শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎ
উপন্যাস সমগ্র



মণ্ডল প্রকাশন

মণ্ডল এন্ড সন্স
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

SARAT UPANYAS SAMAGRA
• MANDAL SAMSKARAN •

প্রথম প্রকাশ ঃ ফাল্গুন, ১৩৬৭
দ্বিতীয় মুদ্রণঃ ফাল্গুন, ১৩৯৫

প্রকাশকের নিবেদন ।।

বাংলা সাহিত্য জগতে কালজয়ী সৃষ্টির শিরোপায় যে কয়জন স্রষ্টা ভূষিত হয়েছেন 'শরৎ'—(কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মধুসূদনের আবির্ভাব হয়েছিল কাব্যের জগতে, যার চরমতম প্রকাশ মেঘনাদবধ-এ। শরৎচন্দ্রের উদয় কিন্তু ভিন্নতর ক্ষেত্রে—সমাজের নির্যাতিত-অবহেলিত সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা-বঞ্চনার কাহিনী রচনা করে, সমাজের ভণ্ডামীর মুখোস খোলার উদ্দেশ্যে।

শরৎ-রচনার বৈশিষ্ট্য হ'ল, তাঁর অনবদ্য সহজ-সরল আটপৌরে ভাষা আর সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ—মনে হয়, তিনি যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতি মুহূর্তের এক দরদী, মরমী সঙ্গী। আমাদের অন্তরের সকল ব্যথাই তাঁর রচনায় সাবলীল।

তাঁর তিরোধানের (১৬-১-১৯৩৮) অর্দ্ধ শতাব্দীকাল পরেও, মানুষের জীবনের বৃহত্তর মূল্যায়ণে আগ্রহী শিক্ষিত শহরবাসী থেকে সরল অল্পশিক্ষিতা গ্রাম্যবধূটি আজও তাই বারবার নিজেদের শরৎ সাহিত্যের অংশীদার ক'রে তোলে।

শরৎ-প্রতিভার বিভিন্ন দিক, তাঁর রচনার সাহিত্যিক মূল্যবোধ বিচার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিদগ্ধ মহলে আজও অ্যানাটমির বিশ্লেষণ চলছে। কিন্তু সাধারণ পাঠকের শরৎ-প্রীতির উচ্ছ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের অবয়বটি যথাযথভাবে অক্ষুণ্ণ রাখার ও আগামী প্রজন্মের হাতে শরৎ সাহিত্যের ঐতিহ্যপূর্ণ ভাণ্ডারটি পৌঁছে দেবার প্রয়াসী হয়েছি।

মূল শরৎরচনার অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রকাশ জাতীয় কর্তব্যের প্রতি অপরাধ। আগামী দিনের অনুসন্ধিৎসু শরৎ পাঠক তা ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখবেন এ আশাও করা যায় না। তাই সমগ্র শরৎ রচনার চট্-জলদি প্রকাশনার মোহে একত্রে সমগ্র প্রকাশের পরিবর্তে, পর্যায়ক্রমে উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশে ব্রতী হয়েছি।

প্রথম প্রয়াস শরৎ-সাহিত্যের একাংশ-বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির সংকলন— 'শরৎ উপন্যাস সমগ্র' আপাতত আপনাদের কাছে পৌঁছে দিলাম, এই আশায় যে, আপনাদের বিচারে উত্তীর্ণ হলেই শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর অবকাশ পেয়েছি বলে ধন্য মনে করবো।

শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল

সূচীপত্র

দত্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সেকালে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলের হেডমাস্টারবাবু বিদ্যালয়ের রত্ন বলিয়া যে তিনটি ছেলেকে নির্দেশ করিতেন, তাহারা তিনখানি বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রত্যহ এক ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পড়িতে আসিত। তিনজনের কি ভালবাসাই ছিল! এমন দিন ছিল না, যেদিন এই তিনটি বন্ধুতে স্কুলের পথে ন্যাড়া বটতলায় একত্র না হইয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিত! তিন জনেরই বাড়ি ছিল হুগলির পশ্চিমে। জগদীশ আসিত সরস্বতীর পুল পার হইয়া দিঘড়া গ্রাম হইতে, এবং বনমালী ও রাসবিহারী আসিত দুইখানি পাশাপাশি গ্রাম কৃষ্ণপুর ও রাধাপুর হইতে। জগদীশ যেমন ছিল সবচেয়ে মেধাবী, তাহার অবস্থাও ছিল সবচেয়ে মন্দ। পিতা একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। যজমানি করিয়া, বিয়া-পৈতা দিয়াই সংসার চালাইতেন। বনমালীরা সংগতিপন্ন জমিদার। তাহার পিতাকে লোকে বিত্তশালী ব্যক্তি বলিয়াই জানিত, অথচ পল্লীগ্রামের সরল জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। রাসবিহারীদের অবস্থাও বেশ সচ্ছল। জমিজমা চাষবাস পুকুর-বাগান, পাড়াগাঁয়ে যাহা থাকিলে সংসার চলিয়া যায়—সবই ছিল। এ সকল থাকা সত্ত্বেও যে ছেলেরা কোন শহরে বাসা ভাড়া না করিয়া—ঝড় নাই, জল নাই, শীত-গ্রীষ্ম মাথায় পাতিয়া এতটা পথ হাঁটিয়া প্রত্যহ বাটী হইতে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করিত, তাহার কারণ, তখনকার দিনে কোন পিতামাতাই ছেলেদের এই ক্লেশ-স্বীকার করাটাকে ক্লেশ বলিয়াই ভাবিতে পারিতেন না; বরঞ্চ মনে করিতেন, এতটুকু দুঃখ না করিলে সরস্বতী ধরা দিবেন না। তা কারণ যাই হোক, এমনি করিয়াই ছেলে তিনটি এন্ট্রান্স পাশ করিয়াছিল। বটতলায় বসিয়া ন্যাড়া বটকে সাক্ষী করিয়া তিন বন্ধুতে প্রতিদিন এই প্রতিজ্ঞা করিত, জীবনে কখনও তাহারা পৃথক হইবে না, কখনও বিবাহ করিবে না, এবং উকিল হইয়া তিনজনেই একটা বাড়িতে থাকিবে; টাকা রোজগার করিয়া সমস্ত টাকা একটা সিন্দুকে জমা করিবে, এবং তাই দিয়া দেশের কাজ করিবে।

এই ত গেল ছেলেবেলার কল্পনা; কিন্তু যেটা কল্পনা নয়, সত্য, সেটা অবশেষে কিরূপ দাঁড়াইল, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি। বন্ধুত্বের প্রথম পাক্‌টা এলাইয়া গেল বি. এ. ক্লাসে। কলিকাতায় কেশব সেনের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ। বক্তৃতার বড় জোর। সে জোর পাড়াগাঁয়ের ছেলে তিনটি হঠাৎ সামলাইতে পারিল না—ভাসিয়া গেল! গেল বটে, কিন্ত বনমালী এবং রাসবিহারী যেরূপ প্রকাশ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইল, জগদীশ সেরূপ পারিল না—ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে সর্বাপেক্ষা মেধাবী বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত। তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পিতা তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু ও দুটির সে বালাই ছিল না। কিছুকাল পূর্বে পিতার পরলোক প্রাপ্তিতে বনমালী তখন কৃষ্ণপুরের জমিদার, এবং রাসবিহারী তাহাদের রাধাপুরের সমস্ত বিষয়-আশয়ের একচ্ছত্র সম্রাট্‌। অতএব অনতিকাল পরেই এই দুই বন্ধু ব্রাহ্ম-পরিবারে বিবাহ করিয়া বিদুষী ভার্যা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দরিদ্র জগদীশের সে সুবিধা হইল না। তাহাকে যথাসময়ে আইন পাশ করিতে হইল, এবং এক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের এগারো বছরের কন্যাকে বিবাহ করিয়া অর্থোপার্জনের নিমিত্ত এলাহাবাদে চলিয়া যাইতে হইল। কিন্তু যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের যে কাজ কলিকাতায় নিতান্ত সহজ মনে হইয়াছিল, গ্রামে ফিরিয়া তাহাই একান্ত কঠিন ঠেকিল। বৌ-মানুষ শ্বশুরবাড়ি আসিয়া ঘোমটা দেয় না, জুতামোজা পরিয়া রাস্তায় বাহির হয়—তামাশা দেখিতে পাঁচখানা গ্রামের লোক ভিড় করিয়া আসিতে লাগিল; এবং গ্রাম জুড়িয়া এম্‌নি একটা কদর্য হৈ হৈ শব্দ হইয়া

গেল যে, একান্ত নিরুপায় না হইলে আর কেহ স্ত্রী লইয়া সেখানে বাস করিতে পারে না। বনমালীর উপায় ছিল, সুতরাং সে গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিল; এবং একমাত্র জমিদারির উপর নির্ভর না করিয়া ব্যবসা শুরু করিয়া দিল। কিন্তু রাসবিহারীর অল্প আয়। কাজেই সে নিজের পিঠের উপর একটা এবং বিদুষী ভার্যার পিঠের উপর একটা কুলা চাপা দিয়া কোনমতে তাহার দেশের বাটীতেই 'একঘরে' হইয়া বসিয়া রহিল। অতএব এই তিন বন্ধুর একজন এলাহাবাদে, একজন রাধাপুরে এবং আর একজন কলিকাতায় বাসা করায়, আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া, এক বাড়িতে বাস করিয়া, এক সিন্দুকে টাকা জমা করিয়া দেশ উদ্ধার করার প্রতিজ্ঞাটা আপাততঃ স্থগিত রহিল; এবং যে ন্যাড়া বটবৃক্ষ সাক্ষ্য ছিলেন, তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন না করিয়া নীরবে মনে মনে বোধ করি হাসিতে লাগিলেন। এইভাবে অনেক দিন গেল। ইতিমধ্যে তিন বন্ধুর কদাচিৎ কখনও দেখা হইত বটে, কিন্তু ছেলেবেলার প্রণয়টা একেবারে তিরোহিত হইল না। জগদীশের ছেলে হইলে সে বনমালীকে সুসংবাদ দিয়া এলাহাবাদ হইতে লিখিল, 'তোমার মেয়ে হইলে তাহাকে পুত্রবধূ করিয়া, ছেলেবেলায় যে পাপ করিয়াছি, তাহার কতক প্রায়শ্চিত্ত করিব। তোমার দয়াতেই আমি উকীল হইয়া সুখে আছি, এ-কথা কোন দিন ভুলি নাই।'

বনমালী তাহার উত্তরে লিখিলেন, 'বেশ। তোমার ছেলের দীর্ঘজীবন কামনা করি। কিন্তু আমার মেয়ে হওয়ার কোন আশাই নাই। তবে, যদি কোন দিন মঙ্গলময়ের আশীর্বাদে সন্তান হয়, তোমাকে দিব।' চিঠি লিখিয়া বনমালী মনে মনে হাসিল। কারণ বছর-দুই পূর্বে তাহার অপর বন্ধু রাসবিহারীর যখন ছেলে হয়, সেও ঠিক এই প্রার্থনাই করিয়া ছিল। বাণিজ্যের কৃপায় সে এখন মস্ত ধনী। সবাই তাহার মেয়েকে ঘরে আনিতে চায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দু'মাস-ছ'মাসের কথা নয়, পঁচিশ বৎসরের কাহিনী বলিতেছি। বনমালী প্রাচীন হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতে রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া এইবার শয্যা আশ্রয় করিয়া টের পাইয়াছিলেন, আর বোধ হয় উঠিতে হইবে না। তিনি চিরদিনই ভগবৎপরায়ণ ও ধর্মভীরু। মরণে তাঁহার ভয় ছিল না। শুধু একমাত্র সন্তান বিজয়ার বিবাহ দিয়া যাইবার অবকাশ ঘটিল না মনে করিয়াই কিছু ক্ষুণ্ণ ছিলেন। সেদিন অপরাহ্নকালে হঠাৎ বিজয়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিয়াছিলেন, মা, আমার ছেলে নেই ব'লে আমি এতটুকু দুঃখ করিনে। তুই আমার সব। এখনো তোর আঠারো বৎসর বয়স পূর্ণ হয়নি বটে, কিন্তু তোর এইটুকু মাথার উপর আমার এত বড় বিষয়টা রেখে যেতেও আমার একবিন্দু ভয় হয় না। তোর মা নেই, ভাই নেই, একটা খুড়ো-জ্যাঠা পর্যন্ত নেই। তবু আমি নিশ্চয় জানি, আমার সমস্ত বজায় থাকবে। শুধু একটা অনুরোধ ক'রে যাই মা, জগদীশ যাই করুক আর যাই হোক, সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তাকে ভালবাসি—এই কথাটা ভুলিস নে মা। তার একটি ছেলে আছে—তাকে চোখে দেখিনি, কিন্তু শুনেছি সে বড় সৎ ছেলে। বাপের দোষে সে যেন না দণ্ড ভোগ করে, এই আমার অনুরোধ।

বিজয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়াছিল, বাবা, তোমার আদেশ আমি কোন দিন অমান্য করব না। জগদীশবাবু যতদিন বাঁচবেন, তাঁকে তোমার মতই মান্য করব; কিন্তু তাঁর অবর্তমানে, সমস্ত বিষয় মিছামিছি তাঁর ছেলেকে কেন ছেড়ে দেব? তাঁকে তুমিও কখনো চোখে দেখনি, আমিও দেখিনি। আর যদি সত্যিই তিনি লেখাপড়া শিখে থাকেন, অনায়াসেই পিতৃ-ঋণ শোধ করতে পারবেন।

বনমালী মেয়ের মুখের পানে চোখ তুলিয়া কহিয়াছিলেন, ঋণ ত কম নয় মা। ছেলেমানুষ, এ যদি না শুধতে পারে?

মেয়ে জবাব দিয়াছিল, যে না পারে, সে কুসন্তান বাবা, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।

বনমালী তাঁহার এই সুশিক্ষিতা তেজস্বিনী কন্যাকে চিনিতেন। তাই আর পীড়াপীড়ি করেন নাই; শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, সমস্ত কাজকর্মে ভগবানকে মাথার উপর রেখে যা কর্তব্য, তাই করো মা। তোমাকে বিশেষ কোন আদেশ দিয়ে আমি আবদ্ধ করে যেতে চাইনে। বলিয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিয়াছিলেন, জানিস মা বিজয়া, এই জগদীশ যখন একটা মানুষের মত মানুষ ছিল, তখন তুই না জন্মাতেই সে তোকে তার এই ছেলেটির নাম কোরে চেয়ে নিয়েছিল। আমিও মা, কথা দিয়েছিলাম; বলিয়া তিনি যেন উৎসুক দৃষ্টিতেই চাহিয়াছিলেন।

তাঁহার এই কন্যাটি শিশুকালেই মাতৃহীন হইয়াছিল বলিয়া তিনিই তাহার পিতামাতা উভয়ের স্থান পূর্ণ করিয়াছিলেন। তাই বিজয়া পিতার কাছে মায়ের আবদার করিতেও কোন দিন সঙ্কোচ বোধ করে নাই; কহিয়াছিল, বাবা, তুমি তাঁকে শুধু মুখের কথাই দিয়েছিলে, তোমার মনের কথা দাওনি।

কেন মা?

তা দিলে কি একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখতেও চাইতে না?

বনমালী বলিয়াছিলেন, রাসবিহারীর কাছে যখন শুনেছিলাম, ছেলেটি নাকি তার মায়ের মতই দুর্বল—এমন কি, ডাক্তারেরা তার দীর্ঘজীবনের কোন আশাই করেন না, তখন তাকে কাছে পেয়েও একবার আনিয়ে দেখতে চাইনি। এই কলকাতা শহরেই কোন্ একটা বাসায় থেকে সে তখন বি. এ. পড়ত। তার পরে নিজের নানান অসুখে-বিসুখে সে কথা আর ভাবিনি। কিন্তু এখন দেখছি, সেটাই আমার মস্ত ক্ষতি হয়ে গেছে মা। তবু, তোকে সত্যি বলছি বিজয়া, সে-সময় জগদীশকে তোর সম্বন্ধে আমার মনের কথাই দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ থামিয়া বলিয়াছিলেন, আজ জগদীশকে সবাই জানে—একটা অকর্মণ্য জুয়াড়ি, অপদার্থ মাতাল। কিন্তু এই জগদীশই একদিন আমাদের সকলের চেয়েই ভাল ছেলে ছিল। বিদ্যাবুদ্ধির জন্য বলছি না, মা, সে অনেকেরই থাকে; কিন্তু এমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে আমি কাউকে দেখিনি; এই ভালবাসাই তার কাল হয়েছে। তার অনেক দোষ আমি জানি, কিন্তু যখনি মনে পড়ে, স্ত্রীর মৃত্যুতে সে শোকে পাগল হয়ে গেছে, তখন তোর মায়ের কথা স্মরণ ক'রে আমি ত মা তাকে মনে মনে শ্রদ্ধা না ক'রে পারিনে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সতী-লক্ষ্মী। তিনি মৃত্যুকালে নরেনকে কাছে ডেকে শুধু বলেছিলেন, বাবা, শুধু এই আশীর্বাদই ক'রে যাই, যেন ভগবানের ওপর তোমার অচল বিশ্বাস থাকে। শুনেছি নাকি মায়ের এই শেষ আশীর্বাদটুকু নিষ্ফল হয়নি। নরেন এইটুকু বয়সেই ভগবানকে তার মায়ের মতই ভালবাসতে শিখেছে। যে এ পেরেছে, সংসারে আর তার বাকী কি আছে মা?

বিজয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, এইটাই কি সংসারে সব চেয়ে বড় পারা বাবা?

মরণ প্রতীক্ষায় বনমালীর দিন কাটিতেছিল, কন্যার প্রশ্নে তাঁহার শুষ্ক চক্ষু সজল হইয়া উঠিয়াছিল। দুই হাত বাড়াইয়া মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, এইটিই সবচেয়ে বড় পারা মা! সংসারের মধ্যে, সংসারের বাইরে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এত বড় পারা আর কিছু নেই বিজয়া। তুমি নিজে কোন দিন পারো আর না পারো, এ যে পারে, তার পায়ে যেন মাথা পাততে পারো—আমিও মরণকালে তোমাকে এই আশীর্বাদ করে যাই।

পিতৃবক্ষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সেদিন বিজয়ার মনে হইয়াছিল, কে যেন বড় মধুর, বড় উজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়া তাহার পিতার বুকের ভিতর হইতে তাহার নিজের বুকের গভীর অন্তস্তল পর্যন্ত চাহিয়া দেখিতেছে। এই অভূতপূর্ব পরমাশ্চর্য অনুভূতি সেদিন ক্ষণকালের জন্য তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ছিল। বনমালী কহিয়াছিলেন, ছেলেটির নাম নরেন। তার বাপের মুখে শুনেছি, সে ডাক্তার হয়েছে—কিন্তু ডাক্তারি করে না। এখন যদি এ দেশে সে থাকতো, এই সময়ে একবার তাকে আনিয়ে চোখের দেখা দেখে নিতাম।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এখন তিনি কোথায় আছেন?

বনমালী বলিয়াছিলেন, তার মামার কাছে—বর্মায়। জগদীশের এখন ত আর সব

কথা গুছিয়ে বলবার ক্ষমতা নেই, তবু তার মুখের দুই-একটা ভাসা ভাসা কথায় মনে হয়, যেন সে ছেলে তার মায়ের সমস্ত সদ্‌গুণই পেয়েছে। ভগবান করুন, যেখানে যেমন করেই থাক যেন বেঁচে থাকে।

সন্ধ্যা হইয়াছিল। ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া, বিলাসবাবুর আগমন-সংবাদ জানাইয়া গেলে, বনমালী বলিয়াছিলেন, তবে তুমি নীচে যাও মা, আমি একটু বিশ্রাম করি।

বিজয়া পিতার শিয়রের বালিশগুলি গুছাইয়া দিয়া, পায়ের উপর শালখানি যথাস্থানে টানিয়া দিয়া, আলোটা চোখের উপর হইতে আড়াল করিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেলে, পিতার জীর্ণ বক্ষ ভেদিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িয়াছিল। সেদিন বিলাসের আগমন-সংবাদে কন্যার মুখের উপর যে আরক্ত আভাটুকু দেখা দিয়াছিল, বৃদ্ধকে তাহা ব্যথাই দিয়াছিল।

বিলাসবিহারী রাসবিহারীর পুত্র। সে এই কলকাতা শহরে থাকিয়া বহুদিন যাবৎ প্রথমে এফ. এ. এবং পরে বি এ. পড়িতেছে। বনমালী সমাজ ত্যাগ করিয়া অবধি বড় একটা দেশে যাইতেন না। যদিচ ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশেও জমিদারি অনেক বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সে-সমস্ত তত্ত্বাবধানের ভার বাল্যবন্ধু রাসবিহারীর উপরেই ছিল। সেই সূত্রেই বিলাসের এ বাটীতে আসা-যাওয়া আরম্ভ হইয়া কিছুদিন হইতে অন্য যে-কারণে পর্যবসিত হইয়াছিল, তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মাস-দুই হইল বনমালীর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার কলিকাতার এত বড় বাড়িতে বিজয়া এখন একা। তাহার দেশের বিষয়-সম্পত্তির দেখাশুনা রাসবিহারীই করিতে লাগিলেন, এবং সেই সূত্রে তাহার একপ্রকার অভিভাবক হইয়াও বসিলেন। কিন্তু নিজে থাকেন গ্রামে, সেই জন্য পুত্র বিলাসবিহারীর উপরেই বিজয়ার সমস্ত খবরদারির ভার পড়িল। সে-ই তাহার প্রকৃত অভিভাবক হইয়া উঠিল।

তখন এই সময়টায়, প্রতি ব্রাহ্ম-পরিবারে 'সত্য', 'সুনীতি', 'সুরুচি' এই শব্দগুলো বেশ বড় করিয়াই শিখানো হইত। কারণ বিদেশে পড়িতে আসিয়া হিন্দু যুবকেরা যখন পিতামাতার বিরুদ্ধে, দেবদেবীর বিরুদ্ধে, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এই সমাজের বাঁধানো খাতায় নাম লিখাইয়া বসিত, তখন এই শব্দগুলোই চাড়া দিয়া তাহাদের কাঁচা মাথা ঘাড়ের উপর সোজা করিয়া রাখিত—ঝুঁকিয়া ভাঙিয়া পড়িতে দিত না। তাহারা কহিত, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, তাহাই করিবে। মায়ের অশ্রুজলই বল, আর বাপের দীর্ঘনিশ্বাসই বল, কিছুই দেখিবার শুনিবার প্রয়োজন নাই। ও-সব দুর্বলতা সর্বপ্রযত্নে পরিহার করিবে, নচেৎ আলোকের সন্ধান পাইবে না, কথাগুলো বিজয়াও শিখিয়াছিল।

আজ গ্রাম হইতে বিলাসবাবু বৃদ্ধ মাতাল জগদীশের মৃত্যু-সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন। বিজয়ার সে পিতৃবন্ধু বটে, কিন্তু বিলাসবাবু যখনই বলিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া জগদীশ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া ছাদের উপর হইতে পড়িয়া মরিয়াছে, তখন ব্রাহ্মধর্মের সুনীতি স্মরণ করিয়া বিজয়া এই দুর্ভাগা পিতৃসখার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না। বিলাস বলিতে লাগিল, জগদীশ মুখুয্যে আমার বাবারও ছেলেবেলার বন্ধু ছিলেন; কিন্তু তিনি তার মুখ পর্যন্ত দেখতেন না। টাকা ধার করতে দুবার এসেছিল, বাবা চাকর দিয়ে তাকে ফটকের বার ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি সর্বদা বলেন, এই সব দুর্নীতিপরায়ণ লোকগুলোকে প্রশ্রয় দিলে, মঙ্গলময় ভগবানের শ্রীচরণে অপরাধ করা হয়।

বিজয়া সায় দিয়া কহিল, অতি সত্য কথা।

বিলাস উৎসাহিত হইয়া বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল, বন্ধুই হোক, আর যেই

হোক, দুর্বলতা-বশে কোনমতেই ব্রাহ্মসমাজের চরম আদর্শকে ক্ষুন্ন করা উচিত নয়। জগদীশের সমস্ত সম্পত্তি এখন ন্যায়তঃ আমাদের। তার ছেলে পিতৃঋণ শোধ করতে পারে ভাল, না পারে, আইনমত আমাদের এই দণ্ডেই সমস্ত হাতে নেওয়া উচিত। বস্তুতঃ ছেড়ে দেবার আমাদের কোন অধিকার নেই। কারণ এই টাকায় আমরা অনেক সৎকার্য করতে পারি। সমাজের কোন ছেলেকে বিলাত পর্যন্ত পাঠাতে পারি; ধর্ম-প্রচারে ব্যয় করতে পারি; কত কি করতে পারি। কেন তা না করব বলুন? তা ছাড়া জগদীশবাবু কিংবা তাঁর ছেলে আমাদের সমাজভুক্ত নয় যে, তাকে দয়া করা আবশ্যক। আপনার সম্মতি পেলেই বাবা সমস্ত ঠিক ক'রে ফেলবেন বলে আজ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

বিজয়া মৃত পিতার শেষ কথাগুলা স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিল—সহসা জবাব দিতে পারিল না। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বিলাস সজোরে প্রবলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না, না, আপনাকে ইতস্ততঃ করতে আমি কোন মতেই দেব না। দ্বিধা, দুর্বলতা—পাপ! শুধু পাপ নয়, মহাপাপ! আমি মনে মনে সংকল্প করেছি, তার বাড়িটায় আপনার নাম ক'রে—যা কোথাও নেই, কোথাও হয়নি—আমি তাই করব। পাড়াগাঁয়ের মধ্যে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে দেশের হতভাগ্য মূর্খ লোকগুলোকে ধর্মশিক্ষা দেব। আপনি একবার ভেবে দেখুন দেখি, এদের মূর্খতার জ্বালাতেই বিরক্ত হয়ে আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব দেশ ছেড়েছিলেন কি না। তাঁর কন্যা হয়ে কি আপনার উচিত নয়—এই নোব্‌ল প্রতিশোধ নিয়ে তাদেরই এই চরম উপকার করা! বলুন, আপনি এ কথার উত্তর দিন।

বিজয়া বিচলিত হইয়া উঠিল। বিলাস দৃপ্তস্বরে বলিতে লাগিল, সমস্ত দেশের মধ্যে একটা কত বড় নাম, কত বড় সাড়া প'ড়ে যাবে, ভেবে দেখুন দেখি? হিন্দুদের স্বীকার করতেই হবে—সে ভার আমার উপর—যে, ব্রাহ্মসমাজে মানুষ আছে; হৃদয় আছে, স্বার্থত্যাগ আছে; যাঁকে তারা নির্যাতন ক'রে দেশ থেকে বিদায় ক'রে দিয়েছিল, সেই মহাত্মারই মহীয়সী কন্যা তাদেরই মঙ্গলের জন্যে এই বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় একটা কি বিরাট্ ময়্যাল এফেক্ট হবে, বলুন দেখি। বলিয়া বিলাসবিহারী সম্মুখের টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিল। শুনিতে শুনিতে বিজয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। বাস্তবিক, এত-বড় নামের লোভ সংবরণ করা আঠারো বছরের মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। তথাপি, পিতার কথাগুলি স্মরণ করিয়া সে দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর ছেলের নাম শুনেচি নরেন্দ্র। এখন সে কোথায় আছে, জানেন?

জানি। হতভাগ্য পিতার মৃত্যুর পরে সে বাড়ি এসে এখন দেশেই আছে।

আপনার সঙ্গে বোধ হয় আলাপ আছে?

আলাপ? ছিঃ! আপনি আমাকে কি মনে করেন বলুন দেখি! বলিয়া বিজয়াকে একেবারে অপ্রতিভ করিয়া দিয়া বিলাসবাবু একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমি ত ভাবতেই পারিনে যে, জগদীশ মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে আলাপ করছি। তবে, সেদিন রাস্তায় হঠাৎ একটা পাগলের মত নূতন লোক দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। শুনলাম, সেই নরেন মুখুয্যে।

বিজয়া কৌতূহলী হইয়া কহিল, পাগলের মত? শুনেছি নাকি ডাক্তার?

বিলাসবাবু ঘৃণায় সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, ঠিক পাগলের মত। ডাক্তার? আমি বিশ্বাস করিনে। মাথায় বড় বড় চুল—যেমন লম্বা তেমনি রোগা। বুকের প্রত্যেক পাঁজরাটি বোধ করি দূর থেকে গোণা যায়—এই ত চেহারা। তালপাতার সেপাই! ছোঃ—

বস্তুতঃ চেহারা লইয়া গর্ব করিবার অধিকার বিলাসের ছিল। কারণ সে বেঁটে, মোটা এবং ভারি জোয়ান। তাহার বুকের পাঁজর বোমা মারিয়া নির্দেশ করা যাইত না। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, বিজয়া বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বিলাসবাবু, জগদীশবাবুর বাড়িটা যদি আমরা সত্যই দখল ক'রে নিই, গ্রামের মধ্যে কি একটা বিশ্রী গোলমাল উঠবে না?

বিলাস জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, একেবারে না। আপনি পাঁচ-সাতখানা গ্রামের মধ্যে এমন একজনও পাবেন না, যার ঐ মাতালটার উপর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল। আহা বলে, এমন লোক ও-অঞ্চলে নেই। একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু তাও যদি না হ'ত আমি

বেঁচে থাকা পর্যন্ত সে চিন্তা আপনার মনে আনাও উচিত নয়। কিন্তু আমি বলি, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও আপনার একবার দেশে যাওয়া কর্তব্য।

বিজয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আমরা কখনই ত সেখানে যাইনে।

বিলাস জোর দিয়া বলিল, সেই জন্যেই ত বলি, আপনার যাওয়া চাই-ই! প্রজাদের একবার তাদের মহারানীকে দেখতে দিন। আমার ত নিশ্চয়ই মনে হয়, এ সৌভাগ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা অপরাধ।

লজ্জায় বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে আনত মুখে কি-একটা বলিবার উপক্রম করিতেই, বিলাস বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, ইতস্ততঃ করবার এতে কিচ্ছু নেই। একবার ভেবে দেখুন দিকি, কত কাজ সেখানে আপনার করবার আছে! এ-কথা আজ আপনার মুখের ওপরেই আমি বলতে পারি, যে আপনার বাবা সমস্ত দেশের মালিক হয়েও যে কতকগুলো ক্ষেপা কুকুরের ভয়ে আর কখনো গ্রামে ফিরে গেলেন না, সে কি ভাল কাজ করেছিলেন? এই কি আমাদের ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ? এ যে কোন সমাজেরই আদর্শ নয়, তাতে আর ভুল কি!

বিজয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু বাবার মুখে শুনেছি, আমাদের দেশের বাড়ি ত বাস করবার উপযুক্ত নয়।

বিলাস বলিল, আপনি হুকুম দিন, একবার বলুন সেখানে যাবেন—আমি দশ দিনের মধ্যে তাকে বাসের উপযুক্ত ক'রে দেব। আমার উপর নির্ভর করুন, যাতে সে বাড়ি আপনার মর্যাদা সম্পূর্ণ বহন করতে পারে, আমি প্রাণপণে তার বন্দোবস্ত ক'রে দেব। দেখুন, একটা কথা আমার বহুদিন থেকে বার বার মনে হয়—আপনাকে শুধু সামনে রেখে আমি কি যে ক'রে তুলতে পারি, তার বোধ করি সীমা-পরিসীমা নেই।

বিজয়াকে সম্মত করাইয়া বিলাস প্রস্থান করিলে, সে সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। যাহা তাহার দেশ, সেখানে সে জন্মাবধি কখনও যায় নাই বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে পিতার মুখে তাহার কত বর্ণনাই না শুনিয়াছে। দেশের গল্প করিতে তাঁহার উৎসাহ ও আনন্দ ধরিত না। কিন্তু তখন সে-সকল কাহিনী তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না; যেমন শুনিত, তেমনি ভুলিত। কিন্তু আজ কোথা হইতে অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিয়া সেই সব বিস্মৃত বিবরণ একেবারে আকার ধরিয়া তাহার চোখের উপর দেখা দিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহাদের গ্রামের বাড়ি কলিকাতার এই অট্টালিকার মত বৃহৎ ও জমকালো নয় বটে, কিন্তু সেই ত তাহার সাতপুরুষের বাস্তুভিটা! সেখানে পিতামহ-পিতামহী, প্রপিতামহ-প্রপিতামহী, তাঁদেরও বাপ-মা, এমন কত পুরুষের সুখে-দুঃখে উৎসবে-ব্যসনে যদি দিন কাটিয়া থাকে, তবে তাহারই বা কাটিবে না কেন?

গলির সুমুখে হাজরাদের তেতলা বাড়ির আড়ালে সূর্য অদৃশ্য হইল। এই লইয়া পিতার সঙ্গে তাহার কত দিন কত কথা হইয়া গেছে। তাহার মনে পড়িল, কত সন্ধ্যায় তিনি ওই ইজিচেয়ারটার উপর বসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, বিজয়া আমার দেশের বাড়িতে কখনও এ-দুঃখ পাইনি। সেখানে কোন হাজরার তেতলা-ছাদই আমার শেষ সূর্যাস্তটুকুকে এমন কোরে কোনদিন আড়াল ক'রে দাঁড়ায় নি। তুই ত জানিস নে মা, কিন্তু আমার যে চোখ-দুটি এই বুকের ভেতর থেকে উঁকি মেরে চেয়ে আছে, তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমাদের ফুলবাগানের ধারের ছোট্ট নদীটি এতক্ষণ সোনার জলে টলটল ক'রে উঠেছে; আর তার পরপারে বাঁশবনের আড়াল থেকে সূর্যিঠাকুর এখনো যাই-যাই করেও গ্রামের মায়া কাটিয়ে যেতে পারেন নি। ঐ ত মা, গলির মোড়ে দেখতে পাচ্ছিস, দিনের কাজ শেষ করে ঘরপানে মানুষের স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে; কিন্তু এই দশ-বারো হাত জমিটুক ছেড়ে তাদের সঙ্গে যাবার ত আর একটুও পথ নেই। এমনি কোরে এই সন্ধ্যা-বেলায় সেখানেও উলটো স্রোত ঘরপানে বয়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু তাব প্রত্যেক গরু-বাছুরটির গোয়ালঘরের পরিচয় পর্যন্ত জানতাম মা। বলিয়া অকস্মাৎ একটা অতি গভীর শ্বাস হৃদয়ের ভিতর হইতে মোচন করিয়া নীরব হইয়া থাকিতেন। যে গ্রাম একদিন তিনি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এত সুখৈশ্বর্যের মধ্যেও যে তাহারই জন্য তাঁহার ভিতরটা কাঁদিতে থাকিত, ইহা যখন তখন বিজয়া টের পাইত। তথাপি, একটা দিনের জন্যও সে ইহার কারণ

চিন্তা করিয়া দেখে নাই; কিন্তু আজ বিলাসবাবু সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চলিয়া গেলে, পরলোকগত পিতৃদেবের কথাগুলা স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার প্রচ্ছন্ন বেদনার হেতু অকস্মাৎ একমুহূর্তেই তাহার মনের মধ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কলিকাতার এই বিপুল জনারণ্যের মধ্যেও তিনি যে কিরূপ একাকী দিন যাপন করিয়া গেছেন, আজ তাহা সে চোখের উপর দেখিতে পাইয়া একেবারে ভয় পাইয়া গেল; এবং আশ্চর্য এই যে, যে গ্রাম, যে ভিটার সহিত তাহার জন্মাবধি পরিচয় নাই, তাহাই আজ তাহাকে দুর্নিবার শক্তিতে টানিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বহুকাল-পরিত্যক্ত জমিদার-বাটী বিলাসের তত্ত্বাবধানে মেরামত হইতে লাগিল। কলিকাতা হইতে অদৃষ্টপূর্ব বিচিত্র আসবাব-সকল গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া নিত্য আসিতে লাগিল। জমিদারের একমাত্র কন্যা দেশে বাস করিতে আসিবেন, এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র শুধু কেবল কৃষ্ণপুরের নয়, রাধাপুর, বজ্রপুর, দিঘ্‌ড়া প্রভৃতি আশপাশের পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে হৈচৈ পড়িয়া গেল। এমনই ত ঘরের পাশে জমিদারের বাস চিরদিনই লোকের অপ্রিয়, তাহাতে জমিদারের না থাকাটাই প্রজাদের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহার বাস করিবার বাসনাটা সকলের কাছেই একটা অন্যায় উৎপাতের মত প্রতিভাত হইল। ম্যানেজার রাসবিহারীর প্রবল শাসনে তাহাদের দুঃখের অভাব ছিল না, আবার জমিদার-কন্যার প্রত্যাবর্তনের শুভ-উপলক্ষে সে যে কোন্‌ নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি করিবে, তাহা হাটে-মাঠে-ঘাটে—সর্বত্রই এক অশুভ আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। পরলোকগত বৃদ্ধ জমিদার বনমালী যতদিন জীবিত ছিলেন, তখন দুঃখের মধ্যেও এই সুখটুকু ছিল যে, কোন গতিকে কলিকাতায় গিয়া একবার তাঁহার কাছে পড়িতে পারিলে, কাহাকেও নিষ্ফল হইয়া ফিরিতে হইত না। কিন্তু জমিদার-কন্যার বয়স অল্প, মাথা গরম; রাসবিহারীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহের জনশ্রুতিও গ্রামে অপ্রচারিত ছিল না—তিনি মেমসাহেব, ম্লেচ্ছ; সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে রাসবিহারীর দৌরাত্ম্য কল্পনা করিয়া কাহারও মনে কিছুমাত্র সুখ রহিল না—পৈতাধারী ব্রাহ্মণেরও না, পৈতাহীন শূদ্রেরও না। এমনি, ভয়ে ভাবনায় বর্ষাটা গেল। শরতের প্রারম্ভেই এক মধুর প্রভাতে মস্ত দুই ওয়েলার বাহিত খোলা ফিটনে চড়িয়া তরুণী জমিদার-কন্যা শত নরনারীর সভয় কৌতূহল দৃষ্টির মাঝখান দিয়া হুগলি স্টেশন হইতে পিতৃ-পিতামহের পুরাতন আবাসস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাঙালীর মেয়ে—আঠারো-উনিশ-কুড়ি পার হইয়া গেছে, তথাপি বিবাহ হয় নাই—সে প্রকাশ্যে জুতামোজা পরে—খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না—ইত্যাদি কুৎসা গ্রামের লোকেরা সংগোপনে করিতে লাগিল, আবার জমিদারের নজর লইয়া একে একে, দুইয়ে দুইয়ে আসিয়া নানাপ্রকার আনন্দ ও মঙ্গল-কামনা জানাইয়াও যাইতে লাগিল। এমন করিয়া পাঁচ-ছয়দিন কাটিবার পরে, সেদিন সকালবেলা বিজয়া চা-পানের পর নীচের বসিবার ঘরে বিলাসবাবুর সহিত বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিতেছিল, বেহারা আসিয়া জানাইল একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে চান।

বিজয়া কহিল, এইখানে নিয়ে এসো।

এই কয়দিন ক্রমাগতই তাহার ইতর-ভদ্র প্রজারা নজর লইয়া যখন-তখন সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল; সুতরাং প্রথমে সে বিশেষ কিছু মনে করে নাই। কিন্তু ক্ষণকাল পরে যে ভদ্রলোকটি বেহারার পিছনে ঘরে প্রবেশ করিল, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্রই বিজয়া বিস্মিত হইল। তাহার বয়স বোধ করি পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে। লোকটি দীর্ঘাঙ্গ, কিন্তু তদনুপাতে হৃষ্টপুষ্ট নয়, বরঞ্চ কৃশ। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, গোঁফদাড়ি কামানো, পায়ে চটিজুতা, গায়ে জামা নাই, শুধু একখানি মোটা চাদরের ফাঁক দিয়া শুভ্র পৈতার গোছা

দেখা যাইতেছে। সে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। ইতিপূর্বে যে-কোন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, শুধু যে নজরের টাকা হাতে লইয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাই নয়, তাহারা সভয়ে, কুণ্ঠার সহিত প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু, এ লোকটির আচরণে সঙ্কোচের লেশমাত্র নাই। তাহার আগমনে শুধু যে বিজয়াই বিস্মিত হইয়াছিল, তাই নয়, বিলাসও কম আশ্চর্য হয় নাই। বিলাসের গ্রামান্তরে বাস হইলেও এ-দিকের সকল ভদ্রলোককেই সে চিনিত; কিন্তু এই যুবকটি তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আগন্তুক ভদ্রলোকটিই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, আমার মামা পূর্ণ গাঙ্গুলীমশাই আপনার প্রতিবেশী, পাশের বাড়িটিই তাঁর। আমি শুনে অবাক হয়ে গেছি যে, তাঁর পিতৃ-পিতামহের কালের দুর্গাপূজো নাকি আপনি এবার বন্ধ ক'রে দিতে চান? এর মানে কি? বলিয়া সে বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। প্রশ্ন এবং তাহা জিজ্ঞাসা করার ধরনে বিজয়া আশ্চর্য এবং মনে মনে বিরক্ত হইল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

তাহার উত্তর দিল বিলাস। সে রুক্ষস্বরে কহিল, আপনি কি তাই মামার হয়ে ঝগড়া করতে এসেছেন নাকি? কিন্তু কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন, সেটা ভুলে যাবেন না।

আগন্তুক হাসিয়া একটুখানি জিভ কাটিয়া কহিল, সে আমি ভুলিনি, এবং ঝগড়া করতেও আসিনি। বরঞ্চ, কথাটা আমার বিশ্বাস হয়নি বলেই ভাল ক'রে জেনে যেতে এসেছি।

বিলাস বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কহিল, বিশ্বাস হয়নি কেন?

আগন্তুক কহিল, কেমন ক'রে হবে বলুন দেখি? নিরর্থক নিজের প্রতিবেশীর ধর্ম-বিশ্বাসে আঘাত করবেন—এ বিশ্বাস না হওয়াই ত স্বাভাবিক।

ধর্মমত লইয়া তর্ক-বিতর্ক বিলাসের কাছে ছেলেবেলা হইতেই অতিশয় উপাদেয়। সে উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া, প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কণ্ঠে কহিল, আপনার কাছে নিরর্থক বোধ হলেই যে কারও কাছে তার অর্থ থাকবে না, কিংবা আপনি ধর্ম বললেই সকলে তাকে শিরোধার্য ক'রে মেনে নেবে, তার কোন হেতু নেই। পুতুলপূজো আমাদের কাছে ধর্ম নয়, এবং তার নিষেধ করাটাও আমরা অন্যায় ব'লে মনে করিনে।

আগন্তুক গভীর বিস্ময়ে বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আপনিও কি তাই বলেন নাকি?

তাহার বিস্ময় বিজয়াকে যেন আঘাত করিল, কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া সে সহজ সুরেই জবাব দিল, আমার কাছে কি আপনি এর বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনবার আশা ক'রে এসেছিলেন?

বিলাস সগর্বে হাস্য করিয়া কহিল, বোধ হয়। কিন্তু, উনি ত বিদেশী লোক—খুব সম্ভব আপনাদের কিছুই জানেন না।

আগন্তুক ক্ষণকাল নীরবে বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া তাহাকেই কহিল, আমি বিদেশী না হলেও, এ গ্রামের লোক নয়—সে কথা ঠিক। তবুও এ আমি সত্যিই আপনার কাছে আশা করিনি। পুতুল-পূজো কথাটা আপনার মুখ থেকে বার না হলেও, সাকার-নিরাকার উপাসনার পুরানো ঝগড়া আমি এখানে তুলব না। আপনারা যে ব্রাহ্ম-সমাজের তা-ও আমি জানি। কিন্তু এ ত সে নয়। গ্রামের মধ্যে এই একটি পূজো। সমস্ত লোক সারা বৎসর এই তিনটি দিনের আশায় পথ চেয়ে ব'সে আছে। এই বলিয়া আর একবার তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, গ্রাম আপনার, প্রজারা আপনার ছেলেমেয়ের মত; আপনার আসার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আনন্দ-উৎসব শতগুণে বেড়ে যাবে, এই আশাই ত সকলে করে। কিন্তু তা না হয়ে, এতবড় দুঃখ, এতবড় নিরানন্দ বিনা অপরাধে আপনার দুঃখী প্রজাদের মাথায় নিজে তুলে দেবেন, এ বিশ্বাস করা কি সহজ? আমি ত বিশ্বাস করতে পারিনি।

বিজয়া সহসা উত্তর দিতে পারিল না। দুঃখী প্রজাদের নামে তাহার কোমল চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না, শুধু বিলাসবাবু বিজয়ার সেই নিঃশব্দ স্নেহার্দ্র-মুখের প্রতি চাহিয়া ভিতরে ভিতরে উষ্ণ এবং উদ্দীপ্ত হইয়া তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিল, আপনি অনেক কথা কইচেন।

সাকার-নিরাকারের তর্ক আপনার সঙ্গে করব, এত অপর্যাপ্ত সময় আমাদের নেই। তা' সে চুলোয় যাক, আপনার মামা একটি কেন, একশ'টা পুতুল গড়িয়ে ঘরে ব'সে পুজো করতে পারেন, তাতে কোন আপত্তিই নেই। শুধু কতকগুলো ঢাক-ঢোল-কাঁসি অহোরাত্র ওঁর কানের কাছে পিটে ওঁকে অসুস্থ ক'রে তোলাতেই আমাদের আপত্তি।

আগন্তুক একটুখানি হাসিয়া কহিল, অহোরাত্র ত বাজে না। তা' সকল উৎসবেই একটু হৈচৈ গণ্ডগোল হয়, বলিয়া বিজয়াকে বিশেষ করিয়া উদ্দেশ করিয়া বলিল, অসুবিধে যদি কিছু হয়, না হয় হ'লই। আপনারা মায়ের জাত, এদের আনন্দের অত্যাচার আপনি সইবেন না ত কে সইবে?

বিজয়া তেমনি নিরুত্তরেই বসিয়া রহিল। বিলাস শ্লেষের শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, আপনি ত কাজ আদায়ের ফন্দিতে ছেলেমেয়ের উপমা দিলেন, শুনতেও মন্দ লাগল না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আপনি নিজেই যদি মুসলমান হয়ে মামার কানের কাছে মহরম শুরু ক'রে দিতেন, তাঁর সেটা ভাল বোধ হ'ত কি? তা' সে যাই হোক, বকাবকি করবার সময় নেই আমাদের, বাবা যে হুকুম দিয়েছেন, তাই হবে। কলকাতা থেকে ওঁকে দেশে এনে, মিছামিছি একরাশ ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজিয়ে ওঁর কানের মাথা খেয়ে ফেলতে আমরা দেব না—কিছুতেই না।

তাহার অভদ্র ব্যঙ্গ ও উষ্মার আতিশয্যে আগন্তুকের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বিলাসের মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কহিল, আপনার বাবা কে এবং তাঁর নিষেধ করবার কি অধিকার, আমার জানা নেই; কিন্তু আপনি যে মহরমের অদ্ভুত উপমা দিলেন, এটা হিন্দুর রোশনচৌকি না হয়ে সেই মুসলমানদের মহরমের কাড়া-নাকাড়ার বাদ্য হ'লে কি করতেন শুনি? এ শুধু নিরীহ স্বজাতির প্রতি অত্যাচার বৈ ত নয়!

বিলাস অকস্মাৎ চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। চোখ রাঙাইয়া ভীষণকণ্ঠে চেঁচাইয়া কহিল, বাবার সম্বন্ধে তুমি সাবধান হয়ে কথা কও ব'লে দিচ্চি, নইলে এখনি অন্য উপায়ে শিখিয়ে দেব তিনি কে এবং তাঁর কি অধিকার!

আগন্তুক আশ্চর্য হইয়া বিলাসের মুখের প্রতি চাহিল, কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র তাহার মুখে দেখা দিল না। দেখা দিল বিজয়ার মুখে। তাহার বাটীতে বসিয়া তাহারই এক অপরিচিত অতিথির প্রতি এই একান্ত অশিষ্ট আচরণে ক্রোধে, লজ্জায় তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। আগন্তুক মুহূর্তকালমাত্র বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল; পরক্ষণেই তাহাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া বিজয়ার প্রতি চোখ ফিরাইয়া কহিল, আমার মামা বড়লোক নন, তাঁর পুজার আয়োজন সামান্যই। তবুও এইটিই একমাত্র আপনার দরিদ্র প্রজাদের সমস্ত বছরের আনন্দ-উৎসব। হয়ত আপনার কিছু অসুবিধা হবে, কিন্তু তাদের মুখ চেয়ে কি এটুকু আপনি সহ্য ক'রে নিতে পারবেন না?

বিলাস ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া সম্মুখের টেবিলের উপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, না, পারবেন না, একশবার পারবেন না। কতকগুলো মুর্খ চাষার পাগলামি সহ্য করবার জন্যে কেউ জমিদারি করে না। তোমার আর কিছু বলবার না থাকে ত তুমি যাও—মিথ্যে আমাদের সময় নষ্ট কোরো না। বলিয়া সে হাত দিয়া দরজা দেখাইয়া দিল।

তাহার উৎকট উত্তেজনায় ক্ষণকালের জন্য আগন্তুক ভদ্রলোকটি যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সহসা তাহার মুখে প্রত্যুত্তর যোগাইল না। কিন্তু পিতার কাছে বিজয়া নিষ্ফল শিক্ষা পায় নাই—সে শান্ত, ধীরভাবে বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনার বাবা আমাকে মেয়ের মত ভালবাসেন বলেই এ'দের পুজো নিষেধ করেছেন; কিন্তু আমি বলি, হ'লই বা তিন-চার দিন একটু গোলমাল—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই বিলাস তেমনি উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল-সে অসহ্য গণ্ডগোল! আপনি জানেন না বলেই—

বিজয়া হাসিমুখে বলিল, তা হোক গণ্ডগোল—তিন দিন বৈ ত নয়! আর আপনি আমার অসুবিধের ভাবনা ভাবচেন—কিন্তু কলকাতা হ'লে কি করতেন বলুন ত? সেখানে অষ্টপ্রহর কেউ কানের পাশে তোপ দাগতে থাকলেও ত চুপ ক'রে সহ্য করতে হোতো?

বলিয়া আগন্তুক যুবকটির পানে চাহিয়া কহিল, আপনার মামাকে জানাবেন, তিনি প্রতিবার যেমন করেন, এবারেও তেমনি পুজো করুন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

আগন্তুক এবং বিলাসবাবু উভয়েই বিস্ময়ে অবাক হইয়া বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আপনি তবে এখন আসুন, বলিয়া বিজয়া হাত তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিল। অপরিচিত ভদ্রলোকটিও আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধন্যবাদ ও প্রতি-নমস্কার করিয়া এবং বিলাসকেও একটি নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। অবশ্য ক্রুদ্ধ বিলাস আর একদিকে চক্ষু ফিরাইয়া তাহা অগ্রাহ্য করিল; কিন্তু দুজনের কেহই জানিতে পারিল না যে, এই অপরিচিত যুবকটিই তাহাদের সর্বপ্রধান আসামী জগদীশের পুত্র নরেন্দ্রনাথ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সে চলিয়া গেলে, মিনিট-খানেক বিজয়া অন্যমনস্ক ও নীরব থাকিয়া সহসা চকিত হইয়া মুখ তুলিতেই, নিতান্ত অকারণেই তাহার কপোলের উপর একটা ক্ষীণ আরক্ত আভা দেখা দিল। বিলাসের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ না থাকিলে তাহার বিস্ময় ও অভিমানের হয়ত পরিসীমা থাকিত না। বিজয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, আমাদের কথাটা যে শেষ হতেই পেলে না। তা হ'লে তালুকটা নেওয়াই আপনার বাবার মত?

বিলাস জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল—সেইভাবেই কহিল, হুঁ।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এর মধ্যে কোন রকম গোলমাল নেই ত?

বিলাস বলিল, না।

বিজয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল, আজ কি তিনি ও-বেলায় এদিকে আসবেন?

বিলাস কহিল, বলতে পারিনে।

বিজয়া হাসিয়া কহিল, আপনি রাগ করলেন নাকি?

এবার বিলাস মুখ ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে জবাব দিল, রাগ না করলেও পিতার অপমানে পুত্রের ক্ষুণ্ণ হওয়া বোধ করি অস্বাভাবিক নয়।

কথাটা বিজয়াকে আঘাত করিল, তবু সে হাসিমুখেই কহিল, কিন্তু এতে তাঁর মানহানি হয়েছে—এ ভুল ধারণা আপনার কি ক'রে জন্মাল? তিনি স্নেহবশে মনে করেছেন, আমার কষ্ট হবে, কিন্তু কষ্ট হবে না এইটেই শুধু ভদ্রলোককে জানিয়ে দিলুম। এতে মান-অপমানের কথা ত কিছুই নেই বিলাসবাবু!

বিলাসের গাম্ভীর্যের মাত্রা তাহাতে বিন্দুমাত্র কমিল না; সে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, ওটা কথাই নয়। বেশ, আপনার এস্টেটের দায়িত্ব নিজে নিতে চান, নিন, কিন্তু এর পরে বাবাকে আমায় সাবধান ক'রে দিতেই হবে, নইলে পুত্রের কর্তব্যে ত্রুটি হবে।

এই অচিন্তনীয় রূঢ় প্রত্যুত্তরে বিজয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল; এবং কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া অত্যন্ত ব্যথার সহিত কহিল, বিলাসবাবু, এই সামান্য বিষয়টাকে যে আপনি এমন ক'রে নিয়ে এত গুরুতর ক'রে তুলবেন, এ আমি মনেও করিনি। ভাল, আমার বোঝবার ভুলে যদি অন্যায়ই হয়ে থাকে, আমি অপরাধ স্বীকার করছি, ভবিষ্যতে আর হবে না। এই বলিয়া বিজয়া বিলাসের মুখের প্রতি চাহিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। সে ভাবিয়াছিল, ইহার পরে কাহারও কোন কথাই আর থাকিতে পারে না—দোষ-স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সমাপ্তি হইয়া যায়। কিন্তু এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না যে, দুষ্ট ব্রণের মত এমন মানুষও আছে, যাহার বিষাক্ত ক্ষুধা একবার কাহারও ত্রুটির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর কোন মতেই নিবৃত্ত হইতে চাহে না। তাই বিলাস যখন প্রত্যুত্তরে কহিল, তা হ'লে পূর্ণ গাঙ্গুলীকে জানিয়ে পাঠান যে রাসবিহারীবাবু যে হুকুম দিয়েছেন, তার অন্যথা করা আপনার সাধ্য নয়, তখন বিজয়ার দৃষ্টির সম্মুখে এই লোকটির হিংস্র

প্রকৃতিটা একমুহূর্তেই একেবারে পরিস্ফুট হইয়া দেখা দিল। সে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, সেটা কি ঢের বেশী অন্যায় কাজ হবে না? আচ্ছা, আমি নিজেই না হয় চিঠি লিখে তাঁর অনুমতি নিচ্চি।

বিলাস বলিল, এখন অনুমতি নেওয়া-না-নেওয়া দুই-ই সমান। আপনি যদি তাঁকে সমস্ত গ্রামের মধ্যে অশ্রদ্ধার পাত্র ক'রে তুলতে চান, আমাকেও তা হ'লে অত্যন্ত অপ্রিয় কর্তব্য পালন করতে হবে।

বিজয়ার অন্তরটা অকস্মাৎ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু সে আত্মসংযম করিয়া ধীরভাবে প্রশ্ন করিল, এই কর্তব্যটা কি শুনি?

বিলাস বলিল, আপনার জমিদারি শাসনের মধ্যে তিনি যেন আর হাত না দেন।

আপনার নিষেধ তিনি শুনবেন, আপনি মনে করেন?

অন্ততঃ সেই চেষ্টাই আমাকে করতে হবে।

বিজয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অন্য দিকে চাহিয়া, তেমনি শান্তকণ্ঠেই জবাব দিল, বেশ, আপনি যা পারেন করবেন; কিন্তু অপরের ধর্ম-কর্মে আমি বাধা দিতে পারব না।

তাহার কণ্ঠস্বরের মৃদুতা সত্ত্বেও তাহার ভিতরের ক্রোধ গোপন রহিল না। বিলাস তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনার বাবা কিন্তু এ কথা বলতে সাহস করতেন না।

বিজয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিল; কহিল, আমার বাবার কথা আপনার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি বিলাসবাবু। কিন্তু সে নিয়ে তর্ক ক'রে কি হবে? আমার স্নানের বেলা হ'ল, আমি উঠলুম। বলিয়া সে সমস্ত বাগ্‌বিতণ্ডা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্রই ক্রোধোন্মত্ত বিলাসের মুখের উপর হইতে তাহার ধার-করা ভদ্রতার মুখোশ একমুহূর্তে খসিয়া পড়িল। সে নিজেও স্বভাবটাকে একেবারে অনাবৃত উলঙ্গ করিয়া দিয়া, নিরতিশয় কটুকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি নেমকহারাম।

বিজয়া পা বাড়াইয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, পলকমাত্র এই বর্বরটার মুখের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলাস শুষ্ক হইয়া উঠিল।

সে যে পিতৃভক্তির আতিশয্যবশতঃই বিবাদ করিতেছিল, এ ভ্রম যেন কেহ না করেন। এ সকল লোকের স্বভাবই এই যে, ছিদ্র পাইলেই তাহাকে নিরর্থক বড় করিয়া দুর্বলকে পীড়া দিতে, ভীতকে আরও ভয় দেখাইয়া ব্যাকুল করিয়া তুলিতেই আনন্দ অনুভব করে—তা সে যাই থাক এবং হেতু যত অসংলগ্নই হোক। কিন্তু বিজয়া যখন তিলার্ধ অবনত না হইয়া তাহাকেই তুচ্ছ করিয়া দিয়া ঘৃণাভরে চলিয়া গেল, তখন এই গায়ে-পড়া কলহের সমস্ত ক্ষুদ্রতা তাহাকে তাহার নিজের কাছেও অত্যন্ত ছোট করিয়া ফেলিল। সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া, মুখখানা কালি করিয়া আস্তে আস্তে বাড়ি চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণকালে রাসবিহারী ছেলে সঙ্গে করিয়া দেখা করিতে আসিলেন। বলিলেন, কাজটা ভাল হয়নি মা। আমার হুকুমের বিরুদ্ধে হুকুম দেওয়ায় আমাকে ঢের বেশী অপ্রতিভ করা হয়েছে। তা যাক, বিষয় যখন তোমার, তখন এ কথা নিয়ে আর অধিক ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইনে। কিন্তু বারংবার এ রকম ঘটলে আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে আমাকে তফাত হতেই হবে, তা জানিয়ে রাখছি।

বিজয়া কোন উত্তর দিল না; বরঞ্চ মৌনমুখে সে অপরাধটা একরকম স্বীকার করিয়াই লইল। রাসবিহারী তখন কোমল হইয়া বিষয়-সংক্রান্ত অন্যান্য কথাবার্তা তুলিলেন। নূতন তালুকটা খরিদ করিবার আলোচনা শেষ করিয়া বলিলেন, জগদীশের দরুন বাড়িটা যখন তুমি সমাজকেই দান করলে মা, তখন আর বিলম্ব না ক'রে এই পূজার ছুটিটা শেষ হলেই তার দখল নিতে হবে—কি বল?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনি যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে। টাকা পরিশোধ করবার মেয়াদ ত তাঁদের শেষ হয়ে গেছে!

রাসবিহারী কহিলেন, অনেক দিন। জগদীশ তার সমস্ত খুঁচরা ঋণ একত্র করবার জন্যে তোমার বাবার কাছে আট বছরের কড়ারে দশ হাজার টাকা কর্জ নিয়ে কবালা লিখে

দেয়। শর্ত ছিল, এর মধ্যে শোধ দিতে পারে ভালই; না পারে, তার বাড়ি-বাগান-পুকুর—তার সমস্ত সম্পত্তিই আমাদের। তা আট বৎসর পার হয়ে এটা নয় বৎসর চলছে।

বিজয়া কিছুক্ষণ অধোমুখে নীরবে বসিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, শুনতে পাই, তাঁর ছেলে এখানে আছেন; তাঁকে ডেকে আরো কিছুদিন সময় দিয়ে দেখলে হয় না, যদি কোন উপায় করতে পারেন?

রাসবিহারী মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তা' পারবে না—পারবে না। পারলে—

পিতার কথাটা শেষ না হইতেই বিলাস হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে কোনরূপে ধৈর্য ধরিয়া ছিল, আর পারিল না। কর্কশস্বরে বলিল, পারলেই বা আমরা দেব কেন? টাকা নেবার সময় সে মাতালটার হুঁশ ছিল না—কি শর্ত করছি? এ শোধ দেব কি কোরে?

বিজয়া বিলাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই রাসবিহারীর মুখের দিকে চাহিয়া শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন; তাঁর সম্বন্ধে সসম্মানে কথা কইতে বাবা আমাকে আদেশ ক'রে গেছেন—

বিলাস পুনরায় তর্জন করিয়া উঠিল, হাজার ক'রে গেলেও সে যে একটা—

রাসবিহারী বাধা দিলেন,—তুমি চুপ কর না বিলাস।

বিলাস জবাব দিল, এ সব বাজে সেন্টিমেন্ট আমি কিছুতেই সইতে পারিনে—তা' সে কেউ রাগই করুক, আর যাই করুক। আমি সত্য কথা বলতে ভয় পাইনে, সত্য কাজ করতে পেছিয়ে দাঁড়াই নে!

রাসবিহারী উভয় পক্ষকেই শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে হাসিবার মত মুখ করিয়া বার বার মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিতে লাগিলেন, তা বটে, তা বটে। আমাদের বংশের এই স্বভাবটা আমারও গেল না কিনা! বুঝলে না মা বিজয়া, আমি আর তোমার বাবা এই জন্যেই সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে সত্য-ধর্ম গ্রহণ করতে ভয় পাইনি।

বিজয়া কহিল, বাবা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে আদেশ করে গিয়েছিলেন, ঋণের দায়ে তাঁর বাল্যবন্ধুর প্রতি যেন অত্যাচার না করি। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। স্নেহময় পিতার যে অনুরোধ তাঁহার জীবিতকালে অসংগত খেয়াল বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে আজ তাহাই দুরতিক্রম্য আদেশের মত তাহাকে বাধা দিতেছিল।

বিলাস কহিল, তবে তিনিই কেন সমস্ত দেনাটা নিজে ছেড়ে দিয়ে গেলেন না শুনি?

বিজয়া তাহার কোন উত্তর না দিয়া, রাসবিহারীর মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরায় কহিল, জগদীশবাবুর ছেলেকে ডেকে পাঠিয়ে সমস্ত কথা জানানো হয়, এই আমার ইচ্ছে।

তিনি জবাব দিবার পূর্বেই বিলাস নির্লজ্জের মত আবার গর্জন করিল, সে যদি আরো দশ বৎসর সময় চায়? তাই দিতে হবে নাকি? তা হ'লে দেশে সমাজ-প্রতিষ্ঠার আশা সাগরের অতল-গর্ভে বিসর্জন দিতে হবে দেখছি!

বিজয়া ইহার উত্তর না দিয়া রাসবিহারীকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, আপনি একবার তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে, এ বিষয়ে তাঁর কি ইচ্ছা, জানতে পারবেন না কি?

রাসবিহারী অতিশয় ধূর্ত লোক; তিনি ছেলের ঔদ্ধত্যের জন্য মনে মনে বিরক্ত হইলেও, বাহিরে তাহারই মতটাকে সমীচীন প্রমাণ করিতে একটুখানি ভূমিকাচ্ছলে ধীরভাবে কহিলেন, দেখ মা, তোমাদের মতান্তরের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা কওয়া উচিত নয়। কারণ, কিন্তু সে তোমাদের ভালো সে আজ না হয় কাল তোমরাই স্থির ক'রে নিতে পারবে, এ বুড়োর মতামতের আবশ্যক হবে না; কিন্তু কথা যদি বলতে হয় মা, বলতেই হবে—এ-ক্ষেত্রে তোমারই ভুল হচ্ছে। জমিদারি চালাবার কাজে আমাকেও বিলাসের কাছে হার মানতে হয়—সে আমি অনেকবার দেখেছি। আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, কার গরজ বেশী, তোমার না জগদীশের ছেলের? তার ঋণ পরিশোধের সাধ্যই যদি থাকতো, সে কি নিজে এসে একবার চেষ্টা ক'রে দেখত না? সে ত জানে, তুমি এসেছ। এখন আমরাই যদি উপযাচক হয়ে তাকে ডাকিয়ে পাঠাই, সে নিশ্চয়ই একটা বড় রকমের সময় নেবে, কিন্তু তাতে ফল শুধু এই হবে যে, সে টাকাও দিতে পারবে না, তোমাদের সমাজ প্রতিষ্ঠার

সঙ্কল্পও চিরদিনের জন্যে ডুবে যাবে। বেশ ক'রে ভেবে দেখ দেখি মা, এই কি ঠিক নয়?

বিজয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী ক্ষণকাল পরে কহিলেন, বেশ ত, তার অগোচরে ত কিছুই হ'তে পারবে না। তখন নিজে যদি সে সময় চায় তখন নাহয় বিবেচনা ক'রেই দেখা যাবে। কি বল মা?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা। কিন্তু তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, সে মনে মনে এই প্রস্তাব অনুমোদন করে নাই। রাসবিহারী আজ বিজয়াকে চিনিলেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিলেন, এ মেয়েটির বয়স কম কিন্তু সে যে তাহার পিতার বিষয়ের মালিক, ইহা সে জানে, এবং তাহাকে মুঠার ভিতরে আনিতেও সময় লাগিবে। সুতরাং একটা কথা লইয়াই বেশী টানা-হেঁচড়া সঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া সান্ধ্য-উপাসনার নাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। বিজয়া প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি আশীর্বাদ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বিজয়া মুহূর্তকালমাত্র চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, আমার অনেকগুলো চিঠিপত্র লিখতে আছে—আপনার কি আমাকে কোন আবশ্যক আছে'?

বিলাস রূঢ়ভাবে জবাব দিল, কিছু না। আপনি যেতে পারেন।

আপনাকে চা পাঠিয়ে দিতে বোলব কি?

না, দরকার নেই।

আচ্ছা নমস্কার, বলিয়া বিজয়া দুই করতল একবার একত্র করিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিঘ্‌ড়ায় স্বর্গীয় জগদীশবাবুর বাড়িটা সরস্বতীর পরপারে। ইহা গ্রামান্তরে হইলেও নদীতীরের কতকগুলি বাঁশঝাড়ের জন্যেই বনমালীবাবুর বাটীর ছাদ হইতে তাহা দেখা যাইত না। তখন শরৎকালের অবসানে সরস্বতীর জলধারা শীর্ণতর হইয়া আসিতেছিল, এবং তীরের উপর দিয়া কৃষকদিগের গমনাগমনের পথটিও পায়ে পায়ে শুকাইয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। এই পথের উপর দিয়া আজ অপরাহ্ণবেলায় বিজয়া বৃদ্ধ দরোয়ান কানহাইয়া সিংকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। ও-পারের বাবলা, বাঁশ, খেজুর প্রভৃতি গাছপালার ফাঁক দিয়া অস্তগমনোন্মুখ সূর্যের আরক্ত-আভা মাঝে মাঝে তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে—অন্যমনস্ক-দৃষ্টিতে উভয় তীরের এটা-ওটা-সেটা দেখিতে দেখিতে বরাবর উত্তরমুখে চলিতে চলিতে হঠাৎ একস্থানে আসিয়া তাহার চোখে পড়িল—নদীর মধ্যে গোটা-কয়েক বাঁশ একত্র করিয়া পারাপারের জন্য একটা সেতু প্রস্তুত করা হইয়াছে। এইটি ভাল করিয়া দেখিবার জন্য বিজয়া জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিতে পাইল, অনতিদূরে বসিয়া একজন অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে মাছ ধরিতেছে। সাড়া পাইয়া লোকটি মুখ তুলিয়া নমস্কার করিল। ঠিক সেই সময়ে বিজয়ার মুখের উপর সূর্যরশ্মি আসিয়া পড়িল কি না জানি না: কিন্তু চোখাচোখি হইবামাত্রই তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি একেবারে যেন রাঙা হইয়া গেল। যে মাছ ধরিতেছিল, সে পূর্ণবাবুর সেই ভাগিনেয়টি, যে সেদিন মামার হইয়া তাহার কাছে দরবার করিতে আসিয়াছিল। বিজয়া প্রতি-নমস্কার করিতেই সে কাছে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, বিকেলবেলায় একটুখানি বেড়াবার পক্ষে নদীর ধারটা মন্দ জায়গা নয় বটে, কিন্তু এই সময়টা ম্যালেরিয়ার ভয়ও কম নেই। এ বুঝি আপনাকে কেউ সাবধান ক'রে দেয়নি?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না; এবং পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া ত লোক চিনে ধরে না। আমি ত বরং না জেনে এসেচি, আপনি যে জেনে-শুনে জলের ধারে ব'সে আছেন? কৈ দেখি, কি মাছ ধরলেন?

লোকটি হাসিয়া কহিল, পুঁটি মাছ। কিন্তু দু'ঘণ্টায় মাত্র দুটি পেয়েছি। মজুরি

পোষায় নি। কিন্তু কি করি বলুন, আপনার মত আমিও প্রায় বিদেশী বললেই হয়। বাইরে বাইরে দিন কেটেছে, প্রায় কারুর সঙ্গেই তেমন আলাপ-পরিচয় নেই—কিন্তু বিকেলটা ত যা ক'রে হোক কাটাতে হবে?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে কহিল, আমারও প্রায় সেই দশা। আপনাদের বাড়ি বুঝি পূর্ণবাবুর বাড়ির কাছেই?

লোকটি কহিল, না। হাত দিয়া নদীর ওপার দেখাইয়া বলিল, আমাদের বাড়ি ঐ দিঘ্ড়ায়। এই বাঁশের পুল দিয়ে যেতে হয়।

গ্রামের নাম শুনিয়া বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তা হ'লে বোধ হয় জগদীশবাবুর ছেলে নরেনবাবুকে আপনি চেনেন?

লোকটি মাথা নাড়িবামাত্রই বিজয়া একান্ত কৌতূহলবশে সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তিনি কি রকম লোক, আপনি বলতে পারেন?

কিন্তু, বলিয়া ফেলিয়াই নিজের অভদ্র প্রশ্নে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিল। এই লজ্জা লোকটির দৃষ্টি এড়াইল না। সে হাসিয়া বলিল, তার বাড়ি ত আপনি দেনার দায়ে কিনে নিয়েছেন; এখন তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান কোরে আর ফল কি? কিন্তু যে সদুদ্দেশ্যে নিলেন সে-কথাও এ অঞ্চলের সবাই শুনেছে।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, একেবারে নেওয়া হয়ে গেছে—এই বুঝি এদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেছে?

লোকটি বলিল, হবারই কথা। জগদীশবাবুর সর্বস্ব আপনার বাবার কাছে বিক্রি-কবালায় বাঁধা ছিল। তাঁর ছেলের সাধ্য নেই, তত টাকা শোধ করেন—মিয়াদও শেষ হয়েছে—খবর সবাই জানে কিনা!

বাড়িটি কেমন?

মন্দ নয়, বেশ বড় বাড়ি। যে জন্যে নিচেছন, তার পক্ষে ভালই হবে। চলুন না, আর একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে।

চলিতে চলিতে বিজয়া কহিল, আপনি যখন গ্রামের লোক, তখন নিশ্চয় সমস্ত জানেন। আচ্ছা, শুনেছি নরেনবাবু বিলেত থেকে ভাল ক'রেই ডাক্তারি পাশ ক'রে এসেছেন। কোন ভাল জায়গায় প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ কোরে আরও কিছুদিন সময় নিয়েও কি বাপের ঋণটা শোধ করতে পারেন না?

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সম্ভব নয়। শুনেছি, চিকিৎসা করাই নাকি তার সংকল্প নয়।

বিজয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, তবে তাঁর সংকল্পটাই বা কি শুনি? এত খরচ-পত্র কোরে বিলেতে গিয়ে কষ্ট ক'রে ডাক্তারি শেখবার ফলটাই বা কি হ'তে পারে। লোকটি বোধ হয় একেবারেই অপদার্থ।

ভদ্রলোক একটুখানি হাসিয়া বলিল, অসম্ভব নয়। তবে শুনেছি নাকি নরেনবাবু নিজে চিকিৎসা ক'রে রোগ সারানোর চেয়ে, এমন কিছু একটা নাকি বার ক'রে যেতে চান, যাতে ঢের ঢের বেশী লোকের উপকার হবে। শুনতে পাই, নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি নিয়ে দিনরাত পরিশ্রমও খুব করেন।

বিজয়া চকিত হইয়া কহিল, সে ত ঢের বড় কথা। কিন্তু তাঁর বাড়ি-ঘরদোর গেলে কি ক'রে এসব করবেন? তখন ত রোজগার করা চাই। আচ্ছা, আপনি ত নিশ্চয় বলতে পারবেন, বিলেত যাওয়ার জন্যে এখানকার লোকে তাঁকে 'একঘরে' ক'রে রেখেছে কি না।

ভদ্রলোক কহিল, সে ত নিশ্চয়ই। আমার মামা পূর্ণবাবু তারও ত একপ্রকার আত্মীয়, তবুও পূজোর ক'দিন বাড়িতে ডাকতে সাহস করেন নি—কিন্তু তাতে তাঁর কিছুই আসে-যায় না। নিজের কাজকর্ম নিয়ে আছেন, সময় পেলে ছবি আঁকেন—বাড়ি থেকে বারই হন না। ঐ তাঁর বাড়ি, বলিয়া আঙুল দিয়া গাছপালায় ঘেরা একটা বৃহৎ অট্টালিকা দেখাইয়া দিল।

এই সময় বুড়া দরোয়ান পিছন হইয়া ভাঙা-বাঙলায় জানাইল যে, অনেকদূর আসিয়া পড়া হইয়াছে, বাটী ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে।

লোকটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ, কথায় কথায় অনেক পথ এসে পড়েছেন।

তাহাকেও সেই বাঁশের সেতু দিয়াই গ্রামে ঢুকিতে হইবে, সুতরাং ফিরিবার মুখেও সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। বিজয়া মনে মনে ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া কহিল, তা হ'লে তাঁর কোন আত্মীয়-কুটুম্বের ঘরেও আশ্রয় পাবার ভরসা নেই বলুন?

লোকটি কহিল, একেবারেই না।

বিজয়া আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চলিয়া কহিল, তিনি যে কারও কাছে যেতে চান না, সে কথা ঠিক। নইলে এই মাসের শেষেই ত তাঁকে বাড়ি ছেড়ে দেবার নোটিশ দেওয়া হয়েছে—আর কেউ হ'লে অন্ততঃ আমাদের সঙ্গেও একবার দেখা করার চেষ্টা করতেন।

লোকটি কহিল, হয়ত তাঁর দরকার নেই—নয় ভাবেন, লাভ কি। আপনি ত আর সত্যিই তাঁকে বাড়িতে থাকতে দিতে পারবেন না!

বিজয়া কহিল, না পারলেও, আর কিছুকাল থাকতে দিতেও ত পারা যায়! দেনার দায়ে হাজার হলেও ত একজনকে তার বাড়ি-ছাড়া করতে সকলেরই কষ্ট হয়! কিন্তু আপনার কথাবার্তার ভাবে বোধ হয় যেন, তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে। কি বলেন, সত্যি নয়?

লোকটি শুধু হাসিল, কোন কথা কহিল না। পুলটির কাছেই তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। সে ছোট ছিপটা কুড়াইয়া লইয়া কহিল, এই আমাদের গ্রামে ঢোকবার পথ। নমস্কার। বলিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া সেই বংশ-নির্মিত পুলটির উপর দিয়া টলিতে টলিতে কোনমতে পার হইয়া সঙ্কীর্ণ বন্যপথের ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বহুদিনের বৃদ্ধ ভৃত্য কানাই সিং বিজয়াকে শিশুকালে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, এবং সেই সঙ্গে সে দরোয়ানীর ন্যায্য অধিকারকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ বাবুটি কে মাইজী?

বিজয়া কিন্তু এতটাই বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল যে, বুড়ার প্রশ্ন তাহার কানেই পেঁৗছিল না। সেই প্রায়ান্ধকার নদীতটের সমস্ত নীরব মাধুর্যকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত শুধু এই কথা ভাবিতে ভাবিতেই পথ চলিতে লাগিল—লোকটি কে, এবং আবার কবে দেখা হইবে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাসবিহারী বলিলেন, আমরাই নোটিশ দিয়েছি, আবার আমরাই যদি তাকে রদ করতে যাই, আর পাঁচজন প্রজার কাছে সেটা কি-রকম দেখাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি মা।

বিজয়া কহিল, এই মর্মে একখানা চিঠি লিখে কেন তার কাছে পাঠিয়ে দিন না। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, তিনি শুধু অপমানের ভয়েই এখানে আসতে সাহস করেন না।

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, অপমান কিসের?

বিজয়া বলিল, তিনি নিশ্চয় ভেবেছেন, তাঁর প্রার্থনা আমরা মঞ্জুর করব না।

রাসবিহারী বিদ্রূপের ভাবে কহিলেন, মহা মানী লোক দেখচি। তাই অপমানটা ঘাড়ে নিয়ে আমাদের যেচে তাঁকে থাকতে দিতে হবে?

বিজয়া কাতর হইয়া কহিল, তাতেও দোষ নেই কাকাবাবু! অযাচিত দয়া করার মধ্যে কোন লজ্জা নেই।

রাসবিহারী কহিলেন, ভাল, লজ্জা নাহয় নেই; কিন্তু আমরা যে সমাজ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেচি, তার কি হবে বল দেখি?

বিজয়া বলিল, তার অন্য কোন ব্যবস্থাও আমরা করতে পারব।

রাসবিহারী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া প্রকাশ্যে একটু হাসিয়া বলিলেন, তোমার

বাবা যথেষ্ট টাকা রেখে গেছেন, তুমি অন্য ব্যবস্থাও করতে পার সে আমি বুঝলুম; কিন্তু কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি মা, যাকে আজ পর্যন্ত কখনো চোখেও দেখনি, আমাদের সকলের অনুরোধ এড়িয়ে তার জন্যেই বা তোমার অত ব্যথা কেন? ভগবানের করুণায় তোমার আরও পাঁচজন প্রজা আছে, আরও দশজন খাতক আছে; তাদের সকলের জন্যেই কি এই ব্যবস্থা করতে পারবে, না, পারলেই তাতে মঙ্গল হবে—সে জবাব আমাকে দাও দেখি বিজয়া?

বিজয়া কহিল, আপনাকে ত বলেচি, এটা বাবার অনুরোধ। তা ছাড়া আমি শুনেচি—

কি শুনেচ?

বিদ্রূপের ভয়ে তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধানের কথাটা বিজয়া কহিল না, শুধু বলিল, আমি শুনেচি, তিনি 'একঘরে'। গৃহহীন করলে আত্মীয়-কুটুম্ব কারও বাড়িতেই তাঁর আশ্রয় পাবার পথ নেই। তা ছাড়া, 'গৃহহীন' কথাটা মনে করলেই আমার ভারি কষ্ট হয় কাকাবাবু।

রাসবিহারী কণ্ঠস্বর করুণায় গদ্‌গদ করিয়া বলিলেন, তোমার এইটুকু বয়সে যদি এই কষ্ট হয়, আমার এতখানি বয়সে সে কষ্ট কতবড় হ'তে পারে, একটু ভেবে দেখ দেখি? আর আমার দীর্ঘ জীবনে এই কি প্রথম অপ্রিয় কর্তব্যের সুমুখে দাঁড়িয়েছি বিজয়া? না, তা নয়! কর্তব্য চিরদিনই আমার কর্তব্য! তার কাছে হৃদয়-বৃত্তির কোন দাবি-দাওয়া নেই। বনমালী যে কঠোর দায়িত্ব আমার উপরে ন্যস্ত ক'রে গেছেন, সে ভার আমাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বহন করতেই হবে—তাতে যত দুঃখ-কষ্টই না আমাকে ভোগ করতে হোক। হয় আমাকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দাও, নইলে কিছুতেই তোমার এ অসঙ্গত অনুরোধ আমি রাখতে পারব না।

বিজয়া অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। পিতার অপরাধে তাহার নিরপরাধ পুত্রকে গৃহ-ছাড়া করার সংকল্প তাহার অন্তরের মধ্যে যে বেদনা দিতে লাগিল, বয়সের অনুপাত কষিয়া এই বৃদ্ধ যে তাহার অন্তগুণ অধিক ব্যথা সহ্য করিয়াও কর্তব্যপালনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা সে মনের মধ্যেও ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিল না—বরঞ্চ এ যেন শুধু একজন নিরুপায় হতভাগ্যের প্রতি প্রবলের একান্ত হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার মতই তাহাকে বাজিতে লাগিল। কিন্তু জোর করিয়া নিজের ইচ্ছা পরিচালন করিবার সাহসও তাহার নাই। অথচ ইহাও তাহার অগোচর ছিল না যে, পল্লীগ্রামে সমারোহপূর্বক ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার খ্যাতিলাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেই বৃদ্ধ পিতার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বিলাসবিহারী এই জিদ এবং জবরদস্তি করিতেছে।

রাসবিহারী আর কিছু বলিলেন না। বিজয়াও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নীরবে সম্মতি দিল বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার পরদুঃখকাতর স্নেহকোমল নারীচিত্ত এই বৃদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাহার পুত্রের প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল।

রাসবিহারী বিষয়ী লোক; এ কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না যে, যে মালিক, তাহাকে তর্কের বেলায় ষোল আনা পরাজয় করিয়া আদায়ের বেলায় আট আনার বেশী লোভ করিতে নাই। কারণ সে পাওনা শেষ পর্যন্ত পাকা হয় না। সুতরাং দাক্ষিণ্য-প্রকাশের দ্বারা লাভবান হইবার যদি কোন সময় থাকে ত সে এই! বিজয়ার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, মা, তোমার জিনিস তুমি দান করবে, আমি বাদ সাধব কেন? আমি শুধু এই দেখাতে চেয়েছিলুম যে, বিলাস যা করতে চেয়েছিল তা স্বার্থের জন্যও নয়, রাগের জন্যেও নয়, শুধু কর্তব্য ব'লেই চেয়েছিল। একদিন আমার বিষয়, তোমার বাবার বিষয়—সব এক হয়েই তোমাদের দুজনের হাতে পড়বে; সেদিন বুদ্ধি দেবার জন্যে এ বুড়োকেও খুঁজে পাবে না। সেদিন তোমাদের উভয়ের মতের অমিল না হয়, সেদিন তোমার স্বামীর প্রত্যেক কাজটিকে যাতে অভ্রান্ত ব'লে শ্রদ্ধা করতে পার, বিশ্বাস করতে পার—কেবল এই আমি চেয়েছি। নইলে দান করতে, দয়া করতে সেও জানে আমিও জানি। কিন্তু সে দান অপাত্রে হ'লে যে কিছুতে চলবে না, এই শুধু তোমার কাছে আমার প্রমাণ করা। এখন বুঝলে মা, কেন আমরা জগদীশের ছেলেকে একবিন্দু দয়া করতে চাইনি এবং কেন সে দয়া একেবারে অসম্ভব? বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহ-

হাস্যে বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। এই পরম সারগর্ভ ও অকাট্য যুক্তিযুক্ত উপদেশাবলীর বিরুদ্ধে তর্ক করা চলে না—বিজয়া নীরবেই বসিয়া রহিল। রাসবিহারী পুনশ্চ কহিলেন, এখন বুঝলে মা বিজয়া, বিলাস ছেলেমানুষ হ'লেও কতদূর পর্যন্ত ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করে! ঐ যে তোমাকে বললুম, আমি ত এই কাজেই চুল পাকালুম, কিন্তু জমিদারি-কাজে ওর চাল বুঝতে আমাকে মাঝে মাঝে স্তম্ভিত হয়ে চিন্তা করতে হয়।

বিজয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না।

সাড়ে-চারটে বাজে বলিয়া রাসবিহারী লাঠিটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, এই সমাজ প্রতিষ্ঠার চিন্তায় বিলাস যে কি রকম উতলা হয়ে উঠেছে, তা প্রকাশ ক'রে বলা যায় না। তার ধ্যান-জ্ঞান-ধারণা সমস্তই হয়েছে এখন ওই। এখন ঈশ্বরের চরণে কেবল প্রার্থনা আমার এই, যেন সে শুভদিনটি আমি চোখে দেখে যেতে পারি। বলিয়া তিনি দুই হাত যুক্ত করিয়া ব্রহ্মের উদ্দেশে বার বার নমস্কার করিলেন। দ্বারের কাছে আসিয়া তিনি সহসা দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিলেন, ছোকরা একবার আমার কাছে এলেও নাহয় যা হোক একটা বিবেচনা করার চেষ্টা করতুম; কিন্তু তাও ত কখনও—অতি হতভাগা, অতি হতভাগা! বাপের স্বভাব একেবারে ষোলকলায় পেয়েছে দেখতে পাচ্চি—বলিতে বলিতে তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

সেইখানে একভাবে বসিয়া বিজয়া কি যে ভাবিতে লাগিল, তাহার ঠিকানা নাই। অকস্মাৎ বাহিরের দিকে নজর পড়ায় যাই দেখিল, বেলা পড়িয়া আসিতেছে, অমনি নদীতীরের অস্বাস্থ্যকর বাতাস তাহাকে সজোরে টান দিয়া যেন আসন ছাড়িয়া তুলিয়া দিল, এবং আজিও সে বৃদ্ধ দরোয়ানজীকে ডাকিয়া লইয়া বায়ুসেবনের ছলে বাহির হইয়া পড়িল।

ঠিক সেইখানে বসিয়া আজিও সেই লোকটি মাছ ধরিতেছিল। অনেকটা দূর হইতে বিজয়া তাহা দেখিতে পাইলেও কাছাকাছি আসিয়া যেন দেখিতেই পায় নাই, এমনভাবে চলিয়া যাইতেছিল, সহসা কানাই সিং পিছন হইতে ডাক দিয়া উঠিল, সেলাম বাবুজী, শিকার মিলা?

কথাটা কানে যাইবামাত্রই তাহার মূল পর্যন্ত বিজয়ার আরক্ত হইয়া উঠিল। যাঁহারা মনে করেন যথার্থ বন্ধুত্বের জন্য অনেকদিন এবং অনেক কথাবার্তা হওয়া চাই-ই, তাঁহাদের এইখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া প্রয়োজন যে, না, তাহা অত্যাবশ্যক নহে। বিজয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতেই লোকটি ছিপ রাখিয়া দিয়া নমস্কার করিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সহাস্যে কহিল, হাঁ দেশের প্রতি আপনার সত্যিকার টান আছে বটে। এমন কি, তার ম্যালেরিয়াটা পর্যন্ত না নিলে আপনার চলছে না দেখছি।

বিজয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নেওয়া হয়ে গেছে বোধ হয়? কিন্তু দেখে ত তা মনে হয় না।

লোকটি বলিল, ডাক্তারদের একটু সবুর ক'রে নিতে হয়। অমন তাড়াতাড়ি—

কথাটা শেষ না হইতেই বিজয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ডাক্তার নাকি?

লোকটি অপ্রতিভ হইয়া সহসা উত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিল, তা বৈ কি! একজন কতবড় ডাক্তারের প্রতিবেশী আমরা! সবাইকে দিয়ে-থুয়ে তবে ত আমাদের—কি বলেন?

বিজয়া তৎক্ষণাৎ কোন কথাই বলিল না; ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পরে কহিল, শুধু প্রতিবেশী নয়, তিনি যে আপনার একজন বন্ধু, সে আমি অনুমান করেছিলুম। আমার কথা তাঁকে গল্প করেছেন নাকি?

লোকটা হাসিয়া কহিল, আপনি তাকে একটা অপদার্থ হতভাগা মনে করেন, এ ত পুরোনো গল্প—সবাই করে। এ আর নূতন ক'রে বলবার দরকার কি? তবে একদিন হয়ত সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

বিজয়া মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া কহিল, আমার সঙ্গে দেখা করায় তাঁর লাভ কি? কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে ত আমি এ রকম কথা আপনাকে বলিনি।

না ব'লে থাকলেও বলাই ত উচিত ছিল।

উচিত ছিল কেন?

যার বাড়ি-ঘরদোর বিকিয়ে যায়, তাকে সবাই হতভাগ্য বলে। আমরাও বলি। সুমুখে না পারি, আড়ালেও ত আমরা বলতে পারি।

বিজয়া হাসিতে লাগিল, কহিল, আপনি ত তাঁর খুব ভাল বন্ধু!

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে ঠিক। এমন কি, তার হয়ে আমি নিজেই আপনাকে ধরতুম, যদি না জানতুম, আপনি সদুদ্দেশ্যেই তার বাড়িখানি গ্রহণ করচেন।

বিজয়া একটিবার মাত্র মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথা কহিল না।

কথায় কথায় আজ তাহারা আরও একটু অধিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। দেখা গেল, ও-পারে একদল লোক সার বাঁধিয়া নরেন্দ্রবাবুর বাটীর দিকে চলিয়াছে। তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হইতে পনর পর্যন্ত সকল বয়সের লোকই ছিল। লোকটি দেখাইয়া কহিল, ওরা কোথায় যাচ্ছে জানেন? নরেনবাবুর ইস্কুলে পড়তে।

বিজয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি এ ব্যবসাও করেন নাকি? কিন্তু যতদূর বুঝতে পারছি, বিনা পয়সায়—ঠিক না?

লোকটি হাসিমুখে কহিল, তাকে ঠিক চিনেচেন। অপদার্থ লোকের কোথাও আত্মগোপন করা চলে না। পরে অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হইয়া কহিল, নরেন বলে, আমাদের দেশে সত্যিকার চাষী নেই। চাষ করা পৈতৃক পেশা; তাই সময়ে-অসময়ে জমিতে দুবার লাঙ্গল দিয়ে, বীজ ছড়িয়ে আকাশের পানে হাঁ ক'রে চেয়ে ব'সে থাকে। একে চাষ করা বলে না, লটারির খেলা বলে! কোন্ জমিতে কখন সার দিতে হয়, কাকে সার বলে, কাকে সত্যিকার চাষ করা বলে—এ-সব জানেই না। বিলাত থাকতে ডাক্তারি পড়ার সঙ্গে এ বিদ্যেটাও সে শিখে এসেছিল। ভাল কথা, একদিন যাবেন তার ইস্কুল দেখতে? মাঠের মাঝখানে গাছের তলায় বাপ-ব্যাটা-ঠাকুর্দায় মিলে যেখানে পাঠশালা বসে, সেখানে?

যাইবার জন্য বিজয়া তৎক্ষণাৎ উদ্যত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই কৌতূহল দমন করিয়া শুধু কহিল, না থাক। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, অতবড় বাড়ি থাকতে তিনি গাছতলায় পাঠশালা বসান কেন?

লোকটি বলিল, এ-সব শিক্ষা ত শুধু কেবল মুখের কথায় বই মুখস্থ করিয়ে দেওয়া যায় না! তাদের হাতেনাতে চাষ করিয়ে দেখাতে হয় যে, এ জিনিসটা রীতিমত শিখে করলে দুগুণো, এমন কি চার-পাঁচ-গুণো ফসলও পাওয়া যায়। তার জন্যে মাঠ দরকার, চাষ করা দরকার। কপাল ঠুকে মেঘের পানে চেয়ে হাত পেতে ব'সে থাকা দরকার নয়। এখন বুঝলেন, কেন তার পাঠশালা গাছতলায় বসে? একবার যদি তার ইস্কুলের মাঠের ফসল দেখেন, আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে, তা নিশ্চয়ই বলতে পারি। এখনো ত বেলা আছে—আজই চলুন না—ঐ ত দেখা যাচ্চে।

বিজয়ার মুখের ভাব ক্রমশঃ গম্ভীর এবং কঠিন হইয়া আসিতেছিল; কহিল, না, আজ থাক।

লোকটি সহজেই বলিল, তবে থাক। চলুন, খানিকটা আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। মিনিট পাঁচ-ছয় বিজয়া একটা কথাও কহিল না, ভিতরে ভিতরে কেমন যেন তাহার লজ্জা করিতে লাগিল—অথচ লজ্জার হেতুও সে ভাবিয়া পাইল না। লোকটি পুনরায় কথা কহিল, বলিল, আপনি ধর্মের জন্যই যখন তার বাড়িটা নিচ্চেন—এই ক'বিঘে জমি যখন ভাল কাজেই লাগছে, তখন এটা ত আপনি অনায়াসেই ছেড়ে দিতে পারেন? বলিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কিন্তু প্রত্যুত্তরে বিজয়া গম্ভীর হইয়া কহিল, এই অনুরোধ করবার জন্যে তাঁর তরফ থেকে আপনার কোন অধিকার আছে? বলিয়া আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, লোকটির হাসিমুখের কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

সে বলিল, এ অধিকার দেবার ওপর নির্ভর করে না, নেবার ওপর নির্ভর করে। যা ভাল কাজ, তার অধিকার মানুষ সঙ্গে সঙ্গেই ভগবানের কাছে পায়—মানুষের কাছে হাত পেতে নিতে হয় না। যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করার জন্যে আপনি মনে মনে বিরক্ত হলেন, পেলে কারা পেতো জানেন? দেশের নিরন্ন কৃষকেরা। আমাদের শাস্ত্রে আছে, দরিদ্র

ভগবানের একটা বিশেষ মূর্তি। তাঁর সেবার অধিকার ত সকলেরই আছে। সে অধিকার নরেনের কাছে চাইতে যাব কেন বলুন? বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বিজয়া চলিতে চলিতে বলিল, কিন্তু আপনার বন্ধু ত শুধু এই জন্যেই এখানে বসে থাকতে পারবেন না?

লোকটি কহিল, না। কিন্তু তিনি হয়ত আমার ওপরে এ ভার দিয়ে যেতে পারেন।

বিজয়ার ওষ্ঠাধরে একটা চাপা হাসি খেলা করিয়া গেল; কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বলিল, সে আমি অনুমান করেছিলুম।

লোকটি বলিল, করবারই কথা কিনা। এ সকল কাজ আগে ছিল দেশের ভূস্বামীর। তাদের ব্রহ্মোত্তর দিতে হ'ত। এখন সে দায় নেই বটে, কিন্তু তার জের মেটেনি। তাই দু-চার বিঘে কেউ ঠকিয়ে নেবার চেষ্টা করলেই তারা পূর্ব-সংস্কারবশে টের পান। বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল।

বিজয়া নিজেও এ হাসিতে যোগ দিতে গেল, কিন্তু পারিল না। এই সরল পরিহাস তাহার অন্তরের কোথায় গিয়া যেন বিঁধিয়া রহিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজেও ত আপনার বন্ধুকে আশ্রয় দিতে পারেন?

কিন্তু আমি ত এখানে থাকিনে। বোধ হয়, এক সপ্তাহ পরেই চ'লে যাবো।

বিজয়া অন্তরের মধ্যে যেন চমকাইয়া উঠিল; কহিল, কিন্তু বাড়ি যখন এখানে তখন নিশ্চয়ই ঘন ঘন যাতায়াত করতে হয়।

লোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আর বোধ হয় আমাকে আসতে হবে না।

বিজয়ার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। সে মনে মনে বুঝিল, এ সম্বন্ধে অযথা প্রশ্ন করা আর কোনমতেই উচিত হইবে না; কিন্তু কিছুতেই কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। ধীরে ধীরে কহিল, এখানে বাড়ির লোকের ভার নেবার লোক আপনার নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু—

লোকটি হাসিয়া বলিল, না, সে রকম লোক কেউ নেই।

তা হ'লে আপনার বাপ-মা—

আমার বাপ-মা, ভাই-বোন কেউ নেই—এই যে, আপনার বাড়ির সুমুখে এসে পড়া গেছে। নমস্কার, আমি চললুম—বলিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়া আর তাহার মুখের পানে চাহিতে পারিল না; কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, ভেতরে আসবেন না?

না, ফিরে যেতে আমার অন্ধকার হয়ে যাবে, নমস্কার।

বিজয়া হাত তুলিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া অত্যন্ত সংকোচের সহিত ধীরে ধীরে বলিল, আপনার বন্ধুকে একবার রাসবিহারীবাবুর কাছে যেতে বলতে পারেন না?

লোকটি বিস্মিত হইয়া বলিল, তাঁর কাছে কেন?

তিনিই বাবার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দেখেন কিনা।

সে আমি জানি। কিন্তু তাঁর কাছে যেতে কেন বলছেন?

বিজয়া এ প্রশ্নের আর কোন উত্তর দিতে পারিল না। লোকটি ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বোধ করি প্রতীক্ষা করিল। পরে কহিল, আমার ফিরতে রাত হয়ে যাবে—আমি আসি, বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিজয়াদের বাটী-সংলগ্ন উদ্যানের এই দিকের অংশটা খুব বড়। সুদীর্ঘ আম-কাঁঠাল গাছের তলায় তখন অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছিল, বুড়া দরোয়ান কহিল, মাইজী, একটু ঘুরে সদর রাস্তা দিয়ে গেলে ভাল হোত না?

এ সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিবার মত মনের অবস্থা বিজয়ার ছিল না, সে শুধু একটা 'না' বলিয়াই তাড়াতাড়ি অন্ধকার বাগানের ভিতর দিয়া বাটীর দিকে অগ্রসর

হইয়া গেল। যে দুইটা কথা তাহার মনকে সর্বাপেক্ষা অধিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার একটা এই যে, এত কথাবার্তার মধ্যেও শুধু নারীর পক্ষে ভদ্ররীতি-বিগর্হিত বলিয়াই ইহার নামটা পর্যন্ত জানা হইল না। দ্বিতীয়টি এই যে, দু'দিন পরে ইনি কোথায় চলিয়া যাইবেন—প্রশ্নটা শতবার মুখে আসিয়া পড়িলেও, শতবারেই কেবল লজ্জাতেই মুখে বাধিল। ইঁহার সম্বন্ধে একটা বিষয় প্রথম হইতেই বিজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল যে, ইনি যেই হোন যথেষ্ট সুশিক্ষিত, এবং পল্লীগ্রাম জন্মস্থান হইলেও অনাত্মীয় ভদ্র-মহিলার সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিবার শিক্ষা এবং অভ্যাস ইঁহার আছে। ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত না হইয়াও এ শিক্ষা যে তিনি কি করিয়া কোথায় পাইলেন, ভাবিতে ভাবিতে বাড়িতে পা দিতেই, পরেশের মা আসিয়া জানাইল যে, বহুক্ষণ পর্যন্ত বিলাসবাবু বাহিরের বসিবার ঘরে অপেক্ষা করিতেছেন। শুনিবামাত্রই তাহার মন ক্লান্তি ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। এই লোকটি সেই যে সেদিন রাগ করিয়া গিয়াছিল, আর আসে নাই, কিন্তু আজ যে-কারণেই আসিয়া থাক, যে লোকটির চিন্তায় তাহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তাহার কিছুই না জানিয়াও, উভয়ের মধ্যে অকস্মাৎ ব্যবধান সৃষ্টি না করিয়া বিজয়া পারিল না। শ্রান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমি বাড়ি এসেছি—তাঁকে জানান হয়েছে পরেশের মা?

পরেশের মা কহিল, না দিদিমণি, আমি এক্ষুণি পরেশকে খবর দিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তিনি চা খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল?

ও মা, তা আর হয়নি? তিনি যে বলেছিলেন, তুমি ফিরে এলেই একসঙ্গে হবে।

বিলাসবাবুই যে এ বাটীর ভবিষ্যৎ কর্তৃপক্ষ, এ সংবাদ আত্মীয়-পরিজন কাহারও অবিদিত ছিল না, এবং সেই হিসাবে আদর-যত্নেরও ত্রুটি হইত না। বিজয়া আর কোন কথা না বলিয়া উপরে তাহার ঘরে চলিয়া গেল। প্রায় মিনিট-কুড়ি পরে সে নীচে আসিয়া খোলা দরজার বাহির হইতে দেখিতে পাইল, বিলাস বাতির সম্মুখে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি কতকগুলা কাগজপত্র দেখিতেছে। তাহার পদশব্দে সে মুখ তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া একেবারেই গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, তুমি নিশ্চয় ভেবেচ আমি রাগ ক'রে এতদিন আসিনি। যদিও রাগ আমি করিনি, কিন্তু করলেও যে সেটা আমার পক্ষে কিছুমাত্র অন্যায় হোতো না, সে আজ আমি তোমার কাছে প্রমাণ করবো।

বিলাস এতদিন পর্যন্ত বিজয়াকে 'আপনি' বলিয়া ডাকিত। আজিকার এই আকস্মিক 'তুমি' সম্বোধনের কারণ কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, যে বিজয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল না, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া অনুমান করা কঠিন নয়। কিন্তু সে কোন কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া অনতিদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। বিলাস সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া কহিল, আমি সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে এইমাত্র কলকাতা থেকে আসচি, এখন পর্যন্ত বাবার সঙ্গেও দেখা করতে পারিনি। তুমি স্বচ্ছন্দে চুপ ক'রে থাকতে পার, কিন্তু আমি ত পারিনে! আমার দায়িত্ব-বোধ আছে—একটা বিরাট কার্য মাথায় নিয়ে আমি কিছুতে স্থির থাকতে পারিনে। আমাদের ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা এই বড়দিনের ছুটিতেই হবে—সমস্ত স্থির ক'রে এলুম; এমন কি, নিমন্ত্রণ করা পর্যন্ত বাকী রেখে আসিনি। উঃ—কাল সকাল থেকে কি ঘোরাটাই না আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে! যাক—ওদিকের সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কারা কারা আসবেন, তাও এই কাগজখানায় আমি টুকে এনেচি—একবার পড়ে দেখ, বলিয়া বিলাস আত্মপ্রসাদের প্রচণ্ড নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুমুখের কাগজখানা বিজয়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া চৌকিতে হেলান দিয়া বসিল।

তথাপি বিজয়া কথা কহিল না—নিমন্ত্রিতদিগের সম্বন্ধেও লেশমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিল না; যেমন বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি বসিয়া রহিল। এতক্ষণ পরে বিলাসবিহারী বিজয়ার নীরবতা সম্বন্ধে ঈষৎ সচেতন হইয়া কহিল, ব্যাপার কি! এমন চুপচাপ যে?

বিজয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি ভাবচি, আপনি যে নিমন্ত্রণ ক'রে এলেন, এখন তাঁদের কি বলা যায়?

তার মানে?

মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু স্থির ক'রে উঠতে পারিনি।

বিলাস সটান সোজা হইয়া বসিয়া কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তার মানে কি? তুমি কি ভেবেছ, এই ছুটির মধ্যে' না করতে পারলে আর শীঘ্র করা যাবে? তাঁরা ত কেউ তোমার—ইয়ে নন যে, তোমার যখন সুবিধে হবে, তখনই তাঁরা এসে হাজির হবেন? মনস্থির হয়নি তার অর্থ কি শুনি?

রাগে তাহার চোখ-দুটা যেন জ্বলিতে লাগিল। বিজয়া অধোমুখে বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি ভেবে দেখলুম, এখানে এই নিয়ে সমারোহ করবার দরকার নেই।

বিলাস দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, সমারোহ! সমারোহ করতে হবে এমন কথা ত আমি বলিনি! বরঞ্চ যা স্বভাবতঃই শান্ত, গম্ভীর—তার কাজ নিঃশব্দে সমাধা করবার মত জ্ঞান আমার আছে। তোমাকে সেজন্যে চিন্তিত হ'তে হবে না।

বিজয়া তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল, এখানে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করার কোন সার্থকতা নেই। সে হবে না।

বিলাস প্রথমটা এমনি স্তম্ভিত হইয়া গেল যে, তাহার মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। পরে কহিল, আমি জানতে চাই, তুমি যথার্থ ব্রাহ্মমহিলা কিনা।

বিজয়া তীব্র আঘাতে যেন চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু চক্ষের পলকে আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া শুধু বলিল, আপনি বাড়ি থেকে শান্ত হয়ে ফিরে এলে তার পরে কথা হবে—এখন থাক। বলিয়াই উঠিবার উপক্রম করিল। কিন্তু ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া সে পুনরায় বসিয়া পড়িল। বিলাস সেদিকে দৃক্‌পাতমাত্র করিল না। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়াও সে নিজের ব্যবহার সুসংযত বা ভদ্র করিতে শিখে নাই—সে চাকরটার সম্মুখেই উদ্ধতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমরা তোমার সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করতে পারি জানো?

বিজয়া নীরবে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। ভৃত্য প্রস্থান করিলে ধীরে ধীরে কহিল, সে আলোচনা আমি কাকাবাবুর সঙ্গে করবো—আপনার সঙ্গে নয়। বলিয়া একবাটি চা তাহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিল।

বিলাস তাহা স্পর্শ না করিয়া সে কথারই পুনরুক্তি করিয়া বলিল, আমরা তোমার সংস্পর্শ ত্যাগ করলে কি হয় জানো?

বিজয়া বলিল, না। কিন্তু সে যাই হোক না, আপনার দায়িত্ববোধ যখন এত বেশী, তখন আমার অনিচ্ছায় যাঁদের নিমন্ত্রণ ক'রে অপদস্থ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ভার নিজেই বহন করুন, আমাকে অংশ নিতে অনুরোধ করবেন না।

বিলাস দুই চক্ষু প্রদীপ্ত করিয়া হাঁকিয়া কহিল, আমি কাজের লোক—কাজই ভালবাসি, খেলা ভালবাসি নে—তা মনে রেখো বিজয়া।

বিজয়া স্বাভাবিক শান্তস্বরে জবাব দিল, আচ্ছা, সে আমি ভুলব না।

ইহার মধ্যে যেটুকু শ্লেষ ছিল, তাহা বিলাসবিহারীকে একেবারে উন্মত্ত করিয়া দিল। সে প্রায় চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল, আচ্ছা যাতে না ভোলো, সে আমি দেখব।

বিজয়া ইহার জবাব দিল না, মুখ নীচু করিয়া নিঃশব্দে চায়ের বাটির মধ্যে চামচাটা ডুবাইয়া নাড়িতে লাগিল। তাহাকে মৌন দেখিয়া বিলাস নিজেও ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আপনাকে কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, এত বড় বাড়ি তবে কি কাজে লাগবে শুনি? এ ত আর শুধু শুধু ফেলে রাখা যেতে পারবে না।

এবার বিজয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত কহিল, না। কিন্তু এ বাড়ি যে নিতেই হবে, সে ত এখনো স্থির হয়নি।

জবাব শুনিয়া বিলাস ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। মাটিতে সজোরে পা ঠুকিয়া পুনরায় চেঁচাইয়া বলিল, হয়েছে, একশ বার স্থির হয়েছে। আমি সমাজের মান্য ব্যক্তিদের আহ্বান ক'রে এনে অপমান করতে পারব না—এ বাড়ি আমাদের চাই-ই। এ আমি কোরে তবে ছাড়বো—এই তোমাকে আজ আমি জানিয়ে গেলুম। বলিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা-মাত্র না করিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সেইদিন হইতে বিজয়ার মনের মধ্যে এই আশাটা অনুক্ষণ যেন তৃষ্ণার মত জাগিতেছিল যে, সেই অপরিচিত লোকটি যাইবার পূর্বে অন্ততঃ একটিবারও তাঁহার বন্ধুকে লইয়া অনুরোধ করিতে আসিবেন। যত কথা তাহাদের মধ্যে হইয়াছিল, সমস্তগুলি তাহার অন্তরের মধ্যে গাঁথা হইয়া ছিল, একটি কথাও সে বিস্মৃত হয় নাই। সেইগুলি সে মনে মনে অহর্নিশ আন্দোলন করিয়া দেখিয়াছিল যে, বস্তুতঃ সে এমন একটা কথাও বলে নাই যাহাতে এ ধারণা তাঁহার জন্মিতে পারে যে তাহার কাছে আশা করিবার তাঁহার বন্ধুর একেবারে কিছু নাই। বরঞ্চ তাহার বেশ মনে পড়ে, নরেন যে তাহার পিতৃবন্ধুর পুত্র, এ উল্লেখ সে করিয়াছে; সময় পাইলে ঋণ-পরিশোধ করিবার মত শক্তি-সামর্থ্য আছে কিনা, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছে; তবে যাহার সর্বস্ব যাইতে বসিয়াছে তাহার ইহাতেও কি চেষ্টা করিবার মত কিছুই ছিল না! যেখানে কোন ভরসাই থাকে না সেখানেও ত আত্মীয়-বন্ধুরা একবার যত্ন করিয়া দেখিতে বলে। এ বন্ধুটি কি তাঁহার তবে একেবারে সৃষ্টিছাড়া!

নদীতীরের পথে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু সে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যহই এই আশা করিত যে, একবার না একবার তিনি আসিবেনই। কিন্তু দিন বহিয়া যাইতে লাগিল—না আসিলেন তিনি, না আসিল তাঁহার অদ্ভুত ডাক্তার বন্ধুটি।

বৃদ্ধ রাসবিহারীর সহিত দেখা হইলে তিনি ছেলের সঙ্গে যে ইতিমধ্যে কোন কথা হইয়াছে ইহার আভাসমাত্র দিলেন না। বরঞ্চ ইঙ্গিতে এই ভাবটাই প্রকাশ করিতে লাগিলেন যেন সঙ্কল্প একপ্রকার সিদ্ধ হইয়াই গিয়াছে। এই লইয়া যে আর কোনপ্রকার আন্দোলন উঠিতে পারে, তাহা যেন তাঁহার মনেই আসিতে পারে না। বিজয়া নিজেই সঙ্কোচে কথাটা উত্থাপন করিতে পারিল না। অগ্রহায়ণ শেষ হইয়া গেল, পৌষের ঠিক প্রথম দিনটিতেই পিতাপুত্র একত্র দর্শন দিলেন। রাসবিহারী কহিলেন, মা, আর ত বেশী দিন নেই, এর মধ্যেই ত সমস্ত সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে হবে।

বিজয়া সত্য সত্যই একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, তিনি নিজে ইচ্ছে ক'রে চলে না গেলে তো কিছুই হ'তে পারে না।

বিলাসবিহারী মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; তাহার পিতা কহিলেন, কার কথা বলচ মা, জগদীশের ছেলে ত? সে তো কালই বাড়ি ছেড়ে দিয়েছে।

সংবাদটা যথার্থই বিজয়ার বুকের ভিতর পর্যন্ত গিয়া আঘাত করিল। সে তৎক্ষণাৎ বিলাসের দিক হইতে এমন করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, যাহাতে সে কোন মতে না তাহার মুখ দেখিতে পায়। এই ভাবে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া আঘাতটা সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে রাসবিহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর জিনিসপত্র কি হ'ল? সমস্ত নিয়ে গেছেন?

বিলাস পিছন হইতে হাসির ভঙ্গিতে বলিল, থাকবার মধ্যে একটা তে-পেয়ে খাট ছিল—তার উপরেই বোধ করি তাঁর শয়ন চলত, আমি সেটা বাইরে গাছতলায় টেনে ফেলে দিয়েছি, তাঁর ইচ্ছে হ'লে নিয়ে যেতে পারেন—কোন আপত্তি নেই।

বিজয়া চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখের উপর সুস্পষ্ট বেদনার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া রাসবিহারী ভর্ৎসনার কণ্ঠে ছেলেকে বলিলেন, ওটা তোমার দোষ বিলাস। মানুষ যেমন অপরাধীই হোক, ভগবান তাকে যতই দণ্ড দিন, তার দুঃখে আমাদের দুঃখিত হওয়া, সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত। আমি বলছি নে যে, তুমি অন্তরে তার জন্যে কষ্ট পাচ্চ না, কিন্তু বাইরেও সেটা প্রকাশ করা কর্তব্য। জগদীশের ছেলের সঙ্গে তোমার কি দেখা হয়েছিল? তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বললে না কেন? দেখতুম যদি কিছু—

পিতার কথাটা শেষ হইতেও পাইল না—পুত্র তাঁহার ইঙ্গিতটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করিয়া দিয়া মুখে একটা শব্দ করিয়া বলিয়া উঠিল, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে নিমন্ত্রণ করা ছাড়া আমার ত আর কাজ ছিল না বাবা! তুমি কি যে বল তার ঠিকানাই নেই। তা ছাড়া আমার পৌঁছোবার পূর্বেই ত ডাক্তারসাহেব তাঁর তোরঙ্গ, প্যাটরা, যন্ত্রপাতি গুটিয়ে নিয়ে স'রে

পড়েছিলেন। বিলাতের ডাক্তার! একটা অপদার্থ হাম্‌বাগ কোথাকার! বলিয়া সে আরও কি সব বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু রাসবিহারী বিজয়ার মুখের প্রতি আড়চোখে চাহিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, না বিলাস, তোমার এ-রকম কথাবার্তা আমি মার্জনা করতে পারিনে। নিজের ব্যবহারে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত—অনুতাপ করা উচিত।

কিন্তু বিলাস লেশমাত্র লজ্জিত বা অনুতপ্ত না হইয়া জবাব দিল, কি জন্যে শুনি? পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, পরের ক্লেশ নিবারণ করার শিক্ষা আমার আছে, কিন্তু যে দাম্ভিক বাড়ি বয়ে অপমান ক'রে যায়, তাকে আমি মাপ করিনে। অত ভণ্ডামি আমার নেই।

তাহার জবাব শুনিয়া উভয়েই আশ্চর্য হইয়া উঠিল। রাসবিহারী কহিলেন, কে আবার তোমাকে বাড়ি বয়ে অপমান ক'রে গেল? কার কথা তুমি বলছ?

বিলাস ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, জগদীশবাবুর সু-পুত্র নরেনবাবুর কথাই বলছি বাবা। তিনিই একদিন ঠিক এই ঘরে বসেই আমাকে অপমান ক'রে গিয়েছিলেন। তখন তাঁকে চিনতুম না তাই--বলিয়া ইঙ্গিতে বিজয়াকে দেখাইয়া কহিল, নইলে ওঁকেও অপমান ক'রে যেতে সে কসুর করেনি—তোমরা জান সে কথা?

বিজয়া চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া চাইতেই, বিলাস তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিল, পূর্ণবাবুর ভাগ্নে ব'লে পরিচয় দিয়ে যে তোমাকে পর্যন্ত অপমান করে গিয়েছিল, সে কে? তখন যে তাকে ভারী প্রশ্রয় দিলে। সে-ই নরেনবাবু! তখন নিজের যথার্থ পরিচয় দিতে যদি সে সাহস করতো তবেই বলতে পারতুম, সে পুরুষমানুষ! ভণ্ড কোথাকার!

সহসা পিতাপুত্র উভয়েই সবিস্ময়ে দেখিল, বিজয়ার সমস্ত মুখ বেদনায় একেবারে শুষ্ক বিবর্ণ হইয়া গেছে।

দশম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটির আর বিলম্ব নাই। সুতরাং জগদীশের বাটীর প্রকাণ্ড হলঘরটা মন্দিরের জন্য, এবং অপরাপর কক্ষগুলি কলিকাতার মান্য অতিথিদের নিমিত্ত সজ্জিত করা হইতেছে। স্বয়ং বিলাসবিহারী তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সাধারণ নিমন্ত্রিতের সংখ্যাও অল্প নয়। যাঁহারা বিলাসেরই বন্ধু, স্থির হইয়াছিল তাঁহারা রাসবিহারীর বাটীতে এবং অবশিষ্ট বিজয়ার এখানে থাকিবেন। মহিলা যাঁহারা আসিবেন তাঁহারাও এইখানেই আশ্রয় লইবেন। বন্দোবস্তও সেইরূপ হইয়াছিল।

সেদিন সকালবেলায় বিজয়া স্নান সারিয়া নীচে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে দাঁড়াইয়া পরেশ একহাতে মায়ের কোঁচড় হইতে মুড়ি লইয়া চিবাইতেছে, অপরহস্তে রজ্জুবদ্ধ একটা গরুর গলায় হাত বুলাইয়া অনির্বচনীয় তৃপ্তি লাভ করিতেছে। গরুটাও আরামে চোখ বুজিয়া গলা উঁচু করিয়া ছেলেটার সেবা গ্রহণ করিতেছে।

এই দুটি বিজাতীয় জীবের সৌহৃদ্যের সহিত তাহার মনের পুঞ্জীভূত বেদনার কি যে সংযোগ ছিল বলা কঠিন; কিন্তু চাহিয়া চাহিয়া অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু দুটি অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। এ বাটীতে এ ছেলেটি ছিল তাহার ভারী অনুগত। সে চোখ মুছিয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া সস্নেহে কৌতুকের সহিত কহিল, হাঁ রে পরেশ, তোর মা বুঝি তোকে এই কাপড় কিনে দিয়েছে? ছিঃ—এ কি আবার একটা পাড় রে?

পরেশ ঘাড় বাঁকাইয়া, আড়চোখে চাহিয়া নিজের পাড়ের সঙ্গে বিজয়ার শাড়ীর চমৎকার চওড়া পাড়টা মনে মনে মিলাইয়া দেখিয়া অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার ভাব বুঝিয়া বিজয়া নিজের পাড়টা দেখাইয়া কহিল, এম্‌নি না হ'লে কি তোকে মানায়? কি বলিস রে?

পরেশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, মা কিচ্ছু কিনতে জানে না যে।

বিজয়া কহিল, আমি কিন্তু তোকে এমনি একখানা কাপড় কিনে দিতে পারি, যদি তুই—

কিন্তু 'যদি'তে পরেশের প্রয়োজন ছিল না। সে সলজ্জ হাস্যে মুখখানা আকর্ণ-প্রসারিত করিয়া প্রশ্ন করিল, কখন দেবে?

দিই, যদি তুই আমার একটা কথা শুনিস।

কি কথা?

বিজয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, কিন্তু তোর মা কি আর কেউ শুনলে তোকে পরতে দেবে না।

এ সম্বন্ধে কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করিবার মত মনের অবস্থা পরেশের নয়। সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মা জানবে ক্যাম্‌নে? তুমি বল না, আমি এক্ষুণি শুনব।

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই দিঘ্‌ড়া-গাঁ চিনিস?

পরেশ হাত তুলিয়া বলিল, ওই ত হোথা। গুটিপোকা খুঁজতে কতদিন দিঘ্‌ড়ে যাই।

বিজয়া প্রশ্ন করিল, ওখানে সবচেয়ে বড় কাদের বাড়ি, তুই জানিস?

পরেশ বলিল, হিঁ—বামুনদের গো। সেই যে আর বছর রস খেয়ে তিনি ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছ্যালো। এই যেন হেথায় গোবিন্দের মুড়কি-বাতাসার দোকান, আর ওই হোথায় তেনাদের দালান। গোবিন্দ কি বলে জানো মাঠান? বলে, সব মাগ্যি-গোণ্ডা, আধ পয়সায় আর আড়াই গোণ্ডা বাতাসা মিলবে না, এখন মোটে দু গোণ্ডা। কিন্তু তুমি যদি একসঙ্গে গোটা পয়সার আনতে দাও মাঠান, আমি তা হ'লে সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা নিয়ে আসতে পারি।

বিজয়া কহিল, তুই দু'পয়সার বাতাসা কিনে আনতে পারবি?

পরেশ কহিল, হিঁ—এ হাতে এক পয়সার সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা গুণে নিয়ে বলব, দোকানী, এ হাতে আরো সাড়ে পাঁচ গোণ্ডা গুণে দাও। দিলে বলব, মাঠান ব'লে দেছে দুটো ফাউ—নাঃ? তবে পয়সা দুটো হাতে দেব, নাঃ?

বিজয়া হাসিয়া কহিল, হাঁ, তবে পয়সা দিবি। আর অমনি দোকানীকে জিজ্ঞেস ক'রে নিবি, ওই যে বড় বাড়িতে নরেনবাবু থাকত, সে কোথায় গেছে? বলবি—যে বাড়িতে তিনি আছেন, সেটা আমাকে চিনিয়ে দিতে পার দোকানী? কি রে পারবি ত?

পরেশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, হিঁ—পয়সা দুটো দাও না তুমি। আমি ছুট্টে গে নে আসি।

আমি যা জিজ্ঞেসা করতে বললুম?

পরেশ কহিল হিঁ—তা-ও।

বাতাসা হাতে পেয়ে ভুলে যাবিনে তো?

পরেশ হাত বাড়াইয়া বলিল, তুমি পয়সা আগে দাও না! আমি ছুট্টে যাই।

আর তোর মা যদি জিজ্ঞেস করে, পরেশ, গিয়েছিলি কোথায়, কি বলবি?

পরেশ অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত হাস্য করিয়া কহিল, সে আমি খুব বলতে পারব। বাতাসার ঠোঙা এমনি কোরে কোঁচড়ে নুকিয়ে বলব, মাঠান পাঠিয়ে ছ্যালো—ঐ হোথা বামুনদের নরেনবাবুর খবর জানতে গেছলাম। তুমি দাও না শিগ্‌গির পয়সা।

বিজয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, তুই কি বোকা ছেলে রে পরেশ, মায়ের কাছে কি মিছে কথা বলতে আছে? বাতাসা কিনতে গিয়েছিলি, জিজ্ঞেস করলে তাই বলবি। কিন্তু দোকানীর কাছে সে খবরটা জেনে আসতে ভুলিস নে যেন। নইলে কাপড় পাবিনে তা ব'লে দিচ্ছি।

আচ্ছা, বলিয়া পরেশ পয়সা লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলে, বিজয়া শূন্যদৃষ্টিতে সেই দিকেই চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে সংবাদ জানিবার কৌতূহলের মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা নাই, যাহা সে যে-কোন লোক পাঠাইয়া অনেকদিন পূর্বেই স্বচ্ছন্দে জানিতে পারিত, তাহাই যে কেন এখন তাহার কাছে এতবড় সঙ্কোচের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, একবার তলাইয়া দেখিলে এই লুকোচুরির লজ্জায় আজ সে নিজেই মরিয়া যাইত। কিন্তু লজ্জাটা নাকি তাহার চিন্তার ধারার সহিত অজ্ঞাতসারে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছিল, তাই তাহাকে আলাদা করিয়া দেখিবার দৃষ্টি যে কোনকালে তাহার চোখে ছিল, ইহাও আজ তাহার মনে পড়িল না।

কয়েকখানা চিঠি লিখিবার ছিল। সময় কাটাইবার জন্য বিজয়া টেবিলে গিয়া কাগজ-কলম লইয়া বসিল। কিন্তু কথাগুলো এমনি এলোমেলো অসংবদ্ধ হইয়া মনে আসিতে লাগিল যে, কয়েকটা চিঠির কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহাকে কলম রাখিয়া দিতে হইল। পরেশের দেখা নাই। মনের চাঞ্চল্য আর দমন করিতে না পারিয়া বিজয়া ছাদে উঠিয়া তাহার পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বহুক্ষণে দেখা গেল সে হনহন করিয়া নদীর পথ ধরিয়া আসিতেছে। বিজয়া কম্পিতপদে শঙ্কিত-বক্ষে নীচে নামিয়া বাহিরের ঘরে ঢুকিতেই ছেলেটা বাতাসার ঠোঙা কোঁচড়ে লুকাইয়া চোরের মত পা টিপিয়া কাছে আসিয়া সেগুলি মেলিয়া ধরিয়া বলিল, দু' পয়সায় বারো গোণ্ডা এনেছি মাঠান।

বিজয়া সভয়ে কহিল, আর দোকানী কি বললে?

পরেশ ফিসফিস করিয়া বলিল, পয়সায় ছ' গোণ্ডার কথা কাউকে বলতে মানা করে দেছে। বলে কি জান মা—

বিজয়া বাধা দিয়া কহিল, আর সেই বামুনদের নরেনবাবুর কথা—

পরেশ কহিল, সে হোতা নেই—কোথায় চ'লে গেছে। গোবিন্দ বলে কি জানো মাঠান, বার গোণ্ডায়—

বিজয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া রুক্ষস্বরে কহিল, নিয়ে যা তোর বার গোণ্ডা বাতাসা আমার সুমুখ থেকে—বলিয়া সরিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই অচিন্তনীয় রূঢ়তায় ছেলেটা এতটুকু হইয়া গেল। সে এত দ্রুত গিয়াছে এবং আসিয়াছে, এগার গণ্ডার স্থানে কত কৌশলে বার গণ্ডা সওদা করিয়াছে, তবুও মাঠানকে প্রসন্ন করিতে পারিল না মনে করিয়া তাহার ক্ষোভের সীমা রহিল না। সে ঠোঙা দুইটা হাতে করিয়া মলিনমুখে কহিল, এর বেশী যে দেয় না মাঠান!

বিজয়া ইহার জবাব দিল না, কিন্তু এদিকে না চাহিয়াও সে ছেলেটার অবস্থা অনুভব করিতেছিল। তাই খানিক পরে সদয়কণ্ঠে কহিল, যা পরেশ, ওগুলো তুই খেগে যা।

পরেশ সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সব?

বিজয়া মুখ না ফিরাইয়া কহিল, সব। ওতে আমার কাজ নেই।

পরেশ বুঝিল এ রাগের কথা। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কাপড়ের কথাটা স্মরণ হইতেই আরও একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। আস্তে আস্তে কহিল, ভট্‌চায্যিমশায়ের কাছে জেনে আসব মাঠান?

কে ভট্‌চায্যিমশাই? কি জেনে—বলিয়া উৎসুককণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াই বিজয়া মুখ ফিরাইয়াই থামিয়া গেল। মুখের বাকী কথাটুকু তাহার মুখেই রহিয়া গেল, আর বাহির হইল না। বারান্দার উপর ঠিক সম্মুখেই অকস্মাৎ নরেন্দ্রকে দেখা গেল এবং পরক্ষণেই সে ঘরে পা দিয়া হাত তুলিয়া বিজয়াকে নমস্কার করিল।

পরেশ বলিল, কোথায় গেছে নরেন্দরবাবু—

বিজয়া প্রতি-নমস্কারেরও সময় পাইল না, নিদারুণ লজ্জায় সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা যা, যা—আর জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই।

পরেশ বুঝিল, এও রাগের কথা। ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল, কাণা ভট্‌চায্যিমশাই ত তেনাদের পাশের বাড়িতেই থাকে মাঠান। গোবিন্দ-দোকানী যে বললে—

বিজয়া শুষ্ক হাসিয়া কহিল, আসুন, বসুন।

পরেশের প্রতি চাহিয়া বলিয়া উঠিল, তুই এখন যা না পরেশ। ভারী ত কথা, তার আবার—সে আর একদিন তখন জেনে আসিস না হয়। এখন যা।

পরেশ চলিয়া গেলে নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নরেনবাবুর খবর জানতে চান? তিনি কোথায় আছেন তাই?

অস্বীকার করিতে পারিলেই বিজয়া বাঁচিত, কিন্তু মিথ্যা বলিবার অভ্যাস তাহার ছিল না। সে কোনমতে ভিতরের লজ্জা দমন করিয়া বলিল, হাঁ। তা সে একদিন জানলেই হবে।

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন? কোন দরকার আছে?

প্রশ্ন তাহার কানের মধ্যে ঠিক বিদ্রূপের মত শুনাইল। কহিল, দরকার ছাড়া কি কেউ কারও খবর জানতে চায় না?

কেউ কি করে না করে, সে ছেড়ে দিন। কিন্তু তার সঙ্গে তো আপনার সমস্ত সম্বন্ধ চুকে গেছে; তবে আবার কেন তার সন্ধান নিচেচন? দেনাটা কি সব শোধ হয়নি?

বিজয়ার মুখের উপর ক্লেশের চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু সে উত্তর দিল না। নরেন নিজেও তাহার ভিতরের উদ্বেগ সম্পূর্ণ গোপন করিতে পারিল না। পুনরায় কহিল, যদি আরও কিছু ঋণ বার হয়ে থাকে তা হ'লেও আমি যতদূর জানি, তার এমন কিছু আর নেই, যা থেকে সেই বাকী ঋণটা পরিশোধ হ'তে পারবে। এখন আর তাঁর খোঁজ করা—

কে আপনাকে বললে আমি দেনার জন্যেই তাঁর অনুসন্ধান করছি?

তা ছাড়া আর যে কি হ'তে পারে, আমি ত ভাবতে পারিনে। তিনিও আপনাকে চেনেন না, আপনিও তাঁকে চেনেন না!

তিনিও আমাকে চেনেন, আমিও তাঁকে চিনি।

নরেন হাসিল, কহিল, তিনি আপনাকে চেনেন, এ কথা সত্যি, কিন্তু আপনি তাঁকে চেনেন না। ধরুন, আমিই যদি বলি, আমার নাম নরেন, তা হ'লেও ত আপনি—

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা হ'লেও আমি বিশ্বাস করি, এবং বলি এই সত্যি কথাটা অনেকদিন পূর্বেই আপনার মুখ থেকে বার হওয়া উচিত ছিল।

ফুঁ দিয়া আলো নিবাইলে ঘরের চেহারা যেমন বদল হয়, বিজয়ার প্রত্যুত্তরে চক্ষুর নিমেষে নরেনের মুখ তেমনি মলিন হইয়া গেল। বিজয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াই পুনশ্চ কহিল, অন্য পরিচয়ে নিজের আলোচনা শোনা, আর লুকিয়ে আড়ি পেতে শোনা, দুটোই কি সমান ব'লে আপনার মনে হয় না? আমার ত হয়। তবে কিনা আমরা ব্রাহ্ম, এই যা বলেন।

নরেনের মলিনমুখ এইবার লজ্জায় কালো হইয়া উঠিল। একটুখানি মৌন থাকিয়া বলিল, আপনাব সঙ্গে অনেক রকম আলোচনার মধ্যে নিজের আলোচনাও ছিল বটে, কিন্তু তাতে মন্দ অভিপ্রায় কিছুই ছিল না। শেষ দিনটায় পরিচয় দেব মনেও করেছিলাম, কিন্তু হয়ে উঠল না। এতে আপনার কোন ক্ষতি হয়েছে কি?

এ প্রশ্ন গোড়াতেই করিয়া বসিলে এ পক্ষেও উত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই শক্ত হইত। কিন্তু যে আলোচনা একবার শুরু হইয়া গেছে, নিজের ঝোঁকে সে অনেক কঠিন স্থান আপনি ডিঙাইয়া যায়। তাই সহজেই বিজয়া জবাব দিতে পারিল। কহিল, ক্ষতি একজনের ত কত রকমেই হ'তে পারে। আর যদি হয়েও থাকে, সে ত হয়েই গেছে, আপনি ত এখন তার উপায় করতে পারবেন না। সে যাক। আপনার নিজের সম্বন্ধে কোন কথা জানতে চাইলে কি—

রাগ করব? না না। বলিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রশান্ত নির্ম্মল হাস্যে তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এতদিন এত কথাবার্তাতেও এই লোকটির যে পরিচয় বিজয়া পায় নাই, একমুহূর্তের হাসিটুকু তাহাকে সেই খবর দিয়া গেল। তাহার মনে হইল, ইহার সমস্ত অন্তর-বাহির একেবারে যেন স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। যে লোক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কাছেও ইহার না না-ই বটে, এবং ঠিক এইজন্যই বোধ করি সে তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া আর প্রশ্ন করিতে পারিল না, ঘাড় হেঁট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন আছেন কোথায়?

নরেন বলিল, আমার দূর-সম্পর্কের এক পিসি এখনো বেঁচে আছেন, তাঁর বাড়িতেই আছি।

আপনার সম্বন্ধে যে সামাজিক গোলযোগ আছে, তা কি সে গ্রামের লোকেরা জানে না?

জানে বৈ কি?

তবে?

নরেন্দ্র একটুখানি ভাবিয়া বলিল, যে ঘরটায় আছি সেটাকে ঠিক বাড়ির মধ্যে বলা যায় না; আর আমার অবস্থা শুনেও বোধ করি, সামান্য কিছুদিনের জন্যে তাঁর ছেলেরা আপত্তি করে না। তবে বেশী দিন থেকে তাঁদের বিব্রত করা চলবে না, সে ঠিক। বলিয়া

সে একটুখানি থামিল। কহিল, আচ্ছা, সত্যি কথা বলুন তো, কেন এসব খোঁজ নিচ্ছিলেন? বাবার আরও কিছু দেনা বেরিয়েছে, এই না?

উত্তর দিবার জন্যই বোধ করি বিজয়া তাহার মুখপানে চাহিল। কিন্তু সহসা হাঁ—না কোন কথাই তাহার গলা দিয়া বাহির হইল না।

নরেন্দ্র কহিল, পিতৃঋণ কে না শোধ দিতে চায়, কিন্তু সত্যি বলচি আপনাকে, স্বনামে বেনামে এমন কিছু আমার নেই, যা বেচে দিতে পারি। শুধু মাইক্রস্কোপটা আছে, তাও বেচে তবে বিদেশে যাবার খরচটা যোগাড় করতে হবে। পিসিমার অবস্থাও খারাপ—এমন কি, সেখানে খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত—বলিয়াই সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

বিজয়ার চোখে জল আসিয়া পড়িল; সে ঘাড় ফিরাইল।

নরেন্দ্র বলিল, তবে যদি এই দয়াটা করেন, তা হ'লে বাবার দেনাটা আমি নিজের নামে লিখে নিতে পারি। ভবিষ্যতে শোধ দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করব। আপনি রাসবিহারী-বাবুকে একটু বললেই আর তিনি এ নিয়ে এখন পীড়াপীড়ি করবেন না।

পরেশ আসিয়া দ্বারের বাহির হইতে কহিল, মাঠান, মা বলচে, বেলা যে অনেক হয়ে গেল—ঠাকুরমশাইকে ভাত দিতে বলবে?

সুমুখের ঘড়িটার প্রতি চাহিয়া নরেন্দ্র চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; লজ্জিত হইয়া বলিল, ইস্! বারোটা বাজে! আপনার ভারী কষ্ট হ'ল।

বিজয়া চোখের জল সামলাইয়া লইয়াছিল; কহিল, আপনি কি জন্যে এসেছিলেন, সে ত বললেন না?

নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল, সে থাক। বলিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পিসিমার বাড়ি এখান থেকে কত দূর? এখন সেখানেই ত যেতে হবে?

নরেন্দ্র কহিল, হ্যাঁ। দূর একটু বৈ কি—প্রায় ক্রোশ-দুই।

বিজয়া অবাক হইয়া বলিল, এই রোদের মধ্যে এখন দু ক্রোশ হাঁটবেন? যেতেই তো তিনটে বেজে যাবে।

তা হোক, তা হোক, নমস্কার। বলিয়া নরেন পা বাড়াইতেই বিজয়া দ্রুতপদে কবাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল, আমার একটা অনুরোধ আপনাকে আজ রাখতেই হবে। এত বেলায় না খেয়ে আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না।

নরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিল, খেয়ে যাব? এখানে?

কেন, তাতে কি আপনারও জাত যাবে নাকি?

প্রত্যুত্তরে পুনরায় তেমনি প্রশান্ত হাসিতে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কহিল, না, সে ভয় আমার দুনিয়ায় আর নেই। তা ছাড়া ভগবান আমার প্রতি আজ ভারী প্রসন্ন, নইলে এত বেলায় সেখানে যে কি জুটত, সে ত আমি জানি।

তবে একটু বসুন, আমি আসচি, বলিয়া বিজয়া তাহার প্রতি না চাহিয়াই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিলে নরেন্দ্র পুনরায় সেই কথাই বলিল, কহিল, এত বেলা পর্যন্ত উপোস ক'রে আমাকে সুমুখে বসিয়ে খাওয়াবার কোন দরকার ছিল না। অন্য দেশে এ প্রথা নেই।

বিজয়া হাসিমুখে জবাব দিল, বাবা বলতেন, সে দেশের ভারী দুর্ভাগ্য, যে দেশের মেয়েরা অভুক্ত থেকে পুরুষদের খাওয়াতে পায় না, সঙ্গে বসে খেতে হয়। আমিও ঠিক তাই বলি।

নরেন্দ্র কহিল, কেন তা বলেন? অন্য দেশের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু আমাদের দেশেও ত অনেকের বাড়িতে খেয়েছি, তাঁদের মধ্যেও ত এ প্রথা চলে দেখেছি।

বিজয়া কহিল, বিলিতি প্রথা যাঁরা শিখেছেন, তাঁদের বাড়িতে হয়ত চলে, কিন্তু সকলের নয়। আপনি নিজে সেদেশে অনেক দিন ছিলেন বলেই আপনার ভুল হচ্ছে। নইলে পুরুষদের সামনে বার হই, দরকার হ'লে কথা কই বলেই আমরা সবাই মেমসাহেবও নই, তাদের চাল-চলনেও চলিনে।

নরেন্দ্র কহিল, না চললেও চলা ত উচিত। যাদের যেটা ভাল, তাদের কাছে সেটা ত নেওয়া চাই।

বিজয়া বলিল, কোন্‌টা ভাল, একসঙ্গে ব'সে খাওয়া? বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনি কি জানবেন মেয়েদের কতখানি জোর এই খাওয়ানোর মধ্যে থাকে? আমি ত বরঞ্চ আমাদের অনেক অধিকার ছাড়তে রাজী আছি কিন্তু এটি নয়—ও কি, সমস্ত দুধই যে প'ড়ে রইল! না, না—মাথা নাড়লে হবে না। কখনই আপনার পেট ভরেনি, তা ব'লে দিচ্ছি।

নরেন হাসিয়া বলিল, আমার নিজের পেট ভরেছে কি না, সেও আপনি ব'লে দেবেন! এ ত বড় অদ্ভুত কথা। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কথাটা শুনিয়া বিজয়া নিজেও একটু হাসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সে ঐটুকু দুধ না খাওয়ার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

বেলা পড়িলে বিদায় লইতে গিয়া নরেন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, একটা বিষয়ে আজ আমি ভারী আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমাকে রোদের মধ্যে আপনি যেতে দিলেন না, না খাইয়ে ছেড়ে দিলেন না, একটু কম খাওয়া দেখে ক্ষুণ্ণ হলেন—এ সব কেমন ক'রে সম্ভব? শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না—আমি শ্লেষ বা বিদ্রূপ করার অভিপ্রায়ে এ কথা বলছি নে—কিন্তু আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি, এ রকম কেমন ক'রে সম্ভব হয়।

বিজয়া কোন উপায়ে এই আলোচনার হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, সব বাড়িতেই এই রকম হয়ে থাকে। সে থাক, আপনি আর কতদিনের মধ্যে বিদেশ যাবার ইচ্ছা করেন?

নরেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, পরশু। কিন্তু আমি ত আপনার একেবারেই পর; আমার দুঃখ-কষ্টতে সত্যই ত আপনার কিছু যায় আসে না, তবু আপনার আচরণ দেখে বাইরের কারুর বলবার জো নেই যে, আমি আপনার লোক নই। পাছে কম খাই বা খাওয়ার সামান্য ত্রুটি হয়, এই ভয়ে নিজে না খেয়ে সুমুখে ব'সে রইলেন। আমার বোন নেই, মা-ও ছেলেবেলায় মারা গেছেন। তাঁরা বেঁচে থাকলে এমনি ব্যাকুল হতেন কি না আমি ঠিক জানিনে; কিন্তু আপনার যত্ন করা দেখে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেছি। অথচ এ-কিছু আর যথার্থই সত্যি হ'তে পারে না, সে আমিও জানি, আপনিও জানেন; বরঞ্চ একে সত্যি বললেই আপনাকে ব্যঙ্গ করা হবে—অথচ মিথ্যা ব'লে ভাবতেও যেন ইচ্ছে করে না।

বিজয়া জানালার বাহিরে চাহিয়াছিল; সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, ভদ্রতা ব'লে একটা জিনিস আছে সে কি আপনি আর কোথাও দেখেন নি?

ভদ্রতা! তাই হবে বোধ হয়। বলিয়া হঠাৎ তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল। তার পরে হাত তুলিয়া আবার একবার নমস্কার করিয়া কহিল, যেমন কোরে হোক বাবার ঋণটা যে সমস্ত শোধ হয়েছে, এই আমার ভারী তৃপ্তি। আপনার মন্দিরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক—আজকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি চললুম। বলিয়া সে যখন ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন ভিতর হইতে অস্ফুট আহ্বান আসিল, একটু দাঁড়ান—

নরেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইতে, বিজয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মাইক্রস্কোপ্‌টার দাম কত?

নরেন্দ্র কহিল, কিনতে আমার পাঁচশ টাকার বেশী লেগেছিল, এখন আড়াই শ টাকা—দু'শ টাকা পেলেও আমি দিই। কেউ নিতে পারে আপনি জানেন? একেবারে নূতন আছে বললেও হয়।

তাঁহার বিক্রি করিবার আগ্রহ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত কমে দেবেন, আপনার কি তার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে?

নরেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কাজ? কিছুই হয়নি।

এই নিশ্বাসটুকুও বিজয়ার লক্ষ্য এড়াইল না। সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমার নিজেরই একটা অনেকদিন থেকে কেনবার সাধ আছে, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। কাল একবার দেখাতে পারেন?

পারি। আমি সমস্ত আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাব।

একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় কহিল, যাচাই করবার সময় নেই বটে, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলছি, নিলে আপনি ঠকবেন না।

আবার একটু মৌন থাকিয়া বলিল, টাকার বদলে দাম হয় না, এ এমনি জিনিস। আমার আর কোন উপায় যে নেই, নইলে—আচ্ছা, কাল দুপুরবেলায় আমি নিয়ে আসব।

সে চলিয়া গেলে যতক্ষণ দেখা গেল, বিজয়া অপলক চক্ষে চাহিয়া রহিল; তার পরে ফিরিয়া আসিয়া সুমুখের চৌকিটার উপর বসিয়া পড়িল। কখনো বা তাহার মনে হইতে লাগিল, যতদূর দৃষ্টি যায়, সব যেন খালি হইয়া গেছে—কিছুতেই যেন কোন দিন তাহার প্রয়োজন ছিল না, কিছুই যেন তাহার মরণকাল পর্যন্ত কোন কাজেই লাগিবে না। অথচ সেজন্য ক্ষোভ বা দুঃখ কিছুই মনের মধ্যে নাই। এমনি শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরের গাছপালার পানে চাহিয়া মূর্তির মত স্তব্ধভাবে বসিয়া কি করিয়া যে সময় কাটিতেছিল তাহার খেয়াল ছিল না। কখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, কখন চাকরে আলো দিয়া গেছে সে টেরও পায় নাই। তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তাহার নিজের চোখের জলে। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া হাত দিয়া দেখিল, কখন ফোঁটা ফোঁটা করিয়া অজ্ঞাতসারে পড়িয়া বুকের কাপড় পর্যন্ত ভিজিয়া গেছে। ছি ছি—চাকর-বাকর আসিয়াছে, গেছে—হয়ত তাহারা লক্ষ্য করিয়াছে—হয়ত তাহারা কি মনে করিয়াছে—লজ্জায় আজ সে প্রয়োজনেও কাহাকেও কাছে ডাকিতে পারিল না। রাত্রিতে বিছানায় শুইয়া জানালা খুলিয়া দিয়া তেমনি বাহিরের অন্ধকারে চাহিয়া রহিল; অমনি বস্তু-বর্ণহীন শূন্য অন্ধকারের মত নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎটা তাহার চোখে ভাসিতে লাগিল। তাহার পরে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল তাহার মনে নাই, কিন্তু ঘুম যখন ভাঙিল তখন প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে ঘর ভরিয়া গেছে—প্রথমেই মনে পড়িল তাহাকে, যাহার সহিত সে জীবনে পাঁচ-ছয় দিনের বেশী কথা পর্যন্ত বলে নাই। আর মনে পড়িল, যে অজ্ঞাত বেদনা তাহার ঘুমের মধ্যেও সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল তাহারই সহিত কেমন করিয়া যেন সেই লোকটির ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে।

বেলা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যখনই মনে পড়ে সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে কোথায় তাহার একটি চোখ এবং একটি কান আজ সারাদিন পড়িয়া আছে, তখন নিজের কাছেই তাহার ভারী লজ্জা বোধ হয়। কিন্তু এ যে কিছুই নয়, এ যে শুধু সেই যন্ত্রটা দেখিবার কৌতূহল, একবার সেটা দেখা হইয়া গেলেই সমস্ত আগ্রহের নিবৃত্তি হইবে, আজ না হয় ত কাল হইবে—এমন করিয়াও আপনাকে আপনি অনেকবার বুঝাইল, কিন্তু কোন কাজেই লাগিল না; বরঞ্চ, বেলার সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠা যেন রহিয়া রহিয়া আশঙ্কায় আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। পৌষের মধ্যাহ্নসূর্য ক্রমশঃ এক পাশে হেলিয়া পড়িল; আলোকের চেহারায় দিনান্তের সূচনা দেখিয়া বিজয়ার বুক দমিয়া গেল। কাল যে লোক চিরদিনের মত দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, আজ সে যদি এতদূরে আসিতে এতখানি সময় নষ্ট করিতে না পারে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে! তাহার শেষ সম্বলটুকু যদি অপর কাহাকেও বেশী দামে বিক্রয় করিয়া চলিয়া গিয়া থাকে, তাহাকেই বা কি দোষ দিবে কে? তাহাদের শেষ কথাবার্তাগুলি সে বার বার তোলাপাড়া করিয়া নিরতিশয় অনুশোচনার সহিত মনে করিতে লাগিল যে মনের মধ্যে তাহার যাহাই থাক, মুখে সে এ সম্বন্ধে আগ্রহাতিশয্য একেবারেই প্রকাশ করে নাই। ইহাকে অনিচ্ছা কল্পনা করিয়া সে যদি শেষ পর্যন্ত পিছাইয়া গিয়া থাকে ত দর্পিতার উচিত শাস্তিই হইয়াছে বলিয়া হৃদয়ের ভিতর হইতে যে কঠিন তিরস্কার বারংবার ধ্বনিত হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার জবাব সে কোনদিকে চাহিয়াই খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু পরেশকে কিংবা আর কাহাকেও কোন ছলে তাঁহার কাছে পাঠান যায় কিনা, পাঠাইলেও তাহারা খুঁজিয়া পাইবে কিনা, তিনি আসিতে স্বীকার করিবেন কিনা, এমনি তর্ক-বিতর্ক করিয়া ছটফট করিয়া ঘড়ির

পানে চাহিয়া ঘর-বাহির করিয়া যখন কোনমতেই তাহার সময় কাটিতেছিল না, এমনি সময়ে পরেশ ঘরে ঢুকিয়া সংবাদ দিল, মাঠান, নীচে এসো, বাবু এসেছে।

বিজয়ার মুখ পাংশু হইয়া গেল—কে বাবু রে?

পরেশ কহিল, কাল যে এসেছ্যালো—তেনার হাতে মস্ত একটা চামড়ার বাক্স রয়েছে মাঠান।

আচ্ছা, তুই বাবুকে বসতে বল গে, আমি যাচ্ছি।

মিনিট দুই-তিন পরে বিজয়া ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিল। আজ তাহার পরনের কাপড়ে, মাথার ঈষৎ রুক্ষ এলোচুলে এমন একটা বিশেষত্ব ও পারিপাট্য ছিল যাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নহে। গতকল্যের সঙ্গে আজকের এই প্রভেদটায় ক্ষণকালের জন্য নরেনের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তাহার বিস্মিত-দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বিজয়ার নিজের দৃষ্টি যখন নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, তখন লজ্জায়-শরমে সে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। মাইক্রস্কোপের ব্যাগটা এতক্ষণ তাহার হাতেই ছিল, সেটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে কহিল, নমস্কার। আমি বিলেতে থাকতে ছবি আঁকতে শিখেছিলাম। আপনাকে ত আমি আরও কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু আজ আপনি ঘরে ঢুকতেই আমার চোখ খুলে গেল। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, যে ছবি আঁকতে জানে, তারই আপনাকে দেখে আজ লোভ হবে। বাঃ কি সুন্দর!

বিজয়া মনে মনে বুঝিল, ইহা সৌন্দর্যের পদমূলে অকপট ভক্তের স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কলুষ স্তোত্র অজ্ঞাতসারে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; এবং এ কথা একমাত্র ইহার মুখ দিয়াই বাহির হইতে পারে। কিন্তু তথাপি নিজের আরক্ত মুখখানা যে সে কোথায় লুকাইবে, এই দেহটাকে তাহার সমস্ত সাজসজ্জার সহিত যে কি করিয়া বিলুপ্ত করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া গম্ভীরস্বরে কহিল, আমাকে এ রকম অপ্রতিভ করা কি আপনার উচিত? তা ছাড়া, একটি জিনিস কিনব ব'লেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, ছবি আঁকাবার জন্যে ত ডাকিনি।

জবাব শুনিয়া নরেনের মুখ শুকাইল। সে লজ্জায় একান্ত সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া অস্ফুটকণ্ঠে এই বলিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল যে, সে কিছুই ভাবিয়া বলে নাই—তাহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে—আর কখনো সে—ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহার অনুতাপের পরিমাণ দেখিয়া বিজয়া হাসিল। স্নিগ্ধহাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিল, কৈ দেখি আপনার যন্ত্র।

নরেন বাঁচিয়া গেল। এই যে দেখাই, বলিয়া সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া তাহার বাক্স খুলিতে প্রবৃত্ত হইল। এই বসিবার ঘরটায় আলো কম হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া বিজয়া পাশের ঘরটা দেখাইয়া কহিল, ও-ঘরে এখনো আলো আছে, চলুন, ঐখানে যাই।

তাই চলুন, বলিয়া সে বাক্স হাতে লইয়া গৃহস্বামিনীর পিছনে পিছনে পাশের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। একটি ছোট টিপয়ের উপর যন্ত্রটি স্থাপিত করিয়া উভয়ে দুই দিকে দুখানা চেয়ার লইয়া বসিল। নরেন কহিল, এইবার দেখুন। কি ক'রে ব্যবহার করতে হয়, তার পরে আমি শিখিয়ে দেব।

এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটির সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নাই তাহারা ভাবিতেও পারে না কত বড় বিস্ময় এই ছোট জিনিসটির ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মত এমনি সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডও যে মানুষের একটি ক্ষুদ্র মুঠার ভিতর ধরিতে পারে, সে আভাস শুধু এই যন্ত্রটির সাহায্যেই পাওয়া যায়। এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়াই সে বিজয়ার মনোযোগ আহ্বান করিল। বিলাতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করার পরে তাহার জ্ঞানের পিপাসা এই জীবাণুতত্ত্বের দিকেই গিয়াছিল। তাই একদিকে যেমন ইহার সহিত তাহার পরিচয়ও একান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সংগ্রহও তেমনি অপর্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে-সমস্তই সে তাহার এই প্রাণাধিক যন্ত্রটির সহিত বিজয়াকে দিবার জন্য সঙ্গে আনিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল এ-সকল না দিলে শুধু শুধু যন্ত্রটা লইয়া আর একজনের কি লাভ হইবে। প্রথমে ত বিজয়া কিছু দেখিতে পায় না—শুধু ঝাপসা

আর ধোঁয়া। নরেন যতই আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করে সে কি দেখিতেছে ততই তাহার হাসি পায়। সেদিকে তাহার চেষ্টাও নাই মনোযোগও নাই। দেখিবার কৌশলটা নরেন প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে; প্রত্যেক কলকবজা নানাভাবে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া দেখাটা সহজ করিয়া তুলিবার বিধিমতে প্রয়াস পাইতেছে; কিন্তু দেখিবে কে? যে বুঝাইতেছে, তাহার কণ্ঠস্বরে আর একজনের বুকের ভিতরটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে, প্রবল নিশ্বাসে তাহার এলোচুল উড়িয়া সর্বাঙ্গ কণ্টকিত করিতেছে, হাত হাতে ঠেকিয়া দেহ অবশ করিয়া আনিতেছে—তাহার কি আসে-যায় জীবাণুর স্বচ্ছদেহের অভ্যন্তরে কি আছে, না আছে, দেখিয়া? কে ম্যালেরিয়ায় গ্রাম উজাড় করিতেছে, আর কে যক্ষ্মায় গৃহ শূন্য করিতেছে চিনিয়া রাখিয়া তাহার লাভ কি? করিলেও ত সে তাহাদের নিবারণ করিতে পারিবে না! সে ত আর ডাক্তার নয়! মিনিট-দশেক ধস্তাধস্তি করিয়া নরেন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সোজা উঠিয়া বসিল; কহিল, যান, এ আপনার কাজ নয়। এমন মোটাবুদ্ধি আমি জন্মে দেখিনি।

বিজয়া প্রাণপণে হাসি চাপিয়া কহিল, মোটাবুদ্ধি আমার, না আপনি বোঝাতে পারেন না।

নিজের রূঢ় কথায় নরেন মনে মনে লজ্জিত হইয়া কহিল, আর কি ক'রে বোঝাবো বলুন? আপনার বুদ্ধি আর কিছু সত্যিই মোটা নয়, কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে, আপনি মন দিচ্চেন না। আমি ব'কে মরচি, আর আপনি মিছামিছি ওটাতে চোখ রেখে মুখ নীচু ক'রে শুধু হাসচেন।

কে বললে আমি হাসচি?

আমি বলচি।

আপনার ভুল।

আমার ভুল? আচ্ছা বেশ, যন্ত্রটা ত আর ভুল নয়, তবে কেন দেখতে পেলেন না?

যন্ত্রটা আপনার খারাপ, তাই!

নরেন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বলিল, খারাপ! আপনি জানেন এ রকম পাওয়ারফুল মাইক্রস্কোপ্ এখানে বেশী লোকের নেই! এমন স্পষ্ট দেখাতে—

বলিয়া স্বচক্ষে একবার যাচাই করিয়া লইবার অত্যন্ত ব্যগ্রতায় ঝুঁকিতে গিয়া বিজয়ার মাথার সঙ্গে তাহার মাথা ঠুকিয়া গেল।

উঃ—করিয়া বিজয়া মাথা সরাইয়া লইয়া হাত বুলাইতে লাগিল। নরেন অপ্রস্তুত হইয়া কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, মাথা ঠুকে দিলে কি হয় জানেন? শিঙ্ বেরোয়।

নরেনও হাসিল। কহিল, বেরোতে হ'লে আপনার মাথা থেকেই তাদের বার হওয়া উচিত।

তা বৈ কি! আপনার এই পুরোনো ভাঙা যন্ত্রটাকে ভালো বলিনি ব'লে, আমার মাথাটা শিঙ্ বেরোবার মত মাথা!

নরেন হাসিল বটে, কিন্তু তাহার মুখ শুষ্ক হইল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে সত্যি বলচি, ভাঙা নয়। আমার কিছু নেই ব'লেই আপনার সন্দেহ হচ্চে আমি ঠকিয়ে টাকা নেবার চেষ্টা করচি, কিন্তু আপনি পরে দেখবেন।

বিজয়া কহিল, পরে দেখে আর কি কোরব বলুন? তখন আপনাকে আমি পাবো কোথায়?

নরেন তিক্তস্বরে বলিল, তবে কেন বললেন, আপনি নেবেন? কেন মিথ্যে কষ্ট দিলেন?

বিজয়া গম্ভীরভাবে বলিল, তখন আপনিই বা কেন না বললেন এটা ভাঙা?

নরেন মহা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, একশবার বলচি ভাঙা নয়, তবু বলবেন ভাঙা?

কিন্তু পরক্ষণেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা, তাই ভাল। আমি আর তর্ক করতে চাইনে—এটা ভাঙাই বটে। আপনি আমার এইটুকুমাত্র ক্ষতি করলেন যে, কাল আর যাওয়া হ'ল না। কিন্তু সবাই আপনার মত অন্ধ নয়—কলকাতায় আমি অনায়াসেই বেচতে পারি, তা জানবেন। আচ্ছা, চললুম—বলিয়া সে যন্ত্রটা বাক্সের মধ্যে পুরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

বিজয়া গম্ভীরভাবে বলিল, এখনি যাবেন কি করে? আপনাকে যে খেয়ে যেতে হবে।

না, তার দরকার নেই।

দরকার আছে বৈ কি।

নরেন মুখ তুলিয়া কহিল, আপনি মনে মনে হাসচেন। আমাকে কি উপহাস করচেন?

কাল যখন খেতে বলেছিলাম, তখন কি উপহাস করেছিলাম? সে হবে না, আপনাকে নিশ্চয় খেয়ে যেতে হবে। একটু বসুন, আমি এখনি আসচি, বলিয়া বিজয়া হাসি চাপিতে চাপিতে সমস্ত ঘরময় রূপের তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট-পাঁচেক পরেই সে স্বহস্তে খাবারের থালা এবং চাকরের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়া ফিরিয়া আসিল। টিপয়টা খালি দেখিয়া কহিল, এর মধ্যে বন্ধ ক'রে ফেলেচেন—আপনার রাগ ত কম নয়!

নরেন্দ্র উদাসকণ্ঠে জবাব দিল, আপনি নেবেন না তাতে রাগ কিসের? কিন্তু ভেবে দেখুন ত, এতবড় একটা ভারী জিনিস এতদূর বয়ে আনতে, বয়ে নিয়ে যেতে কত কষ্ট হয়!

থালাটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বিজয়া কহিল, তা হ'তে পারে। কিন্তু, কষ্ট ত আমার জন্য করেন নি, করেছেন নিজের জন্যে। আচ্ছা, খেতে বসুন, আমি চা তৈরি ক'রে দিই।

নরেন খাড়া বসিয়া রহিল দেখিয়া সে পুনরায় কহিল, আচ্ছা, আমিই না হয় নেব, আপনাকে ব'য়ে নিয়ে যেতে হবে না। আপনি খেতে আরম্ভ করুন।

নরেন্দ্র নিজেকে অপমানিত মনে করিয়া বলিল, আপনাকে দয়া করতে ত আমি অনুরোধ করিনি।

বিজয়া কহিল, সেদিন কিন্তু করেছিলেন, যেদিন মামার হ'য়ে বলতে এসেছিলেন।

সে পরের জন্যে, নিজের জন্যে নয়। এ অভ্যাস আমার নেই।

কথাটা যে কতদূর সত্য, বিজয়ার তাহা অগোচর ছিল না। সেই হেতু একটু গায়েও লাগিল। কহিল, যাই হোক, ওটা আপনার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না—এইখানেই থাকবে। আচ্ছা, খেতে বসুন।

নরেন সন্দিগ্ধ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে?

বিজয়া কহিল, কিছু একটা আছে বৈ কি।

জবাব শুনিয়া নরেন ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বোধ করি, মনে মনে এই কারণটা অনুসন্ধান করিল, এবং পরক্ষণেই হঠাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, সেইটে কি, তাই আমি আপনার কাছে স্পষ্ট শুনতে চাই। আপনি কি কেনবার ছলে কাছে আনিয়ে আটকাতে চান? এও কি বাবা আপনার কাছে বাঁধা রেখেছিলেন? আপনি ত তা হ'লে দেখচি আমাকেও আটকাতে পারেন? অনায়াসে বলতে পারেন, বাবা আমাকেও আপনার কাছে বাঁধা দিয়ে গেছেন।

বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে ঘাড় ফিরাইয়া কহিল, কালীপদ, তুই দাঁড়িয়ে কি করচিস? ও-গুলো নামিয়ে রেখে যা পান নিয়ে আয়।

ভৃত্য কেৎলি প্রভৃতি টেবিলের একধারে নামাইয়া দিয়া প্রস্থান করিলে বিজয়া নিঃশব্দে নতমুখে চা প্রস্তুত করিতে লাগিল, এবং অদূরে চৌকির উপর নরেন্দ্র মুখখানা রাগে হাঁড়ির মত করিয়া বসিয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সৃষ্টিতত্ত্বের যাহা অজ্ঞের ব্যাপার তাহার সম্বন্ধে বিজয়া বড় বড় পণ্ডিতের মুখে অনেক আলোচনা, অনেক গবেষণা শুনিয়াছে; কিন্তু যে অংশটা তাহার জ্ঞেয়, সে কোথায় শুরু হইয়াছে, কি তাহার কার্য, কেমন তাহার আকৃতি-প্রকৃতি, কি তাহার ইতিহাস,

এমন দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে সে যে আর কখনো শুনিয়াছে তাহার মনে হইল না। যে যন্ত্রটাকে সে এইমাত্র ভাঙ্গা বলিয়া উপহাস করিতেছিল তাহারই সাহায্যে কি অপূর্ব এবং অদ্ভুত ব্যাপার না তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। এই রোগা এবং ক্ষ্যাপাটে গোছের লোকটি যে ডাক্তারি পাশ করিয়াছে, ইহাই ত বিশ্বাস হইতে চায় না। কিন্তু শুধু তাহাই নয়; জীবিতদের সম্বন্ধে ইহার জ্ঞানের গভীরতা, ইহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা, ইহার স্মরণ করিয়া রাখিবার অসামান্য শক্তির পরিচয়ে সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। অথচ সামান্য লোকের মত ইহাকে রাগাইয়া দেওয়াও কত না সহজ! শেষাশেষি সে কতক বা শুনিতেছিল, কতক বা তাহার কানেও প্রবেশ করিতেছিল না। শুধু মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। নিজের ঝোঁকে সে যখন নিজেই বকিয়া যাইতেছিল, শ্রোতাটি হয়ত তখন ইহার ত্যাগ, ইহার সততা, ইহার সরলতার কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া স্নেহে, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে বিভোর হইয়া বসিয়া ছিল।

হঠাৎ এক সময়ে নরেনের চোখে পড়িয়া গেল যে সে মিথ্যা বকিয়া মরিতেছে। কহিল, আপনি কিছুই শুনচেন না।

বিজয়া চকিত হইয়া বলিল, শুনচি বৈ কি।

কি শুনলেন, বলুন তো?

বাঃ—একদিনেই বুঝি সবাই শিখতে পারে?

নরেন হতাশভাবে কহিল, না, আপনার কিছু হবে না। আপনার মত অন্যমনস্ক লোক আমি কোন কালে দেখিনি।

বিজয়া লেশমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিল, একদিনেই বুঝি হয়? আপনারই নাকি একদিনে হয়েছিল?

নরেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আপনার যে একশ বচ্ছরেও হবে না। তা ছাড়া এ সব শেখাবেই বা কে?

বিজয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, আপনি। নইলে ঐ ভাঙ্গা যন্ত্রটা কে নেবে?

নরেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনার নিয়েও কাজ নেই, আমি শেখাতেও পারব না।

বিজয়া কহিল, তা হ'লে ছবি-আঁকা শিখিয়ে দিন। সে ত শিখতে পারব?

নরেন উত্তেজিত হইয়া বলিল, তাও না। যে বিষয়ে মানুষের নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকে না, তাতেই যখন মন দিতে পারলেন না, মন দেবেন ছবি আঁকাতে? কিছুতেই না।

তা হ'লে ছবি-আঁকাও শিখতে পারব না?

না।

বিজয়া ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, কিছুই শিখতে না পারলে কিন্তু মাথায় সত্যিই শিঙ বেরোবে।

তাহার মুখের ভাবে ও কথায় নরেন পুনরায় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, সেই হবে আপনার উচিত শাস্তি।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, তা বৈ কি। আপনার শেখাবার ক্ষমতা নেই তাই কেন বলুন না। কিন্তু চাকরেরা কি করছে, আলো দেয় না কেন? একটু বসুন, আমি আলো দিতে ব'লে আসি। বলিয়া দ্রুতপদে উঠিয়া, দ্বারের পর্দা সরাইয়া অকস্মাৎ যেন ভূত দেখিয়া থামিয়া গেল। সম্মুখেই বসিবার ঘরের দুটা চৌকি দখল করিয়া পিতা-পুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী বসিয়া আছেন। বিলাসের মুখের উপর কে যেন এক ছোপ কালি মাখাইয়া দিয়াছে। বিজয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখন এলেন কাকাবাবু? আমাকে ডাকেন নি কেন?

রাসবিহারী শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, প্রায় আধ-ঘণ্টা এসেছি মা। তুমি ও-ঘরে কথায়-বার্তায় ব্যস্ত আছ ব'লে আর ডাকিনি। ওই বুঝি জগদীশের ছেলে? কি চায় ও?

পাশের ঘর পর্যন্ত শব্দ না পৌঁছায়, বিজয়া এমনি মৃদুস্বরে বলিল, একটা মাইক্রস্কোপ্ বিক্রি ক'রে উনি এখান থেকে যেতে চান। তাই দেখাচ্ছিলেন।

বিলাস ঠিক যেন গর্জন করিয়া উঠিল—মাইক্রস্কোপ্! ঠকাবার জায়গা পেলে না ও!

রাসবিহারী মৃদু ভর্ৎসনার ভাবে ছেলেকে বলিলেন, ও কথা কেন? তার উদ্দেশ্য ত আমরা জানিনে—ভালও ত হ'তে পারে!

বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, যা জানিনে, সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা আমি উচিত মনে করিনে। তার উদ্দেশ্য মন্দ নাও ত হ'তে পারে—কি বল মা? বলিয়া একটু থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিলেন, অবশ্য জোর ক'রে কিছুই বলা যায় না, সেও ঠিক। তা সে যাই হোক গে, ওতে আমাদের আবশ্যক কি? দূরবীন হ'লেও না হয় কখনো কালে-ভদ্রে দূরে-টুরে দেখতে কাজে লাগতেও পারে!—ও কে কালীপদ? ও ঘরে আলো দিতে যাচ্ছিস? অমনি বাবুটিকে ব'লে দিস আমরা কিনতে পারব না—তিনি যেতে পারেন।

বিজয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, তাঁকে বলেছি আমি নেব।

রাসবিহারী কিছু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, নেবে? কেন? তাতে প্রয়োজন কি?

বিজয়া মৌন হইয়া রহিল।

রাসবিহারী জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি কত দাম চান?

দু'শ টাকা।

রাসবিহারী দুই ভ্রূ প্রসারিত করিয়া কহিলেন, দু'শ? দু'শ টাকা চায়? বিলাস তা হ'লে নেহাত—কি বল বিলাস, কলেজে তোমার এফ এ. ক্লাসে কেমিস্ট্রীতে ত এসব অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেচ—দু'শ টাকা একটা মাইক্রস্কোপের দাম? কালীপদ, যা—ওঁকে যেতে ব'লে দে—এসব ফন্দি এখানে খাটবে না।

কিন্তু যাহাকে বলিতে হইবে, সে যে নিজের কানেই সমস্ত শুনিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কালীপদ যাইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া বিজয়া তাহাকে শান্ত অথচ দৃঢ়-কণ্ঠে বলিয়া দিল, তুমি শুধু আলো দিয়ে এসো গে, যা বলবার আমি নিজেই বলব।

বিলাস শ্লেষ করিয়া তাহার পিতাকে কহিল, কেন বাবা, তুমি মিথ্যে অপমান হতে গেলে? ওঁর হয়ত এখনো কিছু দেখিয়ে নিতে বাকী আছে।

রাসবিহারী কথা কহিলেন না, কিন্তু ক্রোধে বিজয়ার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বিলাস তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিয়া ফেলিল, আমরাও অনেক রকম মাইক্রস্কোপ্ দেখেচি বাবা, কিন্তু হো হো ক'রে হাসবার বিষয় কখনো কোনটার মধ্যে পাইনি।

কাল খাওয়ানোর কথাও সে জানিতে পারিয়াছিল, আজ উচ্চহাস্যও সে স্বকর্ণে শুনিয়াছিল। বিজয়ার আজিকার বেশভূষার পারিপাট্যও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। ঈর্ষার বিষে সে এমনি জ্বলিয়া মরিতেছিল যে, তাহার আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। বিজয়া তাহার দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া রাসবিহারীকে কহিল, আমার সঙ্গে কি আপনার কোন বিশেষ কথা আছে কাকাবাবু?

রাসবিহারী অলক্ষ্যে পুত্রের প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বিজয়াকে কহিলেন, কথা আছে বৈ কি মা! কিন্তু তার জন্যে তাড়াতাড়ি কি?

একটু থামিয়া কহিলেন, আর—ভেবে দেখলাম, ওকে কথা যখন দিয়েচ, তখন যাই হোক সেটা নিতে হবে বৈ কি। দু'শ টাকা বেশী, না, কথাটার দাম বেশী! তা না হয়, ওকে কাল একবার এসে টাকাটা নিয়ে যেতে ব'লে দিক না মা?

বিজয়া এ প্রশ্নের জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কি কাল কথা হ'তে পারে না কাকাবাবু?

রাসবিহারী একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন মা?

বিজয়া মুহূর্তকাল স্থির থাকিয়া দ্বিধা-সঙ্কোচ সবলে বর্জন করিয়া কহিল, ওঁর রাত হয়ে যাচ্চে—আবার অনেক দূর যেতে হবে। ওঁর সঙ্গে আমার কিছু আলোচনা করবার আছে।

তাহার এই স্পর্ধিত প্রকাশ্যতায় বৃদ্ধ মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেও বাহিরে তাহার লেশমাত্র প্রকাশ পাইতে দিলেন না। চাহিয়া দেখিলেন, পুত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি অন্ধকারে হিংস্র শ্বাপদের মত ঝকঝক করিতেছে, এবং কি একটা সে বলিবার চেষ্টায় যেন যুদ্ধ করিতেছে। ধূর্ত রাসবিহারী অবস্থাটা চক্ষের নিমেষে বুঝিয়া লইয়া

তাহাকে কটাক্ষে নিবারণ করিয়া প্রফুল্ল হাসিমুখে কহিলেন, বেশ ত মা, আমি কাল সকালেই আবার আসব। বিলাস, অন্ধকার হ'য়ে আসচে বাবা, চল, আমরা যাই—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ছেলের বাহুতে একটু মৃদু আকর্ষণ দিয়া তাহার অবরুদ্ধ দুর্দাম ক্রোধ ফাটিয়া বাহির হইবার পূর্বেই সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

বিজয়া সেই অবধি বিলাসের প্রতি একেবারেই চাহে নাই। সুতরাং তাহার মুখের ভাব ও চোখের চাহনি স্বচক্ষে দেখিতে না পাইলেও মনে মনে সমস্ত অনুভব করিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কালীপদ এ ঘরে বাতি দিতে আসিয়া কহিল, ও-ঘরে আলো দিয়ে এসেচি মা।

আচ্ছা, বলিয়া বিজয়া নিজেকে সংযত করিয়া পরক্ষণে দ্বারের পর্দা সরাইয়া ধীরে ধীরে এ ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নরেন ঘাড় হেঁট করিয়া কি ভাবিতেছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিঃশ্বাস চাপিবার ব্যর্থ চেষ্টাও বিজয়ার কাছে ধরা পড়িল। একটুখানি চুপ করিয়া নরেন দুঃখের সহিত কহিল, এটা আমি সঙ্গে নিয়েই যাচ্ছি, কিন্তু আজকের দিনটা আপনার বড় খারাপ গেল। কি জানি কার মুখ দেখে সকালে উঠেছিলেন, আপনাকে অনেক অপ্রিয় কথা আমিও বলেচি, ওঁরাও বলে গেলেন।

বিজয়ার মনের ভিতরটায় তখনো জ্বালা করিতেছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার অন্তরের দাহ দুই চক্ষে দীপ্ত হইয়া উঠিল; অবিচলিতকণ্ঠে কহিল, তার মুখ দেখেই আমার যেন রোজ ঘুম ভাঙে। আপনি সমস্ত কথা নিজের কানে শুনেছেন ব'লেই বলচি যে, আপনার সম্বন্ধে তাঁরা যে সব অসম্মানের কথা বলেছেন, সে তাঁদের অনধিকার চর্চা। কাল তাঁদের আমি তা বুঝিয়ে দেব।

অতিথির অসম্মান যে তাহার কিরূপ লাগিয়াছে নরেন তাহা বুঝিয়াছিল, কিন্তু শান্ত সহজভাবে কহিল, আবশ্যক কি? এ সব জিনিসের ধারণা নেই বলেই তাঁদের সন্দেহ হয়েচে, নইলে আমাকে অপমান করায় তাঁদের কোন লাভ নেই। আপনার নিজেরও ত প্রথমে নানা কারণে সন্দেহ হয়েছিল, সে কি অসম্মান করার জন্যে? তাঁরা আপনার আত্মীয়, শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার জন্যে তাঁদের ক্ষুন্ন করবেন না। কিন্তু রাত হ'য়ে যাচ্চে—আমি যাই।

কাল কি পরশু একবার আসতে পারবেন?

কাল কি পরশু? কিন্তু আর ত সময় হবে না। কাল আমি যাচ্ছি, অবশ্য কালই চলে যাওয়া হবে না, কলকাতায় কয়েকদিন থাকতে হবে। কিন্তু আর দেখা করবার—

বিজয়ার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে না পারিল মুখ তুলিতে, না পারিল কথা কহিতে। নরেন আপনিই একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আপনি নিজে এত হাসাতে পারেন, আর আপনারই এত সামান্য কথায় এমন রাগ হয়? আমিই বরঞ্চ একবার রেগে আপনাকে মোটাবুদ্ধি প্রভৃতি কত কি ব'লে ফেলেচি; কিন্তু তাতে ত রাগ করেন নি, বরঞ্চ মুখ টিপে হাসছিলেন দেখে আমার আরও রাগ হচ্ছিল। কিন্তু আপনাকে আমার সর্বদা মনে পড়বে—আপনি ভারী হাসাতে পারেন।

ক্ষান্ত-বর্ষণ বৃষ্টির জল দমকা হাওয়ায় যেমন করিয়া পাতা হইতে ঝরিয়া পড়ে, তেমনি শেষ কথাটায় কয়েক ফোঁটা চোখের জল বিজয়ার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু পাছে হাত তুলিয়া মুছিতে গেলে অপরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, এই ভয়ে সে নিঃশব্দে নতমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন বলিতে লাগিল, এটা নিতে পারলেন না ব'লে আপনি দুঃখিত—বলিয়াই সহসা কথার মাঝখানে থামিয়া গিয়া এই কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত বৈজ্ঞানিক চক্ষের নিমিষে এক বিষম কাণ্ড করিয়া বসিল। অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া বিজয়ার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, এ কি আপনি কাঁদচেন?

বিদ্যুদ্বেগে বিজয়া দুই পা পিছাইয়া গিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। নরেন হতবুদ্ধি হইয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ল?

এ সকল ব্যাপার সে বেচারার বুদ্ধির অতীত। সে জীবাণুদের চিনে, তাহাদের নাম-ধাম, জাতি-গোত্রের কোন খবর তাহার অপরিজ্ঞাত নয়, তাহাদের কার্যকলাপ রীতিনীতি সম্বন্ধে কখনো তাহার একবিন্দু ভুল হয় না, তাহাদের আচার-ব্যবহারের সমস্ত হিসাব

তাহার নখাগ্রে—কিন্তু এ কি! যাহাকে নির্বোধ বলিয়া গালি দিলে লুকাইয়া হাসে, এবং শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় তদ্গত হইয়া প্রশংসা করিলে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়, এমন অদ্ভুত-প্রকৃতির জীবকে লইয়া সংসারের জ্ঞানী লোকের সহজ কারবার চলে কি করিয়া! সে খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই বিজয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওটা আমার, আপনি রেখে দিন, বলিয়া কান্না আর চাপিতে না পারিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেটা নামাইয়া রাখিয়া নরেন হতবুদ্ধির মত মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। আরও মিনিট-খানেক চুপ করিয়া অপেক্ষা করিয়া অবশেষে শূন্য-হাতে অন্ধকার পথ ধরিয়া প্রস্থান করিল।

বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, ব্যাগ আছে মালিক নাই। সে টাকা আনিতে নিজের ঘরে গিয়াছিল; কিন্তু বিছানায় মুখ গুঁজিয়া কান্না সামলাইতে যে এতক্ষণ গেছে, তাহার হুঁশ ছিল না। ডাক শুনিয়া কালীপদ বাহিরে আসিল। প্রশ্ন শুনিয়া সে মুখে মুখে সাংসারিক কাজের বিরাট ফর্দ দাখিল করিয়া কহিল, সে ভিতরে ছিল, জানেও না বাবু কখন চলিয়া গিয়াছেন। দরোয়ান কানাই সিং আসিয়া বলিল, সে ড়হর ডাল নামাইয়া চাপাটি গড়িতেছিল, কোন্ ফুরসতে যে বাবু চুপ্‌সে বাহির হইয়া গেছেন, তাহার মালুম নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিলাসবিহারীর প্রচণ্ড কীর্তি—পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার শুভদিন আসন্ন হইয়া আসিল। একে একে অতিথিগণের সমাগম ঘটিতে লাগিল। শুধু কলিকাতার নয়, আশপাশ হইতেও দুই-চারিজন সস্ত্রীক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাল সেই শুভদিন। আজ সন্ধ্যায় রাসবিহারী তাহার আবাস-ভবনে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন।

সংসারে স্বার্থহানির আশংকা কোন কোন বিষয়ী লোককে যে কিরূপ কুশাগ্রবুদ্ধি ও দূরদর্শী করিয়া তুলে, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে।

সমবেত নিমন্ত্রিতগণের মাঝখানে বসিয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী তাঁহার পাকা দাড়িতে হাত বুলাইয়া অর্ধমুদিত নেত্রে তাঁহার আবাল্য-সুহৃৎ পরলোকগত বনমালীর উল্লেখ করিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ভগবান তাঁকে অসময়ে আহ্বান ক'রে নিলেন—তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার এতটুকু নালিশ নেই; কিন্তু সে যে আমাকে কি ক'রে রেখে গেছে, আমার বাইরে দেখে সে আপনারা অনুমান করতেও পারবেন না। যদিচ আমাদের সাক্ষাতের দিন প্রতিদিন নিকটবর্তী হয়ে আসচে, সে আভাস আমি প্রতিমুহূর্তেই পাই, তবুও সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্মের শ্রীচরণে এই প্রার্থনা করি, তিনি তাঁর অসীম করুণায় সেই দিনটিকে যেন আরও সন্নিকটবর্তী ক'রে দেন। এই বলিয়া তিনি জামার হাতায় চোখের কোণটা মুছিয়া ফেলিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ আত্ম-সমাহিত ভাবে মৌন থাকিয়া পুনরায় অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল-কণ্ঠে কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাল্যের খেলাধুলো, কিশোর বয়সের পড়াশুনা—তারপর যৌবনে সত্যধর্ম গ্রহণের ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিলেন, কিন্তু বনমালীর কোমল হৃদয়ে গ্রামের অত্যাচার সহ্য হ'ল না—তিনি কলকাতায় চলে গেলেন। কিন্তু আমি সমস্ত নির্যাতন সহ্য ক'রে গ্রামে থাকতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। উঃ—সে কি নির্যাতন! তথাপি মনে মনে বললাম, সত্যের জয় হ'বেই। তাঁর মহিমায় একদিন জয়ী হ'বই। সেই শুভদিন আজ সমাগত—তাই এখানে এতকাল পরে আপনাদের পদধূলি পড়ল। বনমালী আমাদের মধ্যে আজ নেই—দুদিন পূর্বেই তিনি চলে গেছেন; কিন্তু আমি চোখ বুজলেই দেখতে পাই, ওই, তিনি উপর থেকে আনন্দে মৃদু মৃদু হাস্য করচেন। এই বলিয়া তিনি পুনরায় মুদিত নেত্রে স্থির হইলেন।

উপস্থিত সকলের মনই উত্তেজিত হইয়া উঠিল—বিজয়ার দুচক্ষে অশ্রু টলটল করিতে

লাগিল। রাসবিহারী চক্ষু মেলিয়া সহসা দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই তাঁর একমাত্র কন্যা বিজয়া। পিতার সর্বগুণের অধিকারিণী —কিন্তু কর্তব্যে কঠোর! সত্যে নির্ভীক! স্থির! আর ঐ আমার পুত্র বিলাসবিহারী। এমনি অটল, এমনি দৃঢ়চিত্ত। এরা বাহিরে এখনও আলাদা হলেও অন্তরে—হ্যাঁ, আর একটি শুভদিন আসন্ন হয়ে আসচে যেদিন আবার আপনাদের পদধূলির কল্যাণে এ'দের সম্মিলিত নবীন-জীবন ধন্য হবে।

একটি অস্ফুট মধুর কলরবে সমস্ত সভাটি মুখরিত হইয়া উঠিল। যে মহিলাটি পাশে বসিয়া ছিলেন, তিনি বিজয়ার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া একটু চাপ দিলেন। রাসবিহারী একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, ঐ তাঁর একমাত্র সন্তান—এটি তাঁর চোখে দেখে যাবার বড় সাধ ছিল; কিন্তু সমস্ত অপরাধ আমার। আজ আপনাদের সকলের কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করচি—এর জন্যে দায়ী আমি একা। পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মত যে মানব-জীবন, এ শুধু আমরা মুখেই বলি, কিন্তু কাজে ত করি না! সে যে এত শীঘ্র যেতে পারে সে খেয়াল ত করলাম না!

এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত নীরব হইলেন। তাঁহার অনুতাপবিদ্ধ অন্তরের ছবি উজ্জ্বল দীপালোকে মুখের উপর ফুটিয়া উঠিল। পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্ত গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, কিন্তু এবার আমার চৈতন্য হয়েচে। তাই নিজের শরীরের দিকে চেয়ে, এই আগামী ফাল্গুনের বেশী আর আমার বিলম্ব করবার সাহস হয় না। কি জানি, পাছে আমিও না দেখে যেতে পারি।

আবার একটা অব্যক্ত ধ্বনি উত্থিত হইল। রাসবিহারী দক্ষিণে ও বামে দৃষ্টিপাত করিয়া বিজয়াকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বনমালী তাঁর যথাসর্বস্বের সঙ্গে মেয়েকেও যেমন আমার হাতে দিয়ে গেছেন, আমিও তেমনি ধর্মের দিকে দৃষ্টি রেখে আমার কর্তব্য সমাপন ক'রে যাবো। ওঁরাও তেমনি আপনাদের আশীর্বাদে দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে, সত্যকে আশ্রয় ক'রে, কর্তব্য করুন। যেখান থেকে ওঁদের পিতাকে নির্বাসিত করা হয়েছিল সেইখানে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে সত্যধর্ম প্রচার করুন, এই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

বৃদ্ধ আচার্য দয়ালচন্দ্র ধাড়া মহাশয় ইহার উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করিলেন।

রাসবিহারী তখন বিজয়াকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মা, তোমার বাবা নেই, তোমার জননী সাধ্বীসতী বহু পূর্বেই স্বর্গারোহণ করেছেন, নইলে এ কথা আজ আমার তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে হ'ত না। লজ্জা করো না মা, বল, আজ এখানেই আমাদের এই পূজনীয় অতিথিগণকে আগামী ফাল্গুন মাসেই আবার একবার পদধূলি দেবার জন্যে আমন্ত্রণ ক'রে রাখি।

বিজয়া কথা কহিবে কি, ক্ষোভে, বিরক্তিতে, ভয়ে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। সে অধোবদনে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রাসবিহারী ক্ষণকালমাত্র অপেক্ষা করিয়াই মৃদু হাসিয়া কহিলেন, দীর্ঘজীবী হও মা, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না—আমরা সমস্ত বুঝেছি।

তাহার পরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া, দুই হাত যুক্ত করিয়া বলিলেন, আমি আগামী ফাল্গুনেই আর একবার আপনাদের পদধূলির ভিক্ষা জানাচ্ছি।

সকলেই বার বার করিয়া তাঁদের সম্মতি জানাইতে লাগিলেন। বিজয়া আর সহ্য করিতে না পারিয়া অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, বাবার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে—প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে কথাটা সে শেষ করিতেও পারিল না।

রাসবিহারী চক্ষের পলকে ব্যাপারটা অনুভব করিয়া গভীর অনুতাপের সহিত তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, ঠিক ত মা, ঠিক ত! এ যে আমার স্মরণ ছিল না। কিন্তু তুমি আমার মা কিনা, তাই এ বুড়ো ছেলের ভুল ধ'রে দিলে।

বিজয়া নীরবে আঁচলে চোখ মুছিল। রাসবিহারী ইহাও লক্ষ্য করিলেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে বলিলেন, সকলই তাঁর ইচ্ছা। একটু পরে কহিলেন, তাই হবে। কিন্তু তারও ত আর বিলম্ব নেই।

সকলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বেশ, আগামী বৈশাখেই শুভকার্য সম্পন্ন হবে।

আপনাদের কাছে এই আমাদের পাকা কথা হয়ে রইল। বিলাসবিহারী, বাবা, রাত্রি হয়ে যাচ্ছে—কাল প্রভাত থেকে ত কাজের অন্ত থাকবে না,—আমাদের আহারের আয়োজনটা—না—না, চাকরদের উপর আর নির্ভর করা নয়—তুমি নিজে যাও,—চল, আমিও যাচ্ছি—তা হ'লে আপনাদের অনুমতি হ'লে আমি একবার—বলিতে বলিতেই তিনি পুত্রের পিছনে পিছনে অন্দরের দিকে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে প্রীতি-ভোজনের কার্য সমাধা হইয়া গেল। আয়োজন প্রচুর হইয়াছিল, কোথাও কোন অংশে ত্রুটি পড়িল না। রাত্রি প্রায় বারোটা বাজে, একটা থামের আড়ালে অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া বিজয়া পালকির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। রাসবিহারী তাহাকে যেন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া একেবারে চমকিয়া গেলেন—এখানে একলা দাঁড়িয়ে কেন মা? এসো এসো—ঘরে বসবে এসো।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল. না, কাকাবাবু, আমি বেশ দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে যে মা?

না, লাগবে না।

রাসবিহারী তখন পাশে দাঁড়াইয়া 'ঘরের লক্ষ্মী' প্রভৃতি বলিয়া আর একদফা আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন। বিজয়া পাথরের মূর্তির মত নির্বাক হইয়া এই সমস্ত স্নেহের অভিনয় সহ্য করিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তাঁহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, তোমাকে সে কথাটা বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম মা। সেই মাইক্রস্কোপের দামটা তাঁকে আমি দিয়ে দিয়েছি।

আট-দশ দিন হইয়া গেল, নরেন্দ্র সেই যে সেটা রাখিয়া গেছে, আর আসে নাই। এই কয়টা দিন যে বিজয়ার কি করিয়া কাটিয়াছে, তাহা শুধু সেই জানে। তাঁহার পিসীর বাড়ির দূরত্বটাই সে জানিয়া লইয়াছিল, কিন্তু সে যে কোথায় কোন্ গ্রামে তাহা জিজ্ঞাসা করে নাই। এই ভুলটা তাহাকে প্রতি মুহূর্তে তপ্ত শেলে বিঁধিয়া গেছে; কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। এখন রাসবিহারীর কথায় সে চকিত হইয়া বলিল, কখন দিলেন?

রাসবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, কি জানি তার পরের দিনেই হবে বুঝি। শুনলাম, তুমি সেটা কিনবে ব'লেই রেখেছ। কথা, কথা। যখন কথা দেওয়া হয়েছে, তখন ঠকাই হোক আর যাই হোক, টাকা দেওয়াও হয়েছে—এই ত আমি সারাজীবন বুঝে এসেছি মা। দেখলাম সে বেচারার ভারী দরকার—টাকাটা হাতে পেলেই চ'লে যায়—গিয়ে যা হোক কিছু করবার চেষ্টা করে। হাজার হোক সেও ত আমার পর নয় মা, সেও ত এক বন্ধুরই ছেলে। দেখলাম চলে যাবার জন্যে ভারী ব্যস্ত—পেলেই চ'লে যায়। আর তোমার দেওয়াও দেওয়া, আমার দেওয়াও দেওয়া। তাই তখনি দিয়ে দিলাম। তার ধর্ম তার কাছে—দশ টাকা বেশী নিয়ে থাকে, নিক।

বিজয়ার মুখের ভিতর জিভটা যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল,—কিছুতেই যেন তার কথা ফুটিবে না এমনি মনে হইল। কিছুক্ষণ প্রবল চেষ্টায় বলিয়া ফেলিল, কোথায় তাঁকে টাকা দিলেন?

রাসবিহারী কেমন করিয়া জানি না, প্রশ্নটাকে সম্পূর্ণ অন্য বুঝিয়া চমকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, না—না, বল কি, টাকাটা দুবার ক'রে নিলে নাকি? কিন্তু কৈ সে রকম ত তার মুখ দেখে মনে হ'ল না? আর কাকেই বা দোষ দেব। এমনি ক'রে লোকের কথায় বিশ্বাস ক'রে ঠকতে ঠকতেই ত দাড়ি পাকিয়ে দিলাম। না হয়, আর দু'শ গেল। তা সে টাকাটা আমিই দেব—চিরকাল এই রকম দণ্ড বইতে বইতে কাঁধে কড়া পড়ে গেছে মা, আর লাগে না। যাক সে আমি—

বিজয়া আর কিছুতেই সহিতে না পারিয়া রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিল, কেন আপনি মিথ্যে ভয় করচেন কাকাবাবু? দু'বার ক'রে টাকা নেবার লোক তিনি ন'ন—না খেতে পেয়ে মরবার সময় পর্যন্ত ন'ন। কিন্ত কোথায় দেখা হ'ল? কবে টাকা দিলেন?

—— [illegible] হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, যাক বাঁচা গেল!

টাকাটাও ত কম নয়—দু'শ! যাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত! হঠাৎ দেখা হ'তেই—কে দাঁড়িয়ে? বিলাস? পাল্কির কি হ'ল, বল দেখি? ঠাণ্ডা লেগে যাচ্ছে যে! যে কাজটা আমি নিজে না দেখব, তাই কি হবে না! বলিয়া অত্যন্ত রাগ করিয়া তিনি ও-ধারের একটা থামকে বিলাস কল্পনা করিয়া অকস্মাৎ দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

এমন একদিন ছিল, যখন বিলাসের হাতে আত্মসমর্পণ করা বিজয়ার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন ছিল না। কিন্তু আজ শুধু বিলাস কেন, এত বড় পৃথিবীর এত কোটি লোকের মধ্যে কেবল একটিমাত্র লোক ছাড়া আর কেহ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে ভাবিলেও তাহার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় এবং কি-একটা গভীর পাপের ভয়ে ত্রস্ত সশঙ্কিত হইয়া ওঠে। এই জিনিসটাকেই সে রাসবিহারীর নিমন্ত্রণ সারিয়া পাল্কিতে উঠিয়া পর্যন্ত নানাদিক দিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করিতে করিতে বাটী আসিতেছিল।

তাহার সম্বন্ধে তাহার পিতার মনোভাব ঠিক কি ছিল, তাহা জানিয়া লইবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাহার নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ধারণাটা যে বিলাসবিহারীর সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রবাহিত হইবে তাহা স্থির হইয়া গিয়াছিল। কোনমতেই যে ইহার ব্যত্যয় ঘটিতে পারে, এ সম্ভাবনা কোন দিন তাহার মনে উদয় হয় নাই!

অথচ এই যে একটা অনাসক্ত উদাসীন লোক আকাশের কোন্ এক অদৃশ্য প্রান্ত হইতে সহসা ধূমকেতুর মত উঠিয়া আসিল এবং এক নিমেষে তাহার বিশাল পুচ্ছের প্রচণ্ড তাড়নায় সমস্ত লণ্ডভণ্ড বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া তাহার সুনির্দিষ্ট পথের রেখাটা পর্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া কোথায় যে নিজে সরিয়া গেল—চিহ্ন পর্যন্ত রাখিয়া গেল না—ইহা সত্য কিংবা নিছক স্বপ্ন ইহাই বিজয়া তাহার সমস্ত আত্মাকে জাগ্রত করিয়া আজ ভাবিতেছিল। যদি স্বপ্ন হয় সে মোহ কেমন করিয়া কতদিনে কাটিবে, আর যদি সত্য হয় তবে তাহাই বা জীবনে কি করিয়া সার্থক হইবে?

ঘরে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল কিন্তু নিদ্রা তাহার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কাছেও ঘেঁষিল না। আজ যে আশঙ্কাটা তাহার মনে বার বার উঠিতে লাগিল তাহা এই যে, যে-চিন্তা কিছুদিন হইতে তাহার চিত্তকে অহর্নিশ আন্দোলিত করিতেছে তাহাতে সত্য বস্তু কিছু আছে, কিংবা সে শুধুই তাহার আকাশকুসুমের মালা? এর নিদারুণ সমস্যার গ্রন্থিভেদ করিয়া তাহাকে কে দিবে?

তাহার মা নাই, পিতাও পরলোকে; ভাই-বোন ত কোনদিনই ছিল না—আপনার বলিতে একা রাসবিহারী ব্যতীত আর কেহ নাই। তিনিই বন্ধু, তিনিই বান্ধব, তিনিই অভিভাবক। অথচ কোন্ শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে যে তিনি এমন তাড়া করিয়া তাহাকে তাহার আজন্ম-পরিচিত কলিকাতার সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেশে আনিয়া ফেলিয়াছেন সে আজ বিজয়ার কাছে জলের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেছে। এই স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, আজ সমস্তই তাহার চোখে সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। বিদেশ যাত্রায় নরেনকে অযাচিত সাহায্য দান, নিজের গৃহে এই খাওয়ানোর আয়োজন, সম্মানিত অতিথিদের সম্মুখে এই বিবাহের প্রস্তাব, তাহার সলজ্জ নীরবতার অর্থ মৌন-সম্মতি বলিয়া অসংশয়ে প্রচার করা—তাহাকে সকল দিক দিয়া বাঁধিয়া ফেলিতে এই বৃদ্ধের চেষ্টা-পরম্পরার কিছুই আর তাহার কাছে প্রচ্ছন্ন নাই।

কিন্তু রহস্য এই যে, অত্যাচার-উপদ্রবের লেশমাত্র চিহ্নও রাসবিহারীর কোন কাজে কোথাও বিদ্যমান নাই। অথচ বৃদ্ধের বিনম্র স্নেহসরস মঙ্গলেচ্ছার অন্তরালে দাঁড়াইয়া কত বড় দুর্নিবার তাড়না যে তাহাকে অহরহ ঠেলিয়া জালের মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে—উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের উপায়-বিহীনত্বের ছবিটা এমনি সুস্পষ্ট

হইয়া দেখা দিল যে, একাকী ঘরের মধ্যেও বিজয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে সে মুহূর্তের জন্য ঘুমাইতে পারিল না; তাহার পরলোকগত পিতাকে বারংবার ডাকিয়া কেবলই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, 'বাবা, তুমি ত এঁদের চিনতে পেরেছিলে, তবে কেন আমাকে এমন করে তাঁদের মুখের মধ্যে সঁপে দিয়ে গেলে?'

এক সময় সে যে নিজেই বিলাসকে পছন্দ করিয়াছিল, এবং তাহারই সহিত একযোগে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নরেনের সর্বনাশ কামনা করিয়াছিল, সেই কামনাই আজ তাহার সমস্ত শুভ-ইচ্ছাকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিতেছে, মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। সে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, স্নেহে অন্ধ হইয়া কেন পিতা এই সর্বনাশের মূল স্বহস্তে উন্মূলিত করিয়া গেলেন না; কেন তাহারই বুদ্ধি-বিবেচনার উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া গেলেন। আর তাই যদি গেলেন, তবে কেন তাহার স্বাধীনতার পথ এমন করিয়া সকল দিক দিয়া রুদ্ধ করিয়া গেলেন? সমস্ত উপাধান সিক্ত করিয়া সে কেবলই ভাবিতে লাগিল তাহার এই ক্রুদ্ধ অভিমানের নিষ্ফল নালিশ আজ সেই স্বর্গবাসী পিতার কানে কি পৌঁছিতেছে না? আজ প্রতিকারের উপায় কি তাহার হাতে আর একবিন্দুও নাই?

পরদিন পরেশের মায়ের ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা হইয়াছে। উঠিয়া শুনিল, তাহার বাহিরের ঘর নিমন্ত্রিতগণের অভ্যাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে—শুধু সে-ই উপস্থিত নাই। এই ত্রুটি সারিয়া লইতে সে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি করিবে কি—আজিকার সারাদিনব্যাপী উৎসবের হাঙ্গামা মনে করিতেই তাহার ভারী যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মিল। শীতের প্রভাত-সূর্যালোক বাগানের আমগাছের মাথায় মাথায় ভরিয়া গিয়াছে, এবং তাহারই পাতার ফাঁকে ফাঁকে সম্মুখের মাঠের উপর দিয়া রাখাল বালকেরা খেলা করিতে করিতে গরু চরাইতে চলিয়াছে। দেশে আসিয়া পর্যন্ত এই দৃশ্যটি দেখিতে তাহার কোন দিন ক্লান্তি জন্মে নাই। অনেক দিন অনেক দরকারী কাজ ফেলিয়াও সে বহুক্ষণ পর্যন্ত ইহাদের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু আজ সে ভাবিয়াই পাইল না এতদিন কি মাধুর্য ইহাতে ছিল! বরঞ্চ এ যেন একটা অত্যন্ত পুরানো বাসী জিনিসের মত তাহার কাছে আগাগোড়া বিস্বাদ ঠেকিল। এই দৃশ্য হইতে সে তাহার শ্রান্ত চোখ দুটি ধীরে ধীরে ফিরাইয়া লইতেই দেখিতে পাইল, কালীপদ এক-এক লাফে তিন-তিনটা সিঁড়ি ডিঙাইয়া উপরে উঠিতেছে। চোখাচোখি হইবামাত্র সে মহাব্যস্ততার ইঙ্গিত জানাইয়া হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল, মা শিগগির, শিগগির! ছোটবাবু ভয়ানক রেগে উঠেছেন। আজ এত দেরিও করতে আছে!

কিন্তু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ একরাশি বারুদের মধ্যে পড়িয়া যে বিপ্লবের সৃষ্টি করে, ভৃত্যের এই সংবাদটাও বিজয়ার দেহ-মনে ঠিক তেমনি ভীষণ কাণ্ড বাধাইয়া প্রচণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু হঠাৎ সে কথা কহিতে পারিল না, তাহার দুই প্রদীপ্ত চক্ষু হইতে অসহ্য দাহ ঠিকরিয়া পড়িতে লাগিল। কালীপদ সেই চোখের পানে চাহিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া কি-একটা পুনরায় বলিবার চেষ্টা করিতেই, বিজয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, তুমি নীচে যাও কালীপদ। বলিয়া নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

এ বাটীতে 'ছোটবাবু' বলিতে যে বিলাসবিহারীকে এবং 'বড়বাবু' বলিতে তাহার পিতাকে বুঝায়, [illegible] তাহা জানিত। কিন্তু এই দুটি পিতা-পুত্রে এখানে এত বড় হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহাদের ক্রোধের গুরুত্ব আজ চাকর-বাকরদের কাছে বাড়ির মনিবকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়াছে, এ খবর বিজয়া এই প্রথম পাইল। আজ সে স্পষ্ট দেখিল, ইহারই মধ্যে বিলাস এখানকার সত্যকার প্রভু এবং সে নিজে তাহার শাসিত কৃপার পাত্রী। এ তথ্য যে তাহার মনের আগুনে জলধারা সিঞ্চিত করিল না তাহা বলাই বাহুল্য।

আধ-ঘণ্টা পরে সে যখন হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিল, তখন চা খাওয়া চলিতেছিল। উপস্থিত সকলেই প্রায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিল, এবং তাহার মুখ-চোখের শুষ্কতা লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলা অস্ফুট-কণ্ঠের উদ্বিগ্ন প্রশ্নও ধ্বনিয়া উঠিল। কিন্তু সহসা বিলাসবিহারীর তীব্র কটুকণ্ঠে সমস্ত ডুবিয়া গেল।

সে তাহার চায়ের পেয়ালাটা ঠক্ করিয়া টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া বলিয়া উঠিল, ঘুমটা এ-বেলায় না ভাঙলেই ত চলত। তোমার ব্যবহারে আমি ক্রমশঃ ডিস্‌গস্‌টেড্ হয়ে উঠচি, এ কথা না জানিয়ে আর আমি পারলাম না।

বিরক্তি জানাইবার অধিকার তাঁহার আছে—এ একটা কথা বটে! কিন্তু এতগুলি বাহিরের লোকের সমক্ষে ভাবী স্বামীর এই কর্তব্যপরায়ণতা নিরতিশয় অভদ্রতার আকারেই সকলকে বিস্মিত এবং ব্যথিত করিল। কিন্তু বিজয়া তাহার প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিল না। যেন কিছুই হয় নাই, এমনিভাবে সে সকলকেই প্রতিনমস্কার করিয়া যেখানে বৃদ্ধ আচার্য দয়ালবাবু বসিয়াছিলেন, সেই দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। বৃদ্ধ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিজয়া তাঁহার কাছে গিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, আপনার চা খাওয়ার কোন বিঘ্ন হয়নি ত? আমার অপরাধ হয়ে গেছে—আজ সকালে আমি উঠতে পারিনি।

বৃদ্ধ দয়াল স্নেহার্দ্র স্বরে একেবারেই 'মা' সম্বোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না মা, আমাদের কারও কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। বিলাসবাবু, রাসবিহারীবাবু কোথাও কোন ত্রুটি ঘটতে দেননি। কিন্তু তোমাকে ত তেমন ভাল দেখাচ্ছে না মা; অসুখ-বিসুখ ত কিছু হয়নি?

ইনি সর্বদা কলিকাতায় থাকেন না বলিয়া বিজয়া পূর্ব হইতে ইহাকে চিনিত না। কালও সে ভাল করিয়া ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই কিন্তু আজ ঘরে পা দিয়া দেখিবামাত্রই এই বৃদ্ধের শান্ত, সৌম্য মূর্তি যেন নিতান্ত আপনার জন বলিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিল এবং ইঁহার স্নিগ্ধ সুকোমল কণ্ঠস্বরে তাহার স্বর্গীয় পিতার কণ্ঠস্বরের আভাস জ্ঞাপন করিল।

দয়াল একটা কৌচের উপর বসিয়াছিলেন, পাশে একটু জায়গা ছিল। তিনি সেই স্থানটুকু নির্দেশ করিয়া কহিলেন, দাঁড়িয়ে কেন মা, বোস এইখানে; অসুখ-বিসুখ ত কিছু করেনি?

বিজয়া পার্শ্বে বসিয়া পড়িল বটে, কিন্তু জবাব দিতে পারিল না, ঘাড় বাঁকাইয়া আর একদিকে চাহিয়া রহিল। অশ্রু দমন করা তাহার পক্ষে যে উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। বৃদ্ধ আবার সেই প্রশ্ন করিলেন। প্রত্যুত্তরে এবার বিজয়া মাথা নাড়িয়া কোনমতে শুধু কহিল, না।

এই ধরা-গলার সংক্ষিপ্ত উত্তর বৃদ্ধের লক্ষ্য এড়াইল না—তিনি মুহূর্তকালের জন্য মৌন থাকিয়া, ব্যাপারটা অনুভব করিয়া মনে মনে শুধু একটু হাসিলেন। যিনি এ বাটীর মালিকের জায়গাটি কিছু পূর্বেই দখল করিয়া বসিয়াছেন তিনি যদি তাঁর ভাবী-পত্নী গৃহস্বামিনীকে একটু তিক্ত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন ত আনাড়ীদের কাছে তাহা যত রূঢ়ই ঠেকুক, যাঁরা যৌবনের ইতিহাসটুকু পড়িয়া শেষ করিয়া দিয়াছেন, তেমন জ্ঞানবৃদ্ধ কেহ যদি মনে মনে একটু হাস্যই করেন ত তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না।

তখন বৃদ্ধ তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্টা এই নবীনা অভিমানিনীটিকে সুস্থ হইবার সময় দিতে নিজেই ধীরে ধীরে কথা কহিতে লাগিলেন। এত অল্প বয়সেই এই সত্য-ধর্মের প্রতি তাহাদের অবিচলিত নিষ্ঠা ও প্রীতির অসংখ্য প্রশংসা করিয়া অবশেষে বলিলেন, ভগবানের আশীর্বাদে তোমাদের মহৎ উদ্দেশ্য দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক; কিন্তু মা, যে মন্দির তুমি তোমার গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলে, তাকে বজায় রাখতে তোমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক স্বার্থত্যাগের আবশ্যক হবে। আমি নিজেও ত পাড়াগাঁয়েই থাকি; আমি বেশ দেখছি, এ ধর্ম এখনও আমাদের পল্লীসমাজের রস নিয়ে যেন বাঁচতেই চায় না। তাই আমার মনে হয়, একে যদি যথার্থই জীবিত রাখতে পার মা, এ দেশে একটা সত্যিই বড় সমস্যার মীমাংসা হবে। তোমাদের এই উদ্যমকে আমি যে কি ব'লে আশীর্বাদ করব এ আমি ভেবেই পাইনে।

বিজয়ার মুখে আসিয়া পড়িতেছিল, বলে, মন্দির-প্রতিষ্ঠায় আমার আর কোন উৎসাহ নেই, এর লেশমাত্র সার্থকতা আর আমি দেখতে পাইনে। কিন্তু, সে কথা চাপিয়া গিয়া মৃদুস্বরে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, একটা জটিল সমস্যার সমাধান হবে আপনি কেন বলছেন?

দয়াল কহিলেন, তা বৈ কি মা। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, বাঙলার পল্লীর সহস্রকোটি

কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে শুধু আমাদের এই ধর্মই পারে। কিন্তু এও জানি, যার যেখানে স্থান নয়, যার যেখানে প্রয়োজন নেই, সে সেখানে বাঁচে না। কিন্তু চেষ্টায়, যত্নে যদি একটিকেও বাঁচাতে পারা যায়, সে কি মস্ত একটা আশা-ভরসার আশ্রয় নয়? আমাদের বাঙালী-ঘরের দোষ-গুণের কথা তুমি নিজেও ত কম জানো না, সেইগুলি সব অন্তরের মধ্যে ভাল ক'রে একটুখানি তলিয়ে ভেবে দেখ দেখি।

বিজয়া আর প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। স্বদেশের মঙ্গল-কামনা তাহার মধ্যে যথার্থই স্বাভাবিক ছিল, আচার্যের শেষ-কথাটায় তাহাই আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সংস্পর্শে একটা মস্ত নামের অন্তরালে থাকিয়া বিলাস তাহার হৃদয়ের অত্যন্ত ব্যথার স্থানটাতেই পুনঃপুনঃ আঘাত করিতেছিল। সে বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, অথচ প্রতিঘাত করিবার উপায় ছিল না বলিয়া তাহার সমস্ত চিত্ত সমস্ত ব্যাপারটার বিরুদ্ধেই ক্রোধ ও বিরক্তিতে প্রায় অন্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দয়াল যখন তাঁহার প্রশান্ত মূর্তি ও স্নিগ্ধকণ্ঠের আহ্বানে বিলাসের চেষ্টার এই বিশেষ দিকটায় চোখ মেলিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন, তখন বিজয়া সত্য সত্যই যেন নিজের ভ্রম দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইতে লাগিল, বিলাস হয়ত বাস্তবিকই হৃদয়হীন এবং ক্রূর নয়, তাহার কঠোরতা হয়ত প্রবল ধর্মানুরক্তির একটা প্রকাশমাত্র। মানুষের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের ত অভাব নাই। তাহার মনে পড়িল, সে কোথায় যেন পড়িয়াছে, সংসারে সকল বড় কার্যই কাহারো-না-কাহারো ক্ষতিকর হয়; যাঁহারা এই কার্যভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, তাঁহারা অনেকের মঙ্গলের জন্য সামান্য ক্ষতিতে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর পান না। সেই জন্য অনেক স্থলেই তাঁহারা নির্মম ও নিষ্ঠুরের মত দেখিতে হন। চিরদিনের শিক্ষা ও সংস্কারবশে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ বিজয়ার কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না। সেই ধর্মের বিস্তৃতিতে দেশের এতখানি মঙ্গল নির্ভর করিতেছে শুনিয়া তাহার উচ্চাশিক্ষিত শ্রদ্ধানিষ্ঠ মন বিলাসকে অন্তরে ক্ষমা না করিয়া পারিল না। এমন কি, সে আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, 'সংসারে যাহারা বড় কাজ করিতে আসে তাহাদিগের ব্যবহার আমাদের মত সাধারণ লোকের সহিত বর্ণে বর্ণে না মিলিলেই তাহাদিগকে দোষ দেওয়া অসঙ্গত, এমন কি অন্যায়; এবং অন্যায়কে অন্যায় বুঝিয়া কোন কারণেই প্রশ্রয় দিতে পারিব না।'

বেলা হইতেছিল বলিয়া সকলেই একে একে উঠিতেছিলেন। বিজয়াও উঠিয়া দাঁড়াইল। রাসবিহারী ছেলেকে একটু আড়ালে ডাকিয়া কি একটা কথা বলিবার পরে, বিলাস এই সুযোগটার জন্যই যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল, কাছে আসিয়া বলিল, তোমার শরীরটা কি আজ সকালে ভাল নেই বিজয়া?

আধ-ঘণ্টা পূর্বেও হয়ত বিজয়া প্রশ্নটাকে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া যা হোক একটা-কিছু বলিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু, এখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল। সহজভাবে বলিল, না, ভালই আছি। কাল রাত্রে ঘুম হয়নি বলেই বোধ করি একটু অসুস্থ দেখাচ্চে।

বিলাসের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন অনেক লোক আছে, যাহারা আঘাতের বদলে প্রতিঘাত না করিয়া কিছুতেই থাকিতে পারে না। নিজের সমূহ ক্ষতি বুঝিয়াও আত্মসংবরণ করিতে পারে না। বিলাস তাহাদেরই একজন। তাহার প্রতি বিজয়ার আচরণ প্রতিদিন যতই অপ্রীতিকর হইতেছিল, তাহার নিজের আচরণও ততোধিক নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেছিল। এইরূপে ঘাত-প্রতিঘাতের আগুন প্রতি মুহূর্তেই যখন মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইতেছিল, এবং পক্বকেশ অভিজ্ঞ পিতার পুনঃ পুনঃ সনির্বন্ধ অনুযোগ, সহিষ্ণুতার পরম লাভ ও চরম সিদ্ধির নিভৃত গভীর উপদেশ অনভিজ্ঞ উদ্ধত পুত্রের কোন কাজেই লাগিতেছিল না, তখন বিজয়ার মুখের এই একটিমাত্র কোমল বাক্য বিলাসের স্বভাবটাকেই যেন বদলাইয়া দিল। সে স্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠ যতদূর সাধ্য কোমল করিয়া কহিল, তা হ'লে তুমি এ-বেলায় রোদ আর বার হ'য়ো না। সকাল সকাল স্নানাহার সেরে যদি একটু ঘুমোতে পার, সেই চেষ্টা করো। সিজন চেঞ্জের সময়টা ভাল নয়—অসুখ-বিসুখ না হয়ে পড়ে। এই বলিয়া মুখের চেহারায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া, বোধ করি বা নিজের ব্যবহারের জন্য একবার ক্ষমা চাহিতেও উদ্যত হইল; কিন্তু এ বস্তুটা

তাহার স্বভাবে নাকি একেবারেই নাই, তাই আর কিছু না কহিয়া দ্রুতপদে ভদ্রলোকদিগের অনুসরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যতদূর দেখা যায় বিজয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে তাহার উপরের ঘরে চলিয়া গেল। কিছুকাল অবধি একটা অব্যক্ত পীড়া কাঁটার মত তাহার মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করিয়া অহরহ বিঁধিতেছিল, আজ তাহার অকস্মাৎ বোধ হইল, সেটার যেন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা যথারীতি সম্পন্ন হইয়া গেল। ভিতরের বিশেষ একটা জায়গায় দুখানা ভাল চেয়ার আজ পাশাপাশি রাখা হইয়াছিল। তাহার একটাতে যখন অত্যন্ত সমারোহের সহিত বিজয়াকে বসান হইল, তখন পার্শ্বের অন্য আসনটা যে কাহার দ্বারা পূর্ণ হইবার অপেক্ষা করিতেছে, তাহা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। পলকের জন্য বিজয়ার মনের ভিতরটা হুহু করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু ক্ষণেক পরেই বিলাস আসিয়া যখন তাহার নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল, তখন সে জ্বালা নিবিতেও তাহার বেশী সময় লাগিল না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পোড়া তুবড়ির খোলাটার ন্যায় তুচ্ছ বস্তুর মত এই ব্রাহ্মমন্দির হইতেও পাছে সমারোহ-শেষে লোকের দৃষ্টি অবজ্ঞায় অন্যত্র সরিয়া যায়, এই আশঙ্কায় বিলাসবিহারী উৎসবের জেরটা যেন কিছুতেই আর নিকাশ করিতে চাহিতেছিল না। কিন্তু যাঁহারা নিমন্ত্রণ লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বাড়িঘর আছে, কাজকর্ম আছে, পরের খরচে কেবল আনন্দে মাতিয়া থাকিলেই চলে না, সুতরাং শেষ একদিন তাহাদের করিতেই হইল। সেদিন বৃদ্ধ রাসবিহারী ছোট একটি বক্তৃতা করিয়া শেষের দিকে বলিলেন, যাঁহার অসীম করুণায় আমরা পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকাব হইতে আলোকে আসিতে পারিয়াছি, সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌, নিরাকার পরমব্রহ্মের পাদপদ্মে এই মন্দির যাঁহারা উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের কল্যাণ হোক। আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যে অচির-ভবিষ্যতে সেই দুটি নির্মল নবীন জীবন চিরদিনের জন্য সম্মিলিত হইবে—সেই শুভ-মুহূর্ত দেখিতে ভগবান যেন আমাদের জীবিত রাখেন। এই বলিয়া সেই দুটি নবীন জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মা বিজয়া, বিলাস, তোমরা এঁদের প্রণাম কর। আপনারাও আমার সন্তানদের আশীর্বাদ করুন।

বিজয়া ও বিলাস পাশাপাশি মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রবীণ ব্রাহ্মদিগের উদ্দেশে প্রণাম করিল, তাঁহারাও অস্ফুটকণ্ঠে ইহাদের আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পরে সভাভঙ্গ হইল।

সন্ধ্যার পর বিজয়া যখন বাটীতে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহার মনের মধ্যে কোন বিরোধ, কোন চাঞ্চল্য ছিল না। ধর্মের আনন্দে ও উৎসাহে হৃদয় এমনি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, আপনাকে আপনি কেবলই বলিতে লাগিল, 'পার্থিব সুখই একমাত্র সুখ নয়—বরঞ্চ ধর্মের জন্য, পরের জন্য সে সুখ বলি দেওয়াই একমাত্র শ্রেয়ঃ।'

বিলাসের সহিত তাহার মতের আর কোথাও যদি মিল না হয়, ধর্ম সম্বন্ধে যে তাহাদের কোন দিন অনৈক্য ঘটিবে না, একথা সে জোর করিয়াই নিজেকে বুঝাইল। বিছানায় শুইয়াও সে বার বার ইহাই কহিতে লাগিল—এ ভালই হইল যে তাহার মত একজন স্থিরসংকল্প, স্বধর্মপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ লোকের সহিত তাহার জীবন চিরদিনের জন্য মিলিত হইতে যাইতেছে। ঈশ্বর তাহার দ্বারা নিজের অনেক কার্য সম্পন্ন করাইয়া লইবেন বলিয়াই এমন করিয়া তাহার মনের গতি পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেন।

পরদিন বিলাস সকলকেই করজোড়ে আবেদন করিল, তাঁহারা যদি অন্ততঃ মাসে একবার করিয়া আসিয়াও মন্দিরের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ত, তাহারা আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। এ অনুরোধ অনেকেই স্বীকার করিয়াই বাড়ি গেলেন।

রাসবিহারী আসিয়া বলিলেন, মা বিজয়া, তোমরা মন্দিরের স্থায়িত্ব যদি কামনা কর ত দয়ালবাবুকে এখানে রাখবার চেষ্টা কর।

বিজয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কি সম্ভব কাকাবাবু?

রাসবিহারী হাসিয়া কহিলেন, সম্ভব না হ'লে বলব কেন মা? তাঁকে ছেলেবেলা থেকে জানি—এক রকম আমারই বাল্যবন্ধু। অবস্থা ভাল না হ'লেও দয়াল খাঁটি লোক। তোমার জমিদারিতে কোন একটা কাজ দিয়ে তাঁকে অনায়াসে রাখা যেতে পারে। মন্দিরের বাড়িতেও ঘরের অভাব নেই, স্বচ্ছন্দে দু-চারটে ঘর নিয়ে তিনি সপরিবারে বাস করতে পারবেন।

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির প্রতি বিজয়ার সত্যকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাঁহার সাংসারিক হীনাবস্থা শুনিয়া সেই শ্রদ্ধায় করুণা যোগ দিল। সে তৎক্ষণাৎ রাসবিহারীর প্রস্তাব আনন্দে অনুমোদন করিয়া বলিল, ওঁকে এইখানেই রাখুন। আমি সত্যিই ভারী খুশী হব কাকাবাবু।

তাহাই হইল। দয়াল আসিয়া সপরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। পৌষ শেষ হইয়া মাঘের মাঝামাঝিতে আসিয়া পেঁাছিল। জমিদারি এবং মন্দিরের কাজ সুশৃংখলায় চলিতে লাগিল—কোথাও যে কোন বিরোধ বা অশান্তি আছে তাহা কাহারও কল্পনায় উদয় হইল না।

নরেন্দ্রের কোন সংবাদ নাই। থাকিবার কথাও নহে। শুধু দুদিনের জন্য সে দেশে আসিয়াছিল, দুদিন পরে চলিয়া গেছে। তবে একটা ব্যথা বিজয়ার মনে বাজিত, যখনই সেই মাইক্রস্কোপ্‌টার প্রতি তাহার চোখ পড়িত। আর কিছু নয়—শুধু যদি তাহার সেই একান্ত দুঃসময়ে কিছু বেশী করিয়াও জিনিসটার দাম দেওয়া হইত। আর একটা কথা স্মরণ হইলে সে যেমন আশ্চর্য হইত, তেমনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। দুদিনের পরিচয়ে কেমন করিয়াই না জানি এই লোকটার প্রতি এত মমতা জন্মিয়াছিল, ভাগ্যে তাহা প্রকাশ পায় নাই। না হইলে, মিথ্যা মোহ একদিন মিথ্যায় মিলাইয়া যাইতই—কিন্তু, সারাজীবন লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই থাকিত না। তাই, সেই দুদিনের স্নেহ-মমতার পাত্রটিকে যখনই মনে পড়িত, তখনই প্রাণপণ বলে মন হইতে তাহাকে সে দূরে ঠেলিয়া দিত। এমনি করিয়া মাঘ মাসও শেষ হইয়া গেল।

ফাল্গুনের প্রারম্ভেই হঠাৎ অত্যন্ত গরম পড়িয়া চারিদিকে জ্বর দেখা দিতে লাগিল। দিন-দুই হইতে দয়ালবাবু জ্বরে পড়িয়াছিলেন। আজ সকালে তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য বিজয়া কাপড় পরিয়া একেবারে প্রস্তুত হইয়াই নীচে নামিয়াছিল। বুড়া দরোয়ান কানাই সিং লাঠি আনিতে তাহার ঘরে গিয়াছিল, এবং সেই অবকাশে বাহিরের ঘরে বসিয়া বিজয়া এক পেয়ালা চা খাইয়া লইতেছিল।

নমস্কা—র।

বিজয়া চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, নরেন্দ্র ঘরে ঢুকিতেছে।

তাহার হাতের পেয়ালা হাতে রহিল, শুধু অভিভূতের মত নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। না করিল প্রতিনমস্কার, না বলিল বসিতে।

একটা চেয়ারের পিঠে নরেন্দ্র তাহার লাঠিটা হেলান দিয়া রাখিল, আর একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল; কহিল, এ কাজটা আমারও এখনো সারা হয়নি—আর এক পেয়ালা চা আনতে হুকুম ক'রে দিন ত।

দিই, বলিয়া বিজয়া হাতের বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু কালীপদকে বলিয়া দিয়াই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে পারিল না। উপরে যাইবার সিঁড়ির রেলিঙ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতরটা ভীষণ ঝড়ে সমুদ্রের মত উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কোন কারণেই হৃদয় যে মানুষের এমন করিয়া দুলিয়া উঠিতে পারে, ইহা সে জানিতই না। তথাপি এ কথা স্পষ্ট বুঝিতেছিল, এ আন্দোলন শান্ত না হইলে কাহারো সহিত সহজভাবেই কথাবার্তা অসম্ভব। মিনিট পাঁচ-ছয় সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া যখন দেখিল, কালীপদ চা লইয়া যাইতেছে, তখন সেও তাহার পিছনে পিছনে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

কালীপদ চলিয়া গেলে নরেন্দ্র বিজয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনি মনে মনে ভারী বিরক্ত হয়েছেন। আপনি কোথাও বার হচ্ছিলেন, আমি এসে বাধা দিয়েচি। কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের বেশী আপনাকে আটকে রাখব না।

বিজয়া কহিল, আচ্ছা, আগে আপনি চা খান। বলিয়া হঠাৎ পশ্চিমদিকের জানালাটার প্রতি নজর পড়ায় আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও জানালাটা কে খুলে দিয়ে গেল?

নরেন্দ্র বলিল, কেউ না, আমি।

কি ক'রে খুললেন?

যেমন ক'রে সবাই খোলে—টেনে। কোন দোষ হয়েছে?

বিজয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, না; এবং মুহূর্ত কয়েক তাহার লম্বা সরু সরু আঙুলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার আঙুলগুলো কি লোহার? ঐ জানালাটা বন্ধ থাকলে পিছন থেকে সজোরে ধাক্কা না দিয়ে শুধু টেনে খুলতে পারে, এমন লোক আমি দেখিনি।

কথা শুনিয়া নরেন হো হো করিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিল। এ সেই হাসি। মনে পড়িয়া বিজয়ার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। হাসি থামিলে নরেন সহজভাবে কহিল, সত্যি, আমার আঙুলগুলো ভারী শক্ত। জোরে টিপে ধরলে যে-কোন লোকের বোধ করি হাড ভেঙ্গে যায়।

বিজয়া হাসি চাপিয়া গম্ভীরমুখে কহিল, আপনার মাথাটা তার চেয়েও শক্ত। ঢুঁ মারলে—

কথাটা শেষ না হইতেই নরেন আবার তেমনি উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। এই লোকটির হাসি প্রভাতের আলোর মত এমনি মধুর, এমনি উপভোগের বস্তু যে, কোনমতেই যেন লোভ সংবরণ করা যায় না।

নরেন পকেট হইতে দু'শ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিল, সেই জন্যেই এসেছি। আমি জোচ্চোর, আমি ঠক, আরও কত কি গালাগালি ওই ক'টা টাকার জন্যে আমাকে দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। আপনার টাকা নিন—দিন আমার জিনিস।

বিজয়ার মুখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তখনই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, আর কি কি বলে পাঠিয়েছিলুম, বলুন ত?

নরেন কহিল, অত আমার মনে নেই। সেটা আনতে বলে দিন, আমি সাড়ে ন'টার গাড়িতেই কলকাতা ফিরে যাবো। ভাল কথা, আমি কলকাতাতেই বেশ একটা চাকরি পেয়েচি—অতদূর আর যেতে হয়নি।

বিজয়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, আমার ভাগ্য ভাল।

নরেন বলিল, হাঁ। কিন্তু আমার আর সময় নেই, নটা বাজে—চক্ষের নিমিষে বিজয়ার মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল; কিন্তু নরেন তাহা লক্ষ্যও করিল না, কহিল, আমাকে এখুনি বার হতে হবে—সেটা আনতে বলে দিন।

বিজয়া তাহার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া বলিল, এই শর্ত কি আপনার সঙ্গে হয়েছিল যে, আপনি দয়া করে টাকা এনেছেন বলেই তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিতে হবে?

নরেন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, না, তা নয় সত্যি; কিন্তু আপনার ত ওতে দরকার নেই।

আজ নেই বলে কোন দিন দরকার হবে না এ আপনাকে কে বললে?

নরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, আমি বলচি, ও জিনিস আপনার কোন কাজেই লাগবে না। অথচ, আমার—

বিজয়া উত্তর দিল, তবে যে বিক্রি করে যাবার সময় বলেছিলেন, ওটা আমার অনেক উপকারে লাগবে! আমাকে ঠকিয়ে গেছেন বলে পাঠিয়েছিলুম বলে আপনি আবার রাগ কচ্চেন? তখন একরকম কথা আর এখন একরকম কথা?

নরেন লজ্জায় একেবারে মলিন হইয়া গেল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দেখুন, তখন ভেবেছিলুম, অমন জিনিসটা আপনি ব্যবহারে লাগাবেন, এ রকম ফেলে রেখে দেবেন না। আচ্ছা, আপনি ত জিনিস বাঁধা রেখেও টাকা ধার দেন, এও কেন তাই মনে করুন না! আমি এ টাকার সুদ দিচ্চি।

বিজয়া কহিল, কত সুদ দেবেন?

নরেন্দ্র বলিল, যা ন্যায্য সুদ আমি তাই দিতে রাজী আছি।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি রাজী নই। কলকাতায় যাচাই ক'রে দেখিয়েচি ওটা অনায়াসে চার শ টাকায় বিক্রি করতে পারি।

নরেন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বেশ তাই করুন গে—আমার দরকার নেই। যে দু'শ টাকায় চার শ টাকা চায়, তাকে আমি কিছুই বলতে চাইনে।

বিজয়া মুখ নীচু করিয়া প্রাণপণে হাসি দমন করিয়া যখন মুখ তুলিল, তখন কেবল এই লোকটি ছাড়া সংসারে আর কাহারও কাছে বোধ করি সে আত্মগোপন করিতে পারিত না। কিন্তু সেদিকে নরেনের দৃষ্টিই ছিল না। সে তীক্ষ্নভাবে কহিল, আপনি যে একটি শাইলক, তা জানলে আমি আসতাম না।

বিজয়া ভাল-মানুষটির মত কহিল, দেনার দায়ে যখন আপনার যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছিলুম তখনও ভাবেন নি?

নরেন কহিল, না। কেন না, তাতে অপনার হাত ছিল না। সে কাজ আপনার বাবা এবং আমার বাবা দুজনে ক'রে গিয়েছিলেন। আমরা কেউ তার জন্যে অপরাধী নই। আচ্ছা, আমি চললুম।

বিজয়া কহিল, খেয়ে যাবেন না?

নরেন উদ্ধতভাবে কহিল, না, খাবার জন্যে আসিনি।

বিজয়া শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনি ত ডাক্তার—আপনি হাত দেখতে জানেন?

এইবার তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির রেখা ধরা পড়িয়া গেল। নরেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি আপনার উপহাসের পাত্র? টাকা আপনার ঢের থাকতে পারে, কিন্তু সে জোরে ও-অধিকার কারও জন্মায় না জানবেন—আপনি একটু হিসেব ক'রে কথা কইবেন; বলিয়া সে লাঠিটা তুলিয়া লইল।

বিজয়া কহিল, নইলে আপনার গায়ে জোর আছে, এবং হাতে লাঠি আছে এইত?

নরেন লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া হতাশভরে চেয়ারটায় বসিয়া পড়িয়া বলিল, ছি ছি—আপনি যা মুখে আসে তাই বলচেন। আপনার সঙ্গে আর পারিনে।

কিন্তু মনে থাকে যেন। বলিয়া আর সে আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

একাকী ঘরের মধ্যে নরেন হতবুদ্ধির মত খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহার লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই বিজয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আপনার জনাই আমার যখন দেরি হয়ে গেল, তখন আপনারও চলে যাওয়া হবে না। আপনি হাত দেখতে জানেন—চলুন আমার সঙ্গে।

নরেন যাওয়ার কথাটা বিশ্বাস করিল না। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে হাত দেখতে?

তাহার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইবার বিজয়া গম্ভীর হইল, কহিল, এখানে ভাল ডাক্তার নেই। আমাদের যিনি নূতন আচার্য হয়ে এসেছেন—তাঁকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি—আজ দুদিন হ'ল তাঁর ভারী জ্বর হয়েছে; চলুন, একবার দেখে আসবেন।

আচ্ছা চলুন।

বিজয়া কহিল, তবে একটু দাঁড়ান। সেই পরেশ ছেলেটিকে ত আপনি চেনেন—তিন-চার দিন তারও জ্বর। তার মাকে আনতে বলে দিয়েচি। বলিতে বলিতেই পরেশের মা ছেলেকে অগ্রবর্তী করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, ছেলের সমস্ত গায়ে ভয়ানক বেদনা বাবু, নাড়িটা দেখে একটু ওষুধ-টষুধ যদি দিতেন—

নরেন কহিল, তোমার ছেলেকে ঘরে নিয়ে যাও, হাওয়া-টাওয়া লাগিয়ো না, ওষুধ আমি লিখে দিচ্ছি।

মা একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই ছেলেকে লইয়া চলিয়া গেল। তখন নরেন বিজয়ার বিস্মিত

মুখের পানে চাহিয়া কহিল, এদিকে ভারী বসন্ত হচ্চে—একটু সাবধানে রাখ্‌তে ব'লে দেবেন।

বিজয়ার মুখ কালি হইয়া গেল—বসন্ত! বসন্ত হবে কেন?

নরেন কহিল, হবে কেন, সে অনেক কথা। আজও ভাল বোঝা যাবে না বটে, কিন্তু কাল ওর পানে চাইলেই জানতে পারবেন। আমার মনে হচ্চে, আপনার আচার্যবাবুকেও আর দেখবার বিশেষ আবশ্যক নেই—তাঁর অসুখটাও খুব সম্ভব কাল-পরশুই টের পাবেন।

ভয়ে বিজয়ার সর্বাঙ্গ ঝিম্‌ঝিম্‌ করিতে লাগিল। সে অবশ নির্জীবের মত চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, আমারও নিশ্চয় বসন্ত হবে নরেনবাবু—আমারও কাল রাত্রে জ্বর হয়েছিল, আমারও গায়ে ভয়ানক ব্যথা।

নরেন হাসিল, কহিল, ব্যথা ভয়ানক নয়, ভয়ানক যা হয়েচে তা আপনার ভয়! বেশ ত, জ্বরই যদি একটু হয়ে থাকে তাতেই বা কি? আশেপাশে বসন্ত দেখা দিয়েছে বলেই যে গ্রামসুদ্ধ সকলেরই তাই হতে হবে তার কোন মানে নেই।

বিজয়ার চোখ দুটি ছলছল করিয়া আসিল, কহিল, হলেই বা আমাকে দেখবে কে? আমার কে আছে?

নরেন পুনরায় হাসিয়া কহিল, দেখবার লোক অনেক পাবেন, সে ভাবনা নেই—কিন্তু কিছু হবে না আপনার।

বিজয়া হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, না হলেই ভাল। কিন্তু কাল রাত্রে আমার সত্যই খুব জ্বর হয়েছিল। তবুও সকালবেলা জোর করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দয়ালবাবুকে দেখতে যাচ্ছিলুম। এখনও আমার একটু একটু জ্বর রয়েছে, এই দেখুন—বলিয়া সে ডান হাত বাড়াইয়া দিল। নরেন কাছে গিয়া তাহার কোমল শিথিল হাতখানি নিজের শক্তিমান কঠিন হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া মুহূর্তকাল পরেই ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, আজ আর কিছু খাবেন না, চুপ করে শুয়ে থাকুন গে। কোন ভয় নেই, কাল-পরশু আবার আমি আসব।

আপনার দয়া—বলিয়া বিজয়া চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু কথাটা তীরের মত গিয়া নরেনের মর্মমূলে বিঁধিল। প্রত্যুত্তরে আর সে কোন কথাই বলিল না বটে, কিন্তু নীরবে লাঠিটি তুলিয়া লইয়া যখন ঘরের বাহির হইয়া গেল তখন এই ভয়ার্ত রমণীর অসহায় মুখের দয়া-ভিক্ষা তাহার বলিষ্ঠ পুরুষ-চিত্তকে এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত মথিত করিতে লাগিল।

পরদিন কাজের ভিড়ে কোনমতেই সে কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারিল না। কিন্তু তাহার পরদিন বেলা নয়টার মধ্যেই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাটীতে পা দিতেই কালীপদ তাড়াতাড়ি আসিয়া কহিল, মায়ের বড় জ্বর বাবু, আপনি একেবারে ওপরে চলুন।

নরেন্দ্র বিজয়ার ঘরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন সে প্রবল জ্বরে শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে। কে একজন প্রৌঢ়া নারী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছে এবং অদূরে চৌকির উপর পিতা-পুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী মুখ ভয়ানক গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছেন। উভয়ের কাহারই চিত্ত যে ডাক্তারের আগমনে আশায় ও আনন্দে নাচিয়া উঠিল না তাহা না বলিলেও চলে।

বিলাসবিহারী ভূমিকার লেশমাত্র বাহুল্য না করিয়া সোজা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নাকি পরশু এসে বসন্তের ভয় দেখিয়ে গেছেন?

কথাটা এতবড় মিথ্যা যে হঠাৎ কোন জবাব দিতেই পারা যায় না।

কিন্তু প্রশ্ন শুনিয়া বিজয়া রক্তচক্ষু মেলিয়া চাহিল। প্রথমটা সে যেন ঠাহর করিতে পারিল না; তাহার পরে দুই বাহু বাড়াইয়া কহিল, আসুন।

নিকটে আর কোন আসন না থাকায় নরেন তাহার শয্যার একাংশে গিয়াই উপবেশন করিল। চক্ষের পলকে বিজয়া দুই হাত দিয়া সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, কাল এলে ত আজ আমার এত জ্বর হতো না—আমি সমস্ত দিন পথ পানে চেয়েছিলাম।

নরেন্দ্র ডাক্তার—তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, প্রবল জ্বর উগ্র নেশার মত অনেক

আশ্চর্য কথা মানুষের ভিতর হইতে টানিয়া আনে; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব, না মুখে না অন্তরে কোথাও হয়ত থাকে না। কিন্তু অনতিদূরে বসিয়া দুর্ভাগ্য পিতা-পুত্রের মাথার চুল পর্যন্ত ক্রোধে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নরেন সহজে সান্ত্বনার স্বরে প্রসন্ন মুখে কহিল, ভয় কি, জ্বর দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে।

তাহার হাতখানা বিজয়া একেবারে বুকের উপর টানিয়া লইয়া একান্ত করুণসুরে কহিল, কিন্তু আমি ভাল না হওয়া পর্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না বল—তুমি চ'লে গেলে আমি হয়ত বাঁচব না।

জবাব দিতে গিয়া নরেন মুখ তুলিতেই দুই জোড়া ভীষণ চক্ষুর সহিত তাহার চোখাচোখি হইয়া গেল। দেখিল, একান্ত সন্নিকটবর্তী নিঃশঙ্কচিত্ত শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্বাহ্নে ক্ষুধিত ব্যাঘ্র যেমন করিয়া চাহে, ঠিক তেমনি দুই প্রদীপ্ত চক্ষু মেলিয়া বিলাসবিহারী তাহার প্রতি চাহিয়া আছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

নরেন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল—বিজয়ার প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইল না। চোখের হিংস্র-দৃষ্টি শুধু মানুষ কেন, অনেক জানোয়ারে পর্যন্ত বুঝিতে পারে। সুতরাং এই লোকটি যত সোজা মানুষ হোক, এবং সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার যত অল্পই থাকুক, এ কথাটা সে এক নিমিষেই টের পাইল যে ওই চেয়ারে আসীন পিতা-পুত্রের চোখের চাহনিতে আর যে ভাবই প্রকাশ করুক, হৃদয়ের প্রীতি প্রকাশ করে নাই। ইঁহারা যে তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাহা সে জানিত। সেই মাইক্রস্কোপ্‌টা বিজয়াকে দেখাইতে আসিয়া সে নিজের কানেই অনেক কথা শুনিয়া গিয়াছিল; এবং রাসবিহারী চাকরের হাতে যেদিন তাহার দাম পাঠাইয়াছিলেন সেদিনও হিতোপদেশ-ছলে বড় কম কটু কথা শুনাইয়া আসেন নাই। কিন্তু সে যখন সত্যই ঠকাইয়া যায় নাই, এবং জিনিসটা আজ যখন দুই শতের স্থানে চারি শত ঘুরাইয়া আনিতে পারে, যাচাই হইয়া গেছে, তখন সেদিক দিয়া কেন যে এখনো তাঁহাদের রাগ থাকিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। আর এই বসন্তের ভয় দেখাইয়া যাওয়া! কিন্তু সে ত ভয় দেখাইয়া যায় নাই—বরঞ্চ ঠিক উলটা। এ মিথ্যা আর কেহ প্রচার করিয়াছে, কিংবা বিজয়ার নিজের মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা স্থির করিবার পূর্বেই বিলাসবিহারী আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিল। ভৃত্য কালীপদ বোধ করি নিছক কৌতূহলবশেই পর্দা একটুখানি ফাঁক করিয়া মুখ বাড়াইয়াছিল, বিলাসের চোখে পড়িতেই সে একেবারে হিন্দী-গর্জন ছাড়িল। খুব সম্ভব, হিন্দীভাষায় অধিক রোক্ প্রকাশ পায়। কহিল, এই শূয়ারকা বাচ্চা, একঠো কুরসী লাও।

ঘরের সকলেই চমকিয়া উঠিল। কালীপদ 'শূয়ারকা বাচ্চা' এবং 'লাও' কথাটার অর্থ বুঝিতে পারিল, কিন্তু 'কুরসী' বস্তুটি যে কি, তাহার আন্দাজ করিতে না পারিয়া সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একবার এদিকে একবার ওদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিল। বৃদ্ধ রাসবিহারী নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়াছিলেন; তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন, ও ঘর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে এসো কালীপদ, বাবুকে বসতে দাও। কালীপদ দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলে তিনি ছেলের দিকে ফিরিয়া, তাঁহার শান্ত উদারকণ্ঠে বলিলেন, রোগা-মানুষের ঘর—অমন হেস্টি হ'য়ো না বিলাস। টেম্পার লুজ করা কোন ভদ্রলোকের পক্ষেই শোভা পায় না।

ছেলে উদ্ধতভাবে জবাব দিল, মানুষ এতে টেম্পার লুজ করে না ত করে কিসে শুনি? হারামজাদা চাকর, বলা নেই, কওয়া নেই, এমন একটা অসভ্য লোককে ঘরে এনে ঢোকালে যে ভদ্র-মহিলার সম্মান রাখতে পর্যন্ত জানে না।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ধাক্কায় মাতালের যেমন নেশা ছুটিয়া যায় বিজয়ারও ঠিক তেমনি জ্বরের আচ্ছন্ন ঘোরটা ঘুচিয়া গেল। সে নিঃশব্দে নরেনের হাত ছাড়িয়া দিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

কালীপদ তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার আনিয়া রাখিয়া যাইতেই নরেন্দ্র বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহাতে বসিল। রাসবিহারী বিজয়ার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। তিনি একটু প্রসন্ন হাস্য করিয়া পুত্রকেই উদ্দেশ করিয়া পুনশ্চ বলিলেন, আমি সমস্তই বুঝি বিলাস। এ ক্ষেত্রে তোমার রাগ হওয়াটা যে অস্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ খুবই স্বাভাবিক, তাও মানি, কিন্তু এটা তোমার ভাবা উচিত ছিল যে সবাই ইচ্ছা ক'রে অপরাধ করে না। সকলেই যদি সব রকম রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার জানত, তা হ'লে ভাবনা ছিল কি? সেই জন্যে রাগ না ক'রে শান্তভাবে মানুষের দোষ-ত্রুটি সংশোধন ক'রে দিতে হয়।

এই দোষ-ত্রুটি যে কাহার, তা কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বিলাস কহিল, না বাবা, এরকম impertinence সহ্য হয় না। তা ছাড়া আমার এ বাড়ির চাকরগুলো হয়েছে যেমন হতভাগা তেমনি বজ্জাত। কালই আমি ব্যাটাদের সব দূর করে তবে ছাড়ব।

রাসবিহারী আবার একটু হাস্য করিয়া সস্নেহ তিরস্কারের ভঙ্গীতে এবার বোধ করি ঘরের দেওয়ালগুলোকে শুনাইয়া বলিলেন, এর মন খারাপ হয়ে থাকলে যে কি বলে, তার ঠিকানাই নেই। আর শুধু ছেলেকেই বা দোষ দেব কি, আমি বুড়োমানুষ, আমি পর্যন্ত অসুখ শুনে কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম! বাড়িতেই হল একজনের বসন্ত, তার উপর উনি ভয় দেখিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত নরেন্দ্র কোন কথা কহে নাই; এইবার সে বাধা দিয়া কহিল, না, আমি কোন রকম ভয় দেখিয়ে যাইনি।

বিলাস মাটিতে একটা পা ঠুকিয়া সতেজে কহিল, আল্‌বৎ ভয় দেখিয়ে গেছেন। কালীপদ সাক্ষী আছে।

নরেন কহিল, কালীপদ ভুল শুনেচে।

প্রত্যুত্তরে বিলাস আর একটা কি কাণ্ড করিতে যাইতেছিল, তাহার পিতা থামাইয়া দিয়া বলিলেন, আঃ—কি কর বিলাস? উনি যখন অস্বীকার করছেন, তখন কি কালীপদকে বিশ্বাস করতে হবে? নিশ্চয়ই ওঁর কথা সত্যি।

তথাপি বিলাস কি যেন বলিবার প্রয়াস করিতেই বৃদ্ধ কটাক্ষে নিষেধ করিয়া বলিলেন, এই সামান্য অসুখেই মাথা হারিয়ো না বিলাস, স্থির হও। মঙ্গলময় জগদীশ্বর যে শুধু আমাদের পরীক্ষা করবার জন্যেই বিপদ পাঠিয়ে দেন, বিপদে পড়লে তোমরা সকলের আগে এই কথাটাই কেন ভুলে যাও আমি ত ভেবে পাইনে।

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, আর তাই যদি একটা ভুল অসুখের কথা বলেই থাকেন তাতেই বা কি? কত পাশ-করা ভাল ভাল বিচক্ষণ ডাক্তারের যে ভ্রম হয়, উনি ত ছেলেমানুষ। বলিয়া নরেন্দ্রের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিলেন, যাক—জ্বর ত তা হ'লে অতি সামান্যই আপনি বলছেন? চিন্তা করবার ত কোন কারণ নেই এই ত আপনার মত?

নরেন্দ্র আসিয়া পর্যন্ত অনেক অপমান নীরবে সহিয়াছিল, কিন্তু এইবার একটা বাঁকা জবাব না দিয়া থাকিতে পারিল না। কহিল, আমার বলায় কি আসে যায় বলুন? আমার ওপর ত নির্ভর করছেন না। বরং তার চেয়ে কোন ভাল পাশ-করা বিচক্ষণ ডাক্তার দেখিয়ে তাঁর মতামত নেবেন।

কথাটার নিহিত খোঁচা যাই থাক, এ জবাব দিবার তাহার অধিকার ছিল। কিন্তু বিলাস একেবারে লাফাইয়া উঠিয়া মারমুখী হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—তুমি কার সংগে কথা কইচ মনে ক'রে কথা ক'য়ো বলে দিচ্চি। এ ঘর না হয়ে আর কোথাও হ'লে তোমার বিদ্রূপ করা—

এই লোকটার কারণে-অকারণে প্রথম হইতেই একটা ঝগড়া বাধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিবার প্রাণপণ চেষ্টা দেখিয়া নরেন্দ্র বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কিন্তু কেন, কিসের জন্য—কোথায় তাহার ব্যবহারের মধ্যে কি অপরাধ ঘটিতেছে কিছুই সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। আসল কারণ হইতেছে এই যে, কোথায় যে ওই লোকটার অন্তর্দাহ নরেন্দ্র তাহা আজিও জানিত না। বিজয়া এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের অনুসন্ধিৎসু প্রতিবেশীর দল যখন বিলাসের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধের আলোচনা

করিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করিত, তখন ভিন্ন-গ্রামবাসী এই নবীন বৈজ্ঞানিকের অখণ্ড মনোযোগ কীটাণুকীটের সম্বন্ধ-নিরূপণেই ব্যাপৃত থাকিত; গ্রামের জনশ্রুতি তাহার কানে পেঁৗছিত না। তাহার পরে ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে যখন কথাটা পাকা হইয়া রাষ্ট্র হইতে কোথাও আর বাকী রহিল না তখন সে কলিকাতায় চলিয়া গেছে। আজ পিতা-পুত্রের কথার ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে কি যেন একটা অনির্দেশ্য এবং অস্পষ্ট ব্যথার মত তাহাকে বাজিতেছিল বটে, কিন্তু চিন্তার দ্বারা তাহাকে সুস্পষ্ট করিয়া দেখিবার সময় কিংবা প্রয়োজন কিছুই তাহার ছিল না। ঠিক এই সময়ে বিজয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। নরেন্দ্রের মুখের প্রতি ব্যথিত, উৎপীড়িত দুটি চক্ষু ক্ষণকাল নিবদ্ধ করিয়া কহিল, আমি যতদিন বাঁচব, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। কিন্তু এঁরা যখন অন্য ডাক্তার দিয়ে আমার চিকিৎসা করা স্থির করেছেন, তখন আর আপনি নিরর্থক অপমান সইবেন না। কিন্তু ফিরে যাবার পথে দয়ালবাবুকে একবার দেখে যাবেন শুধু এই মিনতিটি রাখবেন। বলিয়া প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সে পুনরায় মুখ ফিরাইয়া শুইল। রাসবিহারী অনেক পূর্বেই আসল ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, বিলক্ষণ! তুমি যাঁকে ডেকে পাঠিয়েছ তাঁকে অপমান করে কার সাধ্য!

তারপর ছেলেকে নানাপ্রকার ভর্ৎসনার মধ্যে বারংবার এই কথাটাই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, অসুখের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া উৎকণ্ঠায় বিলাসের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক আধ্যাত্মিক ও নিগূঢ় তত্ত্ব-কথার মর্মোদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়া দিলেন। নরেন্দ্র কোন কথা কহিল না। পিতা ও পুত্রের নিকট হইতে তত্ত্বকথা ও অপমানের বোঝা নিঃশব্দে দুই স্কন্ধে ঝুলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং লাঠি ও ছোট ব্যাগটি হাতে করিয়া তেমনি নীরবে বাহির হইয়া গেল। রাসবিহারী পিছন হইতে ডাকিয়া কহিলেন, নরেন্দ্রবাবু, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আলোচনা করবার আছে—বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া ছেলেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র ও অদ্বিতীয়রূপে বিজয়ার ঘরের মধ্যে অধিষ্ঠিত রাখিয়া দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

নরেন্দ্রকে পাশের একটা ঘরে বসাইয়া তিনি ভূমিকাচ্ছলে কহিলেন, পাঁচজনের সামনে তোমাকে বাবুই বলি আর যাই বলি, বাবা, এটা কিন্তু ভুলতে পারিনে তুমি আমাদের সেই জগদীশের ছেলে। বনমালী, জগদীশ দুইজনেই স্বর্গীয় হয়েছেন, শুধু আমিই পড়ে আছি। কিন্তু আমরা তিনজনে যে কি ছিলাম সে আভাস তোমাকে ত সেইদিনই দিয়েছিলাম, কিন্তু খুলে বলতে পারিনে নরেন—আমার বুক যেন ফেটে যেতে চায়।

নরেন চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ রাসবিহারীর আর একদিনের কথাগুলো যেন মনে পড়ায় বলিয়া উঠিলেন, ওই দরকারী যন্ত্রটা বিক্রি করায় আমি সত্যই তোমার উপর বড় বিরক্ত হয়েছিলাম নরেন। একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, কিন্তু দেখ বাবা, এই বিরক্ত হয়েছিলাম কথাটা বড় রূঢ়। হইনি বলতে পারলেই সাংসারিক হিসাবে হয় ভাল—বলতে শুনতে সব দিকেই নিরাপদ—কিন্তু যাক। বলিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অনেকটা যেন আত্মগত ভাবেই পুনরায় কহিতে লাগিলেন, আমার দ্বারা যা অসাধ্য তা নিয়ে দুঃখ করা বৃথা। কত লোকের অপ্রিয় হই, কত লোকে গাল দেয়, বন্ধুরা বলেন, 'বেশ, মিথ্যা বলতে যখন কোন কালেই পারলে না রাসবিহারী, তখন, তা বলতেও আমরা বলিনে, কিন্তু একটু ঘুরিয়ে বললেই যদি গালমন্দ হ'তে নিস্তার পাওয়া যায়, তাই কেন করো না?' আমি শুনে শুধু অবাক হয়ে ভাবি বাবা, যা ঘটেনি, তা বানিয়ে বলা, ঘুরিয়ে বলা যায় কি করে? এরা আমার ভালই চায়, তা বুঝি কিন্তু সেই মঙ্গলময় আমাকে যে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছেন, সে অসাধ্য সাধন করিই বা আমি কেমন করে? যাক বাবা, নিজের সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমি কোন দিনই ভালবাসি নে—এতে আমার বড় বিতৃষ্ণা। পাছে তুমি দুঃখ পাও, তাই এত কথা বলা। বলিয়া উদাস-নেত্র কড়িকাঠের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া চোখ নামাইয়া কহিলেন, আর একটা কথা কি জান নরেন, এই সংসারেই চিরকাল আছি বটে, চুল পাকিয়েও ফেললাম সত্য, কিন্তু কি করলে, কি বললে যে এখানে সুখ-সুবিধে

মেলে তা আজও এই পাকা-মাথাটায় ঢুকল না। নইলে, তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম এ কথা মুখের ওপর বলে তোমার মনে আজ ক্লেশ দেব কেন?

নরেন বিনয়ের সহিত বলিল, যা সত্য তাই বলেছেন—এতে দুঃখ করবার ত কিছু নেই।

রাসবিহারী ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, না না, ও কথা বলো না নরেন—কঠোর কথা মনে বাজে বৈ কি! যে শোনে তার ত বাজেই, যে বলে, তারও কম বাজে না বাবা। জগদীশ্বর!

নরেন অধোমুখে চুপ করিয়া রহিল। রাসবিহারী অন্তরের ধর্মোচ্ছ্বাস সংযত করিয়া লইয়া পরে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তার পরে আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না। ভাবলাম, সে কি কথা! সে অনেক দুঃখেই নিজের অমন আবশ্যকীয় জিনিসটা বিক্রি করে গেছে। তার মূল্য যাই হোক, কিন্তু কথা যখন দেওয়া হয়েছে তখন, আর ত ভাবাও চলে না, দাম দিতেও বিলম্ব করা চলে না। মনে মনে বললাম, আমার বিজয়া-মা যখন ইচ্ছে, যতদিনে ইচ্ছে টাকা দিন, কিন্তু আমি টাকাটা পাঠিয়ে দিই-ই। সে বেচারা যখন ঐ টাকা নিয়েই তবে বিদেশে যাবে, একটা দিনও ত দেরি করা কর্তব্য নয়। তার উপর সে যখন আমার জগদীশের ছেলে!

নরেন তখনকার কটু কথাগুলো স্মরণ করিয়া বেদনার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, তার কি দাম দেবার ইচ্ছে ছিল না?

বৃদ্ধ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, না, সে কথা আমার ত মনে হয়নি নরেন। কিন্তু তবে কি জান—না, থাক। বলিয়া তিনি সহসা মৌন হইলেন।

চারিশত টাকায় যাচাই করার কথাটা একবারে নরেনের জিহ্বায় আসিয়া পড়িল, কিন্তু সেই সঙ্গেই কেমন একটা ক্লেশ বোধ হওয়ায় এ সম্বন্ধে আর কোন কথা সে কহিল না।

রাসবিহারী এইবার দরকারী কথাটা পাড়িলেন। তিনি লোক চিনিতেন। নরেনের আজিকার কথাবার্তায় ও ব্যবহারে তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, এখনও সে আসল কথাটা জানে না; এবং এই সকল অন্যমনস্ক ও উদাসীন-প্রকৃতির মানুষগুলোর একেবারে চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া না দিলে নিজে হইতে অনুসন্ধান করিয়াও ইহারা কোন দিনই কিছু জানিতে চাহে না। বলিলেন, বিলাসের আচরণে আজ আমি যেমন দুঃখ তেমনি লজ্জা বোধ করেছি। ওই মাইক্রস্কোপ্‌টার কথাই বলি। বিজয়া একবার যদি তার মত নিয়ে সেটা কিন্‌ত, তা হ'লে ত কোন কথাই উঠতে পারত না। তুমিই বল দেখি, এ কি তার কর্তব্য ছিল না?

বিজয়ার কর্তব্যটা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া নরেন্দ্র জিজ্ঞাসু মুখে চাহিয়া রহিল। রাসবিহারী কহিলেন, তার অসুখের খবর পেয়েই বিলাস যে কি রকম উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে, এ ত আমার বুঝতে বাকী নেই। হওয়াই স্বাভাবিক—সমস্ত ভালমন্দ, সমস্ত দায়িত্ব ত শুধু তারই মাথার উপরে। চিকিৎসা এবং চিকিৎসক স্থির করা ত তারই কাজ। তার অমতে ত কিছুই হ'তে পারে না। বিজয়া নিজেও ত অবশেষে তা বুঝলেন, কিন্তু দুদিন পূর্বে চিন্তা করলে ত এসব অপ্রিয় ব্যাপার ঘটতে পারত না। নিতান্ত বালিকা নয়—ভাবা ত উচিত ছিল।

কেন যে উচিত ছিল, তাহা তখন পর্যন্তও বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া নরেন বৃদ্ধের প্রশ্নে সায় দিতে পারিল না। কিন্তু তবুও তাহার বুকের ভিতরটা আশঙ্কায় তোলপাড় করিতে লাগিল। অথচ, বুঝিয়া লইবার মত কথাও তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে শুধু শঙ্কিত দুই চক্ষু বৃদ্ধের মুখের প্রতি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

রাসবিহারী বলিলেন, তুমি কিন্তু বাবা, বিলাসের মনের অবস্থা বুঝে মনের মধ্যে কোন গ্লানি রাখতে পাবে না। আর একটা অনুরোধ আমার এই রইল নরেন, এদের বিবাহ ত বৈশাখেই হবে, যদি কলকাতাতেই থাকো, শুভকর্মে যোগ দিতে হবে তা বলে রাখলাম।

নরেন কথা কহিতে পারিল না, শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

রাসবিহারী তখন পুলকিত-চিত্তে অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, এ বিবাহ যে মঙ্গলময়ের একান্ত অভিপ্রেত, এবং বর-কন্যার জন্মকাল হইতেই যে স্থির হইয়া ছিল,

এবং এই প্রসঙ্গে বিজয়ার পরলোকগত পিতার সহিত তাহার কি কি কথা হইয়াছিল ইত্যাদি বহু প্রাচীন ইতিহাস বিবৃত করিতে করিতে সহসা বলিয়া উঠিলেন, ভাল কথা, কলকাতাতেই কি এখন থাকা হবে? একটু সুবিধে-টুবিধে হবার কি আশা—

নরেন্দ্র কহিল, হাঁ। একটা বিলাতি ওষুধের দোকানে সামান্য একটা কাজ পেয়েচি।

রাসবিহারী খুশী হইয়া বলিলেন, বেশ—বেশ। ওষুধের দোকান—কাঁচা পয়সা। টিকে থাকতে পারলে আখেরে গুছিয়ে নিতে পারবে।

নরেন এ ইঙ্গিতের ধার দিয়াও গেল না। কহিল, আজ্ঞে হাঁ।

শুনিয়া রাসবিহারী আর কৌতূহল দমন করিতে পারিলেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা হ'লে মাইনেটা কি রকম দিচ্চে?

নরেন্দ্র কহিল, পরে কিছু বেশী দিতে পারে। চার শ টাকা মাত্র দেয়।

চার শ! রাসবিহারী বিবর্ণ মুখে চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন, আহা, বেশ—বেশ: শুনে বড় সুখী হলাম।

এদিকে বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল দেখিয়া নরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। দয়ালবাবুর দুই-চারিটা বসন্ত দেখা দিয়াছিল, তাহাকে একবার দেখিতে যাইতে হইবে। জিজ্ঞাসা করিল, সেই পরেশ ছেলেটি কেমন আছে বলতে পারেন?

রাসবিহারী অম্লান মুখে জানাইলেন তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে—সে কেমন আছে বলিতে পারেন না।

উভয়েই ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন। তাহাকে আবার একবার উপরে যাইতে হইবে। ছেলে তখনও অপেক্ষা করিয়া আছে; সে চিকিৎসার কিরূপ ব্যবস্থা করিল, তাহারও খবর লওয়া আবশ্যক। বারান্দার শেষ পর্যন্ত আসিয়া নরেন মুহূর্তের জন্য একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তাহার পরে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া রাসবিহারীকে কহিল, আপনি আমার হয়ে বিলাসবাবুকে একটা কথা জানাবেন। বলবেন, প্রবল জ্বরে মানুষের আবেগ নিতান্ত সামান্য কারণেও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে। বিজয়ার সম্বন্ধে ডাক্তারের মুখের এই কথাটা তিনি যেন অবিশ্বাস না করেন। বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া একটু দ্রুতগতিতেই প্রস্থান করিল।।

স্নান নাই, আহার নাই, মাথার উপর কড়া রৌদ্র—মাঠের উপর দিয়া নরেন্দ্র দিঘ্‌ড়ায় চলিয়াছিল। কিন্তু কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাই চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি সে বারংবার প্রশ্ন করিতেছিল, তাহার কিসের গরজ? কে একটা স্ত্রীলোক তাহার শ্রদ্ধার পাত্রকে দেখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছে বলিয়াই সে যাহাকে কখনো চোখেও দেখে নাই তাহাকে দেখিবার জন্য এই রৌদ্রের মধ্যে মাঠ ভাঙিতেছে! এই অন্যায় অনুরোধ করিবার যে তাহার একবিন্দু অধিকার ছিল না তাহা মনে করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, এবং ইহা রক্ষা করিতে যাওয়াও নিজের সম্মানের হানিকর ইহাও সে বার বার করিয়া আপনাকে বলিতে লাগিল অথচ মুখ ফিরিয়া চলিয়া যাইতেও পারিল না। এক-পা এক-পা করিয়া সেই দিঘড়ার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং অনতিকাল পরে সেই নিতান্ত স্পর্ধিত অনুরোধটাকেই বজায় রাখিতে নিজের বাটীর দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এক টুকরা কাগজের উপর নরেন নিজের নামের সঙ্গে তাহার বিলাতী ডাক্তারি খেতাবটা জুড়িয়া দিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেইটা পাঠ করিয়া দয়াল অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। এতবড় একটা ডাক্তার পায়ে হাঁটিয়া তাহাকে দেখিতে আসিয়াছে ইহা তাঁহার নিজেরই যেন একটা অশোভন স্পর্ধা ও অপরাধের মত ঠেকিল, এবং ইহাকেই বঞ্চিত করিয়া নিজে এই বাটীতে বাস করিতেছেন এই লজ্জায় কি করিয়া যে মুখ দেখাইবেন

ভাবিয়া পাইলেন না। ক্ষণেক পরে একজন গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, ছিপছিপে যুবক যখন তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিল তখন মুগ্ধনেত্রে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, ব্যাধি তাঁহার যাই হোক, এবং যত বড়ই হোক, আর ভয় নাই—এ যাত্রা তিনি বাঁচিয়া গেলেন। বস্তুতঃ রোগ অতি সামান্য, চিন্তার কিছুমাত্র হেতু নাই আশ্বাস পাইয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, এমন কি ডাক্তারসাহেবকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে স্টেশন পর্যন্ত সঙ্গে যাওয়া সম্ভব হইবে কিনা ভাবিতে লাগিলেন। বিজয়া নিজে শয্যাগত হইয়াও তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই ; সে-ই অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে শুনিয়া কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে দয়ালের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে এই নবীন চিকিৎসক ও প্রাচীন আচার্যের মধ্যে আলাপ জমিয়া উঠিল। নরেন্দ্রর চিত্তের মাঝে আজ অনেকখানি গ্লানি জমা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই বৃদ্ধের সন্তোষ, সহৃদয়তা ও অন্তরের শুচিতার সংস্পর্শে তাহার অর্ধেক পরিষ্কার হইয়া গেল। কথায় কথায় সে বুঝিল, এই লোকটির ধর্মসম্বন্ধীয় পড়াশুনা যদিচ নিতান্তই যৎসামান্য, কিন্তু ধর্ম বস্তুটিকে বৃদ্ধ বুক দিয়া ভালবাসেন এবং সেই অকৃত্রিম ভালবাসায়ই যেন ধর্মের সত্য দিকটার প্রতি তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে অসামান্যরূপে স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে! কোন ধর্মের বিরুদ্ধেই তাঁহার নালিশ নাই, এবং মানুষ খাঁটি হইলেই যে সকল ধর্মই তাঁহাকে খাঁটি জিনিসটি দিতে পারে, ইহাই তিনি অকপটে বিশ্বাস করেন। এরূপ অসাম্প্রদায়িক মতবাদ বিলাসবিহারীর কানে গেলে তাঁহার আচার্য পদ বহাল থাকিত কিনা ঘোর সন্দেহ, কিন্তু বৃদ্ধের শান্ত, সরল ও বিদ্বেষ-লেশহীন কথা শুনিয়া নরেন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল। রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীরও তিনি অনেক গুণগান করিলেন। তিনি যাহারই কথা বলেন, তাঁহারই মত সাধু পুরুষ জগতে আর দ্বিতীয় দেখেন নাই বলেন। বৃদ্ধের মানুষ চিনিবার এই অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া নরেন্দ্র মনে মনে হাসিল। পরিশেষে বিলাসের প্রসঙ্গেই তিনি আগামী বৈশাখে বিবাহের উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত জানাইলেন যে, সে উপলক্ষে তাঁহাকেই আচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে ইহাই বিজয়ার অভিলাষ; এবং এই বিবাহই যে ব্রাহ্মসমাজে বিবাহের যথার্থ আদর্শ হওয়া উচিত এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেও তিনি বিরত হইলেন না।

কিন্তু বৃদ্ধ সৌভাগ্য ও আনন্দের আতিশয্যে নিজে এতদূর বিহ্বল হইয়া না উঠিলে অত্যন্ত অনায়াসেই দেখিতে পাইতেন, এই শেষের আলোচনা কি করিয়া তাঁহার শ্রোতার মুখের উপর কালির উপর কালি ঢালিয়া দিতেছিল।

স্নানাহারের জন্য তিনি নরেন্দ্রকে যৎপরোনাস্তি পীড়াপীড়ি করিয়াও রাজী করাইতে পারিলেন না। ঘণ্টা-দেড়েক পরে নরেন্দ্র যখন যথার্থ শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন কোথায় যে তাহার ব্যথা, কেন যে সমস্ত মন উদ্‌ভ্রান্ত-বিপর্যস্ত, সমস্ত সংসার এরূপ তিক্ত, বিস্বাদ হইয়া গেছে তাহা জানিতে তাহার বাকী রহিল না। নদী পার হইতেই বাম দিকে অনেকদূরে জমিদার-বাটীর সৌধ-চূড়া চোখে পড়ায় আর একবার নূতন করিয়া তাহার দুই চক্ষু জ্বলিয়া গেল। সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া সোজা মাঠের পথ ধরিয়া রেলওয়ে স্টেশনের দিকে দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। আজ এমন অকস্মাৎ এত বড় আঘাত না খাইলে সে হয়ত এত সত্বর নিজের মনটাকে চিনিতে পারিত না। এতদিন তাহার জানা ছিল এ জীবনে হৃদয় তাহার একমাত্র শুধু বিজ্ঞানকেই ভালবাসিয়াছে। সেখানে কোন কালে আর কোন জিনিসেরই যে জায়গা মিলিবে না, তাহা এমন নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিত বলিয়াই জগতের অন্যান্য সমস্ত কামনার বস্তুই তাহার কাছে একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু আজ আঘাত খাইয়া যখন ধরা পড়িল হৃদয় তাহার তাহারই অজ্ঞাতসারে আর একটা বস্তুকে এমনিই একান্ত করিয়া ভালবাসিয়াছে, তখন ব্যথায় ও বিস্ময়েই শুধু চমকিয়া গেল না, নিজের কাছেই নিজে যেন অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। আজ কোন কথারই যথার্থ মানে বুঝিতে তাহার বাধিল না। বিজয়ার সমস্ত আচরণ, সমস্ত কথাবার্তাই যে প্রচ্ছন্ন উপহাস এবং এই লইয়া বিলাসের সহিত না জানি সে কতই হাসিয়াছে, কল্পনা করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ লজ্জায় বার বার করিয়া শিহরিতে লাগিল। এই ত সেদিন যে তাহার সর্বস্ব গ্রহণ করিয়া পথে বাহির করিয়া দিতেও একবিন্দু

দ্বিধা করে নাই, তাহারই কাছে দৈন্য জানাইয়া তাহার শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত বিক্রয় করিতে যাইবার চরম দুর্মতি তাহার কোন্ মহাপাপে জন্মিয়াছিল? নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া কেবলই বলিতে লাগিল, এ আমার ঠিকই হইয়াছে। যে লজ্জাহীন সেই নিষ্ঠুর রমণীর একটা সামান্য কথায় নিজের সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া এতদূরে ছুটিয়া আসিতে পারে এ শাস্তি তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। বেশ করিয়াছে, বিলাস তাহাকে অপমান করিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিয়াছে।

স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিল, যে মাইক্রস্কোপটা এত দুঃখের মূল, সেইটাকে লইয়াই কালীপদ দাঁড়াইয়া আছে। সে কাছে আসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, মাঠান আপনাকে এইটে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

নরেন তিক্তস্বরে কহিল, কেন?

কেন তাহা কালীপদ জানিত না। কিন্তু জিনিসটা যে ডাক্তারবাবুর, এবং ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া যত প্রকারের অপ্রিয় ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে সম্মুখে এবং দ্বারের অন্তরাল হইতে কিছুই কালীপদর অবিদিত ছিল না। সে বুদ্ধি খাটাইয়া হাসিমুখে বলিল, আপনি ফিরে চেয়েছিলেন যে!

নরেন্দ্র মনে মনে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, না চাইনি। দাম দেবার টাকা নেই আমার।

কালীপদ বুঝিল ইহা অভিমানের কথা। সে অনেক দিনের চাকর, টাকাকড়ি সম্বন্ধে বিজয়ার মনের ভাব এবং আচরণের বহু দৃষ্টান্ত সে চোখে দেখিয়াছে। সে তাহার সেই জ্ঞানটুকু আরও একটু ফলাও করিয়া একটু হাসিয়া, একটু তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল, ইঃ, ভারী ত দাম। মাঠানের কাছে দু-চার শ টাকা নাকি আবার টাকা! নিয়ে যান আপনি। যখন যোগাড় করতে পারবেন দামটা পাঠিয়ে দেবেন।

অর্থ-সম্বন্ধে তাহার প্রতি বিজয়ার এই অযাচিত বিশ্বাস নরেন্দ্রের ক্রোধটাকে একটু নরম করিয়া আনিলেও তাহার কণ্ঠস্বরের তিক্ততা দূর করিতে পারিল না। তাই সে যখন দুই শতের পরিবর্তে চারি শত দিবার অক্ষমতা জানাইয়া কহিল, না না, তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও কালীপদ, আমার দরকার নেই। দু'শ টাকার বদলে চার শ টাকা আমি দিতে পারব না, তখন কালীপদ অনুনয়ের স্বরেই বলিয়া উঠিল, না ডাক্তারবাবু, তা হবে না—আপনি সঙ্গে নিয়ে যান—আমি গাড়িতে তুলে দিয়ে যাবো।

এই জিনিসটা সম্বন্ধে তাহার নিজের একটুখানি বিশেষ গরজ ছিল। বিলাসকে সে দুচক্ষে দেখিতে পারিত না বলিয়া তাহার প্রতি অনেকটা আক্রোশবশতঃই নরেনের প্রতি তাহার একপ্রকার সহানুভূতি জন্মিয়াছিল। সেইজন্য দরোয়ানকে দিয়া পাঠাইতে বিজয়া আদেশ করিলেও কালীপদ নিজে যাচিয়া এতটা পথ এই ভারী বাক্সটা বহিয়া আনিয়াছিল। নরেন্দ্র মনে মনে ইতস্ততঃ করিতেছে কল্পনা করিয়া সে আরও একটু কাছে ঘেঁষিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, আপনি নিয়ে যান ডাক্তারবাবু। মাঠান ভাল হয়ে চাই কি দামটা আপনাকে ছেড়ে দিতেও পারেন।

এই ইঙ্গিত শুনিয়া নরেন্দ্র অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। বটে! সে ডাকিয়াছে অথচ বিলাস তাহার অপমান করিয়াছে—এ বুঝি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ কৃপার বকশিশ!

কিন্ত প্লাটফরমের উপর আরও লোকজন ছিল বলিয়াই সে যাত্রা কালীপদর একটা ফাঁড়া কাটিয়া গেল। নরেন্দ্র কোনমতে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া বাহিরের পথটা হাত দিয়া নির্দেশ করিয়া শুধু বলিল—যাও আমার সুমুখ থেকে। বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া আর একদিকে চলিয়া গেল। কালীপদ হতবুদ্ধি বিহ্বলের ন্যায় কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যাপারটা যে কি হইল তাহার মাথায় ঢুকিল না। মিনিট পনরো পরে গাড়ি আসিলে নরেন্দ্র যখন উঠিয়া বসিল তখন কালীপদ আস্তে আস্তে সেই ফার্স্টক্লাস কামরার জানালার কাছে আসিয়া ডাকিল, ডাক্তারবাবু!

নরেন্দ্র অন্যদিকে চাহিয়াছিল, মুখ ফিরাইতেই কালীপদর মলিন মুখের উপর চোখ পড়িল। চাকরটার প্রতি নিরর্থক রূঢ় ব্যবহার করিয়া সে মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল; তাই একটু হাসিয়া সদয়কণ্ঠে কহিল, আবার কি?

সে এক টুকরা কাগজ এবং পেন্সিল বাহির করিয়া বলিল, আপনার ঠিকানাটা একটুখানি যদি—

আমার ঠিকানা নিয়ে কি করবে?

আমি কিছু করব না—মাঠান ব'লে দিলেন—

মাঠানের নামে এবার নরেন্দ্রর আত্মবিস্মৃতি ঘটিল। অকস্মাৎ সে প্রচণ্ড একটি ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল—বেরো সামনে থেকে বলচি—পাজি নচ্ছার কোথাকার!

কালীপদ চমকিয়া দু'পা হটিয়া গেল—এবং পরক্ষণেই বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

সে ফিরিয়া আসিয়া যখন উপরের ঘরে প্রবেশ করিল তখন বিজয়া খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়া হেলান দিয়া বসিয়াছিল। পদশব্দে চোখ মেলিতেই কালীপদ কহিল, ফিরিয়ে দিলেন—নিলেন না।

বিজয়ার দৃষ্টিতে বেদনা বা বিস্ময় কিছুই প্রকাশ পাইল না। কালীপদ হাতের কাগজ ও পেন্সিলটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে দিতে বলিল, বাবা, কি রাগ! ঠিকানা জিজ্ঞেস করায় যেন তেড়ে মারতে এলেন। ইহার উত্তরেও বিজয়া কথা কহিল না।

সমস্ত পথটা কালীপদ আপনা আপনি মহলা দিতে দিতে আসিতেছিল, মনিবের আগ্রহের জবাবে সে কি বলিবে? কিন্তু সে-পক্ষে লেশমাত্র উৎসাহ না পাইয়া সে চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, বিজয়ার দৃষ্টি তেমনি নির্বিকার, তেমনি শূন্য। হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই বিজয়া এই একটা মিথ্যা কাজে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাই সে অপ্রতিভভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই বিজয়ার রোগ সারিয়া গেল বটে, কিন্তু শরীর সারিতে দেরি হইতে লাগিল। বিলাস ভাল ডাক্তার দিয়া বলকারক ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত করিতে ত্রুটি করিল না, কিন্তু দুর্বলতা যেন প্রতিদিন বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। এদিকে ফাল্গুন শেষ হইতে চলিল, মধ্যে শুধু চৈত্র মাসটা বাকী; বৈশাখের প্রথম সপ্তাহেই ছেলের বিবাহ দিবেন রাসবিহারীর ইহাই সংকল্প। কিন্তু পাত্র যত দিন দিন পরিপুষ্ট ও কান্তিমান হইয়া উঠিতে লাগিলেন, কন্যা তেমনি শীর্ণ ও মলিন হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাসবিহারী প্রত্যহ একবার করিয়া আসিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অথচ চেষ্টার কোন দিকে কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না—তবে একি! সেই মাইক্রস্কোপ্-ঘটিত ব্যাপারটা বাহিরে হইতে কেমন করিয়া না জানি একটু অতিরঞ্জিত হইয়াই পিতা-পুত্রের কানে গিয়াছিল। শুনিয়া ছোটতরফ যতই লাফাইতে লাগিল, বড়তরফ ততই তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ছেলেকে তিনি বিশেষ করিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই সকল ছোটখাটো বিষয় লইয়া দাপাদাপি করিয়া বেড়ানো শুধু যে নিষ্প্রয়োজন তাই নয়, তাহার অসুস্থ দেহের উপর হাঙ্গামা করিতে গেলে হিতে বিপরীত ঘটাও অসম্ভব নয়। বিলাস পৃথিবীর আর যত লোককেই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক, পিতার পাকা-বুদ্ধিকে সে মনে মনে খাতির করিত। কারণ ঐহিক ব্যাপারে সে বুদ্ধির উৎকর্ষতার এত অপর্যাপ্ত নজির রহিয়া গেছে যে তাহার প্রামাণ্য-সম্বন্ধে সন্দেহ করা একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং এই লইয়া বুকের মধ্যে তাহার যত বিষই গাঁজাইয়া উঠিতে থাকুক, প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে সাহস করে নাই। কিন্ত আর সহিল না। সেদিন হঠাৎ অতি তুচ্ছ কারণে সে কালীপদকে লইয়া পড়িল; এবং প্রথমটা এই-মারি-ত-এই-মারি করিয়া অবশেষে তাহার মাহিনা চুকাইয়া দিতে গোমস্তার প্রতি হুকুম করিয়া তাহাকে ডিস্‌মিস্ করিল।

চিকিৎসক বিজয়ার সকালে বিকালে যৎকিঞ্চিৎ ভ্রমণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেদিন

সকালে সে নদীর তীরে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া বাটী ফিরিতেই কালীপদ অশ্রুবিকৃতস্বরে বলিল, মা, ছোটবাবু আমাকে জবাব দিলেন।

বিজয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কালীপদ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, কর্তাবাবু স্বর্গে গেছেন, কিন্তু তেনার কাছে কখন গালমন্দ খাইনি মা, কিন্তু আজ—বলিয়া সে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল; তার পরে কান্না শেষ করিয়া যাহা কহিল, তাহার মর্ম এই যে, যদিচ সে কোন অপরাধ করে নাই তথাপি ছোটবাবু তাহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। ডাক্তারবাবুর কাছে সেই বাক্সটা দিতে যাওয়ার কথা কেন আমি তাহাকে নিজে জানাই নাই, কেন আমি তাঁহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়াছিলাম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিজয়া চৌকির উপর অত্যন্ত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল—বহুক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও কহিল না। পরে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায়?

কালীপদ বলিল, কাছারি-ঘরে বসে কাগজ দেখচেন।

বিজয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আচ্ছা, দরকার নেই—এখন তুই কাজ কর গে যা। বলিয়া সে নিজেও চলিয়া গেল। ঘণ্টা-খানেক পরে জানালা দিয়া দেখিতে পাইল, বিলাস কাছারি-ঘর হইতে বাহির হইয়া বাড়ি চলিয়া গেল। কেন যে আজ সে তত্ত্ব লইতে বাড়ি ঢুকিল না তাহা সে বুঝিল।

দয়াল আরোগ্য হইয়া আবার নিয়মিত কাজে আসিতেছিলেন। সন্ধ্যার পূর্বে ঘরে ফিরিবার সময় এক-একদিন বিজয়া তাঁহার সঙ্গ লইত, এবং কথা কহিতে কহিতে কতকটা পথ আগাইয়া দিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিত।

নরেনের প্রতি দয়ালের অন্তঃকরণ সম্ভ্রমে কৃতজ্ঞতায় একেবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পীড়ার কথা উঠিলে বৃদ্ধ এই নবীন চিকিৎসকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সহস্র-মুখ হইয়া উঠিতেন। বিজয়া চুপ করিয়া শুনিত কিন্তু কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিত না বলিয়াই দয়াল মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেন না যে, তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ইঁহাকে ডাকাইয়াই একবার বিজয়ার অসুখের কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয়। ভিতরের রহস্য তখনো তাঁহার সম্পূর্ণ অগোচর ছিল বলিয়াই বিজয়ার নীরব উপেক্ষায় তিনি মনে মনে পীড়া অনুভব করিয়া সহস্র প্রকার ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ করিতে চাহিতেন, হোক সে ছেলেমানুষ, কিন্তু যে-সব নামজাদা বিজ্ঞ চিকিৎসকের দল তোমার মিথ্যা চিকিৎসা করিয়া টাকা এবং সময় নষ্ট করচে, তাদের চেয়ে সে ঢের বেশী বিজ্ঞ এ আমি শপথ করে বলতে পারি।

কিন্তু, এই গোপন রহস্যের আভাস পাইতে তাঁহার বেশী দিন লাগিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরেই একদিন সহসা তিনি বিজয়ার ঘরে আসিয়া বলিলেন, কালীপদকে আর ত আমি বাড়িতে রাখতে পারিনে মা।

বিজয়ার এ আশঙ্কা ছিলই; তথাপি সে জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

দয়াল কহিলেন, তুমি যাকে বাড়িতে রাখতে পারলে না, আমি তাকে রাখব কোন্ সাহসে বল দেখি মা?

বিজয়া মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, কিন্তু সেটাও ত আমারই বাড়ি।

দয়াল লজ্জা পাইয়া বলিলেন, তা ত বটেই। আমরা সকলেই ত তোমার আশ্রিত মা। কিন্তু—

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি আপনাকে রাখতে নিষেধ করেছেন?

দয়াল চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়া বুঝিতে পারিয়া কহিল, তবে আমার কাছেই কালীপদকে পাঠিয়ে দেবেন, সে আমার বাবার চাকর, তাকে আমি বিদায় দিতে পারব না।

দয়াল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সঙ্কোচের সহিত কহিলেন, কাজটা ভাল হবে না মা। তাঁর অবাধ্য হওয়াও তোমার কর্তব্য নয়।

বিজয়া ভাবিয়া বলিল, তা হ'লে আমাকে কি করতে বলেন?

দয়াল কহিলেন, তোমাকে কিছুই করতে হবে না। কালীপদ নিজেই বাড়ি যেতে চাচ্চে। আমি বলি, কিছুদিন সে তাই যাক।

বিজয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলিল, তবে তাই হোক। কিন্তু যাবার আগে এখানে তাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া বৃদ্ধ মুখ তুলিতেই এই তরুণীর মলিন মুখের উপর একটা নিবিড় ঘৃণার ছবি দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সেদিন এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না।

ইহার পর চার-পাঁচদিন দয়ালকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বিজয়া কাছারি-ঘরে সংবাদ লইয়া জানিল, তিনি কাজেও আসেন নাই, শুনিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছে, লোক পাঠাইয়া সংবাদ লওয়া প্রয়োজন কিনা, এমনি সময়ে দ্বারের বাহিরে তাঁহারই কাশির শব্দে বিজয়া সানন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বসাইল।

দয়ালের স্ত্রী চিররুগ্না। হঠাৎ তাঁহারই অসুখের বাড়াবাড়িতে কয়েকদিন তিনি বাহির হইতে পারেন নাই। নিজেকেই পাক করিতে হইতেছিল। অথচ তাঁহার নিরুদ্বেগ মুখের চেহারায় বিজয়া বুঝিতে পারিল, বিশেষ কোন ভয় নাই। তথাপি প্রশ্ন করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

দয়াল বলিলেন, আজ ভাল আছেন। নরেনবাবুকে চিঠি লিখতে কাল বিকালে এসে তিনি ওষুধ দিয়ে গেছেন। কি অদ্ভুত চিকিৎসা মা, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই পীড়া যেন বারো আনা আরোগ্য হয়ে গেছে।

বিজয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, ভাল হবে না? আপনাদের সকলের কি সোজা বিশ্বাস তাঁর উপরে?

দয়াল বলিলেন, সে কথা সত্যি। কিন্তু বিশ্বাস ত শুধু শুধু হয় না মা, আমরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি কিনা, মনে হয়, ঘরে পা দিলেই যেন সমস্ত ভাল হয়ে যাবে।

তা হবে, বলিয়া বিজয়া আবার একটুখানি হাসিল। এবার দয়াল নিজেও একটু হাসিয়া কহিলেন, শুধু তাঁরই চিকিৎসা ক'রে যাননি মা, আরও একজনের ব্যবস্থা ক'রে গেছেন। বলিয়া তিনি টেবিলের উপর এক টুকরা কাগজ মেলিয়া ধরিলেন।

একখানা প্রেস্‌ক্রিপসান। উপরে বিজয়ার নাম লেখা। লেখাটুকুর উপর চোখ পড়িবামাত্রই ওই কয়টা অক্ষর যেন আনন্দের বাণ হইয়া বিজয়ার বুকে আসিয়া বিঁধিল। পলকের জন্য তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়াই একেবারে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। বৃদ্ধ নিজের কৃতিত্বের পুলকে এমনি বিভোর হইয়াছিলেন যে, সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না। বলিলেন, তোমাকে কিন্তু উপেক্ষা করতে দেব না মা। ওষুধটা একবার পরীক্ষা করে দেখতেই হবে, তা ব'লে দিচ্চি।

বিজয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, কিন্তু এ যে অন্ধকারে ঢিল ফেলা—

বৃদ্ধ গর্বে প্রদীপ্ত হইয়া বলিলেন, ইস! তাই বুঝি! এ কি তোমার নেটিভ ডাক্তার পেয়েছ মা, যে দক্ষিণা দিলেই ব্যবস্থা লিখে দেবে? এ যে বিলাতের বড় পাশ-করা ডাক্তার! নিজের চোখে না দেখে যে এঁরা কিছুই করেন না। এঁদের দায়িত্ববোধ কি সোজা মা?

অকৃত্রিম বিস্ময়ে বিজয়া দুইচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, নিজের চোখে দেখে কি রকম? কে বললে আমাকে তিনি দেখে গেছেন? এ শুধু আপনার মুখের কথা শুনেই ওষুধ লিখে দিয়েছেন।

দয়াল বার বার করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না না, না। তা কখনই নয়। কাল যখন তুমি তোমাদের বাগানের রেলিঙ ধ'রে দাঁড়িয়ে ছিলে, তখন ঠিক তোমার সুমুখের পথ দিয়েই যে তিনি হেঁটে গেছেন। তোমাকে ভাল ক'রেই দেখে গেছেন— বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলে ব'লেই—

বিজয়া হঠাৎ চমকিয়া কহিল, তাঁর কি সাহেবি পোশাক ছিল? মাথায় হ্যাট ছিল?

দয়াল কৌতুকের প্রাবল্যে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, কে বলবে যে খাঁটি সাহেব নয়? কে বলবে আমাদের স্বজাতি বাঙালী? আমি নিজেই যে হঠাৎ চমকে গিয়েছিলুম মা।

সুমুখ দিয়া গিয়াছেন, ঠিক চোখের উপর দিয়া গিয়াছেন, তাহাকে দেখিতে দেখিতে গিয়াছেন—অথচ সে একটি বারের বেশী দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করে নাই। পুলিশের কোন

ইংরাজ কর্মচারী হইবে ভাবিয়া বরঞ্চ সে অবজ্ঞায় চোখ নামাইয়া লইয়াছিল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে কি ঝড় বহিয়া গেল বৃদ্ধ তাহার কোন সংবাদই রাখিলেন না। তিনি নিজের মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—মাঝে শুধু চৈত্র মাসটা বাকী। বৈশাখের প্রথম, না হয় বড় জোর দ্বিতীয় সপ্তাহেই বিবাহ। বললাম মায়ের যে শরীর সারে না ডাক্তারবাবু, একটা কিছু ওষুধ দিন, যাতে—তাঁহার মুখের কথাটা ঐখানেই অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

এভাবে অকস্মাৎ থামিয়া যাইতে দেখিয়া বিজয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিতেই দেখিল, বিলাস ঘরে ঢুকিতেছে। একটা আলোচনা চলিতেছিল, তাহার আগমনে বন্ধ হইয়া গেল—প্রবেশমাত্রই অনুভব করিয়া বিলাসের চোখমুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে যথাসাধ্য সংবরণ করিয়া সে নিকটে আসিয়া একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। ঠিক সম্মুখে প্রেস্‌ক্রিপসানটা পড়িয়া ছিল, দৃষ্টি পড়ায় হাত দিয়া সেখানা টেবিলের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া আগাগোড়া তিন-চারবার করিয়া পড়িয়া যথাস্থলে রাখিয়া দিয়া কহিল, নরেন ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসান দেখচি। এলো কি ক'রে—ডাকে নাকি?

কেহই সে কথার উত্তর দিল না। বিজয়া ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিলাস হিংসায়-পোড়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, ডাক্তার ত নরেন ডাক্তার! তাই বুঝি এ'দের ওষুধ খাওয়া হয় না, শিশির ওষুধ শিশিতেই পচে; তার পরে ফেলে দেওয়া হয়! তা না হয় হোলো কিন্তু এই কলির ধন্বন্তরিটি কাগজখানি পাঠালেন কি করে শুনি? ডাকে নাকি?

এ প্রশ্নেরও কেহ জবাব দিল না।

সে তখন দয়ালের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনি ত এতক্ষণ খুব লেকচার দিচ্ছিলেন—সিঁড়ি থেকেই শোনা যাচ্ছিল—বলি, আপনি কিছু জানেন?

এই জমিদারী সেরেস্তায় বিলাসবিহারীর অধীনে কর্ম গ্রহণ করা অবধি দয়াল মনে মনে তাহাকে বাঘের মত ভয় করিতেন। কালীপদর মুখে শুনিতেও কিছু বাকী ছিল না। সুতরাং প্রেস্‌ক্রিপসনখানা হাতে করা পর্যন্তই তাঁহার বুকের ভিতরটা বাঁশপাতার মত কাঁপিতেছিল। এখন প্রশ্ন শুনিয়া মুখের মধ্যে জিভটা তাঁহার এমনি আড়ষ্ট হইয়া গেল যে কথা বাহির হইল না।

বিলাস একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া ধমক দিয়া কহিল, একেবারে যে ভিজেবেড়ালটি হয়ে গেলেন? বলি জানেন কিছু?

চাকরির ভয় যে ভারাক্রান্ত দরিদ্রকে কিরূপ হীন করিয়া ফেলে, তাহা দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। দয়াল চমকিয়া উঠিয়া অস্ফুট-স্বরে কহিলেন, আজ্ঞে হাঁ, আমিই এনেচি।

ওঃ- তাই বটে! কোথায় পেলেন সেটাকে।

দয়াল তখন জড়াইয়া জড়াইয়া কোন মতে ব্যাপারটা বিবৃত করিলেন।

বিলাস স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, গেল বছরের হিসাবটা আপনাকে সারতে বলেছিলাম, সেটা সারা হয়েছে?

দয়াল বিবর্ণমুখে কহিলেন, আজ্ঞে, দুদিনের মধ্যেই সেরে ফেলব।

হয়নি কেন?

বাড়িতে ভারী বিপদ যাচ্ছিল, বাঁধতে হ'তো—আসতেই পারিনি।

প্রত্যুত্তরে বিলাস কুৎসিত বটকণ্ঠে দয়ালের জড়িমার নকল করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, আসতেই পারিনি! তবে আর কি, আমাকে রাজা করেছেন! বলিয়া তীব্রস্বরে কহিল, আমি তখনই বাবাকে বলেছিলাম, এ সব বুড়ো-হাবড়া নিয়ে আমার কাজ চলবে না।

এতক্ষণ পরে বিজয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল। তাহার মুখের ভাব প্রশান্ত, গম্ভীর; কিন্ত দুই চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। অনুচ্চ কঠিন-কণ্ঠে কহিল, দয়ালবাবুকে এখানে কে এনেচে জানেন? আপনার বাবা নন—আমি।

বিলাস থমকিয়া গেল। তাহার এরূপ কণ্ঠস্বরও সে আর কখনো শুনে নাই, এরূপ

চোখের চাহনিও আর কখন দেখে নাই। কিন্তু নত হইবার পাত্র সে নয়। তাই পলকমাত্র স্থির থাকিয়া জবাব দিল, যেই আনুক, আমার জানবার দরকার নেই। আমি কাজ চাই, কাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ।

বিজয়া কহিল, যাঁর বাড়িতে বিপদ তিনি কি করে কাজ করতে আসবেন?

বিলাস উদ্ধতভাবে বলিল, অমন সবাই বিপদের দোহাই পাড়ে। কিন্তু সে শুনতে গেলে ত আমার চলে না! আমি দরকারী কাজ সেরে রাখতে হুকুম দিয়েছিলাম, হয়নি কেন সেই কৈফিয়ত চাই। বিপদের খবর জানতে চাইনে।

বিজয়ার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। কহিল, সবাই মিথ্যাবাদী নয়—সবাই মিথ্যা বিপদের দোহাই দেয় না; অন্ততঃ মন্দিরের আচার্য দেয় না। সে যাক, কিন্তু, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আমি, যখন জানেন, দরকারী কাজ হওয়া চাই-ই, তখন নিজে কেন সেরে রাখেন নি? আপনি কেন চারদিন কাজ কামাই করলেন? কি বিপদ হয়েছিল আপনার শুনি?

বিলাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধিপ্রায় হইয়া কহিল, আমি নিজে খাতা সেরে রাখব! আমি কামাই করলাম কেন!

বিজয়া কহিল, হাঁ তাই। মাসে মাসে দু'শ টাকা মাইনে আপনি নেন। সে টাকা ত আমি শুধু শুধু আপনাকে দিইনে, কাজ করবার জন্যেই দিই।

বিলাস কলের পুতুলের মত কেবল কহিল, আমি চাকর? আমি তোমার আমলা?

অসহ্য ক্রোধে বিজয়ার প্রায় হিতাহিত-জ্ঞান লোপ হইয়াছিল; সে তীব্রতর কণ্ঠে উত্তর দিল, কাজ করবার জন্য যাকে মাইনে দিতে হয় তাকে ও-ছাড়া আর কি বলে? আপনার অসংখ্য উৎপাত আমি নিঃশব্দে সয়ে এসেছি; কিন্তু যত সহ্য করেচি, অন্যায় উপদ্রব ততই বেড়ে গেছে। যান, নীচে যান। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ছাড়া আজ থেকে আপনার সঙ্গে আর আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যে নিয়মে আমার অপর কর্মচারীরা কাজ করে, ঠিক সেই নিয়মে কাজ করতে পারেন করবেন, নইলে আপনাকে আমি জবাব দিলুম, আমার কাছারিতে আর ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।

বিলাস লাফাইয়া উঠিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী কম্পিত করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিল, তোমার এত সাহস!

বিজয়া কহিল, দুঃসাহস আমার নয়, আপনার। আমার স্টেটেই চাকরি করবেন, আর আমারই উপর অত্যাচার করবেন! আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে? আমার চাকরকে আমারই বাড়িতে জবাব দেবার, আমার অতিথিকে আমারই চোখের সামনে অপমান করবার এ সকল স্পর্ধা কোথা থেকে আপনার জন্মাল?

বিলাস ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া চীৎকারে ঘর ফাটাইয়া বলিল, অতিথির বাপের পুণ্য যে, সেদিন তার গায়ে হাত দিইনি—তার একটা হাত ভেঙ্গে দিইনি। নচ্ছার, বদমাইস, জোচ্চোর, লোফার কোথাকার। আর কখনো যদি তার দেখা পাই—

চীৎকার-শব্দে ভীত হইয়া গোপাল কানাই সিংকে ডাকিয়া আনিয়াছিল; দ্বারপ্রান্তে তাহার চেহারা দেখিতে পাইয়া বিজয়া লজ্জিত হইয়া কণ্ঠস্বর সংযত এবং স্বাভাবিক করিয়া কহিল, আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি সেটা আপনারই কত বড় সৌভাগ্য যে তাঁর গায়ে হাত দেবার অতি-সাহস আপনার হয়নি। তিনি উচ্চশিক্ষিত বড় ডাক্তার। সেদিন তাঁর গায়ে হাত দিলেও হয়ত তিনি একজন পীড়িত স্ত্রীলোকের ঘরের মধ্যে বিবাদ না ক'রে সহ্য ক'রেই চলে যেতেন, কিন্তু এই উপদেশটা আমার ভুলেও অবহেলা করবেন না, ভবিষ্যতে তাঁর গায়ে হাত দেবার শখ যদি আপনার থাকে ত হয় পিছন থেকে দেবেন, না হয় আপনার মত আরও পাঁচ-সাতজনকে সঙ্গে নিয়ে তবে সুমুখ থেকে দেবেন, কিন্তু বিস্তর চেঁচামেচি হয়ে গেছে, আর না। নীচে থেকে চাকর-বাকর দরোয়ান পর্যন্ত ভয় পেয়ে ওপরে উঠে এসেছে। যান, নীচে যান; বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া পাশের দরজা দিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

ছেলের মুখে ব্যাপারটা শুনিয়া ক্রোধে, বিরক্তিতে ও আশাভঙ্গের নিদারুণ হতাশ্বাসে রাসবিহারীর ব্রহ্ম-জ্ঞান ও আনুষঙ্গিক ইত্যাদির খোলস একমুহূর্তে খসিয়া পড়িয়া গেল। তিনি তিক্ত-কটুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আরে বাপু, হিঁদুরা যে আমাদের ছোটলোক বলে, সেটা ত আর মিছে কথা নয়। ব্রাহ্মই হই, আর যাই হই—কৈবর্ত ত? বামুন-কায়েতের ছেলে হ'লে ভদ্রতাও শিখতিস, নিজের ভালমন্দ কিসে হয়, না হয়, সে কাণ্ডজ্ঞানও জন্মাত। যাও, এখন মাঠে মাঠে হাল-গরু নিয়ে কুল-কর্ম কোরে বেড়াও গে। উঠতে বসতে তোকে পাখি-পড়া করে শেখালাম যে, ভালয় ভালয় কাজটা একবার হয়ে যাক, তার পরে যা ইচ্ছে হয় করিস; কিন্তু তোর সবুর সইল না, তুই গেলি তাকে ঘাঁটাতে! সে হলো রায়-বংশের মেয়ে! ডাকসাইটে হরি রায়ের নাতনি, যার ভয়ে বাঘে-বলদে একঘাটে জল খেত। তুই হাত বাড়িয়ে গেছিস তার নাকে দড়ি পরাতে—মুখ্যু কোথাকার। মান-ইজ্জত গেল, এত বড় জমিদারির আশা-ভরসা গেল, মাসে মাসে দু-দুশ টাকা মাইনে ব'লে আদায় হচ্ছিল, সে গেল—যা এখন চাষার ছেলে চাষ-বাস ক'রে খেগে যা! আবার আমার কাছে এসেছেন চোখ রাঙিয়ে তার নামে নালিশ করতে? যা যা—সুমুখ থেকে সরে যা হতভাগা বোম্বেটে শয়তান।

ঘটনাটা না ঘটিলেই যে ঢের ভাল হইত, তাহা বিলাস নিজেও বুঝিতেছিল। তাহাতে পিতৃদেবের এই ভীষণ উগ্রমূর্তি দেখিয়া তাহার সতেজ আস্ফালন নিবিয়া জল হইয়া গেল। তথাপি কি একটু কৈফিয়ত দিবার চেষ্টা করিতেই ক্রুদ্ধ পিতা দ্রুতবেগে তাঁহার নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু রাগের মাথায় ছেলেকে যাই বলুন, কাজের বেলায় রাসবিহারী ক্রোধের উত্তেজনাতেও কখনো তাড়াহুড়া করিয়া কাজ মাটি করেন নাই, আলস্য করিয়াও কখনো ইষ্ট নষ্ট করেন নাই। তাই সেদিনটা তিনি ধৈর্য ধরিয়া বিজয়াকে শান্ত হইবার সময় দিয়া পরদিন তাঁহার নিজস্ব শান্তি এবং অবিচলিত গাম্ভীর্য লইয়া বিজয়ার বসিবার ঘরে দেখা দিলেন, এবং চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন।

বিজয়ার ক্রোধোন্মত্ততা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেলে, সে নিজের অসংযত রূঢ়তা এবং নির্লজ্জ প্রগল্‌ভতা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। বাড়ির সমস্ত চাকর-বাকর এবং কর্মচারীদের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে সে এই যে একটা নাটকের অভিনয় করিয়া বসিল, হয়ত বা ইহারই মধ্যে তাহা নানা আকারে পল্লবিত এবং অতিরঞ্জিত হইয়া গ্রামের বাটীতে বাটীতে পুরুষমহলে আলোচিত হইতেছে, এবং পুকুর ও নদীর ঘাটে মেয়েদের হাসি-তামাশার ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইহারই কদর্যতা কল্পনা করিয়া সে সেই অবধি আর ঘরের বাহির পর্যন্ত আসিতে পারে নাই। লজ্জা শতগুণে বাড়িয়া গেছে আরও এই মনে করিয়া যে, আজ যাহাকে সে ভৃত্য বলিয়া প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা করিতে সংকোচ মানে নাই, দুই দিন বাদে স্বামী বলিয়া তাহার গলায় বরমাল্য পরাইবার কথা রাষ্ট্র হইতেও কোথাও আর বাকী নাই।

তাই রাসবিহারী যখন ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া নিঃশব্দ প্রসন্ন-মুখে আসন গ্রহণ করিলেন তখন বিজয়া মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিতেও পারিল না। কিন্তু ইহারই জন্য সে প্রত্যেক মুহূর্তেই প্রতীক্ষা করিয়াছিল, এবং যে-সকল যুক্তিতর্কের তরঙ্গ এবং অপ্রিয় আলোচনা আলোড়িত হইয়া উঠিবে, তাহার মোটামুটি খসড়াটা কাল হইতেই ভাবিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া সে একপ্রকার স্থির হইয়াই বসিয়া রহিল। কিন্তু বৃদ্ধ ঠিক উল্টা কথা পাড়িয়া বিজয়াকে একেবারে অবাক করিয়া দিলেন। তিনি ক্ষণেক কাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, মা বিজয়া, শুনে পর্যন্ত যে আমার কি আনন্দ হয়েছে তা জানাবার জন্যে আমি কালই ছুটে আসতাম—যদি না সেই অম্বলের ব্যথাটা আমাকে বিছানায় পেড়ে ফেলত। দীর্ঘজীবী হও মা, আমি এই ত চাই! এই ত তোমার কাছে আশা করি। বলিয়া অত্যন্ত উচ্চভাবের আর একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, সেই সর্বশক্তিমান মঙ্গলময়ের কাছে শুধু এই প্রার্থনা জানাই, সুখে-

দুঃখে, ভালতে-মন্দতে, যেন আমাকে তিনি যা ধর্ম, যা ন্যায়, তার প্রতিই অবিচলিত শ্রদ্ধা রাখবার সামর্থ্য দেন। এই বলিয়া তিনি যুক্তকর মাথায় ঠেকাইয়া চোখ বুজিয়া, বোধ করি, সেই সর্বশক্তিমানকেই প্রণাম করিলেন।

পরে চোখ চাহিয়া হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এই কথাটা আমি কোনমতেই ভেবে পাইনে বিজয়া, বিলাস আমার মত একটা খোলা ভোলা উদাসীন লোকের ছেলে হয়ে এত বড় পাকা বিষয়ী হয়ে উঠলো কি করে? যার বাপের আজও সংসারে কাজকর্মের জ্ঞান, লাভ-লোকসানের ধারণাই জন্মালো না, সে এই বয়সের মধ্যেই এরূপ দৃঢ়কর্মী হয়ে উঠল কেমন করে? কি যে তাঁর খেলা, কি যে সংসারের রহস্য, কিছুই বোঝবার জো নেই মা। বলিয়া আর একবার মুদ্রিত-নেত্রে তিনি মাথা নত করিলেন।

বিজয়া নীরবে বসিয়া রহিল। রাসবিহারী আবার একটু মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন জিনিসেরই ত অত্যন্ত ভাল নয়। জানি, বিলাসের কাজ-অন্ত প্রাণ। সেখানে সে অন্ধ। কর্তব্য-কর্মে অবহেলা তার বুকে শূলের মত বাজে; কিন্তু তাই ব'লে কি মানীর মান রাখতে হবে না? দয়ালের মত লোকেরও কি ত্রুটি মার্জনা করা আবশ্যক নয়? জানি, অপরাধ ছোট-বড় ধনী-নির্ধন বিচার করে না। কিন্তু তাই ব'লে কি তাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে? সব বুঝি। কাজ না করাও দোষ খবর না দিয়ে কামাই করাও খুব অন্যায়, আপিসে ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করাও আপিস মাস্টারের পক্ষে বড় অপরাধ; কিন্তু, দয়ালকেও কি—না মা, আমরা বুড়োমানুষ আমাদের সে তেজও নেই, জোরও নেই—সাহেবরা বিলাসের কর্তব্যনিষ্ঠার যত সুখ্যাতিই করুক, তাকে যত বড়ই মনে করুক—আমরা কিন্তু কিছুতেই ভাল বলতে পারব না। নিজের ছেলে ব'লে ত এ মুখ দিয়ে মিথ্যে বার হবে না মা! আমি বলি, কাজ না হয় দুদিন পরেই হ'ত, না হয় দশ টাকা লোকসানই হ'ত; কিন্তু তাই ব'লে কি মানুষের ভুলভ্রান্তি, দুর্বলতা ক্ষমা করতে হবে না? তোমার জমিদারির ভালমন্দের পরেই যে বিলাসের সমস্ত মন পড়ে থাকে সে তার প্রত্যেক কথাটিতেই বুঝতে পারি। কিন্তু, আমাকে ভুল বুঝো না মা। আমি নিজে সংসার-বিরাগী হ'লেও বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করা যে গৃহস্থের পরম ধর্ম তা স্বীকার করি। তার উন্নতি করা আরও ঢের বড় ধর্ম; কারণ সে ছাড়া জগতের মঙ্গল করা যায় না। আর বিলাসের হাতে তোমাদের দুজনের জমিদারি যদি দ্বিগুণ, চতুর্গুণ, এমন কি দশ গুণ হয় শুনতে পাই, আমি তাতেও বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হ'ব না। আর হচ্চেও তাই দেখতে পাচ্ছি। সব ঠিক, সব সত্যি—কিন্তু, তাই ব'লে যে বিষয়ের উন্নতিতে কোথাও একটু সামান্য বাধা পৌঁছলেই ধৈর্য হারাতে হবে সেও যে মন্দ। আমি তাই সেই অদ্বিতীয় নিরাকারের শ্রীপাদপদ্মে বার বার ভিক্ষা জানাচ্চি মা, তার উদ্ধত অবিনয়ের জন্যে যে শাস্তি তাকে তুমি দিয়েচ, তার থেকেই সে যেন ভবিষ্যতে সচেতন হয়। কাজ! কাজ! সংসারে শুধু কাজ করতেই কি এসেচি! কাজের পায়ে কি দয়ামায়াও বিসর্জন দিতে হবে! ভালই হয়েছে মা, আজ সে তোমার হাত থেকেই তার সর্বোত্তম শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ পেলে!

বিজয়া কোন কথাই কহিল না। রাসবিহারী কিছুক্ষণ যেন নিজের অন্তরের মধ্যেই মগ্ন থাকিয়া পরে মুখ তুলিলেন। একটু হাস্য করিয়া, কোমল-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আমার দুটি সন্তানের একটি প্রচণ্ড কর্মী, আর একটির হৃদয় যেন স্নেহ-মমতা-করুণার নির্ঝর! একজন যেমন কাজে উন্মাদ, আর একটি তেমনি দয়া-মায়ায় পাগল! আমি কাল থেকে শুধু স্তব্ধ হয়ে ভাবচি, ভগবান এই দুটিকে যখন জুড়ি মিলিয়ে তাঁর রথ চালাবেন, তখন দুঃখের সংসারে না জানি কি স্বর্গ-ই নেমে আসবে! আমার আর এক প্রার্থনা মা, এই অলৌকিক বস্তুটি চোখে দেখবার জন্যে তিনি যেন আমাকে একটি দিনের জন্যও জীবিত রাখেন। বলিয়া এইবার তিনি টেবিলের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। মাথা তুলিয়া কহিলেন, অথচ, আশ্চর্য, ধর্মের প্রতিও ত তার সোজা অনুরাগ নয়। মন্দির-প্রতিষ্ঠা নিয়ে কি প্রাণান্ত পরিশ্রমই না সে করেচে! যে তাকে জানে না, সে মনে করবে বিলাসের ব্রাহ্মধর্ম ছাড়া বুঝি সংসারের আর কোন

উদ্দেশ্যই নেই। শুধু এরই জন্যে সে বুঝি বেঁচে আছে—এছাড়া আর বুঝি সে কিছু জানে না! কিন্তু কি ভুল দেখ মা। নিজের ছেলের কথায় এমনি অভিভূত হয়ে পড়েছি যে, তোমাকেই বোঝাচ্ছি। যেন আমার চেয়ে তাকে তুমি কম বুঝেছ! যেন আমার চেয়ে তার তুমি কম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী! বলিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, আমার এত আনন্দ ত শুধু সেই জন্যেই মা। আমি যে তোমার হৃদয়ের ভিতরটা আরশির মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তোমার কল্যাণের হাতখানি যে বড় উজ্জ্বল দেখা যাচ্ছে। আর তাও বলি, তুমি ছাড়া এ কাজ করতে পারেই বা কে, করবেই বা কে? তার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকলের যে তুমিই সঙ্গিনী! তোমার হাতেই যে তার সমস্ত শুভ নির্ভর করছে! তার শক্তি, তোমার বুদ্ধি! সে ভার বহন ক'রে চলবে, তুমি পথ দেখাবে। তবেই ত দু'জনের জীবন একসঙ্গে সার্থক হবে মা! সেই জন্যেই ত আজ আমার সুখ ধরছে না। আজ যে চোখের উপরে দেখতে পেয়েছি বিলাসের আর ভয় নেই, তার ভবিষ্যতের জন্যে আমাকে একটি মুহূর্তের জন্যেও আর আশঙ্কা করতে হবে না! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এত চিন্তা, এত জ্ঞান, ভবিষ্যৎ-জীবন সফল করে তোলবার এতবড় বুদ্ধি ঐটুকু মাথার মধ্যে এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে মা? আজ আমি যে একেবারে অবাক হয়ে গেছি।

বিজয়ার সর্বাঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে নিঃশব্দেই বসিয়া রহিল। রাসবিহারী ঘড়ির দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, ইস্, দশটা বাজে যে! একবার দয়ালের স্ত্রীকে দেখতে যেতে হবে যে!

বিজয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

ভালই আছেন, বলিয়া তিনি দ্বারের দিকে দুই-এক পদ অগ্রসর হইয়া হঠাৎ থামিয়া বলিলেন, কিন্তু আসল কথাটা যে এখনো বলা হয়নি। বলিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, তোমার এই বুড়ো কাকাবাবুর একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে বিজয়া। বল রাখবে?

বিজয়া মনে মনে ভীত হইয়া উঠিল। তাহার মুখের ভাব কটাক্ষে লক্ষ্য করিয়া রাসবিহারী বলিলেন, সে হবে না, সন্তানের ঐ আব্দারটি মাকে রাখতেই হবে। বল রাখবে!

বিজয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, বলুন।

তখন রাসবিহারী কহিলেন, সে যে শুধু আহার-নিদ্রাই পরিত্যাগ করেছে তাই নয়—অনুতাপেও দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে জানি; কিন্তু তোমাকে মা এ ক্ষেত্রে একটু শক্ত হ'তে হবে। কাল অভিমানে সে আসেনি, কিন্তু আজ আর থাকতে পারবে না—এসে পড়বেই; কিন্তু ক্ষমা চাইবামাত্রই যে মাপ করবে, সে হবে না—এই আমার একান্ত অনুরোধ। যে অন্যায়ের শাস্তি তাকে দিয়েছ, অন্ততঃ সে শাস্তি আরও একটা দিন সে ভোগ করুক।

এই বলিয়া বিজয়ার মুখের উপর বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন। স্নেহার্দ্র-স্বরে বলিলেন, তোমার নিজের যে কত কষ্ট হচ্ছে, সে কি আমার অগোচর আছে মা? তোমাকে কি চিনিনে? তুমি আমারই ত মা! বরঞ্চ তার চেয়েও বেশী ব্যথা পাচ্চো সেও আমি জানি। কিন্তু অপরাধের শাস্তি পূর্ণ না হ'লে যে প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই গভীর দুঃখ আরো একটা দিন সহ্য না করলে যে সে মুক্ত হবে না! শক্ত না হ'তে পার তার সঙ্গে দেখা করো না; কিন্তু আজ সে বিফল হয়েই ফিরে যাক। এ যন্ত্রণা আরও কিছু তাকে ভোগ করতে দাও—এই আমার একান্ত অনুরোধ বিজয়া।

রাসবিহারী প্রস্থান করিলে বিজয়া অকৃত্রিম বিস্ময়ে আবিষ্টের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এই সকল কথা, এরূপ ব্যবহার তাঁহার কাছে সে একেবারেই প্রত্যাশা করে নাই। বরঞ্চ ঠিক বিপরীতটাই আশঙ্কা করিয়া তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আপনাকে সে কঠিন করিয়া তুলিতে মনে মনে চেষ্টা করিয়াছিল। বিলাস একাকী আঘাত খাইয়া চলিয়া গেছে, কিন্তু প্রতিঘাতের বেলা সে যে একলা আসিবে না, এবং তখন রাসবিহারীর সহিত তাহার যে একটা অত্যন্ত কড়া রকমের বোঝাপড়ার সময় আসিবে, তাহার সমস্ত বীভৎসতার নগ্ন মূর্তিটা কল্পনায় অঙ্কিত করিয়া অবধি বিজয়ার মনে তিলমাত্র শান্তি ছিল না।

এখন বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলে, শুধু তাহার বুকের উপর হইতে ভয়ের একটা গুরুভার পাথর নামিয়া গেল না—সে যে একসময়ে এই লোকটিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত, সে কথাও মনে পড়িল, এবং কেন যে এতবড় শ্রদ্ধাটা ধীরে ধীরে সরিয়া গেল, তাহারও ঝাপসা আভাসগুলো সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া আজ তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। এমনও একটা সংশয় তাহার অন্তরের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল, হয়ত সে এই বৃদ্ধের যথার্থ সংকল্প না বুঝিয়াই তাঁহার প্রতি মনে মনে অবিচার করিয়াছে; এবং তাহার পরলোকগত পিতৃ-আত্মা আবাল্য সুহৃদের প্রতি এই অন্যায়ে ক্ষুব্ধ হইতেছেন। সে বার বার করিয়া আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, কৈ, তিনি ত সত্যকার অপরাধের বেলায় নিজের ছেলেকেও মাপ করেন নাই। বরঞ্চ আমি যেন তাহাকে সহজে ক্ষমা করিয়া তাহার শাস্তিভোগের পরিমাণটা কমাইয়া না দিই, তিনি বার বার সেই অনুরোধই করিয়া গেলেন।

আর একটা কথা—বৃদ্ধের সকল অনুরোধ উপরোধ আন্দোলন আলোচনার মধ্যে যে ইঙ্গিতটা সকলের চেয়ে গোপন থাকিয়াও সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল সেটা বিলাসের অসীম ভালবাসা এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফল—প্রবল ঈর্ষা।

এই জিনিসটা বিজয়ার নিজের কাছেও অজ্ঞাত ছিল, তা নয়; কিন্তু বাহিরের আলোড়নে তাহা যেন নূতন তরঙ্গ তুলিয়া তাহার বুকে আসিয়া লাগিল। এতদিন যাহা শুধু তাহার হৃদয়ের তলদেশেই থিতাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাই বাহিরের আঘাতে ফুলিয়া উঠিয়া হৃদয়ের উপরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তাই রাসবিহারী বহুক্ষণ চলিয়া গেলেও তাঁহার আলাপের ঝঙ্কার দুই কানের মধ্যে লইয়া বিজয়া তেমনি নিঃশব্দে জানালার বাহিরে চাহিয়া বিভোর হইয়া বসিয়া রহিল। ঈর্ষা বস্তুটা সংসারে চিরদিনই নিন্দিত সত্য, তথাপি সেই নিন্দিত দ্রব্যটা আজ বিজয়ার চক্ষে বিলাসের অনেকখানি মলিনতা ফিকা করিয়া ফেলিল, এবং যাহাদিগকে প্রতিপক্ষ কল্পনা করিয়া এই দুটি পিতাপুত্রের সহস্র রকমের প্রতিহিংসার বিভীষিকা কাল হইতে তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত নিরুদ্যম ও নির্জীব করিয়া আনিতেছিল, আজ আবার তাহাদিগকেই আপনার জন ভাবিতে পাইয়া সে যেন হাঁপ ফেলিয়া বাঁচিল।

কালীপদ আসিয়া বলিল, মাঠান, তাহ'লে এখন আমার যাওয়া হ'ল না ব'লে বাড়িতে আর একখানা চিঠি লিখিয়ে দিই?

বিজয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আচ্ছা—

কালীপদ চলিয়া যাইতেছিল, বিজয়া তাহাকে আহ্বান করিয়া সলজ্জ দ্বিধাভরে কহিল, না হয়, আমি বলি কি কালীপদ, চিঠি যখন লিখে দেওয়াই হয়েছে, তখন মাস-খানেকের জন্যে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে এস। ওঁর কথাটাও থাক, তোমার একবার বাড়ি যাওয়া—অনেকদিন ত যাওনি, কি বল?

কালীপদ মনে মনে আশ্চর্য হইল, কিন্তু সম্মত হইয়া কহিল, আচ্ছা, আমি মাস-খানেক ঘুরেই আসি মাঠান। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিলে এই দুর্বলতায় বিজয়ার কি একরকম যেন ভারী লজ্জা করিতে লাগিল; কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে আর একবার ফিরাইয়া ডাকিয়া নিষেধ করিয়া দিতেও পারিল না। সেও লজ্জা করিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ

প্রাচীরের ধারে যে কয়টা ঘর লইয়া বিজয়ার জমিদারির কাজকর্ম চলিত, তাহার সম্মুখেই এক সার ঘন-পল্লবের লিচুগাছ থাকায় বসতবাটীর উপরের বারান্দা হইতে ঘরগুলার কিছুই প্রায় দেখা যাইত না। তা ছাড়া, পূর্বদিকের প্রাচীরের গায়ে যে ছোট দরজাটা ছিল তাহা দিয়া যাতায়াত করিলে কর্মচারীদের কে কখন আসিতেছে যাইতেছে তাহার কিছুই জানিবার জো ছিল না।

সেই অবধি দয়াল বাড়ির মধ্যে আর আসেন নাই। কাজ করিতে কাছারিতে আসেন

কি না, সঙ্কোচবশতঃ সে সংবাদও বিজয়া লয় নাই, আর বিলাসবিহারী যে এদিক মাড়ান না তাহা কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই সে স্বতঃসিদ্ধের মত মানিয়া লইয়াছিল। মধ্যে শুধু একদিন সকালে মিনিট-দশেকের জন্য রাসবিহারী দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণভাবে দুই-চারিটা অসুখের কথাবার্তা ছাড়া আর কোন কথাই হয় নাই।

মানুষের অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানুন, কিন্তু মুখের যেটুকু প্রসন্নতা এবং সৌহার্দ্য লইয়া সেদিন তিনি পুত্রের বিরুদ্ধে ওকালতি করিয়া গিয়াছিলেন, কোন অজ্ঞাত কারণে সে-ভাব তাঁহার পরিবর্তিত হইয়াছে নিশ্চয় বুঝিয়া বিজয়া উদ্বেগ অনুভব করিয়াছিল। মোটের উপর সবটুকু জড়াইয়া একটা অতৃপ্তি অস্বস্তির মধ্যেই তাহার দিন কাটিতেছিল। এমন করিয়া আরও কয়েকদিন কাটিয়া গেল।

আজ অপরাহ্ণবেলায় বিজয়া বাটীর কাছাকাছি নদীর তীরে একটুখানি বেড়াইবার জন্য একাকী বাহির হইতেছিল, বৃদ্ধ নায়েবমশাই একতাড়া খাতাপত্র বগলে লইয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা কি কোথাও বার হচ্চেন? কানাই সিং কৈ?

বিজয়া হাসিমুখে বলিল, এই কাছেই একটুখানি নদীর তীরে ঘুরে আসতে যাচ্চি। দরোয়ানের দরকার নেই। আমাকে কি আপনার কোন আবশ্যক আছে?

নায়েব কহিল, একটু ছিল মা। না হয় কালকেই হবে। বলিয়া সে ফিরিবার উপক্রম করতেই বিজয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, দরকার যদি একটুখানিই হয় ত আজই বলুন না। অত খাতাপত্র নিয়ে কোথায় চলেছেন?

নায়েব সেইগুলাই দেখাইয়া কহিল, আপনার কাছেই এসেছি। গত বছরের হিসাবটা সারা হয়েচে—মিলিয়ে দেখে একটা দস্তখত করে দিতে হবে। তা ছাড়া, ছোটবাবু হুকুম দিয়েছেন হাল সনের জমাখরচটাতেও রোজ-তারিখে আপনার সই নেওয়া চাই।

বিজয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিল। নায়েব সঙ্গে আসিয়া টেবিলের উপর সেগুলা রাখিয়া দিয়া একখানা খুলিবার উদ্যোগ করিতেই বিজয়া বাধা দিয়া প্রশ্ন করিল, এ হুকুম ছোটবাবু কবে দিলেন?

আজ সকালে দিয়েছেন।

আজ সকালে তিনি এসেছিলেন?

তিনি ত রোজই আসেন।

এখন কাছারি-ঘরে আছেন?

নায়েব ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এইমাত্র চলে গেলেন।

সেদিনের হাঙ্গামা কোন আমলারই অবিদিত ছিল না। নায়েব বিজয়ার প্রশ্নের ইঙ্গিত বুঝিয়া ধীরে ধীরে অনেক কথাই কহিল। বিলাসবিহারী প্রত্যহ ঠিক এগারোটার সময় কাছারিতে উপস্থিত হন; কাহারও সহিত বিশেষ কোন কথাবার্তা কহেন না, নিজের মনে কাজ করিয়া পাঁচটার সময় বাড়ি ফিরিয়া যান। দয়ালবাবুর বাটীতে অসুখ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার আসিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া তাঁহাকে ছুটি দিয়াছেন ইত্যাদি অনেক ব্যাপার মনিবের গোচর করিল।

বিজয়া লজ্জিতমুখে নীরবে সমস্ত কাহিনী শুনিয়া বুঝিল, বিলাস এই নূতন নিয়ম নিদারুণ অভিমানবশেই প্রবর্তিত করিয়াছে। তথাপি এমন কথাও কহিল না যে, এতদিন যাহার সই লইয়া কাজ চলিতেছিল, আজও চলিবে—তাহার নিজের সই অনাবশ্যক। বরঞ্চ বলিল, এগুলো থাক, কাল সকালে একবার এসে আমার সই নিয়ে যাবেন। বলিয়া নায়েবকে বিদায় দিয়া সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে দিনের আলো ক্রমশঃ নিবিয়া আসিল, এবং প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে শাঁখের শব্দে সন্ধ্যার শান্ত আকাশ চঞ্চল হইয়া উঠিল; তথাপি তাহার উঠিবার লক্ষণ দেখা গেল না। আরও কতক্ষণ যে সে এমনি একভাবে বসিয়া কাটাইত, বলা যায় না; কিন্তু বেহারা আলো হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কর্ত্রীকে একাকী দেখিয়া যেমন চমকাইয়া উঠিল বিজয়া নিজেও তেমনি লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বাহিরে আসিয়াই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

যে জিনিসটি তাহার চোখে পড়িল, সে তাহার সুদূর কল্পনারও অতীত। সে কি কোন কারণে কোন ছলেও আর এ বাড়িতে পা দিতে পারে? অথচ সেই প্রায়ান্ধকারেও স্পষ্ট দেখা গেল সেদিনের সেই সাহেবটিই হ্যাট্-সমেত প্রায় সাড়ে-ছয় ফুট দীর্ঘদেহ লইয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং সাধারণ বাঙালীর অন্ততঃ আড়াই গুণ লম্বা পা ফেলিয়া এই দিকেই আসিতেছে।

আজ আর তাহাকে পুলিশ কর্মচারী বলিয়া ভুল হয় নাই। কিন্তু আনন্দের সেই অপরিমিত দীপ্ত রেখাটিকে যে তাহার বিশ্বজোড়া ভয় ও নিরাশার অন্ধকার চক্ষের পলকে গিলিয়া ফেলিল। গাছপালায় ঘেরা, আঁকাবাঁকা পথের মাঝে মাঝে তাহার দেহ অদৃশ্য হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পথের কাঁকরে তাহার জুতার শব্দ ক্রমেই সন্নিকটবর্তী হইতে লাগিল। বিজয়া মনে মনে বুঝিল, তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসানো ভয়ানক অন্যায়, কিন্তু দ্বারের বাহির হইতে অবহেলায় বিদায় দেওয়াও যে অসাধ্য!

এই অবস্থা-সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের উপায় কোন দিকে খুঁজিয়া না পাইয়া, যে মুহূর্তে পথের বাঁকে কামিনী গাছের পাশে সেই দীর্ঘ ঋজুদেহ তাহার সুমুখে আসিয়া পড়িল, সেই মুহূর্তেই সে পিছন ফিরিয়া দ্রুতবেগে তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ নায়েব কিছুই লক্ষ্য করে নাই, নিজের মনে চলিয়াছিল; অকস্মাৎ সাহেব দেখিয়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সাহেবের প্রশ্নে চিনিতে পারিয়া আশ্বস্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন হইয়া জবাব দিল, হাঁ, উনি বাহিরের ঘরেই আছেন, বলিয়া চলিয়া গেল। প্রশ্ন এবং উত্তর দুই-ই বিজয়ার কানে গেল। ক্ষণেক পরেই ঘরে ঢুকিয়া নরেন্দ্র নমস্কার করিল। লাঠি এবং টুপি টেবিলের উপর রাখিয়া সহাস্যে কহিল, এই যে দেখচি আমার ওষুধে চমৎকার ফল হয়েছে। বাঃ!

ক্ষণেক পূর্বেই বিজয়া মনে মনে ভাবিয়াছিল, আজ বুঝি সে চোখ তুলিয়া চাহিতেও পারিবে না—একটা কথার জবাব পর্যন্ত তাহার মুখে ফুটিবে না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই লোকটির কেবল কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্রই শুধু যে তাহার দ্বিধা-সঙ্কোচই ভোজবাজির মত অন্তর্হিত হইয়া গেল তাই নয়, তাহার হৃদয়ের অন্ধকার, অজ্ঞাত কোণে সুরবাঁধা বীণার তারের উপর কে যেন না জানিয়া আঙুল বুলাইয়া দিল; এবং একমুহূর্তেই বিজয়া তাহার সমস্ত বিষাদ বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি ক'রে জানলেন? আমাকে দেখে, না কারো কাছে শুনে?

নরেন্দ্র বলিল, শুনে। কেন, আপনি কি দয়ালবাবুর কাছে শোনেন নি যে, আমার ওষুধ খেতে পর্যন্ত হয় না, শুধু প্রেস্‌ক্রিপসানটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেও অর্ধেক কাজ হয়। বলিয়া নিজের রসিকতায় প্রফুল্ল হইয়া অট্টহাস্যে ঘর কাঁপাইয়া তুলিল।

বিজয়া বুঝিল, সে দয়ালের কাছে সমস্ত শুনিয়াই তবে আজ ব্যঙ্গ করিতে আসিয়াছে। তাই এই অসঙ্গত উচ্চহাস্যে মনে মনে রাগ করিয়া ঠোক্কর দিয়া বলিল, ওঃ—তাই বুঝি বাকী অর্ধেকটা সারাবার জন্যে দয়া করে আবার ওষুধ লিখে দিতে এসেছেন?

খোঁচা খাইয়া নরেনের হাসি থামিল। কহিল, বাস্তবিক বলচি, এ এক আচ্ছা তামাশা।

বিজয়া কহিল, তাই বুঝি এত খুশী হয়েছেন?

নরেনের মুখ গম্ভীর হইল। কহিল, খুশী হয়েছি! একেবারে না। অবশ্য এ কথা একেবারে অস্বীকার করতে পারিনে যে, শুনেই প্রথমে একটু আমোদ বোধ করেছিলাম, কিন্তু তার পরেই বাস্তবিক দুঃখিত হয়েচি। দয়ালবাবুর মেজাজটা তেমন ভাল নয় সত্যি—অকারণে খামকা রেগে উঠে পরকে অপমান ক'রে বসেন, কিন্তু তাই ব'লে আপনিও যে অসহিষ্ণু হয়ে কতকগুলো অপমানের কথা বলে ফেলবেন সেও ত ভাল নয়। ভেবে দেখুন দিকি, কথাটা প্রকাশ পেলে ভবিষ্যতে কতবড় একটা লজ্জা এবং ক্ষোভের কারণ হবে। আমাকে বিশ্বাস করুন, শাস্তীবকট শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। আমার জন্যে আপনাদের মধ্যে এরূপ একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়—

এই লোকটির হৃদয়ের পবিত্রতায় বিজয়া মনে মনে মুগ্ধ হইয়া গেল। তথাপি

পরিহাসের ভঙ্গীতে কহিল, কিন্তু হাসিও চাপতে পাচ্ছেন না। বলিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

নরেন জোর করিয়া এবার ভয়ানক গম্ভীর হইয়া কহিল, কেন আপনি বার বার তাই মনে করচেন? যথার্থই আমি অতিশয় ক্ষুণ্ণ হয়েচি। কিন্তু তখন আমি আপনাদের সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিল, সেই দিনই নীচে তাঁর বাবা সমস্ত কথা জানিয়ে বললেন, ঈর্ষা! দয়ালবাবুও কাল তাই বললেন। শুনে আমি কি লজ্জা পেয়েচি বলতে পারিনে। কিন্তু এত লোকের মধ্যে আমাকে ঈর্ষা করবার মত কি আমার আছে আমি তাও ত ভেবে পাইনে। আপনারা ব্রাহ্মসমাজের, আবশ্যক হ'লে সকলের সঙ্গেই কথা কন—আমার সঙ্গেও কয়েছেন। এতে এমন কি দোষ তিনি দেখতে পেয়েছেন, আমি ত খুঁজে পাইনে। যাই হোক, আমাকে আপনারা মাপ করবেন—আর ওই বাংলায় কি ব'লে—অভি—অভিনন্দন! আমিও আপনাকে তাই জানিয়ে যাচ্ছি—আপনারা সুখী হোন।

সে নিজের আচরণের উল্লেখ করিতে গিয়াও যে বিজয়ার সেদিনের আচরণ সম্বন্ধে লেশমাত্র ইঙ্গিত করে নাই, বিজয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহার শেষ কথাটায় বিজয়ার দুই চক্ষু অকস্মাৎ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। সে ঘাড় ফিরাইয়া কোনমতে চোখের জল সামলাইতে লাগিল।

প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই নরেন জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সেদিন কালীপদকে দিয়ে হঠাৎ স্টেশনে মাইক্রস্কোপটা পাঠিয়েছিলেন কেন বলুন ত?

বিজয়া রুদ্ধস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, আপনার জিনিস আপনি নিজেই ত ফিরে চেয়েছিলেন।

নরেন বলিল, তা বটে; কিন্তু দামের কথাটা ত তাকে দিয়ে ব'লে পাঠান নি? তা হ'লে ত আমার—

বিজয়া কহিল, না। জ্বরের উপর আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু সে ভুলের শাস্তিও ত আপনি আমাকে কম দেননি!

নরেন লজ্জিত হইয়া কহিল, কিন্তু কালীপদ যে বললে—

বিজয়া বাধা দিয়া বলিল, সে আমি শুনেচি। কিন্তু যাই কেন না সে বলুক, আপনাকে উপহার দেবার মত স্পর্ধা আমার থাকতে পারে—এমন কথা কি ক'রে আপনি বিশ্বাস করলেন? আর সত্যিই তাই যদি ক'রে থাকি, নিজের হাতে কেন শাস্তি দিলেন না? কেন চাকরকে দিয়ে আমার অপমান করলেন? আপনার আমি কি করেছিলুম? বলিতে বলিতেই তাহার গলা যেন ভাঙ্গিয়া আসিল।

নরেন লজ্জিত এবং অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বিজয়ার মুখের পানে চাহিয়া দেখিল, সে ঘাড় ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া আছে। মুখ তাহার চোখে পড়িল না, চোখে পড়িল শুধু তাহার গ্রীবার উপর হীরার কণ্ঠীর একটুখানি—দীপালোকে বিচিত্র রশ্মি প্রতিফলিত করিতেছে। উভয়েই কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর নরেন্দ্র ক্ষুণ্ণকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল, কাজটা যে আমার ভাল হয়নি সে আমি তখনি টের পেয়েছিলাম, কিন্তু ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছিল। কালীপদর দোষ কি? তার ওপর রাগ করা কিছুতেই আমার উচিত হয়নি। আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দেখুন, ঐ ঈর্ষা জিনিসটা যে কত মন্দ এবার আমি ভাল ক'রেই টের পেয়েছি। ও যে শুধু নিজের ঝোঁকেই বেড়ে চলে তাই নয়; সংক্রামক ব্যাধির মত অপরকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। এখন ত আমি বেশ জানি, আমাকে ঈর্ষা করার মত ভ্রম বিলাসবাবুর আর কিছু হতেই পারে না। তাঁর বাবাও সে জন্যে লজ্জা এবং দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু আপনি শুনে হয়ত আশ্চর্য হবেন যে, আমার নিজেরও তখন বড় কম ভুল হয়নি।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, আপনার ভুল কি রকম?

নরেন অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিল, আমাকে নিরর্থক ও-রকম অপমান করায় আপনি যে সত্যিই ক্লেশ বোধ করেছিলেন, সে ত আপনার কথা শুনে সবাই বুঝতে পেরেছিল। তার উপর রাসবিহারীবাবু যখন নীচে গিয়ে তাঁর ছেলের ওই

ঈর্ষার কথাটা তুলে আমাকে দুঃখ করতে নিষেধ করলেন, তখন হঠাৎ দুঃখটা আমার যেন বেড়ে গেল। কেবলি মনে হ'তে লাগল নিশ্চয় কিছু কারণ আছে; নইলে শুধু শুধু কেউ কারুকে হিংসা করে না। আপনাকে আজ আমি যথার্থ বলচি, তারপর আট-দশদিন বোধ করি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টা শুধু আপনাকেই ভাবতুম। আর আপনার অসুখের সেই কথাগুলোই মনে পড়ত। তাই ত বলছিলুম—এ কি ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ। কাজকর্ম চুলোয় গেল—দিবারাত্রি আপনার কথাই শুধু মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। এর কি আবশ্যক ছিল বলুন ত! আর শুধু কি তাই? দু-তিনদিন এই পথে অনর্থক হেঁটে গেছি কেবল আপনাকে দেখবার জন্যে। দিন-কতক সে আচ্ছা পাগলা ভূত আমার ঘাড়ে চেপেছিল! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিল না, একটা কথার জবাব দিল না, নীরবে উঠিয়া পাশের দরজা দিয়া বাটীর ভিতরে চলিয়া গেল; এবং আর একজনের মুখের হাসি চক্ষের পলকে নিবিয়া গেল। যে পথে সে বাহির হইয়া গেল, সেই অন্ধকারের মধ্যেই নির্নিমেষে চাহিয়া নরেন হতবুদ্ধি হইয়া শুধু ভাবিতে লাগিল, না জানিয়া এ আবার কোন্ নূতন অপরাধের সে সৃষ্টি করিয়া বসিল!

সুতরাং বেহারা আসিয়া যখন কহিল, আপনি যাবেন না, আপনার চা তৈরী হচ্চে--তখন নরেন ব্যস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, আমার চা দরকার নেই ত।

কিন্তু মা আপনাকে বসতে ব'লে দিলেন, বলিয়া বেহারা চলিয়া গেল। ইহাও নরেন্দ্রকে কম আশ্চর্য করিল না।

প্রায় মিনিট-পনের পরে চাকরের হাতে চা এবং নিজের হাতে জলখাবারের থালা লইয়া বিজয়া প্রবেশ করিল। সে যে সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার মুখের উপর হইতে রোদনের ছায়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই তাহা অস্পষ্ট দীপালোকে হয়ত আর কাহারও চোখে ধরা পড়িত না—কিন্তু ডাক্তারের অভ্যস্ত চক্ষুকে সে ফাঁকি দিতে পারিল না, কিন্তু এবার আর সে সহসা কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বসিল না। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে অনেক বিষয়েই সতর্ক হইতে শিখিয়াছিল। যেদিন প্রায় অপরিচিত হইয়াও অন্তরের সামান্য কৌতূহল ও ইচ্ছার চাঞ্চল্য দমন করিতে না পারিয়া হাত দিয়া বিজয়ার মুখ তুলিয়া ধরিয়াছিল আজ আর তাহার সেদিন ছিল না। তাই সে চুপ করিয়াই রহিল।

চাকর টেবিলের উপর চা রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। বিজয়া তাহারই পাশে খাবারের থালা রাখিয়া নিজের জায়গায় গিয়া বসিল। নরেন তৎক্ষণাৎ থালাটা কাছে টানিয়া লইয়া এমনিভাবে আহারে মন দিল যেন এই জন্যই সে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় নিঃশব্দে কাটিবার পর বিজয়াই প্রথমে কথা কহিল। নীরবতার গোপন ভার আর সে সহিতে না পারিয়া হঠাৎ যেন জোর করিয়াই হাসিয়া বলিল, কৈ, আপনার সেই পাগলা ভূতটার কথা শেষ করলেন না?

নরেন বোধ করি অন্য কথা ভাবিতেছিল, তাই সে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কার কথা বলচেন?

বিজয়া কহিল, সেই পাগলা ভূতটা, যে দিন-কতক আপনার কাঁধে চেপেছিল, সে নেবে গেছে ত?

এবার নরেনও হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ গেছে।

বিজয়া কহিল, যাক। তাহ'লে বেঁচে গেছেন বলুন। নইলে আরও কত দিন যে আপনাকে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে বেড়াত কে জানে!

নরেন চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিয়া লইয়া শুধু বলিল, হাঁ।

বিজয়া পুনরায় ভাল কিছু একটা বলিতে চাহিল বটে, কিন্তু হঠাৎ আর কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কেবল আকণ্ঠ উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া চুপ করিয়া গেল। পরের ঘাড়ের ভূত ছাড়ার আনন্দের জের টানিয়া চলা কিছুতেই আর তাহার শক্তিতে কুলাইল না।

আবার কিছুক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। নরেন ধীরেসুস্থে চায়ের

বাটিটা নিঃশেষ করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল; পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল, আর দশ মিনিট সময় আছে, আমি চললুম।

বিজয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, কলকাতায় ফিরে যাবার এই বুঝি শেষ ট্রেন?

নরেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপিটা মাথায় দিয়া বলিল, আরও একটা আছে বটে, সে কিন্তু ঘণ্টা-দেড়েক পরে। চললুম—নমস্কার। বলিয়া লাঠিটা তুলিয়া একটু দ্রুতপদেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

বিলাস যথাসময়ে কাছারিতে আসিয়া নিজের কাজ করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত; নিতান্ত প্রয়োজন হইলে কর্মচারী পাঠাইয়া বিজয়ার মত লইত, কিন্তু আপনি আসিত না। তাহাকে ডাকাইয়া না পাঠাইলে যে নিজে যাচিয়া আসিবে না, ইহাও বিজয়া বুঝিয়াছিল। অথচ তাহার আচরণের মধ্যে অনুতাপ এবং আহত অভিমানের বেদনা ভিন্ন ক্রোধের জ্বালা প্রকাশ পাইত না বলিয়া বিজয়ার নিজেরও রাগ পড়িয়া গিয়াছিল।

বরঞ্চ, আপনার ব্যবহারের মধ্যেই কেমন যেন একটা নাটক অভিনয়ের আভাস অনুভব করিয়া তাহার মাঝে মাঝে ভারী লজ্জা করিত। প্রায়ই মনে হইত, কত লোকেই না জানি এই লইয়া হাসি-তামাশা করিতেছে। তা ছাড়া যে লোক সকলের চক্ষেই এতদিন সর্বময় হইয়া বিরাজ করিতেছিল, বিশেষ করিয়া জমিদারির কাজে-অকাজে সে যাহাদিগকে শাসন করিয়া শত্রু করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের সকলের কাছে তাহাকে অকস্মাৎ এতখানি ছোট করিয়া দিয়া বিজয়া আপনার নিভৃত হৃদয়ে সত্যকার ব্যথা অনুভব করিতেছিল। পূর্বের অবস্থাকে ফিরাইয়া না আনিয়া শুধু এই ঘটনাকে কোন মতে সে যদি সম্পূর্ণ 'না' করিয়া দিতে পারিত তাহা হইলে বাঁচিয়া যাইত। এমনি যখন তাহার মনের ভাব, সেই সময় হঠাৎ একদিন বিকালে কাছারির বেহারা আসিয়া জানাইল বিলাসবাবু দেখা করিতে চান।

ব্যাপারটা একেবারে নূতন। বিজয়া চিঠি লিখিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই কহিল, আসতে বল। তাহার মনের ভিতরটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় দুলিতে লাগিল; কিন্তু বিলাস প্রবেশ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া শান্তভাবে নমস্কার করিয়া কহিল, আসুন। বিলাস আসন গ্রহণ করিয়া বলিল, কাজের ভিড়ে আসতে পারিনে, তোমার শরীর ভাল আছে?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

সেই ওষুধটাই চলছে?

বিজয়া ইহার উত্তর দিল না, কিন্তু বিলাসও প্রশ্নের পুনরুক্তি না করিয়া অন্য কথা কহিল। বলিল, কাল নব-বৎসরের নূতন দিন—আমার ইচ্ছা হয় সকলকে একত্র ক'রে কাল সকালবেলা একটু ভগবানের নাম করা হয়।

সে যে তাহার প্রশ্ন লইয়া পীড়াপীড়ি করিল না, কেবল ইহাতেই বিজয়ার মনের উপর হইতে একটা ভার নামিয়া গেল। সে খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল, এ ত খুব ভাল কথা।

বিলাস বলিল, কিন্ত নানা কারণে মন্দিরে যাওয়ার সুবিধে হলো না। যদি তোমার অমত না হয় ত আমি বলি এইখানেই—

বিজয়া তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া সায় দিল, এমন কি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। কহিল, তা হ'লে ঘরটাকে একটুখানি ফুল-পাতা-লতা দিয়ে সাজালে ভাল হয় না? আপনাদের বাড়িতে ত ফুলের অভাব নেই—যদি মালীকে হুকুম দিয়ে কাল ভোর থাকতেই—কি বলেন? হ'তে পারে না কি?

বিলাস বিশেষ কোন প্রকার আনন্দের আড়ম্বর না দেখাইয়া সহজভাবে বলিল, বেশ, তাই হবে। আমি সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করে দেব।

বিজয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, কাল ত বৎসরের প্রথম দিন—আচ্ছা, আমি বলি কি অমনি একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলে কি—

বিলাস এ প্রস্তাবও অনুমোদন করিল এবং উপাসনার পরে জলযোগের আয়োজন যাহাতে ভাল রকম হয়, সে বিষয়ে নায়েবকে হুকুম দিয়া যাইবে জানাইল। আরও দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্তার পরে সে বিদায় গ্রহণ করিলে বহুদিনের পরে বিজয়ার অন্তরের মধ্যে তৃপ্তি ও উল্লাসের দক্ষিণা-বাতাস দিতে লাগিল। সেদিনকার সেই প্রকাশ্য সংঘর্ষের পর হইতে অব্যক্ত গ্লানির আকারে যে বস্তুটি তাহাকে অনুক্ষণ দুঃখ দিতেছিল, তাহার ভার যে কত ছিল, আজ নিষ্কৃতি পাইয়া সে যেমন অনুভব করিল এমন বোধ করি কোনদিন করে নাই। তাই আজ তাহার ব্যথার সহিত মনে হইতে লাগিল, এই কয়েকদিনের মধ্যে বিলাস পূর্বেকার অপেক্ষা যেন অনেকটা রোগা হইয়া গিয়াছে। অপমান ও অনুশোচনার আঘাত ইহার প্রকৃতিকে যে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে তাহা চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়া অজ্ঞাতসারে বিজয়ার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, এবং বৃদ্ধ রাসবিহারীর সেদিনের কথাগুলি চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। বিলাসবিহারী তাহাকে যে অত্যন্ত ভালবাসে তাহা ভাষায়, ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে, সর্বপ্রকারেই ব্যক্ত করা হইয়াছে, অথচ একটা দিনের জন্যও সঙ্গোপনে এই ভালবাসার কথা বিজয়ার মনে স্থান পায় না। বরঞ্চ, সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকারে একাকী ঘরের মধ্যে সঙ্গ-বিহীন প্রাণটা যখন ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন কল্পনার নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে যে আসিয়া তাহার পাশে বসে, সে বিলাস নয়, আর একজন। অলস মধ্যাহ্নে বইয়ে যখন মন বসে না, সেলাইয়ের কাজও অসহ্য বোধ হয়, প্রকাণ্ড শূন্য বাড়িটা রবি-করে খাঁখাঁ করিতে থাকে তখন সুদূর ভবিষ্যতে একদিন এই শূন্য গৃহই পূর্ণ করিয়া যে ঘরকন্নার স্নিগ্ধ ছবিটি তাহার অন্তরে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে থাকে, তাহার মধ্যে কোথাও বিলাসের জন্য এতটুকু স্থান থাকে না। অথচ, যে লোকটি সমস্ত জায়গা জুড়িয়া বসে, সংসার-যাত্রার দুর্গম পথে সহায় বা সহযোগী হিসাবে মূল্য তাহার বিলাসের অপেক্ষা অনেক কম। সে যেমন অপটু, তেমনি নিরুপায়। বিপদের দিনে ইহার কাছে কোন সাহায্যই মিলিবে না। তবুও এই অকেজো মানুষটারই সমস্ত অকাজের বোঝা সে নিজে সারাজীবন মাথায় লইয়া চলিতেছে মনে করিতেও বিজয়ার সমস্ত দেহ-মন অপরিমিত আনন্দবেগে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। বিলাস চলিয়া গেলে বিজয়ার এই মনোভাবের আজও যে কোন ব্যতিক্রম ঘটিল তাহা নহে, কিন্তু আজ সে বিনা প্রার্থনায় বিলাসের দোষের পুনর্বিচারের ভার হাতে তুলিয়া লইল, এবং ঘটনাচক্রে তাহার স্বভাবের যে পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে বাস্তবিক স্বভাব যে তাহার এত হীন নহে, কাহারও সহিত কোন তর্ক না করিয়া সে আপনা-আপনি তাহা মানিয়া লইল। এমন কি, নিরতিশয় উদারতার সহিত ইহাও আজ সে আপনার কাছে গোপন করিল না যে, বিলাসের মত মানসিক অবস্থায় পড়িয়া জগতে অধিকাংশ লোকেই হয়ত ভিন্নরূপ আচরণ দেখাইতে পারিত না। সে যে ভালবাসিয়াছে এবং ভালবাসার অপরাধই তাহাকে লাঞ্ছিত এবং দণ্ডিত করিয়াছে, ইহাই বার বার স্মরণ করিয়া আজ সে করুণামিশ্রিত মমতার সহিত তাহাকে মার্জনা করিল।

সকালে উঠিয়া শুনিল, বিলাস বহুপূর্বেই লোকজন লইয়া ঘর-সাজানোর কাজে লাগিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া লজ্জিতভাবে কহিল, আমাকে ডেকে পাঠান নি কেন?

বিলাস স্নিগ্ধস্বরে বলিল, দরকার কি!

বিজয়া একটু হাসিয়া প্রসন্নমুখে জবাব দিল, আমি বুঝি এতই অকর্মণ্য যে এদিকেও কিছু সাহায্য করতে পারিনে? আচ্ছা, এখন বলুন আমি কি করব?

অনেক দিনের পর বিলাস আজ হাসিল, কহিল, তুমি শুধু নজর রেখো, আমাদের কাজে ভুল হচ্ছে কিনা।

আচ্ছা, বলিয়া বিজয়া হাসিমুখে একটা কোচের উপর গিয়া বসিল। খানিক পরেই প্রশ্ন করিল, খাবার বন্দোবস্ত?

বিলাস ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, সমস্ত ঠিক হচ্চে—কোন চিন্তা নেই।

আচ্ছা, আমি কেন সেই দিকেই যাইনে?

বেশ ত। বলিয়া বিলাস পুনরায় কাজে মন দিল।

বেলা আটটার মধ্যেই সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বিজয়া অনেকবার আনাগোনা করিয়া অনেক ছোটখাট ব্যাপারে বিলাসের পরামর্শ লইয়া গেছে—কোথাও বাধে নাই। না জানিয়া কখন যে সঞ্চিত বিরোধের প্লানি কাটিয়া উভয়ের কথাবার্তার পথ এমন সহজ ও সুগম হইয়া গিয়াছিল, দুইজনের কেহই বোধ করি খেয়াল করে নাই।

বিজয়া হাসিয়া বলিল, আমাকে একেবারে অপদার্থ মনে ক'রে বাদ দিলেন কিন্তু আমিও আপনার একটা ভুল ধরেচি তা বলচি।

বিলাস একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, অপদার্থ একবারও মনে করিনি, কিন্তু ভুল কি রকম?

বিজয়া বলিল, আমরা আছি ত মোটে চার-পাঁচজন, কিন্তু খাবারের আয়োজন হয়ে পড়েচে প্রায় কুড়ি জনের, তা জানেন?

বিলাস কহিল, সে ত বটেই। বাবা তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করেছেন। তাঁরা ক'জন, কে কে আসবেন, তা ত ঠিক জানিনে।

বিজয়া ভয়ানক বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কৈ, সে ত আমাকে বলেন নি?

বিলাস নিজেও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখান থেকে কাল আমি যাবার পরে বাবা তোমাকে চিঠি লিখে জানান নি?

না।

কিন্তু তিনি যে স্পষ্ট বললেন—বিলাস থমকিয়া গেল।

বিজয়া প্রশ্ন করিল, কি বললেন?

বিলাস ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হয়ত আমারই শোনবার ভুল হয়েছে। তিনি চিঠি লিখে জানাবেন ব'লে বোধ করি ভুলে গেছেন।

বিজয়া আর কোন প্রশ্ন করিল না; কিন্তু তাহার মনের ভিতর জ্যোৎস্নার প্রসন্নতা সহসা যেন মেঘে ঢাকিয়া গেল।

আধ-ঘণ্টা পরে রাসবিহারী স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বেলা নয়টার মধ্যেই তাঁহার নিমন্ত্রিত বন্ধুর দল একে একে দেখা দিতে লাগিলেন। ইঁহাদের সকলেই ব্রাহ্মসমাজের নহেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা রাসবিহারীর সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাসবিহারী সকলকেই পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং বিজয়ার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না, তাঁহাদের পরিচিত করাইতে গিয়া অচির-ভবিষ্যতে এই মেয়েটির সহিত নিজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিতেও ত্রুটি করিলেন না। বিজয়া অস্ফুট-কণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। এই সকল প্রচলিত ভদ্রতা-রক্ষার কার্যে সে যখন ব্যাপৃত, তখন অদূরে বাগানের সংকীর্ণ পথে দয়ালবাবু দেখা দিলেন। কিন্তু তিনি একা নহেন, একজন অপরিচিত তরুণী আজ তাঁহার সংগে। মেয়েটি সুশ্রী, বয়স বোধ করি বিজয়ার অপেক্ষা কিছু বেশী। কাছে আসিয়া দয়াল তাহাকে আপনার ভাগ্নী বলিয়া পরিচয় দিলেন। নাম নলিনী, কলিকাতার কলেজে বি. এ. পড়ে। এখনো গরমের ছুটি শুরু হয় নাই বটে, কিন্তু মামীর অসুখে সেবা করিবার জন্য কিছু পূর্বেই দিন-দুই হইল মামার কাছে আসিয়াছে, এবং স্থির হইয়াছে, গ্রীষ্মের অবকাশটা এইখানেই কাটাইয়া যাইবে।

নলিনীকে যে বিজয়া কলিকাতায় একেবারে দেখে নাই তাহা নহে, কিন্তু আলাপ ছিল না। তথাপি এতগুলি পরিচিত ও অপরিচিত পুরুষের মধ্যে আজ সেই তাহার কাছে সকলের চেয়ে অন্তরংগ বলিয়া মনে হইল। বিজয়া দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া আনিল, এবং পাশে বসাইয়া ভাব করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

উপাসনা সাড়ে-নয়টার সময় শুরু করিবার কথা। তখনো কিছু বিলম্ব ছিল বলিয়া,

সকলেই বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আলাপ করিতেছিলেন, এমন সময় রাসবিহারীর উচ্চকণ্ঠ ঘরের মধ্যে হইতে শোনা গেল। তিনি অত্যন্ত আদর করিয়া কাহাকে যেন বলিতেছিলেন, এসো বাবা, এসো। তোমার কত কাজ, তুমি যে সময় করে আসতে পারবে এ আমি আশা করিনি।

এই সম্মানিত কাজের ব্যক্তিটি কে জানিবার জন্য বিজয়া মুখ তুলিয়া সম্মুখেই দেখিল নরেন্দ্র। কিন্তু অসম্ভব বলিয়া হঠাৎ তাহার প্রত্যয় হইল না। নলিনীও একই সঙ্গে কৌতূহলবশে মুখ তুলিয়া কহিল, নরেন্দ্রবাবু।

রাসবিহারী তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন, এবং সে সেই নিমন্ত্রণ রাখিতে এই বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে। ঘটনাটা এমনি অচিন্তনীয় যে, বিজয়ার সমস্ত চিন্তাশক্তি পর্যন্ত যেন বিপর্যস্ত হইয়া গেল। আর সে সেদিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না কিন্তু, রাসবিহারীর সবিনয় অভ্যর্থনা স্পষ্ট শুনিতে পাইল, এবং পরক্ষণেই উভয়কে লইয়া রাসবিহারী ঘরের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিলেন। তখন বৃদ্ধ শান্ত, গম্ভীর স্বরে এই দুইটি যুবককে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমাদের বাপেদের সম্পর্কে তোমরা দুজনে যে ভাই হও, এই কথাটাই আজ তোমাদের আমি বিশেষ ক'রে বলতে চাই বিলাস। বনমালী গেলেন, জগদীশ গেছেন, আমারও ডাক পড়েছে। ইহজগতে আমাদের যে শুধু দেহ ব্যতীত আর কিছুই ভিন্ন ছিল না এ কথা তোমরা আজকালকার ছেলেরা হয়ত বুঝবে না, বোঝা সম্ভবও নয়—আমি বোঝাতেও চাইনে।/ শুধু কেবল আজ নব-বৎসরের এই পুণ্যদিনটিতে তোমাদের উভয়ের কাছে অনুরোধ করতে চাই যে, তোমাদের গৃহ-বিচ্ছেদের কালি দিয়ে এই বৃদ্ধের বাকী দিন ক'টা আর অন্ধকার করে তুলো না। তাঁহার শেষ কথাটা কাঁপিয়া উঠিয়া ঠিক যেন কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল। নরেন আর সহিতে পারিল না। সে অগ্রসর হইয়া গিয়া বিলাসের একটা হাত নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত কহিল, বিলাসবাবু, আমার সকল অপরাধ আপনি মাপ করুন। আমি ক্ষমা চাইচি।

প্রত্যুত্তরে বিলাস হাত ছাড়িয়া দিয়া নরেন্দ্রকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, অপরাধ আমিই করেচি নরেন। আমাকেই তুমি ক্ষমা কর।

বৃদ্ধ রাসবিহারী মুদিত-নেত্রে কম্পিত মৃদুকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, হে সর্বশক্তিমান পরম পিতা পরমেশ্বর! এই দয়া, এই করুণার জন্য তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার কোটী কোটী নমস্কার! এই বলিয়া তিনি দুই হাত জোড় করিয়া কপালে স্পর্শ করিলেন, এবং চাদরের কোণে চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিলেন, আজিকার শুভ-মুহূর্ত তোমাদের উভয়ের জীবনে অক্ষয় হোক। আপনারাও আশীর্বাদ করুন! এই বলিয়া তিনি বিস্ময়-বিহ্বল অভ্যাগত ভদ্রলোকদিগের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

দয়াল ভিন্ন কেহই কিছু জানিতেন না, সুতরাং এই মর্মস্পর্শী করুণ অনুষ্ঠানের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ইহাদের বাস্তবিকই বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না। রাসবিহারী চক্ষের পলকে তাহা অনুভব করিয়া তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া স্নিগ্ধভাবে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, মেয়েরা যে বলে শাঁকের করাত, আসতে কাটে যেতেও কাটে, আমারও হয়েছিল তাই। আমার এ-ও ছেলে, ও-ও ছেলে—বলিয়া নরেন বিলাসকে চোখের ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিলেন, আমার ডান হাতেও যেমন ব্যথা, বাঁ হাতেও তেমনি। কিন্তু আপনাদের কৃপায় আজ আমার বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। আমি কি আর বলব।

ভিতরের ব্যাপারটা তলাইয়া না বুঝিলেও প্রত্যুত্তরে সকলেই হর্ষসূচক একপ্রকার অস্ফুট ধ্বনি করিলেন।

রাসবিহারী ঘাড়টা একটুখানি মাত্র হেলাইয়া উত্তরীয়-প্রান্তে পুনরায় চক্ষু মার্জনা করিয়া নিকটবর্তী আসনে গিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন। সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া উপস্থিত কাহারও অনুমান করিতে অবশিষ্ট রহিল না যে, হৃদয় তাঁহার অনির্বচনীয় ভাবরাশিতে এমনি পরিপূর্ণ হইয়া গেছে যে বাক্যের আর তিলার্ধ স্থান নাই। দয়াল তাঁহার পাকা দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভগবৎ-উপাসনার

প্রারম্ভে ভূমিকাচ্ছলে বলিলেন, যেখানে বিশুদ্ধ-হৃদয় সম্মিলিত হয়, তথায় ভগবানের আসন পাতা হয়। সুতরাং আজ এখানে পরম পিতার আবির্ভাব সম্বন্ধে দ্বিধা করিবার কিছু নাই।/

অতঃপর তিনি নূতন বৎসরের প্রথম দিনটিতে প্রায় পনর মিনিট ধরিয়া একটি সুন্দর উপাসনা করিলেন। তাঁহার নিজের মধ্যে অকপট বিশ্বাস ও আন্তরিক ভক্তি ছিল বলিয়া যাহা কিছু কহিলেন সমস্তই সত্য এবং মধুর হইয়া সকলের হৃদয়ে বাজিল। সকলের চক্ষু-পল্লবেই একটা সজলতার আভাস দেখা দিল; শুধু রাসবিহারীর নিমীলিত চোখ বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। শেষ হইয়া গেলেও একই ভাবে বসিয়া রহিলেন। তিনি অচেতন, কিংবা সচেতন বহুক্ষণ পর্যন্ত ইহাই বুঝিতে পারা গেল না।

আর একজন, যাহার মনের কথা টের পাওয়া গেল না সে বিজয়া। সারাক্ষণ সে আনত-নেত্রে পাষাণ-মূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তার পরে যখন মুখ তুলিল, তখন মুখখানা শুধু পাথরের মতই অস্বাভাবিক রূপে সাদা দেখাইল।

দয়ালের ভক্তি-গদগদ ধ্বনির প্রতিধ্বনি তখন অনেকেরই হৃদয়ের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইতেছিল, এমনি সময়ে রাসবিহারী চক্ষু মেলিলেন; এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিলেন, আমার সে সাধনার বল নাই, কিন্তু দয়ালের মহাবাক্য যে কত বড় সত্য আজ তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। সম্মিলিত হৃদয়ের সন্ধিস্থলে যে সেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মের আবির্ভাব হয়, আজ তাহা অন্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখিয়া আমার জীবন চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়া গেল। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইয়া গিয়া দয়ালকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, দয়াল! ভাই! এ শুধু তোমারই পুণ্যে, তোমারই আশীর্বাদে!

দয়ালের চোখ ছলছল করিয়া আসিল কিন্তু তিনি কোন কথা কহিতে না পারিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পাশের ঘরেই জলযোগের প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। এখন বিলাস সেই ইঙ্গিত করিতেই রাসবিহারী তাহাকে বাধা দিয়া অভ্যাগতগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আপনাদের কাছে আজ আর একটি বিষয়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করি।

বনমালী বেঁচে থাকলে আজ তাঁর কন্যার বিবাহের কথা তিনিই আপনাদিগকে জানাতেন, আমাকে বলতে হ'তো না; কিন্তু এখন সে ভার আমার উপরেই পড়েছে।/এখন আমি বর-কন্যার পিতা। আমি এই মাসেরই শেষ-সপ্তাহে পূর্ণিমা-তিথিতে বিবাহের দিন স্থির করেচি—আপনারা সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করুন যেন শুভকর্ম নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। এই বলিয়া তিনি একজোড়া মোটা সোনার বালা পকেট হইতে বাহির করিয়া দয়ালের হাতে দিলেন।

দয়াল সেই দুটি লইয়া বিজয়ার কাছে অগ্রসর হইয়া গিয়া হাত বাড়াইয়া বলিলেন, শুভকর্মের সূচনায় কায়মনোবাক্যে তোমার কল্যাণ কামনা করি মা, হাত দুটি একবার দেখি!

কিন্তু সেই আনতমুখী, মূর্তির মত আসীনা রমণীর নিকট হইতে লেশমাত্র সাড়া আসিল না। দয়াল পুনরায় তাহার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন; তথাপি সে তেমনি স্থির বসিয়া রহিল। নলিনী পাশেই ছিল; সে মামার অবস্থাসঙ্কট অনুভব করিয়া হাসিয়া বিজয়ার হাত দুটি তুলিয়া ধরিল, এবং দয়াল না জানিয়া এক-জোড়া অত্যাচারের হাতকড়ি আশীর্বাদের সুবর্ণ-বলয় জ্ঞানে সেই মূর্ছিত-প্রায় নিরুপায় নারীর অশক্ত অবশ দুটি হাতে একে একে পরাইয়া দিলেন।

কিন্তু কেহই কিছু জানিল না। বরঞ্চ ইহাকে মধুর লজ্জা কল্পনা করিয়া স্বাভাবিক এবং সংগত ভাবিয়া তাঁহারা উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, এবং নিমিষে শুভকামনার কল-গুঞ্জনে সমস্ত ঘরটা মুখরিত হইয়া উঠিল।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার সমাধা হইয়া গেলে বেলা হইতেছিল বলিয়া সকলেই একে একে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সময়টায় কি করিয়া যে বিজয়া আত্মসংবরণ করিয়া অতিথিদের সম্ভ্রম এবং মর্যাদা রক্ষা করিল তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর যে লোকটির

অগোচর রহিল না সে রাসবিহারী। কিন্তু তিনি আভাসমাত্র দিলেন না। জলযোগ সমাপন করিয়া একটি লবঙ্গ মুখে দিয়া হাসিমুখে কহিলেন, মা, আমি চললুম। বুড়োমানুষ রোদ উঠলে আর হাঁটতে পারব না। বলিয়া আর একপ্রস্থ আশীর্বাদ করিয়া ছাতাটি মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সবাই চলিয়া গিয়াছে। শুধু বিজয়া এবং নলিনী তখনও বাহিরের বারান্দায় একধারে দাঁড়াইয়া কথাবার্তা কহিতেছিল। বিজয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে কত যে সুখী হলুম, সে বলতে পারিনে। এখানে এসে পর্যন্ত আমি একেবারে একলা প'ড়ে গেছি —এমন কেউ নেই যে দুটো কথা বলি। আপনার যখন ইচ্ছে হবে, যখন সময় পাবেন আসবেন।

নলিনী খুশী হইয়া সম্মত হইল।

তখন বিজয়া কহিল, আমি নিজেও হয়ত ও-বেলায় আপনার মামীমাকে দেখতে যাব। কিন্তু তখনই রৌদ্রের দিকে চাহিয়া একটু ব্যস্ত হইয়াই বলিয়া উঠিল, দয়ালবাবু নিশ্চয় কাছারিতে ঢুকেছেন, ডেকে পাঠাই—বলিয়া বেহারার সন্ধানে পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেই নলিনী বাধা দিয়া বলিল, তিনি ত এখন বাড়ি যাবেন না, একেবারে সন্ধ্যাবেলায় ফিরবেন।

বিজয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, এ কথা আমাকে আগে বলেন নি কেন? আমি দরোয়ানকে ডেকে দিচ্ছি, সে আপনার—

নলিনী কহিল, না, দরোয়ানের দরকার নেই, আমি নরেন্দ্রবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছি। তিনি তাঁর মামার সঙ্গে একবার দেখা করতে গেছেন, এখ্খুনি এসে পড়বেন।

বিজয়া অতিশয় আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে কি তাঁর পরিচয় ছিল নাকি? কৈ, আমি ত এ কথা জানতুম না।

নলিনী কহিল, পরিচয় কিছুই ছিল না। শুধু পরশুদিন মামার চিঠি পেয়ে স্টেশনে এসে দেখি, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গেই এখানে এসেছি।

বিজয়া বলিল, ওঃ—তাই বুঝি?

নলিনী কহিল, কিন্তু কি চমৎকার লোক দেখেছেন! দু'দিনেই যেন কত দিনের আত্মীয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এ-বেলায় আমাদের ওখানেই উনি স্নানাহার ক'রে বিকেলবেলা কলকাতায় যাবেন, স্থির হয়েছে। আমার মামীমা ত ওঁকে একেবারে ছেলের মত ভালবাসেন।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, হাঁ চমৎকার লোক।

নলিনী কহিতে লাগিল, ওঁর সঙ্গে যে কারও কখনো মনোমালিন্য ঘটতে পারে, এ আমি চোখে না দেখলে হয়ত বিশ্বাস করতে পারতুম না। আমি বড় খুশী হয়েছি যে, আজ বিলাসবাবুর সঙ্গে তাঁর মিল হয়ে গেল; কিন্তু কি চমৎকার লোক ওঁর বাবা। আমার মনে হয়, আমাদের সমাজে সকলেরই ওঁর মত হবার চেষ্টা করা উচিত। রাসবিহারী-বাবুর আদর্শ যেদিন ব্রাহ্মসমাজের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই দিনই বুঝব আমাদের ব্রাহ্মধর্ম সফল হ'ল, সার্থক হ'ল! কি বলেন? ঠিক নয়?

অদূরে দেখা গেল, নরেন্দ্র টুপিটা হাতে লইয়া দ্রুতবেগে এই দিকে আসিতেছে। বিজয়া নলিনীর প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া শুধু সেই দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিল, ঐ যে উনি আসচেন।

নরেন্দ্র কাছে আসিয়া বিজয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই যে, এরই মধ্যে দুজনের দিব্যি ভাব হয়ে গেছে। বাস্তবিক, আজ বছরের প্রথম দিনটায় আমার ভারী সুপ্রভাত! সকালটা চমৎকার কাটল। দেখে আশা হচ্ছে, এ বছরটা হয়ত ভালই কাটবে। কিন্তু, আপনাকে অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন বলুন ত?

বিজয়া উত্যক্ত-স্বরে কহিল, একদিনের মধ্যে ও প্রশ্ন কতবার করা দরকার বলুন ত?

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, আরও একবার জিজ্ঞাসা করেছি, না? তা হোলই বা। আচ্ছা, খপ্ কোরে অমন রেগে যান কেন বলুন দেখি? ওটা ত আপনার ভারী দোষ। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বিজয়া নিজেও কোন মতে হাসি চাপিয়া ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত জবাব দিল, ও

বিষয়ে সবাই কি আপনার মত নির্দোষ হ'তে পারে? তবুও দেখুন, কালীপদর মত এমনও সব নিন্দুক আছে যারা আপনার মত সাধুকেও বদ্‌রাগী ব'লে অপবাদ দেয়।

কালীপদর নামে নরেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে কহিল, আপনি ভয়ানক অভিমানী, কিছুতেই কারও দোষ মার্জনা করতে পারেন না। কিন্তু 'এমন সব'-এর সবটা কারা শুনি? কালীপদ আর আপনি নিজে, এই ত?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আর স্টেশনে যারা দেখেছে তারাও।

নরেন কহিল, আর?

বিজয়া কহিল, আর যারা শুনেছে তারাও।

নরেন কহিল, তা হ'লে আমার সম্বন্ধে রাজ্যসুদ্ধ লোকেরই এই মত বলুন?

বিজয়া পূর্বের গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়াই জবাব দিল, হাঁ। আমাদের সকলের মতই এই।

নরেন কহিল, তা হ'লে ধন্যবাদ। এইবার আপনার নিজের সম্বন্ধে সকলের মত কি, সেইটে বলুন। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহার ইঙ্গিতে বিজয়ার মুখ পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, নিজের সুখ্যাতি নিজে করতে নেই—পাপ হয়। সেটা বরঞ্চ আপনি বলুন। কিন্তু এখন নয়, নাওয়া-খাওয়ার পরে। বলিয়া একটু থামিয়া কহিল, কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেছে, এ কাজটা এখানেই সেরে নিলে ভাল হ'ত না? বলিয়া সে নলিনীর মুখের প্রতি চাহিল।

নলিনী কহিল, কিন্তু মামীমা যে অপেক্ষা ক'রে থাকবেন।

বিজয়া কহিল, আমি এখ্‌খুনি লোক পাঠিয়ে খবর দিচ্ছি।

নলিনী কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কহিল, আমাকে যেতেই হবে। মামীমা রোগী মানুষ, বাড়িতে সমস্ত দুপুরবেলাটা কেউ কাছে না থাকলে চলবে না।

কথাটা সত্য, তাই সে আর জিদ করিতে পারিল না; কিন্তু তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কি ভাবিয়া নলিনী তৎক্ষণাৎ কহিয়া উঠিল, কিন্তু আপনি না হয় এখানেই স্নানাহার করুন নরেনবাবু, আমি গিয়ে মামীমাকে জানাব। শুধু যাবার সময় একবার তাঁকে দেখা দিয়ে যাবেন।

আর আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ নরাধম পেয়েছেন যে, এই রোদের মধ্যে আপনাকে একলা ছেড়ে দেব? বলিয়া নরেন সহাস্যে বিজয়ার মুখের পানে চোখ তুলিয়া কহিল, আপনার কাছে একদিন ত ভালরকম খাওয়া পাওনা আছেই—সেদিন না হয় সকাল সকাল এসে এই খাওয়াটার শোধ তোলবার চেষ্টা করব। আচ্ছা নমস্কার। নলিনীকে কহিল, আর দেরি নয়, চলুন। বলিয়া হাতের টুপিটা মাথায় তুলিয়া দিল।

নলিনী নামিয়া কাছে আসিল, কিন্তু আর একজন যে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষে যে শান-দেওয়া ছুরির আলো ঝলসিতে লাগিল, তাহা দুজনের কেহই লক্ষ্য করিল না; করিলে বোধ করি, নরেন্দ্র দুই-এক পা অগ্রসর হইয়াই সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া বলিতে সাহস করিত না—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না? যে জিনিসটা শুরু থেকেই এত দুঃখের মূল, যার জন্যে আমার দেশময় অখ্যাতি আমাকেই কেন সেটা আজকের আনন্দের দিনে বকশিশ ক'রে দিন না? সেই দুশো টাকাটা কাল-পরশু যেদিন হয় পাঠিয়ে দেব। বলিয়া আরও একবার হাসিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু উৎসাহের অভাবে সুবিধা হইল না। বরঞ্চ ও-পক্ষ হইতে প্রত্যুত্তরে একেবারে অপ্রত্যাশিত কড়া জবাব আসিল। বিজয়া কহিল, দাম দিয়ে দেওয়াকে আমি উপহার দেওয়া বলিনে, বিক্রি করা বলি। ও-রকম উপহার দিয়ে আপনি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন; কিন্তু আমাদের শিক্ষা আর একরকম হয়েছিল। তাই আজ আনন্দের দিনে সেটা বেচতে ইচ্ছে করিনে।

এই আঘাতের কঠোরতায় নরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমনিই ত সে বিজয়ার মেজাজের প্রায়ই কোন কূল-কিনারা পায় না—তাহাতে আজ তাহার বুকের মধ্যে ক্ষুধের আগুন জ্বলিতেছিল, তাহার দাহ যখন অকস্মাৎ অকারণে বাহির হইয়া পড়িল তখন

নরেন তাহাকে চিনিয়া লইতে পারিল না। সে ক্ষণকাল তাহার কঠিন মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অত্যন্ত ব্যথার সহিত বলিল, আমার একান্ত দীন অবস্থা আমি ভুলেও যাইনি, গোপন করবার চেষ্টাও করিনি যে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

নলিনীকে দেখাইয়া কহিল, আমি এ'কেও আমার সমস্ত ইতিহাস বলেছি। বাবা অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে বাড়ি-ঘরদ্বার যা-কিছু এখানে ছিল সর্বস্ব দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেছে, কিছুই কারো কাছে লুকোই নি। উপহার দিয়েছি এ কথা বলিনি। আচ্ছা, বলুন ত এসব কি আপনাকে জানাই নি?

নলিনী সলজ্জে সায় দিয়া কহিল, হ্যাঁ।

বিজয়ার মুখ বেদনায়, লজ্জায়, ক্ষোভে বিবর্ণ হইয়া উঠিল—সে শুধু বিহ্বল আচ্ছন্নের মত একদৃষ্টে উভয়ের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

তাহার সেই অপরিসীম বেদনাকে বিমথিত করিয়া নরেন্দ্র ম্লানমুখে পুনশ্চ কহিল, আমার কথায় আপনি প্রায়ই অত্যন্ত উত্যক্ত হয়ে উঠেন। হয়ত ভাবেন, নিজের অবস্থাকে ডিঙিয়ে আমি নিজেকে আপনাদের সমান এবং সমকক্ষ ব'লে প্রচার করতে চাই—হ'তেও পারে সব কথায় আপনার ওজন ঠিক রাখতে পারিনে, কিন্তু সে আমার অন্যমনস্ক স্বভাবের দোষে। কিন্তু যাক, অসম্ভ্রম যদি ক'রে থাকি আমাকে মাপ করবেন। বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত পথটার মধ্যে দু'জনের শুধু এই কথাটাই হইল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, কি উপহার দেবার কথা বলেছিলেন?

নরেন্দ্র ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, আর একদিন এ কথা আপনাকে বলব—কিন্তু আজ নয়।

সেই বাঁশের পুলটার কাছে আসিয়া নরেন সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, আজ আমাকে মাপ করতে হবে—আমি ফিরে চললুম। কিন্তু নলিনীকে বিস্ময়ে অভিভূতপ্রায় দেখিয়া পুনরায় বলিল, এইভাবে হঠাৎ ফিরে যাওয়ায় আমার অন্যায় যে কি পর্যন্ত হচ্চে, সে আমি জানি। কিন্তু তবুও ক্ষমা করতে হবে—আজ আমি কোন মতে যেতে পারব না। আপনার মামীমাকে ব'লে দেবেন আমি আর একদিন এসে—

তাহার সংকল্পের এই আকস্মিক পরিবর্তনে নলিনী যত আশ্চর্য হইয়াছিল, এখন তাহার কণ্ঠস্বর ও মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঢের বেশী আশ্চর্য হইল। বোধ হয়, এই জন্যই সে এবিষয়ে আর অধিক অনুরোধ না করিয়া তাঁহাকে শুধু কহিল, আপনার যে খাওয়া হলো না। কিন্তু আবার কবে আসবেন?

পরশু আসবার চেষ্টা করব, বলিয়া নরেন যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে দ্রুতপদে রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

মাঠ পার হইতে আর যখন দেরি নাই, এমন সময় দেখিল কে একটা ছেলে হাত উঁচু করিয়া তাহারই দিকে প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে। সে যে তাহার জন্য ছুটিতেছে, এবং হাত তুলিয়া তাহাকেই থামিতে ইঙ্গিত করিতেছে অনুমান করিয়া নরেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল। খানিক পরেই পরেশ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাঠান ডেকে পাঠালেন তোমাকে। চল।

আমাকে?

হিঁ—চল না।

নরেন্দ্র নিশ্চল হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, তুই বুঝতে পারিস নি রে—আমাকে নয়।

পরেশ প্রবলাবেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হিঁ তোমাকেই। তোমার মাথায় যে সাহেবের টুপি রয়েছে। চল।

নরেন্দ্র আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোর মাঠান কি ব'লে দিলে তোকে?

পরেশ কহিল, মাঠান সেই চিলের ছাত থেকে দৌড়ে নেমে এসে বললে, পরেশ, ছুটে যা—এই সোজা গিয়ে বাবুকে ধ'রে আন। মাথায় সাহেবের টুপি—যা—ছুটে যা—তোকে খুব ভাল একটা লাটাই কিনে দেব। চল না।

এতক্ষণে ইহার ব্যগ্রতার হেতু বুঝা গেল। সে লাটাইয়ের লোভে এই রৌদ্রের মধ্যে ইঞ্জিনের বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে। সুতরাং কোনমতে ছাড়িয়া যাইবে না। তাহার একবার মনে হইল, ছেলেটিকে নিজেই একটা লাটাইয়ের দাম দিয়া এইখান হইতে বিদায় করে। কিন্তু আজই এমন করিয়া ডাকিয়া পাঠাইবার কি কারণ, সে কৌতূহলও কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিল না। কিন্তু যাওয়া উচিত কি না স্থির করিতে তাহার আরও কিছুক্ষণ লাগিল; এবং শেষ পর্যন্ত স্থিরও কিছু হইল না; তবুও অনিশ্চিত পথ তাহার ওই দিকেই ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। সমস্ত রাস্তাটা সে ডাকিবার কারণটাই মনে মনে হাতড়াইয়া মরিতে লাগিল, কিন্তু ডাকাটাই যে সব চেয়ে বড় কারণ সেটা আর তাহার চোখে পড়িল না। বাহিরের ঘরে পা দিতেই বিজয়া আসিয়া সুমুখে দাঁড়াইল। দুটি আর্দ্র উৎসুক চক্ষু তাহার মুখের উপর পাতিয়া তীক্ষ্মকণ্ঠে কহিল, না খেয়ে এত বেলায় চলে যাচ্ছেন যে বড়? আমি মিছামিছি রাগ করি, আমি ভয়ানক মন্দ লোক—আর নিজে?

নরেন গভীর বিস্ময়ভরে বলিল, এর মানে? কে বলেছে আপনি মন্দ লোক, কে বলেছে ও-সব কথা আপনাকে?

বিজয়ার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল; কহিল, আপনি বলেছেন। কেন নলিনীর সামনে আমাকে অমন ক'রে অপমান করলেন? আমাকেই অপমান করলেন, আবার আমাকেই শাস্তি দিতে না খেয়ে চলে যাচ্ছেন? কি করেছি আপনার আমি? বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। বোধ করি, তাহাই সামলাইবার জন্য সে তৎক্ষণাৎ ও-দিকের জানালায় গিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। নরেন হতবুদ্ধির মত বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। এ অভিযোগের কোথায় কি যে জবাব আছে তাহাও যেন খুঁজিয়া পাইল না, ইহার কারণই বা কি তাহাও তেমনি ভাবিয়া পাইল না।

স্নানের জল প্রভৃতি দেওয়া হইয়াছে বেহারা জানাইয়া গেলে বিজয়া ফিরিয়া আসিয়া শান্তভাবে শুধু কহিল, আর দেরি করবেন না, যান।

স্নান সারিয়া নরেন্দ্র আহারে বসিল। বিজয়া একখানা পাখা হাতে করিয়া তাহার অদূরে আসিয়া যখন উপবেশন করিল, তখন অত্যন্ত সংগোপনে তাহার সর্বাঙ্গ আলোড়িত করিয়া যেন লজ্জার ঝড় বহিয়া গেল। বাতাস করিতে উদ্যত দেখিয়া নরেন সংকুচিত হইয়া কহিল, আমাকে হাওয়া করবার দরকার নেই, আপনি পাখাটা রেখে দিন।

বিজয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, আপনার দরকার না থাকলেও আমার দরকার আছে। বাবা বল'তেন, মেয়েমানুষকে শুধু হাতে কখনও বসতে নেই।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, আপনার খাওয়াও ত হয়নি!

বিজয়া কহিল, না। পুরুষমানুষদের খাওয়া না হ'লে আমাদের খেতেও নেই।

নরেন খুশী হইয়া বলিল, আচ্ছা, ব্রাহ্ম হলেও ত আপনাদের আচার-ব্যবহার আমাদের মতই।

বিজয়া এ কথা বলিল না যে, অনেক ব্রাহ্মবাড়িতেই তাহা নয়, বরঞ্চ ঠিক উলটো, শুধু তাহার পিতাই কেবল এই সকল হিন্দু-আচার নিজের বাড়িতে বজায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। বরঞ্চ কহিল, এতে আশ্চর্য হবার ত কিছু নেই। আমরা বিলেত থেকেও আসিনি, কাবুল থেকেও আমাদের আচার-ব্যবহার আমদানী ক'রে আনতে হয়নি। এ রকম না হ'লেই বরং আশ্চর্য হবার কথা।

চাকর দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, মা, সরকারমশাই হিসেবের খাতা নিয়ে নীচে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন কি যেতে ব'লে দেব?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আজ আর আমার দেখবার সময় হবে না, তাঁকে কাল একবার আসতে ব'লে দাও।

ভৃত্য চলিয়া গেলে নরেন বিজয়ার মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কহিল, এইটি আমাকে সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয়।

কোন্‌টি?

চাকরদের মুখের এই ডাকটি। বলিয়া হাসিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্মমহিলাও বটে, আলোকপ্রাপ্তাও বটে, এবং বিশেষ করে বড়মানুষও বটে। এমনি আলোক-পাওয়া অনেক বাড়িতেই আমাকে আজকাল চিকিৎসা করতে যেতে হয়। তাঁদের চাকর-বাকরেরা মেয়েদের বলে 'মেম-সাহেব'। সত্যিকারের মেম-সাহেবরা এঁদের যে চক্ষে দেখে, তা জানেন ব'লেই বোধ করি মাইনে-করা চাকরদের দিয়ে 'মেম-সাহেব' বলিয়ে নিয়ে আত্মমর্যাদা বজায় রাখেন। বলিয়া প্রকাণ্ড একটা পরিহাসের মত হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া অট্টহাস্যে বাড়িটা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। বিজয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল। নরেনের হাসি থামিলে সে পুনরায় কহিল, বাড়ির দাসী-চাকরের মুখের মাতৃ-সম্বোধনের চেয়ে 'মেম-সাহেব' ডাকটা যেন বেশী ইজ্জতের। প্রথম দিন আমি বুঝতেই পারিনি বেহারাটা 'মেম' বলে কারে? চাকরটা কি বললে জানেন? বলে, 'আমি অনেক সাহেব-বাড়িতে চাকরি করেচি, সত্যকারের মেম-সাহেব কি, তা খুব জানি। কিন্তু, কি করব ডাক্তারবাবু? নতুন হিন্দুস্থানী দরোয়ানটা গিন্নীকে 'মাইজী' ব'লে ফেলেছিল ব'লে মেম-সাহেব তার একটাকা জরিমানা ক'রে দিলেন। চাকরিটা যে বজায় রইল এই তার ভাগ্যি। এমনি রাগ। আচ্ছা, আপনি বোধ হয় এরকম অনেক দেখেছেন, না?

বিজয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

নরেন কহিল, আমাকে এইটে একদিন দেখতে হবে, এই সব মেম-সাহেবদের ছেলে-মেয়েরা মাকে মা বলে, না 'মেম-সাহেব' বলে ডাকে! বলিয়া নিজের রসিকতার আনন্দে আর একবার ঘর ফাটাইয়া তুলিবার আয়োজন করিল।

বিজয়া হাসিমুখে কহিল, খেয়ে-দেয়ে সমস্ত দিন ধ'রে পরচর্চা ক'রে আমোদ করবেন, আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আমাকে কি আজ খেতে দেবেন না?

নরেন লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি দু-চার গ্রাস গিলিয়া লইয়াই সব ভুলিয়া গেল। কহিল, আমিও ত চার-পাঁচ বছর বিলেতে ছিলুম, কিন্তু এই দিশী-সাহেবরা—

বিজয়া তর্জনী তুলিয়া কৃত্রিম শাসন করার ভঙ্গীতে কহিল, আবার পরের নিন্দে!

আচ্ছা, আর নয়—বলিয়া সে পুনরায় আহারে মন দিয়াই কহিল, কিন্তু আর খেতে পাচ্ছিনে—

বিজয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, বাঃ—কিছুই ত খাননি। না, এখন উঠতে পাবেন না। আচ্ছা, না হয় পরের নিন্দে করতে করতেই অন্যমনস্ক হয়ে খান, আমি কিছু বলব না।

নরেন হাসিতে গিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল। কহিল, আপনি এতেই বলছেন খাওয়া হল না—কিন্তু আমার কলকাতার রোজকার খাওয়া যদি দেখেন ত অবাক হয়ে যাবেন। দেখছেন না, এই ক'মাসের মধ্যেই কি রকম রোগা হয়ে গেছি। আমার বাসায় বামুন-ব্যাটা হয়েছে যেমন পাজী, তেমনি বদমাইস জুটেছে চাকরটা। সাত-সকালে রেঁধে রেখে কোথায় যায় তার ঠিকানা নেই—আমার কোন দিন ফিরতে হয় দুটো, কোন দিন বা চারটে বেজে যায়। সেই ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত—দুধ কোন দিন বা বেড়ালে খেয়ে যায়, কোন দিন বা জানালা দিয়ে কাক ঢুকে সমস্ত ছড়াছড়ি করে রাখে—সে দেখলেই ঘৃণা হয়। অর্ধেক দিন ত একেবারেই খাওয়া হয় না।

রাগে বিজয়ার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, এমন সব চাকর-বাকরদের দূর ক'রে দিতে পারেন না? নিজের বাসায় এত টাকা মাইনে পেয়েও যদি এত কষ্ট, তবে চাকরি করাই বা কেন?

নরেন কহিল, এক হিসাবে আপনার কথা সত্যি। একদিন বাক্স থেকে কে দু'শ টাকা চুরি করে নিলে, একদিন নিজেই কোথায় একশ টাকার নোট হারিয়ে ফেললুম। অন্যমনস্ক লোকের ত পদে পদেই বিপদ কিনা! একটুখানি থামিয়া কহিল, তবে নাকি দুঃখ-কষ্ট

আমার অনেকদিন থেকেই সয়ে গেছে, তাই তেমন গায়ে লাগে না। শুধু অত্যন্ত ক্ষিদের উপর খাওয়ার কষ্টটা এক-একদিন যেন অসহ্য বোধ হয়।

বিজয়া মুখ নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল। নরেন কহিতে লাগিল, বাস্তবিক, চাকরি আমার ভালও লাগে না, পারিও না। অভাব আমার খুবই সামান্য—আপনার মত কোন বড়লোক দু'বেলা চারটি খেতে দিত, আর নিজের কাজ নিয়ে থাকতে পারতুম ত আমি আর কিছুই চাইতুম না—কিন্তু, সে রকম বড়লোক কি আর আছে? বলিয়া আর এক দফা উচ্চহাসির ঢেউ তুলিয়া দিল। বিজয়া পূর্বের মতই নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল। নরেন কহিল, কিন্তু আপনার বাবা বেঁচে থাকলে, হয়ত এ সময়ে আমার অনেক উপকার হ'তে পারত—তিনি নিশ্চয় আমাকে উঞ্ছবৃত্তি থেকে রেহাই দিতেন।

বিজয়া উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করে জানলেন? তাঁকে ত আপনি চিনতেন না?

নরেন কহিল, না, আমিও তাঁকে কখনও দেখিনি, তিনিও বোধ হয় কখনো দেখেন নি। কিন্তু তবুও আমাকে খুব ভালবাসতেন। কে আমাকে টাকা দিয়ে বিলেত পাঠিয়েছিলেন জানেন? তিনিই। আচ্ছা, আমাদের ঋণের সম্বন্ধে আপনাকে কি কখনও তিনি কিছু ব'লে যাননি?

বিজয়া কহিল, বলাই ত সম্ভব। কিন্তু আপনি ঠিক কি ইঙ্গিত করচেন, তা না বুঝলে ত জবাব দিতে পারিনে।

নরেন ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা করিয়া কহিল, থাক গে। এখন এ আলোচনা একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

বিজয়া ব্যগ্র হইয়া কহিল, না, বলুন। আমি শুনতে চাই।

নরেন আবার একটু ভাবিয়া বলিল, যা চুকে-বুকে শেষ হয়ে গেছে, তা শুনে আর কি হবে বলুন?

বিজয়া জিদ করিয়া কহিল, না, তা হবে না। আমি শুনতে চাই, আপনি বলুন।

তাহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নরেন হাসিল; কহিল, বলা শুধু যে নিরর্থক তাই নয়—বলতে আমার নিজেরও লজ্জা হচে। হয়ত আপনার মনে হবে আমি কৌশলে আপনার সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে—

বিজয়া অধীর হইয়া কথার মাঝখানেই বলিল, আমি আর খোশামোদ করতে পারিনে আপনাকে—পায়ে পড়ি, বলুন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে।

না, এখ্খুনি—

আচ্ছা বলচি বলচি। কিন্তু একটা কথা পূর্বে জিজ্ঞাসা করি, আমাদের বাড়িটার বিষয়ে কোন কথা কি তিনি কখনো আপনাকে বলেন নি?

বিজয়া অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। নরেন মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, আচ্ছা, রাগ করতে হবে না আমি বলচি। যখন বিলেত যাই তখনই বাবার কাছে শুনেছিলুম আপনার বাবাই আমাকে পাঠাচেন। আজ তিনদিন হ'ল, দয়ালবাবু আমাকে একতাড়া চিঠি দেন। যে ঘরটায় ভাঙ্গাচোরা কতকগুলো আসবাব পড়ে আছে, তারই একটা ভাঙ্গা দেরাজের মধ্যে চিঠিগুলো ছিল—বাবার জিনিস ব'লে দয়ালবাবু আমার হাতেই দেন। পড়ে দেখ্লুম, খান-দুই চিঠি আপনার বাবার লেখা। শুনেছেন বোধ হয় শেষ-বয়সে বাবা দেনার জ্বালায় জুয়া খেলতে শুরু করেন। বোধ করি সেই ইঙ্গিতই একটা চিঠির গোড়ায় ছিল। তার পরে নীচের দিকে এক জায়গায় তিনি উপদেশের ছলে সান্ত্বনা দিয়ে বাবাকে লিখেছিলেন, বাড়িটার জন্যে ভাবনা নেই—নরেন আমারও ত ছেলে, বাড়িটা তাকে যৌতুক দিলাম।

বিজয়া মুখ তুলিয়া কহিল, তার পরে?

নরেন কহিল, তার পরে সব অন্যান্য কথা। তবে এ পত্র বহুদিন পূর্বের লেখা। খুব সম্ভব, তাঁর এ অভিপ্রায় পরে বদলে গিয়েছিল ব'লেই কোন কথা আপনাকে ব'লে যাওয়া আবশ্যক মনে করেন নি।

পিতার শেষ ইচ্ছাগুলি বিজয়ার অক্ষরে অক্ষরে মনে পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, তা হ'লে বাড়িটা দাবী করবেন বলুন, বলিয়া হাসিল।

নরেন নিজেও হাসিল। প্রস্তাবটা চমৎকার পরিহাস কল্পনা করিয়া কহিল, দাবী নিশ্চয় করব, এবং আপনাকেও সাক্ষী মানব। আশা করি সত্য কথাই বলবেন।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, নিশ্চয়। কিন্তু সাক্ষী মানবেন কেন?

নরেন কহিল, নইলে প্রমাণ হবে কিসে? বাড়িটা যে সত্যিই আমার সে কথা ত আদালতে প্রতিষ্ঠিত করা চাই।

বিজয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, অন্য আদালতের দরকার নেই—বাবার আদেশই আমার আদালত। ও বাড়ি আপনাকে আমি ফিরিয়ে দেব।

তাহার মুখের চেহারা এবং কণ্ঠস্বর ঠিক রহস্যের মত শোনাইল না বটে, কিন্তু সে ছাড়া যে আর কি হইতে পারে তাহাও মনে ঠাঁই দেওয়া যায় না। বিশেষতঃ বিজয়ার পরিহাসের ভঙ্গী এত নিগূঢ় যে, শুধু মুখ দেখিয়া জোর করিয়া কিছু বলা অত্যন্ত কঠিন। তাই নরেন্দ্র নিজেও ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, তা হ'লে তাঁর চিঠিটা চোখে না দেখেই বোধ হয় বাড়িটা দিয়ে দেবেন?

বিজয়া কহিল, না, চিঠি আমি দেখতে চাই। কিন্তু, এই কথাই যদি তাতে থাকে তাঁর হুকুম আমি কোন মতেই অমান্য করব না।

নরেন্দ্র কহিল, তাঁর অভিপ্রায় যে শেষ পর্যন্ত এই ছিল তারই বা প্রমাণ কোথায়?

বিজয়া উত্তর দিল, ছিল না তার ত প্রমাণ নেই।

নরেন্দ্র কহিল, কিন্তু, আমি যদি না নিই? দাবী না করি?

বিজয়া কহিল, সে আপনার ইচ্ছা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আপনার পিসীর ছেলেরা আছেন। আমার বিশ্বাস, অনুরোধ করলে তারা দাবী করতে অসম্মত হবেন না।

নরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, এ বিশ্বাস আমারও আছে। এমন কি, হলফ করে বলতেও রাজী আছি।

বিজয়া এ হাসিতে যোগ দিল না—চুপ করিয়া রহিল।

নরেন্দ্র পুনরায় কহিল, অর্থাৎ, আমি নিই, না নিই আপনি দেবেনই?

বিজয়া কহিল, অর্থাৎ বাবার দান করা জিনিস আমি আত্মসাৎ করব না এই আমার প্রতিজ্ঞা।

তাহার সংকল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া নরেন মনে মনে বিস্মিত হইল, মুগ্ধ হইল। কিন্তু নিঃশব্দে কিছুক্ষণ থাকিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, ও বাড়ি যখন সৎকর্মে দান করেছেন তখন আমি না নিলেও আপনার আত্মসাৎ করার পাপ হবে না। তা ছাড়া, ফিরিয়ে নিয়ে কি করব বলুন? আপনার কেউ নেই যে তারা বাস করবে। আমাকে বাইরের কোথাও না কোথাও কাজ করতেই হবে। তার চেয়ে যে ব্যবস্থা হয়েছে, সেই ত সবচেয়ে ভাল হয়েছে। আরও এক কথা এই যে বিলাসবাবুকে কোনও মতেই রাজী করাতে পারবেন না।

এই শেষ কথাটায় বিজয়া মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, নিজের জিনিসে অপরকে রাজী করানোর চেষ্টা করার মত অপর্যাপ্ত সময় আমার নেই। কিন্তু, আপনি ত আর এক কাজ করতে পারেন। বাড়ি যখন আপনার দরকার নেই, তখন তার উচিত মূল্য আমার কাছে নিন। তা হ'লে চাকরিও করতে হবে না, অথচ নিজের কাজও স্বচ্ছন্দে করতে পারবেন। আপনি সম্মত হোন নরেনবাবু।

এই একান্ত মিনতিপূর্ণ অনুনয়ের স্বর অকস্মাৎ শরের মত গিয়া নরেনের হৃদয়ে বিঁধিয়া তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল; এবং যদিচ বিজয়ার অবনতমুখে এই মিনতির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পড়িয়া লইবার সুযোগ মিলিল না, তথাপি ইহা পরিহাস নয় সত্য, ইহাও বুঝিতে বিলম্ব ঘটিল না। পিতৃঋণের দায়ে তাহাকে গৃহহীন করিয়া এই মেয়েটি যে সুখী নয়, বরঞ্চ হৃদয়ে ব্যথাই অনুভব করিতেছে, এবং কোন একটা উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া তাহার দুঃখের ভার লঘু করিয়া দিতে চায় ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। কিন্তু, তাই বলিয়া এরূপ প্রস্তাবও ত স্বীকার করা চলে না। যাহা প্রাপ্য নয় গরীব বলিয়া তাহাই বা কিরূপে ভিক্ষা লইবে? আরও একটা কথা আছে।

যে সকল সাংসারিক ব্যাপার পূর্বে একেবারেই সমস্যা ছিল, তাহার অনেকগুলিই এখন এই লোকটির কাছে সহজ হইয়া গেছে। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, বিলাসের সম্বন্ধে বিজয়া আবেগের উপর যাহাই কেন না বলুক, তাহার বাধা ঠেলিয়া শেষ পর্যন্ত এ সংকল্প কিছুতেই কার্যে পরিণত করিতে পারিবে না। ইহাতে শুধু কেবল তাহার লজ্জা এবং বেদনাই বাড়িবে আর কিছু হইবে না।

কিছুক্ষণ তাহার অবনত মুখের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া পরিহাস-তরলকণ্ঠে বলিল, আপনার মনের কথা আমি বুঝেচি। গরীবকে কোন একটা ছলে কিছু দান করতে চান, এই ত?

ঠিক এই কথাটাই আজ একবার হইয়া গেছে। তাহারই পুনরাবৃত্তিতে বিজয়া বেদনায় ম্লান হইয়া চোখ তুলিয়া কহিল, এ কথায় আমি কত কষ্ট পাই, আপনি জানেন?

নরেন মনে মনে হাসিয়া প্রশ্ন করিল, তবে আসল কথাটা কি শুনি?

বিজয়া কহিল, সত্যি কথাই আমি বরাবর বলেচি; আপনার পাপ মন ব'লেই শুধু বিশ্বাস করতে পারেন নি। আপনি গরীব হোন, বড়লোক হোন, আমার কি? আমি কেবল বাবার আদেশ পালন করবার জন্যেই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে চাচ্চি।

নরেন সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, ওর মধ্যেও একটু মিথ্যে রয়ে গেল—তা থাক। কিন্তু খুব বড় বড় প্রতিজ্ঞা ত করচেন; কিন্তু বাবার হুকুমমত ফিরিয়ে দিতে হ'লে আরও কত জিনিস দিতে হয় জানেন? শুধু ওই বাড়িটাই নয়।

বিজয়া কহিল, বেশ। নিন, আপনার সম্পত্তি ফিরিয়ে নিন।

এইবার নরেন হাসিয়া ঘাড় নাড়িল। কহিল, খুব বড় গলায় চীৎকার ক'রে ত আমাকে দাবী করতে বলচেন। আমি না করলে আমার পিসীমার ছেলেদের দাবী করতে বলবেন, ভয় দেখাচ্চেন। কিন্ত, তাঁরই আদেশমত দাবী আমার কোথা পর্যন্ত পোঁছুতে পারে, জানেন কি? শুধু কেবল ওই বাড়িটা আর কয়েক বিঘে জমি নয়, তার ঢের-ঢের বেশী।

বিজয়া উৎসুক হইয়া কহিল, বাবা আর কি আপনাকে দিয়েছেন?

নরেন বলিল, তাঁর সে চিঠিও আমার কাছে আছে। তাতে যৌতুক শুধু তিনি ওইটুকু দিয়েই আমাকে বিদায় করেন নি। যেখানে যা কিছু আছে দেখচেন, সমস্তই তার মধ্যে। আমি দাবী শুধু ওই বাড়িটা করতে পারি তাই নয়। এ বাড়ি, এই ঘর, ওই সমস্ত টেবিল-চেয়ার-আয়না-দেয়ালগিরি-খাট-পালঙ্ক, বাড়ির দাস-দাসী-আমলা-কর্মচারী, মায় তাদের মনিবটিকে পর্যন্ত দাবী করতে পারি, তা জানেন কি? বাবার হুকুম—দেবেন এই সব?

বিজয়ার পদনখ হইতে চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু, সে কোন উত্তর না দিয়া অধোমুখে কাঠের মূর্তির মত বসিয়া রহিল। নরেন সগর্বে ভাতের গ্রাস মুখে তুলিয়া দিয়া খোঁচা দিয়া বলিল, কেমন, দিতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে? বরঞ্চ একবার না হয় বিলাসবাবুর সঙ্গে নিরিবিলি পরামর্শ করবেন! বলিয়া হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিন্তু, এইবার বিজয়া মুখ তুলিতেই তাহার প্রবল হাস্য সহসা যেন মার খাইয়া মূক হইল। বিজয়ার মুখে যেন রক্তের আভাসমাত্র নাই—এমনি একটি শুষ্ক পাণ্ডুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, নরেন উদ্বিগ্ন শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি? আমি কি সত্যি সত্যিই এই সব দাবী করতে যাচ্চি, না করলেই পাব? বরঞ্চ আমাকেই ত তা হ'লে ধরে নিয়ে পাগলা গারদে পুরে দেবে।

বিজয়া এ-সকল কথা যেন শুনিতেই পাইল না। কহিল, কৈ দেখি বাবার চিঠি?

নরেন আশ্চর্য হইয়া বলিল, বেশ, আমি কি পকেটে করে নিয়ে বেড়াচ্চি নাকি? আর সে দেখেই বা লাভ কি আপনার?

তা হোক। দরোয়ানের হাতে চিঠি দুটো আজই দেবেন। সে আপনার সঙ্গে কলকাতায় যাবে।

এত তাড়া?

হাঁ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

নিদ্রাহীন রজনীর পরিপূর্ণ ক্লান্তি লইয়া বিজয়া সকালে নীচের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জমিদারী সেরেস্তার খেরো-বাঁধানো খাতাগুলি টেবিলের উপর থাকে থাকে সাজানো রহিয়াছে, এবং বৃদ্ধ গোমস্তা অদূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সে সবিনয়ে কহিল, মা, এগুলো আজ ফিরে চাই-ই।

তাহাকে ঘণ্টা-দুই পরে ঘুরিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া বিজয়া উপরের খাতাটা তুলিয়া লইয়া জানালা-সংলগ্ন কৌচের উপর গিয়া উপবেশন করিল। তাহার মনোযোগ দিবার শক্তিই ছিল না—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি বারংবার হিসাবের অঙ্ক ছাড়িয়া জানালার বাহিরে এখানে-ওখানে পলায়ন করিতেছিল। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, বাগানের ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ রাসবিহারী পরেশকে কি-সকল প্রশ্ন করিতেছেন। আঙুল তুলিয়া কখনও নীচের ঘর, কখনও বা ছাদের উপর নির্দেশ করিতেছেন। দু'জনের কাহারও একটা কথাও না শুনিয়া বিজয়া চক্ষের নিমেষে বৃদ্ধের ক্রূর ইঙ্গিতের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল।

খানিক পরে তিনি ছেলেটাকে ছাড়িয়া দিয়া কাছারি-ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। পরেশ বাড়ির দিকে আসিতেছিল, বিজয়া জানালা দিয়া হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোকে কি জিজ্ঞেসা করছিলেন রে?

পরেশ কহিল, আচ্ছা মাঠান, সরকারমশায়ের কাছে টাকা নিয়ে আমি ঘুড়ি-নাটাই কিনতে চলে গেনু না? ডাক্তারবাবুর ভাত খাবার বেলা কি আমি বাড়ি ছিনু মাঠান?

বিজয়া কহিল, না।

পরেশ কহিল, তবে বড়বাবু বলে, কি কথা হয়েছিল বল ব্যাটা, নইলে সেপাই দিয়ে তোকে বেঁধে জলবিছুটি দেওয়াব। আমি বন্নু, নতুন দরোয়ান তোমারে মিথ্যে মিথে নাগিয়েচে। মাঠান বললে পরেশ, ছুটে গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন তোকে ভাল নাটাই কিনে দেব—তাই না ছুটে গেনু? কিন্তু, বড়বাবুকে বোলো না মাঠান। তোমাকে বলতে তিনি মানা করে দেছে।

জানাইবে না বলিয়া ভরসা দিয়া বিজয়া পরেশকে বিদায় করিল, এবং স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় খাতা খুলিয়া বসিল; কিন্তু এবার তাহার দৃষ্টির সম্মুখে খাতার লেখা একেবারে লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু রাত্রি-জাগর নয়, অসহ্য ক্রোধে আরক্ত চক্ষু দুটি আগুনের শিখার মত জ্বলিতে লাগিল। অনতিকা পরেই রাসবিহারী দ্বারের বাহিরে লাঠির শব্দ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে প্রবেশ করিলে এবং বিজয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অল্প একটুখানি কাশিয়া চেয়ার টানিয়া উপবেশ করিলেন।

বিজয়া খাতা হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, আসুন। আজ এত সকালে যে?

রাসবিহারী তৎক্ষণাৎ সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অত্যন্ত উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞা করিলেন, তোমার চোখ দুটি যে ভয়ানক রাঙ্গা দেখাচ্ছে মা? ঠাণ্ডা-টাণ্ডা লাগেনি ত?

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

রাসবিহারী তাহা কানে না তুলিয়া উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, না বললে ত শুনবো না মা। হয় রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, নয় কোন রকম কিছু—

না, আমার কিছুই হয়নি।

কিন্তু, ও-রকম চোখ লাল হবার কারণ ত একটা কিছু—

বিজয়া আর প্রতিবাদ না করিয়া কাজে মন দিল দেখিয়া রাসবিহারী থামিয়া গেলেন। একটু মৌন থাকিয়া কহিলেন, রোদের ভয়েই সকালে আসতে হল মা। দলিল-পত্রগুলো একবার দেখতে হবে—শুনচি নাকি চৌধুরীরা ঘোষপাড়ার সীমানা নিয়ে একটা মামলা রুজু করবে।

জমিদারি-সংক্রান্ত অত্যাবশ্যক দলিলগুলি বনমালী নিজের কাছেই রাখিতেন। একে ত এ সকলের সচরাচর প্রয়োজন হয় না, তাহাতে অন্যত্র খোয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে

বলিয়া তিনি কোন দিন কাছ-ছাড়া করেন নাই। কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিবার সময় বিজয়া এগুলি সঙ্গে আনিয়াছিল, এবং নিজের শোবার ঘরের লোহার আলমারিতে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বিজয়া মুখ তুলিয়া কহিল, তাঁরা মামলা করবেন কে বললে?

রাসবিহারী বিজ্ঞভাবে অল্প হাস্য করিয়া কহিলেন, কেউ বলেনি মা, আমি বাতাসে খবর পাই। তা না হ'লে কি এতবড় জমিদারিটা এতদিন চালাতে পারতাম?

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁরা কতটা দাবী করছেন?

রাসবিহারী মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, তা হবে বৈ কি—খুব কম হ'লেও সেটা বিঘে-দুই হবে।

বিজয়া তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, এই! তা হ'লে তাঁরাই নিন। এটুকু জায়গা নিয়ে মামলা-মকদ্দমার দরকার নেই।

রাসবিহারী অত্যধিক বিস্ময়ের ভান করিয়া ক্ষোভের সহিত কহিলেন, এরকম কথা তোমার মত মেয়ের মুখে আমি আশা করিনি মা। আজ বিনা বাধায় যদি দু'বিঘে ছেড়ে দিই, কাল যে আবার দু'শ বিঘে ছেড়ে দিতে হবে না তাই বা কে বললে?

কিন্তু আশ্চর্য, এত বড় তিরস্কারেও বিজয়া বিচলিত হইল না। সে সহজভাবে প্রত্যুত্তর করিল, কিন্তু সত্যিই ত আর দু'শ বিঘে আমাদের ছাড়তে হচ্ছে না। আমি বলি, সামান্য কারণে মামলা-মকদ্দমার দরকার নেই।

রাসবিহারী মর্মাহত হইলেন। বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, কিছুতেই হ'তে পারে না মা, কিছুতেই হ'তে পারে না। তোমার বাবা যখন আমার উপর সমস্ত নির্ভর ক'রে গেছেন, এবং যতক্ষণ আমি বে'চে আছি বিনা প্রতিবাদে দু'বিঘে কেন, দু'আঙুল জায়গা ছেড়ে দিলেও ঘোর অধর্ম হবে। তা ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে যার জন্যে পুরোনো দলিলগুলো একবার ভাল ক'রে দেখা দরকার। একবার কষ্ট করে ওঠো মা, বাক্সটা উপর থেকে আনিয়ে দাও।

বিজয়া উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করিল, আরও কারণ আছে?

রাসবিহারী বলিলেন, হাঁ।

বিজয়া কহিল, কি কারণ?

রাসবিহারী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেও আত্মসংবরণ করিয়া জবাব দিলেন, কারণ ত একটা নয়—মুখে মুখে তার কি কৈফিয়ত তোমাকে দেব মা?

এই সময় সরকারমশায় তাঁহার খাতাপত্রের জন্য আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিতেই, বিজয়া লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি কহিল, এ-বেলায় আর হয়ে উঠল না, ও-বেলা এসে নিয়ে যাবেন।

সরকার 'যে আজ্ঞে', বলিয়া ফিরিতেছিল—বিজয়া ডাকিয়া বলিল, একটা কাজ আছে কিন্তু। কাছারির ওই নতুন দরোয়ানটা কতদিন বাহাল হয়েছে জানেন?

সরকার কহিল, মাস-তিনেক হবে বোধ হয়।

বিজয়া কহিল, তা যতই হোক, ওকে আর দরকার নেই। এখনো এ মাসের প্রায় কুড়ি দিন বাকী, এই ক'টা দিনের মাইনে বেশী দিয়ে আজই ওকে জবাব দেবেন।

সরকার বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিয়া রহিল। ইচ্ছাটা তাহার অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু সাহস করিল না।

বিজয়া তাহা বুঝিয়াই কহিল, না, দোষের জন্য নয়, তবে লোকটাকে আমার ভাল লাগে না ব'লেই ছাড়িয়ে দিচ্চি। কিন্তু, মাইনেটা পুরো মাসের দেবেন।

রাসবিহারীর মুখ পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পলকের মধ্যেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিলেন, তা হ'লে বিনা দোষে কারো অন্ন মারাটা কি ভালো মা?

বিজয়া তাহার জবাব না দিয়া চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া সরকার ভরসা পাইয়া কহিতে গেল—তা হ'লে তাকে—

হাঁ, বিদায় ক'রে দেবেন—আজই। বলিয়া বিজয়া খাতায় মন দিল। সরকার তবুও

কিছু একটা প্রত্যাশা করিয়া খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেলে রাসবিহারী মিনিট-পাঁচেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া তাঁহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, একটু কষ্ট স্বীকার ক'রে না উঠলেই যে নয় মা। পুরোনো দলিলগুলো একবার আগাগোড়া বেশ ক'রে পড়া যে চাই-ই।

বিজয়া মুখ না তুলিয়াই কহিল, কেন?

রাসবিহারী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বললাম বিশেষ কারণ আছে। তবুও বারবার এক কথা বলবার ত আমার সময় নেই বিজয়া।

বিজয়া তাহার খাতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই আস্তে আস্তে কহিল, তা বলেছেন সত্যি; কিন্তু কারণ ত একটাও দেখান নি।

না দেখালে কি তুমি উঠবে না? বলিয়া কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া এবার তিনি ধৈর্য হারাইয়া ফেলিলেন, কহিলেন, তার মানে, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?

বিজয়া নিরুত্তর অধোমুখে কাজ করিতে লাগিল—কোন উত্তর দিল না। তাহার এই নীরবতার অর্থ এত সুস্পষ্ট, এত তীক্ষ্ন যে, ক্রোধে রাসবিহারীর মুখ কালো হইয়া উঠিল। তিনি হাতের লাঠিটা মেঝেতে ঠুকিয়া বলিলেন, কিসের জন্যে আমাকে তুমি এতবড় অপমান করতে সাহস কর বিজয়া? কিসের জন্যে তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর শুনি?

বিজয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, আমাকেও ত আপনি বিশ্বাস করেন না! আমার পয়সায় আমারি উপর গোয়েন্দা নিযুক্ত করলে মনের ভাব কি হয় আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারেন, এবং তার পর আমার সম্পত্তির মূল দলিলপত্র হস্তগত করার তাৎপর্য যদি আমি আর কিছু ব'লে সন্দেহ করি, সে কি অস্বাভাবিক? না সে আপনাকে অপমান করা?

রাসবিহারী একেবারে নির্বাক, স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার এতবড় পাকা চাল কলিকাতায় বিলাসিতার মধ্যে যত্ন-আদরে প্রতিপালিত একটা অনভিজ্ঞ বালিকার কাছে ধরা পড়িতে পারে এ সম্ভাবনা তাঁহার পাকা মাথায় স্থান পায় নাই; এবং ইহাই সে মুখের উপর অসঙ্কোচে নালিশ করিবে—সে ত স্বপ্নের অগোচর!

রাসবিহারী অনেকক্ষণ বিমূঢ়ের মত বসিয়া থাকিয়া আর একবার যুদ্ধের জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন; এবং এই প্রকৃতির লোকের যাহা চরম অস্ত্র তাহাই তূণীর হইতে বাহির করিয়া এই অসহায় বালিকার প্রতি নির্মমভাবে নিক্ষেপ করিলেন। কহিলেন, বনমালীর মুখ রাখবার জন্যেই এ কাজ করেছি। বন্ধুর কর্তব্য ব'লেই তোমার চলাফেরার প্রতি আমাকে নজর রাখতে হয়েচে। একটা অজানা অচেনা হতভাগাকে মাঠের মধ্যে থেকে ধ'রে এনে যে কাল সমস্ত বেলাটা কাটালে, তার মানে কি আমি বুঝতে পারিনে? শুধু কি তাই? সেদিন দুপুর রাত্রি পর্যন্ত তার সঙ্গে হাসি-তামাশা গল্প ক'রেও তোমার যথেষ্ট হ'ল না, সে রাত্রে কলকাতায় ফিরতে পারলে না, ছল ক'রে তাকে এইখানেই থাকতে হ'ল। এতে তোমার লজ্জা হয় না বটে, কিন্তু আমাদের যে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়ে গেল! সমাজে কারও সামনে মাথা তোলবার যে আর জো রইল না।

কথাটা এত বড় মর্মান্তিক না হইলে হয়ত বিজয়া অপমানে ক্রোধে সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করিয়া প্রতিবাদ করিত, কিন্তু এ আঘাত যেন তাহাকে অসাড় করিয়া ফেলিল।

রাসবিহারী আড়চোখে চাহিয়া তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রের প্রচণ্ড মহিমা বিজয়ার রক্তহীন মুখের উপর নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন; তারপরে বলিলেন, তবে এগুলো কি ভাল, না এ-সকল নিবারণ করার চেষ্টা করা আমার কাজ নয়?

বিজয়া স্তব্ধ হইয়া আছে দেখিয়া তিনি পুনরায় জোর দিয়া কহিলেন, না, চুপ ক'রে থাকলে হবে না বিজয়া—তোমাকে জবাব দিতে হবে।

তবুও যখন বিজয়া কথা কহিল না, তখন তিনি হাতের লাঠিটা পুনরায় মেঝেতে ঠুকিয়া তাড়া দিয়া কহিলেন, না, চুপ করে থাকলে চলবে না। এ-সকল গুরুতর ব্যাপার—জবাব দেওয়া চাই।

এতক্ষণে বিজয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার পাংশু ওষ্ঠাধর একবার একটু কাঁপিয়া

উঠিল; তারপর ধীরে ধীরে কহিল, ব্যাপার যত গুরুতর হোক, মিথ্যে কথার আমি কি উত্তর আপনাকে দিতে পারি?

রাসবিহারী তেজের সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, তা হ'লে একে তুমি মিথ্যে কথা ব'লে উড়োতে চাও নাকি?

বিজয়া আবার একটুখানি মৌন থাকিয়া তেমনি মৃদুকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল—আমি উড়োতে কিছুই চাইনে কাকাবাবু। শুধু এ যে মিথ্যে তাই আপনাকে বলতে চাই; এবং মিথ্যে ব'লে একে আপনি যে নিজেই সকলের চেয়ে বেশী জানেন, তাও এই সঙ্গে আপনাকে জানাতে চাই।

রাসবিহারী একেবারে থতমত খাইয়া গেলেন। তিনি প্রথমটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন বটে, কিন্তু শেষটার জন্য আদৌ ছিলেন না। কোন অবস্থাতেই যে বিজয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী এবং মিথ্যা দুর্নাম-প্রচারকারী বলিয়া তাঁহারি মুখের উপর অভিযোগ করিতে পারে, এ তাঁহার কল্পনারও অতীত। তাঁর নিজের কথা আর মুখে যোগাইল না—শুধু বিজয়ার কথাটাই কলের পুতুলের মত আবৃত্তি করিলেন—মিথ্যে কথা ব'লে আমি নিজেই সকলের চেয়ে বেশী জানি?

বিজয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনি গুরুজন—আপনার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করবার আমার প্রবৃত্তি হয় না। দলিলপত্র এখন থাক, মামলা-মকদ্দমার আবশ্যক বুঝলে তখন আপনাকে ডেকে পাঠাব, বলিয়া পাশের দরজা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিজয়ার সর্বাগ্রে মনে হইয়াছিল, কাল প্রভাতেই সে যেমন করিয়া হোক কলিকাতায় পলাইয়া এই ব্যাধের ফাঁদ হইতে আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু, উত্তেজনার প্রথম ধাক্কাটা যখন কাটিয়া গেল, তখন দেখিতে পাইল তাহাতে জালের ফাঁস যে শুধু বেশী করিয়া চাপিয়া বসিবে তাই নয়, অপবাদের ধুয়া সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া সেখানকার আকাশ পর্যন্ত কলুষিত করিতে বাকী রাখিবে না। তখন কলিকাতার সমাজেই বা সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? অথচ, এখানেও সে ঘরের বাহির হইতে পারিল না। যদিচ নিশ্চয় বুঝিতেছিল রাসবিহারী তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্য নয়, বরঞ্চ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়েই এই দুর্নামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং একান্ত নিরাশ না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই বাহিরে এ মিথ্যা প্রচার করিবেন না, তবুও দিন-দুই পরে কাছারির গোমস্তা যখন হিসাব সই করাইতে বিজয়ার দর্শন প্রার্থনা করিল, তখন সে অসুস্থতার ছুতা করিয়া চাকরকে দিয়া খাতাপত্র উপরে চাহিয়া আনাইল। আজ নিজের কর্মচারীকেও দেখা দিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল পাছে কোন ছিদ্র দিয়া এ কথা তাহার কানে গিয়া থাকে, এবং তাহার চক্ষেও অবজ্ঞা ও উপহাসের দৃষ্টি লুকাইয়া থাকে।

একটা জিনিস সে যেমন ভয় করিতেছিল তেমনি প্রাণ দিয়া কামনা করিতেছিল—তাহার পিতার পত্র লইয়া নরেন নিজেই উপস্থিত হইবে। কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পরে সে সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল পিয়নের হাত দিয়া। চিঠি আসিল বটে, কিন্তু সে ডাকে। নরেন নিজে আসিল না। কেন যে সে আসিল না তাহা অনুমান করিতে তাহার মুহূর্ত বিলম্ব হইল না। সে ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিল পাছে রাসবিহারী কোন ছলে এ কথা নরেনের কর্ণগোচর করিয়া তাহার এ বাটীর পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। চিঠি হাতে করিয়া বিজয়া ভাবিতে লাগিল। কিন্তু, এত সহজেই যদি এ দিকের পথ তাহার রুদ্ধ হইয়া যায়, এমনি অনায়াসে সেও যদি এই মিথ্যা কলঙ্কের ডালি তাহারি মাথায় তুলিয়া দিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে এ দুর্নামের বোঝা—তা সে যত বড় মিথ্যাই হোক—সে বহিয়া বেড়াইবে কোন্ অবলম্বনে? তখন এই মিথ্যা ভারই যে পরম সত্যের মত তাহাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে!

এমনি অভিভূতের মত স্থির হইয়া বসিয়া সে যে কত কি চিন্তা করিতে লাগিল তাহার সীমা নাই। তাহার বহুক্ষণ পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং এইবার তাহার পরলোকগত পিতৃদেবের হাতের লেখা কাগজ দুটি মাথায় চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বার বার করিয়া চোখ মুছিয়া চিঠি দুটি পড়িতে গেল, বার বার অশ্রুজলে দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গেল। অবশেষে অনেক বিলম্বে অনেক যত্নে যখন পড়া শেষ করিল, তখন পিতার আন্তরিক বাসনা তাহার কাছে আর অবিদিত রহিল না। এক সময়ে তিনি যে শুধু তাহারি জন্য নরেনকে মানুষ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন এ সত্য একেবারে স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া গেল; এবং এ কথা আর যাহারি অগোচরে থাকুক, রাসবিহারীর যে ছিল না, তাহাও বুঝিতে অবশিষ্ট রহিল না।

আরও পাঁচ-ছয় দিন কাটিয়া গেলে, একদিন সকালে বিজয়া ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া দেখিল বাড়িতে রাজমজুর লাগিয়াছে। তাহারা ভারা বাঁধিয়া সমস্ত বাড়িটা চুনকাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। কারণ ভাবিতে গিয়া তাহার অকস্মাৎ সর্বাঙ্গ শিথিল করিয়া মনে পড়িল, আগামী পূর্ণিমা তিথির আর মাত্র সাতদিন বাকী।

সারাদিন সতেজে কাজ চলিতে লাগিল; অথচ, সে একজন কাহাকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না ইহা কাহার আদেশে হইতেছে, কিংবা কেন এ বিষয়ে তাহার মতামত জানা হইল না।

বিকালবেলায় আজ অনেক দিনের পরে বিজয়া কানাই সিংকে সঙ্গে লইয়া নদীর তীরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। হঠাৎ দয়াল আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, আমি তোমাকেই খুঁজে বেড়াচ্চি মা।

বিজয়া আশ্চর্য হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, আর ত দেরি নেই, নিমন্ত্রণপত্র ছাপাতে হবে, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সমাদরের সঙ্গে আনবার চেষ্টা করতে হবে—তাই তাঁদের সব নাম-ধাম জানতে পারলে—

বিজয়া শক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নিমন্ত্রণপত্র বোধ হয় আমার নামেই ছাপান হবে?

এ বিবাহ যে সুখের নয় দয়াল তাহা মনে মনে জানিতেন। সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, না মা, তোমার নামে হবে কেন? রাসবিহারীবাবু বর-কন্যা উভয়েরই যখন অভিভাবক, তখন তাঁর নামেই নিমন্ত্রণ করা হবে স্থির হয়েছে।

বিজয়া কহিল, স্থির কি তিনিই করেছেন?

দয়াল ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁ, তিনিই করেছেন বৈ কি।

বিজয়া কহিল, তবে এও তিনিই স্থির করুন। আমার বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই।

দয়াল ইহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। বিজয়া সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, যে-চিঠিগুলো আপনি নরেনবাবুকে দিয়েছিলেন সে কি আপনি পড়েছিলেন?

দয়াল বলিলেন, না মা, পরের চিঠি আমি পড়ব কেন? নরেনের পিতার নাম দেখেই আমি বুঝেছিলাম, এ যখন তাঁর জিনিস, তখন তাঁর ছেলের হাতেই দেওয়া উচিত। একবার মনে হয়েছিল বটে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু—কোন দোষ হয়েছে কি মা?

বৃদ্ধকে লজ্জা পাইতে দেখিয়া বিজয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, তাঁর বাবার জিনিস তাঁকে দিয়েছেন, এ ত ঠিকই করেছেন। আচ্ছা, তিনি কি এ সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলেন নি?

দয়াল বলিলেন, না, কোন কথাই না। কিন্তু কিছু জানবার থাকলে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে আমি কালই তোমাকে বলতে পারি।

বিজয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, কালই বলতে পারবেন কেমন ক'রে?

দয়াল কহিলেন, তা বোধ হয় পারি। আজকাল তিনি প্রত্যহই আমাদের ওখানে আসেন কিনা।

বিজয়া শঙ্কিত হইয়া কহিল, আপনার স্ত্রীর অসুখ আবার বেড়েচে, কৈ, সে কথা ত আপনি আমাকে বলেন নি!

দয়াল একটু হাসিয়া বলিলেন, না, এখন তিনি বেশ ভালই আছেন। নরেনের চিকিৎসা আর ভগবানের দয়া। বলিয়া তিনি হাত জোড় করিয়া তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

বিজয়ার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে দয়ালের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তবে কেন তাঁকে প্রত্যহ আসতে হয়?

দয়াল প্রসন্ন-মুখে কহিতে লাগিলেন, আবশ্যক না থাকলেও জন্মভূমির মায়া কি সহজে কাটে মা! তা ছাড়া, আজকাল নরেনের কাজকর্ম কম, সেখানে বন্ধু-বান্ধবও বিশেষ কেউ নেই—তাই সন্ধ্যেবেলাটা এখানেই কাটিয়ে যান। বিশেষ, আমার স্ত্রী ত তাকে একেবারে ছেলের মতোই ভালবাসেন। ভালবাসার ছেলেও বটে। কিন্তু কথায় কথায় যদি এতদূরেই এসে পড়লে মা, একবার চল না কেন তোমার এ বাড়িতে?

চলুন, বলিয়া বিজয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

দয়াল বলিতে লাগিলেন, আমি ত এমন নির্মল, এমন স্বভাবতঃ ভদ্রলোক আমার এতটা বয়সে কখনো দেখ্‌তে পাইনি। নলিনীর ইচ্ছে সে বি. এ. পাশ ক'রে ডাক্তারি পড়ে। এ বিষয়ে তাকে কত উৎসাহ, কত সাহায্য যে করেন তার সীমা নেই।

বিজয়া চমকিয়া উঠিল। কলিকাতা হইতে প্রত্যহ এতদূরে আসিয়া সন্ধ্যা অতিবাহিত করিবার এই সন্দেহটাই এতক্ষণ তাহার বুকের ভিতরে বিষের মত ফেনাইয়া উঠিতেছিল। দয়াল ফিরিয়া চাহিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, তবে আর গিয়ে কাজ নেই মা—তুমি শ্রান্ত হয়ে পড়েচ।

বিজয়া কহিল, না চলুন।

তাহার গতির মৃদুতা লক্ষ্য করিয়াই দয়াল ক্লান্তির কথা তুলিতেছিলেন; কিন্তু তাহার মুখের চেহারা দেখিতে পাইলে এ কথা তিনি মুখে আনিতেও পারিতেন না।

তখন প্রতি পদক্ষেপে যে কঠিন ধরণী বিজয়ার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছিল, এ কথা অনুমান করা দয়ালের পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি পুনরায় নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, নরেনের সাহায্যে এর মধ্যেই নলিনী অনেকগুলো বই শেষ ক'রে ফেলেচে। লেখাপড়ায় দু'জনারই বড় অনুরাগ।

অনেকক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে বিজয়া প্রাণপণ চেষ্টায় আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি আর কিছু সন্দেহ করেন না?

দয়াল বিশেষ কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না। সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের সন্দেহ মা?

এ প্রশ্নের জবাব বিজয়া তৎক্ষণাৎ দিতে পারিল না। তাহার বুক যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। শেষে বলিল, আমার মনে হয় নলিনীর সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাব স্পষ্ট ক'রে স্বীকার করা উচিত।

দয়াল সায় দিয়া কহিলেন, ঠিক কথা। কিন্তু তার ত এখনো সময় যায়নি মা। বরঞ্চ আমার মনে হয়, দুজনের পরিচয় আরও একটু ঘনিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত সহসা কিছু না বলাই উচিত।

বিজয়া বুঝিল, এ প্রশ্ন অপরের মনেও উদয় হইয়াছে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু, নলিনীর পক্ষে ত ক্ষতিকর হ'তে পারে। তাঁর মন স্থির করতে হয়ত সময় লাগবে, কিন্তু ইতিমধ্যে নলিনীর—

সঙ্কোচ ও বেদনায় কথাটা আর তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিন্তু, দয়াল বোধ করি সমস্যার এই দিকটা তেমন চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, সত্যি কথা। কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে যতদূর শুনেছি, তাতে—কিন্তু, তোমাকে ত বলেছি, নরেনকে আমরা খুব বিশ্বাস করি। তাঁর দ্বারা যে কারও কোন ক্ষতি হতে পারে, তিনি যে ভুলেও কারও প্রতি অন্যায় করতে পারেন এ ত আমি ভাবতে পারিনে।

তিনি ভাবিতে নাই পারুন, কিন্তু তবুও ঠিক সেই সময়েই অন্যায় যে কোথায় এবং কতদূরে পর্যন্ত পৌঁছিতেছিল সে শুধু অন্তর্যামীই জানিতেছিলেন।

উভয়ে যখন দয়ালের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে। একটা টেবিলের দুদিকে দুখানা চেয়ারে বসিয়া নরেন্দ্র ও নলিনী। সম্মুখে খোলা বই। অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া উঠায় পড়া ছাড়িয়া তখন ধীরে ধীরে আলোচনা শুরু হইয়াছিল। নলিনী এই দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, সে-ই বিজয়াকে প্রথমে দেখিতে পাইয়া

কলকণ্ঠে সংবর্ধনা করিল। কিন্তু, বিজয়ার মুখ বেদনায় যে বিবর্ণ হইয়া গেল—তাহা সন্ধ্যার ম্লান আলোকে তাহার চোখে পড়িল না। নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন?

বিজয়া নমস্কারও ফিরাইয়া দিল না, প্রশ্নের উত্তরও দিল না। যেন দেখিতেই পায় নাই এমনি ভাবে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নলিনীকে কহিল, কৈ, আপনি ত আর একদিনও গেলেন না?

নরেন সুমুখে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, আর আমাকে বুঝি চিনতেও পারলেন না?

বিজয়া শান্ত অবজ্ঞার সহিত জবাব দিল, চিনতে পারলেই চেনা দরকার নাকি?

নলিনীকে কহিল, চলুন আপনার মামীমার সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি। বলিয়া পলকমাত্র এদিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে একপ্রকার ঠেলিয়া লইয়া উপরে চলিয়া গেল।

নলিনী সিঁড়ির কয়েক ধাপ উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, কিন্তু চা না খেয়ে যেন পালাবেন না নরেনবাবু!

নরেন ইহারও জবাব দিতে পারিল না—বিস্ময়ে, অপমানে একেবারে কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং বৃদ্ধ দয়াল তাহার এই অপ্রত্যাশিত লজ্জার অংশ লইবার জন্য বিরস-মুখে সেইখানেই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু, তবুও কেমন করিয়া যেন তাঁহার কেবলি সন্দেহ হইতে লাগিল, যাহা বাহিরে প্রকাশ পাইল ইহা ঠিক সেই বস্তুই নয়—এই অকারণ অবমাননার অন্তরালে দৃষ্টির আড়ালে যাহা রহিয়া গেল তাহা আর যাহাই হোক উপেক্ষা অবহেলা নয়।

কিছু পরে চায়ের জন্যে উপরে ডাক পড়িলে আজ নরেন্দ্র দয়ালের অনুরোধ এড়াইয়া নীচেই রহিয়া গেল। কিন্তু তাহাকে একাকী ফেলিয়া দয়াল উপরে যাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সহাস্যে কহিল, আমি ঘরের লোক, আমার কথা ভাববেন না দয়ালবাবু। কিন্তু, আপনার মান্য অতিথিটির সম্মান রাখা অবশ্যক। আপনি শীঘ্র যান।

দয়াল দুঃখিত এবং লজ্জিতভাবে উপরে যাইবার উপক্রম করিয়া কহিলেন, তা হ'লে তুমি কি একটু বসবে?

ভৃত্য আলো দিয়া গিয়াছিল। নরেন খোলা বইটা কাছে টানিয়া লইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ, বসবো বৈ কি!

প্রায় আধঘণ্টা পরে আবার তিনজনে নীচে নামিয়া আসিলে নরেন বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ না থাকিয়া চলিয়া গেলেই বোধ করি ইঁহারা আরাম অনুভব করিতেন, কারণ এই তাহার একাকী অপেক্ষা করাটাই সকলকে একসঙ্গে যেন লজ্জা ও কুণ্ঠার কশাঘাত করিল।

নলিনী সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনার চা নীচে আনতে বলে দিয়েচি—এলো বলে নরেনবাবু!

কিন্তু বিজয়া তাহাকে কোনপ্রকার সম্ভাষণ না করিয়া, এমন কি দৃক্‌পাত পর্যন্ত না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কানাই সিং দ্বারের কাছে বসিয়া ছিল, লাঠি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিজয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, আকাশে মেঘের আভাস পর্যন্ত নাই—নবমীর চাঁদ ঠিক সুমুখেই স্থির হইয়া আছে। তাহার মনে হইতে লাগিল পদতলের তৃণরাজি হইতে আরম্ভ করিয়া কাছে দূরে যাহা-কিছু দেখা যায়—আকাশ-প্রান্তর, গ্রামান্তের বনরেখা, নদী, জল সমস্তই এই নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় দাঁড়াইয়া ঝিমঝিম করিতেছে। কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই—পরিচয় নাই—কে যেন তাহাদের ঘুমের মধ্যে স্বতন্ত্র জগৎ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া যেখানে সেখানে ফেলিয়া গেছে—এখন তন্দ্রা ভাঙিয়া তাহারা পরস্পরের অজানা মুখের প্রতি অবাক্ হইয়া তাকাইয়া আছে। চলিতে চলিতে তাহার চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল এবং মুছিতে মুছিতে বার বার বলিতে লাগিল, আমি আর পারি না, আমি আর পারি না!

বাড়ি আসিতেই খবর পাইল রাসবিহারী কি জন্য সন্ধ্যা হইতে বাহিরের ঘরে অপেক্ষা করিয়া আছেন। শুনিতেই তাহার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল, এবং কোন কথা না কহিয়া

পাশের সিঁড়ি দিয়া উপরে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু, ইহাও তাহার অবিদিত ছিল না যে শত বিলম্বেও এই পরম সহিষ্ণু লোকটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটিবে না। তিনি প্রতীক্ষা করিয়া যখন আছেন, তখন, রাত্রি যত বেশী হোক, সাক্ষাৎ না করিয়া কোন মতেই নড়িবেন না।

অনতিকাল মধ্যেই দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া পরেশ জানাইয়া দিল বড়বাবু আসিতেছেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার চটিজুতার ও লাঠির শব্দ যুগপৎ শুনিতে পাওয়া গেল।

বিজয়া কহিল, আসুন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া রাসবিহারী চৌকিতে উপবেশন করিয়া বলিলেন, আমি তাই এতক্ষণ এদের বলছিলাম যে, এতগুলো চাকর-বাকরের মধ্যে এ হুঁশ কারও হ'লো না যে, বাড়ি থেকে দুটো লণ্ঠন নিয়ে যায়! দয়ালেরও এ ভয় হওয়া উচিত ছিল যে, মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোয় নির্ভর না ক'রে সঙ্গে একটা আলো দেওয়া প্রয়োজন! তাই ভাবি, ভগবান! এ সংসারে আত্মীয়-পরে কী প্রভেদটাই তুমি ক'রে রেখেচ! বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন। কিন্তু, বিজয়া কিছুই কহিল না। তখন রাসবিহারী একবার কাশিয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, যা করবার সবই আমি ক'রে রেখেচি; শুধু তোমার নামটা একটু লিখে দিতে হবে মা, এটা আবার কালকেই পাঠিয়ে দেওয়া চাই। বলিয়া কাগজখানা বিজয়ার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। বিজয়া দৃষ্টিপাতমাত্রই বুঝিল, ইহা তাহাদের ব্রাহ্মবিবাহ আইনমতে রেজেস্ট্রি করিবার আবশ্যক দলিল। ছাপা এবং হাতের লেখা আগাগোড়া দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিয়া অবশেষে সে মুখ তুলিল। বেশী সময় যায় নাই, কিন্তু, এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাহার মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। তাহার এতক্ষণের এতবড় বেদনা অকস্মাৎ কি একপ্রকার কঠিন ঔদাসীন্য ও নিদারুণ বিতৃষ্ণায় রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল। তাহার মনে হইল, জগতের সমস্ত পুরুষ একছাঁচে ঢালা। রাসবিহারী, দয়াল, বিলাস, নরেন্দ্র—আসলে কাহারো সঙ্গে কাহারো প্রভেদ নাই। শুধু বুদ্ধি ও অবস্থার তারতম্যে যা-কিছু প্রভেদ বাহিরে প্রকাশ পায়—এইমাত্র; নহিলে নিজের সুখ ও সুবিধার কাছে নীচতায়, কৃতঘ্নতায়, নির্মম নিষ্ঠুরতায় নারীর পক্ষে ইহারা সকলেই সমান। আজ দয়ালের আচরণটাই তাহাকে সবচেয়ে বেশী বাজিয়াছিল। কারণ, কেমন করিয়া যেন তাহার অসংশয়ে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তাহার হৃদয়ের একাগ্র কামনার জিনিসটি ইনি জানিতেন। অথচ এই দয়ালের জন্য সে কি না করিয়াছে! সমস্ত হৃদয় দিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, একান্ত আপনার ভাবিয়াছে। কিন্তু, নিজের ভাগিনেয়ীর কল্যাণের পার্শ্বে সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, তিনি এই শ্রদ্ধা ও স্নেহের কোন মর্যাদাই রাখিলেন না। তাঁহার চোখের নীচেই যখন দিনের পর দিন এক অনাত্মীয়া রমণীর মর্মান্তিক দুঃখের পথ প্রস্তুত হইতেছিল তখন কতটুকু দ্বিধা, কতটুকু করুণা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল! তবে রাসবিহারীর সহিত মূলতঃ তাঁহার পার্থক্য কোনখানে এবং কতটুকু? আর নরেন্দ্রের কথাটা সে গোড়া হইতেই চিন্তার বাহিরে ঠেলিয়া রাখিয়াছিল, এখনও তাহাকে বিচার করার ভান করিল না। শুধু এই কথাটাই এখন সে আপনাকে আপনি বারংবার বলিতে লাগিল, যদি সকলেই সমান, তবে বিলাসের বিরুদ্ধেই বা তাহার বিদ্বেষ কিসের? বরঞ্চ সে-ই ত সব চেয়ে নির্দোষ! সে-ই ত অপরাধ করিয়াছে সর্বাপেক্ষা কম! বস্তুতঃ, তাহারই ত শুধু বাক্যে এবং ব্যবহারে সামঞ্জস্য দেখা গেল! তাহার যা-কিছু অপরাধ সে ত শুধু তাহারই জন্য। একটু স্থির থাকিয়া বিজয়া আপনাকে আপনি পুনরায় বুঝাইল যে, বিলাসের ভালবাসা সত্য এবং সজীব বলিয়াই সে নীরবে সহিতে পারে নাই, বিরুদ্ধ শক্তিকে সর্বাঙ্গে হাতিয়ার বাঁধিয়া বাধা দিতে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। 'যাও' বলিতেই সস্তা ভদ্রতা বাঁচাইয়া অভিমানভরে চলিয়া যায় নাই! এই যদি অপরাধ তবে শাস্তি দিবার অধিকার আর যাহারই থাক, তাহার নাই। আরও একটা ব্যাপার মনে পড়িল, সে এই কঠিন বাস্তব সংসার। সেদিক দিয়া চিন্তা করিলে এই বিলাসের যোগ্যতাই ত সকলের চেয়ে বড় দেখা যায়। সেই অপদার্থ নরেন্দ্রর তুলনায় তাহাকে ত কোন মতেই উপেক্ষার পাত্র বলা সাজে না।

কিন্তু, রাসবিহারী তাহার গম্ভীর নির্বাক মুখের প্রতি চাহিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত

হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, তা হ'লে মা—এ ঘরে কালি-কলম আছে, না নীচ থেকে আনতে বলে দেব?

বিজয়া চমকিয়া চাহিল। অতীতের কুৎসিত, কদাকার স্মৃতির উপরে তাহার চিন্তার ডোর ধীরে ধীরে একখানি সূক্ষ্ম জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এই স্বার্থান্ধ বৃদ্ধের নিষ্ঠুর ব্যগ্রতা ছুরির মত পড়িয়া তাহাকে নিমেষে ছিন্নভিন্ন করিয়া আগাগোড়া অনাবৃত করিয়া দিল; এবং পরক্ষণেই বিজয়া একেবারে মরিয়ার মত নির্দয় হইয়া কহিল, আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি কাকাবাবু, আপনার কি এই মত যে, পাপ যতই বড় হোক, টাকার তলায় সমস্ত চাপা পড়ে যায়?

রাসবিহারী প্রশ্নের তাৎপর্য ঠিক ধরিতে না পারিয়া থতমত খাইয়া শুধু কহিলেন, কেন, কেন মা?

বিজয়া অবিচলিত দৃঢ়স্বরে বলিল, নইলে, আমার অতবড় পাপটাকে উপেক্ষা ক'রে কি আপনি আমাকে গ্রহণ করতে চাইতেন?

রাসবিহারী লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। হতবুদ্ধির মত বলিলেন, সে ত মিথ্যে কথা। অতিবড় শত্রুও ত তোমাকে ও অপবাদ দিতে পারে না মা!

বিজয়া কহিল, শত্রু হয়ত পারে না। কিন্তু, আমি জিজ্ঞাসা করি, বিলাসবাবু কি আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবেন?

রাসবিহারী কহিলেন, শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে না! তোমাকে! বিলাস! আচ্ছা—বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, বিলাস! বিলাস!

বিলাস নিকটে কোথাও বোধকরি প্রতীক্ষা করিতেছিল, ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। রাসবিহারী বলিয়া উঠিলেন, শোন কথা বিলাস! আমার বিজয়া মা বলচেন তুমি কি তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে? শোন একবার—

বিলাস সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না—প্রশ্নটা যেন সে বুঝিতেই পারিল না, এমনি ভাবে শুধু চাহিয়া রহিল।

বিজয়া কহিল, সেদিন কাকাবাবু বাড়ির চাকর-বাকরদের জিজ্ঞেসা ক'রে আমাকে এসে বলেছিলেন যে, আমি অনেক রাত্রি পর্যন্ত নিভৃতে নরেনবাবুর সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ ক'রেও তৃপ্ত হইনি; অবশেষে তিনি ট্রেন না পাবার অছিলায় সে রাত্রিটা এইখানে কাটিয়েই সকালবেলা চলে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায়—

কথাটা রাসবিহারীর উচ্চকণ্ঠে চাপা পড়িয়া গেল। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, কখ্‌খনো না! কখ্‌খনো না! এ যে অসম্ভব! এ যে ঘোর মিথ্যা—এ যে একেবারেই—ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিলাসের মুখ কালো হইয়া উঠিল। সে কহিল, না আমি শুনিনি।

রাসবিহারী আবার চেঁচাইতে লাগিলেন, কেমন ক'রে শুনবে বিলাস—এ যে ভয়ানক মিথ্যা! এ যে দারুণ—তাই আমি দরোয়ান ব্যাটাকে—তুমি দেখো দিকি, পরেশ ছোঁড়াটাকে আমি কি রকম শাস্তি দিই! আমি—

বিলাস কহিল, পৃথিবী-সুদ্ধ লোক যদি এ কথার সাক্ষ্য দিত তবুও বিশ্বাস করতাম না।

বিজয়া কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন করতেন না? সে কি আমার বিষয়ের জন্যে?

রাসবিহারী এই কথার সূত্র ধরিয়া পুনরায় বকিতে শুরু করিয়াছিলেন; কিন্তু, ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা থামিয়া গেলেন।

বিলাসের দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে লেশমাত্র উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা প্রকাশ পাইল না। শুধু শান্ত স্থির স্বরে জবাব দিল, না। তোমার বিষয়ের উপর আমার লেশমাত্র লোভ নেই।

সমস্ত কক্ষটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল; এবং এই নীরবতার ভিতর দিয়াই এতক্ষণে একই সঙ্গে সকলের যেন সমস্ত ব্যাপারটার কদর্য কুশ্রীতা চোখে পড়িয়া গেল। এ যেন হাটের মধ্যে একটা বেচা-কেনার পণ্য লইয়া দুই পক্ষে তীব্র কঠোর দরদস্তুর চলিতেছিল। যাহাতে লজ্জা, শরম, শ্রী, শোভার কিছুমাত্র অবকাশ ছিল না—শুধু দুটা মানুষ এক

উলঙ্গ স্বার্থের দুই দিকে দৃঢ়-মুষ্টিতে চাপিয়া পরস্পরের কাছে ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণে টানা-ছেঁড়া করিতেছিল।

রাসবিহারী তাঁহার বহু ক্লেশার্জিত পরিণত বয়সের প্রশান্ত গাম্ভীর্য বিসর্জন দিয়া যেভাবে একটা ইতরের মত গণ্ডগোল চেঁচামেচি করিতেছিলেন, বিলাসের ভাষা ও সংযমের সম্মুখে সে দৃটি তাঁহাকেও যেমন বাজিল, বিজয়াও নিজের একান্ত লজ্জাহীন প্রগল্‌ভতায় মর্মে মরিয়া গেল। বিপদ যত গুরুতরই হোক, কোন ভদ্রমহিলাই যে এতদূর আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনার চরিত্রকে মীমাংসার বিষয়ীভূত করিয়া পুরুষের সহিত এমন করিয়া মর্যাদাহীন বাদ-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে পারে, ক্ষণকালের জন্য এ যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া তাহার বোধ হইল। মনে হইল, দাম্পত্য-জীবনের যত কিছু মাধুর্য, যত কিছু পবিত্রতা আছে সমস্তই যেন তাহার জন্য একেবারে উদ্ঘাটিত হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।

ঘরের নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিলাসই আবার কথা কহিল। বলিল, বিজয়া, বাবা যাই করুন, যাই বলুন, আমরা তাঁকে বুঝতে পারি না পারি—কিন্তু এই কথাটা আমাদের কোন মতে বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়—যিনি ব্রহ্মপদে আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি কখনো অন্যায় করতে পারেন না। আমি বলচি তোমাকে, তোমাকে ছাড়া তোমার বিষয়-সম্পত্তির প্রতি আমাদের লেশমাত্র স্পৃহা নাই।

বিজয়া তাহার পাংশু মুখ ও মলিন চোখ দুটি বিলাসের মুখের ওপর ক্ষণকাল স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি বলচেন?

বিলাস অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিজয়ার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, আমার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে বিজয়া, আজ তা হ'লে আমি তোমাদের কাছে সত্য কথাই বলচি।

শুধু মুহূর্তকাল উভয়ে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বিজয়া আস্তে আস্তে নিজের হাতখানি মুক্ত করিয়া লইয়া টেবিলের কাছে আসিয়া কলম তুলিয়া লইল। পলকের জন্য হয়ত একবার দ্বিধা করিল, হয়ত করিল না—কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—কিন্তু পরক্ষণেই বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিয়া কাগজখানি রাসবিহারীর হাতে আনিয়া দিয়া কহিল, এই নিন।

রাসবিহারী দলিলখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিলেন, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া বনমালীর শোকে অনেক অশ্রু ব্যয় করিয়া, এবং নিরাকার পরব্রহ্মের অসীম করুণার বিস্তর গুণগান করিয়া রাত্রি হইতেছে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

পিতৃদেব চলিয়া গেলে বিলাস আর একবার গম্ভীর এবং কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি জানি আমাকে তুমি ভালবাস না। কিন্তু, সাধারণ লোকের মত আমিও যদি সেই ভালবাসাকেই উর্ধ্বে স্থান দিতাম, তা হ'লে আজ মুক্তকণ্ঠে ব'লে যেতাম—বিজয়া, তুমি যাকে ভালবেসেচ, তাকেই বরণ কর! আমার মধ্যে সে শক্তি, সে উদারতা, সে ত্যাগ আছে! বাবার কাছে আমি আজীবন মিথ্যা শিক্ষা পেয়ে আসিনি।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিল, কিন্তু, একটা সকাম রূপ-তৃষ্ণা, যাকে ভালবাসা ব'লে মানুষ ভুল করে, সেই কি ব্রাহ্ম-কুমার-কুমারীর বিবাহের চরম লক্ষ্য? না, তা কিছুতেই নয়, কিছুতেই হ'তে পারে না। এই বিরাট উদ্দেশ্য সত্য! মুক্তি! পরব্রহ্মপদে যুগ্ম আত্মার একান্ত আত্মসমর্পণ! আমি বলচি তোমাকে, একদিন আমার কাছে এ সত্য তুমি বুঝবেই বুঝবে। এই নরেন যখন আসেনি, তখনকার কথাগুলা একবার স্মরণ ক'র দেখি বিজয়া!

কি একটা বলিবার জন্য বিজয়া মুখ তুলিল, কিন্তু তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিয়া প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে বাক্‌রোধ হইয়া গেল—মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। সে শুধু কেবল হাত দুটি কপালে তুলিয়া একটা নমস্কার করিয়াই পাশের দরজা দিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নিদারুণ সংশয়ের বেড়া-আগুনের মধ্যে বিজয়ার চিত্ত যে কতদূর পীড়িত এবং উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আপনাকে চূড়ান্তভাবে সমর্পণ করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত সে ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই। আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়াই বুঝিল, তাহার মন খুব শান্ত হইয়া গেছে। কারণ, মনের মধ্যে চাঞ্চল্যের আভাসটুকুও খুঁজিয়া পাইল না। বাহিরে চাহিতে মনে হইল সমস্ত আকাশটা যেন শ্রাবণ-প্রভাতের মত ধূসর মেঘের ভারে পৃথিবীর উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছে। এমন দিনে শয্যাত্যাগ করা না-করা তাহার সমান বলিয়া বোধ হইল, এবং কেন যে অন্যান্য দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে সামান্য বেলা হইলেও অন্তঃকরণ ব্যথিত লজ্জিত হইয়া উঠিত—মনে হইত, অনেক সময় নষ্ট হইয়া গেছে, আজ তাহা ভাবিয়াই পাইল না। তাহার এমন কি কাজ আছে যে, দু-একঘণ্টা বিছানায় পড়িয়া থাকিলে চলে না। বাটীতে দাস-দাসী ভরা, বৃহৎ জমিদারি সুশৃংখলায় চলিতেছে, তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন যদি এমনি আরামে, এমনি শান্তিতে কাটিয়া যায়, ত তার চেয়ে আর ভাল জিনিস কি আছে? জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিল গাছতলার সবুজ রঙটা পর্যন্ত আজ কি একরকম বদলাইয়া গিয়া তাহার পাতাগুলা পর্যন্ত স্থির গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। কলহ-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক, অশান্তি-উপদ্রব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আর কিছু নাই—একটা রাত্রির মধ্যেই সমস্ত যেন একেবারে মুনি-ঋষির তপোবন হইয়া উঠিয়াছে।

হৃদয়জোড়া এই চরম অবসাদকে শান্তি কল্পনা করিয়া বিজয়া পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত হয়ত আরও বহুক্ষণ বিছানায় পড়িয়া থাকিতে পারিত, কিন্তু পরেশের মা আসিয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে শান্তিভঙ্গ করিয়া দিল। যে লোক প্রত্যুষেই শয্যাত্যাগ করে, তাহার পক্ষে এতখানি বেলায়—সে উৎকণ্ঠিতচিত্তে বারংবার ডাকাডাকি করিয়া কপাট খোলাইয়া তবে ছাড়িল।

হাতমুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া বিজয়া নীচে নামিতেছিল; শুনিল, বাহিরে রাসবিহারী আজ স্বয়ং আসিয়া জনমজুরদের কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। মাত্র দুটি দিন আর বাকী, এইটুকু সময়েই সমস্ত বাড়িটাকে মাজিয়া ঘষিয়া একেবারে নূতন করিয়া তুলিতে হইবে।

বিজয়া একটু পূর্বেই ভাবিয়াছিল, গতরাত্রে যে দুরূহ সমস্যার শেষ এবং চরম নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, কোনও কারণে কাহারও দ্বারা যাহার অন্যথা ঘটিতে পারে না, তাহার ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ লইয়া আর সে মনে মনেও কখনো বিতর্ক করিবে না। তাহা মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় মঙ্গলের জন্যেই হইয়াছে এ বিশ্বাসে সন্দেহের ছায়াটুকুও আর পড়িতে দিবে না। কিন্তু সহসা দেখিতে পাইল তাহা সম্ভব নয়। রাসবিহারী নীচে আছেন, নামিলেই মুখোমুখি সাক্ষাৎ হইয়া যাইবে ইহা মনে করিতেই তাহার সর্বাঙ্গ বিমুখ হইয়া আপনিই সিঁড়ি হইতে ফিরিয়া আসিল। বহুক্ষণ ধরিয়া বারান্দায় পায়চারি করিয়াও যখন সময় কাটিতে চাহিল না, তখন অকস্মাৎ তাহার বাল্যবন্ধুদের কথা মনে পড়িল। বহুকাল কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ নাই, চিঠিপত্রও বন্ধ ছিল, আজ তাহাদিগকেই স্মরণ করিয়া সে কয়েকখানা পত্র লিখিবার জন্য তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। মনের মধ্যে তাহার কত না বেদনা সঞ্চিত হইয়া ছিল। চিঠির মধ্যে দিয়া তাহাদিগকেই মুক্তি দিতে গিয়া সে দেখিতে দেখিতে একেবারে মগ্ন হইয়া গেল। কেমন করিয়া যে সময় কাটিল, কত যে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, তাহার কিছুই খেয়াল ছিল না। এমনি সময়ে পরেশের মা দ্বারের কাছে আসিয়া কহিল, বেলা যে একটা বেজে গেল দিদিমণি, খাবে না?

ঘড়ির প্রতি চাহিয়া পুনশ্চ লেখায় মনঃসংযোগ করিতে যাইতেছিল, পরেশের মা সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে কহিল, ও মা, ডাক্তারবাবু আসচেন যে। বলিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল। বিজয়া চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, ঠিক সোজা বারান্দার অপর প্রান্তে পরেশের পিছনে নরেন্দ্র আসিতেছে।

ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার সে উপরে আসিলেও নিজের ইচ্ছায় এমন বিনা সংবাদে উঠিয়া আসিতে পারে, ইহা বিজয়া ভাবিতেও পারিত না। তাহার মুখ শুষ্ক, বড় বড়

রুক্ষ চুল এলোমেলো; কিন্তু সে ঘরে পা দিয়াই যখন বলিয়া উঠিল, সেদিন আমাকে চিনতে চাননি কেন, বলুন ত? বলিয়া একটা চৌকি অধিকার করিয়া বসিল। তখন তাহার মুখে, তাহার কণ্ঠস্বরে, তাহার সর্বদেহে হৃদয়-ভারাক্রান্ত ক্লান্তি এমন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিল যে, বিজয়া জবাব দিবে কি, দুর্বিষহ বেদনায় একেবারে চমকিয়া গেল। উৎকণ্ঠিত ব্যগ্রতায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি হয়েছে নরেনবাবু? কোন অসুখ করেনি ত?

নরেন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না সেরে গেছে। হয়েও ছিল সামান্য একটু জ্বর, কিন্তু তাতেই হঠাৎ এমন দুর্বল ক'রে ফেলেছিল যে, আগে আসতে পারিনি—কিন্তু সেদিন দোষটা কি করেছিলাম, আজ বলুন ত?

পরেশ দাঁড়াইয়া ছিল; বিজয়া তাহাকে কহিল, তোর মাকে শিগগির কিছু খাবার আনতে বল গে যা পরেশ। নরেনকে কহিল, সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি বোধ করি।

না, কিন্তু তার জন্যে আমি ব্যস্ত হইনি।

কিন্তু আমি ব্যস্ত হয়েচি, বলিয়া বিজয়া পরেশের পিছু পিছু নিজেও নীচে চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে খাবারের থালার উপর একবাটি গরম দুধ লইয়া নিজেই উপস্থিত হইল এবং নিঃশব্দে অতিথির সম্মুখে ধরিয়া দিল। আহারে মন দিয়া নরেন সহাস্যে কহিল, আপনি একটি অদ্ভুত লোক। পরের বাড়িতে চিনতেও চান না এবং নিজের বাড়িতে এত বেশী চেনেন যে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। সেদিনের কাণ্ড দেখে ভাবলুম, খবর দিলে হয়ত দেখাই করবেন না, তাই বিনা সংবাদেই পরেশের সঙ্গে এসে আপনাকে ধরেছি। এখন দেখছি তাতে ঠকিনি।

বিজয়া কোন কথা কহিল না। নরেন্দ্র নিজেও একটু মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, এই সামান্য জ্বর, কিন্তু এত নির্জীব ক'রে ফেলেছে যে, আমি আপনিই আশ্চর্য হয়ে গেছি। আপনাদের সঙ্গে আমার শীঘ্র দেখা হবার সম্ভাবনা থাকলে আজ হয়ত আসতাম না। এই পথটা আসতে আমার সত্যিই ভারী কষ্ট হয়েছে।

বিজয়া তেমনি নিঃশব্দে রহিল; বোধ করি সে কথাটা ঠিক বুঝিতেও পারিল না। নরেন দুধের বাটিটা নিঃশেষ করিয়া রাখিয়া দিয়া কহিল, আপনারা বোধ করি শোনেন নি যে, আমি এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। আমার আজকে তাড়াতাড়ি আসবার এও একটা কারণ, বলিয়া পকেট হইতে একখানা লাল রঙের চিঠির কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র আমি পেয়েছি। কিন্তু, দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হবে না। সেই দিন সকালেই আমাদের জাহাজ করাচী থেকে ছাড়বে।

বিজয়া ভীত হইয়া বলিল, করাচী থেকে? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

নরেন কহিল, সাউথ আফ্রিকায়। পশ্চিমেও একটা যোগাড় হয়েছিল বটে, কিন্তু চাকরি যখন করতেই হবে, তখন বড় দেখে করাই ভাল। আমার পক্ষে পাঞ্জাবও যা, কেপ-কলোনিও ত তাই। কি বলেন? হয়ত আমাদের আর কখনো দেখাই হবে না।

শেষের কথাগুলা বোধ করি বিজয়ার কানেও গেল না। সে অত্যন্ত উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিল, নলিনী কি রাজী হয়েছেন? হ'লেও বা আপনি এত শীঘ্র কি ক'রে যেতে পারেন, আমি ত বুঝতে পারিনে! তাঁকে সমস্ত খুলে বলেছেন কি? আর এত দূরেই বা তিনি কেমন ক'রে মত দিলেন?

নরেন হাসিমুখে বলিল, দাঁড়ান, দাঁড়ান! এখনও কাউকে সমস্ত কথা বলা হয়নি বটে, কিন্তু—

কথাটা শেষ করিতে দিবার ধৈর্যও বিজয়ার রহিল না, সে মাঝখানেই একেবারে আগুন হইয়া বলিয়া উঠিল, সে কোনমতেই হ'তে পারে না। আপনারা কি আমাদের বাক্স-বিছানার সমান মনে করেন যে, ইচ্ছে থাক না-থাক দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়িতে তুলে দিলেই সঙ্গে যেতে হবে? সে কিছুতেই হবে না। তাঁর অমতে কোন মতেই তাঁকে তত দূর নিয়ে যেতে পারবেন না।

নরেনের মুখ মলিন হইয়া গেল। বিহ্বলের ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, ব্যাপারটা কি আমাকে বুঝিয়ে বলুন ত? এখানে আসবার পূর্বেই দয়ালবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল; তিনিও শুনে হঠাৎ চমকে উঠে, এই রকম কি একটা আপত্তি তুললেন, আমি বুঝতেই

পারলাম না। এত লোকের মধ্যে নলিনীর মতামতের উপরেই বা আমার যাওয়া-না-যাওয়া কেন নির্ভর করে, আর তিনিই বা কিসের জন্যে বাধা দেবেন এসব যে ক্রমেই হে'য়ালি হয়ে উঠছে। কথাটা কি, আমাকে খুলে বলুন দেখি।

বিজয়া স্থিরদৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তাঁর সঙ্গে একটা বিবাহের প্রস্তাব কি আপনি করেন নি?

নরেন একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল। কহিল, না, কোন দিন নয়!

বিজয়ার মুখের উপর সহসা এক ঝলক রক্ত ছুটিয়া আসিয়া সমস্ত মুখ আরক্ত করিয়া দিল। কিন্তু, চক্ষের পলকে আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, না করলেও কি করা উচিত ছিল না? আপনার মনোভাব ত কারও কাছে গোপন নেই!

নরেন অনেকক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া বলিল, এ অনিষ্ট কার দ্বারা হয়েছে, আমি তাই শুধু ভাবছি। তাঁর নিজের দ্বারা কদাচ ঘটেনি, কেননা তিনি প্রথম থেকেই জেনেছিলেন—এ অসম্ভব। কিন্তু—

বিজয়া জিজ্ঞাসা করিল, অসম্ভব কেন?

নরেন কহিল, সে থাক। তবে, একটা কারণ এই যে, আমি হিন্দু এবং তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের। তা ছাড়া, আমাদের জাতও এক নয়।

বিজয়া মলিন হইয়া কহিল, আপনি কি জাত মানেন?

নরেন কহিল, মানি বৈ কি। হিন্দুসমাজে যে জাতিভেদ আছে, একের সঙ্গে অপরের বিবাহ হয় না—এ কি আপনিও মানেন না?

বিজয়া কহিল, মানি, কিন্তু ভাল ব'লে মানিনে। আপনি শিক্ষিত হয়ে একে ভাল ব'লে মানেন কি ক'রে?

নরেন হাসিতে লাগিল। কহিল, ডাক্তারের বুদ্ধিটা সাধারণতঃ একটু ঘোলাটে ধরনের হয়। বিশেষ ক'রে আমার মত যারা মাইক্রস্কোপের মধ্যে দিয়ে জীবাণুর মত তুচ্ছ জিনিস নিয়েই কাল কাটায়। তাই এ ক্ষেত্রে আমাকে না হয় মাপ ক'রেই নিন না।

বিজয়া বুঝিল, নরেন্দ্র জাতিভেদের ভাল-মন্দর প্রশ্নটা কৌশলে এড়াইয়া গেল, তাই রুষ্টমুখে কহিল, আচ্ছা, অন্য জগতের কথা থাক। কিন্তু জাত যেখানে এক, সেখানেও কি শুধু আলাদা ধর্মমতের জন্যই বিবাহ অসম্ভব বলতে চান? আপনি কিসের হিন্দু? আপনি ত একঘরে। আপনার কাছেও কি কোন ব্রাহ্মকুমারী বিবাহযোগ্যা নয় মনে করেন? এত অহংকার আপনার কিসের জন্যে? আর এই যদি সত্যিকার মত, তবে সে কথা গোড়াতেই ব'লে দেননি কেন?

বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল এবং তাহাই লুকাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু নরেন্দ্রের দৃষ্টিকে একেবারে ফাঁকি দিতে পারিল না। সে কিছু আশ্চর্য হইয়াই কহিল, কিন্তু এখন যা বলচেন, এ ত আমার মত নয়।

বিজয়া মুখ না ফিরাইয়াই অবরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল, নিশ্চয় এই আপনার সত্যিকার মত।

নরেন্দ্র কহিল, না। আমাকে পরীক্ষা করলে টের পেতেন, এ আমার সত্যিকার কেন, মিথ্যেকার মতও নয়। তা ছাড়া, নলিনীর কথা নিয়ে আপনি মিথ্যে কেন কষ্ট পাচ্ছেন? আমি জানি, তাঁর মন কোথায় বাঁধা আছে; এবং আমিও যে কেন পৃথিবীর আর এক প্রান্তে পালাচ্ছি, সে তিনিও ঠিক বুঝবেন। সুতরাং আমার যাওয়া নিয়ে আপনি নিরর্থক উদ্বিগ্ন হবেন না।

বিজয়া বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাঁর অমত না হ'লেই আপনি যেখানে খুশী যেতে পারেন মনে করেন?

নরেনের বুকের মধ্যে কথাগুলো তড়িৎ-রেখার ন্যায় শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিও গিয়া টেবিলের উপরে সেই লাল রঙের নিমন্ত্রণ-পত্রের উপর পড়িল। সে এক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সে ঠিক, আমি আপনার অমতেও কিছু করতে পারিনে। কিন্তু আপনি ত আমার সমস্ত কথাই জানেন। আমার জীবনের সাধও আপনার অজ্ঞাত নেই। বিদেশে সে সাধ হয়ত একদিন পূর্ণ হ'তেও পারে; কিন্তু এ দেশে

এত বড় নিষ্কর্মা দীন-দরিদ্রের থাকা না-থাকায় কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আমাকে যেতে বাধা দেবেন না।

বিজয়া আনত-মুখে ক্ষণকাল নির্বাক থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আপনি দীন-দরিদ্র ত নয়। আপনার সমস্তই আছে, ইচ্ছে করলেই ত সমস্ত ফিরে নিতে পারেন!

নরেন কহিল, ইচ্ছে করলেই পারিনে বটে, কিন্তু আপনি যে দিতে চেয়েছিলেন, সে আমার মনে আছে, এবং চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু দেখুন, নেবারও একটা অধিকার থাকা চাই—সে অধিকার আমার নেই।

বিজয়া তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই প্রত্যুত্তর করিল, আছে বৈ কি! বিষয় আমার নয়, বাবার। নইলে সেদিন তাঁর যথাসর্বস্ব দাবীর কথা আপনি পরিহাসচ্ছলেও মুখে আনতে পারতেন না। আমি হ'লে কিন্তু এখানেই থামতুম না। তিনি যা দিয়ে গেছেন, সমস্ত জোর ক'রে দখল করতুম, তার একতিল ছেড়ে দিতুম না।

নরেন কোন কথা কহিল না। বিজয়াও আর কিছু না বলিয়া নতনেত্রে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মিনিট-দুই এমনি নীরবে কাটিবার পরে অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া বিজয়া মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল, নরেনের সমস্ত চেহারাটা যেন কি এক রকম হইয়া গেছে। দুজনের চোখাচোখি হইবামাত্রই সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, নলিনী ঠিকই বুঝেছিল বিজয়া, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি। আমার মত একটা অকেজো অপদার্থ লোককেও যে কারও কোন প্রয়োজন হ'তে পারে, এ আমি অসম্ভব ব'লে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যিই যদি এই অসঙ্গত খেয়াল তোমার হয়েছিল, শুধু একবার হুকুম করনি কেন? আমার পক্ষে এর স্বপ্ন দেখাও যে পাগলামি বিজয়া!

আজ এতদিন পরে তাহার মুখে নিজের নাম শুনিয়া বিজয়ার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল; সে মুখের উপর সজোরে আঁচল চাপিয়া ধরিয়া উচ্ছ্বসিত রোদন সংবরণ করিতে লাগিল।

নরেন পিছনে পদশব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দয়াল ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।

দয়াল দ্বারের উপরে দাঁড়াইয়া এক মুহূর্ত নিঃশব্দে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তার পরে ধীরে ধীরে বিজয়ার কাছে গিয়া তাহার সোফার একান্তে বসিয়া মাথার উপর ডান হাতটি রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, মা।

সে তাঁহার আগমন অনুভব করিয়াছিল এবং প্রাণপণে এই লজ্জাকর ক্রন্দন রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু এই করুণ সুরে মাতৃ-সম্বোধনের ফল একেবারে বিপরীত হইল। কি জানি, তাহার মৃত পিতাকে মনে পড়িয়াই ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল কি না—সে চক্ষের পলকে বৃদ্ধের দুই জানুর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দয়ালের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। এ সংসারে একমাত্র তিনিই শুধু এই মর্মান্তিক রোদনের আগাগোড়া ইতিহাসটা জানিতেন। মাথার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, শুধু আমার দোষেই এই ভয়ানক অন্যায় হ'ল মা—শুধু আমিই এই দুর্ঘটনা ঘটালুম। নলিনীর সঙ্গে এতক্ষণ আমার এই কথাই হচ্ছিল—সে সমস্তই জানত। কিন্তু, সে জানত, নরেনই মনে মনে তোমাকে—কিন্তু নির্বোধ আমি সমস্ত ভুল বুঝে তোমাকে উলটো খবর দিয়ে শুধু এই দুঃখ ঘরে ডেকে আনলাম। এখন বুঝি আর কোন প্রতিকার—

দেওয়ালের ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। তিনজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার ক্রোড়ের মধ্যে বিজয়ার দুর্জয় দুঃখের বেগ ক্রমশঃ প্রশমিত হইয়া আসিতেছে অনুভব করিয়া দয়াল অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে তাহার পিঠের উপর হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন, এর কি আর কোন উপায় হ'তে পারে না মা?

বিজয়া তেমনি মুখ লুকাইয়া রাখিয়াই ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, না—না, মরণ ছাড়া আর আমার কোন পথ নেই।

দয়াল কহিতে গেলেন, ছি মা, কিন্তু—

বিজয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, না—না, এর মধ্যে আর কোন

কিন্তু নেই। আমি কথা দিয়েছি—বে'চে থাকতে সে আমি ভাংগতে পারব না দয়ালবাব! মরতে না পারলে আমি—, বলিতে বলিতেই আবার তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। দয়ালের গলা দিয়াও আর কথা বাহির হইল না। তিনি নীরবে ধীরে ধীরে তাহার চুলের মধ্যে শুধু হাত বুলাইতে লাগিলেন।

পরেশের মা বাহির হইতে ছেলেকে দিয়া বলাইল, মাঠান, বেলা তিনটে বেজে গেল যে!

সংবাদ শুনিয়া দয়াল অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং স্নানাহারের জন্য নির্বন্ধের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিবার যত্ন করিতে লাগিলেন।

পরেশ পুনরায় কহিল, তোমার জন্যে কেউ যে খেতে পারছি নে মাঠান।

তখন চোখ মুছিয়া বিজয়া উঠিয়া বসিল, এবং কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া ধীরপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

দয়াল কহিলেন, নরেন, তোমারও ত এখনো খাওয়া হয়নি?

নরেন অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, মুখ তুলিয়া কহিল, না।

তবে আমার সংগে বাড়ি চল।

চলুন, বলিয়া সে দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দয়ালের সংগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আসন্ন বিবাহোৎসব উপলক্ষে কয়েকটা প্রয়োজনীয় কথাবার্তার পরে পিতাপুত্র রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী প্রস্থান করিলে বিজয়া তাহার পড়িবার ঘরে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। দয়াল এমনি তন্ময় হইয়া বসিয়াছিলেন যে কাহারও আগমন লক্ষ্যও করিলেন না। তিনি কখন আসিয়াছেন, কতক্ষণ বসিয়া আছেন, বিজয়া জানিত না। কিন্তু তাঁহার সেই তম্গত ভাব দেখিয়া ধ্যান ভাংগিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; সে যেমন আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। কিন্তু প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়াও যখন দেখিতে পাইল, তিনি একই ভাবে বসিয়া আছেন, তখন ধীরে ধীরে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

দয়াল চকিত হইয়া কহিলেন, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি মা।

বিজয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, তা হ'লে ডাকেন নি কেন?

দয়াল কহিলেন, তোমরা কথা কইছিলে ব'লে আর বিরক্ত করিনি। কাল দুপুরবেলা আমার ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রইল মা। না মা, না সে কিছুতেই হবে না। পাছে 'না' ব'লে বিদায় কর, সেই ভয়ে এই পথ হে'টে আবার নিজে এসেছি। কিন্তু দুপুর রোদে হে'টে যেতে পারবে না ব'লে দিচ্ছি; আমি পালকি-বেহারা ঠিক ক'রে রেখেছি, তারা এসে তোমাকে ঠিক সময়ে নিয়ে যাবে।

বৃদ্ধের সকরুণ কথায় বিজয়ার চোখ ছলছল করিয়া আসিল; কহিল, একটা চিঠি লিখে পাঠালেও আমি 'না' বলতুম না। কেন অনর্থক আবার নিজে হে'টে এলেন?

দয়াল উঠিয়া আসিয়া বিজয়ার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, মনে থাকে যেন, বুড়ো ছেলেকে কথা দিচ্ছ মা। না গেলে আবার আমাকে ছুটে আসতে হবে—কোন মতেই ছাড়ব না।

বিজয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

কিন্তু এই আগ্রহাতিশয্যে সে মনে মনে বিস্মিত হইল। একে ত ইতিপূর্বে কোনদিনই তিনি নিমন্ত্রণ করেন নাই। তাহাতে সান্ধ্যভোজনের পরিবর্তে এই মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা, এবং প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্য এইরূপ বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ, কেমন যেন ঠিক সহজ এবং সাধারণ নয় বলিয়াই তাহার সন্দেহ হইল। আজ দুপুরবেলাও যে এই অকারণ নিমন্ত্রণের সংকল্প তাঁহার মনের মধ্যে ছিল না, তাহা নিশ্চিত; অথচ ইহারই মধ্যে যানবাহনের বন্দোবস্ত পর্যন্ত করিয়া আসিতে তিনি অবহেলা করেন নাই।

মনের অস্বস্তি গোপন করিয়া বিজয়া ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কারণটা কি, শুনতে পাইনে?

দয়াল লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া উত্তর দিলেন, না মা, সেটি তোমাকে পূর্বাহ্নে জানাতে পারব না।

বিজয়া কহিল, তা না বলেন, নিমন্ত্রিতদের নাম বলুন?

দয়াল কহিলেন, তুমি ত সবাইকে চিনবে না মা। তাঁরা আমার ঐ পাড়ারই বন্ধু। যাঁদের চিনবে, তাঁদের একজনের নাম রাসবিহারী, অপরের নাম নরেন্দ্র।

দয়াল চলিয়া গেলে বিজয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত স্থির হইয়া বসিয়া মনে মনে ইহার হেতু অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু যতই ভাবিতে লাগিল, কি একটা অশুভ সংশয়ে মনের অন্ধকার নিরন্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

কিন্তু পরদিন বেলা আড়াইটা পর্যন্ত যখন পালকি আসিয়া পেঁছিল না, বিজয়া প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তখন একদিকে যেমন বিস্ময়ের অবধি রহিল না, অপর দিকে তেমনি একটা আরাম বোধ করিতে লাগিল। পরেশের মা সঙ্গে যাইবে, এইরূপ একটা কথা ছিল। সে বোধ করি এইবার লইয়া দশবার আসিয়া কিছু খাইবার জন্য বিজয়াকে পীড়াপীড়ি করিল, এবং বুড়া দয়ালের ভীমরতি হইয়াছে কিনা, এবং নিমন্ত্রণের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিল। অথচ লোক পাঠাইয়া সংবাদ লইতেও বিজয়ার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কারণ সত্যই যদি কোন অচিন্তনীয় কারণে তিনি নিমন্ত্রণ করিবার কথা বিস্মৃত হইয়া থাকেন, ত তাঁহাকে অপরিসীম লজ্জায় ফেলা হইবে। এই অভূতপূর্ব অবস্থা-সংকটের মধ্যে তাহার দ্বিধাগ্রস্ত মন কি করিবে, কিছুই যখন নিশ্চয় করিতে পারিতেছে না, এমন সময় পরেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া খবর দিল, পালকি আসিতেছে।

বিজয়া যখন যাত্রা করিল, তখন বেলা অপরাহ্ণ। রাসবিহারী তাঁহার জনমজুর লইয়া অতিশয় ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি পালকির পার্শ্বে আসিয়া সহাস্যে বলিলেন, দয়ালের হঠাৎ এমন লোক খাওয়ানোর ধুম পড়ে গেল কেন, সে ত জানিনে। সন্ধ্যার পরে আমাকেও যেতে হবে, বিশেষ ক'রে বলে গেছেন। কিন্তু পালকি পাঠাতে রাত্রি করলে যেতে পারব না, সে কিন্তু ব'লে দিয়ো মা।

দয়ালের বাটীর দ্বারের উপর আম্র-পল্লবের সারি দেওয়া, উভয় পার্শ্বে জলপূর্ণ কলস—বিজয়া বিস্মিত হইল। ভিতরে পা দিতেই—দয়াল গ্রামস্থ জন-কয়েক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিতেছিলেন—ছুটিয়া আসিয়া 'মা' বলিয়া তাহার হাত ধরিলেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে বিজয়া রুষ্ট অভিমানের সুরে কহিল, ক্ষিদেয় আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল, এই বুঝি আপনার মধ্যাহ্নভোজনের নেমন্তন্ন?

দয়াল স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, আজ যে তোমাদের খেতে নেই মা। নরেন ত নির্জীব হয়ে শুয়েই পড়েছে। আজ একটা দিনের জন্যে অন্ততঃ কানা ভট্‌চায্যিমশায়ের শাসন মানতেই হবে যে।

দ্বিতলের সম্মুখের হলে বিবাহের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে। এগুলো কি, ঠিক না বুঝিয়াও বিজয়ার নিভৃত অন্তর কাঁপিয়া উঠিল—সে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পর্যন্ত সাহস করিল না।

দয়াল অত্যন্ত সহজভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, সন্ধ্যার পরেই লগ্ন—আজ যে তোমার বিবাহ বিজয়া! ভাগ্যক্রমে দিনক্ষণ সমস্ত পাওয়া গেছে—না গেলেও আজই দিতে হ'ত, কিছুতেই অন্যথা করা যেত না; তা যাক, সমস্তই ঠিকঠাক মিলে গেছে। তাই ত কানা ভট্‌চায্যিমশাই হেসে বললেন, এ যেন তোমাদের জন্যেই পাঁজিতে আজকের দিনটি সৃষ্টি হয়েছিল।

বিজয়ার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। কহিল, আপনি কি আমার হিন্দু-বিবাহ দেবেন?

দয়াল কহিল, হিন্দু-বিবাহ কি বিবাহ নয় মা? কিন্তু সাম্প্রদায়িক মত মানুষকে এমনি বোকা ক'রে আনে যে, কাল সমস্ত বেলাটা ভেবে ভেবেও এই তুচ্ছ কথাটার কোন কূল-কিনারা খুঁজে পাইনি। কিন্তু নলিনী আমাকে একটি মুহূর্তে বুঝিয়ে দিলে।

বললে, মামা, তাঁর বাবা তাঁকে যাঁর হাতে দিয়ে গেছেন, তোমরা তাঁর হাতেই তাঁকে দাও; নইলে ব্রাহ্ম-বিবাহের ছল ক'রে যদি অপাত্রে দান কর ত অধর্মের সীমা থাকবে না। আর মনের মিলনই সত্যিকার বিবাহ। নইলে বিয়ের মন্তর বাংলা হবে কি সংস্কৃত হবে ভট্‌চাযিমশাই পড়াবেন কিংবা আচার্যমশাই পড়াবেন, তাতে কি আসে যায় মামা? এতবড় জটিল সমস্যাটা যেন একেবারে জল হয়ে গেল বিজয়া। মনে মনে বললুম, ভগবান! তোমার ত কিছু অগোচর নেই! এদের বিবাহ আমি যে-কোন মতেই দিই না, তোমার কাছে যে অপরাধী হব না, সে নিশ্চয় জানি। তবুও বললুম, কিন্তু একটা কথা আছে যে নলিনী! বিজয়া যে তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাঁরা যে তারই উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন। এ সত্য ভাঙবে কি করে?

নলিনী বললে, মামা তুমি ত জান, বিজয়ার অন্তর্যামী কখনো সায় দেননি। তাঁর চেয়ে কি বিজয়ার বলাটাই বড় হ'ল? তার হৃদয়ের সত্যকে লঙ্ঘন ক'রে কি তার মুখের কথাটাকেই বড় ক'রে তুলতে হবে?

আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললুম, তুই এ-সব শিখলি কোথায় মা?

নলিনী বললে, আমি নরেনবাবুর কাছেই শিখেছি। তিনি বার বার বলেন, সত্যের স্থান বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে নয়। কেবল মুখ দিয়ে বার হয়েছে ব'লেই কোন জিনিস কখনো সত্য হয়ে উঠে না। তবুও তাকেই যারা সকলের অগ্রে, সকলের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চায়, তারা সত্যকে ভালবাসে ব'লেই করে না, তারা সত্যভাষণের দম্ভকেই ভালবাসে ব'লে করে।

একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, তুমি নরেনকে জান না মা, সে যে তোমাকে কত ভালবাসে, তাও হয়ত ঠিক জান না। সে এমন ছেলে যে, অসত্যের বোঝা তোমার মাথায় তুলে দিয়ে তোমাকে গ্রহণ করতে কিছুতেই রাজী হ'ত না। একবার আগাগোড়া তার কাজগুলো মনে ক'রে দেখ দিকি বিজয়া!

বিজয়া কিছুই কহিল না। নিঃশব্দে নতমুখে কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নলিনী ভিতরে কাজে ব্যস্ত ছিল। খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বিজয়াকে জড়াইয়া ধরিল। কানে কানে কহিল, তোমাকে সাজাবার ভার আজ নরেনবাবু আমাকে দিয়েছেন। চল, বলিয়া তাহাকে একপ্রকার জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে তাহাকে ফুল ও চন্দনে সজ্জিত করিয়া নলিনী বধূর আসনে বসাইয়া সম্মুখে বড় জানালাটা খুলিয়া দিতেই তাহার লজ্জিত মুখের উপর দক্ষিণের বাতাস এবং আকাশের জ্যোৎস্না যেন একই কালে তাহার স্বর্গত মাতা-পিতার আশীর্বাদের মত আসিয়া পড়িল।

যিনি সম্প্রদান করিতে বসিলেন, শোনা গেল, তিনি কোন এক সুদূর-সম্পর্কে বিজয়ার পিসী। একচক্ষু ভট্টাচার্যমশাই মন্ত্র পড়াইতে বসিয়া দাবী করিলেন, দুই-তিন পুরুষ পূর্বে তাঁরাই ছিলেন জমিদার-বাটীর কুল-পুরোহিত।

বিবাহ অনুষ্ঠান সমাধা হইয়া গিয়াছে—বর-বধূকে তুলিবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময়ে রাসবিহারী আসিয়া বিবাহ-সভায় উপস্থিত হইলেন। দয়াল উঠিয়া দাঁড়াইয়া সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, এস ভাই, এস। শুভকর্ম নির্বিঘ্নে শেষ হয়ে গিয়েছে—আজকের দিনে আর মনের মধ্যে কোন গ্লানি রেখো না ভাই—এদের তুমি আশীর্বাদ কর।

রাসবিহারী ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহজ গলায় কহিলেন, বনমালীর মেয়ের বিবাহটা কি শেষে হিন্দুর মতেই দিলে দয়াল? আমাকে একটু জানালে ত এর প্রয়োজন হ'ত না।

দয়াল থতমত খাইয়া কহিল, সমস্ত বিবাহই ত এক ভাই।

রাসবিহারী কঠোরস্বরে কহিলেন, না। কিন্তু বনমালীর মেয়ে কি তার বাপের গ্রাম থেকে আজীবন নির্বাসন-দুঃখও একবার ভেবে দেখলে না?

নলিনী পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল—সে কহিল, তাঁর মেয়ে তার স্বর্গীয় পিতার সত্যকার

আজ্ঞাটাই পালন করছে, অনুষ্ঠানের কথা ভাববার সময় পায়নি। আপনি নিজেও ত বনমালীবাবুর যথার্থ ইচ্ছাটা জানতেন। তাতে ত ত্রুটি হয়নি।

রাসবিহারী এই দুর্মুখ মেয়েটার প্রতি একটা ক্রুর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শুধু বলিলেন, হুঁ। বলিয়া ফিরিতে উদ্যত হইতেছিলেন—নলিনী আবদারের সুরে কহিল, বাঃ—আপনি বুঝি বিয়ে-বাড়ি থেকে শুধু শুধু চ'লে যাবেন? সে হবে না, আপনাকে খেয়ে যেতে হবে! আমি মামাকে দিয়ে কত কণ্ট ক'রে আপনাকে নেমন্তন্ন ক'রে আনিয়েছি।

রাসবিহারী কথা কহিলেন না, শুধু আর একটা অগ্নিদৃষ্টি তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

দেবদাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদিন বৈশাখের দ্বিপ্রহরে রৌদ্রেরও অন্ত ছিল না, উত্তাপেরও সীমা ছিল না। ঠিক সেই সময়টিতে মুখুয্যেদের দেবদাস পাঠশালা-ঘরের এক কোণে ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া, শ্লেট হাতে লইয়া, চক্ষু চাহিয়া, বুজিয়া, পা ছড়াইয়া, হাই তুলিয়া, অবশেষে হঠাৎ খুব চিন্তাশীল হইয়া উঠিল; এবং নিমিষে স্থির করিয়া ফেলিল যে, এই পরম রমণীয় সময়টিতে মাঠে মাঠে ঘুড়ি উড়াইয়া বেড়ানোর পরিবর্তে পাঠশালায় আবদ্ধ থাকাটা কিছু নয়। উর্বর মস্তিষ্কে একটা উপায়ও গজাইয়া উঠিল। সে শ্লেট-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাঠশালায় এখন টিফিনের ছুটি হইয়াছিল। বালকের দল নানারূপ ভাবভঙ্গী ও শব্দ-সাড়া করিয়া অনতিদূরের বটবৃক্ষতলে ডাংগুলি খেলিতেছিল। দেবদাস সেদিকে একবার চাহিল। টিফিনের ছুটি সে পায় না—কেননা গোবিন্দ পণ্ডিত অনেকবার দেখিয়াছেন যে, একবার পাঠশালা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় প্রবেশ করাটা দেবদাস নিতান্ত অপছন্দ করে। তাহার পিতারও নিষেধ ছিল। নানা কারণে ইহাই স্থির হইয়াছিল যে এই সময়টিতে সে সর্দার-পোড়ো ভুলোর জিম্মায় থাকিবে।

এখন ঘরের মধ্যে শুধু পণ্ডিত মহাশয় দ্বিপ্রাহরিক আলস্যে চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন এবং সর্দার-পোড়ো ভুলো এক কোণে হাত-পা ভাঙ্গা একখণ্ড বেঞ্চের উপর ছোটখাটো পণ্ডিত সাজিয়া বসিয়াছিল এবং মধ্যে মধ্যে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত কখন বা ছেলেদের খেলা দেখিতেছিল, কখন বা দেবদাস এবং পার্বতীর প্রতি আলস্য-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছিল। পার্বতী এই মাস-খানেক হইল পণ্ডিত মহাশয়ের আশ্রয়ে এবং তত্ত্বাবধানে আসিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় সম্ভবতঃ এই অল্পসময়ের মধ্যেই তাহার একান্ত মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন, তাই সে নিবিষ্ট মনে, নিরতিশয় ধৈর্যের সহিত সুপ্ত পণ্ডিতের প্রতিকৃতি বোধোদয়ের শেষ পাতাটির উপর কালি দিয়া লিখিতেছিল এবং দক্ষ চিত্রকরের ন্যায় নানাভাবে দেখিতেছিল যে, তাহার বহু যত্নের চিত্রটি আদর্শের সহিত কতখানি মিলিয়াছে। বেশী যে মিল ছিল তাহা নয়; কিন্তু পার্বতী ইহাতেই যথেষ্ট আনন্দ ও আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিল।

এই সময় দেবদাস শ্লেট-হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ভুলোর উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল, অংক হয় না।

ভুলো শান্ত গম্ভীরমুখে কহিল, কি আঁক?

মণকষা—

শেলেটটা দেখি—

ভাবটা এই যে, তাহার নিকট এ-সব কাজে শ্লেটখানি হাতে পাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। দেবদাস তাহার হাতে শ্লেট দিয়া নিকটে দাঁড়াইল। ভুলো ডাকিয়া লিখিতে লাগিল যে, এক মণ তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা নয় আনা তিন গণ্ডা হয়, তাহা হইলে—

এমনি সময়ে একটা ঘটনা ঘটিল। হাত-পা-ভাঙ্গা বেঞ্চখানার উপর সর্দার-পোড়ো তাহার পদমর্যাদার উপযুক্ত আসন নির্বাচন করিয়া যথানিয়মে আজ তিন বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন বসিয়া আসিতেছে। তাহার পশ্চাতে একরাশি চুন গাদা করা ছিল। এটি পণ্ডিত মহাশয় কবে কোন্ যুগে নাকি সস্তা দরে কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, মানস ছিল, সময় ভাল হইলে ইহাতে কোঠা-দালান দিবেন। কবে যে সে শুভদিন আসিবে তাহা

জানি না। কিন্তু এই শ্বেত-চূর্ণের প্রতি তাঁহার সতর্কতা এবং যত্নের অবধি ছিল না। সংসারানভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী কোন অলক্ষ্মী-আশ্রিত বালক ইহার রেণুমাত্র নষ্ট না করিতে পারে, এইজন্য প্রিয়পাত্র এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ভোলানাথ এই সযত্ন-সঞ্চিত বস্তুটি সাবধানে রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিল এবং তাই সে বেঞ্চের উপর বসিয়া ইহাকে আগুলিয়া থাকিত।

ভোলানাথ লিখিতেছিল—এক মণ তেলের দাম যদি চৌদ্দ টাকা নয় আনা তিন গণ্ডা হয়, তাহা হইলে,—ওগো বাবা গো—তাহার পর খুব শব্দ-সাড়া হইল। পার্বতী ভয়ানক উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া হাততালি দিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। সদ্যঃনিদ্রোত্থিত গোবিন্দ পণ্ডিত রক্তনেত্রে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, গাছতলায় ছেলের দল একেবারে সার বাঁধিয়া হৈহৈ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, এবং তখনি চক্ষে পড়িল যে, ভগ্ন বেঞ্চের উপর একজোড়া পা নাচিয়া বেড়াইতেছে এবং চুনের মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইতেছে। চীৎকার করিলেন, কি—কি—কি রে!

বলিবার মধ্যে শুধু পার্বতী ছিল। কিন্তু সে তখন ভূমিতলে লুটাইতেছে এবং করতালি দিতেছে। পণ্ডিত মহাশয়ের বিফল প্রশ্ন ক্রুদ্ধভাবে ফিরিয়া গেল, কি, কি—কি রে!

তাহার পর শ্বেতমূর্তি ভোলানাথ চুন ঠেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত মহাশয় আবার চীৎকার করিলেন, গুয়োটা তুই!—তুই ওর ভেতর!

অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

আবার!

দেবা শালা—ঠেলে—অ্যাঁ—অ্যাঁ—মণকষা—

আবার গুয়োটা!

কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া, মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া প্রশ্ন করিলেন, দেবা ঠেলে ফেলে দিয়ে পালিয়েচে?

ভুলো আরো কাঁদিতে লাগিল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া চুন ঝাড়াঝাড়ি হইল, কিন্তু সাদা এবং কাল রঙে সর্দার-পোড়োকে কতকটা ভূতের মত দেখাইতে লাগিল এবং তখনও তাহার ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল না।

পণ্ডিত বলিলেন, দেবা ঠেলে ফেলে পালিয়েচে? বটে?

ভুলো বলিল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

পণ্ডিত বলিলেন, এর শোধ নেব।

ভুলো কহিল,—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

পণ্ডিত প্রশ্ন করিলেন, ছোঁড়াটা কোথায়—

তাহার পর ছেলেদের দল রক্তমুখে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, দেবাকে ধরা গেল না। উঃ—যে ইঁট ছোঁড়ে—!

ধরা গেল না?

আর একজন বালক পূর্বকথার প্রতিধ্বনি করিল—উঃ—যে—

থাম বেটা—

সে ঢোক গিলিয়া একপাশে সরিয়া গেল। নিষ্ফল-ক্রোধে পণ্ডিতমশাই প্রথমে পার্বতীকে খুব ধমকাইয়া উঠিলেন; তাহার পর ভোলানাথের হাত ধরিয়া কহিলেন, চল্, একবার কাছারি-বাড়িতে কর্তাকে বলে আসি।

ইহার অর্থ এই যে, জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের নিকট তাঁহার পুত্রের আচরণের নালিশ করিবেন।

তখন বেলা তিনটা আন্দাজ হইয়াছিল। নারায়ণ মুখুয্যেমশায় বাহিরে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন এবং একজন ভৃত্য হাত-পাখা লইয়া বাতাস করিতেছিল। সছাত্র পণ্ডিতের অসময় আগমনে কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, গোবিন্দ যে!

গোবিন্দ জাতিতে কায়স্থ—ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া ভুলোকে দেখাইয়া সমস্ত

কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। মুখুয্যেমশায় বিরক্ত হইলেন; বলিলেন, তাইত, দেবদাস যে শাসনের বাইরে গেছে দেখচি!

কি করি, আপনি হুকুম করুন।

জমিদারবাবু নলটা রাখিয়া দিয়া কহিলেন, কোথা গেল সে?

তা কি জানি? যারা ধরতে গিয়েছিল, তাদের ইঁট মেরে তাড়িয়েচে।

তাঁহারা দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। নারায়ণবাবু বলিলেন, বাড়ি এলে যা হয় করব।

গোবিন্দ ছাত্রের হাত ধরিয়া পাঠশালায় ফিরিয়া গিয়া মুখ ও চোখের ভাব-ভঙ্গীতে সমস্ত পাঠশালা সন্ত্রাসিত করিয়া তুলিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দেবদাসের পিতা সে অঞ্চলের জমিদার হইলেও তাহাকে আর পাঠশালে ঢুকিতে দিবেন না। সেদিন পাঠশালার ছুটি কিছু পূর্বেই হইল; যাইবার সময় ছেলেরা অনেক কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

একজন কহিল, উঃ! দেবা কি ষণ্ডা দেখেচিস!

আর একজন কহিল, ভুলোকে আচ্ছা জব্দ করেচে।

উঃ, কি ঢিল ছোঁড়ে!

আর একজন ভুলোর তরফ হইতে কহিল,—ভুলো শোধ নেবে দেখিস।

ইস্—সে ত আর পাঠশালায় আসবে না যে শোধ নেবে।

এই ক্ষুদ্র দলটির একপাশে পার্বতীও বই-শেলট লইয়া বাড়ি আসিতেছিল। সে নিকটবর্তী একজন ছেলের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মণি, দেবদাদাকে আর পাঠশালায় সত্যি আসতে দেবে না?

মণি বলিল, না—কিছুতেই না।

পার্বতী সরিয়া গেল—কথাটা তার বরাবরই ভাল লাগে নাই।

পার্বতীর পিতার নাম নীলকণ্ঠ চক্রবর্তী। চক্রবর্তী মহাশয় জমিদারদের প্রতিবেশী অর্থাৎ মুখুয্যে মহাশয়ের খুব বড় বাড়ির পার্শ্বে তাঁহার ছোট এবং পুরাতন সেকেলে ইঁটের বাড়ি। তাঁহার দু-দশ বিঘা জমিজমা আছে, দু-চার ঘর যজমান আছে, জমিদার-বাড়ির আশা-প্রত্যাশাটা আছে,—বেশ স্বচ্ছন্দ পরিবার—বেশ দিন কাটে।

প্রথমে ধর্মদাসের সহিত পার্বতীর সাক্ষাৎ হইল। সে দেবদাসের বাটীর ভৃত্য। এক বৎসর বয়স হইতে আজ দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত তাহাকে লইয়াই আছে—পাঠশালায় পৌঁছিয়া দিয়া আসে এবং ছুটির সময় সঙ্গে করিয়া বাটী ফিরাইয়া আনে। এ কাজটি সে যথানিয়মে প্রত্যহ করিয়াছে এবং আজিও সেইজন্যই পাঠশালায় যাইতেছিল। পার্বতীকে দেখিয়া কহিল, কৈ পারু, তোর দেবদাদা কোথায়?

পালিয়ে গেছে—

ধর্মদাস ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া বলিল, পালিয়ে গেছে কি রে?

তখন পার্বতী ভোলানাথের দুর্দশার কথা মনে করিয়া আবার নূতন করিয়া হাসিতে শুরু করিল,—দেখ্ ধম্ম, দেবদা—হি হি হি—একেবারে চুনের গাদায়—হি হি—হু হু—একেবারে ধম্ম চিৎ করে—

ধর্মদাস সব কথা বুঝিতে না পারিলেও হাসি দেখিয়া খানিকটা হাসিয়া লইল; পরে হাস্য সংবরণ করিয়া জিদ করিয়া কহিল, বল না পারু, কি হয়েচে?

দেবদা ঠেলে ফেলে দিয়ে—ভুলোকে—চুনের গাদায়—হি হি হি—

ধর্মদাস এবার বাকীটা বুঝিয়া লইল এবং অতিশয় চিন্তিত হইল; বলিল, পারু সে এখন কোথায় আছে জানিস?

আমি কি জানি!

তুই জানিস—বলে দে। আহা তার বোধ হয় খুব খিদে পেয়েচে।

তা ত পেয়েচে—আমি কিন্তু বলব না।

কেন বলবি নে?

বললে আমাকে বড় মারবে। আমি খাবার দিয়ে আসব।

ধর্মদাস কতকটা সন্তুষ্ট হইল—কহিল, তা দিয়ে আসিস, আর সন্ধ্যের আগে জুলিয়ে-ভালিয়ে বাড়ি ডেকে আনিস।

আনব।

বাটীতে আসিয়া পার্বতী দেখিল, তাহার মা এবং দেবদাসের মা উভয়েই সব কথা শুনিয়াছেন। তাহাকেও একথা জিজ্ঞাসা করা হইল। হাসিয়া গম্ভীর হইয়া সে যতটা পারিল কহিল। তাহার পর আঁচলে মুড়ি বাঁধিয়া জমিদারদের একটা আমবাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। বাগানটা তাহাদেরই বাটীর নিকটে, এবং ইহারই একান্তে একটা বাঁশঝাড় ছিল। সে জানিত, লুকাইয়া তামাক খাইবার জন্য দেবদাস এই বাঁশঝাড়ের মধ্যে কতকটা স্থান পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। পলাইয়া লুকাইয়া থাকিতে হইলে ইহাই তাহার গুপ্তস্থান। ভিতরে প্রবেশ করিয়া পার্বতী দেখিল, বাঁশঝোপের মধ্যে দেবদাস ছোট একটা হুঁকা হাতে বসিয়া আছে এবং বিজ্ঞের মত ধূমপান করিতেছে। মুখখানা বড় গম্ভীর—যথেষ্ট দুর্ভাবনার চিহ্ন তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে। পার্বতীকে দেখিতে পাইয়া সে খুব খুশী হইল, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ করিল না। তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীরভাবেই কহিল, আয়।

পার্বতী কাছে আসিয়া বসিল। আঁচলে যাহা বাঁধা ছিল, তৎক্ষণাৎ দেবদাসের চক্ষে পড়িল। কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সে তাহা খুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া কহিল, পারু, পণ্ডিতমশাই কি বললে রে?

জ্যাঠামশায়ের কাছে বলে দিয়েচে।

দেবদাস হুঁকা নামাইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, বাবাকে বলে দিয়েচে?

হাঁ।

তারপর?

তোমাকে আর পাঠশালায় যেতে দেবে না।

আমি পড়তেও চাই না।

এই সময়ে তাহার খাদ্যদ্রব্য প্রায় ফুরাইয়া আসিল, দেবদাস পার্বতীর মুখপানে চাহিয়া বলিল, সন্দেশ দে।

সন্দেশ ত আনিনি।

তবে জল দে।

জল কোথায় পাব?

বিরক্ত হইয়া দেবদাস কহিল, কিছুই নেই, ত এসেচিস কেন? যা, জল নিয়ে আয়।

তাহার রুক্ষস্বর পার্বতীর ভাল লাগিল না; কহিল, আমি আবার যেতে পারিনে—তুমি খেয়ে আসবে চল।

আমি কি এখন যেতে পারি?

তবে কি এইখানেই থাকবে?

এইখানে থাকব, তারপর চলে যাব—

পার্বতীর মনটা খারাপ হইয়া গেল। দেবদাসের আপাত-বৈরাগ্য দেখিয়া এবং কথাবার্তা শুনিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল,—কহিল, দেবদা, আমিও যাব।

কোথায়? আমার সঙ্গে? দূর—তা কি হয়?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া কহিল, যাবই—

না,—যেতে হবে না—তুই আগে জল নিয়ে আয়—

পার্বতী আবার মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি যাবই—

আগে জল নিয়ে আয়—

আমি যাব না—তুমি তা হলে পালিয়ে যাবে।

না—যাব না।

কিন্তু পার্বতী কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাই বসিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় হুকুম করিল, যা বলচি।

আমি যেতে পারব না।

রাগ করিয়া দেবদাস পার্বতীর চুল ধরিয়া টান দিয়া ধমক দিল—যা বলচি।

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তারপর তাহার পিঠে একটা কিল পড়িল—যাবিনে?

পার্বতী কাঁদিয়া ফেলিল—আমি কিছুতেই যাব না।

দেবদাস একদিকে চলিয়া গেল। পার্বতীও কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে দেবদাসের পিতার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুখুয্যেমশাই পার্বতীকে বড় ভালবাসিতেন। বলিলেন, পারু, কাঁদচিস কেন মা?

দেবদা মেরেচে।

কোথায় সে?

ঐ বাঁশবাগানে বসে তামাক খাচ্ছিল।

একে পণ্ডিত মহাশয়ের আগমন হইতেই তিনি চটিয়া বসিয়া ছিলেন—এখন এই সংবাদটা তাঁহাকে একেবারে অগ্নিমূর্তি করিয়া দিল। বলিলেন, দেবা বুঝি আবার তামাক খায়?

হাঁ খায়, রোজ খায়। বাঁশবাগানে তার হুঁকো নুকোন আছে—

এতদিন আমাকে বলিস নি কেন?

দেবদাদা মারবে বলে।

কথাটা কিন্তু ঠিক তাই নহে। প্রকাশ করিলে দেবদাস পাছে শাস্তি ভোগ করে, এই ভয়ে সে কোন কথা বলে নাই। আজ কথাটা শুধু রাগের মাথায় বলিয়া দিয়াছে। এই তাহার সবে আট বৎসরমাত্র বয়স—রাগ এখন বড় বেশী; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা নিতান্ত কম ছিল না। বাড়ি গিয়া বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ কাঁদিয়া-কাটিয়া ঘুমাইয়া পড়িল,—সে রাত্রে ভাত পর্যন্ত খাইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেবদাসকে পরদিন খুব মারধর করা হইল,—সমস্তদিন ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তাহার পর, তাহার জননী যখন ভারী কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন, তখন দেবদাসকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পরদিন ভোরবেলায় সে পলাইয়া আসিয়া পার্বতীর ঘরের জানালার নিকট দাঁড়াইল—ডাকিল, পারু! আবার ডাকিল, পারু!

পার্বতী জানালা খুলিয়া কহিল, দেবদা!

দেবদাস ইশারা করিয়া বলিল, শিগগির আয়। দু'জনে একত্র হইলে দেবদাস বলিল, তামাক খাবার কথা বলে দিলি কেন?

তুমি মারলে কেন?

তুই জল আনতে গেলি না কেন?

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল।

দেবদাস বলিল, তুই বড় গাধা—আর যেন বলে দিসনে।

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তবে চল্, ছিপ কেটে আনি। আজ বাঁধে মাছ ধরতে হবে।

বাঁশঝাড়ের নিকট একটা নোনা গাছ ছিল, দেবদাস তাহাতে উঠিয়া পড়িল। বহুকষ্টে একটা বাঁশের ডগা নোয়াইয়া পার্বতীকে ধরিতে দিয়া কহিল, দেখিস যেন ছেড়ে দিসনে, তা হলে পড়ে যাব।

পার্বতী প্রাণপণে টানিয়া ধরিয়া রহিল। দেবদাস সেইটা ধরিয়া একটা নোনাডালে পা রাখিয়া, ছিপ কাটিতে লাগিল। পার্বতী নীচে হইতে কহিল, দেবদা, পাঠশালে যাবে না?

না।

জ্যাঠামশাই তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

বাবা আপনি বলেচেন, আমি আর ওখানে পড়ব না। বাড়িতে পণ্ডিত আসবে।

পার্বতী একটু চিন্তিত হইয়া উঠিল। পরে বলিল, কাল থেকে গরমের জন্য আমাদের সকালবেলা পাঠশালা বসে, আমি এখনি যাব।

দেবদাস উপর হইতে চক্ষু রাঙগাইয়া বলিল, না, যেতে হবে না।

এই সময়ে পার্বতী একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল,—অমনি বাঁশের ডগা উপরে উঠিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেবদাস নোনা-ডাল হইতে নীচে পড়িয়া গেল। বেশী উঁচু ছিল না বলিয়া তেমন লাগিল না, কিন্তু গায়ে অনেক স্থানে ছড়িয়া গেল। নীচে আসিয়া ক্রুদ্ধ দেবদাস একটা শুষ্ক কঞ্চি তুলিয়া লইয়া পার্বতীর পিঠের উপর, গালের উপর, যেখানে-সেখানে সজোরে ঘা কতক বসাইয়া দিয়া বলিল, যা, দূর হয়ে যা।

প্রথমে পার্বতী নিজেই লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু যখন ছড়ির পর ছড়ি ক্রমাগত পড়িতে লাগিল, তখন সে ক্রোধে ও অভিমানে চক্ষু দুটি আগুনের মত করিয়া কাঁদিয়া বলিল, এই আমি জ্যাঠামশায়ের কাছে যাচ্ছি—

দেবদাস রাগিয়া আর এক ঘা বসাইয়া দিয়া বলিল, যা, এখনি ব'লে দিগে যা—বয়ে গেল।

পার্বতী চলিয়া গেল। যখন অনেকটা গিয়াছে, তখন দেবদাস ডাকিল, পারু!

পার্বতী শুনিয়াও শুনিল না—আরও দ্রুত চলিতে লাগিল। দেবদাস আবার ডাকিল, ও পারু, শুনে যা না!

পার্বতী জবাব দিল না। দেবদাস বিরক্ত হইয়া, কতকটা চীৎকার করিয়া, কতকটা আপনার মনে বলিল, যাক—মরুক গে।

পার্বতী চলিয়া গেলে, দেবদাস যেমন-তেমন করিয়া দুই-একটা ছিপ কাটিয়া লইল। তাহার মনটা বিগড়াইয়া গিয়াছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে পার্বতী বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাহার গালের উপর ছড়ির দাগ নীল হইয়া ফুলিয়া রহিয়াছে। প্রথমেই ঠাকুরমার চক্ষে পড়িল। তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন—ওগো, মা গো, কে এমন করে মারলে পারু?

চোখ মুছিতে মুছিতে পার্বতী কহিল, পণ্ডিতমশাই।

ঠাকুরমা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, চল্ ত, একবার নারাণের কাছে যাই, দেখি সে কেমন পণ্ডিত! আহা—বাছাকে একেবারে মেরে ফেলেচে!

পার্বতী পিতামহীর গলা জড়াইয়া কহিল, চল।

মুখুয্যে মহাশযের নিকট আসিয়া পিতামহী পণ্ডিত মহাশয়ের অনেকগুলি পুরুষের উল্লেখ করিয়া তাহাদিগের পারলৌকিক অশুভ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং খাদ্যদ্রব্যেরও তেমন ভাল ব্যবস্থা করিলেন না। শেষে স্বয়ং গোবিন্দকে নানামতে গালি পাড়িয়া বলিলেন, নারাণ, দেখ ত মিনষের আস্পর্ধা! শুদ্দুর হয়ে বামুনের মেয়ের গায়ে হাত তোলে! কি করে মেরেচে একবার দেখ। বলিয়া গালের উপর নীল দাগগুলো বৃদ্ধা অত্যন্ত বেদনার সহিত দেখাইতে লাগিলেন।

নারায়ণবাবু তখন পার্বতীকেই প্রশ্ন করিলেন, কে মেরেচে পারু?

পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তখন ঠাকুরমাই আর একবার চীৎকার করিয়া বলিলেন, আবার কে! ঐ গোঁয়ার পণ্ডিতটা।

কেন মারলে?

পার্বতী এবারও কথা কহিল না। মুখুয্যেমশাই বুঝিলেন, কোন দোষ করার জন্য মার খাইয়াছে—কিন্তু এরূপ আঘাত করা উচিত হয় নাই, প্রকাশ করিযা তাহাই বলিলেন। শুনিয়া পার্বতী পিঠ খুলিয়া বলিল, এখানেও মেরেচে।

পিঠের দাগগুলো আরও স্পষ্ট, আরো গুরুতর। তাই দুজনেই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গেলেন। পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিয়া কৈফিয়ত তলব করিবেন, মুখুয্যে মহাশয় এরূপ অভিসন্ধিও প্রকাশ করিলেন; এবং স্থির হইল যে, এরূপ পণ্ডিতের নিকট ছেলেমেয়ে পাঠান উচিত নহে।

রায় শুনিয়া পার্বতী খুশী হইয়া ঠাকুরমার কোলে চড়িয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। বাটীতে পৌঁছিয়া পার্বতী জননীর জেরায় পড়িল। তিনি ধরিয়া বসিলেন, কেন মেরেচে বল্?

পার্বতী বলিল, মিছিমিছি মেরেচে।

জননী কন্যার খুব করিয়া কান মলিয়া দিয়া বলিলেন, মিছিমিছি কেউ কখন মারে?

দালান দিয়া সেই সময়ে শাশুড়ী যাইতেছিলেন, তিনি ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া বলিলেন, বৌমা, মা হয়ে তুমি মিছিমিছি মারতে পার, আর সে মুখপোড়া পারে না?

বৌমা বলিল, শুধু-শুধু কখনো মারেনি। যে শান্ত মেয়ে—কি করেচে, তাই মার খেয়েচে।

শাশুড়ী বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আচ্ছা, তাই না হয় হলো, কিন্তু ওকে আর আমি পাঠশালে যেতে দেব না।

একটু লেখাপড়া শিখবে না!

কি হবে বৌমা? একটা-আধটা চিঠিপত্র লিখতে পারলে, দু'ছত্র রামায়ণ-মহাভারত পড়তে শিখলেই ঢের। পারু কি তোমার জজিয়তি করবে, না উকিল হবে?

বৌমা অগত্যা চুপ করিয়া রহিল। সেদিন দেবদাস বড় ভয়ে-ভয়েই বাড়িতে প্রবেশ করিল। পার্বতী যে ইতিমধ্যে সমস্তই বলিয়া দিয়াছে, তাহাতে তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু বাড়ি আসিয়া যখন তাহার অণুমাত্র আভাসও প্রকাশ পাইল না, বরঞ্চ মায়ের কাছে শুনিতে পাইল—আজ গোবিন্দ পণ্ডিত পার্বতীকেও অত্যন্ত প্রহার করিয়াছে, তাই আর সে পাঠশালায় যাইবে না—তখন আনন্দের আতিশয্যে তাহার ভাল করিয়া আহার করাই হইল না; কোনমতে নাকে-মুখে গুঁজিয়া পার্বতীর কাছে ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল, তুই আর পাঠশালে যাবিনে?

না।

কি করে হ'ল রে?

আমি বললুম, পণ্ডিতমশায় মেরেচে।

দেবদাস খুব একগাল হাসিয়া, তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া, মত প্রকাশ করিল যে, তাহার মত বুদ্ধিমতী এ পৃথিবীতে আর নাই। তাহার পর ধীরে ধীরে সে পার্বতীর গালের নীল দাগগুলি সযত্নে পরীক্ষা করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আহা!

পার্বতী একটু হাসিয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি?

বড় লেগেচে, না রে পারু?

পার্বতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ।

আহা, কেন অমন করিস, তাই ত রাগ হয়—তাই ত মারি।

পার্বতীর চোখে জল আসিল; মনে ভাবিল, জিজ্ঞাসা করে, কি করি? কিন্তু পারিল না।

দেবদাস তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, আর অমন করো না, কেমন?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

দেবদাস আর একবার তাহার পিঠ ঠুকিয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা—আর কখনও তোকে আমি মারব না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন যায়—এ দুটি বালক-বালিকার আমোদের সীমা নাই—সমস্ত দিন ধরিয়া রোদে রোদে ঘুরিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া মারধর খায়, আবার সকালবেলায় ছুটিয়া পলাইয়া যায়—আবার তিরস্কার-প্রহার ভোগ করে। রাত্রে নিশ্চিন্ত-নিরুদ্বেগে নিদ্রা যায়; আবার সকাল হয়, আবার পলাইয়া খেলা করিয়া বেড়ায়। অন্য সঙ্গী-সাথী বড় কেহ নাই, প্রয়োজনও হয় না। পাড়াময় অত্যাচার উপদ্রব করিয়া বেড়াইতে দুইজনেই যথেষ্ট। সেদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরেই দুইজনে বাঁধে গিয়া নামিয়াছিল। বেলা দ্বিপ্রহরে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, সমস্ত জল ঘোলা করিয়া, পনরটা পুঁটিমাছ ধরিয়া যোগ্যতা অনুসারে ভাগ করিয়া লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল। পার্বতীর জননী কন্যাকে

রীতিমত প্রহার করিয়া ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। দেবদাসের কথা ঠিক জানি না; কেননা এ-সব কাহিনী সে কিছুতেই প্রকাশ করে না। তবে পার্বতী যখন ঘরে বসিয়া খুব করিয়া কাঁদিতেছিল, তখন—বেলা দুইটা-আড়াইটার সময়, একবার জানালার নীচে আসিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিয়াছিল, পারু, ও পারু! পার্বতী বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছিল, কিন্তু রাগ করিয়া উত্তর দেয় নাই। তাহার পর সমস্ত দিনটা সে অদূরবর্তী একটা চাঁপা গাছে বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল; এবং সন্ধ্যার পর বহু পরিশ্রমে ধর্মদাস তাহাকে নামাইয়া আনিতে পারিয়াছিল।

তবে শুধু সেই দিনটা মাত্র। পরদিন পার্বতী সকালবেলা হইতে দেব-দাদার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া রহিল, কিন্তু দেবদাস আসিল না—সে পিতার সহিত নিকটবর্তী গ্রামে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল। দেবদাস যখন আসিল না, পার্বতী তখন ক্ষুণ্নমনে একাকী বাটীর বাহির হইয়া পড়িল। কাল বাঁধে নামিবার সময় দেবদাস তিনটা টাকা পার্বতীকে রাখিতে দিয়াছিল—পাছে হারাইয়া যায়। আঁচলে সে টাকা তিনটা বাঁধা ছিল। সে আঁচল ঘুরাইয়া, নিজে ঘুরিয়া বহুক্ষণ একা কাটাইয়া দিল। সঙ্গী-সাথী কেহ মিলিল না; কেননা তখন সকালবেলায় পাঠশালা বসে। পার্বতী তখন ও-পাড়ায় চলিল। সেখানে মনোরমাদের বাড়ি। মনোরমা পাঠশালে পড়ে, বয়সে কিছু বড়, কিন্তু পারুর বন্ধু। অনেকদিন দেখাশুনা হয় নাই। আজ সময় পাইয়া পার্বতী ও-পাড়ায় তাহাদের বাটীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, মনো—বাড়ি আছিস?

মনোরমার পিসীমা বাহিরে আসিলেন।

পারু?

হ্যাঁ,—মনো কোথায় পিসীমা?

সে ত পাঠশালায় গেছে—তুমি যাওনি?

আমি পাঠশালায় যাইনি—দেবদাও যায় না।

মনোরমার পিসীমাতা হাসিয়া কহিলেন,—তবে ত ভাল! তুমিও যাও না, দেব-দাদাও যায় না?

না। আমরা কেউ যাইনে।

সে ভাল কথা; কিন্তু মনো পাঠশালায় গেছে।

পিসীমা বসিতে বলিলেন, কিন্তু পার্বতী ফিরিয়া আসিল। পথে রসিক পালের দোকানের কাছে তিনজন বৈষ্ণবী রসকলি পরিয়া খঞ্জনী-হাতে ভিক্ষায় চলিয়াছিল, পার্বতী তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিল, ও বোষ্টমী! তোমরা গান করতে জান?

একজন ফিরিয়া চাহিল—জানি বৈ কি বাছা!

তবে গাও না।

তখন তিনজনেই ফিরিয়া দাঁড়াইল। একজন কহিল, অমনি কি গান হয় মা, ভিক্ষে দিতে হয়। চল, তোমাদের বাড়ি গিয়ে গা'ব।

না, এইখানে গাও।

পয়সা দিতে হয় যে মা!

পার্বতী আঁচল দেখাইয়া কহিল, পয়সা নেই—টাকা আছে।

আঁচলে বাঁধা টাকা দেখিয়া তাহারা দোকান হইতে একটু দূরে গিয়া বসিল। তাহার পর খঞ্জনী বাজাইয়া তিনজনে গলা মিলাইয়া গান ধরিল। কি গান হইল, কি তাহার অর্থ—পার্বতী এ-সব কিছুই বুঝিল না। ইচ্ছা করিলেও হয়ত বুঝিতে পারিত না। কিন্তু মনটি তাহার সেই নিমেষে দেব-দাদার কাছে ছুটিয়া গিয়াছিল।

গান শেষ করিয়া তাহারা কহিল, কৈ, কি ভিক্ষে দেবে দাও তো মা!

পার্বতী আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া টাকা তিনটা তাহাদের হাতে দিল। তিনজনেই অবাক হইয়া তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

একজন বলিল, কার টাকা বাছা?

দেব-দাদার।

সে তোমাকে মারবে না?

পার্বতী একটু ভাবিয়া কহিল, না।

একজন কহিল, বেঁচে থাক মা!

পার্বতী হাসিয়া কহিল, তোমাদের তিনজনের বেশ ভাগে মিলেচে, না গো?

তিনজনেই মাথা নাড়িয়া বলিল, তা মিলেচে। রাধারানী তোমার ভাল করুন। বলিয়া তাহারা আন্তরিক আশীর্বাদ করিয়া গেল, যেন এই দানশীলা ছোট মেয়েটি শাস্তি ভোগ না করে। পার্বতী সেদিন সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল। পরদিন সকালবেলাই দেবদাসের সহিত তাহার দেখা হইল। তার হাতে একটা লাটাই ছিল—তবে ঘুড়ি নাই, সেইটা কিনিতে হইবে। পার্বতীকে কাছে পাইয়া কহিল, পারু, টাকা দে।

পার্বতীর মুখ শুকাইল,—বলিল, টাকা নেই!

কি হ'ল?

বোষ্টমীদের দিয়ে দিয়েচি। তারা গান গেয়েছিল।

সব দিয়ে দিয়েচিস?

সব। তিনটি টাকা ত ছিল।

দূর গাধা, সব বুঝি দিতে হয়!

বাঃ! তারা যে তিনজন ছিল! তিন টাকা না দিলে তিনজনের কি ভাগে মেলে?

দেবদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি হলে দুই টাকা দিতুম, বলিয়া সে লাটাইয়ের বাঁট দিয়া মাটির উপর আঁচড় কাটিয়া কহিল, তা হলে তারা দশ আনা তের গণ্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি করে ভাগে পেত।

পার্বতী ভাবিয়া কহিল, তারা কি তোমার মত আঁক কষতে জানে?

দেবদাস মনকষা পর্যন্ত পড়িয়াছিল; পার্বতীর কথাটায় খুশী হইয়া কহিল, তা বটে!

পার্বতী দেবদাসের হাত ধরিয়া বলিল, আমি ভেবেছিলুম তুমি আমাকে মারবে, দেবদা।

দেবদাস বিস্মিত হইল—মারব কেন?

বোষ্টমীরা বলেছিল, তুমি আমাকে মারবে।

কথা শুনিয়া দেবদাস মহা খুশী হইয়া পার্বতীর কাঁধের উপর ভর দিয়া কহিল, দূর—না দোষ করলে কি আমি মারি?

দেবদাস বোধ হয় মনে করিয়াছিল যে, পার্বতীর এ কাজটা তাহার পিনাল কোডের ভিতরে পড়ে না; কেননা, তিন টাকা তিনজনে বেশ ভাগ করিয়া লইতে পারিয়াছে। বিশেষতঃ, যে বোষ্টমীরা পাঠশালায় মণকষা পর্যন্ত পড়ে নাই তাহাদিগকে তিন টাকার বদলে দুই টাকা দিলে, তাহাদের প্রতি কতকটা অত্যাচার করা হইত। তাহার পর সে পার্বতীর হাত ধরিয়া ঘুড়ি কিনিবার জন্য ছোট বাজারের দিকে চলিল,—লাটাইটা সেইখানেই একটা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এমনি করিয়া এক বৎসর কাটিল বটে, কিন্তু আর কাটিতে চাহে না। দেবদাসের জননী বড় গোলযোগ করিতে লাগিলেন। স্বামীকে ডাকিয়া বলিলেন, দেবা যে মুখ্যু চাষা হয়ে গেল,—একটা যা হয় উপায় কর।

তিনি ভাবিয়া বলিলেন, দেবা কলকাতায় যাক। নগেনের বাসায় থেকে বেশ পড়াশুনা করতে পারবে।

নগেনবাবু সম্পর্কে দেবদাসের মাতুল হইতেন। কথাটা সবাই শুনিল। পার্বতী শুনিয়া ভীত হইয়া উঠিল। দেবদাসকে একা পাইয়া তাহার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বলিল, দেবদা, তুমি বুঝি কলকাতা যাবে?

কে বললে?

জেঠামশাই বলেচেন।

দূর—আমি কিছুতে যাব না।

আর যদি জোর করে পাঠিয়ে দেন?

জোর?

দেবদাস এই সময় এমন একটা মুখের ভাব করিল, যাহাতে পার্বতী বেশ বুঝিল যে, জোর করিয়া কোন কাজ তাহাকে দিয়া করাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ নাই। সেও ত তাহাই চায়। অতএব, নিরতিশয় আনন্দে আর একবার তাহার হাত ধরিয়া, আর একবার ঝুলিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিয়া মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, দেখো, যেন যেয়ো না দেবদা।

কখ্খন না—

এ প্রতিজ্ঞা কিন্তু তাহার রহিল না। তাহার পিতা রীতিমত বকা-ঝকা করিয়া, এমন কি তিরস্কার ও প্রহার করিয়া ধর্মদাসকে সঙ্গে দিয়া তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার দিন দেবদাস মনের মধ্যে বড় ক্লেশ অনুভব করিল; নূতন স্থানে যাইতেছে বলিয়া তাহার কিছুমাত্র কৌতূহল বা আনন্দ হইল না। পার্বতী সেদিন তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। কত কান্নাকাটি করিল, কিন্তু কে তাহার কথা শুনিবে? প্রথমে অভিমানে কিছুক্ষণ দেবদাসের সহিত কথা কহিল না; কিন্তু শেষে যখন দেবদাস ডাকিয়া বলিল, পারু, আবার শিগগির আসব; যদি না পাঠিয়ে দেয় ত পালিয়ে আসব।

তখন পার্বতী প্রকৃতিস্থা হইয়া নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ের অনেক কথা কহিয়া শুনাইল। তাহার পর সে ঘোড়ার গাড়ি চড়িয়া, পোর্টমাণ্টো লইয়া, জননীর আশীর্বাদ ও চক্ষের জলের শেষ বিন্দুটি কপালে টিপের মত পরিয়া দেবদাস চলিয়া গেল।

তখন পার্বতীর কত কষ্ট হইল; কত চোখের জলের ধারা গাল বহিয়া নীচে পড়িতে লাগিল; কত অভিমানে তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। প্রথম কয়েক দিন তাহার এইরূপে কাটিল। তাহার পর হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিতে পাইল, সমস্তদিনের জন্য তাহার কিছুই করিবার নাই। ইতিপূর্বে পাঠশালা ছাড়িয়া অবধি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু গোলমালে, হুজুগে কাটিয়া যাইত; কত কি যেন তাহার করিবার আছে,—শুধু সময়ে কুলাইয়া উঠে না। এখন অনেক সময়, কিন্তু এতটুকু কাজ খুঁজিয়া পায় না। সকালবেলা উঠিয়া কোনদিন চিঠি লিখিতে বসে। বেলা দশটা বাজিয়া যায়, জননী বিরক্ত হইয়া উঠেন; পিতামহী শুনিয়া বলেন, আহা, তা লিখুক। সকালবেলা ছুটোছুটি না করিয়া লেখাপড়া করা ভাল।

আবার যেদিন দেবদাসের পত্র আইসে, সেদিনটি পার্বতীর বড় সুখের দিন। সিঁড়ির দ্বারে চৌকাঠের উপর কাগজখানি হাতে লইয়া সারাদিন তাহাই পড়িতে থাকে। শেষে মাস-দুই অতিবাহিত হইয়া গেল। পত্র লেখা কিংবা পাওয়া আর তত ঘন ঘন হয় না; উৎসাহটা যেন কিছু কিছু কমিয়া আসিয়াছে।

একদিন পার্বতী সকালবেলায় জননীকে বলিল, মা, আমি আবার পাঠশালায় যাব।

কেন রে? তিনি কিছু বিস্মিত হইয়াছিলেন।

পার্বতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমি নিশ্চয় যাব।

তা যাস্। পাঠশালা যেতে আমি আর কবে তোকে মানা করেচি মা?

সেইদিন দ্বিপ্রহরে পার্বতী দাসীর হাত ধরিয়া, বহুদিন-পরিত্যক্ত শ্লেট ও বইখানি খুঁজিয়া বাহির করিয়া, সেই পুরাতন স্থানে গিয়া শান্ত, ধীরভাবে উপবেশন করিল।

দাসী কহিল, গুরুমশাই, পারুকে আর মারধর করো না; আপনার ইচ্ছায় পড়তে এসেছে। যখন তার ইচ্ছে হবে পড়বে, যখন ইচ্ছা হবে না বাড়ি চলে যাবে।

পণ্ডিত মহাশয় মনে মনে কহিলেন, তথাস্তু। মুখে বলিলেন, তাই হবে।

একবার তাঁহার এমন ইচ্ছাও হইয়াছিল যে জিজ্ঞাসা করেন, পার্বতীকেও কেন কলিকাতায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল না। কিন্তু সেকথা কহিলেন না। পার্বতী দেখিল, সেইখানে সেই বেঞ্চের উপরেই সর্দার-পোড়ো ভুলো বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া প্রথমে একবার হাসি আসিবার মত হইল, কিন্তু, পরক্ষণেই চোখে জল আসিল। তাহার পর তাহার ভুলোর

উপর বড় রাগ হইল। মনে হইল, যেন সে-ই শুধু দেবদাসকে গৃহছাড়া করিয়াছে। এমন করিয়াও অনেক দিন কাটিয়া গেল।

অনেক দিনের পর দেবদাস বাটী ফিরিয়া আসিল। পার্বতী কাছে ছুটিয়া আসিল—অনেক কথাবার্তা হইল। তাহার বেশী কিছু বলিবার ছিল না,—থাকিলেও বলিতে পারিল না। কিন্তু দেবদাস অনেক কথা কহিল। সমস্তই প্রায় কলিকাতার কথা। তাহার পর, একদিন গ্রীষ্মের ছুটি ফুরাইল। দেবদাস আবার কলিকাতায় চলিয়া গেল। এবারও কান্নাকাটি হইল বটে, কিন্তু সেবারের মত তাহাতে তেমন গভীরতা রহিল না। এমনি করিয়া চারি বৎসর কাটিয়া গেল। এই কয় বৎসরে দেবদাসের স্বভাবের এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, দেখিয়া পার্বতী গোপনে কাঁদিয়া অনেকবার চক্ষু মুছিল। ইতিপূর্বে দেবদাসের যে-সমস্ত গ্রাম্যতা-দোষ ছিল, শহরে বাস করিয়া সে-সব আর একেবারে নাই। এখন তাহার বিলাতী জুতা, ভাল জামা, কাপড়, ছড়ি, সোনার ঘড়ি-চেন, বোতাম—এ-সব না হইলে বড় লজ্জা করে। গ্রামে নদীতীরে বেড়াইতে আর সাধ যায় না; বরং তাহার পরিবর্তে বন্দুক-হাতে শিকারে বাহির হইতেই আনন্দ পায়। ক্ষুদ্র পুঁটিমাছ ধরার বদলে বড় মাছ খেলাইতে ইচ্ছা হয়। শুধু কি তাই? সমাজের কথা, রাজনীতির চর্চা, সভা-সমিতি—ক্রিকেট, ফুটবলের আলোচনা। হায় রে! কোথায় সেই পার্বতী, আর তাহাদের সেই তালসোনাপুর গ্রাম! বাল্যস্মৃতিজড়িত দুই-একটা সুখের কথা যে এখন আর মনে পড়ে না, তাহা নয়—কিন্তু নানা কাজের উৎসাহে সে-সকল আর বেশীক্ষণ হৃদয়ে স্থান পায় না।

আবার গ্রীষ্মের ছুটি হইল। পূর্ব বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে দেবদাস বিদেশ বেড়াইতে গিয়াছিল, বাটী যায় নাই। এবার পিতা-মাতা উভয়েই জিদ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাই ইচ্ছা না থাকিলেও দেবদাস বিছানাপত্র বাঁধিয়া তালসোনাপুর গ্রামের জন্য হাওড়া স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। যেদিন বাটী আসিল, সেদিন তাহার শরীর তেমন ভাল ছিল না, তাই বাহির হইতে পারিল না। পরদিন পার্বতীদের বাটীতে আসিয়া ডাকিল, খুড়ীমা!

পার্বতীর জননী আদর করিয়া ডাকিলেন, এস বাবা, ব'স।

খুড়ীমার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, পারু কোথায় খুড়ীমা?

ঐ বুঝি ওপরের ঘরে আছে।

দেবদাস উপরে আসিয়া দেখিল, পার্বতী সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেছে; ডাকিল, পারু!

প্রথমে পার্বতী চমকিত হইয়া উঠিল, তারপর প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

কি হচ্ছে পারু?

সে-কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই—তাই পার্বতী চুপ করিয়া রহিল। তার পর, দেবদাসের লজ্জা করিতে লাগিল—কহিল, যাই, সন্ধ্যা হয়ে গেল। শরীরটা ভাল নয়।

দেবদাস চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পার্বতী এই তের বছরে পা দিয়াছে—ঠাকুরমাতা এই কথা বলেন। এই বয়সে শারীরিক সৌন্দর্য অকস্মাৎ যেন কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া কিশোরীর সর্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলে। আত্মীয়-স্বজন হঠাৎ একদিন চমকিত হইয়া দেখিতে পান যে, তাঁহাদের ছোট মেয়েটি বড় হইয়াছে। তখন পাত্রস্থা করিবার জন্য বড় তাড়াহুড়া পড়িয়া যায়। চক্রবর্তী-বাড়িতে আজ কয়েক দিবস হইতেই সেই কথার আলোচনা হইতেছে। জননী বড় বিষণ্ণ; কথায় কথায় স্বামীকে শুনাইয়া বলেন, তাইত, পারুকে আর ত রাখা যায় না। তাঁহারা বড়লোক নহেন; তবে ভরসা এই যে, মেয়েটি অতিশয় সুশ্রী। জগতে রূপের

যদি মর্যাদা থাকে, ত পার্বতীর জন্য ভাবিতে হইবে না। আরও একটা কথা আছে—সেটা এইখানেই বলিয়া রাখি। চক্রবর্তী-পরিবারে ইতিপূর্বে কন্যার বিবাহে এতটুকু চিন্তা করিতে হইত না, পুত্রের বিবাহে করিতে হইত। কন্যার বিবাহে পণ গ্রহণ করিতেন এবং পুত্রের বিবাহে পণ দিয়া মেয়ে ঘরে আনিতেন। নীলকণ্ঠের পিতাও তাঁহার কন্যার বিবাহে অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলকণ্ঠ স্বয়ং এ-প্রথাটাকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে, পার্বতীকে বিক্রয় করিয়া অর্থ লাভ করিবেন। পার্বতীর জননী এ-কথা জানিতেন; তাই স্বামীকে কন্যার জন্য তাগাদা করিতেন। ইতিপূর্বে পার্বতীর জননী মনে মনে একটা দুরাশাকে স্থান দিয়াছিলেন—ভাবিয়াছিলেন, দেবদাসের সহিত যদি কোন সূত্রে কন্যার বিবাহ ঘটাইতে পারেন। এ আশা যে নিতান্ত অসম্ভব, তাহা মনে হইত না। ভাবিলেন, দেবদাসকে অনুরোধ করিলে বোধ হয় কোন সুরাহা হইতে পারে। তাই বোধ হয় নীলকণ্ঠের জননী কথায় কথায় দেবদাসের মাতার কাছে কথাটা এইরূপে পাড়িয়াছিলেন—আহা বৌমা, দেবদাসে আর আমার পারুতে কি ভাব! এমনটি কৈ, কোথাও ত দেখা যায় না!

দেবদাসের জননী বলিলেন, তা আর হবে না খুড়ী, দু'জনে ভাই-বোনের মতই যে একসঙ্গে মানুষ হয়ে এসেচে।

হাঁ মা হাঁ—তাইত মনে হয়, যদি দু'জনের—এই দেখ না কেন বৌমা, দেবদাস যখন কলকাতায় গেল, বাছা তখন সবে আট বছরের; সেই বয়সেই ভেবে ভেবে যেন কাঠ হয়ে গেল। দেবদাসের একখানা চিঠি এলে, সেখানা যেন একবারে ওর জপমালা হয়ে উঠত। আমরা সবাই ত তা জানি!

দেবদাসের জননী মনে মনে সমস্ত বুঝিলেন। একটু হাসিলেন। এ হাসিতে বিদ্রূপ কতটুকু প্রচ্ছন্ন ছিল জানি না, কিন্তু, বেদনা অনেকখানি ছিল। তিনিও সব কথা জানিতেন, পার্বতীকে ভালও বাসিতেন। কিন্তু বেচা-কেনা ঘরের মেয়ে যে! তার ওপর আবার ঘরের পাশে কুটুম্ব' ছি ছি! বলিলেন, খুড়ী, কর্তার ত একেবারে ইচ্ছা নয় এই ছেলেবেলায়, বিশেষ প' শুনার সময়ে দেবদাসের বিয়ে দেন। তাই ত কর্তা আমাকে এখনও বলেন, বড় ছেলে বজদাসের ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে কি সর্বনাশটাই করলে। লেখাপড়া একেবারেই হ'ল না

পার্বতীর ঠাকুরমা একেবা' অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তবুও কহিলেন, তা ত সব জানি বৌমা. কিন্তু কি জান—পারু, ষেটের বাছা একটু অমনি বেড়েচেও বটে, আর বাড়ন্ত গড়নও বটে. তাইতে—তাইতে—যদি নারাণের অমত—

দেবদাসের জননী বাধা দিলেন; বলিলেন, না খুড়ী, এ কথা আমি তাঁকে বলতে পারব না। দেবদাসের এ-সময়ে বিয়ের কথা পাড়লে, তিনি কি আমার মুখ দেখবেন!

কথাটা এইখানেই চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। দেবদাসের জননী কর্তার খাবার সময় কথাটা পাড়িয়া বলিলেন, পারুর ঠাকুমা আজ তার বিয়ের কথা পেড়েছিলেন।

কর্তা মুখ তুলিলেন; বলিলেন. হাঁ, পারুর বয়স হ'ল বটে; শীঘ্র বিবাহ দেওয়াই কর্তব্য।

তাইতে ত আজ কথা পেড়েছিলেন। বললেন, দেবদাসের সঙ্গে যদি—

স্বামী ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন. তুমি কি বললে?

আমি আর কি বলব! দু'জনের বড় ভাব; কিন্তু তাই বলে কি বেচা-কেনা, চক্রবর্তী-ঘরের মেয়ে আনতে পারি? তাতে আবার বাড়ির পাশে কুটুম্ব—ছি ছি!

কর্তা সন্তুষ্ট হইলেন; কহিলেন, ঠিক তাই। কুলের কি মুখ হাসাব? এ-সব কথায় কান দিও না।

গৃহিণী শুষ্কহাসি হাসিয়া কহিলেন, না—আমি কান দিইনে; কিন্তু তুমিও যেন ভুলে যেয়ো না।

কর্তা গম্ভীরমুখে ভাতের গ্রাস তুলিয়া বলিলেন, তা হলে এত বড় জমিদারি কোন কালে উড়ে যেত!

জমিদারি তাঁহার চিরদিন থাকুক, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু পার্বতীর দুঃখের কথাটা বলি। যখন এই প্রস্তাবটা নিতান্ত অগ্রাহ্য হইয়া নীলকণ্ঠের কানে গেল, তখন তিনি মাকে ডাকিয়া তিরস্কার করিয়া বলিলেন, মা, কেন এমন কথা বলতে গিয়েছিলে?

মা চুপ করিয়া রহিলেন।

নীলকণ্ঠ কহিতে লাগিলেন, মেয়ের বিয়ে দিতে আমাদের পায়ে ধরে বেড়াতে হয় না, বরং অনেকেই আমার পায়ে ধরবে। মেয়ে আমার কুৎসিত নয়। দেখো, তোমাদের বলে রাখলুম—এক হপ্তার মধ্যেই আমি সম্বন্ধ স্থির ক'রে ফেলবো। বিয়ের ভাবনা কি?

কিন্তু যাহার জন্য পিতা এতবড় কথাটা বলিলেন, তাহার যে মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িল। ছোটবেলা হইতে তাহার একটা ধারণা ছিল যে, দেবদাদার উপর তাহার একটু অধিকার আছে। অধিকার কেহ যে হাতে তুলিয়া দিয়াছে, তাহা নয়। প্রথম সে নিজেও ঠিকমত কিছুই বুঝিতে পারে নাই,—অজ্ঞাতসারে, অশান্ত মন দিনে দিনে এই অধিকারটি এমন নিঃশব্দে অথচ এতই দৃঢ় করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছিল যে, বাহিরে যদিও একটা বাহ্য আকৃতি তাহার এতদিন চোখে পড়ে নাই, কিন্তু, আজ এই হারানোর কথা উঠিতেই তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া একটা ভয়ানক তুফান উঠিতে লাগিল।

কিন্তু দেবদাসের সম্বন্ধে এই কথাটা ঠিক খাটানো যায় না। ছেলেবেলায় যখন সে পার্বতীর উপর দখল পাইয়াছিল, তখন তাহা সে পরিপূর্ণভাবেই উপভোগ করিয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় গিয়া কর্মের উৎসাহে ও অন্যান্য আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে পার্বতীকে সে অনেকটা ছাড়িয়াই দিয়াছিল। কিন্তু সে জানিত না যে, পার্বতী তাহার সেই একঘেয়ে গ্রাম্য-জীবনের মধ্যে নিশিদিন শুধু তাহাকেই ধ্যান করিয়া আসিয়াছে। শুধু তাই নয়। সে ভাবিত, ছেলেবেলা হইতে যাহাকে নিতান্ত আপনার বলিয়াই জানিয়াছিল, ন্যায়-অন্যায় সমস্ত আবদারই এতদিন যাহার উপর খাটাইয়া লইয়াছে, যৌবনের প্রথম ধাপটিতে পা দিয়াই তাহা হইতে এমন অকস্মাৎ পিছলাইয়া পড়িতে হইবে না। কিন্তু তখন কে ভাবিত বিবাহের কথা? কে জানিত সেই কিশোর-বন্ধন বিবাহ ব্যতীত কোনমতেই চিরস্থায়ী করিয়া রাখা যায় না! 'বিবাহ হইতে পারে না', এই সংবাদটা পার্বতীর হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের ভিতর হইতে যেন ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু দেবদাসকে সকালবেলাটায় পড়াশুনা করিতে হয়; দুপুরবেলায় বড় গরম, ঘরের বাহির হওয়া যায় না, শুধু বিকেলবেলাটাতেই ইচ্ছা করিলে একটু বাহির হইতে পারা যায়। এই সময়টাতেই কোনদিন বা সে জামাজোড়া পরিয়া ভাল জুতা পায়ে দিয়া ছড়ি হাতে ময়দানে বাহির হইত। যাইবার সময় চক্রবর্তীদের বাড়ির পাশ দিয়াই যাইত,—পার্বতী উপরে জানালা হইতে চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহা দেখিত। কত কথা মনে পড়িত। মনে পড়িত, দুজনেই বড় হইয়াছে,—দীর্ঘ প্রবাসের পর পরের মত এখন পরস্পরকে বড় লজ্জা করে। দেবদাস সেদিন অমনি চলিয়া গিয়াছিল; লজ্জা করিতেছিল, তাই ভাল করিয়া কথাই কহিতে পারে নাই। এটুকু পার্বতীর বুঝিতে বাকী ছিল না।

দেবদাসও প্রায় এমনি করিয়াই ভাবে। মাঝে মাঝে তাহার সহিত কথা কহিতে, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু অমনি মনে হয়, ইহা কি ভাল দেখাইবে?

এখানে কলিকাতার সেই কোলাহল নাই, আমোদ-আহ্লাদ, থিয়েটার, গান-বাজনা নাই—তাই কেবলই তাহার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, সেই পার্বতী এই পার্বতী হইয়াছে! পার্বতী মনে করে, সেই দেবদাস—এখন এই দেবদাসবাবু হইয়াছে! দেবদাস এখন প্রায়ই চক্রবর্তীদের বাটীতে যায় না। কোনদিন যদি-বা সন্ধ্যার সময় উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকে, খুড়ীমা, কি হচ্ছে?

খুড়ীমা বলেন, এসো বাবা, বোস।

দেবদাস অমনি কহে—না থাক খুড়ীমা, একটু ঘুরে আসি।

তখন পার্বতী কোনদিন বা উপরে থাকে, কোনদিন বা সামনে পড়িয়া যায়। দেবদাস খুড়ীমার সহিত কথা কহে, পার্বতী ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। রাত্রে দেবদাসের ঘরে আলো জ্বলে। গ্রীষ্মকালের খোলা জানালা দিয়া পার্বতী সেদিকে বহুক্ষণ হয়ত চাহিয়া

থাকে—আর কিছুই দেখা যায় না। পার্বতী চিরদিন অভিমানিনী। সে যে ক্লেশ সহ্য করিতেছে, ঘৃণাগ্রে এ কথা কেহ না বুঝিতে পারে, পার্বতীর ইহা কায়মন চেষ্টা। আর জানাইয়াই বা লাভ কি? সহানুভূতি সহ্য হইবে না, আর তিরস্কার-লাঞ্ছনা?—তা তার চেয়ে ত মরণ ভাল। মনোরমার গত বৎসর বিবাহ হইয়াছে। এখনও সে শ্বশুরবাড়ি যায় নাই, তাই মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসে। পূর্বে দুই সখীতে মিলিয়া মাঝে মাঝে এইসব কথাবার্তা হইত, এখনও হয়; কিন্তু পার্বতী আর যোগ দেয় না—হয় চুপ করিয়া থাকে, না হয় কথা উলটাইয়া দেয়।

পার্বতীর পিতা কাল রাত্রে বাটী ফিরিয়াছেন। এ কয়দিন তিনি পাত্র স্থির করিতে বাহিরে গিয়াছিলেন। এখন বিবাহের সমস্ত স্থির করিয়া ঘরে আসিয়াছেন। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ ক্রোশ দূরে বর্ধমান জেলায় হাতীপোতা গ্রামের জমিদারই পাত্র। তাঁহার অবস্থা ভাল, বয়স চল্লিশের নীচেই,—গত বৎসর স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তাই আবার বিবাহ করিবেন। সংবাদটা যে বাটীর সকলেরই চিত্তরঞ্জন করিয়াছিল, তাহা নহে, বরং দুঃখের কারণই হইয়াছিল; তবে একটা কথা এই যে, ভুবন চৌধুরীর নিকট হইতে সর্বরকমে প্রায় দু'তিন হাজার টাকা ঘরে আসিবে। তাই মেয়েরা চুপ করিয়া ছিলেন।

একদিন দুপুরবেলা দেবদাস আহারে বসিয়াছিল। মা কাছে বসিয়া কহিলেন, পারুর যে বিয়ে।

দেবদাস মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে?

এই মাসেই। কাল মেয়ে দেখে গেছে। বর নিজেই এসেছিল।

দেবদাস কিছু বিস্মিত হইল,—কৈ, আমি ত কিছু জানিনে মা!

তুমি আর কি করে জানবে? বর দোজবরে—বয়স হয়েচে; তবে বেশ টাকাকড়ি নাকি আছে, পারু সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে।

দেবদাস মুখ নীচু করিয়া আহার করিতে লাগিল। তাহার জননী পুনরায় কহিতে লাগিলেন, ওদের ইচ্ছা ছিল এই বাড়িতে বিয়ে দেয়।

দেবদাস মুখ তুলিল—তার পর?

জননী হাসিলেন—ছিঃ, তা কি হয়! একে বেচা-কেনা ছোটঘর, তাতে আবার ঘরের পাশে বিয়ে, ছি ছি—বলিয়া মা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন। দেবদাস তাহা দেখিতে পাইল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মা পুনরায় কহিলেন, কর্তাকে আমি বলেছিলাম।

দেবদাস মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কি বললেন?

কি আর বলবেন! এতবড় বংশের মুখ হাসাতে পারবেন না,—তাই আমাকে শুনিয়ে দিলেন।

দেবদাস আর কথা কহিল না।

সেইদিন দ্বিপ্রহরে মনোরমা ও পার্বতীতে কথোপকথন হইতেছিল। পার্বতীর চোখে জল,—মনোরমা বোধ করি এইমাত্র মুছিয়াছে। মনোরমা কহিল,—তবে উপায় বোন?

পার্বতী চোখ মুছিয়া কহিল, উপায় আর কি? তোমার বরকে তুমি পছন্দ করে বিয়ে করেছিলে?

আমার কথা আলাদা। আমার পছন্দ ছিল না, অপছন্দও হয়নি; তাই আমার কোন কষ্টই ভোগ করতে হয় না। কিন্তু তুমি যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেচ বোন!

পার্বতী জবাব দিল না,—ভাবিতে লাগিল।

মনোরমা কি ভাবিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, পারু, বরটির বয়স কত?

কার বরটির?

তোর।

পার্বতী একটু হিসাব করিয়া বলিল, বোধ হয় উনিশ।

মনোরমা অতিশয় বিস্মিত হইল; কহিল, সে কি, এই যে শুনলুম প্রায় চল্লিশ!

এবারে পার্বতীও একটু হাসিল; কহিল, মনোদিদি, কত লোকের বয়স চল্লিশ থাকে, আমি কি তার হিসাব রাখি? আমার বরের বয়স উনিশ-কুড়ি এই পর্যন্ত জানি।

মুখপানে চাহিয়া মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, কি নাম রে?

পার্বতী আবার হাসিয়া উঠিল—এতদিনে বুঝি তাও জানো না।

কি করে জানব!

জান না? আচ্ছা বলে দিই। একটু হাসিয়া, একটু গম্ভীর হইয়া পার্বতী তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, জানিস নে—শ্রীদেবদাস—

মনোরমা প্রথমে একটু চমকাইয়া উঠিল। পরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আর ঠাট্টায় কাজ নেই। নাম কি, এই বেলা বল্, আর ত বলতে পাবিনে—

এই ত বললুম।

মনোরমা রাগ করিয়া কহিল, যদি দেবদাস নাম—তবে কান্নাকাটি করে মরচিস কেন?

পার্বতী সহসা মলিন হইয়া গেল। কি যেন একটু ভাবিয়া বলিল, তা বটে। আর ত কান্নাকাটি করব না—

পারু।

কি?

সব কথা খুলে বল্ না বোন! আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

পার্বতী কহিল, যা বলবার সবই ত বললুম।

কিন্তু কিছুই যে বোঝা গেল না রে!

যাবেও না। বলিয়া পার্বতী আর-একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

মনোরমা ভাবিল, পার্বতী কথা লুকাইতেছে,—তাহার মনের কথা কহিবার ইচ্ছা নাই। বড় অভিমান হইল; দুঃখিত হইয়া কহিল, পারু, তোর যাতে দুঃখ, আমারও ত তাতে তাই বোন। তুই সুখী হ, এই ত আমার আন্তরিক প্রার্থনা। যদি কিছু তোর লুকোন কথা থাকে, আমাকে বলতে না চাস্, বলিস নে। কিন্তু এমন করে আমাকে তামাশা করিস নে।

পার্বতীও দুঃখিতা হইল, কহিল, ঠাট্টা করিনি দিদি। যতদূর নিজে জানি, ততদূর তোমাকেও বলেচি। আমি জানি, আমার স্বামীর নাম দেবদাস; বয়স উনিশ-কুড়ি—সেই কথাই ত তোমাকে বলেচি।

কিন্তু এই যে শুনলুম, তোর আর-কোথায় সম্বন্ধ স্থির হয়েচে!

স্থির আর কি! ঠাকুরমার সঙ্গে ত আর বিয়ে হবে না, হলে আমারই সঙ্গে হবে; আমি ত কৈ এ খবর শুনিনি!

মনোরমা যাহা শুনিয়াছিল, তাহা এখন বলিতে গেল। পার্বতী তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, ও-সব শুনেচি।

তবে? দেবদাস তোকে—

কি আমাকে?

মনোরমা হাসি চাপিয়া বলিল, তবে স্বয়ম্বরা বুঝি? লুকিয়ে লুকিয়ে পাকা বন্দোবস্ত করা হয়ে গেছে?

কাঁচা-পাকা এখনও কিছুই হয়নি।

মনোরমা ব্যথিত-স্বরে কহিল, তুই কি বলিস পারু, কিছুই ত বুঝতে পারিনে।

পার্বতী কহিল, তা হলে দেবদাসকে জিজ্ঞাসা করে তোমায় বুঝিয়ে দেব।

কি জিজ্ঞাসা করবে? সে বিয়ে করবে কি না, তাই?

পার্বতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ, তাই।

মনোরমা ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলিস কি পারু? তুই নিজে একথা জিজ্ঞাসা করবি?

দোষ কি দিদি?

মনোরমা একেবারে অবাক হইয়া গেল—বলিস কি রে? নিজে?

নিজেই। নইলে আমার হয়ে আর কে জিজ্ঞাসা করবে দিদি?

লজ্জা করবে না?

লজ্জা কি? তোমাকে বলতে লজ্জা করলুম?

আমি মেয়েমানুষ—তোর সই, কিন্তু সে যে পুরুষমানুষ পারু।

এবার পার্বতী হাসিয়া উঠিল; কহিল, তুমি সই, তুমি আপনার—কিন্তু তিনি কি পর? যে কথা তোমাকে বলতে পারি, সে কথা কি তাঁকে বলা যায় না?

মনোরমা অবাক হইয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পার্বতী হাসিমুখে কহিল, মনোদিদি, তুই মিছামিছি মাথায় সিঁদুর পরিস। কাকে স্বামী বলে তাই জানিস নে। তিনি আমার স্বামী না হ'লে, আমার সমস্ত লজ্জা-শরমের অতীত না হ'লে, আমি এমন করে মরতে বসতুম না। তা ছাড়া দিদি, মানুষ যখন মরতে বসে, তখন সে কি ভেবে দেখে, বিষটা তেতো কি মিষ্টি! তাঁর কাছে আমার কোন লজ্জা নেই।

মনোরমা মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, তাঁকে কি বলবি? বলবি যে পায়ে স্থান দাও?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক তাই বলবো দিদি।

আর যদি সে স্থান না দেয়?

এবার পার্বতী বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, তখনকার কথা জানিনে দিদি।

বাটী ফিরিবার সময় মনোরমা ভাবিল, ধন্য সাহস! ধন্য বুকের পাটা! আমি যদি মরেও যাই ত এমন কথা মুখে আনতে পারিনে।

কথাটা সত্য। তাই ত পার্বতী বলিয়াছিল, ইহারা অনর্থক মাথায় সিন্দুর পরে, হাতে নোয়া দেয়!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাত্রি বোধ হয় একটা বাজিয়া গিয়াছে। তখনও ম্লান জ্যোৎস্না আকাশের গায়ে লাগিয়া আছে। পার্বতী বিছানার চাদরে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া ধীরপদবিক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—কেহ জাগিয়া নাই। তাহার পর দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়াগ্রামের পথ, একেবারে স্তব্ধ, একেবারে নির্জন—কাহারও সাক্ষাতের আশঙ্কা ছিল না। সে বিনা বাধায় জমিদার-বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেউড়ির উপর বৃদ্ধ দরোয়ান কিষণ সিংহ খাটিয়া বিছাইয়া তখনও তুলসীদাসী রামায়ণ পড়িতেছিল; পার্বতীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চোখ না তুলিয়াই কহিল, কে?

পার্বতী বলিল, আমি।

দ্বারবানজী কণ্ঠস্বরে বুঝিল স্ত্রীলোক। দাসী মনে করিয়া, সে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতে লাগিল। পার্বতী চলিয়া গেল। গ্রীষ্মকাল; বাহিরে উঠানের উপর কয়েকজন ভৃত্য শয়ন করিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ-বা নিদ্রিত, কেহ-বা অর্ধ-জাগরিত। তন্দ্রার ঘোরে কেহ-বা পার্বতীকে দেখিতে পাইল, কিন্তু দাসী ভাবিয়া কথা কহিল না। পার্বতী নির্বিঘ্নে ভিতরে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেল। এ বাটীর প্রতি কক্ষ, প্রতি গবাক্ষ তাহার পরিচিত। দেবদাসের ঘর চিনিয়া লইতে তাহার বিলম্ব হইল না। কপাট খোলা ছিল এবং ভিতরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। পার্বতী ভিতরে আসিয়া দেখিল, দেবদাস শয্যায় নিদ্রিত। শিয়রের কাছে কি একখানা বই তখনও খোলা পড়িয়াছিল,—ভাবে বোধ হইল, সে এইমাত্র যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সে দেবদাসের পায়ের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল। দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটা শুধু টক্‌টক্‌ শব্দ করিতেছে, ইহা ভিন্ন সমস্ত নিস্তব্ধ, সমস্ত সুপ্ত।

পায়ের উপর হাত রাখিয়া পার্বতী ধীরে ধীরে ডাকিল, দেবদা!—

দেবদাস ঘুমের ঘোরে শুনিতে পাইল, কে যেন ডাকিতেছে। চোখ না চাহিয়া সাড়া দিল, উঁ—

ও দেবদা—

এবার দেবদাস চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। পার্বতীর মুখে আবরণ নাই, ঘরে দীপও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে; সহজেই দেবদাস চিনিতে পারিল। কিন্তু প্রথমে যেন বিশ্বাস হইল না। তাহার পর কহিল, একি! পারু নাকি?

হাঁ, আমি।

দেবদাস ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল। বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় বাড়িল—কহিল, এত রাত্রে?

পার্বতী উত্তর দিল না, মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

দেবদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত্রে কি একলা এসেচ নাকি?

পার্বতী বলিল, হাঁ।

দেবদাস উদ্বেগে, আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া কহিল, বল কি! পথে ভয় করেনি?

পার্বতী মৃদু হাসিয়া কহিল, ভূতের ভয় আমার তেমন করে না।

ভূতের ভয় না করুক, কিন্তু মানুষের ভয় ত করে! কেন এসেচ?

পার্বতী জবাব দিল না, কিন্তু মনে মনে কহিল, এ সময়ে আমার তাও বুঝি নেই।

বাড়ি ঢুকলে কি করে? কেউ দেখেনি ত?

দরোয়ান দেখেচে।

দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিল, দরোয়ান দেখেচে? আর কেউ?

উঠানে চাকরেরা শুয়ে আছে—তাদের মধ্যেও বোধ হয় কেউ দেখে থাকবে।

দেবদাস বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কেউ চিনতে পেরেচে কি? পার্বতী কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, তারা সবাই আমাকে জানে, হয়ত-বা কেউ চিনে থাকবে।

বল কি? এমন কাজ কেন করলে পারু?

পার্বতী মনে মনে কহিল, তা তুমি কেমন ক'রে বুঝবে? কিন্তু কোন কথা কহিল না,—অধোবদনে বসিয়া রহিল।

এত রাত্রে! ছি ছি! কাল মুখ দেখাবে কেমন করে?

মুখ নীচু করিয়াই পার্বতী বলিল, আমার সে সাহস আছে।

কথা শুনিয়া দেবদাস রাগ করিল না, কিন্তু নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, ছি ছি—এখনও কি তুমি ছেলেমানুষ আছ? এখানে, এভাবে আসতে কি তোমার কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হ'ল না?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছু না।

কাল তোমার লজ্জায় কি মাথা কাটা যাবে না?

প্রশ্ন শুনিয়া পার্বতী তীব্র অথচ করুণ দৃষ্টিতে দেবদাসের মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া অসঙ্কোচে কহিল, মাথা কাটাই যেতো—যদি না আমি নিশ্চয় জানতুম, আমার সমস্ত লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে।

দেবদাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, আমি! কিন্তু আমিই কি মুখ দেখাতে পারব?

পার্বতী তেমনি অবিচলিত-কণ্ঠে উত্তর দিল, তুমি? কিন্তু তোমার কি দেবদা?

একটুখানি মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল, তুমি পুরুষমানুষ। আজ না হয় কাল তোমার কলঙ্কের কথা সবাই ভুলবে; দু'দিন পরে কেউ মনে রাখবে না—কবে কোন্ রাত্রে হতভাগিনী পার্বতী তোমার পায়ের উপর মাথা রাখবার জন্যে সমস্ত তুচ্ছ করে এসেছিল।

ও কি পারু?

আর আমি—

মন্ত্রমুগ্ধের মত দেবদাস কহিল, আর তুমি?

আমার কলঙ্কের কথা বলচ? না, আমার কলঙ্ক নেই। তোমার কাছে গোপনে এসেছিলাম বলে যদি আমার নিন্দে হয়, সে নিন্দে আমার গায়ে লাগবে না।

ও কি পারু? কাঁদচ?

দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?

সহসা দেবদাস পার্বতীর হাত দুখানি ধরিয়া ফেলিল—পার্বতী!

পার্বতী দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—এইখানে একটু স্থান দাও, দেবদা!

তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। দেবদাসের পা বাহিয়া অনেক ফোঁটা অশ্রু শুভ্র শয্যার উপর গড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পরে দেবদাস পার্বতীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, পারু, আমাকে ছাড়া কি তোমার উপায় নেই?

পার্বতী কথা কহিল না। তেমনি করিয়া পায়ের উপর মাথা পাতিয়া পড়িয়া রহিল। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শুধু তাহার অশ্রু-ব্যাকুল ঘন দীর্ঘশ্বাস দুলিয়া দুলিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। টং টং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল। দেবদাস ডাকিল, পারু!

পার্বতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কি?

বাপ-মায়ের একেবারে অমত, তা শুনেচ?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া জবাব দিল যে, সে শুনিয়াছে। তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর দেবদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে আর কেন?

জলে ডুবিয়া মানুষ যেমন করিয়া অন্ধভাবে মাটি চাপিয়া ধরে, সেটা কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, ঠিক তেমনি করিয়া পার্বতী অজ্ঞানের মত দেবদাসের পা দুটি চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। মুখপানে চাহিয়া কহিল, আমি কিছুই জানতে চাইনে, দেবদা!

পারু, বাপ-মায়ের অবাধ্য হ'ব?

দোষ কি? হও।

তুমি তা'হলে কোথায় থাকবে?

পার্বতী কাঁদিয়া বলিল, তোমার পায়ে—

আবার দুইজনে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। গ্রীষ্মকালের রাত্রি, আর অল্পক্ষণেই প্রভাত হইবে দেখিয়া দেবদাস পার্বতীর হাত ধরিয়া কহিল, চল, তোমাকে বাড়ি রেখে আসি—

আমার সঙ্গে যাবে?

ক্ষতি কি? যদি দুর্নাম রটে, হয়ত কতকটা উপায় হতে পারবে—

তবে চল।

উভয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরদিন পিতার সহিত দেবদাসের অল্পক্ষণের জন্য কথাবার্তা হইল।

পিতা কহিলেন, তুমি চিরদিন আমাকে জ্বালাতন করিয়াছ, যতদিন বাঁচিব, ততদিনই জ্বালাতন হইতে হইবে। তোমার মুখে এ-কথায় আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

দেবদাস নিঃশব্দে অধোবদনে বসিয়া রহিল।

পিতা কহিলেন, আমি ইহার ভিতর নাই। যা ইচ্ছা হয়, তুমি ও তোমার জননীতে মিলিয়া কর।

দেবদাসের জননী এ-কথা শুনিয়া কাঁদিয়া কহিলেন—বাবা, এতও আমার অদৃষ্টে ছিল!

সেইদিন দেবদাস তোড়জোড় বাঁধিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল।

পার্বতী এ-কথা শুনিয়া কঠোর মুখে আরও কঠিন হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। গত রাত্রের কথা কেহই জানে না, সেও কাহাকে কহিল না। তবে মনোরমা আসিয়া ধরিয়া বসিল, পারু, শুনলাম দেবদাস চলে গেছে?

হাঁ—

তবে, তোর উপায় কি করেচে?

উপায়ের কথা সে নিজেই জানে না, অপরকে কি বলিবে? আজ কয়দিন হইতে সে নিরন্তর ইহাই ভাবিতেছিল; কিন্তু কোনক্রমেই স্থির করিতে পারিতেছিল না যে, তাহার আশা কতখানি এবং নিরাশা কতখানি। তবে একটা কথা এই যে, মানুষ এমনি দুঃসময়ের মাঝে আশা-নিরাশার কূল-কিনারা যখন দেখিতে পায় না, তখন দুর্বল মন বড় ভয়ে ভয়ে আশার দিকটাই চাপিয়া ধরিয়া থাকে। যেটা হইলে তাহার মঙ্গল, সেইটাই আশা করে। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই দিক পানেই নিতান্ত উৎসুক নয়নে চাহিয়া দেখিতে চাহে। পার্বতীর এই অবস্থায় সে কতকটা জোর করিয়া আশা করিতেছিল যে, কাল রাত্রের কথাটা নিশ্চয়ই বিফল হইবে না। বিফল হইলে তাহার দশা কি হইবে, এটা তাহার চিন্তার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল। তাই সে ভাবিতেছিল, দেবদাদা আবার আসিবে, আবার আমাকে ডাকিয়া বলিবে, পারু, তোমাকে আমি সাধ্য থাকিতে পরের হাতে দিতে পারিব না।

কিন্তু দিন-দুই পরে পার্বতী এইরূপ পত্র পাইল—

পার্বতী, আজ দুইদিন হইতে তোমার কথাই ভাবিয়াছি। পিতা-মাতার কাহারও ইচ্ছা নহে যে, আমাদের বিবাহ হয়। তোমাকে সুখী করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে এত বড় আঘাত দিতে হইবে, যাহা আমার দ্বারা অসাধ্য। তা ছাড়া, তাঁহাদের বিরুদ্ধে এ-কাজ করিবই বা কেমন করিয়া? তোমাকে আর যে কখন পত্র লিখিব, আপাততঃ এমন কথা ভাবিতে পারিতেছি না। তাই এ পত্রেই সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি। তোমাদের ঘর নীচু। বেচা-কেনা ঘরের মেয়ে মা কোন মতেই ঘরে আনিবেন না; এবং ঘরের পাশে কুটুম্ব, ইহাই তাঁহার মতে নিতান্ত কদর্য। বাবার কথা—সে ত তুমি সমস্তই জান। সে রাত্রের কথা মনে করিয়া বড় ক্লেশ পাইতেছি। কারণ, তোমার মত অভিমানিনী মেয়ে কত বড় ব্যথায় যে সে-কাজ পারিয়াছিল, সে আমি জানি।

আর এক কথা—তোমাকে আমি যে বড় ভালবাসিতাম, তাহা আমার কোন দিন মনে হয় নাই—আজিও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি না। শুধু এই আমার বড় দুঃখ যে, তুমি আমার জন্য কষ্ট পাইবে। চেষ্টা করিয়া আমাকে ভুলিও, এবং আন্তরিক আশীর্বাদ করি, তুমি সফল হও।

—দেবদাস।

পত্রখানা যতক্ষণ দেবদাস ডাকঘরে নিক্ষেপ করে নাই, ততক্ষণ এক কথা ভাবিয়াছিল; কিন্তু রওনা করিবার পরমুহূর্তে হইতেই অন্য কথা ভাবিতে লাগিল। হাতের ঢিল ছুঁড়িয়া দিয়া একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। একটা অনির্দিষ্ট শঙ্কা তাহার মনের মাঝে ক্রমে ক্রমে জড় হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, এ ঢিলটা তাহার মাথায় কিভাবে পড়িবে। খুব লাগিবে কি? বাঁচিবে ত? সে-রাত্রে পায়ের উপর মাথা রাখিয়া সে কেমন করিয়া কাঁদিয়াছিল, পোস্ট অফিস হইতে বাসায় ফিরিবার পথে প্রতি পদক্ষেপে দেবদাসের ইহাই মনে পড়িতেছিল। কাজটা ভাল হইল কি? এবং সকলের উপরে দেবদাস এই ভাবিতেছিল যে, পার্বতীর নিজের যখন কোন দোষ নাই, তখন কেন পিতা-মাতা নিষেধ করেন? বয়সের বুদ্ধির সহিত, এবং কলিকাতায় থাকিয়া, সে এই কথাটি বুঝিতে পারিতেছিল যে শুধু লোক-দেখানো কুলমর্যাদা এবং একটা হীন খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া নিরর্থক একটা প্রাণনাশ করিতে নাই। যদি পার্বতী না বাঁচিতে চাহে, যদি সে নদীর জলে অন্তরের জ্বালা জুড়াইতে ছুটিয়া যায়, তা হইলে বিশ্বপতির চরণে কি একটা মহাপাতকের দাগ পড়িবে না?

বাসায় আসিয়া দেবদাস আপনার ঘরে শুইয়া পড়িল। আজকাল সে একটা মেসে থাকে। মাতুলের আশ্রয় সে অনেকদিন ছাড়িয়া দিয়াছে—সেখানে তাহার কিছুতেই সুবিধা হইত না। যে ঘরে দেবদাস থাকে, তাহারই পাশের ঘরে চুনিলাল বলিয়া একজন যুবক আজ নয় বৎসর হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার এই দীর্ঘ কলিকাতা বাস বি.এ. পাশ করিবার জন্য অতিবাহিত হইয়াছে—আজিও সফলকাম হইতে পারেন নাই বলিয়া এখনো এইখানেই তাঁহাকে থাকিতে হইয়াছে। চুনিলাল তাঁহার নিত্যকর্ম সান্ধ্য-

ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, ভোর নাগাত বাটী ফিরিবেন। বাসায় আর কেহ এখনও আসেন নাই। ঝি আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল, দেবদাস দ্বার রুদ্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল।

তাহার পর একে একে সকলে ফিরিয়া আসিল। খাইবার সময় দেবদাসকে ডাকাডাকি করিল, কিন্তু সে উঠিল না। চুনিলাল কোনদিন রাত্রে বাসায় আসে না, আজিও আসে নাই।

তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গিয়াছে। বাসায় দেবদাস ব্যতীত কেহই জাগিয়া নাই। চুনিলাল গৃহপ্রত্যাবর্তন করিয়া দেবদাসের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ কিন্তু আলো জ্বলিতেছে; ডাকিল, দেবদাস কি জেগে আছ নাকি হে?

দেবদাস ভিতর হইতে কহিল, আছি, তুমি এর মধ্যে ফিরলে যে?

চুনিলাল ঈষৎ হাসিয়া কহিল, হাঁ, শরীরটা আজ ভাল নেই, বলিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, দেবদাস, একবার দ্বার খুলতে পার?

পারি, কেন?

তামাকের জোগাড় আছে?

আছে। বলিয়া দেবদাস দ্বার খুলিয়া দিল। চুনিলাল তামাক সাজিতে বসিয়া কহিল, দেবদাস, এখনো জেগে কেন?

রোজ রোজই কি ঘুম হয়?

হয় না?

চুনিলাল যেন একটু বিদ্রূপ করিয়া কহিল, আমি ভাবতুম তোমাদের মত ভাল ছেলেরা কখনো দুপুর রাত্রের মুখ দেখেনি—আমার আজ একটা নূতন শিক্ষা হ'ল।

দেবদাস কথা কহিল না। চুনিলাল আপনার মনে তামাক খাইতে খাইতে কহিল, দেবদাস, বাড়ি থেকে ফিরে এসে পর্যন্ত যেন ভাল নেই। তোমার মনে যেন কি ক্লেশ আছে।

দেবদাস অন্যমনস্ক হইয়াছিল। জবাব দিল না।

মনটা ভাল নেই, না হে?

দেবদাস হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। ব্যগ্রভাবে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা চুনিবাবু, তোমার মনে কি কোন ক্লেশ নেই?

চুনিলাল হাসিয়া উঠিল—কিছু না।

কখন এ জীবনে ক্লেশ পাওনি?

একথা কেন?

আমার শুনতে বড় সাধ হয়।

তা হলে আর একদিন শুনো।

দেবদাস বলিল, আচ্ছা চুনি, তুমি সারারাত্রি কোথায় থাক?

চুনিলাল মৃদু হাসিয়া কহিল, তা কি তুমি জানো না?

জানি, কিন্তু ঠিক জানিনে।

চুনিলালের মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এসব আলোচনার মধ্যে আর কিছু না থাক, একটা চক্ষুলজ্জাও যে আছে, দীর্ঘ অভ্যাসের দোষে সে তাহাও বিস্মৃত হইয়াছিল। কৌতুক করিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিল, দেবদাস, ভাল করে জানতে হলে কিন্তু ঠিক আমার মত হওয়া চাই। কাল আমার সঙ্গে যাবে?

দেবদাস একবার ভাবিয়া দেখিল। তাহার পর কহিল, শুনি, সেখানে নাকি খুব আমোদ পাওয়া যায়। কোন কষ্ট মনে থাকে না; এ কি সত্যি?

একেবারে খাঁটি সত্যি।

তা যদি হয়, ত আমাকে নিয়ে যেয়ো—আমি যাবো।

পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে চুনিলাল দেবদাসের ঘরে আসিয়া দেখিল, সে ব্যস্তভাবে জিনিসপত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া সাজাইয়া লইতেছে। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হে, যাবে না?

দেবদাস কোনদিকে না চাহিয়া কহিল, হাঁ, যাবো বৈ কি।

তবে এসব কি করচ?

যাবার উদ্যোগ করচি।

চুনিলাল ঈষৎ হাসিয়া ভাবিল, মন্দ উদ্যোগ নয়; কহিল, ঘর-বাড়ি কি সব সেখানে নিয়ে যাবে নাকি হে?

তবে কার কাছে রেখে যাব?

চুনিলাল বুঝিতে পারিল না। কহিল, জিনিসপত্র আমি কার কাছে রেখে যাই? সব ত বাসায় পড়ে থাকে।

দেবদাস যেন হঠাৎ সচেতন হইয়া চোখ তুলিল। লজ্জিত হইয়া কহিল, চুনিবাবু, আজ আমি বাড়ি যাচ্ছি।

সে কি হে? কবে আসবে?

দেবদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি আর আসব না।

বিস্ময়ে চুনিলাল তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেবদাস কহিতে লাগিল,—এই টাকা নাও; আমার যা কিছু ধার আছে, এই থেকে শোধ করে দিয়ো। যদি কিছু বাঁচে, বাসার দাসী-চাকরকে বিলিয়ে দিয়ো। আমি আর কখনো কলকাতায় ফিরব না। মনে মনে বলিতে লাগিল, কলকাতায় এসে আমার অনেক গেছে, অনেক গেছে।

আজ যৌবনের কুয়াশাচ্ছন্ন আঁধার ভেদ করিয়া তাহার চোখে পড়িতেছে—সেই দুর্দান্ত দুর্বিনীত কিশোর বয়সের সেই অযাচিত পদদলিত রত্ন আজ সমস্ত কলিকাতার তুলনাতেও যেন অনেক বড়, অনেক দামী। চুনিলালের মুখপানে চাহিয়া বলিল, চুনি, শিক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান উন্নতি—যা কিছু, সব সুখের জন্য। যেমন করেই দেখ না কেন, নিজের সুখ বাড়ানো ছাড়া এসকল আর কিছুই নয়—

চুনিলাল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, তবে তুমি কি আর লেখাপড়া করবে না নাকি?

না। লেখাপড়ার জন্যে আমার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। আগে যদি জানতাম, এতখানির বদলে আমার এইটুকু লেখাপড়া হবে, তাহলে আমি জন্মে কখনো কলিকাতার মুখ দেখতাম না।

তোমার হয়েছে কি?

দেবদাস ভাবিতে বসিল; কিছুক্ষণ পরে কহিল, আবার যদি কখন দেখা হয়, সব কথা বলব।

রাত্রি তখন প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। বাসায় সকলে এবং চুনিলাল নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া দেখিল, দেবদাস গাড়িতে সমস্ত দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া চিরদিনের মত বাসা পরিত্যাগ করিয়া বাটী চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে চুনিলাল রাগ করিয়া বাসার অপর সকলকে বলিতে লাগিল—এই রকম ভিজে-বেড়াল-গোছ লোকগুলোকে আদতে চিনিতে পারা যায় না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সতর্ক এবং অভিজ্ঞ লোকদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা চক্ষুর নিমিষে কোন দ্রব্যের দোষগুণ সম্বন্ধে দৃঢ় মতামত প্রকাশ করে না—সবটুকুর বিচার না করিয়া, সবটুকুর ধারণা করিয়া লয় না; দুটো দিক দেখিয়া চারিদিকের কথা কহে না। কিন্তু আর একরকমের লোক আছে, যাহারা ঠিক ইহার উলটা। কোন জিনিস বেশীক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করার ধৈর্য ইহাদের নাই, কোন-কিছু হাতে পড়িবামাত্র স্থির করিয়া ফেলে—ইহা ভাল কিংবা মন্দ; তলাইয়া দেখিবার পরিশ্রমটুকু ইহারা বিশ্বাসের জোরে চালাইয়া লয়। এ-সকল লোক যে জগতে কাজ করিতে পারে না তাহা নহে, বরঞ্চ অনেক সময় বেশী কাজ করে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে ইহাদিগকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে দেখিতে পাওয়া যায়। আর না হইলে, অবনতির গভীর কন্দরে চিরদিনের জন্য শুইয়া পড়ে; আর উঠিতে পারে না, আর বসিতে পারে না, আর আলোকের পানে চাহিয়া দেখে না; নিশ্চল, মৃত জড়পিণ্ডের মত পড়িয়া থাকে। এই শ্রেণীর মানুষ দেবদাস।

পরদিন প্রাতঃকালে সে বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। মা আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, দেবা, কলেজের কি আবার ছুটি হ'ল?

দেবদাস 'হাঁ' বলিয়া অন্যমনস্কের ন্যায় চলিয়া গেল। পিতার প্রশ্নেও সে এমনি কি-একটা জবাব দিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া গেল। তিনি ভাল বুঝিতে না পারিয়া গৃহিণীকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি বুদ্ধি খাটাইয়া কহিলেন, গরম এখনো কমেনি বলে আবার ছুটি হয়েচে।

দিন-দুই দেবদাস ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইল। কেননা, যাহা কামনা তাহা হইতেছে না—পার্বতীর সহিত নির্জনে মোটেই সাক্ষাৎ হইল না। দিন-দুই পরে পার্বতীর জননী দেবদাসকে সুমুখে পাইয়া বলিলেন, যদি এসেচিস বাছা, ত পারুর বিয়ে পর্যন্ত থেকে যা।

দেবদাস কহিল, আচ্ছা।

দুপুরবেলা আহারাদি শেষ হইবার পর পার্বতী নিত্য বাঁধে জল আনিতে যাইত; কক্ষে পিত্তল-কলসী লইয়া আজিও সে ঘাটের উপর আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিতে পাইল, অদূরে একটা কুলগাছের আড়ালে দেবদাস জলে ছিপ ফেলিয়া বসিয়া আছে। একবার তাহার মনে হইল, ফিরিয়া যায়; একবার মনে হইল, নিঃশব্দে জল লইয়া প্রস্থান করে; কিন্তু তাড়াতাড়ি কোন কাজটাই সে করিতে পারিল না। কলসীটা ঘাটের উপর রাখিতে গিয়া বোধ হয় একটু শব্দ হওয়ায় দেবদাস চাহিয়া দেখিল। তাহার পর হাত নাড়িয়া ডাকিয়া কহিল, পারু, শুনে যাও।

পার্বতী ধীরে ধীরে কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দেবদাস একটিবার মাত্র মুখ তুলিল, তাহার পর বহুক্ষণ ধরিয়া শূন্যদৃষ্টিতে জলের পানে চাহিয়া রহিল।

পার্বতী কহিল, দেবদা, আমাকে কিছু বলবে?

দেবদাস কোনদিকে না চাহিয়া কহিল, হুঁ,—বোসো। পার্বতী বসিল না, আনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর্যন্ত যখন কোন কথাই হইল না, তখন পার্বতী এক-পা এক-পা করিয়া ধীরে ধীরে ঘাটের দিকে ফিরিয়া চলিতে লাগিল। দেবদাস একবার মুখ তুলিয়া চাহিল; তাহার পর পুনরায় জলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, শোন।

পার্বতী ফিরিয়া আসিল; কিন্তু তথাপি দেবদাস আর কোন কথা কহিতে পারিল না দেখিয়া সে আবার ফিরিয়া গেল। দেবদাস নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে সে ফিরিয়া দেখিল, পার্বতী জল লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে। তখন সে ছিপ গুটাইয়া ঘাটের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল; কহিল, আমি এসেচি।

পার্বতী ঘড়াটা শুধু নামাইয়া রাখিল, কথা কহিল না।

আমি এসেচি পারু!

পার্বতী কিছুক্ষণ কথা না কহিয়া, শেষে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

তুমি আসতে লিখেছিলে, মনে নেই?

না।

সে কি পারু! সে রাত্রের কথা মনে পড়ে না?

তা পড়ে। কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি?

তাহার কণ্ঠস্বর স্থির, কিন্তু অতি রুক্ষ। কিন্তু দেবদাস তাহার মর্ম বুঝিল না; কহিল, আমাকে মাপ কর, পারু। আমি তখন অত বুঝিনি।

চুপ কর। ওসব কথা আমার শুনতেও ভাল লাগে না।

আমি যেমন করিয়া পারি, মা-বাপের মত করিব। শুধু তুমি—

পার্বতী দেবদাসের মুখপানে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, তোমার মা-বাপ আছেন, আমার নেই? তাঁদের মতামতের প্রয়োজন নেই?

দেবদাস লজ্জিত হইয়া কহিল, তা আছে বৈ কি পারু, কিন্তু তাঁদের ত অমত নেই,—তুমি শুধু—

কি করে জানলে তাঁদের অমত নেই? সম্পূর্ণ অমত।

দেবদাস হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কহিল—না গো, তাঁদের একটুকুও অমত নেই—সে আমি বেশ জানি। শুধু তুমি—

পার্বতী কথার মাঝখানেই তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, শুধু আমি! তোমার সঙ্গে? ছিঃ—

চক্ষের পলকে দেবদাসের দুই চক্ষু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। কঠিন-কণ্ঠে কহিল, পার্বতী! আমাকে কি ভুলে গেলে?

প্রথমটা পার্বতী থতমত খাইল; কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া শান্ত কঠিন-স্বরে জবাব দিল, না, ভুলব কেন? ছেলেবেলা থেকে তোমাকে দেখে আসচি, জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত ভয় করে আসচি—তুমি কি তাই আমাকে ভয় দেখাতে এসেচ? কিন্তু আমাকেই কি তুমি চেন না? বলিয়া সে নির্ভীক দুই চক্ষু তুলিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমে দেবদাসের বাক্য-নিঃসরণ হইল না; পরে কহিল, চিরকাল ভয় করেই আমাকে এসেচ,—আর কিছু না?

পার্বতী দৃঢ়স্বরে বলিল, না, আর কিছুই না।

সত্যি বলচ?

হাঁ, সত্যিই বলচি। তোমাতে কিছুমাত্র আমার আস্থা নেই। আমি যাঁর কাছে যাচ্ছি, তিনি ধনবান্ বুদ্ধিমান্—শান্ত এবং স্থির। তিনি ধার্মিক। আমার মা-বাপ আমার মঙ্গল কামনা করেন; তাই তাঁরা তোমার মত একজন অজ্ঞান, চঞ্চলচিত্ত, দুর্দান্ত লোকের হাতে আমাকে কিছুতেই দেবেন না। তুমি পথ ছেড়ে দাও।

একবার দেবদাস একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, একবার যেন একটু পথ ছাড়িতেও উদ্যত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দৃঢ়পদে মুখ তুলিয়া কহিল—এত অহঙ্কার!

পার্বতী বলিল, নয় কেন? তুমি পার, আমি পারিনে? তোমার রূপ আছে, গুণ নেই—আমার রূপ আছে, গুণও আছে। তোমরা বড়লোক, কিন্তু আমার বাবাও ভিক্ষে করে বেড়ান না। তা ছাড়া, দু'দিন পরে আমি নিজেও তোমাদের চেয়ে কোন অংশে হীন থাকবো না, সে তুমি জানো?

দেবদাস অবাক হইয়া গেল।

পার্বতী পুনরায় কহিয়া উঠিল—তুমি ভাবচ যে, আমার অনেক ক্ষতি করবে। অনেক না হোক, কিছু ক্ষতি করতে পার বটে, সে আমি জানি। বেশ, তাই ক'রো। আমাকে শুধু পথ ছেড়ে দাও।

দেবদাস হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, ক্ষতি কেমন ক'রে করবো?

পার্বতী তৎক্ষণাৎ বলিয়া দিল—অপবাদ দিয়ে। তাই দাও গে যাও।

কথা শুনিয়া দেবদাস বজ্রাহতের মত চাহিয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—অপবাদ দেব আমি!

পার্বতী বিষের মত একটুখানি ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, যাও, শেষ সময়ে আমার নামে একটা কলঙ্ক রটিয়ে দাও গে; সে রাত্রে তোমার কাছে একাকী গিয়েছিলাম, এই কথা চারিদিকে রাষ্ট্র করে দাও গে। মনের মধ্যে অনেকখানি সান্ত্বনা পেতে পারবে। বলিয়া পার্বতীর দর্পিত ক্রুদ্ধ ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল।

কিন্তু দেবদাসের বুকের ভিতরটায় রাগে অপমানে অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। সে অব্যক্তস্বরে কহিল, মিথ্যে দুর্নাম রটিয়ে মনের মধ্যে সান্ত্বনা পাব আমি? এবং পরক্ষণেই সে ছিপের মোটা বাঁটটা সজোরে ঘুরাইয়া ধরিয়া ভীষণ-কণ্ঠে কহিল, শোন পার্বতী, অতটা রূপ থাকা ভাল নয়। অহঙ্কার বড় বেড়ে যায়। বলিয়া গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, দেখতে পাও না, চাঁদের অত রূপ বলেই তাতে কলঙ্কের কালো দাগ; পদ্ম অত সাদা বলেই তাতে কালো ভ্রমর বসে থাকে। এস, তোমারও মুখে কিছু কলঙ্কের ছাপ দিয়ে দিই।

দেবদাসের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সে দৃঢ়মুষ্টিতে ছিপের বাঁট ঘুরাইয়া লইয়া সজোরে পার্বতীর মাথায় আঘাত করিল; সঙ্গে সঙ্গেই কপালের উপর বাম ভ্রূর নীচে পর্যন্ত চিরিয়া গেল। চক্ষের নিমিষে সমস্ত মুখ রক্তে ভাসিয়া গেল।

পার্বতী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, দেবদা, করলে কি!

দেবদাস ছিপটা টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙিয়া জলে ভাসাইয়া দিতে দিতে স্থিরভাবে উত্তর দিল, বেশী কিছু নয়, সামান্য খানিকটা কেটে গেছে মাত্র।

পার্বতী আকুল-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল—ও গো, দেবদা!

দেবদাস নিজের পাতলা জামার খানিকটা ছিঁড়িয়া লইয়া, জলে ভিজাইয়া পার্বতীর কপালের উপর বাঁধিতে বাঁধিতে কহিল, ভয় কি পারু! এ আঘাত শীঘ্র সেরে যাবে—শুধু দাগ থাকবে। যদি কেউ কখনো এ কথা জিজ্ঞাসা করে, মিথ্যা কথা ব'লো; না হয়, সত্য ব'লে নিজের কলঙ্ক নিজেই প্রকাশ করো।

ও গো, মা গো!—

ছিঃ, অমন ক'রে না পারু। শেষ-বিদায়ের দিনে শুধু একটুখানি মনে রাখবার মত চিহ্ন রেখে গেলাম। অমন সোনার মুখ আরশিতে মাঝে মাঝে দেখবে ত? বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া চলিতে উদ্যত হইল।

পার্বতী আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, দেবদাদা গো—

দেবদাস ফিরিয়া আসিল। চোখের কোণে একফোঁটা জল।

বড় স্নেহজড়িতকণ্ঠে কহিল, কেন রে পারু?

কাউকে যেন ব'লো না।

দেবদাস নিমিষে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া পার্বতীর চুলের উপর ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, ছিঃ—তুই কি আমার পর পারু? তোর মনে নেই, দুষ্টামি করলে ছেলেবেলায় কত তোর কান মলে দিয়েচি।

দেবদাদা—মাপ কর আমাকে।

তা তোকে বলতে হবে না ভাই। সত্যিই কি পারু, আমাকে একেবারে ভুলে গেছিস? কবে তোর ওপর রাগ করেছিলাম? কবে মাপ করিনি?

দেবদাদা—

পার্বতী, তুমি ত জানো, আমি বেশী কথা বলতে পারিনে; বেশী ভেবে-চিন্তে কাজ করতেও পারিনে। যখন যা মনে হয় করি। বলিয়া দেবদাস পার্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিল, তুমি ভালই করেছ। আমার কাছে তুমি ত সুখ পেতে না; কিন্তু তোমার এই দেবদাদার অক্ষয় স্বর্গবাস ঘটত।

এই সময় বাঁধের অন্যদিকে কাহারা আসিতেছিল। পার্বতী ধীরে ধীরে জলে আসিয়া নামিল। দেবদাস চলিয়া গেল। পার্বতী যখন বাটী ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুমা না দেখিয়াই কহিতেছিলেন, পারু, পুকুর খুঁড়ে কি জল আনচিস দিদি!

কিন্তু তাঁর মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। পার্বতীর মুখপানে চাহিবামাত্রই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ও মা গো! এ সর্বনাশ কেমন ক'রে হ'ল?

ক্ষতস্থান দিয়া তখনও রক্তস্রাব হইতেছিল; বস্ত্রখণ্ড প্রায় সমস্তটাই রক্তে রাঙা। কাঁদিয়া কহিলেন, ওগো মা গো! তোর যে বিয়ে পারু!

পার্বতী স্থিরভাবে কলসী নামাইয়া রাখিল। মা আসিয়া কাঁদিয়া প্রশ্ন করিলেন, এ সর্বনাশ কি করে হ'লো, পারু!

পারু সহজভাবে বলিল, ঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম। ইঁটে মাথা লেগে কেটে গেছে।

তাহার পর সকলে মিলিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দেবদাস সত্য কথাই কহিয়াছিল,—আঘাত বেশী নয়। চার-পাঁচ দিনেই শুকাইয়া উঠিল। আরো আট-দশ দিন অমনি গেল। তাহার পর একদিন রাত্রে হাতীপোতা গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন চৌধুরী বর সাজিয়া বিবাহ করিতে আসিলেন। উৎসবে ঘটাপটা তেমন হইল না। ভুবনবাবু নির্বোধ লোক ছিলেন না,—প্রৌঢ়-বয়সে আবার বিবাহ করিতে আসিয়া ছোকরা সাজাটা ভাল বোধ করেন নাই।

বরের বয়স চল্লিশের নীচে নহে,—কিছু উপর; গৌরবর্ণ, মোটাসোটা নন্দদুলাল ধরনের শরীর। কাঁচা-পাকা গোঁফ, মাথার সামনে একটু টাক। বর দেখিয়া কেহ হাসিল, কেহ চুপ করিয়া রহিল। ভুবনবাবু শান্ত-গম্ভীরমুখে কতকটা যেন অপরাধীর মত,

ছাদনাতলায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। কানমলা প্রভৃতি অত্যাচার উপদ্রব হইল না; কারণ, অতখানি বিজ্ঞ গম্ভীর লোকের কানে কাহারই হাত উঠিল না। শুভদৃষ্টির সময় পার্বতী কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল। ওষ্ঠের কোণে একটু হাসির রেখা,—ভুবনবাবু ছেলেমানুষটির মত দৃষ্টি অবনত করিলেন। পাড়ার মেয়েরা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। চক্রবর্তী মহাশয় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রবীণ জামাতা লইয়া তিনি কিছু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। জমিদার নারাণ মুখুয্যে আজ কন্যাকর্তা। পাকা লোক—কোন পক্ষে, কোনদিকেই ত্রুটি হইল না। শুভকর্ম সুশৃঙ্খলায় সমাধা হইয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে চৌধুরীমহাশয় এক বাক্স অলঙ্কার বাহির করিয়া দিলেন। পার্বতীর সর্বাঙ্গে সে-সকল ঝলমল করিয়া উঠিল। জননী তাহা দেখিয়া আঁচল দিয়া চোখের কোণ মুছিলেন। নিকটে জমিদার-গৃহিণী দাঁড়াইয়া ছিলেন,—তিনি সস্নেহে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, আজ চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিস নে দিদি!

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মনোরমা পার্বতীকে একটা নির্জন ঘরে টানিয়া লইয়া গিয়া আশীর্বাদ করিল—যা হ'ল, ভালই হ'ল। এখন থেকে দেখবি—কত সুখে থাকবি।

পার্বতী অল্প হাসিয়া বলিল, তা থাকব। যমের সঙ্গে কাল একটুখানি পরিচয় হয়েছে কিনা!

ও কি কথা রে!

সময়ে সব দেখতে পাবি।

মনোরমা তখন অন্য কথা পাড়িল; কহিল, একবার ইচ্ছে করে, দেবদাসকে ডেকে এনে এই সোনার প্রতিমা দেখাই!

পার্বতীর যেন চমক ভাঙ্গিল। পারিস দিদি? একবার ডেকে আনতে পারা যায় না?

কণ্ঠস্বরে মনোরমা শিহরিয়া উঠিল,—কেন পারু!

পার্বতী হাতের বালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে অন্যমনস্কভাবে কহিল, একবার পায়ের ধুলো মাথায় নেব—আজ যাব কিনা!

মনোরমা পার্বতীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া, দু'জনে বড় কান্না কাঁদিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, ঘর অন্ধকার—পিতামহী দ্বার ঠেলিয়া বাহির হইতে কহিলেন, ও পারু, ও মনো, তোরা বাইরে আয় দিদি!

সেই রাত্রিতেই পার্বতী স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

আর দেবদাস? সে রাত্রিটা সে কলিকাতা ইডেন গার্ডেনের একটা বেঞ্চের উপর বসিয়া কাটাইয়া দিল। তাহার খুব যে ক্লেশ হইতেছিল, যাতনায় মর্মভেদ হইতেছিল, তাহা নয়। কেমন একটা শিথিল ঔদাস্য ধীরে ধীরে বুকের মধ্যে জমা হইয়া উঠিতেছিল। নিদ্রার মধ্যে শরীরের কোন একটা অঙ্গে হঠাৎ পক্ষাঘাত হইলে, ঘুম ভাঙ্গিয়া সেটার উপর যেমন কোন অধিকার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং বিস্মিত স্তম্ভিত মন মুহূর্তে ঠাওরাইতে পারে না, কেন তাহার আজন্ম-সঙ্গী চিরদিনের বিশ্বস্ত অঙ্গটা তাহার আহ্বানে সাড়া দিতেছে না; তাহার পর ধীরে ধীরে বুঝিতে পারা যায়, ধীরে ধীরে জ্ঞান জন্মে যে, এটা আর তাহার নিজের নাই; দেবদাস এমনি ধীরে ধীরে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া বুঝিতেছিল যে, সময়ে সংসারটার অকস্মাৎ পক্ষাঘাত হইয়া, তাহার সহিত চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার উপর মিথ্যা রাগ-অভিমান আর কিছুই খাটিবে না। সাবেক অধিকারের কথাটা ভাবিতে যাওয়াই ভুল হইবে। তখন সূর্যোদয় হইতেছিল। দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিল, কোথায় যাই? হঠাৎ স্মরণ হইল তাহার কলিকাতার বাসাটা। সেখানে চুনিলাল আছে। দেবদাস চলিতে লাগিল। পথে বার-দুই ধাক্কা খাইল, হোঁচট খাইয়া অঙ্গুলি রক্তাক্ত করিল—টাল খাইয়া একজনের গায়ের

উপর পড়িতেছিল,—সে মাতাল বলিয়া ঠেলিয়া দিল। এমনি করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দিনশেষে মেসের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। চুনিবাবু তখন বেশ-বিন্যাস করিয়া বাহির হইতেছিলেন। — এ কি, দেবদাস যে!

দেবদাস নীরবে চাহিয়া রহিল।

কখন এলে হে? মুখ শুকনো, স্নানাহার হয়নি—ওকি—কি! দেবদাস পথের উপরেই বসিয়া পড়িতেছিল, চুনিলাল হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেল। নিজের শয্যার উপর বসাইয়া, শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি দেবদাস?

কাল বাড়ি থেকে এসেচি।

কাল? সমস্তদিন তবে ছিলে কোথায়? রাত্রেই বা কোথায় ছিলে?

ইডেন গার্ডেনে।

পাগল নাকি! কি হয়েছে, বল দেখি?

শুনে কি হবে?

না বল, এখন খাওয়া-দাওয়া করো। তোমার জিনিসপত্র কোথায়?

কিছুই আনিনি।

তা হোক, এখন খেতে বোস।

তখন জোর করিয়া চুনিলাল কিছু আহার করাইয়া, শয্যায় শুইতে আদেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিতে করিতে কহিল, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, আমি রাত্রে এসে তোমাকে তুলব। বলিয়া সে তখনকার মত চলিয়া গেল। রাত্রি দশটার মধ্যে সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, দেবদাস তাহার বিছানায় গভীর নিদ্রায় সুপ্ত। না ডাকিয়া, সে নিজে একখানা কম্বল টানিয়া লইয়া, নীচে মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। সারা রাত্রির মধ্যে দেবদাসের ঘুম ভাঙ্গিল না, প্রভাতেও না। বেলা দশটার সময় সে উঠিয়া বসিয়া কহিল, চুনিবাবু, কখন এলে হে?

এইমাত্র আসচি।

তবে তোমার কোনরকম অসুবিধা হয়নি!

কিছু না।

দেবদাস কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, চুনিবাবু, আমার যে কিছু নেই, তুমি আমাকে প্রতিপালন করবে?

চুনিলাল হাসিল। সে জানিত, দেবদাসের পিতা মহা ধনবান ব্যক্তি। তাই হাসিয়া কহিল, আমি প্রতিপালন করব! বেশ কথা। তোমার যতদিন ইচ্ছা থাক, কোন ভাবনা নেই।

চুনিবাবু, তোমার আয় কত?

ভাই, আমার আয় সামান্য। বাটীতে কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, তা দাদার কাছে গচ্ছিত রেখে এখানে বাস করি। তিনি প্রতিমাসে সত্তর টাকা হিসাবে পাঠিয়ে দেন। এতে তোমার আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

তুমি বাড়ি যাও না কেন?

চুনিলাল ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল, সে অনেক কথা।

দেবদাস আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। ক্রমে আহারাদির জন্য ডাক পড়িল। তাহার পর দুইজনে স্নানাহার শেষ করিয়া পুনরায় ঘরে আসিয়া বসিলে চুনিলাল বলিল, দেবদাস, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করেচ?

না।

আর কারো সঙ্গে?

দেবদাস তেমনি জবাব দিল, না।

তাহার পর চুনিলালের হঠাৎ অন্য কথা স্মরণ হইল। কহিল, ওহো, তোমার এখনো বিয়েই হয়নি যে!

এই সময় দেবদাস অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণেই চুনিলাল দেখিল, দেবদাস ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এমনি করিয়া ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আরও দুইদিন অতীত হইল। তৃতীয় দিবসের প্রাতঃকালে দেবদাস সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। মুখ

হইতে সেই ঘন ছায়া যেন অনেকটা সরিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। চুনিলাল জিজ্ঞাসা করিল, আজ শরীর কেমন?

বোধ হয় অনেকটা ভাল। আচ্ছা চুনিবাবু, রাত্রে তুমি কোথায় যাও?

আজ চুনিলাল লজ্জিত হইল; বলিল, হাঁ, তা যাই বটে, কিন্তু সে কথা কেন?

আচ্ছা,—আর তুমি কেন কলেজে যাও না?

না—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েচি।

ছিঃ, তা কি হয়? মাস-দুই পরে তোমার পরীক্ষা। পড়াও তোমার মন্দ হয়নি, এবার কেন পরীক্ষা দাও না!

না—পড়া ছেড়ে দিয়েচি।

চুনিলাল চুপ করিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাও—বলবে না? তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।

চুনিলাল দেবদাসের মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি জান দেবদাস, আমি খুব ভাল জায়গায় যাইনে।

দেবদাস যেন আপনার মনে কহিল, ভাল আর মন্দ! ছাই কথা!—চুনিবাবু, আমাকে সঙ্গে নেবে না?

তা নিতে পারি। কিন্তু তুমি যেয়ো না।

না, আমি যাবই। যদি ভাল না লাগে, আর না হয় যাব না। কিন্তু তুমি যে সুখের আশায় প্রত্যহ উন্মুখ হয়ে থাকো—যাই হোক চুনিবাবু, আমি নিশ্চয়ই যাবো।

চুনিলাল মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল; মনে মনে বলিল, আমার দশা! মুখে বলিল, আচ্ছা, তাই যেয়ো।

অপরাহ্ণবেলায় ধর্মদাস জিনিসপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। দেবদাসকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। দেবতা, আজ তিন-চারদিন ধরে মা কত যে কাঁদচেন—

কেন রে?

কিছু না বলে হঠাৎ চলে এলে কেন? একখানা পত্র বাহির করিয়া হাতে দিয়া কহিল, মার চিঠি।

চুনিলাল ভিতরের খবর বুঝিবার জন্য উৎসুকভাবে চাহিয়া রহিল। দেবদাস পত্র পাঠ করিয়া রাখিয়া দিল। জননী বাটী আসিবার জন্য আদেশ ও অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছেন। সমস্ত বাটীর মধ্যে তিনিই শুধু দেবদাসের অকস্মাৎ তিরোধানের কারণ কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্মদাসের হাত দিয়া লুকাইয়া অনেকগুলি টাকাও পাঠাইয়াছিলেন। ধর্মদাস সেগুলি হাতে দিয়া কহিল, দেব্‌তা, বাড়ি চল।

আমি যাব না। তুই ফিরে যা।

রাত্রিতে দুই বন্ধু বেশ-বিন্যাস করিয়া বাহির হইল। দেবদাসের এ-সকলে তেমন প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু চুনিলাল কিছুতেই সামান্য পোশাকে বাহির হইতে রাজী হইল না। রাত্রি নয়টার সময় একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ি চীৎপুরের একটি দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চুনিলাল দেবদাসের হাত ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। গৃহ-স্বামিনীর নাম চন্দ্রমুখী—সে আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। এইবার দেবদাসের সর্বশরীর জ্বালা করিয়া উঠিল। সে যে এই কয়দিন ধরিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে নারীদেহের ছায়ার উপরেও বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল, ইহা সে নিজেই জানিত না। চন্দ্রমুখীকে দেখিবামাত্রই অন্তরের নিবিড় ঘৃণা দাবদাহের ন্যায় বুকের ভিতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। চুনিলালের মুখপানে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, চুনিবাবু, এ কোন্ হতভাগা জায়গায় আনলে? তার তীব্রকণ্ঠ ও চোখের দৃষ্টি দেখিয়া চন্দ্রমুখী ও চুনিলাল উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেল। পরক্ষণেই চুনিলাল আপনাকে সামলাইয়া লইয়া দেবদাসের একটা হাত ধরিয়া কোমল-কণ্ঠে কহিল, চল চল, ভিতরে গিয়ে বসি।

দেবদাস আর কিছু কহিল না—ঘরের ভিতরে আসিয়া নীচের বিছানায় বিষণ্ণ নতমুখে উপবেশন করিল। চন্দ্রমুখীও নীরবে অদূরে বসিয়া পড়িল। ঝি রূপা-বাঁধানো হুঁকায়

তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল—দেবদাস স্পর্শও করিল না। চুনিলাল মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ঝি কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে চন্দ্রমুখীর হাতেই হুঁকাটা দিয়া প্রস্থান করিল। সে দুই-একবার টানিবার সময়, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া, হঠাৎ নিরতিশয় ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, কি অসভ্য! আর কি বিশ্রীই দেখতে!

ইতিপূর্বে চন্দ্রমুখীকে কেহ কখনো কথায় ঠকাইতে পারে নাই। তাহাকে অপ্রতিভ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু দেবদাসের এই আন্তরিক ঘৃণার সরল এবং কঠিন উক্তি তাহার ভিতরে গিয়া পৌঁছিল। ক্ষণকালের জন্য সে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরে আরও বার-দুই গুড়গুড় করিয়া শব্দ হইল, কিন্তু চন্দ্রমুখীর মুখ দিয়া আর ধোঁয়া বাহির হইল না। তখন চুনিলালের হাতে হুঁকা দিয়া সে একবার দেবদাসের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। নির্বাক তিনজনেই। শুধু গুড়গুড় করিয়া হুঁকার শব্দ হইতেছে, কিন্তু তাহা যেন বড় ভয়ে ভয়ে। বন্ধুমণ্ডলীর মাঝে তর্ক উঠিয়া হঠাৎ নিরর্থক একটা কলহ হইয়া গেলে, প্রত্যেকেই যেমন নীরবে নিজের মনে ফুলিতে থাকে, এবং ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ মিছামিছি কহিতে থাকে, তাইত! এমনি তিনজনেই মনে মনে বলিতে লাগিল, তাইত! এ কেমন হইল!

যেমনই হোক, কেহই স্বস্তি পাইতেছিল না। চুনিলাল হুঁকা রাখিয়া দিয়া নীচে নামিয়া গেল, বোধ করি আর কোন কাজ খুঁজিয়া পাইল না,—তাই। ঘরে দুইজনে বসিয়া রহিল। দেবদাস মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি টাকা নাও?

চন্দ্রমুখী সহসা উত্তর দিতে পারিল না। আজ তার চব্বিশ বৎসর বয়স হইয়াছে, এই নয়-দশ বৎসরের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে; কিন্তু এমন আশ্চর্য লোক সে একটি দিনও দেখে নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আপনার যখন পায়ের ধুলো পড়েচে—

দেবদাস কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, পায়ের ধুলোর কথা নয়। টাকা নাও ত?

তা নিই বৈ কি। না হলে আমাদের চলবে কিসে?

থাক, অত শুনতে চাইনে। বলিয়া সে পকেটে হাত দিয়া একখানা নোট বাহির করিল এবং চন্দ্রমুখীর হাতে দিয়াই চলিতে উদ্যত হইল—একবার চাহিয়াও দেখিল না কত টাকা দিল।

চন্দ্রমুখী বিনীতভাবে কহিল, এরি মধ্যে যাবেন?

দেবদাস কথা কহিল না—বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রমুখীর একবার ইচ্ছা হইল, টাকাটা ফিরাইয়া দেয়; কিন্তু কেমন একটা তীব্র সঙ্কোচের বশে পারিল না, বোধ করি বা একটু ভয়ও তাহার হইয়াছিল। তা ছাড়া, অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও অপমান সহ্য করা অভ্যাস তাহাদের আছে বলিয়াই নির্বাক নিস্পন্দ হইয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দেবদাস সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সিঁড়ির পথেই চুনিলালের সহিত দেখা হইল। সে আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কোথায় যাচ্চ দেবদাস?

বাসায় যাচ্চি।

সে কি হে?

দেবদাস আরও দুই-তিনটি সিঁড়ি নামিয়া পড়িল।

চুনিলাল কহিল, চল, আমিও যাই।

দেবদাস কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, চল।

একটু দাঁড়াও, একবার উপর থেকে আসি।

না, আমি যাই, তুমি পরে এসো; বলিয়া দেবদাস চলিয়া গেল।

চুনিলাল উপরে আসিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী তখনও সেইভাবে চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া কহিল, বন্ধু চলে গেল?

হ্যাঁ।

চন্দ্রমুখী হাতের নোট দেখাইয়া কহিল, এই দেখ। কিন্তু ভাল বোধ কর ত নিয়ে যাও; তোমার বন্ধুকে ফিরিয়ে দিয়ো।

চুনিলাল কহিল, সে ইচ্ছে করে দিয়ে গেছে, আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো কেন?

এতক্ষণ পরে চন্দ্রমুখী একটুখানি হাসিতে পারিল; কিন্তু হাসিতে আনন্দ ছিল না। কহিল, ইচ্ছে করে নয়, আমরা টাকা নিই বলে রাগ করে দিয়ে গেছে। হাঁ, চুনিবাবু, লোকটা কি পাগল?

একটুও না। তবে আজ ক'দিন থেকে বোধ করি ওর মন ভালো নেই।

কেন মন ভালো নেই —কিছু জানো?

তা জানিনে। বোধ হয় বাড়িতে কিছু হয়ে থাকবে।

তবে এখানে আনলে কেন?

আমি আনতে চাইনি, সে নিজে জোর করে এসেছিল।

চন্দ্রমুখী এবার যথার্থই বিস্মিত হইল। কহিল, জোর করে নিজে এসেছিল? সমস্ত জেনে?

চুনিলাল একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তা বৈ কি! সমস্তই ত জানত। আমি ত আর ভুলিয়ে আনিনি!

চন্দ্রমুখী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিয়া কহিল, চুনি, আমার একটি উপকার করবে?

কি?

তোমার বন্ধু কোথায় থাকেন?

আমার কাছে।

আর-একদিন তাকে আনতে পারবে?

তা বোধ হয় পারব না। এর আগেও কখনো সে এ-সব জায়গায় আসেনি, পরেও বোধ হয় আর আসবে না। কিন্তু কেন বল দেখি?

চন্দ্রমুখী একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, চুনি, যেমন করে হোক, ভুলিয়ে আর একবার তাকে এনো।

চুনি হাসিল; চোখ টিপিয়া কহিল, ধমক খেয়ে ভালবাসা জন্মাল নাকি?

চন্দ্রমুখীও হাসিল; কহিল, না দেখে নোট দিয়ে যায়—এটা বুঝলে না?

চুনি চন্দ্রমুখীকে কতকটা চিনিতে পারিয়াছিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—না, নোট-ফোটের লোক আলাদা—সে তুমি নও। কিন্তু সত্যি কথাটা কি বল ত?

চন্দ্রমুখী কহিল, সত্যিই একটু মায়া পড়েচে।

চুনি বিশ্বাস করিল না; হাসিয়া কহিল, এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে?

এবার চন্দ্রমুখীও হাসিতে লাগিল। বলিল, তা হোক। মন ভালো হলে আর একদিন এনো—আর একবার দেখব। আনবে ত?

কি জানি!

আমার মাথার দিব্যি রইল।

আচ্ছা—দেখব।

দশম পরিচ্ছেদ

পার্বতী আসিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর মস্ত বাড়ি। নূতন সাহেবী ফ্যাশনের নহে, পুরাতন সেকেলে ধরনের। সদর মহল, অন্দর মহল, পূজার দালান, নাটমন্দির, অতিথিশালা, কাছারি-বাড়ি তোশাখানা, কত দাসদাসী—পার্বতী অবাক হইয়া গেল। সে শুনিয়াছিল, তাহার স্বামী বড়লোক, জমিদার। কিন্তু এতটা ভাবে নাই। অভাব শুধু লোকের। আত্মীয়, কুটুম্ব-কুটুম্বিনী কেহই প্রায় নাই। অত বড় অন্দর মহল জনশূন্য। পার্বতী

বিয়ের কনে, একেবারে গৃহিণী হইয়া বসিল। বরণ করিয়া ঘরে তুলিবার জন্য একজন বৃদ্ধা পিসী ছিলেন। ইনি ভিন্ন কেবল দাসদাসীর দল।

সন্ধ্যার পূর্বে একজন সুশ্রী সুন্দর বিংশবর্ষীয় যুবাপুরুষ প্রণাম করিয়া অদূরে দাঁড়াইয়া কহিল, মা, আমি তোমার বড়ছেলে।

পার্বতী অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া ঈষৎ চাহিয়া দেখিল, কথা কহিল না। সে আর একবার প্রণাম করিয়া কহিল, মা, আমি তোমার বড়ছেলে—প্রণাম করি।

পার্বতী দীর্ঘ অবগুণ্ঠন কপালের উপর পর্যন্ত তুলিয়া দিয়া এবার কথা কহিল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, এস বাবা, এস।

ছেলেটির নাম মহেন্দ্র। সে কিছুক্ষণ পার্বতীর মুখপানে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল; তৎপর অদূরে বসিয়া পড়িয়া বিনীত-স্বরে বলিতে লাগিল, আজ দু'বছর হ'ল আমরা মা হারিয়েচি। এই দু'বছর আমাদের দুঃখে-কষ্টেই দিন কেটেচে। আজ তুমি এলে,—আশীর্বাদ কর মা, এবার যেন সুখে থাকতে পাই।

পার্বতী বেশ সহজ গলায় কথা কহিল। কেননা, একেবারে গৃহিণী হইতে হইলে অনেক কথা জানিবার এবং বলিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ কাহিনী অনেকের কাছেই হয়ত একটু অস্বাভাবিক শুনাইবে। তবে যিনি পার্বতীকে আরও একটু ভাল করিয়া বুঝিয়াছেন তিনি দেখিতে পাইবেন, অবস্থার এই নানারূপ পরিবর্তনে পার্বতীকে তাহার বয়সের অপেক্ষা অনেকখানি পরিপক্ক করিয়া দিয়াছিল। তা ছাড়া নিরর্থক লজ্জা-শরম, অহেতুক জড়তা-সংকোচ তাহার কোনদিনই ছিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আর সব ছেলে-মেয়েরা কোথায় বাবা?

মহেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল, বলচি। তোমার বড়মেয়ে, আমার ছোটবোন তার শ্বশুরবাড়িতেই আছে। আমি চিঠি লিখেছিলুম, কিন্তু যশোদা কিছুতেই আসতে পারলে না।

পার্বতী দুঃখিত হইল; জিজ্ঞাসা করিল, আসতে পারলে না, না ইচ্ছা করে এলো না?

মহেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল, ঠিক জানিনে মা।

কিন্তু তাহার কথার ও মুখের ভাবে পার্বতী বুঝিল, যশোদা রাগ করিয়াই আইসে নাই; কহিল, আর আমার ছোটছেলে?

মহেন্দ্র কহিল, সে শিগগির আসবে। কলকাতায় আছে, পরীক্ষা দিয়েই আসবে।

ভুবন চৌধুরী নিজেই জমিদারির কাজকর্ম দেখিতেন। তা ছাড়া, সহস্তে নিত্য শালগ্রাম-শিলার পূজা করা, ব্রত-নিয়ম-উপবাস, ঠাকুরবাড়ি ও অতিথিশালায় সাধু-সন্ন্যাসীর পরিচর্যা—এইসব কাজে তাঁহার সকাল হইতে রাত্রি দশটা-এগারটা পর্যন্ত কাটিয়া যাইত। নূতন বিবাহ করিয়া কোন প্রকার নূতন আমোদ-আহ্লাদ তাঁহাতে প্রকাশ পাইল না। রাত্রে কোনদিন ভিতরে আসিতেন, কোনদিন বা আসিতে পারিতেন না। আসিলেও অতি সামান্যই কথাবার্তা হইত—শয্যায় শুইয়া পাশবালিশটা টানিয়া লইয়া, চোখ বুজিয়া বড় জোর বলিতেন, তা তুমিই হলে বাড়ির গৃহিণী, সব দেখে-শুনে, বুঝে-পড়ে নিজেই নিয়ো—

পার্বতী মাথা নাড়িয়া বলিত, আচ্ছা।

ভুবন বলিতেন, আর দেখ, তা এই ছেলে-মেয়েরা,—হাঁ, তা এরা তোমারই ত সব—

স্বামীর লজ্জা দেখিয়া পার্বতীর চোখের কোণে হাসি ফুটিয়া বাহির হইত। তিনি আবার একটু হাসিয়া কহিতেন, হাঁ, আর এই দেখ, এই মহেন তোমার বড়ছেলে, সেদিন বি. এ. পাশ করেছে,—এমন ভাল ছেলে, এমন দয়ামায়া—কি জান, একটু যত্ন-আত্মীয়তা—

পার্বতী হাসি চাপিয়া বলিত, আমি জানি, সে আমার বড়ছেলে—

তা জানবে বৈ কি! এমন ছেলে কেউ কখনও দেখেনি। আর আমার যশোমতী, মেয়ে ত নয়—প্রতিমা। তা আসবে বৈ কি! আসবে বৈ কি! বুড়ো বাপকে দেখতে আসবে না! তা সে এলে তাকে—

পার্বতী নিকটে আসিয়া টাকের উপর মৃণাল-হস্ত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিত, তোমাকে ভাবতে হবে না। যশোকে আনবার জন্য আমি লোক পাঠাব—না হয় মহেন নিজেই যাবে।

যাবে! যাবে! আহা, অনেকদিন দেখিনি—তুমি লোক পাঠাবে?

পাঠাব বৈ কি। আমার মেয়ে, আমি আনতে পাঠাব না!

বৃদ্ধ এই সময়ে উৎসাহে উঠিয়া বসিতেন। উভয়ের সম্বন্ধ ভুলিয়া পার্বতীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিতেন—তোমার ভাল হবে। আমি আশীর্বাদ করচি—তুমি সুখী হবে—ভগবান তোমায় দীর্ঘায়ু করবেন।

তাহার পর হঠাৎ কি-সব কথা বৃদ্ধের যেন মনে পড়িয়া যাইত। পুনরায় শয্যায় শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া মনে মনে বলিতেন, বড়মেয়ে, ঐ এক মেয়ে,—সে বড় ভালবাসত—

এ সময়ে কাঁচা-পাকা গোঁফের পাশ দিয়া এক ফোঁটা চোখের জল বালিশে আসিয়া পড়িত। পার্বতী মুছাইয়া দিত। কখনো কখনো বা চুপি চুপি বলিতেন, আহা, তারা সবাই আসবে, আর-একবার বাড়ি-ঘরদোর জমজম করবে—আহা, আগে কি জমকালো সংসারই ছিল! ছেলেরা, মেয়ে, গিন্নী—হৈচৈ—নিত্য দুর্গোৎসব। তারপর একদিন সব নিবে গেল। ছেলেরা কলকাতায় চলে গেল, যশোকে তার শ্বশুর নিয়ে গেল। তারপর অন্ধকার শ্মশান—

এই সময় আবার গোঁফের দু'পাশ ভিজিয়া বালিশ ভিজিতে শুরু করিত। পার্বতী কাতর হইয়া মুছাইয়া দিয়া কহিত, মহেনের কেন বিয়ে দিলে না?

বুড়ো বলিতেন, আহা, সে ত আমার সুখের দিন। তাইত ভেবেছিলাম কিন্তু কি যে ওর মনের কথা, কি যে ওর জিদ—কিছুতেই বিয়ে করলে না। তাইত বুড়ো বয়সে—বাড়ি ঘর খাঁখাঁ করে, লক্ষ্মীছাড়া বাড়ির মতই সমস্তই মলিন, একটা জলুস কিছুতেই দেখতে পাইনে—তাইতেই—

কথা শুনিয়া পার্বতীর দুঃখ হইত। করুণ-সুরে, হাসির ভান করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিত, তুমি বুড়ো হলে আমিও শিগগির বুড়ো হয়ে যাব। মেয়েমানুষের বুড়ো হতে কি বেশী দেরি হয় গা?

ভুবন চৌধুরী উঠিয়া বসিয়া একহাতে তাহার চিবুক ধরিয়া নিঃশব্দে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিতেন। কারিগর যেমন করিয়া প্রতিমা সাজাইয়া, মাথায় মুকুট পরাইয়া দক্ষিণে ও বামে হেলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে থাকে, একটু গর্ব, আর অনেকখানি স্নেহ সেই সুন্দর মুখখানির আশেপাশে জমা হইয়া উঠে, ভুবনবাবুরও ঠিক তেমনি হয়। কোনদিন বা তাঁহার অস্ফুটে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে, আহা, ভাল করনি—

কি ভালো করিনি গো?

ভাবছি—এখানে তোমাকে সাজে না—

পার্বতী হাসিয়া উঠিয়া বলিত, খুব সাজে! আমাদের আবার সাজাসাজি কি?

বৃদ্ধ আবার শুইয়া পড়িয়া যেন মনে মনে বলিতেন, তা বুঝি—তা বুঝি। তবে, তোমার ভাল হবে। ভগবান তোমাকে দেখবেন।

এমনি করিয়া প্রায় একমাস অতীত হইয়া গেল। মধ্যে একবার চক্রবর্তী মহাশয় কন্যাকে লইতে আসিয়াছিলেন,—পার্বতী নিজেই ইচ্ছা করিয়া গেল না। পিতাকে কহিল, বাবা, বড় অগোছাল সংসার, আর কিছুদিন পরে যাব।

তিনি অলক্ষ্যে মুখ টিপিয়া হাসিলেন। মনে মনে বলিলেন, মেয়েমানুষ এমনি জাতই বটে!

তিনি বিদায় হইলে পার্বতী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, বাবা, আমার বড়মেয়েকে একবার নিয়ে এস।

মহেন্দ্র ইতস্ততঃ করিল। সে জানিত, যশোদা কিছুতেই আসিবে না। কহিল, বাবা একবার গেলে ভাল হয়।

ছিঃ! তা কি ভাল দেখায়! তার চেয়ে চল, আমরা মা-ব্যাটায় মেয়েকে নিয়ে আসি।

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইল—তুমি যাবে?

ক্ষতি কি বাবা? আমার তাতে লজ্জা নাই; আমি গেলে যশোদা যদি আসে—যদি তার রাগ পড়ে, আমার যাওয়াটা কি এতই কঠিন!

কাজেই মহেন্দ্র পরদিন একাকী যশোদাকে আনিতে গেল। সেখানে সে কি কৌশল

করিয়াছিল জানি না, কিন্তু চারদিন পরে যশোদা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন পার্বতীর সর্বাঙ্গে বিচিত্র নূতন বহুমূল্য অলংকার; এই সেদিন ভুবনবাবু কলিকাতা হইতে আনাইয়া দিয়াছিলেন—পার্বতী আজ তাহাই পরিয়া বসিয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে যশোদা ক্রোধ-অভিমানের অনেক কথা মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে আসিয়াছিল। নূতনবৌ দেখিয়া সে একেবারে অবাক হইয়া গেল। সে-সব বিদ্বেষের কথা তাহার মনেই পড়িল না। শুধু অস্ফুটেই কহিল, এই!

পার্বতী যশোদার হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল। কাছে বসাইয়া হাতে পাখা লইয়া কহিল, মা, মেয়ের উপর নাকি রাগ করেচ?

যশোদার মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল। পার্বতী তখন সে সমস্ত অলংকার একটির পর একটি করিয়া যশোদার অঙ্গে পরাইতে লাগিল। বিস্মিতা যশোদা কহিল, এ কি?

কিছুই না। শুধু তোমার মেয়ের সাধ।

গহনা পরিতে যশোদার মন্দ লাগিল না এবং পরা শেষ হইলে তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির আভাস দেখা দিল। সর্বাঙ্গে অলংকার পরাইয়া নিরাভরণা পার্বতী কহিল, মা, মেয়ের উপর রাগ করেচ?

না, না—রাগ কেন? রাগ কি?—

তা বৈ কি মা, এ তোমার বাপের বাড়ি, এতবড় বাড়ি, কত দাসদাসীর দরকার। আমি একজন দাসী বৈ ত নয়! ছি মা, তুচ্ছ দাসদাসীর ওপর কি তোমার রাগ করা সাজে?

যশোদা বয়সে বড়, কিন্তু কথা কহিতে এখনো অনেক ছোট। সে প্রায় বিহ্বল হইয়া পড়িল। বাতাস করিতে করিতে পার্বতী আবার কহিল,—দুঃখীর মেয়ে, তোমাদের দয়ায় এখানে একটু স্থান পেয়েচি। কত দীন, দুঃখী, অনাথ তোমাদের দয়ায় এখানে নিত্য প্রতিপালিত হয়; আমি ত মা, তাদেরই একজন। যে আশ্রিত—

যশোদা অভিভূত হইয়া শুনিতেছিল, এখন একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি মা—

পার্বতী তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল।

যশোদা কহিল, দোষ নিও না মা।

পরদিন মহেন্দ্র যশোদাকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, কি রে, রাগ থেমেচে?

যশোদা তাড়াতাড়ি দাদার পায়ে হাত দিয়া কহিল, দাদা, রাগের মাথায়—ছি ছি, কত কি বলেচি। দেখো যেন সে-সব প্রকাশ না পায়।

মহেন্দ্র হাসিতে লাগিল। যশোদা কহিল, আচ্ছা দাদা, সৎমায়ে এত যত্ন-আদর করতে পারে?

দিন-দুই পরে যশোদা পিতার নিকট নিজে কহিল, বাবা, ওখানে চিঠি লিখে দাও—আমি এখন দু'মাস এখান থেকে যাব না।

ভুবনবাবু একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, কেন মা?

যশোদা লজ্জিতভাবে মৃদু হাসিয়া কহিল, আমার শরীরটা তেমন ভাল নেই—এখন দিন-কতক ছোটমা'র কাছে থাকি!

আনন্দে বৃদ্ধের চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সন্ধ্যার সময় পার্বতীকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি আমাকে লজ্জা থেকে মুক্তি দিয়েচ। বেঁচে থাকো, সুখে থাকো।

পার্বতী কহিল, সে আবার কি?

কি, তা তোমাকে বোঝাতে পারিনে। নারায়ণ! কত লজ্জা, কত আত্মগ্লানি থেকে আজ আমাকে নিষ্কৃতি দিলে।

সন্ধ্যার আঁধারে পার্বতী দেখিল না যে, তাহার স্বামীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে। আর বিনোদলাল—সে ভুবনমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র, পরীক্ষা দিয়া সে বাড়ি আসিয়া আর দাঁড়াতেই গেল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তাহার পর দুই-তিনদিন দেবদাস মিছামিছি পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল—অনেকটা পাগলের মত। ধর্মদাস কি কহিতে গিয়াছিল, তাহাকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া ধমকাইয়া উঠিল। গতিক দেখিয়া চুনিলালও কথা কহিতে সাহস করিল না। ধর্মদাস কাঁদিয়া বলিল, চুনিবাবু, কেন এমন হল?

চুনিলাল বলিল, কি হয়েচে ধর্মদাস?

একজন অন্ধ আর-একজন অন্ধকে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিল। ভিতরের খবর দুজনের কেহই জানে না। চোখ মুছিতে মুছিতে ধর্মদাস বলিল, চুনিবাবু, যেমন করে হোক দেব্‌তাকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিন। আর লেখাপড়া যদি করবে না, ত এখানে থেকে কি হবে?

কথাটা খুব সত্য। চুনিলাল চিন্তা করিতে লাগিল। চারি-পাঁচদিন পরে একদিন ঠিক তেমনি সন্ধ্যার সময় চুনিবাবু বাহির হইতেছিল—দেবদাস কোথা হইতে আসিয়া হাত ধরিল—চুনিবাবু, সেখানে যাচ্চ?

চুনিলাল কুণ্ঠিত হইয়া বলিতে গেল, হাঁ—না, বল ত আর যাইনে।

দেবদাস কহিল, না, যেতে বারণ করচি নে; কিন্তু, একটি কথা বল, কি আশায় সেখানে তুমি যাও?

আশা আর কি? এমনি সময় কাটে।

কাটে? কৈ, আমার সময় ত কাটে না! আমি সময় কাটাতে চাই।

চুনিলাল কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, বোধ করি তাহার মনের ভাব মুখে পড়িতে চেষ্টা করিল। তাহার পর কহিল, দেবদাস, তোমার কি হয়েচে খুলে বলতে পারো?

কিছুই ত হয়নি।

বলবে না?

না চুনি, বলবার কিছুই নেই।

চুনিলাল বহুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া কহিল, দেবদাস, একটা কথা রাখবে?

কি?

সেখানে আর একবার তোমাকে যেতে হবে। আমি কথা দিয়েচি।

যেখানে সেদিন গিয়েছিলাম—সেইখানে ত?

হাঁ—

ছিঃ—আমার ভাল লাগে না।

যাতে ভাল লাগে, আমি করে দেব।

দেবদাস অন্যমনস্কের মত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, চল যাই।

অবনতির এক সোপান নীচে নামাইয়া দিয়া চুনিলাল কোথায় সরিয়া গিয়াছে। একা দেবদাস চন্দ্রমুখীর ঘরে নীচে বসিয়া মদ খাইতেছে। অদূরে বসিয়া চন্দ্রমুখী বিষণ্ণমুখে চাহিয়া চাহিয়া সভয়ে বলিয়া উঠিল—দেবদাস, আর খেয়ো না।

দেবদাস মদের গ্লাস নীচে রাখিয়া ভ্রূকুটি করিল, কেন?

অল্পদিন মদ ধরেচ, অত সইতে পারবে না।

সহ্য করব বলে মদ খাইনে। এখানে থাকব বলে শুধু মদ খাই।

এ কথা চন্দ্রমুখী অনেকবার শুনিয়াছে। এক-একবার তাহার মনে হয়, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া সে রক্তগঙ্গা হইয়া মরে। দেবদাসকে সে ভালবাসিয়াছে। দেবদাস মদের গ্লাস ছুঁড়িয়া ফেলিল। কৌচের পায়ায় লাগিয়া সেটা চূর্ণ হইয়া গেল। তখন আড় হইয়া বালিশে হেলান দিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া কহিল, আমার উঠে যাবার ক্ষমতা নেই,

তাই এখানে বসে থাকি—জ্ঞান থাকে না, তাই তোমার মুখের পানে চেয়ে কথা কই—চন্দ—র—তবু অজ্ঞান হইনে—তবু একটু জ্ঞান থাকে—তোমাকে ছুঁতে পারিনে—আমার বড় ঘৃণা হয়।

চন্দ্রমুখী চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, দেবদাস, কত লোক এখানে আসে, তারা কখনো মদ স্পর্শও করে না।

দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া উঠিয়া বসিল। টলিয়া টলিয়া ইতস্ততঃ হস্ত নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—স্পর্শ করে না? আমার বন্দুক থাকলে তাদের গুলি করতাম। তারা যে আমার চেয়েও পাপিষ্ঠ—চন্দ্রমুখী!

কিছুক্ষণ থামিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল; তাহার পর আবার কহিল, যদি কখনও মদ ছাড়ি—যদিও ছাড়ব না—তা হলে আর কখন ত এখানে আসব না। আমার উপায় আছে, কিন্তু তাদের কি হবে?

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিল, বড় দুঃখে মদ ধরেচি—আমাদের বিপদের, দুঃখের বন্ধু! আর তোমাকে ছাড়তে পারিনে,—

দেবদাস বালিশের উপর মুখ রগড়াইতে লাগিল। চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া মুখ তুলিয়া ধরিল। দেবদাস ভ্রূকুটি করিল—ছিঃ, ছুঁয়ো না—এখনো আমার জ্ঞান আছে। চন্দ্রমুখী, তুমি ত জান না—আমি শুধু জানি আমি কত যে তোমাদের ঘৃণা করি। চিরকাল ঘৃণা করব—তবু আসব, তবু বসব, তবু কথা ক'ব—না হলে যে উপায় নেই। তা কি তোমরা কেউ বুঝবে? হাঃ—হাঃ—লোকে পাপ কাজ আঁধারে করে, আর আমি এখানে মাতাল হই—এমন উপযুক্ত স্থান জগতে কি আর আছে! আর তোমরা—

দেবদাস দৃষ্টি সংযত করিয়া কিছুক্ষণ তাহার বিষন্ন মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আহা! সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, অত্যাচার, উপদ্রব—স্ত্রীলোকে যে কত সইতে পারে—তোমরাই তার দৃষ্টান্ত!

তাহার পর চিত হইয়া শুইয়া পড়িয়া, চুপি চুপি কহিতে লাগিল—চন্দ্রমুখী বলে, সে আমাকে ভালবাসে—আমি তা চাইনে—চাইনে—চাইনে—লোকে থিয়েটার করে, মুখে চুনকালী মাখে—চোর হয়—ভিক্ষা করে—রাজা হয়—রানী হয়—ভালবাসে—কত ভালবাসার কথা বলে—কত কাঁদে—ঠিক যেন সব সত্য! চন্দ্রমুখী আমার থিয়েটার করে, আমি দেখি! কিন্তু তাকে যে মনে পড়ে—একদণ্ডে কি যেন সব হয়ে গেল। কোথায় সে চলে গেল—আর কোন্ পথে আমি চলে গেলাম। এখন একটা সমস্ত জীবনব্যাপী মস্ত অভিনয় আরম্ভ হয়েচে। একটা ঘোর মাতাল—আর এই একটা—হোক, তাই হোক—মন্দ কি! আশা নেই, ভরসা নেই—সুখও নেই, সাধও নেই—বাঃ! বহুৎ আচ্ছা—

তাহার পর দেবদাস পাশ ফিরিয়া বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল।

চন্দ্রমুখী তাহা বুঝিতে পারিল না। অল্পক্ষণেই দেবদাস ঘুমাইয়া পড়িল। চন্দ্রমুখী তখন কাছে আসিয়া বসিল। অঞ্চল ভিজাইয়া মুখ মুছাইয়া দিয়া, সিক্ত বালিশ বদলাইয়া দিল। একটা পাখা লইয়া কিছুক্ষণ বাতাস করিয়া, বহুক্ষণ অধোবদনে বসিয়া রহিল। রাত্রি তখন প্রায় একটা। দীপ নিভাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দুই ভাই দ্বিজদাস ও দেবদাস ও গ্রামের অনেকেই জমিদার নারায়ণ মুখুয্যের সৎকার করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল। দ্বিজদাস চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া পাগলের মত হইয়াছে—পাড়ার পাঁচজন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। আর দেবদাস শান্তভাবে একটা থামের পার্শ্বে বসিয়া আছে। মুখে শব্দ নাই, চোখে এক ফোঁটা জল নাই। কেহ তাহাকে ধরিতেছে না—কেহ সান্ত্বনা দিবার প্রয়াস করিতেছে না। মধুসূদন ঘোষ নিকটে গিয়া একবার বলিতে গিয়াছিল,—তা বাবা কপালে—

দেবদাস হাত দিয়া দ্বিজদাসের দিকটা দেখাইয়া বলিল, ওখানে।

ঘোষজা মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া—হাঁ, তা উনি—কত বড় লোক, ইত্যাদি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। আর কেহ নিকটে আসিল না। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে দেবদাস অর্ধমূর্ছিত জননীর পদপ্রান্তে গিয়া উপবেশন করিল। সেখানে অনেকগুলি স্ত্রীলোক তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। পার্বতীর পিতামহীও উপস্থিত ছিলেন। ভাঙ্গাগলায় সদ্যবিধবা শোকার্ত জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বউমা, চেয়ে দেখ মা, দেবদাস এসেচে। দেবদাস ডাকিল, মা।

তিনি একবারমাত্র চাহিয়া বলিলেন, বাবা! তাহার পর নিমীলিত চোখের কোণ হইতে অজস্র অশ্রু বহিতে লাগিল। স্ত্রীলোকের দল কলস্বরে রৈ-রাই করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেবদাস জননীর চরণে কিছুক্ষণ মুখ ঢাকিয়া রহিল; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। গেল মৃত পিতার শয়নকক্ষে। চোখে জল নাই, গম্ভীর শান্তমূর্তি। রক্তনেত্র ঊর্ধ্বে স্থাপিত করিয়া ভূমিতলে বসিয়া পড়িল। যে-কেহ সে মূর্তি দেখিতে পাইলে বোধ করি ভীত হইত। কপালের দুই পার্শ্বে উভয় শিরা স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, বড় বড় রুক্ষ কেশ ফুলিয়া উঠিয়াছে। তপ্তকাঞ্চনের বর্ণ কালিমাখা হইয়াছে—কলিকাতার জঘন্য অত্যাচারের পর এই দীর্ঘ রাত্রি-জাগরণ, তাহার পর পিতার মৃত্যু! এক বৎসর পূর্বে যে-কেহ তাহাকে দেখিয়াছিল—এখন বোধ হয় তাহাকে হঠাৎ সে চিনিতে পারিত না। কিছুক্ষণের পর পার্বতীর জননী সন্ধান করিয়া দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিলেন—দেবদাস!

কেন খুড়ীমা?

এমন করলে ত চলবে না বাবা!

দেবদাস তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, কি করেচি খুড়ীমা?

খুড়ীমা তাহা বুঝিলেন, কিন্তু উত্তর দিতে পারিলেন না। দেবদাসের মাথাটা কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—দেব্‌তা—বাবা!

কেন খুড়ীমা?

দেব্‌তা চরণ—বাবা—

বুকের কাছে মুখ রাখিয়া দেবদাস এইবার এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করিল।

শোকার্ত পরিবারেরও দিন কাটে। ক্রমে প্রভাত হইল, কান্নাকাটি অনেক কমিয়া আসিল। দ্বিজদাস একেবারে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। তাঁহার জননীও উঠিয়া বসিয়াছেন,—চোখ মুছিতে মুছিতে দিনের কাজ করিতেছেন। দুইদিন পরে দ্বিজদাস দেবদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, দেবদাস, পিতার শ্রাদ্ধকার্যে কত ব্যয় করা উচিত?

দেবদাস অগ্রজের মুখপানে চাহিয়া কহিল, যেমন উচিত বিবেচনা করেন।

না ভাই, এখন শুধু আমার বিবেচনায় চলবে না। তুমি বড় হয়েচ, তোমার মত জানা আবশ্যক।

দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, কত নগদ টাকা আছে?

বাবার তবিলে দেড় লাখ টাকা জমা আছে। আমার বিবেচনায় হাজার-দশেক টাকা খরচ করলেই যথেষ্ট হবে—কি বল?

আমি কত পাব?

দ্বিজদাস একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, তা 'তুমিও অর্ধেক পাবে। দশ হাজার খরচ হলে, তোমার সত্তর হাজার ও আমার সত্তর হাজার থাকবে।

মা কি পাবেন?

মা নগদ টাকা কি করবেন? তিনি বাটীর গিন্নী—আমরা প্রতিপালন করব।

দেবদাস একটু চিন্তা করিয়া বলিল, আমার বিবেচনায়, আপনার ভাগের পাঁচ হাজার টাকা খরচ হোক এবং আমার ভাগের পঁচিশ হাজার টাকা খরচ হবে। বাকি পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে আমি পঁচিশ হাজার নেব, বাকি পঁচিশ হাজার টাকা মায়ের নামে জমা থাকবে। আপনার কি বিবেচনা হয়?

প্রথমে দ্বিজদাস যেন লজ্জিত হইলেন; পরে কহিলেন, উত্তম কথা। কিন্তু আমার, কি জান,—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আছে; তাদের বিয়ে, পৈতা দেওয়া,—অনেক খরচ। তা এই পরামর্শই ভাল। একটু থামিয়া বলিলেন, তা একটু লিখে দিলেই—

লেখাপড়ার প্রয়োজন হবে কি? কাজটা ভাল দেখাবে না। আমার ইচ্ছা, টাকাকড়ির কথা—এ সময়ে গোপনেই হয়।

তা ভাল কথা; কিন্তু কি জানো ভাই—

আচ্ছা, আমি লিখেই দিচ্চি। সেইদিনই দেবদাস লেখাপড়া করিয়া দিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে দেবদাস নীচে নামিতেছিল, সিঁড়ির পার্শ্বে পার্বতীকে দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। পার্বতী মুখপানে চাহিয়াছিল—চিনিতে যেন তাহার ক্লেশ হইতেছিল। দেবদাস গম্ভীর শান্তমুখে কাছে আসিয়া কহিল, কখন এলে পার্বতী?

সেই কণ্ঠস্বর! আজ তিন বৎসর পরে দেখা। অধোমুখে পার্বতী কহিল—সকালবেলা এসেচি।

অনেকদিন দেখা হয়নি। বেশ ভাল ছিলে?

পার্বতী মাথা নাড়িল।

চৌধুরীমশাই ভাল আছেন? ছেলেমেয়েরা সব ভাল?

সব ভাল। পার্বতী একটিবার মুখপানে চাহিয়া দেখিল। কিন্তু একটিবার জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না, তিনি কেমন আছেন—কি করিতেছেন। এখন যে কোন প্রশ্নই খাটে না।

দেবদাস কহিল, এখন কিছুদিন আছ ত?

হাঁ।

তবে আর কি—বলিয়া দেবদাস বাহিরে চলিয়া গেল।

শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেছে। সে-কথা বলিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়, তাই তাহাতে প্রয়োজন নাই। শ্রাদ্ধের পরদিবস পার্বতী ধর্মদাসকে নিভৃতে ডাকিয়া তাহার হাতে একগাছা সোনার হার দিয়া কহিল, ধর্ম, তোমার মেয়েকে পরতে দিয়ো—

ধর্মদাস মুখপানে চাহিয়া অশ্রুপূর্ণ চক্ষু আরো আর্দ্র করিয়া বলিল, আহা, তোমাকে কতদিন দেখিনি; সব ভাল খবর ত দিদি?

সব ভাল। তোমার ছেলেমেয়ে ভাল আছে?

তা আছে পারু।

তুমি ভাল আছ?

এইবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধর্মদাস কহিল, কৈ আর ভাল! এইবার যেতে ইচ্ছে করে—কর্তা গেলেন। ধর্মদাস শোকের আবেগে কত কি হয়ত কহিত, কিন্তু তাহাতে পার্বতী বাধা দিল। এ-সব সংবাদ শুনিবার জন্য সে হার দেয় নাই।

পার্বতী কহিয়া উঠিল, সে কি কথা ধর্ম, তুমি গেলে দেবদাদাকে দেখবে কে?

ধর্মদাস কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, যখন ছেলেমানুষটি ছিল, তখন দেখো এখন না দেখতে হলেই বাঁচি, পারু।

পার্বতী আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল, ধর্ম, একটি কথা সত্য বলবে?

কেন বলব না দিদি!

তবে সত্যি করে বল, দেবদা এখন কি করে?

করে আমার মাথা আর মুণ্ডু।

ধর্মদাস, খুলে বল না?

ধর্মদাস পুনরায় কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, খুলে আর কি বলব দিদি! এ কি আর বলবার কথা! এবারে কর্তা নাই, দেব্‌তার হাতে অগাধ টাকা হ'ল; এবারে কি আর রক্ষা থাকবে?

পার্বতীর মুখ একেবারে ম্লান হইয়া গেল। সে আভাসে-ইঙ্গিতে কিছু কিছু শুনিয়াছিল। শুষ্ক হইয়া কহিল, বল কি ধর্মদাস? সে মনোরমার পত্রে যখন কতক শুনিয়াছিল, তখন বিশ্বাস করিতে পারে নাই। ধর্মদাস মাথা নাড়িয়া কহিতে লাগিল—আহার নাই, নিদ্রা নাই, শুধু বোতল বোতল মদ। তিনদিন, চারদিন ধরে কোথায় পড়ে থাকে—ঠিকানা নাই। কত টাকা উড়িয়ে দিলে,—শুনতে পাই, কত হাজার টাকার নাকি তাকে গয়না গড়িয়ে দিয়েচে।

পার্বতীর আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল—ধর্মদাস, এ-সব সত্যি?

ধর্মদাস নিজের মনে কহিতে লাগিল,—তোর কথা হয়ত শুনতে পারে—একবার বারণ করে দে। কি শরীর কি হয়ে গেল—এমনধারা অত্যাচারে ক'টা দিন বা বাঁচবে? কাকেই বা এ-কথা বলি? মা, বাপ, ভাই—এদের এ-কথা বলা যায় না। ধর্মদাস শিরে পুনঃপুনঃ করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, ইচ্ছে করে, মাথা খুঁড়ে মরি পারু, আর বাঁচতে সাধ নেই।

পার্বতী উঠিয়া গেল। নারাণবাবুর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এ বিপদের সময় দেবদাসের কাছে যাওয়া একবার উচিত। কিন্তু, তাহার এত সাধের দেবদাদা এই হইয়াছে! কত কথাই যে মনে পড়িতে লাগিল, তাহার অবধি নাই। যত ধিক্কার সে দেবদাসকে দিল, তাহার সহস্রগুণ আপনাকে দিল; সহস্রবার তাহার মনে হইল, সে থাকিলে কি এমন হইতে পারিত? আগেই সে নিজের পায়ে নিজে কুঠার মরিয়াছিল, কিন্তু, সে কুঠার এখন তাহার মাথায় পড়িল। তাহার দেবদাদা এমন হইয়া যাইতেছে—এমন করিয়া নষ্ট হইতেছে, আর সে পরের সংসার ভাল করিবার জন্য বিব্রত! পরকে আপনার ভাবিয়া সে নিত্য অন্ন বিতরণ করিতেছে, আর তাহার সর্বস্ব,—আজ অনাহারে মরিতেছে! পার্বতী প্রতিজ্ঞা করিল, আজ সে দেবদাসের পায়ে মাথা খুঁড়িয়া মরিবে!

এখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে,—পার্বতী দেবদাসের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেবদাস শয্যায় বসিয়া হিসাব দেখিতেছিল, চাহিয়া দেখিল। পার্বতী ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া মেঝের উপর বসিল। দেবদাস মুখ তুলিয়া হাসিল। তাহার মুখ বিষণ্ন, কিন্তু শান্ত। হঠাৎ কৌতুক করিয়া কহিল, যদি অপবাদ দিই?

পার্বতী সলজ্জ, নীলোৎপল চক্ষু দুটি একবার তাহার পানে রাখিয়া, পরক্ষণেই অবনত করিল। মুহূর্তে বুঝাইয়া দিল, এ-কথা তাহার বুকের মাঝে চিরদিনের জন্য শেলের মত বিঁধিয়া আছে। আর কেন? কত কথা বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল। দেবদাসের কাছে সে কথা কহিতে পারে না।

আবার দেবদাস হাসিয়া উঠিল; কহিল, বুঝেচি রে, বুঝেচি! লজ্জা হচ্ছে, না?

তবুও পার্বতী কথা কহিতে পারিল না। দেবদাস কহিতে লাগিল, তাতে আর লজ্জা কি? দু'জনে মিলেমিশে একটা ছেলেমানুষী করে ফেলে—এই দেখ্ দেখি—মাঝে থেকে কি গোলমাল হয়ে গেল। রাগ করে তুই যা ইচ্ছে তাই বললি; আমিও কপালের ওপর ঐ দাগ দিয়ে দিলাম। কেমন হয়েচে!

দেবদাসের কথার ভিতর শ্লেষ বা বিদ্রুপের লেশমাত্র ছিল না; প্রসন্ন হাসি-হাসি মুখে অতীতের দুঃখের কাহিনী। পার্বতীর কিন্তু বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মুখে কাপড় দিয়া, নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মনে মনে বলিল, দেবদাদা, ঐ দাগই আমার সান্ত্বনা, ঐ আমার সম্বল। তুমি আমাকে ভালবাসিতে—তাই দয়া করে, আমাদের বাল্য-ইতিহাস ললাটে লিখে দিয়েচ। ও আমার লজ্জা নয়, কলঙ্ক নয়, আমার গৌরবের সামগ্রী।

পারু!

মুখ হইতে অঞ্চল না খুলিয়া পার্বতী কহিল, কি?

তোর উপর আমার বড় রাগ হয়—

এইবার দেবদাসের কণ্ঠস্বর বিকৃত হইতে লাগিল—বাবা নাই, আজ আমার কি দুঃখের দিন; কিন্তু তুই থাকলে কি ভাবনা ছিল! বড়বৌকে জানিস ত, দাদার স্বভাবও কিছু তোর কাছে লুকানো নেই; বল্ দেখি, মাকে নিয়ে এ সময়ে কি করি! আর আমারই বা যে কি হবে, কিছুই বুঝে পাই না। তুই থাকলে নিশ্চিন্ত হয়ে—সব তোর হাতে ফেলে দিয়ে—ও কি রে পারু!

পার্বতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দেবদাস কহিল, কাঁদছিস বুঝি? তবে আর বলা হ'ল না।

পার্বতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বল।

দেবদাস মুহূর্তে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, পারু, তুই নাকি খুব পাকা গিন্নী হয়েচিস রে?

ভিতরে ভিতরে পার্বতী চাপিয়া অধর দংশন করিল; মনে মনে বলিল, ছাই গৃহিণী। শিমুলফুল দেবসেবায় লাগে কি?

দেবদাস হাসিয়া উঠিল; হাসিয়া কহিল—বড় হাসি পায়! ছিলি তুই এতটুকু—কত বড় হ'লি। বড় বাড়ি, বড় জমিদারি, বড় বড় ছেলেমেয়ে—আর চৌধুরীমশাই, সবাই বড়—কি রে পারু!

চৌধুরীমশাই পার্বতীর বড় আমোদের জিনিস; তাঁকে মনে হইলেই তাহার হাসি পাইত। এত কষ্টেও তাই তার হাসি আসিল।

দেবদাস কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, একটা উপকার করতে পারিস?

পার্বতী মুখ তুলিয়া কহিল, কি?

তোদের দেশে ভাল মেয়ে পাওয়া যায়?

পার্বতী ঢোক গিলিয়া, কাশিয়া বলিল—ভাল মেয়ে? কি করবে?

পেলে বিয়ে করি। একবার সংসারী হতে সাধ হয়।

পার্বতী ভালমানুষটির মত কহিল, খুব সুন্দরী ত?

হাঁ, তোর মত।

আর খুব ভালমানুষ?

না, খুব ভালমানুষে কাজ নেই—বরং একটু দুষ্টু,—তোর মত আমার সঙ্গে যে ঝগড়া করতে পারবে।

পার্বতী মনে মনে কহিল, সে ত কেউ পারবে না দেবদাদা; কেননা তাতে আমার মত ভালবাসতে পারা চাই। মুখে কহিল, পোড়ার মুখ আমার, আমার মত কত হাজার তোমার পায়ে আসতে পেলে ধন্য হয়।

দেবদাস কৌতুক করিয়া হাসিয়া বলিল, একটি আপাততঃ দিতে পারিস দিদি?

দেবদাদা, সত্যি বিয়ে করবে?

এই যে বললাম।

শুধু এইটি সে খুলিয়া বলিল না যে, তাকে ভিন্ন এ জীবনে অন্য স্ত্রীলোকে তার প্রবৃত্তি হইবে না।

দেবদাদা, একটি কথা বলব?

কি?

পার্বতী আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল, তুমি মদ খেতে শিখলে কেন?

দেবদাস হাসিয়া উঠিল; কহিল, খেতে কি কোন জিনিস শিখতে হয়?

তা নয়, অভ্যাস করলে কেন?

কে বলেচে, ধর্মদাস?

যেই বলুক, কথাটা কি সত্যি?

দেবদাস প্রতারণা করিল না; কহিল, কতকটা বটে।

পার্বতী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত হাজার টাকার গয়না গড়িয়ে দিয়েচ, না?

দেবদাস হাসিয়া কহিল, দিইনি, গড়িয়ে রেখেচি। তুই নিবি?

পার্বতী হাত পাতিয়া বলিল, দাও। এই দেখ, আমার একটিও গয়না নেই।

চৌধুরীমশাই তোকে দেননি?

দিয়েছিলেন; আমি সমস্ত তাঁর বড়মেয়েকে দিয়ে দিয়েচি।

তোর বুঝি দরকার নেই?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া মুখ নীচু করিল।

এইবার সত্যই দেবদাসের চোখে জল আসিতেছিল। দেবদাস অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিল, কম দুঃখে আর স্ত্রীলোকে নিজের গহনা খুলিয়া বিলাইয়া দেয় না। কিন্তু চোখের জল চাপিয়া ধীরে ধীরে বলিল, মিছে কথা, পারু। কোন স্ত্রীলোককেই আমি ভালবাসিনি, কাউকেই গয়না দিইনি।

পার্বতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, তাই আমি বিশ্বাস করি।

অনেকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর পার্বতী কহিল, কিন্তু, প্রতিজ্ঞা কর—আর মদ খাবে না!

তা পারিনে। তুমি কি প্রতিজ্ঞা করিতে পার, আমাকে আর একটিবারও মনে করবে না?

পার্বতী কথা কহিল না। এই সময়ে বাহিরে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি হইল। দেবদাস চকিত হইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া কহিল, সন্ধ্যা হ'ল, এখন বাড়ি যা পারু!

আমি যাব না। তুমি প্রতিজ্ঞা কর।

আমি পারিনে।

কেন পার না?

সবাই কি সব কাজ পারে?

ইচ্ছে করলে নিশ্চয় পারে।

তুমি আজ রাত্রে আমার সঙ্গে পালিয়ে যেতে প্যর?

পার্বতীর সহসা যেন হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ হইয়া গেল। অজ্ঞাতসারে অস্ফুটে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তা কি হয়?

দেবদাস শয্যার উপর একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, পার্বতী, দোর খুলে দাও।

পার্বতী সরিয়া আসিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া ভাল করিয়া বসিয়া বলিল, প্রতিজ্ঞা কর।

দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরভাবে কহিতে লাগিল—পারু, জোর করিয়ে প্রতিজ্ঞা করানটা কি ভাল, না, তাতে বিশেষ লাভ আছে? আজকার প্রতিজ্ঞা কাল হয়ত থাকবে না—কেন আমাকে আর মিথ্যাবাদী করিবি?

আবার বহুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল। এমনি সময়ে কোথায় কোন ঘরের ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। দেবদাস ব্যস্ত হইয়া পড়িল; কহিল, ওরে পারু, দোর খুলে দে—

পার্বতী কথা কহে না।

ও পারু—

আমি কিছুতেই যাব না, বলিয়া পার্বতী অকস্মাৎ রুদ্ধ-আবেগে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল—বহুক্ষণ ধরিয়া বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল। ঘরের ভিতর এখন গাঢ় অন্ধকার কিছুই দেখা যায় না। দেবদাস শুধু অনুমান করিয়া বুঝিল, পার্বতী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছে। ধীরে ধীরে ডাকিল—পারু!

পার্বতী কাঁদিয়া উত্তর দিল, দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট!

দেবদাস কাছে সরিয়া আসিল। তাঁহার চক্ষেও জল—কিন্তু, স্বর বিকৃত হইতে পায় নাই। কহিল, তা কি আর জানিনে রে?

দেবদা, আমি যে মরে যাচ্চি। কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না—আমার যে আজন্মের সাধ—

অন্ধকারে চোখ মুছিয়া দেবদাস কহিল—তারও ত সময় আছে।

তবে আমার কাছে চল; এখানে তোমাকে দেখবার যে কেউ নেই!

তোর বাড়ি গেলে খুব যত্ন করবি?

আমার ছেলেবেলার সাধ! স্বর্গের ঠাকুর! আমার এ সাধটি পূর্ণ করে দাও! তারপর মরি—তাতেও দুঃখ নেই।

এবার দেবদাসের চোখেও জল আসিয়া পড়িল।

পার্বতী পুনরায় কহিল, দেবদা, আমার বাড়ি চল।

দেবদাস চোখ মুছিয়া বলিল, আচ্ছা যাব।

আমাকে ছুঁয়ে বল, যাবে?

দেবদাস অনুমান করিয়া পার্বতীর পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া বলিল, এ-কথা কখনও ভুলব না। আমাকে যত্ন করলে যদি—তোমার দুঃখ ঘোচে—আমি যাব। মরবার আগেও আমার এ-কথা স্মরণ থাকবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পিতার মৃত্যুর পর ছয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত বাটীতে থাকিয়া, দেবদাস একেবারে জ্বালাতন হইয়া উঠিল। সুখ নাই, শান্তি নাই, একান্ত একঘেয়ে জীবন। তার উপর ক্রমাগত পার্বতীর চিন্তা; আজকাল সব কাজেই তাহাকে মনে পড়ে। আর, ভাই দ্বিজদাস এবং পতিব্রতা ভ্রাতৃজায়া দেবদাসের জ্বালা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন।

গৃহিণীর অবস্থাও দেবদাসের ন্যায়। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত সুখই ফুরাইয়া গিয়াছে। পরাধীনভাবে এ বাড়ি তাঁহার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। আজ কয়দিন হইতে তিনি কাশীবাসের সংকল্প করিতেছেন; শুধু দেবদাসের বিবাহ না দিয়া যাইতে পারিতেছেন না। বলিতেছেন—দেবদাস, একটি বিয়ে কর্—আমি দেখে যাই। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব? একে অশৌচ অবস্থা, তার উপর আবার মনোমত পাত্রীর সন্ধান করিতে হইবে। আজকাল তাই গৃহিণীর মাঝে মাঝে দুঃখ হয় যে, সে-সময় পার্বতীর সহিত বিবাহ দিলেই বেশ হইত। একদিন তিনি দেবদাসকে ডাকিয়া কহিলেন, দেবদাস, আর ত পারিনে—দিন কতক কাশী গেলে হয়। দেবদাসেরও তাই ইচ্ছা; কহিল, আমিও তাই বলি। ছয় মাস পরে ফিরে এলেই হবে।

হাঁ বাবা, তাই কর। শেষে ফিরে এসে, তাঁর কাজ হয়ে গেলে, তোর বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী দেখে, আমি কাশীবাস করব।

দেবদাস স্বীকৃত হইয়া, জননীকে কিছুদিনের জন্য কাশীতে রাখিয়া আসিয়া, কলিকাতায় চলিয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া তিন-চারদিন ধরিয়া দেবদাস চুনিলালের সন্ধান করিল। সে নাই, বাসা পরিবর্তন করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একদিন সন্ধ্যার সময় দেবদাস চন্দ্রমুখীর কথা স্মরণ করিল। একবার দেখা করিলে হয় না? এতদিন তাহাকে মোটেই মনে পড়ে নাই। দেবদাসের যেন একটু লজ্জা করিল. একটা গাড়ি ভাড়া করিয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই চন্দ্রমুখীর বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। বহুক্ষণ ডাকাডাকির পর ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে উত্তর আসিল—এখানে নয়।

সম্মুখে একটা গ্যাসপোস্ট ছিল, দেবদাস তাহার নিকটে সরিয়া আসিয়া কহিল, বলতে পার সে স্ত্রীলোকটি কোথায় গেছে?

জানালা খুলিয়া কিছুক্ষণ সে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, তুমি কি দেবদাস?

হাঁ।

দাঁড়াও দোর খুলে দিই।

দ্বার খুলিয়া সে কহিল, এস—

কণ্ঠস্বর যেন কতকটা পরিচিত, অথচ ভাল চিনিতে পারিল না। একটু অন্ধকারও হইয়াছিল। সন্দেহে কহিল, চন্দ্রমুখী কোথায় বলতে পার?

স্ত্রীলোকটি মৃদু হাসিয়া কহিল, পারি; ওপরে চল।

এবার দেবদাস চিনিতে পারিল—অ্যাঁ, তুমি?

হাঁ আমি। দেবদাস, আমাকে একেবারে ভুলে গেলে?

উপরে গিয়া দেবদাস দেখিল, চন্দ্রমুখীর পরনে কালাপেড়ে ধুতি, কিন্তু মলিন। হাতে শুধু দু'গাছি বালা, অন্য অলঙ্কার নাই। মাথার চুল এলোমেলো। বিস্মিত হইয়া বলিল, তুমি? ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, চন্দ্রমুখী পূর্বাপেক্ষা অনেক কৃশ হইয়াছে। কহিল, তোমার অসুখ হয়েছিল?

চন্দ্রমুখী হাসিয়া কহিল, শারীরিক একটুও নয়। তুমি ভাল করে বোস।

দেবদাস শয্যায় উপবেশন করিয়া দেখিল, ঘরটির একেবারে আগাগোড়া পরিবর্তন হইয়াছে। গৃহস্বামিনীর মত তাহারও দুর্দশার সীমা নাই। একটিও আসবাব নাই—আলমারি, টেবিল, চেয়ারের স্থান শূন্য পড়িয়া আছে। শুধু একটি শয্যা; চাদর অপরিষ্কৃত, দেয়ালের গায়ে ছবিগুলি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে, লোহার কাঁটি এখনো পোঁতা আছে, দুই-একটায় লাল ফিতা এখনও ঝুলিতেছে। উপরের সেই ঘড়িটা এখনো ব্রাকেটের উপর

আছে, কিন্তু নিঃশব্দ। আশেপাশে মাকড়সা মনের মত করিয়া জাল বুনিয়া রাখিয়াছে। এক কোণে একটা তৈল-দীপ মৃদু আলোক বিতরণ করিতেছে—তাহারই সাহায্যে দেবদাস নূতন ধরনের গৃহসজ্জা দেখিয়া লইল। কিছু বিস্মিত, কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, চন্দ্র, এমন দুর্দশা কেমন করে হ'ল?

চন্দ্রমুখী ম্লান-হাসি হাসিয়া কহিল, দুর্দশা তোমাকে কে বললে? আমার ত ভাগ্য খুলেচে।

দেবদাস বুঝিতে পারিল না; কহিল, তোমার গায়ের গয়নাই বা গেল কোথায়?

বেচে ফেলেচি।

আসবাবপত্র?

তাও বেচেচি।

ঘরের ছবিগুলোও বিক্রি করেচ?

এবার চন্দ্রমুখী হাসিয়া সম্মুখের একটা বাড়ি দেখাইয়া কহিল, ও-বাড়ির ক্ষেত্রমণিকে বিলিয়ে দিয়েচি।

দেবদাস কিছুক্ষণ মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, চুনিবাবু কোথায়?

বলতে পারিনে। মাস-দুই হ'ল ঝগড়া করে চলে গেছে, আর আসেনি।

দেবদাস আরও আশ্চর্য হইল—ঝগড়া কেন?

চন্দ্রমুখী কহিল, ঝগড়া কি হয় না?

হয়। কিন্তু কেন?

দালালি করতে এসেছিল, তাই তাড়িয়ে দিয়েছিলুম।

কিসের দালালি?

চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলিল, পাটের। তার পর কহিল, তুমি বুঝতে পার না কেন? একজন বড়লোক ধরে এনেছিল, মাসে দু'শ টাকা, একরাশ অলঙ্কার, আর দরজার সুমুখে এক সেপাই। বুঝলে?

দেবদাস বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, কৈ, সে-সকল ত দেখিনে?

থাকলে ত দেখবে। আমি তাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিলাম!

তাদের অপরাধ?

অপরাধ বেশী কিছু ছিল না, কিন্তু আমার ভাল লাগল না।

দেবদাস বহুক্ষণ ধরিয়া ভাবিয়া বলিল, সেই পর্যন্ত আর কেউ এখানে আসেনি?

না। সেই পর্যন্ত কেন, তুমি যাবার পরদিন থেকেই এখানে কেউ আসে না। শুধু চুনি মাঝে মাঝে এসে বসত, কিন্তু মাস-দুই থেকে তাও বন্ধ।

দেবদাস বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। অন্যমনস্কভাবে বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে কহিল, চন্দ্রমুখী, তবে দোকানপাট সব তুলে দিলে?

হাঁ—দেউলে হ'য়ে পড়েচি।

দেবদাস সে-কথার উত্তর না দিয়া বলিল, কিন্তু খাবে কি করে?

এই যে শুনলে কিছু গহনাপত্র ছিল, বিক্রি করেচি।

সে আর কত?

বেশী নয়। প্রায় আট-ন'শ টাকা আমার আছে। একজন মুদীর কাছে রেখে দিয়েচি—সে আমাকে মাসে কুড়ি টাকা দেয়।

কুড়ি টাকায় আগে ত তোমার চলত না?

না, আজও ভাল চলে না। তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকী, তাই মনে করচি, হাতের এই দু'গাছা বালা বিক্রি করে, সমস্ত পরিশোধ করে দিয়ে আর কোথাও চলে যাব।

কোথায় যাবে?

তা এখনো স্থির করিনি। কোন সস্তা মুলুকে যাব—কোন পাড়াগ্রামে—যেখানে কুড়ি টাকায় মাস চলে।

এতদিন যাওনি কেন? যদি সত্যই তোমার আর-কিছু প্রয়োজন নেই ত এতদিন মিথ্যা কেন ধার-কর্জ বাড়ালে?

চন্দ্রমুখী নতমুখে কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইল। তাহার জীবনে এ কথাটা বলিতে আজ তাহার প্রথম লজ্জা করিল। দেবদাস বলিল, চুপ করলে যে?

চন্দ্রমুখী শয্যার একপ্রান্তে সঙ্কুচিতভাবে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—রাগ করো না; যাবার আগে আশা করেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে ভাল হয়। ভাবতাম, তুমি হয়ত আর-একবার আসবে। আজ তুমি এসেচ, এখন কালই যাবার উদ্যোগ করব। কিন্তু কোথায় যাই, বলে দেবে?

দেবদাস বিস্মিত হইয়া উঠিয়া বসিল; কহিল, শুধু আমাকে দেখবার আশায়? কিন্তু কেন?

একটা খেয়াল। তুমি আমাকে বড় ঘৃণা করতে। এত ঘৃণা কেউ কখনো করেনি, বোধ হয় তাই। আজ তোমার মনে পড়বে কিনা জানিনে, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে,—যেদিন তুমি এখানে প্রথম এলে, সেইদিন থেকেই তোমার উপর আমার দৃষ্টি পড়েছিল। তুমি ধনীর সন্তান তা জানতাম; কিন্তু ধনের আশায় তোমার পানে আকৃষ্ট হইনি। তোমার পূর্বে কত লোক এখানে এসেচে গেছে, কিন্তু কারো ভিতরে কখনো তেজ দেখিনি। আর তুমি এসেই আমাকে আঘাত করলে; একটা অযাচিত, উপযুক্ত অথচ অনুচিত রূঢ় ব্যবহার; ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রইলে, শেষে তামাশার মত কিছু দিয়ে গেলে। এসব মনে পড়ে কি?

দেবদাস চুপ করিয়া রহিল। চন্দ্রমুখী পুনরায় কহিতে লাগিল, সেই অবধি তোমার প্রতি দৃষ্টি রাখলাম। ভালবেসে নয়, ঘৃণা করেও নয়। একটা নূতন জিনিস দেখলে যেমন তা খুব মনে থাকে, তোমাকেও তাই কিছুতেই ভুলতে পারিনি—তুমি এলে বড় ভয়ে ভয়ে সতর্ক হয়ে থাকতাম, কিন্তু না এলে কিছুই ভাল লাগত না। তার পর আবার কি যে মতিভ্রম ঘটল—এই দুটো চোখে অনেক জিনিসই আর একরকম দেখতে লাগলাম। পূর্বের 'আমি'র সঙ্গে এমন করে বদলে গেলাম—যেন সে 'আমি' আর নয়। তার পরে তুমি মদ ধরলে। মদে আমার বড় ঘৃণা। কেউ মাতাল হলে তার ওপর বড় রাগ হ'ত। কিন্তু তুমি মাতাল হলে রাগ হ'ত না; কিন্তু বড্ড দুঃখ পেতাম।—বলিয়া চন্দ্রমুখী দেবদাসের পায়ের উপর হাত রাখিয়া ছলছল চক্ষে কহিল, আমি বড় অধম, আমার অপরাধ নিয়ো না। তুমি যে কত কথা কইতে, কত বড় ঘৃণায় সরিয়ে দিতে; আমি কিন্তু তোমার তত কাছে যেতে চাইতাম। শেষে ঘুমিয়ে পড়লে—থাক্ সে-সব বলব না, হয়ত আবার রাগ করে বসবে।

দেবদাস কিছুই কহিল না—নূতন ধরনের কথাবার্তা তাহাকে কিছু ক্লেশ দিতেছিল। চন্দ্রমুখী গোপনে চক্ষু মুছিয়া কহিতে লাগিল, একদিন তুমি বললে—আমরা কত সহ্য করি। লাঞ্ছনা, অপমান—জঘন্য অত্যাচার, উপদ্রবের কথা—সেইদিন থেকেই বড় অভিমান হয়েচে—আমি সব বন্ধ করে দিয়েচি।

দেবদাস উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু দিন চলবে কি ক'রে?

চন্দ্রমুখী কহিল, সে ত আগেই বলেচি।

মনে কর, সে যদি তোমার সমস্ত টাকা ফাঁকি দেয়—

চন্দ্রমুখী ভয় পাইল না। শান্ত সহজভাবে কহিল, আশ্চর্য নয়, কিন্তু তাও ভেবেচি। বিপদে পড়লে তোমার কাছে কিছু ভিক্ষা চেয়ে নেব।

দেবদাস ভাবিয়া কহিল, তাই নিয়ো। এখন আর কোথাও যাবার উদ্যোগ কর।

কালই করব। বালা দু'গাছা বেচে, একবার মুদীর সঙ্গে দেখা করব।

দেবদাস পকেট হইতে পাঁচখানা একশত টাকার নোট বাহির করিয়া বালিশের তলে রাখিয়া কহিল,—বালা বিক্রি ক'রো না, তবে মুদীর সঙ্গে দেখা ক'রো। কিন্তু যাবে কোথায়? কোন তীর্থস্থানে?

না দেবদাস। তীর্থধর্মের উপর আমার তত আস্থা নেই। কলকাতা থেকে বেশী দূরে যাব না, কাছাকাছি কোন গ্রামে গিয়ে থাকব।

কোন ভদ্র-পরিবারে কি দাসীবৃত্তি করবে?

চন্দ্রমুখীর চোখে আবার জল আসিল। মুছিয়া কহিল, প্রবৃত্তি হয় না। স্বাধীন

ভাবে স্বচ্ছন্দে থাকব। কেন দুঃখ করতে যাব? শরীরের দুঃখ কোনদিন সইনি, এখনো সইতে পারব না। আর বেশী টানাটানি করলে হয়ত ছিঁড়ে যাবে।

দেবদাস বিষন্ন-মুখে ঈষৎ হাসিল; কহিল, কিন্তু শহরের কাছে থাকলে আবার হয়ত প্রলোভনে পড়বে—মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই।

এবার চন্দ্রমুখীর মুখ প্রফুল্ল হইল। হাসিয়া কহিল, সে-কথা সত্যি, মানুষের মনকে বিশ্বাস নেই বটে, কিন্তু আমি আর প্রলোভনে পড়ব না। স্ত্রীলোকের লোভ বড় বেশী তাও মানি, কিন্তু যা-কিছু লোভের জিনিস যখন ইচ্ছে করেই ত্যাগ করচি তখন আর আমার ভয় নেই। হঠাৎ যদি ঝোঁকের ওপর ছাড়তাম, তাহলে হয়ত সাবধান হবার আবশ্যক ছিল, কিন্তু এতদিনের মধ্যে একটা দিনও ত আমাকে অনুতাপ করতে হয়নি। আমি যে বেশ সুখে আছি।

তথাপি দেবদাস মাথা নাড়িল; কহিল, স্ত্রীলোকের মন বড় চঞ্চল—বড় অবিশ্বাসী।

এবার চন্দ্রমুখী একেবারে কাছে আসিয়া বসিল। হাত ধরিয়া কহিল, দেবদাস!

দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিল, এখন আর বলিতে পারিল না—আমাকে স্পর্শ ক'রো না।

চন্দ্রমুখী স্নেহ-বিস্ফারিত চক্ষে, ঈষৎ কম্পিত-কণ্ঠে, তাহার হাত দুটি নিজের কোলের উপর টানিয়া লইয়া কহিল, আজ শেষ দিন, আজ আর রাগ ক'রো না। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবার বড় সাধ হয়।—বলিয়া সে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে দেবদাসের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, পার্বতী তোমাকে কি বড় বেশী আঘাত করেচে?

দেবদাস ভ্রূকুটি করিল, বলিল, এ কথা কেন?

চন্দ্রমুখী বিচলিত হইল না। শান্ত দৃঢ়-স্বরে বলিল, আমার কাজ আছে। তোমাকে সত্যি বলচি, তুমি দুঃখ পেলে আমারও বড় বাজে। তা ছাড়া আমি বোধ হয় অনেক কথাই জানি। মাঝে মাঝে নেশার ঘোরে তোমার মুখ থেকে অনেক কথাই শুনেচি। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস হয় না যে, পার্বতী তোমাকে ঠকিয়েচে। বরঞ্চ মনে হয়, তুমি নিজেই নিজেকে ঠকিয়েচ। দেবদাস, আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড়, এ সংসারে অনেক জিনিস দেখেচি। আমার কি মনে হয় জান? নিশ্চয় মনে হয়, তোমারই ভুল হয়েচে। মনে হয়, চঞ্চল এবং অস্থিরচিত্ত বলে স্ত্রীলোকের যত অখ্যাতি, ততখানি অখ্যাতির তারা যোগ্য নয়। অখ্যাতি করতেও তোমরা, সুখ্যাতি করতেও তোমরা। তোমাদের যা বলবার—অনায়াসে বল; কিন্তু তারা তা পারে না। নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে পারে না; পারলেও, তা সবাই বোঝে না। কেননা, বড় অস্পষ্ট হয়—তোমাদের মুখের কাছে চাপা পড়ে যায়। তার পরে অখ্যাতিটাই লোকের মুখে মুখে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

চন্দ্রমুখী একটু থামিয়া, কণ্ঠস্বর আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে লাগিল, এ জীবনে ভালবাসার ব্যবসা অনেকদিন করেচি, কিন্তু একটিবার মাত্র ভালবেসেচি। সে ভালবাসার অনেক মূল্য। অনেক শিখেচি, জান ত ভালবাসা এক, আর রূপের মোহ আর। এ দুয়ে বড় গোল বাধে, আর পুরুষেই বেশী গোল বাধায়। রূপের মোহটা তোমাদের চেয়ে আমাদের নাকি অনেক কম, তাই একদণ্ডেই আমরা তোমাদের মত উন্মত্ত হয়ে উঠিনে। তোমরা এসে যখন ভালবাসা জানাও, কত কথায়, কত ভাবে যখন প্রকাশ কর, আমরা চুপ করে থাকি। অনেক সময় তোমাদের মনে ক্লেশ দিতে লজ্জা করে, দুঃখ হয়, সঙ্কোচে বাধে। মুখ দেখতেও যখন ঘৃণা বোধ হয়, তখনও হয়ত লজ্জায় বলতে পারিনে—আমি তোমাকে ভালবাসতে পারব না। তার পরে একটা বাহ্যিক প্রণয়ের অভিনয় চলে; একদিন, যখন তা শেষ হয়ে যায়, পুরুষমানুষ রেগে অস্থির হয়ে বলে, কি। বিশ্বাসঘাতক! সবাই সেই কথা শোনে, সেই কথাই বোঝে। আমরা তখনও চুপ ক'রে থাকি। মনে কত ক্লেশ হয়, কিন্তু কে তা দেখতে যায়?

দেবদাস কোন কথা কহিল না। সেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়ত একটা মমতা জন্মায়; স্ত্রীলোক মনে করে এই বুঝি ভালবাসা! শান্ত ধীরভাবে সংসারের কাজকর্ম করে, দুঃখের সময় প্রাণপণে সাহায্য করে, তোমরা কত সুখ্যাতি কর,—মুখে মুখে তার কত ধন্য ধন্য! কিন্তু হয়ত তখনো তার ভালবাসার

বর্ণপরিচয় হয় না। তার পরে যদি কোন অশুভ মুহূর্তে তাহার বুকের ভেতরটা অসহ্য বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করে বেরিয়ে এসে দাঁড়ায়, তখন—বলিয়া সে দেবদাসের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তখন তোমরা চিৎকার করে বলে ওঠো—কলঙ্কিনী! ছিঃ ছিঃ!

অকস্মাৎ দেবদাস চন্দ্রমুখীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল—চন্দ্রমুখী, ও কি!

চন্দ্রমুখী ধীরে ধীরে হাত সরাইয়া দিয়া কহিল, ভয় নেই দেবদাস, আমি তোমার পার্বতীর কথা বলচি নে। বলিয়া সে মৌন হইল!

দেবদাসও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যমনস্কের মত কহিল, কিন্তু কর্তব্য আছে ত! ধর্মাধর্ম আছে ত!

চন্দ্রমুখী বলিল, তা ত আছেই। আর আছে বলেই, দেবদাস, যে যথার্থ ভালবাসে, সে সহ্য ক'রে থাকে। শুধু অন্তরে ভালবেসেও যে কত সুখ, কত তৃপ্তি—যে টের পায়, সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ-অশান্তি আনতে চায় না। কিন্তু কি বলছিলাম দেবদাস,—আমি নিশ্চয় জানি, পার্বতী তোমাকে একবিন্দুও ঠকায় নি, তুমি আপনাকেই ঠকিয়েচ। আজ এ-কথা বোঝবার তোমার সাধ্য নেই আমি জানি; কিন্তু যদি কখনো সময় আসে, তখন হয়ত দেখতে পাবে, আমি সত্য কথাই বলেছিলাম।

দেবদাসের দু' চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আজ কেমন করিয়া তাহার যেন মনে হইতে লাগিল, চন্দ্রমুখীর কথাই সত্য। এই চোখের জল চন্দ্রমুখী দেখিতে পাইল, কিন্তু মুছাইবার চেষ্টা করিল না। মনে মনে বলিতে লাগিল, তোমাকে আমি অনেকবার অনেকরকমে দেখেচি, আমি তোমার মন জানি। বেশ বুঝেচি, সাধারণ পুরুষের মত তুমি সেধে ভালবাসা জানাতে পারবে না। তবে রূপের কথা—রূপ কে না ভালবাসে? কিন্তু তাই বলেই যে তোমার অতখানি তেজ রূপের পায়ে আত্মবিসর্জন করে ফেলবে, সে-কথা কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। পার্বতী হয়ত খুব রূপবতী; কিন্তু, তবু মনে হয়, সে-ই তোমাকে আগে ভালবেসেছিল, আগে সে-কথা জানিয়েছিল।

মনে মনে বলিতে বলিতে সহসা তাহার মুখ দিয়া অস্ফুটে বাহির হইয়া পড়িল, নিজেকে দিয়েই বুঝেচি, সে তোমাকে কত ভালবাসে!

দেবদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল, কি বললে?

চন্দ্রমুখী কহিল, কিছু না; বলছিলাম যে, সে তোমার রূপে ভোলেনি। তোমার রূপ আছে বটে, কিন্তু তাতে ভুল হয় না। এই তীব্র রুক্ষ রূপ সকলের চোখেও পড়ে না। কিন্তু যার পড়ে, সে আর চোখ ফিরুতে পারে না।—বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি যে কি আকর্ষণ, তা যে কখন তোমাকে ভালবেসেছে সে জানে। এই স্বর্গ থেকে সাধ করে ফিরে যাবে, এমন মেয়েমানুষ কি পৃথিবীতে আছে!

আবার কিছুক্ষণ নীরবে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল,—এ রূপ ত চোখে পড়ে না! বুকের একেবারে মাঝখানটিতে এর গভীর ছায়া পড়ে। তার পরে দিন শেষ হলে আগুনের সঙ্গে চিতায় ছাই হয়ে যায়।

দেবদাস বিহ্বল দৃষ্টিতে চন্দ্রমুখীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, আজ এ-সব তুমি কি বলচ?

চন্দ্রমুখী মৃদু হাসিয়া বলিল, এমন বিপদ আর নেই দেবদাস, যাকে ভালবাসি না সে যদি জোর করে ভালবাসার কথা শোনায়! কিন্তু আমি শুধু পার্বতীর জন্য ওকালতি করছিলাম—নিজের জন্য নয়।

দেবদাস উঠিতে উদ্যত হইয়া বলিল, এবার আমি যাই।

আর একটু বসো। কখনো তোমাকে সজ্ঞানে পাইনি, কখনো এমন করে হাত দুটি ধরে কথা বলতে পাইনি—এ কি তৃপ্তি! বলিয়াই হঠাৎ হাসিয়া উঠিল।

দেবদাস আশ্চর্য হইয়া কহিল, হাসলে যে?

ও কিছুই নয়, শুধু একটা পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। সে আজ দশ বছরের কথা—যখন আমি ভালবেসে ঘর ছেড়ে চলে আসি। তখন মনে হতো, কত না ভালবাসি, বুঝি প্রাণটাও দিতে পারি। তার পর একদিন তুচ্ছ একটা গয়না নিয়ে দু'জনের এমনি

ঝগড়া হয়ে গেল যে, আর কখন কেউ কারো মুখ দেখলাম না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, সে আমাকে মোটেই ভালবাস্‌ত না,—না হলে একটা গয়না দেয় না!

আর একবার চন্দ্রমুখী নিজের মনে হাসিয়া উঠিল। পরক্ষণেই শান্ত গম্ভীর-মুখে মৃদু মৃদু কহিল—ছাই গয়না! তখন কি জানতাম, একটু সামান্য মাথা-ধরা সারাবার জন্যেও অকাতরে এই প্রাণটা পর্যন্ত দেওয়া যায়! তখন না বুঝতাম সীতা-দময়ন্তীর ব্যথা, না বিশ্বাস করতাম জগাই-মাধাইয়ের কথা। আচ্ছা দেবদাস, এ জগতে সকলই সম্ভব, না?

দেবদাস কিছুই বলিতে পারিল না; হতবুদ্ধির মত ফ্যালফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি যাই—

ভয় কি, আরো একটু বসো। আমি তোমাকে আর ভুলিয়ে রাখতে চাইনে—সেদিন আমার কেটে গেছে। এখন তুমিও আমাকে যতখানি ঘৃণা কর, আমিও আমাকে ততখানি ঘৃণা করি; কিন্তু দেবদাস, একটা বিয়ে কর না কেন?

এতক্ষণে দেবদাসের যেন নিঃশ্বাস পড়িল; একটু হাসিয়া কহিল, উচিত বটে, কিন্তু প্রবৃত্তি হয় না।

না হলেও কর। ছেলেমেয়ের মুখ দেখলেও অনেক শান্তি পাবে। তা ছাড়া আমারও একটা উপায় হয়। তোমার সংসারে দাসীর মত থেকেও স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারব।

দেবদাস সহাস্যে কহিল, আচ্ছা, তখন তোমাকে ডেকে আনব।

চন্দ্রমুখী তাহার হাসি যেন দেখিতেই পাইল না; কহিল, দেবদাস, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে।

কি?

তুমি এতক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কইলে কেন?

কোন দোষ হয়েচে কি?

তা জানিনে। কিন্তু নতুন বটে! মদ খেয়ে জ্ঞান না হারালে, কখন ত পূর্বে আমার মুখ দেখতে না!

দেবদাস সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া বিষন্ন-মুখে কহিল, এখন মদ ছুঁতে নেই—আমার পিতার মৃত্যু হয়েচে।

চন্দ্রমুখী বহুক্ষণ করুণ-চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এর পরে আর খাবে কি?

বলতে পারিনে।

চন্দ্রমুখী তাহার হাত দুটি আর একটু টানিয়া লইয়া অশ্রু-ব্যাকুল স্বরে কহিল, যদি পার ছেড়ে দিয়ো. অসময়ে এমন সোনার প্রাণ নষ্ট ক'রো না।

দেবদাস সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি চললাম। যেখানে যাও, সংবাদ দিয়ো—আর যদি কখনও কিছু প্রয়োজন হয়, আমাকে লজ্জা ক'রো না।

চন্দ্রমুখী প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া বলিল, আশীর্বাদ কর, যেন সুখী হই। আর একটা ভিক্ষা,—ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখন দাসীর প্রয়োজন হয়, আমাকে স্মরণ ক'রো।

আচ্ছা। —বলিয়া দেবদাস চলিয়া গেল। চন্দ্রমুখী যুক্ত-করে কাঁদিয়া বলিল, ভগবান! আর একবার যেন দেখা হয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বৎসর-দুই হইল পার্বতী মহেন্দ্রের বিবাহ দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। জলদবালা বুদ্ধিমতী ও কর্মপটু। পার্বতীর পরিবর্তে সংসারের অনেক কাজ সে-ই করে। পার্বতী এখন অন্যদিকে মন দিয়াছে। আজ পাঁচ বৎসর হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সন্তান

হয় নাই। নিজের ছেলেপুলে নাই বলিয়া পরের ছেলেমেয়েদের উপর তাহার বড় টান। গরীব-দুঃখীর কথা দূরে থাক, যাহাদের কিছু সংস্থান আছে, তাহাদিগের পুত্র-কন্যারও অধিকাংশ ব্যয়ভার সে-ই বহন করে। ইহা ভিন্ন ঠাকুরবাড়ির কাজ করিয়া, সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া, অন্ধ-খঞ্জের পরিচর্যা করিয়া তাহার দিন কাটিতেছে। স্বামীকে প্রবৃত্তি দিয়া পার্বতী আর একটা অতিথিশালা নির্মাণ করাইয়াছে। সেখানে নিরাশ্রয়, অসহায় লোক ইচ্ছামত থাকিতে পারে—জমিদার-সংসার হইতেই তাহার খাওয়া-পরা মিলে। আর একটা কাজ পার্বতী বড় গোপনে করে, স্বামীকেও তাহা জানিতে দেয় না। দরিদ্র ভদ্র-পরিবারে লুকাইয়া অর্থসাহায্য করে। এটি তাহার নিজের খরচ। স্বামীর নিকট হইতে প্রতি মাসে যাহা পায়, সমস্তই ইহাতে ব্যয় করে। কিন্তু যেমন করিয়া যাহাই ব্যয় হউক, সদর-কাছারির নায়েব-গোমস্তার তাহা জানিতে বাকী থাকে না। নিজেদের মধ্যে তাহারা বলাবলি করিতে থাকে। দাসীরা লুকাইয়া শুনিয়া আসে যে, সংসারে ব্যয় আজকাল ডবলের বেশী বাড়িয়া গিয়াছে; তহবিল শূন্য—কিছুই জমা হইতেছে না। সংসারে বাজে-খরচ বৃদ্ধি পাইলে দাসদাসীর যেন তাহা মর্মান্তিক হয়। তাহাদের কাছে জলদ এ-সব কথা শুনিতে পায়। একদিন রাত্রে সে স্বামীকে কহিল, তুমি কি এ বাড়ির কেউ নয়?

মহেন্দ্র বলিল, কেন বল দেখি?

স্ত্রী কহিল, দাসদাসীরা দেখতে পায়, আর তুমি পাও না? কর্তার নতুন গিন্নী-অন্ত প্রাণ, তিনি ত আর কিছু বলবেন না; কিন্তু তোমার বলা উচিত।

মহেন্দ্র কথাটা বুঝিল না, কিন্তু উৎসুক হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিল, কিসের কথা?

জলদবালা গম্ভীর হইয়া স্বামীকে মন্ত্রণা দিতে লাগিল—নতুন মার ছেলেমেয়ে নাই, তাঁর কেন সংসারে টান হবে, সব উড়িয়ে দিলেন, দেখতেও পাও না?

মহেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, কি করে!

জলদ কহিল, তোমার চোখ থাকলে দেখতে পেতে। আজকাল সংসারের দ্বিগুণ খরচ—সদাব্রত, দান-খয়রাত, অতিথি-ফকির। আচ্ছা, তিনি যেন পরকালের কাজ করচেন; কিন্তু তোমারও ত ছেলেমেয়ে হবে? তখন তারা খাবে কি? নিজের জিনিস বিলিয়ে দিয়ে কি শেষে ভিক্ষে করবে নাকি?

মহেন্দ্র শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিল, তুমি কার কথা বলচ, মার কথা?

জলদ কহিল, আমার পোড়া কপাল যে, এ-সব আবার মুখ ফুটে বলতে হয়।

মহেন্দ্র কহিল, তাই তুমি মার নামে নালিশ করতে এসেচ?

জলদ রাগ করিয়া বলিল, আমার নালিশ-মকদ্দমার দরকার নেই। শুধু ভেতরের খবরটা জানিয়ে দিলুম, নইলে শেষে আমাকেই দোষ দিতে।

মহেন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল, তোমার বাপের বাড়িতে রোজ হাঁড়ি চড়ে না, তুমি জমিদারের বাড়ির খরচের ব্যাপার কি বোঝ?

এবার জলদও রাগিয়া উঠিল; বলিল, তোমার মার বাপের বাড়িতেই-বা ক'টা অতিথিশালা আছে শুনি?

মহেন্দ্র আর তর্কাতর্কি না করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। সকালে উঠিয়া পার্বতীর কাছে আসিয়া কহিল, কি বিয়ে দিলে মা, একে নিয়ে সংসার করাই যে যায় না। আমি কলকাতায় চললুম।

পার্বতী অবাক হইয়া কহিল, কেন বাবা?

তোমাদের নামে কটু কথা বলে—আমি ওকে ত্যাগ করলুম।

পার্বতী কিছুদিন হইতেই বড়বৌয়ের আচরণ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়া হাসিয়া বলিল, ছিঃ বাবা, সে যে আমার বড় ভাল মেয়ে! তার পর সে জলদকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, বৌমা, ঝগড়া হয়েচে বুঝি?

সকাল হইতেই জলদ স্বামীর কলিকাতা-যাত্রার আয়োজন দেখিয়া মনে মনে ভয় পাইয়াছিল; শাশুড়ীর কথায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমারই দোষ মা। কিন্তু ঐ দাসীরাই খরচপত্রের কথা নিয়ে বলাবলি করে।

পার্বতী তখন সমস্ত শুনিল। নিজে লজ্জিত হইয়া বধূর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল,

বৌমা, তুমি ঠিক বলেচ। কিন্তু আমি মা তেমন সংসারী নই, তাই খরচের দিকটা আমার স্মরণ ছিল না।

তাহার পর মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, বাবা, বিনাদোষে রাগ ক'রো না—তুমি স্বামী, তোমার মঙ্গল-চিন্তার কাছে স্ত্রীর আর সব তুচ্ছ হওয়া উচিত। বৌমা তোমার লক্ষ্মী।

কিন্তু সেইদিন হইতে পার্বতী হাত গুটাইয়া আনিল। অতিথিশালার ঠাকুরবাড়ির আর তেমন সেবা হইল না; অনাথ, অন্ধ, ফকির অনেকে ফিরিয়া যাইতে লাগিল। কর্তা শুনিয়া পার্বতীকে ডাকিয়া কহিলেন, কনেবৌ, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কি ফুরাল নাকি?

পার্বতী সহাস্যে উত্তর দিল, শুধু দিলেই চলবে কেন? দিন-কতক জমা করাও ত চাই—দেখচ না, খরচ কত বেড়ে গেছে!

তা যাক। আমার আর ক'দিন। দিন-কতক সৎকর্ম করে পরকালের দিকটা দেখা উচিত।

পার্বতী হাসিয়া কহিল, এ যে বড় স্বার্থপরের মত কথা গো! নিজেরটাই দেখবে, আর ছেলেমেয়েরা কি ভেসে যাবে? দিন-কতক আবার চুপ করে থাকো, তার পর আবার সব হবে। কাজ মানুষের ত আর ফুরিয়ে যায় না!

কাজেই চৌধুরী মহাশয় নিরস্ত হইলেন।

পার্বতীর এখন কাজ কমিয়াছে, তাই ভাবনাটা কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু সমস্ত ভাবনারই একটা ধরন আছে। যাহার আশা আছে, সে একরকম করিয়া ভাবে; আর যাহার আশা নাই, সে অন্যরকম ভাবে। পূর্বোক্ত ভাবনার মধ্যে সজীবতা আছে, সুখ আছে, তৃপ্তি আছে, দুঃখ আছে, উৎকণ্ঠা আছে; তাই মানুষকে শ্রান্ত করিয়া আনে—বেশীক্ষণ ভাবিতে পারে না। কিন্তু আশাহীনের সুখ নাই, দুঃখ নাই, উৎকণ্ঠা নাই, অথচ তৃপ্তি আছে। চোখ দিয়া জলও পড়ে, গভীরতাও আছে—কিন্তু নিত্য নূতন করিয়া মর্মভেদ করে না। হালকা মেঘের মত যথা-তথা ভাসিয়া চলে। যেখানে বাতাস লাগে না, সেখানে দাঁড়ায়; আর যেখানে লাগে, সেখান হইতে সরিয়া যায়; তন্ময় মন উদ্বেগহীন চিন্তায় একটা সার্থকতা লাভ করে। পার্বতীর আজকাল ঠিক তাই হইয়াছে। পূজা-আহ্নিক করিতে বসিয়া অস্থির, উদ্দেশ্যহীন হতাশ মনটা চট্ করিয়া একবার তালসোনাপুরের বাঁশঝাড়, আমবাগান, পাঠশালা-ঘর, বাঁধের পাড় প্রভৃতি ঘুরিয়া আসে। আবার হয়ত এমন কোন স্থানে লুকাইয়া পড়ে যে, পার্বতী নিজেকেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। আগে হয়ত ঠোঁটের কোণে হাসি আসিয়াছিল, এখন হয়ত একফোঁটা চোখের জল টপ্ করিয়া কোথায় জলের সঙ্গে মিশিয়া যায়। তবু দিন কাটে। কাজ করিয়া, মিষ্ট কথাবার্তা কহিয়া, পরোপকার, সেবা-শুশ্রূষা করিয়াও কাটে, আবার সব ভুলিয়া ধ্যানমগ্না যোগিনীর মতও কাটে। কেহ কহে লক্ষ্মীস্বরূপা অন্নপূর্ণা! কেহ কহে অন্যমনস্কা উদাসিনী! কিন্তু কাল সকাল হইতে তাহার অন্য একরকমের পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। যেন কিছু তীব্র, কিছু কঠোর। সেই পরিপূর্ণ থমথমে জোয়ার-গঙ্গায় যেন হঠাৎ কোথা হইতে ভাঁটার টান ধরিয়াছে। বাড়ির কেহ কারণ জানে না, শুধু আমরা জানি। মনোরমা কাল গ্রাম হইতে একখানা পত্র লিখিয়াছে। যাহা লিখিয়াছে, তাহা এইরূপ—

পার্বতী, অনেকদিন হইতে দুজনের কেহ কাহাকেও পত্র লিখি নাই, সেজন্য দোষটা উভয়তঃ হইয়াছে। আমার ইচ্ছা একটা মিটমাট হইয়া যায়। দুজনেই দোষ স্বীকার করিয়া অভিমানটা কম করি। কিন্তু আমি বড়, তাই আমি মানভিক্ষা চাহিয়া লইলাম। ভরসা করি শীঘ্র উত্তর দিবে। আজ প্রায় একমাস হইল এখানে আসিয়াছি। আমরা গৃহস্থঘরের মেয়েরা শারীরিক ভালমন্দটা তেমন বুঝি না। মরিলে বলি, গঙ্গায় গিয়াছে; আর বাঁচিয়া থাকিলে বলি, ভাল আছে। আমিও তাই ভাল আছি। কিন্তু এ তো গেল নিজের কথা, বাজে কথা। কাজের কথাও এমন যে কিছু আছে, তাও নয়। তবে একটা সংবাদ দিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে। কাল হইতে ভাবিতেছি দিব কি না। দিলে তোমার ক্লেশ হইবে, না দিলেও আমি বাঁচি না—যেন মারীচের দশা হইয়াছে। দেবদাসের কথা শুনিয়া তোমার ত দুঃখ হইবেই, কিন্তু আমিও যে তোমার কথা মনে করিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারি না। ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, না হইলে তুমি যে অভিমানিনী, তার হাতে পড়িলে এতদিন

হয় জলে ডুবিতে, না হয় বিষ খাইতে। আর তার কথা আজ শুনিলেও শুনিবে, দু'দিন পরে হইলেও শুনিবে, কেননা, যে কথা সংসার-সুন্ধ লোকে জানে, তার আর চাপাচাপি কি?

আজ প্রায় ছয়-সাতদিন হইল, সে এখানে আসিয়াছে। তুমি ত জান, জমিদারগৃহিণী কাশীবাসী হইয়াছেন, আর দেবদাস কলিকাতাবাসী হইয়াছে। বাড়ি আসিয়াছে শুধু দাদার সহিত কলহ করিতে, আর টাকা লইতে। শুনিলাম, এমন সে মধ্যে মধ্যে আসে; যতদিন টাকার যোগাড় না হয়, ততদিন থাকে,—টাকা পাইলেই চলিয়া যায়।

তাহার পিতা মরিয়াছেন আজ আড়াই বছর হইল। শুনিয়া আশ্চর্য হইবে, এইটুকু সময়ের মধ্যে সে নাকি তাহার অর্ধেক বিষয় উড়াইয়া দিয়াছে। দ্বিজদাস নাকি বড় হিসাবী লোক, তাই কোনমতে পৈতৃক সম্পত্তি নিজে রাখিয়াছে, না হইলে এতদিনে পাঁচজনে লুটিয়া লইত। মদ ও বেশ্যায় সর্বস্বান্ত হইতেছে, কে তাহাকে রক্ষা করিবে? এক পারে যম! আর তারও বোধ হয় বেশী দেরি নাই। সর্বরক্ষা—যে বিবাহ করেনি।

আহা, দুঃখও হয়। সে সোনার বর্ণ নাই, সে রূপ নাই, সে শ্রী নাই—এ যেন আর কেহ! রুক্ষ চুলগুলা বাতাসে উড়িতেছে, চোখ কোটরে ঢুকিয়াছে, নাক যেন খাঁড়ার মত উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে। কি কুৎসিত যে হইয়াছে, তোমাকে আর তা কি বলিব! দেখিলে ঘৃণা হয়, ভয় করে। সমস্তদিন নদীর ধারে, বাঁধের পাড়ে বন্দুক-হাতে পাখি মারিয়া বেড়ায়। আর রৌদ্রে মাথা ঘুরিয়া উঠিলে বাঁধের পাড়ে সেই কুলগাছটার তলায় মুখ নীচু করিয়া বসিয়া থাকে। সন্ধ্যার পর বাড়ি গিয়া মদ খায়—রাত্রে ঘুমায় কি ঘুরিয়া বেড়ায়, ভগবান জানেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় নদীতে জল আনিতে গিয়াছিলাম; দেখি দেবদাস বন্দুক-হাতে ধারে ধারে শুষ্ক-মুখে চলিয়া যাইতেছে। আমাকে চিনিতে পারিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—আমি ত ভয়ে মরি! ঘাটে জনপ্রাণী নাই—আমি সেদিন আর আমাতে ছিলাম না। ঠাকুর রক্ষা করিয়াছেন যে, কোনরূপ মাতলামি কি বদমায়েসী করে নাই। নিরীহ ভদ্রলোকটির মত শান্তভাবে বলিল, 'মনো, ভাল আছ ত দিদি?'

আমি আর করি কি, ভয়ে ভয়ে ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'হুঁ'।

তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সুখে থাক বোন, তোদের দেখলে বড় আহ্লাদ হয়। তারপর আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। আমি উঠি ত পড়ি—প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইলাম। মা গো! ভাগ্যে হাত-টাত কিছু ধরিয়া ফেলে নাই! যাক তার কথা—সে-সব দুর্বৃত্তের কথা লিখিতে গেলে চিঠিতে কুলায় না।

বড় কষ্ট দিলাম কি বোন? আজিও তাহাকে যদি না ভুলিয়া থাক ত কষ্ট হইবেই। কিন্তু উপায় কি? আর, সেজন্য রাঙ্গা পায়ে যদি অপরাধ হইয়া থাকে তা নিজ গুণে তোমার স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী মনোদিদিকে ক্ষমা করিও।

কাল পত্র আসিয়াছিল। আজ সে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, দুটো পাল্কি আর বত্রিশ জন কাহার চাই. আমি এখনি তালসোনাপুরে যাব।

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল. পাল্কি বেহারা আনিয়ে দিচ্চি. কিন্তু দুটো কেন মা?

পার্বতী কহিল, তুমি সঙ্গে যাবে বাবা। পথে যদি মরি, মুখে আগুন দেবার জন্য বড়ছেলেকে প্রয়োজন।

মহেন্দ্র আর কিছু কহিল না। পাল্কি আসিলে দুইজনে প্রস্থান করিল।

চৌধুরী মহাশয় শুনিতে পাইয়া ব্যস্ত হইয়া দাসদাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন. কেহই কিন্তু কারণ বলিতে পারিল না। তখন তিনি বুদ্ধি খরচ করিয়া আরও পাঁচ-ছ'জন দরোয়ান, দাসদাসী পাঠাইয়া দিলেন।

একজন সিপাহী জিজ্ঞাসা করিল. পথে দেখা হলে পাল্কি ফিরিয়ে আনতে হবে কি?

তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, না, তাতে কাজ নেই। তোমরা সঙ্গে যেয়ো—যেন কোনো বিপদ-আপদ ঘটে না।

সেইদিন সন্ধ্যার পর পাল্কি দুইটা তালসোনাপুরে পৌঁছিয়াছিল. কিন্তু দেবদাস গ্রামে নাই। সেদিন দ্বিপ্রহরে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে।

পার্বতী কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, অদৃষ্ট! মনোরমার সহিত সাক্ষাৎ করিল।

মনো বলিল, পারু কি দেবদাসকে দেখতে এসেছিলে?

পার্বতী বলিল, না, সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলাম। এখানে তার আপনার লোক ত কেউ নেই।

মনোরমা অবাক হইল। কহিল, বলিস কি? লজ্জা করত না?

লজ্জা আবার কাকে? নিজের জিনিস নিজে নিয়ে যাব—তাতে লজ্জা কি?

ছিঃ ছিঃ—ওকি কথা! একটা সম্পর্ক পর্যন্ত নেই—অমন কথা মুখে এনো না।

পার্বতী ম্লান-হাসি হাসিয়া কহিল, মনোদিদি, জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যে কথা বুকের মাঝে বাসা করে আছে, এক-আধবার তা মুখ দিয়ে বার হয়ে পড়ে। তুমি বোন তাই এ কথা শুনলে।

পরদিন প্রাতঃকালে পার্বতী পিতামাতার চরণে প্রণাম করিয়া পুনরায় পাল্কিতে উঠিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আজ দুই বৎসর হইতে অশথঝুরি গ্রামে চন্দ্রমুখী ঘর বাঁধিয়াছে। ছোট নদীর তীরে একটা উঁচু জায়গায় তাহার ঝরঝরে দু'খানি মাটির ঘর; পাশে একটা চালা, তাহাতে কাল রংয়ের একটা পরিপুষ্ট গাভী বাঁধা থাকে। ঘর-দুইটির একটিতে রান্না, ভাঁড়ার; অপরটিতে সে শোয়। উঠান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, রমা বাগদীর মেয়ে রোজ নিকাইয়া দিয়া যায়। চতুর্দিকে ভেরেণ্ডার বেড়া, মাঝখানে একটা কুলগাছ, আর একপাশে তুলসীর ঝাড়। সম্মুখে নদীর ঘাট—লোক লাগাইয়া, খেজুর গাছ কাটিয়া সিঁড়ি তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। সে ভিন্ন এ ঘাট আর কেহ ব্যবহার করে না। বর্ষার সময় দু'কূল পুরিয়া চন্দ্রমুখীর বাটীর নীচে পর্যন্ত জল আসে। গ্রামের লোক ব্যগ্র হইয়া কোদাল লইয়া ছুটিয়া আসে। নীচে মাটি ফেলিয়া উঁচু করিয়া দিয়া যায়। এ গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই। চাষা, গোয়ালা, বাগদী, দু'ঘর কলু, আর গ্রামের শেষে ঘর-দুই মুচীর বাস। চন্দ্রমুখী এ গ্রামে আসিয়া দেবদাসকে সংবাদ দেয়; উত্তরে সে আরও কিছু টাকা পাঠাইয়া দেয়। এই টাকা চন্দ্রমুখী গ্রামের লোককে ধার দেয়। আপদে-বিপদে সবাই তাহার কাছে ছুটিয়া আসে—টাকা লইয়া বাড়ি যায়। চন্দ্রমুখী সুদ লয় না—তাহার পরিবর্তে কলাটা, মুলাটা, ক্ষেতে শাক-সবজি তাহারা ইচ্ছা করিয়া দিয়া যায়; আসলের জন্যও কখনো পীড়াপীড়ি করে না। যে দিতে পারে না, সে দেয় না।

চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলে, আর তোকে কখনও দেব না।

সে নম্রভাবে বলে, মা ঠাকরুন, আশীর্বাদ কর, এবার যেন ভাল ফসল হয়।

চন্দ্রমুখী আশীর্বাদ করে। আবার হয়ত ভাল ফসল হয় না, খাজনার তাগাদা পড়ে—আবার আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়ায়—চন্দ্রমুখী আবার দেয়। মনে মনে হাসিয়া বলে, তিনি বাঁচিয়া থাকুন, আমার টাকার ভাবনা কি!

কিন্তু তিনি কোথায়? প্রায় ছয় মাস হইল, সে কোন সংবাদ পায় নাই। চিঠি লিখিলে জবাব আসে না, রেজেস্ট্রি করিয়া দিলে ফিরিয়া আসে। একঘর গয়লাকে চন্দ্রমুখী নিজের বাটীর কাছে বসাইয়াছে, তাহার পুত্রের বিবাহে সাড়ে দশ গণ্ডা টাকা পণ দিয়াছে, একজোড়া লাঙ্গল কিনিয়া দিয়াছে। তাহারা সপরিবারে চন্দ্রমুখীর আশ্রিত এবং নিতান্ত অনুগত। একদিন সকালবেলা চন্দ্রমুখী ভৈরব গয়লাকে ডাকিয়া কহিল, ভৈরব, তালসোনাপুর এখান থেকে কতদূর জানো?

ভৈরব চিন্তা করিয়া কহিল, দুটো মাঠ পার হলেই কাছারি।

চন্দ্রমুখী প্রশ্ন করিল, সেখানে বুঝি জমিদার থাকেন?

ভৈরব কহিল, হাঁ, তিনি মুলুকের জমিদার। এ গাঁও তাঁর। আজ তিন বছর হ'ল তিনি

স্বর্গে গিয়েছেন; যত প্রজা একমাস ধরে সেখানে নুচিমণ্ডা খেয়েছিল। এখন তাঁর দুই ছেলে আছে, মস্ত বড়লোক—রাজা।

চন্দ্রমুখী কহিল, ভৈরব, আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পার?

ভৈরব বলিল, কেন পারব না মা, যেদিন ইচ্ছা চল।

চন্দ্রমুখী উৎসুক হইয়া বলিল, তবে চল না কেন ভৈরব, আমরা আজই যাই।

ভৈরব বিস্মিত হইয়া কহিল, আজই? তারপর চন্দ্রমুখীর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, তা হলে মা তুমি শিগগির রান্না করে নাও, আমিও দুটো মুড়ি বেঁধে নিই।

চন্দ্রমুখী বলিল, আমি আর রান্না করব না ভৈরব, তুমি মুড়ি বেঁধে নাও।

ভৈরব বাড়ি গিয়া কিছু মুড়ি ও গুড় চাদরে বাঁধিয়া কাঁধে ফেলিল। একগাছা লাঠি হাতে লইয়া ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তবে চল; কিন্তু তুমি কিছু খাবে না মা?

চন্দ্রমুখী বলিল, না ভৈরব, আমার এখনো পূজা-আহ্নিক হয়নি; যদি সময় পাই ত সেখানে গিয়ে ও-সব করব।

ভৈরব আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। পিছনে চন্দ্রমুখী বহু কষ্টে আলের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। অনভ্যস্ত কোমল পা-দুটি ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইল, রৌদ্রে সমস্ত মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। স্নানাহার কিছুই হয় নাই; তবু চন্দ্রমুখী মাঠের পর মাঠ পার হইয়া চলিতে লাগিল। মাঠের কৃষকেরা আশ্চর্য হইয়া মুখপানে চাহিয়া রহিল।

চন্দ্রমুখীর পরিধানে একখানা লালপেড়ে কাপড়, হাতে দু'গাছা বালা, মাথায় কপালের উপর পর্যন্ত আধ-ঘোমটা; সমস্ত দেহ একখানা মোটা বিছানার চাদরে আবৃত। সূর্যদেবের অস্ত যাইতে যখন আর অধিক বিলম্ব নাই, সেই সময়ে দুইজনে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দ্রমুখী ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ভৈরব, তোমার দুটো মাঠ এতক্ষণে কি শেষ হ'ল?

ভৈরব পরিহাসটা বুঝিতে না পারিয়া সরলভাবে বলিল, মাঠাকরুন, এইবার এসেচি; কিন্তু তোমাদের এই সুখী শরীরে আজ কি আর ফিরে যেতে পারবে?

চন্দ্রমুখী মনে মনে বলিল, আজ কেন, কালও বোধ করি এ পথ হাঁটতে পারব না।

প্রকাশ্যে কহিল, ভৈরব, গাড়ি পাওয়া যায় না?

ভৈরব বলিল, যায় বৈ কি মা, গরুর গাড়ি ঠিক করব?

গাড়ি ঠিক করিতে আদেশ করিয়া চন্দ্রমুখী জমিদার-বাটী প্রবেশ করিল।

ভৈরব গাড়ির বন্দোবস্তে অন্যদিকে গেল। অন্দরে উপরের বারান্দায় বড়বৌ (আজকাল জমিদারগৃহিণী) বসিয়া ছিলেন। একজন দাসী সেইখানে চন্দ্রমুখীকে লইয়া উপস্থিত করিল। উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিল।

চন্দ্রমুখী নমস্কার করিল। বড়বধূর দেহে অলঙ্কার ধরে না, চোখের কোণ দিয়া অহংকার ফাটিয়া পড়িতেছে। ঠোঁট দুটা ও দাঁতগুলা পান ও মিসিতে প্রায় কালো হইয়া গিয়াছে। একদিকের গাল উঁচু, বোধ হয় দোক্তা আর পানে ভরা আছে। এমন টান করিয়া চুল বাঁধা যে খোঁপাটা মাথার ডগায় উঠিয়াছে। দু'কানে ছোট-বড় বিশ-ত্রিশটা মাকড়ি। নাকের একদিকে নাকচাবি, অপর দিকে মস্ত ফুটা—বোধ হয় শাশুড়ীর আমলে তাহাতে নথ পরা হইত।

চন্দ্রমুখী দেখিল, বড়বৌয়ের বেশ মোটাসোটা মাজা-ঘষা দেহ, বর্ণ বেশ শ্যাম, বেশ ভাসা চোখ, গোল ধরনের মুখ—পরনে কালাপেড়ে শাড়ি, গায়ে একটা দামী জামা—সেইটা দেখিয়া চন্দ্রমুখীর ঘৃণা বোধ হইল। আর বড়বৌ দেখিলেন, চন্দ্রমুখীর বয়স হইলেও শরীরে রূপ ধরে না। দু'জনেই বোধ করি সমবয়সী, কিন্তু বড়বৌ মনে মনে তাহা স্বীকার করিলেন না। এ গ্রামে পার্বতী ভিন্ন অতখানি রূপ তিনি আর কাহারও দেখেন নাই। আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে গা?

চন্দ্রমুখী কহিল, আমি আপনারই একজন প্রজা; কিছু খাজনা বাকী পড়েচে তাই দিতে এসেচি।

বড়বৌ মনে মনে খুশী হইয়া বলিলেন, তা এখানে কেন? কাছারি-বাড়ি যাও না।

চন্দ্রমুখী মৃদু হাসিয়া কহিল, মা, আমরা দুঃখী মানুষ, সব খাজনা ত দিতে পারিনে। শুনেচি, আপনার বড় দয়া; তাই আপনার কাছেই এসেচি, দয়া করে কিছু মাপ করে দেন।

এরূপ কথা বড়বৌ জীবনে এই প্রথম শুনিলেন। তাঁর দয়া আছে, খাজনা মাপ করিতে পারেন—কাজেই চন্দ্রমুখী একেবারে প্রিয়পাত্রী হইয়া পড়িল। বড়বৌ কহিলেন, তা বাছা, দিনের মধ্যে এমন কত টাকা আমাকে ছেড়ে দিতে হয়, কত লোক আমাকে ধরে; আমি না বলিতে পারি না, এজন্য কর্তা আমার উপর কত রাগ করেন।—তা তোমার কত টাকা বাকী পড়েচে?

বেশী নয় মা, মোটে দু' টাকা; কিন্তু আমাদের কাছে তাই যেন পাহাড়; সমস্ত দিন আজ পথ চলে এসেচি।

বড়বৌ কহিলেন, আহা, তোমরা দুঃখী লোক, আমাদের দয়া করাই উচিত। ও বিন্দু, একে বাইরে নিয়ে যা, দেওয়ানমশাইকে আমার নাম করে বলে দে, যেন দু' টাকা মাপ করা হয়। তা বাছা, তোমার বাড়ি কোথায়?

চন্দ্রমুখী বলিল, আপনারই রাজত্বে—ওই অশথঝুরি গাঁয়ে। আচ্ছা মা, কর্তারা এখন দু' শরিক, না?

বড়বৌ বলিলেন, পোড়া কপাল! ছোট শরিক আর কি আছে? দু'দিন পরে আমারই সব হবে।

চন্দ্রমুখী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা? ছোটবাবুর বুঝি ধার-কর্জ?

বড়বৌ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, আমার কাছে সব বাঁধা। ঠাকুরপো একেবারে ব'য়ে গেছে! কলকাতায় মদ-বেশ্যা এই নিয়েই আছে। কত টাকা উড়িয়ে দিলে তার কি আদি-অন্ত আছে!

চন্দ্রমুখীর মুখ শুকাইল, একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ মা, ছোটবাবু কি তা হলে বাড়িও আসেন না?

বড়বৌ বলিলেন, আসবে না কেন! যখন টাকার দরকার হয়, আসে। ধার করে, বিষয় দেয়—চলে যায়। এই মাস-দুই হ'ল এসে বার হাজার টাকা নিয়ে গেছে। বাঁচবার আকারও নেই, গা-ময় কুচ্ছিত রোগ জন্মেচে—ছিঃ—ছিঃ—

চন্দ্রমুখী শিহরিয়া উঠিল— মলিন-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কলকাতায় কোথায় থাকেন?

বড়বৌ কপালে একটা করাঘাত করিয়া হাসিমুখে কহিলেন, পোড়া দশা! তা কেউ কি জানে? কোথায় কোন্ হোটেলে খায়—যার-তার বাড়িতে পড়ে থাকে—সেই জানে,—আর যম জানে।

চন্দ্রমুখী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি—যাই—

বড়বৌ একটু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, যাবে? ওরে ও বিন্দু—

চন্দ্রমুখী বাধা দিয়া বলিল, থাক্ মা, আমি আপনিই কাছারিতে যেতে পারব, বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাটীর বাহির হইয়া দেখিল, ভৈরব অপেক্ষা করিয়া আছে—গো-শকট প্রস্তুত। সেই রাত্রে চন্দ্রমুখী বাটী ফিরিয়া আসিল। সকালবেলা ভৈরবকে আবার ডাকিয়া কহিল, ভৈরব, আমি আজ কলকাতায় যাব; তুমি ত যেতে পারবে না, তাই তোমার ছেলেকে সঙ্গে নেব, কি বল?

তোমার ইচ্ছে। কিন্তু কলকাতায় কেন মা, বিশেষ কোন কাজ আছে কি?

হাঁ ভৈরব, বিশেষ কাজ আছে।

আবার কবে আসবে মা?

সে কথা বলতে পারিনে ভৈরব। হয়ত শীঘ্র ফিরে আসব, হয়ত বা দেরি হবে। আর যদি না আসি, এ-সব ঘরবাড়ি তোমার রইল।

প্রথমে ভৈরব অবাক হইয়া গেল। তাহার পর তাহার দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল। কহিল, ও কি কথা মা! তুমি না এলে এ গাঁয়ের লোক যে কেউ বাঁচবে না।

চন্দ্রমুখী সজলচক্ষে মৃদু হাসিয়া বলিল, সেকি ভৈরব, আমি দু' বছর হ'ল এখানে এসেচি। তার পূর্বে কি তোমরা বেঁচে ছিলে না?

ইহার উত্তর মূর্খ ভৈরব দিতে পারিল না, কিন্তু চন্দ্রমুখী অন্তরে সমস্তই বুঝিল। ভৈরবের ছেলে কেব্‌লো শুধু সঙ্গে যাইবে। গাড়িতে আবশ্যক দ্রব্যাদি বোঝাই করিয়া উঠিবার সময় পাড়ার মেয়ে-পুরুষ সবাই দেখিতে আসিল, দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। চন্দ্রমুখীর নিজের চোখেও জল ধরে না। ছাই কলিকাতা! দেবদাসের জন্য না হইলে কলিকাতার রানীগিরি পাইবার জন্যও চন্দ্রমুখী এত ভালবাসা তুচ্ছ করিয়া যাইতে পারিত না।

পরদিন সে ক্ষেত্রমণির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পূর্বের বাসাতে এখন অন্য লোক আসিয়াছে। ক্ষেত্রমণি অবাক হইয়া গেল—দিদি যে! কোথায় ছিলে এতদিন?

চন্দ্রমুখী সত্য কথা গোপন করিয়া বলিল, এলাহাবাদে ছিলাম।

ক্ষেত্রমণি ভাল করিয়া নজর দিয়া তাহার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, তোমার গহনাগাঁটি কি হল দিদি?

চন্দ্রমুখী হাসিয়া সংক্ষেপে বলিল, সব আছে।

সেই দিন মুদীর সহিত দেখা করিয়া কহিল, দয়াল, কত টাকা আমি পাব?

দয়াল বিপদে পড়িল—তা বাছা, প্রায় ষাট-সত্তর টাকা। আজ না হোক দু' দিন পরে দিব।

তোমাকে কিছুই দিতে হবে না। যদি আমার কিছু কাজ করে দাও।

কি কাজ?

দু' দিন খাটতে হবে এই মাত্র। আমাদের পাড়ায় একটা বাড়ি ভাড়া করবে—বুঝলে?

দয়াল হাসিয়া বলিল, বুঝেছি বাছা।

ভাল বাড়ি। বেশ ভাল বিছানা, বালিশ, চাদর, আলো, ছবি, দুটো চেয়ার, একটা টেবিল—বুঝলে?

দয়াল মাথা নাড়িল।

আরশি, চিরুনী, রং-করা দু'জোড়া কাপড়, গায়ের জামা, আর—ভাল গিল্টির গয়না কোথায় পাওয়া যায় জান?

দয়াল মুদী ঠিকানা বলিয়া দিল।

চন্দ্রমুখী কহিল, তবে তাও এক সেট ভাল দেখে কিনতে হবে—আমি সঙ্গে গিয়ে পছন্দ করে নেব। তারপর হাসিয়া কহিল, আমাদের যা চাই, জানো ত সব,—একজন ঝিও ঠিক করতে হবে।

দয়াল কহিল, কবে চাই বাছা?

যত শীঘ্র হয়। দু'তিন দিনের মধ্যে হলেই ভাল হয়। বলিয়া চন্দ্রমুখী তাহার হাতে একশত টাকার নোট দিয়া কহিল,—ভালো জিনিস নিয়ো, সস্তা ক'রো না।

তৃতীয় দিবসে সে নূতন বাটীতে চলিয়া গেল। সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলরামকে লইয়া মনের মত করিয়া ঘর সাজাইল এবং সন্ধ্যার পূর্বে আপনি সাজিতে বসিল। সাবান দিয়া মুখ ধুইয়া তাহাতে পাউডার দিল, আলতা গুলিয়া পায়ে দিল, পান খাইয়া ওষ্ঠ রঞ্জিত করিল। তাহার পর সর্বাঙ্গে গহনা পরিয়া জামা আঁটিয়া রং-করা কাপড় পরিল; বহুদিন পরে চুল বাঁধিয়া আবার টিপ পরিল। আয়নায় মুখ দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিল, পোড়া অদৃষ্টে আরও কি আছে!

পাড়াগাঁয়ের ছেলে কেবলরাম সহসা এই অভিনব সাজ-সজ্জা, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া ভীত হইয়া কহিল, দিদি, এ কি!

চন্দ্রমুখী হাসিয়া বলিল, কেবল, আজ আমার বর আসবে।

কেবলরাম বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর ক্ষেত্রমণি বেড়াইতে আসিল,—দিদি, এ আবার কি?

চন্দ্রমুখী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, এ-সব চাই ত আবার।

ক্ষেত্রমণি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দিদির যত বয়স বাড়চে, রূপও তত বাড়চে।

সে চলিয়া গেলে চন্দ্রমুখী বহুদিন পূর্বের মত আবার জানালার পার্শ্বে উপবেশন

করিল। নির্নিমেষ চক্ষে রাস্তার পানে চাহিয়া রহিল। এই তাহার কাজ; এই করিতে সে আসিয়াছে—যতদিন এখানে থাকিবে, ততদিন ইহাই করিবে। নূতন লোক কেহ হয়ত আসিতে চায়, দ্বার ঠেলাঠেলি করে; কেবলরাম মুখস্থর মত ভিতর হইতে কহে—এখানে নয়।

পুরাতন পরিচিত কেহ বা আসিয়া উপস্থিত হয়। চন্দ্রমুখী বসাইয়া হাসিয়া কথা কহে; কথায় কথায় দেবদাসের কথা জিজ্ঞাসা করে; তাহারা বলিতে পারে না—অমনি বিদায় করিয়া দেয়। রাত্রি অধিক হইলে নিজে বাহির হইয়া পড়ে। পাড়ায় পাড়ায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়। অলক্ষ্যে দ্বারে দ্বারে কান পাতিয়া কথাবার্তা শুনিতে চায়—নানা লোকে নানা কথা বলে, যাহা শুনিতে চায়, তাহা কিন্তু শোনা যায় না—কেহ বা মুখ ঢাকিয়া হঠাৎ মুখের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়—স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়ায়—শশব্যস্তে চন্দ্রমুখী সরিয়া যায়। দুপুরবেলা পুরাতন পরিচিত সঙ্গিনীদের বাড়ি বেড়াইতে যায়। কথায় কথায় প্রশ্ন করে,—কেহ দেবদাসকে জান?

তাহারা জিজ্ঞাসা করে, কে দেবদাস?

চন্দ্রমুখী উৎসুক হইয়া পরিচয় দিতে থাকে—গৌরবর্ণ, মাথায় কোঁকড়া চুল, কপালের বাঁ দিকে একটা কাটা দাগ, বড়লোক—অজস্র টাকা খরচ করে, কেউ চেন কি?

কেহই সন্ধান দিতে পারে না। হতাশ বিষণ্নমুখে চন্দ্রমুখী বাড়ি ফিরিয়া যায়। গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া রাস্তার পানে চাহিয়া থাকে। ঘুম পাইলে বিরক্ত হয়; মনে মনে কহে, এ কি তোমার ঘুমাইবার সময়?

ক্রমে একমাস অতীত হইল, কেবলরামও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। চন্দ্রমুখীর নিজেরও সন্দেহ হইতে লাগিল, বুঝি সে এখানে নাই। তবুও আশায় ভর করিয়া দেবতার চরণে কায়মনে প্রার্থনা করিয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

কলিকাতা আসিবার পর দেড়মাস গত হইয়াছে। আজ রাত্রে তাহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। রাত্রি তখন এগারোটা—হতাশ-মনে বাড়ি ফিরিতেছিল, দেখিতে পাইল, পথের ধারে একটা ঘরের সম্মুখে একজন আপনার মনে কি বলিতেছে। চন্দ্রমুখীর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল। এ কণ্ঠস্বর যে পরিচিত! কোটি-কোটি লোকের মধ্যেও চন্দ্রমুখী সে স্বর বুঝিতে পারিত। স্থানটা একটু অন্ধকার, তাহাতে আবার লোকটা অত্যন্ত মাতাল হইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। চন্দ্রমুখী নিকটে গিয়া গায়ে হাত দিল—তুমি কে গা, এমন করে পড়ে আছ?

লোকটা সুর করিয়া বলিল,—শুন সই, মনের মানুষ কই; যদি পাই কানু হেন স্বামী—

চন্দ্রমুখীর আর সন্দেহ নাই, ডাকিল, দেবদাস?

দেবদাস সেইভাবে বলিল, উঁ।

এখানে পড়ে কেন, ঘরে যাবে?

না, বেশ আছি—

একটু মদ খাবে?

'খাব' বলিয়া সে একেবারে চন্দ্রমুখীর গলা জড়াইয়া ধরিল, কহিল—এমন বন্ধু কে বাবা তুমি?

চন্দ্রমুখীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তখন বহু পরিশ্রমে টলিয়া টলিয়া, তাহার গলা ধরিয়া কোনক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাঃ, এ যে খাসা জিনিস!

চন্দ্রমুখীর কান্নায় হাসি মিশিল; কহিল, হাঁ, বেশ জিনিস; এখন আপাতত আমার কাঁধে ভর দিয়ে একটু এগিয়ে চল, একটা গাড়ি চাই ত।

তা চাই বৈ কি! পথে আসিতে আসিতে দেবদাস জড়িতকণ্ঠে কহিল, সুন্দরী, আমাকে তুমি চেন?

চন্দ্রমুখী কহিল, চিনি।

দেবদাস গাহিয়া উঠিল,—অন্য লোকে ভুয়া দেয় ভাগ্যে আমি চিনি—তাহার পর গাড়িতে বসিয়া চন্দ্রমুখীর কাঁধে ভর দিয়া বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারের নিকট

দাঁড়াইয়া পকেটে হাত দিয়া কহিল, সুন্দরী! কুড়িয়ে ত আনলে, কিন্তু পকেটে যে কিছু নেই—

চন্দ্রমুখী নীরবে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া একেবারে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া কহিল, ঘুমোও।

দেবদাস তেমনি জড়িতকণ্ঠে কহিল, কিছু মতলব আছে নাকি? এই যে বললাম পকেট খালি,—কিছু আশা নেই। বুঝলে রূপসী!

রূপসী তাহা বুঝিয়াছিল; কহিল, কাল দিয়ো।

দেবদাস বলিল, এতটা বিশ্বাস ত ভাল নয়—কি চাও খুলে বল দেখি?

চন্দ্রমুখী কহিল, কাল শুনো—বলিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

দেবদাসের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা হইয়াছিল। ঘরে কেহ ছিল না। চন্দ্রমুখী স্নান করিয়া নীচে রান্নার উদ্যোগে গিয়াছে। দেবদাস চাহিয়া দেখিল, এ ঘরে কখন সে আসে নাই, একটি জিনিসও চিনিতে পারিল না। তাহার গত রাত্রের কোন কথাই মনে পড়িল না; শুধু স্মরণ হইল কাহার একটা আন্তরিক সেবা। কে যেন বড় স্নেহ করিয়া টানিয়া আনিয়া ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছিল। এই সময়ে চন্দ্রমুখী ঘরে প্রবেশ করিল। রাত্রের সাজসজ্জার সে অনেকখানি পরিবর্তন করিয়াছিল। গায়ে গহনাগুলি ছিল বটে, কিন্তু পরনে রঙ্গিন কাপড়, কপালে টিপ, মুখে পানের দাগ—এ-সকল ছিল না। নিতান্তই একখানি সাদাসিধা কাপড় পরিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল। দেবদাস মুখপানে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল, কোথা থেকে কাল আমাকে ডাকাতি করে আনলে?

চন্দ্রমুখী বলিল, ডাকাতি করিনি—পথ থেকে শুধু কুড়িয়ে এনেছিলাম।

দেবদাস হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিল, তা যেন হ'ল, কিন্তু তোমার আবার এ-সব কি! কবে এলে? গায়ে যে গয়না ধরে না—দিলে কে?

চন্দ্রমুখী দেবদাসের মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আবার!

দেবদাস হাসিয়া কহিল, না না—তা নয়; একটা তামাশা করতেও কি দোষ? এলে কবে?

চন্দ্রমুখী বলিল, দেড়-মাস হ'ল।

দেবদাস মনে মনে যেন কি হিসাব করিল। পরে কহিল, আমাদের বাড়ি যখন গিয়েছিলে, তার পরেই এসেচ?

চন্দ্রমুখী বিস্মিত হইয়া কহিল, তোমাদের বাড়ি গিয়েছিলাম—কি করে জানলে?

দেবদাস কহিল, তুমি যাবার পরেই আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। একজন দাসী—যে তোমাকে বৌঠাকরুনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, তার কাছেই শুনতে পাই,—কাল অশথঝুরি গাঁ থেকে একজন স্ত্রীলোক এসেছিল, সে ভারী সুন্দরী। আর কি বুঝতে বাকী থাকে! কিন্তু এত গয়না আবার গড়ালে কেন?

চন্দ্রমুখী বলিল, গড়াই নি, এ-সব গিল্টির গয়না, কলকাতায় এসে কিনেচি। তবুও দেখ দেখি, তোমার জন্য আমার কত বাজে খরচ করতে হ'ল! অথচ কাল আমাকে তুমি চিনতেও পারলে না।

দেবদাস হাসিয়া উঠিল; বলিল, একেবারে চিনতে পারিনি, কিন্তু যত্নটি চিনেছিলাম। অনেকবার মনে হয়েছিল, আমার চন্দ্রমুখী ছাড়া এত যত্ন কার?

আনন্দে চন্দ্রমুখীর কাঁদিতে সাধ হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দেবদাস, আমাকে আর তত ঘৃণা কর না—না?

দেবদাস জবাব দিল, না। বরং ভালবাসি।

দুপুরবেলা স্নান করিবার সময় চন্দ্রমুখী দেখিল, দেবদাসের পেটে একখণ্ড ফ্লানেল বাঁধা আছে। ভয় পাইয়া বলিল, ও কি, ফ্লানেল বেঁধেছ কেন?

দেবদাস বলিল, পেটে একটু ব্যথা বোধ করি—তুমি অমন করচ কেন?

চন্দ্রমুখী কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, সর্বনাশ করনি ত? লিভারে ব্যথা হয়নি ত?

দেবদাস হাসিয়া কহিল, চন্দ্রমুখী, বোধ হয় তাই হয়েচে।

সেইদিন ডাক্তার আসিয়া বহুক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ঠিক এই আশঙ্কাই করিয়া গেলেন, ঔষধ দিলেন, এবং জানাইলেন যে যথেষ্ট সাবধানে না থাকিলে বিষম অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

অর্থ উভয়েই বুঝিল। বাসায় সংবাদ দিয়া ধর্মদাসকে আনা হইল, চিকিৎসার জন্য ব্যাংক হইতে টাকা আনা হইল। দু'দিন অমনি গেল, কিন্তু তৃতীয় দিনে তাহার জ্বর দেখা দিল।

দেবদাস চন্দ্রমুখীকে ডাকিয়া কহিল, খুব সময়ে এসেছিলে, না হলে হয়ত আর দেখতেই পেতে না।

চোখ মুছিয়া চন্দ্রমুখী প্রাণপণে সেবা করিতে বসিল। যুক্ত-করে প্রার্থনা করিল, ভগবান, অসময়ে এতখানি কাজে লাগিব, এ আশা স্বপ্নেও করি নাই, কিন্তু দেবদাসকে ভাল করিয়া দাও।

প্রায় মাসাধিক কাল দেবদাস শয্যায় পড়িয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে লাগিল, অসুখ তেমন গুরুতর হইতে পারিল না।

এই সময়ে একদিন দেবদাস কহিল, চন্দ্রমুখী, তোমার নামটা মস্ত বড়, সর্বদা ডাকতে অসুবিধা হয়,—একটু ছোট করে নিতে চাই।

চন্দ্রমুখী বলিল, বেশ ত।

দেবদাস কহিল, তবে আজ থেকে তোমাকে বৌ বলে ডাকব।

চন্দ্রমুখী হাসিয়া উঠিল। কহিল, তা যেন ডাকলে কিন্তু একটা মানে থাকা ত চাই।

সব কথার কি মানে থাকে?

যদি সাধ হয়ে থাকে, তাই ডেকো, কিন্তু এ সাধ কেন, তাও বলবে না?

না; কখনো কারণ জিজ্ঞাসা করতেও পাবে না।

চন্দ্রমুখী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বেশ তাই হবে।

দেবদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা বৌ, তুমি আমার কে যে, এত প্রাণপণে আমার সেবা করচ?

চন্দ্রমুখী লজ্জাবনত বধূ নহে, অ-বাক্‌পটু বালিকাও নহে; মুখপানে স্থির শান্ত দৃষ্টি রাখিয়া স্নেহজড়িতকণ্ঠে কহিল, তুমি আমার সর্বস্ব—তা কি আজও বুঝতে পারনি!

দেবদাস দেয়ালের দিকে চাহিয়া ছিল। সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তা পেরেচি, কিন্তু তেমন আনন্দ পাইনে। পার্বতীকে কত ভালবাসি, সে আমাকে কত ভালবাসে, কিন্তু তবু কি কষ্ট! অনেক দুঃখ পেয়ে ভেবেছিলাম, আর কখনো এ-সব ফাঁদে পা দেব না; ইচ্ছে করে দিইও নি। কিন্তু তুমি এমন কেন করলে? জোর করে আমাকে কেন বাঁধলে? বলিয়া আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল, বৌ, তুমিও হয়ত পার্বতীর মতই কষ্ট পাবে।

চন্দ্রমুখী মুখে অঞ্চল দিয়া শয্যার একপ্রান্তে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

দেবদাস পুনরায় মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, তোমাদের দু'জনে কত অমিল, আবার কত মিল। একজন অভিমানী উদ্ধত, আর একজন কত শান্ত, কত সংযত। সে কিছুই সইতে পারে না, আর তোমার কত সহ্য! তার কত যশ, কত সুনাম, আর তোমার কত কলঙ্ক! সবাই তাকে কত ভালবাসে, আর কেউ তোমাকে ভালবাসে না। তবে আমি ভালবাসি, বাসি বৈ কি! বলিয়া মোটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিল, পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা তোমার কি বিচার করবেন জানিনে; কিন্তু মৃত্যুর পরে যদি আবার মিলন হয়, আমি কখনো তোমা হতে দূরে থাকতে পারব না।

চন্দ্রমুখী নীরবে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল; মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল, ভগবান, কোনকালে, কোন জন্মে যদি এ পাপিষ্ঠার প্রায়শ্চিত্ত হয়, আমাকে যেন এই পুরস্কার দিয়ো।

মাস-দুই অতিবাহিত হইয়াছে। দেবদাস আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু শরীর সারে নাই। বায়ু-পরিবর্তন আবশ্যক। কাল পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে, সঙ্গে শুধু ধর্মদাস যাইবে।

চন্দ্রমুখী ধরিয়া বসিয়াছিল, তোমার একজন দাসীরও ত প্রয়োজন, আমাকে সঙ্গে যেতে দাও।

দেবদাস বলিল, ছিঃ, তা হয় না! আর যাই করি, এত বড় নির্লজ্জ হতে পারব না।

চন্দ্রমুখী একেবারে মৌন হইয়া গেল। সে অবুঝ নয়, তাই সহজেই বুঝিল। আর যাহাই

হোক, এ-জগতে তাহার সম্মান নাই। তাহার সংস্পর্শে দেবদাস সুখ পাইবে, সেবা পাইবে, কিন্তু কখনো সম্মান পাইবে না। চোখ মুছিয়া কহিল, আবার কবে দেখা পাব?

দেবদাস কহিল, বলতে পারিনে, তবে বেঁচে থাকতে তোমাকে কোনদিন ভুলব না, তোমাকে দেখবার তৃষ্ণা আমার কখনো মিটবে না।

প্রণাম করিয়া চন্দ্রমুখী সরিয়া দাঁড়াইল। চুপি চুপি বলিল, এই আমার যথেষ্ট। এর বেশী আশা করিনে।

যাবার সময় দেবদাস আরও দু'হাজার টাকা চন্দ্রমুখীর হাতে দিয়া কহিল, রেখে দাও। মানুষের শরীরে ত বিশ্বাস নেই; শেষে তুমি কি অকূলে ভাসবে!

চন্দ্রমুখী ইহাও বুঝিল, তাই হাত পাতিয়া অর্থ গ্রহণ করিল। চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একটি কথা আমাকে বলে যাও—

দেবদাস মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি?

চন্দ্রমুখী কহিল, বড়বৌঠাকরুন বলেছিলেন, তোমার শরীরে খারাপ রোগ জন্মেচে—এ কি সত্য?

প্রশ্ন শুনিয়া দেবদাস দুঃখিত হইল; কহিল, বড়বৌ সব পারেন; কিন্তু তা হলে তুমি জানতে না? আমার কোন্ কথা তোমার জানা নেই? এ-বিষয়ে তুমি যে পার্বতীরও বেশী।

চন্দ্রমুখী আর একবার চোখ মুছিয়া কহিল, বাঁচলুম। কিন্তু তবুও খুব সাবধানে থেকো। তোমার শরীর একে মন্দ, তার ওপর দেখো, কোনদিন ভুল করে ব'সো না।

প্রত্যুত্তরে দেবদাস শুধু হাসিল, কথা কহিল না।

চন্দ্রমুখী কহিল, আর একটি ভিক্ষে—দেহ এতটুকু খারাপ হলেই আমাকে খবর দেবে বল?

দেবদাস তাহার মুখপানে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—দেব বৈ কি বৌ!

আর একবার প্রণাম করিয়া চন্দ্রমুখী কাঁদিয়া কক্ষান্তরে পলাইয়া গেল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছুদিন যখন দেবদাস এলাহাবাদে বাস করিতেছিল, তখন হঠাৎ একদিন সে চন্দ্রমুখীকে চিঠি লিখিয়াছিল, বৌ, মনে করেছিলাম, আর কখনো ভালবাসব না। একে ত ভালবেসে শুধু-হাতে ফিরে আসাটাই বড় যাতনা, তার পরে আবার নূতন করে ভালবাসতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে আর নেই।

প্রত্যুত্তরে চন্দ্রমুখী কি লিখিয়াছিল, তাহাতে আবশ্যক নাই; কিন্তু এই সময়টায় দেবদাসের কেবলই মনে হইত, সে একবার এলে হয় না!

পরক্ষণে সভয়ে ভাবিত—না না, কাজ নেই,—কোনদিন পার্বতী যদি জানতে পারে! এমনি করিয়া একবার পার্বতী, একবার চন্দ্রমুখী তাহার হৃদয়-রাজ্যে বাস করিতেছিল। কখনও বা দুজনের মুখই পাশাপাশি তাহার হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিত—যেন উভয়ের কত ভাব!

মনের মাঝে দু'জনেই পাশাপাশি বিরাজ করিত। কোনদিন বা অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইত, তাহারা দু'জনেই যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। এই সময়টায় মনটা তাহার এমনি অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িত যে, শুধু একটা নির্জীব অতৃপ্তিই তাহার মনের মধ্যে মিথ্যা প্রতিধ্বনির মত ঘুরিয়া বেড়াইত। তার পরে দেবদাস লাহোরে চলিয়া গেল। এখানে চুনিলাল কাজ করিতেছিল, সন্ধান পাইয়া দেখা করিতে আসিল। বহুদিন পরে দেবদাস সুরা স্পর্শ করিল। চন্দ্রমুখীকে মনে পড়ে, সে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। মনে হয়, তার কত বুদ্ধি। সে কত শান্ত, ধীর; আর তার কত স্নেহ। পার্বতী এখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—শুধু নির্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত কখনো কখনো জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু এখানকার জলবায়ু তাহার সহিল না। মাঝে মাঝে অসুখ হয়, পেটের কাছে আবার যেন ব্যথা বোধ হয়।

ধর্ম্মদাস একদিন কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, দেব্‌তা, তোমার শরীর আবার খারাপ হচ্চে—আর কোথাও চল।

দেবদাস অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, চল যাই।

দেবদাস প্রায় বাসাতে মদ খায় না। চুনিলাল আসিলে কোনদিন খায়, কোন দিন বাহির হইয়া চলিয়া যায়। রাত্রিশেষে বাটী ফিরিয়া আসে, কোন রাত্রি বা একেবারেই আসে না। আজ দুইদিন হইতে হঠাৎ তাহার দেখা নাই। কাঁদিয়া ধর্ম্মদাস অন্নজল স্পর্শ করিল না। তৃতীয় দিনে দেবদাস জ্বর লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিল; শয্যা লইল, আর উঠিতে পারিল না। তিন-চারিজন ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিল।

ধর্ম্মদাস কহিল, দেব্‌তা, কাশীতে মাকে খবর দিই—

দেবদাস তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল, ছিঃ ছিঃ—মাকে কি এ মুখ দেখাতে পারি?

ধর্ম্মদাস প্রতিবাদ করিল, রোগ-শোক সকলেরই আছে; কিন্তু তাই বলে কি এতবড় বিপদের দিনে মাকে লুকানো যায়? তোমার কোন লজ্জা নাই, দেব্‌তা, কাশীতে চল।

দেবদাস মুখ ফিরাইয়া কহিল, না ধর্ম্মদাস, এ সময়ে তাঁর কাছে যেতে পারব না। ভাল হই, তার পরে।

ধর্ম্মদাস একবার মনে করিল, চন্দ্রমুখীর উল্লেখ করে; কিন্তু নিজে তাহাকে এত ঘৃণা করিত যে, তাহার মুখ মনে পড়িবামাত্রই চুপ করিয়া রহিল।

দেবদাসের নিজেরও অনেকবার এ কথা মনে হইত; কিন্তু কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করিত না। সুতরাং কেহই আসিল না। তার পরে অনেক দিনে সে ধীরে ধীরে আরোগ্য হইতে লাগিল। একদিন সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, চল ধর্ম্মদাস, এইবার আর কোথাও যাই।

বিপদের দিনে মাকে লুকানো যায়? তোমার কোন লজ্জা নাই, দেব্‌তা, কাশীতে চল।

জিনিসপত্র বাঁধিয়া চুনিলালের নিকট বিদায় লইয়া, দেবদাস আবার এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল—শরীরটা অনেকটা ভাল। কিছুদিন থাকিবার পর একদিন দেবদাস কহিল, ধর্ম্ম, কোন নূতন জায়গায় গেলে হয় না? কখনো বোম্বাই দেখিনি, যাবে?

আগ্রহ দেখিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধর্ম্মদাস মত দিল। সময়টা জ্যৈষ্ঠ মাস, বোম্বাই শহর তেমন গরম নয়। এখানে আসিয়া দেবদাস অনেকটা সারিয়া উঠিল।

ধর্ম্মদাস জিজ্ঞাসা করিল, এখন বাড়ি গেলে হয় না?

দেবদাস কহিল, না, বেশ আছি। আমি এখানেই আর কিছুদিন থাকব।

এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। ভাদ্র মাসের সকালবেলা, একদিন দেবদাস ধর্ম্মদাসের কাঁধে ভর দিয়া বোম্বাই হাসপাতাল হইতে বাহির হইয়া গাড়িতে আসিয়া বসিল। ধর্ম্মদাস কহিল, দেব্‌তা, আমি বলি, মায়ের কাছে যাওয়া ভাল।

দেবদাসের দু' চক্ষু জলে ভরিয়া গেল—আজ কয়দিন হইতে মাকে তাহার কেবল মনে পড়িতেছিল। হাসপাতালে পড়িয়া যখন তখন এই কথাই ভাবিয়াছে,—এ সংসারে তাহার সবই আছে, অথচ কেহই নাই। তাহার মা আছেন, বড় ভাই আছেন, ভগিনীর অধিক পার্ব্বতী আছে—চন্দ্রমুখীও আছে! তাহার সবাই আছে, কিন্তু সে আর কাহারও নাই। ধর্ম্মদাসও কাঁদিতেছিল; কহিল, তা হলে দাদা, মায়ের কাছে যাওয়াই স্থির?

দেবদাস মুখ ফিরাইয়া অশ্রু মুছিল; বলিল, না ধর্ম্মদাস, মাকে এ মুখ দেখাতে ইচ্ছা হয় না,—আমার এখনো বোধ করি সে সময় আসেনি।

বৃদ্ধ ধর্ম্মদাস হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া কহিল, দাদা, এখনো যে মা বেঁচে আছেন!

কথাটায় কতখানি যে প্রকাশ করিল, তাহা অন্তরে উভয়েই অনুভব করিল। দেবদাসের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়াছে। সমস্ত পেট প্লীহা-লিভারে পরিপূর্ণ; তাহার উপর জ্বর, কাশি। রঙ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, দেহ অস্থিচর্ম্মসার। চোখ একেবারে ঢুকিয়া গিয়াছে, শুধু একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় চকচক করিতেছে। মাথায় চুল রুক্ষ ও ঋজু—চেষ্টা করিলে বোধ হয় গুনিতে পারা যায়। হাতের আঙ্গুলগুলার পানে চাহিলে ঘৃণা বোধ হয়—একে শীর্ণ,

তাহাতে আবার কুৎসিত ব্যাধির দাগে দুষ্ট। স্টেশনে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথাকার টিকিট কিনব দেব্‌তা?

দেবদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, চল বাড়ি যাই—তার পর সব হবে।

গাড়ির সময় হইলে তাহারা হুগলির টিকিট কিনিয়া চাপিয়া বসিল।

ধর্মদাস দেবদাসের নিকটেই রহিল। সন্ধ্যার পূর্বে দেবদাসের চোখ জ্বালা করিয়া আবার জ্বর আসিল। ধর্মদাসকে ডাকিয়া কহিল, ধর্মদাস, আজ মনে হচ্চে, বাড়ি পেঁছানও হয়ত কঠিন হবে।

ধর্মদাস সভয়ে কহিল, কেন দাদা?

দেবদাস হাসিবার চেষ্টা করিয়া শুধু বলিল, আবার যে জ্বর হ'ল ধর্মদাস।

কাশীর পথ যখন পার হইয়া গেল, দেবদাস তখন জ্বরে অচেতন। পাটনার কাছাকাছি তাহার হুঁশ হইল, কহিল, তাইত ধর্মদাস, মায়ের কাছে যাওয়া সত্যিই আর ঘটল না।

ধর্মদাস কহিল, চল দাদা, আমরা পাটনায় নেমে গিয়ে ডাক্তার দেখাই—

উত্তরে দেবদাস বলিল, না থাক, আমরা বাড়ি যাই চল।

গাড়ি যখন পান্ডুয়া স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন ভোর হইতেছে। সারারাত্রি বৃষ্টি হইয়াছিল, এখন থামিয়াছে। দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। নীচে ধর্মদাস নিদ্রিত। ধীরে ধীরে একবার তাহার ললাট স্পর্শ করিল, লজ্জায় তাহাকে জাগাইতে পারিল না। তার পর দ্বার খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পড়িল। গাড়ি সুপ্ত ধর্মদাসকে লইয়া চলিয়া গেল। কাঁপিতে কাঁপিতে দেবদাস স্টেশনের বাহিরে আসিল। একজন ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিল, বাপু, হাতীপোতায় নিয়ে যেতে পারবে?

সে একবার মুখপানে চাহিল, একবার এদিক-ওদিক চাহিল, তাহার পর কহিল, না বাবু, রাস্তা ভাল নয়—ঘোড়ার গাড়ি এ বর্ষায় ওখানে যেতে পারবে না।

দেবদাস উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, পালকি পাওয়া যায়?

গাড়োয়ান বলিল, না।

আশঙ্কায় দেবদাস বসিয়া পড়িল—তবে কি যাওয়া হবে না? তাহার মুখের উপরেই তাহার অন্তিম অবস্থা গাঢ় মুদ্রিত ছিল, অন্ধেও তাহা পড়িতে পারিত।

গাড়োয়ান আর্দ্র হইয়া কহিল, বাবু, একটা গরুর গাড়ি ঠিক করে দেব?

দেবদাস জিজ্ঞাসা করিল, কতক্ষণে পেঁছবে?

গাড়োয়ান বলিল, পথ ভাল নয় বাবু, বোধ হয় দিন-দুই লেগে যাবে।

দেবদাস মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল, দু' দিন বাঁচব ত? কিন্তু পার্বতীর কাছে যাইতেই হইবে। তাহার অনেকদিনের অনেক মিথ্যা কথা, অনেক মিথ্যা আচরণ স্মরণ হইল। কিন্তু শেষদিনের এ প্রতিশ্রুতি সত্য করিতেই হইবে। যেমন করিয়া হোক, একবার তাহাকে শেষ দেখা দিতেই হইবে! কিন্তু এ জীবনের মেয়াদ যে আর বেশী বাকী নাই! সেই যে বড় ভয়ের কথা!

দেবদাস গরুর গাড়িতে যখন উঠিয়া বসিল, তখন জননীর কথা মনে করিয়া তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। আর একখানি স্নেহকোমল মুখ আজ জীবনের শেষক্ষণে নিরতিশয় পবিত্র হইয়া দেখা দিল—সে মুখ চন্দ্রমুখীর। যাহাকে পাপিষ্ঠা বলিয়া সে চিরদিন ঘৃণা করিয়াছে, আজ তাহাকেই জননীর পাশে সগৌরবে ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ জীবনে আর দেখা হইবে না, হয়ত বহুদিন পর্যন্ত সে খবরটাও পাইবে না। তবু পার্বতীর কাছে যাইতে হইবে। দেবদাস শপথ করিয়াছিল, আর একবার দেখা দিবেই। আজ এ প্রতিজ্ঞা তাহাকে পূর্ণ করিতেই হইবে। পথ ভাল নয়। বর্ষার জল কোথাও পথের মাঝে জমিয়া আছে, কোথাও বা পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কাদায় সমস্ত রাস্তা পরিপূর্ণ। গরুর গাড়ি হটর হটর করিয়া চলিল। কোথাও নামিয়া চাকা ঠেলিতে হইল, কোথাও গরু দুটোকে নির্দয়রূপে প্রহার করিতে হইল—যেমন করিয়াই হোক, এ ষোল ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতেই হইবে। হুহু করিয়া ঠান্ডা বাতাস বহিতেছিল। আজও তাহার সন্ধ্যার পর প্রবল জ্বর দেখা দিল। সে সভয়ে প্রশ্ন করিল, গাড়োয়ান, আর কত পথ?

গাড়োয়ান জবাব দিল, এখনো আট-দশ কোশ আছে বাবু।

শিগ্‌গির নিয়ে চল্‌ বাপু, তোকে অনেক টাকা বকশিশ দেব। পকেটে একখানা এক শ' টাকার নোট ছিল, তাই দেখাইয়া কহিল, এক শ' টাকা দেব, নিয়ে চল্‌।

তাহার পর কেমন করিয়া কোথা দিয়া সমস্ত রাত্রি গেল, দেবদাস জানিতেও পারিল না। অসাড় অচেতন; সকালে সজ্ঞান হইয়া কহিল, ওরে, আর কত পথ? এ কি ফুরোবে না?

গাড়োয়ান কহিল, আরও ছয় কোশ।

দেবদাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, একটু শিগ্‌গির চল্‌ বাপু, আর যে সময় নেই।

গাড়োয়ান বুঝিতে পারিল না, কিন্তু নূতন উৎসাহে গরু ঠেঙ্গাইয়া গালিগালাজ করিয়া চলিল। প্রাণপণে গাড়ি চলিতেছে, ভিতরে দেবদাস ছটফট করিতেছে। কেবল মনে হইতেছে, দেখা হবে ত? পৌঁছব ত? দুপুরবেলা গাড়ি থামাইয়া গাড়োয়ান গরুকে খাবার দিয়া, নিজে আহার করিয়া আবার উঠিয়া বসিল। কহিল, বাবু, তুমি খাবে না কিছু?

না বাপু, তবে বড় তেষ্টা পেয়েচে, একটু জল দিতে পার?

সে পথিপার্শ্বস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিল। আজ সন্ধ্যার পর জ্বরের সঙ্গে দেবদাসের নাকের ভিতর হইতে সড়সড় করিয়া ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতে লাগিল। সে প্রাণপণে নাক চাপিয়া ধরিল। তাহার পর বোধ হইল, দাঁতের পাশ দিয়াও রক্ত বাহির হইতেছে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসেও যেন টান ধরিয়াছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, আর কত?

গাড়োয়ান কহিল, আর কোশ-দুই; রাত্রি দশটা নাগাদ পেঁছব।

দেবদাস বহুকষ্টে মুখ তুলিয়া পথের পানে চাহিয়া কহিল, ভগবান!

গাড়োয়ান প্রশ্ন করিল, বাবু, অমন করচেন কেন?

দেবদাস এ কথার জবাব দিতেও পারিল না। গাড়ি চলিতে লাগিল, কিন্তু দশটার সময় না পেঁছিয়া প্রায় রাত্রি বারোটায় গাড়ি হাতীপোতার জমিদারবাবুর বাটীর সম্মুখে বাঁধান অশ্বত্থ তলায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

গাড়োয়ান ডাকিয়া কহিল, বাবু, নেমে এসো।

কোন উত্তর নাই। আবার ডাকিল, তবু উত্তর নাই। তখন সে ভয় পাইয়া প্রদীপ মুখের কাছে আনিল, বাবু, ঘুমালে কি?

দেবদাস চাহিয়া আছে; ঠোঁট নাড়িয়া কি বলিল, কিন্তু শব্দ হইল না। গাড়োয়ান আবার ডাকিল, ও বাবু!

দেবদাস হাত তুলিতে চাহিল, কিন্তু হাত উঠিল না; শুধু তাহার চোখের কোণ বাহিয়া দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। গাড়োয়ান তখন বুদ্ধি খাটাইয়া অশ্বত্থতলার বাঁধানো বেদীটার উপর খড় পাতিয়া শয্যা রচনা করিল। তাহার পর বহুকষ্টে দেবদাসকে তুলিয়া আনিয়া তাহার উপর শয়ন করাইয়া দিল। বাহিরে আর কেহ নাই, জমিদারবাটী নিস্তব্ধ, নিদ্রিত। দেবদাস বহুক্লেশে পকেট হইতে এক শ' টাকার নোটটা বাহির করিয়া দিল। লণ্ঠনের আলোকে গাড়োয়ান দেখিল, বাবু তাহার পানে চাহিয়া আছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। সে অবস্থাটা অনুমান করিয়া নোট লইয়া চাদরে বাঁধিয়া রাখিল। শাল দিয়া দেবদাসের মুখ পর্যন্ত আবৃত; সম্মুখে লণ্ঠন জ্বলিতেছে, নূতন বন্ধু পায়ের কাছে বসিয়া ভাবিতেছে।

ভোর হইল। সকালবেলা জমিদারবাটী হইতে লোক বাহির হইল,—এক আশ্চর্য দৃশ্য। গাছতলায় একজন লোক মরিতেছে। ভদ্রলোক। গায়ে শাল, পায়ে চকচকে জুতো, হাতে আংটি। একে একে অনেক লোক জমা হইল। ক্রমে ভুবনবাবুর কানে এ কথা গেল, তিনি ডাক্তার আনিতে বলিয়া নিজে উপস্থিত হইলেন। দেবদাস সকলের পানে চাহিয়া দেখিল; কিন্তু তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল—একটা কথাও বলিতে পারিল না, শুধু চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। গাড়োয়ান যতদূর জানে বলিল, কিন্তু তাহাতে সুবিধা হইল না। ডাক্তার আসিয়া কহিল, শ্বাস উঠেচে, এখনই মরবে।

সকলেই কহিল, আহা!

উপরে বসিয়া পার্বতী এ কাহিনী শুনিয়া বলিল, আহা!

কে একজন দয়া করিয়া মুখে একফোঁটা জল দিয়ে গেল। দেবদাস তাহার পানে

করুণদৃষ্টিতে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর চক্ষু মুদিল। আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়া ছিল, তাহার পরে সব ফুরাইল। এখন কে দাহ করিবে, কে ছুঁইবে, কি জাত ইত্যাদি লইয়া তর্ক উঠিল। ভুবনবাবু নিকটস্থ পুলিশ-স্টেশনে সংবাদ দিলেন। ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। প্লীহা-লিভারে মৃত্যু। নাকে মুখে রক্তের দাগ। পকেট হইতে দুইখানা পত্র বাহির হইল। একখানা তালসোনাপুরের দ্বিজদাস মুখুয্যে বোম্বায়ের দেবদাসকে লিখিতেছে—টাকা পাঠান এখন সম্ভব নয়। আর একটা কাশীর হরিমতী দেবী উক্ত দেবদাস মুখুয্যেকে লিখিতেছে—কেমন আছ?

বাঁ হাতে উলকি দিয়া ইংরাজী অক্ষরে নামের আদ্যাক্ষর লেখা আছে। ইন্‌স্পেক্টরবাবু তদন্ত করিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, লোকটা দেবদাস বটে।

হাতে নীল-পাথর দেওয়া আংটি—দাম আন্দাজ দেড় শ', গায়ে একজোড়া শাল—দাম আন্দাজ দুই শ'। জামাকাপড় ইত্যাদি সমস্তই লিখিয়া লইলেন। চৌধুরীমহাশয় ও মহেন্দ্রনাথ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন। তালসোনাপুর নাম শুনিয়া মহেন্দ্র কহিল, ছোটমার বাপের বাড়ির লোক, তিনি দেখলে—

চৌধুরীমহাশয় তাড়া দিলেন, সে কি এখানে মড়া সনাক্ত করতে আসবে নাকি?

দারোগাবাবু সহাস্যে কহিলেন, পাগল আর কি!

ব্রাহ্মণের মৃতদেহ হইলেও, পাড়াগাঁয়ে কেহ স্পর্শ করিতে চাহিল না; কাজেই চণ্ডাল আসিয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। তার পর কোন শুষ্ক পুষ্করিণীর তটে অর্ধদগ্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল—কাক-শকুন উপরে আসিয়া বসিল, শৃগাল-কুকুর শবদেহ লইয়া কলহ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তবুও যে শুনিল, সেই কহিল, আহা! দাসী চাকরও বলাবলি করিতে লাগিল, আহা ভদ্দরলোক, বড়লোক! দু'শ' টাকা দামের শাল, দেড় শ' টাকা দামের আংটি! সে-সব এখন দারোগার জিম্মায় আছে; পত্র দু'খানাও তিনি রাখিয়াছেন।

খবরটা সকালেই পার্বতীর কানে গিয়াছিল বটে, কিন্তু কোন বিষয়েই আজকাল সে মনোনিবেশ করিতে পারিত না বলিয়া ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু সকলের মুখেই যখন ঐ কথা, তখন পার্বতীও বিশেষ করিয়া শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যার পূর্বে একজন দাসীকে ডাকিয়া কহিল, কি হয়েচে লা? কে মরেচে?

দাসী কহিল, আহা, কেউ তা জানে না মা! পূর্বজন্মের মাটি কেনা ছিল, তাই মরতে এসেছিল। শীতে হিমে সেই রাত্রি থেকে পড়ে ছিল, আর বেলা ন'টার সময় মরেচে।

পার্বতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আহা, কে তা কিছু জানা গেল না?

দাসী বলিল, মহেনবাবু সব জানেন, আমি অত জানিনে মা।

মহেন্দ্রকে ডাকিয়া আনা হইলে সে কহিল, তোমাদের দেশের দেবদাস মুখুয্যে।

পার্বতী মহেন্দ্রর অত্যন্ত নিকটে সরিয়া আসিয়া, তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে, দেবদাদা? কেমন করে জানলে?

পকেটে দু'খানা চিঠি ছিল; একখানা দ্বিজদাস মুখুয্যে লিখেচেন—

পার্বতী বাধা দিয়া কহিল, হাঁ, তাঁর বড়দাদা।

আর একখানা কাশীর হরিমতী দেবী লিখেচেন—

হাঁ, তিনি মা।

হাতের উপর উলকি দিয়ে নাম লেখা ছিল—

পার্বতী কহিল, হাঁ, কলকাতায় প্রথম গিয়ে লিখিয়েছিলেন বটে—

একটা নীল রংয়ের আংটি—

পৈতার সময় জেঠামশাই দিয়েছিলেন। আমি যাই—, বলিতে বলিতে পার্বতী ছুটিয়া নামিয়া পড়িল।

মহেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, ও মা, কোথা যাও?

দেবদার কাছে।

সে ত আর নেই—ডোমে নিয়ে গেছে।

ওগো, মা গো! বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পার্বতী ছুটিল। মহেন্দ্র ছুটিয়া সম্মুখে আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, তুমি কি পাগল হলে মা? কোথা যাবে?

পার্বতী মহেন্দ্রর পানে তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিল, মহেন, আমাকে কি সত্যি পাগল পেলে? পথ ছাড়।

তাহার চক্ষের পানে চাহিয়া, মহেন্দ্র পথ ছাড়িয়া নিঃশব্দে পিছনে পিছনে চলিল। পার্বতী বাহির হইয়া গেল। বাহিরে তখনও নায়েব গোমস্তা কাজ করিতেছিল, তাহারা চাহিয়া দেখিল। চৌধুরীমহাশয় চশমার উপর দিয়া চাহিয়া কহিলেন, যায় কে?

মহেন্দ্র বলিল, ছোটমা।

সে কি? কোথায় যায়?

মহেন্দ্র বলিল, দেবদাসকে দেখতে।

ভুবন চৌধুরী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তোরা কি সব ক্ষেপে গেলি, ধর—ধর—ধরে আনো ওকে। পাগল হয়েচে! ও মহেন, ও কনেবৌ!

তাহার পর দাসী-চাকর মিলিয়া ধরাধরি করিয়া পার্বতীর মূর্ছিত দেহ টানিয়া আনিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেল। পরদিন তাহার মূর্ছাভঙ্গ হইল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। একজন দাসীকে ডাকিয়া শুধু জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রিতে এসেছিলেন, না? সমস্ত রাত্রি!

তাহার পর পার্বতী চুপ করিয়া রহিল।

এখন এতদিনে পার্বতীর কি হইয়াছে, কেমন আছে জানি না। সংবাদ লইতেও ইচ্ছা করে না। শুধু দেবদাসের জন্য বড় কষ্ট হয়। তোমরা যে-কেহ এ কাহিনী পড়িবে, হয়ত আমাদেরই মত দুঃখ পাইবে। তবু যদি কখনও দেবদাসের মত এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য একটু প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক, যেন তাহার মত এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে। মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময়ে যেন একটি স্নেহ-করস্পর্শ তাহার ললাটে পৌঁছে—যেন একটিও করুণার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।

দেনা-পাওনা

এক

চণ্ডীগড়ে 'চণ্ডী বহু প্রাচীন দেবতা। কিংবদন্তী আছে রাজা বীরবাহুর কোন্ এক পূর্বপুরুষ কি একটা যুদ্ধ জয় করিয়া বারুই নদীর উপকূলে এই মন্দির স্থাপিত করেন, এবং পরবর্তীকালে কেবল ইহাকেই আশ্রয় করিয়া এই চণ্ডীগড় গ্রামখানি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। হয়ত একদিন যথার্থই সমস্ত চণ্ডীগড় গ্রাম দেবতার সম্পত্তি ছিল; কিন্তু আজ মন্দির-সংলগ্ন মাত্র কয়েক বিঘা ভূমি ভিন্ন সমস্তই মানুষে ছিনাইয়া লইয়াছে। গ্রামখানি এখন বীজগাঁর জমিদারিভুক্ত। কেমন করিয়া এবং কোন্ দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় পথে অনাথ ও অক্ষমের সম্পত্তি এবং এমনি নিঃসহায় দেবতার ধন অবশেষে জমিদারের জঠরে আসিয়া স্থিতিলাভ করে, সে কাহিনী সাধারণ পাঠকের জানা নিষ্প্রয়োজন। আমার বক্তব্যটা কেবল এই যে, চণ্ডীগড় গ্রামের অধিকাংশই এখন চণ্ডীর হস্তচ্যুত। দেবতার হয়ত ইহাতে যায়-আসে না; কিন্তু তাঁহার সেবায়েত যাঁহারা, এ ক্ষোভ তাঁহাদের আজিও যায় নাই; তাই আজিও বিবাদ-বিসংবাদ ঘটিতে ছাড়ে না এবং মাঝে মাঝে সেটা তুমুল হইয়া উঠিবারই উপক্রম করে। অত্যাচারী বলিয়া বীজগাঁয়ের জমিদার-বংশের চিরদিনই একটা অখ্যাতি আছে; কিন্তু বৎসর-খানেক পূর্বে অপুত্রক জমিদারের মৃত্যুতে ভাগিনেয় জীবানন্দ চৌধুরী যেদিন হইতে বাদশাহী লাভ করিয়াছেন, সেদিন হইতে ছোট-বড় সকল প্রজার জীবনই একেবারে দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, ভূতপূর্ব ভূস্বামী কালীমোহনবাবু পর্যন্ত এই লোকটির উচ্ছৃঙ্খলতা আর সহিতে না পারিয়া ইহাকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যু তাঁহার সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করিতে দেয় নাই।

সেই জীবানন্দ চৌধুরী সম্প্রতি রাজ্য-পরিদর্শনচ্ছলে চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গ্রামের মধ্যে একটা সামান্য রকমের কাছারি-বাড়ি বরাবরই আছে; কিন্তু বাঁকুড়া জেলার এই অসমতল পাহাড়-ঘেঁষা গ্রামখানির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সুনাম থাকায়, এবং বিশেষতঃ বালুময় বারুইয়ের জল অত্যন্ত রুচিকর বলিয়া এই জীবানন্দেরই মাতামহ রাধামোহনবাবু গ্রামপ্রান্তে নদীতীরে শান্তিকুঞ্জ নাম দিয়া একখানি বাংলো-বাটী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, এবং প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র কালীমোহন কোনদিন এখানে পদার্পণ করেন নাই। সুতরাং একদিন যে গৃহের রূপ ছিল, ঐশ্বর্য ছিল, মর্যাদা ছিল—চারিদিকের যে উদ্যান দিবারাত্রি ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ থাকিত, তাহাই আবার আর একদিন আর এক হাতে অযত্ন-অবহেলায় জীর্ণ মলিন ও আগাছায় ভরিয়া গিয়াছিল। এখানে মালী ছিল না, রক্ষক ছিল না, আশেপাশে লোকালয় ছিল না, কেবল বারুইয়ের শুষ্ক উপকূলে মস্ত একটা ভাঙ্গাচোরা বাড়ি বন-জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অবমানিত গৌরবের মত অহর্নিশি শূন্য খাঁখাঁ করিত। কতকাল ধরিয়া যে এখানে কেহ প্রবেশ করে নাই, কতকাল ধরিয়া যে কাছারির প্রধান কর্মচারী সদরে কেবল মিথ্যা কৈফিয়ত পেশ করিয়া আসিতেছে, তাহা হিসাব করিয়া লইবার কেহ নাই।

এই যখন অবস্থা, তখন অকস্মাৎ একদিন সায়াহ্নবেলায় মাত্র জন-দুই লোক সঙ্গে লইয়া নূতন ভূস্বামী আসিয়া গ্রামের কাছারি-বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; পালকি হইতে অবতরণ পর্যন্ত করিলেন না, কেবল গোমস্তা এককড়ি নন্দীকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, তিনি দিন-কয়েক শান্তিকুঞ্জে বাস করিবেন এবং পরক্ষণেই গন্তব্যপথে চলিয়া গেলেন। আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় এককড়ির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। হয়ত সেখানে প্রবেশ করিবার পথ নাই, হয়ত সমস্ত দরজা-জানালা চোরে চুরি করিয়া লইয়া গেছে, হয়ত ঘরে ঘরে বাঘ-ভালুকের দল বসবাস করিয়া আছে—তথায় কি যে আছে, আর কি যে নাই, তাহার কোন জ্ঞানই এককড়ির ছিল না।

এই সন্ধ্যাবেলায় কোথায় লোকজন, কোথায় আলোর বন্দোবস্ত, কোথায় খাবার-দাবার

আয়োজন—হঠাৎ এখন সে কি করিবে, কাহার শরণাপন্ন হইবে, চিন্তা করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ ভারী এবং মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। চাকরি ত গেছেই—সে যাক্, কিন্তু এই দুর্দান্ত নবীন মনিবের যে-সকল ইতিবৃত্ত সে ইতিমধ্যে লোকপরম্পরায় সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে, তাহার কোনটাই তাহাকে কোন ভরসা দিল না এবং এই যে খবর নাই, এত্তেলা নাই, এই হঠাৎ শুভাগমন, এ যখন কেবল তাহারই জন্য, তখন ইঁহারই জমিদারিতে বাস করিয়া ছেলেপুলে লইয়া কোথায় পালাইয়া যে সে আত্মরক্ষা করিবে, ইহার কোন কিনারাই তাহার চোখে পড়িল না।

মনিবকে সে কখনো চোখে দেখে নাই—তাহার প্রয়োজন হয় নাই, আজও সে সাহস করিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারে নাই; কিন্তু সঙ্কীর্ণ পথপ্রান্তে বাহকেরা অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পালকির ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে যে মুখের চেহারা তাহার মনশ্চক্ষে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। তাহার অনেক গাফিলতি, অনেক চুরির এইবার যে একটা কঠোর বোঝাপড়া সরজমিনে বসিয়া চলিতে থাকিবে, তাহার কোন অংশ আর কাহারও স্কন্ধে আরোপ করা সম্ভবপর হইবে কিনা, ইহাই যখন সে ভাবিবার চেষ্টা করিতেছিল, ঠিক এমনি সময়ে কাছারির বড় পেয়াদা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বেচারা তাগাদায় গিয়াছিল; পথের মধ্যে এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়াছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দীমশাই, হুজুর আসছেন না?

এককড়ি চোখ তুলিয়া শুধু বলিল, হুঁ।

বিশ্বম্ভর আশ্চর্য হইয়া ক্ষণকাল এককড়ির পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে কহিল, হুঁ কি গো নন্দীমশাই? স্বয়ং হুজুর আসচেন যে!

এককড়ি মনে মনে একপ্রকার মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল; বিকৃত স্বরে জবাব দিল, আসচেন ত আমি করব কি? খবর নেই, এত্তেলা নেই, হুজুর আসছেন! হুজুর বলে ত আর মাথা কেটে নিতে পারবে না!

এই আকস্মিক উত্তেজনার অর্থ সহসা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ বিশ্বম্ভর মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার মগজ যেমন পরিষ্কার তেমনি ঠাণ্ডা, এবং পিয়াদা হইলেও গোমস্তার সহিত সম্বন্ধটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এককড়িকে সে ভিতরে লইয়া গিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই সান্ত্বনা দান করিল, এবং মদের বোতল, মাংস এবং আনুষঙ্গিক আরও একটা বস্তুর গোপন ইঙ্গিত করিয়া এতবড় আশার বাণী শুনাইতেও ইতস্ততঃ করিল না যে, পুরুষের ভাগ্যের সীমা যখন দেবতারাও নির্দেশ করিতে পারেন না, তখন হুজুরের নজরে পড়িলে নন্দীমশায়ের অদৃষ্টেও কেন যে একদিন সদরের নায়েবী পদ মিলিবে না, এমন কথা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না।

অনতিকাল মধ্যেই এককড়ি যখন জন-কয়েক লোক, গোটা-দুই আলো এবং সামান্য কিছু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া লইয়া বিশ্বম্ভরকে সঙ্গে করিয়া শান্তিকুঞ্জের ভাঙ্গা গেটের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। দেখিল ইতিমধ্যেই কিছু কিছু ডালপালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পথটাকে চলনসই করা হইয়াছে; তথাপি এই বনময় অন্ধকার পথে সহসা প্রবেশ করিতে বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারও ভরসা হইল না। এবং প্রবেশ করিয়াও পা ফেলিতে প্রতিপদেই তাহাদের গা ছমছম করিতে লাগিল। বিঘা-দশেক ভূমি ব্যাপিয়া এই বন, সুতরাং পথও অল্প নহে, তাহা অতিক্রম করিবার দুঃখও অল্প নহে। কোথাও একটা দীপ নাই, কেবল চাতালের একধারে যেখানে বাহকেরা পালকি নামাইয়া রাখিয়া একত্র বসিয়া ধূমপান করিতেছে তাহারই অদূরে একখণ্ড জ্বলন্ত শুষ্ককাষ্ঠ হইতে কতকটা স্থান যৎকিঞ্চিৎ আলোকিত হইয়াছে। খবর পাইয়া ভৃত্য আসিয়া এককড়িকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। সমস্ত কক্ষ মদের গন্ধে পরিপূর্ণ, এককোণে মিটমিট করিয়া একটা মোমবাতি জ্বলিতেছে এবং অপরপ্রান্তে একটা ভাঙ্গা তক্তপোশের উপর বিছানা পাতিয়া বীজগাঁয়ের জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী বসিয়া আছেন। লোকটা অত্যন্ত রোগা এবং ফরসা; বয়স অনুমান করা অতিশয় কঠিন, কারণ উপদ্রবে অত্যাচারে মুখখানা শুকাইয়া যেন একেবারে কাঠের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে সুরাপূর্ণ কাচের গেলাস এবং তাহারই পার্শ্বে বিচিত্র আকারের একটা মদের বোতল প্রায় শেষ হইয়াছে। বালিশের তলা হইতে একটা

নেপালী কুকরির কিয়দংশ দেখা যাইতেছে এবং তাহারই সন্নিকটে একটা খোলা বাক্সের মধ্যে একজোড়া পিস্তল সাজান রহিয়াছে।

এককড়ি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনিব কহিলেন, তোমার নাম এককড়ি নন্দী? তুমিই এখানকার গোমস্তা?

ভয়ে এককড়ির হৃৎপিণ্ড দুলিতেছিল, সে অস্ফুট কম্পিতকণ্ঠে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুজুর!

সে ভাবিয়া আসিয়াছিল এইবার এই বাড়ির কথা উঠিবে, কিন্তু হুজুরে তাহার কোন উল্লেখ করিলেন না, শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কাছারির তসিল কত?

এককড়ি বলিল, আজ্ঞে, প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা।

হাজার পাঁচেক? বেশ আমি দিন-আষ্টেক আছি, তার মধ্যে হাজার দশেক টাকা চাই।

এককড়ি কহিল, যে আজ্ঞে।

তাহার মনিব বলিলেন, কাল সকালে তোমার কাছারিতে গিয়ে বসব—বেলা দশটা-এগারোটা হবে—তার পূর্বে আমার ঘুম ভাঙে না। প্রজাদের খবর দিও।

এককড়ি সানন্দে মাথা নাড়িয়া কহিল, যে আজ্ঞে। কারণ ইহা বলা বাহুল্য যে খাজনার অতিরিক্ত টাকা আদায়ের গুরুভারে এককড়ি আপনাকে নিরতিশয় প্রপীড়িত বা বিপন্ন জ্ঞান করে নাই। সে পুলকিত-চিত্তে কহিল, আমি রাত্রের মধ্যেই আজ চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দেব যেন কেউ না বলতে পারে সে সময়ে খবর পায়নি।

জীবানন্দ মাথা হেলাইয়া সম্মতি দান করিলেন, এবং মদের পাত্রটা মুখে তুলিয়া সমস্তটা এক চুমুকে পান করিয়া সেটা ধীরে ধীরে রাখিয়া দিতে দিতে বলিলেন, এককড়ি, তোমাদের এখানে বোধ করি বিলিতী মদের দোকান নেই! তা না থাক, যা আমার সঙ্গে আছে তাতেই এ ক'টা দিন চলে যাবে, কিন্তু মাংস আমার রোজ চাই।

এককড়ি প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কহিল, এ আর বেশী কথা কি হুজুর, মা চণ্ডীর সরেস মহাপ্রসাদ আমি রোজ হুজুরে দিয়ে যাবো।

হুজুর খুশী হইয়া কহিলেন, বেশ, বেশ। তার পরে বোতল হইতে কতকটা সুরা পাত্রে ঢালিয়া তাহা পান করিলেন, এবং মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, আরও একটা কথা আছে এককড়ি।

এককড়ির সাহস বাড়িতেছিল, কহিল, আজ্ঞে করুন?

তিনি মুখের মধ্যে গোটা-দুই লবঙ্গ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ এককড়ি, আমি বিবাহ করিনি—বোধ হয় কখনো করবও না।

এককড়ি মৌন হইয়া রহিল। তখন এই মদ্যপ ভূস্বামী একটা শুষ্কহাস্য করিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে আমি ভীষ্মদেব—বলি মহাভারত পড়েচ ত? আর ভীষ্মদেব সেজেও বসিনি—শুকদেব হয়েও উঠিনি—বলি, কথাটা বুঝলে ত এককড়ি? ওটা চাই।

এককড়ি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল, মুখ ফুটিয়া জবাব দিতে পারিল না; কিন্তু যে নির্লজ্জ উক্তিতে জমিদারের গোমস্তার পর্যন্ত লজ্জা বোধ হয়, এ কথা যিনি অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করিলেন, তিনি ইহা গ্রাহ্যও করিলেন না। কহিলেন, অপর সকলের মত চাকরকে দিয়ে এ-সব কথা বলাতে আমি ভালবাসি নে, তাতে ঠকতে হয়। আচ্ছা, এখন যাও। আমার বেহারাদের খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করে দিও; ওরা তাড়িটা আস্‌টাও বোধ করি খায়। সেদিকেও একটু নজর রেখো। আচ্ছা যাও।

এককড়ি মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া আর একদফা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল; হুজুর হঠাৎ ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, এ গাঁয়ে দুষ্ট বজ্জাত প্রজা কেউ আছে জানো?

এককড়ি ফিরিয়া দাঁড়াইল। এইখানে তাহার অনেকদিনের একটা পুরাতন ক্ষত ছিল—মনিবের প্রশ্নটা ঠিক সেইখানেই আঘাত করিল। কিন্তু বেদনাটাকে সে একটা সংযমের আবরণ দিয়া নিরুৎসুক-কণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে না, তা এমন কেউ—শুধু তারাদাস চক্কোত্তি—তা সে হুজুরের প্রজা নয়।

তারাদাসটা কে?

এককড়ি কহিল, গড়চণ্ডীর সেবায়েত।

এই সেবায়েতদিগের সহিত জমিদারি সংস্পর্শে এককড়ির অনেক কলহ-বিবাদ হইয়া গেছে, কিন্তু সেজন্য তাহার বিশেষ কোন ক্ষোভ ছিল না; কিন্তু বৎসর-দুই পূর্বে একটা পাকা কাঁঠাল গাছ লইয়া যে লড়াই বাধে, সে জ্বালা তাহার যায় নাই। কারণ কাঁঠালের তক্তাগুলা ছিল তাহার নিজের বাটীর জন্য এবং সেই হেতু শেষ পর্যন্ত তাহাকেই নতি স্বীকার করিয়া গোপনে মিটমাট করিয়া লইতে হয়।

এককড়ি কহিতে লাগিল, কি করব হুজুর, সদরে আরজি ক'রে সুবিচার পাই নে—দেওয়ানজী গেরাহ্যিই করেন না, নইলে চক্কোত্তিকে ঢিট্ করতে কতক্ষণ লাগে! কিন্তু এও নিবেদন করচি, হুজুর আশকারা দিলে ওরা প্রজা বিগড়ে দেবে—তখন গাঁ শাসন করা ভার হবে।

হুজুরের কিন্তু নেশা বাড়িয়া উঠিতেছিল, তিনি নিস্পৃহ জড়িত-কণ্ঠে বলিলেন, তুমি তারাদাসের নামটাই ত করলে, এককড়ি—আবার ওরা এল কারা?

এককড়ি কহিল, চক্কোত্তির মেয়ে ভৈরবী। নইলে চক্কোত্তিমশাই নিজে তত লোক মন্দ নয়, কিন্তু মেয়েটাই হচ্চে আসল সর্বনাশী। দেশের যত বোম্বেটে বদমাশগুলো হয়েচে যেন একেবারে তার গোলাম।

জমিদারবাবুর কানে বোধ করি সমস্ত কথাগুলি পৌঁছিল না। তিনি তেমনি অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, হবারই কথা। কত বয়স? দেখতে কেমন?

এককড়ি কহিল, বয়স তেইশ-চব্বিশ হতে পারে। আর রূপের কথা যদি বলেন হুজুর, ত সে যেন এক কাটখোট্টা সেপাই। না আছে মেয়েলী ছিরি, না আছে মেয়েলী ছাঁদ। যেন চুয়াড়, যেন হাতিয়ার বেঁধে লড়াই করতে চলেছে। তাতেই ত দেশের ছোটলোকগুলো মনে করে গড়ের উনিই হচ্চেন সাক্ষাৎ চণ্ডী।

জীবানন্দ অকস্মাৎ সোজা উঠিয়া বসিলেন। উৎসাহ ও কৌতূহলে দুই রক্তচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, বল কি এককড়ি? ব্যাপারটা কি খুলে বল ত শুনি? না হয় চুয়াড়ের মতই দেখতে, তবু ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে—সর্বনাশীই বা হ'ল কি ক'রে, আর বোম্বেটে বদমাশের দলই বা তার জুটলো কোথা থেকে?

এককড়ি কহিল, তা আর আশ্চর্যি কি হুজুর! বলিয়া সে ভৈরবীর যে ইতিহাসটা দিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

ভৈরবী কাহারও নাম নয়, গড়চণ্ডীর প্রধান সেবিকাদের ইহা একটা সাধারণ উপাধি। যেমন বর্তমান ভৈরবীর নাম ষোড়শী এবং ইহার পূর্বে যিনি ছিলেন তাঁহার নাম ছিল মাতঙ্গিনী ভৈরবী। মাতার আদেশে তাঁহার সেবায়েত কখনও পুরুষ হইতে পারে না, মেয়েরাই এ পদ চিরদিন অধিকার করিয়া আসিতেছে।

আন্দাজ বৎসর পনর-ষোল হইবে হঠাৎ একদিন জানা যায় মাতঙ্গিনী ভৈরবীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। কথাটা অনেক কষ্টে যখন সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তখন বাধ্য হইয়া মাতঙ্গিনীকে পদত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া যাইতে হয়।

জীবানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বিধবা হ'লে বুঝি ভৈরবীগিরি খারিজ হয়ে যায়?

এককড়ি কহিল, হাঁ হুজুর।

তাই বুঝি তিনি স্বামীটিকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েছিলেন?

এককড়ি বলিল, সে ছাড়া আর ত কোন উপায় নেই হুজুর! মায়ের আদেশে বিয়ের তেরাত্রি পরে স্বামীর আর ভৈরবী স্পর্শ করিবারও জো নেই। তাই দূরদেশ থেকে দুঃখী গরীবের একটা ছেলে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে পরের দিনই টাকাকড়ি দিয়ে সেই যে বিদায় করা হয়, আর কখনো কেউ তার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায় না। এই-ই নিয়ম, এই-ই চিরকাল ধরে হয়ে আসচে।

জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, বল কি এককড়ি, একেবারে দেশান্তর? ভৈরবী মানুষ, রাত্রে নিরিবিলি একপাত্র সুরা ঢেলে দেওয়া—গরম মসলা দিয়ে চাট্টি মহাপ্রসাদ রেঁধে খাওয়ানো—একেবারে কিছুই করতে পায় না?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, না হুজুর, মায়ের ভৈরবীকে স্বামী স্পর্শ করতে নেই; কিন্তু তাই বলে কি স্বামী ছাড়া গাঁয়ে আর পুরুষ নেই? মাতু ভৈরবীকেও দেখেচি, ষোড়শী ভৈরবীকেও দেখচি। লোকগুলো কি আর খামকা তার পায়ে পায়ে জড়ায়! কথায় কথায় হুজুরের সঙ্গেই মামলা-মকদ্দমা বাধিয়ে দেয়।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিলেন, মেয়ে-মোহন্ত আর কি! তার দোষ নেই; কিন্তু মাতুর পরে ইনি জুটলেন কি ক'রে?

এককড়ি বলিল, চক্কোত্তিমশাই হচ্চেন মাতঙ্গিনীর ভাগ্নে। ঢাকা না কোথায় কোন্ মহাজনের আড়তে খাতা লিখছিলেন, চিঠি পেয়ে চলে এলেন, সঙ্গে একটা বছর-দশেকের মেয়ে। কোথা থেকে একটা পাত্রও জুটিয়ে আনলেন—কি জাত, কার ছেলে, কোথায় ঘর—রাতারাতি বিয়ে হ'ল, রাতারাতি চালান দিয়ে দিলেন—তারপর দিব্যি গদিতে বসিয়ে রাজভোগে আছেন। কেবা কথা কয়, কেবা জিজ্ঞেসা করে? গাঁয়েও মানুষ নেই, রাজারও শাসন নেই! বলিয়া সে জমিদারকেই কটাক্ষ করিল। কিন্তু চাহিয়া বুঝিল এ বক্রোক্তি নিষ্ফল হইয়াছে। রাজা নিমীলিত চক্ষে এক নিমিষেই যেন তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা নাই—পাছে তাহার কিছুমাত্র অবিবেচনায় এই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া যায়, এই ভয়ে সে পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া মনে মনে মাতালের পিতৃপুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইবে কিনা ভাবিতেছিল, এমনি সময়ে জীবানন্দ ঠিক সহজ মানুষের মতই পুনরায় কথা কহিলেন। বলিলেন, বছর-পনর পূর্বে না? আচ্ছা, এই তারাদাস লোকটা কি দেখতে খুব বেঁটে আর ফরসা?

এককড়ি কহিল, না হুজুর, চক্কোত্তিমশায়ের রঙ ফরসা বটে, কিন্তু ইনি খুব দীর্ঘাঙ্গ।

দীর্ঘাঙ্গ? আচ্ছা, লোকটা যে ঢাকায় মহাজনের গদিতে খাতা লিখত এ তুমি জানলে কি করে? এমন ত হ'তে পরে সে কলকাতায় রাঁধুনি বামুনের কাজ করত?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, না হুজুর, সত্যিই তিনি খাতা লিখতেন। তাঁর ছ'মাসের মাইনে বাকী ছিল, আমিই নালিশ করবার ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখে টাকাটা আদায় করে দিই।

জীবানন্দ কহিলেন, তা হ'লে সত্যি। আচ্ছা, এই লোকটাই কি বছর-পাঁচেক পূর্বে একটা প্রজা উৎখাতের মামলায় মামার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল?

এককড়ি মস্ত একটা মাথায় ঝাঁকানি দিয়া বলিল, হুজুরের নজর থেকে কিছুই এড়ায় না। আজ্ঞে, এই সেই তারাদাস।

জীবানন্দ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হুঁ। সেবার অনেক টাকার ফেরে ফেলে দিয়েছিল! এরা কতখানি জমি ভোগ করে?

এককড়ি মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল, পঞ্চাশ-ষাট বিঘের কম নয়।

জীবানন্দ মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কাল তুমি নিজে গিয়ে একে জানিয়ে এসো যে বিঘে পিছু দশ টাকা আমার নজর চাই। আমি আটদিন আছি।

এককড়ি কুণ্ঠিত এবং সংকুচিত হইয়া কহিল, আজ্ঞে, সে যে নিষ্কর দেবোত্তর হুজুর।

না, দেবোত্তর এ গাঁয়ে এক ফোঁটা নেই। সেলামী না পেলে সমস্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে।

এককড়ি নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সে চক্রবর্তী মহাশয়ের জন্য নয়, তাঁহার কন্যা কাটখোট্টা ষোড়শী ভৈরবীর কথাই স্মরণ করিয়া। জমিদার ত একদিন চলিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহাকে যে এই গ্রামেই বাস করিতে হইবে। একবার সে অস্ফুটে বলিতেও গেল, কিন্তু হুজুর—

কিন্তু বক্তব্যটা উহার অধিক অগ্রসর হইতে পাইল না। হুজুর মাঝখানেই থামাইয়া দিয়া কহিলেন, কিন্তু এখন থাক এককড়ি। আমার টাকার দরকার, পাঁচ-ছ'শ টাকা আমি ছাড়তে পারব না, ওটা তাদের দিতেই হবে। কাল চক্রবর্তীকে খবর দিও যেন কাছারিতে হাজির থাকে। দলিলপত্র কিছু থাকে ত তাও সঙ্গে আনতে পারে। রাত হ'ল, এখন তুমি যেতে পারো। লোকজনদের খাবার বন্দোবস্ত করে দিও—সদরে ফিরে তোমাকে মনে রাখব।

হুজুর মা-বাপ, বলিয়া এককড়ি আর একদফা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুই

জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী মাত্র পাঁচদিন চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছেন, এইটুকু সময়ের অনাচার ও অত্যাচারে সমস্ত গ্রামখানা যেন জ্বলিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। নজরের টাকাও আদায় হইতেছে, কিন্তু সে যে কি করিয়া হইতেছে তাহা জমিদার-সরকারে চাকরি না করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করাও পাগলামি।

তারাদাস চক্রবর্তী আদেশমত প্রথম দিন হাজির হইয়া নজর দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, এমন কি ছয় ঘণ্টাকাল তীক্ষ্ন রৌদ্রে খাড়া দাঁড়াইয়াও স্বীকার করেন নাই; কিন্তু সর্বসমক্ষে কান ধরিয়া ওঠ-বোস, ঘোড়দৌড় এবং ব্যাঙের নাচ নাচাইবার প্রস্তাবে আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। চণ্ডীমাতার নিকট কায়মনে জমিদারগোষ্ঠীর বংশলোপের আবেদন করিয়া, প্রকাশ্যে পাঁচদিনের কড়ারে টাকা আদায় দিবার অঙ্গীকারে অব্যাহতি পাইয়া বাড়ি আসেন। আজ সেই দিন, কিন্তু সকাল হইতে কোথাও তাঁহাকে দেখা যাইতেছে না:

ইতিমধ্যে প্রত্যহ মহাপ্রসাদ যোগাইতে হইয়াছে; পুকুরের মাছ, বাগানের ফলমূল, চালের লাউ-কুমড়া জমিদারের লোক যথেচ্ছা টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে—ষোড়শী প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু তারাদাস কিছুতেই একটা কথাও কহিতে দেয় নাই, তাহার হাতে ধরিয়া কাঁদাকাটা করিয়া যেমন করিয়া হোক নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে। পিতার অপমান হইতে আরম্ভ করিয়া এই সকল নির্যাতন সে কোনমতে এতদিন সহিয়াছিল, কিন্তু আজিকার ঘটনায় তাহার সমস্ত সঞ্চিত ক্রোধ একমুহূর্তে অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। পিতার নিঃশব্দ অন্তর্ধানের হেতু ও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের ভার তাহার মন একাকী যেন আজ আর বহিতে পারিতেছিল না। এমনি করিয়া সমস্ত সকাল ও মধ্যাহ্ন যখন অপরাহ্নে গড়াইয়া পড়িল, তখন রাত্রের অন্ধকারে উপবাসী পিতার গোপনে ফিরিয়া আসার প্রত্যাশা করিয়া সে দুটো রাঁধিতে বসিয়াছিল, এমন সময়ে মন্দিরের পরিচারিকা আসিয়া যে অত্যাচার বর্ণনা করিল, তাহা এই—

মাতাল ভূস্বামীর হঠাৎ খেয়াল হইয়াছে যে, অতঃপর নিষিদ্ধ মাংস ত নহেই, এমন কি বৃথা মাংসও ভোজন করিবেন না। অথচ পাঁঠার মাংস যথেষ্ট সুস্বাদু বা রুচিকর নহে। তাই আজ জমিদারের লোক ডোমপাড়া হইতে একটা খাসি আনিয়া মন্দিরে হাজির করে এবং তাহাকে মহাপ্রসাদ করিয়া দিতে বলে। পুরোহিত প্রথমটা আপত্তি করে, কিন্তু শেষে আদেশ শিরোধার্য করিয়া উহাকেই উৎসর্গ করিয়া যথারীতি বলি দিয়া দেবীর মহাপ্রসাদ করিয়া দেয়।

শুনিবামাত্রই ষোড়শী হাঁড়িটা দুম্ করিয়া চুলা হইতে নামাইয়া দিয়া ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দ্রুতবেগে মন্দিরে চলিয়াছিল, বহির্দ্বারে জন-চারেক হিন্দুস্থানী পাইক তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল। বিশ্বম্ভর দূর হইতে বাড়িটা দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। ইহারা জমিদারের পালকি-বেহারা। মুখে তাড়ির দুর্গন্ধ, চোখগুলো রাঙ্গা—অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল অবস্থা। যে লোকটা বাংলা শিখিয়াছে, সে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, শালা ঠাঁকুর-মোশাই ঘোরে আছে? শালা টাকা দেবে, না ভেগে ফিরচে।

ষোড়শী চাহিয়া দেখিল কোথাও কেহ নাই। পাছে এই দুর্বিনীত মদমত্ত পশুগুলো হঠাৎ তাহাকেই অপমান করিয়া বসে এই ভয়ে সে দুর্জয় ক্রোধ প্রাণপণে সংবরণ করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, বাবা বাড়ি নেই।

কোথা ছিপ্‌ছে?

আমি জানি নে, বলিয়া ষোড়শী পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেই লোকটা হাত বাড়াইয়া একটা অত্যন্ত অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিল, না আছে ত তুই চোল। গোলায় গামছা লাগিয়ে খিঁচে লিয়ে যাবো।

এ অপমান ষোড়শীকে একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল, সে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া কহিল, খবরদার বলচি। চল্ আমিই যাবো—তোদের মাতালটা আমাকে কি করতে পারে দেখি গে। বলিয়া সে পরিণাম-ভয়হীন উন্মাদিনীর ন্যায় নিজেই দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া চলিল।

পথে দুই-একজন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু ষোড়শী ভ্রূক্ষেপও করিল না। জমিদারের লোকগুলা পিছনে হল্লা করিয়া চলিয়াছে, ইহার অর্থ পল্লীগ্রামের কাহাকেও বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই শুধু নয়, কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করিয়া এতবড় অবমাননাকে আর নিজের মুখে চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিতে তাহার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না।

কাছারি-বাড়ি বেশী দূরে নয়, এককড়ি সম্মুখেই ছিল। সে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিল, আমি জানিনে—আমি কিছুই জানিনে—সর্দারজী, হুজুরের কাছে নিয়ে যাও। বলিয়া সে শান্তিকুঞ্জের উদ্দেশে অঙ্গুলিসংকেত করিয়া তাড়াতাড়ি গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

এতক্ষণে ষোড়শী নিজের বিপদের গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

কোথায় যাইতে হইবে বুঝিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কোথায় যেতে হবে?

লোকটা এককড়ির প্রদর্শিত দিকটা নির্দেশ করিয়া কেবল কহিল, চল্।

এ যাইতেই হইবে, তবুও কহিল, আমার কাছে ত টাকা নেই সর্দার, হুজুরের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের কি লাভ হবে?

কিন্তু সর্দার বলিয়া যাহাকে ভিক্ষা জানানো হইল, সে এই আবেদনের ধার দিয়াও গেল না। শুধু প্রত্যুত্তরে একটা বিশ্রী ভঙ্গী করিয়া বলিল, চল্ মাগী, চল্।

আর ষোড়শী কথা কহিল না। এই লোকগুলা স্থানান্তর হইতে আসিয়াছে, তাহার মর্যাদার কোন ধারণাই ইহাদের নাই। সুতরাং টাকার জন্য, খাজনার জন্য নরনারী নির্বিচারে সামান্য প্রজার প্রতি যে আচরণে নিত্য অভ্যস্ত, এ ক্ষেত্রেও তাহাদের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। অনুনয় বিনয় নিষ্ফল কাঁদাকাটায় কেহ সাহায্য করিতে আসিবে না। অবাধ্য হইলে হয়ত পথের মধ্যেই টানাহেঁচড়া বাধাইয়া দিবে। প্রকাশ্য রাজপথে অপমানের এই চরম কদর্যতার চিত্র তাহাকে মুখ বাঁধিয়া যেন সুমুখের দিকে ঠেলিয়া দিল। পথে রাখাল বালকেরা গরু লইয়া ফিরিয়াছে, কৃষকেরা দিনের কর্ম শেষ করিয়া বোঝা মাথায় ঘরে চলিয়াছে—সবাই অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল; ষোড়শী কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না, কাহাকেও কিছু বলিবার উদ্যম করিল না, কেবল মনে মনে কহিতে লাগিল, মা ধরিত্রী, দ্বিধা হও!

সূর্য অস্ত গেল, অন্ধকার অগ্রসর হইয়া আসিল। সে যন্ত্রচালিত পুতুলের মত নীরবে শান্তিকুঞ্জের গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল; থামিবার আপত্তি করিবার কোথাও এতটুকু চেষ্টা পর্যন্ত করিল না।

যে ঘরে আনিয়া তাহাকে হাজির করা হইল এটা সেই ঘর, এককড়ি যেখানে সেদিন প্রবেশ করিয়া ভয়ে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। তেমনি আবর্জনা, তেমনি মদের গন্ধ। সাদা, কালো, লম্বা, বেঁটে নানা আকারের শূন্য মদের বোতল চারিদিকে ছড়ানো। শিয়রের দেয়ালে খান-দুই চকচকে ভোজালি টাঙানো, এককোণে একটা বন্দুক ঠেস দিয়ে রাখা, হাতের কাছে একটা ভাঙা তেপায়ার উপর একজোড়া পিস্তল, অদূরে ঠিক সুমুখের বারান্দায় কি একটা বন্যপশুর কাঁচা চামড়া ছাদ হইতে ঝুলানো—তাহার বিকট দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে নাকে লাগিতেছে। বোধ হয় খানিক পূর্বেই গুলি করিয়া একটা শিয়াল মারা হইয়াছে। সেটা তখন পর্যন্ত মেঝেয় পড়িয়া—তাহারই রক্ত গড়াইয়া কতকটা স্থান রাঙা হইয়া আছে। জমিদার শয্যার উপর চিত হইয়া শুইয়া শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছিলেন। মাথার কাছে আর একটা মোটা বাঁধানো বইকে বাতিদান করিয়া মোমবাতি জ্বালানো হইয়াছে; সেই আলোকে চক্ষের পলকে অনেক বস্তুই ষোড়শীর চোখে পড়িল। বিছানায় বোধ করি কেবল চাদরের অভাবেই একটা বহুমূল্যের শাল পাতা, তাহার অনেকখানি মাটিতে লুটাইতেছে; দামী সোনার ঘড়িটার উপরে আধপোড়া একখণ্ড চুরুট হইতে তখনও ধূমের সূক্ষ্ম রেখাটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতেছে; খাটের নীচে একটা রূপার পাত্রে ভুক্তাবশিষ্ট কতকগুলা হাড়গোড় হয়ত সকাল হইতেই পড়িয়া আছে; তাহারই কাছে পড়িয়া একটা জরি-পাড়ের ঢাকাই চাদর, বোধ হয় হাতের কাছে হাত মুছিবার রুমাল বা গামছার অভাবেই ইহাতে হাত মুছিয়া ফেলিয়া দিয়াছে।

বইয়ের ছায়ায় লোকটার মুখের চেহারা ষোড়শী দেখিতে পাইল না, কিন্তু তবুও তাহার মনে হইল ইহাকে সে আয়নার মত স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছে। ইহার ধর্ম নাই, পুণ্য নাই, লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই—এ নির্মম, এ পাষাণ। ইহার মুহূর্তের প্রয়োজনের কাছেও কাহারও কোন মূল্য কোন মর্যাদা নাই! এই পিশাচপুরীর অভ্যন্তরে এই ভয়ঙ্করের হাতের মধ্যে আপনাকে একান্তভাবে কল্পনা করিয়া ক্ষণকালের জন্য ষোড়শীর সকল ইন্দ্রিয় যেন অচেতন হইয়া পড়িতে চাহিল।

সাড়া পাইয়া লোকটা জিজ্ঞাসা করিল, কে?

বাহির হইতে সর্দার ঘটনাটা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া চক্রবর্তীর উদ্দেশে একটা অকথ্য গালি দিয়া কহিল, হুজুর! উস্‌কো বেটিকো পাকড় লায়া।

কাকে? ভৈরবীকে? বলিয়া জীবানন্দ বই ফেলিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। বোধ হয় এ হুকুম সে দেয় নাই। কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, ঠিক হয়েছে। আচ্ছা যা।

তাহারা চলিয়া গেলে ষোড়শীকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, তোমাদের আজ টাকা দেবার কথা। এনেচ?

ষোড়শীর শুষ্ককণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া রহিল, কিছুতেই স্বর ফুটিল না।

জীবানন্দ ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় কহিল, আনোনি জানি। কিন্তু কেন?

এবার ষোড়শী প্রাণপণ চেষ্টায় জবাব দিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমাদের নেই।

না থাকলে সমস্ত রাত্রি তোমাকে পাইকদের ঘরে আটকে থাকতে হবে। তার মানে জানো?

ষোড়শী দ্বারের চৌকাঠটা দুই হাতে সবলে চাপিয়া ধরিয়া চোখ বুজিয়া নীরব হইয়া রহিল। অসম্ভব বলিয়া সে এখানে কিছুই ভাবিতেও পারিল না।

তাহার এ ভয়ানক বিবর্ণ মুখের চেহারা দূর হইতেও বোধহয় জীবানন্দের চোখে পড়িল, এবং মূর্ছা হইতে তাহার এই আত্মরক্ষার চেষ্টাটাও বোধ হয় তাহার অগোচর রহিল না; মিনিট-খানেক সে নিজেও কেমন যেন আচ্ছন্নের ন্যায় বসিয়া রহিল। তারপরে বাতির আলোটা হঠাৎ হাতে তুলিয়া লইয়া এই মৃতকল্প অচেতনপ্রায় রমণীর একেবারে মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং আরতির পূর্বে পূজারী যেমন করিয়া দীপ জ্বালিয়া প্রতিমার মুখ নিরীক্ষণ করে, ঠিক তেমনি করিয়া এই মহাপাপিষ্ঠ স্তব্ধ গম্ভীর মুখে এই সন্ন্যাসিনীর নিমীলিত চক্ষের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার গৈরিক বস্ত্র, তাহার এলায়িত রুক্ষ কেশভার, তাহার পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর, তাহার সবল সুস্থ ঋজু দেহ, সমস্তই সে যেন দুই বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে গিলিতে লাগিল।

তিন

নারীর একজাতীয় রূপ আছে যাহাকে যৌবনের অপর প্রান্তে না পৌঁছিয়া পুরুষে কোনদিন দেখিতে পায় না। সেই অদৃষ্টপূর্ব অদ্ভুত নারী-রূপই আজ ষোড়শীর তৈলহীন বিপর্যস্ত চুলে, তাহার উপবাস-কঠিন দেহে, তাহার নিপীড়িত যৌবনের রুক্ষতায়, তাহার উৎসাদিত প্রবৃত্তির শুষ্কতায়, শূন্যতায়, তাহার সকল অঙ্গে অঙ্গে এই প্রথম জীবানন্দের চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

রমণীর দেহ লইয়া যাহার বীভৎস-লীলা এই বিশ বর্ষ ব্যাপিয়া অবাধে বহিয়াছে—কত শোভা, কত লজ্জা, কত মাধুর্যই যে এই ব্যভিচারের ঘূর্ণাবর্তের অতলে তলাইয়াছে, তাহার দাগটুকু পর্যন্ত পাষণ্ডের মনে নাই; লালসার সেই অগ্নিজিহ্বা আজ যখন অকস্মাৎ বাধা পাইল, তখন কিছুক্ষণের জন্য এই অপরিচিত বিস্ময়ে তাহার মদোন্মত্ত বিকৃত দৃষ্টি স্তব্ধ, গম্ভীর এবং আবিষ্ট হইয়া রহিল।

ভৈরবীকে মাথায় কাপড় দিতে নাই, সে অধোমুখে চোখ বুজিয়া হতজ্ঞানের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু জীবানন্দ নীরবে ফিরিয়া গিয়া আলোটা রাখিয়া দিল, এবং মদের বোতল হইতে কয়েক পাত্র উপর্যুপরি পান করিতে লাগিল।

মিনিট-পনর এইভাবে নিঃশব্দে কাটিয়া গেল, হঠাৎ এক সময়ে সে সোজা হইয়া উঠিয়া

বসিল। মনে হইল এতক্ষণে সে তাহার মূর্ছিতপ্রায় পশুপ্রকৃতিটাকে চাবুক মারিয়া মারিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রশ্ন করিল, তোমার নাম ষোড়শী, না?

এ পক্ষ হইতে কোন সাড়া আসিল না।

জীবানন্দ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার বয়স কত?

কিন্তু তথাপি কোন উত্তর না পাইয়া তাহার কণ্ঠস্বর কঠিন হইল, কহিল, চুপ করে থেকে কোন লাভ হবে না। জবাব দাও।

ষোড়শী অনেক কষ্টে মৃদুস্বরে কহিল, আমার বয়স আটাশ।

জীবানন্দ বলিল, বেশ। তাহলে খবর যদি সত্য হয় ত এই উনিশ-কুড়ি বৎসর ধরে তুমি ভৈরবীগিরি করচ; খুব সম্ভব অনেক টাকা জমিয়েচ। দিতে পারবে না কেন?

ষোড়শী তেমনি আস্তে আস্তে উত্তর দিল, আপনাকে ত আগেই জানিয়েছি আমার টাকা নেই।

এই সশঙ্ক মৃদু কণ্ঠস্বরের মধ্যেও যে সত্যের দৃঢ়তা ছিল তাহা জমিদারের কানে বাজিল। সে এ লইয়া আর তর্ক করিল না; কহিল, বেশ, তা হলে আরও দশজনে যা করচে তাই কর। যাদের টাকা আছে তাদের কাছে জমি বাঁধা দিয়ে হোক, বিক্রি করে হোক দাও গে।

ষোড়শী কহিল, তারা পারে, জমি তাদের। কিন্তু দেবতার সম্পত্তি বাঁধা দেবার, বিক্রি করবার ত আমার অধিকার নেই।

জীবানন্দ একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া বলিল, নেবার অধিকার কি ছাই আমারই আছে? এক কপর্দকও না। তবুও নিচ্চি, কেননা আমার চাই। এই চাইটাই হচ্ছে সংসারের খাঁটি অধিকার! তোমার যখন দেওয়া চাই-ই তখন—বুঝলে?

ষোড়শী নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল, জীবানন্দ কহিতে লাগিল, ভাবে মনে হয় তুমি লেখাপড়া কিছু জানো; তা যদি হয় ত জমিদারের প্রাপ্যটা নিয়ে আর হাঙ্গামা ক'রো না—দিয়ো।

ষোড়শী এবার সাহস করিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, ওটা কি আপনি জমিদারের প্রাপ্য বলতে চান?

জীবানন্দ কহিল, প্রাপ্য বলতে চাইনে; ওটা তোমাদের দেয় এই বলতে চাই। তোমার মনে হ'তে পারে বটে, অন্য জমিদারকে ত দিতে হয়নি। তার কারণ, তাঁরা আমার মত সরল ছিলেন না। স্পষ্ট করে দাবী করেন নি, কিন্তু প্রায় সমস্ত গ্রামখানাই ধীরে ধীরে বেদখল করে নিয়েছেন। তাঁরা একরকম বুঝেছিলেন, আমি একরকম বুঝি। যাক্, এত রাত্রে কি একা বাড়ি যেতে পারবে? যাদের সঙ্গে তুমি এসেছিলে তাদের আর সঙ্গে দিতে চাইনে।

এতক্ষণ ও এতগুলো কথাবার্তায় ষোড়শীর ভয়টা কতকটা অভ্যাস হইয়া আসিতেছিল, সে সবিনয়ে কহিল, আপনার হুকুম হলেই যেতে পারি।

জীবানন্দ সবিস্ময়ে কহিল, একলা? এই অন্ধকার রাত্রে? ভারী কষ্ট হবে যে! বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

তাহার কথা ও হাসির ইঙ্গিত এতই স্পষ্ট যে, যে আশঙ্কা ষোড়শীর কমিতেছিল, তাহাই একেবারে চতুর্গুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। সে মাথা নাড়িয়া ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, না, আমাকে এখুনি যেতেই হবে। বলিয়া পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেই জীবানন্দ তেমনি সহাস্যে কহিল, বেশ ত টাকা না হয় নাই দেবে ষোড়শী। তা ছাড়া আরও অনেক-রকমের সুবিধে—

কিন্তু প্রস্তাব শেষ হইতে পাইল না। ইহার মুখে নিজের নাম শুনিয়াই ষোড়শী অকস্মাৎ প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, আপনার টাকা, আপনার সুবিধা আপনার থাক্, আমাকে যেতে দিন। বলিয়াই সে যথার্থই এবার এক পা অগ্রসর হইয়া গেল। কিন্তু যে লোকগুলাকে এই লোকটাও তাহার সঙ্গে দিতে সাহস করে না তাহাদিগকেই সম্মুখে কিছু দূরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে আপনিই থমকিয়া দাঁড়াইল।

তাহার বাক্য ও কার্যের কোন প্রতিবাদ জমিদার করিল না, কিন্তু তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি মদ খাও?

ষোড়শী কহিল, না।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার জন-দুই অন্তরঙ্গ পুরুষ বন্ধু আছে শুনেছি। সত্যি?

ষোড়শী তেমনি মাথা নাড়িয়া বলিল, মিছে কথা।

জীবানন্দ আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তোমার পূর্বেকার সকল ভৈরবীই মদ খেতেন—সত্যি?

ষোড়শী কহিল, সত্যি।

জীবানন্দ কহিল, মাতঙ্গী ভৈরবীর চরিত্র ভাল ছিল না—এখনো তার সাক্ষী আছে। সত্যি না মিছে?

ষোড়শী লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, সত্যি বলেই শুনেছি।

জীবানন্দ কহিল, শুনেছ? ভাল। তবে হঠাৎ তুমিই বা এমন দলছাড়া গোত্রছাড়া ভাল হতে গেলে কেন?

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী এই কথা বলিতে গেল যে ভাল হইবার অধিকার সকলেরই আছে; কিন্তু সহসা একটা পরুষ কণ্ঠস্বর তাহাকে মাঝখানেই থামাইয়া দিল। জমিদার জীবানন্দ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্কও আমি করিনে, তাদের মতামতও কখনও জানতে চাইনে। তুমি ভাল কি মন্দ, চুল চিরে তার বিচার করবারও আমার সময় নেই। আমি বলি চণ্ডীগড়ের সাবেক ভৈরবীদের যেভাবে কেটেছে, তোমারও তেমনিভাবে কেটে গেলেই যথেষ্ট। আজ তুমি এই বাড়িতেই থাকবে।

হুকুম শুনিয়া ষোড়শী বজ্রাহতের ন্যায় একেবারে কাঠ হইয়া গেল। জীবানন্দ কহিতে লাগিল, তোমার সম্বন্ধে কি ক'রে যে এতটা সহ্য করেচি জানিনে, আর কেউ এ বেয়াদপি করলে এতক্ষণ তাকে পাইকদের ঘরে পাঠিয়ে দিতুম। এমন অনেককে দিয়েচি।

ইহা ভিত্তিহীন শূন্য আস্ফালন নহে, তাহা শুনিলেই বুঝা যায়। ষোড়শী অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল, গলায় আঁচল দিয়া দুই হাত জোড় করিয়া অশ্রুরুদ্ধ-স্বরে কেবল কহিল, আমার যা-কিছু আছে সব নিয়ে আজ আমাকে ছেড়ে দিন।

জীবানন্দ মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কেন বল ত? এরকম কান্নাও নতুন নয়, এরকম ভিক্ষেও এই নতুন শুনচি নে। কিন্তু তাদের সব স্বামী-পুত্র ছিল—কতকটা নাহয় বুঝতেও পারি।

তাহাদের স্বামী-পুত্র ছিল! শুনিয়া ষোড়শী শিহরিয়া উঠিল।

জীবানন্দ কহিতে লাগিল, কিন্তু তোমার ত সে বালাই নেই! পনর-ষোল বছরের মধ্যে তোমার স্বামীকে ত তুমি চোখেও দেখনি। তাছাড়া তোমাদের ত এতে দোষই নেই।

ষোড়শী যুক্তহস্তেই দাঁড়াইয়া ছিল, অশ্রুরুদ্ধ-স্বরে বলিল, স্বামীকে আমার ভাল মনে নেই সত্যি, কিন্তু তিনি ত আছেন! যথার্থ বলচি আপনাকে, কখনো কোন অন্যায়ই আমি আজ পর্যন্ত করিনি। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

জীবানন্দ হাঁক দিয়া ডাকিল, মহাবীর—

ষোড়শী আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিয়া বলিল, আমাকে আপনি মেরে ফেলতে পারবেন, কিন্তু—

জীবানন্দ কহিল, আচ্ছা, ও বাহাদুরি কর গে ওদের ঘরে গিয়ে, মহাবীর—

ষোড়শী মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, কারও সাধ্য নেই আমাকে প্রাণ থাকতে নিয়ে যেতে পারে। আমার যা-কিছু দুর্দশা, যত অত্যাচার আপনার সামনেই হোক —আপনি আজও ব্রাহ্মণ, আপনি আজও ভদ্রলোক।

কিন্তু এতবড় অভিযোগেও জীবানন্দ হাসিল; সে হাসি যেমন কঠিন তেমনি নিষ্ঠুর। কহিল, তোমার কথাগুলো শুনতে মন্দ নয়, কিন্তু কান্না দেখে আমার দয়া হয় না। ও আমি অনেক শুনি। মেয়েমানুষের ওপর আমার এতটুকুও লোভ নেই—ভাল না লাগলেই চাকরদের দিয়ে দিই। তোমাকেও দিয়ে দিতুম, শুধু এই বোধ হয় আজ প্রথম একটু মোহ জন্মেছে। ঠিক জানিনে—নেশা না কাটলে ঠাওর পাচ্চিনে।

মহাবীর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সাড়া দিল, হুজুর!

জীবানন্দ সম্মুখের কবাটটায় অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, একে আজ রাত্রের মত ও-ঘরে বন্ধ করে রেখে দে। কাল আবার দেখা যাবে।

ষোড়শী গলদশ্রুনয়নে কহিল, আমার সর্বনাশটা একবার ভেবে দেখুন হুজুর! কাল যে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।

জীবানন্দ কহিল, দু-এক দিন। তারপরে পারবে। সেই লিভারের ব্যথাটা আজ ভারী বেড়েচে—আর বেশী বিরক্ত ক'রো না—যাও।

মহাবীর তাড়া দিয়া বলিল, আরে ওঠ্ না মাগী—চোল্।

কিন্তু তাহার কথা শেষ না হইতেই অকস্মাৎ উভয়েই চমকিয়া উঠিল। জীবানন্দ ভয়ানক ধমক দিয়া কহিল, খবরদার শুয়োরের বাচ্চা, ভাল করে কথা বল্। ফের যদি কখনো আমার হুকুম ছাড়া কোনো মেয়েমানুষকে ধরে আনিস ত গুলি করে মেরে ফেলব। বলিতে বলিতেই মাথার বালিশটা তাড়াতাড়ি পেটের নীচে টানিয়া লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, এবং যাতনায় একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া কহিল, আজকের মত ও-ঘরে বন্ধ থাকো, কাল তোমার সতীপনার বোঝাপড়া হবে। এই—যা না আমার সুমুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে।

মহাবীর আস্তে আস্তে বলিল, চলিয়ে—

ষোড়শী নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নির্দেশমত পাশের অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া জীবানন্দ কহিল, একটু দাঁড়াও—তুমি পড়তে জানো, না?

ষোড়শী মৃদুকণ্ঠে বলিল, জানি।

জীবানন্দ কহিল, তা হলে একটু কাজ করে যাও। ওই যে বাক্সটা—ওর মধ্যে আর একটা ছোট কাগজের বাক্স পাবে। কয়েকটা ছোট-বড় শিশি আছে, যার গায়ে বাংলায় 'মরফিয়া' লেখা, তার থেকে একটুখানি ঘুমের ওষুধ দিয়ে যাও। কিন্তু খুব সাবধান, এ ভয়ানক বিষ। মহাবীর, আলোটা ধর্।

বাতির আলোকে ষোড়শী কম্পিতহস্তে বাক্স খুলিয়া শিশি বাহির করিল, এবং সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কতটুকু দিতে হবে?

জীবানন্দ তীব্র বেদনায় আবার একটা অব্যক্ত ধ্বনি করিয়া কহিল, ঐ ত বললুম খুব একটুখানি। আমি উঠতেও পারচি নে, আমার হাতেরও ঠিক নেই, চোখেরও ঠিক নেই। ওতেই একটা কাঁচের ঝিনুক আছে, তার অর্ধেকেরও কম। একটু বেশি হয়ে গেলে এ ঘুম তোমার চণ্ডীর বাবা এসেও ভাঙ্গাতে পারবে না।

ষোড়শী সন্ধান করিয়া ঝিনুক বাহির করিল, কিন্তু পরিমাণ স্থির করিতে তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। তার পরে অনেক যত্নে অনেক সাবধানে যখন সে নির্দেশমত ঔষধ লইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন নির্বিচারে সেই বিষ হাত বাড়াইয়া লইয়া জীবানন্দ মুখে ফেলিয়া দিল। প্রশ্ন করিল না, পরীক্ষা করিল না, একবার চোখ মেলিয়া দেখিল না।

চার

পার্শ্বের অন্ধকার ঘরের মধ্যে রাখিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া মহাবীর চলিয়া গেল, কিন্তু ভিতর হইতে বন্ধ করিবার উপায় না থাকায় ষোড়শী সেই রুদ্ধ দ্বারেই পিঠ দিয়া অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার দেহ ও মন শ্রান্তি ও অবসাদের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, এবং রাত্রের মধ্যেও হয়ত আর কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তথাপি ঘুমাইয়া পড়াও ত কোনমতে চলিবে না। এখানে একবিন্দু শৈথিল্যের স্থান নাই, এখানে একান্ত অসম্ভবের বিরুদ্ধেও তাহাকে সর্বতোভাবে জাগ্রত থাকিতে হইবে।

কিন্তু বাকী রাত্রিটা যেমন করিয়াই কাটুক, কাল তাহার সতীত্বের অতিশয় কঠোর পরীক্ষা হইবে তাহা সে নিজের কানেই শুনিয়াছে এবং ইহা হইতে বাঁচিবার কি উপায় আছে তাহাও তাহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

নিজের পিতার কথা মনে করিয়া ষোড়শী ভরসা পাইবে কি লজ্জায় মরিয়া গেল। তাঁহাকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি যেমন ভীতু, তেমনি নীচাশয়। অনেক রাত্রে ঘরে ফিরিয়া এ দুর্ঘটনা জানিয়াও হয়ত তিনি প্রকাশ করিবেন না, বরঞ্চ সামাজিক গোলযোগের ভয়ে চাপিয়া দিবারই চেষ্টা করিবেন। মনে মনে এই বলিয়া তর্ক করিবেন, ষোড়শীকে একদিন জমিদার ছাড়িয়া দিবেই, কিন্তু কথাটা ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া দেব-সম্পত্তি হইতেই যদি বঞ্চিত হইতে হয় ত লাভের চেয়ে লোকসানের অঙ্কটাই ঢের বেশী ভারী হইয়া উঠিবে। উপরন্তু নজরের টাকাটার সম্বন্ধেও যে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বহুদূরে অগ্রসর হইয়া যাইবে ইহাও ষোড়শী স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। তা ছাড়া, এই দুর্দান্ত ভূস্বামীর বিরুদ্ধে তিনি করিবেনই বা কি! ছয়-সাত ক্রোশের মধ্যে একটা থানা নাই, চৌকি নাই—পুলিশের কাছে খবর দিতে গেলেও যে পরিমাণ সময়, অর্থ এবং লোকবলের প্রয়োজন তাহার কোনটাই তারাদাসের নাই। অতএব অত্যাচার যত বড়ই হোক, এই সুবৃহৎ শক্তির সম্মুখে অবনত-শিরে সহ্য করা ব্যতীত আর যে গত্যন্তর নাই, এই কথাটাই চোখে আঙ্গুল দিয়া ষোড়শীকে বার বার দেখাইয়া দিতে লাগিল।

অথচ সমস্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে মিশিয়া তাহার আর একটা চিন্তার ধারা নীরবে অনুক্ষণ বহিয়া যাইতেছিল—সে ওই তাহার চণ্ডীমাতা, যাঁহাকে শিশুকাল হইতে সে কায়মনে পূজা করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ঐ যে লোকটা ও-ঘরে ঘুমাইতেছে—যাহার গূঢ়, ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ অস্পষ্ট হইয়া তাহার কানে পৌঁছিতেছে, উহার ধর্ম ও অধর্ম, ভাল ও মন্দ, আপনার ও পর—পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর প্রতি কি গভীর নির্মম অবহেলা! নারীর চোখের জলে উহার করুণা নাই, রমণীর রূপ ও যৌবনে উহার মমতা নাই, আকর্ষণ নাই, স্বামী-পুত্রবতীর সতীধর্মকে নিতান্ত নিরর্থক হত্যা করিতে উহার বাধে না, তাহাদের হৃদয়ের রক্তে দুই পা ভরিয়া গেলেও ভ্রূক্ষেপ করে না, যে নিজের প্রাণটাকে পর্যন্ত এইমাত্র তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া তাহারি প্রদত্ত বিষ অসঙ্কোচে চোখ মুদিয়া ভক্ষণ করিল, এতটুকু দ্বিধা করিল না, অশ্রদ্ধা ও অনাসক্তির এই অপরিমেয় পাষাণ-ভার ঠেলিয়া কি মা-চণ্ডীই তাহার পরিত্রাণের পথ করিতে পারিবেন!

এমনি করিয়া সে যেদিকে দৃষ্টিপাত করিল নিদারুণ আঁধার ব্যতীত এতটুকু আলোক-রশ্মিও চোখে পড়িল না। তখন পরিপূর্ণ নিরাশ্বাস তাহার ওই একমাত্র দেবতার মন্দির ঘুরিয়াই কেবল কল্পনার জাল বুনিতে লাগিল।

ভোরের দিকে বোধ করি সে একটুখানি তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ পিঠের উপর একটা চাপ অনুভব করিয়া ধড়মড় করিয়া সোজা উঠিয়া বসিয়া দেখিল, জানালা দিয়া সূর্যের আলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

বাহির হইতে যে দ্বার ঠেলিতেছিল, সে কহিল, আপনি বেরিয়ে আসুন, আমি এককড়ি।

ষোড়শী গায়ের বস্ত্র সংযত করিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দ্বার খুলিয়া সম্মুখেই দেখিতে পাইল, গত রাত্রির সেই শয্যার উপর জীবানন্দ প্রায় তেমনিভাবেই বালিশে ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। কাল দীপের স্বল্প আলোকে তাহার মুখখানা ষোড়শী ভাল দেখিতে পায় নাই, কিন্তু আজ একমুহূর্তের দৃষ্টিপাতেই দেখিতে পাইল সুদীর্ঘ অত্যাচার তাহার দেহের প্রতি অঙ্গে কত বড় গভীর আঘাত করিয়াছে। বয়স ঠিক অনুমান হয় না—হয়ত চল্লিশ, হয়ত আরও বেশী—রগের দুইধারে কিছু কিছু চুল পাকিয়াছে, প্রশস্ত ললাট রেখায় ভরা, তাহারি উপরে কালো কালো ছাপ পড়িয়াছে। যক্ষ্মারোগীর চোখের মত দৃষ্টি অস্বাভাবিক তীক্ষ্ম এবং তাহারই নীচে শীর্ণ নাকটা যেন খাঁড়ার মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত মুখখানা অত্যন্ত ম্লান, তাহারই সঙ্গে মিশিয়া ভিতরের কি একটা অব্যক্ত বেদনা যেন কালিমাব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে।

জীবানন্দ হাত নাড়িয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, তোমার ভয় নেই, কাছে এসো।

ষোড়শী ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া নতনেত্রে নীরবে দাঁড়াইল। জীবানন্দ কহিল, পুলিশের লোক বাড়ি ঘিরে ফেলেছে—ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব গেটের মধ্যে ঢুকেছেন—এলেন বলে।

ষোড়শী মনে মনে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু কথা কহিল না। জীবানন্দ বলিতে লাগিল, জেলার ম্যাজিস্ট্রেট টুরে বেরিয়ে ক্রোশ-খানেক দূরে তাঁবু ফেলেছিলেন, তোমার বাবা কাল রাত্রেই তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত জানিয়েছেন। কেবল তাতেই এতটা হ'তো না, কে-সাহেবের নিজেরই আমার উপর ভারী রাগ। গত বৎসর দুবার ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি—আজ একেবারে হাতে হাতে ধরে ফেলেছে, বলিয়া সে একটু হাসিল।

এককড়ি মুখ চুন করিয়া পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল, হুজুর, এবার বোধ হয় আমাদেরও আর রক্ষে নেই।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সম্ভব বটে। ষোড়শীকে কহিল, শোধ নিতে চাও ত এই-ই সময়। আমাকে জেলে দিতেও পারো।

ষোড়শী জবাব দিতে গিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিল জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি এক-দৃষ্টে চাহিয়া আছে। চোখ নামাইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, এতে জেল হবে কেন?

জীবানন্দ কহিল, আইন। তা ছাড়া কে-সায়েবের হাতে পড়েচি। বাদুড়বাগানের মেসে থাকতে, এরই কাছে একবার দিন-কুড়ি হাজত-বাসও হয়ে গেছে। কিছুতে জামিন দিলে না—আর জামিন বা তখন হ'তো কে!

ষোড়শী হঠাৎ উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, আপনি কি কখনো বাদুড়বাগানের মেসে ছিলেন?

জীবানন্দ কহিল, হ্যাঁ। ওই সময়ে একটা প্রণয়কাণ্ডের বন্দে হয়েছিলুম—ব্যাটা আয়ান ঘোষ কিছুতেই ছাড়লে না—পুলিশে দিলে। যাক সে অনেক কথা। কে আমাকে ভোলেনি, বেশ চেনে। আজও পালাতে পারতুম, কিন্তু ব্যথায় শয্যাগত হয়ে পড়েচি, নড়বার জো নেই।

ষোড়শী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কালকের ব্যথাটা কি আপনার সারেনি?

জীবানন্দ কহিল, না, ভয়ানক বেড়েচে। তা ছাড়া এ সারবার ব্যথাও নয়।

ষোড়শী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে কি করতে হবে?

জীবানন্দ কহিল, শুধু বলতে হবে তুমি নিজের ইচ্ছেয় এসেচ, নিজের ইচ্ছেয় এখানে আছো। তার বদলে তোমার সমস্ত দেবোত্তর ছেড়ে দেব, হাজার টাকা নগদ দেব, আর নজরের ত কথাই নেই।

এককড়ি এই কথাগুলারই বোধ হয় প্রতিধ্বনি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু ষোড়শীর মুখের পানে চাহিয়া সহসা থামিয়া গেল। ষোড়শী সোজা জীবানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, এ কথা স্বীকার করার অর্থ বোঝেন? তারপরেও কি আমার জমিতে, টাকাকড়িতে প্রয়োজন থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

জীবানন্দের মুখখানা প্রথমে ফ্যাকাশে হইল, এবং সেই পাণ্ডুর মুখের তীক্ষ্ণ তীব্র দুটি চক্ষে কোথা হইতে তাহার গত রাত্রির তেমনি স্নিগ্ধ মুগ্ধ দৃষ্টি যেন ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া স্থির হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে একটা কথাও কহিল না, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়িয়া বলিল, তাই বটে ষোড়শী, তাই বটে! জীবনে আজও ত তুমি পাপ করোনি—ও তুমি পারবে না সত্যি।

একটুখানি হাসিয়া বলিল, টাকাকড়ির বদলে যে সম্ভ্রম বেচা যায় না—ও যেন আমি ভুলেই গেছি! তাই হোক, যা সত্যি তাই তুমি বলো—জমিদারের তরফ থেকে আর কোন উপদ্রব তোমার ওপর হবে না।

এককড়ি ব্যাকুল হইয়া আবার কি কতকগুলা বলিতে গেল, কিন্তু বাহিরের রুদ্ধ দ্বারে পুনঃপুনঃ করাঘাতের শব্দে এবারেও তাহা বলা হইল না, কেবল তাহার মুখখানাই সাদা হইয়া রহিল।

জীবানন্দ সাড়া দিয়া কহিল, খোলা আছে, ভিতরে আসুন। এবং পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার সম্মুখে দেখা গেল ছোট-বড় জন-কয়েক পুলিশ-কর্মচারীর পিছনে দাঁড়াইয়া স্বয়ং জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং তাঁহারই কাঁধের উপর দিয়া উঁকি মারিতেছে তারাদাস চক্রবর্তী। সে ভিতরে ঢুকিয়াই কাঁদিয়া বলিল, ধর্মাবতার, হুজুর! এই আমার মেয়ে, মা-চণ্ডীর ভৈরবী। আপনার দয়া না হলে আজ ওকে টাকার জন্যে খুন করে ফেলতো ধর্মাবতার!

কে-সাহেব ষোড়শীর আপাদমস্তক পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম ষোড়শী? তোমাকেই বাড়ি থেকে ধরে এনে উনি বন্ধ করে রেখেছেন?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আমি নিজের ইচ্ছেয় এসেচি, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি।

চক্রবর্তী চেঁচামেচি করিয়া উঠিল, না হুজুর, ভয়ানক মিথ্যে কথা! গ্রামসুদ্ধ সাক্ষী আছে। মা আমার ভাত রাঁধছিল, আটজন পাইক গিয়ে মাকে বাড়ি থেকে মারতে মারতে টেনে এনেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট জীবানন্দের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া ষোড়শীকে পুনশ্চ বলিলেন, তোমার কোন ভয় নেই, তুমি সত্যি কথা বল। তোমাকে বাড়ি থেকে ধরে এনেছে?

না, আমি আপনি এসেচি।

এখানে তোমার কি প্রয়োজন?

ষোড়শী শুধু কহিল, আমার কাজ ছিল।

সাহেব একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, সমস্ত রাত্রিই কাজ ছিল?

ষোড়শী তেমনি মাথা নাড়িয়া শান্ত মৃদুকণ্ঠে বলিল, হাঁ, সমস্ত রাত্রিই আমার কাজ ছিল। ওঁর অসুখ করেছিল বলে বাড়ি ফিরে যেতে পারিনি।

তারাদাস চেঁচাইয়া বলিল, বিশ্বাস করবেন না হুজুর, সমস্ত মিছে, সমস্ত বানানো। আগাগোড়া শিখানো কথা।

সাহেব তাহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু মুখ টিপিয়া একটু হাসিলেন, এবং শিস্ দিতে দিতে প্রথমে বন্দুকটা এবং পরে রিভলভার দুটো বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া জীবানন্দকে কেবল বলিলেন, আশা করি এ-সকল রাখবার আপনার হুকুম আছে? এবং তারপর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বাহির হইতে তাঁহার গলা শোনা গেল, হামারা ঘোড়া লাও, এবং ক্ষণেক পরেই ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে বুঝা গেল, জে ার ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব বাড়ি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

পাঁচ

ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিল, পুলিশ-কর্মচারীও আপনার অনুচরগণকে স্থানত্যাগের ইঙ্গিত জ্ঞাপন করিলেন—এইবার তারাদাসের নিজের অবস্থাটা তাহার কাছে প্রকট হইয়া উঠিল। এতক্ষণ সে যেন এক মোহাবৃত প্রগাঢ় কুহেলিকার মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ মধ্যাহ্ন-সূর্যকিরণে তাহার বাষ্পটুকু পর্যন্ত উড়িয়া গিয়া দুঃখের আকাশ একেবারে দিগন্ত ব্যাপিয়া ধূধূ করিতে লাগিল। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও ছায়া, কোথাও আশ্রয়, কোথাও লুকাইবার স্থান নাই—কেবল সে আর তাহার মৃত্যু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দাঁত মেলিয়া হাসিতেছে।

সমস্ত জেলার যিনি ভাগ্যবিধাতা, তাঁহার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত ও আশাতীত সুলভে লাভ করিয়া কল্পনা তাহার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিয়াছিল। মনে করিয়াছিল এ কেবল ওই অত্যাচারী মাতালটাকে হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়াই নয়, এ তাহার ভাগ্যলক্ষ্মীর অপর্যাপ্ত দান। তাঁহার বরহস্তের দশ অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে আজ যে বস্তু ঝরিয়া পড়িবে, সে শুধু ওই জমিদারগোষ্ঠীর সর্বনাশ নয়, এ তাহার জমি-জমা ও টাকা-মোহরের রাশি। তাহার একমাত্র আশঙ্কা ছিল, পাছে না তাহারা সময়ে পৌঁছিতে পারে, পাছে সংবাদ দিয়া কেহ পূর্বাহ্নেই সতর্ক করিয়া দেয়; এবং এ-পক্ষে তাহার চিন্তা, পরিশ্রম ও উদ্যমের অবধি ছিল না। ইহার বিফলতার দণ্ডও সে যে না ভাবিয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু সে নিষ্ফলতা পৌঁছিল যখন এই দিক দিয়া, ষোড়শীর স্বহস্তের আঘাতেই যখন কামনার এতবড় পাষাণ-প্রাসাদ ভিত্তিসমেত ধূলিসাৎ হইয়া গেল, তখন প্রথমটা তারাদাস মূঢ়ের মত চেঁচামেচি করিল, তার পর হতজ্ঞানের ন্যায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ আড ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ এক বুকফাটা ক্রন্দনে উপস্থিত সকলকে

সচকিত করিয়া পুলিশ-কর্মচারীর পায়ের নীচে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, বাবুমশাই, আমার কি হবে! আমাকে যে এবার জমিদারের লোক জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে!

ইন্‌স্পেক্টরবাবুটি প্রবীণ গোছের ভদ্রলোক, তিনি শশব্যস্ত হইয়া তাহাকে চেষ্টা করিয়া হাত ধরিয়া তুলিলেন, এবং আশ্বাস দিয়া সদয়কণ্ঠে বলিলেন, ভয় কি ঠাকুর, তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো গে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব তোমার সহায় রইলেন—আর কেউ তোমাকে জুলুম করবে না। বলিয়া তিনি কটাক্ষে একবার জীবানন্দের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলেন।

তারাদাস চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, সাহেব যে রাগ করে চলে গেলেন বাবু!

ইন্‌স্পেক্টরবাবু মুচকিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, না ঠাকুর, রাগ করেন নি। তবে আজকের এই ঠাট্টাটুকু তিনি সহজে ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া আমরাও মরিনি, থানাও যা হোক একটা আছে। বলিয়া আর একবার জমিদারের শয্যার প্রতি তিনি আড়-চোখে চাহিয়া লইলেন। এই ইঙ্গিতটুকুর অর্থ তাঁহার যাই হোক, জমিদারের তরফ হইতে কিন্তু ইহার কোনরূপ প্রত্যুত্তর আসিল না। একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, এখন চল ঠাকুর. যাওয়া যাক। যেতেও ত হবে অনেকটা।

সাব্-ইন্‌স্পেক্টরবাবুটির বয়স কম, তিনি অল্প একটু হাসিয়া কহিলেন, ঠাকুরটি তবে কি একাই যাবেন নাকি?

কথাটায় সবাই হাসিল। যে চৌকিদার দু'জন দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও হাসিয়া মুখ ফিরাইল। এমন কি এককড়ি পর্যন্ত মুখ রাঙ্গা করিয়া কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

এই কদর্য ইঙ্গিতে তারাদাসের চোখের অশ্রু চোখের পলকে অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত হইয়া গেল। সে ষোড়শীর প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, যেতে হয় আমি একাই যাবো। আবার ওর মুখ দেখব, আবার ওকে বাড়ি ঢুকতে দেবো আপনারা ভেবেচেন!

ইন্‌স্পেক্টরবাবু সহাস্যে কহিলেন, মুখ তুমি না দেখতে পারো, কেউ মাথার দিব্যি দেবে না ঠাকুর। কিন্তু যার বাড়ি, তাকে বাড়ি ঢুকতে না দিয়ে আবার যেন নতুন ফ্যাসাদে পড়ো না।

তারাদাস আস্ফালন করিয়া বলিল, বাড়ি কার? বাড়ি আমার। আমিই ভৈরবী করেছি, আমিই ওকে দূর করে তাড়াবো। কলকাঠি এই তারা চক্কোত্তির হাতে। এই বলিয়া সে সজোরে নিজের বুক ঠুকিয়া বলিল, নইলে কে ও জানেন? শুনবেন ওর মায়ের—

ইন্‌স্পেক্টর থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থামো ঠাকুর, থামো। রাগের মাথায় পুলিশের কাছে সব কথা বলে ফেলতে নেই—তাতে বিপদে পড়তে হয়। ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তুমি যেতে চাও ত আমরা তোমাকে নিরাপদে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি। চল, আর দেরি করো না।

এতক্ষণ পর্যন্ত ষোড়শী অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, এইবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

পুলিশের ছোটবাবু মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যাবার বিলম্ব আছে বুঝি?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিন্তু জবাব দিল ইন্‌স্পেক্টরবাবুকে। কহিল, আপনারা যান, আমার যেতে দেরি আছে।

দেরি আছে? হারামজাদী, তোকে যদি না খুন করি ত আমি মনোহর চক্কোত্তির ছেলে নই! এই বলিয়া তারাদাস উন্মাদের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া বোধ হয় তাহাকে যথার্থই কঠিন আঘাত করিত, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরবাবু ধরিয়া ফেলিয়া ধমক দিয়া কহিলেন, ফের যদি বাড়াবাড়ি কর ত তোমাকে থানায় ধরে নিয়ে যাব। চল, ভালমানুষের মত ঘরে চল।

এই বলিয়া তিনি লোকটাকে এক প্রকার টানিয়া লইয়াই গেলেন, কিন্তু তারাদাস তাঁহার হিত কথায় কর্ণপাতও করিল না। যতদূর শোনা গেল, সে সুউচ্চ-কণ্ঠে ষোড়শীর মাতার সম্বন্ধে যা-তা বলিতে বলিতে এবং তাহাকে অচিরে হত্যা করিবার কঠিনতম শপথ পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিতে করিতে গেল।

পুলিশের সম্পর্কীয় সকলেই যথার্থ বিদায় গ্রহণ করিল, কিংবা কোথাও কেহ লুকাইয়া রহিয়া গেল, এ-বিষয় নিঃসংশয় হইতে ধূর্ত্তে এককড়ি পা টিপিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলে জীবানন্দ ইঙ্গিত করিয়া ষোড়শীকে আর একটু নিকটে আহ্বান করিয়া অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এ'দের সঙ্গে গেলে না কেন?

ষোড়শী কহিল, এ'দের সঙ্গে ত আমি আসিনি।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, তোমার বিষয়ের ছাড় লিখে দিতে দু'-চার দিন দেরি হবে, কিন্তু টাকাটা কি তুমি আজই নিয়ে যাবে?

ষোড়শী কহিল, তাই দিন।

জীবানন্দ শয্যার এক নিভৃত প্রদেশে হাত দিয়া একতাড়া নোট টানিয়া বাহির করিল। সেইগুলো গণনা করিতে করিতে ষোড়শীর মুখের প্রতি বার বার চাহিয়া দেখিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার কিছুতে লজ্জা করে না, কিন্তু আমারও এগুলো তোমার হাতে তুলে দিতে বাধ-বাধ ঠেকচে।

ষোড়শী শান্ত-নম্রকণ্ঠে বলিল, কিন্তু তাই ত দেবার কথা ছিল।

জীবানন্দের পাংশু মুখের উপর ক্ষণিকের জন্য লজ্জার আরক্ত আভা ভাসিয়া গেল, কহিল, কথা যাই থাক ষোড়শী, আমাকে বাঁচাতে তুমি যা খোয়ালে, তার দাম টাকায় ধার্য করচি, এ মনে করার চেয়ে বরঞ্চ আমার না বাঁচাই ছিল ভাল।

ষোড়শী তাহার মুখের উপর দুই চক্ষুর অচপল দৃষ্টি স্থির রাখিয়া কহিল, কিন্তু মেয়েমানুষের দাম ত আপনি এই দিয়েই চিরদিন ধার্য করে এসেছেন।

জীবানন্দ নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

ষোড়শী কহিল, বেশ, আজ যদি সে মত আপনার বদলে থাকে, টাকা না হয় রেখে দিন, আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। কিন্তু আমাকে কি সত্যিই এখনো চিনতে পারেন নি? ভাল করে চেয়ে দেখুন দিকি?

জীবানন্দ নীরবে চাহিয়া রহিল, বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার চোখে পলক পর্যন্ত পড়িল না। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিল, বোধ হয় পেরেছি। ছেলেবেলায় তোমার নাম অলকা ছিল না?

ষোড়শী হাসিল না, কিন্তু তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, আমার নাম ষোড়শী। ভৈরবীর দশমহাবিদ্যার নাম ছাড়া আর কোন নাম থাকে না, কিন্তু অলকাকে আপনার মনে আছে?

জীবানন্দ নিরুৎসুক-কণ্ঠে বলিল, কিছু কিছু মনে আছে বৈ কি। তোমার মায়ের হোটেলে যখন মাঝে মাঝে খেতে যেতাম, তখন তুমি ছ-সাত বছরের মেয়ে; কিন্তু আমাকে ত তুমি অনায়াসে চিনতে পেরেচ!

এই কণ্ঠস্বর ও তাহার নিগূঢ় অর্থ অনুভব করিয়া ষোড়শী কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া অবশেষে সহজভাবে বলিল, তার কারণ অলকার বয়স তখন ছ-সাত নয়, ন-দশ বৎসর ছিল; এবং আপনার মনেও হতে পারে তার মা তাকে আপনার বাহন বলে পরিহাস করতেন। তা ছাড়া আপনার মুখের আর যত বদলই হোক, ডান চোখের ওই তিলটির কখনো পরিবর্ত্তন হবে না। অলকার মাকে মনে পড়ে?

জীবানন্দ কহিল, পড়ে। তাঁর সম্বন্ধে তারাদাস যা বলতে বলতে গেল তাও বুঝতে পারচি। তিনি বেঁচে আছেন?

না। বছর-দশেক পূর্বে তাঁর কাশীলাভ হয়েচে। আপনাকে তিনি বড় ভাল-বাসতেন, না?

জীবানন্দর শীর্ণ মুখের উপর এবার উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিল, হাঁ। একবার বিপদে পড়ে তাঁর কাছে একশ' টাকা ধার নিয়েছিলাম, সেটা বোধ হয় আর শোধ দেওয়া হয়নি।

সহসা ষোড়শীর ওষ্ঠাধর চাপা হাসিতে ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ তাহা সংবরণ করিয়া লইয়া সহজভাবে কহিল, আপনি সে জন্যে কোন ক্ষোভ মনে রাখবেন না। অলকার মা সে টাকা ধার বলে আপনাকে দেননি, যৌতুক বলেই দিয়েছিলেন। অলকার চুপ করিয়া

পুনশ্চ কহিল, আজ অপর্যাপ্ত সম্পদের দিনে সে-সব দুঃখের কথা হয়ত মনে হতে চাইবে না, হয়ত সেদিনের একশ' টাকার মূল্য আজ হিসেব করাও কঠিন হবে, কিন্তু চেষ্টা করলে এটুকু মনেও পড়তে পারে যে, সে দিনটাও ঠিক এমনি দুর্দিনই ছিল। আজ যোড়শীর ঋণটাই খুব ভারী বোধ হচ্চে, কিন্তু সেদিন ছোট্ট অলকার কুলটা মায়ের ঋণটাও কম ভারী ছিল না।

জীবানন্দ আহত হইয়া কহিল, তাই মনে করতে পারতাম যদি না তিনি ওই ক'টা টাকার জন্য তাঁর মেয়েকে বিবাহ করতে আমাকে বাধ্য করতেন।

যোড়শী কহিল, বিবাহ করতে তিনি বাধ্য করেন নি, বরঞ্চ করেছিলেন আপনি। কিন্তু থাক্ ও-সব বিশ্রী আলোচনা। আপনাকে ত এইমাত্র বলেচি, আজ আর সেই তুচ্ছ টাকা ক'টার মূল্য-নিরূপণ সম্ভব হবে না, কিন্তু ওইমাত্র ছিল অলকার মায়ের জীবনের সঞ্চয়। মেয়ের কোন একটা সদ্গতি করবার ও-ছাড়া আর কিছু যখন তাঁর হাতে ছিল না, তখন টাকা ক'টির সঙ্গে মেয়েটাকেও আপনারই হাতে দিতে হ'লো। কিন্তু বিবাহ ত আপনি করেন নি, করেছিলেন শুধু একটু তামাশা। সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই যে নিরুদ্দেশ হলেন, এই বোধ হয় তারপরে কাল প্রথম দেখা।

জীবানন্দ কহিল, কিন্তু তারপরে ত তোমার সত্যিকারের বিবাহই হয়েচে শুনেচি।

যোড়শী ধৈর্য হারাইল না। তেমনি শান্ত গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, তার মানে আর একজনের সঙ্গে? এই না? কিন্তু নিরপরাধ নিরুপায় বালিকার ভাগ্যে এ বিড়ম্বনা যদি ঘটেই থাকে, তবু ত আপনার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

জীবানন্দ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, যোড়শী, তখন তুমি ছেলেমানুষ ছিলে, অনেক কথাই ঠিক জানো না। তোমার মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তিনি সাক্ষী দিতেন—তিনি সত্যি কি চেয়েছিলেন। তোমার বাবাকে আজকের পূর্বে কখনো দেখিনি, কেবল সেই সম্প্রদানের রাত্রে নামটা মাত্র শুনেছিলাম। কিন্তু তিনিই যে তারাদাস, তুমিই যে অলকা, সে আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি।

যোড়শী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, আজও ত কল্পনা করবার প্রয়োজন নেই!

জীবানন্দ কহিল, নাই থাক্, কিন্তু তোমার মা জানতেন শুধু কেবল তোমাকে তোমার বাবার হাত থেকে আলাদা রাখবার জন্যেই তিনি যা হোক একটা—

বিবাহের গণ্ডি টেনে রেখেছিলেন? তা হবেও বা। অলকার মাও বেঁচে নেই, অলকাই আমি কিনা তা নিয়েও আপনার দুশ্চিন্তা করার আবশ্যক নেই। কিন্তু কেন যে ওঁদের সঙ্গে গেলুম না, কেন যে নিজের সর্বনাশের কোথাও কিছু বাকী রাখলুম না, সেই কথাটাই আজ আপনাকে বলে যাব। কাল আপনার সন্দেহ হয়েছিল হয়ত বা আমি লেখাপড়া জানি; লিখতে-পড়তে ত ওই এককড়িও জানে, সে নয়, কিন্তু আমার যিনি গুরু তিনি হাতে রেখে কিছু দান করেন না, তাই আজ তাঁরই পায়ে নিজেকে এমন করে বলি দিতেও আমার বাধল না।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ নীরবে নতমুখে থাকিয়া ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিল, কিন্তু ধর, আসল কথা যদি তুমি প্রকাশ করে বল, তা হলে—

যোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, আসল কথাটা কি? বিবাহের কথা! কিন্তু সেই ত মিথ্যে। বিয়ে ত হয়নি। তা ছাড়া, সে সমস্যা অলকার, আমার নয়। আমি সারারাত এখানে কাটিয়ে গিয়ে ও গল্প করলে সর্বনাশের পরিমাণ তাতে এতটুকু কমবে না। কিন্তু ও-কথা ত আর আমি ভাবচি নে। আমার বড় দুঃখ এখন আর আমি নিজে নয়—সে আপনি। কাল ভেবেছিলুম আপনার বুঝি সাহসের আর অন্ত নেই—নিজের প্রাণটাও বুঝি তার কাছে ছোট, কিন্তু আজ দেখতে পেলাম সে ভুল। শুধু যে এক নিরপরাধ নারীর কলঙ্কের মূল্যেই আজ নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তাই নয়, একদিন যে অনাথ মেয়েটিকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়েই কেবল আত্মরক্ষা করেছিলেন, আজ তাকে চেনবার সাহস পর্যন্ত আপনার হয়নি।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া, অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, যোড়শী আজ আমি এত নীচে নেমে গেছি যে, গৃহস্থের কুলবধূর দোহাই দিলেও তুমি মনে মনে হাসবে,

কিন্তু সেদিন অলকাকে বিবাহ করে বীজগাঁর জমিদার-বংশের বধূ বলে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটাই কি ভালো কাজ হতো?

ষোড়শী অসঙ্কোচে উত্তর দিল, সে ঠিক জানিনে, কিন্তু সত্য কাজ হ'তো এ জানি। যার সমস্ত দুর্ভাগ্য জেনেও যাকে হাত পেতে নিতে আপনার বাধেনি, তাকে অমন করে ফেলে না পালালে এতবড় লাঞ্ছনা আজ আপনার ভাগ্যে ঘটতো না। সেই সত্যই আজ আপনাকে এ দুর্গতি থেকে বাঁচাতে পারতো। কিন্তু আমি মিথ্যে বকচি, এখন এ-সব আর আপনার কাছে বলা নিষ্ফল। আমি চললুম—আপনি কোন-কিছু দেবার চেষ্টা ক'রে আর আমাকে অপমান করবেন না।

জীবানন্দ কিছুই কহিল না, কিন্তু এককড়িকে দ্বারপ্রান্তে দেখিতে পাইয়া সে হঠাৎ যেন কাঙ্গাল হইয়া বলিয়া উঠিল, এককড়ি, তোমাদের এখানে কোন ডাক্তার আছেন—একবার খবর দিয়ে আনতে পারো? তিনি যা চাবেন আমি তাই দেব।

ষোড়শী চমকিয়া উঠিল। নিজের অভিমান ও উত্তেজনার মধ্য দিয়া এতক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই আবদ্ধ ছিল।

এককড়ি কহিল, ডাক্তার আছে বৈ কি হুজুর—আমাদের বল্লভ ডাক্তারের খাসা হাতযশ। বলিয়া সে সমর্থনের জন্য ভৈরবীর প্রতি চাহিল।

ষোড়শী কথা কহিল না, কিন্তু জীবানন্দ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তাঁকেই আনতে পাঠাও এককড়ি, আর এক মিনিট দেরি ক'রো না। আর ঐখানে সব খালি বোতল পড়ে আছে—কাউকে বলে দাও গরম জল করে আনুক। কোথায় গেল এরা?

এককড়ি কহিল, ঐ কথাটাই ত নিবেদন করতে আসছিলাম, হুজুর, পুলিশের ভয়ে কে যে কোথায় সরেছে কাউকে খুঁজে পেলাম না।

কেউ নেই, সব পালিয়েচে?

সব, সব, জনপ্রাণী নেই। ওরা কি আর মানুষ হুজুর! কৈ, আমি ত—

জীবানন্দ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, ডাক্তার আনা কি হবে না এককড়ি?

এককড়ি বাধা পাইয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া কহিল, হবে না কেন হুজুর, আমি নিজেই যাচ্ছি, এখনো তিনি ঘরেই আছেন। কিন্তু গরম জল করতে গেলে ত বড় দেরি হয়ে যাবে? তা ছাড়া হুজুরকে একলা—

কিন্তু কথাটা শেষ হইবার সময় হইল না। ভিতরের একটা উচ্ছ্বসিত দুঃসহ বেদনায় জীবানন্দের মুখখানা চক্ষের পলকে বিবর্ণ হইয়া উঠিল, এবং ইহাকেই দমন করিতে সে উপুড় হইয়া পড়িয়া কেবল অস্ফুটকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, উঃ—আর আমি পারিনে!

ষোড়শীকে কিসে যেন কঠিন আঘাত করিল। এত বড় করুণ, হতাশ কণ্ঠস্বরও যে এমন দুর্দান্ত পাষণ্ডের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, এ যেন তাহার স্বপ্নাতীত। আসলে মানুষ যে কত দুর্বল, কত নিরুপায়, দুঃখে বেদনায় মানুষে মানুষে যে কত এক, কত আপনার, এই কথাটা মনে করিয়া তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু এক মুহূর্তে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে হতবুদ্ধি এককড়ির প্রতি চাহিয়া কহিল, তুমি বল্লভ ডাক্তারকে ডেকে আনো গে এককড়ি, এখানে যা করবার আমি করব এখন। পথে কাউকে যদি দেখতে পাও, পাঠিয়ে দিয়ো, ব'লো পুলিশের ভয় আর কিছু নেই।

এককড়ি আশ্চর্য হইল না, বরঞ্চ খুশী হইয়া বলিল, ডাক্তারবাবুকে যেখানে পাই আমি আনবই। কিন্তু রান্নাঘরটা কি আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে যাব?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, দরকার নেই, আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারব। তুমি কিন্তু কোন কারণে কোথাও দেরি ক'রো না।

আজ্ঞে না, আমি যাব আর আসব, বলিতে বলিতে এককড়ি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

ছয়

সন্ধান করিয়া রান্নাঘর হইতে যখন ষোড়শী বোতলের জল গরম করিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল, তখনও লোকজন কেহ ফিরিয়া আসে নাই। জীবানন্দ তেমনি উপুড় হইয়া

পড়িয়া। সে পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, তুমি? ডাক্তার আসেনি?

ষোড়শী কহিল, এখনও ত তাদের আসবার সময় হয়নি। বলিয়া সে হাতের বোতল দু'টা শয্যার একধারে রাখিয়া দিল।

জীবানন্দ কথাটাকে ঠিক যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না; কহিল, এখনও আসবার সময় হয়নি? ডাক্তার কতদূরে থাকেন জানো?

ষোড়শী কহিল, জানি, কিন্তু পনর মিনিটের মধ্যেই কি আসা যায়?

জীবানন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সবে পনর মিনিট? আমি ভেবেছি দু'ঘণ্টা-তিন ঘণ্টা, কি আরও কতক্ষণ যেন এককড়ি তাঁকে আনতে গেছে। হয়ত তিনিও ভয়ে এখানে আসবেন না অলকা! বলিয়া সে চুপ করিয়া আবার উপুড় হইয়া শুইল। তাঁর কণ্ঠস্বরে এবং চোখের দৃষ্টিতে ব্যাকুল নিরাশ্বাসের কোথাও যেন আর শেষ রহিল না।

ষোড়শী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিল, ডাক্তার আসবেন বৈ কি! গরম জলের বোতল ততক্ষণ কেন টেনে নিন না?

জীবানন্দ তেমনিভাবেই মাথা নাড়িয়া বলিল, না, ও থাক্। ওতে আমার কিছু হয় না, কেবল কষ্ট বাড়ে।

ষোড়শী সহসা কোন প্রতিবাদ করিল না। এই উপায়হীন রোগগ্রস্ত লোকটির মুখ হইতে তাহার নিজের শিশুকালের নামটা এতক্ষণ পরে যেন এই প্রথম তাহার কানে কানে গুন্‌গুন্ করিয়া কি একটা অজানা রহস্যের অর্থ বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বোধ হয় ইহাতেই মগ্ন হইয়া সে নিজের ও পরের, সুমুখের ও পশ্চাতের সমস্তই ভুলিয়া গিয়া অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ জীবানন্দের প্রশ্নেই তাহার হুঁশ হইল।

অলকা!

নামটাকে আর সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। কহিল, আজ্ঞে?

জীবানন্দ বলিল, এখনও সময় হয়নি? হয়ত তিনি আসবেন না, হয়ত কোথাও চলে গেছেন।

ষোড়শী কহিল, আমি নিশ্চয় জানি, তিনি আসবেন—তিনি কোথাও যাননি।

বাড়িতে কেউ কি এখনও ফিরে আসেনি?

ষোড়শী বলিল, না।

জীবানন্দ একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বোধ হয় তারা আর আসবে না, বোধ হয় এককড়িও একটা ছল ক'রে চ'লে গেল।

ষোড়শী মৌন হইয়া রহিল। জীবানন্দ নিজেও বোধ হয় একটা ব্যথা সামলাইয়া লইয়া একটু পরেই বলিল, সবাই গেছে, তারা যেতে পারে—কেবল তোমারই যাওয়া হবে না।

কেন?

বোধ করি আমি বাঁচব না—তাই। আমার নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে, মনে হচ্ছে, পৃথিবীতে আর বুঝি হাওয়া নেই।

আপনার কি বড্ড কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ। অলকা, আমাকে তুমি মাপ কর।

ষোড়শী নির্বাক হইয়া রহিল। জীবানন্দ একটু থামিয়া পুনরায় কহিল, আমি ঠাকুর-দেবতা মানিনে, দরকারও হয় না; কিন্তু একটু আগেই মনে মনে ভাবছিলুম। জীবনে অনেক পাপ করেচি, তার আর আদি-অবধি নেই। আজ থেকে থেকে কেবলি মনে হচ্চে, বুঝি সব দেনা মাথায় নিয়ে যেতে হবে।

ষোড়শী তেমনি নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিল। জীবানন্দ কহিল, মানুষ অমরও নয়, মৃত্যুর বয়সও কেউ দাগ দিয়ে রাখেনি, কিন্তু এই যন্ত্রণা আর সইতে পারচি নে—উঃ—মাগো! বলিতে বলিতে তাহার সর্বশরীর ব্যথার অসহ্য তীব্রতায় যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ষোড়শী চাহিয়া দেখিল তাহার কেবল দেহই নয়, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়াছে এবং বিবর্ণমুখে দুই নিমীলিত চক্ষের নীচে রক্তহীন ওষ্ঠাধর একটা অত্যন্ত কঠিন রেখায় সংবদ্ধ হইয়া গেছে।

পলকের জন্য কি একটা সে ভাবিয়া লইল, বোধ হয় একবার একটু দ্বিধাও করিল;

তার পরে এই পীড়িতের শয্যায় হতভাগ্যের পার্শ্বে গিয়া উপবেশন করিল। গরম জলের বোতল দু'টা সাবধানে তাহার পেটের কাছে টানিয়া দিতে জীবানন্দ কেবল ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ মেলিয়াই আবার মুদ্রিত করিল। ষোড়শী আঁচল দিয়া তাহার ললাটের স্বেদ মুছাইয়া দিল, এবং হাতপাখার অভাবে সেই অঞ্চলটাই জড় করিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল।

জীবানন্দ কোন কথা কহিল না, কেবল তাহার ডান হাতটা ধীরে ধীরে তুলিয়া ষোড়শীর ক্রোড়ের উপর রাখিয়া নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

মিনিট দশ-পনর এমনি নীরবে কাটিবার পরে জীবানন্দই প্রথমে কথা কহিল। ডাকিল, অলকা!

ষোড়শী কহিল, আপনি আমাকে ষোড়শী বলে ডাকবেন।

আর কি অলকা হতে পারো না?

না।

কোনদিন কোন কারণেই কি—

আপনি অন্য কথা বলুন।

কিন্তু অন্য কথা জীবানন্দের মুখ দিয়া আর বাহির হইল না, শুধু নিবারিত দীর্ঘ-শ্বাসের শেষ বাতাসটুকু তাহার বক্ষের সম্মুখটাকে ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া দিয়া শূন্যে মিলাইল।

মিনিট দুই-তিন পরে ষোড়শী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কষ্টটা কিছুই কমেনি?

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বোধ হয় একটু কমেচে। আচ্ছা, যদি বাঁচি, তোমার কি কোন উপকার করতে পারিনে?

ষোড়শী বলিল, না, আমি সন্ন্যাসিনী—আমার নিজের কোনও উপকার করাই কারও সম্ভব নয়।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এমন কিছুই কি নেই. যাতে সন্ন্যাসিনীও খুশী হয়?

ষোড়শী কহিল, তা হয়ত আছে, কিন্তু সেজন্য কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন?

জীবানন্দ এইবার একটুখানি ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিল, আমার ঢের দোষ আছে, কিন্তু পরের উপকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, এ দোষ আজও কেউ আমাকে দেয়নি। তা ছাড়া এখন বলচি বলেই যে ভাল হয়েও বলবো, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই—এমনই বটে! এমনই বটে! সারাজীবনে এ ছাড়া আর আমার কিছুই বোধ হয় নেই।

ষোড়শী নীরবে আর একবার তাহার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল। জীবানন্দ হঠাৎ সেই হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, সন্ন্যাসিনীর কি সুখদুঃখ নেই? সে খুশী হয়, পৃথিবীতে এমন কি কিছুই নেই?

ষোড়শী বলিল, কিন্তু সে ত আপনার হাতের মধ্যে নয়!

জীবানন্দ বলিল, যা মানুষের হাতের মধ্যে? তেমন কিছু?

ষোড়শী বলিল, তাও আছে, কিন্তু ভাল হয়ে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করেন, তখনই জানাবো।

তাহার হাতটাকে জীবানন্দ সহসা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বার বার মাথা নাড়িয়া কহিল, না না, আর ভাল হয়ে নয়—এই কঠিন অসুখের মধ্যে আমাকে বল! মানুষকে অনেক দুঃখ দিয়েচি, আজ নিজের ব্যথার মধ্যে পরের ব্যথা, পরের আশার কথাটা একটু শুনে নিই। নিজের দুঃখটার আজ একটা সদ্গতি হোক।

ষোড়শী আপনার হাতটাকে ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। জীবানন্দ নিজেও মিনিট-খানেক স্থিরভাবে থাকিয়া কহিল, বেশ তাই হোক, সকলের মত আমিও তোমাকে আজ থেকে ষোড়শী বলেই ডাকব। কাল থেকে আজ পর্যন্ত আমি এত যন্ত্রণার মধ্যেও মাঝে মাঝে অনেক কথাই ভেবেচি। বোধ হয় তোমার কথাটাই বেশী। আমি বেঁচে গেলুম, কিন্তু তোমার যে এখানে—

ষোড়শী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমার কথা থাক্।

জীবানন্দ বাধা পাইয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি বুঝেচি ষোড়শী! তোমার জন্যে আমি ভাবি এও আর তুমি চাও না। এমনিই হওয়া উচিত বটে! বলিয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ষোড়শী বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ চোখ মেলিয়া কহিল, তুমিও চললে?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। ঘরটা ভারী নোংরা হয়ে রয়েচে, একটু পরিষ্কার করে ফেলি। বলিয়া সে সম্মতির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই গৃহকার্যে নিযুক্ত হইল। ঘরের অধিকাংশ জানালা-দরজাই এ পর্যন্ত খোলা হয় নাই; বিস্তর টানাটানি করিয়া সেগুলি খুলিয়া ফেলিতেই উন্মুক্ত আকাশ দিয়া একমুহূর্তে আলো ও বাতাসে ঘর ভরিয়া গেল; মেঝের উপর আবর্জনার রাশি নানাস্থানে প্রতিদিন স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছিল, একটা ঝাঁটা সন্ধান করিয়া আনিয়া ষোড়শী সমুদয় পরিষ্কার করিয়া ফেলিল, এবং অঞ্চল দিয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বালিশ দু'টা যখন যথাস্থানে গুছাইয়া দিল, তখনও জীবানন্দ একটা কথা কহিল না, কেবল তাঁহার মলিন মুখের উপর একটা স্নিগ্ধ আলোক যেন কোথা হইতে আসিয়া ধীরে ধীরে স্থিতি লাভ করিতেছিল। ষোড়শী কাজ করিতেছিল, সে শুধু দুই চক্ষু মেলিয়া তাহাকে নীরবে অনুসরণ করিতেছিল, যেন শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা কি, সমস্ত বেদনা ভুলিয়া সে সংসারের সর্বোত্তম বিস্ময়ের মত জীবনে এই প্রথম দেখিতেছিল।

সহসা বাহিরে অনেকগুলা পদশব্দ শুনিয়া ষোড়শী ঝাঁটাটা রাখিয়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। এককড়ি দ্বারের কাছে মুখ বাহির করিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু এসেচেন।

ষোড়শী কহিল, তাঁকে নিয়ে এস। বলিয়া সে তাহার পূর্বস্থানে গিয়া উপবেশন করিল।

পরক্ষণেই যে চিকিৎসকের হাতযশ এ অঞ্চলে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, সেই বল্লভ ডাক্তার আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং ষোড়শীকে এখানে এভাবে দেখিয়া তিনি একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

এককড়ি অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া কহিল, ঐ যে হুজুর। যদি ভাল করতে পারেন ডাক্তারবাবু, বকশিশের কথা ছেড়েই দিন—আমরা সবাই আপনার কেনা হয়ে থাকব।

ডাক্তার নীরবে আসিয়া শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং পকেট হইতে কাঠের চোঙাটা বাহির করিয়া বিনা-বাক্যব্যয়ে রোগ পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। বিস্তর ঘষা-মাজা করিয়া তিনি বেশ বড় ডাক্তারের মতই রায় দিলেন—অত্যাচার করিয়া রোগ জন্মিয়াছে, সাবধান না হইলে প্লীহা কিংবা লিভার পাকা অসম্ভব নয় এবং তাহাতে ভয়ের কথাও আছে। কিন্তু সাবধান হইলে নাও পাকিতে পারে, এবং তাহাতে ভয়ও কম। তবে এ-কথা নিশ্চয় যে ঔষধ খাওয়া আবশ্যক।

জীবানন্দ প্রশ্ন করিলেন, এ অবস্থায় কলকাতায় যাওয়া সম্ভব কিনা বলতে পারেন?

ডাক্তার কহিলেন, যদি যেতে পারেন, তা হ'লে সম্ভব, নইলে কিছুতেই সম্ভব নয়।

জীবানন্দ পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে থাকলে ভাল হবে কি না বলতে পারেন?

ডাক্তার অত্যন্ত বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন, আজ্ঞে না হুজুর, তা বলতে পারিনে। তবে, এ-কথা নিশ্চয় যে, এখানে থাকলে ভাল হতে পারেন, আবার কলকাতা গিয়ে ভাল নাও হতে পারেন।

জীবানন্দ মনে মনে বিরক্ত হইয়া আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন না। ডাক্তার ঔষধের জন্য লোক পাঠাইবার ইঙ্গিত করিয়া উপযুক্ত দর্শনী লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এককড়ি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দ্বারের বাহিরে পর্যন্ত আসিয়া ফিরিয়া গেলে জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি হবে এককড়ি?

এককড়ি সাহস দিয়া বলিল, ভয় কি হুজুর, ওষুধ এলো বলে। বল্লভ ডাক্তারের একশিশি মিক্সচার খেলেই সব ভাল হয়ে যাবে।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না এককড়ি, তোমাদের বল্লভের মিক্সচার তোমাদেরই

থাক, আমাকে তুমি কেবল কলকাতা যাবার একটা বন্দোবস্ত আজই করে দাও। এই বলিয়া তিনি যে-দ্বার দিয়া ষোড়শী কয়েক মুহূর্ত পূর্বে অন্যত্র সরিয়া গিয়াছিল, সেইদিকে উৎসুক-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু কেহই ফিরিয়া আসিল না। মিনিট দু-তিন পরে তাঁহার অধৈর্য আর মানা মানিল না, কহিলেন, ওঁকে একবার ডেকে দিয়ে তুমি যাবার একটা ব্যবস্থা কর গে এককড়ি। আজ যাওয়া আমার চাই-ই।

এ সংকেত এককড়ি চক্ষের নিমিষে বুঝিল, এবং যে আজ্ঞে হুজুর, বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। কিন্তু ফিরিয়া আসিতে তাহার বিলম্ব হইতে লাগিল, এবং মিনিট-পনর বিলম্বে যখন সে যথার্থই আসিল, তখন একাকীই আসিল; কহিল, তিনি নেই, বাড়ি চলে গেছেন হুজুর!

জীবানন্দ বিশ্বাস করিতে পারিল না। ব্যগ্র ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমাকে না জানিয়ে চলে যাবেন? এমন হতেই পারে না এককড়ি!

বিশ্বাস করা সত্যই কঠিন। অলকা কোন ব্যবস্থা না করিয়াই চলিয়া গেল, একটা কথা বলিয়া গেল না—ডাক্তারের অভিমতটুকু শুনিয়া যাইবার পর্যন্ত তাহার ধৈর্য রহিল না —এ কথা জীবানন্দ কিছুতেই যেন মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

এককড়ি বলিল, হাঁ হুজুর, তিনি ডাক্তারবাবু যাবার পরেই চলে গেছেন। বাইরে গোপাল কাওরা বসে আছে, সে দেখেছে ভৈরবী সোজা চলে গেলেন।

জীবানন্দ আর প্রতিবাদ করিলেন না। এককড়ি কহিল, তাহলে একটু বেলাবেলি যাত্রা করবার ব্যবস্থা করি গে হুজুর?

হাঁ, তাই কর, বলিয়া জীবানন্দ পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইলেন। এককড়ি কলিকাতা যাত্রার বিস্তর খুঁটিনাটি আলোচনা করিতে লাগিল, কিন্তু প্রভুর নিকট হইতে কোন কথারই প্রত্যুত্তর আসিল না। কথাগুলা তাঁহার কানেই গেল কি না তাহাও ঠিক বুঝা গেল না।

সাত

জমিদারের বিলাস-কুঞ্জ হইতে ষোড়শী যখন নিঃশব্দে সরিয়া গেল, তখন বেলা বোধ হয় ন'টা-দশটা। এমন করিয়া চলিয়া আসাটা তাহার বিশ্রী ঠেকিতে লাগিল, কিন্তু তখনই মনে হইল, বলিয়া কহিয়া বিদায় লইয়া আসাটা আরও অশোভন, আরও বাড়াবাড়ি হইত। কিন্তু গেটের বাইরে আসিয়া দেখিল আর একপদও অগ্রসর হওয়া চলে না। এবার নাবী বর্ষায় কৃষকদের ধান্য-রোপণের কাজকর্ম তখনও মাঠে শেষ হইয়া যায় নাই, উহাদের মাঝখান দিয়া গ্রামের একমাত্র পথ। এই প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই পথের উপর দিয়া মুখ উঁচু বা নীচু করিয়া কোনভাবেই হাঁটিয়া যাইতে তাহার পা উঠিল না। আকাশের বিদ্যুৎ এক-মুহূর্তে অন্ধকারের পর্দা তুলিয়া মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীর বক্ষটাকে যেমন সুস্পষ্ট করিয়া দেয়, দূরের ঐ চাষীগুলাও ঠিক তেমনি করিয়া চক্ষের পলকে ষোড়শীর বিগত রাত্রিটাকে তাহার কাছে অত্যন্ত অনাবৃত করিয়া দিল। আবরণের নীচে যে এত জিনিস ঢাকা ছিল, কোন মানুষের জীবনেই যে একটা রাত্রির মধ্যে এতবড় ব্যাপার ঘটিয়া উঠিতে পারে, দেখিতে পাইয়া সে ক্ষণিকের জন্য যেন হতজ্ঞান হইয়া রহিল। সম্পূর্ণ একটা দিনও কাটে নাই, মাত্র কাল সায়াহ্নবেলায় অপমানের প্রবল তাড়নে দিগ্বিদিক্ না ভাবিয়া এই পথ দিয়াই সে হাঁটিয়া গেছে, কিন্তু তাহার পরে? তাহার পরের ঘটনা ঘটিতে মানুষের বহু যুগ লাগিতে পারে, অথচ তাহার লাগে নাই। এ-যেন একটা ভোজবাজি হইয়া গেল, তাই আজ পরিচিত পথটারই ও-ধারে তাহার জন্য কি যে অপেক্ষা করিয়া আছে তাহা কল্পনা করিতেও পারিল না। ফটকের বাহিরে বাগানের ধার দিয়া একটা পায়ে-হাঁটা পথ নদীর দিকে গিয়াছে, কেবলমাত্র সম্মুখের রাস্তাটা বাঁচিয়াই সে এই পথ দিয়া ধীরে ধীরে নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইল। এদিকে গ্রাম নাই, গরু-ছাগল চরাইতে কাচিৎ কোন রাখাল বালক ভিন্ন এ পথে সচরাচর কেহ চলে না—এই নিরালা স্থানটায় সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করিয়া

সে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া ঘরে ফিরিবে মনে করিয়া একটা প্রাচীন তেঁতুলগাছের তলায় বসিয়া পড়িল।

এতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়িয়াছিল; তাহাতে বর্তমানের চিন্তা ছাড়া আর কিছুই তাহার মনে ছিল না। এইবার যে ভবিষ্যৎ সাগ্রহে তাহার পথ চাহিয়া আছে, তাহার কথাই একটি একটি করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে লাগিল। তাহাদের ছোট গ্রামে এতক্ষণ কোন কথাই কাহারো অবিদিত নাই; জমিদার তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছে, সারারাত্রি আটক রাখিয়াছে—এই কয়দিনের অত্যাচারে গ্রামে ইহা এমনিই একটা সাধারণ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে যে, এজন্য বিশেষ কোনরূপ চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। এমন কি, কেন যে সে মিথ্যা করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কবল হইতে জমিদারকে উদ্ধার করিয়াছে, এ রহস্যোদ্ভেদ করিবারও গ্রামে বুদ্ধিমান লোকের অভাব হইবে না। এ যে একটা বড় রকমের ঘুষের ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিবে। কিন্তু আসল বিপদ হইতেছে তাহার পিতা তারাদাসকে লইয়া! বহুকাল হইতেই উভয়ের সহজ সম্বন্ধটা বাহিরের অগোচরে ভিতরে ভিতরে পচিয়া উঠিতেছিল, এইবার তাহা ঘৃণার বাষ্পে অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া জ্বলিতে থাকিবে। ইহার শিখা কাহারও দৃষ্টি হইতে আড়াল করা সম্ভব হইবে না। সংসারে সে লোকটার অসাধ্য কার্য নাই। তাহার অনেক কুকর্মে বাধা দিয়া পিতা ও কন্যার মধ্যে অনেক গোপন সংগ্রাম হইয়া গেছে, চিরদিন পিতাকেই পরাভব মানিতে হইয়াছে, অথচ, নানা কারণে এতকাল তাহাকে ষোড়শীর মাতার সম্বন্ধে মৌন থাকিতেই হইয়াছে। কিন্তু আজ যখন তারাদাস ক্রোধবশে একবার কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন আর সে কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিবে না। এই কলঙ্কের কালি দুই হাতে ছড়াইয়া নিজের সঙ্গে আর একজনের সর্বনাশ করিয়া তবে গ্রাম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবে। ইহা যে অকিঞ্চিৎকর নয়, ইহা যে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎটাকে আঁধার করিয়া তুলিবে, তাহাও ষোড়শী দূর হইতে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল; কিন্তু সেই অন্ধকারের অভ্যন্তরে যে কি সঞ্চিত আছে, তাহার কোন আভাসই তাহার চোখে পড়িল না। বেলা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, এইখানে বসিয়া ভিতরের উদ্যোগ-আয়োজনের অস্পষ্ট কোলাহল মাঝে মাঝে তাহার কানে আসিতে লাগিল, এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জীবানন্দের মুখের অলকা নাম, তাহার সলজ্জ ক্ষমাভিক্ষা, তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা, এমনি কত-কি যেন একটা ভুলে-যাওয়া কবিতার ভাঙ্গাচোরা চরণের মত রহিয়া রহিয়া তাহার মনের মধ্যে অকারণে আনাগোনা করিতে লাগিল; অথচ যে সঙ্কট ওই গ্রামখানার মধ্যে তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্যত হইয়া আছে, তাহার বিভীষিকা সেই মনের মধ্যেই অনুক্ষণ তেমনি ভীষণ হইয়াই রহিল।

ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সূর্যদেব অপর প্রান্তে হেলিয়া পড়িলেন, এবং তাহারই একটা দীপ্ত রশ্মি হইতে মুখ ফিরাইতে গিয়া হঠাৎ বহুদূরে পরপারের মাঠের মধ্যে জমিদারের পালকিখানা তাহার চোখে পড়িল। এই দিকেই যখন তাহারা গিয়াছে, তখন এক সময়ে নিকট দিয়াই গিয়াছে, সে খেয়াল করে নাই, হয়ত চেষ্টা করিলে একটু দেখা যাইতে পারিত, কিন্তু এখন অজ্ঞাতসারে শুধু কেবল তাহার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

অপরাহ্ন সায়াহ্নে এবং সায়াহ্ন সন্ধ্যায় অবসান হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। ষোড়শী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখনও মানুষ চেনা যায়, কিন্তু মাঠে লোক ছিল না। এবং এই নির্জন পথটা অতিক্রম করিয়া যখন নিজের গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ না হইলেও তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, কিন্তু সদর দরজায় তালা বন্ধ দেখিয়া সে যেন একটা কঠিন দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। ঘুরিয়া খিড়কির দ্বারে গিয়া দেখিল ভিতর হইতে তাহা আবদ্ধ; ইহাই সে প্রত্যাশা করিয়াছিল, কিন্তু এই কবাটটা সে বাহির হইতে খুলিবার কৌশল জানিত। অনতিবিলম্বে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ঘরে ঘরে তালা বন্ধ, কেহ কোথাও নাই—সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, শূন্য খাঁখাঁ করিতেছে।

সন্ন্যাসিনীকে অনেক উপবাস করিতে হয়, খাওয়ার কথা তাহার মনেও ছিল না; কোথাও নিরালায় একটু শুইতে পাইলেই সে আপাততঃ বাঁচিয়া যাইত; কিন্তু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার যখন উপায় নাই, তখন বারান্দার উপরেই একধারে সে নিজের অঞ্চলটা

পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তারাদাস গৃহে নাই, কেন নাই, কি জন্য নাই, কোথায় গিয়াছে. এই সকল কূট প্রশ্নমালা হইতে তাহার নিরতিশয় শ্রান্ত দেহ-মন অত্যন্ত সহজেই সরিয়া দাঁড়াইল। এবং রাত্রিটার মত যে সে নিরুপদ্রবে ঘুমাইতে পাইবে, এই তৃপ্তিটুকু লইয়াই সে দেখিতে দেখিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

ভোরবেলায় ষোড়শীর যখন ঘুম ভাঙিল তাহার অব্যবহিত পরেই সদর দরজায় চাবি খোলার শব্দ হইল, এবং যে বিধবা স্ত্রীলোকটি মন্দিরের ও গৃহের কাজকর্ম করে, সে আসিয়া প্রবেশ করিল। ষোড়শীকে দেখিয়া সে অধিক বিস্মিত হইল না—কখন এলে মা, রাত্তিরেই? খিড়কির দোর খুলে ঢুকেছিলে বুঝি?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে সে বলিল, এই কথাই সকলে বলাবলি করছিল মা, রাজাবাবু ত অ-বেলায় চলে গেল, এইবার তোমাকে ছেড়ে দেবে। খাওয়া-দাওয়া হয়নি বুঝি? কি করব মা, ঘরের চাবি বাবাঠাকুর ত রেখে যায়নি, সঙ্গে নে গেছে। তা হোক গে, দোকান থেকে চাল-ডাল এনে দি, কাঠকুটো দুটো যোগাড় করে দি, চান করে এসে যা হোক দুমুঠো ফুটিয়ে নিয়ে মুখে দাও। তার পরে যা হবার তা হবে।

ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, বাবা কোথায় গেছেন জানিস রানীর মা?

রানীর মা কহিল, শুনচি ত মা, কে নাকি তার বোনের মেয়ে আছে, তাকেই আনতে গেছে—এলো বলে। আজ বড়কর্তাবাবুর নাতির মানত পুজো, আজ কি আর কোথাও থাকবার জো আছে? মন্দিরে ত পহর রাত থাকতে ধুম লেগে গেছে মা!

ষোড়শীর দপ্ করিয়া মনে পড়িল, আজ মঙ্গলবার, আজ জনার্দন রায়ের দৌহিত্রের মানত পূজা উপলক্ষে জয়চণ্ডীর মন্দিরে তুমুল কাণ্ড। আজ কোনমতে কোথাও তাহার লুকাইয়া থাকিবার পথ নাই। সে দেবীর ভৈরবী, এতবড় ব্যাপারে তাহাকে হাজির হইতেই হইবে।

এইখানে জনার্দন রায়ের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। লোকটি যেমন ধনী, তেমনি ভীষণ। একবার একজন প্রজার বেগার দেওয়ার উপলক্ষে ষোড়শীর সহিত ইঁহার অত্যন্ত মনোমালিন্য ঘটে, সে-কথা কোন পক্ষই আজও বিস্মৃত হয় নাই। এবং কেবল ষোড়শীই নয়, এ অঞ্চলের সকলেই ইঁহাকে অত্যন্ত ভয় করে। জমিদার ইঁহাকে খাতির করে, এককড়ি ইঁহার হাত-ধরা। অনাদায়ী বৎসরে ইনিই জমিদারের সদর খাজনার যোগান দেন। দুই শত বিঘা ইঁহার নিজ চাষ এবং ধান-চাল-গুড় হইতে তেজারতি ও বন্ধকী কারবার ইঁহার একচেটে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ এই বড়কর্তাই একদিন অতি নিঃস্ব ছিলেন। জনশ্রুতি এইরূপ যে, এ সমস্তই তাঁহার মধ্যম জামাতা মিস্টার বসুর টাকা। তিনি পশ্চিমের কোন্ একটা হাইকোর্টের বড় ব্যারিস্টার। বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতিতে উঠিয়াছেন। আজ তাঁহারই একমাত্র পুত্রের সর্ববিধ মঙ্গল-কামনায় চণ্ডীর পূজার আয়োজন হইতেছে। এবং আয়োজন কেবল আজ নয়, মাসাধিক কাল হইতেই গ্রামের মধ্যে ইহার কথাবার্তা চলিয়াছে। বড়কর্তার যে মেয়েটি এতবড় ঘরে পড়িয়াছে, সেই হৈমবতীকে ষোড়শী ছেলেবেলায় চিনিত। তাহার চেয়ে বয়সে সামান্য কিছু ছোটই হইবে। মন্দির-প্রাঙ্গণে যে ছোট্ট পাঠশালাটি এখনও বসে, সকলের সঙ্গে সেও পড়িতে আসিত; এবং খেলাচ্ছলে যদি কোনদিন ষোড়শী উপস্থিত হইত, দেবীর ভৈরবী বলিয়া সকলের সঙ্গে সেও প্রণাম করিয়া পদধূলি লইত। আজ সে বড়ঘরের ঘরণী। আজ হয়ত তাহার দেহে সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের মণিমাণিক্য ধরে না, আজ হয়ত সে তাহাকে চিনিতেও পারিবে না। কিন্তু একদিন এমন ছিল না। সেদিন তাহার রূপ এবং বয়স কোনটাই বেশী ছিল না; তবু যে এতবড় ঘরে পড়িয়াছে, শুনা যায়, সে কেবল এই দেবীর মাহাত্ম্যে। কোন্ এক অমাবস্যায় নাকি এক সিদ্ধ তান্ত্রিক দেবী-দর্শনে আসিয়াছিলেন; রায় মহাশয় গোপনে এই কন্যার কল্যাণেই কি-সব যাগ-যজ্ঞ করাইয়া লইয়াছিলেন। এই পুত্রটিও নাকি তাঁহারই করুণায়। হতাশ হইয়া হৈম বিদেশে এই দেবীকেই মানত করিয়া পুত্রলাভ করিয়াছে।

দাসী কাজ করিতে করিতে কহিল, মা, মন্দিরে আজ হঠাৎ কখন ডাক পড়ে বলা যায় না, এই বেলা কেন চানটানগুলো সেরে নিলে না?

ষোড়শী অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, মন্দিরের ডাক পড়ার নামে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সেজন্য না হোক, বেলা বাড়িবার পূর্বেই নিভৃতে স্নান করিয়া আসাই ভাল মনে করিয়া সে কালবিলম্ব না করিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া পুষ্করিণীতে চলিয়া গেল। এই পুকুরটায় পাড়ার কেহ বড় একটা আসে না, তাই সেখানে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ভিজা কাপড় ছাড়িবার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, গা-মাথা মুছিবার একটা গামছা পর্যন্ত বাহিরে নাই। রানীর মা লক্ষ্য করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল। সে তারাদাসকে দেখিতে পারিত না, রাগ করিয়া কহিল, বিটলে খড়কুটোটি পর্যন্ত তালাবন্ধ করে গেছে—আমার একখানি কাচা মটকার কাপড় আছে মা, নে আসবো? তাতে ত দোষ নেই?

ষোড়শী কহিল, না, থাক।

ভিজে কাপড় গায়ে শুখোবে মা, অসুখ করবে যে?

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল। দাসী তাহার শুষ্ক মুখের প্রতি চাহিয়া ব্যথার সহিত বলিল, ক'দিন যে উপোস করচ মা, তা কে জানে! মেলেচ্ছ ব্যাটাদের ঘরে যে তুমি জলটুকু ছোঁবে না তা আমি বেশ জানি। এইবেলা দুটো চাল-ডাল দোকান থেকে না হোক, আমার বাড়ি থেকে এনে রেখে যাইনে মা?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, ও-সব এখন থাক রানীর মা।

এই দাসীটি কায়স্থের মেয়ে। তাহার বোধ-শোধ ছিল, এ লইয়া আর নিষ্ফল পীড়াপীড়ি করিল না। কাজকর্ম শেষ করিয়া, যাইবার সময় প্রশ্ন করিল, বাবাঠাকুরকে মন্দিরে দেখতে পেলে কি একবার আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে দেব?

ষোড়শী কহিল, থাক, তার আবশ্যক নেই।

দাসী কহিল, তালা দেবার দরকার নেই, দোরটা তুমি ভেতর থেকেই বন্ধ করে দাও। কিন্তু, আচ্ছা মা, কেউ যদি কোন কথা জিজ্ঞেসা করে ত কি—

ষোড়শী ক্ষণকাল মাত্র চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে মুখ তুলিয়া কহিল, হাঁ, ব'লো আমি বাড়িতেই আছি। এবং রানীর মা চলিয়া গেলে সে দ্বার আর রুদ্ধ হইল না, তেমনিই উন্মুক্তই রহিল। সুমুখের বারান্দার উপরে নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া ঘণ্টা দুই-তিন যে কেমন করিয়া কোথা দিয়া চলিয়া গেল, ষোড়শী জানিতেও পারে নাই; কেবল একটা নির্দিষ্ট বেদনার মত তাহার মনের মধ্যে এই ভাবটা ছিল যে, এইবার তাহার একটা অত্যন্ত কঠোর দুঃসময় আসিতেছে। পরীক্ষাচ্ছলে একটা অতিশয় কদর্য আন্দোলন এইবার গ্রামের মধ্যে উত্তাল হইয়া উঠিবে। অথচ যুদ্ধের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য আজ তাহার মন কিছুতেই বদ্ধ-পরিকর হইতে চাহিল না, বরঞ্চ সে যেন কেবলি তাহার কানে কানে এই কথাই কহিতে লাগিল, তুমি সন্ন্যাসিনী, এই সকল কথার বড় কথাটা আজ তোমার মনে রাখিতে হইবে। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, একদিন যে তোমার এই দেহটা দেবতার কাছে উৎসর্গ করা হইয়াছিল, এই সকল সত্যের বড় সত্যটা আজ তোমার কিছুতেই অস্বীকার করিলে চলিবে না। তোমাকে পণ রাখিয়া মিথ্যার বাজি যাহারা খেলিতেছিল, মরুক না তাহারা মারামারি কাটাকাটি করিয়া, তুমি এইবার মুক্তি লইয়া বাঁচো।

ঠিক এমনি সময়ে দ্বার খুলিয়া মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, মা, এ'রা একবার তোমাকে ডাকচেন।

চল, বলিয়া ষোড়শী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কেন, কোথায় বা কাহারা ডাকিতেছেন, প্রশ্নমাত্র করিল না, যেন এইজন্যই সে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল। তাহার উদ্যত বিপদ সম্বন্ধে পুরোহিত বেচারার বোধ হয় কিছু আভাস দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ভৈরবীর মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার কোন কথাই মুখে আসিল না।

আজ মন্দির-প্রাঙ্গণের বড় দ্বার খোলা। প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইল ও-ধারের দেয়ালের গায়ে গোটা-দুই কালো রঙের পাঁঠা বাঁধা আছে, এবং বারান্দার এক প্রান্তে পূজার উপকরণ ভারে ভারে স্তূপাকার করা হইয়াছে। তথায় পাঁচ-ছয়জন বর্ষীয়সী রমণী বাক্যে এবং কার্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আছেন, এবং সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড কলরব উঠিয়াছে প্রাঙ্গণের নাটমন্দিরের মধ্যে। সেখানে রায়মহাশয়ের সুদৃশ্য এবং প্রশস্ত সতরঞ্চি বিছানো রহিয়াছে, এবং তাঁহাকে মধ্যবর্তী করিয়া গ্রামের প্রবীণের দল যথাযোগ্য মর্যাদায় আসীন হইয়া

সম্ভবতঃ বিচার করিতেছে এবং তাহা ষোড়শীকে লইয়া। এতক্ষণ কে শুনিতেছিল বলা যায় না, অথচ আশ্চর্য এই যে, যাহার শোনা সবচেয়ে প্রয়োজন, সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই এই শতকণ্ঠের উদ্দাম বক্তৃতা একেবারে পলকে নিবিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন পক্ষ হইতেই কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল না। পুরুষেরা সকলেই ষোড়শীর পরিচিত, এবং মেয়েরাও যখন কাজ ফেলিয়া একে একে থামের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল তাহারাও তাহার অপরিচিত নয়; কেবল যে মেয়েটি সকলের পরে মন্দিরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে আসিয়া ঠিক তাহার সম্মুখের জোড়া-থামটা আশ্রয় করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, সে অচেনা হইলেও ষোড়শী একমুহূর্তে বুঝিল, এই হৈমবতী। এই মেয়েটি তাহার স্বামিগৃহ ছাড়িয়া বহুকাল যাবৎ বাপের বাড়ি আসিতে পারে নাই; তাই তাহার সম্বন্ধে জনশ্রুতিও এই বাপের বাড়ির দেশে উত্তরোত্তর বিবিধ হইয়াই উঠিতেছিল। সে অখাদ্য খানা খায়, ঘাগরা এবং জুতা-মোজা পরে, রাস্তায় পুরুষদের হাত ধরিয়া বেড়ায়, সে একেবারে খ্রীষ্টান মেমসাহেব হইয়া গেছে—এমনি কত কি! আজ কিন্তু ষোড়শী তাহার কিছুই দেখিতে পাইল না। পরনে একখানি মূল্যবান বেনারসী শাড়ি এবং গায়ে দু-একখানা দামী অলঙ্কার ব্যতীত, জুতা-মোজা-ঘাগরার কিছুই ছিল না। বরঞ্চ তাহার সিঁথির সিঁদুর এবং পায়ের আলতা বেশ মোটা করিয়াই দেওয়া, দেখিলে কোনমতেই মনে হয় না এ-সকল সে বিশেষ করিয়া কেবল আজকার জন্যই ধারণ করিয়া আসিয়াছে। সে সুন্দরী সত্য, কিন্তু অসাধারণ নয়। দেহের রঙটা হয়ত একটু ময়লার দিকেই. তবে ধনী-ঘরের মেয়েরা যেমন নিরন্তর মাজিয়া-ঘষিয়া বর্ণটাকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে ইহাও তেমনি—তাহার অধিক নয়। নিমিষের দৃষ্টিপাতেই ষোড়শীর মনে হইল এই ধনী-গৃহিণী ধনের আড়ম্বরেও যেমন তাহার দেহকে বস্ত্রালঙ্কারের দোকান করিয়া সাজায় নাই, লজ্জা এবং নির্লজ্জতা কোনটার বাড়াবাড়িতেও তেমনি তাহার শিশুকালের গ্রামখানিকে বিড়ম্বিত করিয়া তোলে নাই। মেয়েটি নীরবে চাহিয়া রহিল, হয়ত শেষ পর্যন্ত এমনি নীরবেই রহিবে. কিন্তু ইহারই সম্মুখে নিজের আসন্ন দুর্গতির আশঙ্কায় ষোড়শীর লজ্জায় ঘাড় হেঁট হইয়া গেল।

আরও মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিয়া গেলে বৃদ্ধ সর্বেশ্বর শিরোমণি প্রথমে কথা কহিলেন, ষোড়শীকে উদ্দেশ করিয়া অতিশয় সাধুভাষায় তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আজ হৈমবতী তাঁর পুত্রের কল্যাণে যে পুজো দিতেছেন, তাতে তোমার কোন অধিকার থাকবে না. তাঁর এই সংকল্প তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা, তোমাকে দিয়ে তাঁর কার্য সুসিদ্ধ হবে না।

ষোড়শীর মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার গলায় জড়িমা ছিল না। কহিল. বেশ! তাঁর কাজ যাতে সুসিদ্ধ হয় তিনি তাই করুন।

তাহার এই কণ্ঠস্বরের সুস্পষ্টতায় সর্বেশ্বর শিরোমণি নিজের গলাতেও যেন জোর পাইলেন; বলিলেন, কেবল এইটুকুই ত নয়। আমরা গ্রামস্থ ভদ্রমণ্ডলী আজ স্থিরসিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েচি যে. দেবীর কাজ আর তোমাকে দিয়ে হবে না। মায়ের ভৈরবী তোমাকে রাখলে আর চলবে না। কে আছ. একবার তারাদাস ঠাকুরকে ডাক ত?

একজন তাহাকে ডাকিতে গেল। ষোড়শীর মুখে যে প্রত্যুত্তর আসিয়াছিল, তাহার পিতার নামে সেইখানেই তাহা বাধিয়া গেল. সে মুখ তুলিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, কেন চলবে না? কিন্তু বলিয়া ফেলিয়া সে নিজেই যেন চমকিয়া গেল।

ভিড়ের মধ্য হইতে কে একজন কহিল. সে তোমার বাবার মুখেই শুনতে পাবে।

ষোড়শী এ কথার আর কোন উত্তর দিল না. চাহিয়া দেখিল, তাহার পিতা কে-একটি বছর-দশেকের মেয়েকে সঙ্গে করিয়া আসিতেছে, এবং তাহাদের পশ্চাতে আর একটি বয়স্থা স্ত্রীলোক সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। ইঁহাদের কাহাকেও ষোড়শী পূর্বে দেখে নাই, তথাপি বুঝিল উনিই পিসী এবং এই মেয়েটিই সেই অচেনা পিসীর কন্যা।

এ সমস্তই যে রায়মহাশয়ের কৃপায়, তাহা ভিতরে ভিতরে সকলেই জানিত, ষোড়শীরও অজানিত নয়। রায়মহাশয় নীরব থাকিলেও তাঁহার চোখের উৎসাহ পাইয়াও তারাদাস প্রথম কথা কহিতে পারিল না, পরে জড়াইয়া জড়াইয়া যাহা কহিল, তাহারও অধিকাংশ অস্পষ্ট

হইল না, কেবল একটা কাজের কথা বুঝা গেল যে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং ইহাকে সেবায়েত হইতে অপসারিত না করিলে ভাল হইবে না।

ইহাই যথেষ্ট। একটা কলরব উঠিল, অনেকেই রায় দিলেন যে এতবড় গুরুতর ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি খাটিতে পারে না। পারে না তাহা ঠিক। যাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন তাঁহারাও এই সত্যটাই মানিয়া লইলেন। কারণ, কেন পারে না, এমন প্রশ্ন করিবার মত দুঃসাহস কাহারও ছিল না। অথচ আশ্চর্য এই যে, ঠিক তাহাই ঘটিল। কোলাহল থামিলে শিরোমণি এই নিষ্পত্তিটিই বোধ হয় আর একটু ফলাও করিতে যাইতেছিলেন, সহসা একটি মৃদু কণ্ঠস্বর শোনা গেল—বাবা?

সবাই মুখ তুলিয়া চাহিল। রায়মহাশয় নিজেও মুখ তুলিয়া এ-দিকে ও-দিকে চাহিয়া পরিশেষে কন্যার কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিয়া সস্নেহে সাড়া দিলেন, কেন মা?

হৈম মুখখানি আরও একটু বাড়াইয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, সাহেব যে রাগ করেচেন, এ কি ক'রে জানা গেল?

বড়কর্তা প্রথমে একটু বিস্মিত হইলেন, তারপরে বলিলেন, জানা গেছে বৈ কি মা! বেশ ভাল করেই জানা গেছে। বলিয়া তিনি তারাদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

হৈম পিতার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কহিল, পরশু থেকে ত সমস্তই শুনচি বাবা, তাতে কি ওঁর কথাটাই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে?

রায়মহাশয় ইহার ঠিক জবাবটা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিলেন, নয়ই বা কেন শুনি?

হৈম তারাদাসের পুরোবর্তী সেই ছোট মেয়েটাকে দেখাইয়া বলিল, ঐটিকে যখন যোগাড় করে এনেচেন, তখন মিথ্যে বলা কি এতই অসম্ভব বাবা? তা ছাড়া সত্যি-মিথ্যে ত যাচাই করতে হয়, ও-ত একতরফা রায় দেওয়া চলে না।

কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য হইল, এমন কি ষোড়শী পর্যন্ত বিস্মিত-চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। ইহার উত্তর দিলেন সর্বেশ্বর শিরোমণি। তিনি স্মিতহাস্যে মুখখানি সরস করিয়া কহিলেন, বেটী কৌঁসুলির গিন্নী কিনা, তাই জেরা ধরেচে। আচ্ছা, আমি দিচ্চি থামিয়ে। বলিয়া তিনি হৈমর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, এটা দেবীর মন্দির—পীঠস্থান! বলি, এটা ত মানিস?

হৈম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মানি বৈ কি।

শিরোমণি বলিলেন, তা যদি হয়, তা হলে তারাদাস বামুনের ছেলে হয়ে কি দেব-মন্দিরে দাঁড়িয়ে মিছে কথা কইচে পাগলী? বলিয়া তিনি প্রবল হাস্যে সমস্ত স্থানটা গরম করিয়া তুলিলেন।

তাঁহার হাসির বেগ মন্দীভূত হইলে হৈম কহিল, আপনি নিজেও ত তাই শিরোমণি জ্যাঠামশাই। অথচ এই দেবমন্দিরে দাঁড়িয়েই ত মিছে কথার বৃষ্টি করে গেলেন! আমি বলোচি ওঁকে দিয়ে পুজো করালে আমার কাজ সিদ্ধ হবে না, এর বিন্দুবিসর্গও ত সত্যি নয়!

শিরোমণি হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, রায়মহাশয় মনে মনে অত্যন্ত কুপিত হইয়া তীক্ষ্ম-কণ্ঠে বলিলেন, কে তোমাকে বললে হৈম, সত্যি নয়, শুনি?

হৈম একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমিই বলচি, সত্যি নয় বাবা। তার কারণ আমি কখনো অমন কথা বলা ত দূরে, মনেও করিনে। আমি ওকে দিয়েই পুজো করাবো; এতে আমার ছেলের কল্যাণই হোক আর অকল্যাণই হোক। ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনি হয়ত আমাকে চিনতে পারচেন না, কিন্তু আমার আপনাকে তেমনি মনে আছে। চলুন মন্দিরে, আমাদের সময় বয়ে যাচ্চে। বলিয়া সে একপদ অগ্রসর হইয়া বোধ হয় তাহার কাছেই যাইতেছিল, কিন্তু নিজের মেয়ের কাছে অপমানের এই নিদারুণ আঘাতে পিতা ধৈর্য হারাইয়া ফেলিলেন; তিনি অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ভীষণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, কখনো না। আমি বেঁচে থাকতে ওঁকে কিছুতেই মন্দিরে ঢুকতে দেব না। তারাদাস বল ত ওর মায়ের কথাটা! একবার শুনুক সবাই। ভেবেছিলাম ওটা আর তুলতে হবে না, সহজেই হবে।

শিরোমণি সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, না তারাদাস, থাক। ওর কথা

আপনার মেয়ে হয়ত বিশ্বাস করবে না রায়মশাই! ও-ই বলুক। চণ্ডীর দিকে মুখ করে ও-ই নিজের মায়ের কথা নিজেই বলে যাক। কি বলেন চৌধুরীমশাই? তুমি কি বল হে যোগেন ভট্‌চায? কেমন, ও-ই নিজেই বলুক!

গ্রামের এই দুই দিক্‌পালের সাংঘাতিক অভিযোগে উপস্থিত সকলেই যেন বিভ্রান্ত হইয়া উঠিল। ষোড়শীর পাণ্ডুর ওষ্ঠাধর কি একটা বলিবার চেষ্টায় বারংবার কাঁপিতে লাগিল, মুহূর্ত পরে হয়ত সে কি একটা বলিয়াও ফেলিত, কিন্তু হৈম দ্রুতপদে তাহার কাছে আসিয়া হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া শান্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, না, আপনি কিছুতেই কোন কথা বলবেন না। পিতার মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আপনারা ওঁর বিচার করতে চান নিজেরাই করুন, কিন্তু ওঁর মায়ের কথা ওঁর নিজের মুখ দিয়ে কবুল করিয়ে নেবেন, এতবড় অন্যায় আমি কোনমতে হতে দেব না। ওঁরা যা পারেন করুন, চলুন আপনি আমার সঙ্গে মন্দিরের মধ্যে। বলিয়া সে আর কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ষোড়শীকে এক-প্রকার জোর করিয়াই সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল।

আট

মন্দিরের অভ্যন্তরে একপাশে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া ষোড়শী কহিল, না বোন, আমি পুজো করব না।

কেন? বলিয়া হৈম সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, ভৈরবীর মুখ ম্লান, কোনরূপ আনন্দ বা উৎসাহের লেশমাত্র নাই এবং তাহার প্রশ্নের উত্তর সে যেন একটু চিন্তা করিয়াই দিল। কহিল, এর কারণ যদি কখনো বলবার দরকার হয়, সে শুধু তোমাকেই বলব, কিন্তু আজ নয়। তা ছাড়া আমি নিজেও বড়-একটা পুজো করিনে ভাই, যিনি এ কাজ নিত্য করেন তিনিই করুন, আমি কেবল এইখানেই দাঁড়িয়ে তোমার ছেলেকে আশীর্বাদ করি, সে যেন দীর্ঘজীবী হয়, নীরোগ হয়, মানুষ হয়!

সন্তানের প্রতি ভৈরবীর এই ঐকান্তিক আশীর্বচনেও মায়ের মন হইতে অপ্রসন্নতা ঘুচিল না। সে কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, কিন্তু আজকের দিনটা যে একটু অন্যরকমের দিদি! আপনি নিজের হাতে পুজো না করলে যে ওঁদের কাছে ভারী ছোট হয়ে যাবো! বলিয়া সে একবার উন্মুক্ত দ্বার দিয়া বাহিরের বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ষোড়শীর নিজের দৃষ্টিও উহাকে অনুসরণ না করিয়া পারিল না। দেখিল সকলে এই-দিকেই চাহিয়া আছে। তাহাদের চোখ ও মুখের উপর উৎকট কলহের চিহ্ন একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে—ঠিক যেন অধীর সৈনিকের দল কেবলমাত্র তাহাদের অধিপতির ইঙ্গিতের অপেক্ষায় বহু দুঃখে তাহাদের যুদ্ধ-বেগ সংযত করিয়া আছে। কিন্তু রায়মহাশয় সে ইঙ্গিত দিলেন না। তিনি ঘোর সংসারী লোক, মুহূর্তেই বুঝিলেন উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ্যে ধনী কন্যা-জামাতার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। অল্পকালেই তাঁহার রক্তচক্ষু অবনত হইয়া আসিল, এবং কাহাকেও আর একটি কথাও না কহিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া ধীরে ধীরে মন্দির-প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিয়া গেলেন। দুই-চারিজন অনুগত ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তাঁহার সঙ্গ লইল না। বৃদ্ধ শিরোমণিমহাশয় রহিয়া গেলেন, এবং অনেকেই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি গড়ায় জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

হৈম মিনতি করিয়া কহিল, মা-ভৈরবীর আশীর্বাদ আমরা মাতা-পুত্রে মাথায় ক'রে নিলাম, কিন্তু সে আশীর্বাদ আমি আপনাকে দিয়েই পাকা ক'রে নিতে চাই দিদি। বেশ, আমি অপেক্ষা করতে পারব; পুজো আজ বন্ধ থাক—যেদিন আপনি আদেশ করবেন, এই উদ্যোগ-আয়োজন আবার না হয় সেই দিনই হবে।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে সুবিধে আর হবে কিনা এ কথা ত আজ তোমাকে নিশ্চয় করে বলতে পারবো না বোন!

হৈম সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, তবে কি মা-চণ্ডীর ভৈরবী আর আপনি থাকবেন না?

ষোড়শী শুধু বলিল, আজও ত তাই আছি।

হৈম কহিল, তবে? বলিয়াই দেখিতে পাইল দ্বারের চৌকাঠ ধরিয়া শিরোমণি দাঁড়াইয়া

আছেন। চোখাচোখি হইতেই তিনি সদর্পে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিলেন, তোমার বাবা আর আমি সেই কথাই ত এতক্ষণ বকে মরচি গো! ভালো, আমাদের সবুর সইবে। উনি কাল হোক, পরশু হোক, দু'দিন পরে হোক, দশদিন পরে হোক, পুজো করুন। দিন তার জবাব!

হৈম ষোড়শীর মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল, কিন্তু সে তার কোন উত্তর দিল না।

শিরোমণি ভৈরবীর ম্লান-মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সহাস্যে কহিল, মা হৈম, এ ত সোজা প্রশ্ন নয়! এ পীঠস্থান, জাগ্রত দেবতা, দেবীর ভৈরবী ছাড়া এ দেব-অঙ্গ স্পর্শ করা ত যে-সে স্ত্রীলোকের কর্ম নয়! বুকের জোর থাকে, থাকুন উনি মায়ের ভৈরবী—আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা জানি সে আর ওঁর সাধ্যই নেই।

ইঙ্গিতটা এতই সুস্পষ্ট যে লজ্জায় হৈমর পর্যন্ত মাথা হেঁট হইয়া গেল। ষোড়শী নিজেও অভিভূতের মত ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অকস্মাৎ আপনাকে আপনি ধাক্কা মারিয়া যেন সম্পূর্ণ সচেতন করিয়া তুলিল। শিরোমণিকে সে কোন উত্তর করিল না, কিন্তু বুড়ো পুজারীকে হঠাৎ একটা ধমক দিবার মত তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, ছোট ঠাকুরমশাই, তুমি ইতস্ততঃ করচ কিসের জন্যে? আমার আদেশ রইল, দেবীর পুজো যথারীতি সেরে তুমি নিজের প্রাপ্য নিয়ো, বাকী মন্দিরের ভাঁড়ারে বন্ধ করে চাবি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। হৈমর প্রতি চাহিয়া কহিল, অনেক আয়োজন করেচ, এসব নষ্ট করা উচিত হবে না ভাই। আমি আশীর্বাদ ক'রে যাচ্ছি এতেই তোমার ছেলের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে। আমার নিজের পুজো-আহ্নিক এখনো বাকী রয়েচে, আমি এখন চললাম—সময় যদি পাই ত আবার আসব। এই বলিয়া সে আর বাদানুবাদ না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মুহূর্ত-কয়েকের জন্য সকলেই নির্বাক্ হইয়া রহিল, কিন্তু ক্ষণপরেই অপমান ও অবহেলায় বৃদ্ধ শিরোমণি অঙ্কুশ-আহত পশুর ন্যায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বয়সোচিত মর্যাদা-বোধ ও ছদ্ম-গাম্ভীর্য কোথায় ভাসিয়া গেল, দৃষ্টিবহির্ভূত ষোড়শীর উদ্দেশে একটা অভদ্র ইঙ্গিত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, এবার মন্দিরে ঢুকলে গলাধাক্কা খেয়ে মরতে হবে জানিস! নষ্ট মেয়েমানুষ কোথাকার! ভেবেচিস গাঁয়ে মানুষ নেই? আজও জনার্দন রায় বেঁচে, আজও সর্বেশ্বর শিরোমণি মরেনি, তা জানিস!

এই সকল অভিযোগ ও আস্ফালনের প্রতিবাদ করিবার তথায় কেহ ছিল না, বরঞ্চ তাঁহারই পোষকতায় রমণীগণের মধ্য হইতে বর্ষীয়সী কে একজন বলিয়া ফেলিল, হতভাগীকে ঝাঁটা মেরে দূর কর শিরোমণিমশাই! বড় অহঙ্কার! বড় অহঙ্কার! জমিদারের বাগানবাড়িতে একরাত একদিন কাটিয়ে এসে বলে কিনা বাবুর অসুখ হয়েছিল! হয়েই যদি থাকে ত তোর কি! কিন্তু, বলিতে বলিতেই সহসা প্রতিমার প্রতি চক্ষু পড়িতেই তাঁহার ঈর্ষা-পীড়িত উচ্ছৃঙ্খল রসনা চক্ষের পলকে শান্ত ও সংযত হইয়া গেল; নিজের দুই কান তিনি তৎক্ষণাৎ দুই হাতে স্পর্শ করিয়া কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুমিষ্ট ও কোমল করিয়া অতঃপর কহিতে লাগিলেন, মায়ের ভৈরবী, নিন্দে করলে মহাপাপ হবে, নিন্দে আমি করচি নে, কিন্তু তাই বলে কি এতটা ভাল! সাহেব ভালমানুষ, তাই ছেড়ে দিলে, নইলে মিথ্যের দায়ে নিজের বাপের হাতেই যে দাঁড়ি পড়ত!

কিন্তু ইহাতে উপস্থিত কেহই আর কথা যোগ করিল না। ষোড়শী যাহাই করুক সে যে চণ্ডীমাতার ভৈরবী এই সত্যটা হঠাৎ উত্থাপিত হইয়া না পড়িলে কু-কথার প্রবাহটা বোধ করি এমন করিয়া তখনি থামিত না। কিন্তু তাই বলিয়া শিরোমণিমহাশয়ের রাগ পড়ে নাই, তিনি পুনশ্চ কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হৈম মলিন অবসন্ন মুখখানি তুলিয়া আস্তে আস্তে কহিল, ওসব কথা এখন থাক শিরোমণি জ্যাঠামশাই! তাড়াতাড়ি ত নেই—এখন আমার ছেলের পুজোটি হয়ে যাক।

তাই হোক, তাই হোক, বলিয়া শিরোমণি তাঁহার দুঃসহ বিরক্তি ও ক্রোধ তখনকার মত সংবরণ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং হৈম অদূরে একধারে নির্জীবের মত নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। এই লজ্জাকর ও নিরতিশয় অপ্রিয়কর আলোচনা সে এইভাবে বন্ধ করিয়া দিল সত্য, পুরোহিতও সাড়ম্বরে দেবীর পুজো করিয়া দিলেন, কিন্তু হৈম তাহার অন্তরের মধ্যে

উৎসাহ বা আনন্দের লেশমাত্র খুঁজিয়া পাইল না। তাহার পিতা ও লোকগুলোর দুর্ব্যবহারে এবং বিশেষ করিয়া ওই ব্রাহ্মণের জঘন্য ইতরতায় তাহার যেমন বিতৃষ্ণা জন্মিল, ষোড়শীর অদ্ভুত আচরণেও তাহার মনের ভিতরটা তেমনি অজ্ঞাত গ্লানি ও সংশয়ের ব্যথায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিল। তথাপি পুরোহিতের কাজটা কলের মত অবাধে চলিল। জাগ্রত দেবতার পূজা, বলিদান, হোম প্রভৃতি যাহা কিছু অনেক সময় লইয়া সমস্তই ধীরে ধীরে সমাধা হইয়া আসিল, তাহার পুত্রের কল্যাণে শুভকর্মে কোথাও কোন বিঘ্নই ঘটিল না, কিন্তু ষোড়শী আর ফিরিল না।

দাসীর ক্রোড়ে ছেলেকে দিয়া হৈম যখন বাড়ি ফিরিয়া আসিল তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। আসিয়া দেখিল তাহার পিতা কিংবা শিরোমণিমহাশয় কেহই এতক্ষণ আলস্যে সময় কাটান নাই। বাহিরের বসিবার ঘরে তুমুল কোলাহল হইতেছে। তাহার প্রাবল্য দেখিয়া সহজেই বুঝা গেল একযোগে অনেকগুলি বক্তাই স্ব স্ব মন্তব্য প্রকাশের প্রয়াস করিতেছেন। অলক্ষ্যে কোনমতে পাশ কাটাইয়া তাহার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পিতার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না; তিনি হাত নাড়িয়া আহ্বান করিয়া কহিলেন, হৈম, এদিকে একবার শুনে যা ত মা?

সে ক্লান্তদেহে মলিনমুখে ধীরে ধীরে গিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই দেখিল তথায় একটিমাত্র প্রাণী নীরবে বসিয়া আছেন, যাঁহাকে শ্রোতা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে—সে তাহার স্বামী মিস্টার এন. বসু, ব্যারিস্টার। সকলের সমবেত বক্তৃতার উপলক্ষ একমাত্র তিনিই। বেলা দেড়টার ট্রেনে তাঁহার আসিবার একটা কথা ছিল বটে, কিন্তু ঠিক কিছু ছিল না। স্বামীকে দেখিয়া সে মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্বারের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পিতা সস্নেহ অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, তখন না বুঝে-সুঝে আমাদের কথায় হঠাৎ রাগ করে ফেললে মা, কিন্তু এখন নিজের কানেই ত সব শুনলে? ব্যাপার বুঝতে ত আর তোমার বাকী নেই, এখন তুমিই বল দেখি মা, অমন মেয়েমানুষকে কি ঠাকুর-দেবতার স্থানে রাখা যায়? এ ত ছেলেখেলা নয়!

হৈম অত্যন্ত মৃদুস্বরে জবাব দিল, আপনারা যা ভাল বোঝেন করুন।

তাহার পিতা হাস্য করিলেন, কহিলেন, করব বৈ কি মা, করব বৈ কি! করতেই ত গিয়েছিলাম। নির্মল এসেচে ভালই হয়েচে। যদি একটা মামলা-মকদ্দমাই বাধে ত বল পাওয়া যাবে। অপর পক্ষে বোধ করি তিনি জমিদারের সাহায্যের আশঙ্কাই করিলেন, কিন্তু শিরোমণি খামকাই উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং হাঁকিয়া কহিলেন, ঘাড় ধরে বার করে দেব তার আবার নালিশ-ফরিয়াদ কি হে জনার্দন! জামাইবাবাজী যখন উপস্থিত আছেন, তখন তিনিই বিচার করুন। তিনিই আমাদের জজ, তিনিই আমাদের ম্যাজিস্টর! আমরা অন্য জজ-ম্যাজিস্টর মানিনে। কি বল হে যোগেন ভায়া? তুমি কি বল হে মিত্তিরজা? এই বলিয়া তিনি কয়েকজনের মুখের প্রতি সস্মিত দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন। এ ক্ষেত্রে যোগেন ভায়া ও মিত্তিরজার সম্মতি গ্রহণের তাৎপর্য ঠিক বুঝা গেল না, কিন্তু এটা বুঝা গেল, বড়লোক এবং দানশীল জামাইবাবাজী বিচার করুন, আর না করুন, ভবিষ্যতে তাঁহার অনুগ্রহলাভের পথটা শিরোমণি নিজের জন্য কথঞ্চিৎ প্রশস্ত এবং সুগম করিয়া রাখিলেন।

এই জামাইবাবাজী মানুষটির মাথার ডগা হইতে জুতার তল পর্যন্ত সমস্তই নিষ্কলঙ্ক সাহেবী। সুতরাং প্রত্যুত্তরে মৃদু-মধুর হাসিয়া তিনিও যে জবাবটুকু দিলেন তাহাও নিখুঁত সাহেবী। কহিলেন, এই সব মোহন্ত-মোহন্তানী জাতের লোকগুলোর ব্যাপার সবাই জানে, এরা যেমন অসাধু তেমনি অসচ্চরিত্র। এদের অসাধ্য কাজ নেই। কোন কারণেই এদের প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত। কিন্তু আপনাদের ভৈরবীটি ঠিক কি করেচেন না-করেচেন সেটাও নিশ্চিত জানা উচিত।

শিরোমণি বলিয়া উঠিলেন, বাবা নির্মল, জানার আর বাকী কোথাও কিছুই নেই—কি বল মা, এখনও কি তোমার সন্দেহ আছে? তা ছাড়া তার মা—সেই যে একটা মস্ত কথা। এই বলিয়া তিনি হৈমর দিকে বিশেষ একটু কটাক্ষ করিলেন।

হৈম অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার সলজ্জ নীরবতায় ইহাই সকলে অনুভব

করিলেন যে, সে ভৈরবীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ করিতে লজ্জা এবং সঙ্কোচ বোধ করিতেছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে ভাল কথা বলিবারও তাহার কিছু নাই।

জনার্দন কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মা, সমস্ত দিন উপোস ক'রে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে, যাও, তুমি বাড়ির ভেতরে যাও। ভৈরবীকে ডাকতে লোক পাঠানো হয়েচে, যদি আসে ত তোমাকে খবর দেবো।

হৈম চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে যে লোকটা ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া যাহা জানাইল তাহার সারমর্ম এই যে, ভৈরবী কেবল যে তাহার প্রজা দিগম্বর ও বিপিনকে দিয়া তালা ভাঙ্গাইয়া সমস্ত ঘরগুলা দখল করাইয়া লইয়াছেন তাই নয়, রায়মহাশয়ের হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া এখানে আসিতেও সম্মত হন নাই। শুধু কেবল ফকির-সাহেবের অনুরোধেই অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন। বোধ হয় দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই আসিতে পারেন।

বোধ হয় আসিতে পারেন! তা বটে! জ্বলন্ত অঙ্গারে ঘৃতাহুতি পড়িল এবং সামান্য একটা স্ত্রীলোকের অভাবনীয় দুঃসাহস ও স্পর্ধায় সম্ভ্রান্ত পুরুষগুলির মুখ দিয়া যে-সকল শব্দ ও বাক্যাবলীর প্রবাহ নিঃসৃত হইল তাহার আদ্যোপান্ত উল্লেখ না করিয়াও একটা কথা বলা আবশ্যক যে, এই ভ্রষ্টা নারীকে কেবল এই মুহূর্তেই গ্রাম হইতে বিদূরিত করা নয়, ইহাকে তালাভাঙ্গা ও অনধিকার-প্রবেশের জন্য পুলিশের হাতে দিয়া জেল খাটানোর প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা অসংশয়ে প্রকাশ করিলেন। শুধু জামাতাবাবাজীই এই কোলাহলে যোগদান করিলেন না, খুব সম্ভব, তিনি তাঁহার সাহেবী ও ব্যারিস্টারী এই উভয় মর্যাদা রক্ষা করিতেই গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কোলাহল কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে জামাতা-সাহেব প্রশ্ন করিলেন, এই ফকির-সাহেবটি কে? হঠাৎ ইনি জুটলেন কি করে?

ইহার সম্বন্ধে নানা জনে নানা অভিমত প্রকাশ করিলেন। শিরোমণি তাহার সারোদ্ধার করিয়া কহিলেন, ভালো না ছাই! মোচলমান আবার সিদ্ধপুরুষ! সেসব কিছু নয়, তবে লোকটা কারও মন্দ-টন্দ করে না। বারুইয়ের ওপর একটা বটগাছের তলায় আড্ডা; অনেককাল আছে—তবে মাঝে মাঝে কোথায় যায়, আবার আসে। বছর-দুই ছিল না, আবার শুনচি নাকি দিন পাঁচ-ছয় হ'লো ফিরেচে। হয়ত ওরই মতলবে তালা ভেঙ্গেচে। বলা কিছু যায় না—হাজার হোক ম্লেচ্ছ ত!

জামাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আজ এলেন কি করে?

তারাদাস এতক্ষণ নীরবেই ছিল, এবার কথা কহিল। বলিল, ও-পারের ওই বটগাছের সঙ্গে জায়গাগুলো সব মা-চণ্ডীর। তাই থেকে আলাপ। ফকির-সাহেব ষোড়শীকে বড় ভালবাসেন, থাকলে ওখানে ষোড়শী প্রায়ই যায়। তাঁর কাছে পড়াশুনোও করে দেখেচি।

জামাই-সাহেব একটু হাসির ভাবে কহিলেন, ভালবাসে! বিদ্যাচর্চাও চলে! এই ফকির-সাহেবটির বয়স কত?

তারাদাস লজ্জিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে, বুড়োমানুষ তিনি। বয়স ষাট-বাষট্টির কম নয়, মা বলে ডাকেন। একবার ষোড়শীর ভারী অসুখ হয়েছিল—প্রায় মরতে বসেছিল—উনিই ভাল করেন।

সাহেব কহিলেন, ওঃ—তাই নাকি! তবে কি জানো বাপু, ওদিকেও সাধু-ফকির, এদিকেও ডাকিনী-যোগিনী! এই-সব ভৈরব-ভৈরবীর দলটিকে—কিন্তু শেষ করিতে পারিলেন না। হঠাৎ স্ত্রীর মুখের একাংশে চক্ষু পড়িয়া এই বেফাঁস কথাটা ওখানেই রহিয়া গেল। আর কেহই কথা যোগ করিল না, কেবল অপ্রতিহত-গতি শিরোমণি নিবৃত্ত হইলেন না। অপরাধের বাকীটুকু সদম্ভে সম্পূর্ণ করিয়া দিয়া তিনিই কেবল বলিয়া উঠিলেন, একশো-বার বাবাজী, একশো-বার! এই-সব ভণ্ড বেটা-বেটীরা যেমন নষ্ট তেমনি ভ্রষ্ট। তিনি বাম ও দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিয়া বোধ করি তাঁহার যোগেন ভায়া ও মিত্তিরজার মাথা-নাড়াটাও অন্ততঃ প্রত্যাশা করিলেন। কিন্তু এবার তাহারাও নির্বাক্ রহিল, এবং দ্বারের অন্তরাল-বর্তিনী হৈমবতীর শুষ্ক মুখখানি ক্ষণেকের জন্য একেবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে ভৈরবীকে সঙ্গে করিয়া, সেই ভণ্ড মুসলমান ফকির ধীর-পদক্ষেপে প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কাহারও সংশয় রহিল না যে শিরোমণির উচ্চকণ্ঠ তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে।

অনতিবিলম্বে উভয়ে যখন নিকটে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন কাহারও মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। একটা অভ্যর্থনা না, বসিতে বলার একটা সামান্য ভদ্রতা-রক্ষা পর্যন্ত না। অথচ মনে মনে সকলেই যেন বিশেষ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। শিরোমণির পর্যন্ত মনে হইতে লাগিল, কি যেন ঠিক হইল না—কিসে যেন ভারী একটা ত্রুটি হইয়াছে অথচ সবাই তেমনিই বসিয়া রহিলেন।

মিস্টার বসুসাহেবের কাছে উভয় আগন্তুকই একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মিনিট দুই-তিন তীক্ষ্নদৃষ্টি দ্বারা তিনি দুইজনকেই আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিলেন। এই ফকিরটির মাথার চুল হইতে দীর্ঘ দাড়ি-গোঁফ সমস্তই একেবারে তুষার-শুভ্র, অঙ্গে মুসলমান ফকিরের সাধারণ পোশাক। সচরাচর যাহা দেখা যায় তাহার অধিক কিছু নয়, অথচ মনে হয় এই সবল সুদীর্ঘ দেহের উপরে এগুলি সমস্ত যেন তাদের সামান্যতাকে বহু ঊর্ধ্বে অতিক্রম করিয়া গেছে। তাঁহার গায়ের রঙ জলে ভিজিয়া এবং রৌদ্রে পুড়িয়া এমন একপ্রকার হইয়াছে, যাহা আগে কি ছিল কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ফকিরের মুখ ও চোখের উপর সামান্য একটুখানি উৎকণ্ঠিত কৌতূহলের ছায়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আরও একটু মন দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, ইহারই অন্তরালে যে চিত্তখানি বিরাজ করিতেছে, তাহা যেমন শান্ত তেমনি নিরুদ্বেগ এবং তেমনি ভয়হীন। ইঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল ষোড়শী। তাহার গৈরিক বস্ত্র, তাহার সুন্দর সুগঠিত, অনাবৃত মাথাটি ভরিয়া রুক্ষ বিস্রস্ত কেশ-ভার, তাহার উপবাস-কঠিন, যৌবন-সন্নদ্ধ দেহের সর্বপ্রকার বাহুল্যবর্জিত আশ্চর্য সুষমা, সর্বোপরি তাহার নত-নেত্রের অপরিদৃষ্ট বেদনার অনন্ত ইতিহাস—সমস্ত একসঙ্গে মিশিয়া ক্ষণকালের জন্য সাহেবকে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

এই আচ্ছন্ন ভাবটা তাঁহার কাটিয়া গেল ফকিরের একটা কথার ধাক্কায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দুর্বলতায় তিনি অকারণ লজ্জিত হইয়া তাঁহার কথার জবাবে খামকা রূঢ় হইয়া উঠিলেন। ফকির নিজেদের প্রথামত অভিবাদন করিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুসাহেব, আপনি কি ডেকে পাঠিয়েছিলেন? বাবুসাহেব তখন উত্তর দিলেন, তোমাকে ডেকে পাঠাই নি, তুমি যেতে পারো।

ফকির রাগ করিলেন না। একটু হাসিয়া ষোড়শীকে দেখাইয়া শান্তস্বরে বলিলেন, আসামীকে কিন্তু আমিই হাজির করেচি বাবুসাহেব। উনি ত আসতেই চাননি। নেহাত দোষ দেওয়াও যায় না, কারণ সবাই মিলে হট্টগোল করে যে বিচার তাতে বিচারের চেয়ে অবিচারই বেশী হয়। আর সেও ত সকালবেলাই একদফা সাঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু আপনার নাম শুনে আমি বললুম, চল মা, আমরা যাই। তিনি আইনজ্ঞ মানুষ, তাতে বাইরের লোক—যদি সম্ভব হয় তিনি সুমীমাংসাই করে দেবেন।

ব্যারিস্টার-সাহেব মনে মনে বুঝিলেন, এই ফকিরের সম্বন্ধে তিনি ভুল ধারণা করেন নাই। ইনি যেই হোন, অশিক্ষিত সাধারণ ভিক্ষুক-শ্রেণীর নয়। সুতরাং প্রত্যুত্তরে তাঁহাকেও কতকটা ভদ্র হইতে হইল; কহিলেন, এঁরা ত তালা-ভাঙ্গা এবং অনধিকার প্রবেশের জন্য পুলিশের হাতে দিয়ে ওঁকে প্রথমটা জেল খাটিয়ে নিতে চান। আর শুনলাম তালা-ভাঙ্গা নাকি আপনার হুকুমেই হয়েচে।

ফকির হাসিয়া কহিলেন, ওরে বাপ রে, একা কেবল অপরাধী নয়, তার সঙ্গে আবার তার সাহায্যকারী! কিন্তু বাবুসাহেব, আমি শুধু তালা ভাঙ্গবারই মতলব দিয়েচি, কিন্তু আইন ভাঙ্গবার পরামর্শ দিইনি। বাড়িটা দেবোত্তর সম্পত্তি, এবং মা ভৈরবীই তার অভিভাবিকা। তারাদাস খামকা যদি তালা বন্ধ না করতে যেতেন ত ভাল ভাল তালাগুলো এমন ভেঙ্গে নষ্ট করতে হ'তো না। তারাদাসের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তারাদাস, ও-বুদ্ধি তোমাকে কে দিয়েছিলেন বাবা? কিন্তু যেই দিন সুবুদ্ধি দেননি।

তারাদাস ইহার উত্তর দিতে পারিল না, এবং অন্য কেহও যখন কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না, নির্বাক্ হইয়া রহিল, তখন শিরোমণি সাড়ম্বরে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, ওকে

ভৈরবী কে করেছিল জানেন ফকির-সাহেব? সে ওই তারাদাস। এখন ও যদি ওকে না রাখতে চায় ত সে তার ইচ্ছা। এই আমার মত।

ফকির কহিলেন, শিরোমণিমশাই, মতটাও আপনার বটে, ইচ্ছাটাও তারাদাসের সত্য, কিন্তু সম্পত্তিটা অন্যের। এই অন্য লোকটি এ দুটোর কোনটাতেই সম্মত নয়! কি করবেন বলুন!

তাঁহার উত্তর এবং সেটা বলিবার ভঙ্গীতে ব্যারিস্টার-সাহেব হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, এদের নালিশ এই যে, বর্তমান ভৈরবী যে অপরাধ করেছেন তাতে দেবীর সেবায়েত হবার সম্পূর্ণ অনধিকারী। উনি তার কিছু সাফাই দিতে পারেন কি? বলিয়া তিনি ষোড়শীর আনত মুখের প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইলেন।

ফকির কহিলেন, ওঁকে আসামী করেই আপনাদের সুমুখে দাঁড় করিয়েচি, আবার অপরাধ অপ্রমাণ করবার বোঝাটাও ওঁকেই বইতে অনুরোধ করব, এতবড় জুলুম ত আমি পেরে উঠব না বাবুসাহেব।

ব্যারিস্টার-সাহেব মনে মনে লজ্জিত হইয়া নীরব হইলেন, কিন্তু শিরোমণি তীক্ষ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী যে ভৈরবীকে পেয়াদা দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে সারারাত আটক রেখেছিল, সে আমরা সবাই জানি, তবে কেন সে সকালে ম্যাজিস্টার-সাহেবের কাছে মিছে কথা বললে যে, সে স্ব-ইচ্ছায় গিয়েছিল, আর জমিদারের অসুখ হ'লো বলেই সমস্ত রাত্রি নিজের ইচ্ছায় সেখানে ছিল! ও যদি নিষ্পাপ ত এ কথার জবাব দিক।

ফকির জবাব দিলেন, কহিলেন, জমিদারের অত্যাচার ও অনাচারে উনি যে রাগের মাথায় নিজেই গিয়েছিলেন এ কথা ত মিথ্যে নয় শিরোমণিমশাই? এবং তিনি যে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়েছিলেন, এ ঘটনাও সত্য।

জনার্দন রায় এতক্ষণ নীরবেই সমস্ত বাদানুবাদ শুনিতেছিলেন, আর সহিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, এই যদি সত্য হয় ফকির-সাহেব, ত নিজের বাপের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীকে বাঁচাবার কি প্রয়োজন হয়েছিল? তাঁর অসুখ ত ওঁর কি? অসুখে সেবা করবার জন্য ত বীজগাঁয়ের জমিদার পালকি পাঠিয়ে নিয়ে যায়নি? মোট কথা আমরা ওকে রাখব না—আমরা ভিতরের ব্যাপার জানি। তা ছাড়া, ওর যদি কিছু বলবার থাকে ওকেই বলতে দিন। আপনি মুসলমান, বিদেশী, আপনার ত হিন্দুধর্মের মাঝখানে পড়ে মধ্যস্থ হবার দরকার নেই!

তাঁহার কথার ঝাঁজ এবং তীক্ষ্নতা কিছুক্ষণ অবধি যেন ঘর ভরিয়া রিরি করিয়া বাজিতে লাগিল। ব্যারিস্টার-সাহেব নিজেও কেমন একপ্রকার অস্বচ্ছন্দ এবং অপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন, এবং বাক্যহীনা ভৈরবীর নিস্তব্ধ বক্ষঃকুহরেও কি একটা উত্তর বাহিরে আসিবার জন্য বারবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহারই চিহ্ন ফকির-সাহেব ষোড়শীর মুখের উপরে চক্ষের পলকে অনুভব করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন, তার পরে জনার্দন রায়কে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, রায়মশায়, অনেকদিনের কথা হ'লো, আপনার হয়ত মনে নেই, মন্দিরের দক্ষিণে ঐ যে বুড়ো নিমগাছটা, তারই তলায় তখন থাকি। ষোড়শী তখন এতটুকু মেয়ে, তখন থেকেই মা বলে ডাকি—মুসলমান হয়েও যে ভুলটা করে ফেলেচি সেটা আজ আমাকে মাপ করতে হবে। সেই মায়ের এতবড় বিপদে কি না এসে থাকতে পারি? মা জিনিসটা ত তুচ্ছ নয়! তা না হলে আজই সকালে যখন ওঁরই মুখ থেকে ওঁর মায়ের লজ্জার কাহিনী টেনে বার করতে চেয়েছিলেন, তখন আপনার নিজের ওই মা'টির কাছে ধমক খেয়ে অমন বিহ্বল ব্যাকুল হতে আপনাকে হ'তো না। এই বলিয়া ফকির দ্বারসংলগ্ন মূর্তিবৎ স্থির হৈমবতীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন।

হতবুদ্ধি জনার্দন হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া কহিলেন, ওসব বাজে কথা।

ফকির তেমনি হাসিমুখে বলিলেন, পাকা বীজও পাথরের উপর পড়ে বাজে হয়ে যায়, আমার এতটা বয়সে সে আমি জানতুম। আমি কাজের কথাও বলচি। ওই মহাপাপিষ্ঠ জমিদারটিকে কেন যে মা আমার বাঁচাতে গেলেন সে আমিও জানিনে—জিজ্ঞেস করেও জবাব পাইনি। আমার বিশ্বাস, কারণ ছিল—আপনাদের বিশ্বাস সেই হেতুটা মন্দ। এখানে মাতঙ্গিনী ভৈরবীর কথাটা তুলতে পারতুম, কিন্তু একজনের ভাল করবার জন্যেও অন্যের

স্নানি করা আমাদের ধর্মে নিষেধ, তাই আমি সে নজির দেব না। কিন্তু আপনাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে রায়মশায়। এ যদি কেবল তারাদাসের সঙ্গেই হ'তো, হয়ত আমি মাঝে পড়তে যেতাম না, কিন্তু আপনারা, বিশেষ করে আপনি নিজে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন, কিসের জন্য শুনি? ষোড়শী ত একা নয়, আরও অনেক মেয়ে আছে। গ্রামের বুকের মধ্যে বসে লোকটা যখন রাত্রির পর রাত্রি মানুষের মান-ইজ্জত অপহরণ করছিল, তখন কোথায় ছিলেন শিরোমণি, কোথায় ছিলেন জনার্দন রায়? সে যখন গরীবের সর্বস্ব শোষণ করে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করে নিয়ে গেল, তার কতখানি বুকের রক্ত আপনি তাদের জমি-জমা, বাড়ি-ঘর-দ্বার বাঁধা রেখে যুগিয়েছিলেন শুনি? কিন্তু থাক রায়মশায়, আপনার মেয়ে-জামাই দাঁড়িয়ে আছেন, তাদের চোখের সুমুখে আর আপনার মহাপাপের ভরা উন্মুক্ত করে ধরব না।

এই বলিয়া সেই মুসলমান ফকির নীরব হইলেন, কিন্তু তাঁহার নিদারুণ অভিযোগের শেষ বাক্যটা যেন শেষ হইয়াও নিঃশেষ হইল না। কাহারও মুখে কথা নাই, সমস্ত ঘরটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, কেবল একটা তীব্র কণ্ঠের রেশ যেন চারিদিকের প্রাচীর হইতে বারংবার প্রতিহত হইয়া কেবল ধিক্! ধিক্! করিতে লাগিল।

হৈম কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র করিল না; নীরবে নতমুখে ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল, এবং ব্যারিস্টার-সাহেব সেইখানে তাঁহার চৌকির উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

ফকির ভৈরবীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, মা, চল আমরা যাই। এই বলিয়া তিনি আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন সদর দরজার একপাশে দাঁড়াইয়া হৈম। তাহার দুইচক্ষু ছলছল করিতেছে; সে অশ্রু-সজল দৃষ্টি ফকিরের মুখের প্রতি তুলিয়া কহিল, বাবা, আমার স্বামীকে আপনি মাপ করুন।

ফকির বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন মা?

হৈম তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, আমার স্বামীকে নিয়ে যদি আপনার আশ্রমে যাই আপনি দেখা করবেন?

এবার ফকির হাসিলেন; তারপরে স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, করব বৈ কি মা! তোমাদের দুজনের নিমন্ত্রণ রইল, সময় পেলে যেয়ো।

নয়

মন্দির-সংক্রান্ত গোলযোগটা যে ওখানেই মিটিয়া শেষ হইয়া গেল না ষোড়শী তাহা ভাল করিয়াই জানিত; কিন্তু বিপত্তি যেদিক দিয়া তাহাকে পুনশ্চ আক্রমণ করিল তাহা সম্পূর্ণ অভাবনীয়। এখানে থাকিলে ফকির-সাহেব মাঝে মাঝে এমন আসিতেন বটে, কিন্তু মাত্র কাল সন্ধ্যাকালে তিনি গিয়াছেন, মাঝে একটা দিন কেবল গিয়াছে, আবার আজই প্রত্যুষে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, এইরূপ তাঁহার কোনদিন নিয়ম নয়। ষোড়শী সেইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়া নিত্যক্রিয়াগুলি সারিয়া লইতে ঘরে ঢুকিতেছিল, অসময়ে হঠাৎ তাঁহাকে দেখিয়া চিন্তিত হইল। তাড়াতাড়ি প্রণাম করিয়া, একটা আসন পাতিয়া দিয়া উদ্বিগ্ন-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, এত সকালে যে?

তিনি উপবেশন করিয়া একটু হাসির চেষ্টা করিয়া কহিলেন, ফকির মানুষ, সংসারে সুখ-দুঃখের ধার বড় ধারিনে মা, তবুও কাল রাত্রিটায় ভাল করে ঘুমোতে পারিনি, ষোড়শী, দেহধারণের এমনই বিড়ম্বনা। কবে যে এটা মাটির তলায় যাবে!

ষোড়শী শারীরিক পীড়ার কথাই মনে করিয়া কহিল, আপনার কি কোন অসুখ করেছে?

ফকির ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না আমার শরীর ভালই আছে। কাল বিকেলে এঁরা সকলেই আমার কুটীরে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, সঙ্গে জামাইবাবু-সাহেবও ছিলেন,

এককড়িও ছিল। তাকে চিনি এই যা—নইলে সে অনেক কথাই বললে। তবুও দু-একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলাম না মা!

ষোড়শী কহিল, বলুন।

ফকির বলিলেন, দেখ মা, আমি মুসলমান, তোমাদের দেব-দেবীর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল থাকা উচিতও নয়, নেইও—কিন্তু তোমাকে আমি মা বলে ডাকি; তুমি কি জানিয়েছ স্বহস্তে আর কখনো চণ্ডীর পূজো করতে পারবে না?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, এ কথা সত্য।

ফকির বলিলেন, কিন্তু এতকাল ত তোমার সে বাধা ছিল না?

ইহার উত্তরে ষোড়শী যখন মৌন হইয়া রহিল, তখন তিনি কহিলেন, যাঁরা তোমাকে চান না তাঁরা যদি তোমার এই নূতন আচরণটা মন্দ বলেই গ্রহণ করেন, তাতে ত কোন জবাব দেওয়া যায় না ষোড়শী?

ইহারও কোনরূপ সদুত্তর দিবার চেষ্টা না করিয়া ষোড়শী যখন তেমনি নীরব হইয়া রহিল, তখন ফকিরের মুখও অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল; তিনি নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, এর কারণ বলবার হলে তুমি আমাকে নিশ্চয়ই বলতে। এ ছাড়া এককড়ি আরও একটা কথা বললে। সে বললে, জমিদারবাবু ভারী আশা করেছিলেন, তুমি তার সঙ্গে যাবে। এমন কি, আর একটা পালকি আনিয়ে যাই যাই করেও তাঁর শেষ পর্যন্ত ভরসা ছিল হয়ত তুমি ফিরে আসবে।

এবার ষোড়শী কথা কহিল, বলিল, তাঁর আশা-ভরসার জন্যও কি আমাকে দায়ী হতে হবে?

ফকির তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, নিশ্চয় না, নিশ্চয় না। কিন্তু কথাটা শুনতেও নাকি বিশ্রী, তাই উল্লেখ করলাম। আচ্ছা মা, যে ব্যাপারটায় সকল কুৎসিত কথার সৃষ্টি তার যথার্থ হেতুটা কি তুমি আমাকে বলতে পারো না? ও লোকটাকে যে তুমি কেন এমন করে বাঁচিয়ে দিলে এর কোন মীমাংসাই ত খুঁজে পাইনে ষোড়শী?

ষোড়শীর প্রথমে মনে হইল এ প্রশ্নেরও সে কোন উত্তর দিবে না, কিন্তু বৃদ্ধের উদ্বিগ্ন মুখের স্নেহ-করুণ চোখ-দুটির প্রতি চাহিয়া সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল, ফকির-সাহেব, ওই পীড়িত লোকটিকে জেলে পাঠানোই কি উচিত হ'তো?

ফকির বিস্মিত হইলেন, মনে মনে বোধ করি বা একটু বিরক্তও হইলেন, বলিলেন, সে বিবেচনার ভার ত তোমার নয় মা, সে রাজার। তাই তাঁর জেলেও হাসপাতাল আছে, পীড়িত অপরাধীরও তিনি চিকিৎসা করান। কিন্তু এই যদি হয়ে থাকে, তুমি অন্যায় করেচ বলতে হবে।

ষোড়শী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ফকির বলিলেন, যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে এর ত্রুটি শুধরে নিতে হবে।

ষোড়শী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তার অর্থ?

ফকির বলিলেন, ওই লোকটার অপরাধ ও অত্যাচারের অন্ত নেই, এ ত তুমি জানো! তার শাস্তি হওয়া উচিত।

এবার ষোড়শী বহুক্ষণ পর্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি সমস্ত জানি। তাঁকে শাস্তি দেওয়াই হয়ত আপনাদের উচিত, কিন্তু আমার কথা কাউকে বলবার নয়—তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আমি কোনদিন পারব না।

ফকির কহিলেন, ব্যাপার কি ষোড়শী?

ষোড়শী অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারও মুখ দিয়া কোন বাক্যই বাহির হইল না। দাসী সংসারের কাজ করিতে আসিতেছিল, দ্বারের কাছে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ফকির আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, এখন তা হলে আমি চললাম।

ষোড়শী কেবল হেঁট হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল; তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

তাঁহার প্রশান্ত মুখের গম্ভীর বিষণ্ণতাই শুধু যে কেবল ষোড়শীর সমস্তদিন সকল কাজকর্মের মধ্যেই যখন-তখন মনে হইতে লাগিল তাই নয়, যে অনুচ্চারিত বাক্য তিনি সহসা দমন করিয়া লইয়া নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন, তাহাও নানা আকারে নানা ছন্দে তাহার কানে বাজিতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল এই সাধু ব্যক্তি যে শ্রদ্ধা, যে স্নেহ এতদিন তাহার প্রতি ন্যস্ত রাখিয়াছিলেন ঠিক কিছু না জানিয়াও আজ যেন তাহাকে খর্ব করিয়া লইয়া গেলেন। এই ক্ষতি যে কত বড়, তাহার পরিমাণ সে নিজে ছাড়া আর কেহই অধিক জানিত না। কিন্তু তথাপি ইহাকে ফিরিয়া পাইবারও কোন পন্থা তাহার চোখে পড়িল না। তাহার বাল্য ইতিহাস কাহারও কাছে ব্যক্ত করা চলে না, এমন কি এই ফকিরের কাছেও না। কারণ ইহাতে যে-সকল পুরাতন কাহিনী উঠিয়া পড়িবে তাহা মেয়ের পক্ষে যতবড় লজ্জার কথাই হোক, তাহার যে মা আজ পরলোকে তাঁহাকেই সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে একেবারে পথের ধূলায় টানিয়া আনা হইবে। এবং এইখানেই ইহার শেষ নয়। স্বামিস্পর্শ ভৈরবীর একান্ত নিষিদ্ধ। কত যুগ হইতে এই নিষ্ঠুর অনুশাসন ইহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া আসিতে হইয়াছে। সুতরাং ভালমন্দ যাই হোক, জীবানন্দের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া একটা রাত্রির জন্যও তাহাকে যে-হাত দিয়া তাঁহার সেবা করিতে হইয়াছে, সেই হাত দিয়া আর যে দেবীর সেবা করা চলিবে না তাহা নিশ্চিত, অথচ এইখানেই এই দেবীর প্রাঙ্গণতলেই তারাদাস যখন তাহাকে অজ্ঞাতকুলশীল একজনের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল তখন সে কোন আপত্তিই করে নাই; এবং সমস্ত জানিয়াও যে সে নিঃসঙ্কোচে এতকাল ভৈরবীর কার্য করিয়া আসিয়াছে, ইহার জবাবদিহি আজ যদি সমস্ত ক্রুদ্ধ হিন্দুসমাজের কাছে করিতে হয়, ত সে যে কি হইবে সে তাহার চিন্তাতীত। আবার এ-সকল ত গেল কেবল একটা দিকের কথা, কিন্তু যে দিকটা একেবারেই তাহার আয়ত্তাতীত, তথায় কি যে হইবে সে তাহার কি জানে? যে জীবানন্দ একদিন তাহাদের বিবাহটাকে কেবল পরিহাস করিয়া গিয়াছিল, সে যদি আজ সমস্ত ইতিহাসটাকে নিছক গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেয়, ত তাহাকে সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে সে নিজে ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জীবিত নাই।

গৃহস্থালী-সম্বন্ধে রানীর মায়ের দুই-একটা কথার উত্তরে ষোড়শী কি যে জবাব দিল তাহার ঠিকানা নাই। মন্দিরের পুরোহিত কি একটা বিশেষ আদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়া অন্যমনস্ক ভৈরবীর কাছে কি যে হুকুম পাইল তাহা ভাল বুঝিতেই পারিল না। নিত্যনিয়মিত পূজা-আহ্নিকে বসিয়া আজ ষোড়শী কোনমতেই মনস্থির করিতে পারিল না, অথচ যে জন্য তাহার সমস্ত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত এবং চঞ্চল হইয়া রহিল, তাহার যথার্থ রূপটাও তাহাকে ধরা দিল না—কেবলমাত্র কতকগুলো অস্ফুট অনুচ্চারিত বাক্যই সমস্ত সকালটা একটা অর্থহীন প্রলাপে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। রান্নার উদ্যোগ-আয়োজন পড়িয়া রহিল, সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল না—এ সকল তাহার ভালই লাগিল না। এমনি করিয়া সমস্ত দিনটা যখন কোথা দিয়া কিভাবে কাটিয়া গেল, একপ্রকার ঘোলাটে মেঘলায় শীতের দিনের অপরাহ্ণ যখন অসময়েই গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল, তখন সে একাকী ঘরের মধ্যে আর থাকিতে না পারিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া আসিল, এবং ফকির-সাহেবকে স্মরণ করিয়া বারুইয়ের পরপারে তাঁহারই আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করিল। এমন অনেকদিন হইয়াছে সে একটুখানি ঘুরিয়া তাহার অনুগত বিপিন কিংবা দিগম্বরকে তাহাদের বাটীর সম্মুখ হইতে ডাক দিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছে; কিন্তু আজ পাড়ার পথ দিয়া তাহাদিগকে ডাকিতে যাইতে তাহার সাহসও হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না—একাকীই মাঠের পথ ধরিয়া নদীর অভিমুখে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল। তাহার মনেও পড়িল না যে, ঘরগুলো খোলাই পড়িয়া রহিল।

এই পথটা বেশী নহে, বোধ করি অর্ধ ক্রোশের মধ্যেই, এবং নদীতেও এমন জল এ-সময়ে ছিল না যাহা স্বচ্ছন্দে হাঁটিয়া পার হওয়া না যায়, সুতরাং অভ্যাসবশতঃ এদিকে চিন্তিত হইবার কিছুই ছিল না। কেবল ফিরিয়া আসার কথাটাই একবার মনে হইল, অথচ ভিতরে ভিতরে বোধ হয় তাহার ভরসা ছিল যদি সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া অন্ধকার হইয়াই আসে ত ফকির-সাহেব কিছুতেই তাহাকে নিঃসঙ্গ ছাড়িয়া দিবেন না, কিছু একটা উপায়

করিবেনই। মনের এই অবস্থাই তাহাকে জনহীন পথ ও ততোধিক নির্জন বালুময় নদীর উপকূলে আসন্ন সন্ধ্যা জানিয়াও দ্বিধামাত্র করিতে দিল না, বারুইয়ের পরপারে সোজা সেই বিপুল বটবৃক্ষতলে সাধুর আশ্রমে আনিয়া উপনীত করিল এবং প্রথমেই যাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তিনি ফকির-সাহেব নহেন, রায়মহাশয়ের জামাতা ব্যারিস্টার-সাহেব। আজ তাঁহার পরিধানে কোট-প্যান্টের পরিবর্তে সাধারণ ভদ্র-বাঙালীর ধুতি-চাদর প্রভৃতি ছিল। তিনিও ঠিক ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না; কি করিবেন সহসা ভাবিয়া না পাইয়া বোধ হয় কেবলমাত্র অভ্যাসবশতঃই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোনমতে একটা নমস্কার করিলেন।

ভৈরবী চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কোথায়?

বসুসাহেব কহিলেন, আমারও জিজ্ঞাস্য তাই। হয়ত কাছাকাছি কোথাও গেছেন মনে করে আমিও প্রায় ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করে আছি।

ভৈরবী মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, তিনি সন্ধ্যার সময় কোথাও থাকেন না, বোধ হয় এখুনি এসে পড়বেন।

বসুসাহেব কহিলেন, এখানে থাকলে তাই তাঁর নিয়ম বটে, আমিও শুনে এসেচি। কিন্তু সন্ধ্যা ত হ'লো। আকাশের গতিকও তেমন ভাল নয়, বলিয়া তিনি সম্মুখে মাঠের প্রান্তে দৃষ্টিপাত করিলেন। ষোড়শীও তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া সেইদিকে চাহিয়া নীরব হইল।

পশ্চিমদিগন্তে তখন কালো কালো খণ্ড মেঘ ধীরে ধীরে জমা হইয়া উঠিতেছিল। এই নিস্তব্ধ জনহীন প্রান্তরে ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলের ঘনায়মান অন্ধকারে দাঁড়াইয়া উভয়ের কেহই কিছুক্ষণের জন্য কথা খুঁজিয়া পাইলেন না, অথচ এই বিসদৃশ অবস্থায় দুজনেই কেমন যেন সংকুচিত হইয়া উঠিলেন। এবং বোধ হয় এই মৌনতার সঙ্কট হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই যেন বসুসাহেব হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কাল আমি চলে যাচ্চি, শীঘ্র আর আসা হবে কিনা জানিনে, কিন্তু ফকিরের সঙ্গে আর একবার দেখা না করে চলে যেতে হৈম আমাকে কিছুতেই দিলে না, তাই—কিন্তু তিনি ত কোথাও চলে যাননি? এই বলিয়া তিনি দু-এক পদ অগ্রসর হইয়া গেলেন, এবং অনতিদূরবর্তী কুটীরের সম্মুখে আসিয়া গলা বাড়াইয়া ক্ষণকাল ঘরের মধ্যে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, ভাল দেখা যায় না, কিন্তু কোথাও কিছু আছে বলেও মনে হয় না। মুসলমান ফকিরেরা ধুনি জ্বালে কিনা জানিনে, কিন্তু এই রকম কি একটা জল দিয়ে কে যেন নিবিয়ে দিয়ে গেছে বলে মনে হচ্চে। আপনি দেখুন দেখি, আমি আর ভিতরে যাবো না। তা হলে নিরর্থক অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই। বলিয়া তিনি ষোড়শীর প্রতি চাহিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

কথাটা শুনিয়াই ষোড়শীর বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ করিয়া উঠিল, এবং তাঁহার থাকা-না-থাকার পরীক্ষা না করিয়াই তাহার নিশ্চয় মনে হইল সংসারে তাহার একমাত্র শুভাকাঙ্ক্ষী আজ নিঃশব্দে চলিয়া গেছেন, এবং এই নীরব প্রস্থানের হেতু জগতে সে ছাড়া আর কেহ জানে না। ষোড়শী যন্ত্রচালিতের ন্যায় সন্ন্যাসীর কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাঝখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কোথাও যে কিছু নাই, এই ছোট ঘরখানি আজ যে একেবারে একান্ত শূন্য, সে তাহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই চোখে পড়িয়াছিল, কিন্তু তবুও সে তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে কেবল এই কথাটাই অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, তিনি যথার্থ-ই দোষীজ্ঞানে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেছেন, এবং তাহার আভাসমাত্র দিবারও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সেইখানে পাষাণ-মূর্তির ন্যায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া তাহার অনেক কথাই মনে হইতে লাগিল। ফকির যে তাহাকে কত ভালবাসিতেন, তাহা তাহার চেয়ে বেশী আর কে জানে? তথাপি না জানিয়া যে তিনি অপরাধীর পক্ষ লইয়া বিবাদ করিয়াছেন, এই লজ্জা ও গ্লানি সেই সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসীকে এমন করিয়া আজ স্থানত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে, ইহা সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এবং যে-বেদনা লইয়া তিনি নীরবে বিদায় লইয়াছেন, ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। অথচ এ-কথা জানাইবার অবকাশ যে তাহার কবে মিলিবে, কিংবা কোনদিন মিলিবে কি না, তাহাও ভবিষ্যতের গর্ভে আজ সম্পূর্ণ লুক্কায়িত। এমনি একইভাবে তাহার অনেকক্ষণ কাটিল, এবং বোধ হয় আরও

কিছুক্ষণ কাটিত, সহসা মুক্তদ্বার দিয়া ঘরের মধ্যে একটা দমকা বাতাস অনুভব করিয়া তাহার চৈতন্য হইল, বাহিরে আর একজন হয়ত এখনও তাহার অপেক্ষা করিয়া আছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে যে আকাশ এমন মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিতে পারে এবং বাতাস প্রবল হইয়া ঝড় ও জলের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া উঠিতে পারে, ইহা তাহার মনেও আসে নাই। বাহিরে আসিয়া দেখিল অনতিদূরে একটা শুষ্ক বৃক্ষকাণ্ডের উপর বসুসাহেব বসিয়া আছেন, তাঁহার শুভ্র পরিচ্ছদ ভিন্ন আর কিছুই প্রায় দেখা যায় না। তাঁহাকে এইভাবে বাস্তবিক অপেক্ষা করিতে দেখিয়া ষোড়শী মনে মনে অতিশয় সঙ্কোচ বোধ করিল।

সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কৈ, ফকির ত এখনো এলেন না, আসবেন বলে কি আপনার আশা হয়?

ষোড়শী অতি মৃদুস্বরে উত্তর দিল, কি জানি, বোধ হয় না-ও আসতে পারেন।

বসু কহিলেন, ফকির-সাহেবের জিনিসপত্র কি ছিল আমি জানিনে, কিন্তু তাঁর ঘরটি ত একেবারে খালি—এমন হঠাৎ চলে যাওয়া কি আপনার সম্ভব মনে হয়?

ষোড়শী তেমনি আস্তে আস্তে বলিল, একেবারে অসম্ভবও নয়। এমনি সহসা তিনি মাঝে মাঝে কোথায় চলে যান।

আবার কতদিনে ফিরে আসেন?

কিছু ঠিক নেই। এবার ত প্রায় বছর-তিনেক পরে ফিরে এসেছিলেন।

বসু কহিলেন, তা হলে চলুন আমরা বাড়ি ফিরে যাই।

চলুন, বলিয়া ষোড়শী অগ্রসর হইতেই বসু কহিলেন, কিন্তু যাবার সুযোগ ত দেখচি ষোল আনাই হয়েচে। একে ত বালির ওপর পথের চিহ্নমাত্র নেই, তাতে অন্ধকার এমনি যে নিজের হাত-পা পর্যন্ত দেখা যায় না।

ষোড়শী নীরবে ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিয়াছিল, কিছুই বলিল না।

বসু কহিলেন, হাওয়ার শব্দে বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু বৃষ্টি পড়চে। গাছতলা পার হলেই ভিজতে হবে। এ কথাতেও ষোড়শী যখন কথা কহিল না, তখন বসু কহিলেন, দেখুন, পথ-ঘাট আমি কিছুই চিনিনে, তা ছাড়া শুনেচি এ-অঞ্চলে সাপখোপের ভয়টাও খুব বেশী। এই ভয়ানক অন্ধকারে কি—

ষোড়শী থামিল না, চলিতে চলিতেই কহিল, পথ আমি চিনি। আপনি আমার ঠিক পিছনে পিছনে আসুন।

বসুসাহেব হাসিলেন, কহিলেন, অর্থাৎ সর্পাঘাতের দুর্ঘটনা ঘটে ত আপনার উপর দিয়েই যাক। তা বটে! আপনি সন্ন্যাসিনী, এ প্রস্তাব আপনি করতেও পারেন, কিন্তু আমার মুশকিল এই যে, আমিও পুরুষমানুষ। অবশ্য এ কথা আপনি কাউকে বলবেন না জানি, এমন কি হৈমকেও না, কিন্তু তবুও ওটা ঠিক পেরে উঠব না।

এবার ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে দেখা গেল না বটে, কিন্তু সাহেবের কথা শুনিয়া তাহারও মুখে হাসি ফুটিল। মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি তা হলে কি রকম করতে বলেন?

সাহেব কহিলেন, বলা শক্ত। কিন্তু পরামর্শ স্থির হবার পূর্বেই ভিজে উঠতে হবে। বটপত্রে আর বৃষ্টি মানচে না।

কথাটা সত্য। কারণ উপরের জলধারা ফোঁটায় ফোঁটায় নীচে নামিতে শুরু করিয়াছিল। ষোড়শী কহিল, আপনি বরঞ্চ ওই ঘরটার মধ্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমি হৈমকে খবর দিয়ে আলো এবং লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিই গে। আমার অভ্যাস আছে, এ জলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

সাহেব কহিলেন, অত্যন্ত মনোরম প্রস্তাব। কারণ, বাঙালী সাহেব হয়ে উঠলে যা হন সে আপনি বেশ জানেন দেখচি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে আজও একটুখানি ত্রুটি রয়ে গেছে। হৈম মাঝে থাকায় আমার ভেতরের সঙ্গে বাইরের এখনও সম্পূর্ণ একাকার হয়ে উঠতে পায়নি। এ প্রস্তাবও অচল, সুতরাং চলাই স্থির। চলুন।

বৃক্ষতল ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দুজনেই বুঝিলেন, অগ্রসর হওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ, বায়ুবেগে বৃষ্টিধারাই যে কেবল গায়ে সূচের মত বিঁধিতেছে তাই নয়, ইতিপূর্বে

যে শুষ্ক বালুকারাশি আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া শূন্যে উড়িয়াছে জলধারায় ধুইয়া মাটিতে না পড়া পর্যন্ত চোখ চাহিয়া পথ চলা দুঃসাধ্য।

নিঃশব্দে চলিতে চলিতে ষোড়শী হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনার লাগল নাকি?

বসুসাহেব কোনমতে সামলাইয়া লইয়া সোজা হইয়া কহিলেন, হাঁ, কিন্তু প্রত্যাশার অতিরিক্ত কিছু নয়। চশমা-সুদ্ধ চোখ আমার চারটে বটে, কিন্তু দৃষ্টিশক্তিটা চার ভাগের এক ভাগ থাকলেও বাঁচতাম। চলুন।

ষোড়শী চলিল না, একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি সত্যিই ভাল দেখতে পাচ্ছেন না?

বসু কহিলেন, সত্যি। তারপরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বিস্তর ইংরাজী বই মুখস্ত করে সাহেব হতে হয়েচে—তার দক্ষিণাটাও তারা বেশ বড় করেই নিয়েচে। কিন্তু তাই বলে আর দাঁড়িয়ে ভেজাবেন না—এগোন, দু'চক্ষু বুজে চললে যতটা দেখতে পাওয়া যায়, আমি ততটা দেখতে পাবই, এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ভরসা দিচ্চি।

ষোড়শীর কণ্ঠস্বর করুণায় কোমল হইয়া উঠিল, কহিল, তা হলে নদীটা পার হতে আপনার ত ভারী কষ্ট হবে!

বসু বলিলেন, তা ঠিক জানিনে। তবে নদী পার হবার পূর্বেও বিশেষ আরাম পাচ্ছিনে। কিন্তু তাই বলে এই মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলেও সমস্যার মীমাংসা হবে না।

ষোড়শী এক পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, আপনি আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে আসুন, এই বলিয়া সে তাহার হাতখানি বাড়াইয়া দিল।

এই অপরিচিতা নারীর আচরণ ও সাহস দেখিয়া বাক্‌পটু ব্যারিস্টার ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে নির্বাক্ হইয়া গেলেন। কিন্তু সে ওই ক্ষণকালমাত্রই। তারপরে সেই প্রসারিত হাতখানি নিঃশব্দ ব্যগ্রতায় আশ্রয় করিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, চলুন। এইবার আমি সত্যি সত্যিই দু'চক্ষু বুজে চলতে পারব।

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর দিল না। উভয়ে ধীরে ধীরে কিছুদূর অগ্রসর হইলে বসুসাহেব অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, আপনার প্রতি আমি সেদিন ভদ্র ব্যবহার করিনি। তার জন্যে ক্ষমা চাইচি, আপনি আমাকে মাপ করবেন।

ষোড়শী এ কথার উত্তরেও কিছুই বলিল না, তেমনি নিঃশব্দে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

বসু কহিলেন, আপনি হৈমর ছেলেবেলার বন্ধু। আমার সেদিনের আচরণ যাই হোক, আমাকেও ঠিক শত্রু বলেই মনে রাখবেন না। বলিয়া তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিলেন।

ষোড়শী একেবারেই নির্বাক্। বসুসাহেব নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, এঁরা যে আপনাকে সহজে ছাড়বেন তা মনে হয় না। খুব সম্ভব মামলা-মকদ্দমাও হবে। ফকির-সাহেব হয়ত সত্যিই চলে গেছেন, আমিও বোধ হয় থাকব না—

ষোড়শী কিছুই বলিল না। তিনি নিজেও একটু মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আপনি নিজে আর দেবীর পুজো করবেন না বলেচেন, এ কি রাগ করে?

ষোড়শী এবার জবাব দিল, কহিল, না।

তা হলে এর কি সত্যিই কোন কারণ আছে?

ষোড়শী এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, কিন্তু কথা কহিল, বলিল, আমরা এবার নদীতে এসেচি, আপনাকে একটু সাবধানে নামতে হবে।

ইহার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই হইল না। ষোড়শী সযত্নে সাবধানে তাঁহাকে জল পার করিয়া লইয়া গেল। আসিবার সময় সাহেব জুতা খুলিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আর সাহস করিলেন না, যেমন ছিলেন তেমনই গিয়া পরপারে উঠিলেন। একটি তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, একটা মস্ত ফাঁড়া কেটে গেল, বাঁচলাম।

এই মস্ত ফাঁড়া কাটাইয়া দিয়া সাহেব অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়া কহিলেন, পূজারী একজন আছেন বটে, কিন্তু পূজাটা আপনারও একটা কাজের মধ্যেই। অথচ সে প্রশ্নটা

আপনি চাপা দিলেন। এদিকে যে ভীষণ দুর্দান্ত শয়তান জমিদারটাকে বাঁচানো আপনার কর্তব্যের অঙ্গ ছিল না, তাঁকে যে উপায়ে বাঁচালেন তা কেবল আশ্চর্য নয়, অদ্ভুত। এই দুটো ব্যাপারই এমন দুর্বোধ্য যে, গ্রামের লোক বুঝলে না বলে অভিমান করা চলে না।

ষোড়শী তেমনি মৃদুস্বরেই এ অনুযোগের জবাব দিয়া কহিল, অভিমান আমি করিনি।

বসু বলিলেন, করেন নি! সেও অদ্ভুত। আপনার বাবার আচরণ আবার আরও অদ্ভুত। হৈম বলে—কিন্তু হৈমর কথা এখন থাক। কিন্তু আমি বলি, এদের সমস্ত অপরাধটা কেন বুঝিয়েই বলুন না? তাতে কতটা কাজ হবে আমি জানিনে, কিন্তু সে যাই হোক, নারীর সুনামটা ত অবহেলার বস্তু নয়! বলিয়া তিনি কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন; কিন্তু ষোড়শী কোন প্রত্যুত্তরই যখন দিল না, তখন একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বুঝা গেল এই সুনাম দুর্নাম সম্বন্ধে সাধারণ রমণীর মত আপনার বিশেষ কোন মাথাব্যথা নেই। আর সাধারণও ত আপনি ন'ন। তা ছাড়া চুপ করে থাকার এই জিদ—এও অদ্ভুত! বাস্তবিক, আপনার সকলই অদ্ভুত। বলিয়া নিজে একটুখানি চুপ করিয়া কহিলেন, সেদিন একটিবার মাত্র আপনাকে দেখেচি, আর আজ হাত ধরে এগিয়ে চলেচি। যাকে আশ্রয় করেচি, তিনিও আমার কাছে যেমন অন্ধকার, যার মধ্যে দিয়ে চলেচি সেও তেমনি অন্ধকার। তবুও নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে যাত্রা করার কোন বাধা হয়নি। আপনাকে ভক্তি না করে থাকবার জো নেই। এই বলিয়া আবার কিছুক্ষণ কোন একটা কথার প্রত্যাশায় থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, আপনি ত সন্ন্যাসিনী। শ্বশুরমশাই আমার যাই কেন করুন না, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে এই-সব মামলা-মকদ্দমা করায় আপনার গরজ কি?

ষোড়শী এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, কোন গরজ নেই।

তা হলে?

ষোড়শী কহিল, আপনি কোন আশঙ্কা করবেন না; নিরুপায় দুর্বল নারীর ভাগ্যে চিরদিন যা হয়ে আসচে এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না।

কথার খোঁচাটা বসুসাহেবের বিঁধিল, কিন্তু তিনি প্রতিবাদও করিলেন না, প্রতিঘাতও করিলেন না। তারপর উভয়েই নিঃশব্দে চলিতে লাগিলেন। ঝড় এবং জল কোনটাই থামে নাই বটে, কিন্তু গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার প্রকোপ মন্দীভূত হইল, এবং পথে বাঁকটা ঘুরিতেই অদূরে সনাতন মাইতির কুটীরের আলোক দুজনেরই চোখে পড়িল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তেমন অন্ধকার আর নেই, আপনি এই পথ ধরে সোজা গেলেই রায়মশায়ের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছুবেন।

আর আপনি?

আমার পথ এই বাঁ দিকের বাগানের ভেতর দিয়ে।

বসু হাত ছাড়িলেন না, কহিলেন, পরের মুখে শুনেচি আপনি অতিশয় শিক্ষিতা, আমি নিজে কতটুকু জেনেচি সে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এর বেশী জানবার অবকাশ আর যদি কখনো ভাগ্যে নাও ঘটে, আজকের এই অভিযানের স্মৃতিটা আমার চিরদিন বড় শ্রদ্ধার সঙ্গেই মনে থাকবে।

ষোড়শী মৃদু হাসিয়া কহিল, কিন্তু, কেবলমাত্র এইটুকুই যদি কেউ বাইরে থেকে দেখে থাকে, তার সঙ্গে আপনার মতের মিল হবে না।

সাহেব মনে মনে চমকিয়া গেলেন। তারপরে সেই ধরা-হাতটির উপর আর একটুখানি চাপ দিয়া ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, না, বানিয়ে বলা গল্পের মত শোনাবে। তাই একে ঘুলিয়ে নোংরা করে না তুলে বরঞ্চ চুপ করে থাকাই ভাল। এই না?

ষোড়শী ইহার জবাব না দিয়া কহিল, আমার জন্যে অপেক্ষা করে অনেক ভিজেছেন, অনেক দুঃখ পেয়েচেন—আর না। আমিও চললুম।

বসু কহিলেন, এই কথাটাই হয়ত আমাকে অনেকদিন ধরে ভাবতে হবে। কাল আমরা যাচ্ছি—হৈমকে কি কিছু বলে পাঠাবেন না?

✓ষোড়শী একমুহূর্ত কি ভাবিয়া কহিল, না। কেবল তার ছেলেকে আশীর্বাদ করচি, যদি ইচ্ছে হয় এইটুকু জানাবেন। বলিয়াই সে আর কোন প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অন্ধকার বন-পথ ধরিয়া নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাহেব সেইখানে বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটা নমস্কার পর্যন্ত করা হইল না—যে ফকিরের জন্য এই, তাঁহার উদ্দেশে একটা নমস্কার পর্যন্তও জানানো হইল না। তাহার পরে নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

দশ

বসু‌সাহেব যখন শ্বশুরবাটীতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারই জন্য বাড়িময় একটা উৎকণ্ঠার সাড়া পড়িয়া গেছে। ঘরে এবং বাইরে যেখানে যত আস্ত এবং ভাঙ্গা লণ্ঠন ছিল সংগ্রহ হইয়াছে, এবং এই দুর্যোগের রাত্রে এগুলিকে কার্যোপযোগী করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় বাড়িসুদ্ধ সকলে গলদঘর্ম হইয়া উঠিয়াছে। চাকর-বাকর ও আত্মীয় অনুগত লইয়া একটা অভিযানের দল তৈরি হইয়াছে এবং রায়মহাশয় নিজে সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেছেন কাহারা কোন্ দিকে যাইবে, কোন্ পথ, কোন্ মাঠ, কোন্ বন-জঙ্গল অনুসন্ধান করিবে, বারংবার উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার আচরণে ও কণ্ঠস্বরে কেবল উদ্বেগ নয়, আতঙ্ক প্রকাশ পাইয়াছে। এখনও প্রকাশ করিয়া কিছু বলেন নাই সত্য, কিন্তু যে ভয়টা তাঁহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতেছে তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। তিনি জানিতেন ষোড়শীর কয়েকজন একান্ত অনুগত ভূমিজ ও বাগদী প্রজা আছে। তাহারা যেমন উদ্ধত তেমনি নিষ্ঠুর। ডাকাতি করে বলিয়া পুলিশের খাতায় নাম-ধাম পর্যন্ত লেখা আছে—ইহারা এই অন্ধকার রাত্রে কোথাও একাকী পাইয়া যদি তাহাদের ভৈরবী-মায়ের প্রতি অবিচার স্মরণ করিয়া সহসা প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া উঠে ত সেখানেও বিচারের আশা করা বৃথা।

হৈম একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল, পিতার আশঙ্কাও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, কিন্তু তখন পর্যন্ত সে ভিতরের আসল কথাটা জানিত না। এইটাই আত্মপ্রকাশ করিল তাহার জননীর কথায়। তিনি হঠাৎ বাহিরে আসিয়া স্বামীকে কঠোর অনুযোগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, সে জামাই মানুষ, তাকে কেন তোমাদের ঝগড়ার মধ্যস্থ মানা? যার পেছনে ডাকাতের দল রয়েচে তাকে করবে তোমরা জব্দ? যেখানে পাও আমার নির্মলকে খুঁজে এনে দাও, নইলে যেখানে দু'চক্ষু যায় এই অন্ধকারে আমি বেরিয়ে যাবো। বলিয়া তিনি কাঁদ-কাঁদ হইয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন, এবং কিছুক্ষণের জন্য কন্যা ও পিতা উভয়েই নির্বাক্ বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

জনার্দন রায় আত্মসংবরণ করিয়া সান্ত্বনা ও সাহসসূচক কি একটা কথা হৈমকে বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এমনি সময়ে জামাতা প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ বাহিয়া জল ঝরিতেছে, জামা-কাপড় জুতা কাদামাখা। শ্বশুরের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল—কিন্তু পরক্ষণেই যে সাহেব জামাইকে তিনি যথেষ্ট খাতির এবং ভয় করিতেন, তাহাকেই আনন্দের উৎকট প্রাবল্যে যা মুখে আসিল তাই বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

সাহেব নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া হাতের ভাঙ্গা ছড়িটা রাখিয়া দিলেন, এবং পায়ের জুতা হাত দিয়া টানিয়া ফেলিয়া গায়ের ভিজা জামাটা খুলিয়া ফেলার মধ্যে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, আত্মীয়-পর সকলে একযোগে ও নির্বিশেষে প্রশ্ন করিতে লাগিল, কি করিয়া এ দুরবস্থা ঘটিল এবং কোথায় ঘটিল?

রায়মহাশয় প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, সে পরে হবে, তুমি বাড়ির ভেতরে যাও। মা হৈম, দাঁড়িয়ে থেকো না, একটা শুক্‌নো কাপড়-চোপড় দাও গে।

বাটীর মধ্যে শাশুড়ী ও সমবেত কুটুম্বিনীগণের প্রশ্নের উত্তরে নির্মল জানাইল, সে ও-পারে ফকির-সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি আশ্রমে নাই।

ও-পারের নামে একপ্রকার আতঙ্কসূচক অস্ফুট ধ্বনি উঠিল। রায়মহাশয় আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া! আমাকে বললে ত তাকে ডেকে পাঠাতে পারতাম। কিন্তু এই অন্ধকারে পথ চিনলে কি করে?

নির্মল কহিল, পথ চেনবার আমার দরকার হয়নি, হলে পারতাম না।

কিন্তু এলে কি করে?

একজন আমাকে হাত ধরে এনে বাড়ির সামনে দিয়ে গেছেন।

চতুর্দিকে প্রশ্ন উঠিল—কে? কে? কি নাম তার?

নির্মল একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, কি জানি, নামটা জানাতে হয়ত তাঁর আপত্তি আছে।

রায়মহাশয় প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, আপত্তি? কখ্খনো না, আমাদের দেশের লোককে তুমি চেনো না। কিন্তু যেই হোক তাকে খুশী করে দেওয়া চাই ত? বলিয়া চাকরটাকে তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া হুকুম করিয়া দিলেন, অধর, চাটুয্যে যদি বাইরে থাকে, এখনি বলে দে কাল সকালেই খবর নিয়ে যেন বকশিশ দেওয়া হয়। পুরো টাকাই যেন তার হাতে পড়ে—কেটে যেন কিছু না রাখে। চাটুয্যেটা আবার যে কৃপণ! বলিয়া তিনি ঔদার্যের আবেগে প্রথমে গৃহিণী ও পরে কন্যা-জামাতার মুখের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলেন।

রাত্রে আহারাদির পর নিরালা ঘরের মধ্যে স্বামীকে একাকী পাইয়া হৈম কহিল, বাবা ত পুরস্কারের ঘোষণা করে দিলেন, পুরো টাকাটা দেবার চেষ্টাও হয়ত কিছু হবে, কিন্তু ফল হবে না।

নির্মল কহিল, না, আসামীকে পাওয়া যাবে না।

হৈম একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তুমি সেই দয়ালু লোকটিকে কি পুরস্কার দিলে?

নির্মল কহিল, দেওয়া জিনিসটা কি তুমি এতই সহজ মনে কর? ও কি কেবলমাত্র দাতার মর্জির উপরেই নির্ভর করে?

তা হলে দিতে পারোনি?

না, দেবার চেষ্টাও করিনি।

হৈম স্বামীর মুখের প্রতি একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার উচিত। বাবা তাঁকে বার করতে পারবেন না, কিন্তু আমি পারব।

নির্মল সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কহিল, আমার মনে হয় তোমার বাবার মত তুমিও তাঁকে খুঁজে পাবে না।

হৈম বলিল, যদি পাই ত আমাকেও কিছু পুরস্কার দিয়ো। কিন্তু আমি তাঁকে চিনেছি। কারণ তোমার মত অন্ধ মানুষকে যে এই ভয়ানক অন্ধকারে নির্বিঘ্নে নদী পার করে ঘরের সামনে রেখে যেতে পারে, অথচ আত্মপ্রকাশ করে না, তাকে চিনতে পারা শক্ত নয়। তা ছাড়া সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢেকে আমিও একবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি ঘর-দোর খোলা; তিনি নেই বটে, কিন্তু তারাদাস ঠাকুর সমস্ত দখল করে বসে আছেন। লুকিয়ে পালিয়ে এলাম। পথে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হ'লো, সে বলে দিলে ষোড়শীকে সে সোজা নদীর পথে যেতে দেখেচে। এখন বুঝলে, যে দয়ালু লোকটি তোমাকে দিয়ে গেছেন তাঁকে আমি চিনি। কিন্তু সত্যি সত্যিই কি একেবারে হাত ধরে রেখে গেছেন?

নির্মল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, সত্যই তাই। যে-মুহূর্তে তিনি নিশ্চয় বুঝলেন আমি অন্ধের সমান, সেই মুহূর্তে নিঃসঙ্কোচে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার হাত ধরে আসুন। কিন্তু পরের জন্য এ-কাজ তুমি পারতে না।

হৈম অত্যন্ত সহজে স্বীকার করিয়া কহিল, না।

তাহার স্বামী কহিল, তা জানি। ইহার পরে কি করিয়া কি হইল সমস্ত ঘটনা একে একে বিবৃত করিয়া কহিল, অথচ এ ছাড়া আমার পক্ষে যে কি উপায় ছিল জানিনে। আবার ওদিকে তাঁর বিপদের গুরুত্বটা একবার ভেবে দেখ। আমাকে তিনি সামান্যই জানতেন এবং তাও বোধ হয় ভাল করে জানতেন না। তবুও আমাকেই এই যে নির্জন অন্ধকার পথ দিয়ে নিয়ে এলেন, এর দায়িত্বটা কত বিশ্রী, কত ভয়ঙ্কর! বস্তুতঃ পথ চলতে চলতে আমার অনেকবার ভয় হয়েচে যদি কারো সুমুখে পড়ি, তার চোখে এটা কি রকম দেখাবে? দেখ হৈম, তোমাদের দেবীর এই ভৈরবীটিকে আমি চিনতে পারিনি সত্যি, কিন্তু এটুকু আজ নিশ্চয় বুঝেচি এ'র সম্বন্ধে বিচার করার ঠিক সাধারণ নিয়ম খাটে না। হয় সতীত্ব জিনিসটা এ'র

কাছে নিতান্তই একটা বাহুল্য বস্তু—তোমাদের মত তার যথার্থ রূপটা ইনি চেনেন না, না হয় এর সুনাম-দুর্নাম একে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না।

হৈম ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তুমি কি জমিদারের ঘটনা মনে করেই এ-সব বলচ?

নির্মল বলিল, আশ্চর্য নয়। এই স্ত্রীলোকটি ভাল কি মন্দ আমি জানিনে, কিন্তু এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি, ইনি যেমন গভীর, তেমনি শিক্ষিত, তেমনি নিঃশঙ্ক। শাস্ত্রে বলে, সাত পা একসঙ্গে চললে বন্ধুত্ব হয়; এতবড় পথটায় এই দুর্ভেদ্য আঁধারে নিতান্ত তাঁকেই নির্ভর করে অনেক পা আমরা একসঙ্গে চলে এসেচি, একটি একটি করে অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেচি, কিন্তু কালও তিনি যেমন রহস্যে ঢাকা ছিলেন আজও তেমনি রয়ে গেলেন।

হৈম কহিল, তোমার জেরাও মানলে না, বন্ধুত্বও স্বীকার করলে না?

নির্মল কহিল, না, কোনটাই হ'লো না।

হৈম এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, একটুও না? তোমার দিক থেকেও না?

নির্মল কহিল, এতবড় কথাটা কেবল ফাঁকি দিয়ে বার করে নিতে চাও? কিন্তু নিজেকে জানতেও যে দেরি লাগে হৈম। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে থমকিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল হৈমও তাহার প্রতি দুই চক্ষের স্থিরদৃষ্টি পাতিয়া আছে। তাহার মুখে কি ভাব প্রকাশ পাইল, প্রদীপের স্বল্প আলোকে ঠিক বোঝা গেল না, এবং সে নিজেও যে নিজের পূর্বকথার যোগ রাখিয়া হঠাৎ কি বলিবে, ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্বেই হৈম ধীরে ধীরে কহিল, সে ঠিক। তবু পুরুষমানুষদের বুঝতে হয়ত একটু দেরিই হয়, কিন্তু মেয়েমানুষের এমনি অভিশাপ যে, আমরণ নিজের অদৃষ্টকে বুঝতেই তার কেটে যায়। আচ্ছা তুমি ঘুমোও, আমি এখনি আসচি, বলিয়া সে আর কোন কথার পূর্বেই উঠিয়া সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

নির্মল তাহার হাত ধরিল না—রহস্যের অন্তরালে স্ত্রীর এই অর্থহীন সংশয় ও অবিচারের বেদনা তাহাকে যেন অকস্মাৎ ক্রোধে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সুমুখের বড় ঘড়িটায় অত্যন্ত ক্লেশকর মিনিটের কাঁটাটা নড়িতে নড়িতে নীচে ঝুলিয়া পড়িল, কিন্তু তখন পর্যন্তও যখন সে ফিরিয়া আসিল না, তখন আর সে একাকী শয্যায় থাকিতে না পারিয়া ধীরে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, অন্ধকার বারান্দায় একটা থামের পাশে হৈম চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে আসিয়া মাথায় গায়ে হাত দিয়া দেখিল, বৃষ্টির ছাটে সমস্ত ভিজিয়া গেছে। হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া কহিল, তুমি কি পাগল হয়েচ হৈম?

ইহার অধিক আর তাহার মুখেও আসিল না, আসার প্রয়োজনও বোধ করিল না। প্রদীপের আলোকে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল, অশ্রুর আভাস চোখের কোণ হইতে তখন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই।

এগার

সকালে উঠিয়া হৈম নিজের গতরাত্রির ব্যবহার স্মরণ করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। নির্দোষ ও চরিত্রবান স্বামীর প্রতি এই অহেতুক অভিমানের উৎপাতটাকে সে ঝড়-জল ও দুর্যোগের মধ্যে তাহার আকস্মিক নিরুদ্দেশের আতঙ্কটার ঘাড়েই চাপাইয়া দিয়া মনে মনে হাসিতে চাহিল, কিন্তু সমস্ত প্রাণটাকে খুলিয়া দিয়া যে হাসি তাহার চিরদিনের অভ্যাস, কিছুতেই আজ তাহার আর নাগাল পাইল না। চোখের বালি বাহির হইয়া গিয়াছে বুঝিয়াও অবোধ চোখ-দুটা যেন তাহার কোনমতে নিঃশঙ্ক হইতে চাহিল না। শিরোমণিমহাশয় নিজে আসিয়া শুভক্ষণ স্থির করিয়া দিয়াছেন—সাড়ে দশটা না কিছুতেই উত্তীর্ণ হয়। মা ভাঁড়ার-ঘরে যাত্রার আয়োজন ও রান্নাঘরে খাবার ব্যবস্থা করিতে অতিশয় ব্যস্ত, তাঁহার মুহূর্তের অবকাশ নাই, এমনি সময়ে সদর হইতে ডাক আসিল, রায়মহাশয় কন্যাকে আহ্বান করিয়াছেন।

হৈম বাহিরে আসিয়া দেখিল কিসের যেন একটা উৎসব চলিয়াছে। পিতা ফরাসের উপর বাঁধা-হুঁকা হাতে বার দিয়া বসিয়াছেন, শিরোমণিমহাশয় আছেন, জমিদারের গোমস্তা

এককড়ি নন্দী আছে, তারাদাস আছে, আরও কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আছেন, তাহার স্বামীও একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। উৎসাহ ও আনন্দের প্রাবল্যে সবাই একযোগে সংবাদটা হৈমর গোচর করিতে গিয়া প্রথমটা কিছু বুঝাই গেল না। শিরোমণির দাঁত নাই, কিন্তু আওয়াজ আছে—তাহার বিপুল শক্তি মুহূর্তেই আর সমস্ত থামাইয়া দিয়া যাহা প্রকাশ করিল তাহা এইরূপ—কাল ভয়ানক দুর্যোগের রাত্রে মহৎ কার্য সাধিত হইয়াছে—নির্বিঘ্নে শত্রুপুরী হস্তগত হইয়াছে। ভৈরবী বাড়ি ছিল না, চরের মুখে খবর পাইয়া তারাদাস সেই মেয়েটাকে লইয়া এই অবকাশে গিয়া সমস্ত দখল করিয়া লইয়াছে। বিবাদ করা দূরে থাক, ভয়ে সে কথাটি পর্যন্ত বলে নাই, সামান্য কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া রাত্রেই বাহির হইয়া গেছে। প্রাচীরের বাহিরে মন্দির-সংলগ্ন যে চালাটার মধ্যে দূরের যাত্রীরা কেহ কেহ রান্নাবাড়া করিয়া খায়, তাহাতেই আশ্রয় লইয়াছে। এ সমস্ত মা-চণ্ডীর কৃপা এবং এই কৃপাটা আর একটুখানি বৃদ্ধি পাইলেই তাহাকে গ্রাম হইতে দূর করিয়া দেওয়াও কঠিন কাজ হইবে না।

উৎফুল্ল তারাদাস উপরের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া সবিনয় হাস্যে কহিল, সমস্তই মায়ের কাজ—যা করবার তিনি করেছেন, নইলে অত বড় রাঘবাঘিনী একেবারে ভেড়া হয়ে গেল! তামাকটি ধরিয়ে সবে ফুঁ দিচ্চি, মেয়েটা পাশে বসে চা-সিদ্ধটুকু ছেঁকে দিচ্চে, এমনি সময়ে কোথা থেকে ভিজতে ভিজতে এসে হাজির। আমাদের দেখে ভয়ে যেন একেবারে কাঠ হয়ে গেল; খানিক পরে আস্তে আস্তে বললে, বাবা, আমি ত কখনও বলিনি তুমি যাও, কিংবা এখানে থেকো না। নিজে রাগ করে চলে গিয়ে কত কষ্ট না পেলে!

আমি বললাম, হুঃ—

দোরের উপরে উঠে বলল, এ ঘরে তুমি কি তালা দিয়েচ বাবা?

বললাম, হুঃ—দিইচি। কি করবি কর্।

চুপ করে থেকে বললে, তোমার সঙ্গে আমি কিছুই করব না বাবা, তোমরা থাকো। কেবল ঘরটা একবার খুলে দাও, আমার কাপড় দুখানা নিই।

দিলাম খুলে। মা চণ্ডীর দয়ায় আর কোন দাঙ্গা করলে না; পরবার খান-দুই কাপড়, একটা কম্বল, আর একটা ঘটি নিয়ে অন্ধকারেই ভিজতে ভিজতে দূর হয়ে গেল। মাকে গড় হয়ে নমস্কার করে বললাম, মা এমনি দয়া যেন ছেলের ওপর থাকে। তোর নাম না করে কখনো জলগ্রহণ করিনে!

শিরোমণি হাত নাড়িয়া কহিলেন, থাকবে! থাকবে! আমি বলচি তারাদাস, মা মুখ তুলে চাইবেন। নইলে তাঁর জগদম্বা নামই যে বৃথা!

এককড়ি কহিল, কিন্তু ঠাকুর, যাই বল, মায়ের গদি কখনো খালি থাকতে পারবে না, তোমার মেয়েটিকে নতুন ভৈরবী করতে বিলম্ব করলেও চলবে না বলে রাখচি।

রায়মহাশয় পোড়া হুঁকাটা পাশের লোকটির হাতে দিয়া পরম গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, হবে, হবে, সব হবে, আমি সমস্ত ঠিক করে দেব, তোমরা ব্যস্ত হ'য়ো না। জামাতার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি বাবা, ছুঁড়ির কাছ থেকে একছত্র লিখিয়ে নেওয়া ত চাই? চাই বৈ কি! তাও হবে—ডেকে আনিয়ে দুটো ধমক দিয়ে এও আমি করিয়ে নেব। কিন্তু তাও বলে রাখচি তারাদাস, কদমতলার ওই জমিটে নিয়ে হাঙ্গামা করলে চলবে না। ধানের আড়তটা আমার সামনে সরিয়ে না আনলে চারিদিকে আর চোখ রাখতে পারচি নে। মেলার নাম করে ষোড়শীর মত ঝগড়া করলে কিন্তু—

কথাটা সমাপ্ত করিতেও হইল না। অনেকেই তারাদাসের হইয়া রাজী হইয়া গেল, এবং সে নিজে জিভ কাটিয়া গদগদ-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, অমন কথা মুখেও আনবেন না রায়মশাই, আপনারাই ত সব! হাতীর সঙ্গে মশার বিবাদ! কি বল মা? বলিয়া সে একটা ভাল কথা কিংবা একটুখানি ঘাড়-নাড়া কিংবা এমনি কিছু একটা শুনিবার প্রত্যাশায় হৈমর মুখের প্রতি চাহিল, এবং সেই সঙ্গে অনেকেরই দৃষ্টি তাহার উপরে গিয়া পড়িল। হৈম কিছুই কহিল না; পরন্তু তাহার মুখের চেহারায় ষোড়শীর সেই প্রথম বিচারের দিনটাই সকলের দপ্ করিয়া মনে পড়িয়া অপ্রত্যাশিত একটা নিরুৎসাহের মেঘ যেন কোথা হইতে আসিয়া পলকের নিমিত্ত ঘরের মধ্যে ছায়াপাত করিল—কিন্তু পলকমাত্রই। রায়মহাশয় সোজা হইয়া

বসিয়া তামাকের জন্য একটা উচ্চ হাঁক দিয়া কহিলেন, বাবা নির্মল, যাত্রার সময়টা শিরোমণি-মশায় দশটার মধ্যেই দেখে দিয়েচেন; মেয়েদের কাণ্ড—একটু সকাল সকাল তৈরি না হতে পারলে বার হওয়াই যাবে না।

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আর কিছু বলিবার পূর্বেই হৈম নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

মুখ-হাত ধোয়া হইতে স্নান পর্যন্ত সমাধা করিতে বসুসাহেবের বেশী বিলম্ব হইল না। বাটীর মধ্যে পা দিয়াই শাশুড়ীর উচ্চকণ্ঠ রান্নাঘর হইতে শুনা গেল, তিনি মেয়েকে লইয়া পড়িয়াছেন। সে যে ঘরের মধ্যে কি করিতেছে তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না। নির্মল ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল হৈম মেঝের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে; আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি, তোমার মা যে ভারী বকাবকি করচেন? তা ছাড়া সময় ত বেশী নেই।

হৈম কহিল, ঢের সময় আছে—আজ ত আমাদের যাওয়া হতে পারে না।

কেন?

হৈম কহিল, কেন কি? ষোড়শীর এতবড় বিপদে তার সঙ্গে একবার দেখা না করেই যাবো?

নির্মল কহিল, বেশ ত দেখা করেই এসো না। তারও ত সময় আছে।

হৈম বলিল, আর তুমিই বা একবার দেখা না করে কি করে যেতে পারবে?

এই যে সেই গতরাত্রির প্রতিক্রিয়া তাহা মনে মনে বুঝিয়া নির্মল কহিল, চেষ্টা করলে তাও বোধ হয় পারা যাবে। অসম্ভব রকমের শক্ত কাজ নয়, কিন্তু আমি একবার দেখা করে গেলেই যে এ বিপদে তার সুবিধে হবে মনে হয় না।

হৈম প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না, সে কোনমতেই হবে না।

হবে না কেন? তা ছাড়া আমার যে সেই সৈদাবাদের চামড়ার মামলা আছে—

থাক তোমার চামড়ার মামলা, একটা তার করে দাও। আজ তোমার কিছুতেই যাওয়া হবে না।

বেশ ত, চল না হয় দুজনে একবার দেখা করেই আসি? সে সময় ত আছে।

হৈম মুখ তুলিয়া একটু হাসিয়া বলিল, না, সে তোমার সেখানে হয়, কিন্তু এখানে হয় না। আর এত লোকের সামনে বাবাই যা কি মনে করবেন? রাত্রে আমরা লুকিয়ে যাবো।

নির্মলের যথার্থই অত্যন্ত জরুরী মকদ্দমা ছিল, তা ছাড়া কোন্ ছুতায় যে যাওয়া এমন হঠাৎ স্থগিত করা যাইতে পারে, সে ভাবিয়া পাইল না, বিশেষতঃ শ্বশুরের সঙ্গে ইহাতে নিদারুণ বিচ্ছেদ ঘটিবার সম্ভাবনা। চিন্তা করিয়া কহিল, সে হয় না হৈম, যেতে আমাদের আজ হবেই। আর মনে হয় আমরা মাঝে পড়ে বিপদটা হয়ত তাঁর আরও বাড়িয়ে তুলব। আমার কথা শোন, চল, অযাচিত মধ্যস্থতায় কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী হয়।

হৈম স্বামীর মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, আমাকে ত তুমি জানো, আজ আমি কিছুতেই যেতে পারব না। আর, কালকের অপরাধে যদি আমাকে তুমি শাস্তি দিতেই চাও, ত ফেলে রেখে যাও। আমি আর তোমাকে আটকাবো না।

নির্মল আর কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। শরীর ভাল নয়, আজ যাওয়া হইল না শুনিয়া শাশুড়ীঠাকুরানী আশ্চর্য হইলেন, উদ্বিগ্ন হইলেন এবং ততোধিক খুশী হইয়া উঠিলেন, কিন্তু বাহিরের ঘরে বসিয়া শ্বশুরমহাশয় শুধু একটা হুঁ বলিয়াই তামাক টানিতে লাগিলেন। তিনি আশ্চর্যও হইলেন না, উদ্বিগ্নও হইলেন না, এবং যাহার কিছুমাত্র কাণ্ড-জ্ঞান আছে, সে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া খুশির কথা মুখে আনিবে না।

মকদ্দমার ব্যবস্থা করিতে নির্মল তার করিয়া দিল এবং কাজটা যে কেবল নিরর্থক নয়—মন্দ, তাহাও সে মনে মনে বুঝিল, তবুও সেই মনটাই তাহার সারাদিন একান্ত সংগোপনে সেই দিনান্তের জন্যই উন্মুখ হইয়া রহিল। বিগত রাত্রির হৈমর কান্নাটা যে কত হাস্যাস্পদ, কত অসম্ভব অপেক্ষাও অসম্ভব, সমস্ত দিন ধরিয়া এ-কথা তার বহুবার মনে হইয়াছে, তবুও সেই একফোঁটা চোখের জল যেন কোনোমতেই আর শুকাইতে চাহিল না

এবং প্রতি মুহূর্তেই সে এমনই একটা অজ্ঞাত ও অচিন্তপূর্ব রহস্যের সৃষ্টি করিয়া চলিল, যাহা একই কালে মাধুর্য ও তিক্ততায় মিশিয়া একাত্ম হইয়া উঠিতে লাগিল।

রাত্রির অন্ধকারেও পিতার চক্ষুকে ফাঁকি দিবার প্রয়াস নিষ্ফল বুঝিয়া হৈম স্বামী ও তাহার পশ্চিমা চাকরটাকে সঙ্গে করিয়া যখন ষোড়শীর নূতন বাসার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ষোড়শী একখানি কম্বলের উপর বসিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছিল, সম্মুখে জুতার শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আসুন। এস দিদি, এস। বলিয়া সে গুটানো কম্বলখানি প্রসারিত করিয়া পাতিয়া দিল।

আসন গ্রহণ করিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই নিঃশব্দে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া হৈম কহিল, দিদির এই নতুন ঘরখানির আর যা দোষ থাক, অপব্যয়ের অপবাদ শিরোমণিমশাই এমন কি আমার বাবা পর্যন্ত দিতে পারবেন না। এই আশ্চর্য বস্তুটি দেখাবার লোভ দিয়েই আজ এঁকে ধরে রেখেচি, নইলে আমাকে সুদ্ধ নিয়ে দুপুরের গাড়িতে চলে গিয়েছিলেন আর কি! স্বামীকে কহিল, কেমন, এ না দেখে গেলে অনুতাপ করতে হ'তো?

নির্মল কহিল, দেখেও ত কিছু কম করতে হবে মনে হয় না।

হৈম স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সে ঠিক। হয়ত চোখে না দেখলেই ছিল ভাল। তাহার পর ষোড়শীর শান্ত মলিন মুখখানির উপর নিজের স্নিগ্ধ চোখ দুটি রাখিয়া বলিল, আমরা সমস্তই শুনেচি। কিন্তু এ পাগলামি কেন করতে গেলে দিদি, এ-ঘরে তুমি ত থাকতে পারবে না! আবেগে ও করুণায় শেষ দিকটায় তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।

কিন্তু ষোড়শীর গলায় ইহার প্রতিধ্বনি বাজিল না। সে অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, অভ্যাস হয়ে যাবে। এর চেয়েও কত খারাপ ঘরে কত মানুষকে ত থাকতে হয় ভাই। তা ছাড়া, বাবার বড় কষ্ট হচ্ছিল।

হৈম প্রশ্ন করিল, তা হলে সমস্তই ছেড়ে দিলে?

ইহার উত্তর তাহার স্বামীর নিকট হইতে আসিল, সে কহিল, এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বলতে পারো? সমস্ত গ্রামের সঙ্গে ত একজন অসহায় স্ত্রীলোক দিবারাত্রি বিবাদ করে টিকতে পারে না। ষোড়শীকে কহিল, এই ভাল। যদি স্বেচ্ছায় এইখানে থাকাই সঙ্কল্প করে থাকেন, এবং কুটীরও অভ্যাস হয়ে যাবে বিশ্বাস করে থাকেন—সংসারে কিছুই ত্যাগ করা আপনার শক্ত হবে না।

ষোড়শী মৌন হইয়া রহিল, এবং তাহার মুখ দেখিয়াও তাহার মনের কথা কিছুই বুঝা গেল না।

হৈম বলিল, তুমি সন্ন্যাসিনী, বিষয়-আশয় ছাড়া তোমার কঠিন নয়, কুঁড়েও তোমার সইবে আমি জানি, কিন্তু এর সঙ্গে যে মিথ্যে দুর্নাম লেগে রইল সেও কি সইবে দিদি?

ষোড়শী হাসিমুখে ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, দুর্নাম যদি মিথ্যেই হয়, সইবে না কেন? হৈম, সংসারে মিথ্যে কথার অভাব নেই, কিন্তু তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে আবার মিথ্যে কাজের সৃষ্টি হয় তার গুরুভারটাই সওয়া যায় না।

হৈম কহিল, কিন্তু এককড়ি নন্দী যে কথা এবং কাজ দুই-ই মিথ্যে রটিয়ে বেড়াচ্চে? মেয়েমানুষের জীবনে সে যে অসহ্য।

ষোড়শী লেশমাত্র উত্তেজিত হইল না, আস্তে আস্তে কহিল, আমি যতদূর শুনেচি, এককড়ি মিথ্যে ত বিশেষ বলেনি। জমিদারবাবু হঠাৎ অত্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, ঘরে আর কেউ ছিল না—আমি তাঁর সেবা করেচি। এ ত অসত্য নয়।

হৈম উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। আর একজনের ধীরতার তুলনায় তাহার কণ্ঠস্বর কিছু অনাবশ্যক তীক্ষ্ণ শুনাইল, কহিল, কিন্তু সকলেই ত সব কাজ পারে না দিদি। আর্তের সেবা করারও ত একটা ধারা আছে।

ষোড়শী তেমনি মৃদুকণ্ঠে বলিল, আছে বৈ কি। কিন্তু স্থান কাল না বুঝে কেবল বাইরে থেকে ধারাটা স্থির করে দেওয়া যায় না হৈম। আপনি কি বলেন? এই বলিয়া সে নির্মলের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিল।

নির্মল এ ইঙ্গিত সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া কহিল অন্ততঃ আমি ত কোনমতেই

অস্বীকার করতে পারিনে। তা ছাড়া কাজের ধারা সকলের একও নয়—এই যেমন সন্ন্যাসিনীর।

স্বামীর এই উক্তিটাকে হৈম তলাইয়া দেখিল না, কহিল, হোক সন্ন্যাসিনী, কিন্তু তাঁর কি ধর্ম নেই? তিনি কি নারী নয়? আপনাকে সে ঘর থেকে ধরিয়ে নিয়ে গেল, অথচ বললেন নিজে গিয়েছিলেন। এই মিথ্যের কি আবশ্যক ছিল? তাঁর অসুখ ত কেবল নিজের দোষে। তবুও এতবড় ঘোর পাপিষ্ঠকে বাঁচাবার আপনার কি দরকার ছিল? এর পরেও মানুষে যদি সন্দেহ করে, সে কি তাদের দোষ?

স্ত্রীর কথা শুনিয়া নির্মল ক্ষুব্ধ এবং লজ্জিত হইয়া উঠিল। সে জানিত, অভিযোগ করিতে হৈম ঘর হইতে বাহির হয় নাই—বাড়ি চড়িয়া অপমান করিবার মত ক্ষুদ্র এবং হীন সে নয়, বস্তুতঃ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া একটা বড় রকমের ভরসা দিতেই সে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কথায় কথায় এ-সকল কি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পাছে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আরও বেশী কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে সে ব্যস্ত হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আবশ্যক হইল না। ষোড়শী হাসিয়া বলিল, তোমার স্বামী বলছিলেন সন্ন্যাসিনীর ধর্ম অ-সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে নাও মিলতে পারে, এই যেমন কুঁড়ের মধ্যে নিরাশ্রয়, ধুলোবালির ওপর একাকী বাস করা তোমার সহ্য হবে না। বলিয়া সে পুনরায় হাসিয়া কহিল, সত্যই আমাকে ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি, আমি রাগের মাথায় আপনিই বেরিয়ে পড়েছিলাম।

নির্মল কহিল, কিন্তু আপনার রাগ আছে বলে ত মনে হয় না?

ষোড়শী হাসি চাপিয়া শুধু বলিল, আছে বৈ কি! হৈমকে কহিল, কিন্তু সে তর্ক আমি করচি নে, সত্যিই আমি মিথ্যে বলেছিলাম। কিন্তু ঘোর পাপিষ্ঠ বলে কি তাকে বাঁচাবার অধিকারও কারও নেই? তোমার স্বামী উকিল, তাঁকে বরঞ্চ সময়মত জিজ্ঞাসা করে দেখো।

নির্মল বলিল, সময়মত সাধারণ বুদ্ধিতে একটা জবাব দিতেও পারি, কিন্তু ওকালতি বুদ্ধিতে ত কিছুই খুঁজে পাচ্ছিনে।

ষোড়শী কহিল, তা ছাড়া এমন ত হতে পারে, সজ্ঞানে অনেক কর্মই তিনি করেন না—

হৈম বাধা দিয়া কহিল, তাই বলে কি নিজের বাপের বিরুদ্ধেও যেতে হবে? এও কি সন্ন্যাসিনীর ধর্ম?

ষোড়শী রাগ করিল না, হাসিমুখে কহিল, সন্ন্যাসিনীর হোক না হোক মেয়েমানুষের অন্ততঃ এমন জিনিস সংসারে থাকতে পারে যা বাপেরও বড়। তাই যদি না হ'তো হৈম, এই ভাঙ্গা কুঁড়ের মধ্যে তোমার পায়ের ধুলোই বা পড়ত কি করে?

হৈম শশব্যস্তে হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া কহিল, অমন কথা তুমি মুখেও এনো না দিদি। আমার শ্বশুরকে কোন্ এক রাজা একখানি তলোয়ার খিলাত দিয়েছিলেন, ছেলেবেলায় আমি প্রায় সেখানি খুলে খুলে দেখতাম। খাপখানা তার ধুলো-বালিতে মলিন হয়ে গেছে, কিন্তু আসল জিনিসে কোথাও এতটুকু ময়লা ধরেনি। সে যেমন সোজা, তেমনি কঠিন, তেমনি খাঁটি—তার কথা আমার তোমার পানে চাইলেই মনে পড়ে। মনে হয়, দেশ-সুদ্ধ লোক সবাই ভুল করেচে, কেউ কিছু জানে না—তুমি ইচ্ছে করলে চোখের পলকে সেই খাপখানা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারো। কেন দিচ্চ না দিদি?

ষোড়শী তাহার ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া কহিল, আজ তোমাদের যাওয়ার কথা ছিল, হ'লো না কেন? বোধ হয় কাল যাওয়া হবে?

হৈম তাহার স্বামীকে দেখাইয়া কহিল, কাল রাত্রে কে একে হাত ধরে নদী মাঠ প্রান্তর নির্বিঘ্নে পার করে এনে বাড়িতে দিয়ে গেছেন, আমার বাবা তাঁকে পুরো এক টাকা বকশিশ দিতে চেয়েছেন। কিন্তু টাকাটা তাঁর হাতে পড়বে না, কারণ তিনি তাঁকে খুঁজে পাবেন না। এই অন্ধ মানুষটিকে অমন করে দিয়ে না গেলে যে কি হ'তো সে কেবল আমিই জানি, আর আমিই কেবল তাঁর নাম জানি। কিন্তু টাকাকড়ি ত তাঁকে দেবার জো নেই—তাই কেবল একটু পায়ের ধুলো নিতে—বলিয়া সে তাহার হাতখানি টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই ষোড়শী নিজের মুঠাটা শক্ত করিয়া রাখিয়া কেবল একটু হাসিল।

হৈম বাঁ হাত দিয়া তাহার চোখের কোণটা মুছিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, পায়ের ধুলো দিতে হবে না দিদি, মুঠোটা একটু আলগা কর—আমার হাত ভেঙে গেল। শক্ত কেবল মনই নয়, হাতটাও কম নয়! ইস্পাতের তলোয়ারটা কি সাধে মনে পড়ে! কিন্তু এই কথাটি আজ দাও দিদি, আপনার লোকের যদি কখনো দরকার হয় এই প্রবাসী বোনটিকে তখন স্মরণ করবে?

ষোড়শী তাহার হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল, কিছুই বলিল না।

হৈম কহিল, তাহলে কথা দিতে চাও না?

ষোড়শী বলিল, আমার জন্যে তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয় এই কি আমি চাইতে পারি ভাই?

নির্মল কহিল, ঝগড়া না করেও ত অনেক জিনিস করা যায়?

ষোড়শী বলিল, আমি বলি তা-ও আপনাদের চেষ্টা করে কাজ নেই। কিন্তু তাই বলে প্রবাসী বোনটিকেও আমি ভুলে যাবো না। আমার খবর আপনারা পাবেন।

চাকরটা এতক্ষণ চুপ করিয়া বাহিরে বসিয়াছিল, সে কহিল, মা, কালকের মত আজও ঝড়-জল হতে পারে—মেঘ উঠেচে।

হৈম বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিয়া প্রণাম করিয়া এবার পায়ের ধুলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নির্মল হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিয়া কহিল, আমি চিরদিন ঋণীই রয়ে গেলাম, শোধ দেবার আর কোন পথ রইল না। আদালতের মানুষ, বিষয়-সম্পত্তিওয়ালা ভৈরবীর কাজে লাগলেও লাগতে পারতাম, কিন্তু কুঁড়েঘরের সন্ন্যাসিনীরা আমাদের হাতের বাইরে। সমস্ত না ছেড়েও উপায় ছিল না সত্যি, কিন্তু ছেড়েও যে উপায় হবে তা ভরসা হয় না।

ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কে বললে আমি সমস্ত ছেড়ে দিয়েচি? আমি ত কিছুই ছাড়িনি।

নির্মল ও হৈম উভয়েই অবাক্ হইয়া একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, ছাড়েন নি? কোন স্বত্বই ত্যাগ করেন নি?

ষোড়শী তেমনি শান্তসহজ-কণ্ঠে কহিল, না, কিছুই না। আমি স্ত্রীলোক, আমি নিরুপায়, কিন্তু আমার ভৈরবীর অধিকার এক তিল শিথিল হয়নি। তাঁরা পুরুষমানুষ, তাঁদের জোর আছে, কিন্তু সেই জোরটা তাঁদের ষোল আনা সপ্রমাণ না করে আমার হাত থেকে কিছুই পাবার জো নেই—মাটির একটা ঢেলা পর্যন্ত না। নির্মলবাবু, আমি মেয়েমানুষ, কিন্তু সংসারে সেটাই আমার বড় অপরাধ যাঁরা স্থির করে রেখেছেন, তাঁরা ভুল করেছেন। এ ভ্রম তাঁদের সংশোধন করতে হবে।

কথা শুনিয়া দুজনেই স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরে তখনও আলো জ্বলে নাই—অন্ধকারে তাহার মুখ, তাহার চোখ, তাহার ক্ষীণ দেহের অস্পষ্ট ঋজুতা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষ্য হইল না, কিন্তু ওই শান্ত অবিচলিত কণ্ঠস্বরও যে মিথ্যা আস্ফালন উদ্গীর্ণ করে নাই, তাহা মর্মের মাঝখানে গিয়া উভয়কেই সবলে বিদ্ধ করিল।

অনতিদূরে পথের বাঁকটার কাছে একটা গোলমাল শুনা গেল। আগে এবং পিছনে কয়েকটা আলোর সঙ্গে গোটা-দুই পাল্কি চলিয়াছে।

অন্ধকারে নজর করিয়া দেখিয়া নির্মল কহিল, জমিদারবাবু তাহলে আজই পদধূলি দিলেন দেখচি।

ষোড়শী ভিতর হইতে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, জমিদারবাবু! তাঁর কি আসবার কথা ছিল? বলিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নির্মল কহিল, হাঁ, তাঁর নদীর ধারের নরককুণ্ডর ঝাড়ামোছা চলছিল। এককড়ি বলছিল, শরীর সারাবার জন্যে হুজুর আজকালের মধ্যেই স্বরাজ্যে পদার্পণ করবেন। করলেনও বটে।

ষোড়শী নির্বাক্ হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। বিদায় লইয়া নির্মল আস্তে আস্তে কহিল, যত দূরেই থাকি, আমরা বেঁচে থাকতে নিজেকে একেবারেই নিরুপায় এবং নিরাশ্রয় ভেবে রাখবেন না। বলিয়াই সে হৈমর হাত ধরিয়া অন্ধকারে অগ্রসর হইল। ষোড়শী তেমনি স্থির তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিল, এ কথারও কোন উত্তর দিল না।

বার

বিপুলকায় মন্দিরের প্রাচীরতলে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর পালকি দুটা নিমেষে অন্তর্হিত হইল। এই অত্যন্ত আঁধারে মাত্র ওই গোটা-কয়েক আলোর সাহায্যে মানুষের চক্ষে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু ষোড়শীর মনে হইল লোকটিকে সে যেন দিনের মত স্পষ্ট দেখিতে পাইল। এবং শুধু কেবল তিনিই নয়, তাঁহার পিছনে ঘেরা-টোপ ঢাকা যে পালকিটি গেল, তাহার অবরোধের মধ্যেও যে মানুষটি নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহারও শাড়ির চওড়া কালা-পাড়ের একপ্রান্ত ঈষন্মুক্ত দ্বারের ফাঁক দিয়া ঝুলিয়া আছে, সেটুকুও যেন তাহার চোখে পড়িল। তাহার হাতের তীর-কাটা চুড়ির স্বর্ণাভা লণ্ঠনের আলোকে পলকের জন্য যে খেলিয়া গেল এ-বিষয়েও তার সংশয় রহিল না। তাহার দুই কানে হীরার দুল ঝলমল করিতেছে, তাহার আঙুলে আঙটির পাথরে সবুজ রঙ ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। সহসা কল্পনা তাহার বাধা পাইয়া থামিল। তাহার স্মরণ হইল এ সমস্তই সে এইমাত্র হৈমর গায়ে দেখিয়াছে। মনে পড়িয়া একাকী অন্ধকারেও সে লজ্জায় সংকুচিত হইয়া উঠিল। চণ্ডী! চণ্ডী! বলিয়া সে সম্মুখের মন্দিরের উদ্দেশে চৌকাঠে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, এবং সকল চিন্তা দূর করিয়া দিয়া দ্বার ছাড়িয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইতে আর দুটি নর-নারীর চিন্তায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। ক্ষণেক পূর্বেও সকল কথাবার্তার মধ্যেও ঝড়-বৃষ্টির আশু সম্ভাবনা তাহার মনের মধ্যে নাড়া দিয়া গেছে। উপরে কালো ছেঁড়া মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইতেছে, হয়ত দুর্যোগের মাতামাতি অচিরেই আরম্ভ হইয়া যাইবে। বিগত রাত্রির অর্ধেক দুঃখ ত তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেছে, বাকী রাতটুকুও মন্দিরের রুদ্ধ দ্বারে দাঁড়াইয়া কোনমতে কাটিয়াছে, এই প্রকার শারীরিক ক্লেশ সহ্য করা তাহার অভ্যাস নয়—দেবীর ভৈরবীকে এ-সকল ভোগ করিতেও হয় না, তবুও কাল তাহার বিশেষ দুঃখ ছিল না। যে বাড়ি, যে ঘরদ্বার স্বেচ্ছায় সে তাহার হতভাগ্য পিতাকে দান করিয়া আসিয়াছে, সে-সম্বন্ধে সারাদিন আজ কোন চিন্তাই সে করে নাই; কিন্তু এখন হঠাৎ সমস্ত মন যেন তাহার একেবারে বিকল হইয়া গেল। এই নির্জন পল্লীপ্রান্তে একাকিনী এই ভাঙ্গা স্যাঁতসেঁতে গৃহের মধ্যে কি করিয়া তাহার রাত্রি কাটিবে? নিজের আশপাশে চাহিয়া দেখিল। স্তিমিত দীপালোকে ঘরের ও-দিকের কোণ দুইটা আবছায়া হইয়া আছে, তাহারই মাঝে মাঝে ইন্দুরের গর্তগুলো যেন কালো কালো চোখ মেলিয়া রহিয়াছে, তাহাদের বুজাইতে হইবে; মাথার উপরে চালে অসংখ্য ছিদ্র, ক্ষণেক পরে বৃষ্টি শুরু হইলে সহস্রধারে জল ঝরিবে, দাঁড়াইবার স্থানটুকু কোথাও রহিবে না, এইসব লোক ডাকাইয়া মেরামত করিতে হইবে; কবাটের অর্গল নিরতিশয় জীর্ণ, ইহার সংস্কার সর্বাগ্রে আবশ্যক, অথচ দিন থাকিতে লক্ষ্য করে নাই ভাবিয়া বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এই অরক্ষিত, পরিত্যক্ত পর্ণকুটীরে—কেবল আজ নয়—দিনের পর দিন বাস করিবে সে কেমন করিয়া?

তাহার মনে পড়িল, এইমাত্র বিদায়ক্ষণে নির্মলের কথার উত্তরে কিছুই বলা হয় নাই, অথচ শীঘ্র আর হয়ত দেখা হইবে না। সে ভরসা দিয়া বলিয়া গেছে নিজেকে একেবারে নিরুপায় না ভাবিতে। হয়ত সহস্র কাজের মধ্যে এ-কথা তাহার মনেও থাকিবে না। থাকিলেও, পশ্চিমের কোন্ একটা সুদূর শহরে বসিয়া সে সাহায্য করিবেই বা কি করিয়া, এবং তাহা গ্রহণ করিবেই বা সে কোন্ অধিকারে? আবার হৈমকে মনে পড়িল। যাইবার সময় একটিও কথা বলে নাই, কিন্তু স্বামীর আহ্বানে যখন তাঁহার হাত ধরিয়া সে অগ্রসর হইল, তখন তাঁহার প্রত্যেক কথাটিকে সে যেন নীরবে অনুমোদন করিয়া গেল। সুতরাং স্বামী ভুলিলেও ভুলিতে পারেন, কিন্তু স্ত্রী যে তাহার অনুচ্চারিত বাক্য সহজে বিস্মৃত হইবে না, ষোড়শী তাহা মনে মনে বিশ্বাস করিল।

হৈমর সহিত পরিচয় তাহার বহুদিনব্যাপীও নয়, ঘনিষ্ঠও নয়। অথচ কোনমতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে যখন তাহার কম্বলের শয্যাটি বিস্তৃত করিয়া ভূমিতলে উপবেশন করিল, তখন এই মেয়েটিকে তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল। সেই যে সে প্রথম দিনটিতেই অযাচিত তাহার দুঃখের অংশ লইয়া গ্রামের সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তির বিরুদ্ধে, পিতার বিরুদ্ধে, বোধ করি বা আরও একজনের বিরুদ্ধে গোপনে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে চলিয়া গেলে কাল

তাহার পাশে দাঁড়াইতে এখানে আর কেহ থাকিবে না; প্রতিকূলতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেই থাকিবে, কিন্তু আপনার বলিতে, একটা সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারণ করিতেও লোক মিলিবে না, অথচ এই ঝঞ্ঝা যে কোথায় গিয়া কি করিয়া নিবৃত্ত হইবে তাহারও কোন নির্দেশ নাই। এমনি করিয়া এই নির্বান্ধব জনহীন আলয়ে চারিদিকের ঘনীভূত অন্ধকারে একাকিনী বসিয়া সে অদূরে ভবিষ্যতের সুনিশ্চিত বিপদের ছবিটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু কখন অজ্ঞাতসারে যে এই পরিপূর্ণ উপদ্রবের আশঙ্কাকে সরাইয়া দিয়া ক্ষণকালের নিমিত্ত এক অভিনব অপরিজ্ঞাত ভাবের তরঙ্গ তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্তের মাঝে উত্তাল হইয়া উঠিল, সে জানিতে পারিল না। এতদিন জীবনটাকে সে যেভাবে পাইয়াছে সেই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছে। সে চণ্ডীর ভৈরবী—ইহার যে দায়িত্ব আছে, কর্তৃত্ব আছে, সম্পদ আছে, বিপদ আছে—স্মরণাতীত কাল হইতে ইহার অধিকারিণীগণের পায়ে পায়ে যে পথ পড়িয়াছে, তাহা কোথাও সঙ্কীর্ণ কোথাও প্রশস্ত, পথ চলিতে কেহ বা সোজা হাঁটিয়াছেন, কাহারও বা বাঁকা পদচিহ্ন পরম্পরাগত ইতিহাসের অঙ্কে বিদ্যমান। ইহার অলিখিত পাতাগুলো লোকের মুখে মুখে কোথাও বা সদাচারের পুণ্য-কাহিনীতে উদ্ভাসিত, কোথাও বা ব্যভিচারের গ্লানিতে কালো হইয়া আছে, তথাপি ভৈরবী-জীবনের সুনির্দিষ্ট ধারা কোথাও এতটুকু বিলুপ্ত হয় নাই। যাত্রা করিয়া সহজ ও দুর্গম, দুর্জ্ঞেয় ও জটিল অনেক গলিঘুঁজি অনেককেই পার হইতে হইয়াছে, তাহার সুখ ও দুঃখভোগ কম নয়; কিন্তু কেন, কিসের জন্য, এ প্রশ্নও বোধ করি কেহ কখনো করে নাই, কিংবা ইহাকে অস্বীকার করিয়া আর কোন একটা পথ খুঁজিতেও কাহারো প্রবৃত্তি হয় নাই। ভাগ্য-নির্দিষ্ট সেই পরিচিত খাদের মধ্য দিয়াই ষোড়শীর জীবনের এই কুড়িটা বছর প্রবাহিত হইয়া গেছে, ইহাকে ভৈরবীর জীবন বলিয়াই সে অসংশয়ে গ্রহণ করিয়াছে; একটা দিনের তরেও আপনার জীবন নারীর জীবন বলিয়া ভাবে নাই। চণ্ডীর সেবায়েত বলিয়া সে নিকটে ও দূরের বহু গ্রাম ও জনপদের গণনাতীত নরনারীর সহিত সুপরিচিত। কত সংখ্যাতীত রমণী—কেহ ছোট, কেহ বড়, কেহ বা সমবয়সী—তাহাদের কত প্রকারের সুখ-দুঃখ, কত প্রকারের আশা-ভরসা, কত ব্যর্থতা, কত অপরূপ আকাশকুসুমের নির্বাক ও নির্বিকার সাক্ষী হইয়া আছে; দেবীর অনুগ্রহলাভের জন্য কতকাল ধরিয়া কত কথাই না ইহারা গোপনে মৃদুকণ্ঠে তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছে, দুঃখী জীবনের নিভৃততম অধ্যায়গুলি অকপটে তাহার চোখের উপর মেলিয়া ধরিয়া প্রসাদ ভিক্ষা চাহিয়াছে; এ সমস্তই তাহার চোখে পড়িয়াছে, পড়ে নাই কেবল রমণী-হৃদয়ের কোন্ অন্তস্তল ভেদিয়া এই সকল সকরুণ অভাব ও অনুযোগের স্বর উত্থিত হইয়া এতকাল ধরিয়া তাহার কানে আসিয়া পশিয়াছে। ইহাদের গঠন ও প্রবৃত্তি এমনি কোন্ এক বিভিন্ন জগতের বস্তু, যাহাকে জানিবার ও চিনিবার কোন হেতু, কোন প্রয়োজন তাহার হয় নাই, সেই প্রয়োজনের প্রথম আঘাত এইখানে এই পরিত্যক্ত অন্ধকার আলয়ে এই প্রথম তাহার গায়ে লাগিল। কাল দুর্যোগের রাত্রে নির্মলের হাত ধরিয়া নদী পার করিয়া আনিয়া সে তাঁহাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল; হয়ত দুটি লোক ছাড়া এ কথা আর কেহ জানে না, এবং এখন এইমাত্র সেই স্বল্প-দৃষ্টি লোকটির আহ্বানে হৈম যে তাঁহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল, এ কথাও বোধ করি কয়েকটি লোক ছাড়া আর কেহ জানিবে না, কিন্তু কাল এবং আজিকার এই একই কর্তব্যের কত বড়ই না পার্থক্য!

আর একবার তাহার চোখের উপর হৈমর কাপড়ের পাড়টুকু হইতে, তাহার আঙুলের সবুজ রঙের আঙটি হইতে তাহার কানের হীরের দুল পর্যন্ত সমস্ত খেলিয়া গেল, এবং সর্বপ্রকার দুর্ভেদ্য আবরণ ও অন্ধকার অতিক্রম করিয়া তাহার অভ্রান্ত অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি, দৃষ্টির বাহিরে ওই মেয়েটির প্রত্যেক পদক্ষেপ যেন অনুসরণ করিয়া চলিল। সে দেখিতে পাইল, স্বামীর হাত ছাড়িয়া এইবার তাহাকে লুকাইয়া বাড়ি ঢুকিতে হইবে, সেখানে তাহার চিন্তিত ও ব্যাকুল পিতামাতার শত-সহস্র তিরস্কার ও কৈফিয়ত নিরুত্তরে মাথায় করিয়া লজ্জিত দ্রুতপদে নিজের ঘরে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, সেখানে হয়ত তাহার নিদ্রিত পুত্র ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে—তাহাকে শান্ত করিয়া আবার ঘুম পাড়াইতে হইবে; কিন্তু ইহাতেই কি অবসর মিলিবে? তখনও কত কাজ বাকী থাকিয়া যাইবে। অন্তরাল হইতে স্বামীর খাওয়াটুকু পর্যবেক্ষণ করা চাই—ত্রুটি না হয়; ছেলেকে ভুলিয়া

দুধ খাওয়াইতে হইবে—সে অভুক্ত না থাকে; পরে নিজেও খাইয়া লইয়া যেমন-তেমন করিয়া বাকী রাতটুকু কাটাইয়া আবার প্রত্যূষে উঠিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। তাহার কত রকমের প্রয়োজন, কত রকমের গুছান-গাছান। তাহার স্বামী, তাহার পুত্র, তাহার লোকজন—দাসী-চাকর তাহাকে আশ্রয় করিয়াই যাত্রা করিবে। দীর্ঘ পথে কাহার কি চাই—তাহাকেই যোগাইতে হইবে, তাহাকে সমস্ত ভাবিয়া সঙ্গে লইতে হইবে।

নিজের জীবনটাকে ষোড়শী কোনদিন পরের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখে নাই, আলোচনা করিবার কথাও কখনো মনে হয় নাই, তবুও সে মনের মাঝখানে গৃহিণীপনার সকল দায়িত্ব, সকল ভার, জননীর সকল কর্তব্য, সকল চিন্তাকে কে যেন কবে সুনিপুণ হাতে সম্পূর্ণ করিয়া সাজাইয়া দিয়া গেছে। তাই কিছু না জানিয়াও সে সব জানে, কখনও কিছু না শিখিয়াও হৈমর সকল কাজ তাহারি মত নিখুঁত করিয়া করিতে পারে এই কথাই তাহার মনে হইল।

অনতিদূরে একখণ্ড কাঠের উপর সংস্থাপিত মাটির প্রদীপটা নিব-নিব হইয়া আসিতেছিল, অন্যমনে ইহাকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেই তাহার চমক ভাঙিগয়া মনে পড়িল সে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী। এতবড় সম্মানিত গরীয়সী নারী এ প্রদেশে আর কেহ নাই। সে সামান্য একজন রমণীর অত্যন্ত সাধারণ গৃহস্থালীর অতি তুচ্ছ আলোচনায় মুহূর্তের জন্যও আপনাকে বিহ্বল করিয়াছে মনে করিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল। ঘরে আর কেহ নাই, ক্ষণকালের এতটুকু দুর্বলতা জগতে কেহ কখনো জানিবেও না, শুধু কেবল যে দেবীর সেবিকা সে, সেই চণ্ডীর উদ্দেশে আর একবার যুক্তকরে নতশিরে কহিল, মা, বৃথা চিন্তায় সময় বয়ে গেল, তুমি ক্ষমা ক'রো।

রাত্রি কত হইয়াছে ঠিক জানিবার জো নাই, কিন্তু অনুমান করিল অনেক হইয়াছে। তাই শয্যাটুকু আরও একটু বিস্তৃত করিয়া এবং প্রদীপে আরও খানিকটা তেল ঢালিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল। শ্রান্তচক্ষে ঘুম আসিতেও বোধ করি বিলম্ব ঘটিত না; কিন্তু বাহিরে দ্বারের কাছেই একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া বসিল। বাতাসেও একটু জোর ধরিয়াছিল, শিয়াল-কুকুর হওয়াও অসম্ভব নয়, তবুও ক্ষণকাল কান পাতিয়া থাকিয়া সভয়ে কহিল, কে?

বাহির হইতে সাড়া আসিল, ভয় নেই মা, তুমি ঘুমোও—আমি সাগর।

কিন্তু এত রাত্তিরে তুই কেন রে?

সাগর কহিল, হরখুড়ো বলে দিলে, জমিদার এয়েচে, রাতটাও বড় ভাল নয়—মা একলা রয়েচে, যা সাগর, লাঠিটা হাতে নিয়ে একবার বস্‌ গে। তুমি শুয়ে পড় মা, ভোর না দেখে আমি নড়ব না।

ষোড়শী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই যদি হয় সাগর, একা তুই কি করবি বাবা?

বাহিরের লোকটি একটু হাসিয়া কহিল, একা কেন মা, খুড়োকে একটা হাঁক দেব। খুড়ো-ভাইপোয় লাঠি ধরলে জান ত মা সব। সেদিনকার লজ্জাতেই মরে আছি, একটিবার যদি হুকুম দিয়ে পাঠাতে মা।

এই দুইটি খুড়া ও ভাইপো—হরিহর ও সাগর ডাকাতি অপবাদে একবার বছর-দুই করিয়া জেল খাটিয়াছিল। জেলের মধ্যে বরঞ্চ ছিল ভাল, কিন্তু অব্যাহতি পাইয়া ইহাদের প্রতি বহুকাল যাবৎ একদিকে জমিদার ও অন্যদিকে পুলিশ কর্মচারীর দৌরাত্ম্যের অবধি ছিল না। কোথাও কিছু একটা ঘটিলে দুইদিকের টানাটানিতে ইহাদের প্রাণান্ত হইত। স্ত্রীপুত্র লইয়া না পাইত ইহারা নির্বিঘ্নে বাস করিতে, না পাইত দেশ ছাড়িয়া কোথাও উঠিয়া যাইতে। এই অযথা পীড়ন ও অহেতুক যন্ত্রণা হইতে ষোড়শী ইহাদের যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়াছিল। বীজগাঁর জমিদারি হইতে বাস উঠাইয়া আনিয়া নিজের মধ্যে স্থান দিয়া এবং নানা উপায়ে পুলিশকে প্রসন্ন করিয়া জীবনযাত্রার ব্যাপারটা ইহাদের অনেকখানি সুসহ করিয়া দিয়াছিল। সেই অবধি দস্যু অপবাদগ্রস্ত এই দুইটি পরম ভক্ত ষোড়শীর সকল সম্পদে বিপদে একান্ত সহায়। শুধু কেবল নীচ জাতীয় ও অস্পৃশ্য বলিয়াই সঙ্কোচে তাহারা দূরে দূরে থাকিত, এবং ষোড়শী নিজেও কখনো কোনদিন তাহাদের কাছে ডাকিয়া ঘনিষ্ঠতা করিবার চেষ্টা করে নাই। অনুগ্রহ কেবল দিয়াই আসিয়াছে, ফিরিয়া কখনো গ্রহণ

করে নাই, বোধ করি প্রয়োজনও হয় নাই। আজ এই নির্জন নিশীথে সংশয় ও সঙ্কটের মাঝে তাহাদের আড়ম্বরহীন এই স্নেহ ও নিঃশব্দ সেবার চেষ্টায় ষোড়শীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সাগর, তোদের জাতের মধ্যেও বোধ হয় আমার সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়, না রে? কে কি বলে?

বাহির হইতে সাগর আস্ফালন করিয়া জবাব দিল, ইস্! আমাদের সামনে! দুই তাড়ায় কে কোথায় পালাবে ঠিক পায় না মা!

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ সলজ্জে অনুভব করিল, ইহার কাছে এরূপ প্রশ্ন করাই তাহার উচিত হয় নাই। অতএব কথাটাকে আর না বাড়াইয়া মৌন হইয়া রহিল। অথচ চোখেও তাহার ঘুম ছিল না। বাহিরে আসন্ন ঝড়বৃষ্টি মাথায় করিয়া তাহারি খবরদারিতে একজন জাগিয়া বসিয়া আছে জানিলেই যে নিদ্রার সুবিধা হয় তাহা নয়, তাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে এই কথাই পাড়িল, কহিল, যদি জল আসে তোর যে ভারী কষ্ট হবে সাগর, এখানে ত কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই।

সাগর কহিল, নাই থাকল মা। রাত বেশী নেই, প্রহর-দুই জলে ভিজলে আমাদের অসুখ করে না।

বাস্তবিক ইহার কোন প্রতিকারও ছিল না, তাই আবার কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ষোড়শী অন্য প্রসংগ উত্থাপিত করিল। কহিল, আচ্ছা, তোরা কি সব সত্যিই মনে করেচিস জমিদারের পিয়াদারা আমাকে সেদিন বাড়ি থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?

সাগর অনুতপ্ত স্বরে কহিল, কি করবে মা, তুমি যে একলা মেয়েমানুষ। এ পাড়ায় মানুষ বলতেও কেউ নেই, আমরা খুড়ো-ভাইপোও সেদিন হাটে গিয়ে তখনও ফিরতে পারিনি। নইলে সাধ্য কি মা, তোমার গায়ে কেউ হাত দেয়।

ষোড়শী মনে মনে বুঝিল এ আলোচনাও ঠিক হইতেছে না, কথায় কথায় হয়ত কি একটা শুনিতে হইবে; কিন্তু থামিতেও পারিল না, কহিল, তাদের কত লোকজন, তোরা দুটিতে থাকলেই কি আটকাতে পারতিস?

বাহির হইতে সাগর মুখে অস্ফুট ধ্বনি করিয়া বলিল, কি হবে মা আর মনের দুঃখ বাড়িয়ে। হুজুরও এয়েছেন, আমরাও জানি সব। মায়ের কৃপায় আবার যদি কখনো দিন আসে, তখন তার জবাব দেব। তুমি মনে ক'রো না মা, হরখুড়ো বুড়ো হয়েছে বলে মরে গেছে। তাকে জানতো মাতু ভৈরবী, তাকে জানে শিরোমণিঠাকুর। জমিদারের পাইক-পিয়াদা বহুৎ আছে তাও জানি, গরীব বলে আমাদের দুঃখও তারা কম দেয়নি, সেও মনে আছে—ছোটলোক আমরা নিজেদের জন্যে ভাবিনে, কিন্তু তোমার হুকুম হলে মা ভৈরবীর গায়ে হাত দেবার শোধ দিতে পারি। গলায় দড়ি বেঁধে টেনে এনে ওই হুজুরকেই রাতারাতি মায়ের স্থানে বলি দিতে পারি মা, কোন শালা আটকাবে না!

ষোড়শী মনে মনে শিহরিয়া কহিল, বলিস কি সাগর, তোরা এমন নিষ্ঠুর, এমন ভয়ংকর হতে পারিস? এইটুকুর জন্যে একটা মানুষ খুন করবার ইচ্ছে হয় তোদের!

সাগর কহিল, এইটুকু! কেবল এইটুকুর জন্যেই কি আজ তোমার এই দশা। জমিদার এসেছে শুনে খুড়ো যেন জ্বলতে লাগল। তুমি ভেবো না মা, আবার যদি কিছু একটা হয়, তখন সেও কেবল এইটুকুতেই থেমে থাকবে!

ষোড়শী কহিল, হাঁরে সাগর, তুই কখনো গুরুমশায়ের পাঠশালে পড়েছিলি?

বাহিরে বসিয়া সাগর যেন লজ্জিত হইয়া উঠিল, বলিল, তোমার আশীর্বাদে অমনি একটু রামায়ণ মহাভারত নাড়তে চাড়তে পারি। কিন্তু এ কথা কেন জিজ্ঞেসা করলে মা?

ষোড়শী বলিল, তোর কথা শুনলে মনে হয় খুড়ো তোর না বুঝতেও পারে, কিন্তু তুই বুঝতে পারবি। সেদিন আমাকে কেউ ধরে নিয়ে যায়নি সাগর, কেউ আমার গায়ে হাত দেয়নি, আমি কেবল রাগের মাথায় আপনি চলে গিয়েছিলাম।

সাগর কহিল, সে আমরাও শুনেচি, কিন্তু সারারাত যে ঘরে ফিরতে পারলে না মা, সেও কি রাগ করে?

ষোড়শী এ প্রশ্নের ঠিক উত্তরটা এড়াইয়া গিয়া কহিল, কিন্তু যে জন্যে তোদের এত

রাগ, সে দশা আমার ত আমি নিজেই করেচি। আমি ত নিজের ইচ্ছাতেই বাবাকে ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েচি।

সাগর কহিল, কিন্তু এতকাল ত এ আশ্রয় নেবার ইচ্ছে হয়নি মা। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ তাহার কণ্ঠস্বর যেন উগ্র ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, তারাদাস ঠাকুরের ওপরও আমাদের রাগ নেই, রায়মশায়কেও আমরা কেউ কিছু বলব না, কিন্তু জমিদারকে আমরা সুবিধে পেলে সহজে ছাড়ব না। জান মা, আমাদের বিপিনের সে কি করেচে? সে বাড়ি ছিল না—তার লোকজন তার ঘরে ঢুকে—

ষোড়শী তাড়াতাড়ি তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিল, থাক সাগর, ও-সব খবর আর তোরা আমাকে শোনাস নে।

সাগর চুপ করিল, ষোড়শী নিজেও বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন প্রশ্ন করিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সাগর পুনরায় যখন কথা কহিল, তাহার কণ্ঠস্বরে গূঢ় বিস্ময়ের আভাস ষোড়শী স্পষ্ট অনুভব করিল। সাগর কহিল, মা, আমরা তোমার প্রজা, আমাদের দুঃখ তুমি না শুনলে শুনবে কে?

ষোড়শী কহিল, কিন্তু শুনেও ত অতবড় জমিদারের বিরুদ্ধে আমি প্রতিকার করতে পারব না বাছা।

সাগর কহিল, একবার ত করেছিলে। আবার যদি দরকার হয় তুমিই পারবে। তুমি না পারলে আমাদের রক্ষা করতে কেউ নেই মা।

ষোড়শী বলিল, নতুন ভৈরবী যদি কেউ হয় তাকেই তোদের দুঃখ জানাস।

সাগর চমকিয়া কহিল, তাহলে তুমি কি আমাদের সত্যিই ছেড়ে যাবে মা? গ্রামসুদ্ধ সবাই যে বলাবলি করচে—সে সহসা থামিল, কিন্তু ষোড়শী নিজেও এ প্রশ্নের হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, দেখ্ সাগর, তোদের কাছে এ-কথা তুলতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যায়। কিন্তু আমার সম্বন্ধে সব ত শুনেচিস? গ্রামের আরও দশজনের মত তোরা নিজেও দেখচি বিশ্বাস করেচিস, তার পরেও কি তোরা আমাকেই মায়ের ভৈরবী করে রাখতে চাস রে?

বাহিরে বসিয়া সাগর আস্তে আস্তে উত্তর দিল, অনেক কথাই শুনি মা, এবং আরও দশজনের মত আমরাও ভেবে পাইনে কেনই বা তুমি সে-রাত্রে ঘরে ফিরলে না, আর কেনই বা সকালবেলা সাহেবের হাত থেকে হুজুরকে বাঁচালে। কিন্তু সে যাই হোক মা, আমরা ক'ঘর ছোটজাত ভূমিজ তোমাকেই মা বলে জেনেচি; যেখানেই যাও আমরাও সঙ্গে যাব। কিন্তু যাবার আগে একবার জানিয়ে দিয়ে যাব।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু তোরা ত আমার প্রজা নয়, মা চণ্ডীর প্রজা। আমার মত মায়ের দাসী কত হয়ে গেছে, কত হবে। তার জন্যে তোরা কেনই বা ঘরদোর ছেড়ে যাবি, কেনই বা উপদ্রব অশান্তি ঘটাবি। এমন ত হতে পারে, আমার নিজেরই আর এ-সমস্ত ভাল লাগচে না।

সাগর সবিস্ময়ে কহিল, ভাল লাগচে না?

ষোড়শী বলিল, আশ্চর্য কি সাগর? মানুষের মন কি বদলায় না?

এবার প্রত্যুত্তরে লোকটি কেবল একটা হুঁ বলিয়াই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু রাত আর বেশী বাকী নেই মা, আকাশে মেঘও কেটে যাচ্ছে, এইবার তুমি একটু ঘুমোও।

ষোড়শীর নিজেরও এ-সকল আলোচনা ভাল লাগিতেছিল না, তাহাতে সে অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিল। সাগরের কথায় আর দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সে-চক্ষে ঘুম যতক্ষণ না আসিল, কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া উহারই কথাগুলো তাহার মনে হইতে লাগিল, এই যে লোকটি বিনিদ্র-চক্ষে বাহিরে বসিয়া রহিল, তাহাকে সে ছেলেবেলা হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে; ইতর ও অন্ত্যজ বলিয়া এতদিন শুধু তুচ্ছ ও ছোট কাজেই লাগিয়াছে, কোনদিন কোন সম্মানের স্থান পায় নাই, আলাপ করিবার কল্পনা ত কাহারও স্বপ্নেও উঠে নাই, কিন্তু আজ এই দুঃখের রাত্রে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া তাহার অনেক কথাই বাহির হইয়া গেছে, এবং তাহার ভালমন্দ হিসাব করিবার দিন হয়ত

একদিন আসিতেও পারে; কিন্তু শ্রোতা হিসাবে এই ছোটলোকটিকে সে একান্ত ছোট বলিয়া আজ কিছুতেই ভাবিতে পারিল না।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিলে দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিল সকাল আর নাই—ঢের বেলা হইয়াছে; এবং অনতিদূরে অনেকগুলা লোক মিলিয়া তাহারই রুদ্ধ দরজার প্রতি চাহিয়া কি যেন একটা তামাশার প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও এতটুকু পর্দা, এতটুকু আব্রু নাই। সহসা মনে হইল, তৎক্ষণাৎ দ্বার বন্ধ না করিয়া দিলে এই লোকগুলার উৎসুকদৃষ্টি হইতে বুঝি সে বাঁচিবে না। এই ক্ষুদ্র গৃহটুকু যত জীর্ণ যত ভগ্নই হোক, আত্মরক্ষা করিবার এ-ছাড়া আর বুঝি সংসারে দ্বিতীয় স্থান নাই, এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখিতে পাইল ভিড় ঠেলিয়া এককড়ি নন্দী তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সবিনয়ে কহিল, গ্রামে হুজুর পদার্পণ করেছেন, শুনেচেন বোধ হয়।

জমিদারের গোমস্তা এই এককড়ি ইতিপূর্বে কোনদিন তাহাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করে নাই। তাহার বিনয়, তাহার এই সম্ভাষণের পরিবর্তন ষোড়শীকে যেন বিদ্ধ করিল, কিন্তু কিছু একটা জবাব দিবার পূর্বেই সে পুনশ্চ সসম্ভ্রমে কহিল, হুজুর একবার আপনাকে স্মরণ করেচেন।

কোথায়?

এই যে কাছারি-বাড়িতে। সকাল থেকে এসেই প্রজার নালিশ শুনচেন। যদি অনুমতি করেন ত পালকি আনতে পাঠিয়ে দিই?

সকলে হাঁ করিয়া শুনিতেছিল; ষোড়শীর মনে হইল তাহারা যেন এই কথায় হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার ভিতরটা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্তে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, এটা তাঁর প্রস্তাব, না, তোমার সুবিবেচনা এককড়ি?

এককড়ি সসম্ভ্রমে বলিল, আজ্ঞে, আমি ত চাকর, এ স্বয়ং হুজুরের আদেশ।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, তোমার হুজুরের কপাল ভাল। জেলের ঘানি টানার বদলে পালকি চড়ে বেড়াচ্চেন, তাও আবার শুধু স্বয়ং নয়, পরের জন্যও ব্যবস্থা করচেন। কিন্তু বল গে এককড়ি, আমার পালকি চড়ার ফুরসত নেই—আমার ঢের কাজ।

এককড়ি কহিল, ও-বেলায় কিংবা কাল সকালেও কি একটু সময় পাবেন না?

ষোড়শী কহিল, না।

এককড়ি কহিল, কিন্তু হলে যে ভালো হ'তো। আর দশজন প্রজার যে নালিশ আছে।

ষোড়শী কঠোরস্বরে উত্তর দিল, বিচার করবার মত বিদ্যেবুদ্ধি থাকে ত তাঁর নিজের প্রজার করুন গে। কিন্তু আমি তোমার হুজুরের প্রজা নই, আমার বিচার করবার জন্যে রাজার আদালত আছে। এই বলিয়া সে গামছাটা কাঁধের উপর ফেলিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

তের

জমিদারের নিভৃত-নিবাস সাজাইতে গুছাইতে দিন-চারেক গিয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, হুজুর এবার একাদিক্রমে মাস-দুই চণ্ডীগড়ে বিশ্রাম করিয়া যাইবেন। আজ সকাল-বেলাতেই উত্তরদিকের বড় হলটায় মজলিশ বসিয়াছিল। ঘরজোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপরে সাদা জাজিম বিছানো এবং মাঝে মাঝে দুই-চারিটা মোটা তাকিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। গৃহের একধারে আজ গ্রামের মাতব্বরেরা বার দিয়া বসিয়াছিলেন—জমিদারের কাছে তাঁহাদের মস্ত নালিশ ছিল। রায়মহাশয় ছিলেন, শিরোমণি ছিলেন, ঘোষজা ছিলেন, বোসজা ছিলেন, এমন কি তারাদাস ঠাকুরও ইঁহাদের আড়ালে মুখ নীচু করিয়া ও কান খাড়া করিয়া সতর্ক হইয়া বসিয়াছিলেন। আরও যাঁহারা যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের কেহই যদিচ অবহেলার বস্তু নহেন, তবুও ইঁহাদের নাম ধাম ও বিবরণ সবিস্তারে বিদিত না হইলেও পাঠকের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিবে না বিবেচনা করিয়াই তাহাতে নিরস্ত হইলাম। যাই হোক, ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় অভিযোগের ভূমিকাটা একপ্রকার শেষ হইয়া গেলেও আসল কথাটি

উঠি-উঠি করিয়াও থামিয়া যাইতেছিল—ঠিক যেন মুখে আসিয়াও কাহারও বাহির হইতে চাহিতেছিল না।

জীবানন্দ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সকলের সঙ্গে থাকিয়াও একটুখানি দূরে একটা তাকিয়ার উপর দুই কনুয়ের ভর দিয়া বসিয়া তিনি মন দিয়াই যেন সমস্ত শুনিতেছিলেন। মন প্রফুল্ল। একেবারে স্বাভাবিক না হইলেও সম্পূর্ণ কৃত্রিম বলিয়াও সন্দেহ হয় না। খুব সম্ভব মদের ফেনা তখনও তাঁহার মগজের সমস্ত অলিগলি দখল করিয়া বসে নাই। সুমুখের বড় বড় খোলা দরজা দিয়া বাহিরের শুক্‌না বালু ও ভিজা মাটির গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল, এবং পাশের ঘরটাতেই বোধ করি রান্না হইতেছিল বলিয়া তাহারই রুদ্ধ দ্বারের কোন্‌ একটা ফাঁক দিয়া একজাতীয় শব্দ ও গন্ধ মাঝে মাঝে এই বাতাসেই ভর দিয়া লোকের কানে ও নাকে আসিয়া পৌঁছিতেছিল, তাহা ব্যক্তিবিশেষের কাছে উপাদেয় ও রুচিকর হইলেও শিরোমণিমহাশয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি বার-দুই কাশিয়া ও উত্তরীয়-প্রান্তে নাকের ডগাটা মার্জনা করিয়া, উঠিয়া গিয়া আর এক ধারে বসিতেই জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, শিরোমণিমশায়ের কি অর্ধভোজন হয়ে গেল নাকি?

অনেকেই হাসিয়া উঠিল, শিরোমণির নাকের ডগার মত মুখখানাও রাঙ্গা হইয়া উঠিল। জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই ঠাকুর, জাত যাবে না; ওটা আপনাদের মা চন্ডীরই মহাপ্রসাদ। তবে যিনি রাঁধচেন তাঁর গোত্রটি ঠিক জানিনে, হয়ত এক না হতেও পারে।

শিরোমণি আপনাকে কতকটা সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক, তা হোক। ব্রাহ্মণ পাচক—দরিদ্র হলেও একটা গোত্র আছে বৈ কি।

জীবানন্দ হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, জানিনে ঠাকুর, ও-সব বালাই ওর কিছু আছে কি না। কিন্তু হাতা-বেড়ির সঙ্গে মিলে সোনার চুড়ির আওয়াজটাও আমার বড় মিঠে লাগে। আর সেই হাতে পরিবেশন করলে—তা নিমন্ত্রণ করলে ত আর—, বলিয়া তিনি পুনশ্চ প্রবল হাসির শব্দে ঘর ভরিয়া দিলেন।

শিরোমণি অধোবদন হইলেন, এবং ভিতরের কদর্য ব্যাপার যদিচ সকলেই জানিতেন, তথাপি এই অভাবনীয় প্রকাশ্য নির্লজ্জতায় উপস্থিত কেহই লোকটার মুখের প্রতি সহসা চাহিতে পর্যন্ত পারিল না।

হাসি থামিলে তিনি কহিলেন, সদালাপ ত হ'লো। এবং দয়া করে মাঝে মাঝে এলে এমন আরও ঢের হতে পারবে, কিন্তু আপনাদের নালিশটা কি শুনি?

কিন্তু উত্তরে কাহারও মুখে কথা ফুটিল না, সকলে যেমন নীরবে বসিয়াছিল তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

জীবানন্দ কহিলেন, বলতে কি আপনাদের লজ্জাবোধ হচ্ছে?

এবার রায়মহাশয় মুখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন, নন্দীমশাই ত সমস্ত জানেন, তিনি কি হুজুরের গোচর করেন নি?

জীবানন্দ কহিলেন, হয়ত করেচেন, কিন্তু আমার মনে নেই। তা ছাড়া, তার গোচর করার প্রতি খুব বেশী আস্থা না রেখে ব্যাপারটা আপনারাই বলুন। স্বিরুক্তি দোষ ঘটতে পারে, কিন্তু কি আর করা যাবে। জমিদারের গোমস্তা—একটু মোকাবিলে হয়ে থাকা ভাল। ঠিক না?

প্রভুর মুখে এককড়ির এই সুখ্যাতিটুকুতে রায়মহাশয় মনে মনে আনন্দ লাভ করিলেন। কিন্তু চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া পরম গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, হুজুর সর্বজ্ঞ। ভৃত্যের সম্বন্ধে যথা ইচ্ছা আদেশ করতে পারেন, কিন্তু, আমাদের অভিযোগ—

কি অভিযোগ?

জনার্দন রায় কহিলেন, আমরা গ্রামস্থ ষোল আনা ইতর-ভদ্র একত্র হয়ে—

জীবানন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন, তা দেখতে পাচ্ছি। ওইটি কি সেই ভৈরবীর বাপ তারাদাস ঠাকুর নয়? এই বলিয়া তিনি তাহার প্রতি অ[illegible]ত করিলেন।

তারাদাস সাড়া দিল না, জাজিমটার অংশবিশেষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে

বসিয়া রহিল, এবং রায়মহাশয়ের আনত মুখের 'পরেও একটা ফ্যাকাশে ছায়া পড়িল। কিন্তু মুখরক্ষা করিলেন শিরোমণিঠাকুর। তিনি সবিনয়ে কহিলেন, রাজার কাছে প্রজা সন্তানতুল্য, তা দোষ করলেও সন্তান, না করলেও সন্তান। আর কথাটা একরকম ওরই। ওর কন্যা ষোড়শীর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চয় স্থির করেচি, তাকে আর মহাদেবীর ভৈরবী রাখা যেতে পারে না। আমাদের নিবেদন, হুজুর তাকে সেবায়েতের কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার আদেশ করুন।

জমিদার চকিত হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, কেন? তার অপরাধ?

দুই-তিনজন প্রায় সমস্বরে জবাব দিয়া ফেলিল, অপরাধ অতিশয় গুরুতর।

জীবানন্দ একে একে তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে জনার্দনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তিনি হঠাৎ এমন কি ভয়ানক দোষ করেচেন রায়মশায়, যার জন্য তাঁকে তাড়ানো আবশ্যক?

জনার্দন মুখ তুলিয়া শিরোমণিকে চোখের ইঙ্গিত করিতেই জীবানন্দ বাধা দিয়া কহিলেন, না, না, উনি অনেক পরিশ্রম করেচেন, বুড়োমানুষকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, ব্যাপারটা আপনিই ব্যক্ত করুন।

রায়মহাশয়ের চোখে ও মুখে দ্বিধা ও অত্যন্ত সঙ্কোচ প্রকাশ পাইল, মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, ব্রাহ্মণকন্যা—এ আদেশ আমাকে করবেন না।

জীবানন্দ হাসিমুখে কহিলেন, দেব-দ্বিজে আপনার অচলা ভক্তির কথা এদিকে কারও অবিদিত নেই। কিন্তু এতগুলি ইতর-ভদ্রকে নিয়ে আপনি নিজে যখন উপস্থিত হয়েচেন, তখন ব্যাপার যে অতিশয় গুরুতর তা আমার বিশ্বাস হয়েচে। কিন্তু সেটা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

কিন্তু জনার্দন রায় অত সহজে ভুল করিবার লোক নহেন; প্রত্যুত্তরে তিনি শিরোমণির প্রতি একটা ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হুজুর যখন নিজে শুনতে চাচ্চেন তখন আর ভয় কি ঠাকুর? নির্ভয়ে জানিয়ে দিন না।

খোঁচা খাইয়া বৃদ্ধ শিরোমণি হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, সত্যি কথায় ভয় কিসের জনার্দন? তারাদাসের মেয়েকে আর আমরা কেউ ভৈরবী রাখব না হুজুর। তার স্বভাব-চরিত্র ভারী মন্দ হয়ে গেছে—এই আপনাকে আমরা জানিয়ে দিচ্চি।

জীবানন্দের পরিহাস-দীপ্ত প্রফুল্ল মুখ অকস্মাৎ গম্ভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল; একমুহূর্ত নিঃশব্দে থাকিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলেন, তাঁর স্বভাব-চরিত্র মন্দ হবার খবর আপনারা নিশ্চয় জেনেছেন?

তৎক্ষণাৎ অনেকেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল যে, ইহাতে কাহারও কোন সংশয় নাই—এ গ্রামসুদ্ধ সবাই জানিয়াছে। জনার্দন মুখে কিছু না কহিলেও চুপ করিয়া মাথা নাড়িতে লাগিলেন। জীবানন্দ আবার ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহারই মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তাই সুবিচারের আশায় বেছে বেছে একেবারে ভীষ্মদেবের কাছে এসে পড়েছেন রায়মহাশয়? বিশেষ সুবিধে হবে বলে ভরসা হয় না।

এ কথার ইঙ্গিত সকলে বুঝিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু জনার্দন এবং শিরোমণি বুঝিলেন। জনার্দন মৌন হইয়া রহিলেন, কিন্তু শিরোমণি জবাব দিলেন। বলিলেন, আপনি দেশের রাজা—সুবিচার বলুন, অবিচার বলুন, আপনাকেই করতে হবে। আমাদের তাই মাথা পেতে নিতে হবে। সমস্ত চণ্ডীগড় ত আপনারই।

কথা শুনিয়া জীবানন্দের মুখের ভাব একটু সহজ হইয়া আসিল; মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, দেখুন শিরোমণিমশাই, অতি-বিনয়ে আপনাদের খুব হেঁট হয়ে কাজ নেই, অতি-গৌরবে আমাকেও আকাশে তোলবার আবশ্যক নেই। আমি শুধু জানতে চাই, এ অভিযোগ কি সত্য?

সাগ্রহে রায়মহাশয়ের মুখ আশান্বিত হইয়া উঠিল। শিরোমণি ত একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন; কহিলেন, অভিযোগ? সত্য কি না! আচ্ছা, আমরা না হয়, কিন্তু তারাদাস, তুমিই বল ত! রাজদ্বার! যথাধর্ম বলো—

তারাদাস একবার পাংশু, একবার রাঙ্গা হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু উপস্থিত সকলের

একাগ্র দৃষ্টি খোঁচা দিয়া যেন তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। সে একবার ঢোক গিলিয়া, একবার কণ্ঠের জড়িমা সাফ করিয়া অবশেষে মরিয়ার মত বলিয়া উঠিল, হুজুর—

জীবানন্দ চক্ষের নিমেষে হাত তুলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থাক। ওর মুখ থেকে ওর নিজের মেয়ের কাহিনী আমি যথাধর্ম বললেও শুনব না। বরঞ্চ আপনাদের কেউ পারেন ত যথাধর্ম বলুন।

সভা পুনশ্চ নীরব হইল, কিন্তু এবার সেই নীরবতার মধ্য হইতে অস্ফুট উদাম পরিস্ফুট হইবার লক্ষণ দেখা দিল। পাশের দরজা খুলিয়া বেহারা টম্বুরার ভরিয়া হুইস্কি ও সোডা প্রভুর হাতে আনিয়া দিল; তিনি এক নিঃশ্বাসে তাহা নিঃশেষে পান করিয়া ভৃত্যের হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচলাম। একটু হাসিয়া কহিলেন, সকাল-বেলাতেই আপনাদের বাক্যসুধা পান করে তেষ্টায় বুক পর্যন্ত কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুপচাপ যে! কি হলো আপনাদের যথাধর্মের?

শিরোমণি হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই যে বলি হুজুর, আমি যথাধর্ম বলব।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সম্ভব বটে। আপনি শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্রাহ্মণ, কিন্তু একজন স্ত্রীলোকের নষ্ট-চরিত্রের কাহিনী তার অসাক্ষাতে বলার মধ্যে আপনার যথাধর্মের যথাটা যদি বা থাকে, ধর্মটা থাকবে কি? আমার নিজের বিশেষ কোন আপত্তি নেই—ধর্মাধর্মের বালাই আমার বহুদিন ঘুচে গেছে, তবু আমি বলি ওতে কাজ নেই। বরঞ্চ আমি যা জিজ্ঞাসা করি তার জবাব দিন। বর্তমান ভৈরবীকে আপনারা তাড়াতে চান—এই না?

সবাই একযোগে মাথা নাড়িয়া জানাইল, ঠিক তাই।

এঁকে নিয়ে আর সুবিধা হচ্ছে না?

জনার্দন প্রতিবাদের ভঙ্গীতে মাথা তুলিয়া কহিলেন, সুবিধে অসুবিধে কি হুজুর, গ্রামের ভালোর জন্যেই প্রয়োজন।

জীবানন্দ হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, অর্থাৎ গ্রামের ভালমন্দ আলোচনা না তুলেও এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আপনার নিজের ভালমন্দ কিছু একটা আছেই। তাড়াবার আমার ক্ষমতা আছে কি না জানিনে, কিন্তু আপত্তি বিশেষ নেই। কিন্তু আর কোন একটা অজুহাত তৈরি করা যায় না? দেখুন না চেষ্টা করে। বরঞ্চ আমাদের এককড়িটিকেও নাহয় সঙ্গে নিন, এ বিষয়ে তার বেশ একটু সুনাম আছে।

কথা শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। হুজুর একটু থামিয়া কহিলেন, এঁদের সতীপনার কাহিনী অত্যন্ত প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ, সুতরাং তাকে আর নাড়াচাড়া করে কাজ নেই। ভৈরবী থাকলেই ভৈরব এসে জোটে এবং ভৈরবীদেরও ভৈরব নইলে চলে না, এ অতি সনাতন প্রথা—সহজে টলানো যাবে না। দেশসুদ্ধ ভক্তের দল চটে যাবে, হয়ত দেবী নিজেও খুশী হবে না—একটা হাঙ্গামা বেধে যাবে। মাতঙ্গী ভৈরবীর গোটা-পাঁচেক ভৈরব ছিল, এবং তাঁর পূর্বে যিনি ছিলেন তাঁর নাকি হাতে গোনা যেতো না। কি বলেন শিরোমণিমশাই, আপনি ত এ অঞ্চলের প্রাচীন ব্যক্তি, জানেন ত সব? এই বলিয়া তিনি শিরোমণি অপেক্ষা রায়মহাশয়ের প্রতি বিশেষ করিয়া কটাক্ষপাত করিলেন। এ প্রশ্নের কেহ উত্তর দিবে কি, সকলে যেন বুদ্ধি-বিহ্বল হইয়া গেল। জমিদারের কণ্ঠস্বর সোজা না বাঁকা, বক্তব্য সত্য না মিথ্যা, তাৎপর্য বিদ্রূপ না পরিহাস, তামাশা না তিরস্কার, কেহ ঠাহর করিতেই পারিল না।

সম্মুখের বারান্দা ঘুরিয়া একজন ভদ্রবেশধারী শৌখিন যুবক প্রবেশ করিল। হাতে তার ইংরেজী বাংলা কয়েকখানা সংবাদপত্র এবং কতকগুলো খোলা চিঠিপত্র। জীবানন্দ দেখিয়া কহিলেন, কি হে প্রফুল্ল, এখানেও ডাকঘর আছে নাকি? আঃ—কবে এইগুলো সব উঠে যাবে?

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে ঠিক। গেলে আপনার সুবিধে হ'তো। কিন্তু সে যখন হয়নি তখন এগুলো দেখবার কি সময় হবে?

জীবানন্দ কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, না, এখনও হয় না, অন্য

সময়েও হবে না। কিন্তু অনেকটা বাইরে থেকেই উপলব্ধি হচ্চে। এই যে হীরালাল-মোহনলালের দোকানের ছাপ। পত্রখানি তাঁর উকিলের, না একেবারে আদালতের হে? ও খামখানা তো দেখচি সলোমন সাহেবের। বাবা, বিলিতী সুধার গন্ধ কাগজ ফুঁড়ে বার হচ্ছে। কি বলেন সাহেব, ডিক্রি জারি করবেন, না এই রাজবপুখানি নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবেন—জানাচ্চেন? আঃ—সেকালের ব্রাহ্মণ্যতেজ যদি কিছু বাকী থাকতো ত এই ইহুদি বেটাকে একেবারে ভস্ম করে দিতাম। মদের দেনা আর শুধতে হ'তো না।

প্রফুল্ল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কি বলচেন দাদা? থাক থাক, আর একসময়ে আলোচনা করা যাবে। এই বলিয়া সে ফিরিতে উদ্যত হইতেই জীবানন্দ সহাস্যে কহিলেন, আরে লজ্জা কি ভায়া, এ'রা সব আপনার লোক, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী, এমনকি, মণি-মাণিক্যের এ-পিঠ ও-পিঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তা ছাড়া তোমার দাদাটি যে কস্তুরী-মৃগ; সুগন্ধ আর কতকাল চেপে রাখবে ভাই। টাকা! টাকা! এর নালিশ আর তার নালিশ, অমুকের ডিক্রি আর তমুকের কিস্তিখেলাপ—ওহে, ও তারাদাস, সে-দিনটা নেহাত ফসকে গিয়েছিল, কিন্তু হতাশ হ'য়ো না ঠাকুর, যা করে তুলেচি, তাতে মনস্কামনা তোমার পূর্ণ হতে খুব বেশী বিলম্ব হবে বলে আশঙ্কা হয় না। প্রফুল্ল, রাগ ক'রো না ভায়া, আপনার বলতে আর কাউকে বড় বাকী রাখিনি, কিন্তু এই চল্লিশটা বছরের অভ্যাস ছাড়তে পারবো বলেও ভরসা নেই, তার চেয়ে বরঞ্চ, নোট-টোট জাল করতে পারে এমন যদি কাউকে যোগাড় করে আনতে পারতে হে—

প্রফুল্ল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াও হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দেখুন, সবাই আপনার কথা বুঝবেন না, সত্য ভেবে যদি কেউ—

জীবানন্দ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, যদি কেউ সন্ধান করে আনেন? তা হলে ত বেঁচে যাই প্রফুল্ল। রায়মশায়, আপনি ত শুনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি, আপনার জানাশুনা কি এমন কেউ—

রায়মহাশয় ম্লানমুখে অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বেলা হয়ে গেল, যদি অনুমতি করেন ত এখন আমরা আসি।

জীবানন্দ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, বসুন, বসুন, নইলে প্রফুল্লর জাঁক বেড়ে যাবে। তা ছাড়া, ভৈরবীর কথাটাও শেষ হয়ে যাক। কিন্তু আমি যাও বললেই কি সে যাবে?

রায়মহাশয় না বসিয়াই সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, সে ভার আমাদের।

কিন্তু আর কাউকে ত বহাল করা চাই। ও ত খালি থাকতে পারে না।

এবার অনেকেই জবাব দিল, সে ভারও আমাদের।

জীবানন্দ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, যাক বাঁচা গেল, এবার সে যাবেই। এতগুলো মানুষের নিঃশ্বাসের ভার একা ভৈরবী কেন, স্বয়ং মা চণ্ডীও সামলাতে পারবেন না, তা বোঝা গেল। আপনাদের লাভ-লোকসান আপনারাই জানেন, কিন্তু আমার এমন অবস্থা যে, টাকা পেলে আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। নতুন বন্দোবস্তে আমার কিছু পাওয়া চাই। ভাল কথা, কেউ দেখ্ ত রে, এককড়ি আছে না গেছে? কিন্তু গলাটা যে এদিকে শুকিয়ে একেবারে মরুভূমি হয়ে গেল।

বেহারা আসিয়া প্রভুর ব্যগ্র-ব্যাকুল শ্রীহস্তে পূর্ণ-পাত্র দিয়া খবর দিল, সে সদরে বসিয়া খাতা লিখিতেছে। হুজুরের আহ্বানে ক্ষণেক পরে এককড়ি আসিয়া যখন সসম্ভ্রমে এক পাশে দাঁড়াইল, জীবানন্দ শুষ্ককণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সেদিন ভৈরবীকে যে কাছারীতে তলব করেছিলাম, কেউ তাঁকে খবর দিয়েছিলে?

এককড়ি কহিল, আমি নিজে দিয়েছিলাম।

তিনি এসেছিলেন?

আজ্ঞে না।

না কেন?

এককড়ি অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জীবানন্দ উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তিনি কখন আসবেন জানিয়েছিলেন?

এককড়ি তেমনি অধোমুখে থাকিয়াই অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, এত লোকের সামনে আমি সে-কথা হুজুরে পেশ করতে পারব না।

জীবানন্দ হাতের শূন্য গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া হঠাৎ কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এককড়ি, তোমার গোমস্তাগিরি কায়দাটা একটু ছাড়। তিনি আসবেন না, না?

না।

কেন?

এবার প্রত্যুত্তরে যদিচ এককড়ি তাহার জমিদারি কায়দাটা সম্পূর্ণ ছাড়িল না, কিন্তু সবাই শুনিতে পায় এমনি সুস্পষ্ট করিয়াই কহিল, তিনি আসতে পারবেন না, এ কথা যত লোক দাঁড়িয়েছিল সবাই শুনেচে। বলেছিলেন, তোমার হুজুরকে ব'লো এককড়ি, তাঁর বিচার করবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি থাকে ত নিজের প্রজাদের করুন গে। আমার বিচার করবার জন্যে আদালত খোলা আছে।

সহসা মনে হইল জমিদারের এতক্ষণের এত রহস্য, এত সরল ঔদাস্য, হাস্যোজ্জ্বল মুখ ও তরল কণ্ঠস্বর চক্ষের পলকে নিবিয়া যেন অন্ধকার হইয়া গেল। ক্ষণকাল পরে শুধু আস্তে আস্তে কহিলেন, হুঁ। আচ্ছা তুমি যাও। প্রফুল্ল, সেই যে কি একটা চিনির কোম্পানি হাজার বিঘে জমি চেয়েছিল, তাঁদের কোন জবাব দিয়েছিলে?

আজ্ঞে না।

তা হলে লিখে দাও যে জমি তারা পাবে। দেরি ক'রো না।

না, দিচ্চি লিখে, এই বলিয়া সে এককড়িকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিল। আবার কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত গৃহটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শিরোমণি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, আমরা আজ তা হলে আসি?

আসুন।

রায়মহাশয় হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, অনুমতি হয় ত আর একদিন চরণ দর্শন করতে আসব।

বেশ, আসবেন।

সকলেই ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া তাঁহারা জমিদারের হাঁক শুনিতে পাইলেন, বেয়ারা—

অনেকখানি পথ কেহই কাহারো সহিত বাক্যালাপ করিল না। অবশেষে শিরোমণি আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া রায়মহাশয়কে একপাশে একটু টানিয়া ফিসফিস করিয়া কহিলেন, জনার্দন, জমিদারকে তোমার কিরূপ মনে হয় ভায়া?

জনার্দন সংক্ষেপে বলিলেন, মনে ত অনেক রকমই হ'লো।

মহাপাপিষ্ঠ—লজ্জা-শরম আদৌ নেই।

না।

কিন্তু দিব্যি সরল। মাতাল কিনা! দেখলে, দেনার দায়ে চুল পর্যন্ত বাঁধা, তাও বলে ফেললে।

জনার্দন বলিলেন, হুঁ।

শিরোমণি বলিলেন, কিছুই থাকবে না, সব ছারখার হয়ে যাবে, তুমি দেখে নিয়ো।

জনার্দন বলিলেন, খুব সম্ভব।

হয়ত বেশীদিন বাঁচবেও না।

হতেও পারে।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিয়া শিরোমণি পুনশ্চ বলিলেন, যা ভাবা গিয়েছিল, বোধ হয় ঠিক তা নয়—নেহাত হাবাবোকা বলে মনে হয় না। কি বল?

জনার্দন শুধু জবাব দিলেন, না।

কিন্তু বড় দুর্মুখ। মানীর মান-মর্যাদার জ্ঞান নেই।

জনার্দন চুপ করিয়া রহিলেন। উত্তর না পাইয়াও শিরোমণি কহিলেন, কিন্তু দেখেচ

ভায়া কথার ভঙ্গী—অর্ধেক মানে বোঝাই যায় না। সত্য বলচে, না আমাদের বাঁদর নাচাচ্চে ঠাওর করাই শক্ত। জানে সব, কি বল?

রায়মহাশয় তথাপি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না, তেমনি নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বাটীর কাছাকাছি আসিয়া শিরোমণি আর কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলেন না, আস্তে আস্তে বলিলেন, ভায়াকে বড় বিমর্ষ দেখাচ্চে—বিশেষ সুবিধে হবে না বলেই যেন ভয় হচ্চে, না?

রায়মহাশয় যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু দাঁড়াইয়া কহিলেন, মায়ের অভিরুচি।

শিরোমণি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তার আর কথা কি! কিন্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল—না গেল একে ধরা, না গেল তাকে মারা। তোমার কি ভায়া—পয়সার জোর আছে—কিন্তু বাঘের গর্তের মুখে ফাঁদ পাততে গিয়ে না শেষে আমি মারা পড়ি।

জনার্দন একটু রুক্ষকণ্ঠে কহিলেন, আপনি কি ভয় পেয়ে এলেন নাকি?

শিরোমণি বলিলেন, না না ভয় নয়, কিন্তু তুমিও যে খুব ভরসা পেয়ে এলে, তা ত তোমার মুখ দেখেও অনুভব হচ্চে না। হুজুরটি ত কানকাটা সেপাই—কথাও যেমন হেঁয়ালি, কাজও তেমনি অদ্ভুত। ও যে ধরে গলা টিপে মদ খাইয়ে দেয়নি এই আশ্চর্য। এককড়ির মুখে ঠাকরুনটির হুমকিও ত শুনলে? আমিও মেলা কথা কয়ে এসেচি—ভাল করিনি। কি জানি, এককোড়ে ব্যাটা ভেতরে ভেতরে সব বলে দেয় নাকি। দুয়ের মাঝে পড়ে শেষকালে না বেড়াজালে ধরা পড়ি!

জনার্দন উদাসকণ্ঠে কহিলেন, সকলই চণ্ডীর ইচ্ছা। বেলা হয়ে গেল—ও-বেলায় একবার আসবেন।

তা আসবো।

গলির মোড় ফিরিতে বাঁ দিকে গাছের ফাঁকে মন্দিরের অগ্রভাগ দেখা দিতেই বৃদ্ধ শিরোমণি হাত তুলিয়া যুক্তকরে প্রণাম করিলেন, কানে এবং নাকে হাত দিলেন, কিন্তু অস্ফুটে কি প্রার্থনা যে করিলেন তাহা শোনা গেল না। তার পরে ধীরে ধীরে বাড়ি চলিয়া গেলেন।

চোদ্দ

অন্যান্য স্থানের মত চণ্ডীগড়েও দিন আসে যায়, বাহির হইতে কোন বিশেষত্ব নাই। দেবীর সেবা সমভাবে চলিতেছে, গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে যাত্রীরা দল বাঁধিয়া তেমনি আসিতেছে, যাইতেছে, মানস করিতেছে, পূজা দিতেছে, পাঁঠা কাটিতেছে, প্রসাদের ভাগ লইয়া পূজারীর সহিত তেমনি বিবাদ করিতেছে, এবং ঠিক তেমনি মুক্তকণ্ঠে আপনার খ্যাতি ও প্রতিবেশীর অখ্যাতি প্রচার করিয়া দেহ ও মনের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতার প্রমাণ দিতেছে। বস্তুতঃ কোথাও কোন ব্যতিক্রম নাই; বিদেশীর বুঝিবার জো নাই যে, ইতিমধ্যে হাওয়ার বদল হইয়াছে, এবং ঝঞ্ঝার পূর্বক্ষণের ন্যায় চণ্ডীগড়ের মাথার আকাশ গোপন ভারে থমথম করিতেছে। এ গ্রামের সাধারণ চাষাভূষারাও যে ঠিক নিশ্চয় করিয়া কিছু বুঝিয়া লইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ষোড়শীর সম্বন্ধে মোড়ল-পদবাচ্যদের মনোভাব যা-ই হোক, এই দীন-দুঃখীরা তাহাকে যেমন ভক্তি করিত, তেমনি ভালবাসিত। এককড়ি নন্দীর উৎপাত হইতে বাঁচিবার সেই কেবল একমাত্র পথ ছিল। ছোটখাটো ঋণ যখন আর কোথাও মিলিত না, তখন ভৈরবীর কাছে গিয়া হাত পাতিতে তাহাদের বাধিত না। তাহার বাড়ি ছাড়িয়া আসার জন্য ইহাদের সত্য সত্যই বিশেষ কোন দুশ্চিন্তা ছিল না, তাহারা জানিত পিতা ও কন্যার মনোমালিন্য একদিন না একদিন মিটিবেই। ষোড়শীর দুর্নামের কথাটাও অপ্রকাশ ছিল না। কেবল সে-ই বলিয়া ইহা না রটিলেই ভাল হইত; না হইলে দেবীর ভৈরবীদের স্বভাব-চরিত্র লইয়া মাথা গরম করার আবশ্যকতা কেহ লেশমাত্র অনুভব করিত না—দীর্ঘকালের অভ্যাস-বশতঃ ইহা এতই তুচ্ছ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহাকেই উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়া মায়ের মন্দির লইয়া যে তুমুল কাণ্ড বাধিবে, কর্তারা তারাদাস ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই হুজুরের কাছে আনাগোনা করিয়া কি-যেন-কি-একটা ওলটপালট ঘটাইবার মতলব

করিবেন, এবং ওই যে অচেনা ছোট মেয়েটাকে কোথা হইতে কিসের জন্য আনিয়া রাখা হইয়াছে—এমনি সব সংশয়ের বিদ্যুৎ কথায় কথায় ক্ষণে ক্ষণে যখন চমকিতে লাগিল, তখন চোখের আড়ালে কোথায় আকাশের গায়ে যে অকালের মেঘ জমিয়া উঠিতেছে এবং তাহাতে দেশের ভালই হইবে না, এই ভাবটাই সকলের মধ্যে ক্রোধ ও ক্ষোভের মত আবর্তিত হইতে লাগিল।

সেদিন অষ্টমী তিথির জন্য মন্দির-প্রাঙ্গণে লোকসমাগম কিছু অধিক হইয়াছিল। প্রতিমার অনতিদূরে বারান্দার একধারে বসিয়া ষোড়শী আরতির উপকরণ সজ্জিত করিতেছিল, তারাদাস ও সেই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া এককড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। ষোড়শী কাজ করিতে লাগিল, মুখ তুলিয়া চাহিল না। এককড়ি কহিল, মা মঙ্গলা, তোমার চণ্ডীমাকে প্রণাম কর।

পূজারী কি একটা করিতেছিল, সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। ষোড়শী চোখ না তুলিয়াও ইহা লক্ষ্য করিল। মেয়েটি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পূজারী কহিল, মায়ের সন্ধ্যারতি কি তুমি দেখবে মা? তাহলে দেবীর দক্ষিণে ওই যে আসন পাতা আছে ওর ওপরে গিয়ে ব'সো।

এককড়ি ষোড়শীর প্রতি একটা বাঁকা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যে কহিল, ওঁর নিজের স্থান উনি নিজেই চিনে নেবেন ঠাকুর, তোমাকে চেনাতে হবে না, কিন্তু মায়ের জিনিসপত্র যা যা আছে দেখিয়ে দাও দিকি।

পূজারী একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, দেখিয়ে দিতে হবে বৈ কি, সমস্তই একটি একটি করে দেখাতে হবে। লিস্টির সঙ্গে মিলিয়ে সব ঠিক আছে, কোন চিন্তা নেই। মা, ওই যে ও-দিকে বড় সিন্দুক দেখা যাচ্চে, ওতে পূজার পাত্র এবং সমস্ত পিতল-কাঁসার তৈজসাদি তালাবন্ধ আছে, বড় বড় কাজকর্মে শুধু বার করা হয়। আর এই যে গুল-বসানো ছোট কাঠের সিন্দুকটি, এতে মখমলের চাঁদোয়া, ঝালর প্রভৃতি আছে, আর এই কুঠরিটির মধ্যে সতরঞ্চি, গাল্‌চে, কানাত—বসবার আসন এই-সব—

এককড়ি কহিল, আর—

পূজারী বলিলেন, আর ওই যে পূবের দেওয়ালের গায়ে বড় বড় তালা ঝুলচে, ওটা লোহার সিন্দুক, মন্দিরের সঙ্গে একেবারে গাঁথা। ওর মধ্যে মায়ের সোনার মুকুট, রামপুরের মহারানীর দেওয়া মোতির মালা, ধীজগাঁর জমিদারবাবুদের দেওয়া সোনার বাউটি, হার, আরও কত শত ভক্তের দেওয়া কত কি সোনা-রূপার অলঙ্কার, তা ছাড়া টাকাকড়ি, দলিল-পত্র, সোনা-রূপার বাক্স—অর্থাৎ মূল্যবান যা-কিছু সমস্তই ওই সিন্দুকটিতে।

এককড়ি কহিল, আমি আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। কিন্তু ও-সব কেবল তোমার মুখেই আছে, না সিন্দুকটা হাতড়ালে কিছু পাওয়া যাবে? ওই ত উনি বসে আছেন, চাবিটা চেয়ে এনে একবার খুলে দেখাও না। গ্রামের ষোল আনার প্রার্থনা মঞ্জুর করে হুজুর কি হুকুম দিয়েচেন শোননি? চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বে সমস্তই যে একদফা মিলিয়ে দেখতে হবে।

পূজারী হতবুদ্ধির ন্যায় চুপ করিয়া রহিল। মন্দির হইতে ষোড়শীর কর্তৃত্ব যে ঘুচিয়া গেছে তাহা সে শুনিয়াছে এবং নন্দী মহাশয়ের প্রত্যক্ষ আদেশ অমান্য করাও যে অতিশয় সাংঘাতিক তাহাও জানে, কিন্তু কর্মনিরতা ওই যে ভৈরবী অনতিদূরে বসিয়া স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াও শুনিতেছে না, তাহাকে মুখের সম্মুখে গিয়া শুনাইবার সাহস তাহার নাই। সে ভয়ে ভয়ে কহিল, কিন্তু তার ত এখনো দেরি আছে নন্দীমশাই। এদিকে সূর্যাস্ত হয়ে এল—

তারাদাস এতক্ষণ কথা কহে নাই, এবং সঙ্কোচ ও ভয়ের চিহ্ন কেবল পূজারীর মুখে-চোখেই প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা নয়। আস্তে আস্তে কহিল, মিলিয়ে নিতে অনেক বিলম্ব হবে নন্দীমশাই, একটু সকাল করে এসে আর একদিন এ কাজটা সেরে নিলে হবে না? কি বলেন?

এককড়ি চিন্তা করিয়া কহিল, আচ্ছা, তাই না হয় হবে। পূজারীকে কহিল, কিন্তু মনে থাকে যেন চক্রবর্তীমশাই, এই শনিবারেই সংক্রান্তি। ষোল আনা পঞ্চায়েত নাটমন্দিরেই

হবে। হুজুর স্বয়ং এসে বসবেন। উত্তর ধারটা কানাত দিয়ে ঘিরে দিয়ে তাঁর জন্যে মখমলের গালচেটা পেতে দিতে হবে। আলোর সেজ-কটাও তৈরি রাখা চাই।

এককড়ি একটু জোর গলায় কথা কহিতেছিল, সুতরাং অনেকেই কৌতূহলবশে বারান্দার নীচে প্রাঙ্গণে আসিয়া জমা হইয়াছিল। সে তাহাদের শুনাইয়া আরও একটু হাঁকিয়া পূজারীকে কহিল, সেদিন ভিড় ত বড় কম হবে না—ব্যাপারটা খুবই গুরুতর। মঙ্গলা মেয়েটাকে আদর করিয়া কহিল, কি গো মা ক্ষুদে ভৈরবী! দেখে-শুনে সব চালাতে পারবে ত? তবে আমরা আছি, হুজুর এখন থেকে নিজে দৃষ্টি রাখবেন বলেছেন, নইলে ভার বড় সহজ নয়। অনেক বিদ্যে-বুদ্ধির দরকার। বলিয়া ষোড়শীর প্রতি আড়চোখে চাহিয়া দেখিল সে ঠাকুরের পূজার সজ্জায় তেমনি নিবিষ্টচিত্ত হইয়া আছে। তারাদাসকে লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া বলিল, কি গো ঠাকুরমশাই, নূতন অভিষেকের দিনক্ষণ কিছু স্থির হয়েচে শুনেচ? লোকে ত আমাদের একেবারে ব্যস্ত করে তুলেচে, নাবার খাবার সময় দিতে চায় না।

প্রত্যুত্তরে তারাদাস অস্ফুটে কি যে বলিল বুঝিতে পারা গেল না। তাহারা সদর দরজা দিয়া যখন বাহির হইয়া গেল, তখন পিছনে পিছনে অনেকেই গেল এবং গুঞ্জনধ্বনি তাহাদের প্রাঙ্গণের অপর প্রান্ত পর্যন্ত স্পষ্ট শুনা গেল, কিন্তু চণ্ডীর আরতির প্রতীক্ষায় যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারা দূর হইতে ষোড়শীর আনত মুখের প্রতি শুধু নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; এমন ভরসা কাহারও হইল না কাছে গিয়া একটা প্রশ্ন করে।

যথাসময়ে দেবীর আরতি শেষ হইল। প্রসাদ লইয়া যে যাহার গৃহে চলিয়া গেলে মন্দিরের ভৃত্য যখন দ্বার রুদ্ধ করিতে আসিল, তখন ষোড়শী পূজারীকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল, চক্রবর্তীমশাই, ঠাকুরের সেবায়েত আমি, না এককড়ি নন্দী?

চক্রবর্তী লজ্জিত হইয়া বলিল, তুমি বৈ কি মা, তুমিই ত মায়ের ভৈরবী।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু তোমার ব্যবহারে আজ অন্য ভাব প্রকাশ পেয়েছে। যত দিন আছি, গোমস্তার চেয়ে আমার মান্যটা মন্দিরের ভেতর বেশী থাকা দরকার। ঠিক না?

পূজারী কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি মা! কিন্তু—

ষোড়শী কহিল, ওই কিন্তুটা তোমাকে সে কটা দিন বাদ দিয়ে চলতে হবে।

এই শান্ত মৃদুকণ্ঠ পূজারীর অত্যন্ত সুপরিচিত; সে অধোমুখে নিরুত্তরে রহিল, এবং ষোড়শীও আর কিছু কহিল না। মন্দিরদ্বারে তালা পড়িলে সে চাবির গোছা আঁচলে বাঁধিয়া নীরবে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইল এইটুকু সময়ের মধ্যে তাহার পর্ণকুটীরখানি ঘেরিয়া বহু লোক জড় হইয়া বসিয়া আছে। কাছে আসিতেই লোকগুলা ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পদধূলির আশায় একযোগে প্রায় পঁচিশখানি হাত বাড়াইয়া দিতে ষোড়শী পিছাইয়া গিয়া হাসিয়া কহিল, ওরে, অত ধুলো পায়ে নেই রে নেই, আবার আমাকে নাইয়ে মারিস নে, আমার মন্দিরের বেলা হয়ে গেছে। কি হয়েচে বল্?

ইহারা প্রায় সকলেই তাহার প্রজা; হাত জোড় করিয়া কহিল, মা, আমরা যে মারা যাই! সর্বনাশ হয় যে!

তাহাদের মুখের চেহারা যেমন বিষণ্ণ, তেমনি শুষ্ক। কেহ কেহ বোধ করি সারারাত্রি ঘুমাইতে পর্যন্ত পারে নাই। এই সকল মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার নিজের হাসিমুখখানি চক্ষের পলকে মলিন হইয়া গেল। বুড়া বিপিন মাইতি অবস্থা ও বয়সে সকলের বড়; ইহাকেই উদ্দেশ করিয়া ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কি সর্বনাশ হ'লো বিপিন?

বিপিন কহিল, কে একজন মাদ্রাজী সাহেবকে সমস্ত দক্ষিণের মাঠকে মাঠ জমিদার-তরফ থেকে বিক্রি করা হচ্চে। আমাদের যথাসর্বস্ব। কেউ তা হলে আর বাঁচব না—না খেতে পেয়ে সবাই শুকিয়ে মারা যাবো মা!

ব্যাপারটা এমনি অসম্ভব যে ষোড়শী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, তাহলে তোদের শুকিয়ে মরাই ভাল। যা, বাড়ি যা, সকালবেলা আর আমার সময় নষ্ট করিস নে।

কিন্তু তাহার হাসিতে কেহ যোগ দিতে পারিল না, সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, না মা, এ সত্যি।

ষোড়শী বিশ্বাস করিতে পারিল না, বলিল, না রে না, এ কখনো সত্য হতেই পারে না, তোদের সঙ্গে সে তামাশা করেচে। বিশ্বাস না করিবার তাহার বিশেষ হেতু ছিল। একে ত এই সকল জমিজমা তাহারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাতে সমস্ত মাঠ শুধু কেবল বীজগ্রামের সম্পত্তিও নহে। ইহার কতক অংশ চণ্ডীমাতার এবং কিছু রায়-মহাশয়ের খরিদা। অতএব জীবানন্দ একাকী ইচ্ছা করিলেও ইহা হস্তান্তর করিয়া দিতে পারেন না। কিন্তু বৃদ্ধ বিপিন মাইতি যখন সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, কাল কাছারি-বাটীতে সকলকে ডাকাইয়া আনিয়া নন্দীমহাশয় নিজের মুখে জানাইয়া দিয়াছেন এবং তথায় জনার্দন ও তারাদাস উভয়েই উপস্থিত ছিলেন, এবং দেবীর পক্ষ হইতে তাহার পিতা তারাদাসই দলিলে দস্তখত করিয়া দিয়াছেন, তখন অপরিসীম ক্রোধ ও বিস্ময়ে ষোড়শী বহুক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে ধীরে ধীরে কহিল, তাই যদি হয়ে থাকে তোরা আদালতে নালিশ কর্ গে।

বিপিন নিরুপায়ভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, তাও কি হয় মা? রাজার সঙ্গে কি বিবাদ করা চলে? কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা করে জলে বাস করলে যার যা কিছু আছে—ভিটেটুকু পর্যন্তও থাকবে না!

ষোড়শী কহিল, তা বলে বাপ-পিতামহের কালের পৈতৃক বিষয়টুকু তোরা মুখ বুজে ছেড়ে দিবি?

বিপিন কহিল, তুমি যদি কৃপা করে আমাদের বাঁচিয়ে দাও মা, দীনদুঃখী আমাদের নইলে ছেলেপিলের হাত ধরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। তাই ত তোমার কাছে সবাই ছুটে এসেচি।

ষোড়শী একে একে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ইহাদের কাহারও কিছু করিবার সাধ্য নাই; তাই এই একান্ত বিপদের দিনে দল বাঁধিয়া অপরের কৃপা-ভিক্ষা করিতে তাহারা বাহির হইয়াছে। এই সব নিরুদ্যম ভরসাহীন মুখের সকরুণ প্রার্থনায় তাহার বুকের ভিতরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, তোরা এতগুলো পুরুষমানুষ মিলে নিজেদের বাঁচাতে পারবি নে, আর মেয়েমানুষ হয়ে আমি যাবো তোদের বাঁচাতে? রাগ ক'রো না বিপিন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ জমি না হয়ে মাইতিগিন্নীকে যদি জমিদার-বাবু এমনি জবরদস্তি আর একজনকে বিক্রি করে দিতেন, আর সে আসতো তাকে দখল করতে, কি করতে বাবা তুমি?

ষোড়শীর এই অদ্ভুত উপমায় অনেকের মুখই চাপা হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কিন্তু বৃদ্ধের চোখের কোণে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল। কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া সহজকণ্ঠে বলিল, মা, আমি না হয় বুড়ো হয়েছি, আমার কথা ছেড়েই দাও, কিন্তু মাইতিগিন্নীর পাঁচ-পাঁচজন জোয়ান বেটা আছে, তারা তখন জেল কেন, ফাঁসিকাঠের ভয় পর্যন্ত করবে না, একথা তোমাকে মা-চণ্ডীর দিব্যি করেই জানিয়ে যাচ্ছি।

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ষোড়শী বাধা দিয়া কহিল, তাই যদি সত্যি হয় বিপিন, তোমার সেই পাঁচ-পাঁচজন জোয়ান বেটাকে ব'লো এই পিতা-পিতামহের কালের ক্ষেত-খামারটুকুও তাদের বুড়ো মায়ের চেয়ে একতিল ছোট নয়। এঁরা দুজনেই তাদের সমান প্রতিপালন করে এসেছেন।

বৃদ্ধ চক্ষের নিমেষে সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ঠিক! ঠিক কথা মা! আমাদের মা-ই ত বটে। ছেলেদের এখনি গিয়ে আমি এ-কথা জানাবো, কিন্তু তুমি আমাদের সহায় থেকো।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া বলিল, শুধু আমি কেন বিপিন, মা চণ্ডী তোমাদের সহায় থাকবেন। কিন্তু আমার পুজোর সময় বয়ে যাচ্ছে বাবা, আমি চললুম। বলিয়া সে দ্রুতপদে গিয়া আপনার কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিপিনের গম্ভীর গলা সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে সকলকে ডাকিয়া কহিতেছে, তোরা সবাই শুনলি ত রে, শুধু

গর্ভধারিণীই মা নয়, যিনি পালন করেন, তিনিও মা। যা হবার হবে, ঘরের মাকে আমরা কিছুতেই পরের হাতে তুলে দিতে পারব না।

পনর

চৈত্রের সংক্রান্তি আসন্ন হইয়া উঠিল। চড়ক ও গাজন-উৎসবের উত্তেজনায় দেশের কৃষিজীবীর দল প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—এতবড় পর্বদিন তাহাদের আর নাই। নরনারী-নির্বিশেষে যাহারা সমস্ত মাস ব্যাপিয়া সন্ন্যাসের ব্রত ধারণ করিয়া আছে, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রে ও উত্তরীয়ের গৈরিকে দেশের বাতাসে যেন বৈরাগ্যের রঙ ধরিয়া গেছে। পথে পথে 'শিব-শম্ভু' নিনাদের বিরাম নাই, চণ্ডীর দেউলে তাহাদের আসা-যাওয়া শেষ হইতেছে না—প্রাঙ্গণসংলগ্ন শিবমন্দির ঘেরিয়া দেবতার অসংখ্য সেবকে যেন মাতামাতি বাধাইয়া দিয়াছে। পূজো দিতে, তামাশা দেখিতে, বেচাকেনা করিতে যাত্রী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাহিরে প্রাচীরতলে দোকানীরা স্থান লইয়া লড়াই করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে—চোখ চাহিলেই মনে হয় চণ্ডীগড়ের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মহোৎসবের সূচনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে আর বিলম্ব নাই।

ষোড়শী মনের অশান্তি দূর করিয়া দিয়া অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও কাজে লাগিয়া গেছে—সকল দিকে দৃষ্টি রাখিতে সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত তাহার মন্দির ছাড়িবার জো নাই। বিকালের দিকে মন্দিরের রকে বসিয়া সে নিবিষ্টচিত্তে হিসাবের খাতাটায় জমা-খরচের মিল করিতেছিল, নানা জাতীয় শব্দতরঙ্গ অভ্যস্ত ব্যাপারের ন্যায় তাহার কানে পশিয়াও ভিতরে প্রবেশ করিতেছিল না, এমন সময়ে হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত নীরবতা খোঁচার মত যেন তাহাকে আঘাত করিল। চোখ তুলিয়া দেখিল স্বয়ং জীবানন্দ চৌধুরী। তাঁহার দক্ষিণে, বামে ও পশ্চাতে পরিচিত ও অপরিচিত অনেকগুলি ভদ্রব্যক্তি। রায়মহাশয়, শিরোমণি ঠাকুর, তারাদাস, এককড়ি এবং গ্রামের আরও অনেকে প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আরও তিন-চারিজনকে সে চিনিতে পারিল না; কিন্তু পরিচ্ছদের পারিপাট্য দেখিয়া অনুভব করিল ইহারা কলিকাতা হইতে বাবুর সঙ্গে আসিয়াছেন। খুব সম্ভব পল্লীগ্রামের বিশুদ্ধ বায়ু ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করাই অভিপ্রায়। জন-চারেক ভোজপুরী পাইক-পেয়াদাও আছে। তাহাদের মাথায় রঙিন পাগড়ি ও কাঁধে সুদীর্ঘ যষ্টি। অনতিকাল পূর্বে হোলী-উৎসবের সমস্ত চিহ্ন আজও তাহাদের পরিচ্ছদে দেদীপ্যমান। মনিবের শরীর-রক্ষা ও গৌরব-বৃদ্ধি করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। ষোড়শী ক্ষণেকের জন্য চোখ তুলিয়াই আবার তাহার খাতার পাতায় দৃষ্টি সংযোগ করিল, কিন্তু মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। জীবানন্দ আর কখনও এখানে আসেন নাই; তিনি সকৌতুকে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং সুপ্রাচীন শিরোমণি-মহাশয় তাঁহার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া সেখানে যা-কিছু আছে—তাহার ইতিহাস, তাহার প্রবাদ-বাক্য—সমস্তই এই নবীন জমিদার প্রভুটিকে শুনাইতে শুনাইতে সঙ্গে চলিলেন। এইভাবে প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া, এই দলটি আসিয়া এক সময়ে মন্দিরের দ্বারের কাছে উপস্থিত হইল, এবং মিনিট-দুই পরেই পূজারী আসিয়া ষোড়শীকে কহিল, মা, বাবু তোমাকে নমস্কার জানিয়ে একবার আসতে অনুরোধ করলেন।

ষোড়শী মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, আচ্ছা চল, যাচ্চি। বলিয়া সে তাহার অনুবর্তী হইয়া জমিদারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জীবানন্দ মিনিট পাঁচ-ছয় নিঃশব্দে তাহার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, সকলের অনুরোধে তোমার সম্বন্ধে আমি কি হুকুম দিয়েছি শুনেচ?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

জীবানন্দ কহিলেন, তোমাকে বিদায় করা হয়েছে, এবং ওই ছোট মেয়েটিকে নূতন ভৈরবী করে মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়েছে। অভিষেকের দিন স্থির হয়নি, কিন্তু শীঘ্রই হবে। কাল সকালে রায়মশায় প্রভৃতি সকলে আসবেন। তাঁদের কাছে দেবীর

সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দিয়ে আমার গোমস্তার হাতে সিন্দুকের চাবি দেবে। এ সম্বন্ধে তোমার কোন বক্তব্য আছে?

ষোড়শী বহু পূর্ব হইতেই আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়াছিল; তাই তাহার কণ্ঠস্বরে কোনপ্রকার উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না, সহজকণ্ঠে কহিল, আমার বক্তব্যে আপনাদের কি কিছু প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ কহিলেন, না। তবে পরশু সন্ধ্যার পরে এইখানেই একটা সভা হবে, ইচ্ছে কর ত দশের সামনে তোমার দুঃখ জানাতে পার। ভাল কথা, শুনতে পেলাম তুমি নাকি আমার বিরুদ্ধে আমার প্রজাদের বিদ্রোহী করে তোলবার চেষ্টা করচ?

ষোড়শী বলিল, তা জানিনে। তবে, আমার নিজের প্রজাদের আপনার উপদ্রব থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করচি।

জীবানন্দ অধর দংশন করিয়া কহিলেন, পারবে?

ষোড়শী কহিল, পারা না পারা মা চণ্ডীর হাতে।

জীবানন্দ কহিলেন, তারা মরবে।

ষোড়শী কহিল, মানুষ অমর নয় সে তারা জানে।

ক্রোধে ও অপমানে সকলের চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। এককড়ি ত এমনি ভাব দেখাইতে লাগিল যে, সে কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে।

জীবানন্দ একমুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, তোমার নিজের প্রজা আর কেউ নেই। তারা যাঁর প্রজা তিনি নিজে দলিলে দস্তখত করে দিয়েচেন। তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

ষোড়শী মুখ তুলিয়া কহিল, আপনার আর কোন হুকুম আছে?

জীবানন্দ স্পষ্ট অনুভব করিলেন বলিবার সময়ে তাহার ওষ্ঠাধর তাচ্ছিল্যের আভাসে যেন স্ফুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সংক্ষেপে জবাব দিয়া কহিলেন, না, আর কিছুই নেই।

ষোড়শী কহিল, তাহলে দয়া করে এইবার আমার কথাটা শুনুন।

বল।

ষোড়শী কহিল, কাল দেবীর অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার সময় আমার নেই এবং পরশু মন্দিরের কোথাও সভাসমিতির স্থানও হবে না। এগুলো এখন বন্ধ রাখতে হবে।

শিরোমণি অনেক সহিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। সহসা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, কখনো না, কিছুতেই না। এ-সব চালাকি আমাদের কাছে খাটবে না বলে দিচ্চি— এবং শুধু জীবানন্দ ছাড়া যে যেখানে ছিল ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল।

জনার্দন রায় এতক্ষণ কথা কহেন নাই; কলরব থামিলে অকস্মাৎ উষ্মার সহিত বলিয়া উঠিলেন, তোমার সময় এবং মন্দিরের ভেতর জায়গা কেন হবে না শুনি ঠাকরুন?

ইহার শেষ কথাটার শ্লেষ উপলব্ধি করিয়াও ষোড়শী সহজ বিনীতকণ্ঠে কহিল, আপনি ত জানেন রায়মশাই, এখন গাজনের সময়। যাত্রীর ভিড়, সন্ন্যাসীর ভিড়, আমারই বা সময় কোথায়, তাদেরই বা সরাই কোথায়!

সত্যই তাই। এবং এই নিবেদনের মধ্যে যে কিছুমাত্র অসঙ্গতি নাই, বোধ করি জীবানন্দ তাহা বুঝিলেন, কিন্তু দেশের যাঁহারা, তাঁহারা নাকি বদ্ধপরিকর হইয়া আসিয়াছিলেন, তাই এই নম্র কণ্ঠস্বরে উপহাস কল্পনা করিয়া একেবারে জ্বলিয়া গেলেন। জনার্দন রায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হতেই হবে। আমি বলচি হতে হবে এবং দলের মধ্য হইতে একজন কটূক্তি পর্যন্ত করিয়া ফেলিল।

কথাটি ষোড়শীর কানে গেল, এবং মুখের ভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। পলকমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া জীবানন্দকে বিশেষ করিয়া উদ্দেশ করিয়া কহিল, ঝগড়া করতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। তবে ও-সব করবার এখন সুযোগ হবে না, এই কথাটা আপনার অনুচরদের বুঝিয়ে বলে দেবেন। আমার সময় অল্প; আপনাদের কাজ মিটে থাকে ত আমি চললাম।

এই মুখ, এই কণ্ঠস্বর, এই একান্ত অবহেলা হঠাৎ জীবানন্দকেও তীক্ষ্ণ আঘাত

করিল, এবং তাঁহার নিজের কণ্ঠস্বরও তপ্ত হইয়া উঠিল, কহিলেন, কিন্তু আমি হুকুম দিয়ে যাচ্চি, কালই এ-সব হতে হবে এবং হওয়াই চাই।

জোর করে?

হাঁ, জোর করে।

সুবিধে-অসুবিধে যাই-ই হোক?

হাঁ, সুবিধে-অসুবিধে যাই হোক।

ষোড়শী আর কোন তর্ক করিল না। পিছনে চাহিয়া ভিড়ের মধ্যে একজনকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিয়া কহিল, সাগর, তোদের সমস্ত ঠিক আছে?

সাগর সবিনয়ে কহিল, আছে মা, তোমার আশীর্বাদে অভাব কিছুই নেই।

ষোড়শী কহিল, বেশ। জমিদারের লোক কাল একটা হাঙ্গামা বাধাতে চায়, কিন্তু আমি তা চাইনে। এই গাজনের সময়টা রক্তপাত হয় আমার ইচ্ছে নয়, কিন্তু দরকার হলে করতেই হবে। এই লোকগুলো তোরা দেখে রাখ্; এদের কেউ যেন আমার মন্দিরের ত্রিসীমানায় না আসতে পারে। হঠাৎ মারিস নে—শুধু গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিবি। এই বলিয়া সে আর দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া মন্দপদে বারান্দা পার হইয়া গেল। ষোড়শীকে বিশ বছর ধরিয়া লোকে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাকে জানিবার যে কিছু বাকী আছে কেহ মনেও করে নাই। কিন্তু আজ তাহার প্রকৃতির এই অসাধারণ দিকটার প্রথম পরিচয় পাইয়া হুজুর হইতে পিয়াদা পর্যন্ত যেন পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ষোল

চৈত্রের সংক্রান্তি নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল—'শিব-শম্ভু'র গাজন-উৎসবে কোথাও কিছু-মাত্র বিঘ্ন ঘটিল না। দর্শকের দল ঘরে ফিরিল, দোকানীরা দোকান ভাঙিতে প্রবৃত্ত হইল, বাতাসে তেলে-ভাজা খাবারের গন্ধ ফিকা হইয়া আসিল, এবং গেরুয়াধারীরাও চীৎকার ছাড়িয়া গৃহকর্মে মন দিবার প্রয়োজন অনুভব করিল। চিরদিনের অভ্যস্ত সুরে চারিদিকের আবহাওয়ায় সুখ-দুঃখের আবার সেই পরিচিত স্রোত দেখা দিল, কেবল চণ্ডীগড়ের ভৈরবীর দেহের মধ্যে কি যে রোগ প্রবেশ করিল তাহার সে চেহারা আর ফিরিয়া আসিল না—কি একপ্রকার ভয়ে ভয়ে মন যেন তাহার অহর্নিশি চকিত হইয়াই রহিল। উৎসবের কয়টা দিন যেন নির্বিঘ্নে কাটাই সম্ভব এ আশা ষোড়শীর ছিল, কারণ দেবতার ক্রোধোদ্রেকের দায়িত্ব আর যে-কেহ মাথায় করিতে চা'ক, জনার্দন চাহিবে না সে নিশ্চিত জানিত। কিন্তু এইবার?

তবুও দিনগুলো এমনি নিঃশব্দে কাটিতে লাগিল যেন আর কোন হাঙ্গামা নাই, সমস্ত মিটিয়া গেছে। কিন্তু সত্য সত্যই মিটিয়া যে কিছু যায় নাই, অলক্ষ্যে গোপনে কঠিন কিছু-একটা দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে এ আশঙ্কা শুধু ষোড়শীর নহে, মনে মনে প্রায় সকলেরই ছিল। সেই মাঠসংক্রান্ত কৃষকদের কাছে আজ সে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিল। কথা ছিল তাহারা দেবীর সন্ধ্যা-আরতির পরে মন্দির-প্রাঙ্গণে জমা হইবে, কিন্তু আরতি শেষ হইয়া গেল, রাত্রি আটটা ছাড়াইয়া নয়টা এবং নয়টা ছাড়াইয়া দশটা বাজিতে চলিল, কিন্তু কাহারও দেখা নাই। প্রণাম করিতে যাহারা নিত্য আসে, প্রসাদ লইয়া একে একে তাহারা প্রস্থান করিল, পূজারী অন্তর্হিত হইল, এবং মন্দিরের ভৃত্য দুয়ার রুদ্ধ করিবার অনুমতি চাহিল। আর অপেক্ষা করিয়া ফল নাই, এবং কি-একটা ঘটিয়াছে তাহাতেও ভুল নাই, কিন্তু ঠিক তাহা জানিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত উদ্বেগ অনুভব করিতে লাগিল। এমনি সময়ে ধীরে ধীরে সাগর আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে একাকী দেখিয়া ষোড়শী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, এত দেরি যে সাগর? কিন্তু আর কেউ ত আসেনি? এরা কি তবে খবর পায়নি বাবা?

সাগর কহিল, পেয়েচে বৈ কি মা। আমি নিজে গিয়ে সকলের ঘরে ঘরে তোমার ইচ্ছে জানিয়ে এসেচি।

ষোড়শী শঙ্কিত হইয়া কহিল, তবে?

সাগর বলিল, আজ বোধ করি কেউ আর সময় করে উঠতে পারলে না। হুজুরের কাছারি-

বাড়িতে ষোল আনার পঞ্চায়েতি ছিল, তা এইমাত্র সাঙ্গ হ'লো। পঞ্চু, অনাথ, রামময়, নবকুমার, অক্ষয় মাইতি, মায় আমাদের বুড়ো বিপিনখুড়ো পর্যন্ত তার সাজোয়ান ব্যাটাদের নিয়ে। কেউ বাদ যায়নি মা, আমি একটা বাতাপিনেবু গাছের তলায় দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

ষোড়শী কহিল, ভাল করিস নি সাগর, কেউ দেখে ফেললে—

সাগর হাসিয়া বলিল, একা যাইনি মা, ইনি সঙ্গে ছিলেন, বলিয়া সে বাঁ হাতের সুদীর্ঘ বংশদণ্ডখানি সস্নেহে সসম্ভ্রমে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিল।

ষোড়শী কহিল, কিন্তু এইখানে হবার যে কথা ছিল?

সাগর কহিল, কথাও ছিল, হুজুরের ভোজপুরীগুলোর ইচ্ছেও ছিল কিন্তু গ্রামের কেউ রাজী হলেন না। তাঁরা ত এদিককার মানুষ—আমাদের খুড়ো-ভাইপোকে হয়ত চেনেন!

ষোড়শী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সভায় কি স্থির হ'লো?

সাগর কহিল, তা সব ভাল। এই মঙ্গলেই মেয়েটার অভিষেক শেষ হবে। তবে তোমারও ভাবনা নেই—কাশীবাসের বাবদে প্রার্থনা জানালে শ-খানেক টাকা পেতে পারবে।

ষোড়শী কহিল, প্রার্থনা জানাতে হবে কার কাছে?

সাগর বলিল, বোধ হয় হুজুরের কাছেই।

ষোড়শী জিজ্ঞাসা করিল, আর সকলের? যাদের জমিজমা সব গেল তাদের?

সাগর বলিল, ভয় নেই মা, চিরকাল ধরে যা হয়ে আসচে তা থেকে তারা বাদ যাবে না। এই যে সেদিন প্রজার পক্ষ থেকে পাঁচ হাজারের নজর দাখিল হ'লো তার খতের কাগজগুলো ত রায়মশাইয়ের সিন্দুক ছাড়া আর কোথাও জায়গা পায়নি, নইলে তিনি একটা হুকুম দিতে না দিতে ভিড় করে আজ সকলে যাবই বা কেন?

ষোড়শী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, পরে কহিল, আর তোদের?

সাগর কহিল, আমাদের খুড়ো-ভাইপোর? একটু হাসিয়া বলিল, সে ব্যবস্থাও তিনি করেচেন, সাত-সাতটা দিন কিছু আর চুপ করে বসে ছিলেন না। পাকা লোক, দারোগা-পুলিশ মুঠোর মধ্যে, কোশ-দশেকের মধ্যে কোথাও একটা ডাকাতি হতে যা দেরি। জানো ত মা, বছর-দুই করে একবার খেটে এসেচি, এবার দশ বছরের মত একেবারে নিশ্চিন্ত। খুড়োর গঙ্গালাভ তার মধ্যেই হবে, তবে আমার বয়সটা এখনও কম, হয়ত আর-একবার দেশের মুখ দেখতেও পাবো। বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ষোড়শী ভয় পাইয়া কহিল, হাঁ রে, এ কি তোরা সত্যি বলে মনে করিস?

সাগর বলিল, মনে করি? এ ত চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি মা। জেলের বাইরে আমাদের রাখতে পারে এ সাধ্যি আর কারও নেই। বেশী নয়, দু'মাস এক মাস দেরি, হয়ত নিজের চোখেই দেখে যেতে পারবে মা।

ষোড়শী কহিল, আর যারা ওখানে গেছে, তাদের?

সাগর বলিল, তাদের অবস্থা আমাদের চেয়েও মন্দ। জেলের মধ্যে খেতে দেয়, যা হোক আমরা দুটো খেতে পাবো, কিন্তু এরা তাও পাবে না। নালিশগুলো সব ডিক্রি হতে যা বিলম্ব, তার পরে রায়মশায়ের নিজ জোতে জন খেটে দু'মুঠো জোটে ভাল, না হয় আসামের চা-বাগান ত আছে। কেমন মা, তোমারই কি মনে পড়ে না ওই বেনের-ডাঙাটায় আগে আমাদের কত ঘর ভূমিজ বাউরির বসতি ছিল, কিন্তু আজ তারা কোথায়? কতক গেল কয়লা খুঁড়তে, কতক গেল চালান হয়ে চা-বাগানে। কিন্তু আমি দেখেচি ছেলেবেলায় তাদের জমিজমা হাল-বলদ। দু-মুঠো ধানের সংস্থান তাদের সব্বায়ের ছিল। আজ তাদের অর্ধেক এককড়ি নন্দীর, অর্ধেক রায়মশায়ের।

ষোড়শী স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে লাগিল। এই সেদিন যাহারা দল বাঁধিয়া তাহার আশ্রয় চাহিতে আসিয়াছিল, আজ অক্ষম জানিয়া প্রবলের চোখের ইঙ্গিতে তাহারই বিরুদ্ধে তাহারা মন্ত্রণা করিতে একত্র হইয়াছে—সেদিনের সমস্ত কল্পনা তাহাদের কোথায় ভাসিয়া গেল। যে প্রবল, যে ধনবান, যে ধর্মজ্ঞান-বিরহিত, তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিবার কোন পথ দুর্বলের নাই। কোথাও ইহার নালিশ চলে না, ইহার বিচার করিবার কেহ নাই—ভগবান কান দেন না, সংসারে চিরদিন ইহা অবারিত চলিয়া

আসিতেছে। এই যে আজ এতগুলি লোক গিয়া একটিমাত্র প্রবলের পদতলে তাহাদের বিবেক, ধর্ম, মনুষ্যত্ব সমস্ত উজাড় করিয়া দিয়া কোনমতে বাঁচিয়া থাকিবার একটুখানি আশ্বাস লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, ইহার লজ্জা, ইহার দৈন্য, ইহার ব্যথা যত বড়ই হোক, যতদূর দেখা যায়, এই দুঃখীদের এই ক্ষুদ্র কৌশলটুকু ছাড়া পৃথিবীতে আর কিছুই চোখে পড়ে না। যে অন্যায় এতগুলি মানুষকে এমন অমানুষ করিয়া দিল, তাহাকে প্রতিহত করিবার শক্তি এতবড় বিশ্ব-বিধানে কৈ? এই যে সাগর সর্দার সেদিন পীড়িতের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল, দুর্বলের এতবড় স্পর্ধার সহস্র গুণ বড় দণ্ড তাহার তোলা আছে—অব্যাহতির কোন পথ নাই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সাগর, এ-সব তুই শুনলি কার মুখে?

সাগর কহিল, স্বয়ং হুজুরের মুখে।

তাহলে এ-সকল তাঁরই মতলব?

সাগর চিন্তা করিয়া কহিল, কি জানি মা, কিন্তু মনে হয় রায়মশায়ও আছেন।

ষোড়শী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আচ্ছা সাগর, তুই বলতে পারিস, জমিদার আমার উপর অত্যাচার করেন না কেন? আমি ত ভাঙা কুঁড়েয় একলা থাকি, ইচ্ছে করলেই ত পারেন?

সাগর হাসিল, কহিল, কে তোমাকে বললে মা তুমি একলা থাকো? মা, আমাদের নিজের পরিচয় নিজে দিতে নেই,—গুরুর নিষেধ আছে, বলিতে বলিতে সহসা তাহার বলিষ্ঠ দক্ষিণ হাতের পাঁচটা আঙুল লাঠির গায়ে যেন ইস্পাতের সাঁড়াশির মত চাপিয়া বসিল, কহিল, যার ভয়ে চণ্ডীর মন্দিরে না বসে ষোল-আনা বসতে গেল আজ এককড়ির কাছারি-বাড়িতে, তারই ভয়ে কেউ তোমার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না। হরিহর সর্দারের ভাইপো সাগরের নাম দশ-বিশ ক্রোশের লোকে জানে, তোমার উপর অত্যাচার করবার মানুষ ত মা পঞ্চাশখানা গ্রামে কেউ খুঁজে পাবে না।

ষোড়শীর দুই চক্ষু অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, সাগর, এ কি সত্য?

সাগর হেঁট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার হাতের লাঠিটা ষোড়শীর পায়ের নীচে রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশ ত মা, সেই আশীর্বাদ কর না যেন কথা আমার মিথ্যে না হয়।

ষোড়শীর চোখের দৃষ্টি একবার একটুখানি কোমল হইয়াই আবার তেমনি জ্বলিতে লাগিল, কহিল, আচ্ছা সাগর, আমি ত শুনেচি তোদের প্রাণের ভয় করতে নেই?

সাগর সহাস্যে কহিল, মিথ্যে শুনেচ তাও ত আমি বলচি নে মা।

ষোড়শী কহিল, কেবল প্রাণ দিতেই পারিস, আর নিতে পারিস নে?

সাগর কহিল, একটা হুকুম দিয়ে আজ রাত্রেই কেন যাচাই কর না মা? এই বলিয়া সে ষোড়শীর মুখের উপর দুই চোখ মেলিয়া ধরিতে ষোড়শী বিস্ময়ে ও ভয়ে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। সাগরের চাহনি এক পলকে বদলাইয়া গেছে। সেই স্বাভাবিক দীপ্তি নাই, সে তেজ নাই, সে কোমলতা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে—নিষ্প্রভ, সঙ্কুচিত গভীর দৃষ্টি—এ যেন আর সে সাগর নয়, এ যেন আর কেহ। সাগর কথা কহিল। কণ্ঠস্বর শান্ত কঠিন, অত্যন্ত ভারী। কহিল, রাত বেশী হয়নি—ঢের সময় আছে। মা চণ্ডীর কপাট তাই এখনো খোলা আছে মা, আমি তোমার হুকুম শুনতে পেয়েচি। বেশ, তাই হবে মা, পাপের শেষ করে দেব—সকালেই শুনতে পাবে, তোমার সাগর সর্দার মিছে অহঙ্কার করে যায়নি। তাহার পিতৃ-পিতামহের হাতের সুদীর্ঘ লাঠিখানা ত ষোড়শীর পায়ের কাছে পড়িয়া ছিল, হেঁট হইয়া তৎক্ষণাৎ তুলিয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

ষোড়শী কথা কহিতে গেল, তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, নিষেধ করিতে চাহিল, কণ্ঠে স্বর ফুটিল না, ভূমিকম্পের সমুদ্রের মত অকস্মাৎ সমস্ত বুক জুড়িয়া দোলা উঠিল, এবং নিমেষের জন্য সাগরের এই একান্ত অপরিচিত ঘাতকের মূর্তি তাহার চোখের উপর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। সাগর কি যেন একটা কহিল, কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, কেবল এইটুকুমাত্র উপলব্ধি করিল যে, সে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া যাইতেছে।

সতর

ষোড়শীর যখন চেতনা ফিরিয়া আসিল, তখন সাগর চলিয়া গেছে।

মন্দিরের ভৃত্য ডাকিয়া কহিল, মা, এবার দোর বন্ধ করি?

কর, বলিয়া সে চাবির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। ছেলেবেলা হইতে জীবনটা তাহার যথেষ্ট সুখেরও নয়, নিছক আরামেও দিন কাটে নাই; বিশেষ করিয়া যে অশুভ মুহূর্তে বীজগ্রামের নূতন জমিদার চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন হইতে উপদ্রবের ঘূর্ণিহাওয়া তাহাকে অনুক্ষণ ঘেরিয়া নিরন্তর অশান্ত, চঞ্চল ও বিশ্রামহীন করিয়া রাখিয়াছে। তবুও সে সকল সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের ন্যায়, আজ যেখানে সাগর সর্দার তাহাকে এইমাত্র নিক্ষেপ করিয়া অন্তর্হিত হইল। অথচ যথার্থই সে যে এতবড় ভয়ংকর কিছু একটা এই রাত্রির মধ্যে করিয়া উঠিতে পারিবে, তাহা এমনি অসম্ভব যে ষোড়শী বিশ্বাস করিল না। অথবা এ আশংকাও তাহার মনের মধ্যে সত্য সত্যই স্থান পাইল না যে, যে লোক হত্যা, রক্তপাত ও হিংসার সর্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও আয়োজনে পরিবৃত হইয়া অহর্নিশি বাস করে, পাপ তাহার যত বড়ই হোক, কেবলমাত্র সাগরের লাঠির জোরেই তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। তথাপি দৈব বলিয়া যে শক্তির কাছে সকল অঘটনই হার মানে, তাহারই ভয়ে বুকের মধ্যে তাহার মুগুরের ঘা পড়িতে লাগিল।

মন্দিরের দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া ভৃত্য চাবির গোছা হাতে আনিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাত অনেক হয়েচে মা, সঙ্গে যেতে হবে কি?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া অন্যমনস্কের মত বলিল, কোথায় বলাই?

তোমাকে পৌঁছে দিতে মা।

পৌঁছে দিতে? না, বলিয়া ষোড়শী ধীরে ধীরে স্বপ্নাবিষ্টের মত বাহির হইয়া গেল। প্রত্যহের মত এই পথটুকুর মধ্যেও অতি সতর্কতা আজ তাহার মনেই হইল না। রাত্রির প্রগাঢ় অন্ধকার, কিন্তু এ-কয়দিনের ন্যায় ঝাপসা মেঘের আচ্ছাদন আজ ছিল না। স্বচ্ছ নির্মল কৃষ্ণ-দ্বাদশীর কালো আকাশ এইমাত্র যেন কোন্ অদৃশ্য পারাবারে স্নান করিয়া আসিয়াছে, তাহার আর্দ্র গা-মাথায় এখনও যেন জল মাখানো রহিয়াছে। মন্দির হইতে ষোড়শীর কুটীরখানির ব্যবধান যৎসামান্য; এই আঁকাবাঁকা পায়ে-হাঁটা ধূসর পদরেখাটির উপরে একটি স্নিগ্ধ আলোক অসংখ্য নক্ষত্রলোক হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছে; তাহারই উপর দিয়া সে নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার ঘরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শেষ চৈত্রের এই কয়টা দিন গ্রামে জনমজুর মিলে না, তথাপি তাহার অনুগত ভক্ত প্রজারা আঙ্গিনার চারিদিকে শক্ত করিয়া বাঁশের বেড়া বাঁধিয়া দিয়াছে এবং জীর্ণ কুটীরের কিছু কিছু সংস্কার করিয়া তাহারই গায়ে একখানি ছোট চালা বাঁধিবার জন্য তৈরি করিয়া দিয়াছে। পুরাতন অর্গল নূতন হইয়াছে, এবং দেওয়ালের গায়ে ফাটা ও গর্ত যত ছিল, বুজাইয়া নিকিয়া মুছিয়া ঘরটিকে অনেকটা বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। তালা খুলিয়া ষোড়শী এই ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আলো জ্বালিয়া সেইখানেই মাটির উপরে বসিয়া পড়িল। প্রতিদিনের ন্যায় আজিও তাহার অনেক কাজ বাকী ছিল। রাত্রে রান্নার হাঙ্গামা তাহার ছিল না বটে; দেবীর প্রসাদ যাহা-কিছু আঁচলে বাঁধিয়া সঙ্গে আনিত, তাহাতেই চলিয়া যাইত, কিন্তু আহ্নিক প্রভৃতি নিত্যকর্মগুলি সে সর্বসমক্ষে মন্দিরে না করিয়া নির্জন গৃহের মধ্যেই সম্পন্ন করিত, তাহার পরে অনেক রাত্রি জাগিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিত।

এ-সকল তাহার প্রতিদিনের নিয়ম; তাই প্রতিদিনের মত আজও তাহার মনের মধ্যে অসমাপ্ত কর্মের তাগিদ উঠিতে লাগিল, কিন্তু পা-দুটা কোনমতেই আজ খাড়া হইতে চাহিল না; এবং যে দরজা উন্মুক্ত রহিল, উঠি উঠি করিয়াও তাহাকে সে বন্ধ না করিয়া তেমনি জড়ের মত স্থির হইয়া প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া রহিল।

সে সাগরের কথা ভাবিতেছিল। মন্দিরের অনতিদূরবর্তী ভূমিজ পল্লীস্থ এই দুঃস্থ ও দুরন্ত লোকগুলিকে সে শিশুকাল হইতেই ভালবাসিত এবং বড় হইয়া ইহাদের দুঃখ-দুর্দশার চিহ্ন যতই বেশী করিয়া তাহার চোখে পড়িতে লাগিল ততই স্নেহ তাহার সন্তানের

প্রতি মাতৃস্নেহের ন্যায় দৃঢ় ও গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। সে দেখিল চন্ডীগড়ের ইহারাই একপ্রকার আদিম অধিবাসী, এবং একদিন সকলেই ইহারা গৃহস্থ কৃষক ছিল; কিন্তু আজ অধিকাংশই ভূমিহীন—পরের ক্ষেতে মজুরী করিয়া বহু দুঃখে দিনপাত করে। সমস্ত জমিজমা হয় জনার্দন, না হয় জমিদারের কর্মচারী স্বনামে বেনামে গিলিয়া খাইয়াছে। ভূতপূর্ব ভৈরবীদের আমলে দেবীর অনেক জমি মন্দিরের নিজ জোতে ছিল, তাঁহাদের যথেচ্ছামত সেগুলি প্রতি বৎসর ভাগে বিলি হইত, এবং এই উপলক্ষে প্রজায় প্রজায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবধি থাকিত না। অথচ লাভ কিছুই ছিল না; তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্তের অভাবে প্রাপ্য অংশের কিছু-বা প্রজারা লুটিয়া খাইত, এবং অবশিষ্ট আদায় যদি-বা হইত অপব্যয়েই নিঃশেষ হইত। এই সকল ভূমিই সে ভূমিহীন ভূমিজ প্রজাদিগকে বছর ছয়-সাত পূর্বে ফকিরসাহেবের নির্দেশমতে নির্দিষ্ট হারে বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। জনার্দন রায় ও এককড়ি নন্দীর সহিত তাহার বিবাদের সূত্রপাতও তখন হইতে। এবং সেই কলহই পরবর্তী কালে নানা অজুহাতে নানা তুচ্ছ কাজে আজ এই আকারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাগর ও হরিহর সর্দার তখন জেল খাটিতেছিল। খালাস পাইয়া তাহারা মন্দিরে ষোড়শীর কাছে আসিয়া একদিন হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল। কহিল, মা, আমরা খুড়ো-ভাইপোয়েই কি কেবল কূল-কিনারা পাবো না, শুধু ভেসে ভেসে বেড়াব?

ষোড়শী রাগ করিয়া কহিল, তোরা ভাসতে যাবি কেন হরিহর—জেলের অমন সব বাড়িঘর হয়েচে তবে কিসের জন্যে?

সাগর নিঃশব্দে মুখ ফিরাইয়া মাথা উঁচু করিয়া রহিল; কিন্তু বুড়ো হরিহর তেমনি জোড়হাতে কহিল, মা, আমরা তোমার কুপুত্র বলে তুমিও কি কুমাতা হবে? আমাদেরও একটা পথ করে দাও।

ষোড়শী একটু নরম হইয়া কহিল, তোমার কথাগুলি ত ভাল হরিহর, তা ছাড়া তুমি বুড়ো হয়েও গেছ, কিন্তু তোমার ভাইপোটি ত অহঙ্কারে মুখ ফিরিয়ে রইল, দোষটুকু পর্যন্ত স্বীকার করলে না—ও কি কখনো শান্ত হতে পারবে?

হরিহর নিজের সর্বাঙ্গে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বুড়ো হয়ে গেছি, না মা? চুলগুলোও সব পেকে গেছে, বলিয়া সে মুচকাইয়া একটু হাসিতেই সাগরের সমস্ত মুখ শান্ত হাসিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্তে খুড়ো-ভাইপোর চোখে চোখে নিঃশব্দে বোধ হয় এই কথাই হইয়া গেল যে, এই ভাল। তোমার এই প্রাচীন বাহু দুটির শক্তির কোন সংবাদ যে রাখে না, তাহার কাছে এমনি সহাস্যে সবিনয়ে স্বীকার করাই সবচেয়ে শোভন।

বুড়ো কহিল, অহঙ্কার নয় মা, অভিমান। ওটুকু ও পারে করতে—সাগর কখনো ডাকাতি করে না।

ষোড়শী আশ্চর্য হইয়া কহিল, ও কি তবে বিনাদোষে শাস্তিভোগ করলে? যা সবাই জানে, তা সত্য নয়—এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও হরিহর?

তাহার অবিশ্বাসের কণ্ঠস্বর অকারণে অত্যন্ত কঠোর হইয়া বাজিল, তথাপি বুড়া হরিহর কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভাইপো সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে বাধা দিল। কহিল, কি হবে মা, তোমার সে কথা শুনে? তোমরা ভদ্রলোকেরা যখন আমাদের ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করতে পারবে না! ভদ্রলোকেরা যখন আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিলে, সেও সত্যি পাওনার দাবীতে, আবার যখন জেলে দিলে, সেও তেমনি সত্যি সাক্ষীর জোরে। জজসাহেবের আদালত থেকে মা চন্ডীর মন্দির পর্যন্ত ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করবার ত কেউ নেই মা! চল, ছোটখুড়ো, আমরা ঘরে যাই। বলিয়া সে চট করিয়া হেঁট হইয়া ভৈরবীর পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া প্রস্থান করিল। হরিহর নিজেও প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিয়া সলজ্জ-কণ্ঠে কহিল, রাগ ক'রো না মা, ও ব্যাটা ঐ রকম গোঁয়ার, ও কথা কারু সইতে পারে না। বলিয়া সেও ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুগমন করিল।

হোক ইহারা অন্ত্যজ, হোক ইহারা দস্যু; যতক্ষণ দেখা গেল ষোড়শী স্তব্ধবিস্ময়ে এই হীনবীর্য, অবমানিত, অধঃপতিত বাঙলাদেশের এই দুটি সুস্থ, নির্ভীক ও পরম শক্তিমান পুরুষদিগের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতেই ষোড়শী সাগরকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, তোদের কাছে বাবা, কাল আমি অন্যায় করেছি। বিঘে দশ-পনর জমি আমার এখনো আছে, তোরা খুড়ো-ভাইপোতে তাই ভাগ করে নে। মায়ের খাজনা তোরা যা খুশি দিস্, কিন্তু অসৎপথে আর কখনো পা দিবিনে এই আমার শর্ত।

সেই অবধি সাগর আর হরিহর তাহার ক্রীতদাস। তাহার সকল কর্মে সকল সম্পদে তাহারা ছায়ার মত অনুসরণ করিয়াছে, সকল বিপদে বুক দিয়া রক্ষা করিয়াছে। এই যে ভাঙ্গা কুটীর, এই সঙ্গীবিহীন বিপদাপন্ন জীবন, তবু যে কেহ তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করিবার দুঃসাহস করে না, সে যে কিসের ভয়ে এ কথা ত তাহার অবিদিত নাই। তথাপি সেই সাগরের যে মূর্তি আজ সে চোখে দেখিয়া আসিল তাহাতে ভরসা করিবার, বিশ্বাস করিবার আর তাহার কিছুই রহিল না। সে ডাকাতি করে কিনা বলা কঠিন; কিন্তু প্রয়োজন বোধ করিলে ইহার অসাধ্য কিছু নাই—তাহার সমস্ত আয়োজন ও উপকরণ আজও তেমনি সজীব আছে, এবং মুহূর্তের আহ্বানে তাহারা আজও তেমনি সাজিয়া দাঁড়াইতে পারে, এ সংশয় আর ত ঠেকাইয়া রাখা যায় না।

ছেঁড়া একখানা কাগজের টুকরা একপাশে পড়িয়া ছিল, অন্যমনস্কভাবে হাতে তুলিয়া লইতেই তাহার প্রদীপের আলোকে চোখে পড়িল, হৈমর চিঠির জবাবে সেদিন যে চিঠিখানা সে লিখিয়াও ভাল হইল না ভাবিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আর একখানা লিখিয়া পাঠাইয়াছিল ইহা তাহারই অংশ। অনেক রাত্রি জাগিয়া দীর্ঘ পত্র যখন শেষ হয়, তখন একবার যেন সন্দেহ হইয়াছিল এত কথা না লিখিলেই হইত—পরের কাছে আপনাকে এমন করিয়া ব্যক্ত করা হয়ত কিছুতেই ঠিক হইল না, কিন্তু নিদ্রাহীন সেই গভীর রাত্রে ঠিক করিবার ধৈর্যও আর তাহার ছিল না। কিন্তু পরদিন ডাকে ফেলিয়া দিতে যখন পাঠাইল, তখন না পড়িয়াই পাঠাইয়া দিল। তাহার ভয় হইল পাছে ইহাও সে ছিঁড়িয়া ফেলে—পাছে আজও তাহার হৈমকে উত্তর দেওয়া ঘটিয়া না ওঠে। এ কয়দিন যাহা ভুলিয়াছিল, আজ একে একে সেই চিঠির কথাগুলাই মনে পড়িয়া তাহার ভারী লজ্জা করিতে লাগিল—ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহার নির্যাতনের কাহিনীটুকু কেহ ভুল বুঝিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই হৈম ও তাহার স্বামীকে মনে পড়িলেই মন যেন তাহার কেমন বিবশ হইয়া আসিত। ইহাদের শৃঙ্খলিত জীবন-যাত্রার ধারার সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় নাই, তবুও কেমন করিয়া যে স্বপ্ন রচিয়া উঠিত, কেমন করিয়া যে কাজের চিন্তা তাহার এলোমেলো কল্পনায় পর্যবসিত হইত, কখনো হৈম, কখনো নির্মলের সূত্র ধরিয়া কি করিয়া যে ইহাই একসময়ে সমস্ত সংযমের বেড়া ভাঙ্গিয়া অকস্মাৎ লজ্জায় ফাটিয়া পড়িত, তাহা সে নিজেই ভাবিয়া পাইত না। অথচ নিজের মনের এই মোহাবিষ্ট লক্ষ্যহীন গতিকে সে চিনিত, ভয় করিত, লজ্জা করিত, এবং সকল শক্তি দিয়া বর্জন করিতে চাহিত। সেই উতলা আবেগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পত্রখণ্ড খান খান করিয়া ফেলিয়া দিয়া শক্ত হইয়া বসিল। মনে মনে দৃঢ়বলে কহিল, কিসের জন্য হৈমদের এত কথা আমি বলিতে গেলাম! কোন্ সাহায্য তাহাদের কাছে আমি ভিক্ষা করিয়া লইব? কিসের জন্য লইব? দেবীর ভৈরবীপদের মধ্যে কি আছে যে এমন করিয়া আঁকড়াইয়া থাকিব? যে-কেহ নিক না, কি আমার আসিয়া যায়? ইহারা সবাই ত চোর-ডাকাত। যাহার যত শক্তি সে তত বড়ই দস্যু। সুবিধা ও সামর্থ্য মত অপরের গলা টিপিয়া কাড়িয়া লওয়াই ইহাদের কাজ। এই ত সংসার, এই ত সমাজ, এই ত মানুষের ব্যবসা! পীড়িত ও পীড়কের মাঝখানে ব্যবধান কতটুকু যে অহর্নিশি এমন ভয়ে ভয়ে আছি! কিসের জন্য আমার এতবড় মাথা-ব্যথা! কিসের জন্য এতবড় বিরোধ সৃষ্টি করিয়াছি! এই ভৈরবীর আসন ত্যাগ করা কিসের জন্য এতবড় কঠিন! মুহূর্তের জন্য মনে হইল এ কাজ তাহার পক্ষে একেবারেই কঠিন নয়, কাল সকালেই সে এককড়ি ও জনার্দন রায়কে লিখিয়া পাঠাইয়া ভৈরবীর সকল দায়িত্ব স্বচ্ছন্দে ফিরাইয়া দিতে পারে, কোথাও কোন টান, কোন ব্যথা তাহার বাজিবে না।

ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের কুলুঙ্গিতে তাহার কালি কলম ও কাগজ থাকিত; পাড়িয়া লইয়া এই চিঠিখানা তখনই লিখিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হইল। তাড়াতাড়ি কয়েক ছত্র লিখিয়া ফেলিয়া সহসা তাহার লেখনী রুদ্ধ হইল। সর্দার ও সাগরকে মনে পড়িল—

পৃথিবী-জোড়া কাড়াকাড়ি ও দস্যুপনার মাঝখানে কেবল এই দুটি দস্যুই আজও তাহাকে ত্যাগ করে নাই। সহসা নিজের কথা মনে পড়িয়া মনে হইল, তার পরে? দাঁড়াইবার কোথাও স্থান নাই—সবাই ত্যাগ করিয়াছে। কাল যাহারা তাহাকে ঘেরিয়া ছিল, আজ তাহারা শাসনের ভয়ে, জমিদারের গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া তাহারই বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত করিয়া আসিয়াছে। অথচ সে বেশীদিনের কথা নয়, ইহাদিগকেই—কিন্তু থাক সে কথা। এই অত্যন্ত ছোটদের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ নাই। এককড়ি, জনার্দন, শিরোমণি, তাহার পিতা তারাদাস, আর এই জমিদার—পুরানো ও নূতন অনেক কথা—কিন্তু সেও থাক; এ আলোচনাতেও আজ আর কাজ নাই। তাহার ফকিরসাহেবকে মনে পড়িল। তিনি যে কি ভাবিয়া এমন করিয়া অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন তাহার জানা নাই; কাহাকেও তিনি কোন হেতু, কাহারও বিরুদ্ধে কোন অনুযোগ করিয়া যান নাই। ইতিপূর্বেও তিনি এমনি নীরবে চলিয়া গেছেন; স্নেহ দিয়া, ভক্তি দিয়া, সসম্ভ্রমে বিদায় দিবার কোন অবসর কাহাকেও দেন নাই, হয়ত ইহাই তাঁহার প্রস্থানের পদ্ধতি। তবুও কেমন করিয়া যেন ষোড়শীর মনের মধ্যে ব্যথা একটা বিঁধিয়াই ছিল, তাঁহার এই যাওয়াটাকে কোনক্রমে সে তাঁহার অভ্যাস বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেছিল না। তিনি মাঝে মাঝে তাহার কথার প্রত্যুত্তরে বলিতেন, মা, আমি নিজের সঙ্গেই সম্বন্ধ ছেদ করিতে চাই, লোকের সঙ্গে নয়। তাই লোকালয়ের মায়া কাটাতে পারিনে—মানুষের মাঝখানে বাস করতেই ভালবাসি। তুমিও তোমার দেহটাকে যখন দেবতাকেই দিয়েছ, তখন সেই কথাটাই সকলের আগে মনে রেখো। কোন ছলে নিজের বলে যেন ভুল না হয়। দেবতার সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে আত্মবঞ্চনার চেয়ে বরঞ্চ দেবতাকে ছাড়াও ভাল। আজ এই বঞ্চনাই ত তাহাকে জালের মত জড়াইয়া ধরিয়াছে। আজ যদি তিনি থাকিতেন! একবার যদি সে তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিতে পারিত! বহুপূর্বে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, মা, যখন আমাকে তোমার যথার্থ প্রয়োজন হবে, সত্যই ডাকবে, যেখানেই থাকি আমি তখনি এসে দাঁড়াব। আজ ত তার সেই প্রয়োজন!

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাহির হইতে ডাক আসিল, একবার ভিতরে আসতে পারি কি?

ষোড়শীর বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত চক্ষের পলকে সচেতন হইয়া পরক্ষণেই আবার যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এতবড় অলৌকিক বিস্ময় সহসা যেন সে সহিতে পারিল না।

আমি আসতে পারি কি?

আসুন, বলিয়া ষোড়শী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মুদিত-চক্ষে সর্বাঙ্গ দিয়া আগন্তুকের পদতলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া কম্পিতপদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রদীপের আলোকে চাহিয়া দেখিল—ফকিরসাহেব নহেন, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী। চক্ষে আর পলক পড়িল না—চোখের পাতা দুটো পর্যন্ত যেন পাষাণ হইয়া গেল। গৃহের দীপশিখা স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু এমন করিয়া যে-মানুষ এক নিমিষে পাথর হইয়া গেল, তাহাকে চিনিবার মত আলো ছিল। সুতরাং এই অদ্ভুত ও অকারণ উচ্ছ্বসিত ভক্তির উপলক্ষ যে সত্যই সে নয়, আর কেহ, তাহা অনুভব করিয়া জীবানন্দর ভয় ভাঙ্গিল। গম্ভীরমুখে কহিল, এরূপ পতিভক্তি কলিকালে দুর্লভ। আমার পাদ্য-অর্ঘ্য, আসনাদি কই?

ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার এই হতভাগ্য জীবনে সে অনেককে দেখিয়াছে। সে জনার্দনকে দেখিয়াছে, সে এককড়ি নন্দীকে দেখিয়াছে, সে তাহার আপনার পিতাকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরূপে দেখিয়াছে; কিন্তু মানুষের পাষণ্ডতা যে এতদূরে উঠিতে পারে, এ কথা উপলব্ধি করিয়া তাহার ধাক্কা সামলাইতে তাহার সময় লাগিল। জীবানন্দ এদিক ওদিক চাহিয়া বাঁশের আলনা হইতে কম্বলের আসনখানি পাড়িয়া লইল; পাতিতে গিয়া খোলা দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, খিলটা একেবারে দিয়েই বসিনে কেন? তোমার সাগরচাঁদটি শুনেচি নাকি আমাকে তেমন ভালবাসে না। কাছাকাছি কোথাও আছেন নিশ্চয়—এসে পড়লে হয়ত বা কিছু মনেই করবে। ছোটলোক বৈ ত নয়! বলিয়া সে এইবার একটু হাসিল।

ষোড়শীর গা কাঁপিতে লাগিল। সে নিশ্চয় বুঝিল লোকটা একাকী আসে নাই, তাহার লোকজন নিকটেই লুকাইয়া আছে, এবং সম্ভবতঃ এই সুযোগই সে প্রত্যহ প্রতীক্ষা করিতেছিল। আজ ভীষণ কিছু একটা করিতে পারে—হত্যা করাও অসম্ভব নয়। এবং

এই উদ্বেগ কণ্ঠস্বরে সে সম্পূর্ণ গোপন করিতে না পারিয়া কহিল, আপনি এখানে এসেছেন কেন?

জীবানন্দ কহিল, তোমাকে দেখতে। একটু ভয় পেয়েচ বোধ হচ্চে—পাবারই কথা। কিন্তু তাই বলে চেঁচিও না। সঙ্গে গাদা-পিস্তল আছে, তোমার ডাকাতের দল শুধু মারাই পড়বে, আর বিশেষ কিছু পারবে না। বলিয়া সে পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া পুনশ্চ পকেটেই রাখিয়া দিয়া কহিল, কিন্তু দোরটা বন্ধ করে দিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হওয়াই যাক না। এই বলিয়া সে ষোড়শীর মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল, এবং অগ্রসর হইয়া দ্বার অর্গল-বন্ধ করিয়া দিল, যাহার গৃহ তাহার অনুমতির অপেক্ষামাত্র করিল না।

ষোড়শীর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একবার কথা কহিতে গিয়া তাহার কণ্ঠে বাধিল, তার পরে স্বর যখন ফুটিল, তখন সেই স্বর ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, কহিল, সাগর নেই—

জীবানন্দ বলিল, নেই? ব্যাটা গেল কোথায়?

ষোড়শী কহিল, আপনারা জানেন বলেই ত -

জীবানন্দ কহিল, জানি বলে? কিন্তু আপনারা কারা? আমি ত বাষ্পও জানতাম না।

ষোড়শী বলিল, নিরাশ্রয় বলেই ত লোক নিয়ে আমাকে মারতে এসেচেন। কিন্তু আপনার কি করেচি আমি?

জীবানন্দ কহিল, লোক নিয়ে মারতে এসেচি! তোমাকে? মাইরি না! বরঞ্চ মন কেমন করছিল বলে দেখতে এসেচি।

ষোড়শী আর কথা কহিল না। তাহার চোখে জল আসিতেছিল, এই কদর্য উপহাসে তাহা একেবারে শুকাইয়া গেল। এবং সেই শুষ্ক চক্ষু ভূমিতলে নিবদ্ধ করিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; এবং অদূরে বসিয়া আর একজন তাহারই আনত মুখের প্রতি লুব্ধ তৃষিত দৃষ্টি স্থির করিয়া তাহারি মত চুপ করিয়া রহিল।

আঠার

অলকা?

বলুন।

তোমার এখানে তামাক-টামাকের ব্যবস্থা নেই বুঝি?

ষোড়শী একবার মুখ তুলিয়াই আবার অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল।

জবাব না পাইয়া জীবানন্দ সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিল, ব্রজেশ্বরের কপাল ভাল ছিল; দেবী-রানী তাকে ধরে আনিয়েছিল সত্যি, কিন্তু অম্বুরী তামাক খাইয়েছিল, এবং ভোজনান্তে দক্ষিণা দিয়েছিল। বিদায়ের পালাটা আর তুলব না, বলি, বঙ্কিমবাবুর বইখানা পড়েচ ত?

ষোড়শী স্থির করিয়াছিল এই পাষণ্ড আজ তাহাকে যত অপমানই করুক সে নিরুত্তরে সহ্য করিবে, কিন্তু জীবানন্দের কণ্ঠস্বরের শেষ দিকটায় হঠাৎ কেমন যেন তাহার সংকল্প ভাঙিয়া দিল; বলিয়া ফেলিল, আপনাকে ধরে আনলে সেইমত ব্যবস্থাও থাকত—অনুযোগ করতে হ'তো না।

জীবানন্দ হাসিল, কহিল, তা বটে। টানা-হেঁচড়া দড়িদড়ার বাঁধাবাঁধিই মানুষের নজরে পড়ে। ভোজপুরী পেয়াদা পাঠিয়ে ধরে আনাটাই পাড়াসুদ্ধ সকলে দেখে; কিন্তু যে পেয়াদাটিকে চোখে দেখা যায় না—হাঁ অলকা, তোমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁকে কি বলে? অতনু, না? বেশ তিনি।

ষোড়শী আরক্ত অধোমুখে নির্বাক হইয়া রহিল।

জীবানন্দ কহিল, যৎসামান্য অনুরোধ ছিল, কিন্তু আজ উঠি। তোমার অনুচরগুলো সন্ধান পেলে ঠিক জামাই-আদর করবে না, এমন কি শ্বশুরবাড়ি এসেচি বলে হয়ত বিশ্বাস করতেই চাইবে না—ভাববে প্রাণের দায়ে বুঝি মিথ্যেই বলচি।

ষোড়শী কোন কথাই কহিল না; এই কদর্য পরিহাসে অন্তরে সে যে কিরূপ লজ্জা বোধ করিল, মুখ তুলিয়া তাহা জানিতেও দিল না।

জবাব না পাইয়া জীবানন্দ মুহূর্ত-কয়েক তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সত্যই উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, অম্বুরী তামাকের ধুঁয়া আপাততঃ পেটে না গেলেও চলত; কিন্তু ধুঁয়া নয় এখন কিছু একটা পেটে না গেলে আর ত দাঁড়াতে পারিনে। বাস্তবিক নেই কিছু অলকা?

ষোড়শী চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু তাহার নাম ধরিয়া শেষ প্রশ্নটা তাহাকে মৌন থাকিতে দিল না, মুখ তুলিয়া বলিল, কিছু কি? মদ?

জীবানন্দ হাসিয়া মাথা নাড়িল। কহিল, এবারে ভুল হ'লো! ওর জন্যে অন্য লোক আছে, সে তুমি নয়। তোমাকে বুঝতে পারার যথেষ্ট সুবিধে দিয়েচ—আর যা অপবাদ দিই, অস্পষ্টতার অপবাদ দিতে পারব না। অতএব তোমার কাছে যদি চাইতেই হয় ত চাই এমন কিছু যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, মরণের দিকে ঠেলে দেয় না। ডাল-ভাত, মেঠাই-মণ্ডা, চিড়ে-মুড়ি যা হোক দাও, আমি খেয়ে বাঁচি। নেই?

ষোড়শী স্থিরচক্ষে চাহিয়া রহিল। জীবানন্দ বলিতে লাগিল, সকালে আজ মন ভাল ছিল না। শরীরের কথা তোলা বিড়ম্বনা, কারণ সুস্থ দেহ যে কি, আমি জানিনে। সকালে হঠাৎ নদীর তীরে বেরিয়ে পড়লাম—ধারে ধারে কতদূর যে হাঁটলাম বলতে পারিনে—ফিরতে ইচ্ছেই হ'লো না। সূর্যদেব অস্ত গেলেন, একলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যে ভাল লাগল বলতে পারিনে। কেবল তোমাকে মনে পড়তে লাগলো। ফেরবার পথে তাই বোধ হয় আর বাড়ি গেলাম না, ক্ষিদে-তেষ্টা নিয়েই এসে দাঁড়ালাম ওই মন্‌সা গাছটার পেছনে। দেখি দোর খোলা, আলো জ্বলছে। পিস্তল ছাড়া আমি এক পা বাড়াইনে—ওটা পকেটেই ছিল, তবু গা ছমছম করতে লাগল। জানি ত বাবাজীবনরা আড়ালে আবডালে কোথাও আছেন নিশ্চয়। হঠাৎ পাতার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি মেঝের ওপর তুমি চুপ করে বসে। আপনাকে আর সামলাতে পারলাম না। বাস্তবিক নেই কিছু?

ষোড়শী একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু বাড়ি গিয়ে ত অনায়াসে খেতে পারবেন।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ আমার বাড়ির খবর আমার চেয়ে বেশী জানো। বলিয়া সে একটু হাসিল। কিন্তু সে হাসি না মিলাইতেই ষোড়শী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আপনি সারাদিন খাননি, আর বাড়িতে আপনার খাবার ব্যবস্থা নেই, এ কি কখনো হ'তে পারে?

একজনের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার আভাস গোপন রহিল না, কিন্তু আর একজন নিতান্ত ভালমানুষটির মত শান্তভাবে বলিল, পারে বৈ কি। আমি খাইনি বলে আর একজন উপোস করে থালা সাজিয়ে পথ চেয়ে থাকবে, এ ব্যবস্থা ত ক'রে রাখিনি। আজ খামকা রাগ করলে চলবে কেন অলকা! বলিয়া সে তেমনি একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, আজ আসি। কিন্তু সত্যি সত্যিই থাকতে না পেরে যদি আর কোনদিন এসে পড়ি ত রাগ করতে পাবে না বলে যাচ্ছি।

এই লোকটির একান্ত বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রার যে চেহারা একদিন ষোড়শী নিজের চোখে দেখিয়াছিল তাহা মনে হইল। মনে হইল, কদাচারী, মদোন্মত্ত, নিষ্ঠুর মানুষ এ নয়; যে জমিদার মিথ্যা দিয়া তাহার সর্বনাশ করতে উদ্যত হইয়াছে, সে আর কেহ। সে আর কেহ যে সেদিন মন্দির হইতে বিদায় দিতে তাহাকে অসঙ্কোচে হুকুম দিয়াছিল! তবু একবার দ্বিধা করিল, কিন্তু পরক্ষণেই অস্ফুটে কহিল, দেবীর প্রসাদ সামান্য কিছু আছে, কিন্তু সে কি আপনি খেতে পারবেন?

পারব না? তাই বল! বলিয়া সে আসনে ফিরিয়া গিয়া চাপিয়া বসিয়া পড়িয়া কহিল, প্রসাদ খেতে পারব না? শিগগির নিয়ে এসো, ঠাকুর দেবতার প্রতি আমার কিরূপ অচলা ভক্তি একবার দেখিয়ে দিই!

তাহার সুমুখের স্থানটুকু ষোড়শী জল-হাত দিয়া মুছিয়া লইল, এবং রান্নাঘরে গিয়া শালপাতায় করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ যাহা কিছু ছিল, বহিয়া আনিয়া জীবানন্দের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, দেখুন যদি খেতে পারেন।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে দেখতে হবে না, কিন্তু এ ত তোমার জন্যে?

ষোড়শী কহিল, অর্থাৎ আপনার জন্যে আলাদা করে এনে রেখেছিলাম কি না তাই জিজ্ঞেসা করচেন?

জীবানন্দ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, না গো না, তা জিজ্ঞেসা করিনি, আমি জিজ্ঞেসা করচি, আর নেই ত?

ষোড়শী কহিল, না।

তা হলে এ যে পরের মুখের গ্রাস একরকম কেড়ে খাওয়া অলকা?

ষোড়শী কহিল, পরের মুখের গ্রাস কেড়ে খেলে কি আপনার হজম হয় না?

এ কথার উত্তর জীবানন্দ আর হাসিমুখে দিতে পারিল না। কহিল, কি জানি, নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না অলকা। কিন্তু সে যাক, তুমি খাবে কি? বরঞ্চ অর্ধেকটা রেখে দাও।

ষোড়শী কহিল, তাতে আমারও হবে না, আপনারও পেট ভরবে না।

জীবানন্দ জিদ করিয়া কহিল, না ভরুক, কিন্তু তোমাকে ত সারারাত্রি অনাহারে থাকতে হবে না।

আজ খাবার কথা ষোড়শীর মনেও ছিল না—জীবানন্দ না আসিলে ও-সকল পড়িয়াই থাকিত, সে হয়ত স্পর্শও করিত না। কিন্তু সে-কথা না বলিয়া কহিল, ভৈরবীদের অনাহার অভ্যাস করতে হয়। তা ছাড়া আমার একটা রাত্রির কষ্টের ভাবনা ভেবে আপনি কষ্ট নাই পেলেন। বরঞ্চ মিথ্যে দেরি না করে বসে যান; ঠাকুর-দেবতার প্রসাদের প্রতি অচলা ভক্তির সাফাই প্রমাণ দিন।

তা দিচ্চি, কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করচি জেনে সে উৎসাহ আর নেই—

বেশ, কম উৎসাহ নিয়েই শুরু করুন। বলিয়া ষোড়শী একটু হাসিয়া কহিল, আমাকে বঞ্চনা করায় নতুন অপরাধ আর আপনার হবে না। কিন্তু যা নিয়ে তর্ক চালিয়েচেন তাতে আমারি লজ্জা করচে। এবার থামুন।

জীবানন্দ আর কথা না কহিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। মিনিট-দুই পরে হঠাৎ মুখ তুলিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, প্রায় পনর বছর হ'লো, না? আজ একটা বড়লোক হতে পারতাম।

ষোড়শী নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। প্রায় বছর পনর পূর্বের ইঙ্গিতটা সে বুঝিল, কিন্তু শেষের কথাটা বুঝিল না।

জীবানন্দ কহিতে লাগিল, আর সমস্ত ছেড়ে দিয়ে মদের কথাটাই ধরি। মরতে বসেচি —সে ত নিজের চোখেই দেখে এসেচ, কিন্তু এমন একটি শক্ত লোক কেউ নেই যে আমাকে মুক্ত করে দেয়। হয়ত আজও সময় আছে, হয়ত এখনো বাঁচতে পারি—নেবে আমার ভার অলকা?

ষোড়শী অন্তরে কাঁপিয়া উঠিয়া চোখ বুজিল। সেখানে হৈম, তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার দাসদাসী, তাহার সংসারযাত্রার অসংখ্য বিচিত্র ছবি ছায়াবাজির মত খেলিয়া গেল।

জীবানন্দ কহিল, আমার সমস্ত ভার তুমি নাও অলকা—

আত্মসমর্পণের এই আশ্চর্য কণ্ঠস্বর ষোড়শীকে চমকাইয়া দিল। এ জীবনে এমন করিয়া কেহ তাহাকে ডাকে নাই, ইহা একেবারে নূতন; কিন্তু ভৈরবী-জীবনের সংযমের কঠোরতা তাহাকে আত্মবিস্মৃত হইতে দিল না। সে একমুহূর্ত থামিয়া কহিল, অর্থাৎ আমার যে কলঙ্কের বিচার করেছেন, আমাকে দিয়ে তাকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়ে নিতে চান। আমার মাকে ঠকাতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমাকে পারবেন না।

কিন্তু সে চেষ্টা ত আমি করিনি। না জেনে আমি তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করেচি তা সত্যি। তোমার বিচার করেচি, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। কেবলি মনে হয়েচে, এতবড় কঠিন মেয়েমানুষটিকে অভিভূত করেছে, সে মানুষটি কে?

ষোড়শী আশ্চর্য হইয়া কহিল, তারা আপনার কাছে তার নাম বলেনি?

জীবানন্দ কহিল, না। আমি বার বার জিজ্ঞাসা করেচি, তারা বার বার চুপ করে গেছে।

আপনি খান, বলিয়া ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

দুই-চারি গ্রাস আহারের পর জীবানন্দ মুখ তুলিয়া বলিল, আমি বেশী খেতে পারিনে—

বেশী খেতে আপনাকে বলিনে। সাধারণ লোকে যা খায়, তাই খান।

আমি তাও পারিনে। খাওয়া আমার শেষ হয়ে গেছে।

ষোড়শী কহিল, না, হয়নি। প্রসাদের ওপর অভক্তি দেখালে বাবাজীবনদের ডেকে দেব।

জীবানন্দ হাসিয়া বলিল, সে তুমি পারবে না। তোমার জোর আমি জানি। পুলিশের দল থেকে মায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবটি পর্যন্ত একদিন তার নমুনা জেনে গেছেন। তোমার মা যে একদিন আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে গেছেন এ অস্বীকার করবার সাধ্য তোমার নেই।

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল, জীবানন্দ হাতমুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল, কহিল, আমি যখন একলা থাকি, সে রাত্রের কথা মনে মনে আলোচনা করে কোথা দিয়ে যে সময় কাটে বলতে পারিনে। বিশেষ করে চাকরদের ঘরে পাঠানোর ভয়ে তোমার সেই হাতজোড় করে কান্না! ভোলনি বোধ হয়?

ষোড়শী কহিল, না।

জীবানন্দ বলিল, তার পরে সেই শূলব্যথা। একলা ঘরে তুমি আর আমি। শেষে তোমার কোলেই মাথা রেখে আমার রাত কাটল। তারপরের ঘটনাগুলো আর ভাবতে ভাল লাগে না। তোমাকে ঘুষ দিতে যাবার কথা মনে হলে আমার পর্যন্ত যেন লজ্জায় গা শিউরে উঠে। এই সেদিন পুরীতে যখন মর-মর হলাম, প্রফুল্ল বললে, দাদা, অলকাকে একবার আনিয়ে নিন। আমি বললাম, সে আসবে কেন? প্রফুল্ল বললে, গায়ের জোরে। আমি বললাম, গায়ের জোরে ধরে এনে লাভ হবে কি? সে উত্তর দিলে, ঠাকরুন একবার আসুন ত, তার পরে এর লাভ-লোকসানের হিসেব হবে। তাকে তুমি জানো না, কিন্তু এতবড় ভক্ত তোমার আর নেই।

✓এই ভক্ত লোকটির পরিচয় জানিতে ষোড়শীর কৌতূহল হইল, কিন্তু সে-ইচ্ছা সে দমন করিয়া রাখিল।

জীবানন্দ কহিল, রাত অনেক হ'লো, তোমাকে আর বসিয়ে রাখতে পারিনে। এবার আমি যাই, কি বল? ,

ষোড়শী কহিল, আপনার কি-একটা যে কাজের কথা ছিল?

কাজের কথা? কিন্তু বিশেষ কি কথা ছিল আমার আর মনে পড়চে না। এখন কেবল একটা কথাই মনে পড়চে, তোমার সঙ্গে কথা কহাই আমার কাজ। বড্ড খোশামোদের মত শোনাল, না? কিন্তু এ-রকম খোশামোদ করতেও যে পারি, এর আগে তাও জানতাম না। হাঁ অলকা, তোমার কি সত্যি আবার বিয়ে হয়েছিল?

ষোড়শী মুখ তুলিয়া কহিল, আবার কি রকম? সত্যি বিয়ে আমার একবার মাত্রই হয়েছে।

জীবানন্দ বলিল, আর তোমার মা যে আমাকে দিয়েছিলেন, সেটাই কি সত্যি নয়?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে কহিল, না, সে সত্যি নয়। মা আমার সঙ্গে যে টাকাটা দিয়েছিলেন আপনি তাই শুধু নিয়েছিলেন, আমাকে নেননি। ঠকানো ছাড়া তার মধ্যে লেশমাত্র সত্যও কোথাও ছিল না।

জীবানন্দ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কোনপ্রকার উত্তর দিবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না। মিনিট-পাঁচেক যখন এইভাবে কাটিয়া গেল, তখন ষোড়শী মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল, এবং ম্লান দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিবার অবসরে চাহিয়া দেখিল, সে যেন হঠাৎ ধ্যানে বসিয়া গেছে। এই ধ্যান ভাঙ্গিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইল, কিন্তু ক্ষণেক পরে সে নিজেই যখন কথা কহিল, তখন মনে হইল কে যেন কতদূর হইতে কথা কহিতেছে।

অলকা, এ কথা তোমার সত্য নয়।

কোন্‌ কথা?

জীবানন্দ কহিল, তুমি যা জেনে রেখেচ। ভেবেছিলাম সে কাহিনী কখনো কাউকে বলব না, কিন্তু সেই কাউকের মধ্যে আজ তোমাকে ফেলতে পারচি নে। তোমার মাকে

ঠকিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাকে ঠকাবার সুযোগ ভগবান আমাকে দেননি। আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

বলুন।

জীবানন্দ কহিল, আমি সত্যবাদী নই, কিন্তু আজকের কথা আমার তুমি বিশ্বাস কর। তোমার মাকে আমি জানতাম, তাঁর মেয়েকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করার মতলব আমার ছিল না—ছিল কেবল তাঁর টাকাটাই লক্ষ্য, কিন্তু সে-রাত্রে হাতে হাতে তোমাকে যখন পেলাম, তখন না বলে ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছেও আর হ'লো না।

তবে কি ইচ্ছে হ'লো?

জীবানন্দ কহিল, থাক, সে তুমি আর শুনতে চেয়ো না। হয়ত শেষ পর্যন্ত শুনলে আপনিই বুঝবে, এবং সে বোঝায় ক্ষতি বৈ লাভ আমার হবে না, কিন্তু এরা তোমাকে যা বুঝিয়েছিল তা তাই নয়, আমি তোমাকে ফেলে পালাই নি।

ষোড়শী এই ইঙ্গিত বুঝিল, এবং ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া কহিল, আপনার না-পালানোর ইতিবৃত্ত এখন ব্যক্ত করুন।

তাহার কঠোর কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিল। কহিল, অলকা, আমি নির্বোধ নই, যদি ব্যক্তই করি, তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করব। তোমার মায়ের এতবড় ভয়ানক প্রস্তাবেও কেন রাজী হয়েছিলাম জানো? একজন স্ত্রীলোকের হার আমি চুরি করি; ভেবেছিলাম টাকা দিয়ে তাকে শান্ত করব। সে শান্ত হ'লো, কিন্তু পুলিশের ওয়ারেণ্ট তাতে শান্ত হ'লো না। ছ'মাস জেলে গেলাম—সেই যে শেষ রাত্রে বার হয়েছিলাম, আর ফেরবার অবকাশ পেলাম না।

ষোড়শী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল, তার পরে?

জীবানন্দ তেমনি মৃদু হাসিয়া বলিল, তার পরেও মন্দ নয়। জীবানন্দবাবুর নামে আরও একটা ওয়ারেণ্ট ছিল। মাস-খানেক পূর্বে রেলগাড়িতে একজন বন্ধু সহযাত্রীর ব্যাগ নিয়ে তিনি অন্তর্ধান হ'ন। ফলে আরও দেড় বৎসর। একুনে এই বছর-দুই নিরুদ্দেশের পর বীজগাঁয়ের ভাবী জমিদারবাবু আবার যখন রঙ্গমঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করলেন, তখন কোথায় বা অলকা, আর কোথায় বা তার মা!

জীবানন্দের আত্মকাহিনীর এক অধ্যায় শেষ হইল। তার পরে দু'জনেই নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

রাত কত?

বোধ হয় আর বেশী বাকী নেই।

তা হলে এ অন্ধকারে বাড়ি গিয়ে আর কাজ নেই।

কাজ নেই? তার মানে?

ষোড়শী কহিল, কম্বলটা পেতে দিই, আপনি বিশ্রাম করুন।

জীবানন্দের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, কহিল, বিশ্রাম করব? এখানে?

ষোড়শী কহিল, ক্ষতি কি?

কিন্তু বড়লোক জমিদারের যে এখানে কষ্ট হবে অলকা?

ষোড়শী বলিল, হলেও থাকতে হবে। গরীবের দুঃখটা আজ একটুখানি জেনে যান।

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার চোখের কোণে জল আসিতেছিল, ইচ্ছা হইল বলে, আমি জানি সব, কিন্তু বুঝিবার মানুষটা যে মরিয়াছে। কিন্তু এ-কথা না বলিয়া কহিল, যদি ঘুমিয়ে পড়ি অলকা?

অলকা শান্তভাবে জবাব দিল, সে সম্ভাবনা ত রইলই।

উনিশ

জীবানন্দের উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র ও ভুক্তাবশেষ প্রভৃতি ফেলিয়া দিতে এবং রান্নাঘরের কিছু কিছু কাজ সারিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া আসিতে ষোড়শী বাহিরে চলিয়া গেলে, তাহার সেই চিঠির ছেঁড়া টুকরাখানা জীবানন্দের চোখে পড়িল। হাতে তুলিয়া লইয়া সেই মুক্তার

মত সাজানো অক্ষরগুলির প্রতি মুগ্ধচক্ষে চাহিয়া সে প্রদীপের আলোকে রাখিয়া সমস্ত লেখাটুকু একনিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিল। অনেক কথাই বাদ গিয়াছে, তথাপি এটুকু বুঝা গেল, লেখিকার বিপদের অবধি নাই, এবং সাহায্য না হোক, সহানুভূতি কামনা করিয়া এ পত্র যাহাকে সে লিখিয়াছে, সে নিজে যদিও নারী, কিন্তু অক্ষরের আড়ালে দাঁড়াইয়া আর এক ব্যক্তিকে ঝাপসা দেখা যাইতেছে যাহাকে কোনমতেই স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হয় না। এই পত্র তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। একবার, দুইবার শেষ করিয়া যখন সে আরও একবার পড়িতে শুরু করিয়াছে, তখন ষোড়শীর পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া কহিল, সবটুকু থাকলে পড়ে বড় আনন্দ পেতাম! যেমন অক্ষর তেমনি ভাষা—ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

ষোড়শী তাহার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন সহজে লক্ষ্য করিয়াও কহিল, একবার উঠুন, কম্বলটা পেতে দিই।

জীবানন্দ কান দিল না, বলিল, নর-পিশাচটি যে কে তা সামান্য বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, কিন্তু তাকে নিধন করতে যে দেবতার আবাহন হয়েছে তিনি কে? নামটি তাঁর শুনতে পাইনে?

এবারেও ষোড়শী আপনাকে বিচলিত হইতে দিল না। শীতের দিনে আকস্মিক একটা দখিনা বাতাসের মত তাহার মনের ভিতরটা আজ অজানা পদধ্বনির আশায় যেন উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে জীবানন্দের বিদ্রূপ বেশ স্পষ্ট হইয়া পৌঁছিল না, সে তেমনি সহজভাবেই কহিল, সে হবে। এখন আপনি একটু উঠে দাঁড়ান আমি এটা পেতে দিই।

জীবানন্দ আর কথা কহিল না, একপাশে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহার কাজ করা দেখিতে লাগিল। ষোড়শী ঝাঁটা দিয়া প্রথমে সমস্ত ঘরখানি পরিষ্কার করিল, পরে কম্বলখানি দু'পুরু করিয়া বিছাইয়া চাদরের অভাবে নিজের একখানি কাচা কাপড় সযত্নে পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন। আমার কিন্তু বালিশ নেই—

দরকার হলেই পাবো গো—অভাব থাকবে না। এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া কাপড়খানি তুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেই ষোড়শী মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া আরক্ত-মুখে কহিল, কিন্তু ওটা তুলে ফেললেন কেন, শুধু কম্বল ফুটবে যে!

জীবানন্দ উপবেশন করিয়া কহিল, তা জানি, কিন্তু আতিশয্যটা আবার বেশী ফুটবে। ঘ? জিনিসটায় মিষ্টি আছে সত্যি, কিন্তু তার ভান করাটায় না আছে মধু, না আছে স্বাদ। ওটা বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ো।

কথা শুনিয়া ষোড়শী বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। তাহার মুখের উপর চোখের পলকে কে যেন ছাই মাখাইয়া দিল।

জীবানন্দ কহিল, তাঁর নামটি?

ষোড়শী কয়েক মুহূর্ত কথা কহিতে পারিল না, তাহার পরে বলিল, কার নাম?

জীবানন্দ হাতের পত্রখণ্ডের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, যিনি দৈত্যবধের জন্য শীঘ্র অবতীর্ণ হবেন? যিনি দ্রৌপদীর সখা, যিনি—আর বলব?

এই ব্যঙ্গের সে জবাব দিল না, কিন্তু চোখের উপর হইতে তাহার মোহের যবনিকা খান খান হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। ধর্মলেশহীন, সর্বদোষাশ্রিত এই পাষণ্ডের আশ্চর্য অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া কেমন করিয়া যে তাহার মনে ক্ষণকালের নিমিত্ত ক্ষমামিশ্রিত করুণার উদয় হইয়াছিল, ইহা সে সহসা ভাবিয়া পাইল না। এবং চিত্তের এই ক্ষণিক বিহ্বলতায় সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার অনুশোচনায় তিক্ত, সতর্ক ও কঠোর হইয়া উঠিল। মুহূর্তকাল পরে জীবানন্দ পুনশ্চ যখন সেই এক প্রশ্নই করিল, তখন ষোড়শী কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া কহিল, তাঁর নামে আপনার প্রয়োজন?

জীবানন্দ কহিল, প্রয়োজন আছে বৈ কি? আগে থেকে জানতে পারলে হয়ত আত্ম-রক্ষার একটা উপায় করতেও পারি।

ষোড়শী তাহার মুখের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আর আত্মরক্ষায় কি শুধু আমারই অধিকার নেই?

জীবানন্দ বলিয়া ফেলিল, আছে বৈ কি।

ষোড়শী কহিল, তা হলে সে নাম আপনি পেতে পারেন না। আমার ও আপনার একই সঙ্গে রক্ষা পাবার উপায় নেই।

জীবানন্দ একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, তাই যদি হয়, রক্ষা পাওয়া আমারই দরকার এবং তাতে লেশমাত্র ত্রুটি হবে না জেনো।

ষোড়শীর মুখে আসিল বলে, তা জানি, একদিন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কে সাহেবের কাছে এ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছিল। সেদিন নিরপরাধা নারীর স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইয়া তোমার প্রাণ বাঁচিয়াছিল, এবং তোমার আজিকার বাঁচিয়া থাকিবার দামটাও হয়ত ততবড়ই আর একজনকে দিতে হইবে, কিন্তু সে কোন কথাই কহিল না। তাহার মনে হইল, এতবড় নরপশুর কাছে অতবড় দানের উল্লেখ করার মত ব্যর্থতা আর ত কিছু হইতেই পারে না।

জীবানন্দের হুঁশ হইল। তাহার এতবড় ঔদ্ধত্যের যে জবাব দিল না, তাহার কাছে গলাবাজির নিষ্ফলতা তাহার নিজের মনেই বাজিল। তাহার উত্তেজনা কমিল, কিন্তু ক্রোধ বাড়িয়া গেল। কহিল, অলকা, তোমার এই বীরপুরুষটির নাম যে আমি জানিনে তা নয়।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, জানবেন বৈ কি, নইলে তাঁর উদ্দেশে ঝগড়া করবেন কেন? তা ছাড়া, পৃথিবীর বীরপুরুষদের মধ্যে পরিচয় থাকবারই ত কথা।

জীবানন্দ শক্ত হইয়া কহিল, সে ঠিক। কিন্তু এই কাপুরুষকে বার বার অপমান করার ভারটা তোমার বীরপুরুষটি সইতে পারলে হয়। যাক, এ চিঠি ছিঁড়লে কেন?

ষোড়শী বলিল, আর একখানা পাঠিয়েছিলাম বলে।

কিন্তু সোজা তাঁকে না লিখে তাঁর স্ত্রীকে লেখা কেন? এই-সব শব্দভেদী বাণ কি সেই বীরপুরুষের শিক্ষা নাকি?

ষোড়শী কহিল, তার পরে?

জীবানন্দ বলিল, তার পরে, আজ আমার সন্দেহ গেল। বন্ধুর সংবাদ আমি অপরের কাছে শুনেচি, কিন্তু রায়মশাইকে যতই প্রশ্ন করেচি, ততই তিনি চুপ করে গেছেন। আজ বোঝা গেল তাঁর আক্রোশটাই সবচেয়ে কেন বেশী।

ষোড়শী চমকিয়া গেল। কলঙ্কের ঘূর্ণি-হাওয়ার মাঝখানে পড়িয়া তাহার দেহের কোথাও দাগ লাগিতে আর বাকী ছিল না, কিন্তু ইহার বাহিরে দাঁড়াইয়াও যে আর একজন অব্যাহতি পাইবে না, ইহা সে ভাবে নাই। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর সম্বন্ধে আপনি কি শুনেচেন?

জীবানন্দ কহিল, সমস্তই। একটু থামিয়া বলিল, তোমার চমক আর গলার মিঠে আওয়াজে আমার হাসি পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হাসতে পারলাম না—আমার আনন্দ করবার কথা এ নয়। সেই ঝড়-জলের রাত্রির কথা মনে পড়ে? তার সাক্ষী আছে। সাক্ষী বেটারা যে কোথায় লুকিয়ে থাকে আগে থেকে কিছুই বলবার জো নেই। আমি যখন গাড়ি থেকে ব্যাগ নিয়ে পালাই, ভেবেছিলাম কেউ দেখেনি।

ষোড়শী কহিল, যদি সত্যই তাই হয়ে থাকে সে কি এতবড় দোষের?

জীবানন্দ বলিল, কিন্তু তাকে গোপন করাটা? এই চিঠির টুকরোটা? নিজেই একবার পড়ে দেখ ত কি মনে হয়? এ আমি সঙ্গে নিয়ে চললাম, আবশ্যক হয়ত যথাস্থানে পোঁছে দেব। আমার মত ইনিও তোমার একবার বিচার করতে বসেছিলেন না? দেখচি তোমার বিচার করবার বিপদ আছে। বলিয়া সে মুচকি হাসিল।

ষোড়শী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। বিপদের বার্তা জানাইয়া বাস্তবিক সে যে একজনকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া আর একজনকে পত্র লিখিয়াছে, একজনের নাম করিয়া আর একজনকে আসিতে ডাকিয়াছে—সেই ডাকটা যখন এই ছেঁড়া চিঠির টুকরা হইতে এই লোকটাকে পর্যন্ত ফাঁকি দিতে পারিল না, তখন সম্পূর্ণ পত্রটা কি হৈমর চক্ষুকেই ঠকাইতে পারিবে? এবং ঠিক সেইদিকে কেহ যদি আজ আঙুল তুলিয়া হৈমর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহে ত লজ্জার কিছু আর বাকী থাকিবে না।

তাহার চক্ষের পলকে হৈমর ঘর-সংসারের চিত্র—তাহার স্বামী, তাহার ছেলে, তাহার বহু দাসদাসী, তাহার ঐশ্বর্য, তাহার সুন্দর স্বচ্ছন্দ [illegible] ধারা—যে ছবি সে দিনের

পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছে—সমস্ত একনিমেষে কলুষের বাষ্পে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে মনে করিয়া সে নিজের কাছেই যেন মুখ দেখাইতে পারিল না। আর এই যে পাপিষ্ঠ তাহারই ঘরে বসিয়া তাহাকে ভয় দেখাইতেছে, যাহার কুকার্যের অবধি নাই, যে মিথ্যার জাল বুনিয়া অপরিচিত, নিরপরাধ একজন রমণীর সর্বনাশ করিতে কোন কুণ্ঠা মানিবে না, ষোড়শীর মনে হইল এ জীবনে এতবড় ঘৃণা সে আর কখনো কাহাকেও করে নাই, এবং এ বিষ যে হৃদয় মথিত করিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত গর্ভতল সেই দহনে যেন অনলকুণ্ডের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল।

নির্মল আসিবেই! তাহার যত অসুবিধাই হোক, এই দুঃখের আহ্বান সে যে উপেক্ষা করিতে পারিবে না—নিজের মনের এই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসের লজ্জায় সে যেন পুড়িতে লাগিল। তখন তাহারই কলঙ্ককে কেন্দ্র করিয়া শ্বশুরে ও জামাতায়, পিতা ও কন্যায়, জমিদার ও প্রজায় সমস্ত গ্রাম ব্যাপিয়া যে লড়াইয়ের আবর্ত উঠিবে, তাহার বীভৎসতার কালো ছায়া তাহার সাংসারিক দুঃখ-কষ্টকে কোথায় যে ঢাকিয়া ফেলিবে সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

বোধ করি মিনিট পাঁচ-ছয় নিস্তব্ধতার পরে ঠিক এইসময়ে জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেমন, অনেক কথাই জানি, না?

ষোড়শী অভিভূতের ন্যায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, হ্যাঁ।

এ-সব তবে সত্য বল?

ষোড়শী তেমনি অসঙ্কোচে কহিল, হ্যাঁ, সত্যি।

জীবানন্দ অবাক হইয়া গেল। এই অপ্রত্যাশিত সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরে তাহার নিজের মুখেও সহসা কথা যোগাইল না। শুধু কহিল,—ওঃ—সত্যি! তাহার পরে হাত বাড়াইয়া স্তিমিত দীপশিখাটা উজ্জ্বল করিয়া দিতে দিতে ক্ষণে ক্ষণে তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, এখন তাহলে তুমি কি করবে মনে কর?

কি আমাকে আপনি করতে বলেন?

তোমাকে? বলিয়া জীবানন্দ স্তব্ধ নতমুখে বসিয়া তৈলবিরল প্রদীপের বাতিটা অকারণে শুধু শুধু কেবল উস্‌কাইতে লাগিল। খানিক পরে যখন সে কথা কহিল, তখনও তাহার চক্ষু সেই দীপশিখার প্রতি। কহিল, তাহলে এঁরা সকলে তোমাকে অসতী বলে—

এতক্ষণ পরে সে কথার মাঝখানে বাধা দিল, কহিল, সে-কথা এখানে কেন? এঁদের বিরুদ্ধে আপনার কাছে ত আমি নালিশ জানাই নি। আমাকে কি করতে হবে তাই বলুন। কোন কারণ দেখাবার দরকার নেই।

জীবানন্দ বলিল, তা বটে। কিন্তু সবাই মিথ্যে কথা বলে, আর তুমি একাই সত্যবাদী, এই কি আমাকে তুমি বোঝাতে চাও অলকা?

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কি-একটা বলিতে গিয়াও হঠাৎ চুপ করিয়া গেল দেখিয়া জীবানন্দ আপনাকে আর একবার অপমানিত জ্ঞান করিল। বলিল, একটা উত্তর দিতেও চাও না?

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ আমার কাছে কৈফিয়ত দেওয়ার চেয়ে দুর্নামও ভাল। বেশ! কিন্তু সমস্ত স্পষ্টই বোঝা গেছে। এই বলিয়া সে ব্যঙ্গ করিয়া হাসিল।

কিন্তু ইহাতেও ষোড়শীর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিকতা নষ্ট হইল না, কহিল, স্পষ্ট বোঝা যাবার পরে কি করতে হবে বলুন?

তাহার প্রশ্ন ও অচঞ্চল কণ্ঠস্বরের গোপন আঘাতে জীবানন্দের ক্রোধ ও অধৈর্য শতগুণ বাড়িয়া গেল, কহিল, তোমাকে কি করতে হবে সে তুমি জানো, কিন্তু আমাকে দেবমন্দিরের পবিত্রতা বাঁচাতেই হবে। সত্যকার অভিভাবক তুমি নয়, আমি। পূর্বে কি হ'তো আমি জানিনে, কিন্তু এখন থেকে ভৈরবীকে ভৈরবীর মতই থাকতে হবে, না হয় তাকে যেতে হবে। এরকম চিঠি তার লেখা চলবে না। বলিয়া সে মুখ তুলিতেই তাহার ঈর্ষার ক্রূরদৃষ্টি ষোড়শীর চোখে পড়িতে তাহার নিজের দৃষ্টি একমুহূর্তে যেমন যোজন-বিস্তৃত হইয়া গেল, তেমনি লালসার তপ্ত নিঃশ্বাস নিজের সর্বাঙ্গে অনুভব করিয়া বিস্ব-

সংসারে যেন তাহার অরুচি ধরিয়া গেল। মনে হইল হৈম, তাহার সংসার, এই দেব-মন্দির, তাহার অসহায় প্রজাদের দুঃখ, তাহার নিজের ভবিষ্যৎ কিছুরই আর তাহার কাজ নাই—সকল বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাইয়া অজানা কোথাও গিয়া লুকাইতে পারিলে যেন বাঁচে। সকলের চেয়ে বেশী মনে হইল নির্মল যেন না আসে। অনেকক্ষণ নীরবে স্থির থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, বেশ, তাই হবে। যথার্থ অভিভাবক কে, সে নিয়ে আমি ঝগড়া করব না, আপনারা যদি মনে করেন আমি গেলে মন্দিরের ভাল হবে আমি যাবো।

ইহাকে বিদ্রূপ মনে করিয়া জীবানন্দ জ্বালার সহিত কহিল, তুমি যে যাবে সে ঠিক কারণ, যাতে যাও তা আমি দেখব।

ষোড়শী তেমনি নম্রকণ্ঠে বলিল, আমি যখন যেতে চাচ্চি, তখন কেন আপনি রাগ করচেন? কিন্তু আপনার উপর এই ভার রইল, যেন মন্দিরের সত্যিই ভাল হয়।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কবে যাবে?

ষোড়শী উত্তর দিল, আপনারা যখনই আদেশ করবেন। কাল, আজ, এখন—যখনি বলবেন।

জীবানন্দর ক্রোধ বাড়িল বৈ কমিল না, কহিল, কিন্তু নির্মলবাবু? জামাইসাহেব?

ষোড়শী কাতর হইয়া বলিল, তাঁর নাম আর করবেন না।

জীবানন্দ কহিল, আমার মুখে তাঁর নামটা পর্যন্ত সহ্য হয় না? ভাল। কিন্তু তোমায় কি দিতে হবে?

আমাকে কিছুই দিতে হবে না।

জীবানন্দ কহিল, এ ঘরখানা পর্যন্ত ছাড়তে হবে জানো? এ-ও দেবীর।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া সবিনয়ে কহিল, জানি। যদি পারি ত কালই ছেড়ে দেব।

কালই? ভাল, কোথায় থাকবে ঠিক করেচ?

ষোড়শী কহিল, এখানে থাকব না, এর বেশী কিছুই ঠিক করিনি। একদিন কিছু না জেনেই ভৈরবী হয়েছিলাম, আজ বিদায় নেবার সময়েও আমি এর বেশী কিছুই চিন্তা করব না।

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল এতক্ষণ কোথায় যেন তাহার ভুল হইতেছিল।

ষোড়শী বলিল, আপনি দেশের জমিদার, চণ্ডীগড়ের ভালমন্দের বোঝা আপনার উপর রেখে যেতে শেষ সময়ে আর আমি দুশ্চিন্তা করব না। কিন্তু আমার বাবা বড় দুর্বল, তাঁর উপর ভার দিয়ে আপনি যেন নিশ্চিন্ত হবেন না।

তাহার কণ্ঠস্বর ও কথায় বিচলিত হইয়া জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সত্যি সত্যাই চলে যেতে চাও নাকি?

ষোড়শী তাহার পূর্বকথার অনুবৃত্তিস্বরূপ কহিতে লাগিল, আর আমার দুঃখী, দরিদ্র ভূমিজ প্রজারা—এদের সুখ-দুঃখের ভারও আমি আপনাকে দিয়ে চললাম।

জীবানন্দ তাড়াতাড়ি কহিল, আচ্ছা তা হবে হবে। কি তারা চায় বল ত?

ষোড়শী কহিল, সে তারাই আপনাকে জানাবে। কেবল আমি শুধু আপনার কথাটাই যাবার আগে তাদের জানিয়ে যাবো। হঠাৎ সে বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া কহিল, কিন্তু এখন আমি চললাম—আমার স্নান করতে যাবার সময় হ'লো। বলিয়া সে তাহার কাপড় ও গামছা আলনা হইতে তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল।

জীবানন্দ বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, স্নানের সময়? এই রাত্রে?

রাত্রি আর নেই। আপনি এবার বাড়ি যান। বলিতে বলিতেই ষোড়শী ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার এ অকারণ আকস্মিক ব্যগ্রতায় জীবানন্দ নিজেও ব্যগ্র হইয়া উঠিল; কহিল, কিন্তু আমার সকল কথাই যে বাকী রয়ে গেল অলকা?

ষোড়শী কহিল, আপনি বাড়ি যান।

জীবানন্দ জিদ করিয়া কহিল, না। কথা আমার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি এইখানেই তোমার প্রতীক্ষা করে রইলাম।

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না, আপনার পায়ে পড়ি, আমার জন্যে আর আপনি অপেক্ষা করবেন না। বলিয়া সে বামদিকে বনপথ ধরিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কুড়ি

সেদিন প্রাতঃকালটা হঠাৎ একটা ঘন কুয়াশায় সমস্ত অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। রায়-মহাশয় সেইমাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন; একজন ভদ্রব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কহিলেন, কে ও?

আমি নির্মল, বলিয়া জামাতা কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। এই আকস্মিক আগমনে তিনি কোনরূপ বিস্ময় বা হর্ষ প্রকাশ করিলেন না। চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন, কে আছিস রে, নির্মলের জিনিসপত্রগুলো সব হৈমর ঘরে রেখে আয়। তা গাড়িতে কষ্ট হয়নি ত বাবা? খোকা, হৈম, এরা সব ভাল আছে ত?

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সকলে ভাল আছে।

রায়মহাশয় কহিলেন, কিন্তু একা এলে কেন নির্মল, মেয়েটাকে সঙ্গে আনলে ত আর একবার দেখা হ'তো?

নির্মল বলিল, দু'-চার দিনের জন্যে আবার—

রায়মহাশয় ঈষৎ হাস্য করিলেন; বলিলেন, এ কি দু-চার দিনের ব্যাপার বাবা, দু-চার মাসের দরকার। যাও, ভেতরে যাও—মুখ-হাত ধোও গে।

নির্মল ভিতরে আসিয়া দেখিল এখানেও সেই একই ভাব। যে প্রকারেই হোক তাহার আসার সম্ভাবনা কাহারও অবিদিত নয়, এবং সেজন্য কেহই প্রসন্ন নহেন। মুখ-হাত ধোয়া, কাপড়-ছাড়া প্রভৃতি সমাধা হইলে গরম চা এবং কিছু জলখাবার শ্বশ্রূঠাকুরানী স্বহস্তে আনিয়া জামাতাকে নিজে খাওয়াইতে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হৈম কি আসতে চাইলে না?

নির্মল কহিল, না।

তারা জানে তুমি কেন আসছ?

নির্মল মাথা নাড়িয়া বলিল, জানে বৈ কি, সমস্তই জানে।

তবু মানা করলে না?

তাঁহার প্রশ্ন ও কণ্ঠস্বরে নির্মল পীড়া অনুভব করিয়া বলিল, মানা কেন করবে মা? সে ত জানে আমি অন্যায় কাজে কোনদিনই হাত দিইনে।

আর তার বাপই কেবল অন্যায় কাজে হাত দিয়ে বেড়ায়, এই কি সে জানে নির্মল? বলিয়া তিনি ক্ষণকাল নতমুখে স্থির থাকিয়া অকস্মাৎ আবেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন, তা সে যাই কেন না জানুক বাছা, এ তুমি করতে পারবে না—এ-কাজে তোমাকে আমি কোনমতেই নামতে দিতে পারব না। শ্বশুর-জামাইয়ে লড়াই করবে, গাঁয়ের লোক তামাশা দেখবে, তার আগে আমি জলে ডুব দিয়ে মরব, তোমাকে বলে রাখলাম বাবা।

নির্মল আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু যে পীড়িত, যে অসহায়, তাকে রক্ষা করাই ত আমাদের ব্যবসা মা।

শাশুড়ী কহিলেন, কিন্তু ব্যবসাই ত মানুষের সমস্ত নয় বাছা। উকিল-ব্যারিস্টারেরও মা-বোন আছে, স্ত্রী আছে, শ্বশুর-শাশুড়ী আছে—গুরুজনের মান-মর্যাদা রাখার ব্যবস্থা সংসারে তাদের জন্যেও তৈরি হয়েছে।

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হয়েচে বৈ কি মা, নিশ্চয় হয়েছে। তাহার পরে সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে একটু হাসিয়া বলিল, আর শেষ পর্যন্ত হয়ত লড়াই-ঝগড়া কিছুই না হতে পারে।

গৃহিণীর মুখ তাহাতে প্রসন্ন হইল না, কহিলেন, পারে, কিন্তু সে শুধু তোমার শ্বশুরের সর্বরকমে হার হলেই পারে। কিন্তু তার পরে আর তাঁর রায়মশাই হয়ে এ গ্রামে বাস করা চলবে না। তা ছাড়া ষোড়শী দুর্বলও নয়, অসহায়ও নয়। তার ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের

দল আছে, তাকে জমিদার ভয় করে। তার একখানা চিঠির জোরে মানুষ পাঁচশ' ক্রোশ দূরে থেকে ঘর-দোর ছেলেপুলে ফেলে চলে আসে, আমরা যা একশ'খানা চিঠিতে পারিনে। তারা হ'লো ভৈরবী, তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র কত কি জানে। তা সে থাক ভাল, যাক ভাল, আমার ক্ষতি নেই—তার পাপের ভরা সে-ই বইবে, কিন্তু চোখের ওপর আমার নিজের মেয়ের সর্বনাশ আমি হতে দেব না নির্মল, তা লোকে যাই বলুক আর যাই করুক!

নির্মল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যে-ভাবেই হোক, এ-দিকে জানাজানি হইতেও কিছু বাকী নাই, এবং ষড়যন্ত্রেরও কোন ত্রুটি ঘটে নাই। তাহার শ্বশুর সকল আট-ঘাট বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, ছিদ্র বাহির করিবার জো নাই। তাহার চুপচাপ প্রকৃতির শাশুড়ী-ঠাকুরানী যে এমন মজবুত করিয়া কথা কহিতে জানেন, ইহা সে মনে করে নাই, এবং যাহা কিছু কহিলেন সে যে তাঁহার নিজের কথা তাহাও সে মনে করিল না, কিন্তু জবাব দিবারও কিছু খুঁজিয়া পাইল না। এই আর্জি যিনি মুসাবিদা করিয়া আর একজনের মুখে গুঁজিয়া দিয়াছেন, তিনি সকল দিক চিন্তা করিয়াই দিয়াছেন, এবং ইহাও তাঁহার অবিদিত নাই, যে নিছক পরোপকার-মানসেই সে যে পশ্চিমের একপ্রান্ত হইতে স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এ উত্তর সে কোনমতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিবে না।

ঘণ্টা-দুই বিশ্রাম করার পরে নির্মল যখন বাটীর বাহির হইল, তখন কর্তা সদরে বসিয়াছিলেন। তিনি কোথায়, কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি নিরর্থক প্রশ্নে সময় নষ্ট করিলেন না, শুধু একটু সকাল সকাল ফিরিবার অনুরোধ করিয়া বলিয়া দিলেন যে, এই শ্রান্ত দেহে অধিক বেলায় স্নানাহার করিলে অসুখ করিতে পারে।

শিরোমণিমহাশয় পাশে বসিয়া কি বলিতেছিলেন, উঁকি মারিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, বাবাজী—না?

রায়মহাশয় বলিলেন, হাঁ।

শিরোমণি ডাকিয়া আলাপ করিবার উদ্যম করিতেই জনার্দন বাধা দিয়া বলিলেন, নির্মল পালাচ্চে না, তোমার কথাটা শেষ কর, আমাকে উঠতে হবে।

নির্মল নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল। তাহার শ্বশুর যে তাহাকে অতি-কৌতূহলী প্রতিবেশীর অপ্রিয় জেরার দায় হইতে দয়া করিয়া অব্যাহতি দিলেন, ইহা অনুভব করিয়া তাহার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

ষোড়শীর সহিত সে দেখা করিতে চলিয়াছিল। দিন-দুই পূর্বে যে উৎসাহ লইয়া, মনের ভিত্তিগাত্রে যে ছবি আঁকিয়া লইয়া সে তাহার প্রবাস-গৃহ ত্যাগ করিয়াছিল, সে আর ছিল না। যে স্বপ্ন সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সকল দুঃখ তাহার হরণ করিয়াছিল, শ্বশুর ও শাশুড়ীর অব্যক্ত ও ব্যক্ত অভিযোগের আক্রমণে এইমাত্র তাহা লণ্ডভণ্ড হইয়া গিয়াছিল। সমবেত ও প্রবল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার একক পৌরুষ নিরাশ্রয়ের অবলম্বন, দুর্বল, পরিত্যক্ত, নির্জিত নারীর নিঃস্বার্থ বন্ধুরূপে এই গ্রামে পদার্পণ করিতে চাহিয়াছিল। তাহার কত না বল, কত না শোভা, কিন্তু আসিয়া দেখিল তাহার সকল কার্যেরই ইতিমধ্যে একটা কারণ প্রকাশ হইয়া গেছে। তাহা যেমন কদর্য, তেমনি কালো। কালিতে লেপিয়া একাকার হইতে আর বাকী কিছু নাই। শ্বশুরকে সে কোনদিন আদর্শপুরুষ মনে করে নাই; তিনি পল্লীগ্রামের বিষয়ী লোক, সামান্য অবস্থা হইতে যথেষ্ট সঞ্চয় করিয়াছেন, অতএব পরলোকের খরচের পাতাটিও সাদা পড়িয়া থাকিবার কথা নয়, ইহা সে বেশ জানিত, এবং মনে মনে ক্ষমাও করিত; কিন্তু আজ যখন সে মন্দিরের প্রাচীর ঘুরিয়া পায়ে-হাঁটা সেই সরু পথ ধরিয়া ষোড়শীর কুটীর অভিমুখে পা বাড়াইল, তখন সংক্ষুব্ধ চিত্ততলে তাহার একদিকে শ্বশুরের বিরুদ্ধে যেমন বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিবিড় হইয়া দেখা দিল, তেমনি অন্য দিকে বিশেষ কিছু না জানিয়াও ষোড়শীর প্রতি অভিমান ও বিরক্তিতে মন তিক্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, যে স্ত্রী অনাত্মীয় অপরিচিত-প্রায় পুরুষের কৃপাভিক্ষা করিয়া পত্রদ্বারা আহ্বান করিবার সঙ্কোচ অনুভব করে না, এবং সে-কথা নির্লজ্জ দাম্ভিকার ন্যায় পথে ঘাটে প্রচার করিয়া বেড়ায়

তাহাকে আর যাহাই হোক সম্মানের উচ্চ আসনে বসানো চলে না। কিন্তু অকস্মাৎ চিন্তা তাহার এইখানে বাধা পাইয়া থামিল। পত্রবহুল মনসাগাছের বাঁক ফিরিতেই তাহার উৎসুক দৃষ্টি সন্নিকটবর্তিনী ষোড়শীর আনত মুখের উপরে গিয়া পড়িল। সে প্রাঙ্গণের বাহিরে দাঁড়াইয়া একমনে বেড়ার দড়ি বাঁধিতেছিল, আগন্তুকের পদশব্দ শুনিতে পাইল না, এবং ক্ষণকালের জন্য নির্মল না পারিল নড়িতে, না পারিল চোখ ফিরাইতে। এই ত সেদিন, তবুও তাহার মনে হইল এ সে ভৈরবী নয়। অথচ পরিবর্তন যে কোন্‌খানে তাহাও ধরিতে পারিল না। সেই রাঙ্গা-পাড়ের গৈরিক শাড়ি-পরা, তেমনি রুক্ষ এলোচুল, গলায় তেমনি রুদ্রাক্ষের মালা, তেমনি মুখের উপরে উপবাসের একটি শীর্ণ ছায়া—সিঁদুর-মাখানো ত্রিশূলটি পর্যন্ত তেমনি হাতের কাছে ঠেস দিয়া রাখা—কিছু বদলায় নাই, তবুও অপরিচিত, অজানা মোহে তাহাকে মুহূর্ত-কয়েকের নিমিত্ত স্তম্ভিত করিয়া দিল। দড়ির গ্রন্থি টানিয়া দিয়া ষোড়শী মুখ তুলিয়াই একটু চমকিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দড়ি ছাড়িয়া দিয়া স্নিগ্ধমধুর হাসিয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, আসুন, আমার ঘরে আসুন।

নির্মল অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, কিন্তু আপনার কাজে যে বাধা দিলাম।

ষোড়শী সকৌতুকে মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, বেড়া-বাঁধা বুঝি আমার কাজ? আর হ'লোই বা কাজ, কুটুম্বকে খাতির করাটা বুঝি কাজ নয়? শ্বশুরবাড়িতে জামাইয়ের আদর হয়নি, কিন্তু শালীর কুঁড়েঘর থেকে ভগিনীপতিকে অনাদরে ফিরতে দেব না। আসুন, ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন। খোকা, হৈম, চাকর-বাকর সব ভাল আছে? আপনি নিজে ভাল আছেন?

নির্মল কেমন যেন সংকুচিত হইয়া পড়িল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সবাই ভাল আছে, কিন্তু আজ আর বসব না।

ষোড়শী কহিল, কেন শুনি? তার পরে কণ্ঠস্বর নত করিয়া আরও একটু কাছে আসিয়া বলিল, একদিন হাত ধরে অন্ধকারে পার করে এনেছিলাম মনে পড়ে? দিনের-বেলায় ওতে আর কাজ নেই, কিন্তু চলুন বলচি। যে এত দূর থেকে টেনে আনতে পারে, সে এটুকুও টেনে নিয়ে যেতে পারবে।

নির্মল লজ্জা বোধ করিল, আঘাত পাইল। এই আচরণ, এই কথা ষোড়শীর মুখে কেবল অপ্রত্যাশিত নয়, অচিন্তনীয়। বিদুষী সন্ন্যাসিনী ভৈরবীকে সে শান্ত সমাহিত দৃঢ়, এমন কি কঠোর বলিয়া জানিত। সংসারে রমণীর পর্যায়ভুক্ত করিয়া কল্পনা করিতে যেন তাহার বাধিত। তাহাকে অনেক ভাবিয়াছে—কর্মের মধ্যে, বিশ্রামের মধ্যে এই ষোড়শীকে সে চিন্তা করিয়াছে—সমস্ত অন্তর রসে ভরিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কখনও চিন্তাকে সে পদ্ধতি দিবার, শৃঙ্খলিত করিবার সাহস পর্যন্ত করে নাই। কিন্তু সেই ষোড়শী আজ যখন অপ্রত্যাশিত আত্মীয়তার অতি-ঘনিষ্ঠতায় অকস্মাৎ নিজেকে ছোট করিয়া, মানবী করিয়া, সাধারণ মানবের কামনার আয়ত্তাধীন করিয়া দিল, নির্মল অন্তরের একপ্রান্তে যেমন বেদনা বোধ করিল, তেমনি আর একপ্রান্ত তাহার কি একপ্রকার কলুষিত আনন্দে একনিমিষে পরিপ্লুত হইয়া গেল।

নির্মলকে ঘরে আনিয়া ষোড়শী কম্বল পাতিয়া বসিতে দিল, জিজ্ঞাসা করিল, পথে কষ্ট হয়নি?

নির্মল বলিল, না। কিন্তু মন্দিরে আজ আপনার কাজ নেই?

ষোড়শী কহিল, অর্থাৎ আজ মন্দিরের রবিবার কি না! তাহার পরে বলিল, কাজ আছে, সকালে একদফা করেও এসেচি। যেটুকু বাকী আছে সেটুকু বেলাতে করলেও হবে। হাসিয়া কহিল, জামাইবাবু, এ আপনাদের কোর্ট-কাছারি নয়, মন্দির। ঠাকুর-দেবতারা তাদের দাস-দাসীদের কখনো মুহূর্তের ছুটি দেন না, কানে ধরে চব্বিশ ঘণ্টা সেবা করিয়ে নিয়ে তবে ছাড়েন।

কিন্তু এ চাকরি ত আপনি ইচ্ছে করেই নিয়েচেন।

ইচ্ছে করে? তা হবে। বলিয়া ষোড়শী সহসা একটুখানি হাসিয়া কহিল, আচ্ছা, আমায় একটু খবর দিলেন না কেন?

নির্মল কহিল, সময় ছিল না। কিন্তু তার শাস্তিস্বরূপ শ্বশুরবাড়িতে যে খাতির পাইনি, অন্ততঃ তাঁরা যে আমাকে দেখে খুশী হননি, এ কথা আপনি জানলেন কি করে? এবং আমার আসার সংবাদ আসার পূর্বেই কে প্রচার করে দিল বলতে পারেন?

ষোড়শী কহিল, বলতে পারিনে, কিন্তু আন্দাজ করতে পারি।

নির্মল বলিল, আন্দাজ করতে ত আমিও পারি, কিন্তু সত্যি কে করেচে, এবং কোথায় সে খবর পেলে, জানেন ত আমাকে বলুন। আশা করি আপনার দ্বারা এ কথা প্রকাশ হয়নি?

ষোড়শী হাসিল, কহিল, কোন আশা করতেই আমি কাউকে নিষেধ করিনে। কিন্তু জেনে আপনার লাভ কি? আপনি এসেচেন এ খবরও সত্যি, আমারই জন্যে এসেচেন এ কথাও ঠিক। তার চেয়ে বরঞ্চ বলুন, আসা সার্থক হবে কি না? আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন কি না?

নির্মল কহিল, প্রাণপণে চেষ্টা করব বটে।

যদি কষ্ট হয় তবুও?

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, যদি কষ্ট হয় তবুও।

ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল। নির্মল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া নিজেও একটু হাসিয়া বলিল, হাসলেন যে?

ষোড়শী কহিল, হাসচি—আগেকার দিনে ভৈরবীরা বিদেশী মানুষদের ভেড়া বানিয়ে রাখত। আচ্ছা, ভেড়া নিয়ে তারা কি করত? চরিয়ে বেড়াত, না লড়াই বাধিয়ে দিয়ে তামাশা দেখত! বলিতে বলিতেই সে একেবারে ছেলেমানুষের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিতে লাগিল।

নির্মলের দেহ-মন পুলকে নৃত্য করিয়া উঠিল। এই কঠিন আবরণের নীচে যে রহস্য-প্রিয় কৌতুকময়ী চঞ্চল নারী-প্রকৃতি চাপা দেওয়া আছে, তাহার অপর্যাপ্ত হাসির প্রস্রবণ যে ব্রতোপবাসের সহস্রবিধ কৃচ্ছ্রসাধনায় আজও শুকায় নাই—ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় সে তেমনি জীবন্ত—এই কথা স্মরণ করিয়া সর্বশরীরে তাহার কাঁটা দিল। পরিহাসে নিজেও যোগ দিয়া হাসিয়া কহিল, হয়ত বা মাঝে মাঝে মায়ের স্থানে বলি দিয়ে খেতো। অর্থাৎ আমার শ্বশুর কিংবা শাশুড়ীঠাকরুন ইতিমধ্যে আপনার কাছে এসেছিলেন, এবং অনেক অপ্রিয় অসত্য শুনিয়ে গেছেন।

ষোড়শী কহিল, না, তাঁরা কেউ আসেন নি। আমি যে মন্ত্রে-তন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেচি এটা অসত্য হতে পারে, কিন্তু অপ্রিয় হবে কেন নির্মলবাবু? তা ছাড়া আপনার আসার ধরন দেখে নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে হয়ত বা নিতান্ত মিথ্যা না হতেও পারে। তাহার মুখে হাসির আভাস লাগিয়াই রহিল, কিন্তু গলার শব্দ বদলাইয়া গেল। ওষ্ঠপ্রান্তে ও কণ্ঠস্বরে সহসা যেন আর সঙ্গতি রহিল না।

নির্মল আশ্চর্য, অবাক হইয়া রহিল। ইহার কতটুকু পরিহাস এবং কতখানি তিরস্কার, এবং কিসের জন্য তাহা সে কিছুতে ভাবিয়া পাইল না।

ষোড়শী নিজেও আর কিছু কহিল না, কিন্তু তাহার আনত মুখের পরে যে অপ্রত্যাশিত লজ্জার আরক্ত আভা পলকের নিমিত্ত ছায়া ফেলিয়া গেল, ইহা তাহার চোখে পড়িল। কিন্তু সে ঐ পলকের জন্যই। ষোড়শী আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া হাসিমুখে কহিল, কুটুমের অভ্যর্থনা ত হ'লো। অবশ্য হাসি-খুশি দিয়ে যতটুকুই পারি ততটুকুই—তার বেশী ত সম্বল নেই ভাই—এখন আসুন, বরঞ্চ কাজের কথা কওয়া যাক।

তাহার ঘনিষ্ঠ সম্ভাষণকে এবার সে সংশয়ের সহিত গ্রহণ করিতে চাহিল, তবুও তাহার মন ভিতরে ভিতরে উল্লসিত হইয়া উঠিল। কহিল, বলুন।

ষোড়শী কহিল, দুটি লোক দেবতাকে বঞ্চিত করতে চায়। একটি রায়মহাশয়, আর একটি জমিদার—

নির্মল বলিল, আর একটি আপনার বাবা। এ'রাই ত আপনাকেও বঞ্চিত করতে চান।

বাবা? হ্যাঁ, তিনিও বটে। এই বলিয়া ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

নির্মল বলিল, আমার শ্বশুরের কথা বুঝি, আপনার বাবার কথাও কতক বুঝতে

পারি, কিন্তু পারিনে এই জমিদার প্রভুটিকে বুঝতে। তিনি কিসের জন্য আপনার এত শত্রুতা করেন?

ষোড়শী বলিল, দেবীর অনেকখানি জমি তিনি নিজের বলে বিক্রি করে ফেলতে চান, কিন্তু আমি থাকতে সে কোনমতেই হবার জো নাই।

নির্মল সহাস্যে কহিল, সে আমি সামলাতে পারব। বলিয়া সে কটাক্ষে ভৈরবীর মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিল ষোড়শী নীরব হইয়া আছে, কিন্তু তাহার মুখের কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। খানিক পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আরও অনেক জিনিস আছে, যা আপনিও হয়ত সামলাতে পারবেন না।

কি সে-সব? একটা ত আপনার মিথ্যে দুর্নাম?

ষোড়শী কোনরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করিল না; শান্তস্বরে বলিল, সে আমি ভাবিনে। দুর্নাম সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, তাই নিয়েই ত ভৈরবীর জীবন নির্মলবাবু! আমি এই কথাটাই তাঁদের বলতে চাই।

নির্মল বিস্মিত হইয়া কহিল, এই কথা নিজের মুখে বলতে চান? সে যে স্বীকার করার সমান হবে।

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

নির্মল সসঙ্কোচে কহিল, ওরা যে বলে--

কারা বলে?

অনেকেই বলে সে সময়ে আপনি--

কোন্ সময়ে?

নির্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচ সবলে দমন করিয়া বলিল, সেই ম্যাজিস্ট্রেট আসার দিনে। তখন আপনার কোলের উপরেই নাকি--

ষোড়শী একটু আশ্চর্য হইয়া কহিল, তারা কি দেখেছিল নাকি? তা হবে, আমার ঠিক মনে নাই--যদি দেখে থাকে, তা সত্যি, জমিদারের মাথা আমিই কোলে করে বসেছিলাম।.

নির্মল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিল, তার পরে?

ষোড়শী শান্ত মুখখানি হাসির আভাসে একটু উজ্জ্বল করিয়া বলিল, তার পরে দিন কেটে যাচ্চে। কিন্তু কিছুতেই আর মন বসাতে পারিনে। সবই যেন মিথ্যে বলে ঠেকে।

কি মিথ্যে?

সব। ধর্ম কর্ম, ব্রত, উপবাস, দেবসেবা, এতদিনের যা-কিছু সমস্তই—

তবু ভৈরবীর আসন চাই?

চাই বৈ কি। আর আপনি যদি বলেন, চাই না—

না, না, আমি কিছুই বলিনে। এই বলিয়া নির্মল তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বেলা হয়ে যাচ্চে—এখন আমি চললাম।

ষোড়শীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আমারও মন্দিরের কাজ আছে। কিন্তু আবার কখন দেখা হবে?

নির্মল অনিশ্চিত অস্ফুট-কণ্ঠে কি একটা কহিল, ভাল শোনা গেল না। ষোড়শী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ভাল কথা, সন্ধ্যার পর আজই ত আমাকে নিয়ে মন্দিরে একটা হাঙ্গামা আছে, আসবেন?

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া বাহির হইয়া গেল। ষোড়শী মুচকিয়া একটু হাসিল, তার পরে কুটীরের দ্বারে শিকল তুলিয়া দিয়া মন্দিরের অভিমুখে বহির্গত হইল।

একুশ

শ্বশুর-জামাতা একত্রে আহারে বসিয়াছিলেন। শ্বাশুড়ীঠাকুরানী দধি ও মিষ্টান্ন আনিতে স্থানান্তরে গেলে রায়মহাশয় কহিলেন, ষোড়শীর সঙ্গে তোমার দেখা হ'লো নির্মল?

নির্মল মুখ না তুলিয়াই কহিল, আজ্ঞে হাঁ।

কি বলে সে?

এরূপ একটা সাধারণ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের সম্বন্ধে?

মন্দিরের সম্বন্ধে। বেটী ভৈরবীগিরি ছাড়বে, না চণ্ডীগড়ের নাম পর্যন্ত ডোবাবে? দেশের লোক ত আর বাইরের দশজনের কাছে মুখ দেখাতে পারে না এমনি হয়ে উঠেছে।

নির্মল চুপ করিয়া রহিল। চণ্ডীগড়ের ভৈরবীদিগের বিরুদ্ধে এ অপবাদ আবহমান-কাল প্রচলিত আছে, এবং সেজন্যে গ্রামের কেহ কোনদিন লজ্জায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে বলিয়া প্রবাদ নাই। স্বয়ং চণ্ডীমাতাও কখনো আপত্তি করিয়াছেন বলিয়া লোকে জানে না। ইহাদের রীতিনীতি, আচার-অনাচার সমস্তই সে শুনিয়া গিয়াছিল বলিয়া এ-সম্বন্ধে মন তাহার নিরপেক্ষভাবেই ছিল। বিশেষতঃ ষোড়শীর অপবাদ সে বিশ্বাস করে নাই, সুতরাং ইহা মিথ্যা প্রমাণিত হইলেই সে খুশী হইত; কিন্তু এই প্রমাণকেই তাহার ভৈরবী-পদের একমাত্র দাবী বলিয়া সে একদিনও গ্রাহ্য করে নাই। তাহার শ্বশুরের ইঙ্গিত নূতনও নয়, ভীষণও নয়, অথচ এই কয়টা কথাতেই অকস্মাৎ আজ তাহার মন যখন চমকিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, তখন নিজের মনের বিক্ষিপ্ততা অনুভব করিয়া সে যথার্থই আশ্চর্য হইয়া গেল। তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া রায়মহাশয় পুনশ্চ কহিলেন, কি বল হে?

নির্ভুল ও সময়োপযোগী উত্তর দিবার সময় ও অবস্থা নির্মলের ছিল না, সে শুধু পূর্ব কথারই পুনরুক্তি করিয়া কহিল, ভৈরবীদের দুর্নাম ত চিরদিনই আছে।

রায়মহাশয় অস্বীকার করিলেন না, বলিলেন, আছে। কিন্তু দুর্নাম জিনিসটা ত মন্দ, চিরকালের দোহাই দিয়েও মন্দটাকে চিরকাল চালানো চলে না। কি বল?

কিন্তু সে যে মন্দ এ কি নিশ্চিত প্রমাণিত হয়ে গেছে?

রায়মহাশয় অসংশয়ে কহিলেন, গেছে।

নির্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কি করে গেল? নিশ্চয় প্রমাণ কে দিলে?

রায়মহাশয় বলিলেন, যে দিয়েচে সে আজও দেবে। সন্ধ্যার পরে মন্দিরে যেয়ো, তার পরে বোধ হয় শ্বশুর-জামাই দু'জনকে দু'দিকে দাঁড়িয়ে আর সমস্ত গ্রামের হাসি-তামাশা কুড়োতে হবে না। এই ত তোমার ব্যবসা, অতএব নিশ্চয়-প্রমাণ যে কাকে বলে সে আমাকে আর তোমাকে বলে দিতে হবে না।

গৃহিণী পাথরের থালে মিষ্টান্ন ও বাটিতে দধি লইয়া প্রবেশ করিলেন, কহিলেন, কৈ বাবা, খাচ্চো না যে?

এই যে খাচ্চি, বলিয়া নির্মল আহারে মনোনিবেশ করিল।

কর্তা কহিলেন, নির্মলকে দিয়ে আমার জন্যে একটু দুধ এনে দাও, শরীরটা ভালো নেই, দই আর খাবো না।

গৃহিণী প্রস্থান করিলে রায়মহাশয় বলিলেন, অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে সে তোমাকে হাতে ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, তার জন্যে শুধু তুমি কেন বাবা, আমরা পর্যন্ত কৃতজ্ঞ; যে উপকার করে, তার অপকার করতে মন চায় না, কিন্তু এ ত আমাদের নিজেদের কথা নয় নির্মল, এ গ্রামের কথা, সমাজের কথা, দেব-দেবতার কথা, সুতরাং যা বড় কর্তব্য তা আমাকে করতেই হবে।

সে রাত্রের ঘটনা যে অপ্রকাশ নাই তাহা সে শুনিয়াছিল, অথচ নিজে গোপন করিয়াছিল বলিয়া লজ্জিত-মুখে চুপ করিয়া রহিল।

কর্তা বলিতে লাগিলেন, দেব-দেবীরা ত কথা ক'ন না, কিন্তু তাঁরা শোধ নেন। গ্রামের ভালো যে কখনো হয়নি, উত্তরোত্তর অবনতি হয়েই আসচে, মনে হয় এও তার একটা কারণ। প্রমাণের কথা বলছিলে, কিন্তু তুমি যে আসচো এই বা আমরা জানলাম কি করে? তুমি সন্তানতুল্য, তোমার কাছে সব কথা খুলে বলতে আমার বাধে, কিন্তু না বললেও নয়। জমিদারবাবু সে-রাত্রে বোধ করি খেয়ে যাবার ফুরসত পাননি, ষোড়শী খাবার আনতে ঘরের বাইরে যেতে তাঁর চোখ পড়ল একটা চিঠির টুকরোর 'পরে। বোধ হয় তোমাকে লিখে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে শেষে হৈমকেই লিখেছিলু। সেখানাও আজ দেখতে পাবে, তিনি সকালবেলা আসবার সময় সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

নির্মল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, মিথ্যে কথা। সে নির্লজ্জ, নিজে অপরাধী, সেই মাতাল পাজী বদমাইসটার কথা আপনারা বিশ্বাস করেন? হ'তেই পারে না।

রায়মহাশয় শুধু একটু মৃদু হাসিলেন। অবিচলিত-স্বরে কহিলেন, হতে পারে, এবং হয়েছে। জমিদার লোকটা যে নির্লজ্জ, মাতাল, পাজী, বদমাইস তাও জানি। বোধ হয় আরও ঢের বেশী, নইলে তার কলঙ্কের কথাটা মুখে আনতেও পারত না! ওর নিষ্ঠুরতাব অবধি নেই। গ্রামের মঙ্গলের জন্যও এ-কাজে হাত দেয়নি, ঠাকুর-দেবতা ও মানে না। জোর করে মন্দিরে খাসি বলি দিয়ে খেয়েছিল। আবশ্যক হলে ও-পাষণ্ড মুরগী, শুয়োর, এমন কি গো-বধ করেও খেতে পারে।

তবুও তাঁকে আপনি সাহায্য করতে চান?

না, আমি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাই।

নির্মল অনেকক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিল, আপনার কাঁটা উঠবে কি না জানিনে, কিন্তু সে নিষ্কণ্টক হবে। দেবীর যে সম্পত্তিটা সে বিক্রি করতে চায়, ষোড়শী ভৈরবী থাকতে তার সুবিধে হবে না।

রায়মহাশয় কহিলেন, সে গেলেও সুবিধে হবে না—আমি আছি।

তিনি আছেন এতবড় ঘটনাটা নির্মল বিস্মৃত হইয়াছিল, তাহার তৎক্ষণাৎ মনে হইল, জমিদারের সুবিধা না হইতে পারে, কিন্তু দেবীরও সুবিধা হইবে না। তবে সে সুবিধাটা যে কাহার হইবে তাহাও মুখ দিয়া বাহির করিল না।

রায়মহাশয় স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, বাবা নির্মল, তুমি বড় আইন-ব্যবসায়ী, অনেক বোঝ, কিন্তু সংসারে এসে খালি-হাতে আমাকে যখন লড়াই শুরু করতে হয়েছিল, তখন শুধু কেবল বিষয়-সম্পত্তি জমা করেই কাটাই নি, মাথার ভেতরেও কিছু কিছু সঞ্চয় করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তোমাকে লোকে বলেচে ওই জমিটুকুর ওপরেই জমিদারের লোভ- ষোড়শী কড়া মেয়ে, ও থাকতে কিছু হবার নয়, তাই নিজেদের কলঙ্কটা রটিয়ে তাকে তাড়াতে চায়। আচ্ছা বাবাজী, বীজগাঁর জমিদারের কাছে ওটুকু কতটুকু সম্পত্তি? তার টাকার দরকার, একটা না হলে আর একটা বিক্রি করবে—আটকাবে না। কিন্তু যেখানে তার সত্যিকার আটকেচে, সে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এই জঙ্গলের মাঝে মাসের পর মাস সে আর পারে না, শহরের মানুষ শহরে যেতে চায়। নির্মল, হৈমর মত তুমিও আমার ছেলে, তোমাকে বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু ওই ছুঁড়িটার ভালই যদি করতে চাও ত বলে দিয়ো তার ভয় নেই! চণ্ডীগড়ের ভৈরবীগিরির মুনাফা বেশী নয়, যা তার যাবে, জমিদার তার চতুর্গুণ পুষিয়ে দেবে, এ আমি শপথ করে বলতে পারি। সে তাকে কষ্ট দিতেও চায় না- কষ্ট দেবেও না, দু নৌকোয় পা দিয়ে থাকবার অসম্ভব লোভটা যদি সে একবার ত্যাগ করে।

নির্মল নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। শ্বশুরকে সে অনেকটা জানিত—এতটা জানিত না। এই শ্বশুর ষোড়শীর কল্যাণের পথ যাহা নির্দেশ করিয়া দিলেন, তাহাতে তর্ক করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত আর তাহার রহিল না।

শাশুড়ীর দুধ গরম করিয়া আনিতে বিলম্ব হইল, তিনি ঘরে ঢুকিয়া স্বামীর পাতের কাছে বাটি নামাইয়া রাখিয়া আহারের স্বল্পতার জন্য জামাতাকে মৃদু ভৎর্সনা করিলেন, এবং এই ত্রুটি সংশোধন করিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অদূরে উপবেশন করিলেন।

কর্তা দুধের বাটি মুখ হইতে নামাইয়া রাখিয়া কহিলেন, কিন্তু মেয়েটার একটা প্রশংসা না করে পারা যায় না—বেটী বিদ্যের যেন সরস্বতী। জানে না এমন শাস্ত্রই নেই।

গৃহিণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, তা আর বলতে। দেখেচ ত কাজকর্মে সে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার শিরোমণিঠাকুর ভয়ে যেন কেঁচো হয়ে যান। চলে গেলে বুড়োর মুখ সহস্রধারে ফোটে, কিন্তু সুমুখে নিন্দে করবার ভরসা পান না।

কর্তা কহিলেন, না না, নিন্দে করবেন কেন, তিনি বরঞ্চ সুখ্যাতিই করেন।

গৃহিণী নাকের মস্ত নথে একটা নাড়া দিয়া ততখানিই প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন, হাঁ, বুড়ো সেই পাত্র কিনা! হিংসেয় ফেটে মরেন, আবার সুখ্যাতি করবেন! মনে নেই সেই অন্তুর বোনের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিয়ে কি কাণ্ডই না দিন-কতক করে বেড়ালেন! তা ছাড়া, ছুঁড়ী এদিকে যাই করে থাক, শোকে, দুঃখে, আপদে-বিপদে, গরীব-দুঃখীর এমন

মা-বাপও গ্রামে কেউ নেই। যখনি যে কাজেই ডাকো, মুখে হাসিটি যেন লেগে আছে, না বলতে জানে না।

কর্তা খুশী হইলেন না, বলিলেন, হুঃ, সব ভৈরবীই ও-সব করে থাকে।

গৃহিণী বলিলেন, সব? কেন, মাতঙ্গিনীঠাকরুনকে কি আমি চোখে দেখিনি নাকি?

দেখে থাকলেও ভুলে গেছো।

গৃহিণী রাগ করিয়া জবাব দিলেন, ভুলিনি কিছুই। আজও তাঁর কাছে এক শ টাকা পাই—না বলে উড়িয়ে দিলেন। ষোড়শী কখনো কাউকে ঠকিয়ে খায়নি, মিছে কথাও বলেনি।

কর্তা অত্যন্ত অপ্রসন্ন হইয়া কহিলেন, না—যুধিষ্ঠির! এই বলিয়া তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহিণী জামাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আমি ত ভাবি এঁর কল্যাণেই নাতির মুখ আমরা দেখতে পেলাম। না বাবা, যে যাই বলুক, ঠক-জোচ্চোর সে মেয়ে নয়। তাইতে যখন শুনতে পেলাম ঠাকুরের পুজো করাটি সে ছেড়ে দিয়েচে, তখনি সন্দেহ হ'লো এ আবার কি! নইলে কারও কথায় আমি সহজে বিশ্বাস করিনি।

কর্তা চৌকাঠের বাহিরে পা বাড়াইয়াছিলেন, কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, বলি তার কল্যাণে ত নাতি পেলে, কিন্তু নাতির কল্যাণে মানস পুজোটি তিনি কেন অস্বীকার করলেন একবার ডেকে জিজ্ঞাসা করতে পারো না? বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

নির্মলের খাওয়া শেষ হইয়াছিল, সেও উঠিয়া দাঁড়াইল; কহিল, ষোড়শীর ওপর থেকে দেখচি মায়ের ভক্তি আজও একেবারে যায়নি।

না বাবা, মিছে কথা কেন বলব, তার মুখখানি মনে হলেই আমার যেন কান্না পায়। এঁরা সকলে মিলে কেন যে তার বিপক্ষে এত লেগেচেন আমি ভেবেই পাইনে।

নির্মল একটুখানি মৃদু হাসিয়া কর্তার খোঁচার অনুসরণ করিয়া কহিল, কিন্তু মা, তার মন্ত্রতন্ত্রের বিদ্যের কথাটাও একটু ভেবো—

শাশুড়ী কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, দাসী আসিয়া ঘরের আড়ালে দাঁড়াইয়া কহিল, কে একজন জামাইবাবুকে ডাকতে এসেচে—বাবু খবর দিতে বললেন।

নির্মল হাতমুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যে গ্রামের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং সন্ধ্যার পরে মন্দিরে যে বৈঠক বসিবে তাহারই আলোচনা শুরু হইয়া গেছে। শিরোমণিমহাশয়ের আজ অমাবস্যার উপবাস, তিনি নির্মলকে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিলেন, এবং বাবাজীকে হঠাৎ চিনিতে পারেন নাই বলিয়া নিজের বৃদ্ধত্বের প্রতি দোষারোপ করিলেন। যে লোকটা থামের পাশে দাঁড়াইয়াছিল, সে নমস্কার করিয়া জানাইল যে, ভৈরবীঠাকরুন অপেক্ষা করিয়া আছেন, তাঁর সহিত বিশেষ কথা আছে।

নির্মলের হঠাৎ অত্যন্ত লজ্জা করিয়া উঠিল। সে পিছনে না চাহিয়াও স্পষ্ট অনুভব করিল সকলে উৎসুক-কৌতুকে তাহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইহার অভ্যন্তরে যে গোপন বিদ্রূপ আছে, তাহা তাহাকে অপমানিত করিল; অন্য সময় হয়ত সে ইহাকে অত্যন্ত সহজে অবহেলা করিতে পারিত, কিন্তু আজ সে নিজের মধ্যে সে-জোর খুঁজিয়া পাইল না, কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না, চল, আমি যাচ্ছি। বরঞ্চ যেন লজ্জিত হইয়াই লোকটাকে বলিয়া ফেলিল, বল গে, আমার এখন যাবার সুবিধে হবে না।

শিরোমণি গায়ে পড়িয়া কহিলেন, ওকে জিরোবার একটু সময় দাও তোমরা—কি বল হে? বলিয়া তিনি চোখের একটা ইশারা করিয়া অকারণে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। কেহ বা সে হাসিতে প্রকাশ্যে যোগ দিল, কেহ বা শুধু একটু মুচকিয়া হাসিল।

নির্মল সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ভিতরে যাইতেছিল, শিরোমণি ডাকিয়া কহিলেন, বলি, বাবাজীকে কি ও বেটী কৌঁসুলি খাড়া করেচে নাকি?

নির্মল উদ্দীপ্ত ক্রোধ দমন করিয়া শান্তভাবে কহিল, মকদ্দমা বাধলে সে কাজ করতে হবে বোধ হয়।

শিরোমণি এ উত্তরের আশা করেন নাই, একটু থতমত খাইয়া বলিলেন, তা যেন করলে, কিন্তু বলে রাখি বাবাজী, এ দুটি মাছের প্রাণ নয়, বাঘা-ভাল্লুকোর সঙ্গে লড়াই—মকদ্দমা হাইকোর্টে না গড়িয়ে থামবে না, তা নিশ্চয় জেনো।

নির্মল কহিল, মামলা-মকদ্দমা কোথায় গিয়ে থামে এ ত আমার জানবার কথা শিরোমণিমশায়।

শিরোমণি কহিলেন, সে ত বটেই, এ হ'লো তোমার ব্যবসা, তুমি আর জানবে না! কিন্তু আরও ত ঢের খরচপত্র আছে, সে দেবে কে? বলিয়া তিনি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। কিন্তু এ হাসিতে এবার কেহ যোগ দিল না।

নির্মল কহিল, অভাব হ'লে আমি দেব।

তাহার জবাব শুনিয়া শুধু শিরোমণি নয়, উপস্থিত সকলেই অবাক হইয়া গেলেন। রায়মহাশয় নিজেও ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না; রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, তোমাদের ঠাট্টা-তামাশার সম্পর্ক নয় নির্মল, বিশেষতঃ শিরোমণিমশাই প্রাচীন এবং সম্মানিত ব্যক্তি—উপহাস করা তোমার সাজে না।

নির্মল চুপ করিয়া রহিল; শিরোমণি সামলাইয়া লইয়া একটু হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, টাকা ত দেবে, কিন্তু দেবার গরজটা কি একটু শুনতে পাইনে?

নির্মল বলিল, আমার গরজ শুধু আপনাদের অন্যায় অত্যাচার। আমি যেখানে থাকি সেখানে যদি একবার খোঁজ নেন ত শুনতে পাবেন জীবনে অনেক গরজই আমি মাথায় তুলে নিয়েচি।

যে লোকটা ডাকিতে আসিয়াছিল, সে তখনও যায় নাই; কহিল, আপনার কখন যাবার সুবিধে হবে তাঁকে জানাবো?

আমার সময়মত দেখা করব ব'লো। বলিয়া সে বাটীর ভিতর প্রস্থান করিল।

সায়াহ্নবেলায় জনার্দন রায় প্রস্তুত হইয়া আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ডাক দিয়া কহিলেন, মন্দিরে সকলে উপস্থিত হয়েচেন, তোমাকে তাঁরা ডাকতে পাঠিয়েচেন, যদি যাও ত আর বিলম্ব ক'রো না।

নির্মল বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার যাওয়া কি আপনি প্রয়োজন মনে করেন?

জনার্দন কহিলেন, যাঁরা ডাকতে পাঠিয়েচেন, তাঁরা নিশ্চয়ই করেন, এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই দেবীর আরতি শুরু হইল। মাতার বহুবিধ গৌরবের বস্তুই কালক্রমে বিরল হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঢাক, ঢোল, সানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ও যন্ত্রীর সংখ্যা প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি তেমনি বজায় আছে। সেই সম্মিলিত তুমুল বাদ্যনিনাদ নির্মল ঘরে বসিয়াই শুনিতে পাইল। কথা ছিল, আরতি শেষ হইলে পঞ্চায়েত বসিবে অতএব সেই সুপবিত্র ধ্বনি থামিবার পর সে গৃহ হইতে যাত্রা করিল। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল আলোর বন্দোবস্ত বিশেষ কিছু নাই, প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থিত নাট-বাঙ্গালায় গোটা-দুই লণ্ঠন মাঝখানে রাখিয়া একটা কোলাহল উঠিয়াছে এবং তাহাই বহুলোক ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। সেই অন্ধকারে নির্মলকে কেহ চিনিল না, সে জন-দুই লোকের কাঁধের উপর উঁকি মারিয়া দেখিল তথায় কে একজন বাবুগোছের ভদ্রলোক হাতমুখ নাড়িয়া কি-সব বলিতেছেন। কিছুই শোনা গেল না, কিন্তু মানুষের আগ্রহ দেখিয়া এ কথা বুঝা গেল, তিনি অত্যন্ত শ্রুতিমধুর কাহারও নিন্দা ও গ্লানি করিতেছেন। এই ব্যক্তিই যে জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী তাহা সে আন্দাজ করিল, অতএব বক্তব্য বস্তু যে ষোড়শীর জীবন-চরিত তাহাতে সন্দেহ রহিল না। ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইতে যদিচ তাহার প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু দুই-একটা কথা শুনিবার লোভও সে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে না পারিয়া পায়ের দুই আঙুলে ভর দিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইল। কয়েক মুহূর্তেই মনে লাগিয়া গেল, তখনও জীবানন্দ চৌধুরী আসল বস্তুতে অবতীর্ণ হয় নাই—ষোড়শীর মায়ের ইতিবৃত্তেরই আখ্যান চলিতেছিল, অবশ্য সমস্তই শোনা কথা। সাক্ষী তারাদাস অদূরে বসিয়া—এইসকল অসচ্চরিত্র স্ত্রীলোকদিগের সংস্রবে কিরূপে

এই পীঠস্থান ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অপবিত্র হইয়া উঠিতেছে এবং সমস্ত দেশের কল্যাণ তিরোহিত হইতেছে—

পিছনে পিঠের উপর একটু চাপ পড়িতে ফিরিয়া দেখিল কে একজন অন্ধকারে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া তাহাকে বাহিরের দিকে ইশারা করিল এবং তাহাকেই অনুসরণ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইতে নির্মল স্পষ্ট বুঝিতে পারিল এই সুগঠিত দীর্ঘ ঋজুদেহ ষোড়শী ভিন্ন আর কাহারও নহে। সে দ্বারের বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ঈষৎ একটু হাসিয়া অনুযোগের কণ্ঠে কহিল, ছি, কি দাঁড়িয়ে যা-তা শুনচেন! কতকগুলো কাপুরুষ মিলে দু'জন অসহায় স্ত্রীলোকের কুৎসা রটনা করচে—তাও আবার একজন মৃত, আর একজন অনুপস্থিত। চলুন আমার ঘরে, সেখানে ফকিরসাহেব বসে আছেন, আপনাকে পরিচিত ক'রে দিই গে।

তিনি কবে এলেন?

কি জানি। বিকেলবেলা ফিরে গিয়ে দেখি আমার ঘরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। আনন্দ আর রাখতে পারলাম না, প্রণাম করে নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে বসালাম, সমস্ত ইতিহাস মন দিয়ে শুনলেন।

শুনে কি বললেন?

শুধু একটু হাসলেন। বোধ হলো যেন সমস্তই জানতেন। কিন্তু হাঁ নির্মলবাবু, আপনি নাকি বলেচেন আমার মামলা-মকদ্দমার সমস্ত ভার নেবেন? একি সত্যি?

নির্মল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ সত্যি।

কিন্তু কেন নেবেন?

নির্মল একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বোধ করি আপনার প্রতি অন্যায় অত্যাচার হচ্চে বলেই।

কিন্তু আর কিছু বোধ করেন না ত? বলিয়াই ষোড়শী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, থাক, সব কথার যে জবাব দিতেই হবে এমন কিছু শাস্ত্রের অনুশাসন নেই। বিশেষ করে এই কুট-কচালে শাস্ত্রের—না? আসুন, আমার ঘরে আসুন।

তাহার কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিল ফকিরসাহেব নাই। কহিল, কোথায় গেছেন, বোধ হয় এখনি ফিরে আসবেন। প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল, উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পাতা-আসনখানি দেখাইয়া দিয়া কহিল, বসুন। হাঙ্গামা, হৈচৈ, গন্ডগোলের মাঝে এমন সময় পাইনে, যে বসে দু'দন্ড গল্প করি। আচ্ছা, মকদ্দমার যেন সকল ভারই নিলেন, কিন্তু যদি হারি, তখন ভার কে নেবে? তখন পেছবেন না ত?

নির্মল জবাব দিতে পারিল না, তাহার কান পর্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। খানিকক্ষণ পরে কহিল, হারবার কোন সম্ভাবনা আমাদের নেই।

তা বটে। বলিয়া একবার একটুখানি যেন ষোড়শী বিমনা হইয়া পড়িল, কিন্তু পলকমাত্র। সহসা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ছেলে কেমন আছে নির্মলবাবু? কি করে তাকে ছেড়ে এলেন বলুন ত? আমি ত পারিনে।

অকস্মাৎ এই অসংলগ্ন প্রশ্নে নির্মল আশ্চর্য হইল। ষোড়শী একবার এ-দিকে একবার ও-দিকে বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বলিল, আমি কিন্তু হৈম হলে এই সমস্ত পরোপকার করা আপনার ঘুচিয়ে দিতাম। অত ভালমানুষ নই—আমার কাছে ফাঁকি চলত না—রাত্রি-দিন চোখে চোখে রাখতাম।

ইঙ্গিত এত সুস্পষ্ট যে নির্মলের বুকের মধ্যেটা বিস্ময়ে, ভয়ে ও আনন্দে একই সঙ্গে ও একই কালে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। এবং সেই অসংবৃত অবসরে মুখ দিয়া তাহার বাহির হইয়া গেল, চোখে চোখে রাখলেই কি রাখা যায় ষোড়শী? এর বাঁধন যেখানে শুরু হয়, চোখের দৃষ্টি যে সেখানে পৌঁছায় না, এ কথা কি আজও জানতে তুমি পারোনি?

পেরেচি বৈ কি, বলিয়া ষোড়শী হাসিল। বাহিরে হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, এই যে ইনি এসেচেন।

কে? ফকিরসাহেব?

না, জমিদারবাবু। বলে পাঠিয়েছিলাম সভা ভাঙ্গলে যাবার পথে আমার কুঁড়েতে একবার

একটু পদধূলি দিতে। তাই দিতেই বোধ হয় আসচেন। সঙ্গে লোকজন বিস্তর, স্ত্রীলোকের ঘরে একাকী আসতে বোধ করি সাধুপুরুষের ভরসায় কুলোয় নি। পাছে দুর্নাম হয়। বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ব্যাপারটা নির্মলের একেবারে ভাল লাগিল না। সে বিরক্তি ও সংকোচে আড়ষ্ট হইয়া বলিল, এ কথা আমাকে আপনি বলেন নি কেন?

বেশ! একবার তুমি একবার আপনি, বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, ভয় নেই, উনি ভারী ভদ্রলোক, লড়াই করেন না। তা ছাড়া, আপনাদের ত পরিচয় নেই—সেটাও একটা লাভ। বলিয়া সে দ্বারের বাহিরে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া কহিল, আসুন—আমার কুঁড়ে আর একবার পবিত্র হ'লো।

জীবানন্দ চৌকাঠে পা দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, ইনি? নির্মলবাবু বোধ হয়?

ষোড়শী হাসিমুখে জবাব দিল, হাঁ, আপনার বন্ধু বলে পরিচয় দিলে খুব সম্ভব অতিশয়োক্তি হবে না।

বাইশ

অনুমান যে ভুল নয়, লোকটি যে সত্য সত্যই নির্মল বসু, তাহা বুঝিতে পারিয়া জীবানন্দ প্রথমে চমকিত হইল, কিন্তু যে-কোন অবস্থায় নিজেকে মুহূর্তে সামলাইয়া লইবার শক্তি তাহার অদ্ভুত। সে সামান্য একটু হাসিয়া বলিল, বিলক্ষণ! বন্ধু নয় ত কি? ওঁদের কৃপাতেই ত টিঁকে আছি, নইলে মামার জমিদারি পাওয়া পর্যন্ত যে-সব কীর্তি করা গেছে, তাতে চণ্ডীগড়ের শান্তিকুঞ্জের বদলে ত এতদিন আন্দামানের শ্রীঘরে গিয়ে বসবাস করতে হ'তো।

নির্মলের গোড়া হইতেই ভাল লাগে নাই, কিন্তু নিজের দুষ্কৃতির এই লজ্জাহীন, অনাবৃত রসিকতার চেষ্টায় তাহার গা জ্বলিয়া গেল। মুখ লাল করিয়া কি একটা বলিতেও চাহিল, কিন্তু বলিতে হইল না। ষোড়শী জবাব দিল, কহিল, চৌধুরীমশায়, উকিল-ব্যারিস্টার বড়লোক বলে বাহবাটা কি একা ওরাই পাবেন? আন্দামান প্রভৃতি বড় ব্যাপার না হোক, কিন্তু ছোট বলে এ দেশের শ্রীঘরগুলোও ত মনোরম স্থান নয়—দুঃখী বলে ভৈরবীরা কি একটু ধন্যবাদ পেতে পারে না?

জীবানন্দ অপ্রস্তুত হইয়া হঠাৎ যাহা মুখে আসিল কহিল। বলিল, ধন্যবাদ পাবার সময় হলেই পাবে।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, এই যেমন মন্দিরে দাঁড়িয়ে এইমাত্র একদফা দিয়ে এলেন।

জীবানন্দ ইহার কোন জবাব দিল না। নির্মলের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনার শ্বশুরমহাশয়ের মুখে শুনলাম আপনি আসচেন—আশা করেছিলাম মন্দিরেই আলাপ হবে।

ষোড়শী বলিল, সে আমার দোষ চৌধুরীমশায়। উনি এসেও ছিলেন এবং সদালাপে যোগ না দিন, ভিড়ের বাইরে দাঁড়িয়ে গলা বাড়িয়ে শোনবার চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু আমি দেখতে পেয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম। বললাম, চলুন নির্মলবাবু, ঘরে বসে বরঞ্চ দুটো গল্প-সল্প করা যাক।

জীবানন্দ মনের উত্তাপ চাপিয়া কতকটা সহজ গলাতেই কহিল, তা হলে আমি এসে পড়ে ত ব্যাঘাত দিলাম।

ষোড়শী বলিল, দিয়ে থাকলেও আপনার দোষ নেই—আমিই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

জীবানন্দ কহিল, কিন্তু কেন? গল্প করতে নয় বোধ হয়?

ষোড়শী হাসিয়া ফেলিল; বলিল, না গো মশায়, না—বরঞ্চ ঠিক তার উলটো। আজ আপনাকে আমি ভারী বকবো। তাহার কণ্ঠস্বর ও কথা কহিবার ভঙ্গী দেখিয়া নির্মল ও জীবানন্দ উভয়েই আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। ষোড়শী হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, ছি, ছি, ওখানে আজ অত কি করছিলেন বলুন ত? একটা সভার আড়ম্বর করে

মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'জন অসহায় স্ত্রীলোকের কি কুৎসাই রটনা করছিলেন! এর মধ্যে একজন আবার বেঁচে নেই। এ কি কোন পুরুষের পক্ষেই সাজে? তা ছাড়া, কি প্রয়োজন ছিল বলুন ত? সেদিন এই ঘরে বসেই ত আপনাকে বলেছিলাম, আপনি আমাকে যা আদেশ করবেন আমি পালন করব। আপনিও আপনার হুকুম স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, আমিও আমার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিনি। এই নিন মন্দিরের চাবি, এবং এই নিন হিসাবের খাতা। বলিয়া সে অঞ্চল হইতে চাবির গোছা খুলিয়া এবং তাকের উপর হইতে একখানা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা পাড়িয়া জীবানন্দের পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল, মায়ের যা-কিছু অলঙ্কার, যত-কিছু দলিল-পত্র সিন্দুকের ভিতরই পাবেন, এবং আরও একখানা কাগজ পাবেন যাতে ভৈরবীর সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করে আমি সই করে দিয়েচি।

জীবানন্দ বোধ করি ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কহিল, বল কি! কিন্তু ত্যাগ করলে কার কাছে?

ষোড়শী বলিল, তাতেই লেখা আছে দেখতে পাবেন।

তাই যদি হয় ত এই চাবিটাবিগুলো তাঁকেই দিলে না কেন?

তাঁকেই যে দিলাম। বলিয়া ষোড়শী মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। কিন্তু সেই হাসি দেখিয়া এইবার জীবানন্দের মুখ মলিন হইয়া উঠিল। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু এ ত আমি নিতে পারিনে। খাতায় লেখা নামগুলোর সঙ্গে যে সিন্দুকে রাখা জিনিসগুলোও এক হবে, সে আমি কি করে বিশ্বাস করব? তোমার আবশ্যক থাকে তুমি পাঁচজনের কাছে বুঝিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমার সে আবশ্যক নেই। কিন্তু চৌধুরীমশায়, আপনার এ অজুহাতও অচল। একদিন চোখ বুজে যার হাত থেকে বিষ নিয়ে খাবার ভরসা হয়েছিল, তার হাত থেকে আজ এটুকু চোখ বুজে নেবার সাহস হওয়া আপনার উচিত। অপরকে বিশ্বাস করবার শক্তি আপনার সত্য সত্যই এত কম, এ কথা আমি কোন-মতে স্বীকার করতে পারিনে। নিন—ধরুন, বলিয়া সে খাতা এবং চাবির গোছা মাটি হইতে তুলিয়া একরকম জোর করিয়া জীবানন্দের হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আজ আমি বাঁচলাম। আমার কোন ভারই ত কোনদিন নেননি, এইটুকুও না নিলে যে ধর্মে পতিত হবেন। তা ছাড়া, পরকালে জবাব দেবেন কি? বলিয়া সে হাসিতে হাসিতে কহিল, পরকালের চিন্তায় ত আপনার ঘুম হয় না, সে আমি জানি, কিন্তু যা হয়ে গেছে তা গেছে, ভবিষ্যতে কিছু কিছু চিন্তা করতে হবে তা বলে দিচ্চি। তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বর যেন ইহার শেষ দিকে কোমলতায় বিগলিত হইয়া উঠিল। কহিল, আর একটিমাত্র ভার আপনাকে দিয়ে যাবো, সে আমার গরীব দুঃখী প্রজাদের ভার। আমি শত ইচ্ছে করেও তাদের ভাল করতে পারিনি, কিন্তু আপনি অনায়াসে পারবেন। নির্মলের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমার কথাবার্তা শুনে আপনি আশ্চর্য হয়ে গেছেন, না নির্মলবাবু?

নির্মল মাথা নাড়িয়া বলিল, শুধু আশ্চর্য নয়, আমি প্রায় অভিভূত হয়ে পড়েচি। ভৈরবীর আসন ত্যাগ করে যে আপনি ইতিমধ্যে ছাড়পত্র পর্যন্ত সই করে রেখেছেন, এ খবর ত আমাকে ঘুণাগ্রে জানান নি?

ষোড়শী হাসিমুখে কহিল, আমার অনেক কথাই আপনাকে জানানো হয়নি, কিন্তু একদিন হয়ত সমস্তই জানতে পারবেন। কেবল একটিমাত্র মানুষ সংসারে আছেন যাঁকে সকল কথাই জানিয়েচি, সে আমার ফকিরসাহেব।

এ সকল পরামর্শ বোধ করি তিনিই দিয়েচেন?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, না, তিনি আজ সকাল পর্যন্ত কিছুই জানতেন না, এবং ওই যাকে ছাড়পত্র বলচেন সে আমার কাল রাত্রের রচনা। যিনি এ কাজে আমাকে প্রবৃত্তি দিয়েচেন, শুধু তাঁর নামটিই আমি সংসারে সকলের কাছে গোপন রাখবো।

জীবানন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, মনে হচ্চে যেন বাড়িতে ডেকে এনে আমার সঙ্গে কি একটা প্রকাণ্ড তামাশা করচ ষোড়শী! এ বিশ্বাস করা যেন সেই মরফিয়া খাওয়ার চেয়ে শক্ত ঠেকচে!

এতক্ষণ পরে নির্মল তাহার পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, আপনি ত তবু এই কয়েক পা মাত্র হেঁটে এসে তামাশা দেখছেন, কিন্তু আমাকে কাজকর্ম বাড়িঘর ফেলে রেখে এই তামাশা দেখতে আটশ' মাইল ছুটে আসতে হয়েছে। এ যদি সত্য হয়, আপনি যা চেয়েছিলেন অন্ততঃ সেটা পেয়ে গেলেন, কিন্তু আমার ভাগ্যে ষোল আনাই লোকসান। একে তামাশা বলব কি উপহাস বলব ভেবেই পাচ্চিনে। বলিয়া সে লোকটার মুখের প্রতি আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে, দেখিতে পাইল তাহার দুই চক্ষু আকস্মিক বেদনার ভারে যেন ভারাক্রান্ত। সে জবাব কিছুই দিল না, শুধু একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

নির্মল ষোড়শীকে প্রশ্ন করিল, এ-সকল ত আপনার পরিহাস নয়?

ষোড়শী বলিল, না নির্মলবাবু, আমার এবং আমার মায়ের কুৎসায় দেশ ছেয়ে গেল, এই কি আমার হাসি-তামাশার সময়? আমি সত্য সত্যই অবসর নিলাম।

নির্মল কহিল, তা হলে বড় দুঃখে পড়েই এ কাজ আপনাকে করতে হ'লো।

ষোড়শী উত্তর দিল না। নির্মল নিজেও একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আমি আপনাকে বাঁচাতে এসেছিলাম, বাঁচাতেও হয়ত পারতাম, তবু কেন যে হতে দিলেন না তা আমি বুঝেচি। বিষয় রক্ষা হ'তো, কিন্তু কুৎসার ঢেউ তাতে তেমনি উত্তাল হয়ে উঠত। এবং সে থামাবার সাধ্য আমার ছিল না। বলিয়া সে যে কাহাকে কটাক্ষ করিল তাহা উপস্থিত সকলেই বুঝিল। কিন্তু জীবানন্দ নীরব হইয়া রহিল, এবং ষোড়শী নিজেও ইহার কোন প্রতিবাদ করিল না।

নির্মল জিজ্ঞাসা করিল, এখন তা হলে কি করবেন স্থির করেছেন?

ষোড়শী বলিল, সে আপনাকে আমি পরে জানাবো।

কোথায় থাকবেন?

এ সংবাদও আপনাকে আমি পরে দেবো।

বাহির হইতে সাড়া আসিল, মা! ষোড়শী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, ভুতনাথ? আয় বাবা, ঘরে নিয়ে আয় মন্দিরের ভৃত্য আজ একটা বড় ঝুড়ি ভরিয়া দেবীর প্রসাদ, নানাবিধ ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনিয়াছিল। ষোড়শী হাতে লইয়া জীবানন্দের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্নিগ্ধ হা সমুখে কহিল, সেদিন আপনাকে পেটভরে খেতে দিতে পারিনি, কিন্তু আজ সে ত্রুটি সংশোধন করে তবে ছাড়ব। নির্মলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আর আপনি ত ভগিনীপতি, কুটুম্ব—আপনাকে শুধু শুধু যেতে দিলে ত অন্যায় হবে। অনেক তিক্ত কটু আলোচনা হয়ে গেছে, এখন বসুন দিকি দু'জনে খেতে। মিষ্টিমুখ না করিয়ে ছেড়ে দিলে আমার ক্ষোভের সীমা থাকবে না।

নির্মল কহিল, দিন। কিন্তু জীবানন্দ অস্বীকার করিয়া বলিল, আমি খেতে পারব না।

পারবেন না? কিন্তু পারতেই যে হবে।

জীবানন্দ তথাপি মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, মিথ্যে মাথা নাড়া চৌধুরীমশায়। যে সুযোগ জীবনে আর কখনো পাবো না, তা যদি হাতে পেয়ে ছেড়ে দিই ত মিছেই এতকাল ভৈরবীগিরি করে এলাম! বলিয়া সে জল-হাতে উভয়েরই সম্মুখের স্থানটা মুছিয়া লইয়া শালপাতা পাতিয়া মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতে বসিল।

মিষ্টান্ন যে আজ যথার্থ-ই জীবানন্দের গলায় বাধিতেছিল, ইহা লক্ষ্য করিতে ষোড়শীর বিলম্ব হইল না। সে গলা খাটো করিয়া কহিল, তবে থাক, এগুলো আর আপনার খেয়ে কাজ নেই, আপনি শুধু দুটো ফল খান। বলিয়া নিজেই হাত বাড়াইয়া তাঁহার পাতার একধারে উচ্ছিষ্ট খাবারগুলো সরাইয়া দিয়া বলিল, কি হ'লো আজ? সত্যিই ক্ষিদে নেই নাকি? না থাকে ত জোর করে খাবার দরকার নেই। দেহের মধ্যে যে অসুখের সৃষ্টি করে রেখেচেন, সে মনে হলেও আমার ভয় হয়।

নির্মল একমনে খাইতেছিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিল। এই কণ্ঠস্বরের অনির্বচনীয়তা খট্ করিয়া তাহার কানে বাজিয়া অকারণে বহুদূরবর্তী হৈমকে তাহার স্মরণ করাইয়া

দিল। দু'জনের অনেক হাস্য-পরিহাসের বিনিময় হইয়া গেছে, আজ সকালেও এই ষোড়শীর কথায় ও ইঙ্গিতে সর্বশরীরে তাহার পুলকের বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেছে; কিন্তু এ গলা ত সে নয়! মাধুর্যের এরূপ নিবিড় রসধারা ত তাহাতে ঝরে নাই! মিষ্টান্নের মিষ্ট তাহার মুখে বিস্বাদ এবং ফলের রস তিতো লাগিয়া আহারের সমস্ত আনন্দ যেন মুহূর্তে তিরোহিত হইয়া গেল। খানিক পরে লক্ষ্য করিয়া ষোড়শী সবিস্ময়ে কহিল, আপনারও যে ওই দশা হ'লো নির্মলবাবু, খেলেন কৈ?

নির্মল বলিল, যা খেতে পারি তা আপনার বলবার আগেই খেয়েচি, অনুরোধের অপেক্ষা করিনি।

খাবারগুলো আজ বুঝি তা হলে ভাল দেয়নি?

তা হবে। অন্যদিন কেমন দেয় সে ত জানিনে! বলিয়া সে হাত ধুইবার উপক্রম করিল। এ বিষয়ে তাহার কৌতূহলের একান্ত অভাব শুধু ষোড়শীর নয়, জীবানন্দেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল; কিন্তু এ লইয়া কেহ আর আলোচনা তুলিল না। বাহিরে আসিয়া ষোড়শী মুখ-হাত ধুইবার জল দিয়া এবং সাজা পান হাতে দিয়া তাহা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া লইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু নিজের বা তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিল না।

নির্মল কহিল, আমি এখন তা হলে যাই—

আপনি বাড়ি ফিরবেন কবে?

আমার আর ত কোন প্রয়োজন নেই, হয়ত কালই ফিরতে পারি।

ছেলেকে, হৈমকে আমার আশীর্বাদ দেবেন।

নির্মল একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমাকে আর বোধ হয় কোন আবশ্যক নেই?

ষোড়শী নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, এতবড় অহঙ্কারের কথা কি আমি বলতে পারি নির্মলবাবু? তবে মন্দির নিয়ে আর বোধ হয় আমার কখনো আপনাকে দুঃখ দেবার আবশ্যক হবে না।

নির্মল ম্লানমুখে হাসির প্রয়াস করিয়া কহিল, আমাদের শীঘ্র ভুলে যাবেন না আশা করি?

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া শুধু কহিল, না।

নির্মল নমস্কার করিয়া কহিল, আমি চললাম। যদি সকালের গাড়িতে যাওয়া হয় ত, আর বোধ হয় দেখা করবার সময় পাবো না। হৈম আপনাকে বড় ভালবাসে, যদি অবকাশ পান মাঝে মাঝে একটা খবর দেবেন। বলিয়া সে আর কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল। প্রবঞ্চিতের লজ্জা ও জ্বালা অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাহার বুকের মধ্যে ধকধক করিয়া জ্বলিতে লাগিল, এবং বিফল-মনোরথ মাতাল যেমন করিয়া তাহার মদের দোকানের রুদ্ধ-দুয়ার হইতে ফিরিবার পথে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে থাকে, তেমনি করিয়া সে সমস্ত পথটা মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি বাঁচিয়া গেলাম। স্বেচ্ছাচারিণীর মোহের বেষ্টন হইতে বাহির হইতে পারিয়া আমার হৈমকে আবার ফিরিয়া পাইলাম। কথাগুলো কেবলমাত্র বারংবার আবৃত্তি করিয়াই সে তাহার পীড়িত, আহত হৃদয়ের কাছে যেন সপ্রমাণ করিতে চাহিল যে, এ ভালই হইল যে, ষোড়শীর গৃহের দ্বার তাহার মুখের উপর চিরদিনের মত বন্ধ হইয়া গেল।

মিনিট দুই-তিন পরে জীবানন্দ বাহিরে আসিয়া দেখিল, অন্ধকারে একটা খুঁটি ঠেস দিয়া ষোড়শী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, নির্মলবাবু কি চলে গেলেন?

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন ছিল না, ষোড়শী তেমনি চুপ করিয়াই রহিল।

জীবানন্দ কহিল, ভদ্রলোকটিকে ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ষোড়শী পথের দিকে চাহিয়াছিল, সেইদিকেই চক্ষু রাখিয়া বলিল, তাতে আপনার ক্ষতি কি?

আমার ক্ষতি? না, তা বোধ করি কিছু নেই, কিন্তু তোমার ত থাকতে পারে? তুমি কি তাঁকে বুঝতে পেরেছ?

ষোড়শী কহিল, আমার যতটুকু দরকার তা পেরেছি বৈ কি।

তা হলে ভাল। বলিয়া সে ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া যেন নিজের মনেই কহিল, তাঁকে মনে রাখবার জন্যে কি রকম ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে গেলেন, দরখাস্ত মঞ্জুর করলে ত? বলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে সেই অন্ধকারেও দুজনের চোখে চোখে মিলিল।

ষোড়শী দৃষ্টি অবনত করিল না, বলিল, আমি তাঁকে যতখানি জানি, তার অর্ধেকও যদি আমাকে জানবার তাঁর সময় হ'তো, এতবড় বাহুল্য আবেদন আমার কাছে তিনি মুখে উচ্চারণ করতেও পারতেন না। আমার যা-কিছু কল্পনা, যত-কিছু আনন্দের ভাবনা, সে ত কেবল তাঁদের নিয়েই। তাঁদের দেখেই ত আমি সে-ষোড়শী আর নেই। এই যে চণ্ডীগড়ের ভৈরবী-পদ, যা ভাগ করে নেবার লোভে আপনাদের ছেঁড়াছিঁড়ির অবধি নেই, যে জন্যে কলঙ্কে দেশ আপনারা ছেয়ে দিলেন, সে যে আজ জীর্ণবস্ত্রের মত ত্যাগ করে যাচ্ছি, সে শিক্ষা কোথায় পেয়েচি জানেন? সে ওইখানে। মেয়েমানুষের কাছে এ যে কত ফাঁকি, কত মিথ্যে, সে-কথা ওঁদের দেখেই বুঝতে পেরেছি। অথচ এর বাষ্পও তিনি জানেন না, কোনদিন হয়ত জানতেও পারবেন না।

জীবানন্দ অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল, সহসা সেইদিকে দৃষ্টি পড়ায় ষোড়শী নিজের উচ্ছ্বসিত আবেগে লজ্জিত হইয়া নীরব হইল। কিছুক্ষণ উভয়েই মৌন থাকার পরে জীবানন্দ ধীরে ধীরে কথা কহিল। বলিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে আমার ভারী লজ্জা করে, কিন্তু যদি পারতাম, তুমি কি তার সত্যি জবাব দিতে পারতে অলকা?

জীবানন্দের মুখে এই অলকা নামটা ষোড়শীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। তিন অক্ষরের এই ছোট্ট কথাটি তাহার কোন্‌খানে যে গিয়া আঘাত করিত, সে ভাবিয়া পাইত না. বিশেষ করিয়া তাহার প্রশ্ন করার এই কৌতুককর ভঙ্গীতে ষোড়শীর হাসি পাইল; কহিল. আপনি যদি কোন একটা আশ্চর্য কাজ করতে পারতেন, তার পরে আমি আর কোন একটা তেমনি অদ্ভুত কাজ করতে পারতাম কি না, এতবড় সত্য করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু সে-কাজ করবার আপনার আবশ্যক নেই—আমি বুঝেচি। অপবাদ আপনারা দিয়েচেন বলেই তাকে সত্যি করে তুলতে হবে, তার অর্থ নেই। আমি কিছুর জন্যেই কখনো কারও আশ্রয় গ্রহণ করব না। আমার স্বামী আছেন, কোন লোভেই সে-কথাটা আমি ভুলে যেতে পারব না। এই ভয়ানক প্রশ্নটাই না আপনাকে লজ্জা দিচ্ছিল চৌধুরীমশায়?

তুমি আমাকে চৌধুরীমশায় বল কেন?

তবে কি বলব? হুজুর?

না, অনেকে যা বলে ডাকে—জীবানন্দবাবু।

ষোড়শী বলিল, বেশ ভবিষ্যতে তাই হবে।

জীবানন্দ কহিল, ভবিষ্যতে কেন, আজই বল না?

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর দিল না। ভিতরে প্রদীপ স্তিমিত হইয়া আসিতেছিল। সে ঘরে আসিয়া তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিল। জীবানন্দ ফিরিয়া আসিয়া বসিতেই ষোড়শী বিস্মিত হইয়া কহিল, রাত্রি হয়ে যাচ্চে, আপনি বাড়ি গেলেন না? আপনার লোকজন কৈ?

আমি তাদের পাঠিয়ে দিয়েচি।

একলা বাড়ি যেতে আপনার ভয় করবে না?

না, আমার পিস্তল সঙ্গে আছে।

তবে তাই নিয়ে বাড়ি যান, আমার ঢের কাজ আছে।

জীবানন্দ কহিল, তোমার থাকতে পারে, কিন্তু আমার নেই। আমি এখন যাবো না।

ষোড়শীর চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্তভাবে বলিল, রাত হয়েছে, আমি লোক ডেকে আপনার সঙ্গে দিচ্চি, তারা বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবে।

জীবানন্দ বুঝিল কথাটা তাহার ভাল হয় নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ডাকতে কাউকে হবে না, আমি আপনিই যাচ্চি। যেতে আমার ইচ্ছে হয় না, তাই শুধু আমি বলছিলাম। তুমি কি সত্যই চণ্ডীগড় ছেড়ে চলে যাবে অলকা?

আবার সেই নাম! জীবানন্দের মুখের পানে চাহিয়া তাহার ক্লেশ বোধ হইল, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সত্যই সে চলিয়া যাইবে।

কবে যাবে?

কি জানি, হয়ত কালই যেতে পারি।

কাল? কালই যেতে পারো? বলিয়া জীবানন্দ একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিল। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আশ্চর্য! মানুষের নিজের মন বুঝতেই কি ভুল হয়! যাতে তুমি যাও, সেই চেষ্টাই প্রাণপণে করেছি, অথচ তুমি চলে যাবে শুনে চোখের সামনে সমস্ত দুনিয়াটা যেন শুকনো হয়ে গেলো। নির্মলবাবু মস্ত লোক, মস্ত বড় ব্যারিস্টার, তিনি আছেন তোমার পক্ষ নিয়ে—হাঙ্গামা বাধাবে, লড়াই শুরু হবে—আমরা জিতবো, ওই যে জমিটা দেনার দায়ে বিক্রি করেচি, ও নিয়ে আর কোন গোলমাল হবে না—কতকগুলো নগদ টাকাও হাতে এসে পড়বে, আর তোমাকে ত যা বলব তাই করতে হবে, এই দিকটাই কেবল দেখতে পেয়েচি, কিন্তু আর যে একটা দিক আছে—তুমি নিজেই সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বিদায় নিলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে, তামাশাটা কোথায় গিয়ে গড়াবে, তা আমার স্বপ্নেও মনে হয়নি—আচ্ছা অলকা, এমন ত হতে পারে, আমার মত তোমারও ভুল হচ্চে—তুমিও নিজের মনের ঠিক খবরটি পাওনি?

কথাগুলি এত চমৎকার এবং এমন নূতন যে হঠাৎ বিস্ময় লাগে, ইহা জীবানন্দের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। জবাব দিতে ষোড়শীর একটু থামিতে হইল। শেষে সায় দিয়া বলিল, হতে পারে বৈ কি। শুধু এই খবরটা নিশ্চয় জানি, যা আমি স্থির করেচি, সে আর অস্থির হবে না।

জীবানন্দ বলিয়া উঠিল, বাপরে বাপ! তোমার পুরুষমানুষ, আর আমার মেয়েমানুষ হওয়া উচিত ছিল; আচ্ছা, সেইখানেই বা তোমার চলবে কি করে?

ষোড়শী পূর্বের মতই সহজ গলায় উত্তর দিল, এ আলোচনা আমি আপনার সঙ্গে কোনমতে করতে পারিনে।

জীবানন্দ রাগ করিয়া বলিল, তুমি কিছুই পারো না, তুমি পাথর। চুলে আমার পাক ধরে এলো, আমি বুড়ো হয়ে গেলাম--তোমার কাছে কি এখন আমি হাতজোড় করে কাঁদতে পারি তুমি ভেবেচ?

ষোড়শী কহিল, দেখুন অনেক রাত্রি হ'লো, এখনো আমার আহ্নিক পর্যন্ত সারা হয়নি—

পুরোহিতের কাশি এবং পায়ের শব্দ বাহিরে শোনা গেল; সে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, মা, সকলের সম্মুখে মন্দিরের দোর বন্ধ করে চাবিটা আমি তারাদাস ঠাকুরের হাতেই দিলাম। রায়মশায়, শিরোমণি—এরা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

ষোড়শী কহিল, ঠিকই হয়েছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি সাগরের ওখানে একবার যাবো, বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জীবানন্দ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, এগুলোও তা হলে তুমি রায়মশায়ের কাছেই পাঠিয়ে দিয়ো।

ষোড়শী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, সিন্দুকের চাবি আর কারও হাতে দিয়ে আমার বিশ্বাস হবে না।

শুধু আমাকেই হবে?

ষোড়শী ইহার কোন উত্তর না দিয়া ঘরের তালাটা হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং জীবানন্দ বাহিরে আসিতেই কবাট বন্ধ করিয়া তাহার পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া পুরোহিতের পিছনে পিছনে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। শুধু একাকী জীবানন্দ সেই অন্ধকার বারান্দায় ভূতের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তেইশ

ব্যারিস্টার-সাহেব চলিয়া গেছেন, ষোড়শী চলিয়া যাইতেছে—মন্দিরের চাবি-তালা সরঞ্জাম প্রভৃতি যাহা কিছু মূল্যবান সমস্ত আদায় হইয়া গেছে, ইত্যাদি সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া

পড়িতে কিছুমাত্র বিলম্ব ঘটিল না। শিরোমণি আনন্দের আবেগে মস্তকচ্ছ আলুথালু বেশে রায়মহাশয়ের সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নির্মলের যাবার সময়ে বিদায়ের পালাটা বিশেষ প্রীতিকর হয় নাই। মনে মনে বোধ করি এই সকল আলোচনাতেই জনার্দনের মুখমণ্ডল গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার অবস্থা শিরোমণির ছিল না, তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ডান হাত তুলিয়া গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন, দীর্ঘজীবী হও ভায়া, সংসারে এসে বুদ্ধি ধরেছিলে বটে'

জনার্দন মুখ তুলিয়া কহিলেন, ব্যাপার কি?

শিরোমণি বলিলেন, ব্যাপার কি! দশখানা গাঁয়ে রাষ্ট্র হতে বাকী আছে নাকি? বেটী চাবি-পত্র যা-কিছু সমস্ত দিয়ে চলে যাচ্ছে যে! বলি, শোনোনি নাকি?

যে ভদ্রলোক সকাল হইতে বসিয়া এ মাসে সুদের কিছু টাকা মাপ করিতে অনুনয়-বিনয় করিতেছিল, সে কহিল, বেশ! যজ্ঞেশ্বর জানলেন না, আর খবর পেলেন ঘেঁটু-মনসা? এ-সব করলে কে শিরোমণি খুড়ো, সমস্তই ত রায়মশায়।

শিরোমণি আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আসল চাবিটা শুনেচি নাকি গিয়ে পড়েচে জমিদারের হাতে? ব্যাটা পাঁড় মাতাল—দেখো ভায়া, শেষকালে মায়ের সিন্দুকের সোনারূপো না ঢুকে যায় শুঁড়ির সিন্দুকে। পাপের আর অবধি থাকবে না।

ক্রমশঃ একে একে গ্রামের অনেকেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থির হইল, জমিদারের হাত হইতে চাবিটা অবিলম্বে উদ্ধার করা চাই। বেলা তৃতীয় প্রহরে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া হুজুর যখন মদ খাইতে আরম্ভ করিবেন, তাঁহার মাতাল হইয়া পড়িবার পূর্বেই সেটা হস্তগত করা প্রয়োজন। সেটা তাঁহার হাতে যাওয়ার সম্বন্ধে জনার্দন নিজের সামান্য একটু ত্রুটি ও অবিবেচনা স্বীকার করিয়া লইয়াই কহিলেন, সমস্তই স্থির করে রেখেছিলাম, হঠাৎ উনি যে মাঝ থেকে চাবি হাত করবেন, সেটা আর খেয়াল করিনি। এখন সহজে দিলে হয়। দশ দিন পরে হয়ত বলে বসবে, কৈ কিছুই ত সিন্দুকে ছিল না! কিন্তু আমরা সবাই জানি, ভায়া, ষোড়শী আর যাই কেন না করুক, মায়ের সম্পত্তি অপহরণ করবে না—একটি পাই পয়সা না।

সকলে এ কথা স্বীকার করিল। অনেকের এমনও মনে হইল, ইহার চেয়ে বরঞ্চ সে-ই ছিল ভাল।

এই দল যথাসময়ে এবং যথোচিত সমারোহে যখন জমিদারের শান্তিকুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল, জমিদার তখন বাহিরের ঘরে বসিয়া। মদের বোতল ও গ্লাসের পরিবর্তে জমিদারির মোটা মোটা খাতাপত্র তাঁহার সম্মুখে। একধারে বসিয়া তাঁহার সহচর প্রফুল্ল-চন্দ্র খবরের কাগজ পড়িতেছিল, সে-ই সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

শিরোমণি সকলের অগ্রে কথা কহেন, এবং সকলের শেষে অনুতাপ করেন, এ ক্ষেত্রেও তিনিই কথা কহিলেন; বলিলেন, হুজুরের পাছে নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, তাই একটু বিলম্ব করেই আমরা সকলে—

জীবানন্দ খাতাপত্র এক পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া সহাস্যে কহিলেন, বিলম্ব না করে এলেও হুজুরের নিদ্রার ব্যাঘাত হতো না শিরোমণিমশায়, কারণ দিনের বেলা তিনি নিদ্রা দেন না।

কিন্তু আমরা যে শুনি হুজুর—

শোনেন? তা আপনারা অনেক কথা শোনেন যা সত্য নয়, এবং অনেক কথা বলেন যা মিথ্যে। এই যেমন আমার সম্বন্ধে ভৈরবীর কথাটা—, বলিয়া বক্তা হাস্য করিলেন, কিন্তু শ্রোতার দল থতমত খাইয়া একেবারে মুষড়িয়া গেল। জীবানন্দ কহিলেন, কিন্তু যে জন্যে ত্বরা করে আসতে চেয়েছিলেন তার হেতুটা শুনি?

জনার্দন রায় নিজেকে কথঞ্চিৎ সামলাইয়া লইলেন, মনে মনে কহিলেন, এত ভয়ই বা কিসের? প্রকাশ্যে বলিলেন, মন্দির-সংক্রান্ত গোলযোগ যে এত সহজে নিষ্পত্তি করতে পারা যাবে তা আশা ছিল না। নির্মল যে-রকম বেঁকে দাঁড়িয়েছিল—

জীবানন্দ কহিলেন, তিনি সোজা হলেন কি করে?

এই খোঁচা জনার্দন অনুভব করিলেন, কিন্তু শিরোমণি তাহার ধার দিয়াও গেলেন না

খুশী হইয়া সদর্পে কহিলেন, সমস্তই মায়ের ইচ্ছা হুজুর, সোজা যে হতেই হবে। পাপের ভার তিনি আর সইতে পারছিলেন না।

জীবানন্দ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, তাই হবে। তার পরে?

শিরোমণি বলিলেন, কিন্তু পাপ ত দূর হলো, এখন—বল না জনার্দন, হুজুরকে সমস্ত বুঝিয়ে বল না? এই বলিয়া তিনি রায়মশায়কে হাত দিয়া ঠেলিলেন।

জনার্দন চকিত হইয়া কহিলেন, মন্দিরের চাবি ত আমরা দাঁড়িয়ে থেকেই তারাদাস ঠাকুরকে দিইয়েছি। আজ তিনিই সকালে মায়ের দোর খুলেচেন, কিন্তু সিন্দুকের চাবিটা শুনতে পেলাম ষোড়শী হুজুরের হাতে সমর্পণ করেচে।

জীবানন্দ সায় দিয়া কহিলেন, তা করেচে। জমাখরচের খাতাও একখানা দিয়েচে।

শিরোমণি বলিলেন, বেটী এখনও আছে, কিন্তু কখন যে কোথায় চলে যায় সে ত বলা যায় না।

জীবানন্দ মুহূর্তকাল বৃদ্ধের মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সেজন্যে আপনাদের এত উদ্বেগ কেন?

উত্তরের জন্য তিনি জনার্দনের প্রতি চাহিলেন। জনার্দন সাহস পাইয়া কহিলেন, দলিলপত্র, মূল্যবান তৈজসাদি, দেবীর অলঙ্কার প্রভৃতি যা-কিছু আছে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা সমস্তই জানেন। শিরোমণিমশায় বলছেন যে, ষোড়শী থাকতে থাকতেই সেগুলো সব মিলিয়ে দেখলে ভাল হয়। হয়ত—

হয়ত নেই? এই না? কিন্তু না থাকলেই বা আপনারা আদায় করবেন কি করে?

জনার্দন সহসা জবাব খুঁজিয়া পাইলেন না, শেষে বলিলেন, তবু ত জানা যাবে হুজুর!

কিন্তু আজ আমার সময় নাই রায়মশাই।

জনার্দন মনে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, প্রায় এইপ্রকার ফন্দি করিয়াই তাঁহারা আসিয়াছিলেন! শিরোমণি ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, চাবিটা জনার্দন ভায়ার হাতে দিলে আজই সন্ধ্যার পূর্বে আমরা সমস্ত মিলিয়ে দেখতে পারি। হুজুরেরও আর কোন দায়িত্ব থাকে না—কি আছে না আছে সে পালাবার আগেই সব জানা যায়। কি বল ভায়া? কি বল হে তোমরা? ঠিক না?

সকলেই এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল, দিল না কেবল যাহার হাতে চাবি। সে শুধু একটু ঈষৎ হাসিয়া কহিল, ব্যস্ত কি শিরোমণিমশায়, যদি কিছু নষ্ট হয়েই থাকে ত, ভিখিরীর কাছে থেকে আর আদায় হবে না। আপনারা আজ আসুন, আমার যেদিন অবসর হবে, মিলিয়ে দেখতে আপনাদের সকলকেই আমি সংবাদ দেব।

ফন্দি খাটিল না দেখিয়া সবাই মনে মনে রাগ করিল। রায়মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু দায়িত্ব একটা—

জীবানন্দ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, সে ত ঠিক কথা রায়মশায়। দায়িত্ব একটা আমার রইল বৈ কি।

দ্বারের বাহির হইয়াই শিরোমণি জনার্দনের গা টিপিয়া কহিলেন, দেখলে ভায়া, ব্যাটা মাতালের ভাব বোঝাই ভার। গুয়োটা কথা কয় যেন হেঁয়ালি। মদে চুর হয়ে আছে। বাঁচবে না বেশী দিন।

জনার্দন শুধু বলিলেন, হুঁ। যা ভয় করা গেল, তাই হ'লো দেখছি।

শিরোমণি কহিলেন, এবারে গেল সব শুঁড়ির দোকানে। বেটী যাবার সময় আচ্ছা জব্দ করে গেল।

একজন কহিল, হুজুর চাবি আর দিচ্চেন না।

শিরোমণি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আবার! এবার চাইতে গেলে গলা টিপে মদ খাইয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে। কথাটা উচ্চারণ করিয়াই তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে জীবানন্দ খোলা দ্বারের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া স্থির হইয়া

বসিয়াছিল; প্রফুল্ল কহিল, দাদা, আবার একটা নূতন হাঙ্গামা জড়ালেন কেন, চাবিটা ওঁদের দিয়ে দিলেই ত হ'ত।

জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চক্ষু ফিরাইয়া কহিল, হ'তো না প্রফুল্ল, হলে দিতাম। পাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলেই সে কাল রাতে আমার হাতে চাবি দিয়েছে।

প্রফুল্ল মনে মনে বোধ হয় ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, সিন্দুকে আছে কি?

জীবানন্দ একটু হাসিয়া কহিল, কি আছে? আজ সকালে তাই আমি খাতাখানা পড়ে দেখছিলাম। আছে মোহর, টাকা, হীরে, পান্না, মুক্তোর মালা, মুকুট, নানারকম জড়োয়া গয়না, কত কি দলিলপত্র, তা ছাড়া সোনারুপোর বাসন-কোসনও কম নয়। কতকাল ধরে জমা হয়ে এই ছোট্ট চণ্ডীগড়ের ঠাকুরের যে এত সম্পত্তি সঞ্চিত আছে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। চুরি-ডাকাতির ভয়ে ভৈরবীরা বোধ করি কাউকে জানতেও দিত না।

প্রফুল্ল সভয়ে কহিল, বলেন কি! তার চাবি আপনার কাছে? একমাত্র পুত্র সমর্পণ ডাইনীর হাতে?

জীবানন্দ রাগ করিল না, কহিল, নিতান্ত মিথ্যা বলনি ভায়া, এত টাকা দিয়ে আমি নিজেকেও বিশ্বাস করতে পারতাম না। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, অথচ, এ আমি চাইনি প্রফুল্ল। আমি যতই তাকে পীড়াপীড়ি করলাম জনার্দন রায়কে দিতে, ততই সে অস্বীকার করে আমার হাতে গুঁজে দিলে।

প্রফুল্ল নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর কারণ?

জীবানন্দ কহিল, বোধ হয় সে ভেবেছিল, এ দুর্নামের ওপর আবার চুরির কলঙ্ক চাপলে তার আর সইবে না। এদের সে চিনেছিল।

প্রফুল্ল বলিল, কিন্তু আপনাকে সে চিনতে পারেনি।

জীবানন্দ হাসিল, কিন্তু সে হাসিতে আনন্দ ছিল না; কহিল সে দোষ তার, আমার নয়। তার সম্বন্ধে অপরাধ আমার আর যত দিকেই থাক, আমাকে চিনতে না পারার অপরাধ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমি একটা দিনের তরেও করিনি। কিন্তু আশ্চর্য এই পৃথিবী, এবং তার চেয়েও আশ্চর্য এই মানুষের মন। এ যে কি থেকে কি ঠিক করে নেয় কিছুই বলবার জো নেই। এর যুক্তিটা কি জানো ভায়া, সেই যে তার হাত থেকে মরফিয়া নিয়ে চোখ বুজে খাওয়ার গল্পটা তোমার কাছে করেছিলাম, সেই হ'লো তার সকল তর্কের শেষ তর্ক, সকল বিশ্বাসের বড় বিশ্বাস। কিন্তু সে রাত্রে আর যে কোন উপায় ছিল না, এদিকেও মরি, ওদিকেও মরি—সে ছাড়া আর কারও পানে চাইবার পথ ছিল না—এ-সমস্ত ষোড়শী একদম ভুলে বসে আছে, শুধু একটি কথা তার মনে জেগে রয়েছে, যে নিজের প্রাণটা নিঃসংশয়ে তার হাতে দিতে পেরেছিল, তাকে আবার অবিশ্বাস করা যায় কি করে? ব্যস্, যা-কিছু ছিল সমস্ত দিলে চোখ বুজে আমার হাতে তুলে। প্রফুল্ল, দুনিয়ার ভয়ানক চালাক লোকও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করে বসে, নইলে সংসার একেবারে মরুভূমি হয়ে দাঁড়াতো, কোথাও রসের বাষ্পটুকু জমবার ঠাঁই পেত না।

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, অতিশয় খাঁটি কথা দাদা। অতএব অবিলম্বে খাতাখানা পুড়িয়ে ফেলুন, তারাদাস ঠাকুরকে ডেকে ধমক দিন—জমানো মোহরগুলোয় যদি সলোমন সাহেবের দেনাটা শোধা যায় ত, শুধু রসের বাষ্প কেন, মুষলধারে বর্ষণ শুরু হতে পারবে।

জীবানন্দ কহিল, প্রফুল্ল, এইজন্যেই তোমাকে এত পছন্দ করি।

প্রফুল্ল হাত জোড় করিয়া বলিল, এই পছন্দটা এইবার একটু খাটো করতে হবে দাদা। রসের উৎস আপনার অফুরন্ত হোক, কিন্তু মোসাহেবী করে এ অধীনের গলার চুঁটি পর্যন্ত কাঠ হয়ে গেল। এইবার একবার বাইরে গিয়ে দুটো ডালভাতের যোগাড় করতে হবে। কাল-পরশু আমি বিদায় নিলাম।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, একেবারে নিলে? কিন্তু এইবার নিয়ে ক'বার নেওয়া হ'লো প্রফুল্ল?

বার-চারেক। এই বলিয়া সে নিজেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ভগবান মুখটা দিয়ে-

ছিলেন, তা বড়লোকের প্রসাদ খেয়েই দিন গেল; দুটো বড় কথাও যদি না মাঝে-মাঝে বার করতে পারি ত নিতান্তই এর জাত যায়। নেহাত অপরাধও নেই দাদা। বহুকাল ধরে আপনাদের জলকে কখনো উঁচু কখনো নীচু বলে এ দেহটায় মেদ-মাংসই কেবল শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেচে, সত্যিকারের রক্ত বলতে বোধ করি ছিটেফোঁটাও আর বাকী নেই। আজ ভাবচি এক কাজ করব। সন্ধ্যার আবছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে খপ্ করে ভৈরবী ঠাকরুনের এক খামচা পায়ের ধুলো নিয়ে গিলে ফেলব। আপনার অনেক ভালমন্দ দ্রব্যই ত আজ পর্য্যন্ত উদরস্থ করেচি, এ নইলে সেগুলো আর হজম হবে না, পেটে লোহার মত ফুটবে।

জীবানন্দ হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আজ উচ্ছ্বাসের কিছু বাড়াবাড়ি হচ্ছে প্রফুল্ল।

প্রফুল্ল পুনশ্চ হাত জোড় করিয়া কহিল, তা হলে বসুন দাদা, এটা শেষ করি। মোসাহেবি-পেন্সন বলে সেদিন যে উইলখানায় হাজার-পাঁচেক টাকা লিখে রেখেচেন, সেটার ওপরে দয়া করে একটা কলমের আঁচড় দিয়ে রাখবেন—চণ্ডীর টাকাটা হাতে এলে মোসাহেবের অভাব হবে না, কিন্তু আমাকে দান করে অতগুলো টাকার আর দুর্গতি করবেন না।

জীবানন্দ কহিল, তা হলে এবার আমাকে তুমি সত্যি সত্যিই ছাড়লে?

প্রফুল্ল তেমনি করজোড়ে কহিল, আশীর্বাদ করুন, এই সুমতিটুকু শেষ পর্য্যন্ত যেন বজায় থাকে।

জীবানন্দ মৌন হইয়া রহিল।

প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, কবে যাচ্চেন তিনি?

জানিনে।

কোথায় যাচ্ছেন তিনি?

তাও জানিনে।

প্রফুল্ল কহিল, জেনেও কোন লাভ নেই দাদা। সহসা তাহার মুখের চেহারা বদলাইয়া গেল, কহিল, বাপ রে! মেয়েমানুষ ত নয়, যেন পুরুষের বাবা! মন্দিরে দাঁড়িয়ে সেদিন অনেকক্ষণ চেয়েছিলাম, মনে হল, যেন পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একেবারে পাথরে গড়া। ঘা মেরে মেরে গুঁড়ো করা যাবে, কিন্তু আগুনে গলিয়ে যে ইচ্ছেমত ছাঁচে ঢেলে গড়বেন, সেই বস্তুই নয়। পারেন ত ও মতলবটা পরিত্যাগ করবেন।

জীবানন্দ কতকটা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিল, তাহলে প্রফুল্ল এবার নিতান্তই যাচ্চো?

প্রফুল্ল সবিনয়ে জবাব দিল, গুরুজনের আশীর্বাদের জোর থাকে ত মনস্কামনা সিদ্ধ হবে বৈ কি।

জীবানন্দ কহিল, তা হতে পারে। কিন্তু কি করবে স্থির করেচ?

প্রফুল্ল বলিল, অভিলাষ ত আপনার কাছে ব্যক্ত করেচি। প্রথমে চারটি ডালভাতের যোগাড়ের চেষ্টা করব।

জীবানন্দ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া প্রশ্ন করিল, ষোড়শী সত্যই চলে যাবে তোমার মনে হয়?

প্রফুল্ল কহিল, হয়। তার কারণ, সংসারে সবাই প্রফুল্ল নয়। ভাল কথা দাদা, একটা খবর আপনাকে দিতে ভুলেছিলাম। কাল রাত্রে নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি সেই ফকিরসাহেব! আপনাকে যিনি একদিন তাঁর বটগাছে ঘুঘু শিকার করতে দেননি—বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন—তিনি। কুর্নিশ করে কুশল প্রশ্ন করলাম, ইচ্ছে ছিল মুখরোচক দুটো খোশামোদ-টোশামোদ করে যদি একটা কোন ভাল রকমের ওষুধ-টষুধ বার করে নিতে পারি ত আপনাকে ধরে পেটেন্ট নিয়ে বেচে দু'পয়সা রোজগার করব। কিন্তু ব্যাটা ভারী চালাক, সে-দিক দিয়েই গেল না। কথায় কথায় শুনলাম তাঁর ভৈরবী-মাকে দেখতে এসেছিলেন, এখন চলে যাচ্ছেন। ভৈরবী যে সমস্ত ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্চেন, তাঁর কাছেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ কৌতূহলী হইয়া উঠিল, কহিল, এ'র সদুপদেশেই বোধ করি তিনি চলে যাচ্ছেন?

প্রফুল্ল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। বরঞ্চ এ'র উপদেশের বিরুদ্ধেই তিনি চলে যাচ্ছেন।

জীবানন্দ উপহাস করিয়া কহিল, বল কি প্রফুল্ল, ফকিরসাহেব শুনি যে তাঁর গুরু! গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন?

প্রফুল্ল কহিল, এ ক্ষেত্রে তাই বটে।

কিন্তু এত বড় বিরাগের হেতু?

প্রফুল্ল কহিল, বিরাগের হেতু আপনি। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কি জানি এ কথা আপনাকে শোনানো ভাল হবে কি না, কিন্তু ফকিরের বিশ্বাস আপনাকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত ভয় করেন—পাছে কলহ-বিবাদের মধ্য দিয়েও আপনার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়, এই তাঁর সকলের চেয়ে বড় ভয়। নইলে দেশের লোককে তিনি ভয় করেন নি।

জীবানন্দ বিস্ফারিত চক্ষে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

প্রফুল্ল একটুখানি হাসিয়া কহিল, দাদা, ভগবান আপনাকেও বুদ্ধি বড় কম দেননি, কিন্তু সর্বস্ব সমর্পণ করে কাল তিনিই মারাত্মক ভুল করলেন, কি হাত পেতে নিয়ে আপনিই মারাত্মক ভুল করলেন, সে মীমাংসা আজ বাকী রয়ে গেল, যদি বেঁচে থাকি ত একদিন দেখতে পাবো আশা হয়।

জীবানন্দ এ কথারও কোনও উত্তর দিল না, তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা হয়-হয়, বেহারা পাত্র ভরিয়া মদ আনিয়া উপস্থিত করিল; জীবানন্দ হাত নাড়িয়া কহিল, নিয়ে যা—দরকার নেই।

ভৃত্য বুঝিতে না পারিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে প্রফুল্ল কহিল, কখন দরকার সেইটে বলে দিন না?

জীবানন্দ সহসা কখন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, প্রফুল্লর প্রশ্নে চোখ তুলিয়া কহিল, এখন ত নিয়ে যা—দরকার হলে ডেকে পাঠাবো। সে চলিয়া যাইতেছিল, জীবানন্দ ডাকিয়া কহিল, হাঁ রে, তোদের চা আছে?

প্রফুল্ল কহিল, শোন কথা! চা নেই ত আমি বেঁচে আছি কি করে?

তবে, তাই এক বাটি নিয়ে আয়।

বেহারা প্রস্থান করিলে প্রফুল্ল প্রশ্ন করিল, অকস্মাৎ অমৃতে অরুচি যে?

জীবানন্দ বলিল, অরুচি নয়—কিন্তু আর খাবো না।

প্রফুল্ল হাসিল, এবং ক্ষণেক পূর্বে তাহারই প্রতি প্রযুক্ত বিদ্রূপ ফিরাইয়া দিয়া কহিল, এই নিয়ে ক'বার হ'লো দাদা?

জীবানন্দ রাগ করিল না, সেও হাসিয়া তাহারই অনুকরণ করিয়া কহিল, এ মীমাংসাটাও আজ না হয় বাকী থাক প্রফুল্ল, যদি বেঁচে থাকো ত একদিন দেখতে পাবে আশা করি।

প্রফুল্ল মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল, প্রত্যুত্তর করিল না।

চাকর আলো দিয়া গেল। ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার যখন বাহিরে গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, জীবানন্দ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই একটু ঘুরে আসি—

প্রফুল্ল আশ্চর্য হইয়া কহিল, কৈ, কাপড় ছাড়লেন না?

থাক গে।

আপনার সহচর? গাদা পিস্তলটি?

সেও থাক! আজ একলাই ঘুরতে চললাম।

প্রফুল্ল ভয়ানক আপত্তি করিয়া বলিল, না না, সে হয় না দাদা। অন্ধকার রাত, পথে ঘাটে আপনার অনেক শত্রু। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি দেরাজ হইতে পিস্তল বাহির করিয়া হাতে গুঁজিয়া দিতে গেল।

জীবানন্দ দুই-পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, ওকে আর আমি ছুঁচ্ছিনে প্রফুল্ল—

প্রফুল্ল বিস্ময়ে অবাক হইয়া কহিল, হঠাৎ হ'লো কি দাদা? না হয় পাইকদের ডেকে দিই, তাদের কেউ সঙ্গে যাক।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া কহিল, না, তাও না। আজ থেকে আমি এমনি একলা বার হব, যেন কোথাও কোন শত্রু নেই আমার, আর আমার থেকে কারও কোন ভয় না হোক; তার পরে যা হয় তা আমার ঘটুক—আমি কারও কাছে নালিশ করব না। এই বলিয়া সে অন্ধকারে ধীরে ধীরে একাকী বাহির হইয়া গেল।

চব্বিশ

পরিপূর্ণ সুরাপাত্র অসম্মানে ফিরিয়া গেল দেখিয়া প্রফুল্ল ব্যঙ্গ করিয়াছে। করিবারই কথা। লিভারের দুঃসহ যাতনায় ও চিকিৎসকের তাড়নায় শয্যাগত [illegible] জীবনে এ অভিনয় আরও হইয়া গেছে; কিন্তু স্বেচ্ছায়, সুস্থদেহে মদের বদলে চা খাইয়া বাটীর বাহির হওয়া খুব সম্ভব এই প্রথম। সমস্ত জগৎটা তাহার বিস্বাদ ঠেকিল, এবং শান্তি-কুঞ্জের ঘন-ছায়ায় ঘেরা পথের মধ্যে যেদিকে চাহিল, সেই দিক হইতেই একটা অস্ফুট কান্নার সুর আসিয়া যেন তাহার কানে বাজিতে লাগিল। তাহার অভ্যস্ত জীবনের নীচে তাহারই যে আরও একটা সত্যকার জীবন আজও বাঁচিয়া আছে এ খবর সে জানিত না। গেট পার হইয়া যখন মাঠের পথে বাহির হইয়া আসিল, তখন সন্ধ্যার ধূসর আকাশ ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকারে পরিণত হইতেছিল। একদিকে শীর্ণ নদীর বালুময় শুষ্ক সৈকত আঁকিয়া বাঁকিয়া দিগন্তে অদৃশ্য হইয়াছে, আর একদিকে বৈশাখের শষ্প-শস্যহীন বিস্তৃত ক্ষেত্র চণ্ডীগড়ের পাদমূলে গিয়া মিশিয়াছে। পথে পথিক নাই, মাঠে কৃষকদের আর দেখা যায় না, রাখাল বালকেরা গোচারণের কাজ আজিকার মত শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেছে—সান্ধ্য আকাশতলে জনহীন ভূখণ্ডের এই স্তব্ধ বিষণ্ণ মূর্তি আজ তাহার কাছে অত্যন্ত করুণ ও অদ্ভুত মনে হইল। এই পথে, এমনি নির্জন সন্ধ্যায় সে আরও কতবার যাতায়াত করিয়াছে; কিন্তু এতদিন ধরিত্রী যেন এই তাঁহার শান্ত দুঃখের ছবিখানি মাতালের রক্তচক্ষু হইতে একান্ত সঙ্কোচে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ওপারের রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর বহিয়া উষ্ণ বায়ু আসিয়া মাঝে মাঝে তাহার গায়ে লাগিতেছিল; কিছুই নূতন নয়—সেইদিকে চাহিয়া অকস্মাৎ রুদ্ধ অভিমানের কান্নায় যেন আজ তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। মনে মনে বলিতে লাগিল, মা পৃথিবী, তোমার দুঃখের তপ্ত নিশ্বাসটুকুও কি লজ্জায় এতদিন চেপে রেখেছিলে, পাষণ্ড বলে জানতে দাওনি? সংসারে আপনার বলতে আমার কেউ নেই, নিজের ছাড়া কারও সুখ-দুঃখের কখনও ভাগ পাইনি—সেও কি মা, আমার দোষ? আজ আছি, কাল যদি না থাকি, দুনিয়ার কারও ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই, এ কথা কি তুমিই কোনদিন ভেবেচ মা?

এ অভিযোগ যে সে কাহার কাছে করিল, মা বলিয়া যে সে বিশেষ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিল, বোধ হয় সে নিজেই ঠিকমত উপলব্ধি করে নাই, তথাপি গিরিগাত্র-স্খলিত উপলখণ্ডসকল যেমন নির্ঝরের পথ ধরিয়া আপনার ভারবেগে আপনিই গড়াইয়া চলে, তেমনি করিয়াই তাহার সদ্য উৎসারিত আকস্মিক বেদনার অনুভূতি চোখের জলের পথ ধরিয়া কথার মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া নিরন্তর বহিয়া চলিতে লাগিল। মাঠের [illegible] জন্য চাষারা একবার এই পথের উপর দিয়া নালা কাটিয়া দিয়াছিল। নন্দী মহাশয়ের আদেশ অর্জন করিবার মত প্রচুর দক্ষিণা যখন তাহারা কোনমতেই সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তখনই শুধু সর্বনাশ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এই কাজ করিয়াছিল; কিন্তু দরিদ্রের এই দুঃসহ স্পর্ধা এককড়ি হুজুরের গোচর করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, নিরুপায়ের অশ্রুজলে ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন নাই। স্থানটা তখন পর্যন্ত অসমতল অবস্থাতেই ছিল। দরিদ্র-পীড়নের এই উৎকট চিহ্ন এই পথে কতবারই ত তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু আজ ইহাই চোখে পড়িয়া দুই চোখ অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, আহা! কত ক্ষতিই না জানি হয়েছে! কত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে হয়ত পেট ভরে দু'বেলা খেতেও পাবে না। কেনই বা মানুষে এ-সব করে? জায়গাটা অন্ধকারেই কলকাজ পর্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, হাতে টাকা থাকলে কালই মিস্ত্রি লাগিয়ে এটা বাঁধিয়ে দিতাম, প্রতি বৎসর এ নিয়ে আর তাদের দুঃখ পেতে হ'তো না। আচ্ছা, কত টাকা লাগে? সে পথ ছাড়িয়া মাঠে

নামিয়া গেল, এবং সমস্তটা মন দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। এ সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাহার ছিল না. কত ইট, কত চুন-বালি. কত কাঠ. কি কি আবশ্যক কিছুই সে জানিত না, কিন্তু কথাটা তাহাকে যেন পাইয়া বসিল। সেইখানে ভূতের মত অন্ধকারে একাকী দাঁড়াইয়া সে কেবলই মনে মনে হিসাব করিতে লাগিল. এই ব্যয় তাহার সাধ্যাতীত কি না।

পথের ও-ধার দিয়া কি একটা ছুটিয়া গেল? হয়ত কুকুর কিংবা শিয়াল হইবে, কিন্তু তাহার চমক ভাঙ্গিল। পরের জন্য দুঃখ বোধ করা এমনই অভ্যাসবিরুদ্ধ যে. চমক ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সমস্ত তামাশাটা একমুহূর্তে ধরা পড়িয়া তাহার ভারী হাসি পাইল। তাড়াতাড়ি রাস্তায় উঠিয়া আসিয়া শুধু বলিল, বাঃ. বেশ ত কাণ্ড! কেউ যদি দেখে ত কি ভাববে! জীবানন্দ আজ মদ না খাইয়াই বাহির হইয়াছিল. তাহার আজিকার এই মনের দুর্বলতার হেতু সে বুঝিল. অবসাদগ্রস্ত চিত্তের মাঝে কেন যে আজ অকারণে কেবল কান্নার সুরই বাজিয়া উঠিতেছে, ইহারও কারণ বুঝিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল না। আরও একটা জিনিস, নিজের সম্বন্ধে আজ তাহার প্রথম সন্দেহ হইল যে দীর্ঘদিনের অভ্যাস আজ তাহার সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া একেবারে স্বভাবে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আপনাকে আপন বলিয়া দাবী করিবার দাবী হয়ত তাহার চিরদিনের মত হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কিসের জন্য বাটীর বাহির হইয়াছিল ঠিক স্মরণ করিতে পারিল না, ঝোঁকের মাথায় জোর করিয়া যখন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিল. তখন স্থিরসংকল্প হয়ত কিছুই ছিল না, হয়ত অগোচরে অস্পষ্টরূপে অনেক কথাই ছিল—যাহা এখন একেবারে লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। গৃহত্যাগের কোন উদ্দেশ্যই মনে পড়িল না। কিন্তু গৃহে ফিরিতেও ইচ্ছা করিল না। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাস্তা ছাড়িয়া পায়ে-হাঁটা যে পথটা মাঠের উপর দিয়া কোনাকুনি চণ্ডীগড়ের দক্ষিণ ঘুরিয়া গিয়াছে. অন্ধকারে সেই পথেই সে পা বাড়াইল। পথটা দীর্ঘ এবং বন্ধুর. প্রতি পদক্ষেপেই বাধা পাইতে লাগিল. কিন্তু ধাক্কা খাইয়া, হোঁচট খাইয়া পথ চলিতে চলিতে বিক্ষিপ্ত চিত্ততল তাহার কখন যে ইট. কাঠ. চুন এবং সুরকির চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সে জানিতেও পারিল না।

জিনিসটা কিছুই নয়. ছোট একটা সাঁকো. বীজগ্রামের জমিদারের কাছে তাহার চেয়ে তুচ্ছ বস্তু আর ত কিছু হইতেই পারে না। সেটা তৈরি করার মধ্যে না আছে শিল্প, না আছে সৌন্দর্য; তবুও এই শিল্পসৌন্দর্যহীন সামান্য বস্তুটাই যেন কত দুঃখীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়া তাহার মনের মধ্যে আজ এক নূতন রসে ভরিয়া অসামান্য হইয়া দেখা দিল! তাহাকে কতপ্রকারে ভাঙ্গিয়া কতরকমে গড়িয়া সে যেন আর শেষ হইতেই চাহিল না। অথচ এ-সকল যে শুধু তাহার অবসন্ন মনের ক্ষণস্থায়ী খেয়াল, সত্যবস্তু নয়, কাল দিনের বেলা ইহার চিহ্নমাত্র রহিবে না. এ কথাও সে বিস্মৃত হইল না, উৎসবের মাঝে গোপন শোকের মত কোথায় যেন বিঁধিয়াই রহিল। অথচ আজ রাত্রির মত এই ছেলেমানুষীটাকে সে কোন-মতেই ছাড়িতে পারিল না. প্রশ্রয় দিয়া দিয়া কল্পনার পরে কল্পনা যোজনা করিয়া অবিশ্রাম চলিতে লাগিল।

সহসা কালো আকাশপটে চণ্ডী মন্দিরের চূড়া দেখা দিল। এতদূর আসিয়াছে তাহার হুঁশ ছিল না; আরও কাছে আসিয়া মন্দিরের ছোট দরজাটা তখনও খোলা আছে দেখিতে পাইয়া নিঃশব্দে ভিতরে প্রবেশ করিল। দেবীর আরতি অনেকক্ষণ শেষ হইয়া গেছে. মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ. সমস্ত প্রাঙ্গণে ঘোর অন্ধকার. শুধু নাটমন্দিরের একধারে মিটমিট করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে। জীবানন্দ নিকটে গিয়া দেখিল জন চার-পাঁচ লোক মশার ভয়ে আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে. শুধু কে একজন থামের আড়ালে চুপ করিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছে। জীবানন্দ আরও একটু কাছে গিয়া লোকটিকে দেখিবার চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল. কে তুমি?

লোকটি জীবানন্দের ধপধপে সাদা পরিচ্ছদ অন্ধকারেও অনুভব করিয়া তাঁহাকে ভদ্র ব্যক্তি বলিয়া বুঝিল, কহিল, আমি একজন যাত্রী বাবু।

ওঃ—যাত্রী! কোথায় যাবে?

আজ্ঞে. আমি যাবো শ্রীশ্রীপুরীধামে।

কোথা থেকে আসচো? এরা বুঝি তোমার সঙ্গী? এই বলিয়া জীবানন্দ ঘুমন্ত লোকগুলিকে দেখাইয়া দিল।

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে না, আমি একাই আসচি মানভূম জেলা থেকে। এদের কারও বাড়ি মেদিনীপুর, কারও বাড়ি আর কোথাও—কোথায় যাবে তাও জানিনে। দুজন ত কেবল আজ দুপুরবেলাতে এসেছে।

জীবানন্দ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, কত লোক এখানে রোজ আসে? যারা থাকে তারা দুবেলা খেতে পায়, না?

লোকটা বিব্রত হইয়া পড়িল। লজ্জিতভাবে কহিল, কেবল খাবার জন্যেই সবাই থাকে না বাবু। পায়ে-হাঁটা আমার অভ্যাস ছিল না। তাই ফেটে গিয়ে ঘায়ের মত হ'ল। মা ভৈরবী নিজের চোখে দেখে হুকুম দিলেন, যতদিন না সারে এখানে থাকো।

জীবানন্দ কহিল, বেশ ত, থাকো না। জায়গার ত আর অভাব নেই হে।

কিন্তু মা ভৈরবী ত আর নেই শুনতে পেলাম।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, এরই মধ্যে শুনতে পেয়েচ? তা না-ই তিনি থাকলেন, তাঁর হুকুম ত আছে। তোমাকে যেতে বলে সাধ্য কার? তোমার যতদিন না পা সারে, তুমি থাকো। এই বলিয়া জীবানন্দ তাহার কাছে আসিয়া বসিল।

লোকটা প্রথমে একটু ভয় ও সঙ্কোচ অনুভব করিল, কিন্তু সে ভাব রহিল না। এবং দেখিতে দেখিতে অন্ধকার এই নির্জন নিস্তব্ধ দেবায়তনের একান্তে পরাক্রান্ত এক ভূস্বামী ও দীন গৃহহীন আর এক ভিক্ষুকের সুখ-দুঃখের আলোচনা একেবারে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। লোকটির নাম উমাচরণ, জাতিতে কৈবর্ত, বাটী আগে ছিল মানভূম জেলার বংশীতট গ্রামে। গ্রামে অন্ন নাই, জল নাই, চিকিৎসক নাই—এ যাঁহার ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি, তিনি পশ্চিমের কোন এক শহরে ওকালতি করেন। রাজায় প্রজায় প্রীতি নাই, সম্বন্ধ নাই, আছে শুধু শোষণ করিবার বংশগত অধিকার। এই ফাল্গুনের শেষে বিসূচিকা রোগে তাহার স্ত্রী মরিয়াছে, উপযুক্ত দুই পুত্র একে একে চোখের উপর বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে কোন উপায় করিতে পারে নাই; অবশেষে জীর্ণ ঘরখানি সে তাহার বিধবা ভ্রাতুষ্কন্যাকে দান করিয়া চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এ জীবনে আর তাহার ফিরিবার আশা নাই, ইচ্ছা নাই; এই বলিয়া সে ছেলেমানুষের মত হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। জীবানন্দের চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পরের কান্না তাহার কাছে নতুন বস্তু নয়, এ সে জীবনে অনেক দেখিয়াছে, কিন্তু কোনদিন এতটুকু দাগ পর্যন্ত ফেলিতে পারে নাই, আজও সে ছাড়া আর কেহ জানিতেও পারিল না, কিন্তু অন্ধকারে জামার খুঁট দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল কোথাও ছুটিয়া গিয়া যে স্ত্রী তাহার মরে নাই, যে ছেলে তাহার জন্মে নাই, যে গৃহ তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিতে হয় নাই, তাহাদেরই জন্য এই অপরিচিত লোকটার মতই ডাক ছাড়িয়া কাঁদে। খানিক পরে সে কতকটা আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিল, বাবু, আমার মত দুঃখী আর সংসারে নেই।

জীবানন্দ কহিল, ওরে ভাই, সংসারটা ঢের বড় জায়গা, এর কোথায় কে কিভাবে আছে বলবার জো নেই।

ইহার তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করিবার মত শিক্ষা বা শক্তি এই সামান্য লোকটার ছিল না জীবানন্দ নিজেও তাহা আশা করিল না, কিন্তু থামিতেও পারিল না। তাহার অশ্রুসিক্ত কণ্ঠস্বরের অপূর্বতা তাহার কানে এমন অমৃত সিঞ্চন করিল যে, সে-লোভ সে সামলাইতে পারিল না। বলিতে লাগিল, দুঃখীদেরও কোন আলাদা জাত নেই দাদা, দুঃখেরও কোন বাঁধানো রাস্তা নাই। তা হলে সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে পারত। হুড়মুড় করে যখন ঘাড়ে এসে পড়ে তখনই মানুষ তাকে টের পায়। কিন্তু কোন্ পথে যে তার আনাগোনা আজও কেউ তার খোঁজ পেলে না। আমার সব কথা তুমি বুঝবে না ভাই, কিন্তু সংসারে তুমি একলা নও—অন্ততঃ একজন সাথী তোমার বড় কাছেই আছে, তুমি চিনতে পারনি।

লোকটি চুপ করিয়া রহিল। কথাও বুঝিল না, সাথী যে কে আছে তাহাও জানিল না।

জীবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি মায়ের নাম করছিলে ভাই, আমি বাধা দিলাম। আবার শুরু কর, আমি চললাম, কাল এমনি সময়ে হয়ত আবার দেখা হবে।

লোকটি কহিল, আর ত দেখা হবে না বাবু, আমি পাঁচদিন আছি, কাল সকালেই চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে? কিন্তু এই যে বললে তোমার পা সারেনি, তুমি হাঁটতে পারো না।

সে কহিল, মায়ের মন্দির এখন রাজাবাবুর। হুজুরের হুকুম, তিনদিনের বেশী আর কেউ থাকতে পারবে না।

জীবানন্দ হাসিয়া কহিল, ভৈরবী এখনও যায়নি, এরই মধ্যে হুজুরের হুকুম জারি হয়ে গেছে! মা চণ্ডীর কপাল ভাল! এই বলিয়া হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আজ অতিথিদের সেবা হ'লো কিরকম? কি খেলে ভাই?

সে কহিল, যারা তিনদিন আসেনি তারা সবাই মায়ের প্রসাদ পেলে।

আর তুমি? তোমার ত তিনদিনের বেশী হয়ে গেছে!

লোকটি ভালমানুষ, সহসা কাহারও নিন্দা করা স্বভাব নয়, বলিল, ঠাকুরমশাই কি করবেন, রাজাবাবুর হুকুম নেই কিনা।

তাই হবে। বলিয়া জীবানন্দ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। খুব সম্ভব অনাহূত যাত্রীদের সম্বন্ধে পূর্বে হইতেই এমনি একটা নিয়ম ছিল, কিন্তু ষোড়শী তাহা মানিয়া চলিতে পারিত না। এখন তারাদাস এবং এককড়ি নন্দী উভয়ে মিলিয়া জমিদারের নাম করিয়া সে ব্যবস্থা অক্ষরে অক্ষরে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই যদি হয়, অভিযোগ করিবার খুব বেশী হেতু নাই, কিন্তু মন তাহার কোনমতেই এ কথা স্বীকার করিতে চাহিল না। অন্তর হইতে সে বার বার কহিতে লাগিল, এমন হইতেই পারে না! এমন হইতেই পারে না! বুভুক্ষুকে আহার দিবার আবার বিধিব্যবস্থা কি! ওই যে ক্ষুধার্ত অতিথি ওইখানে অনাহারে বসিয়া রহিল, ক্ষুধাকে তাহার বাঁধিয়া রাখিবে ইহারা কোন্ আইন-কানুনে? কহিল, ওহে ভাই, কাল আবার আমি আসব, কিন্তু চুপি চুপি চলে যেতে পারবে না, তা বলে যাচ্ছি।

কিন্তু ঠাকুরমশাই যদি কিছু বলেন?

জীবানন্দ কহিল, বললেই বা। এত দুঃখ সইতে পারলে আর বামুনের একটা কথা সইতে পারবে না? ধীরে ধীরে বাহির হইয়া যাইতেছিল, হঠাৎ মন্দিরের বারান্দায় থামের আড়ালে মানুষের চাপা-গলা শুনিয়া বিস্মিত হইল। প্রথমে মনে করিল, নিভৃতে কেহ আরাধনা করিতে আসিয়াছে, কিন্তু কথাটা তাহার কানে গেল। কে একজন বলিতেছে, আমাদের মায়ের সর্বনাশ যে করেচে তার সর্বনাশ না করে আমরা কিছুতে ছাড়ব না বলে দিচ্চি।

অন্যজন জবাব দিল, মায়ের চৌকাঠ ছুঁয়ে দিব্যি করলাম খুড়ো—ফাঁসি যেতে হয়, তাও যাবো।

আর একজন বলিল, হঃ—আমাদের আবার জেল! আমাদের আবার ফাঁসি! মা চলে যেতে চাচ্চে, আগে যাক্—

অন্ধকারে না চিনিল মানুষ, না চিনিল গলা, তবু মনে হইল একজনের গভীর কণ্ঠস্বর সে কোথাও যেন শুনিয়াছে, একেবারে অপরিচিত নয়। চেষ্টা করিলে হয়ত মনে করিতেও পারিত, কিন্তু আজ তাহার সেদিকে মনই গেল না। সে ত অনেকের অনেক সর্বনাশ করিয়াছে—অতএব নিজেই ত সে ইহার লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু আজ তাহা নির্ণয় করিবার ইচ্ছাই হইল না। মনে মনে হাসিয়া কহিল, বাস্তবিক, ঠাকুর দেবতার মত এমন সহৃদয় শ্রোতা আর নেই। হোক না মিথ্যা দম্ভ, তবু তার দাম আছে। দুর্বলের ব্যর্থ পৌরুষ তবু একটু গৌরবের স্বাদ পায়! আহা!

অলক্ষ্যে নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া আসিল তখন রাত্রি বোধ হয় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। নির্মল কালো আকাশ তারায় তারায় ঠাসা। সেই অসংখ্য নক্ষত্রলোক হইতে ঝরিয়া অদৃশ্য আলোকের আভাস অন্ধকার পথের মাটিকে ধূসর করিয়া দিয়াছে। তাহারই মাঝে মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কঠিন মাটির স্তূপ পথশ্রান্ত পথিকের মত কতকাল ধরিয়া যেন নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার ইতিহাস নাই, তাহারই একটি পাশে গিয়া সে ঠিক তেমনি করিয়াই ধূলার উপর বসিয়া পড়িল।

সুমুখে কতকটা পতিত জমির একধারে ষোড়শীর কুটীর, গাছের আড়ালে বেশ স্পষ্ট

দেখা না গেলেও তাহার মনে হইল অনেকগুলি মানুষ যেন সার বাঁধিয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনতিদূর দিয়া যখন চলিয়া গেল, তখন ইহাদের কথাবার্তা হইতে জীবানন্দ এইটুকু সংগ্রহ করিল যে, ষোড়শীর গোযান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং কাল প্রত্যুষেই সে চণ্ডীগড় ত্যাগ করিয়া যাইবে। ভক্ত প্রজার দল তাহার পদধূলি লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। ষোড়শীকে নিষেধ করিবার পথ নাই, নিষেধ করিলে সে শুনিবে না, এই কয়দিনে এতটুকু তাহাকে সে চিনিয়াছে—কিন্তু মন তাহার ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সজ্ঞানে ও অজ্ঞানে ইহার বিরুদ্ধে যত অন্যায় করিয়াছে, একটি একটি করিয়া এতকাল পরে তাহার তালিকা করা অসম্ভব, কিন্তু সেই সকল অগণিত অত্যাচারের সমষ্টি আজ তাহার চোখের উপর স্তূপাকার হইয়া উঠিল। ইহাকে সরাইয়া রাখিবার স্থান সংসারে সে কোথাও দেখিল না। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতে যাহাকে লজ্জাবোধ করিয়াছে, গণিকা বলিয়া তাহাকেই কামনা করিবার শয়তানী সে যে কোথায় পাইয়াছিল ভাবিয়া পাইল না। আজ সমস্ত হৃদয় তাহার ষোড়শীকে একান্ত-মনে চাহিতেছে, এ তাহার অধিকারের দাবী, অথচ চিরদিন ইহাকেই উপেক্ষা করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যার পরে মিথ্যা জমা করিয়া, সে যে প্রাচীর গড়িয়া তুলিয়াছে, আজ তাহাকে লঙ্ঘন করিবার পথ তাহার কৈ?

হঠাৎ সম্মুখেই দেখিতে পাইল কে একজন দ্রুতপদে চলিয়াছে। তাহাকে অন্ধকারে চিনিতে বিলম্ব হইল না, ডাকিল, অলকা?

ষোড়শী চমকিয়া দাঁড়াইল। এ যে জীবানন্দ তাহা সে ডাক শুনিয়াই বুঝিয়াছিল। একটু সরিয়া আসিয়া তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখানে কেন?

জীবানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি জানি, এমনিই বসে ছিলাম। তুমি যাত্রার আগে ঠাকুর প্রণাম করতে যাচ্চো, না? চল, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

এই একটা বেলার মধ্যে তাহার কণ্ঠস্বরে কি যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ষোড়শী বিস্ময়ে মৌন হইয়া রহিল। ক্ষণেক পরে কহিল, আমার সঙ্গে যাবার বিপদ আছে, সে ত আপনি জানেন।

জীবানন্দ বলিল, জানি। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে একেবারে নেই। আজ আমি একা এবং সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—একগাছা লাঠিও সঙ্গে নেই।

ষোড়শী কহিল, শুনেচি। প্রফুল্লবাবু আপনাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, তাঁর কাছে খবর পেলাম আজ আপনি নিরস্ত্র বাড়ি থেকে একলা বেরিয়ে গেছেন, এবং—

এবং ঝোঁকের উপর মদ না খেয়ে বার হয়ে গেছি, না?

ষোড়শী কহিল, হাঁ। কিন্তু চণ্ডীগড়ে এ কাজ আর আপনি ভবিষ্যতে করবেন না।

জীবানন্দ কহিল, এ কাজ আমি প্রত্যহ করব এবং যতদিন বাঁচব—করব। প্রফুল্ল তোমাকে এত কথা বলেচে, এ কথা বলেনি যে, এ জীবনে আর যাই কেন না স্বীকার করি পৃথিবীতে আমার শত্রু আছে এ আমি একদিনও আর স্বীকার করব না?

ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইহার যুক্তি লইয়াও তর্ক করিল না, এ কথার স্থায়িত্ব লইয়াও প্রশ্ন করিল না। জীবানন্দের মুখের চেহারা অন্ধকারে সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু এই তাহার অদ্ভুত কণ্ঠস্বর নিশীথে এই নির্জন প্রান্তরের মধ্যে তাহার দুই কান ভরিয়া এক আশ্চর্য সুরে বাজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, আমার সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে আপনার কি হবে?

জীবানন্দ কহিল, কিছুই না। শুধু যতক্ষণ আছ, সঙ্গে থাকব, তার পরে যখন যাবার সময় হবে তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আমি বাড়ি চলে যাবো।

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না। জীবানন্দ কহিল, যাবার দিনে আজ আর আমাকে তুমি অবিশ্বাস ক'রো না অলকা। আমার জীবনের দাম তুমি ত জানো, আর হয়ত দেখাও হবে না। আমাকে যে তুমি কতরকমে দয়া করে গেছ, আমার শেষ দিন পর্যন্ত আমি সেই-সব কথাই স্মরণ করব।

ষোড়শী কহিল, আচ্ছা আসুন—এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

মিনিট-দুই নিঃশব্দে চলার পরে জীবানন্দ কহিল, লোকে বলে, ও দয়ার যোগ্য নয়। আচ্ছা অলকা, দয়ার আবার যোগ্যতা অযোগ্যতা কি? দয়া যে করে সে ত নিজের গরজেই

করে। নইলে, দয়া পাবার যোগ্যতা আমার ছিল এত বড় দোষারোপ করতে ত শুধু অতি বড় শত্রু নয়, তুমি পর্যন্ত পারবে না।

ষোড়শী মৃদুস্বরে বলিল, আমার চেয়ে আপনার বড় শত্রু সংসারে বুঝি আর কেউ নেই?

জীবানন্দ বলিল, না।

মন্দিরে প্রবেশ করার পরে জীবানন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, মজা দেখ অলকা, যাদের নিজের অন্ন নেই, সংসারে তারাই অপরের অন্নে সবচেয়ে বড় বাধা। ষোড়শী জিজ্ঞাসু-মুখে ফিরিয়া চাহিতে কহিল, আজ আমি এতক্ষণ পর্যন্ত এই মন্দিরেই বসে ছিলাম। ভৈরবী নেই, এখন জমিদার কর্তা। হুজুরের নাম করে তাই এরই মধ্যে যাত্রীদের উপর তে-রাত্রির আইন জারি হয়ে গেছে। তোমার সেই যে খোঁড়া অতিথিটি, পা না সারা পর্যন্ত যাকে তুমি থাকতে অনুমতি দিয়েছ, তার মুখেই শুনতে পেলাম হুজুরের কড়া হুকুমে আজ তার অন্ন বন্ধ। সে-বেচারা অভুক্ত বসে চন্ডীনাম জপ করছিল—হুজুরের কল্যাণ হোক, কাল সকালেই নাকি আবার তাকে চলে যেতে হবে, পা দুটো তার থাক আর যাক।

ষোড়শী কহিল, আমার বাবা বুঝি হুকুম দিয়েছেন?

জীবানন্দ বলিল, শুধু তোমার বাবা কেন, গরীব-দুঃখীর প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য করতে অনেক বাবাই এ গ্রামে আছেন, আর হুজুরের সুনামে ত স্বর্গ-মর্ত্য ছেয়ে গেল। লোকটার কাছে বসে বসে তাই ভাবছিলাম অলকা, তোমার যাবার পরে সন্ন্যাসিনীর আসনে বসে এই সব বাবার দল যে তান্ডব-কান্ড বাধাবে তাকে আমি সামলাবো কি করে?

ষোড়শী চুপ করিয়া রহিল।

জীবানন্দ নিজেও বহুক্ষণ অবধি মৌন থাকিয়া মনে মনে কত কি যেন ভাবিতে লাগিল, অকস্মাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন অলকা। দুটো দিনও কি আর তোমার থাকা চলে না?

ষোড়শী শান্তকণ্ঠে শুধু কহিল, না। তার পরে সে উঠিয়া গিয়া রুদ্ধ মন্দিরের দ্বারে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, জীবানন্দ কহিল, আর একটা দিন?

ষোড়শী বলিল, না।

তবে সকল অপরাধ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে আজ ক্ষমা করে যাও।

কিন্তু তাতে কি আপনার খুব বেশী প্রয়োজন আছে?

জীবানন্দ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, এর উত্তর আজ দেবার আমার শক্তি নেই। এখন কেবল এই কথাই আমার সমস্ত মন ছেয়ে আছে অলকা, কি করলে তোমাকে একটা দিনও ধরে রাখতে পারি। উঃ—নিজের মন যার পরের হাতে চলে যায়, সংসারে তার চেয়ে নিরুপায় বুঝি আর কেউ নেই। আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ, লোকে জানবে আমি তোমাকেই শাস্তি দিয়েচি, তুমি সহ্য করেচ, আর নিঃশব্দে চলে গেছ। তুমি যাবার আগে তোমার মা-চন্ডীকে জানিয়ে যাও, যে এর চেয়ে মিথ্যে আর নেই।

ষোড়শী কোন উত্তর না দিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিবার মুখে সহসা জীবানন্দ দুই হাত প্রসারিত করিয়া কহিল, তোমার ঠাকুরের সুমুখে দাঁড়িয়ে আজ এই কথাটি আমাকে বলে দাও, কি করলে তোমাকে আমি কেবল একটি দিন কাছে রাখতে পারি। তার পরে তুমি—

ষোড়শী পিছাইয়া গিয়া কহিল, চৌধুরীমশায়, আপনার পাইক-পিয়াদারা কি কেউ নেই যে এত অনুনয়-বিনয়? আপনি ত জানেন, আমি কারও কাছে নালিশ করব না।

জীবানন্দ পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রাগ করিল না, প্রতিঘাত করিল না, সবিনয়ে ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যাও, অসম্ভবের লোভে আর তোমাকে আমি পীড়ন করব না। পাইক-পিয়াদা সবাই আছে অলকা, কিন্তু যে নিজে ধরা দেবে না, জোর করে ধরে রেখে তার বোঝা বয়ে বেড়াবার জোর আমার গায়ে নেই।

ষোড়শী পথ ছাড়া পাইয়াও পা বাড়াইল না, কহিল, আমি কোথায় যাচ্ছি সে কৌতূহল বোধ করি আর আপনার নেই?

জীবানন্দ কহিল, কৌতূহল? বোধ হয় তার সীমা নেই—কিন্তু তাতে আর জ্বালা নেই অলকা। আমি কেবল এই কামনা করি, সেখানে কষ্ট তোমাকে যেন কেউ না দেয়।

তোমার প্রতি যারা বিরূপ তারা যেন তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে পারে। হঠাৎ গলাটা যেন তাহার ধরিয়া আসিল, কিন্তু নিজের দুর্বলতাকে আর সে প্রশ্রয় দিল না, মুহূর্তে সামলাইয়া ফেলিয়া কহিল, আমি জানি, যে লোক স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে যায়, তার সঙ্গে লড়াই চলে না। যেদিন আমাদের হাতে তোমার চাবি ফেলে দিলে সেইদিন তোমার কাছে আমাদের একসঙ্গে সকলের হার হলো। তোমার জোরের আজ অবধি নেই—তবু ত মানুষের মন বোঝে না। যতদিন বেঁচে থাকব, এ আশঙ্কা আমার কোনদিন ঘুচবে না।

ষোড়শী সেইখানে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া জীবানন্দের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া কহিল, আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—

কি অনুরোধ অলকা?

ষোড়শী মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া কহিল, সে আপনি জানেন।

জীবানন্দ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, হয়ত জানি, হয়ত ভেবে দেখলে জানতেও পারব—কিন্তু সেই যে একদিন বলেছিলে সাবধানে থাকতে—কি জানি, সে বোধ হয় আর পেরে উঠব না। আজই কিছুক্ষণ পূর্বে এই মন্দিরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কে দু'জন দেবতার চৌকাঠ ছুঁয়ে প্রাণ পর্যন্ত পণ করে শপথ করে গেল, তাদের মায়ের যে সর্বনাশ করেছে তার সর্বনাশ না করে তারা বিশ্রাম করবে না—আড়ালে দাঁড়িয়ে নিজের কানেই ত সমস্ত শুনলাম—দু'দিন আগে হলে হয়ত মনে হ'তো, সে বুঝি আমি—দুশ্চিন্তার সীমা থাকত না, কিন্তু আজ কিছু মনেই হ'লো না—কি অলকা?

না, কিছু নয়, বলিয়া ষোড়শী জোর করিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে জীবানন্দ দেখিতে পাইল না, সহসা তাহার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। কহিল, চলুন আমার ঘরে গিয়ে একটুখানি আজ বসতে হবে। আমাকে গাড়িতে তুলে না দিয়ে বাড়ি যেতে আপনাকে দেব না। আসুন—

পঁচিশ

গরুর গাড়ির নীচে চাদর মুড়ি দিয়া গাড়োয়ান শুইয়াছিল, সে ষোড়শীর পায়ের শব্দ অনুভবে বুঝিয়া কহিল, মা, শৈবাল-দীঘি ত দশ-বারো ক্রোশের পথ, একটু রাত থাকতে বার না হলে পোঁছতে কাল প্রহর বেলা উৎরে যাবে।

ষোড়শী বলিল, আচ্ছা, তাই হবে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, কোথায় যাচ্চি বোধ করি শুনতে পেলেন?

জীবানন্দ কহিল, পেলাম বৈ কি।

ষোড়শী কহিল, বেশী দূরে নয়। আপনার আক্রোশ এ পথটুকু অনায়াসে খুঁজে বার করতে পারবে।

কিন্তু তোমার ওপর আক্রোশ ত আমার নেই।

ঘর খুলিয়া ষোড়শী প্রবেশ করিল, কহিল, আমার একটিমাত্র কম্বল গাড়িতে পাতা। আপনাকে বসতে দিই এমন কিছু নেই। নির্মলবাবু হলে আঁচল বিছিয়ে দিতাম, কিন্তু আপনাকে ত তা মানাবে না। এই বলিয়া সে মুচকিয়া একটু হাসিয়া ঘরের কোণ হইতে একখানি কুশাসন গ্রহণ করিয়া মেঝের উপর পাতিয়া দিয়া বলিল, যদি অপরাধ না নেন ত—

জীবানন্দ নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া নীরব হইয়াই রহিল।

এতবড় শ্লেষের উত্তর না পাইয়া ষোড়শী মনে মনে বিস্মিত হইল। প্রদীপের আলো অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল, ষোড়শী উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সেটা হাতে করিয়া জীবানন্দের মুখের কাছে আনিয়া মুহূর্তকাল স্থিরভাবে থাকিয়া কহিল, কি ভাবচেন বলুন ত?

আমার ভাবনার কি অন্ত আছে?

অন্ত না থাকে আদি ত আছে, তাই বলুন।

জীবানন্দ মাথা নাড়িয়া কহিল, না, তাও নেই। যার অন্ত নেই তার আদিও থাকে না। ষোড়শীর মুখে আসিয়া পড়িল, ও-সকল কেবল দর্শনশাস্ত্রের বুলি—শুধু বাক্য—

ও লইয়া সংসার চলে না, কিন্তু জীবানন্দের মুখ দেখিয়া তাহার নিজের মুখে স্বর বাহির হইল না। মনে মনে সে সত্যই বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনুভব করিল, একটা কেবল সুচতুর উত্তর দিবার জন্যই এ কথা আজ সে বলে নাই, এ লইয়া আর বাদানুবাদ করিতে সে চাহে না। যাহাকে একান্তই নিষ্ফল বলিয়া বুঝিয়াছে সে লইয়া আর তর্ক কেন?

সেইখানে চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ষোড়শী উঠিয়া গিয়া প্রদীপ রাখিয়া হাত ধুইল, কহিল, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

কি?

এই ঘরে একদিন আমার কাছে আপনি চেয়ে খেয়েছিলেন, আজ তেমনি আমার চাওয়ায় আপনাকে খেতে হবে।

দাও। ক্ষিদেও পেয়েচে।

সে জানি। আমরা পুরুষমানুষের মুখের পানে চাইলেই টের পাই। বলিয়া ষোড়শী জল-হাতে মুছিয়া লইয়া সামনেই ঠাঁই করিয়া দিল। দেবীর প্রসাদ আজ ছিল না, কিন্তু প্রজারা আজ তাহাকে অনেক-কিছু দিয়া গিয়াছিল, তাহাই পাতায় করিয়া সাজাইয়া আনিতে ষোড়শী রান্নাঘরে চলিয়া গেলে একাকী চারিদিকে চাহিয়া সেদিনের সেই দোয়াত ও কলমটা কুলুঙ্গির উপরে তাহার চোখে পড়িল। মিনিট-দুই চিন্তা করিয়া সে তাহা পাড়িয়া আনিল। পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া তাহার সাদা অংশটা ছিঁড়িয়া লইয়া প্রদীপের সুমুখে আসিয়া সে পত্র লিখিতে বসিল। বোধ হয় তিন-চারি ছত্রের বেশী নয়, শেষ করিয়া ভাঁজ করিল, এবং উপরে ষোড়শীর নাম লিখিয়া তাহা পকেটে রাখিয়া দিল। খানিক পরে খাবার লইয়া ষোড়শী প্রবেশ করিল। শালপাতায় জলে-ভিজানো সরু ধানের চিড়া, শাল-পাতার ঠোঙ্গায় দধি, আর একটা পাতায় কিছু ফলমূল ও চিনি, এবং ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া দিয়া একটুখানি মলিন হাসিয়া বলিল, সেদিন ধনীর দেওয়া ঠাকুরের প্রসাদ ছিল, আর আজ গরীবের ঘরের চিড়ে দই আর একটু চিনি। এ কি আপনার মুখে রুচবে?

জীবানন্দ হাতমুখ ধুইয়া খাইতে বসিয়া বলিল, তুমি খেতে দিলে মুখের জন্যে ভাবিনে অলকা, কিন্তু পেটে সহ্য হলে হয়; আমার আবার সেই কলিকের ব্যথাটায়—

কথা শেষ না হতেই ষোড়শী চক্ষের পলকে পাতাটা টানিয়া লইল। ব্যাকুল ম্লানমুখে কপালে করাঘাত করিয়া কহিল, আমার পোড়াকপাল, তাই ভুলেছিলাম! কিন্তু এ ত আপনাকে আমি প্রাণান্তে খেতে দিতে পারব না।

জীবানন্দ নিজের কথায় লজ্জাবোধ করিয়া কহিল, বেশী না খেলে বোধ হয় ক্ষতি হবে না।

ষোড়শী বলিল, বোধ হয়। বোধ হয় নিয়ে আপনাদের চলে, কিন্তু আমাদের চলে না।

কিন্তু এর জন্যে ত তোমার দুঃখ হবে।

ষোড়শী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, দুঃখ হবে কি গো? খাবার সময় তোমার মুখের খাবার কেড়ে নিয়েচি, কিচ্ছু দিতে পারিনি—আমি তো কেঁদেই মরে যাবো। একটু মৌন থাকিয়া হঠাৎ ভারী একটা অনুনয়ের স্বরে বলিয়া উঠিল, ও-বেলা নানা ঝঞ্ঝাটে রাঁধতে পারিনি, এবেলা সন্ধ্যার পর রেঁধেছি। ভাত, মাছের ঝোল—

মাছের ঝোল কি রকম?

ষোড়শী হাসিয়া কহিল, কেন, আমি কি বিধবা নাকি? আমি ত সব খাই।

এতক্ষণ পরে জীবানন্দ হাসিল, বলিল, তা হলে সেগুলি সব নিজের জন্যে রেখে আমাকে দয়া করে ফলার খাওয়াতে গেলে কেন?

ষোড়শী তৎক্ষণাৎ কহিল, আমার দোষ হয়েচে, অপরাধ হয়েচে—একশ'বার ঘাট স্বীকার করচি। যদি বলেন ত আপনার কাছে আমি দশ হাত মেপে নাকে খত দিতে পারি। এই বলিয়া সে ভিজা-চিড়ার পাতাটা তুলিয়া ভাত ও মাছের ঝোল আনিতে হাসিমুখে উঠিয়া গেল।

ষোড়শীর প্রশ্নের উত্তরে জীবানন্দ যখন বলিয়াছিল, তাহার ভাবনার আদি-অন্ত নাই

তখন সে মিথ্যা বলে নাই, বোধ করি বাড়াইয়াও বলে নাই। এ জীবনে নিজের জীবনকে সে কখনও আলোচনার বিষয় করে নাই, এবং কোনদিন কোন প্রয়োজনই তাহার মুহূর্তের প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পায় নাই। তাই তাহার ক্ষণকালের রুমালের প্রয়োজন ক্ষণপরের ঢাকাই চাদরের চের বড়; তাই আস্তরণের অভাবে শয্যায় তাহার বহুমূল্য শাল পাতা, এইজন্যই সে হাতের কাছে অ্যাশ-ট্রে না পাইলে সোনার ঘড়ির ডালার উপরে জ্বলন্ত চুরুট রাখিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করে না। ভবিষ্যৎ তাহার কাছে সত্যবস্তু নয়, যে আসে নাই, সেই অনাগতের প্রতি সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না। নারীর যে দেহটা সে চোখে দেখিতে পায়, তাহারই প্রতি তাহার আসক্তি, কিন্তু চোখ মেলিয়া যাহাকে দেখা যায় না, সেই তাহার দেহের অতিরিক্ত যে নারীত্ব—তাহার প্রতি তাহার কোন লোভই ছিল না। কিন্তু গ্রহবশে যৌবনের একান্তে আসিয়া আজ যে গহনে সে পথ ভুলিয়াছে ইহার কোন সন্ধানই সে জানিত না। কিসের জন্য যে অন্ধকার আশেপাশে মন তাহার অহর্নিশি ঘুরিয়া মরিতেছে, নানাবিধ কৃচ্ছ্রসাধনায় যৌবন যাহার ক্ষুব্ধ নিপীড়িত, রূপ যাহার কঠিন ও কান্তিহীন, তাহাকে অনুক্ষণ কামনা করিয়া সংসার যখন তাহার এমনি বিস্বাদ হইয়া গেল, তখন কারণাতীত এই মোহের কৈফিয়ত সে যে নিজের কাছেই খুঁজিয়া পাইত না। কোন্ অবিদ্যমানে এই রমণী যে তাহার কোন্ অপূর্ণতা সম্পূর্ণ করিয়া দিবে, কি তাহার প্রয়োজন, এই অপরিচিত চিন্তার সে কূল পাইত না।

ভাত খাইতে বসিয়া একসময় সে বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। সম্মুখে খোলা দোরের দিকে পিঠ করিয়া ষোড়শী বসিয়াছিল, এই একটা সাধারণ প্রশ্নের ঠিকমত জবাব না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, আপনি কি ভাবচেন, আমার উত্তর দিচ্চেন না?

জীবানন্দ মুখ তুলিয়া কহিল, কিসের?

ষোড়শী বলিল, এইবারে ত আপনার চণ্ডীগড় ছেড়ে বাড়ি যাওয়া উচিত? আর ত এখানে আপনার কাজ নেই।

জীবানন্দ বোধ হয় অন্যমনস্কতার জন্যই বুঝিতে পারিল না, কহিল, কাজ নেই?

ষোড়শী বলিল, কৈ, আমি ত আর দেখতে পাইনে। এ গ্রাম আপনার, একে নিষ্পাপ করবার জন্যেই আপনি এসেছিলেন। আমার মত অসতীকে নির্বাসিত করার পরে আর এখানে আপনার কি আবশ্যক আছে আমি ত দেখতে পাইনে।

কিন্তু তুমি ত অসতী নও। এই বলিয়া জীবানন্দ চোখ মেলিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্ষণকালমাত্র তাহাদের চোখে চোখে মিলিল, তাহার পরে ষোড়শী মুখ ফিরাইয়া লইল। কিন্তু এতক্ষণ এত কথাবার্তার মধ্যে যে বস্তুটা সে লক্ষ্য করে নাই, এই ক্ষণিকের দৃষ্টিতে এই প্রথম দেখিতে পাইয়া সে যথার্থই বিস্মিত হইল। জীবানন্দের চোখে বুদ্ধির সেই অতি-তীক্ষ্ণতা ছিল না, মুখের কথার মত চাহনি তাহার স্পষ্ট, সরল এবং স্থূল। তাহার বক্রোক্তি ও অভিমান যে এই লোকটির কাছে নিষ্ফল হইয়াছে তাহা সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইল। একটু চুপ করিয়া কহিল, কিন্তু এ কথা ত এতদিন আমার চেয়ে আপনিই বেশী জানতেন।

জীবানন্দ বলিল, কিন্তু নির্মল তোমাকে ভালবাসে এ ত সত্য।

প্রত্যুত্তরে ষোড়শী তাহার আরক্ত মুখ অপরের দৃষ্টির আড়ালে রাখিয়া কহিল, সে কি আমার দোষ? আর কেউ যদি ভালবাসার কদর্যতায় জীবন আমার দুর্ভর করে তোলে, সেও কি আমার অপরাধ? কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সে তাহার মুখ দেখিয়া অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, কিন্তু আমার দোষের জন্যে ত আর এরা দায়ী নয়। এই বলিয়া সে সম্মুখের অন্ন-পাত্রটা দেখাইয়া বলিল, খাওয়া বন্ধ হ'লো কেন? সবই যে পড়ে রইল।

না, এই ত খাচ্চি, বলিয়া সে আহারে মন দিল।

গাড়োয়ান হাঁকিয়া কহিল, মা আর কি বেশী দেরি হবে?

না বাবা, আর বেশী দেরি হবে না। গলা খাটো করিয়া কহিল, চণ্ডীগড় থেকে আপনাকে কিন্তু যেতেই হবে, তা বলে দিচ্চি।

জীবানন্দ কহিল, কোথায় যাবো বল?

কেন, আপনার নিজের বাড়িতে, বীজগাঁয়ে।

বেশ, তাই যাবো।

কিন্তু কালকেই যেতে হবে।

জীবানন্দ মুখ তুলিয়া বলিল, কালই? কিন্তু কাজ আছে যে। মাঠের জলনিকেশের একটা সাঁকো করা দরকার। এদের জমিগুলো সব ফিরিয়ে দিতে হবে, সে ত তোমারই হুকুম। তা ছাড়া মন্দিরের একটা ভালো বিলি-ব্যবস্থা হওয়া চাই— অতিথি-অভ্যাগত যারা আসে তাদের ওপর না অত্যাচার হয় - এ-সব না করেই কি তুমি চলে যেতে বলচ?

ষোড়শী মুশকিলে পড়িল। কিন্তু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল এ-সব সাধু সংকল্প কি কাল সকাল পর্যন্ত থাকবে?

জীবানন্দ এই পরিহাসে যোগ দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

ষোড়শী বলিল, কিন্তু আবশ্যকের চেয়ে একটা দিনও বেশী থাকবেন না আমাকে কথা দিন। এবং সে ক'টা দিন আগেকার মত সাবধানে থাকবেন বলুন?

এ কথারও সে জবাব দিল না, নিঃশব্দে বসিয়া আহার করিতে লাগিল। ষোড়শী জিদ করিল না, কিন্তু কথার চেয়ে এই নীরবতা জীবানন্দের ভিতরের পরিবর্তন তাহার কাছে অধিকতর সুব্যক্ত করিল।

খাওয়া শেষ হইলে বাহিরে আসিয়া ষোড়শী তাহার হাতে জল ঢালিয়া দিল; একমাত্র গামছাটা পুটুলির কাজে নিযুক্ত হইয়া আগে হইতেই গাড়ির মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল, নিজের অঞ্চলটা সে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া শুধু কহিল, এই নিন।

জীবানন্দ হাতমুখ মুছিয়া হঠাৎ বলিল, এ কিন্তু তুমি আর কাউকে দিতে পারতে না অলকা।

ষোড়শী আঁচলটা তাহার টানিয়া লইয়া আনতমুখে শুধু কহিল, ঘরে এসে আর একটু বসুন, গুছিয়ে নিয়ে বার হয়ে পড়তে আর বেশী দেরি হবে না। আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে তবে আপনি যেতে পাবেন।

জীবানন্দ কহিল, অর্থাৎ তোমাকে নির্বাসিত করার কাজটা নিঃশেষ করেই যেতে পারি। ভালো, আমি তাই করে যাবো, কিন্তু তোমারও একটা কাজ রইল। আমার কৃতকর্মের ফল আমি ভোগ করব না ত কে করবে—সে অভিযোগ আমি একটিবারও কারো কাছে করিনি—কিন্তু যাবার সময় তোমার কাছে শুধু এইটুকু মাত্র দাবী করব, আমি তার বেশী আর দুঃখ না পাই। এই বলিয়া সে ঘরে আসিয়া পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া ষোড়শীর হাতে দিয়া কহিল, সারাদিন তোমার খাওয়া হয়নি, এইবার কিছু মুখে দাও, আমি ততক্ষণ অন্ধকারে খানিক ঘুরে আসি। ঠিক সময়ে উপস্থিত হ'বো। এই বলিয়া সে বাহির হইবার উপক্রম করিতেই চক্ষের পলকে ষোড়শী দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। এত কথার মধ্যেও যে এই পরদুঃখ-বিমুখ আত্মসর্বস্ব লোকটি তাহার না খাইবার অতি তুচ্ছ ব্যাপারটি মনে রাখিয়াছে, এই কথা মনে করিয়া তাহার সূচ ফুটিল, চিঠিখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ ত আমাকেই লেখা, আপনার সুমুখেই কি এ পত্র আমি পড়তে পারিনে?

জীবানন্দ কহিল, পারো, কিন্তু অনাবশ্যক। এর জবাব দেবার ত প্রয়োজন হবে না! আমাকে দুঃখ থেকে বাঁচাবার জন্যে তার ঢের বেশী দুঃখ তুমি নিজে নিয়েচ। নইলে এমন করে হয়ত তোমাকে যেতেও হ'তো না। আমার শেষ অনুরোধ এতেই লেখা আছে, তা যদি রাখতে পারো তার চেয়ে আনন্দ আমার নেই।

ষোড়শী কহিল, তা হলে পড়ি?

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। ষোড়শী কাগজখানি হাতের পর মেলিয়া ধরিয়া হেঁট হইয়া সেই ছত্র-কয়েকের লিখনটুকু একনিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া নির্বাক্ ও নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে তাহার নাম লিখা থাকিলেও, বস্তুত এ পত্র তাহার নয়। ভিতরে ছিল—

ফকিরসাহেব,

ষোড়শীর আসল নাম অলকা। সে আমার স্ত্রী। আপনার কুষ্ঠাশ্রমের কল্যাণ কামনা করি, কিন্তু তাহাকে দিয়া কোন ছোট কাজ করাইবেন না। আশ্রম যেখানে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন সে আমার নয়, কিন্তু তাহার সংলগ্ন শৈবাল-দীঘি আমার। এই গ্রামের মুনাফা পাঁচ-ছয় হাজার টাকা। আপনাকে জানি। কিন্তু আপনার অবর্তমানে পাছে কেহ তাহাকে নিরুপায় মনে করিয়া অমর্যাদা করে, এই ভয়ে আশ্রমের জন্যই গ্রামখানি তাহাকে দিলাম। আপনি নিজে একদিন আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন, এই দান পাকা করিয়া লইতে যাহা-কিছু প্রয়োজন, করিবেন; সে খরচ আমিই দিব। কাগজ-পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে আমি সহি করিয়া রেজিস্টারী করিয়া দিব।

শ্রীজীবানন্দ চৌধুরী

ষোড়শী বাহিরে গিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি এত খবর কোথায় পেলে? আমি যে কুষ্ঠাশ্রমের দাসী হয়ে যাচ্চি এই বা তুমি জানলে কি করে?

জীবানন্দ কহিল, কুষ্ঠাশ্রমের কথা অনেকেই জানে। আর তোমার কথা? আজই দেবতার স্থানে দাঁড়িয়ে যারা শপথ করে গেল, নিজের কানে শুনেও অন্ধকারে আমি যাদের চিনতে পারিনি, তুমি তাদের চিনলে কি করে?

ষোড়শী ইহার ঠিক জবাবটা দিতে না পারিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, তোমার কি সংসারে আর মন নেই? সমস্ত বিলিয়ে নষ্ট করে দিয়ে কি তুমি সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে চাও নাকি?

প্রশ্নটা দুজনের কানেই অদ্ভুত ঠেকিল। জীবানন্দ প্রথমে জবাব দিতে পারিল না, কিন্তু দেখিতে দেখিতে সে কিরকম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, আমি সন্ন্যাসী? মিছে কথা। সংসারে আর আমি কিছুই নষ্ট করতে পারব না। এখানে আমি বাঁচতে চাই—মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চাই। বাড়ি চাই, ঘর চাই, স্ত্রী চাই, ছেলেপুলে চাই—আর মরণ যেদিন আটকাতে পারব না, সেদিন তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে যেতে চাই। আমার অনেক গেছে, কত যে গেছে শুনলে তুমি চমকে যাবে—কিন্তু আর আমি লোকসান করতে পারব না।

ষোড়শী সভয়ে আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু আমি ত সন্ন্যাসিনী। পৃথিবীতে স্ত্রী-লোকের অভাব নেই—কিন্তু এর মধ্যে আমাকে তুমি জড়াতে চাইচ কেন?

জীবানন্দ চুপ করিয়া রহিল। পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের অভাব আছে কি নাই, এ কথা তাহাকে বলিবার স্পর্ধা যাহার হইল তাহাকে সে আর কি বলিবে?

গাড়োয়ান প্রাঙ্গণ হইতে তাড়া দিয়া বলিল, মা, রাত পোহাতে যে আর দেরি নেই।

চল বাবা, যাচ্চি। বলিয়া ষোড়শী তেলটুকু প্রদীপের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া ক্ষীণ দীপশিখা সমুজ্জ্বল করিয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। ঘরে তালা বন্ধ করিবার আবশ্যক ছিল না, জীর্ণদ্বারে শুধু শিকলটি তুলিয়া দিয়া, গলায় অঞ্চল দিয়া জীবানন্দের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া তাহার পদধূলি লইয়া কহিল, আমি চললাম।

জীবানন্দ কহিল, খাবার সময়টুকুও হ'ল না।

না। প্রজারা জানে আমি ভোরবেলায় যাত্রা করব, তারা এসে পড়বার পূর্বেই আমার বিদায় হওয়া চাই। একটু হাসিয়া কহিল, এক-আধ দিন না খেলে আমাদের মরণ হয় না।

সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জীবানন্দ তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, অলকা, তোমার মা একদিন তোমাকে আমার হাতে দিয়েছিলেন, তবু তোমাকে পেলাম না, কিন্তু সেদিন আমাকে যদি কেউ তোমার হাতে সঁপে দিতেন, আজ বোধ হয় তুমি অন্ধকারে আমাকে এমন করে ফেলে যেতে পারতে না।

ইহার জবাব ষোড়শী খুঁজিয়া পাইল না। শুধু কথাগুলোর একটা অব্যক্ত, অপরিসীম ব্যাকুল ধ্বনি তাহার দুই কান আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। গাড়ি মোড় ফিরিবার পূর্বেও সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল শেষ-নিশার প্রগাঢ় অন্ধকারে ঠিক সেইখানেই সে তেমনি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

রাত্রি প্রভাত হইতে তখন খুব বেশী বিলম্ব ছিল না, জীবানন্দ মাঠের পথ ধরিয়া তাহার গৃহে ফিরিল। কিছুক্ষণ হইতে একটা অস্ফুট কোলাহল তাহার কানে যাইতেছিল, কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সুমুখের আকাশে উষার আরক্ত আভার মত রাঙ্গা আলো তাহার চোখে পড়িল। এবং চলার সঙ্গে সঙ্গেই এই শব্দ ও আলোক উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল। অবশেষে কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল, বহুলোকের ব্যর্থ চীৎকার ও ছুটাছুটির মধ্যে বীজগ্রামের জমিদার-গোষ্ঠীর প্রমোদ-ভবন, তাহার মাতামহের অত্যন্ত সাধের শান্তিকুঞ্জ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইতে আর বিলম্ব নাই।

ছাব্বিশ

সকাল হইতে না হইতে চণ্ডীগড়ের সমস্ত ইতর-ভদ্র হাহাকার করিয়া আসিয়া পড়িল। শিরোমণি আসিলেন, রায়মহাশয় আসিলেন, তারাদাস আসিলেন, এবং আরও অনেক ভদ্র ব্যক্তি—পোড়া শান্তিকুঞ্জের সব পুড়িল না, দৈবাৎ কিছু রক্ষা পাইল। এবং যাহা পুড়িল তাহার দাম কত, এবং যাহা বাঁচিল তাহা সামান্য এবং অকিঞ্চিৎকর কিনা, ইত্যাদি তথ্য সবিস্তারে ও নিশ্চয় করিয়া আহরণ করিতে ছুটিয়া আসিলেন। এবং ইহা কেমন করিয়া হইল ও কে করিল? সকলের মাঝখানে এককড়ি নন্দী তুমুল কাণ্ড করিতে লাগিল। সর্বনাশ যেন তাহারই হইয়া গেছে। সে সর্বসমক্ষে ডাক ছাড়িয়া প্রকাশ করিল যে, এ-কাজ সাগর সর্দারের। সে ও তাহার জন-দুই সঙ্গীকে কেহ কেহ কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। থানায় এত্তেলা পাঠানো হইয়াছে, পুলিশ আসিল বলিয়া। সমস্ত ভূমিজ-গোষ্ঠীকে যদি না সে এই ব্যাপারে আন্দামানে পাঠাইতে পারে ত তাহার নাম এককড়ি নন্দী নয়—বৃথাই সে এতকাল হুজুরের সরকারে গোলামি করিয়া মরিল!

নির্বাপিতপ্রায় অগ্ন্যুত্তাপ হইতে একটু দূরে একটা বটবৃক্ষছায়াতলে সভা বসিয়াছিল। জীবানন্দ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার মুখের উপর শ্রান্তির অবসন্নতা ছাড়া উদ্বেগ বা উত্তেজনা কিছুই ছিল না, একটু হাসিয়া কহিলেন, তা হ'লে তোমাকেও ত এদের সঙ্গে যেতে হয় এককড়ি। জমিদারের গোমস্তাগিরি কাজে তুমি যাদের ঘরে আগুন দিয়েচ, সে খবর ত আমি জানি। আগুন লাগাতে কেউ তাদের চোখে দেখেনি, মিথ্যে সন্দেহের উপর পুলিশ যদি তাদের উপর অত্যাচার করে, সত্যি কাজের জন্য তোমাকেও তার ভাগ নিতে হবে।

তাঁহার কথা শুনিয়া সকলেই অবাক হইল। এককড়ি প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, পরে ইহাকে পরিহাসের আকৃতি দিতে শুষ্ক-হাস্যের সহিত বলিল, হুজুর মা-বাপ। আমাদের সাতপুরুষ হ'লো হুজুরের গোলাম। হুজুরের আদেশে শুধু জেল কেন, ফাঁসি যাওয়াও আমাদের অহঙ্কার।

জীবানন্দ বিরক্ত হইয়া কহিলেন, আমাকে না জানিয়ে পুলিশে খবর দেওয়া তোমার উচিত হয়নি। যা পুড়েছে সে আর ফিরবে না, কিন্তু এর উপর যদি পুলিশের সঙ্গে জুটে নতুন হাঙ্গামা বাধিয়ে দু' পয়সা উপরি রোজগারের চেষ্টা কর, তা হলে লোকসানের মাত্রা ঢের বেড়ে যাবে।

অনেকেই মুখ টিপিয়া হাসিল। এককড়ি জবাব দিতে পারিল না—ক্রোধে মুখ কালো করিয়া শুধু মনে মনে তাহার বংশলোপ কামনা করিল। নদীর দিকের চাকরদের ঘরগুলো বাঁচিয়াছিল, তাহারই দ্বিতলের গোটা-দুই ঘরে উপস্থিত মত বাস করিবার সংকল্প জানাইয়া জীবানন্দ অভ্যাগত হিতাকাঙ্ক্ষীর দলটিকে বিদায় দিয়া কেবল তারাদাস ঠাকুরকেই কাল সকালে একবার দেখা করিতে আদেশ করিলেন।

তারাদাস কহিল, কাল রাত্রে যোড়শী চলে গেছে—

আমি খবর পেয়েচি।

গোটা-কয়েক থালা-ঘটি-বাটি পাওয়া যাচ্চে না—

তা হলে সেগুলো আবার কিনে নিতে হবে।

এই অগ্নিদাহের সম্বন্ধে অচিরকাল-মধ্যে মুখে মুখে নানা কথা প্রচারিত হইয়া গেল। জমিদার সে-রাত্রে গৃহে ছিলেন না, ইহা লইয়া অধিক আলোচনা অনেকের কাছেই নিষ্প্রয়োজন মনে হইল, কিন্তু ষোড়শী ভৈরবীর যাওয়ার সহিত যে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, এবং এ কাজ যাহারা করিয়াছে জানিয়া-বুঝিয়াও যে জমিদার তাহাকে অব্যাহতি দিলেন এই কথা লইয়া অনুমান ও সংশয়-প্রকাশের অবধি রহিল না। রায়মহাশয় বিজ্ঞ লোক, এককড়ির ফাঁদের মধ্যে জীবানন্দ পা দিল না দেখিয়া ইঁহার বিষয়-বুদ্ধির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িল, কিন্তু নিজের জন্য তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ষোড়শীকে তাড়ানোর কাজে তিনিও একজন পাণ্ডা, এবং জমিদারের গৃহ যাহারা ভস্মীভূত করিয়া দিল তাহারা আশেপাশেই কোথাও অবস্থিতি করিতেছে, এই কথা স্মরণ করিয়া বিছানার মধ্যে তাঁহার সর্বশরীর ঘর্মাপ্লুত হইয়া উঠিল। পাহারার জন্য চারিদিকে লোক মোতায়েন করিয়াও তিনি সারারাত্রি বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আর শুধু কি কেবল বাড়ি! তাঁহার অনেক ধানের গোলা, অনেক খড়ের মাড়, শস্যসঞ্চয়ের বিপুল ব্যবস্থা—এই সকল রক্ষা করিতে তাঁহাকে অনুক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইবে। ভয়ে ভয়ে দিন কাটিতে লাগিল—তবুও দিনগুলো যা হোক করিয়া কাটিয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল যাহাতে ভাবিয়া পার পাইবার আর পথ রহিল না। আদালতের পরওয়ানা আসিয়া পৌঁছিল, ভূমিজ ও অন্যান্য প্রজারা একযোগে জমিদার ও তাঁহার নামে নালিশ রুজু করিয়াছে। যে জমিটা তাঁহারা একত্রে আকের চাষ ও গুড়ের কারখানা করিতে মাদ্রাজী সাহেবকে বিক্রি করিয়াছিলেন, তাহাই বাতিল ও নাকচ করিবার আবেদন। খবর আসিয়াছে কোর্টের প্রস্তাবে ও ইঙ্গিতে কলেক্টর সাহেব স্বয়ং সরজমিনে আসিয়া তদন্ত করিয়া যাইবেন। অনেক টাকার ব্যাপার, অতএব এককড়ির সহযোগে অনেক ডেরা-সই করিয়াছেন, অনেক বন্ধকী তমসুক ও কর্জার খত প্রস্তুত করিয়াছেন—একের বিষয় অপরকে বিক্রয় করিবার যতপ্রকার গলি-ঘুঁজি আছে অতিক্রম করিয়াছেন—সেই-সব মনশ্চক্ষে উপলব্ধি করিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু ইহার চেয়েও একটা বড় কথা এই যে, এইসকল হীন, মূর্খ, মৃতকল্প চাষীর দল এতবড় সাহস পাইল কি করিয়া যে, গ্রামের মধ্যে বাস করিয়াও এই দুর্দান্ত জীবানন্দ চৌধুরী ও জনার্দন রায়ের নামে নালিশ করিয়া বসিল! জীবনের অধিকাংশ কাল যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, শীতের রাত্রে যাহারা বসিয়া কাটায়, মারীর দিনে যাহারা কুকুর-বেড়ালের মত মরে, আবাদের দিনে এক-মুষ্টি বীজের জন্য যাহারা ওই দরজার বাহিরে পড়িয়া হত্যা দেয়, তাহারা আদালতে দাঁড়াইবার টাকা পাইল কাহার কাছে? এ দুর্মতি তাহাদের কে দিল? সে কি এই সোজা কথাটা ইহাদের বলিয়া দিতে পারিল না যে, কেবল জেলা-আদালতেই নয়, হাইকোর্ট বলিয়াও একটা ব্যাপারও আছে, যেখানে জীবানন্দ-জনার্দনকে ডিঙ্গাইয়া সাগর সর্দার কখনও জয়ী হইতে পারে না! ইংরেজের বিচারালয় ধনীর জন্য তৈরি, দরিদ্রের জন্য নয়—তাঁহার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে, ব্যারিস্টার জামাই আছে, বিশ্বস্ত উকিল-মোক্তার আছে—এবং আরও কত কি সুবিধা-সুযোগ আছে—এইসকল আপনাকে আপনি বলিয়া জনার্দন শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সুবিধা বিশেষ হইল না। কারণ, এ ত শুধু টাকাকড়ি, জমিজমা, কেনা-বেচাই নয়, এতদুপলক্ষে যে-সকল অসামান্য কার্যগুলো সম্পন্ন করাইয়াছেন, তাহার ফলস্বরূপ ফৌজদারী দণ্ডবিধির কেতাবের পাতায় পাতায় যে-সকল কঠিন বাক্য লিপিবদ্ধ করা আছে, তাহাদের নিষ্ঠুর চেহারা আড়ালে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় দেখাইতে লাগিল।

এ কথা রাষ্ট্র হইতে যে অবশিষ্ট নাই, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় রায়মহাশয় তাহা জানিতেন, তাই দিনের বেলাটা কোনমতে কাটাইয়া রাত্রের অন্ধকারে এককড়িকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং জমিদার-সরকার হইতে ইহার কিরূপ বিহিত হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন।

এককড়ি কহিল, হুজুরের কাছে ত এখনও পেশ করাও হয়নি।

জনার্দন রাগ করিয়া কহিলেন, করনি ত কর গে। বুড়ো বয়সে কি শেষে ফাটক খাটবো নাকি?

তাঁহার শঙ্কা ও ব্যাকুলতায় এককড়ি হাসিয়া বলিল, ভয় কি রায়মশাই, ফাটক খাটতে

হয় ত আমিই খাটবো, আপনাদের যেতে দেব না। কিন্তু গরীবের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন, ভুলবেন না।

জনার্দন খুশী হইয়া কহিলেন, সে ত জানি এককড়ি, তুমি থাকতে ভয় নেই. তুমি যা বোঝো উকিলের বাবাও তা বোঝে না, কিন্তু জানো ত সব? কে সাহেব নাকি নিজে তদারকে আসচে—ব্যাটা মহা বদমাশ। কিন্তু ভেতরের খবর কিছু জানো? কে ব্যাটাদের বুদ্ধি দিলে বল ত? টাকা কে যোগালে?

এককড়ি অসঙ্কোচে যোড়শীর নাম করিয়া বলিল, টাকা যোগালেন মা চণ্ডী. আর কে? তাতেই ত তাড়াতাড়ি আড়ালে সরে গেল।

ছুঁড়ী আছে কোথায় বল ত?

এককড়ি কহিল, কাছাকাছি কোথাও লুকিয়েচে—জানতে একদিন পারবই।

জনার্দন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, খবরটা নিয়ো। হাঙ্গামটা কেটে যাক, তারপরে।

এককড়ি নন্দী সেদিন এইখানে আহারাদি করিয়া অনেক রাত্রে বাড়ি গেল। অভিমান করিয়া বলিল, সেদিন সাগর সর্দারের প্রসঙ্গে আপনারা সবাই তাঁর মন যুগিয়ে মুখ টিপে হাসলেন, কিন্তু পুলিশের কাছে সেদিন খবরটি দিয়ে রাখলে আজ এ বিপদ আপনাদের ঘটতো না।

জনার্দন সলজ্জে ত্রুটি স্বীকার করিলেন। এককড়ি তখন প্রভুর সম্বন্ধে বিশেষ একটি সংবাদ তাঁহার গোচর করিয়া কহিল, মদ খেয়ে বরঞ্চ ছিল ভাল. এখন কথা বলাই ভার! কলিক্ লেগেই আছে—এতকালের অভ্যাস, হয়ত আর বেশীদিন নয়।

জনার্দন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না. কহিলেন, সত্যি সত্যিই খায় না নাকি?

এককড়ি মাথা নাড়িয়া বলিল, এটা সত্যি যে খায় না। সূর্যদেব পশ্চিমে ওঠাও সহজ—কিন্তু কি জানেন রায়মশাই, ভয়ানক একগুঁয়ে লোক—সেদিন সারাদিনের যন্ত্রণায় রাত্রে হাত-পা প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে এলো, ডাক্তারবাবু ভয় পেয়ে বললেন. আমার কথা রেখে অন্ততঃ এক-চামচে খান—হার্ট ফেল্ করতে পারে—বাবুর কিন্তু ভয়ই হ'লো না। একটু হেসে বললেন, এতকালের মধ্যে ও-বেচারা কখ্খনো ফেল করেনি, সমানে চলেছে. আজ যদি একদিন করেই ফেলে ত আর দোষ দেব না, কিন্তু আমি জীবনভোরই ফেল করে আসচি, আজ অন্ততঃ একটা দিনও আমাকে পাশ করতে দিন। কেউ খাওয়াতে পারলে না।

বল কি!

এককড়ি কহিল, খেয়াল চেপেছে বাড়ি মেরামত থাক, ওই টাকায় মাঠের মাঝখানে এক সাঁকো, আর রূপসী বিলের উত্তরধারে একটা মস্ত বাঁধ তুলতে হবে। ইঞ্জিনিয়রবাবু এসে-ছিলেন, হিসেব ক'রে বললেন, ও টাকায় দশখানা বাড়ি মেরামত হতে পারে। তার একভাগ এদিকে দিয়ে বাড়িটা রক্ষা করুন; কিন্তু কিছুতেই না। দেওয়ানজী বাপের বয়সী বুড়ো-মানুষ, বললেন, জমিদারি বাঁধা পড়বে যে! বাবু বললেন, প্রজারা সব বছর বছর খাজনা যোগাচ্চে আর মরচে। তাদের জমি বাঁচাবার জন্যে যদি জমিদারি বাঁধা পড়ে ত পড়ুক না। ও শোধা যাবে।

রায়মহাশয় চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিলেন, মাথা খারাপ-টারাপ হয়নি ত?

ইহার দিন-দুই পরে খবর লইয়া যখন জনার্দন জানিতে পারিলেন এককড়ি আজও সে কথা হুজুরে পেশ করে নাই. তখন তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অপদার্থ ও ভীতু বলিয়া মনে মনে তাহাকে তিরস্কার করিলেন. এবং রাত্রে সুনিদ্রা হইল না। সাহেব হঠাৎ যদি একদিন এত্তেলা পাঠাইয়া সরজমিনে আসিয়া পড়ে ত বিপদের অবধি থাকিবে না। সকল দিকে প্রস্তুত না থাকিলে যে কি ঘটিতে পারে বলা যায় না। স্থির করিলেন. পরদিন দেখা করিয়া নিজেই সকল কথা নিবেদন করিবেন—পরের উপর নির্ভর করিয়া সময় নষ্ট করিলে মরিতে হইবে।

সকালে একশত আটবার দুর্গানাম জপ করিলেন. শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতার নাম লাল কালি দিয়া কাগজের উপরে লিখিয়া কাজটা পাকা করিয়া লইলেন, এবং হাঁচি. টিকটিকি. শূন্যকুম্ভ প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিপত্তির বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়া মোটা দেখিয়া জন-

চারেক লোক সঙ্গে করিয়া জমিদারের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অধিক দূরে অগ্রসর হইতে হইল না, জন পাঁচ-ছয় লোক ছুটিয়া আসিয়া যে খবর দিল, তাহা যেমন অপ্রীতিকর, তেমনি অপ্রত্যাশিত। বেশী নয়, কাঠা-দশেক পরিমাণ বড় রাস্তার উপরেই একটা জায়গা কিছুকাল হইতে রায়মহাশয় দখল করিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, দোকান-ঘরটা এইখানে সরাইয়া আনিবেন। সম্পত্তি 'চণ্ডীর এবং এই লইয়া ষোড়শীর সহিত তাঁহার বাদানুবাদও হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরাক্রান্ত জনার্দন রায়কে সে বাধা দিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার কি একটা দলিলও ছিল, কিন্তু গ্রামের লোকেরা তাহা বিশ্বাস করিত না। আজ সকালে এইটাই তাহার বে-দখল করা হইয়াছে। জনার্দন ধীরে ধীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অনেকেই হাজির আছেন। শিরোমণি, তারাদাস, গগন চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন তাঁহার দলভুক্ত ভদ্রব্যক্তিদের সমক্ষে জীবানন্দ চৌধুরী নিজে হুকুম দিয়া এবং নিজের লোক দিয়া তাঁহার বেড়া ভাঙ্গাইয়া মন্দির-সংলগ্ন ভূখণ্ডের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছেন। কেহই প্রতিবাদ করিতে ভরসা করে নাই।

জনার্দন দুঃসহ ক্রোধ দমন করিয়া সবিনয়ে কহিলেন, এসব করার আগে হুজুর ত আমাকে একটা খবর পাঠাতে পারতেন?

জীবানন্দ হাসিয়া কহিলেন, তাতে অনর্থক দেরি হ'তো বৈ ত নয়, খবর আপনার কাছে পৌঁছবেই জানি।

জনার্দন বলিলেন, খবর পৌঁছেচে, কিন্তু একটা দিন আগে পৌঁছলে মামলা-মকদ্দমাটা হয়ত বাধত না।

জীবানন্দ তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, এতেও ত বাধা উচিত নয় রায়মশাই। ভৈরবীদের হাতে দেবীর অনেক সম্পত্তিই বে-হাত হয়ে গেছে, আবার সেগুলো হাত-বদল হওয়া দরকার।

জনার্দন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, তার চেয়ে আর সুখের কথা কি আছে হুজুর। শুনতে পাই, সমস্ত গ্রামখানিই নাকি একদিন মা চণ্ডীর ছিল, এখন কিন্তু—

খোঁচাটা সকলেই উপভোগ করিলেন। শিরোমণি ঠাকুর ত জনার্দন রায়ের বুদ্ধি ও বাক্-চাতুর্যে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন।

জীবানন্দের মুখের চেহারায় কোনরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। বলিলেন, তার ত্রুটি হবে না রায়মশাই। মা চণ্ডীর সমস্ত দলিল-পত্র, নক্‌শা, ম্যাপ প্রভৃতি যা-কিছু ছিল আমি কলকাতায় এটর্নির বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েচি। কিন্তু আপনারা আমার সহায় থাকবেন।

শিরোমণি জয়ধ্বনি করিলেন; কিন্তু কথাটা সত্য হইলে কোথাকার জল কোথায় গিয়া মরিবে চিন্তা করিয়া ক্রোধে ও শঙ্কায় জনার্দনের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার চেয়েও ঢের বড় বিপদ তাঁহার মাথার পরে ঝুলিতেছে স্মরণ করিয়া আজিকার মত তিনি আত্মসংবরণ করিয়া গৃহে ফিরিলেন। যে উদ্দেশ্যে বাটীর বাহির হইয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইল। পথে চলিতে চলিতে তাঁহার মনে হইল, আমার নাহয় দু-একশ' বিঘা টান ধরিতে পারে, কিন্তু নিজে যে সমস্ত চণ্ডীগড় গিলিয়া বসিয়াছেন তাহার কি? সুতরাং কথাটা যে নেহাত বাজে, নিছক ধোঁকা দিবার জন্যই বলা এ বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। বাড়ি ঢুকিয়া তামাকের জন্য একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া বসিবার ঘরে পা দিয়াই কিন্তু তিনি চমকিয়া গেলেন। একধারে লুকাইয়া বসিয়া এককড়ি। তাহার মুখ শুষ্ক, চেহারা ম্লান—কি হে, তুমি যে হঠাৎ এখানে? তোমার পাগলা মনিব ত ওদিকে লাঠালাঠি বাধিয়েচেন।

এককড়ি কহিল, জানি। আর সেই পাগলের কাছেই এখনি একবার আমাদের ছুটতে হবে।

জনার্দন ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বল ত?

এককড়ি কহিল, ছোটলোক ব্যাটাদের বুদ্ধি এবং টাকা কে যুগিয়েছে জানতে পারলাম না; কিন্তু এটুকু জানতে পারলাম তারা সাক্ষী মানলে হুজুর গোপন কিছুই করবেন না। দলিল তৈরির কথা পর্যন্ত না।

জনার্দনের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। লোকটার একগুঁয়েমির যে ভয়ানক ইতিহাস সেদিন শুনিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল। তাঁহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—এ কি লঙ্কাকাণ্ড করবে নাকি শেষে!

সাজা তামাক তাঁহার পুড়িতে লাগিল, স্নানের জল ঠাণ্ডা হইতে লাগিল, জনার্দন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। জীবানন্দ তখন মন্দিরের একটা ভাঙ্গা খিলান পরীক্ষা করিতেছিলেন, এবং তারাদাস অদূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিতেছিল, জনার্দন একেবারে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হুজুর! সমস্ত ব্যাপার একবার মনে করে দেখুন।

জীবানন্দ প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না কিসের ব্যাপার, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা এবং প্রাঙ্গণের একধারে এককড়ি নন্দীকে দেখিতে পাইয়া কাল রাত্রের কথা স্মরণ হইল। বলিলেন, কিন্তু উপায় কি রায়মশাই? সাহেব জমি ছাড়তে চায় না, সে সস্তায় কিনেচে—তাছাড়া তার বিস্তর ক্ষতিও হবে। সুতরাং মকদ্দমা জেতা ছাড়া প্রজাদের আর ত পথ দেখিনে।

জনার্দন আকুল হইয়া কহিলেন, কিন্তু আমাদের পথ?

জীবানন্দ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, সে ঠিক, আমাদের পথও খুব দুর্গম মনে হয়।

তাঁহার শান্ত-কণ্ঠ ও নির্বিকার মুখের ভাব দেখিয়া জনার্দন নিজেকে আর সামলাইতে পারিলেন না। মরিয়া হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হুজুর, পথ শুধু দুর্গম নয়—জেল খাটতে হবে। এবং আমরা একা নয়, আপনিও হয়ত বাদ যাবেন না।

জীবানন্দ একটুখানি হাসিলেন, বলিলেন, তাই বা কি করা যাবে রায়মশাই। শখ করে যখন গাছ পোঁতা গেছে, তখন ফল তার খেতেই হবে বৈ কি।

জনার্দন আর জবাব দিলেন না। ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেলেন। এককড়ি সব কথা বোধ হয় শুনিতে পায় নাই, সে দ্রুতপদে কাছে আসিতেই তাহাকে চীৎকার করিয়া বলিলেন, এ আমাদের সর্বনাশ করবে এককড়ি, আমার নির্মলকে একটা টেলিগ্রাফ ক'রে দাও—সে একবার এসে পড়ুক।

সাতাশ

চণ্ডীগড় হইতে নির্মল অনেক দুঃখ পাইয়াই গিয়াছিল। ইহার ভাল এবং সকল সংস্রব হইতে নিজেকে সে চিরকালের মত বিযুক্ত করিয়া যাইতেছে, যাইবার সময়ে ইহাই ছিল তাহার একান্ত অভিলাষ। ভগবানের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করিয়াছিল, যাহা গত হইয়াছে তাহা আর যেন না ফিরিয়া আসে, ইহার কোন সংযোগ-সূত্রই আর যেন না জীবনে তাহার কোথাও অবশিষ্ট রহিয়া যায়। সে সোজা মানুষ। বিলাস ও সাহেবিয়ানার মধ্যে দিয়াও সে সংসারের সোজা পথটি ধরিয়াই চলিতে চাহিত। হৈমই ছিল তাহার একমাত্র—তাহার গৃহিণী, তাহার প্রিয়তমা, তাহার সন্তানের জননী—সৌন্দর্যে, স্নেহে, নিষ্ঠায়, বুদ্ধিতে ইহার বড় যে কোন মানুষই কোনদিন কামনা করিতে পারে তাহা সে ভাবিতেও পারিত না, অথচ এতবড় সম্পদ তুচ্ছ করিয়াও যে মন তাহার একদিন উদ্‌ভ্রান্ত হইতে চাহিয়াছিল, ফিরিয়া আসা পর্যন্ত এই বিড়ম্বনা যখনই মনে হইত তখনই দুইটা কথা তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিত। প্রথম এই যে, এই দুর্মতির ইতিহাস তাহাকে হৈমর কাছ হইতে চিরদিন গোপন করিয়া রাখিতে হইবে; এবং দ্বিতীয়, ষোড়শীর চরিত্র। ইহার সম্বন্ধে বস্তুতঃ কিছুই সে জানে না, তবুও যে কেন একদিন মন তাহার আসক্ত হইয়াছিল, নিজের চিত্তকে এই প্রশ্নই বারংবার করিয়া কেবল একটা উত্তরই নির্মল নিঃসংশয়ে পাইতেছিল, ষোড়শী চরিত্রহীনা। অসম্ভব বস্তুতে মন তাহার প্রলুব্ধ হয় নাই, হইতেই পারে না। সে পাওয়ার বাহিরে নয়, ইহা বুঝিয়াছিল বলিয়াই মন তাহার অমন করিয়া উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। এই কথা স্মরণ করিয়া সে একপ্রকার সান্ত্বনা লাভ করিত, এবং মনে মনে বলিত, ও-পথে আর কখনও নয়। হৈমর বাপের বাড়ি, ইচ্ছা হয় সে যাক, কিন্তু নিজে সে চণ্ডীগড়ের নাম কখনও মুখে আনিবে না।

সেদিন আদালত হইতে ফিরিয়া হৈমর কাছে শুনিল মায়ের চিঠি আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, রাত্রে লুকাইয়া ষোড়শী কোথায় যে চলিয়া গেছে কেহই জানে না।

নির্মল পরিহাসের চেষ্টায় জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, কেউ জানে না কোথায় গেছে? সাগর সর্দারও না, এমনকি জমিদার জীবানন্দ চৌধুরী পর্যন্ত না?

হৈম রাগ করিয়া কহিল, তোমার এক কথা। সাগর জানলেও জানতে পারে, কিন্তু জমিদার জানবে কি ক'রে? মেয়েদের নামে একটা দুর্নাম দিতে পারলে যেন তোমরা বাঁচো!

তা বটে। বলিয়া নির্মল বাহিরে যাইতেছিল, হৈম ডাকিয়া কহিল, আরও একটা কাণ্ড হয়েচে। সেই রাত্রে জমিদারের শান্তিকুঞ্জ কে একদম পুড়িয়ে দিয়েছে।

বল কি!

হাঁ। লোকের সন্দেহ, রাগ করে সাগর পুড়িয়েছে। কিন্তু জমিদারের নামের সঙ্গে জড়িয়ে যে মিথ্যে দুর্নামটা তাঁর গ্রামের সকলে মিলে দিলে, তা সত্যি হ'লে কি কখনো জমিদারেরই বাড়ি পুড়ত? তুমিই বল?

নির্মল চুপ করিয়া রহিল। হৈম কহিল, যে যাই কেন না বলুক, আমি কিন্তু নিশ্চয় জানি তিনি নির্দোষী। চণ্ডীর এমন ভৈরবী আর কখনো ছিল না। তাঁর দয়াতেই ছেলের মুখ দেখতে পেয়েচ, তা জানো?

এ কথারও নির্মল কোন উত্তর দিল না। সকল ঘটনা জানিতে, চিঠি লিখিয়া সকল সংবাদ সবিস্তারে আহরণ করিতে তাহার কৌতূহলের সীমা ছিল না, কিন্তু এ ইচ্ছাকে সে দমন করিয়া বাহির হইয়া গেল। ষোড়শীর সকল সম্পর্ক হইতে আপনাকে সে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিবেই, এই ছিল তাহার পণ। কিন্তু পরদিন সকাল না হইতেই যখন শ্বশুরের জরুরি তার আসিয়া পড়িল এবং সন্ধ্যার মেলে শাশুড়ীর চিঠি আসিল, পত্র পাওয়ামাত্র জামাই না আসিয়া পৌঁছিলে তাহার বৃদ্ধ শ্বশুরকে এ যাত্রা কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না, জেল তাঁহাকে খাটিতেই হইবে, তখন হৈম কাঁদিতে লাগিল, এবং নির্মলকে আর একবার তোরঙ্গ ও বিছানাপত্র বাঁধিবার হুকুম দিয়া তাহার কাজের বন্দোবস্ত করিতে বাটী হইতে বাহির হইতে হইল।

দিন-দুই পরে হৈমকে সঙ্গে করিয়া নির্মল চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, একটা ভয়ের মধ্যে সকলের দিন কাটিতেছে। কে যে কখন আগুন ধরাইয়া দিবে তাহার ঠিক নাই। চারিদিকে লোক নিযুক্ত হইয়াছে, কর্তা শুকাইয়া যেন অর্ধেক হইয়া গেছেন, কোথাও বাহির হন না—এতবড় প্রতাপান্বিত ব্যক্তির নিজের গ্রামের মধ্যেই এতবড় দুর্গতি দেখিয়া নির্মল বিস্মিত হইল। এখান হইতে বেশী দিন সে যায় নাই, কিন্তু কি পরিবর্তন! খবর যাহা পাইল তাহা অত্যন্ত উলটা-পালটা রকমের, বিশেষ কিছু বুঝা গেল না; কেবল একটা সংবাদে সকলেরই মিল হইল যে, জমিদার জীবানন্দ চৌধুরীর মাথা খারাপ হইয়া গেছে। সে মদ ছাড়িয়াছে, প্রজাদের দিয়া নিজের বিরুদ্ধে নালিশ করাইয়া দিয়াছে, যে টাকায় পোড়া বাড়ি মেরামত করা উচিত ছিল, তাই দিয়া মাঠের সাঁকো তৈরি করাইতেছে—এমনি কত কি গল্প, কিন্তু হঠাৎ কিসের জন্য সে এরূপ হইল, তাহা কেহই জানে না। এই লোকটিকে নির্মল অতিশয় ঘৃণা করিত; ইহারই কাছে দরবার করিতে যাইতে হইবে মনে করিয়া সে অতিশয় সঙ্কুচিত হইল। অথচ ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে আর যে কি পথ আছে তাহাও চোখে পড়িল না। ভূমিজ প্রজারা অত্যন্ত বিরুদ্ধে! একে ত তাহাদের সর্বনাশ হইয়াছে, এবং তাহা সম্পাদন করিতে কোন চেষ্টারই ত্রুটি হয় নাই, তাহাতে তাহাদের একমাত্র [illegible]। ভৈরবী মাতার প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে, তাহাতে ক্রোধের তাহাদের সীমা নাই। তাহারা কোন কথা শুনিবে না। এদিকে মাদ্রাজী সাহেবের বিস্তর ক্ষতি, তাঁহার কল-কবজা আসিয়া পড়িয়াছে, সে ক্ষতিপূরণ করা একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার। জমির দখল তাঁহার চাই-ই। বিশেষতঃ নিজে অনুপস্থিত থাকিয়া যে এটর্নির দ্বারা তিনি কাজ চালাইতেছেন তিনি যেমন রূক্ষ, তেমনি অভদ্র, তাঁহার কাছে কোন সুবিধারই আশা নাই। একমাত্র ভরসা নিজেদের মধ্যে এক হওয়া; যেহেতু, আর যাহাই হোক, পিনাল কোডের সেই দুরন্ত ধারাগুলোর তাহাতে বাঁচিবার সম্ভাবনা। নিজেদের মধ্যে কবুল জবাব দিলে আর কোন রাস্তা নাই, অথচ সেই পাগল লোকটা শাসাইয়া রাখিয়াছে হাকিমের কাছে সে কোন কথাই লুকাইবে না। এই কথা নির্মল হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিত, কিন্তু আসিয়া অবধি সে যে-সকল গল্প শুনিল, বিশেষ করিয়া সেই মদ ছাড়া

কাহিনী—হার্টফেলের ভয় দেখাইয়াও ডাক্তারে যাহাকে এক ফোঁটা গিলাইতে পারে নাই, সেই ভীষণ একগুঁয়ে লোকটার মাথায় হঠাৎ কি খেয়াল চাপিয়াছে, কে তাহার কৈফিয়ত দিবে? অথচ, সে আসিয়াছে এই দুর্মদ একান্ত অবোধ ব্যক্তিকে সুবুদ্ধি দিতে। তাহাকে বুঝাইতে হইবে, ভয় দেখাইতে হইবে, অনুনয়-বিনয় করিতে হইবে—কি যে করিতে হইবে সে কিছুই জানে না। এই অত্যন্ত অপ্রীতিকর কার্য হইতে নির্মলের সমস্ত চিত্ত যেন বিদ্রোহ করিতে লাগিল, কিন্তু উপায় কি? দুষ্কৃতকারী যে হৈমর পিতা। তাঁহাকে যে বাঁচাইতেই হইবে। হৈম কাঁদিতে লাগিল, শাশুড়ী কাঁদিতে লাগিলেন, এককড়ি চোরের মত আনাগোনা করিতে লাগিল, শ্বশুর না খাইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন—অথচ মাঝে কেবল একটি দিন বাকী, পরশু দিন আসিবেন হাকিম তদন্ত করিতে।

অপরাহ্নের কাছাকাছি জীবানন্দের সহিত দেখা হইল তাহার মাঠের মাঝখানে। এতকাল জল-নিকাশের পথ ছিল না, তাই সাঁকো তৈরী হইতেছিল। প্রশান্ত হাস্যে দুই হাত বাড়াইয়া আসিয়া জীবানন্দ তাহাকে গ্রহণ করিয়া কহিল, আপনার আসার খবর আমি কালই পেয়েছি; ভাল আছেন আপনি? বাড়ির সব ভাল? তাহার কথায় আচরণে গরিমা নাই, কৃত্রিমতা নাই—যেমন সহজ, তেমনি খোলা—তাহাকে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। এতখানির জন্য নির্মল প্রস্তুত ছিল না; তাহার আপনাকে আপনি যেন ছোট মনে হইল। মাথা যদি ই'হার খারাপ হইয়াও থাকে ত লজ্জা পাইবার নয়। জীবানন্দের কুশল প্রশ্নের উত্তর নির্মল শুধু মাথা নাড়িয়াই দিল এবং প্রতি-প্রশ্ন করিবার কথা হঠাৎ তাহার মনে হইল না।

জীবানন্দ কহিল, আপনি কুটুম্ব মানুষ, সমস্ত গ্রামের আদরের বস্তু, কিন্তু ইচ্ছে ক'রে এমন জায়গায় এসে দেখা করলেন যে—সহসা মিস্ত্রী ও মজুরদের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় কহিল, বাবারা, আজ আমাদের একটু রাত্রি পর্যন্ত খাটতে হবে। সপ্তাহ ধরে মেঘ করচে, আজকালের মধ্যেই হয়ত জল হবে। কিন্তু তা হলে ত কোনমতেই চলবে না। আমরা এমন কাজ করে যাবো যে, আমাদের নাতি-পুতিদের পর্যন্ত ঘাড় নেড়ে বলতে হবে যে, হাঁ, সাঁকো করেছিল তারা, সত্যিকারের দরদ দিয়েই করেছিল। সেই ত আমাদের মেহন্নতয়ানা!

লোকগুলা গলিয়া গেল। বীজগাঁয়ের ভয়ঙ্কর জমিদার একসঙ্গে খাটিতেছেন, তাঁহার মুখের এই কথা; তাহারা সমস্বরে প্রতিজ্ঞা করিয়া জানাইল যে, তাহাদেরও সেই ইচ্ছা। জ্যোৎস্না যদি না মেঘে ঢাকে ত তাহারা রাত্রি দশটা পর্যন্ত কাজ করিবে।

নির্মল কহিল, আপনার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে।

জীবানন্দ বলিল, আর একদিন হলে হয় না?

না, আমার বিশেষ প্রয়োজন।

জীবানন্দ হাসিল; কহিল, তা বটে। অকাজের বোঝা বহাতে যাঁরা এতদূরে টেনে এনেছেন, তাঁরা কি আপনাকে সহজে ছেড়ে দেবেন!

খোঁচাটা নির্মলের গায়ে বাজিল। সে কহিল, সে ত ঠিক কথা। অকাজ মানুষ করে বলেই ত সংসারে আমাদের প্রয়োজন চৌধুরীমশায়। না হলে আপনাকেই বা এই মাঠের মাঝখানে বিরক্ত করবার আমার প্রয়োজন হত কেন?

জীবানন্দ কিছুমাত্র রাগ করিল না, তেমনি প্রসন্নমুখে বলিল, আমি কিছুমাত্র বিরক্ত হইনি নির্মলবাবু। যে জন্যে আপনি এসেছেন, সে যে আপনার কর্তব্য, এ বিষয়েও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, না হ'লে আপনিই বা আসবেন কেন? কিন্তু কর্তব্যের ধারণা ত সকলের এক নয়। রায়মহাশয়ের আমি অকল্যাণ কামনা করিনে; আপনার আসার উদ্দেশ্য সফল হ'লে আমি বাস্তবিক খুশী হবো, কিন্তু আমার কর্তব্যও আমি ঠিক করে ফেলেচি এ থেকে নড়চড় করা আর সম্ভব হবে না।

নির্মলের মুখ ম্লান হইল। সে একটু ভাবিয়া কহিল, দেখুন, ভালই হ'লো যে অপ্রিয় আলোচনার ভূমিকার অংশটা আপনি দয়া করে আমাকে উত্তীর্ণ করে দিয়ে গেলেন। এসে অবধি আপনার সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই শুনেচি—

জীবানন্দ সহাস্যে বলিল, একটা এই যে আমার মাথার ঠিক নেই, সত্য কিনা বলুন?

নির্মল কহিল, সংসারে সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে অকস্মাৎ কারও কর্তব্যের

ধারণা যদি অত্যন্ত প্রভেদ হয়ে যায় ত দুর্নাম একটা রটেই। এ কথা কি সত্য যে আপনি সমস্তই স্বীকার করবেন?

জীবানন্দ কহিল, সত্য বৈ কি। তাহার কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য নাই, ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা, তথাপি নির্মল নিঃসংশয়ে বুঝিল ইহা ফাঁকি নয়। বলিল, এমন ত হ'তে পারে আপনার কবুল-জবাবে আপনিই শাস্তি পাবেন, কিন্তু আর সকলে বেঁচে যাবেন।

জীবানন্দ কহিল, নির্মলবাবু, আপনার কথাটা হ'লো ঠিক সেই পাঠশালার গোবিন্দের মত। পণ্ডিতমশাই! মুকুন্দও যে আম চুরি করছিল! অর্থাৎ, বেতটা চারিয়ে না পড়লে তার পিঠের জ্বালা কমবে না। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। তাহার সকৌতুক হাসির ছটায় নির্মলের মুখ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল দেখিয়া সে জোর করিয়া তাহা নিবারণ করিয়া কহিল, রক্ষে করুন আপনি, এ আমি স্বপ্নেও চাইনে। আমার কৃতকর্মের ফল আমি ভোগ করলেই যথেষ্ট। নইলে, রায়মশাই নিস্তার লাভ ক'রে সুস্থ-দেহে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে থাকুন, এবং আমার এককড়ি নন্দীমশাইও আর কোথাও গোমস্তাগিরি কর্মে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করতে থাকুন, কারও প্রতি আমার কোন আক্রোশ নেই।

নির্মল আইন ব্যবসায়ী, সহজে হাল ছাড়িবার পাত্র নয়, কহিল, এমন ত হতে পারে কারও কোন শাস্তিভোগ করারই আবশ্যক হবে না, অথচ ক্ষতিও কাউকে স্বীকার করতে হবে না।

জীবানন্দ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, বেশ ত, পারেন ভালই। কিন্তু আমি অনেক চিন্তা করে দেখেচি সে হবার নয়। কৃষকেরা তাদের জমি ছাড়বে না। কারণ এ শুধু তাদের অন্ন-বস্ত্রের কথা নয়, তাদের সাত-পুরুষের চাষ-আবাদের মাঠ, এর সঙ্গে তাদের নাড়ীর সম্পর্ক। এ তাদের দিতেই হবে। একটু চুপ করিয়া কহিল, আপনি ভালই জানেন অন্য পক্ষ অত্যন্ত প্রবল, তার উপর জোর-জুলুম চলবে না। চলতে পারে কেবল চাষাদের উপর কিন্তু চিরদিন তাদের প্রতিই অত্যাচার হয়ে আসচে, আর হতে আমি দেব না।

নির্মল মনে মনে প্রমাদ গণিয়া কহিল, আপনার বিস্তীর্ণ জমিদারি, এই ক'টা চাষার কি আর তাতে স্থান হবে না? কোথাও না কোথাও—

না না, আর কোথাও না—এই চণ্ডীগড়ে। এইখানে আমি জোর করে তাদের কাছে ছ হাজার টাকা আদায় করেচি—আর সে টাকা যুগিয়েছেন জনার্দন রায়—সে শোধ করতেই হবে। কিন্তু অপ্রীতিকর আলোচনায় আর কাজ নেই নির্মলবাবু, আমি মনঃস্থির করেচি।

এই ছ হাজার টাকার ইঙ্গিত নির্মল বুঝিল না, কিন্তু এটা বুঝিল যে তাহার শ্বশুর-মহাশয় অনেক পাকে আপনাকে জড়াইয়াছেন যাহা মুক্ত করা সহজ নয়। সে শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, আত্মরক্ষায় সকলেরই ত অধিকার আছে, অতএব শ্বশুরমশায়কেও করতে হবে। আপনি নিজে জমিদার, আপনার কাছে মামলা-মকদ্দমার বিবরণ দিতে যাওয়া বাহুল্য —শেষ পর্যন্ত হয়ত বা বিষ দিয়েই বিষের চিকিৎসা করতে হবে।

জীবানন্দ মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, চিকিৎসক কি জাল করার বিষে খুন করার ব্যবস্থা দেবেন?

নির্মলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কহিল, জানেন ত, অনেক সময় ওষুধের নাম করলে আর খাটে না! সে যাই হোক, আপনি জমিদার, ব্রাহ্মণ, বয়সে বড়, আপনাকে শক্ত কথা বলবার ইচ্ছে আমার নেই। কিংবা হঠাৎ কি কারণে আপনার ধর্ম-জ্ঞান এরূপ প্রচণ্ড হয়ে উঠল তাও জানবার কৌতূহল নেই, কিন্তু একটা কথা বলে যাই যে, এ জিনিস আপনার স্বাভাবিক নয়। গভর্নমেন্ট যদি প্রসিকিউট করে ত জেলের মধ্যে একদিন তা উপলব্ধি করবেন। আপনি সর্পকে রজ্জু বলে ভ্রম করচেন।

জীবানন্দ কহিল, এ কথা আপনার সত্য, কিন্তু ভ্রম যতক্ষণ আছে ততক্ষণ রজ্জুটাই ত আমার সত্য!

নির্মল বলিল, কিন্তু তাতে মরণ আটকাবে না। আরও একটা সত্য কথা আপনাকে বলে যাই। এইসব নোংরা কাজ করা আমার ব্যবসা নয়। আপনাকে আমি অতিশয় ঘৃণা করি, এবং এক পাপিষ্ঠের জন্য আর এক পাপিষ্ঠকে অনুরোধ করতে আমি লজ্জা বোধ করি; কিন্তু সে আপনি বুঝবেন না—সে সাধ্যই আপনার নেই।

জীবানন্দের মুখের উপর কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। লেশমাত্র উত্তেজনা নাই, তেমনি সৌম্য-শান্তকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আপনাকে আমি ঘৃণা করিনে নির্মলবাবু, শ্রদ্ধা করি, এ বোঝবার সাধ্যও ত আপনার নেই!

তাহার নির্বিকার স্বচ্ছন্দতায় নির্মল জ্বলিতে লাগিল, এবং এই প্রত্যুত্তরকে কদর্য উপহাস কল্পনা করিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিল, চোর-ডাকাতদের মধ্যেও বিশ্বাস বলে একটা বস্তু আছে, নিজেদের মধ্যে তারাও তা ভাঙ্গে না। বিশ্বাসঘাতককে তারা ঘৃণা করে। কিন্তু জীবনব্যাপী দুরাচারে বুদ্ধি যার বিকৃত, তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই—আমি চললাম। এই বলিয়া সে চক্ষের পলকে পিছন ফিরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। জীবানন্দ চাহিয়া দেখিল অনেকেই হাতের কাজ বন্ধ করিয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া আছে। সে ম্লানমুখে শুধু একটু হাসিয়া বলিল, সময় যেটুকু নষ্ট করলি বাবারা, সেটুকু কিন্তু পুষিয়ে দিস্। কথাটা নির্মলের কানে গেল।

দিন-চারেকের মধ্যেই কৃষককুলের চিরদিনের দুঃখ দূর করিয়া জল-নিকাশের সাঁকো তৈরি শেষ হইল, গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে ভিড় করিয়া লোক দেখিতে আসিল, কিন্তু যে ইহা নির্মাণ করিল, সেই জীবানন্দ শয্যাগত হইয়া পড়িল। এ পরিশ্রম সে সহ্য করিতে পারিল না। এই অজুহাতে এবং সাহেবের সহিত দেখা করিয়া নানা কৌশলে নির্মল তদন্তের দিন এক সপ্তাহ পিছাইয়া দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু সে-দিনও সমাগতপ্রায়। কেবল দুটা দিন বাকী। বাঁচিবার একমাত্র পথ ছিল, এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া জনার্দন তারাদাসকে দিয়া চণ্ডীমাতার বিশেষ পূজার ব্যবস্থা করাইলেন, এবং নিজে মন্দিরের একান্তে বসিয়া সকাল সন্ধ্যায় কায়মনে ডাকিতে লাগিলেন, মায়ের কৃপায় যেন এ যাত্রা জীবানন্দ আর না ওঠে। সাহেব সরজমিনে আসার পূর্বেই যেন কিছু একটা হইয়া যায়। মেয়েকে লইয়া ষোড়শীর হাতে-পায়ে গিয়া পড়ার কথাও মনে হইয়াছিল, কারণ ছোটলোকদের যদি কেহ ঠেকাইতে পারে ত কেবল সে-ই পারে, কিন্তু কোথায় সে? যে গাড়োয়ান তাহাকে লইয়া গিয়াছিল বহু চেষ্টাতেও তাহার সন্ধান মিলে নাই। সাতদিনের সময় পাইয়া হৈমর নিশ্চিত ভরসা হইয়াছিল ছেলেকে সঙ্গে করিয়া গিয়া একবার কাঁদিয়া পড়িতে পারিলে সে কিছুতেই না বলিতে পারিবে না; কিন্তু সে আশা যে বৃথা হইতে বসিল।

এই কয়দিন প্রায় প্রত্যহই নির্মলকে সদরে যাইতে হইতেছিল। এই যে বিশ্রী মামলাটা বাধিবে, তাহার সকল ছিদ্রপথই যে আগে হইতে বন্ধ করা আবশ্যক। সেদিন দুপুরবেলায় সে রেজেস্ট্রী আপিসের বারান্দার একধারে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া কতকগুলো প্রয়োজনীয় দলিলপত্রের নকল লইয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল, হঠাৎ সুমুখেই ডাক শুনিল, জামাইবাবু, সেলাম। ভাল আছেন?

নির্মল চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, ফকিরসাহেব। তাঁহারও হাতে একতাড়া কাগজ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া অভিবাদন করিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া কহিল, শুনে-ছিলাম আপনাকে ডাকলেই আপনার দেখা মেলে। এ-কয়দিন মনে মনে আমি প্রাণপণে ডাকছিলাম।

ফকির হাসিলেন, কহিলেন, কেন বলুন ত?

ষোড়শীকে আমার বড় প্রয়োজন। তিনি কোথায় আছেন আমাকে দেখা করতেই হবে।

ফকির বিস্মিত হইলেন না, আনন্দও প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, দেখা না হওয়াই ত ভাল।

নির্মল অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কহিল, আপনি হয়ত সর্বজ্ঞ। তা যদি হয়, জানেন ত আমাদের কত বড় প্রয়োজন?

ফকির কহিলেন, না, আমি সর্বজ্ঞ নয়, কিন্তু মা ষোড়শী কোন কথাই আমাকে গোপন করেন না। একটু থামিয়া বলিলেন, দেখা হওয়া না-হওয়ার কথা তিনিই জানেন, আমি জানিনে, কিন্তু তাঁর সমস্ত ব্যাপার আপনাকে জানাতে আমার বাধা নেই। কারণ, একদিন যখন সবাই তাঁর সর্বনাশে উদ্যত হয়েছিল, তখন আপনিই একাকী তাঁকে রক্ষা করতে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি তাঁর মুখেই এ কথা শুনেচি।

নির্মল কহিল, আর আজ ঠিক সেইটি উলটে দাঁড়িয়েচে ফকিরসাহেব। এখন কেউ যদি তাঁদের বাঁচাতে পারে ত তিনিই পারেন।

ফকিরের মুখ অপ্রসন্ন হইল। ইহার বিস্তৃত বিবরণের জন্য তিনি কৌতূহল প্রকাশ না করিয়া কেবল কহিলেন, চণ্ডীগড়ের খবর আমি জানিনে। কিন্তু আমি বলি, তাঁর ভাল করার ভার ভগবানের উপর আপনি ছেড়ে দিন। আমার মাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না নির্মলবাবু।

বিগত দিনের সমস্ত দুঃখের ইতিহাস নির্মলের মনে পড়িল। ইহার জবাব দেওয়া কঠিন, সে শুধু কুণ্ঠার সহিত প্রশ্ন করিল, এখন তিনি কোথায় আছেন?

জায়গাটাকে শৈবাল-দীঘি বলে।

সেখানে সুখে আছেন?

এইবার ফকির মৃদু হাসিয়া কহিলেন, এই নিন! মেয়েমানুষের সুখে থাকার খবর দেবতারা জানেন না। আমি ত আবার সন্ন্যাসী মানুষ। তবে মা আমার শান্তিতে আছেন এইটুকুই অনুমান করতে পারি।

নির্মল ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আদালতে আপনি কোথায় এসেছিলেন?

ফকির কহিলেন, তা বটে! সন্ন্যাসী ফকিরের এ স্থান নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু সংসারের মোহ ত মানুষকে সহজে ছাড়ে না বাবা, তাই শেষ বয়সে আবার বিষয়ী হয়ে উঠেচি। ভাল কথা, বিনা পয়সায় আপনার মত আইনজ্ঞ ব্যক্তিও আর পাব না, এবং আপনাকেই কেবল বলা যায়। আমার এই কাগজগুলি যদি দয়া ক'রে একবার দেখে দেন।

নির্মল হাত বাড়াইয়া কহিল, এ কিসের কাগজ?

একটা দান-পত্রের খসড়া। বলিয়া ফকির তাঁহার কাগজের বাণ্ডিল নির্মলের হাতে তুলিয়া দিলেন। পরের কাজ করিবার মত সময় ও প্রবৃত্তি নির্মলের ছিল না; সে নিস্পৃহের মত তাহা গ্রহণ করিল, এবং ধীরে ধীরে তাহার পাক খুলিয়া পাঠে নিযুক্ত হইল। কিন্তু কয়েক ছত্র পরেই অকস্মাৎ তাহার চোখের দৃষ্টি তীব্র, মুখ গম্ভীর এবং কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। এই দানের সম্পত্তি অকিঞ্চিৎকর নয়, কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া তাহার বিবরণ, সেইগুলির উপর কোনমতে চোখ বুলাইয়া লইয়া অবশেষে শেষ পাতায় আসিয়া যখন তাহার জীবানন্দের সেই চিঠিখানার প্রতি দৃষ্টি পড়িল, তখন লাইন-কয়েকের সেই লিখনটুকু এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিয়া নির্মল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ফকির তার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, বলিলেন, সংসারে কত বিস্ময়ই না আছে!

নির্মলের মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, হাঁ।

ফকির কহিল, খসড়াটা ঠিক ত?

নির্মল কহিল, ঠিক। কিন্তু এ যে সত্য তার প্রমাণ কি?

ফকির বলিলেন, নইলে এ দান ষোড়শী নিতেন না। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হবে নির্মলবাবু? এই বলিয়া তিনি উৎসুকনেত্রে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু জবাব পাইলেন না। নির্মলের চোখের দৃষ্টি ঝাপসা এবং কপাল কুঞ্চিত হইয়াই রহিল, মন যে তাহার কোথায় গিয়াছিল ফকির বোধ করি তাহা অনুমান করিতেও পারিলেন না।

আটাশ

অকস্মাৎ দিন-কয়েকের অবিশ্রান্ত বারিপাতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম এমন অচল হইয়া গেল যে, অপ্রতিহত-গতি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁহার জঙ্গলের চাকাটাকে ঠেলিয়া আনিতে পারিলেন না। তবে তাঁহার হুকুম ছিল, বর্ষণ কমিলেই তিনি চণ্ডীগড়ে পদার্পণ করিবেন, এবং সেই হুকুম তামিলের দিন পড়িয়াছে আজ। খবর পৌঁছিয়াছে, গ্রামের বাহিরে বারুইয়ের তীরে তাঁহার তাঁবু খাটানো হইতেছে, মুরগী, আণ্ডা, দুধ, ঘি প্রভৃতি যোগান দেওয়ার কাজে এককড়ি প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছে এবং খুব সম্ভব দ্বিপ্রহরের দিকেই চণ্ডীগড়ে তাঁহার ঘোড়ার পদধুলি পড়িবে।

শেষ রাত্রি হইতেই বর্ষণ থামিয়াছে, কিন্তু আকাশের চেহারা বদলায় নাই। এ মূর্তি দেখিয়া জোর করিয়া বলিবার জো নাই দুর্যোগ থামিল, কিংবা আবার চারিদিক আকুল করিয়া আসিবে। বাড়ি পোড়ার পরে, বাহিরের দিকে যে দ্বিতল ঘর দুখানিতে জীবানন্দ আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারই একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় ক্যাম্পখাট পাতিয়া সে সকালবেলায় বারুইয়ের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। পাহাড়ের ঘোলা জল নামিয়া নদীর সেই শীর্ণ দেহ আর নাই; উদ্দাম স্রোত তটপ্রান্তে সবেগে আঘাত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—জীবানন্দ কত কি যে ভাবিতেছিল তাহার ঠিকানা নাই। জ্বর এবং তাহার আজন্ম-সহচর বক্ষশূল কমিয়াছে, কিন্তু সারে নাই। আজও সে শয্যাশায়ী, উঠিতে হাঁটিতে পারে না। ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের পোঁছানোর খবর পাইলে সে পালকিতে করিয়া নিজে গিয়া দেখা করিবে। মিথ্যা কিছুই বলিবে না তাহা সে স্থির করিয়াছে—যেমন করিয়া মদ-ছাড়া সে স্থির করিয়াছিল, ঠিক তেমনি করিয়া; যেমন করিয়া সে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিল, এ-জীবনে দুঃখ কাহাকেও আর দিবে না, ঠিক তেমন করিয়াই ইহাও সে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু আজ যথার্থই তাহার কাহার বিরুদ্ধেও কোন বিদ্বেষ, কোন নালিশ ছিল না; সে মনে মনে এই বলিয়া তর্ক করিতেছিল যে, অপরাধ ত মানুষেই করে, অন্যায় ত মানুষের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং তাহার সাক্ষ্যে সে ছাড়া আর কেহ শাস্তি পাইবে চিন্তা করিয়া সে বাস্তবিক বেদনা বোধ করিতেছিল। কি করিয়া বলিলে যে কাহারও কোন ক্ষতি হয় না, এই কথাই যে কতরূপে সে আলোচনা করিতেছিল তাহার নির্দেশ নাই, কিন্তু কোন বিষয়ই সুশৃঙ্খলায় শেষ পর্যন্ত ভাবিবার মত অবস্থা তাহার ছিল না, তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল একই সমস্যা একই মীমাংসা লইয়া বার বার তাহার সুমুখে আসিতেছিল। এই লইয়া সে যখন প্রায় হয়রান হইয়া উঠিয়াছিল, এমনি সময়ে সম্পূর্ণ একটা নূতন জিনিসের উপর গিয়া তাহার মন এবং দৃষ্টি একই সময়ে স্থিতিলাভ করিল। একখানা ছোট নৌকা স্রোতের অনুকূলে অত্যন্ত দ্রুতবেগে আসিতেছিল, এবং তাহার বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্রই মাঝি ডাঙ্গার উপরে নোঙ্গর ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহার গতিরোধ করিল। এ নদীতে নৌকা চলাচল অত্যন্ত বিরল। বৎসরের অধিকাংশ দিন যথেষ্ট জল থাকে না বলিয়াই শুধু নয়, বর্ষাকালেও একটানা খরস্রোতে যাতায়াতের সুবিধা বড় হয় না। বিশেষতঃ তাহারই বাটীর সম্মুখে আসিয়া যখন এমন করিয়া থামিল, তখন কৌতূহলে সে বালিশে ঠেস দিয়া উঁচু হইয়া বসিয়া দেখিল জন-দুই পুরুষ এবং তিনজন রমণী নামিয়া আসিতেছেন। ঘন-পল্লব গাছের অন্তরালে ইহাদের স্পষ্ট দেখা না গেলেও একজনকে জীবানন্দ নিশ্চয় চিনিতে পারিল, তিনি জনার্দন রায়। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি খুব সম্ভব তাঁহার পত্নী এবং অপরটি তাঁহার কন্যা, হয়ত কোথাও গিয়াছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট আসার সংবাদ পাইয়া ত্বরা করিয়া ফিরিয়াছেন। শুধু একটা কথা সে বুঝিতে পারিল না, নিজেদের ঘাট ছাড়িয়া এতদূরে আসিয়া নৌকা বাঁধিবার হেতু কি। হয়ত সুবিধা ছিল না, হয়ত ভুল হইয়াছে, হয়ত-বা ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টিপথে পড়া তাঁহার ইচ্ছা নয়; কিন্তু সে যাই হোক, লোকটা যখন রায়-মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যা, তখন কষ্ট করিয়া বসিয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া জীবানন্দ আবার শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া সে মনে মনে হাসিয়া কহিল, অপরাধের সাজা দিবার মালিক কি একা আদালত? এই মানুষটিকে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব হয়ত কখনো দেখেও নাই, দেখিলেও হয়ত চিনিত না। তবুও ইহার শঙ্কা ও সতর্কতার অবধি নাই। স্ত্রী ও কন্যার কাছে এই যে ভীরুতার লজ্জা, দণ্ডের পরিমাণে ইহাই কি সামান্য?

সহসা কে একজন আসিয়া তাহার শিয়রের দিকে বসিয়া পড়ার চাপে তুচ্ছ ক্যাম্প-খাটখানা মচ্‌ করিয়া উঠিল। জীবানন্দ চমকিয়া চাহিয়া কহিল, কে? বারান্দায় প্রবেশ করিবার পদশব্দও সে কাহারও পায় নাই, যে বসিয়াছিল সে তাহার কপালের উপর একটা হাত রাখিয়া কহিল, আমি।

জীবানন্দ হাত বাড়াইয়া সেই হাতখানি নিজের দুর্বল হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল, এই নৌকাতে তুমি এলে?

হ্যাঁ।

রায়মহাশয় তোমাকে ধরে নিয়ে এলেন, তাঁকে বাঁচাতে হবে?

হাঁ, কিন্তু সে হৈমর বাবাকে, জনার্দন রায়কে নয়।

বুঝেচি। কিন্তু প্রজারা মকদ্দমা ছাড়বে কেন, সাগর স্বীকার করবে কেন?

আমার কাছে তারা স্বীকার করেচে।

করেচে? আশ্চর্য! বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

ষোড়শী কহিল, না, আশ্চর্য নয়। তারা আমাকে মা বলে।

আমি তা জানি। জীবানন্দের হাতের মুঠা শিথিল হইয়া আসিল। সে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, ভালই হয়েছে। আজ সকাল থেকেই আমি ভাবছিলাম অলকা, এই ভয়ানক শক্ত কাজ আমি করব কি করে? আমি বাঁচলাম, আর আমার কিছুই করবার রইল না। তুমি সমস্তই করে দিয়েচ।

ষোড়শী মাথা নাড়িয়া কহিল, তোমার করবার আর কিছু না থাকতে পারে, কিন্তু আমার কাজ এখনো বাকী রয়ে গেছে। এই বলিয়া সে জীবানন্দের যে হাতটা স্খলিত হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল, তাহা নিজের মুঠোর মধ্যে গ্রহণ করিয়া তাহার কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, নৌকা আমার প্রস্তুত, কোনমতে তোমাকে নিয়ে পালাতে পারলেই আমার এইসকল কাজের বড় কাজটা সারা হয়। চল। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাথাটা তাহার জীবানন্দের বুকের উপর রাখিয়া স্থির হইয়া রহিল। বহুক্ষণ কেহই কোন কথা কহিল না, কেবল একজনের প্রবল বক্ষস্পন্দন আর একজন নিঃশব্দে অনুভব করিতে লাগিল।

জীবানন্দ কহিল, কোথায় আমাকে নিয়ে যাবে?

ষোড়শী কহিল, যেখানে আমার দু'চোখ যাবে।

কখন যেতে হবে?

এখনই। সাহেব এসে পড়ার আগেই।

জীবানন্দ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, কিন্তু আমার প্রজারা? তাদের কাছে আমাদের পুরুষানুক্রমে জমা করা ঋণ?

ষোড়শী তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া চুপি চুপি বলিল, পুরুষানুক্রমে আমাদের তা শোধ দিতে হবে।

জীবানন্দ খুশী হইয়া বলিল, ঠিক কথা অলকা। কিন্তু দেরি করলে ত চলবে না। এখন থেকে ত আমাদের দু'জনকে এ ভার মাথায় নিতে হবে।

ষোড়শী সহসা দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, হুজুর, দাসীকে এইটুকু শুধু ভিক্ষে দেবেন, প্রজাদের ভার নেবার চেষ্টা করে আর ভারী করে তুলবেন না। সমস্ত জীবন ধরেই ত নানাবিধ ভার বয়ে এসেছেন, এখন অসুস্থ দেহ একটু বিশ্রাম করলে কেউ নিন্দে করবে না। কিন্তু কে সাহেব এসে পড়তে পারে, চলুন।

প্রত্যুত্তরে জীবানন্দ শুধু একটুখানি হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, এমন করে আমার সমস্ত ক্ষমতা তুমি কেড়ে নিয়ো না অলকা—আমাকে দুঃখীর কাজে লাগিয়ে দেখো কখ্খনো ঠকবে না।

কথা শুনিয়া অলকার দু'চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল, এবং এমন একান্ত আত্মসমর্পণের দ্বারা যে তাহার সর্বস্ব জয় করিয়া লইয়াছে, তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার পদতলের মাটিটা পর্যন্ত যেন অকস্মাৎ কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে সে তৎক্ষণাৎ সংবরণ করিয়া লইয়া হাতের উপরে একটু চাপ দিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা চল ত এখন। নৌকাতে বসে তখন ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখবো কি কি ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া যেতে পারবে এবং কি কি একেবারেই দেওয়া চলবে না।

সেই ভালো! বলিয়া জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

পণ্ডিতমশাই

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুঞ্জ বোষ্টমের ছোট বোন কুসুমের বাল্য-ইতিহাসটা এতই বিশ্রী যে, এখন সে-সব কথা স্মরণ করিলেও, সে লজ্জায় দুঃখে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। যখন সে দু'বছরের শিশু তখন বাপ মরে, মা ভিক্ষা করিয়া ছেলে ও মেয়েটিকে প্রতিপালন করে। যখন পাঁচ বছরের, তখন মেয়েটিকে সুশ্রী দেখিয়া, বাড়ুল গ্রামের অবস্থাপন্ন গৌরদাস অধিকারী তাহার পুত্র বৃন্দাবনের সহিত বিবাহ দেয়; কিন্তু বিবাহের অনতিকাল পরেই কুসুমের বিধবা-মায়ের দুর্নাম উঠে, তাহাতে গৌরদাস কুসুমকে পরিত্যাগ করিয়া ছেলের পুনর্বার বিবাহ দেয়।

কুসুমের মা, দুঃখী হইলেও, অত্যন্ত গর্বিতা ছিল। সেও রাগ করিয়া কন্যাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া, সেই মাসেই আর একজন আসল বৈরাগীর সহিত কন্যার কণ্ঠী-বদল-ক্রিয়া সম্পন্ন করে; কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই এই আসল বৈরাগীটি নিত্যধামে গমন করেন। তবে ইনি কে, কোন্ গ্রামে বাড়ি, তাহা একা কুসুমের মা ছাড়া, আর কেহই জানিত না, কুঞ্জও না। তাহার মা, কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই। কণ্ঠীবদল ব্যাপারটা সত্য, কিংবা শুধুই রচনা, তাহাও কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিত না। এত কাণ্ড কুসুমের সাত বৎসর বয়সেই শেষ হইয়া যায়। সেই অবধি কুসুম বিধবা। সংক্ষেপে এই তাহার বাল্য-ইতিহাস। এখন সে ষোল বৎসরের যুবতী,—তাহার দেহে রূপ ধরে না। যেমনই গুণে, তেমনই কর্মপটুতা, আবার লেখাপড়াও জানে। খুব বড়লোকের ঘরেও বোধ করি তাহাকে বে-মানান দেখাইত না।

এদিকে বৃন্দাবনের বাপ মরিয়াছে, দ্বিতীয় স্ত্রী মরিয়াছে; তাহার বয়সও পঁচিশ-ছাব্বিশের অধিক নয়। এখন সে কুসুমকে ফিরিয়া গ্রহণ করিতে চাহে। সে কুঞ্জকে পঞ্চাশ টাকা নগদ, পাঁচ জোড়া ধুতি-চাদর এবং কুসুমকে পাঁচ ভরি সোনা ও একশ' ভরি রূপার অলঙ্কার দিতে স্বীকৃত। দুঃখী কুঞ্জনাথ লোভে পড়িয়াছে। তাহার বড় ইচ্ছা কুসুম সম্মত হয়; কিন্তু কুসুম সেকথা কানেও তোলে না। কেন তাহা বলিতেছি;—ইহাদের বাপ-মা নাই। ভাই-বোন যে দুখানি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করে, তাহা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ার ভিতরেই। শিশুকাল হইতেই কুসুম ব্রাহ্মণ-কন্যাদের সঙ্গেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, একত্রে হর পণ্ডিতের পাঠশালে পড়িয়াছে, খেলাধুলা করিয়াছে। আজিও তাহারাই তাহার সঙ্গীসাথী। তাই এসব প্রসঙ্গেও তাহার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় লজ্জায় শিহরিয়া উঠে। ম্যালেরিয়া এবং ওলাউঠা-প্রপীড়িত বঙ্গদেশে বিধবা হইতে বিলম্ব হয় না। তাহার বাল্যসখীদের অনেকেই, তাহার মত হাতের নোয়া ও সিঁথির সিন্দুর ঘুচাইয়া, আবার জন্মস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে; ইহারা কেহ তাহার মকর-গঙ্গাজল, কেহ সই মহাপ্রসাদ। ছি, ছি, দাদার কথায় সম্মত হইলে, এ কালামুখ কি ইহজন্মে আর এ গ্রামে সে দেখাইতে পারিবে!

কুঞ্জ কহিল, দিদি, রাজী হ। ধরতে গেলে বৃন্দাবনই তোর আসল বর।

কুসুম অত্যন্ত রাগিয়া জবাব দিল, আসল নকল বুঝিনে দাদা; শুধু বুঝি, আমি বিধবা। কেন? একি কুকুর-বেরাল পেয়েছ যে, যা-ইচ্ছে হবে, তাই করবে? এই বিয়ে এই কণ্ঠীবদল: আবার বিয়ে, আবার কণ্ঠীবদল: যাও, ওসব আমার সুমুখে তুল না। বাড়ুলের উনি আমার কেউ নয়; আমার স্বামী ম'রেছে, আমি বিধবা।

নিরীহ কুঞ্জ আর কথা কহিতে পারে না। তাহার এই শিক্ষিতা তেজস্বিনী ভগিনীটির সুমুখে, সে কেমন যেন থতমত খাইয়া যায়। তথাপি সে ভাবে, আর একরকম করিয়া। সে বড় দুঃখী। এই দু'খানি কুটীর এবং তৎসংলগ্ন অতি ক্ষুদ্র একখানি আম-কাঁঠালের বাগান ছাড়া আর তাহার কিছু নাই। অতএব নগদ এতগুলি টাকা এবং এত জোড়া ধুতি-চাদর তাহার কাছে সোজা ব্যাপার নহে। তবুও এই প্রলোভন ছাড়াও, সে তাহার একমাত্র স্নেহের সামগ্রীকে এই ভাল জায়গাটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহাকে সুখী দেখিয়া নিজেও সুখী হইতে চাহে।

কণ্ঠীবদল তাহাদের সমাজে 'চল' আছে, তাই তাহার মা, ও-কাজ করিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সে যখন মরিয়াছে এবং বৃন্দাবন, কুসুমের স্বামী যখন এত সাধাসাধি করিতেছে, তখন, কেন যে কুসুম এত বড় সুযোগের প্রতি দৃক্‌পাত করিতেছে না, তাহা সে কোন-মতেই ভাবিয়া পায় না। শুধু সমাজের ফৌজদার ও ছড়িদারের মত লইয়া কিছু মালসা-ভোগ দেওয়া। ব্যয়ভার সমস্তই বৃন্দাবন বহিবে; তারপর এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া, একেবারে রাজরানী হইয়া বসিবে। কুসুম কি বোকা! আহা, সে যদি কুসুম হইতে পারিত! এমনই করিয়া কুঞ্জ প্রতিদিনই চিন্তা করে।

কুঞ্জ ফেরিওয়ালার ব্যবসা করে। একটি বড় ধামায় ঘুন্‌সি, মালা, চিরুনি, কৌটা, সিন্দুর, তেলের মসলা, শিশুদের জন্য ছোট-বড় পুতুল প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য এবং কুসুমের হাতের নানাবিধ সুচের কারুকার্য ইত্যাদি মাথায় লইয়া পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে ফেরি করিয়া বেড়ায়। সমস্ত দিন বিক্রয় করিয়া যাহা পায়, দিনান্তে সেই পয়সাগুলি বোনটির হাতে আনিয়া দেয়। ইহা দ্বারা কেমন করিয়া কুসুম মূলধন বজায় রাখিয়া যে সুচারুরূপে সংসার চালাইয়া দেয়, ইহা সে বুঝিতেও পারে না—পারিবার চেষ্টাও করে না।

আজ সকালে সে ঘুরিতে ঘুরিতে বাড়লে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। পথে বৃন্দাবনের সহিত দেখা; সে মাঠে কাজে যাইতেছিল, আর গেল না। স্বজাতি এবং কুটুম্বকে মহাসমাদরে বাড়িতে ধরিয়া আনিল; হাত-পা ধুইতে জল দিল এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া খাতির করিল। দ্বিপ্রহরে তাহার মা নানাবিধ ব্যঞ্জনের দ্বারা কুঞ্জকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইলেন, এবং এত রৌদ্রে কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না।

সন্ধ্যার পর কুঞ্জ ঘরে ফিরিয়া, হাত-পা ধুইয়া, মুড়ি-মুড়কি চিবাইতে চিবাইতে সেই সব কাহিনী ভগিনীর কাছে বিবৃত করিয়া, শেষে কহিল, হাঁ, একটা গেরস্থ বটে! বাগান, পুকুর, চাষবাস, কোন জিনিসটির অভাব নেই—মা-লক্ষ্মী যেন উথলে পড়ছেন।

কুসুম চুপ করিয়া শুনিতেছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিয়া, বৃন্দাবনের মা কি রাঁধিয়াছিলেন এবং কিরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিয়া কহিল, খাইয়ে দাইয়েই কি ছেড়ে দিতে চায়! বলে, এত রোদ্দুরে বেরুলে মাথা ধ'রে অসুখ করবে।

কুসুম দাদার মুখের দিকে চাহিয়া, একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাহ'লে দাদা বুঝি সারাদিন এই কর্মই ক'রেছ? খেয়েচ আর ঘুমিয়েচ?

তাহার দাদাও সহাস্যে জবাব দিল, কি করি বল বোন! ছেড়ে না দিলে তো আর জোর করে আসতে পারিনে?

কুসুম কহিল, তা'হলে ও গাঁয়ে আর কোনদিন যেও না।

কুঞ্জ কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না; জিজ্ঞাসা করিল, যাব না! কেন?

পথে দেখা হ'লেই ত ধরে নিয়ে যাবে। তারা বড়লোক, তাদের ক্ষতি নেই; কিন্তু আমাদের তাহ'লে ত চলবে না দাদা!

ভগিনীর কথায় কুঞ্জ ক্ষুণ্ণ হইল।

কুসুম তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, সে কথা বলিনি দাদা—সে কথা বলিনি; দু'একদিনে আর কি লোকসান হবে। তা নয়; তবে তারা বড়মানুষ, আমরা দুঃখী; কাজ কি দাদা তাদের সঙ্গে বেশী মেশামিশি ক'রে?

কুঞ্জ জবাব দিল, আমি তাদের ঘরে ত যেচে যাইনি, কুসুম!

তা যাওনি বটে; তবু ডেকে নিয়ে গেলেই বা যাবার দরকার কি দাদা?

তুই যে এই বামুন-মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করিস তারাও ত সব বড়লোক, তবে যাস কেন?

কুসুম দাদার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, তাদের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই খেলা করি; তা ছাড়া তারা আমাদের জাতও নয়, সমাজও নয়। এখানে আমাদের লজ্জা নেই; কিন্তু ওদের কথা আলাদা।

কুঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, সেখানেও লজ্জা নেই। মা-লক্ষ্মী তাঁদের দয়া

করেছেন, দু পয়সা আছে সত্য; কিন্তু এতটুকু দেমাক অহঙ্কার নেই—সবাই যেন মাটির মানুষ! বৃন্দাবনের মা আমার হাত দুটি ধরে যেমন করে—

কথাটা শেষ হইল না, মাঝখানেই কুসুম বিরক্ত ও ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আবার সেইসব পুরোনো কথা! মায়ের নামে ওরা যে এত বড় কলঙ্ক তুলেছিল, দাদা বুঝি ভুলে বসে আছ!

কুঞ্জ প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তারা একটা কথাও তোলেনি। বদ লোকে হিংসে ক'রে বদনাম দিয়েছিল।

কুসুম কহিল, তাই ওরা আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে আর একটা বিয়ে   িছিল—কেমন?

কুঞ্জ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তা বটে, তবে কিনা তাতে বৃন্দাব   ারীর একটুও দোষ ছিল না। বরং তার বাপের দোষ ছিল।

কুসুম একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তভাবে বলিল, যার দোষই থাক দাদা—যা হয় না, হবার নয়, দরকার কি এক শ' বার সেই সব কথা তুলে? আমি পারিনে আর তর্ক করতে।

কুঞ্জ প্রথমটা জবাব দিতে পারিল না, পরে একটু রুষ্টস্বরেই বলিল, তুই ত তর্ক করতে পারিস নে; কিন্তু আমাকে যে সব দিক দেখতে হয়! আজ আমি ম'লে তোর দশা কি হবে, তা একবার ভাবিস?

কুসুম বিরক্ত হইয়াছিল, কথা কহিল না।

কুঞ্জ গম্ভীর-মুখে কহিতে লাগিল, আমি আমাদের মুরুব্বিদের সবাইকে জিজ্ঞেস করেচি, তোর শাউড়ী নলডাঙ্গার বুড়ো বাবাজীর মত পর্যন্ত জেনে এসেছে। সবাই খুশী হয়ে মত দিয়েচে, তা জানিস?

কুসুমের মুখের ভাব সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে সংক্ষেপে, জানি বৈ কি!—বলিয়াই চুপ করিয়া গেল।

তাহার কথা লইয়া, তাহার মায়ের কথা লইয়া, তাহার কণ্ঠীবদলের কথা লইয়া, তাহাদের সমাজে আলোচনা চলিতেছে, গণ্যমান্যদিগের মত জানাজানি চলিতেছে,—এ সংবাদ তাহাকে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল; কিন্তু এ ভাব চাপা দিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, এ বেলা কি খাবে দাদা?

কুঞ্জ বোনের মনের ভাব বুঝিল, সেও মুখ ভারী করিয়া বলিল—কিছু না। আমার ক্ষিদে নেই।

কুসুম অধিকতর ক্রুদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাও সংবরণ করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ এক কলিকা তামাক সাজিয়া লইয়া সেইখানে বসিয়া তামাকটা নিঃশেষ করিয়া হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া ডাক দিল, কুসুম!

কুসুম তাহার ঘরের মধ্যে সিলাই করিতে বসিয়াছিল—সাড়া দিল, কেন?

বলি, রাত্তির হচ্ছে না? রাঁধবি কখন?

কুসুম তথা হইতে জবাব দিল, আজ আর রাঁধবো না।

কেন? তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।

কুসুম চেঁচাইয়া বলিল, আমি এক শ' বার বকতে পারিনে।

বোনের কথা শুনিয়া কুঞ্জ দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া, ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। চেঁচাইয়া বলিল, জ্বালাতন করিস নে কুসি! অমনধারা করলে যেখানে দু'চোখ যায় চলে যাব, তা' বলে দিচ্চি।

যাও—এক্ষুণি যাও। বাড়ির মধ্যে আমি হাড়ী-ডোমের মত, অমন করে হাঁকাহাঁকি করতে দেব না। ইচ্ছা হয় যাও, ঐ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যত পার চেঁচাও গে।

কুঞ্জ ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, পোড়ামুখী, তুই ছোটবোন হয়ে বড়ভাইকে তাড়িয়ে দিস?

কুসুম বলিল, দিই। বড় বলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করবে নাকি?

বোনের মুখের পানে চাহিয়া কুঞ্জ মনে মনে একটু ভয় পাইল। গলা নরম করিয়া বলিল, কিসে যা ইচ্ছে করলুম শুনি?

কেন তবে আমাকে না বলে ওখানে গিয়ে খেয়ে এলে?

কেন—তাতে দোষ কি হয়েছে?

কুসুম তীব্রভাবে বলিল, দোষ হয়েচে। ঢের দোষ হয়েচে। আমি মানা ক'রে দিচ্ছি, আর তুমি ওখানে যাবে না।

কুঞ্জ বড়ভাই, কলহের সময় নতি স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা করিল, কহিল, তুই কি বড়বোন যে, আমাকে হুকুম করবি? আমার ইচ্ছে হলেই সেখানে যাব।

কুসুম তেমনি জোর দিয়া বলিল, না, যাবে না। আমি শুনতে পেলে ভাল হবে না বলে দিচ্চি দাদা!

এবার কুঞ্জ যথার্থ ভয় পাইল। তথাপি মুখের সাহস বজায় রাখিয়া বলিল, যদি যাই কি করবি তুই?

কুসুম সিলাই ফেলিয়া দিয়া তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আমাকে রাগিও না বলছি দাদা—যাও আমার সুমুখ থেকে—সরে যাও বলছি।

কুঞ্জ শশব্যস্তে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোর ভয়ে সরে যাব? যদি না যাই, কি করতে পারিস তুই?

কুসুম জবাব দিল না; প্রদীপের আলোটা আরো একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সিলাই করিতে বসিল।

আড়ালে দাঁড়াইয়া কুঞ্জর সাহস বাড়িল, কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত উচ্চ করিয়া বলিল, লোকে কথায় বলে, 'স্বভাব যায় না মলে'। নিজে রাক্ষসীর মত চেঁচাবি, তাতে দোষ নেই; কিন্তু আমি একটু জোর কথা কইলেই—বলিয়া কুঞ্জ থামিল; কিন্তু ঘরের ভিতর হইতে প্রতিবাদ আসিল না দেখিয়া, সে মনে মনে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল। উঠিয়া গিয়া হুঁকাটা তুলিয়া আনিয়া নিরর্থক গোটা-দুই টান দিয়া, গলার সুর আর এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, আমি যখন বড়, আমি যখন কর্তা, তখন আমার হুকুমেই কাজ হবে। বলিয়া পোড়া তামাকটা ঢালিয়া ফেলিয়া নূতন করিয়া সাজিতে সাজিতে, এবার রীতিমত জোর গলায় হাঁকিয়া কহিল, চাইনে আমি কারো কথা, এক শ' বার না-না শুনতে আমি চাইনে! আমি যখন কর্তা —আমার যখন বাড়ি—তখন আমি যা ব'লব তাই—বলিয়া সে সহসা পিছনে পদশব্দ শুনিয়া ঘাড় বাঁকাইয়াই স্তব্ধ হইয়া থামিল।

কুসুম নিঃশব্দে আসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল; বলিল, বসে বসে কোঁদল করবে, না যাবে এখান থেকে?

ছোটবোনের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুমুখের বড়ভাইয়ের কর্তা সাজিবার শখ উড়িয়া গেল। তাহার গলা দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না। কুসুম তেমনিভাবে বলিল, দাদা, যাবে কি না?

এখন সে কুঞ্জনাথও নাই, সে গলাও নাই; চিঁচিঁ করিয়া বলিল, বললুম ত, তামাকটা সেজে নিয়েই যাচ্চি।

কুসুম হাত বাড়াইয়া, দাও আমাকে, বলিয়া কলিকাটা হাতে লইয়া চলিয়া গেল। মিনিট-খানেক পরে, ফিরিয়া আসিয়া, সেটা হুঁকার মাথায় রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, স্যাকরাদের দোকানে যাচ্চ ত?

কুঞ্জ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

কুসুম সহজভাবে বলিল, তাই যাও। কিন্তু বেশী রাত ক'র না, আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না।

কুঞ্জ হুঁকাটা হাতে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন কুঞ্জ ভগিনীর কাছে বৃন্দাবনের সাংসারিক পরিচয় দিবার সময় অত্যুক্তি মাত্র করে নাই। সত্যই তাহাদের গৃহে লক্ষ্মী উথলিয়া পড়িতেছিল; অথচ সেজন্য কাহারও অহঙ্কার অভিমান কিছুই ছিল না।

এ গ্রামে বিদ্যালয় ছিল না। বৃন্দাবন ছেলেবেলায় নিজের চেষ্টায় বাংলা লেখাপড়া শেখে এবং তখন হইতেই একটা পাঠশালা খুলিবার সংকল্প করে। কিন্তু তাহার পিতা গৌরদাস পাকা লোক ছিলেন; বৃন্দাবন একমাত্র সন্তান হইলেও, এইসব অনাসৃষ্ট কার্যে পুত্রকে প্রশ্রয় দেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, সে নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে বিনা-বেতনের একটা পাঠশালা খুলিয়া সংকল্প কার্যে পরিণত করে।

পাড়ায় একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাচীন শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাকে সে নিজের ইংরাজী শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করে। তিনি রাত্রে পড়াইয়া যাইতেন; তাই কথাটা গোপনেই ছিল। গ্রামে কেহই জানিতে পারে নাই—বেন্দা বোষ্টম ইংরাজী শিখিয়াছিল। বছর-পাঁচেক পূর্বে, স্ত্রীবিয়োগের পর, সে এই লেখাপড়া লইয়াই থাকিত। প্রায় সমস্ত রাত্রি পড়িত, সকালে গৃহকর্ম, বিষয়-আশয় দেখিত; এবং দুপুরবেলা স্ব-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালে কৃষক-পুত্রদিগের অধ্যাপনা করিত। বিধবা জননী তাহাকে পুনরায় বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে তাহার শিশুপুত্রটিকে দেখাইয়া বলিত, যে জন্য বিয়ে করা তা আমাদের আছে; আর আবশ্যক নেই মা।

মা কান্নাকাটি করিতেন, কিন্তু সে শুনিত না। এমনই করিয়া বছর-দুই কাটিল।

তারপর, হঠাৎ একদিন সে কুঞ্জ বোষ্টমের বাড়ির সুমুখেই কুসুমকে দেখিল। কুসুম নদী হইতে স্নান করিয়া কলস-কক্ষে ঘরে ফিরিতেছিল; সে তখন সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে। বৃন্দাবন মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল; কুসুম গৃহে প্রবেশ করিলে সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। এ গ্রামের সব বাড়িই সে চিনিত; সুতরাং এই কিশোরী যে কে, তাহাও সে চিনিল।

এক সন্তান হইলে মাতাপুত্রে যে সম্বন্ধ হয়, বৃন্দাবন ও জননীর মধ্যে সেই সম্বন্ধ ছিল। সে ঘরে ফিরিয়া মায়ের কাছে কুসুমের কথা অবাধে প্রকাশ করিল। মা বলিলেন, সে কি হয় বাবা? তাদের যে দোষ আছে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, তা' হউক মা, তবু সে তোমার বৌ। যখন বিয়ে দিয়েছিলে, তখন সে কথা ভাবনি কেন?

মা বলিলেন, সেসব কথা তোমার বাবা জানতেন। তিনি যা বুঝেছিলেন—করে গেছেন।

বৃন্দাবন অভিমানভরে কহিল, তবে তাই ভাল মা। আমি যেমন আছি, তেমনিই থাকি; আমার বিয়ের জন্য তুমি আর পীড়াপীড়ি ক'রো না। বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল।

তখন হইতে তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে ঘরে আনিবার জন্য অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু ফল হয় নাই—কুসুমকে কোনমতেই সম্মত করান যায় নাই। কুসুমের এত দৃঢ় আপত্তির দুটো বড় কারণ ছিল। প্রথম কারণ—সে তাহার নিরীহ, অসমর্থ ও অল্পবুদ্ধি ভাইটিকে একা ফেলিয়া আর কোথাও গিয়াই স্বস্তি পাইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ পূর্বেই বলিয়াছি। আর কোনরূপে সামাজিক ক্রিয়া না করিয়া সে যদি সহজে গিয়া স্বামীর ঘর করিতে পাইত, হয়ত এমন করিয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন দাদার অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত না। কিন্তু ঐ যে আবার কি-সব করিতে হইবে, রকমারি বোষ্টমের দল আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার মায়ের মিথ্যা কলঙ্কের কথা, তাহার নিজের বাল্য-জীবনের বিস্তৃত ঘটনা, আরও কত কি ব্যাপারের উল্লেখ হইবে, চেঁচামেচি উঠিবে, পাড়ার লোক কৌতূহলী হইয়া দেখিতে আসিবে, তাহার সঙ্গিনীদের সকৌতুক-দৃষ্টি বেড়ার ফাঁক দিয়া নিঃসংশয়ে উঁকিঝুঁকি মারিবে, শেষে ঘরে ফিরিয়া গিয়া সোজা ভাষায় হাসিতে হাসিতে বলিবে, হাড়ী-ডোমের মত কুসুমেরও নিকা হইয়া গেল। ছি ছি, এ-সব মনে করিলেও সে লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠে। যে-সব ভদ্রকন্যাদের সহিত সেও লেখাপড়া শিখিয়াছে, একসঙ্গে একভাবেই এত বড় হইয়াছে, দরিদ্র হইলেও আচার-ব্যবহারে তাহাদের অপেক্ষা সে যে ছোট এ কথা সে মনে ঠাঁই দিতেও পারে না।

কাল সন্ধ্যায় দাদার সহিত কুসুমের কলহ হইয়াছিল, রাগ করিয়া কাঠের সিন্দুকের

চাবিটা সে দাদার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া সরোষে বলিয়াছিল, আর সে সংসারের কিছুতেই থাকিবে না। আজ প্রভাতে নদী হইতে স্নান করিয়া ফিরিয়া দেখিল, দাদা ঘরে নাই, চলিয়া গিয়াছে। তাহার ধামাটিও নাই। কুসুম মনে মনে একটু হাসিয়া বলিল, কাল বকুনি খেয়েই দাদা আজ ভোরে উঠে পালিয়েচে। কল্যকার ত্রুটি সারিয়া লইবার জন্যই সে পলাইয়াছে, তাহা সত্য বটে। কিন্তু কুসুম যাহা অনুমান করিল তাহা নহে, সে ত্রুটি আর একটা। খানিক পরেই তাহা প্রকাশ পাইল।

কুসুমকে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গৃহকর্ম করিতে হইত। ঘর-দুয়ার গোময় দিয়া নিকাইয়া, ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া, নদী হইতে স্নান করিয়া জল আনিয়া, তবে দাদার জন্য রাঁধিয়া দিতে হইত। কুঞ্জ ভাত খাইয়া ফেরি করিতে বাহির হইয়া গেলে সে পূজা-আহ্নিকে বসিত। যেদিন কুঞ্জ না খাইয়া যাইত, সেদিন দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ফিরিয়া আসিত। তাহার এখনও অনেক দেরি মনে করিয়া কুসুম ফুল তুলিতে লাগিল। উঠানের একধারে কয়েকটা ফুলের গাছ, গোটা-কয়েক মল্লিকা ও যূঁই-এর ঝাড় ছিল, ইহারাই তাহার নিত্য-পূজার ফুল যোগান দিত। ফুল তুলিয়া, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া লইয়া সবেমাত্র পূজায় বসিয়াছে—এমন সময় সদরে কয়েকখানা গোযান আসিয়া থামিল এবং পরক্ষণেই একটি প্রৌঢ়া নারী কপাট ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকালের নিমিত্ত উভয়েই উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। কুসুম ইহাকে আর কখনও দেখে নাই, কিন্তু নাকে তিলক, গলায় মালা দেখিয়া বুঝিল, যেই হ'ন, স্বজাতি।

প্রৌঢ়া কাছে আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, তুমি আমাকে চেন না মা, তোমার দাদা চেনে। কুঞ্জনাথ কৈ?

কুসুম জবাব দিল, তিনি আজ ভোরেই বাইরে গেছেন। ফিরতে বোধকরি দেরি হবে।

আগন্তুক বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, দেরি হবে কি গো! কাল সে তার ভগিনীপতিকে, আরো চার-পাঁচটি ছেলেকে—তারাও আমাদের আপনার লোক—সম্পর্কে ভাগনে হয়—সবাইকে খেতে বলে এলো—আমিও তাই আজ সকালে বললুম, বৃন্দাবন, গরুর গাড়িটা ঠিক করে আনতে বলে দে বাছা; যাই, আমিও বৌমাকে একবার দেখে আশীর্বাদ করে আসি।

কথা শুনিয়া কুসুম স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, মাথার আঁচলটা আরো খানিকটা টানিয়া দিয়া, তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল, এবং ঘরের ভিতর হইতে আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম বুঝিল ইনি শাশুড়ী। তিনি আসনে বসিয়া হাসিয়া বলিলেন, কাল খাওয়া-দাওয়ার পর বৃন্দাবন তামাশা করে বললে—আমি এমনিই হতভাগা যে, কুঞ্জদা বড়ভাই-এর মত হয়েও, কোনদিন ডেকে এক ঘটি জল পর্যন্ত খেতে বললেন না। ক'দিন থেকে আমার ননদের ছেলেরাও সব এখানে আছে—কুঞ্জনাথ হাসতে হাসতে তাই সকলকে নেমতন্ন ক'রে এল—তারা সবাই এল বলে।

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনের মা সাধারণ নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের মত ছিলেন না—তাঁর বুদ্ধি-সুদ্ধি ছিল; কুসুমের ভাব দেখিয়া হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল, কি যেন একটা গোলমাল ঘটিয়াছে। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ বৌমা, কুঞ্জনাথ কি তোমাকে কিছু ব'লে যায়নি!

কুসুম ঘোমটার ভিতরে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কিন্তু ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বরং মনে করিলেন, সে বলিয়াই গিয়াছে। তাই সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, তবু ভালো, তার পর কুঞ্জনাথকে উদ্দেশ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, ভয় হয়েছিল—আমার পাগলা ছেলেটা বুঝি সব ভুলে বসে আছে! তবে বোধ করি, সে কিছু কিনতে-টিনতে গেছে, এক্ষুণি এসে পড়বে। ঐ যে—ওরাও সব হাজির।

কুঞ্জদা, বলিয়া বৃন্দাবন একটা হাঁক দিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে তাহার আরও তিনটি ছেলে—ইহারই মামাতো ভাই।

তাহার মা বলিলেন, কুঞ্জনাথ এইমাত্র কোথায় গেল। বৌমা, ঘরের ভিতর একটা সতরঞ্চি পেতে দাও বাছা—ওরা বসুক।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া তাহার দাদার ঘরের মেঝেতে একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া, কলিকাটা হাতে লইয়া তামাক সাজিয়া আনিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন দেখিতে পাইয়া সহাস্যে কহিল, ও থাক। তামাক আমরা কেউ খাইনে।

কুসুম কলিকাটা ফেলিয়া দিয়া এইবার রান্নাঘরের একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ অগ্রজ অকস্মাৎ এ কি বিপদের মাঝখানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল! ক্রোধে, অভিমানে, লজ্জায়, অবশ্যম্ভাবী অপমানের আশঙ্কায়, তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। কাল হইতেই তাহার ভাঁড়ারে সমস্ত জিনিস বাড়ন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে স্নানে যাইবার পূর্বেও সে ভাবিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়াই দাদাকে হাটে পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া, আর দাদার সন্ধান পায় নাই। দোষ অপরাধ করার পরে, ছোটবোনকে কুঞ্জ যথার্থই এত ভয় করিত যে, সচরাচর মানুষ দুষ্ট মনিবকেও এত করে না। যে বড়লোকদের ঘরে শুধু খাইয়া আসিবার অপরাধে কুসুম এত রাগ করিয়াছিল, ঝোঁকের মাথায়—সেই বড়লোকদিগকে সদলবলে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার গুরুতর অপরাধ মুখ ফুটিয়া বলিবার দুঃসাহস কুঞ্জ কোনমতেই নিজের মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারে নাই। পারে নাই বলিয়াই সে সকালে উঠিয়াই পলাইয়াছে, এবং কিছুতেই সে রাত্রির পূর্বে ফিরিবে না, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়াই কুসুম আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সবচেয়ে বিপদ হইয়াছিল, যে সিন্দুকটির ভিতরে তাহাদের সঞ্চিত গুটি-কয়েক টাকা ছিল, তাহার চাবিটাও কাছে নাই; অথচ হাতেও একটি পয়সা নাই।

এখন নিরুপায়ভাবে মিনিট-পাঁচেক দাঁড়াইয়া থাকিয়া, হঠাৎ তাহার সমস্ত রাগটা গিয়া পড়িল বৃন্দাবনের উপরে; বাস্তবিক সমস্ত দোষ ত তাহারই। কেন সে তাহার নির্বোধ নিরীহ ভাইটিকে পথ হইতে ধরিয়া লইয়া গেল, কেনই বা এইসব পরিহাস করিল! উনি কে যে, দাদা ওঁকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইবে?

এই তিন বৎসর কত ছলে, কত উপলক্ষে বৃন্দাবন এদিকে যাতায়াত করিয়াছে; কত উপায়ে তাহাদের মন পাইবার চেষ্টা করিয়াছে; কতদিন সকাল-সন্ধ্যায়, বিনা প্রয়োজনে বাটীর সম্মুখের পথ দিয়া হাঁটিয়া গিয়াছে। তাহাদের দুঃস্থ অবস্থার কথা সে সমস্ত জানে; জানে বলিয়াই, তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার এই কৌশল সৃষ্টি করিয়াছে।

সুম কাঠের মূর্তির মত সেইখানে দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে বড় অভি-...; এখন একা সে কি উপায় করিবে?

বৃন্দাবনের মা ঘরের ভিতরে উঠিয়া গিয়া, ছেলেদের সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন; কিন্তু তাঁর ছেলের চোখ ঘরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ সে দৃষ্টি রান্নাঘরের ভিতরে কুসুমের উপর পড়িল—চোখাচোখি হইল, মনে হইল, সে সংকেতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল। পলকের এক অংশের জন্য তাহার সমস্ত হৃৎপিণ্ড উন্মত্তের মত লাফাইয়া উঠিয়াই স্থির হইল। সে বুঝিল, ইহা চোখের ভুল; ইহা অসম্ভব।

দৈবাৎ কখন দেখা হইয়া গেলে যে মানুষ মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিয়াছে, যাহার নিদারুণ বিতৃষ্ণার কথা সে অনেকবার কুঞ্জনাথের কাছে শুনিয়াছে, সে যাচিয়া তাহাকে আহ্বান করিবে—এ হইতেই পারে না। বৃন্দাবন অন্য দিকে চোখ ফিরাইয়া লইল; কিন্তু থাকিতেও পারিল না। যেখানে চোখাচোখি হইয়াছিল, আবার সেইখানেই চাহিল। ঠিক তাই! কুসুম তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, হাত নাড়িয়া ডাকিল।

ত্রস্তপদে বৃন্দাবন উঠিয়া আসিয়া, রান্নাঘরের কপাটের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাকছিলে আমাকে?

কুসুম তেমনই মৃদুকণ্ঠে বলিল, হুঁ।

বৃন্দাবন আরো একটু সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কুসুম একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া, ভারী চাপা গলায় বলিল, জিজ্ঞেস কচ্চি তোমাকে, আমাদের মত দীন-দুঃখীকে জব্দ করে, তোমার মত বড়লোকের কি বাহাদুরি বাড়বে?

হঠাৎ এ কি অভিযোগ! বৃন্দাবন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম অধিকতর কঠোরভাবে বলিল, জান না, আমাদের কি ক'রে দিন চলে? কেন তবে তুমি দাদাকে অমন তামাশা করতে গেলে? কেন এত লোক নিয়ে খেতে এলে?

বৃন্দাবন প্রথমে ভাবিয়া পাইল না, এই নালিশের কি জবাব দিবে; কিন্তু স্বভাবতঃ সে ধীর প্রকৃতির লোক। কিছুতেই বেশী বিচলিত হয় না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, শেষে সহজ শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জদা কোথায়?

কুসুম বলিল, জানিনে। আমাকে কোন কথা না বলেই তিনি সকালে উঠে চলে গেছেন।

বৃন্দাবন আর একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, গেলই বা। সে নেই, আমি আছি। ঘরে খেতে দেবার কিছু নেই নাকি?

কিছু না; সব ফুরিয়েচে, আমার হাতে টাকাও নাই।

বৃন্দাবন কহিল, এ-গাঁয়ে তোমাদের মত আমাকেও সবাই জানে। আমি মুদির হাতে সমস্ত কিনে পাঠিয়ে দিচ্চি। আমাকে একটা গামছা দাও—আমি, একেবারে স্নান করে ফিরে আসব। মা জিজ্ঞেস করলে ব'ল আমি নাইতে গেছি। দাঁড়িয়ে থেক না—যাও।

কুসুম ঘরে গিয়া তাহার গামছা আনিয়া হাতে দিল।

সেটা মাথায় জড়াইয়া লইয়া বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, কুঞ্জদার তুমি বোন হও, তাই সে পালাতে পেরেচে; আর কিছু হলে বোধ করি, এমন করে ফেলে যেতে পারত না।

কুসুম চুপি চুপি জবাব দিল, সবাই পারে না বটে, কিন্তু কেউ কেউ তাও বেশ পারে। বলিয়াই সে বৃন্দাবনের মুখের প্রতি আড় চোখে চাহিয়া দেখিল, কথাটা তাহাকে বাস্তবিক কিরূপ আঘাত করিল।

বৃন্দাবন যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, থামিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, তোমার এ ভুল হয়ত একদিন ভাঙ্গতেও পারে। ছেলেবেলায় তোমার মায়ের অন্যায়ের জন্য যেমন তুমি দায়ী নও, আমার বাবার ভুলের জন্যেও তেমনই আমার দোষ নাই। যাক, এ-সব ঝগড়ার এখন সময় নয়, যাও—রাঁধবার যোগাড় কর গে।

রাঁধবার কি যোগাড় করব শুনি? আমার মাথাটা কেটে রেঁধে দিলে যদি তোমার পেট ভরে, না হয় বল, তাই দিই গে।

বৃন্দাবন দু-এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া এ-কথার জবাব না দিয়া কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলতে পার, আমাকে তা সইতেই হবে, কিন্তু রাগের মাথায় তোমার শাশুড়ীঠাকরুনকে যেন কটু কথা শুনিয়ে দিও না। তিনি অল্পেই বড় আঘাত পান।

কুসুম ক্রুদ্ধ চাপা গলায় ফিসফিস করিয়া বলিল, আমি জন্তু নই, আমার সে-বুদ্ধি আছে।

বৃন্দাবন কহিল, সেও জানি, আবার বুদ্ধির চেয়ে রাগ তোমার ঢের বেশী তাও জানি। আর একটা কথা কুসুম! মা স্নান করেই চলে এসেছেন, এখনও পূজা-আহ্নিক করেন নি। তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আগে সেই যোগাড়টা করে দাও গে। আমি চললুম।

যাও, কিন্তু কোথাও গল্প করতে বসে যেও না যেন।

বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া বলিল, না। কিন্তু দেরি ক'রে বকুনি খাবারও ভারী লোভ হচ্চে। আর একদিনের আশা দাও ত আজ না হয় শিগ্‌গির ক'রে ফিরে আসি।

সে তখন দেখা যাবে, বলিয়া কুসুম রান্নাঘরের ভিতরে যাইতেছিল, সহসা বৃন্দাবন একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, আশ্চর্য! একবার মনে হল না যে, আজ তুমি এই প্রথম কথা কইলে। যেন কত যুগযুগান্তর আমাকে তুমি এমনি শাসন করে এসেছ—ভগবানের হাতে বাঁধা কি আশ্চর্য বাঁধন কুসুম।

কুসুম দাঁড়াইয়া শুনিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বৃন্দাবন চলিয়া গেলে এই কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল. সে রান্নাঘরের ভিতরে আসিয়া স্থির হইয়া বসিল। নিজের শিক্ষার অভিমানে, তাহাকে সে এতদিন অশিক্ষিত চাষা মনে করিয়া গণনার মধ্যেই আনে নাই, আজিকার কথাবার্তা এবং এই ব্যবহারের পর, তাহারই সম্বন্ধে এক নূতন আনন্দে নূতন তৃষ্ণায় সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে বাটী ফিরিবার সময় বৃন্দাবনের জননী কুসুমকে কাছে ডাকিয়া অশ্রু-গদগদকণ্ঠে বলিলেন, বৌমা, কি আনন্দে যে সারাদিন কাটালুম, তা মুখে বলতে পারিনে। সুখী হও মা! বলিয়া তিনি অঞ্চলের ভিতর হইতে একজোড়া সোনার বালা বাহির করিয়া স্বহস্তে তাহার হাতে পরাইয়া দিলেন।

আজিকার সমস্ত আয়োজন কুসুম গোপনে বৃন্দাবনের সাহায্যে নির্বাহ করিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইহাতেই তাঁহার হৃদয় আশায় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কুসুম গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্বশ্রূ-বধূতে এ-সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না, গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া তিনি বধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কুঞ্জনাথের সঙ্গে দেখা হ'ল না মা, পাগলা কোথায় সারাদিন পালিয়ে রইল, কাল তাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

কুসুম ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবনের পিতামহ বাটীতে গৌর-নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ঘরে বসিয়া বৃন্দাবনের মা প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত মালা জপ করিতেন। আজিও করিতে-ছিলেন। তাঁহার শিশু পৌত্র কোলের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেই স্থানটায় প্রদীপের ছায়া পড়িয়াছিল; সেই হেতু বৃন্দাবন ঘরে ঢুকিয়া ইহাদিগকে দেখিতে পাইল না। সে বেদীর সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া জানু পাতিয়া বসিল এবং কিছু মনে মনে প্রার্থনা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই এইবার মায়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। মনে মনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল, অমন আবছায়ায় বসে কেন মা?

মা সস্নেহে বলিলেন, তা হোক। আয়, তুই আমার কাছে এসে একটু ব'স।

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া বসিল।

তাহার লজ্জা পাইবার কারণ ছিল। তখন রাত্রি এক প্রহরের অধিক হইয়াছিল। এমন অসময়ে কোনোদিন সে ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসে না। আজ আসিয়াছিল—যে আশাতীত সৌভাগ্যের আনন্দে বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল, দিনটা সার্থক বোধ হইয়াছিল, তাহাই নম্র-হৃদয়ে, গোপনে, ঠাকুরের কাছে নিবেদন করিয়া দিতে। কিন্তু পাছে মা তাহার মনের কথাটা অনুমান করিয়া থাকেন, এই লজ্জাতেই সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

খানিক পরে মা নিদ্রিত পৌত্রের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে উচ্ছ্বসিত স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, মা-মরা আমার এই একফোঁটা বংশধরকে ফেলে রেখে কোথাও আমি এক-পা নড়তে পারিনে, তাই আজ মনে হচ্ছে বৃন্দাবন, আমার মাথা থেকে কে যেন ভারী বোঝা নিয়ে নামিয়েচে। তাকে শিগ্‌গির ঘরে আন বাছা, আমি মায়ের হাতে সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে একটু ছুটি নিই—দিন-কতক কাশী-বৃন্দাবন করে বেড়াই।

আজ বৃন্দাবনের অন্তরেও আশা ও বিশ্বাসের এমনি স্রোতই বহিতেছিল, তথাপি সে সলজ্জ হাস্যে কহিল, সে আসবে কেন মা?

মা নিঃসন্দিগ্ধ-কণ্ঠে বলিলেন, আসবে বৈ কি! সে এলে তবে ত আমার ছুটি হবে। আমারই ভুল হয়েছে বৃন্দাবন, এতদিন আমি নিজে যাইনি। আসবার সময় নিজের হাতের বালা দু'গাছি পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলুম, বৌমা পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে চুপ করে দাঁড়াল। তখন বুঝেছি, আমার মাথার ভার নেমে গেছে। তুই দেখিস দিকি, প্রথম যেদিন একটা ভাল দিন পাব, সেইদিনেই ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আনব।

বৃন্দাবন ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এসে তোমার বংশধরটিকে দেখবে ত?

মা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, দেখবে বৈ কি! সে ভয় আমার নেই।

কেন নেই মা?

মা বলিলেন, আমি সোনা চিনি বৃন্দাবন। অবশ্য খাঁটি কিনা, এখন বলতে পারিনে, কিন্তু পেতল নয়, গিলটি নয়, এ-কথা তোকে আমি নিশ্চয় বলে দিলুম। তা নইলে আমার

সংসারে তাকে আনবার কথা তুলতুম না। হাঁ রে বৃন্দাবন, বৌমা কি তোর সঙ্গে বরাবরই কথা কন?

কোনদিন নয় মা। তবে আজ বোধ করি বিপদে পড়েই,—বলিয়া বৃন্দাবন একটুখানি হাসিয়া চুপ করিল।

মা একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে ঠিক কথা বাছা। তার দোষ নেই; সবাই এমনই! মানুষ বিপদে পড়লেই তখন যথার্থ আপনার জনের কাছে ছুটে আসে। আমি ত মেয়েমানুষ বৃন্দাবন, তবুও সে তার দুঃখের কথা আমাকে জানায় নি তোকেই জানিয়েচে।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আমার আর একটা কাজ রইল, সেটা কুঞ্জনাথকে সংসারী করা, বলিয়াই তিনি নিজের মনে হাসিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, সে বেশ লোক পাড়া-সুদ্ধ নেমন্তন্ন করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল—তার পর যা হয় তা হোক।

বৃন্দাবনও নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

মা বলিলেন, শুনলুম, বৌমাকে সে ভারী ভয় করে—বড় ভাই হয়েও ছোট ভাইটির মতই আছে। এক-একজন রাশভারী মানুষ আছে বৃন্দাবন, তাদের ভয় না করে থাকবার জো নেই—তা বয়সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক। আমার বৌমাও সেই ধাতের মানুষ শান্ত, অথচ শক্ত। এমনি মানুষই আমি চাই, যে ভার দিলে ভার সইতে পারবে। তবেই ত আমি সংসার ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে একবার বেরিয়ে পড়তে পারব!

ক্ষণকাল চুপ করিয়া তখনি বলিয়া উঠিলেন, একটি দিনের দেখায় তাকে কি যে ভালবেসেচি, তা আমি তোকে মুখে বলতে পারব না—সারা সন্ধ্যেবেলাটা কেবল মনে হয়েছে কতক্ষণে ঘরে নিয়ে আসব, আবার কতক্ষণে দেখব।

বৃন্দাবনের মনে মনে লজ্জা করিতে লাগিল, সে কথাটা চাপা দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কুঞ্জদার কথা কি বলছিলে মা?

মা বলিলেন, হাঁ, তার কথা। বৌমাকে নিয়ে আসার আগে কুঞ্জনাথকে সংসারী করাও আমার একটা কাজ। কাল খুব ভোরে তুই গোপালকে গাড়ি আনতে বলে দিস, আমি একবার নলডাঙ্গায় যাব। ওখানে গোকুল বৈরাগীর মেয়েকে আমার বেশ পছন্দ হয়। দেখতে শুনতেও মন্দ না; তা ছাড়া—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বে বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, তা ছাড়া ঐ এক মেয়ে, বৈরাগীও কিছু বিষয়-আশয় রেখে মরেচে, না মা?

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, সে-কথা সত্যি বাছা! কুঞ্জর পক্ষে সবচেয়ে দরকার। নইলে বিয়ে করলেই ত হয় না, খেতে পরতে দেওয়া চাই। আর মেয়েটিই বা মন্দ কি বৃন্দাবন, একটু কালো, কিন্তু মুখশ্রী আছে। যাই হোক, দেখি কাল কি করে আসতে পারি।

বৃন্দাবন মাথা নাড়িয়া বলিল, আমিও দিন-ক্ষণ দেখাই গে মা। তুমি নিজে যখন যাচ্চ, তখন শুধু যে ফিরবে না, সে নিশ্চয় জানি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা, দেনা-পাওনার কথা, খাওয়ান-দাওয়ানর কথা সমস্তই প্রায় স্থির করিয়া পরদিন অপরাহ্নে বৃন্দাবনের জননী বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

তখন চণ্ডীমণ্ডপের সুমুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া পোড়োরা নামতা আবৃত্তি করিতেছিল, বৃন্দাবন একধারে দাঁড়াইয়া তাহাই শুনিতেছিল। গরুর গাড়ি সুমুখে আসিয়া থামিতেই তাহার শিশুপুত্র চরণ গাড়ি হইতে নামিয়া চেঁচামেচি করিয়া বাপের কাছে ছুটিয়া আসিল মাতুলানী পছন্দ করিতে সেও আজ পিতামহীর সঙ্গে গিয়াছিল। বৃন্দাবন তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গাড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মা তখন নামিতেছিলেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া সে কহিল, কবে দিন স্থির করে এলে মা?

এই মাসের শেষে আর দিন নেই, তুই ভিতরে আয়—অনেক কথা আছে; বলিয়া তিনি হাসিমুখে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাঁর নিজের ঘরে বৌ আসিবে, এই আনন্দে তাঁর বুক ভরিয়া গিয়াছিল। তা ছাড়া, ঐ একটি দিনে ঘরকন্নার গৃহিণীপনায় কুসুমকে তিনি সত্যই ভালবাসিয়াছিলেন। নিজে সুখী হইবেন, একমাত্র সন্তানকে যথার্থ সুখী করিবেন, তাহাদের হাতে ঘর-সংসার সঁপিয়া দিয়া তীর্থ-ধর্ম করিয়া বেড়াইবেন—এইসব সুখস্বপ্নের কাছে আর সমস্ত কাজই তাঁর সহজসাধ্য হইয়া গিয়াছিল। তাই গোকুলের বিধবার সমস্ত প্রস্তাবেই তিনি সম্মত হইয়া, সমস্ত ব্যয়ভার নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়া বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন।

ও-বেলায় তাঁহার খাওয়া হয় নাই। সহজে তিনি কোথাও কিছু খাইতে চাহিতেন না, বৃন্দাবন তাহা জানিত। সে পাঠশালের ছুটি দিয়া ভিতরে আসিয়া দেখিল, সেদিকের কোন উদ্যোগ না করিয়াই তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বৃন্দাবন বলিল, উপোস করে ভাবলে সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়। পরের ভাবনা পরে ভেব মা, আগে সেই চেষ্টা কর।

মা বলিলেন, সে সন্ধ্যার পরে হবে। না রে তামাশা নয়, আর সময় নেই—সে পাগলের না আছে টাকাকড়ি, না আছে লোকজন, আমাকেই সব ভার বইতে হবে—মেয়ের মা দেখলুম বেশ শক্ত মানুষ—সহজে কিছুতেই রাজী হতে চায় না। তবে আমিও ছাড়বার লোক নই—ওরে ঐ যে! সহস্র বৎসর পরমায়ু হোক বাবা, তোমারই কথা হচ্ছিল, এস বস। হঠাৎ এ-সময়ে যে?

বাস্তবিক গ্রামান্তর হইতে পরের বাড়ি আসার এটা সময় নয়।

কুঞ্জনাথ বাড়ি ঢুকিয়াই এ-রকমের সংবর্ধনা পাইয়া প্রথমটা থতমত খাইল। তারপর অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বসিল।

বৃন্দাবন পরিহাস করিয়া কহিল, আচ্ছা কুঞ্জদা, টের পেলে কি করে? রাতটাও কি চুপ করে থাকতে পারলে না, না হয় কাল সকালে এসেই শুনতে?

মা একটু হাসিলেন। কুঞ্জ কিন্তু এদিক দিয়াও গেল না। সে চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! বোন নয় ত, যেন দারোগা!

বৃন্দাবন ঘাড় ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল; মা মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৌমা কিছু বলে পাঠিয়েচেন বুঝি?

কুঞ্জ সে-প্রশ্নেরও জবাব না দিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা মা, তোমার এ কি-রকম ভুল? ধর, কুসুমের চোখে না পড়ে যদি আর কারও চোখে পড়ত, তা হলে কি সর্বনাশ হ'ত বল ত!

কথাটা তিনি বুঝিতে না পারিয়া ঈষৎ উদ্বিগ্নমুখে চাহিয়া রহিলেন।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি কুঞ্জদা?

ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ ভাঙিয়া দিয়া কুঞ্জ নিজেকে হালকা করিতে চাহিল না; তাই বৃন্দাবনের প্রশ্ন কানেও তুলিল না। মাকে বলিল, আগে কি খাওয়াবে, তবে বলব।

মা এবার হাসিলেন; বলিলেন, তা বেশ ত বাবা, এ তোমারই বাড়ি, কি খাবে বল?

কুঞ্জ কহিল, আচ্ছা, সে আর একদিন হবে—তোমার কি হারিয়েচে আগে বল?

বৃন্দাবনের মা চিন্তিত হইলেন। একটু থামিয়া সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, কৈ কিছুই ত হারায় নি!

কথা শুনিয়া কুঞ্জ হোহো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; পরে নিজের চাদরের মধ্যে হাত দিয়া একজোড়া সোনার বালা মেলিয়া ধরিয়া বলিল, তা হলে এটা তোমাদের নয় বল? বলিয়া মহা আহ্লাদে নিজের মনেই হাসিতে লাগিল।

এ সেই বালা, যাহা কাল এমনই সময়ে পরমস্নেহে স্বহস্তে তিনি পুত্রবধূর হাতে পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। আজ সেই অলঙ্কার, সেই আশীর্বাদ সে নির্বোধ কুঞ্জর হাতে ফিরাইয়া দিয়াছে।

বৃন্দাবন একমুহূর্ত সেদিকে চাহিয়া, মায়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া ভীত হইয়া উঠিল। মুখে একফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। অপরাহ্নের ম্লান আলোকে তাহা শবের মুখের মত পাণ্ডুর দেখাইল। বৃন্দাবনের নিজের বুকের মধ্যে যে কি করিয়া উঠিয়াছিল, সে শুধু

অন্তর্যামী জানিলেন, কিন্তু নিজেকে সে প্রবল চেষ্টায় চক্ষের নিমেষে সামলাইয়া লইয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া সহজ ও শান্তভাবে বলিল, মা আমার বড় ভাগ্য যে, ভগবান আমাদের জিনিস আমাদেরই ফিরিয়ে দিলেন। এ তোমার হাতের বালা, সাধ্য কি মা যে-সে পরে? কুঞ্জদা, চল আমরা বাইরে গিয়ে বসি গে। বলিয়া কুঞ্জর একটা হাত ধরিয়া জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কুঞ্জ সোজা মানুষ, তাই মহা আহ্লাদে অসময়ে এতটা পথ ছুটিয়া আসিয়াছিল। আজ দুপুরবেলা তাহার খাওয়া-দাওয়ার পরে যখন কুসুম ম্লানমুখে বালাজোড়াটি হাতে করিয়া আনিয়া শুষ্ক মৃদুকণ্ঠে বলিয়াছিল, দাদা, কাল তাঁরা ভুলে ফেলে রেখে গেছেন, তোমাকে একবার গিয়ে দিয়ে আসতে হবে; তখন আনন্দের আতিশয্যে সে তাহার মলিন মুখ লক্ষ্য করিবার অবকাশও পায় নাই।

ঘুরপ্যাঁচ সে বুঝিতে পারে না, তাহার বোনের কথা সত্য নয়,—মানুষ মানুষকে এত দামী জিনিস দিতে পারে, কিংবা দিলে আর একজন তাহা গ্রহণ করে না—ফিরাইয়া দেয়, এ-সব অসম্ভব কাণ্ড তাহার বুদ্ধির অগোচর। তাই সারাটা পথ শুধু ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছে, এই হারানো জিনিস অকস্মাৎ ফিরিয়া পাইয়া তাঁহারা কিরূপ সুখী হইবেন, তাহাকে কত আশীর্বাদ করিবেন—এইসব।

কিন্তু কৈ, সে-রকম ত কিছুই হইল না? যাহা হইল, তাহা ভাল কি মন্দ, সে ঠিক ধরিতে পারিল না; কিন্তু এতবড় একটা কাজ করিয়াও মায়ের মুখের একটা ভাল কথা, একটা আশীর্বচন না পাইয়া তাহার মন ভারী খারাপ হইয়া গেল। বরং বৃন্দাবন তাহাকে যেন তাঁহার সম্মুখ হইতে বাহিরে তাড়াইয়া আনিয়াছে, এমনই একটা লজ্জাকর অনুভব তাহাকে ক্রমশঃ চাপিয়া ধরিতে লাগিল। সে লজ্জিত বিষণ্ণমুখে চুপ করিয়া রহিল। তাহার পাশে বসিয়া বৃন্দাবনও কথা কহিল না। বাক্যালাপ করিবার অবস্থা তাহার নহে—তাহার বুকের ভিতরটা তখন অপমানের আগুনে পুড়িয়া যাইতেছিল। অপমান তাহার নিজের নয়—মায়ের।

নিজের ভাল-মন্দ, মান-অপমান আর ছিল না। মৃত্যু-যাতনা যেমন আর সর্বপ্রকার যাতনা আকর্ষণ করিয়া একা বিরাজ করে, জননীর অপমানাহত বিবর্ণ মুখের স্মৃতি ঠিক তেমনিই করিয়া তাহার সমস্ত অনুভূতি গ্রাস করিয়া, একটিমাত্র নিবিড় ভীষণ অগ্নিশিখার মত জ্বলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হইয়া আসিল। কুঞ্জ আস্তে আস্তে কহিল, বৃন্দাবন, আজ তবে যাই ভাই।

বৃন্দাবন বিহ্বলের মত চাহিয়া বলিল, যাও, কিন্তু আর একদিন এস।

কুঞ্জ চলিয়া গেল, বৃন্দাবন সেইখানে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল, জননীর কি আশা, কি ভবিষ্যতের কল্পনাই এক নিমেষে ভূমিসাৎ হইয়া গেল! এখন, কি উপায়ে তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে—কাছে গিয়া কোন্ সান্ত্বনার কথা উচ্চারণ করিবে!

আবার সবচেয়ে নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, যে এমন করিয়া সমস্ত নির্মূল করিয়া দিয়া তাহার উপবাসী, শান্ত, সন্ন্যাসিনী মাকে এমন করিয়া আঘাত করিতে পারিল—সে তাহার স্ত্রী, তাহাকেই সে ভালবাসে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কাল একটি দিনের মেলামেশায় কুসুম তাহার শাশুড়ী ও স্বামীকে যেমন চিনিয়াছিল, তাঁহারাও যে ঠিক তেমনি চিনিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

যাঁহারা চিনিতে জানেন, তাঁহাদের কাছে এমন করিয়া নিজেকে সারাদিন ধরা দিতে পাইয়া শুধু অভূতপূর্ব আনন্দে হৃদয় তাহার স্ফীত হইয়া উঠে নাই, নিজের অগোচরে একটা দুশ্ছেদ্য স্নেহের বন্ধনে আপনাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। সেই বাঁধন আজ আপনার হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বালাজোড়াটি যখন ফিরাইয়া দিতে দিল, এবং নিরীহ কুঞ্জনাথ মহা

উল্লাসে বাহির হইয়া গেল, তখন মুহূর্তের জন্য সেই ক্ষত-বেদনা তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কাঁদিতে লাগিল। যেন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, তাহার এই নিষ্ঠুর আচরণ তাঁহাদের নিকট কত অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও কিরূপ ভয়ানক মর্মান্তিক হইয়া বাজিবে এবং তাহার সম্বন্ধে মনের ভাব তাঁহাদের কি হইয়া যাইবে!

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কুঞ্জ বাড়ি ফিরিয়া চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া ভগিনীর ঘরের সুমুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কুসি, আলো জ্বালাস নি রে?

কুসুম তখনও মেঝের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ব্যস্ত ও লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এই দিই দাদা। কখন এলে?

এই ত আসচি, বলিয়া কুঞ্জ সন্ধান করিয়া হুঁকা-কলিকা সংগ্রহ করিয়া তামাক সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখনো প্রদীপ সাজানো হয় নাই, অতএব, সেইসব প্রস্তুত করিয়া আলো জ্বালিতে তাহার বিলম্ব ঘটিল; ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তামাক সাজিয়া লইয়া দাদা চলিয়া গিয়াছে।

প্রতিদিনের মত আজ রাত্রেও ভাত বাড়িয়া দিয়া কুসুম অদূরে বসিয়া রহিল। কুঞ্জ গম্ভীর মুখে ভাত খাইতে লাগিল, একটি কথাও কহিল না। যে লোক কথা কহিতে পাইলে আর কিছু চাহে না, তাহার সহসা আজ এতবড় মৌনাবলম্বনে কুসুম আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

একটা কিছু অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা কি, এবং কতদূর গিয়াছে ইহাই জানিবার জন্য সে ছটফট করিতে লাগিল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল, দাদাকে তাঁহারা অতিশয় অপমান করিয়াছেন। কারণ ছোটখাটো অপমান তাহার দাদা ধরিতে পারে না এবং পারিলেও এতক্ষণ মনে রাখিতে পারে না, ইহা সে নিশ্চিত জানিত।

আহার শেষ করিয়া কুঞ্জ উঠিতেছিল, কুসুম আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তা'হলে কার হাতে দিয়ে এলে দাদা?

কুঞ্জ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, আবার কার হাতে, মার হাতে দিয়ে এলুম।

কি বললেন তিনি?

কিছু না, বলিয়া কুঞ্জ বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন ফেরি করিতে বাহির হইবার সময় সে নিজেই ডাকিয়া বলিল, তোর শাশুড়ী-ঠাকরুন কি এক-রকম যেন হয়ে গেছে কুসুম। অমন জিনিস হাতে দিয়ে এলুম, তা একটি কথা বললে না। বরং বৃন্দাবনকে ভাল বলতে হয়, সে খুশী হয়ে বলতে লাগল, সাধ্য কি মা, যে-সে লোক তোমার বালা হাতে রাখতে পারে! আমার বড় ভাগ্য মা, তাই ভগবান আমাদের জিনিস আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিলেন—ও কি রে?

কুসুমের গৌরবর্ণ মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল। সে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না। এ-কথা তিনি বললেন?

হাঁ, সে-ই বললে। মা একটা কথাও কইলেন না। তা ছাড়া তিনি কোথায় নাকি সারাদিন গিয়েছিলেন, তখনও নাওয়া-খাওয়া হয়নি—এমন করে আমার পানে চেয়ে রইলেন যে, কি দিলুম, কি বললুম তা যেন বুঝতেই পারলেন না। বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে বার-দুই ঘাড় নাড়িয়া ধামা মাথায় লইয়া বাহির হইয়া গেল।

তিন-চারিদিন গত হইয়াছে, রান্না ভাল হয় নাই বলিয়া কুঞ্জ পরশু ও কাল মুখ ভার করিয়াছিল, আজ স্পষ্ট অভিযোগ করিতে গিয়া এইমাত্র ভাই-বোনে তুমুল কলহ হইয়া গেল।

কুঞ্জ ভাত ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এ পুড়ে যায়, ও পুড়ে যায়, আজকাল মন তোর কোথায় থাকে কুসী?

কুসীও ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া জবাব দিল, আমি কারো কেনা দাসী নই—পারব না রাঁধতে —যে ভাল রেঁধে দেবে তাকে আনো গে।

কুঞ্জর পেট জ্বলিতেছিল, আজ সে ভয় পাইল না। হাত নাড়িয়া বলিল, তুই আগে দূর হ, তখন আনি কি না দেখিস। বলিয়া ধামা লইয়া নিজেই তাড়াতাড়ি দূর হইয়া গেল।

সেইদিন হইতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার জন্য কুসুম ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ এতবড় সুযোগ সে ত্যাগ করিল না।

দাদার অভুক্ত ভাতের থালা পড়িয়া রহিল, সদর দরজা তেমনি খোলা রহিল, সে আঁচল পাতিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠে মাথা দিয়া একেবারে মড়াকান্না শুরু করিয়া দিল।

বেলা বোধ করি তখন দশটা, ঘণ্টাখানেক কাঁদিয়া-কাটিয়া শ্রান্ত হইয়া এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া চোখ মেলিয়া দেখিল, বৃন্দাবন উঠানে দাঁড়াইয়া 'কুঞ্জদা' 'কুঞ্জদা' করিয়া ডাকিতেছে। তাহার হাত ধরিয়া বছর-ছয়েকের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর শিশু। কুসুম শশব্যস্তে মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া কবাটের আড়ালে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সব ভুলিয়া শিশুর সুন্দর মুখের পানে কবাটের ছিদ্রপথে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এ যে তাহারই স্বামীর সন্তান, তাহা সে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিয়াছিল। চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল এবং দুই বাহু যেন সহস্র বাহু হইয়া উহাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য তাহার বক্ষঃপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিল, তথাপি সে সাড়া দিতে, পা বাড়াইতে পারিল না, পাথরের মূর্তির মত একভাবে পলকবিহীন চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাহারো সাড়া না পাইয়া বৃন্দাবন কিছু বিস্মিত হইল।

আজ সকালে নিজের কাজে সে এইদিকে আসিয়াছিল এবং কাজ সারিয়া ফিরিবার পথে ইহাদের দোর খোলা দেখিয়া কুঞ্জ ঘরে আছে মনে করিয়াই গাড়ি হইতে নামিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল। কুঞ্জর কাছে তাহার বিশেষ আবশ্যক ছিল। গোযান সজ্জিত দেখিয়া তাহার পুত্র 'চরণ' পূর্বাহ্ণেই চড়িয়া বসিয়াছিল, তাই সে-ও সঙ্গে ছিল।

বৃন্দাবন আবার ডাক দিল, কেউ বাড়ি নেই নাকি?

তথাপি সাড়া নাই।

চরণ কহিল, জল খাবো বাবা, বড় তেষ্টা পেয়েচে।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া ধমক দিল, না, পায়নি, যাবার সময় নদীতে খাস।

সে বেচারা শুষ্কমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন কুসুম লজ্জার প্রথম বেগটা কাটাইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে বৃন্দাবনের সুমুখে বাহির হইয়াছিল এবং প্রয়োজনীয় কথাবার্তা অতি সহজেই কহিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার সর্বাঙ্গ লজ্জায় অবশ হইয়া আসিতে লাগিল।

চরণ পিপাসার কথা না জানাইলে সে বোধ করি কোনমতেই সুমুখে আসিতে পারিত না। সে একবার একমুহূর্ত দ্বিধা করিল, তারপর একখানি ক্ষুদ্র আসন হাতে করিয়া আনিয়া দাওয়ায় পাতিয়া দিয়া, কাছে আসিয়া চরণকে কোলে করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন এ ইঙ্গিত বুঝিল, কিন্তু চরণ যে কি ভাবিয়া কথাটি না কহিয়া এই সম্পূর্ণ অপরিচিতার ক্রোড়ে উঠিয়া চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না। পুত্রের স্বভাব পিতা ভাল করিয়া জানিত।

এদিকে চরণ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। একে ত এইমাত্র সে ধমক খাইয়াছে, তাহাতে অচেনা জায়গায় হঠাৎ কোথা হইতে বাহির হইয়া এমন ছোঁ মারিয়া কোনদিন কেহ তাহাকে লইয়া যায় নাই।

কুসুম ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া তাহাকে বাতাসা দিল, তারপর কিছুক্ষণ নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া সহসা প্রবলবেগে বুকের উপর টানিয়া লইয়া দুই বাহুতে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চরণ নিজেকে এই সুকঠিন বাহুপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে সে চোখ মুছিয়া বলিল, ছি বাবা, আমি যে মা হই।

ছেলের উপর বরাবরই তাহার ভয়ানক লোভ ছিল, কাহাকেও কোনমতে একবার হাতের মধ্যে পাইলে আর ছাড়িতে চাহিত না, কিন্তু আজিকার মত এমন বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার ঝড় বুঝি আর কখনও তাহার মধ্যে উঠে নাই। বুক যেন তাহার ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। এই মনোহর সুস্থ সবল শিশু তাহারই হইতে পারিত, কিন্তু কেন হইল না? কে এমন বাদ সাধিল? সন্তান হইতে জননীকে বঞ্চিত করিবার এতবড় অনধিকার সংসারে

কার আছে? চরণকে সে যতই নিজের বুকের উপর অনুভব করিতে লাগিল ততই তাহার বঞ্চিত, তৃষিত মাতৃহৃদয় কিছুতেই যেন সান্ত্বনা মানিতে চাহিল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, তার নিজের ধন জোর করিয়া, অন্যায় করিয়া অপরে কাড়িয়া লইয়াছে।

কিন্তু চরণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। এমন জানিলে সে বোধ করি নদীতেই জল খাইত। এই স্নেহের পীড়ন হইতে পিপাসা বোধ করি অনেক সুসহ হইতে পারিত। কহিল, ছেড়ে দাও।

কুসুম দুই হাতের মধ্যে তাহার মুখখানি লইয়া বলিল, মা বল, তাহলে ছেড়ে দেব।

চরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহলে ছেড়ে দেব না, বলিয়া কুসুম বুকের মধ্যে আবার চাপিয়া ধরিল। টিপিয়া, পিষিয়া, চুমা খাইয়া তাহাকে হাঁপাইয়া তুলিয়া বলিল, মা না বললে কিছুতেই ছেড়ে দেবো না।

চরণ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা।

ইহার পরে ছাড়িয়া দেওয়া কুসুমের পক্ষে একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর একবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিলম্ব হইতেছিল। বাহির হইতে বৃন্দাবন কহিল, তোর জল খাওয়া হ'ল রে চরণ?

চরণ কাঁদিয়া বলিল, ছেড়ে দেয় না যে।

কুসুম চোখ মুছিয়া ভাঙ্গা-গলায় কহিল, আজ চরণ আমার কাছে থাক!

বৃন্দাবন দ্বারের সন্নিকটে আসিয়া বলিল, ও থাকতে পারবে কেন? তা ছাড়া, এখনও খায়নি, মা বড় ব্যস্ত হবেন।

কুসুম তেমনিভাবে জবাব দিল, না, ও থাকবে। আজ আমার বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

মন খারাপ কেন?

কুসুম সে-কথার উত্তর দিল না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, গাড়ি ফিরিয়ে দাও, বেলা হয়েচে, আমি নদী থেকে চরণকে স্নান করিয়ে আনি। বলিয়া আর কোনরূপ প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া গামছা ও তেলের বাটি হাতে লইয়া চরণকে কোলে করিয়া নদীতে চলিয়া গেল।

বাটীর নীচেই স্বচ্ছ ও স্বল্পতোয়া নদী, জল দেখিয়া চরণ খুশী হইয়া উঠিল। তাহাদের গ্রামে নদী নাই, পুষ্করিণী আছে, কিন্তু তাহাতে নামিতে দেওয়া হয় না, সুতরাং এ সৌভাগ্য তাহার ইতিপূর্বে ঘটে নাই। ঘাটে গিয়া সে স্থির হইয়া তেল মাখিল, এবং উপর হইতে হাঁটু-জলে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর কিছুক্ষণ মাতামাতি করিয়া স্নান সারিয়া কোলে চড়িয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন মাতাপুত্রে বিলক্ষণ সদ্ভাব হইয়া গিয়াছে।

ছেলে কোলে করিয়া কুসুম সুমুখে আসিল। মুখ তাহার সম্পূর্ণ অনাবৃত। মাথার আঁচল ললাট স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। যাইবার সময় সে মন খারাপের কথা বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু দুঃখ-কষ্টের আভাসমাত্রও সে-মুখে দেখিতে পাইল না। বরং সদ্যঃবিকশিত গোলাপের মত ওষ্ঠাধর চাপাহাসিতে ফাটিয়া পড়িতেছিল। তাহার আচরণে সংকোচ বা কুণ্ঠা একেবারে নাই; সহজভাবে কহিল, এবার তুমি যাও, স্নান করে এস।

তারপরে?

খাবে।

তারপরে?

খেয়ে একটু ঘুমোবে।

তারপরে?

যাও, আমি জানিনে। এই গামছা নাও—আর দেরি ক'র না, বলিয়া সে সহাস্যে গামছাটা স্বামীর গায়ের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বৃন্দাবন গামছা ধরিয়া ফেলিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া একটা অতি দীর্ঘশ্বাস অলক্ষ্যে মোচন করিয়া শেষে কহিল, বরং তুমি বিলম্ব করো না। চরণকে যা হোক দুটো খাইয়ে দাও—আমাদের বাড়ি যেতেই হবে।

যেতেই হবে কেন? গাড়ি ফিরে গেলেই মা বুঝতে পারবেন।

ঠিক সেইজন্যেই গাড়ি ফিরে যায়নি, একটু আগে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

সংবাদ শুনিয়া কুসুমের হাসিমুখ মলিন হইয়া গেল। শুষ্কমুখে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, তাহলে আমি বলি, মায়ের অমতে এখানে তোমার আসাই উচিত হয়নি।

তাহার গূঢ় অভিমানের সুর লক্ষ্য করিয়া বৃন্দাবন হাসিল, কিন্তু, সে হাসিতে আনন্দ ছিল না। তার পরে সহজভাবে বলিল, আমি এমন হয়ে মানুষ হয়েচি কুসুম, যে, মায়ের অমতে এ বাড়িতে কেন, এ গ্রামেও পা দিতে পারতুম না। যাক্, যে কথা শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তুলে কোন পক্ষেরই আর লাভ নেই—তোমারও না, আমারও না। যাও আর দেরি করো না, ওকে খাইয়ে দাও গে। বলিয়া বৃন্দাবন ফিরিয়া গিয়া আসনে বসিল।

কুসুম চোখের জল চাপিয়া মৌন-অধোমুখে ছেলে লইয়া ঘরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে পিতাপুত্রে গাড়ি চড়িয়া যখন গৃহে ফিরিয়া চলিল, তখন পথে চরণ জিজ্ঞাসা করিল, বাবা, মা অত কাঁদছিল কেন?

বৃন্দাবন আশ্চর্য হইয়া বলিল, তোর মা হয় কে বলে দিলে রে?

চরণ জোর দিয়া কহিল, হাঁ, আমার মা-ই ত হয়—হয় না?

বৃন্দাবন ও-কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই থাকতে পারিস তোর মার কাছে?

চরণ খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, পারি বাবা।

আচ্ছা, বলিয়া বৃন্দাবন মুখ ফিরাইয়া গাড়ির একধারে শুইয়া পড়িল, এবং রৌদ্রতপ্ত স্বচ্ছ আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

পরদিন অপরাহ্ণবেলায় কুসুম নদীতে জল আনিবার জন্য সদর দরজায় শিকল তুলিয়া দিতেছিল, একটি বার-তের বছরের বালক এদিকে ওদিকে চাহিয়া কাছে আসিয়া বলিল, তুমি কুঞ্জ বৈরাগীর বাড়ি দেখিয়ে দিতে পার?

পারি, তুমি কোথা থেকে আসচ?

বাড়ল থেকে। পণ্ডিতমশাই চিঠি দিয়েছেন, বলিয়া সে মলিন উত্তরীয়ের মধ্যে হাত দিয়া একখানি চিঠি বাহির করিয়া দেখাইল।

কুসুমের শিরার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল উপরে তাহারই নাম। খুলিয়া দেখিল, অনেক লেখা—বৃন্দাবনের স্বাক্ষর।

কি কথা লেখা আছে তাহাই জানিবার উন্মত্ত-আগ্রহ সে প্রাণপণে দমন করিয়া ছেলেটিকে ভিতরে ডাকিয়া আনিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি পণ্ডিতমশাই কাকে বলছিলে? কে তোমার হাতে চিঠি দিলে?

ছেলেটি আশ্চর্য হইয়া বলিল, পণ্ডিতমশাই দিলেন।

কুসুম পাঠশালার কথা জানিত না, বুঝিতে না পারিয়া আবার প্রশ্ন করিল, তুমি চরণের বাপকে চেন?

চিনি—তিনিই ত পণ্ডিতমশাই।

তাঁর কাছে তুমি পড়?

আমি পড়ি, পাঠশালে আরো অনেক পোড়ো আছে।

কুসুম উৎসুক হইয়া উঠিল এবং তাহাকে প্রশ্ন করিয়া এ-সম্বন্ধে সমস্ত জানিয়া লইল। পাঠশালা বাটীতে প্রতিষ্ঠিত, বেতন লাগে না, পণ্ডিতমশাই নিজেই শ্লেট পেনসিল প্রভৃতি কিনিয়া দেন, যে-সকল দরিদ্র ছাত্র দিনের বেলায় অবকাশ পায় না, তাহারা সন্ধ্যার সময় পড়িতে আসে এবং ঠাকুরের আরতি শেষ হইয়া গেলে প্রসাদ খাইয়া কলরব করিয়া ঘরে ফিরিয়া যায়। দুইজন বয়স্ক ছাত্র পাঠশালে ইংরাজী পড়ে, ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জানিয়া লইয়া কুসুম ছেলেটিকে মুড়ি, বাতাসা প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিয়া দিয়া চিঠি খুলিয়া বসিল।

সুখের স্বপ্ন কে যেন প্রবল ঝাঁকানি দিয়া ভাঙ্গিয়া দিল। পত্র তাহাকেই লেখা বটে, কিন্তু একটা সম্ভাষণ নাই, একটা স্নেহের কথা নাই, একটু আশীর্বাদ পর্যন্ত নাই। অথচ এই তার প্রথম পত্র। ইতিপূর্বে আর কেহ তাহাকে পত্র লেখে নাই সত্য, কিন্তু সে তার

সঙ্গিনীদের অনেকেরই প্রেমপত্র দেখিয়াছে—তাহাতে ইহাতে কি কঠোর প্রভেদ! আগাগোড়া কাজের কথা। কুঞ্জনাথের বিবাহের কথা। এ কথা বলিতেই সে কাল আসিয়াছিল। বৃন্দাবন জানাইয়াছে, মা সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, এবং সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহিবেন। সব দিক দিয়াই এ বিবাহ প্রার্থনীয়, কেননা, ইহাতে কুঞ্জনাথের এবং সেই সঙ্গে তাহারও সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট ঘুচিবে। এই ইঙ্গিতটা প্রায় স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া হইয়াছে।

একবার শেষ করিয়া সে আর-একবার পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবার সমস্ত অক্ষরগুলা তাহার চোখের সুমুখে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে চিঠিখানা বন্ধ করিয়া ফেলিয়া কোনমতে ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। তাহাদের এত বড় সৌভাগ্যের সম্ভাবনাও তাহার মনের মধ্যে একবিন্দু পরিমাণও আনন্দের আভাস জানাইতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মাস-খানেক হইল, কুঞ্জনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবন সেদিন হইতে আর আসে নাই। বিবাহের দিনেও জ্বর হইয়াছে বলিয়া অনুপস্থিত ছিল। মা চরণকে লইয়া শুধু সেই দিনটির জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ গৃহদেবতা ফেলিয়া রাখিয়া কোথাও তাঁহার থাকিবার জো ছিল না। শুধু চরণ আরও পাঁচ-ছয়দিন ছিল। মনের মতন নূতন মা পাইয়াই হোক বা নদীতে স্নান করিবার লোভেই হোক, সে ফিরিয়া যাইতে চাহে নাই, পরে তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেই অবধি কুসুমের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠিয়াছিল।

এই বিবাহ না হইতেই সে যে-সমস্ত আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই এখন অক্ষরে অক্ষরে ফলিবার উপক্রম করিতেছিল। দাদাকে সে ভালমতেই চিনিত, ঠিক বুঝিয়াছিল, দাদা শাশুড়ীর পরামর্শে এই দুঃখ-কষ্টের সংসার ছাড়িয়া ঘরজামাই হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিবে। ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যে মাথায় টোপর পরিয়া কুঞ্জ বিবাহ করিতে গিয়াছিল, সেই মাথায় আর ধামা বহিতে চাহিল না। নলডাঙার লোক শুনিলে কি বলিবে? বিবাহের সময় বৃন্দাবনের জননী কৌশল করিয়া কিছু নগদ টাকা দিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাল খরিদ করিয়া বাহিরে পথের ধারে একটা চালা বাঁধিয়া, সে মনিহারীর দোকান খুলিয়া বসিল। এক পয়সাও বিক্রি হইল না। অথচ এই একমাসের মধ্যেই সে নূতন জামা-কাপড় পরিয়া, জুতা পায়ে দিয়া, তিন-চারিবার শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করিল। পূর্বে কুঞ্জ কুসুমকে ভারী ভয় করিত, এখন আর করে না। চাল-ডাল নাই জানাইলে সে চুপ করিয়া দোকানে গিয়া বসে, না হয় কোথায় সরিয়া যায়—সমস্ত দিন আসে না। চারিদিকে চাহিয়া কুসুম প্রমাদ গণিল। তাহার যে কয়েকটি জমানো টাকা ছিল, তাহাই খরচ হইয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল, তথাপি কুঞ্জ চোখ মেলিল না। নূতন দোকানে বসিয়া সারাদিন তামাক খায় এবং ঝিমায়। লোক জুটিলে শ্বশুরবাড়ির গল্প এবং নূতন বিষয়-আশয়ের ফর্দ তৈয়ার করে।

সেদিন সকালে উঠিয়া কুঞ্জ নূতন বার্নিশ-করা জুতায় তেল মাখাইয়া চকচকে করিতেছিল, কুসুম রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া কহিল, আবার আজও নলডাঙায় যাবে বুঝি?

হুঁ, বলিয়া কুঞ্জ নিজের মনে কাজ করিতে লাগিল।

খানিক পরে কুসুম মৃদুস্বরে কহিল, সেখানে এই ত সেদিন গিয়েছিলে দাদা। আজ একবার আমার চরণকে দেখে এসো। অনেকদিন ছেলেটার খবর পাইনি, বড় মন খারাপ হয়ে আছে।

কুঞ্জ উত্ত্যক্ত হইয়া কহিল, তোর সব তাতেই মন খারাপ হয়। সে ভাল আছে।

কুসুমের রাগ হইল। কিন্তু সংবরণ করিয়া বলিল, ভালই থাক। তবু একবার দেখে এসো গে, শ্বশুরবাড়ি কাল যেয়ো।

কুঞ্জ গরম হইয়া উঠিল, কাল গেলে কি করে হবে? সেখানে একটি পুরুষ মানুষ

পুর্যন্ত নেই। ঘরবাড়ি বিষয়-আশয় কি হচ্চে, না হচ্চে—সব ভার আমার মাথায়—আমি একা মানুষ কতদিক সামলাব বল্ ত?

দাদার কথার ভঙ্গীতে এবার কুসুম রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, পারবে সামলাতে দাদা। তোমার পায়ে পড়ি, আজ একবারটি যাও—কি জানি কেন সত্যিই তার জন্যে বড় মন কেমন কচ্চে।

কুঞ্জ জুতা-জোড়াটা হাত দিয়া ঠেলিয়া অতি রুক্ষস্বরে কহিল, আমি পারব না যেতে। বৃন্দাবন আমার বিয়ের সময় আসেনি কেন, এতই কি সে আমার চেয়ে বড়লোক যে, একবার আসতে পারলে না, শুনি?

কুসুমের উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, তথাপি সে শান্তভাবে বলিল, তার জ্বর হয়েছিল।

হয়নি। নলডাঙ্গায় বসে মা খবর শুনে বললেন, মিছে কথা, চালাকি। তাঁকে ঠকানো সোজা কাজ নয় কুসুম, তিনি ঘরে বসে রাজ্যের খবর দিতে পারেন, তা জানিস? নেমকহারাম আর কা'কে বলে, একেই বলে। আমি তার মুখ দেখতেও চাইনে। বলিয়া কুঞ্জ গম্ভীরভাবে রায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতা পায়ে দিল।

কুসুম বজ্রাহতের মত কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, নেমকহারাম তিনি! নুন তাঁকে সেইদিন বেশী করে খাইয়েছিলে, যেদিন ডেকে এনে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলে। দাদা, তুমি এমন হয়ে যেতে পার, এ বোধ করি, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারতুম না।

কুঞ্জর তরফে এ অভিযোগের জবাব ছিল না। তাই সে যেন শুনিতেই পাইল না, এই রকম ভাব করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম পুনরায় কহিল, যা তুমি তোমার বিষয়-আশয় বলচ, সে কা'র হত? কে তোমার বিয়ে দিয়ে দিলে?

কুঞ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কে কার বিয়ে দিয়ে দেয়? মা বলেন, ফুল ফুটলে কেউ আটকাতে পারে না। বিয়ে আপনি হয়।

আপনি হয়?

হয়ই ত।

কুসুম আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ছি ছি, এ-সব কথা যদি তাঁহারা শুনিতে পান! শুনিলে, প্রথমেই তাঁহাদের মনে হইবে, এই দুটি ভাই-বোন এক ছাঁচে ঢালা!

মিনিট-কুড়ি পরে নূতন জুতার মচমচ শব্দ শুনিয়া কুসুম বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে ফিরবে?

কাল সকালে।

আমাকে বাড়িতে একা ফেলে রেখে যেতে তোমার ভয় করে না? লজ্জা হয় না?

কেন, এখানে কি বাঘ-ভাল্লুক আছে যে তোকে খেয়ে ফেলবে? আমি সকালেই ত ফিরে আসব, বলিয়া কুঞ্জ শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল।

কুসুম ফিরিয়া গিয়া জ্বলন্ত উনানে জল ঢালিয়া দিয়া বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুতপ্ত দুষ্কৃতকারী নিরুপায় হইলে যেমন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করে, ঠিক তেমনি মুখের চেহারা করিয়া বৃন্দাবন জননীর কাছে আসিয়া বলিল, আমাকে মাপ কর মা, হুকুম দাও আমি খুঁজে পেতে তোমাকে একটি দাসী এনে দিই। চিরকাল এই সংসার ঘাড়ে নিয়ে তোমাকে সারা হয়ে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।

মা ঠাকুর-ঘরে পূজার সাজ প্রস্তুত করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, কি করবি?

তোমার দাসী আনব। যে চরণকে দেখবে, তোমার সেবা করবে, আবশ্যক হলে এই

ঠাকুর-ঘরের কাজ করতেও পারবে। হুকুম দেবে ত মা? প্রশ্ন করিয়া বৃন্দাবন উৎসুক ব্যথিত-দৃষ্টিতে জননীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মা এবার বুঝিলেন। কারণ, স্বজাতি ভিন্ন এ ঘরে প্রবেশাধিকার সাধারণ দাসীর ছিল না। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি তুই সত্যি বলছিস বৃন্দাবন?

সত্যি বৈ কি মা! ছেলেবেলা মিথ্যে বলে থাকি ত সে তুমি জান; কিন্তু বড় হয়ে তোমার সামনে কখন ত মিথ্যে বলিনি মা!

আচ্ছা, ভেবে দেখি, বলিয়া মা একটু কাজে মন দিলেন।

বৃন্দাবন সুমুখে আসিয়া বলিল, সে হবে না মা। তোমাকে আমি ভাবতে সময় দেব না। যা হোক একটা হুকুম নিয়ে এ ঘর থেকে বার হব বলে এসেছি, হুকুম নিয়েই যাব।

কেন ভাবতে সময় দিবিনে?

তার কারণ আছে মা! তুমি ভেবে-চিন্তে যা বলবে, সে শুধু তোমার নিজের কথাই হবে, আমার মায়ের হুকুম হবে না। আমি ভালমন্দ পরামর্শ চাইনে—শুধু অনুমতি চাই।

মা মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কিন্তু একদিন যখন অনুমতি দিয়েছিলুম, সাধাসাধি করেছিলুম, তখন ত শুনিস নি বৃন্দাবন?

তা জানি। সেই পাপের ফলই এখন চারদিক থেকে ঘিরে ধরেচে, বলিয়া বৃন্দাবন মুখ নত করিল।

সে যে এখন শুধু তাঁহাকেই সুখী করিবার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে এবং ইহা কাজে পরিণত করিতে তাহার যে কিরূপ বাজিবে, ইহা নিশ্চিত বুঝিয়া মার চোখে জল আসিল। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, এখন থাক্ বৃন্দাবন, দু'দিন পরে বলব।

বৃন্দাবন জিদ করিয়া কহিল, যে কারণে ইতস্ততঃ করচ মা, তা দু'দিন পরেও হবে না। যে তোমাকে অপমান করেচে, ইচ্ছে হয়, তাকে তুমি ক্ষমা ক'রো, কিন্তু আমি করবো না। আর পারিনে মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি একটু সুস্থ হয়ে বাঁচি।

মা মুখ তুলিয়া আবার চাহিলেন। ক্ষণকাল ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, অনুমতি দিলুম।

এ নিশ্বাসের মর্ম্ম বৃন্দাবন বুঝিল, কিন্তু সেও আর কথা কহিল না। নিঃশব্দে পায়ে মাথা ঠেকাইয়া, পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিতমশায়, আপনার চিঠি, বলিয়া পাঠশালের এক ছাত্র আসিয়া একখানা পত্র হাতে দিল।

মা ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার চিঠি বৃন্দাবন?

জানিনে মা, দেখি, বলিয়া বৃন্দাবন অন্যমনস্কের মত নিজের ঘরে চলিয়া গেল। খুলিয়া দেখিল, মেয়েলি অক্ষরে পরিষ্কার স্পষ্ট লেখা। কাটাকুটি নাই, বর্ণাশুদ্ধি নাই, উপরে শ্রীচরণকমলেষু পাঠ লেখা আছে, কিন্তু নীচে দস্তখত নাই। কুসুমের হস্তাক্ষর সে পূর্ব্বে না দেখিলেও তৎক্ষণাৎ বুঝিল, ইহা তাহারই পত্র।

সে লিখিয়াছে—দাদাকে দেখিলে এখন তুমি আর চিনিতে পারিবে না। কেন, তাহা অপরকে কিছুতেই বলা যায় না, এমন কি, তোমাকে বলিতেও আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হইতেছে। তিনি আবার আজিও শ্বশুরবাড়ি গেলেন। হয়ত কাল ফিরিবেন। নাও ফিরিতে পারেন, কারণ বলিয়া গিয়াছেন, এখানে বাঘ-ভাল্লুক নাই, একা পাইয়া আমাকে কেহ খাইয়া ফেলিবে, এ আশঙ্কা তাঁহার নাই। তোমার অত সাহস যদি না থাকে, আমার চরণকে দিয়া যাও।

সকালে দাদার উপর অভিমান করিয়া কুসুম উনানে জল ঢালিয়া দিয়াছিল, আর তাহা জ্বলে নাই। সারাদিন অভুক্ত। ভয়ে ভাবনায় সহস্রবার ঘর-বার করিয়া যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, কেহ আসিবে এ ভরসা আর যখন রহিল না এবং এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ বাটীতে সমস্ত রাত্রি নিজেকে নিছক একাকী কল্পনা করিয়া যখন বারংবার তাহার গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল, এমনি সময়ে বাহিরে চরণের সুতীক্ষ্ণ-কণ্ঠের মাতৃ-সম্বোধন শুনিয়া তাহার জলমগ্ন মন অতল জলে যেন অকস্মাৎ মাটিতে পা দিয়া দাঁড়াইল।

সে ছুটিয়া আসিয়া চরণকে কোলে তুলিয়া লইল এবং তার মুখ নিজের মুখের উপর রাখিয়া, সে যে একলা নহে, ইহাই প্রাণ ভরিয়া অনুভব করিতে লাগিল।

চরণ চাকরের সঙ্গে আসিয়াছিল। রাত্রে আহারাদির পরে কুঞ্জনাথের নূতন দোকানে তাহার স্থান করা হইল। বিছানায় শুইয়া ছেলেকে বুকের কাছে টানিয়া কুসুম নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া শেষে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ চরণ, তোমার বাবা কি কচ্ছেন?

চরণ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া গিয়া তাহার জামার পকেট হইতে একটি ছোট পুটুলি আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, আমি ভুলে গেছি মা, বাবা তোমাকে দিলেন।

কুসুম হাতে লইয়া বুঝিল, তাহাতে টাকা আছে।

চরণ কহিল, দিয়েই বাবা চলে গেলেন।

কুসুম ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা থেকে চলে গেলেন রে?

চরণ হাত তুলিয়া বলিল, ঐ যে হোথা থেকে।

এ-পারে এসেছিলেন তিনি?

চরণ মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এসেছিলেন ত।

কুসুম আর প্রশ্ন করিল না। নিদারুণ অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। সেই যেদিন দ্বিপ্রহরে তিনি একবিন্দু জল পর্যন্ত না খাইয়া চরণকে লইয়া চলিয়া গেলেন, সে-ও রাগ করিয়া দ্বিতীয় অনুরোধ করিল না, বরং শক্ত কথা শুনাইয়া দিল, তখন হইতে আর একটি দিনও তিনি দেখা দিলেন না। আগে এই পথে তাঁহার কত প্রয়োজন ছিল, এখন সে প্রয়োজন একেবারে মিটিয়া গিয়াছে। তাঁহার মিটিতে পারে, কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা কাটাইতেছে। পথে গরুর গাড়ির শব্দ শুনিলেও তাহার শিরার রক্ত কিভাবে উন্দাম হইয়া উঠে এবং কি আশা করিয়া সে আড়ালে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। দাদার বিবাহের রাত্রে আসিলেন না, আজ আসিয়াও দ্বারের বাহির হইতে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেলেন।

তাহার সেদিনের কথা মনে পড়িল। দাদা যেদিন বালা ফিরাইতে গিয়া তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া আসিয়াছিল, ভগবান তাহাদের জিনিস তাহাদিগকেই প্রত্যর্পণ করিয়া দিয়াছেন।

অবশেষে সত্যই এই যদি তাঁহার মনের ভাব হইয়া থাকে! সে নিজে আঘাত দিতে ত বাকী রাখে নাই! বারংবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, মাকেও অপমান করিতে ছাড়ে নাই। ক্ষণকালের নিমিত্ত সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না, সেদিন এত বড় দুর্মতি তাহার কি করিয়া হইয়াছিল! যে সম্বন্ধ সে চিরদিন প্রাণপণে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহারি বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত দেহ-মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া তর্ক করিতে লাগিল; কেন, একি আমার নিজের হাতে-গড়া সম্বন্ধ যে, আমি 'না-না' করিলেই তাহা উড়িয়া যাইবে! তাই যদি যাইবে, সত্যই তিনি যদি স্বামী নন, হৃদয়ের সমস্ত ভক্তি আমার, অন্তরের সমস্ত কামনা আমার, তাঁহারি উপরে এমন করিয়া একাগ্র হইয়া উঠিয়াছে কি জন্য? শুধু একটি দিনের দুটো তুচ্ছ সাংসারিক কথাবার্তায়, একটি বেলার অতি ক্ষুদ্র একটুখানি সেবায় এত ভালবাসা আসিল কোথা দিয়া? সে জোর করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল—কখন সত্য নয়, আমার দুর্নাম কিছুতেই সত্য হইতে পারে না, এ আমি যে-কোন শপথ করিয়া বলিতে পারি। মা শুধু অপমানের জ্বালায় আত্মহারা হইয়া এই দুরপনেয় কলঙ্ক আমার সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার মনে মনে বলিল, মা মরিয়াছে, সত্য-মিথ্যা প্রমাণ হইবার আর পথ নাই, কিন্তু আমি যাই বলি না কেন, তিনি নিজে ত জানেন, আমিই তাঁর ধর্মপত্নী, তবে কেন তিনি আমার এই অন্যায় স্পর্ধা গ্রাহ্য করিবেন? কেন জোর করিয়া আসেন না? কেন আমার সমস্ত দর্প পা দিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া দিয়া যেথায় ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যান না? অস্বীকার করিবার, প্রতিবাদ করিবার আমি কেহ নয়, কিন্তু তাহা মানিয়া লইবার অধিকার তাঁহারও ত নাই!

হঠাৎ তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেই বক্ষলগ্ন চরণের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল—কি মা?

কুসুম তাহাকে বুকে চাপিয়া চুপি চুপি বলিল, কাকে বেশী ভালবাসিস বল্ ত চরণ? তোর বাবাকে, না আমাকে?

চরণ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমাকে মা।

বড় হয়ে তোর মাকে খেতে দিবি চরণ?

হাঁ, দেবো।

তোর বাবা যখন আমাকে তাড়িয়ে দেবে, তখন মাকে আশ্রয় দিবি ত?

হাঁ, দেবো।

কোন্ অবস্থায় কি দিতে হইবে, ইহা সে বোঝে নাই, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই নূতন মাকে তাহার অদেয় কিছু নাই, ইহা সে বুঝিয়াছিল।

কুসুমের চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। চরণ ঘুমাইয়া পড়িলে, সে চোখ মুছিয়া তাহার পানে চাহিয়া মনে মনে কহিল, ভয় কি! আমার ছেলে আছে, আর কেহ আশ্রয় না দিক, সে দেবেই।

পরদিন সূর্যোদয়ের কিছু পরে মাতাপুত্র নদী হইতে স্নান করিয়া আসিয়াই দেখিল, এক প্রৌঢ়া নারী প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছেন এবং কুঞ্জনাথ সবিনয়ে যথাযোগ্য উত্তর দিতেছে। ইনি কুঞ্জনাথের শাশুড়ী। শুধু কৌতূহলবশে জামাতার কুটীরখানি দেখিতে আসেন নাই, নিজের চোখে দেখিয়া নিশ্চয় করিতে আসিয়াছেন, একমাত্র কন্যা-রত্নকে কোনদিন এখানে পাঠানো নিরাপদ কি না।

হঠাৎ কুসুমকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার সিক্ত বসনে যৌবন-শ্রী আঁটিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। দেহের তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণ ভিজা কাপড় ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। আর্দ্র এলোচুলের রাশি সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া জানু স্পর্শ করিয়া ঝুলিতেছিল। তাহার বামকক্ষে পূর্ণ কলস, ডান হাতে চরণের বাম হাত ধরা। তাহার হাতেও একটি ক্ষুদ্র জলপূর্ণ ঘটি। সংসারে এমন মাতৃমূর্তি কদাচিৎ চোখে পড়ে এবং যখন পড়ে, তখন অবাক হইয়াই চাহিয়া থাকিতে হয়। কুঞ্জনাথও হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া কুসুমের লজ্জা করিয়া উঠিল, সে ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই কুঞ্জর শাশুড়ী বলিয়া উঠিলেন, এই কুসুম বুঝি?

কুঞ্জ খুশী হইয়া কহিল, হাঁ মা, আমার বোন।

সমস্ত প্রাঙ্গণটাই গোময় দিয়া নিকানো, তাই কুসুম সেইখানেই ঘড়াটা নামাইয়া রাখিয়া প্রণাম করিল। মায়ের দেখাদেখি চরণও প্রণাম করিল।

তিনি বলিলেন, এ ছেলেটিকে কোথায় দেখেচি যেন।

ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আত্মপরিচয় দিয়া কহিল, আমি চরণ। ঠাকুরমার সঙ্গে আপনাদের বাড়িতে মামাবাবুর মেয়ে দেখতে গিয়েছিলুম।

কুসুম সস্নেহে হাসিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিল, ছি বাবা, বলতে নেই! মামীমাকে দেখতে গিয়েছিলুম বলতে হয়।

কুঞ্জর শাশুড়ী বলিলেন, বেন্দা বোষ্টমের ছেলে বুঝি? একফোঁটা ছোঁড়ার কথা দেখ!

দারুণ বিস্ময়ে কুসুমের হাসিমুখ একমুহূর্তে কালি হইয়া গেল। সে একবার দাদার মুখের প্রতি চাহিল, একবার এই নিরতিশয় অশিক্ষিতা অপ্রিয়বাদিনীর মুখের প্রতি চাহিল, তার পর, ঘড়া তুলিয়া লইয়া ছেলের হাত ধরিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল। অকস্মাৎ এ কি ব্যাপার হইয়া গেল!

কুঞ্জ নির্বোধ হইলেও শাশুড়ীর এত বড় রুক্ষ কথাটা তাহার কানে বাজিল, বিশেষ ভগিনীকে ভাল করিয়াই চিনিত, তাহার মুখ দেখিয়া মনের কথা স্পষ্ট অনুমান করিয়া সে অন্তরে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

সে বুঝিয়াছিল, কুসুম ইহাকে আর কিছুতেই দেখিতে পারিবে না। তাহার শাশুড়ীও মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। ঠিক এইরূপ বলা তাঁহারও অভিপ্রায় ছিল না। শুধু শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষেই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

রান্নাঘর হইতে কুসুম গোকুলের বিধবার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল। বয়স চল্লিশ পূর্ণ হয় নাই। পরনে থান কাপড়, কিন্তু গলায় সোনার হার, কানে মাকড়ি, বাহুতে তাগা এবং বাজু—নিজের শাশুড়ীর সহিত তুলনা করিয়া তাহার ঘৃণা বোধ হইল।

দাদার সহিত তাহার কথাবার্তা হইতেছিল, কি কথা তাহা শুনিতে না পাইলেও, ইহা যে তাহারই সম্বন্ধে হইতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিল।

তিনি পান এবং দোক্তাটা কিছু বেশী খান। সকাল হইতে শুরু করিয়া সারাদিনটাই সেটা ঘনঘন চলিতে লাগিল। স্নানান্তে তিলকসেবা অনুষ্ঠানটি নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করিলেন। এই দুটি ব্যাপারের সমস্ত আয়োজন সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছিলেন। ছোট আরশিটি পর্যন্ত ভুলিয়া আসেন নাই।

কুসুম নিত্যপূজো সারিয়া রাঁধিতে বসিয়াছিল, তিনি কাছে আসিয়া বসিলেন। এদিক ওদিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, কৈ গা, তোমার গলায় মালা নেই, তেলকসেবা করলে না, কি রকম বোষ্টমের মেয়ে তুমি বাছা?

কুসুম সংক্ষেপে কহিল, আমি ওসব করিনে।

করিনে বললে চলবে কেন? লোকে তোমার হাতে জল পর্যন্ত খাবে না যে।

কুসুম ফিরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার তাহলে আলাদা রান্নার যোগাড় করে দি?

আমি আপনার লোক, তোমার হাতে না হয় খেলুম—কিন্তু পরে খাবে না ত!

কুসুম জবাব দিল না।

কুঞ্জ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, চরণ কখন এল কুসুম?

কাল সন্ধ্যার সময়।

কুঞ্জর শাশুড়ী কহিলেন, এই শুনি, বেন্দা বোষ্টম আর নেবে না, কিন্তু ছেলে-চাকর পাঠিয়ে দিয়েচে ত!

কুঞ্জ আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি কোথায় শুনলে মা?

মা গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন, আমার আরও চারটে চোখ-কান আছে। তা সাত্যি কথা বাছা। তারা এত সাধাসাধি হাঁটাহাঁটি করলে তবু তোমার বোন রাজী হ'ল না। লোকে নানা কথা বলবেই ত। পাড়ার পাঁচজন ছেলে-ছোকরা আছে, তোমার বোনের এই সোমত্ত বয়স, এমন কাঁচা-সোনার রঙ—লোকে বলে, মন না মতি, পা ফস্‌কাতে, মন টলতে কতক্ষণ বাছা?

কুঞ্জ সায় দিয়া বলিল, সে ঠিক কথা মা।

কুসুম সহসা মুখ তুলিয়া ভীষণ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, তুমি এখানে বসে কি কচ্চ দাদা! উঠে যাও।

কুঞ্জ থতমত খাইয়া উঠিতে গেল, কিন্তু তাহার শাশুড়ী উষ্ণ হইয়া বলিলেন, দাদাকে ঢাকলেই ত আর লোকের চোখ ঢাকা পড়বে না বাছা! এই যে তুমি নদীতে চান করে, ভিজে কাপড়ে চুল এলিয়ে দিয়ে এলে, ও দেখলে মুনির মন টলে কি না, তোমার দাদাই বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি?

কুসুম চেঁচাইয়া উঠিল, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনো না—যাও এখান থেকে।

তাহার চীৎকার ও চোখমুখ দেখিয়া কুঞ্জ শশব্যস্তে উঠিয়া পলাইল। কুসুম উনান হইতে তরকারির কড়াটা দুম্‌ করিয়া নীচে নামাইয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কুঞ্জর শাশুড়ী মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সমকক্ষ কলহ-বীর সংসারে নাই, ইহাই ছিল তাহার ধারণা; এই সহায়-সম্বলহীন মেয়েটা তাঁহাকে যে হতভম্ব করিয়া দিয়া উঠিয়া যাইতে পারে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কেন, তাহা না বুঝিলেও সেদিন দাদার শাশুড়ী যে বিবাদ-সংকল্প করিয়াই এখানে আসিয়াছিলেন, তাহাতে কুসুমের সন্দেহ ছিল না। তা ছাড়া, তাঁহার বলার মর্মটা ঠিক এই রকম শুনাইল, যেন বৃন্দাবন একসময়ে গ্রহণেচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কুসুম বিশেষ কোন গূঢ় কারণে যায় নাই। সেই গূঢ় কারণটি সম্ভবতঃ কি, তাহা তাঁহার ত অগোচর নাই-ই, বৃন্দাবন নিজেও আভাস পাইয়া সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ইঙ্গিতই কুসুমকে অমন আত্মহারা করিয়া ফেলিয়াছিল। তথাপি অমন করিয়া ঘর হইতে চলিয়া যাওয়াটা তাহারো যে ভাল কাজ হয় নাই, ইহা সে নিজেও টের পাইয়াছিল।

কুঞ্জর শাশুড়ী সেদিন সারাদিন আহার করেন নাই, শেষে অনেক সাধ্যসাধনায়, অনেক ঘাট-মানায় রাত্রে করিয়াছিলেন। তাঁহার মান রক্ষার জন্য কুঞ্জ সমস্তদিন ভগিনীকে ভর্ৎসনা করিয়াছিল, কিন্তু রাগারাগি, মান-অভিমান সমাপ্ত হইবার পরেও তাহাকে একবার খাইতে বলে নাই। পরদিন বাটী ফিরিবার পূর্বে, কুসুম প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলো লইয়া দাঁড়াইলে কুঞ্জর শাশুড়ী কথা কহেন নাই এবং জামাইকে উপলক্ষ করিয়া কহিয়াছিলেন, কুঞ্জনাথকে ঘর-বাড়ি বিষয়-সম্পত্তি দেখতে হবে, এখানে বোন আগলে বসে থাকলেই ত তার চলবে না!

কুসুমের দিক হইতে এ কথার জবাব ছিল না; তাই সে নিরুত্তর অধোমুখে শুনিয়া গিয়াছিল। সত্যই ত! দাদা এদিক ওদিক দু'দিক সামলাইবে কি করিয়া?

তখন হইতে প্রায় মাস-দুই গত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে কুঞ্জকে তাহার শাশুড়ী যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লইয়াছে। এখন প্রায়ই সে এখানে থাকে না। যখন থাকে, তখনও ভাল করিয়া কথা কহে না। কুসুম ভাবে, এমন মানুষ এমন হইয়া গেল কিরূপে? শুধু যদি সে জানিত, সংসারে ইহারাই এরূপ হয়, এতটা পরিবর্তন তাহারি মত সরল অল্পবুদ্ধি লোকের দ্বারাই সম্ভব, দুঃখ বোধ করি তাহার এমন অসহ্য হইয়া উঠিত না। ভাই-বোনের সে স্নেহ নাই, এখন কলহও হয় না। কলহ করিতে কুসুমের আর প্রবৃত্তি হয় না, সাহসও হয় না। সেদিন এক রাত্রি বাড়িতে একা থাকিতে সে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন কত রাত্রিই একা থাকিতে হয়। অবশ্য দুঃখে পড়িয়া তাহার ভয়ও ভাঙ্গিয়াছে।

তথাপি এ-সব দুঃখও সে তত গ্রাহ্য করে না, কিন্তু সে যে দাদার গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাই তাহাকে উঠিতে বসিতে বিঁধে। রহিয়া রহিয়া কেবলি মনে হয়, হঠাৎ সে মরিয়া গেলেও, বোধ করি দাদা একবার কাঁদিবে না—একফোঁটা চোখের জলও ফেলিবে না। ভবিষ্যতে দাদার এই নিষ্ঠুর ত্রুটি সে তখনি নিজের চোখের জল দিয়া ক্ষালন করিয়া দিতে ঘরে দোর দিয়া বসে, আর সেদিন দোর খোলে না। হৃদয় বড় ভারাতুর হইয়া উঠিলে চরণের কথা মনে করে। শুধু সে-ই মা মা করিয়া যখন-তখন ছুটিয়া আসে, এবং কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহে না।

তাহারি হাতে একদিন সে অনেক সঙ্কোচ এড়াইয়া বৃন্দাবনকে একখানি চিঠি দিয়াছিল, তাহাতে যে ইঙ্গিত ছিল, বৃন্দাবনের কাছে তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। কারণ যে প্রত্যুত্তর প্রত্যাশা করিয়া কুসুম পথ চাহিয়া রহিল, তাহা ত আসিলই না, দু'ছত্র কাগজে-লেখা জবাবও আসিল না। শুধু আসিল কিছু টাকা। বাধ্য হইয়া, নিরুপায় হইয়া, কুসুমকে তাহাই গ্রহণ করিতে হইল।

কাল রাত্রে কুঞ্জ ঘরে আসিয়াছিল, সকালেই ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিতে কুসুম কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আজকাল কোনো বিষয়েই দাদাকে সে অনুরোধ করে না, বাধাও দেয় না। আজ কি যে হইল, মৃদুকণ্ঠে বলিয়া বসিল, এক্ষণি যাবে দাদা? আমার রান্না শেষ হতে দেরি হবে না, দুটো খেয়ে যাও না!

কুঞ্জ ঘাড় ফিরাইয়া মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, যা ভেবেচি তাই। অমনি পেছু ডেকে বসলি?

দায়ে পড়িয়া কুসুম অনেক সহিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু এই অকারণ মুখ-বিকৃতিতে তাহার সর্বাঙ্গে আগুন ধরিয়া গেল, সে পালটা মুখ-বিকৃতি করিল না বটে, কিন্তু অতি কঠোর-স্বরে বলিল, তোমার ভয় নেই দাদা, তুমি মরবে না। না হলে, আজ পর্যন্ত যত পেছু ডেকেচি, মানুষ হলে মরে যেতে।

আমি মানুষ নই?

না। কুকুর-বেড়ালও নও—তারা তোমার চেয়ে ভাল—এমন নেমকহারাম নয়, বলিয়াই দ্রুতপদে ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কুঞ্জ মূঢ়ের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরের দরজা তেমনি খোলা পড়িয়া রহিল। সেই খোলা পথ দিয়া ঘণ্টা-খানেক পরে বৃন্দাবন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল।

কুঞ্জের ঘর তালা-বন্ধ, কুসুমের ঘর ভিতর হইতে বন্ধ—রান্নাঘর খোলা। মুখ বাড়াইতেই একটা কুকুর আহার পরিত্যাগ করিয়া কেঁউ করিয়া লজ্জা ও আক্ষেপ জানাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

কতক রান্না হইয়াছে, কতক বাকী আছে—উনান নিবিয়া গিয়াছে। চরণ চাকরের সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতেছিল, সুতরাং কিছু পিছাইয়া পড়িয়াছিল, মিনিট-দশেক পরে সু-উচ্চ মাতৃ-সম্বোধনে পাড়ার লোককে নিজের আগমনবার্তা ঘোষণা করিয়া বাড়ি ঢুকিল। হঠাৎ ছেলের ডাকে কুসুম দোর খুলিয়া বাহির হইতেই তাহার অশ্রু-কষায়িত দুই চোখের শান্ত বিপন্ন দৃষ্টি সর্বাগ্রেই বৃন্দাবনের বিস্ময়-বিহ্বল জিজ্ঞাসু চোখের উপর গিয়া পড়িল।

হঠাৎ ইনি আসিবেন, কুসুম তাহা আশাও করে নাই, কল্পনাও করে নাই। সে এক পা পিছাইয়া গিয়া আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া, ঘরে ফিরিয়া গিয়া একটা আসন আনিয়া পাতিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই চরণ ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া ধরিল। তাহাকে কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিয়া কুসুম একটা খুঁটির আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

চরণ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা কাঁদচে বাবা!

বৃন্দাবন তাহা টের পাইয়াছিল। জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?

কুসুম তখনও নিজেকে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই; জবাব দিতে পারিল না।

বৃন্দাবন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, দাদার সঙ্গে দেখা করতে চিঠি লিখেছিলে, কৈ তিনি?

কুসুম রুদ্ধস্বরে কহিল, মরে গেছে।

আহা, মরে গেল! কি হয়েছিল?

তাহার গম্ভীরস্বরে যে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল, এই দুঃখের সময় কুসুমকে তাহা বড় বাজিল। সে নিজের অবস্থা ভুলিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, দেখ, তামাশা ক'রো না। দেহ আমার জ্বলে পুড়ে যাচ্চে, এখন ওসব ভাল লাগে না। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েচি বলে কি এমনি করে তার শোধ দিতে এলে? বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার চাপা-কান্না বৃন্দাবন স্পষ্ট শুনিতে পাইল, কিন্তু ইহা তাহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে পাঠিয়েচ কেন?

কুসুম চোখ মুছিয়া ভারী গলায় কহিল, না এলে আমি বলি কাকে? আগে বরং নিজের কাজেও এদিকে আসতে যেতে, এখন ভুলেও আর এ-পথ মাড়াও না।

বৃন্দাবন কহিল, ভুলতে পারিনি বলেই মাড়াই নে, পারলে হয়ত মাড়াতুম। যাক, কি কথা?

এমন করে তাড়া দিলে কি বলা যায়?

বৃন্দাবন হাসিল। তার পরে শান্তকণ্ঠে কহিল, তাড়া দিইনি, ভালভাবেই জানতে চাচ্চি। যেমন করে বললে সুবিধে হয়, বেশ ত তুমি তেমনি করেই বল না।

কুসুম কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব বলে আমি অনেকদিন অপেক্ষা করে আছি—আমি চুল এলো করে, পথেঘাটে রূপ দেখিয়ে বেড়াই, এ কথা কে রটিয়েছিল?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া বৃন্দাবন ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, আমি। তারপরে?

তুমি রটাবে এমন কথা আমি বলিনি, মনেও ভাবিনি, কিন্তু—

কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বৃন্দাবন বলিয়া উঠিল, কিন্তু সেদিন বলেওছিলে, ভেবেওছিলে। আমি বড়লোক হয়ে শুধু তোমাদের জব্দ করবার জন্যেই মাকে নিয়ে ভাইদের নিয়ে খেতে এসেছিলুম—সে পেরেচি, আজ আর পারিনে? সে অপরাধের সাজা আমার মাকে দিতে তুমিও ছাড়নি!

কুসুম নিরতিশয় ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েচে। তখন তোমাকে আমি চিনতে পারিনি।

এখন পেরেছ?

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

বৃন্দাবনও চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, ভাল কথা, একটা কুকুর রান্নাঘরে ঢুকে তোমার হাঁড়িকুঁড়ি রান্নাবান্না সমস্ত যে মেরে দিয়ে গেল।

কুসুম কিছুমাত্র উদ্বেগ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া জবাব দিল, যাক গে। আমি ত খাবো না—আগে জানলে রাঁধতেই যেতুম না।

আজ একাদশী বুঝি?

কুসুম ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, জানিনে। ওসব আমি করিনে।

কর না?

কুসুম তেমনি অধোমুখে নিরুত্তর রহিল।

বৃন্দাবন সন্দিগ্ধস্বরে বলিল, আগে করতে, হঠাৎ ছাড়লে কেন?

পুনঃ পুনঃ আঘাতে কুসুম অধীর হইয়া উঠিতেছিল। উত্যক্ত হইয়া কহিল, করিনে আমার ইচ্ছে বলে। জেনে শুনে কেউ নিজের সর্বনাশ করতে চায় না, সেইজন্যে। দাদার ব্যবহার অসহ্য হয়েছে, কিন্তু সত্যি বলচি, তোমার ব্যবহারে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করচে।

বৃন্দাবন কহিল, সেটা ক'রো না। আমার ব্যবহারের বিচার পরে হবে, না হলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দাদার ব্যবহার অসহ্য হল কেন?

কুসুম ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া জবাব দিল, সে আর এক মহাভারত—তোমাকে শোনাবার আমার ধৈর্য নেই। মোট কথা, তিনি নিজের বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে আর আমাকে দেখতে শুনতে পারবেন না—তাঁর শাশুড়ীর হুকুম নেই। খেতে পরতে দেওয়া বন্ধ করেচেন, চরণ তার মায়ের ভার না নিলে অনেকদিন আগেই আমাকে শুকিয়ে মরতে হ'তো। এখন আমি—সহসা সে থামিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিল, আর বলা উচিত কি না। তারপর বলিল, এখন আমি তোমাদের সম্পূর্ণ গলগ্রহ। তাই একদিন একদণ্ডও এখানে আর থাকতে চাইনে।

বৃন্দাবন সহাস্যে প্রশ্ন করিল, তাই থাকতে ইচ্ছে নেই?

কুসুম একটিবার চোখ তুলিয়াই মুখ নীচু করিল। এই সহজ সহাস্য প্রশ্নের মধ্যে যতখানি খোঁচা ছিল, তাহার সমস্তটাই তাহাকে গভীরভাবে বিদ্ধ করিল।

বৃন্দাবন বলিল, চরণ তার মায়ের ভার নিশ্চয়ই নেবে, কিন্তু কোথায় থাকতে চাও তুমি?

কুসুম তেমনি নতমুখেই বলিল, কি করে জানব? তাঁরাই জানেন।

তাঁরা কে?—আমি?

কুসুম মৌনমুখে সম্মতি জানাইল।

বৃন্দাবন কহিল, সে হয় না। আমি তোমার কোন বিষয়েই হাত দিতে পারিনে। পারেন শুধু মা। তুমি যেমন আচরণই তাঁর সঙ্গে করে থাক না কেন, চরণের হাত ধরে যাও তাঁর কাছে—উপায় তিনি করে দেবেনই। কিন্তু, তোমার দাদা?

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। মুছিয়া বলিল, বলেচি ত আমার দাদা মরে গেছেন। কিন্তু কি করে আমি দিনের বেলা পায়ে হেঁটে ভিক্ষুকের মত গ্রামে গিয়ে ঢুকব?

বৃন্দাবন বলিল, তা জানিনে, কিন্তু পারলে ভাল হ'ত। এ ছাড়া আর কোন সোজা পথ আমি দেখতে পাইনে।

কুসুম ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আমি যাব না।

খুশী তোমার।

সংক্ষিপ্ত সরল উত্তর। ইহাতে নিহিত অর্থ বা কিছুমাত্র অস্পষ্টতা নাই। এতক্ষণে কুসুম সত্যই ভয় পাইল।

বৃন্দাবন আর কিছু বলে কি না, শুনিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত সে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর অতিশয় নম্র ও কুণ্ঠিতভাবে ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু এখানেও আমার যে আর দাঁড়াবার স্থান নেই। আমি দাদার দোষও দিতে চাইনে, কেননা, নিজের অনিষ্ট করে পরের ভালো না করতে চাইলে তাকে দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু তুমি ত অমন করে ঝেড়ে ফেলে দিতে পার না?

বৃন্দাবন কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বেলা হ'ল। চরণ, তুই থাকবি, না যাবি রে? থাকবি? আচ্ছা থাক্। তোমার ইচ্ছে হলে যেয়ো। আমার বিশ্বাস, ও-বাড়িতে ওর হাত ধরে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার খুব মস্ত অপমান হ'তো না। যাক চললুম, বলিয়া পা বাড়াইতে কুসুম সহসা চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ সমস্ত বুঝলুম। আমার এত বড় দুঃখের কথা মুখ ফুটে জানাতেও যখন দাঁড়িয়ে উঠে জবাব দিলে, বেলা হ'ল চললুম, আমি কত নিরাশ্রয় তা স্পষ্ট বুঝেও যখন আশ্রয় দিতে চাইলে না, তখন তোমাকে বলবার বা আশা করবার আর কিছু নেই। তবু আরও একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বল, সত্যি জবাব দেবে?

বৃন্দাবন ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, দেব। আমি আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিনি, বরং তুমিই নিতে বারংবার অস্বীকার করেচ।

কুসুম দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, মিছে কথা। আমার কপালের দোষে কি যে দুর্মতি হয়েছিল —মার মনে আঘাত দিয়ে একবার গুরুতর অপরাধ করে আমার মা, স্বামী, পুত্র, ঘরবাড়ি সব থাকতেও আজ আমি পরের গলগ্রহ, নিরাশ্রয়। আজ পর্যন্ত শ্বশুরবাড়ির মুখ দেখতে পাইনি। অপরাধ আমার যত ভয়ানকই হোক, তবু ত আমি সে-বাড়ির বৌ। কি করে সেখানে আমাকে ভিখিরীর মত, দিনের বেলা সমস্ত লোকের সুমুখ দিয়ে পায়ে হেঁটে, পাঠাতে চাচ্চ? তুমি আর কোন সোজা পথ দেখতে পাওনি। কেন পাওনি জান? আমরা বড় দুঃখী. আমার মা ভিক্ষা করে আমাদের ভাই-বোন দুটিকে মানুষ করেছিলেন, দাদা উঞ্ছবৃত্তি করে দিনপাত করেন, তাই তুমি ভেবেচ, ভিখিরীর মেয়ে ভিখিরীর মতই যাবে, সে আর বেশী কথা কি! এ শুধু তোমার মস্ত ভুল নয়, অসহ্য দর্প। আমি বরং এইখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরব, তবু তোমার কাছে হাত পেতে তোমার হাসি-কৌতুকের আর মালমসলা যুগিয়ে দেব না।

বৃন্দাবন অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, চললুম। আমার আর কিছুই বলবার নেই।

কুসুম তেমনিভাবে জবাব দিল—যাও। দাঁড়াও, আর একটা কথা। দয়া করে মিথ্যে বলো না—জিজ্ঞেস করি, আমার সম্বন্ধে তোমার কি কোন সন্দেহ হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে শপথ কচ্চি—

বৃন্দাবন দুই-এক পা গিয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়া বাধা দিয়া বলিল, ও কি, নিরর্থক শপথ কর কেন? আমি তোমার সম্বন্ধে কিছুই শুনিনি। তাহার অর্ধ-আবরিত মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে কহিল, তা ছাড়া পরের চলাফেরা গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখা আমার স্বভাবও নয়, উচিতও নয়। তোমার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, ওই নিয়ে আলোচনা করতেও চাইনে। আমি সকলকেই ভাল মনে করি, তোমাকেও মন্দ মনে করিনে, বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কুসুম বজ্রাহতের ন্যায় নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

চরণ কহিল, মা, নদীতে নাইতে যাবে না?

কুসুম কথা কহিল না, তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া এক-পা এক-পা করিয়া ঘরে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িয়া তাহাকে প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অনেকদিন কাটিয়াছে। মাঘ শেষ হইয়া ফাল্গুন আসিয়া পড়িল, চরণ সেই যে গিয়াছে, আর আসিল না। তাহাকে যে জোর করিয়া আসিতে দেওয়া হয় না, ইহা অতি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কোনরূপ সম্বন্ধ আর তাঁহারা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। ওদিকের কোন সংবাদ নাই, সেও আর কখনও চিঠিপত্র লিখিয়া নিজেকে অপমানিত করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। দাদার সেই একই ভাব—সর্বরকমেই প্রাণ যেন কুসুমের বাহির হইবার উপক্রম হইতে লাগিল। সেই অবধি প্রকাশ্যে বাটীর বাহির হওয়া কিংবা পূর্বের ন্যায় সঙ্গিনীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাওয়াও বন্ধ করিয়াছে। রাত্রি থাকিতেই নদী হইতে স্নান করিয়া জল লইয়া আসে, হাটের দিন গোপালের মা হাট-বাজার করিয়া দেয়,—এমনি করিয়া বাহিরের সমস্ত সংস্রব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, তাহার গুরুভারাক্রান্ত সুদীর্ঘ দিন-রাত্রিগুলি যথার্থই বড় দুঃখে কাটিতেছিল।

সে খুব ভাল সূচের কাজ করিতে পারিত। যে যাহা পারিশ্রমিক দিত, তাহাই হাসি-মুখে গ্রহণ করিত এবং কেহ দিতে ভুলিয়া গেলে সেও ভুলিয়া যাইত। এই সমস্ত মহৎ গুণ থাকায় পাড়ার অধিকাংশ মশারি, বালিশের অড়, বিছানার চাদর সে-ই সিলাই করিত। আজ অপরাহ্নবেলায় নিজের ঘরের সুমুখে মাদুর পাতিয়া একটা অর্ধ-সমাপ্ত মশারি শেষ করিতে বসিয়াছিল। হাতের সূচ তাহার অচল হইয়া রহিল, সে সেই প্রথম দিনের আগা-গোড়া ঘটনা লইয়া নিজের মনে খেলা করিতে লাগিল।

যেদিন তাঁহারা সদলবলে পলাতক দাদার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন এবং বড় দায়ে ঠেকিয়া তাহাকে লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়া মুখরার মত প্রথম স্বামী-সম্ভাষণ করিতে হইয়াছিল—সেই সব কথা। দুঃখ তাহার যখনই অসহ্য হইয়া উঠিত, তখনই সে সব কাজ ফেলিয়া রাখিয়া এই স্মৃতি লইয়া চুপ করিয়া বসিত। মা যেমন তাঁহার একমাত্র শিশুকে লইয়া নানাভাবে নাড়াচাড়া করিয়া ক্রীড়াচ্ছলে উপভোগ করেন, সেও তাহার এই একটিমাত্র চিন্তাকেই অনির্বচনীয় প্রীতির সহিত নানা দিক হইতে তোলাপাড়া করিয়া দেখিয়া অসীম তৃপ্তি অনুভব করিত। তাহার সমস্ত দুঃখ তখনকার মত যেন ধুইয়া মুছিয়া যাইত। দু'জনের সেই বাদ-প্রতিবাদ, অপর সকলকে লুকাইয়া আহারের আয়োজন, তার পরে রাঁধিয়া বাড়িয়া পরিবেশন করিয়া স্বামী-দেবরদিগকে খাওয়ানো, শাশুড়ীর সেবা, সকলের শেষে দিনান্তে নিজের জন্য সেই অবশিষ্ট শুষ্ক শীতল, যা হোক কিছু।

তাহার চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নারীদেহ ধরিয়া ইহাপেক্ষা অধিক সুখ সে ভাবিতেও পারিত না, কামনাও করিত না। তাহার মনে হইত, যাহারা এ কার্য নিত্য করিতে পায়, এ সংসারে বুঝি তাহাদের আর কিছুই বাকী থাকে না।

তাহার পর মনে পড়িয়া গেল, শেষদিনের কথা। যেদিন তিনি সমুদয় সংস্রব ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। সেদিন সে নিজেও বাধা দেয় নাই, বরং ছিঁড়িতেই সাহায্য করিয়াছিল, কিন্তু তখন চরণের কথা ভাবে নাই। ঐ সঙ্গে সেও যে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে পারে, দারুণ অভিমানে তাহা মনে পড়ে নাই। এখন যত দিন যাইতেছিল, ওই ভয়ই তাহার বুকের রক্ত পলে পলে শুকাইয়া আনিতেছিল, পাছে চরণ আর না আসিতে পায়। সত্যিই যদি সে না আসে, তবে একদণ্ডও সে বাঁচিবে কি করিয়া? আবার সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে, যে সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে পূর্বে ছিল, যাহা এ দুর্দিনে হয়ত তাহাকে বল দিতেও পারিত, আর তাহা নাই, একেবারে নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তাহার অন্তর-বাসী সুপ্ত বিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়া অহর্নিশি তাহার কানে কানে ঘোষণা করিতেছে, সমস্ত মিথ্যা! তাহার ছেলেবেলার কলঙ্ক দুর্নাম কিছু সত্য নয়। সে হিঁদুর মেয়ে, অতএব যাহা পাপ, যাহা অন্যায়, তাহা কোনমতেই তাহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, স্বামী ছাড়া আর কাহাকেও কখন হিঁদুর ঘরের মেয়ে এত ভালবাসিতে পারে না; তাঁহাকে সেবা করিবার, তাঁহার কাজে লাগিবার জন্য সমস্ত দেহমন উন্মত্ত হইয়া উঠে না। তিনি স্বামী না হইলে ভগবান নিশ্চয়ই তাহাকে সুপথ দেখাইয়া

দিতেন, অন্তরের কোথাও, কোনো একটু ক্ষুদ্র কোণে এতটুকু লজ্জার বাষ্পও অবশিষ্ট রাখিতেন।

আজ হাটবার। গোপালের মা বহুক্ষণ হাটে গিয়াছে, এখনি আসিবে, এইজন্য সদর দরজা খোলা ছিল; হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া কুঞ্জনাথবাবু চাকর সঙ্গে করিয়া বিলাতি জুতার মচমচ শব্দ করিয়া পাড়ার লোকের বিস্ময় ও ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া বাড়ি ঢুকিলেন। কুসুম টের পাইল, কিন্তু অশ্রুকলুষিত রাঙ্গা চোখ লজ্জায় তুলিতে পারিল না।

কুঞ্জনাথ সোজা ভগিনীর সম্মুখে আসিয়া কহিল, তোর বৃন্দাবন যে আবার বিয়ে কচ্চে রে!

কুসুমের বক্ষঃস্পন্দন থামিয়া গেল, সে কাঠের মত নতমুখে বসিয়া রহিল।

কুঞ্জ গলা চড়াইয়া কহিল, কুমীরের সঙ্গে বাদ করে কি করে জলে বাস করে, আমাকে তাই একবার দেখতে হবে। ঐ নন্দা বোষ্টম, কত বড় বোষ্টমের বেটা বোষ্টম, আমি তাই দেখতে চাই, আমার জমিদারিতে বাস করে আমারই অপমান!

কুসুম কোন কথাই বুঝিতে পারিল না, অনেক কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দ বোষ্টম কে?

কে? আমার প্রজা! আমার পুকুরপাড়ে ঘর বেঁধে আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেব। সেই ব্যাটার মেয়ে—এই ফাল্গুন মাসে হবে, সব নাকি ঠিকঠাক হয়ে গেছে- ভূতো, তামাক সাজ্।

কুসুম এতক্ষণ চোখ তোলে নাই, তাই চাকরের আগমন লক্ষ্য করে নাই, একটু সংকুচিত হইয়া বসিল।

কুঞ্জ প্রশ্ন করিল, ভূতো, নন্দার মেয়েটা দেখতে কেমন রে?

ভূতো ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ।

কুঞ্জ আস্ফালন করিয়া কহিল, বেশ! কখ্খন না, আমার বোনের মত দেখতে? দূর্‌—এমন রূপ তুই কখন চোখে দেখেচিস?

ভূতো জবাব দিবার পূর্বেই কুসুম ঘরে উঠিয়া গেল।

খানিক পরে কুঞ্জ তামাক টানিতে টানিতে ঘরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, কি রে কুসি, বলেছিলুম না! বেন্দা বৈরাগীর মত অমন নেমকহারাম বজ্জাত আর দুটি নেই—কেমন ফলল কিনা? মা বলেন, বেদ মিথ্যে হবে, কিন্তু আমার কুঞ্জনাথের বচন মিথ্যে হবে না—ভূতো, মা বলে না?

ঘরের ভিতর হইতে কোন জবাব আসিল না, কিন্তু কি-একরকমের অস্পষ্ট আওয়াজ আসিতে লাগিল।

কুঞ্জ কি মনে করিয়া, হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া, দোর ঠেলিয়া, ঘরের ভেতরে আসিয়া দাঁড়াইল।

কুসুম শয্যার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল; ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া বহুকালের পর হঠাৎ আজ তাহার চোখ দুটা জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে শয্যার একাংশে গিয়া বসিল এবং বোনের মাথায় একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুই কিছু ভয় করিস নে কুসুম, এ বিয়ে আমি কিছুতেই হতে দেব না। তখন দেখতে পাবি, তোর দাদা যা বলে তাই করে কি না। কিন্তু তুইও ত শ্বশুরঘর করতে চাইলি নি বোন—আমরা সবাই মিলে কত সাধাসাধি করলুম, তুই একটা কথাও কারুর কানে তুললি নে।

কুঞ্জর শেষ কথাগুলো অশ্রুভারে জড়াইয়া আসিল।

কুসুম আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না—হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার জন্য আজও যে দাদার স্নেহের লেশমাত্রও অবশিষ্ট আছে, এ আশা সে অনেকদিন ছাড়িয়াছিল।

কুঞ্জর চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সন্ধ্যা হইল। কুঞ্জ আর একবার ভাল করিয়া জামার হাতায় চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, তুই অস্থির হ'সনে বোন, আমি বলে যাচ্ছি, এ বিয়ে কোনমতেই হতে দেব না।

এবার কুসুম কথা কহিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি এতে হাত দিয়ো না দাদা।

কুঞ্জ অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, হাত দেব না? আমার চোখের সামনে বিয়ে হবে. আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব? তুই বলচিস কি কুসুম?

না দাদা. তুমি বাধা দিতে পাবে না।

কুঞ্জ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, বাধা দেব না? নিশ্চয় দেব। এতে তোর অপমান না হয় না হবে. কিন্তু আমি সইতে পারব না। আমার প্রজা—তুই বলিস কি রে! লোকে শুনলে আমাকে ছি ছি করবে না?

কুসুম বালিশে মুখ লুকাইয়া বারংবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, আমি মানা করচি দাদা, তুমি কিছুতেই হাত দিও না। আমাদের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক নেই. আর ঘাঁটাঘাঁটি করে কেলেঙ্কারি বাড়িয়ো না—বিয়ে হচ্চে হোক।

কুঞ্জ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, না।

না কেন? আমাকে ত্যাগ করে তিনি বিয়ে করেছিলেন, না হয় আর একবার করবেন। আমার পক্ষে দুই-ই সমান। তোমার পায়ে ধরচি দাদা, অনর্থক বাধা দিয়ে হাঙ্গামা করে আমার সমস্ত সম্ভ্রম নষ্ট করে দিয়ো না—তিনি যাতে সুখী হন. তাই ভাল।

হুঃ, বলিয়া কুঞ্জ খানিকক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া থাকিয়া বলিল, জানি ত তোকে চিরকাল। একবার 'না' বললে কার বাপের সাধ্যি 'হাঁ' বলায়। তুই কারো কথা শুনবি নে. কিন্তু তোর কথা সবাইকে শুনতে হবে।

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

কুঞ্জ বলিতে লাগিল, আর ধরলে কথাটা মিথ্যে নয়। তুই যখন কিছুতেই শ্বশুরঘর করবি নে, তখন তাদের সংসারই বা চলে কি করে? এখন না হয় মা আছেন. কিন্তু তিনি ত চিরকাল বেঁচে থাকবেন না।

কুসুম কথা কহিল না।

কুঞ্জ ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা কুসুম, সে বিয়ে করুক, না করুক, তুই তবে এত কাঁদচিস্ কেন?

ইহার আর জবাব কি?

অন্ধকারে কুঞ্জ দেখিতে পাইল না কুসুমের চোখের জল কমিয়া আসিয়াছিল. এই প্রশ্নে পুনরায় তাহা প্রবলবেগে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কুঞ্জ উঠিয়া গেলে কুসুম সেদিনের কথাগুলো স্মরণ করিয়া লজ্জায় ধিক্কারে মনে মনে মরিয়া যাইতে লাগিল। ছি ছি. মরিলেও ত এ লজ্জার হাত হইতে নিষ্কৃতির পথ নাই। এজন্যাই তাঁহার আশ্রয় দিবার সাধ্য ছিল না, অথচ সে কতই না সাধিয়াছিল। ওদিকে যখন নূতন করিয়া বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, তখন না জানিয়া সে মুখ ফুটিয়া নিজেকে বাড়ির বধূ বলিয়া দর্প করিয়াছিল। যেখানে বিন্দু পরিমাণ ভালবাসা ছিল না, সেখানে সে পর্বত-প্রমাণ অভিমান করিয়াছিল। ভগবান! এই অসহ্য দুঃখের উপর কি মর্মান্তিক লজ্জাই না তাহার মাথায় চাপাইয়া দিলে!

তাহার বুক চিরিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল—উঃ, এইজন্যই আমার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র কৌতূহল নাই! আর আমি লজ্জাহীনা, তাহাতে শপথ করিতে গিয়াছিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবন লোকটি সেই প্রকৃতির মানুষ. যাহারা কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইয়া মাথা গরম করাকে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার বলিয়া ঘৃণা করে। ইহারা হাজার রাগ হইলেও সামলাইতে পারে এবং কোনো কারণেই প্রতিপক্ষের রাগারাগি হাঁকাহাঁকি বা উচ্চ তর্কে যোগ দিয়া লোক জড় করিতে চাহে না। তথাপি সেদিন কুসুমের বারংবার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও অন্যায় অভিযোগে উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কতকগুলো নিরর্থক রূঢ় কথা বলিয়া আসিয়া

তাহার মনস্তাপের অবধি ছিল না। তাই পরদিন প্রভাতেই চরণকে আনিবার ছলে একজন দাসী, ভৃত্য ও গাড়ি পাঠাইয়া দিয়া যথার্থই আশা করিয়াছিল, বুদ্ধিমতী কুসুম এ ইংগিতে বুঝিতে পারিবে এবং হয়ত আসিবেও। যদি সত্যই আসে, তাহা হইলে একটা দিনের জন্যও তাহাকে লইয়া যে কি উপায় হইবে, এ দুরূহ প্রশ্নের এই বলিয়া মীমাংসা করিয়া রাখিয়াছিল—যদি আসে, তখন মা আছেন। জননীর কার্যকুশলতায় তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। যত বড় অবস্থাসংকটই হোক, কোন-না-কোন উপায়ে তিনি সবদিক বজায় রাখিয়া যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা করিবেনই। এই বিশ্বাসের জোরেই মাকে একটি কথা না বলিয়াই গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল এবং আশায় আনন্দে লজ্জায় ভয়ে অধীর হইয়া পথ চাহিয়া ছিল, অন্ততঃ মায়ের কাছে ক্ষমা ভিক্ষার জন্যও আজ সে আসিবে।

দুপুরবেলা গাড়ি একা চরণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল, বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুদিন হইতে তাহার পাঠশালায় পূর্বের শৃঙ্খলা ছিল না। পণ্ডিতমশায়ের দারুণ অমনোযোগে অনেক পোড়ো কামাই করিতে শুরু করিয়াছিল এবং যাহারা আসিত, তাহাদেরও পুকুরে তালপাতা ধুইয়া আনিতেই দিন কাটিয়া যাইত। শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ ছিল শুধু ঠাকুরের আরতি-শেষে প্রসাদ ভক্ষণে। এটা বোধ করি, অকৃত্রিম ভক্তিবশতঃই—ছাত্রেরা এ সময়ে অনুপস্থিত থাকিয়া গৌর-নিতাইয়ের অমর্যাদা করিতে পছন্দ করিত না।

এমনি সময়ে অকস্মাৎ একদিন বৃন্দাবন তাহার পাঠশালায় সমুদয় চিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিল। পোড়োদের তালপাতা ধুইয়া আনিবার সময় ছয় ঘণ্টা হইতে কমাইয়া পনর মিনিট করিল এবং সারাদিন অদর্শনের পর শুধু আরতির সময়টায় গৌরাঙ্গপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় ঠাকুর-দালান ছাইয়া না ফেলে সেদিকেও খরদৃষ্টি রাখিল।

দিন-দশেক পরে একদিন বৈকালে বৃন্দাবনের তত্ত্বাবধানে পোড়োরা সারি দিয়া দাঁড়াইয়া তারস্বরে গণিত-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতেছিল, একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। বৃন্দাবন সসম্ভ্রমে উঠিয়া, বসিতে আসন দিয়া চাহিয়া রহিল, চিনিতে পারিল না।

আগন্তুক তারই সমবয়সী। আসন গ্রহণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কি ভায়া, চিনতে পারলে না?

বৃন্দাবন সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, কৈ না।

তিনি বলিলেন, আমার কাজ আছে তা পরে জানাব। মামার চিঠিতে তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনে বিদেশ যাবার পূর্বে একবার দেখতে এলাম—আমি কেশব।

বৃন্দাবন লাফাইয়া উঠিয়া এই বাল্যসুহৃৎকে আলিঙ্গন করিল। তাহার ভূতপূর্ব ইংরাজী-শিক্ষক দুর্গাদাসবাবুর ভাগিনেয় ইনি। পনর-ষোল বৎসর পূর্বে এখানে পাঁচ-ছয় মাস ছিলেন, সেই সময় উভয়ের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। দুর্গাদাসবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইলে কেশব চলিয়া যায়, সেই অবধি আর দেখা হয় নাই। তথাপি কেহই কাহাকেও বিস্মৃত হয় নাই এবং তাহার শিক্ষকের মুখে বৃন্দাবন প্রায়ই এই বাল্যবন্ধুটির সংবাদ পাইতেছিল।

কেশব পাঁচ-ছয় বৎসর হইল এম. এ. পাশ করিয়া কলেজের শিক্ষকতা করিতেছিল, সম্প্রতি সরকারী চাকরিতে বিদেশ যাইতেছে।

কুশলাদি প্রশ্নের পর সে কহিল, আমার মামা মিথ্যে কথা ত দূরের কথা, কখনো বাড়িয়েও বলেন না; গতবারে তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন, জীবনে অনেক ছাত্রকেই পড়িয়েছেন; কিন্তু তুমি ছাড়া আর কেউ যথার্থ মানুষ হয়েচে কিনা তিনি জানেন না। যথার্থ মানুষ কখনও চোখে দেখিনি ভাই, তাই দেশ ছেড়ে যাবার আগে তোমাকে দেখতে এসেছি।

কথাগুলো বন্ধুর মুখ দিয়া বাহির হইলেও বৃন্দাবন লজ্জায় এতই অভিভূত হইয়া পড়িল যে, কি জবাব দিবে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। সংসারে কোন মানুষই যে তাহার সম্বন্ধে এতবড় স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বিশেষতঃ এই স্তুতি তাহারই পরম পূজনীয় শিক্ষকের মুখ দিয়া প্রথম প্রচারিত হইবার সংবাদে যথার্থই সে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেশব বুঝিয়া বলিল, থাক, যাতে লজ্জা পাও, আর তা বলব না, শুধু মামার মতটা

তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন কাজের কথা বলি। পাঠশাল খুলেচ, শুনি মাইনে নাও না, পোড়োদের বই-টই কাপড়-চোপড় পর্যন্ত যোগাও—এতে আমিও রাজী ছিলাম, কিন্তু ছাত্র জোটাতে পারলাম না। বলি, এতগুলি ছেলে যোগাড় করলে কি করে বল ত ভায়া?

বৃন্দাবন তাহার কথা বুঝিতে পারিল না, বিস্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

কেশব হাসিয়া বলিল, খুলে বলচি—নইলে বুঝবে না। আমরা আজকাল সবাই টের পেয়েচি, যদি দেশের কোনো কাজ থাকে ত ইতর-সাধারণের ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষা না দিয়ে আর যাই করি না কেন, নিছক পণ্ডশ্রম। অন্ততঃ আমার ত এই মত যে লেখাপড়া শিখিয়ে দাও, তখন আপনার ভাবনা তারা আপনি ভাববে। ইঞ্জিনে স্টিম হলে তবে গাড়ি চলে, নইলে এতবড় জড় পদার্থটাকে জন-কতক ভদ্রলোকে মিলে গায়ের জোরে ঠেলাঠেলি করে একচুলও নড়াতে পারবে না। যাক, তুমি এ-সব জানই, নইলে গাঁটের পয়সা খরচ করে পাঠশালা খুলতে না। আমি এইজন্যে বিয়ে পর্যন্ত করিনি হে, তোমাদের মত আমাদের গাঁয়েও লেখাপড়া শেখবার বালাই নেই, তাই প্রথমে একটা পাঠশালা খুলে—শেষে একটা স্কুলে দাঁড় করাব মনে করি—তা আমার পাঠশালাই চলল না—ছেলে জুটল না। আমাদের গাঁয়ের ছোটলোকগুলো এমনি শয়তান যে, কোনমতেই ছেলেদের পড়তে দিতে চায় না। নিজের মানসম্ভ্রম নষ্ট করে দিন-কতক ছোটলোকদের বাড়ি পর্যন্ত ঘুরেছিলাম—না, তবুও না।

বৃন্দাবনের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু শান্তভাবে বলিল, ছোটলোকদের ভাগ্য ভাল যে, ভদ্রলোকের পাঠশালে ছেলে পাঠায় নি। কিন্তু তোমারও ভাই, আমাদের মত ছোটলোকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মান-ইজ্জত নষ্ট করা উচিত হয়নি।

তাহার কথার খোঁচাটা কেশবকে সম্পূর্ণ বিঁধিল। সে ভারী অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, না হে না—তোমাকে—তোমাদের সে কি কথা! ছি ছি! তা আমি বলিনি, সে কথা নয়—কি জানো—

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, আমাকে বলনি তা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনকে বলেচ। আমরা সব তাঁতি কামার গয়লা চাষা—তাঁত বুনি, লাঙ্গল ঠেলি, গরু চরাই—জামাজোড়া পরতে পাইনে, সরকারী অফিসের দোর গোড়ায় যেতে পারিনে, কাজেই তোমরা আমাদের ছোটলোক বলে ডাকো—ভাল কাজেও আমাদের বাড়িতে ঢুকলে তোমাদের মত উচ্চশিক্ষিত সদাশয় লোকেরও সম্ভ্রম নষ্ট হয়ে যায়।

কেশব মাথা হেঁট করিয়া বলিল, বৃন্দাবন, সত্যি বলচি ভাই, তোমাকে আমি চাষাভূষোর দল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক মনে করেই অমন কথা বলে ফেলেছি। যদি জানতুম, তুমি নিজেকে ওদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রাগ করবে, কখন এ কথা মুখ দিয়ে বার করতাম না।

বৃন্দাবন কহিল, তাও জানি। কিন্তু তুমি আলাদা করে নিলেই ত আলাদা হতে পারিনে ভাই। আমার সাতপুরুষ এদেশের ছোটলোকদের সঙ্গে মিলে রয়েচে। আমিও চাষা, আমিও নিজের হাতে চাষ-আবাদ করি। কেশব, এইজন্যই তোমার পাঠশালায় ছেলে জোটেনি—আমার পাঠশালায় জুটেচে; আমি দলের মধ্যে থেকেই বড়, দল-ছাড়া বড় নই, তাই তারা অসঙ্কোচে আমার কাছে এসেচে—তোমার কাছে যেতে ভরসা করেনি। আমরা অশিক্ষিত দরিদ্র, আমরা মুখে আমাদের অভিমান প্রকাশ করিতে পারিনে, তোমরা ছোটলোক বলে ডাকো, আমরা নিঃশব্দে স্বীকার করি, কিন্তু আমাদের অন্তর্যামী স্বীকার করেন না; তিনি তোমাদের ভাল কথাতেও সাড়া দিতে চান না।

কেশব লজ্জায় ও ক্ষোভে অবনতমুখে শুনিতে লাগিল।

বৃন্দাবন কহিল, জানি, এতে আমাদেরই সমূহ ক্ষতি হয়, তবুও আমরা তোমাদের আত্মীয় শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মেনে নিতে ভয় পাই। দেখতে পাও না ভাই, আমাদের মধ্যে হাতুড়ে বদ্যি, হাতুড়ে পণ্ডিতই প্রসার-প্রতিপত্তি লাভ করে—যেমন আমি করেচি, কিন্তু তোমাদের মত বড় ডাক্তার প্রফেসারও আমল পায় না। আমাদের বুকের মধ্যেও দেবতা বাস করেন, তোমাদের এই অশ্রদ্ধার করুণা, এই উঁচুতে বসে নীচে ভিক্ষা দেওয়া তাঁর গায়ে বেঁধে, তিনি মুখ ফেরান।

এবার কেশব প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কিন্তু মুখ ফেরানো অন্যায়। আমরা বাস্তবিক

তোমাদের ঘৃণা করিনে, সত্যই মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের উচিত, আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা। কিসে ভাল হয়, না হয়, শিক্ষার গুণে আমরা বেশী বুঝি; তোমরাও চোখে দেখতে পাচ্ছ, আমরাই সব বিষয়ে উন্নত, তখন তোমাদের কর্তব্য আমাদের কথা শোনা।

বৃন্দাবন কহিল, দেখ কেশব, দেবতা কেন মুখ ফেরান, তা দেবতাই জানেন। সে কথা থাক্। কিন্তু তোমরা আত্মীয়ের মত আমাদের শুভকামনা কর না, মনিবের মত কর। তাই তোমাদের পনর-আনা লোকই মনে করে, যাতে ভদ্রলোকের ছেলের ভাল হয়, তাতে চাষাভুষোর ছেলেরা অধঃপথে যায়। তোমাদের সংস্রবে লেখাপড়া শিখলে চাষাব ছেলে যে বাবু হয়ে যায়, তখন অশিক্ষিত বাপ-দাদাকে মানে না, শ্রদ্ধা করে না, বিদ্যাশিক্ষার এই শেষ পরিণতির আশঙ্কা আমরা তোমাদের আচরণেই শিখি। কেশব, আগে আমাদের অর্থাৎ এই দেশের ছোটলোকদের আত্মীয় হতে শেখো, তার পরে তাদের মঙ্গলকামনা করো, তাদের ছেলে-পিলেদের লেখাপড়া শেখাতে যেয়ো। আগে নিজেদের আচার-ব্যবহারে দেখাও, তোমরা লেখাপড়া-শেখা ভদ্রলোকেরা একেবারে স্বতন্ত্র দল নও, লেখাপড়া শিখেও তোমরা দেশের অশিক্ষিত চাষাভুষোকে নেহাত ছোটলোক মনে কর না, বরং শ্রদ্ধা কর, তবেই শুধু আমাদের ভয় ভাঙবে যে, আমাদেরও লেখাপড়া-শেখা ছেলেরা অশ্রদ্ধা করবে না এবং দল ছেড়ে সমাজ ছেড়ে, জাতিগত ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্ম সমস্ত বিসর্জন দিয়ে, পৃথক হবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে না। এ যতক্ষণ না করচ ভাই, ততক্ষণ জন্ম জন্ম অবিবাহিত থেকে হাজার জীবনের ব্রত কর না কেন, তোমার পাঠশালে ছোটলোকের ছেলে যাবে না। ছোটলোকেরা শিক্ষিত ভদ্রলোককে ভয় করবে, মান্য করবে, ভক্তিও করবে, কিন্তু বিশ্বাস করবে না, কথা শুনবে না। এ সংশয় তাদের মন থেকে কিছুতেই ঘুচবে না যে, তোমাদের ভালো এবং তাদের ভালো এক নয়।

কেশব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, বৃন্দাবন, বোধ করি তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, যদি উভয়ের মধ্যে বিশ্বাসের বন্ধনই না থাকে, তা হলে আমাদের শত আত্মীয়তার প্রয়াসও ত কাজে লাগবে না? বিশ্বাস না করলে, আমরা কি করে বোঝাবো, আমরা আত্মীয় কিংবা পর? তার উপায় কি?

বৃন্দাবন কহিল, ঐ যে বললুম, আচার-ব্যবহারে। আমাদের ষোল-আনা সংস্কারই যদি তোমাদের শিক্ষিতের দল কুসংস্কার বলে বর্জন করে, আমাদের বাসস্থান, আমাদের সাংসারিক গতিবিধি, আমাদের জীবিকা অর্জনের উপায়, যদি তোমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়, তা হলে কোনদিনই আমরা বুঝতে পারব না, তোমাদের নির্দিষ্ট কল্যাণের পন্থায় যথার্থই আমাদের কল্যাণ হবে। আচ্ছা কেশব, পৈতে হবার পর থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক কর?

না।

জুতো পায়ে দিয়ে জল খাও?

খাই।

মুসলমানের হাতের রান্না?

প্রেজুডিস্ নেই। খেতে পারি।

তা হলে আমিও বলতে পারি, ছোটলোকদের মধ্যে পাঠশালা খুলে তাদের ছেলেদের শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প তোমার বিড়ম্বনা—কিংবা আরও কিছু বেশী—সেটা বললে তুমি রাগ করবে?

ধৃষ্টতা?

ঠিক তাই। কেশব, শুধু ইচ্ছা এবং হৃদয় থাকলেই পরের ভালো এবং দেশের কাজ করা যায় না। যাদের ভাল করবে, তাদের সঙ্গে থাকার কষ্ট সহ্য করতে পারা চাই, বুদ্ধি-বিবেচনায় ধর্মে-কর্মে এত এগিয়ে গেলে তারাও তোমার নাগাল পাবে না, তুমিও তাদের নাগাল পাবে না। কিন্তু আর না, সন্ধ্যা হয়, এবার একটু পাঠশালের কাজ করি।

কর, কাল সকালেই আবার আসব, বলিয়া কেশব উঠিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা গ্রহণ করিল।

পাড়াগাঁয়ে বাড়ি হইলেও কেশব শহরের লোক। বন্ধুর নিকট এই ব্যবহারে মনে মনে

অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিল। উভয়ে প্রাঙ্গণে নামিতেই পোড়োর দল মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল।

বাল্যবন্ধুকে দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বৃন্দাবন আস্তে আস্তে বলিল, তুমি বন্ধু হলেও ব্রাহ্মণ। তাই তোমাকে নিজের তরফ থেকেও প্রণাম করেচি, ছাত্রদের তরফ থেকেও করেচি—বুঝলে ত?

কেশব সলজ্জ হাস্যে 'বুঝেচি' বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালেই কেশব হাজির হইয়া বলিল, বৃন্দাবন, তুমি যে যথার্থই মানুষ তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

বৃন্দাবন হাসিয়া বলিল, আমারও নেই। তার পরে?

কেশব কহিল, তোমাকে উপদেশ দিচ্চিনে, সে অহঙ্কার আমার কাল ভেঙ্গে গেছে। শুধু বন্ধুর মত সবিনয়ে জিজ্ঞেস কচ্চি, এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট করে ছেলেদের শিক্ষা দিচ্চ, কিন্তু আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েচে সেখানে ক খ শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, এ কাজ কি গভর্নমেন্টের করা উচিত নয়?

বৃন্দাবন হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার প্রশ্নটা ঠিক ওই পোড়োদের মত হ'ল। দোষের জন্য রাধুকে মারতে যাও দিকি, সে তক্ষণি দুই হাত তুলে বলবে—পণ্ডিত-মশাই, মাধুও করেচে। অর্থাৎ মাধুর দোষ দেখিয়ে দিতে পারলে যেন রাধুর দোষ আর থাকে না। এই দেশজোড়া মূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত নিজে ত করি ভাই, তার পরে দেখা যাবে গভর্নমেন্ট তাঁর কর্তব্য করেন কি না। নিজের কর্তব্য করার আগে পরের কর্তব্য আলোচনা করলে পাপ হয়।

কিন্তু তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?

বৃন্দাবন বিস্মিতভাবে একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কথাটা ঠিক হ'ল না ভাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয়, ত এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরী হয় না কেশব, বরং আশীর্বাদ কর যেন এই ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্বে মানুষ দেখে মরতে পারি। আর এক কথা। আমার পাঠশালায় একটি শর্ত আছে। কাল যদি তুমি সন্ধ্যার পর উপস্থিত থাকতে ত দেখতে পেতে প্রত্যহ বাড়ি যাবার পূর্বে প্রত্যেক ছাত্রই প্রতিজ্ঞা করে, বড় হয়ে তারা অন্ততঃ দুটি-একটি ছেলেকেও লেখাপড়া শেখাবে। আমার প্রতি পাঁচটি ছাত্রের একটি ছাত্রও যদি বড় হয়ে তাদের ছেলেবেলার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে, তা হলে আমি হিসেব করে দেখেচি কেশব, বিশ বছর পরে এই বাঙ্গলাদেশে একটি লোকও মূর্খ থাকবে না।

কেশব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ—কি ভয়ানক আশা!

বৃন্দাবন বলিল, সে বলতে পার বটে। দুর্বল মুহূর্তে আমারও ভয় হয় দুরাশা, কিন্তু সবল মুহূর্তে মনে হয়, ভগবান মুখ তুলে চাইলে পূর্ণ হতে কতক্ষণ!

কেশব কহিল, বৃন্দাবন, আজ রাত্রেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে, আবার কবে দেখা হবে, ভগবান জানেন। চিঠি লিখলে জবাব দেবে বল?

এ আর বেশী কথা কি কেশব?

বেশী কথাও আছে, বলচি। যদি কখন বন্ধুর প্রয়োজন হয়, স্মরণ করবে বল?

তাও করব, বলিয়া বৃন্দাবন নত হইয়া কেশবের পদধূলি মাথায় লইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুরের দোল-উৎসব বৃন্দাবনের জননী খুব ঘটা করিয়া সম্পন্ন করিতেন। কাল তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে বৃন্দাবন অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই, মা ঘরের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিলেন, বৃন্দাবন, একবার ওঠ দিকি বাবা!

জননীর ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে বৃন্দাবন ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা?

মা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে আসিয়া বলিলেন, আমি ত চিনিনে বাছা, তোর পাঠশালার একটি ছাত্তর বাইরে বসে বড় কাঁদচে—তার বাপ নাকি ভেদবমি হয়ে আর উঠতে পারচে না।

বৃন্দাবন ঊর্ধ্বশ্বাসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই শিবু গোয়ালার ছেলে কাঁদিয়া উঠিল। পণ্ডিতমশাই, বাবা আর চেয়েও দেখচে না, কথাও বলচে না।

বৃন্দাবন সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া হাত ধরিয়া তাহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শিবুর তখন শেষ-সময়। প্রতি বৎসর এই সময়টায় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়, এ বৎসর এই প্রথম। কাল সন্ধ্যা-রাত্রেই শিবু রোগে আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় এতক্ষণ পর্যন্ত টিঁকিয়াছিল, বৃন্দাবন আসিবার ঘণ্টা-খানেক পরেই দেহত্যাগ করিল।

বাঙ্গলাদেশের প্রায় প্রতি গ্রামেই যেমন আপনা-আপনি শিক্ষিত এক-আধজন ডাক্তার বাস করেন, এ গ্রামেও গোপাল ডাক্তার ছিলেন। কাল রাত্রে তাঁহাকে ডাকিতে যাওয়া হয়। কলেরা শুনিয়া তিনি দু টাকা ভিজিট নগদ প্রার্থনা করেন। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি ঠিক জানিতেন, ধারে কারবার করিলে, এসব রোগে তাঁহার ঔষধ খাইয়া ছোটলোকগুলো পরদিন ভিজিট বুঝাইয়া দিবার জন্য বাঁচিয়া থাকে না। শিবুর স্ত্রীও অত রাত্রে নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, নিরুপায় হইয়া নুন-জল খাওয়াইয়া, স্বামীর শেষ চিকিৎসা সমাধা করিয়া, সারারাত্রি শিয়রে বসিয়া মা শীতলার কৃপা প্রার্থনা করে। তারপর সকাল-বেলা এই।

বৃন্দাবন বড়লোক, এ গ্রামে তাহাকে সবাই মান্য করিত। মৃত স্বামীর গতি করিয়া দিবার জন্য শিবুর সদ্য-বিধবা তাহার পায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িল। শিবুর সম্বলের মধ্যে ছিল তাহার অনশন ও অর্ধাশনক্লিষ্ট হাত দুখানি এবং দুটি গাভী। তাহারই একটিকে বন্ধক রাখিয়া এ বিপদে উদ্ধার করিতে হইবে।

কোন কিছু বন্ধক না রাখিয়াও বৃন্দাবন তাহার জীবনে এমন অনেক গতি করিয়াছে, শিবুরও গতি করিয়া অপরাহ্ণবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখনও বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় একটা মাদুর পাতিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া ছিল, সহসা পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, মৃত শিবুর সেই ছেলেটি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আয় বোস ষষ্ঠীচরণ, বলিয়া বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল।

ছেলেটি বার-দুই ঠোঁট ফুলাইয়া 'পণ্ডিতমশাই' বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল।

সদ্য-পিতৃহীন শিশুকে বৃন্দাবন কাছে টানিয়া লইতেই সে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, কেষ্টাও বমি কচ্চে!

কেষ্টা তাহার ছোট ভাই, সেও মাঝে মাঝে দাদার সহিত পাঠশালে লিখিতে আসিত।

আজ রাত্রে গোপাল ডাক্তার ভিজিটের টাকা আদায় না করিয়াই বৃন্দাবনের সহিত কেষ্টাকে দেখিতে আসিলেন। তাহার নাড়ী দেখিলেন, জিভ দেখিলেন, ঔষধ দিলেন, কিন্তু অবাধ্য কেষ্টা মায়ের বুকফাটা কান্না, চিকিৎসকের মর্যাদা কিছুই গ্রাহ্য করিল না, রাত্রি ভোর না হতেই গোপাল ডাক্তারের বিশ্ব-বিশ্রুত হাতযশ খারাপ করিয়া বাপের কাছে চলিয়া গেল।

মৃতপুত্র ক্রোড়ে করিয়া সদ্য-বিধবা জননীর মর্মান্তিক বিলাপে বৃন্দাবনের বুকের ভিতরটা ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহার নিজের ছেলে আছে, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরে পলাইয়া আসিয়া চরণকে প্রাণপণে বুকে চাপিয়া কাঁদিতে লাগিল। নিজের অন্তরের মধ্যে চাহিয়া সহস্রবার মনে মনে বলিল, মানুষের দোষের শাস্তি আর যা ইচ্ছে হয় দিয়ো ভগবান, শুধু এই শাস্তি দিয়ো না—জানি না, এ প্রার্থনা জগদীশ্বর শুনিতে পাইলেন কিনা, কিন্তু নিজে আজ সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিল, এ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি আর যাহারই থাক, তাহার নাই।

ইহার পর দিন দুই-তিন নির্বিঘ্নে কাটিল, কিন্তু তৃতীয় দিবসে শোনা গেল, তাহাদের প্রতিবেশী রসিক ময়রার স্ত্রী ওলাউঠায় মরমর হইয়াছে।

মা দেখিতে গিয়াছিলেন, বেলা দশটার সময় তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ঘণ্টা-খানেক পরে আর্ত ক্রন্দনের রোলে বুঝিতে পারা গেল, রসিকের স্ত্রী ছোট ছোট চার-পাঁচটি ছেলে-মেয়ে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

এইবার গ্রামে মহামারী শুরু হইয়া গেল। যাহার পলাইবার স্থান ছিল, সে পলাইল; অধিকাংশেরই ছিল না, তাহারা ভীতশুষ্ক-মুখে সাহস টানিয়া আনিয়া কহিল, অন্নজল ফুরাইলেই যাইতে হইবে, পলাইয়া কি করিব?

বৃন্দাবনের বাড়ির সুমুখ দিয়াই গ্রামের বড় পথ, তথায় যখন-তখন ভয়ঙ্কর হরি-ধ্বনিতে ক্রমাগতই জানা যাইতে লাগিল, ইহাদের অনেকেরই অন্নজল প্রতিনিয়তই নিঃশেষ হইতেছে।

আশপাশের গ্রামেও দুই-একটা মৃত্যু শোনা যাইতে লাগিল বটে, কিন্তু বাড়লের অবস্থা প্রতি মুহূর্তেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার প্রধান কারণ, গ্রামের অবস্থা অন্যান্য বিষয়ে ভাল হইলেও পানীয় জলের কিছুমাত্র বন্দোবস্ত ছিল না।

নদী নাই, যে দুই-চারটা পুষ্করিণী পূর্বে উত্তম ছিল, তাহাও সংস্কার অভাবে মজিয়া উঠিয়া প্রায় অব্যবহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অথচ কাহারো তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র ছিল না। গ্রামবাসীদের অনেকেরই বিশ্বাস, জলের তৃষ্ণা-নিবারণ ও আহার্য পাক করিবার ক্ষমতা থাকা পর্যন্ত তাহার ভালমন্দের প্রতি চাহিবার আবশ্যকতা নাই।

এদিকে গোপাল ডাক্তার ছাড়া আর চিকিৎসক নাই, তিনি গরীবের ঘরে যাইবার সময় পান না, অথচ মহামারী প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, ক্রমশঃ এমন হইয়া উঠিল যে, ঔষধ-পথ্য ত দূরের কথা, মৃতদেহের সংকার করাও দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল।

শুধু বৃন্দাবনের পাড়াটা তখনও নিরাপদ ছিল। রসিকের স্ত্রীর মৃত্যু ব্যতীত এই পাঁচ-সাতটা বাটীতে তখনও মৃত্যু প্রবেশ করে নাই।

বৃন্দাবনের পিতা নিজেদের ব্যবহারের নিমিত্ত যে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার জল তখনও দুষ্ট হয় নাই, প্রতিবেশী গৃহস্থেরা এই পানীয় ব্যবহার করিয়াই সম্ভবতঃ এখনও মৃত্যু এড়াইয়াছিল।

কিন্তু, প্রতিদিন বৃন্দাবন শুকাইয়া উঠিতে লাগিল। ছেলের মুখের পানে চাহিলেই তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠে, কেবলই মনে হয়, অলক্ষ্যে অভেদ্য অন্তরায় তাহাদের পিতাপুত্রের মাঝখানে প্রতি মুহূর্তেই উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে! তাহার সে সাহস নাই, রোগ ও মৃত্যু শুনিলেই চমকাইয়া উঠে। ডাকিতে আসিলে যায় বটে, কিন্তু তাহার প্রতি পদক্ষেপ বিচারালয়ের অভিমুখে অপরাধীর চলনের মত দেখায়। শুধু তাহার চির-দিনের অভ্যাসই তাহাকে যেন টানিয়া বাঁধিয়া লইয়া যায়। মৃতদেহ সংকার করিয়া ঘরে ফিরিয়া, চরণকে কাছে ডাকিতে, তাহাকে স্পর্শ করিতে তাহার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠে। কেবলই মনে হয়, অজ্ঞাতসারে কোন সংক্রামক বীজ বুঝি একমাত্র বংশধরের দেহে সে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। কি করিয়া যে তাহাকে বাহিরের সর্বপ্রকার সংস্রব হইতে, রোগ হইতে, মরণ হইতে আড়াল করিয়া রাখিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চিন্তা।

পাঠশালা আপনা-আপনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, চরণের মুখের দিকে চাহিয়া, ইহাও তাহাকে ক্লিষ্ট করে নাই। কিছুদিন হইতে তাহার খাওয়া, পরা, শোওয়া সমস্তই নিজের হাতে লইয়াছিল, এ বিষয়ে মাকেও যেন সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। এমনি সময়ে একদিন মায়ের মুখে সংবাদ পাইল, তাহাদের প্রতিবেশী তারিণী মুখুয্যের ছোটছেলে রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; খবর শুনিয়া তাহার মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। মা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আর না বাবা! এবার চরণকে নিয়ে তুই বাইরে যা।

বৃন্দাবন ছলছল চক্ষে বলিল, মা! তুমিও চল।

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুরঘর ফেলে রেখে!

পুরুতঠাকুরের ওপর ভার দিয়ে চল।

মা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার ঠাকুরের ভার অপরে নেবে, আর আমি পালিয়ে যাব?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া বলিল, তা' নয় মা, তোমার ভার তোমারই রইল, শুধু দু'দিন পরে ফিরে এসে তুলে নিয়ো।

মা দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা হয় না বৃন্দাবন। আমার শাশুড়ীঠাকরুন এ ভার আমাকে দিয়ে গেছেন, আমিও যদি কখন তেমন করে দিতে পারি, তবেই দেব, না হলে আমারই মাথায় থাক। কিন্তু, তোরা যা।

বৃন্দাবন উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, এই সময়ে কি করে তোমাকে একা রেখে যাব, মা? ধর যদি—

মা একটু হাসিলেন। বলিলেন, সে ত সুসময় বাবা। তখন জানব, আমার কাজ শেষ হয়েচে, ঠাকুর তাঁর ভার অপরকে দিতে চান। তাই হোক বৃন্দাবন, আমার আশীর্বাদ নিয়ে তোরা নির্ভয়ে যা, আমি আমার ঠাকুরঘর নিয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারব।

জননীর অবিচলিত কণ্ঠস্বরে অন্যত্র পলাইবার আশা বৃন্দাবনের তিরোহিত হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত ভাবিয়া লইয়া সেও দৃঢ়স্বরে কহিল, তা হলে আমারও যাওয়া হবে না। তোমার ঠাকুর আছেন, আমারও মা আছেন। নিজের জন্য আমি এতটুকু ভয় পাইনি মা, শুধু চরণের মুখের দিকে চাইলেই আমি থাকতে পারিনে। কিন্তু যাওয়া যখন কোনমতেই হতে পারে না, তখন আজ থেকে তাকে ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে নির্ভয়ে থাকব। এখন থেকে আর তুমি আমার শুকনো মুখ দেখতে পাবে না মা।

তারিণী মুখুয্যের ছোটছেলে মরিয়াছে। পরদিন সকালবেলা বৃন্দাবন কি কাজে ঐ দিক দিয়া আসিতেছিল, দেখিতে পাইল, তাহাদের পুকুরের ঘাটের উপরেই একটি স্ত্রীলোক কতগুলি কাপড়চোপড় কাচিতেছে। কতক কাচা হইয়াছে, কতক তখনও বাকী আছে। বস্ত্রখণ্ডগুলির চেহারা দেখিয়াই বৃন্দাবন শিহরিয়া উঠিল। নিকটে আসিয়া রুদ্ধস্বরে কহিল, মড়ার কাপড়চোপড় কি বলে আপনি পুকুরে পরিষ্কার করচেন?

স্ত্রীলোকটি ঘোমটার ভিতর হইতে কি বলিল, তাহা বোঝা গেল না।

বৃন্দাবন বলিল, যতটা অন্যায় করেচেন, তার ত আর উপায় নেই, কিন্তু আর ধোবেন না—উঠে যান।

সে পরিষ্কৃত অপরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি তুলিয়া লইয়া গেল।

বৃন্দাবন জলের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া উঠিয়া আসিতেছিল, দেখিল, তারিণী দ্রুতপদে এইদিকে আসিতেছে। একে পুত্রশোকে কাতর, তাহাতে এই অপমান, আসিয়াই পাগলের মত চোখমুখ করিয়া বলিল, তুমি নাকি আমার বাড়ির লোককে পুকুরে নাবতে দাওনি?

বৃন্দাবন কহিল, তা নয়, আমি ময়লা কাপড় ধুতে মানা করেচি।

তারিণী চেঁচাইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় ধোবে? থাকব বাড়লে, ধুতে যাবো বাদ্দিবাটীতে? উচ্ছন্ন যাবি বৃন্দাবন—উচ্ছন্ন যাবি। ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিলে নির্বংশ হবি।

বৃন্দাবনের বুকের ভিতর ধড়াস্ করিয়া উঠিল, কিন্তু চেঁচামেচি করা, কলহ করা তাহার স্বভাব নয়; তাই আত্মসংবরণ করিয়া শান্তভাবে কহিল, আমি একা উচ্ছন্ন যাই, তত ক্ষতি নাই; কিন্তু আপনি সমস্ত পাড়াটা যে উচ্ছন্ন দেবার আয়োজন করেচেন। গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্চে, শুধু পাড়াটা ভাল আছে, তাও আপনি থাকতে দেবেন না?

ব্রাহ্মণ উদ্ধতভাবে প্রশ্ন করিল, চিরকাল মানুষ পুকুরে কাপড়চোপড় কাচে না ত কি তোমার মাথার ওপর কাচে বাপু?

বৃন্দাবন দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, এ পুকুর আমার। আপনি নিষেধ যদি না শোনেন, আপনার বাড়ির কোন লোককে আমি পুকুরে নাবতে দেব না।

নাবতে দিবিনে ত, আমরা যাব কোথায় বলে দে?

বৃন্দাবন কহিল, এখান থেকে শুধু ব্যবহারের জল নিতে পারেন। কাপড়চোপড় ধুতে হলে মাঠের ধারের ডোবাতে গিয়ে ধুতে হবে।

তারিণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, ছোটলোক হয়ে তোর এতবড় মুখ? তুই বলিস মেয়েরা মাঠে যাবে কাপড় ধুতে? একলা আমার বাড়িতেই বিপদ ঢোকেনি রে, তোর বাড়িতেও ঢুকবে।

বৃন্দাবন তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে জবাব দিল, আমি মেয়েদের যেতে বলিনি। আপনার ঘরে যখন দাসী-চাকর নেই, তখন মানুষ হ'ন ত নিজে গিয়ে ধুয়ে আনুন। আপনি এখন শোকে কাতর, আপনাকে শক্ত কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়—কিন্তু হাজার অভি-সম্পাত দিলেও আমি পুকুরের জল নষ্ট করতে দেব না। বলিয়া আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে ঘোষাল মহাশয় আসিয়া সদরে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। ইনি তারিণীর আত্মীয়, বৃন্দাবন বাহিরে আসিতেই বলিলেন, হাঁ, বাপু বৃন্দাবন, তোমাকে সবাই সৎ ছেলে বলেই জানে, একি ব্যবহার তোমার? ব্রাহ্মণ পুত্রশোকে মারা যাচ্চে, তার ওপর তুমি তাদের পুকুর বন্ধ করে দিয়েচ নাকি?

বৃন্দাবন কহিল, ময়লা কাপড় ধোয়া বন্ধ করেচি, জল তোলা বন্ধ করিনি।

ভাল করনি বাপু। আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি, তোমার মান্য রেখে ঘাটের ওপর না ধুয়ে একটু তফাতে ধোবে।

বৃন্দাবন জবাব দিল, এই পুকুরটি মাত্র সমস্ত গ্রামের সম্বল. কিছুতেই আমি এমন দুঃসময়ে এর জল নষ্ট হতে দেব না।

বিজ্ঞ ঘোষাল মহাশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, এ তোমার অন্যায় জিদ বৃন্দাবন। শাস্ত্রমতে প্রতিষ্ঠা-করা পুষ্করিণীর জল কিছুতেই অপবিত্র বা কলুষিত হয় না। দু'পাতা ইংরিজী পড়ে শাস্ত্র বিশ্বাস না করলে চলবে কেন বাপু?

বৃন্দাবন এক কথা একশবার বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিরক্ত হইয়া বলিল, শাস্ত্র আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আপনাদের মন-গড়া শাস্ত্র মানিনে। যা বলেছি তাই হবে, আমি ওর জলে ময়লা ধুতে দেব না। আর কেউ মলে ও-সব পুড়িয়ে ফেলত, কিন্তু আপনারা যখন সে মায়া ত্যাগ করতে পারবেন না, তখন মাঠের ডোবা থেকে পরিষ্কার করে আনুন, আমার পুকুরে ও-সব চলবে না, বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

শাস্ত্রজ্ঞানী ঘোষাল মহাশয় বৃন্দাবনের সর্বনাশ কামনা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু বৃন্দাবন ঠিক জানিত. এইখানে ইহার শেষ নয়, তাই সে একটা লোককে পুষ্করিণীর জল পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। লোকটা সমস্তদিনের পর রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া সংবাদ দিল. পুকুরের জলে কাপড় কাচা হইতেছে এবং তারিণী মুখুয্যে কিছুতেই নিষেধ শুনিতেছেন না। বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া দেখিল, তারিণীর বিধবা কন্যা বালিশের অড়, বিছানার চাদর, ছোট-বড় অনেকগুলি বস্ত্রখণ্ড জলে কাচিয়া জলের উপরেই সেগুলি নিঙড়াইয়া লইতেছে. তারিণী নিজে দাঁড়াইয়া আছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন সকালেই বৃন্দাবন জননীর নির্দেশমত চরণকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর মায়ের কাছে যাবি রে চরণ?

চরণ নাচিয়া উঠিল—যাব বাবা।

বৃন্দাবন মনে মনে একটু আঘাত পাইয়া বলিল, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোকে অনেকদিন থাকতে হবে। আমাকে ছেড়ে পারবি থাকতে?

চরণ তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, পারব।

বস্তুতঃ এ-দিকের সুক্ষ্ম বাঁধাধরা আঁটাআঁটির মধ্যে তাহার শিশুপ্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বাহিরে ছুটাছুটি করিতে পায় না, পাঠশালা বন্ধ, সঙ্গী-সাথীদের মুখ দেখিতে পর্যন্ত পায় না, দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হয়, চারিদিকেই কিরকম একটা থমথমে ভাব. ভাল করিয়া কোন কথা বুঝিতে না পারিলেও

ভিতরে ভিতরে সে বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ও-দিকে মায়ের অগাধ স্নেহ, অবাধ স্বাধীনতা—স্নান, আহার, খেলা কিছুতে নিষেধ নাই, হাজার দোষ করিলেও হাসিমুখে সস্নেহের অনুযোগ ভিন্ন, কাহারও ভ্রূকুটি সহিতে হয় না—সে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য ছটফট করিতে লাগিল।

তবে যা, বলিয়া বৃন্দাবন নিজের হাতে একটি ছোট টিনের বাক্স জামায়-কাপড়ে পরিপূর্ণ করিয়া এবং তাহাতে কিছু টাকা রাখিয়া দিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিল এবং সজল-চক্ষে ছেলের মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে তার মায়ের কাছে পাঠাইয়া দিয়া, দুঃখের ভিতরেও একটা সুগভীর স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। যে ভৃত্য সঙ্গে গেল, পুত্রের উপর অনুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য বারংবার উপদেশ করিল এবং প্রত্যহ না হোক, একদিন অন্তরও সংবাদ জানাইয়া যাইবার জন্য আদেশ দিল। মনে মনে বলিল, আর কখন যদি দেখতেও না পাই, সেও ভাল, কিন্তু এ বিপদের মধ্যে আর রাখিতে পারি না।

গাড়ি যতক্ষণ দেখা গেল, একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ভিতরে ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া হঠাৎ সেদিনের কথা স্মরণ করিয়াই তাহার ভয় হইল, পাছে কুসুম রাগ করে। মনে মনে বলিল, না, কাজটা ঠিক হ'ল না। অত বড় একজিদী রাগী মানুষকে ভরসা হয় না। নিজে সঙ্গে না গেলে হয়ত উলটো বুঝে একেবারে অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠবে। একখানা চাদর কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে হাঁটিয়া অবিলম্বে গাড়ির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ছেলের পাশে উঠিয়া বসিল।

কুঞ্জনাথের বাটীর সম্মুখে আসিয়া, বাহির-বাটীর চেহারা দেখিয়া বৃন্দাবন আশ্চর্য হইয়া গেল। চারিদিক অপরিচ্ছন্ন—যেন বহুদিন এখানে কেহ বাস করে নাই। দোর খোলা ছিল, ছেলেকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াও দেখিল—সেই ভাব।

সাড়া পাইয়া কুসুম ঘর হইতে 'দাদা' বলিয়া বাহিরে আসিয়াই অকস্মাৎ ইহাদিগকে দেখিয়া ঈর্ষায় অভিমানে জ্বলিয়া উঠিয়া, চক্ষের নিমিষে পিছাইয়া ঘরে ঢুকিল। চরণ পূর্বের মত মহোল্লাসে চেঁচামেচি করিয়া ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিল। কুসুম তাহাকে কোলে লইয়া মাথায় রীতিমত আঁচল টানিয়া দিয়া মিনিট-পাঁচেক পরে দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল।

বৃন্দাবন জিজ্ঞাসা করিল, কুঞ্জদা কৈ?

কি জানি, কোথায় বেড়াতে গেছেন।

বৃন্দাবন কহিল, দেখে মনে হয় এ যেন পোড়ো-বাড়ি। এতদিন তোমরা কি এখানে ছিলে না?

না।

কোথায় ছিলে?

মাস-খানেক পূর্বে কুসুম দাদার শাশুড়ীর সঙ্গে পশ্চিমে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, কাল সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিয়াছে।

সে কথা না বলিয়া তাচ্ছিল্যভাবে জবাব দিল, এখানে সেখানে নানা জায়গায় ছিলুম।

অন্যবারে কুসুম সর্বাগ্রে বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছে, এবার তাহা দিল না দেখিয়া বৃন্দাবন নিজেই বলিল, দাঁড়িয়ে রয়েচি, একটা বসবার জায়গা দাও।

কুসুম তেমনি অবজ্ঞাভরে বলিল, কি জানি, কোথায় আসন-টাসন আছে, বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক পা নড়িল না।

বৃন্দাবন প্রস্তুত হইয়া আসিলেও এতবড় অবহেলা তাহাকে সজোরে আঘাত করিল। কিন্তু সেদিনের উত্তেজনাবশতঃ কলহ করিয়া ফেলার হীনতা তাহার মনে ছিল না, তাই সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া, নম্রস্বরে বলিল, আমি বেশীক্ষণ তোমাকে বিরক্ত করব না। যেজন্য এসেছি, বলি। আমাদের ওখানে ভারী ব্যারাম হচ্চে, তাই চরণকে তোমার কাছে রেখে যাব।

কুসুম এতদিন এখানে ছিল না বলিয়াই ব্যারাম-স্যারামের অর্থ বুঝিল না, তীব্র অভিমানে প্রজ্বলিত হইয়া বলিল, ওঃ—তাই দয়া করে নিয়ে এসেচ? কিন্তু অসুখ-বিসুখ নেই কোন্ দেশে? আমিই বা পরের ছেলের দায় ঘাড়ে করব কি সাহসে?

বৃন্দাবন শান্তভাবে কহিল, আমি যে সাহসে করি, ঠিক সেই সাহসে। তা'ছাড়া তোমাকেই বোধ করি, ও সবচেয়ে ভালবাসে।

কুসুম কি একটা বলিতে যাইতেছিল, চরণ হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, মা, বাবা বলেচে, আমি তোমার কাছে থাকব—নাইতে যাবে না, মা?

কুসুম প্রত্যুত্তরে বৃন্দাবনকে শুনাইয়া কহিল, আমার কাছে তোমার থেকে কাজ নেই চরণ, তোমার নতুন মা এলে তার কাছে থেকো।

বৃন্দাবন অতিশয় ম্লান একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাও শুনেচ। আচ্ছা, বলচি তা' হলে। মা একা আর পেরে ওঠেন না বলেই একবার ও-কথা উঠেছিল, কিন্তু তখনি থেমে গেছে।

থামল কেন?

তার বিশেষ কারণ আছে, কিন্তু সে-কথায় আর কাজ নেই।—চরণ, আয় রে, আমরা যাই—বেলা বাড়চে।

চরণ অনুনয় করিয়া কহিল, বাবা, কাল যাব।

বৃন্দাবন চুপ করিয়া রহিল। কুসুমও কথা না কহিয়া চরণকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। মিনিট-দুই পরে বৃন্দাবন গম্ভীরস্বরে ডাক দিয়া বলিল, আর দেরি করিস্ নে রে, আয়, বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

চরণ বড় আদরের সন্তান হইলেও গুরুজনদের আদেশ পালন করিতে শিখিয়াছিল, তথাপি সে মায়ের মুখের দিকে সতৃষ্ণ চোখ দুটি তুলিয়া শেষে ক্ষুব্ধমুখে নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

গাড়োয়ান গরু দুটাকে জল খাওয়াইয়া আনিতে গিয়াছিল, পিতাপুত্র অপেক্ষা করিয়া পথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। এইবার কুসুম সরিয়া আসিয়া সদর দরজার ফাঁক দিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। তাহার সে লাবণ্য নাই, চোখমুখের ভাব অতিশয় কৃশ ও পাণ্ডুর; হঠাৎ সে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া আড়ালে থাকিয়াই ডাকিল, একবার শোনো।

বৃন্দাবন কাছে আসিয়া কহিল, কি?

তোমার কি এর মধ্যে অসুখ করেছিল?

না।

তবে, এমন কেন?

তা ত' বলতে পারিনে। বোধ করি ভাবনায় চিন্তায় শুকনো দেখাচ্চে।

ভাবনা চিন্তা! স্বামীর শীর্ণমুখের পানে চাহিয়া তাহার জ্বালাটা নরম হইয়া আসিয়াছিল, শেষ কথায় পুনর্বার জ্বলিয়া উঠিল। শ্লেষ করিয়া কহিল, তোমার ত ষোলো-আনাই সুখের! ভাবনা-চিন্তা কি শুনি?

বৃন্দাবন ইহার জবাব দিল না। গাড়ি প্রস্তুত হইলে, চরণ উঠিতে গেলে বৃন্দাবন কহিল, তোর মাকে প্রণাম করে এলিনে রে?

সে নামিয়া আসিয়া দ্বারের বাহিরে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিল, কুসুম ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলে ছুটিয়া পালাইয়া গেল। সব কথা না বুঝিলেও এ কথাটা সে বুঝিয়াছিল, মাতা তাহাকে আজ আদর করে নাই, এবং সে থাকিতে আসিয়াছিল, তাহাকে রাখে নাই।

বৃন্দাবন আরও একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া কহিল, কে জানে, যদি আর কখন না বলতে পাই, তাই আজই কথাটা বলে যাই! আজ রাগের মাথায় তোমার চরণকে তুমি ঠাঁই দিলে না, কিন্তু, আমার অবর্তমানে দিয়ো।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া উঠিল—ও-সব আমি শুনতে চাইনে।

তবু শোনো। আজ তোমার হাতেই তাকে দিতে এসেছিলুম।

আমাকে তোমার বিশ্বাস কি?

বৃন্দাবনের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, বলিল, তবু সেই রাগের কথা! কুসুম, শুনি তুমি অনেক শিখেচ, কিন্তু মেয়েমানুষ হয়ে ক্ষমা করতে শেখাই যে সবচেয়ে বড়-শেখা এটা

কেন শেখোনি! কিন্তু তুমি চরণের মা, এই আমার বিশ্বাস। ছেলেকে মা-বাপের হাতে দিয়ে বিশ্বাস না হলে কার হাতে হয় বল?

কুসুম হঠাৎ এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

গরু দুটা বাড়ি ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, চরণ ডাকিল, বাবা, এসো না!

কুসুম কিছু বলিবার পূর্বেই বৃন্দাবন 'যাই' বলিয়া গাড়িতে গিয়া উঠিল।

কুসুম সেইখানে বসিয়া পড়িয়া মহা অভিমান-ভরে তাহার পরলোকগতা জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, মা হইয়া এ কি অসহ্য শত্রুতা সন্তানের প্রতি সাধিয়া গিয়াছ মা! যদি, যথার্থই আমার অজ্ঞানে কলঙ্কে আমাকে ডুবাইয়া গিয়াছ, যদি সত্যিই নিজের ঘৃণিত দর্পের পায়ে আমাকে বলি দিয়াছ, তবে সে-কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যাও নাই কেন? কার ভয়ে সমস্ত চিহ্ন এমন করিয়া মুছিয়া দিয়া গেলে? আমার অন্তর্যামী যাহাদিগকে স্বামী-পুত্র বলিয়া চিনিয়াছে, সমস্ত জগতের সুমুখে সেকথা সপ্রমাণ করিবার রেখামাত্র পথ অবশিষ্ট রাখ নাই কেন? আজ তাহা হইলে কে আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিত, কোন্ নির্লজ্জ স্বামী, স্ত্রীকে অনাথিনীর মত নিজের আশ্রয়ে প্রবেশ করিবার উপদেশ দিতে সাহস করিত? কিংবা সত্যই যদি আমি বিধবা, তাই বা নিঃসংশয়ে জানিতে পাই না কেন? তখন কার সাধ্য বিধবার সম্মুখে রূপের লোভে বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গ তুলিতে সাহস করিত?

একস্থানে একভাবে বসিয়া বহুক্ষণ কাঁদিয়া কুসুম আকাশের পানে চোখ তুলিয়া হাত-জোড় করিয়া বলিল, ভগবান, আমার যা হোক একটা উপায় করে দাও। হয় মাথা তুলিয়া সগর্বে স্বামীর ঘরে যাইতে দাও, না হয় ছেলেবেলার সেই নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন দিনগুলি ফিরাইয়া দাও, আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বামী আবার বিবাহ করিতেছেন, সেদিন দাদার মুখে এই সংবাদ শুনিবার পরে, কি করি, কোথায় পালাই, এমনি যখন তাহার মানসিক অবস্থা, সেই সময়েই দাদার শাশুড়ীর সংগে তীর্থে যাইবার প্রস্তাবে সে বিনাবাক্যব্যয়ে যাইতে সম্মত হইয়াছিল। কুঞ্জর শাশুড়ী কুসুমকে নিতান্তই দাসীর মত সংগে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং সেই মত ব্যবহারও করিয়াছিলেন। কিন্তু এসব ছোটোখাটো বিষয়ে মনোনিবেশ করিবার সামর্থ্য কুসুমের ছিল না, নলডাঙ্গায় ফিরিয়া যখন সে বাড়ি আসিতে চাইল, এবং তিনি সাপের মত গর্জন করিয়া বলিলেন, ক্ষ্যাপার মত কথা ব'লো না বাছা। আমাদের বড়লোকদের শত্তুর পদে পদে—তুমি সোমত্ত মেয়ে, সেখানে একলা পড়ে থাকলে, আমরা সমাজে মুখ দেখাতে পারব না। তখনও কুসুম প্রতিবাদ করে নাই।

তিনি ক্ষণেক পরে কহিলেন, ইচ্ছে হয়, দাদার সংগে যাও, ঘরদোর দেখে দাদার সংগেই ফিরে এসো। একলা তোমার কিছুতেই থাকা হবে না, তা বলে দিচ্ছি।

কুসুম তাহাতেই রাজী হইয়া কাল সন্ধ্যায় ঘরদোর দেখিতে আসিয়াছিল।

আজ চরণ প্রভৃতি চলিয়া যাইবার ঘণ্টা-দুই পরে কুঞ্জনাথ জমিদারি চালে সারা গ্রামটা ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল, স্নানাহার করিয়া নিদ্রা দিল এবং বেলা পড়িলে বোনকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার আয়োজন করিল। কুসুম ঘরদোরে চাবি দিয়া নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়া বসিল। সে জানিত, দাদা ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন নয়, তাই, সকালের কোন কথা প্রকাশ করিল না।

কুঞ্জর স্ত্রীর নাম ব্রজেশ্বরী। সে যেমন মুখরা, তেমনি কলহপটু। বয়স এখনও পনর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু তাহার কথার বাঁধুনি ও বিষের জ্বলনে তাহার মাকেও হার মানিয়া চোখের জল ফেলিতে হইত।

এই ব্রজেশ্বরী কুসুমকে কি জানি কেন, চোখের দেখামাত্রই ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। বলা বাহুল্য, মা তাহাতে খুশী হন নাই, এবং মেয়ের চোখের আড়ালে টিপিয়া টিপিয়া তাহাকে যা-তা বলিতে লাগিলেন।

বাড়ির সম্মুখেই পুষ্করিণী, তিন-চার দিন পরে, একদিন সকালে সে কতকগুলো বাসন লইয়া ধুইয়া আনিতে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী ঘর হইতে বাহির হইয়াই সুতীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, হাঁ ঠাকুরঝি, মা তোমাকে ক'টাকা মাইনে দেবে বলে এনেচে গা?

মা অদূরে ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, মেয়ের তীব্র শ্লেষাত্মক প্রশ্ন শুনিয়া বিস্ময়ে ক্রোধে গর্জিয়া উঠিলেন, এ তোর কি রকম কথার ছিরি লা? মানুষ আপনার জনকে কি মাইনে দিয়ে ঘরে আনে?

মেয়ে উত্তর দিল, আপনার জন আমার, তোমার এ কে যে, দুঃখী মানুষকে দিয়ে দাসীবৃত্তি করিয়ে নেবে, মাইনে দেবে না?

প্রত্যুত্তরে মা দ্রুতপদে কাছে আসিয়া কুসুমের হাত হইতে বাসনগুলো একটানে ছিনাইয়া লইয়া নিজেই পুকুরে চলিয়া গেলেন।

কুসুম হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, ব্রজেশ্বরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া তা যাক বলিয়াই ঘরে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুই-তিন দিন তিনি কুসুমকে লক্ষ্য করিয়া বেশ রাগ-ঝাল করিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ একদিন তাঁহার ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিয়া ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য হইল।

কাল রাত্রে শরীর ভাল নাই বলিয়া কুসুম খায় নাই, আজ সকালেই গৃহিণী স্নানাহ্নিক করিয়া খাইয়া লইবার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, মা ভোল ফেরালেন কেন, তাই ভাবচি ঠাকুরঝি!

কুসুম চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু মেয়ে মাকে বেশ চিনিত, তাই দু'দিনেই এই অকস্মাৎ পরিবর্তনের কারণ সন্দেহ করিয়া মনে মনে আগুন হইয়া উঠিল।

গোবর্ধন বলিয়া গৃহিণীর এক বোনপো ছিল, সে অপরিমিত তাড়ি ও গাঁজা-গুলি খাইয়া চেহারাটা এমন করিয়া রাখিয়াছিল যে, বয়স প'য়ত্রিশ কি প'য়ষট্টি, তাহা ধরিবার জো ছিল না। কেহ মেয়ে দেয় নাই বলিয়া এখনো অবিবাহিত। বাড়ি ও-পাড়ায়, পূর্বে কদাচিৎ দেখা মিলিত, কিন্তু সম্প্রতি কোন্ অজ্ঞাত কারণে মাসীমায়ের প্রতি তাহার ভক্তি-ভালবাসা এতই বড় হইয়া উঠিল যে প্রত্যহ যখন তখন 'মাসীমা' বলিয়া হাজির হইয়া, তাহার ঘরে বসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা ও আদেশ-উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল।

আজ অপরাহ্নে ব্রজেশ্বরী কুসুমকে লইয়া পুকুরে গা ধুইতে গিয়াছিল। জলে নামিয়া, ঘাটের অদূরে একটা ঘন কামিনী-ঝাড়ের প্রতি হঠাৎ নজর পড়ায় দেখিল, তাহার আড়ালে দাঁড়াইয়া গোবর্ধন একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তখন আর কিছু না বলিয়া, কোনমতে কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, সে উঠানের উপর দাঁড়াইয়া মাসীর সহিত কথা কহিতেছে। কুসুম আকণ্ঠ ঘোমটা টানিয়া দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া ঘরে চলিয়া গেলে, ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা গোবর্ধন দাদা, আগে কোনকালে তোমাকে ত দেখতে পেতাম না, আজকাল হঠাৎ এমন সদয় হয়ে উঠেচ কেন বল ত? বাড়ির ভেতরে আসা-যাওয়াটা একটু কম করে ফ্যালো।

গোবর্ধন জানিত না সে তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু এই প্রশ্নের ভাবে উৎকণ্ঠায় শশব্যস্ত হইয়া উঠিল—জবাব দিতে পারিল না।

কিন্তু মা অগ্নিমূর্তি হইয়া চোখ রাঙ্গা করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, আগে ওর ইচ্ছে হয়নি, তাই আসেনি, এখন ইচ্ছে হয়েচে আসচে। তোর কি?

মেয়ে রাগ করিল না, স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিল, এই ইচ্ছেটাই আমি পছন্দ করিনে। আমার নিজের জন্যও তত বলিনে মা, কিন্তু আমার ননদ রয়েচে, পরের মেয়ে, তা ত মনে রাখতে হবে।

মা সপ্তমে চড়িয়া উত্তর করিলেন, পরের মেয়ের জন্য কি আমার আপনার বোনপো ভাইপোরা পর হয়ে যাবে, না বাড়ি ঢুকবে না? তা ছাড়া এই পরের মেয়েটি কি পর্দার

বিবি, না কারুর সামনে বার হন না? ওলো, ও যেমন করে বার হতে জানে, তা দেখলে আমাদের বুড়ো মাগীদের পর্যন্ত লজ্জা হয়।

ব্রজেশ্বরী বুঝিল, মা কি ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাই সে থামিয়া গেল। তাহার মনে পড়িল, এই কুসুমেরই কত কথা, কত ভাবে, কত ছাঁদে, সে দু'দিন আগে মায়ের সহিত আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু তখন আলাদা কথা ছিল, এখন সম্পূর্ণ আলাদা কথা দাঁড়াইয়াছে। তখন কুসুমকে সে ভালবাসে নাই এখন বাসিয়াছে। এবং এ ধরনের ভালবাসা ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতীত দেওয়াও যায় না, পাওয়াও যায় না।

ব্রজেশ্বরী যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া গোবর্ধনের মুখের পানে তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, গোবর্ধন দাদা, ভারী লজ্জার কথা ভাই, মুখ ফুটে বলতে পারলুম না, কিন্তু আমি দেখেচি। দাদার মত আসতে পার ত এসো, না হলে তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে—সে দুঃখ মাও ঠেকাতে পারবে না, তা বলে দিচ্চি। বলিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

মা কহিলেন, কি হয়েচে রে গোবর্ধন?

গোবর্ধন মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, তোমার দিব্যি মাসী, আমি জানিনে—কোন্ শালা ঝোপের ভিতর—মাইরি বলচি—একটা দাঁতন ভাঙতে—জিজ্ঞেস করবে চল ময়রাদের দোকানে—আসুক ও আমার সঙ্গে ও-পাড়ায়, ভজিয়ে দিচ্চি—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গোবর্ধন সরিয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বরী কাপড় ছাড়িয়া কুসুমের ঘরে গিয়া দেখিল, তখনও সে ভিজা কাপড়ে স্তব্ধ হইয়া জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাহির দিকে চাহিয়া আছে। পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কেন বৌ, আমার কথায় তুমি কথা কইতে গেলে? আমাকে কি তুমি এখানেও টিঁকতে দেবে না?

আগে কাপড় ছাড়, তারপর বলচি, বলিয়া সে জোর করিয়া তাহার আর্দ্র বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া দিয়া কহিল, অন্যায় আমি কোনমতেই সইতে পারিনে ঠাকুরঝি, তা তোমার জন্যই হোক, আর আমার জন্যই হোক। ও হতভাগাকে আমি বাড়ি ঢুকতে দেব না—ওর মতলব আমি টের পেয়েছি।

জননীর কথাটা সে লজ্জায় উচ্চারণ করিতে পারিল না।

কুসুম কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মতলব যার যাই থাক বৌদি, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার কথা নিয়ে কথা কয়ে আর আমাকে বিপদে ফেলো না।

কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে বিপদ হবে কেন?

কুসুম প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, হবেই। চোখে দেখচি হবে, কপালে সজোর আঘাত করিয়া কহিল, এই হতভাগা কপালকে যেখানে নিয়ে যাব, সেইখানেই বিপদ সঙ্গে সঙ্গে যাবে। বোধ করি, স্বয়ং ভগবানও আমাকে রক্ষা করতে পারেন না! বলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বোধ করি নিতান্ত মিথ্যে বলনি। রাগ করো না ভাই, কিন্তু শুধু কপালের দোষ দিলে হবে কেন? তোমার নিজেরও দোষ কম নয় ঠাকুরঝি!

কুসুম তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার নিজের দোষ কি? আমার ছেলেবেলার ঘটনা সব শুনেচ ত?

শুনেচি। কিন্তু সে আগাগোড়া মিথ্যে। সমস্ত জেনে শুনে এস্ত্রী মানুষ তুমি—সিঁদুর পর না, নোয়া হাতে রাখ না, স্বামীর ঘর কর না, এ কপালের দোষ, না তোমার নিজের দোষ ভাই? তখন না হয় জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না, এখন হয়েচে ত? তুমি বল, কোন্ সধবা কবে বিধবার বেশে থাকে?

সমস্তই জানি বৌ, কিন্তু আমি সিঁদুর-নোয়া পরে থাকলেই ত লোকে শুনবে না। কে আমার স্বামী? কে তার সাক্ষী? তিনিই বা আমাকে শুধু শুধু ঘরে নেবেন কেন?

ব্রজেশ্বরী বিস্ময়ে অবাক হইয়া গিয়া বলিল, সে কি কথা ঠাকুরঝি? এর চেয়ে বেশী প্রমাণ কবে কোন্ জিনিসের হয়ে থাকে? তুমি কি কিছুই শোননি, ঐ কথা নিয়ে কি কাণ্ড নন্দজ্যাঠার সঙ্গে এই বাড়িতেই হয়ে গেল? একটুখানি চুপ করিয়া পরক্ষণেই বলিয়া

উঠিল, কেন, তোমার দাদা ত সমস্ত জানেন, তিনি বলেন নি? আমি মনে করেচি, তুমি সমস্ত জেনেশুনেই এখানে এসেচ, তাই পাছে রাগ কর, মনে দুঃখ পাও, সেইজন্যে কোন কথা বলিনি, চুপ করেই আছি। বরং, তুমি এসেচ বলে প্রথম দিন তোমার উপর আমার রাগ পর্যন্ত হয়েছিল।

কুসুম উদ্বেগে অধীর হইয়া বলিল, আমি কিছু শুনিনি বৌ, কি হয়েছিল বল।

ব্রজেশ্বরী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বেশ! যেমন ভাই, তেমনি বোন। ঠাকুরজামাইয়ের সঙ্গে নন্দজ্যাঠার মেয়ের যখন সম্বন্ধ হয়, তখন তোমরা পশ্চিমে ছিলে, তখন তোমার দাদাই অত হাঙ্গামা বাধালে, আর শেষে সে-ই চুপ করে আছে! আমার শাশুড়ীর কথা, তোমাদের কথা, ওদের কথা, সমস্তই উঠে—তখন নন্দজ্যাঠা অস্বীকার করেন, পাছে তাঁর মেয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। তারপরে ঠাকুরবাড়ির বড়-বাবাজীকে ডেকে আনা হয়, তিনি মীমাংসা করে দেন, সমস্ত মিথ্যে। কারণ একে ত তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর অনুমতি না নিয়ে আমাদের সমাজে এ-সকল কাজ হতেই পারে না, তা ছাড়া তিনি নন্দজ্যাঠাকে হুকুম দেন, যে এ কাজ করিয়েছিল তাকে হাজির করিয়ে দিতে। তখনই তাঁকে স্বীকার করতে হয় কণ্ঠীবদলের কথা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু হয়নি।

কুসুম আশঙ্কায় নিশ্বাস রোধ করিয়া বলিয়া উঠিল, হয়নি? বৌ, আমি মনে মনে জানতুম। কিন্তু আমার কথাই বা এত উঠল কেন?

ব্রজেশ্বরী হাসিয়া বলিল, তোমার দাদার একটুখানি বাইয়ের ছিট আছে কিনা, তাই। অপর কেউ হয়ত চক্ষুলজ্জাতেও এত গণ্ডগোল করতে চাইত না, কিন্তু ওঁর ত সে বালাই নেই, তাই চতুর্দিকে তোলপাড় করতে লাগলেন, আমার বোনের যখন কোন দোষ নেই, মা যখন সত্যিই তার কণ্ঠীবদল দেননি, তখন কেন ঠাকুরজামাই তাকে নিয়ে ঘর করবে না, কেন আবার বিয়ে করবে, আর কেনই বা নন্দজ্যাঠা তাকে মেয়ে দেবে!

কুসুম লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া বলিল, ছি ছি, তার পরে?

ব্রজেশ্বরী কহিল, তার পরে আর বেশী কিছু নেই। আমার শাশুড়ীঠাকরুন আর নন্দজ্যাঠাইমা এক গাঁয়ের মেয়ে, রাগে-দুঃখে, লজ্জায়-অভিমানে তোমাকে নিয়ে এইখানেই আসেন, তাঁর ছেলের সঙ্গেই কথা হয়—কিন্তু হতে পায়নি। আচ্ছা ঠাকুরঝি, ঠাকুরজামাই নিজেও ত সব কথা শুনে গেছেন, তিনিও কি কোন ছলে জানান নি? আগে শুনেছিলুম, তোমার জন্যে তিনি নাকি—

কুসুম মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, বৌ, সেদিন হয়ত তিনি তাই বলতেই এসেছিলেন।

ব্রজেশ্বরী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ দিন? সম্প্রতি এসেছিলেন?

হাঁ, আমরা যেদিন এখানে আসি সেদিন সকালে।

তার পরে?

আমার দুর্ব্যবহারে না বলেই ফিরে যান।

ব্রজেশ্বরী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, কি করেছিলে? কুঞ্জে ঢুকতে দাওনি, না কথা কওনি?

কুসুম জবাব দিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

ব্রজেশ্বরীও আর কোন প্রশ্ন করিল না। সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছিল, চারিদিকে শাঁখের শব্দে সে চকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি একটু ব'সো ভাই, আমি সন্ধ্যা দিয়ে একটা প্রদীপ জেলে আনি, বলিয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কুসুম সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। প্রদীপ যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া কুসুমের পাশে আসিয়া বসিল এবং তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, সত্যই কাজটা ভাল করনি দিদি। অবশ্য কি করেছিলে, তা আমি জানিনে, কিন্তু মনে যখন জানো তিনি কে, আর তুমি কে, তখন তাঁর অনুমতি ভিন্ন তোমার কোথাও যাওয়া উচিত হয়নি।

কুসুম মুখ তুলিল না, চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী কহিল, তোমাদেরই কথা তোমারই মুখ থেকে যতদূর শুনেচি, আমার তেমন

অবস্থা হলে, পায়ে হে'টে যাওয়া কি ঠাকুরঝি, যদি হুকুম দিতেন, সারা পথ নাকখত দিয়ে যেতে হবে, আমি তাই যেতুম!

কুসুম পূর্ববৎ থাকিয়াই এবার অস্ফুটে বলিল, বৌ, মুখে বলা যায় বটে, কিন্তু কাজে করা শক্ত।

কিছু না। গেলে স্বামী পাবো, ছেলে পাবো, তাঁর ভাত খেতে পাবো, এত পাওয়ার কাছে মেয়েমানুষের শক্ত কাজ কি দিদি? তাও যদি না পাই, তবু ফিরে আসতুম না—তাড়িয়ে দিলেও না। গায়ে ত আর হাত দিতে পারতেন না, তবে আর ভয়টা কি? বড়জোর বলতেন, তুমি যাও; আমিও বলতুম, তুমি যাও—জোর করে থাকলে কি করতেন তিনি?

তাহার কথা শুনিয়া এত দুঃখেও কুসুম হাসিয়া ফেলিল।

ব্রজেশ্বরী কিন্তু এ হাসিতে যোগ দিল না—সে নিজের মনের কথাই বলিতেছিল, হাসাইবার জন্য, সান্ত্বনা দিবার জন্য বলে নাই। অধিকতর গম্ভীর হইয়া কহিল, সত্যি বলচি ঠাকুরঝি, কারো মানা শুনো না—যাও তাঁর কাছে। এমন বিপদের দিনে স্বামী-পুত্রকে একা ফেলে রেখো না।

ব্রজেশ্বরীর এই আকস্মিক কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে কুসুম সব ভুলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, বিপদের দিন কেন?

ব্রজেশ্বরী বলিল, বিপদের দিন বৈ কি! অবশ্য, তাঁরা ভাল আছেন, কিন্তু বাড়লে সেই যে ওলাউঠা শুরু হয়েছিল, তোমার দাদা এখনি বললেন, এখন নাকি ভয়ানক বেড়েছে—প্রত্যহ দশজন বারজন করে মারা পড়চে—ছি ছি, ওকি কর—পায়ে হাত দিয়ো না ঠাকুরঝি।

কুসুম তাহার দুই-পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—বৌদি, আমার চরণকে তিনি দিতে এসেছিলেন, আমি নিইনি—আমি কিছু শুনিনি বৌদি—

ব্রজেশ্বরী বাধা দিয়া বলিল, বেশ, এখন শুনলে ত! এখন গিয়ে তাকে নাও গে!

কি করে যাবো?

ব্রজেশ্বরী কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ পিছনে শব্দ শুনিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, দোর ঠেলিয়া চৌকাঠের ও-দিকে মা দাঁড়াইয়া আছেন। চোখাচোখি হইতেই তীব্র শ্লেষের সহিত বলিলেন, ঠাকুরঝি-ঠাকরুনকে কি পরামর্শ দেওয়া হচ্চে শুনি?

ব্রজেশ্বরী স্বাভাবিকস্বরে কহিল, বেশ ত মা, ভেতরে এসো বলচি। তোমার কিন্তু কোন ভয়ের কারণ নেই মা, আপনার লোককে কেউ খারাপ মতলব দেয় না, আমিও দিচ্চিনে।

মা বহুক্ষণ হইতেই অন্তরে পুড়িয়া মরিতেছিলেন, জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, তার মানে আমি লোকজনকে কু-মতলব দিয়ে থাকি, না? তখনি জানি, ও কালামুখী যখন ঘরে ঢুকেচে, তখন এ বাড়িও ছারখার করবে। সাধে কি কুঞ্জনাথ ওকে দুটি চক্ষে দেখতে পারে না, এই স্বভাব-রীতির গুণে!

মেয়েও তেমনি শক্ত কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কুসুমের হাতের চিমটি খাইয়া থামিয়া বলিল, সেইজন্যেই কালামুখীকে বলছিলুম, যা শ্বশুরঘর কর্ গে যা, থাকিস নে এখানে।

শ্বশুরবাড়ির নামে মা তাম্বুলরঞ্জিত অধর প্রসারিত ও তিলকসেবিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, বলি কোন্ শ্বশুরঘরে ঠাকুরঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছিস লো? নন্দ বোষ্ট—

এবার ব্রজেশ্বরী ধমক দিয়া উঠিল—সমস্ত জেনে ন্যাকা সেজে খামকা মানুষকে অপমান করো না। শ্বশুরঘর মেয়েমানুষের দশ-বিশটা থাকে না যে, আজ নন্দ বোষ্টমের নাম করবে, কাল তোমার গোবর্ধনের বাপের নাম করবে, আর তাই চুপ করে শুনতে হবে।

মেয়ের নিষ্ঠুর স্পষ্ট ইঙ্গিতে মা বারুদের মত ফাটিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হতভাগী, মেয়ে হয়ে তুই মায়ের নামে এতবড় অপবাদ দিস্!

মেয়ে বলিল, অপবাদ হলেও বাঁচতুম মা, এ যে সত্যি কথা। মাইরি বলচি মা, তোমাদের মত দু-একটি বোষ্টম মেয়েদের গুণে আমার বরং হাড়ী মুচি বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু বোষ্টম বলতে মাথা কাটা যায়। থাক, চেঁচামেচি করো না, যদি অপবাদ দিয়েচি বলেই তোমার দুঃখ হয়ে থাকে, ঠাকুরঝিকে বাড়লে পাঠিয়ে, তার পরে তোমার যা মুখে আসে, তাই বলে আমাকে গাল দিয়ো; তোমার দিব্যি করে বলচি মা, কথাটি কব না।

মেয়ের সুতীক্ষ্ন শরের মুখে মা বুঝিলেন, যুদ্ধ এভাবে আর অধিকদূর অগ্রসর হইলে তাঁহারই পরাজয় হইবে, কণ্ঠস্বর নরম করিয়া বলিলেন, সেখানে পাঠিয়ে দিলেই বা তারা ঘরে নেবে কেন? তোর চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি ব্রজেশ্বরী, আর তারা ওর কেউ নয়, বৃন্দাবনের সঙ্গে কুসুমের কোন সম্পর্ক নেই। মিথ্যে আশা দিয়ে ওকে তুই নাচিয়ে বেড়াস নে, বলিয়া তিনি প্রত্যুত্তর না শুনিয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন।

কুসুম শুষ্ক পাণ্ডুর মুখখানি উঁচু করিতেই ব্রজেশ্বরী জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, মিথ্যে কথা বোন, মিথ্যে কথা। মা জেনেশুনে ইচ্ছে করে মিথ্যে কথা বলে গেলেন, আমি মেয়ে হয়ে তোমার কাছে স্বীকার করচি—আচ্ছা, এখনি আসচি আমি, বলিয়া কি ভাবিয়া ব্রজেশ্বরী দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

অবস্থা ভাল হইলে যে বুদ্ধিও ভাল হয়, কুঞ্জনাথ তাহা সপ্রমাণ করিল। পত্নী ও ভগিনীর সংযুক্ত অনুরোধ ও আবেদন তাহাকে কর্তব্যবিচলিত করিল না। সে মাথা নাড়িয়া বলিল, সে হতে পারে না। মা না বললে আমি চরণকে এখানে আনতে পারিনে।

ব্রজেশ্বরী কহিল, অন্ততঃ একবার গিয়ে দেখে এসো, তাঁরা কেমন আছেন।

কুঞ্জনাথ চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! দশ-বিশটা রোজ মরচে সেখানে।

তবে কোন লোক পাঠিয়ে দাও, খবর আনুক।

তা হতে পারে বটে। বলিয়া কুঞ্জ লোকের সন্ধানে বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে কুসুম স্নান করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, দাসী উঠান ঝাঁট দিতে দিতে বলিল, মা বারণ করলেন দিদিঠাকরুন, আজ আর রান্নাঘরে ঢুকো না।

কথাটা শুনিয়াই তাহার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া সভয়ে বলিল, কেন?

সে ত জানিনে দিদি, বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

ফিরিয়া আসিয়া কুসুম অনেকক্ষণ নিজের ঘরে বসিয়া রহিল। অন্যদিন এই সময়টুকুর মধ্যে কতবার ব্রজেশ্বরী আসে যায়, কিন্তু আজ তাহার দেখা নাই। বাহির হইয়া একবার খুঁজিয়াও আসিল, কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না।

সে মায়ের ঘরে লুকাইয়া বসিয়াছিল, কারণ এ-ঘরে কুসুম আসে না, তাহা সে জানিত। প্রত্যহ উভয়ে একত্রে আহার করিত, আজ সে-সময়ও যখন উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন উদ্বেগ, আশঙ্কা, সংশয় আর সহ্য করিতে না পারিয়া, সে আর-একবার ব্রজেশ্বরীর সন্ধানে বাহিরে আসিতেছিল, মা সুমুখে আসিয়া বলিলেন, আর দেরি করে কি হবে বাছা, যাও একটা ডুব দিয়ে এস, এ-বেলার মত যা হোক মুখে দাও—তোমার দাদা ঠাকুরবাড়িতে মত জানতে গেছে।

কুসুম মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে গেল, কিন্তু মুখের মধ্যে জিহ্বা কাঠের মত শক্ত হইয়া রহিল।

তখন মা নিজেই একটু করুণ সুরে বলিলেন, ব্যাটার বৌ যখন, তখন ব্যাটার মতই অশৌচ মানতে হবে। যাই হোক, মাগী দোষে গুণে ভালমানুষই ছিল। সেদিন আমার ব্রজেশ্বরীর সম্বন্ধ করতে এসে কত কথা! আজ ছ'দিন হয়ে গেল, বৃন্দাবনের মা মরেচে—তা সে যা হবার হয়েচে, এখন মহাপ্রভু ছেলেটিকে বাঁচিয়ে দিন। কি নাম বাছা তার? চরণ না? আহা! রাজপুত্তুর ছেলে, আজ সকালে তারও দু'বার ভেদবমি হয়েচে।

কুসুম মুখ তুলিল না, কথা কহিল না, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বেলা প্রায় তিনটা বাজে, ব্রজেশ্বরী এঘর-ওঘর খুঁজিয়া কোথাও কুসুমের সন্ধান না পাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুরঝিকে তোরা কেউ দেখেছিস রে?

না দিদি, সেই সকালে দেখেছিলুম।

পত্নীর কান্নার শব্দে কুঞ্জনাথ কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, সে কি কথা? কোথায় গেল তবে সে?

ব্রজেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, জানিনে, আমি ঘরদোর, পুকুর, বাগান সমস্ত খুঁজেচি, কোথাও দেখতে পাচ্চিনে।

চোখের জল ও পুকুরের উল্লেখে কুঞ্জ কাঁদিয়া উঠিল—তবে সে আর নেই। মার গঞ্জনা সইতে না পেরে নিশ্চয় সে ডুবে মরেচে, বলিয়া ছুটিয়া বাইরে যাইতেছিল, ব্রজেশ্বরী কোঁচার খুঁট ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, শোনো—অমন ক'রে যেয়ো না—

আমি কিছু শুনতে চাইনে, বলিয়া এক টান মারিয়া নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া কুঞ্জ পাগলের মত দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মিনিট-দশেক পরে মেয়েমানুষের মত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, মা আমার বোনকে মেরে ফেলেচে—আর আমি থাকব না, আর এ বাড়ি ঢুকব না—ওরে কুসুম রে—

তাহার শাশুড়ী কিছুই জানিতেন না, চীৎকারের শব্দে বাহিরে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন।

তাহাকে দেখিতে পাইয়াই কুঞ্জ সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া সজোরে মাথা খুঁড়িতে লাগিল—ওই রাক্ষুসীই আমার ছোটবোনটিকে খেয়েচে—ওরে কেন মরতে আমি এখানে এসেছিলুম রে—ওরে আমার কি হ'ল রে!

ব্রজেশ্বরী কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতেই সে তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিল—দূর হ—দূর হ! ছুঁসনি আমাকে।

ব্রজেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া এবার জোর করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, শুধু কাঁদলে আর চেঁচালেই কি বোনকে ফিরে পাবে? আমি বলচি সে কক্ষনো ডুবে মরেনি!

কুঞ্জ বিশ্বাস করিল না, একভাবেই কাঁদিতে লাগিল। এই বোনকে সে অনেক দুঃখ-কষ্টে মানুষ করিয়াছে এবং যথার্থই তাহাকে প্রাণতুল্য ভালবাসিত। পূর্বে অনেকবার কুসুম রাগ করিয়া জলে ডোবার ভয় দেখাইয়াছে—এখন তাহার সমস্ত বুক ভরিয়া কোথাকার খানিকটা জল এবং তাহার অভিমানিনী ছোটবোনটির মৃতদেহ ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ব্রজেশ্বরী সস্নেহে স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, তুমি স্থির হও—আমি নিশ্চয়ই বলচি, সে মরেনি।

কুঞ্জ সজলচক্ষে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

তাহার স্ত্রী, আর একবার ভাল করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া বলিল, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, ঠাকুরঝি লুকিয়ে বাড়লে চলে গেছেন।

কুঞ্জ অবিশ্বাস করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, সেখানে সে যাবে না। চরণকে ছাড়া তাদের কাউকে সে দেখতে পারত না।

ব্রজেশ্বরী কহিল, এটা তোমাদের পাহাড়-পর্বত ভুল! আমি যেমন তোমাকে ভালবাসি, সেও তার স্বামীকে তেমনি ভালবাসে। সে যাই হোক, চরণের জন্যও ত সে যেতে পারে!

কিন্তু সে ত বাড়লের পথ চেনে না?

সেইটাই শুধু আমার ভয়, পাছে ভুল ক'রে পৌঁছুতে দেরি হয়। কিংবা পথে আর কোন বিপদে পড়ে, নইলে বাড়ল সাত-সমুদ্র তের-নদীর পারে হলেও, সে একদিন না একদিন জিজ্ঞেস করতে করতে গিয়ে উপস্থিত হবে। আমার কথা শোনো, তুমিও সেই পথ ধরে যাও। যদি পথে দেখা পাও, সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে তার স্বামীর হাতে তাকে সঁপে দিয়ে ফিরে এসো।

চললুম, বলিয়া কুঞ্জ উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ তাহার চকচকে বিলাতি জুতা, বহুমূল্য রেশমের চাদর এবং গগনস্পর্শী বিরাট চাল শ্বশুরবাড়িতেই পড়িয়া রহিল। পোড়ারমুখী কুসীর শোকে, জমিদার কুঞ্জনাথবাবু ফেরিওয়ালা কুঞ্জ বোষ্টমের সাজে খালি পায়ে, খালি গায়ে পাগলের মত দ্রুতপদে পথে বাহির হইয়া গেল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ছয়দিন হইল বৃন্দাবনের জননী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মৃত্যুর পর কেহ কোনদিন এ অধিকার সুকৃতিবলে পাইয়া থাকিলে, তিনিও পাইয়াছেন তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

সেদিন তারিণী মুখুয্যের দুর্ব্যবহারে ও ঘোষাল মহাশয়ের শাস্ত্রজ্ঞান ও অভিসম্পাতে অতিশয় পীড়িত হইয়া বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে একটা আধুনিক ধরনের লোহার নলের কূপ প্রস্তুত করাইবার সংকল্প করে। যাহার জল কোন উপায়েই কেহ দূষিত করিতে পারিবে না এবং যৎসামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া আহরণ করিয়া লইয়া গেলে সমস্ত গ্রামবাসীর অভাব মোচন করিয়া দুঃসময়ে বহুপরিমাণে মারীভয় নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে, এমনি একটা বড়-রকমের কূপ, যত ব্যয়ই হোক, নির্মাণ করাইবার অভিপ্রায়ে সে কলিকাতার কোন বিখ্যাত কল-কারখানার ফারমে পত্র লিখিয়াছিল, কোম্পানী লোক পাঠাইয়াছিলেন, জননীর মৃত্যুর দিন সকালে তাহারই সহিত বৃন্দাবন কথাবার্তা ও চুক্তিপত্র সম্পূর্ণ করিতেছিল। বেলা প্রায় দশটা, দাসী ত্রস্তব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, দাদাবাবু, এত বেলা হয়ে গেল, মা কেন দোর খুলচেন না?

বৃন্দাবন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া প্রশ্ন করিল, মা কি এখনো শুয়ে আছেন?

হাঁ দাদা, ভেতর থেকে বন্ধ, ডেকেও সাড়া পাচ্চিনে।

বৃন্দাবন ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কপাটে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া ডাকিল, ওমা—মাগো!

কেহ সাড়া দিল না। বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলিয়া চেঁচাইতে লাগিল, তথাপি ভিতর হইতে শব্দমাত্র আসিল না। তখন লোহার শাবলের চাড় দিয়া রুদ্ধদ্বার মুক্ত করিয়া ফেলামাত্রই, ভিতর হইতে একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ যেন মুখের উপর সজোরে ধাক্কা মারিয়া সকলকে বিমুখ করিয়া ফেলিল। সে ধাক্কা বৃন্দাবন মুহূর্তের মধ্যে সামলাইয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া ভিতরে চাহিল।

শয্যা শূন্য। মা মাটিতে লুটাইতেছেন—মৃত্যু আসন্নপ্রায়। ঘরময় বিসূচিকার ভীষণ আক্রমণের সমস্ত চিহ্ন বিদ্যমান। যতক্ষণ তাঁহার উঠিবার শক্তি ছিল, উঠিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, অবশেষে অশক্ত, অসহায়, মেঝেয় পড়িয়া আর উঠিতে পারেন নাই। জীবনে কখনও কাহাকে বিন্দুমাত্র ক্লেশ দিতে চাহিতেন না, তাই মৃত্যুর কবলে পড়িয়াও অত রাত্রে ডাকাডাকি করিয়া কাহারও ঘুম ভাঙ্গাইতে লজ্জাবোধ করিয়াছিলেন। সারারাত্রি ধরিয়া তাঁহার কি ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিবার অপেক্ষা রহিল না। মাতার এমন অকস্মাৎ, এরূপ শোচনীয় মৃত্যু চোখে দেখিয়া সহ্য করা মানুষের সাধ্য নহে। বৃন্দাবনও পারিল না। তথাপি নিজেকে সোজা রাখিবার জন্য একবার প্রাণপণ-বলে চৌকাঠ চাপিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই সংজ্ঞা হারাইয়া জননীর পায়ের কাছে গড়াইয়া পড়িল। তাহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে আনা হইল: মিনিট-কুড়ি পরে সচেতন হইয়া দেখিল, মুখের কাছে বসিয়া চরণ কাঁদিতেছে। বৃন্দাবন উঠিয়া বসিল, এবং ছেলের হাত ধরিয়া মৃতকল্প জননীর পদপ্রান্তে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল।

যে লোকটা ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তিনি নেই। কোথায় গেছেন, এ বেলা ফিরবেন না।

মায়ের সম্পূর্ণ কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, কিন্তু জ্ঞান ছিল, পুত্র ও পৌত্রকে কাছে পাইয়া তাঁহার জ্যোতিঃহীন দুই চক্ষের প্রান্ত বাহিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, ওষ্ঠাধর বারংবার কাঁপাইয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলকেই আশীর্বাদ করিলেন, তাহা কাহারও কানে গেল না বটে, কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে পৌঁছিল।

তখন তুলসীমঞ্চমূলে শয্যা পাতিয়া তাঁহাকে শোয়ান হইল, কতক্ষণ গাছের পানে চাহিয়া রহিলেন, তার পরে মিলন-শ্রান্ত চক্ষু দুটি সংসারের শেষ নিদ্রায় ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া গেল।

অতঃপর এই ছয়টা দিন-রাত বৃন্দাবনের কাটিল শুধু এই জন্যে যে তাহা ভগবানের হাতে। তাহার নিজের হাতে থাকিলে কাটিত না।

কিন্তু চরণ আর খেলাও করে না, কথাও কহে না। বৃন্দাবন তাহাকে কত রকমের মূল্যবান খেলনা কিনিয়া দিয়াছিল—নানাবিধ কলের গাড়ি, জাহাজ, ছবি-দেওয়া পশু-পক্ষী—যে-সমস্ত লইয়া ইতিপূর্বে সে নিয়তই ব্যস্ত থাকিত, এখন তাহা ঘরের কোণে পড়িয়া থাকে, সে হাত দিতেও চাহে না।

সে বিপদের দিনে এই শিশুর প্রতি লক্ষ্য করিবার কথাও কাহারো মনে হয় নাই। তাহার ঠাকুরমাকে যখন চাদর-চাপা দিয়া খাটে তুলিয়া বিকট হরিধ্বনি দিয়া লইয়া যায়, তখন সে তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়াছিল।

কেন ঠাকুরমা তাহাকে সঙ্গে লইলেন না, কেন গরুর গাড়ির বদলে মানুষের কাঁধে অমন করিয়া মুড়িসুড়ি দিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেলেন, কেন ফিরিয়া আসিতেছেন না, কেন বাবা এত কাঁদেন, ইহাই সে যখন তখন আপন মনে চিন্তা করে। তাহার এই হতাশ বিহ্বল বিষণ্ণ মূর্তি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, করিল না শুধু তাহার পিতার। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু বৃন্দাবনকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, কোনদিকে মনোযোগ করিবার, বুদ্ধিপূর্বক চাহিয়া দেখিবার বা চিন্তা করিবার শক্তি তাহার মধ্যেই ছিল না। তাহার উদাস উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টির সম্মুখে যাহাই আসিত, তাহাই ভাসিয়া যাইত, স্থির হইতে পাইত না।

এ-কয়দিন প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তাহার শিক্ষক দুর্গাদাসবাবু আসিয়া বসিতেন, কত-রকম করিয়া বুঝাইতেন, বৃন্দাবন চুপ করিয়া শুনিত বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে কিছু গ্রহণ করিতে পারিত না। কারণ এই একটা ভাব তাহাকে স্থায়ীরূপে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল যে, অকস্মাৎ অকূল সমুদ্রের মাঝখানে তাহার জাহাজের তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিলেও এ ভগ্নপোত কিছুতেই বন্দরে পৌঁছিবে না। শেষ পরিণতি যাহার সমুদ্রগর্ভে, তাহার জন্য হাঁপাইয়া মরিয়া লাভ কি! এমন না হইলে তাহার অমন স্ত্রী জীবনের সূর্যোদয়েই চরণকে রাখিয়া অপসৃত হইত না, এমন অসময়ে কুসুমেরও হয়ত দয়া হইত, এত নিষ্ঠুর হইয়া চরণকে পরিত্যাগ করিতে পারিত না। এবং সকলের উপর তাহার মা। এমন মা কে কবে পায়? তিনিও যেন স্বেচ্ছায় বিদায় হইয়া গেলেন—যাইবার সময় কথাটি পর্যন্ত কহিয়া গেলেন না। এমনি করিয়া তাহার বিপর্যস্ত মস্তিষ্কে বিধাতার ইচ্ছা যখন প্রত্যহ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া দেখা দিতে লাগিল, তখন বাড়ির পুরাতন দাসী আসিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, দাদা, শেষকালে ছেলেটাকেও কি হারাতে হবে? একবার তাকে তুমি কাছে ডাকো না, আদর কর না, চেয়ে দেখ দেখি, কিরকম হয়ে গেছে!

তাহার কথাগুলো লাঠির মত বৃন্দাবনের মাথায় পড়িয়া তন্দ্রার ঘোর ভাঙিয়া দিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বলিল, কি হয়েচে চরণের?

দাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বালাই, ষাট! হয়নি কিছু—আয় বাবা চরণ, কাছে আয়—বাবা ডাকচেন।

অত্যন্ত সঙ্কুচিত ধীরপদে চরণ আড়াল হইতে সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই বৃন্দাবন ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সহসা কাঁদিয়া ফেলিল—চরণ, তুইও কি যাবি নাকি রে!

দাসী ধমক দিয়া উঠিল—ছিঃ, ও কি কথা দাদা?

বৃন্দাবন লজ্জিত হইয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আজ অনেকদিনের পর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল।

দাসী নিজের কাজে চলিয়া গেলে চরণ চুপি চুপি আবেদন করিল, মার কাছে যাব বাবা।

সে যে ঠাকুরমার কাছে যাইতে চাহে নাই, ইহাতেই বৃন্দাবন মনে মনে ভারী আরাম বোধ করিল, আদর করিয়া বলিল, তোর মা ত সে বাড়িতে নেই চরণ।

কখন আসবেন তিনি?

সে ত জানিনে বাবা। আচ্ছা, আজই আমি লোক পাঠিয়ে খবর নিচ্চি।

চরণ খুশী হইল। সেইদিনই বৃন্দাবন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, চরণকে আসিয়া লইয়া

যাইবার জন্য কেশবকে চিঠি লিখিয়া দিল। গ্রামের ভীষণ অবস্থাও সেই পত্রে লিখিয়া জানাইল।

মায়ের শ্রাদ্ধের আর দুইদিন বাকী আছে; সকালে বৃন্দাবন চণ্ডীমণ্ডপে কাজে ব্যস্ত ছিল, খবর পাইল, ভিতরে চরণের ভেদবমি হইতেছে। ছুটিয়া গিয়া দেখিল, সে নির্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার ভেদবমির চেহারায় বিসূচিকা মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছে।

বৃন্দাবনের চোখের সুমুখে সমস্ত জগৎ নিবিড় অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল, হাত-পা দুমড়াইয়া ভাঙিয়া পড়িল, একবার কেশবকে খবর দাও, বলিয়া সে সন্তানের শয্যার নীচে মড়ার মত শুইয়া পড়িল।

ঘণ্টা-খানেক পরে গোপাল ডাক্তারের বসিবার ঘরে বৃন্দাবন তাহার পা-দুটো আকুলভাবে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, দয়া করুন ডাক্তারবাবু, ছেলেটিকে বাঁচান! আমার অপরাধ যতই হয়ে থাক, কিন্তু, সে নির্দোষ। অতি শিশু, ডাক্তারবাবু—একবার পায়ের ধুলো দিন, একবার তাকে দেখুন! তার কষ্ট দেখলে আপনারও মায়া হবে!

গোপাল বিকৃত মুখ নাড়া দিয়া বলিলেন, তখন মনে ছিল না যে, তারিণী মুখুয্যে এই ডাক্তারবাবুরই মামা? ছোটলোক হয়ে পয়সার জোরে ব্রাহ্মণকে অপমান! সে সময়ে মনে হয়নি, এই পা-দুটোই মাথায় ধরতে হবে!

বৃন্দাবন কাঁদিয়া কহিল, আপনি ব্রাহ্মণ, আপনার পা ছুঁয়ে বলচি, তারিণী ঠাকুরকে আমি কিছুমাত্র অপমান করিনি। যা' তাঁকে নিষেধ করেছিলাম—সমস্ত গ্রামের ভালর জন্যই করে-ছিলাম। আপনি ডাক্তার, আপনি ত জানেন, এ সময় খাবার জল নষ্ট করা কি ভয়ানক অন্যায়!

গোপাল পা ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, অন্যায় বৈ কি! মামা ভারী অন্যায় করেচে। আমি ডাক্তার আমি জানিনে, তুমি দুর্গাদাসের কাছে দু' ছত্তর ইংরিজী পড়ে আমাকে জ্ঞান দিতে এসেচ! অতবড় পুকুরে দুখানা কাপড় কাচলে জল নষ্ট হয়! আমি কচি খোকা! এ আর কিছু নয় বাপু, এ শুধু টাকার গরম। ছোটলোকের টাকা হলে যা হয় তাই! নইলে বামুনের তুমি ঘাট বন্ধ করতে চাও? এত দর্প! অত অহংকার! যাও—যাও—আমি তোমার বাড়ি মাড়াব না।

ছেলের জন্য বৃন্দাবনের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, পুনরায় ডাক্তারের পা জড়াইয়া ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল—ঘাট মানচি, পায়ের ধুলো মাথায় নিচ্চি ডাক্তারবাবু, একবার চলুন! শিশুর প্রাণ বাঁচান। এক শ টাকা দেব—দু'শ টাকা, পাঁচ শ টাকা—যা' চান দেব ডাক্তারবাবু, চলুন—ওষুধ দিন।

পাঁচ শ টাকা!

গোপাল নরম হইয়া বলিলেন, কি জান বাপু, তা হ'লে খুলে বলি। ওখানে গেলে আমাকে একঘরে হতে হবে। এইমাত্র তাঁরাও এসেছিলেন,—না বাপু, তারিণীমামা অনুমতি না দিলে আমার সঙ্গে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ আহার-ব্যবহার বন্ধ করে দেবে। নইলে আমি ডাক্তার, আমার কি! টাকা নেব, ওষুধ দেব। কিন্তু, সে ত হবার জো নেই! তোমার ওপর দয়া করতে গিয়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে-পৈতে দেব কি করে বাপু? কাল আমার মা মরলে গতি হবে তাঁর কি করে বাপু? তখন তোমাকে নিয়ে ত আমার কাজ চলবে না। বরং এক কাজ কর, ঘোষালমশায়কে নিয়ে মামার কাছে যাও—তিনি প্রাচীন লোক, তাঁর কথা সবাই শোনে—হাতে-পায়ে ধর গে—কি জান বৃন্দাবন, তাঁরা একবার বললেই আমি—আজকাল টাটকা ভাল ভাল ঔষধ এনেচি—দিলেই সেরে যাবে।

বৃন্দাবন বিহ্বলদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, গোপাল ভরসা দিয়া পুনরায় কহিলেন, ভয় নেই ছোকরা, যাও দেরি ক'রো না। আর দেখ বাপু, আমার টাকার কথাটা সেখানে বলে কাজ নেই—যাও, ছুটে যাও।

বৃন্দাবন ঊর্ধ্বশ্বাসে কাঁদিতে কাঁদিতে তারিণীর শ্রীচরণে আসিয়া পড়িল।

তারিণী লাথি মারিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া পিশাচের হাসি হাসিয়া কহিলেন, সন্ধ্যে-আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে। কেমন, ফলল কি না! নির্বংশে হলি কি না!

বৃন্দাবনের কান্না শুনিয়া তারিণীর স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিয়া স্বামীকে বলিলেন, ছি ছি, এমন অধর্মের কাজ ক'রো না। যা হবার হয়েচে—আহা শিশু, নাবালক—বলে দাও গোপালকে, ওষুধ দিক।

তারিণী খিঁচাইয়া উঠিল—তুই থাম মাগী! পুরুষমানুষের কথায় কথা ক'স নে।

তিনি থতমত খাইয়া বৃন্দাবনকে বলিলেন, আমি আশীর্বাদ কচ্চি বাবা, তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে, বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন পাগলের মত কাতরোক্তি করিতে লাগিল, তারিণীর হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল, না—তবু না।

এমন সময় শাস্ত্রজ্ঞ ঘোষালমহাশয় পাশের বাড়ি হইতে খড়ম পায়ে দিয়া খটখট করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, শাস্ত্রে আছে কুকুরকে প্রশ্রয় দিলে মাথায় ওঠে। ছোটলোককে শাসন না করলে সমাজ উচ্ছন্ন যায়। এমনি করেই কলিকালে ধর্মকর্ম, ব্রাহ্মণের সম্মান লোপ পাচ্চে—কেমন হে তারিণী, সেদিন বলিনি তোমাকে, বেন্দা বোষ্টমের ভারী বাড় বেড়েচে। যখন ও আমার কথা মানলে না, তখনই জানি, ওর উপর বিধি বাম! আর রক্ষে নেই! হাতে হাতে ফল দেখলে তারিণী?

তারিণী মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, আর আমি! সেদিন পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে পৈতে হাতে করে বলেছিলাম, নির্বংশ হ! খুড়ো, আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে! এখনও চন্দ্র-সূর্য উঠচে, এখনও জোয়ার-ভাঁটা খেলচে! বলিয়া ব্যাধ যেমন করিয়া তাহার স্ব-শরবিদ্ধ ভূপাতিত জন্তুটার মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রতি চাহিয়া নিজের অব্যর্থ লক্ষ্যের আস্বাদন করিতে থাকে, তেমনি পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া তারিণী এই একমাত্র পুত্রশোকাহত হতভাগ্য পিতার অপরিসীম ব্যথা সর্বাগ্রে উপভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু বৃন্দাবন উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণের দায়ে সে অনেক সাধিয়াছিল, অনেক বলিয়াছিল, আর একটি কথাও বলিল না। নিদারুণ অজ্ঞান ও অন্ধতম মূঢ়ত্বের অসহ্য অত্যাচার এতক্ষণে তাহার পুত্র-বিয়োগ-বেদনাকেও অতিক্রম করিয়া তাহার আত্মসম্ভ্রমকে জাগাইয়া দিল। সমস্ত গ্রামের মঙ্গল-কামনার ফলে এই দুই অধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের কাহার গায়ত্রী ও সন্ধ্যা-আহ্নিকের তেজে সে নির্বংশ হইতে বসিয়াছে, এই বাক্‌বিতণ্ডার শেষ-মীমাংসা না শুনিয়াই সে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল এবং বেলা দশটার সময় নিরুদ্বিগ্ন শান্তমুখে পীড়িত সন্তানের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

কেশব তখন আগুন জ্বালিয়া চরণের হাতে পায়ে সেক দিতেছিল এবং তাহার নিদাঘ-তপ্ত মরুতৃষ্ণার সহিত প্রাণপণে যুঝিতেছিল। বৃন্দাবনের মুখে সমস্ত শুনিয়া সে উঃ—করিয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিল এবং একটা উড়নি কাঁধে ফেলিয়া বলিল, কলকাতায় চললুম। যদি ডাক্তার পাই, সন্ধ্যা নাগাদ ফিরব, না পাই, এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। উঃ—এই ব্রাহ্মণই একদিন সমস্ত পৃথিবীর গর্বের বস্তু ছিল—ভাবলেও বুক ফেটে যায় হে বৃন্দাবন! চললুম, পার ত ছেলেটারে বাঁচিয়ে রেখ ভাই! বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

কেশব চলিয়া গেলে, পিতাকে কাছে পাইয়া, মার কাছে যাব, বলিয়া ভয়ানক কান্না জুড়িয়া দিল। সে স্বভাবতঃ শান্ত, কোনদিনই জিদ করিতে জানিত না, কিন্তু আজ তাহাকে ভুলাইয়া রাখা নিতান্ত কঠিন কাজ হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ বেলা ধত পড়িয়া আসিতে লাগিল, রোগের যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৃষ্ণার হাহাকার এবং মায়ের কাছে যাইবার উন্মত্ত-চীৎকারে সে সমস্ত লোককে পাগল করিয়া তুলিল। এই চীৎকার বন্ধ হইল অপরাহ্ণে, যখন হাতে পায়ে পেটে খিল ধরিয়া কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

চৈত্রের স্বল্প দিনমান শেষ হয়-হয়, এমন সময়ে কেশব ডাক্তার লইয়া বাড়ি ঢুকিল। ডাক্তার তাহারই সমবয়সী এবং বন্ধু, ঘরে ঢুকিয়া চরণের দিকে চাহিয়াই মুখ গম্ভীর করিয়া একধারে বসিলেন। কেশব সভয়ে তাঁহার মুখপানে চাহিতেই তিনি কি বলিতে গিয়া বৃন্দাবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থামিয়া গেলেন।

বৃন্দাবন তাহা দেখিল, শান্তভাবে কহিল, হাঁ, আমিই বাপ বটে; কিন্তু কিছুমাত্র সঙ্কোচের প্রয়োজন নেই, আপনার যাহা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে বলুন। যে বাপ, বারো ঘণ্টাকাল বিনা চিকিৎসায় একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বসে থাকতে পারে, তার সমস্ত সহ্য হয় ডাক্তারবাবু!

পিতার এত বড় ধৈর্যে ডাক্তার মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তথাপি ডাক্তার হইলেও সে মানুষ, যে কথা তাহার বলিবার ছিল, পিতার মুখের উপর উচ্চারণ করিতে পারিল না, মাথা হেঁট করিল।

বৃন্দাবন বুঝিয়া কহিল, কেশব, এখন আমি চললুম। পাশেই ঠাকুর-ঘর, আবশ্যক হলে ডেকো। আর একটা কথা ভাই, শেষ হবার আগে খবর দিয়ো, আর একবার যেন দেখতে পাই, বলিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন যখন ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিল, তখন ঘরের আলো ম্লান হইয়াছে। ডান দিকে চাহিয়া দেখিল, ঐখানে বসিয়া মা জপ করিতেন। হঠাৎ সেদিনের কথা মনে পড়িয়া গেল—যেদিন তাহারা কুঞ্জনাথের ঘরে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিল, মা যেদিন কুসুমকে বালা পরাইয়া দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিয়া ঐখানে চরণকে লইয়া বসিয়া ছিলেন; আর সে আনন্দোন্মত্ত হৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিয়া দিতে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিল। আর আজ, কি নিবেদন করিতে সে ঘরে ঢুকিয়াছে? বৃন্দাবন লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, পাশের ঘরেই আমার চরণ মরিতেছে, ভগবান, আমি সে নালিশ জানাইতে আসি নাই, কিন্তু পিতৃস্নেহ যদি তুমিই দিয়াছ, তবে বাপের চোখের উপর বিনা চিকিৎসায়, এমন নিষ্ঠুরভাবে তাহার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করিলে কেন? পিতৃহৃদয়ে এতটুকু সান্ত্বনার পথ খুলিয়া রাখিলে না কিজন্য? তাহার স্মরণ হইল, বহু লোকের বহুবার কথিত সেই বহু পুরাতন কথাটা—সমস্ত মঙ্গলের নিমিত্ত! সে মনে মনে বলিল, যাহারা তোমাকে বিশ্বাস করে না তাহাদের কথা তাহারাই জানে, কিন্তু আমি ত নিশ্চয় জানি, তোমার ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি শুষ্ক পাতাও মাটিতে পড়ে না; তাই আজ এই প্রার্থনা শুধু করি জগদীশ্বর, বুঝাইয়া দাও, কি মঙ্গল ইহার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছ? আমার এই অতি ক্ষুদ্র একফোঁটা চরণের মৃত্যুতে সংসারে কাহার কি উপকার সাধিত হইবে? যদিও সে জানিত, জগতের সমস্ত ঘটনাই মানবের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে, তথাপি, এই কথাটার উপর সে সমস্ত চিত্ত প্রাণপণে একাগ্র করিয়া পড়িয়া রহিল, কেন চরণ জন্মিল, কেনই বা এত বড় হইল এবং কেনই বা তাহাকে একটি কাজ করিবারও অবসর না দিয়া ডাকিয়া লওয়া হইল!

কিছুক্ষণ পরে পুরোহিত রাত্রির কর্তব্য সম্পন্ন করিতে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার পদশব্দে ধ্যান ভাঙিয়া যখন বৃন্দাবন উঠিয়া গেল, তখন তাহার উদ্দাম ঝঞ্ঝা শান্ত হইয়াছে। গগনে আলোর আভাস তখনো ফুটিয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু মেঘ-মুক্ত নির্মল স্বচ্ছ আকাশের তলে ভবিষ্যৎ-জীবনের অস্পষ্ট পথের রেখা চিনিতে পারিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া সে প্রাঙ্গণের একধারে দ্বারের অন্তরালে একটি মলিন স্ত্রী-মূর্তি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। কে ওখানে অমন আঁধারে আড়ালে বসিয়া আছে!

বৃন্দাবন কাছে সরিয়া আসিয়া এক মুহূর্তে ঠাহর করিয়াই চিনিতে পারিল, সে কুসুম। তাহার জিহ্বাগ্রে ছুটিয়া আসিল, কুসুম, আমার ষোল-আনা সুখ দেখিতে আসিলে কি? কিন্তু বলিল না।

এইমাত্র সে নাকি তাহার চরণের শিশু-আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে নিজের সমস্ত সুখদুঃখ, মান-অভিমান বিসর্জন দিয়া আসিয়াছিল, তাই, হীন প্রতিহিংসা সাধিয়া মৃত্যুশয্যাশায়ী সন্তানের অকল্যাণ করিতে ইচ্ছা করিল না; বরং করুণকণ্ঠে বলিল, আর একটু আগে এলে চরণের বড় সাধ পূর্ণ হ'ত। আজ সমস্ত দিন যত যন্ত্রণা পেয়েচে, ততই সে তোমার কাছে যাবার জন্য কেঁদেচে—কি ভালই তোমাকে সে বেসেছিল! কিন্তু, এখন আর জ্ঞান নেই—এসো আমার সঙ্গে।

কুসুম নিঃশব্দে স্বামীর অনুসরণ করিল। দ্বারের কাছে আসিয়া বৃন্দাবন হাত দিয়া চরণের অন্তিম-শয্যা দেখাইয়া দিয়া কহিল, ঐ চরণ শুয়ে আছে—যাও, নাও গে। কেশব, ইনি চরণের মা। বলিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা কেহই যখন কুসুমের সুমুখে গিয়া ও-কথা বলিতে সাহস করিল না, কুঞ্জনাথ পর্যন্ত ভয়ে পিছাইয়া গেল, তখন বৃন্দাবন ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বলিল, ওর মৃতদেহটা ধরে রেখে লাভ কি, ছেড়ে দাও, ওরা নিয়ে যাক।

কুসমে মুখ তুলিয়া বলিল, ওদের আসতে বল, আমি নিজেই তুলে দিচ্ছি।

তারপর সে যেরূপ অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত চরণের মৃতদেহ শ্মশানে পাঠাইয়া দিল, দেখিয়া বৃন্দাবনও মনে মনে ভয় পাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

চরণের ক্ষুদ্র দেহ পুড়িয়া ছাই হইতে বিলম্ব হইল না। কেশব সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ভয়ঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—সমস্ত মিছে কথা! যারা কথায় কথায় বলে—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য, তারা শয়তান, হারামজাদা, জোচ্চোর!

বৃন্দাবন দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া অদূরে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, ঘোর রক্তবর্ণ শ্রান্ত দুই চোখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া দেখিয়া কহিল, শ্মশানে রাগ করতে নেই কেশব।

প্রত্যুত্তরে কেশব 'উঃ'—বলিয়া চুপ করিল।

ফিরিয়া আসিবার পথে বাগদীদের দুই-তিনটি ছেলেমেয়ে গাছতলায় খেলা করিতেছিল, বৃন্দাবন থমকিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শিশুরা খেলার ছলে আর একটা গাছতলায় যখন ছুটিয়া চলিয়া গেল, বৃন্দাবন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া বলিল, কেশব, কাল থেকে অহর্নিশি যে প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঠেচে, এখন বোধ করি, তার জবাব পেলাম—সংসারের এক ছেলে মরারও প্রয়োজন আছে।

কেশব এইমাত্র গালাগালি করিতেছিল, অকস্মাৎ এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল।

বৃন্দাবন কহিল, তোমার ছেলে নেই, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আমার জ্বালা বুঝবে না—বোঝা অসম্ভব। এ এমন জ্বালা যে, মহাশত্রুর জন্যও কেউ কামনা করে না। কিন্তু এর দামও আছে কেশব, এখন যেন টের পাচ্ছি, খুব বড়-রকমের দামই আছে। তাই বোধ হয়, ভগবান এরও ব্যবস্থা করেছেন।

কেশব তেমনি নিরুত্তর-মুখে চাহিয়া রহিল; বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, এই জ্বালা আমার জুড়িয়ে যাচ্ছিল ওই শিশুদের পানে চেয়ে। আজ আমি সকলের মুখেই চরণের মুখ দেখচি, সব শিশুকেই বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে হচ্চে—চরণ বেঁচে থাকতে ত একটা দিনও এমন হয়নি!

কেশব অবনত-মুখে শুনিতে শুনিতে চলিতে লাগিল। পাঠশালার পোড়ো বনমালী ও তাহার ছোটভাই জলপান ও জল লইয়া যাইতেছিল, বৃন্দাবন ডাকিয়া বলিল, বনমালী, কোথায় যাচ্ছিস রে?

বাবাকে জলপান দিতে মাঠে যাচ্ছি পণ্ডিতমশাই?

আমার কাছে একবার আয় তোরা, বলিয়া নিজেই দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া উভয়কেই একসঙ্গে বুকের উপর টানিয়া লইয়া পরম স্নেহে তাহাদের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আঃ—আঃ, বুক জুড়িয়ে গেল রে বনমালী! কেশব, কাল বড় ভয় হয়েছিল ভাই, চরণকে বুঝি সত্যই হারালাম। না, আর ভয় নেই, আর তাকে হারাতে হবে না—এদের ভেতরেই চরণ আমার মিশিয়ে আছে, এদের ভেতর থেকেই একদিন তাকে ফিরে পাবো।

কেশব সভয়ে এদিকে ওদিকে চাহিয়া বলিল, ছেড়ে দাও হে বৃন্দাবন, ওদের মা কি কেউ দেখতে পেলে ভারী রাগ করবে।

ও—তা বটে। আমি চরণকে পুড়িয়ে আসছি যে! বলিয়া ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বনমালী পণ্ডিতমশায়ের ব্যবহারে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল, ছাড়া পাইয়া ভাইকে লইয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

পণ্ডিতমশাই সেইখানে পথের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ঊর্ধ্বমুখে হাতজোড় করিয়া বলিল, জগদীশ্বর! চরণকে নিয়েছ, কিন্তু আমার চোখের এই দৃষ্টিটুকু যেন কেড়ে নিয়ো না! আজ যেমন দেখতে দিলে, এমনি যেন চিরদিন সকল শিশুর মুখেই আমার চরণের

মুখ দেখতে পাই। এমনি বুকে নেবার জন্যে যেন চিরদিন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারি! কেশব, শ্মশানে দাঁড়িয়ে যাঁদের গাল দিচ্ছিলে, তাঁরা সকলেই হয়ত জোচ্চোর নন।

কেশব হাত ধরিয়া বলিল, বাড়ি চল।

চল, বলিয়া বৃন্দাবন অতি সহজেই দাঁড়াইল। দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল, আজ আমার বাচালতা মাপ করো ভাই। কেশব, মনের ওপর বড় গুরুভার চেপেছিল, এ শাস্তি আমার কেন? জ্ঞানতঃ এমন কিছু গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিনি যে, ভগবান এত বড় দণ্ড আমাকে দিলেন, আমার—

কথাটা সম্পূর্ণ না হইতেই কেশব উদ্ধতভাবে গর্জিয়া উঠিল, জিজ্ঞেস কর গে ওই হারামজাদা বুড়ো ঘোষালকে—সে বলবে, তার জপ-তপের তেজে; জিজ্ঞেস কর গে আর এক জোচ্চোরকে—সে বলবে, পূর্বজন্মের পাপে—উঃ—এই দেশের ব্রাহ্মণ!

বৃন্দাবন ধীরভাবে বলিল, কেশব, গোখরো সাপের খোলসকে লাঠির আঘাত করে লাভ নেই, পচা ঘোলের দুর্গন্ধের অপবাদ দুধের ওপর আরোপ করাও ভুল। অজ্ঞান ব্রাহ্মণকেও কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে, তাই বরং দ্যাখো।

কেশব সেইসব কথা স্মরণ করিয়া ক্রোধে ক্ষোভে অন্তরে পুড়িয়া যাইতেছিল, যা মুখে আসিল বলিল, তবে এতবড় দণ্ড কেন?

বৃন্দাবন কহিল, দণ্ড ত নয়। সেই কথাই তোমাকে বলছিলুম কেশব, যখন কোন পাপের কথাই মনে পড়ে না, তখন এ আমার পাপের শাস্তি স্বীকার ক'রে, নিজেকে ছোট করে দেখতে আমি চাইনে। এ জীবনে স্মরণ হয় না, গত জীবনের ঘাড়েও নিরর্থক অপরাধ চাপিয়ে দিলে আত্মার অপমান করা হয়। সুতরাং আমার এ পাপের ফল নয়, অপরাধের শাস্তি নয়—এ আমার গুরুগৃহ-বাসের গৌরবের ক্লেশ। কোন বড় জিনিসই বিনা দুঃখে মেলে না কেশব, আজ আমার চরণের মৃত্যুতে যে শিক্ষা লাভ হ'ল, তত বড় শিক্ষা, পুত্র-শোকের মত মহৎ দুঃখ ছাড়া কিছুতেই মেলে না। বুক চিরে দেখাবার হলে তোমাকে দেখাতাম, আজ পৃথিবীর যেখানে যত ছেলে আছে, তাদের সবাইকে আমার চরণ তার নিজের জায়গাটি ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুমি ব্রাহ্মণ, আজ আমাকে শুধু এই আশীর্বাদ কর, আজ যা পেয়েছি, তাকে যেন না হারিয়ে ফেলে সব নষ্ট করে বসি।

বৃন্দাবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল, দুই বন্ধু মুখোমুখি দাঁড়াইয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সেদিন বৃন্দাবন একটিমাত্র কূপ প্রস্তুত করাইবার সংকল্প করিয়াছিল, কিন্তু দেখা গেল একটিই যথেষ্ট নহে। গ্রামের পূর্বদিকেই অধিকাংশ দুঃখী লোকের বাস; এ পাড়ায় আর একটা বড়-রকমের কূপ প্রস্তুত না করিলে জলকষ্ট এবং ব্যাধি-পীড়া নিবারিত হইবে না। তাই কেশব ফার্মের সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সংবাদ লইয়া আসিল যে, যথেষ্ট অর্থব্যয় করিলে এমন কূপ নির্মাণ করা যাইতে পারে, যাহাতে শুধু একটা গ্রামের নয়, পাঁচ-সাতটা গ্রামেরও দুঃখ দূর করা যাইতে পারে; উপরন্তু, অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে চাষ-আবাদেরও সাহায্য চলিতে পারিবে।

বৃন্দাবন খুশী হইয়া সম্মত হইল এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধের দিন, দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যতীত সমুদয় সম্পত্তি রেজেস্ট্রী করিয়া কেশবের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, কেশব, এই ক'রো ভাই, বিষাক্ত জল খেয়ে আমার চরণের বন্ধুবান্ধবেরা যেন আর না মরে। আর আমার সকল সম্পত্তির বড় সম্পত্তি এই পাঠশালা। এর ভারও যখন নিলে, তখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। যদি কোনদিন এদিকে ফিরে আসি, যেন দেখতে পাই, আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও মানুষ হয়েচে। আমি সেইদিনে শুধু চরণের দুঃখ ভুলব।

দুর্গাদাসবাবু এ-কয়দিন সর্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার কথা খুঁজে পাইনে বাবা! কিন্তু দুঃখ যত বড়ই হোক, সহ্য করাই ত মনুষ্যত্ব। অক্ষম অপারগ হয়ে সংসার ত্যাগ করা কখনই ভগবানের অভিপ্রায় নয়।

বৃন্দাবন মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, সংসার ত্যাগ করার কোন সংকল্প ত আমার

নেই মাস্টারমশাই। বরং সে ত একেবারে অসম্ভব। ছেলেদের মুখ না দেখতে পেলে আমি একটা দিনও বাঁচব না। আপনার দয়ায় আমি পণ্ডিতমশাই বলে সকলের পরিচিত, আমার এ সম্মান আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না, আবার কোথাও গিয়ে এই ব্যবসাই আরম্ভ করে দেব।

দুর্গাদাসবাবু বলিলেন, কিন্তু তোমার সর্বস্ব ত জলকষ্ট-মোচনের জন্য দান করে গেলে, তোমাদের ভরণপোষণ হবে কি করে?

বৃন্দাবন সলজ্জ হাস্যে দেয়ালে টাঙানো ভিক্ষার ঝুলি দেখাইয়া বলিল, বৈষ্ণবের ছেলের কোথাও মুষ্টিভিক্ষার অভাব হবে না মাস্টারমশাই, এইতেই আমার বাকী দিনগুলো স্বচ্ছন্দে কেটে যাবে। তা ছাড়া সম্পত্তি আমার চরণের, আমি তারই সঙ্গী-সাথীদের জন্য দিয়ে গেলাম।

দুর্গাদাস ব্রাহ্মণ এবং প্রবীণ হইলেও শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, তাই তিনিও কুসুমের যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন। এখন তাহাই স্মরণ করিয়া বলিলেন, সেটা ভাল হবে না বাবা, তোমার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু বৌমার পক্ষে সেটা বড় লজ্জার কথা। এমন হতেই পারে না বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন মুখ নীচু করিয়া কহিল, তিনি তাঁর ভায়ের কাছেই যাবেন।

দুর্গাদাস বৃন্দাবনকে ছেলের মত স্নেহ করিতেন, তাহার বিপদে এবং সর্বোপরি এই গৃহত্যাগের সঙ্কল্পে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইয়া নিবৃত্ত করিবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, বৃন্দাবন, জন্মভূমি ত্যাগ করবার আবশ্যকতা কি? এখানে বাস করেও ত পূর্বের মত সমস্ত হতে পারে।

বৃন্দাবনের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, বলিল, ভিক্ষা ছাড়া আমার আর উপায় নেই, কিন্তু সে আমি এখানে পারব না। তা ছাড়া, এ বাড়িতে যেদিকেই চোখ পড়ছে, সেইদিকেই তার ছোট হাত-দুখানির চিহ্ন দেখতে পাচ্চি। আমাকে ক্ষমা করুন মাস্টারমশাই, আমি মানুষ, মানুষের মাথা এ গুরুভারে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

দুর্গাদাস বিমর্ষমুখে মৌন রহিলেন।

যে ডাক্তার চরণের শেষ-চিকিৎসা করিয়াছিলেন, সেদিনের মর্মান্তিক ঘটনা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ইহার শেষ দেখিবার কৌতূহল ও বৃন্দাবনের প্রতি অদম্য আকর্ষণ তাঁহাকে সেইদিন সকালে বিনা-আহ্বানে আবার কলিকাতা হইতে টানিয়া আনিয়াছিল। এতক্ষণ তিনি নিঃশব্দে সমস্ত শুনিতেছিলেন; বৃন্দাবনের এতটা বৈরাগ্যের হেতু কোনমতে বুঝা যায়, কিন্তু কেশব কিসের জন্য সমস্ত উন্নতি জলাঞ্জলি দিয়া এই অতি তুচ্ছ পাঠশালার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কেশব, সত্যই কি তুমি এমন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে পাঠশালা নিয়ে সারাজীবন থাকবে?

কেশব সংক্ষেপে কহিল, শিক্ষা দেওয়াই ত আমার ব্যবসা।

ডাক্তার ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, তা জানি, কিন্তু কলেজের প্রফেসারি এবং এই পাঠশালার পণ্ডিতি কি এক? এতে কি উন্নতি আশা কর শুনি?

কেশব সহজভাবে বলিল, সমস্তই। টাকা রোজগার—আর উন্নতি এক নয় অবিনাশ।

নয় মানি। কিন্তু এমন গ্রামে বাস করলেও যে মহাপাতক হয়! উঃ—মনে হলেও গা শিউরে ওঠে রে!

বৃন্দাবন হাসিল এবং কেশবের জবাব দিবার পূর্বেই কহিল, সে কি শুধু গ্রামেরই অপরাধ ডাক্তারবাবু, আপনাদের নয়? আজ আমার দুর্দশা দেখে শিউরে উঠেছেন, এমনি দুর্দশায় প্রতি বৎসর কত শিশু, কত নরনারী-হত্যা হয়, সে কি কারো কোনদিন চোখে পড়ে? আপনারা সবাই আমাদের এমন নির্মমভাবে ত্যাগ করে চলে না গেলে, আমরা ত এত নিরুপায় হয়ে মরি না! রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু, কিন্তু যারা আপনাদের মুখের অন্ন, পরনের বসন যোগায়, সেই হতভাগ্য দরিদ্রের এইসব গ্রামেই বাস। তাদিকেই দু'পায়ে মাড়িয়ে থেঁতলে থেঁতলে আপনাদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি তৈরী হয়। সেই উন্নতির পথ থেকে কেশব এম. এ. পাশ করেও স্বেচ্ছায় মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েচে।

কেশব আনন্দে উৎসাহে সহসা বৃন্দাবনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, বৃন্দাবন, মানুষ হবার কত বড় সুযোগই না আমাকে দিয়ে গেলে! দশ বছর পরে একবার দয়া করে ফিরে এসো, দেখে যেয়ো তোমার জন্মভূমিতে লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে কি না।

দুর্গাদাস ও অবিনাশ ডাক্তার উভয়েই এই দুই বন্ধুর মুখের দিকে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

পরদিন বৃন্দাবন ভিক্ষার ঝুলিমাত্র সম্বল করিয়া বাড়ল ত্যাগ করিয়া যাইবে এবং ঘুরিতে ঘুরিতে যে-কোনস্থানে নিজের কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত করিয়া লইবে। কেশব তাহাকে তাহাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়া কিছুকাল অবস্থান করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু বৃন্দাবন সম্মত হয় নাই। কারণ, সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধাকে সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে চাহে।

যাত্রার উদ্যোগ করিয়া সে দেবসেবার ভার পুরোহিত ও কেশবের উপর দিয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলের কথাই চিন্তা করিয়াছিল। মায়ের সিন্দুকের সঞ্চিত অর্থ তাহাদিগকে দিয়া বিদায় করিয়াছিল।

শুধু কুসুমের কথাই চিন্তা করিয়া দেখে নাই। প্রবৃত্তিও হয় নাই, আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। যেদিন সে চরণকে আশ্রয় দেয় নাই, সেইদিন হইতে তাহার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার ভাব জমিয়া উঠিতেছিল, সেই বিতৃষ্ণা তাহার মৃত্যুর পরে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও বিদ্বেষে রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই কেন কুসুম আসিয়াছে, কি করিয়া আসিয়াছে, কি জন্য আছে, এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র খোঁজ লয় নাই এবং না লইয়াই নিজের মনে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, আপনি আসিয়াছে, শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেলে আপনিই চলিয়া যাইবে। সে আসার পরে, যদিও কার্যোপলক্ষে বাধ্য হইয়া কয়েকবার কথা কহিয়াছিল, কিন্তু তাহার মুখের পানে সেদিন সকালে ছাড়া আর চাহিয়া দেখে নাই। ও-দিকে কুসুমও তাহার সহিত দেখা করিবার বা কথা কহিবার লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই।

এমনি করিয়া এ-কয়টা দিন কাটিয়াছে, কিন্তু আর ত সময় নাই; তাই আজ বৃন্দাবন একজন দাসীকে ডাকিয়া, সে কবে যাইবে জানিতে পাঠাইয়া, বাহিরে অপেক্ষা করিয়া রহিল।

দাসী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, এখন তিনি যাবেন না।

বৃন্দাবন বিস্মিত হইয়া কহিল, এখানে আর ত থাকবার জো নেই, সে কথা বলে দিলে না কেন?

দাসী কহিল, বৌমা নিজেই সমস্ত জানেন।

বৃন্দাবন বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে জেনে এসো, সে কি একলাই থাকবে?

দাসী এক মিনিটের মধ্যে জানিয়া আসিয়া কহিল, হাঁ।

বৃন্দাবন তখন নিজেই ভিতরে আসিল। ঘরের কপাট বন্ধ ছিল, হঠাৎ ঢুকিতে সাহস করিল না, ঈষৎ ঠেলিয়া ভিতরে চাহিয়াই তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। দগ্ধগৃহের পোড়া-প্রাচীরের মত কুসুম এইদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—চোখে তাহার উৎকট ক্ষিপ্ত চাহনি। আত্মগ্লানি ও পুত্রশোক কত শীঘ্র মানুষকে কি করিয়া ফেলিতে পারে, বৃন্দাবন এই তাহা প্রথম দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

অসাবধানে কপাটের কড়া নড়িয়া উঠিতেই কুসুম চাহিয়া দেখিল এবং সরিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিল, ভেতরে এসো।

বৃন্দাবন ভিতরে আসিতেই সে দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। হয়ত সে প্রকৃতিস্থ নয়, উন্মত্ত নারী কি কাণ্ড করিবে সন্দেহ করিয়া বৃন্দাবনের বুক কাঁপিয়া উঠিল।

কিন্তু কুসুম অসম্ভব কাণ্ড কিছুই করিল না, গলায় আঁচল দিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া স্বামীর দুই পায়ের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

বৃন্দাবন ভয়ে নড়িতে চড়িতে সাহস করিল না, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কুসুম বহুক্ষণ ধরিয়া ওই দুটি পায়ের ভিতর হইতে যেন শক্তি সংগ্রহ করিতে লাগিল,

বহুক্ষণ পরে উঠিয়া বসিয়া মুখপানে চাহিয়া বড় করুণ-কণ্ঠে বলিল, সবাই বলে, তুমি সইতে পেরেচ; কিন্তু আমার বুকের ভেতর দিবানিশি হুহু করে জ্বলে যাচ্চে, আমি বাঁচব কি করে? তোমাকে রেখে আমি মরবই বা কি করে?

দু'জনের এক জ্বালা। বৃন্দাবনের বিদ্বেষ-বহ্নি নিবিয়া গেল, সে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল, কুসুম, আমি যাতে শান্তি পেয়েছি, তুমিও তাতে পাবে—সে ছাড়া আর পথ নেই।

কুসুম চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বৃন্দাবন বলিতে লাগিল, চরণকে যে তুমি কত ভালবাসতে তা আমি জানি কুসুম। তাই তোমাকেও এ পথে ডাকছি। সে তোমার মরেনি, হারায় নি, শুধু লুকিয়ে আছে—একবার ভাল করে চেয়ে দেখতে শিখলেই দেখতে পাবে, যেখানে যত ছেলেমেয়ে আছে, আমাদের চরণও তাদের সঙ্গে আছে।

এতক্ষণে কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, সে আর-একবার নত হইয়া স্বামীর পায়ে মুখ রাখিল। ক্ষণকাল পরে মুখ তুলিয়া বলিল, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

বৃন্দাবন সভয়ে বলিল, আমার সঙ্গে? সে অসম্ভব।

খুব সম্ভব। আমি যাব।

বৃন্দাবন উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, কি করে যাবে কুসুম, আমি তোমাকে প্রতিপালন করব কি করে? আমি নিজের জন্য ভিক্ষে করতে পারি, কিন্তু তোমার জন্য ত পারিনে! তা ছাড়া তুমি হাঁটবে কি করে?

কুসুম অবিচলিত-স্বরে কহিল, আমিও খুব হাঁটতে পারি—হেঁটেই এসেছি। তা ছাড়া ভিক্ষে করতে তোমাকে আমি দেব না, তা সে আমার জন্যই হোক, আর তোমার নিজের জন্যই হোক। তুমি শুধু তোমার কাজ করে যেয়ো, আমি উপায় করতেও জানি, সংসার চালাতেও জানি। দাদার সংসার এতদিন আমিই চালিয়ে এসেছি।

বৃন্দাবন ভাবিতে লাগিল। কুসুম বলিল, ভাবনা মিছে। আমি যাবই। অবহেলায় ছেলে হারিয়েচি, স্বামী হারাতে আর চাইনে।

বৃন্দাবন আরও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল, চরণ আমার যে মন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত করে গেছে, পারবে সেই মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করতে?

কুসুম শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, পারব।

তবে চল, বলিয়া বৃন্দাবন সম্মতি জানাইল এবং আর-একবার কেশবের উপর সমস্ত ভার তুলিয়া দিয়া সেই রাত্রেই স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেল।

নিঃকৃতি

এক

ভবানীপুরের চাটুয্যেরা একান্নবর্তী পরিবার। দুই সহোদর গিরীশ ও হরিশ এবং খুড়তুতো ছোট ভাই রমেশ। পূর্বে ইহাদের পৈতৃক বাটী ও বিষয়-সম্পত্তি রূপনারায়ণ নদের তীরে হাওড়া জেলার ছোট-বিষ্ণুপুর গ্রামে ছিল। তখন গিরীশের পিতা ভবানী চাটুয্যের অবস্থাও ভাল ছিল। কিন্তু, হঠাৎ একসময়ে রূপনারায়ণ এমনি প্রচণ্ড ক্ষুধায় ভবানীর জমি-জায়গা, পুকুর-বাগান গিলিতে শুরু করিলেন যে, বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যে প্রায় কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। অবশেষে, সাতপুরুষের বাস্তুভিটাটি পর্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়া এই ব্রাহ্মণকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করিয়া নিজের ত্রিসীমানা হইতে দূর করিয়া দিলেন। ভবানী সপরিবারে পলাইয়া আসিয়া ভবানীপুরে-আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সে-সব অনেক-দিনের কথা। তাহার পর গিরীশ ও হরিশ উভয়েই উকীল হইয়াছেন, বিস্তর বিষয়-আশয় অর্জন করিয়াছেন, বাটী প্রস্তুত করিয়াছেন—এক কথায়, যাহা গিয়াছিল তাহার চতুর্গুণ ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এখন বড়ভাই গিরীশের বাৎসরিক আয় প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা, হরিশও পাঁচ-ছয় হাজার টাকা উপায় করেন, শুধু করিতে পারে নাই রমেশ। তবে একেবারে যে কিছুই পারে নাই তাহা নহে। বার দুই-তিন সে আইন ফেল করিতে পারিয়াছিল এবং সম্প্রতি কি-একটা ব্যবসায়ে বড়দার হাজার তিন-চার লোকসান করিয়া এইবার ঘরে বসিয়া খবরের কাগজের সাহায্যে দেশ-উদ্ধারে রত হইয়াছিল।

কিন্তু, এতদিনের এক সংসার এইবার ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিতে লাগিল। তাহার কারণ, মেজবৌ ও ছোটবৌয়ে কিছুতেই আর বনিবনাও হয় না। হরিশ এতকাল কলিকাতায় থাকিতেন না, সপরিবারে মফস্বলে থাকিয়া প্র্যাকটিস করিতেন। তখন মাঝে মাঝে দু-দশদিনের বাড়ি আসা-যাওয়ার অল্প সময়টুকু এই দুটি নারীর বিশেষ সদ্ভাবে না কাটিলেও কলহ-বিবাদের এরূপ প্রচুর অবসর ছিল না। প্রায় মাস-খানেক হইল হরিশ সদরে ফিরিয়া আসিয়া ওকালতি করিতেছেন এবং বাড়ি হইতে সুখশান্তিও পলাইবার উপক্রম করিয়াছে। তবে এবার আসিয়া পর্যন্ত দুই জায়ের মনকষাকষি ব্যাপার এখনও উঁচু পর্দায় উঠে নাই; তাহার কারণ ছোটবৌ এতদিন এখানে ছিল না। রমেশের স্ত্রী শৈলজা তাহার একমাত্র পুত্র পটল ও সপত্নী-পুত্র কানাইলালকে বড়জার হাতে রাখিয়া মরণাপন্ন বাপকে দেখিতে কৃষ্ণনগরে গিয়াছিল। বাপ আরোগ্য হইয়াছেন, সেও দিন পাঁচ-ছয় ফিরিয়া আসিয়াছে।

বাড়িতে শাশুড়ী এখনও বাঁচিয়া আছেন বটে, কিন্তু বড়বধূ সিদ্ধেশ্বরীই যথার্থ গৃহিণী। তাঁহার প্রকৃতিটা ঠিক বুঝা যাইত না, এইজন্যই বোধ করি পাড়ায় তাঁহার অখ্যাতি-সুখ্যাতি দুই-ই একটু অতিমাত্রায় ছিল।

সিদ্ধেশ্বরীর দরিদ্র পিতামাতা এখনও বাঁচিয়া ছিলেন। গত পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া তাঁহারা অবিশ্রাম চেষ্টা করিয়া এবার পূজার সময় মেয়েকে বাড়ি লইয়া গিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী সংসার ফেলিয়া বেশীদিন সেখানে থাকিতে পারিলেন না, মাস-খানেক পরেই ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু কাটোয়ার ম্যালেরিয়া সঙ্গে করিয়া আনিলেন। অথচ, বাড়ি আসিয়া অত্যাচার বন্ধ করিলেন না। তেমনিই প্রাতঃস্নান চলিতে লাগিল এবং কিছুতেই কুইনিন সেবন করিতে সম্মত হইলেন না। অতএব ভুগিতেও লাগিলেন। দুই-চারি দিন যায়—জ্বরে পড়েন, আবার উঠেন আবার পড়েন। ফলে, দুর্বল হইয়া পড়িতেছিলেন—এমনি সময়ে শৈল বাপের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া চিকিৎসা সম্বন্ধে অত্যন্ত কড়াকড়ি শুরু করিয়া দিল। ছেলেবেলা হইতে চিরকাল সে বড়বধূর কাছেই আছে, এজন্য সে যত জোর করিতে পারিত, মেজবৌ কিংবা আর কেহ তাহা পারিত না। আরও একটা কারণ ছিল। মনে মনে সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে ভারী ভয় করিতেন। শৈল অত্যন্ত রাগী মানুষ এবং এমনি কঠোর উপবাস করিতে পারিত যে, একবার শুরু করিলে কোন

উপায়েই তাহাকে জলস্পর্শ করানো যাইত না—এইটাই সিদ্ধেশ্বরীর সর্বাপেক্ষা উৎকণ্ঠার হেতু ছিল।

শৈলর মাসীর বাড়ি পটলডাঙ্গায়। এবার কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া অবধি তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে পারে নাই। আজ একাদশী, শাশুড়ীর রান্নার কাজ নাই—তাই সকালে সিদ্ধেশ্বরীর মেজছেলে হরিচরণের উপর মাকে ঔষধ খাওয়াইবার ভার দিয়া সে পটলডাঙ্গায় গিয়াছিল।

শীতকাল। ঘণ্টা-দুই হইল সন্ধ্যা হইয়াছে। কাল প্রভাত হইতেই সিদ্ধেশ্বরীর ভালো করিয়া জ্বর ছাড়ে নাই। আজ এই সময়টায় তিনি লেপ মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া নির্জীবের মত তাঁহার অতি প্রশস্ত শয্যার একাংশে শুইয়া ছিলেন এবং এই শয্যার উপরেই তিন-চারিটি ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি করিয়া খেলা করিতেছিল। নীচে কানাইলাল প্রদীপের আলোকের সম্মুখে বসিয়া ভূগোল মুখস্থ করিতেছিল—অর্থাৎ বই খুলিয়া হাঁ করিয়া হুড়োহুড়ি দেখিতেছিল। ওধারে শয্যার উপর হরিচরণ শিয়রে আলো জ্বালিয়া চিত হইয়া নিবিষ্টচিত্তে বই পড়িতেছিল। বোধ করি পাশের পড়া তৈরি করিতেছিল, কারণ এত গণ্ডগোলেও তাহার লেশমাত্র ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতেছিল না। যে শিশুর দলটি এতক্ষণ চেঁচামেচি করিয়া বিছানার উপর খেলিতেছিল ইহারা সকলেই মেজকর্তা হরিশের সন্তান।

বিপিন সহসা সরিয়া আসিয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, আজ আমার ডান দিকে শোবার পালা, না বড়মা?

কিন্তু বড়মা জবাব দিবার পূর্বেই নীচে হইতে কানাই ডাক দিযা বলিল, না বিপিন, তুমি না। বড়মার ডান দিকে আমি শোব যে।

বিপিন প্রতিবাদ করিল, তুমি কাল শুয়েছিলে যে মেজদা?

কাল শুয়েছিলাম? আচ্ছা, আচ্ছা, আজ তবে বাঁ দিকে।

যেই বলা, অমনি পটলের ক্ষুদ্র মস্তক লেপের ভিতর হইতে উঁচু হইয়া উঠিল, সে এতক্ষণ প্রাণপণে চুপ করিয়া জ্যাঠাইমার বাঁ দিক ঘেঁষিয়া পড়িয়াছিল। বেদখল হইবার সম্ভাবনায় অমন হুড়োমুড়িতে পর্যন্ত যোগ দিতে ভরসা করে নাই। সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমি এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে আছি যে!

কানাই অগ্রজের অধিকার লইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, পটল! বড়ভাইয়ের সঙ্গে তর্ক ক'রো না বলচি! মাকে বলে দেব!

পটল বেচারা অত্যন্ত বেগতিক দেখিয়া এবার জ্যাঠাইমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া নালিশ করিল, বড়মা, আমি কখন থেকে শুয়ে আছি যে!

কানাই ছোটভাইয়ের স্পর্ধায় চোখ পাকাইয়া 'পটল' বলিয়া গর্জিয়া উঠিয়াই হঠাৎ থামিয়া গেল।

ঠিক এইসময়ে ঘরের বাহিরের বারান্দার একপ্রান্ত হইতে শৈলজার কণ্ঠস্বর আসিল ওরে বাপ রে! দিদির ঘরে কি ডাকাত পড়েচে!

সঙ্গে সঙ্গে কি পরিবর্তন! ও-বিছানায় হরিচরণ পাঠ্যপুস্তকটা ধাঁ করিয়া বালিশের তলায় গুঁজিয়া দিয়া এবার বোধ করি একখানা অপাঠ্য পুস্তক খুলিয়া বসিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—চোখে তাহার জ্বলন্ত মনোযোগ। কানাই বাঁ দিক ডান দিকের সমস্যা আপাততঃ নিষ্পত্তি না করিয়াই চীৎকার জুড়িয়া দিল—'যে বিস্তীর্ণ জলরাশি—', আর সবচেয়ে আশ্চর্য ওই শিশুর দলটি! ভোজবাজির মত কোথায় তাহারা যে একমুহূর্তে অন্তর্ধান হইয়া গেল তাহার চিহ্ন পর্যন্ত রহিল না। শৈলজা কলিকাতা হইতে এইমাত্র ফিরিয়া বড়জার জন্য একবাটি গরম দুধ হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। এখন কানাইলালের 'মহাসমুদ্রের গভীর কল্লোল' ব্যতীত ঘর সম্পূর্ণ স্তব্ধ। ওদিকে হরিচরণ এমন পড়াই পড়িতে লাগিল যে, তাহার পিঠের উপর দিয়া হাতি চলিয়া গেলেও সে ভ্রূক্ষেপ করিত না। কারণ ইতিপূর্বে সে 'আনন্দমঠ' পড়িতেছিল। তাহার ভবানন্দ জীবানন্দ ছোটখুড়ীমার আকস্মিক শুভাগমনে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার

হাতের কসরতটা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন কি না এবং তাহাই ঠিক অবগত না হওয়া পর্যন্ত তাহার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল।

শৈলজা কানাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, ওরে ওই 'বিস্তীর্ণ জলরাশি' এতক্ষণ হচ্ছিল কি?

কানাই মুখ তুলিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত-কণ্ঠে চিঁচিঁ করিয়া বলিল, আমি নয় মা, বিপিন আর পটল।

কারণ ইহারাই তাহার বাঁ দিক ডান দিকের মকদ্দমায় প্রধান শত্রু। সে অসঙ্কোচে এই দুটি নিরপরাধীকে বিমাতার হস্তে অর্পণ করিল।

শৈলজা বলিল, কাউকে ত দেখচি নে, এরা সব পালাল কোথা দিয়ে?

এবারে কানাই বিপুল উৎসাহে দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত বাড়াইয়া বিছানা দেখাইয়া বলিল, কেউ পালায় নি মা, সব ঐ নেপের মধ্যে ঢুকেচে।

তাহার কথা ও মুখচোখের চেহারা দেখিয়া শৈলজা হাসিয়া উঠিল। দূর হইতে সে ইহার গলাটাই বেশী শুনিতে পাইয়াছিল। এবার বড়জাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দিদি, খেয়ে ফেললে যে তোমাকে! হাত তোমার না ওঠে, একবার ধমকাতেও কি পার না? ওরে, ওই সব ছেলেরা—বেরো—চল্ আমার সঙ্গে।

সিদ্ধেশ্বরী কিছুক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন, এখন মৃদুকণ্ঠে ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিলেন, ওরা নিজের মনে খেলা কচ্চে, আমাকে বা খেয়ে ফেলবে কেন, আর তোর সঙ্গেই বা যাবে কেন? না না, আমার সামনে কাউকে তোর মারধর কত্তে হবে না। যা, তুই এখান থেকে- লেপের ভেতর ছেলেরা হাঁপিয়ে উঠচে।

শৈলজা একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি কি শুধুই মারধর করি দিদি?

বড্ড করিস শৈল! ছোট বোনের মত তিনি নাম ধরিয়া ডাকিতেন। বলিলেন, তোকে দেখলে ওদের মুখ যেন কালিবর্ণ হয়ে যায়—আচ্ছা যা না বাপু তুই সুমুখ থেকে—ওরা বেরুক।

আমি ওদের নিয়ে যাব। অমন করে দিবারাত্রি জ্বালাতন করলে তোমার অসুখ সারবে না। পটল সবচেয়ে শান্ত, সে শুধু তার বড়মার কাছে শুতে পাবে, আর সবাইকে আজ থেকে আমার কাছে শুতে হবে, বলিয়া শৈলজা জজ-সাহেবের মত রায় দিয়া বড়জায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি এখন ওঠো—দুধ খাও—হাঁ রে হরি, সাড়ে-ছ'টার সময় তোর মাকে ওষুধ দিয়েছিলি ত?

প্রশ্ন শুনিয়া হরিচরণের মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল। সে সন্তানদিগের সঙ্গে এতক্ষণ বনেজঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, দেশ উদ্ধার করিতেছিল, তুচ্ছ ঔষধ-পথ্যের কথা তাহার মনেও ছিল না। তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

কিন্তু সিদ্ধেশ্বরী রুষ্টস্বরে বলিয়া উঠিলেন, ওষুধ-টষুধ আর আমি খেতে পারব না শৈল।

তোমাকে বলিনি দিদি, তুমি চুপ কর, বলিয়া হরিচরণের বিছানার অত্যন্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, তোকে জিজ্ঞেস কচ্চি, ওষুধ দিয়েছিলি?

তিনি ঘরে ঢুকিবার পূর্বেই হরিচরণ জড়সড় হইয়া উঠিয়া বসিয়াছিল, ভীতকণ্ঠে বলিল, মা খেতে চান না যে!

শৈলজা ধমক দিয়া উঠিল, ফের কথা কাটে! তুই দিয়েছিলি কি না, তাই বল?

খুড়ীর কঠোর শাসন হইতে ছেলেকে উদ্ধার করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বরী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, কেন তুই এত রাত্তিরে হাঙ্গামা কত্তে এলি বল ত শৈল? ওরে ও হরিচরণ, দিয়ে যা না শিগ্গির কি ওষুধ-টষুধ আমাকে দিবি!

হরিচরণ একটু সাহস পাইয়া ব্যস্তভাবে শয্যার অপর প্রান্তে নামিয়া পড়িল এবং দেরাজের উপর হইতে একটা শিশি ও ছোট গেলাস হাতে করিয়া জননীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ছিপি খুলিবার উদ্যোগ করিতেই শৈলজা সেইখান হইতে বলিল, গেলাসে ওষুধ ঢেলে দিলেই হ'লো, না রে হরি? জল চাইনে, মুখে দেবার কিছু চাইনে, না? এ ব্যাগার-ঠ্যালা কাজ তোমাদের আমি বা'র কচ্চি।

ঔষধের শিশিটা হাতে করিতে পাইয়া হরিচরণের হঠাৎ ভরসা হইয়াছিল, বোধ করি ফাঁড়াটা আজিকার মত কাটিয়া গেল। কিন্তু এই 'মুখে দিবার কিছু'র প্রশ্নে তাহা উবিয়া গেল। সে নিরুপায়ের মত এদিকে ওদিকে চাহিয়া করুণকণ্ঠে বলিল, কোথাও কিছু নেই যে খুড়ীমা!

না আনলে কোথাও কিছু কি উড়ে আসবে রে?

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, ও কোথায় কি পাবে যে দেবে? এসব কি পুরুষ-মানুষের কাজ? শৈলর যত শাসন এই ছেলেদের ওপরে। নীলিকে বলে যেতে পারিস নি? সে মুখপোড়া মেয়ে তুই আসা পর্যন্ত এ ঘর একবার মাড়ায় না—একবার চেয়ে দেখে না, মা মরচে কি বেঁচে আছে।

সে কি ছিল দিদি, সে আমার সঙ্গে পটলডাঙায় গিয়েছিল যে।

কেন গেল? কোন্ হিসেবে তুই তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলি? দে, হরিচরণ, তুই ওষুধ ঢেলে দে—আমি অমনি খাব, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী অনুপস্থিত কন্যার উপর সমস্ত দোষটা চাপাইয়া দিয়া ঔষধের জন্য হাত বাড়াইলেন।

একটু থাম হরি, আমি আনচি, বলিয়া শৈল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুই

হরিশের স্ত্রী নয়নতারা বিদেশে থাকিয়া বেশ একটু সাহেবিয়ানা শিখিয়াছিল। ছেলেদের সে বিলাতী পোশাক ছাড়া বাহির হইতে দিত না। আজ সকালে সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিকে বসিয়াছিলেন, কন্যা নীলাম্বরী ঔষধের তোড়জোড় সুমুখে লইয়া বসিয়াছিল, এমন সময় নয়নতারা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দিদি, দরজি অতুলের কোট তৈরি করে এনেচে, কুড়িটা টাকা দিতে হবে যে।

সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক ভুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, জামার দাম কুড়ি টাকা?

নয়নতারা একটু হাসিয়া বলিল, এ আর বেশী কি দিদি? আমার অতুলের এক-একটি সুট তৈরি করতে ষাট-সত্তর টাকা লেগে গেছে।

'সুট' কথাটা সিদ্ধেশ্বরী বুঝিলেন না, চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বুঝাইয়া বলিল, কোট, প্যান্ট, নেকটাই—এইসব আমরা সুট বলি।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষুব্ধভাবে মেয়েকে বলিলেন, নীলা, তোর খুড়ীমাকে ডেকে দে, টাকা বা'র করে দিয়ে যাক।

নয়নতারা বলিল, চাবিটা দাও না—আমিই বা'র করে নিচ্ছি।

নীলা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল—সে-ই বলিল, মা কোথা পাবেন, লোয়ার সিন্দুকের চাবি বরাবর খুড়ীমার কাছে থাকে, বলিয়া চলিয়া গেল।

কথা শুনিয়া নয়নতারার মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কহিল, ছোটবৌ এতদিন ছিল না, তাই বুঝি দিন-কতক সিন্দুকের চাবি তোমার কাছে ছিল দিদি?

সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক করিতে শুরু করিয়াছিলেন, জবাব দিলেন না।

মিনিট-দশেক পরে টাকা বাহির করিয়া দিতে শৈলজা যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন অতুলের নূতন কোট লইয়া রীতিমত আলোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে। অতুল কোটটা গায়ে দিয়া ইহার কাটছাঁট প্রভৃতি বুঝাইয়া দিতেছে এবং তাহার মা ও হরিচরণ মুগ্ধচক্ষে চাহিয়া ফ্যাশন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করিতেছে।

অতুল বলিল, ছোটখুড়ীমা, তুমি দেখ ত কেমন তৈরি করেচে।

শৈল সংক্ষেপে বেশ বলিয়া সিন্দুক খুলিয়া কুড়িটা টাকা গণিয়া তাহার হাতে দিল।

নয়নতারা উপস্থিত সকলকে শুনাইয়া নিজের ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, তোর তোরঙ্গভরা পোশাক, তবু তোর আর কিছুতেই হয় না।

ছেলে অধীরভাবে জবাব দিল, কতবার বলব মা তোমাকে? আজকালকার ফ্যাশন এইরকম। কাটছাঁট অন্ততঃ একটাও এরকমের না থাকলে লোকে হাসবে যে! বলিয়া টাকা লইয়া বাহিরে যাইতেছিল, হঠাৎ থামিয়া বলিল, আমাদের হরিদা যা গায়ে দিয়ে বাইরে

যায়, দেখে আমারই লজ্জা করে। এখানে ঝুলে আছে, ওখানে কুঁচকে আছে—ছি ছি, কি বিশ্রীই দেখায়! তারপর হাসিয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিল, ঠিক যেন একটা পাশবালিশ হেঁটে যাচ্ছে!

ছেলের ভঙ্গী দেখিয়া নয়নতারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। নীলা মুখ ফিরাইয়া হাসি চাপিতে লাগিল।

হরিচরণ করুণচক্ষে ছোটখুড়ীর মুখপানে চাহিয়া লজ্জায় মাথাটা হেঁট করিল।

সিদ্ধেশ্বরী নামেমাত্র আহ্নিক করিতেছিলেন, ছেলের মুখ দেখিয়া ব্যথা পাইলেন। রাগ করিয়া বলিলেন, সত্যিই ত! ওদের প্রাণে কি সাধ-আহ্লাদ থাকতে নেই শৈল? দে না, বাছাদের সব দুটো জামাটামা তৈরি করিয়ে।

অতুল মুরুব্বির মত হাত নাড়িয়া বলিল, আমাকে টাকা দাও জ্যাঠাইমা, আমার দরজিকে দিয়ে দস্তুরমত তৈরি করিয়ে দেব—বাবা আমাকে ফাঁকি দেবার জো নেই।

নয়নতারা পুত্রের হুঁশিয়ারি সম্বন্ধে কি-একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার পূর্বেই শৈল গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল, তোমাকে জ্যাঠামো করতে হবে না বাবা, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গে। ওদের জামা তৈরি করবার লোক আছে। বলিয়া আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নয়নতারা সক্রোধে বলিল, দিদি, ছোটবোর কথা শুনলে? কেন, কি অন্যায় কথাটা অতুল বলেচে শুনি?

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না। বোধ করি, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন, তাই শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু শৈল শুনিতে পাইল। সে দু পা পিছাইয়া আসিয়া মেজজায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, ছোটবোর কথা দিদি অনেক শুনেচে—তুমিই শোননি। অতুল ছোটভাই হয়ে হরিকে যেমন করে ভ্যাঙালে, আর তুমি খিলখিল করে হাসলে—ও আমার পেটের ছেলে হলে আজ ওকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলতুম। বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ঘর-সুদ্ধ সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। খানিক পরে নয়নতারা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বড়জাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, দিদি, আজ আমার অতুলের জন্মবার, আর ছোটবৌ যা মুখে এল তাই বলে তাকে গাল দিয়ে গেল!

সিদ্ধেশ্বরী দুই জায়ের কলহের সূচনায় নিঃশব্দে সভয়ে ইষ্টনাম জপিতে লাগিলেন।

নয়নতারা জবাব না পাইয়া পুনরায় কহিল, তুমি নিজে কিছু না করে দিলে আমাদেরই যা হোক একটা উপায় করে নিতে হবে।

তথাপি সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না। তখন নয়নতারা ছেলেকে লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু মিনিট-দশেক পরে সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক সারিয়া গাত্রোত্থান করিতেই মেজবৌ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কবাটের আড়ালে অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

সিদ্ধেশ্বরী সভয়ে শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি মেজবৌ?

নয়নতারা কহিল, সেই কথাই জানতে এসেছি। আমি কারুর খাইনে পরিনে দিদি যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ বুজে ঝাঁটা খাবো।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বিনীতভাবে বলিলেন, ঝাঁটা মারবে কেন মেজবৌ, ওর ঐরকম কথা। তা ছাড়া তোমাকে ত বলেনি, শুধু—

শুধু অতুলকে জ্যান্ত পুঁততে চেয়েছিল। আর আমি খিলখিল করে হাসি! শাগ দিয়ে মাছ ঢেকো না দিদি—আবার ঝ্যাঁটা লোকে কি করে মারে? ধরে মারেনি বলে বুঝি তোমার মন ওঠেনি?

সিদ্ধেশ্বরী অবাক হইয়া গেলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন, ও কি কথা মেজবৌ? আমি কি তাকে শিখিয়ে দিয়েচি?

মেজবৌ চাবির ব্যাপার হইতেই অন্তরে জ্বলিয়া মরিতেছিল, উদ্ধতভাবে জবাব দিল, সে তুমিই জানো। কেউ কারো মন জানতে যায় না দিদি, চোখে দেখে, কানে শুনেই বলতে হয়। আমরা নূতন লোক, তোমার সংসারে এসে পড়ে যদি আপদ-বালাই হয়ে থাকি, বেশ ত, তুমি নিজে বললেই ত ভাল হয়, আর একজনকে লেলিয়ে দেওয়া কেন?

এ অভিযোগের উত্তর সিদ্ধেশ্বরীর মুখে যোগাইল না, তিনি বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন।

মেজবৌ অধিকতর কঠোরস্বরে কহিল, আমরাও ঘাস খাইনে দিদি, সব বুঝি। কিন্তু এমন করে না তাড়িয়ে দুটো মিষ্টি কথায় বিদেয় করলেই ত দেখতে শুনতে ভাল হয়, আমরাও স-মানে চলে যাই। উঃ—উনি শুনলে একেবারে আকাশ থেকে পড়বেন! যাকে তাকে বলে বেড়ান, আমাদের বৌঠাকরুন মানুষ নয়—সাক্ষাৎ ঠাকুরদেবতা!

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। রুদ্ধস্বরে বলিলেন, এমন অপবাদ আমার শত্তুরেও দিতে পারে না মেজবৌ! এসব কথা ঠাকুরপোকে শোনানোর চেয়ে আমার মরণ ভাল। তোমরা এসেচ বলে আমার কত আহ্লাদ—আমার কানাই পটলকে আনো, আমি তাদের মাথায় হাত দিয়ে—

কথাটা শেষ হইল না। শৈল একবাটি দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আহ্নিক হয়েচে— একটু দুধ খাও দিদি।

সিদ্ধেশ্বরী কান্না ভুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, বেরো আমার সুমুখ থেকে—দূর হয়ে যা।

হঠাৎ শৈল থতমত খাইয়া চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, তোর যা মুখে আসবে তাই লোককে বলবি কেন?

কাকে কি বলেচি?

সিদ্ধেশ্বরী এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, তেমনি চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেন, আমাকে বলে বলে তোর বুক বেড়ে গেছে—কে তোর কথার ধার ধারে লা? সবাইকে তুই দিদি পেয়েচিস? দূর হ আমার সুমুখ থেকে।

শৈল সহজভাবে বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, দুধ খেয়ে নাও, আমি যাচ্ছি। এ বাটিটাও আমার দরকার।

তাহার নিরুদ্বিগ্ন কথা শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিলেন, খাবো না কিচ্ছু খাবো না, তুই যা। হয় তুই বাড়ি থেকে বেরো, না হয় আমি বেরোই দুটোর একটা না করে আমি জলস্পর্শ করব না।

শৈল তেমনি সহজ গলায় বলিল, আমি এই সেদিন এসেচি দিদি এখন যেতে পারব না। তার চেয়ে বরং তুমিই গিয়ে আর দিনকতক কাটোয়ায় থাক গে—কাছেই গঙ্গা—অমনি বা'র করে নিয়ে গেলেই হবে। আচ্ছা মেজদি, কি তুচ্ছ কথা নিয়ে সকালবেলা তোলপাড় ক'চ্চ বল ত? জ্বরে জ্বরে দিদি আধমরা হয়ে রয়েছে, ওঁকে কেন বিঁধচ? আমি যদি দোষ করে থাকি, আমাকে বললেই ত হয়—কি হয়েচে বল?

সিদ্ধেশ্বরী চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিলেন, আজ অতুলের জন্মদিন, কেন তুই বাছাকে অমন কথা বললি?

শৈল হাসিয়া উঠিল, ওঃ, এই! কিছু ভয় করো না মেজদি—তোমার মত আমিও ত মা। আমার হরিচরণ, কানু, পটল যেমন, অতুলও তেমনি। মায়ের কথায় গাল লাগে না মেজদি, আচ্ছা, আমি তাকে ডেকে আশীর্বাদ করচি—নাও দিদি, তুমি খেয়ে নাও, আমি কড়া চড়িয়ে এসেচি।

সিদ্ধেশ্বরীর মুখে কান্নার সঙ্গে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, আচ্ছা, তোর মেজদির কাছেও ঘাট মান, তুই তাকেও মন্দ বলেচিস।

আচ্ছা মানচি, বলিয়া শৈল তৎক্ষণাৎ হেঁট হইয়া হাত দিয়া নয়নতারার পা ছুঁইয়া কহিল, যদি অন্যায় করে থাকি মেজদি, মাপ কর—আমি ঘাট মানচি।

নয়নতারা হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরীর বুকের ভারী বোঝা নামিয়া গেল। তিনি স্নেহে আনন্দে গলিয়া গিয়া নয়নতারার মত ছোটজায়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া মেজজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ পাগলীর কথায় কোনদিন রাগ ক'রো না মেজবৌ। এই আমাকেই দেখ না—ওকে বকি ঝকি

কত গালমন্দ করি; কিন্তু একদণ্ড দেখতে না পেলে বুকের ভেতরে কি যেন আঁচড়াতে থাকে—এত দুধ ত খেতে পারব না দিদি?

পারবে, খাও।

সিদ্ধেশ্বরী আর তর্ক না করিয়া জোর করিয়া সমস্তটা খাইয়া ফেলিয়া বলিলেন, এক্ষণি বাছাকে ডেকে আশীর্বাদ করিস শৈল।

এক্ষণি করচি, বলিয়া শৈল হাসিয়া খালি বাটিটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তিন

অতুল এমন অপ্রস্তুত জীবনে হয় নাই। শৈশব হইতে আদর-যত্নে লালিত পালিত; বাপ-মা কোনদিন তাহার ইচ্ছা ও অভিরুচির বিরুদ্ধে কথা কহিতেন না। আজ সকলের সম্মুখে এত বড় অপমান তাহার সর্বাঙ্গ বেড়িয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। সে বাহিরে আসিয়া নূতন কোটটা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া প্যাঁচার মত মুখ করিয়া বসিল।

আজ হরিচরণের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল অতুলের উপর। কারণ, তাহারই ওকালতি করিতে গিয়া সে লাঞ্ছিত হইয়াছে--তাই সেও তাহার পাশে আসিয়া মুখ ভারী করিয়া বসিল। ইচ্ছাটা—তাহাকে সান্ত্বনা দেয়; কিন্তু সময়োপযোগী একটা কথাও খুঁজিয়া না পাইয়া মৌন হইয়া রহিল।

কিন্তু অতুলের আর ত চুপ করিয়া থাকা চলে না। কারণ, অপমানটাই এ ক্ষেত্রে তাহার একমাত্র ক্ষোভের বস্তু নয়, সে বিদেশ হইতে অনেক ফ্যাশন, অনেক কোট-প্যান্ট নেক্‌টাই লইয়া ঘরে ফিরিয়াছে, নানা রকমে অনেক উঁচুতে তুলিয়া নিজের আসন বাঁধিয়াছে, আজ ছোটখুড়ীমার একটা তিরস্কারের ধাক্কায় অকস্মাৎ সমস্ত ভাঙিয়া-চুরিয়া একাকার হইয়া যায় দেখিয়া সে উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। হরিদাকে উদ্দেশ করিয়া সরোষে বলিল, আমি কারো কথার ধার ধারিনে বাবা! এ শর্মা অতুলচন্দর,--রেগে গেলে ওসব ছোটখুড়ী-টুড়ী কাউকে কেয়ার করে না!

হরিচরণ এদিকে ওদিকে চাহিয়া ভয়ে ভয়ে প্রত্যুত্তর করিল, আমিও করিনে—চুপ, কানাই আসছে। পাছে নির্বোধ অতুল উহারই সম্মুখে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বসে এই ভয়ে সে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কানাই দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া মোগল-বাদশার নকিবের মত উচ্চকণ্ঠে হাঁকিয়া কহিল, মেজদা, সেজদা, মা ডাকচেন—শিগ্‌গির।

হরিচরণ পাংশুমুখে কহিল, আমাকে? আমি কি করেচি? আমাকে কখ্‌খন নয়--যাও অতুল, ছোটখুড়ীমা ডাকচেন তোমাকে।

কানাই প্রভুত্বের স্বরে কহিল, দু'জনকেই--দু'জনকেই--এক্ষুণি--অ্যাঁ, সেজদা, তোমার নতুন কোট মাটিতে ফেলে দিলে কে?

প্রত্যুত্তরে সেজদা শুধু মেজদার মুখের পানে চাহিল, এবং মেজদা সেজদার মুখের পানে চাহিল। কেহই সাড়া দিল না। কানাই ভূলুণ্ঠিত কোটটা চেয়ারের হাতলে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

হরিচরণ শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আমার আর ভয় কি, আমি ত কিছু বলিনি—তুমিই বলেচ ছোটখুড়ীমাকে কেয়ার কর না—

আমি একা বলিনি, তুমিও বলেচ, বলিয়া অতুল সগর্বে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। ভাবটা এই যে, আবশ্যক হইলে সে সত্য কথা প্রকাশ করিয়া দিবে।

হরিচরণের চেহারা আরও খারাপ হইয়া গেল। একে ত ছোটখুড়ীমা যে কেন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন তাহা জানা নাই, তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানহীন অতুল কি যে বলিয়া ফেলিবে তাহাও আন্দাজ করা শক্ত। একবার ভাবিল, সেও পিছনে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সর্বপ্রকার নালিশের রীতিমত প্রতিবাদ করে। কিন্তু, কিছুই তাহার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া ভরসা হইল না। এদিকে হাজিরির সময় নিকটতর হইয়া আসিতেছে—কানাই শমন ধরাইয়া গিয়াছে, এবার

নিশ্চয় ওয়ারেন্ট লইয়া আসিবে। হরিচরণ আত্মরক্ষার উপস্থিত আর কোন সদুপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, সহসা গাড়ুটা হাতে তুলিয়া লইয়া বিশেষ একটা স্থানের উদ্দেশে সবেগে প্রস্থান করিল। ছোটখুড়ীমাকে বাড়ি-সুদ্ধ লোক বাঘের মত ভয় করিত।

অতুল ভিতরে ঢুকিয়া সংবাদ লইয়া জানিল, ছোটখুড়ীমা নিরামিষ-রান্নাঘরে আছেন। সে বুক ফুলাইয়া দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। কারণ, এ বাটীর অন্যান্য ছেলেদের মত সে এই ছোটখুড়ীমাটিকে চিনিবার অবকাশ পায় নাই। স্ত্রীলোকেও যে ইস্পাতের মত শক্ত হইতে পারে ইহা সে জানিতই না। অথচ, সাধারণ দুর্বলচিত্ত ও মৃদু আত্মীয়-আত্মীয়তার কাছে জন্মাবধি প্রশ্রয় পাইয়া তাহার মা, খুড়ী, জ্যাঠাই প্রভৃতি গুরুজন সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ইঁহাদিগের মুখের উপর শুধু কড়া জবাব দিতে পারিলেই কাজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছাটা খুব জোরে প্রকাশ করিতে পারা চাই। তাহা হইলেই ইঁহারা সায় দেন, অন্যথা দেন না। যে ছেলে ইহা না পারে তাহাকে চিরকাল ঠকিয়া মরিতেই হয়। এখানে আসিয়া অবধি সে হরিচরণের বেশভূষার অভাব লক্ষ্য করিয়া এই ফন্দিটা গোপনে তাহাকে শিখাইয়াও দিয়াছিল। অথচ, এইমাত্র নিজের বেলায় কোন ফন্দিই খাটে নাই, ছোটখুড়ীমার তাড়া খাইয়া কড়া জবাব ত ঢের দূরের কথা—কোনপ্রকার জবাবই মুখে যোগায় নাই—হতবুদ্ধির মত নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিল। তাই এখন ফিরিয়া গিয়া সমস্ত অপমান কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিবার অভিপ্রায়ে সে অমন মরিয়ার মত রান্নাঘরের দ্বারের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই স্থানটা হইতে শৈলজার মুখের কিয়দংশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, এমন কি মুখ তুলিলেই তিনি অতুলকে দেখিতে পাইতেন; কিন্তু রান্নায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় অতুলের পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলেন না, মুখ তুলিয়াও চাহিলেন না। কিন্তু অতুল খুড়ীমাকে আজ ভাল করিয়া দেখিল নিমিষমাত্র, তথাপি সে অনুভব করিল এ মুখ তাহার মায়ের নয়, জ্যাঠাইমার নয়—এ মুখের সুমুখে দাঁড়াইয়া নিজের অভিপ্রায় জোর করিয়া ব্যক্ত করিবার মত জোর আর যাহারই থাক, অন্ততঃ তাহার গলায় নাই। তাহার বিস্ফারিত বক্ষ আপনি কুণ্ঠিত হইয়া গেল এবং সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার এটুকু পর্যন্ত সাহস হইল না—কোনরকম সাড়া দিয়াও ছোটখুড়ীমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নীলা কি কাজে এই দিকে আসিতেছিল। হঠাৎ সেজদার পায়ের দিকে চাহিয়া সে থমকিয়া জিভ কাটিয়া দাঁড়াইল, এবং অলক্ষ্যে থাকিয়া ভীত ব্যাকুল ইঙ্গিতে পুনঃ পুনঃ তাহাকে জানাইতে লাগিল, জুতো পায় দিয়া দাঁড়াইবার স্থান ওটা নয়।

ছোটখুড়ীমার আনত-মুখের প্রতি কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া অতুল অন্তরে কন্টকিত হইয়া উঠিল। একবার মনে করিল নিঃশব্দে সরিয়া যায়, একবার ভাবিল, জুতা-জোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু ছোটবোনের সুমুখে ভয়ের লক্ষণ প্রকাশ করিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। এই নিষেধটা সে যথার্থই জানিত না এবং স্পর্ধাপূর্বক তাহা অমান্যও করে নাই। কিন্তু পিতামাতার কাছে নিরন্তর অবারিত ও অসঙ্গত প্রশ্রয়ে তাহার অভিমান এতই সূক্ষ্ম ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়া শেষে ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইতে তাহার মাথা কাটা যাইত। ভীত-বিবর্ণমুখে সেইখানে দাঁড়াইয়া নিজের সর্বনাশ উপলব্ধি করিয়াও সে অভিমানী দুর্যোধনের মত সূচাগ্র ভূমিও পরিত্যাগ করিতে পারিল না।

শৈলজা মুখ তুলিল। সস্নেহে মৃদু হাসিয়া বলিল, অতুল এসেচিস? দাঁড়া বাবা—ও কি রে! জুতো পায়ে? নীচে যা—নীচে যা—

বাড়ির আর কোন ছেলে অনুরূপ অবস্থায় শৈলজার হাতে এত সহজে নিষ্কৃতি পাইলে ছুটিয়া পলাইয়া বাঁচিত, কিন্তু অতুল ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শৈলজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, জুতো পায়ে দিয়ে এখানে আসতে নেই অতুল, নীচে যাও।

অতুল শুষ্কমুখে ক্ষীণস্বরে কহিল, আমি ত চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—এখানে দোষ কি?

শৈলজা ধমকাইয়া উঠিল, দোষ আছে—যাও।

অতুল তথাপি নড়িল না; সে মানস-চক্ষে দেখিতে লাগিল, হরিচরণ, কানাই, বিপিন প্রভৃতি আড়াল হইতে তাহার লাঞ্ছনা উপভোগ করিতেছে। তাই বজ্জাত ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, আমরা চুঁচড়ার বাড়িতে ত জুতো পায়ে দিয়েই রান্নাঘরে যেতুম—এখানে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ালে কিছু দোষ নেই।

ইহার স্পর্ধা দেখিয়া শৈলজা দুঃসহ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু তাহার দুই চোখ দিয়া যেন আগুন ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল।

ঠিক এইসময়ে হরিচরণের বড়ভাই মণীন্দ্র ডাম্বেল ও মুগুর ভাঁজিয়া ঘর্মাক্তকলেবরে বাইরে যাইতেছিল। শৈলজার চোখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে খুড়ীমা?

ক্রোধে শৈলজার মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা বাহির হইল না। নীলা দাঁড়াইয়াছিল, অতুলের পায়ের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, সেজদা জুতো পায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কিছুতে নাবছে না।

মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, এই—নেবে আয়!

অতুল গোঁ-ভরে বলিল, এখানে দাঁড়াতে দোষ কি? ছোটখুড়ী আমাকে দেখতে পারে না বলে শুধু যা যা কচ্চে।

মণীন্দ্র তড়াক্ করিয়া রকের উপর লাফাইয়া উঠিয়া অতুলের গণ্ডে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিয়া কহিল, 'ছোটখুড়ী' নয়--'ছোটখুড়ীমা'; 'কচ্চে' নয়—'কচ্চেন' বলতে হয়—ইতর কোথাকার!

একে মণীন্দ্র পালোয়ান লোক, চড়ের ওজনটাও ঠিক রাখিতে পারে নাই, অতুল চোখে অন্ধকার দেখিয়া বসিয়া পড়িল।

মণীন্দ্র ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেল। এতটা আঘাত করা সে ইচ্ছাও করে নাই, আবশ্যকও মনে করে নাই। ব্যস্তভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার হাতদুটা ধরিয়া দাঁড় করাইয়া দিবামাত্রই অতুল ক্রোধোন্মত্ত চিতাবাঘের মত মণীন্দ্রের গায়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া, আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া এমন সকল মিথ্যা সম্পর্ক ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, যাহা হিন্দুসমাজে থাকিয়া, জ্যাঠতুত-খুড়তুত ভায়ের মধ্যে হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। মণি প্রথমটা বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে মেডিক্যাল কলেজের উঁচু ক্লাসে পড়ে এবং বয়সে ছোট ভাইদের চেয়ে অনেকটাই বড়। তাহারা বড়ভাইয়ের সুমুখে দাঁড়াইয়া চোখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে না। এ বাড়িতে ইহাই সে চিরকাল দেখিয়া আসিয়াছে। কেহ যে এইসমস্ত অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ উচ্চারণ করিতে পারে ইহা তাহার কল্পনারও অগোচর। আর তাহার হিতাহিত জ্ঞান রহিল না—অতুলের ঘাড় ধরিয়া সজোরে তাহাকে সানের উপর নিক্ষেপ করিয়া, লাথি মারিয়া মারিয়া ঠেলিয়া উপর হইতে প্রাঙ্গণের উপর ফেলিয়া দিল। কানাই, বিপিন, পটল প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা রৈরৈ শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। মণীন্দ্রের মা সিদ্ধেশ্বরী আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, মেজবধূ নির্জন ঘরে বসিয়া গোটা-দুই সন্দেশ গালে দিয়া জল খাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—গোলমাল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে নীলবর্ণ হইয়া গেলেন। মুখের সন্দেশ ফেলিয়া দিয়া, মড়াকান্না তুলিয়া ঝাঁপাইয়া আসিয়া ছেলের উপর উপুড় হইয়া পড়িলেন। সমস্তটা মিলিয়া এমনি একটা গণ্ডগোল উঠিল যে, বাহির হইতে কর্তারা কাজকর্ম ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শৈলজা রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, মণি, তুই বাইরে যা। বলিয়া, পুনরায় নিজের কাজে মন দিল। মণি নিঃশব্দে চলিয়া গেল। তাহার পিতা মেজবৌমার উন্মাদ ভঙ্গী দেখিয়া লজ্জা পাইয়া প্রস্থান করিলেন।

এই মহামারী ব্যাপার কতকটা শান্ত হইয়া গেলে, হরিশ ছেলেকে প্রশ্ন করিলেন।

অতুল কাঁদিতে কাঁদিতে ছোটখুড়ীর প্রতি সমস্ত দোষারোপ করিয়া কহিল, ও বড়দাকে মারতে শিখিয়ে দিলে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

হরিশ চীৎকার করিয়া বলিলেন, ছোটবৌমা, মণিকে যে তুমি খুন করতে শিখিয়ে দিলে, কেন শুনি?

নীলা রান্নাঘরের ভিতর হইতে ছোটখুড়ীর হইয়া জবাব দিল, সেজদা কথা শোনেন নি, আর বড়দাকে গালাগালি দিয়েচেন, তাই।

নয়নতারা ছেলের তরফ হইতে বলিল, তবে আমিও বলি ছোটবৌ—তোমার হুকুমে ওকে মেরে ফেলছিল বলেই প্রাণের দায়ে ও গাল দিয়েচে, নইলে গাল দেবার ছেলে ত আমার অতুল নয়!

নয়ই ত! বলিয়া সায় দিয়া হরিশ আরও রুদ্ধস্বরে জানিতে চাহিলেন—তোর ছোট-খুড়ীকে জিজ্ঞাসা কর্ নীলা, উনি কে যে অতুলকে মারতে হুকুম দেন? কথা যখন ও না শুনেছিল, তখন কেন আমাদের কাছে নালিশ না করা হল? আমরা উপস্থিত থাকতে উনি শাসন করতে গেলেন কেন?

নীলা এই তিনটি প্রশ্নের একটারও উত্তর দিল না।

সিদ্ধেশ্বরী এতক্ষণ বারান্দার একধারে অবসন্নের মত চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পীড়িত দেহে এই উত্তেজনা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছিল। একে ত, এ সংসারে তিনি ছেলে-পুলে মানুষ করা ছাড়া সহজে কোন বিষয়েই কথা কহিতে চাহিতেন না, কারণ তাঁহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ভগবান এ বাটীর সম্বন্ধে সুবিচার করেন নাই। তাঁহাকে বড়বধূ এবং গৃহিণী করিয়াও উপযুক্ত বুদ্ধি দেন নাই, অথচ শৈলকে সকলের ছোট এবং ছোটবৌ করিয়াও রাশিপ্রমাণ বুদ্ধি দিয়াছেন। হিসাব করিতে, চিঠিপত্র লিখিতে, কথাবার্তা কহিতে, রোগে শোকে চারিদিকে নজর রাখিতে, সকলকে শাসন করিতে, রাঁধিতে-বাড়িতে, সাজাইতে-গুছাইতে ইহার জুড়ি নাই। তিনি প্রায়ই বলিতেন, শৈল আমার পুরুষমানুষ হইলে এতদিনে জজ হইত। সেই শৈলকে যখন মেজকর্তা কটূক্তি করিতে লাগিলেন, তখন হঠাৎ বোধ করি, ভগবান তাঁহার মাথার মধ্যে গৃহিণীর কর্তব্যবুদ্ধি গুঁজিয়া দিয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরী একটু রুক্ষস্বরে বলিয়া ফেলিলেন, বেশ ত মেজঠাকুরপো, তাই যদি হয়, তবে তুমিই বা আমাদের কাছে নালিশ না করে নিজে শাসন করছ কেন? মা বেঁচে, আমি বেঁচে—ঝি-বৌকে শাসন করতে হয় আমরা করব! তুমি পুরুষমানুষ, ভাশুর—ও কি কথা —বাইরে যাও। লোকে শুনলে বলবে কি!

হরিশ লজ্জা পাইয়া বলিলেন, তুমি সবদিকে দৃষ্টি রাখলে ভাবনা কি বৌঠাকরুন! তা হলে কি একজন আর একজনকে বাড়ির মধ্যে হত্যা করে ফেলতে পারে? বলিয়া বাইরে যাইবার উপক্রম করিতেই তাঁহার স্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন, বেশ ত, দাঁড়িয়ে দেখই না, উনি ঝি-বৌকে কেমন শাসন করেন।

হরিশ সে কথার আর জবাব না দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চার

দিন-পাঁচেক পরে সকাল হইতেই মেজগিন্নীদের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী তাহা লক্ষ্য করিয়া দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিনিট-খানেক নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, আজ এসব কি হচ্চে মেজবৌ।

নয়নতারা উদাসভাবে জবাব দিল, দেখতেই ত পাচ্চ।

তা ত পাচ্চি। কোথায় যাওয়া হবে?

নয়নতারা তেমনিভাবে কহিল, যেখানে হোক।

তবু, কোথায় শুনি?

কি করে জানব দিদি, কোথায়? উনি বাসা ঠিক করতে বেরিয়েছেন, ফিরে না এলে ত বলতে পারিনে।

তোমার ভাশুর শুনেচেন?

তাঁকে শুনিয়ে কি হবে? যাঁর শোনা দরকার, সেই ছোটগিন্নী শুনেচেন, আড়ালে দাঁড়িয়ে একবার দেখেও গেছেন।

এটা নয়নতারার মিছে কথা। শৈলজার এই সকাল বেলাটায় নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না—সে কিছুই জানিত না।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দেখ মেজবৌ, এই ভাশুরের মান-মর্যাদা তোমরা বুঝলে না, কিন্তু বাইরের লোককে জিজ্ঞাসা করলে শুনতে পাবে, অনেক জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যার ফলেই এমন ভাশুর পাওয়া যায়, নইলে পাওয়া যায় না।

নয়নতারা সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; বলিল, আমরা সে কথা কি জানিনে দিদি? দুজনে দিবারাত্রি বলাবলি করি, শুধু ভাশুর নয়, অনেক পুণ্যে এমন বড়জা মেলে। তোমার বাড়িতে আমরা ঘরদোর ঝাঁট দিয়ে চাকরদের মত থাকতে পারি, কিন্তু এখানে আর একদণ্ড বাস করতে পারব না।

আজ নয়নতারার কণ্ঠস্বরে এমন একটু আন্তরিকতার আভাস সিদ্ধেশ্বরীর কানে বাজিল যে, তিনি আর্দ্র হইয়া পড়িলেন। কহিলেন, এ আমার বাড়ি ত নয় মেজবৌ, বাড়ি তোমাদেরই। কোনমতেই তোমাদের আমি আর কোথাও যেতে দিতে পারব না।

নয়নতারা ঘাড় নাড়িয়া করুণকণ্ঠে কহিল, যদি কখন ভগবান তেমন দিন দেন দিদি, তা হলে তোমার কাছে এসেই আমরা থাকব; কিন্তু, এখানে একটি দিনও আর থাকতে ব'লো না দিদি। আমার অতুল হয়েচে সকলের চক্ষুশূল; অনুমতি দাও, তাকে নিয়ে আমরা সরে যাই।

সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, সে কি কথা মেজবৌ? দৈবাৎ একদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেছে বলে কি সেই কথা মনে রাখতে আছে? অতুল আমাদের ছেলে--

কথাটা শেষ হওয়া পর্যন্তও নয়নতারা ধৈর্য ধরিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল—কোন কথা মনে রাখতে পারিনে বলে কত বকুনি খেয়ে মরি দিদি। ঐ যখন হ'লো, তখনই হাউমাউ করে কেঁদেকেটে মরি, কিন্তু একদণ্ড পরে আমি যে গঙ্গাজল সেই গঙ্গাজল—একটি কথাও আমার স্মরণ থাকে না। আমি ত সমস্ত ভুলেই গিয়েছিলুম; কিন্তু রাগ করতে পাবে না দিদি—তুমি যতই বল, আমাদের ছোটবৌ সহজ মেয়ে নয়! বাড়িসুদ্ধ সবাইকে শিখিয়ে দিয়েচে, সেই থেকে কেউ আমার অতুলের সঙ্গে কথাটি কয় না। বাছা মুখ চুন করে বেড়ায় দেখেই ত জিজ্ঞেসা করে শুনতে পেলুম। না দিদি, এখানে আমাদের থাকা চলবে না। এক বাড়িতে থেকে ছেলে আমার অমন মন গুমরে গুমরে বেড়ালে ব্যামোতে পড়বে। তার চেয়ে অন্য কোন স্থানে চলে যাওয়াই মঙ্গল। তারও হাড় জুড়োয়, আমিও দুটো নিশ্বেস ফেলে বাঁচি। বলিয়া ছেলের দুঃখে নয়নতারার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, তাহা সিদ্ধেশ্বরীকেও গলাইয়া দিল। কোন ছেলের কোন দুঃখ সহিবার ক্ষমতাই তাঁহার ছিল না। আঁচল দিয়া মেজবৌর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে এতবড় কঠিন শাস্তি দিবার এত সহজ কৌশল যে সংসারে থাকিতে পারে তাহা তিনি কল্পনা করিতেও পারিতেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বাছা রে! বাড়িতে কেউ কি অতুলের সঙ্গে কথা কয় না, মেজবৌ?

নয়নতারাও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, জিজ্ঞেস করেই দেখ না দিদি।

হরিচরণকে সেইখানে ডাকাইয়া আনিয়া সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন। হরিচরণ তেজের সহিত তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ও ছোটলোকটার সঙ্গে কে কথা কইবে, মা? বড়দাকে যা মুখে আসে তাই বলে; ছোটখুড়ীমাকে গালাগালি দেয়!

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ প্রত্যুত্তর করিতে পারিলেন না। একটু পরে কহিলেন, যা হয়ে গেছে তার আর উপায় কি হরি; যাও, ডেকে কথা কও গে।

হরিচরণ মাথা নাড়িয়া বলিল, ওর কথা বলবার ভাবনা নেই মা! পাড়ার আস্তাবলে অনেক গাড়োয়ান আছে সেইখানে যাক, ঢের বন্ধুবান্ধব জুটে যাবে।

নয়নতারা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তোর মুখও ত নেহাত কম নয় হরি; তুই এমন কথা আমাদের বলিস! আচ্ছা, সেই ভাল! আমরা গাড়োয়ানদের সঙ্গেই মেলামেশা করতে যাব। ওঠো দিদি, জিনিসপত্রগুলো চাকরটা বেঁধেছেঁদে নিক্।

হরিচরণ মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, অতুল সকলের সুমুখে দাঁড়িয়ে কান মলবে, নাকখত দেবে, তবে আমরা কথা ক'ব। তা নইলে ছোটখুড়ীমা—না, মা, সে আমরা কেউ পারব না। বলিয়াই আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

মেজবৌ মৃদুকণ্ঠে কহিল, ছোটবৌ একবার যদি ছেলেদের ডেকে বলে দেয়, তা হলে সমস্ত গোলই মিটে যায়!

সিদ্ধেশ্বরী ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তা যায়।

মেজবৌ কহিল, তবেই দেখ দিদি। এইসব ছেলেরা বড় হয়ে তোমাকে মানবে, না ভালবাসবে? বলা যায় না ভবিষ্যতের কথা—নিজের ছেলেমেয়েরা তোমার পর হয়ে যাচ্চে, কিন্তু আমার অতুল-টতুলকে তোমরা যে যাই বল, তাদের মা-অন্ত প্রাণ। আমি বললে, সাধ্যি কি তার এমন করে ঘাড় নেড়ে তেজ করে বেরিয়ে যায়! এতটা বাড়াবাড়ি কিন্তু ভাল নয় দিদি।

সিদ্ধেশ্বরী এত কথায় বোধ করি মন দিতে পারেন নাই; নিরীহভাবে জবাব দিলেন, তা বটে। এ বাড়ির মণি থেকে পটল পর্যন্ত সবাই ঐ শৈলর বশে। সে যা বলবে যা করবে, তাই হবে—কেউ আমাকে মানেও না।

এটা কি ভাল?

সিদ্ধেশ্বরী মুখ তুলিয়া বলিলেন, কোন্‌টা?—ওরে ও নীলা, তোর খুড়ীমাকে একবার ডেকে দে ত মা।

নীলা কি কাজে এইদিকে আসিতেছিল, ফিরিয়া গেল। নয়নতারা আর কথা কহিল না, সিদ্ধেশ্বরীও উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

শৈলজা ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, জিনিসপত্র বাঁধা হয়েছে—এরা তবে চলে যাক?

শৈল কিছুই জানিত না, একটু ভীত হইয়া কহিল, কেন?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, তা বৈ কি—কি পাষাণ প্রাণ তোর শৈল! তোর হুকুমে কেউ অতুলের সঙ্গে খেলা করে না, কথাবার্তা পর্যন্ত কয় না—কি করে বাছার দিন কাটে, শুনি? আর নিজের ছেলের দিবারাত্রি শুকনো মুখ দেখে বাপ-মাই বা কেমন করে এখানে বাস করে? তুই এদের তা হলে এ বাড়িতে রাখতে চাসনে বল্‌?

নয়নতারা চিমটি কাটিয়া কহিল, তা হলে হয়ত সবদিকেই ছোটবৌর হয় ভাল।

শৈলজা এ কথা কানে তুলিল না। সিদ্ধেশ্বরীকে কহিল, অমন ছেলের সঙ্গে আমি বাড়ির কোনও ছেলেকেই মিশতে দিতে পারিনে দিদি। ও যে কি মন্দ হয়ে গেছে, তা মুখে বলা যায় না।

নয়নতারা আর সহ্য করিতে পারিল না। ক্রুদ্ধ সর্পিণীর মত মাথা তুলিয়া গর্জিয়া উঠিল—হতভাগী, মায়ের মুখের সামনে তুই অমন করে ছেলের নিন্দে করিস! দূর হ আমার ঘর থেকে। মুখ যেন তোর খসে যায়।

আমি ইচ্ছে করে কখন তোমার ঘর মাড়াই নে মেজদি। কিন্তু তুমি এমনি করেই ছেলের মাথাটি খেয়ে বসে আছ। বলিয়া শৈল শান্তভাবে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বহুক্ষণ পর্যন্ত বিহ্বলের মত বসিয়া রহিলেন। কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুতেই যেন ভাবিয়া পাইলেন না।

নয়নতারা সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাদের মায়া-মমতা ত্যাগ কর দিদি, আমরা সরে যাই। এঁরা মায়ের পেটের ভাই বলেই তুমি এমন করে আমাদের টেনে বেড়াচ্চ; কিন্তু ছোটবৌর এতটুকু ইচ্ছে নয়—আমরা এ বাড়িতে থাকি।

সিদ্ধেশ্বরী এ কথার জবাব না দিয়া বলিলেন, ওরা যা বলচে, অতুল কেন তাই করুক না। সেও ত ভাল কাজ করেনি মেজবৌ!

আমি কি বলচি—সে ভাল কাজ করেচে দিদি? জ্ঞানবুদ্ধি থাকলে কেউ কি বড়ভাইকে গালাগালি দেয়! আচ্ছা, আমি তার হয়ে তোমাদের সকলের পায় নাকখত দিচ্ছি, বলিয়া নয়নতারা মাটিতে সজোরে নাক ঘষিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, তাকে তোমরা মাপ করো দিদি, তার মুখ দেখে বুক আমার ফেটে যাচ্ছে—বলিয়া নয়নতারা আর একবার বোধ করি মাটিতে নাক ঘষিতে যাইতেছিল—সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিয়া নিজেও চোখ মুছিলেন।

দুপুরবেলা রান্নাঘরে বসিয়া সিদ্ধেশ্বরী অনেক বলিয়া কহিয়া, অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াও শৈলকে রাজী করাইতে না পারিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোর মনের কথা খুলেই বল্ না শৈল, মেজবৌরা চলে যাক।

প্রত্যুত্তরে শৈল মুখ তুলিয়া একবার চাহিল মাত্র। সে চাহনি সিদ্ধেশ্বরীকে অধিকতর ক্রুদ্ধ করিয়া দিল; বলিলেন, আপনার মার পেটের ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের নিয়ে থাকি, আর লোকে আমাদের মুখে চুনকালি দিক। আমার সংসারে বনিয়ে না চলতে পার, যেখানে সুবিধে হয়, সেইখানে তোমরা চলে যাও--আমি আর পারিনে। ওদের চেয়ে তোমরা ত বাপু আমার বেশী আপনার নও। বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ করি, তাহার মনে মনে আশা ছিল, এইবার শৈলজা নরম হইয়া আসিবে। কিন্তু সে যখন একটা কথারও জবাব না দিয়া নিঃশব্দে নিজের মনে হাতা-বেড়ি নাড়িয়া চাড়িয়া রান্না করিতেই লাগিল, তখন তিনি যথার্থই মহাক্রোধভরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

দুপুরবেলা বড়কর্তা আহারে বসিলে, সিদ্ধেশ্বরী পাখার বাতাস করিতে করিতে দুঃখে অভিমানে পরিপূর্ণ হইয়া সেই কথাই তুলিলেন; কহিলেন, মেজবৌদের আর ত এ বাড়িতে থাকা পোষায় না দেখছি। আজ সকাল থেকেই তাদের জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি হচ্ছে।

গিরীশ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, তা বৈ কি! এমনি ত ছোটবৌয়ের সংগে এক তিলার্ধ বনে না, তার ওপর ছোটবৌ বাড়িতে সব ছেলেকে শিখিয়ে দিয়েছে—কেউ অতুলের সংগে কথা কয় না। সে বেচারা এই ক'দিনে শুকিয়ে যেন অর্ধেক হয়ে গেছে—

এইসময়ে শৈলজা দুধের বাটি-হাতে দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং কাপড়-চোপড় আর একবার ভাল করিয়া সামলাইয়া লইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পাতের কাছে বাটি রাখিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে শুনাইয়া বলিলেন, এই যে ছোটবৌ—বলিয়াই লক্ষ্য করিলেন, শৈল নিজের নাম শুনিয়া অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

ও-পক্ষের দোষ যতই হোক, অতুল ও তাহার জননীর দুঃখে সিদ্ধেশ্বরীর মাতৃহৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল। কোনমতে একটা মিটমাট হইলেই তিনি বাঁচেন। কিন্তু শৈল কিছুতেই বাগ মানিতেছে না দেখিয়া তাঁহার শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাই আজ তাহাকে শাস্তি দিতেই তিনি কোমর বাঁধিয়াছিলেন; বলিলেন, এই যে শৈল এখন থেকেই ভায়ে ভায়ে অসদ্ভাব করে দিচ্চে, বড় হলে এরা ত লাঠালাঠি মারামারি করে বেড়াবে—এটা কি ভাল?

কর্তা ভাতের গ্রাস মুখে পুরিয়া বলিলেন, বড় খারাপ।

সিদ্ধেশ্বরী কহিতে লাগিলেন, ওর জন্যেই ত মণি অতুলকে অমন করে ঠ্যাঙগালে। আচ্ছা সে-ও মেরেচে, ও-ও গাল দিয়েচে—চুকেবুকে গেল, আবার কেন! আবার কেন ছেলেদের কথা কইতে নিষেধ করে দেওয়া? আজ তুমি মণি হরিকে ডেকে বলে দিয়ো--তারা যেন অতুলের সংগে কথাবার্তা বলে, নইলে ওরা চলে গেলে যে পাড়ার লোকে আমাদের মুখে চুনকালি দেবে। সত্যিই ত আর ছোটবৌয়ের জন্যে মায়ের পেটের ভাই-ভাজকে তুমি ছাড়তে পাররে না!

তা ত নয়ই, বলিয়া তিনি আহার করিতে লাগিলেন।

আচ্ছা, ছোটঠাকুরপো কি কোনদিন কিছু রোজগার করবার চেষ্টা করবে না? এমনি করেই কি চিরটা কাল কাটাবে?

স্বামীর প্রসংগ উত্থিত হইবামাত্রই শৈলজা কানে হাত দিয়া দ্রুতপদে নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। কর্তা কি জবাব দিলেন, তাহা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না। কান পাতিয়া এইসকল প্রসংগ সে কোনদিন শুনিত না এবং শুনিতে ইচ্ছাও করিত না। কারণ, তাহার মনে মনে যথেষ্ট আশংকা ছিল, তাহার স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। অথচ সত্যকে সে আজীবন ভালবাসিত। তাহা প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক বলিতে বা শুনিতে কোনদিনই মুখ ফিরাইত না। কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে কেমন করিয়া যে সে তাহার স্বভাবটিকে লংঘন করিয়া গিয়াছিল তাহা বলা সুকঠিন।

পাঁচ

সিদ্ধেশ্বরী যত বড় ক্রোধের উপরেই স্বামীর কাছে নালিশ করিতে শুরু করুন, শৈলকে দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল—কাজটা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইয়া

গেল! স্বামী লইয়া খোঁটা দিলে শৈলর দুঃখ এবং অভিমানের অবধি থাকিত না তাহা তিনি জানিতেন।

স্ত্রীকে চুপ করিয়া যাইতে দেখিয়া কর্তা মুখ তুলিয়া চাহিলেন; এবং কহিলেন, আমি বেশ করে ধমকে দেব'খন। বলিয়া আহার সমাধা করিয়া পান চর্বণ করিবার সময়টুকুর মধ্যেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

বস্তুতঃ গিরীশের স্বভাবটা অদ্ভুত রকমের ছিল। আদালত মকদ্দমা ব্যতীত কিছুই তাঁহার মনে স্থান পাইত না। বাটীর মধ্যে কি ঘটিতেছে, কে আসিতেছে, কে যাইতেছে, কি খরচ হইতেছে, ছেলেরা কি করিতেছে, কিছুই তিনি তত্ত্ব লইতেন না। টাকা রোজগার করিতেন এবং ভালোমন্দ সব কথাতেই সায় দিয়া, যা হোক একটা মতামত প্রকাশ করিয়া কর্তব্য সম্পাদন করিতেন।

সুতরাং 'ধমকে দেব'খন' বলিয়া কর্তা যখন কর্তার কর্তব্য শেষ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন, তখন সিদ্ধেশ্বরী কথাও কহিলেন না; কাহাকে ধমকাইবেন—কেন ধমকাইবেন—জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

নয়নতারা পাশের ঘরে আড়ি পাতিয়া সমস্ত শুনিতেছিল, ভাশুর এবং বড়জায়ের মন্তব্য শুনিয়া পুলকিত-চিত্তে প্রস্থান করিল। কিন্তু মিনিট-কয়েক পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, অমন করে বসে কেন দিদি, বেলা হ'ল, যা হোক চাট্টি মুখে দেবে চল।

সিদ্ধেশ্বরী উদাসভাবে বলিলেন, বেলা আর কোথায়—এই ত সবে এগারোটা।

এগারোটা কি সোজা বেলা দিদি? তোমার এই অসুখ শরীরে যে বেলা ন'টার মধ্যেই খাওয়া দরকার।

সিদ্ধেশ্বরীর এখন খাওয়া-দাওয়ার কথাবার্তা কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। বলিলেন তা হোক মেজবৌ, আমি কোনদিনই এত শিগ্‌গির খাইনে—আমার একটু দেরি আছে।

নয়নতারা ছাড়িল না, কাছে আসিয়া হাত ধরিল। কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা ঢালিয়া দিয়া কহিল, এইজন্যেই ত পিত্তি পড়ে দেহের এই আকার! আমার হাতে হেঁসেল থাকলে আমি ন'টা পেরুতে দিই? তুমি না বাঁচলে কার আর কি দিদি, আমাদেরই সর্বনাশ। নাও চল যা হোক দুটো তোমাকে খাইয়ে দিয়ে একটু সুস্থির হই।

নয়নতারা এক মাসের অধিককাল এখানে আসিয়াছে; এবং বড়জায়ের জন্য প্রত্যহ এই দারুণ অস্থিরতা ভোগ করা সত্ত্বেও কেন যে এতদিন নিজেকে সুস্থির করিবার চেষ্টা করে নাই, সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে তাহার কারণ বুঝিলেন। কিন্তু কৈতববাদের এমনি মহিমা সমস্ত বুঝিয়াও, আর্দ্রচিত্তে কহিলেন, তুমি আপনার জন বলেই এ কথাটি আজ বললে মেজবৌ; নইলে কে আর আমার আছে বল!

নয়নতারা হাত ধরিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে রান্নাঘরে লইয়া গেল এবং নিজের হাতে ঠাঁই করিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া, বামুনঠাকরুনের দ্বারা ভাত বাড়াইয়া আপনি সম্মুখে ধরিয়া দিল।

নিরামিষ দিকের রান্না শৈলজা রাঁধিত। মেজবৌ নীলাকে ডাকিয়া কহিল, তোর ছোটখুড়ীকে বল্ গে ও-হেঁসেলে কি আছে এনে দিতে।

মিনিট-খানেক পরে শৈল আসিয়া তরকারি প্রভৃতি সিদ্ধেশ্বরীর পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া নীরবে বাহির হইয়া যাইতেছিল—তিনি মেজজাকে লক্ষ্য করিয়া রোগীর কণ্ঠে চিঁচিঁ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমরা এইসঙ্গে কেন বসলে না মেজবৌ?

মেজবৌ কহিল, আমরা ত আর তোমার মত মরতে বসিনি দিদি। তুমি খেয়ে ওঠো আমি তোমার পাতেই বসব। শৈলজার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে কহিল, না দিদি, আমি বেঁচে থাকতে কিন্তু আমাদের ফাঁকি দিয়ে তোমাকে পালাতে দেব না তা বলে দিচ্চি। একটুখানি চুপ করিয়া, ছোটবৌ কত দূরে আছে দেখিয়া লইয়া কহিল এরা দু'জনে যেমন সহোদর, আমরাও ত তেমনি দুটি বোন। যেখানে যতদূরেই থাকি না কেন দিদি, আমি যত নাড়ীর টানে তোমার জন্যে কেঁদে মরব, আর কি কেউ তেমন করে

কাঁদবে? অপরে করবে নিজের ভালোর জন্যে, কিন্তু আমি করব ভেতর থেকে। তুমি এই যে বললে দিদি, আমি ছাড়া তোমার আর কেউ সত্যিকার আপনার জন নেই—এই কথাটি যেন কোনদিন ভুলে যেও না।

সিদ্ধেশ্বরী বিগলিত-কণ্ঠে কহিলেন, এ কি ভোলবার কথা মেজবৌ? এতদিন যে তোমাকে চিনতে পারিনি তার শাস্তিই ত ভগবান আমাকে দিচ্চেন।

মেজবৌ চোখের জল আঁচলে মুছিয়া কহিল, শাস্তি যা-কিছু ভগবান যেন আমাকেই দেন, দিদি। সমস্ত দোষ আমার, আমিই তোমাকে চিনিনি। একটুখানি থামিয়া পুনরায় কহিল, আজ যদি বা জানতে পেলুম, আমরা তোমার পায়ের ধুলোর যোগ্য নই, কিন্তু জানাবো সে কথা কি করে দিদি? তোমার কাছে থেকে তোমার সেবা করব, ভগবান সে দিন ত আমাকে দিলেন না। আমরা হয়েচি যে ছোটবোর দু'চক্ষের বিষ!

সিদ্ধেশ্বরী উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তা হলে সে যেন তার ছেলেপিলে নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে থাকে। আমি তার সাতগুষ্টিকে দুধেভাতে খাওয়াব কি নিজের সর্বনাশ করবার জন্যে? খুড়তুত ভাই, ভাজ, তাদের ছেলেপুলে—এই সম্পর্ক। ঢের খাইয়েচি, ঢের পরিয়েচি—আর না; দাসী-চাকরের মত মুখ বুজে আমার সংসারে থাকতে পারে থাক, না হয় চলে যাক।

অদূরে চৌকাঠ ধরিয়া শৈল দাঁড়াইয়া ছিল, সিদ্ধেশ্বরী তাহা স্বপ্নেও মনে করেন নাই। হঠাৎ তাহার আঁচলের চওড়া লাল পাড়টা প্রদীপ্ত অগ্নিরেখার মত সিদ্ধেশ্বরীর চোখের উপর জ্বলিয়া উঠিতেই, তিনি গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, ঠিক পাশের কবাটের চৌকাঠ ধরিয়া সে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া এতক্ষণের সমস্ত কথোপকথন শুনিতেছে। চক্ষের পলকে ভয়ে তাঁহার আহারের রুচি চলিয়া গেল; এবং এই মেজবৌকে তাহার সমস্ত আত্মীয়তার সহিত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তিনি আর কোথাও ছুটিয়া পলাইতে পারিলেই যেন এ যাত্রা রক্ষা পান--তাঁহার এমনি মনে হইল।

মেজবৌ মহা উদ্বিগ্নস্বরে কহিল, ও কি দিদি, শুধু হাত নাড়চ—খাচ্চ না যে?

সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধকণ্ঠে শুধু বলিলেন, না।

মেজবৌ কহিল, আমার মাথা খাও দিদি, আর দুটি খাও—

তাহার কথাটা শেষ না হইতেই সিদ্ধেশ্বরী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, কেন মিছে কতকগুলো বকচ মেজবৌ, আমি খাব না—যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে, বলিয়া সহসা ভাতের থালাটা ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন।

নয়নতারা হাঁ করিয়া কাঠের পুতুলের মত চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কিন্তু বিহ্বল হইয়া নিজের ক্ষতি করিবার লোক সে নয়। সিদ্ধেশ্বরী উঠিয়া গিয়া যেখানে মুখ ধুইতে বসিয়াছিলেন, তথায় গিয়া সে তাঁহার হাত ধরিয়া বিনীত-কণ্ঠে কহিল, না জেনে অন্যায় যদি কিছু বলে থাকি দিদি, আমি মাপ চাইচি। তুমি রোগা শরীরে উপোস করে থাকলে, আমি সত্যি বলচি, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

সিদ্ধেশ্বরী নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। ফিরিয়া গিয়া যা পারিলেন নীরবে আহার করিয়া উঠিয়া গেলেন।

কিন্তু নিজের ঘরে বসিয়া অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, আজ এত ব্যথা তিনি শৈলকে দিলেন কি করিয়া? এবং ইহার অনিবার্য শাস্তিস্বরূপ সে যে এইবার তাহার সেই অতি কঠোর উপবাস শুরু করিয়া দিবে ইহাতেও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় রহিল না। সুতরাং দুপুরবেলা নীলাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিতে পাইলেন, খুড়ীমা ভাত খাইতে বসিয়াছেন, তখন তাঁহার আহ্লাদ কতটুকু হইল বলা যায় না, কিন্তু বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। শৈল তাহার চিরদিনের স্বভাব অতিক্রম করিয়া কি করিয়া যে অকস্মাৎ এমন শান্ত এবং ক্ষমাশীল হইয়া উঠিল তাহা কোনমতেই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

গিরীশ এবং হরিশ দুই ভাই আদালত হইতে ফিরিয়া সন্ধ্যার সময় একত্রে জল খাইতে বসিলেন। সিদ্ধেশ্বরী অদূরে ম্লানমুখে বসিয়া ছিলেন—আজ তাঁহার দেহ-মন কিছুই ভালো ছিল না।

গৃহিণীর মুখের পানে চাহিয়াই গিরীশের সকালের কথা স্মরণ হইল। সব কথা মনে না হোক, রমেশকে বকিতে হইবে—তাহা মনে পড়িল। দ্বারের কাছে নীলা দাঁড়াইয়া ছিল—তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন, তোর ছোটকাকাকে ডেকে আন্ নীলা।

সিদ্ধেশ্বরী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, তাকে আবার কেন?

কেন? তাকে রীতিমত ধমকে দেওয়া দরকার। বসে বসে সে যে একেবারে জানোয়ার হয়ে গেল।

হরিশ ইংরাজী করিয়া বলিলেন, অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।

সিদ্ধেশ্বরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, না—না, বৌঠান, তুমি তাকে আর প্রশ্রয় দিয়ো না—সে আর ছেলেমানুষটি নয়।

সিদ্ধেশ্বরী জবাব দিলেন না, রুষ্টমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রমেশ তখন বাটীতেই ছিল—দাদার আহ্বানে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। গিরীশ তাহার মুখের প্রতি চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, অতুলের সঙ্গে তুই ঝগড়া করেচিস কেন?

রমেশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, ঝগড়া করেচি?

গিরীশ ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, আলবত করেচিস। বলিয়া গৃহিণীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, বড়গিন্নী বলছিলেন, তুই যা মুখে আসে, তাই বলে তাকে গালমন্দ করেচিস। ও কি আমাকে মিথ্যা কথা বললে?

রমেশ অবাক হইয়া সিদ্ধেশ্বরীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী গর্জিয়া উঠিলেন, তোমার কি ভীমরতি ধরেচে? কখন তোমাকে বললুম ছোটঠাকুরপো অতুলকে গালমন্দ করেছে?

হরিশ ভ্রম সংশোধন করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, না—না, সে ছোটবৌমা।

তখন গিরীশ বলিলেন, ছোটবৌমাই বা কেন গালমন্দ করবেন শুনি?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি সক্রোধে অস্বীকার করিয়া কহিলেন, সেই বা কেন অতুলকে গালমন্দ করবে! সেও করেনি। আর যদি করেই থাকে, তাকে বলব আমি। তুমি ছোটঠাকুরপোকে খোঁচা দিচ্চ কেন?

গিরীশ কহিলেন, আচ্ছা, তাই যেন হ'লো, কিন্তু তুই হতভাগা এমনি অপদার্থ যে, খড়ের দালালি করে আমার চার-চার হাজার টাকা উড়িয়ে দিলি. আর দেখ গে যা বাগবাজারের খাঁ-দের। এই খড়ের দালালিতে ক্রোড়পতি হয়ে গেল।

হরিশ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, খড়ের দালালি?

রমেশ কহিল, আজ্ঞে না, পাটের।

গিরীশ রাগিয়া বলিলেন, তারা আমার মক্কেল—আমি জানিনে, তুই জানিস? খড়ের দালালি করেই তারা বড়লোক। বিলাতে জাহাজ-জাহাজ খড় পাঠাচ্ছে।

হরিশ এবং রমেশ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল।

গিরীশ তাহাদের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, না হয় পাটই হ'লো। এই পাটের দালালি করে তুই কি দু'শ এক'শও করে আনতে পারিস নে? তোমাদের আমি ত চিরকালটা বসে বসে খাওয়াতে পারব না! 'যে মাটিতে পড়ে লোক ওঠে তাই ধরে।' একবার চার হাজার গেছে—গেছেই। কুছ পরোয়া নেই—আর চার হাজার দাও। না হয়, আরো চার হাজার দাও। তা বলে, আমি খেটে মরব, আর তুমি বসে বসে খাবে?

হরিশ মনে মনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, সব কাজ শিখতে হয়; নইলে, পাটের দালালি ত করলেই হয় না! বার বার এই টাকা নষ্ট করা ত ঠিক নয়।

গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, নয়ই ত। আমি পাটের দালালি-টালালি বুঝিনে. তোমাকে খড়ের দালালি কাল থেকে শুরু করতে হবে। সকালে আমি ব্যাঙ্কের ওপর আট হাজার টাকার চেক দেব। চার হাজার টাকার খড় কিনবে, চার হাজার টাকা জমা থাকবে। এটা নষ্ট হলে তবে ও-টাকায় হাত দেবে—তার আগে নয়। বুঝলে? আমি তোমাদের বসে বসে খাওয়াতে পারব না—যাও।

রমেশ নীরবে চলিয়া গেলে হরিশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এই আট হাজার টাকাই জলে গেল ধরে রাখুন। কি বল বৌঠান?

সিদ্ধেশ্বরী চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব না পাইয়া হরিশ দাদার দিকে চাহিয়া কহিলেন, টাকাটা কি সত্যিই ওকে দেবেন নাকি?

গিরীশ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সত্যি কি রকম?

হরিশ বলিলেন, এই সেদিন চার হাজার টাকা জলে দিলে, আবার আট হাজার সেই জলেই ফেলতে দেবেন, এ যেন আমি ভাবতেই পারিনে।

গিরীশ কহিলেন, তা হলে তুমি কি রকম করতে বল?

হরিশ বলিলেন, রমেশ ব্যবসা-বাণিজ্যের জানে কি দাদা? আট হাজার দিন, আর আট লাখই দিন, আটটা পয়সাও ফিরিয়ে আনতে পারবে না—আমি বাজি রেখে বলতে পারি। এই টাকাটা উপার্জন করে জমাতে কত সময় লাগে একবার ভেবে দেখুন দেখি!

গিরীশ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন, ঠিক ঠিক, ঠিক বলেচ। ওকে টাকা দেওয়া মানেই জলে ফেলা, ঠিক ত। ও কি আবার একটা মানুষ?

হরিশ উৎসাহ পাইয়া কহিতে লাগিলেন, তার চেয়ে বরং একটা চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নিয়ে করুক। যার যেমন ক্ষমতা তার তেমনই করা উচিত। এই যে ছেলেদের পড়াবার জন্যে আমাকে মাসে ২৫ টাকা মাস্টারকে দিতে হচ্চে, এ কাজটাও ত ওর দ্বারা হতে পারে। সেই টাকাটা সংসারে দিয়েও আমাদের কতক সাহায্য করতে পারে। কি বল বৌঠান?

কিন্তু বৌঠান জবাব দিবার পূর্বেই গিরীশ খুশী হইয়া বলিলেন, ঠিক, ঠিক কথা বলেচ হরিশ। কাঠবিড়াল নিয়ে রামচন্দ্র সাগর বেঁধেছিলেন যে। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, দেখেচ বড়বৌ, হরিশ ঠিক ধরেছে। আমি বরাবর দেখেচি কিনা ছেলেবেলা থেকেই ওর বিষয়-বুদ্ধিটা ভারী প্রখর। ভবিষ্যৎ ও যত ভেবে দেখতে পারে এমন কেউ নয়। আমি ত আর একটু হলেই এতগুলো টাকা নষ্ট করে ফেলেছিলাম। কাল থেকেই রমেশ ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ করে দিক। খবরের কাগজ নিয়ে সময় নষ্ট করবার দরকার নেই।

সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, টাকাটা কি তবে দেবে না নাকি?

নিশ্চয় না। তুমি বল কি, আবার নাকি আমি টাকা দিই তাকে?

তবে এমন কথা বলাই বা কেন?

হরিশ কহিলেন, বললেই যে দিতে হবে তার কোন মানে নাই বৌঠান। আমিও ত দাদার সহোদর, আমারও ত একটা মতামত নেওয়া চাই! সংসারে টাকা নষ্ট হলে আমারও ত গায়ে লাগে!

সেইটেই তোমার আসল কথা ঠাকুরপো, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

ছয়

সিদ্ধেশ্বরীর সেবার ভার নয়নতারা গ্রহণ করিয়াছিল। সে সেবা এমনি নিরেট, এমনি ভরাট যে, তাহার কোন এতটুকু ফাঁক দিয়া আর কাহারও কাছে ঘেঁষিবার জো ছিল না। সিদ্ধেশ্বরী এমন সেবা তাঁর এতখানি বয়সে কখনও কাহারও কাছে পান নাই। তবুও কেন যে তাঁহার অশান্ত মন অনুক্ষণ শুধু ছল ধরিয়া কলহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল এ রহস্য জানিত শুধু অন্তর্যামী। সেদিন সকালে সিদ্ধেশ্বরী ছয়মাসের রোগীর মত টলিয়া টলিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্রান্ত-দুর্বলকণ্ঠে, বোধ করি বা সুমুখের দেয়ালটাকেই উপলক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনার জন বটে মেজবৌ, সে না থাকলে আমাকে দেখচি বেঘোরে মরতে হয়। এমনি সেবাযত্ন আমার মায়ের পেটের বোন থাকলে করতে পারত না।

শৈল ঘরের ভিতরে রাঁধিতেছিল, সমস্তই শুনিতে পাইল। এই কয়টা দিন সে বড়জায়ের ঘরেও যায় নাই, তাঁহার সঙ্গে কথাও কহে নাই। এখনও চুপ করিয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী পুনরায় শুরু করিলেন, আর অপরকে খাওয়ানো-পরানো শুধু অধর্মের ভোগ—ভস্মে ঘি ঢালা। অসময়ে কোন কাজেই আসে না। আর এই আমার মেজবৌ। মুখের

কথাটি খসাতে হয় না, হাঁ-হাঁ করে এসে পড়ে। আমি হে'টে গেলে তার বুকে বাজে। আমার পোড়া কপাল যে, এমন মানুষকেও আমি পরের ভাঙ্চি শুনে পর মনে করেছিলুম।

শৈলর চুড়ির শব্দ, হাতা-বেড়ি নাড়ার শব্দ সবই তাঁহার কানে আসিতেছে। এত কাছে থাকিয়াও সে যখন এতবড় মিথ্যা অভিযোগের কোন জবাব দিল না, তখন আর তাঁহার অধৈর্যের সীমা রহিল না। তাঁর চিঁচিঁ কণ্ঠস্বর একমুহূর্তেই প্রবল ও সতেজ হইয়া উঠিল; মায়ের কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেচে তা যে কারুকে দিয়ে একটুখানি পড়িয়ে শুনব, আমার সে জোটি পর্যন্ত নেই। পরকে খাওয়ান-পরান আমার কিসের জন্যে?

নীলা ছোটখুড়ীর কাছে বসিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেছিল; সেইখান হইতে কহিল, সে চিঠি যে মেজখুড়ীমা তোমাকে দু-তিনবার পড়ে শোনালেন মা! আবার কবে নতুন চিঠি এল?

তুই সব কথায় গিন্নীপনা করতে যাসনে নীলা, বলিয়া মেয়েকে একটা ধমক দিয়া সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন, চিঠি শুনলেই হ'লো। তার জবাব দিতে হবে না? কেন তোর ছোট-খুড়ী কি মরেছে যে আমি ও-পাড়ার লোক ডেকে এনে চিঠির জবাব লেখাব?

নীলাও রাগ করিয়া বলিল, চিঠি লেখবার কি আর কেউ নেই মা, যে আজ সংক্রান্তির দিনটায় তুমি খুড়ীমাকে মরিয়ে দিচ্চ?

আজ সংক্রান্তি, সে কথাটা সিদ্ধেশ্বরীর স্মরণ ছিল না। তিনি একমুহূর্তেই একেবারে পাংশু হইয়া বলিলেন, তুই যে অবাক করলি নীলা? বালাই, ষাট! মরবার কথা আমি তাকে আবার কখন বললুম লা? পেটের মেয়ে আমাকে মুখনাড়া দেয়! কাল যার বিয়ে দিয়ে এনে কোলেপিঠে মানুষ করলুম, সে আমার ছায়া মাড়ায় না; এত যে রোগে ভুগচি, তবুও ত আমার মরণ হয় না! আজ থেকে আর যদি একফোঁটা ওষুধ খাই ত আমার অতি বড়—

কান্নায় সিদ্ধেশ্বরীর কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। তিনি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে নিজের ঘরে গিয়া একেবারে মড়ার মত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

নয়নতারা পাশের বারান্দায় জানালার আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিল; এখন ধীরে ধীরে সিদ্ধেশ্বরীর ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বসিল। আস্তে আস্তে বলিল, একখানা চিঠির জবাব দেবার জন্য আবার তার খোশামোদ করতে যাওয়া কেন দিদি? আমাকে হুকুম করলে ত দশখানা জবাব লিখে দিতে পারতুম।

সিদ্ধেশ্বরী কথা কহিলেন না; পাশ ফিরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়া শুইলেন।

নয়নতারা একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে এখনি কি সেটা লিখে দিতে হবে দিদি?

সিদ্ধেশ্বরী হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, তুমি বড় বকাও মেজবৌ। বলচি, সে এখন থাক—সে তুমি পারবে না। তা না—

নয়নতারা রাগ করিল না। যেখানে কাজ আদায় করিতে হয়, সেখানে তার ক্রোধ-অভিমান প্রকাশ পাইত না। সে নীরবে উঠিয়া গেল।

বেলা দুটো-আড়াইটার সময় সিদ্ধেশ্বরী মেয়েকে ডাকিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর খুড়ীমা ভাত খেয়েছে রে?

নীলা আশ্চর্য হইয়া বলিল, খাবেন না কেন? রোজ যেমন খান, তেমনিই ত খেয়েছেন।

সিদ্ধেশ্বরী হু বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, শৈল চিবকালই অত্যন্ত অভিমানী। সামান্য কারণেই সে খাওয়া বন্ধ করিত এবং তাই লইয়া সিদ্ধেশ্বরীর যন্ত্রণার অবধি ছিল না। হাতে ধরিয়া খোশামোদ করিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া নানা প্রকারে তাহাকে প্রসন্ন করিতে হইত। অথচ, সেই শৈল এবার খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এত গঞ্জনাতেও কেন যে বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিতেছে না, ইহার কোন কারণই তিনি ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাহার এই ব্যবহার তাঁহার কাছে যতই অপরিচিত এবং অস্বাভাবিক ঠেকিতে লাগিল, ততই তিনি অন্তরের মধ্যে ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোনমতে একটা প্রকাশ্য কলহ হইয়া গেলেই তিনি বাঁচেন—কিন্তু তাহার ধার দিয়াও শৈল যায় না। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত সে তাহার নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যায়। তাহার আচরণে বাড়ির কেহ কিছুই দেখিতে পায় না;

শুধু যিনি দশ বছরের মেয়েটিকে বুক দিয়া মানুষ করিয়া আজ এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তিনিই কেবল ভয়ার্তচিত্তে অনুক্ষণ অনুভব করেন শৈলর চারিপাশে একটা নির্মম ঔদাসীন্যের গাঢ় মেঘ প্রতিদিনই পুঞ্জীভূত হইয়া তাহাকে শুধু ঝাপসা দুর্নিরীক্ষ্য করিয়াই আনিতেছে।

নীলা কহিল, মা, আমি যাই?

মা জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় শুনি?

নীলা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী তখন ক্রোধে উঠিয়া বসিয়া, চেঁচাইয়া কহিলেন, কোথায় যেতে হবে শুনি? ছোটখুড়ীর সঙ্গে তোর এত কি লা যে একদণ্ড আমার কাছে বসতে পারিস না? বসে থাক পোড়ারমুখী চুপ করে এইখানে। কোথাও তোকে যেতে হবে না। বলিয়া নিজেই ধপ্ করিয়া শুইয়া পড়িয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া রহিলেন।

নয়নতারা মৃদু-পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া সস্নেহ অনুযোগের স্বরে কহিল, ছি মা, বড় হয়েচ, দু'দিন পরে শ্বশুরঘর করতে চলে যাবে, এখন যে ক'দিন পাও বাপ-মায়ের সেবা করে নাও। মায়ের কাছে বসবে, দাঁড়াবে, সঙ্গে সঙ্গে থেকে দুটো ভালো কথা শিখে নেবে; এ সময়ে কি যার-তার সঙ্গে সারাদিন কাটানো উচিত? যাও, কাছে বসে দু'দণ্ড পায়ে হাত বুলিয়ে দাও, দিদি ঘুমিয়ে পড়ুন। রোগা শরীরে অনেকক্ষণ জেগে আছেন।

নীলা মেজখুড়ীর প্রতি প্রসন্ন ছিল না। মুখ তুলিয়া উত্তপ্তকণ্ঠে কহিল, বাড়ির মধ্যে যার-তার সঙ্গে আর কার সঙ্গে সারাদিন কাটাই মেজখুড়ীমা? তুমি কি খুড়ীমার কথা বলচ?

তাহার রুষ্ট আরক্ত মুখ লক্ষ্য করিয়া নয়নতারা বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, আমি কারো কথা বলিনি নীলা, আমি শুধু বলচি, তোমার রোগা মায়ের সেবাযত্ন করা উচিত।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ না ফিরাইয়া বলিলেন, সেবাযত্ন করবে! আমি ম'লেই বরঞ্চ ওরা বাঁচে।

নয়নতারা কহিল, ভাল, ওই না হয় ছেলেমানুষ, জ্ঞানবুদ্ধি নেই, কিন্তু ছোটবৌ ত ছেলেমানুষ নয়! তার ত বলা উচিত, যা নীলা, দু মিনিট গিয়ে তোর মায়ের কাছে বোস। না সে নিজে একবার আসবে, না মেয়েটাকে আসতে দেবে।

নীলা কি একটা জবাব দিতে গিয়া চাপিয়া গিয়া মুখ ভার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, তোমাকে সত্যি বলচি মেজবৌ, আমার এমন ইচ্ছে করে না যে শৈলর আর মুখ দেখি। আমার যেন সে দুটি চক্ষের বিষ হয়ে গেছে।

নয়নতারা কহিল, অমন কথা বলো না দিদি। হাজার হোক সে সকলের ছোট। তুমি রাগ করলে তাদের আর দাঁড়াবার জায়গা নেই, এ কথাটা ত মনে রাখতে হবে। ভাল কথা। এ মাসে উনি পাঁচ শ টাকা পেয়েছিলেন, তার খুচরো ক'টাকা নিজের হাতে রেখে বাকী টাকা তোমাকে দিতে দিলেন; এই নাও দিদি—বলিয়া নয়নতারা আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া পাঁচখানা নোট বাহির করিয়া দিল।

উদাস-মুখে সিদ্ধেশ্বরী হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিয়া বলিলেন, নীলা, যা তোর ছোট-খুড়ীমাকে ডেকে আন, লোহার সিন্দুকে তুলে রাখুক।

নয়নতারার মুখ কালিবর্ণ হইয়া গেল। এই টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা উপলক্ষ করিয়া সে কল্পনায় যে-সকল উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আগাগোড়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। শুধু যে সিদ্ধেশ্বরীর মুখে আনন্দের রেখাটি মাত্র ফুটিল না, তাহা নয়; এই টাকাটা তুলিবার জন্য অবশেষে এই ছোটবৌকেই কিনা ডাক পড়িল—সিন্দুকের চাবি এখনও তাহারই হাতে! বস্তুতঃ, এই টাকাটা দেওয়া সম্বন্ধে একটুখানি গোপন ইতিহাস ছিল। হরিশের দিবার ইচ্ছাই ছিল না, শুধু নয়নতারা মস্ত একটা জটিল সাংসারিক চাল চালিবার জন্যই স্বামীকে নিরন্তর খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া ইহা বাহির করিয়া আনিয়াছিল। এখন সিদ্ধেশ্বরীর এই নিস্পৃহ আচরণে এতগুলো টাকা ত জলে গেলই, উপরন্তু রোষে ক্ষোভে তাহার নিজের মাথাটা নিজের হাতে ভাঙিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিতে লাগিল।

শৈল আসিয়া উপস্থিত হইল। ছয়দিন পরে সে বড়জায়ের মুখের পানে চাহিয়া সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল, দিদি কি আমাকে ডাকছিলে?

শৈলর মুখের মাত্র এই দুটি কথার প্রশ্নই সিদ্ধেশ্বরীর কানের মধ্যে অজস্র মধু ঢালিয়া দিল। তিনি চক্ষের পলকে বিগলিতচিত্তে শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, হাঁ দিদি, ডাকছিলুম বৈ কি! অনেকগুলো টাকা বাইরে রয়েছে, তাই নীলাকে বললুম, যা মা, তোর খুড়ীমাকে একবার ডেকে আন, টাকাগুলো তুলে ফেলুক। এই নাও—বলিয়া তিনি শৈলর প্রসারিত ডান হাতের উপর নোট কয়খানি ধরিয়া দিলেন।

আজ আর তাঁহার এমন ইচ্ছা হইল না যে, বলেন, এ কখন কাহার কাছে পাওয়া।

শৈল আঁচলে-বাঁধা চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া ধীরে-সুস্থে টাকা তুলিতে লাগিল, চাহিয়া চাহিয়া নয়নতারার অসহ্য হইয়া উঠিল। তথাপি ভিতরের চাঞ্চল্য কোনমতে দমন করিয়া, একটুখানি শুষ্কহাসি হাসিয়া কহিল, তাই তোমার দেওর কাল আমাকে বললেন, দিদি, 'জাঠতুত-খুড়তুত ভাই নয়, মায়ের পেটের বড় ভাই। তাঁর খাব না, পরব না ত আর যাব কোথায়? তবু, মাসে মাসে এমনি পাঁচশ'-ছ'শ টাকা করেও যদি দাদাকে সাহায্য করতে পারি ত অনেক উপকার!' কি বল দিদি?

সিদ্ধেশ্বরীর হাসিমুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া শৈলর পানে চাহিয়া রহিলেন। নয়নতারা বোধ করি তাঁহার গাম্ভীর্যের হেতু অনুমান করিতে পারিল না। কহিল, শ্রীরামচন্দ্র কাঠবিড়াল নিয়ে সাগর বেঁধেছিলেন। তাই তিনি যখন-তখন বলেন, বড়বোঠান মুখ ফুটে যেন কারো কাছে কিছু চান না; কিন্তু তাই বলে কি নিজেদের বিবেচনা থাকবে না? যার যেমন শক্তি, কাজ ক'রে তাঁকে সাহায্য করা ত চাই। নইলে বসে বসে শুধু গুষ্টিবর্গ মিলে খাবো, বেড়াবো, আর ঘুমোবো, তা করলে কি চলে? তোমারও ত হরি-মণির জন্যে কিছু সংস্থান করে যাওয়া চাই! আমাদের জন্যে সর্বস্ব উড়িয়ে দিলে ত তোমার চলবে না! ঠিক কিনা, সত্যি করে বল দিদি?

সিদ্ধেশ্বরী মুখ ভার করিয়া বলিলেন, তা সত্যি বৈ কি!

শৈল সিন্দুক বন্ধ করিয়া সুমুখে আসিয়া সেই চাবিটা তাহার রিং হইতে খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিলেন, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া তীক্ষ্ণ-ধীরভাবে কহিলেন, এটা কি হ'লো ছোটবৌ?

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ক'দিন ধরেই ভেবে দেখেছিলুম দিদি, ও চাবি আমার কাছে রাখা আর ঠিক নয়। অভাবেই মানুষের স্বভাব নষ্ট হয়, আমার অভাব চারিদিকে—মতিভ্রম হতে কতক্ষণ, কি বল মেজদি?

নয়নতারা কহিল, আমি ত তোমার কোন কথাতেই নেই ছোটবৌ, আমাকে মিছে কেন জড়াও?

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, মতিভ্রমটা এতদিন হয়নি কেন, শুনতে পাই কি?

শৈল কহিল, একটা জিনিস হয়নি বলে যে কখনো হবে না, তার মানে নেই। এমনি ত তোমাদের শুধু আমরা খাচ্চি, পরচি। না পারি পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে, না পারি গতর দিয়ে সাহায্য করতে। কিন্তু তাই বলে কি চিরকাল করা ভালো?

সিদ্ধেশ্বরী রুদ্ধ রোষে মুখ রাঙ্গা করিয়া কহিলেন, এত ভাল কবে থেকে হলি লা? এত ভালমন্দর বিচার এতদিন তোদের ছিল কোথায়?

শৈল অবিচলিত-স্বরে বলিল, কেন রাগ করে শরীর খারাপ করচ দিদি? তোমারও আর আমাদের নিয়ে ভাল লাগচে না, আমার নিজেরও আর ভাল লাগচে না।

ক্রোধে সিদ্ধেশ্বরীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

নয়নতারা তাঁহার হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দিদির না হয় ভাল না লাগতে পারে, সে কথা মানি, কিন্তু তোমার ভাল লাগচে না কেন ছোটবৌ?

শৈল ইহার জবাব না দিয়াই বাহির হইয়া যাইতেছিল, সিদ্ধেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, বলে যা পোড়ারমুখী, কবে তুই বিদায় হবি—আমি হরির নোট দেব! আমার সোনার সংসার ঝগড়া-বিবাদে একেবারে পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে দিলি। মেজবৌ কি মিছে বলে যে, কোমরের জোর না থাকলে মানুষের এত তেজ হয় না? কত টাকা আমার তুই চুরি করেচিস, তার হিসেব দিয়ে যা।

শৈল ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ-চোখ অগ্নিকাণ্ডের মত মুহূর্তকালের জন্য প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু, পরক্ষণেই সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ছিন্ন-শাখার ন্যায় শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, হতভাগীকে আমি এতটুকু এনে মানুষ করেছিলুম মেজবৌ; সে আমাকে এমনি করে অপমান করে গেল! কর্তারা বাড়ি আসুন, ওকে আমি উঠানের মাঝখানে যদি না আজ জ্যান্ত পুঁতি ত আমার নাম সিদ্ধেশ্বরী নয়।

সাত

সিদ্ধেশ্বরীর স্বভাবে একটা মারাত্মক দোষ ছিল—তাঁহার বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ছিল না। আজিকার দৃঢ়নির্ভরতা কাল সামান্য কারণেই হয়ত শিথিল হইতে পারিত। শৈলকে তিনি চিরদিন একান্ত বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু, দিন-কয়েকের মধ্যেই নয়নতারা যখন অন্যরূপ বুঝাইয়া দিল, তখন তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল যে, কথাটা ঠিক যে, শৈলর হাতে টাকা আছে, এই টাকার মূল যে কোথায় তাহাও অনুমান করা তাঁহার কঠিন হইল না। তথাপি সে যে স্বামী-পুত্র লইয়া এই শহর অঞ্চলে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া কোনমতেই থাকিতে সাহস করিবে না ইহাও তিনি জানিতেন।

রাত্রে বড়কর্তা তাঁহার বাহিরের ঘরে বসিয়া, চোখে চশমা আঁটিয়া, গ্যাসের আলোকে নিবিষ্টচিত্তে জরুরী মকদ্দমার দলিলপত্র দেখিতেছিলেন, সিদ্ধেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া একেবারেই কাজের কথা পাড়িলেন। বলিলেন, তোমার কাজকর্ম করে লাভটা কি, আমাকে বলতে পার? কেবল শুয়ারের পাল খাওয়াবার জন্যেই কি দিবারাত্রি খেটে মরবে?

গিরীশের খাওয়ার কথাটাই বোধ করি শুধু কানে গিয়াছিল। মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, না, আর দেরি নেই। এইটুকু দেখে নিয়েই চল খেতে যাচ্চি।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, খাওয়ার কথা তোমাকে কে বলচে! আমি বলচি, ছোটবৌরা যে বেশ গুছিয়ে নিয়ে এবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্চেন। এতদিন যে তাদের এত করলে, সব মিছে হয়ে গেল সে খবর শুনেচ কি?

গিরীশ কতকটা সচেতন হইয়া বলিলেন, হুঁ, শুনেচি বৈ কি। ছোটবৌমাকে বেশ করে গুছিয়ে নিতে বল। সঙ্গে কে কে গেল—মণিকে—মকদ্দমার কাগজাদির মধ্যে অসমাপ্ত কথাটা এইভাবে থামিয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধে চেঁচাইয়া উঠিলেন—আমার একটা কথাও কি তোমার কানে তুলতে নেই? আমি কি বলচি, আর তুমি কি জবাব দিচ্চ। ছোটবৌরা যে বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে।

ধমক খাইয়া গিরীশ চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্চে?

সিদ্ধেশ্বরী তেমনি উচ্চকণ্ঠে জবাব দিলেন, কোথায় যাচ্ছে তার আমি কি জানি?

গিরীশ কহিলেন, ঠিকানাটা লিখে নাও না।

সিদ্ধেশ্বরী ক্ষোভে, অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, পোড়া কপাল! আমি নিতে যাব তাদের ঠিকানা লিখে! আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট না হবে ত তোমার হাতে পড়ব কেন? বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলে না কেন? বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বাপ-মা যে তাঁহাকে অপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন, আজ তেত্রিশ বৎসরের পর সেই দুর্ঘটনা আবিষ্কার করিয়া তাঁহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। কহিলেন, আজ যদি তুমি দু'চক্ষু বোজো, আমি না হয় কারো বাড়ি দাসীবৃত্তি করে খাবো, সে আমাকে করতেই হবে তা বেশ জানি—আমার মণি-হরি যে কোথায় দাঁড়াবে, তার—, বলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর অবরুদ্ধ ক্রন্দন এতক্ষণে মুক্তিলাভ করিয়া একেবারে দুই চক্ষু ভাসাইয়া দিল।

জরুরী মকদ্দমার দলিল-দস্তাবেজ গিরীশের মগজ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। স্ত্রীর আকস্মিক ও অত্যুগ্র ক্রন্দনে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তিনি ক্রুদ্ধ, গম্ভীরকণ্ঠে ডাক দিলেন—হরে?

হরি পাশের ঘরে পড়িতেছিল। শশব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল।

গিরীশ প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়া বলিলেন, ফের যদি তুই ঝগড়া করবি ত ঘোড়ার চাবুকে

তোর পিঠে ভাঙবো। হারামজাদার লেখাপড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, কেবল দিনরাত খেলা আর ঝগড়া! মণি কৈ?

পিতার কাছে বকুনি খাওয়াটা ছেলেরা জানিতই না। হরি হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, জানিনে।

জান না? তোদের বজ্জাতি আমি টের পাইনে, বটে? আমার সবদিকে চোখ আছে, তা জানিস? কে তোদের পড়ায়? ডাক্ তাকে?

হরি অব্যক্তকণ্ঠে কহিল, আমাদের থার্ডমাস্টার ধীরেনবাবু সকালে পড়িয়ে যান।

গিরীশ প্রশ্ন করিলেন, কেন সকালে? রাত্রে পড়ায় না কেন শুনি? আমি চাইনে এমন মাস্টার, কাল থেকে অন্য লোক পড়াবে। যা, মন দিয়ে পড় গে যা; হারামজাদা বজ্জাত!

হরি শুষ্ক ম্লানমুখে মায়ের মুখের দিকে একবার চাহিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

গিরীশ স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, দেখেচ আজকালকার মাস্টারগুলোর স্বভাব? কেবল টাকা নেবে, আর ফাঁকি দেবে। রমেশকে বলে দিয়ো, কালই যেন এই পরাণবাবুকে জবাব দিয়ে অন্য মাস্টার রেখে দেয়। মনে করেচে, আমার চোখে ধুলো দিয়ে সে এড়িয়ে যাবে!

সিদ্ধেশ্বরী কোন কথা কহিলেন না। স্বামীর মুখের প্রতি শুধু একটা রোষকষায়িত তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন এবং গিরীশ কর্তব্যকর্ম সুচারুরূপে সমাপন করিয়াছেন মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহার কাগজপত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

টাকা জিনিসটা সংসারে যে আবশ্যকীয় বস্তু, এ খবর সিদ্ধেশ্বরীর যে জানা ছিল না তাহা নয়, কিন্তু সেদিকে এতদিন তাঁহার খেয়াল ছিল না। কিন্তু লোভ একটা সংক্রামক ব্যাধি। নয়নতারার ছোঁয়াচ লাগিয়া সিদ্ধেশ্বরীরও দেহ-মনে এই ব্যাধি ধীরে ধীরে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল।

আজই খাওয়া-দাওয়ার পর শৈল এ বাটী হইতে বিদায় লইবে, এইরূপ একটা জনশ্রুতিতে সিদ্ধেশ্বরীর বুক ফাটিয়া একটা সুদীর্ঘ ক্রন্দন বাহির হইবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছিল। তিনি সেইটা কোনমতে নিবারণ করিয়া জ্বরের ভান করিয়া বিছানাতেই পড়িয়াছিলেন. নয়নতারা আসিয়া নিকটে বসিল। গায়ে হাত দিয়া জ্বরের উত্তাপ অনুভব করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিল এবং ডাক্তার ডাকা উচিত কিনা জিজ্ঞাসা করিল।

সিদ্ধেশ্বরী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সংক্ষেপে বলিলেন, না।

নয়নতারা বিরক্তির কারণ অনুভব করিয়া ঠিক ওষুধ দিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তাই আমি ভাবছিলুম দিদি. লোক কি করে হাতে এত টাকা করে। আমাদের পাড়ায় যদুবাবু, গোপালবাবু, হারাণ সরকার কেউ ত আমার বট্‌ঠাকুরের অর্ধেক রোজগার করে না, তবু তাদের কারও লাখ টাকার কম ব্যাঙ্কে জমা নেই। তাদের পরিবারদের হাতেও দশ-বিশ হাজারের কম নেই।

সিদ্ধেশ্বরী ঈষৎ আকৃষ্ট হইয়া কহিলেন, কি করে জানলে মেজবৌ?

নয়নতারা কহিল, ইনি যে ব্যাঙ্কের সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁরা সব এঁর বন্ধু কিনা। কাল গোপালবাবুর স্ত্রী আমার কথায় অবিশ্বাস করে বললে, এ কি একটা কথা মেজবৌ, যে তোমার দিদির হাতে টাকা নেই? যেমন করে হোক—

সিদ্ধেশ্বরী জ্বর ভুলিয়া উঠিয়া বসিয়া নয়নতারার সম্মুখে চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, বাক্স-পেটরা তুমি নিজের হাতে খুলে দেখ না মেজবৌ, সংসার-খরচের টাকা ছাড়া কোথাও যদি নুকোনো একটা পয়সা দেখতে পাও। যা করবে ছোটবৌ। আমার কি একটা কথা বলবার জো ছিল! এমন সোয়ামীর হাতে পড়েছিলুম মেজবৌ. যে কখনো একটা পয়সার মুখ দেখতে পেলুম না। তেমনি শাস্তিও হয়েচে। এখন সে সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্চে—কি করবে তার? কিন্তু আমার হাতে টাকা থাকলে সে টাকা ঘরেই থাকত না এমনি করে জলে যেত তা বল দেখি মেজবৌ?

আর কেহ যে এইসকল উৎপাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবে এ অধিকারও কাহাকেও দিতেন না। তাঁহার এতবড় অসুখের সময়ও জ্যাঠাইমার বিছানা ছাড়া কোন ছেলেরই কোথাও ঘুমাইবার স্থান ছিল না। কানাইয়ের শোয়া খারাপ, তাহার জন্য এতটা স্থান চাই, ক্ষুদে প্রায়ই একটা অপরাধ করিয়া ফেলিত, তাহার জন্য অয়েলক্লথের ব্যবস্থা; বিপিন চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিত, তাহার আর-একপ্রকার বন্দোবস্ত; পটলের আড়াই প্রহরের সময় ক্ষুধাবোধ হইত, শিয়রের কাছে সে আয়োজন রাখিতে হইত; খেঁদির বুকের উপর কানাই পা তুলিয়া দিয়াছে কিনা, পটলের নাকটা বিপিনের হাঁটুর তলায় চাপা পড়িয়াছে কিনা, এই সব দেখিতে দেখিতে আর বকিতে বকিতেই সিদ্ধেশ্বরীর রাত্রি পোহাইত।

আজ শোবার সময় বিছানায় এতখানি জায়গা যে খালি পড়িয়া থাকিবে, শৈলর যাবার সময় সিদ্ধেশ্বরীর সে হুঁশ ছিল না। নয়নতারা শতকোটি মাথার দিব্য দিবার পর তিনি রাত্রে নীচে হইতে খাইয়া ঘরে আসিতেছিলেন, হঠাৎ শৈলর ঘরের দিকে চোখ পড়ায় কে যেন তাঁহার বুকে মুগুর দিয়া মারিল। ঘরে আলো নাই, দরজা দুইটা খোলা—সিদ্ধেশ্বরী মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। শয্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, অল্প একটুখানি স্থানের মধ্যে বিপিন এবং ক্ষুদে ঘুমাইতেছে—বাকী বিছানাটা তপ্ত মরুর মত শূন্যে খাঁখাঁ করিতেছে। নিজের অপরিসর স্থানটুকুতে তিনি নীরবে চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন; কিন্তু সেই দুটি নিমীলিত চোখের কোণ বাহিয়া তখন অজস্র তপ্ত-অশ্রুতে তাঁহার মাথার বালিশ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। বাটীর ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই অত্যন্ত খুঁতখুঁতে। এ বিষয়ে আপনাকে ছাড়া তিনি আর কাহাকেও একবিন্দু বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার বদ্ধ সংস্কার ছিল, নিজে উপস্থিত না থাকিলেই ছেলেরা নানাপ্রকারে ফাঁকি দিয়া কম খায় এবং এ ফাঁকি তিনি ছাড়া আর কাহারও সাধ্য নাই যে ধরে। দৈবাৎ কোনগতিকে কোন ছেলের খাওয়া চোখে দেখিতে না পাইলে তাহাকে জেরা করিয়া, তাহার পেটে হাত দিয়া অনুভব করিয়া, নানারকমে সিদ্ধেশ্বরী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন—সে কিছুতেই তাহার ন্যায্য আহার করে নাই; এবং এই অন্যায়টুকু সংশোধন করিতে হতভাগ্য ছেলেটাকে তখনই তাঁহার চোখের উপর দাঁড়াইয়া একবাটি দুধ খাইতে হইত। শৈল ছেলেদের হইয়া মাঝে মাঝে লড়াই করিত; জবরদস্তি খাওয়ানোর অপকারিতা লইয়া তর্ক করিত; কিন্তু সিদ্ধেশ্বরীকে আন্তরিক ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা ভিন্ন তাহাতে আর কোন ফল হইত না। সিদ্ধেশ্বরী যখনই যে ছেলেটার পানে চাহিতেন, তখনই দেখিতেন—সে রোগা হইয়া যাইতেছে। এই লইয়া তাঁহার উৎকণ্ঠা, অশান্তির অবধি ছিল না।

আজ বিছানায় শুইয়া তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, দেশের বাটীর বহুবিধ বিশৃংখলার মধ্যে হয়ত কানাইয়ের খাইয়া পেট ভরে নাই এবং পটল নিশ্চয়ই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, হয়ত তাহাকে তুলিয়া খাওয়ানো হইবে না, হয়ত সে সারারাত্রি ক্ষুধায় ছটফট করিবে,—কল্পনায় যতই এই সকল দুর্ঘটনা তিনি স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন, ততই রাগে দুঃখে বেদনায় তাঁহার বুক ফাটিতে লাগিল। পাশের ঘরে গিরীশ অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি অনেক রাত্রে স্বামীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে হাত দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, মানলুম যেন, পটলকে শৈল নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু, কানাই ত আর তার পেটের ছেলে নয়,—তার ওপর তার জোর কি?

গিরীশ ঘুমের ঝোঁকে জবাব দিলেন, কিছু না।

সিদ্ধেশ্বরী আশান্বিত হইয়া শয্যাংশে বসিয়া বলিলেন, তা হলে আমরা নালিশ করে দিলে যে তার শাস্তি হয়ে যেতে পারে। পারে কিনা ঠিক বলো?

গিরীশ অসংশয়ে বলিলেন, নিশ্চয় শাস্তি হবে।

সিদ্ধেশ্বরী আশায় আনন্দে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, সে যেন হ'লো; কিন্তু ধরো পটল। তাকে ত আমিই মানুষ করেচি। হাকিমকে যদি বুঝিয়ে বলা যায়, সে আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না, তাই কি ভেবে ভেবে তার শক্ত অসুখ হতে পারে, তাহলে হাকিম কি রায় দেবে না যে সে তার জ্যাঠাইমার কাছে থাকুক? বেশ! অমনি তোমার

মেজবৌ মাথা নাড়িয়া কহিল, সে ত সত্যি কথা দিদি।

সিদ্ধেশ্বরীর মন শৈলর বিরুদ্ধে আবার শক্ত হইয়া উঠিল। এতদিন যে তিনি নিজেই শৈলকে মানুষ করিয়া নিজের সিন্দুকের চাবি তাহার হাতে দিয়া, আপনি ছোট হইয়া সংসারের মধ্যে তাহাকে বড় করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন সে কথাটা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। বলিলেন, একটা লোক রোজগারী, আর এতবড় সংসার তাঁর মাথায়, তাঁরই বা দোষ দিই কি করে বল দেখি?

নয়নতারা সায় দিয়া বলিল, সে ত সবাই দেখতে পাচ্ছে দিদি!

একটু চুপ করিয়া নয়নতারা মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, আমাদের গাঁয়ের নন্দ মিত্তির একজন ডাকসাইটে কেরানী। ছোটভাইকে মানুষ করতে, লেখাপড়া শেখাতে তার ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিতে নিজের হাতে আর কানাকড়িটি রাখলে না। বড়বৌ বলতে গেলে ধমকে জবাব দিত—

সিদ্ধেশ্বরী কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিলেন, ঠিক আমার দশা আর কি!

নয়নতারা কহিল, তা বৈ কি। বড়বৌকে নন্দ মিত্তির ধমকে বলত, তোমার ভাবনা কি? তোমার নরেন রইল। তাকে যেমন মানুষ করে উকীল করে দিলুম বুড়ো বয়সে সেও আমাদের তেমনি দেখবে। মনে ভেবো, সে তোমার দেওর নয়, সন্তান। কিন্তু এমনি কলিকাল দিদি, সে নন্দ মিত্তিরের চোখে ছানি পড়ে যখন চাকরিটি গেল, তখন নরেন উকীল—সহোদর ভাই হয়ে দাদাকে টাকা ধার দিয়ে সুদে-আসলে পৈতৃক বাড়িটার অংশ পর্যন্ত নীলাম ডেকে নিলে। এখন নন্দ মিত্তির ভিক্ষে করে খায়, আর কেঁদে বলে, স্ত্রীর কথা না শুনেই এখন এই অবস্থা। তবু ত খুড়তুত-জাঠতুত নয়, মায়ের পেটের ভাই!

সিদ্ধেশ্বরী মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন, বল কি মেজবৌ!

নয়নতারা বলিল, মিছে নয় দিদি, এ কথা দেশসুদ্ধ লোক জানে।

সিদ্ধেশ্বরী আর কথা কহিলেন না। তৎপূর্বে তাঁহার এক-একবার মনে হইতেছিল, শৈলকে ডাকিয়া নিষেধ করেন; এবং কি করিলে যে তাহাদের যাওয়ার বিঘ্ন ঘটিতে পারে, মনে মনে ইহাও নানারূপ আলোচনা করিতেছিলেন; কিন্তু নন্দ মিত্তিরের দুরবস্থার ইতিহাসে তাঁহার অন্তঃকরণ একেবারে বিকল হইয়া গেল। শৈলকে বাধা দিবার আর তাঁহার চেষ্টামাত্র রহিল না।

গিরীশ তখন আদালতের জন্য প্রস্তুত হইতে উঠি-উঠি করিতেছিলেন; রমেশ আসিয়া কহিল, আমি দেশের বাড়িতে গিয়েই থাকব মনে করচি।

কেন?

রমেশ কহিল, কেউ বাস না করলে বাড়ি-ঘর-দোর ভেঙেচুরে যায়, আর জমি-জায়গা পুকুরগুলোও খারাপ হয়ে যায়। আমারও এখানে কোন কাজ নেই। তাই বলচি।

বেশ কথা! বেশ কথা! বলিয়া গিরীশ খুশী হইয়া সম্মতি দিলেন।

ছোটভাইয়ের প্রার্থনার ভিতরে যে কত গৃহবিচ্ছেদ, কতখানি মনোমালিন্য প্রচ্ছন্ন ছিল সে-সংবাদ ভদ্রলোক কিছুই জানিতেন না। তিনি আদালতে বাহির হইয়া যাইবার পরেই শৈল বড়জায়ের ঘরের চৌকাঠের নিকট হইতে তাঁহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল এবং সামান্য একটি তোরঙ্গমাত্র সঙ্গে লইয়া দুই ছেলের হাত ধরিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বিছানার ওপর কাঠ হইয়া পড়িয়া রহিলেন এবং নয়নতারা নিজের দোতলার ঘরের জানালা খুলিয়া দেখিতে লাগিল।

আট

গোটা-দুই প্রকাণ্ড খাট জোড়া করিয়া সিদ্ধেশ্বরীর বিছানা ছিল। এত বড় শয্যাতেও কিন্তু তাঁহাকে স্থানাভাবে সঙ্কুচিত হইয়া সারারাত্রি কষ্টে কাটাইতে হইত। এ লইয়া তিনি রাগারাগি করিতেও ছাড়িতেন না, আবার বাড়ির কোন ছেলেকে একটা রাত্রিও তিনি কাছ-ছাড়া করিতে পারিতেন না। সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে সতর্ক হইয়া থাকিতে হইত, অনেকবার উঠিতে হইত; কোনদিনই সুস্থ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে পারিতেন না; অথচ শৈল কিংবা

নাক ডাকচে—আমার কথা বুঝি তবে শোননি! বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর পায়ের উপর সজোরে নাড়া দিলেন।

গিরীশ জাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, নিশ্চয় না।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া বলিলেন, কেন নয়? মা বলেই যে ছেলেকে মেরে ফেলবে মহারানীর কিছু এমন হুকুম নেই। কালই যদি মেজঠাকুরপোকে দিয়ে উকীলের চিঠি দিই, কি হয় তা হলে?—বলিয়া সিদ্ধেশ্বরী উত্তরের আশায় ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া প্রত্যুত্তরে স্বামীর নাসিকাধ্বনি শুনিয়া রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

সারারাত্রি তাঁহার লেশমাত্র ঘুম আসিল না। কখন সকাল হইবে, কখন হরিশকে দিয়া উকীলের চিঠি পাঠাইয়া ছেলের দাবী করিবেন, চিঠি পাইয়া তাহারা কিরূপ ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া কানাই ও পটলকে রাখিয়া যাইবে, এই সমস্ত আশা ও আকাশকুসুমের কল্পনা তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি সজাগ করিয়া রাখিল।

প্রভাত হইতে না হইতে তিনি হরিশের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিয়া বলিলেন, মেজ-ঠাকুরপো, উঠেচ?

হরিশ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, দেরি করলে চলবে না, এখ্খুনি ছোটঠাকুরপোদের নামে উকীলের চিঠি লিখে, দরোয়ান পাঠাতে হবে। তুমি বেশ করে একখানা চিঠি লিখে বলে দাও যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জবাব না পেলে নালিশ করা হবে।

হরিশকে এ বিষয়ে উত্তেজিত করা বাহুল্য। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া, গলা খাটো করিয়া প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপারটা কি বল দেখি বড়বৌ? বসো, বসো—কি কি নিয়ে গেছে? দাবীটা একটু বেশী করে দেওয়া চাই। বুঝলে না?

সিদ্ধেশ্বরী খাটের উপর আসন গ্রহণ করিয়া, দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া তাঁহার দাবীটা বিবৃত করিলেন।

বিবরণ শুনিয়া হরিশের হর্ষোজ্জ্বল মুখ কালি হইয়া গেল। কহিলেন, তুমি কি ক্ষেপেচ বড়বৌঠান? আমি বলি, বুঝি আর-কিছু। তাদের ছেলে তারা নিয়ে গেছে, তুমি করবে কি?

সিদ্ধেশ্বরী বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, তোমার দাদা যে বললেন, নালিশ করলে তাদের সাজা হয়ে যাবে!

হরিশ কহিলেন, দাদা এমন কথা বলতেই পারেন না। তোমাকে তামাশা করেচেন।

সিদ্ধেশ্বরী রাগ করিয়া কহিলেন, এতটা বয়স হ'লো তামাশা কাকে বলে বুঝিনে ঠাকুরপো? তোমার মনোগত ইচ্ছে নয় যে, ছেলে-দুটাকে কাছে আনি। তাই কেন স্পষ্ট করে বল না?

হরিশ লজ্জিত হইয়া তখন বহুপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, এ দাবী আদালত গ্রাহ্য করিবে না। তার চেয়ে বরং আর কোন দাবী-দাওয়া উত্থাপন করিয়া জব্দ করা যাইতে পারে। আমাদের উচিত এখন তাই করা।

সিদ্ধেশ্বরী ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, তোমার উচিত তোমার থাক ঠাকুরপো; আমার তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে, এখন মিথ্যে দাবী-দাওয়া করতে পারবো না। পরকালে আমার হয়ে ত আর তুমি জবাব দিতে যাবে না! তুমি না লেখো, আমি মণিকে পাঠিয়ে নগেনবাবুর কাছ থেকে লিখিয়ে আনি গে। বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় কি একটা কাজে বাজার-খরচের হিসাব লইয়া সিদ্ধেশ্বরী বাড়ির সরকার গণেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে বচসা করিতেছিলেন। সে বেচারা নানাপ্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে, বারো গণ্ডা টাকার উপর আরও দু' টাকা খরচ হওয়াতেই পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। গৃহিণী এ কর্মে নূতন ব্রতী। তাঁহার নূতন ধারণা—তাঁহাকে নির্বোধ পাইয়া সবাই টাকা চুরি করে। অতএব চক্রবর্তীও যে চুরি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি তর্ক করিতেছিলেন, পঞ্চাশ টাকা যে এক আঁজলা টাকা গণেশ! আমি লেখাপড়া জানিনে বলেই কি তুমি বুঝিয়ে দেবে যে, বারো গণ্ডার ওপর মোটে দুটি টাকা বেশী খরচ

হয়েচে বলে এই পঞ্চাশ-পঞ্চাশটে টাকা সব খরচ হয়ে গেছে—আর কিছু নেই? আমি কি এতই বোকা!

গণেশ ব্যাকুল হইয়া বলিল, মা, দিদিকে ডেকে না হয়—

নীলাকে ডেকে হিসেব বুঝতে হবে? সে আমার চেয়ে বেশী বুঝবে? না গণেশ, ওসব ভাল কথা নয়। শৈল নেই বলেই যে তোমার যা ইচ্ছে তাই করে হিসেব দেবে সে হবে না বলচি। না সে যাবে, না আমাকে এত ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে। পোড়ারমুখীকে দশ-বছরের মেয়ে বৌ করে আনলুম, বুকে করে মানুষ করে এত বড় করলুম, এখন সে তেজ করে বাড়ির দু-দুটো ছেলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তা যাক। আমিও খবর রাখচি। কানাই-পটলের কোনদিন এতটুকু অসুখ শুনতে পেলে দেখব, কেমন করে সে ছেলে রাখে! তা এখন যাও—দুপুরবেলা মনে করে বলে যেয়ো, এতগুলো টাকা কোথায় কি করলে।—বলিয়া গণেশকে বিদায় দিলেন।

সে বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মেজবৌ আসিয়া কহিল, দিদি, বলতে পারিনে, কিন্তু আমিও সংসার চালিয়েচি, টাকাকড়ি হিসাবপত্র সব রেখেচি। ছোটবৌ নেই বলে যে এত ঝঞ্ঝাট তুমি সহ্য করবে, আর আমি বসে বসে দেখব, সে ভাল নয়। আমার কাছে কারো চালাকি করে হিসেবে গোল করবার জো নেই।

সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন, সে ত ভাল কথা মেজবৌ। আমার এই রোগা শরীরে এত হাঙ্গামা কি ভাল লাগে! শৈল ছিল—যেখানকার যত টাকা তার হিসেব করা, খরচ করা, ব্যাঙ্কে পাঠানো—সমস্তই তার কাজ। এসব কি আর আমাকে দিয়ে হয়? বেশ ত, এখন থেকে তুমিই করো মেজবৌ।—বলিয়া সিন্দুকের চাবিটা কিন্তু নিজের আঁচলেই বাঁধিয়া ফেলিলেন।

দিন কাটিতে লাগিল। নয়নতারা সহস্র কৌশল উদ্ভাবন করিয়াও লোহার সিন্দুকের চাবিটা আর নিজের আঁচলে বাঁধিতে সমর্থ হইল না। নয়নতারা অত্যন্ত কৌশলী এবং চতুর, অনেকখানি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিতে পারিত। কিন্তু এই একটা তাহার বড় রকমের গোড়ায় গলদ হইয়া গিয়াছিল যে, স্বার্থের জন্য নিরীহ লোকের মনে সংশয়ের বীজ বপন করিলে যথাকালে তাহার ফলভোগ হইতে নিজেকেও দূরে রাখা যায় না। সে শত্রুপক্ষকে যেমন সন্দেহ করিতে শিখে, মিত্র পক্ষের উপরও তেমনি বিশ্বাস হারায়, সুতরাং সিদ্ধেশ্বরী যে-মুহূর্তে ছোটবৌয়ের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, মেজবৌকেও ঠিক সেই মুহূর্তেই অবিশ্বাস করিতে শিখিয়াছেন।

নয়

কোন একটা অভাব লইয়া—তা সে যতই গুরুতর হউক, মানুষ অনন্তকাল শোক করিতে পারে না। সিদ্ধেশ্বরীর কাছে তাঁহার শয্যার শূন্যতা ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। শৈলর ঘরের দিকটা তিনি মাড়াইতেই পারিতেন না, এখন সে বারান্দা স্বচ্ছন্দে পার হইয়া যান—মনেও পড়ে না। কানাই-পটলের সংবাদ তিনি বিবিধ উপায়ে সংগ্রহ করিবার জন্য অহরহ উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, এখন সে উৎকণ্ঠার অর্ধেক তিরোহিত হইয়া গেছে। এইরূপে সুখে-দুঃখে এক বৎসর ঘুরিয়া গেল।

সেদিন হঠাৎ সিদ্ধেশ্বরীর কানে গেল যে, দেশের বিষয় লইয়া আজ ছয় মাস ধরিয়া ছোট-দেবরের সহিত তাঁহাদের মামলা চলিতেছে। মকদ্দমা চালাইতেছে হরিশ নিজে। দেওয়ানী ত চলিতেছেই, গোটা-দুই ফৌজদারীও ইতিমধ্যে হইয়া গেছে। খবর শুনিয়া সিদ্ধেশ্বরী ভয়ে ভাবনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন।

স্বামীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার মত সংবাদ জানার সুবিধা হইবে না জানিয়া তিনি সন্ধ্যার সময় হরিশের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, বল কি ঠাকুরপো, ছোটঠাকুরপো করচে তোমার দাদার সঙ্গে মামলা?

হরিশ উচ্চ অঙ্গের একটুখানি হাস্য করিয়া কহিলেন, তাই ত হচ্চে বৌঠান!

সিদ্ধেশ্বরী মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া বলিলেন, আমার যে বিশ্বাস হয় না, মেজঠাকুরপো। এখনো যে চন্দ্র-সূর্যি উঠচে।

নয়নতারা খাটের একধারে বসিয়া খোঁদিকে ধুম পাড়াইতেছিল, মৃদুস্বরে কহিল, সে ত উঠচেই দিদি। আর এই ছোট-দেওরকেই তোমরা হাজার হাজার টাকা ব্যবসা করতে দিতে। সে সব ত তখন যায়নি, যাচ্চে এখন।

সিদ্ধেশ্বরী দুঃসহ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মকদ্দমা কেন?

হরিশ বলিলেন, কেন! দেখলুম, মকদ্দমা না করে আর উপায় নেই। দেশের বিষয়ই বিষয়। দেখলুম আমরা গেলে আমাদের মণি-হরি-বিপিন-ক্ষুদে এক কাঠা জমি-জায়গা ত পাবেই না—দেশের বাড়িতে হয়ত ঢুকতে পর্যন্ত পাবে না। ধর না বড়বৌ, দেশে যা-কিছু আছে, সে-ই সমস্ত দখল করে বসে গেছে। খাজনাপত্র আদায় করচে, খাচ্চে দাচ্চে—একটা পয়সা পর্যন্ত দেবার নাম করে না। বিষয় যা-কিছু তা ত দাদাই করেছেন, অথচ দাদার চিঠির একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না—এমনি নেমকহারাম রমেশ। আমিও বাড়ি থেকে তাকে বার করে দিয়ে তবে ছাড়ব এই আমার প্রতিজ্ঞা।

সিদ্ধেশ্বরী আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তারাই বা ছেলে-পিলে নিয়ে যাবে কোথায়?

হরিশ বলিলেন, সে খবরে আমাদের ত দরকার নেই, বড়বৌ।

সিদ্ধেশ্বরী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার দাদা কি বললেন?

হরিশ বলিলেন, দাদা যদি তেমন হতেন, তা হলে ত ভাবনা ছিল না বড়বৌ। যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, রমেশ তাঁর খেয়ে-পরে, তাঁর টাকায় তাঁরই বিষয় নিয়ে গোলযোগ বাধিয়েচে, তখনই তিনি মত দিলেন। ফৌজদারীতে রমেশ ত দাদাকেই জড়িয়ে তোলার চেষ্টায় ছিল। অনেক কষ্টে আমাকে সেটা ফাঁসাতে হয়েচে।

নয়নতারা ফিসফিস করিয়া বলিল, আচ্ছা, ছোটঠাকুরপোই যেন দোষী, কিন্তু, আমি কেবল ভাবি দিদি, ছোটবৌ কি করে এতে মত দিলে? আমরা আর সবাই দুষ্টু বজ্জাত হতে পারি, কিন্তু সে তার বট্‌ঠাকুরকে ত চেনে। তাঁকে জেলে দিয়ে সে কি সুখ পেত?

সিদ্ধেশ্বরীর আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল। তিনি আর একটি কথাও না বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

তথা হইতে আসিয়া সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরীশ যথারীতি কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মুখ তুলিয়া স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিতেই তাঁহার অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা আজ তাঁহারও চোখে পড়িল। হাতের কাগজখানা রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আজ কখন জ্বর এল?

সিদ্ধেশ্বরী অভিমানভরে বলিলেন, তবু ভালো, জিজ্ঞেসা করলে।

গিরীশ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! জিজ্ঞেসা করিনি ত কি? পরশুও ত মণিকে ডেকে বললুম, তোর মাকে ওষুধ-টষুধ দিস? তা আজকালকার ছেলেগুলো হয়েচে সব এমনি যে, বাপ-মাকে পর্যন্ত মানে না।

সিদ্ধেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, বুড়োবয়সে মিথ্যে কথাগুলো আর ব'লো না, পনর দিন হয়ে গেল, মণি তার পিসির ওখানে এলাহাবাদে গেছে, আর তুমি তাকে পরশু জিজ্ঞাসা করলে! কখনো যা করোনি, তা কি আজ করবে? তা নয়, আমি সেজন্যে আসিনি। আমি এসেচি জানতে, ব্যাপারটা কি? ছোটঠাকুরপোর সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা কিসের?

গিরীশ মহা খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, সেটা একটা চোর! চোর! একেবারে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে! বিষয়পত্র সব নষ্ট করে ফেললে। সেটাকে দূর করে না দিলে দেখচি আর ভদ্রস্থ নেই—সমস্ত ছারখার ধ্বংস করে দিলে।

সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা তা যেন দিলে, কিন্তু মামলা-মকদ্দমা ত শুধু শুধু হয় না, টাকা খরচ করা ত চাই? ছোটঠাকুরপো টাকা পাচ্ছে কোথায়?

ইতিমধ্যে হরিশ নামিয়া আসিয়া ছেলেদের পড়িবার ঘরে যাইতেছিলেন, দাদার উচ্চকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিলেন। তিনি জবাব দিলেন—টাকার কথা ত এইমাত্র মেজবৌ বলে দিলেন বড়বৌঠান! পাটের দালালির নাম করে দাদার কাছ থেকে হাজার-চারেক

নিয়েছিল, সেটা ত হাতে আছেই; তা ছাড়া, ছোটবৌমার হাতেই ত এতদিন টাকাকড়ি সমস্ত ছিল—বুঝেই দেখ না!

গিরীশ পুনরায় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে, কিছু কি আর রেখেচে হে হরিশ! সেটা একেবারে বেহেড লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে! শুক্রবার দিন কোর্টে এসে বলে—বাড়ি-ঘরদোর মেরামত করতে হবে, পাঁচশ' টাকা চাই।

হরিশ অবাক হইয়া গেলেন, বলেন কি? সাহস ত কম নয়!

গিরীশ কহিলেন, সাহস বলে সাহস! একেবারে লম্বা ফর্দ—এখানটা সারাতে হবে, ওখানটা গাঁথাতে হবে; এটা না বদলালে নয়, ওটা না করলেই চলে না। শুধু কি তাই? সংসারের অনটন—শীতের কাপড়-চোপড় কিনতে হবে—ধান কিনে, আলু কিনে রাখতে হবে, —এমনি হাজারো খরচ দেখিয়ে আরও তিনশ টাকার দরকার।

হরিশ অসহ্য ক্রোধ কোনমতে সংবরণ করিয়া শুধু কহিলেন, নির্লজ্জ! তারপরে?

গিরীশ বলিলেন, ঠিক তাই। হতভাগার একেবারে লজ্জাশরম নেই—একেবারে নেই। এই আটশ' টাকা নিয়ে তবে ছাড়লে।

নিয়ে গেল? আপনি দিলেন?

গিরীশ বলিলেন, না হলে কি ছাড়ে? নিয়ে তবে উঠল যে!

হরিশের সমস্ত মুখখানা প্রথমটা অগ্নিবর্ণ হইয়া পরক্ষণেই ছাইয়ের মত হইয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা হলে মামলা-মকদ্দমা করে আর লাভ কি দাদা?

গিরীশ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, কিছু না, কিছু না। নিজের সংসারটা যে চালিয়ে নেবে হতভাগার সেটুকু ক্ষমতাও নেই—এমনি অপদার্থ হয়ে গেছে। শুনি, বৈঠকখানায় দিব্যি আড্ডা বসিয়ে দিনরাত তাস-পাশা চলচে, আর খাচ্চেন—বাস্! মানুষ যেমন শিব-স্থাপনা করে, আমাদেরও হয়েচে তাই—বুঝলে না হরিশ! বলিয়া নিজের রসিকতায় নিজেই মাতিয়া উঠিয়া হোহো রবে হাসিয়া ঘর ভরিয়া দিলেন।

হরিশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন। দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বলিতে বলিতে গেলেন, আচ্ছা, আমি একাই দেখচি।

মাঘ মাসের বাইশে মকদ্দমার দিন ছিল। বিশে গিরীশের এক জ্ঞাতিকন্যার বিবাহে কন্যার পিতা আসিয়া গিরীশকে চাপিয়া ধরিলেন, দাদা, তুমি উপস্থিত থেকে আমার মেয়ের বিবাহ দাও, এই আমার বড় সাধ। তোমাকে একটি দিনের জন্যেও অন্তত দেশে যেতে হবে।

'না' শব্দটা গিরীশের মুখ দিয়া বাহির হইবার জো ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া বলিলেন, যাব বৈ কি ভায়া, নিশ্চয় যাব।

কন্যার পিতা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু এই 'নিশ্চয়' কথাটার বাস্তবিক অর্থ যথাকালে যে কি হইবে, তাহা সবচেয়ে বেশী জানিতেন সিদ্ধেশ্বরী। সুতরাং প্রতিশ্রুতির বিবরণ যদিচ স্বামী বিস্মৃত হইয়াছিলেন, স্ত্রী হন নাই।

বিশে সকালে গিরীশ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলেন, বল কি! আজ যে আমার সেই জয়পুরের মক—

না, সে হবে না। তোমাকে যেতেই হবে। উকীল হয়ে পর্যন্ত ত মিছে কথা বলে আসচ —আজ একটা কথাও রাখো। পরকালের ভয় কি তোমার এতটুকু হয় না?

গিরীশ কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, পরকাল? তা বটে—কিন্তু—

না, কিছুতে হবে না, তোমাকে যেতেই হবে। যাও।

অতএব গিরীশকে দেশে যাইতে হইল।

যাইবার সময় সিদ্ধেশ্বরী অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ছেলে দুটোকে—বলিয়াই হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন!

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে, বলিয়া গিরীশ বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কি হবে, তাহা

স্বামী-স্ত্রীর কেহই বুঝিলেন না। নয়নতারা গা টিপিয়া সিদ্ধেশ্বরীকে অন্তরালে ডাকিয়া কহিল, ও বাড়িতে কিছু খেতেটেতে বট্‌ঠাকুরকে মানা করে দিলে না কেন?

সিদ্ধেশ্বরী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

নয়নতারা মুখখানা বিকৃত-গম্ভীর করিয়া বলিল, বলা যায় কি দিদি!

সিদ্ধেশ্বরীর চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, সে তুমি পার মেজবৌ। শৈলর গলা কেটে ফেললেও সে তা পারবে না। বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

মকদ্দমার তদবির করিতে দুই-একদিন পূর্বে জেলায় যাইবার জন্য রমেশ ঘরের মধ্যে প্রস্তুত হইতেছিল। শৈল সেখানে ছিল না। সে ঠাকুরঘরের মধ্যে দেহ হইতে তাহার সর্বশেষ অলঙ্কারখানি খুলিয়া ফেলিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া গলবস্ত্র, যুক্তকরে মনে মনে বলিতেছিল, ঠাকুর, আর ত কিছু নাই; এইবার যেমন করিয়া হোক আমাকে নিষ্কৃতি দাও। আমার ছেলেরা না খাইয়া মরিতেছে, আমার স্বামী দুশ্চিন্তায় কঙ্কালসার হইতেছেন—

ওরে কেনো—ওরে পটলি—

শৈল চমকিয়া উঠিল,—এ যে তাহার ভাশুরের কণ্ঠস্বর! জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তিনিই বটে। পাকা চুল, কাঁচা-পাকা গোঁফ, সেই শান্ত স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্তি। চিরকালটি যেমনটি দেখিয়া আসিয়াছে, ঠিক তাই। কোন অঙ্গে এতটুকু পরিবর্তন ঘটে নাই। কানাই পড়া ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া প্রণাম করিল; পটল খেলা ছাড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে উপস্থিত হইল। তাহাকে তিনি কোলে তুলিয়া লইলেন।

রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল।

গিরীশ কহিলেন, এমন সময় কোথায় যাওয়া হবে?

রমেশ কুণ্ঠিত অস্পষ্টস্বরে বলিল, জেলায়—

গিরীশ চক্ষের পলকে বারুদের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন—হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, তুমি আমার খাবে-পরবে, আর আমারই সঙ্গে মামলা করবে? তোমাকে এক সিকি-পয়সার বিষয়-আশয় দেব না—দূর হও আমার বাড়ি থেকে; এখখুনি দূর হও—এক মিনিট দেরি নয়—এক কাপড়ে বেরিয়ে যাও—

রমেশ কথা কহিল না, মুখ তুলিল না; যেমন ছিল তেমনি বাহির হইয়া গেল। দাদাকে সে যেমন ভক্তিমান্য করিত, তেমনি চিনিত। এইসব তিরস্কারের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পূর্ণ অনুভব করিয়া সে তখনকার মত মুখ বুজিয়া বাহির হইয়া গেল।

তখন শৈল আসিয়া দূরে হইতে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

গিরীশ আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, এস, এস, মা এস। সে স্বরে উত্তাপ নাই, জ্বালা নাই—বাহির হইতে প্রবেশ করিয়া কোন লোকের সাধ্য নাই যে, বলে এই মানুষটাই মুহূর্তকাল পূর্বে ওরূপভাবে চীৎকার করিতেছিল।

গিরীশের নজরে কোনদিন কিছু পড়ে না; কিন্তু আজ কেমন করিয়া জানি না, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি আশ্চর্য নৈপুণ্য লাভ করিল। শৈলর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমার গায়ে গয়না দেখচি নে কেন ছোটবৌমা?

শৈল অধোমুখে স্থির হইয়া রহিল।

গিরীশের কণ্ঠস্বর পুনরায় এক এক পর্দা চড়িতে লাগিল—ঐ হতভাগা শুয়ার বেচে খেয়েচে। গয়না কার? আমার। ওকে আমি জেলে দিয়ে তবে ছাড়ব, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাইশে মকদ্দমার দিন অপরাহ্ণবেলায় হরিশ মুখ কালি করিয়া হুগলীর আদালত হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন এবং ধড়াচূড়া না ছাড়িয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন।

নয়নতারা কাঁদ-কাঁদ হইয়া সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল; খবর পাইয়া সিদ্ধেশ্বরী ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন। কিন্তু হরিশ সেই যে পাশ ফিরিয়া নীরব হইয়া রহিলেন, কেহই তাঁহার মুখ হইতে একটা জবাবও বাহির করিতে পারিল না।

মকদ্দমায় যে হার হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই,—দুই জায়ে নিরন্তর বুঝাইতে লাগিলেন—মকদ্দমায় হার-জিত আছেই—তা ছাড়া এখনও হাইকোর্ট আছে, বিলাতে আপীল করা আছে—এরই মধ্যে এমন করিয়া ভাঙিগয়া পড়িবার কিছুমাত্র হেতু নেই।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই দুটি স্ত্রীলোকের যে আশা-ভরসা ছিল, নিজে উকীল হইয়াও হরিশের তাহার কণামাত্রও দেখা গেল না।

সিদ্ধেশ্বরী আর সহ্য করিতে না পারিয়া হরিশের হাত ধরিয়া বলিলেন, মেজঠাকুরপো, আমি বলচি, তোমাদের হার হবে না। যত টাকা লাগে আমি দেব, তুমি হাইকোর্ট কর। আমি আশীর্বাদ করচি তুমি জিতবেই।

এতক্ষণে হরিশ মুখ ফিরাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বৌঠান, সে হবার জো নেই—সব শেষ হয়ে গেছে। হাইকোর্টই বল, আর বিলাতই বল—কোথাও কোন রাস্তা নেই। বিষয় সমস্তই দাদার নামে খরিদ ছিল। বিয়ে দিতে গিয়ে তিনি—সর্বস্ব ছোটবৌমার নামে দানপত্র করে দিয়ে এসেছেন। রেজেস্ট্রি পর্যন্ত হয়ে গেছে। দেশের দিকে মুখ ফেরাবারও আর পথ নেই।

দুই জায়ে মুখোমুখি হইয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার পর গিরীশ আদালত হইতে ফিরিয়া আসিলে যে কাণ্ড ঘটিল তাহা বর্ণনাতীত। কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মাদ বলিয়া লাঞ্ছনা করিতে কেহ আর বাকী রাখিল না।

গিরীশ কিন্তু সকলের বিরুদ্ধে ক্রমাগত বুঝাইতে লাগিলেন, যে এ-ছাড়া আর কোন রাস্তাই ছিল না। হতভাগা নচ্ছার বোম্বেটে, ছোটবৌমার গয়নাগুলো বেচিয়া খাইয়াছে, আর একটু হইলেই বাড়ির ইঁটকাট পর্যন্ত বেচিয়া খাইত—দেশের বাড়ির অস্তিত্ব পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া যাইত। তিনি সকল দিক বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভরাডুবি হইতে বংশকে নিষ্কৃতি দিয়া আসিয়াছেন।

শুধু সিদ্ধেশ্বরী একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন, ভালমন্দ কোন কথাই এতক্ষণ বলেন নাই। সবাই চলিয়া গেলে, তিনি উঠিয়া আসিয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। চোখ-দুটিতে জল তখনও টলটল করিতেছিল; দুই পায়ের উপর মাথা পাতিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আজ তুমি আমাকে মাপ কর। তোমাকে যার যা মুখে এলো—বলে গাল দিয়ে গেল বটে, কিন্তু তুমি যে তাদের সবাইয়ের চেয়ে কত বড়, সে-কথা আজ যেমন আমি বুঝেচি এমন কোনদিন নয়।

গিরীশ মহা খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, দেখলে বড়বৌ, আমার সর্বদিকে নজর থাকে কিনা! রমেশ কালকের ছোঁড়া, সে আমার চোখে ধুলো দিয়ে আমার এত কষ্টের বিষয় নষ্ট করে দেবে! এমনি কায়দা বেঁধে দিয়ে এলুম যে, আর সেখানে বাছাধনের চালাকিটি চলবে না।—বলিয়া কি জানি নিজের কোন্ হাসির কথায় নিজেই হোহো শব্দে হাসিয়া ঘরম্বার পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

স্বামী

সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাকে এক বছরের বেশী ত তিনি চোখে দেখে যেতে পাননি, তবে এমন করে আমার ভিতরে বাহিরে মিলিয়ে নাম রেখে গিয়েছিলেন কি করে? বীজমন্ত্রের মত এই একটি কথায় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ-জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা ব্যক্ত করে গেছেন।

রূপ? তা আছে মানি; কিন্তু না গো না, এ আমার দেমাক নয়, দেমাক নয়। বুক চিরে দেখান যায় না, নইলে এই মুহূর্তেই দেখিয়ে দিতুম, রূপ নিয়ে গৌরব করবার আমার আর বাকী কিছু নেই, একেবারে—কিছু নেই। আঠারো, উনিশ? হ্যাঁ, তাই বটে। বয়স আমার উনিশই। বাইরের দেহটা আমার তার বেশী প্রাচীন হতে পায়নি। কিন্তু এই বুকের ভিতরটায়? এখানে যে বুড়ী তার উনআশি বছরের শুকনো হাড়-গোড় নিয়ে বাস করে আছে, তাকে দেখতে পাচ্ছ না? পেলে এতক্ষণ ভয়ে আঁৎকে উঠতে।

একলা ঘরের মধ্যে মনে হলেও ত আজও আমার লজ্জায় মরতে ইচ্ছা করে; তবে এ কলঙ্কের কালি কাগজের উপর ঢেলে দেবার আমার কি আবশ্যক ছিল! সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটাই ত আজ আমাকে বলতে হবে। নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে?

সব মেয়ের মত আমিও ত আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম। তবু কেন তাতে আমার মন উঠল না। তাই যে দামটা আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি-বড় শত্রুর জন্যেও তা একদিনের জন্যে কামনা করিনে। কিন্তু দাম আমাকে দিতে হ'ল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে একবিন্দু রেহাই দিলেন না। কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় করে সর্বস্বান্ত করে যখন আমাকে পথে বার করে দিলেন, লজ্জাশরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না, তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্বনাশী, এ তুই করেছিস কি? স্বামী যে তোর আত্মা। তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন না একদিন তোর ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাকে যে তোর পেতেই হবে। এ জন্মে হোক, আগামী জন্মে হোক, কোটি জন্ম পরে হোক, তাঁকে যে তোর চাই-ই। তুই যে তাঁরই।

জানি, যা হারিয়েছি, তার অনন্ত গুণ আজ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু তবু যে এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে, এটা আমার নারী-দেহ। আজ আমার আনন্দ রাখবারও জায়গা নেই, কিন্তু ব্যথা রাখবারও যে ঠাঁই দেখি না প্রভু! এ দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু যে অহোরাত্র কাঁদচে—ওরে অস্পৃশ্যা, ওরে পতিতা, আমাদের আর বেঁধে পোড়াস নে, আমাদের ছুটি দে, আমরা একবার মরে বাঁচি'

কিন্তু থাক সে কথা।

বাবা মারা গেলেন, এক বছরের মেয়ে নিয়ে মা বাপের বাড়ি চলে এলেন। মামার ছেলেপিলে ছিল না, তাই গরীবের ঘর হলেও আমার আদর-যত্নের কোন ত্রুটি হ'ল না: বড় বয়স পর্যন্ত তাঁর কাছে বসে ইংরাজী বাংলা কত বই না আমি পড়েছিলুম।

কিন্তু মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানতেন না। বাড়িতে একটা পুজো-অর্চনা কি ব্রতব্রতও কোনদিন হতে দেখিনি, এ-সব তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না।

নাস্তিক বৈ কি? মামা মুখে বলতেন বটে তিনি Agnostic, কিন্তু সেও ত একটা মস্ত ফাঁকি! কথাটা যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি ত শুধু লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যই নিজেদের আগাগোড়া ফাঁকির পিছনে আর একটা আকাশ-পাতাল-জোড়া ফাঁকি জুড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তখন কি ছাই এ-সব বুঝেছিলুম! আসল কথা হচ্চে, সূর্য্যির চেয়ে বালির তাতেই গায়ে বেশী ফোস্কা পড়ে। আমার মামারও হয়েছিল ঠিক সেই দশা'

শুধু আমার মা বোধ করি যেন লুকিয়ে বসে কি-সব করতেন। সে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জানতে পেত না। তা মা যা খুশি করুন, আমি কিন্তু মামার বিদ্যে ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা শিখে নিয়েছিলুম।

আমার বেশ মনে পড়ে, দোরগোড়ায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে দাঁড়ালে সঙ দেখবার জন্যে ছুটে গিয়ে মামাকে ডেকে আনতুম। তিনি তাদের সঙ্গে এমনি ঠাট্টা শুরু করে দিতেন যে, বেচারারা পালাবার পথ পেত না। আমি হেসে হাততালি দিয়ে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়তুম। এমনি করেই আমাদের দিন কাটছিল।

শুধু মা এক-একদিন ভারী গোল বাধাতেন। মুখ ভারী করে এসে বলতেন, দাদা, সদুর ত দিন দিন বয়স হচ্চে, এখন থেকে একটু খোঁজাখুঁজি না করলে সময়ে বিয়ে দেবে কি করে।

মামা আশ্চর্য হয়ে বলতেন, বলিস কি গিরি, তোর মেয়ে ত এখনো বারো পেরোয় নি, এর মধ্যেই তোর—সাহেবদের মেয়েরা ত এ বয়সে—

মা কাঁদ-কাঁদ গলায় জবাব দিতেন, সাহেবদের কথা কেন তুলচ দাদা, আমরা ত সত্যিই আর সাহেব নই! ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া করতে আসচেন না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সমাজ ত আছে? তাকে উড়িয়ে দেবে কি করে?

মামা হেসে বলতেন, ভাবিস নে বোন, সে-সব আমি জানি। এই যেমন তোকে হেসে উড়িয়ে দিচ্চি, ঠিক এমনি করে আমাদের নচ্ছার সমাজটাকেও হেসে উড়িয়ে দেব।

মা মুখ ভার করে বিড়বিড় করে বকতে বকতে উঠে যেতেন। মামা গ্রাহ্য করতেন না বটে, কিন্তু আমার ভারী ভয় হ'ত। কেমন করে যেন বুঝতে পারতুম, মামা যাই বলুন, মার কাছ থেকে আমাকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন না।

কেন যে বিয়ের কথায় ভয় হতে শুরু হয়েছিল, তা বলচি। আমাদের পশ্চিম-পাড়ার বুক চিরে যে নালাটা গ্রামের সমস্ত বর্ষার জল নদীতে ঢেলে দিত, তার দু'পাড়ে যে দু'ঘরের বাস ছিল, তার এক ঘর আমরা, অন্য ঘর গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদার। এই মজুমদার-বংশ যেমন ধনী তেমনি দুর্দান্ত। গাঁয়ের ভেতরে-বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না। নরেন ছিল এই বংশের একমাত্র বংশধর।

আজ এতবড় মিথ্যেটা মুখে আনতে আমার যে কি হচ্চে, সে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জানবে বল, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম, এ বুঝি সত্যি একটা জিনিস -সত্যিই বুঝি নরেনকে ভালবাসি।

কবে যে এই মোহটা প্রথম জন্মেছিল, সে আমি বলতে পারি না। কলকাতায় সে বি. এ. পড়ত, কিন্তু ছুটির সময় বাড়ি এলে মামার সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা করতে প্রায়ই আসত। তখনকার দিনে Agnosticism-ই ছিল বোধ করি লেখাপড়া-জানাদের ফ্যাশন। এই নিয়েই বেশিভাগ তর্ক হত। কতদিন মামা তাঁর গৌরব দেখাবার জন্য নরেনবাবুর তর্কের জবাব দিতে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কতদিন সন্ধ্যা ছাড়িয়ে রাত্রি হয়ে যেত, দু'জনের তর্কের কোন মীমাংসা হতো না। কিন্তু আমিই প্রায় জিততুম, তার কারণও আজ আর আমার অবিদিত নেই।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে মামার মুখপানে চেয়ে গভীর বিস্ময়ে বলে উঠত, আচ্ছা ব্রজবাবু, এই বয়সে এত বড় লজিকের জ্ঞান, তর্ক করবার এমন একটা আশ্চর্য ক্ষমতা কি আপনি একটা ফিনোমিনন বলে মনে করেন না?

আমি গর্বে, সৌভাগ্যে ঘাড় হেঁট করতুম। ওরে হতভাগী' সেদিন ঘাড়টা তোর চির-কালের মত একেবারে ভেঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েনি কেন?

মামা উচ্চ-অঙ্গের একটু হাস্য করে বলতেন, কি জান নরেন, এ শুধু শেখাবার ক্যাপাসিটি।

কিন্তু তর্কাতর্ক আমার তত ভাল লাগত না, যত ভাল লাগত তার মুখের মণ্টিক্রিস্টোর গল্প। কিন্তু গল্পও আর শেষ হতে চায় না, আমার অধৈর্যেরও আর সীমা পাওয়া যায় না। সকালে ঘুম ভেঙ্গে পর্যন্ত সারাদিন একশ'বার মনে করতুম, কখন বেলা পড়বে, কখন নরেনবাবু আসবে।

এমনি তর্ক করে আর গল্প শুনে আমার বিয়ের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোর শেষে গড়িয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে আমার হ'ল না।

তখন বর্ষার নবযৌবনের দিনে মজুমদারদের বাগানের একটা মস্ত বকুলগাছের তলা ঝরা ফুলে ফুলে একেবারে বোঝাই হয়ে যেত। আমাদের বাগানের ধারের সেই নালাটা পার হয়ে আমি রোজ গিয়ে কুড়িয়ে আনতুম। সেদিন বিকালেও, মাথার উপর গাঢ় মেঘ উপেক্ষা করেই দ্রুতপদে যাচ্চি, মা দেখতে পেয়ে বললেন, ওলো, ছুটে ত যাচ্ছিস, জল যে এল বলে।

আমি বললুম, জল এখন আসবে না মা, ছুটে গিয়ে দুটো কুড়িয়ে আনি।

মা বললেন, পনরো মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নামবে সদু, কথা শোন্—যাসনে। এই অবেলায় ভিজে গেলে ঐ চুলের বোঝা আর শুকোবে না তা বলে দিচ্চি।

আমি বললুম, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা, যাই। বৃষ্টি এসে পড়লে মালীদের এই চালাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব। বলতে বলতে ছুটে পালিয়ে গেলুম। মায়ের আমি একটি মেয়ে, দুঃখ দিতে আমাকে কিছুতেই পারতেন না। ছেলেবেলা থেকেই ফুল যে কত ভালবাসি, সে ত তিনি নিজেও জানতেন, তাই চুপ করে রইলেন। কতদিন ভাবি, সেদিন যদি হতভাগীর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনতে মা, এমন করে হয়ত তোমার মুখ পোড়াতুম না।

বকুল ফুলে কোঁচড় প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছে, এমন সময় মা যা বললেন, তাই হ'ল। ঝমঝম করে বৃষ্টি এল। ছুটে গিয়ে মালীদের চালার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। কেউ নেই, খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের পানে চেয়ে ভাবচি, ঝমঝম করে ছুটে এসে কে ঢুকে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি -ওমা! এ যে নরেনবাবু! কলকাতা থেকে তিনি যে বাড়ি এসেছেন, কৈ সে ত আমি শুনিনি।

আমাকে দেখে চমকে উঠে বললেন, আাঁ, সদু যে! এখানে?

অনেকদিন তাঁকে দেখিনি, অনেকদিন তাঁর গলা শুনিনি, আমার বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। কান পর্যন্ত লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠল, মুখের পানে চেয়ে ত জবাব দিতে পারলুম না, মাটির দিকে চেয়ে বললুম, আমি ত রোজই ফুল কুড়ুতে আসি। কবে এলেন?

নরেন মালীদের একটা ভাঙ্গা খাটিয়া টেনে নিয়ে বসে বললে, আজ সকালে। কিন্তু তুমি কার হুকুমে ফুল চুরি কর শুনি?

গম্ভীর গলায় আশ্চর্য হয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, চোখ দুটো তার চাপা হাসিতে নাচচে।

লজ্জা! লজ্জা! এই পোড়ার মুখেও কোথা থেকে হাসি এসে পড়ল, বললুম, তাই বৈ কি। কষ্ট করে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয়?

নরেন ফস্ করে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আর আমি যদি ঐ কুড়ান ফুলগুলো তোমার কোঁচড়ের ভেতর থেকে আর একবার কুড়িয়ে নিই, তাকে কি বলে?

জানিনে, কেন আমার ভয় হ'ল, সত্যিই যেন এইবার সে এসে আমার আঁচল চেপে ধরবে। হাতের মুঠো আমার আলগা হয়ে গিয়ে চোখের পলকে সমস্ত ফুল ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

ও কি করলে?

আমি কোনমতে আপনাকে সামলে নিয়ে বললুম, আপনাদেরই ত ফুল, বেশ ত, নিন না কুড়িয়ে।

এ্যাঁ! এত অভিমান! বলে সে উঠে এসে আমার আঁচলটা টেনে নিয়ে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখতে লাগল। কেন জানিনে, হঠাৎ আমার দু'চোখ জলে ভরে গেল, আমি জোর করে মুখ ফিরিয়ে আর-একদিকে চেয়ে রইলুম।

সমস্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমার আঁচলে একটা গেরো দিয়ে, নরেন তার জায়গায় ফিরে গেল। খানিকক্ষণ আমার পানে চুপ করে চেয়ে থেকে বললে, যে ঠাট্টা বুঝতে পারে না,

এত অল্পে রাগ করে, তার ফিলজফি পড়া কেন? আমি কালই গিয়ে ব্রজবাবুকে বলে দেব, তিনি আর যেন পণ্ডশ্রম না করেন।

আমি আগেই চোখ মুছে ফেলেছিলুম, বললুম, কে রাগ করেছে?

যে ফুল ফেলে দিলে?

ফুল ত আপনি পড়ে গেল।

মুখখানাও বুঝি আপনি ফিরে আছে?

আমি ত মেঘ দেখচি।

মেঘ বুঝি এদিকে ফিরে দেখা যায় না?

কৈ যায়? বলে আমি ভুলে হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দু'জনার চোখোচোখি হয়ে গেল। নরেন ফিক করে হেসে বললে, একখানা আরশি থাকলে যায় কি না, দেখিয়ে দিতুম। নিজের মুখে চোখেই একসঙ্গে মেঘ-বিদ্যুৎ দেখতে পেতে; কষ্ট করে আকাশ খুঁজতে হ'ত না।

আমি তখন চোখ ফিরিয়ে নিলুম। রূপের প্রশংসা আমি ঢের শুনেছি, কিন্তু নরেনের চাপা হাসি, চাপা ইঙ্গিত, সেদিন আমার বুকের মধ্যে ঢুকে আমার হৃৎপিণ্ডটাকে যেন সজোরে দুলিয়ে দিলে। এই ত সেই পাঁচ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হয়, সে সৌদামিনী বুঝি বা আর কেউ ছিল।

নরেন বললে, মেঘ না কাটলে ব্রজবাবুকে বলে দেব, লেখাপড়া শেখান মিছে। তিনি আর যেন কষ্ট না করেন।

আমি বললুম, বেশ ত, ভালই ত। আমি ও-সব পড়তেও চাইনে, বরং গল্পের বই পড়তেই আমার ঢের ভাল লাগে।

নরেন হাততালি দিয়ে বলে উঠল, দাঁড়াও বলে দিচ্ছি, আজকাল নভেল পড়া হচ্চে বুঝি?

আমি বললুম, গল্পের বই তবে আপনি নিজে পড়েন কেন?

নরেন বললে, সে শুধু তোমাকে গল্প বলবার জন্যে। নইলে পড়তুম না। বৃষ্টির দিকে চেয়ে বললে, আচ্ছা, এ জল যদি আজ না থামে? কি করবে?

বললুম, ভিজে ভিজে চলে যাব।

আচ্ছা, এ যদি আমাদের পাহাড়ী বৃষ্টি হ'ত, তা হলে?

গল্প জিনিসটা চিরদিন কি ভালই বাসি! একটুখানি গন্ধ পাবামাত্র আমার চোখের দৃষ্টি একমুহূর্তে আকাশ থেকে নরেনের মুখের উপর নেমে এলো। জিজ্ঞেস করে ফেললুম, সে দেশের বৃষ্টির মধ্যে বুঝি বেরোনো যায় না?

নরেন বললে, একেবারে না। গায়ে তীরের মত বেঁধে।

আচ্ছা, তুমি সে বৃষ্টি দেখেচ? পোড়া-মুখ দিয়ে তুমি বার হয়ে গেল। ভাবি, জিভটা সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখ থেকে খসে পড়ে যেত!

সে বললে, এর পর যদি একজন আপনি বলে ডাকে, সে আর একজনের মরা-মুখ দেখবে।

কেন দিব্যি দিলেন? আমি ত কিছুতেই তুমি বলব না।

· বেশ, তা হলে মরা-মুখ দেখো।

দিব্যি কিছুই না। আমি মানিনে।

কেমন মান না, একবার আপনি বলে প্রমাণ করে দাও।

মনে মনে রাগ করে বললুম, পোড়ামুখী! মিছে তেজ তোর রইল কোথায়? মুখ দিয়ে ত কিছুতে বার করতে পারলি নে। কিন্তু দুর্গতির যদি ঐখানেই সেদিন শেষ হয়ে যেত!

ক্রমে আকাশের জল থামল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জলে সমস্ত দুনিয়াটা যেন ঘুলিয়ে একাকার করে দিলে। সন্ধ্যা হয়-হয়। ফুল ক'টি আঁচলে বাঁধা, কাদা-ভরা বাগানের পথে বেরিয়ে পড়লুম।

নরেন বললে, চল, তোমাকে পৌঁছে দি।

আমি বললুম, না।

মন যেন বলে দিলে, সেটা ভাল না। কিন্তু অদৃষ্টকে ডিঙ্গিয়ে যাব কি করে? বাগানের

ধারে এসে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। সমস্ত নালাটা জলে পরিপূর্ণ। পার হই কি করে?

নরেন সঙ্গে আসেনি, কিন্তু সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমাকে চুপ করে দাঁড়াতে দেখে, অবস্থাটা বুঝে নিতে তার দেরি হ'ল না। কাছে এসে বললে, এখন উপায়?

আমি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম, নালায় ডুবে মরি, সেও আমার ভাল, কিন্তু একলা অতদূর সদর রাস্তা ঘুরে আমি কিছুতে যাব না। মা দেখলে—

কথাটা আমি শেষ করতেই পারলুম না।

নরেন হেসে বললে, তার আর কি, চল তোমাকে সেই পিটুলি গাছটার উপর দিয়ে পার করে দিই।

তাই ত বটে! আহ্লাদে মনে মনে নেচে উঠলুম। এতক্ষণ আমার মনে পড়েনি যে খানিকটা দূরে একটা পিটুলি গাছ বহুকাল থেকে ঝড়ে উপড়ে নালার ওপর ব্রিজের মত পড়ে আছে। ছেলেবেলায় আমি নিজেই তার উপর দিয়ে এপার ওপার হয়েচি।

খুশী হয়ে বললুম, তাই চল—

নরেন তার চেয়েও খুশী হয়ে বললে, কেমন মিষ্টি শোনালে বল ত!

বললুম, যাও—

সে বললে, নির্বিঘ্নে পার না করে দিয়ে কি আর যেতে পারি!

বললুম, তুমি কি আমার পারের কাণ্ডারী নাকি?

আমি আজও ভেবে পাইনি, এ কথা কি করেই বা মনে এল এবং কেমন করেই বা মুখ দিয়ে বার করলুম। কিন্তু সে যখন আমার মুখপানে চেয়ে একটু হেসে বললে, দেখি, তাই যদি হতে পারি—আমি ঘেন্নায় যেন মরে গেলুম!

সেখানে এসে দেখি, পার হওয়া সোজা নয়। একে ত স্থানটা গাছের ছায়ায় অন্ধকার, তাতে পিটুলি গাছটাই জলে ভিজে ভিজে যেমন পিছল তেমনি উঁচু-নীচু হয়ে আছে। তলা দিয়ে সমস্ত বৃষ্টির জল হুহু শব্দে বয়ে যাচ্চে, আমি একবার পা বাড়াই, একবার টেনে নিই। নরেন খানিকক্ষণ দেখে বললে, আমার হাত ধরে যেতে পারবে?

বললুম, পারব। কিন্তু তার হাত ধরে এমনি কাণ্ড করলুম যে, সে কোনমতে টাল সামলে এদিকে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করলে। কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দুটো যেন ঝকঝক করে উঠল। বললে, দেখবে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হতে পারি কি না?

আশ্চর্য হয়ে বললুম, কি করে?

এমনি করে, বলেই সে নত হয়ে আমার দুই হাঁটুর নীচে এক হাত, ঘাড়ের নীচে অন্য হাত দিয়ে চোখের নিমিষে তার বুকের কাছে তুলে নিযে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলুম। নরেন দ্রুতপদে পার হয়ে এপারে চলে এল। কিন্তু নামাবার আগে, আমার ঠোঁট দুটোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু থাক গে! কম ঘেন্নায় কি আর এ দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশি গলায় দড়ি দিতে চায়!

শিউরুতে শিউরুতে বাড়ি চলে এলুম, ঠোঁট দুটো তেমনি জ্বলতেই লাগল বটে, কিন্তু সে জ্বালা লঙ্কা-মরিচখোরের জ্বলুনির মত যত জ্বলতে লাগল, জ্বালার তৃষ্ণা তত বেড়ে যেতেই লাগল।

মা বললেন, ভালো মেয়ে তুই সদু, এলি কি করে? নালাটা ত জলে জলমগ্ন হয়েছে দেখে এলুম। সেই গাছটার ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি? পড়ে মরতে পারলি নে?

না মা। সে পুণ্য থাকলে আর এ গল্প লেখবার দরকার হবে কেন?

তার পরদিন নরেন মামার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি সেইখানেই বসেছিলুম, তার পানে চাইতে পারলুম না, কিন্তু আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যে চোরাবালির মত আমার পা দুটোকে একটু একটু করে গিলতে লাগল, আমি নড়তেও পারলুম না, মুখ তুলে দেখতেও পারলুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হ'ল, তা শয়তানই জানে, অনেকদিন পর্যন্ত আর সে কলকাতায় গেল না। রোজই দেখা হতে লাগল। মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে

পাঠিয়ে বলতে লাগলেন, ওদের পুরুষমানুষদের লেখাপড়ার কথাবার্তা হয়, তুই তার মধ্যে হাঁ করে বসে কি শুনিস বল ত? যা, বাড়ির ভেতরে যা। এতবড় মেয়ের যদি লজ্জাশরম একটুকু আছে!

এক-পা এক-পা করে আমার ঘরে চলে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পারতুম না। যতক্ষণ সে থাকত তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টানতে থাকত।

আমার মামা আর যাই হোন, তাঁর মনটা প্যাঁচালো ছিল না। তা ছাড়া, লিখে পড়ে তর্ক করে ভগবানকে উড়িয়ে দেবার ফন্দিতেই সমস্ত অন্তঃকরণটা তাঁর এমনি অনুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘটচে তা দেখতে পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেচি, জগতের সবচেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলোই হচ্চে সবচেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানের যে লীলার অন্ত নেই। তিনি যে এই 'না' রূপেই তাদের পনরো আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় না। সপ্রমাণ হোক, অপ্রমাণ হোক, তাঁর ভাবনাতে সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, সংসারের মানুষগুলো কি বোকা! তারা সকাল-সন্ধ্যায় বসে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে। আমার মামারও ছিল সেই দশা। তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। কিন্তু মা ত তা নয়। তিনি যে আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ ছিল না! আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ করেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের দু'জনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জানতেন, আমি জানতুম না, তা নয়। ভাবলেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠত, তাই ভাবনার এই বিশ্রী দিকটাকে আমি দু'হাতে ঠেলে রাখতুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেলেচি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হলে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না। নির্জলা বিষের আগুনে কলজে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ।

আর একটা জিনিস আমি কিছুতেই ভুলতে পারতুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বর্যের চেহারা। ছেলেবেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়িতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘরদোর, ছবি-দেয়ালগিরি, আলমারি, সিন্দুক, আসবাবপত্রের সঙ্গে কোন্ একটা ভাবী ছোট একতলা শ্বশুরবাড়ির কদাকার মূর্তি কল্পনা করে মনে মনে আমি যেন শিউরে উঠতুম।

মাস-খানেক পরে একদিন সকালবেলা নদী থেকে স্নান করে বাড়িতে পা দিয়েই দেখি, বারান্দার ওপর একজন প্রৌঢ়-গোছের বিধবা স্ত্রীলোক মায়ের কাছে বসে গল্প করচে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলে, এইটি বুঝি মেয়ে?

মা ঘাড় নেড়ে বললেন, হাঁ মা, এই আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন, নইলে—

স্ত্রীলোকটি হেসে বললে, তা হোক, ছেলেটির বয়সও প্রায় ত্রিশ, দু'জনের মানাবে ভাল। আর ঐ শুনতেই দোজবরে, নইলে যেন কার্তিক।

আমি দ্রুতপদে ঘরে চলে গেলুম। বুঝলুম, ইনি ঘটকঠাকরুন, আমার সম্বন্ধ এনেছেন। মা চেঁচিয়ে বললেন, কাপড় ছেড়ে একবার এসে ব'স মা।

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনতে লাগলুম। বুকের কাঁপুনি যেন আর থামতে চায় না। শুনতে পেলুম, চিতোর গ্রামের কে একজন রাধাবিনোদ মুখুয্যের ছেলে ঘনশ্যাম। পোড়াকপালে নাকি অনেক দুঃখ ছিল, তাই আজ যে নাম জপের মন্ত্র, সে নাম শুনে সেদিন গা জ্বলে যাবে কেন?

শুনলুম, বাপ নেই, কিন্তু মা আছেন। ছোট দুটি ভাই, এক ভায়ের বিয়ে হয়েছে, একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই ঘাড়ে, তাই এন্ট্রান্স পাশ করেই রোজগারের ধান্দায় পড়া ছাড়তে হয়েছে। ধান, চাল, তিসি, পাট প্রভৃতির দালালি করে উপায় মন্দ করেন না।

তাঁরই উপর সমস্ত নির্ভর। তা ছাড়া ঘরে নারায়ণ-শিলা আছেন, দুটো গরু আছে, বিধবা বোন আছে—নেই কি?

নেই শুধু সংসারের বড়বৌ। সাত বছর আগে বিয়ের একমাসের মধ্যেই তিনি মারা যান, তারপর এতদিন বাদে এই চেষ্টা। সাত বচ্ছর! ঘটকীকে উদ্দেশ করে মনে মনে বললুম, পোড়ারমুখী, এতদিন কি তুই শুধু আমার মাথা খেতেই চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিলি?

মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বসলুম। সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বললে, মেয়ে পছন্দ হয়েচে, এখন দিন স্থির করলেই হ'ল। মায়ের চোখ দুটিতে জল টলটল করতে লাগল, বললেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক মা, আর কি বলব!

মামা শুনে বললেন, এনট্রান্স? তবে বলে পাঠা, এখন বছর-দুই সদুর কাছে ইংরিজী পড়ে যাক, তবে বিয়ের কথা কওয়া যাবে।

মা বললেন, তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত ক'রো না, এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। দিতে-থুতে কিছু হবে না—

মামা বললেন, তা হলে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় দিগে যা, সেও এক পয়সা চাইবে না।

মা বললেন, পনরয় পা দিলে যে—

মামা বললেন, তা ত দেবেই; পনর বছর বেঁচে রয়েছে যে!

মা রাগে দুঃখে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, তুমি কি ওর তবে বিয়ে দেবে না দাদা? এর পরে একেবারেই পাত্র জুটবে না।

মামা বললেন, সেই ভয়ে ত আগে থেকে ওকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না!

মা বললেন, ছেলেটিকে একবার নিজের চোখে দেখে এস না দাদা, পছন্দ না হয়, না দেবে।

মামা বললেন, সে ভাল কথা। রবিবার যাব বলে চিঠি লিখে দিচ্চি।

ভাঙ্‌চির ভয়ে কথাটা মা গোপনে রেখেছিলেন এবং মামাকেও সাবধান করে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন না, এমন চোখ-কানও ছিল, যাকে কোন সতর্কতা ফাঁকি দিতে পারে না।

বাগানে একটুকরো শাকের ক্ষেত করেছিলুম। দিন-দুই পরে দুপুরবেলা একটা ভাঙ্গা খুন্তি নিয়ে তার ঘাস তুলচি, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি, নরেন। তার সে-রকম মুখের চেহারা অনেকদিন পরে আর একবার দেখেছিলুম সত্যি, কিন্তু আগে কখনও দেখিনি। বুকে এমন একটা ব্যথা বাজল যা কখন কোনদিন পাইনি। সে বললে, আমাকে ছেড়ে কি সত্যিই চললে?

কথাটা বুঝেও যেন বুঝতে পারলুম না। বলে ফেললুম, কোথায়?

সে বললে, চিতোর।

স্পষ্ট হ'বা-মাত্রই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল, কোন উত্তর মুখে এল না।

সে পুনরায় বললে, তাই আমিও বিদায় নিতে এসেছি; বোধ হয় জন্মের মতই। কিন্তু তার আগে দুটো কথা বলতে চাই—শুনবে?

বলতে বলতেই তার গলাটা যেন ধরে গেল। তবুও আমার মুখে কথা যোগাল না—কিন্তু মুখ তুলে চাইলুম। এ কি! দেখি, তার দু'চোখ বয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে।

ওরে পতিত! ওরে দুর্বল নারী! মানুষের চোখের জল সহ্য করবার ক্ষমতা ভগবান তোকে যখন একেবারে দেননি, তখন তোর আর সাধ্য ছিল কি! দেখতে দেখতে আমারও চোখের জলে বুক ভেসে গেছে। নরেন কাছে এসে কোঁচার খুঁট দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাত ধরে বললে, চল, ওই গাছটার তলায় গিয়ে বসি গে, এখানে কেউ দেখতে পাবে।

মনে বুঝলুম, এ অন্যায়, একান্ত অন্যায়! কিন্তু তখনও যে তার চোখের পাতা ভিজে, তখনও যে তার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভরা।

বাগানের একপ্রান্তে একটা কাঁটালী-চাঁপার কুঞ্জ ছিল, তার মধ্যে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটা ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুরদুর করছিল, কিন্তু সে নিজেই দূরে গিয়ে বসে বললে, এই একান্ত নির্জ্জন স্থানে তোমাকে ডেকে এনেছি বটে কিন্তু তোমাকে ছোঁব না, এখনও তুমি আমার হওনি।

তার শেষ কথায় আবার পোড়া চোখে জল এসে পড়ল। আঁচলে চোখ মুছে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলুম।

তারপর অনেক কথাই হল, কিন্তু থাক গে সে-সব। আজও ত প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্যন্ত মনে করতে পারি, মরণেও যে বিস্মৃতি আসবে, সে আশা করতেও যেন ভরসা হয় না; একটা কারণে আমি আমার এতবড় দুর্গতিতেও কোনদিন বিধাতাকে দোষ দিতে পারিনি। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার চিত্তের মাঝে থেকে নরেনের সংস্রব তিনি কোনদিন প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন নি। সে যে আমার জীবনে কত বড় মিথ্যে, এ ত তাঁর অগোচর ছিল না। তাই তার প্রণয়-নিবেদনের মুহূর্তের উত্তেজনা পরক্ষণের কতবড় অবসাদে যে ডুবে যেত, সে আমি ভুলিনি। যেন কার কত চুরি-ডাকাতি সর্বনাশ করে ঘরে ফিরে এলুম, এমনি মনে হ'ত। কিন্তু এমনি পোড়া কপাল যে, অন্তর্যামীর এতবড় ইঙ্গিতেও আমার হুঁশ হয়নি। হবেই বা কি করে? কোনদিন ত শিখিনি যে, ভগবান মানুষের বুকের মধ্যেও বাস করেন। এই সবই তাঁরই নিষেধ।

মামা পাত্র দেখতে যাত্রা করলেন। যাবার সময় কতই না ঠাট্টা-তামাশা করে গেলেন। মা মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বেশ বুঝলেন, এ যাওয়া পণ্ডশ্রম। পাত্র তাঁর কিছুতেই পছন্দ হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য, ফিরে এসে আর বড় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলেন না। বললেন, হাঁ, ছেলেটি পাশ-টাশ তেমন কিছু করতে পারেনি বটে, কিন্তু মুখ্যু বলেও মনে হ'ল না! তা ছাড়া বড় নম্র, বড় বিনয়ী। আর একটা কি জানিস গিরি, ছেলেটির মুখের ভাবে কি একটু আছে, ইচ্ছে হয়, বসে বসে আরও দু'দণ্ড আলাপ করি।

মা আহ্লাদে মুখখানি উজ্জ্বল করে বললেন, তবে আর আপত্তি ক'রো না দাদা, মত দাও-সদুর একটা কিনারা হয়ে যাক।

মামা বললেন, আচ্ছা, ভেবে দেখি।

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে নিরাশার আশাটুকু বুকে চেপে ধরে মনে মনে বললুম, যাক, মামা এখনো মতস্থির করতে পারেন নি। এখনও বলা যায় না। কিন্তু কে জানত, তাঁর ভাগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার পূর্বেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার ডাক এসে পড়বে। যাঁকে সারাজীবন সন্দেহ করে এসেছেন, সেদিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর দূত এসে যখন একেবারে মামার শিয়রে দাঁড়াল, তখন তিনি চমকে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও বড় কম চমক লাগল না। মাকে কাছে ডেকে বললেন, আমি মত দিয়ে যাচ্ছি বোন, সদুর সেইখানেই বিয়ে দিস। ছেলেটির যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে। মেয়েটা সুখে থাকবে। অবাক কাণ্ড! কিন্তু অবাক হলেন না শুধু মা। নাস্তিকতা তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, মরণকালে সবাই ঘুরে ফিরে হরি বলে। তাই তিনি বলতেন, মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যত ভালই বাসুক না কেন, নির্ভর করবার বেলায় করে শুধু তাকে, যে মদ খায় না। জানি না, কথাটা কতখানি সত্যি।

হৃদ্‌রোগে মামা মারা গেলেন, আমরা পড়লুম অকূল পাথারে। সুখে-দুঃখে কিছুদিন কেটে গেল বটে, কিন্তু যে বাড়িতে অবিবাহিতা মেয়ের বয়স পনর পার হয়ে যায়, সেখানে আলস্যভরে শোক করবার সুবিধা থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে বসে আবার কোমর বেঁধে লাগলেন।

অবশেষে অনেকদিন অনেক কথা-কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন যখন সত্যিই আমার বুকে এসে বিঁধল, তখন বয়সও ষোল পার হয়ে গেল। তখনও আমি প্রায় এমনিই লম্বা। আমার এই দীর্ঘ দেহটার জন্য জননীর লজ্জা ও কুণ্ঠার অবধি ছিল না। রাগ করে প্রায়ই ভর্ৎসনা করতেন, হতভাগা-মেয়েটার সবই সৃষ্টিছাড়া। একে ত বিয়ের কনের পক্ষে সতের বছর একটা মারাত্মক অপরাধ, তার উপর এই দীর্ঘ গড়নটা যেন তাকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ সে রাতটার জন্যও যদি আমাকে কোনরকমে মুচড়ে মাচড়ে একটু খাটো করে তুলতে পারতেন, মা বোধ করি তাতেও পেছুতেন না। কিন্তু সে ত হবার নয়। আমি আমার স্বামীর বুক ছাড়িয়ে একেবারে দাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছলুম।

কিন্তু শুভদৃষ্টি হ'ল না, আমি ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণায় চোখ

বুজে রইলুম। কিন্তু তাও বলি, এমন কোন অসহ্য মর্মান্তিক দুঃখও তখন আমি মনের মধ্যে পাইনি।

ইতিপূর্বে কতদিন সারারাত্রি জেগে ভেবেছি, এমন দুর্ঘটনা যদি সত্যিই কপালে ঘটে, নরেন এসে আমাকে না নিয়ে যায়, তবু আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে কোনমতেই হতে পারবে না। সে রাত্রে নিশ্চয় আমার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে, ধরাধরি করে আমাকে বিবাহ-সভা থেকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হবে, এ বিশ্বাস আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু কৈ, কিছুই ত হ'ল না। আরও পাঁচজন বাঙ্গালীর মেয়ের যেমন হয় শুভকর্ম তেমনি করে আমারও সমাধা হয়ে গেল এবং তেমনি করেই একদিন শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করলুম।

শুধু যাবার সময়টিতে পালকির ফাঁক দিয়ে সেই কাঁটালী-চাপার কুঞ্জটায় চোখ পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কতদিনের কত চোখের জল, কত দিব্যি-দিলাসার নীরব সাক্ষী।

আমার চিতোর গ্রামের সম্বন্ধটা যেদিন পাকা হয়ে গেল, ওই গাছটার আড়ালে বসেই অনেক অশ্রু-বিনিময়ের পর স্থির হয়েছিল, সে এসে একদিন আমাকে নিয়ে চলে যাবে। কেন, কোথায় প্রভৃতি বাহুল্য প্রশ্নের তখন আবশ্যকও হয়নি।

আর কিছু না, শুধু যাবার সময় একবার যদি দেখা হ'ত! কেন সে আমাকে আর চাইলে না, কেন আর একটা দিনও দেখা দিলে না, শুধু যদি খবরটা পেতুম।

শ্বশুরবাড়ি গেলুম, বিয়ের বাকী অনুষ্ঠানও শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি আমার স্বামীর ধর্মপত্নীর পদে এইবার পাকা হয়ে বসলুম।

দেখলুম, স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা শুধু একা আমার নয়। বাড়িসুদ্ধ আমার দলে। শ্বশুর নেই, সৎ-শাশুড়ী তাঁর নিজের ছেলে দুটি, একটি বৌ এবং বিধবা মেয়েটি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এতদিন নিরাপদে সংসার করছিলেন, হঠাৎ একটি সতের-আঠার বছরের মস্ত বৌ দেখে তাঁর সমস্ত মন সশস্ত্র জেগে উঠল। কিন্তু মুখে বললেন, বাঁচলুম বৌমা, তোমার হাতে সংসার ফেলে দিয়ে এখন দু'দণ্ড ঠাকুরদের নাম করতে পাব। ঘনশ্যাম আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী। সে বেঁচে থাকলেই তবে সব বজায় থাকবে, এইটি বুঝে শুধু কাজ কর মা, আর কিছু আমি চাইনে।

তাঁর কাজ তিনি করলেন; আমার কাজ আমি করলুম, বললুম, আচ্ছা। কিন্তু সে ওই কুস্তিগিরের তাল ঠোকার মত। প্যাঁচ মারতে যে দু'জনেই জানি, তা ইশারায় জানিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কত শীঘ্র মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে চিনতে পারে, এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। তাঁকে জানতে আমারও যেমন দেরি হ'ল না, আমাকেও দু'দিনের মধ্যে চিনে নিয়ে তিনিও তেমনিই আরামের নিশ্বাস ফেললেন, বেশ বুঝলেন, স্বামীর খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, খরচ-পত্র নিয়ে দিবারাত্র চক্র ধরে ফোঁসফোঁস করে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

মেয়েমানুষের তূণে যতপ্রকার দিব্যাস্ত্র আছে, 'আড়ি-পাতা'টা ব্রহ্মাস্ত্র। সুবিধা পেলে এতে মা-মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ, জা-ননদ, কেউ কাকে খাতির করে না। আমি ঠিক জানি, আমি যে পালঙ্কে না শুয়ে ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর টেনে নিয়ে সারারাত্রি পড়ে থাকতুম, এ সুসংবাদ তাঁর অগোচর ছিল না। আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হলে সেইদিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম, সেটা ভুল। ফাটবার চেরবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু তাই বলে একশয্যায় শুতেও আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হ'ল না।

দেখলুম, আমার স্বামীটি অদ্ভুত-প্রকৃতির লোক। আমার আচরণ নিয়ে তিনি কিছুদিন পর্যন্ত কোন কথাই কইলেন না। অথচ মনে মনে রাগ কিংবা অভিমান করে আছেন, তাও না। শুধু একদিন একটু হেসে বললেন, ঘরে আর একটা খাট এনে বিছানাটা বড় করে নিলে কি শুতে পার না?

আমি বললুম, দরকার কি, আমার ত এতে কষ্ট হয় না।

তিনি বললেন, না হলেও একদিন অসুখ করতে পারে যে।

আমি বললুম, তোমার এতই যদি ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দিতে পার না?

তিনি বললেন, ছিঃ, তা কি হয়? তাতে কত রকমের অপ্রিয় আলোচনা উঠবে।

বললুম, ওঠে উঠুক, আমি গ্রাহ্য করিনে।

তিনি একমুহূর্ত চুপ করে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, এতবড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাকবে, এমন কি কথা আছে? বলে একটুখানি হেসে কাজে চলে গেলেন।

আমার মেজদেওর টাকা চল্লিশের মত কোথাও চাকরি করতেন; কিন্তু একটা পয়সা কখনো সংসারে দিতেন না। অথচ তাঁর আপিসের সময়ের ভাত, আপিস থেকে এলে পা-ধোবার গাড়ু-গামছা, জল-খাবার, পান-তামাক ইত্যাদি যোগাবার জন্যে বাড়িসুদ্ধ সবাই যেন ত্রস্ত হয়ে থাকত। দেখতুম, আমার স্বামী, আমার মেজদেওর হয়ত কোনদিন এক-সঙ্গেই বিকেলবেলায় বাড়ি ফিরে এলেন, সবাই তাঁর জন্যেই ব্যতিব্যস্ত; এমন কি চাকরটা পর্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্যে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে। তাঁর একতিল দেরি কিংবা অসুবিধা হলে যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। অথচ আমার স্বামীর দিকে কেউ চেয়েও দেখত না। তিনি আধঘণ্টা ধরে হয়ত এক ঘটি জলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, কারও সেদিকে গ্রাহ্যই নেই। অথচ এদের খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধের জন্যেই তিনি দিবারাত্রি খেটে মরচেন। ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, কিন্তু তাঁর যেন কিছুতেই শ্রান্তি নেই, কোন দুঃখই যেন তাঁকে পীড়া দিতে পারে না। এমন শান্ত, এত ধীর, এতবড় পরিশ্রমী এর আগে কখনও আমি চোখে দেখিনি। আর চোখে দেখেচি বলেই লিখতে পারচি, নইলে শোনা কথা হলে বিশ্বাস করতেই পারতুম না, সংসারে এমন ভালোমানুষও থাকতে পারে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সব-তাতেই বলতেন, থাক থাক, আমার এতেই হবে।

স্বামীর প্রতি আমার মায়াই ত ছিল না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণার ভাবই ছিল। তবু এমন একটা নিরীহ লোকের উপর বাড়িসুদ্ধ সকলের এতবড় অন্যায় অবহেলায় আমার গা যেন জ্বলে যেতে লাগল।

বাড়িতে গরুর দুধ বড় কম হ'ত না। কিন্তু তাঁর পাতে কোনদিন বা একটু পড়ত, কোনদিন পড়ত না। হঠাৎ একদিন সইতে না পেরে বলে ফেলেছিলুম আর কি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছি ছি, কি নির্লজ্জই আমাকে তা হলে এরা মনে করত! তা ছাড়া এরা সব আপনার লোক হয়েও যদি দয়ামায়া না করে, আমারই বা এত মাথাব্যথা কেন? আমি কোথাকার কে? পর বৈ ত না।

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন সকালবেলা রান্নাঘরে বসে মেজঠাকুরপোর জন্যে চা তৈরি করচি, স্বামীর কণ্ঠস্বর আমার কানে গেল। তাঁর সকালেই কোথায় বার হবার দরকার ছিল, ফিরতে দেরি হবে, মাকে ডেকে বললেন, কিছু খেয়ে গেলে বড় ভাল হ'ত মা, খাবার-টাবার কিছু আছে?

মা বললেন, অবাক করলে ঘনশ্যাম? এত সকালে খাবার পাব কোথায়?

স্বামী বললেন, তবে থাক, ফিরে এসেই খাব। বলে চলে গেলেন।

সেদিন আমি কিছুতেই আপনাকে আর সামলাতে পারলুম না। আমি জানতুম, ও-পাড়ার বোসেরা তাদের বেয়াইবাড়ির পাওয়া সন্দেশ-রসগোল্লা পাড়ায় বিলিয়েছিল। কাল রাত্রে আমাদেরও কিছু দিয়েছিল।

শাশুড়ী ঘরে ঢুকতেই বলে ফেললুম, কালকের খাবার কি কিছুই ছিল না মা?

তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়ে বললেন, খাবার আবার কে কিনে আনলে বৌমা?

আমি বললুম, সেই যে বোসেরা দিয়ে গিয়েছিল?

তিনি বললেন, ও মা, সে আবার ক'টা যে, আজ সকাল পর্যন্ত থাকবে? সে ত কালই শেষ হয়ে গেছে।

বললুম, তা ঘরেই কিছু খাবার তৈরি করে দেওয়া যেত না মা?

শাশুড়ী বললেন, বেশ ত বৌমা, তাই কেন দিলে না? তুমি ত বসে বসে সমস্ত শুনছিলে বাছা?

চুপ করে রইলুম। আমার কি-ই বা বলবার ছিল। স্বামীর প্রতি আমার ভালবাসার টান ত আর বাড়িতে কারো অবিদিত ছিল না!

চুপ করে রইলুম সত্যি, কিন্তু ভেতরে মনটা আমার জ্বলতেই লাগল। দুপুরবেলা শাশুড়ী ডেকে বললেন, খাবে এস বৌমা, ভাত বাড়া হয়েছে।

বললুম, আমি এখন খাব না, তোমরা খাও গে।

আমার আজকের মনের ভাব শাশুড়ী লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, খাবে না কেন শুনি?

বললুম, এখন ক্ষিদে নেই।

আমার মেজজা আমার চেয়ে বছর-চারেকের বড় ছিলেন। রান্নাঘরের ভেতর থেকে ঠোকর দিয়ে বলে উঠলেন, বট্‌ঠাকুরের খাওয়া না হলে বোধ হয় দিদির ক্ষিদে হবে না, না?

শাশুড়ী বললেন, তাই নাকি বৌমা, বলি, এ নূতন ঢঙ্‌ শিখলে কোথায়?

তিনি কিছুই মিথ্যে বলেন নি, আমার পক্ষে এ ঢঙ্‌ই বটে, তবু খোঁটা সইতে পারলুম না, জবাব দিয়ে বললুম, নূতন হবে কেন মা, তোমাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি খেতে?

তবু ভাল, ঘনশ্যামের এতদিনে কপাল ফিরল! বলে শাশুড়ী মুখখানা বিকৃত করে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মেজজায়ের গলা কানে গেল। তিনি আমাকে শুনিয়েই বললেন, তখনই ত বলেছিলুম মা, বুড়ো শালিক পোষ মানবে না!

রাগ করে ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু এইবার সমস্ত জিনিসটা মনে মনে আলোচনা করে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, তাঁর খাওয়া হয়নি বলে খাইনি, তাঁর কথা নিয়ে ঝগড়া করেছি, ফিরে এসে, এ-সব যদি তাঁর কানে যায়? ছি ছি! কি ভাববেন তিনি! আমার এতদিনের আচরণের সঙ্গে এ ব্যবহার এমনি বিসদৃশ খাপছাড়া যে নিজের লজ্জাতেই নিজে মরে যেতে লাগলুম।

কিন্তু বাঁচলুম, ফিরে এলে এ কথা কেউ তাকে শোনালে না।

সত্যিই বাঁচলুম, এর একবিন্দু মিছে নয়, কিন্তু আচ্ছা, একটা কথা যদি বলি, তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে কি? যদি বলি, সে রাত্রে পরিশ্রান্ত স্বামী শয্যার উপর ঘুমিয়ে রইলেন, আর নীচে যতক্ষণ না আমার ঘুম এল, ততক্ষণ ফিরে ফিরে কেবলই সাধ হতে লাগল, কেউ যদি কথাটা ওঁর কানে তুলে দিত, অভুক্ত স্বামীকে ফেলে আজ আমি কিছুতে খাইনি, এই নিয়ে ঝগড়া করেছি, তবু মুখ বুজে এ অন্যায় সহ্য করিনি, কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে কি? না হলে তোমাদের দোষ দেব না, হলে বহুভাগ্য বলে মানব। আজ আমার স্বামীর বড় ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই, তাঁর নাম নিয়ে বলচি, মানুষের মন-পদার্থটার যে অন্ত নেই, সেইদিন তার আভাস পেয়েছিলুম। এতবড় পাপিষ্ঠার মনের মধ্যেও এমন দুটো উলটো স্রোত একসঙ্গে বয়ে যাবার স্থান হতে পারে দেখে তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলুম।

মনে মনে বলতে লাগলুম, এ যে বড় লজ্জার কথা! নইলে এখুনি ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে দিতুম, শুধু সৃষ্টিছাড়া ভালোমানুষ হলেই হয় না, কর্তব্য করতে শেখাও দরকার। যে স্ত্রীর তুমি একবিন্দু খবর নাও না, সে তোমার জন্যে কি করেচে একবার চোখ মেলে দেখ। হা রে পোড়া কপাল! খদ্যোৎ চায় সূর্যদেবকে আলো ধরে পথ দেখাতে! তাই বলি, হতভাগীর স্পর্ধার কি আর আদি-অন্ত দাওনি ভগবান!

গরমের জন্যে কিনা বলতে পারিনে, ক'দিন ধরে প্রায়ই মাথা ধরছিল। দিন-পাঁচেক পরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ছটফট করে কখন একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছিল, কে পাশে বসে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করচে। একবার ঠক করে গায়ে পাখাটা ঠেকে যেতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘরে আলো জ্বলছিল, চেয়ে দেখলুম, স্বামী!

রাত জেগে বসে পাখার বাতাস করে আমাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন!

হাত দিয়ে পাখাটা ধরে ফেলে বললুম, এ তুমি কি করচ?

তিনি বললেন, কথা কইতে হবে না, ঘুমোও, জেগে থাকলে মাথাধরা ছাড়বে না।

আমি বললুম, আমার মাথা ধরেচে, কে তোমাকে বললে?

তিনি একটু হেসে জবাব দিলেন, কেউ বলেনি; আমি হাত গুণতে জানি। কারো মাথা ধরলেই টের পাই।

বললুম, তা হলে অন্যদিনও পেয়েচ বল? মাথা ত শুধু আমার আজই ধরেনি।

তিনি আবার একটু হেসে বললেন, রোজই পেয়েচি। কিন্তু এখন একটু ঘুমোবে, না কথা কবে?

বললুম, মাথাধরা আমার ছেড়ে গেছে, আর ঘুমোবো না।

তিনি বললেন, তবে সবুর কর, ওষুধটা তোমার কপালে লাগিয়ে দিই, বলে উঠে গিয়ে কি একটা নিয়ে এসে ধীরে ধীরে আমার কপালে ঘষে দিতে লাগলেন। আমি ঠিক ইচ্ছে করেই যে করলুম, তা নয়, কিন্তু আমার ডান হাতটা কেমন করে তাঁর কোলের ওপর গিয়ে পড়তেই তিনি একটা হাত দিয়ে সেটা ধরে রাখলেন। হয়ত একবার একটু জোর করেও ছিলুম। কিন্তু জোর আপনিই কোথায় মিলিয়ে গেল। দুরন্ত ছেলেকে মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর করে ধরে রাখেন, তখন বাইরে থেকে হয়ত সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতও দেখায়, কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়তে বাধে না।

বাইরের লোক যাই বলুক, শিশু বোঝে, ওটাই তার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। আমার এই জড়পিন্ড হাতটারও বোধ করি সে জ্ঞানই ছিল, নইলে কি করে সে টের পেলে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে পড়ে থাকবার এমন আশ্রয় তার আর নাই!

তারপর তিনি আস্তে আস্তে আমার কপালে হাত বুলোতে লাগলেন, আমি চুপ করে পড়ে রইলুম। আমি এর বেশী আর বলব না। আমার সেই প্রথম রাত্রির আনন্দ-স্মৃতি-- সে আমার, একেবারে আমারই থাক।

কিন্তু আমি ত জানতুম, ভালবাসার যা-কিছু সে আমি শিখে এবং শেষ করে দিয়ে শ্বশুরবাড়ি এসেছি। কিন্তু সে শেখা যে ডাঙায় হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতার শেখার মত ভুল শেখা, এই সোজা কথাটা সেদিন যদি টের পেতাম! স্বামীর কোলের উপর থেকে আমার হাতখানা যে তার সর্বাঙ্গ দিয়ে শোষণ করে এই কথাটাই আমার বুকের ভেতর পৌঁছে দেবার মত চেষ্টা করছিল, এই কথাটাই যদি সেদিন আমার কাছে ধরা পড়ত!

সকালে ঘুম ভেঙে দেখলুম স্বামী ঘরে নেই, কখন উঠে গেছেন। হঠাৎ মনে হ'ল, স্বপন দেখিনি ত? কিন্তু চেয়ে দেখি, সেই ওষুধের শিশিটা তখনও শিয়রের কাছে রয়েছে। কি যেন মনে হ'ল, সেটা বার বার মাথায় ঠেকিয়ে তবে কুলুঙ্গিতে রেখে বাইরে এলুম।

শাশুড়ীঠাকরুন সেইদিন থেকে আমার উপর যে কড়া নজর রাখছিলেন, সে আমি টের পেলুম। আমিও ভেবেছিলুম, মরুক গে, আমি কোন কথায় আর থাকব না। তা ছাড়া দু'দিন আসতে না আসতেই স্বামীর খাওয়া-পরা নিয়ে ঝগড়া—ছি ছি, লোকে শুনলেই বা বলবে কি?

কিন্তু কবে যে এর মধ্যেই আমার মনের ওপর দাগ পড়ে গিয়েছিল, কবে যে তাঁর খাওয়া-পরা নিয়ে ভিতরে ভিতরে উৎসুক হয়ে উঠেছিলুম সে আমি নিজেই জানতুম না! তাই দুটো দিন যেতে-না-যেতেই আবার একদিন ঝগড়া করে ফেললুম।

আমার স্বামীর কে একজন আড়তদার বন্ধু সেদিন সকালে মস্ত একটা রুইমাছ পাঠিয়েছিলেন। স্নান করতে পুকুরে যাচ্ছি, দেখি, বারান্দার ওপর সবাই জড় হয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। কাছে এসে দাঁড়ালুম, মাছ কোটা হয়ে গেছে। মেজজা তরকারি কুটচেন, শাশুড়ী বলে বলে দিচ্ছেন; এটা মাছের ঝোলের কুটনো, ওটা মাছের ডালনার কুটনো, ওটা মাছের অম্বলের কুটনো, এমনই সমস্তই প্রায় আঁশ-রান্না। আজ একাদশী, তাঁর এবং বিধবা মেয়ের খাবার হাঙ্গামা নেই, কিন্তু আমার স্বামীর জন্যে কোন ব্যবস্থাই দেখলুম না। তিনি বৈষ্ণবমানুষ, মাছমাংস ছুঁতেন না। একটু ডাল, দুটো ভাজাভুজি, একটুখানি অম্বল হলেই তাঁর খাওয়া হ'ত। অথচ ভাল খেতেও তিনি ভালবাসতেন। এক-আধদিন একটু ভাল তরকারি হলে তাঁর আহ্লাদের সীমা থাকত না, তাও দেখেচি।

বললুম, ওঁর জন্যে কি হচ্ছে মা?

শাশুড়ী বললেন, আজ আর সময় কৈ বোমা? ওর জন্যে দুটো আলু-উচ্ছে ভাতে দিতে বলে দিয়েচি, তার পর একটু দুধ দেব'খন।

বললুম, সময় নেই কেন মা?

শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছ বৌমা! এতগুলো আঁশ-রান্না হতেই ত দশটা-এগারোটা বেজে যাবে। আজ আমার অখিলের (মেজদেওর) দু-চার জন বন্ধুবান্ধব খাবে, তারা হ'ল সব আপিসার মানুষ, দশটার মধ্যে খাওয়া না হলে পিত্তি পড়ে সারাদিন আর খাওয়াই হবে না। এর উপর আবার নিরামিষ রান্না করতে গেলে ত রাঁধুনী বাঁচে না। তার প্রাণটাও ত দেখতে হবে বাছা!

রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করে জ্বলতে লাগল। তবু কোনমতে আত্মসংবরণ করে বললুম, শুধু আলু-উচ্ছে-ভাতে দিয়ে কি কেউ খেতে পারে? একটুখানি ডাল রাঁধবারও কি সময় হ'ত না?

তিনি আমার মুখের পানে কটমট করে চেয়ে বললেন, তোমার সংগে তর্ক করতে পারিনে বাছা, আমার কাজ আছে।

এতক্ষণ রাগ সামলেছিলুম, আর পারলুম না। বলে ফেললুম, কাজ সকলেরি আছে মা! তিনি তিরিশ টাকার কেরানীগিরি করেন না বলে, কুলি-মজুর বলে তোমরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে পারো। কিন্তু আমি ত পারিনে। আমি ওই দিয়ে তাঁকে খেতে দেব না। রাঁধুনী রাঁধতে না পারে, আমি যাচ্ছি।

শাশুড়ী খানিকক্ষণ অবাক হয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, তুমি ত কাল এলে বৌমা, এতদিন তার কি করে খাওয়া হ'ত শুনি?

বললুম, সে খোঁজে আমার দরকার নেই। কিন্তু কাল এলেও আমি কচি খুকী নই মা! এখন থেকে সে-সব হতে দিতে পারব না। রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধুনীকে বললুম, বড়বাবুর জন্যে নিরামিষ ডাল, ডালনা, অম্বল হবে। তুমি না পার, একটা উনুন ছেড়ে দাও, আমি এসে রাঁধচি, বলে আর কোন তর্কাতর্কির অপেক্ষা না করে স্নান করতে চলে গেলুম।

স্বামীর বিছানা আমি রোজ নিজের হাতেই করতুম। এই ধপধপে সাদা বিছানাটার উপর ভেতরে ভেতরে যে একটা লোভ জন্মাচ্ছিল, হঠাৎ এতদিনের পর আজ বিছানা করবার সময় সে কথা জানতে পেরে নিজের কাছেই যেন লজ্জায় মরে গেলুম।

ঘড়িতে বারোটা বাজতে তিনি শুতে এলেন। কেন যে এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে বই পড়ছিলুম, তাঁর পায়ের শব্দ সে খবর আজ এমনি স্পষ্ট করে আমার কানে কানে বলে দিল যে, লজ্জায় মুখ তুলে চাইতেও পারলাম না।

স্বামী বললেন, এখনো শোওনি যে?

আমি বই থেকে মুখ তুলে ঘড়ির পানে তাকিয়ে যেন চমকে উঠলুম—তাইত, বারোটা বেজে গেছে।

কিন্তু যিনি সব দেখতে পান, তিনি দেখেছিলেন, আমি পাঁচ মিনিট অন্তর ঘড়ি দেখেচি।

স্বামী শয্যায় বসে একটু হেসে বললেন, আজ আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছিলে?

বললুম, কে বললে?

তিনি বললেন, সেদিন তোমাকে ত বলেচি, আমি হাত গুণতে জানি।

বললুম, জানলে ভালই! কিন্তু তোমার গোয়েন্দার নাম না বল, তিনি কি কি দোষ আমার দিলেন শুনি?

তিনি বললেন, গোয়েন্দা দোষ দেয়নি, কিন্তু আমি দিচ্ছি। আচ্ছা জিজ্ঞেসা করি, এত অল্পে তোমার এত রাগ হয় কেন?

বললুম, অল্প? তুমি কি ভাবো, তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের বাটখারা দিয়েই সকলের ওজন চলবে? কিন্তু তাও বলচি, তুমি যে এত বলচ, এ অত্যাচার চোখে দেখলে তোমারও রাগ হ'ত।

তিনি আবার একটু হাসলেন, বললেন, আমি বোষ্টম, আমার ত নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন, আর তোমাকে এখন থেকে তাই হতে হবে।

কেন, আমার অপরাধ?

বৈষ্ণবের স্ত্রী, এইমাত্র তোমার অপরাধ।

বললুম, তা হতে পারে, কিন্তু গাছের মত অন্যায় সহ্য করা আমার কাজ নয়, তা সে, যে প্রভুই আদেশ করুন। তা ছাড়া যে লোক ভগবান পর্যন্ত মানে না, তার কাছে আবার মহাপ্রভু কি?

স্বামী হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন, বললেন, কে ভগবান মানে না? তুমি?

বললুম, হাঁ, আমি।

তিনি বললেন, ভগবান মান না কেন?

বললুম, নেই বলে মানিনে। মিথ্যে বলে মানিনে।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছিলুম, আমার স্বামীর হাসিমুখখানি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসছিল, এই কথার পরে সে মুখ একেবারে যেন ছাই-এর মত সাদা হয়ে গেল। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, শুনেছিলুম, তোমার মামা নাকি নিজেকে নাস্তিক বলতেন—

আমি মাঝখানে ভুল শুধরে দিয়ে বললুম, তিনি নিজেকে নাস্তিক বলতেন না, Agnostic বলতেন।

স্বামী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, সে আবার কি?

আমি বললুম, Agnostic তারা, যারা ঈশ্বর আছেন বা নেই কোন কথাই বলে না।

কথাটা শেষ না হতেই স্বামী বলে উঠলেন, থাক এসব আলোচনা। আমার সামনে তুমি কোনদিন আর এ কথা মুখে এনো না।

তবু তর্ক করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখপানে চেয়ে আর আমার মুখে কথা যোগাল না। ভগবানের ওপর তাঁর অচল বিশ্বাস আমি জানতুম, কিন্তু কোন মানুষ যে আর একজনের মুখ থেকে তাঁর অস্বীকার শুনলে এত ব্যথা পেতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না। এই নিয়ে মামার বসবার ঘরে অনেক তর্ক নিজেও করেচি, অপরকেও করতে শুনেচি, রাগারাগি হয়ে যেতে বহুবার দেখেচি, কিন্তু এমন বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যেতে কাউকে দেখিনি। আমি নিজেও ব্যথা বড় কম পেলুম না, কিন্তু কোন তর্ক না করে এভাবে আমার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার অপমানে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। কিন্তু ভাবি, আমার অপমানের পালাটা এর ওপর দিয়েই কেন সেদিন শেষ হ'ল না।

যে মাদুরটা পেতে আমি নীচে শুতুম, সেটা ঘরের কোণে গুটানো থাকত; আজ কে সরিয়ে রেখেছিল বলতে পারিনে। খুঁজে পাচ্ছিনে দেখে, তিনি নিজে বিছানা থেকে একটা তোশক তুলে বললেন, আজ এইটে পেতে শোও। এত রাত্রে কোথা আর খুঁজে বেড়াবে বল?

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের লেশমাত্র ছিল না। তবুও কথাটা যেন অপমানের শূলে হয়ে আমার বুকে বিঁধল। রোজ ত আমি নীচেই শুই। সামান্য একখানা মাদুর পেতে যেমন-তেমন ভাবে রাত্রি যাপন করাটাই ত ছিল আমার সবচেয়ে বড় গর্ব। কিন্তু স্বামীর ছোট্ট দুটি কথায় যে আজ আমার সেই গর্ব ঠিক তত বড় লাঞ্ছনায় রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেবে, এ কে ভেবেছিল?

অন্যত্র শোবার উপকরণ স্বামীর হাত থেকেই হাত পেতে নিলুম, কিন্তু শোবা-মাত্রই কান্নার ঢেউ যেন আমার গলা পর্যন্ত ফেনিয়ে উঠল। জানিনে, তিনি শুনতে পেয়েছিলেন কি না। সকাল হতে না হতেই তাড়াতাড়ি বিছানা তুলে ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করচি, তিনি ডেকে বললেন, আজ এত ভোরে উঠলে যে?

বললুম, ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাই বাইরে যাচ্ছি।

বললেন, একটা কথা আমার শুনবে?

রাগে, অভিমানে সর্বাঙ্গ ভরে গেল, বললুম, তোমার কথা কি আমি শুনিনি?

আমার মুখপানে চেয়ে তিনি একটু হেসে বললেন, শোন, আচ্ছা তা হলে কাছে এস, বলি।

বললুম, আমি ত কালা নই, এখানে দাঁড়িয়েই শুনতে পাব।

পাবে না গো পাবে না, বলেই হঠাৎ তিনি সুমুখে ঝুঁকে পড়ে আমার হাতটা ধরে ফেললেন। আমি জোর করে ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারব কেন, একেবারে বুকের কাছে টেনে নিয়ে হাত দিয়ে জোর করে আমার মুখ তুলে ধরে বললেন, যারা ভগবান মানে, তারা কি বলে জান? তারা বলে, স্বামীর কাছে কিছুতেই মিথ্যে বলতে নেই।

আমি বললুম, কিন্তু যারা ভগবান মানে না, তারা বলে, কারও কাছে মিথ্যে বলতে নেই।

স্বামী হেসে বললেন, বটে! কিন্তু তাই যদি হয়, অতবড় মিথ্যে কথাটা কাল কি করে মুখে আনলে বল ত? কি করে বললে ভগবান তুমি মান না?

হঠাৎ মনে হ'ল, এত আশা করে কেউ বুঝি কখনো কারও সঙ্গে কথা কয়নি। তাই বলতে মুখে বাধতে লাগল, কিন্তু তবু ত পোড়া অহঙ্কার গেল না, বলে ফেললুম, ভগবান মানি বললেই বুঝি সত্য কথা বলা হ'ত? আমাকে আটকে রাখলে কেন? আর কোন কথা আছে?

তিনি ম্লানমুখে আস্তে আস্তে বললেন, আর একটা কথা, মায়ের কাছে আজ মাপ চেয়ো।

আমার সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে উঠল; বললুম, মাপ চাওয়াটা কি ছেলেখেলা, না তার কোন অর্থ আছে?

স্বামী বললেন, অর্থ তার এই যে, সেটা তোমার কর্তব্য।

বললুম, তোমাদের ভগবান বুঝি বলেন, যে নিরপরাধ, সে গিয়ে অপরাধীর নিকট ক্ষমা চেয়ে কর্তব্য করুক?

স্বামী আমাকে ছেড়ে দিয়ে আমার মুখের পানে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন। তার পরে ধীরে ধীরে বললেন, ভগবানের নাম নিয়ে তামাশা করতে নেই, এ কথা ভবিষ্যতে কোনদিন আর যেন মনে করে দিতে আমার না হয়। আমি তর্ক করতে ভালবাসি নে—মায়ের কাছে মাপ চাইতে না পার, তাঁর সঙ্গে আর কখনও বিবাদ করতে যেও না।

বললুম, কেন, শুনতে পাইনে?

তিনি বললেন, না। নিষেধ করা আমার কর্তব্য, তাই নিষেধ করে দিলুম। এই বলে তিনি বাইরে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি আর সইতে পারলুম না, বললুম, কর্তব্যজ্ঞানটা তোমাদের যদি এত বেশী, সে কি আর কারও নেই? আমিও ত মানুষ, বাড়ির মধ্যে আমারও ত একটা কর্তব্য আছে। তা যদি তোমাদের ভাল না লাগে, আমাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। থাকলেই বিবাদ হবে, এ নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।

তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তা হলে গুরুজনের সঙ্গে বিবাদ করাই বুঝি তোমার কর্তব্য? সে যদি হয়, যেদিন ইচ্ছে বাপের বাড়ি যাও, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

স্বামী চলে গেলেন, আমি সেইখানেই ধপ করে বসে পড়লুম। মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হ'ল, হায় রে! যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর!

সমস্ত সকালটা যে আমার কি করে কাটল, সে আমিই জানি। কিন্তু দুপুরবেলা স্বামীর মুখ থেকেই যে কথা শুনলুম তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

খেতে বসিয়ে শাশুড়ি বললেন, কাল তোমাকে বলিনি বাছা, কিন্তু এ বৌ নিয়ে ত আমি ঘর করতে পারিনে ঘনশ্যাম! কালকের কাণ্ড ত শুনেচ?

স্বামী বললেন, শুনেচি মা।

শাশুড়ী বললেন, তা হলে যা হোক এর একটা ব্যবস্থা কর।

স্বামী একটুখানি হেসে বললেন, ব্যবস্থা করার মালিক ত তুমি নিজেই মা।

শাশুড়ী বললেন, তা কি আর পারিনে বাছা, একদিনেই পারি। এতবড় ধাড়ী মেয়ে, আমার ত বিয়ে দিতেই ইচ্ছে ছিল না। শুধু—

স্বামী বললেন, সে কথা ভেবে আর লাভ কি মা! আর ভালোমন্দ যাই হোক, বাড়ির বড়বৌকে ত আর ফেলতে পারবে না! ও চায়, আমি একটু ভাল খাই-দাই। ভাল, সে ব্যবস্থাই কেন করে দাও না মা!

শাশুড়ী বললেন, অবাক করলি ঘনশ্যাম! আমি কি ভালোমন্দ খেতে দিতে জানিনে যে আজ ও এসে আমাকে শিখিয়ে দেবে? আর তোমারই বা দোষ কি বাবা! অতবড় বৌ যেদিন এসেছে, সেই দিনই জানতে পেরেচি, সংসার এবার ভাঙ্গল। তা বাছা, আমার গিন্নিপনার আর না যদি চলে, ওর হাতেই না হয় ভাঁড়ারের চাবি দিচ্চি। কৈ গা বড়বৌমা, বেরিয়ে এস গো, চাবি নিয়ে যাও! বলে শাশুড়ী ঝনাৎ করে চাবির গোছাটা রান্নাঘরের দাওয়ার উপর ফেলে দিলেন।

স্বামী আর একটি কথাও কইলেন না; মুখ বুজে ভাত খেয়ে বাইরে যাবার সময় বলতে বলতে গেলেন, সব মেয়েমানুষের ঐ এক রোগ, কাকেই বা কি বলি!

আমার বুকের মধ্যে যেন আহ্লাদের জোয়ার ডেকে উঠল। আমি যে কেন ঝগড়া করেচি, তা উনি জানতে পেরেছেন, এই কথাটা শতবার মুখে আবৃত্তি করে সহস্র রকমে মনের মধ্যে অনুভব করতে লাগলুম। সকালের সমস্ত ব্যথা আমার যেন ধুয়ে মুছে গেল।

এখন কতবার মনে হয়ঃ ছেলেবেলা থেকে কাজের অকাজের কত বই পড়ে কত কথাই শিখেছিলুম, কিন্তু এ কথাটা কোথাও যদি শিখতে পেতুম, পৃথিবীতে তুচ্ছ একটি কথা গুছিয়ে না বলবার দোষে, ছোট একটি কথা মুখ ফুটে না বলবার অপরাধে, কত শত ঘর-সংসারই না ছারখার হয়ে যায়। হয়ত, তা হলে এ কাহিনী লেখবার আজ আবশ্যকই হ'ত না।

তাইত, বার বার বলি, ওরে হতভাগী! এত শিখেছিলি, এটা শুধু শিখিস নি, মেয়ে-মানুষের কার মানে মান! কার হতাদরে তোদের মানের অট্টালিকা তাসের অট্টালিকার মতই এক নিমিষে একটা ফুঁয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যায়!

তবে তোর কপাল পুড়বে না ত পুড়বে কার? সমস্ত সন্ধ্যাবেলাটা ঘরে খিল দিয়ে যদি সাজসজ্জাই করলি, অসময়ে ঘুমের ভান করে যদি স্বামীর পালঙ্কের একধারে গিয়ে শুতেই পারলি, তাঁকে একটা সাড়া দিতেই কি তোর এমন কণ্ঠরোধ হ'ল! তিনি ঘরে ঢুকে দ্বিধায় সঙ্কোচে বার বার ইতস্ততঃ করে যখন বেরিয়ে গেলেন, একটা হাত বাড়িয়ে তাঁর হাতটা ধরে ফেলতেই কি তোর হাতে পক্ষাঘাত হ'ল? সেই ত সারারাত্রি ধরে মাটিতে পড়ে পড়ে কাঁদলি, একবার মুখ ফুটে বলতেই কি শুধু এত বাধা হ'ল যে, আচ্ছা, তুমি তোমার বিছানাতে এসে শোও, আমি আমার ভূমিশয্যাতে না হয় ফিরে যাচ্ছি।

অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গল, মনে হ'ল যেন জ্বর হয়েচে। উঠে বাইরে যাচ্চি, স্বামী এসে ঘরে ঢুকলেন। আমি মুখ নীচু করে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম, তিনি বললেন, তোমাদের গ্রামের নরেনবাবু এসেছেন।

বুকের ভেতরটায় ধক করে উঠল।

স্বামী বলতে লাগলেন, আমাদের নিখিলের তিনি কলেজের বন্ধু। চিতোর বিলে হাঁস শিকার করবার জন্য কলকাতায় থাকতে সে বুঝি কবে নেমতন্ন করে এসেছিল, তাই এসেছেন। তুমিও তাঁকে বেশ চেন, না?

উঃ, মানুষের স্পর্ধার কি একটা সীমা থাকতে নেই!

ঘাড় নেড়ে জানালুম, আছে। কিন্তু ঘৃণায় লজ্জায় নখ থেকে চুল পর্যন্ত আমার তেতো হয়ে গেল।

স্বামী বললেন, তোমার প্রতিবেশীর আদর-যত্নের ভার তোমাকেই নিতে হবে।

শুনে এমনি চমকে উঠলুম যে, ভয় হ'ল, হয়ত আমার চমকটা তাঁর চোখে পড়েচে। কিন্তু এদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। বললেন, কাল রাত্রি থেকেই মায়ের বাতটা ভয়ানক বেড়েচে। এদিকে নিখিলও বাড়ি নেই, অখিলকেও তার আপিস করতে হবে।

মুখ নীচু করে কোনমতে বললুম, তুমি?

আমার কিছুতেই থাকবার জো নেই। রায়গঞ্জে পাট কিনতে না গেলেই নয়।

কখন ফিরবে?

ফিরতে আবার কাল এই সময়। রাত্রিটা সেইখানেই থাকতে হবে।

তা হলে আর কোথাও তাঁকে যেতে বল। আমি বৌ-মানুষ, শ্বশুরবাড়িতে তাঁর সামনে বার হতে পারব না।

স্বামী বললেন, ছি, তা কি হয়! আমি সমস্ত ঠিক করে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সামনে না বার হও, আড়াল থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ো। এই বলে তিনি বাইরে চলে গেলেন।

সেইদিন পাঁচ মাস পরে আবার নরেনকে দেখলুম। দুপুরবেলা সে খেতে বসেছিল, আমি রান্নাঘরের দোরের আড়ালে বসে কিছুতেই চোখের কৌতূহল থামাতে পারলুম না। কিন্তু চাইবামাত্রই আমার সমস্ত মনটা এমন একপ্রকার বিতৃষ্ণায় ভরে গেল যে, সে পরকে বোঝানো শক্ত। মস্ত একটা তেঁতুলবিছে এঁকেবেঁকে চলে যেতে দেখলে সর্বাঙ্গ যেমন করে ওঠে, অথচ যতক্ষণ সেটা দেখা যায়, চোখ ফিরুতে পারা যায় না, ঠিক তেমনি করে আমি নরেনের পানে চেয়ে রইলুম। ছি, ছি, ওর ওই দেহটাকে কি করে যে একদিন ছুঁয়েছি, মনে পড়তেই সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে মাথার চুল পর্যন্ত আমার খাড়া হয়ে উঠল।

খেতে খেতে সে মাঝে মাঝে চোখ তুলে চারিদিকে কি যে খুঁজছিল, সে আমি জানি। আমাদের রাঁধুনী কি একটা তরকারি দিতে গেল, সে হঠাৎ ভারী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হাঁ গা, তোমাদের বড়বৌ যে বড় বেরুলো না?

রাঁধুনী জানত যে, ইনি আমাদের বাপের বাড়ির লোক—গ্রামের জমিদার। তাই বোধ করি খুশী করবার জন্যেই হাসির ভঙ্গীতে একঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে তার মন যোগালে। বললে, কি জানি বাবু, বড়বৌমার ভারী লজ্জা, নইলে তিনিই ত আপনার জন্যে আজ নিজে রাঁধলেন। রান্নাঘরে বসে তিনিই ত আপনার সব খাবার এগিয়ে গুছিয়ে দিচ্ছেন। লজ্জা করে কিন্তু কম-সম খাবেন না বাবু, তা হলে তিনি বড় রাগ করবেন, আমাকে বলে দিলেন।

মানুষের শয়তানির অন্ত নেই, দুঃসাহসেরও অবধি নেই। সে স্বচ্ছন্দে স্নেহের হাসিতে মুখখানা রান্নাঘরের দিকে তুলে চেঁচিয়ে বললে, আমার কাছে তোর আবার লজ্জা কি রে সদু? আয় আয়, বেরিয়ে আয়। অনেকদিন দেখিনি, একবার দেখি।

কাঠ হয়ে সেই দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মেজজাও রান্নাঘরে ছিল, ঠাট্টা করে বললে, দিদির সবটাতেই বাড়াবাড়ি। পাড়ার লোক, ভাইয়ের মত, বিয়ের দিন পর্যন্ত সামনে বেরিয়েচ, কথা কয়েচ, আর আজই যত লজ্জা! একবার দেখতে চাচ্চেন, যাও না।

এর আর জবাব দেব কি?

বেলা তখন দুটো-আড়াইটে, বাড়ির সবাই যে যার ঘরে শুয়েচে, চাকরটা এসে বাইরে থেকে বলল, বাবু পান চাইলেন মা।

কে বাবু?

নরেনবাবু।

তিনি শিকার করতে যাননি?

কৈ ন্‌া, বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন যে।

তা হলে শিকারের ছলটাও মিথ্যে।

পান পাঠিয়ে দিয়ে জানালায় এসে বসলুম। এ বাড়িতে আসা পর্যন্ত এই জানালাটিই ছিল সবচেয়ে আমার প্রিয়। নীচেই ফুল-বাগান, একঝাড় চামেলি ফুলের গাছ দিয়ে সম্মুখটা ঢাকা; এখানে বসলে বাইরের সমস্ত দেখা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে কিছু দেখা যায় না।

আমি মানুষের এই বড় একটা অদ্ভুত কাণ্ড দেখি যে, যে বিপদটা হঠাৎ তার ঘাড়ে এসে পড়ে তাকে একান্ত অস্থির ও উদ্বিগ্ন করে দিয়ে যায়, অনেক সময়ে সে তাকেই একপাশে ঠেলে দিয়ে একটা তুচ্ছ কথা চিন্তা করতে বসে যায়। বাইরে পান পাঠিয়ে দিয়ে আমি নরেনের কথাই ভাবতে বসেছিলুম সত্যি, কিন্তু কখন কোন্ ফাঁকে যে আমার স্বামী এসে আমার সমস্ত মন জুড়ে বসে গিয়েছিলেন, সে আমি টেরও পাইনি।

আমার স্বামীকে আমি যত দেখছিলুম ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলুম। সবচেয়ে আশ্চর্য হ'তুম—তাঁর ক্ষমা করবার ক্ষমতা দেখে। আগে আগে মনে হ'ত, এ তাঁর দুর্বলতা, পুরুষত্বের অভাব। শাসন করবার সাধ্য নেই বলেই ক্ষমা করেন। কিন্তু যত দিন যাচ্ছিল, ততই টের পাচ্ছিলুম তিনি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি দৃঢ়। আমাকে যে তিনি ভেতরে ভেতরে কত

ভালবেসেচেন, সে ত আমি অসংশয়ে অনুভব করতে পারি, কিন্তু সে ভালবাসার ওপর এতটুকু জোর খাটাবার সাহস আমার ত হয় না।

একদিন কথায় কথায় বলেছিলুম, আচ্ছা, তুমিই বাড়ির সর্বস্ব, কিন্তু তোমাকে যে বাড়িসুদ্ধ সবাই অযত্ন অবহেলা করে, এমন কি অত্যাচার করে, এ কি তুমি ইচ্ছা করলে শাসন করে দিতে পার না?

তিনি হেসে জবাব দিয়েছিলেন, কৈ, কেউ ত অযত্ন করে না!

কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতুম, কিছুই তাঁর অবিদিত ছিল না। বললুম, আচ্ছা, যত বড় দোষই হোক, তুমি কি সব মাপ করতে পার?

তিনি তেমনি হাসিমুখে বললেন, যে সত্যি ক্ষমা চায়, তাকে করতেই হবে, এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো!

তাই এক-একদিন চুপ করে বসে ভাবতুম, ভগবান যদি সত্যি নেই, তা হলে এত শক্তি, এত শান্তি ইনি পেলেন কোথায়? এই যে আমি স্ত্রীর কর্তব্য একদিনের জন্যে করিনে, তবু ত তিনি কোনদিন স্বামীর জোর নিয়ে আমায় অমর্যাদা অপমান করেন না!

আমাদের ঘরের কুলুঙ্গিতে একটি শ্বেত-পাথরের গৌরাঙ্গমূর্তি ছিল, আমি কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেচি, স্বামী বিছানার উপর স্তব্ধ হয়ে বসে একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে আছেন, আর দু'চক্ষু বয়ে অশ্রুর ধারা বয়ে যাচ্ছে। সময়ে সময়ে তাঁর মুখ দেখে আমারও যেন কান্না আসত, মনে হত, অমনি করে একটা দিনও কাঁদতে পারলে বুঝি মনের অর্ধেক বেদনা কমে যাবে। পাশের কুলুঙ্গিতে তাঁর খান-কয়েক বড় আদরের বই ছিল, তাঁর দেখাদেখি আমিও মাঝে মাঝে পড়তুম। লেখাগুলো যে আমি সত্যি বলে বিশ্বাস করতুম, তা নয়, তবুও এমন কতদিন হয়েচে, কখন পড়ায় মন লেগে গেছে, কখন বেলা বয়ে গেছে, কখন দু'ফোঁটা চোখের জল গাড়িয়ে গালের উপর শুকিয়ে আছে, কিছুই ঠাওর পাইনি। কতদিন হিংসে পর্যন্ত হয়েছে, তাঁর মত আমিও যদি এগুলি সমস্ত সত্যি বলেই ভাবতে পারতুম!

কিছুদিন থেকে আমি বেশ টের পেতুম, কি একটা ব্যথা যেন প্রতিদিনই আমার বুকের মধ্যে জমা হয়ে উঠছিল। কিন্তু কেন, কিসের জন্যে, তা কিছুতে হাতড়ে পেতুম না। শুধু মনে হ'ত আমার যেন কেউ কোথাও নেই। ভাবতুম, মায়ের জন্যেই বুঝি ভেতরে ভেতরে মন কেমন করে, তাই কতদিন ঠিক করেচি, কালই পাঠিয়ে দিতে বলব, কিন্তু যেই মনে হ'ত, এই ঘরটি ছেড়ে আর কোথাও যাচ্ছি, না—অমনি সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় যে ভেসে যেত, তাকে মুখ ফুটে বলাও হ'ত না।

মনে করলুম, যাই, কুলুঙ্গি থেকে বইখানা এনে একটু পড়ি। আজকাল এই বইখানা হয়েছিল আমার অনেক দুঃখের সান্ত্বনা। কিন্তু উঠতে গিয়ে হঠাৎ আঁচলে একটা টান পড়তেই ফিরে চেয়ে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস হ'ল না। দেখি, আমার আঁচল ধরে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে নরেন। একটু হলেই চেঁচিয়ে ফেলেছিলুম আর কি! সে কখন এসেচে, কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই জানতে পারিনি। কিন্তু কি করে যে সেদিন আপনাকে সামলে ফেলেছিলুম, আমি আজও ভেবে পাইনে। ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এখানে এসেচ কেন? শিকার করতে?

নরেন বললে, বস বলচি।

আমি জানালার ওপর বসে পড়ে বললুম, শিকার করতে যাওনি কেন?

নরেন বললে, ঘনশ্যামবাবুর হুকুম পাইনি। যাবার সময় বলে গেলেন, আমরা বৈষ্ণব, আমাদের বাড়ি থেকে জীবহত্যা করা নিষেধ।

চক্ষের নিমেষে স্বামী-গর্বে আমার বুকখানা ফুলে উঠল। তিনি কোন কর্তব্য ভোলেন না, কোনদিকে তাঁর একবিন্দু দুর্বলতা নেই। মনে মনে ভাবলুম, এ লোকটা দেখে যাক, আমার স্বামী কত বড়!

বললুম, তা হলে বাড়ি ফিরে গেলে না কেন?

সে লোকটা গরাদের ফাঁক দিয়ে খপ করে আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, সদু, টাইফয়েড জ্বরে মরতে মরতে বেঁচে উঠে যখন শুনলুম তুমি পরের হয়েচ, আর আমার

নেই, তখন বার বার করে বললুম, ভগবান, আমাকে বাঁচালে কেন? তোমার কাছে আমি এইটুকু বয়সের মধ্যে এমন কি পাপ করেচি, যার শাস্তি দেবার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে!

বললুম, তুমি ভগবান মান?

নরেন থতমত খেয়ে বলতে লাগল, না হাঁ, না, মানিনে, কিন্তু সে সময়ে—কি জান!

থাক গে, তার পরে?

নরেন বলে উঠল, উঃ, সে আমার কি দিন, যেদিন শুনলুম, তুমি আমারই আছ, শুধু নামে অন্যের, নইলে, আমারই চিরকাল, শুধু আমারই! আজও একদিনের জন্য আর কারও শয্যায় রাত্রি—

ছি ছি, চুপ কর। কিন্তু কে তোমাকে এ খবর দিলে? কার কাছে শুনলে?

তোমাদের যে দাসী তিন-চারদিন হ'ল বাড়ি যাবার নাম করে চলে গেছে, যে—

মুক্ত কি তোমার লোক ছিল? বলে জোর করে তার হাত ছাড়াতে গেলুম, কিন্তু এবারেও সে তেমনি সজোরে ধরে রাখলে। তার চোখ দিয়ে ফোঁটা-দুই জলও গড়িয়ে পড়ল। বললে, সদু, এমনি করেই কি আমাদের জীবনের শেষ হবে? অমন অসুখে না পড়লে আজ কেউ ত আমাদের আলাদা করে রাখতে পারত না! যে অপরাধ আমার নিজের নয়, তার জন্য কেন এতবড় শাস্তি ভোগ করব? লোকে ভগবান ভগবান করে, কিন্তু তিনি সত্যি থাকলে কি বিনাদোষে এতবড় সাজা আমাদের দিতেন? কখন না। তুমিই বা কিসের জন্য একজন অজানা-অচেনা মুখ্যু-লোকের—

থাক, থাক, ও-কথা থাক।

নরেন চমকে উঠে বললে, আচ্ছা থাক, কিন্তু যদি জানতুম, তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েচ, তা হলে হয়ত একদিন মনকে সান্ত্বনা দিতে পারতুম, কিন্তু কোন সম্বলই যে আমার হাতে নেই, আমি বাঁচব কি করে?

আবার তার চোখে জল এসে পড়ল। এবার সে আমার হাতটাই টেনে নিয়ে তার নিজের চোখের জল মুছে বললে, এমন কোন সভ্য দেশ পৃথিবীতে আছে—যেখানে এতবড় অন্যায় হতে পারত! মেয়েমানুষ বলে কি তার প্রাণ নেই, তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দিয়ে এমন করে তাকে সারাজীবন দগ্ধ করবার অধিকার সংসারে কার আছে? কোন্ দেশের মেয়েরা ইচ্ছে করলে এমন বিয়ে লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে না পারে?

এসব কথা আমি সমস্তই জানতুম! আমার মামার ঘরে নব্য-যুগের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কোন আলোচনাই বাকী ছিল না। আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুলতে লাগল। বললুম, তুমি আমাকে কি করতে বল?

নরেন বললে, আমি তোমাকে কোন কথাই বলব না। এইটুকু শুধু জানিয়ে যাব যে, মরণের গ্রাস থেকে উঠে পর্যন্ত আমি এই আজকের দিনের প্রতীক্ষা করেই পথ চেয়েছিলুম। তার পরে হয়ত একদিন শুনতে পাবে, যেখান থেকে উঠে এসেচি, তার কাছেই ফিরে চলে গেছি। কিন্তু তোমার কাছে এই আমার শেষ নিবেদন রইল সদু, বেঁচে থাকতে যখন কিছুই পেলুম না, মরণের পরে যেন ঐ চোখের দু' ফোঁটা জল পাই। আত্মা বলে যদি কিছু থাকে, তার তাতেই তৃপ্তি হবে।

আমার হাতটা তার হাতের মধ্যেই রইল, চুপ করে বসে রইলুম। এখন ভাবি, সেদিন যদি ঘুণাগ্রেও জানতুম, মানুষের মনের দাম এই, একেবারে উলটো ধারায় বইয়ে দিতে এইটুকুমাত্র সময়, এইটুকুমাত্র মাল-মসলার প্রয়োজন, তা হলে যেমন করে হোক, সেদিন তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে জানালা বন্ধ করে দিতুম, কিছুতেই তার একটা কথাও কানে ঢুকতে দিতুম না। ক'টা কথা, ক'ফোটা চোখের জলই বা তার খরচ হয়েছিল? কিন্তু নদীর প্রচণ্ড স্রোতে পাতাসুদ্ধ শরগাছ যেমন করে কাঁপতে থাকে, তেমনি করে আমার সমগ্র দেহটা কাঁপতে লাগল, মনে হতে লাগল, নরেন যেন কোন অদ্ভুত কৌশলে আমার পাঁচ আঙুলের ভেতর দিয়ে পাঁচ শ বিদ্যুতের ধারা আমার সর্বাঙ্গে বইয়ে দিয়ে আমার পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত অবশ করে আনচে। সেদিন মাঝখানের সেই লোহার গরাদগুলো যদি

না থাকত, আর সে যদি আমাকে টেনে তুলে নিয়ে পালাত, হয়ত আমি একবার চেঁচাতে পর্যন্ত পারতুম না—ওগো, কে আছ আমায় রক্ষা করো!

দু'জনে কতক্ষণ এমন স্তব্ধ হয়ে ছিলুম জানিনে, সে হঠাৎ বলে উঠল, সদু!

কেন?

তুমি ত বেশ জান, আমাদের মিথ্যে শাস্ত্রগুলো শুধু মেয়েমানুষকে বেঁধে রাখবার শেকল মাত্র! যেমন করে হোক আটকে রেখে তাদের সেবা নেবার ফন্দি। সতীর মহিমা কেবল মেয়েমানুষের বেলায়, পুরুষের বেলায় সব ফাঁকি! আত্মা আত্মা যে করে, সে কি মেয়েমানুষের দেহে নেই? তার কি স্বাধীন সত্তা নেই? সে কি শুধু এসেছিল পুরুষের সেবাদাসী হবার জন্যে?

বৌমা, বলি কথা তোমাদের শেষ হবে না বাছা?

মাথার ওপর বাজ ভেঙ্গে পড়লেও বোধ করি মানুষে এমন করে চমকে ওঠে না, আমরা দু'জনে যেমন করে চমকে উঠলুম, নরেন হাত ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল, আমি মুখ ফিরিয়ে দেখলুম, বারান্দায় খোলা জানালার ঠিক সুমুখে দাঁড়িয়ে আমার শাশুড়ী।

বললেন, বাছা, এ পাড়ার লোকগুলো ত তেমন সভ্য-ভব্য নয়, অমন করে ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান্নাকাটি করতে দেখলে হয়ত বা দোষের ভেবে নেবে। বলি, বাবুটিকে ঘরে ডেকে পাঠালেই ত দেখতে শুনতে সবদিকে বেশ হ'ত।

কি একটা জবাব দিতে গেলুম, কিন্তু মুখের মধ্যে জিভটা আমার আড়ষ্ট রইল, একটা কথাও ফুটল না।

তিনি একটুখানি হেসে বললেন, বলতে পারিনে বাছা, শুধু ভেবেই মরি, বৌমাটি কেন আমার এত কষ্ট সয়ে মাটিতে শুয়ে থাকেন! তা বেশ! বাবুটি নাকি দুপুরবেলা চা খান! চা তৈরীও হয়েছে, একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা কর দেখি বৌমা, চায়ের পিয়ালাটা বৈঠকখানায় পাঠিয়ে দেব, না ঐ বাগানে দাঁড়িয়ে খাবেন?

উঠে দাঁড়িয়ে প্রবল চেষ্টায় তবে কথা কইতে পারলুম, বললুম, তুমি কি রোজ এমনি করে আমার ঘরে আড়ি পাত মা?

শাশুড়ী মাথা নেড়ে বললেন, না না, সময় পাই কোথা? সংসারের কাজ করেই ত সারতে পারিনে। এই দেখ না বাছা, বাতে মরচি, তবু চা তৈরি করতে রান্নাঘরে ঢুকতে হয়েছিল। তা এ ঘরেই না হয় পাঠিয়ে দিচ্ছি, বাবুটির আবার ভারী লজ্জার শরীর, আমি থাকতে হয়ত খাবেন না। তা যাচ্ছি আমি—, বলে তিনি ফিক করে একটু মুচকে হেসে চলে গেলেন। এমনি মেয়েমানুষের বিদ্বেষ! প্রতিশোধ নেবার বেলায় শাশুড়ী-বধূর মান্য সম্বন্ধের কোন উঁচু-নীচুর ব্যবধানই রাখলেন না।

সেইখানেই মেঝের ওপর চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম, সর্বাঙ্গ বয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরে সমস্ত মাটিটা ভিজে গেল।

শুধু একটা সান্ত্বনা ছিল, আজ তিনি আসবেন না, আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ চুপ করে পড়ে থাকতে পাব, তাঁর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

কতবার ভাবলুম উঠে বসি, কাজকর্ম করি—যেন কিছুই হয়নি, কিন্তু কিছুতেই পারলুম না, সমস্ত শরীর যেন থরথর করতে লাগল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, এ ঘরে কেউ আলো দিতে এল না।

রাত্রি তখন প্রায় আটটা, সহসা তাঁর গলা বাইরে থেকে কানে আসতেই বুকের সমস্ত রক্ত-চলাচল যেন একেবারে থেমে গেল। তিনি চাকরকে জিজ্ঞাসা করছিলেন, বঙ্কু, নরেনবাবু হঠাৎ চলে গেলেন কেন রে? চাকরের জবাব শোনা গেল না। তখন নিজেই বললেন, খুব সম্ভব শিকার করতে বারণ করেছিলুম বলে। তা উপায় কি!

অন্দরে ঢুকতেই, শাশুড়ী ঠাকরুন ডেকে বললেন, একবার আমার ঘরে এস ত বাবা!

তাঁর যে একমুহূর্ত দেরি সইবে না, সে আমি জানতুম। তিনি যখন আমার ঘরে এলেন আমি কিসের একটা প্রচণ্ড নিষ্ঠুর আঘাত প্রতীক্ষা করেই যেন সর্বাঙ্গ কাঠের মত শক্ত

করে পড়ে রইলুম, কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না। কাপড়চোপড় ছেড়ে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বেরিয়ে গেলেন, যেন কিছুই হয়নি, শাশুড়ী তাঁকে যেন এইমাত্র একটা কথাও বলেন নি। তার পরে যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিনি ঘরে শুতে এলেন।

সারারাত্রির মধ্যে আমার সঙ্গে একটা কথাও হ'ল না। সকালবেলা সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ প্রাণপণে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, মেজজা বললেন, হেঁসেলে তোমার আর এসে কাজ নেই দিদি. আজ আমিই আছি।

বললুম, তুমি থাকলে কি আমাকে থাকতে নেই মেজদি?

কাজ কি, মা কি জন্যে বারণ করে গেলেন, বলে তিনি যে ঘাড় ফিরিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, সে আমি স্পষ্ট টের পেলুম। মুখ দিয়ে আমার একটা কথাও বার হ'ল না, আড়ষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এলুম।

দেখলুম, বাড়িসুদ্ধ সকলের মুখ ঘোর অন্ধকার, শুধু যাঁর মুখ সবচেয়ে অন্ধকার হবার কথা, তাঁর মুখেই কোন বিকার নেই। স্বামীর নিত্য-প্রসন্ন মুখ, আজও তেমনি প্রসন্ন।

হায় রে, শুধু একবার গিয়ে যদি বলি, প্রভু, এই পাপিষ্ঠার মুখ থেকে তার অপরাধের বিবরণ শুনে তাকে নিজের হাতে দণ্ড দাও, কিন্তু সমস্ত লোকের এই বিচারহীন শাস্তি আর সহ্য হয় না! কিন্তু সে ত কোনমতেই পারলুম না। তবুও এই বাড়িতে এই ঘরের মধ্যেই আমার দিন কাটতে লাগল।

এ কেমন করে আমার দ্বারা সম্ভব হতে পেরেছিল, তা আজ আমি জানি। যে কাল মায়ের বুক থেকে পুত্রশোকের ভার পর্যন্ত হালকা করে দেয়, সে যে এই পাপিষ্ঠার মাথা থেকে তার অপরাধের বোঝা লঘু করে দেবে, সে আর বিচিত্র কি! যে দণ্ড একদিন মানুষ অকাতরে মাথায় তুলে নেয়, আর একদিন তাকেই সে মাথা থেকে ফেলতে পারলে বাঁচে! কালের ব্যবধানে অপরাধের খোঁচা যতই অস্পষ্ট, যত লঘু হয়ে আসতে থাকে, দণ্ডের ভার ততই গুরুতর, ততই অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে! এই ত মানুষের মন! এই ত তার গঠন! তাকে অনিশ্চিত সংশয়ে মরিয়া করে তোলে। একদিন দুদিন করে যখন সাতদিন কেটে গেল, তখন কেবলই মনে হতে লাগল, এতই কি দোষ করেচি যে স্বামী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা না করে নির্বিচারে দণ্ড দিয়ে যাবেন! কিন্তু তিনি যে সকলের সঙ্গে মিলে নিঃশব্দে আমাকে পীড়ন করে যাচ্চেন, এ বুদ্ধি যে কোথায় পেয়েছিলুম, এখন তাই শুধু ভাবি।

সেদিন সকালে শুনলুম, শাশুড়ী বলচেন, ফিরে এলি মা মুক্ত! পাঁচদিন বলে কতদিন দেরি করলি বল ত বাছা?

সে যে কেন ফিরে এসেচে, তা মনে মনে বুঝলুম।

নাইতে যাচ্ছি, দেখা হ'ল। মুচকি হেসে হাতের মধ্যে একটা কাগজ গুঁজে দিলে। হঠাৎ মনে হ'ল, সে যেন একটুকরো জ্বলন্ত কয়লা আমার হাতের তেলোয় টিপে ধরেচে। ইচ্ছে হ'ল তখখুনি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু সে যে নরেনের চিঠি! না পড়েই যদি ছিঁড়ে ফেলতে পারব, তা হলে মেয়েমানুষের মনের মধ্যে বিশ্বের সেই অফুরন্ত চিরন্তন কৌতূহল জমা রয়েচে কিসের জন্যে? নির্জন পুকুরঘাটে জলে পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঠি খুলে বসলুম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা কথাও পড়তে পারলুম না। চিঠি লাল কালিতে লেখা, মনে হতে লাগল তার রাঙ্গা অক্ষরগুলো যেন একপাল কেন্নোর বাচ্চার মত গায়ে গায়ে জড়িয়ে কিলকিল করে নড়ে নড়ে বেড়াচ্চে। তার পরে পড়লুম—একবার, দুবার, তিনবার পড়লুম। তার পরে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জলে ভাসিয়ে দিয়ে স্নান করে ঘরে ফিরে এলুম। কি ছিল তাতে? সংসারে যা সবচেয়ে বড় অপরাধ, তাই লেখা ছিল।

ধোপা এসে বললে, মাঠাকরুন, বাবুর ময়লা কাপড় দাও।

জামার পকেটগনুলো সব দেখে দিতে গিয়ে একখানা পোস্টকার্ড বেরিয়ে এল, হাতে তুলে দেখি, আমার চিঠি, মা লিখেছেন। তারিখ দেখলনুম, পাঁচদিন আগের, কিন্তু আজও আমি পাইনি।

পড়ে দেখি সর্বনাশ। মা লিখেছেন, শনুধন রান্নাঘরটি ছাড়া আর সমস্ত পনুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে গেছে। এই ঘরটির মধ্যে কোনমতে সবাই মাথা গনুঁজে আছেন।

দনুচোখ জনুালা করতে লাগল কিন্তু একফোঁটা জল বেরনুল না। কতক্ষণ যে এভাবে বসেছিলনুম জানিনে, ধোপার চীৎকারে আবার সজাগ হয়ে উঠলনুম। তাড়াতাড়ি তাকে কাপড়গনুলো ফেলে দিয়ে, বিছানায় এসে শনুয়ে পড়লনুম। এইবার চোখের জলে বালিশ ভিজে গেল। কিন্তু এই কি তাঁর ঈশ্বরপরায়ণতা! আমার মা গরীব, একবিন্দন সাহায্য করতে অননুরোধ করি, এই ভয়ে চিঠিখানা পর্যন্ত আমাকে দেওয়া হয়নি। এতবড় ক্ষনুদ্রতা আমার নাস্তিক মামার দ্বারা কি কখনো সম্ভব হতে পারত!

আজ তিনি ঘরে আসতে কথা কইলনুম। বললনুম, আমাদের বাড়ি পনুড়ে গেছে।

তিনি মনুখপানে চেয়ে বললেন, কোথায় শনুনলে?

গায়ের ওপর পোস্টকার্ড ছনুঁড়ে ফেলে দিয়ে জবাব দিলনুম, ধোপাকে কাপড় দিয়ে তোমারই পকেট থেকে পেলনুম। দেখ, আমাকে নাস্তিক বলে তুমি ঘৃণা কর জানি, কিন্তু যারা লনুকিয়ে পরের চিঠি পড়ে, আড়ালে গোয়েন্দাগিরি করে বেড়ায়, তাদের আমরাও ঘৃণা করি। তোমার বাড়িসনুদ্ধ লোকেরই কি এই ব্যবসা?

যে লোক নিজের অপরাধে মগ্ন হয়ে আছে, তার মনুখের এই কথা! কিন্তু আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, এতবড় স্পর্ধিত আঘাত আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ সহ্য করতে পারত না। মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয় কবচের মতই যে তাঁর মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষে করত, আমার এমন তীক্ষ্ন শনুলও খানখান হয়ে পড়ে গেল।

একটনুখানি ম্লান হেসে বললেন, কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ফেলেছিলনুম সদন, আমাকে মাপ কর।

এই প্রথম তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন।

বললনুম, মিথ্যে কথা। তা হলে আমার চিঠি আমাকে দিতে। কেন এ খবর লনুকিয়েচ, তাও জানি।

তিনি বললেন, শনুধন দনুঃখ পেতে বৈ ত না! তাই ভেবেছিলনুম, কিছনুদিন পরে তোমাকে জানাব।

বললনুম, কেমন করে তুমি হাত গোণো, সে আমার জানতে বাকী নেই! তুমিই কি বাড়িসনুদ্ধ সবাইকে আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছ? স্পাই! ইংরেজ-মহিলারা এমন স্বামীর মনুখ পর্যন্ত দেখে না, তা জানো?

ওরে হতভাগী! বল্, বল্, যা মনুখে আসে বলে নে। শাস্তি তোর গেছে কোথায়, সবই যে তোলা রইল!

স্বামী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, একটা কথারও জবাব দিলেন না। এখন ভাবি, এত ক্ষমা করতেও মাননুষে পারে!

কিন্তু আমার ভেতরে যত গ্লানি, যত অপমান এতদিন ধীরে ধীরে জমা হয়ে উঠেছিল, একবার মনুক্তি পেয়ে তারা কোনমতেই আর ফিরতে চাইলে না।

একটন থেমে আবার বললনুম, আমি হেঁসেলে ঢনুকতে—

তিনি একটনুখানি যেন চমকে উঠে মাঝখানেই বলে উঠলেন, উঃ, তাই বটে! তাই আমার খাবার ব্যবস্থাটা আবার—

বললনুম, সে নালিশ আমার নয়। বাঙালীর ঘরে জন্মেচি বলেই যে তোমরা খনুঁচে খনুঁচে আমাকে তিল তিল করে মারবে, সে অধিকার তোমাদের আমি কিছনুতেই দেব না, তা নিশ্চয় জেনো। আমার মামাধ বাড়িতে এখনো রান্নাঘরটা বাকী আছে, আমি তার মধ্যেই আবার ফিরে যাব। কাল আমি যাচ্ছি।

স্বামী অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললেন, যাওয়াই উচিত বটে। কিন্তু তোমার গয়নাগুলো রেখে যেয়ো।

শুনে অবাক হয়ে গেলুম। এত হীন, এত ছোট স্বামীর স্ত্রী আমি! পোড়া মুখে হঠাৎ হাসি এল। বললুম, সেগুলো কেড়ে নিতে চাও ত? বেশ, আমি রেখেই যাব।

প্রদীপের ক্ষীণ আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাঁর মুখখানি যেন সাদা হয়ে গেল। বললেন, না না, তোমার কিছু গয়না আমি ভিক্ষে চাচ্ছি, আমার টাকার বড় অনটন, তাই বাঁধা দেব।

কিন্তু এমন পোড়াকপালী আমি যে, ও-মুখ দেখেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। বললুম, বাঁধা দাও, বেচে ফেল, যা ইচ্ছে কর, তোমাদের গয়নার ওপর আমার এতটুকু লোভ নেই। বলে, তখুনি বাক্স খুলে আমার সমস্ত গয়না বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। যে দু' গাছি বালা মা দিয়েছিলেন, সেই দুটি ছাড়া গা থেকে পর্যন্ত গয়না খুলে ফেলে দিলুম। তাতেও তৃপ্তি হ'ল না, বেনারসী কাপড় জামা প্রভৃতি যা কিছু এ'রা দিয়েছিলেন, সমস্ত বার করে টান মেরে ফেলে দিলুম।

স্বামী পাথরের মত স্থির নির্বাক্ হয়ে বসে রইলেন। আমার ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা এমনি বিষিয়ে উঠল যে, এক ঘরের মধ্যে থাকাও অসহ্য হয়ে পড়ল। বেরিয়ে এসে অন্ধকার বারান্দায় একধারে আঁচল পেতে শুয়ে পড়লুম। মনে হ'ল, দোরের আড়াল থেকে কে যেন বেরিয়ে গেল।

কান্নায় বুক ফেটে যেতে লাগল, তবু প্রাণপণে মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে মান বাঁচালুম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম জানিনে, উঠে দেখি, ভোর হয়-হয়। ঘরে গিয়ে দেখি, বিছানা খালি, দু-একখানা ছাড়া প্রায় সমস্ত গয়না নিয়ে তিনি কখন বেরিয়ে গেছেন।

সারাদিন তিনি বাড়ি এলেন না। রাত্রি বারোটা বেজে গেল, তাঁর দেখা নাই।

তন্দ্রার মধ্যেও বোধ করি সজাগ ছিলুম। রাত্রি দুটোর পর বাগানের দিকেই সেই জানলাটার গায়ে খটখট শব্দ শুনেই বুঝলুম, এ নরেন। কেমন করে যেন আমি নিশ্চয় জানতুম, আজ রাত্রে সে আসবে। স্বামী ঘরে নেই, এ খবর মুক্ত দেবেই এবং এ সুযোগ সে কিছুতে ছাড়বে না। কোথাও কাছাকাছি সে যে আছেই, এ যেন আমি ভাবী অমঙ্গলের মত অনুভব করতুম। নরেন এত নিঃসংশয় ছিল যে, সে অনায়াসে বললে, দেরি ক'র না, যেমন আছ বেরিয়ে এসো, মুক্ত খিড়কি খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

বাগান পার হয়ে রাস্তা দিয়ে অনেকখানি অন্ধকারে এগিয়ে গিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলুম। মা বসুমতি! গাড়িসুদ্ধ হতভাগীকে সেদিন গ্রাস করলে না কেন?

কলকাতায় বৌবাজারের একটা ছোট্ট বাসায় গিয়ে যখন উঠলুম, তখন বেলা সাড়ে-আটটা। আমাকে পৌঁছে দিয়েই নরেন তার নিজের বাসায় কিছুক্ষণের জন্য চলে গেল। দাসী উপরের ঘরে বিছানা পেতে রেখেছিল, টলতে টলতে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আশ্চর্য যে, যে কথা কখনও ভাবিনি, সমস্ত ভাবনা ছেয়ে তখন সেই কথাই আমার মনে পড়তে লাগল। আমি ন'বছর বয়সে একবার জলে ডুবে যাই, অনেক যত্ন-চেষ্টার পরে জ্ঞান হলে মায়ের হাত ধরে ঘরের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। মা শিয়রে বসে এক হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে, এক হাতে পাখায় বাতাস করেছিলেন—মায়ের মুখ, আর তাঁর সেই পাখা নিয়ে হাতনাড়াটা ছাড়া সংসারে আর যেন আমার কিছু রইল না।

দাসী এসে বললে, বৌমা, কলের জল চলে যাবে, উঠে চান করে নাও।

স্নান করে এলুম, উড়ে-বামুন ভাত দিয়ে গেল। মনে হয় কিছু খেয়েও ছিলুম, কিন্তু উঠতে না উঠতে সমস্ত বমি হয়ে গেল। তার পর হাত-মুখ ধুয়ে নির্জীবের মত বিছানায় এসে শুয়ে পড়বামাত্রই বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

স্বপ্ন দেখলুম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করচি। তিনি তেমনি নীরবে বসে আছেন, আর আমি গায়ের গয়না খুলে তাঁর গায়ে ছুঁড়ে ফেলচি; কিন্তু গয়নাগুলোও আর ফুরোয় না, আমার ছুঁড়ে ফেলাও থামে না। যত ফেলি ততই যেন কোথা থেকে গয়নায় সর্বাঙ্গ ভরে ওঠে।

হঠাৎ হাতের ভারী অনন্তটা ছুঁড়ে ফেলতেই সেটা সজোরে গিয়ে তাঁর কপালে লাগল,

সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন, আর সেই ফাটা কপাল থেকে রক্তের ধারা ফিনকি দিয়ে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকতে লাগল।

এমন করে কতক্ষণ যে কেটেছিল, আর কতক্ষণ যে কাটতে পারত, বলতে পারিনে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন চোখের জলে বালিশ-বিছানা ভিজে গেছে।

চোখ চেয়ে দেখি, তখন অনেক বেলা আছে, আর নরেন পাশে বসে আমাকে ঠেলা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গাচ্চে।

সে বললে, স্বপন দেখছিলে? ইস্, এ হয়েচে কি! বলে কোঁচার খুঁট দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে।

স্বপন! একমুহূর্তে মনটা যেন স্বস্তিতে ভরে গেল।

চোখ রগড়ে উঠে বসে দেখলুম, সুমুখেই মস্ত একটা কাগজে-মোড়া পার্শেল।

ও কি?

তোমার জামা-কাপড় সব কিনে আনলুম।

তুমি কিনতে গেলে কেন?

নরেন একটু হেসে বললে, আমি ছাড়া আর কে কিনবে?

এত কান্না আমি আর কখনও কাঁদিনি। নরেন বললে, আচ্ছা, পা ছেড়ে উঠে ব'স্ বোন, আমি দিব্যি করচি, আমরা এক মায়ের পেটের ভাইবোন। তোকে যত ভালই বাসিনে কেন, তবু আমি আমার কাছ থেকে তোকে চিরকাল রক্ষে করব।

চিরকাল! না না, তাঁর পায়ের ওপর আমাকে তোমরা ফেলে দিয়ে চলে এস নরেনদাদা। আমার অদৃষ্টে যা হবার তা হোক! কাল সমস্ত রাত্রি তাঁকে চোখে দেখিনি, আজ আবার সমস্ত রাত্রি দেখতে না পেলে যে আমি মরে যাব ভাই।

দাসী ঘরে প্রদীপ দিয়ে গেল। নরেন উঠে গিয়ে একটা মোড়ার ওপরে বসে বললে, মুক্তর কাছে আমি সমস্ত শুনেচি! কিন্তু তাঁকে যদি এতই ভালবাসতে, কোনদিন এক-সঙ্গে ত—

তাড়াতাড়ি বললুম, তুমি আমার বড়ভাই, এ-সব কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞেস ক'র না।

নরেন অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললে, আমি আজই তোমাকে তোমাদের বাগানের কাছে রেখে আসতে পারি, কিন্তু তিনি কি তোমাকে নেবেন? তখন গ্রামের মধ্যে তোমার কি দুর্গতি হবে বল ত?

বুকের ভেতরটা কে যেন দু'হাতে পাকিয়ে মুচড়ে দিলে। কিন্তু তখখুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম, ঘরে নেবেন না সে জানি, কিন্তু তিনি যে আমাকে মাপ করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। যত বড় অপরাধ হোক, সত্যি সত্যি মাপ চাইলে তাঁর না বলবার জো নেই, এ যে আমি তাঁর মুখেই শুনেচি ভাই। আমাকে তুমি তাঁর পায়ের তলায় রেখে এস নরেনদাদা, ভগবান তোমাকে রাজ্যেশ্বর করবেন, আমি কায়মনে বলচি।

মনে করেছিলুম, আর চোখের জল ফেলব না, কিন্তু কিছুতেই ধরে রাখতে পারলুম না, আবার ঝরঝর করে পড়তে লাগল। নরেন মিনিট-খানেক চুপ করে থেকে বললে, সদু, তুমি কি সত্যিই ভগবান মানো?

আজ চরম দুঃখে মুখ দিয়ে পরম সত্য বার হয়ে গেল; বললুম, মানি। তিনি আছেন বলেই ত এত করেও ফিরে যেতে চাইচি। নইলে এইখানে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম নরেনদাদা, ফিরে যাবার কথা মুখে আনতুম না।

নরেন বললে, কিন্তু আমি ত মানিনে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম, আমি বলচি, আমার মত তুমিও একদিন নিশ্চয় মানবে।

সে তখন বোঝা যাবে। বলে নরেন গম্ভীর-মুখে বসে রইল। মনে মনে কি যেন ভাবছে দেখতে পেয়ে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলুম। আমার এক মিনিট দেরি সইছিল না, বললুম, আমাকে কখন রেখে আসবে নরেনদাদা?

নরেন মুখ তুলে ধীরে ধীরে বললে, সে কখখনো তোমাকে নেবে না।

সে চিন্তা কেন করচ ভাই? নিন, না-নিন সে তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন, এ কথা নিশ্চয় বলতে পারি।

ক্ষমা! না নিলে ক্ষমা করা, না-করা দুই-ই সমান। তখন তুমি কোথায় যাবে বল ত? সমস্ত পাড়ার মধ্যে কতবড় একটা বিশ্রী হৈচৈ গণ্ডগোল পড়ে যাবে, একবার ভেবে দেখ দিকি!

ভয়ে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম, সে ভাবনা এতটুকু ক'রো না নরেনদাদা! তখন তিনি আমার উপায় করে দেবেন।

নরেন আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, আর তোমারই না হয় একটা উপায় করবেন, কিন্তু আমার ত করবেন না! তখন?

এ কথার কি যে জবাব দেব ভেবে পেলুম না। বললুম, তাতেই বা তোমার ভয় কি?

নরেন ম্লানমুখে জোর করে একটু হেসে বললে, ভয়? এমন কিছু নয়, পাঁচ-সাত বছরের জন্যে জেল খাটতে হবে। শেষকালে এমন করে তুমি আমাকে ডোবাবে জানলে আমি এতে হাতই দিতুম না। মনের এতটুকু স্থিরতা নেই, এ কি ছেলেখেলা?

আমি কেঁদে ফেলে বললুম, তবে আমার কি উপায় হবে ভাই? আমার সমস্ত অপরাধ তাঁর পায়ে নিবেদন না করে ত আমি কিছুতে বাঁচব না!

নরেন দাঁড়িয়ে উঠে বললে, শুধু নিজের কথাই ভাবচ, আমার বিপদ ত ভাবচ না? এখন সবদিক না বুঝে আমি কোন কাজ করতে পারব না।

ও কি, বাসায় যাচ্ছ নাকি?

হুঁ।

রাগে, দুঃখে, হতাশ্বাসে আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাথা কুটে কাঁদতে লাগলুম— তুমি সঙ্গে না যাও, এইখান থেকে আমার যাবার উপায় করে দাও, আমি একলা ফিরে যাব! ওগো, আমি তাঁর দিব্যি করে বলচি আমি কারুর নাম করব না, কাউকে বিপদে জড়াব না, সমস্ত শাস্তি একা মাথা পেতে নেব। তোমার দুটি পায়ে পড়ি নরেনদা, আমাকে আটকে রেখে আমার সর্বনাশ ক'র না।

মুখ তুলে দেখি, সে ঘরে নেই, পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেছে। ছুটে গিয়ে সদর দরজায় দেখি, তালা বন্ধ। উড়ে-বামুন বললে, বাবু চাবি নিয়ে চলে গেছেন, কাল সকালে এসে খুলে দেবেন।

ঘরে ফিরে এসে আর-একবার মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললুম, ভগবান! কখনো তোমাকে ডাকিনি, আজ ডাকচি, তোমার এই একান্ত নিরুপায় মহা-পাপিষ্ঠা সন্তানের গতি দাও।

আমার সে ডাক কত প্রচণ্ড, তার শক্তি যে কত দুর্নিবার, আজ সে শুধু আমিই জানি।

তবু সাতদিন কেটে গেল। কিন্তু কেমন করে যে কাটল, সে ইতিহাস বলবার আমার সামর্থ্যও নেই, ধৈর্যও নেই। সে যাক।

বিকেলবেলায় আমার ওপরের ঘরের জানালায় বসে নীচে গলির পানে তাকিয়ে ছিলুম। আপিসের ছুটি হয়ে গেছে, সারাদিনের খাটুনির পর বাবুরা বাড়িমুখো হনহন করে চলেছে। অধিকাংশই সামান্য গৃহস্থ। তাদের বাড়ির ছবি আমার চোখের ওপর স্পষ্ট ফুটে উঠল। বাড়ির মেয়েদের মধ্যে এখন সবচেয়ে কারা বেশী ব্যস্ত, জলখাবার সাজাতে, চা তৈরি করতে সবচেয়ে কারা বেশী ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে, সেটা মনে হতেই বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। মনে পড়ল, তিনিও সমস্তদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে এলেন। কোথায় কাপড়, কোথায় গামছা, কোথায় জল! ডাকাডাকির পর কেউ হয়ত সাড়াও দিলে না। তার পরে, হয়ত মেজদেওরের খাবারের সঙ্গে তাঁরও একটুখানি জলখাবারের যোগাড় মেজবৌ করে রেখেচে, না হয় ভুলেই গেছে! আমি ত আর নেই, ভুলতে ভয়ই বা কি! হয়ত বা শুধু এক গেলাস জল চেয়ে খেয়ে ময়লা বিছানাটা কোঁচা দিয়ে একটু ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়বেন! তার পরে, রাতদুপুরে দুটো শুকনো ঝরঝরে ভাত, একটু ভাতে-পোড়া। ও-বেলার একটুখানি ডাল হয়ত বা আছে, হয়ত বা উঠে গেছে। সকলের দিয়ে-থুয়ে দুধ একটু বাঁচে ত সে পরম ভাগ্য! নিরীহ ভালমানুষ, কাউকে কড়া কথা বলতে পারেন না, কারো ওপর রাগ দেখাতে জানেন না—

ওরে মহাপাতাক! এতবড় নিষ্ঠুর মহাপাপ তোর চেয়ে বেশী সংসারে কেউ কি কোনদিন করেছে? ইচ্ছে হ'ল এই লোহার গরাদেতে মাথাটা ছেঁচে ফেলে সমস্ত ভাবনা-চিন্তার এইখানেই শেষ করে দিই!

বোধ করি অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনদিকেই চোখ ছিল না, হঠাৎ কড়ানাড়ার শব্দে চমকে উঠে দেখি, সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নরেন আর মুক্ত। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ফেলে নীচের বিছানায় উঠে এসে বসলুম; সেইদিন থেকে নরেন আর আসেনি। আমার সমস্ত মন যে কোথায় পড়ে আছে সে নিঃসংশয়ে বুঝতে পেরেছিল বলে ভয়ে এদিক মাড়াত না। তার নিজের ধারণা জন্মেছিল, বিপদে পড়লে স্বামীর বিরুদ্ধে আমি তার উপকারেই লাগব না। তাই তার ভয়ও যেমন হয়েছিল, রাগও তেমনি হয়েছিল। ঘরে ঢুকে আমার দিকে চেয়েই দু'জনে একসঙ্গে চমকে উঠল, নরেন বললে, তোমার এত অসুখ করেছিল ত আমাকে খবর দাওনি কেন? তোমার বামুনটা ত আমার বাসা চেনে?

ঝি দালানে ঝাঁট দিচ্ছিল, সে খপ করে বলে বসল, অসুখ করবে কেন? শুধু জল খেয়ে থাকলে মানুষ রোগা হবে না বাবু? দুটি বেলা দেখচি ভাতের থালা যেমন বাড়া হয়, তেমনি পড়ে থাকে। অর্ধেক দিন ত হাতও দেন না।

শুনে দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে আমার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার পর নরেন বাসায় চলে গেলে, মুক্তকে নীচে টেনে নিয়ে বললুম, কেমন আছেন তিনি।

মুক্ত কেঁদে ফেললে। বললে, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই বৌমা, নইলে এমন সোয়ামীর ঘর করতে পেলে না!

তুই ত ঘর করতে দিলি না মুক্ত!

মুক্ত চোখ মুছে বললে, মনে হলে বুকের ভিতরটায় যে কি করতে থাকে, সে আর তোমাকে কি বলব? বাবু ছাড়া আর সবাই জানে, তুমি বাড়ি-পোড়ার খবর পেয়ে বাবুর সঙ্গেই রাগারাগি করে বাপের বাড়ি চলে গেছ। তোমার শাশুড়ীও তাঁর হুকুম নেওয়া হয়নি বলে রাগ করে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তাই বন্ধ করে দিয়েচে। মাগী কি বজ্জাত মা, কি বজ্জাত! যে কষ্টটা বাবুকে দিচ্ছে, দেখলে পাষাণের দুঃখ হয়। সাধে কি আর তুমি ঝগড়া করতে বৌমা!

ঝগড়া করা আমার চিরকালের জন্য ঘুচে গেল! বলতে গিয়ে সত্যি সত্যি যেন দম আটকে এল।

আজ মুক্তর কাছে শুনতে পেলুম, আমাদের পোড়া-বাড়ি আবার মেরামত হচ্ছে, তিনি টাকা দিয়েছেন। হয়ত সেইজন্যই আমার গয়নাগুলো হঠাৎ বাঁধা দেবার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

বললুম, বল্ মুক্ত, সব বল্। যত-রকমের বুকফাটা খবর আছে সমস্ত আমাকে একটি একটি করে শোনা, এতটুকু দয়া তোরা আমাকে কারিস নে।

মুক্ত বললে, এ বাড়ির ঠিকানা তিনি জানেন।

শিউরে উঠে বললুম, কি করে?

মাস-খানেক আগে যখন এ বাড়ি তোমার জন্যেই ভাড়া নেওয়া হয় তখন আমি জানতুম।

তার পর?

একদিন নদীর ধারে নরেনবাবুর সঙ্গে আমাকে লুকিয়ে কথা কইতে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন।

তার পর?

বামুনের পা ছুঁয়ে মিথ্যে বলতে পারলুম না বৌমা—চলে আসবার দিন এ বাসার ঠিকানা বলে ফেললুম।

এলিয়ে মুক্তর কোলের ওপরেই চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে মুক্ত বললে, বৌমা!

কেন মুক্ত?

যদি তিনি নিজে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে এসে পড়েন?

প্রাণপণ বলে উঠে বসে মুক্তর মুখ চেপে ধরলুম—না মুক্ত, ও কথা তোকে আমি বলতে দেব না! আমার দুঃখ আমাকে সজ্ঞানে বইতে দে, পাগল করে দিয়ে আমার প্রায়শ্চিত্তের পথ তুই বন্ধ করে দিসনে।

মুক্ত জোর করে তার মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, আমাকেও ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে বৌমা! টাকার সঙ্গে ত ওকে ওজন করে ঘরে তুলতে পারব না!

এ কথার আর জবাব দিলুম না, চোখ বুজে শুয়ে পড়লুম। মনে মনে বললুম, ওরে মুক্ত, পৃথিবী এখনও পৃথিবী আছে। আকাশকুসুমের কথা কানেই শোনা যায়, তাকে ফুটতে কেউ আজও চোখে দেখেনি।

ঘণ্টা-খানেক পরে মুক্ত নীচে থেকে ভাত খেয়ে ফিরে এল, তখন রাত্রি দশটা। ঘরে ঢুকেই বললে, মাথার আঁচলটা তুলে দাও বৌমা, বাবু আসছেন, বলেই বেরিয়ে গেল।

আবার এত রাত্রে? তাড়াতাড়ি কাপড় সেরে উঠে বসতেই দেখলুম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন নয়, আমার স্বামী।

বললেন, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি জানি, তুমি আমারই আছ। বাড়ি চল।

মনে মনে বললুম, ভগবান! এত যদি দিলে, তবে আরও একটু দাও, ওই দুটি পায়ে মাথা রাখবার সময়টুকু পর্যন্ত আমাকে সচেতন রাখো।

একাদশী বৈরাগী

কালীদহ গ্রামটা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ইহার গোপাল মুখুয্যের ছেলে অপূর্ব ছেলেবেলা হইতেই ছেলেদের মোড়ল ছিল। এবার সে যখন বছর পাঁচ-ছয় কলিকাতার মেসে থাকিয়া অনার্স-সমেত বি. এ. পাশ করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিল, তখন গ্রামের মধ্যে তাহার প্রসার-প্রতিপত্তির আর অবধি রহিল না। গ্রামের মধ্যে জীর্ণশীর্ণ একটা হাইস্কুল ছিল—তাহার সমবয়সীরা ইতিমধ্যেই ইহাতেই পাঠ সাঙ্গ করিয়া, সন্ধ্যাহ্নিক ছাড়িয়া দিয়া দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু কলিকাতা-প্রত্যাগত এই গ্রাজুয়েট ছোকরার মাথার চুল সমান করিয়া তাহারই মাঝখানে একখণ্ড নধর টিকির সংস্থান দেখিয়া শুধু ছোকরা কেন, তাহাদের বাবাদের পর্যন্ত বিস্ময়ে তাক লাগিয়া গেল।

শহরের সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া, জ্ঞানী লোকদিগের বক্তৃতা শুনিয়া, অপূর্ব সনাতন হিন্দুদের অনেক নিগূঢ় রহস্যের মর্মোদ্ভেদ করিয়া দেশে গিয়াছিল। এখন সঙ্গীদের মধ্যে ইহাই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতে লাগিল যে, এই হিন্দুধর্মের মত এমন সনাতন ধর্ম আর নাই; কারণ ইহার প্রত্যেক ব্যবস্থাই বিজ্ঞানসম্মত। টিকির বৈদ্যুতিক উপযোগিতা, দেহরক্ষা ব্যাপারে সন্ধ্যাহ্নিকের পরম উপকারিতা, কাঁচকলা ভক্ষণের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বহুবিধ অপরিজ্ঞাত তত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনিয়া গ্রামের ছেলে-বুড়ো নির্বিশেষে অভিভূত হইয়া গেল এবং তাহার ফল হইল এই যে, অনতিকাল মধ্যেই ছেলেদের টিকি হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, একাদশী, পূর্ণিমা ও গঙ্গাস্নানের ঘটায় বাড়ির মেয়েরাও হার মানিল। হিন্দু-ধর্মের পুনরুদ্ধার, দেশোদ্ধার ইত্যাদির জল্পনা-কল্পনায় যুবক মহলে একেবারে হৈহৈ পড়িয়া গেল। বুড়ারা বলিতে লাগিল, হ্যাঁ, গোপাল মুখুয্যের বরাত বটে! মা কমলারও যেমন সুদৃষ্টি, সন্তান জন্মিয়াছেও তেমনি। না হইলে আজকালকার কালে এতগুলো ইংরাজী পাশ করিয়াও এই বয়সে এমনি ধর্মে মতিগতি কয়টা দেখা যায়! সুতরাং দেশের মধ্যে অপূর্ব একটা অপূর্ব বস্তু হইয়া উঠিল। তাহার হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী, ধূমপান-নিবারণী ও দুর্নীতি-দলনী, এই তিন-তিনটা সভার আস্ফালনে গ্রামে চাষাভূষার দল পর্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাঁচকড়ি তেওর তাড়ি খাইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিল শুনিতে পাইয়া অপূর্ব সদুলবলে উপস্থিত হইয়া পাঁচকড়িকে এমনি শাসিত করিয়া দিল যে পরদিন পাঁচকড়ির স্ত্রী স্বামী লইয়া বাপের বাড়ি পলাইয়া গেল। ভগা কাওরা অনেক রাত্রিতে বিল হইতে মাছ ধরিয়া বাড়ি ফিরিবার পথে গাঁজার ঝোঁকে নাকি বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর গান গাহিয়া যাইতেছিল। ব্রাহ্মণপাড়ার অবিনাশের কানে যাওয়ায়, সে তার নাক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া তবে ছাড়িয়া দিল। দুর্গা ডোমের চৌদ্দ-পনর বছরের ছেলে বিড়ি খাইয়া মাঠে যাইতেছিল; অপূর্বর দলের ছোকরার চোখে পড়ায়, সে তাহার পিঠের উপর সেই জ্বলন্ত বিড়ি চাপিয়া ধরিয়া ফোস্কা তুলিয়া দিল। এমনি করিয়া অপূর্ব হিন্দুধর্ম-প্রচারিণী ও দুর্নীতি-দলনী সভা ভানুমতীর আমগাছের মত সদ্য সদ্যই ফুলে-ফলে কালীদহ গ্রামটাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এইবার গ্রামের মানসিক উন্নতির দিকে নজর দিতে গিয়া অপূর্বর চোখে পড়িল যে স্কুলের লাইব্রেরীতে শশিভূষণের দেড়খানা মানচিত্র ও বঙ্কিমের আড়াইখানা উপন্যাস ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই দীনতার জন্য সে হেডমাস্টারকে অশেষরূপে লাঞ্ছিত করিয়া অবশেষে নিজেই লাইব্রেরী গঠন করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল। তাহার সভাপতিত্বে চাঁদার খাতা, আইন-কানুনের তালিকা এবং পুস্তকের লিস্ট তৈরী হইতে বিলম্ব হইল না।

এতদিন ছেলেদের ধর্মপ্রচারের উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সহিয়াছিল। কিন্তু দুই-একদিনের মধ্যেই তাদের চাঁদা আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র গৃহস্থের কাছে এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্মপ্রচার ও দুর্নীতি-দলনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল, লাইব্রেরীর জন্য অর্থসংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ভারী সুরাহা

চোখে পড়িল। স্কুলের অদূরে একটা পরিত্যক্ত, পোড়ো ভিটার প্রতি একদিন অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। শোনা গেল, ইহা একাদশী বৈরাগীর। অনুসন্ধান করিতে জানা গেল, লোকটা কি-একটা গর্হিত সামাজিক অপরাধ করায় গ্রামের ব্রাহ্মণেরা তাহার ধোপা, নাপিত, মুদী প্রভৃতি বন্ধ করিয়া বছর-দশেক পূর্বে উদ্বাস্তু করিয়া নির্বাসিত করিয়াছেন। এখন সে ক্রোশ-দুই উত্তরে বারুইপুরে গ্রামে বাস করিতেছে। লোকটা নাকি টাকার কুমির; কিন্তু তাঁহার সাবেক নাম যে কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না—হাঁড়ি ফাটার ভয়ে বহুদিনের অব্যবহারে মানুষের স্মৃতি হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে। তদবধি এই একাদশী নামেই বৈরাগীমহাশয় সুপ্রসিদ্ধ। অপূর্ব তাল ঠুকিয়া কহিল, টাকার কুমির! সামাজিক কদাচার! তবে ত এই ব্যাটাই লাইব্রেরীর অর্ধেক ভার বহন করিতে বাধ্য। না হইলে সেখানে ধোপা, নাপিত, মুদীও বন্ধ! বারুইপুরের জমিদার ত দিদির মামাশ্বশুর।

ছেলেরা মাতিয়া উঠিল এবং অবিলম্বে ডোনেশনের খাতায় বৈরাগীর নামের পিছনে একটা মস্ত অঙ্কপাত হইয়া গেল। একাদশীর কাছে টাকা আদায় করা হইবে, না হইলে অপূর্ব তাহার দিদির মামাশ্বশুরকে বলিয়া বারুইপুরেও ধোপা, নাপিত বন্ধ করিবে, সংবাদ পাইয়া রসিক স্মৃতিরত্ন লাইব্রেরীর মঙ্গলার্থ উপযাচক হইয়া পরামর্শ দিয়া গেলেন যে, বেশ একটু মোটা টাকা না দিলে মহাপাপী ব্যাটা কালীদহে বাস্তু কি করিয়া রক্ষা করে, দেখিতে হইবে। কারণ, বাস না করিলেও এই বাস্তুভিটার উপর একাদশীর যে অত্যন্ত মমতা, স্মৃতিরত্নের তাহা অগোচর ছিল না। যে-হেতু বছর-দুই পূর্বে এই জমিটুকু খরিদ করিয়া নিজের বাগানের অঙ্গীভূত করিবার অভিপ্রায়ে সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবে তখন একাদশী অত্যন্ত সাধু ব্যক্তির ন্যায় কানে আঙ্গুল দিয়া বলিয়াছিল, এমন অনুমতি করবেন না ঠাকুরমশাই, ঐ একফোঁটা জমির বদলে ব্রাহ্মণের কাছে দাম নিতে আমি কিছুতেই পারব না। ব্রাহ্মণের সেবায় লাগবে, এ ত আমার সাত-পুরুষের ভাগ্য। স্মৃতিরত্ন নিরতিশয় পুলকিত-চিত্তে তাহার দেব-দ্বিজে ভক্তি-শ্রদ্ধার লক্ষকোটি সুখ্যাতি করিয়া অসংখ্য আশীর্বাদ করার পরে, একাদশী করজোড়ে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিল, কিন্তু এমনি পোড়া অদৃষ্ট ঠাকুরমশাই যে, সাত-পুরুষের ভিটে আমার কিছুতেই হাতছাড়া করবার জো নাই। বাবা মরণকালে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে গিয়েছিলেন, খেতেও যদি না পাস বাবা, বাস্তুভিটে কখনো ছাড়িস নে! ইত্যাদি ইত্যাদি। সে আক্রোশ স্মৃতিরত্ন বিস্মৃত হন নাই।

দিন-পাঁচেক পরে, একদিন সকালবেলা এই ছেলের দলটি দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয় একাদশীর সদরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়িটি মাটির কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয়, লক্ষ্মীশ্রী আছে। অপূর্ব কিংবা তাহার দলের আর কেহ একাদশীকে পূর্বে কখনো দেখে নাই; সুতরাং চণ্ডীমণ্ডপে পা দিয়াই তাহাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। এ-লোক টাকার কুমিরই হোক, হাঙ্গরই হোক, লাইব্রেরীর সম্বন্ধে যে পুঁটি মাছটির উপকারে আসিবে না, তাহা নিঃসন্দেহ। একাদশীর পেশা তেজারতি। বয়স ষাটের উপর গিয়াছে। সমস্ত দেহ যেমন শীর্ণ, তেমনি শুষ্ক। কণ্ঠভরা তুলসীর মালা। দাড়ি-গোঁফ কামান, মুখখানার প্রতি চাহিলে মনে হয় না যে কোথাও ইহার লেশমাত্র রসকস আছে। ইক্ষু যেমন নিজের রস কলের পেষণে বাহির করিয়া দিয়া, অবশেষে নিজেই ইন্ধন হইয়া তাহাকে জ্বালাইয়া শুষ্ক করে, এ ব্যক্তি যেন তেমনি মানুষকে পুড়াইয়া শুষ্ক করিবার জন্যই নিজের সমস্ত মনুষ্যত্বকে নিঙড়াইয়া বিসর্জন দিয়া মহাজন হইয়া বসিয়া আছে। তাহার শুধু চেহারা দেখিয়াই অপূর্ব মনে মনে দমিয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপের উপর ঢালা বিছানা। মাঝখানে একাদশী বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে একটা কাঠের হাতবাক্স এবং একপাশে থাক-দেওয়া হিসাবের খাতাপত্র। একজন বৃদ্ধ-গোছের গোমস্তা খালিগায়ে পৈতার গোছা গলায় ঝুলাইয়া শ্লেটের উপর সুদের হিসাব করিতেছে; এবং সম্মুখে, পার্শ্বে, বারান্দায় খুঁটির আড়ালে নানা বয়সের নানা অবস্থার স্ত্রী-পুরুষ ম্লানমুখে বসিয়া আছে। কেহ ঋণ গ্রহণ করিতে, কেহ সুদ দিতে, কেহ-বা শুধু সময় ভিক্ষা করিতেই আসিয়াছে; কিন্তু ঋণ পরিশোধের জন্য কেহ যে বসিয়াছিল, তাহা কাহারও মুখ দেখিয়া মনে হইল না।

অকস্মাৎ কয়েকজন অপরিচিত ভদ্রসন্তান দেখিয়া একাদশী বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিল। গোমস্তা শ্লেটখানা রাখিয়া দিয়া কহিল, কোত্থেকে আসচেন?

অপূর্ব কহিল, কালীদহ থেকে।

মশায় আপনারা?

আমরা সবাই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ শুনিয়া একাদশী সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ঝুঁকাইয়া প্রণাম করিল; কহিল, বসতে আজ্ঞা হোক।

সকলে উপবেশন করিলে একাদশী নিজেও বসিল। গোমস্তা প্রশ্ন করিল, আপনাদের কি প্রয়োজন?

অপূর্ব লাইব্রেরীর উপকারিতা-সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া চাঁদার কথা পাড়িতে গিয়া দেখিল, একাদশীর ঘাড় আর একদিকে ফিরিয়া গিয়াছে। সে খুঁটির আড়ালের স্ত্রীলোকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে হারুর মা? সুদ ত হয়েচে কুল্লে সাত টাকা দু'আনা; তার দু'আনাই যদি ছাড় করে নেবে, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে জিভ বের করে মেরে ফেল না কেন?

তাহার পরে উভয়ে এমনি ধস্তাধস্তি শুরু করিয়া দিল, যেন এই দু'আনা পয়সার উপরেই তাহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। কিন্তু হারুর মাও যেমন স্থিরসংকল্প, একাদশীও তেমনি অটল। দেরি হইতেছে দেখিয়া অপূর্ব উভয়ের বাগবিতণ্ডার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, আমাদের লাইব্রেরীর কথাটা—

একাদশী মুখ ফিরাইয়া বলিল, আজ্ঞে, এই যে শুনি;—হাঁ রে নফর, তুই কি আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবুতে চাস রে! সে দু'টাকা এখনো শোধ দিলিনে, আবার একটাকা চাইতে এসেচিস কোন্ লজ্জায় শুনি? বলি সুদ-টুদ কিছু এনেচিস?

নফর ট্যাঁক খুলিয়া এক আনা পয়সা বাহির করিতেই একাদশী চোখ রাঙাইয়া কহিল, তিন মাস হয়ে গেল না রে? আর দুটো পয়সা কই?

নফর হাতজোড় করিয়া বলিল, আর নেই কর্তা; ধাড়ার পোর কত হাতে-পায়ে পড়ে পয়সা চারটি ধার করে আনচি, বাকী দুটো পয়সা আসচে হাটবারেই দিয়ে যাব।

একাদশী গলা বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল, দেখি তোর ওদিকের ট্যাঁকটা?

নফর বাঁ-দিকের ট্যাঁকটা দেখাইয়া অভিমানভরে কহিল, দুটো পয়সার জন্য মিছে কথা কইচি কর্তা? যে শালা পয়সা এনেও তোমাদের ঠকায়, তার মুখে পোকা পড়ুক, এই বলে দিলুম।

একাদশী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, তুই চারটে পয়সা ধার করে আনতে পারলি, আর দুটো এমনি ধার করতে পারলি নে?

নফর রাগিয়া কহিল, মাইরি দিলাসা করলুম না কর্তা! মুখে পোকা পড়ুক।

অপূর্বর গা জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা লোক তুমি মশায়!

একাদশী একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র, কোন কথা কহিল না। পরাণ বাগদী সম্মুখের উঠান দিয়া যাইতেছিল। একাদশী হাত নাড়িয়া ডাকিয়া কহিল, পরাণ, নফ্‌রার কাছাটা একবার খুলে দেখত রে, পয়সা দুটো বাঁধা আছে নাকি?

পরাণ উঠিয়া আসিতেই নফর রাগ করিয়া তাহার কাছার খুঁটে বাঁধা পয়সা দুটো খুলিয়া একাদশীর সুমুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। একাদশী এই বেয়াদপিতে কিছুমাত্র রাগ করিল না। গম্ভীর মুখে পয়সা ছয়টা বাক্সে তুলিয়া রাখিয়া গোমস্তাকে কহিল, ঘোষাল-মশাই, নফ্‌রার নামে সুদ আদায় জমা করে নেন। হাঁ রে, একটা টাকা কি আবার করবি রে?

নফর কহিল, আবশ্যক না হলেই কি এয়েচি মশাই?

একাদশী কহিল, আট আনা নিয়ে যা না! গোটা টাকা নিয়ে গেলেই ত নয়-ছয় করে ফেলবি রে!

তার পরে অনেক কষা-মাজা করিয়া নফর মোড়ল বারো আনা পয়সা কর্জ লইয়া প্রস্থান করিল।

বেলা বাড়িয়া উঠিতেছিল। অপূর্বর সঙ্গী অনাথ চাঁদার খাতাটা একাদশীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, যা দেবেন দিয়ে দিন মশাই, আমরা আর দেরি করতে পারিনে।

একাদশী খাতাটা তুলিয়া লইয়া প্রায় পনর মিনিট ধরিয়া আগাগোড়া তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া খাতাটা ফিরাইয়া দিয়া বলিল, আমি বুড়ো-মানুষ, আমার কাছে আবার চাঁদা কেন?

অপূর্ব কোনমতে রাগ সামলাইয়া কহিল, বুড়োমানুষ টাকা দেবে না ত কি ছোট ছেলেতে টাকা দেবে? তারা পাবে কোথায় শুনি?

বুড়ো সে কথার উত্তর না দিয়া কহিল, ইস্কুল ত হয়েচে কুড়ি-পঁচিশ বছর; কৈ, এতদিন ত কেউ লাইব্রেরীর কথা তোলেনি বাপু? তা যাক, এ ত আর মন্দ কাজ নয়, আমাদের ছেলেপুলে বই পড়ুক আর না পড়ুক, আমার গাঁয়ের ছেলেরাই পড়বে ত। কি বল ঘোষালমশাই? ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া কি যে বলিল, বোঝা গেল না। একাদশী কহিল, তা বেশ, চাঁদা দেব আমি, একদিন এসে নিয়ে যাবেন চার আনা পয়সা। কি বল ঘোষাল, এর কমে আর ভাল দেখায় না। অতদূর থেকে ছেলেরা এসে ধরেচে, যা হোক একটু নাম-ডাক আছে বলেই ত! আরও ত লোক আছে, তাদের কাছে ত চাইতে যায় না, কি বল হে?

ক্রোধে অপূর্বর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। অনাথ কহিল, এই চার আনার জন্যে আমরা এতদূরে এসেচি? তাও আবার আর একদিন এসে নিয়ে যেতে হবে?

একাদশী মুখে একটা শব্দ করিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, দেখলেন ত অবস্থা, ছ'টা পয়সা হক্কের সুদ আদায় করতে ব্যাটাদের কাছে কি ছ্যাঁচড়াপনাই না করতে হয়? তা এ পাট-টা বিক্রি হয়ে না গেলে আর চাঁদা দেবার সুবিধে—

অপূর্বর রাগে ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল; বলিল, সুবিধে হবে এখানেও ধোপা-নাপিত বন্ধ হলে। ব্যাটা পিশাচ সর্বাঙ্গে ছিটে-ফোঁটা কেটে জাত হারিয়ে বোষ্টম হয়েছেন, আচ্ছা!

বিপিন উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটি আঙুল তুলিয়া শাসাইয়া কহিল, বারুইপুরের রাখালদাসবাবু আমাদের কুটুম্ব, মনে থাকে যেন বৈরাগী!

বুড়া বৈরাগী এই অভাবনীয় কাণ্ডে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। বিদেশী ছেলেদের অকস্মাৎ এত ক্রোধের হেতু সে কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব বলিল, গরীবের রক্ত শুষে সুদ খাওয়া তোমার বার করব তবে ছাড়ব।

নফর তখনও বসিয়া ছিল; তাহার কাছায় বাঁধা পয়সা দুটো আদায় করার রাগে মনে মনে ফুলিতেছিল; সে কহিল, যা কইলেন কর্তা, তা ঠিক। বৈরাগী ত নয়, পিচেশ! চোখে দেখলেন ত কি করে মোর পয়সা দুটো আদায় নিলে!

বুড়োর লাঞ্ছনায় উপস্থিত সকলেই মনে মনে নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তাহাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া বিপিন উৎসাহিত হইয়া চোখ টিপিয়া বলিয়া উঠিল, তোমরা ত ভেতরের কথা জানো না, কিন্তু আমাদের গাঁয়ের লোক আমরা সব জানি। কি গো বুড়ো, আমাদের গাঁয়ে কেন তোমার ধোপা-নাপতে বন্ধ হয়েছিল বলব?

খবরটা পুরাতন। সবাই জানিত। একাদশী সদ্‌গোপের ছেলে, জাত-বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ মরা এই বৈমাত্র ছোটবোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। সংসারে তাহার আর কেহ ছিল না; ইহাকেই সে শিশুকাল হইতে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, তাহার ঘটা করিয়া বিবাহ দিয়াছিল। আবার অল্প বয়সে বিধবা হইয়া গেলে, দাদার ঘরেই সে আদর-যত্নে ফিরিয়া আসিয়াছিল। বয়স এবং বুদ্ধির দোষে এই ভগিনীর এতবড় পদস্খলনে বৃদ্ধ কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল; আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে ঘুরিয়া অবশেষে যখন তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, তখন গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিত, একান্ত অনুতপ্তা, দুর্ভাগিনী ভগিনীটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে

একাদশী কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা-নাপিত-মুদী প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল। কথাটা সবাই জানিত; তথাপি আর একজনের মুখ হইতে আর একজনের কলঙ্ক-কাহিনীর মাধুর্যটা উপভোগ করিবার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। কিন্তু একাদশী লজ্জায় ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গেল। তাহার নিজের জন্য নয়, ছোট বোনটির জন্য। প্রথম যৌবনের অপরাধ গৌরীর বুকের মধ্যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছিল, আজিও যে তাহা তেমনি আছে, তিলার্ধও শুষ্ক হয় নাই, বৃদ্ধ তাহা ভালরূপেই জানিত। পাছে বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও তাহার কানে গিয়া সেই ব্যথা আলোড়িত হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় একাদশী বিবর্ণমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার এই সকরুণ দৃষ্টির নীরব মিনতি আর কাহারও চক্ষে পড়িল না, কিন্তু অপূর্ব হঠাৎ অনুভব করিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল।

বিপিন বলিতে লাগিল, আমরা কি ভিখিরী যে দু'কোশ পথ হেঁটে এই রৌদ্রে চারগণ্ডা পয়সা ভিক্ষে চাইতে এসেচি? তাও আবার আজ নয়, কবে ওঁর কোন্ খাতকের পাট বিক্রি হবে, সেই খবর নিয়ে আমাদের আর একদিন হাঁটতে হবে—তবে যদি বাবুর দয়া হয়! কিন্তু লোকের রক্ত শুষে সুদ খাও বুড়ো, মনে করেচ জোঁকের গায়ে জোঁক বসে না? আমি এখানেও না তোমার হাঁড়ির হাল করি ত আমার নাম বিপিন ভট্‌চায্যিই নয়। ছোটজাতের পয়সা হয়েচে বলে চোখে কানে আর দেখতে পাও না? চল হে অপূর্ব, আমরা যাই, তার পরে যা জানি করা যাবে। বলিয়া সে অপূর্বর হাত ধরিয়া টান দিল।

বেলা এগারটা বাজিয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ এতটা পথ হাঁটিয়া আসিয়া অপূর্বর অত্যন্ত পিপাসা বোধ হওয়ায় কিছুক্ষণ পূর্বে চাকরটাকে সে জল আনিতে বলিয়া দিয়াছিল। তাহার পর কলহ-বিবাদে সে কথা মনে ছিল না। কিন্তু তাহার তৃষ্ণার জল এক হাতে এবং অন্য হাতে রেকাবিতে গুটি-কয়েক বাতাসা লইয়া একটি সাতাশ-আটাশ বছরের বিধবা মেয়ে পাশের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে তাহার জল চাওয়ার কথা স্মরণ হইল। গৌরীকে ছোটজাতের মেয়ে বলিয়া কিছুতেই মনে হয় না। পরনে গরদের কাপড়; স্নানের পর বোধ করি এইমাত্র আহ্নিক করিতে বসিয়াছিল, ব্রাহ্মণ জল চাহিয়াছে, চাকরের কাছে শুনিয়া সে আহ্নিক ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। কহিল, আপনাদের কে জল চেয়েছিলেন যে?

বিপিন কহিল, পাটের শাড়ি পরে এলেই বুঝি তোমার হাতে জল খাব আমরা? অপূর্ব, ইনিই সে বিদ্যেধরী হে!

চক্ষের নিমিষে মেয়েটির হাত হইতে বাতাসার রেকাবটা ঝনাৎ করিয়া নীচে পড়িয়া গেল এবং সেই অসীম লজ্জা চোখে দেখিয়া অপূর্ব নিজেই লজ্জায় মরিয়া গেল। সক্রোধে বিপিনকে একটা কনুইয়ের গুঁতো মারিয়া কহিল, এ-সব কি বাঁদরামি হচ্ছে? কাণ্ডজ্ঞান নেই?

বিপিন পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলহের মুখে অপমান করিতে নর-নারী-ভেদাভেদজ্ঞান-বিবর্জিত নিরপেক্ষ বীরপুরুষ। সে অপূর্বর খোঁচা খাইয়া আরও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। চোখ রাঙ্গাইয়া হাঁকিয়া কহিল, কেন, মিছে কথা বলচি নাকি? ওর এতবড় সাহস যে, বামুনের ছেলের জন্য জল আনে? আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিতে পারি জান?

অপূর্ব বুঝিল আর তর্ক নয়। অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বৈ কমিবে না। কহিল, আমি আনতে বলেছিলুম বিপিন, তুমি না জেনে অনর্থক ঝগড়া ক'রো না। চল, আমরা এখন যাই।

গৌরী রেকাবিটা কুড়াইয়া লইয়া, কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া নিঃশব্দে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। তথা হইতে কহিল, দাদা, এঁরা যে কিসের চাঁদা নিতে এসেছিলেন, তুমি দিয়েচ?

একাদশী এতক্ষণ পর্যন্ত বিহ্বলের ন্যায় বসিয়া ছিল, ভগিনীর আহ্বানে চকিত হইয়া বলিল, না, এই যে দিই দিদি!

অপূর্বর প্রতি চাহিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, বাবুমশাই, আমি গরীব মানুষ। চার আনাই আমার পক্ষে ঢের, দয়া করে নিন।

বিপিন পুনরায় কি একটা কড়া জবাব দিতে উদ্যত হইয়াছিল, অপূর্ব ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিল; কিন্তু এত কাণ্ডের পর সেই চার আনার প্রস্তাবে তাহার নিজেরও অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল। আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, থাক বৈরাগী, তোমায় কিছু দিতে হবে না।

একাদশী বুঝিল, ইহা রাগের কথা; একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কলিকাল! বাগে পেলে কেউ কি কারও ঘাড় ভাঙতে ছাড়ে! দাও ঘোষালমশাই, পাঁচ গণ্ডা পয়সাই খাতায় খরচ লেখ। কি আর করব বল। বলিয়া বৈরাগী পুনরায় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। তাহার মুখ দেখিয়া অপূর্বর এবার হাসি পাইল। এই কুসীদজীবী বৃদ্ধের পক্ষে চার আনার এবং পাঁচ আনার মধ্যে কতবড় যে প্রকাণ্ড প্রভেদ, তাহা সে মনে মনে বুঝিল; মৃদু হাসিয়া কহিল, থাক বৈরাগী, তোমায় দিতে হবে না। আমরা চার-পাঁচ আনা পয়সা নিইনে। আমরা চললুম।

কি জানি কেন, অপূর্ব একান্ত আশা করিয়াছিল, এই পাঁচ আনার বিরুদ্ধে দ্বারের অন্তরাল হইতে অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ আসিবে। তাহার অঞ্চলের প্রান্তটুকু তখনও দেখা যাইতেছিল, কিন্তু সে কোন কথা কহিল না। যাইবার পূর্বে অপূর্ব যথার্থই ক্ষোভের সহিত মনে মনে কহিল, ইহারা বাস্তবিকই অত্যন্ত ক্ষুদ্র। দান করা সম্বন্ধে পাঁচ আনা পয়সার অধিক ইহাদের ধারণা নাই। পয়সাই ইহাদের প্রাণ, পয়সাই ইহাদের অস্থি-মাংস, পয়সার জন্য ইহারা করিতে পারে না এমন কাজ সংসারে নাই।

অপূর্ব সদলবলে উঠিয়া দাঁড়াইতেই একটি বছর-দশেকের ছেলের প্রতি অনাথের দৃষ্টি পড়িল। ছেলেটির গলায় উত্তরীয়, বোধ করি পিতৃবিয়োগ কিংবা এমনি কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাহার বিধবা জননী বারান্দায় খুঁটির আড়ালে বসিয়া ছিল। অনাথ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুটে, তুই যে এখানে?

পুটে আঙুল দেখাইয়া কহিল, আমার মা বসে আছেন। মা বললেন, আমাদের অনেক টাকা ওঁর কাছে জমা আছে। বলিয়া সে একাদশীকে দেখাইয়া দিল।

কথাটা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। ইহার শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখিবার জন্য অপূর্ব নিজের আকণ্ঠ পিপাসা সত্ত্বেও বিপিনের হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

একাদশী প্রশ্ন করিল, তোমার নামটি কি বাবা? বাড়ি কোথায়?

ছেলেটি কহিল, আমার নাম শশধর; বাড়ি ওঁদের গাঁয়ে—কালীদহে।

তোমার বাবার নামটি কি?

ছেলেটির হইয়া অনাথ জবাব দিল, কহিল, এর বাপ অনেকদিন মারা গেছে। পিতামহ রামলোচন চাটুয্যে ছেলের মৃত্যুর পর সংসার ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন; সাত বৎসর পরে মাস-খানেক হ'ল ফিরে এসেছিলেন। পরশু এদের ঘরে আগুন লাগে, আগুন নিবোতে গিয়ে বৃদ্ধ মারা পড়েচেন। আর কেউ নেই, এই নাতিটিই শ্রাদ্ধাধিকারী।

কাহিনী শুনিয়া সকলে দুঃখ প্রকাশ করিল, শুধু একাদশী চুপ করিয়া রহিল। একটু পরেই প্রশ্ন করিল, টাকার হাতচিটা আছে? যাও, তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এস।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিয়া আসিয়া কহিল, কাগজ-পত্র কিছু নেই, সব পুড়ে গেছে।

একাদশী প্রশ্ন করিল, কত টাকা?

এবার বিধবা অগ্রসর হইয়া আসিয়া মাথার কাপড়টা সরাইয়া জবাব দিল, ঠাকুর মরবার আগে বলে গেছেন, পাঁচ শ টাকা তিনি জমা রেখে তীর্থযাত্রা করেন। বাবা আমরা বড় গরীব; সব টাকা না দাও, কিছু আমাদের ভিক্ষে দাও বলিয়া বিধবা টিপিয়া টিপিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘোষালমশাই এতক্ষণ খাতা লেখা ছাড়িয়া একাগ্রচিত্তে শুনিতেছিলেন, তিনিই অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বলি কেউ সাক্ষী-টাক্ষী আছে?

বিধবা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। আমরাও জানতুম না। ঠাকুর গোপনে টাকা জমা রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

ঘোষাল মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, শুধু কাঁদলেই ত হয় না বাপু! এ-সব মবলগ টাকাকড়ির কান্ড যে! সাক্ষী নেই, হাতচিটা নেই, তা হলে কি রকম হবে বল দেখি?

বিধবা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু কান্নার ফল যে কি হইবে তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। একাদশী এবার কথা কহিল; ঘোষালের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমার মনে হচ্চে, যেন পাঁচ শ টাকা কে জমা রেখে আর নেয়নি। তুমি একবার পুরানো খাতাগুলো খুঁজে দেখ দিকি, কিছু লেখা-টেখা আছে নাকি?

ঘোষাল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, কে এতবেলায় ভূতের ব্যাগার খাটতে যাবে বাপু? সাক্ষী নেই, রসিদ-পত্তর নেই—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই দ্বারের অন্তরাল হইতে জবাব আসিল, রসিদ-পত্তর নেই বলে কি ব্রাহ্মণের টাকাটা ডুবে যাবে নাকি? পুরানো খাতা দেখুন, আপনি না পারেন আমাকে দিন, দেখে দিচ্চি।

সকলেই বিস্মিত হইয়া দ্বারের প্রতি চোখ তুলিল; কিন্তু যে হুকুম দিল তাহাকে দেখা গেল না।

ঘোষাল নরম হইয়া কহিল, কত বছর হয়ে গেল মা! এতদিনের খাতা খুঁজে বার করা ত সোজা নয়। খাতা-পত্তরের আন্ডিল! তা জমা থাকে, পাওয়া যাবে বৈ কি! বিধবাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, তুমি বাছা কেঁদো না, হকের টাকা হয় ত পাবে বৈ কি। আচ্ছা, কাল একবার আমার বাড়ি যেয়ো; সব কথা জিজ্ঞাসা করে খাতা দেখে বার করে দেব। আজ এতবেলায় ত আর হবে না।

বিধবা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আচ্ছা বাবা, কাল সকালেই আপনার ওখানে যাব।

যেয়ো, বলিয়া ঘোষাল ঘাড় নাড়িয়া সম্মুখে খোলা খাতা সেদিনের মত বন্ধ করিয়া ফেলিল।

কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ছলে বিধবাকে বাড়িতে আহ্বান করার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অন্তরাল হইতে গৌরী কহিল, আট বছর আগের—তাহলে ১৩০১ সালের খাতাটা একবার খুলে দেখুন ত, টাকা জমা আছে কি না?

ঘোষাল কহিলেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের মা!

গৌরী কহিল, আমাকে দিন, আমি দেখে দিচ্চি। ব্রাহ্মণের মেয়ে দু'কোশ হেঁটে এসেচেন—দু'কোশ এই রৌদ্রে হেঁটে যাবেন, আবার কাল আপনার কাছে আসবেন; এত হাংগামায় কাজ কি ঘোষালকাকা?

একাদশী কহিল, সত্যিই ত ঘোষালমশাই; ব্রাহ্মণের মেয়েকে মিছামিছি হাঁটান কি ভাল? বাপ রে! দাও, দাও, চটপট দেখে দাও।

ক্রুদ্ধ ঘোষাল তখন রুষ্টকণ্ঠে উঠিয়া গিয়া পাশের ঘর হইতে ১৩০১ সালের খাতা বাহির করিয়া আনিলেন। মিনিট-দশেক পাতা উলটাইয়া হঠাৎ ভয়ানক খুশী হইয়া বলিয়া উঠিলেন, বাঃ! আমার গৌরীমায়ের কি সূক্ষ্ম বুদ্ধি! ঠিক এক সালের খাতাতেই জমা পাওয়া গেল! এই যে রামলোচন চাটুয্যের জমা পাঁচ শ'—

একাদশী কহিল, দাও, চটপট সুদটা কষে দাও ঘোষালমশাই।

ঘোষাল বিস্মিত হইয়া কহিল, আবার সুদ?

একাদশী কহিল, বেশ, দিতে হবে না! টাকাটা এতদিন খেটেচে ত, বসে ত থাকেনি। আট বছরের সুদ, এই ক'মাস সুদ বাদ পড়বে।

তখন সুদে-আসলে প্রায় সাড়ে-সাত শ টাকা হইল। একাদশী ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দিদি, টাকাটা তবে সিন্দুক থেকে বার করে আন। হাঁ বাছা, সব টাকাটাই একসংগে নিয়ে যাবে ত?

বিধবার অন্তরের কথা অন্তর্যামী শুনিলেন; চোখ মুছিয়া প্রকাশ্যে কহিল, না বাবা, অত টাকায় আমার কাজ নেই; আমাকে পঞ্চাশটি টাকা এখন শুধু দাও।

তাই নিয়ে যাও মা। ঘোষালমশাই, খাতাটা একবার দাও, সই করে নেই; আর বাকী টাকার তুমি একটা চিঠি করে দাও।

ঘোষাল কহিল, আমি সই করে নিচ্চি। তুমি আবার—

একাদশী কহিল, না না, আমাকেই দাও না ঠাকুর, নিজের চোখে দেখে দিই। বলিয়া খাতা লইয়া অর্ধ-মিনিট চোখ বুলাইয়া হাসিয়া কহিল, ঘোষাল মশাই, এই যে একজোড়া আসল মুক্তা ব্রাহ্মণের নামে জমা রয়েছে। আমি জানি কিনা, ঠাকুরমশাই আমাদের সব সময়ে চোখে দেখতে পায় না, বলিয়া একাদশী দরজার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। এতগুলি লোকের সুমুখে মনিবের সেই ব্যঙ্গোক্তিতে ঘোষালের মুখ কালি হইয়া গেল।

সেদিনের সমস্ত কর্ম নির্বাহ হইলে অপূর্ব সঙ্গীদের লইয়া যখন উত্তপ্ত পথের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িল, তখন তাহার মনের মধ্যে একটা বিপ্লব চলিতেছিল। ঘোষাল সঙ্গে ছিল, সে সবিনয়ে আহ্বান করিয়া কহিল, আসুন, গরীবের ঘরে অন্ততঃ একটু গুড় দিয়েও জল খেতে যেতে হবে।

অপূর্ব কোন কথা না কহিয়া নীরবে অনুসরণ করিল। ঘোষালের গা জ্বলিয়া যাইতেছিল। সে একাদশীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দেখলেন, ছোটলোক ব্যাটার আস্পর্ধা? আপনাদের মত ব্রাহ্মণ-সন্তানের পায়ের ধুলো পড়েছে, হারামজাদার ষোল পুরুষের ভাগ্যি! ব্যাটা পিচেশ কিনা পাঁচ গণ্ডা পয়সা দিয়ে ভিখারী বিদেয় করতে চায়।

বিপিন কহিল, দু'দিন সবুর করুন না; হারামজাদা মহাপাপীর ধোপা-নাপতে বন্ধ করে পাঁচ গণ্ডা পয়সা দেওয়া বার করে দিচ্চি। রাখালবাবু আমাদের কুটুম, সে মনে রাখবেন ঘোষালমশাই।

ঘোষাল কহিল, আমি ব্রাহ্মণ। দু'বেলা সন্ধ্যা-আহ্নিক না করে জলগ্রহণ করিনে, দুটো মুক্তোর জন্যে কি-রকম অপমানটা দুপুরবেলায় আমাকে করলে চোখে দেখলেন ত। ব্যাটার ভাল হবে? মনেও করবেন না। সে-বেটী—যারে ছুঁলে নাইতে হয়, কিনা বামুনের ছেলের তেষ্টার জল নিয়ে আসে, টাকার গুমরটা কি রকম হয়েচে, একবার ভেবে দেখুন দেখি!

অপূর্ব এতক্ষণ একটা কথাতেও কথা যোগ করে নাই; সে হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, অনাথ আমি ফিরে চললুম ভাই, আমার ভারী তেষ্টা পেয়েচে।

ঘোষাল আশ্চর্য হইয়া কহিল, ফিরে কোথায় যাবেন? ঐ ত আমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, আপনি এদের নিয়ে যান, আমি যাচ্চি ঐ একাদশীর বাড়িতেই জল খেতে।

একাদশীর বাড়িতে জল খেতে! সকলেই চোখ কপালে তুলিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বিপিন তাহার হাত ধরিয়া একটা টান দিয়া বলিল, চল, চল—দুপুর রোদ্দুরে রাস্তার মাঝখানে আর ঢঙ্ করতে হবে না। তুমি সেই পাত্রই বটে! তুমি খাবে একাদশীর বোনের ছোঁয়া জল!

অপূর্ব হাত টানিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, সত্যিই আমি তার দেওয়া সেই জলটুকু খাবার জন্য ফিরে যাচ্ছি। তোমরা ঘোষালমশায়ের ওখান থেকে খেয়ে এস, ঐ গাছতলায় আমি অপেক্ষা করে থাকব।

তাহার শান্ত স্থির কণ্ঠস্বরে হতবুদ্ধি হইয়া ঘোষাল কহিল, এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় তা জানেন?

অনাথ কহিল, ক্ষেপে গেলে নাকি?

অপূর্ব কহিল, তা জানিনে? কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় সে তখন ধীরে-সুস্থে করা যাবে। কিন্তু এখন ত পারলাম না, বলিয়া সে এই খর-রৌদ্রের মধ্যে দ্রুতপদে একাদশীর বাড়ির উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

বৈকুণ্ঠের উইল

এক

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে বাবুগঞ্জের বৈকুণ্ঠ মজুমদারের মুদীর দোকান যখন অনেক প্রকার ঝড়ঝাপটা সহ্য করিয়াও টিকিয়া গেল, তখন অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিল। কারণ, কি করিয়া যে বৈকুণ্ঠ তাল সামলাইল তাহা কেহই জানে না। সেই অবধি দোকানখানি ধীরে ধীরে উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছিল।

আবার তেমন দুঃখ-কষ্ট আর যখন রহিল না, অথচ বৈকুণ্ঠ তাহার বড়ছেলে গোকুলকে ইস্কুল ছাড়াইয়া নিজের দোকানে ভর্তি করিয়া দিল, তখনও পাড়ার পাঁচজন কম আশ্চর্য বোধ করিল না। তাহারা বৈকুণ্ঠের আচরণ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিল, দেখলে বুড়োর ব্যবহার! না হয় ছেলেটির তেমন ধার নাই—এক বছর না হয় কেলাসে উঠতেই পারে নাই, তাই বলে এই কাজ! ওর মা বেঁচে থাকলে কি এরূপ করতে পারত! কৈ ছাড়িয়ে দিক দেখি ওর ছোটছেলে বিনোদকে! ছোটগিন্নী ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেবে।

বস্তুতঃ গোকুল ছেলেটি মেধাবী ছিল না। ক্লাসে সে কোনদিনই প্রায় ভাল পড়া বলিতে পারিত না। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, সে মুখখানি ম্লান করিয়া তাহার বিমাতার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বিমাতা তাহাকে কোলে টানিয়া সস্নেহে মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন. গোকুল, বেঁচে থাকতে গেলে এমন কতশত দুঃখ সইতে হয় বাবা! মনের কষ্ট যে ছেলে হাসিমুখে সহ্য করে আবার চেষ্টা করে, সে-ই ত ছেলের মত ছেলে। কেঁদ না বাবা, আবার মন দিয়ে পড়, আসচে বছর পাশ হবে।

ছোটছেলে বিনোদ লাফাইতে লাফাইতে বাড়ি আসিল। সে দাদার চেয়ে বছর-ছয়েক ছোট, তিন-চার ক্লাস নীচেও পড়ে; কিন্তু সে একেবারে প্রথম হইয়া ডবল প্রমোশন পাইয়াছে! পুত্রের সুসংবাদ শুনিয়া মা তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন এবং পুলকিত চিত্তে অসংখ্য আশীর্বাদ করিলেন।

সন্ধ্যার পর বৈকুণ্ঠ দোকানের কাজ সারিয়া খাতা বগলে ঘরে আসিয়া উভয় পুত্রের বিবরণ শুনিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। ছেলেদের ভার তাহাদের মায়ের উপর দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। হাত-পা ধুইয়া জল খাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ধীরেসুস্থে নিত্যনিয়মিত খাতা দেখিতে বসিয়া গেলেন।

দুই

আমার মা ভবানী কৈ গো? বলিয়া লাঠির গোটা-দুই ঠোকা দিয়া ইস্কুলের ষষ্ঠ শিক্ষক জয়লাল বাঁড়ুয্যে সেইদিন সন্ধ্যাকালেই বৈকুণ্ঠ মজুমদারের বাড়ির ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বৈকুণ্ঠের গোলদারি দোকানে চাল-ডাল-ঘি-তেল বাবদে অনেক টাকা বাকী ফেলিয়া গৃহিণীকে মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন।

ভবানী সন্ধ্যার কাজকর্ম সারিয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ছেলে-দুটিকে কোলের কাছে লইয়া বসিয়াছিলেন; শশব্যস্তে উঠিয়া আসন পাতিয়া দিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই উপবেশন করিয়াই শুরু করিয়া দিলেন, হাঁ, রত্নগর্ভা বটে মা তুমি! ছেলে পেটে ধরেছিলে বটে! এত ছোকরার মধ্যে তোমার বিনোদ একেবারে ফার্স্ট। একেবারে ডবল প্রমোশন। ওর নম্বর পাওয়া দেখে হেডমাস্টারমশাইয়ের পর্যন্ত তাক লেগে গেছে। আজ তাঁকেও গালে হাত দিয়ে দাঁড়াতে হয়েচে! আমিও ত মা, এই ছেলে চরিয়েই বুড়ো হলুম; কিন্তু তোমার এই বিনোদ ছেলেটির মত ছেলে কখনও চোখে দেখলুম না! আমি এই বলে যাচ্ছি আজ, ও ছেলে তোমার হাইকোর্টের জজ হবে—হবেই হবে।

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আর

এই গোক্‌লো! কিসে আর কিসে! এ ছোঁড়া এতবড় গাধার সন্দার মা, এক্‌জামিনের দিন আমিই ত ছিল্‌ম এদের পাহারায়—কত ছেলে টেবিলের নীচে দিব্যি বই খ্‌লে কাপি করে দিলে—ওরই ডাইনে-বাঁয়ে মল্লিকদের দ্‌ই ছেলে বই খ্‌লে লিখতে লাগল—আমি দেখেও দেখল্‌ম না—বরং হতভাগাটাকে চোখ টিপে একটা ইশারা পর্যন্ত করে দিল্‌ম, কিন্তু সেই যে বোদা বলদের মত হাত গ্‌টিয়ে বসে রইল, কোনদিকে চোখ পর্যন্ত ফেরালে না। নইলে আশ্‌ মল্লিকের ছেলে পাশ হয়, আর ও হতে পারে না! সত্যি কিনা, ওকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ দেখি মা। বলিয়া জয়লাল মাস্টার লাঠিটা তুলিয়া লইয়া সহসা গোকুলের প্রতি একটা খোঁচানোর ভঙ্গী করিয়াই আপাততঃ কোনমতে তাঁর অস্থি-মজ্জাগত ছেলে-ঠ্যাঙানোর প্রব্‌ত্তিটা শান্ত করিয়া লইলেন। কিন্তু গোকুল ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। নিমিষের মধ্যে ভবানী দ্‌ই বাহ্‌ বাড়াইয়া তাঁর এই সপত্নীপ্‌ত্রটিকে ব্‌কের কাছে টানিয়া লইলেন। গোকুলের মা নাই। মাকে তাহার মনেও পড়ে না। এই বিমাতার কাছেই সে মান্‌ষ হইয়াছে। আজই ইস্কুল হইতে ফিরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যখন সে তাঁহার কাছে আসিয়া পড়িল, তখন হইতে আর তাহাকে তিনি কাছছাড়া করেন নাই এবং এতক্ষণে তাঁহাদের চুপি চুপি এই সকল কথাই হইতেছিল। গোকুলের মাথায় ম্‌খে হাত ব্‌লাইয়া স্নেহার্দ্র ম্‌দ্‌কণ্ঠে বলিলেন, হাঁ বাবা, আর সব ছেলেরা বই দেখেছিল, তুমি শ্‌ধ্‌ কোনদিকে তাকিয়ে দেখও নি?

গোকুল কিছ্‌ই বলিতে পারিল না। নিজের অক্ষমতার ইহাও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ মনে করিয়া সে লজ্জায় একেবারে অধোবদন হইয়া গেল। কিন্তু কথাটা ঘরের মধ্যে বৈকুণ্ঠের কানে যাওয়ায় তিনি হিসাবের খাতা হইতে ম্‌খ তুলিয়া একেবারে কান খাড়া করিয়া রহিলেন।

ভবানী ম্‌দ্‌ হাসিয়া কহিলেন, এ বছর খ্‌ব মন দিয়ে পড়লে আসচে বছর ও-ও ফার্স্ট হতে পারবে।

বিমাতার এই স্নেহের কণ্ঠস্বর বাঁড়্‌য্যেমশাই চিনিতে পারিলেন না। সপত্নীপ্‌ত্রের প্রতি স্ত্রীলোকের বিদ্বেষ তাঁহার কাছে এমনি স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে কোথাও কোন ক্ষেত্রেই যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত পারে, সে কথাও তাঁহার মনে উদয় হইল না। ইহাকে একটা মৌখিক শিষ্টতামাত্র জ্ঞান করিয়া তিনি গোক্‌লোকে আরও তুচ্ছ করিয়া দেখাইবার অভি-প্রায়ে জিহ্বার দ্বারা তাল্‌তে একপ্রকার শব্দ উৎপাদন করিয়া বলিলেন, হায় হায়! গোক্‌লো হবে ফার্স্ট! প্‌বের স্‌য্যি উঠবে পশ্চিমে। যে ফার্স্ট হবে মা সে ঐ তোমার বাঁ-দিকে শ্‌নচে। বলিয়া তিনি অঙ্গ্‌লিসঙ্কেতে বিনোদকে নির্দেশ করিয়া হঠাৎ একট্‌খানি কাষ্ঠ-হাসির রসান দিয়া বলিলেন, তাই কি ছোঁড়ার লজ্জাশরম আছে! উলটে ছেলেদের সঙ্গে কোঁদল করছিল যে 'আমি পাশ হইনি বটে, কিন্তু আমার ছোটভাই যে সক্কলের প্রথম হয়েচে! তোদের কটা ভাই এমন ডবল প্রমোশন পেয়েচে বল্‌ ত রে!' শোন একবার কথা মা! ছোটভাই ফার্স্ট হয়েছে—কোথায় ও লজ্জায় মরে যাবে, না, ওর দেমাক দেখ!

ভবানী আর থাকিতে পারিলেন না, জোর করিয়া গোকুলকে টানিয়া লইয়া তাহার মাথাটা ব্‌কের উপর চাপিয়া ধরিলেন। গোকুল লজ্জায় মরিয়া গিয়া মায়ের ব্‌কে ম্‌খ ল্‌কাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গোকুল তাহার ছোটভাইটিকে যে কত ভালবাসিত তাহা তিনি জানিতেন।

বাঁড়্‌য্যেমশাই আরও গ্‌টিকয়েক বাছা বাছা কথা বলিয়া তাঁহার বিনোদকে এই সময় হইতেই যে বাটীতে উপয্‌ক্ত শিক্ষক নিয্‌ক্ত করিয়া পড়ান উচিত, ইহাই জানাইতে চাহিয়া-ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এইসময়ে পাশের ঘরের এক ঝলক আলো মাতা-প্‌ত্রের গায়ের উপর আসিয়া পড়ায় তাঁহার মনে যেন একট্‌ খটকা বাজিল। ভবানী যেমন করিয়া এই নির্বোধ সপত্নীপ্‌ত্রকে ব্‌কে লইয়া তাহার মাথায় হাত ব্‌লাইয়া দিতেছিলেন, তাহা ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত, তেমনটি নয় বলিয়াই তাঁহার সন্দেহ জন্মিল। স্‌তরাং এই তুলনাম্‌লক সমালোচনা সম্প্রতি আর অধিক ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা, তাহা ঠিক ঠাহর করিতে না পারায় তাঁহাকে অন্য কথা পাড়িতে হইল।

ভবানী এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই শ্‌নিতেছিলেন। এখনও বেশী কথা কহিলেন না। অবশেষে রাত্রি হইতেছে বলিয়া বাঁড়্‌য্যেমশাই বহ্‌প্রকার আশীর্বচন উচ্চারণ করিয়া এবং

ভবিষ্যতে বিনোদের জজিয়তি-প্রাপ্তির সম্ভাবনা বারংবার নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিয়া লাঠিটি হাতে করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ঘরের মধ্যে বসিয়া বৈকুণ্ঠ ঠিক যেন এই সময়টির জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। সম্মুখে আসিয়া কঠোরভাবে প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে গোকুলো, সবাই বই দেখে লিখে পাশ করে গেল, তুই লিখলি না কেন?

গোকুল ভয়ে কাঁটা হইয়া পূর্ব্ববৎ লুকাইয়া রহিল। অনেক ধমক-টমকের পর সে যাহা কহিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বাহ্ণেই হেডমাস্টার মহাশয় আসিয়া চুরি করিয়া দেখা-দেখি করিয়া লিখিতে নিষেধ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কি যেন চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, কাল থেকে আর তোকে ইস্কুলে যেতে হবে না, আমার সঙ্গে দোকানে যাবি। বলিয়া ঘরে ফিরিয়া গিয়া নিজের কাজে মন দিলেন। ইহা একটা মামুলি শাসনমাত্র মনে করিয়া ভবানী তখন কথা কহিলেন না। কিন্তু পরদিন সকালবেলা বৈকুণ্ঠ যখন সত্য সত্যই গোকুলকে দোকানে লইয়া যাইতে চাহিলেন, তখন তিনি আগুন হইয়া উঠিয়া ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিলেন, যে কথা নয়, সেই কথা! দুধের ছেলে যাবে তোমার দোকান করতে? সে হবে না—আমি বেঁচে থাকতে আমার গোকুলকে পড়া ছাড়াতে দেব না। এমন রাগ ত দেখিনি! বলিয়া গৃহিণী ক্রোধভরে ছেলেকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, বৈকুণ্ঠ ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, কে রাগ করেছে ছোটবৌ?

গৃহিণী কহিলেন, তুমি। আবার কে?

আমাকে রাগ করতে কখনও দেখেছ?

এ তবে তোমার কি-রকম কথা শুনি? ছেলেবেলা পাশ-ফেল সবাই হয়। তাই বলে ইস্কুল ছাড়িয়ে দেবে?

বৈকুণ্ঠ তখন গোকুলকে অন্যত্র পাঠাইযা দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, ছোটবৌ, রাগ আমি করিনি। তোমার বড়ছেলেকে আজ বড় আহ্লাদ করেই আমি দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। ছোট-ছেলে তোমার কখনও জজিয়তি পাবে কিনা, বাঁড়ুয্যেমশায়ের মত সে ভরসা তোমাকে দিতে পারলুম না; কিন্তু আমার অবর্তমানে গোকুলের ওপর যে তোমরা নির্ভয়ে ভর দিতে পারবে, সে আমি তোমাকে নিশ্চয় বলে দিচ্ছি।

স্বামীর অবিদ্যমানতার কথায় ভবানীর চোখের কোণ একমুহূর্তেই আর্দ্র হইয়া উঠিল। বলিলেন, সে আমি জানি। কিন্তু গোকুল যে বড্ড সোজা মানুষ—ও কি তোমার ব্যবসার ঘোরপ্যাঁচই বুঝতে পারবে? ওকে হয়ত সবাই ঠকিয়ে নেবে।

বৈকুণ্ঠ হাসিয়া কহিলেন, সবাই ঠকাবে না। তবে কেউ কেউ ঠকিয়ে নেবে, সে কথা সত্যি। তা নিক, কিন্তু ও ত কারুকে ঠকাবে না? তা হলেই হবে। মা-লক্ষ্মী ওর হাতে আপনি এসে ধরা দেবেন। বলিতে বলিতে বৈকুণ্ঠর নিজের চোখও সজল হইয়া উঠিল। তিনি নিজেও খাঁটি লোক কিন্তু মূলধনের অভাবে অনেকদিন অনেক কষ্টই ভোগ করিয়াছেন। এখন যদি বা কিছু সংগ্রহ হইয়াছে, কিন্তু সময়ও ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে শক্তি-সামর্থ্যও আর নাই। তাড়াতাড়ি চোখের উপর হাতটা বুলাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিলেন, গিন্নী, এই বয়সে গোকুল যত বড় লোভ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেচে, সে যে কত শক্ত, তা তুমি হয়ত বুঝতে পারবে না। যে এ পারে, তার ত ব্যবসার ঘোরপ্যাঁচ চৌদ্দ আনা শেখা হয়ে গেছে। শুধু বাকী দুটো আনা আমি তাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

কিন্তু লোকে কি বলবে?

লোকের কথা ত জানিনে ছোটবৌ। আমি শুধু আমাদের কথাই জানি। আমি জানি, ওর হাতে তোমাদের সঁপে দিয়ে আমি নির্ভয়ে দুচক্ষু বুজতে পারব।

ভবানী নিজেও কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁর স্বামীর স্বাস্থ্য যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তাঁর শেষ কথায় একটা আসন্ন বিপদের বার্তা অনুভব করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আচ্ছা নিয়ে যাও। বলিয়া নিজে গিয়া গোকুলকে ডাকিয়া আনিয়া স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিলেন। তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, ওঁর সঙ্গে দোকানে যাও বাবা! তুমি মানুষ হলেই তবে আমরা দাঁড়াতে পারব।

গোকুল পিতামাতার মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে বেচারা কাল রাত্রেই

বিছানায় শুইয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ বৎসর যেমন করিয়া হোক উত্তীর্ণ হইবেই। ইস্কুল ছাড়িয়া দোকান যাইতে কোন ছেলেই গৌরব বোধ করে না; কিন্তু কোনদিনই সে মায়ের অবাধ্য নহে। সহপাঠীদের বিদ্রুপের খোঁচা তাহার মনে বাজিতে লাগিল, কিন্তু সে কোন আপত্তি করিল না, নিঃশব্দে পিতার অনুসরণ করিল।

তিন

দশ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, জরাগ্রস্ত বৈকুণ্ঠ নিজেও মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু গোকুলের সম্বন্ধে সে ভুল করে নাই, তাহা তাহার বাড়িটার পানে চাহিলেই বুঝা যায়। গঞ্জের ভিতর সে মুদীর দোকান আর নাই। তাহার পরিবর্তে প্রকাণ্ড গোলদারি দোকান। সেখানে লাখো টাকার কারবার চলিতেছে। বিনোদ কলিকাতায় থাকিয়া এম. এ. পড়ে। বৈকুণ্ঠ নাতি-নাতনীর মুখ দেখিয়া পরম সুখে মরিতে পারিত, কিন্তু কিছুদিন হইতে ছোটছেলের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসিত জনশ্রুতিতে তাহার অবশিষ্ট দিনগুলা বড় ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন সকালে বৈকুণ্ঠ জীবনের শেষ ডাক শুনিতে পাইলেন। সর্বাঙ্গে কি একপ্রকার নূতন অস্বস্তি লইয়া জাগিয়া উঠিয়া গৃহিণীকে শয্যাপার্শ্বে ডাকিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ছোটবৌ, আমার ত সময় হয়েছে, তাই একটু এগিয়ে চললুম। তোমার যতদিন না আসা হয় ততদিন আমার ছেলে দু'টিকে দেখো। তোমার হাতেই তাদের দিয়ে গেলুম।

স্বামীর শীর্ণ হাতখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া ভবানী নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, গোকুলকে রেখে তার মা মারা গেলে—আমার কিছুতেই আর দ্বিতীয় সংসার করবার ইচ্ছা ছিল না। আমি কোন মতেই বিয়ে করতুম না; কিন্তু যখন দেখলুম আমি একা, গোকুলকেই হয়ত বাঁচাতে পারব না, তখনই শুধু বড় কষ্টে, বড় ভয়ে ভয়ে রাজী হয়েছিলুম। ভগবান আমার মনের কথা জানতে পেরেছিলেন; তাই এমন স্ত্রী দিলেন যে, কোনদিন কোন দুঃখ পাইনি। শুধু বিনোদ যদি আমার শেষকালটায় এত দুঃখ না দিত, তা হলে কত সুখেই না আজ যেতে পারতুম। বলিতে বলিতেই তাঁহার ম্লান চক্ষুদুটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। ভবানী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, আমি মরতেও পারচি নে ছোটবৌ, আমার অবর্তমানে আমার এত কষ্টের দোকানটি বিনোদ হাতে পেয়ে দু'দিনে নষ্ট করে ফেলবে। এ শোক আমি পরকালে বসেও সহ্য করতে পারব না—সেখানেও আমার বুকে শেল বাজবে।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুধু কি তাই? তোমার দাঁড়াবার স্থান থাকবে না—আমার গোকুলকেও হয়ত ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসতে হবে, বলিতে বলিতেই বৈকুণ্ঠ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন। এরূপ দুর্ঘটনার কল্পনামাত্রেই তাঁহার বক্ষস্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল। ভবানী তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখের উপর মুখ আনিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, ওগো, বিনোদকে তুমি কিছুই দিয়ে যেও না। তোমার গায়ের রক্ত-জল-করা জিনিস আমি কারুকে দেব না। দোকান, ঘর, বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত তুমি গোকুলকে লিখে দিয়ে যাও। তুমি শান্ত হও—নিশ্চিন্ত হও—আমি নিজে তার সাক্ষী হয়ে থাকব।

বৈকুণ্ঠ কিছুক্ষণ স্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেবল এই কথাই আমি দিবারাত্রি ভাবচি ছোটবৌ, আমি ভগবানকে পর্যন্ত মন দিয়ে ডাকতে পারচি নে! কিন্তু তুমি কি এতে মত দিতে পারবে? বলিয়া বৈকুণ্ঠ হতাশভাবে আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল। তিনি মরণোন্মুখ স্বামীর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুজড়িত-কণ্ঠে কহিলেন, ওগো, আমি মত দিতে পারব। তোমাকে ছুঁয়ে বলচি পারব। আমি আর কিছুই চাইনে, শুধু চাই, তুমি নিশ্চিন্ত হও—সুস্থ হও। এ সময়ে তোমার মনে যেন কোন ক্ষোভ, কোন ক্লেশ না থাকতে পায়।

বৈকুণ্ঠ আবার কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, কিন্তু বিনোদ?

ভবানী নিমিষমাত্র দেরী না করিয়া কহিলেন, তার কথা তুমি ভেবো না। সে লেখাপড়া শিখচে—নিজের পথ সে নিজে করে নেবে। আর যত মন্দই হোক—গোকুল তাকে ফেলতে পারবে না—ছোটভাইকে সে দেখবেই।

বৈকুণ্ঠ আর কথা কহিলেন না। একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ভবানী সেইখানে একভাবে পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিলেন, নিদারুণ অভিমানে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার গর্ভের সন্তানকে স্বামী বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মন্দ বলিয়া মৃত্যুকালে পুত্রের ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহিলেন, এ দুঃখ তাঁহার বক্ষে যে কি শূলবিদ্ধ করিল, তাহা তিনি একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। সে মন্দ হোক, যা হোক, তিনি ত মা? সে ত তাঁহারই সন্তান? সেই দুর্ভাগ্য সন্তানের অন্ধকার-ভবিষ্যৎ চোখের উপর সুস্পষ্ট দেখিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয় এইবার মাথা কুটিয়া কুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু পিছাইয়া পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় কোনদিকে চাহিয়া চোখে পড়িল না। মুমূর্ষু স্বামীর তৃপ্তির জন্য সন্তানের সর্বনাশের পথ যখন নিজেই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে দেখাইয়া দিয়াছেন, তখন কে তাঁহার মুখ চাহিয়া সে পথ যাচিয়া রুদ্ধ করিয়া দিতে আসিবে?

সেইদিনই অপরাহ্নকালে উকিল ডাকিয়া রীতিমত উইল লেখা হইয়া গেল। বৈকুণ্ঠ স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার বড়ছেলেকে লিখিয়া দিলেন। সাক্ষী হইয়া নাম লিখিতে গিয়া ভবানীর হাত কাঁপিয়া গেল। মাতৃস্নেহ কোথায় অলক্ষ্যে বসিয়া বারংবার তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিতে লাগিল, কিন্তু নিবৃত্ত করিতে পারিল না। স্বামীর পা দুইখানি অন্তরের মধ্যে দৃঢ়-স্থাপিত করিয়া তিনি আঁকাবাঁকা অক্ষরে নিজের নাম সই করিয়া দিলেন। বিনোদ কোন কথাই জানিল না। সে তখন কলিকাতার এক অপবিত্র পল্লীতে, ততোধিক অপবিত্র সংসর্গে মদ খাইয়া মাতাল হইয়া রহিল। বাটী হইতে যে দুইজন কর্মচারী তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, তাহারা দুইদিন পর্যন্ত তাহার বাসায় বৃথা অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিল। কেহই এ সংবাদ বৈকুণ্ঠকে দিতে সাহস করিল না। তিনিও এ সম্বন্ধে কাহাকেও কোন প্রশ্ন করিলেন না। কিন্তু কিছুই তাঁহার কাছে চাপা রহিল না।

আরও দিন-দুই টালে-বেটালে কাটিয়া আজ সকাল হইতেই তাঁহার শ্বাসকষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল। সমস্তদিন আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি চোখ মেলিলেন। ভবানী শিয়রের কাছে বসিয়াছিলেন, গোকুল পদতলে বসিয়া কাঁদিতেছিল। বৈকুণ্ঠ ইঙ্গিতে তাহাকে আরও কাছে আসিতে বলিয়া অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, বিনোদ বুঝি খবর পেলে না গোকুল? নইলে সে নিশ্চয় আসত। বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখের কোণ বাহিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। এই কয়দিনের মধ্যে তিনি বিনোদের নাম একটিবারও মুখে আনেন নাই। সহসা শেষ সময়ে ছেলের নাম স্বামীর মুখে শুনিয়া ধিক্কারে বেদনায় ভবানীর বুক ফাটিয়া গেল, কিন্তু তিনি তেমনি নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

গোকুল পিতার চোখ মুছাইয়া দিলে তিনি বলিলেন, চোখে তাকে দেখতে পেলুম না, কিন্তু তাকে বলিস আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, একদিন সে ভাল হবে। এমন মায়ের পেটে জন্মে কখনো এভাবে চিরকাল কাটাতে পারবে না। দেখিস বাবা, সেদিন তোর ছোটভাইকে যেন ফেলিস নে। আর এই তোমার মা রইলেন—অনেক তপস্যায় তবে এমন মা মেলে গোকুল!

গোকুল শিশুর মত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, বাবা, আমার মা আমারই রইলেন, কিন্তু বিনোদকে আপনি অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে যান।

বৈকুণ্ঠ কহিলেন, না গোকুল, আমার অনেক দুঃখের সম্পত্তি—এ নষ্ট হতে দেখলে পরকালে বসেও আমার বুকে শেল বাজবে। এ আমি কিছুতেই সইতে পারব না। বলিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছেলের মুখের পানে চাহিয়া, বোধ করি বা মনে মনে তাঁহার শেষ আশীর্বাদ করিয়া চোখ বুজিলেন। গোকুল পায়ের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠ ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া শুধু চুপি চুপি বলিলেন, ছেলেরা রইল ছোটবৌ, আমি এবার চললুম।

আর কথা কহিলেন না। এবং পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণ বাহির

হইয়া গেল। তখন অনেকেই অনেক কথা কহিল। বৈকুণ্ঠ পাকা ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু খাঁটি লোক ছিলেন। বিশেষতঃ অত্যন্ত দীন অবস্থা হইতে বড় হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া শত্রুমিত্র দুই-ই তাঁর একটু বেশী পরিমাণে ছিল। মিত্রপক্ষের গুণগান অত্যুক্তিকে ছাড়াইয়া গেল। আবার শত্রুপক্ষেরা নিন্দা করিতেও ত্রুটি করিল না। তাহারা কৃপণ বলিয়া, চশমখোর বলিয়া, বৈকুণ্ঠ মুদীর স্ফীত অঙ্গুলির সহিত কদলী-কাণ্ডের উপমা দিয়া বোধ করি বেশ একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। তবে এই একটা অতি তুচ্ছ গুণের কথা তাহারাও অস্বীকার করিল না যে, আর যাই হোক লোকটা জোচ্চোর বাটপাড় ছিল না। নিজের ন্যায্য পাওনার বেশী কাহাকেও কোনদিন একটি তামার পয়সাও ফাঁকি দেয় নাই। বস্তুতঃ ব্যবসা সম্বন্ধে এই বিদ্যাটিই তিনি বিশেষ করিয়া তাঁর বড়ছেলেকে শিখাইয়া গিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠ বার বার বলিতেন, গোকুল, আমার এই কথাটি কোনদিন ভুলিস নে বাবা যে, ঠকিয়ে কখনো মহাজনকে মারা যায় না। তাতে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই মরতে হয়।

নিজের পলিত মস্তকটি দেখাইয়া বলিতেন, এই মাথাটার উপর দিয়ে অনেক ঝড়বৃষ্টি বয়ে গেছে গোকুল, অনেক দুঃখকষ্ট পেয়েচি, কিন্তু এর জোরে কখনো কারো কাছে মাথা হেঁট করিনি। আমার এই মর্যাদাটুকু বজায় রাখিস বাবা!

চার

বিনোদ বিষয় পায় নাই, কথাটা প্রকাশ পাইবামাত্র পাড়ার দুই-চারিজন গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কলিকাতায় গিয়া খোঁজাখুঁজি শুরু করিয়া দিল। তখন আর কোন কথাই চাপা রহিল না। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বিনোদের ব্যাপার নাম-ধাম পরিচয় দিয়া একেবারে প্রকাশ করিয়া দিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অকৃতজ্ঞ গোকুল তাহাদের এই উপকার স্বীকার করিল না। সে রাগের মাথায় একেবারে ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল, শালারা সব মিথ্যেবাদী। কেবল হিংসে করে এই সব রটাচ্চে।

অতিবৃদ্ধ বাঁড়ুয্যেমশাই লাঠি ঠকঠক করিয়া আসিয়াই একেবারে কাঁদিতে শুরু করিয়া দিলেন। অনেক কষ্টে কান্না থামিলে বলিলেন, গোকুল রে, আমার হারাণ তিনদিন তিনরাত্রি খায়নি শোয়নি, কেবল কলকাতার গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়িয়েচে। পঁচিশ-ত্রিশ টাকা খরচ করে তবে সন্ধান পেয়েচে, কোথায় সে ছোঁড়া থাকে। এ ঠিকানা বার করা আর কি কারো সাধ্য ছিল?

গোকুল তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল, আমি ত কাউকে টাকা খরচ করতে সাধিনি মশাই!

বাঁড়ুয্যে অবাক হইয়া কহিলেন, সে কি গোকুল, আমরা যে তোমাদের আপনার লোক' আর সবাই চুপ করে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা পারি কৈ?

আচ্ছা, যান যান, আপনারা কাজে যান। বলিয়া গোকুল নিতান্ত অভদ্রভাবে অন্যত্র চলিয়া গেল। একদিন দুইদিন করিয়া কাটিতে লাগিল, অথচ বিনোদ আসে না। শান্তপ্রকৃতি গোকুল একেবারে উগ্র হইয়া উঠিল।

ভবানীকে দেখিলে যেন চেনা যায় না, এই কয়দিনে তাঁহার এমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নীরবে নতমুখে আগামী শ্রাদ্ধের কাজকর্ম করেন—ছেলের নাম মুখেও আনেন না।

এই একটা বৎসর বিনোদ যখন তখন নানা ছলে গোকুলের নিকট টাকা আদায় করিত। তাহার স্ত্রী মনোরমা ব্যাপারটা পূর্বেই অনুমান করিয়া স্বামীকে বারংবার সতর্ক করা সত্ত্বেও সে কান দেয় নাই। এই উল্লেখ আজ সকালে করিবামাত্রই গোকুল আগুন হইয়া কহিল, বিনোদ যখন কারুর বাপের বাড়ির টাকা নষ্ট করবে, তখন যেন তারা কথা কয়। বলিয়া দ্রুতপদে তাহার বিমাতার ঘরের সুমুখে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, অতবড় রাবণ রাজা মেয়েমানুষের পরামর্শে সবংশে ধ্বংস হয়ে গেল, তা আমরা কোন্ ছার! কি যে বাবার কানে কানে ফুস্ ফুস্ করে উইল করার মন্তর দিলে মা, সবদিকে আমাকে মাটি করে দিলে।

ভবানী আশ্চর্য হইয়া মুখ তুলিবামাত্রই সে হাত-পা নাড়িয়া একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গী করিয়া বলিয়া ফেলিল, তোমাকে ভালমানুষ বলেই জানতুম মা, তুমিও কম নয়! মেয়েমানুষের জাতটাই এম্‌নি! বলিয়া, তাঁহাকে 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছিল,

তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। একে দোকানদার তাহাতে মূর্খ, গোকুলের কথাই এমনি সকলেই জানিত। বিশেষতঃ রাগিলে আর তাহার মুখে বাধা বাঁধন থাকিত না। ইহাও কাহারো অগোচর ছিল না। কিন্তু তাহার আজকালকার কথাবার্তাগুলো বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইতেছে বলিয়া আত্মীয়-পর সকলেরই মনে হইতে লাগিল।

অপরাহ্ণবেলায় বাঁড়ুয্যেমশাই দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া হাত-মুখ ধুইতেছিল—হঠাৎ গোকুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন অপমান করিলেও ত সে বড়লোক। সুতরাং তাহার আগমনে বৃদ্ধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। গোকুল তিনখানি নোট ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া ম্লানমুখে. বিনীতকণ্ঠে বলিল, মাস্টারমশাই, হারাণের সেদিনকার খরচাটা দিতে এলুম।

থাক থাক. সেজন্যে আর ব্যস্ত কেন দাদা, তোমাদের কতই ত খাচ্চি নিচ্চি। বলিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই সে নোট তিনখানি তুলিয়া লইলেন। গোকুলের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয়ের প্রান্তে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কৈ আজও ত বিনোদ এলো না মাস্টার-মশাই! হারাণকে সঙ্গে করে আমি একবার আজ যাব।

বাঁড়ুয্যেমশাই তীব্রভাবে সর্বাঙ্গ আন্দোলিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি, এমন কথা মুখেও এনো না ভাই। সে স্থানে যাবে তুমি, আমার হারাণ থাকতে? না না. তা হবে না—আমি কালই তাকে পাঠিয়ে দেব।

গোকুল মাথা নাড়িয়া কহিল, না মাস্টারমশাই, আমি না গেলে হবে না। সে বড় অভিমানী—শুধু উইলের কথা শুনেই অভিমানে আসচে না। আমার মুখ থেকে না শুনলে সে আর কারো কথাই বিশ্বাস করবে না। বাপ-মায়ে আমার কি সর্বনাশই করলে! বলিয়া গোকুল সহসা আর্তস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। বাঁড়ুয্যেমশাই তাহাকে অনেক প্রকার সান্ত্বনা দিয়া এবং তাহার এ-অবস্থায় কোনমতেই সে স্থানে যাওয়া হইতে পারে না বলিয়া, কালই হারাণের দ্বারা তাহাকে আনাইয়া দিবেন, বার বার প্রতিজ্ঞা করিলেন। গোকুল নিরুপায় হইয়া আর পাঁচখানি নোট হারাণের খরচের বাবদ ধরিয়া দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বাটী ফিরিয়া গেল।

পাঁচ

জয়লাল মাস্টারকে গোকুল গোপনে আশী টাকা ঘুষ দিয়া আসিয়াছে—কথাটা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত অনেকেই তাহার নির্বুদ্ধিতা লক্ষ্য করিয়া কটাক্ষ করিয়াছে। সে বিনোদের জন্য ছটফট করিতেছে, অথচ বিনোদ তাহাকে ভ্রূক্ষেপের দ্বারাও গ্রাহ্য করে না—এমনধারা একটা আভাসও বাড়িসুদ্ধ সকলের চোখে-মুখে অনুভব করিয়া গোকুল মনে মনে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

বাড়ির গাড়ি বোধ করি এই লইয়া দশবার চুঁচুড়া স্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল। গোকুল তাচ্ছিল্যভাবে কোচম্যানকে প্রশ্ন করিল, আর কি কলকাতার গাড়ি নেই যে তোরা ফিরে এলি? যা, যা, তোরা জিরো গে যা।

কোচম্যান বিনীতভাবে কহিল. আরো দুখানা আছে বটে, কিন্তু ঘোড়া দানাপানি পায় নাই বলেই চলে আসতে হ'লো।

গোকুল একমিনিটেই সপ্তমে চড়িয়া ধমকাইয়া উঠিল, ছোটবাবু মেঠাই-মণ্ডা খায়কে আসতা হ্যায় কিনা. তাই ব্যাটাদের নবাব ঘোড়া একদণ্ড দানাপানি না পেলেই মরে যাবে! যাও, আভি লে যাও।

কোচম্যান প্রভুর মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া সভয়ে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

রসিক চক্রবর্তী বহুদিনের কর্মচারী। এ বাটীতে সকলেই তাহাকে সম্মান করিত। সে কহিল, ছোটবাবু এলে গাড়ি ভাড়া করেও আসতে পারবেন। সেজন্য কেন আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন বড়বাবু?

রসিক যে নিকটেই ছিল, গোকুল তাহা দেখে নাই। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, আমি ব্যস্ত হব সে হতভাগার জন্যে? তুমি বল কি চক্কোত্তিমশাই? বাড়িতে মেয়েরা অমন দিবারাত্রি

কান্নাকাটি না করলে আমি ত তাকে বাড়ি ঢুকতেই দিইনে। গোকুল মজুমদার রাগলে বাপের কুপুত্তুর—হ্যাঁ।

রসিকের কিছুই অবিদিত ছিল না। বাটীর মেয়েরা যে বিনোদের অদর্শনে একটি দিনের জন্যেও চোখের জল ফেলে নাই, তাহা সে জানিত। কিন্তু এ লইয়া আর তর্কও করিল না।

সমারোহ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধ হইবে। গোকুল সেজন্য বড় ব্যস্ত। কিন্তু কান দুটা তাহার গাড়ির চাকার দিকেই পড়িয়া ছিল। ঘণ্টা-দুই পরে সে বহুদূরে একটা ভারী গাড়ির আওয়াজ পাইয়া রসিক চক্রবর্তীকে শুনাইয়া একটা চাকরকে ডাকিয়া কহিল, ওরে এগিয়ে দেখত রে, আমাদের গাড়ি কিনা! ঘোড়া দুটোকে হয়রান করে মারলে বলে রাগ করে দুটো কথা বললুম, আর বেটারা কিনা সত্যি মনে করে গাড়ি নিয়ে ইস্টিসানে ফিরে গেল! গুণধর ভায়ের জন্য আবার গাড়ি পাঠাতে হবে! সৎমার রাগ হবে বলে ত আর ঘোড়া দুটোকে ফেলা যায় না!

রসিক শুনিতে পাইল, কিন্তু ভালোমন্দ কোন কথাই কহিল না। অনতিকাল পরে খালি গাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আস্তাবলে চলিয়া গেল। চাকর আসিয়া সংবাদ দিল। রসিক সম্মুখে ছিল। গোকুল তাহার পানে চাহিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, তবে ত দুঃখে মরে গেলুম। যা, যা, বাড়িতে গিয়ে গিন্নীকে বল গে, তার পাশ-করা ছেলের কীর্তি! কাল-পরশু এলে যদি তাকে ফটক পার হতে দিই ত তখন তোরা বলিস—হাঁ, সে ছেলে গোকুল মজুমদার নয়। একবার যখন বেঁকে বসেছি, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসেও যদি তার হয়ে বলে, তবুও মুখ পাবে না তা বলে দিচ্ছি। তুমি মাকে বলে দাও গে চক্কোত্তিমশাই পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাবে তবু গোকুল মজুমদারের কথার নড়চড় হবে না। সময়ে এলে কিছু পেত; এখন আর একটি পয়সাও না। বাড়ি ঢুকতেই ত তাকে দেব না। বলিয়া গোকুল হনহন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গোকুল কাহার উপরে ক্রোধ করিয়া যে অসময়ে আসিয়া সন্ধ্যার পরেই শয্যা গ্রহণ করিল, তাহা বাটীর মেয়েরা টের পাইল না। দাসী দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল। দোকানের গোমস্তার উপর অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দ প্রস্তুতের ভার ছিল। সে ঘরে আসিয়া কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই গোকুল তড়াক করিয়া উঠিয়া কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বাবা দশখানা তালুক রেখে যাননি যে, রাজা-রাজড়ার মত পণ্ডিত-বিদায় করতে হবে! যাও যাও, ওসব আমিরী চাল আমার কাছে খাটবে না।

লোকটা যারপরনাই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

ভবানী জানিতে পারিয়া ঘরের বাহিরে চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিলেন। সস্নেহে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কি কোনরকম অসুখ বোধ হচ্ছে গোকুল?

গোকুল যেমন শুইয়া ছিল, তেমনিভাবে জবাব দিল, না।

ভবানী বলিলেন, না, তবে যে কিছু খেলিনে, হঠাৎ এমন সময়ে এসে যে শুয়ে পড়লি?

গোকুল কহিল, পড়লুম।

ভবানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলি যে? কাল সকালেই নিমন্ত্রণপত্র না পাঠালে আর সময় হবে না বাবা।

গোকুল ঠিক তেমনি করিয়া জবাব দিল, না হয় নাই হবে।

ভবানী কিছু বিস্মিত কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, ছি গোকুল, এ সময়ে ও-রকম অধীর হলে ত হবে না। কি হয়েচে আমাকে খুলে বল্—আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

মায়ের কথার উত্তরে গোকুল তাহার কম্বলের শয্যা ত্যাগ করিয়া চোখ পাকাইয়া উঠিয়া বসিল। কাহার সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, সে কোনদিন শিক্ষা করে নাই। কর্কশ-কণ্ঠে কহিল, তোমার যে মতলব শোনে মা, সে একটা গাধা। বাবা তোমার কথা শুনত বলে কি আমিও শুনব? আমি দশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে শুদ্ধ হব, কোন জাঁকজমক করব না। বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভবানী শান্তস্বরে কহিলেন, ছি বাবা, তিনি স্বর্গে গেছেন—তাঁর সম্বন্ধে কি এমন করে কথা কইতে আছে!

গোকুল জবাব দিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, এ রকম করলে লোকে কি বলবে বল দেখি বাছা! যাদের যেমন সঙ্গতি, তাদের তেমনি কাজ করতে হয়, না করলেই অখ্যাতি রটে।

গোকুল তেমনিভাবে থাকিয়াই কহিল, রটাক গে শালারা। আমি কারো ধার ধারিনি যে ভয়ে মরে যাব।

ভবানী বলিলেন, কিন্তু তাঁর এতে তৃপ্তি হবে কেন? তিনি যে এত বিষয়-আশয় রেখে গেলেন, তাঁর মত কাজ না করলে তিনি সুখী হবেন না।

ভবানী ইচ্ছা করিয়াই গোকুলের বড় ব্যথার স্থানে ঘা দিলেন। পিতাকে সে যে কি ভালবাসিত তাহা তিনি জানিতেন।

গোকুল উঠিয়া বসিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, খরচের কথা কে বলচে মা। যত ইচ্ছে তোমরা খরচ কর; কিন্তু যত দিন যাচ্চে ততই যে আমার হাত-পা বন্ধ হয়ে আসচে। বিনোদ অভিমান করে উদাসীন হয়ে গেল মা, আমি একলা কি করে কি করব? বলিয়া সে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভবানী নিজেকেও আর সামলাইতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন, অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে আঁচলে চোখ মুছিয়া অশ্রুজড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি এ খবর পেয়েচে গোকুল?

গোকুল তৎক্ষণাৎ কহিল, পেয়েচে বৈ কি মা।

কে তাকে খবর দিল?

কে যে তাহাকে বাড়ির এই দুঃসংবাদ দিয়াছে, গোকুল নিজেও তাহা জানিত না। মাস্টারমশায়ের পুত্র হারাণের সম্বন্ধে তাহার নিজেরও সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তথাপি কেমন করিয়া যেন নিঃসংশয়ে বুঝিয়া বসিয়াছিল—বিনোদ সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই শুধু লজ্জা ও অভিমানেই বাড়ি আসিতেছে না। সে মায়ের মুখপানে চাহিয়া কহিল, খবর সে পেয়েচে মা। বাবা চিরকালের মত চলে গেলেন—এ কি সে টের পায়নি? আমার মত তার বুকের ভেতরেও কি হাহা করে আগুন জ্বলে যাচ্ছে না? সে সব জেনেচে মা, সব জেনেচে।

ভবানী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অবশেষে যখন কথা কহিলেন, গোকুল আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিল—মায়ের সেই অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠস্বর আর নাই। কিন্তু তাহাতে উত্তাপও ছিল না। সহজকণ্ঠে বলিলেন, গোকুল, তাই যদি সত্যি হয় বাবা, তবে অমন ভায়ের জন্যে তুই আর দুঃখ করিস নে। মনে কর, আমাদের বংশে আর ছেলেপিলে নেই। যে রাগের বশে মরা বাপ-মায়ের শেষ-কাজ করতেও বাড়ি আসে না, তার সঙ্গে আমাদেরও কোন সম্পর্ক নেই।

গোকুল এ অভিযোগের যে কি জবাব দিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু জবাব দিল তাহার স্ত্রী। সে দ্বারের আড়ালে বসিয়া সমস্ত আলোচনাই শুনিতেছিল। সেইখান হইতেই বেশ স্পষ্ট গলায় কহিল, ঠাকুর কি না বুঝেই এমন একটা কাজ করে গেলেন? তিনি ছিলেন অন্তর্যামী। তিন-চারদিন ধরে কলকাতার বাসায় ঠাকুরপোকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখনই ত তিনি তাঁর গুণগান সব ধরে ফেললেন। তাঁর বিষয় তিনি যদি সমস্ত দিয়ে যান, তাতে আমাদের কেউ ত আর দোষ দিতে পারবে না। তুমি যাই, তাই ভাই ভাই কর, আর কেউ হলে—

টানটা অসমাপ্তই রহিল। আর কেহ কি করিত তাহা খুলিয়া বলা এ ক্ষেত্রে বড়বৌ বাহুল্য মনে করিল। কিন্তু ভবানী মনে মনে ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কারণ ইতিপূর্বে শ্বশুর বর্তমানে বড়বৌ এরূপ কথা কোনদিন বলে নাই, এমন কি শ্বাশুড়ীর সামনে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথাই কহে নাই। এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উন্নতিতে তিনি নির্বাক হইয়া রহিলেন।

গোকুলও প্রথমটা কেমন-যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার দিকে ডান হাত প্রসারিত করিয়া ভবানীর মুখের পানে চাহিয়া একেবারে ক্ষ্যাপার মত চেঁচাইয়া উঠিল, শোন মা, শোন। ছোটলোকের মেয়ের কথা শোন।

কান্নাকাটি না করলে আমি ত তাকে বাড়ি ঢুকতেই দিইনে। গোকুল মজুমদার রাগলে বাপের কুপুত্তুর—হ্যাঁ।

রসিকের কিছুই অবিদিত ছিল না। বাটীর মেয়েরা যে বিনোদের অদর্শনে একটি দিনের জন্যেও চোখের জল ফেলে নাই, তাহা সে জানিত। কিন্তু এ লইয়া আর তর্কও করিল না।

সমারোহ করিয়া বাপের শ্রাদ্ধ হইবে। গোকুল সেজন্য বড় ব্যস্ত। কিন্তু কান দুটা তাহার গাড়ির চাকার দিকেই পড়িয়া ছিল। ঘণ্টা-দুই পরে সে বহুদূরে একটা ভারী গাড়ির আওয়াজ পাইয়া রসিক চক্রবর্তীকে শুনাইয়া একটা চাকরকে ডাকিয়া কহিল, ওরে এগিয়ে দেখত রে, আমাদের গাড়ি কিনা! ঘোড়া দুটোকে হয়রান করে মারলে বলে রাগ করে দুটো কথা বললুম, আর বেটারা কিনা সত্যি মনে করে গাড়ি নিয়ে ইস্টিসানে ফিরে গেল! গুণধর ভায়ের জন্য আবার গাড়ি পাঠাতে হবে! সৎমার রাগ হবে বলে ত আর ঘোড়া দুটোকে ফেলা যায় না!

রসিক শুনিতে পাইল, কিন্তু ভালোমন্দ কোন কথাই কহিল না। অনতিকাল পরে খালি গাড়ি ফিরিয়া আসিয়া আস্তাবলে চলিয়া গেল। চাকর আসিয়া সংবাদ দিল। রসিক সম্মুখে ছিল। গোকুল তাহার পানে চাহিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, তবে ত দুঃখে মরে গেলুম। যা, যা, বাড়িতে গিয়ে গিন্নীকে বল গে, তার পাশ-করা ছেলের কীর্তি! কাল-পরশু এলে যদি তাকে ফটক পার হতে দিই ত তখন তোরা বলিস—হাঁ, সে ছেলে গোকুল মজুমদার নয়। একবার যখন বেঁকে বসেছি, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এসেও যদি তার হয়ে বলে, তবুও মুখ পাবে না তা বলে দিচ্ছি। তুমি মাকে বলে দাও গে চক্কোত্তিমশাই, পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যাবে তবু গোকুল মজুমদারের কথার নড়চড় হবে না। সময়ে এলে কিছু পেত; এখন আর একটি পয়সাও না। বাড়ি ঢুকতেই ত তাকে দেব না। বলিয়া গোকুল হনহন করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

গোকুল কাহার উপরে ক্রোধ করিয়া যে অসময়ে আসিয়া সন্ধ্যার পরেই শয্যা গ্রহণ করিল, তাহা বাটীর মেয়েরা টের পাইল না। দাসী দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসিয়া ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল। দোকানের গোমস্তার উপর অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দ প্রস্তুতের ভার ছিল। সে ঘরে আসিয়া কি-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্রই গোকুল তড়াক করিয়া উঠিয়া কাগজখানা ছিনাইয়া লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বাবা দশখানা তালুক রেখে যাননি যে, রাজা-রাজড়ার মত পণ্ডিত-বিদায় করতে হবে! যাও যাও, ওসব আমিরী চাল আমার কাছে খাটবে না।

লোকটা যারপরনাই কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল।

ভবানী জানিতে পারিয়া ঘরের বাহিরে চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিলেন। সস্নেহে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর কি কোনরকম অসুখ বোধ হচ্ছে গোকুল?

গোকুল যেমন শুইয়া ছিল, তেমনিভাবে জবাব দিল, না।

ভবানী বলিলেন, না, তবে যে কিছু খেলিনে, হঠাৎ এমন সময়ে এসে যে শুয়ে পড়লি?

গোকুল কহিল, পড়লুম।

ভবানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, অধ্যাপক-বিদায়ের ফর্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলি যে? কাল সকালেই নিমন্ত্রণপত্র না পাঠালে আর সময় হবে না বাবা।

গোকুল ঠিক তেমনি করিয়া জবাব দিল, না হয় নাই হবে।

ভবানী কিছু বিস্মিত কিছু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, ছি গোকুল, এ সময়ে ও-রকম অধীর হলে ত হবে না। কি হয়েচে আমাকে খুলে বল্—আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

মায়ের কথার উত্তরে গোকুল তাহার কম্বলের শয্যা ত্যাগ করিয়া চোখ পাকাইয়া উঠিয়া বসিল। কাহার সহিত কি ভাবে কথা কহিতে হয়, সে কোনদিন শিক্ষা করে নাই। কর্কশ-কণ্ঠে কহিল, তোমার যে মতলব শোনে না, সে একটা গাধা। বাবা তোমার কথা শুনত বলে কি আমিও শুনব? আমি দশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে শুদ্ধ হব, কোন জাঁকজমক করব না। বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া পড়িল।

ভবানী শান্তস্বরে কহিলেন, ছি বাবা, তিনি স্বর্গে গেছেন—তাঁর সম্বন্ধে কি এমন করে কথা কইতে আছে!

গোকুল জবাব দিল না। তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, এ রকম করলে লোকে কি বলবে বল দেখি বাছা! যাদের যেমন সম্পত্তি, তাদের তেমনি কাজ করতে হয়, না করলেই অখ্যাতি রটে।

গোকুল তেমনিভাবে থাকিয়াই কহিল, রটাক গে শালারা। আমি কারো ধার ধারিনি যে ভয়ে মরে যাব।

ভবানী বলিলেন, কিন্তু তাঁর এতে তৃপ্তি হবে কেন? তিনি যে এত বিষয়-আশয় রেখে গেলেন, তাঁর মত কাজ না করলে তিনি সুখী হবেন না।

ভবানী ইচ্ছা করিয়াই গোকুলের বড় ব্যথার স্থানে ঘা দিলেন। পিতাকে সে যে কি ভালবাসিত তাহা তিনি জানিতেন।

গোকুল উঠিয়া বসিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে কহিল, খরচের কথা কে বলচে মা। যত ইচ্ছে তোমরা খরচ কর; কিন্তু যত দিন যাচ্চে ততই যে আমার হাত-পা বন্ধ হয়ে আসচে। বিনোদ অভিমান করে উদাসীন হয়ে গেল মা, আমি একলা কি করে কি করব? বলিয়া সে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ভবানী নিজেকেও আর সামলাইতে পারিলেন না। কাঁদিয়া ফেলিলেন, অনেকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে আঁচলে চোখ মুছিয়া অশ্রুজড়িত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি এ খবর পেয়েচে গোকুল?

গোকুল তৎক্ষণাৎ কহিল, পেয়েচে বৈ কি মা।

কে তাকে খবর দিল?

কে যে তাহাকে বাড়ির এই দুঃসংবাদ দিয়াছে, গোকুল নিজেও তাহা জানিত না। মাস্টারমশায়ের পুত্র হারাণের সম্বন্ধে তাহার নিজেরও সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তথাপি কেমন করিয়া যেন নিঃসংশয়ে বুঝিয়া বসিয়াছিল—বিনোদ সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াই শুধু লজ্জা ও অভিমানেই বাড়ি আসিতেছে না। সে মায়ের মুখপানে চাহিয়া কহিল, খবর সে পেয়েচে মা। বাবা চিরকালের মত চলে গেলেন—এ কি সে টের পায়নি? আমার মত তার বুকের ভেতরেও কি হাহা করে আগুন জ্বলে যাচ্ছে না? সে সব জেনেচে মা, সব জেনেচে।

ভবানী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া অবশেষে যখন কথা কহিলেন, গোকুল আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করিল—মায়ের সেই অশ্রুগদ্‌গদ কণ্ঠস্বর আর নাই। কিন্তু তাহাতে উত্তাপও ছিল না। সহজকণ্ঠে বলিলেন, গোকুল, তাই যদি সত্যি হয় বাবা, তবে অমন ভায়ের জন্যে তুই আর দুঃখ করিস নে। মনে কর, আমাদের বংশে আর ছেলেপিলে নেই। যে রাগের বশে মরা বাপ-মায়ের শেষ-কাজ করতেও বাড়ি আসে না, তার সঙ্গে আমাদেরও কোন সম্পর্ক নেই।

গোকুল এ অভিযোগের যে কি জবাব দিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু জবাব দিল তাহার স্ত্রী। সে দ্বারের আড়ালে বসিয়া সমস্ত আলোচনাই শুনিতেছিল। সেইখান হইতেই বেশ স্পষ্ট গলায় কহিল, ঠাকুর কি না বুঝেই এমন একটা কাজ করে গেলেন? তিনি ছিলেন অন্তর্যামী। তিন-চারদিন ধরে কলকাতার বাসায় ঠাকুরপোকে যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখনই ত তিনি তাঁর গুণগান সব ধরে ফেললেন। তাঁর বিষয় তিনি যদি সমস্ত দিয়ে যান, তাতে আমাদের কেউ ত আর দোষ দিতে পারবে না। তুমি যাই, তাই ভাই ভাই কর, আর কেউ হলে—

টানটা অসমাপ্তই রহিল। আর কেহ কি করিত তাহা খুলিয়া বলা এ ক্ষেত্রে বড়বৌ বাহুল্য মনে করিল। কিন্তু ভবানী মনে মনে ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলেন। কারণ ইতিপূর্বে শ্বশুর বর্তমানে বড়বৌ এরূপ কথা কোনদিন বলে নাই, এমন কি শ্বাশুড়ীর সামনে স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া সে কথাই কহে নাই। এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উন্নতিতে তিনি নির্বাক হইয়া রহিলেন।

গোকুলও প্রথমটা কেমন-যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই উন্মুক্ত দরজার দিকে ডান হাত প্রসারিত করিয়া ভবানীর মুখের পানে চাহিয়া একেবারে ক্ষ্যাপার মত চেঁচাইয়া উঠিল, শোন মা, শোন। ছোটলোকের মেয়ের কথা শোন।

প্রত্যুত্তরে বড়বৌ চেঁচাইল না বটে, কিন্তু আরও একটুখানি সবল-কণ্ঠে স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, দ্যাখো, যা বলবে আমাকে বল। খামকা বাপ তুলো না—আমার বাপ তোমার বাপ একই পদার্থ।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু কথা ফুটিল না। কিন্তু তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল।

ভবানী এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিলেন। এখন মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিলেন, বৌমা, তোমার কথা ক'বার দরকার কি মা! যাও, নিজের কাজে যাও।

বৌমা কহিল, কথা আমি কোনদিনই কইনে মা। দাসী-চাকরের মত খাটতে এসেছি, দিবারাত্রি খেটেই মরি। কিন্তু উনি যে খেতে শুতে বসতে—আমার চারটে পাশ-করা ভাই, আমার পাঁচটা পাশ-করা ভাই করে নাপিয়ে বেড়ান; কিন্তু ভাই ত বাড়ি এসে মুখ্যু বলে একটা কথাও কোনদিন কয় না। ওঁর নিজের লজ্জা-শরম থাকলে কি আর কথা বলবার দরকার হয়? বলিয়া সে তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া গুমগুম পায়ে অবস্থাটা জানাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার কথা শুনিয়া আজ এতদিন পরে ভবানী স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এতদিন তিনি তাঁহার বড়বধূটিকে চিনিতে পারেন নাই। এখন চিনিতে পারিয়া তাঁহার দুঃখ, ক্ষোভ ও শঙ্কার আর সীমা-পরিসীমা রহিল না।

কিন্তু বড়বৌ একেবারে চলিয়া যায় নাই। সে বারান্দার একপ্রান্ত হইতে—কাহারো শুনিতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় বলিল, যখন-তখন শুধু রাশ রাশ টাকা যোগাবার বেলাতেই দাদা। আমার মামাদেরও দু-পাঁচটা পাশ করে বেরুতে দেখচি ত। কিন্তু সাবধান করে দিতে গেলেই তখন বড় তেতো লাগত। তা বাবু, তেতোই লাগুক আর মিষ্টিই লাগুক, নিজের টাকা অমন করে অপব্যয় হতে থাকলে নিজের ছেলেপিলের মুখ চেয়ে আমি কিছু আর চিরকালটা মুখ বুজে থাকতে পারিনে। মুখ্যু দাদা পেয়েচে, যত পেরেচে, তত ঠকিয়েচে। ঠকাক, আমার কি? ওর নিজের ছেলে-মেয়েই পথে বসবে। বলিয়া বড়বৌ সত্য সত্যই চলিয়া গেল।

গোকুল হাত-পা ছুঁড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। অনুপস্থিত স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিতে লাগিল।

কি! আমি মুখ্যু? কোন্ শালা বলে? এ-সব বিষয়-সম্পত্তি করলে কে? আমি, না বেন্দা? আমার চোখে ধুলো দিয়ে টাকা আদায় করে নিয়ে যাবে—বেন্দার বাপের সাধ্যি আছে? আমি বড়, সে ছোট। সে চারটে পাশ করে থাকে ত আমি দশটা পাশ করতে পারি তা জানিস? আমি মুখ্যু? বাড়ি ঢুকলে দরোয়ান দিয়ে তাকে দূর করে দেব—দেখি, কে তাকে রাখে।

এমনি অসংলগ্ন এবং নিরর্থক কত-কি সে অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতে লাগিল। ভবানী সেই যে নীরব হইয়াছিলেন, আর কথা কহিলেন না। বহুক্ষণ পর্যন্ত একভাবে পাথরের মত বসিয়া থাকিয়া একসময়ে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

ছয়

তখন ঝগড়া হইল বটে, কিন্তু সেই রাত্রেই যে স্ত্রীর সহিত গোকুলের একটা মিটমাট হইতে বাকী রহিল না, সে তাহার পরদিনের ব্যবহারেই বুঝা গেল। হঠাৎ সকাল হইতেই সে সমস্ত কাজকর্মে হাঁকডাক করিয়া লাগিয়া গেল এবং আগামী কর্মের দিনটি আসিয়া পড়িতে যে মাত্র তিনটি দিন বাকী রহিয়াছে, সে কথা বাড়িসুদ্ধ সকলকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া ফিরিতে লাগিল। বাহিরের যে-কেহ বিনোদের নাম উত্থাপন করিলেই, আজ সে কানে আঙুল দিয়া বলিতে লাগিল, নিজের বাপ যাকে মৃত্যুকালে ত্যাজ্যপুত্র করে যায়, তার কথা কেউ জিজ্ঞেসা করবেন না। আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমার যে ভাই ছিল সে মরে গেছে।

তাহার কথা শুনিয়া কেহ চোখ টিপিয়া আর একজনকে ইঙ্গিত করিল, কেহ অলক্ষ্যে ঘাড় নাড়িয়া মনের ভাব প্রকাশ করিল। অর্থাৎ এই সোজা কথাটি কাহারো অবিদিত রহিল

না যে, বিনোদ্ একেবারেই পথে বসিয়াছে এবং গোকুল যে-কোন কৌশলেই হোক, ষোল আনাই গ্রাস করিয়াছে। এখন গোপনে অনেকেই বিনোদের জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, সে আসিয়া এই ভয়ানক জুয়াচুরির বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাহাদের নিকট সাহায্য পাইতেও পারিবে—এরূপ আভাসও কেহ কেহ দিতে লাগিল। সুবিজ্ঞ জয়লাল বাঁড়ুয্যে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে, মানুষকে যে চিনিতে পারা যায় না, তাহার জীবন্ত প্রমাণ এই গোকুল মজুমদার। শুধু তাঁহার চক্ষেই সে ধূলি প্রক্ষেপ করিতে পারে নাই। কারণ পাড়ার সমস্ত ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষে যখন একবাক্যে গোকুলকে ন্যায়নিষ্ঠ, ভ্রাতৃবৎসল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিয়া চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিয়াছে, তখন তিনিই শুধু চুপ করিয়া হাসিয়াছেন আর মনে মনে বলিয়াছেন, আরে, সৎমার ছেলে বৈমাত্র ভাই—তার ওপর এত টান! বেদে পুরাণে যা কস্মিনকালে কখনো ঘটেনি, তাই হবে এই ঘোর কলিকালে! সুতরাং এতদিন তিনি শুধু মুখ বুজিয়া কৌতুক দেখিতেছিলেন, কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই। আবশ্যক কি! বেশ জানিতেন, একদিন সমস্ত প্রকাশ পাইবেই।

এখন দেখ তোমরা—এই এত ভালো, অত ভালো, গোকুলের সম্বন্ধে যা আমি বরাবর ভেবে এসেচি, ঠিক তাই কিনা!

কিন্তু কি এতদিন তিনি ভাবিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কাহারও যখন জানা ছিল না, তখন সকলকেই নীরবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া লইতে হইল এবং দেখিতে দেখিতে খড়ের আগুনের মত কথাটা মুখে মুখে প্রচার হইয়া গেল। অথচ গোকুল টের পাইল না যে, বাহিরের বিরুদ্ধ আন্দোলন তাহার বিপক্ষে এত সত্বর এরূপ তীব্র হইয়া উঠিল।

ভবানী চিরদিনই অল্প কথা কইতেন। তাহাতে কাল রাত্রি হইতে ব্যথার ভারে তাঁহার হৃদয় একেবারেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। গোকুলের স্ত্রী মনোরমা একসময়ে স্বামীকে নির্জনে ডাকিয়া এইদিকে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, মার ভাবগতিক দেখচ?

গোকুল উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, না। কি হয়েচে মার?

মনোরমা তাচ্ছিল্যভরে বলিল, হবে আবার কি! সেই যে কাল বলেছিলুম ঠাকুরপোর টাকা নষ্ট করার কথা—সেই থেকে আমার সঙ্গে কথা ক'ন না। তোমার সঙ্গে কথা-টথা কইচেন ত?

গোকুল শুষ্ক হইয়া কহিল, না, আমার সঙ্গেও না।

মনোরমা ঘাড়টা একটুখানি হেলাইয়া, কণ্ঠস্বর আরও নীচু করিয়া বলিল, দেখলে মজা! যে টাকাগুলো ঠাকুরপো দু'হাতে উড়িয়ে দিলে, সেগুলো থাকলে ত আমাদেরই থাকত। ঠাকুর ত আমাদেরই সব লিখে দিয়ে গেচেন। আমাদের তিনি সর্বনাশ করবেন—আর সে-কথা একটু মুখ থেকে খসালেই রাগ করে কথাবার্তা বন্ধ করে দিতে হবে? এইটে কি ব্যবহার? তুমি ত 'মা' 'মা' করে অজ্ঞান, তুমিই বল না, সত্যি না মিছে?

গোকুলের মুখখানা একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল। কোন রকম জবাবই সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রী বোধ করি তাহা লক্ষ্য করিয়াই কহিল, ঠাকুরপো যাই করুক আর যাই হোক, সে পেটের ছেলে। তুমি সতীনপো বৈ নয়। তুমি পেলে সমস্ত বিষয়—এ কি কোন মেয়েমানুষের সহ্য হয়? না না, আমার সব কথা অমন করে তোমার উড়িয়ে দিলে আর চলবে না। এখন থেকে তোমাকে একটু সাবধান হতে হবে, অমন 'মা' 'মা' করে গলে গেলে সবদিকে মাটি হতে হবে, বলে দিচ্ছি! বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস।

গোকুলের বুকের ভিতরটা অভূতপূর্ব শঙ্কায় গুরগুর করিয়া উঠিল। সে বিবর্ণমুখে ফ্যালফ্যাল করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। তাহার স্ত্রী কহিল, আমরা মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মনের ভাব যত বুঝি, তোমরা পুরুষমানুষ তা পার না। আমার কথাটা শুনো। বলিয়া সে স্বামীর মুখের পানে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কতটা কাজ হইয়াছে অনুমান করিয়া লইয়া বেশ-একটু জোর দিয়া বলিল, আর ঠাকুরপোর ত চিরদিন এমনধারা বয়াটেপানা করে বেড়ালে চলবে না। তাঁকে লেখাপড়া ত তুমি আর কম শেখাও নি। এখন যা হোক একটু চাকরি-বাকরি করে মাকে নিয়ে বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হতে হবে তাঁকে। তিনি নিজের মাকে ত সত্যি আর বরাবর আমাদের কাছে ফেলে রাখতে পারবেন

না! তা ছাড়া, মাথা গুঁজে দাঁড়াবার যা হোক একটু কুঁড়েকাঁড়াও ত করা চাই। তখন আমরাও যেমন ক্ষমতা সাহায্য করব—লোক যেন না বলতে পারে, অমুক মজুমদার তার বৈমাত্র ভাইকে দেখলে না। বৈমাত্র ভায়ের সংগে আবার সম্পর্ক কি? যারা বলে তারা বলুক, আমরা সে কথা বলতে পারব না। সে বংশ আমাদের নয়। বলিয়া সে স্বামীকে ভাবিবার অবকাশ দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

গোকুল স্বপ্নাবিষ্টের মত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া সেইখানে বসিয়া কি-সব যেন অদ্ভুত আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। সব কথা ছাপাইয়া এই একটা কথা তাহার কানের মধ্যে ক্রমাগত বাজিতে লাগিল—বিষয়-সম্পত্তি বড় ভয়ানক জিনিস! এবং শুধু সেইজন্যই মা যেন রাগ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া বিনোদের কাছে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছেন। তাহার মনে পড়িল তাহার স্ত্রী মিথ্যা বলে নাই। আজ সারাদিনের মধ্যে মায়ের সহিত তাহার একটা কথাও ত হয় নাই। কার্যোপলক্ষে তাঁহার সুমুখ দিয়া সে দু-তিনবার যাতায়াতও করিয়াছে, কিন্তু তিনি মুখ তুলিয়াও ত চাহেন নাই। মা চিরদিনই অত্যন্ত অল্পভাষিণী জানিয়া সে সময়টায় গোকুলের কিছুই মনে হয় নাই বটে, কিন্তু এখন সে সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক যেন জলের মতই স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। অথচ এই সমস্ত চুপচাপ নীরব বিরুখতা সহ্য করাও তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মার সহিত মুখোমুখি কলহ করিবার জন্য দ্রুতপদে তাঁহার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। ঢুকিয়াই বলিল, এমনধারা মুখভার করে কাজকর্মের বাড়িতে বসে থাকলে ত চলবে না মা!

ভবানী বিস্ময়াপন্ন হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিবামাত্রই গোকুল বলিয়া উঠিল, তোমার বৌ ত আর মিছে বলেনি যে, বিনোদ রাশ রাশ টাকা নষ্ট করচে! বাবা তার বিষয় যদি আমাকে দিয়ে যান, তাতে আমার দোষ কি? তুমি তার সংগে বোঝাপড়া কর গে, আমাদের উপর রাগ করতে পারবে না, তা বলে দিচ্চি।

ভবানী মর্মাহত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আমি কারো ওপরেই রাগ করিনি গোকুল, কারো সংগে বোঝাপড়া করতে চাইনে।

যদি চাও না ত ওরকম করে থাকলে চলবে না। বিনোদকে ব'লো সে যেন চাকরি-বাকরি করে। আমার বাড়িতে তার জায়গা হবে না।

সে ত হবেই না গোকুল, এ আর বেশী কথা কি! বলিয়া ভবানী মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ঝগড়া করিতে না পাইয়া গোকুল নিরুপায় ক্রোধে বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল। স্ত্রীকে ডাকিয়া কহিল, আজ স্পষ্ট বলে দিলুম মাকে—বিনোদের এখানে আর থাকা হবে না—চাকরি-বাকরি করে যা ইচ্ছে করুক আমি কিছু জানিনে।

মনোরমা আহ্লাদে আগাইয়া আসিয়া ফিসফিস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বললেন উনি?

গোকুল অস্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত জবাব দিল, বলবেন আবার কি! আমি বলাবলির কি ধার ধারি!

বড়বৌ চোখ ঘুরাইয়া কহিল, তবু, তবু?

গোকুল তেমনি করিয়াই কহিল, তবু আর কি! তাঁকে স্বীকার করতে হ'লো যে—না, বিনোদের এ বাড়িতে থাকা চলবে না।

তাহার স্ত্রী গলা আরো খাটো করিয়া কহিল, এ যোল আনা রাগের কথা, তা বুঝেচ? মার মন পড়ে রয়েচে নিজের ছেলেটির পানে—এখন তুমি হয়েচ তাঁর দুচক্ষের বালি।

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আর বুঝিনি? আমার কাছে কি চালাকি চলে? বাহিরে আসিয়াই রসিক চক্রবর্তীকে সুমুখে পাইয়া কহিল, বলি একটা নতুন খবর শুনেচ চক্কোত্তিমশাই? এতকাল এত করে এখন আমিই হয়েচি মার দু'চক্ষের বিষ। কথাবার্তা আর আমাদের সংগে ক'ন না, সুমুখে পড়লে মুখ ফিরিয়ে বসেন।

চক্রবর্তী অকৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, না না, বল কি বড়বাবু!

কি বলি? ওরে ও হাবুর মা, শোন শোন!

বাড়ির বুড়া ঝি কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল, মনিবের ডাকাডাকিতে কাছে আসিবা-

মাত্র গোকুল চক্রবর্তীর প্রতি চাহিয়া কহিল, একে জিজ্ঞেস করে দেখ।—কি বলিস হাবুর মা, মাকে আমার সঙ্গে কথা কইতে আর দেখচিস? সুমুখে পড়লে বরং মুখ ফিরিয়ে নিচ্চেন ত?

হাবুর মা কিছুই জানিত না। সে মূঢ়ের মত ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া, অবশেষে একটু ঘাড় নাড়িয়া মনিবের মন রাখিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেল।

সত্যি মিথ্যে শুনলে ত? বলিয়া চক্রবর্তীর প্রতি একটা ইশারা করিয়া গোকুল অন্যত্র চলিয়া গেল।

সেদিন পাড়ার যে-কেহ দেখাশুনা করিতে আসিল, তাহারই কাছে সে বিমাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া, পুনঃপুনঃ এই একটা কথাই বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, আমি সতীনপো বৈ ত নয়! কাজেই বাবা মরতে-না-মরতেই দু'চক্ষের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েচি!

সন্ধ্যার সময় বাড়ির ভিতরে আসিয়া ভবানীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমার এত দায় পড়ে যায়নি যে, লোকজন পাঠিয়ে বর্ধমান থেকে ছোটপিসীমাদের আনতে যাব। এত গরজ নেই—আসতে হয় তিনি নিজে আসবেন।

ভবানী মুখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, সেটা কি ভাল কাজ হবে গোকুল?

গোকুল তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভালোমন্দ জানিনে। দু'হাতে টাকা ওড়াবার আমার সাধ্য নেই। তুমি এ নিয়ে আমাকে আর জেদ ক'রনা, তা বলে দিচ্চি।

ইঁহাদিগকে আনাইবার জন্য ভবানীই কাল গোকুলকে আদেশ করিয়াছিলেন। এখন আর কিছু বলিলেন না। চুপ করিয়া হাতের কাজে মন দিলেন। তথাপি গোকুল সুমুখে পায়চারি করিতে করিতে বলিতে লাগিল, আনো বললেই ত আর আনতে পারিনে মা। ধারকর্জ করে ত আমি ডুবে যেতে পারব না।

ভবানী অস্ফুট-স্বরে বলিলেন, বেশ ত গোকুল, ভাল বোঝো—নাই বা সেখানে লোক পাঠালে।

গোকুল বলিতে বলিতে চলিয়া গেল, এখন থেকে আমাকে বুঝতেই হবে যে! আমার কি আর আপনার মা আছে! আমি ম'লেই বা কার কি—কে আর আমার আছে! এখন নিজেকে নিজে সামলানো চাই। টাকাকড়ি বুঝেসুঝে খরচ করা দরকার। নিজের মা ত নেই। বলিয়া সে চলিয়া গেল। তাহার টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তিতে অকস্মাৎ এতবড় আসক্তি দেখিয়া ভবানী নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু গোকুল তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আমি কি বুঝিনে? এটা তোমার রাগের কথা নয়? কাল নিজে তুমি বললে, গোকুল, তোর পিসীমাদের লোক পাঠিয়ে আনা, আর আজ বলচ, যা ভাল হয় তাই কর্? আমার বাপ নেই, ভাই নেই বলে, আমাকে এমনি করে জব্দ করা! লোকে বলবে গোকুল বুঝি সত্যি সত্যিই তার মায়ের কথা শোনে না!

তাহার এই একান্ত অবোধ্য অভিযোগে ভবানী বিমূঢ় হতবুদ্ধির মত একমুহূর্ত তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, গোকুল, আমি ত তোদের কিছুতেই নেই—কোন কথাই ত বলিনি বাবা!

গোকুল অকস্মাৎ দুইচক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিয়া কহিল, তোমার কোন্ হুকুমটা শুনিনে মা, যে তুমি আমাকে এমনি করে বলচ? কিন্তু ভাল হবে না, তা বলে দিচ্ছি। বেন্দা লজ্জায়-ঘেন্নায় বাড়িছাড়া হয়ে গেল—আমারও যেখানে দু'চক্ষু যায় চলে যাব। থাকো তুমি তোমার বিষয়-আশয় নিয়ে। বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সাত

গোকুলের বড়মেয়ে হেমাঙ্গিনী তাহার ঠাকুরমার কাছে শুইত। সে ভোর হইতে-না-হইতে চেঁচাইতে চেঁচাইতে আসিল, কাকা এসেচে মা, কাকা এসেচে।

পাশের ঘরে গোকুল শুইয়াছিল। সে ধড়ফড় করিয়া কম্বলের শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। শুনিতে পাইল, তাহার স্ত্রী নিরানন্দ-বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিতেছে, কখন এল রে তোর কাকা?

মেয়ে কহিল, অনেক রাত্তিরে মা।

মা জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি কচ্চে?

মেয়ে কহিল, এখনও ওঠেন নি। তিনি নিজের ঘরে ঘুমিয়ে আছেন।

তাহার মা আর কোন প্রশ্ন না করিয়া কাজে চলিয়া গেল। গোকুল দরজা হইতে গলা বাড়াইয়া হাত নাড়িয়া মেয়েকে কাছে ডাকিয়া কহিল, তোর ঠাকুরমা তাকে কি বললে রে হিমু?

হিমু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানিনে ত বাবা।

গোকুল তথাপি প্রশ্ন করিল, খুব বকলে বুঝি রে?

হিমু অনিশ্চিতভাবে বার-দুই মাথা নাড়িয়া অবশেষে কি মনে করিয়া বলিল, হুঁ।

গোকুল ব্যগ্র হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া আস্তে আস্তে কহিল, তোর ঠাকুরমা কি কি সব বললে—বল ত মা হিমু।

হিমু বিপদে পড়িল। কাকা যখন আসেন, তখন সে ঘুমাইতেছিল—কিছুই জানিত না। বলিল, জানিনে ত বাবা!

গোকুল বিশ্বাস করিল না। অপ্রসন্ন হইয়া বলিল, এই যে বললি, জানিস। মা তোকে মানা করে দিয়েচে, না? আমি কাউকে বলব না রে, তুই বল না।

জেরায় পড়িয়া হিমু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। গোকুল তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া উৎসাহ দিয়া কহিল, বল ত মা, কি কি কথা হ'ল? মা বুঝি বললে, বেরিয়ে যা তুই বাড়ি থেকে? এই নে দুটো টাকা নে—পুতুল কিনিস। বলিয়া সে বালিশের তলা হইতে টাকা লইয়া মেয়ের হাতে গুঁজিয়া দিল।

হিমু শুষ্ক হইয়া বলিল, হুঁ বললে।

তার পর? তার পর?

হিমু কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, তার পরে ত জানিনে বাবা।

গোকুল পুনরায় তাহার মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, জানিস বৈ কি! তোর কাকা কি বললে?

কিচ্ছু বললে না।

গোকুল বিশ্বাস করিল না। বিরক্ত ও কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিল, একেবারে কিছুই বললে না? তা কি হয়?

পিতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া হিমু প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানিনে ত বাবা।

ফের জানিস নে? হারামজাদা মেয়ে? বলিয়া সে চটাস্ করিয়া মেয়ের গালে চড় কসাইয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা, দূর হ।

মেয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

গোকুল দ্রুতপদে নীচে নামিয়া তাহার বিমাতার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, তা বেশ করেচ! সে বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই নানারকম করে লাগিয়েচ, ভাঙিয়েচ—আমার ওপর যাতে তার মন ভেঙ্গে যায়—এই ত? সে-সব কিছু আমার আর শুনতে বাকী নেই। কিন্তু তোমার ছেলেকেও সাবধান করে দিয়ো—আমার সুমুখে না পড়ে, তা বলে দিয়ে যাচ্চি। বলিয়াই তেমনি দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। ভবানী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। বাহিরের নানা লোক নানা কাজে ব্যস্ত ছিল। সে খানিকক্ষণ এদিক-সেদিক করিয়া হাবুর মাকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিল, ও হাবুর মা, বলি, ভায়া যে বাড়ি এসেচেন, শুনেচিস?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ বাবু, ঘোর রাত্তিরে ছোটবাবু বাড়ি এলেন।

গোকুল কহিল, সে ত জানি রে। তার পরে মায়ে-ব্যাটায় কি কি কথা হলো? আমার নামে বুঝি মা খুব করে লাগালে? বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার-টাবার কথা—

ঝি বাধা দিয়া কহিল, না বড়বাবু, মা ত ওঠেন নি। যদু তার ব্যাগটা নিয়ে এলে আমি ছোটবাবুর ঘর খুলে আলো জেবলে দিলুম। তিনি সেই যে ঢুকলেন আর ত বার হননি।

গোকুল অপ্রত্যয় করিয়া কহিল, কেন ঢাকচিস ঝি? আমি যে সব শুনেচি।

গোকুলের কথা শুনিয়া ঝি বিস্ময়ে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। তার পরে হাবুর দিব্যি করিয়া বলিল, অমন কথাটি ব'লো না বড়বাবু। আমি সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ছোটবাবুর কাজকর্ম করে দিলুম। তিনি মাকে ডাকতে নিষেধ করে বললেন, ঝি, আর আমার কিছু দরকার নেই। তুই শুধু আলোটা জেবলে দিয়ে শুগে যা। আহা! চোখ-মুখ বসে গিয়ে একেবারে কালিবর্ণ হয়ে গেছে।

গোকুলের চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। কহিল, তা আর হবে না? তুই বলিস কি হাবুর মা, বাবা মারা গেলেন, ছোঁড়া একবার চোখের দেখাটা দেখতে পেলে না—একটা পয়সার বিষয়-আশয় পর্যন্ত পেলে না—তার মনে মনে যা হচ্ছে, তা সেই জানে। বাবাকে সে কি ভালই বাসত, তা তোরা সব জানিস? কি বলিস হাবুর মা? বলিতে বলিতেই গোকুলের চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

হাবুর মা অনেকদিনের দাসী। চোখের জল দেখিয়া তাহার চোখেও জল আসিল। গাঢ়স্বরে কহিল, তা আর বলতে বড়বাবু! তেনার বাবা-অন্ত প্রাণ ছিল যে! তবে কিনা বড় বড় লেখাপড়া করতে করতে মগজটা কেমনধারা যে গরম হয়ে গেল—তাই—

গোকুল হাবুর মাকে একেবারে পাইয়া বসিল। কহিল, তাই বল না হাবুর মা। মগজটা গরম হবে না? বিদ্যেটা কি সে কম শিখেচে! অনার গ্রাজুয়েট্! বলি, এই হুগলি-চুঁচড়ো-বাবুগঞ্জে ক'টা লোক আমার ভায়ের মত বিদ্যে শিখেচে—কৈ দেখিয়ে দে দেখি? লাটসাহেব নিজে এসে যে তাকে হাত ধরে বসায়—সে কি একটা হেঁজিপেঁজি মানুষ! তুই ত ঝি, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে কোন ভদ্রলোককে বল্ গে দেখি যে, তুই বিনোদবাবুদের বাড়ির দাসী! তোকে ডেকে নিয়ে বসিয়ে হাজারটা খবর নেবে, তা জানিস? কিন্তু ঐ যে কথায় বলে গাঁয়ের যুগী ভিক্ষে পায় না! এখানকার কোন ব্যাটা কি তারে চিনতে পারলে? মুখখানি একবারে শুকিয়ে গেছে দেখলি, না রে?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মুখখানি দেখলে চোখে আর জল রাখা যায় না বড়বাবু!

গোকুলের চোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উত্তরীয় অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, তুই তাকে মানুষ করেচিস হাবুর মা, তুই শুধু তাকে চিনতে পেরেচিস। আহা! চিরটা কাল তার হেসেখেলে আমোদ-আহ্লাদ করে লেখাপড়া নিয়েই কেটেচে। কবে এ-সব হাঙ্গামা তাকে পোয়াতে হয়েচে, বল দেখি? আর উইল করে বিষয় দেব না বললেই দেব না! তার বাপের বিষয় নয়? কোন্ শালা আটকায়? কি করেচে সে? চুরি করেচে? ডাকাতি করেচে? খুন করেচে? কোন্ শালা দেখেচে? তবে কেন বিষয় পাবে না বল দেখি শুনি? আইন-আদালত নেই? বিনোদ নালিশ করলে আমাকে যে বাবা বলে অর্ধেক বিষয় কড়ায়-গণ্ডায় তাকে চুলচিরে ভাগ করে দিতে হবে তা জানিস।

ঝি সায় দিয়া বলিল, তা দিতে হবে বৈ কি বাবু!

গোকুল উৎসাহে চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত করিয়া কহিল, তবে তাই বল না! আর এই মা-টি! তুই মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক না কেন? তুই কেন উইল করার মতলব দিতে গেলি? এইটে কি তোর মায়ের মত কাজ হ'লো? ধর্ম নেই? তিনি দেখচেন না? নির্দোষকে কষ্ট দিলে—তাঁর কাছে তোকে জবাব দিতে হবে না? আর বিষয়! ভারী বিষয় --আজ বাদে কাল সে যখন হাইকোর্টের জজ হবে—সে ত আর কেউ তার আটকাতে পারবে না—তখন কি করে রাখবি বিষয়? এ-সব ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে না? এখন সম্মানে না দিলে, তখন অপমান হয়ে দিতে হবে যে!

হাবুর মা খুশী হইয়া উঠিল। সে বিনোদকে মানুষ করিয়াছিল—এই সমস্ত উইল-টুইল তাহার একেবারে ভালই লাগে নাই; কহিল, আচ্ছা বড়বাবু, তুমি তাই কেন ছোট-বাবুকে ডেকে বল না যে, তোর বিষয়-আশয় ভাই তুই নে! তুমি দিলে ত আর কারুর না বলবার জো নেই।

কিন্তু এইখানেই ছিল গোকুলের আসল খটকা। সে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তবে সবাই যে বলে, আমার দেবার সাধ্যি নেই। বাবার উইল ত রদ করতে পারিনে হাবুর মা। আমাদের বড়বৌর মামাত ভাই একজন মস্ত মোক্তার—সে নাকি তার বোনকে

চিঠি লিখেচে, তা হলে জেল খাটতে হবে। তবে যদি মা রাজী হয়, বড়বো রাজী হয়, তখন বটে।

হাবুর মা ইহার সদুত্তর দিতে না পারিয়া তাহার কাজে চলিয়া গেল।

গোকুল মুখ ফিরাইতেই দেখিল ছিমু খেলা করিতে যাইতেছে। তাহাকে আদর করিয়া কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর কাকা উঠেচে রে?

ছিমু ঘাড় কাত করিয়া কহিল, হুঁ, উঠেই তার বসবার ঘরে চলে গেলেন—কারু সঙ্গে কথা কইলেন না।

বাটীর একান্তে পথের ধারের একটা ঘরে বিনোদ বসিত। ঘরখানি ইংরাজি ধরনে সাজানো ছিল—এইখানেই তাহার বন্ধু-বান্ধবেরা দেখাসাক্ষাৎ করিতে আসিত। গোকুল পা টিপিয়া কাছে গিয়া জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখিল, বিনোদ চৌকিতে না বসিয়া নীচে মেঝের উপর ওদিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার এই বসিবার ধরন দেখিয়াই গোকুলের দুটি চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া ছোট-ভাইয়ের মুখখানি দেখিবার আশায় মিনিট-পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়া শেষে চোখ মুছিয়া ফিরিয়া আসিল।

চক্রবর্তী কহিল, বড়বাবু, অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দটা—

গোকুল সহসা যেন অন্ধকারে আলোর রেখা দেখিতে পাইল। তাড়াতাড়ি কহিল, এ-সব বিষয়ে আমাকে আর কেন জড়াও চক্কোত্তিমশাই। মা সরস্বতী ত স্বয়ং এসে পড়েছেন। কে কেমন পণ্ডিত, কার কত মান-মর্যাদা বিনোদের কাছে ত চাপা নেই—তাকেই জিজ্ঞাসা করে ঠিক করে নাও না কেন? আমি এর মধ্যে আর হাত দেব না চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্তী কহিল, কিন্তু ছোটবাবু ত এখনো ঘুম থেকে উঠেন নি।

গোকুল ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল, ঘুম থেকে! তার কি আহার-নিদ্রা আছে? হাবুর মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ—সে স্বচক্ষে দেখেচে। বলে, বড়বাবু, ছোট-বাবুর মুখের পানে চাইলে আর চোখের জল রাখা যায় না—এমনি চেহারা হয়েছে। ভেবে ভেবে সোনার বর্ণ যেন কালিমাড়া হয়ে গেছে। বলিয়া তাহার বসিবার ঘরটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিল, গিয়ে দেখ গে—সে ঠাণ্ডা মাটির উপর একলাটি চুপ করে বসে আছে। সে দেখলে কার না বুক ফেটে যায়, বল ত চক্কোত্তিমশাই!

চক্রবর্তী দুঃখসূচক কি-একটা কথা অস্ফুটে কহিয়া ফর্দ লইয়া যাইতেছিল, গোকুল তাহাকে ফিরাইয়া ডাকিয়া কহিল, আচ্ছা, তুমি ত সমস্তই জানো—তাই জিজ্ঞাসা করি, আমি থাকতে বিনোদকে আর এত কষ্ট দেওয়া কেন? উপোস-তিরেশ কি ওর ওই রোগা দেহতে সহ্য হবে? হয়ত বা অসুখ হয়ে পড়বে। আমি বলি—খাওয়া-শোওয়া ওর যেমন অভ্যাস তেমনি চলুক!

চক্রবর্তী নিরুৎসাহভাবে কহিল, না পারলে—

কথাটা গোকুল শেষ করিতেই দিল না। বলিল, পারবে কি করে, তুমিই বল দেখি? আমাদের এ-সব কুলি-মজুরের দেহ—এতে সব সয়। কিন্তু ওর ত তা নয়। পাঁচ-সাতটা পাশ করে যে দেশের মাথার মণি হয়েচে, তার দেহতে আর আমার দেহতে তুমি তুলনা করে বসলে? কে আছিস রে ওখানে—ভুতো? যা ত একবার চট করে আমাদের ভশ্চায্যিমশাইকে ডেকে আন। না হয় যত টাকা লাগে—শ্রাদ্ধের সময় আমি মূল্য ধরে দেব। তা বলে ত মায়ের পেটের ভাইকে মেরে ফেলতে পারব না। ওকে আমি আলোচালের হবিষ্যি করিয়ে নিকেশ করতে পারব না, এতে তিনি যাই বলুন।

চক্রবর্তী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া সায় দিয়া কহিল, সে ত ঠিক কথা বড়বাবু। তবে কিনা লোকে বলবে—

আরে লোকে কি বলবে বলে কি নিজের ভাইটাকে মেরে ফেলব? তোমার এ-সব কি বুদ্ধি হ'লো, বল ত চক্কোত্তিমশাই? না না, ফর্দ-টর্দ নিয়ে তোমার এখন তাকে জ্বালাতন করার দরকার নেই। মুখে যা হোক একটু-কিছু দিয়ে আগে সে সুস্থ হোক, বলিয়া গোকুল নিতান্ত অকারণেই সে বেচারার উপর রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আট

চায়ের বাটিটা বিনোদ ব্রাহ্মণের হাত হইতে লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। কিন্তু সে বস্তুটা যে কত গোপনে প্রস্তুত হইয়াছিল এবং পাত্রটা যে কাহার বুকের উপর গিয়া কতখানি আঘাত করিল, সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন।

সমস্তদিনের মধ্যে বিনোদ অনেকেরই সহিত কিছু কিছু কথাবার্তা কহিল বটে, কিন্তু বড়ভাইয়ের ছায়া দেখিলেও সে সরিয়া যাইতে লাগিল। অথচ সে ছায়াও তাহাকে মুহূর্তের অবকাশ দেয় না। বিনোদ যেদিকে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, গোকুল কাজের ঝঞ্ঝাটে হঠাৎ সেইদিকেই আসিয়া পড়ে। এমনি করিয়া বেলা পড়িয়া আসিল।

অপরাহ্নবেলায় বিনোদ বসিবার ঘরে একা বসিয়া ছিল, একখানা কাগজ হাতে করিয়া গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল। অকারণে খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিল, কলিকাতার বাসা ছেড়ে তুমি হাজারিবাগে হঠাৎ চলে গেলে—বাবা মৃত্যুকালে—সে শুনেচ বোধ হয়—সে একটা তামাশা আর কি! বলিয়া গোকুল পুনরায় শুষ্কহাসির অভিনয় করিয়া কহিল, তা তোমার যেমন কাণ্ড, একটা খবর পর্যন্ত দেওয়া নেই; তা যাক, সে-সব হবে অখন—কাজটা চুকে যাক—একটা দানপত্র লিখলেই—বুঝলে না বিনোদ—গোটা-কয়েক টাকা শুধু বাজে খরচ হয়ে যাবে—বুঝলে না—আর শালার লোক যা এখানকার—জানোই ত সব—বুঝলে না ভাই—তা সে কিছুই না—বাবাও বলে গেলেন বিষয়-আশয় তোমাদের দুই ভায়ের রইল, এ একটা শুধু বুঝলে—না—তা যাক—সেজন্য কিছুই আটকাবে না—আর আমার ত মেজাজের ঠিক নেই ভাই। এই লোহার সিন্দুকের চাবিটা তুমি রাখ। আবার পণ্ডিতদের আহ্বান করা হয়েচে, কার কত বিদায়, কে কি দরের লোক, সে তুমি ঠিক করে না দিলে ত আর কেউ পারবে না। কিন্তু আমার ত এমন ফুরসত নেই যে, দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড তোমার সঙ্গে দুটো পরামর্শ করি। বলিয়া গোকুল চাবিটা এবং কাগজখানা কোনমতে সুমুখে ধরিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থানের উপক্রম করিল। ঘুম ভাঙিয়া অবধি এই কথাগুলাই সে মনে মনে মক্‌শ করিতেছিল। বিনোদ হাত দিয়া সেগুলা ঠেলিয়া দিয়া কহিল, আমাকে এর মধ্যে আপনি জড়াবেন না—এ-সব আমি ছোঁব না।

একমুহূর্তেই গোকুলের দাঁতের হাসি পাথরের মত জমাট বাঁধিয়া গেল। তাহার সারা-দিনের জল্পনা-কল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম করিল। কহিল, ছোঁবে না? কেন?

বিনোদ কহিল, আমার আবশ্যক কি? আমি বাইরের লোক, দু'দিনের জন্যে এসেচি—দু'দিন পরেই চলে যাব।

গোকুল কহিল, চলে যাবে?

বিনোদ বলিল, যেতেই ত হবে। তা ছাড়া এ-সব টাকাকড়ির ব্যাপার। আমি দীন-দুঃখী, হিসাব মিলিয়ে দিতে না পারলে চোর বলে তখন আপনিই হয়ত আমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে জেল খাটিয়ে ছাড়বেন।

জবাব দিবার জন্য গোকুলের ঠোঁট দুটা একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। তার পর হেঁট হইয়া চাবি এবং কাগজটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। পিতৃশ্রাদ্ধে জাঁকজমক করিয়া নাম কিনিবার ইচ্ছা তাহার মনের ভিতর হইতে মরীচিকার মত মিলাইয়া গেল।

অথচ আজ সকাল হইতেই তাহার উৎসাহ এবং চেঁচামেচির বিরাম ছিল না। সহসা সন্ধ্যার পরেই সে আসিয়া যখন তাহার কম্বলের শয্যাশ্রয় করিয়া শুইয়া পড়িল, তাহার স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল।

তোমার কি অসুখ করেচে?

গোকুল উদাসভাবে কহিল, না বেশ আছি।

তবে, অমন করে শুলে যে?

গোকুল জবাব দিল না। মনোরমা পুনরায় প্রশ্ন করিল, ঠাকুরপোর সঙ্গে কথা-টথা কিছু হ'লো?

গোকুল কহিল, না।

তখন বড়বধূ অদূরে মেঝের উপর বেশ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, ঠাকুরপো কি বলে বেড়াচ্ছে শুনেচ?

গোকুল মৌন হইয়া রহিল। মনোরমা তখন আরও একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া কহিল, বলে, বাবার ব্যামো-স্যামো কিছুই জানিনে, হাজারিবাগ না কোথায়—কত ফন্দিই জানে তোমার এই ভাইটি!

গোকুল নিরীহভাবে প্রশ্ন করিল, ফন্দি কেন? তুমি বিশ্বাস কর না?

মনোরমা বলিল, আমি? আমি ন্যাকা? এক-গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও করিনে।

কথাটা গোকুলের অত্যন্ত বিশ্রী লাগিল। তাহার এই অসাধারণ চারটে পাশ-করা কুল-প্রদীপ ভাইটির বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলেই সে চটিয়া উঠিত। কিন্তু আজ নাকি তাহার বুকজোড়া ব্যথায় সমস্ত দেহ অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাই সে চুপ করিয়াই রহিল। ঘরে প্রদীপ ছিল বটে, কিন্তু সে আলোক তেমন উজ্জ্বল ছিল না—মনোরমা তাহার স্বামীর মুখের ভাবটা ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিল না; বলিয়া উঠিল, খুব সাবধান, খুব সাবধান! এখন অনেকরকম ফন্দি-ফিকির হতে থাকবে—কিছুতে কান দিও না। বাবাকে জিজ্ঞাসা না করে একটি কাজও করতে যেয়ো না যেন। কাল সকালের গাড়িতেই তিনি এসে পড়বেন—আমি অনেক করে চিঠি লিখে দিয়েচি। যাই বল, বাবা না এলে আমার কিছুতে ভয় ঘুচবে না।

গোকুল উঠিয়া বলিল, তোমার বাবা কি আসবেন?

আসবেন না? তিনি না এলে এ সময়ে সামলাবে কে? নিমতলার কুণ্ডুদের আড়তের বাবাই হলেন সর্বেসর্বা। কিন্তু তা বলে এমন বিপদে মেয়ে-জামাইকে তিনি ত ফেলে দিতে পারবেন না!

গোকুল চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল। মনোরমা অত্যন্ত খুশী এবং ততোধিক উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল, তোমার দোকানপত্র যা-কিছু ফেলে দাও বাবার ঘাড়ে। আর কি কাউকে কিছু দেখতে হবে? শুধু বলবে, আমি জানিনে, বাবা জানেন। ব্যস! তখন ঠাকুরপোই বল, আর যেই বল, কারু সাধ্যি হবে না যে তাঁর কাছে দাঁত ফোটাবেন। বুঝলে না? বলিয়া মনোরমা একান্ত অর্থপূর্ণ একটা কটাক্ষ করিল। ম্লান আলোকে গোকুল তাহা দেখিতে পাইল কি না, বলা যায় না; কিন্তু সে হাঁ-না কোন কথাই কহিল না। তাহার পরেও অনেক ভাল ভাল কথা বলিয়াও মনোরমা যখন আর স্বামীর নিকট হইতে কোন সাড়াই পাইল না, তখন বাতাসটা যে কোন্-মুখো বহিতেছে, তাহা ঠাহর করিতে না পারিয়া সে সে-রাত্রির মত ক্ষান্ত দিল। সকালবেলা গোকুল অতিশয় ব্যস্তভাবে ভবানীর ঘরের সুমুখে আসিয়া কহিল, মা, লোহার সিন্দুকের চাবিটা কি বিনোদ তোমার কাছে রেখে গেছে?

ভবানী সংক্ষেপে বলিলেন, কৈ না।

চাবিটা গোকুলের নিজের কাছেই ছিল। কিন্তু সে মনে মনে অনেক মতলব করিয়াই এই মিথ্যাটা আসিয়া কহিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, এমন জিনিসটা বিনোদের হাতে দেওয়া সম্বন্ধে মা নিশ্চয়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু মায়ের এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মুখে তাহার সমস্ত কৌশলই ভাসিয়া গেল। তখন সে ম্লানমুখে আস্তে আস্তে কহিল, কি জানি, সে-ই কোথায় রাখলে, না আমিই কোথায় ফেললুম!

ভবানী কোন কথাই কহিলেন না। এই ভিড়ের বাড়িতে সিন্দুকের চাবির উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না, এ-সংবাদেও মা যখন কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন না এবং এই তাঁহার একান্ত নির্লিপ্ততা গোকুলের বুকে যে কি শূল বিঁধিল, তাহাও যখন তিনি চোখ তুলিয়া একবার দেখিলেন না, তখন সে যে কি বলিবে, কি করিয়া মাকে সংসার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিবে, তাহার কোন কূলকিনারাই চোখে দেখিতে পাইল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, শম্ভু আর দরবারী পিসীমাদের যে আনতে গেল, কৈ তারাও ত এখনো এসে পড়ল না!

ভবানী মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, কি জানি, বলতে পারিনে ত!

গোকুল বলিল, ভাগ্যে লোক পাঠাতে তুমি বলেছিলে মা! এখন না আসেন, তাঁদের

হচ্ছে। কিন্তু আমরা ত দোষ থেকে খালাস হয়ে গেলুম। তুমি যে কতদূরে ভেবে কাজ কর মা, তাই শুধু আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি। তুমি না থাকলে আমাদের—

ভবানী চুপ করিয়া রহিলেন। গোকুলের মুখের এমন কথাটাতেও তাঁহার গম্ভীর বিষণ্ণ-মুখে সন্তোষ বা আনন্দের লেশমাত্র দীপ্তি প্রকাশ পাইল না। গোকুল অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বাহিরে আসিয়াই গোকুল শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে জেলার নূতন ডেপুটি এবং কয়েকজন উকিল-মোক্তার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিনোদ তাঁহাদের পার্শ্বে বসিয়া মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা কহিতেছে।

এই সমস্ত বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের কাছে ছোটভায়ের পরিচয়টা কোন সুযোগে দিয়া ফেলিবার জন্য গোকুল একেবারে ছটফট করিতে লাগিল। অথচ বিনোদের সমক্ষে তাহারই চারটে পাশ করার খবর দিবার উপায় ছিল না—সে তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত।

সে খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক করিয়া হাকিমের সুমুখে আসিয়া একেবারে মাথা ঝুঁকাইয়া সেলাম করিল এবং একান্ত বিনয়ের সহিত কহিল, এটি আমার ছোটভাই বিনোদ —অনার গ্রাজুয়েট।

বিনোদ ক্রুদ্ধ-কটাক্ষে বড়ভায়ের মুখের প্রতি চাহিল; কিন্তু গোকুল ভ্রূক্ষেপও করিল না; কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, আমার সাতপুরুষের ভাগ্য যে আপনি এসেচেন—বিনোদ, হাকিমের সঙ্গে ইংরিজীতে আলাপ ক'চ্চ না কেন? ওঁরা হাকিম, হুজুর; ওঁদের কি বাংলায় কথা কওয়া সাজে? পাঁচজনে শুনলেই বা তোমাকে বলবে কি?

আশেপাশের ভদ্রলোকেরা মুখ তুলিয়া চাহিল। ডেপুটিবাবু সংকুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন এবং অসহ্য লজ্জায় বিনোদের সমস্ত চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। দাদার স্বভাব সে ভালমতেই জানিত। সুতরাং নিরস্ত করিতে না পারিলে দাদা যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবেন, তাহার কোন হিসাব-নিকাশই ছিল না।

একটা কথা শুনুন, বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই হাত ধরিয়া গোকুলকে একপাশে টানিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আমাকে কি আপনি এক্ষুণি বাড়ি থেকে তাড়াতে চান? এ-রকম করলে আমি ত একদণ্ডও টিকতে পারিনে।

গোকুল ভীত হইয়া কহিল, কেন? কেন ভাই?

কতদিন বলেচি আপনার এ অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারিনে; তবু কি আপনি আমাকে রেহাই দেবেন না? আমার মতন পাশ-করা লোক গলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্চে যে! বলিয়া বিনোদ ক্ষোভে অভিমানে মুখখানা বিকৃত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল।

গোকুল লজ্জায় এতটুকু হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বোধ করি বলিতে বলিতে গেল, এরূপ কর্ম সে আর করিবে না। অথচ আধ-ঘন্টা পরে বিনোদ এবং বোধ করি উপস্থিত অনেকেরু কানে গেল—গোকুল চীৎকার করিয়া একটা ভৃত্যকে সাবধান করিয়া দিতেছে—ছোটবাবুর অনার গ্রাজুয়েটের সোনার মেডেলটা যেন সকলে হাতে করিয়া, ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া, নোংরা করিয়া না ফেলে।

ডেপুটিবাবু একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া বিনোদের মুখের প্রতি চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

নয়

নিমতলার কুণ্ডুদের আড়ত কানা করিয়া গোকুলের শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাকা চুল, কাঁচা গোঁফ, বেঁটে আঁটসাঁট গড়ন। অত্যন্ত পাকা লোক। আড়তের ছোঁড়ারা আড়ালে বলিত, বাস্তুঘুঘু। শ্রাদ্ধবাটীতে একমুহূর্তেই তিনি কর্মকর্তা হইয়া উঠিলেন এবং ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই পাড়াসুদ্ধ সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়া ফেলিলেন। এই কর্মদক্ষ হিসাবী শ্বশুরকে পাইয়া গোকুল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আত্মীয়-বান্ধবেরা সবাই শুনিল, মেয়ে-জামাইয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তিনি ব্যবসা হাতে লইবার জন্য দয়া করিয়া আসিয়াছেন।

রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে, খাওয়ান-দাওয়ানও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, কর্তাবাবু আহ্বান করিয়াছেন। গোকুল সসম্ভ্রমে ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুরমশাই—নিমাই রায়, বহুমূল্য কার্পেটের আসনে বসিয়া দৌহিত্রীকে সঙ্গে লইয়া জলযোগে বসিয়াছেন, অদূরে কন্যা মনোরমা মাথার আঁচলটা অমনি একটু টানিয়া দিয়া সৎ-শাশুড়ীর আসল পরিচয়টা চুপি চুপি পিতৃসকাশে গোচর করিতেছে, এমনি সময়ে গোকুল আসিয়া দাঁড়াইল।

শ্বশুরমশাই ক্ষীরের বাটিটা একচুমুকে নিঃশেষ করিয়া, বাটির কানায় গোঁফটা মুছিয়া লইয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, বাবাজী, একটি প্রশ্ন করি তোমাকে। বলি হাতের ঢিল আর মুখের কথা একবার ফসকে গেলে কি আর ফেরানো যায়?

গোকুল হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, আজ্ঞে না।

নিমাই কন্যার প্রতি চাহিয়া একটু-স্নিগ্ধ-গম্ভীর হাস্য করিয়া জামাতাকে কহিলেন, তবে?

এই 'তবে'র উত্তর জামাতা কিন্তু আকাশ-পাতাল খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই ভূমিকাটি ধীরে ধীরে জমাট করিয়া তুলিতে লাগিলেন, কহিলেন, বাবাজী, তোমরা ছেলেমানুষ দুটিতে যে কান্নাকাটি করে আমাকে এই তুফানে হাল ধরতে ডেকে আনলে—তা হাল আমি ধরতে পারি, ধরবও, কিন্তু তোমাদের ত ছটফট করলে চলবে না বাবা। যেখানে বসতে বলব, যেখানে দাঁড়াতে বলব, ঠিক তেমনি করে থাকা চাই, তবেই ত এই সমুদ্রে পাড়ি জমাতে পারব। বিনোদ বাবাজী হাজারীবাগে ছিলেন, এই যে-সব এলেমেলো কথা যাকে তাকে বলে বেড়াচ্চ এটা কি হচ্চে? এ যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা হচ্চে, সেটা কি বিবেচ্য করতে পারচ না?

পিতার বক্তৃতা শুনিয়া কন্যা আহ্লাদে গদগদ হইয়া ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, হচ্চেই ত বাবা। তাইতে ত তোমাকে আমরা ডেকে এনেচি। আমরা কিছু জানিনে—তুমি যা বলবে, যা করবে, তাই হবে। আমরা জিজ্ঞেসা পর্যন্ত করব না, তুমি কি করচ না করচ।

পিতা খুশী হইয়া কহিলেন, এই ত আমি চাই মা! মামলা-মকদ্দমা অতি ভয়ানক জিনিস। শোননি মা, লোকে গাল দেয়, 'তোর ঘরে মামলা ঢুকুক'। সেই মামলা এখন তোমাদের ঘরে। আমাদের নাকি বড় পাকা মাথা, তাই সাহস করচি, তোমাদের আমি কিনারায় টেনে তুলে দিয়ে তবে যব—এতে আমার নিজের যাই হোক। একটি একটি করে তাদের গলা টিপে বার করব, তবে আমার নাম বন্দিপাড়ার নিমাই রায়। বলিয়া তিনি মুখের ভাবটা এমনধারাই করিলেন যে, ওয়াটারলুর লড়াই জিতিয়া ওয়েলিংটনের মুখেও বোধ করি অতবড় গর্ব প্রকাশ পায় নাই। গলা বাড়াইয়া দ্বারের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মা মনু, এইখানেই আমার হাতে একটু জল দে, মুখটা ধুয়ে ফেলি: আর বাইরে যাব না। আর অমনি একটু বেরিয়ে দেখ মা, কেউ কোথাও কান পেতে-টেতে আছে কি না। বলা যায় না ত—এ হ'লো শত্রুর পুরী।

মনোরমা যথানির্দিষ্ট কর্তব্য সমাপন করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন করিল। গোকুল বিহ্বল বিবর্ণ-মুখে একবার স্ত্রীর প্রতি, একবার শ্বশুরের প্রতি চাহিতে লাগিল। এতক্ষণ ধরিয়া পিতাপুত্রীতে যত কথা হইল, তাহার একটা বর্ণও বুঝিতে পারিল না। এ কাহাদের কথা, কাহার ঘরে মামলা ঢুকিল, কাহাকে গলা টিপিয়া কে বাহির করিতে চায়, কাহার কি সর্বনাশ হইল—প্রভৃতি ইশারা-ইঙ্গিতের বিন্দুমাত্র তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া একেবারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

নিমাই কহিলেন, দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবাজী, একটু স্থির হয়ে বসো—দুটো কথাবার্তা হয়ে যাক।

গোকুল সেইখানে বসিয়া পড়িল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই তোমাদের সুসময়। যা করে নিতে পার বাবা, এইবেলা। কিন্তু একটা সর্বনেশে মকদ্দমা যে বাধবে, সেও চোখের উপরই দেখতে পাচ্চি। তা বাধুক, আমি তাতে ভয় খাইনে—সে জানে হাটখোলার যদু উকিল আর তারিণী মোক্তার। বন্দিপাড়ার নিমাই রায়ের নাম শুনলে বড় বড় উকিল

ব্যারিস্টার কৌঁসুলীর মুখ শুকিয়ে যায়—তা এ তো একফোঁটা ছোঁড়া—না হয় দু'পাত ইংরিজী পড়েছে।

গোকুল আর থাকিতে না পারিয়া সভয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, আপনি কার কথা বলচেন? কাদের মকদ্দমা?

এবার অবাক হইবার পালা—বন্দিপাড়ার নিমাই রায়ের। প্রশ্ন শুনিয়া তিনি গভীর বিস্ময়ে গোকুলের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

মনোরমা ব্যাকুল হইয়া সজোরে বলিয়া উঠিল, দেখলে বাবা, যা বলোচ তাই। জিজ্ঞাসা করচেন কার মকদ্দমা! তোমার দিব্যি করে বলচি বাবা, এঁর মত সোজা মানুষ আর ভূ-ভারতে নেই। এঁকে যে ঠাকুরপো ঠকিয়ে সর্বস্ব নেবে সে কি বেশী কথা? তুমি এসেচ, এই যা ভরসা, নইলে সোম-বচ্ছরের মধ্যে দেখতে পেতে বাবা, তোমার নাতি-নাতকুড়েরা রাস্তায় দাঁড়িয়েচে।

নিমাই নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই বটে। তা যাক, আর সে ভয় নেই—আমি এসে পড়েছি। কিন্তু তোমাদের আড়তের ঐ-সব চক্কোত্তি-ফক্কোত্তিকে আমি আগে তাড়াব। ওরা সব হচ্ছে—বরের মাসী কনের পিসী, বুঝলে না মা! ভেতরে ভেতরে যদি না ওরা তোমার বিনোদের দলে যোগ দেয় ত আমার নামই নিমাই রায় নয়। লোকের ছায়া দেখলে তার মনের কথা বলতে পারি। বলিয়াই নিমাই একবার গোকুলের প্রতি, একবার কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

কন্যা তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিল, এখ্খুনি এখ্খুনি! আমি আর জানিনে বাবা, সব জানি। জেনেশুনেও বোকা হয়ে বসে আছি। তোমার যাকে খুশি রাখো, যাকে খুশি তাড়াও, আমরা কথাটি ক'ব না।

এতক্ষণে গোকুল সমস্তটা বুঝিতে পারিল। তাহার ছোটভাই বিনোদ তাহারই বিরুদ্ধে মকদ্দমা করিতে ষড়যন্ত্র করিতেছে। অথচ ইহারা যখন তাহার সমস্ত অভিসন্ধিই বুঝিয়া ফেলিয়াছে, সে শুধু নির্বোধের মত সেই ছোটভাইকে প্রসন্ন করিবার জন্য ক্রমাগত তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রথমটা তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন তাহার ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু ঐ একটি মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই সমস্ত নিবিয়া গিয়া, নিদারুণ অন্ধকারে তাহার দৃষ্টি, তাহার বুদ্ধি, তাহার চৈতন্যকে পর্যন্ত যেন বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। তাহার দুই কানের মধ্যে কত লোক যেন ক্রমাগত চীৎকার করিতে লাগিল—বিনোদ তাহার নামে আদালতে নালিশ করিয়াছে। নিমাই কহিলেন, টাকার দিকে চাইলে হবে না বাবাজী, সাক্ষীদের হাত করা চাই। তাঁদের মুখেই মকদ্দমা। বুঝলে না বাবাজী!

গোকুল মাথা ঝুঁকাইয়া কাঠের মত বসিয়া রহিল, বুঝিল কি না তাহার জবাব দিল না। বোধ করি কথাটা তাহার কানেও যায় নাই।

কিন্তু তাঁহার কন্যার কানে গিয়াছিল। সে ঢালা হুকুমও দিল, অবশ্য কন্যা এবং জামাতা একই পদার্থ এবং অন্যান্য বিষয়ে তার কথাতেই কাজ চলিতে পারে বটে; কিন্তু এই সাক্ষীর বাবদে গোপনে টাকা খরচ করিবার অবারিত হুকুমটা জামাতা বাবাজীর মুখ হইতে ঠিক না পাইয়া রায়মহাশয়ের উৎসাহের প্রাখর্যটা যেন ঢিমা পড়িয়া গেল। বলিলেন, আচ্ছা সে-সব পরামর্শ কাল-পরশু একদিন ধীরে সুস্থে হবে অখন। আজ যাও বাবাজী, হাতমুখ ধুয়ে কিছু জলটল খাও, সারাদিন—

কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই গোকুল হঠাৎ উঠিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। রায়মহাশয় মেয়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন, বাবাজী ত কথাই কইলে না! টাকা ছাড়া কি মামলা-মকদ্দমা করা যায়? বিপক্ষের সাক্ষী ভাঙিয়ে নেওয়া কি শুধু-হাতে হয় রে বাপু! ভয় করলে চলবে কেন?

নিমাই পাকা লোক। মানুষের ছায়া দেখিলে তার মনের ভাব টের পান। সুতরাং গোকুলের এই নিরুদ্যম স্তব্ধতা শুধু যে টাকা খরচের ভয়েই, তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সময় লাগে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের এই ঘোর বিপদের দিনেও ত তিনি আর অভিমান করিয়া দূরে থাকিতে পারেন না। বিনা হিসাবে অর্থব্যয় করিবার

গুরুভার তাঁহার মত আপনার লোক ছাড়া কে আর মাথায় লইতে আসিবে? কাজেই নিজের যতই কেন ক্ষতি হোক না, এমন কি কুণ্ডুদের আড়তের কাজটা গেলেও তাঁর পশ্চাদপদ হইবার জো নাই। লোকে শুনিলে যে গায়ে থুথু দিবে। গোকুল চলিয়া গেলে, এমনি অনেক প্রকারের কথায়, অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি তাঁর বিপদগ্রস্ত কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

দশ

সামান্য কারণেই গোকুলের চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিত। তাহাতে সারারাত্রি জাগিয়া সকালবেলা যখন সে তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই একান্ত রুক্ষমূর্তি দেখিয়া ভবানী ভীত হইলেন। গোকুল ঘরে পা দিয়া কহিল, ওঃ—সৎমা যে কেমন তা জানা গেল।

একে ত এই কথাটা সে আজকাল পুনঃপুনঃ কহিতেছে; তাহাতে ও অন্যান্য নানা প্রকারে উত্ত্যক্ত হইয়া ভবানীর নিজের স্বাভাবিক মাধুর্য নষ্ট হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাহিরের লোক, আত্মীয়-কুটুম্বেরা তখনও নাকি বাটীতে ছিল তাই তিনি কোনমতে আপনাকে সংযত করিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, কি হয়েচে?

গোকুল লাফাইয়া উঠিল। কহিল, হবে কি? কি করতে পার তোমরা? বেন্দা নালিশ করে কিছু করতে পারবে না তা বলে দিয়ে যাচ্চি—এদিকে ঈশের মূল আছে। নিমাই রায়—বন্দিপাড়ার নিমাই রায়, সোজা লোক নয়, তা জেনে রেখো।

ভবানী ক্রোধ ভুলিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিনোদ নালিশ করবে, এ কথা তোমাকে কে বললে?

গোকুল কহিল, সবাই বললে। কে না জানে যে, বিনোদ আমার নামে নালিশ করবে?

ভবানী বলিলেন, কৈ আমি ত জানিনে।

আচ্ছা, জানো কি না, সে আমরা দেখে নিচ্চি! বলিয়া গোকুল সক্রোধে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সহসা তাহার শ্বশুরের কথাটাই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমাদের মত শত্রুদের আমি ত আর বাড়িতে রাখতে পারিনে!

কিন্তু কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার রুদ্রমূর্তি ভয়ে বিবর্ণ এবং ক্ষুদ্র হইয়া গেল। এবং ব্যাধের আকৃষ্ট ধনুর সম্মুখ হইতে ভয়ার্ত মৃগ যেমন করিয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া পলায়, গোকুলও ঠিক তেমনিভাবে মায়ের সুমুখ হইতে সবেগে পলায়ন করিল। সে যে কি কথা বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহা সে জানে, তাই সেদিন সমস্ত দিবারাত্রির মধ্যে কোথাও তাহার সাড়াশব্দ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। কুটুম্ব-ভোজনের সময়েও সে উপস্থিত রহিল না। ভবানী প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, বড়বাবু জরুরী তাগাদায় বাহির হইয়া গিয়াছেন: কখন আসিবেন কাহাকেও বলিয়া যান নাই। নিমাই রায় কর্মকর্তা সাজিয়া আদর-আপ্যায়ন কাহাকেও কম করিলেন না। বাহিরের নিমন্ত্রিত যে কয়জন আসিয়াছিলেন, বিনোদ তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া নিঃশব্দে ভোজন করিয়া উঠিয়া গেল।

ঝড়ের পূর্বে নিরানন্দ প্রকৃতি যেরূপ স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করে, অনেক লোকজন সত্ত্বেও সমস্ত বাড়িটা সেইরূপ অশুভ ভাব ধরিয়া রহিল। বিশেষ কোন হেতু না জানিয়াও চাকর-দাসীরা কেমন যেন কুণ্ঠিত ত্রস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমনি করিয়া আরও দুইদিন কাটিল। যাঁহারা শ্রাদ্ধোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা একে একে বিদায় লইলেন। পিসীমা তাঁহার ছেলেমেয়ে লইয়া বর্ধমানে চলিয়া গেলেন। বিনোদ তাহার বাহিরে বসিবার ঘরে বসিয়াই, সকাল হইতে সন্ধ্যা কাটাইয়া দেয়—কাহারো সহিত বাক্যালাপ করে না। ভিতরে ভবানী একেবারেই নির্বাক্ হইয়া গিয়াছেন! গোকুল পলাইয়া পলাইয়া বেড়ায়—ভিতরে বাহিরে কোথাও তাহার সাড়া পাওয়া যায় না—এমনভাবেও তিন-চারদিন অতিবাহিত হইল। মনোরমা এবং তাঁহার পুত্রকন্যা ছাড়া এ বাড়িতে আর যেন কোন মানুষ নাই।

নিমাই রায় তাঁহার কলিকাতার সম্পর্ক চুকাইয়া দিবার জন্য গিয়াছিলেন। সেদিন সকালবেলা, বোধ করি বা কুণ্ডুদের অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়াই, মেয়ে-জামাইকে কূলে তুলিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। আজ সঙ্গে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রটিও আসিয়াছিল।

আগমনের হেতুটা যদিচ তখনও পরিষ্কার হয় নাই, কিন্তু সে যে তাহার ভগিনী ও ভগিনীপতিকে শুধু দেখিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়া আসে নাই, সেটুকু বুঝা গিয়াছিল। এ কয়দিন অতিপ্রাজ্ঞ শ্বশুরের সবল উৎসাহের অভাবে গোকুল যেরূপ ম্রিয়মাণ হইয়াছিল, আজ তাহারও সে ভাব ছিল না। মনোরমার ত কথাই নাই। সকাল হইতে সমস্ত বাড়িটা সে যেন চষিয়া বেড়াইতে লাগিল। খাওয়া-দাওয়ার পর মনোরমার ঘরের মধ্যেই ইহাদের বৈঠক বসিল; এবং অল্পকালের বাদানুবাদেই সমস্ত স্থির হইয়া গেল। আজ চক্রবর্তীর তলব হইয়াছিল। তাহাকে বিদায় দিবার পূর্বে সমস্ত কাগজপত্র নিমাই তন্নতন্ন করিয়া বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। একান্ত পীড়িত ও উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে সে বেচারা না পারে সব কথার জবাব দিতে, না পারে ঠিকমত হিসাব বুঝাইতে। ক্রমাগতই সে ধমক খাইতেছিল এবং বাপ-ব্যাটার কড়া জেরার চোটে, সে যে একজন পাকা চোর ইহাই নিজেকে প্রতিপন্ন করিতেছিল।

নিমাই কহিলেন, আমি ছিলাম না, তাই অনেক টাকাই তুমি আমার খেয়েচ, কিন্তু আর না, যাও তোমাকে জবাব দিলুম।

চক্রবর্তীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল; কহিল, বাবু, আমি আজকের চাকর নই, কর্তামশাই আমাকে জানতেন।

গোকুল ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রায়মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুখ খিঁচাইয়া কহিল, তোমার কর্তামশায়ের মত কি বাবাকে গরু পেয়েচ, হ্যাঁ? আর মায়া বাড়াতে হবে না; সরে পড়।

এই নাবালক শ্যালকের একান্ত অভদ্র তিরস্কারে ব্যথিত হইয়া চক্রবর্তী চোখ মুছিয়া ফেলিল এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া গোকুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, বাবু, আমার চার মাসের মাইনে—

গোকুল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে ত আছেই চক্কোত্তিমশাই, আরও যদি—

কথাটা শেষ হইল না। নিমাই ডান হাত প্রসারিত করিয়া গোকুলকে থামাইয়া দিয়া জলদগম্ভীর-স্বরে কহিলেন, তুমি থাম না বাবাজী। চক্রবর্তীকে কহিলেন, বাবু উনি নয়, বাবু আমি! আমি যা করব, তাই হবে। মাইনে তুমি পাবে না। তোমাকে যে জেলে দিচ্চিনে, এই তোমার বাপের ভাগ্যি বলে মানো।

চক্রবর্তী দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া গেল।

মনোরমা এতক্ষণ কথা কহিতে না পাইয়া ফুলিতেছিল। সে যাইবামাত্রই মুখখানা গম্ভীর করিয়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কণ্ঠস্বরে আব্‌দার মাখাইয়া দিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, ফের যদি তুমি বাবার কথায় কথা কবে—আমি হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরব, না হয় সব্বাইকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাব।

গোকুল জবাব দিল না, নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। পিতা ও ভ্রাতার সম্মুখে স্বামীর এই একান্ত বাধ্যতায় সুখে গর্বে গলিয়া গিয়া মনোরমা আধ-আধ স্বরে কহিল, আচ্ছা বাবা, আমাদের নন্দলালকে কেন দোকানের একটা কাজে লাগিয়ে দাও না?

নিমাই বলিলেন, তাই ত ছোঁড়াটাকে সঙ্গে আনলুম মা। আমি ত আর বেশী দিন এখানে থাকতে পারব না; আমাদের নিজেদের চালানি কাজটা তা হলে বন্ধ হয়ে যাবে। আমার কি আসবার জো ছিল মা, বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেচি। তিনি প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, রায়মশাই, তুমি না ফিরে আসা পর্যন্ত আমার আহার-নিদ্রা বন্ধ হয়ে থাকবে। দিবারাত্রি তোমার পথ চেয়ে বসেই আমার দিন যাবে। তাই মনে করচি মা, আমার নন্দলালকেই দেখিয়ে-শুনিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে যাব। আর যাই হোক, ও আমারই ত ছেলে!

তাই করে যাও বাবা। আমি সেইজন্যেই ত—

হঠাৎ মনোরমা মাথার আঁচল সবেগে টানিয়া দিয়া চুপ করিল। ঘরের সম্মুখে চক্রবর্তী ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কহিল, বাবু, মা এসেছেন—

অকস্মাৎ মা আসিয়াছেন শুনিয়া গোকুল ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আজ সাত-আট দিন তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত নাই। কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া ভবানী সহজ-কণ্ঠে ডাকিলেন, গোকুল!

গোকুল তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল, কেন মা?

ভবানী অন্তরালে থাকিয়াই তেমনই পরিষ্কার-কণ্ঠে কহিলেন, এ-সব পাগলামি করতে তোমাকে কে বললে? চক্রবর্তীমশাই অনেকদিনের লোক, তিনি যতদিন বাঁচবেন, আমি ততদিন তাঁকে বাহাল রাখলুম। সিন্দুকের চাবি খাতাপত্র নিয়ে তাঁকে দোকানে যেতে দাও।

ঘরের মধ্যে বজ্রাঘাত হইলেও বোধকরি লোক্কে এত আশ্চর্য হইত না। ভবানী এক-মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর একটা কথা। বেয়াইমশাই দয়া করে এসেচেন—কুটুমের আদরে দু'দিন থাকুন; দেখুন-শুনুন; কিন্তু দোকানে আমার চুরি হচ্চে কি না হচ্চে, সে চিন্তা করবার তাঁর আবশ্যক নাই। চক্রবর্তীমশাই, আপনি দেরি করবেন না, যান। আমার ইচ্ছে নয়, বাইরের লোক দোকানে ঢুকে খাতাপত্র নাড়াচাড়া করে। গোকুল চাবি দে, উনি যান। বলিয়া কাহারো উত্তরের জন্য তিলার্ধ অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন। ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়া গেলে, নিমাই রায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, একেই বলে পরের ধনে পোদ্দারি। হুকুম দেবার ঘটাটা একবার দেখলে বাবাজী।

বাবাজী কিন্তু জবাব দিল না। জবাব দিল তাঁহার নিজের পুত্ররত্নটি। সে কহিল, এ ত জানা কথাই বাবা, তুমি থাকলে ত আর চুরি চলবে না! বলিহারি হুকুমকে!

পিতা সায় দিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই বটে! এবং চক্রবর্তীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায় জ্বলিয়া উঠিয়া মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন, আর দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে স্যাঙাত, বিদায় হও না! আবার ডেকে আনা হয়েচে? নেমকহারাম। জেলে দিলুম না কিনা, তাই। দূর হও সুমুখ থেকে। বামুন বলে মনে করেছিলুম—যাক মরুক গে; যা করেচে তা করেচে, না হয় দু-পাঁচ টাকা দিয়ে দেব—কিন্তু আবার! তোমাকে শ্রীঘরে পোরাই কর্তব্য ছিল আমার।

কিন্তু মনোরমা স্বামীর ভাব দেখিয়া কথাটি কহিতে সাহস করিল না। গোকুল সেই যে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঠিক তেমনি করিয়া একভাবে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

চক্রবর্তী কাহারও কোন কথার জবাব না দিয়া প্রভুকে উদ্দেশ করিয়া নম্রস্বরে কহিল, তা হলে খাতাপত্রগুলো আমি নিয়ে চললুম। সিন্দুকের চাবিটা দিন।

গোকুল বিনাবাক্যব্যয়ে কোমর হইতে চাবির তোড়াটা চক্রবর্তীর পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। চক্রবর্তী চাবি ট্যাঁকে গুঁজিয়া, খাতা বগলে পুরিয়া, হাসি চাপিয়া হেলিয়া-দুলিয়া প্রস্থান করিল। তাহার এই প্রস্থানের অর্থ যথেষ্ট প্রাঞ্জল। সুতরাং কাহাকেও কোন প্রশ্ন না করিয়াই, বন্দিপাড়ার নিমাই রায়ের কালো মুখের উপর কে যেন সংসারের সমস্ত কালি ঢালিয়া দিয়া গেল।

অতঃপর এই মন্ত্রণাগৃহের মধ্যে যে দৃশ্যটি ঘটিল, তাহা সত্যই অনির্বচনীয়। পিতা ও ভ্রাতার এই অচিন্তনীয় বিকট লাঞ্ছনায় মনোরমা জ্ঞানশূন্যা হইয়া স্বামীর প্রতি উৎকট তিরস্কার, গঞ্জনা, সর্বপ্রকার বিভীষিকা-প্রদর্শন, অনুনয়-বিনয় এবং পরিশেষে মর্মান্তিক বিলাপ করিয়াও যখন তাঁহার মুখ হইতে পিতার স্বপক্ষে একটা কথাও বাহির করিতে পারিল না, তখন সে মুখ গুঁজিয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল।

গোকুল লজ্জায় ক্ষোভে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, মা যে শত্রুতা করে এমন হুকুম দেবেন, সে আমি কি করে জানব?

নিমাই একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেল। একটা মস্ত ঝঞ্ঝাটের হাত এড়ালুম। ওদিকে শিবতুল্য মনিব আমার কাঁদা-কাটা করচেন—আমার কি কোথাও থাকবার জো আছে। তা ছাড়া, দরকার কি আমার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে! কিন্তু মা মনু, ছেলেপিলের হাত ধরে যদি পথে দাঁড়াও—সে ত দাঁড়াতেই হবে, চোখের উপর দেখ্তে পাচ্ছি—তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবে না যে, বাবা একবার ফিরেও তাকালে না। সে বাবা আমি নই, তা বলে যাচ্চি—তা মেয়েই হও আর জামাতাই হও। বলিয়া তিনি জামাতার প্রতিই একটা তীব্র বক্র কটাক্ষ করিলেন। কিন্তু সে কটাক্ষ ছেলে ছাড়া আর কাহারও কাজে লাগিল না। তিনি তখন আবার প্রদীপ্ত-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এখনো বেঁকে বসেনি বটে, কিন্তু বেঁকলে নিমাই রায় কারু নয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণুরও অসাধ্য—তা

তোমরা দু'জনে একবার গোপনে ভেবে দেখো। বাবা নন্দলাল, আড়াইটে বেজেছে, সাড়ে-তিনটের গাড়িতে আমি যাব। জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—জানো ত তোমার বাপের কথার নড়চড় পৃথিবী উলটে গেলেও হবার জো নেই। বলিয়া তিনি সদর্পে ছেলের হাত ধরিয়া মেয়ে-জামাইকে ভাবিবার একঘণ্টা মাত্র সময় দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কোন কাজই হইল না। একঘণ্টা অতি অল্প সময়—তিনদিন পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া, অবিশ্রাম মান-অভিমান রাগারাগি এবং কটূক্তি করিয়াও গোকুলের মুখ হইতে দ্বিতীয় কথা বাহির করা গেল না। শ্বশুরের এই অত্যন্ত অপমানে তাহার নিজেরই লজ্জা ও ক্ষোভের সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু মায়ের সুস্পষ্ট আদেশের বিরুদ্ধে সে যে কি করিবে তাহা কোনদিকে চাহিয়া দেখিতে না পাইয়াই, সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

এগার

নিমাই যখন দেখিল তাহার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, জল্পনা-কল্পনা নিষ্ফল হইয়া গেল, তখন সে ভীষণ হইয়া উঠিল এবং স্পষ্ট শাসাইয়া দিতে বাধ্য হইল যে তাঁহাকে চাকরি ছাড়াইয়া আনার দরুন ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। তিনি বাঁড়ুয্যেমশাইকে ইতিমধ্যে হাত করিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া গোকুলকে নির্বোধ বলিয়া, অন্ধ বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং এমন একটা ভয়ানক ইঙ্গিত করিলেন যাহাতে বুঝা গেল, নিমাই রায়কে অপমান করিলে সে বিনোদকে গিয়াও সাহায্য করিতে পারে।

গোকুল কাতরকণ্ঠে কহিল, কি করব মাস্টারমশাই, মা যে তাঁকে বাড়িতে রাখতেই চান না। চক্রবর্তীমশাইকে হুকুম দিয়েচেন দোকানে পর্যন্ত যেন তিনি না ঢোকেন।

মাস্টারমশাই প্রশ্ন করিলেন, কারবার, বিষয়-আশয় তোমার না তোমার মায়ের, গোকুল? তা ছাড়া, তোমার বিমাতা এখন তোমার শত্রুপক্ষে, সে সংবাদ রেখেচ ত?

গোকুল ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলে বাঁড়ুয্যেমশাই খুশী হইয়া বলিলেন, তবে পাগলামি করো না ভায়া; রায়মশাইকে বিষয়-আশয়, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বুঝিয়ে, চুপটি করে বসে বসে শুধু মজা দেখ। আমার কথা ছেড়ে দাও, নইলে অমন পাকা লোক একটি এ-তল্লাটে খুঁজলে পাবে না।

গোকুল কহিল, সে ত জানি মাস্টারমশাই; কিন্তু মায়ের অমতে কোন কাজ করতে বাবা যে নিষেধ করে গেছেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বিদ্রূপ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, নিষেধ! মা যে তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াবে সে কি তোমার বাবা জেনে গিয়েছিলেন? নিষেধ করলেই ত হ'লো না। নিষেধ শুনতে গিয়ে কি বিষয়টি খোয়াবে? তা বল? গোকুলের তরফে এ-সকল প্রশ্নের জবাব ছিল না; তাই সে ঘাড় গুঁজিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। রায়মশাই নেপথ্যে থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন। এবার সদরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এই দুইজন মহারথীর সমবেত জেরার মুখে গোকুল অকূলে ভাসিয়া গেল। তাহাকে অধোবদন এবং নিরুত্তর দেখিয়া উভয়েই প্রীত হইলেন এবং তাহার এই সুবুদ্ধির জন্য তাহাকে বারংবার প্রশংসা করিলেন।

বাঁড়ুয্যেমশাই বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে, সফল-মনোরথ রায়মশাই আজ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং তিনি সস্নেহে গোকুলের পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, আমি আশীর্বাদ করচি গোকুল, তুমি যেমন তোমার যথাসর্বস্ব আমাদের হাতে সঁপে দিলে—তোমার তেমনি গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত আমরা লাগতে দেব না। কি বল রায়মশাই?

রায়মশাই আনন্দে বিনয়ে গদ্‌গদ হইয়া কহিলেন, আপনার আশীর্বাদে সে দেশের পাঁচজন দেখতেই পাবে। কিন্তু শত্রুদের আর আমি এ-বাড়িতে একটি দিনও থাকতে দেব না, তা আপনাকে জানিয়ে দিচ্চি বাঁড়ুয্যেমশাই। তা তাঁরা আমার বাবাজীর মা-ই হোন, আর ভাই-ই হোন। আর সেই ব্যাটা চক্কোত্তিকে আমি তাড়িয়ে তবে জলগ্রহণ করব। কে

আছিস রে ওখানে? ব্যাটা বামুনকে ডেকে আন্ দোকান থেকে। বলিয়া রায়মশাই ইহারই মধ্যে ষোল আনা ছাপাইয়া সতর আনার মত একটা হুঙ্কার ছাড়িলেন।

গোকুল সঙ্কুচিত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিল, না না, এখন তাঁকে ডাকবার আবশ্যক নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই দুই হাত দুইদিকে প্রসারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, গোকুল, এ-সব চক্ষুলজ্জার কাজ নয়। তাকে আমরা রাখতে পারব না—কোনমতেই না। তার বড় আস্পর্ধা। আমরা তাকে চাইনে তা বলে দিচ্চি।

প্রত্যুত্তরে গোকুল তেমনি বিনীত-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু মা তাঁকে চান। তিনি যাঁকে বাহাল করচেন তাঁকে ছাড়িয়ে দেবার সাধ্য কারুর নেই। বাবা আমাকে সে ক্ষমতা দিয়ে যাননি। বলিয়া গোকুল পুনরায় মুখ হেঁট করিল। তাহার এই একান্ত অপ্রত্যাশিত উত্তর, এই শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া উভয়েই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বাঁড়ুয্যেমশাই কহিলেন, তা হলে সে থাকবে বল?

গোকুল কহিল, আজ্ঞে হাঁ। চক্কোত্তিমশায়ের উপর আমার আর কোন হাত নেই।

বাঁড়ুয্যেমশাই ভয়ে বলিলেন, তা হলে রায়মশায়ের কি-রকম হবে?

গোকুল কহিল, উনি বাড়ি যান। মা কোনমতেই ওঁকে এখানে রাখতে চান না। আর চাকরি ছাড়ায় ক্ষতি যা হয়েছে, সে আমি মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়ে দেব। বলিয়া কাহারও উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া প্রস্থান করিল।

সবাই মনে করিয়াছিল, এতবড় অপমানের পর রায়মশাই আর তিলার্ধ অবস্থান করিবেন না। কিন্তু আট-দশদিন কাটিয়া গেল—এই মনে করার বিশেষ কোন মূল্য দেখা গেল না। বোধ করি বা কন্যা-জামাতার প্রতি অসাধারণ মমতাবশতঃই তিনি ছোট কথা কানে তুলিলেন না এবং সরেজমিনে উপস্থিত থাকিয়া অহর্নিশ তাহাদের হিতচেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই হিতাকাঙ্ক্ষার প্রবল দাপটে একদিকে গোকুল নিজে যেমন পীড়িত ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল, ওদিকে বাটীর মধ্যে ভবানীও তেমনি প্রতি মুহূর্তেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। বধূ ও তাহার পিতার পরিত্যক্ত শব্দভেদী বাণ খাইতে-শুইতে-বসিতে তাঁহার দুই কানের মধ্যে দিয়া অবিশ্রাম বুকে বিঁধিতে লাগিল।

সেদিন তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, বৌমা, গোকুল কি চায় না যে, আমি বাড়িতে থাকি?

বৌমা জবাব ইচ্ছা করিয়াই দিল না—মাথা হেঁট করিয়া নখের কোণ খুঁটিতে লাগিল।

ভবানী কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিলেন, বেশ, তাই যদি তার ইচ্ছে, সে নিজে এসে স্পষ্ট করে বলে না কেন? এমন করে তোমার ভাইকে দিয়ে, তোমার বাপকে দিয়ে আমাকে দিবারাত্রি অপমান করাচ্ছে কেন?

অথচ গোকুল যে ইহার বাষ্পও না জানিতে পারে, এমন কি তাহাকে সম্পূর্ণ গোপন করিয়াই যে এই ক্ষুদ্রাশয়েরা তাহাদের বিষদন্ত বাহির করিয়া দংশন করিয়া ফিরিতেছিল, এ কথা ভবানীর একবার মনেও হইল না। কিন্তু বধূ ত আর সে বধূ নাই। সে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, অপমান কে কাকে করেচে, সে কথা দেশসুদ্ধ লোক জানে। আমার নিজের জিনিস যদি আমি চোরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আমার বাপ-ভাইকে তুলে দিতে যাই, তাতে তোমার বুকে শূল বেঁধে কেন মা? আর একজনের জন্যে আর-একজনের সর্বনাশ করাটাই কি ভালো?

ভবানী আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিলেন, আমি কার সর্বনাশ করেচি মা?

বধূ কহিল, যাদের করেচ তারাই গাল দিচ্চে। এতে তিনিই বা কি করবেন, আর আমিই বা করব কি! ইঁট মারলেই পাটকেলটি খেতে হয়—তাতে রাগ করলে ত চলে না মা। বলিয়া বধূ চলিয়া গেল।

ভবানী স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। স্বামীর জীবদ্দশায় তাঁহার সেই গোকুল এবং সেই গোকুলের স্ত্রীর কথা মনে করিয়া, অনেকদিন পর আজ আবার তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আজ আর কোন মতেই মন হইতে এ অনুশোচনা দূর করিতে পারিলেন না যে, নির্বোধ তিনি শুধু

নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করেন নাই, ছেলের পায়েও করিয়াছেন। অমন করিয়া বাঁচিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য গোকুলকে লিখাইয়া না দিলে ত আজ এ দুর্দশা ঘটিত না। বিনোদ যত মন্দই হোক, কিছুতেই সে জননীকে এমন করিয়া অপমান ও নির্যাতন করিতে পারিত না।

কিন্তু বিনোদ যে গোপনে উপার্জনের চেষ্টা করিতেছিল, তাহা কেহ জানিত না। সে আদালতে একটা চাকরি যোগাড় করিয়া লইয়া এবং শহরের একপ্রান্তে একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া, সন্ধ্যার পর আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাল সকালেই সে তাহার নূতন বাসায় যাইবে।

ভবানী আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, বিনোদ, আমাকেও নিয়ে চল্ বাবা, এ অপমান আমি আর সইতে পারিনে। তুই যেমন করে রাখবি, আমি তেমনি করে থাকব; কিন্তু এ বাড়ি থেকে আমাকে মুক্ত করে দে। বলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

তার পর একটি একটি করিয়া সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া লইয়া বিনোদ বাহিরে যাইতেছিল, পথে গোকুলের সহিত দেখা হইল। সে দোকানের কাজকর্ম সারিয়া ঘরে আসিতেছিল। অন্যদিন এ অবস্থায় বিনোদ দূরে হইতে পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইত, আজ দাঁড়াইয়া রহিল। বিনোদ কাছে আসিয়া কহিল, কাল সকালেই মাকে নিয়ে আমি নূতন বাসায় যাব।

গোকুল অবাক হইয়া কহিল, নূতন বাসায়? আমাকে না জিজ্ঞেসা করেই বাসা করা হয়েচে নাকি?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

এম. এ. পড়া তা হলে ছাড়লে বল?

বিনোদ কহিল, হাঁ।

সংবাদটা গোকুলকে যে কিরূপ মর্মান্তিক আঘাত করিল, সন্ধ্যার অন্ধকারে বিনোদ তাহা দেখিতে পাইল না। ছোটভাইয়ের এই এম. এ. পাসের স্বপ্ন সে শিশুকাল হইতেই দেখিয়া আসিয়াছে। পরিচিতের মধ্যে যেখানে যে-কেহ কোন-একটা পাশ করিয়াছে—খবর পাইলেই গোকুল উপযাচক হইয়া সেখানে গিয়া হাজির হইত এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়া শেষে এম. এ. পরীক্ষাটা শেষ হওয়ার জন্য নিজের অত্যন্ত দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। ব্যাপারটা যাহারা জানিত, তাহারা মুখ টিপিয়া হাসিত। যাহারা জানিত না, তাহারা উদ্বেগের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেই 'আমার ছোটভাই বিনোদের অনার গ্রাজুয়েটে'র কথাটা উঠিয়া পড়িত। তখন কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইয়া বিনোদের সোনার মেডেলটাও বাহির হইয়া পড়িত। কিন্তু কি করিয়া যে মখমলের বাক্সসুদ্ধ জিনিসটা গোকুলের পকেটে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার কোন হেতুই সে স্মরণ করিতে পারিত না। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল, সেকরা ডাকাইয়া এই দুর্লভ বস্তুটি সে নিজের ঘড়ির চেনের সঙ্গে জুড়িয়া লয় এবং এতদিনে তাহা সমাধা হইয়াও যাইত—যদি না বিনোদ ভয় দেখাইত—এরূপ পাগলামি করিলে সে সমস্ত টান মারিয়া পুকুরের জলে ফেলিয়া দিবে। গোকুল উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়াছিল, এম. এ.-র মেডেলটা না-জানি কিরূপ দেখিতে হইবে এবং এ বস্তু ঘরে আসিলে কোথায় কিভাবে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

এ-হেন এম. এ. পাশের পড়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল শুনিয়া গোকুলের বুকে তপ্ত শেল বিঁধিল। কিন্তু আজ সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া কহিল, তা বেশ কিন্তু মাকে নূতন বাসায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে কি শুনি?

সে দেখা যাবে। বলিয়া বিনোদ চলিয়া গেল। সে নিজেও মায়ের মত অল্পভাষী; যে-সকল কথা সে এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছিল, তাহার কিছুই দাদার কাছে প্রকাশ করিল না।

গোকুল বাড়ির ভিতরে পা দিতে না দিতেই, হারুর মা সংবাদ দিল, মা একবার ডেকেছিলেন। গোকুল সোজা মায়ের ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি এমন সন্ধ্যার সময়েও নির্জীবের মত শয্যায় পড়িয়া আছেন। ভবানী উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, গোকুল, কাল সকালেই আমি এ বাড়ি থেকে যাচ্ছি।

সে এইমাত্র বিনোদের কাছে শুনিয়া মনে মনে জ্বলিয়া যাইতেছিল; তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, তোমার পায়ে ত আমরা কেউ দড়ি দিয়ে রাখিনি মা। যেখানে খুশি যাও, আমাদের তাতে কি? গেলেই বাঁচি। বলিয়া গোকুল মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলায় ভবানী যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, হাবুর মা কাছে বসিয়া সাহায্য করিতেছিল। গোকুল উঠানের উপর দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, হাবুর মা, আজ ওঁর যাওয়া হতে পারে না, বলে দে।

হাবুর মা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বড়বাবু?

গোকুল কহিল, আজ দশমী না? ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, আজ গেলে গেরস্থের অকল্যাণ হয়। আজ আমি কিছুতেই বাড়ি থেকে যেতে দিতে পারব না, বলে দে। ইচ্ছা হয় কাল যাবেন—আমি গাড়ি ফিরিয়ে দিয়েচি। বলিয়া গোকুল দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেছিল, মনোরমা হাত নাড়িয়া তাহাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া তর্জন করিয়া কহিল, যাচ্ছিলেন, আটকাতে গেলে কেন?

এ-কয়দিন স্ত্রীর সহিত গোকুলের বেশ বনিবনাও হইতেছিল। আজ সে অকস্মাৎ মুখ ভেঙ্গাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, আটকালুম আমার খুশি। বাড়ির গিন্নী, অদিনে, অক্ষণে বাড়ি থেকে গেলে ছেলেপিলেগুলো পটপট করে মরে যাবে না? বলিয়া তেমনি দ্রুতবেগে বাহিরে চলিয়া গেল।

রকম দ্যাখো! বলিয়া মনোরমা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিল।

বার

দশমীর পর একাদশী গেল, দ্বাদশীও গেল, মাকে পাঠাইবার মত তিথি-নক্ষত্র গোকুলের চোখে পড়িল না। ত্রয়োদশীর দিন বাটীর পুরোহিত নিজে আসিয়া সুদিনের সংবাদ দিবামাত্র গোকুল অকারণে গরম হইয়া কহিল, তুমি যার খাবে, তারই সর্বনাশ করবে? যাও, নিজের কাজে যাও, আমি মাকে কোথাও যেতে দিতে পারব না।

মনোরমা সেদিন ধমক খাইয়া অবধি নিজে কিছু বলিত না, আজ সে তাহার পিতাকে পাঠাইয়া দিল।

নিমাই আসিয়া কহিল, এটা ত ভাল কাজ হচ্ছে না বাবাজী!

গোকুল কোনদিন খবরের কাগজ পড়ে না, কিন্তু আজ পড়িতে বসিয়াছিল।

কহিল, কোন্‌টা?

বেয়ানঠাকরুন তাঁর নিজের ছেলের বাসায় যখন স্ব-ইচ্ছায় যেতে চাচ্ছেন, তখন আমাদের বাধা দেওয়া ত উচিত হয় না।

গোকুল পড়িতে পড়িতে কহিল, পাড়ার লোক শুনলে আমার অখ্যাতি করবে।

নিমাই অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, অখ্যাতি করবার আমি ত কোন কারণ দেখতে পাইনে।

গোকুল শ্বশুরকে এতদিন মান্য করিয়াই কথা কহিত। আজ হঠাৎ আগুন হইয়া কহিল, আপনার দেখবার ত কোন প্রয়োজন দেখিনে। আমার মাকে আমি কারু কাছে পাঠাব না—বাস্‌ সাফ কথা! যে যা পারে আমার করুক।

গোকুলের এই সাফ কথাটা বিনোদের কানে গিয়া পেঁৗছিতে বিলম্ব হইল না। প্রত্যহ বাধা দিয়া গাড়ি ফেরত দেওয়ায় সে মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। আজ অত্যন্ত রাগিয়া আসিয়া কহিল, দাদা, মাকে আমি আজ নিয়ে যাব। আপনি অনর্থক বাধা দেবেন না।

গোকুল সংবাদপত্রে অতিশয় মনোনিবেশ করিয়া কহিল, আজকে ত হতে পারবে না।

বিনোদ কহিল, খুব পারবে। আমি এখনি নিয়ে যাচ্ছি।

তাহার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গোকুল হাতের কাগজটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া কহিল, নিয়ে যাচ্ছি বললেই কি হবে? বাবা মরবার সময় মাকে আমায় দিয়ে গেছেন—তোমাকে দেননি। আমি কোথাও পাঠাব না।

বিনোদ কহিল, সে ভার যদি আপনি বাস্তবিক নিতেন দাদা, তা হলে এমন করে মাকে দিবারাত্রি লাঞ্ছনা অপমান ভোগ করতে হ'ত না। মা, বেরিয়ে এসো, গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বলিয়া বিনোদ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই ভবানী বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি যে অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা গোকুল জানিত না। তাঁহাকে সোজা গিয়া গাড়িতে

উঠিতে দেখিয়া গোকুল আড়ষ্ট হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে পিছনে পিছনে গাড়ির কাছে আসিয়া কহিল, এমন জোর করে চলে গেলে আমার সঙ্গে তোমাদের আর কোন সম্পর্ক থাকবে না, তা বলে দিচ্চি মা।

ভবানী জবাব দিলেন না। বিনোদ গাড়োয়ানকে ডাকিয়া গাড়ি হাঁকাইতে আদেশ করিল। গাড়ি ছাড়িয়া দিতেই গোকুল অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ফেলে চলে গেলে মা, আমি কি তোমার ছেলে নয়? আমাকে কি তোমার মানুষ করতে হয়নি?

গাড়ির চাকার শব্দে সে কথা ভবানীর কানে গেল না, কিন্তু বিনোদের কানে গেল। সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, গোকুল কোঁচার খুঁটে মুখ ঢাকিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল এবং ভিতরে ঢুকিয়া সে বিনোদের বসিবার ঘরে গিয়া দোর দিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার এই ব্যবহারে অলক্ষ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়া নিমাই কিছু উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন, কিন্তু খানিক পরে সে যখন দ্বার খুলিয়া বাহির হইল এবং যথাসময়ে স্নানাহার করিয়া দোকানে চলিয়া গেল, তখন তাহার চোখে-মুখে এবং আচরণে বিশেষ কোন ভয়ের চিহ্ন না দেখিয়া তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং নির্বিঘ্ন হইয়া তিনি এইবার নিজের কাজে মন দিলেন। অর্থাৎ সাপ যেমন করিয়া তাহার শিকার ধীরে ধীরে উদরস্থ করে, ঠিক তেমনি করিয়া তিনি জামাতাকে মহা-আনন্দে জীর্ণ করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

লক্ষণও বেশ অনুকূল বলিয়াই মনে হইল। গোকুল পিতার মৃত্যুর পর হইতেই অত্যন্ত উগ্র এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল, সামান্য কারণেই বিদ্রোহ করিত; কিন্তু যেদিন ভবানী চলিয়া গেলেন, সেইদিন হইতে সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গেল। কাহারও কোন কথায় রাগও করিত না, প্রতিবাদও করিত না। ইহাতে নিমাই যত পুলকিতই হউন, তাঁহার কন্যা খুশী হইতে পারিল না। গোকুলকে সে চিনিত। সে যখন দেখিল, স্বামী খাওয়া-দাওয়া লইয়া হাঙ্গামা করে না, যা পায় নীরবে খাইয়া উঠিয়া যায়, তখন সে ভয় পাইল। এই জিনিসটাতেই গোকুলের ছেলেবেলা হইতেই একটু বিশেষ শখ ছিল। খাইতে এবং খাওয়াইতে সে ভালবাসিত। প্রতি রবিবারেই সে বন্ধু-বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত; এ রবিবারে তাহার কোনরূপ আয়োজন না দেখিয়া মনোরমা প্রশ্ন করিল।

গোকুল উদাসভাবে জবাব দিল, সে-সব মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গেছে, রেঁধে খাওয়াবে কে? মনোরমা অভিমানভরে কহিল, রাঁধতে কি শুধু মা-ই শিখেছিলেন—আমরা শিখিনি? গোকুল কহিল, সে তোমার বাপ-ভাইকে খাইয়ো, আমার দরকার নেই।

মনোরমার মা কালীঘাটের ফেরত একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সৎ-শাশুড়ী রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, মেয়ের ভাঙ্গা সংসার গুছান আবশ্যক বিবেচনা করিয়া তিনি দুই-চারিদিন থাকিয়া যাইতেই মনস্থ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিকল সংসার মেরামত হইয়া আবার সুন্দর চলিতে লাগিল; এবং কর্ণধার হইয়া দৃঢ়হস্তে হাল ধরিয়া দিনের পর দিন কাটাইতে লাগিলেন।

পাড়ার লোকেরা প্রথমে কথাটা লইয়া আন্দোলন করিল, কিন্তু কলিকালের স্বধর্মে দুই-চারিদিনেই নিরস্ত হইল।

হাবুর মার ঘর এই পথে। সে মাঝে মাঝে দেখা দিয়া যাইত। তার মুখে ভবানী গোকুলের নূতন সংসারের কাহিনী শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভালোমন্দ কোন কথা কহিলেন না।

সেদিন আসিবার সময় সেই যে গোকুল গাড়ির কাছে দাঁড়াইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, তাঁহাদের সমস্ত সম্বন্ধের এই শেষ, তখন নিজের অভিমানের কথাটা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু একমাসকাল যখন কাটিয়া গেল, গোকুল তাঁহার সংবাদ লইল না, তখন তিনি মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। সে যে সত্য সত্যই তাঁহাকে ত্যাগ করিবে, ছোটভাইকে এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিবে, এত কাণ্ড, এত রাগারাগির পরেও সে-কথা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাই আজ হাবুর মার মুখে ঘরের মধ্যে তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠার বার্তা পাইয়া তিনি শুধু স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন।

নূতন বাসায় আসিয়া দুই-চারিদিন মাত্র বিনোদ সংযত ছিল, তার পরেই সে স্বরূপ

প্রকাশ করিল। মায়ের কোন তত্ত্বই প্রায় সে লইত না; রাত্রে বাড়িতে থাকিত না; সকালে যখন ঘরে আসিত, তখন দুঃখে লজ্জায় ভবানী তাহার প্রতি চাহিতে পারিতেন না।

এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, সে চাকরি করে। কিন্তু কি চাকরি, কত মাহিনা, কিছুই জানিতেন না। সুতরাং এখন এইটাই তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে, আর যাই হোক, তিনি ছেলেকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত হইয়া অন্যায় করেন নাই; কারণ গোকুল স্ত্রী-শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রভাবে তাঁহাদের প্রতি যত অন্যায়ই করুক, সে স্বামীর এত দুঃখের দোকানটি অন্ততঃ বজায় করিয়া রাখিবে, স্বর্গীয় স্বামীর কথা মনে করিয়া তিনি এ চিন্তাতেও কতকটা সুখ পাইতেন। এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছিল।

আজ বৈশাখী সংক্রান্তি। প্রতি বৎসর এইদিনে ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতেন। কিন্তু এবার নিজের কাছে টাকা না থাকায় এবং কথা-প্রসঙ্গে বিনোদকে বার-দুই জানাইয়াও তাহার কাছে সাড়া না পাওয়ায় এ বৎসর ভবানী সে সঙ্কল্পই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সহসা অতি প্রত্যূষে ভয়ানক ডাকাডাকি, হাবুর মা সদর দরজা খুলিয়া দিতেই গোকুল ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গে তাহার অনেক লোক, ঘি, ময়দা, বহুপ্রকার মিষ্টান্ন, ঝুড়িভরা পাকা আম। ঢুকিয়াই কহিল, আমাদের পাড়ার সমস্ত বামুনদের নেমন্তন্ন করে এসেচি—সে বাঁদরটার পিত্যেশে ত আর ফেলে রাখতে পারিনে। মা কই? এখনো ওঠেন নি বুঝি? যাই, কাজকর্ম করবার লোকজন গিয়ে পাঠিয়ে দিই গে। যেমন মা—তেমনি ব্যাটা, কারো চাড়ই নেই, যেন আমারই বড় মাথাব্যথা! মাকে খবর দি গে হাবুর মা, আমি ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ফিরে আসচি। বলিয়া গোকুল যেমন ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভবানী অনেকক্ষণ উঠিয়াছিলেন এবং আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্তই দেখিতেছিলেন। গোকুল চলিয়া যাইবামাত্র অকস্মাৎ অশ্রুর বন্যা আসিয়া তাঁহার দুই চোখ ভাসাইয়া দিয়া গেল। সেদিন ছিল রবিবার। 'শনিবারের রাত্রি' করিয়া অনেক বেলায় বিনোদ বাড়ি ঢুকিয়া অবাক হইয়া গেল! হাবুর মার কাছে সমস্ত অবগত হইয়া মাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, দাদাকে খবর দিয়ে এর মধ্যে না এনে আমাকে জানালেই ত হ'তো। আমার যে এতে অপমান হয়।

ভবানী সমস্ত বুঝিয়াও প্রতিবাদ করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন।

গোকুল ফিরিয়া আসিয়া বিনোদকে দেখিয়াও দেখিল না। কাজকর্মের তদারক করিয়া ফিরিতে লাগিল এবং যথাসময়ে ব্রাহ্মণ-ভোজন সমাধা হইয়া গেলে, কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় বাঁড়ুয্যেমশাই তাহাকে সকলের মধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, ব'সো।

আজ তিনিও গোকুলের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাই তাহারই টাকায় পরিতোষপূর্বক আহার করিয়া সেদিনের অপমানের শোধ তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মজুম-দারদের অনেক অন্নই নাকি তিনি হজম করিয়াছিলেন, তাই নিমাই রায়ের দরুন সেদিনের লাঞ্ছনাটা তাঁহাকেই বেশী বাজিয়াছিল। সর্বসমক্ষে বিনোদকে উদ্দেশ করিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন, বলি ভায়া, দাদার আজকের চালটা টের পেয়েচ ত?

কথার ধরনে গোকুল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

বিনোদ সংক্ষেপে কহিল, না।

বাঁড়ুয্যেমশাই মৃদু-গম্ভীর হাস্য করিয়া কহিলেন, তবেই দেখচি মকদ্দমা জিতেচ! বি. এ., এম. এ. পাশ করলে ভাই, আর এটা ঠাওর হ'লো না যে, মাকে হাত করাটাই হচ্চে যে আজকের চাল। তাঁর ওপরই যে মকদ্দমা!

গোকুল চোখমুখ কালিবর্ণ করিয়া—কখ্খনো না মাস্টারমশাই, কখ্খনো না! বলিতে বলিতে বেগে প্রস্থান করিল।

বাঁড়ুয্যেমশাই চেঁচাইয়া বলিলেন, এখানে ঢুকতে দিয়ো না ভায়া, সর্বনাশ করে তোমার ছাড়বে।

এ কথাটাও গোকুলের কানে পৌঁছিল।

বিনোদ লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। মাস্টারকে সে যে না চিনিত, তাহা নয়।

একটা উদ্দেশ্য লইয়া আর একটা কাজ করা যে তাহার দ্বারা একেবারেই অসম্ভব, তাহাও সে জানিত। তাই বাঁড়ুয্যের কথাগুলো শুধু যে সে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিল তাহা নয়, এত লোকের সমক্ষে দাদার এই অপমান তাহাকে অত্যন্ত বিঁধিল।

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় হইলে বিনোদ ভিতরে গিয়া দেখিল—মা ঘরে দ্বার দিয়া শুইয়া পড়িয়াছেন। কথাটা যে তাঁর কানে গিয়াছে, তাহা কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াই বিনোদ টের পাইল।

দোকানের কাজ সারিয়া সন্ধ্যার পর গোকুল নিজের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—সেখানেও একটা বিরাট মুখভারীর অভিনয় চলিতেছে। স্বয়ং রায়মশাই খাটের উপর বসিয়া মুখখানা অতি বিশ্রী করিয়া বসিয়া আছেন এবং নীচে মেঝের উপর বসিয়া তাঁহার কন্যা, হিমুকে কাছে লইয়া, পিতৃ-মুখের অনুকরণ করিতেছে।

ঘরে ঢুকিতেই রায়মশাই কহিলেন, বাবাজী, নির্বোধের মত তুমি এই যে আমাদের আজ তোমার মাকে দিয়ে অপমান করালে, তার প্রতিকার কি বল?

একে গোকুলের যারপরনাই মন খারাপ হইয়াছিল, তাহাতে সারাদিনের পরিশ্রমে অতিশয় শ্রান্ত। অভিযোগের ধরনটায় তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

মনোরমা ফোঁসফোঁস করিয়া কাঁদিয়া কহিল, আর যদি কোনদিন তুমি ওখানে যাও—আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

মেয়ের উৎসাহ পাইয়া রায়মশাই অধিকতর গম্ভীরভাবে কহিলেন, সে মাগী কি সোজা—

গোকুল বোমার মত ফাটিয়া উঠিল—চোপরাও বলচি। আমার মায়ের নামে ওরকম কথা কইলে ঘাড় ধরে বার করে দেব। বলিয়া নিজেই ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

রায়মশায় ও তাঁহার কন্যা বজ্রাহতের ন্যায় পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। গোকুল এ কি করিল! পূজ্যপাদ শ্বশুরমহাশয়কে এ কি ভয়ঙ্কর অপমান করিয়া বসিল!

তের

বিনোদের বেশ একটি বন্ধুর দল জুটিয়াছিল যাহারা প্রতিনিয়তই তাহাকে মকদ্দমায় উৎসাহিত করিতেছিল। কারণ, হারিলে তাহাদের ক্ষতি নাই—জিতিলে পরম লাভ। অনেক-দিনের অনেক আমোদ-প্রমোদের খোরাক সংগ্রহ হয়। আবার মকদ্দমা যে করিতেই হইবে, তাহাও একপ্রকার নিশ্চিত অবধারিত হইয়াছিল। যেহেতু বিনোদের তরফ হইতে যে বন্ধুটি আপোসে মিটমাট করিবার প্রস্তাব লইয়া একদিন গোকুলের কাছে গিয়াছিল, গোকুল তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বয়াটে নচ্ছার পাজিকে এক সিকি-পয়সার বিষয় দেব না—যা পারে সে করুক।

কিন্তু এতবড় বিষয়ের জন্য মামলা রুজু করিতে একটু বেশী টাকার আবশ্যক। সেইটুকুর জন্যই বিনোদের কালবিলম্ব হইয়া যাইতেছিল।

দাদার উপর বিনোদের যত রাগই থাকুক, সেইদিন হইতেই কেমন যেন তাহার প্রাণটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। অত লোকের সম্মুখে অপমানিত হইয়া যেমন করিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়াছিল, তাহার মুখের সে আর্ত ছবিটা সে কোনমতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। বুকের ভিতরে কে যেন অনুক্ষণ বলিতেছিল—অন্যায়, অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত মিথ্যা ও কুৎসিত অপবাদে অভিহিত করিয়া দাদাকে বিদায় করা হইয়াছে। সেই দাদা যে জীবনে কোনদিন এ পথ মাড়াইবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বিনোদ বুঝিয়াছিল।

দেশের কৃতবিদ্য যুবকদিগের অনেকেই বিনোদের বন্ধু। সকলেরই পূর্ণ সহানুভূতি বিনোদের উপরে। সেদিন সকালে তাঁহারা বাহিরের ঘরে বসিয়া মাস্টারমশাইকে ডাকাইয়া আনিয়া অনেক বাদানুবাদের পরে স্থির করিয়াছিলেন, কথার ফাঁদে গোকুলকে জড়াইতে না পারিলে সুবিধা নাই। গোকুল মূর্খ এবং অত্যন্ত নির্বোধ তাহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন।

সুতরাং তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তাহারই মুখের কথায় তাহাকেই জব্দ করিয়া সাক্ষীর সৃষ্টি করা কঠিন হইবে না। কথা ছিল, আগামী রবিবার সকালবেলায় দেশের দশজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া গোকুলের বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কথার ফেরে বাঁধিতেই হইবে। এই প্রসঙ্গে কত তামাশা, কত বিদ্রূপ অনুপস্থিত হতভাগ্য গোকুলের মাথায় বর্ষিত হইল; কে কি বলিবেন এবং করিবেন, সকলেই একে একে তাহার মহড়া দিলেন, শুধু বিনোদ মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার উৎসাহের অভাব নিজেদের উৎসাহের বাহুল্যে কেহ লক্ষ্যই করিলেন না।

আজ বিনোদ কাজে বাহির হয় নাই, আহারাদি শেষ করিয়া ঘরে বসিয়াছিল; বেলা একটার সময় হঠাৎ গোকুল—কৈ রে হাবুর মা, খাওয়া-দাওয়া চুকল? বলিয়া প্রবেশ করিল।

হাবুর মা শশব্যস্তে বড়বাবুকে আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, না বড়বাবু, এখনো শেষ হয়নি।

হয়নি? বলিয়া গোকুল নিজেই আসনটা তুলিয়া আনিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় পাতিল। বসিয়া কহিল, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খাওয়া দিকি হাবুর মা। তাগাদায় বেরিয়ে এই রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে একেবারে হয়রান হয়ে গেছি। মা কৈ রে?

ভবানী রান্নাঘরেই ছিলেন। কিন্তু সেদিনের কথা স্মরণ করিয়া বিপুল লজ্জায় হঠাৎ সম্মুখে আসিতেই পারিলেন না।

বিনোদ কাজে গিয়াছে, ঘরে নাই—গোকুল ইহাই জানিত। কহিল, সব মিথ্যে হাবুর মা, সব মিথ্যে। কলিকাল—আর কি ধর্ম-কর্ম আছে? বাবা মরবার সময় মাকে আমাকে দিয়ে বললেন, বাবা গোকুল, এই নাও তোমার মা! আমি ভালোমানুষ—নইলে বেন্দার বাপের সাধ্যি কি, সে মাকে আমার জোর করে নিয়ে আসে? কেন, আমি ছেলে নই? ইচ্ছে করি যদি, এখনি জোর করে নিয়ে যেতে পারিনে? বাবার এই হ'লো আসল উইল—তা জানিস হাবুর মা? শুধু দু'কলম লিখে দিলেই উইল হয় না।

হাবুর মা চোখ টিপিয়া ইঙ্গিতে জানাইল বিনোদ ঘরে আছে। গোকুল জলের গেলাসটা রাখিয়া দিয়া জুতা পায়ে দিয়া দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি নটা-দশটার সময় হঠাৎ দোকানের চক্রবর্তী আসিয়া হাজির। জিজ্ঞাসা করিল, মা, বড়বাবু এখনো বাড়ি যাননি—এখান থেকে খেয়ে কখন গেলেন?

ভবানী আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে ত এখানে খায়নি। তাগাদার পথে শুধু এক গেলাশ জল খেয়ে চলে গেল।

চক্রবর্তী কহিল, এই নাও। আজ বড়বাবুর জন্মতিথি। বাড়ি থেকে ঝগড়া করে বলে এসেচে, মায়ের প্রসাদ পেতে যাচ্চি। তা হলে সারাদিন খাওয়াই হয়নি দেখচি।

শুনিয়া ভবানীর বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিনোদ পাশের ঘরেই ছিল, চক্রবর্তীর সাড়া পাইয়া কাছে আসিয়া বসিল। তামাশা করিয়া কহিল, কি চক্রবর্তীমশাই, নিমাই রায়ের তাঁবে চাকরি হচ্চে কেমন?

চক্রবর্তী আশ্চর্য হইয়া কহিল, নিমাই রায়? রামঃ—সে কি দোকানে ঢুকতে পারে নাকি?

বিনোদ বলিল, শুনতে পাই দাদাকে সে গ্রাস করে বসে আছে?

চক্রবর্তী ভবানীকে দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, উনি বেঁচে থাকতে সেটি হবার জো নেই ছোটবাবু। আমাকে তাড়িয়ে সর্বস্বের মালিক হতেই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মায়ের একটা হুকুমে সব ফেঁসে গেল। এখন ঠকিয়ে-মজিয়ে ছ্যাঁচড়ামি করে যা দু'পয়সা আদায় হয়, দোকানে হাত দেবার জো নেই। বলিয়া চক্রবর্তী সেদিনের সমস্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া কহিল, বড়বাবু একটুখানি বড্ড সোজা মানুষ কিনা, লোকের প্যাঁচ-স্যাঁচ ধরতে পারে না। কিন্তু তা হলে কি হয়, পিতৃমাতৃভক্তি যে অচলা—সেই যে বললেন, মায়ের হুকুম রদ করবার

আমার সাধ্যি নেই—তা এত কাঁদাকাটি, ঝগড়াঝাঁটি—না, কিছুতে না। আমার বাপের হুকুম—মায়ের হুকুম! আমি যেমন কর্তা ছিলাম--তেমনি আছি ছোটবাবু।

বিনোদের দুচক্ষু জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া গেল। চক্রবর্তী কহিতে লাগিল, এমন বড়ভাই কি কারু হয় ছোটবাবু? মুখে কেবল বিনোদ আর বিনোদ। আমার বিনোদের মত পাশ কেউ করেনি, আমার বিনোদের মত লেখাপড়া কেউ শেখেনি, আমার বিনোদের মত ভাই কারু জন্মায় নি। লোকে তোমার নামে কত অপবাদ দিয়েচে ছোটবাবু, আমার কাছে এসে হেসে বলেন, চক্কোত্তিমশাই, শালারা কেবল আমার ভায়ের হিংসে করে দুর্নাম রটায়। আমি তাদের কথায় বিশ্বাস করব, আমাকে এমনি বোকাই ঠাউরেচে শালারা!

একটু থামিয়া কহিল, এই সেদিন কে এক কাশীর পন্ডিত এসে তোমার মন ভাল করে দেবে বলে একশ-আট সোনার তুলসীপাতার দাম প্রায় পাঁচ শ টাকা বড়বাবুর কাছে হাতিয়ে নিয়ে গেছে। আমি কত নিষেধ করলুম, কিছুতেই শুনলেন না; বললেন, আমার বিনোদের যদি সুমতি হয়, আমার বিনোদ যদি এম. এ. পাশ করে—যায় যাক আমার পাঁচ শ টাকা।

বিনোদ চোখ মুছিয়া ফেলিয়া আর্দ্রস্বরে কহিল, কত লোক যে আমার নাম করে দাদাকে ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সে আমিও শুনেচি চক্কোত্তিমশাই।

চক্রবর্তী গলা খাটো করিয়া কহিল, এই জয়লাল বাঁড়ুয্যেই কি কম টাকা মেরে নিয়েচে ছোটবাবু! ওই ব্যাটাই ত যত নষ্টের গোড়া। বলিয়া সে কর্তার মৃত্যুর পরে সেই ঠিকানা বাহির করিয়া দিবার গল্প করিল।

ভবানী কোন কথায় একটি কথাও কহেন নাই--শুধু তাঁর দুই চোখে শ্রাবণের ধারা বহিয়া যাইতেছিল।

চক্রবর্তী বিদায় লইলে বিনোদ শুইতে গেল; কিন্তু সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না। কেন এমন একটা অস্বাভাবিক কান্ড ঘটিল, পিতা তাহাকে একভাবে বঞ্চিত করিয়া গেলেন, দাদা তাহাকে কিছুই দিতে চাহিতেছে না, চক্রবর্তীর মুখে আজ সেই ইতিহাস অবগত হইয়া সে ক্রমাগত ইহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

বিনোদের বন্ধুরা বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক সঙ্গে করিয়া রবিবারের সকালবেলা গোকুলের বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোকুল দোকানে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, এতগুলি ভদ্রলোকের আকস্মিক অভ্যাগমে তটস্থ হইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া ডেপুটিবাবুকে এবং সদরআলা গিরিশবাবুকে দেখিয়া তাঁহাদের যে কোথায় বসাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। বিনোদ নিঃশব্দে মলিনমুখে একধারে গিয়া বসিল। তাহার চেহারা দেখিলে মনে হয় তাহাকে যেন বলি দিবার জন্যে ধরিয়া আনা হইয়াছে।

বাঁড়ুয্যেমশাই ছিলেন, কথাটা তিনিই পাড়িলেন।

দেখিতে দেখিতে গোকুলের চোখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, ওঃ, তাই এত লোক! যান আপনারা নালিশ করুন গে, আমি এক সিকি-পয়সা ওই হতভাগা নচ্ছারকে দেব না। ও মদ খায়।

আর সকলে মৌন হইয়া রহিলেন। বাঁড়ুয্যেমশাই ভঙ্গী করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বেশ, তাই যেন খায়, কিন্তু তুমি ওর হক্কের বিষয় আটকাবার কে? তুমি যে তোমার বাপের মরণকালে জোচ্চুরি করে উইল লিখে নাওনি তার প্রমাণ কি?

গোকুল আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া কহিল, জুচ্চুরি করেছি? আমি জোচ্চোর? কোন্ শালা বলে?

গিরিশবাবু প্রাচীন লোক। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, গোকুলবাবু অমন উতলা হবেন না, একটু শান্ত হয়ে জবাব দিন।

বাঁড়ুয্যেমশাই পুরানো দিনের অনেক কথাই নাকি জানিতেন, তাই চোখ ঘুরাইয়া কহিলেন, তা হলে আদালতে গিয়ে তোমার মাকে সাক্ষী দিতে হবে গোকুল।

তিনি যা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাই। গোকুল উন্মত্ত হইয়া উঠিল—কি, আমার মাকে দাঁড় করাবে আদালতে? সাক্ষীর কাঠগড়ায়? নি গে যা তোরা সব বিষয়-আশয়—নি গে যা —আমি চাইনে। আমি যাব না আদালতে; মাকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হবো।

নিমাই রায়ও উপস্থিত ছিলেন, চোখ টিপিয়া বলিলেন, আহা-হা, থাক না গোকুল। কর কি, কি-সব বলচ?

গোকুল সে কথা কানেও তুলিল না। সকলের সম্মুখে ডান-পা বাড়াইয়া দিয়া বিনোদকে লক্ষ্য করিয়া তেমনি চীৎকারে কহিল, আয় হতভাগা এদিকে আয়, এই পা বাড়িয়ে দিয়েচি—ছুঁয়ে বল—তোর দাদা জোচ্চোর। সমস্ত না এই দণ্ডে তোকে ছেড়ে দিই ত আমি বৈকুণ্ঠ মজুমদারের ছেলে নই।

নিমাই ভয়ে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, আহা-হা, কর কি বাবাজী! করুক না ওরা নালিশ—বিচারে যা হয় তাই হবে—এ-সব দিব্যি-দিলেসা কেন? চল চল, বাড়ির ভেতরে চল। বলিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল।

কিন্তু বিনোদ মাথা তুলিয়া চাহিল না, একটা কথার জবাবও দিল না—একভাবে নীরবে বসিয়া রহিল।

গোকুল সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, না, আমি এক-পা নড়ব না। উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাবা শুনচেন, তিনি মরবার সময় বলেছিলেন কিনা গোকুল, এই রইল তোমাদের দু'ভায়ের বিষয়। বিনোদ যখন ভাল হবে, তখন দিয়ো বাবা তার যা-কিছু পাওনা। ওপর থেকে বাবা দেখচেন, সেই বিষয় আমি যক্ষের মত আগলে আছি। কবে ও ভাল হয়ে আমার ঘরে ফিরে আসবে—দিবারাত্রি ভগবানকে ডাকচি—আর ও বলে আমি জোচ্চোর! আয়, এগিয়ে আয় হতভাগা, আমার পা ছুঁয়ে এদের সামনে বলে যা, তোর বড়ভাই চুরি করে তোর বিষয় নিয়েছে।

বন্ধুবান্ধবেরা বিনোদকে চারিদিক হইতে ঠেলিতে লাগিলেন; কিন্তু সে উঠে না। বাঁড়ুয্যেমশাই খাড়া হইয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিলেন, বল না বিনোদ, পা ছুঁয়ে। ভয় কি তোমার? এমন সুযোগ আর পাবে কবে?

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, এমন সুযোগ আর পাব না। বলিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, তোমার পা ছুঁতে বলছিলে দাদা, এই ছুঁয়েচি। আমি মদ খাই—আর যাই খাই দাদা, তোমাকে চিনি। তোমার পা ছুঁয়ে তোমাকেই যদি জোচ্চোর বলি দাদা, ডান হাত আমার এইখানেই খসে পড়ে যাবে। সে আমি বলতে পারব না; কিন্তু আজ এই পা ছুঁয়েই দিব্যি করে বলচি, মদ আর আমি ছোঁব না। আশীর্বাদ কর দাদা, তোমার ছোটভাই বলে আজ থেকে যেন পরিচয় দিতে পারি। তোমার মান রেখে যেন তোমার পায়ের তলাতেই চিরকাল কাটাতে পারি। বলিয়া বিনোদ অগ্রজের সেই প্রসারিত পায়ের উপর মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

চন্দ্রনাথ

প্রথম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথের পিতৃ-শ্রাদ্ধের ঠিক পূর্বের দিন কি একটা কথা লইয়া তাহার খুড়া মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাহার মনান্তর হইয়া গেল। তাহার ফল এই হইল যে, পরদিন মণিশংকর উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্রজের পারলৌকিক সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান করিলেন, কিন্তু একবিন্দু আহার্য স্পর্শ করিলেন না, কিংবা নিজের বাটীর কাহাকেও স্পর্শ করিতে দিলেন না। ব্রাহ্মণ-ভোজনান্তে চন্দ্রনাথ করজোড়ে কহিল, কাকা, দোষ করি, অপরাধ করি, আপনি আমার পিতৃতুল্য, আমি আপনার ছেলের মতো—এবার মার্জনা করুন।

পিতৃতুল্য মণিশংকর উত্তরে বলিলেন, বাবা, তোমরা কলকাতায় থেকে বি.এ., এম.এ. পাশ ক'রে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হয়েছো, আমরা কিন্তু সেকালের মূর্খ, আমাদের সঙ্গে তোমাদের মিশ খাবে না। এই দেখ না কেন, শাস্ত্রকারেরাই বলেছেন, যেমন, গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

শাস্ত্রোক্ত বচনটির সহিত আধুনিক পণ্ডিত ও সেকেলে মূর্খের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও মণিশংকর যে নিজের মনের ভাবটা প্রকাশ করিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, খুড়ার সহিত আর সে কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। আর পিতার জীবদ্দশাতেও দুই সহোদরের মধ্যে হৃদ্যতা ছিল না। কিন্তু আহার-ব্যবহারটা ছিল। এখন সেইটা বন্ধ হইল। চন্দ্রনাথের পিতা যথেষ্ট ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বাটীতে আত্মীয়-স্বজন কেহ নাই, শুধু এক অপুত্রক মাতুল এবং দ্বিতীয় পক্ষের মাতুলানী।

সমস্ত বাড়িটা যখন বড় ফাঁকা ঠেকিল, চন্দ্রনাথ তখন বাটীর গোমস্তাকে ডাকিয়া কহিল, সরকারমশায়, আমি কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাব, আপনি বিষয়-সম্পত্তি যেমন দেখছিলেন, তেমনি দেখবেন। আমার ফিরে আসতে বোধ করি বিলম্ব হবে।

মাতুল ব্রজকিশোর তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন, এখন তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই; তোমার মন খারাপ হয়ে আছে, এ সময় বাটীতে থাকাই উচিত।

চন্দ্রনাথ তাহা শুনিল না। বিষয়-সম্পত্তির সমুদয় ভার সরকার মহাশয়ের উপর দিয়া, এবং বসত-বাটীর ভার ব্রজকিশোরের উপর দিয়া অতি সামান্যভাবেই সে বিদেশ-যাত্রা করিল। যাইবার সময় একজন ভৃত্যকেও সঙ্গে লইল না।

ব্রজকিশোরকে নিভৃতে ডাকিয়া তাঁহার স্ত্রী হরকালী বলিল, একটা কাজ করলে না?

ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কাজ?

এই যে বিদেশে গেল, একটা কিছু লিখে নিলে না কেন? মানুষ কখন কি হয়, কিছুই বলা যায় না। যদি বিদেশে ভালমন্দ হঠাৎ কিছু হয়ে যায়, তখন তুমি দাঁড়াবে কোথায়?

ব্রজকিশোর কানে আঙুল দিয়া জিভ কাটিয়া কহিলেন, ছি, ছি, এমন কথা মুখে এনো না।

হরকালী রাগ করিল। কহিল, তুমি বোকা, তাই মুখে আনতে হয়েছে, যদি সেয়ানা হ'তে, আমাকে মুখে আনতে হ'ত না।

কিন্তু কথাটা যে ঠিক, তাহা ব্রজকিশোর স্ত্রীর কৃপায় দুই-চারি দিনেই বুঝিতে পারিলেন। তখন পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

এক বৎসর চন্দ্রনাথ নানা স্থানে একা ভ্রমণ করিয়া বেড়াইল। তাহার পর গয়ায় আসিয়া স্বর্গীয় পিতৃদেবের সাংবাৎসরিক পিণ্ডদান করিল, কিন্তু তাহার বাটী ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইল না—মনে করিল, কিছুদিন কাশীতে অতিবাহিত করিয়া যাহা হয় করিবে। কাশীতে মুখোপাধ্যায় বংশের পাণ্ডা হরিদয়াল ঘোষাল। চন্দ্রনাথ একদিন দ্বিপ্রহরে একটি ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে লইয়া তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাশী চন্দ্রনাথের অপরিচিত নহে, ইতিপূর্বে কয়েকবার সে পিতার সহিত এখানে আসিয়াছিল। হরিদয়ালও তাহাকে বিলক্ষণ চিনিতেন। অকস্মাৎ তাহার এরূপ আগমনে তিনি কিছু বিস্মিত হইলেন।

উপরের একটা ঘর চন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট হইল, এবং ইহাও স্থির হইল যে, চন্দ্রনাথের যতদিন ইচ্ছা তিনি এইখানেই থাকিবেন।

এ কক্ষের একটা জানালা দিয়া ভিতরের রন্ধনশালার কিয়দংশ দেখা যাইত। চন্দ্রনাথ আগ্রহের সহিত অনেক সময় এইদিকে চাহিয়া থাকিত। রন্ধন-সামগ্রীর উপরেই যে আগ্রহ তাহা নহে, তবে বন্ধনকারিণীকে দেখিতে বড় ভাল লাগিত।

বিধবা সুন্দরী। কিন্তু মুখখানি যেন দুঃখের আগুনে দগ্ধ হইয়া গেছে! যৌবন আছে কি ি াছে, সেও যেন আর চোখে পড়িতে চাহে না। তিনি আপন মনে আপনার কাজ করিয়া যান, নিকটে কেবল একটি দশমবর্ষীয়া বালিকা রন্ধনের যোগাড় করিয়া দিতে থাকে। চন্দ্রনাথ অতৃপ্তনয়নে তাহাই দেখে।

কিছুদিন তিনি চন্দ্রনাথের সম্মুখে বাহির হইলেন না। আহার্য সামগ্রী ধরিয়া দিয়া সরিয়া যাইতেন। কিন্তু ক্রমশঃ বাহির হইতে লাগিলেন। একে ত চন্দ্রনাথ বয়সে ছোট, তাহাতে এক স্থানে অধিক দিন ধরিয়া থাকিলে একটা আত্মীয়-ভাব আসিয়া পড়ে। তখন তিনি চন্দ্রনাথকে খাওয়াইতে বসিতেন—জননীর মত কাছে বসিয়া যত্নপূর্বক আহার করাইতেন।

আপনার জননীর কথা চন্দ্রনাথের স্মরণ হয় না—চিরদিন মাতৃহীন চন্দ্রনাথ পিতার নিকট লালিত-পালিত হইয়াছিল। পিতা সে স্থান কতক পূর্ণ রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এরূপ কোমল স্নেহ তথায় ছিল না।

পিতার মৃত্যুতে চন্দ্রনাথের বুকের যে অংশটা খালি পড়িয়াছিল, শুধু তাহাই পূর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল তাহা নহে, অভিনব মাতৃস্নেহ-রসে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল।

একদিন চন্দ্রনাথ হরিদয়ালকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নিজের বলিতে কেহ ত নাই বলিয়াই জানি, কিন্তু ইনি কে?

হরিদয়াল কহিলেন, ইনি বামুন-ঠাকরুন!

কোন আত্মীয়?

না।

তবে এদের কোথায় পেলেন?

হরিদয়াল কহিলেন, সে অনেক কথা। তবে সংক্ষেপে বলতে হ'লে, ইনি প্রায় তিন বৎসর হ'ল স্বামী এবং ওই মেয়েটিকে নিয়ে তীর্থ করতে আসেন। কাশীতে স্বামীর মৃত্যু হয়। দেশেও এমন কোন আত্মীয় নেই যে ফিরে যান। তার পর ত দেখছ।

আপনি পেলেন কিরূপে?

মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছে মেয়েটি ভিক্ষে করছিল?

চন্দ্রনাথ একটু চিন্তা করিয়া কহিল, কোথায় বাড়ি জানেন কি?

ঠিক জানি না। নবদ্বীপের নিকট কোন একটা গ্রামে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দিন-দুই পরে আহারে বসিয়া চন্দ্রনাথ বামুন-ঠাকরুনের মুখের পানে চাহিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কোন শ্রেণী?

বামুন-ঠাকরুনের মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গেল। এ প্রশ্নের হেতু তিনি বুঝিলেন। কিন্তু যেন শুনিতে পান নাই, এই ভাবে তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া বলিলেন, যাই দুধ আনি গে।

দুধের জন্য অত তাড়াতাড়ি ছিল না। ভাবিবার জন্য তিনি একেবারে রন্ধনশালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কন্যা সরযূবালা হাতা করিয়া দুধ ঢালিতেছিল, জননীর বিবর্ণ-মুখ লক্ষ্য করিল না। জননী কন্যার মুখপানে একবার চাহিলেন, দুধের বাটি হাতে লইয়া একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, হে দীন-দুঃখীর প্রতিপালক, হে অন্তর্যামী, তুমি আমাকে মার্জনা ক'রো। তাহার পর দুধের বাটি আনিয়া নিকটে রাখিয়া উপবেশন করিলে, চন্দ্রনাথ পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল।

একটি-একটি করিয়া সমস্ত কথা জানিয়া লইয়া চন্দ্রনাথ অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বাড়ি যান না কেন? সেখানে কি কেউ নেই?

খেতে দেয় এমন কেউ নেই।

চন্দ্রনাথ মুখ নীচু করিয়া কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল, আপনার একটি কন্যা আছে, তার বিবাহ কিরূপে দেবেন?

বামুন-ঠাকরুন দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, বিশ্বেশ্বর জানেন।

আহার প্রায় শেষ হইয়া আসিল। চন্দ্রনাথ মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, ভাল ক'রে আপনার মেয়েটিকে কখন দেখিনি,—হরিদয়াল বলেন খুব শান্ত-শিষ্ট। দেখতে সুশ্রী কি?

বামুন-ঠাকরুন ঈষৎ হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন, আমি মা, মায়ের চক্ষুকে ত বিশ্বাস নেই বাবা; তবে সরযূ বোধ হয় কুৎসিত নয়। কিন্তু মনে মনে বলিলেন, কাশীতে কত লোক আসে যায়, কিন্তু এত রূপ ত কারও দেখিনি।

ইহার তিন-চারি দিন পরে একদিন প্রভাতে চন্দ্রনাথ বেশ করিয়া সরযূকে দেখিয়া লইল। মনে হইল, এত রূপ আর জগতে নাই। রান্নাঘরে বসিয়া সরযূ তরকারি কুটিতেছিল। সেখানে অপর কেহ ছিল না। জননী গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন, এবং হরিদয়াল যথানিয়মে যাত্রীর অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন।

চন্দ্রনাথ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল, সরযূ!

সরযূ চমকিত হইল। জড়সড় হইয়া বলিল, আজ্ঞে।

তুমি রাঁধতে পারো?

সরযূ মাথা নাড়িয়া কহিল, পারি।

কি কি রাঁধতে শিখেছ?

সরযূ চুপ করিয়া রহিল, কেননা, পরিচয় দিতে হইলে অনেক কথা কহিতে হয়।

চন্দ্রনাথ মনের ভাবটা বুঝিতে পারিল, তাই অন্য প্রশ্ন করিল, তোমার মা ও তুমি দুই জনেই এখানে কাজ কর?

সরযূ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, করি।

তুমি কত মাইনে পাও?

মা পান, আমি পাই নে। আমি শুধু খেতে পাই।

খেতে পেলেই তুমি কাজ কর?

সরযূ চুপ করিয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, মনে কর, আমি যদি খেতে দিই, তা হ'লে আমারও কাজ কর?

সরযূ ধীরে ধীরে বলিল, মাকে জিজ্ঞাসা করব।

তাই ক'রো।

সেইদিন চন্দ্রনাথ হরিদয়াল ঠাকুরকে দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে সরকার মহাশয়কে এইরূপ পত্র লিখিল—

আমি কাশীতে আছি। এখানে এই মাসের মধ্যেই বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি। মাতুল মহাশয়কে এ কথা বলিবেন এবং আপনি কিছু অর্থ, অলঙ্কার এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া শীঘ্র আসিবেন।

সেই মাসেই চন্দ্রনাথ সরযূকে বিবাহ করিল।

তাহার পর বাড়ি যাইবার সময় আসিল। সরযূ কাঁদিয়া বলিল, মার কি হবে?

আমাদের সঙ্গে যাবেন।

কথাটা বামুন-ঠাকরুনের কানে গেল। তিনি কন্যা সরযূকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, সরযূ, সেখানে গিয়ে তুই আমার কথা মাঝে মাঝে মনে করিস, কিন্তু আমার নাম কখনো মুখে আনিস না। যত দিন বাঁচবো কাশী ছেড়ে কোথাও যাব-না। তবে যদি কখনো তোমাদের এ অঞ্চলে আসা হয়, তা হ'লে আবার দেখা হ'তে পারে।

সরযূ কাঁদিতে লাগিল।

জননী তাহার মুখে অঞ্চল দিয়া কান্না নিবারণ করিলেন, এবং গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বাছা, সব জেনেশুনে কি কাঁদতে আছে?

কন্যা জননীর কোলের ভিতর মুখ লুকাইয়া ডাকিল, মা—

তা হোক। মায়ের জন্য যদি মাকে ভুলতে হয়, সেই ত মাতৃভক্তি মা!

চন্দ্রনাথ অনুরোধ করিলেও তিনি ইহাই বলিলেন। কাশী ছাড়িয়া তিনি আর কোথাও যাইতে পারিবেন না।

চন্দ্রনাথ বলিল, একান্ত যদি অন্যত্র না যাবেন, তবে অন্ততঃ স্বাধীনভাবে কাশীতে বাস করুন।

বামুন-ঠাকরুন তাহাও অস্বীকার করিয়া বলিলেন, হরিদয়াল ঠাকুর আমাকে মেয়ের মত যত্ন করেন এবং নিতান্ত দুঃসময়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন, আমিও তাঁকে পিতার মত ভক্তি করি; তাঁকে কিছুতেই ত্যাগ করতে পারব না।

চন্দ্রনাথ বুঝিল, দুঃখিনীর আত্মসম্ভ্রম বোধ আছে, সাধ করিয়া তিনি কাহারও দয়ার পাত্রী হইবেন না। কাজেই তখন শুধু সরযূকে লইয়া চন্দ্রনাথ বাটী ফিরিয়া আসিল।

এখানে আসিয়া সরযূ দেখিল, প্রকাণ্ড বাড়ি! কত গৃহসজ্জা, কত আসবাব--তাহার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে মনে মনে ভাবিল, কি অনুগ্রহ! কত দয়া!

চন্দ্রনাথ বালিকা বধূকে আদর করিয়া কহিল, বাড়িঘর সব দেখলে? মনে ধরেচে ত?

সরযূ অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া আঁচলে মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িল।

চন্দ্রনাথ স্ত্রীর মনের কথা বুঝিতে চাহে নাই; প্রত্যুত্তরে কণ্ঠস্বর শুনিতে চাহিয়াছিল, তাই দুই হাতে সরযূর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, কি বল, মনে ধরেছে ত?

লজ্জায় সরযূর মুখ আরক্ত হইয়া গেল, কিন্তু স্বামীর পুনঃপুনঃ প্রশ্নে কোনরূপে সে বলিয়া ফেলিল, সব তোমার?

চন্দ্রনাথ হাসিয়া কথাটা একটু ফিরাইয়া বলিল, হাঁ, সব তোমার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাহার পর কতদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। সরযূ বড় হইয়াছে। স্বামীকে সে কত যত্ন করিতে শিখিয়াছে। চন্দ্রনাথ বুঝিতে পারে যে, সে কথা কহিবার পূর্বেই সরযূ তাহার মনের কথা বুঝিয়া লয়। কিন্তু সে যদি শুধু দাসী হইত, তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব খুঁজিয়াও চন্দ্রনাথ এমন আর একটি দাসী পাইত না, কিন্তু শুধু দাসীর জন্যই কেহ বিবাহ করে না—স্ত্রীর নিকট আরও কিছুর আশা রাখে। মনে হয়, দাসীর আচরণের সহিত স্ত্রীর আচরণটি সর্বতোভাবে মিলিয়া না গেলেই ভাল হয়। সরযূর ব্যবহার বড় নিরীহ, বড় মধুর, কিন্তু দাম্পত্যের সুনিবিড়-পরিপূর্ণ সুখ কিছুতেই যেন গড়িয়া তুলিতে পারিল না। তাই এমন মিলনে, এত যত্ন-আদরেও উভয়ের মধ্যে একটা দূরত্ব, একটা অন্তরাল কিছুতেই সরিতে চাহিল না। একদিন সে সরযূকে হঠাৎ বলিল, তুমি এত ভয়ে ভয়ে থাক কেন? আমি কি কোন দুর্ব্যবহার করি?

সরযূ মনে মনে ভাবিল, এ কথার উত্তর কি তুমি নিজে জানো না? তাহার পর ভাবিল, তুমি দেবতা, কত উচ্চ, কত মহৎ,—আর আমি? সে তুমি আজও জানো না। তুমি আমার প্রতিপালক, আমি শুধু তোমার আশ্রিতা। তুমি দাতা, আমি ভিখারিণী।

তাহার সমস্ত হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, তাই ভালবাসা মাথা ঠেলিয়া উপরে উঠিতে পারে না,—অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিঃশব্দে ধীরে ধীরে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে লুকাইয়া বহিতে থাকে, উচ্ছৃংখল হইতে পায় না—তেমনি অবিশ্রাম বহিতে লাগিল, কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহার সন্ধান পাইল না—অতি বড় দুর্ভাগারা যেমন জীবনের মাঝে ভগবানকে খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু আজ অকস্মাৎ উজ্জ্বল দীপালোকে যখন সে দেখিতে পাইল, পদ্মের মত ডাগর সরযূর চক্ষু দুটিতে অশ্রু ছাপাইয়া উঠিয়াছে, তখন কাতর হইয়া সহসা তাহাকে সে কাছে টানিয়া লইল। বুকের উপর মুখ লুটাইয়া পড়িল। চন্দ্রনাথ কহিল, থাক, ওসব কথায় আর কাজ নেই—বলিয়া দুই হাতে স্ত্রীর মুখ তুলিয়া ধরিল, মুদিত চক্ষের উপর সরযূ একটা তপ্ত-নিশ্বাস অনুভব করিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, একবার চেয়ে দেখ দেখি—

সরযূর চোখের পাতা দুইটি আকুলভাবে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল, সে কিছুতেই চাহিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রনাথ কহিল, তোমার বড় ভয়, তাই চাইতে পারলে না সরযূ। কিন্তু পারলে ভাল হ'ত, না হয়, একটা কাজ ক'রো, আমার ঘুমন্ত মুখ ভাল ক'রে চেয়ে দেখো—এ মুখে ভয় করবার মত কিছু নেই। বুকে শুয়ে আছ, ভিতরের কথাটা কি শুনতে পাও না? তাই বড় দুঃখ হয় সরযূ—আমাকে তুমি বুঝতেই পারলে না।

তবু সরযূ কথা কহিতে পারিল না, শুধু মনে মনে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া কহিল, আমি পদাশ্রিতা দাসী, দাসীকে চিরদিন দাসীর মতই থাকিতে দিয়ো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথের মাতুলানী হরকালীর মনে আর তিলমাত্র সুখ রহিল না। ভগবান তাহাকে এ কি বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। এ সংসারটা কাহারো নিকট কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মত বোধ হয়, তাহাদের চেষ্টা করিয়া এখানে একটা পথের সন্ধান করিতে হয়। কেহ পথ পায়, কেহ পায় না। অনেক দিন হইতে হরকালীও এই সংসার-কাননে একটা সংক্ষেপ-পথ খুঁজিতেছিল, চন্দ্রনাথের পিতার মৃত্যুতে একটা সুরাহাও হইয়াছিল। কিন্তু এই আকস্মিক বিবাহ, বধূ সরযূ, চন্দ্রনাথের অতিরিক্ত পত্নীপ্রেম, তাহার এই পাওয়া-পথের মুখটা একেবারে পাষাণ দিয়া যেন গাঁথিয়া দিল। হরকালীর একটি বছর পাঁচেকের বোনঝি পিতৃগৃহে বড় হইয়া আজ দশ বছরেরটি হইয়াছে। কিন্তু সে কথা যাক। নানা কারণে হরকালীর মনের সুখ-শান্তি অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল।

অবশ্য আজও সে-ই গৃহিণী, তাহার স্বামী কর্তা—এ সমস্ত তেমনিই আছে। আজ পর্যন্ত সরযূ তাহারই মুখ চাহিয়া থাকে, কোন অসন্তোষ বা অভিমান প্রকাশ করে না। দেখিলে মনে হয়, সে এই পরিবারভুক্ত একটি সামান্য পরিজন মাত্র। হরকালীর স্বামী এইটুকু দেখিয়াই খুশী হইয়া যেই বলিতে যান—বৌমা আমার যেন—, হরকালী চোখ রাঙা করিয়া ধমক দিয়া বলিয়া উঠে, চুপ কর, চুপ কর। যা বোঝ না, তাতে কথা কয়ো না। তোমার হাতে দেওয়ার চেয়ে বাপ-মা আমাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিলে ছিল ভাল।

ব্রজকিশোর মুখ কালি করিয়া উঠিয়া যান।

হরকালীর বয়স প্রায় ত্রিশ হইতে চলিল, কিন্তু সরযূর আজও পঞ্চদশ উত্তীর্ণ হয় নাই,—তবু তাহার আসা অবধি দুই জনের মনে মনে যুদ্ধ বাধিয়াছে। প্রাণপণ করিয়াও হরকালী জয়ী হইতে পারে না। একফোঁটা মেয়ের শক্তি দেখিয়া হরকালী মনে মনে অবাক হয়। বাহিরের লোক এ কথা জানে না যে, এই অন্তর-যুদ্ধে সরযূ ডিক্রি পাইয়াছে, কিন্তু তাহা জারি করে নাই। নিজের ডিক্রি নিজে তামাদি করিয়া বিজিত অংশ তাহাকেই সে ফিরাইয়া দিয়াছে এবং এখানেই হরকালীর একেবারে হার হইয়াছে।

হরকালী বুঝিতে পারে, সরযূ বোবা কিংবা হাবা নহে। অনেকগুলি শক্ত কথারও সে এমন নিরুত্তর অবনতমুখে উত্তর দিতে সমর্থ যে, হরকালী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়, কিন্তু না পারিল সে এই মেয়েটির সহিত সন্ধি করিতে, না পারিল তাহাকে জয় করিতে। সরযূ যদি কলহ-প্রিয় মুখরা হইত, স্বার্থপর নির্দয় হইত, তাহা হইলেও হরকালী হয়ত পথ খুঁজিয়া পাইত। কিন্তু সরযূ নিজ হইতে এতখানি করুণা তাহাকে দিয়া রাখিয়াছে যে হরকালী অপরের করুণা ভিক্ষা করিবার আর অবকাশ পায় না। সরযূ অন্তরে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে যে, এ বাটীর সে-ই সর্বময়ী কর্ত্রী, হরকালী কেহ না, তাই বাহিরে সে কেহ না হইয়া হরকালীকেই সর্বময়ী করিয়াছে। ইহাতেই হরকালী আরও ঈর্ষার জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে।

শুধু একটি স্থান সরযূ একেবারে নিজের জন্য রাখিয়াছিল, এখানে হরকালী কিছুতেই

প্রবেশ করিতে পায় না। স্বামীর চতুষ্পার্শে সে এমন একটি সূক্ষ্ম দাগ টানিয়া রাখিয়াছে যে, তাহার ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারিলে, আর কেহ চন্দ্রনাথের শরীরে আঁচড়টিও কাটিতে পারে না। এই দাগের বাহিরে হরকালী যাহা ইচ্ছা করুক, কিন্তু ভিতরে আসিবার অধিকার ছিল না। বুদ্ধিমতী হরকালী বেশ বুঝিতে পারে যে, এই একফোঁটা মেয়েটি কোন্ এক মায়ামন্ত্রে তাহার নখদন্তের সমস্ত বিষ হরণ করিয়া লইয়াছে!

এমনি করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর গত হইল। সে এগারো বছর বয়সে স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, সতরোয় পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বয়সের সম্মান-জ্ঞানটা যেমন পুরুষের মধ্যে আছে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে তেমন নাই; পুরুষের মধ্যে অনেকগুলি পর্যায় আছে—যেমন দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট প্রভৃতি। ত্রিশবর্ষীয় একজন যুবা বিশ বছরের একজন যুবার প্রতি মুরুব্বিয়ানার চোখে চাহিয়া দেখিতে পারে, কিন্তু মেয়েমহলে এটা খাটে না। তাহার বিবাহকালটা পর্যন্ত বড় ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, জননী, পিসীমা অথবা ঠাকুরমাতার নিকট অল্পস্বল্প উমেদারি করে, নারী-জীবনে যাহা কিছু অল্পবিস্তর শিখিবার আছে, শিখিয়া লয়;—তাহার পরই একেবারে প্রথম শ্রেণীতে চড়িয়া বসে। তখন ষোল হইতে ছাপ্পান্ন পর্যন্ত তাহার সমবয়সী। স্থানভেদে হয়ত বা কোথাও এ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এমনি। অন্ততঃ, চন্দ্রনাথের গ্রাম-সম্পর্কীয়া ঠানদিদি হরিবালার জীবনে এমনটি দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। সেদিন অপরাহ্নে পশ্চিমদিকের জানালা খুলিয়া দিয়া সরযূ আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। হরিবালা এক থালা মিষ্টান্ন এবং একগাছি মোটা যূঁইয়ের মালা হাতে লইয়া একেবারে সরযূর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মালাগাছটি তাহাকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন, আজ থেকে তুমি আমার সই হ'লে। বল দেখি সই—

সরযূ একটু বিপন্ন হইল। তথাপি অল্প হাসিয়া কহিল, বেশ।

বেশ ত নয় দিদি, সই ব'লে ডাকতে হবে।

ইহাকে আদরই বল, আর আবদারই বল, সরযূর জীবনে ঠিক এমনটি ইতিপূর্বে ঘটিয়া উঠে নাই, তাই এই আকস্মিক আত্মীয়তাকে সে মনের মধ্যে মিলাইয়া লইতে পারিল না। একদণ্ডে একজন দিদিমার বয়সী লোকের গলা ধরিয়া 'সই' বলিয়া আহ্বান করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু হরিবালা যে ছাড়েন না। ইহাতে অভিনবত্ব কিংবা অস্বাভাবিকতা যে কিছু থাকিতে পারে, হরিবালার তাহা ধারণায় নাই। তাই সরযূর মুখ হইতে প্রিয়-সম্বোধনটির বিলম্ব দেখিয়া একটু গম্ভীরভাবে, একটু ম্লান হইয়া তিনি কহিলেন, তবে আমার মালা ফিরিয়ে দাও, আমি আর কোথাও যাই।

সরযূ বিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু অপ্রতিভ হয় নাই, ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, সইয়ের সন্ধানে নাকি?

ঠানদিদি একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিলেন, ব্যাঃ! এই যে বেশ কথা কও। তবে যে লোকে বলে, ওদের বৌ বোবা!

সরযূ হাসিতে লাগিল।

ঠানদিদি বলিলেন, তা শোন। এ গাঁয়ে তোমার একটিও সাথী নাই। বড়লোকের বাড়ি ব'লেও বটে, তোমার মামীর বচনের গুণেও বটে, কেউ তোমার কাছে আসে না, জানি। আমি তাই আসব। আমার কিন্তু একটা সম্পর্ক না হ'লে চলে না, তাই আজ 'সই' পাতালুম। আর বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু হরিনামের মালা নিয়েও সারা দিনটা কাটাতে পারি না। আমি রোজ আসব।

সরযূ কহিল, রোজ আসবেন।

হরিবালা গর্জিয়া উঠিলেন, আসবেন কি লা? বল সই, তুমি রোজ এস। 'তুই' বলতে পারবি নে, না?

সরয়, হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, রক্ষা কর ঠানদিদি, গলায় ছুরি দিলেও তা পারব না।

ঠানদিদিও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, তা না হয় সই বলিস। কিন্তু 'তুমি' বলতেই হবে। বল—সই তুমি রোজ এস।

সরয়, চোখ নীচু করিয়া সলজ্জহাস্যে কহিল, সই, তুমি রোজ এস।

হরিবালার যেন একটা দুর্ভাবনা কাটিয়া গেল। তিনি কহিলেন, আসব।

পরদিন হইতে হরিবালা প্রায়ই আসেন, শত-কর্ম থাকিলেও একবার হাজিরা দিয়া যান। ক্রমশঃ পাতানো সম্বন্ধ গাঢ় হইয়া আসিল। সময়ে সরয়ুও ভুলিল যে, হরিবালা তাহার সমবয়সী নহেন, কিংবা এই গলায় গলায় মেশামেশি সকলের কাছে তেমন সুন্দর দেখিতে হয় না।

এই অন্তরঙ্গতা হরকালীর কেমন লাগিত, বলিতে পারি না, কিন্তু চন্দ্রনাথের বেশ লাগিত। স্ত্রীর সহিত এ বিষয়ে প্রায়ই তাহার কথাবার্তা হইত। ঠানদিদির এই হৃদ্যতায় সে আমোদ বোধ করিত। আরও একটু কারণ ছিল। চন্দ্রনাথ স্ত্রীকে বড় স্নেহ করিত; সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া ভালবাসা না থাকিলেও স্নেহের অভাব ছিল না। সে মনে করিত, সকলের ভাগ্যেই একরূপ স্ত্রী মিলে না। কাহারো বা স্ত্রী দাসী, কাহারো বা বন্ধু, কাহারো বা প্রভু! তাহার ভাগ্যে যদি একটি পুণ্যবতী, পবিত্রা, সাধ্বী এবং স্নেহময়ী দাসী মিলিয়াছে ত, সে অসুখী হইয়া কি লাভ করিবে? তাহার উপর একটা কথা প্রায়ই তাহার মনে হয়, সেটা সরয়ূর বিগত দিনের দুঃখের কাহিনী। শিশুকালটা তাহার বড় দুঃখেই অতিবাহিত হইয়াছে। দুঃখিনীর কন্যা হয়ত সারা-জীবনটা দুঃখেই কাটাইত; হয়ত বা এতদিনে কোন দুর্ভাগ্য দুশ্চরিত্রের হাতে পড়িয়া চক্ষের জলে ভাসিত, না হয় দাসীবৃত্তি করিতে গিয়া শত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিত; তা ছাড়া, এত অধিক রূপ-যৌবন লইয়া নরকের পথও দুরূহ নহে;—তাহা হইলে?

এই কথাটা মনে উঠিলেই চন্দ্রনাথ গভীর করুণায় সরয়ূর লজ্জিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আচ্ছা সরয়ু, আমি যদি তোমাকে না দেখতুম, যদি বিয়ে না করতুম, এতদিন তুমি কার কাছে থাকতে বল ত?

সরয়ু জবাব দিত না; সভয়ে স্বামীর বুকের কাছে সরিয়া আসিত। চন্দ্রনাথ সস্নেহে তাহার মাথার উপর হাত রাখিত। যেন সাহস দিয়া মনে মনে বলিত, ভয় কি!

সরয়ু আরও কাছে সরিয়া আসিত—এসব কথায় সত্যই সে বড় ভয় পাইত। চন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়াই যেন তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিত, তা নয় সরয়ু, তা নয়। তুমি দুঃখীর ঘরে গিয়ে কেন জন্মেছিলে, জানিনে; কিন্তু তুমিই আমার জন্ম-জন্মান্তরের পতিব্রতা স্ত্রী! তুমি সংসারের যে-কোন জায়গায় ব'সে টান দিলে আমাকে যেতেই হ'ত। তোমার আকর্ষণেই যে আমি কাশী গিয়েছিলুম, সরয়ু!

এই সময় তাহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া যে ভাবের স্রোত বহিয়া যাইত, সরয়ূর সমস্ত স্নেহ, প্রেম, যত্ন, ভক্তি এক করিলেও বোধ করি তাহার তুলনা হইত না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দুঃখীকে দয়া করিয়া যে গর্ব, যে তৃপ্তি, বালিকা সরয়ূকে বিবাহ করিবার সময় একদিন আত্মপ্রসাদের ছদ্মবেশে চন্দ্রনাথের নিভৃত-অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, এখন শতচেষ্টাতেও চন্দ্রনাথ তাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে পারে না। হৃদয়ের এক অজ্ঞাত অন্ধকার কোণে আজও সে বাসা বাঁধিয়া আছে। তাই, যখনই সেটা মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়, তখনই চন্দ্রনাথ সরয়ূকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বার বার বলিতে থাকে, আমি বড় আশ্চর্য হই সরয়ু, যাকে চিরদিন দেখে এসেচ, তাকে কেন আজও তোমার চিনতে বিলম্ব হচ্চে! আমি তো তোমাকে কাশীতে দেখেই চিনেছিলুম, তুমি আমার! কত যুগ, কত কল্প, কত জন্ম-জন্ম ধ'রে আমার! কি জানি, কেন আলাদা হয়েছিলুম, আবার এক হয়ে মিলতে এসেচি।

সরয়ু বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মৃদুকণ্ঠে কহে, কে বললে, আমি তোমাকে চিনতে পারিনি?

উৎসাহের আতিশয্যে চন্দ্রনাথ সরয়ূর লজ্জিত মুখখানি নিজের মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলে, পেরেচ? তবে কেন এত ভয়ে ভয়ে থাক? আমি ত কোন দুর্ব্যবহার করিনে—আমি যে আমার নিজের চেয়েও তোমাকে ভালবাসি সরয়ু।

সরযূ আবার স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফেলে। চন্দ্রনাথ আবার প্রশ্ন করে, বল, কেন ভয় পাও সরযূ? সরযূ আর উত্তর দিতে পারে না। স্বামীকে স্পর্শ করিয়া সে মিথ্যা কথা কি করিয়া মুখে আনিবে? কি করিয়া বলিবে যে, ভয় করে না? সত্যই যে তাহার বড় ভয়! সে যে কত সত্য, কত বড় ভয়, তাহা সে ছাড়া আর কে জানে?

তা কথাটা কি বলিতেছিলাম! চন্দ্রনাথ হরিবালার আগমনে আমোদ বোধ করিত। সরযূ একটি সখী পাইয়াছে, দু'টা মনের কথা বলিবার লোক জুটিয়াছে—ইহাই চন্দ্রনাথের আনন্দের কারণ।

একদিন সরযূ সমস্ত দুপুরটা হরিবালার প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। আকাশে মেঘ করিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল; হরিবালা আসিলেন না। সরযূ মনে করিল, জল পড়িতেছে, তাই আসিলেন না। এখন বেলা যায়-যায়, সমস্ত দিনটা একা কাটিয়াছে, হরকালীও আজ বাটী নাই। সরযূ তখন সাহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর পড়িবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে এ ঘরটিতে কেহ প্রবেশ করিত না। সরযূও না। চন্দ্রনাথ বই হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, আজ বুঝি তোমার সই আসে- নি?

না।

তাই বুঝি আমাকে মনে পড়েছে?

সরযূ ঈষৎ হাসিল। ভাবটা এই যে, মনে সর্বদাই পড়ে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। সরযূ বলিল, জলের জন্য বোধ হয় আসতে পারেনি।

বোধ হয়, তা নয়। আজ কাকার ছোটমেয়ে নির্মলাকে আশীর্বাদ করতে এসেছে। শীঘ্রই বিয়ে হবে। তারই আয়োজনে ঠানদিদি বোধ হয় মেতেছেন।

সরযূ বলিল, বোধ হয়।

তাহার পর চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দুঃখ হয় যে, আমরা একেবারে পর হয়ে গেছি—মামীমা কোথায়?

তিনিও বোধ হয় সেইখানে।

চন্দ্রনাথ চুপ কবিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

সরযূ ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া একপাশে বসিয়া পড়িয়া বলিল, কি ভাবচ, বল না।

চন্দ্রনাথ একবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া সরযূর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, বিশেষ-কিছু নয় সরযূ। ভাবছিলাম, নির্মলার বিয়ে, কাকা কিন্তু আমাকে একবার খবরটাও দিলেন না, অথচ মামীমাকেও ডেকে নিয়ে গেলেন। আমরা দু'জনেই শুধু পর!

তাহার স্বরে একটু কাতরতা ছিল, সরযূ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমাকে পায়ে স্থান দিয়েই তুমি আরও পর হয়ে গেছ; না হ'লে বোধ হয় এত দিনে মিল হ'তে পারত।

চন্দ্রনাথ হাসিল, কহিল, মিল হয়ে কাজ নেই। তোমার পরিবর্তে, কাকার সঙ্গে মিল ক'রে যে আমার মস্ত সুখ হ'ত, সে মনে হয় না। আমি বেশ আছি। যখন বিয়ে করেছিলুম, তখন যদি কাকার মত নিতে হ'ত, তা হ'লে এমন ত বোধ হয় না যে, তোমাকে কখনো পেতুম—একটা বাধা নিশ্চয় উঠত। হয় কুল নিয়ে, না হয় বংশ নিয়ে—যেমন ক'রেই হোক, এ বিয়ে ভেঙ্গে যেত।

ভিতরে ভিতরে সরযূ শিহরিয়া উঠিল। তখন সন্ধ্যার ছায়া ঘরের মধ্যে অন্ধকার করিয়াছিল, তাই তাহার মুখখানি দেখিতে পাওয়া গেল না, কিন্তু যে হাতখানি তাহার হাতের মধ্যে ধরা ছিল, সেই হাতখানি কাঁপিয়া উঠিয়া সরযূর সমস্ত মনের কথা চন্দ্রনাথের কাছে প্রকাশ করিয়া দিল। চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, এখন বুঝতে পেরেছ, মত না নিয়ে ভাল করেচি কি মন্দ করেচি?

সরযূ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কি জানি! আমার মত শত সহস্র দাসীরও ত তোমার অভাব হ'ত না!

চন্দ্রনাথ সরযূর কোমল হাতখানি সস্নেহে ঈষৎ পীড়ন করিয়া বলিল, তা জানিনে। আমার দাসী একটি, তার অভাবের কথাই ভাবতে পারি। শত সহস্রের ভাবনা ইচ্ছে হয় তুমি ভেবো।

পরদিন হরিবালা আসিলেন; কিন্তু মুখের ভাবটা কিছু স্বতন্ত্র। ফস করিয়া গলা ধরিয়া সই-সই বলিয়া তিনি ব্যস্ত করিলেন না, কিংবা বিন্তি খেলিবার জন্য তাস আনিতেও পুনঃ পুনঃ সাধাসাধি পীড়াপীড়ি করিলেন না! মলিনমুখে মৌন হইয়া রহিলেন।

সরযূ বলিল, সইয়ের কাল দেখা পাইনি।

হ্যাঁ দিদি—কাল বড় কাজ ছিল। ও-বাড়িতে নির্মলার বিয়ে।

তা শুনেছি। সব ঠিক হ'ল কি?

হরিবালা সে কথার উত্তর না দিয়া সরযূর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, সই, একটা কথা—সত্যি বলবি?

কি কথা?

যদি সত্যি বলিস, তা হ'লেই জিজ্ঞাসা করি—না হ'লে জিজ্ঞাসা ক'রে কোন লাভ নেই।

সরযূ চিন্তিত হইল। বলিল, সত্যি বলব না কেন?

দেখিস দিদি—আমাকে বিশ্বাস করিস ত?

করি বৈ কি।

তবে বল্ দেখি, চন্দ্রনাথ তোকে কতখানি ভালবাসে?

সরযূ একটু লজ্জিত হইল, বলিল, খুব দয়া করেন।

দয়ার কথা নয়। খুব একেবারে বড় বেশী ভালবাসে কিনা?

সরযূ হাসিল। বলিল, বড় বেশী কিনা—কেমন ক'রে জানব?

সত্যি জানিস নে?

না।

সত্যই সরযূ ইহা জানিত না। হরিবালা যেন বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, স্ত্রী জানে না স্বামী তাকে কতখানি ভালবাসে! এইখানেই আমার বড় ভয় হয়।

হরিবালার মুখের ভাবে একটা গভীর শঙ্কা প্রচ্ছন্ন ছিল, সরযূ তাহা বুঝিয়া নিজেও শঙ্কিত হইল। বলিল, ভয় কিসের?

আর একদিন শুনিস। তার পর তাহার চিবুকে হাত দিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, এত রূপ. এত গুণ, এত বুদ্ধি নিয়ে সই, এত দিন কি ঘাস কাটছিলি?

সরযূ হাসিয়া ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তখনও কথাটা প্রকাশ পায় নাই। হরিদয়াল ঘোষালের সন্দেহের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন ছিল। একজন ভদ্রলোকের মত দেখিতে অথচ বস্ত্রাদি জীর্ণ এবং ছিন্ন আজ দুই-তিন দিন হইতেই বামুন-ঠাকরুন সুলোচনা দেবীর সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া যাইতেছিল। সুলোচনা ভাবিত. হরিদয়াল তাহা জানেন না; কিন্তু তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন।

আজ দ্বিপ্রহরে দয়ালঠাকুর এবং কৈলাসখুড়ো ঘরে বসিয়া সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন, এমন সময় অন্দরের প্রাঙ্গণে একটা গোলযোগ উঠিল। কে যেন মৃদুকণ্ঠে সকাতরে দয়া ভিক্ষা চাহিতেছে, এবং অপরে কর্কশকণ্ঠে তীব্র-ভাষায় তিরস্কার করিতেছে এবং ভয় দেখাইতেছে। একজন স্ত্রীলোক, অপর পুরুষ। দয়ালঠাকুর কহিলেন, খুড়ো, বাড়িতে কিসের গোলমাল হয়?

কৈলাসখুড়ো বলিলেন, কিস্তি! সামলাও দেখি বাবাজী!

আবার অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। ভিতরের গোলমাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া দয়ালঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। খুড়ো, একটু ব'স, আমি দেখে আসি।

খুড়া তাঁহার কোঁচার টিপ এক হাতে ধরিয়া কহিলেন, এবার যে দাবা চাপা গেল।

দয়ালঠাকুর পুনর্বার বসিয়া পড়িলেন। কিন্তু গোলমাল কিছুতেই থামে না। তখন দয়ালঠাকুর অগত্যা উঠিয়া পড়িলেন। প্রাঙ্গণে আসিয়া দেখিলেন, সুলোচনা দুই হাতে

সেই লোকটার পা জড়াইয়া আছে এবং সে উত্তরোত্তর চাপা-কণ্ঠে কহিতেছে, আমার কথা রাখ, না হ'লে যা বলছি তাই করব!

সুলোচনা কাঁদিয়া বলিতেছে, আমায় মার্জনা কর। তুমি একবার সর্বনাশ করেছ, যা-একটু বাকী আছে, সেটুকু আর নাশ করো না।

সে কহিতেছে, তোমার মেয়ে বড়লোকের ঘরে পড়েছে, দু'হাজার টাকা দিতে পারে না? আমি টাকা পেলেই চ'লে যাব।

সুলোচনা কহিল, তুমি মাতাল, অসচ্চরিত্র!—দু'হাজার টাকা তোমার কত দিন? তুমি আবার আসবে, আবার টাকা চাইবে।—আমি কিছুতেই তোমায় টাকা দেব না।

আমি মদ ছেড়ে দেব। ব্যবসা করব, আর কখনও তোমার কাছে টাকা চাইতে আসব না।

সুলোচনা সে কথার উত্তর না দিয়া ভূমিতলে মাথা খুঁড়িয়া যুক্ত-করে কহিল, দয়া কর—টাকার জন্য আমি সরযূকে অনুরোধ করতে পারব না।

দয়ালঠাকুর যে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা কেহই দেখে নাই, তাই এসব কথা জোরে জোরেই হইতেছিল। দয়ালঠাকুর এইবার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা দুজনেই চমকিত হইল—দয়ালঠাকুর এই অপরিচিত লোকটার নিকটে আসিয়া কহিলেন, তুমি কার অনুমতিতে বাড়ির ভিতরে ঢুকেছ?

লোকটা প্রথমে থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর যখন বুঝিল, কাজটা তেমন আইন-সঙ্গত হয় নাই, তখন সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। কঠিন মুষ্টিতে হরিদয়াল তাহার হাত ধরিয়া উচ্চকণ্ঠে পুনর্বার কহিলেন, কার অনুমতিতে?

পলাইবার উপায় নাই দেখিয়া সে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, সুলোচনার কাছে এসেছি।

তাহার মুখ দিয়া তীব্র সুরার গন্ধ বাহির হইতেছে, এবং সর্বাঙ্গে হীনতা এবং অত্যাচারের মলিন-ছায়া পড়িয়াছে। দয়ালঠাকুর ঘৃণায় ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া সেইরূপ কর্কশ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কার হুকুমে?

হুকুম আবার কি?

লোকটার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল; সহসা যেন তাহার স্মরণ হইল, প্রশ্নকর্তার উপর তাহার জোর আছে এবং এ বাড়ির উপরেও কিঞ্চিৎ দাবী আছে।

দয়ালঠাকুর এরূপ উত্তরে অসম্ভব চটিয়া উঠিলেন, উচ্চস্বরে কহিলেন, ব্যাটা মাতাল, জান, তোমাকে এখনি জেলে দিতে পারি!

সে বিদ্রূপ করিয়া কহিল, জানি বৈ কি!

দয়ালঠাকুর প্রায় প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, জান বৈ কি! চল্‌ ব্যাটা, এখনি তোকে পুলিশে দেব।

লোকটা ঈষৎ হাসিয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিল, যেন পুলিশের নিকট যাইতে তাহার বিশেষ আপত্তি নাই। কহিল, এখনই দেবে?

দয়ালঠাকুর ধাক্কা দিয়া বলিলেন, এখনি।

লোকটা ধাক্কা সামলাইয়া স্থির হইয়া গম্ভীরভাবে বলিল, ঠাকুর, একেবারে অত বিক্রম প্রকাশ করো না, পুলিশে দেবে কি থানায় দেবে, একটু বিলম্ব ক'রে দিয়ো। আমি তোমাকে কাশী ছাড়া করতে পারি, জান?

দয়ালঠাকুর উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ব্যাটা পাজী, আজ আমার চল্লিশ বছর কাশীবাস হ'ল, এখন তুমি কাশী-ছাড়া করবে?

তিনি ভাবিয়াছিলেন, লোকটা তাঁহাকে গুণ্ডার ভয় দেখাইতেছে। অনেকে এ কথায় হয়ত ভয় পাইত, কিন্তু এই দীর্ঘকালের কাশীবাসে দয়ালঠাকুরের এ ভয় ছিল না। বলিলেন, ব্যাটা, আমার কাছে গুণ্ডাগিরি!

গুণ্ডাগিরি নয় ঠাকুর, গুণ্ডাগিরি নয়। পুলিশে নিয়ে চল। সেখানেই সব কথা প্রকাশ করব।

কোন্‌ কথা প্রকাশ করবে?

যা জানি। যাতে তুমি কাশী ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না। যাতে সমস্ত দেশের লোক শুনবে যে, তুমি জাতিচ্যুত অব্রাহ্মণ।

আমি অব্রাহ্মণ!

রাগ করো না, ঠাকুর। তুমি জাতিচ্যুত। শুধু তাই নয়। তোমার কাছে যত ভদ্রসন্তান বিশ্বাস ক'রে এসেছে, এই তিন বৎসরের মধ্যে যত লোককে তুমি অন্ন বেচেছ, সকলেরই জাত গেছে। সকলকেই আমি সে কথা বলবো।

দয়ালঠাকুর ভয় পাইলেন। ভয়ের যথার্থ কারণ হৃদয়ঙ্গম হইবার পূর্বেই উদ্ধত কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আসিল। তথাপি বলিলেন, আমি লোকের জাত মেরেছি?

তাই। আর প্রমাণ করবার ভারও আমার।

ঠাকুর নরম হইয়া কণ্ঠস্বর কিছু কম করিয়া বলিলেন, কথাটা কি, ভেঙ্গে বল দেখি বাপু?

লোকটা মৃদু হাসিয়া কহিল, একাই শুনবে, না, দু'-দশজন লোক ডাকবে। আমি বলি, দু'-চারজন লোক ডাক। দু'-চারজন পাড়াপড়শীর সামনে কথাটা শোনাবে ভাল।

দয়ালঠাকুর তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, রাগ করো না বাপু, আমি হঠাৎ বড় অন্যায় কাজ করেছি। কিছু মনে করো না। এস, ঘরে চল।

দুই জনে একটা ঘরে আসিয়া বসিলে দয়ালঠাকুর কহিলেন, তার পর?

সে কহিল, সুলোচনা—যার হাতে আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়, তাকে কোথায় পেলেন?

এইখানেই পেয়েছি। দুঃখীর কন্যা, তাই আশ্রয় দিয়েছি।

টাকাওয়ালা লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, এ কথা আমি বলছি না। কিন্তু সে কি জাত, তার অনুসন্ধান করেছেন কি?

দয়ালঠাকুরের সমস্ত মুখমণ্ডল একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, ব্রাহ্মণ-কন্যা, বিধবা, শুদ্ধাচারিণী, তার হাতে খেতে দোষ কি?

ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং বিধবা, এ কথা সত্যি, কেউ যদি কুলত্যাগ ক'রে চ'লে যায়, তাকেও কি শুদ্ধাচারিণী বলা চলে? না, তার হাতে খাওয়া যায়?

দয়ালঠাকুর জিভ কাটিয়া বলিলেন, শিব! শিব! তা কি খাওয়া যায়!

তবে তাই! পনরো-ষোল বৎসর পূর্বে সুলোচনা তিন বছরের একটি মেয়ে নিয়ে গৃহ-ত্যাগ করে, এবং তাকেই আশ্রয় দিয়ে আপনি নিজের এবং আর পাঁচজনের সর্বনাশ করেছেন!

প্রমাণ?

প্রমাণ আছে বৈ কি! তার জন্য ভাববেন না। যাঁর সঙ্গে কুলত্যাগ করেন, সেই অসীম প্রেমাস্পদ রাখাল ভট্চায এখনো বেঁচে আছেন।

দয়াল লোকটার মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন ইহারই নাম রাখাল। বলিলেন, তুমি কি ব্রাহ্মণ?

লোকটা মলিন উড়ানির ভিতর হইতে অধিকতর মলিন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, না, না, গোয়ালা!

দয়াল একটুখানি সরিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমাকে দেখে তো চামার ব'লে মনে হয়েছিল। যা হোক, নমস্কার।

সে ব্যক্তি রাগ করিল না। বলিল, নমস্কার। আপনার অনুমান মিথ্যা নয়, আমাকে চামার বলাও চলে, মুসলমান খ্রীষ্টান বলাও চলে। আমি জাত মানিনে—আমি পরমহংস।

তুমি অতি পাষণ্ড।

সে বলিল, সে কথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখচি না, কেননা, ইতিপূর্বে অনেকেই অনুগ্রহ ক'রে ও কথা বলেছেন। কি ছিলাম, কি হয়েচি, তা এখনো বুঝি। কিন্তু আমিই রাখালদাস।

দয়ালের মুখখানি অপরিসীম ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কোনমতে মনের ভাব দমন করিয়া তিনি বলিলেন, এখন কি করতে চাও? সুলোচনাকে নিয়ে যাবে?

আজ্ঞে না। তাতে আপনার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হবে, আমি অত নরাধম নই।

প্রাণের দায়ে দয়াল এ পরিহাসটাও পরিপাক করিলেন। তারপর বলিলেন, তবে কি চাও? আবার এসেচ কেন?

টাকা চাই। দারুণ অর্থাভাব, তাই আপাততঃ এসেছি। হাজার-দুই পেলেই নিঃশব্দে চলে যাব, জানাতে এসেছি।

এত টাকা তোমায় কে দেবে?

যার গরজ। আপনি দেবেন—সুলোচনার জামাই দেবে—সে বড়লোক।

দয়াল তাহার স্পর্ধা দেখিয়া মনে মনে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিন্তু সে অতিশয় ধূর্ত এবং কৌশলী, তাহাও বুঝিলেন। বলিলেন, বাপু, আমি দরিদ্র, অত টাকা কখনও চোখে দেখিনি। তবে সুলোচনার জামাই দিতে পারে, সে কথা ঠিক। কিন্তু সে দেবে না। তাকে চেন না, ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে দু'হাজার ত ঢের দূরের কথা—দুটো পয়সাও আদায় করতে পারবে না। তুমি যে বুদ্ধিমান লোক তা টের পেয়েছি, কিন্তু সে আরও বুদ্ধিমান। বরং আর কোন ফন্দি দেখ—এ খাটবে না।

রাখাল দয়ালের মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিল। বলিল, সে ভাবনা আমার। দেখা যাক, যত্নে কৃতে যদি—

দয়াল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, থাক বাবা, দেবভাষাটাকে আর অপবিত্র করো না।

রাখাল সপ্রতিভভাবে বলিল, যে আজ্ঞে। কিন্তু আর ত বসতে পাচ্চিনে—বলি তাঁর ঠিকানাটা কি?

দয়াল বলিলেন, সুলোচনাকেই জিজ্ঞাসা কর না বাপু।

রাখাল কহিল, সে বলবে না, কিন্তু আপনি বলবেন।

যদি না বলি?

রাখাল শান্তভাবে বলিল, নিশ্চয়ই বলবেন। আর না বললে কি করব, তা ত পূর্বেই বলেছি।

দয়ালের মুখ শুকাইল। তিনি বলিলেন, আমি তোমার কিছুই ত করিনি বাপু।

রাখাল বলিল, না, কিছু করেন নি। তাই এখন কিছু করতে বলি। নাম-ধামটা ব'লে দিলে জামাইবাবুকেও দুটো আশীর্বাদ ক'রে আসি, মেয়েটাকেও একবার দেখে আসি। অনেক দিন দেখিনি।

দয়ালঠাকুর রীতিমত ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু মুখে সাহস দেখাইয়া কহিলেন, আমি তোমায় সাহায্য করব না। তোমার যা ইচ্ছা কর। অজ্ঞাতে একটা পাপ করেছি, সে জন্য না হয় প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার আর ভয় কি?

ভয় কিছুই নেই, তবে পান্ডা-মহলে আজই একথা রাষ্ট্র হবে। তার পর যেমন ক'রে পারি, অনুসন্ধান ক'রে সুলোচনার জামাইয়ের কাছে যাব, এবং সেখানেও এ কথা প্রকাশ করব। নমস্কার ঠাকুর, আমি চললাম।

সত্যিই সে চলিয়া যায় দেখিয়া দয়াল তাহার হাত ধরিয়া পুনর্বার বসাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, বাপু, তুমি যে অল্পে ছাড়বার পাত্র নও তা বুঝেছি। রাগ করো না। আমার কথা শোন। এর মধ্যে তুমি এ কথা নিয়ে আর আন্দোলন করো না। হপ্তাখানেক পরে এস, তখন যা হয় করব।

মনে রাখবেন, সেদিন এমন ক'রে ফেরালে চলবে না। দয়াল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, বাপু, তুমি কি সত্যিই বামুনের ছেলে?

আজ্ঞে।

দয়াল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আশ্চর্য! আচ্ছা, হপ্তাখানেক পরেই এস—এর মধ্যে আর আন্দোলন করো না, বুঝলে?

আজ্ঞে, বলিয়া রাখাল দুই-এক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ভাল কথা। গোটা-দুই টাকা দিন তো। মাইরি, মনিব্যাগটা কোথায় যে হারালাম, বলিয়া সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে লাগিল।

দয়াল রাগে তাহার পানে আর চাহিতেও পারিলেন না। নিঃশব্দে দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন, সে তাহা ট্যাঁকে গুঁজিয়া প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া গেল, কিন্তু সেইখানে দয়াল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ যেন সহস্র বৃশ্চিকের দংশনে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কিন্তু সুলোচনা কোথায়? আজ তিন দিন ধরিয়া হরিদয়াল আহার, নিদ্রা, পূজা-পাঠ, ধাত্রীর অনুসন্ধান, সব বন্ধ রাখিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত কাশী খুঁজিয়াও যখন তাহাকে বাহির করিতে পারিলেন না, তখন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, বিশ্বেশ্বর! এ কি দুর্দৈব? অনাথাকে দয়া করিতে গিয়া শেষে কি পাপ সঞ্চয় করিলাম!

গলির শেষে কৈলাসখুড়োর বাটী। হরিদয়াল সেখানে আসিয়া দেখিলেন, কেহ নাই। ডাকিলেন, খুড়ো, বাড়ি আছ?

কেহ সাড়া দিল না দেখিয়া তিনি ঘরের মধ্যে আসিলেন, দেখিলেন, কৈলাস প্রদীপের আলোকে নিবিষ্টচিত্তে সতরঞ্চ সাজাইয়া একা বসিয়া আছে; বলিলেন, খুড়ো, একাই দাবা খেলচ?

খুড়ো চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এস বাবাজী, এই চালটা বাঁচাও দেখি।

হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া মনে মনে গালি পাড়িয়া কহিলেন, নিজের জাত বাঁচে না, ও বলে কিনা দাবার চাল বাঁচাও!

কৈলাসের কানে কথাগুলো অর্ধেক প্রবেশ করিল, অর্ধেক করিল না। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বল বাবাজী?

বলি, সেদিনের ব্যাপারটা সব শুনেছিলে?

কি ব্যাপার?

সেই যে আমাদের ভিতরের সেদিনকার গোলযোগ!

কৈলাস কহিলেন, না বাবাজী, ভাল শুনতে পাইনি। গোলযোগ বোধ করি খুব আস্তে আস্তে হয়েছিল; কিন্তু সেদিন তোমার দাবাটা আচ্ছা চেপেছিলাম!

হরিদয়াল মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত করিয়া কহিলেন, তা ত চেপেছিলে, কিন্তু কথাগুলো কিছুই শোননি?

কৈলাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, না, কিছুই প্রায় শুনতে পাইনি। অত আস্তে আস্তে গোলমাল করলে কি ক'রে শুনি বল? কিন্তু সেদিনকার খেলাটা কি রকম জমেছিল, মনে আছে? মন্ত্রীটা তুমি কোনমতেই বাঁচাতে পারতে না—আচ্ছা, এই ত ছিল, কৈ বাঁচাও দেখি কেমন—

হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, মন্ত্রী চুলোয় যাক! জিজ্ঞেস করি, সেদিনকার কথাবার্তা কিছু শোননি?

খুড়ো হরিদয়ালের বিরক্ত মুখের দিকে চাহিয়া এইবার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কি জানি বাবাজী, স্মরণ ত কিছুই হয় না।

হরিদয়াল ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, আচ্ছা সংসারের যেন কোন কাজই না করলে, কিন্তু পরকালটা মান ত?

মানি বৈ কি!

তবে! সেকালের একটা কাজও করেছ কি? একদিনের তরেও মন্দিরে গিয়েছিলে কি?

কৈলাস বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কি বল দয়াল, মন্দিরে যাইনি! কত দিন গিয়েছি।

দয়াল তেমনি গম্ভীর হইয়াই বলিতে লাগিলেন, তুমি এই বিশ বৎসর কাশীবাসী হয়েছ, কিন্তু বোধ হয় বিশ দিনও ঠাকুর দর্শন করনি—পূজা-পাঠ ত দূরের কথা!

কৈলাস প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, না দয়াল, বিশ দিনের বেশী হবে; তবে কি জান বাবাজী, সময় পাই না ব'লেই পুজোটুজোগুলো হয়ে উঠে না। এই দেখ না, সকাল বেলাটা শম্ভু মিশিরের সঙ্গে এক চাল বসতেই হয়—লোকটা খেলে ভাল। এ বাজি শেষ হ'তেই দুপুর বেজে যায়, তারপর আহ্নিক সেরে পাক করতে, আহার করতে বেলা শেষ হয়। তার

পর বাবাজী, গঙ্গা পাঁড়ের—তা যাই বল, লোকটার খেলার বড় তারিফ—আমাকে ত সেদিন প্রায় মাত করেছিল। ঘোড়া আর গজ দু'টো দু'কোণ থেকে চেপে এসে—আমি বলি বুঝি—

আঃ! থামো না খুড়ো—দুপুর বেলা কি কর, তাই বল।

দুপুর বেলা! গঙ্গা পাঁড়ের সঙ্গে—তার গজ দু'টো—এই কালই দেখ না—

দয়াল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন, হয়েচে, হয়েচে—দুপুর বেলা গঙ্গা পাঁড়ে আর সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানা—আর তোমার সময় কোথায়?

কৈলাস চুপ করিয়া রহিলেন—হরিদয়াল অধিকতর গম্ভীর হইয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু খুড়ো, দিনও ত আর বেশী নেই। পরকালের জন্যও প্রস্তুত হওয়া উচিত, আর সে কথা কিছু কিছু ভাবাও দরকার। দাবার পুঁটলিটা আর সঙ্গে নিতে পারবে না।

কৈলাস হঠাৎ হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, না না দয়াল, দাবার পুঁটলিটা বোধ করি সঙ্গে নিতে পারব না। আর প্রস্তুত হ'বার কথা বলচ বাবাজী? প্রস্তুত আমি হয়েই আছি। যেদিন ডাক আসবে, ঐটে কারো হাতে তুলে দিয়ে সোজা রওনা হয়ে পড়ব—সেজন্যে চিন্তার বিষয় আর কি আছে?

কিছুই নেই? কোন শঙ্কা হয় না?

কিছু না, বাবাজী, কিছু না। যেদিন কমলা আমার চলে গেল, যেদিন কমলচরণ আমার মুখের পানেই চোখ রেখে চোখ বুজলে, সেদিন থেকেই শঙ্কা, ভয় প্রভৃতি উপদ্রবগুলো তাদের পিছনে পিছনেই চলে গেল—কেমন ক'রে যে গেল, সে কথা একদিনের তরে জানতে পারলাম না বাবাজী—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ দু'টি ছলছল করিয়া আসিল।

দয়াল বাধা দিয়া বলিলেন, থাক সে-সব কথা। এখন আমার কথাটা শুনবে?

বল বাবাজী।

দয়াল তখন সেদিনের কাহিনী একে একে বিবৃত করিয়া শেষে বলিলেন, এখন উপায়?

শুনিতে শুনিতে কৈলাসের সদাপ্রফুল্ল মুখশ্রী পাংশুবর্ণ হইল। কাতরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, এমন হয় না, হরিদয়াল। সুলোচনা সতী-সাবিত্রী ছিলেন।

দয়াল কহিলেন, আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু স্ত্রীলোকে সকলই সম্ভব।

ছি, অমন কথা মুখে এনো না। মানুষ-মাত্রেই পাপপুণ্য ক'রে থাকে—এতে স্ত্রী-পুরুষের কোন প্রভেদ দেখিনে। বাবাজী, তোমার জননীর কথা কি স্মরণ হয় না, সে স্মৃতি একেবারে মুছে ফেলেচ?

হরিদয়াল লজ্জিত হইলেন, অথচ বিরক্তও হইলেন, কিছুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া তিনি বলিলেন, কিন্তু এখন যে জাত যায়।

কৈলাস বলিলেন, একটা প্রায়শ্চিত্ত কর। অজানা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই কি?

আছে, কিন্তু এখানকার লোকে আমাকে যে একঘরে করবে?

করলেই বা—

হরিদয়াল এবার বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, করলেই বা! কি বলছ! একটু বুঝে বল খুড়ো।

বুঝেই বলছি, দয়াল! তোমার বয়সও কম হয়নি—বোধ করি পঞ্চাশ পার হ'ল। এতটা বয়স জাত ছিল, বাকী দু'চার বছর না হয় নাই রইল, বাবাজী, এতই কি তাতে ক্ষতি?

ক্ষতি নেই? জাত যাবে, ধর্ম্ম যাবে, পরকালে জবাব দেব কি?

কৈলাস কহিলেন, এই জবাব দেবে যে একজন অনাথাকে আশ্রয় দিয়েছিলে।

হরিদয়াল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কথাটা তাঁহার মনের সঙ্গে একেবারেই মিলিল না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, তবে সুলোচনার জামায়ের ঠিকানা দেব না।

কিছুতেই না। এক ব্যাটা বদমায়েস—মাতাল—সে ভয় দেখিয়ে তোমার কাছে টাকা আদায় করবে, আর এক ভদ্র-সন্তানের কাছে টাকা আদায় করবে, আর তুমি তার সাহায্য করবে?

কিন্তু না করলে যে আমার সর্ব্বস্ব যায়! একজনও যজমান আসবে না। আমি খাব কি ক'রে?

কৈলাস বলিলেন, সে ভয় করো না। আমি সরকার বাহাদুরের কল্যাণে বিশ টাকা

পেন্সন পাই, খুড়োভাইপোর তাতেই চলে যাবে। আমরা খাব, আর দাবা খেলব, ঘর থেকে কোথাও বেরোব না।

বিরক্ত হইলেও এরূপ বালকের মত কথায় হরিদয়াল হাসিয়া বলিলেন, খুড়ো, আমার বোঝা তুমিই বা কেন ঘাড়ে নেবে, আর আমিই বা কেন পরের হাঙ্গামা মাথায় বয়ে জাত-ধর্ম খোয়াব? তার চেয়ে—

কৈলাস বলিলেন, ঠিক ত। তার চেয়ে তাদের নাম-ধাম ঠিকানা ব'লে দিয়ে একজন দরিদ্র বালিকাকে তার স্বামী, সংসার, সম্মান, সমস্ত হ'তে বঞ্চিত ক'রে এই বুড়ো হাড়-গোড়গুলো ভাগাড়ের শিয়াল-কুকুরের গ্রাস থেকে বাঁচাতে হবে! বাঁচাও গে বাবাজী, কিন্তু আমাকে বলতে এসে ভাল করনি। তবে যখন মতলব নিতেই এসেছ, তখন আর একটা কথা ব'লে দিই। কাশীধাম, মা অন্নপূর্ণার রাজত্ব। এখানে বাস ক'রে তাঁর সতী মেয়েদের পিছনে লেগে মোটের উপর বড় সুবিধা হবে না বাবা।

হরিদয়াল ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, খুড়ো কি এবার শাপ-সম্পাত করচ।

না। তোমরা কাশীর পাণ্ডা, স্বয়ং বাবার বাহন, আমাদের শাপ-সম্পাত তোমাদের লাগবে না—সে ভয় তোমার নেই, কিন্তু যে কাজে হাত দিতে যাচ্চ, বাবা, সে বড় নিরাপদ জিনিস নয়। সতী-সাবিত্রীকে যমে ভয় করে। সেই কথাটাই মনে করিয়ে দিচ্চি। অনেকদিন একসঙ্গে দাবা খেলেচি—তোমাকে ভালও বাসি।

হরিদয়াল জবাব দিলেন না, মুখ কালি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কৈলাস বলিলেন, বাবাজী, কথাটা তাহ'লে রাখবে না?

হরিদয়াল বলিলেন, পাগলের কথা রাখতে গেলে পাগল হওয়া দরকার।

কৈলাস চুপ করিয়া রহিলেন, হরিদয়াল বাহির হইয়া গেলেন।

কৈলাস দাবার পুঁটুলিটা টানিয়া লইয়া গ্রন্থি বাঁধিতে বাঁধিতে মনে মনে ভাবিলেন, বোধ হয় ওর কথাই ঠিক। আমার পরামর্শ হয়ত সংসারে সত্যই চলে না। মানুষ মরিলে লোকাভাব হইলে কেহ কেহ ডাকিতে আসে—দাহ করিতে হইবে। রোগ হইলে ডাকিতে আসে—শুশ্রূষা করিতে হইবে। আর সতরঞ্চ খেলিতে আসে। কৈ, এত বয়স হইল, কেহ ত কখন পরামর্শ করিতে আসে নাই!

কিন্তু অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভাবিয়াও তিনি স্থির করিতে পারিলেন না, কেন, এই সূর্যের আলোর মত পরিষ্কার এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জিনিসটা লোক-গ্রাহ্য হয় না, কেন এই সহজ প্রাঞ্জল ভাষাটা সংসারের লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

সেই রাত্রেই হরিদয়াল অনেক চিন্তার পর মন স্থির করিয়া চন্দ্রনাথের খুড়ো, মণিশঙ্করকে পত্র লিখিয়া দিলেন যে, চন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় এক বেশ্যা-কন্যা বিবাহ করিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হরিদয়াল সমস্ত কথা পরিষ্কার করিয়া মণিশঙ্করকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহার সহজেই বিশ্বাস হইল, সংবাদটা অসত্য নহে। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না, এস্থলে কর্তব্য কি? এ সংবাদটা তাঁহার পক্ষে সুখেরই হউক বা দুঃখেরই হউক, গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই। এত ভার তাঁহার একা বহিতে ক্লেশ বোধ হইল, তাই স্ত্রীকে নিরিবিলিতে পাইয়া মোটামুটি খবরটা জানাইয়া বলিলেন, আমার পরামর্শ নিলে কি এমন হ'ত? না এতবড় জুয়াচুরি ঘটতে দিতাম? যাই হউক, কথাটা এখন প্রকাশ করো না, ভাল ক'রে ভেবে দেখা উচিত। কিন্তু ভাল করিয়া ভাবিতে সময় লাগে, দুই-চারি দিন অপেক্ষা করিতে হয়, স্ত্রীলোক এতটা পারে না, তাই হরিদয়ালের পত্রের মর্মার্থ দুই-চারি কান করিয়া ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মেয়ে দেখার দিন হরিবালা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাই ভয়ে ভয়ে সেদিন জানিতে আসিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথ সরযুকে কতখানি ভালবাসেন। সেদিন মেয়ে-মহলে অস্ফুট-কলকণ্ঠে এ প্রশ্নটা খুব উৎসাহের সহিত আলোচিত হইয়াছিল,

কেননা, তাহারাই প্রথমে বুঝিয়াছিল যে, শুধু ভালবাসার গভীরতার উপরেই সরযূর ভবিষ্যৎ নিহিত আছে।

সকলেই চাপা গলায় কথা কহে, সকলের মুখে চোখে প্রকাশ পায় যে, একটা পৈশাচিক আনন্দ-প্রবাহ এই কোমল বক্ষগুলির মধ্যে ছুটিয়া ফিরিতেছে। দুঃখপ্রকাশ এবং দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত আছেই, কিন্তু সকলেরই যেন গোপন ইচ্ছা সরযূর ভাগ্যদেবতা যেদিকে মুখ ফিরাইলে তাহারা অত্যন্ত দুঃখের সহিত 'আহা' বলিবে, সেই পরম দুঃখের চিত্রটি যেন তাহারা দেখিতে পায়। আজ দুইদিন ধরিয়া উৎকণ্ঠায় তাহাদের নিদ্রা হয় না। ক্রমে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। এই রাতদিন শুধু ধুঁয়া হইয়াছে, আগুন জ্বলে নাই—কথাটা শুধু মেয়েদের মধ্যে বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিয়াছে গিয়াছে, অথচ দুকূল ভাসাইয়া বহিতে পারে নাই। পুরুষের দলেও একথা উঠিতেছিল, কিন্তু তাহা অল্প সময়ের জন্য। তাহাদিগের চন্দ্রনাথের জাতি-মারা ভিন্ন আরও কাজ আছে, সংসারের ভার বহন করিতে হয়—একেবারে গা ছড়াইয়া দিয়া অনেকক্ষণের জন্য বসিবার সময় পায় না, তাই কথাটা মীমাংসা হইবার পূর্বেই দল ভাঙিয়া যায়। তবে কথাটা যদি ছোট হইত, চন্দ্রনাথ দরিদ্র হইত, তাহা হইলে বোধ করি যেমন তেমন মীমাংসা হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু এরূপ স্থলে কেহই প্রকাশ্যভাবে দলপতি সাজিয়া চন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সাহস করিল না। যে পারিত, সে মণিশঙ্কর। কিন্তু কেন বলিতে পারি না, তিনি একেবারেই কোন কথা উত্থাপন করেন না। এখন পাড়ার বর্ষীয়সী বিধবা বা সধবার দল কর্তব্য-কর্মে মন দিলেন। তাঁহারা নিরপরাধ ব্রজকিশোর, তাঁহার পত্নী হরকালীর ধর্ম ও জাত বাঁচাইবার পবিত্র বাসনায়, নিতান্ত দুঃখের সহিত জানাইয়া দিয়া গেলেন যে, ইহা নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে, বধূমাতা সরযূর মা একজন কাশীবাসিনী বেশ্যা, সুতরাং তাঁহার কন্যার স্পর্শিত পান-ভোজনাদি ব্যবহারে তাঁহাদের উভয় স্ত্রী-পুরুষেরই জাতি এবং ধর্মনাশ হইয়াছে।

প্রথমটা হরকালী বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে বলিলেন, কি হয়েছে?

রামময়ের বৃদ্ধা জননী ফোস করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর কি হবে বড়গিন্নী, যা হবার তাই হয়েছে—সর্বনাশ হয়েচে। এই বলিয়া তিনি কাহিনীটা আর একবার আগা-গোড়া বিবৃত করিয়া গেলেন। বলিবার সময় অল্পস্বল্প ভুল-ভ্রান্তি যাহা ঘটিল, তাহা আর পাঁচজনে সংশোধন করিয়া দিল। এইরূপে হরকালী হৃদয়ঙ্গম করিলেন, সত্যই সর্বনাশ ঘটিয়াছে। কিন্তু সেটা কতটা তাঁহার নিজের এবং কতটা আর একজনের, সেই কথাটাই বেশ করিয়া অনুভব করিতে তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরের মধ্যে দ্বার বন্ধ করিলেন। যাঁহারা ভাল করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাল করিলেন কি মন্দ করিলেন, ঠিক বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া চিন্তিত বিমর্ষমুখে একে একে সরিয়া পড়িল। নিভৃত ঘরের মধ্যে আসিয়া হরকালীর আশঙ্কা হইল, তাঁহার দগ্ধ অদৃষ্টে এতবড় সুসংবাদ শেষ পর্যন্ত টিকিবে কি না! তিনি ভাবিলেন, যদি নাই টিকে, উপায় নাই। কিন্তু যদি অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াই থাকে, যদি ভগবান এতদিন পরে সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিয়া থাকেন, তাহা হইলে বোনঝিটি এখনও আছে,—এখনো সে পরের হাতে গিয়া পড়ে নাই—এই তার সময়। যাহাই হউক, শেষ পর্যন্ত যে প্রাণপণ করিয়া দেখিতেই হইবে, তাহাতে আর তাঁহার কিছুমাত্র সংশয় রহিল না। তিনি মুখ ম্লান করিয়া যেখানে চন্দ্রনাথ লেখাপড়া করিতেছিল, সেইখানে আসিয়া উপবেশন করিলেন।

তাঁহার মুখের ভয়ঙ্কর ভাব দেখিয়া চন্দ্রনাথ চিন্তিত হইয়া বলিল, কি হয়েছে মামীমা।

হরকালী শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, বাবা, চন্দ্রনাথ, দুঃখী ব'লে কি আমাদের শাস্তি দিতে হয়।

চন্দ্রনাথ হতবুদ্ধি হইয়া গেল, সে কি করিয়াছে, তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না।

হরকালী বলিতে লাগিলেন, আর বাকী কি? একমুঠো ভাতের জন্য জাত গেল, ধর্ম গেল। বাবা, খাবার থাকলে কি তুমি এমন ক'রে আমাদের সর্বনাশ করতে পারতে।

চন্দ্রনাথ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অনেকটা শান্তভাবে কহিল, হয়েছে কি?

হরকালী আঁচল দিয়া মিথ্যা চোখ মুছিয়া বলিলেন, পোড়া কপালে যা হ'বার তাই হয়েছে। আমার সোনার চাঁদ তুমি, তোমাকে ডাকিনীরা ভুলিয়ে এই কাণ্ড করেচে।

পায়ে পড়ি মামীমা, খুলে বল!

আর কি বলব? তোমার খুড়োকে জিজ্ঞেস কর।

চন্দ্রনাথ এবার বিরক্ত হইল। বলিল, খুড়োকেই যদি জিজ্ঞাসা করব, তবে তুমি অমন করচ কেন?

আমাদের সর্বনাশ হয়েছে, তাই এমন কাঁচ্চ বাবা,—আর কেন?

চন্দ্রনাথ মাতুল ও মাতুলানীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, কিন্তু ওরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইতে হয়, সে বিরক্ত হইয়াছিল, আরো বিরক্ত হইয়া বলিল, যদি সর্বনাশ হয়েই থাকে ত অন্য ঘরে যাও—আমার সামনে অমন করো না।

হরকালী তখন চন্দ্রনাথের মৃত-জননীর নামোচ্চারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন —ওগো, তুমি আমাদের ডেকে এনেছিলে, আজ তোমার ছেলে তাড়িয়ে দিতে চায় গো।

চন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া মামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, খুলে না বললে, কেমন করে বুঝব মামী, কিসে তোমাদের সর্বনাশ হ'ল। সর্বনাশ সর্বনাশই করছো, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলতে পারলে না!

হরকালী আর একবার চোখ মুছিয়া বলিলেন, কিছুই জান না—বাবা?

না।

তোমার খুড়োকে কাশী থেকে তোমাদের পাণ্ডা চিঠি লিখেচে।

কি লিখেচে?

হরকালী তখন ঢোক গিলিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, বাবা, কাশীতে তোমাকে একা পেয়ে ডাকিনীরা ভুলিয়ে যে বেশ্যার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েচে।

চন্দ্রনাথ বিস্ফারিত চক্ষে প্রশ্ন করিল, কার গো?

শিরে করতাড়না করিয়া হরকালী বলিলেন, তোমার।

চন্দ্রনাথ কাছে সরিয়া আসিয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কার বেশ্যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে? আমার?

হাঁ।

তার মানে, বিয়ের পূর্বে সরযূ বেশ্যাবৃত্তি করত? মামীমা, ওকে যে দশ বছরেরটি ঘরে এনেচি, সে কথা কি তোমার মনে নাই?

তা ঠিক জানিনে চন্দরনাথ, কিন্তু ওর মায়ের কাশীতে নাম আছে।

তবে সরযূর মা বেশ্যাবৃত্তি করত! ও নিজে নয়?

হরকালী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, ও একই কথা বাবা, একই কথা।

চন্দ্রনাথ ধমক দিয়া উঠিল, কাকে কি বলচ মামী? তুমি কি পাগল হয়েছ?

ধমক খাইয়া হরকালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিলেন, পাগল হবারই কথা যে বাবা। আমাদের দু'জনের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দাও—তারপর যেদিকে দু'চক্ষু যায়, আমরা চলে যাই। এর চেয়ে ভিক্ষে ক'রে খাওয়া ভাল।

চন্দ্রনাথ রাগের মাথায় বলিল, সেই ভাল।

তবে চলে যাই?

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া বলিল, যাও।

তখন হরকালী আবার সশব্দে কপালে করাঘাত করিলেন, হা পোড়াকপাল। শেষে এই অদৃষ্টে ছিল!

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, তবু পরিষ্কার ক'রে বলবে না?

সব ত বলেছি।

কিছুই বলনি—চিঠি কৈ?

তোমার কাকার কাছে।

তাতে কি লেখা আছে?

তাও ত বলেছি।

চন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। গভীর লজ্জায় ও ঘৃণায় তাহার পদতল হইতে কেশাগ্র পর্যন্ত বার-দুই শিহরিয়া উঠিয়া সমস্ত দেহ যেন অসাড় হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—ছিঃ।

হরকালী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে ভয় পাইলেন—এমন ভীষণ কঠোর ভাব কোন মৃত-মানুষের মুখেও কেহ কোন দিন দেখে নাই। তিনি নিঃশব্দে উঠিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথ কহিল, কৈ চিঠি দেখি?

মণিশংকর নিঃশব্দে বাক্স খুলিয়া একখানি পত্র তাহার হাতে দিলেন। চন্দ্রনাথ সমস্ত পত্রটা বার-দুই পড়িয়া শুষ্ক-মুখে প্রশ্ন করিল, প্রমাণ?

রাখালদাস নিজেই আসচে।

তাঁর কথায় বিশ্বাস কি?

তা বলতে পারিনে। যা ভাল বিবেচনা হয়, তখন করো।

সে কি জন্য আসছে? এ কথা প্রমাণ ক'রে তার লাভ?

লাভের কথা ত চিঠিতেই লেখা আছে। দু'হাজার টাকা চায়।

চন্দ্রনাথ তাঁহার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া সহজভাবে কহিল, এ কথা প্রকাশ না হ'লে সে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করতে পারত, কিন্তু সে আশায় তার ছাই পড়েচে। আপনি এক হিসাবে আমার উপকার করেছেন—এতগুলো টাকা বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

মণিশঙ্কর লজ্জায় মরিয়া গেলেন। ইচ্ছা হইল বলেন যে, তিনি এ কথা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তথাপি স্মরণ হইল, তাঁহার দ্বারাই ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। স্ত্রীকে না বলিলে কে জানিতে পারিত? সুতরাং অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ পুনরায় কহিল, এ গ্রাম আমাদের। অথচ একজন দীন, লম্পট ভিক্ষুক আমাকে অপমান করবার জন্য আমার গ্রামে আমার বাড়িতে আসচে যে কি সাহসে সে কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইনে, কিন্তু এই কথাটা আজ আপনাকে জিজ্ঞাসা করি কাকা, আমার মৃত্যু হলে কি আপনি সুখী হন?

মণিশঙ্কর জিভ কাটিয়া কহিলেন, ছি ছি, অমন কথা মুখেও এনো না চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ কহিল, আর কোনদিন আনবার আবশ্যক হবে না। আপনি আমার পূজনীয়, আজ যদি কোন অপরাধ করি মার্জনা করবেন। আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আপনি নিন, নিয়ে আমার 'পরে প্রসন্ন হোন। শুধু যেখানেই থাকি, কিছু কিছু মাসহারা দেবেন—ঈশ্বরের শপথ ক'রে বলচি, এর বেশী আর কিছু চাইব না। কিন্তু এ সর্বনাশ আমার করবেন না। তাহার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল এবং অধর দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে কোন-মতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন থামাইয়া ফেলিল।

মণিশঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্রনাথের ডান-হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, বাবা চন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় অগ্রজের তুমি একমাত্র বংশধর—আমি ভিক্ষা চাইচি বাবা, আর এ বৃদ্ধকে তিরস্কার করো না।

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তিরস্কার করি না কাকা। কিন্তু এত বড় দুর্ভাগ্যের পর দেশ ত্যাগ করা ছাড়া আর আমার অন্য পথ নেই, সেই কথাই আপনাকে বলছিলাম।

মণিশঙ্কর বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, দেশ ত্যাগ করবে কেন? না জেনে এরূপ বিবাহ করেচ, তাতে বিশেষ লজ্জার কারণ নেই—শুধু একটা প্রায়শ্চিত্ত করা বোধ করি প্রয়োজন হবে। চন্দ্রনাথ মৌন হইয়া রহিল। মণিশঙ্কর উৎসাহিত হইয়া পুনরায় কহিলেন, উপায় যথেষ্ট আছে। বউমাকে পরিত্যাগ ক'রে একটা গোপনে প্রায়শ্চিত্ত কর। আবার বিবাহ কর, সংসারী হও—সকল দিক রক্ষা হবে।

চন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিল।

সংসারাভিজ্ঞ মণিশঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিয়া স্থির-দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রনাথ কহিল, কোন মতেই পরিত্যাগ করতে পারব না কাকা।

মণিশঙ্কর কহিলেন, পারবে চন্দ্রনাথ। আজ বিশ্রাম কর গে, কাল সুস্থিরচিত্তে ভেবে দেখো এ কাজ শক্ত নয়। বউমাকে কিছুতেই গৃহে স্থান দেওয়া যেতে পারে না।

কিন্তু প্রমাণ না নিয়ে কিরূপে ত্যাগ করতে অনুমতি করেন?

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, অধিক প্রমাণ যাতে না হয় সে উপায় করব। কিন্তু তোমাকেও আপাততঃ ত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করলেই গোল মিটবে।

কে মেটাবে?

আমি মেটাব।

কিন্তু কিছুমাত্র অনুসন্ধান না ক'রেই—

ইচ্ছা হয়, অনুসন্ধান পরে করো। কিন্তু একথা যে মিথ্যা নয়, তা আমি তোমাকে নিশ্চয় বললাম।

চন্দ্রনাথ বাটী ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল; মণিশঙ্কর বলিয়াছেন, সরযূকে ত্যাগ করিতে হইবে। শয্যার উপর পড়িয়া শূন্য-দৃষ্টিতে উপরের দিকে চাহিয়া মানুষ ঘুমাইয়া যেমন করিয়া কথা কহে, ঠিক তেমনি করিয়া সে ঐ একটা কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল। সরযূকে ত্যাগ করিতে হইবে, সে বেশ্যার কন্যা। কথাটা সে অনেকবার অনেক রকম করিয়া নিজের মুখে উচ্চারণ করিল, নিজে কান পাতিয়া শুনিল, কিন্তু মনে বুঝিতে পারিল না। সে সরযূকে ত্যাগ করিয়াছে,—সরযূ বাটীর মধ্যে নাই, ঘরের মধ্যে নাই, চোখের সুমুখে নাই, চোখের আড়ালে নাই, সে আর তাহার নাই। বস্তুটা যে ঠিক কি এবং কি তাহার সম্পূর্ণ আকৃতি, সহস্র চেষ্টাতেও তাহা সে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারিল না। অথচ মণিশঙ্কর বলিয়াছেন, কাজটা শক্ত নয়। কাজটা শক্ত কি সহজ, পারা যায় কি যায় না, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবার মত শক্তি, মানুষের হৃদয়ে আছে কি না, তাহাও সে স্থির করিতে পারিল না। সে নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল এবং এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইয়া কত কি স্বপ্ন দেখিল—কোনটা স্পষ্ট, কোনটা ঝাপসা—ঘুমের ঘোরে কি একরকমের অস্পষ্ট ব্যথা তাহার সর্বাঙ্গে যেন নড়িয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাও সে অনুভব করিল, তাহার পর সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, এমন সময় সে ঘুম ভাঙিগয়া উঠিয়া বসিল। তাহার মানসিক অবস্থা তখন এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, মায়া-মমতার ঠাঁই নাই, রাগ করিবার, ঘৃণা করিবারও ক্ষমতা নাই। শুধু একটা অব্যক্ত অবোধ্য লজ্জার গুরুভারে তাহার সমস্ত দেহ-মন ধীরে ধীরে অবশ ও অবনত হইয়া একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

এমনি সময়ে বাতি জ্বালিয়া আনিয়া ভৃত্য রুদ্ধ-দ্বারে ঘা দিতেই চন্দ্রনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং কপাট খুলিয়া দিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। চোখের উপর আলো লাগিয়া তাহার মোহের ঘোর আপনা আপনিই স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছিল, এবং তাহারই ভিতর দিয়া এখন হঠাৎ সন্দেহ হইল, কথাটা সত্য কি?—সরযূ নিজে জানে কি? জানিয়া শুনিয়া তাহার সরযূ তাহারই এত বড় সর্বনাশ করিবে, এ কথা চন্দ্রনাথ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া সরযূর শয়নকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া সরযূ বসিয়া ছিল। স্বামীকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নাই, যেন একফোঁটা রক্তও নাই। চন্দ্রনাথ একেবারেই বলিল, সব শুনেচ?

সরযূ মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

সব সত্য?

সত্য।

চন্দ্রনাথ শয্যার উপর বসিয়া পড়িল,—এতদিন বলনি কেন?

মা বারণ করিয়াছিলেন, তুমিও জিজ্ঞাসা করনি।

তোমার মায়ের উপকার করেছিলাম, তাই তোমরা এইরূপে শোধ দিলে!

সরযূ অধোমুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ পুনরায় কহিল, এখন দেখচি কেন তুমি অত ভয়ে ভয়ে থাকতে, এখন বুঝচি এত ভালবেসেও কেন সুখ পাইনি, পূর্বের সব কথাই এখন স্পষ্ট হয়েচে। এই জন্যই বুঝি তোমার মা কিছুতেই এখানে আসতে স্বীকার করেন নি।

সরযূ মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

মুহূর্তের মধ্যে চন্দ্রনাথ বিগত দিনের সমস্ত কথা স্মরণ করিল। সেই কাশীবাস, সেই চিরশুভ্র মূর্তি সরযূর বিধবা মাতা,—সেই তাঁর কৃতজ্ঞ সজল চক্ষু দু'টি, স্নিগ্ধ শান্ত কথাগুলি। চন্দ্রনাথ সহসা আর্দ্র হইয়া বলিল, সরযূ, সব কথা আমাকে খুলে বলতে পার?

পারি। আমার মামার বাড়ি নবদ্বীপের কাছে। রাখাল ভট্টাচার্যের বাড়ি আমার মামার বাড়ির কাছেই ছিল। ছেলেবেলা থেকেই মা তাঁকে ভালবাসতেন। দু'জনের একবার বিয়ের কথাও হয়, কিন্তু তাঁরা নীচু ঘর ব'লে বিয়ে হতে পায়নি। আমার বাবার বাড়ি হালিশহর। আমার যখন তিন বৎসর বয়স, তখন বাবা মারা যান, মা আমাকে নিয়ে নবদ্বীপ ফিরে আসেন। তার পর আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, সেই সময় আমাকে নিয়ে মা—

চন্দ্রনাথ বলিল, তার পরে?

আমরা কিছুদিন মথুরায় থাকি, বৃন্দাবনে থাকি, তার পর কাশীতে আসি। সেই সময়ে রাখাল মদ খেতে শুরু করে। মায়ের কিছু অলঙ্কার ছিল, তাই নিয়ে রোজ ঝগড়া হ'ত। তার পর একরাত্রে সমস্ত চুরি ক'রে পালায়। সে সময় মায়ের হাতে একটি পয়সাও ছিল না। সাত-আট দিন আমরা ভিক্ষা ক'রে কোনরূপে থাকি, তার পরে যা ঘটেছিল, তুমি নিজেই জান।

চন্দ্রনাথের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে সরযূর আনত মুখের দিকে ক্রুর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি সরযূ, তুমি এই! তোমরা এই! সমস্ত জেনে শুনে তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে? এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনে, কি মহাপাপিষ্ঠা তুমি!

সরযূর চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইল না। অধিকতর কঠোর হইয়া বলিল, এখন উপায়?

সরযূ চোখের জল মুছিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুমি ব'লে দাও।

তবে কাছে এস।

সরযূ কাছে আসিলে চন্দ্রনাথ দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, লোকে তোমাকে ত্যাগ করতে বলে, কিন্তু আমার সে সাহস হয় না—তোমাকে বিশ্বাস হয় না—আমি সব বিশ্বাস হারিয়েচি।

মুহূর্তের মধ্যে সরযূর বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে এক ঝলক রক্ত ছুটিয়া আসিল, অশ্রু-মলিন চোখ দু'টি মুহূর্তের জন্য চকচক করিয়া উঠিল, বলিল, আমাকে বিশ্বাস নেই?

কিছু না—কিছু না, তুমি সব পার।

সরযূ স্বামীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া অবিচলিতকণ্ঠে কহিল, তুমি যে আমার কি, তা তুমিও জান। একদিন তুমি আমাকে বলেছিলে, তোমার মুখের পানে চেয়ে দেখতে। আজ আমার মুখের পানে একবার চেয়ে দেখ। আজ আমি উপায় ব'লে দেব, বল, শুনবে?

শুনব। দাও ব'লে কি উপায়!

সরযূ বলিল, আমি বিষ খেলে উপায় হয় কি?

চন্দ্রনাথের মুষ্টি আরও দৃঢ় হইল, যেন পলাইয়া না যাইতে পারে। কহিল, হয়। হয় সরযূ, হয়। বিষ খেতে পারবে?

পারব।

খুব সাবধানে, খুব গোপনে।

তাই হবে।

আজই।

সরযূ কহিল, আচ্ছা, আজই। চন্দ্রনাথ চলিয়া যায় দেখিয়া সে স্বামীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, একটা আশীর্বাদও করলে না?

চন্দ্রনাথ উপর দিকে চাহিয়া বলিল, এখন নয়। যখন চলে যাবে, যখন মৃতদেহ পুড়ে ছাই হবে, তখন আশীর্বাদ করব।

সরযূ পা ছাড়িয়া দিয়া বলিল, তাই করো।

চন্দ্রনাথ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই সে আর একবার উঠিয়া গিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি বিষ খেলে কোন বিপদ তোমাকে স্পর্শ করবে না ত?

কিছু না।

কেউ কোন রকম সন্দেহ করবে না ত?

নিশ্চয় করবে। কিন্তু টাকা দিয়ে লোকের মুখ বন্ধ করব।

সরযূ বলিল, বিছানার তলায় একখানা চিঠি লিখে রেখে যাব, সেইখানা দেখিয়ো।

চন্দ্রনাথ কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিল, তাই করো। বেশ ক'রে লিখে নীচে নিজের নাম স্পষ্ট ক'রে লিখে রেখো—কেউ যেন না বুঝতে পারে, আমি তোমাকে খুন করেচি। আর একটা কথা, ঘরের দোর-জানালা বেশ ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ো—একবিন্দু শব্দ যেন বাইরে না যায়। আমি যেন শুনতে না পাই—

সরযূ দ্বার ছাড়িয়া দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া আর একবার প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে যাও—বলিয়াই তাহার কি যেন সন্দেহ হইল—হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, রোসো, আর একটু দাঁড়াও। সে প্রদীপ কাছে আনিয়া স্বামীর মুখের দিকে বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। চন্দ্রনাথের দুই চোখে একটা অমানুষিক তীব্র-দ্যুতি—ক্ষিপ্তের দৃষ্টির মত তাহা ঝকঝক করিয়া উঠিল।

চন্দ্রনাথ বলিল, চোখে কি দেখছ সরযূ?

সরযূ এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিছু না, আচ্ছা যাও।

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল—বিড়বিড় করিয়া বলিতে বলিতে গেল—সেই ভাল—সেই ভাল—আজই।

দশম পরিচ্ছেদ

সেই রাত্রে সরযূ নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া মনে মনে কহিল, আমি বিষ খেতে কিছুতেই পারব না। একা হ'লে মরতে পারতাম কিন্তু আমি ত আর একা নই—আমি যে মা। মা হয়ে সন্তান বধ করব কেমন ক'রে। তাই সে মরিতে পারিল না। কিন্তু তাহার সুখের দিন যে নিঃশেষ হইয়াছে, তাহাতেও তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

গভীর রাত্রে চন্দ্রনাথ সহসা তাহার স্ত্রীর ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং সমস্ত শুনিয়া উন্মত্ত-আবেগে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল। অস্ফুটে বারংবার কহিতে লাগিল, এমন কাজ কখনো করো না সরযূ, কখনো না। কিন্তু ইহার অধিক সে ত আর কোন ভরসাই দিতে পারিল না। তাহার এই বৃহৎ ভবনে এই হতভাগিনীর জন্য এতটুকু কোণের সন্ধানও ত সে খুঁজিয়া পাইল না, যেখানে সরযূ তাহার লজ্জাহত পাংশু মুখখানি লুকাইয়া রাখিতে পারে। সমস্ত গ্রামের মধ্যে কোথাও একবিন্দু মমতাও সে কল্পনা করিতে পারিল না, যাহার আশ্রয়ে সে তপ্ত অশ্রুরাশির একটি কণাও মুছিতে পারে। কাঁদিয়া কাটিয়া সে সাত দিনের সময় ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে। ভাদ্র মাসের এই শেষ সাতটি দিন সে স্বামীর আশ্রয়ে থাকিয়া চিরদিনের মত নিরাশ্রিতা পথের ভিখারিণী হইতে যাইবে। ভাদ্র মাসে ঘরে কুকুর বিড়াল তাড়াইতে নাই,—গৃহস্থের অকল্যাণ হয়, তাই সরযূর এই আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছে।

একদিন সে স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, আমার দুরদৃষ্ট আমি ভোগ করব, সে জন্য

তুমি দুঃখ করো না। আমার মত দুর্ভাগিনীকে ঘরে এনে অনেক সহ্য করেছ, আর করো না। বিদায় দিয়ে আবার সংসারী হও, আমার এমন সংসার যেন ভেঙে ফেলো না।

চন্দ্রনাথ হেঁটমুখে নিরুত্তর হইয়া থাকে। ভালমন্দ কোন জবাবই খুঁজিয়া পায় না। তবে, এই কথাটা তাহার মনে হইতেছে, আজকাল সরযূ যেন মুখরা হইয়াছে। বেশী কিছু কথা কহিতেছে। এতদিন তাহার মনের মধ্যে যে ভয়টা ছিল, এখন তাহা নাই। দু'দিন পূর্বেও সে মুখ ঢাকিয়া, মুখোশ পরিয়া এ সংসারে বাস করিতেছিল; তখন সামান্য বাতাসেও ভয় পাইত, পাছে তাহার ছদ্ম আবরণ খসিয়া পড়ে, পাছে তাহার সত্য পরিচয় জানাজানি হইয়া যায়। এখন তাহার সে ভয় গিয়াছে। তাই এখন নির্ভয়ে কথা কহিতেছে। এ জীবনে তাহার যাহা-কিছু ছিল, সেই স্বামী, তাহার সর্বস্ব, সমাজের আদালত ডিক্রি জারি করিয়া নিলাম করিয়া লইয়াছে। এখন সে মুক্তঋণ, সর্বস্বহীন সন্ন্যাসিনী। তাই সে স্বামীর সহিত স্বচ্ছন্দে কথা কহে, বন্ধুর মত, শিক্ষকের মত উপদেশ দিয়া নির্ভীক মতামত প্রকাশ করে। আর সেদিনের রাত্রে দুইজন দুইজনকে ক্ষমা করিয়াছে। চন্দ্রনাথ বিষ খাইতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তাহার এ আত্মগ্লানি সরযূর সব দোষ ঢাকিয়া দিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে হরকালী একখণ্ড কাগজে টিকিট আঁটিয়া স্বামীকে দিয়া মাথামুণ্ড কত-কি লিখাইতেছিলেন।

ব্রজকিশোর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, এত লিখে কি হবে?

হরকালী তাড়া দিয়া বলিলেন, তোমার যদি একটুও বুদ্ধি থাকত, তাহ'লে জিজ্ঞেস করতে না। একবার আমার কথা না শুনে এইটি ঘটেছে, আর কোন বিষয়ে নিজের বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না।

হরকালী যাহা বলিলেন, সুবোধ শিশুর মত ব্রজকিশোর তাহা লিখিয়া লইলেন। শেষ হইলে হরকালী স্বয়ং তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ঠিক হয়েছে। নির্বোধ ব্রজকিশোর চুপ করিয়া রহিলেন। অপরাহ্ণে হরকালী কাগজখানি হাতে লইয়া সরযূর কাছে আসিয়া কহিলেন, বউমা, এই কাগজখানিতে তোমার নামটি লিখে দাও।

কাগজ হাতে লইয়া সরযূ মুখপানে চাহিয়া কহিল, কেন মামীমা?

যা বলচি, তাই কর না বউমা!

কিসে নাম লিখে দেব, তাও কি শুনতে পাব না?

হরকালী মুখখানা ভারী করিয়া কহিলেন, এটা বাছা তোমারই ভালর জন্য। তুমি এখানে যখন থাকবে না, তখন কোথায় কিভাবে থাকবে, তাও কিছু আমরা আর সন্ধান নিতে যাব না। তা বাছা, যেমন করেই থাক না কেন, মাসে পাঁচ টাকা ক'রে খোরাকি পাবে। একি মন্দ?

ভাল-মন্দ সরযূ বুঝিত। এবং এই হিতাকাঙ্ক্ষিণীর বুকের ভিতর যতটুকু হিত প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাও বুঝিল, কিন্তু যাহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নদীগর্ভে ভাঙিয়া পড়িতেছে, সে আর খানকতক ইট বাঁচাইবার জন্য নদীর সহিত কলহ করিতে চাহে না। সরযূ সেই কথা ভাবিল। তথাপি একবার হরকালীর মুখের পানে চাহিয়া দেখিল। সেই দৃষ্টি! যে-দৃষ্টিকে হরকালী সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন, ভয় করিতেন, আজিও তিনি এ চাহনি সহিতে পারিলেন না। চোখ নামাইয়া বলিলেন, বউমা!

হাঁ মামীমা, লিখে দিই। সরযূ কলম লইয়া পরিষ্কার করিয়া নিজের নাম সই করিয়া দিল।

আজই দোসরা আশ্বিন—সরযূর চলিয়া যাইবার দিন। প্রাতঃকাল হইতে বড় বৃষ্টি পড়িতেছিল, হরকালী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, পাছে যাওয়া না হয়।

সমস্ত দিন ধরিয়া সরযূ ঘরের দ্রব্য-সামগ্রী গুছাইয়া রাখিতেছিল। মূল্যবান বস্ত্রাদি একে একে আলমারিতে বন্ধ করিল। সমস্ত অলঙ্কার লোহসিন্দুকে পুরিয়া চাবি দিল, তাহার পর স্বামীকে ডাকিয়া আনিতে লোক পাঠাইয়া দিয়া নিজে ভূমিতলে পড়িয়া অনেক কান্না কাঁদিল। গৃহত্যাগের সময় যত নিকটে আসিতেছে, ক্লেশ তত অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। এই সাত দিন যেভাবে কাটিয়াছিল, আজ সেভাবে কাটিবে বলিয়া মনে হইতেছে না। তাহার শঙ্কা হইল, পাছে এই শেষ দিনটিতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, যাইবার সময় পাছে নিতান্ত তাড়িত

ভিক্ষুকের মত দেখিতে হয়। আত্মসম্মানটুকুকে সে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়াছিল; সেটুকুকে ত্যাগ করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চন্দ্রনাথ আসিলে সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, এস, আজ আমার যাবার দিন। তখনও তাহার চক্ষুর পাতা আর্দ্র রহিয়াছে। চন্দ্রনাথ আর-এক দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। সরযূ কাছে আসিয়া বলিল, এই চাবি নাও। যত দিন আর বিয়ে না কর, ততদিন অপর কাকেও দিও না।

চন্দ্রনাথ রুদ্ধস্বরে কহিল, যেখানে হর রেখে দাও।

সরযূ হাত দিয়া টানিয়া চন্দ্রনাথের মুখ ফিরাইয়া ধরিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কাঁদবার চেষ্টা করচ?

চন্দ্রনাথের মনে হইল কথাটা বড় শক্ত বলা হইয়াছে। সরযূ তখনই তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া আদর করিয়া বলিল, মনে ক'রে দেখ কোন দিন একটা পরিহাস করিনি, তাই যাবার দিনে আজ একটা তামাশা করলাম, রাগ করো না। তাহার পর কহিল, যা-কিছু ছিল, সমস্ত বন্ধ ক'রে আলমারিতে রেখে গেলাম, দেখো, মিছামিছি আমার একটি জিনিসও যেন নষ্ট না হয়।

চন্দ্রনাথ চাহিয়া দেখিল, নিরাভরণা সরযূর হাতে শুধু চার-পাঁচ গাছি কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু নাই। সরযূর এ মূর্তি তাহার দুই চোখে শূলে বিদ্ধ করিল, কিন্তু, কি বলিবে সে? আজ দু'খানা অলঙ্কার পরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়া কি করিয়া সে এই দেবীর প্রতিমূর্তিটিকে অপমান করিবে? সরযূ গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল, আমি যাচ্চি ব'লে অনর্থক দুঃখ করো না, এতে তোমার হাত নেই, আমি তা জানি।

চন্দ্রনাথ এতক্ষণ পর্যন্ত সহ্য করিয়াছিল, আর পারিল না, ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সন্ধ্যার পূর্বে গাড়ির সময় স্টেশনে যাইতে হইবে। বৃষ্টি আসিয়াছে, বাটীর বৃদ্ধ সরকার দুই-একখানি কাপড় গামছায় বাঁধিয়া কোচম্যানের কাছে গিয়া বসিল। সেই সীতা-দেবীর কথা বোধ করি তাহার মনে পড়িয়াছিল, তাই চোখের জলও বড় প্রবল হইয়া গড়াইয়া পড়িতেছিল। চক্ষু মুছিয়া মনে মনে কহিল, ভগবান, আমি ভৃত্য—তাই আজ আমার এই শাস্তি!

যাইবার সময় সরযূ হরকালীর মনের ভাব বুঝিয়া ডাকিয়া প্রণাম করিল। পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, মামীমা, বাক্সটা একবার দেখ।

হরকালী অপ্রতিভ হইলেন—না না না, থাক;—ততক্ষণে কিন্তু টিনের বাক্স উন্মোচিত হইয়া হরকালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। লোভ সংবরণ করা অসম্ভব। বক্রদৃষ্টিতে তিনি দেখিলেন, ভিতরে দুই-এক জোড়া সাধারণ বস্ত্র, দুই-তিনটা পুস্তক, কাগজে আবৃত দুইখানা ছবি, আরও দুই-একটা কি কি রহিয়াছে। সরযূ কহিল, শুধু এই আছে।

হরকালী ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পূর্বেই সরযূ গাড়িতে উঠিয়া বসিল। কোচম্যান গাড়ি হাঁকাইয়া ফটক বাহিয়া দ্রুত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল। দ্বিতলের জানালা খুলিয়া মণিশঙ্কর তাহা দেখিলেন। আজ তাঁহার হঠাৎ মনে হইল, বুঝি কাজটা ভাল হইল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সমস্ত রাত্রি মণিশঙ্কর ঘুমাইতে পারিলেন না। সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহার দুই কানের মধ্যে একটা ভারী গাড়ির গভীর আওয়াজ গুমগুম শব্দ করিতে লাগিল। প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, গেটের উপর একজন অপরিচিত লোক দীনবেশে অর্ধ-সুপ্তাবস্থায় বসিয়া আছে। কাছে যাইতেই লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি একজন পথিক। মণিশঙ্কর চলিয়া যাইতেছিলেন, সে পিছন হইতে ডাকিল, মণিশঙ্করবাবুর বাড়ি কি এই?

তিনি ফিরিয়া বলিলেন, এই।

তাঁহার সহিত কখন দেখা হ'তে পারে, ব'লে দিতে পারেন?

আমার নাম মণিশঙ্কর।

লোকটা সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া বলিল, আপনার কাছেই এসেছি।

মণিশঙ্কর তাহার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, কাশী থেকে কি আসছ বাপু?

আজ্ঞে হাঁ।

দয়াল পাঠিয়েছে?

আজ্ঞে হাঁ।

টাকার জন্য এসেছ?

আজ্ঞে হাঁ।

মণিশঙ্কর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তবে আমার কাছে কেন? আমি টাকা দেব, তাই কি তুমি মনে করেচ?

লোকটি ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। দয়ালঠাকুর ব'লে দিয়েচেন, আপনি টাকা পাবার সুবিধে করে দিতে পারবেন।

মণিশঙ্কর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, পারব। তবে ভেতরে এস।

দুইজনে নির্জন-কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিলেন। মণিশঙ্কর বলিলেন, সমস্ত তবে সত্য?

সমস্ত সত্য। এই বলিয়া সে কয়েকখানা পত্র বাহির করিয়া দিল। মণিশঙ্কর তাহা আগাগোড়া পাঠ করিয়া বলিলেন, তবে বউমার দোষ কি?

তার দোষ নেই, কিন্তু মায়ের দোষে মেয়েও দোষী হয়ে পড়েছে।

তবে যার নিজের দোষ নেই, তাকে কি জন্য বিপদগ্রস্ত করচ?

আমারও উপায় নেই। টাকার জন্য সব করতে হয়।

মণিশঙ্কর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, দেখ বাপু, এ দুর্নাম প্রকাশ পেলে আমারও অত্যন্ত লজ্জার কথা। চন্দ্রনাথ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

রাখালদাস মাথা নাড়িয়া দৃঢ়ভাবে কহিল, আমি নিরুপায়।

সে কথা তোমার দিকে তাকালেই জানা যায়। ধর, টাকা যদি আমি নিজেই দিই, তা হ'লে কি রকম হয়।

ভালই হয়! আর ক্লেশ স্বীকার ক'রে চন্দ্রনাথবাবুর নিকট যেতে হয় না।

টাকা পেলেই তুমি গ্রাম ছেড়ে চ'লে যাবে, আর কোন কথা প্রকাশ করবে না, এ নিশ্চয়?

নিশ্চয়।

কত টাকা চাই?

অন্ততঃ দুই সহস্র।

মণিশঙ্কর বাহিরে গিয়া নায়েব লক্ষ্মীনারায়ণকে ডাকিয়া দুই-তিনটি কথা বলিয়া দিলেন, তাহার পর ভিতরে আসিয়া একসহস্র করিয়া দুইখানি নোট বাক্স খুলিয়া রাখালদাসের হাতে দিয়া বলিলেন, এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে সরকারী খাজনা ঘর, সেখানে ভাঙিয়ে নিয়ো, আর কোথাও ভাঙান যাবে না। আর কখনো এ দিকে এসো না। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট নই, তাই আর যদি কখনো এ দিকে আসবার চেষ্টা কর, জীবিত ফিরতে পারবে না, তাও বলে দিলাম।

রাখালদাস চলিয়া গেল।

প্রাণপণে হাঁটিয়া অপরাহ্ণে সে শহরে উপস্থিত হইল। তখন কাছারি বন্ধ হইয়াছে। কোন কাজ হইল না। পরদিন সময়ে রাখালদাস খাজাঞ্চীর নিকট দুইখানি হাজার টাকার নোট দিয়া কহিল, টাকা চাই।

খাজাঞ্চীবাবু নোট দুইখানি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া, বসো, বলিয়া বাইরে গিয়া একজন পুলিশের দারোগা সংগে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রাখালকে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন এই নোট চুরি হয়েছে। জমিদার মণিশঙ্করবাবুর লোক বলচে, কাল সকালে ভিক্ষার ছল ক'রে তাঁর ঘরে ঢুকে এই দু'খানি নোট চুরি করেচে। নোটের নম্বর মিলচে।

রাখালদাস কহিল, জমিদারবাবু নিজে দিয়েছেন।

খাজাঞ্চী কহিল, বেশ হাকিমের কাছে বলো।

যথাসময়ে হাকিমের কাছে রাখাল বলিল, যাঁর টাকা, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই সমস্ত পরিষ্কার হবে। বিচারের দিন ডেপুটির আদালতে জমিদার মণিশঙ্কর উপস্থিত হইয়া হলফ লইয়া বলিলেন, তিনি লোকটাকে জীবনে কখনও দেখেন নাই। নোট তাঁহারই বাক্সে ছিল, কাহাকেও দেন নাই। রাখাল নিজেকে বাঁচাইবার জন্য অনেক কথা কহিতে চাহিল, হাকিম তাহা কতক কতক লিখিয়া লইলেন, কতক বা মণিশঙ্করের উকিল-মোক্তার গোলমাল করিয়া দিল। মোটের উপর, কথা কেহই বিশ্বাস করিল না, ডেপুটি তাহার দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হরিদয়ালের বাটীতে পুরাতন দাসীটি পর্যন্ত নাই। বামুন-ঠাকরুন ত সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। সরযু যখন প্রবেশ করিল, তখন বাটীতে কেহ নাই, শূন্য বাটী হাহা করিতেছে। বৃদ্ধ সরকার কাঁদিয়া কহিল, মা, আমি তবে যাই?

সরযু প্রণাম করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সরকার কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করিল—দয়ালঠাকুরের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না—ইচ্ছাও ছিল না।

সন্ধ্যার সময় দয়াল বাটী আসিলেন। সরযুকে দয়াল বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, কে?

সরযু প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখ তুলিয়া বলিল, আমি।

সরযু!—দয়াল বিস্মিত হইয়া মনোযোগ-সহকারে দেখিলেন, সরযুর গাত্রে একখানিও অলঙ্কার নাই, পরিধেয় বস্ত্র সামান্য, দাসদাসী কেহ সঙ্গে আসে নাই, অদূরে একটা বাক্স মাত্র পড়িয়া আছে। ব্যাপারটা সমস্ত বুঝিয়া লইয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই হয়েচে। তাড়িয়ে দিয়েচে?

সরযু মৌন হইয়া রহিল।

দয়ালঠাকুর তখন অতিশয় কর্কশ-কণ্ঠে কহিলেন, এখানে তোমার স্থান হবে না। একবার আশ্রয় দিয়ে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েচে—আর নয়।

সরযু মাথা হেঁট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায়?

মাগী পালিয়েচে। আমাকে ডুবিয়ে দিয়ে স'রে পড়েচে, যেমন চরিত্র, সেইরূপ করেচে। রাগে তাঁহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছিল, হঠাৎ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, বলা যায় না —হয়ত কোথাও খুব সুখেই আছে।

সেইখানে সরযু বসিয়া পড়িল। সে যে অবশেষে তাহার মায়ের কাছেই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

দয়াল বলিতে লাগিলেন, আমি তোমাকে স্থান দিয়ে জাত হারাতে চাইনে! যারা আদর ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, শেষকালে তারা কি তোমার মাথা রাখবার একটু কুঁড়েও বেঁধে দিতে পারেনি, তাই রেখে গেছে আমার কাছে? যাও এখান থেকে।

এবার সরযু কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, দাদামশাই, মা নেই, আমি যাব কোথায়?

হরিদয়ালের শরীরে আর মায়া-মমতা নাই। তিনি স্বচ্ছন্দে বলিলেন, কাশীর মত স্থানে তোমাদের স্থানাভাব হয় না। সুবিধামত একটা খুঁজে নিয়ো। তিনি নাকি বড় জ্বালায় জ্বলিতেছিলেন, তাই এমন কথাটাও কহিতে পারিলেন।

সরযুর স্বামী তাঁহাকে গৃহে স্থান দেয় নাই, হরিদয়াল দিবেন কেন? ইহাতে তাঁহাকে দোষ দিবার কিছু নাই, সরযু তাহা বুঝিল। কিন্তু তাহারও যে আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। স্বামীর গৃহে দু'দিনের আদর-যত্নে অতিথির মত গিয়াছিল—এখন বিদায় হইয়া আসিয়াছে। এ সংসারে, সেই যত্নপরায়ণ গৃহস্থ আর ফিরিয়া দেখিবে না, অতিথিটি কোথায় গেল! বড় যাতনায় তাহার নীরব-অশ্রু গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছিল। এই তাহার সতরো বছর বয়স—

তাহার সব সাধ ফুরাইয়াছে! মাতা নাই, পিতা নাই, স্বামী পরিত্যাগ করিয়াছেন। দাঁড়াইবার স্থান নাই, আছে শুধু কলঙ্ক, লজ্জা আর বিপুল রূপযৌবন। এ নিয়ে বাঁচা চলে, কিন্তু সরযূর চলে না। সে ভাবিতেছিল, তাহার কত আয়ু, আর কতদিন বাঁচিতে হইবে! যতদিন হউক, আজ তাহার নূতন জন্মদিন। যদিও দুঃখকষ্টের সহিত তাহার পূর্বেই পরিচয় ঘটিয়াছে, কিন্তু এরূপ তীব্র অপমান এবং লাঞ্ছনা কবে সে ভোগ করিয়াছে? দয়ালঠাকুর উত্তরোত্তর উত্তেজিত-কণ্ঠে কথা কহিতেছিলেন, এবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ব'সে রইলে যে?

সরযূ আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাব?

আমি তার কি জানি?

সরযূ রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, দাদামশাই, আজ রাত্রি—

দূর দূর, একদণ্ডও না।

এবার সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল। চকিতে মনে একটু সাহস হইল, মনে করিল, যাহার কাছে শত অপরাধেও ভিক্ষা চাহিবার অধিকার ছিল, তাহার কাছেই যখন চাহি নাই, তখন পরের কাছে চাহিব কি জন্য? মনে মনে বলিল, আর কিছু না থাকে কাশীর গঙ্গা ত এখনও শুকায় নাই, সে সমাজের ভয়ও করে না, তাহার জাতিও যায় না; এ দুঃখের দিনে একটি দুঃখী মেয়েকে স্বচ্ছন্দে কোলে তুলিয়া লইবে। আমার আর কোথাও আশ্রয় না থাকে, সেখানে থাকিবেই। সরযূ চলিতে লাগিল, কিন্তু চলিতে পারিল না, আবার বসিয়া পড়িল।

দয়ালঠাকুর ভাবিলেন, এমন বিপদে তিনি জন্মে পড়েন নাই। তাঁহার গলাটা শুকাইয়া আসিতেছিল; পাছে অবশেষে দমিয়া পড়েন, এই ভয়ে চীৎকার করিয়া কহিলেন, অপমান না হ'লে বুঝি যাবে না? এই বেলা দূর হও—

এমন সময় সহসা বাহির হইতে ডাক আসিল, বাবাজী!

হরিদয়াল ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ঐ বুঝি খুড়ো আসচে। বলিতে বলিতেই কৈলাসচন্দ্র এক হাতে দাবার পুঁটুলি, অপর হাতে হুঁকা লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে এইমাত্র আসিয়াছিলেন, তাহা নহে; গোলমাল শুনিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া হরিদয়ালের তিরস্কার ও গালিগালাজ শুনিতেছিলেন। তাই যখন ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তখন হাতে দাবার পুঁটুলি ও হুঁকা ছিল, কিন্তু মুখে হাসি ছিল না। সোজা সরযূর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সরযূ যে! কখন এলে মা?

সরযূ কৈলাসখুড়োকে চিনিত, প্রণাম করিল।

তিনি আশীর্বাদ করিলেন, এস মা, এস। তোমাদের ছেলের বাড়িতে না গিয়ে এখানে কেন মা? তাহার পর হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া সরযূর টিনের বাক্সটা একেবারে কক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, চল মা, সন্ধ্যা হয়। কথাগুলি তিনি এরূপভাবে কহিলেন, যেন তাহাকে লইবার জন্যই আসিয়াছিলেন!

সরযূ কোন কথাই পরিষ্কার বুঝিতে পারিল না, অধোমুখে বসিয়া রহিল।

কৈলাসচন্দ্র ব্যস্ত হইলেন, কহিলেন, তোর বুড়ো ছেলের বাড়ি যেতে লজ্জা কি? সেখানে কেউ তোকে অপমানের কথা বলবে না, মা-ব্যাটায় মিলে নূতন ক'রে ঘরকন্না করব, চল মা, দেরি করিস নে।

সরযূ তথাপি উঠিতে পারিল না।

হরিদয়াল হাঁকিয়া বলিলেন, খুড়ো, কি করচো?

কিছু না বাবাজী। কিন্তু তখনই সরযূর খুব নিকটে আসিয়া হাতখানি প্রায় ধরিয়া ফেলিবার মত করিয়া নিতান্ত কাতরভাবে বলিলেন, চল্ না মা, ব'সে ব'সে কেন মিছে কটু কথা শুনেচিস?

সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল দেখিয়া হরিদয়াল কহিলেন, খুড়ো কি একে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ?

খুড়ো জবাব দিলেন, না বাবা, রাস্তায় বসিয়ে দিতে যাচ্ছি।

ব্যঙ্গোক্তি শুনিয়া হরিদয়াল বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কিন্তু খুড়ো, কাজটি ভাল হচ্ছে না। কাল কি হবে, ভেবে দেখো।

কৈলাস তাহার উত্তর দিলেন না, কিন্তু সরযূকে কহিলেন, শিগ্‌গির চল না মা, নইলে আবার হয়ত কি ব'লে ফেলবে।

সরযূ দরজার বাহিরে আসিয়া পড়িল। কৈলাসচন্দ্রও ঘাড়ে বাক্স লইয়া পশ্চাতে চলিলেন।

হরিদয়াল পিছন হইতে কহিলেন, খুড়ো, শেষে কি জাতটা দেবে?

কৈলাসচন্দ্র না ফিরিয়াই বলিলেন, বাবাজী, নাও ত দিতে পারি।

আমাদের সঙ্গে তবে আহার বন্ধ হ'ল।

কৈলাসচন্দ্র এবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, কবে কার বাড়িতে দয়াল, কৈলাসখুড়ো পাত পেতেছে?

তা না পাত, কিন্তু সাবধান করে দিচ্চি।

কৈলাস ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ কাশীবাসের মধ্যে আজ তাঁহার এই প্রথম ক্রোধ দেখা দিল। বলিলেন, হরিদয়াল, আমি কি কাশীর পাণ্ডা, না যজমানের মন জুগিয়ে অন্নের সংস্থান করি? আমাকে ভয় দেখাচ্চ কেন? আমি যা ভাল বুঝি, তাই চিরদিন করেচি, আজও তাই করব। সেজন্য তোমার দুর্ভাবনার আবশ্যক নেই।

হরিদয়াল শুষ্ক হইয়া কহিলেন, তোমার ভালর জন্য—

থাক বাবাজী! যদি এই পঁয়ষট্টি বছর তোমার পরামর্শ না নিয়েই কাটাতে পেরে থাকি, তখন বাকী দু'চার বছর পরামর্শ না নিলেও আমার কেটে যাবে। যাও বাবাজী, ঘরে যাও।

হরিদয়াল পিছাইয়া পড়িলেন।

কৈলাসচন্দ্র বাটীতে পৌঁছিয়া বাক্স নামাইয়া সহজভাবে বলিলেন, এ ঘরবাড়ি সব তোমার মা, আমি তোমার ছেলে। বুড়োকে একটু-আধটু দেখো, আর তোমার নিজের ঘরকন্না চালিয়ে নিয়ো, আর কি বলব?

কৈলাসের আর কোন কথা কহিবার ছিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু সরযূ বহুক্ষণ অবধি অশ্রু মুছিতে মুছিতে ভাবিয়া দেখিল, তাহার কোন কথাই আর বলিবার নাই।

সরযূ আশ্রয় পাইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শরৎকালে প্রাতঃসমীরণ যখন স্নিগ্ধ-মধুর সঞ্চরণে চন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশ করিত, সারা রাত্রির দীর্ঘ জাগরণের পর চন্দ্রনাথ এই সময়টিতে ঘুমাইয়া পড়িত। তাহার পর তপ্ত সূর্যরশ্মি জানালা দিয়া তাহার মুখের উপর, চোখের উপর পড়িত, চন্দ্রনাথের আবার ঘুম ভাঙিয়া যাইত। কিন্তু ঘুমের ঘোর কিছুতেই কাটিতে চাহিত না, পাতায় পাতায় জড়াইয়া থাকিত, তথাপি সে জোর করিয়া বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িত। সারাদিন কাজকর্ম নাই, আমোদ নাই, উৎসাহ নাই, দুঃখ-ক্লেশও প্রায় নাই; সুখের কামনা ত সে একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে। শীর্ণকায়া নদীর উপর দিয়া সন্ধ্যার দীর্ঘ ভারবাহী তরণী যেমন করিয়া এপাশ ওপাশ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া বাঁকিয়া চুরিয়া মন্থরগমনে স্বেচ্ছামত ভাসিয়া যায়, চন্দ্রনাথের ভাবী দিনগুলাও ঠিক তেমনি করিয়া এক সূর্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্যোদয় পর্যন্ত ভাসিয়া যাইতে থাকে। সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছে, যে দিগন্ত-প্রসারিত কালোমেঘ তাহার মুখের সূর্যকে জীবনের মধ্যাহ্নেই আচ্ছাদিত করিয়াছে, এই মেঘের আড়ালেই একদিন সে সূর্য অস্তগমন করিবে। ইহজীবনে আর সাক্ষাৎলাভ ঘটিবে না। তাহার নীরব, নির্জন কক্ষে এই নিরাশার কালো ছায়াই প্রতিদিন ঘন হইতে ঘনতর হইতে লাগিল এবং তাহারি মাঝখানে বসিয়া চন্দ্রনাথ অলস-নিমীলিত চোখে দিন কাটাইয়া দিতে লাগিল।

হরকালী বলেন, এই অগ্রহায়ণ মাসেই চন্দ্রনাথের আবার বিবাহ হইবে। চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া থাকে। এই চুপ করিয়া থাকা সম্মতি বা অসম্মতির লক্ষণ, তাহা নির্ণয় করিতে স্বামীর সঙ্গে তাঁহার তর্ক-বিতর্ক হয়। মণিশঙ্করবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, চন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু বলা যায় না।

এবার কার্তিক মাসে দুর্গা-পূজা। মণিশঙ্করের ঠাকুর-দালান হইতে সানাইয়ের গান প্রাতঃকাল হইতে গ্রামবাসীদের কানে কানে আগামী আনন্দের বার্তা ঘোষণা করিতেছে। চন্দ্রনাথের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। [illegible] বিছানায় পড়িয়া শুনিতেছিল, একে একে কত কি সুর বাজিয়া যাইতেছে। কিন্তু একটা সুরও তাহার কাছে আনন্দের ভাষা বহিয়া আনিল না; বরঞ্চ ধীরে ধীরে হৃদয়-আকাশ গাঢ় কালোমেঘে ছাইয়া যাইতে লাগিল। আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, এখানে আর ত থাকা যায় না; একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নে, রাত্রির গাড়িতে এলাহাবাদ যাব।

এ কথা হরকালী শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন, ব্রজকিশোর আসিয়া বুঝাইতে লাগিলেন, এমন কি মণিশঙ্কর নিজে আসিয়াও অনুরোধ করিলেন যে আজ ষষ্ঠীর দিনে কোথাও গিয়া কাজ নাই।

চন্দ্রনাথ কাহারও কথা শুনিল না।

দুপুরবেলা হরিবালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সরযূ গিয়া অবধি এ বাটীতে তিনি আসেন নাই।

চন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, হঠাৎ ঠানদিদি কি মনে ক'রে!

ঠানদিদি জবাব না দিয়া প্রশ্ন করিলেন, আজ বিদেশে যাচ্ছ?

চন্দ্রনাথ বলিল, যাচ্ছি।

পশ্চিমে যাবে?

যাবো।

হরিবালা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, দাদা, আর কোথাও যাবে কি?

চন্দ্রনাথ হরিবালার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিল, না। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে এটা ওটা নাড়িতে লাগিল।

হরিবালা যে কত কথা বলিতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলিতে তাঁহার লজ্জা করিতেছিল, সাহসও হইতেছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, দাদা, তার একটা উপায় করলে না? দুইজনের দেখা হওয়া অবধি দুইজনেই মনে মনে তাহার কথাই ভাবিতেছিল,—তাই এই সামান্য কথাটিতে দুইজনের চক্ষেই জল আসিয়া পড়িল। চন্দ্রনাথ সামলাইয়া লইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, উপায় আর কি করব দিদি?

কাশীতে সে আছে কোথায়?

বোধ হয়, তার মায়ের কাছে আছে।

তা আছে, কিন্তু—

চন্দ্রনাথ মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কি?

ঠানদিদি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, রাগ করো না দাদা—

চন্দ্রনাথ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

ঠানদিদি তেমনি মৃদু মিনতির স্বরে বলিলেন, কিছু টাকাকড়ি দিয়ো দাদা—আজ যেন সে একলা আছে, কিন্তু দু'দিন পরে—

চন্দ্রনাথ কথাটা বুঝিয়াও বুঝিল না, বলিল, কি দু'দিন পরে?

বড় বড় দু'ফোটা চোখের জল হরিবালা চন্দ্রনাথের সম্মুখেই মুছিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তার পেটে যা আছে, ভালয় ভালয় তা যদি বেঁচে-বর্তে থাকে, তা হ'লে—

চন্দ্রনাথের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি সে বলিয়া উঠিল, ঠানদিদি আজ বুঝি ষষ্ঠী?

হ্যাঁ, ভাই।

আজ তা হ'লে—

যাবে না মনে কচ্চ?

তাই ভাবছি।

তবে তাই করো। পুজোর পর যেখানে হয় যেয়ো, এ ক'টা দিন বাড়িতেই থাক।

কি জানি কি ভাবিয়া চন্দ্রনাথ তাহাতেই সম্মত হইল।

বিজয়ার পর একদিন চন্দ্রনাথ গোমস্তাকে ডাকিয়া বলিল, সরকারমশাই, কাশীতে তাকে রেখে আসবার সময় হরিদয়াল কি কিছু ব'লে দিয়েছিলেন?

সরকার কহিল, তাঁর সঙ্গে আমার ত দেখা হয় নি।

চন্দ্রনাথ ভয় পাইয়া কহিল, দেখা হয় নি? তবে কার কাছে দিয়ে এলেন? তার মায়ের সঙ্গে ত দেখা হয়েছিল?

সরকার মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে না, বাড়িতে ত কেউ ছিল না।

কেউ ছিল না? সে বাড়িতে কেউ থাকে কি না, সে সংবাদ নিয়েছিলেন ত? হরিদয়াল আর কোথাও উঠে যেতেও ত পারেন!

সরকার কহিল, সে সংবাদ নিয়েছিলাম। দয়াল ঘোষাল সেই বাড়িতে থাকতেন।

চন্দ্রনাথ নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ পর্যন্ত কত টাকা পাঠিয়েছেন?

আজ্ঞে, টাকাকড়ি ত কিছু পাঠাই নি।

পাঠান নি! চন্দ্রনাথ বিস্ময়ে, বেদনায়, উৎকণ্ঠায় পাংশুবর্ণ হইয়া কহিল, কেন?

সরকার লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া কহিল, মামাবাবু বলেন, পাঁচ টাকার হিসাবে কিছু পাঠালেই হবে।

জবাব শুনিয়া চন্দ্রনাথ অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল।

পাঁচ টাকার হিসাবে? কেন, টাকা কি মামাবাবুর? আপনি প্রতি মাসে কাশীর ঠিকানায় পাঁচ শ টাকা করে পাঠাবেন।

সরকার, যে আজ্ঞে, বলিয়া স্তম্ভিত হইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

হরকালী এ কথা শুনিয়া চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, সে পাগল হয়েচে। সরকারকে তলব করিয়া অন্তরাল হইতে জোর করিয়া হাসিলেন। হাসির ছটা ও ঘটা বৃদ্ধ সরকার শুনিতেও পাইল, বুঝিতেও পারিল। হরকালী কহিলেন, সরকারমশায়, কত টাকা পাঠাতে বলেচে?

প্রতিমাসে পাঁচ শ টাকা।

ভিতর হইতে পুনর্বার বিদ্রূপের হাসি শুনিয়া সরকার ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

হরকালী অনেক হাসিয়া পরিশেষে গম্ভীর হইলেন। ভিতর হইতে বলিলেন, আহা, বাছার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না। সে পোড়া-কপালীর যেমন অদৃষ্ট! আমি পাঁচ টাকা ক'রে দিতে বলেচি, তাই রেগে উঠেচে। বলে, পাঁচ শ টাকা করে দিও। বুঝলেন সরকার-মশায়, চন্দ্রনাথের ইচ্ছা নয় যে, এক পয়সাও দেওয়া হয়।

কথাটা কিন্তু সরকার মহাশয় প্রথমে তেমন বুঝিল না; কিন্তু মনে মনে যত হিসাব করিল, তত বোধ হইতে লাগিল, হরকালীর কথাটাই সত্য। যাহাকে বাড়ি হইতে বাহির করা হইয়াছে, তাহাকে কি কেহ ইচ্ছাপূর্বক অত টাকা দেয়?

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বলিল, তা আপনি যা বলেন।

বলব আর কি! এই সামান্য কথাটা বুঝলেন না?

সরকার মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তাই হবে।

হ্যাঁ, তাই। আপনি কিন্তু পাঁচ টাকা হিসাবে পাঠাবেন। চন্দ্র না দেয়, আমার হিসেব থেকে পাঁচ টাকা পাঠাবেন।

হরকালী মাসিক পঞ্চাশ টাকা করিয়া নিজের হিসাবে হাতখরচ পাইতেন।

সরকার মহাশয় প্রস্থান করিবার সময় বলিল, তাই পাঠাব।

চন্দ্রনাথ বাড়ি নাই। এলাহাবাদে গিয়াছে। সরকার মহাশয় তাহাকে পত্র লিখিয়া মতামত জানিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু পরে মনে হইল, এরূপ অসম্ভব কথা লইয়া অনর্থক তোলাপাড়া করিয়া নিজের বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিয়া লাভ নাই।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

উপরিউক্ত ঘটনার পর দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসরে আর কোন পরিবর্তন হউক বা না হউক, কৈলাসখুড়োর জীবনে বড় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যেদিন তাঁহার কমলা চলিয়া গিয়াছিলেন, যেদিন তাঁহার কমলচরণ সর্বশেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করিয়া ইহজীবনের মত চক্ষু মুদিয়াছিল, সেই দিন হইতে বিপুল বিশ্বও কৈলাসচন্দ্রের পক্ষে চক্ষু মুদিয়াছিল; কিন্তু সরযূর ওই ক্ষুদ্র শিশুটি তাঁহাকে পুনর্বার সেই বিস্মৃত-সংসারের স্নেহময় জটিল-পথে ফিরাইয়া আনিয়াছে। সেদিন তাঁহার ক্ষুদ্র চক্ষু-দু'টি বহুদিন পরে আর-একবার জলে ভরিয়া গিয়াছিল, চক্ষু মুছিয়া বলিয়াছিলেন, আমার ঘরে বিশ্বেশ্বর এসেছেন।

তখনও সে ছোট ছিল; 'বিশু' বলিয়া ডাকিলে উত্তর দিতে পারিত না, শুধু চাহিয়া থাকিত। তখন সে সরযূর ক্রোড়ে, লখীয়ার মার ক্রোড়ে এবং বিছানায় শুইয়া থাকিত; কিন্তু যেদিন হইতে সে তাহার চঞ্চল পা-দু'টি চৌকাঠের বাহিরে লইয়া যাইতে শিখিয়াছে, সেদিন হইতে সে বুঝিয়াছে, দুধের চেয়ে জল ভাল এবং দ্বিধাশূন্য হইয়া পরিষ্কার অপরিষ্কার সর্ববিধ জলপাত্রেই মুখ ডুবাইয়া সরযূকে ফাঁকি দিয়া আকণ্ঠ জল খায় এবং যেদিন হইতে তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তাহার শুভ্রকোমল উদর এবং মুখের উপর কয়লা কিংবা ধূলার প্রলেপ দিতে পারিলেই দেহের শোভা বাড়ে, সেইদিন হইতে সে সরযূর কোল ছাড়িয়া মাটি এবং তথা হইতে কৈলাসচন্দ্রের ক্রোড়ে স্থান করিয়া লইয়াছে। সকালবেলা কৈলাসচন্দ্র ডাকেন, 'বিশু', বিশু মুখ বাড়াইয়া বলে, 'দাদু'; কৈলাসচন্দ্র বলেন, 'চল ত দাদা, শম্ভু মিশিরকে এক বাজি দিয়ে আসি', সে অমনি দাবার পুঁটলিটা হাতে লইয়া 'তল' বলিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধের গলা জড়াইয়া ধরে। কৈলাস-চন্দ্রের আনন্দের সীমা থাকে না। সরযূকে ডাকিয়া বলেন, মা, বিশু আমার একদিন পাকা খেলোয়াড় হবে। সরযূ মুখ টিপিয়া হাসে, বিশু দাবার পুঁটলি হাতে লইয়া বৃদ্ধের কোলে বসিয়া দাবা খেলিতে বাহির হয়। পথে যাইতে যদি কেহ তামাশা করিয়া কহে, খুড়ো, বুড়ো-বয়সে কি আরও দুটো হাত গজিয়েছে?

বৃদ্ধ একগাল হাসিয়া বলেন, বাবাজী, এ হাত-দুটোতে আর জোর নেই, বড় শুকনো হয়ে গেছে; তাই দু'টো নতুন হাত বেরিয়েচে, যেন সংসারের গাছ থেকে প'ড়ে না যাই।

তাহারা সরিয়া যায়—বুড়োর কাছে কথায় পারিবার জো নেই।

শম্ভু মিশিরের বাটীতে সতরঞ্চ খেলার মধ্যে শ্রীমান্ বিশ্বেশ্বরেরও একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। দাদামহাশয়ের জানুর উপর বসিয়া, লাল রঙের কোঁচা ঝুলাইয়া, গম্ভীরভাবে চাহিয়া থাকে, যেন দরকার হইলে সেও দুই-একটা চাল বলিয়া দিতে পারে।

হস্তীদন্তনির্মিত বলগুলো যখন একটির পর একটি করিয়া তাহার দাদামহাশয়ের হস্তে নিহত হইতে থাকে, অতিশয় উৎসাহের সহিত বিশ্বেশ্বর সেগুলি দুই হাতে লইয়া পেটের উপর চাপিয়া ধরে। কিন্তু লাল রঙের মন্ত্রীটার উপরই তাহার ঝোঁকটা কিছু অধিক। সেটা যতক্ষণ হাতে না আসিয়া উপস্থিত হয়, ততক্ষণ সে লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। মাঝে মাঝে তাগিদ দিয়া কহে, দাদু, ঐতে? কৈলাসচন্দ্র খেলার ঝোঁকে অন্যমনস্ক হইয়া কহেন, দাঁড়া দাদা—। কখনও হয়ত বা সে আশেপাশে সরিয়া যায়, কৈলাসচন্দ্রের মনটিও চঞ্চলভাবে একবার বিশু ও একবার সতরঞ্চের উপর আনাগোনা করিতে থাকে, গোলমালে হয়ত বা একটা বল মারা পড়ে—কৈলাসচন্দ্র অমনি ফিরিয়া ডাকেন, দাদু, হেরে যাই যে—আয় আয়, ছুটে আয়। বিশ্বেশ্বর ছুটিয়া আসিয়া তাহার পূর্বস্থান অধিকার করিয়া বসে, সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধেরও দ্বিগুণ উৎসাহ ফিরিয়া আসে। খেলা শেষ হইলে সে লাল মন্ত্রীটা হাতে লইয়া দাদামহাশয়ের কোলে উঠিয়া বাটী ফিরিয়া যায়।

কৈলাসচন্দ্রের এইরূপে নূতন ধরনের দিনগুলো কাটে। পুরাতন বাঁধা নিয়মে বিষম বাধা পড়িয়াছে। সাবেক দিনের মত দাবার পুঁটলি আর সব সময়ে তেমন যত্ন পায় না, হয়ত বা ঘরের কোণে একবেলা পড়িয়া থাকে; শম্ভু মিশিরের সহিত রোজ সকালবেলা হয়ত বা দেখাশুনা করিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। গঙ্গা পাঁড়ের দ্বিপ্রাহরিক খেলাটা ত একরূপ

বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানায় আর তেমন লোক জমে না,—মুকুন্দ ঘোষ ডাকিয়া ডাকিয়া হার মানিয়াছে—কৈলাসচন্দ্রকে রাত্রে আর কিছুতেই পাওয়া যায় না। সে সময়টা তিনি প্রদীপের আলোকে বসিয়া নূতন শিষ্যটিকে খেলা শিখাইতে থাকেন; বলেন, বিশু, ঘোড়া আড়াই পা চলে।

বিশু গম্ভীরভাবে বলে, ঘোয়া—

হাঁ ঘোড়া—

ঘোয়া চয়ে—ভাবটা এই যে, ঘোড়া চলে।

হাঁ, ঘোড়া চলে, আড়াই পা চলে।

বিশ্বেশ্বরের মনে নূতন ভাবোদয় হয়, বলে গায়ী চয়ে—

কৈলাসচন্দ্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন, না দাদা, এ ঘোড়া গাড়ি টানে না। সে ঘোড়া আলাদা।

সরযূ এ সময় নিকটে থাকিলে, পুত্রের বুদ্ধির তীক্ষ্নতা দেখিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া চলিয়া যায়।

বিশু আঙুল বাড়াইয়া বলে, ঐতে। অর্থাৎ সেই লাল রঙের মন্ত্রীটা এখন চাই। বৃদ্ধ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতেন না যে, এতগুলা দ্রব্য থাকিতে ঐ লাল মন্ত্রীটার উপরেই তাহার এত নজর কেন?

প্রার্থনা কিন্তু অগ্রাহ্য হইবার জো নাই। বৃদ্ধ প্রথমে দুই-একটা 'বোড়ে' হাতে দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন; বিশু বড় বিজ্ঞ, কিছুতেই ভুলিত না। তখন অনিচ্ছা-সত্ত্বে তাহার ক্ষুদ্র হস্তে প্রার্থিত বস্তুটি তুলিয়া দিয়া বলিতেন, দেখিস দাদা, যেন হারায় না।

কেন?

মন্ত্রী হারালে কি খেলা চলে?

চয়ে না?

কিছুতেই না।

বিশু গম্ভীর হইয়া বলিত, দাদু—মন্‌তী!

হাঁ দাদু—মন্ত্রী!

সেদিন ভোলানাথ চাটুয্যের বাটীতে কথা হইতেছিল, কৈলাসচন্দ্র ডাকিলেন, বিশু, চল দাদা, কথা শুনে আসি।

বিশ্বেশ্বর তখন লাল কাপড় পরিয়া, জামা গায়ে দিয়া, টিপ পরিয়া, চুল আঁচড়াইয়া দাদুর কোলে চড়িয়া কথা শুনিতে গেল। কথকঠাকুর রাজা ভরতের উপাখ্যান কহিতেছিলেন। করুণকণ্ঠে গাহিতেছিলেন, কেমন করিয়া সেই বনবাসী মহাপুরুষের ক্রোড়ের নিকট হরিণ-শিশু ভাসিয়া আসিয়াছিল, কেমন করিয়া সেই সদ্যঃপ্রসূত মৃগ-শাবক কাতর-নয়নে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিয়াছিল। আহা, রাজা ভরত নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এই সময় বিশু একটু সরিয়া বসিয়াছিল, কৈলাসচন্দ্র তাহাকে কোলের উপর টানিয়া লইলেন।

তাহার পর কথক গাহিলেন, সেই মৃগ-শিশু কেমন করিয়া পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে দিনে তাঁহার ছিন্ন স্নেহডোর আবার গাঁথিয়া তুলিতে লাগিল, কেমন করিয়া সেই শত-ভগ্ন মায়াশৃঙ্খল তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে জড়াইয়া দিতে লাগিল, কেমন করিয়া সেই মৃগ-শিশু নিত্যকর্ম পূজাপাঠ, এমন কি, ঈশ্বর-চিন্তার মাঝে আসিয়াও অংশ লইয়া যাইত। ধ্যান করিবার সময়ে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইতেন, সেই নিরাশ্রয় পশু-শাবকের সজলকরুণ-দৃষ্টি তাঁহার পানে চাহিয়া আছে; তাহার পর সে বড় হইতে লাগিল। ক্রমে কুটীর ছাড়িয়া প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া পুষ্পকাননে, তাহার পর অরণ্যে, ক্রমে সুদূর অরণ্যপথে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া বেড়াইত। ফিরিয়া আসিবার নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে রাজা ভরত উৎকণ্ঠিত হইতেন। সঘনে ডাকিতেন, আয়, আয়, আয়! তাহার পর কবি নিজে কাঁদিলেন, সকলকে কাঁদাইয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে গাহিলেন, কেমন করিয়া একদিন সে আজন্ম মায়াবন্ধন নিমিষে ছিন্ন করিয়া গেল,—বনের পশু বনে চলিয়া গেল, মানুষের ব্যথা বুঝিল না। বৃদ্ধ ভরত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, আয়, আয়, আয়! কেহ আসিল না, কেহ সে আকুল আহ্বানের

উত্তর দিল না। তখন সমস্ত অরণ্য অন্বেষণ করিলেন, প্রতি কন্দরে কন্দরে, প্রতি বৃক্ষতলে, প্রতি লতাবিতানে কাঁদিয়া ডাকিলেন, আয়, আয়, আয়! কেহ আসিল না। প্রথমে তাঁহার আহার-নিদ্রা বন্ধ হইল, পূজাপাঠ উঠিয়া গেল—তাঁহার ধ্যান, চিন্তা—সব সেই নিরুদ্দেশ স্নেহাস্পদের পিছে পিছে অনুদ্দেশ বনপথে ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল।

কবি গাহিলেন, মৃত্যুর কালোছায়া ভূলুণ্ঠিত ভরতের অঙ্গ অধিকার করিয়াছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে, তথাপি তৃষিত ওষ্ঠ ধীরে ধীরে কাঁপিয়া উঠিতেছে। যেন এখনও ডাকিতেছেন, ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়!

কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে সবলে বক্ষে চাপিয়া হাহা-রবে কাঁদিয়া উঠিলেন। অন্তরের অন্তর কাঁপিয়া কাঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল, আয়, আয়, আয়!

সভায় কেহই বৃদ্ধের এ ক্রন্দন অস্বাভাবিক মনে করিল না। কারণ, বয়সের সহিত সকলেরই কেহ না কেহ হারাইয়া গিয়াছে। সকলেরই হৃদয় কাঁদিয়া ডাকিতেছে—ফিরে আয়, ফিরে আয়, ফিরে আয়!

কৈলাসচন্দ্র চক্ষু মুছিয়া বিশ্বেশ্বরকে ক্রোড়ে তুলিয়া বলিলেন, চল দাদা, বাড়ি যাই—রাত্তির হয়েচে।

বিশু কোলে উঠিয়া বাড়ি চলিল। অনেকক্ষণ একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ঘুম পাইয়াছিল, পথিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাড়ি গিয়া কৈলাসচন্দ্র সরযূর নিকট তাহাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, নে মা, তোর জিনিস তোর কাছে থাক।

সরযূ দেখিল, বুড়োর চক্ষু-দু'টি আজ বড় ভারী হইয়াছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

এই দুই বৎসরের মধ্যে চন্দ্রনাথের সহিত তাহার বাটীর সম্বন্ধই ছিল না। শুধু অর্থের প্রয়োজন হইলে সরকারকে পত্র লিখিত, সরকার লিখিত ঠিকানায় টাকা পাঠাইয়া দিত।

দুঃখ করিয়া হরকালী মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। ব্রজকিশোর ফিরিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া চিঠি দিতেন। মণিশঙ্করও দুই-একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতেছে, এ সময় একবার দেখিবার ইচ্ছা করে।

প্রথমে চন্দ্রনাথ সে-সকল কথায় কর্ণপাত করিত না, কিন্তু, যেদিন হরিবালা লিখিলেন, তুমি সুবিধা পাইলে একবার আসিয়ো, কিছু বলিবার আছে, সেই দিন চন্দ্রনাথ তল্পি বাঁধিয়া গাড়িতে উঠিল।

হরিবালা যদি কিছু কহেন, যদি কোন পত্র, যদি কোন হস্তলিপি দেখাইতে পারেন, যদি সেই বিগত সুখের একটু আভাস তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা হইলে—কিছু নয়। তথাপি চন্দ্রনাথ বাটী অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে চাহিল। কিন্তু এতখানি পথ যে আশায় ভর করিয়া ছুটিয়া আসিল, বাটীতে আসিয়া তাহার কিছুই মিলিল না। হরিবালার সহিত সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিল, ঠানদিদি, আর কিছু বলবে না?

না, আর কিছু না।

নিরাশ হইয়া চন্দ্রনাথ কহিল, তবে কেন মিথ্যা ক্লেশ দিয়ে ফিরিয়ে আনলে?

বাড়ি না এলে কি ভাল দেখায়? তাহার পর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, দাদা, যা হবার হয়েছে—এখন তুমি সংসারী না হ'লে আমাদের দুঃখ রাখবার স্থান থাকবে না।

চন্দ্রনাথ বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, তা আমি কি করব?

কিন্তু মণিশঙ্কর কিছুতেই ছাড়িলেন না। হাত ধরিয়া বলিলেন, বাবা, আমাকে মাপ কর। সেই দিন থেকে যে জ্বালায় জ্বলে যাচ্চি তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন।

চন্দ্রনাথ বিপন্ন হইল, কিন্তু কথা কহিতে পারিল না।

মণিশঙ্কর পুনরপি বলিতে লাগিলেন, আবার বিবাহ ক'রে সংসারধর্ম পালন কর। আমি তোমার মনোমত পাত্রী অন্বেষণ করে রেখেচি, শুধু তোমার অভিপ্রায় জানবার

অপেক্ষায় এখনও কথা দিইনি। বাবা, এক সংসার গত হ'লে লোকে কি দ্বিতীয় সংসার করে না?

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিল, এক সংসার গত হয়েচে—সে সংবাদ পেলে পারি।

দুর্গা—দুর্গা—এমন কথা বলতে নেই বাবা।

চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিল।

মণিশংকর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আমার মনে হয়, আমিই তোমাকে সংসার-ত্যাগী করিয়েচি। এ দুঃখ আমার ম'লেও যাবে না।

চন্দ্রনাথ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, কোথায় সম্বন্ধ স্থির করেচেন?

মণিশংকর চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, কলকাতায়; তুমি একবার নিজে দেখে এলেই হয়।

চন্দ্রনাথ কহিল, তবে কালই যাব।

মণিশংকর আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, তাই করো। যদি পছন্দ হয় আমাকে পত্র লিখো, আমি বাটীর সকলকে নিয়ে একেবারে কলকাতায় উপস্থিত হব। কিছুক্ষণ থামিয়া বলিলেন, আমার আর বাঁচবার বেশী দিন নেই চন্দ্রনাথ, তোমাকে সংসারী এবং সুখী দেখলেই স্বচ্ছন্দে যেতে পারব।

পরদিন চন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিল। সঙ্গে মাতুল ব্রজকিশোরও আসিয়াছিলেন। কন্যা দেখা শেষ হইলে ব্রজকিশোর বলিলেন, কন্যাটি দেখতে মা-লক্ষ্মীর মত।

চন্দ্রনাথ মুখ ফিরাইয়া রহিল, কোনও মতামত প্রকাশ করিল না।

স্টেশনে আসিয়া টিকিট লইয়া দুইজনে গাড়িতে উঠিলে ব্রজকিশোর জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে বাবাজী, পছন্দ হয়েছে ত?

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ব্রজকিশোর যেন আকাশ হইতে পড়িলেন,—এমন মেয়ে, তবু পছন্দ হ'ল না?

চন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ব্রজকিশোর মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তিনি সরযূকে দেখেন নাই।

তাহার পর, নির্দিষ্ট স্টেশনে ট্রেন থামিলে ব্রজকিশোর নামিয়া পড়িলেন। চন্দ্রনাথ এলাহাবাদের টিকিট লইয়াছিল।

ব্রজকিশোর বলিলেন, তবে কতদিনে ফিরবে?

কাকাকে প্রণাম জানিয়ে বলবেন, শীঘ্র ফেরবার ইচ্ছা নেই।

মণিশঙ্কর সে কথা শুনিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, যা হয় হবে। আমার দেহটা একটু ভাল হ'লেই নিজে গিয়ে বউমাকে ফিরিয়ে আনব। মিথ্যা সমাজের ভয় ক'রে চিরকাল নরকে পচতে পারব না—আর সমাজই বা কে? সে ত আমি নিজে।

হরকালী এ সংবাদ শুনিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন, মরবার আগে মিন্‌সের বায়াত্তুরে ধরেচে! সরকারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রনাথ কি বললে?

সরকার কহিল, আজ পর্যন্ত কত টাকা কাশীতে পাঠানো হয়েচে?

শুধু এই জিজ্ঞেস করেছিল—আর কিছু না?

না।

হরকালী মুখের ভাব অতি ভীষণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রনাথ এলাহাবাদের টিকিট কিনিয়াছিল, কিন্তু পথিমধ্যে অকস্মাৎ সঙ্কল্প পরিবর্তন করিয়া কাশী আসিয়া উপস্থিত হইল।

সঙ্গে যে দুইজন ভৃত্য ছিল, তাহারা গাড়ি ঠিক করিয়া জিনিসপত্র তুলিল; কিন্তু চন্দ্রনাথ তাহাতে উঠিল না; উহাদিগকে ডাকবাংলায় অপেক্ষা করিয়া থাকিবার হুকুম দিয়া পদব্রজে অন্য পথে চলিয়া গেল। পথে চলিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইতেছিল। মুখ শুষ্ক,

বিবর্ণ, নিজের প্রতি পদক্ষেপ নিজের বুকের উপরেই যেন পদাঘাতের মত বাজিতে লাগিল, তথাপি চন্দ্রনাথ চলিতে লাগিল, থামিতে পারিল না। ক্রমেই হরিদয়ালের বাটীর দূরত্ব কমিয়া আসিতেছে। এ সমস্তই যে তাহার বিশেষ পরিচিত পথ! গলির মোড়ের সেই ছোট চেনা দোকানটি—ঠিক তেমনি রহিয়াছে। দোকানের মালিক ঠিক তত বড় ভুঁড়িটি লইয়াই মোড়ার উপর বসিয়া ফুলুরি ভাজিতেছে। চন্দ্রনাথ একবার দাঁড়াইল, দোকানদার চাহিয়া দেখিল, কিন্তু সাহেবী পোশাক-পরা লোকটিকে সাহস করিয়া ফুলুরি কিনিতে অনুরোধ করিতে পারিল না, একবার চাহিয়াই সে নিজের কাজে মন দিল।

চন্দ্রনাথ চলিয়া গেল। এই মোড়ের শেষে—আর ত তাহার পা চলে না। সংকীর্ণ কাশীর পথে যেন বিন্দুমাত্র বাতাস নাই, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্লেশ হইতেছে, দুই-এক পা গিয়া সে দাঁড়ায়—আবার চলে, আবার দাঁড়ায়, পথ আর ফুরায় না, তথাপি মনে হয়, এ পথ যেন না ফুরায়! পথের শেষে না জানি কিবা দেখিতে হয়! তারপর হরিদয়ালের বাটীর সম্মুখে আসিয়া সে দাঁড়াইল। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, ডাকিতে চাহিল, কিন্তু গলা শুকাইয়া গিয়াছে। বদ্ধ-স্বর, ভগ্ন-শব্দ করিয়া থামিয়া গেল। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, নয়টা বাজিয়া গিয়াছে, তখন সাহস করিয়া ডাকিল, ঠাকুর, দয়ালঠাকুর! কেহ উত্তর দিল না। পথ দিয়া যাহারা চলিয়া যাইতেছিল, অনেকেই চন্দ্রনাথের রীতিমত সাহেবী পোশাক দেখিয়া ফিরিয়া চাহিল। চন্দ্রনাথ আবার ডাকিল, দয়ালঠাকুর!

এবার ভিতর হইতে স্ত্রী-কণ্ঠে উত্তর আসিল, ঠাকুর বাড়ি নেই।

যে উত্তর দিল সে একজন বাঙ্গালী দাসী।

সে দ্বার পর্যন্ত আসিয়া চন্দ্রনাথের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া লুকাইয়া পড়িল, কিন্তু মাতৃভাষায় কথা কহিতে শুনিয়া একেবারে ভয়ে অভিভূত হইয়া পলাইয়া গেল না। অন্তরাল হইতে বলিল, ঠাকুর বাড়ি নেই।

কখন আসবেন?

দুপুরবেলা।

চন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিল। আনন্দ, শংকা ও লজ্জা তিনের সংমিশ্রণে বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল—ভিতরে সরযূ আছে। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইল না। জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে আর কেউ নেই?

না।

তারা কোথা?

কারা?

একজন স্ত্রীলোক—

এই আমি ছাড়া আর ত কেউ এখানে নাই!

একটা ছোট ছেলে?

না, কেউ না।

চন্দ্রনাথ পইঠার উপরে বসিয়া পড়িল, এরা তবে গেল কোথায়?

দাসী বিব্রত হইয়া পড়িল। বলিল, না গো, এখানে কেউ থাকে না। আমি আর ঠাকুর-মশাই থাকি। এক মাসের মধ্যে কোন যজমানও আসেনি।

চন্দ্রনাথ স্তব্ধ হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মনে যে-সব কথা উঠিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। বহুক্ষণ পরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কতদিন এখানে আছ?

প্রায় দেড় বছর।

তবুও কাউকে দেখনি? একজন গৌরবর্ণ স্ত্রীলোক, আর একটি ছেলে, না হয় মেয়ে, না হয় শুধু ঐ স্ত্রীলোকটি, কেউ না, কাউকে দেখনি?

না, আমি কাউকে দেখিনি।

কারো মুখে কোন কথা শোনোনি?

না।

চন্দ্রনাথ আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। সেইখানে দয়ালঠাকুরের অপেক্ষা করিয়া

বসিয়া রহিল। তাহার সেই সরযূ আর বাঁচিয়া নাই, তাহা সে বেশ বুঝিতেছিল, তথাপি শুনিয়া যাওয়া উচিত, এই জন্যই বসিয়া রহিল। এক-একটি মিনিট এক-একটি বৎসর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইলে হরিদয়াল ঠাকুর বাটী আসিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে তিনি চমকিত হইলেন, পরে চিনিতে পারিয়া শুষ্কস্বরে কহিলেন, তাইত, চন্দ্রবাবু যে, কখন এলেন?

চন্দ্রনাথ ভগ্নকণ্ঠে কহিল, অনেকক্ষণ, এরা কোথায়?

হ্যাঁ এরা—তা এরা—

চন্দ্রনাথ টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রাণপণ-শক্তিতে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কবে শেষ হ'ল?

কি শেষ হল?

চন্দ্রনাথ শুষ্ক-ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, সরযূ কবে মরেছে ঠাকুর?

ঠাকুর এবার বুঝিয়া বলিলেন, মরবে কেন, ভালই আছে।

কোথায় আছে?

কৈলাসখুড়োর বাড়িতে।

সে কোথায়?

এই গলির শেষে। কাঁটালতলার বাড়িতে।

কপাল টিপিয়া ধরিয়া চন্দ্রনাথ পুনর্বার বসিয়া পড়িল। বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সে এখানে নেই কেন?

দয়ালঠাকুর ভাবিলেন, মন্দ নয়; এবং মিথ্যা লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই ভাবিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, আপনি যাকে বাড়িতে জায়গা দিতে পারলেন না, আমি দেব কি বলে? আমারো ত পাঁচজনকে নিয়েই কাজ?

চন্দ্রনাথ বুঝিল, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। একটু ভাবিয়া বলিল, কৈলাসখুড়ার বাড়িতে কেমন ক'রে গেল?

তিনি নিজে নিয়ে গেছেন।

কে তিনি?

কাশীবাসী একজন দুঃখী ব্রাহ্মণ।

সরযূ তাঁকে আগে থেকেই চিনত কি?

হ্যাঁ, খুব চিনত।

তাঁর বয়স কত?

বুড়া হরিদয়াল মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, তাঁর বয়স বোধ হয় ষাট-বাষট্টি হবে। সরযূকে মা ব'লে ডাকেন।

সেখানে আর কে আছে?

একজন দাসী, সরযূ আর বিশু।

বিশু কে?

সরযূর ছেলে।

চন্দ্রনাথ দাঁড়াইয়া বলিল, যাই।

হরিদয়াল গতিরোধ করিলেন না। চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। গলির শেষে আসিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, কৈলাসখুড়ার বাড়ি কোথায় জান? সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল। চন্দ্রনাথ একেবারে ভিতরে প্রবেশ করিল। সম্মুখে কাহাকেও দেখিতে পাইল না, শুধু সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট-দেহ একটি শিশু ঘরের সম্মুখের বারান্ডায় বসিয়া একথালা জল লইয়া সর্বাঙ্গে মাখিতেছিল এবং মাঝে মাঝে পরম পরিতোষের সহিত দেখিতেছিল, তাহার কচি মুখখানির কালো ছায়া কেমন করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাহার সহিত সহাস্যে পরিহাস করিতেছে। চন্দ্রনাথ তাহাকে একেবারে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শিশু বিস্ময় বা ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করিল না। দেখিলে বোধ হয়, অপরিচিত লোকের ক্রোড়ে যাওয়া তাহার কাছে নূতন নহে। সে চন্দ্রনাথের নাকের উপর কচি হাতখানি রাখিয়া, মুখপানে চাহিয়া বলিল তুমি কে?

চন্দ্রনাথ গভীর-স্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, আমি বাবা।

বাবা?

হ্যাঁ বাবা, তুমি কে?

আমি বিশু!

চন্দ্রনাথ ঘড়ি-চেন বুক হইতে খুলিয়া লইয়া তাহার গলায় পরাইয়া দিল, পকেট হইতে ছুরি, পেন্সিল, মনিব্যাগ যাহা পাইল, তাহাই পুত্রের হস্তে গুঁজিয়া দিল; হাতের কাছে আর কিছুই খুঁজিয়া পাইল না যাহা পুত্রহস্তে তুলিয়া দেওয়া যায়।

বিশু অনেকগুলি দ্রব্য হাতের মধ্যে পাইয়া পুলকিত হইয়া বলিল, বাবা!

চন্দ্রনাথ নিঃশব্দে তাহার ছোট মুখখানি নিজের মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বাবা!

এই সময় লখীয়ার মা বড় গোল করিল। সে হঠাৎ জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল যে, একজন সাহেব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বিশুকে কোলে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া একেবারে রান্নাঘরে ছুটিয়া গেল। বাটীতে আজ কৈলাসচন্দ্র নাই, অনেক দিনের পর তিনি বিশ্বেশ্বরের পূজা দিতে গিয়াছিলেন; সরযূও এই কিছুক্ষণ হইল মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়া রন্ধন করিতে বসিয়াছিল। লখীয়ার মা সেইখানে ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, মাইজি!

কি রে!

ঘরের ভেতরে সাহেব ঢুকে বিশুকে কোলে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্চে।

সরযূ আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে আবার কি? বলিয়া দ্বারের অন্তরাল হইতে দেখিতে চাহিল, দেখিতে পাইল না।

লখীয়ার মা তাহার বস্ত্র ধরিয়া টানিয়া বলিল, যেয়ো না—বাবাজী আসুন।

সরযূ তাহা শুনিল না, তাহার বিশ্বাস হয় নাই। অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বোধ হইল, দাসীর কথা অসত্য নহে, একজন সাহেবের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং অস্ফুটে বিশ্বেশ্বরের সহিত কথা কহিতেছে। সাহসে ভর করিয়া সে জানালার নিকটে গেল। যাহার ছায়া দেখিলে সে চিনিতে পারিত, তাহাকে চক্ষের নিমিষে চিনিতে পারিল—তাহার স্বামী—চন্দ্রনাথ!

ভিতরে প্রবেশ করিয়া, গলায় আঁচল দিয়া, পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া, সরযূ মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল।

চন্দ্রনাথ বলিল, সরযূ!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তখন স্বামী-স্ত্রীতে এইরূপ কথাবার্তা হইল।

চন্দ্রনাথ বলিল, বড় রোগা হয়েচ।

সরযূ মুখপানে চাহিয়া অল্প হাসিল, যেন বলিতে চাহে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি! তাহার পর চন্দ্রনাথ বিশুকে লইয়া একটু অধিক পরিমাণে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সরযূ তাহার জুতার ফিতা খুলিয়া দিল, গায়ের কোট-শার্ট একে একে খুলিয়া লইল, পাখা লইয়া বাতাস করিল, গামছা ভিজাইয়া পা মুছাইয়া দিল। এ-সকল কাজ সে এমন নিয়মিত শৃঙ্খলায় করিল, যেন ইহা তাহার নিত্যকর্ম, প্রত্যহ এমনি করিয়া থাকে। যাঁহাকে এ জীবনে দেখিতে পাইবার আশামাত্র ছিল না, আজ অকস্মাৎ কতদিন পরে তিনি আসিয়াছেন, কত অশ্রু, দীর্ঘনিঃশ্বাসের ছড়াছড়ি হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহা কিছুই হইল না। সরযূ এমন ভাবটি প্রকাশ করিল যেন স্বামী তাহার নিত্য আসিয়া থাকেন, আজিও আসিয়াছেন হয়ত একটু বিলম্ব হইয়াছে—একটু বেলা হইয়াছে।

কিন্তু চন্দ্রনাথের ব্যবহারটি অন্য রকমের দেখাইতেছে। বিশুর সহিত ঘনিষ্ঠ আলাপ যেন ঘরে আর কেহ নাই, বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ হইতেছে। ঘরে ক্ষুদ্রবুদ্ধি বিশ্বেশ্বর

ভিন্ন আর কেহ ছিল না, থাকিলে বুঝিতে পারিত যে, চন্দ্রনাথ নিজে ধরা পড়িয়া গিয়াছে এবং সেইটুকু ঢাকিবার জন্যই প্রাণপণে মুখ ফিরাইয়া পুত্রকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সরযূ বলিল, খোকা, খেলা কর গে।

বিশু শয্যা হইতে নামিয়া পড়িতেছিল, চন্দ্রনাথ সযত্নে তাহাকে নামাইয়া দিল। ইতি-পূর্বে সে জননীকে প্রণাম করিতে দেখিয়াছিল, তাই নামিয়াই পিতার চরণপ্রান্তে ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিয়া ছুটিয়া পলাইল। চন্দ্রনাথ হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেল, কিন্তু সে ততক্ষণে স্পর্শের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল।

সরযূ তাহার বুকের কাছে হাত দিয়া কহিল, শরীরে যে তোমার কিছু নেই, অসুখ হয়েছিল?

না, অসুখ হয়নি।

তবে বড় বেশী ভাবতে বুঝি?

চন্দ্রনাথ তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, তোমার কি মনে হয়?

সরযূ সে কথার উত্তর দিল না, অন্য কথা পাড়িল—বেলা হয়েচে, স্নান করবে চল।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ির কর্তা কোথায়?

তিনি আজ মন্দিরে পুজো করতে গেছেন, বোধ করি, সন্ধ্যার পরে আসবেন।

তুমি তাঁকে কি ব'লে ডাক?

বরাবর জ্যাঠামশায় ব'লে ডাকি, এখনও তাই বলি।

চন্দ্রনাথ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কারা এসেছে?

হরি আর মধু এসেচে। তারা ডাকবাংলায় আছে।

এখানে আনতে বুঝি সাহস হ'ল না?

চন্দ্রনাথ এ কথার উত্তর দিল না।

চন্দ্রনাথ আহারে বসিয়া সুমুখে একথালা লুচি দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। অপ্রসন্ন-ভাবে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, এ আবার কি? কুটুম্বিতে করচো, না তামাশা করচো?

সরযূ অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মলিন-মুখে বলিল, খাবে না?

চন্দ্রনাথ ক্ষণকাল সরযূর মুখপানে চাহিয়া বলিল, দুপুরবেলা কি আমি লুচি খাই?

সরযূ মনে মনে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া মৌন হইয়া রহিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, আজ যে তুমি আমাকে প্রথম খেতে দিলে তা নয়; আমি কি খাই, তাও বোধ করি ভুলে যাওনি।

সরযূর চোখে জল আসিতেছিল; ভাবিতেছিল, সেই দিন যে ফুরাইয়া গিয়াছে,—কহিল, ভাত খাবে? কিন্তু—

কিন্তু কি? শুকিয়ে গেছে?

না, তা নয়,—আমি এখানে রাঁধি!

বাড়িতেও ত রাঁধতে?

সরযূ একটু থামিয়া কহিল, আমার হাতে খাবে?

এইবার চন্দ্রনাথ মুখ নত করিল। এতক্ষণ তাহার মনে হয় নাই যে, সরযূ পর হইয়া গিয়াছে, কিংবা তাহার স্পর্শিত অন্নব্যঞ্জন আহার করা যায় না। কিন্তু সরযূর কথার ভিতর বড় জ্বালা ছিল। বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, সরযূ, দুপুরবেলা আমার চোখের জল না দেখলে কি তোমার তৃপ্তি হবে না? সরযূ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল—যাই; তবে আনি গে। রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া সে বড় কান্না কাঁদিল, তার পর চক্ষু মুছিল, জল দিয়া ধুইয়া ফেলিল, আবার অশ্রু আসে, আবার মুছিতে হয়, সরযূ আর আপনাকে কিছুতে সামলাইতে পারে না। কিন্তু স্বামী অভুক্ত বসিয়া আছেন, তখন অন্নের থালা লইয়া উপস্থিত হইল। কাছে বসিয়া, বহুদিন পূর্বের মত যত্ন করিয়া

আহার করাইয়া উচ্ছিষ্ট পাত্র হাতে লইয়া, আর একবার ভাল করিয়া কাঁদিবার জন্য রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

বেলা দুইটা বাজিয়াছে। চন্দ্রনাথের ক্রোড়ের কাছে বিশ্বেশ্বর পরম আরামে ঘুমাইয়াছে। সরযূ প্রবেশ করিল।

চন্দ্রনাথ কহিল, সমস্ত কাজকর্ম সারা হ'ল?

কাজ কিছুই ছিল না। জ্যাঠামশাই এখনও আসেন নি। তাহার পর সরযূ ঘরকন্নার কথা পাড়িল। বাড়ির প্রতি ঘর, প্রতি সামগ্রী, মাতুল-মাতুলানী, দাস-দাসী, সরকারমশায়, হরিবালা সই, পাড়া-প্রতিবেশী, একে একে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিল। এই সময়টুকুর মধ্যে দু'জনের কাহারও মনে পড়িল না যে, সরযূর এ-সব জানিয়া লাভ নাই, কিংবা এ-সকল সংবাদ দিবার সময় চন্দ্রনাথেরও ক্লেশ হওয়া উচিত—একটু লজ্জা, একটু বিমর্ষতা, একটু সংকোচের আবশ্যক। একজন পরম আনন্দে প্রশ্ন করিতেছে, অপরে উৎসাহের সহিত উত্তর দিতেছে। নিতান্ত বন্ধুর মত দুইজনে যেন পৃথক হইয়াছিল, আবার মিলিয়াছে।

সহসা সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, বিয়ে করলে কোথায়?

এটা যেন নিতান্ত পরিহাসের কথা!

চন্দ্রনাথ বলিল, পশ্চিমে।

কেমন বৌ হ'ল?

তোমার মত।

এই সময় সরযূ বুকের কাছে একটা ব্যথা অনুভব করিল, সামলাইতে পারিল না, বসিয়া ছিল, শুইয়া পড়িল। মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

ব্যস্ত হইয়া চন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া পড়িল, কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সরযূ একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছিল। তখন শিয়রে বসিয়া ক্রোড়ের উপর তাহার মাথাটা তুলিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া ডাকিল, সরযূ!

সরযূ চোখ বুজিল। তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল এবং অস্পষ্ট কি বলিল, বোঝা গেল না।

চন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভয় পাইয়া জলের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। লখীয়ার মা নিকটেই ছিল, জল লইয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু কোনরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিল না। বলিল, বাবু, এখনি সেরে যাবে, অমন মাঝে মাঝে হয়।

তাহার পর মুখে চোখে জল দেওয়া হইল, বাতাস করা হইল, বিশু আসিয়া বার-দুই চুল ধরিয়া টানাটানি করিয়া ডাকিল, মা!

সরযূর চৈতন্য হইল, লজ্জিত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। লখীয়ার মা আপনার কাজে চলিয়া গেল। ভয়ে চন্দ্রনাথের মুখ কালি হইয়া গিয়াছিল।

সরযূ হাসিল। বড় ক্ষীণ, অথচ বড় মধুর হাসিয়া বলিল, ভয় পেয়েছিলে?

চন্দ্রনাথের দুই চোখে জল টলটল করিতেছিল, এইবারে গড়াইয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিল; বলিল, ভেবেছিলাম বুঝি সব শেষ হয়ে গেল।

সরযূ মনে মনে ভাবিল, তোমার কোলে মাথা ছিল—সে সুকৃতি কি এ হতভাগিনীর আছে? প্রকাশ্যে কহিল, এমন ধারা মাঝে মাঝে হয়।

তা দেখচি! তখন হ'ত না, এখন হয়, সেও বুঝি। বলিয়া চন্দ্রনাথ বহুক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর পকেট হইতে মরিচা-ধরা একটা চাবির গোছা বাহির করিয়া সরযূর আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, এই তোমার চাবির রিং—আমার কাছে গচ্ছিত রেখে চ'লে এসেছিলে, আজ আবার ফিরিয়ে দিলাম। চেয়ে দেখ, কখন কি ব্যবহার হয়েচে ব'লে মনে হয়?

সরযূ দেখিল, তাহার আদরের চাবির রিং মরিচা ধরিয়া একেবারে ময়লা হইয়া গিয়াছে। হাতে লইয়া বলিল, তাকে দাওনি কেন?

চন্দ্রনাথের শুষ্ক ম্লানমুখ অকস্মাৎ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল, দুই চোখে অসীম স্নেহ চঞ্চল হইয়া উঠিল, তথাপি নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, তাকেই ত দিলাম সরযূ।

সরযূ ঠিক বুঝিতে পারিল না। ক্ষণকাল স্বামীর মুখের পানে সন্দিগ্ধ-দৃষ্টি নিবদ্ধ

রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমি নূতন বৌর কথা বলচি। তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী, তাকে দাওনি কেন?

চন্দ্রনাথ আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। সহসা দুই হাত বাড়াইয়া সরযূর মুখখানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, তাকেই দিয়েচি সরযূ, তাকেই দিয়েচি। স্ত্রী আমার দুটি নয়, একটি। কিন্তু সে আমার পুরানো হয় না—চিরদিনই নতুন। প্রথম যেদিন তাকে এই কাশী থেকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদী ফুলটির মত বুকে ক'রে নিয়ে যাই সেদিনও যেমন নতুন, আজও আবার যখন সেই বিশ্বেশ্বরের পায়ের তলা থেকে কুড়িয়ে নিতে এসেচি এখনও তেমনি নতুন।

সন্ধ্যার দীপ জ্বালিয়া ছেলে কোলে লইয়া সরযূ স্বামীর পায়ের নিকট বসিয়া বলিল, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা না ক'রে তোমার যাওয়া হবে না– আজ রাত্তিরে তোমাকে থাকতে হবে।

চন্দ্রনাথ বলিল, তাই ভাবচি, আজ বুঝি আর যাওয়া হয় না।

সরযূ অনেকক্ষণ অবধি একটা কথা কহিতে চাহিতেছিল, কিন্তু লজ্জা করিতেছিল, সময়ও পায় নাই। এখন তাহা বলিল, তোমার কাছে আর লজ্জা কি—?

চন্দ্রনাথ সরযূর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সরযূ বলিল, ভেবেছিলাম, তোমাকে একখানা চিঠি লিখব।

লেখনি কেন, আমি ত বারণ করিনি।

সরযূ একটুখানি ভাবিয়া বলিল, ভয় হ'ত, পাছে তুমি রাগ কর। আবার কবে তুমি আসবে?

যখন আসতে বলবে, তখনি আসব।

সরযূ একবার মনে করিল, সেই সময় বলিবে, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিয়া দেখিল, মানুষের শরীরে বিশ্বাস নাই। এখন না বলিলে হয়ত বলাই হবে না। চন্দ্রনাথ হয় ত আবার আসিবে, কিন্তু সে হয়ত ততদিনে পুড়িয়া ছাই হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে। তাই বিবেচনা করিয়া বলিল, তোমার কাছে আমার কোন লজ্জা নেই।

সে কথা ত হয়ে গেল—আর কিছু বলবে?

সরযূ কিছুক্ষণ থামিয়া বলিল আমার বাঁচতে ইচ্ছে নেই,—এমন ক'রে বেঁচে থাকা আর ভাল দেখাচ্চে না।

চন্দ্রনাথ ভাবিল, ইহা পরিহাসের মত শুনাইতেছে না। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, সরযূর মুখ আবার বিবর্ণ হইয়াছে। সভয়ে কহিল, সরযূ কোন শক্ত রোগ জন্মায় নি ত?

সরযূ ম্লান হাসিয়া কহিল, তা বলতে পারিনে! বুকের কাছে মাঝে মাঝে একটা ব্যথা টের পাই।

চন্দ্রনাথ বলিল, আর ঐ মূর্ছাটা?

সরযূ হাসিল, ওটা কিছুই নয়।

চন্দ্রনাথ মনে মনে বলিল, যা হইবার হইয়াছে, এখন সর্বস্বান্ত হইয়াও তোমাকে আরোগ্য করিব।

সরযূ কহিল, তোমার কাছে একটি ভিক্ষা আছে, দেবে ত?

চাই কি?

নিজের কিছু চাই না। তবে, আমার যখন মৃত্যু-সংবাদ পাবে, তখন—এই সময় সে খোকাকে চন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসাইয়া দিয়া বলিল, তখন একবার এখানে এসে খোকাকে নিয়ে যেয়ো—

চন্দ্রনাথ বিপুল আবেগে বিশ্বেশ্বরকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিল।

এই সময় বাহির হইতে কৈলাসচন্দ্র ডাকিলেন, দাদা, বিশু!

বিশ্বেশ্বর পিতার ক্রোড় হইতে ছটফট করিয়া নামিয়া পড়িল,—দাদু যাই।

সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইল,—ঐ এসেছেন।

কিছুক্ষণ পরে কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে ক্রোড়ে লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন, চন্দ্রনাথও বাহিরে আসিল। কৈলাসচন্দ্র ইতিপূর্বে চন্দ্রনাথকে কখনও দেখেন নাই—দেখিলেও চিনতেন না, চাহিয়া রহিলেন। খোকা পরিচয় করিয়া দিল। হাত বাড়াইয়া বলিল, ওতা বাবা।

চন্দ্রনাথ প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কৈলাসচন্দ্র আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, এস বাবা, এস।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কিন্তু চন্দ্রনাথ যখন বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কাল এদের নিয়ে যাব, তখন কৈলাস-চন্দ্রের বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে এককালে শতাধিক কামান দাগার মত শব্দ করিয়া উঠিল! নিজে কি কহিলেন, নিজের কানে সে শব্দ পেঁৗছিল না। কিন্তু চন্দ্রনাথ শুনিল, অস্ফুট ক্রন্দনের মত বহুদূরে হইতে কে যেন কহিল, এমন সুখের কথা আর কি আছে!

সরযূ এ সংবাদ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল না, তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। স্বামীর পদযুগল মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিল, পায়ের ধূলো দিয়ে হত-ভাগিনীকে এইখানেই রেখে যাও, আমাকে নিয়ে যেয়ো না।

চন্দ্রনাথ বলিল, কেন?

সরযূ জবাব দিতে পারিল না—কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্রের কাতর মুখখানি তাহার চোখের উপরে কেবলি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

চন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমার স্বামী, আমি যদি নিয়ে যাই, তোমার অনিচ্ছায় কিছু হবে না। আমি বিশুকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

সরযূ দেখিল, তাহার কিছুই বলিবার নাই।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে সেদিনের মত কোলে তুলিয়া লইলেন। দাবার পুঁটুলি হাতে করিয়া শম্ভু মিশিরের বাড়ি আসিলেন। তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, মিশিরজী! আজ আমার সুখের দিন—বিশুদাদা আজ তার নিজের বাড়ি যাবে। বড় হয়েছে ভাই, কুঁড়েঘরে আর তাকে ধ'রে রাখা যায় না।

মিশিরজী আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

কৈলাসচন্দ্র সতরঞ্চ পাতিয়া বল সাজাইয়া বলিলেন, আজ আমোদের দিনে এস, তোমাকে দু বাজি মাত ক'রে যাই।

খেলার প্রারম্ভেই কিন্তু কৈলাসচন্দ্র একে একে বল হারাইতে লাগিলেন। গজ চালিতে নৌকা, নৌকা চালিতে ঘোড়া, এমনি বড় গোলমাল হইতে লাগিল। মিশিরজী কহিল, বাবুজী, আজ তোমার মেজাজ চৈন নাই, বহুত গলতি হোতা। ক্রমে এক বাজির পর আর এক বাজি কৈলাসচন্দ্র হারিয়া খেলা উঠাইয়া পুঁটুলি বাঁধিতে বসিলেন, কিন্তু লাল মন্ত্রীটা বাঁধিলেন না। বিশুর হাতে দিয়া বলিলেন, দাদা, মন্ত্রীটা তোমাকে দিলাম, আর কখনও চাব না। পথে আসিতে যাহার সহিত দেখা হইল, তাহাকেই এই সুখবরটা জানাইয়া দিলেন।

আজ সর্বকর্মেই বৃদ্ধের বড় উৎসাহ। কিন্তু কাজ করিতে কাজ পিছাইয়া পড়িতেছে। দাবাখেলার মত বড় ভুলচুক হইয়া যাইতেছে। যত বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল ভুলচুক ততই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সরযূ তাহা দেখিয়া গোপনে শতবার চক্ষু মুছিল। বৃদ্ধের কিন্তু মুখের উৎসাহ কমে নাই, এমন কি সরযূ যখন আড়ালে ডাকিয়া পদধূলি মাথায় লইয়া কাঁদিতে লাগিল, তখনও তিনি অশ্রুসংবরণ করিয়া হাসিয়া আশীর্বাদ করিলেন, মা আমার কাঁদিস নে। তোর বুড়ো জ্যাঠার আশীর্বাদে তুই রাজরানী হবি। আবার যদি কখনো আসিস, তোদের এই কুঁড়েঘরটিকে ভুলে যেন আর কোথাও থাকিস নে।

সরযূ আরও কাঁদিতে লাগিল, বুকের মাঝে শুধু সেই দিনের কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল, যেদিন সে নিরাশ্রিতা পথের ভিখারিণী হইয়া কাশীতে আসিয়াছিল। আর আজ!

সরযূ বলিল, জ্যাঠামশাই, আমাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে না যে—

কৈলাসচন্দ্র কহিলেন, আর ক'টা দিন মা? কিন্তু মনে মনে বলিলেন, এইবার ডাক পড়েছে, এতদিনে তপ্ত প্রাণটার জুড়োবার উপায় হয়েছে।

সরযূ চোখ মুছিতে মুছিতে আকুলভাবে বলিল, আমার মায়া-দয়া নেই—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন, ছি মা, ও-কথা ব'লো না—আমি তোমাকে চিনেচি।

রাত্রি দশটার সময়ে সকলে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ির সময় ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে।

বিশ্বেশ্বর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু লাল মন্ত্রীটা তখনও বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ছিল। বৃদ্ধ নাড়াচাড়া করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেন। সদ্য নিদ্রোত্থিত হইয়া প্রথমে সে কাঁদিবার উপক্রম করিল, কিন্তু যখন তিনি মুখের কাছে মুখ আনিয়া ডাকিলেন, বিশু, দাদা! তখন সে হাসিয়া উঠিল, দাদু।

দাদাভাই আমার, কোথায় যাচ্ছ?

বিশু বলিল, দাত্তি। তাহার পর মন্ত্রীটা দেখাইয়া কহিল, মন্তী।

কৈলাসচন্দ্র কহিলেন, হ্যাঁ দাদা! মন্ত্রী হারিয়ো না যেন।

এ গজদন্ত-নির্মিত রক্ত-রঞ্জিত পদার্থটা সম্বন্ধে কৈলাসচন্দ্র ইতিপূর্বে তাহাকে অনেকবার সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, সেও ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হারাবো না—মন্তী!

ট্রেন আসিলে সরযূ পুনরায় তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া গাড়িতে উঠিল। বৃদ্ধের আন্তরিক আশীর্বচন ওষ্ঠাধরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভিতরেই রহিয়া গেল।

ট্রেন ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই দেখিয়া কৈলাসচন্দ্র বিশ্বেশ্বরকে চন্দ্রনাথের ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন, দাদু!

দাদু!

মন্ত্রী!

সে মন্ত্রীটা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, দাদু—মন্তী!

হারাস নে—

না।

এইবার বৃদ্ধের শুষ্কচক্ষে জল আসিয়া পড়িল। গাড়ি ছাড়িয়া দিলে তিনি সরযূর জানালার নিকট মুখ আনিয়া কহিলেন, মা, তবে যাই—আর একবার জোর করিয়া ডাকিলেন, ও দাদু—

গাড়ির শব্দে এবং লোকের কোলাহলে বিশ্বেশ্বর সে আহ্বান শুনিতে পাইল না। যতক্ষণ গাড়ির শেষ শব্দটুকু শুনা গেল, ততক্ষণ তিনি একপদও নাড়লেন না। তাহার পর ধীরে ধীরে ফিরিয়া গেলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বাড়ি পৌঁছিয়া চন্দ্রনাথের যেটুকু ভয় ছিল, খুড়ো মণিশঙ্করের কথায় তাহা উড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, চন্দ্রনাথ, পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, যে পাপ করেনি তার আবার প্রায়শ্চিত্তের কি প্রয়োজন? বধূমাতার কোন পাপ নেই, অনর্থক প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলে তাঁর অবমাননা করো না। মণিশঙ্করের মুখে এরূপ কথা বড় নূতন শোনাইল। চন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তিনি আবার কহিলেন, বুড়ো হয়ে অনেক দেখেছি যে, দোষ-লজ্জা প্রতি সংসারে আছে। মানুষের দীর্ঘ-জীবনে তাকে অনেক পা চলতে হয়, দীর্ঘ-পথটির কোথাও কাদা, কোথাও পিছল, কোথাও বা উঁচু-নীচু থাকে, তাই বাবা, লোকের পদস্খলন হয়; তারা কিন্তু সে কথা বলে না, শুধু পরের কথা বলে। পরের দোষ, পরের লজ্জার কথা চীৎকার ক'রে বলে, সে শুধু আপনার দোষটুকু গোপনে ঢেকে ফেলবার জন্যেই। তারা আশা করে, পরের গোলমালে নিজের লজ্জাটুকু চাপা পড়ে যাবে। চন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিল। মণিশঙ্কর একটু থামিয়া পুনর্বার কহিলেন, আর একটা নূতন কথা

শিখেছি—শিখেছি যে, পরকে আপনার করা যায়; কিন্তু যে আপনার, তাকে কে কবে পর করতে পেরেছে? এতদিন আমি অন্ধ ছিলাম, কিন্তু বিশু আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছে। তার পুণ্যে সব পবিত্র হয়েছে। আজ দ্বাদশী। পূর্ণিমার দিন তোমার বাড়িতে গ্রামসুদ্ধ লোকের নিমন্ত্রণ করেচি। তখন দাদা ছিলেন, কাজকর্ম সবই তিনি করতেন। আমি কখনও কিছু করতে পাইনি—তাই মনে করছি, বিশুর আবার নূতন ক'রে অন্নপ্রাশন দেব।

চন্দ্রনাথ চিন্তা করিল, কিন্তু সমাজ?

মণিশঙ্কর হাসিলেন, বলিলেন, সমাজ আমি, সমাজ তুমি। এ গ্রামে আর কেউ নেই; যার অর্থ আছে, সেই সমাজপতি। আমি ইচ্ছা করলে তোমার জাত মারতে পারি, আর তুমি ইচ্ছা করলে আমার জাত মারতে পার। সমাজের জন্য ভেব না। আর একটা কথা বলি—এত-দিন তা বলিনি, বোধ হয় কখনও বলতাম না, কিন্তু ভাবচি, তোমার কাছে একথা প্রকাশ করলে কোন ক্ষতি হবে না। তোমার রাখাল ভট্‌চায্যের কথা মনে হয়?

হয়। হরিদয়াল ঠাকুরের পত্রে পড়েছিলাম।

আমার পরিবারের যদি কিছু লজ্জার কথা থাকে, শুধু সেই প্রমাণ করতে পারত, কিন্তু সে আর কোন কথা প্রকাশ করবে না, আমি তাকে জেলে দিয়েছি। কিছুদিন হল সে খালাস হয়ে কোথায় চলে গেছে, আর কখনও এ দেশে পা বাড়াবে না।

মণিশঙ্কর তখন আনুপূর্বিক সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন। সে সকল কাহিনী শুনিয়া চন্দ্রনাথের দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

তাহার পর পূর্ণিমার দিন খাওয়ানো-দাওয়ানো শেষ হইল। গ্রামের কেহই কোন কথা কহিল না। তাহারা মণিশঙ্করের ব্যবহার দেখিয়া বিশ্বাস করিল যে, একটা মিথ্যা অপবাদ রটনা হইয়াছিল,—হয় ত সে একটা জমিদারী চাল মাত্র!

হরকালী আলাদা রাঁধিয়া খাইলেন,—তাঁহারা এ গ্রামে আর বাস করিবেন না—বাড়ি যাইবেন। হরকালী বলিলেন, প্রাণ যায় সেও স্বীকার, কিন্তু ধর্মটাকে তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারিবেন না। ইহা সুখের কথাই হউক আর দুঃখের কথাই হউক, চন্দ্রনাথ তাঁহাদের পঞ্চাশ টাকার পরিবর্তে মাসিক একশত টাকা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছে।

উৎসবের শেষে অনেক রাত্রে নাচ-গান বন্ধ হইলে ঘরে আসিয়া চন্দ্রনাথ দেখিল সর্ব-অলঙ্কার-ভূষিতা রাজরাজেশ্বরীর মত নিদ্রিত পুত্র ক্রোড়ে লইয়া সরযূ স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া নিশি জাগিয়া বসিয়া আছে।

আজ পূর্ণিমা।

চন্দ্রনাথ বলিল, ইস।

সরযূ মৃদু হাসিয়া বলিল, সই আজ কিছুতেই ছাড়লেন না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে এক-পা এক-পা করিয়া বৃদ্ধ কৈলাসচন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। বাঁধান তুলসী-বেদীর উপর তখনও দীপটা জ্বলিতেছিল, তথাপি এ কি ভীষণ অন্ধকার! এইমাত্র সবাই ছিল, এখন আর কেহ নাই। শুধু মাটির প্রদীপটি সেই অবধি জ্বলিতেছে; তাহারও আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে, এইবার নিবিয়া যাইবে। সরযূ এটি স্বহস্তে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল।

শয্যায় আসিয়া তিনি শয়ন করিলেন। অবসন্ন চক্ষু দুইটি তন্দ্রায় জড়াইয়া আসিল। কিন্তু কানের কাছে সেই অবধি যেন কে মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে, দাদু! স্বপ্ন দেখিলেন, রাজা ভরত তাঁহার বুকের মাঝখানটিতে মৃত্যুশয্যা পাতিয়া ক্ষীণ ওষ্ঠ কাঁপাইয়া বলিতেছে,—ফিরে আয়! ফিরে আয়!

সকালবেলায় শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, বাহিরে আসিয়া অভ্যাসবশতঃ ডাকিলেন, বিশু! তাহার পর মনে পড়িল, বিশু নাই, তাহারা চলিয়া গিয়াছে।

দাবার পুঁটুলি হাতে লইয়া শম্ভু মিশিরের বাড়ি চলিলেন। ডাকিয়া বলিলেন, মিশিরজী, দাদাভাই আমার চলে গেছে।

দাদাভাইকে সবাই ভালবাসিত। মিশিরজীও দুঃখিত হইল। দাবার বল সাজান হইলে মিশিরজী কহিল, বাবুজী, তোমার উজীর কি হ'ল?

কৈলাসচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন,—তাই ত, মিশিরজী, সেটা নিয়ে গেছে। লাল উজীরটা সে বড় ভালবাসত। ছেলেমানুষ কিছুতেই ছাড়লে না।

তিনি যে স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় দাবা-জোড়াটি অঙ্গহীন করিয়াছিলেন, সে কথা বলিতে লজ্জা করিল।

মিশিরজী কহিল, তবে অন্য জোড়া পাতি?

পাত।

খেলায় কৈলাসচন্দ্রের হার হইল। শম্ভু মিশির তাঁহার সহিত চিরকাল খেলিতেছে, কখনও হারাইতে পারে নাই। হারিবার কারণ সে সহজেই বুঝিল। বলিল, বাবুজী, খোকা-বাবু তোমার বিলকুল ইলিম সাথে লে গিয়া বাবুজী!

বাবুজীর মুখে শুষ্ক-হাসির রেখা দিল। বলিলেন, এস, আর এক বাজি দেখা যাক।

বহুৎ আচ্ছা।

খেলার মাঝামাঝি অবস্থায় কৈলাসচন্দ্র কিস্তি দিয়া ভুলিয়া বলিলেন, বিশু!

শম্ভু মিশির হাসিয়া ফেলিল। কিস্তি কথাটা সে বুঝিত, বলিল, বাবুজী, কিস্তি, বিশু নয়। দুইজনে হাসিয়া উঠিলেন।

শম্ভু মিশির কিস্তি দিয়া বলিল, বাবুজী, এইবার তোমার দো পেয়াদা গিয়া।

কৈলাসচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, দাদা, আয়, আয়, শিগগির আয়। পরে কিছুক্ষণ যেন তাহার অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিলেন। মনে হইতেছিল যেন এইবার একটি ক্ষুদ্র-কোমল-দেহ তাঁহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে। শম্ভু মিশির বিলম্ব দেখিয়া বলিল, বাবুজী, পেয়াদা নাহি বাঁচনে পারবে। বৃদ্ধের চমক ভাঙ্গিল, তাই ত, বোড়ে দুটো মারা গেল!

তাহার পর খেলা শেষ হইল। মিশিরজী জয়ী হইল, কিন্তু আনন্দিত হইল না। বলগুলা সরাইয়া দিয়া বলিল, বাবুজী, দোসরা দিন খেলা হবে। আজ আপনা তবিয়ৎ বহুৎ বে-দুরস্ত—মেজাজ একদম দিক্ আছে।

বাড়ি ফিরিয়া যাইতে দুই প্রহর হইল। মনে হইতেছিল, বিশু ত নাই, তবে আর তাড়াতাড়ি কি?

বাটীতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, লখীয়ার মা একা রন্ধনশালায় বসিয়া পাকের যোগাড় করিতেছে। আজ তাঁহাকে নিজে রাঁধিতে হইবে, নিজে বাড়িয়া খাইতে হইবে—একা আহার করিতে হইবে। ইচ্ছামত আহার করিবেন, তাড়াতাড়ি নাই, পীড়াপীড়ি নাই—বিশ্বেশ্বরের দৌরাত্ম্যের ভয় নাই। বড় স্বাধীন! কিন্তু এ যে ভাল লাগে না। রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, একমুঠো চাল, দু'টা আলু, দু'টা পটল, খানিকটা ডালবাটা। চোখ ফাটিয়া জল আসিল—মনে পড়িল, দুই বৎসর আগেকার কথা। তখন এমনি নিজে রাঁধিতে হইত—এই লখীয়ার মা-ই আয়োজন করিয়া দিত। কিন্তু তখন বিশুও আসে নাই, চলিয়াও যায় নাই।

কাঁটালতলায় তাহার ক্ষুদ্র খেলাঘর এখনও বাঁধা আছে। দুটো ভগ্ন-ঘট একটা ছিন্ন-হস্তপদ মাটির পুতুল, একটা দু পয়সা দামের ভাঙ্গা বাঁশী। ছেলেমানুষের মত বৃদ্ধ সেগুলি কুড়াইয়া আনিয়া আপনার শোবার ঘরে রাখিয়া দিলেন।

দুপুরবেলা আবার গঙ্গা পাঁড়ের বাড়িতে দাবা পাতিয়া বসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার পর মুকুন্দ ঘোষের বৈঠকখানায় আবার লোক জমিতে লাগিল, কিন্তু প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় বলিয়া কৈলাসচন্দ্রের আর তেমন সম্মান নাই; তখন দিগ্বিজয়ী ছিলেন, এখন খেলামাত্র সার হইয়াছে। সেদিন যাহাকে হাতে ধরিয়া খেলা শিখাইয়াছিলেন, সে আজ চাল বলিয়া দেয়। যাহার সহিত তিনি দাবা রাখিয়াও খেলিতে পারেন, সে আজ মাথা উঁচু করিয়া স্বেচ্ছায় একখানা নৌকা মার দিয়া খেলা আরম্ভ করে।

পূর্বের মত এখনও খেলিবার ঝোঁক আছে কিন্তু সামর্থ্য নাই। দুই-একটা শক্ত চাল এখনও মনে পড়ে—কিন্তু সোজা খেলায় বড় ভুল হইয়া যায়। দাবাখেলায় গর্ব ছিল—আজ তাহা শুধু লজ্জায় পরিণত হইয়াছে। তবে শম্ভু মিশির এখনও সম্মান করে; সে আর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া খেলে না, প্রয়োজন হইলে দুই-একটা কঠিন সমস্যা পূর্ণ করিয়া লইয়া যায়।

বাড়িতে আজকাল তাঁহার বড় গোলযোগ বাধিতেছে। লখীয়ার মা দস্তুরমত রাগ করিতেছে; দু-একদিন তাহাকে চোখের জল মুছিতেও দেখা গিয়াছে। সে বলে, বাবু, খাওয়া-নাওয়া একেবারে কি ছেড়ে দিলে? আয়না দিয়া চেহারাটা দেখ গে!

কৈলাসচন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহেন, বেটী, রাঁধাবাড়া সব ভুলে গেছি—আর আগুন-তাতে যেতে পারিনে।

সে বহুদিনের পুরানো দাসী, ছাড়ে না, বকা-ঝকা করিয়া এক-আধ মুঠো চাউল সিদ্ধ করাইয়া লয়।

এমন করিয়া এক মাস কাটিয়া গেল।

তাহার পর তিন-চারদিন ধরিয়া কৈলাসখুড়োকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। শম্ভু মিশির এ কথা প্রথমে মনে করিল। সে দেখিতে আসিল। ডাকিল, বাবুজী!

লখীয়ার মা উত্তর দিল। কহিল, বাবুর বোখার হয়েছে।

মিশিরজী কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিছানার নিকট আসিয়া বলিল, বাবুজী বোখার হ'ল কি?

কৈলাসচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, হ্যাঁ মিশিরজী, ডাক পড়েচে, তাই আস্তে আস্তে যাচ্ছি।

মিশিরজী কহিল, ছিয়া ছিয়া—রাম রাম! আরাম হো যায়েগা।

আর আরাম হবার বয়স নেই ঠাকুর—এইবার রওনা হ'তে হবে।

কবিরাজ বোলায় ছিলে?

কৈলাস আবার হাসিলেন, আটষট্টি-বছর বয়সে কবিরাজ এসে আর কি করবে মিশিরজী?

আটষট্ বয়স—বাবুজী! আউর আটষট্ আদমী জিতে পারে।

কৈলাসচন্দ্র সে কথায় উত্তর না দিয়া সহসা বলিলেন, ভাল কথা মিশিরজী! আমার দাদাভাই চিঠি লিখেছে—ও লখীয়ার মা, জানালাটা খুলে দে ত, মিশিরজীকে পত্রখানা পড়ে শুনাই। বালিশের তলা হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া বহুক্লেশে আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইলেন। হিন্দুস্থানী শম্ভু মিশির কতক বুঝিল, কতক বুঝিল না।

রাত্রে শম্ভু মিশির কবিরাজ ডাকিয়া আনিল। কবিরাজ বাঙ্গালী—কৈলাসচন্দ্রের সহিত জানাশুনা ছিল। তাঁহার প্রশ্নের দুই-একটা উত্তর দিয়া কহিলেন, কবিরাজমশাই, দাদাভাই চিঠি লিখেচে, এই পড়ি শুনুন।

দাদাভায়ের সহিত কবিরাজ মহাশয়ের পরিচয় ছিল না। তিনি বলিলেন, কার পত্র?

দাদু—বিশু—লখীয়ার মা, আলোটা একবার ধর ত বাছা—

প্রদীপের সাহায্যে তিনি সবটুকু পড়িয়া শুনাইলেন। কবিরাজ শুনিলেন কিনা কৈলাসচন্দ্রের তাহাতে দ্রূক্ষেপও নাই। সরযূর হাতের লেখা বিশুর চিঠি, বৃদ্ধের ইহাই সান্ত্বনা, ইহাই সুখ। কবিরাজ মহাশয় ঔষধ দিয়া প্রস্থান করিলে, কৈলাসচন্দ্র শম্ভু মিশিরকে ডাকিয়া বিশ্বেশ্বরের রূপ, গুণ, বুদ্ধি এ-সকলের আলোচনা করিতে লাগিলেন।

দুই সপ্তাহ অতীত হইল, কিন্তু জ্বর কমিল না; বৃদ্ধ তখন একজন পাড়ার ছেলেকে ডাকিয়া বিশুকে পত্র লিখাইলেন—মোট কথা এই যে, তিনি ভাল আছেন, তবে সম্প্রতি শরীরটা কিছু মন্দ হইয়াছে, কিন্তু ভাবনার কোন কারণ নাই।

কৈলাসখুড়ার প্রাণের আশা আর নাই শুনিয়া হরিদয়াল দেখিতে আসিলেন। দুই-একটা কথাবার্তার পর কৈলাসচন্দ্র বালিশের তলা হইতে সেই চিঠিখানি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, বাবাজী, পড়।

পত্রখানা নিতান্ত মলিন হইয়াছে, দুই-এক জায়গায় ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, ভাল পড়া যায় না। হরিদয়াল যাহা পারিলেন পড়িলেন। বলিলেন, সরযূর হাতের লেখা।

তার হাতের লেখা বটে, আমার দাদার চিঠি।

নীচে তার নাম আছে বটে!

বৃদ্ধ কথাটায় তেমন সন্তুষ্ট হইলেন না। বলিলেন, তার নাম, তার চিঠি, সরযূ কেবল লিখে দিয়েছে। সে যখন লিখতে শিখবে, তখন নিজের হাতেই লিখবে।

হরিদয়াল ঘাড় নাড়িলেন।

কৈলাসচন্দ্র উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন, পড়লে বাবাজী? বিশু আমার রাত্তিরে দাদু দাদু ব'লে কেঁদে ওঠে, সে ভুলতে পারে? এই সময় গণ্ড বাহিয়া দু' ফোঁটা চোখের জল বালিশে আসিয়া পড়িল।

লখীয়ার মা নিকটে ছিল, সে দয়ালঠাকুরকে ইশারা করিয়া বাহিরে ডাকিয়া বলিল, ঠাকুর, যাও, তুমি থাকলে সারাদিন ঐ কথাই বলবে।

আর চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। অবস্থা নেহাত মন্দ হইয়াছে, শম্ভু মিশির আজকাল রাত্রিদিন থাকে, মাঝে কবিরাজ আসিয়া দেখিয়া যায়। আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সংজ্ঞা ছিল না; সন্ধ্যার পর একটু জ্ঞান হইয়াছিল, তাহার পর অর্ধচেতনভাবে পড়িয়া ছিলেন। গভীর রাত্রে কথা কহিলেন, বিশু দাদা, আমার মন্ত্রীটা! এবার দে, নইলে মাত হয়ে যাব! শম্ভু মিশির কাছে আসিয়া বলিল, বাবুজী কি বলচে?

কৈলাসচন্দ্র তাহার পানে একবার চাহিলেন, ব্যস্তভাবে বালিশের তলায় একবার হাত দিলেন, যেন কি একটা হারাইয়া গিয়াছে, প্রয়োজনের সময় হাত বাড়াইয়া পাইতেছেন না। তাহার পর হতাশভাবে পাশ ফিরিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন, বিশু, বিশ্বেশ্বর, মন্ত্রীটা একবার দে ভাই, মন্ত্রী হারিয়ে আর কতক্ষণ খেলি বল্?

এ বিশ্বের দাবাখেলায় কৈলাসচন্দ্রের মন্ত্রী হারাইয়া গিয়াছে। বিশ্বপতির নিকট তাহাই যেন কাতরে ভিক্ষা চাহিতেছে। শম্ভু মিশির নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। লখীয়ার মা প্রদীপ মুখের সম্মুখে ধরিয়া দেখিল, বৃদ্ধের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, শুধু ওষ্ঠাধর তখনও যেন কাঁপিয়া কহিতেছে, বিশ্বেশ্বর! মন্ত্রী-হারা হয়ে আর কতক্ষণ খেলা যায়, দে ভাই, দে।

পরদিন দয়ালঠাকুর চন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়া দিলেন যে, গতরাত্রে কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে।

বামুনের মেয়ে

এক

পাড়া-বেড়ানো শেষ করিয়া রাসমণি অপরাহ্নবেলায় ঘরে ফিরিতেছিলেন! সঙ্গে দশ-বারো বৎসরের নাতিনীটি আগে আগে চলিয়াছিল। অপ্রশস্ত পল্লীপথের এধারে বাঁধা একটি ছাগশিশু ওধারে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল। সম্মুখে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি নাতিনীর উদ্দেশে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওলো ছুঁড়ী, দড়িটা ডিঙুস্‌নি, ডিঙুলি? হারামজাদী, সগ্‌গপানে চেয়ে পথ হাঁটচ। চোখে দেখতে প্যাও না যে ছাগল বাঁধা রয়েচে!

নাতিনী কহিল, ছাগল ঘুমোচ্চে ঠাকুমা।

ঘুমোচ্চে! আর দোষ নেই? এই শনি-মঙ্গলবারে কিনা তুই দড়িটা স্বচ্ছন্দে ডিঙিয়ে গেলি?

তাতে কি হয় ঠাকুমা?

কি হয়? পোড়ারমুখী বামুনের ঘরের ন'-দশ বছরের বুড়োধাড়ী মেয়ে এটা শেখোনি যে, ছাগলদড়ি ডিঙোতে মাড়াতে নেই—কিছুতে নেই! আবার বলে কিনা, কি হয়! না বাপু, ব্যাটাবেটীদের ছাগল-পোষার জ্বালায় মানুষের পথেঘাটে চলা দায় হ'লো। অ্যাঁ! এই মঙ্গলবারের বারবেলায় মেয়েটা যে দড়িটা ডিঙিয়ে ফেললে—কেন? কিসের জন্যে পথের ওপর ছাগল বাঁধা? বলি তাদের ঘরে কি ছেলেমেয়ে নেই? তাদের কি একটা ভালোমন্দ হতে জানে না?

অকস্মাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়িল বারো-তেরো বছরের একটি দুলেদের মেয়ের প্রতি। সে ত্রস্তব্যস্ত হইয়া তাহার ছাগশিশুটিকে সরাইবার জন্য আসিতেছিল। তখন অনুপস্থিতকে ছাড়িয়া তিনি উপস্থিতকে লইয়া পড়িলেন। তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, তুই কে লা? মরণ আর কি, একেবারে গা ঘেঁষে চলেছিস যে! চোখে-কানে দেখতে পাস্‌নে? বলি, মেয়েটার গায়ে তোর আঁচলটা ঠেকিয়ে দিলিনে ত?

দুলে মেয়েটি ভয়ে জড়সড় হইয়া বলিল, না মাঠান, আমি ত হেথা দিয়ে যাচ্চি!

রাসমণি মুখখানা অতিশয় বিকৃত করিয়া কহিলেন, হেথা দিয়ে যাচ্চি! তোর হেথা দিয়ে যাবার দরকার কি লা? ছাগলটা বুঝি তোর? বলি কি জেতের মেয়ে তুই?

আমরা দুলে মাঠান।

দুলে! অ্যাঁ, এই অবেলায় মেয়েটাকে ছুঁয়ে দিয়ে তুই নাওয়ালি?

তাঁহার নাতিনী বলিয়া উঠিল, আমাকে ত ছোঁয়নি ঠাকুমা—

রাসমণি ধমক দিলেন, তুই থাম পোড়ারমুখী। আমি দেখলুম যেন দুলে-ছুঁড়ীর আঁচলের ডগাটা তোর গায়ে ঠেকে গেল। যা—এই পড়ন্তবেলায় পুকুরে ডুব দিয়ে মর্ গে যা। দিয়ে তবে বাড়ি ঢুকবি। না বাপু জাতজন্ম আর রইল না। ছোটলোকের বড় বাড়বাড়ন্ত হয়েচে, দেবতা-বামুন আর গেরাহ্যিই করে না! হারামজাদী দুলেপাড়া থেকে ছাগল বাঁধতে এসেচ বামুনপাড়ার মধ্যে?

দুলে মেয়েটির ভয় ও লজ্জার অবধি ছিল না। সে ছাগশিশুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া শুধু বলিল, মাঠান আমি ছুঁইনি।

ছুঁস্‌নি যদি তবে এ-পাড়ায় এসেচিস কেন?

মেয়ে হাত তুলিয়া অদূরে কোন একটা অদৃশ্য গৃহ নির্দেশ করিয়া কহিল, ঠাকুরমশাই তেনার ওই গইলের ধারে আমাদের থাকতে দিয়েচে। মাকে আর আমাকে দাদামশাই তেইড়ে দিয়েচে না!

যাহারাই হোক এবং যেজন্যই হোক, একজনের দুর্গতির ইতিহাসে রাসমণির ক্রুদ্ধ হৃদয় কথঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল এবং এর রুচিকর সংবাদ সবিস্তারে আহরণ করিতে তিনি কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বটে? বলি, কবে তাড়িয়ে দিলে লো?

পরশু রাত্তিরে মাঠান।

ও তুই এককড়ে দুলের মেয়ে বুঝি? তাই বল্। এককড়ে মরতে না মরতে বুড়ো তোদের বের করে দিলে? ছোটজাতের মুখে আগুন! তা বাপু, দিলে বলেই কি তোরা বামুনপাড়ায় এসে থাকবি? তোদের আস্পর্দা ত কম নয় লা! কে আনলে তোর মাকে? রামতনু বাঁড়ুয্যের জামাই বুঝি? নইলে এমন বিদ্যে আর কার! ঘরজামাই ঘরজামাইয়ের মত থাক্, তা না, শ্বশুরের বিষয় পেয়েচিস বলে পাড়ার মধ্যে হাড়ি-ডোম-দুলে-ক্যাওরা এনে বসাবি।

এই বলিয়া রাসমণি হাঁক দিয়া ডাকিলেন, বলি সন্ধ্যা—ও সন্ধ্যা, ঘরে আছিস গা?

সামান্য একটুখানি পোড়ো জমির ওধারে রামতনু বাঁড়ুয্যের খিড়কি। তাঁহার ডাক শুনিয়া অদূরবর্তী খিড়কির দ্বার খুলিয়া একটি উনিশ-কুড়ি বছরের সুশ্রী মেয়ে মুখ বাহির করিয়া সাড়া দিল—কে ডাকে গা? ওমা, দিদিমা যে! কেন গা! বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া আসিল।

রাসমণি কহিলেন, তোর বাপের আক্কেলটা কি রকম শুনি বাছা? তোর দাদামশাই রামতনু বাঁড়ুয্যে—একটা ডাকসাইটে কুলীন, তার ভিটেবাড়িতে আজ প্রজা বসল কিনা বাগদী-দুলে! কি ঘেন্নার কথা মা!

এই বলিয়া গালে একবার হাত দিয়াই পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, তোর মাকে একবার ডাক। জগো এর কি বিহিত করে করুক, নইলে চাটুয্যেদাদাকে গিয়ে আমি নিজে জানিয়ে আসব। সে ত একটা জমিদার! একটা নামজাদা বড়লোক। সে কি বলে একবার শুনি।

সন্ধ্যা অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে দিদিমা?

ডাক্ না একবার তোর মাকে। তাকে বলে যাচ্চি কি হয়েচে।

এই বলিয়া নাতিনীকে দেখাইয়া কহিলেন, এই যে মেয়েটা মঙ্গলবারের বারবেলায় ছাগলদড়ি ডিঙিয়ে ফেললে, ওই যে দুলে ছুড়ী আঁচল ঘুরিয়ে বাছাকে ছুঁয়ে দিলে—

সন্ধ্যা দুলে মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই ছুঁয়ে ফেলেচিস?

সে বেচারা তখনও ছাগশিশু বুকে করিয়া একধারে দাঁড়াইয়াছিল, কাঁদ-কাঁদ গলায় অস্বীকার করিয়া বলিল, না দিদিঠান—

রাসমণির নাতিনীটিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, না সন্ধ্যাদিদি, ও আমাকে ছোঁয়নি, ওই হোথা দিয়ে—

কিন্তু কথাটা তাহার পিতামহীর হুঙ্কারে ওই পর্যন্তই হইয়া রহিল।

ফের 'নেই' কচ্ছিস হারামজাদী? চল্, আগে বাড়ি চল্। ছুঁয়েচে কিনা সেখানে গিয়ে দেখাচ্চি।

সন্ধ্যা হাসিয়া কহিল, জোর করে নাওয়ালে ও আর কি করবে দিদিমা?

তাহার হাসিতে রাসমণি জ্বলিয়া গেলেন। বলিলেন, জোর করি, না করি, সে আমি বুঝব, কিন্তু তোর বাপের ব্যাভারটা কিরকম? কোন্ ভদ্দরলোকটা ভিটেবাড়িতে ছোটজাত ঢোকায় শুনি? লোকে কথায় বলে, দুলে। সেই দুলে এনে বামুনপাড়ায় ঢুকিয়েচে! বলি, ঘরজামাই ঘরজামাইয়ের মত থাকলেই ত ভাল হয়!

পিতার সম্বন্ধে এই অপমানকর উক্তিতে ক্রোধে সন্ধ্যার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সেও কঠিন হইয়া জবাব দিল, বাবা ত আর পরের ভিটেয় ছোটজাত ঢোকাতে যাননি দিদিমা। ভাল বুঝেচেন নিজের জায়গায় আশ্রয় দিয়েচেন, তাতে তোমারই বা এত গায়ের জ্বালা কেন?

আমার গায়ের জ্বালা কেন? কেন জ্বালা দেখবি তবে? যাব একবার চাটুয্যেদাদার কাছে? গিয়ে বলব?

তা বেশ ত, গিয়ে বল গে না। বাবা ত তাঁর জায়গায় দুলে বসান নি যে, তিনি বড়লোক বলে বাবার মাথাটা কেটে নেবেন!

বটে! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! ওলো, সে আর কেউ নয়—গোলোক চাটুয্যে! তোর বাপ বুঝি এখনো তারে চেনেনি? আচ্ছা—

হাঙ্গামা শুনিয়া জগদ্ধাত্রী বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই রাসমণি অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। চীৎকারে সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া

বলিলেন, শোন্ জগো, তোর বিদ্যেধরী মেয়ের আস্পর্ধার কথাটা একবার শোন্। লেখাপড়া শেখাচ্চিস্ কিনা! বলে, বলিস তোর গোলোক চাটুয্যেকে বাবার মাথাটা যেন কেটে নেয়! বলে, বেশ করেচি নিজের জায়গায় হাড়ী-দুলে বসিয়েচি—কারো বাপ-ঠাকুদ্দার জায়গায় বসাই নি—অমন ঢের বড়লোক দেখেচি, যে যা পারে তা করুক। শোন্, তোর মেয়ের কথাগুলো একবার শোন্!

জগদ্ধাত্রী বিস্মিত ও কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বলেচিস এইসব কথা?

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া কহিল, না, আমি এমন করে বলিনি।

রাসমণি তাহারই মুখের উপর হাত নাড়িয়া গর্জন করিয়া উঠিলেন, বলালি নে? এরা সবাই সাক্ষী নেই?

কিন্তু পরক্ষণেই কণ্ঠস্বর অনির্বচনীয় কৌশলে উচ্চ সপ্তক হইতে একেবারে খাদের নিখাদে নামাইয়া লইয়া জগদ্ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, মা, ভাল কথাই বলেছিলুম। মঙ্গলবারের বারবেলায় মেয়েটা ছাগলদাড় ডিঙিয়ে ফেললে, তাই বললুম, আহা, কে এমন করে পথের ওপর ছাগল বাঁধলে গা? তাই না শুনতে পেয়ে দুলি-ছুড়ীটা ছুটে এসে বাছার মুখের ওপর আঁচল ঘুরিয়ে মারলে! বলে ঠাকুরমশায়ের জায়গায় ছাগল বেঁধেচি, তুমি বলবার কে? তাই মা, তোমার মেয়েকে ডেকে শুধু এই কথাটি বলেচি, দিদি, এই যে অবেলায় মেয়েটার নাইতে হবে, বারবেলায় ছাগলদাড় ডিঙিয়ে ফেললে—তা তোমার বাবা যদি এদের দুলেপাড়া থেকে তুলে এনে বসিয়েই থাকে ত দিদি, ছাগল-টাগলগুলো একটু দেখেশুনে বাঁধতে বলে দিস্—ছোটজেতের আচার-বিচারের জ্ঞানগম্যি ত নেই—চাটুয্যেদাদা, বুড়োমানুষ, এই পথেই ত আসা-যাওয়া করে—মাড়ামাড়ি করে আবার রেগে-টেগে উঠবে—মা, এই। এতেই তোমার মেয়ে আমায় মারতে যা বাকী রেখেচে। বলে, যা যা, তোর চাটুয্যেদাদাকে ডেকে আন্ গে! তার মত বড়লোক আমি ঢের দেখেচি! তার বাপের জায়গায় যখন হাড়ী-দুলে প্রজা বসাব, তখন যেন সে শাসন করতে আসে। আচ্ছা, তুমিই বল দিকি মা, এইগুলো কি মেয়ের কথা?

জগদ্ধাত্রী অগ্নিমূর্তি হইয়া কহিলেন, বলেছিস্ এইসব?

সন্ধ্যা এতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাক-বিস্ময়ে রাসমণির মুখের প্রতি চাহিয়া ছিল, মায়ের কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া ঘাড় ফিরাইয়া শুধু বলিল, না।

বলিস্ নি, তবে কি মাসী মিছে কথা কইচে?

বল্ মা, তাই একবার তোর মেয়েকে বল্।

সন্ধ্যা মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া মায়ের প্রশ্নের উত্তর দিল, জানিনে মা, কার কথা মিছে। কিন্তু তোমার আপনার মেয়ের চেয়ে এই পাতানো-মাসীকেই যদি বেশী চিনে থাকো ত না হয় তাই।

এই বলিয়া দ্বিতীয় প্রশ্নের পূর্বেই খোলা দ্বার দিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল। উভয়েই বিস্ফারিত-নেত্রে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন, এবং অবসর বুঝিয়া দুলে-মেয়েটাও তাহার ছাগলছানা বুকে করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

রাসমণি বলিলেন, দেখলি ত জগো, তোর মেয়ের তেজ! শুনলি ত কথা! বলে, পাতানো মাসী! কুলীনের ঘরের মেয়ে, তাই। নইলে, বিয়ে হলে এ-বয়সে যে পাঁচ-ছ ছেলের মা হতে পারতো। পাতানো মাসী,—শুনলি ত!

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া রহিলেন, এবং রাসমণি নিজেও একটু স্থির থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, হাঁ জগো, শুনলুম নাকি অমর্ত চক্কোত্তির ছেলেটাকে তোরা আজও বাড়িতে ঢুকতে দিস্? বলি, কথাটা কি সত্যি?

জগদ্ধাত্রী মনে মনে অতিশয় শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

রাসমণি বলিতে লাগিলেন, আমি ত সেদিন পুলিনের মায়ের সঙ্গে ঝগড়াই করে ফেললুম। বললুম, সে মেয়ে জগদ্ধাত্রী—আর কেউ নয়। হরিহর বাঁড়ুয্যেমশায়ের নাতনী, রামতনু বাঁড়ুয্যের কন্যা! যারা শুদ্দুর বলে কায়েতের বাড়িতে পর্যন্ত পা ধোয় না! তারা দেবে ঐ ম্লেচ্ছ ছোঁড়াটাকে উঠোন মাড়াতে! তোরা বলচিস কি?

এই হিতৈষিণীর দরদের কাছে লজ্জা পাইয়া জগদ্ধাত্রী শুধু একটুখানি শুষ্ক হাসি

হাসিয়া বলিলেন, কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ মাসী, তবে কি জানো মা, ছেলেবেলা থেকেই ওর আসা-যাওয়া আছে, আমাকে খুড়ীমা বলতে অজ্ঞান, তাই, কালেভদ্রে যদি কখনো আসে ত মুখ ফুটে বলতে পারিনে, অরুণ, তুমি আর আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকো না। মা-বাপ নেই, বাছাকে দেখলেই কেমন যেন মায়া হয়।

রাসমণি প্রথমে অবাক্ হইলেন, পরে ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, অমন মায়ার মুখে আগুন!

অকস্মাৎ সেই ক্রোধ অতি উচ্চ ধাপে চড়িয়া গেল এবং তাহারই সহিত কণ্ঠস্বরের সমতা রক্ষা করিয়া বলিতে লাগিলেন, ওই একগুঁয়ে ছোঁড়াটাকে কি তোরা সোজা বজ্জাত ঠাওরাস? অমন নচ্ছার গাঁয়ের মধ্যে আর দুটি নেই তোকে বলে দিলুম। চাটুয্যেদাদা, একটা জমিদার মানুষ,—তিনি নিজে স্বয়ং ছোঁড়াটাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, অরুণ, জলপানির লোভ দরিয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ব'সো গে যাও। বিলেতে যেয়ো না। কিন্তু, কথাটা কি ছোঁড়া শুনলে? অত বড় একটা মানী লোকের মান রাখলে? উলটে ছোঁড়া নাকি বিলেতে যাবার সময় ঠাট্টা করে বলেছিল, বিলেতে গিয়ে জাত যায় আমার সেও ভাল, কিন্তু গোলোক চাটুয্যের মত বিলেতে পাঁঠা-ভেড়া চালান দিয়ে টাকা করতেও চাইনে, সমাজের মাথায় চড়ে, লোকের জাত মেরে বেড়াতেও পারব না। উঃ—আমি যদি সেখানে থাকতুম জগো, ঝেঁটিয়ে ছোঁড়ার মুখ সোজা করে দিতুম। যে গোলোক চাটুয্যে—ভাত খেয়ে গোবর দিয়ে মুখ ধোয়, তাকে কিনা—

জগদ্ধাত্রী বিনীত-কণ্ঠে বলিতে গেলেন, কিন্তু অরুণ ত কখনো কারও নিন্দে করে না মাসী?

তবে বুঝি আমি মিছে কথা কইচি? চাটুয্যেদাদা বুঝি তবে—

না না, তিনি বলবেন কেন? তবে, লোকে নাকি অনেক কথা বানিয়ে বলে—

তোর এক কথা জগো। লোকের ত আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তাই গেছে বানিয়ে বলতে। আচ্ছা, তাই বা বিলেতে গিয়ে কোন্ দিগ্‌গজ হয়ে এলি? শিখে এলি চাষার বিদ্যে! শুনে হেসে বাঁচিনে! চক্কোত্তিই হ, আর যাই হ, বামুনের ছেলে ত বটে! দেশে কি চাষী ছিল না? এখন তুই কি যাবি হালগরু নিয়ে মাঠে মাঠে লাঙ্গল দিতে! মরণ আর কি!

তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীব্র সৌরভ ক্রমে ব্যাপ্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, গন্ধ পাইয়া পাছে পাড়ার সমঝদার মধুমক্ষীর দল জুটিয়া যায়, এই ভয়ে জগদ্ধাত্রী আস্তে আস্তে বলিলেন, কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন মাসী, একটু ভেতরে গিয়ে বসবে চল না?

না মা, বেলা গেল আর বসব না। মেয়েটাকেও ত আবার নাইয়ে-ধুইয়ে ঘরে তুলতে হবে। দুলি ছুড়ীটা বুঝি পালিয়েচে?

হাঁ ঠাকুমা, তোমরা যখন কথা কচ্ছিলে। কিন্তু সে আমাকে ছোঁয়নি—

ফের 'নেই' কচ্চিস হারামজাদী। কিন্তু জগো, ব্যাগত্তা করি বাছা, পাড়ার ভেতর আর হাড়ী-দুলে ঢোকাস নি। জামাইকে বলিস্।

বলব বৈ কি মাসী, আমি কালই ওদের দূর করে দেব। আর থাকলে ত আমাদের পুকুর-ঘাট সরবে, ওদের জল মাড়ামাড়ি করে আমাদেরই ত হাঁটতে হবে।

তবে, তাই বল্ না মা। তা হলে কি আর জাতজন্ম থাকবে? আমি ত সেই কথাই বলেছিলুম, কিন্তু আজকালকার মেয়ে-ছেলেরা নাকি কিছু মানতে চায়! তাই ত চাটুয্যে-দাদা সেদিন শুনে অবাক্ হয়ে বললেন, রাসু, আমাদের জগদ্ধাত্রীর মেয়েটাকে নাকি তার বাপ লেখাপড়া শিখুচ্চে? তারা করচে কি! মানা করে দে—মানা করে দে—মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখলে যে একেবারে গোল্লায় যাবে।

জগদ্ধাত্রীর ভয়ের পরিসীমা রহিল না। কহিলেন, চাটুয্যেমামা বুঝি বলছিলেন?

বলবে না? সে হ'লো সমাজের মাথা, গাঁয়ের একটা জমিদার। তার কানে আর কোন্ কথাটা না ওঠে বল্। এই ত আমারও—ধর্ না কেন, বুড়ো হতে চললুম—লেখাপড়ার ত ধার ধারিনে, কিন্তু কোন্ শাস্তরটি না জানি বল্? কারও বাপের সাধ্যি আছে বলে, রাসি বামনি একটা অশাস্তর কাজ করেছে? এই যে মেয়েটা ছাগলদড়ি ডিঙোবা-মাত্তর শিউরে উঠে বললুম, ওলো ছুড়ী, করলি কি, আজ যে মঙ্গলবারের বারবেলা! কৈ কোন্ পণ্ডিত বলে যাক দিকি—না, এতে দোষ নেই! তা হবার জো নেই মা। তা হবার জো নেই। আমার

বাপ-মায়ের কাছে শিক্ষে পেয়েছিলুম। কিন্তু ডাক দিকি তোমার লিখিয়ে-পড়িয়ে মেয়েকে কেমন বলতে পারে!

জগদ্ধাত্রী নিঃশব্দে ত্রুটি স্বীকার করিয়া কহিলেন, একটু বসলে হ'ত না মাসী?

না মা, বেলা গেছে,—আর একদিন আসব। নে খেঁদী, বাড়ি চল্। এই বলিয়া নাতিনীকে অগ্রবর্তী করিয়া কয়েক পদ চলিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ জগো, অমন পাত্তরটি হাতছাড়া করলি কেন বল্ দেখি?

না হাতছাড়া ঠিক নয়, তবে কিনা ঘরবাড়ি কিছু নেই, বয়েস হয়েচে--তোমার জামায়ের মত হয় না বাছা।

রাসমণি বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, শোন কথা এক-বার! বলি, তার ঘর নেই, তোর ত আছে? তোর আর ছেলেও নেই, মেয়েও নেই যে তার জন্যে ভাবনা। এক মেয়ে, সেই মেয়ে-জামাই নিয়ে ঘর করাতস, সে কি অমন্দ হ'ত বাছা? আর বয়েস? কুলীনের ছেলের চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়েস কি আবার একটা বয়েস? রসিকপুরের জয়রাম মুখুয্যের দৌউত্তুর। তার আবার বয়েসের খোঁজ কে করে জগো? তা ছাড়া মেয়ের বয়েসের দিকেও একবার তাকা দিকিনি! আরও গড়িমসি করবি ত বিয়ে দিবি কবে? শেষে কি তোর ছোটপিসীর মত চিরটাকাল থুবড়ো রাখবি?

জগদ্ধাত্রী সলজ্জভাবে কহিলেন, আমিও ত তাই বলি মাসী, কিন্তু মেয়ের বাপ যে একেবারে—

কথাটাকে সম্পূর্ণ করিতে দিবার ধৈর্যও রাসমণির রহিল না। জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, মেয়ের বাপ বলবে না কেন? আহা! তাঁর নিজেরই যেন কত ঘর-বাড়ি জমিদারি ছিল! হাসালি বাপু তোরা! তা ছাড়া ঐ অরুণদের বৈঠকে দিনরাত বসা-দাঁড়ানো গানবাজনা করা —শুনি হ[illegible] পর্যন্ত নাকি চলে যাচ্চে—ও-কথা সে বলবে না ত কি চাটুয্যেদাদা বলবে? [illegible] কিন্তু তাও বলে দিচ্চি বাছা, ঘর-বর যখন মিলেচে, তখন, না না করে [illegible] ক[illegible]শেষকালে অতিলোভে তাঁতি নষ্ট করিস নে। তোর ছোটপিসী গোলাপী থুবড়ো হয়ে মোলো, তোর বাপের বড়, মেজ—দুই পিসীর বিয়েই হ'লো না। আর তোমার কি সময়ে বিয়ে হ'ত বাছা, যদি না তোর বাপ-মা কাশীতে গিয়ে পড়ত? বেয়ান কাশী-বাসিনী, কামড় কোমড় নেই, জামাই ইস্কুলে পড়চে—ঘর-বর যাই মিলে গেল, অমনি ধাঁ করে তোদের দু'হাত এক করে দিয়ে মেয়ে-জামাই নিয়ে দেশের লোক দেশে ফিরে এলো। ভাঙ্চির ভয়ে বিয়ের আগে কাউকে খবরটুকু পর্যন্ত দিলে না। তা ভালই করেছিল, নইলে বিয়ে হ'তই কিনা তাই বা কে জানে! নে খেঁদি, চল্! জয়রাম মুখুয্যের নাতি—তার আবার ঘরবাড়ি, তার আবার বয়স, তার আবার কালো-ধলো—কালে কালে কতই শুনব। নে, এগো বাছা, আর দেরি করিস নে। কাপড়-চোপড় কাচতে, সন্ধ্যা দিয়ে আহ্নিক-মালা সারতে আজ দেখচি এক পহর রাত হয়ে যাবে। কিন্তু তাও বলি বাপু, থিয়েটার-ফিয়েটারকে বাড়ি ঢুকতে দেওয়া, মেয়ের সঙ্গে হাসি-তামাশা করতে দেওয়া ভাল নয়। কথাটা ঢিঢি হয়ে গেলে মেয়ের পাত্তর পাওয়া ভার হবে বাছা। নে না খেঁদি, চল্ না! পরের কথা পেলে তুই যে আর নড়তে চাসনে দেখি।

বকিতে বকিতে নাতিনীকে অগ্রবর্তী করিয়া রাসমণি প্রস্থান করিতেছিলেন, জগদ্ধাত্রী শঙ্কিত-বিরসমুখে কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ যেন তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। কহিলেন, ওমা খেঁদি, একটু দাঁড়া দিকি বাছা। ক্ষেত থেকে কাল একঝুড়ি নতুন মুক্তকেশী বেগুন, আর একটা কচি নাউ এসেছিল, তার গোটা কতক আর নাউয়ের একফালি সঙ্গে নিয়ে যা দিকি মা—আমি চট্ করে এনে দিই—

এই বলিয়া তিনি দ্রুতপদে বাটীর দিকে যাইতেছিলেন, রাসমণি পুলকিত বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, ও মা, বেগুন বুঝি এরি মধ্যে উঠলো? বলিয়াই কণ্ঠস্বর একমুহূর্তে খাটো করিয়া নাতিনীকে কহিলেন, ওলো খেঁদি, মুখপোড়া মেয়ে! ঠুঁটোর মত দাঁড়িয়ে রইল, সঙ্গে সঙ্গে যা না! এবং পরক্ষণেই তাহাকে পিছন হইতে ডাকিয়া কহিলেন, ছুটে আসিস খেঁদি,—আমি ততক্ষণ একটু এগোই।

[খ]

সম্মুখের একটা দাওয়ায় বসিয়া সন্ধ্যা নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিল, জগদ্ধাত্রী আহ্নিক সারিয়া পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ক্ষণকাল কন্যার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, সকাল থেকে কি অত সেলাই হচ্চে সন্ধ্যে, বেলা যে দুপুর বেজে গেছে—নাওয়া-খাওয়া করবি নে? পরশু সবে পথ্যি করেছিস, আবার কিন্তু পিত্তি পড়ে অসুখ হবে তা বলে দিচ্চি।

সন্ধ্যা দাঁত দিয়া বাড়তি সুতাটা কাটিয়া ফেলিয়া কহিল, বাবা যে এখনো আসেন নি মা।

তা জানি। কেবল বিনিপয়সার চিকিচ্ছে সারতে কত বেলা হবে সেইটে জানিনে। আর বেশ ত, আমি ত আছি, তোর উপোস করে থাকবার দরকারটা কি?

সন্ধ্যা নীরবে কাজ করিতে লাগিল, জবাব দিল না।

মা প্রশ্ন করিলেন, সেলাইটা কিসের হচ্ছে শুনি?

মেয়ে অনিচ্ছুক অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, এই দুটো বোতাম পরিয়ে দিচ্চি।

তা জানি মা, জানি। নইলে আমার কাপড়খানা সেরে রাখতে বসেচিস্ কি না তা জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু কি বাপ-সোহাগীই হয়েছিস সন্ধ্যে, যেন পৃথিবীতে ও আর কারও নেই। কোথায় একটা বোতাম নেই, কোথায় কাপড়ের কোণে একটু খোঁচা লেগেছে, কোন্ পিরানটায় একটু দাগ ধরেছে, জুতোজোড়াটার কোথায় একরতি সেলাই কেটেছে—এই নিয়েই দিবারাত্তির আছিস, এ ছাড়া সংসারে আর যেন কোন কাজ নেই তোর।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, বাবার যে কিছু নজরে পড়ে না মা।

জবাব শুনিয়া মা খুশী হইলেন না, বলিলেন, পড়বে কি করে,—বিনিপয়সার ডাক্তারিতে সময় পেলে ত! বলি, দুলে মাগীরা গেলো?

যাবে বৈ কি মা।

কিন্তু সে কবে? ছোঁয়া-ন্যাপা করে জাতজন্ম ঘুচে গেলে, তারপরে? আবার যে বড়ো ছুঁচে সুতো পরাচ্চিস? উঠবি নে বুঝি?

তুমি যাও না মা, আমি এখুনি যাচ্ছি।

এই অসুখ শরীরে যা ইচ্ছে তুমি কর গে মা—তোমাদের দুজনের সঙ্গে বকতে বকতে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। সংসারে আর আমার দরকার নেই—এইবার আমি শাশুড়ীর কাছে গিয়ে কাশীবাস করব—তা কিন্তু তোমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি।

এই বলিয়া জগদ্ধাত্রী ক্রোধভরে একটা পিতলের কলসী তুলিয়া লইয়া খিড়কির পুকুরের দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যা আনত-মুখে মুখ টিপিয়া শুধু একটু হাসিল, জননীর কোন কথার উত্তর দিল না। তাহার সেলাই প্রায় শেষ হইয়াছিল, ছুঁচ-সুতা প্রভৃতি এখনকার মত একটা ছোট সাবানের বাক্সে গুছাইয়া রাখিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহার পিতার সোরগোলে চমকিয়া মুখ তুলিল। তিনি সদাই ব্যস্ত,—এইমাত্র বাড়ি ঢুকিয়াছেন, হাতে একটা হোমিওপ্যাথি ঔষধের ছোট বাক্স এবং বগলে চাপা কয়েকখানা ডাক্তারি বই। মেয়েকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, সন্ধ্যে, ওঠ ত মা, চট্ করে আমার বড় ওষুধের বাক্সটা একবার, —কি যে করি কিছুই ভেবে পাইনে—এমনি মুশকিলের মধ্যে—

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পিতার হাতের বাক্স ও বইগুলো লইয়া একধারে রাখিয়া দিল। বারান্দার ইতিপূর্বে যে মাদুরখানি পাতিয়া রাখিয়াছিল, তাহারই উপর হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে করিতে বলিল, আজ কেন তোমার এত দেরি হ'লো বাবা?

দেরি! আমার কি নাবার-খাবার ফুরসত আছে তোরা ভাবিস? যে রোগীটির কাছে না যাব তারই রাগ, তারই অভিমান। প্রিয় মুখুয্যের হাতের একফোঁটা ওষুধ না পেলে যেন কেউ আর বাঁচবে না। ভয় যে নেহাত মিথ্যে তা যদিও বলতে পারিনে, কিন্তু প্রিয় মুখুয্যে ত একটাই—দুটো ত নয়! তাদের বলি—এই নন্দ মিত্তির লোকটা যা হোক একটু প্র্যাক্‌টিস

ত করচে,—দু-একটা ওষুধ ও যে না জানে তা নয়,—কিন্তু তা হবে না। মুখুয্যেমশাইকে নইলে চলবে না। আর তাদের বা কি বলি! একটা বলি! একটা ওষুধের সিমটম যদি মুখস্থ করবে! আরে অত সহজ বিদ্যে নয়—অত সহজ নয়! তা হলে সবাই ডাক্তার হ'ত। সবাই প্রিয় মুখুয্যে হ'ত!

বাবা, জামাটা ছেড়ে ফেলো না—

ছাড়্‌চি মা। এই আজই,—ধাঁ করে যে পল্‌সেটিলা দিয়ে ফেললি, প্র্যাক্‌টিস ত কচ্চিস, কিন্তু বল্‌ দেখি তার অ্যাকশন? দেখি, আমার মত কেমন তুই কণ্ঠস্থ বলে যেতে পারিস! সন্ধ্যে, ধর দিকি মা বইখানা, একবার পল্‌সেটিলাটা—

তোমার আবার বই কি হবে বাবা! আজ খাওয়া-দাওয়ার পরে ওই ওষুধটাই তোমার কাছে পড়ে নেব। দেবে পড়িয়ে বাবা?

দেব বৈ কি মা, দেব বৈ কি। নক্সের সংগে তফাতটা হচ্চে আসলে—ওই বইখানা একবার—

তোমার পায়ে ততক্ষণ তেলটুকু মাখিয়ে দিই না বাবা? বড্ড বেলা হয়ে গেছে—মা আবার রাগ করবেন। বলিয়া সে একবার উদ্বিগ্ননেত্রে দেখিয়া লইল তাহার জননী ঘাট হইতে ফিরিতেছেন কিনা। এবং আপত্তি করিবার পূর্বেই তেলের বাটি হইতে খানিকটা তেল লইয়া বাবার পায়ে মাখাইয়া দিল।

ইঃ—একটু সবুর করলি নে মা। একবার দেখে নিয়ে—

আজ কাকে কাকে দেখলে বাবা? আচ্ছা, পণ্ডা জেলের ঠাকুর্দাদা—

সে বুড়ো? ব্যাটা মরবে, মরবে, মরবে, তুই দেখে নিস্‌ সন্ধ্যে। আর ঐ পরানে চাটুয্যে, ও হারামজাদার নামে আমি কেস করে তবে ছাড়ব। যে রুগীটি পাব, অমনি তাকে গিয়ে ভাঙ্‌চি দিয়ে আসবে! একদিনের বেশী যে কেউ আমার ওষুধ খেতে চায় না সে কেন?—সে কেবল ওই নচ্ছার বোম্বেটে পাজী উল্লুকের জন্যে! কি করেচে জনিস? পণ্ডার ঠাকুরদাকে যাই একটি রেমিডি সিলেক্ট করে দিয়ে এসেছি, অমনি ব্যাটা পিছনে পিছনে গিয়ে বলেচে, কৈ দেখি কি দিলে?

সন্ধ্যা রুদ্ধস্বরে কহিল, তারপরে?

তাহার পিতা ততোধিক রুদ্ধস্বরে বলিলেন, ব্যাটা বজ্জাত ঢক্‌ঢক্‌ করে সমস্ত শিশিটা খেয়ে ফেলে বলেচে, ছাই ওষুধ! এই ত সমস্ত খেয়ে ফেললুম। কৈ, আমার ওষুধ সে খাক ত দেখি! এই বলে না এক শিশি ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে এসেচে। তারা বলে, ঠাকুর, তোমার ওষুধ সে একচুমুকে খেয়ে ফেললে, তার ওষুধ তুমি খেতে পার ত তোমার ওষুধ আমরা খাব, নইলে না।

সন্ধ্যা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া বলিল, সে ত তুমি খাওনি বাবা?

নাঃ—তা কি আর খাই! কিন্তু এতটা বেলা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ালুম, একটা রুগী যোগাড় করতে পারলুম না। পরাণের নামে আমি নিশ্চয় কেস্‌ করব তোকে বললুম সন্ধ্যে।

ক্ষোভে অভিমানে সন্ধ্যার চোখে জল আসিতে চাহিল। এই পিতাটিকে সংসারে সর্ব-প্রকার আঘাত, উপদ্রব, লাঞ্ছনা, উপহাস-পরিহাস হইতে বাঁচাইবার জন্য সে যেন অহরহ তাহার দশ হাত বাড়াইয়া আড়াল করিয়া রাখিত। সজলকণ্ঠে কহিল, কেন বাবা তুমি পরের জন্যে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াবে! এই বাড়িতেই যে কতজন তোমার ওষুধের জন্যে এসে এসে ফিরে গেল।

কথাটার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল। পল্লীর গরীব-দুঃখীরা ঔষধ চাহিতে আসে বটে, কিন্তু সে সন্ধ্যার কাছে, তাহার পিতার কাছে নয়। বাবার কাছেই সে ছোটখাটো রোগের চিকিৎসা করিতে শিখিয়াছিল, এবং তাহার দেওয়া ঔষধ প্রায় নিষ্ফলও হইত না। কিন্তু গুরুটিকে রোগীরা যমের মত ভয় করিত। তাই তাহারা সতর্ক হইয়া খোঁজখবর লইয়া এমন সময়েই বাড়ি ঢুকিত, যেন হঠাৎ মুখুয্যেমশায়ের হাতের মধ্যে গিয়া না পড়িতে হয়। সন্ধ্যা ইহা জানিত, কিন্তু বাবার জন্য মিথ্যা বলিতে তাহার বাধিত না।

কিন্তু পিতা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—ফিরে গেল? কে কে? কারা কারা? কতক্ষণ গেল? কোন্‌ পথে গেল? নামধাম জেনে নিয়েচিস ত!

সন্ধ্যা মনে মনে অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া কহিল, নামধামে আমাদের কি দরকার বাবা, তারা আপনিই আবার আসবে অখন।

আঃ, তোদের জ্বালায় আর পারিনে বাপু। নামটা জিজ্ঞেস করতে কি হয়েছিল? এখুনি ত একবার ঘুরে আসতে পারতুম। দেরিতে কঠিন দাঁড়াতে পারে—কিছুই বলা যায় না—এখন একটি ফোঁটায় যে সারিয়ে দিতুম।

সন্ধ্যা নীরবে তেল মাখাইতে লাগিল, কিছুই বলিল না।

পিতা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, কখন আসবে বলে গেল?

বিকেলবেলায় হয়ত—

হয়ত! দেখ দিকি কিরকম অন্যায়টাই হয়ে গেল! ধর্, যদি কোন গতিকে নাই আসতে পারে? ওরে—ও সন্ধ্যে, বিপ্‌নের কাছে গিয়ে পড়ল না ত? পরাণে হারামজাদা ত ঐ খোঁজেই থাকে, সে ত এর মধ্যে খবর পায়নি? না বাপু, আর পারিনে আমি। বাড়িতে কি ছাই দুটি মুড়ি-মুড়কিও ছিল না? দুটো দুটো দিয়ে কি ঘণ্টা-খানেক বসিয়ে রাখতে পারতিস নে? যা না বলে দেব, যেটি না দেখব—কে? কে? কে উঁকি মারছ হে? চলে এস না। আরে রামময় যে! খোঁড়াচ্ছ কেন বল দিকি?

তাঁহার সাদর আহ্বান ও কলকণ্ঠে একজন চাষীগোছের মধ্যবয়সী লোক উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একান্ত নিস্পৃহস্বরে কহিল, আজ্ঞে না, ও কিছু না—

কিছু না? বিলক্ষণ! দিব্যি খোঁড়াচ্ছ যে! আঃ—তেলমাখানোটা একটু রাখ্ না সন্ধ্যে! কিছু না? স্পষ্ট আর্নিকা কেস দেখতে পাচ্চি—না না, তামাশা নয় রামময়, কৈ দেখি পা-টা?

পা দেখানোর প্রস্তাবে রামময় একটিবার করুণচক্ষে সন্ধ্যার মুখের পানে কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, আজ্ঞে হাঁ, এই পা-টা একটু মুচড়ে কাল পড়ে গিয়েছিলুম।

প্রিয়বাবু কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, দেখলি ত সন্ধ্যে, দেখেই বলেচি কিনা আর্নিকা! আমরা দেখলেই যে বুঝতে পারি! হুঁ, পড়লে কি ক'রে?

আজ্ঞে, ঐ যে বললুম পা মুচড়ে। দরজার পাশেই একটা জল যাবার ছোট নর্দমার ওপর থেকে ছেলেগুলো তক্তাখানা সরিয়ে ফেলেছিল, অন্যমনস্ক হয়ে—

অন্যমনস্ক? এ্যাগ্‌নস্—এপিস্!—সন্ধ্যে, মা, মনে রাখবে স্বভাবটাই আসল জিনিস। মহাত্মা হেরিং বলেচেন—হুঁ, অন্যমনস্ক হয়ে—তারপর?

যাই পা বাড়াব অমনি দুমড়ে পড়ে—

থামো, থামো। এই যে বললে মুচড়ে? মোচড়ানো আর দোমড়ানো এক নয় রাম।

আজ্ঞে, না। তা ঐ পা মুচড়েই পড়ে গেলুম বটে।

হুঁ—অন্যমনস্ক! মনে থাকে না! এই বলে, এই ভোলে। এ্যাগ্‌নস্! এপিস্ হুঁ—তার পরে?

তার পর আর কি ঠাকুরমশাই, কাল থেকেই বেদনায় পা ফেলতে পারচি নে। বলিয়া লোকটা উৎসুক-চক্ষে একবার সন্ধ্যার মুখের প্রতি চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিল।

সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি কহিল, বাবা, বেলা হয়ে যাচ্চে, একটু আর্নিকা—

আঃ—থাম্ না সন্ধ্যে। কেসটা স্টাডি করতে দে না। সিমিলিয়া সিমিলিবস্! রেমিডি সিলেক্ট করা ত ছেলেখেলা নয়। বদনাম হয়ে যাবে। হুঁ, তারপরে? বেদনাটা কি রকম বল দেখি রামময়?

আজ্ঞে বড্ড বেদনা ঠাকুরমশাই।

আহা তা নয়, তা নয়। কি রকমের বেদনা? ঘর্ষণবৎ, না মর্ষণবৎ, সূচীবিদ্ধবৎ, না বৃশ্চিক-দংশনবৎ। কনকন করচে, না ঝনঝন করচে?

আজ্ঞে হাঁ, ঠাকুরমশাই, ঠিক ওই-রকম করচে।

তা হলে ঝনঝন করচে! ঠিক তাই! তারপরে?

তারপরে আর কি হবে ঠাকুরমশাই, কাল থেকে ব্যথায় মরে যাচ্ছি—

থামো, থামো! কি বললে? মরে যাচ্ছ?

রামময় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, তা বৈ কি মুখুয্যেমশাই। খুঁড়িয়ে চলচি, পা ফেলতে পারিনে—আর মরা নয় ত কি! তা ছাড়া ছোঁড়াগুলো যে বজ্জাত,—কথা শোনে না, বারণ মানে না,—ওই তক্তাখানা নিয়েই তাদের যত খেলা। আবার কোন্‌দিন হয়ত আঁধারে পড়ে মরব দেখতে পাচ্চি। যা হয় একটু ওষুধ দিয়ে দেন ঠাকুরমশাই—ভারী বেলা হয়ে গেল!

বাবা, আর্নিকা দু' ফোঁটা—

প্রিয়বাবু মেয়ের প্রতি চাহিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, না মা, না। এ আর্নিকা কেস নয়। বিপ্‌নে হলে তাই দিয়ে দিত বটে। চার ফোঁটা একোনাইট তিরিশ শক্তি। দু' ঘণ্টা অন্তর খাবে।

সন্ধ্যা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, একোনাইট বাবা?

হাঁ মা, হাঁ। মৃত্যুভয়! মৃত্যুভয়! পড়ে মরব! সিমিলিয়া সিমিলিবস্‌ কিউরেন্টার! মহাত্মা হেরিং বলেচেন, রোগের নয়, রোগীর চিকিৎসা করবে। মৃত্যুভয়ে একোনাইট প্রধান। বিপ্‌নে হলে—হুঃ—তবু, তবু হারামজাদারা চিকিৎসা করতে আসে! রামময়, শিশি নিয়ে যাও আমার মেয়ের সঙ্গে। দু'ঘণ্টা অন্তর চারবার খাবে। ও-বেলা গিয়ে দেখে আসব। ভাল কথা, পরাণে যদি এসে বলে, কৈ দেখি কি দিলে? খবরদার শিশি বার ক'রো না বলে দিচ্ছি। হারামজাদা ঢকঢক করে হয়ত সবটা খেয়ে ফেলে আবার ক্যাস্টর অয়েল রেখে যাবে। উঃ—পেটটা মুচড়ে মুচড়ে উঠচে যে!

রামময়কে ঔষধ দিতে সন্ধ্যা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভয়ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ক্যাস্টর অয়েল অতখানি ত সব খেয়ে আসোনি বাবা?

নাঃ—উঃ—গাড়ুটা কৈ রে?

তবে বুঝি তুমি—

না—না—না—দে না শিগগির গাড়ুটা! পোড়া বাড়িতে যদি কোথাও কিছু পাওয়া যাবে! তবে থাকগে গাড়ু। বলিতে বলিতেই প্রিয়বাবু উর্ধ্বশ্বাসে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

রামময় কহিল, দিদিঠাকরুন, ওষুধটা তা হলে—

সন্ধ্যা চকিত হইয়া বলিল, ওষুধ? হাঁ, এই যে দিই এনে।

এই যে তুমি বললে 'আরুনি' নাকি, তাই দু'ফোঁটা দিয়ে দাও দিদিঠাকরুন। মুখুয্যে-মশায়ের ওষুধটা না হয়—

সন্ধ্যা অন্তরে ব্যথা পাইয়া কহিল, আমি কি বাবার চেয়ে বেশী বুঝি রামময়?

রামময় লজ্জিত হইয়া বলিল, না—তা না,—তবে মুখুয্যেমশায়ের ওষুধটা বড় জোর ওষুধ কিনা দিদিঠাকরুন,—আমি রোগা মানুষ—বরঞ্চ, গিয়েই না হয় সাঁতেদের মেথোকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে-পাঠিয়ে দেব—কাল থেকে তার পেট নাবাচ্চে,—দাঠাকুরের ওষুধ দিলেই ভাল হয়ে যাবে। আমাকে ঐ তোমার ওষুধটাই আজ দাও দিদিমনি।

সন্ধ্যা বিষণ্নমুখে কহিল, আচ্ছা, এসো এইদিকে।

এই বলিয়া সে রামময়কে সঙ্গে লইয়া বারান্দা দিয়া পাশের একটা ঘরে চলিয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী ঠাকুরঘরের জন্য এক ঘড়া জল আনিতে পুকুরে গিয়াছিলেন, বাড়ি ঢুকিয়াই জলপূর্ণ কলসীটা দাওয়ার উপর ধপ্‌ করিয়া বসাইয়া দিয়া রুদ্ধস্বরে ডাক দিলেন, সন্ধ্যে?

সন্ধ্যা ঘরের মধ্য হইতে সাড়া দিল, যাই মা।

মা কহিলেন, তোর বাবা এখনো ফেরেনি? ঠাকুরপুজো আজ তা হলে বন্ধ থাক?

মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, বাবা ত অনেকক্ষণ এসেচেন মা। তেল মেখে নাইতে গেছেন।

কৈ, পুকুরে ত দেখলুম না?

তিনি যে কোথায় ছুটিয়া গেলেন সন্ধ্যা তাহা জানিত। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আজ বোধ হয় তা হলে নদীতে গেছেন। অনেকক্ষণ হ'লো, এলেন বলে।

জগদ্ধাত্রী কিছুমাত্র শান্ত হইলেন না, বরঞ্চ অধিকতর উত্তপ্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,

এ'কে নিয়ে আর ত পারিনে সন্ধ্যে, হয় উনিই কোথাও যান, না হয় আমিই কোথাও চলে যাই। বার বার বলে দিলুম, ভট্‌চাযিমশাই আসতে পারবেন না, আজ একটু সকাল সকাল ফিরো। তবু এই বেলা—ঠাকুরের মাথায় একটু জল পর্যন্ত পড়তে পেলে না—তা ছাড়া কাল রাত্তিরে কি করে এসেচে জানিস? বিরাট পরামাণিকের সুদের সমস্ত টাকা মকুফ করে একেবারে রসিদ দিয়ে এসেচে।

সন্ধ্যা আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, কে বললে মা?

কেন, বিরাটের নিজের বোনই বলে গেল যে। ভাজকে নিয়ে সে পুকুরে নাইতে এসেছিল।

সন্ধ্যা একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, ভাই-বোনে তাদের ঝগড়া মা, হয়ত কথাটা সত্যি নয়।

মা রাগিয়া বলিলেন, কেন তুই সব কথা ঢাকতে যাস বল দিকি সন্ধ্যে? জ্বর বলে বিরাট নাপতে ডেকে নিয়ে গেছে, ওষুধ খেয়েচে, ধন্বন্তরি বলে পায়ের ধুলো নিয়েচে, জমিদার বলে, গৌরী সেন বলে, ন্যাজ চুলকে দিয়েচে—তারা বলে আর হেসে লুটোপুটি! টাকা যাক, কিন্তু মনে হ'লো যেন আর ঘরে ফিরে কাজ নেই—ওই কলসীটাই আঁচলে জড়িয়ে পুকুরে ডুবে মরি। আজকাল যেন বড্ড বাড়িয়ে তুলেচে সন্ধ্যে, আমি সংসার চালাই বা কি করে বল্‌ দিকি?

কত টাকা মা?

কত! দশ-বারো টাকার কম নয় বললুম। একমুঠো টাকা কিনা স্বচ্ছন্দে—

কথাটা তাঁহার সমাপ্ত হইতে পাইল না। প্রিয়বাবু আর্দ্রবস্ত্রে ব্যতিব্যস্তভাবে বাড়ি ঢুকিতে ঢুকিতে চেঁচাইয়া ডাকিলেন, সন্ধ্যে, গামছা—গামছা—গামছাটা একবার দে দিকি মা। একোনাইট তিরিশ শক্তি—বাক্সর একেবারে কোণের দিকে—

জগদ্ধাত্রী অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, একোনাইট ঘোচাচ্চি আমি। শ্বশুরের অন্নে জমিদার সাজতে লজ্জা করে না তোমার? কে বললে বিরাট নাপতেকে সুদ ছেড়ে দিতে? কার জায়গায় তুমি হাড়ী-দুলে এনে বসাও? কার জমি তুমি 'গোচর' বলে দান করে এসো? চিরটা কাল তুমি হাড়মাস আমার জ্বালিয়ে খেলে! আজ, হয় আমি চলে যাই, না হয়, তুমি আমার বাড়ি থেকে বার হয়ে যাও।

সন্ধ্যা তীব্রকণ্ঠে কহিল, মা, দুপুরবেলা এ-সব তুমি কি শুরু করলে বল ত?

মা তেমনিভাবে জবাব দিলেন, এর আবার দুপুর-সকাল কি? কে ও? ঠাকুরপুজো সেরে উনুনের ছাইপাঁশ মুখে গিলে যেন বাড়ি থেকে দূর হয়ে যায়। আমি অনেক সয়েচি, আর সইতে পারব না, পারব না, পারব না।

বলিতে বলিতেই তিনি অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া দ্রুতবেগে তাঁহার ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

হুঁ, বলিয়া প্রিয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, বললুম তাদের জমিদার বলেই কি সুদের এতগুলো টাকা ছেড়ে দিতে পারি বিরাট? তোরা বলিস কি? কিন্তু কে কার কথা শোনে? আর তাদেরই বা দোষ দেব কি! ওষুধ খাবে ত পথ্যির যোগাড় নেই। নেট্রাম দু'শ শক্তি একটা ফোঁটা দিয়ে—

সন্ধ্যার দুই চক্ষে অশ্রু টলটল করিতেছিল, সে অলক্ষ্যে আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, কেন বাবা তুমি মাকে না জানিয়ে এসব হাঙ্গামার মধ্যে যাও?

আমি ত বলি যাব না—কিন্তু প্রিয় মুখুয্যে ছাড়া যে গাঁয়ের কিছুটি হবার জো নেই, তাও ত দেখতে পাই। কোথায় কার রোগ হয়েচে, কোথায় কার—

বক্তব্য সম্পূর্ণ করিতে না দিয়াই সন্ধ্যা চলিয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ শুষ্কবস্ত্র ও গামছা আনিয়া পিতার হাতে দিয়া কহিল, আর দেরি করো না বাবা, ঠাকুরপুজোটি সেরে ফেল। আমি আসচি।

এই বলিয়া সে তাহার ঘরে চলিয়া গেল এবং প্রিয়বাবুও মাথা মুছিতে মুছিতে বোধ করি বা ঠাকুরঘরের উদ্দেশেই প্রস্থান করিলেন। বলিতে বলিতে গেলেন—ইঃ—আবার যে পেটটা কামড়াতে লাগলো! পরাণের নামে—ইঃ—

[গ]

যে গোলোক চাটুয্যে মহাশয়ের নামে বাঘে ও গরুতে একত্রে একঘাটে জলপান করে বলিয়া সেদিন রাসমণি বারংবার সন্ধ্যাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই হিন্দুকুল-চূড়ামণি পরাক্রান্ত ব্যক্তিটি এইমাত্র তাঁহার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিধানের পট্টবস্ত্র ও শিখাসংলগ্ন টাটকা একটি করবী পুষ্প দেখিয়া মনে হয় অনতি-বিলম্বেই তাঁহার সকালের আহ্নিক ও পূজা সারা হইয়াছে। বাহিরের লোকজন তখনও হাজির হইয়া উঠিতে পারে নাই, ভৃত্য হুঁকায় নল করিয়া তামাক দিয়া গিয়াছিল, সুডৌল ভুঁড়িটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া, অন্যমনস্ক-মুখে তাহাই পান করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, এমনি সময়ে অন্দরের কবাটটা নাড়িয়া উঠার শব্দে চোখ তুলিয়া বলিলেন, কে?

অন্তরাল হইতে সাড়া আসিল, আমি। কিছু না খেয়েই যে বাইরে চলে এলেন বড়? রাগ হ'লো নাকি?

গোলোক কহিলেন, রাগ? না, রাগ-অভিমান আর কার ওপর করব বল? সে তোমার দিদির সঙ্গে সঙ্গেই গেছে। বলিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, না, এখন আর কিছু খাব না। আজ গোকুল ঠাকুরের তিরোভাব—সেই সন্ধ্যার পরেই একেবারে সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দেব। এমনি করে যে ক'টা দিন যায়। বলিয়া আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হুঁকার নলটা মুখে দিলেন।

যে মেয়েটি নেপথ্য হইতে কথা কহিতেছিল, সে দ্বারটা ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া, ঘরে আর কেহ আছে কিনা দেখিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। মেয়েটি বিধবা। দেখিতে কুশ্রী নয়, বয়সও বোধ করি চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই। পরিধানে মিহি সাদা ধুতি, হাতে কোন অলংকার নাই, কিন্তু গলায় ইষ্টকবচ-বাঁধা একছড়া মোটা সোনার হার। একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনি ওই-সব ঠাট্টা করেন, লোকে কি মনে করে বলুন ত? তা ছাড়া আমাকে কি ফিরে যেতে হবে না? বলিয়া পরক্ষণেই মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া কহিল, যাকে সেবা করতে এলুম তিনি ত ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন, এখন ফিরে গিয়ে কি বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীকে আবার দেখতে শুনতে হবে না? আপনিই বলুন।

গোলোক তামাক টানিতে টানিতে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, সে ত বটেই। আমার সংসার অচল বলে ত আর কুটুম্বের মেয়েকে ধরে রাখা যায় না। আর তাই যদি না হবে ঘরের লক্ষ্মীই বা এ-বয়সে ছেড়ে যাবে কেন? মধুসূদন! বেশ, তাই যাও একটা ভাল দিন দেখিয়ে। বোনের সেবা করতে এসেছিলে, সেবা দেখিয়ে গেলে বটে! গ্রামে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে রইল।

জ্ঞানদা মৌন হইয়া রহিল। গোলোক কোঁচার খুঁট দিয়া চক্ষু মার্জনা করিয়া মিনিট-খানেক নিঃশব্দে তামাক খাইয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন, সতী-লক্ষ্মী তাঁর দিন ফুরলো, চলে গেলেন। সেজন্য দুঃখ করিনে—কিন্তু সংসারটা বয়ে গেল। মেয়েরা সব বড় হয়েছে, যে যার স্বামী-পুত্র নিয়ে শ্বশুরঘর করচে, তাদের জন্যে ভাবিনে, কিন্তু ছোঁড়াটা এবার ভেসে যাবে।

জ্ঞানদা আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বালাই ষাট। আপনি ও-সব মুখে আনেন কেন?

গোলোক মুখ তুলিয়া একটু ম্লান হাস্য করিয়া কহিল, না আনাই উচিত বটে, কিন্তু সমস্তই চোখের ওপর স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি কিনা! মধুসূদন! তুমিই সত্য! ঘর-সংসারেও মন নেই, বিষয়-কর্মও বিষের মত ঠেকচে। যে ক'টা দিন বাঁচি, ব্রত-উপোস করতে আর তাঁর নাম নিতেই কেটে যাবে। সেজন্যে চিন্তা নেই—একমুঠো একসন্ধ্যে জোটে ভালো, না জোটে ক্ষতি নেই—কিন্তু ওই ছোঁড়াটার আখের ভেবেই—মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

জ্ঞানদার দুই চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। গোলোকের স্ত্রী তাঁহার মামাত ভগিনী হইলেও সহোদরার ন্যায়ই স্নেহ করিতেন। তাই কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি জ্ঞানদাকে স্মরণ করিলে, সে না আসিয়া কোনমতেই থাকিতে পারে নাই। সেই দিদি আজ মাসাধিক কাল হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং যাবার সময় নাকি ইহারই হাতে তাঁহার বছর-দশেকের ছেলেটিকে সঁপিয়া গিয়াছেন।

সে করুণকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমি ত চিরকাল এখানে থাকতে পারিনে চাটুয্যেমশায়। লোকেই বা বলবে কি বলুন?

গোলোক দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া কহিলেন, লোকে বলবে তোমাকে? এই গাঁয়ে বাস করে? ইহার অধিক কথা আর তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, হওয়ার প্রয়োজনও ছিল না।

জ্ঞানদা নিজেও ইহা জানিত, তাই সে চুপ করিয়া রহিল।

গোলোক কহিতে লাগিলেন, আমার কথায় কথা কইলে তাকে আর কোথাও বাস করতে হবে—এ গাঁয়ে হবে না। সে বড় ভাবিনে, ভাবি কেবল ছেলেটার জন্যে। সে নাকি তোমাকে বড্ড ভালবাসত, তাই মরবার সময় তার সন্তানকে তোমারই হাতে দিয়ে গেল; কৈ আমার হাতে দিলে না?

জ্ঞানদা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, সব ত বুঝি চাটুয্যেমশায়, কিন্তু আমার বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী যে এখনো বেঁচে রয়েচেন! আমি ছাড়া যে তাঁদের গতি নেই।

গোলোক অচ্ছিল্যভরে জবাব দিলেন, না গতি নেই। তুমিও যেমন! হাঁ, মুখুয্যে বেঁচে থাকত ত একটা কথা ছিল; কিন্তু তাকে ত চোখেও দেখনি। তের বছরে বিধবা হয়েচ—

জ্ঞানদা বলিল, হ'লাম বা বিধবা, চাটুয্যেমশাই—শ্বশুর-শাশুড়ী যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তাঁদের সেবা আমাকে করতেই হবে।

গোলোক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তবে যাও আমাদের সব ভাসিয়ে দিয়ে। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখ ছোটগিন্নী—

জ্ঞানদা রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, আবার ছোটগিন্নী! বলেচি না আপনাকে, লোকে হাসি-তামাশা করে। কেন, নাম ধরে ডাকতে কি হয়?

গোলোক মুখখানা ঈষৎ প্রফুল্ল করিয়া বলিলেন, করলেই বা তামাশা ছোটগিন্নী? সম্পর্কটাই যে হাসি-তামাশার!

জ্ঞানদা হঠাৎ একটু হাসিয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, না, তা হবে না, আপনি চিরকাল নাম ধরে ডেকেছেন—তাই ডাকবেন।

গোলোক কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। বলিয়া, দেখিতে দেখিতে তাঁহার শ্মশ্রু-গুম্ফহীন মুখখানা বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে একটা উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া কতকটা যেন নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, বুকের মধ্যে দিবারাত্রি হুহু করে জ্বলে যাচ্চে—হায়রে! আমার আবার হাসি, আমার আবার তামাশা! তবে মাঝে মাঝে —তা যাক, নাই বললুম। কেউ অসন্তোষ হয়, জীবনে যা করিনি, আজই কি তা করব? বিষয় বিষ! সংসার বিষ! কবে তোমার শ্রীচরণে একটু আশ্রয় পাব! মধুসূদন!

জ্ঞানদা ছলছল চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিল। গোলোক বলিতে লাগিলেন, আবার জ্বালার ওপর জ্বালা, এর ওপর দিনরাত ঘটকের উৎপাত। তারা সবই জানে, লুকোতে পারিনে, বলি—কথা তোমাদের মানি, কুলীনের কুল কুলীনকেই রাখতে হয় এও জানি, আবার শোকে-তাপে অকালে-অসময়ে চুলগুলো পেকেচে তাও সত্যি, কিন্তু তবু ত পাকা চুল! এ নিয়ে আবার বিবাহ করা, আবার একটা বন্ধন ঘাড়ে করা সাজে, না মানায়? তুমি বল না ছোটগিন্নী?

জ্ঞানদা শুষ্ক একটুখানি হাসিয়া কহিল, বেশ ত, করুন না একটি বিয়ে।

গোলোক কহিলেন, ক্ষ্যাপা না পাগল! আবার বিয়ে! লক্ষ্মীর মত তুমি যার ঘরে আছ—যতই বল না, অনাথ বোনপোটাকে ভাসিয়ে যেতে পারবে না। যে মরণকালে হাতে তুলে দিয়ে গেছে—তার মান তোমাকে রাখতেই হবে, আমার আবার—কে?

ভৃত্য মুখ বাড়াইয়া সংবাদ দিল, চোঙদারমশাই এসেচেন।

গোলোক মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, আঃ, আর পারিনে। কাজ, কাজ, বিষয়, বিষয়,—আমার যে এদিকে সব বিষ হয়ে গেছে, তা কাকেই বা বোঝাই, কে বা বোঝে! মধুসূদন! কবে নিস্তার করবে! যা না, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আসতে বল গে।

ভৃত্য অন্তর্হিত হইল, জ্ঞানদাও ও-দিকে দরজার বাহিরে গিয়া চাপাকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এ বেলা কি তা হলে সত্যিই কিছু খাবেন না?

গোলোক মাথা নাড়িয়া কহিলেন, না। প্রভু গোকুল ঠাকুরের তিরোভাবের দিন একটা পর্বদিন। ছোটগিন্নী, আমাদের মত সেকেলে লোকগুলো আজও এসব মেনে চলে বলেই তবু এখনো চন্দ্র-সূর্য আকাশে উঠচে, জোয়ার-ভাঁটা নদীতে খেলচে। মধুসূদন! তোমারই ইচ্ছা!

জ্ঞানদা কহিল, তা হোক, একটু দুধ-গঙ্গাজল মুখে দিতে দোষ নেই। একটু শিগগির করে আসবেন, আমি নিয়ে বসে থাকব। এই বলিয়া সে অন্দরের কবাট রুদ্ধ করিয়া দিল।

সম্মুখের দ্বার দিয়া ভৃত্যের পশ্চাতে একজন ভদ্রব্যক্তি প্রবেশ করিলেন, গোলোক তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, এসো চোঙদার, বসো। ভেবে মরি, একটা খবর দিতেও কি পারো না? ভুলো, যা, শূদ্রের হুঁকোয় শিগগির জল করে তামাক নিয়ে আয়।

বিষ্ণু চোঙদার প্রণাম করিয়া গোলোকের পদধূলি লইয়া ফরাসের একধারে উপবেশন করিয়া প্রথমে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, তারপরে কহিলেন, দম ফেলবার ফুরসত ছিল না বড়কর্তা, তা খবর! যাক, পাঁচ শ আর তিন শ—এই আট শ জাহাজে তুলে দিয়ে তবে এলুম। আঃ—কি হাঙ্গামা!

দক্ষিণ আফ্রিকায় ছাগল ও ভেড়া চালান দিবার গোপন কারবারে এই বিষ্ণু চোঙদার ছিল তাঁহার অংশীদার। তিন মাসের মধ্যে তিন হাজার পশু যোগান দিবার শর্তে লেখাপড়া হইয়াছিল। তাই খবরটা শুনিয়া গোলোক খুশী হইলেন না। অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, মোটে আট শ। কনট্রাক্ট ত তিন হাজারের—এখনো ত ঢের বাকী হে! চোঙদার ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, ছাগল-ভেড়া কি আর পাওয়া যাচ্চে বড়কর্তা, সব চালান, সব চালান—এই আট শ যোগাড় করতেই যেন জিভ বেরিয়ে গেছে। তবু ত হরেন রামপুর থেকে চিঠি লিখেচে, আট-দশ দিনেই আরও পাঁচ-সাত শ রেলে পাঠাচ্চে—কেবল নাবিয়ে নিয়ে জাহাজে তুলে দেওয়া। আর সময় ত তিন মাসের—হয়েই যাবে নারায়ণের ইচ্ছেয়।

গোলোক আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, তোমার উপরেই ভরসা। আমাকে ত এখন একরকম গেরস্ত-সন্ন্যাসী বললেই হয়—তোমার বৌঠাকরুনের মৃত্যুর পর থেকে টাকাকড়ি, বিষয়-আশয় একেবারে বিষ হয়ে গেছে। কেবল ঐ নাবালক ছেলেটার জন্যে—তা টাকায় টাকা উতোর পড়বে বলে মনে হয় না?

চোঙদার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়! কিন্তু টাকাটা পিটবে এবার আহম্মদ সাহেব। সাত-শোর কন্‌ট্রাক্টো পেয়েচে—আরও বেশি পেতো, শুধু সাহস করলে না টাকার অভাবে।

গোলোক চোখের একটা ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন, বড় নাকি?

চোঙদার বলিলেন, হুঁ, নইলে আমি ছেড়ে দিই!

গোলোক ডান হাতটা মুখের সম্মুখে তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুর্গা দুর্গা, রাম রাম! সক্কালবেলায় ও-কথা কি মুখে উচ্চারণ করতে আছে হে চোঙদার! জাতে ম্লেচ্ছ, ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই,—তা হাজার দশেক টাকা মারবে বলে মনে হয় না?

চোঙদার কহিলেন, বেশি! বেশি!

গোলোক বলিলেন, লড়াইটা বেশীদিন চললে ব্যাটা দেখচি লাল হয়ে যাবে। তাই ত হে!

চোঙদার কহিলেন, নিঃসন্দেহ। তবে, বহুত টাকার খেলা—একসঙ্গে জোটাতে পারলে হয়।

গোলোক কহিলেন, কন্‌ট্রাক্টো দেখিয়ে কর্জ করবে—শক্ত হবে কেন?

চোঙদার মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিলেন, তা বটে, কিন্তু পেলে হয়। আমাকে বলছিল কিনা।

খবর শুনিয়া গোলোক উৎসুক হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, বলছিল নাকি? সুদ কি দিতে চায়?

চোঙদার কহিলেন, চার পয়সা ত বটেই। হয়ত—

এই 'হয়ত'-টাকে গোলোক শেষ করিতে দিলেন না। রাগ করিয়া বলিলেন, চার পয়সা!

টাকায় টাকা ম্যরবে, আর সুদের বেলায় চার পয়সা! দশ আনা ছ আনা হয়ত, না হয় একবার দেখা করতে বলো।

চোঙদার কিছু আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, টাকাটা আপনিই দেবেন নাকি সাহেবকে? কথাটা কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলে—

মুহূর্তে গোলোক নিজেকে সাবধান করিয়া লইয়া একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, রাধামাধব! তুমি ক্ষেপলে চোঙদার! বরঞ্চ, পারি ত নিষেধ কল্লেই দেব। আর জানাজানির মধ্যে ত তুমি আর আমি। কিন্তু তাও বলি, টাকা ধার ও নেবেই, নিয়ে বাপের শ্রাদ্ধ করবে, কি বাই-নাচ দেবে, কি গরু চালান দেবে, তাতে মহাজনের কি? এই বলিয়া তাহার মুখের প্রতি সম্মতির জন্য ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া নিজেই বলিলেন, তা নয় চোঙদার, শুধু একটা কথার কথা বলচি যে, অত খোঁজ নিতে গেলে মহাজনের চলে না; কিন্তু আমাকে ত চিরকাল দেখে আসচ, ব্রাহ্মণের ছেলে, ধর্মপথে থেকে ভিক্ষে করি সে ভালো, কিন্তু অধর্মের পয়সা যেন কখনো না ছুঁতে হয়। কেবল তাঁর পদেই চিরদিন মতি স্থির রেখেচি বলেই আজ পাঁচখানা গ্রামের সমাজপতি! আজ মুখের একটা কথায় বামুনকে শূদ্দুর, শূদ্দুরকে বামুনের দলে তুলে দিতে পারি। মধুসূদন! তুমিই ভরসা! সেবার সেই ভারী অসুখে জয়-গোপাল ডাক্তার বললে, সোডার জল আপনাকে খেতেই হবে। আমি বললুম, ডাক্তার, জন্মালেই মরতে হবে সেটা কিছু বেশী কথা নয়, কিন্তু গোলোক চাটুয্যেকে ও-কথা যেন আর দ্বিতীয়বার না কানে শুনতে হয়। কেনারামের পুত্র হররাম চাটুয্যের পৌত্র—যাঁর একবিন্দু পাদোদকের আশায় স্বয়ং ভাঁড়ারহাটির রাজাকেও পালকি-বেহারা পাঠিয়ে দিতে হ'ত!

চোঙদার দ্বিতীয়বার প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ও-কথা কে আর অস্বীকার করবে বলুন—ও ত পৃথিবীসুদ্ধ লোকে জানে।

গোলোক প্রত্যুত্তরে শুধু কেবল একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

চোঙদার প্রস্থানের উপক্রম করিতে তিনি ডাকিয়া কহিলেন, আর দেখ, হরেনের কাছ থেকে এলে, রেলের রসিদটা দেখিয়ে যেয়ো।

চোঙদার ঘাড় নাড়িয়া কহিল, যে আজ্ঞে।

গোলোক কহিলেন, তা হলে আট শ আর পাঁচ শ হ'লো! বাকী রইল সতের শ—মাস-তিনেক সময় আছে—হয়ে যাবে, কি বল হে?

চোঙদার বলিলেন, আজ্ঞে হয়ে যাবে বৈ কি।

গোলোক কহিলেন, তাই তোমাকে তখনই বলেছিলুম চোঙদার, একেবারে ওটা পুরো-পুরি হাজার-পাঁচেকের কন্‌ট্রাক্টোই করে ফেল। তখন সাহস করলে না—

চোঙদার কহিলেন, আজ্ঞে, অতগুলো ছাগল-ভেড়া যদি যোগাড় না হয়ে ওঠে—

গোলোক প্রতিবাদ করিলেন না, কহিলেন, তাই ভাল, তাই ভাল। ধর্মপথে একের জায়গায় আধ, আধের জায়গায় সিকি হয় সেও ঢের, কিন্তু অধর্মের পথে মোহরও কিছু নয়। বুঝলে না চোঙদার? মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

চোঙদার আর কিছু না বলিয়া প্রস্থান করিলে ভগবদ্ভক্ত গৃহস্থ-সন্ন্যাসী চাটুয্যেমহাশয় শুধু হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া চিন্তিতমুখে তামাক টানিতে লাগিলেন, বিষয়কর্ম বোধ করি বা বিষের মতই বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু এমনি সময়ে অন্দরের দিকের কবাটটা ঈষৎ উদ্ঘাটিত করিয়া দাসী মুখ বাড়াইয়া কহিল, মাসীমা একবার ভেতরে ডাকচেন।

গোলোক চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন বল্ ত সদু?

দাসী কহিল, একটুখানি জলখাবার নিয়ে বসে আছেন মাসীমা।

গোলোক হুঁকাটা রাখিয়া দিয়া একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, তোর মাসীর জ্বালায় আর আমি পারিনে সদু। পর্বদিনটায় যে একবেলা উপবাস করব সে বুঝি তার সইল না! এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যাইতে যাইতে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া গেলেন, সংসারে থেকে পরকালের দুটো কাজ করার কতই না বিঘ্ন! মধুসূদন! হরি!

[ঘ]

সন্ধ্যার শরীরটা কিছুদিন হইতে তেমন ভাল চলিতেছিল না। প্রায়ই জ্বর হইত, এবং পিতার চিকিৎসাধীনে থাকিয়া সে যেন ধীরে ধীরে মন্দের দিকেই পথ করিতেছিল। মা বিপিন ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইবেন বলিয়া প্রত্যহ ভয় দেখাইতেছিলেন, এবং এই লইয়া মাতায় কন্যায় একটু না একটু কলহ প্রায় প্রতিদিনই ঘটিতেছিল। আজ সায়াহ্নবেলায় সন্ধ্যা সম্মুখের বারান্দায় একটি খুঁটি ঠেস দিয়া বসিয়া মাতৃ-প্রদত্ত সাগুর বাটিটা চোখ বুজিয়া নিঃশেষ করিল এবং তাড়াতাড়ি একটি পান মুখে পুরিয়া দিয়া কোনমতে সেগুলার ঊর্ধ্বগতি নিবারণ করিল। এই খাদ্যবস্তুটার প্রতি তাহার অতিশয় বিতৃষ্ণা ছিল, কিন্তু তথাপি না খাওয়া এবং কম খাওয়া লইয়া আর তাহার কথা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইল না। কোথাও না কোথাও হইতে মা যে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, ইহা সে নিশ্চয় জানিত। ইতিপূর্বে বোধ হয় সে একখানা বই পড়িতেছিল—তাহার খোলা পাতাটা উপুড় করিয়া তাহার কোলের উপর রাখা ছিল, সেইখানা পুনরায় হাতে তুলিয়া লইয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেই শুনিতে পাইল প্রাঙ্গণের একপ্রান্ত হইতে ডাক আসিল, খুড়ীমা, কৈ গো?

যে বাড়ি ঢুকিয়াছিল সে অরুণ। তাহার জামাকাপড় এবং পরিশ্রান্ত চেহারা দেখিলেই বুঝা যায় সে এইমাত্র অন্যত্র হইতে আসিতেছে।

মুহূর্তের জন্য সন্ধ্যার পাণ্ডুর মলিন মুখের উপর একটা রক্তিমাভা দেখা দিয়া গেল। সে চোখ তুলিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি বুঝি কোলকাতা থেকে আসচ অরুণদা?

অরুণ কাছে আসিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, হাঁ, কিন্তু তোমাকে এমন শুকনো দেখাচ্চে কেন? আবার জ্বর নাকি?

সন্ধ্যা বলিল, ঐ-রকম কিছু একটা হবে বোধ হয়; কিন্তু তোমার চেহারাটাও ত খুব তাজা দেখাচ্চে না।

অরুণ হাসিয়া কহিল, চেহারার আর অপরাধ কি? সারাদিন নাওয়া-খাওয়া নেই— আচ্ছা প্যাটার্ন ফরমাস করেছিলে যা হোক, খুঁজে খুঁজে হয়রান। এই নাও।

এই বলিয়া সে পকেট হইতে একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া সন্ধ্যার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, খুড়ীমা কৈ? কাকা বেরিয়েছেন বুঝি? গেল-শনিবারে কিছুতেই বাড়ি আসতে পারলাম না—তাই ওটা আনতে দেরি হয়ে গেল। কি বুনবে, পাখি-পক্ষী, না ঠাকুর-দেবতা? না গোলাপফুলের—

সন্ধ্যা কহিল, সে ভাবনার ঢের সময় আছে; কিন্তু যা আনতে সাতদিন দেরি হ'লো, তা দিতে কি ঘণ্টা-খানেক সবুর সইত না, ইস্টিসান থেকে বাড়ি না গিয়ে এখানে এলে কেন?

অরুণ সহাস্যে কহিল, নাওয়া-খাওয়া ত? সে সন্ধ্যার পরে। কিন্তু ঘন ঘন এত অসুখ হতে লাগল কেন বল ত?

তাহার 'সন্ধ্যা' কথাটার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন নিগূঢ় কটাক্ষ সন্ধ্যার কর্ণমূলে আঘাত করিয়া একটুখানি রাঙা করিয়া দিল, কিন্তু যেন লক্ষ্যই করে নাই এমনিভাবে সে রাগ করিয়া কহিল, তারই বা আর বাকী কি অরুণদা? যাও, আর মিছিমিছি দেরি করতে হবে না।

প্রত্যুত্তরে অরুণ পুনরায় হাসিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তিনি ক্রোধে সমস্ত মুখখানা কালো করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং কন্যাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, পানটা আর চিবোস নে সন্ধ্যে, ওটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে যত পারিস হাসি-তামাশা কর্। বলিয়াই কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত-মাত্র না করিয়া দ্রুতপদে ঘরে চলিয়া গেলেন।

অকস্মাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। অরুণ বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল নির্বাক হইয়া রহিল এবং সন্ধ্যা বিবর্ণ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণের জন্য সায়াহ্নের আকাশতল হইতে সমস্ত আলো যেন একেবারে নিবিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত এইভাবে থাকিয়া, মুখের পান ফেলিয়া দিয়া, সহসা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিল, কেন তুমি এ-বাড়িতে আর এস অরুণদা? আমাদের সর্বনাশ না করে কি তুমি ছাড়বে না?

প্রথমটা অরুণ একটা কথাও কহিতে পারিল না, তারপরে ধীরে ধীরে শুধু বলিল, মুখের পান ফেলে দিলে সন্ধ্যা—আমি কি সত্যিই তোমার অস্পৃশ্য?

সন্ধ্যা হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমার জাত নেই, ধর্ম নেই, কেন তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে!

আমার জাত নেই? ধর্ম নেই?

না নেই। তুমি বিলেত গেছ—তুমি ম্লেচ্ছ। সেদিন মা তোমাকে পেতলের ঘটিতে জল খেতে দিয়েছিল, তোমার মনে নেই?

অরুণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, না, আমার মনে নেই। কিন্তু তোমার কাছে আজ আমি অস্পৃশ্য, ম্লেচ্ছ!

সন্ধ্যা চোখ মুছিয়া কহিল, শুধু আমার কাছে নয়, সকলের কাছে। শুধু আজ নয়, যখন থেকে কারও নিষেধ শোনোনি—বিলেত চলে গেলে, তখন থেকে।

অরুণ কহিল, কিন্তু আমি মনে করেছিলাম—

কিন্তু কি মনে করিয়াছিল তাহা আর বলিতে পারিল না। নিমেষমাত্র স্থির থাকিয়া কহিল, আমি আর হয়ত এ-বাড়িতে আসব না, কিন্তু আমাকে তুমি ঘৃণা ক'রো না সন্ধ্যা—আমি ঘৃণিত কাজ কখনো করিনি।

সন্ধ্যা কহিল, তোমার কি ক্ষিদে-তেষ্টা পায়নি অরুণদা? তুমি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কেবল ঝগড়াই করবে?

অরুণ কহিল, না, ঝগড়া আমি করব না। যে ঘৃণা করে, তার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিবাদ করবার মত ছোট আমি নই। এই বলিয়া অরুণ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল,—সন্ধ্যা সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া যেন পাষাণ-প্রতিমার ন্যায় বসিয়া রহিল।

মা সম্মুখে আসিয়া প্রসন্নমুখে কহিলেন, যাক, আর বোধ হয় আসবে না।

সন্ধ্যা চকিত হইয়া বলিল, না।

মা বলিলেন, খামকা ছুঁয়ে দিলে, যা, কাপড়খানা ছেড়ে ফেল গে।

সন্ধ্যা মায়ের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাপড়খানা পর্যন্ত ছেড়ে ফেলতে হবে?

তাহার ম্লানমুখের অন্তরের ছবি জননীর চোখে পড়িল না, তিনি আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, হবে না? খ্রীস্টেন মানুষ—বিধবা গিন্নী-বান্নী হলে যে নেয়ে ফেলতে হ'তো! সেদিন রাসু-মাসী—হাঁ, বড়াই করে বটে—কিন্তু বিচের-আচার শিখতে হয় ত ওর কাছে। দুলে-ছুঁড়ী ছুঁলে কি ছুঁলে না, তবু নাতনীটাকে অবেলায় ডুব দিইয়ে তবে দোরে তুললে।

সন্ধ্যা কহিল, বেশ ত মা যাচ্চি।

মা ঘাড় নাড়িয়া বামনাই আচার-বিচার সম্বন্ধে বোধ হয় আরও কিছু উপদেশ দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পিছন হইতে ডাক শুনিলেন, জগো, ঘরে আছিস গা?

গোলোক চাটুয্যেমশায় একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছিলেন; জগদ্ধাত্রী ফিরিয়া চাহিয়া সাড়া দিলেন, ও মা, চাটুয্যেমামা যে! কি ভাগ্যি!

কিন্তু সেদিনকার রাসু-মাসী ও কন্যার ঘটনাটা স্মরণ করিয়া তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। সন্ধ্যা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, গোলোক মায়ের উত্তর না দিয়া মেয়েকেই সম্ভাষণ করিলেন, সহাস্যে কহিলেন, বলি আমার সন্ধ্যে নাতনী কেমন আছিস গো? যেন রোগা দেখাচ্ছে না?

সন্ধ্যা বলিল, না, ভালো আছি ঠাকুর্দা।

জগদ্ধাত্রী শুষ্কমুখে একটু হাসি আনিয়া বলিলেন, হাঁ ভালই বটে! মাস ঘুরতে চলল মামা, রোজ অসুখ, রোজ জ্বর। আজও ত সাবু খেয়ে রয়েচে।

গোলোক কহিলেন, তাই নাকি? তা হবে না কেন বাছা,—কোথায় আজ ও কাঁখে-কোলে ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্না করবে, না তোরা ওকে টাঙিয়ে রেখে দিলি! পাত্রস্থ করবি কবে? বয়স যে—

জগদ্ধাত্রী বয়সের কথাটা তাড়াতাড়ি চাপিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি করব মামা,

আমি একা মেয়েমানুষ আর কতদিকে সামলাবো! তোমার জামাই গেরাহ্যি করে না—ডাক্তারি নিয়েই উন্মত্ত,—আমার এমন ধিক্কার হয় মামা, যে, সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে শাশুড়ীর কাছে কাশীতে পালিয়ে গিয়ে থাকি। তারপরে যার যা কপালে আছে হোক।—বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া উঠিল!

গোলোক কহিলেন, পাগলাটা এখন কচ্চে কি?

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, তাই একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেলেও যে বাঁচি, ঘরে শিকল দিয়ে ফেলে রেখে দি। এ যে দু'য়ের বার—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে খাক্ করে দিলে! এই বলিয়া তিনি চোখের কোণটা আঁচলে মুছিয়া ফেলিলেন।

গোলোক সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, তাই বটে, তাই বটে—আমি অনেক কথাই শুনতে পাই। তা তোরাও ত বাপু, ধনুকভাঙ্গা পণ করে আছিস, স্বয়ং কার্তিক নইলে আর মেয়ের বিয়ে দেব না। আমাদের ভারী কুলীনের ঘরে তা কি কখনো হয়, না, হয়েচে বাছা? শুনিস নি, তখনকার দিনে কত কুলীনকে গঙ্গাযাত্রা করেও কুলীনের কুল রক্ষা করতে হ'তো? মধুসূদন, তুমিই সত্য!

জগদ্ধাত্রী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, কে তোমাকে বলেচে মামা, জামাই আমার ময়ূরে চড়ে না এলে মেয়ে দেব না? মেয়ে আগে, না কুল আগে? বংশে কেউ কখ্নো শূদ্দুর বলে কায়েতের ঘরে পা ধুলে না, আর আমি চাই কার্তিক! ছোট ঘরে যাব না এই আমার পণ—তা মেয়ে জলে ফেলে দিতে হয় দেব।

গোলোক খুশী হইয়া বলিলেন, এই ত কথা! আচ্ছা, আমি দেখচি।

যাই যাই করিয়াও সন্ধ্যা নতশিরে আরক্তমুখে দাঁড়াইয়াছিল। গোলোক তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে রহস্য করিয়া বলিলেন, কার্তিক যখন চাসনে জগো, তখন মেয়েকে না হয় আমার হাতেই দে না! সম্পর্কেও বাধবে না, থাকবেও রাজরানীর মত। কি বলিস নাতনী—পছন্দ হবে?

অন্য সময়ে হইলে সন্ধ্যা পরিহাসে যোগ দিতে পারিত, কিন্তু অরুণ হইতে আরম্ভ করিয়া পিতার প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়া পর্যন্ত সে ক্রোধে, দুঃখে, লজ্জায় জ্বলিয়া যাইতেছিল, মুখ তুলিয়া কঠিনভাবে জবাব দিল, পছন্দ কেন হবে না ঠাকুদ্দা? দড়ির খাটের চতুর্দোলায় চেপে আসবেন এই দিক দিয়ে, আমি মালা গেঁথে দাঁড়িয়ে থাকব তখন। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে খিড়কির দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল।

সে যে ভয়ানক রাগ করিয়া গেল তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ব্যর্থ পরিহাসের এই তীব্র লাঞ্ছনায় প্রথমটা গোলোক অবাক হইয়া গেলেন, পরে হাঃ হাঃ করিয়া খানিকটা কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, মেয়ে ত নয়, যেন বিলিতি পল্টন! এ না হয় দাদা-নাতনী সম্পর্ক—বলতেও পারে, কিন্তু সেদিন রাসুর মুখে শুনলাম নাকি, যা মুখে এসেচে তাই বলেচে! মা-বাপ পর্যন্ত রেয়াত করেনি।

গোড়ায় জগদ্ধাত্রীর ঠিক এই ভয়ই ছিল, কেবল মাঝখানে আশা করিয়াছিলেন পরিহাসের মধ্য দিয়া বুঝি এবারের মত ফাঁড়া কাটিয়া গেল। হয়ত কাটিয়াই যাইত, শুধু মেয়েটাই আবার নিরর্থক খোঁচা মারিয়া বিবরের সর্পকে বাহিরে আনিয়া দিল। কন্যার প্রতি তাঁহার বিরক্তির অবধি রহিল না, কিন্তু প্রকাশ্যে সবিনয়ে কহিলেন, না মামা, সন্ধ্যা ত সে-সব কিছুই বলেনি। মাসী তিলকে তাল করেন, সে ত তুমি বেশ জানো!

গোলোক কহিলেন, তা জানি। কিন্তু আমার কাছে করে না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, আমি যে তখন দাঁড়িয়ে মামা!

গোলোক হাসিয়া বলিলেন, তা হলে ত আরও ভাল। শাসন করতেও বুঝি পারলি নে?

এই হাসিটুকুতে জগদ্ধাত্রী মনে মনে একটু বল পাইয়া সক্রোধে কহিলেন শাসন? তুমি দেখো দিকি মামা, ওর কি দুর্গতিটাই আমি করি!

গোলোক স্নিগ্ধভাবে বলিলেন, থাক, দুর্গতি করে আর কাজ নেই—বিয়ে হলে, সংসার ঘাড়ে পড়লে আপনিই সব শুধরে যাবে, তবে শাসনে একটু রাখিস। কালটা বড় ভয়ানক কিনা! অরুণ আসে আর?

জগদ্ধাত্রী ভয়ে মিথ্যা বলিয়া ফেলিলেন, অরুণ? নাঃ—

গোলোক বলিলেন, ভালই। ছোঁড়াটাকে দিসনে আসতে। অনেক রকম কানাকানি শুনতে পাই কিনা।

অরুণকে সন্ধ্যা ছেলেবেলা হইতে দাদা বলিয়া ডাকে। সে বিলাত যাইবার পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ বংশের এতটাই নীচের ধাপের যে, এই স্নেহ কখনও কোন কারণেই যে আর কোন আকারে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতে পারে, এ সংশয় স্বপ্নেও মায়ের মনে ছায়াপাত করে নাই। কিন্তু কিছুদিন হইতে সন্ধ্যা আচরণে ও কথায়-বার্তায় মাঝে মাঝে এমনই একটা তীব্র জ্বালা আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিত যে, তাঁহার মুদিত চক্ষেও তাহার আভাস পড়িত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিনিসটা এতখানিই অসম্ভব যে এ লইয়া উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। এখন ইহারই স্পষ্ট ইঙ্গিত অপরের মুখে শুনিয়া সহসা তিনি ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না। তিক্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন, শুনলে অনেক জিনিসই শোনা যায় মামা, কিন্তু আমার মেয়ের কথা নিয়ে লোকেরই বা এত মাথাব্যথা কেন?

গোলোক মৃদু হাসিয়া ধীরভাবে বলিলেন, তা সত্যি বাছা। কিন্তু, সময়ে সাবধান না হলে লোকের পোড়ার মুখও যে বন্ধ করা যায় না, জগো।

জগদ্ধাত্রী ইহারও প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঠিক এই সময়েই সন্ধ্যার কাণ্ড দেখিয়া তিনি ভয়ে, বিস্ময়ে ও নিদারুণ ক্রোধে নির্বাক হইয়া গেলেন। সন্ধ্যা পুকুর হইতে স্নান করিয়া বাড়ি ঢুকিতেছিল, তাহার কাপড় ভিজা, মাথার চুলের বোঝা হইতে জল ঝরিতেছে, এখনও মুছিবার অবকাশ হয় নাই--এই অবস্থায় পাশ কাটাইয়া সে দ্রুতবেগে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

গোলোক কহিলেন, মেয়ের জ্বর বললি নে জগো? সন্ধ্যেবেলায় নেয়ে এল যে?

জগদ্ধাত্রী কেবলমাত্র জবাব দিলেন, কি জানি মামা! কিন্তু মনে মনে তিনি নিশ্চয় বুঝিয়াছিলেন, এ তাঁহারই বিরুদ্ধে অরুণের অপমানের গূঢ় সুকঠোর প্রতিশোধ।

গোলোক কহিলেন, এমন অত্যাচার করলে যে বাড়াবাড়িতে দাঁড়াবে!

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, দাঁড়ালেই বা কি করব বল? ও আমার হাতের বাইরে।

গোলোক মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, তা বুঝেছি। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, এ-বাড়ির কর্তাটা কে? তুই, না জামাই, না তোর মেয়ে?

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, সবাই কর্তা।

গোলোক কহিলেন, তা হলে তাদের বলিস যে, পাড়ার মধ্যে দুলে-বাগদী প্রজা রাখা চলবে না। তারা এর একটা ব্যবস্থা না করলে শেষে আমাকেই করতে হবে। মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

প্রত্যুত্তরে জগদ্ধাত্রী সক্রোধে ডাক দিলেন, সন্ধ্যে, এদিকে আয়।

সন্ধ্যা ঘরের মধ্যে বোধ হয় মাথা মুছিতেছিল, একটুখানি মুখ বাড়াইয়া সাড়া দিল, কেন মা?

মা বলিলেন, দুলে মাগীদের সরাবি, না, আমাকেই কাল নাইবার আগে ঝাঁটা মেরে তাড়াতে হবে?

● সন্ধ্যা কহিল, দুঃখী অনাথা মেয়ে দুটোকে ঝাঁটা মারা ত শক্ত কাজ নয় মা, কিন্তু ওরা কি কারও কোন ক্ষতি করেচে?

গোলোক ইহার জবাব দিলেন। কহিলেন, ক্ষতি করে বৈ কি। পরশু বেড়িয়ে যাবার সময় দেখি পথের ওপর দাঁড়িয়ে ছাগলটাকে ফ্যান খাওয়াচ্চে। ছিটকে ছিটকে পড়চে ত? বলিয়া তিনি জগদ্ধাত্রীর মুখের পানে চাহিলেন।

জগদ্ধাত্রী তৎক্ষণাৎ সমর্থন করিয়া কহিলেন, পড়বে বৈ কি মামা।

গোলোক কহিলেন, তবে তাই বল্। না জেনে সাপের বিষ খাওয়া যায়, কিন্তু, জেনে ত আর পারা যায় না!

সন্ধ্যার প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, তোমার কাঁচা বয়স নাতনী, তুমি না হয় রাত্তিরেও নাইতে পার, কিন্তু আমি ত পারিনে!

সন্ধ্যা অন্তরের দুর্দমনীয় ক্রোধ চাপিয়া রাখিয়া বলিল, সে জানি ঠাকুর্দা। কিন্তু বাবা

যখন ওদের স্থান দিয়েছেন, তখন আর কোথাও একটা আশ্রয় না দিয়েও ত তাঁর অপমান করতে পারিনে।

মেয়ের এই মান-অপমানের ধারণায় মায়ের মুখ দিয়া রাগে কথা বাহির হইল না। কিন্তু গোলোক বলিলেন, বেশ ত, তারই বা অভাব কি সন্ধ্যা? অরুণের বাড়ির পিছনে ত ঢের জায়গা আছে, তাকেই বল্ না আশ্রয় দিতে। বাগদী-দুলে হোক, তবু তারা হিঁদু—তাতে তার আর জাত যাবে না। এই বলিয়া তিনি জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার রসিকতার রসগ্রহণ জগদ্ধাত্রী যত বেশীই না করুক, অরুণের কথায় পাছে তাঁহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়েটা ভয়ানক কঠোর কিছু বলিয়া বসে এই ভয়ে তাঁহার উৎকণ্ঠার অবধি রহিল না।

ঠিক তাহাই ঘটিল। সন্ধ্যার কণ্ঠস্বরে পরিহাসের তরলতা উছলিয়া উঠিল, কিন্তু কথাগুলা শুনাইল যেমন তীক্ষ্ন, তেমনি শক্ত। কহিল, গেলেই বা কে তার জমাখরচ রাখচে বলুন? যে জাতই মানে না, তার আবার যাওয়া আর থাকা।

গোলোক হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুখ তাঁহার কালো হইয়া উঠিল। বলিলেন, তোমার সঙ্গে এই সব তার বুঝি পরামর্শ চলে?

সন্ধ্যা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, হায়, হায়, ঠাকুর্দা, সে আপনাদেরই গ্রাহ্য করে না—কুকুর-বেড়ালের সামিল মনে করে, তা আমি! এই বলিয়া সে বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়া চক্ষের পলকে ঘরের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

জগদ্ধাত্রী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ধমক দিয়া উঠিলেন,—হতভাগী! পরের ছেলের নামে তুই মিথ্যে অপবাদ দিস! তাকে কে না জানে? সে কখনো এ-কথা বলেনি—আমি গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে বলতে পারি।

ঘরের মধ্য হইতে কোন প্রত্যুত্তর আসিল না।

গোলোক কহিলেন, না জগো, আজকালকার ছেলেমেয়েরা সব এমনিই বটে, তা বেশ, না হয় কুকুর-বেড়ালই হলুম। কিন্তু, একটা কথা বলে যাই আজ, আর বিয়ে দিতে মেয়ের দেরি করিস নে। যেখানে হোক দিয়ে ফেলে পাপ চুকিয়ে দে, চুকিয়ে দে।

জগদ্ধাত্রী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, দাও না মামা একটা দেখেশুনে। আর যে আমি ভাবতে পারিনে।

গোলোক মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আচ্ছা, দেখি। কিন্তু কি জানিস মা, এক মেয়ে, দূরে বিয়ে দিয়ে কিছুতে থাকতে পারবি নে, কেঁদে-কেটে মরে যাবি। আমাদের স্বভাবের-ঘরে পাত্রের বয়স দেখতে গেলে চলে না। তবে কাছাকাছি হয়, দুবেলা চোখের দেখাটা দেখতে পাস ত, তার চেয়ে সুখ আর নেই।

জগদ্ধাত্রী চোখ মুছিয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন, কোথায় পাব মামা এত সুবিধে? তবে ঘরজামাই—

গোলোক কথাটা শেষ করিতেও দিলেন না, বলিলেন, ছি ছি, অমন কথা মুখেও আনিস নে জগো, ঘরজামাইয়ের কাল আর নেই, তাতে বড় নিন্দে। আর যদিও বা একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ ধরে আনিস, গাঁজা গুলি আর মাতলামি করেই তোর যথাসর্বস্ব উড়িয়ে দেবে। বলি, নিজের কথাটাই একটু ভেবে দেখ না।

ইহার নিহিত ইঙ্গিত অনুভব করিয়া জগদ্ধাত্রী চোখের নিমেষে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, চিরকালটাই দেখচি মামা, চিরকালটাই জ্বলেপুড়ে মরচি।

গোলোক মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, তবে তাই বল্। বিনা কাজকর্মে বসে বসে খেলেই এমনি হবে। এ কি আর তোর মত বুদ্ধিমতী বুঝতে পারে না?

জগদ্ধাত্রী আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন, বুঝি বৈ কি, ভেতরে ভেতরে সব বুঝি। কিন্তু আমি মেয়েমানুষ, কোনদিকে চেয়ে যে কূলকিনারা দেখতে পাইনে।

গোলোক আশ্বাস দিয়া কহিলেন, পাবি, পাবি। তাড়াতাড়ি কি—দেখি না একটু ভেবেচিন্তে। কিন্তু আজ যাই, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

জগদ্ধাত্রী মিনতি করিয়া বলিলেন, মামা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রইলে, একটু বসবে না?

গোলোক বলিলেন, না মা, সন্ধ্যে-আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আজ আর বিলম্ব করব না। এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। জগদ্ধাত্রী তাঁহাকে আগাইয়া দিতে সদর দরজার বাহিরে পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

[৬]

সকালবেলায় প্রিয় মুখুয্যেমশায় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্র্যাক্‌টিসে চলিতেছিলেন, বগলে চাপা একতাড়া হোমিওপ্যাথি বই, হাতে তোয়ালে-বাঁধা ঔষধের বাক্স, পিছনে পিছনে এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রী মিনতি করিয়া চলিয়াছিল, বাবাঠাকুর, তুমি দয়া না করলে আমরা যাই কোথাকে?

প্রিয়র মুখ ফিরাইয়া কথা কহিবার অবকাশ ছিল না, তিনি বাঁ হাতটা পিছনে নাড়িয়া বলিয়া দিলেন, না, না, না—তোদের আর আমি রাখতে পারব না, তোরা বড় বজ্জাত। কেন তুই ছাগলকে ফ্যান খাওয়ালি?

দুলে-বৌ বিস্মিত হইয়া বলিল, সক্কলের প্যাঁটাপেঁটি ত ফ্যান খায় বাবাঠাকুর?

প্রিয় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ফের মিথ্যে কথা হারামজাদী! কারুর ছাগল ফ্যান খায় না। ছাগল খায় ঘাস।

দুলে-বৌ কহিল, ঘাস খায়, পাতা-পত্তর খায়, ফ্যানও খায় বাবাঠাকুর।

প্রিয় তেমনি হাত নাড়িয়া বলিয়া দিলেন, না না, তোদের আর আমি রাখব না, তোরা আজই দূর হ! গোলোক চাটুয্যে বলে গেছে, বামুন-পাড়ায় তোরা ছাগলকে ফ্যান খাইয়েচিস। আর তোদের ওপর আমার দয়া নেই—তোরা বড় বজ্জাত।

দুলে-বৌ শেষ মিনতি করিয়া কহিল, ফ্যানটুকু কি তবে ফেলে দেব বাবাঠাকুর?

প্রিয় অসঙ্কোচে কহিলেন, হাঁ দিবি। তোদের গরু থাকত খাওয়াতিস, দোষ ছিল না; কিন্তু এ যে ভয়ানক কথা। আজই উঠে যা বুঝলি? উঃ—বড্ড বেলা হয়ে গেছে—সল্‌ফর দেবার সময় বয়ে যায়। বলিতে বলিতে তিনি দ্রুতবেগে প্রস্থানের উদ্যম করিতেই দুলে-বৌ পিছন হইতে করুণস্বরে কহিল, বাবাঠাকুর, কাল চোপ্‌পর দিন-রাত মেয়েটার পেটে লক্ষ্মীর দানাটুকু যায়নি—

প্রিয় তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কেন, কেন? পেট নাবাচ্চে? গা বমি-বমি করচে?

দুলে-বৌ মাথা নাড়িল।

তবে কি? পেট ফুল্‌চে? ক্ষিদে নেই?

ক্ষিদে বড্ড বাবাঠাকুর।

প্রিয় কহিলেন, ওঃ—তাই বল্‌। সেও যে একটা মস্ত রোগ—ন্যাট্রাম, আইয়োডম, আরও ঢের ওষুধ আছে। এতক্ষণ বলিস নি কেন—দেখেশুনে যে একদাগ খাইয়ে দিতে পারতাম। চল্‌ দেখি—

দুলে-বৌ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, ওষুধ চাই না বাবাঠাকুর, দুটো চাল পেলে মেয়েটাকে ফুটিয়ে দিই—

প্রিয় ক্ষণকাল বিস্মিতের মত চাহিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, ওষুধ চাইনে চাল চাই! দূর হ হারামজাদী আমার সুমুখ থেকে। ছোটজাতের মুখে আগুন!

দুলে-বৌ লজ্জিত হইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতে প্রিয় ধমক দিয়া বলিলেন, খেতে পাসনি ত সন্ধ্যের কাছে গিয়ে বল্‌ গে না।

দুলে-বৌ শুধু নীরবে মুখ তুলিয়া চাহিল।

প্রিয় কহিলেন, গিন্নীর কাছে গিয়ে যেন মরিস নে। ঘাটের ধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌ গে, দিদিঠাকরুন এলে বলিস আমার বড় ওষুধের বাক্সে একটা আট-আনি আছে দিতে। কিন্তু খবরদার বলে দিচ্চি, ব্যামো হলে আগে আমাকে ডাকতে হবে। তখন যে বিপ্নের কাছে গিয়ে—কে হে ত্রৈলোক্য নাকি? ষষ্ঠীচরণ যে! বলি বাড়ির সব খবর ভাল ত?

দুলে-বৌ আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল, ত্রৈলোক্য ও ষষ্ঠীচরণ সম্মুখে আসিয়া

প্রাতঃপ্রণাম করিয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে খবর সব ভাল। সবাই ভাল আছে।

প্রিয় অস্ফুটে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, ভাল, ভাল। যে দিনকাল পড়েচে, আমার ত নাইবার খাবার সময় নেই। ঘরে ঘরে সর্দিকাশি, একটু অবহেলা করেচে কি ব্রঙ্কাইটিস। সকালেই যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

ত্রৈলোক্য কহিল, আজ্ঞে, আপনারই কাছে।

প্রিয় উৎসাহিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, কেন, আমার কাছে কেন?

ত্রৈলোক্য কহিল, লোকজনের চলাচলের বড় দুঃখ হচ্চে জামাইবাবু, তাই খালটার ওপরে একটা সাঁকো তৈরি করচি। আপনার ওই বৈকুণ্ঠের দরুন ছোট বাঁশঝাড়টা না দিলে ত আর কিছু হয় না।

প্রিয় রাগ করিয়া বলিলেন, কিন্তু আমি দিতে যাব কেন? গাঁয়ে কি আর মানুষ নেই?

বুড়ো ষষ্ঠীচরণ এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এইবার সে ঘাড় নোয়াইয়া আর একটা প্রণাম করিয়া বলিল, যদি অভয় দেন ত বলি জামাইবাবু, এ গাঁয়ে আপনি ছাড়া আর মানুষ নেই। আপনি দয়া করেন ত, দশজনে চলে বাঁচবে, নইলে আমরা চাষী-মানুষ কোথায় পাব বাঁশ কেনবার টাকা?

প্রিয় একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, লোকজনের কি কষ্ট হচ্ছে নাকি?

ত্রৈলোক্য কহিল, মরে যাচ্ছে বাবাঠাকুর, হাত-পা ভেঙ্গে একেবারে মরে যাচ্ছে।

প্রিয় কহিলেন, কিন্তু গিন্নী শুনলে যে ভারী রাগ করবে!

ষষ্ঠীচরণ কহিল, আপনি দিলে মাঠাকরুন করবেন কি? তখন না হয় সবাই গিয়ে তাঁর পায়ে উপুড় হয়ে পড়ব।

প্রিয় চিন্তিত-মুখে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, লোকজনের কষ্ট হচ্চে, আচ্ছা নাও গে যাও—কিন্তু গিন্নী যেন শুনতে না পায়। উঃ—বড় বেলা হয়ে গেল—রসুকে বাগদীর পরিবারটা রাত্রে কেমন ছিল কে জানে! ব্রায়োনিয়ার অ্যাক্‌শনটা—নড়লে-চড়লে ব্যথা—হতেই হবে। আচ্ছা চললুম—চললুম। বলিয়া প্রিয় দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

বুড়া ষষ্ঠীচরণ একটু হাসিল, কিন্তু ত্রৈলোক্য কহিল, ক্ষ্যাপাটে লোকে বলে বটে, কিন্তু খুড়ো, পাগলাঠাকুর ছাড়া গরীব-দুঃখীর দরদও কেউ বোঝে না। মন যেন গঙ্গাজলের মত সাদা। এই বলিয়া সে যেদিকে পাগলাঠাকুর অন্তর্হিত হইয়াছিল সেই দিকে মুখ করিয়া দুই হাত জোড় করিয়া একটা নমস্কার করিল।

ষষ্ঠীচরণ বলিল, হুকুম হয়ে গেল, আর দেরি নয় ত্রৈলোক্য, কাজটা শেষ করে ফেলতে পারলে হয়।

ত্রৈলোক্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তাই চল খুড়ো।

দুই

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তখনও আলো জ্বালা হয় নাই। অরুণ তাহার পড়িবার ঘরের মধ্যে টেবিলের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া কড়ি-কাঠের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিল। তাহার ক্রোড়ের উপর বই খোলা, কিন্তু একটু মনোযোগ করিলেই দেখা যাইত যে, এ কেবল সন্ধ্যার অজুহাতেই পড়া বন্ধ হয় নাই, বরঞ্চ আলো যখন যথেষ্ট ছিল, তখনও ঐ বই ওখানে অমনি করিয়াই পড়িয়া ছিল। বস্তুতঃ সেইদিন হইতে সে কাজেও যায় নাই, বাড়ির বাহির পর্যন্ত হয় নাই। এই কয়টা দিন তাহার কেবল একটা কথাই বার বার মনে পড়িয়াছে যে, একজনের কাছে সে একেবারে অস্পৃশ্য হইয়া গেছে! ঘৃণা এবং অশুচিতা এতদূরে গিয়াছে যে, তাহাকে ছুঁইয়া ফেলিলেও একজনের মুখের পান ফেলিয়া দিবার প্রয়োজন হয়!

সহসা তাহার চিন্তা বাধা পাইল। দ্বারের কাছে একটা শব্দ শুনিয়া সে চোখ নামাইয়া ঠাহর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে ওখানে?

আমি সন্ধ্যা,—বলিয়া সাড়া দিয়া সন্ধ্যা দরজা খুলিয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল।

অরুণ ব্যস্ত হইয়া পা নামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং একান্ত বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি এখানে? এমন সময়ে যে? ঘরে এসে ব'সো।

সন্ধ্যা কহিল, আমার বসবার সময় নেই। আমি পুকুরে গা ধুতে এসে তোমার এখানে লুকিয়ে এসেচি। আমাদের একটা মান রাখবে অরুণদা?

অরুণ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, মান? তোমাদের? নিশ্চয় রাখব সন্ধ্যা।

তা আমি জানতুম, বলিয়া সন্ধ্যা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বাবার কাছে শুনলুম এ ক'দিন তুমি কাজে যাওনি, বাড়ি থেকে পর্যন্ত বেরোও নি—কেন শুনি?

আমার শরীর ভাল নেই।

সন্ধ্যা কহিল, না থাকা আশ্চর্য নয়, কিন্তু তা নয়। বাবা তা হলে সকলের আগে সেই কথাটাই বলতেন।

অরুণ চুপ করিয়া রহিল। সন্ধ্যা নিজেও একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, কারণ আমি জানি অরুণদা। কিন্তু আমাদের বাড়িতে তুমি আর কখনো যেয়ো না।

অরুণ আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—শুধু কেবল তোমাদের বাড়িতে নয়—এ গ্রামের বাস তুলে দিয়ে আর কোথাও যাব কিনা, যেথায় বিনাদোষে মানুষে মানুষকে এত হীন, এত লাঞ্ছিত করে না—আমি সেই কথাই, দিনরাত ভাবচি।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, জন্মভূমি ত্যাগ করে চলে যাবে?

অরুণ কহিল, জন্মভূমিই ত আমাকে ত্যাগ করচে সন্ধ্যা। আজ তোমার কাছেও আমি এমন অশুচি হয়ে গেছি যে, তোমাকেও মুখের পান ফেলে দিতে হ'লো। এই ঘৃণা সয়েও কি আমাকে তুমি এই গ্রামে থাকতে বল?

সন্ধ্যা নিরুত্তরে অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। অরুণ কহিল, আচারের নাম নিয়ে এই চিরাগত সংস্কার তোমাদের মনটাকে হয়ত আর স্পর্শ পর্যন্ত করে না, কিন্তু যেখানে করে, সেখানে মানুষের হাত থেকে মানুষের এই লাঞ্ছনা মানুষকে যে বেদনায় কতদূর বিদ্ধ করতে পারে, এই কথাটা যে একদিন আমাকে এমন করে অনুভব করতে হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু এ লাঞ্ছনা কি তুমি নিজেই টেনে আনোনি অরুণদা?

অরুণ কহিল, কি জানি। কিন্তু, আচ্ছা সন্ধ্যা, প্রায়শ্চিত্ত করলে কি এর কোন উপায় হয় বলতে পার?

সন্ধ্যা বলিল, হতে পারে, কিন্তু একদিন আত্মমর্যাদা হারাবার ভয়ে তুমি রাজী হওনি আবার আজ যদি নিজেই তাকে বিসর্জন দাও ত, আমি বলি অরুণদা, তুমি আর যাই কর, এখানে আর থেকো না।

অরুণ কহিল, কিন্তু তোমার ঘৃণা যে সেখানেও আমাকে টিকতে দেবে না!

কিন্তু তাতেই বা তোমার কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি?

অরুণ কহিল, সন্ধ্যা! এ কথা তুমিও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারলে?

সন্ধ্যা বলিল, তুমি যে আমার লজ্জার, আমার সঙ্কোচের আবরণটুকু রাখতে দিলে না অরুণদা! আভাসে ইঙ্গিতে তোমাকে কতবার জানিয়েচি সে কিছুতেই হয় না, তবুও তোমার ভিক্ষার জবরদস্তি যেন কোনমতেই শেষ হতে চায় না। বাবা রাজী হতে পারেন, মাও ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি ভুলতে পারিনে আমি কতবড় বামুনের মেয়ে!

অরুণ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, আর আমি?

সন্ধ্যা বলিল, তুমিও আমার স্বজাতি—কিন্তু তবুও বাঘ আর বেড়াল ত এক নয় অরুণদা! কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিজেই যেন মনে মনে শিহরিয়া উঠিল।

অরুণ আর কথা কহিল না, কেবল তাহার মুখের উপর হইতে নিজের বিস্মিত, ব্যথিত চোখ দুটি সরাইয়া লইল।

সন্ধ্যা জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তুমি যেখানেই যাও না

অরুণদা, আমাকে কিন্তু সহজে ভুলতে পারবে না। অনেককাল তোমার মনে থাকবে, বার বার এত অপমান তোমাকে কেউ করেনি।

অরুণ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে-জন্যে এসেছিলে তা ত এখনো বলনি?

সন্ধ্যা প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হাসিল। একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, পৃথিবীতে আশ্চর্যের আর অন্ত নেই। তারপরে কি একটা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া কহিল, অথচ আমার মান তুমি না রাখলে পৃথিবীতে আর কেউ রাখবার নেই। এ তোমার বিশ্বাস হয় অরুণদা?

অরুণ শুধু নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, এককড়ি দুলের বিধবা স্ত্রীকে আর তার মেয়েকে এককড়ির বাপ তাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আমার বাবা তাদের ডেকে এনেচেন। আমি দিয়েছি তাদের আশ্রয়।

কোথায়?

আমাদের পুরানো গোয়ালঘরে। কিন্তু বামুনপাড়ার মধ্যে তারা থাকতে পাবে না।

অরুণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সন্ধ্যা বলিল, কেন কি? তারা যে দুলে! তারা আমাদের পুকুরঘাট থেকে খাবার জল নেয়, তারা পথের ওপর ছাগলকে ফ্যান খাওয়ায়—গোলোকঠাকুর্দা না জেনে পাছে মাড়িয়ে ফেলেন—মা প্রতিজ্ঞা করেছেন কাল সকালে তাদের ঝাঁটা মেরে বিদায় করে তবে স্নান করবেন। তুমি তাদের স্থান দাও অরুণদা—তাদের কিছু নেই—তারা একেবারে নিরাশ্রয়।

অরুণ কহিল, বেশ, কিন্তু কোথায় স্থান দেব?

সন্ধ্যা বলিল, তা আমি জানিনে—যেখানে হোক। তুমি ছাড়া আর আমি কাকে গিয়ে বলব?

অরুণ একটু ভাবিয়া বলিল, আমার উড়ে মালীটা বাড়ি চলে গেছে—তার ঘরটাতে কি তারা থাকতে পারবে? না হয় একটু-আধটু সারিয়ে দেব।

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারিল না, কেবল অধোমুখে মাথা নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

অরুণ কহিল, তা হলে তাদের পাঠিয়ে দাও গে। মালীটা ফিরে এলে তার অন্য ব্যবস্থা করে দেব।

সন্ধ্যা ইহারও জবাব দিতে পারিল না। তেমনি নতনেত্রে থাকিয়া বোধ হয় আপনাকে সামলাইতে লাগিল। তারপর আস্তে আস্তে বলিল, এখন আমার মুখেও পান নেই, গা ধুতেও এসেছিলাম। এই সময়ে তোমাকে একটু প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে যাই। এই বলিয়া সে গড় হইয়া নমস্কার করিয়া তাহার পায়ের ধুলো মাথায় দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অরুণ তাহাকে ফিরিয়া ডাকিবার, বা আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিল না, কেবল সেইদিকে চাহিয়া সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

[খ]

বোধ করি দিন-দুই পরে হইবে, জগদ্ধাত্রী তাঁহার পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলেন, পথের মধ্যে রাসমণি দেখা দিলেন। তাঁহার সমস্ত চোখমুখ উত্তেজনা ও আগ্রহের আতিশয্যে কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিয়াছে; কাছে আসিয়া অশ্রু-গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, জগো, মা আমার, তোর ঐ পাগলি মেয়েটা কি শেষে এমন তপিস্যেই করেছিল! অ্যাঁ, এ যে স্বপনের অতীত!

জগদ্ধাত্রী কিছুই বুঝিলেন না, কিন্তু এঁর মুখে কেবল মেয়েটার নাম শুনিয়াই মনে মনে ভয় পাইলেন। উদ্‌গ্রীব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েচে মাসী? কি করেচে সন্ধ্যে?

রাসমণি বলিলেন, যা করেচে তা পৃথিবীতে কোন্ মেয়ে কবে করেচে শুনি? যা ভিজে কাপড়ে, ভিজে চুলে গিয়ে শ্রীধরকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার কর্ গে। পঞ্চাননের আর

বিশালাক্ষীর স্থানে পুজো পাঠিয়ে দি গে। কিন্তু আমাকে বাছা, ইষ্টিকবজখানি গলায় ধারণ করতে একটি সরু সোনার গোট করিয়ে দিতে হবে, তা কিন্তু আগে থেকে বলে রাখচি।

জগদ্ধাত্রী আকুল হইয়া কহিলেন, কি হয়েছে মাসী? খুলে না বললে বুঝব কি করে?

রাসমণি একটু হাসিয়া বলিলেন, খুলে বলতে হবে? তবে বলি। তোরা মায়ে-ঝিয়ে ঢের পুণ্যি করেছিলি, নইলে এ কখনো হয় না। ভেবে মরছিলি মেয়েটার বিয়ে দিবি কি করে,—এখন যা—একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে ব'স্ গে।

কথা শুনিয়া জগদ্ধাত্রী দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া চাহিয়া রহিলেন।

রাসমণি সদয়কণ্ঠে কহিলেন, তোর একার দোষ নেই জগো, শুনে আমিও অমনি করে চেয়েছিলুম, মনে হ'লো বুঝি-বা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপন দেখচি।

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, খুলে বল না মাসী কি হয়েচে? আমি যে আকাশপাতাল ভেবে মরে গেলুম।

রাসমণি তখন জগদ্ধাত্রীর বাম বাহুটা নিজের মুঠার মধ্যে গ্রহণ করিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিসফিস করিয়া বলিলেন, কথা গোপন রাখিস মা, আহ্লাদে এখুনি জানাজানি করে ফেলিস নে—ভাঙচি পড়ে যেতে পারে। আমাকে ছাড়া নাকি চাটুয্যেদাদা আর জনপ্রাণীকে বিশ্বাস করেন না, তাই. সকালেই ডেকে আমাকে বললেন, রাসু, জগদ্ধাত্রীকে খবরটা দিয়ে এসো গে দিদি। তার মেয়ের জন্যে আর ভেবে মরতে হবে না—আমার হাতেই সঁপে দিয়ে একেবারে রাজার শাশুড়ী হয়ে পায়ের ওপর পা দিয়ে ঘরে বসুক গে। মনে ভাবলাম. আমারও ত বৈকুণ্ঠপুরী শূন্য খাঁখাঁ করচে—ছেলেটাও মানুষ হচ্ছে না—যাক, এক কাজে দু'কাজ হবে। একটা ব্রাহ্মণের কুলরক্ষাও করা হবে, গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই থাকবে। তাদেরও ত সবেমাত্র ওই মেয়েটি—

কিন্তু কথাটাকে তিনি রাজার ভাবী শাশুড়ীর মুখের দিকে চাহিয়া আর শেষ করিতে পারিলেন না। শুনিতে শুনিতে জগদ্ধাত্রী একেবারে যেন কাঠ হইয়া গিয়াছিলেন।

রাসমণি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, কি হ'লো রে জগো?

জগদ্ধাত্রী নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, নাঃ—মাসী, গোলোক-মামা তোমাকে তামাশা করেচেন।

তামাশা কি লো? এতটা বয়স হ'লো তামাশা কাকে বলে জানিনে? তা ছাড়া ভাই-বোনে তামাশা?

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তামাশা বৈ কি মাসী! একি কখন হতে পারে?

রাসমণি একটু হাসিলেন, বলিলেন, তা সত্যি বাছা—আমারও প্রথমে তাই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, বুঝি-বা স্বপনই দেখচি। কিন্তু পরেই বুঝলাম, না, জেগেই আছি। মেয়েটার অদৃষ্ট বটে! নইলে কুলীনের মেয়ের ভাগ্যে এ কেউ কখনো দেখেচে না শুনেচে। আশীর্বাদ করি জন্ম-এয়োস্ত্রী হয়ে থাক, কিন্তু যা যা বলে দিলুম আজকেই কর গে বাছা। আর কথাটা না যেন পাঁচ-কান হয়। আগে ভালোয় ভালোয় আশীর্বাদটা হয়ে যাক।

জগদ্ধাত্রী বাক্‌শূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাসমণি পুনশ্চ কহিলেন, এই সামনের অঘ্রানের পরেই নাকি এক বছর অকাল। আমার চাটুয্যে দাদার ইচ্ছেটা—, বলিয়া তিনি একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, আর হবে নাই বা কেন বল্? মেয়ে যে একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমে! দেখলে যে মুনির মন টলে যায়, তা আবার গোলোক চাটুয্যে! বলিয়া সহাস্যে জগদ্ধাত্রীর বাহুর উপরে একটু আঙুলের চাপ দিয়া কহিলেন, যাও মা, ভিজে কাপড়ে আর দাঁড়িয়ো না—আমিও যাই, বেলা হয়ে গেল—ও-বেলা আবার তখন আসব এখন, ঢের কথা আছে।

এই বলিয়া তিনি আর সময় নষ্ট না করিয়া প্রস্থান করিলেন।

জগদ্ধাত্রী অনেকটা যেন টলিতে টলিতে বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুর-ঘরের বারান্দার উপর জলপূর্ণ কলসীটাকে ধপ করিয়া রাখিয়া দিয়া সিক্তবস্ত্রে সেইখানেই বসিয়া পড়িতে তাঁহার দুই চক্ষু তপ্ত অশ্রুতে ভরিয়া গেল।

তাঁহার ওই একমাত্র সন্তান। তাঁহার বড় আদরের সন্ধ্যা রূপে ও গুণে যথার্থই লক্ষ্মীর প্রতিমা, সেই প্রতিমার বিসর্জনের আহ্বান আসিল গোলোক চাটুয্যের নরককুণ্ডে! যে গোলোক কন্যার মাতামহের অপেক্ষাও বয়োজ্যেষ্ঠ, তাহারই হাতে সমর্পণ করার চেয়ে যে তাহার মৃত্যু ভাল, এ তাঁহার বুকের মধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু মুখ দিয়া 'না' কথাটাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেও নাকি ব্রাহ্মণ কুলীনেরই মেয়ে—সমাজে এবং পরিবারে ইহা যে কিছুই বিচিত্র নয়—ইহার চেয়েও বহুতর দুর্গতি নাকি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—তাই নিজের মেয়ের কথা স্মরণ করিয়া অন্তরটা ধূধূ করিয়া জ্বলিতে থাকিলেও ইহাকে অসম্ভব বলিয়া নিবাইয়া ফেলিবার একবিন্দু জল কোনদিকে চাহিয়া খুঁজিয়া পাইলেন না। একাকী বসিয়া নিঃশব্দে কেবলই অশ্রু মুছিতে লাগিলেন, এবং কেবলই মনে হইতে লাগিল, অচিরভবিষ্যতে হয়ত ইহাই একদিন সত্য হইয়া উঠিবে—হয়ত ওই বীভৎস মানুষটার দুর্জয় বাসনাকে বাধা দিবার কোন উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইবেন না। উহার সেদিনের সকৌতুক রহস্যালাপের কথাগুলাই তাঁহার ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেবলই স্মরণ হইতে লাগিল—তাহার মধ্যে যে এতখানি গরল গোপন ছিল, তাহা কে সন্দেহ করিতে পারিত!

সদর দরজা দিয়া সন্ধ্যা একখানা চিঠি পড়িতে পড়িতে এক-পা এক-পা করিয়া প্রবেশ করিল। পড়া বোধ হয় তখনও শেষ হয় নাই, কোনদিকে না চাহিয়াই ডাক দিল, মা, মা গো?

জগদ্ধাত্রী তাড়াতাড়ি চোখ দুটি মুছিয়া সাড়া দিলেন, কেন মা?

তাঁহার ভারী গলার আওয়াজে সন্ধ্যা চমকিয়া মুখ তুলিল, ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে মা?

জগদ্ধাত্রী কন্যার তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইতে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কিছুই ত হয়নি মা।

সন্ধ্যা আরও নিকটে আসিয়া নিজের অঞ্চলে মায়ের অশ্রুজল সযত্নে মুছাইয়া দিয়া করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আমার বাবা কি আজ কিছু করেছেন মা?

জগদ্ধাত্রী শুধু বলিলেন, না।

মেয়ে তাহা বিশ্বাস করিল না। আস্তে আস্তে জননীর পাশে বসিয়া কহিল, সংসারে সব জিনিস মানুষের মনের মত হয় না মা। সবাই ত আমার বাবাকে পাগলা-ঠাকুর বলে ডাকে, তুমিও কেন তাঁকে তাই মনে ভাবো না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তারা ভাবতে পারে তাদের কোন লোকসান নেই—কিন্তু আমার মত কাউকে ত জ্বালা পোহাতে হয় না সন্ধ্যে!

এই জ্বালা যে কি এবং তাঁহার জন্যে কাহাকে যে কোথায় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, ইহা সে কোনদিন ভাবিয়া পাইত না, আজও পাইল না এবং এই তাহার নিরীহ, নির্বিরোধী, পরদুঃখকাতর, অল্পবুদ্ধি পিতার দুঃখে তাহার চিত্ত স্নেহে ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া চোখ-দুটি ছলছল করিয়া আসিল; কহিল, আমার যদি সাধ্য থাকত মা, তা হলে বাবাকে নিয়ে আমি বনে-জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতে এমন কোথাও চলে যেতাম, পৃথিবীর কাউকে তাঁর জন্যে আর জ্বালা সইতে হ'তো না।

জগদ্ধাত্রী তাঁহার কন্যার চিবুক হইতে তাড়াতাড়ি হাত দিয়া চুম্বন গ্রহণ করিয়া সস্নেহে বলিলেন, বালাই! ষাট! কিন্তু আমি যেন তোর সৎমা। তাঁর অর্ধেকও তুই যদি আমাকে ভালোবাসতিস সন্ধ্যে!

সন্ধ্যা কহিল, তোমাকে কি ভালোবাসি নে মা?

মা বলিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে তোর যেন সারা প্রাণটা পড়ে আছে—পায়ে কাঁকরটি না ফোটে এমনি তোর ভাব। তুই বেশ জানিস তাঁর ওষুধে কিছু হয় না, তবু তুই প্রাণটা দিতে বসেচিস, কিন্তু আর কারও ওষুধ খাবিনে—পাছে তাঁর লজ্জা হয়। এ-সব কি আমি টের পাইনে সন্ধ্যে!

সন্ধ্যা দুই হাতে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া বলিল, তাই বৈ কি! বাবার মত ডাক্তার কি কোথাও আছে নাকি!

মা বলিলেন, নেই সে কথা সত্যি।

সন্ধ্যা রাগ করিয়া বলিল, যাও—তোমাকে ঠাট্টা করতে হবে না। মানুষের অসুখ বুঝি একদিনেই ভাল হয়ে যায়? আমি ত আগের চেয়ে ঢের সেরে উঠেচি।

এই বলিয়াই প্রসঙ্গটা চাপা দিয়া কহিল, দুলে-বৌরা উঠে গেছে মা। বাঁচা গেছে।

কখন গেল?

কি জানি! বোধ হয় ভোরে উঠেই চলে গেছে।

তাহার কৃত্রিম ঔদাসীন্য মাকে ভুলাইতে পারিল না। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কোথায় উঠে গেল জানিস?

সন্ধ্যা তেমনি তাচ্ছিল্যভরে কহিল, অরুণদার ওই পিছনের বাগানটাতে বুঝি। তার উড়ে মালীর একটা ভাঙ্গা পোড়ো-ঘর ছিল না? তাতেই বোধ হয়।

জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, অরুণের কাছে কে তাদের পাঠালো? তুই বুঝি?

সন্ধ্যা মনে মনে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কোনমতে সোজা মিথ্যাটা বাঁচাইয়া বলিল, অরুণদার কাছে আমি কেন তাদের পাঠাতে যাব মা? আমি কাউকে কারো কাছে পাঠাই নি।

এই বলিয়া সে নিরতিশয় বিশ্রী প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি উলটাইয়া দিয়া হাতের চিঠিটা মেলিয়া ধরিয়া কহিল, আসল কথাটাই তোমাকে এখনো বলা হয়নি মা। আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা এবার কাশী থেকে সত্যি সত্যিই আসবেন লিখেছেন। তিনি ত কখনো মিথ্যা বলেন না মা—এবার বোধ হয় তাঁর দয়া হয়েছে।

জগদ্ধাত্রী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মার চিঠি? কবে আসবেন লিখেছেন?

তাঁহার কাশীবাসিনী সন্ন্যাসিনী শ্বশ্রূ কাশী ছাড়িয়া একটা দিনের জন্যও কোথাও যাইতে চাহিতেন না। এবার জগদ্ধাত্রী তাঁহাকে অনেক করিয়া লিখিয়াছেন যে, তাঁহার একমাত্র পৌত্রীর বিবাহে তাঁহাকে কেবল উপস্থিত হওয়া নয়, কন্যাদান করিতে হইবে। শাশুড়ী দান করিতে কোনমতেই সম্মত হন নাই, কিন্তু যথাসময়ে উপস্থিত হইবেন বলিয়া জবাব দিয়াছেন।

সন্ধ্যা নিজের বিবাহের কথায় লজ্জা পাইয়া বলিল, তোমার চিঠির জবাব তুমিই পড় না মা। বলিয়া কাগজখানি মায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া হঠাৎ ব্যগ্র হইয়া কহিল, ও মা, তুমি যে এখন পর্যন্ত ভিজে কাপড়েই রয়েছ—যাই তোমার শুকনো কাপড়খানা দৌড়ে নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

জগদ্ধাত্রী চিঠিখানি মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, বৌ বলে এতকাল পরে কি সত্যিই দয়া হ'লো মা! বলিয়া তিনিও উঠিয়া ধীরে ধীরে ঠাকুরঘরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন—অকস্মাৎ তাঁহার স্বামী অত্যন্ত সোরগোল করিয়া বাড়ি ঢুকিলেন। তিনি বলিতেছিলেন—দুটো দিন যাইনি, দুটো দিন দেখিনি অমনি হাইপোকণ্ড্রিয়া ডেভেলপ্ করেচে!

স্বামীর সহিত জগদ্ধাত্রীর বড় একটা কথা হইত না, কিন্তু তাঁহার এই অতি-ব্যস্ততা এবং বিশেষ করিয়া বেলা বারোটার পূর্বে আজ অকস্মাৎ প্রত্যাবর্তন দেখিয়া তিনি মনে মনে কিছু বিস্মিত হইলেন। মুখ তুলিয়া শ্রান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার কি হয়েচে?

প্রিয় কহিলেন, অরুণের। ঠিক হাইপোকণ্ড্রিয়া! আমি যা ডায়াগনোস্ করব, কারুর বাবার সাধ্যি আছে কাটে? কৈ, বিপ্‌নে বলুক ত এর মানে কি!

অন্য সময়ে জগদ্ধাত্রী বোধ হয় আর দ্বিতীয় কথা কহিতেন না, কিন্তু অরুণের নাম শুনিয়া কিছু উদ্বিগ্ন হইলেন, কহিলেন, কি হয়েচে অরুণের?

প্রিয় কহিলেন, ঐ ত বললুম গো। বিপ্‌নেই বুঝবে না, তা তুমি! তবু ত সে যা হোক একটু প্র্যাক্‌টিস-ফ্র্যাক্‌টিস্ করে। জিনিসপত্র বাঁধা হচ্ছে—বাড়ি-ঘর-দোর-জমি-জায়দাদ বিক্রি হবে—হারাণ কুণ্ডুকে খবর দেওয়া হয়েচে—ভাগ্যে গিয়ে পড়লুম! যেদিকে যাব না, যেদিকে একদিন নজর রাখব না, অমনি একটা অঘটন ঘটে বসবে! এমন করে আমার ত প্রাণ বাঁচে না বাপু! সন্ধ্যে, কোথা গেলি আবার? ধাঁ করে মেটিরিয়া মেডিকাখানা নিয়ে আয় ত মা, একটা রেমিডি সিলেক্ট করে তারে খাইয়ে দিয়ে আসি।

যাই বাবা, বলিয়া সাড়া দিয়া একখানা মোটা বই হাতে সন্ধ্যা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

জগদ্ধাত্রী রাগ করিয়া কহিলেন, পায়ে পড়ি তোমার, খুলেই বল না ছাই কি হয়েচে অরুণের?

প্রিয় চমকিয়া উঠিলেন, তারপরে বলিলেন, আহা হাইপো—মানসিক ব্যাধি। আজ-কালের মধ্যেই সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায় হারাণ কুন্ডুকে সমস্ত বেচে দিয়ে। তা হবে না, হবে না—ওসব হতে আমি দেব না। একটি ফোঁটা দু'শ শক্তির—

সন্ধ্যা বিবর্ণ নতমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। জগদ্ধাত্রী ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বাড়ি-ঘর বিক্রি করে চলে যাবে অরুণ? সে কি পাগল হয়ে গেল?

প্রিয় হাতখানা সুমুখে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, উঁহু, তা নয়, তা নয়। নিছক হাইপোকণ্ড্রিয়া! পাগল নয়—তারে বলে ইন্‌স্যানিটি। তার আলাদা ওষুধ। বিপুনে হলে তাই বলে বসত বটে, কিন্তু—

জগদ্ধাত্রী কটাক্ষে একবার মেয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া লইলেন এবং স্বামীর অনর্গল বক্তৃতা সহসা দৃঢ়কণ্ঠে থামাইয়া দিয়া অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, তোমার নিজের কথা আমার শোনবার সময় নেই। অরুণ কি দেশ ছেড়ে চলে যেতে চাচ্চে?

প্রিয় বলিলেন, চাইচে! একেবারে ঠিকঠাক। কেবল আমি গিয়ে—

ফের আমি? অরুণ কবে যাবে?

প্রিয় থতমত খাইয়া বলিলেন, কবে? আজও যেতে পারে, কালও যেতে পারে, শুধু হারাণ কুন্ডু ব্যাটা—

জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, হারাণ কুন্ডু সমস্ত কিনবে বলেচে?

প্রিয় বলিলেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। সে ব্যাটা ত কেবল ওই চায়। জলের দামে পেলে—

জগদ্ধাত্রী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, এ কথা গ্রামের আর কেউ জানে?

প্রিয় বলিলেন, কেউ না, জনপ্রাণী নয়। কেবল আমি ভাগ্যে—

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, তোমার ভাগ্যের কথা জানবার আমার সাধ নেই। তুমি শুধু তাকে একবার ডেকে দিতে পার? বলবে, তোমার খুড়ীমা এখ্‌খুনি একবার অতি অবশ্য ডেকেচেন।

সন্ধ্যা এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও কহে নাই, নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, এইবার সে চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখ অতিশয় পান্ডুর, এবং কথা কহিতে গিয়া ওষ্ঠাধরও কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরেই সে দৃঢ়স্বরে বলিল, কেন মা তাঁকে তুমি বার বার অপমান করতে চাও? তোমার কাছে তিনি কি এত অপরাধ করেচেন শুনি?

জগদ্ধাত্রী ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, কে তাকে অপমান করতে চাইচে সন্ধ্যে?

সন্ধ্যা কহিল, না, তুমি কখ্‌খনো তাঁকে এ বাড়িতে ডেকে পাঠাতে পারবে না।

জগদ্ধাত্রী কহিলেন, ডেকে দুটো ভাল কথা বলতেও কি দোষ?

সন্ধ্যা বলিল, ভাল হোক, মন্দ হোক, তিনি থাকুন বা যান, বাড়ি বিক্রি করুন বা না করুন, আমাদের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ যে, এ তুমি বলতে যাবে? এ বাড়িতে যদি তুমি তাঁকে ডেকে আনো মা, আমি তোমারই দিব্যি করে বলচি, ঐ পুকুরের জলে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে মরব। বলিতে বলিতেই সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল, জননীর প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র করিল না।

দুঃসহ বিস্ময়ে জগদ্ধাত্রী দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন,—কেবল প্রিয়বাবু চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা বইখানা দিয়ে যা না ছাই! বেলা হয়ে গেল, একটা রেমিডি সিলেক্ট করে ফেলি, সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা ফিরিয়া আসিয়া হাতের বইটা পিতার পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল, তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িয়া ঔষধ-নির্বাচনে মনোনিবেশ করিলেন।

জগদ্ধাত্রী কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তুমি মেয়ের বিয়ে কি দেবে না ঠিক করেছ?

প্রিয় কাজ করিতে করিতে বলিলেন, দেব না? নিশ্চয়ই দেব।

কবে দেবে? শেষে একটা কিছু হয়ে গেলে দেবে?

হুঁ।

জগদ্ধাত্রী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিলেন, রসিকপুরে যাও না একবার?

প্রিয় খোলা পাতার একটা স্থান আঙুল দিয়া চাপিয়া মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন, রসিকপুরে? কার কি হয়েচে? কেউ খবর দিয়ে গেছে নাকি? কখন দিয়ে গেল?

জগদ্ধাত্রী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জয়রাম মুখুয্যের নাতির সঙ্গে যে বিয়ের একটা কথা হয়েছিল, যাও না, গিয়ে একবার পাত্রটিকে দেখেই এসো না।

প্রিয় কহিলেন, কিন্তু যাই কখন? দেখলে ত, একটা বেলা না থাকলে কি কাণ্ড হয়ে যায়। অরুণের ওই দশা, আবার চাটুয্যেমশায়ের ওখান থেকে খবর দিয়ে গেছে তাঁর শ্যালীর নাকি ভারী অসুখ।

জগদ্ধাত্রী কিছু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কার, জ্ঞানদার অসুখ? কি হ'ল আবার তার?

প্রিয় বলিলেন, অম্বল! অম্বল! খাবার দোষে অজীর্ণ রোগ। কেবল গা বমি-বমি—অরুণের ওখান থেকে ফিরে গিয়ে একটি ফোঁটাই—

জগদ্ধাত্রী বলিলেন, তাঁদের ওষুধ দেবার ঢের লোক আছে। তোমার পায়ে পড়ি, একবার যাও রসিকপুরে। পাত্রটিকে একবার দেখে এসে যা হোক করে মেয়েটার একটা উপায় কর।

গৃহিণীর অশ্রুবিকৃত কণ্ঠস্বর বোধ করি প্রিয়বাবুকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিল। কহিলেন, কিন্তু পাত্রটি যে শুনি ভারী বকাটে! কেবল নেশা ভাঙ—

জগদ্ধাত্রী আর ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, করুক নেশা-ভাঙ, হোক গে বকাটে, তবু মেয়েটা দু'দিন নোয়া-সিঁদুর পরতে পাবে। তুমি কি? তোমার হাতে আমার বাপ-মা যদি মেয়ে দিতে পেরে থাকেন, তুমিই বা পারবে না কেন?

এই বলিয়া তিনি অঞ্চলে চোখ মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

প্রিয় অবাক হইয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তাহার পরে বইখানি মুড়িয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, দু-দুটো সাংঘাতিক রোগী হাতে—এমনধারা করলে কি রেমিডি সিলেক্ট করা যায়! বলিয়া পুনশ্চ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বইটা বগলে চাপিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

[গ]

স্নান, পূজাহ্নিক এবং যথাবিহিত সাত্ত্বিক জলযোগাদি সমাপনান্তর মূর্তিমান ব্রহ্মণ্যের ন্যায় গোলোক চাটুয্যেমহাশয় ধীরে ধীরে নীচে অবতরণ করিলেন, এবং বোধ হয় সোজা বাহিরেই যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি মনে করিয়া পাশের বারান্দাটা ঘুরিয়া ভাঁড়ার ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ উদ্বেগে পরিপূর্ণ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, অ্যাঁ, এ-সব কি হচ্চে বল দিকি ছোটগিন্নী? অসুখ শরীরে গৃহস্থালীর ছাই-পাঁশ [illegible] কি না ঘাটলেই নয়? তাই আমি বলি! আচ্ছা, দেহ আগে, না কাজ আগে?

জ্ঞানদা বঁটি পাতিয়া তরকারি কুটিতেছিল, কুটিতেই লাগিল। তাহার কাষ্ঠ-পাদুকার বিকট খটাখট শব্দও যেমন তাহার কানে যায় নাই, তাঁহার উৎকণ্ঠিত অনুযোগও তেমনি যেন তাহার কানে গেল না।

গোলোক একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিলেন, ব্যাপার কি? আজ সকালে আছ কেমন?

জ্ঞানদা মুখ তুলিল না, হাতের বেগুনটার প্রতি চোখ রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, ভালো।

গোলোক অতিশয় আশ্বস্ত হইলেন, কহিলেন, ভালো, ভালো। আমি জানি কিনা, প্রিয় হোক ক্ষ্যাপা-পাগলা কিন্তু ওষুধ দেয় যেন ধন্বন্তরি! কিন্তু যেমন বলে যাবে টাইম-মত খেতে হবে। তাচ্ছিল্য করলে চলবে না তা কিন্তু বলে যাচ্চি।

জ্ঞানদা এত কথার কোন জবাব দিল না, অধোমুখে কাজ করিতেই লাগিল।

গোলোক কিছুক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, প্রিয়কে বিশেষ করে বলে দিয়েচি দুটি বেলা এসে দেখে যাবে—সকালে এসেছিল ত?

জ্ঞানদা তেমনি নতমুখেই মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

গোলোক খুশী হইয়া বলিলেন, আসবে বৈ কি! আসবে বৈ কি! সে যে আমার ভারী অনুগত! কিন্তু ঝি বেটী গেল কোথায়? সে যাবে ওষুধ দিয়ে, আর তুমি এদিকে খেটে খেটে শরীর পাত করবে, তা আমি হতে দিতে পারব না। বলি, গেল কোথা সব? থাক এ-সব পড়ে। যাও ওপরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করগে—মধুসূদন! তুমিই ভরসা! এই বলিয়া গোলোক পরের এবং নিজের লৌকিক ও পারলৌকিক উভয় কর্তব্যই আপাততঃ শেষ করিয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

তাঁহার খড়মের একটুখানি শব্দে চকিত হইয়া এতক্ষণে জ্ঞানদা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখে সেদিনের সেই প্রসন্ন হাসিটুকু আজ নাই, আজ তাহা চিন্তা ও বিষাদের ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন। চোখ দুটি আরক্ত, পল্লবপ্রান্তে অশ্রুর আভাস যেন তখনও বিদ্যমান—সেই সজল দৃষ্টি গোলোকের মুখের প্রতি স্থির করিয়া অকস্মাৎ গাঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি কি প্রিয়বাবুর মেয়ে সন্ধ্যাকে বিয়ে করতে চেয়েচ? আমাকে ঠকিয়ো না, সত্যি বল?

গোলোক থতমত খাইয়া হঠাৎ জবাব দিতে পারিলেন না, কিন্তু পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, আমি? সন্ধ্যাকে? নাঃ! কে বললে?

জ্ঞানদা কহিল, যেই বলুক। রাসুদিদিকে তুমি তার মায়ের কাছে পাঠিয়েছিলে? সামনের অঘ্রানেই সমস্ত স্থির হয়ে গেছে? ভগবানের দোহাই, সত্যি কথা বল।

গোলোক অস্ফুট তর্জনে শাসাইয়া বলিলেন, রাসী-বামনী বলে গেছে? আচ্ছা দেখছি তাকে! আমি—

জ্ঞানদা বলিয়া উঠিল, কেন তবে তুমি আমার এ সর্বনাশ করলে? মুখ দেখাবার, দাঁড়াবার যে আর আমার কোথাও স্থান নেই,—বলিতে বলিতেই তাহার বিকৃতকণ্ঠ বুক-ফাটা ক্রন্দনে একেবারে সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িল।

গোলোক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। চারিদিকে সভয় দৃষ্টিপাত করিয়া হাত তুলিয়া চাপা গলায় বলিতে লাগিলেন, আহা হা! কর কি, কর কি! লোকজন শুনতে পাবে যে! মিছে—মিছে—মিছে কথা গো! ঠাট্টা—

জ্ঞানদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, না কখ্খনো ঠাট্টা নয়—কখ্খনো এ মিথ্যে নয়। এ সত্যি। এ সত্যি। তুমি সব পার। তোমার অসাধ্য কাজ নেই।

না না বলচি, এ ঠাট্টা—তামাশা—নাতনী সুবাদে—আহা হা! চুপ কর না—ঝি-চাকর এসে পড়বে যে! বলিতে বলিতে গোলোক খটখট করিয়া শশব্যস্তে পলায়ন করিলেন।

জ্ঞানদার হাতের বেগুন হাতেই রহিল, সে মুখের মধ্যে অঞ্চল গুঁজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত রোদন প্রাণপণে নিরোধ করিল।

বাটীর দাসী হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া জানাইল, মাসীমা, ঝি সঙ্গে করে কানা দাদামশাই যে স্বয়ং এসে হাজির গো!

জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিল। তাহার অশ্রু-কলুষিত ব্যথিত দৃষ্টির সম্মুখে দাসী বিস্ময়ে লজ্জায় বলিল, তোমাদের সেই পুরোনো ঝিকে সঙ্গে নিয়ে তোমার শ্বশুরমশাই এসেচেন মাসীমা। কি হয়েচে গা?

খবর শুনিয়া জ্ঞানদার মুখের উপর রক্তের লেশমাত্রও যেন আর রহিল না। মুখোমুখি মৃত্যুকে দেখিয়াও মানুষ বোধ হয় এমন পাণ্ডুর হইয়া যায় না।

দাসী ভীত হইয়া কহিল, কি হয়েচে মাসীমা?

জ্ঞানদা ইহারও উত্তর দিল না, কেবল বিহ্বল শূন্যদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

দাসী পুনরায় বলিল, তোমার কি কোন অসুখ করেচে মাসীমা?

এতক্ষণে জ্ঞানদা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ। বাবা কতক্ষণ এসেচেন কালী?

ঝি বলিল, সে ত জানিনে মাসীমা। এইমাত্র দেখলুম তিনি উঠানে দাঁড়িয়ে বাবুর সঙ্গে কথা কইচেন।

জ্ঞানদা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুর সঙ্গে?

ঝি বলিল, হাঁ। আমি বাইরে থেকে আসছিলুম, বাবু ডেকে বলে দিলেন, কালী, তোমার মাসীমাকে খবর দাও গে তাঁর শ্বশুরমশাই তাঁকে নিতে এসেছেন। ও মা, ঐ যে নিজেই আসচেন! বলিয়া ঝি একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই লাঠির শব্দে মুক্তা

গেল এ লাঠি যাঁর তাঁকে চোখের চেয়ে লাঠির উপরে চলাচলের পথটা অধিক নির্ভর করিতে হয়।

পরক্ষণেই একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকের পশ্চাতে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি লাঠির দ্বারা পথ ঠাহর করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন এবং ডাকিয়া বলিলেন, আমার মা কোথায় গো?

জ্ঞানদা উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পদতলে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ মানুষ চিনিতে না পারিলেও চেহারাটা দেখিতে পাইতেন। তিনি আশীর্বাদ করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, বুড়ো-বুড়ীকে এমন করে ভুলে কি করে আছিস মা?

যে স্ত্রীলোকটি সঙ্গে আসিয়াছিল সে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, তা সত্যি বৌদিদি। বুড়ো শাশুড়ী মরে, কেবল মুখে তাঁর—আমার বৌমাকে নিয়ে এসো—আমার বৌমাকে এনে দাও। কেমন করে এতদিন ভুলে আছ বল ত?

জ্ঞানদা এ অভিযোগের কোন জবাব দিল না। কেবল এক হাতে অশ্রু মুছিতে মুছিতে অন্য হাতে বৃদ্ধ শ্বশুরের হাত ধরিয়া তাঁহাকে বারান্দায় আনিল, এবং স্বহস্তে আসন পাতিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ উপবেশন করিয়া বলিতে লাগিলেন, চাটুয্যেমশাইকে দু'খানা চিঠি দিলাম। কিন্তু একটারও জবাব পেলাম না। মনে ভাবলাম, তিনি বড়লোক, নানা কাজ তাঁর, আমাদের মত গরীবকে উত্তর দেবার কথা হয়ত তাঁর মনেই নেই। কিন্তু মা ত আমার এই দুঃখীরই ঘরের লক্ষ্মী—

যে দাসী সঙ্গে আসিয়াছিল অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, হ'লেই বা ভগিনীপতি বড়লোক, তাই বলে ঘরের বৌকে আর কে কতদিন পরের বাড়ি ফেলে রাখতে পারে, বৌদিদি? তা ছাড়া, যার সেবা করতে আসা, সেই বোনই যখন মারা গেল! আমি বলি—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া বলিলেন, থাক সদু, ওসব কথা। তোমার শাশুড়ীঠাকরুন, বৌমা, বড় পীড়িত। আজ দিন ভালো দেখেই তিনি পাঠিয়ে দিলেন যে আমার বৌমাকে একবার—

সদু বলিল, বৌদিদি, তোমার জন্যেই বুঝি প্রাণটা তাঁর বেরুচ্চে না। আজ দু'দিন থেকে কেবল বলচেন—সদু, মা আমার, যা তুই একবার এ'কে নিয়ে। এনে একবার দেখা আমার মাকে।' বলিতে বলিতে সদুর গলা করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ কহিলেন, চাটুয্যেমশায় যে আমার চিঠি দুটো পাননি, তা ত আর আমরা জানিনে। আমরা কত কথাই না তোলাপাড়া করছিলাম। বড় ভালো লোক—সাধু ব্যক্তি। শুনেই বললেন, বিলক্ষণ! আপনাদের বৌ আপনারা নিয়ে যাবেন তাতে বাধা দেবে কে? পালকি বেহারা বলে দিলেন। তোমার শাশুড়ীর অসুখ শুনে দুঃখ করে বার বার বলতে লাগলেন, আমার বড় বিপদের দিনে জ্ঞানদাকে আপনারা পাঠিয়েছিলেন, এখন আপনাদের বিপদের সময় এমন পাষণ্ড সংসারে কে আছে যে তাকে ফিরে পাঠাতে আপত্তি করবে! এখ্খুনি নিয়ে যান, আমি সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিচ্চি।

জ্ঞানদা এতক্ষণ একেবারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল, অকস্মাৎ বিবর্ণমুখে বলিয়া উঠিল—চাটুয্যেমশাই বললেন এই কথা? এখ্খুনি পাঠাবেন? আজই?

সৌদামিনী খুশী হইয়া কহিল, হাঁ—বললেন বৈ কি। বরঞ্চ এমনও বলে দিলেন যে, খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়লে তিনটের গাড়ি ধরে অনায়াসে কাল সকাল নাগাদ বাড়ি পৌঁছান যাবে। তা ছাড়া ঘরে মর-মর রোগী, কোথাও কি একটা দিনও দেরি করবার জো আছে বৌদিদি! আহা! বুড়ী যেন কেবল হা-পিত্যেস করে তোমার পথ চেয়ে আছে!

জ্ঞানদা কেবল যেন কলের পুতুলের মত তাহার পূর্ব-কথাটাই আবৃত্তি করিতে পারিল। কহিল, উনি বললেন পাঠাবেন? আজই?

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া কহিলেন, হাঁ মা, আজই বৈ কি! থাকবার ত জো নেই।

কিন্তু সৌদামিনী বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার কণ্ঠস্বরে তাহা অপ্রকাশও রহিল না। কহিল, শোন কথা একবার। শাশুড়ী মরে—যার ঘরের বৌ তিনি নিজে এসেচেন নিতে—কে পাঠাবে না শুনি? তা ছাড়া, আর থাকাই বা এখানে কিজন্যে? ভালো, তোমার ভগ্নীপতিকে জিজ্ঞেসা করেই না হয় পাঠাও না বৌদিদি?

কিন্তু পাঠাইতে হইল না। বোধ করি কাছেই কোথাও তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন, খটখট করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভাবটা তাঁহার অত্যন্ত ব্যস্ত। বৃদ্ধকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, না মুখুয্যেমশাই, বসে গল্প করলে চলবে না। বেলা বেড়ে যাচ্ছে, স্নানাহ্নিক সেরে আহারাদির পরে একটু বিশ্রাম করে বেরুতেই সময় হয়ে যাবে। ওদিকে আবার বারবেলা পড়বে। বিলক্ষণ! পাঠাতে আপত্তি! আমাদের না হয় একটু কষ্টই হবে, তা বলে—সে কি কথা! শাশুড়ীঠাকরুনের অত বড় ব্যারাম, আমার যে সহস্র ঝঞ্ঝাট—এতটুকু ফুরসত নেই, নইলে যে নিজে গিয়ে জ্ঞানদাকে রেখে আসতাম! চিঠি কি একটাও পেলাম! তা হলে আপনাকে নাকি আবার কষ্ট করে আসতে হয়? পিয়ন বেটারা সব হয়েচে—কালী কোথায় গেলি? ভুলোকে না হয় এইখানেই বল্ না এক কল্‌কে তামাক দিয়ে যেতে। নিন মুখুয্যেমশাই, আর দেরি নয়, উঠুন। জ্ঞানদা, একটুখানি চটপট নাও দিদি—ওদিকে আবার তিনটের গাড়ি ধরাই চাই। আঃ—চোঙদারটা আবার বাইরে বসে—গিন্নী স্বর্গীয় হওয়া থেকে কি যে মন হয়েচে মুখুয্যেমশাই, কিছু মনেই থাকে না। মধুসূদন! তুমিই ভরসা! তুমিই ভবসা! বলিতে বলিতে গোলোক চাটুয্যেমশাই যে পথে আসিয়াছিলেন সেই পথে সমস্ত বাড়িটা খড়মের কঠোর শব্দে মুখরিত করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

জ্ঞানদা একটা কথারও জবাব দিল না—কেবল সেইদিকে চাহিয়া পাথরের ন্যায় শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভুলো আসিয়া কহিল, মাসীমা, খোকাবাবু নাইবার জন্যে কাঁদছে। নদীতে কি নিয়ে যাব?

জ্ঞানদা তেমনি নিশ্চল নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, ভৃত্যের আবেদন বোধ হয় তাহার কানেও গেল না।

বৃদ্ধ শ্বশুর ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, মা, আমি তা হলে বাইরে যাই, তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও।

সদু কহিল, আজ আমার ষষ্ঠী, বৌদিদি, এবেলা ভাত খাব না বলে দিয়ো।

জ্ঞানদা সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বাবা, আমি যাব না।

বৃদ্ধ চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন, যাবে না? কেন মা, আজ ত বেশ দিন!

সোদামিনী ষষ্ঠীর ফলার ভুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, আমরা যে ভট্‌চায্যি-মশায়কে দিয়ে দিন-ক্ষণ দেখিয়ে তবে বাড়ি থেকে বার হয়েচি বৌদি!

জ্ঞানদা শুধু বলিল, না বাবা, আমি যেতে পারব না।

গোলোকের বছর-দশেকের ছেলেটা ছুটিয়া আসিয়া তাহার গায়ে পড়িয়া বলিল, মাসীমা, তুমি বলে দাও না মাসীমা, আমি যাব, নদীতে নাইতে—হুঁ—যাবই কিন্তু—

জ্ঞানদা কাহাকেও কিছু কহিল না, কেবল সেই দুর্দান্ত ছেলেটাকে সবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া হুহু রবে কাঁদিয়া উঠিল।

[ঘ]

তাহার পর জ্ঞানদা সেই যে ঘরে কবাট দিল আর খুলিল না। বৃদ্ধ অন্ধ শ্বশুর সমস্ত দুপুরবেলাটা বিমূঢ় বুদ্ধিভ্রষ্টের ন্যায় নীরবে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। সঙ্গে সোদামিনীও গেল। এই অপ্রত্যাশিত প্রত্যাখ্যানের হেতু সেও বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু সে মেয়েমানুষ—অমন করিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া যাওয়া তাহার সাধ্য নয়। যাইবার পূর্বে জ্ঞানদার রুদ্ধ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া যে গুটি-কয়েক কথা বলিয়া গেল তাহা সুন্দরও নয়, মধুরও নয়। কিন্তু কোন কথার কোন জবাবই জ্ঞানদা দিল না। এমন কি তাহার একবিন্দু কান্নার শব্দ পর্যন্ত সে বাহিরে আসিতে দিল না। ছেলেবেলা বিধবা হওয়ার দিন হইতে যে শাশুড়ী তাহাকে এতকাল বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, একটি দিনের জন্য কোন দুঃখ দেন নাই, আজ তিনি মৃত্যুশয্যায়, কেবল তাহারই মুখ চাহিয়া তাঁহার দুঃখের জীবন মুক্তি পাইতেছে না, অথচ, তাহার অশক্ত অন্ধ শ্বশুর রিক্তহস্তে ফিরিয়া চলিলেন—এ যে কি এবং কি করিয়া যে এই ব্যথা সে তাহার রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে

একাকী বহন করিতে লাগিল, সে কেবল জগদীশ্বরই দেখিলেন, বাহিরে তাহার আর কোন সাক্ষ্য রহিল না।

বন্ধুর যাইবার সময় গোলোক দেখা করিলেন, সবিনয়ে পাথেয় দিতে চাহিলেন, এবং জ্ঞানদার না যাওয়ার বিস্ময় ও বেদনা তাঁহার বুদ্ধিকেও যেন অতিক্রম করিয়া গেল।

গোলোক বাহিরের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য বসিয়া আছে। মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিল। গোলোক নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন না, ঘাড়টা একটুখানি নাড়িয়া বলিলেন, তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম বাবাজী!

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আজ্ঞে, শুনেই ত মুখে দুটি ভাত দিয়েই ছুটে আসচি চাটুয্যেমশাই!

গোলোক বলিলেন, তা ত আসচ হে—কিন্তু ঘটকালি ত করে বেড়াও, বলি দেশের খবর-টবর কিছু রাখো? হাঁ, ঘটক ছিলেন বটে তোমার পিতামহ রামতারণ শিরোমণি! সমাজটি ছিল নখ-দর্পণে।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আজ্ঞে, আমার অপরাধ কি? এ-সব কি মেয়েমানুষের কাজ? কিন্তু, সে যাই হোক—জগো বামনীর মেয়েটার কি আস্পর্ধা বলুন দেখি চাটুয্যেমশাই? রাসু-পিসীর কাছে শুনে পর্যন্ত আমরা যেন রাগে জ্বলে যাচ্চি।

গোলোক অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, কি কি? ব্যাপারটা কি বল দেখি?

আপনি কি কিছু শোনেন নি?

না না, কিছু না। হয়েচে কি?

মৃত্যুঞ্জয় বলিল, আপনারও গৃহশূন্য, ও মেয়েটারও আর বিয়ে হয় না। শুনলাম আপনি নাকি দয়া করে দুটো ফুল ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণের কুলটা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ছুঁড়ী নাকি তেজ করে সকলের সুমুখে বলেচে—কথাটা উচ্চারণ করতে মুখে বাধে মশায়—বলেচে নাকি, ঘাটের মড়ার গলায় ছেঁড়া-জুতোর মালা গেঁথে পারিয়ে দেব! তাঁর মা-বাপও নাকি তাকে সায় দিয়েচে।

রাগে গোলোকের চোখমুখ রাঙা হইয়া উঠিল, কিন্তু এক নিমিষে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া কহিলেন, বলেচে নাকি? ছুঁড়ী আচ্ছা ফাজিল ত!

ক্রুদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় কহিল, হোক ফাজিল, কিন্তু তাই বলে আপনাকে বলবে এই কথা! জানে না সে আপনার পায়ে মালা দিলে তার ছাপ্পান্ন পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে! আপনি বলেন কি?

গোলোক প্রশান্ত হাসিমুখে কহিলেন, ছেলেমানুষ! ছেলেমানুষ! রাগ করতে নেই হে মৃত্যুঞ্জয়—রাগ করতে নেই। আমার মর্যাদা সে জানবে কি—জানো তোমরা, জানে দশখানা গ্রামের লোক।

মৃত্যুঞ্জয় গলাটা কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপারটা কি তা হলে সত্যি নয়? আপনি কি তা হলে রাসুপিসীকে দিয়ে—

গোলোক কহিলেন, রাধামাধব! তুমিও ক্ষেপলে বাবাজী! যার অমন গৃহলক্ষ্মী যার, সে নাকি আবার—বলিয়া অকস্মাৎ প্রবল নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

তাঁহার ভক্তি-গদ্‌গদ উচ্ছ্বাসের প্রত্যুত্তরে মৃত্যুঞ্জয় কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া শুধু তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

গোলোক কয়েক মুহূর্ত পরে উদাসকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, ছাইপাঁশ মনেও পড়ে না কিছু—লোকজনেরা ত দিবারাত্রি খেয়ে ফেললে আমাকে—এঁকে বাঁচান, ওঁকে রক্ষা করুন, অমুকের কুল উদ্ধার করুন—আমাকে ত জানো, চিরকাল অন্যমনস্ক উদাসীন লোক—হয়ত বা মনের ভুলে কাউকে কিছু বলেও থাকব—মধুসূদন! তুমিই ভরসা! তুমিই গতি মুক্তি!

ঘটক মৃত্যুঞ্জয় পাইয়া বসিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে তাই যদি হয়, আমাদের প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের মেয়েটিকে আপনাকে পায়ে স্থান দিতেই হবে। ব্রাহ্মণ গরীব, মেয়েটির বয়সও তের-চোদ্দ হলো—কিন্তু যেমন লক্ষ্মী, তেমনি সুরূপা।

গোলোক বলিলেন, তুমি পাগল হলে মৃত্যুঞ্জয়! আমার ওসব সাজে, না ভাল লাগে?

তা মেয়েটি বুঝি এরই মধ্যে বছর-চোদ্দর হলো? বেশ একটু বাড়ন্ত গড়ন বলেই শুনেচি, না?

মৃত্যুঞ্জয় উৎসাহিত হইয়া কহিল, আজ্ঞা হাঁ, খুব খুব। তা ছাড়া যেমন শান্ত তেমনি সুন্দরী।

গোলোক মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, হাঃ! আমার আবার সুন্দরী! আমার আবার সুরূপা! যে লক্ষ্মীর প্রতিমে হারালাম! মধুসূদন! কারও দুঃখই সইতে পারিনে, শুনলে দুঃখই হয়। তেরো-চোদ্দ যখন বলচে তখন পনর-ষোল হবেই। ব্রাহ্মণ বড় বিপদেই পড়েচে বল?

মৃত্যুঞ্জয় মাথা নাড়িয়া কহিল, তাতে আর সন্দেহ কি!

গোলোক কহিলেন, বুঝি সমস্তই মৃত্যুঞ্জয়। কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। না রাখলে প্রত্যবায় হয়। কিন্তু একে শোক-তাপের শরীর, বয়সও ধর পঞ্চাশের কাছে ঘেঁষেই আসচে—কিন্তু কি যে স্বভাব, অপরের বিপদ শুনলেই প্রাণটা যেন কেঁদে ওঠে—না বলতে পারিনে।

মৃত্যুঞ্জয় পুনঃপুনঃ শির সঞ্চালন করিতে লাগিল। গোলোক পুনশ্চ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, এই স্বভাব-কুলীনের গ্রামে সমাজের মাথা হওয়া যে কি ঝকমারি তা আমিই জানি। কে খেতে পাচ্চে না, কে পরতে পাচ্চে না, কার চিকিৎসা হচ্চে না—এ-সকল ত আছেই, তার ওপর এইসব জুলুম হলে ত আমি আর বাঁচিনে মৃত্যুঞ্জয়! প্রাণকৃষ্ণ গরীব—তা মেয়েটি বুঝি বেশ ডাগর হয়ে উঠেচে? তের-চোদ্দ নয়, পনর-ষোলর কম হবে না কিছুতেই—ত ব'লো না হয় প্রাণকৃষ্ণকে একবার দেখা করতে—

মৃত্যুঞ্জয় ব্যগ্র হইয়া বলিল, আজই—গিয়েই পাঠিয়ে দেব—বরঞ্চ, সঙ্গে করেই না হয় নিয়ে আসব।

গোলোক উদাসকণ্ঠে কহিলেন, এনো, কিন্তু বড় বিপদে ফেললে মৃত্যুঞ্জয়—গরীব ব্রাহ্মণের এ বিপদে না বলবই বা কি করে! মধুসূদন! ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন। যা করাবেন তাই করতে হবে। আমরা নিমিত্ত বৈ ত না।

মৃত্যুঞ্জয় নীরব হইয়া রহিল।

গোলোকের হঠাৎ যেন একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিলেন, হাঁ দ্যাখো, তোমাকে যেজন্যে ডেকে পাঠিয়েচি, তাই এখনো বলা হয়নি। বলচি, মাসটা বড় টানাটানি চলচে, তোমার সুদের টাকাটা—

মৃত্যুঞ্জয় করুণস্বরে বলিল, এ মাসটা যদি একটু দয়া করে—

গোলোক কহিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে, তাই হবে। আমি কষ্ট দিয়ে এক পয়সাও নিতে চাইনে। কিন্তু বাবাজী, তোমাকেও আমার একটি কাজ করে দিতে হবে।

মৃত্যুঞ্জয় প্রফুল্ল হইয়া কহিল, যে আজ্ঞে। আজ্ঞা করুন।

গোলোক বলিলেন, সনাতন হিন্দুধর্মটি বাঁচিয়ে সমাজ রক্ষা করে চলা ত সোজা দায়িত্ব নয় মৃত্যুঞ্জয়! এ মহৎ ভার যার মাথার উপর, তার সকল দিকে চোখকান খুলে রাখতে হয়। শুনেছিলাম প্রিয় মুখুয্যের মায়ের সম্বন্ধে কি একটা নাকি গোল ছিল। এই খবরটি বাবা তোমাকে তাদের গ্রামে গিয়ে অতি গোপনে সংগ্রহ করে আনতে হবে। সে ছিলেন বটে তোমার পিতামহ শিরোমণি-মশায়, বিশ-ত্রিশখানা গ্রামের নাড়ীর খবর ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ—ভূপতি চাটুয্যের যে দশটি বছর হুঁকো-নাপ্‌তে বন্ধ করে দিয়েছিলাম—ভায়াকে শেষে বাপ বাপ করে ছন্নভন্ন হয়ে গাঁ ছেড়ে পালাতে হ'লো, সে ত তোমার পিতামহের সাহায্যেই। কিন্তু তোমরা বাবা তাঁর কীর্তি বজায় রাখতে পারলে না, এ-কথা আমাকে বলতেই হবে।

মৃত্যুঞ্জয় তাহার পূর্বপুরুষের তুলনায় নিজের হীনতা উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কহিল, আপনি দেখবেন, চাটুয্যেমশায়, আমি একটি হপ্তার মধ্যেই তাদের পেটের খবর টেনে বার করে আনব।

গোলোক উৎসাহ দিয়া বলিলেন, তা তুমি পারবে, পারবে। কত বড় বংশের ছেলে। কিন্তু দেখ বাবাজী, এ নিয়ে এখন আর পাঁচ-কান করবার আবশ্যক নেই—কথাটা তোমার আমার মধ্যেই গোপনে থাক; সমাজের মান-মর্যাদা রক্ষা করতে হলে অনেক বিবেচনার

প্রয়োজন। তা দ্যাখো, কেবল সুদ কেন, তোমার আসল টাকাটাও আমি বিবেচনা করে দেখব। কষ্টে পড়েচ, এ কথা যদি আগে জানাতে—

মৃত্যুঞ্জয় পুলকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে—আমরা আপনার চরণেই ত পড়ে আছি। আমি কালই এর সন্ধানে যাব—এই বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

গোলোক জিভ কাটিয়া কহিলেন, অমন কথা মুখেও এনো না বাবাজী। আমি নিমিত্ত-মাত্র—তাঁর শ্রীচরণে কীটাণুকীটের ন্যায় পড়ে আছি। এই বলিয়া তিনি উপরের দিকে শিবনেত্র করিয়া হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া যাইতেছিল, অন্যমনস্ক গোলোক সহসা কহিলেন, আর দ্যাখো, প্রাণকৃষ্ণকে একবার পাঠিয়ে দিতে যেন ভুলো না। ব্রাহ্মণের বিপদের কথা শুনে পর্যন্ত প্রাণটা কেঁদে কেঁদে উঠছে। নারায়ণ! মধুসূদন! তুমিই ভরসা!

তিন

প্রসিদ্ধ জয়রাম মুখোর দৌহিত্র শ্রীমান বীরচন্দ্র বন্দ্যোর সহিতই সন্ধ্যার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে। আগামীকল্য বরপক্ষ আশীর্বাদ করিতে আসিবেন, বাড়িতে তাহার উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। অগ্রহায়ণের শেষাশেষি বিবাহ, একটিমাত্র দিন আছে, তাহার পরে দীর্ঘদিনব্যাপী অকাল। এই সূত্রে বহু বৎসর পরে বহু সাধ্যসাধনায় শাশুড়ী কাশী হইতে আসিয়াছেন। সন্ধ্যার পরে ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া প্রদীপের আলোকে জগদ্ধাত্রী মিষ্টান্ন রচনা করিতেছিলেন এবং তাঁহারই অদূরে কম্বলের আসনে বসিয়া বৃদ্ধা শাশুড়ী কালীতারা মালা জপ করিতেছিলেন। শীতের আভাস দিয়াছে, তাঁহার গায়ে একখানি গেরুয়া রঙের লুই, পরিধানেও সেই রঙে রঞ্জিত বস্ত্র; পুত্রবধূর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিয়ের বুঝি আর দিন-দশেক বাকী রইল বৌমা?

জগদ্ধাত্রী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কহিলেন, কোথায় দশ দিন মা? এই আজ নিয়ে ন' দিন। কাজটা হয়ে গেলে যেন বাঁচি। এ পোড়া দেশে কিছুই যেন না হলে আর ভরসা হয় না।

শাশুড়ী একটু হাসিয়া কহিলেন, সব দেশেই এই ভয় মা, কেবল তোমাদের গ্রামেই নয়। কিন্তু এতে আশা-ভরসাই বা কি আছে বৌমা, অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা মেয়েকে যখন জলে ফেলেই দিচ্চ?

জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া কাজ করিতে লাগিলেন, উত্তর দিলেন না।

শাশুড়ী বলিলেন, প্রিয়র কাছে সমস্তই শুনেচি। আজ সকালে স্নানের পথে অরুণকেও দেখলাম। এমন সোনার চাঁদ ছেলেকে তোমার পছন্দ হলো না বৌমা?

জগদ্ধাত্রী বিশেষ খুশী হইলেন না, বলিলেন, কিন্তু কেবল পছন্দই ত সব নয় মা?

শাশুড়ী বলিলেন, নয় মানি। কিন্তু ফিরে এসে সন্ধ্যার কাছে তার কথা পেড়ে একটু একটু করে যতটুকু পেলাম তাতেই যেন দুঃখে আমার বুক ফাটতে লাগল। হাঁ বৌমা, মা হয়েও কি এ তোমার চোখে পড়ল না?

চোখে তাঁহার বহুদিন পড়িয়াছে, কিন্তু স্বীকার করা যে একেবারে অসম্ভব। বরঞ্চ সভয়ে এদিকে-ওদিকে চাহিয়া চাপা গলায় বলিলেন, কাজ-কর্মের বাড়ি, কেউ যদি এসে পড়ে ত শুনতে পাবে মা।

শাশুড়ী আর কিছুই বলিলেন না, কিন্তু জগদ্ধাত্রী নিজের কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, আচ্ছা মা, তুমি কি ক'রে এমন কথা বল? তোমার এতবড় কুলের মর্যাদা ভাসিয়ে দিয়ে কি ক'রে লোকের কাছে মুখ দেখাবে বল ত? তা ছাড়া তার ত জাতও নেই। যারা তার হয়ে তোমার কাছে ওকালতি করেচে এ কথাটা কি তোমাকে তারা বলেছে?

জগদ্ধাত্রী মনে করিলেন, ইহার পরে আর কাহারও বলিবার কিছু থাকিতেই পারে না। কিন্তু শাশুড়ী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বলেচে বৈ কি। কিন্তু তার কিছুই যায়নি বৌমা, সমস্তই বজায় আছে। কেবল তার বিদ্যা-বুদ্ধির জন্যেই বলচি নে। ছোটলাট বলে যে

অনাথা মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে, সে তাদেরই বুকে তুলে নিলে। তার জাত ভগবানের বরে অমর হয়ে গেছে, বৌমা, তাকে আর মানুষ মারতে পারে না।

জগদ্ধাত্রী মনে মনে কুপিত হইয়া বলিলেন, অনাথা বলেই কি হাড়ী-দুলে হয়ে বামুনের ভিটে-বাড়িতে বাস করবে মা? এই কি শাস্তরে বলে?

শাশুড়ী বলিলেন, শাস্তরে কি বলে তা ঠিক জানিনে বৌমা। কিন্তু নিজের ব্যথা যে কত তা ত ঠিক জানি। আমার কথা কাউকে বলবার নয়, কিন্তু এ ব্যথা যদি পেতে, ত বুঝতে বৌমা, ছোটজাত বলে মানুষকে ঘৃণা করার শাস্তি ভগবান প্রতিনিয়ত কোথা দিয়ে দিচ্চেন। এই যে কুলের মর্যাদা, এ যে কত বড় পাপ, কত বড় ফাঁকির বোঝা, এ যদি টের পেতে ত নিজের মেয়েটাকে এমন ক'রে বলি দিতে পারতে না। জাত আর কুলই সত্যি, আর দুটো মানুষের সমস্ত জীবনের সুখদুঃখ কি এত বড়ই মিথ্যে মা?

জগদ্ধাত্রী ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, তা হলে কি এই মিথ্যে নিয়েই পৃথিবী চলচে মা?

শাশুড়ী একটু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, পৃথিবী ত চলে না বৌমা,—চলে কেবল আমাদের মত অভিশপ্ত জাতের। আমি বিদেশে থাকি, অনেক বয়স হ'ল, অনেক দেখলাম, অনেক দুঃখ পেলাম,—আমি জানি যাকে বংশের মর্যাদা বলে ভাবচো, যথার্থ সে কি! কিন্তু কথাটা তোমাকে খুলে বলতেও পারব না, হয়ত বুঝতেও তুমি পারবে না। তবুও এই কথাটা আমার মনে রেখো মা, মিথ্যাকে মর্যাদা দিয়ে যত উঁচু ক'রে রাখবে তার মধ্যে তত গ্লানি, তত পঙ্ক, তত অনাচার জমা হয়ে উঠতে থাকবে। উঠচেও তাই।

জগদ্ধাত্রী কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মেয়েকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেলেন। সন্ধ্যা খিড়কির বাগানে এতক্ষণ তাহার ফুলগাছে জল দিতেছিল, বাড়িতে প্রবেশ করিয়া হাতের ঘটিটা প্রাঙ্গণের চাতালের উপর রাখিয়া দিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মায়ের প্রতি চাহিয়া কহিল, ও-কি মা? চন্দ্রপুলি বুঝি? বলিয়াই হঠাৎ পিতামহীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ঠাকুরমা, সক্কলের নাড়ু আছে, আমাদের নেই কেন?

কালীতারা সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন, তা ত আমি জানিনে দিদি।

সন্ধ্যা কহিল, বাঃ—তোমার শাশুড়ীকে বুঝি এ কথা জিজ্ঞেসা করোনি।

কালীতারা বলিলেন, কি ক'রে আর জিজ্ঞেস করব ভাই, জন্মে ত কোনদিন শ্বশুর-বাড়ির মুখ দেখিনি।

জগদ্ধাত্রী ইহা জানিতেন, তিনি লজ্জিত-মুখে নীরবে কাজ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ঠাকুরমা, তোমার সবসুদ্ধ কতগুলি সতীন ছিল? এক শ'? দু' শ'? তিন শ'? চার শ'?

ঠাকুরমা পুনরায় হাসিলেন—ঠিক জানিনে দিদি, কিন্তু অসম্ভবও নয়। আমার বিয়ে হয়েছিল আট বছর বয়সে, তখনই তাঁর পরিবার ছিল ছিয়াশিটি। তারপরেও অনেক বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু কত, সে বোধ হয় তিনি নিজেও জানতেন না, তা আমি জানব কি ক'রে?

সন্ধ্যা বলিল, আহা, তাঁর লেখা ত ছিল? সেই খাতাখানা যদি কেড়ে রাখতে ঠাকুরমা, তা হলে বাবাকে দিয়ে আমি খোঁজ করাতুম তাঁরা সব এখন কে কোথায় আছেন। হয়ত আমার কত কাকা, কত জ্যাঠামশাই, কত ভাই-বোন সব আছেন, না ঠাকুরমা? আহা, তাঁদের যদি সব জানতে পারা যেত!

একটুখানি হাসিয়াই প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ঠাকুরমা, ঠাকুদ্দামশাই কালে-ভদ্রে কখনো এলে তাঁকে ক' টাকা দিতে হ'তো? দর-দস্তুর নিয়ে তোমাদের সঙ্গে বুঝি ঝগড়া বেধে যেতো,—না?

জগদ্ধাত্রী রাগ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, জ্যাঠামি রেখে ঠাকুরের শেতলের জোগাড়টি সেরে ফেল্ দিকি সন্ধ্যে!

ঠাকুরমা নিজেও একটু হাসিয়া বলিলেন, সমস্তই ত জানো দিদি, কিন্তু তবু ত তোমাদের মোহ কাটে না!

এইসকল বিরুদ্ধ-আলোচনা জগদ্ধাত্রীর গোড়া হইতেই ভাল লাগিতেছিল না এবং মনে মনে তিনি বিরক্তও কম হইতেছিলেন না; শাশুড়ীর কথার উত্তরে বলিলেন, তখনকার

দিনের কথা জানিনে মা, কিন্তু এখন অত বিয়েও কেউ করে না, ওসব অত্যাচারও আর নেই। আর জন-কতক লোক যদি একসময়ে অন্যায় করেই থাকে, তাই বলে কি বংশের সম্মান কেউ ছেড়ে দেয় মা? আমি বেঁচে থাকতে ত সে হবে না।

গৃহস্বামিনী পুত্রবধূর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে শাশুড়ী নীরব রইলেন, কিন্তু সন্ধ্যা ব্যথিত হইয়া উঠিল; সে পিতামহীর আর একটু কাছে গিয়া কোমল-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু, কেন তাঁরা অমন অত্যাচার করতেন ঠাকুরমা? তাদের কি মায়াও হ'তো না?

ঠাকুরমা সন্ধ্যার হাত ধরিয়া তাহাকে পার্শ্বে টানিয়া লইয়া বলিলেন, মায়া কি ক'রে হবে দিদি? একটি রাত ছাড়া যার সঙ্গে আর জীবনে হয়তো কখনো দেখা হবে না, তার জন্যে কি কারো প্রাণ কাঁদে? আর সে অত্যাচার কি আজই থেমে গেছে? তোমার ওপরে যা হতে যাচ্চে সে কি কারও চেয়ে কম অত্যাচার দিদি?

জগদ্ধাত্রী হাতের কাজ রাখিয়া দিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত কঠোরস্বরে মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুই ঠাকুরঘরে যাবি, না আমি কাজকর্ম ফেলে রেখে উঠে যাবো সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা মায়ের মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কথাও কহিল না, উঠিবারও চেষ্টা করিল না। ধীরে ধীরে পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু, যে জিনিসটার এত সম্মান—এতদিন ধরে এমনভাবে চলে আসচে ঠাকুরমা, তাকে কি নষ্ট হতে দেওয়াই ভাল?

এবার শাশুড়ীও বধূর রুক্ষ-কথায় বিশেষ কর্ণপাত করিলেন না। নাতিনীর প্রশ্নের জবাবে বলিলেন, কিছু একটা দীর্ঘদিন ধরে কেবল চলে আসচে বলেই তা ভাল হয়ে যায় না দিদি, সম্মানের সঙ্গে হলেও না। মাঝে মাঝে তাকে যাচাই করে বিচার করে নিতে হয়। যে মমতায় চোখ বুজে থাকতে চায় সে-ই মরে। আমার সকল কথা কাউকে বলবার নয় ভাই, কিন্তু এ নিয়ে সমস্ত জীবনটাই না কি আমাকে অহরহ বিষের জ্বালা সইতে হয়েছে,—বলিতে বলিতে তাঁহার গলা যেন ভিতরের অব্যক্ত যাতনায় বুজিয়া আসিল।

সন্ধ্যা তাঁহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া আস্তে আস্তে বলিল, থাক গে ঠাকুরমা এ-সব কথা।

তিনি অন্য হাত দিয়া পৌত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া নীরবে আপনাকে আপনি একমুহূর্তেই সংবরণ করিয়া ফেলিলেন, তারপর সহজকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, সন্ধ্যা, দেশের রাজা একদিন শুধু গুণের সমষ্টি ধরেই ব্রাহ্মণকে কৌলীন্য-মর্যাদা দিয়ে শ্রেণীবিন্ধ করেছিলেন, তারপরে আবার এমন দুর্দিনও একদিন এসেছিল যেদিন এই দেশেরই রাজার আদেশে তাঁদের বংশধরদের কেবল দোষের সংখ্যা গণনা করেই মেলবন্ধ করা হয়েছিল। যে সম্মানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ত্রুটি এবং অনাচারের উপর, তার ভিতরের মিথ্যেটা যদি জানতে দিদি, তা হলে আজ যে বস্তু তোমাদের এত মুগ্ধ করে রেখেচে, শুধু কেবল সেই কুল নয়—ছোটজাত বলে যে দুলে-মেয়ে দুটোকে তোমরা তাড়িয়ে দিলে, তাদেরও ছোটো বলতে তোমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট হ'তো।

জগদ্ধাত্রী ক্রোধ এবং বিরক্তি আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু সন্ধ্যা চুপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার সত্যবাদিনী সন্ন্যাসিনী পিতামহী ভিতরের কি একটা 'অত্যন্ত-লজ্জা ও ব্যথার ইতিহাস কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহার বুক ফাটিতেছে। তাহার হঠাৎ মনে হইল, তাহার পিতামহের বহুবিবাহের সহিত ইহার কি যেন একটা ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সে সলজ্জে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি ঠাকুরমা, আমাদের মধ্যে খুব বেশী অনাচার প্রবেশ করেচে? যা নিয়ে আমরা এত গর্ব করি তার কি অনেকখানি ভুয়ো?

পিতামহী কহিলেন, এর যে কতখানি ভুয়ো সে যে আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না! কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিতেও যে তাঁর চোখে জল আসিয়া পড়িল তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও সন্ধ্যার অবিদিত রহিল না। তিনি হাত দিয়া চোখ দুটি মুছিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, কিন্তু এখন আমি মাঝে মাঝে কি মনে করি জানিস সন্ধ্যা? মানুষে মানুষে ব্যবধানের এই যে মানুষের হাতে-গড়া গণ্ডি, এ কখনো ভগবানের নিয়ম নয়।

তাঁর প্রকাশ্য মিলনের মুক্ত সিংহদ্বারে মানুষে যতই কাঁটার উপর কাঁটা চাপায়, ততই গোপন গহ্বরে তার অত্যাচারের বেড়া অনাচারে শতচ্ছিদ্র হতে থাকে। তাদের মধ্যে দিয়ে তখন পাপ আর আবর্জনাই কেবল লুকিয়ে প্রবেশ করে।

অতঃপর কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার নিশ্চয় মনে হইতে লাগিল, ইহার সহিত তাহার পিতামহের বহুবিবাহের সত্যই কি একটা কদর্য সম্বন্ধ আছে এবং কিছু না বুঝিয়াও তাহার কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল।

ঠাকুরমা বলিলেন, যাও দিদি, ঠাকুরঘরের কাজটি সেরে ফেল গে, নইলে তোমার মা বড় রাগ করবেন।

সন্ধ্যা অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, তিনি নিজেই করে নেবেন এখন। বলিয়াই সে তাঁহার একটা হাত ধরিয়া কহিল, চল না ঠাকুরমা আমার ঘরে গিয়ে একটু সেকালের গল্প করবে!

এই বলিয়া সে একরকম জোর করিয়া তাঁহাকে টানিয়া তুলিয়া নিজের ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

[খ]

রাত্রি খুব বেশী হয় নাই, বোধ হয় একপ্রহর হইয়া থাকিবে, কিন্তু শীতের দিনের পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে অত্যন্ত গভীর মনে হইতেছিল। জ্ঞানদার শয়ন-কক্ষের এক কোণে একটা মাটির প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। ঘরের মেঝেয় বসিয়া জ্ঞানদা এবং তাহারই অদূরে বসিয়া রাসমণি হাত-মুখ নাড়িয়া বুঝাইয়া বলিতেছেন, কথা শোন্ জ্ঞানদা, পাগলামি করিস নে। ওষুধটুকু দিয়ে গেছে—খেয়ে ফ্যাল্। আবার যেমন ছিল সব তেমনি হবে, কেউ জানতেও পারবে না।

জ্ঞানদা অশ্রুরুদ্ধ-স্বরে বলিল, এমন কথা আমাকে তোমরা কেমন করে বল দিদি! পাপের ওপর এতবড় পাপ আমি কি করে করব? নরকেও যে আমার জায়গা হবে না!

রাসমণি ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, আর এতবড় কুলে কালি দিয়েই বুঝি তুমি স্বর্গে যাবে ভেবেচ? যা রয় সয় তাই কর্ জ্ঞানদা, আদিখ্যেতা করে এতবড় একটা দেশপুজ্যি লোকের মাথা হেঁট করে দিসনে।

জ্ঞানদা হাতজোড় করিয়া কাঁদিয়া বলিল, ও আমি কিছুতে খেতে পারব না, আমাকে বিষ দিয়ে তোমরা মেরে ফেলবে, আমি টের পেয়েচি।

রাসমণি মুখখানা অতিশয় বিকৃত করিয়া কহিলেন, তবে, তাই বল্ মরবার ভয়ে খাব না। মিছে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিস নে।

জ্ঞানদা কহিল, কিন্তু ও যে বিষ!

রাসমণি বলিলেন, বিষ তা তোর কি? তুই ত আর মরচিস নে। বলিয়াই তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর চক্ষের নিমিষে কোমল ও করুণ করিয়া কহিলেন, পাগলী আর বলে কাকে! আমরা কি তোকে খারাপ জিনিস খেতে বলতে পারি বোন? এ কি কখনো হয়? রাসী-বামনীকে এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? তা নয় দিদি—কপালের দোষে যে শত্রুটা তোর পেটে জন্মেচে, সেই আপদ-বালাইটা ঘুচে যাক—কতক্ষণেরই বা মামলা! তারপরে যা ছিলি তাই হ—খা, দা, ঘুরে বেড়া, তীর্থ-ধর্ম্ম বার-ব্রত কর্—এ কথা কে-ই বা জানবে, আর কে-ই বা শুনবে!

জ্ঞানদা অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে আনতে বলে দি' বোন?

জ্ঞানদা মুখ তুলিল না, কিন্তু কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, না, আমি ওসব কিছুতেই খাবো না—আমি কখ্খনো তা হলে আর বাঁচব না।

রাসমণি ভয়ানক রাগ করিয়া বলিলেন, এ ত তোর ভারী ছিষ্টিছাড়া অন্যায় জ্ঞানদা? খেতে না চাস্, যা এখান থেকে। পুরুষ মানুষ, একটা অ-কাজ না হয় করেই ফেলেচে, তা বলে মেয়েমানুষের এমনি জিদ ধরলে ত চলে না। চাটুয্যেদাদা ত বলেচেন, বেশ, যা

হবার হয়েচে, ওকে আমি পঞ্চাশটা টাকা দিচ্চি, ও কাশী-বৃন্দাবনে চলে যাক। তারপরে ত তাঁকে আর দোষ দিতে পারিনে জ্ঞানদা? টাকাটাও ত কম নয়? একসঙ্গে একমুঠো!

জ্ঞানদা কহিল, আমি টাকা চাইনে দিদি, টাকা নিয়ে আমি কি করব? আমি যে কাউকে কোথাও চিনিনে—আমি কেমন করে কার কাছে গিয়ে এ মুখ নিয়ে দাঁড়াব?

রাসমণি বলিলেন, এ তোমার জব্দ করার মতলব নয় জ্ঞানদা? লোকে কথায় বলেচে কাশী-বৃন্দাবন! এত লোকের স্থান হয়, আর তোমারই হবে না?

জ্ঞানদা খানিকক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, রাসুদিদি, আমি সব জানি। কাল ওঁর প্রাণকৃষ্ণ মুখুয্যের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে, তাও জানি। আজ, তাই আমাকে বিষ দিয়ে হোক, কাশীতে পাঠিয়ে হোক, বাড়ি থেকে দূর করা চাই। কিন্তু ভগবান! বলিতে বলিতে সে সহসা ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কহিতে লাগিল, ভগবান! তোমার পায়ে এত লোকের যখন স্থান হয়, তখন আমারও হবে। কিন্তু ছেলেবেলা থেকে কখনো কোন পাপ করিনি, হয়ত কখনো করতেও হ'তো না—কিন্তু তুমি ত সব জানো? এর সমস্ত শাস্তির বোঝা কি কেবল নিরুপায় বলে আমার মাথাতেই তুলে দেবে?

ভগবানের নামে রাসমণির বোধ করি বিরক্তির অবধি রহিল না, তিনি ধমক দিয়া বলিলেন, আ-মর্! শাপমন্যি দিস কেন? কচি খুকি! চোর মরে সাত বাড়ি জড়িয়ে,—এ হয়েচে তাই। তুমি আশকারা না দিলে পুরুষমানুষের দোষ কি! কৈ বলুক ত দেখি এমন ব্যাটাছেলে কে আছে রাসী বামনীকে—

ইহার আর উত্তর কি? জ্ঞানদা নীরবে অঞ্চলে চোখ মুছিতে লাগিল। রাসমণি অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বলিলেন, বেশ ত জ্ঞানদা, ক্যাওরা-বৌয়ের ওষুধ খেতে যদি তোমার ভয় হয়, প্রিয় মুখুয্যেকে ত বিশ্বেস হয়? সেই না হয় একটা কিছু দেবে যাতে—

জ্ঞানদা অবাক হইয়া বলিল, তিনি দেবেন?

রাসমণি বলিলেন, হুঁ! দেবে না আবার! চাটুয্যেদাদা বললে দিতে পথ পাবে না। খবর দেওয়া হয়েচে, এসে পড়ল বলে! তখন কিন্তু না বললে আর হবে না বলে দিচ্চি।

জ্ঞানদা চুপ করিয়া রহিল। রাসমণি অধিকতর উৎসাহজনক আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অদূরে প্রাঙ্গণে জুতার শব্দ এবং প্রিয় মুখুয্যের গলা শোনা গেল—আঃ! এখানে একটা আলো দেয় না কেন? লোকজন সব গেল কোথায়?—বলিতে বলিতে খটখট করিয়া তিনি ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বগলে চাপা ছোট-বড় চার-পাঁচখানা বই তক্তপোশের উপর এবং হাতের বাক্সটা নীচে রাখিতে রাখিতে বলিলেন, আজ কেমন আছ জ্ঞানদা? উঁহু হুঁ,—ও চলবে না, ও চলবে না—ঠাণ্ডা পড়েচে, মাটিতে বসা চলবে না—রেমিডিটা একটু পালটে দিতে হলো দেখচি! এ কে, মাসী যে! কতক্ষণ? ভালো ত সব? তোমার নাতনীটিকে কাল রাস্তায় দেখলাম—তেমন ভাল বলে ত মনে হ'লো না? ক্ষিদে কেমন? কাল নিয়ে গিয়ে তার জিভটা একবার দেখিয়ো দিকি। মরবার ফুরসত নেই, কোন্‌দিকে যে যাই! যেদিকে নজর না রাখব অমনি—কাল মেয়েটার বিয়ে—মাসী, কাল কিন্তু সকালবেলাতেই যাওয়া চাই। মেয়ের বিয়ে, কাল কিছু আর বা'র হ'তে পারব না, —কিন্তু রোগীগুলোর কি যে হবে তাই কেবলি ভাবচি। একটা আধটা ত নয়! এমনি হয়েচে যে প্রিয় মুখুয্যেকে ছেড়ে কেউ আর বিপ্‌নেকে ডাকতেই চায় না। তারই বা চলে কি করে? দুঃখও হয়, তবু যা হোক একটু শিখেচে ত! দাও হাতটা একবার দেখি। পঞ্চা গয়লার শুনলাম বুকে সর্দি বসে গেছে—খপ্ করে একবার দেখে আসতে হবে। দাও হাতটা একবার—

জ্ঞানদা হাত বাড়াইয়া দিল না, নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

রাসমণি বলিলেন, ছুড়ীর ব্যারামটা কি ঠাওরালে বল দিকি জামাই?

প্রিয় তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, ডিজিস্—গরহজম, অজীর্ণ—অম্বল! অম্বল!

কিন্তু প্রশ্নকারিণীর মৃদু মৃদু শিরশ্চালনা দেখিয়া তাঁহার ডাক্তারি-বিদ্যা একেবারে নিবিবার উপক্রম করিল। ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, কেন, কেন? নয় কেন? বিপ্‌নে এসেছিল বুঝি? কি বললে সে? কৈ দেখি, কি ওষুধ দিয়ে গেল?

রাসমণির মুখে সত্য-মিথ্যা, উগ্র-কোমল, ভাল-মন্দ কিছুই বাধে না, ভূমিকা করিয়া

কথা কহিবার প্রয়োজন তাঁহার দৈবাৎ ঘটে—কিন্তু তবুও তাঁহাকে আজ সাবধান হইতে হইল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, বিপিন ডাক্তারকেও ডাকা হয়নি, পরাণ চাটুয্যেও আসেনি—তোমার কাছে কি আবার তারা? ডাক্তারির তারা জানে কি? এ কথা চাটুয্যে-দাদা যে সকলের কাছে বলে বেড়ায়।

বলবে না? এ যে সবাই বলবে। বিপ্‌নেকে যে আমি দশ বচ্ছর শেখাতে পারি। সেবার পল্‌সেটিলা দিয়ে—

মাসী বললে, তা ছাড়া ছুড়ী এমন কাণ্ড করে বসল বাবা যে, আপনার লোক ছাড়া পরকে ডাকবার পর্যন্ত জো নেই।

প্রিয় উত্তপ্ত হইয়া কহিলেন, আমি থাকতে পর ঢুকবে এখানে ডাক্তারি করতে! তবে কি জানো মাসী, এ-সব রোগে একটু টাইম লাগে—কিন্তু, তাও বলে যাচ্চি, দুটির বেশী তিনটি রেমিডি আমি দেব না। কেমন জ্ঞানদা, গা-বমিটা আমার দুটি ফোঁটা ওষুধে থামল কিনা? ঠিক বল?

জ্ঞানদার আনত-শির একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিল। তাহার হইয়া রাসমণি বলিলেন, তোমাকে ছাড়া ও আর কাউকে বিশ্বাস করে না বাবা, তোমার ওষুধ যেন ওর ধন্বন্তরি। কিন্তু ব্যামোটা যে তা নয় পিওনাথ। অদিষ্টের ফেরে পোড়া-কপালীর অসুখটা যে হয়ে দাঁড়িয়েচে উলটো!

প্রিয় হাতটা তুলিয়া কহিলেন, উলটো নয় মাসী, উলটো নয়। বিপ্‌নে মিত্তিরের হাতে পড়লে তাই হয়ে দাঁড়াত বটে, কিন্তু কিছু ভয় নেই, এ প্রিয় মুখুয্যে!

রাসমণি ললাটে একটুখানি করাঘাত করিয়া বলিলেন, তুমি বাঁচাও ত ভয় নেই সত্যি, কিন্তু সর্বনাশী যে এদিকে সর্বনাশ করে বসেচে! এখন তার মত একটু ওষুধ দিয়ে উদ্ধার না করলে যে কুলে কালি পড়বার জো হ'লো বাবা।

কিন্তু এত বড় অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কাছেও তাঁহার শেষ কথাটা যে বেশ প্রাঞ্জল হইয়া উঠিল না, তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া মাসী চক্ষের নিমিষে অনুভব করিলেন, এবং ইহাই যথেষ্ট পরিস্ফুট করিতে প্রিয়নাথকে তিনি ঘরের একধারে টানিয়া লইয়া গিয়া কানে কানে গুটিকয়েক কথা বলিতেই সে চমকাইয়া উঠিয়া কহিল, বল কি মাসী? জ্ঞানদা—?

মাসী কহিলেন, কি আর বলব বাবা, কপালের লেখা কে খণ্ডাবে বল? এখন দাও একটু ওষুধ পিওনাথ, যাতে গোলোক চাটুয্যের উঁচু মাথা না নীচু হয়। একটা দেশের মাথা, সমাজের শিরোমণি! পুরুষমানুষ—তার দোষ কি বাবা? কিন্তু তার ঘরে এসে তুই ছুড়ি কি ঢলাঢলিটা করলি বল্ দিকি!

প্রিয়র মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। একবার জ্ঞানদার মুখখানা তিনি দেখিবার চেষ্টা করিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে কহিলেন, তোমরা বরঞ্চ বিপিন ডাক্তারকে খবর দাও মাসী, এ-সব ওষুধ আমার কাছে নেই। বলিয়া তিনি হেঁট হইয়া নিজের বাক্সটা এবং বইগুলো সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাসমণি আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, বল কি পিওনাথ, আর কি পাঁচ-কান করা যায়? হাজার হোক তুমি আপনার জন, আর বিপিন ডাক্তার পর, শূদ্দুর, বামুনের মান-মর্যাদা কি তারে বলা যায়?

কিন্তু বলিবার পূর্বেই সহসা দ্বার খুলিয়া নিঃশব্দে গোলোক প্রবেশ করিলেন এবং প্রিয়র বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন, বিষের ভয়ে ও যে আর কারও ওষুধ খেতে চায় না বাবা, নইলে কষ্ট তোমাকে দিতাম না। এ বিপদটি তোমাকে উদ্ধার করতেই হবে, প্রিয়নাথ।

প্রিয় হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, না, না, ওসব নোংরা কাজের মধ্যে আমি নেই। আমি রোগী দেখি, রেমিডি সিলেক্ট করি, ব্যস্! বিপিন-টিপিনকে ডেকে পরামর্শ করুন—আমি ওসব জানি-টানিনে। বলিয়া আর একবার তিনি বইগুলো বগলে চাপিবার আয়োজন করিলেন।

গোলোক সেই হাতটা তাহার আর একবার নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ গলায় কহিতে লাগিলেন, প্রিয়নাথ, বুড়োমানুষের কথাটা রাখো বাবা। সম্পর্কে

তোমার আমি শ্বশুরেই হই। রাখবে না জানলে যে তোমাকে আমরা বলতাম না! দোহাই বাবা, একটা উপায় করে দাও—হাতে ধরচি তোমার—

প্রিয়নাথ হাতটা পুনরায় ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, সম্পর্কে শ্বশুর হ'ন বলে কি আপনার কথায় জীবহত্যা করব? আচ্ছা লোক ত আপনি! পরলোকে জবাব দেব কি!

গোলোক দ্বারের কাছে সরিয়া গেলেন। তাঁহার মুখের চেহারা, চোখের ভাব, গলার স্বর সমস্তই যেন অদ্ভুত জাদুবলে এক নিমিষে পরিবর্তিত হইয়া গেল। কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত রাত্রে তুমি ভদ্রলোকের বাড়ির ভেতরে ঢুকেচ কেন? এখানে তোমার কি দরকার?

প্রশ্ন শুনিয়া প্রিয় শুধু আশ্চর্য নয়, হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; বলিলেন, কি দরকার! বাঃ—বেশ ত! চিকিৎসা করতে কে ডেকে পাঠালে? বাঃ—

গোলোক চীৎকার করিয়া উঠিলেন, বাঃ—? চিকিৎসার তুই কি জানিস হারামজাদা নচ্ছার। কে তোকে ডেকেচে? কোথা দিয়ে বাড়ি ঢুকলি? খিড়কির দরজা কে তোকে খুলে দিলে?

জ্ঞানদার প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, হারামজাদী! তাই অন্ধ শ্বশুর কেঁদে কেঁদে ফিরে গেল, যাওয়া হ'লো না! বুড়ো শাশুড়ী মরে—আমি নিজে কত বললুম, জ্ঞানদা যাও, এ-সময়ে তাঁর সেবা করো গে। কিছুতে গেলিনে এইজন্যে? রাত-দুপুরে চিকিচ্ছে করাবার জন্যে? দাঁড়া হারামজাদী, কাল যদি না তোর মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গ্রামের বার করে দিই ত, আমার নাম গোলোক চাটুয্যেই নয়।

জ্ঞানদার মাথায় কাপড় নাই—কখন পড়িয়া গেছে জানিতেই পারে নাই—মুখেও কথা নাই—কেবল দুইচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সে যেন একেবারে পাথর হইয়া রহিল।

গোলোক রাসমণির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, রাসু, চোখে দেখলি ত এদের কাণ্ড? আমি দশখানা গ্রামের সমাজের কর্তা, আমার বাড়িতে পাপ! এ যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হ'লো রে!

রাসমণি নিজেও এতক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়াছিলেন, কহিলেন, হ'লোই ত দাদা!

গোলোক কহিলেন, কিন্তু সাক্ষী রইলি তুই।

রাসমণি কহিল, রইলুম বৈ কি। আমি বলি, রাত্রিতে ত একটু হাত আজাড় হ'লো—দেখে আসি জ্ঞানদা কেমন আছে, দেখি, না বেশ দুটিতে বসে বসে হাসি-তামাশা, খোস-গল্প হচ্ছে।

জ্ঞানদা ইহার কোন উত্তর দিল না, তেমনি প্রসারিত-চক্ষে পাষাণমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিল।

প্রিয় আচ্ছন্ন অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া ছিলেন, গোলোক ছোঁ মারিয়া তাঁহার হাত হইতে বইগুলি কাড়িয়া লইয়া তাঁহার গলায় সজোরে একটা ধাক্কা মারিয়া বলিলেন, বেরো ব্যাটা পাজী নচ্ছার আমার বাড়ি থেকে। কি বলব, তুই রামতনু বাঁড়ুয্যের জামাই, নইলে জুতিয়ে আজ আধ-মরা করে তোকে থানায় চালান দিতাম! বলিয়া পুনশ্চ একটা ধাক্কা দিলেন এবং যে চাকর-দাসীরা গোলযোগ শুনিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদেরই মধ্য দিয়া তাঁহাকে বারংবার ঠেলিতে ঠেলিতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন।

প্রিয় বলিতে বলিতে গেলেন, বাঃ—বেশ মজা ত!

চাকর-দাসীরাও সঙ্গে সঙ্গে গেল এবং রাসমণি নীরবে তাহাদেরই পিছনে পিছনে নিঃসাড়ায় সরিয়া পড়িলেন।

রহিল কেবল জ্ঞানদা—তেমনি নিশ্চল, তেমনি বাক্যহীন, তেমনি অচেতন মূর্তির মত বসিয়া।

[গ]

আজ সমস্ত দিন ধরিয়াই কাছে ও দূর হইতে সানাইয়ের করুণ সুর মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছিল। অঘ্রানের আজিকার দিনটি ছাড়া অনেকদিন পর্যন্ত বিবাহের দিন নাই;

তাই বোধ হয় এই ছোট গ্রামখানির মধ্যেই প্রায় চার-পাঁচটা বাড়িতে শুভ-বিবাহের আয়োজন চলিয়াছে। আজ সন্ধ্যার বিবাহ।

নানা কারণে অরুণ এখনো পর্যন্ত বাসস্থান ও জন্মভূমি পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিয়া তুলিতে পারে নাই। পূর্বের মত আবার সে কাজকর্মও শুরু করিয়াছে। বাহির হইতে জীবনে তাহার কোন পরিবর্তনও দেখা যায় না, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই দেখা যাইতে পারিত যে, দেশের প্রতি মমতাবোধটা তাহার যেন একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। যে-সকল হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত তাহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সংস্রব ছিল, তাহারা যেন তেমনি দূরে সরিয়া গিয়াছে। গ্রামে সে 'একঘরে', এতগুলো বিবাহ-বাটীর কোনটা হইতেই তাহার নিমন্ত্রণ ছিল না, সামাজিকতা রাখিতে তাহার কোথাও যাইবার নাই, আজ সকল বাটীর দরজাই তাহার কাছে রুদ্ধ।

সন্ধ্যার পর হইতে তাহার দোতলার পড়িবার ঘরটিতে সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শীতের হাওয়া বহিতেছে, কিন্তু তবুও ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করা হয় নাই—সব কয়টাই খোলা খাঁখাঁ করিতেছিল। নির্মেঘ নির্মল আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় ভাসিয়া যাইতেছে, তাহারই একটুকরা পিছনের মুক্ত বাতায়নের ভিতর দিয়া আসিয়া তাহার পায়ের কাছে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার সম্মুখের খোলা বারান্দার অদূরে একটা ছোট নারিকেল বৃক্ষের মাথার উপর পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নার আলোক পড়িয়া ঝকঝক করিতেছিল, সে তাহার প্রতি অর্ধ-জাগ্রত অর্ধ-নিদ্রাতুরের ন্যায় চাহিয়া কি যে ভাবিতেছিল তাহার কোন ঠিকানা ছিল না। পাচক আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে, ক্ষুধা নাই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল, এবং দেওয়ালে একটা অন্ধকার স্থান হইতে ঘড়িতে এগারটা বাজিয়া তাহার শোবার সময়টা নির্দেশ করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও আজ তাহার নড়িবার ইচ্ছাই হইল না, যেমন ছিল তেমনি নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ তাহার কানে সদর দরজায় করাঘাতের আওয়াজ এবং পরক্ষণে তাহা খোলার শব্দও শুনিতে পাইল। একবার ইচ্ছা করিল ডাকিয়া হেতু জিজ্ঞাসা করে, কারণ, পল্লীগ্রামে এত রাত্রে সহজে কেহ কাহারও বাটীতে যায় না, কিন্তু উদ্যমের অভাবে প্রশ্ন করা হইল না।

কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। মুহূর্ত-কয়েক পরেই দ্বারপ্রান্তে নূতন রেশমের শাড়ীর প্রবল খসখস শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই কে একজন ঝড়ের মত ঢুকিয়া তাহার পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল।

অরুণ শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল জ্যোৎস্নার আলোকে ইহার পরিধানের রাঙ্গা চেলী চকচক করিতেছে। এ যে কে, তাহা চক্ষের নিমেষে উপলব্ধি করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা সেই মুহূর্তেই একেবারে শুকাইয়া উঠিল। সে যে কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

কিন্তু তাহারও সময় রহিল না। একটা ভয়ানক মর্মান্তিক চাপা কান্নার অকস্মাৎ ঘরের বাতাস, ঘরের আঁধার, ঘরের ম্লান আলোক, ঘরের যাহা-কিছু সমস্ত একসঙ্গে একমুহূর্তে যেন চিরিয়া খানখান হইয়া গেল।

মিনিট দুই-তিন হতবুদ্ধির ন্যায় নিঃশব্দে থাকিয়া অরুণ একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি সন্ধ্যা?

সন্ধ্যা মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার পরিধানের রাঙ্গা চেলীর সঙ্গে সর্বাঙ্গের অলঙ্কার জ্যোৎস্নায় জ্বলিতে লাগিল, সুন্দর ললাটে চন্দ্ররশ্মি পড়িয়া চন্দনের পত্রলেখা দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারই ঈষৎ নিম্নে অশ্রুভরা আয়ত চোখ দুটি জ্বলজ্বল করিতে লাগিল। নারীর এমন রূপ অরুণ আর কখনো দেখে নাই, সে যেন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

সন্ধ্যা কহিল, অরুণদা, আমি পিঁড়ি থেকে পালিয়ে এসেচি তোমাকে নিয়ে যেতে। আর আমার লজ্জা নেই, ভয় নেই, মান-অপমানের জ্ঞান নেই—তুমি ছাড়া আজ আর আমার পৃথিবীতে কেউ নেই—তুমি চল।

কোথায় যাব?

যেখান থেকে এইমাত্র একজন উঠে চলে গেল—সেই আসনের উপরে।

অরুণ মনে মনে অত্যন্ত আহত হইল। কাণ্ডটা কি ঘটিয়াছে সে বুঝিল। কিছু একটা কলহের পর বর-পক্ষীয়েরা জোর করিয়া পাত্র তুলিয়া লইয়া গেছে। হিন্দুসমাজে এরূপ দুর্ঘটনা বিরল নহে, তাই সেই অপরের পরিত্যক্ত আসনে অকস্মাৎ তাহার ডাক পড়িয়াছে। যেমন করিয়াই হউক, আজ সন্ধ্যার বিবাহ হওয়া চাই-ই।

কিন্তু নিজে আঘাত খাইলেও অরুণ প্রতিঘাত করিতে পারিল না, বরঞ্চ সস্নেহ ভর্ৎসনার কণ্ঠে কহিল, ছিঃ—তোমার নিজে আসা উচিত হয়নি সন্ধ্যা। এমন ত প্রায়ই ঘটে—তোমার বাবা কিংবা আর কেউ ত আসতে পারতেন?

বাবা? বাবা ভয়ে কোথায় লুকিয়েচেন! মা পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন, তাঁকে ধরাধরি করে তুলেচে। আমি সেইসময়ে তোমার কাছে ছুটে এসে পড়েচি। উঃ—এত বড় সর্বনাশ কি পৃথিবীতে আর কারও হয়েচে? আমরা বাঁচব কি করে?

তাহার শেষ কথাটায় অরুণ পুনরায় ঘা খাইল। কহিল, কিন্তু আমাকে দিয়ে ত তোমাদের কুল রক্ষা হবে না সন্ধ্যা, আমি যে ভারী ছোট বামুন! কিন্তু দেশে আরও অনেক কুলীন আছে—তোমার বাবা হয়ত এতক্ষণ সেই সন্ধানেই গেছেন।

সন্ধ্যা কাঁদিয়া বলিল, না, না, না অরুণদা—বাবা কোথাও যাননি, তিনি ভয়ে পালিয়ে গেছেন। আমাকে আর কেউ নেবে না—কেউ বিয়ে করবে না। কেবল তুমি ভালোবাসো,—কেবল তুমিই আমার চিরদিন মান রাখো।

তাহার ভয়ানক উচ্ছৃংখল অবস্থায় অরুণ ক্লেশ বোধ করিল, হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে সন্ধ্যা বাধা দিয়া বলিল, না আমি উঠব না—যতক্ষণ পারি তোমার পায়ের কাছেই পড়ে থাকব। কুলরক্ষা হবে না বলছিলে? কার কুল অরুণদা? আমি ত বামুনের মেয়ে নই—আমি নাপিতের মেয়ে! তাও ভাল মেয়ে নই। আজ আমার ছোঁয়া জল কেউ খাবে না! উঃ! এত বড় শাস্তি আমাকে তুমি কেন দিলে ভগবান! আমি তোমার কি করেছিলাম!

অরুণ চমকাইয়া উঠিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল বুঝি বা সন্ধ্যা প্রকৃতিস্থা নয়। হয়ত এ-সমস্তই তাহার উষ্ণমস্তিষ্কের উদ্ভট বিকৃত কল্পনা। হয়ত বা এ-সকল কিছুই ঘটে নাই—সে পলাইয়া আসিয়াছে—বাড়িতে তাহাদের এতক্ষণ হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। তাহাকে শান্ত করিয়া বাড়ি পাঠাইবার অভিপ্রায়ে সস্নেহে মাথায় হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা, চল সন্ধ্যা, তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই।

সন্ধ্যা গড় হইয়া প্রণাম করিয়া তাহার পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া বলিল, চল। তুমি যে যাবে সে আমি জানতুম। কিন্তু আমার সমস্ত কথা শুনে তবে চল—নইলে কি জানি, তুমিও হয়ত—কি বলেছিলুম তোমাকে একদিন? ছোট বামুন, না? আজ বোধ হয় সেই পাপেই কেবল প্রমাণ হয়ে গেল আমি বামুনের মেয়ে নই। উঃ—আমরা বেঁচে থাকব কি করে অরুণদা?

তাহার মানসিক যাতনার পরিমাণ দেখিয়া অরুণের মন আবার দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিল, তাহার মনে হইল হয়ত বা যথার্থই কি একটা ঘটিয়াছে—হয়ত বা সে সত্য ঘটনাই বিবৃত করিতেছে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কে এ কথা প্রমাণ করলে?

কে? গোলোক চাটুয্যে। হাঁ, সেই। কি আমাকে সে বলেছিল জানো? জানো না? আচ্ছা, থাক তবে সে কথা। মা আমাকে সম্প্রদান করতে বসেছিলেন, আমার ঠাকুরমা চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। এমনি সময়ে মৃত্যুঞ্জয় ঘটক দু'জন লোক সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হ'লো। একজন তাঁকে ডেকে বললে, তারাদিদি, আমাদের চিনতে পার? একজন আমার মাকে দেখিয়ে বললে, তুমি ছেলের বিয়ে দিয়ে এই বামুনের মেয়ের জাত মেরেচ—আবার কেন নাতনীর বিয়ে দিয়ে এদের জাত মারচ? তারপরে, বাবাকে আঙুল দেখিয়ে সবাইকে ডেকে বললে, তোমরা সবাই শোন, এই যাকে তোমরা পরম কুলীন প্রিয় মুখুয্যে বলে জানো—সে বামুন নয়, সে হিরু নাপ্তের ছেলে।

অরুণ বলিয়া উঠিল, এ-সমস্ত তুমি কি বকে যাচ্ছ সন্ধ্যা?

কিন্তু সন্ধ্যা বোধ করি এ প্রশ্ন শুনিতেই পাইল না—নিজের কথার সূত্র ধরিয়া বলিতে লাগিল, মৃত্যুঞ্জয় ঘটক গঙ্গাজলের ঘটটা ঠাকুরমার সামনে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,

বলুন সত্যি কিনা? বলুন ও কার ছেলে? মুকুন্দ মুখুয্যের, না হীরু নাপিতের? বলুন? অরুণদা, আমার সন্ন্যাসিনী ঠাকুরমা মাথা হেঁট করে রইলেন, কিছুতেই মিথ্যা বলতে পারলেন না। ওগো! এ সত্যি, এ সত্যি, এ ভয়ঙ্কর সত্যি! সত্যিই আমাদের তোমরা যা বলে জানতে তা আমি নই। তোমার সন্ধ্যা বামুনের মেয়ে নয়!

অরুণের মনের মধ্যে সংশয়ের আর লেশমাত্র অবকাশ রহিল না, শুধু বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, একজন তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললে, সে তাদের গ্রামের লোক। বললে, আট বছর বয়সে ঠাকুরমার বিয়ে হয়, তারপরে চোদ্দ-পনর বছর পরে একজন এসে জামাই বলে—মুকুন্দ মুখুয্যে বলে পরিচয় দিয়ে বাড়ি ঢোকে। পাঁচ টাকা আর একখানা কাপড় নিয়ে সে দু'দিন বাস করে চলে যায়।—ওঃ—ভগবান!

অরুণ তেমনি নির্বাক্ নিশ্চল হইয়া রহিল।

সন্ধ্যা কহিল, কি বলছিলাম অরুণদা? হাঁ, হাঁ—মনে পড়েচে। তারপর থেকে লোকটা প্রায়ই আসত। ঠাকুরমা বড় সুন্দরী ছিলেন—আর সে টাকা নিত না। তারপরে একদিন যখন সে হঠাৎ ধরা পড়ে গেল, তখন বাবা জন্মেছেন। উঃ—আমি মা হলে গলা টিপে মেরে ফেলতাম, বড় হতে দিতাম না।—কি বলছিলাম?

অরুণ অস্ফুট-স্বরে বলিল, লোকটা ধরা পড়ে গেল?

সন্ধ্যা বলিল, হাঁ হাঁ, তাই। ধরা পড়ে গেল। তখন সে কি কথা স্বীকার করলে জানো? বললে, এ কুকাজ সে নিজের ইচ্ছেয় করেনি, তার মনিব মুকুন্দ মুখুয্যের আদেশেই করেচে। একে বুড়োমানুষ, তাতে পাঁচ-সাত বছর থেকে বাতে পঙ্গু, তাই অপরিচিত স্ত্রীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ভার তার উপরে দিয়ে বলেছিলেন, হিরু, তুই বামুনের পরিচয় মুখস্থ কর্, একটা পৈতে তৈরি করে রাখ্, এখন থেকে যা-কিছু রোজগার করে আনবি তার অর্ধেক ভাগ পাবি।

অরুণ চমকিয়া বলিল, এ কাজ সে আরও করেছিল নাকি?

সন্ধ্যা কহিল, হাঁ, আরও দশ-বারো জায়গা থেকে সে এমনি করে প্রভুর জন্যে রোজগার করে নিয়ে যেত। সে আরও কি বলেছিল জানো? বলেছিল, এ কাজ নূতনও নয়, আর তার মনিবই কেবল একলা করেন না—এমন অনেক ব্রাহ্মণই দূরাঞ্চলে বখরায় কারবারে অপরের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

অরুণ ক্রোধে গর্জন করিয়া বলিল, খুব সম্ভব সত্যি। নইলে ব্রাহ্মণ-কুলে গোলোকের মত কসাই বা জন্মায় কি করে? অথচ, এরাই সমস্ত হিন্দুসমাজের মাথায় বসে আছে।

তারপর ঠাকুরমা আমার বাবাকে নিয়ে কাশী চলে গেলেন। সেই অবধি তিনি সন্ন্যাসিনী—সেই অবধি তিনি কোথাও মুখ দেখান না।

সন্ধ্যা পুনশ্চ কহিল, হিরু নাকি জিজ্ঞেসা করেছিল, ঠাকুরমশাই, পরকালে কি জবাব দেব? তার মনিব বলেছিলেন, সে পাপ আমার,—আমি তার জবাব দেব। হিরু জিজ্ঞেসা করেছিল, তাদের গতিই বা কি হবে ঠাকুর?

ঠাকুরমশাই হেসে বলেছিলেন, তারা আমার স্ত্রী, তোর নয়। তোর এত দরদ কিসের? যাদের চোখে দেখিনি, চোখে দেখব না, তাদের গতি কি হবে না হবে সে চিন্তা আমারই বা কি, তোরই বা কি! আমাদের চিন্তা টাকা রোজগার। অরুণদা, তাই সেদিন আমার ঠাকুরমা তোমার কথায় কেঁদে বলেছিলেন, সন্ধ্যা, জাতে কে ছোট, কে বড়, সে কেবল ভগবান জানেন—মানুষ যেন কাউকে কখনো হীন বলে ঘৃণা না করে। কিন্তু তখন ত ভাবিনি তার মানে আজ এমন করে বুঝতে হবে! কিন্তু রাত যে বেশী হয়ে যাচ্ছে—আমাকে নিয়ে তোমাকে কখনো দুঃখ পেতে হবে না অরুণদা, তোমার মহত্ত্ব, তোমার ত্যাগ আমি চির-জীবনে ভুলব না। বলিয়া সে নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

অরুণ অনিশ্চিত-কণ্ঠে সঙ্কোচের সহিত বলিল, কিন্তু এখন ত তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারিনে সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা চকিত হইয়া কহিল, কেন? তুমি সঙ্গে না গেলে আমি দাঁড়াব কোথায়? আমি বাঁচব কি করে?

এই আকুল প্রশ্নের জবাবটা অরুণ হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না; তারপরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিল, আজ আমাকে ক্ষমা কর সন্ধ্যা—আমাকে একটু ভাবতে দাও।

ভাবতে? এই বলিয়া সন্ধ্যা অবাক হইয়া একদৃষ্টে অরুণের প্রতি চাহিয়া বোধ করি বা অন্ধকারে যতদূর দেখা যায় তাহার মুখখানাই দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তারপরে একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা ভাবো। একটু নয়, বোধ হয় ভাববার সময় আজীবন পাবে। এতদিন আমিও ভেবেচি—দিনরাত ভেবেচি। যখন নিজের কাছে তোমাকে খুব ছোট করে দেখতে আমার বাধেনি, তখন এই কথাই ভেবেচি। আজ আবার তোমাদের ভাববার সময় এলো! আচ্ছা, চললুম,—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার অঙ্গের সুদীর্ঘ অঞ্চল স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে যথাস্থানে স্থাপিত করিতে গিয়া এতক্ষণে তাহার নিজের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, ভগবান! এই রাঙা চেলী, এই গায়ের গহনা, এই আমার কপালের কনে-চন্দন—এসব পরবার সময়ে এ কথা কে ভেবেছিল! বলিতে গিয়া তাহার কণ্ঠ ভাঙিয়া আসিল, সেই ভাঙ্গা গলায় বলিল, আমি বিদায় হ'লাম অরুণদা। বলিয়া আর একবার প্রণাম করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু দৃষ্টির বাহিরে সন্ধ্যা অন্তর্হিত হইতেই হঠাৎ যেন তাহার চমক ভাঙিয়া গেল—ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে চাকরটাকে বার বার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, শিবু, যা যা, সঙ্গে যা! বলিতে বলিতে সে নিজেই ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

[ঘ]

বাঁ হাতে প্রদীপ লইয়া প্রিয় মুখুয্যে কি কয়েকটা বস্তু বাক্স হইতে বাছিয়া বাছিয়া একটুকরা কাপড়ে রাখিতেছিলেন, হঠাৎ পিছনে ডাক শুনিলেন, বাবা—

কাজটা প্রিয় গোপনেই করিতেছিলেন, শশব্যস্তে হাতের প্রদীপটা রাখিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সাড়া দিলেন, কে? সন্ধ্যা? এই যে মা, যাই চলে,—আর দেরী হবে না—

সন্ধ্যা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, কি করছিলে বাবা?

প্রিয় থতমত খাইয়া বলিলেন, আমি? কৈ না,—কিছুই ত নয় মা!

সেই বস্ত্রখণ্ডটা দেখাইয়া সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল, ওতে কি বাবা? কি রাখছিলে?

ধরা পড়িয়া প্রিয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিলেন; কতকটা মিনতির সুরে কহিলেন, গোটা-কতক—বেশী নয় মা, রেমিডি সঙ্গে নিচ্ছিলাম, আর ঐ মেটিরিয়া মেডিকাখানা—বড়টা নয়, ছোটটা—ছিঁড়ে-খুঁড়েও গেছে—অচেনা জায়গা, যা হোক একটু প্র্যাক্‌টিস্ করতে ত হবে! তাই ভাবলাম—

মা কি তোমাকে এটুকুও দিতে চায় না বাবা?

প্রিয় অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িয়া কি যে জানাইলেন, ঠিক বুঝা গেল না।

তুমি কোথায় প্র্যাক্‌টিস্ করবে বাবা?

বৃন্দাবনে। সেখানে কত যাত্রী যায় আসে—তাদের ওষুধ দিলে কি মাসে চার-পাঁচ টাকাও পাব না সন্ধ্যে? তা হলেই ত আমার বেশ চলে যাবে!

খুব পাবে বাবা, তুমি আরও ঢের বেশি পাবে। কিন্তু সেখানে ত তুমি কাউকে জানো না? পরশু শেষরাত্রে ঠাকুরমা যখন কাশী চলে গেলেন, তুমি কেন তাঁর সঙ্গে গেলে না বাবা?

মার সঙ্গে? কাশীতে? না মা, আর আমি কাউকে জড়াতে চাইনে। আমার জন্যে তোমরা অনেক দুঃখ পেলে, আর আমি কাউকে দুঃখ দেব না। যতদিন বাঁচব ঐ অচেনা জায়গায় একলাই থাকব;

সন্ধ্যা পিতার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁহার হাত-দুটি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, কিন্তু আমি তোমাকে একলা থাকতে দেব না বাবা, আমি যে তোমার সঙ্গে যাব!

প্রিয় ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কন্যার মাথার উপর রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন, দূর পাগলি, সে কি কখনো হয়? আমার সংগে কোথায় যাবি মা,—তোমার মায়ের কাছে তুমি থাকো, সেও অনেক দুঃখ পেলে। আর আমার নাম করে যারা ওষুধ চাইতে আসবে, তাদের ওষুধ দিয়ো। আর দ্যাখ্ সন্ধ্যা, আমার বইগুলো যদি তোর মা দেয় ত বিপিনটাকে দিয়ে দিস। সে বেচারা গরীব, বই কিনতে পারে না বলেই কিছু শিখতে পারে না।

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা, আমি তোমার সংগে যাবই। এই দেখ না আমার পরনের কাপড়-দুটি আমি গামছায় বেঁধে নিয়েচি। এই বলিয়া সে অঞ্চলের ভিতর হইতে একটি ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া দেখাইল।

প্রিয় কোনদিনই বেশী প্রতিবাদ করিতে পারেন না, তিনি রাজী হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, চল্, কিন্তু তোর মা যে বড্ড দুঃখ পাবে সন্ধ্যা।

কাল সর্বসমক্ষে, সমাজের ষোল আনার সম্মুখে পিতার উৎকট দুর্গতি সে চোখে দেখিয়াছে। জগদ্ধাত্রীর নিজের বাড়ি বলিয়াই এতটা সম্ভব হইতে পারিয়াছে—এ অপমান সন্ধ্যার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে; কিন্তু প্রত্যুত্তরে তাহার কোন উল্লেখ করিল না, শুধু বার বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, না বাবা, আমি কিছুতেই থাকব না, আমি যাবই। আমি সংগে না থাকলে কে তোমাকে দেখবে? কে তোমাকে রেঁধে দেবে?

এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাবার ঔষধগুলি ও বইখানি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং তাহার হাত ধরিয়া কহিল, চল বাবা, আমরা এই বেলা বেরিয়ে পড়ি, নইলে বারোটার ট্রেন হয়ত ধরতে পারা যাবে না।

মায়ের রুদ্ধ-ঘরের চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া সন্ধ্যা প্রণাম করিয়া কহিল, মা, আমরা চললুম। কেবল দুখানি পরনের কাপড় ছাড়া আর তোমার আমি কিছু নিইনি। বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, মা, লাঞ্ছনা আর ঘৃণার সমস্ত কালি মুখে মেখেই আমরা বিদায় নিলাম, তোমাদের সমাজে এর বিচার হবে না—কিন্তু যাদের মহাপাতকের বোঝা নিয়ে আজ আমাদের যেতে হ'লো তাদের বিচার করবার জন্যেও অন্ততঃ একজন আছেন, সে কিন্তু একদিন টের পাবে।

ঘরের অভ্যন্তর তেমনি নিস্তব্ধ, দ্বার তেমনি অবরুদ্ধ রহিল, সন্ধ্যা পিতার পিছনে পিছনে বাটীর বাহির হইয়া আসিল। কে একজন অদূরে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল, সে কাছে আসিতেই প্রিয় জ্যোৎস্নার আলোকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, কে অরুণ নাকি?

অরুণ কহিল, আজ্ঞে হাঁ। আজ আপনি বারোটার গাড়িতে যাবেন শুনে দেখা করতে এলাম।

প্রিয় কহিলেন, হাঁ। আর এই দেখ না মুশকিল, মেয়েটা কিছুতেই ছাড়লে না, সংগ নিলে। আমি কোথায় যাই, কোথায় থাকি—দেখ দিকি এর পাগলামি!

অরুণ অবাক হইয়া কহিল, সন্ধ্যা, তুমিও যাবে?

সন্ধ্যা শুধু কেবল বলিল, হাঁ।

অরুণ একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া একান্ত সঙ্কোচের সহিত কহিল, সেদিন রাত্রে আমি কিছুতেই মন স্থির করতে পারিনি, কিন্তু আজ নিশ্চয় করেচি, তোমার কথাতেই রাজী হব সন্ধ্যা।

প্রিয় বুঝিতে না পারিয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা শান্তকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, সেদিন আমিও বড় উতলা হয়ে পড়েছিলাম অরুণদা, কিন্তু আজ আমারও মন স্থির হয়েছে। মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কি না, আমি সেইটে জানতেই বাবার সংগে যাচ্চি। কিন্তু আর ত আমাদের সময় নেই অরুণদা—পারো ত আমাদের ক্ষমা ক'রো। এই বলিয়া সে পিতার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া পড়িল। অরুণ সংগে সংগে যাইবার উদ্যোগ করিতেই সন্ধ্যা ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, না অরুণদা, আমাদের সংগে আসতে পাবে না, তুমি বাড়ি যাও।

অরুণ কহিল, সন্ধ্যা, এই দুঃখের সময় তোমার মাকে ছেড়ে চললে?

এই আকুল প্রশ্নের জবাবটা অরুণ হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না; তারপরে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলিল, আজ আমাকে ক্ষমা কর সন্ধ্যা—আমাকে একটু ভাবতে দাও।

ভাবতে? এই বলিয়া সন্ধ্যা অবাক হইয়া একদৃষ্টে অরুণের প্রতি চাহিয়া বোধ করি বা অন্ধকারে যতদূর দেখা যায় তাহার মুখখানাই দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তারপরে একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা ভাবো। একটু নয়, বোধ হয় ভাববার সময় আজীবন পাবে। এতদিন আমিও ভেবেচি—দিনরাত ভেবেচি। যখন নিজের কাছে তোমাকে খুব ছোট করে দেখতে আমার বাধেনি, তখন এই কথাই ভেবেচি। আজ আবার তোমাদের ভাববার সময় এলো! আচ্ছা, চললুম,—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাহার অঙ্গের সুদীর্ঘ অঞ্চল স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে যথাস্থানে স্থাপিত করিতে গিয়া এতক্ষণে তাহার নিজের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, ভগবান! এই রাঙা চেলী, এই গায়ের গহনা, এই আমার কপালের কনে-চন্দন—এসব পরবার সময়ে এ কথা কে ভেবেছিল! বলিতে গিয়া তাহার কণ্ঠ ভাঙিয়া আসিল, সেই ভাঙ্গা গলায় বলিল, আমি বিদায় হ'লাম অরুণদা। বলিয়া আর একবার প্রণাম করিয়া নীরবে বাহির হইয়া গেল।

অরুণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু দৃষ্টির বাহিরে সন্ধ্যা অন্তর্হিত হইতেই হঠাৎ যেন তাহার চমক ভাঙিয়া গেল—ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে চাকরটাকে বার বার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, শিবু, যা যা, সঙ্গে যা! বলিতে বলিতে সে নিজেই ছুটিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

[ঘ]

বাঁ হাতে প্রদীপ লইয়া প্রিয় মুখুয্যে কি কয়েকটা বস্তু বাক্স হইতে বাছিয়া বাছিয়া একটুকরা কাপড়ে রাখিতেছিলেন, হঠাৎ পিছনে ডাক শুনিলেন, বাবা—

কাজটা প্রিয় গোপনেই করিতেছিলেন, শশব্যস্তে হাতের প্রদীপটা রাখিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সাড়া দিলেন, কে? সন্ধ্যা? এই যে মা, যাই চলে,—আর দেরী হবে না—

সন্ধ্যা কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া কহিল, কি করছিলে বাবা?

প্রিয় থতমত খাইয়া বলিলেন, আমি? কৈ না,—কিছুই ত নয় মা!

সেই বস্ত্রখণ্ডটা দেখাইয়া সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিল, ওতে কি বাবা? কি রাখছিলে?

ধরা পড়িয়া প্রিয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া উঠিলেন; কতকটা মিনতির সুরে কহিলেন, গোটা-কতক—বেশী নয় মা, রেমিডি সঙ্গে নিচ্ছিলাম, আর ঐ মেটিরিয়া মেডিকাখানা—বড়টা নয়, ছোটটা—ছিঁড়ে-খুঁড়েও গেছে—অচেনা জায়গা, যা হোক একটু প্র্যাক্‌টিস্ করতে ত হবে! তাই ভাবলাম—

মা কি তোমাকে এটুকুও দিতে চায় না বাবা?

প্রিয় অনিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িয়া কি যে জানাইলেন, ঠিক বুঝা গেল না।

তুমি কোথায় প্র্যাক্‌টিস্ করবে বাবা?

বৃন্দাবনে। সেখানে কত যাত্রী যায় আসে—তাদের ওষুধ দিলে কি মাসে চার-পাঁচ টাকাও পাব না সন্ধ্যে? তা হলেই ত আমার বেশ চলে যাবে!

খুব পাবে বাবা, তুমি আরও ঢের বেশি পাবে। কিন্তু সেখানে ত তুমি কাউকে জানো না? পরশু শেষরাত্রে ঠাকুরমা যখন কাশী চলে গেলেন, তুমি কেন তাঁর সঙ্গে গেলে না বাবা?

মার সঙ্গে? কাশীতে? না মা, আর আমি কাউকে জড়াতে চাইনে। আমার জন্যে তোমরা অনেক দুঃখ পেলে, আর আমি কাউকে দুঃখ দেব না। যতদিন বাঁচব ঐ অচেনা জায়গায় একলাই থাকব।

সন্ধ্যা পিতার বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া তাঁহার হাত-দুটি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, কিন্তু আমি তোমাকে একলা থাকতে দেব না বাবা, আমি যে তোমার সঙ্গে যাব!

প্রিয় ধীরে ধীরে নিজের হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া কন্যার মাথার উপর রাখিয়া হাসিয়া কহিলেন, দূর পাগলি, সে কি কখনো হয়? আমার সঙ্গে কোথায় যাবি মা,—তোমার মায়ের কাছে তুমি থাকো, সেও অনেক দুঃখ পেলে। আর আমার নাম করে যারা ওষুধ চাইতে আসবে, তাদের ওষুধ দিয়ো। আর দ্যাখ্ সন্ধ্যা, আমার বইগুলো যদি তোর মা দেয় ত বিপিনটাকে দিয়ে দিস। সে বেচারা গরীব, বই কিনতে পারে না বলেই কিছু শিখতে পারে না।

সন্ধ্যা মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাবই। এই দেখ না আমার পরনের কাপড়-দুটি আমি গামছায় বেঁধে নিয়েচি। এই বলিয়া সে অঞ্চলের ভিতর হইতে একটি ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া দেখাইল।

প্রিয় কোনদিনই বেশী প্রতিবাদ করিতে পারেন না, তিনি রাজী হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, চল্, কিন্তু তোর মা যে বড্ড দুঃখ পাবে সন্ধ্যা।

কাল সর্বসমক্ষে, সমাজের ষোল আনার সম্মুখে পিতার উৎকট দুর্গতি সে চোখে দেখিয়াছে। জগদ্ধাত্রীর নিজের বাড়ি বলিয়াই এতটা সম্ভব হইতে পারিয়াছে—এ অপমান সন্ধ্যার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে; কিন্তু প্রত্যুত্তরে তাহার কোন উল্লেখ করিল না, শুধু বার বার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, না বাবা, আমি কিছুতেই থাকব না, আমি যাবই। আমি সঙ্গে না থাকলে কে তোমাকে দেখবে? কে তোমাকে রেঁধে দেবে?

এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি বাবার ঔষধগুলি ও বইখানি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং তাহার হাত ধরিয়া কহিল, চল বাবা, আমরা এই বেলা বেরিয়ে পড়ি, নইলে বারোটার ট্রেন হয়ত ধরতে পারা যাবে না।

মায়ের রুদ্ধ-ঘরের চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া সন্ধ্যা প্রণাম করিয়া কহিল, মা, আমরা চললুম। কেবল দু'খানি পরনের কাপড় ছাড়া আর তোমার আমি কিছু নিইনি। বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল, কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না। তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, মা, লাঞ্ছনা আর ঘৃণার সমস্ত কালি মুখে মেখেই আমরা বিদায় নিলাম, তোমাদের সমাজে এর বিচার হবে না—কিন্তু যাদের মহাপাতকের বোঝা নিয়ে আজ আমাদের যেতে হ'লো তাদের বিচার করবার জন্যেও অন্ততঃ একজন আছেন, সে কিন্তু একদিন টের পাবে।

ঘরের অভ্যন্তর তেমনি নিস্তব্ধ, দ্বার তেমনি অবরুদ্ধ রহিল, সন্ধ্যা পিতার পিছনে পিছনে বাটীর বাহির হইয়া আসিল। কে একজন অদূরে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল, সে কাছে আসিতেই প্রিয় জ্যোৎস্নার আলোকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, কে অরুণ নাকি?

অরুণ কহিল, আজ্ঞে হাঁ। আজ আপনি বারোটার গাড়িতে যাবেন শুনে দেখা করতে এলাম।

প্রিয় কহিলেন, হাঁ। আর এই দেখ না মুশকিল, মেয়েটা কিছুতেই ছাড়লে না, সঙ্গ নিলে। আমি কোথায় যাই, কোথায় থাকি—দেখ দিকি এর পাগলামি!

অরুণ অবাক হইয়া কহিল, সন্ধ্যা, তুমিও যাবে?

সন্ধ্যা শুধু কেবল বলিল, হাঁ।

অরুণ একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া একান্ত সঙ্কোচের সহিত কহিল, সেদিন রাত্রে আমি কিছুতেই মন স্থির করতে পারিনি, কিন্তু আজ নিশ্চয় করেচি, তোমার কথাতেই রাজী হব সন্ধ্যা।

প্রিয় বুঝিতে না পারিয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন। সন্ধ্যা শান্তকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল, সেদিন আমিও বড় উতলা হয়ে পড়েছিলাম অরুণদা, কিন্তু আজ আমারও মন স্থির হয়েছে। মেয়েমানুষের বিয়ে করা ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন কাজ আছে কি না, আমি সেইটে জানতেই বাবার সঙ্গে যাচ্চি। কিন্তু আর ত আমাদের সময় নেই অরুণদা—পারো ত আমাদের ক্ষমা ক'রো। এই বলিয়া সে পিতার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইয়া পড়িল। অরুণ সঙ্গে সঙ্গে যাইবার উদ্যোগ করিতেই সন্ধ্যা ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, না অরুণদা, আমাদের সঙ্গে আসতে পাবে না, তুমি বাড়ি যাও।

অরুণ কহিল, সন্ধ্যা, এই দুঃখের সময় তোমার মাকে ছেড়ে চললে?

সন্ধ্যা কহিল, কি করব অরুণদা, এতদিন বাপ-মা দুজনকেই ভোগ করবার সৌভাগ্য ছিল, কিন্তু আজ একজনকে ছাড়তেই হবে। তবু মায়ের বোধ হয় একটা উপায় আছে। কাল অনেকেই ত তামাশা দেখতে এসেছিলেন, কেউ কেউ বলছিলেন, কি নাকি একটা প্রায়শ্চিত্ত আছে। থাকে ভালই। তখন দেখবার লোকের তাঁর অভাব হবে না, কিন্তু আমি ছাড়া আমার বাবাকে সামলাবার যে আর কেউ নেই সংসারে। কিন্তু আর দাঁড়িয়ো না বাবা, চল।

এই বলিয়া তাহারা পুনশ্চ অগ্রসর হইয়া গেল। অরুণ সেইখানেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটুখানি পথ আসিয়া দেখিতে পাইল, জন-কয়েক লোক লুচি, মাছের তরকারি ও বিবিধ মিষ্টান্নের ভূয়সী প্রশংসায় সমস্ত রাস্তাটা মুখরিত করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ঘরে চলিয়াছে। তাহাদের আনন্দ ও পরিতৃপ্তি ধরে না। জ্যোৎস্নার আলোকে পাছে ইহারা চিনিয়া ফেলে এই ভয়ে সন্ধ্যা পিতার হাত ধরিয়া পথের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারা চলিয়া গেলে আবার পথ চলিতে লাগিল।

মোড় ফিরিয়াই ইহাদের ভূরিভোজনের হেতু বুঝা গেল। পার্শ্বের আমবাগানের ভিতর দিয়া গোলোক চাটুয্যে মহাশয়ের বাটী হইতে প্রচুর আলোক এবং প্রচুরতম কলরব আসিতেছে। লুচি আনো, তরকারি এইদিকে, দই কে দিচ্চে, মিষ্টি কই—প্রভৃতি বহুকণ্ঠ-নিঃসৃত শব্দে সমস্ত স্থানটা জমজম করিতেছে।

প্রিয় কহিলেন, গোলোক চাটুয্যেমশায়ের আজ বৌভাত কিনা! কাজেকর্মে চাটুয্যেমশাই খাওয়ায় ভাল। শুনলাম পাঁচখানা গ্রাম বলা হয়েছে—বামুন-শূদ্দুর কেউ বাদ পড়েনি।

সন্ধ্যা অবাক হইয়া কহিল, কার বৌভাত বাবা? গোলোক ঠাকুর্দার?

প্রিয় কহিলেন, হাঁ, প্রাণকৃষ্ণের মেয়েটাকে পরশু বিয়ে করলেন কিনা!

সন্ধ্যার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল, হরিমতী? তার বৌভাত?

প্রিয় কহিলেন, হাঁ হাঁ, হরিমতীই নাম বটে। গরীব বামুন বেঁচে গেল—মেয়েটা বড় হয়ে—কি রে?

কিছু না বাবা, চল আমরা এখান থেকে একটু তাড়াতাড়ি যাই। এই বলিয়া সন্ধ্যা পিতার হাত ধরিয়া তাঁহাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া রেল-স্টেশনের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

পিতাকে লইয়া সে যখন স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল তখন গাড়ির প্রায় অর্ধঘণ্টা বিলম্ব আছে। পল্লীগ্রামের ছোট স্টেশন, বিশেষতঃ রাত্রি বলিয়া লোক কেহ ছিল না, শুধু প্ল্যাটফর্মের একধারে একটা করবীবৃক্ষের অন্ধকার ছায়ায় কে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, সে ইহাদের দেখিবামাত্রই ব্যস্ত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল।

প্রিয় সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সন্ধ্যার তীক্ষ্ণচক্ষুকে সে একেবারে ফাঁকি দিতে পারিল না। সন্ধ্যা মিনিট-খানেক নিঃশব্দে লক্ষ্য করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, জ্ঞানদাদিদি, তুমি যে এখানে? একলা যে?

সন্ধ্যা ঠিক চিনিয়াছিল, জ্ঞানদা মুহূর্তে দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সন্ধ্যার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে নিজের দুর্ভাগ্যেই অভিভূত ছিল, ইতিমধ্যে তাহারই পাশের বাড়িতে আর একজন হতভাগিনীর ভাগ্য যে কোন্ অতলে তলাইতেছিল তাহার কিছুই জানিত না, কিন্তু প্রিয় একেবারে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা কহিল, তুমি কোথায় যাবে জ্ঞানোদিদি?

জ্ঞানদার রুদ্ধকণ্ঠ দিয়া শব্দ বাহির হইল না, সে কেবল মাথা নাড়িয়া জানাইল, গন্তব্যস্থান যে কোথায় তাহা সে জানে না।

ইহার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেহই কোন কথা কহিল না। কিন্তু গাড়ির সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, টিকিট কিনিতে হইবে, তাই প্রিয় অনেক চেষ্টায় স্বর বাহির করিয়া কহিলেন, তুমি কোথায় যাবে জ্ঞানদা? তোমার কি টিকিট কেনা হয়েছে?

জ্ঞানদা তেমনি মাথা নাড়িয়া বলিল, না। তাহার পরে অশ্রুবিকৃত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন?

প্রিয় কহিলেন, বৃন্দাবনে।

সন্ধ্যাও কি সঙ্গে যাবে?

প্রিয় কহিলেন, হাঁ।

জ্ঞানদা অঞ্চলের গ্রন্থি খুলিয়া কতকগুলা টাকা প্রিয়র পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, টিকিটের দাম কত আমি জানিনে, কিন্তু এই পঞ্চাশটি টাকা আমার আছে—আমাকেও একখানি বৃন্দাবনের টিকিট কিনে দিন। কেবল এইটুকু আমাকে সঙ্গে নিন, তার বেশী আর আমি পৃথিবীতে কারও কাছে কিছু চাইব না।

প্রিয় ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন, আচ্ছা, চল আমাদেরই সঙ্গে।



পরিণীতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

শক্তিশেল বুকে পড়িবার সময় লক্ষ্মণের মুখের ভাব নিশ্চয় খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুচরণের চেহারাটা বোধ করি তার চেয়েও মন্দ দেখাইল—যখন প্রত্যুষেই অন্তঃপুর হইতে সংবাদ পৌঁছিল, গৃহিণী এইমাত্র নির্বিঘ্নে পঞ্চম কন্যার জন্মদান করিয়াছেন।

গুরুচরণ ষাট টাকা বেতনের ব্যাঙ্কের কেরানী। সুতরাং দেহটিও যেমন ঠিকাগাড়ির ঘোড়ার মত শুষ্ক শীর্ণ, চোখেমুখেও তেমনি তাহাদেরি মত একটা নিষ্কাম নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাব। তথাপি এই ভয়ঙ্কর শুভ-সংবাদে আজ তাঁহার হাতের হুঁকাটা, হাতেই রহিল, তিনি জীর্ণ পৈতৃক তাকিয়াটা ঠেস দিয়া বসিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিবারও আর তাঁহার জোর রহিল না।

শুভ-সংবাদ বহিয়া আনিয়াছিল তাঁহার তৃতীয় কন্যা দশমবর্ষীয়া আন্নাকালী। সে বলিল, বাবা, চল না দেখবে।

গুরুচরণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মা, এক গেলাস জল আন ত খাই।

মেয়ে জল আনিতে গেল। সে চলিয়া গেলে, গুরুচরণের সর্বাগ্রে মনে পড়িল সূতিকা-গৃহের রকমারি খরচের কথা। তার পরে, ভিড়ের দিনে স্টেশনে গাড়ি আসিলে দোর খোলা পাইলে থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা পোঁটলা-পোঁটলি লইয়া পাগলের মত যেভাবে লোকজনকে দলিত পিষ্ট করিয়া ঝাঁপাইয়া আসিতে থাকে, তেমনি মার-মার শব্দ করিয়া তাঁহার মগজের মধ্যে দুশ্চিন্তারাশি হুহু করিয়া ঢুকিতে লাগিল। মনে পড়িল, গত বৎসর তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার শুভ-বিবাহে বৌবাজারের এই দ্বিতল ভদ্রাসনটুকু বাঁধা পড়িয়াছে এবং তাহারও ছয় মাসের সুদ বাকী। দুর্গাপূজার আর মাসখানেক মাত্র বিলম্ব আছে—মেজমেয়ের ওখানে তত্ত্ব পাঠাইতে হইবে। অফিসে কাল রাত্রি আটটা পর্যন্ত ডেবিট ক্রেডিট মিলে নাই, আজ বেলা বারোটার মধ্যে বিলাতে হিসাব পাঠাইতেই হইবে। কাল বড়সাহেব হুকুম জারি করিয়াছেন, ময়লা বস্ত্র পরিয়া কেহ অফিসে ঢুকিতে পারিবে না, ফাইন হইবে, অথচ গত সপ্তাহ হইতে রজকের সন্ধান মিলিতেছে না, সংসারের অর্ধেক কাপড়-চোপড় লইয়া সে বোধ করি নিরুদ্দেশ। গুরুচরণ আর ঠেস দিয়া থাকিতেও পারিলেন না, হুঁকাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া এলাইয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন, ভগবান, এই কলিকাতা শহরে প্রতিদিন কত লোক গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়িয়া অপঘাতে মরে, তারা কি আমার চেয়েও তোমার পায়ে বেশী অপরাধী! দয়াময়! তোমার দয়ায় একটা ভারী মোটরগাড়ি যদি বুকের উপর দিয়া চলিয়া যায়!

আন্নাকালী জল আনিয়া বলিল, বাবা ওঠ, জল এনেছি।

গুরুচরণ উঠিয়া সমস্তটুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আঃ, যা মা, গেলাসটা নিয়ে যা।

সে চলিয়া গেলে গুরুচরণ আবার শুইয়া পড়িলেন।

ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মামা, চা এনেচি ওঠ।

চায়ের নামে গুরুচরণ আর একবার উঠিয়া বসিলেন। ললিতার মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার অর্ধেক জ্বালা যেন নিবিয়া গেল, বলিলেন, সারারাত জেগে আছিস মা, আয় আমার কাছে এসে একবার বোস।

ললিতা সলজ্জহাস্যে কাছে বসিয়া বলিল, আমি রাত্তিরে জাগিনি মামা।

এই জীর্ণ শীর্ণ গুরুভারগ্রস্ত অকালবৃদ্ধ মাতুলের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সুগভীর ব্যথাটা তার চেয়ে বেশী এ সংসারে আর কেহ অনুভব করিত না।

গুরুচরণ বলিলেন, তা হোক, আয়, আমার কাছে আয়।

ললিতা কাছে আসিয়া বসিতেই গুরুচরণ তাহার মাথায় হাত দিয়া সহসা বলিয়া

উঠিলেন, আমার এই মা'টিকে যদি রাজার ঘরে দিতে পারতুম, তবেই জানতুম একটা কাজ কল্লুম।

ললিতা মাথা হে'ট করিয়া চা ঢালিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হাঁ মা, তোর দুঃখী মামার ঘরে এসে দিনরাত্রি খাটতে হয়, না?

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, দিবারাত্রি খাটতে হবে কেন মামা? সবাই কাজ করে, আমিও করি।

এইবার গুরুচরণ হাসিলেন। চা খাইতে খাইতে বলিলেন, হাঁ ললিতা, আজ তবে রান্নাবান্নার কি হবে মা?

ললিতা মুখ তুলিয়া বলিল, কেন মামা, আমি রাঁধব যে!

গুরুচরণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই রাঁধবি কি মা, রাঁধতে কি তুই জানিস?

জানি মামা। আমি মামীমার কাছে সব শিখে নিয়েছি।

গুরুচরণ চায়ের বাটিটা নামাইয়া ধরিয়া বলিলেন, সত্যি?

সত্যি! মামীমা দেখিয়ে দেন,—আমি কতদিন রাঁধি যে। বলিয়াই মুখ নীচু করিল।

তাহার আনত মাথার উপর হাত রাখিয়া গুরুচরণ নিঃশব্দে আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার একটা গুরুতর দুর্ভাবনা দূর হইল।

এই ঘরটি গলির উপরেই। চা পান করিতে করিতে জানালাব বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় গুরুচরণ চে'চাইয়া ডাকিয়া উঠিলেন, শেখর নাকি? শোন, শোন।

একজন দীর্ঘায়তন বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা ঘরে প্রবেশ করিল।

গুরুচরণ বলিলেন, বসো, আজ সকালে তোমার খুড়ীমার কাণ্ডটা শুনেচ বোধ হয়।

শেখর মৃদু হাসিয়া বলিল, কাণ্ড আর কি, মেয়ে হয়েছে তাই?

গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুমি ত বলবে তাই, কিন্তু তাই যে কি সে শুধু আমিই জানি যে!

শেখর কহিল, ও-রকম বলবেন না কাকা, খুড়ীমা শুনলে বড় কষ্ট পাবেন। তা ছাড়া ভগবান যাকে পাঠিয়েছেন তাকে আদর-আহ্লাদ করে ডেকে নেওয়া উচিত।

গুরুচরণ মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আদর-আহ্লাদ করা উচিত, সে আমিও জানি! কিন্তু বাবা, ভগবানও ত সুবিচার করেন না। আমি গরীব, আমার ঘরে এত কেন? এই বাড়িটুকু পর্যন্ত তোমার বাপের কাছে বাঁধা পড়েচে, তা পড়ুক, সে জন্যে দুঃখ করিনে শেখর, কিন্তু এই হাতে-হাতেই দেখ না বাবা, এই যে আমার ললিতা, মাবাপ-মরা সোনার পুতুল, একে শুধু রাজার ঘরেই মানায়। কি করে একে প্রাণ ধরে যার-তার হাতে তুলে দিই বল ত? রাজার মুকুটে যে কোহিনূর জ্বলে, তেমনি কোহিনূর রাশীকৃত করে আমার এই মা'টিকে ওজন করলেও দাম হয় না। কিন্তু কে তা বুঝবে! পয়সার অভাবে এমন রত্নকেও আমাকে বিলিয়ে দিতে হবে। বল দেখি বাবা, সে-সময়ে কি রকম শেল বুকে বাজবে? তেরো বছর বয়স হ'লো, কিন্তু হাতে আমার এমন তেরোটা পয়সা নেই যে, একটা সম্বন্ধ পর্যন্ত স্থির করি।

গুরুচরণের দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শেখর চুপ করিয়া রহিল।

গুরুচরণ পুনরায় কহিলেন, শেখরনাথ, দেখো ত বাবা, তোমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যদি এই মেয়েটার কোন গতি করে দিতে পার। আজকাল অনেক ছেলে শুনেচি টাকাকড়ির দিকে চেয়ে দেখে না, শুধু মেয়ে দেখেই পছন্দ করে। তেমনি যদি দৈবাৎ একটা মিলে যায় শেখর, তা হলে বলচি আমি, আমার আশীর্বাদে তুমি রাজা হবে। আর কি বলব বাবা, এ পাড়ায় তোমাদের আশ্রয়ে আমি আছি, তোমার বাবা আমাকে ছোট ভায়ের মতই দেখেন।

শেখর মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা তা দেখব।

গুরুচরণ বলিলেন, ভুলো না বাবা, দেখো। ললিতা ত আট বছর বয়স থেকে তোমাদের কাছে লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে, তুমি ত দেখতে পাচ্ছ ও কেমন বুদ্ধিমতী, কেমন শিষ্ট শান্ত। একফোটা মেয়ে, আজ থেকে ও-ই আমাদের রাঁধাবাড়া করবে, দেবে-থোবে, সমস্তই এখন ওর মাথার।

এই সময়ে ললিতা একটিবার চোখ তুলিয়াই নামাইয়া ফেলিল। তাহার ওষ্ঠাধরের উভয় প্রান্ত ঈষৎ প্রসারিত হইল মাত্র। গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ওর বাপই কি কিছু কম রোজগার করেচে, কিন্তু সমস্তই এমন করে দান করে গেল যে, এই একটা মেয়ের জন্যেও কিছু রেখে গেল না।

শেখর চুপ করিয়া রহিল। গুরুচরণ নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন, আর রেখে গেল না-ই বা বলি কি ক'রে? সে যত লোকের যত দুঃখ ঘুচিয়েছে, তার সমস্ত ফলটুকুই আমার এই মা'টিকে দিয়ে গেছে, তা নইলে কি এতটুকু মেয়ে এমন অন্নপূর্ণা হতে পারে! তুমিই বল না শেখর, সত্য কি না?

শেখর হাসিতে লাগিল। জবাব দিল না।

সে উঠিবার উপক্রম করিতেই গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, এমন সকালেই কোথা যাচ্চ?

শেখর বলিল, ব্যারিস্টারের বাড়ি—একটা কেস আছে। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুরুচরণ আর একবার স্মরণ করাইয়া বলিলেন, কথাটা একটু মনে রেখো বাবা! ও একটু শ্যাম-বর্ণ বটে, কিন্তু চোখমুখ, এমন হাসি, এত দয়ামায়া পৃথিবী খুঁজে বেড়ালেও কেউ পাবে না।

শেখর মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল। এই ছেলেটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। এম. এ. পাশ করিয়া এতদিন শিক্ষানবিশি করিতেছিল, গত বৎসর হইতে এটর্নি হইয়াছে। তাহার পিতা নবীন রায় গুড়ের কারবারে লক্ষপতি হইয়া কয়েক বৎসর হইতে ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া ঘরে বসিয়া তেজারতি করিতেছিলেন, বড় ছেলে অবিনাশ উকিল,—ছোট ছেলে এই শেখরনাথ। তাঁহার প্রকাণ্ড তেতলা বাড়ি পাড়ার মাথায় উঠিয়াছিল এবং ইহার একটা খোলা ছাদের সহিত গুরুচরণের ছাদটা মিশিয়া থাকায় উভয় পরিবারে অত্যন্ত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। বাড়ির মেয়েরা এই পথেই যাতায়াত করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্যামবাজারের এক বড়লোকের ঘরে বহুদিন হইতেই শেখরের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছিল। সেদিন তাঁহারা দেখিতে আসিয়া আগামী মাঘের কোন একটা শুভদিন স্থির করিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু শেখরের জননী স্বীকার করিলেন না। ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ছেলে নিজে দেখিয়া পছন্দ করিলে তবে বিবাহ দিব।

নবীন রায়ের চোখ ছিল শুধু টাকার দিকে, তিনি গৃহিণীর এই গোলমেলে কথায় অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, এ আবার কি কথা! মেয়ে ত দেখাই আছে। কথাবার্তা পাকা হয়ে যাক, তার পরে আশীর্বাদ করার দিন ভাল করে দেখলেই হবে।

তথাপি গৃহিণী সম্মত হইলেন না, পাকা কথা কহিতে দিলেন না। নবীন রায় সেদিন রাগ করিয়া অনেক বেলায় আহার করিলেন এবং দিবানিদ্রাটা বাহিরের ঘরেই দিলেন।

শেখরনাথ লোকটা কিছু শৌখিন। সে তেতলায় যে ঘরটিতে থাকে, সেটি অতিশয় সুসজ্জিত। দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন অপরাহ্ণবেলায় সে সেই ঘরের বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেয়ে দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ললিতা ঘরে ঢুকিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌ দেখতে যাবে, না?

শেখর ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এই যে! কৈ বেশ করে সাজিয়ে দাও দেখি বৌ যাতে পছন্দ করে।

ললিতা হাসিল। বলিল, এখন ত আমার সময় নেই শেখরদা—আমি টাকা নিতে এসেচি, বলিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া একটা দেরাজ খুলিয়া গণিয়া গণিয়া গুটি-কয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যেন কতকটা নিজের মনেই বলিল, টাকা ত দরকার হলেই নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ শোধ হবে কি করে?

শেখর চুলের একপাশ ব্রুশ দিয়া সযত্নে উপরের দিকে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শোধ হবে, না হচ্ছে!

ললিতা বুঝিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

শেখর বলিল, চেয়ে রইলে, বুঝতে পারলে না?

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আরও একটু বড় হও, তখন বুঝতে পারবে, বলিয়া শেখর জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে শেখর একটা কোচের উপর চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মা একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, মেয়ে কি রকম দেখে এলি রে?

শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ।

শেখরের মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু এমনি সুন্দর তাঁহার দেহের বাঁধন যে দেখিলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের অধিক মনে হইত না। আবার এই সুন্দর আবরণের মধ্যে যে মাতৃহৃদয়টি ছিল, তাহা আরও নবীন আরও কোমল। তিনি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে; পাড়াগাঁয়ে জন্মিয়া সেইখানেই বড় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শহরের মধ্যে তাঁহাকে একদিনের জন্য বেমানান দেখায় নাই। শহরের চাঞ্চল্যসজীবতা এবং আচার-ব্যবহারও যেমন তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, জন্মভূমির নিবিড় নিস্তব্ধতা ও মাধুর্যও তেমনি হারাইয়া ফেলেন নাই। এই মা'টি যে শেখরের কত বড় গর্বের বস্তু ছিল, সে-কথা তাহার মা-ও জানিতেন না। জগদীশ্বর শেখরকে অনেক বস্তু দিয়াছিলেন। অনন্যসাধারণ স্বাস্থ্য, রূপ, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি—কিন্তু এই জননীর সন্তান হইতে পারার ভাগ্যটাকেই সে কায়মনে ভগবানের সবচেয়ে বড় দান বলিয়া মনে করিত।

মা বলিলেন, 'বেশ' বলে চুপ করে রইলি যে রে!

শেখর আবার হাসিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, যা জিজ্ঞেস করলে তাই ত বললুম।

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, কৈ বললি? রঙ কেমন, ফরসা? কার মত হবে? আমাদের ললিতার মত?

শেখর মুখ তুলিয়া বলিল, ললিতা ত কালো মা, ওর চেয়ে ফরসা।

মুখচোখ কেমন?

তাও মন্দ নয়।

তবে কর্তাকে বলি?

এবার শেখর চুপ করিয়া রহিল।

মা ক্ষণকাল পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, হাঁ রে, মেয়েটি লেখাপড়া শিখেচে কেমন?

শেখর বলিল, সে ত জিজ্ঞাসা করিনি মা!

অতিশয় আশ্চর্য হইয়া মা বলিলেন, জিজ্ঞেস করিস নি কি রে! যেটা আজকাল তোদের সবচেয়ে দরকারী জিনিস, সেইটেই জেনে আসিস নি?

শেখর হাসিয়া বলিল, না মা, ওকথা আমার মনেই ছিল না।

ছেলের কথা শুনিয়া এবার তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তবে তুই ওখানে বিয়ে করবি নে দেখচি!

শেখর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময় ললিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল। ললিতা ধীরে ধীরে ভুবনেশ্বরীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বাঁ হাত দিয়া তাহাকে সুমুখের দিকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি মা?

ললিতা চুপি চুপি বলিল, কিছু না মা।

ললিতা পূর্বে ইঁহাকে মাসীমা বলিত, কিন্তু তিনি নিষেধ করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তোর আমি ত মাসী হইনে ললিতে, মা হই। তখন হইতে সে মা বলিয়া ডাকিত। ভুবনেশ্বরী

তাহাকে বুকের আরো কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিলেন, কিছু না? তবে বুঝি আমাকে শুধু একবার দেখতে এসেছিস?

ললিতা চুপ করিয়া রহিল।

শেখর কহিল, দেখতে এসেচে, রাঁধবে কখন?

মা বলিলেন, রাঁধবে কেন?

শেখর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তবে ওদের রাঁধবে মা? ওর মামাও ত সেদিন বললেন, ললিতাই রাঁধাবাড়া সব কাজ করবে।

মা হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ওর মামার কি, যা হোক একটা বললেই হ'ল। ওর বিয়ে হয়নি, ওর হাতে খাবে কে? আমাদের বামুনঠাকরুনকে পাঠিয়ে দিয়েচি, তিনি রাঁধবেন। বড়বৌমা আমাদের রান্নাবান্না করচেন—আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতেই আজকাল খাই।

শেখর বুঝিল, মা এই দুঃখী পরিবারের গুরুভার হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

মাস-খানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর শেখর নিজের ঘরে কোচের উপর কাত হইয়া একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতেছিল। বেশ মন লাগিয়া গিয়াছিল, এমন সময় ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া শব্দ-সাড়া করিয়া দেরাজ খুলিতে লাগিল। শেখর বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি?

ললিতা বলিল, টাকা নিচ্চি।

হুঁ, বলিয়া শেখর পড়িতে লাগিল। ললিতা আঁচলে টাকা বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ সে সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা শেখর চাহিয়া দেখে। কহিল, দশ টাকা নিলুম শেখরদা।

শেখর 'আচ্ছা' বলিল, কিন্তু চাহিয়া দেখিল না। অগত্যা সে এটা-ওটা নাড়িতে লাগিল, মিছামিছি দেরি করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না, তখন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু গেলেই ত চলে না, আবার তাহাকে ফিরিয়া আসিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইতে হইল। আজ তাহারা থিয়েটার দেখিতে যাইবে।

শেখরের বিনা হুকুমে সে যে কোথাও যাইতে পারে না, ইহা সে জানিত। কেহই তাহাকে ইহা বলিয়া দেয় নাই, কিংবা কেন, কি জন্য, এ-সব তর্কও কোনদিন মনে উঠে নাই। কিন্তু জীবমাত্রেরই যে একটা স্বাভাবিক সহজবুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধিই তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল; অপরে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে খুশি যাইতে পারে, কিন্তু সে পারে না। সে স্বাধীনও নয় এবং মামা-মামীর অনুমতিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমরা যে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি।

তাহার মৃদুকণ্ঠ শেখরের কানে গেল না—সে জবাব দিল না।

ললিতা তখন আরো একটু গলা চড়াইয়া বলিল, সবাই আমার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েচে যে।

এবার শেখর শুনিতে পাইল, বইখানা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে?

ললিতা একটুখানি রুষ্টভাবে বলিল, এতক্ষণে বুঝি কানে গেল। আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি যে।

শেখর বলিল, আমরা কারা?

আমি, আন্নাকালী, চারুবালা, তার মামা।

মামাটি কে?

ললিতা বলিল, তাঁর নাম গিরীনবাবু। পাঁচ-ছদিন হ'লো মুঙ্গেরের বাড়ি থেকে এসেচেন, এখানে বি, এ, পড়বেন—বেশ লোক সে—

বাঃ—নাম, ধাম, পেশা—এ যে দিব্যি আলাপ হয়ে গেছে দেখচি। তাতেই চার-পাঁচ দিন মাথার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাইনি—তাস খেলা হচ্ছিল বোধ করি?

হঠাৎ শেখরের কথা বলার ধরন দেখিয়া ললিতা ভয় পাইয়া গেল। সে মনেও করে নাই, এরূপ একটা প্রশ্নও উঠিতে পারে। সে চুপ করিয়া রহিল।

শেখর বলিল, এ ক'দিন খুব তাস চলছিল, না?

ললিতা ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, চারু বললে যে।

চারু বললে? কি বললে? বলিয়া শেখর মাথা তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়া কহিল, একেবারে কাপড় পরে তৈরি হয়ে আসা হয়েছে,—আচ্ছা যাও।

ললিতা গেল না, সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাশের বাড়ির চারুবালা তাহার সমবয়সী এবং সই। তাহারা ব্রাহ্ম। শেখর ঐ গিরীনকে ছাড়া তাহাদের সকলকেই চিনিত। গিরীন পাঁচ-সাত বৎসর পূর্বে কিছুদিনের জন্য একবার এদিকে আসিয়াছিল। এতদিন বাঁকিপুরে পড়িত, কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজনও হয় নাই, আসেও নাই। তাই শেখর তাহাকে চিনিত না। ললিতা তথাপি দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিল, মিছে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও। বলিয়া মুখের সমুখেই বই তুলিয়া লইল।

মিনিট-পাঁচেক চুপ করিয়া থাকার পরে ললিতা আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, যাব?

যেতেই ত বললুম, ললিতা।

শেখরের ভাব দেখিয়া ললিতার থিয়েটার দেখিবার সাধ লোপ পাইল, কিন্তু তাহার না গেলেও যে নয়।

কথা হইয়াছিল, সে অর্ধেক খরচ দিবে এবং চারুর মামা অর্ধেক দিবে।

চারুদের ওখানে সকলেই তাহার জন্য অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং যত বিলম্ব হইতেছে তাহাদের অধৈর্যও তত বাড়িতেছে, ইহা সে চোখের উপর দেখিতে লাগিল, কিন্তু উপায়ও খুঁজিয়া পাইল না। অনুমতি না পাইয়া যাইবে এত সাহস তাহার ছিল না। আবার মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, শুধু আজকের দিনটি—যাব?

শেখর বইটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া ধমকাইয়া উঠিল, বিরক্ত করো না ললিতা, যেতে ইচ্ছে হয় যাও, ভালমন্দ বোঝবার তোমার যথেষ্ট বয়স হয়েচে।

ললিতা চমকিয়া উঠিল। শেখরের কাছে বকুনি খাওয়া তাহার নূতন নহে; অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু দু-তিন বৎসরের মধ্যে এরকম শুনে নাই। ওদিকে বন্ধুরা অপেক্ষা করিয়া আছে, সেও কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ইতিমধ্যে টাকা আনিতে আসিয়া এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। এখন তাহাদের কাছেই বা সে কি বলিবে?

কোথাও যাওয়া-আসা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত তাহার শেখরের তরফ হইতে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সেই জোরেই সে একেবারে কাপড় পরিয়া সাজিয়া আসিয়াছিল, এখন শুধু যে সেই স্বাধীনতাই এমন রূঢ়ভাবে খর্ব হইয়া গেল তাহা নহে, যেজন্য হইল সে কারণটা যে কতবড় লজ্জার, তাহাই আজ তাহার তের বছর বয়সে প্রথম উপলব্ধি করিয়া সে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল। অভিমানে চোখ অশ্রুপূর্ণ করিয়া সে আরো মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে গিয়া ঝিকে দিয়া আন্নাকালীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে দশটা টাকা দিয়া কহিল, তোরা আজ যা কালী, আমার বড় অসুখ কচ্চে, সইকে বল গে আমি যেতে পারব না।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ সেজদি?

মাথা ধরেচে, গা বমি-বমি কচ্চে—ভারী অসুখ কচ্চে, বলিয়া সে বিছানায় পাশ ফিরিয়া শুইল। তারপর চারু আসিয়া সাধাসাধি করিল, পীড়াপীড়ি করিল, মামীকে দিয়া সুপারিশ করাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজী করিতে পারিল না। আন্নাকালী হাতে দশটা টাকা পাইয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতেছিল। পাছে এই-সব হাঙ্গামায় পড়িয়া যাওয়া না ঘটে, এই ভয়ে সে চারুকে আড়ালে ডাকিয়া টাকা দেখাইয়া বলিল, সেজদির অসুখ কচ্চে—সে নাই গেল চারুদি! আমাকে টাকা দিয়েছে, এই দ্যাখো—আমরা যাই চল। চারু বুঝিল, আন্নাকালী বয়সে ছোট হইলেও বুদ্ধিতে কাহারো খাটো নয়। সে সম্মত হইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুবালার মা মনোরমার তাস খেলার চেয়ে প্রিয় বস্তু সংসারে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু খেলার ঝোঁক যতটা ছিল দক্ষতা ততটা ছিল না। তাঁহার এই ত্রুটি শুধরাইয়া যাইত ললিতাকে পাইলে। সে খুব ভাল খেলিতে পারিত। মনোরমার মামাত ভাই গিরীন্দ্র আসা পর্যন্ত এ-কয়দিন সমস্ত দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে তাসের বিরাট আড্ডা বসিতেছিল। গিরীন পুরুষমানুষ, খেলে ভাল, সুতরাং তার বিপক্ষে বসিতে গেলে মনোরমার ললিতাকে চাই-ই।

থিয়েটার দেখার পরের দিন যথাসময়ে ললিতা উপস্থিত হইল না দেখিয়া মনোরমা ঝিকে পাঠাইয়া দিলেন। ললিতা তখন একটি মোটা খাতায় একখানা ইংরাজী বই হইতে বাংলা তর্জমা করিতেছিল, গেল না।

তাহার সই আসিয়াও কিছু করিতে পারিল না, তখন মনোরমা নিজে আসিয়া তাহার খাতাপত্র একদিকে টান মারিয়া সরাইয়া দিয়া বলিলেন, নে, ওঠ। বড় হয়ে তোকে জজিয়তি করতে হবে না, বরং তাস খেলতেই হবে—চল।

ললিতা মনে মনে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া, কাঁদ-কাঁদ হইয়া জানাইল, আজ তাহার কিছুতেই যাবার জো নাই, বরং কাল যাইবে। মনোরমা কিছুতেই শুনিলেন না, অবশেষে মামীকে জানাইয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন; সুতরাং তাহাকে আজও গিয়া গিরীনের বিপক্ষে বসিয়া তাস খেলিতে হইল। কিন্তু, খেলা জমিল না। এদিকে সে এতটুকু মন দিতে পারিল না। সমস্ত সময়টা আড় হইয়া রহিল এবং বেলা না পড়িতেই উঠিয়া পড়িল। যাইবার সময় গিরীন বলিল, রাত্রে আপনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু গেলেন না, কাল আবার যাই চলুন।

ললিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, আমার বড় অসুখ করেছিল।

গিরীন হাসিয়া বলিল, এখন ত অসুখ সেরেচে, চলুন কাল যেতে হবে।

না না, কাল আমার সময় হবে না, বলিয়া ললিতা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ শুধু যে শেখরের ভয়ে তাহার খেলায় মন লাগে নাই তাহা নহে, তাহার নিজেরও ভারী লজ্জা করিতেছিল।

শেখরের বাটীর মত, এই বাটীতেও সে ছেলেবেলা হইতে আসা-যাওয়া করিয়াছে এবং ঘরের লোকের মতই সকলের সুমুখে বাহির হইয়াছে। তাই চারুর মামার সুমুখেও বাহির হইতে, কথা বলিতে, প্রথম হইতেই তাহার কোনও দ্বিধা হয় নাই। কিন্তু, আজ গিরীনের সুমুখে বসিয়া সমস্ত খেলার সময়টা কেমন করিয়া যেন তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, এই কয়েকদিনের পরিচয়েই গিরীন্দ্র তাহাকে একটু বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতেছে। পুরুষের প্রীতির চক্ষু যে এতবড় লজ্জার বস্তু তাহা সে ইতিপূর্বে কল্পনাও করে নাই।

বাড়িতে একবার দেখা দিয়াই সে তাড়াতাড়ি ও-বাড়িতে শেখরের ঘরে গিয়া ঢুকিল, এবং একেবারে কাজে লাগিয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে এ ঘরের ছোটখাটো কাজগুলি তাহাকেই করিতে হইত। বই প্রভৃতি গুছাইয়া তুলিয়া রাখা, টেবিল সাজাইয়া দেওয়া, দোয়াত-কলম ঝাড়িয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখা, এ-সমস্ত সে না করিলে আর কেহ করিত না। ছয়-সাত দিনের অবহেলায় অনেক কাজ জমিয়া গিয়াছিল, সেই সমস্ত ত্রুটি শেখরের ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।

ললিতা সময় পাইলেই কাছে কাছে থাকিত এবং সে নিজে কাহাকেও পর মনে করিত না বলিয়া এ-বাড়িতে তাহাকেও কেহ পর মনে করিত না। আট বছর বয়সে মা-বাপ হারাইয়া মামার বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হইতে সে ছোটবোনটির মত শেখরের আশেপাশে ঘুরিয়া তাহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছে।

সে যে শেখরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী তাহা সবাই জানিত, শুধু সেই স্নেহ যে এখন কোথায় উঠিয়াছে তাহাই কেহ জানিত না, ললিতাও না। শিশুকাল হইতে শেখরের কাছে তাহাকে একইভাবে এত অপর্যাপ্ত আদর পাইতে সবাই দেখিয়া আসিয়াছে যে, আজ পর্যন্ত তাহার কোন আদরই কাহারই চোখে বিসদৃশ বোধ হয় না, কিংবা কোন ব্যবহারই কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। করে না বলিয়াই সে যে কোনও দিন বধূরূপে এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত

হইতে পারে, সে সম্ভাবনাও কাহারও মনে উদয় হয় নাই। ললিতাদের বাড়িতেও হয় নাই, ভুবনেশ্বরীর মনেও হয় নাই।

ললিতা ভাবিয়া রাখিয়াছিল, কাজ শেষ করিয়া শেখর আসিবার পূর্বেই চলিয়া যাইবে; কিন্তু অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া ঘড়ির দিকে নজর করে নাই। হঠাৎ দ্বারের বাহিরে জুতার মসমস শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়াই একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

শেখর ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, এই যে! কাল তা হলে ফিরতে কত রাত হ'ল?

ললিতা জবাব দিল না।

শেখর একটা গদিআঁটা আরাম-চৌকির উপর হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, ফেরা হ'ল কখন? দুটো? তিনটে? মুখে কথা নেই কেন?

ললিতা তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর বিরক্ত হইয়া বলিল, নীচে যাও, মা ডাকছেন।

ভুবনেশ্বরী ভাঁড়ারের সম্মুখে বসিয়া জলখাবার সাজাইতেছিলেন, ললিতা কাছে আসিয়া বলিল, ডাকছিলে মা?

কৈ ডাকিনি ত, বলিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়াই বলিলেন, মুখখানি এমন শুকনো কেন ললিতে? কিছু খাসনি বুঝি এখনো?

ললিতা ঘাড় নাড়িল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন, আচ্ছা, যা তোর দাদাকে খাবার দিয়ে আমার কাছে আয়।

ললিতা খাবার হাতে করিয়া খানিক পরে, উপরে আসিয়া দেখিল, তখনো শেখর তেমনিভাবে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, অফিসের পোশাকও ছাড়ে নাই, হাতমুখও ধোয় নাই। কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, খাবার এনেচি।

শেখর চাহিয়া দেখিল না। বলিল, কোথাও রেখে দিয়ে যাও।

ললিতা রাখিয়া দিল না, হাতে করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর না চাহিয়াও বুঝিতেছিল, ললিতা যায় নাই—দাঁড়াইয়া আছে। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ললিতা, আমার দেরি আছে, রেখে নীচে যাও।

ললিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে রাগিতেছিল, মৃদুস্বরে বলিল, থাক দেরি, আমারো নীচে কোন কাজ নেই।

শেখর চোখ চাহিয়া হাসিয়া বলিল, এই যে কথা বেরিয়েছে। নীচে কাজ না থাকে ও-বাড়িতে আছে ত? তাও না থাকে, তার পরের বাড়িতেও আছে ত? বাড়ি ত তোমার একটি নয় ললিতে?

নয়ই ত! বলিয়া রাগ করিয়া ললিতা খাবারের থালাটা দুম করিয়া টেবিলে রাখিয়া দিয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, সন্ধ্যের পরে একবার এসো।

এক শ-বার আমি ওপর-নীচে করতে পারিনে, বলিয়া ললিতা চলিয়া গেল।

নীচে আসিবামাত্রই মা বলিলেন, দাদাকে তোর খাবার দিয়ে এলি, পান দিয়ে এলিনে রে!

আমার ক্ষিদে পেয়েচে মা, আমি আর পারিনে, আর কেউ দিয়ে আসুক, বলিয়া ললিতা বসিয়া পড়িল।

মা তাহার রুষ্ট মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুই খেতে ব'স, ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ললিতা প্রত্যুত্তর না করিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

সে থিয়েটার দেখিতে যায় নাই—তবুও শেখর তাহাকে বকিয়াছিল, এই রাগে সে চার-পাঁচ দিন শেখরকে দেখা দেয় নাই, অথচ সে অফিসে চলিয়া গেলে দুপুরবেলা গিয়া ঘরের কাজ করিয়া দিত। শেখর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দু'দিন ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, তথাপি সে যায় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ পাড়ার একজন অতিবৃদ্ধ ভিক্ষুক মাঝে মাঝে ভিক্ষা করিতে আসিত, তাহার উপর ললিতার বড় দয়া ছিল, আসিলেই তাহাকে একটি করিয়া টাকা দিত। টাকাটি হাতে পাইয়া সে যে-সমস্ত অপূর্ব এবং অসম্ভব আশীর্বাদ উচ্চারণ করিতে থাকিত, সেইগুলি শুনিতে সে অতিশয় ভালবাসিত। সে বলিত, ললিতা পূর্বজন্মে তাহার আপনার মা ছিল, এবং ইহা সে ললিতাকে দেখিবামাত্রই কেমন করিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। সেই বুড়া ছেলেটি তাহার আজ সকালেই দ্বারে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, আমার মা-জননী কোথায় গো?

সন্তানের আহ্বানে আজ ললিতা কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। এখন শেখর ঘরে আছে, সে টাকা আনিতে যায় কিরূপে? এদিক-সেদিক চাহিয়া মামীর কাছে গেল। মামী এইমাত্র ঝির সহিত বকাবকি করিয়া বিরক্ত-মুখে রাঁধিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কিছু না বলিতে পারিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ভিক্ষুক দোরগোড়ায় লাঠিটি ঠেস দিয়া রাখিয়া বেশ চাপিয়া বসিয়াছে। ইতিপূর্বে ললিতা কখনও তাহাকে নিরাশ করে নাই, আজ শুধুহাতে ফিরাইয়া দিতে তাহার মন সরিল না।

ভিক্ষুক আবার ডাক দিল।

আন্নাকালী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সেজদি, তোমার সেই ছেলে এসেচে।

ললিতা বলিল, কালী, একটা কাজ কর না ভাই। আমার হাতজোড়া, তুই একটিবার ছুটে গিয়ে শেখরদার কাছ থেকে একটি টাকা নিয়ে আয়।

কালী ছুটিয়া চলিয়া গেল, খানিক পরে তেমনি ছুটিয়া আসিয়া ললিতার হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল, এই নাও।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, শেখরদা কি বললে রে?

কিছু না। আমাকে বললে চাপকানের পকেট থেকে টাকা নিতে, আর নিয়ে এলুম।

আর কিছু বললে না?

না, আর কিচ্ছু না, বলিয়া আন্নাকালী ঘাড় নাড়িয়া খেলা করিতে চলিয়া গেল।

ললিতা ভিক্ষুক বিদায় করিল; কিন্তু অন্যদিনের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বাক্যচ্ছটা শুনিতে পারিল না—ভালই লাগিল না।

এ কয়দিন তাহাদের আড্ডা পূর্ণ তেজে চলিতেছিল। আজ দুপুরবেলা ললিতা গেল না, মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শুইয়া রহিল। আজ সত্য সত্যই তাহার ভারী মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। বিকালবেলা কালীকে কাছে ডাকিয়া বলিল, কালী, তুই পড়া বলে নিতে শেখরদার ঘরে আর যাসনে?

কালী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ যাই ত।

আমার কথা শেখরদা জিজ্ঞেস করে না?

না। হাঁ হাঁ, পরশু করেছিল—তুমি দুপুরবেলা তাস খেল কিনা?

ললিতা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, তুই কি বললি?

কালী বলিল, তুমি দুপুরবেলা চারুদিদিদের বাড়ি তাস খেলতে যাও, তাই বললুম। শেখরদা বললে, কে কে খেলে? আমি বললুম, তুমি আর সই-মা, চারুদিদি আর তার মামা। আচ্ছা, তুমি ভাল খেলো, না চারুদিদির মামা ভাল খেলে সেজদি? সই-মা বলে তুমি ভালো খেলো, না?

ললিতা সে কথার জবাব না দিয়া হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, তুই অত কথা বলতে গেলি কেন? সব কথায় তোর কথা কওয়া চাই, আর কোনদিন তোকে আমি কিচ্ছু দেব না, বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কালী অবাক হইয়া গেল। তাহার এই আকস্মিক ভাবপরিবর্তনের হেতু সে কিছুই বুঝিল না।

মনোরমার তাস খেলা দু'দিন বন্ধ হইয়াছে—ললিতা আসে না। তাহাকে দেখিয়া অবধি গিরীন্দ্র যে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রথম হইতেই মনোরমা সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সন্দেহ আজ সুদৃঢ় হইল।

এই দুইদিন গিরীন কি একরকম উৎসুক ও অন্যমনস্ক হইয়াছিল। অপরাহ্নে বেড়াইতে যাইত না, যখন তখন বাড়ির ভিতরে আসিয়া এঘর-ওঘর করিত, আজ দুপুরবেলা আসিয়া বলিল, দিদি, আজও খেলা হবে না?

মনোরমা বলিলেন, কি করে হবে গিরীন, লোক কৈ? না হয়, আয় আমরা তিনজনেই খেলি।

গিরীন নিরুৎসাহভাবে বলিল, তিনজনে কি খেলা হয় দিদি? ও-বাড়ির ললিতাকে একবার ডাকতে পাঠাও না।

সে আসবে না।

গিরীন বিমর্ষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন আসবে না, ওদের বাড়িতে মানা ক'রে দিয়েচে বোধ হয়, না?

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, ওর মামা-মামী সে-রকম মানুষ নয়—সে নিজেই আসে না।

গিরীন হঠাৎ খুশী হইয়া বলিল, তা হলে তুমি নিজে আজ একবার গেলেই আসবেন, —কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে নিজের মনেই ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেল।

মনোরমা হাসিয়া ফেলিলেন,—আচ্ছা, তাই যাই, বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং খানিক পরে ললিতাকে ধরিয়া আনিয়া তাস পাড়িয়া বসিলেন।

দু'দিন খেলা হয় নাই, আজ অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ জমিয়া গেল। ললিতারা জিতিতেছিল।

ঘণ্টা-দুই পরে সহসা কালী আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সেজদি, শেখরদা ডাকচেন—জলদি!

ললিতার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাস-দেওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, শেখরদা অফিসে যাননি?

কি জানি, চলে এসেচেন, বলিয়া সে ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল।

ললিতা তাস রাখিয়া দিয়া মনোরমার মুখপানে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, যাই সই-মা।

মনোরমা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, সে কি রে, আর দু-হাত দেখে যা।

ললিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না সই-মা, ইনি তা হলে বড় রাগ করবেন, বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গিরীন প্রশ্ন করিল, শেখরদাদা আবার কে দিদি?

মনোরমা বলিলেন, ঐ যে সুমুখের ফটকওয়ালা বড় বাড়িটা।

গিরীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও—ওই বাড়ি। নবীনবাবু ওঁদের আত্মীয় বুঝি?

মনোরমা মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আত্মীয় কেমন! ললিতাদের ঐ ভিটেটুকু পর্যন্ত বুড়ো আত্মসাৎ করবার ফিকিরে আছেন!

গিরীন আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল।

মনোরমা তখন গল্প করিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া গত বৎসর টাকার অভাবে গুরুচরণবাবুর মেজমেয়ের বিবাহ হইতেছিল না, পরে অসম্ভব সুদে নবীন রায় টাকা ধার দিয়া বাড়িখানি বাঁধা রাখিয়াছেন। এ টাকা কোনদিন শোধ হইবে না এবং অবশেষে বাড়িটা নবীন রায়ই গ্রহণ করিবেন।

মনোরমা সমস্ত কথা বলিয়া পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বুড়ার আন্তরিক ইচ্ছা গুরুচরণবাবুর ভাঙ্গা বাড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঐখানে ছোট ছেলে শেখরের জন্যে একটি বড় রকমের বাড়ি তৈরি করেন—দুই ছেলের দুই আলাদা বাড়ি—মতলব মন্দ নয়।

ইতিহাস শুনিয়া গিরীনের ক্লেশ বোধ হইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দিদি, গুরুচরণবাবুর আরও ত মেয়ে আছে, তাদেরি বা বিয়ে কি করে দেবেন?

মনোরমা বলিলেন, নিজের ত আছেই, তা ছাড়া ললিতা। ওর বাপ-মা নেই, সমস্ত ভার ঐ গরীবের ওপর। বড় হয়ে উঠেচে, এই বছরের মধ্যে বিয়ে না দিলেই নয়। ওদের সমাজে সাহায্য করতে কেউ নেই, জাত নিতে সবাই আছে—আমরা বেশ আছি গিরীন।

গিরীন চুপ করিয়া রহিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, সেদিন ললিতার কথা নিয়েই ওর মামী আমার কাছে কেঁদে ফেললে—কি করে যে কি হবে তার কিছুই স্থির নেই—ওর ভাবনা ভেবেই গুরুচরণবাবুর পেটে অন্ন-জল যায় না,—হাঁ গিরীন, মুঙ্গেরে তোদের কোন বন্ধুবান্ধব এমন নেই যে, শুধু মেয়ে দেখে বিয়ে করে? অমন মেয়ে কিন্তু পাওয়া শক্ত।

গিরীন বিষণ্ণভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, বন্ধুবান্ধব আর পাবো কোথায় দিদি, তবে টাকা দিয়ে আমি সাহায্য করতে পারি।

গিরীনের পিতা ডাক্তারি করিয়া অনেক টাকা এবং বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সে-সমস্তরই এখন সে মালিক।

মনোরমা বলিলেন, টাকা তুই ধার দিবি?

ধার আর কি দেব দিদি—ইচ্ছে হয়, উনি শোধ দেবেন, না হয় নাই দেবেন।

মনোরমা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, তোর টাকা দিয়ে লাভ? ওরা আমাদের আত্মীয়ও নয়, সমাজের লোকও নয়—এমনি কে কাকে টাকা দেয়?

গিরীন তাহার বোনের মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল, তার পরে কহিল, সমাজের লোক নাই হলেন, বাঙ্গালী ত? ওঁর একান্ত অভাব, আর আমার বিস্তর রয়েচে,—তুমি একবার বলে দেখো না দিদি, উনি যদি নিতে রাজী হন, আমি দিতে পারি। ললিতা তাঁদেরও কেউ নয়, আমাদেরও কেউ নয়—তার বিয়ের সমস্ত খরচ না হয় আমিই দেব।

তাহার কথা শুনিয়া মনোরমা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। ইহাতে তাঁহার নিজের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই বটে, তথাপি এত টাকা একজন আর একজনকে দিতেছে দেখিলে অনেক স্ত্রীলোকই প্রসন্ন-চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না।

চারু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সে মহা খুশী হইয়া লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তাই দাও মামা, আমি সই-মাকে বলে আসচি।

তাহার মা ধমক দিয়া বলিলেন, তুই থাম চারু, ছেলেমানুষ—এ-সব কথায় থাকিস নে। বলতে হয় আমিই বলব।

গিরীন কহিল, তাই বলো দিদি। পরশু রাস্তার উপর দাঁড়িয়েই গুরুচরণবাবুর সঙ্গে একটুখানি আলাপ হয়েছিল, কথায়বার্তায় মনে হল—বেশ সরল লোক; তুমি কি বল?

মনোরমা বলিলেন, আমিও তাই বলি, সবাই তাই বলে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বড় সাদাসিধে মানুষ। সেইজন্যেই ত দুঃখ হয় গিরীন, অমন লোকটিকে হয়ত বাড়িঘর ছেড়ে নিরাশ্রয় হতে হবে। তার সাক্ষী দেখলি নে গিরীন, শেখরবাবু ডাকচেন বলতেই ললিতা কি-রকম তাড়াতাড়ি উঠে পালালো, বাড়িসুদ্ধ লোক ওদের কাছে যেন বিক্রি হয়ে আছে। কিন্তু, যত খোশামোদই করুক না কেন, নবীন রায়ের হাতে গিয়ে একবার যখন পড়েচে, রেহাই পাবে, এ ভরসা কেউ করে না।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বলবে ত দিদি?

আচ্ছা, জিজ্ঞেস করব। দিয়ে যদি তুই উপকার করতে পারিস, ভালই ত। বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোরই বা এত চাড় কেন গিরীন?

চাড় আর কি দিদি, দুঃখ-কণ্টে পরস্পরের সাহায্য করতেই হয়, বলিয়া সে ঈষৎ সলজ্জ-মুখে প্রস্থান করিল। দ্বারের বাহিরে গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

তাহার দিদি বলিলেন, আবার বসলি যে?

গিরীন হাসিমুখে বলিল, অত যে কাঁদুনি গাইলে দিদি, হয়ত সব সত্যি নয়।

মনোরমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন?

গিরীন বলিতে লাগিল, ওদের ললিতা যেরকম টাকা খরচ করে সে ত দুঃখীর মত মোটেই নয় দিদি। সেদিন আমরা থিয়েটার দেখতে গেলুম, ও নিজে গেল না, তবু দশ টাকা ওর বোনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। চারুকে জিজ্ঞেস কর না, কিরকম খরচ করে; মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকার কম ওর নিজের খরচই চলে না যে।

মনোরমা বিশ্বাস করিলেন না।

চারু বলিল, সত্যি মা। ও-সব শেখরবাবুর টাকা, শুধু এখন নয়, ছেলেবেলা থেকে ওই শেখরদার আলমারি খুলে টাকা নিয়ে আসে—কেউ কিছু বলে না।

মনোরমা মেয়ের দিকে চাহিয়া সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকা আনে শেখরবাবু জানেন?

চারু মাথা নাড়িয়া বলিল, জানেন, সুমুখেই চাবি খুলে নিয়ে আসে। গেল মাসে আন্নাকালীর পুতুলের বিয়েতে অত টাকা কে দিলে? সবই ত সই দিলে।

মনোরমা ভাবিয়া বলিলেন, কি জানি। কিন্তু এ-কথাও ঠিক বটে, বুড়োর মত ছেলেরা অমন চামার নয়—ওরা সব মায়ের ধাত পেয়েচে—তাই দয়াধর্ম আছে। তা ছাড়া, ললিতা মেয়েটি নাকি খুব ভাল, ছেলেবেলা থেকে কাছে কাছে থাকে, দাদা বলে ডাকে, তাই ওকে মায়া-মমতাও সবাই করে। হাঁ চারু, তুই ত যাওয়া-আসা করিস, ওদের শেখরের এই মাঘ মাসে নাকি বিয়ে হবে? শুনেচি, বুড়ো অনেক টাকা পাবে।

চারু বলিল, হাঁ মা, এই মাঘ মাসেই হবে—সব ঠিক হয়ে গেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গুরুচরণ লোকটি সেই ধাতের মানুষ—যাহার সহিত যে-কোনও বয়সের লোক অসঙ্কোচে আলাপ করিতে পারে। দুই-চারিদিনের আলাপে গিরীনের সহিত তাঁহার একটা স্থায়ী সখ্যতা জন্মিয়া গিয়াছিল। গুরুচরণের চিত্তের বা মনের কিছুমাত্র দৃঢ়তা ছিল না বলিয়া তর্ক করিতেও তিনি যেমন ভালবাসিতেন, তর্কে পরাজিত হইলেও তেমনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না।

সন্ধ্যার পর চা খাইবার নিমন্ত্রণ তিনি গিরীনকে করিয়া রাখিয়াছিলেন। অফিস হইতে ফিরিতেই তাঁহার দিবা অবসান হইয়া যাইত। হাত-মুখ ধুইয়াই বলিতেন, ললিতে, চা তৈরি হ'লো মা? কালী, যা যা, তোর গিরীনমামাকে এইবার ডেকে আন। তারপর উভয়ে চা-খাওয়া এবং তর্ক চলিতে থাকিত।

ললিতা কোন কোন দিন মামার আড়ালে বসিয়া চুপ করিয়া শুনিত। সেদিন গিরীনের যুক্তিতর্ক শতমুখে উৎসারিত হইতে থাকিত। তর্কটা প্রায়ই আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধেই হইত। সমাজের হৃদয়হীনতা, অসঙ্গত উপদ্রব এবং অত্যাচার—এ-সমস্তই সত্য কথা।

একে ত সমর্থন করিবার বাস্তবিক কিছু নাই, তাহাতে গুরুচরণের উৎপীড়িত অশান্ত হৃদয়ের সহিত গিরীনের কথাগুলা বড়ই খাপ খাইত। তিনি শেষকালে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, ঠিক কথা গিরীন! কার ইচ্ছে আর না করে নিজের মেয়েদের যথাসময়ে ভাল জায়গায় বিয়ে দিতে, কিন্তু দিই কি করে? সমাজ বলচেন দাও বিয়ে—মেয়ের বয়স হয়েচে, কিন্তু দেবার বন্দোবস্ত করে ত দিতে পারেন না। যা বলেচ গিরীন, এই আমাকে দিয়েই দ্যাখ না কেন, বাড়িটুকু পর্যন্ত বন্ধক পড়েচে, দুদিন পরে ছেলেমেয়ের হাত ধরে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—সমাজ তখন ত বলবেন না, এসো, আমার বাড়িতে আশ্রয় নাও। কি বল হে?

গিরীন হয়ত চুপ করিয়া থাকিত, গুরুচরণ নিজেই বলিতেন, খুব সত্য কথা। এমন সমাজ থেকে জাত যাওয়াই মঙ্গল। খাই না খাই, শান্তিতে থাকা যায়। যে সমাজ দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বিপদে সাহস দেয় না, শুধু চোখ রাঙ্গায় আর গলা চেপে ধরে সে সমাজ আমার নয়, আমার মত গরীবেরও নয়—এ সমাজ বড়লোকের জন্যে। ভাল, তারাই থাক, আমাদের কাজ নাই। বলিয়া গুরুচরণ সহসা চুপ করিতেন।

যুক্তিতর্কগুলি ললিতা শুধুই মন দিয়া শুনিত না, রাত্রে বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ ঘুম না আসিত নিজের মনে বিচার করিয়া দেখিত। প্রতি কথাটি তাহার মনের উপর গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে মনে বলিত, যথার্থই গিরীনবাবুর কথাগুলি অতিশয় ন্যায়সঙ্গত।

মামাকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, সেই মামার স্বপক্ষে টানিয়া গিরীন যাহাই কিছু বলিত, সমস্তই তাহার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হইত। তাহার মামা, বিশেষ করিয়া তাহারি জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, অন্ন-জল পরিত্যাগ করিতেছে—তাহার নির্বিরোধী

দুঃখী মামা তাহাকে আশ্রয় দিয়াই—এত ক্লেশ পাইতেছে! কিন্তু কেন? কেন মামার জাত যাবে? আজ আমার বিয়ে দিয়ে, কাল যদি বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে আসি, তাহলে ত জাত যাবে না। অথচ তফাত কিসের? গিরীনের এই সমস্ত কথার প্রতিধ্বনি সে তাহার ভারাতুরা হৃদয় হইতে বাহির করিয়া আর একবার তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

তাহার মামার হইয়া, মামার দুঃখ বুঝিয়া, যে-কেহ কথা কহিত, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া, তাহার মতের সহিত মত না মিলাইয়া ললিতার অন্য পথ ছিল না। সে গিরীনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ গুরুচরণের মত সেও সন্ধ্যার চা-পানের সময়টির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে গিরীন ললিতাকে 'আপনি' বলিয়া ডাকিত। গুরুচরণ নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, ওকে আবার 'আপনি' কেন গিরীন, 'তুমি' বলে ডেকো। তখন হইতে সে 'তুমি' বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল।

একদিন গিরীন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি চা খাও না ললিতা?

ললিতা মুখ নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িলে, গুরুচরণ বলিয়াছিলেন, ওর শেখরদার বারণ আছে। মেয়েমানুষের চা খাওয়া সে ভালবাসে না।

হেতু শুনিয়া যে গিরীন সুখী হইতে পারে নাই, ললিতা সেটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল।

আজ শনিবার। অন্যদিনের অপেক্ষা এই দিনটার সভা ভাঙিগতে অধিক বিলম্ব হইল। চা-খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, গুরুচরণ আজ আলোচনায় তেমন উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারিতেছিলেন না, মাঝে মাঝে কি-একরকম অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন।

গিরীন সহজেই তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ আপনার দেহটা বোধ করি তেমন ভাল নাই?

গুরুচরণ হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া বলিলেন, কেন? দেহ ত বেশ ভালই আছে।

গিরীন সঙ্কোচের সহিত বলিল, তাহলে অফিসে কি কিছু—

না, তাও ত কিছু নয়, বলিয়া গুরুচরণ একটু বিস্ময়ের সহিত গিরীনের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার ভিতরের উদ্বেগ যে বাহিরে প্রকাশ পাইতেছিল তাহা এই নিতান্ত সরল প্রকৃতির মানুষটি বুঝিতেই পারেন নাই।

ললিতা পূর্বে একেবারেই চুপ করিয়া থাকিত, কিন্তু আজকাল দু-একটা কথায় মাঝে মাঝে যোগ দিতেছিল। সে বলিল, হাঁ মামা, আজ তোমার হয়ত মন ভাল নেই।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ও সেই কথা! হাঁ মা, ঠিক ধরেচিস বটে, আজ আমার সত্যিই মন ভাল নেই।

ললিতা ও গিরীন উভয়েই তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

গুরুচরণ বলিলেন, নবীনদা সমস্ত জেনেশুনে গোটা-কতক শক্ত কথা পথে দাঁড়িয়েই শুনিয়ে দিলেন। আর তাঁরই বা দোষ কি, ছ'মাস হয়ে গেল, একটা পয়সা সুদ দিতে পারলুম না, তা আসল দূরে থাক।

ব্যাপারটা ললিতা বুঝিয়াই চাপা দিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মামা পাছে ঘরের লজ্জাকর কথাগুলা পরের কাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি ভেবো না মামা, সে-সব পরে হবে।

কিন্তু গুরুচরণ সেদিক দিয়াও গেলেন না। বরং বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিলেন, পরে আর কি হবে মা? তা নয় গিরীন, আমার এই মা'টি চায় তার বুড়ো ছেলেটি যেন কিছু ভাবনা-চিন্তা না করে। কিন্তু বাইরের লোকে যে তোর দুঃখী মামার দুঃখটা চেয়ে দেখতেই চায় না, ললিতে।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, নবীনবাবু আজ কি বললেন?

গিরীন যে সমস্ত কথাই জানে ললিতা তাহা জানিত না, তাই তাহার প্রশ্নটাকে অসঙ্গত কৌতূহল মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

গুরুচরণ খুলিয়া বলিলেন। নবীন রায়ের স্ত্রী বহুদিন হইতে অজীর্ণ রোগে

ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি রোগ কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় চিকিৎসকেরা বায়ু-পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থের প্রয়োজন, অতএব এই সময়ে গুরুচরণের সমস্ত সুদ এবং কিছু আসল দিতে হইবে।

গিরীন ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, একটা কথা আপনাকে বলি বলি করেও বলতে পারিনি, যদি কিছু না মনে করেন আজ তা হলে বলি।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমাকে কোন কথা বলতে কেউ কখন ত সঙ্কোচ করে না গিরীন,—কি কথা?

গিরীন বলিল, দিদির কাছে শুনেচি, নবীনবাবুর খুব বেশী সুদ। তাই বলি, আমার অনেক টাকাই ত অমনি পড়ে রয়েছে, কোনও কাজেই আসে না, আর, তাঁরও দরকার, নাহয় এই ঋণটা শোধ করেই দিন না?

ললিতা ও গুরুচরণ উভয়েই আশ্চর্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। গিরীন অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিতে লাগিল, আমার এখন ত টাকার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই, তাই যখন আপনার সুবিধা হবে, ফিরিয়ে দিলেই চলবে, ওঁদের আবশ্যক, সেইজন্যে বলছিলাম যদি—

গুরুচরণ ধীরে ধীরে বলিলেন, সমস্ত টাকাটা তুমি দেবে?

গিরীন মুখ নীচু করিয়া বলিল, বেশ ত, তাঁদের উপকার হয়—

গুরুচরণ প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে আন্নাকালী ছুটিয়া আসিয়া পড়িল। সেজদি, জলদি—শেখরদা কাপড় পরে নিতে বললেন—থিয়েটার দেখতে যেতে হবে,—বলিয়াই যেমন করিয়া আসিয়াছিল তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া গুরুচরণ হাসিলেন। ললিতা স্থির হইয়া রহিল।

আন্নাকালী মুহূর্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কৈ, উঠলে না সেজদি, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে রয়েচি যে!

তথাপি ললিতা উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। সে শেষ পর্যন্ত শুনিয়া যাইতে চায়, কিন্তু গুরুচরণ কালীর মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া ললিতার মাথায় একটা হাত দিয়া বলিলেন, তাহলে যা মা, দেরি করিস নে—তোর জন্যে বুঝি সবাই অপেক্ষা করে আছে।

অগত্যা ললিতাকে উঠিতে হইল। কিন্তু, যাইবার পূর্বে গিরীনের মুখের পানে সে যে গভীর কৃতজ্ঞদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, গিরীন্দ্র তাহা দেখিতে পাইল।

মিনিট-দশেক পরে কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে পান দিবার ছুতা করিয়া আর একবার বাহিরের ঘরে নিঃশব্দ-পদক্ষেপে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গিরীন চলিয়া গিয়াছে। একাকী গুরুচরণ মোটা বালিশটা মাথায় দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন, তাঁহার মুদিত চক্ষুর দুই পাশ বাহিয়া জল ঝরিতেছে। এ যে আনন্দাশ্রু. ললিতা তাহা বুঝিল। বুঝিল বলিয়াই তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিল না, যেমন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে সে যখন শেখরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার নিজের চোখ দুটিও অশ্রুভারে ছলছল করিতেছিল। কালী ছিল না. সে সকলের আগে গাড়িতে গিয়া বসিয়াছিল, একাকী শেখর তাহার ঘরের মাঝখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বোধ করি ললিতার অপেক্ষাতেই ছিল, মুখ তুলিয়া তাহার জলভারাক্রান্ত চোখ দুটি লক্ষ্য করিল।

সে আট-দশ দিন ললিতাকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল. কিন্তু এখন সে তাহা ভুলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি, কাঁদচ নাকি?

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িল।

এই কয়দিনের একান্ত অদর্শনে শেখরের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল.

তাই সে কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাত দিয়া সহসা ললিতার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, সত্যিই কাঁদচ যে! হ'লো কি?

ললিতা এবার নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিল না, সেইখানে বসিয়া পড়িয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবীন রায় সমস্ত সুদ আসল কড়াক্রান্তি গণিয়া লইয়া বন্ধকী কাগজখানা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, বলি, টাকাটা দিলে কে হে?

গুরুচরণ নম্রভাবে কহিলেন, সেটা জিজ্ঞেস করবেন না দাদা, বলতে নিষেধ আছে।

টাকাটা ফেরত পাইয়া নবীন কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হন নাই, এটা আশাও করেন নাই, ইচ্ছাও করেন নাই। বরং বাড়িটা ভাঙিগয়া ফেলিয়া কিরূপ নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত করিবেন, তাহাই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্লেষ করিয়া বলিলেন, তা এখন নিষেধ ত হবেই। ভায়া, দোষ তোমার নয়, দোষ আমার। দোষ, টাকাটা ফিরে চাওয়ার, নইলে কলিকাল বলেচে কেন!

গুরুচরণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলিলেন, সে কি কথা দাদা! আপনার টাকার ঋণটাই শোধ করেচি, কিন্তু আপনার দয়ার ঋণ ত শোধ করতে পারিনি।

নবীন হাসিলেন। তিনি পাকা লোক, এ-সকল কথা বিশ্বাস করিলে গুড় বেচিয়া এত টাকা করিতে পারিতেন না। বলিলেন, সে যদি সত্যিই ভাবতে ভায়া, তা হলে এমন করে শোধ করে দিতে না। না হয় একবার টাকাটাই চেয়েছিলাম, সেও তোমারই বৌঠানের অসুখের জন্যে, আমার নিজের জন্যে কিছু নয়,—বলি কত সুদে বন্ধক রাখলে বাড়িটা?

গুরুচরণ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, বন্ধক রাখিনি—সুদের কথাও কিছু হয়নি।

নবীন বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, বল কি, শুধু-হাতে?

হাঁ দাদা, একরকম তাই বটে। ছেলেটি বড় সৎ, বড় দয়ার শরীর।

ছেলেটি? ছেলেটি কে?

গুরুচরণ এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না, মৌন হইয়া রহিলেন। যতটা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন এতটাও তাঁহার বলা উচিত ছিল না।

নবীন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, যখন নিষেধ আছে তখন কাজ নেই, কিন্তু সংসারের অনেক জিনিসই দেখেচি বলে এইটুকু সাবধান করে দিই ভায়া, তিনি যেই হোন, এত ভাল করতে গিয়ে শেষকালে যেন ফ্যাসাদে না ফেলেন।

গুরুচরণ সে-কথায় আর জবাব না দিয়া নমস্কার করিয়া কাগজখানি হাতে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় প্রতি বৎসরই ভুবনেশ্বরী এই সময়টায় কিছুদিনের জন্য পশ্চিমে ঘুরিয়া আসিতেন। তাঁহার অজীর্ণ রোগ ছিল, ইহাতে উপকার হইত। রোগ বেশী নয়। নবীন গুরুচরণের কাছে সেদিন কার্যোদ্ধারের জন্যই বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন। যাই হোক, যাত্রার আয়োজন হইতেছিল।

সেদিন সকালবেলা একটা চামড়ার তোরঙ্গে শেখর তাহার আবশ্যকীয় শৌখিন জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছিল।

আন্নাকালী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, শেখরদা, তোমরা কাল যাবে, না?

শেখর তোরঙ্গ হতে মুখ তুলিয়া বলিল, কালী, তোর সেজদিকে ডেকে দে, কি সঙ্গে নেবে-টেবে, এই সময়ে দিয়ে যাক। ললিতা প্রতি বৎসর মায়ের সঙ্গে যাইত, এবারেও যাইবে তাহাই শেখর জানিত।

কালী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এবার সেজদি ত যাবে না!

কেন যাবে না?

কালী কহিল, বাঃ, কি করে যাবে! মাঘ-ফাল্গুন মাসে ওর বিয়ে হবে, বাবা বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে।

শেখর নির্নিমেষ চোখে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কালী বাড়ির ভিতরে যাহা শুনিয়াছিল উৎসাহের সহিত ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু বলেচেন যত টাকা লাগে ভাল পাত্তর চাই। বাবা আজও অফিসে যাবেন না, খেয়েদেয়ে কোথায় ছেলে দেখতে যাবেন; গিরীনবাবুও সঙ্গে যাবেন।

শেখর স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল এবং কেন যে ললিতা আর আসিতে চাহে না তাহারও যেন কতকটা কারণ বুঝিতে পারিল।

কালী বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু খুব ভালমানুষ শেখরদা। মেজদির বিয়ের সময় আমাদের বাড়ি জ্যাঠামশায়ের কাছে বাঁধা ছিল ত, বাবা বলেছিলেন, আর দু'মাস-তিনমাস পরেই আমাদের সবাইকে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হ'ত, তাই গিরীনবাবু টাকা দিলেন। কাল সব টাকা জ্যাঠামশায়কে বাবা ফিরিয়ে দিয়েচেন। সেজদি বলছিল, আর আমাদের কোনও ভয় নেই, সত্যি না শেখরদা?

প্রত্যুত্তরে শেখর কিছুই বলিতে পারিল না, তেমনিই চাহিয়া রহিল।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচ শেখরদা?

এইবার শেখরের চমক ভাঙিগল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিছু না রে। কালী, তোর সেজদিকে একবার শিগগির ডেকে দে, বল আমি ডাকচি, যা ছুটে যা।

কালী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শেখর খোলা তোরঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কোন্ দ্রব্যে তাহার প্রয়োজন, কোন্ দ্রব্যে প্রয়োজন নাই, সমস্তই এখন তাহার চোখের সম্মুখে একাকার হইয়া গেল।

ডাক শুনিয়া ললিতা উপরে আসিয়া প্রথমে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তাহার শেখরদা মেঝের উপর একদৃষ্টে মাটির দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহার এ-রকম মুখের ভাব সে পূর্বে কখনও দেখে নাই। ললিতা আশ্চর্য হইল, ভয় পাইল। ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে শেখর 'এসো' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ললিতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ডাকছিলে?

হ্যাঁ, বলিয়া শেখর ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, কাল সকালের গাড়িতেই আমি মাকে নিয়ে পশ্চিমে যাচ্চি, এবার ফিরতে হয়ত দেরি হবে। এই চাবি নাও, তোমার খরচের টাকাকড়ি ও-দেরাজের মধ্যেই রইল।

প্রতিবার ললিতাও সঙ্গে যায়। গতবারে এই উপলক্ষে সে কি আনন্দে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়াছিল, এবার সে কাজটা শেখরদা একা করিতেছে, খোলা তোরঙ্গের দিকে চাহিবামাত্রই ললিতার তাহা মনে পড়িল।

শেখর তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া একবার কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, সাবধানে থেকো—আর যদি কোন কিছুর বিশেষ আবশ্যক হয়, দাদার কাছে ঠিকানা জেনে নিয়ে আমাকে চিঠি লিখো।

অতঃপর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। এবার ললিতা সঙ্গে যাইবে না, শেখর তাহা জানিতে পারিয়াছে এবং তাহার কারণটাও হয়ত শুনিয়াছে মনে করিয়া ললিতা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।

হঠাৎ শেখর কহিল, আচ্ছা যাও এখন, আমাকে আবার এইগুলো গুছিয়ে নিতে হবে। বেলা হ'ল আজ একবার অফিসেও যেতে হবে।

ললিতা খোলা তোরঙ্গের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, তুমি স্নান কর গে, আমি গুছিয়ে দিচ্চি।

তাহলে ত ভালই হয়, বলিয়া শেখর চাবির গোছাটা ললিতার কাছে ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার কি কি দরকার হয়, তা ভুলে যাওনি ত?

ললিতা মাথা ঝুঁকাইয়া তোরঙ্গের জিনিসপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল, সে-কথার কোন জবাব দিল না।

শেখর নীচে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কালীর সমস্ত সংবাদই সত্য। গুরুচরণ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, সে কথাও সত্য। ললিতার পাত্র স্থির করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে তাহাও সত্য। সে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে স্নানাহার শেষ করিয়া অফিসের পোশাক পরিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল।

এই দুই ঘণ্টাকাল ললিতা কিছুই করে নাই, তোরঙ্গের একটা পাটির উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শেখরের পদশব্দে চকিত হইয়া মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তাহার দুই চোখ জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু, শেখর তাহা দেখিয়াও দেখিল না, অফিসের পোশাক পরিতে পরিতে সহজ-ভাবে বলিল, এখন পারবে না ললিতা, দুপুরবেলা এসে গুছিয়ে রেখো। বলিয়া প্রস্তুত হইয়া অফিসে চলিয়া গেল। সে ললিতার রাঙ্গা চোখের হেতু ঠিক বুঝিয়াছিল, কিন্তু সব দিক বেশ করিয়া চিন্তা না করা পর্যন্ত আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

সেদিন অপরাহ্ণে মামাদের চা দিতে আসিয়া ললিতা সহসা জড়সড় হইয়া পড়িল। আজ শেখর বসিয়া ছিল। সে গুরুচরণবাবুর কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছিল।

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া দু বাটি চা প্রস্তুত করিয়া গিরীন ও তাহার মামার সম্মুখে দিতেই গিরীন কহিল, শেখরবাবুকে চা দিলে না ললিতা?

ললিতা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, শেখরদা চা খান না।

গিরীন আর কিছু বলিল না, ললিতার নিজের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। শেখর নিজে এটা খায় না, অপরে খায় তাহাও ইচ্ছা করে না।

চায়ের বাটি হাতে তুলিয়া লইয়া গুরুচরণ পাত্রের কথা পাড়িলেন। ছেলেটি বি. এ. পড়িতেছে, ইত্যাদি বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া শেষে বলিলেন, অথচ আমাদের গিরীনের পছন্দ হয়নি। অবশ্য ছেলেটি দেখিতে তেমন সুশ্রী নয় বটে, কিন্তু পুরুষমানুষের রূপ আর কোন্ কাজে লাগে, গুণ থাকলেই যথেষ্ট।

কোনমতে বিবাহটা হইয়া গেলেই গুরুচরণ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন।

শেখরের সহিত গিরীনের এইমাত্র সামান্য পরিচয় হইয়াছিল। শেখর তাহার দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গিরীনবাবুর পছন্দ হলো না কেন? ছেলেটি লেখাপড়া করছে, অবস্থাও ভাল,—এই ত সুপাত্র।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল বটে, কিন্তু সে ঠিক বুঝিয়াছিল কেন ইহার পছন্দ হয় নাই এবং কেন ভবিষ্যতেও হইবে না। কিন্তু, গিরীন সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, তাহার মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইল, শেখর তাহাও লক্ষ্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাকা, কাল মাকে নিয়ে পশ্চিমে চললুম, ঠিক সময়ে খবর দিতে যেন ভুলে যাবেন না।

গুরুচরণ বলিলেন, সে কি বাবা, তোমরাই যে আমার সব। তা ছাড়া, ললিতার মা উপস্থিত না থাকলে ত কোনও কাজই হতে পারবে না। কি বলিস মা ললিতা? বলিয়া হাসিমুখে ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, সে উঠে গেল কখন?

শেখর কহিল, কথা উঠতেই পালিয়েচে।

গুরুচরণ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালাবে বৈ কি,—হাজার হোক জ্ঞানবুদ্ধি হয়েচে ত। বলিয়া সহসা একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মা আমার একাধারে যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী! এমন মেয়ে বহু ভাগ্যে মেলে শেখরনাথ! কথাটা উচ্চারণ করিতেই তাঁর শীর্ণ কৃশ মুখের উপর গভীর স্নেহের এমন একটা স্নিগ্ধ-মধুর ছায়াপাত হইল যে, গিরীন ও শেখর উভয়েই আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে মনে মনে নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চায়ের মজলিস হইতে নিঃশব্দে পলাইয়া আসিয়া ললিতা শেখরের ঘরে ঢুকিয়া উজ্জ্বল গ্যাসের নীচে একটা তোরঙ্গ আনিয়া শেখরের গরম বস্ত্রগুলি পাট করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল, শেখরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সে ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল।

মকদ্দমায় সর্বস্ব হারিয়া মানুষ যে-রকম মুখ করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আইসে, এ-বেলার মানুষকে যেন ও-বেলায় সহসা আর চিনিতে পারা যায় না, এই এক-ঘণ্টার মধ্যে তেমনি শেখরকে ললিতা যেন ঠিক চিনিতে পারিল না। তাহার মুখের উপর সর্বস্ব হারানোর সমস্ত চিহ্ন যেন কে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।

শেখর শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হচ্চে ললিতা?

ললিতা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহার একটা হাত লইয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, কি হয়েচে শেখরদা?

কৈ, কিছুই হয়নি ত, বলিয়া শেখর জোর করিয়া একটু হাসিল। ললিতার করস্পর্শে তাহার মুখে কতকটা সজীবতা ফিরিয়া আসিল। সে নিকটস্থ একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া সেই প্রশ্নই করিল, তোমার হচ্চে কি?

ললিতা কহিল, মোটা ওভারকোটটা সঙ্গে দিতে ভুলেছিলুম, সেইটাই দিতে এসেচি।

শেখর শুনিতে লাগিল। ললিতা এতক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বলিতে লাগিল, গতবারে গাড়িতে তোমার বড় কষ্ট হয়েছিল, বড় কোট ত অনেকগুলোই ছিল, কিন্তু খুব মোটাসোটা একটাও ছিল না। তাই আমি ফিরে এসেই দোকানে মাপ দিয়ে এইটে তৈরি করিয়েছিলুম, বলিয়া সে খুব ভারী একটা ওভারকোট তুলিয়া আনিয়া শেখরের কাছে রাখিল।

শেখর হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, কৈ, আমাকে বলনি ত?

ললিতা হাসিয়া বলিল, তুমি 'বাবু'মানুষ, তোমাকে বললে কি এত মোটা কোট তৈরি করতে দিতে? তাই বলিনি, তৈরি করিয়ে তুলে রেখেছিলুম।—বলিয়া সেটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল, ঠিক উপরেই রইল, তোরঙ্গ খুললেই পাবে—শীত করলে গায়ে দিতে ভুলো না যেন।

আচ্ছা, বলিয়া শেখর নির্নিমেষ চোখে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, না, এমন হতেই পারে না।

কি হতে পারে না? গায়ে দেবে না?

শেখর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না, সে-কথা নয়—ও অন্য কথা। আচ্ছা ললিতা, মার জিনিসপত্র গোছান হয়েচে কি না জানো?

ললিতা কহিল, জানি, দুপুরবেলা আমিই সে-সমস্ত গুছিয়ে দিয়েছি, বলিয়া সে আর একবার সমস্ত দ্রব্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া চাবি বন্ধ করিতে লাগিল।

শেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ললিতা, আসচে বছর আমার উপায় কি হবে বলতে পার?

ললিতা চোখ তুলিয়া বলিল, কেন?

কেন সে আমিই টের পাচ্চি ভাই, বলিয়া ফেলিয়াই নিজের কথাটা চাপা দিবার জন্য শুষ্কমুখে প্রফুল্লতা টানিয়া আনিয়া বলিল, কিন্তু পরের ঘরে যাবার আগে কোথায় কি আছে না আছে আমাকে দেখিয়ে দিয়ে যেয়ো—নইলে দরকারের সময় কিছুই খুঁজে পাব না।

ললিতা রাগিয়া বলিল, যাও—

শেখর এতক্ষণে হাসিল, বলিল, যাও ত জানি, কিন্তু সত্যই উপায় হবে কি? আমার শখ ত আছে ষোল আনা, কিন্তু এক কড়ার শক্তি নেই। এ-সব কাজ চাকর দিয়েও হয় না—এখন থেকে দেখচি, তোমার মামার মত হতে হবে—এক কাপড় এক চাদর সম্বল করে—যা হয় তাই হবে।

ললিতা চাবির গোছাটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, কাল সকালে একবার এসো।

ললিতা শুনিয়াও শুনিল না, দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় নামিয়া গেল। বাড়ি গিয়া দেখিল, ছাদের এক কোণে চাঁদের আলোয় বসিয়া আন্নাকালী একরাশ গাঁদাফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে। ললিতা তাহার কাছে গিয়া বসিয়া কহিল, হিমে বসে কি করছিস কালী?

কালী মুখ না তুলিয়াই বলিল, মালা গাঁথচি—আজ রাত্তিরে আমার মেয়ের বিয়ে।

কৈ, আমাকে বলিস নি ত?

ঠিক ছিল না সেজদি। এখন বাবা পাঁজি দেখে বললেন, আজ রাত্তির ছাড়া আর এ-মাসে দিন নেই। মেয়ে বড় হয়েচে, আর রাখতে পারিনে, যেমন-তেমন করে বিদেয় করছি। সেজদি, দুটো টাকা দাও না, জলখাবার আনাই।

ললিতা হাসিয়া বলিল, টাকার বেলায় সেজদি। যা, আমার বালিশের নীচে আছে, নিগে যা। হাঁ রে কালী, গাঁদাফুলে কি বিয়ে হয়?

কালী গম্ভীরভাবে বলিল, হয়। অন্য ফুল না পেলে হয়। আমি কতগুলো মেয়ে পার করলুম সেজদি। আমি সব জানি,—বলিয়া খাবার আনাইবার জন্য নীচে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে বসিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল।

খানিক পরে কালী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর সকলকেই বলা হয়েচে শুধু শেখরদাকে বলা হয়নি—যাই, বলে আসি, নইলে তিনি দুঃখ করবেন, বলিয়া ও-বাড়ি চলিয়া গেল।

কালী পাকা গৃহিণী, সমস্ত কাজকর্মই সে সুশৃঙ্খলায় করে। শেখরদাদাকে সংবাদ দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, তিনি একছড়া মালা চাইলেন। যাও না সেজদি, শিগগির করে দিয়ে এসো না। আমি ততক্ষণ এদিকে বন্দোবস্ত করি—লগ্ন শুরু হয়ে গেছে, আর সময় নেই।

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি পারব না কালী, তুই দিয়ে আয়।

আচ্ছা যাচ্চি। ওই বড় ছড়াটা দাও, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

ললিতা হাতে তুলিয়া দিতে গিয়া কি ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই দিয়ে আসচি।

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল, তাই যাও সেজদি, আমার অনেক কাজ—মরবার ফুরসত নেই।

তার মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গী দেখিয়া ললিতা হাসিয়া ফেলিল। একেবারে পাকা বুড়ী, বলিয়া হাসিয়া মালা লইয়া চলিয়া গেল। কবাটের কাছে আসিয়া দেখিল, শেখর একমনে চিঠি লিখিতেছে। দোর খুলিয়া পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাতেও শেখর টের পাইল না! তখন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহাকে চমকিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে মালাছড়াটা সাবধানে শেখরের মাথা গলাইয়া গলায় ফেলিয়া দিয়াই চৌকির পিছনে বসিয়া পড়িল।

শেখর প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, এই কালী! পরক্ষণেই ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, ও কি করলে ললিতা!

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শেখরের মুখের ভাবে ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া বলিল, কেন, কি?

শেখর পূর্ণমাত্রায় গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া বলিল, জান না কি? কালীকে জিজ্ঞেস করে এসো, আজকের রাত্তিরে গলায় মালা পরিয়ে দিলে কি হয়!

এখন ললিতা বুঝিল। চক্ষের নিমেষে তাহার সমস্ত মুখ ভীষণ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে না, কক্ষনো না,—কক্ষনো না, বলিতে বলিতে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শেখর ডাকিয়া বলিল, যেয়ো না ললিতা, শুনে যাও—বিশেষ কাজ আছে—

শেখরের ডাক তাহার কানে গেল বটে, কিন্তু শুনিবে কে? কোথাও সে থামিতে পারিল না দৌড়িয়া আসিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একেবারে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এই পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া সে শেখরের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন এমন কথা শোনে নাই। একে ত গম্ভীরপ্রকৃতি শেখর কখনই তাহাকে পরিহাস করিত না, করিলেও এতবড় লজ্জাকর পরিহাস যে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, ইহা সে ত কল্পনা করিতেও পারিত না। লজ্জায় সংকুচিত হইয়া মিনিট-কুড়ি পড়িয়া থাকিয়া সে উঠিয়া বসিল। অথচ, শেখরকে সে মনে মনে ভয় করিত, তিনি বিশেষ কাজ আছে বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাই যাইবে কি না ইহাই ললিতা উঠিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। ও-বাড়ির ঝির গলা শোনা গেল, ললিতাদি কোথায় গা, ছোটবাবু একবার ডাকচেন—

ললিতা বাহিরে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, যাচ্ছি, যাও। উপরে আসিয়া কবাট ফাঁক করিয়া দেখিল শেখর তখনও চিঠি লিখিতেছে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কেন?

শেখর লিখিতে লিখিতে বলিল, কাছে এসো বলছি।

না, ঐখান থেকে বল।

শেখর মনে মনে হাসিয়া বলিল, হঠাৎ কি একটা কাজ ক'রে ফেললে বল ত?

ললিতা রুষ্টভাবে বলিল, যাও—আবার!

শেখর মুখ ফিরাইয়া বলিল, আমার দোষ কি! তুমিই ত করে গেলে—

কিছু করিনি—তুমি ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর কহিল, সেইজন্যই ত ডেকে পাঠিয়েছি ললিতা। কাছে এসো, ফিরিয়ে দিচ্চি। তুমি অর্ধেকটা করে গেছ, সরে এসো, আমি সেটা সম্পূর্ণ করে দি।

ললিতা দ্বারের অন্তরালে ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিল, সত্যি বলছি তোমাকে, ও-রকম ঠাট্টা করলে আর কোনদিন তোমার সামনে আসবো না—বলচি, ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর টেবিলের দিকে মুখ ফিরাইয়া মালাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, নিয়ে যাও।

তুমি ঐখান থেকে ছুঁড়ে দাও।

শেখর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কাছে না এলে পাবে না।

তবে আমার কাজ নেই, বলিয়া ললিতা রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, কিন্তু অর্ধেকটা হয়ে থাকলো—

থাকে থাক, বলিয়া ললিতা যথার্থই রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু নীচে গেল না। পূর্বদিকে খোলা ছাদের একান্তে গিয়া রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তখন সম্মুখের আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং শীতের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছিল। উপরে স্বচ্ছ নির্মল নীলাকাশ। সে একবার শেখরের ঘরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ঊর্ধ্বমুখে চাহিয়া রহিল। এইবার তাহার চোখ জ্বালা করিয়া লজ্জায় অভিমানে দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। সে এত ছোট নহে যে, এ-সব কথার তাৎপর্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তবে কেন তাহাকে এমন মর্মান্তিক উপহাস করা! সে যে কত তুচ্ছ, কত নীচে, এ-কথা বুঝিবার তাহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে। সে ঠিক জানে, সে অনাথ এবং নিরুপায় বলিয়া তাহাকে সবাই আদর ও যত্ন করে—শেখরও করে, তাহার জননীও করেন। তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, সত্যকার দায়িত্ব তাহার কাহারও উপর নির্ভর করে না বলিয়াই গিরীন্দ্র সম্পূর্ণ পর হইয়াও তাহাকে উদ্ধার করিয়া দিবার কথা তুলিতে পারিয়াছেন।

ললিতা চোখ মুদিয়া মনে মনে বলিল, এই কলিকাতার সমাজে তাহার মামার অবস্থা ত শেখরদের কত নীচে, সে আবার সেই মামার আশ্রিত গলগ্রহ। ওদিকে সমান ঘরে শেখরের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে, দু'দিন আগেই হউক, পাছেই হউক, সেই ঘরেই একদিন হইবে। এই বিবাহ উপলক্ষে নবীন রায় কত টাকা আদায় করিবেন, সে-সব আলোচনাও সে শেখরের জননীর কাছে শুনিয়াছে।

তবে কেন, তাহাকে হঠাৎ আজ এমন করিয়া শেখরদা অপমান করিয়া বসিল! এই সব কথা ললিতা সম্মুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের মনে মগ্ন হইয়া আলোচনা করিতেছিল, সহসা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, শেখর নিঃশব্দে হাসিতেছে। ইতিপূর্বে যে উপায়ে মালাটা সে শেখরের গলায় পরাইয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই উপায়ে সেই গাঁদা

ফুলের মালাটা তাহার নিজের গলায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কান্নায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু সে জোর করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, কেন এমন করলে?

তুমি করেছিলে কেন?

আমি কিছু করিনি, বলিয়াই সে মালাটা টান মারিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য হাত দিয়াই হঠাৎ শেখরের চোখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। আর ছিঁড়িয়া ফেলিতে সাহস করিল না, কিন্তু কাঁদিয়া বলিল, আমার কেউ নেই বলেই ত তুমি এমন করে আমাকে অপমান করচ!

শেখর এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, ললিতার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। এ ত ছেলেমানুষের কথা নয়! কহিল, আমি অপমান করছি, না, তুমি আমাকে অপমান করছ?

ললিতা চোখ মুছিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আমি কৈ অপমান করলুম?

শেখর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহজভাবে বলিল, এখন একটু ভেবে দেখলেই টের পাবে। আজকাল বড় বাড়াবাড়ি কচ্ছিলে ললিতা, আমি বিদেশ যাবার আগে সেইটেই তোমার বন্ধ করে দিলাম।—বলিয়া চুপ করিল।

ললিতা আর প্রত্যুত্তর করিল না, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতলে দুজনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। শুধু নীচ হইতে কালীর মেয়ের বিয়ের শাঁখের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শেখর কহিল, আর হিমে দাঁড়িয়ে থেক না, নীচে যাও।

যাচ্চি, বলিয়া ললিতা এতক্ষণ পরে তাহার পায়ের নীচে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি করব বলে দিয়ে যাও।

শেখর হাসিল। একবার একটু দ্বিধা করিল, তারপর দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের উপরে টানিয়া আনিয়া নত হইয়া তাহার অধরে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, কিছুই বলে দিতে হবে না ললিতা, আজ থেকে আপনিই বুঝতে পারবে।

ললিতার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল।

সে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি হঠাৎ তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে ফেলেচি বলেই কি তুমি এ-রকম করলে?

শেখর হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমি অনেকদিন থেকেই ভাবচি, কিন্তু স্থির করে উঠতে পারিনি। আজ স্থির করেছি, কেন না, আজই ঠিক বুঝতে পেরেচি, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

ললিতা বলিল, কিন্তু তোমার বাবা শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন, মা শুনলে দুঃখ করবেন—এ হবে না শে—

বাবা শুনলে রাগ করবেন সত্যি, কিন্তু মা খুব খুশী হবেন। সে যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে—এখন তুমিও ফেরাতে পার না, আমিও পারিনে। যাও, নীচে গিয়ে মাকে প্রণাম কর গে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাস-তিনেক পরে একদিন গুরুচরণ ম্লানমুখে নবীন রায়ের ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের উপর বসিবার উপক্রম করিতেই, তিনি চীৎকার করিয়া নিষেধ করিলেন, না না না, এখানে নয়—ঐ চৌকির উপর ব'সো গিয়ে। আমি অসময়ে আবার স্নান করতে পারব না—বলি, জাত দিয়েচ না কি হে?

গুরুচরণ দূরে একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

দিন-চারেক পূর্বে সে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিল, আজ সেই সংবাদটা নানা বর্ণে বিচিত্র হইয়া গোঁড়া হিন্দু নবীনের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। নবীনের চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু গুরুচরণ তেমনি মৌন নতমুখে বসিয়া রহিল।

সে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কাজটা করিয়া অবধি বাড়িতে কান্নাকাটি এবং অশান্তির পরিসীমা ছিল না।

নবীন পুনরায় তর্জন করিয়া উঠিলেন, বল না হে, সত্যি কি না?

গুরুচরণ জলভারাক্রান্ত দুই চক্ষু তুলিয়া বলিল, আজ্ঞে, সত্যি।

কেন এমন কাজ করলে? তোমার মাইনে ত মোটে ষাটটি টাকা, তুমি—ক্রোধে নবীন রায়ের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

গুরুচরণ চোখ মুছিয়া, রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, জ্ঞান ছিল না দাদা। দুঃখের জ্বালায় গলাতেই দড়ি দেবো, কি ব্রহ্মজ্ঞানীই হ'বো, কিছুই ঠাওরাতে পাচ্ছিলুম না। শেষে ভাবলুম, আত্মঘাতী না হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানীই হই, তাই ব্রহ্মজ্ঞানীই হয়ে গেলুম।

গুরুচরণ চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল।

নবীন চীৎকার করিয়া বলিলেন, বেশ করেচ, নিজের গলায় দড়ি না দিতে পেরে জাতের গলায় দড়ি টাঙিয়ে দিয়েছ—আচ্ছা যাও, আর আমাদের সামনে কালামুখ বা'র করো না, এখন যাঁরা-সব মন্ত্রী হয়েচেন, তাঁদের সঙ্গেই থাক গে—মেয়েদের হাড়ি-মুচির ঘরে দেও গে যাও, বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

নবীন রাগে অভিমানে কি যে করিবেন প্রথমটা কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। গুরুচরণ হাতের ভিতর হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে, আর শীঘ্র মুঠার মধ্যে আসিবে, এ সম্ভাবনাও নাই—তাই নিস্ফল আক্রোশে ছটফট করিয়া আপাতত জব্দ করিবার আর কোন ফন্দি খুঁজিয়া না পাইয়া, সেইদিনই মিস্ত্রী ডাকিয়া ছাদের যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া একটা মস্ত প্রাচীর তুলিয়া দিলেন।

এই সংবাদ বহুদূরে-প্রবাসে বসিয়া ভুবনেশ্বরী শেখরের মুখে শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন,—শেখর, এ মতি-বুদ্ধি কে দিলে তাকে?

মতি-বুদ্ধি কে দিয়েছিল শেখর তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়াছিল। সে উল্লেখ না করিয়া বলিল, কিন্তু মা, দু'দিন পরে তোমরাই ত তাঁকে একঘ'রে করে রাখতে। এতগুলি মেয়ের বিয়ে তিনি কি করে দিতেন, আমি ত ভেবে পাইনে।

ভুবনেশ্বরী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, কিছুই আটকে থাকে না শেখর। আর সেজন্য আগে থেকে জাত দিতে হলে অনেককেই দিতে হয়। ভগবান যাদের সংসারে পাঠিয়েছেন, তিনিই তাদের ভার নিতেন।

শেখর চুপ করিয়া রহিল। ভুবনেশ্বরী চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার ললিতা মেয়েটাকে যদি সঙ্গে আনতুম, তা হলে যা হয় একটা উপায় আমাকেই করে দিতে হতো—দিতামও। আমি ত জানিনে গুরুচরণ এই-সব মতলব করেই পাঠিয়ে দিলে না। আমি মনে করেছিলুম বুঝি সত্যিই তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে।

শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি লজ্জিতভাবে বলিল, বেশ ত মা, এখন বাড়ি গিয়ে তাই কর না কেন? সে ত আর ব্রাহ্ম হয়নি—তার মামাই হয়েচে—আর তিনিও কিছু তার যথার্থ আপনার কেউ ন'ন। ললিতার কেউ নেই বলেই তাঁর ঘরে মানুষ হচ্চে।

ভুবনেশ্বরী ভাবিয়া বলিলেন, তা বটে, কিন্তু কর্তা এক রকমের মানুষ, তিনি কিছুতেই রাজী হবেন না। হয়ত তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে দেবেন না।

শেখরের নিজের মনেও এই আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল, সে আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে আর একমিনিটও তাহার বিদেশে থাকিতে ইচ্ছা রহিল না। দু-তিনদিন চিন্তিত অপ্রসন্ন-মুখে এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া বলিল, আর ভাল লাগচে না মা, চল বাড়ি যাই!

ভুবনেশ্বরী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই চল শেখর, আমারও কিছু ভাল লাগচে না।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মাতাপুত্র উভয়েই দেখিলেন, ছাদের সেই যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া প্রাচীর উঠিয়াছে। গুরুচরণের সহিত আর কোনও সম্পর্ক রাখা, এমন কি

মুখের আলাপ রাখাও যে কর্তার অভিপ্রেত নয়, তাহা কাহাকেও না জিজ্ঞাসা করিয়াই উভয়ে বুঝিলেন।

রাত্রে শেখরের আহারের সময় মা উপস্থিত ছিলেন, দুই-একটা কথার পরে বলিলেন, ওদের গিরীনবাবুর সঙ্গেই ললিতার বিয়ে দেবার কথাবার্তা হচ্ছে। আমি তা আগেই বুঝেছিলুম।

শেখর মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, কে বললে?

ওর মামী। দুপুরবেলা কর্তা ঘুমোলে আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে এসেচি। সেই অবধি কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেললে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া তিনি নিজের চোখ দুটি আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কপাল, শেখর, কপাল। এই কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না—কার আর দোষ দিই বল! যাই হোক, গিরীন ছেলেটি ভাল, সংগতিও আছে, ললিতার কষ্ট হবে না,—বলিয়া চুপ করিলেন।

প্রত্যুত্তরে শেখর কোন কথাই বলিল না—মুখ নীচু করিয়া খাবারগুলো হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। খানিক পরে মা উঠিয়া গেলে সেও উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন সন্ধ্যার পর একটুখানি ঘুরিয়া আসিবার জন্য সে পথে বাহির হইয়াছিল। তখন গুরুচরণের বাহিরের ঘরে প্রাত্যহিক চা-পানের সভা বসিয়াছিল এবং যথেষ্ট উৎসাহের সহিত হাসি এবং কথাবার্তা চলিতেছিল। তথাকার কোলাহল শেখরের কানে যাইবামাত্র সে একবার স্থির হইয়া কি ভাবিয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ি ঢুকিয়া সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া গুরুচরণের বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ কলরব থামিল এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

শেখর ফিরিয়া আসিয়াছিল এ সংবাদ ললিতা ছাড়া আর কেহ জানিত না। আজ গিরীন্দ্র এবং আরও একজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তিনি বিস্মিত-মুখে শেখরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন এবং গিরীন মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল। সর্বাপেক্ষা অধিক চেঁচাইতেছিলেন গুরুচরণ নিজে, তাঁহার মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাঁহার হাতের কাছে বসিয়া ললিতা তখনও চা তৈরি করিতেছিল, একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া মাথা হেঁট করিল।

শেখর সরিয়া আসিয়া তক্তপোশের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং একধারে বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া বলিল, এ কি, একেবারে সমস্ত নিবে গেল যে!

গুরুচরণ মৃদুকণ্ঠে বোধ করি আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু কি বলিলেন বোঝা গেল না।

তাঁহার মনের ভাব শেখর বুঝিল, তাই সময় দিবার জন্য নিজেই কথা পাড়িল। কাল সকালের গাড়িতে ফিরিয়া আসিবার কথা, জননীর রোগ উপশম হইবার কথা, পশ্চিমের কথা, আরও কত কি সংবাদ অনর্গল বকিয়া গিয়া শেষে সেই অপরিচিত যুবকটির মুখের দিকে চাহিল।

গুরুচরণ এতক্ষণে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিলেন, ছেলেটির পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইনি আমাদের গিরীনের বন্ধু। এক জায়গায় বাড়ি, একত্রে লেখাপড়া শেখা, অতি সৎ ছেলে—শ্যামবাজারে থাকেন, তবুও আমার সঙ্গে আলাপ হওয়া পর্যন্ত প্রায়ই এসে দেখা-সাক্ষাৎ করে যান।

শেখর ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে বলিল, হাঁ, খুব ভাল ছেলে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাকা, আর সব খবর ভাল ত?

গুরুচরণ জবাব দিলেন না, মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। শেখর উঠিবার উপক্রম করিতেই হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, মাঝে মাঝে এসো বাবা, একেবারে যেন ত্যাগ করো না। সব কথা শুনেচ ত?

শুনেচি বৈ কি, বলিয়া শেখর অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

তার পরেই ভিতর হইতে গৃহিণীর কান্নার শব্দ উঠিল, বাহিরে বসিয়া গুরুচরণ হেঁট মুখে কোঁচার খুঁট দিয়া নিজের চোখের জল মুছিতে লাগিলেন এবং গিরীন অপরাধীর মত মুখ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। ললিতা পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে শেখর রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা পার হইয়া উঠানে নামিতে গিয়া দেখিল, অন্ধকার কবাটের আড়ালে ললিতা দাঁড়াইয়া আছে। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং দাঁড়াইয়া উঠিয়া বুকের একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া মুখ তুলিয়া মুহূর্ত-কাল নিঃশব্দে কি যেন আশা করিয়া রহিল, তার পর পিছাইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার চিঠির জবাব দিলে না কেন?

কৈ, আমি ত চিঠি পাইনি—কি লিখেছিলে?

ললিতা বলিল, অনেক কথা। সে যাক। সব শুনেচ ত, এখন তোমার কি হুকুম, তাই বল।

শেখর বিস্ময়ের স্বরে কহিল, আমার হুকুম! আমার হুকুমে কি হবে?

ললিতা শঙ্কিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

তা বৈ কি ললিতা। আমি কার ওপর হুকুম দেব?

আমার ওপর, আর কার ওপর দিতে পারো?

তোমার ওপরেই বা দেব কেন? আর দিলেই বা তুমি শুনবে কেন? শেখরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, ঈষৎ করুণ।

এবার ললিতা মনে মনে অত্যন্ত ভয় পাইয়া, আর একবার কাছে সরিয়া আসিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় বলিল, যাও—এখন আমার তামাশা ভাল লাগছে না। পায়ে পড়ি, কি হবে বল? ভয়ে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না।

ভয় কিসের?

বেশ যা হোক। ভয় হবে না, তুমি কাছে নেই, মা কাছে নেই, মাঝে থেকে মামা কি-সব কাণ্ড করে বসলেন—এখন মা যদি আমাকে ঘরে নিতে না চান?

শেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে সত্যি, মা নিতে চাইবেন না। তোমাব মামা অপরের কাছে অনেক টাকা নিয়েচেন, সে-কথা তিনি শুনেচেন। তা ছাড়া, এখন তোমরা ব্রাহ্ম, আমরা হিন্দু।

অন্নাকালী এইসময়ে রান্নাঘর হইতে ডাক দিল, সেজদি, মা ডাকচেন।

ললিতা চেঁচাইয়া বলিল, যাচ্ছি, তার পর গলা খাট করিয়া বলিল, মামা যাই হোন, তুমি যা, আমিও তাই। মা তোমাকে যদি ফেলতে না পারেন, আমাকেও ফেলবেন না। আর গিরীনবাবুর কাছে টাকা নেবার কথা বলচ—তা সে আমি ফিরিয়ে দেব। আর ঋণের টাকা, দু'দিন আগেই হোক, পিছনেই হোক, দিতেই তা হবে।

শেখর প্রশ্ন করিল, অত টাকা পাবে কোথায়?

ললিতা শেখরের মুখের পানে একটিবার চোখ তুলিয়া মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিল, জান না, মেয়েমানুষে কোথায় টাকা পায়? আমিও সেইখানে পাব।

এতক্ষণ শেখর সংযত হইয়া কথা কহিতে থাকিলেও ভিতরে পুড়িতেছিল, এবার বিদ্রূপ করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার মামা তোমাকে বিক্রি করে ফেলেছেন যে!

ললিতা অন্ধকারে শেখরের মুখের ভাব দেখিতে পাইল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন টের পাইল। সে দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, ও-সব মিছে কথা। আমার মামার মত মানুষ সংসারে নেই—তাঁকে তুমি ঠাট্টা ক'রো না। তাঁর দুঃখ-কষ্ট তুমি না জানতে পার, কিন্তু পৃথিবী-সুদ্ধ লোক জানে, বলিয়া একবার ঢোক গিলিয়া, একবার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, তা ছাড়া তিনি টাকা নিয়েচেন, আমার বিয়ে হবার পরে, সুতরাং আমাকে বিক্রি করবার অধিকার তাঁর নেই, বিক্রিও করেন নি। এ অধিকার আছে শুধু তোমারি, তুমি ইচ্ছে করলে টাকা দেবার ভয়ে আমাকে বিক্রি করে ফেলতে পার বটে!—বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত শেখর বিহ্বলের মত পথে পথে ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতেছিল, সেদিনকার একফোঁটা ললিতা এত কথা শিখিল কিরূপে? এমন নির্লজ্জ মুখরার মত তাহার মুখের উপর কথা কহিল কি করিয়া?

আজ সে ললিতার ব্যবহারে সত্যই অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু, এই ক্রোধের যথার্থ হেতুটা কি, এ যদি শান্ত হইয়া ভাবিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত রাগ ললিতার উপরে নহে, তাহা সম্পূর্ণ নিজের উপরেই।

ললিতাকে ছাড়িয়া এই কয়টা মাসের প্রবাস-বাসকালে সে নিজের কল্পনায় নিজেকে আবদ্ধ করিয়া শুধু কাল্পনিক সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতিই খতাইয়া দেখিত। কিন্তু ললিতা আজ যে তাহার জীবনের কতখানি, ভবিষ্যতের সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য-বন্ধনে গ্রথিত, তাহার অবর্তমানে বাঁচিয়া থাকা কত কঠিন, কত দুঃখকর, বিছানায় শুইয়া এই কথাই সে বার বার আলোচনা করিতে লাগিল। ললিতা শিশুকাল হইতে নিজেদের সংসারে মিশিয়াছিল বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া আর সে সংসারের ভিতরে, বাপ-মা ভাই-বোনের মাঝখানে নামাইয়া আনিয়া দেখে নাই, দেখিবার কথাও মনে করে নাই। ললিতাকে হয়ত পাওয়া যাইবে না, পিতা-মাতা এ-বিবাহে সম্মতি দিবেন না, হয়ত সে অপর কাহারও হইবে,—দুশ্চিন্তা তাহার বরাবর এই ধার বহিয়াই চলিয়াছিল তাই বিদেশে যাইবার পূর্বের রাত্রে জোর করিয়া গলায় মালা পরাইয়া দিয়া সে এইদিকের ভাঙনটার মুখেই বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছিল।

প্রবাসে থাকিয়া গুরুচরণের ধর্মমত পরিবর্তনের সংবাদ পাইয়া, শুনিয়া সে ব্যাকুল হইয়া অহর্নিশি এই চিন্তাই করিয়াছিল, পাছে ললিতাকে হারাইতে হয়। সুখের হোক, দুঃখের হোক, ভাবনার এই দিকটাই তাহার পরিচিত ছিল, আজ ললিতার স্পষ্ট কথা এই-দিকটা সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়া ভাবনার ধারা একেবারে উলটা স্রোতে বহাইয়া দিয়া গেল। তখন চিন্তা ছিল, পাছে না পাওয়া যায়, এখন ভাবনা হইল, পাছে না ছাড়া যায়।

শ্যামবাজারের সম্বন্ধটা ভাঙিয়া গিয়াছিল। তাঁহারাও অত টাকা দিতে শেষ পর্যন্ত পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। শেখরের জননীরও মেয়েটি মনঃপূত হইল না। সুতরাং এই দায় হইতে শেখর আপাততঃ অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু নবীন রায় দশ-বিশ হাজারের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং সেপক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়াও ছিলেন না।

শেখর ভাবিতেছিল, কি করা যায়। সে-রাত্রির সেই কাজটা যে এতবড় গুরুতর হইয়া উঠিবে, ললিতা যে এমন অসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া লইবে, তাহার সত্যই বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং ধর্মতঃ কোন কারণেই ইহার আর অন্যথা হইতে পারে না, সেদিন এত কথা শেখর ভাবিয়া দেখে নাই। যদিও নিজের মুখেই উচ্চারণ করিয়াছিল, যা হইবার হইয়াছে, এখন তুমিও ফিরাইতে পার না, আমিও না; কিন্তু তখন, আজ যেমন করিয়া সে সমস্তটা ভাবিয়া দেখিতেছে, তেমন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার শক্তিও ছিল না, বোধ করি অবসরও ছিল না।

তখন মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল, গলায় মালা দুলিয়াছিল, প্রিয়তমার বক্ষস্পন্দন নিজের বুক পাতিয়া প্রথম অনুভবের মোহ ছিল, এবং প্রণয়ীরা যাহাকে অধরসুধা বলিয়াছেন, তাহাই পান করার অতি তীব্র নেশা ছিল। তখন স্বার্থ এবং সাংসারিক ভালমন্দ মনে পড়ে নাই, অর্থলোলুপ পিতার রুদ্রমূর্তি চোখের উপর জাগিয়া উঠে নাই। ভাবিয়াছিল, মা ত ললিতাকে স্নেহ করেন, তখন তাঁহাকে সম্মত করানো কঠিন হইবে না, এবং দাদাকে দিয়া পিতাকে কোনমতে কোমল করিয়া আনিতে পারিলে, শেষ পর্যন্ত হয়ত কাজটা হইয়াই যাইবে। তা ছাড়া, গুরুচরণ এইভাবে তখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের আশার পথটা পাথর দিয়া এমনভাবে আঁটিয়া বন্ধ করেন নাই। এখন যে বিধাতাপুরুষ নিজে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছেন।

বস্তুত শেখরের চিন্তা করিবার বিষয় বিশেষ কিছু ছিল না। সে নিশ্চয় বুঝিতেছিল, পিতাকে সম্মত করানো ত ঢের দূরের কথা, জননীকে সম্মত করানোও সম্ভব নহে। এ-কথা যে আর মুখে আনিবারও পথ নাই।

শেখর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আর একবার অস্ফুটে আবৃত্তি করিল, কি করা যায়। সে ললিতাকে বেশ চিনিত, তাহাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে—একবার যাহা সে নিজের ধর্ম বলিয়া বুঝিয়াছে, কোনমতেই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। সে জানিয়াছে, সে শেখরের ধর্মপত্নী, তাই আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে অসঙ্কোচে বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া মুখের কাছে মুখ তুলিয়া অমন করিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছিল।

গিরীনের সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্তা শুরু হইয়াছে—কিন্তু কেহই তাহাকে ত সম্মত করাইতে পারিবে না। আর ত সে কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিবে না। এখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিবে। শেখরের চোখমুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সত্যই ত! সে ত শুধু মালা-বদল করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিল। ললিতা বাধা দেয় নাই—দোষ নাই বলিয়াই দেয় নাই—ইহাতে তাহার অধিকার আছে বলিয়াই দেয় নাই, এখন এই ব্যবহারের জবাব সে কার কাছে কি দিবে?

পিতামাতার অমতে ললিতার সহিত বিবাহ হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয়, কিন্তু গিরীনের সহিত ললিতার বিবাহ না হইবার হেতু প্রকাশ পাইবার পর ঘরে-বাহিরে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া?

দশম পরিচ্ছেদ

অসম্ভব বলিয়া শেখর ললিতার আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। প্রথম ক'টা দিন সে মনে মনে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকিত, পাছে হঠাৎ সে আসিয়া উপস্থিত হয়, পাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, পাছে এই সব লইয়া লোকের কাছে জবাবদিহি করিতে হয়। কিন্তু কেহই তাহার কৈফিয়ত চাহিল না, কোন কথা প্রকাশ পাইয়াছে কিনা তাহাও বুঝা গেল না, কিংবা সে-বাড়ি হইতে এ-বাড়িতে কেহ আসা-যাওয়া পর্যন্ত করিল না। শেখরের ঘরের সুমুখে যে খোলা ছাদটা ছিল, তাহার উপরে দাঁড়াইলে ললিতাদের ছাদের সবটুকু দেখা যাইত; পাছে দেখা হয়, এই ভয়ে সে এই ছাদটায় পর্যন্ত দাঁড়াইত না। কিন্তু যখন নির্বিঘ্নে একমাস কাটিয়া গেল, তখন সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, হাজার হোক মেয়েমানুষের লজ্জাশরম আছে, এ-সকল ব্যাপার সে প্রকাশ করিতেই পারে না। সে শুনিয়াছিল, ইহাদের বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিতে চাহে না, এ-কথা সে বিশ্বাস করিল এবং সৃষ্টিকর্তা তাহাদের দেহে এই দুর্বলতা দিয়াছেন বলিয়া সে মনে মনে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিল। অথচ শান্তি পাওয়া যায় না কেন? যখন হইতে সে বুঝিল আর ভয় নাই, তখন হইতেই এক অভূতপূর্ব ব্যথায় সমস্ত বুক ভরিয়া উঠিতেছে কেন? রহিয়া রহিয়া হৃদয়ের অন্তরতম স্থল পর্যন্ত এমন করিয়া নিরাশায়, বেদনায়, আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে কেন? তবে ত ললিতা কোন কথাই বলিবে না—আর একজনের হাতে সঁপিয়া দিবার সময় পর্যন্ত মৌন হইয়া থাকিবে। তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে মনে হইলেও অন্তরে-বাহিরে তাহার এমন করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে কেন?

পূর্বে সে সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির না হইয়া সুমুখের খোলা ছাদটার উপর পদচারণা করিত, আজও তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু একটি দিনও ও-বাড়ির কাহাকেও ছাদে দেখিতে পাইল না। শুধু একদিন আন্নাকালী কি করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই চোখ নামাইয়া ফেলিল এবং শেখর তাহাকে ডাকিবে কিনা স্থির করিবার পূর্বেই অদৃশ্য হইয়া গেল। শেখর মনে মনে বুঝিল, তাহারা যে পথ বন্ধ করিয়া প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে, ইহার অর্থ ঐ একফোঁটা কালী পর্যন্ত জানিয়াছে।

আরও একমাস গত হইল।

একদিন ভুবনেশ্বরী কথায় কথায় বলিলেন, এর মধ্যে তুই ললিতাটাকে দেখেচিস শেখর?

মা বলিলেন, প্রায় দু'মাস পরে কাল তাকে ছাদে পেয়ে ডাকলুম—মেয়েটা আমার যেন আর-এক রকমের হয়ে গেছে। রোগা, মুখখানি শুকনো, যেন কত বয়স হয়েচে। এমনি গম্ভীর, কার সাধ্যি দেখে বলে চোদ্দ বছরের মেয়ে—তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ভারী গলায় বলিলেন, পরনের কাপড়খানি ময়লা, আঁচলের কাছে খানিকটা সেলাই-করা। জিজ্ঞেস করলুম, তোর কাপড় নেই মা? বললে ত আছে, কিন্তু, বিশ্বাস হয় না। কোনদিনই সে ওর মামার দেওয়া কাপড় পরে না, আমিই দিই, আমিও ত ছ-সাত মাস কিছু দিইনি। তিনি আর বলিতে পারিলেন না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন—ললিতাকে যথার্থই তিনি নিজের মেয়ের মত ভালবাসিতেন।

শেখর আর-এক দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে তিনি পুনরায় বলিলেন, আমি ছাড়া কোনদিন সে কারো কাছে কিছু চাইতেও পারে না। অসময়ে ক্ষিদে পেলেও বাড়িতে মুখ ফুটে বলতেও পারে না,—সেও আমি—ঐ আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতো—আমি তার মুখ দেখলেই টের পেতুম। আমার সেই কথাই মনে হয় শেখর, হয়ত মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়ায়, কেউ তাকে বোঝেও না, জিজ্ঞেসও করে না। আমাকে ত শুধু সে মা বলেই ডাকে না, মায়ের মত ভালও বাসে যে।

শেখর সাহস করিয়া মায়ের মুখের দিকে চোখ ফিরাইতে পারিল না। যেদিকে চাহিয়াছিল, সেইদিকেই চাহিয়া থাকিয়াই কহিল, বেশ ত মা, কি তার দরকার ডেকে জিজ্ঞেস করে দাও না কেন?

নেবে কেন? উনি যাওয়া-আসার পথটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। আমিই বা দিতে যাবো কোন মুখে? ঠাকুরপো দুঃখের জ্বালায় না বুঝে যেন একটা অন্যায় করেচেন, আমরা আপনার লোকের মত কোথায় একটা প্রায়শ্চিত্ত-ট্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ডেকে দেব, তা নয়, একেবারে পর করে দিলুম। আর তাও বলি, এঁর পীড়াপীড়িতেই সে জাত দিয়ে ফেলেছে। কেবল তাগাদা, কেবল তাগাদা—মনের ঘেন্নায় মানুষ সব করতে পারে। বরং আমি ত বলি, ঠাকুরপো ভালই করেছেন। ঐ গিরীন ছেলেটি আমাদের চেয়ে তাঁর ঢের বেশী আপনার, তার সঙ্গে ললিতার বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েটা সুখে থাকবে তা আমি বলচি। শুনচি, আসচে মাসেই হবে।

হঠাৎ শেখর মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, আসচে মাসেই হবে নাকি?

তাই ত শুনি।

শেখর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ললিতার মুখে শুনলাম, ওর মামার দেহটাও নাকি আজকাল ভাল নেই। না থাকবারই কথা। একে তার নিজের মনের সুখ নেই, তাতে বাড়িতে নিত্য-কান্নাকাটি—এক মিনিটের তরেও ও-বাড়িতে স্বস্তি নেই।

শেখর চুপ করিয়া শুনিতেছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

খানিক পরে মা উঠিয়া গেলে সে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল—সে ললিতার কথা ভাবিতে লাগিল।

এই গলিটায় দুখানা গাড়ির স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের স্থান হয় না। একখানা গাড়ি খুব একপাশে ঘেঁসিয়া না দাঁড়াইলে আর-একটা যাইতে পারে না। দিন-দশেক পরে শেখরের অফিস-গাড়ি গুরুচরণের বাটীর সম্মুখে বাধা পাইয়া স্থির হইল। শেখর অফিস হইতে ফিরিতেছিল, নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ডাক্তার আসিয়াছেন।

সে কিছুদিন পূর্বে মায়ের কাছে শুনিয়াছিল গুরুচরণের শরীর ভাল নাই। তাই মনে করিয়া আর বাড়ি গেল না, সোজা গুরুচরণের শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই বটে। গুরুচরণ নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন, একপাশে ললিতা এবং গিরীন শুষ্কমুখে বসিয়া আছে, সম্মুখে চৌকির উপর বসিয়া ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করিতেছেন।

গুরুচরণ অস্ফুট-স্বরে বসিতে বলিলেন, ললিতা মাথায় আঁচলটা আরো একটু টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

ডাক্তার পাড়ার লোক, শেখরকে চিনিতেন। রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। গিরীন পিছনে আসিয়া টাকা দিয়া ডাক্তার বিদায় করিবার সময়, তিনি বিশেষ করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, রোগ এখনও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, এই সময়ে বায়ু-পরিবর্তনের নিতান্ত আবশ্যক।

ডাক্তার চলিয়া গেলে উভয়েই আর একবার গুরুচরণের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ললিতা ইশারা করিয়া গিরীনকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল, শেখর সুমুখের চৌকিতে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া গুরুচরণের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি ইতিপূর্বে ওদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিলেন, শেখরের পুনরাগমন জানিতে পারিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেখর উঠিয়া গেল, তখনও ললিতা ও গিরীন তেমনি চুপি চুপি কথাবার্তা কহিতেছিল, তাহাকে কেহ বসিতে বলিল না, আসিতে বলিল না, একটা কথা পর্যন্ত কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না।

আজ সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিল, ললিতা তাহাকে তাহার কঠিন দায় হইতে চিরদিনের মত মুক্তি দিয়াছে—এখন সে নির্ভয়ে হাঁফ ফেলিয়া বাঁচুক—আর শঙ্কা নাই, আর ললিতা তাহাকে জড়াইবে না! ঘরে আসিয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সহস্রবার মনে পড়িল, আজ সে নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে গিরীনই ও-বাড়ির পরম বন্ধু, সকলের আশা-ভরসা এবং ললিতার ভবিষ্যতের আশ্রয়। সে কেহ নহে, এমন বিপদের দিনেও ললিতা তাহার একটি মুখের পরামর্শেরও আর প্রত্যাশী নহে।

সে সহসা 'উঃ'—বলিয়া একটা গদীআঁটা আরাম-চৌকির উপর ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল। ললিতা তাহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল যেন সম্পূর্ণ পর—একেবারে অপরিচিত! আবার তাহারই চোখের সুমুখে গিরীনকে আড়ালে ডাকিয়া কত-না পরামর্শ! অথচ এই লোকটিরই অভিভাবকতায় একদিন তাকেই থিয়েটার দেখিতে পর্যন্ত যাইতে দেয় নাই।

তখনও একবার ভাবিবার চেষ্টা করিল, হয়ত সে তাহাদের গোপন সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়াই লজ্জায় ওরূপ ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু তাই বা কি করিয়া সম্ভব? তাহা হইলে এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, অথচ একটি কথাও কি সে এতদিনের মধ্যে কোন কৌশলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিত না।

হঠাৎ ঘরের বাহিরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তিনি ডাকিয়া বলিতেছেন, কৈ রে, এখনও হাতমুখ ধুসনি—সন্ধ্যা হয় যে!

শেখর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাহার মুখের উপর মায়ের দৃষ্টি না পড়ে, এইভাবে ঘাড় ফিরাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

এই কয়টা দিন অনেক কথাই অনেক রকমের রূপ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে অনুক্ষণ আনাগোনা করিয়াছে, শুধু একটা কথা সে ভাবিয়া দেখিত না, বস্তুত দোষ কোনদিকে। একটি আশার কথা সে আজ পর্যন্ত তাহাকে বলে নাই, কিংবা তাহাকে বলিবারও সুযোগ দেয় নাই। বরঞ্চ, পাছে প্রকাশ পায়, সে কোনরূপ দাবী করিয়া বসে, এই ভয়ে কাঠ হইয়া ছিল। তথাপি, সর্বপ্রকারের অপরাধ একা ললিতার মাথায় তুলিয়া দিয়াই সে তাহার বিচার করিতেছিল এবং নিজের হিংসায়, ক্রোধে, অভিমানে, অপমানে পুড়িয়া মরিতেছিল। বোধ করি, এমনি করিয়াই সংসারের সকল পুরুষ বিচার করে এবং এমনি করিয়াই দগ্ধ হয়।

পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার সাত দিন কাটিয়াছে, আজও সন্ধ্যার পর নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সেই আগুন জ্বালিয়া দিয়াই বসিয়াছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়াই তাহার হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া উঠিল! কালীর হাত ধরিয়া ললিতা ঘরে ঢুকিয়া নীচে কার্পেটের উপর স্থির হইয়া বসিল। কালী বলিল, শেখরদা, আমরা দুজনে তোমাকে প্রণাম করতে এসেছি—কাল আমরা চলে যাব।

শেখর কথা কহিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

কালী বলিল, অনেক দোষ-অপরাধ তোমার পায়ে আমরা করেচি শেখরদা, সে-সব ভুলে যেয়ো।

শেখর বুঝিল, ইহার একটি কথাও কালীর নিজের নহে, সে শেখানো কথা বলিতেছে মাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, কাল কোথায় যাবে তোমরা?

পশ্চিমে। বাবাকে নিয়ে আমরা সবাই মুঙ্গের যাব—সেখানে গিরীনবাবুর বাড়ি আছে। তিনি ভাল হলেও আর আমাদের আসা হবে না, ডাক্তার বলেছেন, এ-দেশ বাবার সহ্য হবে না।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

একটু ভাল, বলিয়া কালী আঁচলের ভিতর হইতে কয়েক জোড়া কাপড় বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, জ্যাঠাইমা আমাদের কিনে দিয়েচেন।

ললিতা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপর একটি চাবি রাখিয়া দিয়া বলিল, আলমারির এই চাবিটা এতদিন আমার কাছেই ছিল, একটুখানি হাসিয়া বলিল, কিন্তু টাকাকড়ি ওতে আর নেই, সমস্ত খরচ হয়ে গেছে।

শেখর চুপ করিয়া রহিল।

কালী বলিল, চল সেজদি, রাত্তির হচ্ছে।

ললিতা কিছু বলিবার পূর্বেই এবার শেখর হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, কালী, নীচে থেকে আমার জন্যে দুটো পান নিয়ে এস ত ভাই।

ললিতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুই বোস কালী, আমি এনে দিচ্ছি, বলিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। খানিক পরে পান আনিয়া কালীর হাতে দিল, সে শেখরকে দিয়া আসিল।

পান হাতে লইয়া শেখর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

চললুম শেখরদা, বলিয়া কালী পায়ের কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল। ললিতা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

শেখর তাহার ভালমন্দ ও আত্মমর্যাদা লইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুরমুখে, বিহ্বল হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে আসিল, যাহা বলিবার ছিল বলিয়া চিরদিনের মত বিদায় লইয়া গেল, কিন্তু শেখরের কিছুই বলা হইল না। যেন, বলিবার কথা তাহার ছিল না, এইভাবে সমস্ত সময়টুকু কাটিয়া গেল। ললিতা কালীকে ইচ্ছা করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছিল; কারণ, সে চাহে না কোন কথা উঠে, ইহাও সে মনে মনে বুঝিল। তাহার পরে, তাহার সর্বশরীর ঝিমঝিম করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে উঠিয়া গিয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুরুচরণের ভাঙ্গা দেহ মুঙ্গেরের জলহাওয়াতেও আর জোড়া লাগিল না। বৎসর-খানেক পরেই তিনি দুঃখের বোঝা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। গিরীন যথার্থই তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিয়াছিল এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাহার যথাসাধ্য করিয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি সজল-কণ্ঠে তাহার হাত ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে যেন কোনদিন পর না হইয়া যায় এবং এই গভীর বন্ধুত্ব যেন নিকট আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি ইহা চোখে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, অসুখ-বিসুখে সময় হইল না, কিন্তু পরলোকে বসিয়া যেন দেখিতে পান। গিরীন তখন সানন্দে এবং সর্বান্তঃকরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।

গুরুচরণের কলিকাতার বাটীতে যে ভাড়াটিয়া ছিল, তাহার মুখে ভুবনেশ্বরী মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইতেন, গুরুচরণের মৃত্যুসংবাদ তাহারাই দিয়াছিল।

তাহার পর এ-বাড়িতে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল। নবীন রায় হঠাৎ মারা গেলেন। ভুবনেশ্বরী শোকে-দুঃখে পাগলের মত হইয়া বড়বধূর হাতে সংসার সঁপিয়া দিয়া কাশী

চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, আগামী বৎসর শেখরের বিয়ের সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে তিনি আসিয়া বিবাহ দিয়া যাইবেন।

বিবাহের সম্বন্ধ নবীন রায় নিজেই স্থির করিয়াছিলেন। এবং পূর্বেই হইয়া যাইত, শুধু তাঁহার মৃত্যু হওয়াতেই এক বৎসর স্থগিত ছিল। কন্যাপক্ষের আর বিলম্ব করা চলে না, তাই তাহারা কাল আসিয়া আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছিল। এই মাসেই বিবাহ। আজ শেখর জননীকে আনিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। আলমারি হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া তোরঙ্গ সাজাইতে গিয়া অনেকদিন পরে তাহার ললিতার কথা মনে পড়িল—সব সে-ই করিত।

তিন বৎসরের অধিক হইল তাহারা চলিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের কোন সংবাদই সে জানে না। জানিবার চেষ্টাও করে নাই, বোধ করি, ইচ্ছাও ছিল না। ললিতার উপরে ক্রমশঃ তাহার একটা ঘৃণার ভাব আসিয়াছিল। কিন্তু আজ সহসা ইচ্ছা করিল, যদি কোন মতে একটা খবর পাওয়া যায়—কে কেমন আছে। অবশ্য ভাল থাকিবারই কথা, কারণ গিরীনের সঙ্গতি আছে, তাহা সে জানিত, তথাপি সে শুনিতে ইচ্ছা করে, কবে বিবাহ হইয়াছে, তাহার কাছে কেমন আছে—এই সব।

ও-বাড়ির ভাড়াটিয়ারাও আর নাই, মাস-দুই হইল বাড়ি খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শেখর একবার ভাবিল, চারুর বাপকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কারণ তাঁহারা গিরীনের সংবাদ নিশ্চয় রাখেন। ক্ষণকালের জন্য তোরঙ্গ গুছানো স্থগিত রাখিয়া সে শূন্যদৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া এই সব ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া পুরাতন দাসী কহিল, ছোটবাবু, কালীর মা একবার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শেখর মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, কোন্ কালীর মা?

দাসী হাত দিয়া গুরুচরণের বাড়িটা দেখাইয়া বলিল, আমাদের কালীর মা ছোটবাবু, তাঁরা কাল রাত্তিরে ফিরে এসেচেন যে।

চল যাচ্চি, বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, সে বাড়িতে পা দিতেই বুকভাঙ্গা কান্নার রোল উঠিল। বিধবা-বেশধারিণী গুরুচরণের স্ত্রীর কাছে গিয়া সে মাটিতেই বসিয়া পড়িল এবং কোঁচার খুঁট দিয়া নিঃশব্দে চোখ মুছিতে লাগিল। শুধু গুরুচরণের জন্য নহে, সে নিজের পিতার শোকেও আর একবার অভিভূত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইলে ললিতা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। দূর হইতে গলায় আঁচল দিয়া তাহাকে প্রণাম করিল, এবং ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শেখর সপ্তদশবর্ষীয়া পরস্ত্রীর পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে বা ডাকিয়া কথা কহিতে পারিল না' তথাপি আড়চোখে যতটা সে দেখিতে পাইয়াছিল, মনে হইল, ললিতা যেন আরও বড় হইয়াছে এবং অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে।

অনেক কান্নাকাটির পরে গুরুচরণের বিধবা যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম এই যে, এই বাড়িটা তিনি বিক্রয় করিয়া মুঙ্গেরে জামাইয়ের আশ্রয়ে থাকিবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। বাড়িটা বহুদিন হইতে শেখরের পিতার ক্রয় করিবার ইচ্ছা ছিল, এখন উপযুক্ত মূল্যে তাঁহারাই ক্রয় করিলে ইহা একরকম নিজেদেরই থাকিবে, তাহার নিজেরও কোনরূপ ক্লেশ বোধ হইবে না এবং ভবিষ্যতে কখন তিনি এদেশে আসিলে, দুই-একদিন বাস করিয়া যাইতেও পারিবেন—এই-সব। শেখর, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার যথাসাধ্য করিবে বলায় তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন, দিদি কি এর মধ্যে আসবেন না শেখর?

শেখর জানাইল, আজ রাত্রেই তাঁকে সে আনিতে যাইবে। অতঃপর তিনি একটি একটি করিয়া অন্যান্য সংবাদ জানিয়া লইলেন—শেখরের কবে বিবাহ, কোথায়, কত হাজার, কত অলঙ্কার, নবীন রায় কি করিয়া মারা গেলেন, দিদি কি করিলেন ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন এবং শুনিলেন।

শেখর যখন ছুটি পাইল তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। এই সময় গিরীন্দ্র উপর হইতে নামিয়া বোধ করি তাহার দিদির বাটীতে গেল। গুরুচরণের বিধবা দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন

করিলেন, আমার জামাইয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই শেখরনাথ? এমন ছেলে সংসারে আর হয় না।

শেখরের তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহা সে জানাইল এবং আলাপ আছে বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু বাহিরের বসিবার ঘরের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে সহসা থামিতে হইল।

অন্ধকার দরজার আড়ালে ললিতা দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, শোনো, মাকে কি আজই আনতে যাবে?

শেখর বলিল, হাঁ।

তিনি কি বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েচেন?

হাঁ, প্রায় পাগলের মত হয়ে ছিলেন।

তোমার শরীর কেমন আছে?

ভাল আছে, বলিয়া শেখর তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

রাস্তায় আসিয়া তাহার আপাদমস্তক লজ্জায় ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। ললিতার কাছাকাছি দাঁড়াইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার নিজের দেহটাও যেন অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, এমনি মনে হইতে লাগিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে যেমন-তেমন করিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং তখনও গাড়ির বিলম্ব আছে জানিয়া, আর একবার শয্যাশ্রয় করিয়া ললিতার বিষাক্ত স্মৃতিটাকে পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিবে শপথ করিয়া সে হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘৃণার দাবানল জ্বালিয়া দিল। দাহনের যাতনায় সে তাহাকে মনে মনে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিল, এমন কি, কুলটা পর্যন্ত বলিতে সঙ্কোচ করিল না। তখন কথায় কথায় গুরুচরণের স্ত্রী বলিয়াছিলেন, এ ত সুখের বিয়ে নয়, তাই শেষ পর্যন্ত কারো মনে ছিল না, নইলে ললিতা তখন তোমাদের সকলকেই সংবাদ দিতে বলেছিল। ললিতার এই স্পর্ধাটা যেন সমস্ত আগুনের উপরেও শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শেখর মাকে লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার বিবাহের দশ-বারো দিন বিলম্ব ছিল।

দিন-তিনেক পরে, একদিন সকালে ললিতা শেখরের মায়ের কাছে বসিয়া একটা ডালায় কি কতকগুলা তুলিতেছিল। শেখর জানিত না, তাই কি একটা কাজে 'মা' বলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হঠাৎ থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। ললিতা মুখ নীচু করিয়া কাজ করিতে লাগিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রে?

সে যে জন্য আসিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়া, না, এখন থাক, বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ললিতার মুখ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তাহার হাত দুইটির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহা সম্পূর্ণ নিরাভরণ না হইলেও দু'গাছি করিয়া কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। শেখর মনে মনে ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, এ আর এক রকমের ভড়ং। গিরীন সঙ্গতিপন্ন তাহা সে জানিত, তাহার পত্নীর হাত এরূপ অলঙ্কারশূন্য হইবার কোন সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিতেছিল ললিতাও সেই সিঁড়িতে উপরে উঠিতেছিল, একপাশে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শেখর নিকটে আসিতেই অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোমাকে একটা কথা বলবার আছে।

শেখর একমুহূর্ত স্থির হইয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিল, কাকে? আমাকে?

ললিতা তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, হাঁ তোমাকে।

আমার সঙ্গে আবার কি কথা! বলিয়া শেখর পূর্বাপেক্ষা দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে শেখর তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া সেইদিনের সংবাদপত্র পড়িতেছিল, নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত চোখ তুলিয়া দেখিল, গিরীন প্রবেশ করিতেছে। গিরীন নমস্কার করিয়া নিকটে চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। শেখর প্রতি-নমস্কার করিয়া সংবাদপত্রটা এক-পাশে রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। উভয়ের চোখের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু, আলাপ ছিল না এবং সে-পক্ষে আজ পর্যন্ত দুজনের কেহই কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।

গিরীন একেবারেই কাজের কথা পাড়িল। বলিল, বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেচি। আমার শাশুড়ীঠাকরুনের অভিপ্রায় আপনি শুনেচেন—বাড়িটা তিনি আপনাদের কাছে বিক্রি করে ফেলতে চান। আজ আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, শীঘ্র যা হোক একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই তাঁরা এই মাসেই মুঙ্গেরে ফিরে যেতে পারেন।

গিরীনকে দেখিবামাত্রই শেখরের বুকের মধ্যে ঝড় উঠিয়াছিল, কথাগুলো তাহার কিছু-মাত্র ভাল লাগিল না, অপ্রসন্ন-মুখে বলিল, সে ত ঠিক কথা, কিন্তু বাবার অবর্তমানে দাদাই এখন মালিক, তাঁকে বলা আবশ্যক।

গিরীন মৃদু হাসিয়া বলিল, সে আমরাও জানি। কিন্তু তাঁকে আপনি বললেই ত ভাল হয়।

শেখর তেমনিভাবেই জবাব দিল, আপনি বললেও হতে পারে। ও-পক্ষের অভিভাবক এখন আপনিই।

গিরীন কহিল,. আমার বলবার আবশ্যক হলে বলতে পারি; কিন্তু কাল সেজদি বলছিলেন, আপনি একটু মনোযোগ করলে অতি সহজেই হতে পারে।

শেখর মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ কথা কহিতেছিল, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কে বললেন?

গিরীন বলিল,—সেজদি—ললিতাদিদি বলছিলেন—

শেখর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তার পরে গিরীন কি যে বলিয়া গেল, তাহার একবিন্দুও তাহার কানে গেল না। খানিকক্ষণ বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে মাপ করবেন গিরীনবাবু, কিন্তু ললিতার সঙ্গে কি আপনার বিবাহ হয়নি?

গিরীন জিব কাটিয়া বলিল, আজ্ঞে, না—ওদের সকলকেই আপনি জানেন—কালীর সঙ্গে আমার—

কিন্তু, সে-রকম ত কথা ছিল না।

গিরীন ললিতার মুখে সব কথাই শুনিয়াছিল, কহিল, না, কথা ছিল না, সে-কথা সত্য। গুরুচরণবাবু মৃত্যুকালে আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন আমি আর কোথাও যেন বিবাহ না করি। আমিও প্রতিশ্রুত হই। তাঁর মৃত্যুর পরে সেজদিদি আমাকে বুঝিয়ে বলেন, অবশ্য, এ-সব কথা আর কেউ জানে না যে, ইতিপূর্বেই তাঁর বিবাহ হয়ে গেছে এবং স্বামী জীবিত আছেন। এ-কথা আর কেউ হয়ত বিশ্বাস করত না, কিন্তু আমি তাঁর একটি কথাও অবিশ্বাস করিনি। তা ছাড়া, স্ত্রীলোকের একবারের অধিক বিবাহ হতে পারে না—ও কি?

শেখরের দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন সেই বাষ্প অশ্রুধারায় চোখের কোণ বাহিয়া গিরীনের সম্মুখেই ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সেদিকে তাহার চৈতন্য ছিল না, তাহার মনেও পড়িল না, পুরুষের সম্মুখেই পুরুষের এই দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর।

গিরীন নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে মনে সন্দেহ ছিলই—আজ সে ললিতার স্বামীকে নিশ্চয় চিনিতে পারিল। শেখর চোখ মুছিয়া ভারী গলায় বলিল, কিন্তু আপনি ত ললিতাকে স্নেহ করেন?

গিরীনের মুখের উপরে প্রচ্ছন্ন বেদনার গাঢ় ছায়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আস্তে আস্তে বলিল, সে কথার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক। তা ছাড়া, স্নেহ যত বড়ই হোক, জেনে-শুনে কেউ পরের বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করে না—যাক, গুরুজনের সম্বন্ধে ও-সব আলোচনা আমি করতে চাইনে, বলিয়া সে আর একবার হাসিয়া

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ যাই, আবার অন্য সময় দেখা হবে, বলিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

গিরীনকে শেখর চিরদিনই মনে মনে বিদ্বেষ করিয়াছে, এইবারে সেই বিদ্বেষ নিবিড় ঘৃণায় পর্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ সে চলিয়া যাইবামাত্র শেখর উঠিয়া আসিয়া ভূমিতলে বারংবার মাথা ঠেকাইয়া এই অপরিচিত ব্রাহ্ম-যুবকটির উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল। মানুষ নিঃশব্দে যে কতবড় স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, হাসিমুখে কি কঠোর প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারে তাহা আজ সে প্রথম দেখিল।

অপরাহ্নবেলায় ভুবনেশ্বরী নিজের ঘরে মেঝেয় বসিয়া ললিতার সাহায্যে নূতন বস্ত্রের রাশি থাক দিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিলেন, শেখর ঘরে ঢুকিয়া মায়ের শয্যার উপর গিয়া বসিল। আজ সে ললিতাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পলাইল না। মা চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, কি রে!

শেখর জবাব দিল না, চুপ করিয়া থাক দেওয়া দেখিতে লাগিল। খানিক পরে বলিল, ও কি হচ্ছে মা?

মা বলিলেন, নূতন কাপড় কাকে কি-রকম দিতে হবে, হিসেব করে দেখচি—বোধ করি, আরও কিছু কিনতে হবে, না, মা?

ললিতা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

শেখর হাসি-মুখে কহিল, আর যদি বিয়ে না করি মা?

ভুবনেশ্বরী হাসিলেন। বলিলেন, তা তুমি পারো, তোমার গুণে ঘাট নেই।

শেখরও হাসিয়া বলিল, তাই বোধ করি হয়ে দাঁড়ায় মা।

মা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, ও কি কথা! অমন অলক্ষণে কথা মুখে আনিস নে।

শেখর বলিল, এতদিন মুখে ত আনিনি মা, কিন্তু আর না আনলে নয়—আর চুপ করে থাকলে মহাপাতক হবে মা।

ভুবনেশ্বরী বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিত-মুখে চাহিয়া রহিলেন।

শেখর বলিল, তোমার এই ছেলেটির অনেক অপরাধই তুমি ক্ষমা করে এসেচ, এটাও ক্ষমা কর মা, আমি সত্যই এ বিয়ে করতে পারব না।

পুত্রের কথা ও মুখের ভাব দেখিয়া ভুবনেশ্বরী সত্যই উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়া বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। এখন যা তুই এখান থেকে, আমাকে জ্বালাতন করিস নে শেখর—আমার অনেক কাজ।

শেখর আর একবার হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া শুষ্কস্বরে বলিল, না মা, সত্যিই বলচি তোমাকে, এ বিয়ে হতে পারবে না।

কেন, এ কি ছেলেখেলা?

ছেলেখেলা নয় বলেই ত বলচি মা।

ভুবনেশ্বরী এবার রীতিমত ভীত হইয়া সরোষে বলিলেন, কি হয়েচে, আমাকে বুঝিয়ে বল শেখর। ও-সব গোলমেলে কথা আমার ভাল লাগে না।

শেখর মৃদুকণ্ঠে বলিল, আর একদিন শুনো মা, আর একদিন বলবো।

আর একদিন বলবি! তিনি কাপড়ের গোছা একধারে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, তবে আজই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, এমন সংসারে আমি একটা রাতও কাটাতে চাইনে।

শেখর অধোমুখে বসিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বরী অধিকতর অস্থির হইয়া বলিলেন, ললিতাও আমার সঙ্গে কাশী যেতে চায়, দেখি তার যদি একটা কিছু বন্দোবস্ত করতে পারি।

এবার শেখর মুখ তুলিয়া হাসিল, তুমি নিয়ে যাবে, তার আবার বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করবে মা? তোমার হুকুমের বড় ওর আবার কি আছে!

ছেলের হাসিমুখ দেখিয়া তিনি মনে মনে একটু যেন আশান্বিতা হইলেন, ললিতার পানে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, শুনলি মা ওর কথা! ও মনে করে, আমি ইচ্ছা করলেই যেন যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারি! ওর মামীর মত নিতে হবে না?

ললিতা জবাব দিল না। শেখরের কথাবার্তার ধরনে সে মনে মনে অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

শেখর বলিয়া ফেলিল, তাঁকে জানাতে চাও, জানাও গে, সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু, তুমি যা বলবে তাই হবে মা, এ আমিও মনে করি, যাকে নিয়ে যেতে চাচ্চ, সেও মনে করে, ও তোমার পুত্রবধূ। বলিয়া ফেলিয়াই শেখর ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বরী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জননীর সম্মুখে সন্তানের মুখে এ কি পরিহাস! একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি বললি? ও আমার কি?

শেখর মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু জবাব দিল। আস্তে আস্তে বলিল, ঐ ত বললুম মা। আজ নয়, চার বৎসরের বেশী হ'লো, তুমি সত্যই ওর মা। আমি আর বলতে পারিনে মা, ওকে জিজ্ঞেস কর ও-ই বলবে,—বলিয়াই দেখিল ললিতা গলায় আঁচল দিয়া মাকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সেও উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল, এবং উভয়ে একত্রে মায়ের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া শেখর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ভুবনেশ্বরীর দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ললিতাকে সত্যই অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সিন্দুক খুলিয়া নিজের সমস্ত অলঙ্কার বাহির করিয়া তাহাকে পরাইতে পরাইতে একটু একটু করিয়া সব কথা জানিয়া লইলেন। সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তাই বুঝি গিরীনের কালীর সঙ্গে বিয়ে হয়েচে?

ললিতা বলিল, হ্যাঁ মা, তাই। গিরীনবাবুর মত মানুষ সংসারে আর আছে কিনা জানি না। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতেই, তিনি বিশ্বাস করলেন যে সত্যিই আমার বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী আমাকে গ্রহণ করুন, না করুন, সে তাঁর ইচ্ছে, কিন্তু তিনি আছেন।

ভুবনেশ্বরী তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, আছে বৈ কি মা! আশীর্বাদ করি, জন্ম জন্ম দীর্ঘজীবী হয়ে থাকুক, একটু বোস মা, আমি অবিনাশকে জানিয়ে আসি যে, বিয়ের কনে বদল হয়ে গেছে, বলিয়া হাসিয়া বড়ছেলের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

অরক্ষণীয়া

এক

মেজমাসীমা, মা মহাপ্রসাদ পাঠিয়ে দিলেন—ধরো।

কে রে, অতুল? আয় বাবা আয়, বলিয়া দুর্গামণি রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন। অতুল প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলো গ্রহণ করিল।

নীরোগ হও বাবা, দীর্ঘজীবী হও। ওরে ও জ্ঞানদা, তোর অতুলদাদা ফিরে এসেছেন যে রে! একখানা আসন পেতে দিয়ে মহাপ্রসাদটা ঘরে তোল মা। কাল রাত্তিরে সাড়ে-নটা দশটার সময় সদররাস্তায় ঘোড়ার গাড়ির শব্দ শুনে ভাবলুম, কে এলো। তখন যদি জানতুম, দিদি এলেন—ছুটে গিয়ে পায়ের ধূলো নিতুম। এমন মানুষ কি আর জগতে হয়! তা' দিদি ভাল আছেন বাবা? এখন পুরী থেকে আসা হ'ল বুঝি? কি কচ্ছিস মা—তোর অতুলদা যে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মায়ের আহ্বানে একটি বার-তের বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে হাতে একখানি আসন লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল; এবং যতদূর পারা যায়, ঘাড় হেঁট করিয়া দাওয়ার উপর আসনখানি পাতিয়া দিয়া, অতুলের পায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম করিল; কথাও কহিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না। প্রণাম করিয়া উঠিয়া, মহাপ্রসাদের পাত্রখানি হাত হইতে লইয়া, ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল। কিন্তু একটু ভালো করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইত, যাবার সময়ে মেয়েটির চোখমুখ দিয়া একটা চাপা হাসি যেন উছলিয়া পড়িতেছিল।

আবার শুধু মেয়েটিই নয়। এদিকেও একটুখানি নজর করিলে চোখে পড়িতে পারিত, এই সুশ্রী ছেলেটিরও মুখের উপরে দীপ্তি খেলিয়া একটা অদৃশ্য তড়িৎপ্রবাহ মুহূর্তের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

অতুল আসনে বসিয়া তীর্থ-প্রবাসের গল্প বলিতে লাগিল। তাহার বাপ একজন সেকেলে সদরআলা ছিলেন। অনেক টাকাকড়ি এবং বিষয়-সম্পত্তি করিয়া পেন্সন লইয়া ঘরে বসিয়াছিলেন; বছর-চারেক হইল, ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বি.এ. একজামিন দিয়া অতুল মাস-দুই পূর্বে মাকে লইয়া তীর্থপর্যটনে বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি রামেশ্বর হইয়া, পুরী হইয়া কাল ঘরে ফিরিয়াছে।

গল্প শুনিয়া দুর্গামণি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর এমনি মহাপাতকী আমি যে, আর কিছু না হোক, একবার কাশী গিয়ে বাবা বিশ্বেশ্বরের চরণ দর্শন করে আসব, এ-জন্মে সে সাধটাও কখনও পুরল না।

অতুল বলিল, কাশীই বল, আর যাই বল মেজমাসীমা, একবার সব ছেড়েছুড়ে জোর ক'রে বেরিয়ে পড়তে না পারলে আর হয় না। আমি অমন জোর ক'রে না নিয়ে গেলে, আমার মায়েরই কি যাওয়া হ'ত?

দুর্গামণি আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, জানিস ত বাবা সব। জোর করব কি দিয়ে বল দেখি? তিরিশটি টাকা মাইনের উপর খেয়ে-পরে, লোক-লৌকতা, কুটুম্বিতে করে, ডাক্তার-বদ্যির ওষুধের খরচ যুগিয়ে কি থাকে বল দেখি? আর এই মেয়েটা দেখতে দেখতে তেরোয় পা দিলে। তোকে সত্যি বলচি, অতুল, ওর পানে চাইলেই যেন আমার বুকের রক্ত হুহু করে শুকিয়ে যায়! উঃ! এতবড় শত্রুকেও পেটে ধরে মাকে লালন-পালন করতে হয়! বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, অতুল এতবড় দুশ্চিন্তা ও কাতরোক্তির সম্মুখেও ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল; কহিল, মাসীমার সব বাড়াবাড়ি! আচ্ছা, মেয়ে কি আর কারু হয় না যে, তোমারই শুধু ওই একটা হয়েছে—আর রাজ্যের দুর্ভাবনা একা তোমার?

দুর্গামণি কহিলেন, আমার এটা ঠিক ভাবনা নয়, অতুল, এ আমাদের মৃত্যু-যন্ত্রণা! সমাজ আমি জানি ত! মেয়ের বিয়ে দিতে না পারলেই জাত যাবে; কিন্তু দেব কি ক'রে? টাকা চাই—কিন্তু পাব কোথায়? এই ভদ্রাসনের একাংশ ছাড়া আপনার বলতে ত আর কিছু নেই বাবা!

আধ-ঘণ্টা পূর্বে এই মেয়েটাকেই উপলক্ষ করিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কলহ হইয়া গিয়াছিল। স্বামী অর্ধভুক্ত ভাতের থালা ফেলিয়া রাখিয়া অফিসে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেই ব্যথা দুর্গামণির মনে আলোড়িত হইয়া উঠিল এবং টপটপ করিয়া দু'ফোঁটা চোখের জল গাল বাহিয়া কোলের উপর ঝরিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আর-জন্মে কত স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যা করেছিলুম অতুল, যে, এ-জন্মে মেয়ে পেটে ধরেচি।

নাঃ—মেজমাসীমা, আমি উঠলুম, নইলে তুমি থামবে না।

দুর্গামণি আর একবার চোখ মুছিয়া লইয়া কহিলেন, না বাবা, একটু বোস, দু'দণ্ড তোর কাছে কাঁদলেও বুকটা হালকা হয়। তাই বলি, ভগবান! হতভাগীকে আমার কোলেই যদি পাঠালে, রংটা একটু ফরসা করেই পাঠালে না কেন? কালো ব'লে কেউ যে ওকে আশ্রয় দিতেই চায় না! সবাই যে চায় সুন্দরী মেয়ে। ওরে পোড়া সমাজ, তুই কুল, শীল, স্বভাব, চরিত্র কিছুই যদি দেখবি নে, মেয়ে শুধু কালো বলেই তাকে ঘরে ঠাঁই দিবিনে, তবে সে মেয়ের বিয়ে না হলেই বা বাপ-মাকে দণ্ড দিবি কেন?

অতুল কহিল, কালো মেয়ের কি বিয়ে হচ্ছে না? ভোমরাও কালো, কোকিলও কালো—তাদের কি আদর হয় না? এ-সব ত চিরকালের দৃষ্টান্ত—মেজমাসীমা!

দুর্গামণি কহিলেন, তাই দৃষ্টান্তই শুধু চিরজীবী হয়ে আছে বাবা, আর কিছু নেই। কিন্তু তাতে আর সান্ত্বনাও পাইনে, জোরও পাইনে অতুল। গিরিশ ভটচাযিার মেয়ের বিয়ে চোখের উপর দেখে হাত-পা যেন পেটের ভেতর ঢুকে গেছে! ঠিক আমাদের মতই—না ছিল তার টাকার বল, না ছিল মেয়ের রূপ—তাই পাত্রের বয়সও গেল ষাটের কাছাকাছি। তার মায়ের কান্নাটা আমি আজও যেন কানে শুনতে পাচ্ছি।

অতুল সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—ষাটের কাছাকাছি? বল কি?

তা হবে বৈ কি বাবা! হরি চক্কোত্তির নাতজামাই হ'ল ওপাড়ার নিতাই চাটুয্যে। তারই একটা আট-দশ বছরের মেয়ে যে! হিসেব করে দেখ দেখি।

খবর শুনিয়া অতুল স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

দুর্গামণি বলিতে লাগিলেন, সে মেয়ে যদি মনের ঘেন্নায় বিষ খায়, কি গলায় দড়ি দেয়, কিংবা কুলে কালি দিয়ে চলে যায়—মা হয়ে তাকে বুকের ভেতর থেকে অভিশাপ দিই কেমন করে, বল দেখি বাবা?

অতুল চুপ করিয়া রহিল। দুর্গামণি হঠাৎ তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, বাবা অতুল, আজকাল সবাই বলে, তোদের ছেলেদের মধ্যে দয়াধর্ম আছে। দেখিস নে বাবা, তোদের ইস্কুল-কলেজের কোন ছেলে যদি নিতান্ত দয়া করেই মেয়েটাকে তার পায়ে একটুখানি ঠাঁই দেয়। তাহলে তোদের কাছে আমি মরণ পর্যন্ত কেনা হয়ে থাকব।

অতুল শশব্যস্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, কেন এত ব্যস্ত হচ্চ মেজমাসীমা? আমি কথা দিচ্চি—

কিন্তু কথাটা সে দিতে পারিল না। সহসা লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্যন্ত রাঙ্গা হইয়া কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। দুর্গামণি যদিচ ইহা লক্ষ্য করিলেন না, কিন্তু আর কেহ তথায় উপস্থিত থাকিলে হয়ত সংশয় করিত, কি এমন কথাটা অতুল ঝোঁকের উপর দিতে গিয়াও এমন করিয়া থামিয়া গেল।

অতুল নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সহজভাবে কহিল, আচ্ছা, খুব চেষ্টা করব।—কৈ রে জ্ঞানদা, একটা পান-টান দে না—বাড়ি যাই।

দুর্গামণি রাগিয়া চীৎকার করিলেন, তোর অতুলদারে একটা পান দে না গেনি। মুখপোড়া মেয়ের না আছে রূপ, না আছে গুণ। বলি, এ-সব কথাও কি শেখাতে হবে? মহাপ্রসাদ নিয়ে সেই যে ঘরে ঢুকলি, আর বেরুলি নে। শিগ্‌গির পান নিয়ে আয়।

আচ্ছা, আমি নিজেই গিয়ে পান নিচ্চি—কোন্‌ ঘরে রে জ্ঞানদা! বলিয়া উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিয়া অতুল শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

সম্মুখে পানের সজ্জা লইয়া মেয়েটি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। অতুল ঘরে ঢুকিয়াই গম্ভীর হইয়া বলিল, মেজমাসীমা বলচেন, মুখপোড়া গেনির না আছে রূপ, না আছে গুণ। তাকে একটা ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে।

জ্ঞানদা জবাব দিল না, অবনত মুখে বাটা হইতে গোটা-দুই পান লইয়া হাত উঁচু করিয়া ধরিল।

অতুল পিছনে আসিয়া হাত হইতে পান লইয়া কহিল, কিন্তু পান সাজা ভাল হলে এবার মাপ করা হবে, ষাটকে কমিয়ে না হয় কুড়ি-একুশে দাঁড় করান যাবে।

জ্ঞানদা লজ্জায় মাথাটা ঝুঁকাইয়া প্রায় বাটার সঙ্গে এক করিয়া ফেলিল। অতুল গলা খাটো করিয়া বলিল, মাসীমার কাছে আর একটু হলে বলে ফেলেছিলুম আর কি! আচ্ছা, বেলা হ'ল চললুম।

জ্ঞানদা ইহারও প্রত্যুত্তর করিল না। সেই যে জড়সড় হইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল।

কথা কওয়া হ'ল না? আচ্ছা—বলিয়া অতুল মেয়েটির ভিজা এলো চুলের একগোছা টানিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু আসচে হরি চক্কোত্তির মতন একটা বুড়ো—চললুম, বলিয়া হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু উঠানে পা দিয়াই চেঁচাইয়া উঠিল, মেজমাসীমা, জ্ঞানোর জন্যে বোম্বাই থেকে মা একজোড়া চুড়ি কিনেছিলেন, বাইরে এসে দেখ—

কৈ, দেখি বাবা,—বলিয়া দুর্গামণি পুনরায় রন্ধনশালা হইতে বাহির হইলেন। অতুল পকেট হইতে দু'গাছি চুড়ি বাহির করিয়া মেলিয়া ধরিল।

তাহার রং এবং কারুকার্য দেখিয়া দুর্গামণি অত্যন্ত পুলকিত-চিত্তে দাতার ভূয়োভূয়ঃ যশোগান করিতে লাগিলেন। চুড়ি দু'গাছি কাঁচের বটে, কিন্তু সেরূপ মূল্যবান বাহারে চুড়ি পাড়াগাঁয়ে কেন, কলিকাতাতেও তখনো আমদানি হয় নাই। বস্তুতঃ তাহার গঠন, চাকচিক্য এবং সৌন্দর্য দেখিয়া মায়ের নাম করিয়া অতুল নিজের টাকাতেই বোম্বাই হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল।

মায়ের ডাকাডাকিতে জ্ঞানদা বাহির হইয়া আসিল এবং নিঃশব্দ-নতমুখে স্নেহের এই প্রথম উপহার হাত পাতিয়া গ্রহণ করিতে গিয়া তাহার অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুটি কাঁপিয়া গেল। তার পরে দাতার পায়ের কাছে নমস্কার করিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। সে একটি কথাও কহে নাই—কিন্তু আজ তাহার অন্তরের কথা অন্তর্যামী জানিলেন। শুধু পিছনে দাঁড়াইয়া এই দুটি মানুষ ক্ষণকালের জন্য সস্নেহ-মুগ্ধ-নেত্রে এই কিশোরীর অনিন্দ্য গঠন ও গতিভঙ্গীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

দুই

বড়ভাই গোলোকনাথ মারা গেলে, তাঁর বিধবা স্ত্রী স্বর্ণমঞ্জরী নির্বংশ পিতৃকুলের যৎসামান্য বিষয়-আশয় বিক্রয় করিয়া হাতে কিছু নগদ পুঁজি করিয়া, কনিষ্ঠ দেবর অনাথনাথকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। তাহারই বিষের অসহ্য জ্বালায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া মেজভাই প্রিয়নাথ গত বৎসর ঠিক এমন দিনে ছোটভাই অনাথের সঙ্গে বিবাদ করিয়া উঠানের মাঝখানে একটা প্রাচীর তুলিয়া দিয়া পৃথগন্ন হইয়াছিলেন এবং মাঝখানে একটা কপাট রাখার পর্যন্ত প্রয়োজন অনুভব করেন নাই, তখন রঙ্গ দেখিয়া বিধাতাপুরুষ নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে বসিয়া হাসিতেছিলেন। কারণ, একটা বৎসরও কাটিল না—প্রাচীরের সমস্ত উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিয়া দিয়া, সেদিন প্রিয়নাথ সাতদিনের জ্বরে প্রায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিলেন।

মৃত্যুর আগের দিনটায়—মরণ সম্বন্ধে যখন আর কোথাও কিছুমাত্র অনিশ্চয়তা ছিল না, এবং তাই দেখিতে সমস্ত গ্রামের লোক পিলপিল করিয়া বাড়ি ঢুকিয়া, ঘরের দরজার সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া অস্ফুট কলকণ্ঠে হা-হুতাশ করিতেছিল, তখনও প্রিয়নাথের একেবারে সংজ্ঞালোপ হয় নাই। অতুল গ্রামে ছিল না। কলিকাতার মেসে ওই দুঃসংবাদ পাইয়া আজ ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ভিড় ঠেলিয়া যখন সে রোগীর ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল, কোথা হইতে জ্ঞানদা পাগলের মত আছাড় খাইয়া পড়িয়া তাহার দুই পায়ের উপর মাথা কুটিতে লাগিল। যাহারা তামাশা দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা এই

আর একটা অভাবনীয় ফাউ পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিল; কিন্তু অতুল এত লোকের সমক্ষে দুঃখে লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে যখন সে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিতে গেল, তখন জ্ঞানদা জোর করিয়া পায়ের উপর মুখ চাপিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, বাবার মরণকালে তুমি নিজের মুখে তাঁকে একটা সান্ত্বনা দিয়ে যাও—আমার অদৃষ্টে পরে যাই থাক—এ-সময় আমার মতন আমার ভাবনাটাকেও যেন তিনি এইখানেই ফেলে রেখে যেতে পারেন—আর তোমার কাছে আমি কখন কিছু চাইব না।—বলিয়া তেমনি করিয়াই মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

তাহার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুর্ভাগা পিতা অত্যন্ত অসময়ে অকালে মরিতেছে—আজ আর তাহার কাণ্ডজ্ঞান ছিল না—এত লোকের সম্মুখে কি করিতেছে, কি বলিতেছে, কিছুই ভাবিয়া দেখিল না,—ক্রমাগত একভাবে মাথা খুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু অতুল সংযমী লোক। জ্ঞানদার এই ব্যবহারে অন্তরে সে যত ক্লেশই অনুভব করুক, বাহিরে এতগুলি কৌতূহলী চক্ষের উপর কঠিন হইয়া উঠিল। জোর করিয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া মৃদু তিরস্কারের স্বরে কহিল, ছি, শান্ত হও, কান্নাকাটি করো না—আমার যা বলবার তা আমি বলব বৈ কি। বলিয়া মুমূর্ষুর শয্যার একাংশে গিয়া উপবেশন করিল। দুর্গামণি স্বামীর শিয়রে বসিয়া ছিলেন, অতুলের মুখের পানে চাহিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতিবেশী নীলকণ্ঠ চাটুয্যে দ্বারের উপরে দাঁড়াইয়া ছিলেন; অতুলের বিলম্ব দেখিয়া কহিলেন, প্রিয়নাথের এখনো একটু জ্ঞান আছে বাবা, যা বলবে, এইবেলা বেশ চেঁচিয়ে বল—তা হলেই বুঝতে পারবে। বলা বাহুল্য, বৃদ্ধের এই প্রস্তাব আরও দুই-একজন তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিল।

জনতা দেখিয়া অতুল প্রথমেই ক্রুদ্ধ হইয়াছিল; তাহার উপর ইহাদের এই নিতান্ত অশোভন কৌতূহলে সে মনে মনে আগুন হইয়া কহিল, আপনারা নিরর্থক ভিড় করে থেকে ত কোন উপকার করতে পারবেন না,—একটুখানি বাহিরে গিয়ে বসলেই আমার যা বলবার বলতে পারি। নীলকণ্ঠ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, নিরর্থক কি হে? প্রতিবেশীর বিপদে প্রতিবেশীই এসে থাকে। তুমি কোন সার্থক উপকার করতে বিছানায় গিয়ে বসেচ বাপু? অতুল উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, আমি উপকার করি না করি, আপনাদের এমন করে বাতাস আটকে অপকার করতে আমি দেব না। সবাই বাইরে যান।

তাহার ভাব দেখিয়া নীলকণ্ঠ দু'পা পিছাইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, সেদিনকার ছোকরা তোমার ত বড় আস্পর্ধা দেখি হে! কে একজন তাঁহার আড়ালে দাঁড়াইয়া কহিল, এল.এ., বি.এ. পাশ করেচে কিনা! একটা দশ-বার বছরের ছোঁড়া উঁকি মারিতেছিল। অতুল কাহারও কথার কোন জবাব না দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল। সে গিয়া আর একজনের গায়ে পড়িল। যাহার গায়ে পড়িল, সে অস্ফুটস্বরে সদরআলার ব্যাটা প্রভৃতি বলিতে বলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ভদ্রলোক অতুলের কথাটা শুনিবার বিশেষ কোন আশা না দেখিয়া, মনে মনে শাসাইয়া প্রস্থান করিলেন।

যখন বাহিরের লোক আর কেহ রহিল না, তখন অতুল মুমূর্ষুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, মেসোমশাই! প্রিয়নাথ রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন। অতুল পুনরায় উচ্চকণ্ঠে কহিল, আমাকে চিনতে পাচ্ছেন কি? প্রিয়নাথ চক্ষু মুদিয়া অস্ফুটে বলিলেন, অতুল।

এখন কেমন আছেন?

প্রিয়নাথ মাথা নাড়িয়া তেমনি অস্পষ্টস্বরে বলিলেন, ভাল না।

অতুলের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া কহিল, মেসোমশাই, একটা কথা আপনাকে জানাচ্চি। আপনি নিশ্চিন্ত হোন—আজ থেকে জ্ঞানদার ভার আমি নিলুম। প্রিয়নাথ কথাটা বুঝিতে পারিলেন না। এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, কৈ জ্ঞানদা?

দুর্গামণি স্বামীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুবিকৃত রোদনের কণ্ঠে বলিলেন, একবার দেখবে জ্ঞানদাকে? প্রিয়নাথ প্রথমটা জবাব দিলেন না—শেষে বলিলেন, না।

দুর্গামণি কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, অতুল কি বলচে, শুনেচ? সে তোমার জ্ঞানদার ভার নিতে এসেচে। আর তুমি ভেবো না—হতভাগীকে অনেক গালমন্দ করেচ; আজ একবার ডেকে আশীর্বাদ করে যাও।

প্রিয়নাথ চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। দুর্গামণি আবার সেই কথা আবৃত্তি করার পর, তাঁহার চোখ দিয়া দু' ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। অক্ষম হাতখানি অনেক কষ্টে তুলিয়া, অতুলের কপালে একবার স্পর্শ করাইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না বটে, কিন্তু এই আসন্নকালে তাঁহার হৃদয়ের একটা অতি গুরুভার নিঃসংশয়ে তুলিয়া ফেলিতে পারিয়াছে অনুভব করিয়া অতুল অকস্মাৎ বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সাক্ষী রহিলেন—শুধু দুর্গামণি আর ভগবান।

পরদিন সায়াহ্নকালে, শতকরা আশীজন ভদ্র-বাঙ্গালী যাহা করে, প্রিয়নাথও তাহাই করিলেন। অর্থাৎ, অফিসের ত্রিশ টাকা চাকরির মায়া কাটাইয়া, ছাব্বিশ বৎসরের বিধবা ও তের বৎসরের অনূঢ়া কন্যার বোঝা তদপেক্ষা কোন এক দুর্ভাগ্য আত্মীয়ের মাথায় তুলিয়া দিয়া, ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্রায় বিনা চিকিৎসায় ছিয়াশী বৎসরের সমতুল্য একটা জীর্ণ কঙ্কালসার দেহ তুলসীবেদীমূলে পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গানারায়ণব্রহ্ম নাম শুনিতে শুনিতে বোধ করি বা হিন্দুর বিষ্ণুলোকেই গেলেন।

তিন

ছোটভাই অনাথনাথকে বাধ্য হইয়া প্রাঙ্গণের প্রাচীরে একটা দ্বার ফুটাইতে হইল। অগ্রজের শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গেলে পনর-ষোল দিন পরে একদিন তিনি অফিসে যাইবার মুখে চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে বলিলেন, আর না বললে ত নয় বোঠান, বুঝতে ত সবই পার—খেতে তোমাকে একবেলা একমুঠো দিতে আমি কাতর নই—তা দাদা আমার সঙ্গে যতই কেন না কুব্যবহার করে যান। কিন্তু এতবড় মেয়ের বিয়ের ভার ত আমি আর সত্যি সত্যি নিতে পারিনে। শুনতেই আমার দেড়-শ টাকা মাইনে, কিন্তু কাচ্চা-বাচ্চা ত কম নয়? তা ছাড়া আমার নিজের মেয়েটাও বার বছরে পড়ল, দেখতে পাচ্চ ত। তাই, আমি বলি কি, মেয়ে নিয়ে এ সময়ে তোমার একবার হরিপালে যাওয়া উচিত।

দুর্গামণি রান্নাঘরের একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া কোনমতে দাঁড়াইয়া ছিলেন; সভয়ে সসঙ্কোচে কহিলেন, দাদার অবস্থা তুমি ত জান ঠাকুরপো। কিচ্ছু নেই তাঁর। এতবড় বিপদের কথা শুনে একবার দেখা পর্যন্ত দিতে এলেন না। তা ছাড়া, না নিয়ে গেলেই বা যাই কি করে?

বড়বৌ স্বর্ণমঞ্জরী দেবরের পার্শ্বে প্রাচীরের আড়ালেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, একটুখানি গলা বাড়াইয়া কহিলেন, দাদার অবস্থা ভাল নয় জানি, কিন্তু তোমার দেওরটিই কোন্ লাটসাহেব মেজবৌ? আর ঐ শুনতেই দেড়-শো! কিন্তু যা করে আমি সংসার চালাই, তা আমি ত জানি! আর তাও বলি—অত বড় ধুমসো মেয়ে তোমার ঘাড়ে—কে তোমাকে যেচে ঠাঁই দিতে যাবে বল দিকি? কিন্তু তা বলে মান-অভিমান করে বসে থাকলে ত চলে না!

দুর্গামণি ধীরে ধীরে বলিলেন, না দিদি, আমার আবার মান-অভিমান কি!

স্বর্ণ দেওরকে বাঁ হাত দিয়া পিছনে ঠেলিয়া, নিজে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিলেন, তোমাকে মন্দ কথা ত আমি বলিনি মেজবৌ, যে অমন করে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলি বললে? তা, রাগই কর, আর ঝালই কর বাপু—তোমার ঐ ডানাকাটা পরীর বিয়ে দিতে আমরা পারব না। মেয়ে ত ঐ ছোটবৌটাও পেটে ধরেচে। কেউ একবার বাছাদের মুখপানে চেয়ে দেখলে আবার নাকি সে চোখ ফিরিয়ে চলে যাবে! তা সত্যি কথা বলব মেজবৌ—যেমন তোমার মেয়ের ছিরি, তেমনি গিয়ে হরিপালে পোড়ে-হোড়ে থেকে যা-হোক একটা চাষা-ভুষো ধরে দাও গে—ল্যাটা চুকে যাক। শুনেচি নাকি—সেখানকার লোক সুচ্ছিরি-কুচ্ছিরি দেখে না—মেয়ে হলেই হ'ল।

দুর্গামণি চুপ করিয়া রহিলেন। যে বিষের জ্বালায় একদিন তাঁহারা পৃথক হইয়াছিলেন, সেই বিষদন্ত পুনরায় উদ্যত দেখিয়া তিনি ভয়ে কাঠ হইয়া গেলেন। স্বর্ণ কহিলেন, যার যেমন! তোমাকে কেউ ত নিন্দে করতে পারবে না। হাঁ, পারে বটে বলতে আমাকে। তিনটে পাশের কম যদি জামাই ঘরে আনি, দেশসুদ্ধ একটা ঢিঢি পড়ে যাবে। সবাই বলবে—এটা করলে কি! এতবড় একটা জ্যাঠাই ঘরে থাকতে কিনা দুর্গাপ্রতিমে জলে ভাসিয়ে দিলে! সত্যি কিনা বল ঠাকুরপো? বলিয়া স্বর্ণ অনাথের প্রতি কটাক্ষ করিলেন।

তা বৈ কি! বলিয়া অনাথ তাহার মহামান্যা বড়ভাজের মর্যাদা রাখিয়া আফিসের বেলা হওয়ার অছিলায় প্রস্থান করিল।

স্বর্ণ বলিলেন, তোমার ভাইকে ধরে-করে যা হোক একটা ধরে-পাকড়ে দাও গে। তাতে তোমার লজ্জা নেই মেজবৌ, কেউ নিন্দে করতে পারবে না। তিরিশটি টাকা ত সবে মাইনে ছিল, কেই বা তাকে জানত, আর কেই বা চিনত। এঁদের ভাই বলেই যা লোকে জানে। আমি বলি কি—কাল দিনটে ভাল আছে, কালই চলে যাও।

দুর্গামণি মনে মনে একবার অতুলের কথা ভাবিলেন, কিন্তু, ইহার সাক্ষাতে কোন কথা কহিলেন না। কারণ এই বড়জায়ের সম্বন্ধেই অতুলের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ। স্বর্ণ অতুলের মায়ের মামাত বোন।

সেদিন কেমন করিয়া জ্ঞানদা অতুলের পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদাকাটা করিয়াছিল, মা তাহা দেখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতবড় বিপদ মাথার উপর লইয়া ইহার বিশেষ কোন অর্থ ভাবিয়া দেখেন নাই। কিন্তু দুঃখীর ঘরে ত একান্ত-মনে শোক করিবারও অবসর নাই! তাই স্বামীর মৃত্যুর পরের দিন হইতেই এই কথাটা চিন্তা করিতেছিলেন। ঘরে গিয়া দেখিলেন, মেয়ে চুপ করিয়া মেঝের উপর বসিয়া আছে। ধীরে ধীরে তাহার কাছে বসিয়া কহিলেন, দিদি যা বললেন, শুনেচিস ত?

মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল। তার পরে যে তিনি কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। কিন্তু মেয়ে নিজেই তাহার সুবিধা করিয়া দিল। কহিল, কখ্খনো ত বাপের বাড়ি যাওনি মা, এ সময় একবার কেন চল না?

মা বলিলেন, মা বেঁচে নেই, দাদা কোনদিন খোঁজ নিলেন না। এতবড় বিপদ শুনেও একটা চিঠি পর্যন্ত লিখলেন না। কেমন করে তাঁদের কাছে সেধে যাই, বল্ দেখি মা?

মেয়ে কহিল, দুঃখীর খোঁজ কেউ সেধে কখনো নেয় না মা। তাঁরা নেননি—এঁরাও ত নেন না। এঁরা বরং যেতেই বলচেন। আমাদের মান-অভিমান বাবার সঙ্গেই চলে গেছে, মা। চল, আমরা সেখানে গিয়েই থাকি গে।

মায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মেয়ে সস্নেহে মুছাইয়া দিয়া কহিল, আমি জানি, শুধু আমার জন্যেই তুমি কোথাও যেতে চাও না। নইলে, জ্যাঠাইমার কথা শুনে একটা দিনও তুমি এখানে থাকতে না। আমার জন্যে তোমাকে এতটুকু ভাবতে হবে না মা, চল, দিন-কতকের জন্যে আমরা আর কোথাও যাই। এখানে থাকলে তুমি মরে যাবে।

মা আর থাকিতে পারিলেন না, মেয়েকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মেয়ে বাধা দিল না, শান্ত করিবার চেষ্টা করিল না; শুধু নীরবে জননীর বুকের উপর মুখ রাখিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে দুর্গামণি নিজেই কতকটা শান্ত হইয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, তোকে সত্যি বলচি জ্ঞানদা, তুই না থাকলে আমি যেখানে দু'চক্ষু যায় সেইদিনই চলে যেতাম যেদিন তিনিও জন্মের মত চলে গেলেন। শুধু তোর জন্যেই পারিনি।

তা আমি জানি মা।

আচ্ছা, একটা কথা আমাকে সত্যি করে বল দেখি, বাছা, সেদিন কেন অতুল ও-কথা বললে? না জ্ঞানদা, অমন করে মুখ ঢেকে থাকিস নে মা, লজ্জা করবার সময় এ নয়। আমি জানি, মিছে কথা বলবার ছেলে সে নয়। তবে, সেই বা কেন তাঁর মরণকালে অমন ভরসা দিলে, আর তুই বা কেন তার পায়ে পড়ে অমন করে কাঁদলি?

জ্ঞানদা মায়ের বুকের মধ্য হইতে অস্ফুটে কহিল, সে আমি জানিনে, মা।

দুর্গামণি জোর করিয়া মেয়ের মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া একবার দেখিবার চেষ্টা করিলেন,

কিন্তু সে জোর করিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল। বিফলকাম হইয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, তোমার বাবা বেঁচে থাকতে আমার কখনো কিছু মনে হয়নি বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে ভেবে ভেবে এখন যেন অনেক কথাই বুঝতে পারি। অতুলের মুখের কতদিনের কত ছোট-খাট কথাই না আজ আমার মনে হচ্চে। বলিতে বলিতেই তিনি অকস্মাৎ ব্যগ্র হইয়া কন্যার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যি বল মা, আমি যা মনে করেচি, তা মিথ্যে নয়? আমি এ ক'দিন শুধু স্বপন দেখিনি?

জ্ঞানদা তেমনি মুখ ঢাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, কি জানি মা, তাঁর ধর্ম তাঁর কাছে।

দুর্গামণি আনন্দের আবেগে কাঁদিয়া কহিলেন, আমাকে সংশয়ে ফেলে রেখে আর বিঁধিস নে মা, একবার মুখ ফুটে বল্—আমি তোর বাপের জন্যে একটিবার প্রাণ খুলে কাঁদি। আমার এ কান্না আজ তিনি শুনতে পাবেন।

মেয়ে চুপি চুপি কহিল, কাঁদো না মা—আমি ত তোমাকে কাঁদতে বারণ করিনে। বাবাকে জানাতে বলেছিলাম—তিনি নিজেই ত জানিয়েচেন। এখন তাঁর ধর্ম তাঁর কাছে।

দুর্গামণি এবার আর বাধা মানিলেন না। জোর করিয়া মেয়ের আরক্ত অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া, তাহাকে অজস্র চুম্বন করিয়া, পুনরায় বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া, নীরবে বহুক্ষণ ধরিয়া অশ্রুপাত করিলেন। পরে চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তাই বটে মা, তাই বটে! অতুল আমার দীর্ঘজীবী হোক—তার ধর্ম তার কাছেই বটে। কিন্তু এ কথাটা আমাদের কারু একদিনের তরে মনে পড়েনি মা, তুই নিজেই যে তাকে মরা বাঁচিয়েছিলি। সে বছর, লোকে বললে—বেরিবেরি রোগ। তা সে যে রোগই হোক—ফুলে ফেটে, ঘা হয়ে,—আগে তার মা, তার পরে অতুল। অতুলের তো কোন আশাই ছিল না। পচা গন্ধে, ভয়ে, কেউ যখন তাদের ওদিক মাড়াত না, তখন এতটুকু মেয়ে হয়ে তুই যমের সঙ্গে দিবারাত্রি লড়াই করে তাকে ফিরিয়ে এনেছিলি। সে ধর্ম সে কি না রেখে পারে? সাবিত্রীর মত যাকে যমের হাত থেকে তুই ফিরিয়ে এনেছিলি, তাকে কি ভগবান আর কারু হাতে তুলে দিতে পারেন? এ ধর্ম যদি না থাকে, তবে চন্দ্র-সূর্য এখনও উঠচে কেন?

একটুখানি মৌন থাকিয়া পুনরায় পুলকিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন, এখন যেখানে আমাকে বলিস সেইখানেই যাব। কিন্তু তুই ত তার মত না নিয়ে যেতে পারিস নে বাছা। তাই বটে! তাই বটে! তাই বাবা আমার ফিরে এসেই, সকাল হতে না হতে দু'গাছি চুড়ি দেবার ছল করে মাকে আমার দেখতে এসেছিল। ওগো, আর একটা বছর কেন তুমি বেঁচে থেকে চোখে দেখে গেলে না! বলিয়া তিনি উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন বস্ত্রাঞ্চল দিয়া রোধ করিলেন।

বলি মেজবৌ?

দুর্গামণি তাড়াতাড়ি মেয়েকে বুক হইতে ঠেলিয়া দিয়া, চোখটা মুছিয়া লইয়া সাড়া দিলেন, কেন দিদি?

বড়বৌ একবার ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া কঠিন-স্বরে বলিলেন, তোমাদের না হয় শোকের শরীরে ক্ষিদে-তেষ্টা নেই; কিন্তু বাড়ির আর সবাই ত উপোস করে থাকতে পারে না। বেরিয়ে একবার বেলার দিকে চেয়ে দেখ দেখি।

দুর্গামণি শশব্যস্তে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বেলার দিকে চাহিয়া লজ্জিত-মুখে মেয়ের নাম করিয়া কি একটুখানি জবাবদিহি করিতেই, স্বর্ণমঞ্জরী তীক্ষ্ণভাবে বলিলেন, বেশ ত। হেঁসেলটা চুকিয়ে দিয়ে মেয়েকে কাছে বসিয়ে সারাদিন বোঝাও না—আমি কথাটিও কব না। কিন্তু আমার ছেলে-মেয়েগুলো যে পিত্তি পড়ে মারা যায়। না বাপু, এমনধারা সব অনাছিষ্টি কাণ্ড আমি সইতে পারব না। বলিয়া নিঃসন্তান বড়বৌ ছোটবধূর সন্তানদের প্রতি মাতৃস্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

অনাথের সংসারে পুনরায় প্রবেশ করা অবধি দুর্গাকেই রান্নাঘরের সমস্ত ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহাতে বড়বৌ এবং ছোটবৌ উভয়েই সমস্তদিনব্যাপী ছুটি পাইয়া, একজন পাড়া বেড়াইয়া এবং খরচপত্র অত্যন্ত বেশী হইতেছে বলিয়া কোন্দল করিয়া, এবং আর একজন ঘুমাইয়া, নভেল পড়িয়া, গল্প করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন।

অনাথ সাড়ে-আটটার ডেলি প্যাসেঞ্জার। ভোরে উঠিয়া যথাসময়ে তাঁহার আহার্য প্রস্তুত

করিয়া দেওয়া, এ-বাটীতে একটা নিদারুণ অশান্তির ব্যাপার ছিল। এই লইয়া বড় এবং ছোট জায়ে প্রায়ই কথা-কাটাকাটি এবং মন-কষাকষি চলিত। এ কয়দিন এই হাঙ্গামা হইতে নিস্তার পাইয়া, উভয়ের মধ্যে অনেক দিনের পর আবার একটা ভালবাসার গ্রন্থিবন্ধনের সূচনা হইতেছিল। কিন্তু আজ সকালে হঠাৎ সেই বাঁধনটা আর একবার ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাহার কারণ এই যে, বেলা সাতটা বাজে, এবং ঝি আসিয়া সদ্যনিদ্রোত্থিত ছোটবধূকে জানাইল যে, কয়লার উনানের আঁচ উঠিয়া গিয়াছে, একটু তৎপর হইয়া রান্না চাপাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

ছোটবৌ বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন, মেজদি কি করচে? বেলা সাতটা বাজে—আজ বুঝি তার সে হুঁশ নেই?

ঝি কহিল, হুঁশ কেন থাকবে না গা? ভোরে উঠে মায়ে-ঝিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ বাঁধাছাঁদা করচে—এই আটটার গাড়িতে হরিপাল না কোথায় যাবে যে!

ছোটবৌর কালকার কথা মনে পড়িল। কিন্তু কিছুমাত্র প্রসন্ন না হইয়া চেঁচাইয়া কহিল, যাবে বললেই যাবে নাকি? বাবুর হুকুম নিয়েচে? দিদিকে জানিয়েচে?

ঝি কহিল, বাবুর কথা জানিনে ছোটবৌমা, কিন্তু বড়মা ত নিজেই তাদের আজ যেতে বলেছিল।

তবে, তাকেই বল গে সাড়ে-আটটার ভাত দিতে—আমি জানিনে, বলিয়া ছোটবৌ ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হইয়া খানিকটা গুলগুঁড়ানো ঠোঁটের ভিতর পুরিয়া গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া খিড়কির দিকে হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

ঝি বলিল, থাকলে ত বলব! তিনি গেছে গঙ্গাচ্চান করতে—বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ছোটবৌকে ফিরিতে হইল, কারণ অফিসের সাহেব তাহার রাগের মর্যাদা বুঝিবে না। হয় যা-হোক দুটা সিদ্ধ করিয়া দিতেই হইবে, না হয় স্বামীকে ঠিক সময়ে অভুক্তই যাইতে হইবে। দুটার একটা অপরিহার্য। ছোটবৌ ফিরিয়া আসিয়া দুর্গামণির দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, যাবেই ত। কিন্তু এমন খোলোমি করে না গেলেই কি হত না মেজদি?

এই অভাবনীয় আক্রমণে দুর্গামণি অবাক হইয়া গেলেন।

ছোটবৌ কহিল, আমরা কেউ জানিনে, তোমরা সকালেই যাবে। তিনি গেছেন গঙ্গা নাইতে। আমি ত এই উঠচি। টাইমের ভাত কি করে দিই বল দেখি?

প্রাতঃপেন্নাম হই মাসীমারা, বলিয়া অতুল বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ছোটবৌ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তুমি হঠাৎ যে অতুল?

অতুল কলিকাতার মেসে থাকে। সেখানে চিঠি পাইয়া ছুটাছুটি করিয়া এইমাত্র আসিয়া জুটিয়াছে—এখনও বাড়ি যায় নাই। কহিল, মেজমাসীমা হরিপালে গঙ্গাযাত্রা করবেন, আর শেষ দেখাটা একবার দেখতে আসব না? হরিপাল! অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার ডিপো! তা এই আশ্বিনের শুরুতেই এমন সুবুদ্ধিটা তোমাকে কে দিলে বল দেখি, মেজমাসীমা? বাঃ—বাঁধাছাঁদা একেবারে কমপ্লিট যে! বলিয়া সে সহাস্যে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই একপ্রান্ত হইতে একজোড়া জলেভরা আরক্ত চক্ষুর টেলিগ্রাফ পাইয়া স্তব্ধ হইয়া থামিল।

ছোটবৌ প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি করে খবর পেলে অতুল?

আমি? বাঃ—, বলিয়া অতুল তাহার কৈফিয়ত শেষ করিল।

অকস্মাৎ প্রাঙ্গণের কোন একটা অনির্দিষ্ট স্থান হইতে স্বর্ণমঞ্জরীর কণ্ঠস্বর শব্দভেদী বাণের মত আসিয়া প্রত্যেকের কানে বিঁধিল। অর্থাৎ তিনি গঙ্গাস্নানে শান্ত-শুচি হইয়া বাটীতে পা দিয়াই ঝির মুখে কয়লার উনুনের খবর পাইয়াছিলেন। সুতরাং মেজজায়ের সদ্য-বৈধব্যের যথার্থ হেতুটা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বলিতে আসিতেছিলেন—চারপো পূর্ণ না হলে কি ভগবান কারু এমন সর্বনাশ করেন? করেন না। এ তাঁর ধর্মের সংসার—এখানে অধর্ম হবার জো নেই। সোজা চলিয়া আসিয়া ঘরের চৌকাঠের ভিতরে একটা পা দিয়া কহিলেন, কাজকর্মটা ত তোমার এই, মেজবৌ—না খেয়ে উপোস করে ছোটকর্তা অফিসে যাক

সন্ধ্যাবেলা পিত্তি পড়ে জ্বর হয়ে বাড়ি ফিরে আসুক। তারপর নিজের যেমন হয়েচে, তেমনি সর্বনাশ আরো একজনের হোক।

দুর্গামণি মনে মনে শিহরিয়া কহিলেন, এ কপাল যার পুড়েচে দিদি, সে অতিবড় শত্রুর জন্যেও অমন কামনা করে না। কিন্তু কি করেচি তোমার যে, এত কটু কথা আমাকে উঠতে বসতে শোনাচ্ছ?

স্বর্ণ হাত নাড়িয়া, মুখ অতি বিকৃত করিয়া কহিলেন, কচি খুকী যে! আমাকে বলতে হবে—কি করেচ? সাড়ে-সাতটা বাজে—টাইমের ভাত রাঁধবে কে?

অতুল এতক্ষণ অবাক হইয়া শুনিতেছিল। তাহার বড়মাসীকে সে ভাল করিয়াই চিনিত; এইজন্য কথাবার্তাও বড় একটা কহিত না। কিন্তু এখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া নিজেই প্রশ্নের জবাব দিয়া বসিল। কহিল, সত্যি কথা বললে তুমিই রাগ করবে মাসীমা; কিন্তু কপাল নেহাত না পুড়লে, আর কেউ তোমাদের ভাত খেতে আসে না, সে-কথা তোমরাও জান, পাড়ার আর পাঁচজনেও জানে। কিন্তু আজ যাবার দিনটায় হতভাগিনীদের একটুখানি মাপ করলে তোমাদের মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না, মাসীমা।

হঠাৎ অতুলের কথার ঝাঁজে দুই জায়েরই বিস্ময়ের অবধি রহিল না। মিনিট-খানেক কাহারও মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। তার পরে স্বর্ণ কহিলেন, কোলকাতা থেকে তুই কি আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে এসে হাজির হয়েচিস নাকি রে?

ছোটবৌ বলিল, ঝগড়া করতে আসবে কেন দিদি? ওর মেজমাসীকে আমরা হরিপালে গঙ্গাযাত্রা করাচ্ছি, ও তাই যে শেষ দেখাটা দেখতে এসেচে।

ওঃ, তাই বটে?

ছোটবৌ কহিল, তাই দিদি, তাই। তাই তখন থেকে ভাবচি, আমরা বাড়ির লোক কেউ জানলাম না, তোমার বোনপোটি কলকাতায় বসে জানলে কি করে? তা হলে লোকে যা বলে, তা মিথ্যে নয় দেখচি।

স্বর্ণ ক্রোধে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া চেঁচাইয়া বিদ্রূপ করিয়া একটা কাণ্ড করিয়া তুলিলেন। বলিতে লাগিলেন, বেশ ত বাছা, এতই যদি দরদ জন্মে থাকে, তোমার শাশুড়ী-মাসীকে গঙ্গাযাত্রা করাবে কেন, ঘরেই নিয়ে যাও না। গাঁ-সুদ্ধ লোক বাহবা বাহবা করবে এখন।

তাঁহার বিষের জ্বালায় অতুলেরও মাথা বেঠিক হইয়া গেল। সেও বলিয়া বসিল, বেশ ত মাসীমা, তোমরা আপনার লোক, কথাটি যদি দু'দিন আগেই জেনে থাক, ভালই ত। উনি আমার ঘরে গেলে, আমি মাথায় করে নিয়ে যেতে রাজী আছি। তোমাদের গাঁয়ের লোকগুলো তাতে বাহবা দেবে, কি ছি ছি করবে, আমি ভ্রূক্ষেপও করিনে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অতুল নিজেও যেমনি লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, তাহার গুরুজনেরাও তেমনি অসহ্য বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন! এ যেন অকস্মাৎ কোথা হইতে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু ছুটিয়া আসিয়া লজ্জা-শরম আড়াল-আবডাল সমস্তই চক্ষের পলকে ভাঙিয়া মুচড়াইয়া উড়াইয়া লইয়া মস্ত একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে সবাইকে দাঁড় করাইয়া দিয়া গেল। কাহারও কাছে কাহারও আর গোপন করিবার, রাখিবার-ঢাকিবার জায়গা রহিল না।

অতুল নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। যদু বাগদী গরুর গাড়ি আনিয়া কহিল, মা, সময় হয়েচে, জিনিসপত্তর কি দেবে দাও। এখন থেকে না বেরুলে ইস্টিশনে গাড়ি ধরতে পারা যাবে না। বলিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া নির্দেশমত সুমুখের টিনের তোরঙ্গের উপর বিছানাটা তুলিয়া নিয়া ঘাড়ে করিয়া বাহির হইয়া গেল। বড়বৌ ছোটবৌ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। দুর্গামণি 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া ঘরে তালা দিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়া উঠিলেন। মেয়েটা মূর্ছিতের মত মায়ের কোলের উপর চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

চার

এগার বৎসর পরে দুর্গামণি হরিপালে বাপের ভিটায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন শরতের সন্ধ্যা এমনই একটা অস্বাস্থ্যকর ঝাপসা ধুঁয়া লইয়া সমস্ত গ্রামখানার উপর

হুমড়ি খাইয়া বসিয়াছিল যে, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্রই দুর্গামণির বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বাড়িতে বাপ-মা নাই—বড়ভাই আছেন। শম্ভু চাটুয্যের সেদিন ছিল বৈকালিক পালাজ্বরের দিন। অতএব সূর্যাস্তের পরই তিনি প্রস্তুত হইয়া বিছানা গ্রহণ করিয়াছিলেন। খবর পাইয়া সুপ্রাচীন বালাপোশে মাথা এবং দুইকান ঢাকিয়া খড়ম পায়ে খটখট শব্দে বাহিরে আসিয়া চিনিতে পারিলেন।

কে, ও দুর্গা এলি নাকি? তা আয় আয়।

দুর্গা কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হইয়া দাদার পদমূলে প্রণাম করিলেন।

জ্ঞানদা প্রণাম করিলে, কহিলেন, এটি বুঝি মেয়ে? তা বিয়ে দিলি কোথায়?

দুর্গা কুণ্ঠিত-স্বরে কহিলেন, বিয়ে এখনও দিতে পারিনি দাদা—যেখানে হোক শিগগিরই—

অ্যাঁ—বিয়ে দিসনি? এ যে একটা সোমত্ত মাগী রে দুর্গা? বহুকাল অদর্শনের পর ভগিনীর প্রতি তাঁহার ঈষৎ করুণ কণ্ঠস্বর এক মুহূর্তেই জমিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গেল; বলিলেন, তাই ত, এখানকার আবার যে-সব বজ্জাত লোক—তা জানতে পেলে—তা আমি বলি কি, ওকে হেঁসেল-টেসেল ঠাকুরঘরদোরে ঢুকতে দিয়ে কাজ নেই—জানিস ত এদেশের সমাজ! বিশেষ হরিপাল—এমন পাজী জায়গা কি ভূ-ভারতে আছে? তা আয়, বাড়ির ভিতরে আয়। এতবড় মেয়ে—ওর কাকার কাছে রেখে এলে স্বচ্ছন্দে তুই দুদিন জুড়িয়ে যেতে পারতিস। এখানে থাকলে ত আর—বুঝলি নে দুর্গা—তা যা, এখন হাত-পা ধু গে—ওগো, কৈ গো,—বলিতে বলিতে শম্ভু চাটুয্যে পুনরায় খটখট করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। দুর্গা এবং তাঁহার কন্যা যেমন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া বাড়ি ঢুকিল সে শুধু ভগবানই দেখিলেন।

শম্ভুর এটি দ্বিতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষের বৌকে দুর্গা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকে দেখেন নাই। উপস্থিত ইনি যেমনই কাল, তেমনই রোগা এবং লম্বা। ম্যালেরিয়া জ্বরে রঙটা যেন পোড়াকাঠের মত। তিনদিনের গোবর উঠানের মাঝখানে জমা করা ছিল, তাহা এইমাত্র নিঃশেষ করিয়া ঘুঁটে দিয়া, হাত-পা ধুইয়া প্রদীপের জো করিতেছিলেন; স্বামীর আহ্বানে সম্মুখে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। শম্ভুর জ্বর আসিতেছিল, আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনার জন্য স্ত্রীর কাছে সংক্ষেপে ইহাদের পরিচয় দিয়া ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। বৌয়ের নাম ভামিনী। মেদিনীপুর জেলার মেয়ে। কথাগুলো একটু বাঁকা-বাঁকা। সে হাসিয়া উপরের এবং নীচের সমস্ত মাড়ীটা অনাবৃত করিয়া ননদের হাত ধরিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় লইয়া গিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসাইলেন। তাঁহার হাসি এবং কথার শ্রী দেখিয়া দুর্গার বুকের ভিতর পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিল। আসিবার সময় দুর্গা একহাঁড়ি রসগোল্লা আনাইয়াছিলেন, সেটা নামাইতে না নামাইতে এক পাল ছেলে-মেয়ে কোথা হইতে যেন পঙ্গপালের মত ছুটিয়া আসিয়া ছেঁকিয়া ধরিল। চেঁচামেচি ঠ্যালাঠেলি—সে যেন একটা হাট বসিয়া গেল। তাহাদের মা ইহাকে আধখানি, উহাকে সিকিখানি, আর দুজনকে দু'টুকরা বাঁটিয়া দিয়া হাঁড়িটা ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া শোবার ঘরের শিকায় টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। ছেলেগুলো যে যাহা পাইয়াছিল, অমৃতবৎ গিলিয়া ফেলিয়া, হাতের রস চাটিতে চাটিতে প্রস্থান করিল।

দুর্গা এখানকার রীতিনীতি কতক জানিতেন, কারণ তিনি এই গ্রামের মেয়ে। কিন্তু জ্ঞানদা আট-দশ বছরের ছেলেগুলোকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ দিগম্বর দেখিয়া লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল। মেয়েগুলারও প্রায় ঐ দশা। ইতরবিশেষ যাহা আছে, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাহাদের নিজেদের গ্রামটাও শহর নয় বটে, কিন্তু সেখানে রাস্তাঘাট আছে; এমন আম, কাঁঠাল ও বাঁশঝাড়ে মাথার উপর অন্ধকার করিয়া নাই। এরূপ গোবর ও পাট-পচা গন্ধ চতুর্দিক হইতে আসিয়া শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে ভারাক্রান্ত, ব্যাকুল করিয়া দেয় না। তখনও অন্ধকার হয় নাই, একটা শৃগাল উঠানের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেই বড়ছেলেটা তাড়া করিয়া গেল। চারিদিকে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ পোকা বিকট শব্দ শুরু করিয়া দিল। দেয়ালের গায়ে একটা শুকনা ডালে হঠাৎ অশ্রুতপূর্ব একপ্রকার বিশ্রী শব্দ শুনিয়া জ্ঞানদা সভয়ে চুপি চুপি কহিল, ও কি ডাকে মা? মামী শুনিতে পাইয়া কহিলেন, ও যে তোক্কোপ।

জ্ঞানদা শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোক্কোপ কি? তক্ষক সাপ?

মামী বলিলেন, হাঁ মা, তাই। ঐ যে কোন্ রাজাকে কামড়েছিল বলে।—গাছে গাছে একেবারে ভরা!

জবাব শুনিয়া জ্ঞানদা মায়ের মুখের প্রতি একবার চাহিল। ইতিপূর্বে কান্নায় তাহার সমস্ত বক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এইবার সে জননীর কোলের উপর লুটাইয়া পড়িয়া একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল, এখান থেকে চল মা—এখানে আমি একদণ্ডও বাঁচব না।

মামী আশ্চর্য হইলেন। বলিলেন, ভয় কি গো, ওরা যে দেবতা। কখ্খনো কারুর অপকার করে না। আর সাপখোপের কামড়ে কটা লোক মরে বাছা? বরঞ্চ, ভয় যা তা ঐ ম্যালোয়ারীর। একবার ধরলে, আর তাতে বস্তু রেখে ছাড়ে না। এ-বছর দিন-কুড়ি হ'ল তোমার মামাকে ধরেচে—এরই মধ্যে যেন শতজীর্ণ করে ফেলেচে, আর দিনকতক পরে কে কার মুখে জল দেবে মা, এ-গাঁয়ে তার ঠিক থাকবে না।

জ্ঞানদা মনে মনে অতুলের শেষ কথাগুলো মিলাইয়া লইয়া নীরবে পড়িয়া রহিল। সে-রাত্রে সে একবারও ঘুমাইতে পারিল না। মায়ের বুকের কাছে মুখ রাখিয়া বারংবার চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। এমনি করিয়া প্রভাত হইল; নূতন স্থানে নূতন আলো চোখে পড়ায় বিন্দুমাত্রও তাহার আনন্দোদয় হইল না—বরঞ্চ সমস্ত আবহাওয়া, আলো, বাতাস যেন কালকের চেয়েও বেশী করিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরিল।

এতবড় আইবুড়ো মেয়ে দেখিয়া পাড়ার লোক ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেল। আমাদের বাঙ্গালাদেশে মেয়ের বয়স ঠিক করিয়া বলার রীতি নাই। সবাই জানে, বাপ-মাকে দু-এক বছর হাতে রাখিয়া বলিতে হয়। সুতরাং দুর্গা যখন বলিলেন, তের, তখন সবাই বুঝিল পনর। তা ছাড়া একমাত্র সন্তান বলিয়া, নিজেরা না খাইয়া মেয়েকে খাওয়াইয়াছিলেন, পরাইয়াছিলেন—সেই নিটোল স্বাস্থ্যই এখন আরও কাল হইল—জ্ঞানদার যথার্থ বয়সের বিরুদ্ধে ইহাই বেশী করিয়া সাক্ষ্য দিতে লাগিল।

দুই দিন না যাইতেই শম্ভু কথাপ্রসঙ্গে ভগিনীকে কহিলেন, মেয়েটার জন্য ত পাড়ায় মুখ দেখানো ভার হয়েছে। একটি ভারী সুপাত্র হাতে আছে, দিবি?

দুর্গা বলিলেন, জামাই আমার স্থির হয়ে আছে—আর কোথাও হতে পারে না। শম্ভু বলিলেন, তা হলে ত কথাই নেই। কিন্তু এমন সুপাত্র বড় ভাগ্যে মেলে, তা বলে দিচ্চি। কুড়ি-পঁচিশ বিঘে ব্রহ্মত্র, পুকুর, বাগান, ধানের গোলা—লেখাপড়াতেও—

দুর্গা কথাটা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলেন, না দাদা, আর কোথাও হবার জো নেই—এই বছরটা বাদে সেখানেই আমাকে মেয়ে দিতে হবে।

শম্ভু বলিলেন, কিন্তু, আমার বিবেচনায়—এই সামনের অঘ্রানেই মেয়ে উচ্ছুগ্যু করা কর্তব্য হয়েছে। দুর্গা আর নিরর্থক প্রতিবাদ না করিয়া—কাজ আছে, বলিয়া উঠিয়া গেলেন। ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল, এই সুপাত্রটি শম্ভুরই এ-পক্ষের বড় শ্যালক। স্ত্রীর মৃত্যু ঘটায়, প্রায় ছয় মাস যাবৎ বেকার অবস্থায় আছেন—আর বেশীদিন থাকা কেহই সঙ্গত মনে করে না। বিশেষতঃ ঘরে অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা থাকায় একটি ডাগর মেয়ে নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

সেইজন্যই বোধ করি, দুর্গার বারংবার অস্বীকার করা সত্ত্বেও এই সুপাত্রটি একদিন সহসা আবির্ভূত হইয়া সম্মুখেই জ্ঞানদাকে দেখিতে পাইলেন, এবং বলা বাহুল্য যে, পছন্দ করিয়াই ফিরিয়া গেলেন। অনতিকাল মধ্যেই ভগিনীর প্রতি শম্ভুনাথের স্নেহের অনুরোধ কঠোর নির্যাতনের আকার ধরিয়া দাঁড়াইল। একদিন তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, প্রিয়নাথের অবর্তমানে তিনিই এখন ভাগিনেয়ীর যথার্থ অভিভাবক। সুতরাং আবশ্যক হইলে এই সামনের অঘ্রানেই তিনি জোর করিয়া বিবাহ দিবেন।

দাদার সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া দুর্গা ঘরে ঢুকিয়া মেয়ের পানে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সে সমস্ত শুনিয়াছে। তাহার দুই চক্ষু ফুলিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, আমি বেঁচে থাকতে ভয় কি মা! মুখে অভয় দিলেন বটে, কিন্তু ভয়ে তাঁহার নিজের বুকের অন্তস্থল পর্যন্ত শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। এ-সময়

দেশে এরূপ জোর করিয়া বিবাহ দেওয়া যে একটা সচরাচর ঘটনা, তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া মেয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। মা তাহার কপালে বুকে হাত দিয়া দেখিলেন, জ্বরে গা ফাটিয়া যাইতেছে। চোখ মুছাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কখন জ্বর হল মা?

কাল রাত্তির থেকে।

আমাকে জানাস নি কেন? আজকাল যে ভয়ানক ম্যালেরিয়ার সময়। মেয়ে চুপ করিয়া রহিল, জবাব দিল না।

দাদার বৌয়ের সহিত দুর্গা এ পর্যন্ত কোনপ্রকার ঘনিষ্ঠতার চেষ্টা করেন নাই। শুধু যে তাহার বিকট চেহারা ও ততোধিক বিকট হাসি দেখিলেই তাঁহার গা জ্বলিয়া যাইত তাহা নহে, তাহার অতি কর্কশ কণ্ঠস্বরও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা স্বভাবতঃই একটু উচ্চকণ্ঠে কথা কহে; কিন্তু বৌয়ের কথাবার্তা একটু দূরে হইতে শুনিলে ঝগড়া বলিয়া মনে হইত। তাহার উপর সে যেমন মুখরা, তেমনি যুদ্ধবিশারদ। কিন্তু তাহার একটা গুণ দুর্গা টের পাইয়াছিলেন—সে গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে চাহিত না। তার গন্তব্য পথ ছাড়িয়া দিলে, সে কাহাকেও কিছু বলিত না—ছেলে-পিলে ঘর-সংসার লইয়াই থাকিত, পরের কথায় কান দিত না।

প্রথমে আসিয়াই দুর্গা একদিন তাহার রান্নাবান্নার সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে সে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিল—তুমি দু'দিনের জন্যে এসেচ ঠাকুরঝি, তোমাকে কাজ করতে হবে না। আমি রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর কাউকে দিতে পারব না। সেই অবধি দুর্গা এবিষয়ে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন!

আজ বেলা দেখিয়া বৌ দোর-গোড়ায় স্বাভাবিক চীৎকারশব্দে প্রশ্ন করিল, আজ খাওয়া-দাওয়া কি হবে না ঠাকুরঝি? হে'সেল নিয়ে বসে থাকব?

দুর্গা মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেয়েটার ভারী জ্বর হয়েচে বৌ; তোমরা খাও গে, আমরা আজ আর কেউ খাব না। বৌ কহিল, মেয়ের জ্বর, তা তোমার কি হ'ল গো? জ্বর আবার কার না হয়? নাও, উঠে এসো। দুর্গা কাতরকণ্ঠে কহিলেন, না বৌ, আমাকে খেতে বল না—মেয়ে ফেলে আমি মুখে ভাত তুলতে পারব না।

তোমাদের সব আদিখ্যেতা, বলিয়া বৌ চলিয়া গেল। রান্নাঘর হইতে পুনরায় কহিল, জ্বর হয়েচে কবরেজ ডেকে পাঁচন সিদ্ধ করে দাও। ম্যালোয়ারী জ্বরে আবার খায় না কে? আমাদের দেশে ওসব উপোস-তিরেসের পাঠ নেই বাপু! বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

অপরাহ্নবেলায় সে নিজেই একবাটি পাঁচন সিদ্ধ করিয়া আনিয়া কহিল, ওলো ও গেনি, উঠে পাঁচন খা! ভাতে জল দিয়ে রেখেছি, চল, খাবি আয়।

মামীকে সে অত্যন্ত ভয় করিত। বিনাবাক্যে উঠিয়া খানিকটা তিক্ত পাঁচন গিলিয়া বমি করিয়া ফেলিয়া পুনরায় শুইয়া পড়িল। দুর্গা ঘরে ছিল না, বমির শব্দে ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। মামী রাগ করিয়া উঠানে গিয়া সমস্ত পাড়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল, এ-সব বাবুমেয়ে নিয়ে আমাদের গরীব, দুঃখীর ঘরে আসা কেন বাপু?

সেই হইতেই জ্ঞানদার অসুখ উত্তরোত্তর বাড়িতেই লাগিল। তাহার ভামিনী-মামী সেই যে প্রথম দিনেই বলিয়াছিল, বাছা! পল্লীগ্রামে সাপের কামড়ে আর ক'টা লোক মরে, মরে যা তা ঐ ম্যালোয়ারীতে। একবার ধরলে আর রক্ষা নেই। তাহার কথাটার সত্যতা সপ্রমাণ হইতে বেশী বিলম্ব ঘটিল না, অনতিকালমধ্যেই জ্ঞানদাকে একবারে শয্যাগত করিয়া ফেলিল। সেদিন কার্তিকের সংক্রান্তি; দুর্গা ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া দেখিলেন, বৌ জ্ঞানদার শিয়রে বসিয়া তাহার মাথার হাত বুলাইয়া দিতেছে। একে ত সংসারের কাজ ছাড়িয়া এইসব বাজে কাজ করিবার তাহার অবসরই নাই, তাহাতে পরের মেয়ের প্রতি এই অযাচিত সেবাটা এমনি একটা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বিসদৃশ কাণ্ড বলিয়া দুর্গার মনে হইল যে, তিনি দাদার প্রস্তাবিত সেই বিবাহ-ব্যাপারটা স্মরণ করিয়া আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। ভামিনীর এই যত্নটা যে সেই জন্যই, তাহাতে আর সংশয়মাত্র রহিল না। কারণ,

সে যে নিজের দাদার সহিত জ্ঞানদার বিবাহ ঘটাইবার জন্য স্বামীকে নিয়োজিত করিয়াছে এবং ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত করিতেছে, প্রথম হইতেই এই কথাটা দুর্গা স্বতঃসিদ্ধের মত মানিয়া লইয়াছিলেন। বৌ গলাটা আজ একটু খাটো করিয়াই কহিল, [illegible] পাশ-করা ডাক্তার আছে—তোমার দাদাকে আনতে পাঠিয়ে দিয়েচি, ঠাকুরঝি। জ্বর যেন রোজ রোজ বেশীই হচ্চে—এ তো ভালো না। দুর্গা অব্যক্তস্বরে যাহা বলিলেন, তাহা শোনা গেল না, কারণ এই সুসংবাদ শুনিয়াও তিনি অন্তরের ভিতর হইতে প্রসন্ন হইতে পারিলেন না।

বৌ সংসারের কাজে চলিয়া গেল। জ্ঞানদা বালিশের তলা হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া কহিল, জবাব দিয়েচেন।

কৈ দেখি, দেখি, বলিয়া মা সেখানি যেন কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই অসহ্য আগ্রহ দমন করিয়া চিঠিখানা দুই মুঠার মধ্যে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। একবার মনে করিলেন, খুলিয়া পড়ি। আবার ভাবিলেন, না, উচিত নয়। মেয়ে যেন ইচ্ছেই দিয়েছে, কিন্তু মা হইয়া তিনি পড়িবেন কি করিয়া! মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি লিখেচে অতুল?

জ্ঞানদা ইতিমধ্যে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিল। সংক্ষেপে কহিল, আসা উচিত ছিল না—এই-সব। পত্রের এই দুটি কথা শুনিয়াই মায়ের দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিলেন, আসা উচিত ছিল না—এই-সব। অতুলের মুখখানি স্মরণ করিয়া, তাহাকে অসংখ্য আশীর্বাদ করিয়া দুর্গা মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া মনে মনে বলিলেন, না জানি, বাছার কতই না অভিমান, কতই না মর্মান্তিক ব্যথা, এই দুটি কথার মধ্যে লুকান আছে। এখানে আসিয়া জ্ঞানদা জ্বরে পড়িয়াছে—তাহাতেই ত বাছা সেদিন রাগ করিয়া বলিয়াছিল—ইহাদের গঙ্গাযাত্রা দেখিতে কলিকাতা হইতে আসিয়াছি। সত্যই ত!—আমি নিজে যাই করি এবং যেখানেই যাই, সে আলাদা কথা। কিন্তু মেয়ে লইয়া আমার যে কোনমতেই আসা উচিত ছিল না। যতই কষ্ট হোক, সব সহ্য করিয়াই ত সেখানে আমাদের পড়িয়া থাকা উচিত ছিল। কাগজখানি অপূর্ব মমতার সহিত মুঠার মধ্যে নাড়া-চাড়া করিতে করিতে কত কথাই আজ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। স্বামীর মৃত্যুশয্যার অতুলের প্রতিজ্ঞা—সেই চুড়ি দু'গাছি দিবার ছলে মহাপ্রসাদ লইয়া আসা, বিশেষ করিয়া আসিবার দিনটায় মাসীর সহিত তাহার কলহ। এ-কথা তাহার মা শুনিয়াছেন, পাড়ার লোকে শুনিয়াছে—এতদিনে সবাই জানিয়াছে কেন সে কলিকাতা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। আনন্দে গর্বে তাঁহার মাতৃবক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিলেন, কালো মেয়ে! আমার কালো মেয়ের গৌরব দেখুক সবাই! ওরে, কোকিলও কালো, ভোমরাও কালো যে! ডাকিলেন,—জ্ঞানদা, এখন কেমন আছিস মা?

ভাল আছি মা।

হাঁ রে, আমার কথা অতুল কিছু লিখেচে?

পড়ে দেখ না।

কৌতূহল আর তিনি সামলাইতে পারিলেন না। জানালার কাছে কাগজখানি মেলিয়া ধরিলেন। অতবড় কাগজের মধ্যে মাত্র দুইছত্র লেখা দেখিয়া প্রথমটা তাহার মনে হইল, মেয়ে কি দিতে, হয়ত কি দিয়াছে। পরক্ষণেই 'শ্রীচরণেষু' পাঠ দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, তাইতেই পড়তে দিয়েছে—এ যে আমারই চিঠি। লেখা আছে—"সেই সময়েই বলিয়াছিলাম, ও জায়গা ম্যালেরিয়ার ডিপো। জ্ঞানদার জ্বর শুনিয়া দুঃখিত হইলাম—আশা করি, শীঘ্র আরোগ্য হইয়া যাইবে। আমরা ভাল আছি। আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন।" ইতি—

দুর্গার কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে একটু বাধিল, কিন্তু মায়ের প্রাণ—না জিজ্ঞাসা করিয়াও থাকিতে পারিলেন না; কাছে বসিয়া মেয়ের রুক্ষ চুলগুলি আঙুল দিয়া নাড়িতে নাড়িতে আস্তে আস্তে বলিলেন, হাঁ মা, তোমার চিঠিটার মধ্যে বুঝি অতুল রাগ করেচে? জ্ঞানদা বিস্মিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিল, আমার চিঠি আবার কোথায় মা? তোমাকেই তো লিখেছেন। দুর্গা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আমি দেখতে চাই না, শুনলেই সুখী। রাগ করেচে, সে ত আমি বুঝতেই পারচি—

না মা, আমাকে তিনি আলাদা চিঠিপত্র কিছুই লেখেন নি। যা লিখেছেন, তা ওই। বলিয়া মেয়ে পুনরায় পাশ ফিরিয়া শুইল।

সবে দু'ছত্র? আর কোন কথা নেই? বলিয়া দুর্গা স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার যে আঙুলগুলা এতক্ষণ মেয়ের চুলের মধ্যে নানাপ্রকার বিচিত্র গতিতে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল, সেগুলাও যেন হাড়ের মত শক্ত হইয়া উঠিল; এইভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

আবার দিন কাটিতে লাগিল।

পাঁচ

প্রথম অগ্রহায়ণের শীতের বাতাস বহিতেছিল। দুর্গার এক ছেলেবেলার সাথী বাপের বাড়ি আসিয়াছিল। আজ দুপুরবেলা মেয়েকে একটু ভাল দেখিয়া দুর্গা তাহার সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথে ডাক-পিয়নের সাক্ষাৎ পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, হাঁ দাশু, আমার নামের চিঠিপত্র পাচ্ছিনে কেন?

দাশু হাসিয়া কহিল, চিঠি না এলে কি করে পাবে, দিদিঠাকরুন?

দুর্গা সন্দিগ্ধস্বরে বলিলেন, আমার কিংবা আমার মেয়ে জ্ঞানদা দেবী—কারু নামেই কি চিঠি আসে না?

দাশু কহিল, এলে ত আমিই দিয়ে যেতাম দিদিঠাকরুন?

দুর্গা বলিলেন, না দাশু, তোমার ব্যাগটা একটু ভাল করে দেখো—আসতেও পারে। তিন-তিনখানা চিঠির জবাব দেবে না,—আমার অতুল ত তেমন ছেলে নয়।

দাশু বৃথা পরিশ্রম না করিয়া কহিল, না দিদি, নেই—এলেই পাবে। বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, দুর্গা বাধা দিয়া বলিলেন, হাঁ দাশু, এমনও ত হতে পারে—তোমার পোস্টাফিসেই পড়ে আছে—পোস্টমাস্টার আমাদের নাম জানে না। হয়ত বা টেবিলের তলায় ঘোঁজে-ঘাঁজে কোথাও পড়ে গেছে, তোমরা কেউ দেখতে পাওনি। আমাকে ত এখানে সবাই জানে, আমি নিজে গিয়ে কি একবার খুঁজতে পারিনে?

ব্যাকুলতা দেখিয়া দাশু সদয়চিত্তে কহিল, কেন পারবে না দিদিঠাকরুন—কিন্তু সে মিছে খোঁজা হবে। আচ্ছা, আমিই গিয়ে আজ একবার খুঁজে দেখব। যদি পাই দিয়ে যাবো। বলিয়া সে আর সময় নষ্ট না করিয়া চলিয়া গেল।

দুর্গা ঠাকুর-দেবতার চরণে বিশ্বের ঐশ্বর্য মানত করিতে করিতে চলিলেন—হে মা দুর্গা, হে মা কালী, একখানি চিঠিও যেন খুঁজে পাওয়া যায়। জ্ঞানদার এত বড় অসুখ শুনিয়াও সে উত্তর লিখিবে না—এ কি কোনমতেই বিশ্বাস করা যায়! সে নিশ্চয় লিখিয়াছে; কিন্তু কোথাও গোলমাল হইয়া গেছে।

হায় রে মানুষের আশা! শত কোটি সম্ভব-অসম্ভব জল্পনা-কল্পনার মধ্যে এ কথাটা একবারও দুর্গার মনে উদয় হইল না যে, ইতিমধ্যে অতুলের মনের গতি বদলাইয়া যাইতেও পারে। একবারও ভাবিলেন না—অতুলের যে কামনা একদিন একান্ত সঙ্গোপনে সম্পূর্ণ আবরণের অন্তরে, শুধু নির্বিবাদেই বাড়িয়া উঠিতে পাইয়াছিল, তাহাকে এমন অসময়ে এতবড় অনাবৃত প্রকাশ্যতার মাঝখানে টানিয়া আনিলে, সে চক্ষের পলকে শুকাইয়া যাইতে পারে! এখন শত বিরুদ্ধ-শক্তি সজাগ হইয়া তাহাকে মুহূর্তের মধ্যে চাপিয়া মারিতে পারে! মানুষ এমনিই অন্ধ!

দুর্গা একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া মেয়ের ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, হাঁ রে জ্ঞানদা, দাশু কোন চিঠিপত্র দিয়ে গেছে কি?

মেয়ে কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, না মা।

আজ দুই মাস হইতে উপর্যুপরি তিনখানি পত্রের জবাব আসিতেছে না। দুর্গা সংশয়-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিলেন, তুই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলি। তোর সাড়া না পেয়ে দাশু হয়ত ফিরে গেছে। আমি বাড়িতে নেই—একদিন একটুখানি কি জেগে থাকতে পারিস নে বাছা? বলিয়া

দুর্গা মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেলেন। জ্ঞানদা চুপ করিয়া রহিল। সে ঘুমায় নাই, জাগিয়াছিল বলিয়া তর্ক করিল না। মায়ের কাছে প্রত্যহ একই প্রশ্নের একই উত্তর দিতে দিতে সে নিজের লজ্জায় নিজেই মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছিল।

দুর্গা তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দ্বারের বাহির হইতে কহিলেন, কেন দাশু যে আমাকে বললে, সে খুঁজে এনে দিয়ে যাবে? আজ কেমন করিয়া যেন তাঁহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, অতুলের চিঠিপত্র আসিয়াছেই।

মেয়ে কথা কহিল না—একটা মলিন কাঁথার মধ্যে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু দুর্গা এইখানেই থামিতে পারিলেন না। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোস্টাফিসে পাঠাইয়া খবর লইয়া জানিলেন, দাশু আসে নাই।

পরের তিন-চারি দিন তিনি পত্রের প্রত্যাশায় অহোরাত্র যেন কণ্টকশয্যায় বসিয়া কাটাইলেন—তথাপি কিছু আসিল না। অবশেষে হতাশ হইয়া অতুলের জননীকে চিঠি লিখিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে সংক্ষেপে জানাইলেন, অতুল ভাল আছে এবং কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পূর্ববৎ লেখাপড়া করিতেছে। তাঁহার চিঠির মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের সুরই যেন দুর্গার কানে বাজিল। এমনি করিয়া অঘ্রান গেল, পৌষ গেল, কিন্তু অতুলের চিঠি আসিল না। মাঘের মাঝামাঝি মেয়ে যদিবা একটু সারিয়া উঠিল, মা অসুখে পড়িলেন। এতবড় নিরাশার আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। তা ছাড়া, বৌয়ের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষের আর যেন অন্ত ছিল না। তাহার উল্লেখ করিতে হইলেই, ঘৃণাভরে কখনো বা 'পোড়া কাঠ' কখনো বা 'তাড়কা' বলিতেন এবং যত দিন যাইতে লাগিল, ঘৃণা যেন অপরিসীম হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার আরও একটা কারণ এই ছিল,—'পোড়া কাঠ' নিজের ধরনে জ্ঞানদাকে তাহার স্বাভাবিক মাধুর্যের জন্যই বোধ করি ভালবাসিয়াছিল, যত্নও করিত। কিন্তু এই যত্নের মধ্যে একটা উৎকট স্বার্থের গন্ধ পাইয়া দুর্গা বিষের জ্বালায় জ্বলিতে লাগিলেন। বড় দুঃখের দেহ, তাই অনেক সহিয়াছিল; কিন্তু আর সহিল না। মাঘের শেষে তিনি শয্যা আশ্রয় করিলেন। মেয়ে কাঁদিয়া বলিল, আর না মা, এইবার বাড়ি চল। যা হবার সেইখানেই হোক।

দুর্গা রাজী হইলেন। তাঁহার সম্মতির এখন আর কোন বিশেষ কোন কারণ ছিল না; শুধু এই 'পোড়া কাঠে'র যত্ন ও আত্মীয়তা হইতে বাহির হইবার জন্যই মন যেন তাঁহার অহরহ পালাই পালাই করিতে লাগিল।

যাত্রার উদ্যোগ হইতেছে শুনিয়া শম্ভু বাঁকিয়া বসিলেন। তখন সকাল সাতটা-আটটা, শম্ভু সন্ধ্যা-আহ্নিক সারিয়া খটখট শব্দে বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন, দুর্গা!

দুর্গা দাওয়ার একপ্রান্তে খুঁটি ঠেস দিয়া মুখ ধুইতেছিলেন। জ্ঞানদা কাছে বসিয়া সাহায্য করিতেছিল। দাদার আহ্বানে দুর্গা সাড়া দিলেন।

শম্ভু কহিলেন, এখন ত তোমার যাওয়া হতে পারে না।

কেন দাদা?

কেন দাদা! আমি কি তোমার জন্যে কথা দিয়ে মিথ্যাবাদী হব নাকি? সে জন্ম আমার নয়। কথাটা না জানিয়াও দুর্গার বুকের ভিতরে তোলপাড় করিতে লাগিল। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের কথা, দাদা?

শম্ভু কহিলেন, গেনির বিয়ের। আর ত আমি রাখতে পারিনে,—কাজেই আমাদের নবীনের সঙ্গেই সামনের পাঁচুই ফাগুনে কথাবার্তা পাকা করে ফেলতে হ'ল। এদিকে গয়না-গাটিও মন্দ দেবে না বলচে। দেখতে শুনতে সবদিকেই ভাল হবে, দেখলাম কিনা।

খবর শুনিয়া দুর্গার মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিলেন, আমাকে না বলে কেন কথা দিলে, দাদা? এ বিয়ে ত আমি প্রাণ থাকতে দিতে পারব না।

শম্ভু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, পারব না বললেই হবে? আমি মামা—আমি যা বলব, তাই হবে। তোর জন্যে কথার নড়চড় করব, তেমন বাপে আমাকে জন্ম দেয়নি—তা জানিস?

এইবার দুর্গা সত্যি সত্যিই কাঁদিয়া ফেলিলেন; কহিলেন, না দাদা, মেয়ের বিয়ে এখানে আমি মরে গেলেও দেব না—আমার জন্যে তুমি এতটুকু ভেব না দাদা—কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া কথাটা তিনি শেষ করিতেই পারিলেন না।

শম্ভু এই কান্না দেখিয়া মহাবিরক্ত হইয়া দাঁত খিঁচাইয়া কহিলেন, শুভকর্মে মিছে কাঁদিস নে ভ্যানভ্যান করে। যা হবার নয়, যা পারব না—

রঙ্গস্থলে 'পোড়া কাঠ' দেখা দিলেন। দুই হাত গোবর-মাখা—বোধ করি, তখনো গোয়ালঘরের ব্যবস্থাই করিতেছিলেন। উঠানের উপর আসিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া অকস্মাৎ ভাঙ্গা-কাঁসির মত খ্যানখ্যান করিয়া বাজিয়া উঠিলেন—বলি সুপাত্তরটি কে গা ঠাকুর? একবার শুনতে পাইনে?

শম্ভু স্ত্রীর ভাবগতিক দেখিয়া বিচলিত হইলেন। কিন্তু মুখের সাহস বজায় রাখিয়া কহিলেন, যেই হোক, তোর তাতে কি?

'পোড়া কাঠ' গোবর-মাখা হাত দু'খানা নাড়া দিয়া অর্ধেক উঠানটা যেন নাচিয়া আসিল। তেমনি সুমধুর-কণ্ঠে সমস্ত পাড়াটা সচকিত করিয়া কহিল, মামা! মামাগিরি ফলাতে এসেছেন! নবীনের সঙ্গে বিয়ে দেব! তা হলে একশ' টাকা সুদে-আসলে শোধ যায়, না? তাই সে সুপাত্তর? বটে? আমার নিজের দাদা, আমি জানিনে? তাড়ি-গাঁজা খেয়ে পাঁচ ছেলের মা বৌটাকে আট মাস পেটের ওপর লাথি মেরে, মেরে ফেললে কিনা,—তাই অমন সুপাত্তর আর নেই? গলায় দেবার দড়ি জোটে না তোমার? ধিক! ধিক!

শম্ভু ভগিনী ভাগিনেয়ীর সমক্ষে ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। পায়ের খড়ম হাতে লইয়া চীৎকার করিলেন, চুপ কর্ বলচি, হারামজাদী!

'পোড়া কাঠ' এইবার ক্ষেপিয়া উঠিল। সে এমনি একটা ভয়ঙ্কর ভঙ্গী করিয়া চেঁচাইতে লাগিল যে, সে বস্তু চোখে না দেখিলে শুধু লেখা পড়িয়া বোঝা যায় না, কহিল, অ্যাঁ আমাকে হারামজাদী? ফের মুখে আনলে পোড়া কাঠ যদি না মুখে গুঁজে দি ত, পাঁচু ঘোষালের মেয়ে নই আমি। জোর করে বিয়ে দেবে? কেন, কে তুমি? ও এসেছে মেয়ে নিয়ে দু'দিন জুড়োতে, কেন তুমি ওকে রাত্তদিন ভয় দেখাবে? আঁশ-বটিটা আমার দেখে রেখো। শালা-ভগ্নীপোতের একসঙ্গে নাক-কান কেটে তবে ছাড়ব। আমার নাম ভামিনী, তা মনে রেখো।

সে মূর্তির সামনে শম্ভু আর কথা কহিলেন না—ঘরে চলিয়া গেলেন।

'পোড়া কাঠ' তখন দুর্গার পানে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, ও কি সোজা চামার, ঠাকুরঝি! তোমার আসা পর্যন্ত মতলব আঁটচে,—কি করে অমন সোনার প্রতিমা বাঁদরের হাতে দিয়ে ধার শোধ করে জমি খালাস করে নেবে। আবার বলে—মামা আমি!

একটুখানি দম লইয়া কহিতে লাগিল, বললে তুমি মনে কষ্ট করবে, আমি বলতাম না, ঠাকুরঝি। বললাম, মেয়েটা জ্বরে মরে যায়, একটা ভাল ডাক্তার আনো। বললে, অত পয়সা নেই আমার। সম্বলের মধ্যে সম্বল, একগাছি রূপার গোট ছিল আমার, তাই বাঁধা দিয়ে আমি ডাক্তার ডেকে আনলাম—আর ও বলে কিনা যা খুশি করব—আমি মামা! মুখপোড়া। আমি বেঁচে থাকতে ভয় কি ঠাকুরঝি! আমি আজই বন্দোবস্ত করে দিচ্চি, তুমি বাড়ি গিয়ে মেয়ের বিয়ে দাও গে—দিয়ে যখন খুশি আবার এসো।

দুর্গা খুঁটি ঠেস দিয়া তেমনি বসিয়া রহিলেন—তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া কেবল ঝরঝর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

'পোড়া কাঠ' কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ খাটো করিয়া অদৃশ্য স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, অনাথ বলে ওর ওপর জুলুম করবে কেন, মাথার ওপর ভগবান নেই কি? আমি বলি, যা তোমার আছে, তাই নিয়ে নাড়ো-চাড়ো খাও-দাও। পরের নিয়ে নিজের পেট মোটা করব কি জন্যে? ভগবান কখনো তার ভাল করেন না।

সেই দিনেই দুপুরবেলা যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল।

গরুর গাড়িতে উঠিতে গিয়া দুর্গা 'পোড়া কাঠে'র দু'পায়ের উপর মাথা পাতিয়া আজ সত্য সত্যই তাহা অশ্রুজলে ভিজাইয়া ফেলিলেন। কহিলেন, বৌ, বড় ভাজ তুমি, তোমাকে ত আশীর্বাদ করতে পারিনে—কিন্তু ভগবান তোমাকে যেন দেখেন। আমার জন্যে তুমি তোমার গোটছড়াটি পর্যন্ত নষ্ট করে ফেললে।

'পোড়া কাঠ' আদ্যন্ত মাড়ী বাহির করিয়া হাসিয়া কহিল, ছাই গোটছড়া! এই বল ঠাকুরঝি, হাতে নোয়া নিয়ে স্বামী-পুত্তরের, গো-ব্রাহ্মণের সেবা করে যেন যেতে পারি।

নাও, রোগা শরীরে আর দাঁড়িয়ে থেকো না—গাড়িতে উঠে বসো। গেনি, মামা-মামীর ঘরে অনেক কষ্ট পেয়ে গেলি মা; কিন্তু আবার আসিস—ভুলিস নে যেন। বলিয়া তাহার হাতের মধ্যে জোর করিয়া দুটি টাকা গুঁজিয়া দিল।

গাড়ি ছাড়িয়া দিলে দুর্গা চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, না বুঝে অনেক অপরাধ তোমার চরণে করে গেলাম বৌ, সে-সব আমার মাপ করো।

'পোড়া কাঠ' আজ আর সমস্ত মাড়ী বিকশিত করিয়া হাসিল না, বরং চট করিয়া একফোঁটা চোখের জল মুছিয়া লইয়া কহিল, পোড়া কপাল! অপরাধ ত সব আমাদেরই হ'ল ঠাকুরঝি! ওলো, ও গেনি, মামা-মামীর ওপর রাগ-টাগ করিস নে যেন। আসচে বছর আম-কাঁঠালের দিনে তোর নেমন্তন্ন রইল—জামাইকে সঙ্গে করে একবার আসিস মা। বলিয়া হাতের পিঠ দিয়া আর দু'ফোঁটা চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

ছয়

সংবাদ দিবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়াই দুর্গা চিঠি না লিখিয়াই আসিয়াছিলেন। জ্ঞানদার চেহারা দেখিয়া জ্যাঠাইমা হাসিয়াই খুন—ওলো ও গেনি, গালদুটো তোর চড়িয়ে ভেঙ্গে দিলে কে লো? ও মা, কি ঘেন্না! মাথায় টাক পড়ল কি করে লো? ও ছোটবৌ, শিগগির আয়, শিগগির আয়—আমাদের জ্ঞানদাসুন্দরীকে একবার দেখে যা। গায়ের চামড়াটাও কি তোর মামা-মামীরা ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়েচে নাকি লো? জ্ঞানদা নিরুত্তরে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রইল। ছোটখুড়ী আসিতেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলো লইল।

ছোটবৌ শিহরিয়া উঠিল—ইস, এ কি হয়ে গেছিস মা?

জ্যাঠাইমা নিতান্ত অত্যুক্তি করিলেন না; কহিলেন, বাঁশবনের পেত্নী। অন্ধকারে দেখলে আঁৎকে উঠতে হয়। বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিলেন। আজ কিন্তু ছোটবৌ তাহাতে যোগ দিল না। সে আর যাই হউক, সন্তানের জননী ত? মেয়েটির এই কঙ্কালসার পাণ্ডুর মুখের পানে চাহিয়া তাহার মায়ের প্রাণ যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল।

কাছে বসিয়া, তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিয়া, একটি একটি করিয়া রোগের কথা শুনিয়া, নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কেন তবে তখ্খুনি চলে এলিনে মা! আমি ত তোদের আসতে মানা করিনি। মেজদি কোথায়?

মার গাড়িতে জ্বর এসেছিল,—ঘরে শুইয়ে দিয়েছি।

স্বর্ণ কহিলেন, হবে না? আমি হাজার হই বড়জা ত! অত তেজ করে চলে গেলে কি সয়?

ছোটবৌ জ্ঞানদার হাত ধরিয়া তাহার মাকে দেখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বড়-জায়ের এই নিতান্ত গায়ে পড়া কটুকথাগুলো আজ তাহার এতই বিশ্রী লাগিল যে, সে সহিতে পারিল না; কহিল, দিদি, বছর-দুই মধু-সংক্রান্তির ব্রত ক'রো—আর-জন্মে মুখখানা যদি একটু ভাল হয়। স্বর্ণ এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্যে ক্রোধে বিস্ময়ে হঠাৎ অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তীব্রস্বরে গর্জিয়া উঠিলেন, তবু ভাল লো ছোটবৌ, তবু ভাল। এতকাল পরেও যা হোক মেজজাকে দেখে শোকটা উথলে উঠেচে। মাইরি, কত ঢঙই তুই জানিস।

ছোটবৌ জবাব দিল না। জ্ঞানদার হাত ধরিয়া ও-বাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু সে যাওয়া জ্ঞানদার পক্ষে একেবারে মারাত্মক হইয়া উঠিল। কারণ তাহার ও তাহার মাতার বিরুদ্ধে স্বর্ণমঞ্জরীর এমনই ত বিদ্বেষের অবধি ছিল না; কিন্তু ছোটবৌয়ের ব্যবহারে আজিকার বিদ্বেষ তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গেল।

হরিপালে থাকিতে দুর্গা জ্বর আসিলে শুইয়া পড়িতেন, ছাড়িলে উঠিয়া নড়াচড়া করিতেন। সাধ্যে কুলাইলে স্নান-আহ্নিক করিয়া একবেলা একমুঠা ভাতও খাইতেন। কিন্তু এখানে আসিয়া আর একপ্রকার ঘটিল। পাড়ার মেয়েরা অহোরাত্র সহানুভূতি করিয়া দু-পাঁচদিনেই তাঁহাকে একেবারে শয্যাশায়িনী করিয়া দিল। নীলকণ্ঠ মুখুয্যেমশায়ের পরিবার মেজবৌকে দেখিতে আসিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। চোখ কপালে

তুলিয়া বলিলেন, এ কি করেচিস মেজবৌ, মেয়ের বিয়ে দিবি কবে? ওর পানে যে আর চাইতে পারা যায় না।

দুর্গা শ্রান্ত চোখ দুটি নিমীলিত করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, কি জানি পিসীমা, কবে ভগবান মুখ তুলে চাইবেন।

তা ত জানি মা। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে ত? ভগবান ত আর বর জুটিয়ে এনে দিয়ে যাবেন না!

দুর্গা আর জবাব দিলেন না।

একমিনিট প্রতীক্ষা করিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, বলি বাপের বাড়ি গেলি, ভাই কিছু যোগাড় করে দিলে না? দেওর কি বলে?

ভগবান জানেন। বলিয়া দুর্গা পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

ঘণ্টা-খানেক পরেই আদরিণী বেড়াইতে আসিয়া চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়াই উঁকি মারিয়া কহিল, বলি এ-বেলাটায় কেমন আছ মেজবৌ?

জ্ঞানদা শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া মায়ের পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল; কহিল, জ্বর এখনো ছাড়েনি পিসীমা। দুর্গা মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিলেন; বলিলেন, ব'সো ঠাকুরঝি।

না বৌ, বেলা গেল, আর বসবো না। তা বলি কি মেজবৌ, যাকে হোক ধরে উচ্ছুগ্যু করে দাও, আর খুঁতখুঁত ক'রো না। বলতে নেই,—তখন তবুও মেয়েটার যা হোক একটু ছিরি ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়া জ্বরে একেবারে যেন পোড়া কাঠটি হয়ে গেছে। হ্যাঁ লা গেনি, সুমুখের চুলগুলো বুঝি উঠে গেল?

জ্ঞানদা ঘাড় নাড়িয়া নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল। আদরিণী কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া কহিল,—শুনেচি নাকি ও-পাড়ার গোপাল ভটচায্যি আবার বিয়ে করবে। একবার অনাথদাকে পাঠিয়ে খবরটা কেন নিলে না মেজবৌ?

আচ্ছা, বলব, বলিয়া দুর্গা নিশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইলেন।

এমনি করিয়া কত লোক যে কত হিতোপদেশ দিয়া গেল, তাহার সংখ্যা রহিল না। কিন্তু যাহাদের পথ চাহিয়া দুর্গা অনুক্ষণ কান খাড়া করিয়া রহিলেন, তাহারা দেখা দিল না। না আসিল অতুল, না আসিল তাহার মা।

ছোটবৌয়ের দেহে দয়ামায়া ছিল; কিন্তু সে ভারী অলস, তাহাতে অন্তঃসত্ত্বা। সুতরাং স্বর্ণ জ্ঞানদাকে ডাকিয়া যখন বলিলেন, বাছা, রোগ বলে ত আর চিরকাল চলে না, তোমার মা যেন ধরলুম পারে না, কিন্তু তুমি বাপু সোমত্ত মেয়ে—সকালে কাকার ভাত দুটি কি আর রেঁধে দিতে পার না? ঘরের ভিতর হইতে ছোটবৌ কথাটা অন্যায় বুঝিয়াও চুপ করিয়া রহিল। পরের দুঃখে সে ব্যথা অনুভব করিত; কিন্তু তাই বলিয়া নিজেকে পরিশ্রম দিয়া সে দুঃখ দূর করা তাহার পক্ষে অসাধ্য।

জ্ঞানদা তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আমিই দেব জ্যাঠাইমা।

যদিচ, এখনও প্রতিরাত্রেই তাহার জ্বর হইত, কিন্তু মায়ের যন্ত্রণা বাড়াইবার ভয়ে এ কথা সে প্রাণপণে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল! ফোঁপরা নির্জীব দেহটাকে সে সকালে বিছানা হইতে যেন টানিয়া তুলিতেই পারিত না; তথাপি একবার ইতস্ততঃ করিল না—একটিবার মুখভার করিল না।

দুঃখী পিতা-মাতার কন্যা হইলেও সে একমাত্র সন্তান; তাঁহাদের বড় আদরে যত্নে লালিত-পালিত হইয়াছিল। কিন্তু ছেলেবেলা হইতেই গুরুজনের আজ্ঞা—ন্যায়-অন্যায় যাই হউক—নির্বিচারে মাথা পাতিয়া লইতে, সেবা করিতে, মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে, সংসারে বোধ করি আর তাহার জুড়ি ছিল না। কিন্তু আজ সে যে কত বড় গুরুভার মাথায় করিয়া লইল, তাহা আর কেহ না বুঝুক, ছোটবৌ বুঝিল। সুতরাং বড়জায়ের এই অত্যন্ত অন্যায় আদেশে তাহার অন্তর জ্বলিতে লাগিল, তথাপি মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতেও তাহার সাহস হইল না—পাছে, বলিতে গেলেই পালার শর্তমত তাহাকে ভোরে উঠিয়া রাঁধিতে হয়।

পরদিন মধ্যাহ্নে কাকাকে স্নানঘরে যাইতে দেখিয়া, জ্ঞানদা ভাতের থালাটি হাতে

করিয়া দিতে যাইতেছিল,—কোথা হইতে জ্যাঠাইমা হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া পড়িলেন —কোথা যাস লা গেনি?

জ্ঞানদা থতমত খাইয়া বলিল, কাকা স্নান করে এলেন যে!

তাতে তোর কি? বলিয়া জ্যাঠাইমা চেঁচাইয়া উঠিলেন—মানা করে দিয়েচি না ভাত বেড়ে নিয়ে যেতে? তোর হাতে পুরুষমানুষ খেতে পারে লা?

দুর্গা সেইমাত্র উঠিয়া ঘরের সুমুখে বসিয়াছিলেন—চেঁচামেচি শুনিয়া সভয়ে চাহিয়া রহিলেন।

ছোটবৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে দিদি?

স্বর্ণ কাহারো প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সেই নির্বাক নিস্পন্দ মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন—হাতে করে থালা নিয়ে গেলে কাকা খুশী হয়ে তোমাকে মাথায় করে নিয়ে নাচবে—রাজপুত্তুর এনে বিয়ে দেবে, না? এই বয়সে কি মন যোগাতেই শিখেছিস মাইরি! বলিয়া থালাটা ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

দুর্গা সহস্র জ্বালায় জ্বলিয়া ক্রমশঃই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিলেন; মেয়েকে উদ্দেশ করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, পোড়ারমুখী, গুরুজনের কথা শুনবি নে যদি, তোর মরণ হয় না কেন!

জ্ঞানদা নীরবে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। একবার বলিল না, এ-বিষয়ে তাহাকে কেহই নিষেধ করিয়া দেয় নাই। মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিতে সে বোধ করি জানিতই না।

প্রতিবাদ যে করিতে পারিত, সে ছোটবৌ। কিন্তু সে বড়জাকে চিনিত বলিয়া কথা কহিল না। বড়জা যেমন মুখরা, তেমনি আত্মমর্যাদাজ্ঞানশূন্যা। মুখের উপর তাহার সহস্র দোষ দেখাইয়া দিলেও লজ্জা পাইবে না; বরঞ্চ অধিকতর নিষ্ঠুর হইয়া যন্ত্রণা দিবে জানিয়াই, ছোটবৌ নীরবে জ্ঞানদার অনুসরণ করিয়া রান্নাঘরে আসিয়া সস্নেহে সযত্নে তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিল, দিদির কথাটা কেন শুনিস নি মা?

এতক্ষণের এত কঠোর লাঞ্ছনা সে সহিয়াছিল, কিন্তু সেই স্নেহের অনুযোগ সহিতে পারিল না। একটিবার মাত্র চোখ তুলিয়া ছোটখুড়ীর মুখের পানে চাহিয়াই সে তাঁহার পদতলে ভাঙ্গিয়া পড়িল—আমাকে কেউ নিষেধ করে দেয়নি খুড়ীমা, বলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ছোটখুড়ী কাছে বসিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিল, কিন্তু কি বলিয়া যে এই মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না।

এমনি করিয়া এই শ্রীহীনা হতভাগ্য অনূঢ়া কন্যার দিন কাটিতে লাগিল। ঘরে-বাইরে আত্মীয়-পর সবাই মিলিয়া অনুক্ষণ কেবল লাঞ্ছনা দিতেই লাগিল, কিন্তু পরিত্রাণ করিবার কেহ চেষ্টামাত্রও করিল না।

সাত

আজকাল ধরিয়া না তুলিলে দুর্গা প্রায় উঠিতেই পারিতেন না। মেয়ে ছাড়া তাঁহার কোন উপায়ই ছিল না। তাই সহস্র কর্মের মধ্যেও জ্ঞানদা যখন-তখন ঘরে ঢুকিয়া মায়ের কাছে বসিত। আজিকার সকালেও একটুখানি ফাঁক পাইয়া, কাছে বসিয়া আস্তে আস্তে মায়ের পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। সহসা একটা অত্যন্ত সুপরিচিত কণ্ঠস্বরে তাহার বুকের ভিতর ধক করিয়া উঠিল।

দোলের দিন। ছুটির বন্ধে অতুল বাড়ি আসিয়াছিল। দুই-তিনজন পাড়ার সংগী লইয়া রঙ মাখিয়া পকেট ভরিয়া আবীর লইয়া সে 'মাসীমা' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিয়া বাড়ি ঢুকিল।

দুর্গা তন্দ্রায় জাগরণে সারাদিন একপ্রকার আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিতেন। পাছে কণ্ঠস্বর কানে গেলে মা সজাগ হইয়া উঠেন, এই ভয়ে জ্ঞানদা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মনে মনে ইনি যে এই লোকটিরই প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহা সে জানিত। অথচ, তাঁহার সেই স্বাভাবিক ধৈর্য, গাম্ভীর্য, আত্মসম্মান আর যেন ছিল না। বুদ্ধি-বিবেচনাও কেমন যেন

দ্রুতে বিকৃত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার যে জননী কলহের ছায়া দেখিলেও শঙ্কিত হইতেন, তিনি আজকাল ইহাতেও যেন বিমুখ নন—সে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। সুতরাং, উভয়ের দেখা হইলেই একটা অত্যন্ত অশোভন কলহ যে অনিবার্য, এ-কথা তাহার অন্তর্যামী আজ বলিয়া দিলেন। কি করিলে যে এই বিপদ এড়াইতে পারা যায়, ভাবিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পা-টিপিয়া উঠিয়া সে কপাট রুদ্ধ করিতেছিল; মা বলিলেন, জ্ঞানদা, ও অতুল কথা কইলে না?

জ্ঞানদা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কি জানি মা, তিনি ন'ন বোধ হয়।

হাঁ, সেই বৈ কি! উঠে একবার দেখ দিকি।

তর্ক করিলেই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন—তাহা সে জানিত; তাই ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু দেখা গেল না। শুধু বারান্দার ওধারে অনেকের মধ্যে তাঁহারও কণ্ঠস্বর তাহার কানে গেল। এইটুকু খবর লইয়াই সে ফিরিতে পারিত; কিন্তু অন্তরাল হইতে একবার তাঁহার মুখখানি দেখিয়া লইবার লোভ তাহাকে যেন ঠেলিয়া লইয়া গেল।

সে নিঃশব্দে আগাইয়া আসিয়া একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিল, তিনি বড়মাসীর পায়ের উপর মুঠা করিয়া আবীর দিয়া হাসিতেছেন। পাড়ার ছেলেরাও দেখাদেখি তাহাই করিতেছে।

ছোটবৌ ছিল না। একটা ব্যথার মত হওয়াতে আজ সে ঘর ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। ফিরিবে ফিরিবে করিয়াও নিজের অজ্ঞাতসারে বোধ করি জ্ঞানদার একটু বিলম্ব ঘটিয়াছিল, অকস্মাৎ বজ্রাহতপ্রায় হইয়া দেখিল, সে যে ভয় করিয়াছিল ঠিক তাই,—মা হেলিয়া-দুলিয়া সেইদিকে চলিয়াছেন।

ছুটিয়া গিয়া দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, যেয়ো না মা, ফেরো।

দুর্গা চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কেন?

কেন, জানিনে মা, তুমি ফেরো। তার ত কোন আশাই নেই মা—

আমাকে ছাড়্‌ হতভাগী—ছেড়ে দে! বলিয়া অমানুষিক বলে দুর্গা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। জ্ঞানদা কলের পুতুলের মত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। সবাই আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া দেখিল—মেজবৌ।

তাঁহার সেই কঙ্কালসার মুখমণ্ডলে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দৃষ্টি ছিল। সে দুটা জ্বলন্ত চক্ষুর পানে চাহিয়া অতুল সভয়ে দৃষ্টি অবনত করিল।

দুর্গা বলিলেন অতুল, আমরা তোমার কি করেছিলাম যে, এমন করে আমাদের সর্বনাশ করলে?

অতুল জবাব দিবে কি, অপরাধের ভারে ঘাড় তুলিতেই পারিল না।

সেই কাজটা করিলেন স্বর্ণ। হৃদয় বলিয়া তাহার ত কোন বালাই ছিল না; তাই অতি সহজেই মুখ তুলিয়া কহিলেন, কেন, কি সর্বনাশ করেচে শুনি?

দুর্গা বলিলেন, তোমাকে তার কি জবাব দেব, দিদি? যাকে বলচি সেই জানে সে কি করেচে।

স্বর্ণ কহিলেন, আমরাও ঘাস খাইনে মেজবৌ, কিন্তু, ও কি তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে বলে লেখাপড়া করে দিয়েছিল যে, এত লোকের মাঝখানে তেড়ে এসেচ? যাও, ঘরে যাও—পাল-পার্বণ আমোদ-আহ্লাদের দিনে আমার বাড়িতে বসে অনাছিষ্টি কাণ্ড ক'রো না।

অনাছিষ্টি কাণ্ড আমি করতে আসিনি দিদি। বলিয়া অতুলের পানে চাহিয়া বলিলেন, যে করে আমাদের এই একটা বছর কেটেছে অতুল, সে তুমি জান না—কিন্তু ভগবান জানেন। কিন্তু, এই যদি তোমার মনে ছিল, কেন তাঁর মরণকালে আশা দিয়েছিলে? কেন তুমি তখনি জানালে না?

স্বর্ণ রুখিয়া উঠিয়া কহিলেন, বাছাকে তুমি ভগবান দেখিয়ো না বলচি, মেজবৌ ভাল হবে না। আমরা বেঁচে থাকতে কথা দেবার কর্তা ও নয়।

এত লোকের সমক্ষে অতুল নিজেকে অপমানিত বোধ করিতেছিল; মাসীর জোর পাইয়া কহিল, আমি কি নিজে বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছিলাম? আমার পা ছাড়ে না—পায়ের

উপর পড়ে মাথা খুঁড়তে লাগল—বাবাকে নিজের মুখের কথা দাও। করি কি? অত লোকের সামনে আমি লজ্জায় বাঁচিনে—তাই পা ছাড়াবার জন্যে যদি একটা কৌশল করে থাকি, তাকে কি কথা দেওয়া বলে?

স্বর্ণ খিলখিল করিয়া হাসিয়া কহিলেন, ওমা, কি ঘেন্নার কথা অতুল,—তুই বলিস কি রে? ছুঁড়ি নিজে পায়ে ধরে বলে—আমায় বিয়ে কর? অ্যাঁ?

অতুল কহিল, সত্যি কিনা, ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর না? মেজমাসীমা নিজেই বলুন না, আমার পায়ের উপর মাথা খুঁড়তে দেখেছিলেন কিনা। নইলে ঐ মেয়েকে আমি বিয়ে করতে যাব? আমার কি মরবার দড়ি-কলসী জোটে না?

অতুলের সঙ্গীরা মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া উঠিল। দুর্গা উন্মাদের মত চেঁচাইয়া উঠিলেন, ওরে নিষ্ঠুর! ওরে কৃতঘ্ন! দড়ি-কলসী আমি কিনে দেব রে, তুই মর গে! তোর মরাই উচিত। যে মেয়েকে তুই এত লোকের সুমুখে এতবড় অপমান করলি, সেই মেয়েই যে তোকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল রে! সব ভুলে গেলি?

চীৎকার শুনিয়া ছোটবৌ ব্যথা ভুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, স্বর্ণ লাফাইয়া উঠিয়াছে—তবে লো হতভাগী! বেরো আমার বাড়ি থেকে—বেরো বলচি।

জ্ঞানদা দাঁড়াইয়া ছিল। কিন্তু সে অচেতন পাথর হইয়া গিয়াছিল। লজ্জা, ঘৃণা, অভিমান, অপমান, ভালমন্দ কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতেছিল না। এ-সমস্তরই যেন সে একান্ত অতীত হইয়াই নীরবে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অদৃষ্টপূর্ব মূর্তির প্রতি চাহিয়া ছোটবৌ সভয়ে একটা ঠেলা দিয়া ডাকিল,—জ্ঞানদা? সে ঘরের ভিতর হইতেই কলহের কিছু কিছু শুনিতে পাইয়াছিল।

জ্ঞানদা জবাব দিল, কেন খুড়ীমা!

আর কেন দাঁড়িয়ে মা, তোর মাকে ঘরে নিয়ে যা।

মা চল, বলিয়া মায়ের হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে ঘরে লইয়া গেল।

স্বর্ণ কহিলেন, দেখলি ছোটবৌ, আস্পর্ধা! একেই বলে, বামন হয়ে চাঁদে হাত।

অতুল হাসিবার মত করিয়া দাঁত বাহির করিয়া কহিল, শুনলেন ছোটমাসীমা কাণ্ডটা? কি ভয়ানক লজ্জা!

স্বর্ণ খনখন করিয়া বলিলেন, একফোঁটা মেয়ে,—এ কি ঘোর কলি! ছোটবৌ একটুখানি হাসিয়া কহিল,—ঘোর কলি বলেই বাঁচোয়া দিদি। নইলে আর কোন কাল হলে, মা বসুন্ধরা এতক্ষণ লজ্জায় দু'ফাঁক হয়ে যেতেন অতুল। বলিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

স্বর্ণ বিদ্রূপের তাৎপর্য না বুঝিয়া খুশী হইয়া বলিলেন, সেই কথাই ত বলচি ছোটবৌ!

কিন্তু অতুলের মুখ কালো হইয়া উঠিল। ছোটবৌয়ের কথার তাৎপর্য স্বর্ণ না বুঝিলেও সে বুঝিয়াছিল। তাই খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া যখন সে উঠিয়া গেল, তখন মনে হইল, এই হোলির দিনে কে যেন তাহার জামায় কাপড়ে লাল রঙ এবং মুখে গাঢ় কালি লেপিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

আসল কথাটা এতদিন অপ্রকাশ ছিল বটে, কিন্তু আর রহিল না। পাড়ার হিতাকাঙ্ক্ষিণী-দের কথায় অচিরেই দুর্গার কানে গেল যে, এই বাড়িতেই অতুল আবদ্ধ হইয়াছে। অনাথেরই বড়মেয়ে মাধুরীর সঙ্গেই তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। ঘটকালি স্বর্ণ করিয়াছেন এবং মেয়ে দেখিয়া অতুলের ভারী পছন্দ হইয়াছে।

আট

মাধুরী শিশুকাল হইতেই কলিকাতায় মামার বাড়ি থাকে। মহাকালী পাঠশালায় পড়ে। ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত শিখিয়াছে। গাহিতে, বাজাইতে, কার্পেট বুনিতেও জানে; আবার শিব গড়িতে, স্তোত্র আওড়াইতেও পারে। দেখিতেও অতিশয় সুশ্রী। এইবার পূজার সময় মাস-দুয়েের জন্য বাটী আসিয়াছিল; সেই সময়েই কথাবার্তা পাকা হইয়া গিয়াছে।

অতুলের মত দুর্লভ পাত্র চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় নাই, পাত্র আপনিই ধরা দিয়াছে। অবশ্য স্বর্ণ মাঝখানে ছিলেন।

ছোটবৌয়ের ভাইয়েরা অবস্থাপন্ন। মা বাঁচিয়া আছেন, আসন্ন-প্রসবা মেয়েকে তিনি বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন, সঙ্গে মাধুরীও আসিল। মেজজ্যাঠাইকে সে অনেকদিন দেখে নাই, আসিয়াই প্রণাম করিতে আসিল।

দীর্ঘজীবী হও মা! বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া দুর্গা নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিলেন। একে সে সুন্দরী, তাহাতে মামী সাজাইয়া-গুছাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। মামী কলিকাতার মেয়ে—কেমন করিয়া সাজাইয়া দিতে হয় জানে। গায়ে গুটি কয়েক বাছা বাছা স্বর্ণালঙ্কার; পরনে কোঁচানো চওড়া লালপেড়ে শাড়ি; পিঠের উপর চুল এলো করা; কপালে টিপ। চাহিয়া চাহিয়া দুর্গার চোখের পাতা আর পড়ে না। হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল—আহা! মেয়ে ত নয়—যেন স্বর্ণ-প্রতিমা! এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার পদতলে উপবিষ্টা নিজের ঐ মলিন, শ্রীহীন মেয়েটার পানে চাহিয়া তাঁহার দু'চক্ষু সহসা যেন জ্বলিয়া গেল;—পাশ ফিরিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, আর আমি মেয়ে পেটে ধরেচি যেন কাল্‌প্যাঁচা!

মাধুরী ঘরে ঢুকিবামাত্রই তাহার রূপ এবং সাজসজ্জার পানে চাহিয়া জ্ঞানদা নিজেই ত হীনতার সঙ্কোচে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। মাধুরী কহিল, দিদি, চল না, একটু গল্প করি গে।

প্রত্যুত্তরে জ্ঞানদা অব্যক্ত স্বরে কি কহিল, বোঝা গেল না। কিন্তু সেই শব্দটা মাত্র শুনিতে পাইয়াই দুর্গা তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ও পোড়ামুখ লোকের সামনে আর বার করিস নে গোনি—বসে থাক। জ্ঞানদা নীরবে বসিয়া রহিল।

মাধুরী চলিয়া গেলে, দুর্গা বোধ করি নিতান্তই মনের জ্বালায় বার-দুই আঃ উঃ করিলেন। জ্ঞানদা আস্তে আস্তে কহিল, কপালটা একটু টিপে দেব মা?

না।

ওষুধটা একবার—

ওলো, না, না, না। যা, আমার বিছানা থেকে উঠে যা, হারামজাদী! তোর মুখ দেখলেও আমার সর্বাঙ্গ যেন জ্বলেপুড়ে যায়। বলিয়া পা দিয়া তিনি মেয়েকে সজোরে ঠেলিয়া দিলেন।

জ্ঞানদা অনেক সহিয়াছিল; কিন্তু লাথিটা সহ্য করিতে পারিল না। নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিয়া একেবারে মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার দু'চক্ষের জলে মাটি ভিজিয়া গেল। দুই হাত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল,—ভগবান! আমি কার কাছে কি দোষ করিয়াছি যে সকলেরই চক্ষুশূল। আমার রূপ নাই, বসন-ভূষণ নাই, আমার বাপ নাই, সে কি আমার দোষ? আমার রোগগ্রস্ত এই কঙ্কালসার দেহ, এই জীর্ণ পাণ্ডুর মুখ যে একজনকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, সে কি আমার ত্রুটি? আমার বিবাহ দিতে কেহ নাই, তবুও আমার বয়স বাড়িয়া যাইতেছে—সেও কি আমার অপরাধ? প্রভু! এতই যদি আমার দোষ, তবে আমাকে আমার বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও—তিনি আমাকে কখনও ফেলিতে পারিবেন না।

জ্ঞানদা! বলিয়া দুর্গা পাশ ফিরিলেন। মায়ের ডাকে সে চোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

রোগা শরীর, ভিজে মাটির ওপর কেন মা? বলিয়া দুর্গা উৎকণ্ঠায় নিজেই উঠিয়া বসিলেন।

ওঃ, বকেচি বুঝি মা! বলিয়া চক্ষের পলকে দুই হাত বাড়াইয়া মেয়েকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আজ সন্ধ্যার পরে হঠাৎ অনাথ দুর্গামণির ঘরে ঢুকিয়া বিমর্ষমুখে কহিল, আজ কেমন আছ মেজবৌঠান? থাক থাক, আর উঠো না। তা—তা ওষুধপত্র কিছুই খেতে চাও না শুনলাম—অমন করলে ত আরাম হতে পারবে না!

কথাটা সত্য। যদিচ ঔষধ যাহা দেওয়া হইতেছিল, তাহা না দিলেও ক্ষতি ছিল না;

কিন্তু সেও তিনি একেবারে খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার বাঁচিবার আশাও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না। কণ্ঠস্বর প্রতিদিন গহ্বরে ঢুকিতেছিল—খুব কাছে না আসিলে আজকাল আর শুনিতেই পাওয়া যাইত না। দেবরের আকস্মিক আত্মীয়তায় দুর্গা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তথাপি অব্যক্তস্বরে প্রত্যুত্তরে যাহা কহিলেন, অনাথ ঘাড়টা কাত করিয়া, বিশেষ চেষ্টা করিয়া শুনিয়া, বলিলেন, সে ত সত্যি কথাই বৌঠান। বিধবা হয়ে আর বেঁচে লাভ কি,—কোন্ হিন্দুসন্তান এ কথার প্রতিবাদ করবে বল? তবে কিনা, আত্মহত্যাটা না করে কোনগতিকে ক'টা দিন সংসারে থাকা! তোমার আবার যে-রকম দেহের অবস্থা, তাতে এসব কথা আমার না বলাই উচিত, কিন্তু না বললেও যে নয় কিনা, তাই বলি কি, নিজেও দেখতে পাচ্চ—চেষ্টার আমি ত্রুটি করচি নে; কিন্তু কি হতভাগা মেয়ে—কোনমতেই কি একটা গাঁথচে না। ছ-সাতটা সম্বন্ধ—সব ক'টাই ভেঙ্গে গেল—মেয়ে দেখে আর কারুর পছন্দ হ'লো না।

দুর্গা কিছুই বলিলেন না। একটুখানি থামিয়া অনাথ পুনরায় কহিতে লাগিল, মেজদা মরে তুমি আবার আমার সংসারে এসেছ কিনা! গোল হচ্ছে ত তাই নিয়ে। নীলকণ্ঠ মুখুয্যেকে ত চেনই—বাড়ি বাড়ি গিয়ে বেশ তালগোল পাকাচ্চে—তোমার ছুতো করে আমাকে কি করে ঠেলবে। আর, তাদের দোষই বা দিই কি করে, নিজেরাও ত মেয়ের বয়সটা দেখতে পাচ্চি! আবার তাও বলি, শহরে বাপু এত নেই—পোড়া পাড়াগাঁয়েই আমাদের যত হাঙ্গামা, যত বিচার। বলিয়া জোর করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

দেবর যে কিসের ভূমিকা করিতেছেন, কোন্‌দিকে ইহার গতি—তাহা ধরিতে না পারিয়া দুর্গা তেমনি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু শীর্ণ মুখের উপর একটা অনিশ্চিত শঙ্কার ছায়া পড়িল।

একবার কাশিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া অনাথ এইবার আসল কথা প্রকাশ করিল; কহিল, তোমার এ অবস্থায় সত্যিই ত আর কোথাও যাওয়া-আসা চলে না—সে আমি বলিনে; কিন্তু কি জান মেজবৌঠান—নিজের মেয়েটাও ত বিবাহযোগ্য হ'ল,—তাই আমি বলি কি জান,—সব দিক আমার বাঁচিয়ে চলা ত আবশ্যক,—আমি বলি কি—গেনিকে এ সময় আর কোথাও না পাঠালেই নয়। এ বাড়িতে আর ত তাকে রাখা যায় না। বড্ড হৈচৈ হচ্চে।

দুর্গার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ওষ্ঠাধরের মধ্যেই যেন মিলাইয়া গেল,—কোথায় সে যাবে ঠাকুরপো?

অনাথ কহিল, হরিপালেই যাক।

সেখানে কি করে যাবে? গিয়েই বা কি হবে ঠাকুরপো?

অনাথ এবার রুষ্ট হইল; কহিল, এ তোমার অন্যায়, মেজবৌঠান। কেবল নিজেরটি দেখলেই ত চলে না, যার সংসারে আছ—অসময়ে যে তোমাদের ঘাড়ে নিলে—তার ভাল-মন্দও ত চেয়ে দেখা চাই।

দুর্গা জবাব দিতে পারিলেন না—শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এ নিঃশ্বাসে এইটুকু কাজ হইল যে, অনাথ গলাটা একটু কোমল করিয়া কহিতে লাগিল, এ অবস্থায় তোমার একটু কষ্ট হবে বটে, তা বুঝতে পারচি। কিন্তু উপায় কি? আর তোমার নিজের দোষও আছে, মেজবৌঠান। তোমার দাদাকে চিঠি লিখেছিলাম—তিনি ত স্পষ্টই লিখছেন—সেখানে বিয়ের সমস্ত যোগাড় হয়েছিল, তুমি শুধু একটা অসম্ভব আশায় ভুলে, রাগা-রাগি করে মেয়ে নিয়ে চলে এলে। তা না করলে ত আজ স্বচ্ছন্দে—

স্বচ্ছন্দে যে কি হইতে পারিত, সেটা আর অনাথ খুলিয়া বলিল না। কিন্তু দুর্গা বুঝিলেন—হঠাৎ কেন সে আজ জ্ঞানদাকে বিদায় করিবার প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিছুমাত্র হাঙ্গামা না পোহাইয়া, একটা পয়সা খরচ না করিয়া এই দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সন্ধান যখন তাহার মিলিয়াছে, তখন এ লোভ ত্যাগ করিবে—সে লোক অনাথ নয়।

সে চলিয়া গেলে খানিক পরে কাজকর্ম সারিয়া জ্ঞানদা ঘরে ঢুকিয়া, মায়ের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে চমকাইয়া উঠিল। তাঁহার কোটর-প্রবিষ্ট রক্তশূন্য চোখ দুটি আজ ফুলিয়া রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। মেয়েকে দেখিবামাত্রই তাঁহার ক্রন্দনের বেগ একেবারে সহস্রমুখী

হইয়া উঠিল। ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া মেয়ের বুকে মুখ রাখিয়া মা আজ ছোট্ট মেয়েটির মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণে কান্না যখন থামিল, তখন মেয়ে কহিল, আমাকে কি তুমি চেনো না মা যে, কেউ আমাকে তোমার কাছ-ছাড়া করতে পারে? এ ত কাকার বাড়ি নয় মা, এ আমার বাবার বাড়ি। তিনি খেতে না দেন তখন ত আর লজ্জা থাকবে না—যা করে হোক তখন তোমাকে আমি খাওয়াতে পারব মা। বলিয়া মেয়ে আজ মা হইয়া মাকে মেয়ের মত কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে মা শ্রান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু মেয়ে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকিয়াও স্থির করিতে পারিল না, তাহার এই 'যা হোক'টা তখন কি হইবে। সে-দুর্দিনে মায়ের খাওয়া-পরাটা সে কেমন করিয়া কোথা হইতে সংগ্রহ করিবে!

জ্ঞানদাকে বিদায় করার প্রস্তাবটা ছোটবৌ শুনিতে পাইয়া স্বামীকে নির্জনে ডাকিয়া কহিল, তোমার কি ভীমরতি হয়েচে যে, ভাজের পরামর্শে এই অসময়ে মায়ের কাছ থেকে মেয়েকে দূর করবার কথা বলে এলে? কসাই,—যাদের জবাই করাই ব্যবসা—তাদেরও তোমাদের চেয়ে দয়ামায়া আছে।

যাই হোক, কাজটা নাকি একেবারেই অসম্ভব, তাই অনাথ চুপ করিয়া গেল; না হইলে এ-সকল ব্যাপারে সে স্ত্রীর বাধ্য, এতবড় দোষারোপ তাহার অতিবড় শত্রুরাও তাহার প্রতি করিতে পারিত না।

কিন্তু দুর্গা হয়ত এই আসন্নকালেও মেয়ে লইয়া আর একবার হরিপালে যাইতে পারিতেন, কিন্তু সেখানে সেই যে পাত্র, যে নিজের পাঁচ-ছয়টি সন্তানের জননীকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় লাথি মারিয়া হত্যা করিয়াছে, তাহার কথা মনে হইলেই তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

পরদিন অনাথকে নিজের শয্যাপার্শ্বে ডাকাইয়া আনিয়া দুর্গা তাহার হাতদুটি চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, সম্পর্কে বড় না হলে, আজ তোমার পায়ে ধরে ভিক্ষে চাইতাম ভাই, তোমার যাকে ইচ্ছে হয় একে দাও, কিন্তু মেয়েকে এ সময়ে আমার কাছ-ছাড়া ক'র না। বলিয়া জ্ঞানদার হাতখানি তুলিয়া লইয়া তাহার কাকার হাতের উপর রাখিলেন।

অনাথ হাতটা টানিয়া লইয়া বিরক্ত হইয়া কহিল, পরের দায়ে আমার জাত যায়। আমি কি চেষ্টার ত্রুটি করচি মেজবৌঠান? কিন্তু ঘাটের মড়াও যে এ শকুনিকে বিয়ে করতে চায় না। বলি, তোমার সেই বালাজোড়াটা যে ছিল, কি করলে?

সে ত তোমার দাদার শ্রাদ্ধের সময়েই গেছে ঠাকুরপো।

অনাথ হাতটা উলটাইয়া কহিল, তা হলে আর আমি কি করব! একটা পয়সাও দেবে না, মেয়েও ছাড়বে না,—তার মানে, আমাকে মাথায় পা দিয়ে ডুবোতে চাও আর কি! বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে দুর্গা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া, অকস্মাৎ মেয়ের হাতটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, বসে আছিস! ঘরে সন্ধ্যা দিবিনে?

যে-সমস্ত আলোচনা এইমাত্র হইয়া গেল, তাহারই দহনে বোধ করি জ্ঞানদা একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। জবাব দিবার পূর্বেই মা নিরতিশয় কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিলেন, মরণ আর কি! রাজকন্যার মত আবার অভিমান করে বসে আছেন! হাঁ লা গেনি এত ধিক্কারেও তোর ত প্রাণ বেরোয় না! যদু ঘোষের এক ছেলে সেদিন তিনদিনের জ্বরে ম'লো—আর এই একটা বছর ধরে তুই নিত্যি জ্বরের সঙ্গে যুঝচিস্, কিন্তু তোকে ত যম নিতে পারলে না! তুই বলে তাই এখনও মুখ দেখাস, আর কোন মেয়ে হলে মনের ঘেন্নায় এতদিন জলে ডুবে মরত। যা যা, সুমুখ থেকে একটু নড়ে যা শকুনি,—একদণ্ড হাঁফ ফেলে বাঁচি। দিবারাত্রি আমাকে যেন জোঁকের মত কামড়ে পড়ে আছে। বলিয়া একটা ঠেলা দিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইলেন।

বাস্তবিক মায়ের কথাটা সত্য যে, আর কোন মেয়ে হইলে সুধমাত্র মনের ঘৃণাতেই আত্মহত্যা করিত,—এমন কত মেয়েই ত করিয়াছে,—কিন্তু এই মেয়েটিকে ভগবান যেন কোন নিগূঢ় কারণে মা বসুন্ধরার মতই সহিষ্ণু করিয়া গড়িয়াছিলেন। সে নীরবে উঠিয়া গিয়া নিয়মিত গৃহকার্যে প্রবৃত্ত হইল। এতবড় নির্দয় লাঞ্ছনাতেও মুহূর্তের জন্য

আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিল,—না মা, মরিতে আমিও জানি! শুধু তুমি ব্যথা পাইবে বলিয়াই সব সহিয়া বাঁচিয়া আছি।

ঘরে প্রদীপ দিয়া গঙ্গাজল ছড়া দিয়া ধুনা দিয়া সে আর একটি ক্ষুদ্র দীপ হাতে করিয়া তুলসী-বেদীমূলে দিতে গেল। বাঙ্গালীর মেয়ে শিশুকাল হইতেই এই ছোট গাছটিকে দেবতা বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। এইখানে আসিয়া আজ আর সে কিছুতেই সামলাইতে পারিল না। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতে গিয়া আর উঠিতে পারিল না। দুই হাত সুমুখে ছড়াইয়া দিয়া কাঁদিয়া সাষ্টাঙ্গে লুটাইয়া পড়িল।

ঠাকুর! দয়াময়! এইখানে তুমি আমার বাবাকে লইয়াছ—এইবার আমার মাকে আর আমাকে কোলে লইয়া আমার বাবার কাছে পাঠাইয়া দাও ঠাকুর! আমরা আর সহিতে পারিতেছি না।

নয়

চৈত্রের শেষের কয়টা দিন বলিয়া ছোটবৌয়ের বাপের বাড়ি যাওয়া হয় নাই। মাসটা শেষ হইতেই তাহার ছোটভাই তাহাকে এবং মাধুরীকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

আজ ভাল দিন—খাওয়া-দাওয়ার পরেই যাত্রার সময়। অতুল বাড়ি আসিয়াছিল বলিয়া স্বর্ণ তাহাকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

দুপুরবেলা এই দুটি যুবক আহারে বসিল, স্বর্ণ কাছে আসিয়া বসিলেন। শখ করিয়া তিনি মাধুরীর উপর পরিবেশনের ভার দিয়াছিলেন। সকালবেলা আঁষ-রান্নাটা জ্ঞানদাকে দিয়াই রাঁধাইয়া লওয়া হইত, কিন্তু তাহা গোপনে। বাহিরের কেহ জিজ্ঞাসা করিলেই স্বর্ণ অসঙ্কোচে কহিতেন, মা গো! সে কি কথা! ওকে যে আমরা রান্নাঘরেই ঢুকতে দিইনে; সুতরাং পরিবেশন করা তাহার পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া নিজের লজ্জাতেই সে কাহারও সাক্ষাতে বাহির হইত না—যতদূর সাধ্য ঘরের বাহিরের সকলের দৃষ্টি এড়াইয়াই সে চলিত।

অতুলের সহিত মাধুরীর বিবাহ হইবে। তাই, এই সুন্দরী মেয়েটি সর্বাঙ্গে সাজসজ্জা এবং ব্রহ্মাণ্ডের লজ্জা জড়াইয়া লইয়া অপটু হস্তে যখন পরিবেশন করিতে গিয়া কেবলি ভুল করিতে লাগিল—এবং জ্যাঠাইমা সস্নেহ-অনুযোগের স্বরে, কখনো বা 'পোড়ামুখী' বলিয়া, কখনো বা 'হতভাগী' বলিয়া, হাসিয়া তামাশা করিয়া কাজ শিখাইতে লাগিলেন—তখন বিশ্বের পায়ে-ঠেলা আর একটি মেয়ে ইহারই জন্য রন্ধনশালায় নিভৃতে একান্তে বসিয়া মাথা হেঁট করিয়া সর্বপ্রকার আহার্য গুছাইয়া দিতে লাগিল।

স্বর্ণ মাধুরীর বিবাহের কথা তুলিতেই সে ছুটিয়া রান্নাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জ্ঞানদা জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই ভাই?

কিছু না দিদি; আমি আর পারিনে। বলিয়া হাতের খালি থালাটা দুম করিয়া মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পরক্ষণেই স্বর্ণ চেঁচাইয়া ডাকিলেন, একটু নুন দিয়ে যা দেখি মা। কিন্তু নুন লইবার জন্য মাধুরী ফিরিয়া আসিল না। তিনি আবার ডাকিলেন, কৈ রে—তোর ছোটমামা যে বসে আছে। তথাপি কেহ ফিরিল না। এবার তিনি রাগ করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—কথা কি কারু কানে যায় না? এরা কি উঠে যাবে নাকি?

তবুও যখন মাধুরী ফিরিয়া আসিল না, তখন জ্ঞানদা আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। ভাবিল, নুন জিনিসটা ত আর ছোঁয়া যায় না—তাই বোধ করি, এ আদেশটা তাহারই উপরে হইয়াছে। তখন মলিন শতচ্ছিন্ন পরিধেয়খানিতে সর্বাঙ্গ সতর্কে আচ্ছাদিত করিয়া লইয়া, সে নুন হাতে করিয়া ধীরে ধীরে দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলে দুটি তাহাকে দেখিতে পাইল না। জ্যাঠাইমা তাহার আপাদমস্তক বার-দুই নিরীক্ষণ করিয়া মৃদু কঠোর স্বরে প্রশ্ন করিলেন, তোমাকে আনতে কে বললে? মাধুরী কৈ?

জ্ঞানদা ঘরের বাহির হইতেই চুপি চুপি বলিল, কি জানি কোথায় গেল।

তাই তুমি এলে? এক কথা তোমাকে কতবার মনে করিয়ে দিতে হবে যে, তোমার মুখ

দেখলে সাত পুরুষ নরকস্থ হয়? আমার সুমুখে তুমি এস না। ঐ যে অতুল খেতে এসেচে কিনা, তাই তোমার সামনে আসাই চাই? না? নুনের পাত্রটা ঐখানে রেখে দিয়ে যাও।

পাত্রটা রাখিয়া দিয়া জ্ঞানদা চলিয়া গেল। সে শুদ্ধ এইজন্যই যাইতে পারিল যে, মা বসুন্ধরা দ্বিধা হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন না।

স্বর্ণ স্বয়ং উঠিয়া নুন পরিবেশন করিলেন এবং স্বস্থানে বসিয়া অতুলের পানে চাহিয়া কহিলেন, তুই ব্যাটাছেলে, পুরুষমানুষ--তোর আবার লজ্জা কি যে ঘাড় হেঁট করে বসে আছিস! খা।

মাধুরীর মামা প্রশ্ন করিল, ও কে দিদি?

স্বর্ণ একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ও কিছু না—তোমরা খাও।

কিন্তু অতুলের সমস্ত খাবার বিস্বাদ হইয়া গেল। লুচির টুকরা কিছুতেই যেন সে গিলিতে পারিল না। গিলিবে কি করিয়া? আজ সে মাধুরীকে দেখিয়া ভুলিয়াছে, তাহাতে ভুল নাই; কিন্তু জ্ঞানদাকেও ত সে চিনিত। এখনও জ্ঞানদা তাহাকে ভালবাসে কি ঘৃণা করে, যদিচ ঠিক জানিত না, কিন্তু একদিন সে যে তাহাকেই প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত তাহা ত জানে। কিন্তু তেমন দিনেও যে কখনো গায়ে পড়িয়া তাহার সুমুখে আসিবার চেষ্টা করে নাই, আজ সে যে তাহাই করিতে আসিয়াছে—এতবড় নির্লজ্জ অপবাদ সে এত সত্বর বিশ্বাস করিবে কি করিয়া?

অপরাহ্ণবেলায় ছোটবৌ মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গেল। কিন্তু যাইবার সময় মেজজায়ের সহিত দেখা করিয়া গেল না। শুধু একমুহূর্তের জন্য রান্নাঘরে ঢুকিয়া জ্ঞানদার হাতে একখানি দশটাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া, অনেকটা যেন চোরের মত পলাইয়া গেল। দাঁড়াইয়া তাহার প্রণামটা পর্যন্ত গ্রহণ করিল না।

বাটীর মধ্যে শুধু এই একটা লোক,—যে এই দুর্ভাগা মেয়েটার ভিতরটা দেখিতে পাইয়াছিল—সেও আজ কি জানি, কতদিনের জন্য স্থানান্তরে চলিয়া গেল। থাকিয়াও সে যে বিশেষ কিছু করিয়াছিল তাহা নয়—ব্যথা পাওয়া এবং ব্যথা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া কাজ করা, এক জিনিস নয়—সকলে তাহা পারে না, তবুও ছোটখুড়ীমাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া নিবিড় অন্ধকারে এই মেয়েটার সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বৈশাখের মাঝামাঝি একটা দিনে অনাথের অফিস যাইবার সময় বড়বৌ মুখের উপর সংসারের সমস্ত দুশ্চিন্তা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন।

অনাথ ভীত হইয়া কহিল, কি হয়েছে বৌঠান?

স্বর্ণ কহিলেন, তুমি করচ কি ঠাকুরপো; মেজবৌয়ের যে হয়ে এলো!

অনাথ হাতের হুঁকাটা ঠিক করিয়া রাখিয়া দিয়া পাংশু-মুখে কহিল, বল কি? কৈ আমি ত কিছু জানিনে!

স্বর্ণ বলিলেন, না না, তা নয়; আজই সে মরচে না; কিন্তু বেশীদিন আর নেই, তা বলে দিচ্চি। বড় জোর দশ-পনর দিন। তার পরে ছ'মাস, একবছর ছুঁড়িটার বিয়ে দেবার জো থাকবে না—কিন্তু আমার মাধুরী-মায়ের বিয়ে আমি এই আষাঢ়ের মধ্যেই দেব—তা কারু কথা শুনব না। এমন খুঁজলে পাওয়া যাবে না। তা ছাড়া দেবার-থোবার কামড় নেই। ছেলে নিজে পছন্দ করেচে,—মা মাগী যে বলবেন—এ নেব, তা নেব, সে না হলে চলবে না—তার জো নেই। এমন সুবিধে কি আমি শেষকালে দেরি করতে গিয়ে নষ্ট করে ফেলব?

অনাথ সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না না, সে কি হতে পারে! তুমি হলে আমার সংসারের কর্তা গিন্নী সমস্তই। তোমার মেয়ের বিয়ে বোনপোর সঙ্গে দেবে—যেদিন খুশি দিয়ো, যা ইচ্ছে ক'রো, আমি কখনো ত তাতে না বলব না, বৌঠান।

স্বর্ণ সগর্বে বলিলেন, তা ত বলবে না, জানি। কখনো বলোওনি—আমার সে দেওর তুমি নও। তাতেই ত বলচি, এখন যা বলি কর। আর গড়িমসি ক'রো না, যাকে হোক ধরে-বেঁধে ওকে বিদায় কর। সে না করলে মাধুরীর বিয়ে কোনমতেই হতে পারবে না। এমনিই ত পাড়ার ব্যাটা-বেটীরা নানা কথা কইচে, তখন কি আবার একটা গোলমালে পড়ে যাব? মনে বেশ করে বুঝে দেখ, ও তোমারই ঘরের মড়া, ফেলবে ফ্যালো, না হয় পচা গন্ধে মরো।

কথাটা অনাথ ভাবিতে ভাবিতে আফিসে গেল এবং পরদিন হইতেই ঘরের মড়া ফেলিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া এমন দুই-চারিজন পাত্র ধরিয়া আনিতে লাগিল, যাহাদের পরিচয় নিজের মুখে দিতে গেলে বোধ করি স্বর্ণমঞ্জরীকেও দু'বার ঢোক গিলিতে হইত।

সেদিন দুপুরবেলা অনেক দিনের পর স্বর্ণ আসিয়া দুর্গার ঘরে ঢুকিলেন—বলি, আজ কেমন আছ মেজবৌ?

দুর্গা কষ্টে পাশ ফিরিয়া হাতটা একটু উলটাইয়া কহিলেন, আর থাকা-থাকি দিদি! আশীর্বাদ কর, আর যেন বেশী দিন ভুগতে না হয়।

স্বর্ণ সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, না না, ভয় কি? ভাল হয়ে যাবে বৈ কি।

দুর্গা চুপ করিয়া রহিলেন, প্রতিবাদ করিলেন না। স্বর্ণ তখন কাজের কথা পাড়িলেন। কহিলেন, তা মেয়ে বড় কিনা, পাত্তরটি নেহাত ছোঁড়া হলেও ত আর মানাবে না মেজবৌ। বাপ-মা নেই, তাই নিজেই ওবেলা মগরা থেকে দেখতে আসবেন, বলে পাঠিয়েচেন—বলা বাহুল্য, বাপ-মা অমর না হইলে আর পাত্রটির ও-বয়সে তাঁহাদের বাঁচিয়া থাকা চলে না। স্বর্ণ বলিতে লাগিলেন, এখন মা-কালী করেন, মেয়ে দেখে তার পছন্দ হয়, তবেই ত ছোটঠাকুরপোর ছুটাছুটি হাঁটাহাঁটি সার্থক হয়। তার পর আবার দেনা-পাওনার কথা—তা আমি বলি কি—

কথাটা শেষ না হইতেই দুর্গা আগ্রহে উঠিয়া বসিয়া ছলছল চক্ষে চাহিয়া বলিলেন, আশীর্বাদ কর দিদি, এ সম্বন্ধটি আর যেন ভেঙ্গে না যায়। আমি যেন দেখে যেতে পারি, বলিতে বলিতেই তাঁহার চোখ দিয়া দুফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

স্বর্ণ বলিলেন, আশীর্বাদ করচি বৈ কি মেজবৌ, দিনরাত ঠাকুরকে জানাচ্চি,—ঠাকুর, যা হোক মেয়েটার একটা কিনারা করে দাও। তা দেখব বৈ কি মেজবৌ—আমি বলচি, তুমি জামাইয়ের মুখ দেখে তবে—

দুর্গা নীরবে আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন। স্বর্ণ একটা হাই তুলিয়া, তুড়ি দিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, কাচ্চাবাচ্চার বাপ—ঐ শুনতে দেড় শ মাইনে—নইলে কিছু নেই, সব জানি ত। নিজের মেয়েটার কি করে যে দু'হাত এক করবে তাই ভেবে কাঠ হয়ে যাচ্চে। তার ওপর আবার এটি! বুঝতে সবই ত পার মেজবৌ,—তাই ঠাকুরপো বলছিল কি—লজ্জায় নিজে ত তোমাকে বলতে পারে না—বলছিল যে, তোমার অংশের বাড়িটা বাঁধা না দিলে ত আর খরচপত্রের যোগাড় হয়ে উঠবে না—তোমাকে নিজে কিছুই করতে হবে না, শুধু একটা ঢেরা-সই করে দেওয়া। শুধু হাতে কেউ ত আর ধার দিতে চায় না—পোড়া কলিকাল এমনি যে, তুমি মর আর বাঁচ, কেউ কারুকে বিশ্বাস করবে না—

দুর্গা তৎক্ষণাৎ বলিলেন, আমি আর ক'দিন দিদি, তোমরা আমাকে যা করতে বলবে, আমি তাই করব। শুধু এইটুকু দেখো দিদি, ও আমার না একবারে অকূলে ভেসে যায়।

না না, ভেসে যাবে কেন মেজবৌ? বাপ-খুড়ো, মা-জ্যাঠাই কি ভিন্ন? তা যদি হবে আমরাই বা কেন ওর জন্যে ভেবে ভেবে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করব বল? আমার জ্ঞানদাও যা, মাধুরীও সেই পদার্থ। দে না মা জ্ঞানদা, তোর মায়ের চোখ দুটো মুছিয়ে। মাথায় একটু পাখা কর্ মা বসে। বলিয়া একাধারে আশা ও ভরসা দিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

আজ বহুদিনের পর দুর্গার মৃত্যুমলিন মুখের উপর একটা আনন্দের দীপ্তি দেখা দিল। মেয়ের হাত হইতে পাখাটা টানিয়া লইয়া, নিজে শীর্ণ হাতখানি তাহার মাথায় মুখে বুলাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, এইখানে শুয়ে একটু ঘুমো দিকি মা! বলিয়া জোর করিয়া নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, এমন পোড়াকপালীর পেটে তুই জন্মেছিলি মা, যে এই বয়সেই খেটে খেটে, আর ভেবে ভেবে শরীর পাত করলি। যদি জন্মই নিয়েছিলি, ছেলে হয়ে কেন জন্মাস নি মা!

অনেকদিন পর জননীর আদর পাইয়া মেয়ের দুই চোখ দিয়া নীরবে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই বোধ করি একটুখানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ মায়ের ঠেলা খাইয়া জ্ঞানদা শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল।

ও মা, ওঠ ওঠ; বেলা যে আর নেই। আমার টিনের বাক্সটার মধ্যে বোধ করি একটুখানি

সাবান আছে—যা দিকি মা, চট করে পুকুর থেকে মুখ হাত পা ধুয়ে আয়। না বাছা, ঐ তোর বড় দোষ—তুই কথা শুনতে চাসনে। বলচি, যা শিগগির।

মাতার নির্দেশমত জ্ঞানদা টিনের বাক্স খুলিয়া বহুদিন পূর্বের একটুকরা সাবান বাহির করিয়া গামছা লইয়া ম্লানমুখে পুকুরে চলিয়া গেল। মা বলিতে লাগিলেন, বেশ করে একটু রোগড়ে রোগড়ে ধুস মা, তাচ্ছিল্য করিস নে, চট্ করে আসিস মা—বলা যায় না ত, কখন তাঁরা সব এসে পড়বেন।

পুকুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া জ্ঞানদা অবাক হইয়া গেল। মরণাপন্ন মা ইতিমধ্যে কখন বিছানা হইতে উঠিয়া কেমন করিয়া কি জানি তোরঙ্গের কাছে গিয়া, সেটা খুলিয়াছেন এবং নিজের একখানি ছোপান কাপড় এবং জামা বাহির করিয়া বসিয়া আছেন। মেয়ে আসিতেই বলিলেন, ভুল হয়ে গেল রে, মাথাটা বেঁধে দিলাম না, গা ধুয়ে এলি—তা হোক, ব'স। চট করে বেঁধে দিই।

মেয়ে কাতর হইয়া বলিল, না মা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি পারবে না মা, শোও, আমি আপনি বেঁধে নিচ্চি। দোহাই মা তোমার।

মেয়ের কথা শুনিয়া আজ মা একটুখানি হাসিলেন; ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হুঁঃ' পারব না! জানিস গেনি, এই মেজবৌয়ের হাতে চুল বাঁধবার জন্যে পাড়ার মেয়ে ঝেঁটিয়ে আসত। আমি পারব না চুল বাঁধতে? নে, আয় দেরি করিস নে। বলিয়া জোর করিয়া কাছে বসাইয়া সযত্নে সস্নেহে স্বহস্তে পরিপাটি করিয়া, বোধ করি এই তাঁহার শেষ সাজ সাজাইয়া দিলেন। পায়ে আলতা, কপালে খয়েরের টিপ, ঠোঁটে রঙটুকু পর্যন্ত দিতে ভুলিলেন না, মুখখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া একটি চুমা খাইয়া তাঁহার হঠাৎ মনে হইল,—কে বলে, মেয়ে আমার দেখতে ভাল নয়! একটু কালো কিন্তু কার মেয়ের এমন মুখ, এমন চোখ দুটি!

এটা তিনি ধরিতে পারিলেন না যে, কার মেয়ে মাকে এমন ভালবাসে? কার এমন মা-অন্ত প্রাণ? কোন্ মেয়ের হৃদয়ের এতবড় ভক্তি ও ভালবাসার দীপ্তি এমন করিয়া তাহার সমস্ত কুরূপ আবৃত করিয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠে? এ-সকল তিনি টের পাইলেন না বটে, কিন্তু মেয়ের গায়ে একখানি অলঙ্কারও পরাইতে পারেন নাই বলিয়া ইতিপূর্বে যে ক্ষোভ জন্মিয়াছিল, কেমন করিয়া কখন যেন তাহা মুছিয়া গেল। গহনার অভাব একটা ভারী অভাব বলিয়া আজ আর তাঁহার চোখে পড়িল না।

তখনও অনেক বেলা ছিল, কিন্তু কোনমতেই আর তিনি শুইতে চাহিলেন না। সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া মেয়েকে সম্মুখে লইয়া বসিয়া রহিলেন।

গেনিকে দেখিতে আসিবে শুনিয়া পাশের বাড়ির নীলকণ্ঠের পরিবার আসিলেন, তরঙ্গিণী ঠাকুরঝি আসিলেন। যথাসময়ে মেয়ের ডাক পড়িল, তাঁহারা গিয়া পাশের ঘর হইতে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিলেন।

দৃষ্টির অন্তরালে একমাত্র উপযুক্ত সন্তানের অত্যন্ত কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা সম্পন্ন হইতে থাকিলে, তাহার মা যেমন করিয়া সময় কাটান, তেমনি করিয়া দুর্গা একাকী তাঁহার মলিন শয্যার উপর বসিয়া ছিলেন।

পাত্র এবং ঘটকঠাকুর জলযোগাদি সমাধা করিয়া বাহির হইলেন—তিনি টের পাইলেন। তাঁহাদের ঠিকাগাড়ি ছড়ছড় ঘড়ঘড় করিয়া চলিয়া গেল—তাহাও শুনিতে পাইলেন। তার পরে তরঙ্গিণী ঠাকুরঝি ঘরে ঢুকিয়া একটা মস্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া জানাইলেন, নাঃ— মেয়ে পছন্দ হ'লো না।

দুর্গা চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন, একটি প্রশ্নও করিলেন না।

ঠাকুরঝি করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, ঐ হাড়গোড়-বার-করা মেয়ে কি কারো পছন্দ হয়? বলি মেজবৌ, গেনিকে দু'দিন খাওয়াও-মাখাও, একটু তাউত কর। আমরা ছেলে-বেলা থেকে দেখেচি ত, এই মেয়ে কি এমনই ছিল? জ্বরে জ্বরে বাছার হাড়-পাঁজরা বার করে ফেলেচে--একটা বছর সবুর করে যত্ন-আত্তি করে দেখ দিকি, ঐ মেয়ে আবার কেমন হয়! তখন পড়তে পাবে না।

সে ত ঠিক কথা। কিন্তু কৈ সে সুযোগ? টাকা কৈ? একটা বৎসর অপেক্ষা করিয়া

তাহার অস্থিপঞ্জর ঢাকা দিবার সময় কোথায়? মেয়ে যে পনরোয় পড়িল। পিতৃপুরুষেরা প্রতিদিন যে নরকে গভীরতর কূপে নিমগ্ন হইতেছেন! বড় কুলীনের মেয়ে নয়, তাই গ্রামের লোক 'জাতি মারিব' বলিয়া যে অহর্নিশি চোখ রাঙ্গাইয়া শাসাইতেছে। প্রতীক্ষা করিবার আর তিলার্ধ অবসর নাই, বিদায় কর, বিদায় কর। যেমন করিয়া হোক, যাহার হাতে হোক কাল তাহার বৈধব্য অনিবার্য জানিয়া হোক, অসহ্য দুঃখ ও চিরদারিদ্র্য চোখের উপর জাজ্বল্যমান দেখিয়া হোক, তাহাকে সঁপিয়া দিয়া জাতি-ধর্ম এবং পিতৃপুরুষের পারলৌকিক প্রাণ রক্ষা কর।

তখনো ঘরে সন্ধ্যার আলো জ্বালা হয় নাই। সেই অন্ধকারে লুকাইয়া জ্ঞানদা তাহার লাঞ্ছিত সাজসজ্জা খুলিয়া ফেলিবার জন্য নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। দুর্গা মড়ার মত পড়িয়া রহিলেন। খানিক পরে সে হতভাগ্য কঠিন অপরাধীর মতো নীরবে মায়ের পদপ্রান্তে আসিয়া যখন বসিল, জননী জানিতে পারিয়াও সাড়া দিলেন না। তার পরে তেমনি নিঃশব্দে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অভুক্ত পীড়িত কন্যা শ্রান্তির ভারে সেইখানেই ঢলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। সমস্ত অনুভব করিয়াও মায়ের প্রাণে আজ লেশমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না।

দশ

দুর্গার এমন অবস্থা যে, কখন কি ঘটে বলা যায় না। তাহার উপর যখন তিনি পাড়ার সর্বশাস্ত্রদর্শী প্রবীণাদের মুখে শুনিলেন, তাঁহার প্রাপ্তবয়স্কা অনূঢ়া কন্যা শুধু যে পিতৃ-পুরুষদিগেরই দিন দিন অধোগতি করিতেছে তাহা নহে,—তাহার নিজেরও মরণকালে সে কোন কাজেই আসিবে না—তাহার হাতের জল এবং আগুন উভয়ই অস্পৃশ্য—তখন শাস্ত্র শুনিয়া এই আসন্ন পরলোকযাত্রীর পাংশু মুখ কিছুক্ষণের জন্য একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া রহিল।

বহুদিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত ঘা খাইয়া খাইয়া তাঁহার স্নেহের স্থানটা কি একপ্রকার যেন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। যে মেয়ের প্রতি তাঁহার ভালবাসার অবধি ছিল না, সেই মেয়েকেই দেখিলে জ্বলিয়া উঠিতেছিলেন। আজ এই সংবাদ শোনার পর, তাঁহার পরলোকের কাঁটা এই মেয়েটার বিরুদ্ধে তাঁহার সমস্ত চিত্ত একেবারে পাষাণের মত কঠিন হইয়া গেল। মায়া-মমতার আর লেশমাত্র তথায় অবশিষ্ট রহিল না।

অনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, শুনেচি নাকি ও-পাড়ার ঐ যে গোপাল ভটচায্যি, না কে, সে বুঝি আবার বিয়ে করবে। আমার মরবার আগে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে না ঠাকুরপো?

অনাথ কথাটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিল, না না, গোপাল ভটচায্যি আবার বিয়ে করবে কি! কে তোমার সঙ্গে তামাশা করেচে, বৌঠান?

দুর্গা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে আর তামাশা করবে কে, ঠাকুরপো? তিনি পুরুষমানুষ ব্যাটাছেলে, তাঁদের আবার বয়সের খোঁজ কে করে? না না, ও-বয়সে অনেকে বিয়ে করে ঠাকুরপো! আমি মিনতি করচি, একবার গিয়ে তাঁর সন্ধান নাও। বেঁচে থেকে ত কিছুই পেলাম না, মরণের পরে একটু আগুনও কি পাব না?

এখন ইহাই হইয়াছে তাঁহার সকল আশঙ্কার বড় আশঙ্কা। তাঁহার কেবলই মনে হইতেছে এই যে, মেয়ে পেটে ধরা, এত দুঃখে লালন-পালন করা, শেষ মুহূর্তে সমস্তই কি একেবারে নিষ্ফল হইয়া যাইবে? যাহার হাতের আগুন পাইবার জো নাই, সে মেয়ে কেন জন্মিয়াছিল?

উদ্বেগে প্রায় উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, যেখানে হোক, যার হাতে হোক, আমি বেঁচে থাকতে ওকে সঁপে দাও। আমি বলচি, আমার এই শেষ আশীর্বাদে তুমি রাজা হবে ঠাকুরপো।

ঠাকুরপোর নিজের গরজও এ বিষয়ে কম নয়। সে সেইদিনই গোপাল ভটচায্যির খোঁজ লইতে গেল এবং কথাটা সত্য শুনিয়া খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল, শুধু সত্য

বলিয়াই নয়—ইহারই মধ্যে খবর পাইয়া চারি-পাঁচজন কন্যাভারগ্রস্ত পিতা আসিয়া তাহাকে সাধাসাধি করিয়া গিয়াছে বলিয়া।

এত কষ্টের বিয়ে, তবুও যে শুনিল গোপালকে কন্যা দান করা হইবে—সে-ই ছি ছি করিল। কিন্তু জননীর তাহাতে মন টলিল না। তিনি যে এখন পরলোকের যাত্রী; সে যাত্রার পাথেয় শাস্ত্র-নির্দেশমত যেমন করিয়া হোক তাঁহার সংগ্রহ হওয়া যে নিতান্তই চাই।

বাঙ্গালীর মেয়ে—কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া যে শাস্ত্রের যূপকাষ্ঠে কন্যা বলি দিয়া আসিয়াছে, আজ পিছাইয়া দাঁড়াইবে সে কি করিয়া? আবার দুঃখের উপর দুঃখ, সেই গোপাল বলিয়া পাঠাইল, সে মেয়ে দেখিয়া বিবাহ করিবে। এ পোড়া দেশে তাহারও শখ আছে এবং পাঁচটি দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিবার সুযোগও আছে।

গ্রীষ্মের শুষ্ক তৃণ একটা মেঘের বারিপাতেই যেমন উজ্জীবিত হইয়া উঠে, এই একটুকুমাত্র আশার ইঙ্গিতে দুর্গার মরা-আশা চক্ষের পলকে মাথাঝাড়া দিয়া উঠিল। তিনি অনাথের হাতটা ধরিয়া মিনতি করিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, এইটুকু ছোটভাইয়ের কাজ কর ভাই—হতভাগীর হাতের আগুনটুকু যেন শেষ সময়ে পাই। সামনের পাঁচুইটা যেন আর কোনমতেই ফসকে না যায়। তুমি বলে এস ভাই, আজকেই যেন মেয়ে দেখে কথাবার্তা পাকা করে যান।

বিয়ে না হইলে মায়ের শেষ কাজটাও তাহাকে দিয়া করান হইবে না—শাস্ত্রে নিষেধ আছে—এ কথা শুনিয়া জ্ঞানদা নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করিল। সেও ত বাঙ্গালীর মেয়ে—তাহারও বুকের মধ্যে অবিশ্রাম যেন চিতার আগুন জ্বলিতে লাগিল।

অপরাহ্ণবেলায় একাকী রান্নাঘরে বসিয়া সে মায়ের জন্য পথ্য প্রস্তুত করিতেছিল রূপের পরীক্ষা দিবার জন্য আর একবার তাহার ডাক পড়িল।

স্বর্ণ নিজে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, ওলো গেনি, ওটা নামিয়ে রেখে শিগগির শিগগির আয়, তারা দেখতে এসেচে। শুধু একখানা কাপড় পরে আয়, তারা এমনি দেখে যাবে। বলিয়া তিনি তেমনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

অনাথ তখনও অফিস হইতে ফিরে নাই, সুতরাং আদর-অভ্যর্থনা করিবার ভার তাঁরই উপরে। দেখিতে আসিয়াছিল পাত্র নিজে এবং তাহার এক দূর-সম্পর্কীয় ভাগিনেয়। ছেলে-ছোকরাদের পছন্দ আছে বলিয়া গোপাল বুদ্ধি করিয়া তাহার এই ভাগিনেয়টিকে সঙ্গে আনিয়াছিল। ইহারই পরামর্শ মত মেয়ে যেমন আছে তেমনি দেখাইবার আদেশ হইয়াছিল,—কারণ সাজাইয়া দেখানোর মধ্যে ফাঁকি চলিতে পারে।

ছেলেটি ছয়টার ট্রেনে কলিকাতায় যাইবে—সে তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। স্বর্ণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া গলা চাপিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্ঞানদা আর আসে না। শুদ্ধমাত্র একখানা কাপড় পরিয়া আসিতে যে সময় লাগে তাহার অনেক বেশী বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া ঝি গিয়া যখন তাহাকে টানিয়া আনিল, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই জ্যাঠাইমা ক্রোধে আত্মহারা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, খোল এ-সব, কে বললে তোকে এমন করে সেজেগুজে আসতে? যা শিগগির খুলে আয়—

যাঁহারা দেখিতে আসিয়াছিলেন, হঠাৎ এই চেঁচামেচি শুনিয়া তাঁহারা আশ্চর্য হইয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন। ছেলেটি ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া কহিল, তবে এমনিই নিয়ে আসুন, আমার আর দেরি করবার জো নেই।

ঝি যখন তাহাকে আনিয়া সম্মুখে দাঁড় করাইল, তখন কন্যার অপরূপ সাজসজ্জা দেখিয়া ছেলেটি বহু ক্লেশে হাসি দমন করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কাল খবর দেব, বলিয়া মাতুলকে লইয়া প্রস্থান করিল। জলযোগের আয়োজন ছিল, কিন্তু ট্রেন মিস্ করিবার ভয়ে তাহা স্পর্শ করিবারও তাঁহাদের অবকাশ ঘটিল না।

কাল খবর দিবার অর্থ যে কি, তাহা সবাই বুঝিল। জ্যাঠাইমা চেঁচাইয়া, গালি পাড়িয়া, চক্ষের পলকে সমস্ত পাড়াটা মাথায় তুলিয়া ফেলিলেন। মেজবৌয়ের অবস্থা ভাল নয় অনর্থ আশঙ্কা করিয়া পাশের বাড়ির দুই-চারিজন ছুটিয়া আসিয়া পড়িল, এবং ঠিক সময়েই অকস্মাৎ কোথা হইতে অতুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও ছটার ট্রেনে কলিকাতায় যাইতেছিল এবং পথের মধ্যে চীৎকার শুনিয়া এই আশঙ্কা করিয়াই বাড়ি ঢুকিয়াছিল

অতুলকে দেখিতে পাইয়া স্বর্ণের রোষ শতগুণ এবং ক্ষোভ সহস্রগুণ হইয়া উঠিল। শীর্ণ, সংকুচিত, ভয়ে মৃতকল্প, দুর্ভাগা মেয়েটার ঘাড়টা জোর করিয়া অতুলের মুখের উপর তুলিয়া গর্জিয়া উঠিলেন, দ্যাখ অতুল, একবার চেয়ে দ্যাখ! হতভাগী, শতেকখাকী, বাঁদরীর মুখখানা একবার তাকিয়ে দ্যাখ!

বাস্তবিক তাহার মুখের পানে চাহিলে হাসি সামলানো যায় না। তাহার ঠোঁটের রঙ গালে, গালের রঙ দাড়িতে, অন্ধকার কোণে স্বহস্তে টিপ পরিতে গিয়া সেটা কপালের মাঝখানে লাগিয়াছে। রুক্ষ চুল বোধ করি তাড়াতাড়ি এক খাবলা তেল দিয়া বাঁধিতে গিয়াছিল, তখনো দুই রগ গড়াইয়া তেল ঝরিতেছে।

দুই-একটা মেয়ে পাশ হইতে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজনের কোলে ছেলে ছিল, সে কহিল, গিন্নি পিতি থঙ থেজেচে। পিতি, এমনি কোলে জিব বার কলো।— বলিয়া সে হাঁ করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল। আর একবার সবাই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মুখপোড়া ছেলে! বলিয়া তাহার মা-ও হাসিয়া ছেলের গালে একটা ঠোনা মারিলেন।

কিন্তু অতুলের বুকের ভিতরটা কে যেন তপ্ত শেল দিয়া বিঁধিয়া দিল। অনেকদিন হইয়া গেছে, এমন দিবালোকে এত স্পষ্ট করিয়া সে জ্ঞানদার মুখের পানে চাহে নাই। শুধু পরের মুখে শুনিয়াছিল, রোগে বিশ্রী হইয়া গেছে। কিন্তু সে বিশ্রী যে এই বিশ্রী, তাহা সে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। একদিন সাংঘাতিক রোগে নিজে যখন সে মরণাপন্ন, তখন এই মুখখানাকে সে ভালবাসিয়াছিল। চোখের নেশা নয়, কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস নয়,— অকপটে সমস্ত প্রাণ ঢালিয়াই ভালবাসিয়াছিল। আজ অকস্মাৎ যখন চোখে পড়িল, সেই মুখখানার উপরেই যম তাঁহার ডিক্রিজারি করিয়া শেষ নোটিস আঁটিয়া দিয়া গেছেন, তখন মুহূর্তের জন্য সে আত্মবিস্মৃত হইল। কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু স্বর্ণের উচ্চকণ্ঠে তাহা চাপা পড়িয়া গেল।

আঁ, খানকীর বেহদ্দ করলি লা? একটা ঘাটের মড়া, তার মন ভুলোবার জন্যে এই সঙ্ সেজে এলি? কিন্তু পারলি ভুলোতে? মুখে লাথি মেরে চলে গেল যে!

কে একজন প্রশ্ন করিল, কে এমন ভূত সাজিয়ে দিলে বড়বৌ? বুড়োর পছন্দ হ'ল না বুঝি?

স্বর্ণ তাহার প্রতি চাহিয়া, তর্জন করিয়া কহিলেন,--নিজে সেজেছেন--আবার কে সাজাবে? মা ত অজ্ঞান-অচৈতন্য। বলে দিলাম, শুধু একখানি কাপড় পরে আয়। তা পছন্দ হ'ল না। ভাবলেন, সেজেগুজে না গেলে যদি বুড়োর মনে না ধরে? আর সাজের মধ্যে ত ঐ ছোপানো কাপড়খানি, আর অতুলের দেওয়া এই দু-গাছি চুড়ি। তা দিনের মধ্যে দশবার খুলে তুলে রাখচে, দশবার হাতে পরচে। কালামুখীর ও-চুড়ি হাতে দিয়ে বার হতে লজ্জাও করে না? বেরো সুমুখ থেকে দূর হয়ে যা-

বেহায়া মেয়েটার এই নির্লজ্জ চরিত্রের সবাই সমালোচনা করিয়া, ছি ছি করিয়া চলিয়া গেল; শুধু যাঁহার কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকে না, সেই অন্তর্যামীর চোখ দিয়া হয়ত বা একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। তিনিই শুধু জানিলেন,—যে মেয়েটা আজন্মকাল লজ্জায় কখনো মুখ তুলিয়া কথা কহিতেই পারিত না, সে কেমন করিয়া, আজ সকল লজ্জায় পদাঘাত করিয়া নিজের ওই স্বাস্থ্য-শ্রীহীন দেহটাকে স্বহস্তে সাজাইয়া আনিয়া ঐ অতি-বৃদ্ধটার পদেই ঠকাইয়া বিক্রি করিতে গিয়াছিল! কিন্তু বিক্রি হইল না—ফাঁকি ধরা পড়িল। আজ তাই সবাই ছি ছি করিয়া ধিক্কার দিয়া গেল—কেহই ক্ষমা করিল না। কিন্তু অন্তরে বসিয়া যিনি সর্বকালে সর্বলোকের বিচারক, তিনি হয়ত দুর্ভাগা বালিকার এই অপরাধের ভার আপনার শ্রীহস্তেই গ্রহণ করিলেন।

জ্ঞানদা উঠিয়া দাঁড়াইল। কখনো সে পরের সমক্ষে কাঁদে নাই—আজ কিন্তু অতুলের সম্মুখে তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। অথচ, একটা কথারও কৈফিয়ত দিল না, কাহারো পানে চাহিয়া দেখিল না নীরবে চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

কলিকাতা যাইবার আর গাড়ি ছিল না বলিয়া অতুল সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া গেল। পথে সব কথা ছাপাইয়া ছোটমাসীর সেই শেষ কথাটাই বারংবার মনে পড়িতে লাগিল।

সেদিন বাপের বাড়ি যাইবার সময় অতুলকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, অতুল, হীরা ফেলে যে কাঁচ আঁচলে বাঁধে, তার মনস্তাপের আর অবধি থাকে না বাবা। সেদিন কথাটা ভাল বুঝিতে পারে নাই; কিন্তু আজ তাহার যেন নিঃসংশয়ে মনে হইল, কথাটা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছিল। লজ্জাহীনা বলিয়া যাহাকে আজ সবাই লাঞ্ছনা করিয়া বিদায় দিল, তাহারই লজ্জা-শরমের সীমারেখাটা যে কোন্‌খানে, আজ সে-কথাও তাহার স্মরণ হইল।

তখনো ভোর হয় নাই, অনাথ ডাকিতে আসিলেন,—মেজবৌকে দাহ করিতে হইবে।

চলুন যাই, বলিয়া অতুল বাহির হইয়া পড়িল। গিয়া দেখিল, দেড় বৎসর পূর্বে তুলসীমূলে পিতার পা-দুটি কোলে করিয়া যেমন বসিয়াছিল, আজও তেমনি নিঃশব্দে মায়ের পদ-দুটি কোলে লইয়া জ্ঞানদা বসিয়া আছে। শুধু একটিবার ছাড়া জীবনে কেহ কখনো তাহাকে চঞ্চল হইতে দেখে নাই—সেই যখন সে অতুলেরই পায়ের উপর পড়িয়া মাথা খুঁড়িয়াছিল। সুতরাং, তাহার এই নিবিড় নীরবতায় কেহ কিছুই মনে করিল না। সেদিকে কাহারও দৃষ্টিই ছিল না, সৎকারের উদ্যোগ-আয়োজনেই পাড়ার লোক ব্যস্ত।

যথাসময়ে তাহারা মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে যাত্রা করিল। সকলের পিছনে জ্ঞানদাও গেল। দুঃখীর মেয়ে বলিয়া পাড়ার কোন মেয়েই তাহার সঙ্গে গেল না; যাবার কথাও কাহারো মনে হইল না।

বর্ষায় ভরা গঙ্গা শ্মশানের ঠিক নীচে দিয়াই খরবেগে বহিতেছিল। মায়ের শেষ কাজ মেয়ে নীরবে সাঙ্গ করিল। চিতা যখন ধুধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তখন সে পুরুষের ভিড় হইতে সরিয়া নীচে নামিয়া একেবারে জলের ধারে গিয়া বসিল। কেহই নিষেধ করিল না; কারণ, নিষেধ করিবার কিছু ছিল না। বরঞ্চ এই গভীর শোকের দৃশ্যটাকে চোখের আড়াল করিতেই সে যে নামিয়া গেল, তাহা নিশ্চয় অনুভব করিয়া মুহূর্তের সমবেদনায় অনেকেই 'আহা' বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিল।

এই চিরদিন শান্ত পরমসহিষ্ণু মেয়েটি উৎকট কিছু যে করিয়া বসিতে পারে, সে ভয় কাহারও ছিল না। অতুলেরও না। তথাপি তাহাকে খরস্রোতের একান্ত সন্নিকটে গিয়া বসিতে দেখিয়া, তাহার বুকের ভিতরটায় কেমন একরকম করিয়া উঠিল। একবার ভাবিল নিষেধ করে; একবার ভাবিল কাছে গিয়া দাঁড়ায়; কিন্তু লজ্জায়, কুণ্ঠায় কোনটাই পারিল না।

অগ্ন্যুত্তাপ বাঁচাইয়া সবাই গিয়া যেখানে বসিয়াছিল, অতুলও আসিয়া সেখানে বসিল। সম্মুখে প্রজ্বলিত চিতার পানে চাহিয়া সহসা তাহার মনের মধ্যে সেই চিরদিনের পুরানো প্রশ্ন আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল—কাল যে ছিল, আজ সে নাই; আজও যে ছিল, তাহারও ঐ নশ্বর দেহটা ধীরে ধীরে ভস্মসাৎ হইতেছে, আর তাহাকে চেনাই যায় না; অথচ, ওই দেহটাকেই আশ্রয় করিয়া কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত ভয়, কত ভাবনাই না ছিল! কোথায় গেল? এক নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইল? তবে কি তার দাম? মরিতেই বা কতক্ষণ লাগে?

সহসা তাহার নিজেরই বিগত জীবন চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। বছর-তিনেক পূর্বে সেও ত মরিতে বসিয়াছিল, কিন্তু মরে নাই। অজ্ঞাতসারে তাহার চোখের দৃষ্টি চিতার পিঙ্গল ধূসর ধূমের তরঙ্গিত যবনিকা ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। মনে পড়িল, সেদিন যে মরিতে দেয় নাই—সে ওই, ওই যে জাহ্নবীর ঘোলা জলে অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়া মূর্তিমতী শোকের মত বসিয়া আছে,—শুধু রুক্ষ কেশ ও মলিন অঞ্চল যাহার বাতাসে দুলিতেছে!

তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে মনে বলিল, ছাই রূপ! রূপেরই যদি এত দাম, তবে তিন বৎসর পূর্বে রূপের হাটে সে নিজেই ত দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিল। সেদিন [illegible]ও ত ঘৃণায় তাহার পানে চাহিতে পারে নাই!

কেমন করিয়া যে সময় কাটিতেছিল, তাহার জ্ঞান ছিল না। কখন যে চিতা নিভিতে-ছিল, তাহাও সে দেখে নাই। সর্বক্ষণ তাহার সমস্ত দৃষ্টি শুধু ওই নিশ্চল মূর্তিটার প্রতি নিবদ্ধ হইয়া ছিল।

অনাথ কহিলেন, আর বসে কেন বাবা? এসো, শেষ কাজটা শেষ করে দিই।

চলুন, বলিয়া অতুল অপরাহ্নবেলায় স্বপ্ন ভাঙিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তখন সূর্য ঢলিয়া পড়িতেছিল। সেই ম্লান আলোকে দীপ্যমান ঘাটের উপরে নিপতিত দু'গাছি ভাঙা চুড়ির উপর দৃষ্টি পড়ায় সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এ সেই তাহারই দেওয়া অতি তুচ্ছ মহামূল্য অলংকার। শত লাঞ্ছনা, সহস্র ধিক্কারেও যে দু'গাছির মায়া জ্ঞানদা কাটাইতে পারে নাই, আজ নিজের হাতে ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার কৈফিয়ত দিয়াছে। অতুল দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সেই দু'গাছি সস্নেহে, সযত্নে কুড়াইয়া লইল। অখণ্ড অবস্থায় যাহার কোন মর্যাদাই সে দেয় নাই, আজ তাহা ভগ্ন তুচ্ছ কাঁচখণ্ড হইয়াও তাহার কাছে একেবারে অমূল্য হইয়া উঠিল।

পিছনে পদধ্বনি শুনিয়া জ্ঞানদা মুখ ফিরিয়া চাহিল। সে চাহনি অতুল সহ্য করিতে পারিল না। বোধ করি বা একবার সে যেন তাহার হাত ধরিতেও গেল, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, ভুল সকলেরই হয়, জ্ঞানদা, কিন্তু—, বলিয়া সে হাতের মুঠাটা মেলিয়া ধরিতেই সায়াহ্নের আরক্ত আভায় আর একবার সেই কাঁচখণ্ডগুলি ঝকঝক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, আজ যাকে তুমি ভেঙে ফেলে দিয়ে এলে, আমি তাকেই আবার শ্মশান থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলুম।

কথাটা জ্ঞানদা বুঝিতে পারিল না, তাই সে তাহার নিবিড় শোকাচ্ছন্ন উদাস দৃষ্টি অতুলের মুখের প্রতি তুলিয়া আজ অনেক দিনের পরে আবার কথা কহিল, মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

জবাব দিতে গিয়া অতুলের দুচক্ষু সহসা অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু সামলাইয়া লইয়া বলিল, জ্ঞানো, আজ মেজমাসীমার চিতার আগুনের মধ্যে একটা জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পেয়েচি, যা ভাঙবার নয়, তাকে কিছুতেই জোর করে ভাঙা যায় না। জোর করে কাঁচের চুড়িই ভাঙা যায়, কিন্তু, আমাদের সেই দেওয়া-নেওয়াটা আজও তেমনি অটুট হয়ে আছে- তাকে ভেঙে ফেলি, এত জোর তোমার আমার কারও নেই। আমি যা পারিনি, তুমিও তা পারবে না নিশ্চয় জানতে পেরেচি বলেই এই ভাঙা চুড়ি বুকে করে তুলে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। জ্ঞানদা হতচেতনের মত নির্নিমেষ চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতুল অকস্মাৎ দুই হাত বাড়াইয়া তাহার শীর্ণ ডান হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল, কিন্তু জ্ঞানদা তেমনি পাথরের মূর্তির মত স্থির হইয়াই রহিল। অতুল ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমার সমস্ত পাপের গুরুদণ্ড আর যেই দিক জ্ঞানো, তুমি দেবার চেষ্টা ক'রো না। আমি যত অপরাধই করে থাকি না কেন, আমাকে তোমার ফিরে নিতেই হবে। আমাকে ত্যাগ করে শাস্তি দেবে এ সাধ্য তোমার কিছুতেই নেই।

এতক্ষণে জ্ঞানদা মাথা হেঁট করিল, কিন্তু মুখ দিয়া তাহার কথা ফুটিল না—শুধু দুর্বল শীর্ণ হাতটি অতুলের হাতের মধ্যে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত উভয়েই স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অতুল হাতখানি ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, বাড়ি চল, তাঁরা সবাই এগিয়ে গেছেন।

বিরাজ বৌ

এক

হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে দুই ভাই নীলাম্বর ও পীতাম্বর চক্রবর্তী বাস করিত। ও অঞ্চলে নীলাম্বরের মত মড়া পোড়াইতে, কীর্তন গাহিতে, খোল বাজাইতে এবং গাঁজা খাইতে কেহ পারিত না। তাহার উন্নত গৌরবর্ণ দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। গ্রামের মধ্যে পরোপকারী বলিয়া তাহার যেমন খ্যাতি ছিল, গোঁয়ার বলিয়া তেমনই একটা অখ্যাতিও ছিল। কিন্তু ছোটভাই পীতাম্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সে খর্বকায় এবং কৃশ। মানুষ মরিয়াছে শুনিলেই তাহার সন্ধ্যার পর গা ছম্‌ছম্‌ করিত। দাদার মত অমন মূর্খও নয়, গোঁয়ারতুমির ধার দিয়াও সে চলিত না। সকালবেলা ভাত খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া হুগলির আদালতের পশ্চিম দিকের একটা গাছতলায় গিয়া বসিত এবং সমস্ত দিন আর্জি লিখিয়া যা উপার্জন করিত, সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ি ফিরিয়া সেগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া ফেলিত। রাত্রে ঘরের দরজা-জানালা স্বহস্তে বন্ধ করিত এবং স্ত্রীকে দিয়া পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করাইয়া লইয়া তবে ঘুমাইত।

আজ সকালে নীলাম্বর চণ্ডীমণ্ডপের একধারে বসিয়া তামাক খাইতেছিল, তাহার অনূঢ়া ভগিনী হরিমতি নিঃশব্দে আসিয়া পিঠের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর হুঁকাটা দেওয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া আন্দাজ করিয়া এক হাত তাহার বোনের মাথার উপর রাখিয়া, সস্নেহে কহিল, সকালবেলাই কান্না কেন দিদি?

হরিমতি মুখ রগড়াইয়া পিঠময় চোখের জল মাখাইয়া দিতে দিতে জানাইল যে, বৌদি গাল টিপিয়া দিয়াছে এবং 'কানী' বলিয়া গাল দিয়াছে।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তোমাকে 'কানী' বলে? অমন দুটি চোক থাকতে যে কানী বলে, সে-ই কানী। কিন্তু গাল টিপে দেয় কেন?

হরিমতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মিছিমিছি।

মিছিমিছি? আচ্ছা, চল ত দেখি, বলিয়া বোনের হাত ধরিয়া ভিতরে আসিয়া ডাকিল, বিরাজবৌ?

বড়বধূর নাম বিরাজ। তাহার নয় বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া সকলে বিরাজবৌ বলিয়া ডাকিত। এখন তাহার বয়স উনিশ-কুড়ি। শাশুড়ীর মরণের পর হইতে সে গৃহিণী। বিরাজ অসামান্যা সুন্দরী। চার-পাঁচ বছর পূর্বে তাহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়া আঁতুড়েই মরিয়াছিল, সেই অবধি সে নিঃসন্তান। রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল, স্বামীর ডাকে বাহিরে আসিয়া ভাইবোনকে একসঙ্গে দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, পোড়ামুখী আবার নালিশ করতে গিয়েছিলি?

নীলাম্বর বলিল, কেন যাবে না? তুমি 'কানী' বলেচ, সেটা তোমার মিছে কথা। কিন্তু তুমি গাল টিপে দিলে কেন?

বিরাজ কহিল, অত বড় মেয়ে, ঘুম থেকে উঠে চোখেমুখে জল দেওয়া নেই, কাপড় ছাড়া নেই, গোয়ালে ঢুকে বাছুর খুলে দিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখচে। আজ এক ফোঁটা দুধ পাওয়া গেল না। ওকে মারা উচিত।

নীলাম্বর বলিল, না। ঝিকে গয়লা-বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তুমি দিদি, হঠাৎ বাছুর খুলে দিতে গেলে কেন? ও কাজটা ত তোমার নয়।

হরিমতি দাদার পিছনে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি মনে করেচি দুধ দোয়া হয়ে গেছে।

আর কোন দিন মনে ক'রো! বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, নীলাম্বর

হাসিয়া বলিল, তুমিও একদিন ওর বয়সে মায়ের পাখি উড়িয়ে দিয়েছিলে। খাঁচার দোর খুলে দিয়ে মনে করেছিলে, খাঁচার পাখি উড়তে পারে না। মনে পড়ে?

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, পড়ে; কিন্তু ও বয়সে নয়—আরও ছোট ছিলাম। বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

হরিমতি বলিল, চল না দাদা, বাগানে গিয়ে দেখি, আম পাকল কি না।

তাই চল দিদি।

যদু চাকর ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, নারাণ ঠাকুরদা বসে আছেন।

নীলাম্বর একটু অপ্রতিভ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, এর মধ্যেই এসে বসে আছেন?

রান্নাঘরের ভিতর হইতে বিরাজ এ কথা শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, যেতে বলে দে খুড়োকে। স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিল, সকালবেলাতেই যদি ও-সব খাবে ত আমি মাথা খুঁড়ে মরব। কি-সব হচ্ছে আজকাল!

নীলাম্বর জবাব দিল না, নিঃশব্দে ভগিনীর হাত ধরিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাগানে চলিয়া গেল।

এই বাগানটির এক প্রান্ত দিয়া শীর্ণকায়া সরস্বতী নদীর মৃদু স্রোতটুকু গঙ্গাযাত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মত বহিয়া যাইতেছিল। সর্বাঙ্গ শৈবালে পরিপূর্ণ; শুধু মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা জল আহরণের জন্য কূপ খনন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারই আশেপাশে শৈবালমুক্ত অগভীর তলদেশের বিভক্ত শুক্তিগুলি স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া অসংখ্য মাণিক্যের মত সূর্যালোকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তীরে একখণ্ড কালো পাথর সমীপস্থ সমাধিস্তূপের প্রাচীরগাত্র হইতে কোন এক অতীত দিনের বর্ষার খরস্রোতে স্খলিত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। এ বাড়ির বধূরা প্রতিসন্ধ্যায় তাহারই একাংশে মৃতাত্মার উদ্দেশে দীপ জ্বালিয়া দিয়া যাইত। সেই পাথরখানির একধারে আসিয়া নীলাম্বর ছোটবোনটির হাত ধরিয়া বসিল। নদীর উভয় তীরেই বড় বড় আমবাগান এবং বাঁশঝাড়, দুই-একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ, বট নদীর উপর পর্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া শাখা মেলিয়া দিয়াছে। ইহাদের শাখায় কতকাল কত পাখি নিরুদ্বেগে বাসা বাঁধিয়াছে, কত শাবক বড় করিয়াছে, কত ফল খাইয়াছে, কত গান গাহিয়াছে, তাহারই ছায়ায় বসিয়া ভাইবোন ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ হরিমতি দাদার ক্রোড়ের কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা দাদা, বৌদি কেন তোমাকে বোষ্টমঠাকুর বলে ডাকে?

নীলাম্বর গলায় তুলসীর মালা দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, আমি বোষ্টম বলেই ডাকে।

হরিমতি অবিশ্বাস করিয়া বলিল, যাঃ—তুমি কেন বোষ্টম হবে? তারা ত ভিক্ষে করে! আচ্ছা, ভিক্ষে কেন করে দাদা?

নেই বলেই করে।

হরিমতি মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু নেই? তাদের পুকুর নেই, বাগান নেই, ধানের গোলা নেই—কিচ্ছুটি নেই?

নীলাম্বর সস্নেহে হাত দিয়া বোনটির মাথার চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া বলিল, কিচ্ছুটি নেই দিদি, কিচ্ছুটি নেই—বোষ্টম হলে কিচ্ছুটি থাকতে নেই।

হরিমতি বলিল, তবে সবাই কেন তাদের কিছু কিছু দেয় না?

নীলাম্বর বলিল, তোর দাদাই কি তাদের দিয়েছে রে?

কেন দাও না দাদা, আমাদের ত এত আছে।

নীলাম্বর সহাস্যে বলিল, তবুও তোর দাদা দিতে পারে না। কিন্তু তুই যখন রাজার বৌ হবি দিদি, তখন দিস।

হরিমতি বালিকা হইলেও কথাটায় লজ্জা পাইল। দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, যাঃ—

নীলাম্বর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিল। মাবাপ-মরা এই ছোটবোনটিকে সে যে কত ভালবাসিত তাহার সীমা ছিল না। তিন বছরের শিশুকে বড়বৌ-ম্যাটার হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহাদের বিধবা জননী সাত বৎসর পূর্বে স্বর্গারোহণ করে।

সেইদিন হইতে নীলাম্বর ইহাকে মানুষ করিয়াছে। সমস্ত গ্রামের রোগীর সেবা করিয়াছে, মড়া পোড়াইয়াছে, কীর্তন গাহিয়াছে। গাঁজা খাইয়াছে; কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু এক মুহূর্তের জন্য অবহেলা করে নাই। এমনি করিয়া বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল বলিয়াই হরিমতি মায়ের মত অসঙ্কোচে দাদার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অদৃশ্যে পুরাতন ঝির গলা শোনা গেল—পুঁটি, বৌমা ডাকচেন, দুধ খাবে এস।

হরিমতি মুখ তুলিয়া মিনতির স্বরে বলিল, দাদা, তুমি বলে দাও না, এখন দুধ খাব না।

কেন খাবে না দিদি?

হরিমতি বলিল, এখনও আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, সে আমি যেন বুঝলুম, কিন্তু, যে গাল টিপে দেবে, সে-ই বুঝবে না!

দাসী অলক্ষ্যে থাকিয়া আবার ডাক দিল, পুঁটি!

নীলাম্বর তাহাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিয়া বলিল, যা, তুই কাপড় ছেড়ে দুধ খেয়ে আয় বোন, আমি বসে আছি।

হরিমতি অপ্রসন্ন মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সেই দিন দুপুরবেলা বিরাজ স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আচ্ছা, তুমিই বলে দাও, আমি কি দিয়ে রোজ রোজ তোমার পাতে ভাত দি? তুমি এ খাবে না, ও খাবে না, সে খাবে না—শেষকালে কিনা মাছ পর্যন্ত ছেড়ে দিলে!

নীলাম্বর খাইতে বসিয়া বলিল, এই ত, এত তরকারি হয়েচে!

এত কত! ঐ থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়! এ দিয়ে কি পুরুষমানুষ খেতে পারে? এ শহর নয় যে, সব জিনিস পাওয়া যাবে; পাড়াগাঁ, এখানে সম্বলের মধ্যে ঐ পুকুরের মাছ—তাও কিনা তুমি ছেড়ে দিলে? পুঁটি, কোথায় গেলি? বাতাস করবি আয়—সে ত হবে না—আজ যদি একটি ভাত পড়ে থাকে ত তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

নীলাম্বর হাসিমুখে নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল।

বিরাজ রাগিয়া বলিল, কি হাস, আমার গা জ্বালা করে। দিন দিন তোমার খাওয়া কমে আসছে—সে খবর রাখ? গলায় হাড় বেরোবার জো হচ্ছে, সেদিকে চেয়ে দেখ।

নীলাম্বর বলিল, দেখেচি, ও তোমার মনের ভুল।

বিরাজ কহিল, মনের ভুল? তুমি গুণে একটি ভাত কম খেলে আমি বলে দিতে পারি, রতি পরিমাণ রোগা হলে আমি গায়ে হাত দিয়ে ধরে দিতে পারি, তা জান? যা ত পুঁটি, পাখা রেখে রান্নাঘর থেকে তোর দাদার দুধ নিয়ে আয়।

হরিমতি একধারে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে শুরু করিয়াছিল, পাখা রাখিয়া দুধ আনিতে গেল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, ধম্মকম্ম করবার ঢের সময় আছে। আজ ও-বাড়ির পিসীমা এসেছিলেন, শুনে বললেন, এত কম বয়সে মাছ ছেড়ে দিলে চোখের জ্যোতি কমে যায়, গায়ের জোর কমে যায়—না না, সে হবে না—শেষকালে কি হতে কি হবে, তোমাকে মাছ ছাড়তে আমি দেব না।

নীলাম্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার হয়ে তুই বেশী করে খাস্, তা হলেই হবে।

বিরাজ রাগিয়া গিয়া বলিল, হাড়ি-কেওরার মত আবার তুইতোকারি!

নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া গিয়া বলিল, মনে থাকে না রে। ছেলেবেলার অভ্যাস যেতে চায় না—কত তোর কান মলে দিয়েচি মনে আছে?

বিরাজ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মনে আবার নেই! ছোটটি পেয়ে আমার উপর কম অত্যাচার করেচ তুমি! বাবাকে লুকিয়ে, মাকে লুকিয়ে আমাকে দিয়ে তুমি কত তামাক সাজিয়েচ! কত শয়তান লোক তুমি!

নীলাম্বর হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল—আজও সেই সব মনে আছে? কিন্তু তখন থেকেই তোকে ভালবাসতাম।

বিরাজ হাসি চাপিয়া বলিল, চুপ কর, পুঁটি আসচে।

হাসিয়া বলিল, তুমিও একদিন ওর বয়সে মায়ের পাখি উড়িয়ে দিয়েছিলে। খাঁচার দোর খুলে দিয়ে মনে করেছিলে, খাঁচার পাখি উড়তে পারে না। মনে পড়ে?

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, পড়ে; কিন্তু ও বয়সে নয়—আরও ছোট ছিলাম। বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

হরিমতি বলিল, চল্ না দাদা, বাগানে গিয়ে দেখি, আম পাকল কি না।

তাই চল দিদি।

যদু চাকর ভিতরে ঢুকিয়া বলিল, নারাণ ঠাকুরদা বসে আছেন।

নীলাম্বর একটু অপ্রতিভ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, এর মধ্যেই এসে বসে আছেন?

রান্নাঘরের ভিতর হইতে বিরাজ এ কথা শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, যেতে বলে দে খুড়োকে। স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলিল, সকালবেলাতেই যদি ও-সব খাবে ত আমি মাথা খুঁড়ে মরব। কি-সব হচ্ছে আজকাল!

নীলাম্বর জবাব দিল না, নিঃশব্দে ভগিনীর হাত ধরিয়া খিড়কির দ্বার দিয়া বাগানে চলিয়া গেল।

এই বাগানটির এক প্রান্ত দিয়া শীর্ণকায়া সরস্বতী নদীর মৃদু স্রোতটুকু গঙ্গাযাত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাসের মত বহিয়া যাইতেছিল। সর্বাঙ্গ শৈবালে পরিপূর্ণ; শুধু মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা জল আহরণের জন্য কূপ খনন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহারই আশেপাশে শৈবালমুক্ত অগভীর তলদেশের বিভক্ত শুক্তিগুলি স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া অসংখ্য মাণিক্যের মত সূর্যালোকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তীরে একখণ্ড কালো পাথর সমীপস্থ সমাধিস্তূপের প্রাচীরগাত্র হইতে কোন এক অতীত দিনের বর্ষার খরস্রোতে স্খলিত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছিল। এ বাড়ির বধূরা প্রতিসন্ধ্যায় তাহারই একাংশে মৃতাত্মার উদ্দেশে দীপ জ্বালিয়া দিয়া যাইত। সেই পাথরখানির একধারে আসিয়া নীলাম্বর ছোটবোনটির হাত ধরিয়া বসিল। নদীর উভয় তীরেই বড় বড় আমবাগান এবং বাঁশঝাড় দুই-একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থ, বট নদীর উপর পর্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া শাখা মেলিয়া দিয়াছে। ইহাদের শাখায় কতকাল কত পাখি নিরুদ্বেগে বাসা বাঁধিয়াছে কত শাবক বড় করিয়াছে, কত ফল খাইয়াছে, কত গান গাহিয়াছে, তাহারই ছায়ায় বসিয়া ভাইবোন ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ হরিমতি দাদার ক্রোড়ের কাছে আরও একটু সরিয়া আসিয়া বলিল, আচ্ছা দাদা, বৌদি কেন তোমাকে বোষ্টমঠাকুর বলে ডাকে?

নীলাম্বর গলায় তুলসীর মালা দেখাইয়া হাসিয়া বলিল, আমি বোষ্টম বলেই ডাকে।

হরিমতি অবিশ্বাস করিয়া বলিল, যাঃ—তুমি কেন বোষ্টম হবে? তারা ত ভিক্ষে করে! আচ্ছা, ভিক্ষে কেন করে দাদা?

নেই বলেই করে।

হরিমতি মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু নেই? তাদের পুকুর নেই, বাগান নেই, ধানের গোলা নেই—কিচ্ছুটি নেই?

নীলাম্বর সস্নেহে হাত দিয়া বোনটির মাথার চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া বলিল, কিচ্ছুটি নেই দিদি, কিচ্ছুটি নেই—বোষ্টম হলে কিচ্ছুটি থাকতে নেই।

হরিমতি বলিল, তবে সবাই কেন তাদের কিছু কিছু দেয় না?

নীলাম্বর বলিল, তোর দাদাই কি তাদের দিয়েছে রে?

কেন দাও না দাদা, আমাদের ত এত আছে।

নীলাম্বর সহাস্যে বলিল, তবুও তোর দাদা দিতে পারে না। কিন্তু তুই যখন রাজার বৌ হবি দিদি, তখন দিস।

হরিমতি বালিকা হইলেও কথাটায় লজ্জা পাইল। দাদার বুকে মুখ লুকাইয়া বলিল, যাঃ—

নীলাম্বর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার মস্তক চুম্বন করিল। মাবাপ-মরা এই ছোটবোনটিকে সে যে কত ভালবাসিত তাহার সীমা ছিল না। তিন বছরের শিশুকে বড়বৌ-ম্যাটার হাতে সঁপিয়া দিয়া তাহাদের বিধবা জননী সাত বৎসর পূর্বে স্বর্গারোহণ করে।

সেইদিন হইতে নীলাম্বর ইহাকে মানুষ করিয়াছে। সমস্ত গ্রামের রোগীর সেবা করিয়াছে, মড়া পোড়াইয়াছে, কীর্তন গাহিয়াছে। গাঁজা খাইয়াছে; কিন্তু জননীর শেষ আদেশটুকু এক মুহূর্তের জন্য অবহেলা করে নাই। এমনি করিয়া বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছিল বলিয়াই হরিমতি মায়ের মত অসঙ্কোচে দাদার বুকে মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অদৃশ্যে পুরাতন ঝির গলা শোনা গেল—পুঁটি, বৌমা ডাকচেন, দুধ খাবে এস।

হরিমতি মুখ তুলিয়া মিনতির স্বরে বলিল, দাদা, তুমি বলে দাও না, এখন দুধ খাব না।

কেন খাবে না দিদি?

হরিমতি বলিল, এখনও আমার একটুও ক্ষিদে পায়নি।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, সে আমি যেন বুঝলুম, কিন্তু, যে গাল টিপে দেবে, সে-ই বুঝবে না!

দাসী অলক্ষ্যে থাকিয়া আবার ডাক দিল, পুঁটি!

নীলাম্বর তাহাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া দিয়া বলিল, যা, তুই কাপড় ছেড়ে দুধ খেয়ে আয় বোন, আমি বসে আছি।

হরিমতি অপ্রসন্ন মুখে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সেই দিন দুপুরবেলা বিরাজ স্বামীকে ভাত বাড়িয়া দিয়া অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আচ্ছা, তুমিই বলে দাও, আমি কি দিয়ে রোজ রোজ তোমার পাতে ভাত দি? তুমি এ খাবে না, ও খাবে না, সে খাবে না—শেষকালে কিনা মাছ পর্যন্ত ছেড়ে দিলে!

নীলাম্বর খাইতে বসিয়া বলিল, এই ত, এত তরকারি হয়েচে!

এত কত! ঐ থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া-বড়ি-থোড়! এ দিয়ে কি পুরুষমানুষ খেতে পারে? এ শহর নয় যে, সব জিনিস পাওয়া যাবে; পাড়াগাঁ, এখানে সম্বলের মধ্যে ঐ পুকুরের মাছ—তাও কিনা তুমি ছেড়ে দিলে? পুঁটি, কোথায় গেলি? বাতাস করবি আয়—সে ত হবে না—আজ যদি একটি ভাত পড়ে থাকে ত তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

নীলাম্বর হাসিমুখে নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল।

বিরাজ রাগিয়া বলিল, কি হাস, আমার গা জ্বালা করে। দিন দিন তোমার খাওয়া কমে আসছে—সে খবর রাখ? গলায় হাড় বেরোবার জো হচ্চে, সেদিকে চেয়ে দেখ।

নীলাম্বর বলিল, দেখেচি, ও তোমার মনের ভুল।

বিরাজ কহিল, মনের ভুল? তুমি গুণে একটি ভাত কম খেলে আমি বলে দিতে পারি, রতি পরিমাণ রোগা হলে আমি গায়ে হাত দিয়ে ধরে দিতে পারি, তা জান? যা ত পুঁটি, পাখা রেখে রান্নাঘর থেকে তোর দাদার দুধ নিয়ে আয়।

হরিমতি একধারে দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে শুরু করিয়াছিল, পাখা রাখিয়া দুধ আনিতে গেল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, ধম্মকম্ম করবার ঢের সময় আছে। আজ ও-বাড়ির পিসীমা এসেছিলেন, শুনে বললেন, এত কম বয়সে মাছ ছেড়ে দিলে চোখের জ্যোতি কমে যায়, গায়ের জোর কমে যায়—না না, সে হবে না—শেষকালে কি হতে কি হবে, তোমাকে মাছ ছাড়তে আমি দেব না।

নীলাম্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার হয়ে তুই বেশী করে খাস্‌, তা হলেই হবে।

বিরাজ রাগিয়া গিয়া বলিল, হাড়ি-কেওরার মত আবার তুইতোকারি!

নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া গিয়া বলিল, মনে থাকে না রে। ছেলেবেলার অভ্যাস যেতে চায় না—কত তোর কান মলে দিয়েচি মনে আছে?

বিরাজ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মনে আবার নেই! ছোটটি পেয়ে আমার উপর কম অত্যাচার করেচ তুমি! বাবাকে লুকিয়ে, মাকে লুকিয়ে আমাকে দিয়ে তুমি কত তামাক সাজিয়েচ! কত শয়তান লোক তুমি!

নীলাম্বর হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল—আজও সেই সব মনে আছে? কিন্তু তখন থেকেই তোকে ভালবাসতাম।

বিরাজ হাসি চাপিয়া বলিল, চুপ কর, পুঁটি আসচে।

হরিমতি দুধের বাটি পাতের কাছে রাখিয়া দিয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। বিরাজ উঠিয়া গিয়া হাত ধুইয়া আসিয়া স্বামীর সন্নিকটে বসিয়া পড়িয়া বলিল, আমাকে পাখাটা দে পুঁটি—যা তুই খেলগে যা।

পুঁটি চলিয়া গেলে বিরাজ বাতাস করিতে করিতে বলিল, সত্যি বলচি—অত ছোট-বেলায় বিয়ে হওয়া ভাল নয়।

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, কেন নয়? আমি ত বলি, মেয়েদের খুব ছোটবেলায় বিয়ে হওয়াই ভাল।

বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমার কথা আলাদা, কেননা, আমি তোমার হাতে পড়েছিলাম। তা ছাড়া, আমার দুষ্টু বজ্জাত জা-ননদ ছিল না—আমি দশ বছর বয়স থেকেই গিন্নী। কিন্তু, আর পাঁচজনের ঘরেও দেখচি ত, ঐ যে ছোটবেলা থেকে বকাঝকা, মারধর শুরু হয়ে যায়—শেষে বড় হয়েও সে দোষ ঘোচে না—বকাঝকা থামে না। সেই জন্যেই ত আমি আমার পুঁটির বিয়ের নামটি করিনে—নইলে, পরশুও রাজেশ্বরীতলার ঘোষালদের বাড়ি থেকে ঘটকী এসেছিল; সর্বাঙ্গে গয়না—হাজার টাকা নগদ—তবুও আমি বলি, না, আরও দু-বছর থাক।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুই কি পণ নিয়ে মেয়ে বেচবি নাকি রে?

বিরাজ বলিল, কেন নেব না? আমার একটা ছেলে থাকলে টাকা দিয়ে মেয়ে ঘরে আনতে হ'ত না? আমাকে তোমরা তিন শ টাকা দিয়ে কিনে আননি? ঠাকুরপোর বিয়েতে পাঁচ শ টাকা দিতে হয়নি? না না, তুমি আমার ও-সব কথায় থেক না—আমাদের যা নিয়ম, আমি তাই করব।

নীলাম্বর অধিকতর আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমাদের নিয়ম মেয়ে বেচা—এ খবর কে তোকে দিলে? আমরা পণ দিই বটে, কিন্তু মেয়ের বিয়েতে এক পয়সাও নিইনে—আমি পুঁটিকে দান করব।

বিরাজ স্বামীর মুখচোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা আচ্ছা, তাই ক'র—এখন খাও—ছুতো করে যেন উঠে যেও না।

নীলাম্বর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমি বুঝি ছুতো করে উঠে যাই?

বিরাজ কহিল, না—একদিনও না। ও দোষটি তোমার শত্রুরেও দিতে পারবে না। এজন্যে কতদিন যে আমাকে উপোস করে কাটাতে হয়েচে, সে ছোটবৌ জানে। ও কি! খাওয়া হয়ে গেল নাকি?

বিরাজ ব্যস্ত হইয়া পাখাটা ফেলিয়া দিয়া দুধের বাটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, মাথা খাও, উঠ না—ও পুঁটি শিগগির যা—ছোটবোয়ের কাছ থেকে দুটো সন্দেশ নিয়ে আয় —না না, ঘাড় নাড়লে হবে না—তোমার কখ্খন পেট ভরেনি—মাইরি বলচি, আমি তা হলে ভাত খাব না—কাল রাত্তির একটা পর্যন্ত জেগে সন্দেশ তৈরি করেচি।

হরিমতি একটা রেকাবিতে সবগুলো সন্দেশ লইয়া ছুটিয়া আসিয়া পাতের কাছে রাখিয়া দিল।

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আচ্ছা, তুমিই বল, এতগুলো সন্দেশ এখন খেতে পারি?

বিরাজ মিষ্টান্নের পরিমাণ দেখিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, গল্প করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে খাও—পারবে।

তবু খেতে হবে?

বিরাজ কহিল, হাঁ। হয়, মাছ ছাড়তে পাবে না, না হয় এ-জিনিসটা একটু বেশী করে খেতেই হবে।

নীলাম্বর রেকাবিটা টানিয়া লইয়া বলিল, তোর এই খাবার জুলুমের ভয়ে ইচ্ছে করে বনে গিয়ে বসে থাকি।

পুঁটি বলিয়া উঠিল, আমাকেও দাদা—

বিরাজ ধমক দিয়া উঠিল, চুপ কর পোড়ামুখী, খাবিনে ত বাঁচবি কি করে? এই নালিশ করা বেরুবে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে।

দুই

মাস দেড়েক পরে, পাঁচ দিন জ্বরভোগের পর আজ সকাল হইতে নীলাম্বরের জ্বর ছিল না। বিরাজ বাসী কাপড় ছাড়াইয়া, স্বহস্তে কাচা কাপড় পরাইয়া দিয়া, মেঝের বিছানা পাতিয়া শোয়াইয়া দিয়া গিয়াছিল। নীলাম্বর জানালার বাহিরে একটা নারিকেল বৃক্ষের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল। ছোট বোন হরিমতি কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করিতেছিল। অনতিকাল পরেই স্নান করিয়া বিরাজ সিক্ত চুল পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া ঘরে ঢুকিল। সমস্ত ঘর যেন আলো হইয়া উঠিল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, ও কি?

বিরাজ বলিল, যাই, বাবা পঞ্চানন্দের পুজো পাঠিয়ে দিই গে, বলিয়া শিয়রের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হাত দিয়া স্বামীর কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, না জ্বর নেই। জানিনে এ বছর মার মনে কি আছে। ঘরে ঘরে কি কাণ্ড যে শুরু হয়েছে—আজ সকালে শুনলাম, আমাদের মতি মোড়লের ছেলের সর্বাঙ্গে মার অনুগ্রহ হয়েচে—দেহে তিল রাখবার স্থান নেই।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মতির কোন্ ছেলের বসন্ত দেখা দিয়েচে?

বড়ছেলের। মা শীতলা, গাঁ ঠাণ্ডা কর মা! আহা ঐ ছেলেই ওর রোজগারী। গেল শনিবারের শেষ-রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে হঠাৎ তোমার গায়ে হাত পড়ায় দেখি, গা যেন পুড়ে যাচ্চে। ভয়ে বুকের রক্ত কাঠ হয়ে গেল। উঠে বসে অনেকক্ষণ কাঁদলুম, তার পরে মানস করলুম, মা শীতলা, ভাল যদি কর মা, তবেই তো তোমার পুজো দিয়ে আবার খাব-দাব, না হলে অনাহারে প্রাণত্যাগ করব। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া দুফোঁটা জল পড়িল।

নীলাম্বর আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি উপোস করে আছ নাকি?

হরিমতি কহিল, হাঁ দাদা, কিছু খায় না বৌদি—কেবল সন্ধ্যেবেলায় এক মুঠো কাঁচা চাল আর এক ঘটি জল খেয়ে আছে—কারও কথা শোনে না।

নীলাম্বর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল, এইগুলো তোমার পাগলামি নয়?

বিরাজ আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, পাগলামি নয়? আসল পাগলামি! মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাতে ত বুঝতে, স্বামী কি বস্তু!—তখন বুঝতে, এমন দিনে তার জ্বর হলে, বুকের ভিতরে কি করতে থাকে! বলিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, দাঁড়াইয়া বলিল, পুঁটি, ঝি পুজো নিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে যাস ত যা, শিগগির করে নি গে।

পুঁটি আহ্লাদে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, যাব বৌদি!

তবে দেরি করিস নে, যা। ঠাকুরের কাছে তোর দাদার জন্যে বেশ করে বর চেয়ে নিস।

পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, সে ও পারবে। বরং তোমার চেয়ে ওই ভাল পারবে।

বিরাজ হাসিমুখে ঘাড় নাড়িল। বলিল, তা মনে ক'রো না। ভাই বল আর বাপ-মাই বল, মেয়েমানুষের স্বামীর বড় আর কেউ নয়। ভাই বাপ-মা গেলে দুঃখ-কষ্ট খুবই হয়, কিন্তু স্বামী গেলে যে সর্বস্ব যায়! এই যে পাঁচদিন না খেয়ে আছি, তা, দুর্ভাবনার চাপে একবার মনে হয়নি যে উপোস করে আছি—কিন্তু কৈ, ডাক ত তোমার কোন বোনকে দেখি কেমন—

নীলাম্বর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, আবার!

বিরাজ বলিল, তবে বল কেন? পাগলামি করেচি সে আমি জানি, আর যে দেবতা আমার মুখ রেখেচেন, তিনিই জানেন। আমি ত তাহলে একটি দিনও বাঁচতুম না, সিঁথির এ সিঁদুর তোলবার আগে এ সিঁথে পাথর দিয়ে চেঁচে ফেলতুম। শুভযাত্রা করে লোকে মুখ দেখবে না, শুভকর্মে লোকে ডেকে জিজ্ঞেস করবে না, এ দুটো শুধু-হাত লোকের কাছে বার করতে পারব না, লজ্জায় এ মাথার আঁচল সরাতে পারব না, ছি ছি, সে বাঁচা কি আবার একটা বাঁচা? সেকালে যে পুড়িয়ে মারা ছিল, সে ছিল ঠিক কাজ। পুরুষমানুষে তখন মেয়েমানুষের দুঃখ-কষ্ট বুঝতো, এখন বোঝে না।

নীলাম্বর কহিল, না, তুই বুঝিয়ে দি গে।

বিরাজ বলিল, তা পারি। আর শুধু আমিই কেন, তোমাকে পেয়ে যে-কেউ তোমাকে হারাবে, সেই বুঝিয়ে দিতে পারবে—আমি একলা নয়। যাক, কি সব বকে যাচ্ছি, বলিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আর একবার স্বামীর বুকের উত্তাপ হাত দিয়া অনুভব করিয়া বলিল, গায়ে কোথাও ব্যথা নেই ত?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

বিরাজ বলিল, তবে আর কোন ভয় নেই। আজ আমার ক্ষিদে পেয়েছে—যাই এইবার দুটো রাঁধবার যোগাড় করি গে—সত্যি বলচি তোমাকে, আজ কেউ যদি আমার একখানা হাত কেটে দেয়, তাহলেও বোধ করি রাগ হয় না।

যদু চাকর বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, মা, কবিরাজমশাইকে এখন ডেকে আনতে হবে কি?

নীলাম্বর কহিল, না না, আর আবশ্যক নেই।

যদু তথাপি গৃহিণীর অনুমতির জন্য দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল, না? যা ডেকে নিয়ে আয়, একবার ভাল করে দেখে যান।

দিন-তিনেক পরে আরোগ্যলাভ করিয়া নীলাম্বর বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছিল. মতি মোড়ল আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—দাঠাকুর, তুমি একবার না দেখলে ত আমার ছিমন্ত আর বাঁচে না। একবার পায়ের ধুলো দাও দেব্‌তা, তাহলে যদি এ-যাত্রা সে বেঁচে—। আর সে বলিতে পারিল না—আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

নীলাম্বর জিজ্ঞাসা করিল, গায়ে কি খুব বেশী বেরিয়েচে মতি?

মতি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিতে লাগিল, সে আর কি বলব! মা যেন একেবারে ঢেলে দিয়েচেন। ছোটজাত হয়ে জন্মেচি ঠাকুন্দা, কিছুই ত জানি নে কি করতে হয়—একবার চল, বলিয়া সে দু'পা জড়াইয়া ধরিল।

নীলাম্বর ধীরে ধীরে পা ছাড়াইয়া লইয়া কোমলস্বরে বলিল. কিছু ভয় নেই মতি. তুই যা, আমি পরে যাব।

তাহার কান্নাকাটির কাছে সে নিজের অসুখের কথা বলিতে পারিল না। বিশেষ. সকল রকম রোগের সেবা করিয়া এ বিষয়ে তাহার এত অধিক দক্ষতা জন্মিয়াছিল যে, আশপাশের গ্রামের মধ্যে কাহারও শক্ত অসুখ-বিসুখে তাহাকে একবার না দেখাইয়া, তাহার মুখের আশ্বাস-বাক্য না শুনিয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজনেরা কিছুতেই ভরসা পাইত না। নীলাম্বর এ কথা নিজেও জানিত। ডাক্তার কবিরাজের ঔষধের চেয়ে, দেশের অশিক্ষিত লোকের দল তাহার পায়ের ধুলো, তাহার হাতের জলপড়াকে যে অধিক শ্রদ্ধা করে, ইহা সে বুঝিত বলিয়াই কাহাকেও কোনদিন ফিরাইয়া দিতে পারিত না। মতি চাঁড়াল আর একবার কাঁদিয়া, আর একবার পায়ের ধুলোর দাবী জানাইয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নীলাম্বর উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার দেহ তখনও ঈষৎ দুর্বল ছিল বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। সে ভাবিতে লাগিল, বাড়ির বাহির হইবে কি করিয়া। সে বিরাজকে অত্যন্ত ভয় করিত, তাহার কাছে এ কথা সে মুখে আনিবে কি করিয়া?

ঠিক এই সময়ে ভিতরের উঠান হইতে হরিমতির সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক আসিল. দাদা,—বৌদি ঘরে এসে শুতে বলচে।

নীলাম্বর জবাব দিল না।

মিনিট-খানেক পরেই হরিমতি নিজে আসিয়া হাজির হইল। বলিল, শুনতে পাওনি দাদা?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরিমতি কহিল. সেই চারটি খেয়ে বসে আছ.—বৌদি বলচে. আর বসে থাকতে হবে না, একটু শোও গে।

নীলাম্বর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল. সে কি করচে রে পুঁটি?

হরিমতি কহিল, এইবার ভাত খেতে বসেচে।

নীলাম্বর আদর করিয়া বলিল. লক্ষ্মী দিদি আমার, একটি কাজ করবি?

পঁটি মাথা নাড়িয়া বলিল, করব।

নীলাম্বর কণ্ঠস্বর আরও কোমল করিয়া কহিল, আস্তে আস্তে আমার চাদর আর ছাতিটা নিয়ে আয় দেখি!

চাদর আর ছাতি?

নীলাম্বর কহিল, হুঁ।

হরিমতি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, বাপ রে! বৌদি ঠিক এই দিকে মুখ করে খেতে বসেচে যে!

নীলাম্বর শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, পারবি নে আনতে?

হরিমতি অধর প্রসারিত করিয়া দুই-তিনবার মাথা নাড়িয়া বলিল, না দাদা, দেখে ফেলবে; তুমি শোবে চল।

বেলা তখন প্রায় দুইটা, বাহিরের প্রচণ্ড রৌদ্রের দিকে চাহিয়া সে শুধু-মাথায় পথে বাহির হইবার কথা ভাবিতেও পারিল না, হতাশ হইয়া ছোটবোনের হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। হরিমতি কিছুক্ষণ অনর্গল বকিতে বকিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল। নীলাম্বর চুপ করিয়া মনে মনে নানারূপে আবৃত্তি করিয়া দেখিতে লাগিল, কথাটা ঠিক কি রকম করিয়া পাড়িতে পারিলে খুব সম্ভব বিরাজের করুণা উদ্রেক করিবে।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল। বিরাজ ঘরের শীতল মসৃণ সিমেন্টের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়া মগ্ন হইয়া মামা ও মামীকে চারপাতা-জোড়া পত্র লিখিতেছিল। কি করিয়া এ বাড়িতে শুধুমাত্র মা শীতলার কৃপায় মরা বাঁচিয়াছে, কি করিয়া যে এ যাত্রা সিঁথার সিঁদুর ও হাতের নোয়া বজায় রহিয়া গিয়াছে, লিখিয়া লিখিয়া ক্রমাগত লিখিয়াও সে কাহিনী শেষ হইতেছিল না, এমন সময় খাটের উপর হইতে নীলাম্বর হঠাৎ ডাকিয়া বলিল, একটি কথা রাখবে বিরাজ?

বিরাজ দোয়াতের মধ্যে কলমটা ছাড়িয়া দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, কি কথা?

যদি রাখ ত বলি।

বিরাজ কহিল, রাখবার মত হলেই রাখবো—কি কথা?

নীলাম্বর মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, বলে লাভ নেই বিরাজ, তুমি কথা আমার রাখতে পারবে না।

বিরাজ আর প্রশ্ন করিল না, কলমটা তুলিয়া লইয়া পত্রটা শেষ করিবার জন্য আর একবার ঝুঁকিয়া পড়িল। কিন্তু চিঠিতে মন দিতে পারিল না—ভিতরে ভিতরে কৌতূহলটা তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা বল, আমি কথা রাখব।

নীলাম্বর একটুখানি হাসিল, একটুখানি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে বলিল, দুপুর-বেলা মতি চাঁড়াল এসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরেছিল। তাদের বিশ্বাস, আমার পায়ের ধুলো না পড়লে তার ছিমন্ত বাঁচবে না—আমাকে একবার যেতে হবে।

তাহার মুখপানে চাহিয়া বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, এই রোগা দেহ নিয়ে তুমি যাবে?

কি করব বিরাজ, কথা দিয়েচি—আমাকে একবার যেতেই হবে।

কথা দিলে কেন?

নীলাম্বর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ কঠিনভাবে বলিল, তুমি কি মনে কর, তোমার প্রাণটা তোমার একলার, ওতে কারও কিছু বলবার নেই? তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার?

নীলাম্বর কথাটা লঘু করিয়া ফেলিবার জন্য হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া তাহার হাসি আসিল না। কোনমতে বলিয়া ফেলিল, কিন্তু তার কান্না দেখলে—

বিরাজ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ঠিক ত! তার কান্না দেখলে—কিন্তু আমার কান্না দেখবার লোক সংসারে আছে কি? বলিয়া চারপাতা-জোড়া চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া কুচিকুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল, উঃ! পুরুষমানুষেরা কি চার দিন চার রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে কাটালুম—ও হাতে হাতে তার প্রতিফল দিতে চলল! যমে ঘরে

জ্বর, ঘরে ঘরে বসন্ত—এই রোগা দেহ নিয়ে ও রোগী ঘাঁটতে চলল—আচ্ছা যাও, আমার ভগবান আছেন। বলিয়া আর একবার বালিশে বুক দিয়া উপুড় হইয়া পড়িল।

নীলাম্বরের ওষ্ঠাধরে অতি সূক্ষ্ম, অতি ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল; ধীরে ধীরে বলিল, সে ভরসা কি তোদের আছে বিরাজ যে, কথায় কথায় ভগবানের দোহাই পাড়িস!

বিরাজ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া ক্রোধের স্বরে বলিল, না, ভগবানের উপর ভরসা শুধু তোমাদের একচেটে, আমাদের নয়। আমরা কীর্তন গাইনে, তুলসীর মালা পরিনে, মড়া পোড়াই নে, তাই আমাদের নয়,—একলা তোমাদের।

নীলাম্বর তাহার রাগ দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, রাগ করিস নে বিরাজ, সত্যিই তাই। তুই একা নয়—তোরা সবাই ওই! ভগবানের ওপর ভরসা করে থাকতে যতটা জোরের দরকার ততটা জোর মেয়েমানুষের দেহে থাকে না—তাতে তোর দোষ কি?

বিরাজ আরও রাগিয়া বলিল, না, দোষ কেন, ওটা মেয়েমানুষের গুণ। কিন্তু, গায়ের জোরেই যদি এত দরকার ত বাঘ-ভালুকের গায়েও ত আরও জোর আছে। আর জোর থাক্ ভাল, না থাক্ ভাল, এই রোগী দেহ নিয়ে তোমাকে আমি আর বার হতে দেব না—তা তুমি যত তর্কই কর না কেন।

নীলাম্বর আর কথা কহিল না, চুপ করিয়া শুইয়া রহিল। বিরাজও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া, বেলা গেল—যাই বলিয়া উঠিয়া গেল। ঘণ্টা-খানেক পরে দীপ জ্বালিয়া ঘরে সন্ধ্যা দিতে আসিয়া দেখিল, স্বামী শয্যায় নাই। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া বলিল, পুঁটি, তোর দাদা কৈ রে? যা, বাইরে দেখে আয় ত!

পুঁটি ছুটিয়া চলিয়া গেল, মিনিট-পাঁচেক পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কোথাও নেই—নদীর ধারেও না।

বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ। তার পরে রান্নাঘরের দুয়ারে আসিয়া গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

তিন

বছর-তিনেক পরের কথা বলিতেছি। মাস-দুই পূর্বে হরিমতি শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে; ছোটভাই পীতাম্বর এক বাটীতে থাকিয়াও পৃথগন্ন হইয়াছে। বাহিরের চণ্ডী-মণ্ডপের বারান্দায় সন্ধ্যার ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সেইখানে নীলাম্বর একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। বিরাজ নিঃশব্দে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিয়া বলিল, হঠাৎ বাইরে যে?

বিরাজ একধারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

কি?

বিরাজ বলিল, কি খেলে মরণ হয় বলে দিতে পার?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, হয় বলে দাও, না হয় আমাকে খুলে বল, কেন এমন রোজ রোজ শুকিয়ে যাচ্চ।

শুকিয়ে যাচ্ছি কে বললে?

বিরাজ চোখ তুলিয়া এক মুহূর্ত স্বামীর মুখের পানে চাহিল, তারপরে বলিল, হাঁ গা, কেউ বলে দেবে তবে আমি জানব, এ কি সত্যিই তোমার মনের কথা?

নীলাম্বর একটুখানি হাসিল। নিজের কথাটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, না রে, তা নয়। তবে তোর নাকি বড় ভুল হয়—তাই জিজ্ঞেস কচ্চি, এ কি আর কেউ বলেচে, না নিজেই ঠিক করেচিস?

বিরাজ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন বিবেচনা করিল না। বলিল, কত বললুম তোমাকে পুঁটির আমার অমন জায়গায় বিয়ে দিও না—কিছুতেই কথা শুনলে না। নগদ যা ছিল গেল, আমার গায়ের গয়নাগুলো গেল, বন্দ জোড়ের দরুন ভাগাটা বাঁধা পড়ল, দুখানা বাগান বিক্রি করলে, তার উপর এই দু সন অজন্মা। বল আমাকে, কি করে তুমি জামাইয়ের

পড়ার খরচ মাসে মাসে যোগাবে? একটা কিছু হলেই পুঁটিকে খোঁটা সইতে হবে—সে আমার অভিমানী মেয়ে, কিছুতেই তোমার নিন্দে শুনতে পারবে না—শেষে কি হতে কি হবে ভগবান জানেন—কেন তুমি এমন কাজ করলে?

নীলাম্বর মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, তা ছাড়া পুঁটির ভাল করতে গিয়ে দিনরাত ভেবে ভেবে যে শেষে তুমি আমার সর্বনাশ করবে, সে হবে না। তার চেয়ে এক কাজ কর, দু-পাঁচ বিঘে জমি বিক্রি করে শ-পাঁচেক টাকা যোগাড় করে গলায় কাপড় দিয়ে জামাইয়ের বাপকে বল গে, এই নিয়ে আমাদের রেহাই দিন মশাই, আমরা গরীব, আর পারব না। এতে ভালমন্দ পুঁটির অদৃষ্টে যা হয় তা হোক।

তথাপি নীলাম্বর মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পারবে না বলতে?

নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, পারি, কিন্তু সবই যদি বিক্রি করে ফেলি বিরাজ, আমাদের হবে কি?

বিরাজ বলিল, হবে আবার কি! বিষয় বাঁধা দিয়ে মহাজনের সুদ আর মুখনাড়া সহ্য করার চেয়ে এ ঢের ভালো। আমার একটা ছেলেপিলে নেই যে তার জন্যে ভাবনা—আমরা দুটো প্রাণী—যেমন করে হোক চলে যাবেই। নিতান্ত না চলে, তুমি বোষ্টমঠাকুর ত আছই, আমি না হয় বোষ্টমী হয়ে পড়ব—দু'জনে বৃন্দাবন করে বেড়াব।

নীলাম্বর একটুখানি হাসিয়া বলিল, তুই কি করবি, মন্দিরা বাজাবি?

হুঁ বাজাব। নেহাত না পারি, তোমার ঝুলি বয়ে বেড়াতে পারব ত! তোমার মুখের কৃষ্ণনাম শুনে পশু-পক্ষী স্থির হয়ে দাঁড়াবে, আমাদের দুটো প্রাণীর খাওয়া চলবে না? চল, ঘরে চল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্চিনে।

ঘরে আসিয়া বিরাজ স্বামীর মুখের কাছে প্রদীপ তুলিয়া আনিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া হাসি গোপন করিয়া বলিল, না সাহস হয় না, এমন বোষ্টমটিকে আর পাঁচজন বোষ্টমীর সামনে প্রাণ ধরে বার করতে পারব না—তার চেয়ে এখানে শুকিয়ে মরি সে ভাল।

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, ওরে সেখানে শুধু বোষ্টমীই থাকে না, বোষ্টমও থাকে।

বিরাজ বলিল, তা থাক। একজন দুজন কেন, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ থাক,—বলিয়া প্রদীপটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, আচ্ছা, শুনি সংসারে সতী অসতী দুই-ই আছে—অসতী মেয়েমানুষ কখন চোখে দেখিনি—আমার বড় দেখতে সাধ হয়, তারা কি রকম! ঠিক আমাদের মত, না আর কোন রকম! তারা কি করে, কি ভাবে, কি খায়, কেমন করে শুয়ে ঘুমায়—এ-সব আমার দেখতে ইচ্ছে করে। আচ্ছা, তুমি দেখেচ?

নীলাম্বর বলিল, দেখেচি।

দেখেচ? আচ্ছা, এই আমি যেমন করে বসে কথা কইচি তারা কি এমনি করে বসে যার-তার সঙ্গে কথা কয়?

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তা বলতে পারিনে—আমি ততটা দেখিনি।

বিরাজ ক্ষণকাল নির্নিমেষ চোখে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া তাহার সর্বশরীর বারংবার শিহরিয়া উঠিল।

নীলাম্বর দেখিতে পাইয়া বলিল, ও কি রে?

বিরাজ বলিল, উঃ, কি—তারা! দুর্গা! দুর্গা! সন্ধ্যেবেলা কি কথা উঠে পড়ল—কৈ সন্ধ্যে করলে না?

নীলাম্বর বলিল, এই উঠি।

হাঁ যাও, হাত-পা ধুয়ে এস, আমি এই ঘরেই আসন পেতে ঠাঁই করে দিচ্চি।

দিন পাঁচ-ছয় পরে রাত্রি দশটার সময় নীলাম্বর বিছানায় শুইয়া শুইয়া চোখ বুজিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া ধূমপান করিতেছিল। বিরাজ সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া শুইবার

পূর্বে মেঝেয় বসিয়া নিজের জন্য খুব বড় করিয়া একটা পান সাজিতে সাজিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, শাস্তরের কথা কি সমস্ত সত্যি?

নীলাম্বর নলটা একপাশে রাখিয়া স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, শাস্ত্রের কথা সত্যি নয় ত কি মিথ্যে?

বিরাজ বলিল, না, মিথ্যে বলচি নে, কিন্তু সেকালের মত একালেও কি সব ফলে?

নীলাম্বর মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, আমি পণ্ডিত নই বিরাজ, সব কথা জানিনে, কিন্তু আমার মনে হয় যা সত্যি, তা সেকালেও সত্যি, একালেও সত্যি।

বিরাজ বলিল, আচ্ছা মনে কর সাবিত্রী-সত্যবানের কথা। মরা স্বামীকে সে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে এনেছিল, এ কি সত্যি হতে পারে?

নীলাম্বর বলিল, কেন পারে না? যিনি তাঁর মত সতী, তিনি নিশ্চয়ই পারেন।

তা হলে আমিও ত পারি?

নীলাম্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, তুই কি তাঁর মত সতী নাকি? তাঁরা হলেন দেবতা।

বিরাজ পানের বাটাটা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, হলেনই বা দেবতা! সতীত্বে আমিই বা তাঁর চেয়ে কম কিসে? আমার মত সতী সংসারে আরও থাকতে পারে, কিন্তু মনে-জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে, এ কথা মানিনে। আমি কারও চেয়ে একতিল কম নই, তা তিনি সাবিত্রীই হ'ন আর যেই হ'ন।

নীলাম্বর জবাব দিল না, তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। বিরাজ প্রদীপ সুমুখে আনিয়া পান সাজিতেছিল, তাহার মুখের উপরে সমস্ত আলোটাই পড়িয়াছিল, সেই আলোকে নীলাম্বর স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কি এক রকমের আশ্চর্য দ্যুতি বিরাজের দুই চোখের ভিতর হইতে ঠিক্‌রিয়া পড়িতেছে। নীলাম্বর কতকটা ভয়ে ভয়ে বলিয়া ফেলিল, তা হলে তুমিও পারবে বোধ হয়।

বিরাজ উঠিয়া আসিয়া হেঁট হইয়া স্বামীর দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, এই আশীর্বাদ কর, যদি জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত এই দুটি পা ছাড়া সংসারে আর কিছু না জেনে থাকি, যদি যথার্থ সতী হই, তবে যেন অসময়ে তাঁর মতই তোমাকে ফিরিয়ে আনতে পারি—তার পরে, এই পায়ে মাথা রেখে যেন মরি—যেন এই সিঁদুর এই নোয়া নিয়েই চিতায় শুতে পাই।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হয়েচে রে বিরাজ, আজ?

বিরাজের দুই চোখে জল টলটল করিতেছিল, তৎসত্ত্বেও তাহার ওষ্ঠাধরে অতি মৃদু অতি মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিল, আর একদিন শুনো, আজ নয়। আজ শুধু আশীর্বাদ কর, মরণকালে যেন এই দুই পায়ের ধুলো পাই, যেন তোমার কোলে মাথা রেখে তোমার মুখের পানে চেয়ে মরতে পারি।

সে আর বলিতে পারিল না। এইবার তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল।

নীলাম্বর ভয় পাইয়া তাহাকে জোর করিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, কি হয়েচে রে আজ? কেউ কিছু বলেচে কি?

বিরাজ স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল; জবাব দিল না।

নীলাম্বর পুনরায় কহিল, কোনদিন ত তুই এমন করিস নি বিরাজ—কি হয়েচে, বল্‌!

বিরাজ গোপনে চক্ষু মুছিল, কিন্তু মুখ তুলিল না। মৃদুকণ্ঠে বলিল, আর একদিন শুনো।

নীলাম্বর আর পীড়াপীড়ি করিল না, তেমনই ভাবে বসিয়া থাকিয়া তাহার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি-চালনা করিয়া নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে লাগিল। সে ক্ষমতার অতিরিক্ত খরচপত্র করিয়া ভগিনীর বিবাহ দিয়া কিছু জড়াইয়া পড়িয়াছিল। সংসারে আর পূর্বের সচ্ছলতা ছিল না। উপর্যুপরি দুই সন অজন্মা; গোলায় ধান নাই, পুকুরে জল নাই, মাছ নাই—কলাবাগান শুকাইয়া উঠিতেছে, লেবুবাগানের কাঁচা লেবু ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার উপর উত্তমর্ণেরা আসা-যাওয়া শুরু করিয়াছিল এবং পুঁটির শ্বশুরও ছেলের পড়ানোর খরচের জন্য মিঠেকড়া চিঠি পাঠাইতেছিলেন। এত কথা বিরাজ জানিত না। অনেক অপ্রীতিকর সংবাদই নীলাম্বর প্রাণপণে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এখন সে উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, বুঝি এই সমস্ত কথাই কেহ বিরাজকে শুনাইয়া গিয়াছে।

সহসা বিরাজ মুখ তুলিয়া ঈষৎ হাসিল; কহিল, একটি কথা জিজ্ঞেস করব, সত্যি জবাব দেবে?

নীলাম্বর মনে মনে অধিকতর শঙ্কিত হইয়া বলিল, কি কথা?

বিরাজের সমস্ত সৌন্দর্যের বড় সৌন্দর্য ছিল তার মুখের হাসি। সে সেই হাসি আর একবার হাসিয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, আমি কালো-কুচ্ছিত নই ত?

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

যদি কালো-কুচ্ছিত হতুম, তাহলে আমাকে কি ক'রে এত ভালবাসতে?

এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনিয়া যদিও সে কিছু বিস্মিত হইল, তথাপি একটা গুরুতর ভার তাহার বুকের উপর হইতে যেন সহসা গড়াইয়া পড়িয়া গেল।

সে খুশী হইয়া বলিল, ছেলেবেলা থেকে একটি পরমা সুন্দরীকেই ভালবেসে এসেছি —কি করে বলব এখন, সে কালো-কুচ্ছিত হলে কি করতুম?

বিরাজ দুই বাহুদ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আরও সন্নিকটে মুখ আনিয়া কহিল, আমি বলব? তা হলেও তুমি আমাকে এমনই ভালবাসতে।

তথাপি নীলাম্বর নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, তুমি ভাবচ, কি করে জানলুম?—না?

এবার নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল, ঠিক তাই ভাবচি—কি করে জানলে।

বিরাজ গলা ছাড়িয়া দিয়া বুকের একধারে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িয়া উপর দিকে চাহিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার মন বলে দেয়। আমি তোমাকে যত চিনি, তুমি নিজেও নিজেকে তত চেন না। তাই জানি, আমাকে তুমি এমনই ভালই বাসতে। যা অন্যায়, যাতে পাপ হয়, এমন কাজ তুমি কখন করতে পার না—স্ত্রীকে ভাল না বাসা অন্যায়. তাই আমি জানি, যদি আমি কানা-খোঁড়াও হতুম, তবুও তোমার কাছে এমনই আদরই পেতুম।

নীলাম্বর জবাব দিল না।

বিরাজ একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া সহসা হাত বাড়াইয়া আন্দাজ করিয়া চোখের কোণে আঙুল দিয়া বলিল, জল কেন?

নীলাম্বর তাহার হাতটি সযত্নে সরাইয়া দিয়া ভারী গলায় বলিল, জানলে কি করে?

বিরাজ বলিল, ভুলে যাও কেন যে, আমার ন'বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। ভুলে যাও কেন যে তোমাকে পেয়ে তবে তোমাকে পেয়েচি। নিজের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পাও না যে, আমিও ঐ সঙ্গে মিশে আছি?

নীলাম্বর কথা কহিল না। আবার তাহার নিমীলিত চোখের দুই কোণ বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিরাজ উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া তাহা সযত্নে মুছাইয়া দিয়া গাঢ়স্বরে বলিল. ভেব না, মা মরণকালে তোমার আমার হাতে পুঁটিকে দিয়ে গিয়েছেন. সেই পুঁটির ভাল হবে বলে যা ভাল বুঝেচ তাই করেচ—স্বর্গে থেকে মা আমাদের আশীর্বাদ করবেন। তুমি শুধু এখন সুস্থ হও, ঋণমুক্ত হও—যদি সর্বস্ব যায় তাও যাক।

নীলাম্বর চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধস্বরে কহিল, তুই জানিস নে বিরাজ, আমি কি করেচি—আমি তোর—

বিরাজ বলিতে দিল না। মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, সব জানি আমি। আর জানি, না জানি, ভেবে ভেবে তোমাকে আমি রোগা হতে দিতে যে পারব না সেটা নিশ্চয় জানি। না, সে হবে না—যার যা পাওনা দিয়ে দাও, দিয়ে নিশ্চিন্ত হও, তার পরে মাথার ওপর ভগবান আছেন, পায়ের নীচে আমি আছি।

নীলাম্বর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

চার

আরও ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। হরিমতির বিবাহের পূর্বেই ছোটভাই বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইয়াছিল, নীলাম্বরের নিজের ভাগে যাহা পড়িয়াছিল তাহার কিয়দংশে

সেই সময়েই বাঁধা দিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল—বলা বাহুল্য, পীতাম্বর এক কপর্দক দিয়াও সাহায্য করে নাই। অবশিষ্ট জমিজমা যাহা ছিল তাহাই একটির পর একটি বন্ধক দিয়া নীলাম্বর বিবাহের শর্ত পালন করিয়া ভগিনীপতির পড়ার খরচ যোগাইতে লাগিল এবং সংসার চালাইতে লাগিল। এইরূপে দিন দিন নিজেকে সে ক্রমাগত শক্ত করিয়া জড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু মমতাবশে কোনমতেই পৈতৃক সম্পত্তি একেবারে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিল না। আজ বৈকালে ও-পাড়ার ভোলানাথ মুখুয্যে আসিয়া বাকী সুদের জন্য কয়েকটা কথা কড়া করিয়াই বলিয়া গিয়াছিল, আড়ালে দাঁড়াইয়া বিরাজ তাহা সমস্তই শুনিল এবং নীলাম্বর ঘরে আসিতেই, সে রান্নাঘর হইতে নিঃশব্দে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের পানে চাহিয়াই নীলাম্বর মনে মনে প্রমাদ গণিল। ক্ষোভে অপমানে বিরাজের বুকের ভিতরটা হুহু করিয়া জ্বলিতেছিল। কিন্তু সে ভাব সংযত করিয়া হাত দিয়া খাট দেখাইয়া দিয়া প্রশান্ত-গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, ঐখানে ব'স।

নীলাম্বর শয্যার উপর বসিতেই সে নীচে পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল, হয় আমাকে ঋণমুক্ত কর, না হয়, আজ তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করব।

নীলাম্বর বুঝিল, সে সমস্ত শুনিয়াছে, তাই অত্যন্ত ভয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখে হাত চাপা দিয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া তুলিয়া পাশে বসাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, ছি বিরাজ, সামান্যতেই আত্মহারা হ'সনে।

বিরাজ মুখের উপর হইতে তাহার হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিল, এতেও মানুষ আত্মহারা না হয়, কিসে হয় বল শুনি।

নীলাম্বর কি জবাব দিবে হঠাৎ খুঁজিয়া পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও।

নীলাম্বর মৃদুকণ্ঠে বলিল, জবাব দেবার কিছুই নেই বিরাজ, কিন্তু—

বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না, কিন্তুতে হবে না। আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে লোকে তোমাকে অপমান করে যাবে, কানে শুনে আমি সহ্য করে থাকব—এ ভরসা মনে ঠাঁই দিও না। হয় তার উপায় কর, না হয় আমি আত্মঘাতী হব।

নীলাম্বর ভয়ে ভয়ে কহিল, একদিনেই কি উপায় করব বিরাজ?

বেশ, দুদিন পরে কি উপায় করবে, তাই আমাকে বুঝিয়ে বল।

নীলাম্বর পুনরায় মৌন হইয়া রহিল।

বিরাজ বলিল, একটা অসম্ভব আশা করে নিজেকে ভুল বুঝিয়ো না—আমার সর্বনাশ ক'রো না! যত দিন যাবে ততই বেশী জড়িয়ে পড়বে, দোহাই তোমার, আমি ভিক্ষে চাইচি—তোমার দুটি পায়ে ধরছি, এই বেলা যা হয় একটা পথ কর।—বলিতে বলিতে তাহার অশ্রুভারে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ভুলু মুখুয্যের কথাগুলো তাহার বুকের ভিতরে শূল হানিতে লাগিল।

নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিল, অধীর হলে কি হবে বিরাজ? একটা বছর যদি ষোল আনা ফসল পাই, বার আনা বিষয় উদ্ধার করে নিতে পারব। কিন্তু বিক্রি করে ফেললে আর ত হবে না সেটা ভেবে দেখ!

বিরাজ আর্দ্রস্বরে বলিল, দেখচি; আসচে বছরেই যে ষোল আনা ফসল পাবে, তারই বা ঠিকানা কি? তার ওপর সুদ আছে, লোকের গঞ্জনা আছে। আমি সব দুঃখ সইতে পারি, কিন্তু তোমার অপমান ত সইতে পারিনে।

নীলাম্বর নিজে তাহা বেশ জানিত, তাই কথা কহিতে পারিল না।

বিরাজ পুনরায় কহিল, শুধু এই কি আমার সমস্ত দুঃখ? দিবারাত্রি ভেবে ভেবে তুমি আমার চোখের সামনে শুখিয়ে উঠচ, এমন সোনার মূর্তি কালি হয়ে যাচ্চে। আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে তুমিই বল, এও সহ্য করবার ক্ষমতা কি আমার আছে? আর কতদিন যোগীনের পড়ার খরচ যোগাতে হবে?

আরও একটা বছর। তা হলেই সে ডাক্তার হতে পারবে।

বিরাজ একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, পুঁটিকে মানুষ করেচি—সে আমার রাজরানী হোক, কিন্তু সে হতে আমার এত দুঃখ ঘটবে জানলে, ছোটবেলায় তাকে নদীতে ভাসিয়ে

দিতুম। এমন করে নিজের মাথায় বাজ হানতুম না। হা ভগবান! বড়লোক তারা, কোন কষ্ট, কোন অভাব নেই, তবুও জোঁকের মত আমার রক্ত শুষে নিতে তাদের এতটুকুও দয়া-মায়া হচ্চে না!—বলিয়া একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিবার পরে বিরাজ মুখ তুলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, চারিদিকে অভাব, চারিদিকে আকাল, গরীব-দুঃখীরা ত এরই মধ্যে কেউ উপোস, কেউ একবেলা খেতে শুরু করেচে, এমন দুঃসময়েও আমরা পরের ছেলে মানুষ করব কেন? পুঁটির শ্বশুরের অভাব নেই, সে বড়লোক; সে যদি নিজের ছেলেকে না পড়াতে পারে, আমরা পড়াব কেন? যা হয়েচে তা হয়েচে, তুমি আর ধার করতে পাবে না।

নীলাম্বর অতিকষ্টে শুষ্কহাসি ওষ্ঠপ্রান্তে টানিয়া আনিয়া বলিল, সব বুঝি বিরাজ, কিন্তু শালগ্রাম সুমুখে রেখে শপথ করেচি যে! তার কি হবে?

বিরাজ তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, কিছু হবে না। শালগ্রাম যদি সত্যিকারের দেবতা হন, তিনি আমার কষ্ট বুঝবেন। আর আমি ত তোমারই অর্ধেক, যদি কিছু এতে পাপ হয়, আমি আমার নিজের মাথায় নিয়ে জন্ম জন্ম নরকে ডুবে থাকব; তোমার কিছু ভয় নেই—তুমি আর ঋণ ক'রো না।

নীলাম্বর কাতরদৃষ্টিতে একটিবার মাত্র স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া পরক্ষণেই নিরুপায়ের মত মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। ধর্মপ্রাণ স্বামীর অন্তরের নিদারুণ দুঃখের লেশমাত্রও তাহার অগোচর ছিল না। কিন্তু সে আর সহিতে পারিতেছিল না। যথার্থই স্বামী তাহার সর্বস্ব ছিল। সেই স্বামীর অহর্নিশি চিন্তাক্লিষ্ট শুষ্ক অবসন্ন মুখের পানে চাহিয়া তাহার বুক ফাটিতেছিল। এতক্ষণ কোনমতে সে কান্না চাপিয়া কথা কহিতেছিল, আর পারিল না। সবেগে স্বামীর বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর তাহার দক্ষিণ হস্ত বিরাজের মাথার উপরে রাখিয়া নির্বাক্ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ কান্নার পরে তাহার দুঃখের অসহ তীব্রতা মন্দীভূত হইয়া আসিলে সে তেমনই মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ছেলেবেলা থেকে যতদূর আমার মনে পড়ে, কোন দিন তোমার মুখ শুক্‌নো দেখিনি, কোন দিন তোমার মুখ ভার করতে দেখিনি; এখন তোমার পানে চাইলেই আমার বুকের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বলতে থাকে—তুমি নিজের পানে না চাও, আমার দিকে একবার চেয়ে দেখ! সত্যই কি শেষকালে আমাকে পথের ভিখারিণী করবে? সে কি তুমিই সইতে পারবে?

নীলাম্বর তথাপি উত্তর দিতে পারিল না, অন্যমনস্কের মত তাহার চুলগুলি লইয়া ধীরে ধীরে নাড়িতে লাগিল। এমনি সময়ে দ্বারের বাহিরে পুরানো ঝি সুন্দরী ডাকিয়া বলিল, বৌমা, উনুন জেবলে দেব কি?

বিরাজ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী পুনরায় কহিল, উনুন জেবলে দেব?

বিরাজ অস্পষ্টস্বরে বলিল, দে, তোদের জন্যে রাঁধতে হবে, আমি আর কিছু খাব না।

ঝি বড় গলায় নীলাম্বরকে শুনাইয়া বলিল, তুমি কি মা, তবে রাত্তিরে খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে? না খেয়ে খেয়ে যে একেবারে আধখানি হয়ে গেলে!

বিরাজ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া রান্নাঘরের দিকে লইয়া গেল।

জ্বলন্ত উনুনের আলো বিরাজের মুখের উপর পড়িয়াছিল। অদূরে বসিয়া সুন্দরী হাঁ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া ছিল। হঠাৎ বলিল, সত্যি কথা মা, তোমার মত রূপ আমি মানুষের কখন দেখিনি—এত রূপ রাজা-রাজড়ার ঘরেও নেই।

বিরাজ তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ বিরক্তভাবে বলিল, তুই রাজারাজড়ার ঘরের খবর রাখিস?

সুন্দরীর বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপসী বলিয়া তাহারও এক সময় খ্যাতি ছিল, সে খ্যাতি আজিও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই।

সে বলিত, কবে তাহার বিবাহ হইয়াছিল, কবে বিধবা হইয়াছিল, কিছুই মনে পড়ে না, কিন্তু সধবার সৌভাগ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় নাই। তাহাদের গ্রাম কৃষ্ণপুরে এ

সুখ্যাতিও তাহার ছিল। এখন হাসিয়া বলিল, রাজারাজড়ার ঘরের খবর রাখি বৈ কি মা! না হলে সেদিন তাকে ঝাঁটাপেটা কত্তুম।

এবার বিরাজ রীতিমত রাগ করিল, বলিল, তুই যখন তখন ঐ কথাই বলিস কেন সুন্দরী? তাদের যা খুশি বলেচে, তাতে তুই বা ঝাঁটাপেটা করবি কেন? আর আমাকেই বা নাহ'ক শোনাবি কেন? উনি রাগী মানুষ, শুনলে কি বলবেন বল ত?

সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, বাবু শুনবেন কেন মা? এও কি একটা কথার মত কথা!

কথার মত কথা নয়, সে কথা কি তুই আমাকে বুঝিয়ে বলবি? তা ছাড়া যা হয়ে বয়ে চুকে শেষ হয়ে গেছে, সে কথা তোলবার দরকারই বা কি?

সুন্দরী খপ করিয়া বলিল, কোথায় চুকেবুকে শেষ হয়েচে মা? কালও যে আমাকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে—

বিরাজ রাগিয়া উঠিল। বলিল, তুই গেলি কেন? তুই আমার কাছে চাকরি করবি, আর যে ডাকবে তার কাছে ছুটে যাবি? তুই নিজে না বললি সেদিন তাঁরা সব কলকাতায় চলে গেছেন?

সুন্দরী বলিল, সত্যি কথাই বলেছিলুম মা। মাস-দুই তাঁরা চলে গিয়েছিলেন, আবার দেখচি সব এসেচেন। আর যাবার কথা যদি বললে মা, পিয়াদা ডাকতে এলে, না বলি কি করে? তাঁরা এ মুল্লুকের জমিদার, আমরা দুঃখী প্রজা—হুকুম অমান্যি করি কি ভরসায়?

বিরাজ ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তাঁরা এ মুল্লুকের জমিদার নাকি?

সুন্দরী সহাস্যে বলিল, হাঁ মা, এ মহালটা তাঁরাই কিনেচেন—বাবু তাঁবু খাটিয়ে আছেন—তা সত্যি মা, রাজপুত্তুর ত রাজপুত্তুর! কিবা মুখ চোখের—

বিরাজ সহসা থামাইয়া দিয়া বলিল, থাম্ থাম্, চুপ কর্। ও-সব কথা তোকে জিজ্ঞেস করিনি—কি তোকে বললে, তাই বল।

সুন্দরী এবার মনে মনে বিরক্ত হইল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, কি কথা আর হবে মা, কেবল তোমারই কথা।

বিরাজ 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

এইবার কথাটা বুঝাইয়া বলি। বছর-দুই পূর্বে এই মহালটা কলিকাতার এক জমিদারের হস্তগত হয়; তাঁহার ছোটছেলে রাজেন্দ্রকুমার অতিশয় অসচ্চরিত্র এবং দুর্দান্ত। পিতা তাহাকে কাজকর্মে কতকটা শিক্ষিত ও সংযত করিতে এবং বিশেষ করিয়া কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করিবার অভিপ্রায়েই কাছাকাছি কোন একটা মহালে প্রেরণ করিতে চাহেন। গত বৎসর সে এইখানে আসে। রীতিমত কাছারি-বাটী না থাকায়, সে সপ্তগ্রামের পরপারে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা আমবাগানে তাঁবু ফেলিয়া বাস করিতেছিল। আসিয়া অবধি একটি দিনের জন্যও সে কাজকর্ম শিখিবার ধার দিয়া চলে না। পাখি শিকার করিতে ভালবাসিত, হুইস্কির ফ্লাস্ক পিঠে বাঁধিয়া বন্দুক ও চার-পাঁচটা কুকুর লইয়া সমস্ত দিন নদীর ধারে বনে বনে পাখি মারিয়া বেড়াইত। এই অবস্থায় মাস-ছয়েক পূর্বে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোধূলির স্বর্ণাভামণ্ডিত সিক্তবসনা বিরাজের উপর তাহার চক্ষু পড়ে। বিরাজের এই ঘাটটি চারিদিকের বড় বড় গাছে আবৃত থাকায় কোন দিক হইতে দেখা যাইত না। বিরাজ নিঃশঙ্কচিত্তে গা ধুইয়া পূর্ণ-কলস তুলিয়া লইয়া উপর দিকে চক্ষু তুলিতেই এই অপরিচিত লোকটির সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল। রাজেন্দ্র পাখির সন্ধান করিতে করিতে এদিকে আসিয়াছিল, অদূরস্থিত সমাধিস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া সে বিরাজকে দেখিল। মানুষের এত রূপ হয়, সহসা এ কথাটা যেন সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু, আর সে চোখ ফিরাইতেও পারিল না। অপলকদৃষ্টিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই অতুল্য অপরিসীম রূপরাশি বিভোর হইয়া দেখিতে লাগিল। বিরাজ আর্দ্রবসনে কোনমতে লজ্জা নিবারণ করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রাজেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে গেল, কেমন করিয়া এমন সম্ভব হইল। এই অরণ্যপরিবৃত, ভদ্রসমাজ-পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের মধ্যে এত রূপ কেমন করিয়া কি করিয়া আসিল! এই অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্যময়ীর পরিচয় সে সন্ধান করিয়া

সেই রাত্রেই জানিয়া লইল এবং তখন হইতেই এই একমাত্র চিন্তা ব্যতীত তাহার আর দ্বিতীয় চিন্তা রহিল না। ইহার পরে আরও দুইবার বিরাজের চোখে চোখে পড়িয়াছিল।

বিরাজ বাড়িতে আসিয়া সুন্দরীকে ডাকিয়া বলিল, যা' ত সুন্দরী, ঘাটের ধারে কে একটা লোক পীরস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, মানা করে দি গে, যেন আর কোনদিন আমাদের বাগানে না ঢোকে।

সুন্দরী মানা করিতে আসিল, কিন্তু নিকটে আসিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া বলিল, বাবু আপনি!

রাজেন্দ্র সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে চেন নাকি?

সুন্দরী বলিল, আজ্ঞে হাঁ বাবু, আপনাকে আর কে না চেনে?

আমি কোথায় থাকি, জান?

সুন্দরী কহিল, জানি।

রাজেন্দ্র বলিল, আজ একবার ওখানে আসতে পার?

সুন্দরী সলজ্জহাস্যে মুখ নীচু করিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কেন বাবু?

দরকার আছে, একবার যেও, বলিয়া রাজেন্দ্র বন্দুক কাঁধে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর অনেকবার সুন্দরী গোপনে ও নিভৃতে ওপারের জমিদারী কাছারিতে গিয়াছে, অনেক কথা বিরাজের সমক্ষে উত্থাপন করিতে সাহস করে নাই। সুন্দরী নির্বোধ ছিল না; সে বিরাজবৌকে চিনিত। বাহিরে হইতে এই বধূটিকে যতই মধুর এবং কোমল দেখাক না কেন, ভিতরের প্রকৃতি যে তাহার উগ্র এবং পাথরের মত কঠিন ছিল, সুন্দরী তাহা ঠিক জানিত। বিরাজের দেহে আরও একটা বস্তু ছিল, সে তাহার অপরিমেয় সাহস। তা সে মানুষ বলেই হোক, আর সাপখোপ, ভূতপ্রেতই হোক—ভয় কাহাকে বলে ইহা সে একেবারেই জানিত না। সুন্দরী কতকটা সে কারণেও এতদিন তাহার মুখ খুলিতে পারে নাই।

বিরাজ উনুনের কাষ্ঠটা ঠেলিয়া দিয়া ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, আচ্ছা সুন্দরী, তুই ত অনেকবার সেখানে গিয়েছিস এসেছিস, অনেক কথাও কয়েচিস, কিন্তু আমাকে ত একটি কথাও বলিস নি?

সুন্দরী প্রথমটা কিছু হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া কহিল, কে তোমাকে বললে মা, আমি অনেক কথা কয়ে এসেচি?

বিরাজ বলিল, কেউ বলেনি, আমি নিজেই জানি। আমার কপালের পেছনে আরও দুটো চোখ-কান আছে। বলি, কাল ক'টাকা বকশিশ নিয়ে এলি? দশ টাকা?

সুন্দরী বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার মুখের উপরে একটা পাণ্ডুর ছায়া পড়িল, উনুনের অস্পষ্ট আলোকেও বিরাজ তাহা দেখিল এবং সে যে কথা খুঁজিয়া পাইতেছে না তাহাও বুঝিল।

ঈষৎ হাসিয়া বলিল, সুন্দরী, তোর বুকের পাটা এত বড় হবে না যে, তুই আমার কাছে মুখ খুলবি; কিন্তু, কেন মিছে আনাগোনা করে, টাকা খেয়ে শেষে বড়লোকের কোপে পড়বি? কাল থেকে এ বাড়িতে আর ঢুকিস নে। তোর হাতের জল পায়ে ঢালতেও আমার ঘেন্না করে। এতদিন তোর সব কথা জানতুম না, দুদিন আগে তাও শুনেচি। কিন্তু যা, আঁচলে যে দশ টাকার নোট বাঁধা আছে, ফিরিয়ে দি গে, দিয়ে দুঃখী মানুষ দুঃখ-ধান্দা করে খে গে। নিজে বয়সকালে যা করেচিস, সে ত আর ফিরবে না, কিন্তু আর পাঁচজনের সর্বনাশ করতে যাসনে।

সুন্দরী কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার জিভ মুখের মধ্যে আড়ষ্ট হইয়া রহিল।

বিরাজ তাহাও দেখিল; দেখিয়া বলিল, মিথ্যে কথা বলে আর কি হবে? এ-সব কথা আমি কাউকে বলব না। তোর আঁচলে বাঁধা নোট কোথা থেকে এল, সে কথা আমি আগে বুঝিনি, কিন্তু, এখন সব বুঝতে পাচ্ছি। যা, আজ থেকে তোকে আমি জবাব দিলুম—কাল আর আমার বাড়ি ঢুকিস নে।

এ কি কথা! নিদারুণ বিস্ময়ে সুন্দরী বাক্‌শূন্য হইয়া বসিয়া রহিল। এ বাটীতে তাহার কাজ গেল, এমন অসম্ভব কথা সে মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতেও পারিল না।

সে যে অনেক দিনের দাসী! সে বিরাজের বিবাহ দিয়াছে, হরিমতিকে মানুষ করিয়াছে, গৃহিণীর সহিত তীর্থদর্শন করিয়া আসিয়াছে—সেও যে এ বাটীর একজন। আজ তাহাকেই বিরাজবৌ বাটীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল! ক্ষোভ এবং অভিমান তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল—একমুহূর্তে বড় রকমের জবাবদিহি, কত রকমের কথা তাহার জিহ্বাগ্রে পর্যন্ত ছুটিয়া আসিল, কিন্তু মুখ দিয়া শব্দ করিতে পারিল না—বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

বিরাজ মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু সেও কথা কহিল না। মুখ ফিরাইয়া দেখিল, হাঁড়ির জল কমিয়া গিয়াছে। অদূরে একটা পিত্তলের কলসীতে জল ছিল, ঘটি লইয়া তাহার কাছে আসিল; কিন্তু কি ভাবিয়া একমুহূর্ত স্থির হইয়া থাকিয়া ঘটিটা রাখিয়া দিয়া বলিল, না, তোর হাতের জল ছুঁলে ওঁর অকল্যাণ হবে—তুই ঐ হাত দিয়ে টাকা নিয়েচিস।

সুন্দরী এ তিরস্কারেও উত্তর দিতে পারিল না।

বিরাজ আর একটা প্রদীপ জ্বালিয়া কলসীটা তুলিয়া লইয়া এই রাত্রে সূচীভেদ্য অন্ধকার আমবাগানের ভিতর দিয়া একা নদীতে জল আনিতে চলিয়া গেল।

বিরাজ চলিয়া গেল, সুন্দরীর একবার মনে হইল সেও পিছনে যায়, কিন্তু সেই অন্ধকারে সঙ্কীর্ণ বনপথ, চারিদিকের প্রাচীর, সপ্তগ্রামের জানা-অজানা সমাধিস্তূপ, ঐ পুরাতন বটবৃক্ষ—সমস্ত দৃশ্যটা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইবামাত্র তাহার সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল। সে অস্ফুটস্বরে 'মা গো' বলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

পাঁচ

দিন-দুই পরে নীলাম্বর বলিল, সুন্দরীকে দেখ্‌চি নে কেন বিরাজ?

বিরাজ বলিল, আমি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর পরিহাস মনে করিয়া বলিল, বেশ করেচ। বল না কি হয়েচে তার?

বিরাজ বলিল, কি আবার হবে, আমি সত্যিই তাকে ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর তথাপি কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অতিশয় বিস্মিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, তাকে ছাড়িয়ে দেবে কি করে? আর সে যত দোষই করুক, কতদিনের পুরনো লোক তা জান? কি করেছিল সে?

বিরাজ বলিল, ভাল বুঝেচি, তাই ছাড়িয়ে দিয়েচি।

নীলাম্বর বিরক্ত হইল, বলিল, কিসে ভাল বুঝলে তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।

বিরাজ স্বামীর মনের ভাব বুঝিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আমি ভাল বুঝেচি—ছাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি ভাল বুঝ, ফিরিয়ে আন গে।—বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

নীলাম্বর বুঝিল বিরাজ রাগিয়াছে, আর কোন কথা কহিল না। সে ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরের দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু ছাড়িয়ে যে দিলে, কাজ করবে কে?

এবার বিরাজ মুখ ফিরাইয়া হাসিল। তাহার পরে বলিল, তুমি।

নীলাম্বর হাসিয়া বলিল, তবে দাও এঁটো বাসনগুলো মেজে ধুয়ে আনি।

বিরাজ হাতের খুন্তিটা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া হাত ধুইয়া কাছে আসিয়া পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া বলিল, যাও তুমি এখান থেকে। একটা তামাশা করবার জো নেই—তা হলেই এমন কথা বলে বসবে যে, কানে শুনলে পাপ হয়।

নীলাম্বর অপ্রতিভ হইয়া বলিল, এও কানে শুনলে পাপ হয়? তোর পাপ যে কিসে হয় না, তা ত বুঝিনে বিরাজ?

বিরাজ বলিল, তুমি সব বোঝ। না বুঝলে এত কাজ থাকতে এঁটো বাসনের কথা তুলতে না—যাও, আর বেলা ক'রো না, স্নান করে এসো—আমার রান্না হয়ে গেছে।

নীলাম্বর চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, সত্যি কথা বিরাজ, সংসারের কাজ-কর্ম করবে কে?

বিরাজ চোখ তুলিয়া বলিল, কাজ আবার কোথায়? পুঁটি নেই, ঠাকুরপোরা নেই, আমিই ত কাজের অভাবে সারাদিন বসে কাটাই। বেশ ত, কাজ যখন আটকাবে তখন তোমাকে জানাব।

নীলাম্বর বলিল, না বিরাজ, সে হবে না, দাসী-চাকরের কাজ আমি তোমায় করতে দিতে পারব না। সুন্দরী কোন দোষ করেনি, শুধু খরচ বাঁচাবার জন্য তুমি তাকে সরিয়েচ, বল সত্যি কিনা?

বিরাজ বলিল, না সত্যি নয়! সে যথার্থই দোষ করেচে।

কি দোষ?

তা আমি বলব না। যাও, আর বসে থেক না, স্নান করে এসো।—বলিয়া বিরাজও দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া নীলাম্বরকে এইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, কৈ গেলে না? এখনও বসে আছ যে?

নীলাম্বর মৃদুস্বরে বলিল, যাই—কিন্তু, বিরাজ, এ ত আমি সইতে পারব না, তোমাকে উঞ্ছবৃত্তি করতে দেব কি করে?

কথাটা শুনিয়া বিরাজ খুশী হইল না। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কি করবে শুনি?

সুন্দরীকে না চাও আর কোন লোক রাখি—তুমি একাই বা থাকবে কি করে?

যেমন করেই থাকি না কেন, আমি আর লোক চাইনে।

নীলাম্বর বলিল, না, সে হবে না। যতক্ষণ সংসারে আছি ততদিন মান-অপমানও আছে; পাড়ার লোকে শুনলে কি বলবে?

বিরাজ অদূরে বসিয়া পড়িয়া বলিল, পাড়ার লোকে শুনলে কি বলবে এইটাই তোমার আসল ভয়। আমি কি করে থাকব, আমার দুঃখ-কষ্ট হবে, এ কেবল তোমার একটা ছল।

নীলাম্বর ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিল, ছল?

বিরাজ বলিল, হাঁ, ছল। আজকাল আমি সব দেখেচি। আমার মুখের দিকে যদি চাইতে, আমার দুঃখ ভাবতে, আমার একটা কথাও যদি শুনতে, তা হলে আজ আমার এ অবস্থা হ'ত না।

নীলাম্বর বলিল, তোমার একটা কথাও শুনিনি?

বিরাজ জোর দিয়া বলিল, না, একটাও না। যখন যা বলেচি, তাই কোন না কোন ছল করে উড়িয়ে দিয়েচ—তুমি কেবল ভেবেচ নিজের পাপ হবে, মিথ্যে কথা হবে, লোকের কাছে অপযশ হবে—একবারও ভেবেচ কি, আমার কি হবে?

নীলাম্বর বলিল, আমার পাপ কি তোমার পাপ নয়, আমার অপযশে কি তোমার অপযশ হবে না?

এবার বিরাজ রীতিমত ক্রুদ্ধ হইল। তীক্ষ্নভাবে বলিল, দেখ ও-সব ছেলেভুলানো কথা—ওতে ভোলবার বয়স আমার আর নেই। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল—কেবল তুমি নিজের কথা ভাব, আর কিছু ভাব না। অনেক দুঃখে আজ আমাকে এ কথা মুখ দিয়ে বার করতে হ'ল—আজ নিজের ঘরে আমাকে দাসীবৃত্তি করতে দিতে তোমার লজ্জা হচ্চে, কিন্তু কাল যদি তোমার একটা কিছু হয়, পরশু যে আমাকে পরের ঘরে গিয়ে দুটো ভাতের জন্যে দাসীবৃত্তি করে বেড়াতে হবে। তবে একটা কথা এই যে, সে তোমাকে চোখে দেখতেও হবে না, কানে শুনতেও হবে না—কাজে কাজেই তাতে তোমার লজ্জা ত হবে না, ভাবনা-চিন্তা করবারও দরকার নেই—এই না?

নীলাম্বর সহসা এ অভিযোগের উত্তর দিতে পারিল না। মাটির দিকে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ কক্ষণ তোমার মনের কথা নয়। দুঃখ-কষ্ট হয়েচে বলেই রাগ করে বলচ। তোমার কষ্ট আমি যে স্বর্গে বসেও সইতে পারব না, এ তুমি ঠিক জান।

বিরাজ বলিল, তাই আগে জানতুম বটে, কিন্তু কষ্ট যে কি, তা কষ্টে না পড়লে যেমন

ঠিক বোঝা যায় না, পুরুষমানুষের মায়া-দয়াও তেমনই, সময় না হ'লে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু, তোমার সঙ্গে এই দুপুরবেলায় আমি রাগারাগি করতে চাইনে—যা বলচি তাই কর, যাও নেয়ে এসো।

নীলাম্বর 'যাচ্চি' বলিয়াও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বিরাজ পুনরায় কহিল, আজ দু বছর হতে চলল, পুঁটির আমার বিয়ে হয়েচে। তার আগে থেকে আজ পর্যন্ত সব কথা সেদিন আমি মনে মনে ভেবে দেখছিলুম—আমার একটি কথাও তুমি শোননি। যখন যা কিছু বলেচি, সমস্তই একটা একটা করে কাটিয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছায় কাজ করে গেছ। লোকে বাড়ির দাসী-চাকরেরও একটা কথা রাখে, কিন্তু তুমি তাও আমার রাখনি।

নীলাম্বর কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না, তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। কত বড় ঘেন্নায় যে আমি ইষ্টিদেবতার নাম করে দিব্যি করেচি, তোমাকে আর একটি কথাও বলতে যাব না, সে কথা তুমিও শুনতে পেতে না, আজ যদি না কথায় কথা উঠে পড়ত। এখন হয়ত তোমার মনে পড়বে না, কিন্তু ছেলেবেলায় একদিন আমি মাথার ব্যথায় ঘুমিয়ে পড়ি; তোমাকে দোর খুলে দিতে দেরি হয়েছিল বলে মারতে উঠেছিলে, আমার অসুখের কথা বিশ্বাস করনি। সেইদিন থেকে দিব্যি করেছিলুম, অসুখের কথা আর জানাব না—আজ পর্যন্ত সে দিব্যি ভাঙ্গিনি।

নীলাম্বর মুখ তুলিতেই দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল। সে সহসা উঠিয়া আসিয়া বিরাজের হাত দুটি ধরিয়া ফেলিয়া উদ্বিগ্ন-স্বরে বলিয়া উঠিল, সে হবে না বিরাজ, কক্ষণ তোমার দেহ ভাল নেই। কি অসুখ হয়েচে বল—বলতেই হবে।

বিরাজ ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, ছাড়—লাগচে।

লাগুক—বল কি হয়েচে?

বিরাজ শুষ্কভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিল, কৈ, কিছুই ত হয়নি, বেশ আছি।

নীলাম্বর অবিশ্বাস করিয়া বলিল, না, কিছুতেই তুমি বেশ নেই। না হলে, কখন তুমি সেই কত বৎসরের পুরনো কথা তুলে আমার মনে কষ্ট দিতে না—বিশেষ যার জন্যে কতদিন, কত মাপ চেয়েচি।

আচ্ছা, আর কোন দিন বলব না,—বলিয়া বিরাজ নিজেকে মুক্ত করিয়া ঈষৎ সরিয়া বসিল।

নীলাম্বর তাহার কথার অর্থ বুঝিল, কিন্তু আর কিছু বলিল না। তার পর মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল।

রাত্রে প্রদীপের আলোকে বসিয়া বিরাজ চিঠি লিখিতেছিল। নীলাম্বর খাটের উপর শুইয়া নিঃশব্দে তাহাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে সহসা বলিয়া উঠিল, এ জন্মে তোমার ত কোন দোষ-অপরাধ শত্রুতেও দিতে পারে না, কিন্তু তোমার পূর্বজন্মের পাপ ছিল, না হলে কিছুতেই এমন হ'ত না।

বিরাজ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'ত না?

নীলাম্বর কহিল, তোমার সমস্ত দেহ-মন ভগবান রাজরাণীর উপযুক্ত করে গড়ে ছিলেন, কিন্তু—

কিন্তু কি?

নীলাম্বর চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ একমুহূর্ত উত্তরের আশায় থাকিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, এ খবর কখন তোমাকে ভগবান দিয়ে গেলেন?

নীলাম্বর কহিল, চোখ-কান থাকলে ভগবান সকলকেই খবর দেন।

বিরাজ 'হু' বলিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।

নীলাম্বর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তখন বলছিলে, আমি কোন কথা তোমার শুনিনে, হয়ত তাই সত্যি, কিন্তু তা কি শুধু একলা আমারই দোষ?

বিরাজ আবার মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, বেশ ত, আমার দোষটাই দেখিয়ে দাও?

নীলাম্বর বলিল, তোমার দোষ দেখাতে পারব না; কিন্তু আজ একটা সত্যি কথা বলব।

তুমি নিজের সঙ্গে অপরের তুলনা করেই দেখ। কিন্তু এটা ত একবার ভেবে দেখ না, তোমার মত ক'টা মেয়েমানুষ এমন নির্গুণ মুর্খের হাতে পড়ে? এইটেই তোমার পূর্বজন্মের পাপ, নইলে তোমার ত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করবার কথা নয়।

বিরাজ নিঃশব্দে চিঠি লিখিতে লাগিল। বোধ করি সে মনে করিল ইহার জবাব দিবে না; কিন্তু থাকিতে পারিল না। মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি মনে কর, এই সব কথা শুনে আমি খুশী হই?

কি সব কথা?

বিরাজ বলিল, এই যেমন রাজরানী হতে পারতুম—শুধু তোমার হাতে পড়েই এমন হয়েছি. এই সব; মনে কর, এ শুনলে আমার আহ্লাদ হয়, না যে বলে তার মুখ দেখতে ইচ্ছে করে?

নীলাম্বর দেখিল, বিরাজ অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছে। ব্যাপারটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইবে সে আশা করে নাই, তাই মনে মনে সংকুচিত এবং কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল; কিন্তু কি বলিয়া প্রসন্ন করিবে, সহসা তাহাও ভাবিয়া পাইল না।

বিরাজ বলিল, রূপ, রূপ, রূপ। শুনে শুনে কান আমার ভোঁতা হয়ে গেল। আর যারা বলে, তাদের না হয় এইটেই সব চেয়ে বেশী চোখে পড়ে, কিন্তু তুমি স্বামী, এতটুকু বয়স থেকে তোমাকে ধরে এত বড় হয়েচি, তুমিও কি এর বেশী আমার আর কিছু দেখ না? এইটেই কি আমার সবচেয়ে বড় বস্তু? তুমি কি বলে এ কথা মুখে আন? আমি কি রূপের ব্যবসা করি, না, এই দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাই?

নীলাম্বর অত্যন্ত ভয় পাইয়া থতমত খাইয়া বলিতে গেল, না না—

বিরাজ কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই, সেই জন্যেই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম, আমি কালো-কুচ্ছিত হলে ভালবাসতে কিনা! মনে পড়ে?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পড়ে, কিন্তু তুমিই ত তখন বলেছিলে—

বিরাজ বলিল, হাঁ বলেছিলুম, আমি কালো-কুচ্ছিত হলেও ভালবাসতে, কেননা, আমাকে বিয়ে করেচ। গেরস্তর মেয়ে, গেরস্তর বউ, আমাকে এ-সব কথা শোনাতে তোমার লজ্জা করে না? এর পূর্বেও আমাকে তুমি এ কথা বলেচ।—বলিতে বলিতে তাহার ক্রোধে অভিমানে চোখে জল আসিয়া পড়িল, এবং সে জল প্রদীপের আলোকে চকচক করিয়া উঠিল। নীলাম্বর দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

বিরাজ নিজেই একদিন বলিয়া দিয়াছিল, তিনি হাত ধরিলে আর তাহার রাগ থাকে না।

নীলাম্বর সেই কথা হঠাৎ স্মরণ করিয়া উঠিয়া আসিয়া তাহার ডান হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে লইয়া পার্শ্বে উপবেশন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখের জল মুছিয়া ফেলিল।

সেই রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে জাগিয়া ছিল। এক সময়ে নীলাম্বর সহসা স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ কেন অত রাগ, বিরাজ?

বিরাজ জবাব দিল, কেন তুমি ও-সব কথা বললে?

নীলাম্বর বলিল, আমি ত মন্দ কথা বলিনি!

বিরাজ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, অধীরভাবে বলিল, তবু বলবে মন্দ কথা নয়? খুব মন্দ কথা। অত্যন্ত মন্দ কথা। ওই জন্যেই সুন্দরীকে—

সে আর বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

নীলাম্বর ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, শুধু এই দোষে তাকে তাড়িয়ে দিলে?

বিরাজ 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিল।

নীলাম্বর আর প্রশ্ন করিল না।

তখন বিরাজ নিজেই বলিল, দেখ, জেরা ক'রো না—আমি কচি খুকি নই—ভালমন্দ বুঝি। তাড়াবার মত দোষ করেছে বলেই তাড়িয়েচি। কেন, কি বৃত্তান্ত, এত কথা তুমি পুরুষমানুষ নাই শুনলে!

না, আর অত শুনতে চাইনে, বলিয়া নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শুইল।

পৃথগন্ন হইবার দুই-চারি দিন পরেই ছোটভাই পীতাম্বর বাটীর মাঝখানে দরমা ও ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়া নিজের অংশ আলাদা করিয়া লইয়াছিল। দক্ষিণ দিকে দরজা ফুটাইয়া এবং তাহারই সম্মুখে একটি ছোট বৈঠকখানা-ঘর করিয়া সে সর্বরকমে নিজের বাড়িটিকে বেশ মানানসই ঝরঝরে করিয়া লইয়া মহা আরামে জীবন-যাপন করিতেছিল। কোনদিনই প্রায় সে দাদার সহিত বড় একটা কথাবার্তা বলিত না। এখন সমস্ত একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। এদিকে বিরাজকে প্রায় সমস্তদিন একলাটি কাটাইতে হইত। সুন্দরী যাওয়ার পর হইতে শুধু যে সমস্ত কাজকর্ম তাহাকেই করিতে হইত তাহা নহে; যে-সব কাজ পূর্বে দাসীতে করিত, সেইগুলো লোকলজ্জাবশতঃ লোকচক্ষুর অন্তরালেই তাহাকে সমাধা করিয়া লইবার জন্য অনেক রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া থাকিতে হইত। এমনই একদিন কাজ করিতেছিল, অকস্মাৎ ও-বাড়ি হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে ডাক আসিল, দিদি!

রাত অনেক হইয়াছিল। বিরাজ চমকিয়া মুখ তুলিল। তেমনই মৃদুস্বরে আবার কহিল, দিদি, আমি মোহিনী।

বিরাজ আশ্চর্য হইয়া বলিল, কে, ছোটবৌ! এত রাত্তিরে?

হাঁ দিদি, আমি। একবারটি কাছে এসো।

বিরাজ বেড়ার কাছে আসিতেই ছোটবৌ চুপি চুপি বলিল, দিদি, বঠ্‌ঠাকুর ঘুমিয়েচেন?

বিরাজ বলিল, হাঁ।

মোহিনী বলিল, দিদি, একটা কথা আছে, কিন্তু বলতে পাচ্ছিনে,—বলিয়া চুপ করিল।

বিরাজ তাহার কণ্ঠের স্বরে বুঝিল ছোটবৌ কাঁদিতেছে। চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কি হয়েচে ছোটবৌ?

ছোটবৌ তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না, বোধ করি, সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল। এবং নিজেকে সংবরণ করিতে লাগিল।

বিরাজ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, কি ছোটবৌ?

এবার সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বলিল, বঠ্‌ঠাকুরের নামে নালিশ হয়েচে,—কাল সমন না কি বার হবে, কি হবে দিদি?

বিরাজ ভয় পাইল, কিন্তু সে-ভাব গোপন করিয়া বলিল, সমন বার হবে, তার আর ভয় কি ছোটবৌ?

ভয় নেই দিদি?

বিরাজ বলিল, ভয় আর কি! কিন্তু নালিশ করলে কে?

ছোটবৌ বলিল, ভুলু মুখুয্যে।

বিরাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া বলিল, থাক আর বলতে হবে না—বুঝেচি। মুখুয্যেমশাই ওঁর কাছে টাকা পাবেন, তাই বোধ করি নালিশ করেচেন। কিন্তু তাতে ভয়ের কথা কিছু নেই ছোটবৌ। তারপর উভয়েই মৌন হইয়া রহিল। খানিক পরে ছোটবৌ কহিল, দিদি, কোনদিন তোমার সঙ্গে আমি বেশী কথা কইনি—কথা কইবার যোগ্যও আমি নই—আজ ছোটবোনের একটি কথা রাখবে দিদি?

তাহার কণ্ঠস্বরে বিরাজ আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, এখন অধিকতর আর্দ্র হইয়া বলিল, কেন রাখব না বোন?

তবে, একবারটি হাত পাত। বিরাজ হাত পাতিতেই একটি ক্ষুদ্র কোমল হাত বেড়ার ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া তাহার হাতের উপর একছড়া সোনার হার রাখিয়া দিল।

বিরাজ আশ্চর্য হইয়া বলিল,—কেন ছোটবৌ?

ছোটবৌ কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া বলিল, এইটে বিক্রি করে হোক, বাঁধা দিয়ে হোক, ওর টাকা শোধ করে দাও দিদি।

এই আকস্মিক অযাচিত ও অচিন্ত্যপূর্ব সহানুভূতিতে ক্ষণকালের নিমিত্ত বিরাজ অভিভূত হইয়া পড়িল—কথা কহিতে পারিল না। কিন্তু 'চললুম দিদি', বলিয়া ছোটবৌ সরিয়া যায় দেখিয়া, সে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া উঠিল, যেও না ছোটবৌ, শোন।

ছোটবৌ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেন দিদি?

বিরাজ সেই ফাঁকটা দিয়া তৎক্ষণাৎ অপর দিকে হারটা ফেলিয়া দিয়া বলিল, ছি, এ-সব করতে নেই।

ছোটবৌ তাহা তুলিয়া লইয়া ক্ষুণ্ণস্বরে প্রশ্ন করিল, কেন করতে নেই?

বিরাজ বলিল, ঠাকুরপো শুনলে কি বলবেন?

কিন্তু তিনি ত শুনতে পাবেন না।

আজ না হোক দু'দিন পরে জানতে পারবেন, তখন কি হবে?

ছোটবৌ বলিল, তিনি কোনদিন জানতে পারবেন না, দিদি। গত বছর মা মরবার সময় এটি লুকিয়ে আমাকে দিয়ে যান, তখন থেকে কোনদিন পরিনি, কোনদিন বার করিনি—তোমার পায়ে পড়ি দিদি, এটি তুমি নাও!

তাহার কাতর অনুনয়ে বিরাজের চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে স্তব্ধ হইয়া এই নিঃসম্পর্কীয়া রমণীর আচরণের সহিত সহোদরের আচরণ তুলনা করিয়া দেখিল। তারপর হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, আজকের কথা মরণকাল পর্যন্ত আমার মনে থাকবে বোন। কিন্তু এ আমি নিতে পারব না। তা ছাড়া স্বামীকে লুকিয়ে কোন মেয়েমানুষের কোনও কাজই উচিত নয় ছোটবৌ! তাতে তোমার আমার দু'জনেরই পাপ।

ছোটবৌ বলিল, তুমি সব কথা জান না তাই বলচ—কিন্তু ধর্মাধর্ম আমারও ত আছে দিদি,—আমিই বা মরণকালে কি জবাব দেব?

বিরাজ আর একবার চোখ মুছিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, আমি সকলকেই চিনেছিলুম ছোটবৌ, শুধু তোমাকেই এতদিন চিনতে পারিনি; কিন্তু তোমাকে ত মরণকালে কোন জবাব দিতে হবে না, সে জবাব এতক্ষণ তোমার অন্তর্যামী নিজেই লিখে নিয়েচেন। যাও, রাত হ'ল, শোও গে বোন।—বলিয়া প্রত্যুত্তরের অবসর না দিয়াই দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

কিন্তু সেও ঘরে ঢুকিতে পারিল না। অন্ধকার বারান্দার একধারে আসিয়া আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার নালিশ মকদ্দমার কথা মনে হইল না, কিন্তু ওই স্বল্প-ভাষিণী ক্ষুদ্রকায়া ছোটজায়ের সকরুণ কথাগুলি মনে করিয়া প্রস্রবণের মত তাহার দুই চোখ বাহিয়া নিরন্তর জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আজ সব চেয়ে দুঃখটা তাহার এই বাজিতে লাগিল যে, এতদিন এত কাছে পাইয়াও সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, চিনিবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নাই, অসাক্ষাতে তাহার নিন্দা না করিলেও একটি দিনও তাহার হইয়া কখন ভাল কথা বলে নাই। সুতীক্ষ্ন বাজের আলো একমুহূর্তে যেমন করিয়া অন্ধকার চিরিয়া ফেলে, আজ ছোটবৌ তেমনই করিয়া তাহার বুকের অন্তস্তল পর্যন্ত যেন চিরিয়া দিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কখন এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ কাহার হস্তস্পর্শে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দেখিল, নীলাম্বর আসিয়া তাহার শিয়রের কাছে বসিয়াছে।

নীলাম্বর সংক্ষেপে বলিল, ঘরে চল, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেচে।

বিরাজ কোন কথা না বলিয়া স্বামীর দেহ অবলম্বন করিয়া নিঃশব্দে ঘরে আসিয়া নির্জীবের মত শুইয়া পড়িল।

ছয়

এক বৎসর কাটিয়াছে। এ বৎসর দুই আনা ফসলও পাওয়া যায় নাই। যে জমিগুলো হইতেই প্রায় সারা বছরের ভরণপোষণ চলিত, তাহার অনেকটাই ও-পাড়ার মুখুয্যেরাই কিনিয়া লইয়াছেন। ভদ্রাসন পর্যন্ত বাঁধা পড়িয়াছে, ছোটভাই পীতাম্বর তাহা গোপনে নিজের নামে ফিরাইয়া লইয়াছে—তাহাও জানাজানি হইয়াছে। হালের একটা গরু মরিয়াছে। পুকুর রোদে ফাটিতেছে—বিরাজ কোনদিকে চাহিয়া আর কূলকিনারা দেখিতে পাইল না। দেহের কোন একটা স্থান বহুক্ষণ পর্যন্ত বাঁধিয়া রাখিলে একটা অসহ্য অথচ অব্যক্ত যাতনায় সর্বদেহটা যেরকম করিয়া ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া আসিতে থাকে, সমস্ত সংসারের সহিত সম্বন্ধটা তাহার তেমনই হইয়া আসিতে লাগিল। আগে সে যখন তখন

হাসিত, কথায় কথায় ছল ধরিয়া পরিহাস করিত, কিন্তু এখন বাড়ির মধ্যে এমন একটি লোক নাই যে সে কথা কহে। অথচ কেহ দেখা করিতে আসিলে, সংবাদ লইতে আসিলেও সে ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হয়। অভিমানী প্রকৃতি তাহার, পাড়ার লোকের একটা কথাতেও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সংসারের কাজে তাহার যে আর লেশমাত্র উৎসাহ নাই, তাহা তাহার কাজের দিকে চোখ ফিরাইলেই চোখে পড়ে। তাহার ঘরের শয্যা মলিন, কাপড়ের আলনা অগোছাল, জিনিসপত্র অপরিচ্ছন্ন—সে ঝাঁট দিয়া ঘরের কোণে জঞ্জাল জড় করিয়া রাখে—তুলিয়া ফেলিয়া দিবার মত জোরও সে যেন নিজের দেহের মধ্যে আর খুঁজিয়া পায় না। এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে নীলাম্বর ছোটবোন হরিমতিকে দুইবার আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহারা পাঠায় নাই। দিন-পনর হইল একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, হরিমতির শ্বশুর তাহার জবাব পর্যন্ত দেয় নাই। কিন্তু বিরাজের কাছে তাহার নামটি পর্যন্ত করিবার জো নাই। সে একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠে। পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে, মায়ের মত ভালবাসিয়াছে, কিন্তু তাহার সমস্ত সংস্রব পর্যন্ত আজকাল তাহার কাছে বিষ হইয়া গিয়াছে।

আজ সকালে নীলাম্বর গ্রামের পোস্ট আপিস হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বিমর্ষমুখে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, পুঁটির শ্বশুর একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না—এ পুজোতেও বোধ করি বোনটিকে একবার দেখতে পেলেম না।

বিরাজ কাজ করিতে করিতে একবার মুখ তুলিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

সেইদিন দুপুরবেলা আহারে বসিয়া নীলাম্বর আস্তে আস্তে বলিল, তার নাম করলেও তুমি জ্বলে ওঠ—সে কি কোন দোষ করেছে?

বিরাজ অদূরেই বসিয়া ছিল, চোখ তুলিয়া বলিল, জ্বলে উঠি কে বললে?

কে বলবে, আমি নিজেই টের পাই।

বিরাজ ক্ষণকাল স্বামীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, পেলেই ভাল। বলিয়াই উঠিয়া যাইতেছিল, নীলাম্বর ডাকিয়া বলিল, আচ্ছা, আজকাল এমন হয়ে উঠচ কেন? এ যেন একেবারে বদলে গেছ।

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কথাটা মন দিয়া শুনিয়া বলিল, বদলালেই বদলাতে হয়, বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ইহার দুই-তিন দিন পরে অপরাহ্নবেলায় নীলাম্বর বাহিরের চণ্ডীমণ্ডপে একা বসিয়া গুনগুন্ করিয়া গান গাহিতেছিল, বিরাজ পিছনে আসিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া বলিল, কি?

বিরাজ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, জবাব দিল না।

নীলাম্বর মুখ নীচু করিতেই বিরাজ রুক্ষস্বরে বলিল, আর একবার মুখ তোল দেখি।

নীলাম্বর মুখও তুলিল না, জবাবও দিল না; চুপ করিয়া রহিল।

বিরাজ পূর্ববৎ কঠিনভাবে বলিল, এই যে চোখ রাঙা হয়েচে, আবার ঐগুলো খেতে শুরু করেচ?

নীলাম্বর কথা কহিল না, ভয়ে চোখ নীচু করিয়া কাঠের মূর্তির মত বসিয়া রহিল। একে ত চিরদিনই সে তাহাকে ভয় করে, তাহাতে কিছুদিন হইতেই বিরাজ এমনই একরাশি উত্তপ্ত বারুদের মত হইয়া আছে যে, কখন কিভাবে জ্বলিয়া উঠিবে তাহা আন্দাজ পর্যন্ত করিবার জো ছিল না।

বিরাজও কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, সেই ভাল, গাঁজা-গুলি খেয়ে বোমভোলা হয়ে বসে থাকবার এই ত সময়, বলিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল। সেদিন গেল, পরদিন গেল, নীলাম্বর আর থাকিতে না পারিয়া সমস্ত লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সকাল-বেলা পীতাম্বরকে বাহিরের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিল, পুঁটির শ্বশুর ত একটা জবাব পর্যন্ত দিল না—তুই একবার চেষ্টা করে দেখ্ না, যদি বোনটিকে দুটো দিনের তরেও আনতে পারিস!

পীতাম্বর দাদার মুখপানে চাহিয়া বলিল, তুমি থাকতে আমি আবার কি চেষ্টা করব?

নীলাম্বর তাহার শঠতা বুঝিয়া ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু, যথাসাধ্য গোপন করিয়া বলিল, তা হোক, যেমন আমার, তোরও ত সে তেমনই বোন। না হয় মনে কর্ না আমি মরে গেছি—এখন, তুই শুধু একলা আছিস।

পীতাম্বর কহিল, যা সত্যি নয় তা তোমার মত আমি মনে করতে পারিনে। আর তোমাকে চিঠির জবাব দিলে না, আমাকেই বা দেবে কেন?

নীলাম্বর ছোটভাইয়ের এ কথাটাও সহ্য করিয়া বলিল, যা সত্যি নয়, তাই আমি মনে করি! আচ্ছা, তাই ভাল, এ নিয়ে তোর সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাইনে, কিন্তু আমার চিঠির জবাব দেয় না এই জন্যে ত তোকে ডাকিনি—যা বলচি, পারিস কি না, তাই বল্।

পীতাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বিয়ের আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?

করলে কি হ'ত?

পীতাম্বর বলিল, ভাল পরামর্শই দিতুম।

নীলাম্বরের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল, তবুও সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, তা হলে পারবি নে?

পীতাম্বর বলিল, না। আর, পুঁটির শ্বশুরও যা, নিজের শ্বশুরেও তাই—এঁরা গুরুজন। তিনি যখন পাঠাতে ইচ্ছা করেন না, তখন তাঁর বিরুদ্ধে আমি কথা কইতে পারিনে—ও স্বভাব আমার নয়।

তাহার কথা শুনিয়া নীলাম্বরের একবার ইচ্ছা হইল, ছুটিয়া গিয়া লাথি মারিয়া উহার ঐ মুখ গুঁড়া করিয়া ফেলে, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, যা, বেরো—যা আমার সামনে থেকে।

পীতাম্বরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, খামকা রাগ কর কেন দাদা? না গেলে তুমি কি আমাকে জোর করে তাড়াতে পার?

নীলাম্বর দরজার দিকে হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, বুড়া বয়সে মার খেয়ে যদি না মরতে চাস, সরে যা আমার সুমুখ থেকে!

তথাপি পীতাম্বর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু, নীলাম্বর বাধা দিয়া বলিল, বাস্! একটি কথাও না—যাও।

গোঁয়ার নীলাম্বরের গায়ের জোর প্রসিদ্ধ ছিল।

পীতাম্বর আর কথা কহিতে সাহস করিল না, আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

বিরাজ গোলযোগ শুনিয়া বাহিরে আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, ছি, সমস্ত জেনেশুনে কি ভাইয়ের সঙ্গে কেলেঙ্কারী করতে আছে?

নীলাম্বর উদ্ধতভাবে জবাব দিল, জানি বলে কি ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকব? আমার সব সহ্য হয় বিরাজ, ভণ্ডামি সহ্য হয় না।

বিরাজ বলিল, কিন্তু তুমি ত একা নও, আজ হাত ধরে বার করে দিলে কাল কোথায় দাঁড়াবে, সে কথা একবার ভাব কি?

নীলাম্বর বলিল, না। যিনি ভাববার তিনি ভাবেন, আমি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাইনে।

বিরাজ জবাব দিল, তা ঠিক। যার কাজের মধ্যে খোল বাজানো আর মহাভারত পড়া—তার ভাবনা-চিন্তে মিছে।

কথাগুলি বিরাজ মধুর করিয়া বলে নাই, নীলাম্বরের কানেও তাহা মধুবর্ষণ করিল না, তথাপি সে সহজভাবে বলিল, ওগুলা আমি সবচেয়ে বড় কাজ বলেই মনে করি। তা ছাড়া, ভাবতে থাকলেই কি কপালের লেখা মুছে যাবে? বলিয়া সে একবার কপালে হাত দিয়া বলিল, চেয়ে দেখ বিরাজ, এইখানে লেখা ছিল বলে অনেক রাজা-মহারাজাকে গাছতলায় বাস করতে হয়েচে—আমি ত অতি তুচ্ছ!

বিরাজ অন্তরের মধ্যে দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল, বলিল, ও-সব মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা তত সহজ নয়। তা ছাড়া, তুমিই না হয় গাছতলায় বাস করতে পার, আমি ত পারিনে! মেয়েমানুষের লজ্জাশরম আছে—আমাকে খোশামোদ করে হোক, দাসীবৃত্তি করে হোক, একটুখানি আশ্রয়ের মধ্যে বাস করতেই হবে। ছোটভাইয়ের মন যুগিয়ে থাকতে না

পায়, অন্ততঃ হাতাহাতি করে সব দিক মাটি ক'র না।—বলিয়া সে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

স্বামী-স্ত্রীতে ইতিপূর্বে অনেকবার অনেক কলহ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর তাহা জানিত, কিন্তু আজ যাহা হইয়া গেল, তাহা কলহ নহে—এ মূর্তি তাহার কাছে একেবারেই অপরিচিত। সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই বিরাজ আবার ঘরে ঢুকিয়া বলিল, অমন হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বেলা হয়েচে—যাও, স্নানক্রিয়া করে দুটো খাও—যে কটা দিন পাওয়া যায়, সেই কটা দিনই লাভ।—বলিয়া আর একবার সে স্বামীর বুকে শূল বিঁধিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই ঘরে দেওয়ালে একটি রাধাকৃষ্ণের পট ঝোলানো ছিল, সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া নীলাম্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল; কিন্তু পাছে কেহ জানিতে পায়, এই ভয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া গেল।

আর বিরাজ? সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া কেবলই তাহার চোখে যখন তখন জল আসিয়া পড়িতে লাগিল। যাঁহার এতটুকু কষ্ট সে সহিতে পারিত না, তাঁহাকে এত বড় শক্ত কথা নিজের মুখে বলিয়া অবধি তাহার দুঃখ ও আত্মগ্লানির সীমা ছিল না। সমস্ত দিন জলস্পর্শ করিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিছামিছি এ-ঘর ও-ঘর করিয়া ফিরিল, তার পর সন্ধ্যার সময় তুলসীতলায় দীপ জ্বালিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়াই একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সমস্ত বাড়ি নির্জন, নিস্তব্ধ। নীলাম্বর বাড়ি নাই, তিনি দুপুরবেলা একটিবারমাত্র পাতের কাছে বসিয়াই উঠিয়া গিয়াছিলেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই।

বিরাজ কি করিবে, কোথায় যাইবে, কাহার কাছে কি বলিবে—আজ কোন দিকে চাহিয়া কোন উপায় দেখিতে না পাইয়া, সেইখানে অন্ধকার উঠানের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। কেবলই বলিতে লাগিল,—অন্তর্যামী ঠাকুর, একটিবার মুখ তুলে চাও। যে লোক কোন দোষ, কোন পাপ করতে জানে না, তাকে আর কষ্ট দিও না ঠাকুর—আর আমি সইতে পারব না।

রাত্রি তখন নটা বাজিয়া গিয়াছিল, নীলাম্বর নিঃশব্দে আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া পায়ের কাছে বসিল। নীলাম্বর চাহিয়া দেখিল না, কথাও কহিল না।

খানিক পরে বিরাজ স্বামীর পায়ের উপর একটা হাত রাখিতেই তিনি পা সরাইয়া লইলেন। আরও মিনিট-পাঁচেক নিস্তব্ধে কাটিল—বিরাজের লুপ্ত অভিমান ধীরে ধীরে সজাগ হইয়া উঠিতে লাগিল, তথাপি সে মৃদুস্বরে বলিল, সমস্ত দিন যে খেলে না, এটা কার ওপর রাগ করে শুনি?

ইহাতেও নীলাম্বর জবাব দিল না।

বিরাজ বলিল, বল না শুনি?

নীলাম্বর উদাসভাবে বলিল, শুনে কি হবে?

বিরাজ বলিল, তবু শুনিই না।

এবার নীলাম্বর অকস্মাৎ উঠিয়া বসিল, বিরাজের মুখের উপর দুই চোখ সুতীক্ষ্ণ শূলের মত উদ্যত করিয়া বলিল, তোর আমি গুরুজন বিরাজ, খেলার জিনিস নয়।

তাহার চোখের চাহনি, গলার শব্দ শুনিয়া বিরাজ সভয়ে চমকিয়া, স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন আর্ত, এমন গম্ভীর কণ্ঠস্বর সে ত কোন দিন শুনে নাই!

সাত

মগুরার গঞ্জে কয়েকটা পিতলের কবজার কারখানা ছিল। এ পাড়ার চাঁড়ালদের মেয়েরা মাটির ছাঁচ তৈরি করিয়া বিক্রি করিয়া আসিত। অসহ্য দুঃখের জ্বালায় বিরাজ তাহাদেরই একটি মেয়েকে ডাকিয়া ছাঁচ তৈরি করিতে শিখিয়া লইয়াছিল। সে তীক্ষ্ন বুদ্ধিমতী এবং

অসাধারণ কর্মপটু, দু'দিনেই এ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইয়া সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু প্রস্তুত করিতে লাগিল। ব্যাপারীরা আসিয়া এগুলি নগদ মূল্যে দিয়া কিনিয়া লইয়া যাইত। রোজ এমনই করিয়া সে আট আনা উপার্জন করিতেছিল, অথচ, স্বামীর কাছে লজ্জায় তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলে, অনেক রাত্রে নিঃশব্দে শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া এই কাজ করিত। আজ রাত্রেও তাহাই করিতে আসিয়াছিল এবং ক্লান্তিবশতঃ কোন এক সময়ে সেইখানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। নীলাম্বর হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া শয্যায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজের হাতে তখনও কাদা মাখা, আশে-পাশে তৈরী ছাঁচ পড়িয়া আছে এবং তাহারই একধারে হিমের মধ্যে ভিজা মাটির উপরে পড়িয়া সে ঘুমাইতেছে। আজ তিনদিন ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে কথাবার্তা ছিল না। তপ্ত অশ্রুতে তাহার দুই চোখ ভরিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া বিরাজের ভূলুণ্ঠিত সুপ্ত মাথাটি সাবধানে নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল। বিরাজ জাগিল না, শুধু একটিবার নড়িয়া-চড়িয়া পা-দুটি আরও একটু গুটাইয়া লইয়া ভাল করিয়া শুইল। নীলাম্বর বাঁ হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিয়া অপর হাতে অদূরবর্তী স্তিমিত দীপশিখাটি আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া একদৃষ্টে পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ কি হইয়াছে! কৈ, এতদিন সে ত চাহিয়া দেখে নাই! বিরাজের চোখের কোণে এমন কালি পড়িয়াছে! ভ্রূর উপর, সুন্দর সুডৌল ললাটে দুশ্চিন্তার এত সুস্পষ্ট রেখা ফুটিয়াছে! একটা অবোধ্য, অব্যক্ত অপরিসীম বেদনায় তাহার সমস্ত বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল এবং অসাবধানে একফোঁটা বড় অশ্রু বিরাজের নিমীলিত চোখের পাতার উপর টপ করিয়া পড়িবামাত্রই সে চোখ চাহিয়া দেখিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, তার পর দুই হাত প্রসারিত করিয়া স্বামীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল। নীলাম্বর সেইভাবে বসিয়া থাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ কাটিল—কেহ কথা কহিল না। তারপর রাত্রি যখন আর বেশী বাকী নাই, পূর্বাকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে, তখন নীলাম্বর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইয়া স্ত্রীর মাথার উপর হাত রাখিয়া সস্নেহে বলিল আর হিমে থেকো না বিরাজ, ঘরে চল।

চল, বলিয়া বিরাজ উঠিয়া পড়িল, এবং স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল।

সকালবেলা নীলাম্বর বলিল, যা তোর মামার বাড়ি থেকে দিন-কতক ঘুরে আয় বিরাজ, আমিও একবার কলকাতায় যাই।

কলকাতায় গিয়ে কি হবে?

নীলাম্বর কহিল, কত রকম উপার্জনের পথ সেখানে আছে, যা হোক একটা উপায় হবেই—কথা শোন্ বিরাজ, মাস-কয়েক সেখানে গিয়ে থাক্ গে!

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, কতদিনে আমাকে ফিরিয়ে আনবে?

নীলাম্বর বলিল, ছ মাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনব, তোকে আমি কথা দিচ্ছি।

'আচ্ছা' বলিয়া বিরাজ সম্মত হইল।

দিন চার-পাঁচ পরে গরুর গাড়ি আসিল, মামার বাড়ি যাইতে আট-দশ ক্রোশ এই উপায়েই যাইতে হয়। অথচ বিরাজের ব্যবহারে যাত্রার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইতে লাগিল, তাগিদ দিতে লাগিল।

বিরাজ কাজ করিতে করিতে বলিয়া বসিল, আজ ত আমি যাব না—আমার, অসুখ কচ্চে।

নীলাম্বর অবাক হইয়া বলিল, অসুখ কচ্চে কি রে?

বিরাজ বলিল, হাঁ, অসুখ কচ্চে—বড্ড অসুখ কচ্চে,—বলিয়া মুখ ভার করিয়া পিতলের কলসীটা কাঁকালে তুলিয়া লইয়া নদীতে জল আনিতে চলিয়া গেল। সেদিন গাড়ি ফিরিয়া গেল। রাত্রে অনেক সাধাসাধি, অনেক বোঝানোর পর সে দু'দিন পরে যাইতে সম্মত হইল। দু'দিন পরে আবার গাড়ি আসিল।

নীলাম্বর সংবাদ দিবামাত্রই বিরাজ একেবারে বাঁকিয়া বসিল;—না, আমি কক্ষণ যাব না।

নীলাম্বর আরও আশ্চর্য হইয়া বলিল, যাবিনে, কেন?

বিরাজ কাঁদিয়া ফেলিল—না, আমি যাব না। আমার গয়না কৈ, আমি দীন-দুঃখীর মত কিছুতেই যাব না।

নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, আজ তোর গয়না নাই সত্যি, কিন্তু যখন ছিল, তখন ত একদিন ফিরেও চাসনি?

বিরাজ চুপ করিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

নীলাম্বর পুনরায় কহিল, তোর ছল আমি বুঝি। আমার মনে মনে সন্দেহ ছিলই, তবে ভেবেছিলাম, দুঃখে-কষ্টে বুঝি তোর হুঁশ হয়েচে—তা দেখছি কিছুই হয়নি! ভাল, তুইও শুকিয়ে মর্, আমিও মরি।—বলিয়া সে বাহিরে গিয়া গাড়ি ফিরাইয়া দিল।

দুপুরবেলায় নীলাম্বর ঘরের ভিতর ঘুমাইতেছিল, পীতাম্বর নিজের কাজে গিয়াছিল, ছোটবৌ বেড়ার ফাঁক দিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়া বলিল, দিদি, অপরাধ নিও না, তোমায় আমি আর বোঝাব কি, কিন্তু দু'দিন ঘরে এলে না কেন?

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, ওঁকে বন্ধ করে রেখো না দিদি, বিপদের দিনে একটিবার বুক বাঁধ, ভগবান দু'দিনে মুখ তুলে চাইবেন।

বিরাজ আস্তে আস্তে বলিল, আমি ত বুক বেঁধেই আছি, ছোটবৌ!

ছোটবৌ একটু জোর দিয়া বলিল, তবে যাও দিদি, ওঁকে পুরুষমানুষের মত উপার্জন করতে দাও—আমি বলচি, তোমার প্রতি ভগবান দু'দিনে প্রসন্ন হবেন।

বিরাজ একবার মুখ তুলিল, কি কথা বলিতে গেল, তার পর মুখ হেঁট করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিল, পারবে না যেতে?

এবার বিরাজ মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ঘুম ভেঙ্গে উঠে ওঁর মুখ না দেখে আমি একটা দিনও কাটাতে পারব না। যা পারব না ছোটবৌ, সে কাজ আমাকে ব'লো না,—বলিয়া চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেই ছোটবৌ কাঁদ-কাঁদ হইয়া ডাকিয়া বলিল, যেও না দিদি, শোন, তোমাকে দিন-কতক এখান থেকে যেতেই হবে—না গেলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

বিরাজ ফিরিয়া দাঁড়াইল, একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, ও বুঝেছি—সুন্দরী এসেছিল বুঝি?

ছোটবৌ মাথা নাড়িয়া বলিল, এসেছিল।

তাই চলে যেতে বলচ?

তাই বলচি দিদি, তুমি যাও এখান থেকে।

বিরাজ আবার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল; তার পরে বলিল, একটা কুকুরের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যাব?

ছোটবৌ বলিল, কুকুর পাগল হ'লে তাকে ভয় ত করতেই হয় দিদি! তা ছাড়া, তোমার একার জন্যেও নয়, ভেবে দেখ, এই নিয়ে আরও কত কি অনিষ্ট ঘটতে পারে।

বিরাজ আবার চুপ করিয়া রহিল। তারপর উদ্ধতভাবে মুখ তুলিয়া বলিল, না, কোন-মতেই যাব না,—বলিয়া ছোটবৌকে প্রত্যুত্তরের অবসরমাত্র না দিয়া দ্রুতপদে সরিয়া গেল। কিন্তু তাহার যেন ভয় করিতে লাগিল।

তাহাদের ঘাটের ঠিক পরপারে দু'দিন হইতে আড়ম্বর করিয়া একটা স্নানের ঘাট এবং নদীতে জল না থাকা সত্ত্বেও মাছ ধরিবারও মঞ্চ প্রস্তুত হইতেছিল। বিরাজ মনে মনে বুঝিল, এ-সব কেন।

নীলাম্বরও একদিন স্নান করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওপারে ঘাট বাঁধলে কারা বিরাজ?

বিরাজ হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, আমি কি জানি?—বলিয়াই দ্রুতপদে সরিয়া গেল।

তাহার ভাব দেখিয়া নীলাম্বর অবাক হইয়া গেল। কিন্তু সেইদিন হইতে বিরাজ যখন তখন জল আনিতে যাওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিল। হয় অতি প্রত্যুষে, না হয় একটুখানি রাত্রি হইলে তবে সে নদীতে যাইত, এ ছাড়া সহস্র কাজ আটকাইলেও সে ও-মুখো হইত

না। কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, তাহার প্রাণ যেন বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ এই অত্যাচার ও অকথ্য ইতরতার বিরুদ্ধে সে স্বামীর কাছেও সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারিল না।

দিন-চারেক পরে নীলাম্বরই একদিন ঘাট হইতে আসিয়া হাসিয়া বলিল, নূতন জমিদারের সাজ-সরঞ্জাম দেখেচিস বিরাজ?

বিরাজ বুঝিতে পারিয়া অন্যমনস্কভাবে বলিল, দেখচি বৈ কি!

নীলাম্বর পুনরায় হাসিতে হাসিতে বলিল, লোকটা পাগল নাকি, তাই আমি ভাবচি। নদীতে দুটো পুঁটিমাছ থাকবার জল নেই, লোকটা সকাল থেকে একটা মস্ত হুইল-বাঁধা ছিপ ফেলে সারাদিন বসে আছে।

বিরাজ চুপ করিয়া রহিল, সে কোনমতেই স্বামীর হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

নীলাম্বর বলিতে লাগিল, কিন্তু এ ত ঠিক নয়। ভদ্রলোকের খিড়কির ঘাটের সামনে সমস্ত দিন বসে থাকলে মেয়েছেলেরাই বা যায় কি করে? আচ্ছা, তোদের নিশ্চয়ই ত ভারী অসুবিধে হচ্ছে।

বিরাজ বলিল, হলেই বা কি করব?

নীলাম্বর ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিল, তাই হবে কেন? ছিপ নিয়ে পাগলামি করবার কি আর জায়গা নেই? না, না, কাল সকালেই আমি কাছারিতে গিয়ে বলে আসব—শখ হয়, উনি আর কোথাও ছিপ নিয়ে বসে থাকুন গে; কিন্তু আমাদের বাড়ির সামনে ও-সব চলবে না।

স্বামীর কথা শুনিয়া বিরাজ ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না, তোমাকে ও-সব বলতে যেতে হবে না; নদী আমাদের একলার নয় যে, তুমি বারণ করে আসবে।

নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, তুই বলিস কি বিরাজ! নাই হ'ল নদী আমার; কিন্তু লোকের একটা ভালমন্দ বিবেচনা থাকবে না? আমি কালই গিয়ে বলে আসব, না শোনে নিজেই ঐসব ঘাট-ফাট টান মেরে ভেঙ্গে ফেলব, তার পরে যা পারে সে করুক।

কথা শুনিয়া বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যাবে জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করতে?

নীলাম্বর কহিল, কেন যাব না? বড়লোক বলে যা ইচ্ছে অত্যাচার করবে, তাই সয়ে থাকতে হবে?

অত্যাচার করচে তুমি প্রমাণ করতে পার?

নীলাম্বর রাগিয়া বলিল, আমি এত তর্কের ধার ধারিনে; স্পষ্ট দেখচি অন্যায় করচে, আর তুই বলিস প্রমাণ করতে পার? পারি, না পারি সে আমি বুঝব।

বিরাজ একমুহূর্ত স্বামীর মুখের পানে স্থিরভাবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, দেখ, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। যাদের দুবেলা ভাত জোটে না, তাদের মুখে এ কথা শুনলে লোকে গায়ে থুথু দেবে। কিসে আর কিসে, তুমি চাও জমিদারের ছেলের সঙ্গে লড়াই করতে!

কথাটা এতই রূঢ়ভাবে বিরাজের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল যে, নীলাম্বর সহ্য করিতে পারিল না, সে একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল, তুই আমাকে কি কুকুর-বেড়াল মনে করিস যে, যখন তখন সব কথায় ঐ খাবার খোঁটা তুলিস! কোন্ দিন তোর দুবেলা ভাত জোটে না?

দুঃখে-কষ্টে বিরাজের আর পূর্বের ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা ছিল না, সেও জ্বলিয়া উঠিয়া জবাব দিল, মিছে চেঁচিও না। যা করে দুবেলা ভাত জুটচে, সে তুমি জান না বটে, কিন্তু জানি আমি, আর জানেন অন্তর্যামী। এই নিয়ে কোন কথা যদি তুমি বলতে যাও ত আমি বিষ খেয়ে মরব। বলিয়াই মুখ তুলিয়া দেখিল, নীলাম্বরের মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহার দুই চোখে একটা বিহ্বল হতবুদ্ধি দৃষ্টি—সে চাহনির সম্মুখে বিরাজ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। সে আর একটা কথাও না বলিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। সে চলিয়া গেল, তবুও নীলাম্বর তেমনই করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একটা সুদীর্ঘ

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার প্রচণ্ড ক্রোধ না বুঝিয়া একটা অনুচ্চ স্থানের মধ্যে সজোরে মাথা তুলিতে গিয়া তেমনই সজোরে ধাক্কা খাইয়া যেন একেবারে নিস্পন্দ অসাড় হইয়া গেল। কানে তাহার কেবলই বাজিতে লাগিল বিরাজের শেষ কথাটা—কি করিয়া সংসার চলিতেছে! এবং কেবলই মনে পড়িতে লাগিল, সেদিনের সেই অন্ধকারে গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে ভূশয্যায় সুপ্ত বিরাজের শ্রান্ত অবসন্ন মুখ। সত্যই ত! দিন যে কি করিয়া চলিতেছে এবং কেমন করিয়া যে তাহা ওই অসহায়া রমণী একাকিনী চালাইতেছে, সে কথা আর ত তাহার জানিতে বাকী নাই। অনতিপূর্বে বিরাজের শক্ত কথা শক্ত তীরের মতই তাহার বুকে আসিয়া বিঁধিয়াছিল, কিন্তু যতই সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হৃদয়ের সেই ক্ষত, সেই ক্ষোভ শুধু যে মিলাইয়া আসিতে লাগিল তাহা নহে, ধীরে ধীরে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিতে লাগিল। তাহার বিরাজ ত শুধু আজকের বিরাজ নয়, সে যে কতকাল, কত যুগ-যুগান্তের। তাহার বিচার ত শুধু দুটো দিনের ব্যবহারে, দুটো অসহিষ্ণু কথার উপরে করা চলে না! সে-হৃদয় যে কি দিয়া পরিপূর্ণ, সে কথা ত তার চেয়ে আর কেউ বেশী জানে না! এইবার তাহার দুই চোখ বাহিয়া দরদর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে অকস্মাৎ দুই হাত জোড় করিয়া ঊর্ধ্বমুখে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, ভগবান. আমার যা আছে সব নাও, কিন্তু আমার একে নিও না। বলিতেই একটা প্রচণ্ড ইচ্ছার বেগ সেই মুহূর্তেই তাহার প্রিয়তমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিবার জন্য তাহাকে যেন একেবারে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল। সে ছুটিয়া আসিয়া বিরাজের রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, সে ঘা দিয়া আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, বিরাজ!

বিরাজ মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিল, চমকিয়া উঠিয়া বসিল।

নীলাম্বর বলিল, কি কচ্চিস বিরাজ, দোর খোল!

বিরাজ সভয়ে নিঃশব্দে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর ব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলে দে না বিরাজ!

এবার বিরাজ কাঁদ-কাঁদ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, তুমি মারবে না বল?

মারব!

কথাটা তীক্ষ্ণধার ছুরির মত নীলাম্বরের হৃৎপিণ্ডে গিয়া প্রবেশ করিল; বেদনায়, লজ্জায়, অভিমানে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, সে সংজ্ঞাহীনের মত একটা চৌকাঠ আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাজ তাহা দেখিল না; সে না জানিয়া ছুরির উপর ছুরি মারিয়া কাঁদিয়া বলিল, আর আমি এমন কথা ক'ব না—বল, মারবে না?

নীলাম্বর অস্ফুটস্বরে, কোনমতে একটা 'না' বলিতে পারিল মাত্র। সভয়ে ধীরে ধীরে অর্গল মুক্ত করিবামাত্রই নীলাম্বর টলিতে টলিতে ভিতরে ঢুকিয়া চোখ বুজিয়া শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। তাহার নিমীলিত চোখের দুই কোণ বাহিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। স্বামীর এমন মুখ ত বিরাজ কোন দিন দেখে নাই! সমস্তই বুঝিল। শিয়রের কাছে উঠিয়া আসিয়া পরম স্নেহে স্বামীর মাথা নিজের ক্রোড়ের উপর তুলিয়া আঁচল দিয়া চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার আঁধার ঘরের মধ্যে গাঢ় হইয়া আসিতে লাগিল, তথাপি উভয়ের কেহই মুখ খুলিল না। তাহাদের কথা বোধ করি শুধু অন্তর্যামীই শুনিলেন।

আট

তবুও নীলাম্বর ভাবিতেছিল—এ কথা বিরাজ মুখে আনিল কি করিয়া! সে তাহাকে মারধর করিতেও পারে, তাহার সম্বন্ধে এত বড় হীন ধারণা তাহার জন্মিল কেন? একে ত সংসারে দুঃখ-কষ্টের অবধি নাই, তাহার উপর প্রতিদিন এ কি হইতে লাগিল? দু'দিন যায় না, বিবাদ বাধে, কথায় কথায় মনোমালিন্য, চোখে চোখে কলহ, পদে পদে মতভেদ হয়। সর্বোপরি তাহার এমন বিরাজ দিন দিন এমন হইয়া যাইতে লাগিল—অথচ কোন দিকে চাহিয়া সে এই দুঃখের সাগরের কিনারা দেখিল না। নীলাম্বরের

ভগবানের চরণে অচলা ভক্তি ছিল, অদৃষ্টের লেখায় অসীম বিশ্বাস ছিল, সে সেই কথাই ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও মনে মনে দোষ দিল না, কাহারও নিন্দা করিল না—চণ্ডীমণ্ডপের দেয়ালে টাঙ্গানো রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির সুমুখে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, ভগবান, যদি এত দুঃখেই ফেলবে মনে ছিল, তবে এতবড় নিরুপায় করে আমাকে গড়লে কেন? সে যে কত নিরুপায়, সে কথা তাহার অপেক্ষা বেশী আর কেহই জানে না। লেখাপড়া শিখে নাই, কোন রকমের কাজকর্ম জানিত না, জানিত শুধু দুঃখীর সেবা করিতে, শিখিয়াছিল শুধু ভগবানের নাম করিতে। তাহাতে পরের দুঃখ ঘুচিত বটে, কিন্তু অসময়ে আজ নিজের দুঃখ ঘুচিবে কি করিয়া! আর তাহার কিছুই নাই—সমস্ত গিয়াছে। তাই, দুঃখের জ্বালায় কতদিন সে মনে মনে ভাবিয়াছে, এখানে আর থাকিবে না, বিরাজকে লইয়া যেখানে দু'চোখ যায় যাইবে; কিন্তু এই সাত-পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া কোন্ দেব-মন্দিরের দ্বারে বসিয়া, কোন্ গাছের তলায় শুইয়া সে সুখ পাইবে! এই ক্ষুদ্র নদী, এই গাছপালায় ঘেরা বাড়ি, এই ঘরে-বাহিরে আজন্মপরিচিত লোকের মুখ—সমস্ত ছাড়িয়া সে কোন্ দেশে, কোন্ স্বর্গে গিয়া একটা দিনও বাঁচিবে! এই বাটীতে তাহার মা মরিয়াছে, এই চণ্ডীমণ্ডপে সে তাহার মুমূর্ষু পিতার শেষ সেবা করিয়া গঙ্গায় দিয়া আসিয়াছে—এইখানে সে পুঁটিকে মানুষ করিয়াছে, তাহার বিবাহ দিয়াছে—এই ঘরবাড়ির মায়া সে কেমন করিয়া কাটাইবে! সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া রুদ্ধস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আর এই কি তাহার সব দুঃখ? তাহার বোনটিকে সে কোথায় দিয়া আসিল, তাহার একটা সংবাদ পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না; কতদিন হইয়া গেল, তাহার মুখ দেখে নাই, তাহার সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠের 'দাদা' ডাক শুনিতে পায় নাই—পরের ঘরে সে কি দুঃখ পাইতেছে, কত কান্না কাঁদিতেছে, কিছুই সে জানিতে পারে নাই। অথচ বিরাজের কাছে তাহার নামটি পর্যন্ত করিবার জো নাই। সে তাহাকে মানুষ করিয়াও এমন করিয়া ভুলিতে পারিল, কিন্তু সে ভুলিবে কি করিয়া? তাহার মায়ের পেটের বোন, হাতে কাঁখে করিয়া বড় করিয়াছে, যেখানে গিয়াছে সঙ্গে করিয়া গিয়াছে—সেজন্য কত কথা, কত উপহাস সহ্য করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই পুঁটিকে কাঁদাইয়া রাখিয়া ঘর ছাড়িয়া এক পা যাইতে পারে নাই। এ-সব কথা শুধু সে জানে, আর সেই ছোটবোনটি জানে।

বিরাজ জানিয়াও জানে না। একটা কথা পর্যন্ত বলে না। পুঁটির সম্বন্ধে সে যেন পাষাণমূর্তির মত একেবারে চিরদিনের জন্য নির্বাক হইয়া গিয়াছে। সে যে মনে মনে তাহার সেই নিরপরাধা বোনটিকে অপরাধী করিয়া রাখিয়াছে, এ চিন্তা তাহাকে শূলের মত বিঁধিত; কিন্তু এ সম্বন্ধে একবিন্দু আলোচনার পথ পর্যন্ত ছিল না। কোন একটা কথা বলিতে গেলেই বিরাজ থামাইয়া দিয়া বলে, ও-সব কথা থাক—সে রাজরানী হোক, কিন্তু তার কথায় কাজ নেই। এই 'রাজরানী' কথাটা বিরাজ এমনভাবে উচ্চারণ করিয়া উঠিয়া যাইত যে, নীলাম্বরের বুকের ভিতরটা জ্বালা করিতে থাকিত। পাছে তাহার উপর গুরুজনের অভিসম্পাত পড়ে, পাছে কোন অকল্যাণ হয়, এই আশঙ্কায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিত, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিত, লুকাইয়া 'হরির লুঠ' দিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল।

দুর্গাপূজো আসিয়া পড়িল। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোপনে ক'একটা টাকা সংগ্রহ করিয়া একখানি কাপড় ও কিছু মিষ্টান্ন কিনিয়া সুন্দরীকে গিয়া ধরিল।

সুন্দরী বসিতে আসন দিল, তামাক সাজিয়া দিল। নীলাম্বর আসন গ্রহণ করিয়া তাহার জীর্ণ মলিন উত্তরীয়ের ভিতর হইতে সেই কাপড়খানি বাহির করিয়া বলিল, তুই ত তাকে মানুষ করেচিস সুন্দরী, যা একবার দেখে আয়। আর সে বলিতে পারিল না, মুখ ফিরাইয়া চাদরে চোখ মুছিল।

সুন্দরী ইহাদের কষ্টের কথা জানিত। গ্রামের সকলেই জানিত। কহিল, সে কেমন আছে বড়বাবু?

নীলাম্বর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানিনে।

সুন্দরীর বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল, সে আর প্রশ্ন করিল না। পরদিন সকালেই যাইবে

জানাইতে নীলাম্বর কিছু পাথেয় দিতে গেল, সুন্দরী তাহা গ্রহণ করিল না; কহিল, না বড়বাবু, তুমি কাপড় কিনে ফেলেচ, না হলে এও আমি নিয়ে যেতাম না—তোমার মত আমিও যে তাকে মানুষ করেচি।

নীলাম্বরের চোখ দিয়া আবার জল গড়াইয়া পড়িল, সে মুখ ফিরাইয়া ক্রমাগত চোখ মুছিতে লাগিল। এমন একটা সমবেদনার কথা সে কাহারও কাছে পায় নাই। সবাই কহে, সে ভুল করিয়াছে, অন্যায় করিয়াছে, পুঁটি হইতেই তাহার সর্বনাশ হইয়াছে। উঠিবার উদ্যোগ করিয়া সে সুন্দরীকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল যেন এই সব দুঃখ-কষ্টের কথা পুঁটি কোনমতে না জানিতে পারে।

নীলাম্বর চলিয়া গেল, সুন্দরীও এইবার একফোঁটা চোখের জল আঁচলে মুছিল। এই লোকটিকে মনে মনে সবাই ভালবাসিত, সবাই ভক্তি করিত।

সেদিন বিজয়ার অপরাহ্ণ, বিরাজ শোবার ঘরে ঢুকিয়া দোর দিল। সন্ধ্যা না হইতেই কেহ খুড়ো বলিয়া বাড়ি ঢুকিল, কেহ নীলুদা বলিয়া বাহির হইতে চীৎকার করিল।

নীলাম্বর শুষ্কমুখে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যথা-রীতি প্রণাম-কোলাকুলির পর তাহারা বৌঠানকে প্রণাম করিবার জন্য ভিতরের দিকে চলিল।

নীলাম্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দেখিল, বিরাজ রান্নাঘরেও নাই, শোবার ঘরেরও দ্বার রুদ্ধ। সে করাঘাত করিয়া ডাকিল, ছেলেরা তোমাকে প্রণাম করতে এসেচে বিরাজ।

বিরাজ ভিতর হইতে বলিল, আমার জ্বর হয়েচে—উঠতে পারব না।

তাহারা চলিয়া যাইবার খানিক পরেই আবার দ্বারে ঘা পড়িল। বিরাজ জবাব দিল না। দ্বারের বাহিরে মৃদুকণ্ঠে ডাক আসিল, দিদি, আমি মোহিনী—একবারটি দোর খোল।

তথাপি বিরাজ কথা কহিল না।

মোহিনী কহিল, সে হবে না দিদি, সারারাত এই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, সেও থাকব, কিন্তু আজকের দিনে তোমার আশীর্বাদ না নিয়ে যাব না।

বিরাজ উঠিয়া কপাট খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, মোহিনীর বাঁ হাতে এক চুপড়ি খাবার, ডান হাতে ঘটিতে সিদ্ধি-গোলা। সে পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া দুই পায়ের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, শুধু এই আশীর্বাদ কর দিদি, যেন তোমার মত হতে পারি—তোমার মুখ থেকে আমি আর কোন আশীর্বাদ পেতে চাইনে।

বিরাজ সজল চক্ষু আঁচলে মুছিয়া নিঃশব্দে ছোটবধূর অবনত মস্তকে হাত রাখিল।

ছোটবৌ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজকের দিনে চোখের জল ফেলতে নেই, কিন্তু, সে কথা ত তোমাকে বলতে পারলুম না দিদি; তোমার দেহের বাতাসও যদি আমার দেহে লেগে থাকে, ত, সেই জোরে বলে যাচ্ছি, আসচে বছরে এমনই দিনে সে কথা বলব।

মোহিনী চলিয়া গেলে বিরাজ সেইসব ঘরে তুলিয়া রাখিয়া স্থির হইয়া বসিল। মোহিনী যে অহর্নিশ তাহাকে চোখে চোখে রাখে, এ কথা আজ সে আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝিল। তার পর কত ছেলে আসিল, গেল, বিরাজ আর ঘরে দোর দিল না, এই সব দিয়া আজিকার দিনের আচার পালন করিল।

পরদিন সকালবেলা সে ক্লান্তভাবে দাওয়ায় বসিয়া শাক বাছিতেছিল, সুন্দরী আসিয়া প্রণাম করিল।

বিরাজ আশীর্বাদ করিয়া বসিতে বলিল।

সুন্দরী বসিয়াই বলিল, কাল রাত্তির হয়ে গেল, তাই আজ সকালেই বলতে এলুম। কিন্তু যাই বল বৌমা, এমন জানলে আমি কিছুতেই যেতুম না।

বিরাজ বুঝিতে পারিল না—চাহিয়া রহিল।

সুন্দরী বলিতে লাগিল, বাড়িতে কেউ নেই—সবাই গেছে পশ্চিমে হাওয়া খেতে। আছে এক বুড়ো পিসী, তার শক্ত শক্ত কথা কি বৌমা, বলে, ফিরিয়ে নিয়ে যা। জামাইয়ের পর্যন্ত একখানা কাপড় পাঠায় নি, শুধু একখানা সুতোর কাপড় নিয়ে পুজোর তত্ত্ব কত্তে এসেচে! তারপর ছোটলোক, চামার, চোখের চামড়া নেই—এ যে কত বললে, তা আর বলে কি হবে।

বিরাজ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কে কাকে বললে রে?

সুন্দরী বলিল, কেন, আমাদের বাবুকে।

বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল। সে কিছুই জানিত না, কিছুই বুঝিল না। কহিল, আমাদের বাবুকে কে বললে তাই বল্।

এবার সুন্দরীও কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিল, তাই ত এতক্ষণ বলচি বৌমা! পুঁটির বুড়ো পিসশাউড়ির কি দম্প, কি তেজ মা, কাপড়খানা নিলে না, ফিরিয়ে দিলে;—বলিয়া কাপড়খানি আঁচলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দিল।

এবার বিরাজ সমস্ত বুঝিল। সে একদৃষ্টে বস্ত্রখানির দিকে চাহিয়া রহিল—তাহার অন্তরে বাহিরে আগুন ধরিয়া গেল।

নীলাম্বর বাহিরে গিয়াছিল, কত বেলায় আসিবে তাহার স্থিরতা নাই, সুন্দরী অপেক্ষা করিতে পারিল না, চলিয়া গেল।

দুপুরবেলা নীলাম্বর আহার করিতে বসিয়াছিল, বিরাজ ঘরে ঢুকিয়া অদূরে সেই কাপড়খানা রাখিয়া দিয়া বলিল, সুন্দরী ফিরিয়ে দিয়ে গেল।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া দেখিয়াই একেবারে ভয়ে ম্লান হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা যে এমন ভাবে বিরাজের গোচরে আসিতে পারে তাহা সে কল্পনাও করে নাই। এখন কোন প্রশ্ন না করিয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

বিরাজ কহিল, কেন তারা নিলে না, কেন গালিগালাজ করে ফিরিয়ে দিলে, সব কথা সুন্দরীর কাছে গেলেই শুনতে পাবে।

তথাপি নীলাম্বর মুখ তুলিল না, কিংবা একটি কথাও শুনিতে চাহিল না।

বিরাজও চুপ করিল।

নীলাম্বরের ক্ষুধাতৃষ্ণা একেবারে চলিয়া গিয়াছিল, সে ভীত অবনতমুখে কেবলই অনুভব করিতে লাগিল,—বিরাজ তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং সে দৃষ্টি অগ্নিবর্ষণ করিতেছে।

সন্ধ্যাবেলা সুন্দরীর ঘরে গিয়া সব কথা পুনঃ পুনঃ শুনিয়া নীলাম্বর কহিল, পশ্চিমে যখন বেড়াতে গেছে, তখন সে নিশ্চয় ভালই আছে, না সুন্দরী?

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ভাল আছে বৈ কি বাবু।

নীলাম্বরের মুখ প্রফুল্লভাব ধারণ করিল, কহিল, কত বড়টি হয়েচে দেখলি?

সুন্দরী হাসিয়া বলিল, দেখা ত হয়নি বাবু!

নীলাম্বর নিজের প্রশ্নে লজ্জিত হইয়া বলিল, তা বটে, কিন্তু দাসী-চাকরের কাছেও শুনলি ত?

না বাবু। তার পিসশাউড়ি মাগীর যে কথাবার্তা, যে হাত-পা নাড়া, তাতে আর জিজ্ঞেস করব কি, পালাতেই পথ পাইনি।

নীলাম্বর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া ক্ষুব্ধ-মুখে কহিল, আচ্ছা, পুঁটি আমার রোগা হয়ে গেছে, কি একটু মোটাসোটা হয়েছে—তোর কি মনে হয়?

প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সুন্দরী ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সংক্ষেপে কহিল, মোটাসোটাই হয়ে থাকবে।

নীলাম্বর আশান্বিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, শুনে এসেচিস বোধ করি, না?

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না বাবু, শুনে কিছুই আসিনি।

তবে জানলি কি করে?

এবার সুন্দরী বিরক্ত হইল, কহিল, জানলুম আর কোথায়? তুমি বললে আমার কি মনে হয়, তাই বললুম—হয়ত মোটাসোটা হয়েচে।

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, তা বটে। তারপর কয়েক মুহূর্ত সুন্দরীর মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আজ তবে যাই সুন্দরী, আর একদিন আসব।

সুন্দরী মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বস্তুত তাহার অপরাধ ছিল না। এক ত বলিবার কিছুই ছিল না, তাহাতে ঘণ্টা-দুই হইতে নিরন্তর এক কথা এক শ রকম করিয়া বকিয়াও সে নীলাম্বরের কৌতূহল মিটাইতে পারে নাই।

তাড়াতাড়ি কহিল, হাঁ বাবু, রাত হ'ল, আজ এসো, আর একদিন সকালে এলে সব কথা হবে।

এতক্ষণে নীলাম্বর সুন্দরীর উৎকণ্ঠিত ব্যস্ততা লক্ষ্য করিল এবং 'আসি' বলিয়া চলিয়া গেল।

সুন্দরীর উৎকণ্ঠার একটা বিশেষ হেতু ছিল।

এই সময়টায় ও-পাড়ার নিতাই গাঙ্গুলী প্রায় প্রত্যহই একবার করিয়া তাহার সংবাদ লইতে পায়ের ধুলো দিয়া যাইতেন। তাঁহার এই ধুলোটা পাছে মনিবের সাক্ষাতেই পড়ে, এই আশঙ্কায় সে মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। যদিও নানা কারণে এখন তাহার কপাল ফিরিয়াছে এবং জমিদারের অনুগ্রহে লজ্জা গর্বেই রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এই নিষ্কলঙ্ক সাধুচরিত্র ব্রাহ্মণের সম্মুখে হীনতা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনায় সে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল।

নীলাম্বর চলিয়া গেলে সে পুলকিতচিত্তে দ্বার বন্ধ করিতে আসিল। কিন্তু সুমুখে চাহিতেই দেখিল, নীলাম্বর ফিরিয়া আসিতেছে। সে দোর ধরিয়া বিরক্তমুখে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তাহার মুখে দ্বাদশীর চাঁদের আলো পড়িয়াছিল।

নীলাম্বর কাছে আসিয়া একবার ইতস্তত করিল, তাহার পর চাদরের খুঁট হইতে খুলিয়া একটি আধুলি বাহির করিয়া সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোর কাছে বলতে ত লজ্জা নেই সুন্দরী, সবই জানিস—এই আধুলিটি শুধু আছে, নে। বলিয়া হাত তুলিয়া দিতে গেল। সুন্দরী জিভ কাটিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর বলিল, কত কষ্ট দিলাম—যাওয়া-আসার খরচ পর্যন্ত দিতে পারিনি। আর সে বলিতে পারিল না, কান্নায় তাহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল।

সুন্দরী একমুহূর্ত কি ভাবিল, পরক্ষণে হাত পাতিয়া বলিল, দাও। তুমি যাই হও, আমার চিরদিনের মনিব—আমার 'না' বলা সাজে না। বলিয়া আধুলিটি হাতে লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, তবে আর একবার ভিতরে এসো, বলিয়া ভিতরে চলিয়া আসিল।

নীলাম্বর পিছনে পিছনে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুন্দরী ঘরে ঢুকিয়া মিনিট-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া নীলাম্বরের পায়ের কাছে একমুঠা টাকা রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলাম্বর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া, সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, অমন করে চেয়ে থাকলে ত হবে না বাবু, আমি চিরকালের দাসী, শুদ্দুর হলেও এ জোর শুধু আমারই আছে, বলিয়া হেঁট হইয়া টাকাগুলি তুলিয়া লইয়া চাদরে বাঁধিয়া দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ তোমারই দেওয়া টাকা বাবু, তীর্থ করব বলে দেবতার নামে তুলে রেখেছিলুম—আর যেতে হ'ল না—দেবতা নিজে ঘরে এসে নিয়ে গেলেন।

নীলাম্বর তখনও কথা কহিতে পারিল না। বেশ করিয়া বাঁধিয়া দিয়া সে বলিল, বৌমা একলা আছেন, আর না, যাও—কিন্তু এ কথা তিনি যেন কিছুতেই না জানতে পারেন।

নীলাম্বর কি একটা বলিতে গেল, সুন্দরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, হাজার হলেও শুনব না বাবু। আজ আমার মান না রাখলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব। তাহার হাতের মধ্যে তখনও চাদরের সেই অংশটা ধরা ছিল, এমন সময় 'কি হচ্ছে গো?' বলিয়া নিতাই গাঙ্গুলী খোলা দরজার ভিতর দিয়া একেবারে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী চাদর ছাড়িয়া দিল।

নীলাম্বর বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাই ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া বলিল, ও ছোঁড়াটা নীলু না?

সুন্দরী মনে মনে রাগিয়া উঠিল, কিন্তু সহজভাবে বলিল, হাঁ, আমার মনিব।

শুনি, খেতে পায় না—এত রাত্তিরে যে?

কাজ ছিল, তাই এসেছিলেন।

ও—কাজ ছিল? বলিয়া নিতাই মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। ভাবটা এই যে, তাহার মত বয়সের লোকের চোখে ধুলি নিক্ষেপ সহজ কর্ম নয়।

সুন্দরীও হাসির অর্থ স্পষ্ট বুঝিল। নিতাইয়ের বয়স পঞ্চাশের উপরে গিয়াছে, মাথার চুল বারো আনা পাকিয়াছে—তাহার গোঁফ-দাড়ি কামান, মাথায় শিখা, কপালে সকালের চন্দনের ফোঁটা তখনও রহিয়াছে—সুন্দরী তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। সে চাহনির অর্থ বোঝা নিতাইয়ের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই সে কিছু উত্তেজিত হইয়াই বলিয়া উঠিল, অমন করে চেয়ে আছ যে?

দেখচি।

কি দেখচ?

দেখচি তোমরাও বামুন, আর যিনি চলে গেলেন তিনিও বামুন, কিন্তু কি আকাশ-পাতাল তফাত।

নিতাই কথাটা বুঝিতে না পারিয়া, প্রশ্ন করিল, তফাত কিসে?

সুন্দরী একটুখানি হাসিয়া বলিল, বুড়ো মানুষ, আর হিমে থেকো না, দাওয়ায় উঠে ব'স। মাইরি বলচি গাঙ্গুলীমশাই, তোমার দিকে চেয়ে ভাবছিলুম, আমার মনিবের পায়ের এক ফোঁটা ধুলো পেলে তোমাদের মত কতগুলি গাঙ্গুলী কত জন্ম উদ্ধার হতে পারে!

তাহার কথা শুনিয়া নিতাই ক্রোধে বিস্ময়ে বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া রহিল। সুন্দরী একটা কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে অত্যন্ত সহজভাবে বলিতে লাগিল, রাগ ক'রো না ঠাকুর, কথাটা সত্যি। আজ বলে নয়, বরাবরই দেখে আসচি ত আমার মনিবের পৈতেগাছটার দিকে চোখ পড়লে চোখ যেন ঠিকরে যায়—মনে হয়, ওঁর গলার ওপরে যেন আকাশের বিদ্যুৎ খেলা করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তোমাদের দেখ—দেখলেই আমার হাসি পায়। বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রথম হইতেই নিতাই ঈর্ষায় জ্বলিতেছিল, এখন ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দুই চোখ আগুনের মত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, অত দর্প করিস নে সুন্দরী—মুখ পচে যাবে।

সুন্দরী কলিকাটায় ফুঁ দিতে দিতে কাছে আসিয়া সহাস্যে বলিল, কিছু হবে না—নাও, তামাক খাও। বরং তোমার মুখই ম'লে পুড়বে না—আমার দুঃখী মনিবকে দেখে ঐ মুখে হেসেচ।

নিতাই কলিকাটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুন্দরী তাহার উত্তরীয়ের এক অংশ ধরিয়া ফেলিয়া হাসিয়া বলিয়া উঠিল, ব'স ব'স, মাথা খাও—

ক্রুদ্ধ নিতাই নিজের উত্তরীয় সজোরে টানিয়া লইয়া—গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও—নিপাত যাও—বলিয়া শাপ দিতে দিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

সুন্দরী সেইখানে বসিয়া পড়িয়া খুব খানিকটা হাসিল, তার পর উঠিয়া আসিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল—কিসে আর কিসে! বামুন বলি ওঁকে। এত দুঃখেও মুখে হাসিটি যেন লেগে রয়েচে, তবু চোখ তুলে চাইতে ভরসা হয় না—যেন আগুন জ্বলচে!

নয়

ঠিক কাহার অনুগ্রহে ঘটিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু কথাটা বিকৃত হইয়া বিরাজের কানে উঠিতে বাকী থাকিল না। সেদিন আলোচনা করিতে আসিয়াছিলেন ও বাড়ির পিসীমা। বিরাজ সমস্ত মন দিয়া শুনিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, ওঁর একটা কান কেটে নেওয়া উচিত পিসীমা।

পিসীমা রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বলিতে বলিতে গেলেন, জানি ত ওকে—এমন ফাজিল মেয়ে গাঁয়ে আর দুটি আছে কি!

বিরাজ স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, কবে আবার তুমি সুন্দরীর ওখানে গেলে?

নীলাম্বর ভয়ে শুষ্ক হইয়া গিয়া জবাব দিল, অনেকদিন আগে পুঁটির খবরটা নিতে গিয়েছিলাম।

আর যেও না। তার স্বভাব-চরিত্র শুনতে পাই ভারী মন্দ হয়েচে, বলিয়া সে নিজের

কাজে চলিয়া গেল। তারপর কতদিন কাটিয়া গেল। সূর্যদেব ওঠেন এবং অস্ত যান, তাঁকে ধরিয়া রাখিবার জো নাই বলিয়াই বোধ করি শীত গেল, গ্রীষ্মও যাই-যাই করিতে লাগিল। বিরাজের মুখের উপর একটা গাঢ় ছায়া ক্রমশ গাঢ়তর হইয়া পড়িতে লাগিল, অথচ চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত এবং খরতর। যে-কেহ তাহার দিকে চাহিতে যায়, তাহারই চোখ যেন আপনি ঝুঁকিয়া পড়ে। শূলবিদ্ধ দীর্ঘ বিষধর, শূলটাকে নিরন্তর দংশন করিয়া করিয়া, শ্রান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িয়া যেভাবে চাহিয়া থাকে, বিরাজের চোখের দৃষ্টি তেমনই করুণ, অথচ তেমনই ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীর সহিত কথাবার্তা প্রায়ই হয় না। তিনি কখন চোরের মতন আসেন যান, সেদিকে সে যেন দৃষ্টিপাতই করে না। সবাই তাহাকে ভয় করে, শুধু করে না ছোটবৌ। সে সুযোগ পাইলেই যখন তখন আসিয়া উপদ্রব করিতে থাকে। প্রথম প্রথম বিরাজ ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু পারিয়া উঠে নাই। চোখ রাঙাইলে সে গলা জড়াইয়া ধরে, শক্ত কথা বলিলে পা জড়াইয়া ধরে।

সেদিন দশহরা। অতি প্রত্যুষে ছোটবৌ লুকাইয়া আসিয়া ধরিল, এখনও কেউ ওঠেনি দিদি, চল্‌না একবার নদীতে ডুব দিয়ে আসি।

ও-পারে জমিদারের ঘাট তৈরী হওয়া পর্যন্ত তাহার নদীতে যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

দুই জায়ে স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে জল হইতে উঠিয়াই দেখিল, অদূরে একটা গাছতলায় জমিদার রাজেন্দ্রকুমার দাঁড়াইয়া আছে। সে স্থানটা হইতে তখনো সমস্ত অন্ধকার চলিয়া যায় নাই, তথাপি দুজনেই লোকটাকে চিনিল। ছোটবৌ ভয়ে জড়সড় হইয়া বিরাজের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরাজ অতিশয় বিস্মিত হইল। এত প্রভাতে লোকটা আসিল কিরূপে? কিন্তু পরক্ষণেই একটা সম্ভাবনা তাহার মনে উঠিল, হয়ত সে প্রত্যহ এমন করিয়াই প্রহরা দিয়া থাকে। মুহূর্তের এক অংশ মাত্র বিরাজ দ্বিধা করিল, তারপর ছোট-জায়ের একটা হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, দাঁড়াস নে ছোটবৌ, চ'লে আয়।

তাহাকে পাশে লইয়া দ্রুতপদে দ্বার পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া হঠাৎ সে কি ভাবিয়া থামিল, তারপর দৃঢ়পদে ফিরিয়া গিয়া রাজেন্দ্রের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, অস্পষ্ট আলোকেও সে দৃষ্টি রাজেন্দ্র সহিতে পারিল না, মুখ নামাইল।

বিরাজ বলিল, আপনি ভদ্রসন্তান, বড়লোক, এ কি প্রবৃত্তি আপনার!

রাজেন্দ্র হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল—জবাব দিতে পারিল না। বিরাজ বলিতে লাগিল, আপনার জমিদারি যত বড়ই হোক, যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেটা আমার। হাত দিয়া ওপারের ঘাটটা দেখাইয়া বলিল, আপনি যে কত বড় ইতর, তা সবাই জানে, আমিও জানি। বোধ করি, আপনার মা-বোন নেই। অনেকদিন আগে আমার দাসীকে দিয়ে এখানে ঢুকতে নিষেধ করেছিলাম, তা আপনি শোনেন নি।

রাজেন্দ্র এত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে তখনও কথা কহিতে পারিল না।

বিরাজ বলিল, আমার স্বামীকে আপনি চেনেন না, চিনলে কখনই আসতেন না। তাই, আজ বলে দিচ্ছি, আর কখনও আসবার পূর্বে তাঁকে চেনবার চেষ্টা করে দেখবেন, বলিয়া বিরাজ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। বাড়িতে ঢুকিতে-যাইতেছে, দেখিল, পীতাম্বর একটা গাড়ু হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বহুদিন হইতেই তাহার সহিত বাক্যালাপ ছিল না, তথাপি সে ডাকিয়া বলিল, বৌঠান, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কইছিলে সে ও-ই জমিদারবাবু, না?

চক্ষের নিমেষে বিরাজের চোখ-মুখ রাঙা হইয়া উঠিল; সে 'হাঁ' বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ঘরে গিয়া নিজের কথা সে তখনই ভুলিল, কিন্তু ছোটবৌর জন্য মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কেবলই ভাবিতে লাগিল, কি জানি, তাহাকে ঠাকুরপো দেখিতে পাইয়াছে কি না! কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, মিনিট-দশেক পরে ও-বাড়ি হইতে একটি মারের শব্দ ও চাপা কান্নার আর্তস্বর উঠিল।

বিরাজ ছুটিয়া আসিয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া কাঠের মূর্তির মত বসিয়া পড়িল।

নীলাম্বর এইমাত্র ঘুম ভাঙিয়া বাহিরে আসিয়া মুখ ধুইতেছিল; পীতাম্বরের তর্জন

ও প্রহারের শব্দ মুহূর্তকাল কান পাতিয়া শুনিল, এবং পরক্ষণেই বেড়ার কাছে আসিয়া লাথি মারিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া ও-বাড়িতে গিয়া দাঁড়াইল।

বেড়া ভাঙ্গার শব্দে পীতাম্বর চমকিয়া মুখ তুলিয়া সুমুখেই যমের মত বড়ভাইকে দেখিয়া বিবর্ণ হইয়া থামিল।

নীলাম্বর ভূ-শায়িতা ছোটবধূকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ঘরে যাও মা, কোন ভয় নেই।

ছোটবৌ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া গেলে নীলাম্বর সহজভাবে বলিল, বৌমার সামনে আর তোর অপমান করব না, কিন্তু, এই কথাটা আমার ভুলেও অবহেলা করিস নে যে, আমি যতদিন ও-বাড়িতে আছি ততদিন এ-সব চলবে না। যে হাতটা তুই ওর গায়ে তুলবি, তোর সেই হাতটা ভেঙ্গে দিয়ে যাব।—বলিয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

পীতাম্বর সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিয়া উঠিল, বাড়ি চ'ড়ে মারতে এলে, কিন্তু কারণ জান?

নীলাম্বর ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, না, জানতেও চাইনে।

পীতাম্বর বলিল, তা চাইবে কেন? আমাকে দেখচি তা হ'লে নিতান্তই ভিটে ছেড়ে পালাতে হবে।

নীলাম্বর তাহার মুখপানে অল্পক্ষণ চাহিয়া রহিল, পরে বলিল, ভিটে ছেড়ে কাকে পালাতে হবে, সে আমি জানি—তোকে মনে ক'রে দিতে হবে না। কিন্তু, যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ তোকে সবুর ক'রে থাকতেই হবে। সেই কথাটাই তোকে জানিয়ে গেলাম। বলিয়া আবার ফিরিবার উপক্রম করিতেই পীতাম্বর সহসা সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল, তবে তোমাকে জানিয়ে দিই দাদা, পরকে শাসন করবার আগে ঘর শাসন করা ভাল।

নীলাম্বর চাহিয়া রহিল। পীতাম্বর সাহস পাইয়া বলিতে লাগিল, ও পারের ঘাটটা কার জান ত? বেশ। আমি সেই থেকে ছোটবৌকে ঘাটে যেতে মানা ক'রে দিই। আজ রাত থাকতে উঠে বৌঠানের সঙ্গে নাইতে গিয়েছিলেন—এমনই হয়ত রোজই যান, কে জানে!

নীলাম্বর আশ্চর্য হইয়া বলিল, এই দোষে গায়ে হাত তুললি?

পীতাম্বর বলিল, আগে শোন। ওই জমিদারের ছেলের—কি জানি, রাজেনবাবু না কি নাম ওর—দেশ-বিদেশে সুখ্যাতি ধরে না। আজ যে বৌঠান তার সঙ্গে আধঘণ্টা ধ'রে গল্প করছিলেন, কেন?

নীলাম্বর বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, কে কথা কইছিল রে? বিরাজবৌ?

হাঁ, তিনিই।

তুই চোখে দেখেছিস?

পীতাম্বর মুখের ভাবটা হাসিবার মত করিয়া বলিল, তুমি আমাকে দেখতে পার না, জানি,—আমার সে বিচার নারায়ণ করবেন—কিন্তু—

নীলাম্বর ধমকাইয়া উঠিল,—আবার ঐ নাম মুখে আনে! কি বলবি বল।

পীতাম্বর চমকিয়া উঠিয়া ঈষৎ থামিয়া রুষ্টস্বরে বলিতে লাগিল, চোখে না দেখে কথা কওয়া আমার স্বভাব নয়। ঘর শাসন করতে না পার, পরকে তেড়ে মারতে এস না।

নীলাম্বরের মাথার উপর অকস্মাৎ যেন বাড়ি পড়িল। ক্ষণকাল উদ্‌ভ্রান্তের মত চাহিয়া থাকিয়া শেষে প্রশ্ন করিল, আধঘণ্টা ধরে গল্প করছিল, কে? বিরাজবৌ? তুই চোখে দেখেছিস? পীতাম্বর দু-এক পা ফিরিয়া গিয়াছিল, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, চোখেই দেখেচি। আধঘণ্টার হয়ত বেশী হতেও পারে।

আবার নীলাম্বর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, ভাল, তাই যদি হয়, কি করে জানলি তার কথা কইবার আবশ্যক ছিল না?

পীতাম্বর মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, সে কথা জানি নে। তবে আমার মারধর করা উচিত হয়নি, কেননা ঘাট তৈরি ছোটবৌর জন্য হয়নি।

মুহূর্তের উত্তেজনায় নীলাম্বর দুই হাত তুলিয়া ছুটিয়া আসিয়াই থামিয়া পড়িল, তৎপরে পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, তুই জানোয়ার, তাতে ছোটভাই। বড়ভাই

হ'য়ে আমি আর তোকে অভিসম্পাত করব না, আমি মাপ করলুম, কিন্তু আজ তুই যে-কথা গুরুজনকে বললি, ভগবান হয়ত তোকে মাপ করবেন না—যা,—বলিয়া সে ধীরে ধীরে এ-ধারে আসিয়া ভাঙ্গা বেড়াটা নিজেই বাঁধিয়া দিতে লাগিল।

বিরাজ কান পাতিয়া সমস্ত শুনিল। লজ্জায় ঘৃণায় তাহার আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিতেছিল, একবার ভাবিল, সামনে গিয়া নিজের সব কথা বলে, কিন্তু, পা বাড়াইতে পারিল না। তাহার রূপের উপর পরপুরুষের লুব্ধদৃষ্টি পড়িয়াছে, স্বামীর সম্মুখে এ কথা নিজের মুখে সে কি করিয়া উচ্চারণ করিবে!

বেড়া বাঁধিয়া দিয়া নীলাম্বর বাহিরে চলিয়া গেল।

দুপুরবেলা ভাত বাড়িয়া দিয়া বিরাজ আড়ালে বসিয়া রহিল, রাত্রে স্বামী ঘুমাইয়া পড়িলে নিঃশব্দে শয্যায় আসিয়া প্রবেশ করিল এবং প্রভাতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিবার পূর্বেই বাহির হইয়া গেল।

এমনি করিয়া পলাইয়া বেড়াইয়া যখন দু'দিন কাটিয়া গেল, অথচ নীলাম্বর কোন প্রশ্ন করিল না, তখন আর এক ধরনের আশঙ্কা তাহার মনের মধ্যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল। স্ত্রী সম্বন্ধে এতবড় অপবাদের কথায় স্বামীর মনে কৌতূহল জাগে না, ইহার কোন সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না; কিংবা ঘটনাটায় তিনি বিস্মিত হইয়াছেন এ সম্ভাবনাও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না। এ দুইদিন একদিকে যেমন সে গা ঢাকিয়া ফিরিয়াছে, অপর দিকে তেমনই অনুক্ষণ আশা করিয়াছে, এইবার কথা উঠিবে; এইবার তিনি ডাকিয়া ঘটনাটি জানিতে চাহিবেন। তাহা হইলেই সে আনুপূর্বিক সমস্ত নিবেদন করিয়া স্বামীর পায়ের নীচে তাহার বুকের ভারী বোঝাটা নামাইয়া ফেলিয়া সুস্থ হইয়া বাঁচিবে, কিন্তু, কৈ কিছুই যে হইল না! স্বামী নির্বাক হইয়া রহিলেন।

একবার সে ভাবিবার চেষ্টা করিল, হয়ত কথাটা তিনি আদৌ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু এই তাহার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করাটাও কি তাঁহার চোখে পড়িয়া সংশয় উদ্রেক করিতেছে না! অথচ যাহা এতদিন পর্যন্ত সে গোপন করিয়া আসিয়াছে, তাহা নিজেই বা আজ যাচিয়া বলিবে কিরূপে? সেদিনটাও এমনই করিয়া কাটিল। পরদিন সকালে ভয়ার্ত ভারাতুর হৃদয় লইয়া সে কোনমতে ঘরের কাজ করিতেছিল, হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কথা তাহার বুকের গভীর তলদেশ আলোড়িত করিয়া ঘূর্ণাবর্তের মত বাহির হইয়া আসিল, আর যদি ঠাকুরপোর কথা বিশ্বাস করেই থাকেন, তা হ'লে?

নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিতে যাইতেছিল, সে ঝড়ের মত সুমুখে আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

বিস্মিত নীলাম্বর মুখ তুলিতেই বিরাজ সজোরে নিজের অধর দংশন করিয়া বলিয়া উঠিল, কেন, কি করেচি? কথা কও না যে বড়?

নীলাম্বর হাসিল। বলিল, পালিয়ে বেড়ালে কথা কই কার সঙ্গে?

পালিয়ে বেড়াচ্চি! তুমি ডাকতে পারনি একবার?

নীলাম্বর বলিল, যে লোক পালিয়ে বেড়ায় তাকে ডাকলে পাপ হয়।

পাপ হয়? তাহলে ঠাকুরপোর কথা তুমি বিশ্বাস করেচ বল?

সত্যি কথা বিশ্বাস করব না?

বিরাজ রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রুবিকৃতকণ্ঠে চেঁচাইয়া বলিল, সত্যি নয়—ভয়ঙ্কর মিছে কথা। কেন তুমি বিশ্বাস করলে?

তুমি নদীর ধারে কথা বলনি?

বিরাজ উদ্ধতভাবে জবাব দিল, হাঁ বলেচি।

নীলাম্বর বলিল, আমি ঐটুকুই বিশ্বাস করেচি।

বিরাজ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, যদি বিশ্বাসই করেচ, তবে ঐ ইতরটার মত শাসন করলে না কেন?

নীলাম্বর আবার হাসিল। সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের মত নির্মল হাসিতে তাহার সমস্ত মুখ ভরিয়া গেল। ডান হাত তুলিয়া বলিল, তবে কাছে আয়, ছেলেবেলার মত আর একবার কান মলে দিই।

চক্ষের পলকে বিরাজ সম্মুখে আসিয়া হাটু গাড়িয়া বসিল এবং পরক্ষণেই তাহার বুকের উপরে সজোরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দুই বাহু দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর কাঁদিতে নিষেধ করিল না। তাহার নিজের দু চোখও জলে ভিজিয়া উঠিয়াছিল, সে স্ত্রীর মাথার উপরে নিঃশব্দে ডান হাত রাখিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। কিছুক্ষণে কান্নার প্রথম বেগ কমিয়া আসিলে সে মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি তাকে বলেছিলুম জান?

নীলাম্বর সস্নেহে মৃদুস্বরে বলিল, জানি; তাকে আসতে বারণ করে দিয়েচ।

কে তোমাকে বললে?

নীলাম্বর সহাস্যে কহিল, কেউ বলেনি। কিন্তু একটা অচেনা লোকের সঙ্গে যখন কথা কয়েচ, তখন অনেক দুঃখেই কয়েচ। সে কথা ও-ছাড়া আর কি হতে পারে বিরাজ!

বিরাজের চোখ দিয়া আবার জল পড়িতে লাগিল।

নীলাম্বর বলিতে লাগিল, কিন্তু কাজটা ভাল করনি। আমাকে জানান উচিত ছিল, আমিই গিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতাম। আমি অনেকদিন পূর্বেই তার মনের ভাব টের পেয়েছি, কতদিন সকালে বিকালে তাকে দেখতেও পেয়েছি, কিন্তু তোমার নিষেধ মনে করেই কোনদিন কিছু বলিনি।

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই আকাশে মেঘ করিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতেছিল, রাত্রে স্বামী-স্ত্রীতে বিছানায় শুইয়া আবার কথা উঠিল।

নীলাম্বর বলিল, আজ সারাদিন তাকে দেখবার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম।

বিরাজ ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, কেন? কেন?

দুটো কথা না বললে ভগবানের নিকট অপরাধী হয়ে থাকতে হবে—তাই।

ভয়ে উত্তেজনায় বিরাজ উঠিয়া বসিয়া বলিল, না, সে হবে না, কিছুতেই হবে না; এই নিয়ে তুমি তাকে একটি কথাও বলতে পাবে না।

তাহার মুখচোখের ভাব লক্ষ্য করিয়া নীলাম্বর অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, আমি স্বামী, আমার কি একটা কর্তব্য নেই?

বিরাজ কোনরূপ চিন্তা না করিয়াই বলিয়া বসিল, স্বামীর অন্য কর্তব্য আগে কর, তারপরে এ কর্তব্য করতে যেও।

কি? বলিয়া নীলাম্বর ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া থাকিয়া, অবশেষে মৃদুস্বরে 'আচ্ছা' বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া চুপ করিয়া শুইল।

বিরাজ তেমনইভাবে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল,—এ কি কথা সহসা তাহার মুখ দিয়া আজ বাহির হইয়া গেল!

বাহিরে বর্ষার প্রথম বারিপাতের মৃদু শব্দ খোলা জানালার ভিতর দিয়া ভিজামাটির গন্ধ বহিয়া আনিতে লাগিল, ভিতরে স্বামী-স্ত্রী নির্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে নীলাম্বর গভীর আর্তকণ্ঠে কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল, আমি যে কত অপদার্থ, বিরাজ, তা তোর কাছে যেমন শিখি, তেমন আর কারও কাছে নয়।

বিরাজ কি কথা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া শব্দ ফুটিল না।

বহুদিন পরে আজ এই অসহ্য দুঃখদৈন্যপীড়িত দম্পতিটির সন্ধির সূত্রপাতেই, আবার তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল।

দশ

মধ্যাহ্নে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া ছোটবৌ বিরাজের পায়ের নীচে কাঁদিয়া আসিয়া পড়িল। স্বামীর অপরাধের ভয়ে ব্যাকুল হইয়া এই দুইদিন ধরিয়া সে অনুক্ষণ এই সুযোগটুকু প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কাঁদিয়া বলিল, শাপ-সম্পাত দিও না দিদি, আমার মুখ চেয়ে ওঁকে মাপ কর, ওঁর কিছু হ'লে বাঁচব না।

বিরাজ হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া বিরস গম্ভীর-মুখে বলিল, আমি অভিসম্পাত দেব না বোন্, আমার অনিষ্ট করবার সাধ্যও ওর নেই, কিন্তু তোর মত সতীলক্ষ্মীর দেহে বিনাদোষে হাত তুললে মা দুর্গা সহ্য করবেন না যে!

মোহিনী শিহরিয়া উঠিল। চোখ মুছিয়া বলিল, কি করব দিদি, ঐ তাঁর স্বভাব। যে দেবতা ওঁর দেহে অমন রাগ দিয়েছেন, তিনিই মাপ করবেন। তবুও এমন দেব-দেবতা নেই যে, এজন্য মানত করিনি, কিন্তু মহাপাপী আমি, আমার ডাকে কেউ কান দিলেন না। এমন একটা দিন যায় না দিদি,—বলিয়া সে হঠাৎ থামিয়া গেল।

বিরাজ এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই যে ছোটবৌর ডান রগের উপর একটা বাঁকা গাঢ় কাল দাগ পড়িয়াছে, সভয়ে বলিয়া উঠিল, তোর কপালে কি মারের দাগ নাকি রে?

ছোটবৌ লজ্জিত-মুখ হেঁট করিয়া ঘাড় নাড়িল।

কি দিয়ে মারলে?

স্বামীর লজ্জায় মোহিনী মুখ তুলিতে পারিতেছিল না; নতমুখে মৃদুস্বরে বলিল, রাগ হলে ওঁর জ্ঞান থাকে না দিদি।

তা জানি, তবু কি দিয়ে মারলে?

মোহিনী তেমনই নতমুখে থাকিয়াই বলিল, পায়ে চটিজুতা ছিল—

বিরাজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল—তাহার দুই চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল। খানিক পরে চাপা বিকৃতকণ্ঠে বলিল, জুতা দিয়ে মারলে! কি করে সহ্য করে রইলি ছোটবৌ?

ছোটবৌ একটুখানি মুখ তুলিয়া বলিল, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে দিদি।

বিরাজ সে কথা যেন কানে শুনিতে পাইল না, তেমনই বিকৃত গলায় বলিল, আবার তারই জন্যে তুই মাপ চাইতে এলি?

ছোটবৌ বড়জার মুখপানে চাহিয়া বলিল, হাঁ দিদি। তুমি প্রসন্ন না হলে ওঁর অকল্যাণ হবে। আর, সহ্য করার কথা যদি বললে দিদি, সে তোমার কাছেই শেখা—আমার যা কিছু সবই তোমার পায়ে—

বিরাজ অধীর হইয়া উঠিল, না ছোটবৌ, না, মিছে কথা বলিস নে—এ অপমান আমি সইতে পারিনে।

ছোটবৌ একটুখানি হাসিয়া বলিল, নিজের অপমান সইতে পারাটাই খুব বড় পারা দিদি? তোমার মত স্বামী-সৌভাগ্য সংসারে মেয়েমানুষের অদৃষ্টে জোটে না, তবুও তুমি যা সয়ে আছ, সে সইতে গেলে আমরা গুঁড়ো হয়ে যাই। তাঁর মুখে হাসি নেই, মনের ভিতর সুখ নেই, তোমার রাতদিন চোখে দেখতে হচ্চে; অমন স্বামীর অত কষ্ট সহ্য করতে তুমি ছাড়া আর কেউ পারত না দিদি।

বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ খপ করিয়া হাত দিয়া তাহার পা দুটো চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বল, ওঁকে ক্ষমা করলে? তোমার মুখ থেকে না শুনলে আমি কিছুতেই পা ছাড়ব না—তুমি প্রসন্ন না হ'লে ওঁকে কেউ রক্ষে করতে পারবে না দিদি!

বিরাজ পা সরাইয়া লইয়া হাত দিয়া ছোটবৌর চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া বলিল, মাপ করলুম।

ছোটবৌ আর একবার পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া আনন্দিতমুখে চলিয়া গেল।

কিন্তু বিরাজ অভিভূতের মত সেইখানেই বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কে যেন বারংবার ডাক দিয়া বলিতে লাগিল, এই দেখে শেখ বিরাজ!

সেই অবধি অনেকদিন পর্যন্ত ছোটবৌ এ বাড়িতে আসে নাই, কিন্তু একটি চোখ, একটি কান এই দিকেই পাতিয়া রাখিয়াছিল। আজ বেলা একটা বাজে, সে অতি সাবধানে এদিক ওদিকে চাহিয়া এ বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

বিরাজ গালে হাত দিয়া রান্নাঘরে দাওয়ার একধারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল, তেমনই বসিয়া রহিল।

ছোটবৌ কাছে বসিয়া পায়ে হাত দিয়া নিজের মাথায় স্পর্শ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, দিদি কি পাগল হয়ে যাচ্চ?

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া তীব্রকণ্ঠে উত্তর করিল, তুই হ'তিস নে?

ছোটবৌ বলিল, তোমার সঙ্গে তুলনা করে আমাকে অপরাধী ক'র না দিদি, এই দুটি পা'র ধুলোর যোগ্যও ত আমি নই, কিন্তু তুমি বল, কেন এমন কচ্চ? কেন, বটঠাকুরকে আজ খেতে দিলে না?

আমি ত খেতে বারণ করিনি!

ছোটবৌ বলিল, বারণ করনি সে কথা ঠিক, কিন্তু, কেন একবার গেলে না? তিনি খেতে বসে কতবার ডাকলেন। একটা সাড়া পর্যন্ত দিলে না। আচ্ছা তুমিই বল, এতে দুঃখ হয় কি না? একটিবার কাছে গেলে ত তিনি ভাত ফেলে উঠে যেতেন না।

তথাপি বিরাজ মৌন হইয়া রহিল।

ছোটবৌ বলিতে লাগিল, হাত-জোড়া ছিল ব'লে আমাকে ত ভুলাতে পারবে না দিদি! চিরকাল সমস্ত কাজ ফেলে রেখে তাঁকে সুমুখে বসে খাইয়েচ—সংসারে এর চেয়ে বড় কাজ তোমার কোনদিন ছিল না, আজ—

কথা শেষ না হইবার পূর্বেই বিরাজ উন্মাদের মত তাহার একটা হাত ধরিয়া সজোরে টান দিয়া বলিল, তবে দেখবি আয়। বলিয়া টানিয়া আনিয়া রান্নাঘরের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, ঐ চেয়ে দেখ্!

ছোটবৌ চাহিয়া দেখিল একটা কাল পাথরে অপরিস্কৃত মোটা চালের ভাত এবং তাহারই একধারে অনেকটা কলমি-শাকসিদ্ধ, আর কিছুই নাই।

আজ কোন উপায় না দেখিয়া বিরাজ এইগুলি নদী হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া সিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে ছোটবৌর দুচোখ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, কিন্তু, বিরাজের চোখে জলের আভাস মাত্র নাই। দুই জায়ে নিঃশব্দে মুখোমুখি চাহিয়া রহিল।

বিরাজ অবিকৃতকণ্ঠে বলিল, তুইও ত মেয়েমানুষ, তোকেও রেঁধে স্বামীর পাতে ভাত দিতে হয়, তুই বল্, পৃথিবীতে কেউ কি সুমুখে বসে স্বামীর ওই খাওয়া চোখে দেখতে পারে? আগে বল্, ব'লে যা, তোর মুখে যা আসে তাই ব'লে আমাকে গাল দে, আমি কথা ক'ব না।

ছোটবৌ একটি কথাও বলিতে পারিল না, তাহার চোখ দিয়া তেমনই অঝোরে জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিরাজ বলিতে লাগিল, দৈবাৎ রান্নার দোষে যদি কোনদিন তাঁর একটি ভাতও কম খাওয়া হয়েছে, ত, সারাদিন বুকের ভিতর আমার কি ছুঁচ বিঁধেছে, সে আর কেউ না জানে ত তুই জানিস ছোটবৌ, আজ তাঁর ক্ষিদের সময় আমাকে ঐ এনে দিতে হয়—তাও বুঝি আর জোটে না—

আর সে সহ্য করিতে পারিল না, ছোটজার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া দুই হাতে গলা জড়াইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপর, সহোদরার মত এই দুই রমণী বহুক্ষণ পর্যন্ত বাহুপাশে আবদ্ধ হইয়া রহিল, বহুক্ষণ ধরিয়া এই দুই অভিন্ন নারীহৃদয় নিঃশব্দে অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর বিরাজ মাথা তুলিয়া বলিল, না তোকে লুকাব না, কেননা, আমার দুঃখ বুঝতে তুই ছাড়া আর কেউ নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমি সরে না গেলে ওঁর কষ্ট যাবে না। কিন্তু, থেকে ত ও-মুখ না দেখে একটা দিনও কাটাতে পারব না। আমি যাব, বল্ আমি গেলে ওঁকে দেখবি?

ছোটবৌ চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথা যাবে?

বিরাজের শুষ্ক ওষ্ঠাধরে কঠিন শীতল হাসির রেখা পড়িল, বোধ করি একবার সে দ্বিধাও করিল, তারপর বলিল, কি করে জানব বোন কোথায় যেতে হয়, শুনি ওর চেয়ে পাপ নাকি আর নেই, তা সে যাই হোক এ জ্বালা এড়াব ত!

এবার মোহিনী বুঝিতে পারিয়া শিহরিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া তাহার মুখে হাত চাপা

দিয়া বলিয়া উঠিল, ছি ছি, ও কথা মুখে এনো না দিদি! আত্মহত্যার কথা যে বলে তার পাপ, যে কানে শোনে তার পাপ, ছি ছি, কি হয়ে গেলে তুমি!

বিরাজ হাত সরাইয়া দিয়া বলিল, তা জানিনে। শুধু জানি, ওঁকে আর খেতে দিতে পারচি নে। আজ আমাকে ছুঁয়ে কথা দে তুই, যেমন ক'রে পারিস দুই ভায়ে মিল করে দিবি।

কথা দিলুম, বলিয়া মোহিনী সহসা বসিয়া পড়িয়া বিরাজের পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তবে আমাকেও আজ একটা ভিক্ষে দেবে বল?

বিরাজ জিজ্ঞাসা করিল, কি?

তবে এক মিনিট সবুর কর আমি আসছি, বলিয়া সে পা বাড়াইতেই বিরাজ আঁচল ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, না যাসনে। আমি একটি তিল পর্যন্ত কারু কাছে নেব না।

কেন নেবে না?

বিরাজ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, সে কোনমতেই হবে না, আর আমি কারও কিছু নিতে পারব না। —

ছোটবৌ ক্ষণেকের জন্যে স্থিরদৃষ্টিতে বড়জার আকস্মিক উত্তেজনা লক্ষ্য করিল। তারপর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, তবে শোন দিদি। কেন জানিনে, আগে তুমি আমাকে ভালবাসতে না, ভাল ক'রে কথা কইতে না, সেজন্য কত যে লুকিয়ে বসে কেঁদেচি, কত দেবদেবীকে ডেকেচি, তার সংখ্যাই নাই। আজ তাঁরাও মুখ তুলে চেয়েছেন, তুমিও ছোটবোন বলে ডেকেচ। এখন একবার ভেবে দেখ, আমাকে এই অবস্থায় দেখে কিছু না করতে পেলে তুমি কিরকম ক'রে বেড়াতে?

বিরাজ জবাব দিতে পারিল না। মুখ নীচু করিয়া রহিল।

ছোটবৌ উঠিয়া গিয়া অনতিকাল পরে একটা বড় ধামায় সর্বপ্রকার আহার্য পূর্ণ করিয়া আনিয়া নামাইয়া রাখিল।

বিরাজ স্থির হইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু সে যখন কাছে আসিয়া তাহার আঁচলের একটা খুঁট তুলিয়া একখানা মোহর বাঁধিতে লাগিল, তখন সে আর থাকিতে না পারিয়া সজোরে ঠেলিয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, না, ও কিছুতেই হবে না—ম'রে গেলেও না।

মোহিনী ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, হবে না কেন, নিশ্চয় হবে। এ আমার বটঠাকুর আমাকে বিয়ের সময়ে দিয়েছিলেন। বলিয়া আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া আর একবার হেঁট হইয়া পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

এগার

মগরার এতদিনের পিতলের কবজার কারখানা যেদিন সহসা বন্ধ হইয়া গেল এবং এই খবরটা চাঁড়ালদের সেই মেয়েটি বিরাজকে দিতে আসিয়া ছাঁচ বিক্রির অভাবে নিজের নানাবিধ ক্ষতি ও অসুবিধার বিবরণ অনর্গল বকিতে লাগিল, বিরাজ তখন চুপ করিয়া শুনিল। তারপর একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিল মাত্র। মেয়েটি মনে করিল, তাহার দুঃখের অংশী মিলিল না, তাই ক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া গেল। হায় রে, অবোধ দুঃখীর মেয়ে, তুই কি করিয়া বুঝিবি সেইটুকু নিশ্বাসে কি ছিল, সে নীরবতার আড়ালে কি ঝড় বহিতে লাগিল! শান্ত নির্বাক ধরিত্রীর অন্তস্তলে কি আগুন জ্বলে, সে বুঝিবার ক্ষমতা তুই কোথায় পাইবি!

নীলাম্বর আসিয়া বলিল, সে কাজ পাইয়াছে। আগামী পূজার সময় হইতে কলিকাতার এক নামজাদা কীর্তনের দলে সে খোল বাজাইবে।

খবর শুনিয়া বিরাজের মুখ মৃতের মত পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাহার স্বামী গণিকার অধীনে, গণিকার সংস্রবে সমস্ত ভদ্র-সমাজের সম্মুখে গাহিয়া বাজাইয়া ফিরিবে! তবে, তাহার জুটিবে! লজ্জায় ধিক্কারে সে মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল, মুখ ফুটিয়া নিষেধ করিতেও পারিল না—আর যে কোন উপায় নাই। সন্ধ্যার অন্ধকারে নীলাম্বর সে মুখের ছবি দেখিতে পাইল না—তাজাই হইল।

ভাটার টানে জল যেমন প্রতিমুহূর্তে ক্ষয়চিহ্ন তটপ্রান্তে আঁকিতে আঁকিতে দূরে হইতে সুদূরে সরিয়া যায়, ঠিক তেমনই করিয়া বিরাজ শুকাইতে লাগিল। অতি দ্রুত অতি সুস্পষ্টভাবে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার দেহতটের সমস্ত মলিনতা নিরন্তর অনাবৃত করিয়া দিয়া তাহার দেববাঞ্ছিত অতুল যৌবনশ্রী কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতে লাগিল। দেহ শুষ্ক, মুখ ম্লান, দৃষ্টি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল—যেন কি একটা ভয়ের বস্তু সে অহরহ দেখিতেছে। অথচ তাহাকে দেখিবার কেহ নাই। ছিল শুধু ছোটবৌ; সেও মাসাধিক কাল ভাইয়ের অসুখে বাপের বাড়ি গিয়াছে। নীলাম্বর দিনের বেলা প্রায়ই ঘরে থাকে না। যখন আসে তখন রাত্রির আঁধার, তাহার দুই চোখ প্রায়ই রাঙা, নিশ্বাস উষ্ণ বহে। বিরাজ সবই দেখিতে পায়, সবই বুঝিতে পারে, কিন্তু কোনো কথাই বলে না। বলিতে ইচ্ছাও করে না, তাহার সামান্য কথাবার্তা কহিতেও এমনি ক্লান্তি বোধ হয়।

কয়েকদিন হইল, বিকাল হইতে তাহার শীত করিয়া মাথা ধরিয়া উঠিতেছিল, এই লইয়াই তাহাকে স্তিমিত সন্ধ্যা-দীপটি হাতে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইত। স্বামী বাড়ি থাকেন না বলিয়া, দিনের বেলা আর সে প্রায়ই রাঁধিত না, রাতে ভাত রাঁধিত, কিন্তু তখন তাহার জ্বর। স্বামীর খাওয়া হইয়া গেলে হাত-পা ধুইয়া শুইয়া পড়িত। এমনই করিয়া তাহার দিন কাটিতেছিল। ঠাকুর-দেবতাকে বিরাজ আর মুখ তুলিয়া চাহিতেও বলে না, পূর্বের মত প্রার্থনাও জানায় না। আহ্নিক শেষ করিয়া গলায় আঁচল দিয়া যখন প্রণাম করে, তখন শুধু মনে মনে বলে, ঠাকুর যে পথে যাচ্ছি, সে পথে যেন একটু শিগগির ক'রে যেতে পাই।

সেদিন শ্রাবণের সংক্রান্তি। সকাল হইতে ঘন-বৃষ্টিপাতের আর বিরাম ছিল না। তিন দিন জ্বর-ভোগের পর বিরাজ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আকুল হইয়া সন্ধ্যার পর বিছানায় উঠিয়া বসিল। নীলাম্বর বাড়ি ছিল না। পরশু, স্ত্রীর এত জ্বর দেখিয়াও তাহাকে শ্রীরামপুরের এক ধনাঢ্য শিষ্যের বাটীতে কিছু প্রাপ্তির আশায় যাইতে হইয়াছে; কিন্তু কথা ছিল কোনোমতেই রাত্রিবাস করিবে না, যেমন করিয়া হউক সেইদিনই সন্ধ্যা নাগাদ ফিরিয়া আসিবে। পরশু গিয়াছে, কাল গিয়াছে, আজও যাইতে বসিয়াছে, তাহার দেখা নাই। অনেক-দিনের পর আজ সমস্ত দিন ধরিয়া বিরাজ যখন-তখন কাঁদিয়াছে। অনেকদিনের পর আজ সে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পায় মানত করিতে করিতে তাহার সমস্তই নিঃশেষ করিয়াছে। আর কিছুতেই শুইয়া থাকিতে না পারিয়া, সন্ধ্যা জ্বালিয়া দিয়া একটা গামছা মাথায় ফেলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে যতদূর পারিল চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিজা কাপড়ে, ভিজা চুলে, চণ্ডীমণ্ডপের পৈঠায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ পরে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কি জানি, তাঁহার কি ঘটিল! একে দুঃখে কষ্টে অনাহারে দেহ তাঁহার দুর্বল, তাহাতে পথশ্রম—কোথায় অসুখ হইয়া পড়িলেন, না গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়িলেন, কি হইল, কি সর্বনাশ ঘটিল—ঘরে বসিয়া সে কি করিয়া বলিবে, কেমন করিয়া কি উপায় করিবে! আর একটা বিপদ, বাড়িতে পীতাম্বরও নাই, কাল বৈকালে সে ছোটবধূকে আনিতে গিয়াছে, সমস্ত বাড়ির মধ্যে বিরাজ একেবারে একা। আবার সে নিজেও পীড়িত। আজ দুপুর হইতে তাহার জ্বর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘরে এমন এতটুকু কিছু ছিল না যে সে খায়। দুদিন শুধু জল খাইয়া আছে। জলে ভিজিয়া তাহার শীত করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, সে কোনোমতে হাতে পায়ে ভর দিয়া পৈঠা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে ঢুকিয়া মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

সদর দরজায় ঘা পড়িল। বিরাজ একবার কান পাতিয়া শুনিল, দ্বিতীয় করাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই 'যাই' বলিয়া চোখের পলকে কপাট খুলিয়া ফেলিল। অথচ, মুহূর্ত পূর্বে সে উঠিয়া বসিতে পারিতেছিল না।

যে করাঘাত করিতেছিল, সে ও-পাড়ার চাষাদের ছেলে। বলিল, মাঠাকরুন, দাঠাকুর একটা শুকনা কাপড় চাইলে—দাও।

বিরাজ ভাল বুঝিতে পারিল না, চৌকাঠে ভর দিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কাপড় চাইলেন? কোথায় তিনি?

ছেলেটি জবাব দিল, গোপাল ঠাকুরের বাপের গতি ক'রে এই সবাই ফিরে এলেন যে।
গতি ক'রে? বিরাজ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। গোপাল চক্রবর্তী তাহাদের দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। তাহার বৃদ্ধ পিতা বহুদিন যাবৎ রোগে ভুগিতেছিলেন, দিন-দুই পূর্বে তাঁহাকে ত্রিবেণীতে গঙ্গাযাত্রা করান হইয়াছিল, আজ দ্বিপ্রহরে তিনি মরিয়াছেন, দাহ করিয়া এইমাত্র সকলে ফিরিয়া আসিয়াছে। ছেলেটি সব সংবাদ দিয়া শেষকালে জানাইল, দাঠাকুরের মত এ অঞ্চলে কেউ নাড়ী ধরতে পারে না, তাই তিনিও সেইদিন হ'তে সঙ্গে ছিলেন।
বিরাজ টলিতে টলিতে ভিতরে আসিয়া তাহার হাতে একখানা কাপড় দিয়া, শয্যা আশ্রয় করিল।
জনপ্রাণীশূন্য অন্ধকার ঘরের মধ্যে যাহার স্ত্রী একা, জ্বরে, দুশ্চিন্তায়, অনাহারে মৃতকল্প, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও যাহার স্বামী বাহিরে পরোপকার করিতে নিযুক্ত, সেই হতভাগিনীর বলিবার, কি কহিবার আর কি বাকী থাকে! আজ তাহার অবসন্ন বিকৃত মস্তিষ্ক তাহাকে বারংবার দুঃস্বরে বলিয়া দিতে লাগিল,—বিরাজ, সংসারে তোর কেউ নেই। তোর মা নেই, বাপ নেই, ভাই নেই, বোন নেই—স্বামীও নেই; আছে শুধু যম। তাঁর কাছে ভিন্ন তোর জুড়োবার আর দ্বিতীয় স্থান নেই। বাহিরে বৃষ্টির শব্দে, ঝিল্লীর ডাকে, বাতাসের স্বননে কেবল নাই-নাই শব্দই তাহার দুই কানের মধ্যে নিরন্তর প্রবেশ করিতে লাগিল। ভাঁড়ারে চাল নাই, গোলায় ধান নাই, বাগানে ফল নাই, পুকুরে মাছ নাই,—সুখ নাই, শান্তি নাই। স্বাস্থ্য নাই—ও বাড়িতে ছোটবৌ নাই, সকলের সঙ্গে আর তার স্বামীও নাই। অথচ আশ্চর্য এই, কাহারও বিরুদ্ধে বিশেষ কোন ক্ষোভের ভাবও তাহার মনে উঠিল না। এক বৎসর পূর্বে স্বামীর এই হৃদয়হীনতার শতাংশের একাংশ বোধ করি তাহাকে ক্রোধে পাগল করিয়া তুলিত; কিন্তু, আজ কি-একরকম স্তব্ধ অবসাদ তাহাকে অসাড় করিয়া আনিতে লাগিল।
এমনই নির্জীবের মত পড়িয়া থাকিয়া সে কত কি ভাবিয়া দেখিতে চাহিল, ভাবিতেও লাগিল, কিন্তু সমস্ত ভাবনাই এলোমেলো। অথচ ইহারই মধ্যে অভ্যাসবশে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—কিন্তু সমস্ত দিন তাঁর খাওয়া হয়নি যে!
আর শুইয়া থাকিতে পারিল না; ত্বরিত-পদে বিছানা ছাড়িয়া প্রদীপ হাতে ভাঁড়ারে ঢুকিয়া তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিতে লাগিল, রাঁধিবার মত যদি কোথাও কিছু থাকে! কিন্তু কিছুই নাই—একটা কণাও তাহার চোখে পড়িল না। বাহিরে আসিয়া খুঁটি ঠেস দিয়া এক-মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল, তারপরে হাতের প্রদীপ ফু দিয়া নিবাইয়া রাখিয়া খিড়কির কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। কি নিবিড় অন্ধকার! ভীষণ স্তব্ধতা, ঘন গুল্ম-কণ্টকাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পিচ্ছল পথ, কিছুই তাহার গতিরোধ করিল না। বাগানের অপর প্রান্তে বনের মধ্যে চাঁড়ালদের ক্ষুদ্র কুটীর, সে সেইদিকে চলিল। বাহিরে প্রাচীর ছিল না, বিরাজ একেবারে প্রাঙ্গণের উপরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, তুলসী!
ডাক শুনিয়া তুলসী আলো হাতে বাহিরে আসিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল—এই আঁধারে তুমি কেন মা?
বিরাজ কহিল, চাট্টি চাল দে!
চাল দেব? বলিয়া তুলসী হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। এই অদ্ভুত প্রার্থনার কোন অর্থ খুঁজিয়া পাইল না।
বিরাজ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে থাকিস নে তুলসী, একটু শিগগির ক'রে দে।
তুলসী আরও দু' একটা প্রশ্নের পর চাল আনিয়া বিরাজের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া বলিল, কিন্তু এ মোটা চালে কি কাজ হবে মা? এ তো তোমরা খেতে পারবে না।
বিরাজ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পারব।
তারপর তুলসী আলো লইয়া পথ দেখাইতে চাহিল। বিরাজ নিষেধ করিয়া বলিল, কাজ নেই, তুই একা ফিরে আসতে পারবি নে। বলিয়া নিমেষের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।
আজ চাঁড়ালের ঘরে সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিল, ভিক্ষা করিয়া লইয়া গেল, অথচ

এত বড় অপমান তাহাকে তেমন করিয়া বিঁধিল না—শোক, দুঃখ, অপমান, অভিমান, কোন বস্তুরই তীব্রতা অনুভব করিবার শক্তি তাহার দেহে ছিল না।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল নীলাম্বর আসিয়াছে। স্বামীকে সে তিন দিন দেখে নাই, চোখ পড়িবামাত্রই দেহের প্রতি রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত উন্দাম হইয়া উঠিয়া একটা দুর্নিবার আকর্ষণ প্রচণ্ড গতিতে ক্রমাগত ঐদিকে টানিতে লাগিল, কিন্তু, এখন আর তাহাকে এক-পা টলাইতে পারিল না।

তীব্র তড়িৎ-সংস্পর্শে ধাতু যেমন শক্তিময় হইয়া উঠে, স্বামীকে কাছে পাইয়া চক্ষের নিমেষে সে তেমনই শক্তিময়ী হইয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত আকর্ষণের বিরুদ্ধে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর একটিবার-মাত্র মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়াছিল—সেই দৃষ্টিতেই বিরাজ দেখিয়াছিল, তাঁহার দুই চোখ জবার মত ঘোর রক্তবর্ণ—মড়া পোড়াইতে গিয়া তাহারা যে এই তিন দিন অবিশ্রাম গাঁজা খাইয়াছে, সে কথা তাহার অগোচরে রহিল না। মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে থাকিয়া কাছে সরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাওয়া হয়নি?

নীলাম্বর বলিল, না।

বিরাজ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল, নীলাম্বর সহসা ডাকিয়া বলিল, শোন, এত রাত্তিরে একা কোথায় গিয়েছিলে?

বিরাজ দাঁড়াইয়া পড়িয়া একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—ঘাটে।

নীলাম্বর অবিশ্বাসের স্বরে বলিল, না, ঘাটে তুমি যাও নি।

তবে যমের বাড়ি গিয়েছিলুম, বলিয়া বিরাজ রান্নাঘরে চলিয়া গেল। ঘণ্টা-খানেক পরে ভাত বাড়িয়া যখন সে ডাকিতে আসিল, নীলাম্বর তখন চোখ বুজিয়া ঝিমাইতেছিল। অত্যধিক গাঁজার মহিমায় তাহার মাথা তখন উত্তপ্ত এবং বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া পূর্ব প্রশ্নের অনুবৃত্তি-স্বরূপে কহিল, কোথা গিয়েছিলে?

বিরাজ নিজের উদ্যত জিহ্বাকে সজোরে দংশন করিয়া নিবৃত্ত করিয়া শান্তভাবে বলিল, আজ খেয়ে শোও, সে কথা কাল শুনো।

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আজই শুনব। কোথায় ছিলে বল?

তাহার জিদের ভঙ্গী দেখিয়া এত দুঃখেও বিরাজ হাসিল, বলিল, যদি না বলি?

বলতেই হবে, বল।

আমি তা কিছুতেই বলব না। আগে খেয়ে শোও তখন শুনতে পাবে।

নীলাম্বর এ হাসিটুকু লক্ষ্য করিল না, দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া মুখ তুলিল—সে চোখে আর আচ্ছন্ন ভাব নাই, হিংসা ও ঘৃণা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তীক্ষকণ্ঠে বলিল, না কিছুতেই না; কোনমতেই না, না শুনে তোমার ছোঁয়া জল পর্যন্ত খাব না।

বিরাজ চমকাইয়া উঠিল, বুঝি কালসর্প দংশন করিলেও মানুষ এমন করিয়া চমকায় না। সে টলিতে টলিতে দ্বারের কাছে পিছাইয়া গিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, কি বললে? আমার ছোঁয়া জল পর্যন্ত খাবে না?

না, কোন মতেই না।

কেন?

নীলাম্বর চেঁচাইয়া উঠিয়া বলিল, আবার জিজ্ঞেস কচ্ছ কেন?

বিরাজ নিঃশব্দে স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে বলিল, বুঝেচি! আর জিজ্ঞেস করব না। আমিও কোন মতে বলব না, কেননা কাল যখন তোমার হুঁশ হবে তখন নিজেই বুঝবে—এখন তুমি তোমাতেই নেই।

নেশাখোর সব সহিতে পারে, পারে না শুধু তাহার বুদ্ধিভ্রষ্টতার উল্লেখ সহিতে। ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, গাঁজা খেয়েছি এই বলছিস ত? গাঁজা আজ আমি নূতন খাইনি যে, জ্ঞান হারিয়েচি। বরং জ্ঞান হারিয়েচিস তুই, তুই আর তোতে নেই।

বিরাজ তেমনি মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, কার চোখে ধূলো দিতে চাস বিরাজ? আমার? আমি অতি মূর্খ, তাই সেদিন পীতাম্বরের কোন কথা বিশ্বাস করিনি, কিন্তু সে ছোটভাই, যথার্থ ভালো

কাজই করেছিল। নইলে কেন তুই বলতে পারিস নে কোথা ছিলি? কেন মিছে কথা বললি—তুই ঘাটে ছিলি?

বিরাজের দুই চোখ এখন পাগলের চক্ষুর মত ধকধক করিতে লাগিল, তথাপি সে কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া জবাব দিল, মিছে কথা বলছিলুম, এ কথা শুনলে তুমি লজ্জা পাবে, দুঃখ পাবে, হয়ত তোমার খাওয়া হবে না তাই,—কিন্তু সে ভয় মিছে—তোমার লজ্জা-শরমও নেই, তুমি আর মানুষও নেই। কিন্তু, তুমি মিছে কথা বললি? একটা পশুরও এত বড় ভুল করতে লজ্জা হ'ত, কিন্তু তোমার হ'ল না। সাধুপুরুষ! রোগা স্ত্রীকে ঘরে একা ফেলে কোন্‌-শিষ্যের বাড়িতে তিন দিন ধরে গাঁজার ওপর গাঁজা খাচ্ছিলে বল!

নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না। বলচি, বলিয়া হাতের কাছের শূন্য পানের ডিবাটা বিরাজের মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। বন্ধ-ডিবা তাহার কপালে লাগিয়া ঝনঝন করিয়া খুলিয়া নীচে পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের কোণ বাহিয়া, ঠোঁটের প্রান্ত বাহিয়া রক্তে মুখ ভাসিয়া উঠিল।

বিরাজ বাঁ হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—আমাকে মারলে!

নীলাম্বরের ঠোঁট মুখ কাঁপিতে লাগিল, বলিল, না, মারিনি। কিন্তু দূর হ সুমুখ থেকে—ও মুখ আর দেখাস নে—অলক্ষ্মী, দূর হয়ে যা!

বিরাজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, যাচ্চি। এক-পা গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিন্তু সহ্য হবে ত? কাল যখন মনে পড়বে, জ্বরের উপর আমাকে মেরেচ—তাড়িয়ে দিয়েচ, আমি তিন দিন খাইনি, তবু এই অন্ধকারে তোমার জন্যে ভিক্ষা করে এনেচি—সইতে পারবে ত? এই অলক্ষ্মীকে ছেড়ে থাকতে পারবে ত?

রক্ত দেখিয়া নীলাম্বরের নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল—সে মূঢ়ের মত চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

বিরাজ আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিল, এই এক বছর যাই-যাই করচি, কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে পারিনি। চেয়ে দেখ, দেহে আমার কিছু নেই, চোখে ভাল দেখতে পাইনে, এক পা চলতে পারিনে—আমি যেতুম না, কিন্তু স্বামী হয়ে যে অপবাদ আমাকে দিলে, আর আমি তোমায় মুখ দেখাব না। তোমার পায়ের নীচে মরবার লোভ আমার সবচেয়ে বড় লোভ,—সেই লোভটাই আমি কোনমতে ছাড়তে পারছিলুম না—আজ ছাড়লুম,—বলিয়া কপাল মুছিতে মুছিতে খিড়কির খোলা দোর দিয়া আর একবার অন্ধকারে বাগানের মধ্যে মিলাইয়া গেল।

নীলাম্বর কথা কহিতে চাহিল, কিন্তু জিভ নাড়িতে পারিল না। ছুটিয়া পিছনে যাইতে চাহিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। কোন্‌ মায়ামন্ত্রে তাহাকে অচল পাথরে রূপান্তরিত করিয়া দিয়া বিরাজ অদৃশ্য হইয়া গেল।

আজ একবার ওই সরস্বতীর দিকে চাহিয়া দেখ, ভয় করিবে। বৈশাখের সেই শীর্ণকায়া মৃদুপ্রবাহিণী শ্রাবণের শেষ দিনে কি খরবেগে দুই কূল ভাসাইয়া চলিয়াছে! যে কালো পাথরখণ্ডটার উপর একদিন বসন্ত-প্রভাতে দুইটি ভাইবোনকে অসীম স্নেহসুখে এক হইয়া বসিতে থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেই কালো পাথরটার উপর বিরাজ আজিকার আঁধার রাত্রে কি হৃদয় লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া দাঁড়াইল। নীচে গভীর জলরাশি সুদৃঢ় প্রাচীর-ভিত্তিতে ধাক্কা খাইয়া আবর্ত রচিয়া চলিয়াছে, সেইদিকে একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া সম্মুখে চাহিয়া রহিল। তাহার পায়ের নীচে কালো পাথর, মাথার উপর মেঘাচ্ছন্ন কালো আকাশ, সুমুখে কালো জল, চারিদিকে গভীর কৃষ্ণ স্তব্ধ বনানী—আর বুকের ভিতর জাগিতেছে তাদের চেয়ে কালো আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি। সে সেইখানে বসিয়া পড়িয়া নিজের আঁচল দিয়া দৃঢ় করিয়া জড়াইয়া নিজের হাত-পা বাঁধিতে লাগিল।

বার

প্রত্যূষের আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন, টিপিটিপি জল পড়িতেছিল। নীলাম্বর খোলা দরজার চৌকাঠে মাথা রাখিয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহার সুপ্ত-কর্ণে শব্দ আসিল, হাঁ গা, বিরাজবৌমা!

নীলাম্বর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। হয়ত, শ্যাম নাম শুনিয়া এমনই কোন এক বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে শ্রীরাধা এমনই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া বসিতেন। সে চোখ মুছিতে মুছিতে বাহিরে আসিয়া দেখিল, উঠানে তুলসী ডাকিতেছে। কাল সমস্ত রাত্রি বনে বনে প্রতি বৃক্ষতলে খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাঁদিয়া ঘণ্টা-খানেক পূর্বে শ্রান্ত ও ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দোরগোড়ায় বসিয়াছিল, তার পর কখন ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, মা কোথায় বাবু?

নীলাম্বর হতবুদ্ধির মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তুই তবে কাকে ডাকছিলি?

তুলসী বলিল, বৌমাকেই ত ডাকচি বাবু! কাল এক পহর রেতে কোথাও কিছু নেই, এই আঁধারে মা গিয়ে আমাদের বাড়ি মোটা চাল চেয়ে আনলে, তাই সকালে দোর খোলা পেয়ে জানতে এলুম, সে চেলে কি কাজ হ'ল?

নীলাম্বর মনে মনে সমস্ত বুঝিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

তুলসী বলিল, এত ভোরে তবে খিড়কি খুললে কে? তবে বুঝি বৌমা ঘাটে গেছেন, বলিয়া চলিয়া গেল।

নদীর ধারে ধারে প্রতি গর্ত, প্রতি বাঁক, প্রতি ঝোপ-ঝাড় অনুসন্ধান করিতে করিতে সমস্ত দিন অভুক্ত অস্নাত নীলাম্বর সহসা একস্থানে থামিয়া পড়িয়া বলিল, এ কি পাগলামি আমার মাথায় চাপিয়াছে! আমি যে সারাদিন খাই নাই, এখনও কি একথা তাহার মনে পড়িতে বাকী আছে? এর পরেও সে কি কোথাও কোন কারণে একমুহূর্ত থাকিতে পারে? তবে একি অদ্ভুত কাণ্ড সকাল হইতে করিয়া ফিরিতেছি! এ-সব চোখের সামনে এমনই সুস্পষ্ট হইয়া দেখা দিল যে, তাহার সমস্ত দুশ্চিন্তা একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল, সে কাদা ঠেলিয়া, মাঠ ভাঙিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘরের দিকে ছুটিল। বেলা যখন যায়-যায়, পশ্চিমাকাশে সূর্যদেব ক্ষণকালের জন্য মেঘের ফাঁকে রক্তমুখ বাহির করিয়াছেন, সে তখন বাড়ি ঢুকিয়া সোজা রান্নাঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। মেঝের উপর তখনও আসন পাতা, তখনও গতরাত্রির বাড়া ভাত শুকাইয়া পড়িয়া আছে—আরশোলা ইঁদুরে ছিটাছিটি করিতেছে—কেহ মুক্ত করে নাই। সে ভোরের আঁধারে ঠাহর করে নাই; এখন ভাতের চেহারা দেখিয়াই বুঝিল, ইহাই তুলসীর মোটা চাল, ইহাই অভুক্ত স্বামীর জন্য বিরাজ জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে অন্ধকারে লুকাইয়া ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিল, ইহারই জন্য সে মার খাইয়াছে, অশ্রাব্য কটু কথা শুনিয়া লজ্জায় ধিক্কারে বর্ষার দুরন্ত রাতে গৃহত্যাগ করিয়াছে।

নীলাম্বর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া মেয়েমানুষের মত গভীর আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে যখন এখনও ফিরিয়া আসে নাই, তখন আর আসিবার কথা ভাবিতে পারিল না। সে স্ত্রীকে চিনিত। সে যে কত অভিমানী, প্রাণ গেলেও সে যে পরের ঘরে আশ্রয় লইতে গিয়া এই কলঙ্ক প্রকাশ করিতে চাহিবে না, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিল বলিয়াই তাহার বুকের ভিতর এত সত্বর এমন হাহাকার উঠিল। তারপর উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই বাহু সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া অবিশ্রাম আবৃত্তি করিতে লাগিল, এ আমি সইতে পারব না বিরাজ, তুই আয়।

সন্ধ্যা হইল, এ বাড়িতে কেহ দীপ জ্বালিল না; রাত্রি হইল, রান্নাঘরে কেহ রাঁধিতে প্রবেশ করিল না; কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ-মুখ ফুলিয়া গেল, কেহ মুছাইয়া দিল না। দুদিনের উপবাসীকে কেহ খাইতে ডাকিল না। বাহিরে চাপিয়া বৃষ্টি আসিল, ঘনান্ধকার বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুতের শিখা তাহার মুদ্রিত চক্ষুর ভিতর পর্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া দুর্যোগের বার্তা জানাইয়া যাইতে লাগিল; তথাপি সে উঠিয়া বসিল না, চোখ মেলিল না, একভাবে মুখ গুঁজিয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।

যখন তার ঘুম ভাঙিল তখন সকাল। বাহিরের দিকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, দরজায় একটা গো-শকট দাঁড়াইয়া আছে, ব্যস্ত হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইতেই ছোটবৌ ঘোমটা টানিয়া দিয়া নামিয়া পড়িল। অগ্রজের প্রতি একটা বক্র কটাক্ষ করিয়া পীতাম্বর ওধারে সরিয়া গেল। ছোটবৌ কাছে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেই নীলাম্বর অস্ফুটস্বরে কি-একটা আশীর্বাদ উচ্চারণ করিতে গিয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া

উঠিল। বিস্মিত ছোটবৌ হেঁট মাথা তুলিতে সে দ্রুতপদে কোন্ দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ছোটবৌ জীবনে আজ প্রথম স্বামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বাঁকিয়া দাঁড়াইল। অশ্রু-ভারাক্রান্ত রক্তাভ চোখ দুটি তুলিয়া বলিল, তুমি কি পাথর দিয়ে তৈরি? দুঃখ-কষ্টে দিদি আত্মঘাতী হলেন, তবুও আমরা পর হয়ে থাকব? তুমি থাকতে পার থাক গে, আমি আজ থেকে ও-বাড়ির সব কাজ করব।

পীতাম্বর চমকাইয়া উঠিল—সে কি কথা!

মোহিনী তুলসীর কাছে যতটুকু শুনিয়াছিল এবং নিজে যাহা অনুমান করিয়াছিল, কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত কহিল।

পীতাম্বর সহজে বিশ্বাস করিবার লোক নয়। কহিল, তাঁর দেহ ভেসে উঠবে ত!

ছোটবৌ চোখ মুছিয়া বলিল, না উঠতেও পারে। স্রোতে ভেসে গেছেন, সতী-লক্ষ্মীর দেহ মা গঙ্গা হয়ত বুকে তুলে নিয়েচেন। তা ছাড়া কে বা সন্ধান করচে, কে বা খুঁজে বেড়িয়েচে বল?

পীতাম্বর প্রথমটা বিশ্বাস করিল না, শেষটা করিল; বলিল, আচ্ছা, আমি খোঁজ করাচ্চি। একটু ভাবিয়া বলিল, বৌঠান মামার বাড়ি চলে যাননি ত?

মোহিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, কখ্‌খন না। দিদি বড় অভিমানী, তিনি কোথাও যাননি, নদীতেই প্রাণ দিয়েচেন।

আচ্ছা, তাও দেখচি, বলিয়া পীতাম্বর শুষ্কমুখে বাহিরে চলিয়া গেল। বৌঠানের জন্য আজ হঠাৎ তাহার প্রাণটা খারাপ হইয়া গেল। লোকজন নিযুক্ত করিয়া একজন প্রজাকে বিরাজের মামার বাড়ি পাঠাইয়া জীবনে আজ সে প্রথম পুণ্যের কাজ করিল। স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, যদুকে দিয়ে উঠানের বেড়াটা ভাঙ্গিয়ে দাও, আর যা পার কর। দাদার মুখের পানে চাইতে পারা যায় না,—বলিয়া গুড় মুখে দিয়া একটু জল খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া কাজে চলিয়া গেল। চার-পাঁচ দিন কামাই হওয়ায় তাহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।

কাজ করিতে করিতে ছোটবৌ ক্রমাগত চোখ মুছিতে মুছিতে ভাবিতেছিল, ইঁনি যে মুখের পানে চাহিতে পারেন নাই, সে মুখ না জানি কি হইয়া গিয়াছে!

নীলাম্বর চণ্ডীমণ্ডপের মাঝখানে চোখ বুজিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। সুমুখের দেয়ালে টাঙ্গান রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির পট। এই পটখানি নাকি জাগ্রত। যখন রেলগাড়ি হয় নাই, তখন তাহাদের পিতামহ পায়ে হাঁটিয়া এখানি বৃন্দাবন হইতে আনিয়াছিলেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সহিত পটখানি মানুষের গলায় কথা কহিত, এ ইতিহাস নীলাম্বর তাহার জননীর কাছে বহুবার শুনিয়াছিল। ঠাকুর-দেবতা জিনিসটা তাহার কাছে ঝাপসা ব্যাপার ছিল না। তেমন করিয়া ডাকার মত ডাকিতে পারিলে এঁরা যে সুমুখে আসেন, কথা কন, এ-সমস্ত তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য ছিল। তাই ইতিপূর্বে গোপনে গোপনে এই পটখানিকে কথা কহাইবার কত প্রয়াস সে যে করিয়াছে, তাহার অবধি নাই, কিন্তু সফল হয় নাই। অথচ এই নিষ্ফলতার হেতু সে নিজের অক্ষমতার উপরেই দিয়া আসিয়াছে; এমন সংশয় কোনদিন মনে উঠে নাই, পট সত্যই কথা কহে কি না! লেখাপড়া সে শিখে নাই। বর্ণপরিচয় হইয়াছিল, তারপর বিরাজের কাছে রামায়ণ মহাভারত পড়িতে এবং এক-আধটু চিঠিপত্র লিখিতে শিখিয়াছিল—শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থের কোন ধার ধারিত না, তাই ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় ধারণা তাহার নিতান্তই মোটা ধরনের ছিল। অথচ এ সম্বন্ধে কোন যুক্তিতর্কও সহিতে পারিত না। ছেলেবেলায় এই সব লইয়া কখনও-বা পীতাম্বরের সহিত কখনও-বা বিরাজের সহিত মারপিট হইয়া যাইত।

বিরাজ তাহার অপেক্ষা মাত্র চার বছরের ছোট ছিল—তেমন মানিত না। একবার সে মার খাইয়া নীলাম্বরের পেট কামড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। শাশুড়ী উভয়কে ছাড়াইয়া দিয়া বিরাজকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, ছি মা, গুরুজনকে অমন করে কামড়ে দিতে নেই। বিরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল, ও আমাকে আগে মেরেছিল। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া শপথ দিয়াছিলেন, বিরাজের গায়ে কখন যেন সে হাত না তোলে। তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর, আজ প্রায় ত্রিশ হইতে চলিয়াছে—সেই অবধি মাতৃভক্ত নীলাম্বর সেদিন পর্যন্ত মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই।

আজ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পুরাতন দিনের এইসব বিস্মৃত কাহিনী স্মরণ করিয়া প্রথমে সে মায়ের কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিয়া তাহার জাগ্রত ঠাকুরকে দুটো সোজা কথায় বিড়বিড় করিয়া বুঝাইয়া বলিতেছিল—অন্তর্যামী ঠাকুর! তুমি ত সমস্তই দেখতে পেয়েচ! সে যখন এতটুকু অপরাধ করেনি, তখন সমস্ত পাপ আমার মাথায় দিয়ে তাকে স্বর্গে যেতে দাও। এখানে সে অনেক দুঃখ পেয়ে গেছে, আর তাকে দুঃখ দিও না। তাহার নিমীলিত চোখের কোণ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ তাহার ধ্যান ভাঙিয়া গেল।

বাবা!

নীলাম্বর বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, ছোটবৌ অদূরে বসিয়া আছে। তাহার মুখে সামান্য একটু ঘোমটা, সে সহজকণ্ঠে বলিল, আমি আপনার মেয়ে, বাবা, ভেতরে আসুন, স্নান করে আজ আপনাকে দুটি খেতে হবে।

প্রথমে নীলাম্বর নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল—কত যুগ যেন গত হইয়াছে, তাহাকে কেহ খাইতে ডাকে নাই। ছোটবৌ পুনরায় বলিল, বাবা, রান্না হয়ে গেছে।

এইবার সে বুঝিল। একবার তাহার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, তার পর সেইখানে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল—রান্না হয়ে গেল মা!

গ্রামের সবাই শুনিল, সবাই বিশ্বাস করিল, বিরাজবৌ জলে ডুবিয়া মরিয়াছে; বিশ্বাস করিল না শুধু ধূর্ত পীতাম্বর। সে মনে মনে তর্ক করিতে লাগিল, এই নদীতে এত বাঁক, এত ঝোপঝাড়, মৃতদেহ কোথাও-না-কোথাও আটকাইবে। নদীতে নৌকা লইয়া, ধারে ধারে বেড়াইয়া, তটভূমের সমস্ত বন-জঙ্গল লোক দিয়া তন্ন তন্ন অনুসন্ধান করিয়াও যখন শবের কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না, তখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, বৌঠান আর যাই করুক, নদীতে ডুবিয়া মরে নাই। কিছুকাল পূর্বে একটা সন্দেহ তাহার মনে উঠিয়াছিল, আবার সেই সন্দেহটাই মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। অথচ কাহারো কাছে বলিবার জো নাই। একবার মোহিনীকে বলিতে গিয়াছিল, সে জিভ কাটিয়া কানে আঙুল দিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তা হলে ঠাকুর-দেবতাও মিছে, রাতও মিছে, দিনও মিছে। দেয়ালে টাঙানো অন্নপূর্ণার ছবির দিকে চাহিয়া বলিল, দিদি ওঁর অংশ ছিলেন। এ কথা আর কেউ জানুক আর না জানুক, আমি জানি, বলিয়া চলিয়া গেল।

পীতাম্বর রাগ করিল না—হঠাৎ সে যেন আলাদা মানুষ হইয়া গিয়াছিল।

মোহিনী ভাসুরের সহিত কথা কহিতে শুরু করিয়াছে। ভাত বাড়িয়া দিয়া একটুখানি আড়ালে বসিয়া একটু একটু করিয়া সমস্ত ঘটনা শুনিয়া লইল। সমস্ত সংসারের মাঝে শুধু সেই জানিল কি ঘটিয়াছিল, শুধু সেই বুঝিল, কি মর্মান্তিক ব্যথা ওঁর বুকে বিঁধিয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, মা, যত দোষই করে থাকি না কেন, জ্ঞানে ত করিনি, তবে কি করে মায়া কাটিয়ে চলে গেল? আর সইতে পারছিল না, তাই কি গেল মা?

মোহিনী অনেক কথা জানিত। একবার ইচ্ছা হইল বলে, দিদি যাবে বলিয়াই একদিন স্বামীর ভার তাহার উপরে দিয়াছিল; কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

পীতাম্বর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি দাদার সঙ্গে কথা কও?

মোহিনী জবাব দিল, বাবা বলি, তাই কথা কই।

পীতাম্বর হাসিয়া বলিল, কিন্তু লোকে শুনলে নিন্দে করবে যে!

মোহিনী রুষ্টভাবে বলিল, লোকে আর কি পারে যে করবে? তাদের কাজ তারা করুক, আমার কাজ আমি করি। এ যাত্রা ওঁকে যদি বাঁচিয়ে তুলতে পারি ত লোকের নিন্দে আমি মাথায় পেতে নেব।—বলিয়া কাজে চলিয়া গেল।

তের

পনের মাস গত হইয়াছে। আগামী শারদীয়া পূজার আনন্দ-আভাস জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অপরাহ্নবেলায় নীলাম্বর একখানা কম্বলের আসনের উপর স্থির হইয়া বসিয়া আছে। দেহ অত্যন্ত কৃশ, মুখ ঈষৎ পাণ্ডুর, মাথায় ছোট ছোট

জটা, চোখে বৈরাগ্য ও বিশ্বব্যাপী করুণা। মহাভারতখানি বন্ধ করিয়া রাখিয়া বিধবা ভ্রাতৃজায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মা, পুঁটিদের বোধ করি আজ আর আসা হ'ল না।

শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা নিরাভরণা ছোটবৌ অনতিদূরে বসিয়া এতক্ষণ মহাভারত শুনিতেছিল, বেলার দিকে চাহিয়া বলিল, না বাবা, এখনও সময় আছে—আসতেও পারে। দুর্দান্ত শ্বশুরের মৃত্যুতে পুঁটি এখন স্বাধীন। সে স্বামীপুত্র ও দাসদাসী সঙ্গে করিয়া আজ বাপের বাড়ি আসিতেছে এবং পূজার কয়দিন এখানেই থাকিবে বলিয়া খবর পাঠাইয়াছে। আজিও সে কোনও সংবাদই জানে না। তাহার মাতৃসমা বৌদিদি নাই—ছয়মাস পূর্বে সর্পাঘাতে ছোটদাদা মরিয়াছে, কোন কথাই সে জানে না।

নীলাম্বর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না এলেই বোধ করি ছিল ভাল, একসঙ্গে এতগুলো সে কি সইতে পারবে মা!

প্রিয়তমা ছোটভগিনীকে স্মরণ করিয়া বহুদিন পরে আজ তাহার শুষ্ক চক্ষে জল দেখা দিল। যে রাত্রে পীতাম্বর সর্পদষ্ট হইয়া তাহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, আমার কোন ওষুধপত্র চাই না দাদা, শুধু তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় মুখে দাও, এতে যদি না বাঁচি ত আর বাঁচতেও চাইনে, বলিয়া সর্বপ্রকার ঝাড়-ফুঁক সজোরে প্রত্যাখ্যান করিয়া ক্রমাগত তাহার পায়ের নীচে মাথা ঘষিয়াছিল এবং বিষের যাতনায় অব্যাহতি পাইবার আশায় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত পা ছাড়ে নাই, সেইদিন নীলাম্বর তাহার শেষ কান্না কাঁদিয়া চুপ করিয়াছিল, আজ আবার সেই চোখে জল আসিয়াছে। পতিব্রতা সাধ্বী ছোটবধূ নিজের চোখের জল গোপনে মুছিয়া নীরব হইয়া রহিল।

নীলাম্বর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, সেজন্যেও তত দুঃখ করিনি মা; আমার পীতাম্বরের মত বিরাজকেও যদি ভগবান নিতেন'ত আজ আমার সুখের দিন। সে ত হ'ল না। পুঁটি এখন বড় হয়েচে, তার জ্ঞান-বুদ্ধি হয়েচে, তাই মায়ের মতন বৌদির এ কলঙ্ক শুনলে বল ত মা, তার বুকের ভিতর কি করতে থাকবে! আর ত সে মুখ তুলে চাইতেও পারবে না!

সুন্দরী আত্মগ্লানি আর সহ্য করিতে না পারিয়া মাস-দুই পূর্বে নীলাম্বরের কাছে কবুল করিয়া ফেলিয়াছিল, সে রাত্রে বিরাজ মরে নাই, জমিদার রাজেন্দ্রর সহিত গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সে নীলাম্বরের মনোকষ্ট আর দেখিতে পারিতেছিল না। মনে করিয়াছিল, এ কথায় সে ক্রোধের বশে হয়ত দুঃখ ভুলিতে পারিবে। ঘরে আসিয়া নীলাম্বর এ কথা বলিয়াছিল।

সেই কথা মনে করিয়া ছোটবৌ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ঠাকুরঝিকে জানিয়ে কাজ নেই।

কি করে লুকোবে মা? যখন জিজ্ঞেস করবে, বৌদির কি হয়েছিল, তখন কি জবাব দেবে?

ছোটবৌ বলিল, যে কথা সকলে জানে, দিদি নদীতে প্রাণ দিয়েচেন—তাই।

নীলাম্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, তা হয় না মা। শুনেচি, পাপ গোপন করলেই বাড়ে; আমরা তার আপনার লোক, আমরা তার পাপের ভরা আর বাড়িয়ে দেব না। বলিয়া সে একটুখানি হাসিল। সেটুকু হাসিতে কত ব্যথা, কত ক্ষমা, তাহা ছোটবৌ বুঝিল। খানিক পরে ছোটবৌ অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে মৃদুস্বরে বলিল, এ-সব কথা হয়ত সত্যি নয়, বাবা!

কোন্ সব কথা মা? তোমার দিদির কথা?

ছোটবৌ নতমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নীলাম্বর বলিল, সত্যি বৈ কি মা—সব সত্যি। জান ত মা, রেগে গেলে সে পাগলীর জ্ঞান থাকত না। যখন এতটুকুটি ছিল, তখনও তাই, যখন বড় হ'ল তখনও তাই। তাতে যে অত্যাচার, যে অপমান আমি করেছিলাম, সে সহ্য করতে বোধ করি স্বয়ং নারায়ণও পারতেন না—সে ত মানুষ। নীলাম্বর হাত দিয়া একফোঁটা অশ্রু মুছিয়া বলিল, মনে হ'লে বুক ফেটে যায় মা, হতভাগী তিন দিন খায় নি, জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে আমার জন্যে দুটি চাল ভিক্ষে করতে গিয়েছিল, সেই অপরাধে আমি—আর যেন বলিতে পারিল না, কোঁচার খুঁট মুখে গুঁজিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন সবলে নিরোধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

ছোটবৌ নিজেও তেমনই করিয়া কাঁদিতেছিল, সেও কথা কহিল না। বহুক্ষণ কাটিল।

বহুক্ষণে নীলাম্বর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া চোখমুখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, অনেক কথাই তুমি জান, তবু শোন মা। কি ক'রে জানিনে, সেই রাতেই সে অজ্ঞান উন্মত্ত হয়ে সুন্দরীর বাড়িতে গিয়ে উঠে, তারপরে—উঃ—টাকার লোভে সুন্দরী পাগলীকে আমার সেই রাতেই রাজেনবাবুর বজরায় তুলে দিয়ে আসে—

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতেই মোহিনী নিজেকে ভুলিয়া, লজ্জা-শরম ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, কক্ষণ সত্যি নয় বাবা, কক্ষণ সত্যি নয়। দিদির দেহে প্রাণ থাকতে এমন কাজ তাঁকে কেউ করাতে পারবে না। তিনি যে সুন্দরীর মুখ পর্যন্ত দেখতেন না।

নীলাম্বর শান্তভাবে বলিল, তাও শুনেচি। হয়ত, তোমার কথাই সত্যি মা, দেহে তার প্রাণ ছিল না। ভাল ক'রে জ্ঞানবুদ্ধি হ'বার পূর্বেই সেটা সে আমাকে দিয়েছিল, সে ত নিয়ে যায়নি, আজও ত আমার কাছে আছে,—বলিয়া সে চোখ বুজিয়া তাহার হৃদয়ের অন্তস্তম স্থান পর্যন্ত তলাইয়া দেখিতে লাগিল।

ছোটবৌ মুগ্ধ হইয়া সেই শান্ত পাণ্ডুর নিমীলিত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সে মুখে ক্রোধ বা হিংসা-দ্বেষের এতটুকু ছায়া নাই—আছে শুধু অপরিসীম ব্যথা ও অনন্ত ক্ষমার অনির্বচনীয় মহিমা। সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে তাঁহার পদধূলি মাথায় লইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে মনে মনে বলিল, দিদি চিনেছিল, তাহাতেই একটি দিনও ছেড়ে থাকতে চাইত না।

দীর্ঘ চার বৎসর পরে পুঁটি বাপের বাড়ি আসিয়াছে এবং বড়মানুষের মতই আসিয়াছে। তাহার স্বামী, ছয় মাসের শিশুপুত্র, পাঁচ-ছয়জন দাসদাসী এবং অগণিত জিনিসপত্রে সমস্ত বাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। স্টেশনে নামিয়াই যদু চাকরের কাছে খবর শুনিয়া সে সেইখান হইতে কাঁদিতে শুরু করিয়াছিল। উচ্চরোলে কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত পাড়া সচকিত করিয়া রাত্রি এক প্রহরের পর বাড়ি ঢুকিয়া দাদার ক্রোড়ে মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। সে রাত্রে নিজে জলস্পর্শ করিল না, দাদাকেও ছাড়িল না; এবং মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই সে একটু একটু করিয়া সমস্ত কথা শুনিল। আগে বৌদিকে বরঞ্চ সে ভয় করিত, সঙ্কোচ করিত, কিন্তু দাদাকে ঠিক পুরুষমানুষও মনে করিত না, সঙ্কোচও করিত না, সমস্ত আবদার উপদ্রব তাহার দাদার উপরেই ছিল। শ্বশুরবাড়ি যাইবার পূর্বের দিনও সে বৌদির কাছে তাড়া খাইয়া আসিয়া দাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিয়াছিল। তাহার সেই দাদাকে যাহারা এতদিন ধরিয়া এত দুঃখ দিয়াছে, এমন জীর্ণ শীর্ণ এমন পাগলের মত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের প্রতি তাহার ক্রোধ ও দ্বেষের পরিসীমা রহিল না। তাহার দাদার এত বড় দুঃখের কাছে পুঁটি আপনার সমস্ত দুঃখকেই একেবারে তুচ্ছ করিয়া দিল। তাহার শ্বশুরকুলের উপর ঘৃণা জন্মিল, ছোটদার সর্পাঘাত তাহাকে বিঁধিল না এবং তাহার দুঃখিনী বিধবার দিক হইতে সে একেবারে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

দু'দিন পরে সে তাহার স্বামীকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, আমি দাদাকে নিয়ে পশ্চিমে বেড়াতে যাব, তুমি এইসব লটবহর নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। আর যদি ইচ্ছে হয়, না হয় তুমিও সঙ্গে চল।

যতীন অনেক যুক্তি-তর্কের পর শেষ কাজটাই সহজসাধ্য বিবেচনা করিয়া আর একবার জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধির উদ্যোগে প্রস্থান করিল। যাত্রার আয়োজন চলিতে লাগিল। পুঁটি সুন্দরীকে একবার গোপনে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সে আসিল না। যে ডাকিতে গিয়াছিল তাহাকে বলিয়া দিল, এ মুখ দেখাইতে পারিব না এবং যাহা বলিবার ছিল বলিয়াছি। আর কিছু বলিবার নাই। পুঁটি ক্রোধে অধর দংশন করিয়া মৌন হইয়া রহিল। পুঁটির নিদারুণ উপেক্ষা ও ততোধিক নিষ্ঠুর ব্যবহার ছোটবৌকে যে কিরূপ বিঁধিল, তাহা অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ জানিল না। সে হাতজোড় করিয়া মনে মনে বড়জাকে স্মরণ করিয়া বলিল, দিদি, তুমি ছাড়া আমাকে আর কে বুঝবে! যেখানেই থাক, তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করে থাক, সেই আমার সর্বস্ব। চিরদিনই সে নিস্তব্ধ-প্রকৃতির, আজিও নীরবে সকলের সেবা করিতে লাগিল। কাহাকেও কোন কথাটি বলিল না। ভাশুরকে খাওয়াইবার ভার পুঁটি লইয়াছিল। এ-কয়দিন সেখানেও বসিবার তাহার আবশ্যক হইল না।

যাইবার দিন নীলাম্বর অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি যাবে না মা?

ছোটবৌ নীরবে ঘাড় নাড়িল।

পুঁটি ছেলে কোলে করিয়া দাদার পাশে আসিয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর বলিল, সে হয় না মা। তুমি একলাটি কেমন করেই বা থাকবে, আর থেকেই বা কি হবে মা? চল।

ছোটবৌ তেমনই হেঁটমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাবা। আমি কোথাও যেতে পারব না।

ছোটবৌর বাপের বাড়ির অবস্থা খুব ভাল। বিধবা মেয়েকে তারা অনেকবার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে কিছুতেই যায় নাই।

নীলাম্বর তখন মনে করিত, সে শুধু তাহারই জন্য যাইতে পারে না, কিন্তু এখন শূন্য বাটীতে কি হেতু একা পড়িয়া থাকিতে চাহে, কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, কেন কোথাও যেতে পারবে না মা?

ছোটবৌ চুপ করিয়া রহিল।

না বললে ত আমার যাওয়া হবে না মা!

ছোটবৌ মৃদুকণ্ঠে বলিল, আপনি যান, আমি থাকি।

কেন?

ছোটবৌ আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া মনে মনে একটা সঙ্কোচের জড়তা যেন প্রাণপণে কাটাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তারপর ঢোক গিলিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, কখনও দিদি যদি আসেন—তাই আমি কোথাও যেতে পারব না বাবা।

নীলাম্বর চমকিয়া উঠিল। খর বিদ্যুৎ চোখমুখ ধাঁধিয়া দিলে যেমন হয়, তেমনিই চারিদিকে সে অন্ধকার দেখিল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। মুহূর্তেই নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া অতি ক্ষীণ একটুখানি হাসিয়া কহিল, ছি মা, তুমিও যদি এমন ক্ষ্যাপার মত কথা বল, এমন অবুঝ হয়ে যাও, তাহলে আমার উপায় কি হবে? ছোটবৌ চোখের পলকে চোখ বুজিয়া নিজের বুকের মধ্যে চাহিয়া দেখিল, পরক্ষণে সংশয়লেশহীন স্থির মৃদুস্বরে বলিল, অবুঝ হইনি বাবা। আপনাদের যা ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু যতদিন চন্দ্রসূর্য উঠতে দেখব, ততদিন কারো কোন কথা আমি বিশ্বাস করব না।

ভাইবোন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নির্বাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে তেমনই সুদৃঢ়কণ্ঠে বলিতে লাগিল, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে মরণের বর দিদি আপনার কাছে চেয়ে নিয়েছিলেন, সে বর কোন মতেই নিষ্ফল হতে পারে না। সতীলক্ষ্মী দিদি আমার নিশ্চয় ফিরে আসবেন—যতদিন বাঁচব, এই আশায় পথ চেয়ে থাকব—আমাকে কোথাও যেতে বলবেন না বাবা।—বলিয়া এক নিশ্বাসে অনেক কথা কহার জন্য মুখ হেঁট করিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

নীলাম্বর আর সহিতে পারিল না; যে কান্না তাহার গলা পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, কোথাও একটু আড়ালে গিয়া তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পুঁটি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তার পর কাছে আসিয়া তাহার ছেলেকে পায়ের নীচে বসাইয়া দিয়া আজ প্রথম সে এই বিধবা ভ্রাতৃজায়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—বৌদি! কখনো তোমাকে চিনতে পারিনি, বৌদি—আমাকে মাপ কর।

ছোটবৌ হেঁট হইয়া ছেলেকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখে মুখ দিয়া অশ্রু গোপন করিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

চোদ্দ

বিরাজের মরাই উচিত ছিল, কিন্তু মরিল না। সেই রাত্রে, মরিবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে তাহার [illegible] দিলব্যান। দুঃখদৈন্যপীড়িত দুর্বল বিকৃত মস্তিষ্ক অনাহার ও অপমানের অসহ্য আঘাতে মরণের পথ ছাড়িয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পা বাড়াইয়া দিল। মৃত্যু বুকে করিয়া যখন

আঁচল দিয়া হাত-পা বাঁধিতেছিল তখন কোথায় বাজ পড়িল; সেই ভীষণ শব্দে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া তাহারই তীব্র আলোকে ও-পারের সেই স্নানের ঘাট ও সেই মাছ ধরিবার কাঠের মাচা তাহার চোখে পড়িয়া গেল। এগুলো এতক্ষণ ঠিক যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া তাহারই দৃষ্টির অপেক্ষা করিয়াছিল, চোখাচোখি হইবামাত্রই ইশারা করিয়া ডাক দিল। বিরাজ সহসা ভীষণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সাধু পুরুষ আমার হাতের জল পর্যন্ত খাবেন না, কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ খাবে ত! বেশ!

কামারের জাঁতার মুখে জ্বলন্ত কয়লা যেমন করিয়া গর্জিয়া জ্বলিয়া ছাই হয়, বিরাজের প্রজ্বলিত মস্তিষ্কের মুখে ঠিক তেমনই করিয়া তাহার অতুল্য অমূল্য হৃদয়খানি জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে স্বামী ভুলিল, ধর্ম ভুলিল, মরণ ভুলিল, একদৃষ্টে প্রাণপণে ও-পারে ঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। আবার কড়কড় করিয়া অন্ধকার আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ জ্বলিয়া উঠিল, তাহার বিস্ফারিত দৃষ্টি সঙ্কুচিত হইয়া নিজের প্রতি ফিরিয়া আসিল, একবার মুখ বাড়াইয়া জলের পানে চাহিল, একবার ঘাড় ফিরাইয়া বাড়ির দিকে দেখিল। তাহার পর লঘুহস্তে নিজের বাঁধা বাঁধন খুলিয়া ফেলিয়া চক্ষের নিমেষে অন্ধকার বনের মধ্যে মিশিয়া গেল। তাহার দ্রুত পদশব্দে কত কি সরসর খসখস করিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া গেল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না—সে সুন্দরীর কাছে চলিয়াছিল। পঞ্চানন ঠাকুরতলায় তাহার ঘর। পূজা দিতে গিয়া কতবার তাহা দেখিয়া আসিয়াছে। এ গ্রামের বধূ হইলেও শৈশবে এ গ্রামের প্রায় সমস্ত পথঘাটই সে চিনিত, অল্পকালের মধ্যেই সে সুন্দরীর রুদ্ধ জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

ইহার ঘণ্টা-দুই পরেই কাঙালী জেলে তাহার পানসিখানি ওপারের দিকে ভাসাইয়া দিল। অনেক রাত্রেই সে পয়সার লোভে সুন্দরীকে ওপারে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে, আজও চলিয়াছে, আজ শুধু একটির পরিবর্তে দুটি রমণী নিঃশব্দে বসিয়া আছে। অন্ধকারে বিরাজের মুখ সে দেখিতে পাইল না, পাইলেও চিনিতে পারিত না। তাহাদের ঘাটের কাছে আসিয়া দূর হইতে অন্ধকার তীরে একটা অস্পষ্ট দীর্ঘ ঋজুদেহ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বিরাজ চোখ বুজিয়া রহিল।

সুন্দরী চুপি চুপি আবার প্রশ্ন করিল, কে অমন ক'রে মারলে বৌমা?

বিরাজ অধীর হইয়া বলিল, আমার গায়ে হাত তুলতে পারে সে ছাড়া আর কে, সুন্দরী, যে বার বার জিজ্ঞেস কচ্চিস্? সুন্দরী অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

আরো ঘণ্টা-দুই পরে একখানি সুসজ্জিত বজরা নোঙ্গর তুলিবার উপক্রম করিতেই বিরাজ সুন্দরীর পানে চাহিয়া বলিল, তুই সঙ্গে যাবিনে?

না বৌমা, আমি এখানে না থাকলে লোকে সন্দেহ করবে। যাও মা, ভয় নেই, আবার দেখা হবে।

বিরাজ আর কিছু বলিল না। সুন্দরী কাঙালীর পানসিতে উঠিয়া ঘরে ফিরিয়া গেল।

জমিদারের সুশ্রী বজরা বিরাজকে লইয়া তীর ছাড়িয়া ত্রিবেণী অভিমুখে যাত্রা করিল। দাঁড়ের শব্দ ছাপাইয়া বাতাস চাপিয়া আসিল। দূরে একধারে মৌন রাজেন্দ্র নতমুখে বসিয়া মদ খাইতে লাগিল, বিরাজ পাষাণ-মূর্তির মত জলের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আজ রাজেন্দ্র অনেক মদ খাইয়াছিল। মদের নেশা তাহার দেহের রক্তকে উত্তপ্ত এবং মগজকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া আনিতেছিল। বজরা যখন সপ্তগ্রামের সীমানা ছাড়িয়া গেল, তখন সে উঠিয়া আসিয়া কাছে বসিল। বিরাজের রুক্ষ চুল এলাইয়া লুটাইতেছে, মাথার আঁচল খসিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে—কিছুতেই তাহার চৈতন্য নাই। কে আসিল, কে কাছে বসিল, সে ভ্রূক্ষেপও করিল না।

কিন্তু রাজেন্দ্রের একি হইল? একাকী কোন ভয়ঙ্কর স্থানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে ভূত-প্রেতের ভয় মানুষের বুকের মধ্যে যেমন তোলপাড় করিয়া উঠে, তাহারও সমস্ত বুক জুড়িয়া ঠিক তেমনই আতঙ্কের ঝড় উঠিল। সে চাহিয়াই রহিল, ডাকিয়া আলাপ করিতে পারিল না।

অথচ এই রমণীটির জন্য সে কি না করিয়াছে! দুই বৎসর অহর্নিশ মনে মনে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে, নিদ্রায় জাগরণে ধ্যান করিয়াছে, চোখের দেখা দেখিবার লোভে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া বনে জঙ্গলে লুকাইয়া থাকিয়াছে—তাহার স্বপ্নের অগোচর এই সংবাদ আজ

যখন সুন্দরী ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহার কানে কানে কহিয়াছিল, সে ভাবের আবেশে অভিভূত হইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত এ সৌভাগ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

সুমুখে নদী বাঁকিয়া গিয়া উত্তর তীরের দুই প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়, বহু প্রাচীন বট ও পাকুড় গাছের ভিতর দিয়া গিয়াছিল, স্থানে স্থানে বাঁশ, কঞ্চি ও গাছের ডাল জলের উপর পর্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া সমস্ত স্থানটাকে নিবিড় অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছিল। বজরা এইখানে প্রবেশ করিবার পূর্বক্ষণে রাজেন্দ্র সাহস সঞ্চয় করিয়া কণ্ঠের জড়তা কাটাইয়া কোনমতে বলিয়া ফেলিল, তুমি—আপনি—আপনি ভেতরে গিয়ে একবার বসুন—গায়ে ডালপালা লাগবে।

বিরাজ মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সুমুখে একটা ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতেছিল, তাহারই ক্ষীণ আলোকে চোখাচোখি হইল, পূর্বেও হইয়াছে—তখন দুর্বৃত্ত পরের জমির উপর দাঁড়াইয়াও সে দৃষ্টি সহিতে পারিয়াছিল। কিন্তু আজ নিজের অধিকারের মধ্যে নিজেকে মাতাল করিয়াও সে এ চাহনির সুমুখে মাথা সোজা রাখিতে পারিল না—ঘাড় হেঁট করিল।

কিন্তু, বিরাজ চাহিয়াই রহিল। তাহার এত কাছে পরপুরুষ বসিয়া, অথচ মুখে তাহার আবরণ নাই। মাথায় এতটুকু আঁচল পর্যন্তও নাই। এই সময়ে বজরা ঘন ছায়াচ্ছন্ন ঝোপের মধ্যে ঢুকিতেই দাঁড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়া হাত দিয়া ডালপালা সরাইতে ব্যস্ত হইল। নদী অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় ভাটার টানও এখানে অত্যন্ত প্রখর। ওরে সাবধান!—বলিয়া রাজেন্দ্র দাঁড়ীদের সতর্ক করিয়া দিয়া তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিরাজের উদ্দেশে—লাগবে,—ভিতরে আসুন—বলিয়া নিজে গিয়া কামরায় প্রবেশ করিল।

বিরাজ মোহাচ্ছন্ন, যন্ত্রচালিতের মত পিছনে আসিয়া ভিতরে পা দিয়াই অকস্মাৎ 'মা গো' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

সে চীৎকারে রাজেন্দ্র চমকিয়া উঠিল। তখন অস্পষ্ট দীপালোকে বিরাজের দুই চোখ ও রক্তমাখা সিঁথার সিন্দুর চামুণ্ডার ত্রিনয়নের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে—মাতাল সে আগুনের সুমুখ হইতে আহত কুক্কুরের ন্যায় একটা ভীত ও বিকৃত শব্দ করিয়া কাঁপিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মানুষ না জানিয়া অন্ধকারে পায়ের নীচে ক্লেদাক্ত শীতল ও পিচ্ছিল সরীসৃপ মাড়াইয়া ধরিলে যেভাবে লাফাইয়া উঠে, তেমনই করিয়া বিরাজ ছিটকাইয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল,—একবার জলের দিকে চাহিয়া পরক্ষণে 'মা গো! এ কি কল্লুম মা!' বলিয়া অন্ধকার অতল জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

দাঁড়ী-মাঝিরা আর্তনাদ করিয়া উঠিল, ছুটাছুটি করিয়া বজরা উলটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিল,—আর কিছুই করিতে পারিল না। সবাই প্রাণপণে জলের দিকে চাহিয়াও সে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। শুধু রাজেন্দ্র একচুল নড়িল না। নেশা তাহার ছুটিয়া গিয়াছিল, তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ স্রোতের টানে বজরা আপনি বাহিরে আসিয়া পড়ায় মাঝি উদ্বিগ্নমুখে কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু, কি করা যাবে? পুলিশে খবর দিতে হবে ত? রাজেন্দ্র বিহ্বলের মত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, কেন, জেলে যাবার জন্যে? গদাই, যেমন ক'রে পারিস পালা। গদাই-মাঝি পুরানো লোক, বাবুকে চিনিত, সবাই চিনে—তাই, ব্যাপারটা আগেই কতক অনুমান করিয়াছিল। এখন এই ইঙ্গিতে তাহার চোখ খুলিয়া গেল। সে অপর সকলকে একত্র করিয়া চুপিচুপি আদেশ দিয়া বজরা উড়াইয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

কলিকাতার কাছাকাছি আসিয়া রাজেন্দ্র হাঁফ ছাড়িল। গত রজনীর সুগভীর অন্ধকারে মুখোমুখি হইয়া সে যে চোখমুখ দেখিয়াছিল, স্মরণ করিয়া আজ দিনের বেলায় এতদূরে আসিয়াও তাহার গা ছমছম করিতে লাগিল। সে মনে মনে নিজের কান মলিয়া বলিল, ইহজীবনে ও-কাজ আর নয়। কিসের মধ্যে যে কি লুকানো থাকে কেহই জানে না। পাগলী যে কাল চোখ দিয়া পৈতৃক প্রাণটা শুষিয়া লয় নাই ইহাই সে পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিল এবং কোন কারণে কখনও যে সে ওমুখো হইতে পারিবে, সে ভরসা তাহার রহিল না। মুর্খ ফুলটা লইয়াই এতাবৎ নাড়াচাড়া করিয়াছে। সতী যে কি বস্তু তাহা জানিত না। আজ পাপিষ্ঠের কলুষিত জীবনে প্রথম চৈতন্য হইল, খোলস লইয়া খেলা করা চলে, কিন্তু জীবন্ত বিষধর অতবড় জমিদারপুত্রেরও ক্রীড়ার সামগ্রী নয়।

পনর

সেদিন অপরাহ্নে যে স্ত্রীলোকটি বিরাজের শিয়রে বসিয়াছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিরাজ জানিল, সে হুগলির হাসপাতালে আছে। দীর্ঘকাল বাত-শ্লেষ্মা বিকারের পর, যখন হইতে তাহার হুঁশ হইয়াছে, তখন হইতেই সে ধীরে ধীরে নিজের কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। একে একে অনেক কথা মনেও পড়িয়াছে।

একদিন বর্ষার রাত্রে স্বামী তাহার সতীত্বের উপর কটাক্ষ করিয়াছিলেন। তাহার পীড়ায় জর্জর, উপবাসে অবসন্ন, ভগ্নদেহ, বিমল মন, সে নিদারুণ অপবাদ সহ্য করিতে পারে নাই। দুঃখে দুঃখে অনেকদিন হইতেই সে হয়ত পাগল হইয়া আসিতেছিল। সেদিন অভিমানে ঘৃণায়, আর তাঁহার মুখ দেখিবে না বলিয়া, সমস্ত বাঁধন ভাঙিয়া চুরিয়া ফেলিয়া নদীতে মরিতে গিয়াছিল—কিন্তু, মরে নাই।

তাহার পর জ্বর ও বিকারের ঝোঁকে বজরায় উঠিয়াছিল এবং অর্ধপথে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছিল, ভিজা মাথায়, ভিজা কাপড়ে সারারাত্রি একাকী বসিয়া জ্বরে কাঁপিয়াছিল, শেষে কি করিয়া না জানি, এক গৃহস্থের দরজায় শুইয়া পড়িয়াছিল। এতটাই মনে পড়ে। কে এখানে আনিয়াছে, কবে আনিয়াছে, কতদিন এমন করিয়া পড়িয়া আছে—মনে পড়ে না। আর মনে পড়ে, সে গৃহত্যাগিনী কুলটা—পরপুরুষ আশ্রয় করিয়া গ্রামের বাহির হইয়াছিল।

ইহার পরে আর সে ভাবিতে পারিত না—ভাবিতে চাহিত না। তারপর ক্রমশঃ সারিয়া উঠিতে লাগিল, উঠিয়া বসিয়া একটু একটু করিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু ভবিষ্যতের দিক হইতে নিজের চিন্তাকে সে প্রাণপণে বিশ্লিষ্ট করিয়া রাখিল। সে যে কি ব্যাপার, তাহা তাহার প্রতি অণু-পরমাণু অহর্নিশ ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতেছিল সত্য, কিন্তু যে যবনিকা ফেলা আছে তাহার এতটুকু কোণ তুলিয়া দেখিতেও ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া যাইত, মাথা ঝিমঝিম করিয়া মূর্ছার মত বোধ হইত। একদিন অগ্রহায়ণের প্রভাতে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া তাহাকে কহিল, এখন সে ভাল হইয়াছে। এইবার তাহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে। বিরাজ 'আচ্ছা' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে স্ত্রীলোকটি হাসপাতালের লোক। সে বুঝিয়াছিল, এ পীড়িতার আত্মীয়-স্বজন সম্ভবতঃ কেহ নাই, কহিল, রাগ করো না বাছা, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাঁরা তোমাকে রেখে গিয়েছিলেন তাঁরা আর কোনদিন ত দেখতে এলেন না, তাঁরা কি তোমার আপনার লোক নয়?

বিরাজ বলিল, না, তাঁদের কখনও চোখে দেখিনি। একদিন বর্ষার রাত্রে আমি ত্রিবেণীর কাছে জলে ডুবে যাই। তাঁরা বোধ করি দয়া করে এখানে রেখে গিয়েছিলেন।

ওঃ, জলে ডুবেছিলে? তোমার বাড়ি কোথা গা?

বিরাজ মামার বাড়ির নাম করিয়া বলিল, আমি সেখানেই যাব, সেখানে আমার আপনার লোক আছে।

স্ত্রীলোকটির বয়স হইয়াছিল এবং বিরাজের মধুর স্বভাবের গুণে একটু মমতাও জন্মিয়াছিল, দয়ার্দ্র-কণ্ঠে বলিল, তাই যাও বাছা, একটু সাবধানে থেকো, দুদিনেই ভাল হয়ে যাবে।

বিরাজ একটুখানি হাসিয়া বলিল, আর ভাল কি হবে মা? এ চোখও ভাল হবে না, এ হাতও সারবে না।

রোগের পর তাহার বাঁ চোখ অন্ধ এবং বাঁ হাত পড়িয়া গিয়াছিল। স্ত্রীলোকটির চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, কহিল, বলা যায় না বাছা, সেরে যেতেও পারে।

পরদিন সে নিজের একখানি পুরাতন শীতবস্ত্র এবং কিছু পাথেয় দিয়া গেল, বিরাজ তাহা গ্রহণ করিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি নিজের মুখখানা একবার দেখব—একটা আরশি যদি—

আছে বৈ কি, এখনই এনে দিচ্ছি, বলিয়া অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া একখানি দর্পণ বিরাজের হাতে দিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। বিরাজ আর একবার তাহার লোহার খাটের উপর ফিরিয়া গিয়া আরশি খুলিয়া বসিল। প্রতিবিম্বটির দিকে চাহিবামাত্রই একটা

অপরিমেয় ঘৃণায় তাহার মুখ আপনি বিমুখ হইয়া গেল। দর্পণটা ফেলিয়া দিয়া সে বিছানায় মুখ ঢাকিয়া গভীর আর্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। মাথা মুণ্ডিত—তাহার সেই আকাশভরা মেঘের মত কাল চুল কৈ? সমস্ত মুখ এমন করিয়া কে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল? সেই পদ্মপলাশ চক্ষু কোথায় গেল? অমন অতুলনীয় কাঁচা সোনার মত বর্ণ কে হরণ করিল? ভগবান! এ কি গুরুদণ্ড করিয়াছ! যদি কখনও দেখা হয়, এ মুখ সে কেমন করিয়া বাহির করিবে! যতদিন এ দেহে প্রাণ থাকে, ততদিন আশা একেবারে নির্মূল হইয়া মরে না। তাই, তাহারও হয়ত অতি ক্ষীণ একটু আশা অন্তঃসলিলার মত নিভৃত অন্তস্তলে তখনও বহিতেছিল। দয়াময়! সেটুকু শুকাইয়া দিয়া তোমার কি লাভ হইল!

তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পরে রোগশয্যায় শুইয়া স্বামীর মুখ যখন উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত, তখন কখনও বা সহসা মনে হইত, যাহা সে করিয়াছে, সে ত অজ্ঞান হইয়াই করিয়াছে, তবে কি সে অপরাধের ক্ষমা হয় না? সব পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, শুধু কি ইহার নাই? অন্তর্যামী ত জানেন, যথার্থ পাপ সে করে নাই, তথাপি যেটুকুও হইয়াছে, সেটুকুও কি তাহার এতদিনের স্বামী-সেবায় মুছিবে না? মাঝে মাঝে বলিত, তাঁর মনে ত রাগ থাকে না, যদি হঠাৎ গিয়া পায়ের উপর পড়ি, সব কথা খুলে বলি, আমার মুখের পানে চেয়ে কি করেন তা হলে? তাহা হইলে সম্ভবত কি যে করেন, কল্পনাটাকে সে যে কত রঙে, কতভাবে ফুটাইয়া দেখিবার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইত, ঘুম পাইলে উঠিয়া গিয়া চোখেমুখে জল দিয়া আবার নূতন করিয়া ভাবিতে বসিত—হা ভগবান! তাহার সেই বিচিত্র ছবিটাকে কেন এমন করিয়া দুই পায়ে মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া দিলে! সে তাহার স্বামীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কোন্ লজ্জায় আর এ-মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিবে!

ঘরে আর একজন রোগিণী ছিল, সে বিরাজের কান্না দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল, কি হল গা? কেন কাঁদচ?

সে বিরাজের কান্নার হেতু জানিতে চায়!

বিরাজ তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বসিল এবং কোনদিকে না চাহিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সেইদিন লোকপরিপূর্ণ শব্দমুখর রাজপথের এক প্রান্ত বাহিয়া যখন সে তাহার অনভ্যস্ত ক্লান্ত চরণ দুটিকে সারাজীবনের অনুদ্দিষ্ট যাত্রায় প্রথম পরিচালিত করিল, তখন বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে মনে মনে বলিল, ভগবান! হয়ত ভালই করিয়াছ। আর কেহ চাহিয়া দেখিবে না—এই মুখ, এই চোখ, হয়ত এই যাত্রারই উপযুক্ত। গ্রামের লোক জানিয়াছে, সে গৃহত্যাগিনী কুলটা। তাই, যে মুখ তুলিয়া তাহার গ্রামের মুখ, তাহার স্বামীর মুখ দেখা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সে মুখ হয়ত এমন হওয়াই তোমার মঙ্গলের বিধান! বিরাজ পথ চলিতে লাগিল।

ষোল

কতদিন গত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে সে দাসীবৃত্তি করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তাহার ভগ্নদেহ অসমর্থ হইল—গৃহস্থ বিদায় দিলেন। তখন হইতে ভিক্ষাই তাহার উপজীবিকা। সে পথে পথে ভিক্ষা করে, গাছতলায় রাঁধিয়া খায়, গাছতলায় শোয়। এই বর্তমান জীবনে, তাহার অতীতের তিলমাত্র চিহ্নও আর বিদ্যমান নাই। তাহার শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, জটবাঁধা রুক্ষ একটুখানি চুল, মলিন ভিক্ষালব্ধ একখানি ছোট কাঁথা গায়ে। তাহার তেমনই দেহ, তেমনই বর্ণ,—তেমনই সব। অথচ এই তাহার পঁচিশ বৎসর মাত্র বয়স, এই দেহেরই তুলনা একদিন স্বর্গেও মিলিত না। অতীত হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া ভগবান তাহাকে একবারে নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। সে নিজেও সব ভুলিয়াছে। শুধু ভুলিতে পারে নাই দুটো কথা। 'দাও' বলিতে এখনও তাহার মুখে রক্ত ছুটিয়া আসে—আজও কথাটা গলা দিয়া স্পষ্ট বাহির করিতে পারে না। আর ভুলিতে পারে না যে, তাহাকে অনেক দূরে গিয়া মরিতে হইবে। মরণের সেই স্থানটুকু তাহার কোন্ দেশান্তরে তাহা সে জানে না বটে, কিন্তু

এটা জানে, তাহা বহুদূরে। সেই সুদূরের জন্যই সে অবিশ্রাম পথ চলিয়াছে। সে যে কোনমতেই এ দশা তাহার স্বামীর দৃষ্টিগোচর করিতে পারিবে না, এবং দোষ তাহার যত অপ্রমেয়ই হউক, এ অবস্থা চোখে দেখিলে তাঁহার যে বুক ফাটিয়া যাইবে, তাহা এক মুহূর্তের তরেও বিস্মৃত হইতে পারে নাই বলিয়াই নিরন্তর দূরে সরিয়া যাইতেছিল।

একটা বৎসর পথ হাঁটি[illegible] কিন্তু কোথায় তাহার অপরিচিত গম্যস্থান? কোথায় কোন্ ভূমিশয্যায় এই লজ্জা[illegible] মাথাটা পাতিয়া এই লাঞ্ছিত জীবনটা নিঃশব্দে শেষ করিতে পাইবে? আজ দুদিন হইতে সে একটা গাছতলায় পড়িয়া আছে—উঠিতে পারে নাই। আবার ধীরে ধীরে রোগ ঘিরিয়াছে—কাশি, জ্বর, বুকে ব্যথা। দুর্বল দেহে শক্ত অসুখে পড়িয়া হাসপাতালে গিয়াছিল, ভাল হইতে না হইতেই এই পথশ্রম, অনশন ও অর্ধাশন। তাহার বড় সবলদেহ ছিল বলিয়াই এখনও টিঁকিয়া আছে, আর বুঝি থাকে না। আজ চোখ বুজিয়া ভাবিতেছিল, এই বৃক্ষতলই কি সেই গম্যস্থান? ইহার জন্যই কি সে এত দেশ, এত পথ অবিশ্রাম হাঁটিয়াছে? আর কি সে উঠিবে না? বেলা অবসান হইয়া গেল, গাছের সর্বোচ্চ চূড়া হইতে অস্তোন্মুখ সূর্যের শেষ রক্তাভা কোথায় সরিয়া গেল, সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি গ্রামের ভিতর হইতে ভাসিয়া তাহার কানে পৌঁছিল, সেই সঙ্গে তাহার নিমীলিত চোখের সম্মুখে অপরিচিত গৃহস্থবধূদের শান্ত মঙ্গল মূর্তিগুলি ফুটিয়া উঠিল। এখন কে কি করিতেছে, কেমন করিয়া দীপ জ্বালিতেছে, হাতে দীপ লইয়া কোথায় কোথায় দেখাইয়া ফিরিতেছে, এইবার গলায় আঁচল দিয়া নমস্কার করিতেছে, তুলসীতলায় দীপ দিয়া কে কি কামনা ঠাকুরের পায়ে নিবেদন করিতেছে,—এ সমস্তই সে চোখে দেখিতে লাগিল, কানে শুনিতে লাগিল। আজ অনেকদিন পরে তাহার চোখে জল আসিল। কত সহস্র বৎসর যেন শেষ হইয়া গিয়াছে, সে কোন গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে পায় নাই, কাহারও মুখ মনে করিয়া ঠাকুরের পায়ে তাঁহার আয়ু ঐশ্বর্য মাগিয়া লয় নাই। এ-সমস্ত চিন্তাকে সে প্রাণপণে সরাইয়া রাখিত, কিন্তু আজ আর পারিল না। শাঁখের আহ্বানে তাহার ক্ষুধিত তৃষিত হৃদয় কোন নিষেধ না মানিয়া গৃহস্থবধূদের ভিতরে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনশ্চক্ষে প্রতি ঘরদোর, প্রতি প্রাঙ্গণপ্রান্তর, বাঁধান তুলসীবেদী, প্রতি দীপটি পর্যন্ত এক হইয়া গেল—এ যে সমস্তই তাহার চেনা; সবগুলিতেই এখন যে তাহারই হাতের চিহ্ন দেখা যাইতেছে! আর তাহার দুঃখ রহিল না, ক্ষুধাতৃষ্ণা রহিল না, পীড়ার যাতনা রহিল না, সে তন্ময় হইয়া নিরন্তর বধূদের অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। যখন তাহারা রাঁধিতে গেল, সঙ্গে গেল, রান্না শেষ করিয়া যখন স্বামীদের খাইতে দিল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল, তার পর সমস্ত কাজকর্ম সমাধা করিয়া অনেক রাত্রে যখন তাহারা নিদ্রিত স্বামীদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, সেও কাছে দাঁড়াইতে গিয়া সহসা শিহরিয়া উঠিল—এ যে তাহারই স্বামী! আর তাহার চোখের পলক পড়িল না, একদৃষ্টে নিদ্রিত স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। গৃহ ছাড়িয়া পর্যন্ত এমন করিয়া একটি রাত্রিও ত তাহার কাছে আসে নাই! আজ তাহার ভাগ্যে এ কি অসহ সুখ! নিদ্রায় জাগরণে, তন্দ্রায় স্বপনে, এ কি মধুর নিশাযাপন! বিরাজ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বসিয়াছে। তখনও পূর্বগগন স্বচ্ছ হয় নাই, তখনও ধূসর জ্যোৎস্না শাখা ও পাতার ফাঁকে ফাঁকে নামিয়া বৃক্ষতলে, তাহার চারিদিকে শেফালিপুষ্পের মত ঝরিয়া রহিয়াছে। সে ভাবিতেছিল, সে যদি অসতী, তবে কেন তিনি আজ এমন করিয়া দেখা দিলেন? তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইয়াছে, তাহাই কি জানাইয়া দিয়া গেলেন? তবে ত এক-মুহূর্ত কোথাও সে বিলম্ব করিতে পারিবে না। সে উদ্‌গ্রীব হইয়া প্রভাতের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল। আজিকার রাত্রি সহসা তাহার রুদ্ধদৃষ্টি সজোরে উদ্ঘাটিত করিয়া সমস্ত হৃদয় আনন্দে মাধুর্যে ভরিয়া দিয়া গিয়াছে। আর দেখা হউক বা না হউক, আর ত তাহাকে এক নিমিষের জন্যও স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারিবে না! এমন করিয়া তাঁহাকে যে পাবার পথ ছিল, অথচ, সে বৃথায় এতদিন স্বামীছাড়া হইয়া দুঃখ পাইয়াছে, এই ত্রুটিটা তাহাকে গভীর বেদনায় পুনঃ পুনঃ বিঁধিতে লাগিল। আজ কি করিয়া না জানি, তাহার স্থিরবিশ্বাস হইয়াছে তিনি ডাকিতেছেন!

বিরাজ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, ঠিক ত! এই দেহটা কি আমার আপনার যে, তাঁর অনুমতি

ভিন্ন এমন করিয়া নষ্ট করিতেছি! আমার বিচার করিবার অধিকার আমার নয়, তাঁর। যা করিবার তিনিই করিবেন, আমি সব-কথা তাঁর পায়ে নিবেদন করিয়া দিয়া ছুটি লইব। বিরাজ প্রত্যাবর্তন করিল।

আজ তাহার দেহ লঘু, পদক্ষেপ যেন কঠিন মাটির উপর পড়িতেছে না, মন পরিপূর্ণ, কোথাও এতটুকু গ্লানি নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে সে বারংবার আবৃত্তি করিতে লাগিল, একি বিষম ভুল! এ কি অহঙ্কার তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল! এই কুরূপ কুৎসিত মুখ বিশ্বের সুমুখে বাহির করিতে লজ্জা হয় নাই, শুধু লজ্জা হইয়াছিল তাঁর কাছে, যাঁর কাছে প্রকাশ করিবার একমাত্র অধিকার তাহার নয় বৎসর বয়সে বিধাতা স্বয়ং নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

সতের

পুঁটি দাদাকে মুহূর্তের বিশ্রাম দেয় না। পূজার সময় হইতে পৌষের শেষ পর্যন্ত ক্রমাগত নগরের পর নগর, তীর্থের পর তীর্থে টানিয়া লইয়া ফিরিতেছিল। তার অল্প বয়স, সুস্থ সবল দেহ, অসীম কৌতূহল, তাহার সহিত সমানে পা ফেলিয়া চলা নীলাম্বরের সাধ্যাতীত—সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ কোথাও বসিয়া একটুখানি জিরাইয়া লইবার ইচ্ছা না হইয়া কেন যে সমস্ত দেহটা তাহার ঘরের পানে চাহিয়া অহর্নিশ পালাই পালাই করিতেছে, ভারাক্রান্ত মন দেশে ফিরিবার জন্য দিবানিশি কাঁদিয়া কাঁদিয়া নালিশ জানাইতেছে, ইহাও সে বুঝিতে পারিতেছে না। কি আছে দেশে? কেন এমন স্বাস্থ্যকর স্থানে মন বসে না? ছোটবৌ মাঝে মাঝে পুঁটিকে চিঠি দেয়, তাহাতেও এমন কোনও কথা থাকে না, তথাপি সেই বন-জঙ্গলের অবিশ্রাম টানে তাহার শীর্ণদেহ কঙ্কালসার হইয়া উঠিতে লাগিল। পুঁটি চায়—দাদা সব ভুলিয়া আবার তেমনি হয়। তেমনিই সুস্থ সদানন্দ, তেমনই মুখে মুখে গান, তেমনই কারণে অকারণে উচ্চহাসির অফুরন্ত ভাণ্ডার। কিন্তু দাদা তাহার সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল করিতে বসিয়াছে। আগে সে এমন করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই। হতাশ হয় নাই, মনে করিত, আর দুদিন যাক। কিন্তু দুদিন করিয়া চার-পাঁচ মাস কাটিয়া গেল, কৈ কিছুই ত হইল না। বাড়ি ছাড়িয়া আসিবার দিনে মোহিনীর কথায় ব্যবহারে বিরাজের উপর তাহার একটা করুণার ভাব আসিয়াছিল, তাহার কথাগুলো বিশ্বাসও করিয়াছিল। দাদা ভাল হইয়া গেলে ছেলেবেলার কথা মনে করিয়া সে হয়ত মনে মনে তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিতেও পারিত। বস্তুতঃ ক্ষমা করিবার জন্য, সেই বৌদিদিকে একটুখানি মাধুর্যের সহিত স্মরণ করিবার জন্য এক সময়ে নিজেও ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগ তাহার মিলিতেছে কৈ? দাদা ভাল হইতেছে কৈ? একে ত সংসারের এমন কোনও দুঃখ, কোনও হেতু সে কল্পনা করিতেও পারে না যাহাতে এই মানুষটিকে এত দুঃখে ফেলিয়া রাখিয়া কেহ সরিয়া দাঁড়াইতে পারে। বৌদি ভাল হউক, মন্দ হউক, পুঁটি আর ভ্রূক্ষেপ করে না, কিন্তু ত্যাগ করিয়া যাইবার অমার্জনীয় অপরাধে যে স্ত্রী অপরাধিনী, তাহার প্রতি বিদ্বেষেরও তাহার যেন অন্ত রহিল না। সেই হতভাগিনীকে প্রত্যহ স্মরণ করিয়া তাহার বিচ্ছেদ এমন করিয়া মনে মনে লালন করিয়া, যে মানুষ নিজেকে ক্ষয় করিয়া আনিতেছে, তাহারও প্রতি তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইল না।

একদিন সকালে সে মুখ ভার করিয়া আসিয়া বলিল, দাদা, বাড়ি যাই চল। নীলাম্বর কিছু বিস্মিত হইয়াই বোনের মুখের পানে চাহিল, কারণ মাঘ মাসটা প্রয়াগে কাটাইয়া যাইবার কথা ছিল। পুঁটি দাদার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল, একটা দিনও আর থাকতে চাইনে, কালই যাব।

তাহার রুষ্টভাব অবলোকন করিয়া নীলাম্বর একটুখানি বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিল, কেন রে পুঁটি?

পুঁটি এতক্ষণ জোর করিয়া চোখের জল চাপিয়া রাখিয়াছিল, এবার কাঁদিয়া ফেলিল। অশ্রু-বিকৃতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, কি হবে থেকে? তোমার ভাল লাগচে না, তুমি যাই যাই করে প্রতিদিন শুকিয়ে উঠচ, না, আমি কিছুতেই একদিনও থাকব না।

নীলাম্বর সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইয়া বলিল, ফিরে গেলেই কি

ভাল হয়ে যাব রে? এ দেহ সারবে বলে আর আমার ভরসা হয় না পুঁটি—তাই চল বোন, যা হবার ঘরে গিয়েই হোক।

দাদার কথা শুনিয়া পুঁটি অধিকতর কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কেন তুমি সদাসর্বদা তাকে এমন করে ভাববে? শুধু ভেবেই ত এমন হয়ে যাচ্চ।

কে বললে আমি তাকে সর্বদা ভাবি?

পুঁটি তেমনই ভাবে জবাব দিল, কে আবার বলবে, আমি নিজেই জানি।

তুই তাকে ভাবিস নে?

পুঁটি চোখ মুছিয়া উদ্ধতভাবে বলিল, না, ভাবিনে। তাকে ভাবলে পাপ হয়।

নীলাম্বর চমকিত হইল—কি হয়?

পাপ হয়। তার নাম মুখে আনলে মুখ অশুচি হয়, মনে আনলে স্নান করতে হয়,—বলিয়াই সে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, দাদার স্নেহকোমল দৃষ্টি একনিমেষে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর বোনের মুখের দিকে চাহিয়া কঠিনস্বরে বলিল, পুঁটি!

ডাক শুনিয়া সে ভীত ও অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে দাদার বড় আদরের বোন, ছেলেবেলাতেও সহস্র অপরাধে কখনও এমন চোখ দেখে নাই, এমন গলা শুনে নাই। এমন বড়বয়সে বকুনি খাইয়া তাহার ক্ষোভে ও অভিমানে মাথা হেঁট হইয়া গেল।

নীলাম্বর আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া গেলে, সে চোখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। দুপুরবেলা দাদার আহারের সময় কাছে গেল না, অপরাহ্নে দাসীর হাতে খাবার পাঠাইয়া দিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

নীলাম্বর ডাকিল না, কথাটি বলিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। নীলাম্বর আহ্নিক শেষ করিয়া সেই আসনে চুপ করিয়া বসিয়া আছে. পুঁটি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া পিছনে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দাদার পিঠের উপর মুখ রাখিল। এটা তাহার নালিশ করার ধরন। ছেলেবেলায় অপরাধ করিয়া বৌদির তাড়া খাইয়া এমনই করিয়া সে অভিযোগ করিত। নীলাম্বরের সহসা তাহা মনে পড়িয়া দুই চোখ সজল হইয়া উঠিল, মাথায় হাত দিয়া কোমলস্বরে বলিল, কি রে?

পুঁটি পিঠ ছাড়িয়া দিয়া কোলের উপর উপুড় হইয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। নীলাম্বর তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে পুঁটি কান্নার সুরে বলিল, আর বলব না দাদা!

নীলাম্বর হাত দিয়া তাহার চুলগুলি নাড়িতে নাড়িতে বলিল, না, আর ব'ল না।

পুঁটি চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলাম্বর তাহার মনের কথা বুঝিয়া মৃদুস্বরে কহিল, সে তোর গুরুজন। শুধু সম্পর্কে নয় পুঁটি, তোকে মায়ের মত মানুষ ক'রে তোর মায়ের মতই হয়েচে। অপরে যা ইচ্ছে বলুক, কিন্তু তোর মুখের ও-কথায় গভীর অপরাধ হয়।

পুঁটি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কেন সে আমাদের এমন করে ফেলে রেখে গেল!

কেন যে গেল পুঁটি. সে শুধু আমি জানি, আর যিনি সর্বযামী তিনি জানেন। সে নিজেও জানত না—তখন সে পাগল হয়েছিল, তার এতটুকু জ্ঞান থাকলে সে আত্মহত্যাই করত, এ কাজ করত না।

পুঁটি আর একবার চোখ মুছিয়া ভাঙ্গা গলায় বলিল, কিন্তু—এখন, তবে কেন আসে না দাদা?

কেন আসে না? আসবার জো নেই বলেই আসে না দিদি, বলিয়া সে নিজেকে জোর করিয়া সংবরণ করিয়া লইয়া ক্ষণকাল পরেই বলিল, যে অবস্থায় আমাকে ফেলে রেখে গেছে, তার এতটুকু ফেরবার পথ থাকলে সে ফিরে আসত—একটা দিনও কোথাও থাকত না। এ কথা কি তুই নিজেই বুঝিস নে পুঁটি?

পুঁটি মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বুঝি দাদা।

নীলাম্বর উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, তাই বল্ বোন; সে আসতে চায়, পারে না। সে যে কি শাস্তি পুঁটি, তা তোরা দেখতে পাসনে বটে, কিন্তু চোখ বুজলে আমি তা দেখি! সেই দেখাই আমাকে নিত্য ক্ষয় করে আনচে রে, আর কিছুই নয়।

পুঁটি কাঁদিয়া ফেলিল।

নীলাম্বর হাত দিয়া নিজের চোখ মুছিয়া লইয়া বলিল, সে তার দুটো সাধের কথা আমাকে যখন-তখন বলত। এক সাধ, শেষ সময়ে আমার কোলে যেন মাথা রাখতে পায়; আর সাধ, সীতা-সাবিত্রীর মত হয়ে মরণের পরে যেন তাদের কাছেই যায়। হতভাগীর সব সাধই ঘুচেচে।

পুঁটি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

নীলাম্বর রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, তোরা সবাই তার অপরাধ দিস্, বারণ করতে পারিনে বলে আমিও চুপ করে থাকি, কিন্তু ভগবানকে ফাঁকি দিই কি করে বল্ দেখি? তিনি ত দেখেচেন, কার ভুল, কার অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে সে ডুবে গেল। তুই বল্, আমি কোন্ মুখে তার দোষ দিই, আমি তাকে আশীর্বাদ না করে কি করে থাকি? না বোন, সংসারের চোখে সে যত কলঙ্কিনীই হোক, তার বিরুদ্ধে আমার কোন ক্ষোভ, কোন নালিশ নেই। নিজের দোষে এ জন্মে তাকে পেয়েও হারালুম, ভগবান করুন, যেন পরজন্মেও তাকে পাই। সে আর বলিতে পারিল না, এইখানে তাহার গলা একেবারে ধরিয়া গেল।

পুঁটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া দাদার চোখ মুছাইয়া দিতে গিয়া নিজেও কাঁদিয়া ফেলিল, সহসা তাহার মনে হইল, দাদা যেন কোথায় সরিয়া যাইতেছে। কাঁদিয়া বলিল, যেখানে ইচ্ছে চল দাদা, কিন্তু, আমি তোমাকে একটি দিনও কোথাও একলা ছেড়ে দেব না।

নীলাম্বর মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল।

বিরাজ জগন্নাথের পথে ফিরিয়া আসিতেছিল। এই পথ ধরিয়া যখন সে অনুদ্দিষ্ট মৃত্যুশয্যার অনুসন্ধানে গিয়াছিল, সেই যাওয়ায় আর এই আসায় কি প্রভেদ! এখন সে বাড়ি যাইতেছে। তাহার দুর্বল দেহ পথে যতই সকাতরে বিশ্রাম-ভিক্ষা চাহিতে লাগিল, সে ততই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। কোন কারণে কোথাও বিলম্ব করিতে সে সম্মত নয়। তাহার কাশি যক্ষ্মায় পরিণত হইয়াছে, ইহা সে টের পাইয়াছিল, তাই আশঙ্কার অবধি ছিল না, পাছে যাওয়া না ঘটে। ছেলেবেলা হইতে একটা বিশ্বাস তাহার বড় দৃঢ় ছিল, দেহ নিষ্পাপ না হইলে কেহ স্বামীর পায়ে মরিতে পায় না। সে এই উপায়ে মরণের পূর্বে একবার নিজের দেহটাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়—তাহার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে সে নির্ভয়ে, মহানন্দে জীবনের পরপারে দাঁড়াইয়া তাঁর জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিবে। কিন্তু দামোদরের এধারে আসিয়া তাহার হাত-পা ফুলিয়া উঠিল, মুখ দিয়া অধিক পরিমাণে রক্ত পড়িতে লাগিল—আর কিছুতেই পা চলিল না। সে হতাশ হইয়া একটা গাছতলায় ফিরিয়া আসিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিল। এ কি ভয়ানক অপরাধ যে, এত করিয়াও তাহার শেষ আশা মিটিল না! তাহার এ-জন্ম গেল, পরজন্মেও আশা নাই, তবে সে আর কি করিবে! আশা নাই, তবুও সে গাছতলায় পড়িয়া সারাদিন হাতজোড় করিয়া স্বামীর পায়ে মিনতি জানাইতে লাগিল।

পরদিন তারকেশ্বরের কাছাকাছি কোথায় হাটবার ছিল। প্রভাত হইতে সেই পথে গরুর গাড়ি চলিতে লাগিল। সে সাহসে ভর করিয়া এক বৃদ্ধ গাড়োয়ানকে আবেদন করিল। বুড়ো মানুষ তাহার কান্না দেখিয়া, সম্মত হইয়া তাহাকে গাড়ি করিয়া তারকেশ্বরে পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। বিরাজ স্থির করিল, এই মন্দিরের আশেপাশে কোথাও সে পড়িয়া থাকিবে। এখানে কত লোক আসে যায়, যদি কোন উপায়ে একবার ছোটবৌর কাছে সংবাদ পাঠাইতে পারে।

আঠার

কঠিন ব্যাধিপীড়িত কত নরনারী কত কামনায় এই দেবমন্দির ঘেরিয়া ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে, তাহাদের মধ্যে আসিয়া বিরাজ অনেকদিনের পর একটু শান্তি অনুভব করিল। তাহাদের মত তাহারও ব্যাধি আছে, কামনা আছে, সে তাই লইয়া এখানে নীরবে পড়িয়া

থাকিতে পাইবে, কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না, কাহারও অর্থহীন কৌতূহল চরিতার্থ করিতে হইবে না মনে করিয়া এত দুঃখের মাঝেও আরাম পাইল। কিন্তু রোগ দ্রুত বাড়িয়া চলিতে লাগিল। মাঘের এই দুর্জয় শীতে ও অনাহারে ছয়দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু আর কাটিবে বলিয়াও আশা হইল না, কেহ আসিবে বলিয়াও ভরসা রহিল না। ভরসা রহিল শুধু মৃত্যুর—সে তারই জন্য আর একবার নিজেকে প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সেদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, অপরাহ্ণ না হইতেই আঁধার বোধ হইতে লাগিল। ও-বেলায় তাহার মুখ দিয়া অনেকখানি রক্ত উঠার মৃতকল্প দেহটা যেন একেবারে নিঃশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে মনে মনে বলিল, বুঝি, আজই সব সাঙ্গ হইবে এবং তখন হইতেই মন্দিরের পিছনে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া ছিল। দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের পূজা হইয়া গেলে অন্যদিনের মত উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিতে পারিল না—মনে মনে করিল। এতদিন স্বামীর চরণে সে শুধু মিনতি জানাইয়াই আসিয়াছে। সে অবোধ নয়, যে কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে এ জন্মের কোন দাবী রাখে নাই, শুধু পরজন্মের অধিকার না যায়, ইহাই চাহিয়াছে। না বুঝিয়া অপরাধ করার শাস্তি যেন এ জন্ম অতিক্রম করিয়া পরজন্ম পর্যন্ত ব্যাপ্ত না হইতে পায়, এই ভিক্ষাই মাগিয়াছে। কিন্তু বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিন্তার ধারা সহসা এক আশ্চর্য পথে ফিরিয়া গেল। ভিক্ষার ভাব রহিল না, বিদ্রোহের ভাব দেখা দিল। সমস্ত চিত্ত ভরিয়া এক অপূর্ব অভিমানের সুর অনির্বচনীয় মাধুর্যে বাজিয়া উঠিল। সে তাহাতেই মগ্ন হইয়া কেবলই বলিতে লাগিল, কেন তবে তুমি বলেছিলে!

অজ্ঞাতসারে কখন তাহার পঙ্গু বাঁ হাতখানি স্খলিত হইয়া পথের উপর পড়িয়াছিল, সে টের পায় নাই, সহসা তাহারই উপর একটা কঠিন ব্যথা পাইয়া সে অস্ফুটস্বরে কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। এটা যাতায়াতের পথ। যে ব্যক্তি না দেখিয়া এই অবশ শীর্ণ হাতখানি মাড়াইয়া দিয়াছিল, সে অতিশয় লজ্জিত ও ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আহা হা—কে গা, এমন করে পথের উপর শুয়ে আছ? বড় অন্যায় করেচি—বেশী লাগেনি ত?

চক্ষের পলকে বিরাজ মুখের কাপড় সরাইয়া চাহিয়া দেখিল, তার পর আর একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া চুপ করিল। এই ব্যক্তি নীলাম্বর। সে একবার একটু ঝুঁকিয়া দেখিয়া সরিয়া গেল।

কিছুক্ষণে সূর্য অস্ত গেল। পশ্চিম দিগন্তে মেঘ ছিল না, চক্রবালবিচ্ছুরিত স্বর্ণাভা মন্দিরের চূড়ায়, গাছের আগায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া পুঁটিকে কহিল, ওই রোগা মেয়েমানুষটিকে বড় মাড়িয়ে দিয়েচি বোন, দেখ দেখি যদি কিছু দিতে পারিস—বোধ করি ভিক্ষুক।

পুঁটি চাহিয়া দেখিল, স্ত্রীলোকটি একদৃষ্টে তাহাদেরই দিকে চাহিয়া, ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের কিয়দংশ বস্ত্রাবৃত, তথাপি মনে হইল, এ মুখ যেন সে পূর্বে দেখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা তোমার বাড়ি কোথায়?

সাতগাঁয়, বলিয়া স্ত্রীলোকটি হাসিল।

বিরাজের সবচেয়ে মধুর সামগ্রী ছিল তাহার মুখের হাসি; এ হাসি সমস্ত সংসারের মধ্যে কাহারও ভুল করিবার জো ছিল না। ওগো এ যে বৌদি, বলিয়া সেই মুহূর্তেই পুঁটি সেই জীর্ণশীর্ণ দেহের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মুখে মুখ দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নীলাম্বর দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কথাবার্তা শুনিতে না পাইলেও সমস্ত বুঝিল। সে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তারপর শান্ত-কণ্ঠে বলিল, এখানে কাঁদিসনে পুঁটি, ওঠ, বলিয়া ভগিনীকে সরাইয়া দিয়া স্ত্রীর শীর্ণদেহ ক্ষুদ্র শিশুটির মত বুকে তুলিয়া লইয়া দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিয়া গেল।

চিকিৎসার জন্য, উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার জন্য বিরাজকে অনেক সাধ্য-সাধনা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোনমতেই তাহাকে রাজী করান যায় নাই। আর ঘর ছাড়িয়া যাইতে সে কিছুতেই সম্মত হইল না।

নীলাম্বর পুঁটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়া দিল, আর কটা দিন বোন? যেখানে যেমন করে ও থাকতে চায়, দে। আর ওকে তোরা পীড়াপীড়ি করিস নে।

তারকেশ্বরে স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সে প্রথম আবেদন জানাইয়াছিল, তাহাকে ঘরে লইয়া চল, তাহার নিজের শয্যার উপরে শোয়াইয়া দাও। ঘরের উপর, ঘরের প্রতি সামগ্রীটির উপর এবং স্বামীর উপর তাহার কি ভীষণ তৃষ্ণা, তাহা যে-কেহ চোখে দেখে সে-ই উপলব্ধি করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই সে জ্বরে আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে, কিন্তু একটু সজাগ হইলেই ঘরের প্রতি বস্তুটি তন্ন তন্ন করিয়া চাহিয়া দেখে।

নীলাম্বর শয্যা ছাড়িয়া প্রায়ই কোথাও যায় না এবং প্রায়ই সজল চক্ষে প্রার্থনা করে, ভগবান, অনেক শাস্তি দিয়াছ, এইবার ক্ষমা কর। যে লোক পরলোকে যাত্রা করিয়াছে, তাহার ইহলোকের মোহ কাটাইয়া দাও।

গৃহত্যাগিনীর গৃহের উপর এই নিদারুণ আকর্ষণ দেখিয়া সে মনে মনে কণ্টকিত হইয়া উঠিতে থাকে। দুই সপ্তাহ গত হইয়াছে। কাল হইতে তাহার বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। আজ সারাদিন ভুল বকিয়া কিছুক্ষণ পূর্বে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সন্ধ্যার পর চোখ মেলিয়া চাহিল। পুঁটি কাঁদিয়া কাটিয়া পায়ের কাছে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। ছোটবৌ শিয়রের কাছে বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া বলিল, ছোটবৌ না?

ছোটবৌ মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, হাঁ দিদি, আমি মোহিনী।

পুঁটি কোথায়?

ছোটবৌ হাত দিয়া দেখাইয়া বলিল, তোমার পায়ের কাছে ঘুমাচ্চে।

উনি কৈ?

ও ঘরে আহ্নিক কচ্চেন।

তবে আমিও করি, বলিয়া সে চোখ বুজিয়া মনে মনে জপ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ডান হাত ললাটে স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিল, তারপর ছোটবৌয়ের মুখের পানে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, বোধ করি আজই চললুম বোন, কিন্তু আবার যেন দেখা হয়, আবার যেন তোকেই এমনি কাছে পাই।

বিরাজের সময় যে একেবারে শেষ হইয়া আসিয়াছিল, কাল হইতে তাহা সকলেই টের পাইয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া ছোটবৌ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।

বিরাজের বেশ জ্ঞান হইয়াছে। সে কণ্ঠস্বর আরও নত করিয়া চুপি চুপি বলিল, ছোটবৌ, সুন্দরীকে একবার ডাকতে পারিস?

ছোটবৌ রুদ্ধস্বরে বলিল, আর তাকে কেন দিদি? সে আসবে না।

আসবে রে আসবে। একবার ডাকা—আমি তাকে মাপ করে আশীর্বাদ করে যাই। আর আমার কারও ওপর রাগ নেই, কারও ওপর কোন ক্ষোভ নেই। ভগবান আমাকে যখন ক্ষমা করেচেন, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়েচেন, আমিও তখন সকলকে ক্ষমা করে যেতে চাই।

ছোটবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, এ আর ক্ষমা কি দিদি? বিনা অপরাধে এত দণ্ড দিয়েও তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল না—তিনি তোমাকেও নিতে বসেচেন। একটা হাত নিলেন, চোখ নিলেন, তবুও যদি তোমাকে আমাদের কাছে ফেলে রেখে দিতেন—

বিরাজ হাসিয়া উঠিল। বলিল, কি করতিস আমাকে নিয়ে? পাড়ায় দুর্নাম রটেচে—আমার বেঁচে থাকার আর ত লাভ নেই বোন।

ছোটবৌ গলার জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, আছে দিদি, তা ছাড়া ও ত মিথ্যে দুর্নাম—ওতে আমরা ভয় করিনে।

তোরা করিস নে, আমি করি। দুর্নাম মিথ্যে নয়, খুব সত্যি। আমার অপরাধ যতটুকুই হয়ে থাক ছোটবৌ, তার পরে আর হিন্দুর ঘরের মেয়ের বাঁচা চলে না। তোরা ভগবানের দয়া নেই বলচিস, কিন্তু—

তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই পুঁটি উচ্ছ্বসিত কান্নার সুরে চেঁচাইয়া উঠিল, ওঃ ভারী দয়া ভগবানের!

এতক্ষণ সে চুপ করিয়া কাঁদিতেছিল আর শুনিতেছিল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া অমন করিয়া উঠিল। কাঁদিয়া বলিল, তাঁর এতটুকু দয়া নেই, এতটুকু বিচার নেই। যারা আসল পাপী, তাদের কিছু হল না, আর আমাদেরই তিনি এমনই করে শাস্তি দিচ্ছেন।

তাহার কান্নার দিকে চাহিয়া বিরাজ নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। কি মধুর, কি বুক-ভাঙ্গা হাসি! তারপরে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বলিল, চুপ কর্ পোড়ারমুখী, চেঁচাস্ নে।

পুঁটি ছুটিয়া আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল, তুমি ম'রো না বৌদি, আমরা কেউ সইতে পারব না। তুমি ওষুধ খাও—আর কোথাও চল—তোমার দুটি পায়ে পড়ি বৌদি, আর দুটো দিন বাঁচ।

তাহার কান্নার শব্দে আহ্নিক ফেলিয়া নীলাম্বর দ্রুতপদে কাছে আসিয়া শুনিতে লাগিল, পুঁটির যা মুখে আসিল, সে তাই বলিয়া ক্রমাগত অনুনয় করিতে লাগিল। এইবার বিরাজের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িল। ছোটবৌ সযত্নে তাহা মুছাইয়া দিয়া পুঁটিকে টানিয়া লইতেই, সে তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সকলকে কাঁদাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে বিরাজ অবনত ভগ্নকণ্ঠে বলিতে লাগিল, কাঁদিস নে পুঁটি, শোন্।

নীলাম্বর আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, বিরাজের চৈতন্য সম্পূর্ণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে তাহা সে বুঝিল। বিরাজ বলিতে লাগিল, না বুঝে তাঁর দোষ দিস না পুঁটি। কি সূক্ষ্ম বিচার, তবু যে কত দয়া, সে কথা আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না। মরাই আমার বাঁচা, সে কথা আমি গেলেই তোরা বুঝবি। আর বলচিস—একটা হাত আর একটা চোখ নিয়েচেন, সে ত দুদিন আগে পাছে যেতই। কিন্তু এইটুকু শাস্তি দিয়ে তিনি তোদের কোলে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েচেন, সেটা কি করে ভুলবি পুঁটি?

ছাই ফিরিয়ে দিয়েচেন, বলিয়া পুঁটি কাঁদিতেই লাগিল।

ভগবানের দয়া বা সূক্ষ্মবিচারের একটা বর্ণও সে বিশ্বাস করিল না। বরং সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে গভীর অত্যাচার ও অবিচার বলিয়াই মনে হইতে লাগিল। খানিক পরে বিরাজ বলিল, পুঁটি, অনেকক্ষণ দেখিনি রে, তোর দাদাকে একবার ডাক্।

নীলাম্বর আড়ালেই ছিল, আসিতেই ছোটবৌ বিছানা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল। নীলাম্বর শিয়রে বসিয়া স্ত্রীর ডান হাতটা সাবধানে নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া নাড়ী দেখিতে লাগিল। সত্যই বিরাজের আর কিছু ছিল না। সে যে জ্বরের উপর এত কথা বলিতেছে এবং ইহারই অবসানের সঙ্গে খুব সম্ভব সমস্তই শেষ হইবে, তাহা সে পূর্বেই অনুমান করিয়াছিল, এখন তাহাই বুঝিল।

বিরাজ বলিল, বেশ হাত দেখ, বলিয়াই হাসিল।

সহসা সে মর্মান্তিক পরিহাস করিয়া ফেলিল। এই উপলক্ষ করিয়াই যে এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহা সকলেরই মনে পড়িয়া গেল। বেদনায় নীলাম্বরের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বিরাজও বোধ করি তাহা দেখিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ অনুতপ্ত হইয়া বলিল, না, না, তা বলিনি—সত্যিই বলচি, আর কত দেরি? বলিয়া চেষ্টা করিয়া নিজের মাথা স্বামীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়া বলিল, সকলের সুমুখে আর একবার তুমি বল, আমাকে মাপ করেচ?

নীলাম্বর রুদ্ধস্বরে 'করেচি' বলিয়া হাত দিয়া চোখ মুছিল।

বিরাজ ক্ষণকাল চোখ বুজিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, জ্ঞানে, অজ্ঞানে এত-দিনের ঘরকন্নায় কতই না দোষ-ঘাট করেচি—ছোটবৌ, তুমিও শোন, পুঁটি তুইও শোন্, দিদি, তোমরা সব ভুলে আজ আমাকে বিদেয় দাও—আমি চল্লুম। বলিয়া সে হাত বাড়াইয়া স্বামীর পদতল খুঁজিতে লাগিল। নীলাম্বর মাথার বালিশটা এক পাশে সরাইয়া দিয়া উপরে পা তুলিতেই বিরাজ হাত দিয়া ক্রমাগত পায়ের ধুলা মাথায় দিতে দিতে বলিল, আমার সব দুঃখ এতদিনে সার্থক হল—আর কিছু বাকী নেই। দেহ আমার শুদ্ধ নিষ্পাপ —এইবার যাই, গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি গে। বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া ক্রোড়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, এমনই করে আমাকে নিয়ে থাক, কোথাও যেও না, বলিয়া নীরব হইল। সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

সকলেই শুষ্কমুখে বসিয়া রহিল। রাত্রি বারোটার পর হইতে আবার সে ভুল বকিতে লাগিল। নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ার কথা—হাসপাতালের কথা—নিরুদ্দেশ পথের কথা—কিন্তু, সব কথার মধ্যে অত্যুগ্র একাগ্র পতিপ্রেম। মুহূর্তের ভ্রম কি করিয়া সে সতী-সাধ্বীকে দগ্ধ করিয়াছে শুধুই তাই।

এ কয়দিন তাহারই সুমুখে বসিয়া নীলাম্বরকে আহার করিতে হইত; সেদিন মাঝে মাঝে সে পুঁটিকে ডাকিয়া, ছোটবৌকে ডাকিয়া বকিতে লাগিল। তার পর, ভোরবেলায় সমস্ত ডাকাডাকি দমন করিয়া দীর্ঘশ্বাস উঠিল। আর সে চাহিল না, আর সে কথা কহিল না, স্বামীর দেহে মাথা রাখিয়া সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখিনীর সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া গেল।



শ্রীকান্ত

প্রথম পর্ব

এক

আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে!

ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই ত বুড়া হইলাম। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের মুখে শুধু একটা একটানা 'ছি-ছি' শুনিয়া শুনিয়া নিজেও নিজের জীবনটাকে একটা মস্ত 'ছি-ছি-ছি' ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারি নাই। কিন্তু কি করিয়া যে জীবনের প্রভাতেই এই সুদীর্ঘ ছি-ছি'র ভূমিকা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছিল, বহুকালান্তরে আজ সেই সব স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মালা গাঁথিতে বসিয়া যেন হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে, এই 'ছি-ছি'টা যত বড় করিয়া সবাই দেখাইয়াছে, হয়ত ঠিক তত বড়ই ছিল না। মনে হইতেছে, হয়ত ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র-সৃষ্টির ঠিক মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভাল ছেলে হইয়া একজামিন পাশ করিবার সুবিধাও দেন নাই; গাড়ি-পাল্কী চড়িয়া বহু লোক-লস্কর সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিয়া তাহাকে 'কাহিনী' নাম দিয়া ছাপাইবার অভিরুচিও দেন না! বুদ্ধি হয়ত তাহাকে কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী-লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না। তাই প্রবৃত্তি তাহাদের এমনি অসঙ্গত, খাপছাড়া—এবং দেখিবার বস্তু ও তৃষ্ণাটা স্বভাবতঃই এতই বেয়াড়া হইয়া উঠে যে, তাহার বর্ণনা করিতে গেলে সুধী ব্যক্তিরা বোধ করি হাসিয়াই খুন হইবেন। তারপরে সেই মন্দ ছেলেটি যে কেমন করিয়া অনাদরে অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোক্কর খাইয়া অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে —সুদীর্ঘ দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।

অতএব এ সকলও থাক। যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি। কিন্তু বলিলেই ত বলা হয় না। ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে; কিন্তু হাত-দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না! সে যে ভারি শক্ত। তা ছাড়া মস্ত মুস্কিল হইয়াছে আমার এই যে, ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা-কবিত্বের বাষ্পটুকুও দেন নাই। এই দুটো পোড়া চোখ দিয়া আমি যা কিছু দেখি ঠিক তাহাই দেখি। গাছকে ঠিক গাছই দেখি—পাহাড়-পর্বতকে পাহাড়-পর্বতই দেখি। জলের দিকে চাহিয়া জলকে জল ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না! আকাশে মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া, ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ! কাহারো নিবিড় এলোকেশের রাশি চুলোয় যাক—একগাছি চুলের সন্ধানও কোনদিন তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাই নাই। চাঁদের পানে চাহিয়া চাহিয়া চোখ ঠিকরাইয়া গিয়াছে; কিন্তু কাহারো মুখটুখ ত কখনো নজরে পড়ে নাই। এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা ত চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

কিন্তু, কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ। আমাদের প্রথম আলাপ একটা 'ফুটবল ম্যাচে'। আজ সে বাঁচিয়া আছে কি না জানি না। কারণ বহুবৎসর পূর্বে একদিন অতি প্রত্যূষে ঘরবাড়ি, বিষয়-আশয়, আত্মীয়-স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সেই যে একবস্ত্রে সে সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, আর কখনও ফিরিয়া আসিল না। উঃ—সে দিনটা কি মনেই পড়ে!

ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের 'ফুটবল ম্যাচ্'। সন্ধ্যা হয়-হয়। মগ্ন হইয়া দেখিতেছি। আনন্দের সীমা নাই। হঠাৎ—ওরে বাবা—এ কি রে! চটাপট্ শব্দ এবং মারো

শালাকে, ধরো শালাকে! কি একরকম যেন বিহ্বল হইয়া গেলাম। মিনিট দুই-তিন। ইতিমধ্যে কে যে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না। ঠাহর পাইলাম ভাল করিয়া তখন, যখন পিঠের উপর একটা আস্ত ছাতির বাঁট পটাশ্ করিয়া ভাঙিল এবং আরো গোটা দুই-তিন মাথার উপর, পিঠের উপর উদ্যত দেখিলাম। পাঁচ-সাতজন মুসলমান-ছোকরা তখন আমার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়াছে—পালাইবার এতটুকু পথ নাই।

আরও একটা ছাতির বাঁট—আরও একটা। ঠিক সেই মুহূর্তে যে মানুষটি বাহির হইতে বিদ্যুদ্গতিতে ব্যূহভেদ করিয়া আমাকে আগলাইয়া দাঁড়াইল—সেই ইন্দ্রনাথ।

ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশির মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই-চারিটা বসন্তের দাগ। মাথায় আমার মতই, কিন্তু বয়সে কিছু বড়। কহিল, ভয় কি! ঠিক আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এস।

ছেলেটির বুকের ভিতর সাহস এবং করুণা যাহা ছিল, তাহা সুদুর্লভ হইলেও অসাধারণ হয়ত নয়। কিন্তু তাহার হাত দুখানি যে সত্যই অসাধারণ, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। শুধু জোরের জন্য বলিতেছি না। সে দুটি দৈর্ঘ্যে তাহার হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পড়িত। ইহার পরম সুবিধা এই যে, যে ব্যক্তি জানিত না, তাহার কস্মিনকালেও এ আশঙ্কা মনে উদয় হইতে পারে না যে, বিবাদের সময় ঐ খাটো মানুষটি অকস্মাৎ হাত-তিনেক লম্বা একটা হাত বাহির করিয়া তাহার নাকের উপর এই আন্দাজের মুষ্ট্যাঘাত করিবে। সে কি মুষ্টি! বাঘের থাবা বলিলেই হয়।

মিনিট-দুয়ের মধ্যে তাহার পিঠ ঘেঁষিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। ইন্দ্র বিনা-আড়ম্বরে কহিল, পালা।

ছুটিতে শুরু করিয়া কহিলাম, তুমি? সে রুক্ষভাবে জবাব দিল, তুই পালা না—গাধা কোথাকার!

গাধাই হই—আর যাই হই, আমার বেশ মনে পড়ে, আমি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলাম,—না।

ছেলেবেলা মারপিট কে না করিয়াছে? কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমরা—মাস দুই-তিন পূর্বে লেখাপড়ার জন্য শহরে পিসিমার বাড়ি আসিয়াছি—ইতিপূর্বে এভাবে দল বাঁধিয়া মারামারিও করি নাই, এমন আস্ত দুটা ছাতির বাঁট পিঠের উপরও কোনদিন ভাঙেগ নাই। তথাপি একা পলাইতে পারিলাম না। ইন্দ্র একবার আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, না তবে কি? দাঁড়িয়ে মার খাবি না কি? ঐ, ওই দিক থেকে ওরা আসচে—আচ্ছা, তবে খুব ক'ষে দৌড়ো—

এ কাজটা বরাবরই খুব পারি। বড় রাস্তার উপরে আসিয়া যখন পৌঁছান গেল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং পথের উপর মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিন ল্যাম্প লোহার থামের উপর এখানে একটা, আর ওই ওখানে একটা জ্বালা হইয়াছে। চোখের জোর থাকিলে, একটার কাছে দাঁড়াইয়া আর একটা দেখা যায় না, তা নয়। আততায়ীর শঙ্কা আর নাই। ইন্দ্র অতি সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা কহিল। আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আশ্চর্য, সে এতটুকুও হাঁপায় নাই। এতক্ষণ যেন কিছুই হয় নাই—মারে নাই, মার খায় নাই, ছুটিয়া আসে নাই—না, কিছুই নয়; এমনিভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি রে?

শ্রী—কা—ন্ত—

শ্রীকান্ত? আচ্ছা। বলিয়া সে তাহার জামার পকেট হইতে একমুঠা শুকনা পাতা বাহির করিয়া কতকটা নিজের মুখে পুরিয়া দিয়া কতকটা আমার হাতে দিয়া বলিল, ব্যাটাদের খুব ঠুকেচি—চিবো।

কি এ?

সিদ্ধি।

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া কহিলাম, সিদ্ধি? এ আমি খাইনে।

সে ততোধিক বিস্মিত হইয়া কহিল, খাস্‌নে? কোথাকার গাধা রে। বেশ নেশা হবে—চিবো! চিবিয়ে গিলে ফ্যাল্।

নেশা জিনিসটার মাধুর্য তখন ত আর জানি নাই! তাই ঘাড় নাড়িয়া ফিরাইয়া দিলাম। সে তাহাও নিজের মুখে দিয়া চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিল।

আচ্ছা, তা হ'লে সিগ্‌রেট খা। বলিয়া আর একটা পকেট হইতে গোটা-দুই সিগ্‌রেট ও দেশলাই বাহির করিয়া, একটি আমার হাতে দিয়া অপরটা নিজে ধরাইয়া ফেলিল। তারপরে তাহার দুই করতল বিচিত্র উপায়ে জড়ো করিয়া সেই সিগ্‌রেটটাকে কলিকার মত করিয়া টানিতে লাগিল। বাপ রে, সে কি টান! এক টানে সিগ্‌রেটের আগুন মাথা হইতে তলায় নামিয়া আসিল। চারিদিকে লোক—আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলাম। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফ্যালে?

ফেললেই বা! সবাই জানে। বলিয়া স্বচ্ছন্দে সে টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া আমার মনের উপর একটা প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।

আজ আমার সেই দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এইটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না—ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিংবা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।

তারপরে মাস খানেক গত হইয়াছে। সেদিনের রাত্রিটা যেমন গরম তেমনি অন্ধকার। কোথাও গাছের একটি পাতা পর্যন্ত নড়ে না। ছাদের উপর সবাই শুইয়া ছিলাম। বারোটা বাজে, তথাপি কাহারো চক্ষে নিদ্রা নাই। হঠাৎ কি মধুর বংশীস্বর কানে আসিয়া লাগিল। সহজ রামপ্রসাদী সুর। কত ত শুনিয়াছি, কিন্তু বাঁশিতে যে এমন মুগ্ধ করিয়া দিতে পারে, তাহা জানিতাম না। বাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড আম-কাঁটালের বাগান। ভাগের বাগান, অতএব কেহ খোঁজখবর লইত না। সমস্ত নিবিড় জঙ্গলে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। শুধু গরু-বাছুরের যাতায়াতে সেই বনের মধ্য দিয়া সরু একটা পথ পড়িয়াছিল। মনে হইল, যেন সেই বনপথেই বাঁশির সুর ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। পিসিমা উঠিয়া বসিয়া তাঁহার বড়ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, হাঁ রে নবীন, বাঁশি বাজায় কে—রায়েদের ইন্দ্র নাকি? বুঝিলাম ইঁহারা সকলেই ওই বংশীধারীকে চেনেন। বড়দা বলিলেন, সে হতভাগা ছাড়া এমন বাঁশিই বা বাজাবে কে, আর ঐ বনের মধ্যেই বা ঢুকবে কে?

বলিস্ কি রে? ও কি গোঁসাইবাগানের ভেতর দিয়ে আসচে না কি?

বড়দা বলিলেন, হুঁ।

পিসিমা এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ওই অদূরবর্তী গভীর জঙ্গলটা স্মরণ করিয়া মনে মনে বোধ করি শিহরিয়া উঠিলেন। ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, ওর মা কি বারণ করে না? গোঁসাইবাগানে কত লোক যে সাপে-কামড়ে মরেচে, তার সংখ্যা নেই—আচ্ছা, ও-জঙ্গলে এত রাত্তিরে ছোঁড়াটা কেন?

বড়দা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর কেন! ও-পাড়া থেকে এ পাড়ায় আসার এই সোজা পথ। যার ভয় নেই, প্রাণের মায়া নেই, সে কেন বড় রাস্তা ঘুরতে যাবে মা? ওর শিগ্‌গির আসা নিয়ে দরকার। তা, সে পথে নদী-নালাই থাক আর সাপখোপ বাঘ-ভালুকই থাক।

ধন্যি ছেলে! বলিয়া পিসিমা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন। বাঁশির সুর ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হইয়া আবার ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইয়া গেল।

এই সেই ইন্দ্রনাথ। সেদিন ভাবিয়াছিলাম, যদি অতখানি জোর এবং এম্‌নি করিয়া মারামারি করিতে পারিতাম! আর আজ রাত্রে যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম—যদি অম্‌নি করিয়া বাঁশি বাজাইতে পারিতাম!

কিন্তু কেমন করিয়া ভাব করি! সে যে আমার অনেক উচ্চে। তখন ইস্কুলেও সে আর পড়ে না। শুনিয়াছিলাম, হেডমাস্টার মহাশয় অবিচার করিয়া তাহার মাথায় গাধার টুপি দিবার আয়োজন করিতেই সে মর্মাহত হইয়া অকস্মাৎ হেডমাস্টারের পিঠের উপর কি একটা করিয়া ঘৃণাভরে ইস্কুলের রেলিঙ ডিঙ্গাইয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল, আর যায় নাই। অনেকদিন পরে তাহার মুখেই শুনিয়াছিলাম, সে অপরাধ অতি অকিঞ্চিৎ। হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজীর ক্লাশের মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইত। এম্‌নি এক সময়ে সে তাহার গ্রন্থিবন্ধ শিখাটি কাঁচি দিয়া কাটিয়া ছোট করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বিশেষ কিছু অনিষ্ট হয় নাই। কারণ,

পণ্ডিতজী বাড়ি গিয়া তাঁহার নিজের শিখাটি নিজের চাপকানের পকেটেই ফিরিয়া পাইয়াছিলেন—খোয়া যায় নাই। তথাপি কেন যে পণ্ডিতের রাগ পড়ে নাই, এবং হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করিয়াছিলেন—সে কথা আজ পর্যন্ত ইন্দ্র বুঝিতে পারে নাই। সেটা পারে নাই; কিন্তু এটা সে ঠিক বুঝিয়াছিল যে, ইস্কুল হইতে রেলিঙ ডিঙ্গাইয়া বাড়ি আসিবার পথ প্রস্তুত করিয়া লইলে, তথায় ফিরিয়া যাইবার পথ গেটের ভিতর দিয়া আর প্রায়ই খোলা থাকে না। কিন্তু খোলা ছিল, কি ছিল না, এ দেখিবার সখও তাহার আদৌ ছিল না। এমন কি, মাথার উপর দশ-বিশজন অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও কেহ কোনমতেই আর তাহার মুখ বিদ্যালয়ের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইল না! ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকার দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন গঙ্গায় নৌকার উপর। তাহার নিজের একখানা ছোট ডিঙি ছিল; জল নাই, ঝড় নাই, দিন নাই, রাত নাই—একা তাহারই উপর। হঠাৎ হয়ত একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা-স্রোতে পানসি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; দশ-পনর দিন আর তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না। এমনি একদিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাসিয়া যাওয়ার মুখেই তাহার সহিত আমার একান্ত-বাঞ্ছিত মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল। তাই এত কথা আমার বলা।

কিন্তু যাহারা আমাকে জানে, তাহারা বলিবে, তোমার ত এ সাজে নাই বাপু! গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখিতে গ্রাম ছাড়িয়া পরের বাড়িতে আসিয়াছিলে—তাহার সহিত তুমি মিশিলেই বা কেন, এবং মিশিবার জন্য এত ব্যাকুল হইলেই বা কেন? তা না হইলে ত আজ তোমার—

থাক্ থাক্, আর বলিয়া কাজ নাই। সহস্র লোক এ কথা আমাকে লক্ষ বার বলিয়াছে, নিজেকে নিজে আমি এ প্রশ্ন কোটিবার করিয়াছি। কিন্তু সব মিছে। কেন যে—এ জবাব তোমরাও দিতে পারিবে না; এবং না হইলে আজ আমি কি হইতে পারিতাম, সে প্রশ্ন সমাধান করিতেও কেহ তোমরা পারিবে না। যিনি সব জানেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন—কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই একটা হতভাগার প্রতিই আমার সমস্ত মন-প্রাণটা পড়িয়া থাকিত, এবং কেন সেই মন্দের সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার দেহের প্রতি কণাটি পর্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘনমেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক্ গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। সকাল সকাল খাইয়া লইয়া আমরা কয় ভাই নিত্য প্রথামত বাইরে বৈঠকখানার ঢালা-বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশায় ক্যাম্বিশের খাটের উপর শুইয়া তাঁহার সান্ধ্যতন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন, এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্‌চায আফিং খাইয়া, অন্ধকারে চোখ বুজিয়া, থেলো হুঁকায় ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শুনা যাইতেছে, এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই, মেজদা'র কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভ্যাস করিতেছি। ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার-দুই এন্ট্রান্স ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে একমুহূর্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না। আমাদের পড়ার সময় ছিল সাড়ে সাতটা হইতে নয়টা। এই সময়টুকুর মধ্যে কথাবার্তা কহিয়া মেজদা'র 'পাশের পড়া'র বিঘ্ন না করি, এই জন্য তিনি নিজে প্রত্যহ পড়িতে বসিয়াই কাঁচি দিয়া কাগজ কাটিয়া বিশ-ত্রিশখানি টিকিটের মত করিতেন। তাহার কোনটাতে লেখা থাকিত 'বাইরে', কোনটাতে 'থুথুফেলা', কোনটাতে 'নাকঝাড়া', কোনটাতে 'তেষ্টা পাওয়া' ইত্যাদি। যতীনদা একটা 'নাকঝাড়া' টিকিট লইয়া মেজদা'র সুমুখে ধরিয়া দিলেন। মেজদা তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া লিখিয়া দিলেন—হুঁ—আটটা তেত্রিশ মিনিট হইতে আটটা সাড়ে চৌত্রিশ মিনিট পর্যন্ত, অর্থাৎ এই সময়টুকুর জন্য সে নাক ঝাড়িতে যাইতে পারে। ছুটি পাইয়া যতীনদা টিকিট হাতে উঠিয়া যাইতেই ছোড়দা 'থুথুফেলা' টিকিট পেশ করিলেন। মেজদা 'না' লিখিয়া দিলেন। কাজেই ছোড়দা মুখ ভারি করিয়া মিনিট দুই বসিয়া থাকিয়া 'তেষ্টা পাওয়া' আর্জি দাখিল করিয়া দিলেন। এবার মঞ্জুর হইল।

মেজদা সই করিয়া লিখিলেন—হুঁ—আটটা একচল্লিশ মিনিট হইতে আটটা সাতচল্লিশ মিনিট পর্যন্ত। পরওয়ানা লইয়া ছোড়দা হাসিমুখে বাহির হইতেই যতীনদা ফিরিয়া আসিয়া হাতের টিকিট দাখিল করিলেন। মেজদা ঘাড় দেখিয়া সময় মিলাইয়া একটা খাতা বাহির করিয়া সেই টিকিট গঁদ দিয়া আঁটিয়া রাখিলেন। সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম তাঁহার হাতের কাছেই মজুত থাকিত। সপ্তাহ পরে এই সব টিকিটের সময় ধরিয়া কৈফিয়ৎ তলব করা হইত।

এইরূপে মেজদা'র অত্যন্ত সতর্কতায় এবং সুশৃঙ্খলায় আমাদের এবং তাঁহার নিজের কাহারও এতটুকু সময় নষ্ট হইতে পাইত না। প্রত্যহ এই দেড়ঘণ্টা কাল অতিশয় বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাত্রি নয়টার সময় আমরা যখন বাড়ির ভিতরে শুইতে আসিতাম, তখন মা সরস্বতী নিশ্চয়ই ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত আমাদিগকে আগাইয়া দিয়া যাইতেন; এবং পরদিন ইস্কুলে ক্লাশের মধ্যে যে সকল সম্মান-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ঘরে ফিরিতাম, সে ত আপনারা বুঝিতেই পারিতেছেন। কিন্তু মেজদা'র দুর্ভাগ্য, তাঁহার নির্বোধ পরীক্ষকগুলা তাঁহাকে কোনদিন চিনিতেই পারিল না। নিজের এবং পরের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি এরূপ প্রবল অনুরাগ, সময়ের মূল্য সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম দায়িত্ববোধ থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাকে বারংবার ফেল করিয়াই দিতে লাগিল। ইহাই অদৃষ্টের অন্ধ বিচার। যাক—এখন আর সে দুঃখ জানাইয়া কি হইবে।

সে রাত্রেও ঘরের বাহিরে ঐ জমাট অন্ধকার এবং বারান্দায় তন্দ্রাভিভূত সেই দুটো বুড়ো। ভিতরে মৃদু দীপালোকের সম্মুখে গভীর-অধ্যয়নরত আমরা চারিটি প্রাণী।

ছোড়দা ফিরিয়া আসায় তৃষ্ণায় আমার একেবারে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কাজেই টিকিট পেশ করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম। মেজদা তাঁহার সেই টিকিট-আঁটা খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—তৃষ্ণা পাওয়াটা আমার আইনসঙ্গত কি না, অর্থাৎ কাল-পরশু কি পরিমাণে জল খাইয়াছিলাম।

অকস্মাৎ আমার ঠিক পিঠের কাছে একটা 'হুম্' শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোড়দা ও যতীনদার সমবেত আর্তকণ্ঠের গগনভেদী রৈ-রৈ চীৎকার—ওরে বাবা রে, খেয়ে ফেল্লে রে! কিসে ইহাদিগকে খাইয়া ফেলিল, আমি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিবার পূর্বেই, মেজদা মুখ তুলিয়া একটা বিকট শব্দ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে তাঁহার দুই-পা সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া সেজ উল্টাইয়া দিলেন। তখন সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। মেজদা'র ছিল ফিটের ব্যামো। তিনি সেই যে 'আঁ-আঁ' করিয়া প্রদীপ উল্টাইয়া চিৎ হইয়া পড়িলেন, আর খাড়া হইলেন না।

ঠেলাঠেলি করিয়া বাহির হইতেই দেখি, পিসেমশাই তাঁর দুই ছেলেকে বগলে চাপিয়া ধরিয়া তাহাদের অপেক্ষাও তেজে চেঁচাইয়া বাড়ি ফাটাইয়া ফেলিতেছেন। এ যেন তিন বাপ-ব্যাটার কে কতখানি হাঁ করিতে পারে, তারই লড়াই চলিতেছে।

এই সুযোগে একটা চোর নাকি ছুটিয়া পলাইতেছিল, দেউড়ির সিপাহীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। পিসেমশাই প্রচণ্ড চীৎকারে হুকুম দিতেছেন—আউর মারো—শালাকো মার ডালো ইত্যাদি।

মুহূর্তকাল মধ্যে আলোয়, চাকর-বাকরে ও পাশের লোকজনে উঠান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দরওয়ানরা চোরকে মারিতে মারিতে আধমরা করিয়া টানিয়া আলোর সম্মুখে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। তখন চোরের মুখ দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মুখ শুকাইয়া গেল!—আরে, এ যে ভট্চাযিমশাই।

তখন কেহ বা জল, কেহ বা পাখার বাতাস, কেহ বা তাঁহার চোখে মুখে হাত বুলাইয়া দেয়। ওদিকে ঘরের ভিতরে মেজদাকে লইয়া সেই ব্যাপার!

পাখার বাতাস ও জলের ঝাপটা খাইয়া রামকমল প্রকৃতিস্থ হইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সবাই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনি অমন করে ছুটছিলেন কেন? ভট্চাযিমশাই কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, বাবা, বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলো।

ছোড়দা ও যতীনদা বারংবার কহিতে লাগিল, ভালুক নয় বাবা, একটা নেকড়ে বাঘ। হুম্ ক'রে ল্যাজ গুটিয়ে পাপোশের উপর বসেছিল।

মেজদা'র চৈতন্য হইলে তিনি নিমীলিতচক্ষে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, 'দি রয়েল বেঙ্গল টাইগার'।

কিন্তু কোথা সে? মেজদা'র 'দি রয়েল বেঙ্গল'ই হোক আর রামকমলের 'মস্ত ভাল্লুক'ই হোক, সে আসিলই বা কিরূপে, গেলই বা কোথায়? এতগুলো লোক যখন দেখিয়াছে, তখন সে একটা কিছু বটেই।

তখন কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা করিল না। কিন্তু সবাই লণ্ঠন লইয়া ভয়চকিত নেত্রে চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল।

অকস্মাৎ পালোয়ান কিশোরী সিং 'উহ বয়ঠা' বলিয়াই একলাফে একেবারে বারান্দার উপর। তারপর সেও এক ঠেলাঠেলি কাণ্ড। এতগুলো লোক, সবাই এক সঙ্গে বারান্দায় উঠিতে চায়, কাহারো মুহূর্ত বিলম্ব সয় না। উঠানের এক প্রান্তে একটা ডালিম গাছ ছিল, দেখা গেল, তাহারই ঝোপের মধ্যে বসিয়া একটা বৃহৎ জানোয়ার। বাঘের মতই বটে। চক্ষের পলকে বারান্দা খালি হইয়া বৈঠকখানা ভরিয়া গেল—জনপ্রাণী আর সেখানে নাই। সেই ঘরের ভিড়ের মধ্য হইতে পিসেমশায়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর আসিতে লাগিল—সড়কি লাও—বন্দুক লাও। আমাদের পাশের বাড়ির গগনবাবুদের একটা মুঙ্গেরী গাদা বন্দুক ছিল; লক্ষ্য সেই অস্ত্রটার উপর। 'লাও'ত বটে, কিন্তু আনে কে? ডালিম গাছটা যে দরজার কাছেই; এবং তাহারই মধ্যে যে বাঘ বসিয়া! হিন্দুস্থানীরা সাড়া দেয় না—তামাশা দেখিতে যাহারা বাড়ি ঢুকিয়াছিল, তাহারাও নিস্তব্ধ।

এম্‌নি বিপদের সময়ে হঠাৎ কোথা হইতে ইন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সে বোধ করি সুমুখের রাস্তা দিয়া চলিয়াছিল, হাঙ্গামা শুনিয়া বাড়ি ঢুকিয়াছে। নিমেষে শতকণ্ঠ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাঘ! বাঘ! পালিয়ে আয় রে ছোঁড়া, পালিয়ে আয়!

প্রথমটা সে থতমত খাইয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিতরে ঢুকিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই ব্যাপারটা শুনিয়া লইয়া একা নির্ভয়ে উঠানে নামিয়া গিয়া লণ্ঠন তুলিয়া বাঘ দেখিতে লাগিল।

দোতলার জানালা হইতে মেয়েরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে এই ডাকাত ছেলেটির পানে চাহিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। পিসিমা ত ভয়ে কাঁদিয়াই ফেলিলেন। নীচে ভিড়ের মধ্যে গাদাগাদি দাঁড়াইয়া হিন্দুস্থানী সিপাহীরা তাহাকে সাহস দিতে লাগিল এবং এক-একটা অস্ত্র পাইলেই নামিয়া আসে, এমন আভাসও দিল।

বেশ করিয়া দেখিয়া ইন্দ্র কহিল, দ্বারিকবাবু, এ বাঘ নয় বোধ হয়। তাহার কথাটা শেষ হইতে না হইতেই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার দুই থাবা জোড় করিয়া মানুষের গলায় কাঁদিয়া উঠিল। পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া কহিল, না বাবুমশাই, না। আমি বাঘ-ভালুক নই—ছিনাথ বউরূপী। ইন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ভট্‌চাযিমশাই খড়ম হাতে সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন—হারামজাদা! তুমি ভয় দেখাবার জায়গা পাও না?

পিসেমশাই মহাক্রোধে হুকুম দিলেন, শালাকো কান পাকাড়কে লাও!

কিশোরী সিং তাহাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিল, সুতরাং তাহারই দাবি সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া, সেই গিয়া তাহার কান ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া আনিল। ভট্‌চাযিমশাই তাহার পিঠের উপর খড়মের এক ঘা বসাইয়া দিয়া রাগের মাথায় হিন্দী বলিতে লাগিলেন, এই হারামজাদা বজ্জাতকে বাস্তে আমার গতর চূর্ণ হো গিয়া। খোট্টা শালার ব্যাটারা আমাকে যেন কিলায়কে কাঁটাল পাকায় দিয়া--

ছিনাথের বাড়ি বারাসতে। সে প্রতিবৎসর এই সময়টায় একবার করিয়া রোজগার করিতে আসে। কালও এ বাড়িতে সে নারদ সাজিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছিল।

সে একবার ভট্‌চাযিমশায়ের, একবার পিসেমশায়ের পায়ে পড়িতে লাগিল। কহিল, ছেলেরা অমন করিয়া ভয় পাইয়া প্রদীপ উল্টাইয়া মহামারী কাণ্ড বাধাইয়া তোলায় সে নিজেও ভয় পাইয়া গাছের আড়ালে গিয়া লুকাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল একটু ঠাণ্ডা হইলেই বাহির হইয়া তাহার সাজ দেখাইয়া যাইবে। কিন্তু ব্যাপার উত্তরোত্তর এমন হইয়া উঠিল যে, তাহার আর সাহসে কুলাইল না।

ছিনাথ কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল; কিন্তু পিসেমশায়ের আর রাগ পড়ে না। পিসিমা নিজে উপর হইতে কহিলেন, তোমাদের ভাগ্যি ভাল যে সত্যিকারের বাঘ-ভালুক বার হয়নি।

যে বীরপুরুষ তোমরা, আর তোমার দরওয়ানরা। ছেড়ে দাও বেচারীকে, আর দূর করে দাও দেউড়ির ঐ খোট্টাগুলোকে। একটা ছোট ছেলের যা সাহস, একবাড়ি লোকের তা নেই। পিসেমশাই কোন কথাই শুনিলেন না, বরং পিসিমার এই অভিযোগে চোখ পাকাইয়া এমন একটা ভাব ধারণ করিলেন যে, ইচ্ছা করিলেই তিনি এই সকল কথার যথেষ্ট সদুত্তর দিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের কথার উত্তর দিতে যাওয়াই পুরুষমানুষের পক্ষে অপমানকর; তাই আরও গরম হইয়া হুকুম দিলেন, উহার ল্যাজ কাটিয়া দাও। তখন, তাহার সেই রঙিন-কাপড়-জড়ানো সুদীর্ঘ খড়ের ল্যাজ কাটিয়া লইয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। পিসিমা উপর হইতে রাগ করিয়া বলিলেন, রেখে দাও। তোমার ওটা অনেক কাজে লাগবে।

ইন্দ্র আমার দিকে চাহিয়া কহিল, তুই বুঝি এই বাড়িতে থাকিস্ শ্রীকান্ত?

আমি কহিলাম, হ্যাঁ। তুমি এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্চ?

ইন্দ্র হাসিয়া কহিল, রাত্তির কোথায় রে, এই ত সন্ধ্যা। আমি যাচ্ছি আমার ডিঙিতে— মাছ ধ'রে আনতে। যাবি?

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত অন্ধকারে ডিঙিতে চড়বে?

সে আবার হাসিল। কহিল, ভয় কি রে! সেই ত মজা। তা ছাড়া অন্ধকার না হ'লে কি মাছ পাওয়া যায়? সাঁতার জানিস?

খুব জানি।

তবে আয় ভাই! বলিয়া সে আমার একটা হাত ধরিল। কহিল, আমি একলা এত স্রোতে উজোন বাইতে পারিনে—একজন কাউকে খুঁজি, যে ভয় পায় না।

আমি আর কথা কহিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া নিঃশব্দে রাস্তার উপর আসিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমটা আমার নিজেরই যেন বিশ্বাস হইল না—আমি সত্যিই এই রাত্রে নৌকায় চলিয়াছি। কারণ, যে আহ্বানে এই স্তব্ধ-নিবিড় নিশীথে এই বাড়ির সমস্ত কঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া দিয়া, একাকী বাহির হইয়া আসিয়াছি, সে যে কত বড় আকর্ষণ, তাহা তখন বিচার করিয়া দেখিবার আমার সাধ্যই ছিল না। অনতিকাল পরে গোঁসাইবাগানের সেই ভয়ঙ্কর বনপথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং ইন্দ্রকে অনুসরণ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহা অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

খাড়া কাঁকরের পাড়। মাথার উপর একটা বহু প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ মূর্তিমান অন্ধকারের মত নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই প্রায় ত্রিশ হাত নীচে সূচিভেদ্য আঁধার তলে পরিপূর্ণ বর্ষার গভীর জলস্রোত ধাক্কা খাইয়া আবর্ত রচিয়া উন্দাম হইয়া ছুটিয়াছে। দেখিলাম, সেইখানে ইন্দ্রের ক্ষুদ্র তরীখানি বাঁধা আছে। উপর হইতে মনে হইল, সেই সুতীব্র জলধারার মুখে একখানি ছোট্ট মোচার খোলা যেন নিরন্তর কেবলই আছাড় খাইয়া মরিতেছে।

আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। কিন্তু ইন্দ্র যখন উপর হইতে নীচে একগাছি রজ্জু দেখাইয়া কহিল, ডিঙির এই দড়ি ধ'রে পা টিপে টিপে নেবে যা, সাবধানে নাবিস্, পিছলে পড়ে গেলে আর তোকে খুঁজে পাওয়া যাবে না; তখন যথার্থই আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, ইহা অসম্ভব। কিন্তু তথাপি আমার ত দড়ি অবলম্বন আছে, কিন্তু তুমি?

সে কহিল, তুই নেবে গেলেই আমি দড়ি খুলে দিয়ে নাব্‌ব। ভয় নেই, আমার নেবে যাবার অনেক ঘাসের শিকড় ঝুলে আছে।

আর কথা না কহিয়া আমি দড়িতে ভর দিয়া অনেক যত্নে অনেক দুঃখে নীচে আসিয়া নৌকায় বসিলাম। তখন দড়ি খুলিয়া দিয়া ইন্দ্র ঝুলিয়া পড়িল। সে যে কি অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিল, তাহা আজও আমি জানি না। ভয়ে বুকের ভিতরটা এমনি ঢিপঢিপ করিতে লাগিল যে, তাহার পানে চাহিতেই পারিলাম না! মিনিট দুই-তিন কাল বিপুল জলধারার মত্তগর্জন ছাড়া কোনও শব্দমাত্র নাই। হঠাৎ ছোট্ট একটুখানি হাসির শব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, ইন্দ্র দুই হাত দিয়া নৌকা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া লাফাইয়া চড়িয়া বসিল। ক্ষুদ্র তরী তীব্র একটা পাক খাইয়া নক্ষত্রবেগে ভাসিয়া চলিয়া গেল।

দুই

কয়েক মুহূর্তেই ঘনান্ধকারে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ লেপিয়া একাকার হইয়া গেল। রহিল দক্ষিণ ও বামে সীমান্তরাল প্রসারিত বিপুল উন্দাম জলস্রোত এবং তাহারই উপর তীব্রগতিশীলা এই ক্ষুদ্র তরণীটি এবং কিশোরবয়স্ক দুটি বালক। প্রকৃতিদেবীর সেই অপরিমেয় গম্ভীর রূপ উপলব্ধি করিবার বয়স তাহাদের নহে, কিন্তু সে কথা আমি আজও ভুলিতে পারি নাই! বায়ুলেশহীন, নিষ্কম্প, নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ নিশীথিনীর সে যেন এক বিরাট্ কালীমূর্তি। নিবিড় কালো চুলে দ্যুলোক ও ভূলোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে, এবং সেই সূচিভেদ্য অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া করাল দংষ্ট্রারেখার ন্যায় দিগন্তবিস্তৃত এই তীব্র জলধারা হইতে কি এক প্রকারের অপরূপ স্তিমিত দ্যুতি নিষ্ঠুর চাপাহাসির মত বিচ্ছুরিত হইতেছে। আশেপাশে সম্মুখে কোথাও বা উন্মত্ত জলস্রোত গভীর তলদেশে ঘা খাইয়া উপরে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে, কোথাও বা প্রতিকূল গতি পরস্পরের সংঘাতে আবর্ত রচিয়া পাক খাইতেছে, কোথাও বা অপ্রতিহত জলপ্রবাহ পাগল হইয়া ধাইয়া চলিয়াছে।

আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোন্‌খানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার কিছুই জানি না। এই বয়সেই সে যে কত বড় পাকা মাঝি, তখন তাহা বুঝি নাই। হঠাৎ সে কথা কহিল, কি রে শ্রীকান্ত, ভয় করে?

আমি বলিলাম, নাঃ—

ইন্দ্র খুশি হইয়া কহিল, এই ত চাই—সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের! প্রত্যুত্তরে আমি একটি ছোট্ট নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলাম—পাছে সে শুনিতে পায়। কিন্তু এই গাঢ় অন্ধকার রাত্রিতে, এই জলরাশি এবং এই দুর্জয় স্রোতের সঙ্গে সাঁতার জানা, এবং না-জানার পার্থক্য যে কি, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। সেও আর কোন কথা কহিল না। বহুক্ষণ এই ভাবে চলার পরে কি একটা যেন শোনা গেল—অস্ফুট এবং ক্ষীণ; কিন্তু নৌকা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সে শব্দ স্পষ্ট এবং প্রবল হইতে লাগিল। যেন বহুদূরাগত কাহাদের ক্রুদ্ধ আহ্বান। যেন কত বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া ডিঙ্গাইয়া সে আহ্বান আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে—এমনি শ্রান্ত, অথচ বিরাম নাই, বিচ্ছেদ নাই—ক্রোধ যেন তাহাদের কমেও না বাড়েও না, থামিতেও চাহে না। মাঝে মাঝে এক-একবার ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ। জিজ্ঞাসা করিলাম, ইন্দ্র, ও কিসের আওয়াজ শোনা যায়? সে নৌকার মুখটা আর একটু সোজা করিয়া দিয়া কহিল, জলের স্রোতে ওপারের বালির পাড় ভাঙার শব্দ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কত বড় পাড়? কেমন স্রোত?

সে ভয়ানক স্রোত। ওঃ, তাইত, কাল জল হয়ে গেছে, আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। একটা পাড় ভেঙ্গে পড়লে ডিঙি সুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব। তুই দাঁড় টানতে পারিস্?

পারি।

তবে টান্।

আমি টানিতে শুরু করিলাম। ইন্দ্র কহিল, উই—উই যে কালো মত বাঁদিকে দেখা যায় ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটা খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে।

এ আবার কি কথা! সভয়ে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে! ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, আর ত পথ নেই। এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। বড় চড়ার বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাব কি ক'রে? ফিরে আসতে পারা যাবে কিন্তু যাওয়া যাবে না।

তবে মাছ চুরি ক'রে কাজ নেই ভাই, বলিয়াই আমি দাঁড় তুলিয়া ফেলিলাম। চক্ষের পলকে নৌকা পাক খাইয়া পিছাইয়া গেল। ইন্দ্র বিরক্ত হইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল—তবে এলি কেন? চল্ তোকে ফিরে রেখে আসি—কাপুরুষ! তখন চৌদ্দ পার হইয়া পনরয়

পড়িয়াছি—আমাকে কাপুরুষ? ঝপাৎ করিয়া দাঁড় জলে ফেলিয়া প্রাণপণে টান দিলাম। ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, এই ত চাই। কিন্তু আস্তে ভাই—ব্যাটারা ভারী পাজী। আমি ঝাউবনের পাশ দিয়ে মক্কাক্ষেতের ভিতর দিয়ে এমনি বার করে নিয়ে যাব যে শালারা টেরও পাবে না। একটু হাসিয়া কহিল, আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! দ্যাখ্ শ্রীকান্ত, কিছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেল্‌লে ব'লে—আর পালাবার জো নেই, তখন ঝুপ ক'রে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখবার জোটি নাই, তারপর মজা করে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁত্‌রে এপারে এসে গঙ্গার ধার ধরে বাড়ি ফিরে গেলেই বাস্! কি করবে ব্যাটারা?

চড়াটার নাম শুনিয়াছিলাম; কহিলাম, সতুয়ার চড়া ত ঘোরনালার সুমুখে, সে ত অনেক দূরে।

ইন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে কহিল, কোথায় অনেক দূর? ছ-সাত কোশও হবে না বোধ হয়। হাত ভেরে গেলে চিত হ'য়ে থাক্‌লেই হ'ল—তা ছাড়া মড়া-পোড়ানো বড় বড় গুঁড়ি কত ভেসে যাবে দেখতে পাবি।

আত্মরক্ষার যে সোজা রাস্তা সে দেখাইয়া দিল, তাহাতে প্রতিবাদের আর কিছু রহিল না। এই দিক্-চিহ্নহীন অন্ধকার নিশীথে আবর্তসংকুল গভীর তীব্র জলপ্রবাহে সাত ক্রোশ ভাসিয়া গিয়া ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। ইহার মধ্যে আর এ দিকের তীরে উঠিবার জো নাই। দশ-পনর হাত খাড়া উঁচু বালির পাড় মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে—এই দিকেই গঙ্গার ভীষণ ভাঙন ধরিয়া জলস্রোত অর্ধবৃত্তাকারে ছুটিয়া চলিয়াছে!

বস্তুটা অস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াই আমার বীরহৃদয় সংকুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ দাঁড় টানিয়া বলিলাম, কিন্তু আমাদের ডিঙির কি হবে?

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ত আমি ঠিক এমনি করেই পালিয়েছিলাম। তার পরদিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম, বললাম, নৌকা ঘাট থেকে চুরি ক'রে আর কেউ এনেছিল—আমি নয়।

তবে এ-সকল এর কল্পনা নয়—একেবারে হাতেনাতে প্রত্যক্ষ করা সত্য! ক্রমশঃ ডিঙি খাঁড়ির সম্মুখীন হইলে দেখা গেল, জেলেদের নৌকাগুলি সারি দিয়া খাঁড়ির মুখে বাঁধা আছে—মিট্ মিট্ করিয়া আলো জ্বলিতেছে। দুইটি চড়ার মধ্যবর্তী এই জলপ্রবাহটা খালের মত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। ঘুরিয়া তাহার অপর পারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সে স্থানটায় জলের বেগে অনেকগুলো মোহনার মত হইয়াছে এবং সব কয়টাকেই বুনো ঝাউগাছে একটা হইতে আর একটাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। একটার ভিতর দিয়া খানিকটা বাহিয়া গিয়াই আমরা খালের মধ্যে পড়িলাম। জেলেদের নৌকাগুলো তখন অনেকটা দূরে কালো কালো ঝোপের মত দেখাইতেছে। আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছান গেল।

ধীবর প্রভুরা খালের সিংহদ্বার আগুলিয়া আছে মনে করিয়া এ স্থানটায় পাহারা রাখে নাই। ইহাকে মায়াজাল বলে। খালে যখন জল থাকে না তখন এধার হইতে ওধার পর্যন্ত উঁচু উঁচু কাঠি শক্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়া তাহারই বহির্দিকে জাল টাঙ্গাইয়া রাখে। পরে বর্ষার জলস্রোতে বড় বড় রুই-কাৎলা ভাসিয়া আসিয়া এই কাঠিতে বাধা পাইয়া লাফাইয়া ওদিকে পড়িতে চায় এবং দড়ির জালে আবদ্ধ হইয়া থাকে।

দশ, পনর, বিশ সের রুই-কাৎলা গোটা পাঁচ-ছয় ইন্দ্র চক্ষের নিমেষে নৌকায় তুলিয়া ফেলিল। সেই বিরাটকায় মৎস্যরাজেরা তখন পুচ্ছতাড়নায় ক্ষুদ্র ডিঙিখানা যেন চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার উপক্রম করিতে লাগিল, এবং তাহার শব্দও বড় কম হইল না।

এত মাছ কি হবে ভাই?

কাজ আছে। আর না, পালাই চল্। বলিয়া সে জাল ছাড়িয়া দিল। আর দাঁড় টানিবার প্রয়োজন নাই। আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন তেমনি গোপনে আবার সেই পথেই বাহির হইতে হইবে। অনুকূল স্রোতে মিনিট দুই-তিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া হঠাৎ একস্থানে একটা দমকা মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহার এই আকস্মিক গতিপরিবর্তনে আমি চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি? কি হ'ল?

ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, চুপ! শালারা টের পেয়েছে—চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসচে—ঐ দ্যাখ্!

তাই ত বটে! প্রবল জল-তাড়নায় ছপাছপ শব্দ করিয়া চারখানা নৌকা আমাদের গিলিয়া ফেলিবার জন্য যেন কৃষ্ণকায় দৈত্যের মত ছুটিয়া আসিতেছে। ওদিকে জাল দিয়া বন্ধ, সুমুখে ইহারা। পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইবার এতটুকু স্থান নাই। এই ভুট্টা-ক্ষেতের মধ্যেই যে আত্মগোপন করা চলিবে, তাহাও সম্ভব মনে হইল না।

কি হবে ভাই? বলিতে বলিতেই অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাসে আমার কণ্ঠনালী রুদ্ধ হইয়া গেল। এই অন্ধকারে এই ফাঁদের মধ্যে খুন করিয়া এই ক্ষেতের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিলেই বা কে নিবারণ করিবে?

ইতিপূর্বে পাঁচ-ছয় দিন ইন্দ্র 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা' সপ্রমাণ করিয়া নির্বিঘ্নে প্রস্থান করিয়াছে, এতদিন ধরা পড়িয়াও পড়ে নাই, কিন্তু আজ?

সে মুখে একবার বলিল, ভয় নেই। কিন্তু গলাটা তাহার যেন কাঁপিয়া গেল। কিন্তু সে থামিল না! প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া ক্রমাগত ভিতরে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমস্ত চড়াটা জলে জলময়। তাহার উপর আট-দশ হাত দীর্ঘ ভুট্টা এবং জনারের গাছ। ভিতরে এই দুটি চোর। কোথাও জল এক বুক, কোথাও এক কোমর, কোথাও হাঁটুর অধিক নয়। উপরে নিবিড় অন্ধকার, সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে দুর্ভেদ্য জঙ্গল, পাঁকে লগি পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, নৌকা আর একহাতও অগ্রসর হয় না। পিছন হইতে জেলেদের অস্পষ্ট কথাবার্তা কানে আসিতে লাগিল। কিছু একটা সন্দেহ করিয়াই যে তাহারা আসিয়াছে এবং তখনও খুঁজিয়া ফিরিতেছে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই।

সহসা নৌকাটা একটু কাত হইয়াই সোজা হইল। চাহিয়া দেখি, আমি একাকী বসিয়া আছি, দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র? হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল, আমি নীচে।

নীচে কেন?

ডিঙি টেনে বের করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করবে?

ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়ব।

শুনিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অকস্মাৎ কিছুদূরে বনের মধ্যে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ও চেরা বাঁশের কটাকট্ শব্দে চমকাইয়া উঠিলাম। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, ও কি ভাই? সে উত্তর দিল, চাষীরা মাচার উপরে ব'সে বুনো শুয়ার তাড়াচ্ছে।

বুনো শুয়ার! কোথায় সে? ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, আমি কি দেখতে পাচ্চি যে বলব? আছেই কোথাও এইখানে। জবাব শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, কার মুখ দেখিয়া আজ প্রভাত হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রে আজই ঘরের মধ্যে বাঘের হাতে পড়িয়াছিলাম। এ জঙ্গলে যে বুনো শুয়ারের হাতে পড়িব, তাহাতে আর বিচিত্র কি? তথাপি আমি ত নৌকায় বসিয়া; কিন্তু ঐ লোকটি একবুক কাদা ও জলের মধ্যে এই বনের ভিতরে। এক পা নড়িবার চড়িবার উপায় পর্যন্ত তাহার নাই। মিনিট পনর এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম। প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার, ভুট্টাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাং' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সেদিকে ইন্দ্রের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ী শুয়ার না হইলেও বাচ্চা-টাচ্চা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, কি সাপ ভাই?

ইন্দ্র কহিল, সব রকম আছে, ঢোঁড়া, বোড়া, গোখ্রো, করেত্—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙ্গা নেই দেখচিস নে?

সে ত দেখচি। কিন্তু ভয়ে যে পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আমার কাঁটা দিয়া রহিল। সে লোকটি কিন্তু ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না, নিজের কাজ করিতে করিতে বলিতে লাগিল, কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরচে—দুটো-তিনটে ত আমার গা ঘেঁষে পালালো। এক-একটা মস্ত বড়—ঝোগুলো বোড়া-টোড়া হবে বোধ হয়। আর কামড়ালেই বা কি করব। মরতে একদিন ত হবেই ভাই! এমনি আরও কত কি সে মৃদু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিতে বলিতে চলিল, আমার কানে কতক পৌঁছিল কতক পৌঁছিল না। আমি নির্বাক-নিস্পন্দ কাঠের মত আড়ষ্ট হইয়া একস্থানে একভাবে বসিয়া রহিলাম। নিশ্বাস ফেলিতেও যেন ভয় করিতে লাগিল—ছপাং করিয়া একটা যদি নৌকার উপরেই পড়ে!

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না? তবে যে সেদিন মাঠের মধ্যে সকলে পলাইয়া গেলে, সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল! আর আজ? সমস্ত বিপদের বার্তা তন্নতন্ন করিয়া জানিয়া শুনিয়া নিঃশব্দে অকুণ্ঠিতচিত্তে এই ভয়াবহ, অতি ভীষণ মৃত্যুর মুখে নামিয়া দাঁড়াইল, একবার একটা মুখের অনুরোধও করিল না—'শ্রীকান্ত, তুই একবার নেমে যা'। সে ত জোর করিয়াই আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা টানাইতে পারিত! এ ত শুধু খেলা নয়! জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে! ঐ যে বিনা আড়ম্বরে সামান্য ভাবে বলিয়াছিল—মরতে একদিন ত হবেই—এমন সত্য কথা বলিতে কয়টা মানুষকে দেখা যায়? সে-ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু সে যাই হোক, তাহার এত বড় স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? কেমন করিয়া ভুলি, যাহার হৃদয়ের ভিতর হইতে এত বড় অযাচিত দান এতই সহজে বাহির হইয়া আসিল—সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল! তার পরে কত কাল কত সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া আজ এই বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছি। কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে, কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই! কিন্তু সে আর নাই। অকস্মাৎ একদিন যেন বুদ্বুদের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। আজ মনে পড়িয়া এই দুটো শুষ্ক চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে—কেবল একটা নিষ্ফল অভিমান হৃদয়ের তলদেশ আলোড়িত করিয়া উপরের দিকে ফেনাইয়া উঠিতেছে। সৃষ্টিকর্তা! এই অদ্ভুত অপার্থিব বস্তু কেনই বা সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবং কেনই বা তাহা এমন ব্যর্থ করিয়া প্রত্যাহার করিলে! বড় ব্যথায় আমার এই অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে—ভগবান! টাকাকড়ি, ধন-দৌলত, বিদ্যাবুদ্ধি ঢের ত তোমার অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে দিতেছ দেখিতেছি, কিন্তু এত বড় একটা মহাপ্রাণ আজ পর্যন্ত তুমিই বা কয়টা দিতে পারিলে?

যাক্ সে কথা। ক্রমশঃ ঘোর-কলকল্লোল নিকটবর্তী হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতেছিলাম, অতএব আর প্রশ্ন না করিয়াই বুঝিলাম, এই বনান্তরালেই সেই ভীষণ প্রবাহ যাহাকে অতিক্রম করিয়া স্টীমার যাইতে পারে না—তাহাই প্রধাবিত হইতেছে। বেশ অনুভব করিতেছিলাম, জলের বেগ বর্ধিত হইতেছে, এবং ধূসর ফেনপুঞ্জ বিস্তৃত বালুকারাশির ভ্রমোৎপাদন করিতেছে। ইন্দ্র আসিয়া নৌকায় উঠিল এবং বোটে হাতে করিয়া সম্মুখবর্তী উদ্দাম স্রোতের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিল। কহিল, আর ভয় নেই, বড় গাঙে এসে পড়েচি। মনে মনে কহিলাম, ভয় না থাকে ভালই। কিন্তু কিসে যে তোমার ভয় আছে, তাও ত বুঝিলাম না। পরক্ষণেই সমস্ত নৌকাটা আপাদমস্তক একবার যেন শিহরিয়া উঠিল, এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই দেখিলাম, তাহা বড় গাঙের স্রোত ধরিয়া উল্কাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

তখন ছিন্নভিন্ন মেঘের আড়ালে বোধ করি যেন চাঁদ উঠিতেছিল! কারণ, যে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা করিয়াছিলাম, সে অন্ধকার আর ছিল না। এখন অনেক দূর পর্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও দেখা যাইতেছিল। দেখিলাম, বনঝাউ এবং ভুট্টা-জনারের চড়া ডান দিকে রাখিয়া নৌকা আমাদের সোজা চলিতেই লাগিল।

তিন

বড় ঘুম পেয়েছে ইন্দ্র, বাড়ি ফিরে চল না ভাই!

ইন্দ্র একটুখানি হাসিয়া ঠিক যেন মেয়েমানুষের মত স্নেহার্দ্র কোমল স্বরে কথা কহিল। বলিল, ঘুম ত পাবার কথাই ভাই! কি করব শ্রীকান্ত, আজ একটু দেরি হবেই—অনেক কাজ রয়েছে। আচ্ছা, এক কাজ কর্ না কেন? ঐখানে একটু শুয়ে ঘুমিয়ে নে না?

আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিতে হইল না। আমি গুটিশুটি হইয়া সেই তক্তাখানির উপর শুইয়া পড়িলাম। কিন্তু ঘুম আসিল না। স্তিমিতচক্ষে চুপ করিয়া আকাশের গায়ে মেঘ ও চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখিতে লাগিলাম। ঐ ডোবে, ঐ ভাসে, আবার ডোবে, আবার ভাসে। আর কানে আসিতে লাগিল—জলস্রোতের সেই একটানা হুঙ্কার। আমার একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে। সেদিন অমন করিয়া সব ভুলিয়া মেঘ আর চাঁদের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলাম কি করিয়া? সে ত আমার তন্ময় হইয়া চাঁদ দেখিবার বয়স নয়! কিন্তু ঐ যে বুড়োরা পৃথিবীর অনেক ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া বলে যে, ওই বাহিরের চাঁদটাও কিছু না, মেঘটাও কিছু না, সব ফাঁকি—সব ফাঁকি! আসল যা কিছু, তা এই নিজের মনটা। সে যখন যাকে যা দেখায়, বিভোর হইয়া সে তখন তাই শুধু দেখে। আমারও সেই দশা। এত রকমের ভয়ঙ্কর ঘটনার ভিতর দিয়া এমন নিরাপদে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়া আমার নির্জীব মনটা তখন বোধ করি এম্‌নি-কিছু-একটা শান্ত ছবির অন্তরেই বিশ্রাম করিতে চাহিয়াছিল।

ইতিমধ্যে যে ঘণ্টা-দুই কাটিয়া গেছে, তাহা টেরও পাই নাই। হঠাৎ মনে হইল আমার, চাঁদ যেন মেঘের মধ্যে একটা লম্বা ডুবসাঁতার দিয়া একেবারে ডানদিক হইতে বাঁদিকে গিয়া মুখ বাহির করিলেন। ঘাড়টা একটু তুলিয়া দেখিলাম, নৌকা এবার ওপারে পাড়ি দিবার আয়োজন করিয়াছে। প্রশ্ন করিবার বা একটা কথা কহিবার উদ্যমও তখন বোধ করি আমার মধ্যে আর ছিল না; তাই তখনি আবার তেমনি করিয়াই শুইয়া পড়িলাম। আবার সেই দুচক্ষু ভরিয়া চাঁদের খেলা এবং দু'কান ভরিয়া স্রোতের তর্জন। বোধ করি আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল।

খস্—স্—বালুর চরে নৌকা বাধিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। এই যে এপারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। কিন্তু এ কোন্ জায়গা? বাড়ি আমাদের কত দূরে? বালুকার রাশি ভিন্ন আর কিছুই ত কোথাও দেখি না? প্রশ্ন করিবার পূর্বেই হঠাৎ নিকটেই কোথায় যেন কুকুরের কলহ শুনিতে পাইয়া আরও সোজা হইয়া বসিলাম। কাছেই লোকালয় আছে নিশ্চয়।

ইন্দ্র কহিল, একটু বোস শ্রীকান্ত; আমি এখ্খুনি ফিরে আসব—তোর কিচ্ছু ভয় নেই। এই পাড়ের ওধারেই জেলেদের বাড়ি।

সাহসের এতগুলো পরীক্ষায় পাশ করিয়া শেষে এইখানে আসিয়া ফেল করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই। এমনিই ত সর্বকালেই মানুষের মানসিক গতিবিধি বড়ই দুর্জ্ঞেয়; কিন্তু কিশোর-কিশোরীর মনের ভাব বোধ করি একেবারেই অজ্ঞেয়। তাই বোধ করি, শ্রীবৃন্দাবনের সেই দুটি কিশোর-কিশোরীর কৈশোরলীলা চিরদিনই এমন রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল। বুদ্ধি দিয়া তাহাকে ধরিতে না পারিয়া, তাহাকে কেহ কহিল ভালো, কেহ কহিল মন্দ,—কেহ নীতির, কেহ বা রুচির দোহাই পাড়িল,—আবার কেহ বা কোন কথাই শুনিল না—তর্কাতর্কির সমস্ত গণ্ডি মাড়াইয়া ডিঙ্গাইয়া বাহির হইয়া গেল। যাহারা গেল, তাহারা মজিল, পাগল হইল, নাচিয়া, কাঁদিয়া, গান গাহিয়া সব একাকার করিয়া দিয়া সংসারটাকে যেন একটা পাগলাগারদ বানাইয়া ছাড়িল। তখন যাহারা মন্দ বলিয়া গালি পাড়িল, তাহারাও কহিল, এমন রসের উৎস কিন্তু আর কোথাও নাই। যাহাদের রুচির সহিত মিশ খায় নাই, তাহারাও স্বীকার করিল, এই পাগলের দলটি ছাড়া সংসারে এমন গান কিন্তু আর কোথাও শুনিলাম না।

কিন্তু এত কাণ্ড যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঘটিল—সেই যে সর্বদিনের পুরাতন, অথচ চিরনূতন—বৃন্দাবনের বনে বনে দুটি কিশোর-কিশোরীর অপরূপ লীলা—বেদান্ত যাহার কাছে ক্ষুদ্র, মুক্তিফল যাহার তুলনায় বারীশের কাছে বারিবিন্দুর মতই তুচ্ছ—তাহার কে কবে

অন্ত খুঁজিয়া পাইল? পাইল না, পাওয়াও যায় না। তাই বলিতেছিলাম, তেমনি সেও ত আমার সেই কিশোর বয়স! যৌবনের তেজ এবং দৃঢ়তা না আসুক, তাহার দম্ভ ত তখন আসিয়া হাজির হইয়াছে! প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ত হৃদয়ে সজাগ হইয়াছে! তখন সঙ্গীর কাছে ভীরু বলিয়া কে নিজেকে প্রতিপন্ন করিতে চাহে? অতএব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, ভয় করব আবার কিসের? বেশ ত, যাও না। ইন্দ্র আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

উপরে, মাথার উপর আবার সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহু-দূরাগত সেই অবিশ্রান্ত তর্জন। আর সুমুখে সেই বালির পাড়। এটা কোন্ জায়গা, তাই ভাবিতেছি, দেখি ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা বলতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিসনে—খবরদার ব'লে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়ে যদি কেউ আসে, তবু দিবিনে—বল্‌বি, মুখে তোর ছাই দেব—ইচ্ছে হয়, নিজে তুলে নিয়ে যা। খবরদার হাতে ক'রে দিতে যাস্‌নে যেন, ঠিক আমি হলেও না,—খবরদার!

কেন ভাই?

ফিরে এসে বল্‌ব—খবরদার কিন্তু—বলিতে বলিতে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনই ছুটিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।

এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা-উপশিরা দিয়া বরফ-গলা জল বহিয়া চলিতে লাগিল। নিতান্ত শিশুটি নহি যে, তাহার ইঙ্গিতের মর্ম অনুমান করিতে পারি নাই! আমার জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যাহার তুলনায় ইহা সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের জল। কিন্তু তথাপি. এই নিশা অভিযানের রাতটায় যে ভয় অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। বোধ করি ভয়ে চৈতন্য হারাইবার ঠিক শেষ ধাপটিতে আসিয়াই পা দিয়াছিলাম। প্রতি মুহূর্তেই মনে হইতেছিল, পাড়ের ওদিক হইতে কে যেন উঁকি মারিয়া দেখিতেছে। যেমনি আড়চোখে চাই, অম্‌নি সেও যেন মাথা নীচু করে।

সময় আর কাটে না। ইন্দ্র যেন কত যুগ হইল চলিয়া গিয়াছে—আর ফিরিতেছে না।

মনে হইল, যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। পৈতাটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে শতপাকে বেষ্টন করিয়া মুখ নীচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলে বেশ বুঝিলাম, দুই-তিনজন লোক কথাবার্তা বলিতে বলিতে এইদিকেই আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং আর অপর দুইজন হিন্দুস্থানী! কিন্তু সে যাহাই হউক, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আগে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম, চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না। কারণ. এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলেবেলা হইতেই জানিতাম যে, ইহাদের ছায়া থাকে না।

আঃ—ঐ যে ছায়া! অস্পষ্ট হউক তবুও ছায়া! জগতে আমার মত সেদিন কোন মানুষ কোন বস্তু চোখে দেখিয়া কি এমন তৃপ্তি পাইয়াছে! পাক আর নাই পাক, ইহাকেই যে বলে দৃষ্টির চরম আনন্দ, এ কথা আজ আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি! যাক! যাহারা আসিল তাহারা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সহিত সেই বৃহদায়তন মাছগুলি নৌকা হইতে তুলিয়া জালের মত একপ্রকার বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ফেলিল এবং তৎপরিবর্তে ইন্দ্রের হাতে যাহা গুঁজিয়া দিল, তাহার একটা টুং করিয়া একটুখানি মৃদু মধুর শব্দ করিয়া নিজেদের পরিচয়টাও আমার কাছে সম্পূর্ণ গোপন করিয়া গেল না।

ইন্দ্র নৌকা খুলিয়া দিল, কিন্তু স্রোতে ভাসাইল না। ধার ঘেঁষিয়া প্রবাহের প্রতিকূলে লগি ঠেলিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

আমি কোন কথা কহিলাম না। কারণ আমার মন তখন তাহার বিরুদ্ধে ঘৃণায় ও কি-এক-প্রকারের অভিমানে নিবিড়ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এইমাত্র না তাহাকেই চাঁদের আলোয় ছায়া ফেলিয়া ফিরিতে দেখিয়া অধীর আনন্দে ছুটিয়া গিয়া জড়াইয়া ধরিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিলাম!

হাঁ. তা মানুষের স্বভাবই ত এই! একটুখানি দোষ পাইলে পূর্ব-মুহূর্তের সমস্তই নিঃশেষে ভুলিয়া যাইতে তাহার কতক্ষণ লাগে? ছিঃ! ছিঃ! এম্‌নি করিয়া সে টাকা সংগ্রহ

করিল। এতক্ষণ এই মাছচুরির ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে বেশ স্পষ্ট চুরির আকারে বোধ করি স্থান পায় নাই। কেননা ছেলেবেলায় টাকাকড়ি চুরিটাই শুধু যেন বাস্তবিক চুরি; আর সব —অন্যায় বটে—কিন্তু কেমন করিয়া যেন সে সব ঠিক চুরি নয়—এম্‌নিই একটা অদ্ভুত ধারণা প্রায় সকল ছেলেরই থাকে। আমারও তাই ছিল। না হইলে, এই 'টুং' শব্দটি কানে যাইবামাত্র এতক্ষণের এত বীরত্ব, এত পৌরুষ, সমস্তই একমুহূর্তে এমন শুষ্ক তৃণের মত ঝরিয়া পড়িত না। সে যদি মাছগুলা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিত, কিংবা—আর যাহাই করুক, শুধু টাকাকড়ির সহিত ইহার সংস্রব না ঘটাইত, তাহা হইলে আমাদের এই মৎস্য-সংগ্রহের অভিযানটিকে কেহ চুরি বলিলে ক্রোধে বোধ করি তাহার মাথাটাই ফাটাইয়া দিতাম এবং সে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য পাইয়াছে বসিয়াই মনে করিতাম। কিন্তু ছিঃ, ছিঃ! এ কি! এ কাজ ত জেলখানার কয়েদীরা করে!

ইন্দ্র কথা কহিল, জিজ্ঞাসা করিল, তুই একটুও ভয় পাস্‌নি, না রে শ্রীকান্ত?

আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম, না।

ইন্দ্র কহিল, কিন্তু তুই ছাড়া ওখানে আর কেউ ব'সে থাকতে পারত না, তা জানিস? তোকে আমি খুব ভালবাসি—আমার এমন বন্ধু আর একটিও নেই। আমি যখন আস্‌ব, তোকে শুধু ডেকে আন্‌ব, কেমন?

আমি জবাব দিলাম না। কিন্তু এই সময়ে তাহার মুখের উপর সদ্য মেঘমুক্ত যে চাঁদের আলোটুকু পড়িল তাহাতে মুখখানি কি যে দেখাইল, আমি এতক্ষণের সব রাগ অভিমান হঠাৎ ভুলিয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ইন্দ্র, তুমি কখনো ঐ সব দেখেচো?

কি সব?

ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?

না ভাই দেখিনি—লোকে বলে, তাই শুনেচি।

আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পারো?

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

ভয় করে না?

না। রামনাম করি। কিছুতে তারা আসতে পারে না। একটু থামিয়া কহিল, রামনাম কি সোজা রে? তুই যদি রাম নাম করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চ'লে যাস্‌, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা হ'লেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি করছে—তারা সব অন্তর্যামী কিনা!

বালুর চর শেষ হইয়া আবার কাঁকরের পাড় শুরু হইল। ওপার অপেক্ষা এপারে স্রোত অনেক কম। বরঞ্চ এইখানটায় বোধ হইল, স্রোত যেন উল্টামুখে চলিয়াছে। ইন্দ্র লগি তুলিয়া বোটে হাতে করিয়া কহিল, ঐ যে সামনে বনের মত দেখাচ্ছে, আমাদের ওর ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ঐখানে আমি একবার নেবে যাব। যাব আর আসব। কেমন?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিলাম, আচ্ছা। কারণ, 'না' বলিবার পথ ত একপ্রকার নিজেই বন্ধ করিয়া দিয়াছি। আবার ইন্দ্রও আমার নির্ভীকতা সম্বন্ধে বোধ করি নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এখান হইতে ঐ স্থানটা এমনি জঙ্গলের মত অন্ধকার দেখাইতেছিল যে, এই মাত্র রামনামের অসাধারণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও ওই অন্ধকার প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে নৌকার উপর একা বসিয়া এত রাত্রে রামনামের শক্তি-সামর্থ্য যাচাই করিয়া লইতে আমার এতটুকু প্রবৃত্তি হইল না এবং তখন হইতেই গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। সত্য বটে, মাছ আর ছিল না, সুতরাং মৎস্যপ্রার্থীর শুভাগমন না হইতে পারে; কিন্তু সকলের লোভ যে মাছেরই উপর, তাই বা কে বলিল? মানুষের ঘাড় মট্‌কাইয়া ঈষদুষ্ণ রক্তপান এবং মাংস-চর্বণের ইতিহাসও ত শোনা গিয়াছে!

অনুকূল স্রোত এবং বোটের তাড়নায় ডিঙিখানি তর্‌তর্‌ করিয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল। আরও কিছুদূর আসিতেই দক্ষিণদিকের আগ্রীবমগ্ন বনঝাউ এবং কসাড়বন মাথা তুলিয়া এই দুটি [illegible]। মানবশিশুর পানে বিস্ময়স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল এবং কেহ বা মাঝে মাঝে শিরশ্চালনে কি যেন নিষেধ জানাইতে লাগিল। বামদিকেও তাহাদেরই আত্মীয়-

পরিজনেরা সু-উচ্চ কাঁকরের পাড় সমাচ্ছন্ন করিয়া তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল এবং তেমনি করিয়া মানা করিতে লাগিল। আমি একা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের সঙ্কেত অমান্য করিতাম না। কিন্তু কর্ণধার যিনি তাঁহার কাছে বোধ করি 'রামনামে'র জোরে ইহাদের সমস্ত আবেদন-নিবেদন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া গেল। সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপই করিল না। দক্ষিণদিকের চরের বিস্তৃতিবশতঃ এ জায়গাটা একটি ছোটখাটো হ্রদের মত হইয়াছিল—শুধু উত্তরদিকের মুখ খোলা ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা ডিঙি বেঁধে উপরে উঠবার ত ঘাট নেই, তুমি যাবে কি করে?

ইন্দ্র কহিল, ঐ যে বটগাছ, ওর পাশেতেই একটা সরু ঘাট আছে।

কিছুক্ষণ হইতে কেমন একটা দুর্গন্ধ মাঝে মাঝে হাওয়ার সঙ্গে নাকে আসিয়া লাগিতেছিল। যত অগ্রসর হইতেছিলাম, ততই সেটা বাড়িতেছিল। এখন হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধটা এমন বিকট হইয়া নাকে লাগিল যে, অসহ্য বোধ হইল। নাকে কাপড় চাপা দিয়া বলিলাম, নিশ্চয় কি পচেছে, ইন্দ্র!

ইন্দ্র বলিল, মড়া। আজকাল ভয়ানক কলেরা হচ্ছে কিনা! সবাই ত পোড়াতে পারে না—মুখে একটুখানি আগুন ছুঁইয়ে ফেলে দিয়ে যায়। শিয়াল-কুকুরে খায় আর পচে। তারই অত গন্ধ।

কোন্‌খানে ফেলে দিয়ে যায় ভাই?

ঐ হোথা থেকে হেথা পর্যন্ত—সবটাই শ্মশান কিনা। যেখানে হোক ফেলে রেখে ঐ বটতলার ঘাটে চান করে বাড়ি চ'লে যায়,—আরে দূর! ভয় কি রে! ও শিয়ালে-শিয়ালে লড়াই করচে। আচ্ছা আয়, আয়, আমার কাছে এসে বোস।

আমার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না—কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া তাহার কোলের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সে ক্ষণকালের জন্য আমাকে একবার স্পর্শ করিয়া হাসিয়া কহিল, ভয় কি শ্রীকান্ত? কত রাত্তিরে একা একা আমি এই পথে যাই আসি—তিনবার রামনাম করলে কার সাধ্যি কাছে আসে?

তাহাকে স্পর্শ করিয়া দেহটাতে যেন একটু সাড়া পাইলাম—অস্ফুটে কহিলাম, না ভাই তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এখানে কোথাও নেবো না—সোজা বেরিয়ে চল।

সে আবার আমার কাঁধে হাত ঠেকাইয়া বলিল, না শ্রীকান্ত, একটিবার যেতেই হবে! এই টাকা ক'টি না দিলেই নয়—তারা পথ চেয়ে বসে আছে—আমি তিন দিন আস্‌তে পারিনি।

টাকা কাল দিয়ো না ভাই!

না ভাই, অমন কথাটি বলিস নে। আমার সঙ্গে তুইও চল্‌—কিন্তু কারুকে এ কথা বলিস নে যেন।

আমি অস্ফুটে 'না' বলিয়া তাহাকে তেম্‌নি স্পর্শ করিয়া পাথরের মত বসিয়া রহিলাম। গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাত বাড়াইয়া জল লইব, কি নড়াচড়ার কোন প্রকার চেষ্টা করিব, এ সাধ্যই আমার আর ছিল না।

গাছের ছায়ার মধ্যে আসিয়া পড়ায়, অদূরেই সেই ঘাটটি চোখে পড়িল। যেখানে আমাদের অবতরণ করিতে হইবে, তাহার উপর যে গাছপালা নাই, স্থানটি ম্লান জ্যোৎস্নালোকেও বেশ আলোকিত হইয়া আছে,—দেখিয়া অত দুঃখেও একটু আরাম বোধ করিলাম। ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এইজন্য ইন্দ্র পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিল এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয়জড়িত স্বরে 'ইস্' করিয়া উঠিল। আমিও তাহার পশ্চাতে ছিলাম, সুতরাং উভয়েই প্রায় একসময়েই সেই বস্তুটির উপর দৃষ্টিপাত করিলাম। তবে সে নীচে, আমি নৌকার উপরে।

অকালমৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই। ইহা যে কত বড় হৃদয়ভেদী ব্যথার আধার, তাহা তেমন করিয়া না দেখিলে বোধ করি দেখাই হয় না! গভীর নিশীথে চারিদিক নিবিড় স্তব্ধতায় পরিপূর্ণ—শুধু মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে শ্মশানচারী শৃগালের ক্ষুধার্ত কলহ-চীৎকার, কখন বা বৃক্ষোপবিষ্ট অর্ধসুপ্ত বৃহৎকায় পক্ষীর পক্ষতাড়নশব্দ, আর বহুদূরাগত তীব্র জলপ্রবাহের অবিশ্রাম হু-হু-হু আর্তনাদ—ইহার মধ্যে দাঁড়াইয়া উভয়েই নির্বাক, নিস্তব্ধ হইয়া, এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া

রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ছয়-সাত বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক—তাহার সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি জল হইতে তাহাকে এইমাত্র তুলিতেছিল, শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। খুব সম্ভব তিন-চারি ঘণ্টার অধিক তাহার মৃত্যু হয় নাই। ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মা অতি সন্তর্পণে তাহার সুকুমার নশ্বর দেহটিকে এইমাত্র কোল হইতে বিছানায় শোয়াইয়া দিতেছিলেন। জলে-স্থলে বিন্যস্ত এমনিভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রের দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, তুই একটু সরে দাঁড়া শ্রীকান্ত, আমি এ বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউ-বনের মধ্যে জলে রেখে আসি!

চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য; কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পরদুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া—সে ঢের বেশি কঠিন কাজ! তখন ছোট-বড় কত জায়গাতেই না টান ধরে! একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর ঘরে বশিষ্ঠ ইত্যাদির পবিত্র পূজ্য রক্তের বংশধর হইয়া জন্মিয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি, ইহাতে কতই না শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের বাঁধাবাঁধি, কতই না রকমারি কাণ্ডের ঘটা! তাহাতে এ কোন্ রোগের মড়া, কাহার ছেলে, কি জাত—কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোকরা ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কিনা, সে খবরটা পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে?

কুণ্ঠিত হইয়া যেই জিজ্ঞাসা করিলাম, কি জাতের মড়া—তুমি ছোঁবে? ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া একহাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্যহাত হাঁটুর নীচে দিয়া একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়াছিঁড়ি করে খাবে। আহা! মুখে এখনো এর ওষুধের গন্ধ পর্যন্ত রয়েচে রে! বলিয়া নৌকার যে তক্তাখানির উপর ইতিপূর্বে আমি শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই উপর শোয়াইয়া নৌকা ঠেলিয়া দিয়া নিজেও চড়িয়া বসিল। কহিল, মড়ার কি জাত থাকে রে? ,

আমি তর্ক করিলাম, কেন থাকবে না?

ইন্দ্র কহিল, আরে এ যে মড়া। মড়ার আবার জাত কি? এই যেমন আমাদের ডিঙিটা—এর কি জাত আছে? আমগাছ, জামগাছ যে কাঠেরই তৈরি হোক—এখন ডিঙি ছাড়া একে কেউ বলবে না—আমগাছ, জামগাছ—বুঝলি না? এও তেমনি।

দৃষ্টান্তটি যে নেহাৎ ছেলেমানুষের মত, এখন তাহা জানি। কিন্তু অন্তরের মধ্যে ইহাও ত অস্বীকার করিতে পারি না—কোথায় যেন অতি তীক্ষ্ন সত্য ইহারই মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে। মাঝে মাঝে এমনি খাঁটি কথা সে বলিতে পারিত। তাই আমি অনেক সময়ে ভাবিয়াছি, ওই বয়সে কাহারো কাছে কিছুমাত্র শিক্ষা না করিয়া বরং প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া এই সকল তত্ত্ব সে পাইত কোথায়? এখন কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার উত্তরটাও যেন পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। কপটতা ইন্দ্রের মধ্যে ছিলই না। উদ্দেশ্যকে গোপন রাখিয়া কোন কাজ সে করিতেই জানিত না। সেই জন্যই বোধ করি তাহার সেই হৃদয়ের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সত্য কোন অজ্ঞাত নিয়মের বশে সেই বিশ্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিখিল সত্যের দেখা পাইয়া, অনায়াসে অতি সহজেই তাহাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত! তাহার শুদ্ধ সরল বুদ্ধি পাকা ওস্তাদের উমেদারী না করিয়াই ঠিক ব্যাপারটি টের পাইত। বাস্তবিক, অকপট সহজ-বুদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি। ইহার উপরে ত কেহই নাই। ভাল করিয়া দেখিলে, মিথ্যা বলিয়া ত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চোখে পড়ে না। মিথ্যা শুধু মানুষের বুঝিবার এবং বুঝাইবার ফলটা। সোনাকে পিতল বলিয়া বুঝানও মিথ্যা, বুঝাও মিথ্যা, তাহা জানি। কিন্তু তাহাতে সোনারই বা কি, আর পিতলেরই

বা কি আসে যায়। তোমরা যাহা ইচ্ছা বুঝ না, তাহারা যা তাই ত থাকে। সোনা মনে করিয়া তাহাকে সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার সত্যকার মূল্যবৃদ্ধি হয় না, আর পিতল বলিয়া টান মারিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেও তাহার দাম কমে না। সেদিনও সে পিতল, আজও সে পিতলই। তোমার মিথ্যার জন্য তুমি ছাড়া আর কেহ দায়ীও হয় না, ভ্রূক্ষেপও করে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্তটাই পরিপূর্ণ সত্য। মিথ্যার অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে, তবে সে মনুষ্যের মন ছাড়া আর কোথাও না। সুতরাং এই অসত্যকে ইন্দ্র যখন তাহার অন্তরের মধ্যে জানিয়া হোক, না জানিয়া হোক, কোন দিন স্থান দেয় নাই, তখন তাহার বিশুদ্ধ বুদ্ধি যে মঙ্গল এবং সত্যকেই পাইবে, তাহা ত বিচিত্র নয়।

কিন্তু তাহার পক্ষে বিচিত্র না হইলেও কাহারও পক্ষেই যে বিচিত্র নয়, এমন কথা বলিতেছি না। ঠিক এই উপলক্ষে আমার নিজের জীবনেই তাহার যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা বলিবার লোভ এখানে সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এই ঘটনার দশ-বারো বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন অপরাহ্নকালে সংবাদ পাওয়া গেল যে একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও-পাড়ায় সকাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছেন—কোনমতেই তাঁহার সৎকারের লোক জুটে নাই। না জুটিবার হেতু এই যে, তিনি কাশী হইতে ফিরিবার পথে রোগগ্রস্ত হইয়া এই শহরেই রেলগাড়ি হইতে নামিয়া পড়েন এবং সামান্য পরিচয়সূত্রে যাহার বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এই দুইরাত্রি বাস করিয়া আজ সকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তিনি 'বিলাত-ফেরত' এবং সে সময়ে 'একঘরে'। ইহাই বৃদ্ধার অপরাধ যে, তাঁহাকে নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় এই 'একঘরে'র বাটীতে মরিতে হইয়াছে।

যাহা হউক, সৎকার করিয়া পরদিন সকালে ফিরিয়া আসিয়া দেখা গেল প্রত্যেকেরই বাটীর কবাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুনিতে পাওয়া গেল গতরাত্রি এগারোটা পর্যন্ত হ্যারিকেন-লণ্ঠন হাতে সমাজপতিরা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, এবং স্থির করিয়া দিয়াছেন যে এই অত্যন্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপকর্ম (দাহ) করার জন্য এই কুলাঙ্গারদিগকে কেশচ্ছেদ করিতে হইবে, 'ঘাট' মানিতে হইবে, এবং এমন একটা বস্তু সর্বসমক্ষে ভোজন করিতে হইবে, যাহা সুপবিত্র হইলেও খাদ্য নয়! তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া প্রতি বাড়িতেই বলিয়া দিয়াছেন যে ইহাতে তাঁহাদের কোনই হাত নাই; কারণ জীবিত থাকিতে তাঁহারা অশাস্ত্রীয় কাজ সমাজের মধ্যে কিছুতেই ঘটিতে দিতে পারিবেন না। আমরা অনন্যোপায় হইয়া ডাক্তারবাবুর শরণাপন্ন হইলাম। তিনিই তখন শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এবং বিনা দক্ষিণায় বাঙ্গালীর বাটীতে চিকিৎসা করিতেন। আমাদের কাহিনী শুনিয়া ডাক্তারবাবু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া প্রকাশ করিলেন, যাঁহারা এইরূপ নির্যাতন করিতেছেন তাঁহাদের বাটীর কেহ চোখের সম্মুখে বিনা চিকিৎসায় মরিয়া গেলেও তিনি সেদিকে আর চাহিয়া দেখিবেন না। কে এই কথা তাঁহাদের গোচর করিল, জানি না। দিবা অবসান না হইতেই শুনিলাম, কেশচ্ছেদের আবশ্যকতা নাই, শুধু 'ঘাট' মানিয়া সেই সুপবিত্র পদার্থটা ভক্ষণ করিলেই হইবে। আমরা স্বীকার না করায় পরদিন প্রাতঃকালে শুনিলাম, 'ঘাট' মানিলেই হইবে—ওটা না হয় নাই খাইলাম। ইহাও অস্বীকার করায় শোনা গেল, আমাদের এই প্রথম অপরাধ বলিয়া তাঁহারা এমনিই মার্জনা করিয়াছেন—প্রায়শ্চিত্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ডাক্তারবাবু কহিলেন, প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা যে এই দুটা দিন ইহাদিগকে ক্লেশ দিয়াছেন সেইজন্য যদি প্রত্যেকে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না যান, তাহা হইলে তাঁহার যে কথা সেই কাজ; অর্থাৎ কাহারও বাটীতে যাইবেন না। তারপর সেই সন্ধ্যাবেলাতেই ডাক্তারবাবুর বাটীতে একে একে বৃদ্ধ সমাজপতিদিগের শুভাগমন হইয়াছিল। আশীর্বাদ করিয়া তাঁহারা কি কি বলিয়াছিলেন, তাহা অবশ্য শুনিতে পাই নাই; কিন্তু পরদিন ডাক্তারবাবুর আর ক্রোধ ছিল না, আমাদিগকে ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়ই নাই।

যাক, কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। কিন্তু সে যাই হউক, আমি নিশ্চয় জানি—যাঁহারা জানেন তাঁহারা এই নামধামহীন বিবরণটির মধ্যে সমস্ত সত্যটাই উপলব্ধি করিবেন। আমার বলিবার মূল বিষয়টি এই যে, ইন্দ্র ঐ বয়সে নিজের অন্তরের মধ্যে যে সত্যটির সাক্ষাৎ পাইয়াছিল, অত বড় বড় সমাজপতিরা অতটা প্রাচীন বয়স পর্যন্ত তাহার কোন তত্ত্বই পান নাই; এবং ডাক্তারবাবু সেদিন অমন করিয়া তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের চিকিৎসা না

করিয়া দিলে, কোনদিন এ ব্যাধি তাঁহাদের আরোগ্য হইত কি না তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

চড়ার উপর আসিয়া অর্ধমগ্ন বনঝাউয়ের অন্ধকারের মধ্যে জলের উপর সেই অপরিচিত শিশুদেহটিকে ইন্দ্র যখন অপূর্ব মমতার সহিত রাখিয়া দিল তখন রাত্রি আর বড় বাকী নাই। কিছুক্ষণ ধরিয়া সে সেই শবের পানে মাথা ঝুঁকাইয়া থাকিয়া অবশেষে যখন মুখ তুলিয়া চাহিল তখন অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহার মুখের যতটুকু দেখা গেল, তাহাতে—অত্যন্ত ম্লান এবং উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিলে যেরূপ দেখায়, তাহার শুষ্কমুখে ঠিক সেই ভাব প্রকাশ পাইল।

আমি বলিলাম, ইন্দ্র, এইবার চল।

ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে কহিল, কোথায়?

এই যে বললে, কোথায় যাবে?

থাক—আজ আর না।

আমি খুশি হইয়া কহিলাম, বেশ, তাই ভাল ভাই—চল বাড়ি যাই।

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, হাঁ রে শ্রীকান্ত, মরলে মানুষ কি হয়, তুই জানিস?

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, না ভাই জানিনে; তুমি বাড়ি চল। তারা সব স্বর্গে যায় ভাই! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে বাড়ি রেখে এস।

ইন্দ্র যেন কর্ণপাতই করিল না। কহিল, সবাই ত স্বর্গে যেতে পায় না। তা ছাড়া খানিকক্ষণ সবাইকেই এখানে থাকতে হয়। দ্যাখ্, আমি যখন ওকে জলের উপর শুইয়ে দিচ্ছিলুম, তখন সে চুপি চুপি স্পষ্ট বললে, ভেইয়া।

আমি কম্পিতকণ্ঠে কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিলাম, কেন ভয় দেখাচ্ছ ভাই, আমি অজ্ঞান হয়ে যাবো। ইন্দ্র কথা কহিল না, অভয় দিল না, ধীরে ধীরে বোটে হাতে করিয়া নৌকা ঝাউবন হইতে বাহির করিয়া ফেলিল এবং সোজা বাহিতে লাগিল। মিনিট-দুই নিঃশব্দে থাকিয়া গম্ভীর মৃদুস্বরে কহিল, শ্রীকান্ত, মনে মনে রামনাম কর, সে নৌকা ছেড়ে যায়নি—আমার পেছনেই ব'সে আছে।

তারপর সেইখানেই মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়াছিলাম। আর আমার মনে নাই। যখন চোখ চাহিলাম তখন অন্ধকার নাই—নৌকা কিনারায় লাগানো। ইন্দ্র আমার পায়ের কাছে বসিয়াছিল; কহিল, এইটুকু হেঁটে যেতে হবে শ্রীকান্ত, উঠে বোস।

চার

পা আর চলে না—এমনি করিয়া গঙ্গার ধারে ধারে চলিয়া সকালবেলা রক্তচক্ষু ও একান্ত শুষ্ক ম্লানমুখে বাটী ফিরিয়া আসিলাম। একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। এই যে! এই যে! করিয়া সবাই সমস্বরে এমনি অভ্যর্থনা করিয়া উঠিল যে, আমার হৃৎপিণ্ড থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

যতীনদা প্রায় আমার সমবয়সী। অতএব তাহার আনন্দটাই সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া উন্মত্ত চীৎকার শব্দে—এসেচে শ্রীকান্ত—এই এল, মেজদা! বলিয়া বাড়ি ফাটাইয়া আমার আগমন-বার্তা ঘোষণা করিয়া দিল, এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া পরম সমাদরে আমার হাতটি ধরিয়া টানিয়া আনিয়া বৈঠকখানার পাপোশের উপর দাঁড় করাইয়া দিল।

সেখানে মেজদা গভীর মনোযোগের সহিত 'পাশের পড়া' পড়িতেছিলেন। মুখ তুলিয়া একটিবার মাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন। অর্থাৎ বাঘ শিকার হস্তগত করিয়া নিরাপদে বসিয়া যেরূপ অবহেলার সহিত অন্যদিকে চাহিয়া থাকে, তাঁহারও সেই ভাব। শাস্তি দিবার এত বড় মাহেন্দ্রযোগ তাঁহার ভাগ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ।

মিনিটখানেক চুপচাপ। সারারাত্রি বাহিরে কাটাইয়া গেলে কর্ণযুগল ও উভয় গণ্ডের

উপর যে-সকল ঘটনা ঘটিবে তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আর যে দাঁড়াইতে পারি না! অথচ কর্মকর্তারও ফুরসৎ নাই। তাঁহারও যে আবার 'পাশের পড়া'!

আমাদের এই মেজদাদাটিকে আপনারা বোধ করি এত শীঘ্র বিস্মৃত হন নাই। সেই, যাঁহার কঠোর তত্ত্বাবধানে কাল সন্ধ্যাকালে আমরা পাঠাভ্যাস করিতেছিলাম, এবং ক্ষণেক পরেই যাঁহার সুগম্ভীর 'ওঁ-ওঁ' রবে ও সেজ উল্টানোর চোটে গত রাত্রির সেই 'দি রয়েল বেঙ্গল'কেও দিশাহারা হইয়া একেবারে ডালিমতলায় ছুটিয়া পালাইতে হইয়াছিল—সেই তিনি।

পাঁজিটা একবার দেখ্ দেখি রে সতীশ, এ বেলা আবার বেগুন খেতে আছে না কি; বলিতে বলিতে পাশের দ্বার ঠেলিয়া পিসিমা ঘরে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন—কখন এলি রে? কোথায় গিয়েছিলি? ধন্যি ছেলে বাবা তুমি—সারা রাত্রিটা ঘুমুতে পারিনি—ভেবে মরি, সেই যে ইন্দ্রের সঙ্গে চুপিচুপি বেরিয়ে গেল—আর দেখা নেই। না খাওয়া, না দাওয়া; কোথা ছিলি বল্ ত হতভাগা? মুখ কালিবর্ণ, চোখ রাঙ্গা—ছল্‌ছল্ করছে, বলি জ্বরটর হয়নি ত? কই, কাছে আয় ত, গা দেখি—একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করিয়া পিসিমা নিজেই আগাইয়া আসিয়া আমার কপালে হাত দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, যা ভেবেচি তাই। এই যে বেশ গা গরম হয়েচে। এমন সব ছেলের হাত-পা বেঁধে জলবিছুটি দিলে তবে আমার রাগ যায়। তোমাকে বাড়ি থেকে একেবারে বিদেয় ক'রে তবে আমার আর কাজ। চল্ ঘরে গিয়ে শুবি, আয় হতভাগা ছোঁড়া। বলিয়া তিনি বার্তাকু-ভক্ষণের প্রশ্ন বিস্মৃত হইয়া আমার হাত ধরিয়া কোলের কাছে টানিয়া লইলেন।

মেজদা জলদগম্ভীরকণ্ঠে সংক্ষেপে কহিলেন, এখন ও যেতে পারবে না।

কেন, কি করবে ও? না না, এখন আর পড়তে হবে না। আগে যা হোক দুটো মুখে দিয়ে একটু ঘুমোক। আয় আমার সঙ্গে, বলিয়া পিসিমা আমাকে লইয়া চলিবার উপক্রম করিলেন।

কিন্তু শিকার যে হাতছাড়া হয়। মেজদা স্থান-কাল ভুলিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন—খবরদার! যাস্‌নে বলচি শ্রীকান্ত।

পিসিমা পর্যন্ত যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। তারপরে মুখ ফিরাইয়া মেজদার প্রতি চাহিয়া শুধু কহিলেন, সতে! পিসিমা অত্যন্ত রাশভারী লোক। বাড়িসুদ্ধ সবাই তাঁহাকে ভয় করিত। মেজদা সে চাহনির সম্মুখে ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া উঠিল। আবার পাশের ঘরেই বড়দা বসেন। কথাটা তাঁর কানে গেলে আর রক্ষা থাকিত না।

পিসিমার একটা স্বভাব আমরা চিরদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; কখনও, কোন কারণেই, তিনি চেঁচামেচি করিয়া লোক জড় করিয়া তুলিতে ভালবাসিতেন না। হাজার রাগ হইলেও তিনি জোরে কথা বলিতেন না। তিনি কহিলেন, তাই বুঝি ও দাঁড়িয়ে এখানে? দেখ্ সতীশ, যখন তখন শুনি, তুই ছেলেদের মারধোর করিস্। আজ থেকে কারো গায়ে যদি তুই হাত দিস্ আমি জান্‌তে পারি, এই থামে বেঁধে চাকর দিয়ে তোকে আমি বেত দেওয়াব! বেহায়া, নিজে ফি বছর ফেল হচ্চে—ও আবার যায় পরকে শাসন করতে! কেউ পড়ুক, না পড়ুক, কারুকে তুই জিজ্ঞেসা পর্যন্ত কর্‌তে পাবিনে—বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথে বাহির হইয়া গেলেন। মেজদা মুখ কালি করিয়া বসিয়া রহিল। এ আদেশ অবহেলা করিবার সাধ্য বাড়িতে কাহারো নাই—সে কথা মেজদা ভাল করিয়াই জানিত।

আমাকে সঙ্গে করিয়া পিসিমা তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে আনিয়া কাপড় ছাড়াইয়া দিলেন এবং পেট ভরিয়া গরম গরম জিলাপি আহার করাইয়া বিছানার শোয়াইয়া দিয়া—আমি মরিলেই তাঁর হাড় জুড়ায়—এই কথা জানাইয়া দিয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মিনিট-পাঁচেক পরেই খুট্ করিয়া সাবধানে শিকল খুলিয়া ছোড়দা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া আমার বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িল। আনন্দের আতিশয্যে প্রথমটা সে কথা কহিতেই পারিল না। একটুখানি দম লইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, মেজদাকে মা কি হুকুম দিয়েচে জানিস? আমাদের কোন কথায় তার থাকবার জো-টি নেই। তুই, আমি, যতে একঘরে পড়ব—মেজদা অন্য ঘরে পড়বে। আমাদের পুরানো পড়া বড়দা দেখবেন! ওকে

আমরা আর কেয়ার কর্‌ব না। বলিয়া সে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ একত্র করিয়া সবেগে আন্দোলিত করিয়া দিল।

যতীনদাও পিছনে পিছনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। সে তাহার কৃতিত্বের উত্তেজনায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল এবং ছোটদাকে এই শুভ সংবাদ দিয়া সে-ই এখানে আনিয়াছিল। প্রথমে সে খুব খানিকটা হাসিয়া লইল। হাসি থামিলে নিজের বুকে বারংবার করাঘাত করিয়া কহিল, আমি! আমি! আমার জন্যেই হ'ল তা জানো? ওকে আমি মেজদার কাছে না নিয়ে গেলে কি মা হুকুম দিত! ছোড়দা, তোমার কলের লাট্টুটা কিন্তু আমাকে দিতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

আচ্ছা দিলুম। নিগে যা আমার ডেস্ক থেকে, বলিয়া ছোড়দা তৎক্ষণাৎ হুকুম দিয়া ফেলিল। কিন্তু এই লাট্টুটা বোধ করি সে ঘণ্টাখানেক পূর্বে পৃথিবীর বিনিময়েও দিতে পারিত না।

এমনিই মানুষের স্বাধীনতার মূল্য। এমনিই মানুষের ব্যক্তিগত ন্যায্য অধিকার লাভ করার আনন্দ। আজ আমার কেবলই মনে হইতেছে—শিশুদের কাছেও তাহার দুর্মূল্যতা একবিন্দু কম নয়! মেজদা তাহার অগ্রজের অধিকারে স্বেচ্ছাচারে ছোটদের যে সমস্ত অধিকার গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল, তাহাকেই ফিরিয়া পাইবার সৌভাগ্যে ছোড়দা তাহার প্রাণতুল্য প্রিয়-বস্তুটিকেও অসঙ্কোচে হাতছাড়া করিয়া ফেলিল। বস্তুতঃ মেজদার অত্যাচারের আর সীমা ছিল না; রবিবারে দুপুরে রৌদ্রে এক মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া তাঁহার তাস খেলার বন্ধু ডাকিয়া আনিতে হইত। গ্রীষ্মের ছুটির দিনে তাঁহার দিবানিদ্রার সমস্ত সময়টা পাখার বাতাস করিতে হইত। শীতের রাত্রে তিনি লেপের মধ্যে হাত-পা ঢুকাইয়া কচ্ছপের মত বসিয়া বই পড়িতেন, আর আমাদিগকে কাছে বসিয়া তাঁহার বহির পাতা উল্টাইয়া দিতে হইত—এমনি সমস্ত অত্যাচার! অথচ 'না' বলিবার জো নাই, কাহারও কাছে অভিযোগ করিবার সাধ্য পর্যন্ত নাই। ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেও তৎক্ষণাৎ হুকুম করিয়া বসিতেন, কেশব, তোমার জিয়োগ্রাফি আনো, পুরানো পড়া দেখি। যতীন যাও, একটা ভাল দেখে ঝাউয়ের ছড়ি ভেঙে আনো। অর্থাৎ প্রহার অনিবার্য। অতএব আনন্দের মাত্রাও যে ইহাদের বাড়াবাড়িতে গিয়া পড়িবে, ইহাও আশ্চর্যের বিষয় নয়।

কিন্তু সে যতই হউক, আপাততঃ তাহাকে স্থগিত রাখা আবশ্যক, কারণ স্কুলের সময় হইতেছে। আমার জ্বর—সুতরাং কোথাও যাইতে হইবে না।

মনে পড়ে সেই রাত্রেই জ্বরটা প্রবল হইয়াছিল এবং সাত-আট দিন পর্যন্ত শয্যাগত ছিলাম।

৬ তার কতদিন পরে স্কুলে গিয়েছিলাম এবং আরও যে কতদিন পরে ইন্দ্রের সহিত আবার দেখা হইয়াছিল, তাহা মনে নাই। কিন্তু সেটা যে অনেক দিন পরে, এ কথা মনে আছে। সেদিন শনিবার। স্কুল হইতে সকাল সকাল ফিরিয়াছি। গঙ্গার তখন জল মরিতে শুরু করিয়াছে। তাহারই সংলগ্ন একটা নালার ধারে বসিয়া, ছিপ দিয়া ট্যাঙরা মাছ ধরিতে বসিয়া গিয়াছি। অনেকেই ধরিতেছে। হঠাৎ চোখ পড়িল কে একজন অদূরে একটা শর-ঝাড়ের আড়ালে বসিয়া টপাটপ মাছ ধরিতেছে। লোকটিকে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু তাহার মাছধরা দেখা যায়। অনেকক্ষণ হইতেই আমার এ জায়গাটা পছন্দ হইতেছিল না। মনে করিলাম, উহারই পাশে গিয়া বসি। ছিপ হাতে করিয়া একটুখানি ঘুরিয়া দাঁড়াইবামাত্র সে কহিল, আমার ডানদিকে বোস্। ভাল আছিস ত রে শ্রীকান্ত? বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। তখনও তাহার মুখ দেখিতে পাই নাই; কিন্তু বুঝিলাম, এ ইন্দ্র। দেহের ভিতর দিয়া বিদ্যুতের তীব্র প্রবাহ বহিয়া গেলে যে যেখানে আছে এক মুহূর্তে যেমন সজাগ হইয়া উঠে, ইহার কণ্ঠস্বরেও আমার সেই দশা হইল! চক্ষের পলকে সর্বাঙ্গের রক্ত চঞ্চল, উদ্দাম হইয়া বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। কোনমতেই মুখ দিয়া একটা জবাব বাহির হইল না। এই কথাগুলি লিখিলাম বটে, কিন্তু জিনিসটা ভাষায় ব্যক্ত করিয়া পরকে বুঝানো শুধুই যে অত্যন্ত কঠিন, তা নয়, বোধ করি বা অসাধ্য। কারণ বলিতে গেলে, এই সমস্ত বহু-ব্যবহৃত মামুলি বাক্য-রাশি—যেমন বুকের রক্ত তোলপাড় করা—উদ্দাম চঞ্চল হইয়া আছাড় খাওয়া—তড়িৎ প্রবাহ বহিয়া যাওয়া—এই সব ছাড়া ত আর পথ নাই! কিন্তু কতটুকু ইহাতে বুঝাইল? যে জানে না,

তাহার কাছে আমার মনের কথা কতটুকু প্রকাশ পাইল! আমিই বা কি করিয়া তাহাকে জানাইব, এবং সেই বা কি করিয়া তাহা জানিবে? যে নিজের জীবনে একটি দিনের তরেও অনুভব করে নাই, যাহাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করিয়াছি, কামনা করিয়াছি, আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, অথচ পাছে কোথাও কোনরূপে দেখা হইয়া পড়ে এই ভয়েও অহরহ কাঁটা হইয়া আছি, সে এমনি অকস্মাৎ, এতই অভাবনীয়রূপে আমার চোখের উপর থাকিয়া আমাকে পার্শ্বে আসিয়া বসিতে অনুরোধ করিল! পাশে গিয়াও বসিলাম। কিন্তু তখনও কথা কহিতে পারিলাম না।

ইন্দ্র কহিল, সেদিন ফিরে এসে বড় মার খেয়েছিলি—না রে শ্রীকান্ত! আমি তোকে নিয়ে গিয়ে ভাল কাজ করিনি। আমার সেজন্যে রোজ বড় দুঃখ হয়। আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, মার খাই নাই।' ইন্দ্র খুশি হইয়া বলিল, খাস্‌নি! দেখ্ রে শ্রীকান্ত, তুই চলে গেলে আমি মা কালীকে অনেক ডেকেছিলুম—যেন তোকে কেউ না মারে। কালীঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতা রে! মন দিয়ে ডাক্‌লে কখনো কেউ মারতে পারে না। মা এসে তাদের এম্‌নি ভুলিয়ে দেন যে, কেউ কিছু করতে পারে না।' বলিয়া সে ছিপটা রাখিয়া দুই হাত জোড় করিয়া, কপালে ঠেকাইয়া বোধ করি তাঁকেই মনে মনে প্রণাম করিল। ব'ড়শিতে একটা টোপ দিয়া সেটা জলে ফেলিয়া বলিল, আমি ত ভাবিনি তোর জ্বর হবে; তা হ'লে সেও হ'তে দিতুম না।

আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলাম, কি করতে তুমি? ইন্দ্র কহিল, কিছুই না। শুধু জবাফুল তুলে এনে মা কালীর পায়ে দিতুম। উনি জবাফুল বড় ভালবাসেন। যে যা ব'লে দেয় তার তাই হয়।' এ ত সবাই জানে। তুই জানিস নে? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার অসুখ করেনি? ইন্দ্র আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার? আমার কখ্‌খনো অসুখ করে না। কখনো কিছু হয় না। হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, দেখ্ শ্রীকান্ত, আমি তোকে একটা জিনিস শিখিয়ে দেব। যদি তুই দুবেলা খুব মন দিয়ে ঠাকুরদেবতার নাম করিস্—তাঁরা সব সামনে এসে দাঁড়াবেন, তুই স্পষ্ট দেখতে পাবি। তখন আর তোর কোন অসুখ করবে না। কেউ তোর একগাছি চুল পর্যন্ত ছুঁতে পারবে না—তুই আপনি টের পাবি। আমার মতন যেখানে খুশি যা, যা খুশি কর্, কোন ভাবনা নেই। বুঝলি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হুঁ। ব'ড়শিতে টোপ দিয়া জলে ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন তুমি কাকে নিয়ে সেখানে যাও?'

কোথায়?

ওপারে মাছ ধরতে?

ইন্দ্র ছিপটা তুলিয়া লইয়া সাবধানে পাশে রাখিয়া বলিল, আমি আর যাইনে। তাহার কথা শুনিয়া ভারি আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, আর এক দিনও যাওনি?

না, একদিনও না। আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে—কথাটা ইন্দ্র শেষ না করিয়াই ঠিক যেন থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল।

উহার সম্বন্ধে এই কথাই আমাকে অহরহ খোঁচার মত বিঁধিয়াছে। কোন মতেই সেই সেদিনের মাছ-বিক্রিটা ভুলিতে পারি নাই। তাই সে যদি বা চুপ করিয়া গেল, আমি পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে মাথার দিব্যি দিলে ভাই? তোমার মা?

না, মা নয়। বলিয়া ইন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তার পরে সে ছিপের গায়ে সুতাটা ধীরে ধীরে জড়াইতে জড়াইতে কহিল, শ্রীকান্ত, আমাদের সে রাত্রির কথা তুই বাড়িতে বলে দিস্‌নি?

আমি বলিলাম, না। কিন্তু তোমার সঙ্গে চ'লে গিয়েছিলাম তা সবাই জানে।'

ইন্দ্র আর কোন প্রশ্ন করিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম, এইবার সে উঠিবে, কিন্তু, তাহাও করিল না—চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মুখে সর্বদাই কেমন একটা হাসির ভাব থাকে, এখন তাহাও নাই, এবং কি-একটা সে যেন আমাকে বলিতে চায়, অথচ তাহাও পারিতেছে না, বলিয়া উঠিতেও পারিতেছে না—বসিয়া থাকিতেও যেন অস্বস্তি বোধ করিতেছে।' আপনারা পাঁচজন এখানে হয়ত বলিয়া বসিবেন, এটি বাপু তোমার কিন্তু মিছে কথা। অতখানি মনস্তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার বয়সটা ত তা' নয়। আমিও তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আপনারাও এ কথাটা ভুলিতেছেন যে, আমি ইন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিলাম। একজন আর একজনের মন বুঝে সহানুভূতি এবং ভালবাসা দিয়া—বয়স এবং বুদ্ধি দিয়া নয়। সংসারে যে যত ভালবাসিয়াছে, পরের হৃদয়ের ভাষা তাহার কাছে তত ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই অত্যন্ত

কঠিন অন্তর্দৃষ্টি শুধু ভালবাসার জোরেই পাওয়া যায়, আর কিছুতে নয়। তাহার প্রমাণ দিতেছি। ইন্দ্র মুখ তুলিয়া কি যেন বলিতে গেল, কিন্তু বলিতে না পারিয়া সমস্ত মুখ তার অকারণে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি একটা শরের ডাঁটা ছিঁড়িয়া নতমুখে জলের উপর নাড়িতে নাড়িতে কহিল, শ্রীকান্ত!

কি ভাই?

তোর—তোর কাছে টাকা আছে?

ক' টাকা?

ক' টাকা? এই—ধর্, পাঁচ টাকা—

আছে। তুমি নেবে? বলিয়া আমি ভারি খুশি হইয়া তাহার মুখপানে চাহিলাম। এ কয়টি টাকাই আমার ছিল। ইন্দ্রর কাজে লাগিবার অপেক্ষা তাহার সদ্ব্যবহার আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। কিন্তু ইন্দ্র ত কৈ খুশি হইল না। মুখ যেন তাহার অধিকতর লজ্জায় কি এক-রকম হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত এখন তোকে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

আমি আর চাইনে, বলিয়া সগর্বে তাহার মুখের পানে চাহিলাম।

আবার কিছুক্ষণ সে মুখ নীচু করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি নিজে চাইনে। একজনদের দিতে হবে, তাই। তারা বড় দুঃখী রে—খেতেও পায় না। তুই যাবি সেখানে? চক্ষের নিমেষে আমার সে রাত্রির কথা মনে পড়িল। কহিলাম, সেই যাদের তুমি টাকা দিতে নেমে যেতে চেয়েছিলে? ইন্দ্র অন্যমনস্ক ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ তারাই। টাকা আমি নিজেই ত কত দিতে পারি, কিন্তু দিদি যে কিছুতে নিতে চায় না। তোকে একটিবার যেতে হবে শ্রীকান্ত, নইলে, এ টাকাও নেবে না; মনে করবে, আমি মায়ের বাক্স থেকে চুরি ক'রে এনেচি। যাবি শ্রীকান্ত?

তারা বুঝি তোমার দিদি হয়?

ইন্দ্র একটু হাসিয়া কহিল, না, দিদি হয় না—দিদি বলি। যাবি ত? আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া তখনি কহিল, দিনের বেলা গেলে সেখানে কোন ভয় নেই। কাল রবিবার; তুই খেয়েদেয়ে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্, আমি নিয়ে যাব; আবার তখ্খুনি ফিরিয়ে আন্‌ব। যাবি ত ভাই? বলিয়া যেমন করিয়া সে আমার হাতটি ধরিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহাতে আমার 'না' বলিবার সাধ্য রহিল না। আমি দ্বিতীয়বার তাহার নৌকায় উঠিবার কথা দিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

কথা দিলাম সত্য, কিন্তু সে যে কতবড় দুঃসাহসের কথা, সে ত আমার চেয়ে কেউ বেশি জানে না। সমস্ত বিকালবেলাটা মন ভারী হইয়া রহিল, এবং রাত্রে ঘুমের ঘোরে প্রগাঢ় অশান্তির ভাব সর্বাঙ্গে বিচরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভোরবেলা উঠিয়া সর্বাগ্রে ইহাই মনে পড়িল আজ যেখানে যাইব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, সেখানে যাইলে কোনমতেই আমার ভাল হইবে না। কোন সূত্রে কেহ জানিতে পারিলে, ফিরিয়া আসিয়া যে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে, মেজদার জন্যও ছোড়দা বোধ করি সে শাস্তি কামনা করিতে পারিত না। অবশেষে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে টাকা পাঁচটি লুকাইয়া লইয়া নিঃশব্দে যখন বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন এমন কথাও অনেকবার মনে হইল—কাজ নাই গিয়া। নাই বা কথা রাখিলাম; এমনই বা তাহাতে কি আসে যায়! যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, শরঝাড়ের নীচে সেই ছোট্ট নৌকাটির উপর ইন্দ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। চোখাচোখি হইবামাত্র সে এমন করিয়া হাসিয়া আহ্বান করিল যে, না-যাওয়ার কথা মুখে আনিতেও পারিলাম না। সাবধানে ধীরে ধীরে নামিয়া নিঃশব্দে নৌকাটিতে চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র নৌকা ছাড়িয়া দিল।

আজ মনে ভাবি, আমার বহুজন্মের সুকৃতির ফল যে, সেদিন ভয়ে পিছাইয়া আসি নাই! সেই দিনটিকে উপলক্ষ্য করিয়া যে জিনিসটি দেখিয়া লইয়াছিলাম, সারা জীবনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াইয়াও তেমন কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? আমিই বা তাহার মত আর কোথায় দেখিতে পাইলাম? জীবনে এমন সব শুভ মুহূর্ত অনেকবার আসে না। একবার যদি আসে, সে সমস্ত চেতনার উপর এমন গভীর একটা ছাপ মারিয়া দিয়া যায় যে, সেই ছাঁচেই সমস্ত

পরবর্তী জীবন গড়িয়া উঠিতে থাকে। আমার তাই বোধ হয়, স্ত্রীলোককে কখনও আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেন না তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই? নাই যদি তবে পথেঘাটে এত পাপের মূর্তি দেখি কাহাদের? সবাই যদি সেই ইন্দ্রর দিদি, তবে এত প্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ, যখন খুশি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে। বন্ধুরা বলেন, ইহা আমার একটা অতি জঘন্য শোচনীয় ভ্রম মাত্র। আমি তাহারও প্রতিবাদ করি না। শুধু বলি, ইহা আমার যুক্তি নয়— আমার সংস্কার। সংস্কারের মূলে যিনি, জানি না সেই পুণ্যবতী আজও বাঁচিয়া আছেন কি না। থাকিলেও কোথায় কি ভাবে আছেন, তাঁহার নির্দেশমত কখনো কোন সংবাদ লইবার চেষ্টাও করি নাই। কিন্তু কত যে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করিয়াছি, তাহা যিনি সব জানিতে পারেন, তিনিই জানেন।

শ্মশানের সেই সঙ্কীর্ণ ঘাটের পাশে বটবৃক্ষমূলে ডিঙি বাঁধিয়া যখন দুজনে রওনা হইলাম, তখনও অনেক বেলা ছিল। কিছু দূরে গিয়া ডানদিকে বনের ভিতর ঠাহর করিয়া দেখায়, একটা পথের মতও দেখা গেল। ইন্দ্র তাহাই ধরিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রায় দশ মিনিট চলিবার পর একটা পর্ণকুটীর দেখা গেল। কাছে আসিয়া দেখিলাম, ভিতরে ঢুকিবার পথ আগড় দিয়া আবদ্ধ। ইন্দ্র সাবধানে তাহার বাঁধন খুলিয়া ঠেলা দিয়া প্রবেশ করিল এবং আমাকে টানিয়া লইয়া পুনরায় তেমনি করিয়া বাঁধিয়া দিল। আমি তেমন বাসস্থান কখনো জীবনে দেখি নাই। একে ত চতুর্দিকেই নিবিড় জঙ্গল, তাহাতে মাথার উপরে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ এবং পাকুড় গাছে সমস্ত জায়গাটা যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাড়া পাইয়া একপাল মুরগি এবং ছানাগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল। একধারে বাঁধা গোটা-দুই ছাগল ম্যাঁ ম্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সুমুখে চাহিয়া দেখি—ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া-বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে। চক্ষের নিমেষে অস্ফুট চীৎকারে মুরগিগুলাকে আরও ত্রস্ত ভীত করিয়া দিয়া আঁচড়-পিঁচড় করিয়া একেবারে সেই বেড়ার উপর চড়িয়া বসিলাম। ইন্দ্র খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ও কিছু বলে না রে, বড় ভালমানুষ। ওর নাম রহিম। বলিয়া কাছে গিয়া তাহার পেট্‌টা ধরিয়া টানিয়া উঠানের ওধারে সরাইয়া দিল। তখন নামিয়া আসিয়া ডানদিকে চাহিয়া দেখিলাম, সেই পর্ণকুটীরের বারান্দার উপরে বিস্তর ছেঁড়া চাটাই ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলা-গোছের লোক প্রবল কাসির পরে হাঁপাইতেছে। তাহার মাথায় জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোটবড় মালা। গায়ের জামা এবং পরনের কাপড় অত্যন্ত মলিন এবং এক প্রকার হলুদে রঙে ছোপানো। তাহার লম্বা দাড়ি বস্ত্রখণ্ড দিয়া জটার সহিত বাঁধা ছিল বলিয়াই প্রথমটা চিনিতে পারি নাই; কিন্তু কাছে আসিয়াই চিনিলাম সে সাপুড়ে। মাস পাঁচ-ছয় পূর্বে তাহাকে প্রায় সর্বত্রই দেখিতাম। আমাদের বাটীতেও তাহাকে কয়েকবার সাপ খেলাইতে দেখিয়াছি। ইন্দ্র তাহাকে শাহ্‌জী সম্বোধন করিল এবং সে আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রকে গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম এবং কলিকাটি দেখাইয়া দিল। ইন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া, আদেশ পালন করিতে লাগিয়া গেল এবং প্রস্তুত হইলে শাহ্‌জী সেই কাসির উপর ঠিক যেন 'মরি-বাঁচি' পণ করিয়া টানিতে লাগিল এবং একবিন্দু ধোঁয়াও পাছে বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় নাকেমুখে বাম করতল চাপা দিয়া মাথায় একটা ঝাঁকানির সহিত কলিকাটি ইন্দ্রের হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, পিয়ো।

ইন্দ্র পান করিল না। ধীরে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া কহিল, না। শাহ্‌জী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু উত্তরের জন্য একমুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়াই সেটা নিজেই তুলিয়া লইয়া টানিয়া টানিয়া নিঃশেষ করিয়া উপুড় করিয়া রাখিল। তার পরে দুজনের মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা শুরু হইল। তাহার অধিকাংশ শুনিতেও পাইলাম না, বুঝিতেও পারিলাম না। কিন্তু এই একটা বিষয় লক্ষ্য করিলাম, শাহ্‌জী হিন্দিতে কথা কহিলেও ইন্দ্র বাঙলা ছাড়া কিছুই ব্যবহার করিল না।

শাহ্‌জীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা উন্মত্ত চীৎকারে পরিণত হইল। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া সে যে এরূপ অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ

উচ্চারণ করিতে লাগিল, তাহা তখন বুঝিলে, ইন্দ্র সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি করিতাম না। তারপরে লোকটা বেড়ায় ঠেস দিয়া বসিল এবং অনতিকাল পরেই ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া যেন অস্থির হইয়া উঠিলাম, বলিলাম. বেলা যায়; তুমি সেখানে যাবে না?

কোথায় শ্রীকান্ত?

তোমার দিদিকে টাকা দিতে যাবে না?

দিদির জন্যই ত ব'সে আছি। এই ত তাঁর বাড়ি।

এই তোমার দিদির বাড়ি! এরা ত সাপুড়ে—মুসলমান! ইন্দ্র কি-একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াই, চাপিয়া গিয়া চুপ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষের দৃষ্টি বড় ব্যথায় একেবারে যেন ম্লান হইয়া গেল। একটু পরেই কহিল, একদিন তোকে সব কথা বলব। সাপ খেলাব দেখবি শ্রীকান্ত?

তাহার কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। তুমি সাপ খেলাবে কি? কামড়ায় যদি? ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা ছোট ঝাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশি বাহির করিয়া আনিল; এবং সুমুখে রাখিয়া ডালার বাঁধন আল্‌গা করিয়া বাঁশিতে ফুঁ দিল। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম। ডালা খুলো না ভাই, ভেতরে যদি গোখ্‌রো সাপ থাকে! ইন্দ্র তাহার জবাব দেওয়াও আবশ্যক মনে করিল না, শুধু ইঙ্গিতে জানাইল যে, সে গোখরো সাপই খেলাইবে; এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বাঁশি বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখ্‌রো একহাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল; এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রর হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাপ্ রে! বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। আমি বেড়ার গায়ে চাড়িয়া বসিলাম। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশির লাউয়ের উপর আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল, এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই, সে নয়। ভয়ে বিরক্তিতে রাগে আমার প্রায় কান্না আসিতেছিল, বলিলাম, কেন এমন কাজ করলে?' ও বেরিয়ে যদি শাহ্‌জীকে কামড়ায়? ইন্দ্রর লজ্জার পরিসীমা ছিল না। কহিল, ঘরের আগড়টা টেনে দিয়ে আসব? কিন্তু যদি পাশেই লুকিয়ে থাকে? আমি বলিলাম, তা হ'লে বেরিয়েই ওকে কামড়াবে। ইন্দ্র নিরুপায়ভাবে এদিক ওদিকে চাহিয়া বলিল. কামড়াক্ ব্যাটাকে! বুনো সাপ ধরে রাখে—গাঁজাখোর শালার এতটুকু বুদ্ধি নেই। এই যে দিদি! এসো না, এসো না; ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম। যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি! যেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটিবাঁধা কতকগুলো শুক্‌নো কাঠ এবং ডানহাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাক-সবজি। পরনে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামাকাপড়—গেরুয়া রঙে ছোপান, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়। হাতে দুগাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দু-নারীর মত সিঁদুরের আয়তি-চিহ্ন। তিনি কাঠের বোঝাটা নামাইয়া রাখিয়া আগড়টা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, কি? ইন্দ্র মহাব্যস্ত হইয়া বলিল, খুলো না দিদি. তোমার পায়ে পড়ি—মস্ত একটা সাপ ঘরে ঢুকেছে। তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন। তার পরে একটুখানি হাসিয়া পরিষ্কার বাঙ্গলায় বলিলেন. তাই ত! সাপুড়ের ঘরে সাপ ঢুকেছে, এ ত বড় আশ্চর্য! কি বল শ্রীকান্ত? আমি অনিমেষ দৃষ্টিতে শুধু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।—কিন্তু কি ক'রে সাপ ঢুকল ইন্দ্রনাথ? ইন্দ্র বলিল. ঝাঁপির ভেতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে বুনো-সাপ।

উনি ঘুমোচ্ছেন বুঝি? ইন্দ্র রাগিয়া কহিল. গাঁজা খেয়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে ঘুমোচ্ছে। চেঁচিয়ে মরে গেলেও উঠবে না। তিনি আবার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর সেই সুযোগে তুমি শ্রীকান্তকে সাপ খেলানো দেখাতে গিয়েছিলে. না? আচ্ছা এসো. আমি ধরে দিচ্ছি।

তুমি যেয়ো না দিদি. তোমাকে খেয়ে ফেলবে। শাহ্‌জীকে তুলে দাও—আমি তোমাকে যেতে দেব না। বলিয়া ইন্দ্র ভয়ে দুই হাত প্রসারিত করিয়া পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল। তাহার এই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাইল তাহা তিনি টের পাইলেন। মুহূর্তের জন্য চোখ

দুটি তাঁহার ছলছল্ করিয়া উঠিল, কিন্তু গোপন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, ওরে পাগলা, অত পুণ্যি তোর এই দিদির নেই। আমাকে খাবে না রে—এখ্খুনি ধ'রে দিচ্চি দ্যাখ। বলিয়া বাঁশের মাচা হইতে একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং এক মিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইন্দ্র ঢিপ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর একটা নমস্কার করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিল, দিদি, তুমি যদি আমার আপনার দিদি হ'তে। তিনি ডান হাত বাড়াইয়া ইন্দ্রের চিবুক স্পর্শ করিলেন, এবং অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া মুখ ফিরাই— বোধ করি অলক্ষ্যে একবার নিজের চোখদুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

পাঁচ

সমস্ত ব্যাপারটা শুনিতে শুনিতে ইন্দ্রর দিদি হঠাৎ বার-দুই এম্নি শিহরিয়া উঠিলেন যে, ইন্দ্রর সেদিকে যদি কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত, সে আশ্চর্য হইয়া যাইত। সে দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি পাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সস্নেহে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিলেন, ছি দাদা, এমন কাজ আর কখ্খনো করো না। এ সব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা কর্‌তে আছে ভাই? ভাগ্যে তোমার হাতের ডালাটায় ছোবল মেরেছিল, না হ'লে আজ কি কাণ্ড হ'ত বলত?

আমি কি তেম্নি বোকা দিদি! বলিয়া ইন্দ্র সপ্রতিভ হাসিমুখে ফস্ করিয়া তাহার কোঁচার কাপড়টা টানিয়া ফেলিয়া কোমরে সুতা-বাঁধা কি একটা শুক্‌না শিকড় দেখাইয়া বলিল, এই দ্যাখো দিদি, আট-ঘাট বেঁধে রেখেচি কি না!' এ না থাকলে কি আর আজ আমাকে না ছুব্‌লে ছেড়ে দিত? শাহ্‌জীর কাছে এটুকু আদায় করতে কি আমাকে কম কষ্ট পেতে হয়েছে? এ সঙ্গে থাকলে কেউ ত কামড়াতে পারেই না; আর তাই যদি বা কামড়াত—তাতেই বা কি! শাহ্‌জীকে টেনে তুলে তক্ষুনি বিষ-পাথরটা ধরিয়ে দিতুম। আচ্ছা দিদি, ঐ বিষ-পাথরটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পারে? আধ ঘণ্টা? একঘণ্টা? না অতক্ষণ লাগে না, না দিদি?

দিদি কিন্তু তেমনি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ইন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, আজ দাও না দিদি আমাকে একটি। তোমাদের ত দুটো-তিনটে রয়েচে—আর আমি কতদিন ধ'রে চাইচি।' বলিয়া সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, আমাকে তোমরা যা বল আমি তাই করি—আর তোমরা কেবল পট্টি দিয়ে আমাকে আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু—যদি নাই দেবে তবে ব'লে দাও না কেন? আমি আর আসব না—যাও।

ইন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অনুভব করিলাম যে, তাঁর মুখখানি কিসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল! কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া একটুখানি হাসির ভাব সেই শীর্ণ শুষ্ক ওষ্ঠাধরে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, হাঁ রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়িতে শুধু সাপের মন্তর আর বিষ-পাথরের জন্যেই আসিস্ রে?'

ইন্দ্র অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল, তবে না ত কি! নিদ্রিত শাহ্‌জীকে একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, কিন্তু কেবলই আমাকে ভোগা দিচ্চে—এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়, সেই যে কবে শুধু হাতচালার মন্তরটুকু দিয়েছিল আর দিতেই চায় না। কিন্তু আজ আমি টের পেয়েছি দিদি, তুমিও কম নয়, তুমিও সব জানো। ওকে আর আমি খোশামোদ করচি নে দিদি, তোমার কাছ থেকেই সমস্ত মন্তর আদায় ক'রে নেবো। বলিয়াই আমার প্রতি চাহিয়া, সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, শাহ্‌জীকে উদ্দেশ করিয়া গভীর সম্ভ্রমের সহিত কহিল, শাহ্‌জী গাঁজা-টাঁজা খান বটে, শ্রীকান্ত, কিন্তু তিন দিনের বাসীমড়া আধঘণ্টার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন—এত বড় ওস্তাদ উনি! হাঁ দিদি, তুমিও মড়া বাঁচাতে পারো?

দিদি কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া সহসা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন! সে কি মধুর হাসি! অমন করিয়া হাসিতে আমি আজ পর্যন্ত কম লোককেই

দেখিয়াছি।·কিন্তু সে যেন নিবিড় মেঘভরা আকাশের বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত পরক্ষণেই অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।·

কিন্তু ইন্দ্র সেদিক দিয়াই গেল না। বরঞ্চ একেবারে পাইয়া বসিল। সেও হাসিয়া কহিল, আমি জানি, তুমি সব জানো। কিন্তু আমাকে একটি একটি করে তোমাকে সব বিদ্যে দিতে হবে, তা বলে দিচ্চি! আমি যতদিন বাঁচব, তোমাদের একেবারে গোলাম হয়ে থাকব। তুমি কটা মড়া বাঁচিয়েচ দিদি?

দিদি কহিলেন, আমি ত মড়া বাঁচাতে জানিনে ইন্দ্রনাথ!·

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, তোমাকে এ মন্তর শাহ্‌জী দেয়নি? দিদি ঘাড় নাড়িয়া 'না' বলিলে, ইন্দ্র মিনিট-খানেক তাঁর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া নিজেই তখন মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, এ বিদ্যে কি কেউ শীগ্‌গির দিতে চায় দিদি! আচ্ছা কড়ি-চালাটা নিশ্চয়ই শিখে নিয়েচ, না?

দিদি বলিলেন, কাকে কড়ি-চালা বলে, তাইত জানিনে ভাই।

ইন্দ্র বিশ্বাস করিল না। বলিল, ইস্‌! জান না বৈ কি! দেবে না, তাই বল। আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কড়ি-চালা কখনো দেখেচিস শ্রীকান্ত? দুটি কড়ি মন্তর প'ড়ে ছেড়ে দিলে তারা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কাম্‌ড়ে ধ'রে সাপটাকে দশ দিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির ক'রে দেয়।·এম্‌নি মন্তরের জোর! আচ্ছা দিদি, ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন, ধুলো-পড়া এ সব জান ত?·আর যদি নাই জান্‌বে ত অমন সাপটাকে ধ'রে দেবে কি করে? বলিয়া সে জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে দিদির মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

দিদি অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নতমুখে বসিয়া মনে মনে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন; শেষে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, ইন্দ্র, তোর দিদির এ সব কানাকড়ির বিদ্যেও নেই। কিন্তু কেন নেই, সে যদি তোরা বিশ্বাস করিস ভাই, তা হ'লে আজ তোদের কাছে আমি সমস্ত ভেঙ্গে ব'লে আমার বুকখানা হাল্কা ক'রে ফেলি।·বল, তোরা আমার সব কথা আজ বিশ্বাস করবি? বলিতে বলিতেই তাঁহার শেষের কথাগুলি কেমন একরকম যেন ভারী হইয়া উঠিল।

আমি নিজে এতক্ষণ প্রায় কোন কথাই কহি নাই। এইবার সর্বাগ্রে জোর করিয়া বলিয়া উঠিলাম, আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি! সব—যা বলবে সমস্ত। একটি কথাও অবিশ্বাস করব না।

তিনি আমার প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, বিশ্বাস করবে বৈ কি ভাই! তোমরা যে ভদ্রলোকের ছেলে। যারা ইতর, তারাই শুধু অজানা অচেনা লোকের কথায় সন্দেহে ভয়ে পিছিয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া আমি ত কখনও মিথ্যে কথা কইনে ভাই! বলিয়া তিনি আর একবার আমার প্রতি চাহিয়া ম্লানভাবে একটুখানি হাসিলেন।

তখন সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা কাটিয়া গিয়া আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং তাহারই অস্ফুট কিরণ-রেখা গাছের ঘনবিন্যস্ত ডাল ও পাতার ফাঁক দিয়া নীচের গাঢ় অন্ধকারে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া, দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইন্দ্রনাথ, মনে করেছিলুম আজই আমার সমস্ত কথা তোমাদের জানিয়ে দেব! কিন্তু ভেবে দেখছি, এখনও সে সময় আসেনি। আমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস কোরো ভাই, আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি মিথ্যে আশা নিয়ে শাহ্‌জীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়ো না। আমরা তন্ত্রমন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধরে আনতেও পারিনে। আর কেউ পারে কি না, জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।·

কি জানি কেন আমি এই অত্যল্প কালের পরিচয়েই তাঁহার প্রত্যেক কথাটি অসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না। সে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, যদি পার না, তবে সাপ ধরলে কি ক'রে?·

দিদি বললেন, ওটা শুধু হাতের কৌশল ইন্দ্র, কোন মন্ত্রের জোরে নয়। সাপের মন্ত্র আমরা জানিনে।

ইন্দ্র বলিল, যদি জান না, তবে তোমরা দুজনে জোচ্চুরি ক'রে ঠকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন?·

দিদি তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিলেন না; বোধ করি·বা নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া

লইতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনরায় কর্কশকণ্ঠে কহিল, ঠগ্ জোচ্চোর সব—আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি তোমাদের মজা।

অদূরেই একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বলিতেছিল। আমি তাহারই আলোকে দেখিতে পাইলাম, দিদির মুখখানি একেবারে যেন মড়ার মত সাদা হইয়া গেল। সভয়ে সসঙ্কোচে বলিলেন, আমরা যে সাপুড়ে—ভাই, ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা।

ব্যবসা বার ক'রে দিচ্চি—চল্‌রে শ্রীকান্ত, জোচ্চোর শালাদের ছায়া মাড়াতে নেই। হারামজাদা বজ্জাত ব্যাটারা। বলিয়া ইন্দ্র সহসা আমার হাত ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

ইন্দ্রকে দোষ দিতে পারি না, কারণ তাহার অনেক দিনের অনেক বড় আশা একেবারে চোখের পলকে ভূমিসাৎ হইয়া গেল, কিন্তু আমার দুই চোখ যে দিদির সেই দুটি চোখের পানে চাহিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারিল না। জোর করিয়া ইন্দ্রের হাত ছাড়াইয়া লইয়া পাঁচটি টাকা রাখিয়া দিয়া বলিলাম, তোমার জন্যে এনেছিলাম দিদি—এই নাও।

ইন্দ্র ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইয়া কহিল, আবার টাকা! জোচ্চুরি ক'রে এরা আমার কাছে কত টাকা নিয়েচে, তা তুই জানিস শ্রীকান্ত? এরা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক, সেই আমি চাই।

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, না ইন্দ্র, দাও—আমি দিদির নাম করে এনেচি—

ওঃ—ভারী দিদি! বলিয়া সে আমাকে টানিয়া বেড়ার কাছে আনিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে গোলমালে শাহ্‌জীর নেশার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে কেয়া হুয়া, কেয়া হুয়া? বলিয়া উঠিয়া বসিল।

ইন্দ্র আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, ডাকু শালা। রাস্তায় তোমাকে দেখ্‌তে পেলে চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব। কেয়া হুয়া! বদমাস ব্যাটা কিচ্ছু জানে না—আর বলে বেড়ায় মন্তরের জোরে মড়া বাঁচাই! কখনো পথে দেখা হ'লে এবার ভাল ক'রে বাঁচাব তোমাকে! বলিয়া সে এমনি একটা অশিষ্ট ইঙ্গিত করিল যে শাহ্‌জী চমকাইয়া উঠিল।

তাহার একে নেশার ঘোর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড! সেই যে সাধুভাষায় বলে 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' হইয়া বসিয়া থাকা, ঠিক সেইভাবে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দ্র আমাকে লইয়া যখন দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল, তখন সে বোধ করি কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া পরিষ্কার বাঙ্গলা করিয়া ডাকিল, শোন ইন্দ্রনাথ, কি হয়েচে বল ত? আমি তাহাকে এই প্রথম বাঙ্গলা বলিতে শুনিলাম।

ইন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কিছু জান না—কেন মিছামিছি আমাকে ধোঁকা দিয়ে এত দিন এত টাকা নিয়েচ, তার জবাব দাও।

সে কহিল, জানিনে তোমাকে কে বললে?

ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ ঐ স্তব্ধ নতমুখী দিদির দিকে একটা হাত বাড়াইয়া বলিল, ওই বললে, তোমার কানাকড়ির বিদ্যে নাই। বিদ্যে আছে শুধু জোচ্চুরি করবার আর লোক ঠকাবার। এই তোমাদের ব্যবসা। মিথ্যাবাদী চোর।

শাহ্‌জীর চোখ দুটা ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে যে কি ভীষণ প্রকৃতির লোক, সে পরিচয় তখনও জানিতাম না। শুধু তাহার সেই চোখের দৃষ্টিতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। লোকটা তাহার এলোমেলো জটাটা বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুমুখে আসিয়া কহিল, বলেচিস্ তুই?

দিদি তেমনি নতমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিলেন। ইন্দ্র আমাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, রাত্তির হচ্ছে—চল্ না। রাত্রি হইতেছে সত্য, কিন্তু আমার পা যে আর নড়ে না। কিন্তু ইন্দ্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, আমাকে প্রায় জোর করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই শাহ্‌জীর কণ্ঠস্বর আবার কানে আসিল—কেন বললি?

প্রশ্ন শুনিলাম বটে, কিন্তু প্রত্যুত্তর শুনিতে পাইলাম না। আমরা আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই অকস্মাৎ চারিদিকের সেই নিবিড় অন্ধকারের বুক চিরিয়া একটা তীব্র

আর্তস্বর পিছনের আঁধার কুটীর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের কানে বিঁধিল এবং চক্ষের পলক না ফেলিতেই ইন্দ্র সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু আমার অদৃষ্টে অন্যরূপ ঘটিল। সুমুখেই একটা শিয়াকুল গাছের মস্ত ঝাড় ছিল; আমি সবেগে গিয়া তাহারই উপরে পড়িলাম। কাঁটায় সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। সে যাক, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইতেই প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। এ কাঁটা ছাড়াই ত সে কাঁটায় কাপড় বাধে; সে কাঁটা ছাড়াই ত আর একটা কাঁটায় কাপড় আটকায়। এমনি করিয়া অনেক কষ্টে, অনেক বিলম্বে যখন কোন মতে শাহ্জীর বাড়ির প্রাঙ্গণের ধারে গিয়া পাঁড়লাম, তখন দেখি, সেই প্রাঙ্গণেরই একপ্রান্তে দিদি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন এবং আর এক প্রান্তে গুরু-শিষ্যের রীতিমত মল্লযুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে। পাশেই একটা তীক্ষ্ণধার বর্শা পড়িয়া আছে।

শাহ্জী লোকটি অত্যন্ত বলবান। কিন্তু ইন্দ্র যে তাহার অপেক্ষাও কত বেশি শক্তিশালী এ সংবাদ তাহার জানা ছিল না। থাকিলে বোধ হয় সে এত বড় দুঃসাহসের পরিচয় দিত না। দেখিতে দেখিতে ইন্দ্র তাহাকে চিত করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। সে এমনি টিপুনি যে, আমি বাধা না দিলে হয়ত সে যাত্রা শাহ্জীর সাপুড়ে যাত্রাটাই শেষ হইয়া যাইত।

বিস্তর টানা-হেঁচড়ার পর যখন উভয়কে পৃথক করিলাম, তখন ইন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিলাম। অন্ধকারে প্রথমে নজরে পড়ে নাই যে তাহার সমস্ত কাপড় জামা রক্তে ভাসিয়া যাইতেছে। ইন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, শালা গাঁজাখোর আমাকে সাপ-মারা বর্শা দিয়ে খোঁচা মেরেচে—এই দ্যাখ। জামার আস্তিন তুলিয়া দেখাইল, বাহুতে প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত এবং তাহা দিয়া অজস্র রক্তস্রাব হইতেছে।

ইন্দ্র কহিল, কাঁদিস নে—এই কাপড়টা দিয়ে খুব টেনে বেঁধে দে—এই খবরদার! ঠিক্ অম্‌নি ব'সে থাকো। উঠ্‌লেই গলায় পা দিয়ে তোমার জিভ টেনে বার কর্‌ব—হারামজাদা শুয়ার। নে, তুই টেনে বাঁধ—দেরি করিস নে। বলিয়া সে চড়চড় করিয়া তাহার কোঁচার খানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। আমি কম্পিতহস্তে ক্ষতটা বাঁধিতে লাগিলাম এবং শাহ্জী অদূরে বসিয়া মুমূর্ষু বিষাক্ত সর্পের দৃষ্টি দিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

ইন্দ্র কহিল, না, তোমাকে বিশ্বাস নেই, তুমি খুন কর্‌তে পার। আমি তোমার হাত বাঁধব। বলিয়া তাহারই গেরুয়ারঙে ছোপানো পাগড়ি দিয়া টানিয়া টানিয়া তাহার দুই হাত জড় করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। সে বাধা দিল না, প্রতিবাদ করিল না, একটা কথা পর্যন্ত কহিল না।

যে লাঠিটার আঘাতে দিদি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিল সেটা তুলিয়া লইয়া একপাশে রাখিয়া ইন্দ্র কহিল, কি নেমকহারাম শয়তান এই ব্যাটা। বাবার কত টাকা যে চুরি ক'রে একে দিয়েছি, আরও কত হয়ত দিতাম, যদি দিদি না আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করত। আর স্বচ্ছন্দে ও ঐ বল্লমটা আমাকে ছুঁড়ে মেরে বস্‌ল। শ্রীকান্ত নজর রাখ্, যেন না ওঠে—আমি দিদির চোখেমুখে জলের ঝাপ্টা দিই।

জলের ঝাপ্টা দিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, যেদিন থেকে দিদি বললে, 'ইন্দ্রনাথ, তোমার রোজগারের টাকা হ'লে নিতাম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের ইহকাল পরকাল মাটি কর্‌ব না,' সেই দিন থেকে ঐ শয়তান ব্যাটা দিদিকে কত মার মেরেচে, তার হিসেব-নিকেশ নেই। তবু দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে খাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে—তবুও কিছুতে ওর হয় না। কিন্তু আমি ওকে পুলিশে দিয়ে তবে ছাড়ব—না হ'লে দিদিকে ও খুন ক'রে ফেলবে, ও খুন করতে পারে।

আমার মনে হইল, লোকটা যেন এই কথায় শিহরিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ মুখখানা নত করিয়া ফেলিল। সে একটি নিমেষমাত্র। কিন্তু অপরাধীর নিবিড় আশঙ্কা তাতে এম্‌নি পরিস্ফুট হইতে দেখিয়াছিলাম যে, আমি আজিও তাহার তখনকার সেই চেহারাটা স্পষ্ট মনে করিতে পারি।

আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা ত করিবেই, পরন্তু উদ্ভট কল্পনা বলিয়া উপহাস করিতে হয়ত ইতস্তত করিবে না। তথাপি এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার

মূল্য। কারণ সত্যের উপরে না দাঁড়াইতে পারিলে কোনমতেই এই সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না। প্রতি পদেই ভয় হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। জগতে বাস্তব ঘটনা যে কল্পনাকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া যায়, এ কৈফিয়ৎ নিজের কোন জোরই দেয় না, বরঞ্চ হাতের কলমটাকে প্রতি হাতেই টানিয়া টানিয়া ধরিতে থাকে।

যাক সে কথা। দিদি যখন চোখ চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তখন রাত্রি বোধ করি দ্বিপ্রহর! তাঁহার বিহ্বল ভাবটা ঘুচাইতে আরও ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। তারপরে আমার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া শাহ্‌জীর বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন, যাও, শোও গে।

লোকটা ঘরে চলিয়া গেলে তিনি ইন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া, তাহার ডান হাতটা নিজের মাথার উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, ইন্দ্র, এই আমার মাথায় হাত দিয়া শপথ কর্‌ ভাই, আর কখনো এ বাড়িতে আসিস্‌ নে। আমাদের যা হবার হোক, তুই আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিস্‌ নে।

ইন্দ্র প্রথমটা অবাক্‌ হইয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, তা বটে! আমাকে খুন করতে গিয়েছিল, সেটা কিছু নয়। আর আমি যে ওকে বেঁধে রেখেছি, তাতেই তোমার এত রাগ! এমন না হ'লে কলিকাল বলেচে কেন? কিন্তু কি নেমকহারাম তোমরা দুজন!—আয় শ্রীকান্ত, আর না।

দিদি চুপ করিয়া রহিলেন—একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করিলেন না। কেন যে করিলেন না তাহা পরে যত বেশিই বুঝিয়া থাকি না কেন তখন বুঝি নাই। তথাপি আমি অলক্ষ্যে নিঃশব্দে সেই টাকা পাঁচটি খুঁটির কাছে রাখিয়া দিয়া ইন্দ্রের অনুসরণ করিলাম। ইন্দ্র প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিল, হিঁদুর মেয়ে হয়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার আবার ধর্মকর্ম! চুলোয় যাও—আর আমি খোঁজ করব না, খবরও নেব না—হারামজাদা নচ্ছার! বলিয়া দ্রুতপদে বনপথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

দুজনে নৌকায় আসিয়া বসিলে ইন্দ্র নিঃশব্দে বাহিতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে হাত তুলিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। সে যে কাঁদিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিয়া আর কোন প্রশ্ন করিলাম না।

শ্মশানের সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিলাম এবং সেই পথ দিয়াই এখনও চলিয়াছি, কিন্তু কেন জানি না, আজ আমার ভয়ের কথাও মনে আসিল না। বোধ করি, মন আমার এমনি বিহ্বল আচ্ছন্ন হইয়াছিল যে, এত রাত্রে কেমন করিয়া বাড়ি ঢুকিব এবং ঢুকিলেও যে কি দশা হইবে, সে চিন্তাও মনে স্থান পাইল না।

প্রায় শেষরাত্রে নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল। আমাকে নামাইয়া দিয়া ইন্দ্র কহিল, বাড়ি যা শ্রীকান্ত! তুই বড় অপয়া! তোকে সঙ্গে নিলেই একটা-না-একটা ফ্যাসাদ বাধে। আজ থেকে তোকে আর আমি কোন কাজে ডাকব না—তুইও আর আমার সামনে আসিস্‌ নে। যা! বলিয়া সে গভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া দিয়া দেখিতে দেখিতে বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি বিস্মিত, ব্যথিত, স্তব্ধ হইয়া নির্জন নদীতীরে একাকী দাঁড়াইয়া রহিলাম।

৮ম

নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে মা-গঙ্গার উপকূলে ইন্দ্র যখন আমাকে নিতান্ত অকারণে একাকী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তখন কান্না আর সামলাইতে পারিলাম না। তাহাকে যে ভালবাসিয়াছিলাম, সে তাহার কোন মূল্যই দিল না। পরের বাড়ির যে কঠিন শাসনপাশ উপেক্ষা করিয়া তাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারও এতটুকু মর্যাদা রাখিল না। উপরন্তু অপয়া অকর্মণ্য বলিয়া একান্ত অসহায় অবস্থায় বিদায় দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। তাহার এই নিষ্ঠুরতা আমাকে যে কত বিঁধিয়াছিল, তাহা বলিবার চেষ্টা করাও বাহুল্য। তারপরে অনেকদিন সেও আর সন্ধান করিল না, আমিও না। দৈবাৎ পথে-ঘাটে যদি কখনও দেখা হইয়াছে, এমন করিয়া মুখ ফিরাইয়া আমি চলিয়া গিয়াছি, যেন তাহাকে দেখিতে পাই নাই। কিন্তু আমার এই 'যেন'টা আমাকেই শুধু সারাদিন তুষের আগুনে দগ্ধ করিত, তাহার

কতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত। ছেলেমহলে সে একজন মস্ত লোক। ফুটবল ক্রিকেটের দলে কর্তা, জিমন্যাস্টিক আখড়ার মাস্টার। তাহার কত অনুচর, কত ভক্ত! আমি ত তাহার তুলনায় কিছুই নয়। তবে কেনই বা দুদিনের পরিচয়ে আমাকে সে বন্ধু বলিয়া ডাকিল, কেনই বা বিসর্জন দিল! কিন্তু সে যখন দিল, তখন আমিও টানাটানি করিয়া বাঁধিতে গেলাম না। আমার বেশ মনে পড়ে, আমাদের সঙ্গী-সাথীরা যখন ইন্দ্রের উল্লেখ করিয়া তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ অদ্ভুত আশ্চর্য গল্প শুরু করিয়া দিত, আমি চুপ করিয়া শুনিতাম। একটা কথার দ্বারাও কখনও ইহা প্রকাশ করি নাই যে, সে আমাকে চিনে, কিংবা আমি তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানি। সেই বয়সেই আমি কেমন করিয়া যেন জানিতে পারিয়াছিলাম, 'বড়' ও 'ছোট'র বন্ধুত্ব সচরাচর এমনিই দাঁড়ায়। বোধ করি ভাগ্যবশে পরবর্তী জীবনে অনেক 'বড়' বন্ধুর সংস্পর্শে আসিব বলিয়াই ভগবান দয়া করিয়া এই সহজ জ্ঞানটা আমাকে দিয়াছিলেন যে, কখনও কোন কারণেই যেন অবস্থাকে ছাড়াইয়া বন্ধুত্বের মূল্য ধার্য করিতে না যাই। গেলেই যে দেখিতে দেখিতে 'বন্ধু' প্রভু হইয়া দাঁড়ান এবং সাধের বন্ধুত্বপাশ দাসত্বের বেড়ি হইয়া 'ছোট'র পায়ে বাজে, এই দিব্যজ্ঞানটি এত সহজে এমন সত্য করিয়াই শিখিয়াছিলাম বলিয়া লাঞ্ছনার হাত হইতে চিরদিনের মত নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিয়াছি।

তিন-চারিমাস কাটিয়াছে। উভয়েই উভয়কে ত্যাগ করিয়াছি—তা বেদনা এক পক্ষের যত নিদারুণই হোক—কেহ কাহারও খোঁজ করি না।

দত্তদের বাড়িতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের স্টেজ বাঁধা হইতেছে। 'মেঘনাদবধ' হইবে। ইতিপূর্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশি চোখে দেখি নাই। সারাদিন আমার নাওয়া-খাওয়াও নাই, বিশ্রামও নাই। স্টেজ-বাঁধায় সাহায্য করিতে পারিয়া একবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ভারী আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁড়া দিয়া গ্রীনরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয়ত বা আমাকে দেখিলে এক-আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীনরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম। রামচন্দ্র কতবার আসিলেন, গেলেন, আমাকে কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি-ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা 'বেল' হইয়া গেলে নিতান্ত ক্ষুন্নমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া সুমুখে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্প-কালের মধ্যেই সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গেলাম। সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যয় কাণ্ড! তাঁহার ছয় হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার সাড়ে-চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ি ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সেদিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারাণ পলসাই ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপ্‌সিন উঠিয়াছে। বোধ করি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন—অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এম্‌নি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত স্টেজটা মড়মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুটলাইটের গোটা পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্‌ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল! তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ বা সভয় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ বা সিন ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ! কাহারও কোন কথায় বিচলিত হইলেন না। বাঁ হাতের

ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেন্টুলানের মুট্ চাপিয়া ধরিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়—শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে। অবশেষে তাহাতেই জিত। বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

আনন্দের সীমা নাই—মগ্ন হইয়া দেখিতেছি এবং এই অপরূপ লড়াইয়ের জন্য মনে মনে তাঁহার শতকোটি প্রশংসা করিতেছি, এমন সময়ে পিঠের উপব একটা আঙ্গুলের চাপ পড়িল। মুখ ফিরাইয়া দেখি ইন্দ্র। চুপিচুপি কহিল, আয় শ্রীকান্ত, দিদি একবার তোকে ডাকচেন। তড়িৎস্পৃষ্টের মত সোজা খাড়া হইয়া উঠিলাম। কোথায় তিনি?

বেরিয়ে আয় না—বলচি। পথে আসিয়া সে শুধু কহিল, আমার সঙ্গে আয়। বলিয়া চলিতে লাগিল।

গঙ্গার ঘাটে পৌঁছিয়া দেখিলাম, তাহার নৌকা বাঁধা আছে—নিঃশব্দে উভয়ে চড়িয়া বসিলাম, ইন্দ্র বাঁধন খুলিয়া দিল।

আবার সেই সমস্ত অন্ধকার বনের পথ বাহিয়া দুজনে শাহ্‌জীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন বোধ করি, রাত্রি আর বেশি নাই।

একটা কেরোসিনের ডিপা জ্বালাইয়া দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহ্‌জীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ লম্বা হইয়া আছে।

দিদি মৃদুকণ্ঠে ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। আজ দুপুরবেলা কাহার বাটীতে সাপ ধরিবার বায়না থাকে। সেখানে ঐ সাপটিকে ধরিয়া যাহা বকশিশ পায় তাহাতে কোথা হইতে তাড়ি খাইয়া মাতাল হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি ফিরিয়া দিদির পুনঃপুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সাপ খেলাইতে উদ্যত হয়। খেলাইয়াও ছিল। কিন্তু অবশেষে খেলা সাঙ্গ করিয়া তাহার লেজ ধরিয়া হাঁড়িতে পুরিবার সময় মদের ঝোঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গেলে, সেও আদর করিয়া শাহ্‌জীর গলার উপর তীব্র চুম্বন দিয়াছে।

দিদি তাঁহার মলিন অঞ্চল-প্রান্তে চোখ মুছিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তখনই কিন্তু তাঁর চৈতন্য হ'ল যে, সময় আর বেশি নেই। বললেন, আয় দুজনে একসঙ্গেই যাই, ব'লে পা দিয়ে সাপটার মাথা চেপে ধ'রে দুই হাত দিয়ে তাকে টেনে টেনে ঐ অতবড় ক'রে ফেলে দিলেন। তার পরে দুজনেরই খেলা সাঙ্গ হ'ল। বলিয়া তিনি হাত দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহ্‌জীর মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, যাক, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিইনে।

আমরা উভয়েই নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে কণ্ঠস্বরে যে কি মর্মান্তিক বেদনা, কি প্রার্থনা, কি সুনিবিড় অভিমান প্রকাশ পাইল, তাহা যে শুনিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই যে জীবনে বিস্মৃত হয়। কিন্তু কিসের জন্য এই অভিমান? প্রার্থনাই বা কাহার জন্য?

একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিলেন, তোমরা ছেলেমানুষ, কিন্তু তোমরা দুটি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই ভাই, তাই এই ভিক্ষে করি, এ'র একটু তোমরা উপায় ক'রে দিয়ে যাও। আঙ্গুল দিয়া কুটীরের দক্ষিণ দিকের জঙ্গলটা নির্দেশ করিয়া বলিলেন, ওইখানে একটু জায়গা আছে, ইন্দ্রনাথ, আমি অনেকদিন ভেবেচি, যদি আমার মরণ হয়, ওইখানেই যেন শুয়ে থাকতে পাই! সকাল হ'লে সেই জায়গাটুকুতে এ'কে শুইয়ে রেখো ভাই, অনেক কষ্টই এ-জীবনে ভোগ ক'রে গেছেন—তবু একটু শান্তি পাবেন।

ইন্দ্র প্রশ্ন করিল, শাহ্‌জীকে কি কবর দিতে হবে?

দিদি বলিলেন, মুসলমান যখন, তখন দিতে হবে বৈ কি ভাই!

ইন্দ্র পুনরায় প্রশ্ন করিল, দিদি, তুমিও কি মুসলমান?

দিদি বলিলেন, হাঁ, মুসলমান বৈ কি।

উত্তর শুনিয়া ইন্দ্র কেমন যেন সঙ্কুচিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বেশ দেখিতে পাইলাম এ জবাব সে আশা করে নাই। দিদিকে সে বাস্তবিকই ভালবাসিয়াছিল। তাই বোধ করি, মনের মধ্যে একটা গোপন আশা পোষণ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার দিদি তাহাদেরই একজন। আমার

কিন্তু বিশ্বাস হইল না। তাঁহার নিজের মুখের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও কোনমতেই ভাবিতে পারিলাম না যে, তিনি হিন্দু-কন্যা নহেন।

বাকী রাতটুকু কাটিয়া গেলে, ইন্দ্র সেই নির্দিষ্ট স্থানে কবর খুঁড়িয়া আসিল এবং তিনজনে আমরা ধরাধরি করিয়া শাহ্জীর মৃতদেহটা সমাহিত করিলাম। গঙ্গার ঠিক উপরেই কাঁকরের একটুখানি পাড় ভাঙ্গিয়া ঠিক যেন কাহারও শেষ-শয্যা বিছাইবার জন্যই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল। কুড়ি-পঁচিশ হাত নীচেই জাহ্নবী-মায়ের প্রবাহ—মাথার উপরে বন্যলতার আচ্ছাদন। প্রিয়বস্তুকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে! বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনজনে পাশাপাশি উপবেশন করিলাম—আর একজন আমাদের কোলের কাছে মৃত্তিকাতলে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া ঘুমাইয়া রহিল। তখনও সূর্যোদয় হয় নাই—নীচে মন্দস্রোতা ভাগীরথীর কুলুকুলু শব্দ কানে আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল—মাথার উপরে আশে-পাশে বনের পাখিরা প্রভাতী গাহিতে লাগিল। কাল যে ছিল, আজ সে নাই। কাল প্রভাতে কে ভাবিয়াছিল, আজ এমনি করিয়া আমাদের নিশাবসান হইবে! কে জানিত, একজনের শেষ-মুহূর্ত এত কাছেই ঘনাইয়া উঠিয়াছিল!

হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ণকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, মা গঙ্গা, আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা! আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই। তাঁহার এই প্রার্থনা, এই নিবেদন যে কিরূপ মর্মান্তিক সত্য, তাহা তখনও তেমন বুঝিতে পারি নাই, যেমন দুদিন পরে পারিয়াছিলাম। ইন্দ্র একবার আমার মুখের পানে চোখ তুলিল, তার পরে উঠিয়া গিয়া সেই আর্ত নারীর ভূ-লুণ্ঠিত মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইয়া, তাঁহারই মত আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, দিদি, আমার কাছে তুমি চল—আমার মা এখনো বেঁচে আছেন, তিনি তোমাকে ফেলবেন না—কোলে টেনে নেবেন। তাঁর বড় মায়ার শরীর, একবার শুধু তাঁর কাছে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে চল। তুমি হিন্দুর মেয়ে দিদি, কিছুতেই মুসলমানী নও।

দিদি কথা কহিলেন না। মূর্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেমনিভাবে পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তার পরে উঠিয়া আসিয়া তিনজনে গঙ্গাস্নান করিলাম। দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, গালার চুড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মাটি দিয়া সিঁথির সিন্দুর তুলিয়া ফেলিয়া সদ্য-বিধবার সাজে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বলিলেন যে, শাহ্জী তাঁহার স্বামী ছিলেন। ইন্দ্র কিন্তু কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে দিদি।

দিদি বলিলেন, হাঁ বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইন্দ্র ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া কহিল, জাত দিলেন কেন?

দিদি বলিলেন, সে কথা ঠিক জানিনে ভাই। কিন্তু তিনি যখন দিলেন, তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্মিণী বৈ ত নয়। নইলে আমি নিজে হ'তে জাতও দিইনি—কোন দিন কোন অনাচারও করিনি।

ইন্দ্র গাঢ়স্বরে কহিল, সে আমি দেখেচি দিদি—সেই জন্যেই আমার যখন-তখন এই কথাই মনে হয়েচে,—আমাকে মাপ কোরো দিদি, তুমি কি ক'রে এর মধ্যে আছ,—তোমার কেমন ক'রে এমন দুর্মতি হয়েছিল! কিন্তু এখন আমি আর কোন কথা শুনব না, আমাদের বাড়িতে তোমাকে যেতেই হবে। এখনি চল।

দিদি অনেকক্ষণ পর্যন্ত নীরবে কি যেন চিন্তা করিয়া লইলেন, পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এখন আমি কোথাও যেতে পারিনে ইন্দ্রনাথ।

কেন পার না দিদি?

দিদি বলিলেন, আমি জানি, তিনি কিছু কিছু দেনা রেখে গেছেন। সেগুলি শোধ না দেওয়া পর্যন্ত ত কোথাও নড়তে পারিনে।

ইন্দ্র হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—সে আমিও জানি! তাড়ির দোকানে, গাঁজার দোকানে তার দেনা; কিন্তু তোমার তাতে কি? কার সাধ্যি তোমার কাছে টাকা চাইতে পারে? তুমি চল আমার সঙ্গে, কে তোমাকে আটকায় দেখি একবার।

অত দুঃখেও দিদি একটুখানি হাসিলেন। বলিলেন, ওরে পাগলা, যে আমাকে আটক

ক'রে রাখবে, সে যে আমার নিজেরই ধর্ম। স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ। সে পাওনাদারকে তুমি কি ক'রে বাধা দেবে ভাই! তা হয় না, আজ তোমরা বাড়ি যাও—আমার অল্পস্বল্প যা কিছু আছে বিক্রি ক'রে ধার শোধ দেবার চেষ্টা করি। কাল-পরশু একদিন এসো।

আমি এতক্ষণ প্রায় চুপ করিয়াই ছিলাম। এইবার কথা কহিলাম। বলিলাম, দিদি, আমার কাছে বাড়িতে আরও চার-পাঁচটা টাকা আছে—নিয়ে আসব? কথাটা শেষ না হইতেই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে ছোট ছেলেটির মত একেবারে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, আমার কপালের উপর তাঁহার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, না দাদা, আর এনে কাজ নেই! তুমি সেই যে টাকা পাঁচটি রেখে গিয়েছিলে, তোমার সে দয়া আমি মরণ পর্যন্ত মনে রাখব ভাই। আশীর্বাদ ক'রে যাই, তোমার বুকের ভিতর বসে ভগবান চিরদিন যেন অমনি ক'রে দুঃখীর জন্যে চোখের জল ফেলেন। বলিতে বলিতেই তাঁহার দু'চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বেলা আটটা-নয়টার সময় আমরা বাটী ফিরিতে উদ্যত হইলে, সেদিন তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত আসিলেন। যাবার সময় ইন্দ্রের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্বাদ করলুম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্বাদ করি, সে সাহস আমার হয় না। তুমি মানুষের আশীর্বাদের বাইরে। তবে ভগবানের শ্রীচরণে তোমাকে মনে-মনে আজ সঁপে দিলুম। তিনি তোমাকে যেন আপনার ক'রে নেন।

ইন্দ্রকে তিনি চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার বাধা দেওয়া সত্ত্বেও ইন্দ্র জোর করিয়া তাঁহার দুই পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, দিদি, এ জঙ্গলে তোমাকে একলা ফেলে রেখে যেতে আমার কিছুতেই মন সরচে না। আমার কি জানি কেন কেবলি মনে হচ্ছে তোমাকে আর দেখতে পাব না।

দিদি জবাব দিলেন না। সহসা মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সেই বনপথ ধরিয়া তাঁহার শোকাচ্ছন্ন শূন্য কুটীরে ফিরিয়া গেলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, তাঁহাকে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। কিন্তু একটিবারও আর তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না—তেমনি মাথা নত করিয়া একভাবে দৃষ্টির বাহিরে মিলাইয়া গেলেন। অথচ কেন যে তিনি ফিরিয়া চাহিলেন না, তাহা দুজনেই মনে-মনে অনুভব করিলাম।

তিনদিন পরে স্কুলের ছুটির পর বাহির হইয়াই দেখি, ইন্দ্র গেটের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখ অত্যন্ত শুষ্ক, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্যন্ত ধূলায় ভরা। এই অত্যন্ত দীন চেহারা দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। বড়লোকের ছেলে, বাহিরে সে একটু বিশেষ বাবু। এমন অবস্থা তাহার আমি ত দেখিই নাই—বোধ করি আর কেহও দেখে নাই। ইশারা করিয়া মাঠের দিকে আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ইন্দ্র বলিল, দিদি নেই—কোথায় চ'লে গেছেন। আমার মুখের প্রতিও আর সে চাহিয়া দেখিল না। কহিল, কাল থেকে আমি কত জায়গায় যে খুঁজেচি, কিন্তু দেখা পেলাম না। তোকে একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছেন, এই নে, বলিয়া একখানা ভাঁজ করা হলদে রঙের কাগজ আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়াই সে আর-একদিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বোধ করি, হৃদয় তাহার এতই পীড়িত, এতই শোকাতুর হইয়াছিল যে, কাহারও সঙ্গ বা কাহারও সহিত আলোচনা তাহার সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইখানেই আমি ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া ভাঁজ খুলিয়া কাগজখানি চোখের সামনে মেলিয়া ধরিলাম। চিঠিতে যাহা লেখা ছিল, এতকাল পরে তাহার সমস্ত কথা যদিচ মনে নাই, তথাপি অনেক কথাই স্মরণ করিতে পারি। চিঠিতে লেখা ছিল, শ্রীকান্ত, যাইবার সময় আমি তোমাদের আশীর্বাদ করিতেছি। শুধু আজ নয়, যতদিন বাঁচিব, ততদিন তোমাদের আশীর্বাদ করিব। কিন্তু আমার জন্য তোমরা দুঃখ করিয়ো না। ইন্দ্রনাথ আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে, সে জানি। কিন্তু তুমি তাহাকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া নিরস্ত করিয়ো। আমার সমস্ত কথা যে আজই তোমরা বুঝিতে পারিবে, তাহা নয়; কিন্তু বড় হইলে একদিন বুঝিবে সেই আশায় এই পত্র লিখিয়া গেলাম। কিন্তু নিজের কথা নিজের মুখেই ত তোমাদের কাছে

বলিয়া যাইতে পারিতাম! অথচ কেন যে বলি নাই—বলি-বলি করিয়াও কেন চুপ করিয়া গিয়াছি, সেই কথাটাই আজ না বলিতে পারিলে আর বলা হইবে না। আমার কথা—শুধু আমারই কথা নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা। আবার তাও ভাল কথা নয়। এ জন্মের পাপ যে আমার কত, তাহা ঠিক জানি না; কিন্তু পূর্বজন্মের সঞ্চিত পাপের যে আমার সীমা-পরিসীমা নাই, তাহাতে ত কোন সংশয় নাই। তাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি, তখনই মনে হইয়াছে, স্ত্রী হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা-গ্লানি করিয়া সে পাপের বোঝা আর ভারাক্রান্ত করিব না। কিন্তু এখন তিনি পরলোকে গিয়াছেন। আর গিয়াছেন বলিয়াই যে বলিতে আর দোষ নাই, সে মনে করি না। অথচ কেন জানি না, আমার এই অন্তহীন দুঃখের কথাগুলো তোমাদের না জানাইয়াও কোন মতেই বিদায় লইতে পারিতেছি না। শ্রীকান্ত, তোমার এই দুঃখিনী দিদির নাম অন্নদা। স্বামীর নাম কেন গোপন করিয়া গেলাম, তাহার কারণ—এই লেখাটুকুর শেষ পর্যন্ত পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিয়াছিলেন—কিন্তু মানুষ করিতে পারেন নাই। আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়িতেই ছিলেন—ইঁহাকেই হত্যা করিয়া স্বামী নিরুদ্দেশ হন। এ দুষ্কর্ম কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি ছেলেমানুষ আজ না বুঝিতে পারিলেও একদিন বুঝিবে। সে যাই হোক্‌, বল ত শ্রীকান্ত, এ দুঃখ কত বড়? এ লজ্জা কি মর্মান্তিক! তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল। কিন্তু স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন তিনি তাঁর স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন, সে জ্বালা আজও তোমার দিদির থামে নাই। যাক সে কথা! তার পরে সাত বৎসর পরে আবার দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদেরই বাটীর সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন। তাঁকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। আমার চক্ষুকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেন নাই। শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে, খিড়কির দ্বার খুলিয়া আমার স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু সবাই শুনিল, সবাই জানিল, অন্নদা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এ কলঙ্কের বোঝা আমাকে চিরদিনই বহিয়া বেড়াইতে হইবে। কোন উপায় নাই। কারণ স্বামী জীবিত থাকিতে আত্মপ্রকাশ করিতে পারি নাই। পিতাকে চিনিতাম, তিনি কোন মতেই তাঁর সন্তানঘাতীকে ক্ষমা করিতেন না। কিন্তু আজ যদিও আর সে ভয় নাই—আজ গিয়া তাঁকে বলিতে পারি, কিন্তু এ গল্প এতদিন পরে কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পিতৃগৃহে আমার আর স্থান নাই। তা ছাড়া আমি আবার মুসলমানী।

এখানে স্বামীর ঋণ যাহা ছিল, পরিশোধ করিয়াছি। আমার কাছে লুকানো দুটি সোনার মাকড়ি ছিল, তাহাই বেচিয়াছি। তুমি যে পাঁচটি টাকা একদিন রাখিয়া গিয়াছিলে, তাহা খরচ করি নাই। আমাদের বড় রাস্তার মোড়ের উপর যে মুদীর দোকান আছে, তাহার কর্তার কাছে রাখিয়া দিয়াছি—চাহিলেই পাইবে। মনে দুঃখ করিয়ো না ভাই। টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিলাম বটে, কিন্তু তোমার ওই কচি বুকটুকু আমি বুকে পুরিয়া লইয়া গেলাম। আর এইটি তোমার দিদির আদেশ শ্রীকান্ত, আমার কথা ভাবিয়া তোমরা মন খারাপ করিও না। মনে করিও, তোমার দিদি, যেখানেই থাকুক, ভালই থাকিবে; কেননা দুঃখ সহিয়া সহিয়া এখন কোন দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না। তাকে কিছুতেই আর ব্যথা দিতে পারে না। আমার ভাই দুটি, তোমাদের আমি কি বলিয়া যে আশীর্বাদ করিব খুঁজিয়া পাই না। তবে শুধু এই বলিয়া যাই—ভগবান পতিব্রতার যদি মুখ রাখেন, তোমাদের বন্ধুত্বটি যেন চিরদিন তিনি অক্ষয় করেন।

তোমাদের দিদি
অন্নদা

আজ একাকী গিয়া মুদীর কাছে দাঁড়াইলাম। পরিচয় পাইয়া মুদী একটি ছোট ন্যাকড়া বাহির করিয়া গেরো খুলিয়া দুটি সোনার মাকড়ি এবং পাঁচটি টাকা বাহির করিল। টাকা কয়টি আমার হাতে দিয়া কহিল, বহু, মাকড়ি দুইটি আমাকে একুশ টাকায় বিক্রী করিয়া শাহ্‌জীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কোথায় গিয়াছেন, তাহা জানি না। এই বলিয়া সে কাহার কত ঋণ, মুখে মুখে একটা হিসাব দিয়া কহিল, যাবার সময় বহুর হাতে সাড়ে-পাঁচ আনা পয়সা ছিল। অর্থাৎ বাইশটি মাত্র পয়সা অবলম্বন করিয়া এই নিরুপায় নিরাশ্রয় রমণী সংসারের সুদুর্গম পথে একাকী যাত্রা করিয়াছেন। পাছে তাঁহার সেই স্নেহাস্পদ বালক দুটি তাঁহাকে আশ্রয় দিবার ব্যর্থ প্রয়াসে, উপায়হীন বেদনায় ব্যথিত হয়, এই ভয়ে নিঃশব্দে অলক্ষ্যে বাহির হইয়া গিয়াছেন—কোথায়, কাহাকেও জানিতে পর্যন্ত দেন নাই। না দিন, কিন্তু আমার টাকা পাঁচটি নিলেন না। অথচ নিয়াছেন মনে করিয়া আমি আনন্দে, গর্বে কতদিন কত আকাশকুসুম সৃষ্টি করিয়াছিলাম—আজ সব আমার শূন্যে মিলাইয়া গেল। অভিমানে চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাহাই এই বুড়ার কাছে লুকাইবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেলাম। বার বার বলিতে লাগিলাম, ইন্দ্রের কাছে তিনি কতই লইয়াছেন, কিন্তু আমার কাছে কিছুই লইলেন না—যাইবার সময় না বলিয়া ফিরাইয়া দিয়া গেলেন।

কিন্তু এখন আর আমার মনে সে অভিমান নাই। বড় হইয়া বুঝিয়াছি, আমি এমন কি সুকৃতি করিয়াছি যে, তাঁহাকে দান করিতে পাইব! সেই জ্বলন্ত শিখায় যাহা আমি দিব, তাহাই বুঝি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে বলিয়াই দিদি আমার দান প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র! ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুর প্রস্তুত যে, সে যেখানে দান করিবে, আমি সেখানে হাত বাড়াইব! তা ছাড়া ইহাও ত বুঝিতে পারি, দিদি কাহার মুখ চাহিয়া সেই ইন্দ্রের কাছেও হাত পাতিয়াছিলেন। যাক সে কথা।

তার পরে অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি। কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখে আর কখনও তাঁহার দেখা পাই নাই। না পাই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসি মুখখানি চিরদিন তেম্‌নিই দেখিতে পাই। তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করি, তখন এই একটা কথা আমার কেবল মনে হয়, ভগবান! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্মিণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি। তাঁহাদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্তিতে রূপান্তরিত করিয়া জগতের সমস্ত নারীজাতিকে কর্তব্যের ধ্রুবপথে আকর্ষণ করিতেছ—তোমার সে ইচ্ছাও বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এতবড় বিড়ম্বনা নির্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম নিলে,—সমাজ, সংসার, সম্ভ্রম সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি ত আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর! কিন্তু যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সংগেই, তাঁকে তাঁর বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া, বেশ্যা বলিয়া! ইহাতে তোমারই বা কি লাভ? সংসারই বা পাইল কি?

হায় রে, কোথায় তাঁহার এইসব আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র—এ যদি একবার জানিতে পারিতাম! সে দেশ যেখানে যত দূরেই হউক, এ দেশের বাহিরে হইলেও হয়ত এতদিন গিয়া হাজির হইয়া বলিয়া আসিতাম—এই তোমাদের অন্নদা! এই তাঁর অক্ষয় কাহিনী! তোমাদের যে মেয়েটিকে কুলত্যাগিনী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছ, সকালবেলায় একবার তাঁর নামটাই লইও—অনেক দুষ্কৃতির হাত এড়াইতে পারিবে।

তবে আমি একটা সত্য বস্তু লাভ করিয়াছি। পূর্বেও একবার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এতবড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী তিনি ছাড়া, জগতে আর কেহ কি আছে, যে অন্নদাকে একটুখানি

স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।

তার পরে অনেক দিন ইন্দ্রকে আর দেখি নাই। গঙ্গার তীরে বেড়াইতে গেলেই দেখি, তাহার ডিঙি কূলে বাঁধা। জলে ভিজিতেছে, রৌদ্রে ফাটিতেছে। শুধু আর একটি দিনমাত্র আমরা উভয়ে সেই নৌকায় চড়িয়াছিলাম। সেই শেষ। তার পরে সেও আর চড়ে নাই, আমিও না। এই দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। শুধু আমাদের নৌকা-যাত্রার সমাপ্তি বলিয়াই নয়। সেদিন অখণ্ড স্বার্থপরতার যে উৎকট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহা সহজে ভুলিতে পারি নাই। সেই কথাটাই বলিব।

সেদিন কন্‌কনে শীতের সন্ধ্যা। আগের দিন খুব এক পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায়, শীতটা যেন ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতেছিল। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। চারিদিক জ্যোৎস্নায় যেন ভাসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ ইন্দ্র আসিয়া হাজির। কহিল, —তে থিয়েটার হবে, যাবি? থিয়েটারের নামে একেবারেই লাফাইয়া উঠিলাম। ইন্দ্র কহিল, তবে কাপড় পরে শীগ্‌গির আমাদের বাড়ি আয়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইলাম। সেখানে যাইতে হইলে ট্রেনে যাইতে হয়। ভাবিলাম, উহাদের বাড়ির গাড়ি করিয়া স্টেশনে যাইতে হইবে—তাই তাড়াতাড়ি।

ইন্দ্র কহিল, তা নয়। আমরা ডিঙিতে যাব। আমি নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম। কারণ গঙ্গার উজান ঠেলিয়া যাইতে হইলে বহু বিলম্ব হওয়াই সম্ভব। হয়ত বা সময়ে উপস্থিত হইতে পারা যাইবে না। ইন্দ্র কহিল, ভয় নেই, জোর হাওয়া আছে; দেরি হবে না। আমার নতুনদা কলকাতা থেকে এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান।

যাক, দাঁড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি—অনেক বিলম্বে ইন্দ্রর নতুনদা আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। চাঁদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু—অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবু। সিল্কের মোজা, চকচকে পাম্প-সু, আগাগোড়া ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে দস্তানা, মাথায় টুপি—পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই। আমাদের সাধের ডিঙিটাকে তিনি অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রর কাঁধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কষ্টে, অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাঁকিয়া বসিলেন।

তোর নাম কি রে?

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত।

তিনি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী—কান্ত—! শুধু কান্ত। নে, তামাক সাজ। ইন্দ্র, হুঁকো-কলকে রাখলি কোথায়? ছোঁড়াটাকে দে—তামাক সাজুক!

ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভঙ্গি করিয়া আদেশ করে না! ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, আমি তামাক সাজচি।

আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। কারণ, তিনি ইন্দ্রর মাসতুত ভাই, কলিকাতার অধিবাসী এবং সম্প্রতি এল.এ. পাশ করিয়াছেন। কিন্তু মনটা আমার বিগড়াইয়া গেল। তামাক সাজিয়া হুঁকা হাতে দিতে, তিনি প্রসন্নমুখে টানিতে টানিতে প্রশ্ন করিলেন, তুই থাকিস্ কোথায় রে কান্ত? তোর গায়ে ওটা কালোপানা কি রে? র‍্যাপার? আহা, র‍্যাপারের কি শ্রী! তেলের গন্ধে ভূত পালায়। ফুটচে—পেতে দে দেখি, বসি।

আমি দিচ্চি নতুনদা। আমার শীত করচে না—এই নাও, বলিয়া ইন্দ্র নিজের গায়ের আলোয়ানটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তিনি সেটা জড়ো করিয়া লইয়া বেশ করিয়া বসিয়া সুখে তামাক টানিতে লাগিলেন।

শীতের গঙ্গা। অধিক প্রশস্ত নয়। আধঘণ্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে গিয়া ভিড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল।

ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া কহিল, নতুনদা এ যে ভারি মুস্কিল হ'ল, হাওয়া প'ড়ে গেল। আর ত পাল চলবে না।

নতুনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে না, দাঁড় টানুক। কলিকাতাবাসী নতুনদার

ইন্দ্র ঈষৎ ম্লান হাসিয়া কহিল, দাঁড়! কারুর সাধ্য নেই নতুনদা, এই স্রোত ঠেলে

উজোন বয়ে যায়। আমাদের ফিরতে হবে।

প্রস্তাব শুনিয়া, নতুনদা এক মুহূর্তেই একেবারে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন, তবে আনলি কেন হতভাগা! যেমন ক'রে হোক তোকে পৌঁছে দিতেই হবে। আমার থিয়েটারে হারমোনিয়াম বাজাতেই হবে—তারা বিশেষ ক'রে ধরেচে। ইন্দ্র কহিল, তাদের বাজাবার লোক আছে নতুনদা। তুমি না গেলেও আটকাবে না।

না! আটকাবে না? এই মেড়োর দেশের ছেলেরা বাজাবে হারমোনিয়াম! চল্, যেমন ক'রে পারিস নিয়ে চল্। বলিয়া তিনি যেরূপ মুখভঙ্গি করিলেন, তাহাতে আমার গা জ্বলিয়া গেল। ই'হার বাজনা পরে শুনিয়াছিলাম; কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নাই।

ইন্দ্রর অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কহিলাম, ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না? কথাটা শেষ হইতে না হইতেই আমি চমকাইয়া উঠিলাম। তিনি এমনি দাঁতমুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন যে, সে মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে না হে। জানোয়ারের মত ব'সে থাকা হচ্ছে কেন?'

তার পরে একবার ইন্দ্র, একবার আমি গুণ টানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কখনো বা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া কখনো বা নীচে নামিয়া এবং সময়ে সময়ে সেই বরফের মত ঠাণ্ডা জলের ধার ঘেঁষিয়া অত্যন্ত কষ্ট করিয়া চলিতে হইল। আবার তারই মাঝে মাঝে বাবুর তামাক সাজার জন্য নৌকা থামাইতে হইল। অথচ বাবুটি ঠায় বসিয়া রহিলেন—এতটুকু সাহায্য করিলেন না। ইন্দ্র একবার তাঁহাকে হালটা ধরিতে বলায় জবাব দিলেন, তিনি দস্তানা খুলে এই ঠাণ্ডায় নিমোনিয়া করিতে পারিবেন না। ইন্দ্র বলিতে গেলো, না খুলে—

হ্যাঁ, দামী দস্তানাটা মাটি ক'রে ফেলি আর কি! নে—যা করছিস্ কর।

বস্তুতঃ আমি এমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। তাঁরই একটা অপদার্থ খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমাদের এত ক্লেশ সমস্ত চোখে দেখিয়াও তিনি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। অথচ আমরা বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কতই বা ছোট ছিলাম! পাছে এতটুকু ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার অসুখ করে, পাছে একফোঁটা জল লাগিয়া দামী ওভার-কোট খারাপ হইয়া যায়, পাছে নড়িলে চড়িলে কোনরূপ ব্যাঘাত হয়, এই ভয়েই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং অবিশ্রাম চেঁচামেচি করিয়া হুকুম করিতে লাগিলেন।

আরও বিপদ গঙ্গার রুচিকর হাওয়ায় বাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হইল এবং দেখিতে দেখিতে সে ক্ষুধা অবিশ্রান্ত বকুনির চোটে একেবারে ভীষণ হইয়া উঠিল। এদিকে চলিতে চলিতে রাত্রিও প্রায় দশটা হইয়া গেছে—থিয়েটারে পৌঁছিতে রাত্রি দুটা বাজিয়া যাইবে শুনিয়া, বাবু প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাত্রি যখন এগারোটা, তখন কলিকাতার বাবু কাবু হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ রে ইন্দ্র, এদিকে খোট্টামোট্টাদের বস্তি-টস্তি নেই? মুড়ি-টুড়ি পাওয়া যায় না?

ইন্দ্র কহিল, সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুনদা। সব জিনিস পাওয়া যায়।

তবে লাগা লাগা—ওরে ছোঁড়া—ঐ—টান্ না একটু জোরে—ভাত খাসনে? ইন্দ্র বল না তোর ওই ওটাকে, একটু জোর ক'রে টেনে নিয়ে চলুক।

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। যেমন চলিতেছিলাম, তেমনি ভাবেই অনতিকাল পরে একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে পাড়টা ঢালু ও বিস্তৃত হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সংকীর্ণ জলে তুলিয়া দিয়া আমরা দুজনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

বাবু কহিলেন, হাত-পা একটু খেলানো চাই। নাবা দরকার। অতএব ইন্দ্র তাঁহাকে কাঁধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে গঙ্গার শুভ্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

আমরা দুজনে তাঁহার ক্ষুধাশান্তির উদ্দেশে গ্রামের ভিতরে যাত্রা করিলাম। যদিচ বুঝিয়াছিলাম, এতরাত্রে এই দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে আহার্য সংগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নয়, তথাপি চেষ্টা না করিয়াও ত নিস্তার ছিল না। অথচ তাঁর একাকী থাকিতেও ইচ্ছা নাই। সে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেই, ইন্দ্র তৎক্ষণাৎ আহ্বান করিয়া কহিল, চল না নতুনদা, একলা তোমার ভয় করবে—আমাদের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে। এখানে চোর-টোর নেই, ডিঙি কেউ নেবে না—চল।

নতুনদা মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন, ভয়! আমরা দর্জিপাড়ার ছেলে, যমকে ভয় করিনে তা জানিস্! কিন্তু তা ব'লে ছোটলোকদের dirty পাড়ার মধ্যেও আমরা যাইনে। ব্যাটাদের গায়ের গন্ধ নাকে গেলেও আমাদের ব্যামো হয়। অথচ তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়—আমি তাঁহার পাহারায় নিযুক্ত থাকি এবং তামাক সাজি।

কিন্তু আমি তাঁর ব্যবহারে মনে মনে এত বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, ইন্দ্র আভাস দিলেও আমি কিছুতেই একাকী এই লোকটার সংসর্গে থাকিতে রাজী হইলাম না। ইন্দ্রর সঙ্গেই প্রস্থান করিলাম।

দর্জিপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন, ঠুন্-ঠুন্ পেয়ালা—

আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাঁহার সেই মেয়েলি নাকি-সুরে সঙ্গীতচর্চা শুনিতে শুনিতে গেলাম। ইন্দ্র নিজেও তাহার ভ্রাতার ব্যবহারে মনে মনে অতিশয় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কহিল, এরা কলকাতার লোক কিনা, জল-হাওয়া আমাদের মত সহ্য করতে পারে না—বুঝলি না শ্রীকান্ত!

আমি বলিলাম, হুঁ।

ইন্দ্র তখন তাঁহার অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয়—বোধ করি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্যই—দিতে দিতে চলিল। তিনি অচিরেই বি.এ. পাশ করিয়া ডেপুটি হইবেন, কথা-প্রসঙ্গে তাহাও কহিল। যাই হোক্, এতদিন পরে, এখন তিনি কোথাকার ডেপুটি কিংবা আদৌ সে কাজ পাইয়াছেন কি না, সে সংবাদ জানি না। কিন্তু মনে হয় যেন পাইয়াছেন না হইলে বাঙ্গালী ডেপুটির মাঝে মাঝে এত সুখ্যাতি শুনতে পাই কি করিয়া? তখন তাহার প্রথম যৌবন। শুনি, জীবনের এই সময়টায় নাকি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, এমন, আর কোন কালে নয়। অথচ ঘণ্টাকয়েকের সংসর্গেই যে নমুনা তিনি দেখাইয়াছিলেন, এতকালের ব্যবধানেও তাহা ভুলিতে পারা গেল না। তবে ভাগ্যে এমন সব নমুনা কদাচিৎ চোখে পড়ে; না হইলে বহু পূর্বেই সংসারটা রীতিমত একটা পুলিশ থানায় পরিণত হইয়া যাইত। কিন্তু যাক্ সে কথা।

কিন্তু ভগবানও যে তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সে খবরটা পাঠককে দেওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে পথ-ঘাট, দোকান-পত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল। সে গিয়া মুদীর দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের ভয়ে দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এই গভীরতা যে কিরূপ অতলস্পর্শী সে কথা যাহার জানা নাই, তাহাকে লিখিয়া বুঝানো যায় না। ইহারা অম্লরোগী নিষ্কর্মা জমিদারও নয়, বহুভারাক্রান্ত কন্যাদায়গ্রস্ত বাঙ্গালী গৃহস্থও নয়। সুতরাং ঘুমাইতে জানে। দিনের বেলা খাটিয়া-খুটিয়া রাত্রিতে একবার 'চারপাই' আশ্রয় করিলে, ঘরে আগুন না দিয়া, শুধুমাত্র চেঁচামেচি ও দোর নাড়ানাড়ি করিয়া জাগাইয়া দিব, এমন প্রতিজ্ঞা যদি স্বয়ং সত্যবাদী অর্জুন জয়দ্রথ-বধের পরিবর্তে করিয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকেও মিথ্যা-প্রতিজ্ঞা-পাপে দগ্ধ হইয়া মরিতে হইত তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারা যায়।

তখন উভয়ে বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া, এবং যত প্রকার ফন্দি মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া, আধঘণ্টা পরে রিক্তহস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য! জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই যে শূন্য! 'দর্জিপাড়া'র চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিঙি যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে—ইনি গেলেন কোথায়? দুজনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম—নতুনদা, ও নতুনদা! কিন্তু কোথায় কে! ব্যাকুল আহ্বান শুধু বাম ও দক্ষিণের সু-উচ্চ পাড়ে ধাক্কা খাইয়া অস্পষ্ট হইয়া বারংবার ফিরিয়া আসিল। এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে শীতকালে বাঘের জনশ্রুতিও শোনা যাইত। গৃহস্থ কৃষকেরা দলবদ্ধ 'হুড়ারে'র জ্বালায় সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। সহসা ইন্দ্র সেই কথায়ই বলিয়া বসিল, বাঘে নিলে না ত রে! ভয়ে সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল—সে কি কথা! ইতিপূর্বে তাঁহার নিরতিশয় অভদ্র ব্যবহারে আমি অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এতবড় অভিশাপ ত দিই নাই!

সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল, কিছু দূরে বালুর উপর কি একটা বস্তু চাঁদের আলোয় চক্‌চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, তাঁরই সেই বহুমূল্য পাম্প-সু'র একপাটি। ইন্দ্র সেই

ভিজা বালির উপরেই একেবারে শুইয়া পড়িল—শ্রীকান্ত রে! আমার মাসিমাও এসেছেন যে। আমি আর বাড়ি ফিরে যাব না। তখন ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল। আমরা যখন মুদীর দোকানে দাঁড়াইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতে-ছিলাম, তখন এই দিকের কুকুরগুলোও যে সমবেত আর্তচীৎকারে আমাদিগকে এই দুর্ঘটনার সংবাদটাই গোচর করিবার ব্যর্থপ্রয়াস পাইতেছিল, তাহা জলের মত চোখে পড়িল। তখনও দূরে তাহাদের ডাক শুনা যাইতেছিল। সুতরাং আর সংশয়মাত্র রহিল না যে নেকড়েগুলো তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া সেখানে ভোজন করিতেছে, তাহারই আশেপাশে দাঁড়াইয়া সেগুলো এখনও চেঁচাইয়া মরিতেছে।'

অকস্মাৎ ইন্দ্র সোজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমি যাব।' আমি সভয়ে তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম—তুমি পাগল হয়েচ ভাই! ইন্দ্র তাহার জবাব দিল না। ডিঙিতে ফিরিয়া গিয়া লগিটা তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিল। একটা বড় ছুরি পকেট হইতে বাহির করিয়া বাঁ-হাতে লইয়া কহিল, তুই থাক শ্রীকান্ত; আমি না এলে ফিরে গিয়ে বাড়িতে খবর দিস্—আমি চললুম।

তাহার মুখ অত্যন্ত পাণ্ডুর, কিন্তু চোখ-দুটো জ্বলিতে লাগিল। তাহাকে আমি চিনিয়াছিলাম। এ তাহার নিরর্থক শূন্য আস্ফালন নয় যে, হাত ধরিয়া দুটো ভয়ের কথা বলিলেই মিথ্যা দম্ভ মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবে। আমি নিশ্চয় জানিতাম, কোনমতেই তাহাকে নিরস্ত করা যাইবে না, সে যাইবেই। ভয়ের সহিত যে চির-অপরিচিত, তাহাকে আমিই বা কেমন করিয়া, কি বলিয়া বাধা দিব। যখন সে নিতান্তই চলিয়া যায়, তখন আর থাকিতে পারিলাম না—আমিও যা'হোক-একটা হাতে করিয়া অনুসরণ করিতে উদ্যত হইলাম। এইবার ইন্দ্র মুখ ফিরাইয়া আমার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, তুই ক্ষেপেচিস্ শ্রীকান্ত? তোর দোষ কি? তুই কেন যাবি?

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া এক মুহূর্তেই আমার চোখে জল আসিয়া পড়িল। কোন মতে গোপন করিয়া বলিলাম, তোমারই বা দোষ কি ইন্দ্র? তুমিই বা কেন যাবে?

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্র আমার হাতের বাঁশটা টানিয়া লইয়া নৌকায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, আমারও দোষ নেই ভাই, আমিও নতুনদাকে আনতে চাইনি। কিন্তু একলা ফিরে যেতেও পারব না, আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু আমারও ত যাওয়া চাই। কারণ পূর্বেই একবার বলিয়াছি, আমি নিজেও নিতান্ত ভীরু ছিলাম না। অতএব বাঁশটা পুনরায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া দাঁড়াইলাম, এবং আর বাদ-বিতণ্ডা না করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলাম। ইন্দ্র কহিল, বালির ওপর দৌড়ানো যায় না—খবরদার, সে চেষ্টা করিস নে—জলে গিয়ে পড়বি।

সুমুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দূরে জলের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পাঁচ-সাতটা কুকুর চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই! সন্তর্পণে আরও কতকটা অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া আছে। ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা!'

নতুনদা একগলা জলে দাঁড়াইয়া অব্যক্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—এই যে আমি!'

দুজনে প্রাণপণে ছুটিয়া গেলাম; কুকুরগুলো সরিয়া দাঁড়াইল, এবং ইন্দ্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকণ্ঠনিমজ্জিত মূর্ছিতপ্রায় তাহার দর্জিপাড়ার মাসতুত ভাইকে টানিয়া তীরে তুলিল। তখনও তাঁহার একটা পায়ে বহুমূল্য পাম্প, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায়-টুপি—ভিজিয়া ফুলিয়া ঢোল হইয়া উঠিয়াছে।' আমরা গেলে সেই যে তিনি হাততালি দিয়া 'ঠুন্-ঠুন্ পেয়ালা' ধরিয়াছিলেন, খুব সম্ভব, সেই সঙ্গীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের কুকুরগুলো দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং এই অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া এই মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করিয়াছিল। এতটা আসিয়াও আত্মরক্ষার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন; এবং এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে তুষারশীতল জলে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া এই অর্ধঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছিলেন।' কিন্তু

[illegible] ঘোর কাটাইয়া তাঁহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতেও, সে রাত্রে আমাদিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙ্গায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার একপাটি পাম্প?

সেটা ওখানে পড়িয়া আছে—সংবাদ দিতেই, তিনি সমস্ত দুঃখ ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া, তাহা অবিলম্বে হস্তগত করিবার জন্য সোজা খাড়া হইয়া উঠিলেন। তার পরে কোটের জন্য, গলাবন্ধের জন্য, মোজার জন্য, দস্তানার জন্য একে একে পুনঃপুনঃ শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এবং সে রাত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিরিয়া গিয়া নিজেদের ঘাটে পৌঁছিতে পারিলাম, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল এই বলিয়া আমাদের তিরস্কার করিতে লাগিলেন—কেন আমরা নির্বোধের মত সে সব তাঁহার গা হইতে তাড়াতাড়ি খুলিতে গিয়াছিলাম। না খুলিলে ত ধুলাবালি লাগিয়া এমন করিয়া মাটি হইতে পারিত না। আমরা খোট্টার দেশের লোক, আমরা চাষার সামিল, আমরা এসব কখনো চোখে দেখি নাই—এই সমস্ত অবিশ্রান্ত বকিতে বকিতে গেলেন। যে দেহটাতে ইতিপূর্বে একটি ফোঁটা জল লাগাইতেও তিনি ভয়ে সারা হইতেছিলেন, জামা-কাপড়ের শোকে সে দেহটাকেও তিনি বিস্মৃত হইলেন। উপলক্ষ্য যে আসল বস্তুকেও কেমন করিয়া বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যায়, তাহা এই সব লোকের সংসর্গে না আসিলে, এমন করিয়া চোখে পড়ে না।

রাত্রি দুটার পর আমাদের ডিঙি আসিয়া ঘাটে ভিড়িল। আমার যে র‍্যাপারখানির বিকট গন্ধে কলিকাতার বাবু ইতিপূর্বে মূর্ছিত হইতে ছিলেন সেইখানি গায়ে দিয়া, তাহারই অবিশ্রাম নিন্দা করিতে করিতে—পা মুছিতেও ঘৃণা হয়, তাহা পুনঃপুনঃ শুনাইতে শুনাইতে ইন্দ্রর খানি পরিধান করিয়া তিনি সে যাত্রা আত্মরক্ষা করিয়া বাটী গেলেন। যাই হোক, তিনি যে দয়া করিয়া ব্যাঘ্রকবলিত না হইয়া সশরীরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার এই অনুগ্রহের আনন্দেই আমরা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিলাম। এত উপদ্রব-অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিয়া আজ নৌকা চড়ার পরিসমাপ্তি করিয়া, এই দুর্জয় শীতের রাত্রে কোঁচার খুঁটমাত্র অবলম্বন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাটী ফিরিয়া গেলাম।

আট

লিখিতে বসিয়া আমি অনেক সময়ই আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এই সব এলোমেলো ঘটনা আমার মনের মধ্যে এমন করিয়া পরিপাটিভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল কে? যেমন করিয়া বলি, তেমন করিয়া ত তাহারা একটির পর একটি শৃঙ্খলিত হইয়া ঘটে নাই। আবার তাই কি সেই শিকলের সকল গ্রন্থিগুলোই বজায় আছে? তাও ত নাই। কত হারাইয়া গিয়াছে টের পাই, কিন্তু তবু ত শিকল ছিঁড়িয়া যায় না! কে তবে নূতন করিয়া এসব জোড়া দিয়া রাখে?

আরও একটা বিস্ময়ের বস্তু আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, বড়দের চাপে ছোটরা গুঁড়াইয়া যায়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে জীবনের প্রধান ও মুখ্য ঘটনাগুলিই ত কেবল মনে থাকিবার কথা। কিন্তু তাও ত দেখি না! ছেলেবেলার কথা-প্রসঙ্গে হঠাৎ এক সময়ে দেখিতে পাই, স্মৃতির মন্দিরে অনেক তুচ্ছ ক্ষুদ্র ঘটনাও কেমন করিয়া না জানি বেশ বড় হইয়া জাঁকিয়া বসিয়া গিয়াছে, এবং বড়রা ছোট হইয়া কবে কোথায় ঝরিয়া পড়িয়া গেছে। অতএব বলিবার সময়েও ঠিক তাহা ঘটে। তুচ্ছ বড় হইয়া দেখা দেয়, বড় মনেও পড়ে না। অথচ কেন যে এমন হয়, সে কৈফিয়ত আমি পাঠককে দিতে পারিব না, শুধু যা ঘটে তাই জানাইয়া দিলাম।

এমনি একটা তুচ্ছ বিষয় যে মনের মধ্যে এতদিন নীরবে, এমন সংগোপনে এত বড় হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার সন্ধান পাইয়া আমি নিজেও বড় বিস্মিত হইয়া গেছি! সেইটাই আজ পাঠককে বলিব। অথচ জিনিসটি ঠিক কি, তাহার সমস্ত পরিচয়টা না দেওয়া পর্যন্ত, চেহারাটা কিছুতেই পরিষ্কার হইবে না। কারণ গোড়াতেই যদি বলি—সে একটা প্রেমের ইতিহাস—মিথ্যাভাষণের পাপ তাহাতে হইবে না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা নিজের চেষ্টায় যতটা বড় হইয়া উঠিয়াছে, আমার ভাষাটা হয়ত তাহাকেও ডিঙ্গাইয়া যাইবে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বলা আবশ্যক।

সে বহুকাল পরের কথা। দিদির স্মৃতিটাও তখন ঝাপ্সা হইয়া গেছে। যাঁর মুখখানি

মনে করিলেই, কি জানি কেন প্রথম যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা আপনি মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইত, সে দিদিকে আর তখন তেমন করিয়া মনে পড়িত না। এ সেই সময়ের কথা। এক রাজার ছেলের নিমন্ত্রণে তাঁহার শিকার-পার্টিতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এঁর সঙ্গে অনেকদিন স্কুলে পড়িয়াছি, গোপনে অনেক আঁক কষিয়া দিয়াছি—তাই তখন ভারি ভাব ছিল। তার পরে এন্ট্রান্স ক্লাস হইতে ছাড়াছাড়ি। রাজার ছেলেদের স্মৃতিশক্তি কম, তাও জানি। কিন্তু ইনি যে মনে করিয়া চিঠিপত্র লিখিতে শু করিবেন, ভাবি নাই। মাঝে হঠাৎ একদিন দেখা। তখন সবে সাবালক হইয়াছেন। অনেক জমানো টাকা হাতে পড়িয়াছে এবং তার পরে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজার ছেলের কানে গিয়াছে—অতিরঞ্জিত হইয়াই গিয়াছে—রাইফেল চালাইতে আমার জুড়ি নাই, এবং আরও এত প্রকারের গুণগ্রামে ইতিমধ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি যে, একমাত্র সাবালক রাজপুত্রেরই অন্তরঙ্গ বন্ধু হইবার আমি উপযুক্ত। তবে কিনা, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা আপনার লোকের সুখ্যাতিটা একটু বাড়াইয়াই করে, না হইলে সত্যসত্যই যে অতখানি বিদ্যা অমন বেশি পরিমাণে ওই বয়সটাতেও অর্জন করিতে পারিয়াছিলাম, সে অহঙ্কার করা আমার শোভা পায় না, অন্ততঃ একটু বিনয় থাকা ভাল। কিন্তু যাক সে কথা। শাস্ত্রকারেরা বলেন, রাজা-রাজড়ার সাদর আহ্বান কখনো উপেক্ষা করিবে না। হিন্দুর ছেলে, শাস্ত্র অমান্য করিতেও ত আর পারি না। কাজেই গেলাম। স্টেশন হইতে দশ-বারো ক্রোশ পথ গজপৃষ্ঠে গিয়া দেখি, হাঁ, রাজপুত্রের সাবালকের লক্ষণ বটে! গোটা-পাঁচেক তাঁবু পড়িয়াছে। একটা তাঁর নিজস্ব, একটা বন্ধুদের, একটা ভৃত্যদের, একটায় খাবার বন্দোবস্ত। আর একটা অমনি একটু দূরে—সেটা ভাগ করিয়া জন-দুই বাইজী ও তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের আড্ডা।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। রাজপুত্রের খাস-কামরায় অনেকক্ষণ হইতেই যে সঙ্গীতের বৈঠক বসিয়াছে, তাহা প্রবেশমাত্রই টের পাইলাম। রাজপুত্র অত্যন্ত সমাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। এমন কি আদরের আতিশয্যে দাঁড়াইবার আয়োজন করিয়া, তিনি তাকিয়ায় ঠেস দিয়া শুইয়া পড়িলেন। বন্ধু-বান্ধবেরা বিহ্বল কলকণ্ঠে সংবর্ধনা করিতে লাগিলেন। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু সেটা, তাঁহাদের যে অবস্থা, তাহাতে অপরিচয়ের জন্য বাধে না।

এই বাইজীটি পাটনা হইতে অনেক টাকার শর্তে দুই সপ্তাহের জন্য আসিয়াছেন। এইখানে রাজকুমার যে বিবেচনা এবং যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাইজী সুশ্রী, অতিশয় সুকণ্ঠ এবং গান গাহিতে জানে।

আমি প্রবেশ করিতেই গানটা থামিয়া গিয়াছিল। তার পর সময়োচিত বাক্যালাপ ও আদব-কায়দা সমাপন করিতে কিছুক্ষণ গেল। রাজপুত্র অনুগ্রহ করিয়া আমাকে গান ফরমাস করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমটা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু অল্প কিছুক্ষণেই বুঝিলাম, এই সঙ্গীতের মজলিসে আমিই যা-হোক একটু কাণ্সা দেখি, আর সবাই ছুঁচোর মত কানা।

বাইজী প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পয়সার লোভে অনেক কাজই পারা যায় জানি। কিন্তু এই নিরেটের দরবারে বীণা-বাজানো বাস্তবিকই এতক্ষণ তাহার একটা সুকঠিন কাজ হইতেছিল। এইবার একজন সমঝদার পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল। তার পরে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সে যেন শুধুমাত্র আমার জন্যই, তাহার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সৌন্দর্য ও কণ্ঠের সমস্ত মাধুর্য দিয়া আমার চারিদিকের এই সমস্ত কদর্য মদোন্মত্ততা ডুবাইয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া আসিল।

বাইজী পাটনার লোক—নাম পিয়ারী। সে রাত্রে আমাকে সে যেমন করিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া গান শুনাইয়াছিল, বোধ করি এমন আর সে কখনও শুনায় নাই। মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। গান থামিলে আমার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল—বেশ!

পিয়ারী মুখ নীচু করিয়া হাসিল। তারপর দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল—সেলাম করিল না। মজলিস রাত্রির মত শেষ হইয়াছিল।

তখন দলের মধ্যে কেহ সুপ্ত, কেহ তন্দ্রাভিভূত—অধিকাংশই অচৈতন্য। নিজের তাঁবুতে যাইবার জন্য বাইজী যখন তাহার দলবল লইয়া বাহির হইতেছিল, আমি তখন আনন্দের আতিশয্যে হিন্দী করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, বাইজী, আমার বড় সৌভাগ্য যে, তোমার গান দু-সপ্তাহ ধ'রে প্রত্যহ শুনতে পাব।

বাইজী প্রথমটা থমকিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে পরিষ্কার বাঙলা করিয়া কহিল, টাকা নিয়েছি, আমাকে ত গাইতেই হবে, কিন্তু আপনি এই পনর-ষোল দিন ধ'রে এ'র মোসাহেবি করবেন? যান, কালকেই বাড়ি চ'লে যান।

কথা শুনিয়া আমি হতবুদ্ধি, কাঠ হইয়া গেলাম এবং কি জবাব দিব, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিবার পূর্বেই বাইজী বাহির হইয়া গেল। সকালে সোরগোল করিয়া কুমারজী শিকারে বাহির হইলেন। মদ্য-মাংসের আয়োজনটাই সবচেয়ে বেশি। সঙ্গে জন-দশেক শিকারী অনুচর। বন্দুক পনরটা, তার মধ্যে ছয়টা রাইফেল। স্থান—একটা আধশুক্‌নো নদীর উভয় তীর। এপারে গ্রাম, ওপারে বালুর চর। এপারে ক্রোশ ব্যাপিয়া বড় বড় শিমুলগাছ, ওপারে বালুর উপর স্থানে স্থানে কাশ ও কুশের ঝোপ। এইখানে এই পনরটা বন্দুক লইয়া শিকার করিতে হইবে। শিমুল গাছে-গাছে ঘুঘু গোটা-কয়েক দেখিলাম, মরা নদীর বাঁকের কাছটায় দুটো চকাচকি ভাসিতেছে বলিয়াই মনে হইল।

কে কোন্ দিকে যাইবেন, অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পরামর্শ করিতে করিতেই সবাই দু-এক পাত্র টানিয়া লইয়া দেহ ও মন বীরের মত করিয়া লইলেন। আমি বন্দুক রাখিয়া দিলাম। একে বাইজীর খোঁচা খাইয়া রাত্রি হইতেই মনটা বিকল হইয়া ছিল, তাহাতে শিকারের ক্ষেত্র দেখিয়া সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

কুমার প্রশ্ন করিলেন, কি হে শ্রীকান্ত, তুমি যে বড় চুপচাপ? ওকি, বন্দুক রেখে দিলে যে!

আমি পাখি মারি না।

সে কি হে? কেন, কেন?

আমি গোঁফ ওঠবার পর থেকে আর ছর্‌রা দেওয়া বন্দুক ছুঁড়িনি—ও আমি ভুলে গেছি।

কুমারসাহেব হাসিয়াই খুন। কিন্তু সে হাসির কতটা দ্রব্যগুণে, সে কথা অবশ্য আলাদা।

সুরেবুর চোখ-মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনিই এ দলের প্রধান শিকারী এবং রাজপুত্রের প্রিয় পার্শ্বচর। তাঁহার অব্যর্থ লক্ষ্যের খ্যাতি আমি আসিয়াই শুনিয়াছিলাম। রুষ্ট হইয়া কহিলেন, চিড়িয়া শিকারমে কুছ্ সরম হ্যায়?

আমারও মেজাজ ত ভাল ছিল না; সুতরাং জবাব দিলাম, সবাইকার নেহি হ্যায়, কিন্তু আমার হ্যায়! যাক্ আমি তাঁবুতে ফিরিলাম—কুমারসাহেব, আমার শরীরটা ভাল নেই,—বলিয়া ফিরিলাম। ইহাতে কে হাসিল, কে চোখ ঘুরাইল, কে মুখ ভ্যাঙাইল, তাহা চাহিয়াও দেখিলাম না।

তখন সবেমাত্র তাঁবুতে ফিরিয়া ফরাসের উপর চিৎ হইয়া পড়িয়াছি এবং আর-এক পেয়ালা চা আদেশ করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়াছি, বেয়ারা আসিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল, বাইজী একবার সাক্ষাৎ করিতে চায়। ঠিক এইটি আশাও করিতেছিলাম, আশংকাও করিতে-ছিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন সাক্ষাৎ করিতে চায়?

তা' জানিনে।

তুমি কে?

আমি বাইজীর খানসামা।

তুমি বাঙ্গালী?

আজ্ঞে হাঁ—পরামাণিক। নাম রতন।

বাইজী হিন্দু?

রতন হাসিয়া বলিল, নইলে থাকব কেন বাবু?

আমাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া তাঁবুর দরজা দেখাইয়া দিয়া রতন সরিয়া গেল। পর্দা তুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, বাইজী একাকিনী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। কাল রাত্রে পেশোয়াজ ও ওড়নায় ঠিক চিনিতে পারি নাই; আজ দেখিয়াই টের পাইলাম, বাইজী যেই হোক, বাঙ্গালীর মেয়ে বটে। একখণ্ড মূল্যবান কার্পেটের উপর গরদের শাড়ি পরিয়া বাইজী বসিয়া আছে। ভিজা এলোচুল পিঠের উপর ছড়ানো; হাতের কাছে পানের সাজ-সরঞ্জাম, সুমুখে গুড়্গুড়িতে তামাক সাজা। আমাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া হাসিমুখে সুমুখের আসনটা দেখাইয়া দিয়া কহিল, বোসো। তোমার সুমুখে তামাকটা খাবো না আর—ওরে রতন, গুড়্গুড়িটা নিয়ে যা। ওকি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোসো না?

রতন আসিয়া গড়্গড়ি লইয়া গেল। বাইজী কহিল,—তুমি তামাক খাও তা জানি; কিন্তু দেব কিসে? অন্য জায়গায় যা কর, তা কর। কিন্তু আমি জেনেশুনে আমার গড়্গড়িটা ত আর তোমাকে দিতে পারিনে! আচ্ছা, চুরুট আনিয়ে দিচ্ছি—ওরে ও—

থাক থাক, চুরুটে কাজ নেই; আমার পকেটেই আছে।

আছে? বেশ তা হ'লে ঠাণ্ডা হয়ে একটু বোসো; ঢের কথা আছে। ভগবান কখন যে কার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন, তা কেউ বলতে পারে না। স্বপ্নের অগোচর। শিকারে গিয়েছিলে, হঠাৎ ফিরে এলে যে?

ভাল লাগলো না।

না লাগবারই কথা। কি নিষ্ঠুর এই পুরুষমানুষ জাতটা। অনর্থক জীবহত্যা ক'রে কি আমোদ পায়, তা তারাই জানে। বাবা ভাল আছেন?

বাবা মারা গেছেন।

মারা গেছেন! মা?

তিনি আগেই গেছেন।

ওঃ—তাইতেই, বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। একবার মনে হইল তাহার চোখ দুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল। কিন্তু সে হয়ত আমার মনের ভুল। পরক্ষণেই যখন সে কথা কহিল, তখন আর ভুল রহিল না যে, এই মুখরা নারীর চটুল ও পরিহাস-লঘু কণ্ঠস্বর সত্যসত্যই মৃদু ও আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। কহিল, তা হ'লে যত্নটত্ন করবার আর কেউ নেই বল। পিসিমার ওখানেই আছ ত? নইলে আর থাকবেই বা কোথায়? বিয়ে হয়নি সে ত দেখতেই পাচ্ছি। পড়াশুনা করচ? না, তাও ঐ সঙ্গে শেষ ক'রে দিয়েচ?

এতক্ষণ পর্যন্ত ইহার কৌতূহল এবং প্রশ্নমালা আমি যথাসাধ্য সহ্য করিয়া গিয়াছি। কিন্তু এই শেষ কথাটা কেমন যেন হঠাৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। বিরক্ত এবং রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, আচ্ছা, কে তুমি? তোমাকে জীবনে কখনো দেখেচি ব'লেও ত মনে হয় না। আমার সম্বন্ধে এত কথা তুমি জানতে চাইচই বা কেন? আর জেনেই বা তোমার লাভ কি?

বাইজী রাগ করিল না, হাসিল; কহিল, লাভ-ক্ষতিই কি সংসারে সব? মায়া, মমতা, ভালবাসাটা কি কিছু নয়? আমার নাম পিয়ারী, কিন্তু, আমার মুখ দেখেও যখন চিনতে পারলে না, তখন ছেলেবেলার ডাকনাম শুনেই কি আমাকে চিনতে পারবে? তা ছাড়া আমি তোমাদের—ও গ্রামের মেয়েও নই।

আচ্ছা, তোমাদের বাড়ি কোথায় বল?

না, সে আমি বলব না।

তবে তোমার বাবার নাম কি বল?

বাইজী জিভ কাটিয়া কহিল, তিনি স্বর্গে গেছেন। ছি-ছি, তাঁর নাম কি আর এ মুখে উচ্চারণ করতে পারি?

আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, তা যদি না পারো, আমাকে চিনলে কি ক'রে সে কথা বোধ হয় উচ্চারণ করতে দোষ হবে না?

পিয়ারী আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া আবার মুখ টিপিয়া হাসিল। কহিল, না, তাতে দোষ নাই। কিন্তু সে কি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে?

বলেই দেখ না।

পিয়ারী কহিল, তোমাকে চিনেছিলাম ঠাকুর, দুর্বুদ্ধির তাড়ায়—আর কিসে?, তুমি যত চোখের জল আমার ফেলেছিলে, ভাগ্যি সূর্য্যিদেব তা শুকিয়ে নিয়েচেন, নইলে চোখের জলের একটা পুকুর হয়ে থাকতো। বলি বিশ্বাস করতে পারো কি?

সত্যই বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু সে আমারই ভুল। তখন কিছুতেই মনে পড়িল না যে, পিয়ারীর ঠোঁটের গঠনই এইরূপ—যেন সব কথাই সে তামাসা করিয়া বলিতেছে, এবং মনে মনে হাসিতেছে। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সত্যসত্যই হাসিয়া উঠিল। কিন্তু এতক্ষণে কেমন করিয়া জানি না, আমার সহসা মনে হইল, সে নিজের লজ্জিত অবস্থা যেন সামলাইয়া ফেলিল। সহাস্যে কহিল, না ঠাকুর,

তোমাকে যত বোকা ভেবেছিলাম, তুমি তা নও। এ যে আমার একটা বলার ভঙ্গি, তা তুমি ঠিক ধরেচ। কিন্তু তাও বলি, তোমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমানও আমার এই কথাটায় অবিশ্বাস করতে পারেনি। তা এতই যদি বুদ্ধিমান, মোসাহেবী ব্যবসাটা ধরা হ'ল কেন? এই চাকরি ত তোমাদের মত মানুষ দিয়ে হয় না। যাও, চট্‌পট স'রে পড়।

ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলাম না। সহজভাবে বলিলাম, চাকরি যতদিন হয়, ততদিনই ভাল। বসে না থাকি বেগার খাটি—জান ত? আচ্ছা, এখন উঠি। বাইরের লোক হয়ত বা কিছু মনে ক'রে বসবে।

পিয়ারী কহিল, করলে সে ত তোমার সৌভাগ্য ঠাকুর! এ কি আর একটা আপসোসের কথা?

উত্তর না দিয়া যখন আমি দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন সে অকস্মাৎ হাসির লহর তুলিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু দেখো ভাই, আমার সেই চোখের জলের গল্পটা যেন ভুলে যেয়ো না। বন্ধু-মহলে, কুমারসাহেবের দরবারে প্রকাশ করলে—চাই কি তোমার নসিবটাই হয়ত ফিরে যেতে পারে।

আমি নিরুত্তরে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই নির্লজ্জার হাসি এবং কদর্য পরিহাস আমার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেন বিছার কামড়ের মত জ্বলিতে লাগিল।

স্বস্থানে আসিয়া এক পেয়ালা চা খাইয়া চুরুট ধরাইয়া মাথা যথাসম্ভব ঠাণ্ডা করিয়া ভাবিতে লাগিলাম—কে এ? আমার পাঁচবছর বয়সের ঘটনা পর্যন্ত, আমি স্পষ্ট মনে করিতে পারি। কিন্তু অতীতের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, কোথাও এই পিয়ারীকে খুঁজিয়া পাইলাম না। অথচ এ আমাকে বেশ চিনে। পিসিমার কথা পর্যন্ত জানে। আমি যে দরিদ্র, ইহাও তাহার অবিদিত নহে। সুতরাং আর কোন অভিসন্ধি থাকিতেই পারে না। অথচ যেমন করিয়া পারে, আমাকে সে এখান হইতে তাড়াইতে চায়। কিন্তু কিসের জন্য? আমার থাকা-না-থাকায় ইহার কি? তখন কথায় কথায় বলিয়াছিল, সংসারে লাভ-ক্ষতিই কি সমস্ত? ভালবাসাটাসা কিছু নাই? আমি যাহাকে কখনো চোখেও দেখি নাই, তাহার মুখের এই কথাটা মনে করিয়া আমার হাসি পাইল। কিন্তু সমস্ত কথাবার্তা ছাপাইয়া তাহার শেষ বিদ্রূপটাও আমাকে যেন অবিশ্রান্ত মর্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় শিকারীর দল ফিরিয়া আসিল। চাকরের মুখে শুনিলাম আটটা ঘুঘুপাখি মারিয়া আনা হইয়াছে। কুমার ডাকিয়া পাঠাইলেন; অসুস্থতার ছুতা করিয়া বিছানায় পড়িয়াই রহিলাম; এবং এইভাবেই অনেক রাত্রি পর্যন্ত পিয়ারীর গান এবং মাতালের বাহবা শুনিতে পাইলাম।

তার পরের তিন-চারিদিন প্রায় একভাবেই কাটিয়া গেল। 'প্রায়' বলিলাম—কারণ, এক শিকার করা ছাড়া আর সমস্তই একপ্রকার। পিয়ারীর অভিশাপ ফলিল না কি, প্রাণিহত্যার প্রতি আর কাহারো কোন উৎসাহই দেখিলাম না। কেহ তাঁবুর বাহির হইতেই যেন চাহে না। অথচ আমাকেও ছাড়িয়া দেয় না। আমার পলাইবার আর যে কোন বিশেষ কারণ ছিল তাহা নয়। কিন্তু এই বাইজীর প্রতি আমার কি যে ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল; সে হাজির হইলেই, আমাকে কিসে যেন মারিতে থাকিত; উঠিয়া গিয়া স্বস্তি পাইতাম। উঠিতে না পারিলে, অন্ততঃ আর কোনদিকে মুখ ফিরাইয়া, কাহারও সহিত কথাবার্তা কহিয়া, অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিতাম। অথচ সে প্রতিমুহূর্তেই আমার সহিত চোখাচোখি করিবার সহস্র কৌশল করিত, তাহাও টের পাইতাম। প্রথম দুই-একদিন সে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই পরিহাসের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু আমার ভাব দেখিয়া সেও একেবারে নির্বাক হইয়া গেল।

সেদিন ছিল শনিবার। আমি আর কোনমতেই থাকিতে পারি না। খাওয়া-দাওয়ার পরেই রওনা হইয়া পড়িব স্থির হওয়ায়—আজ সকাল হইতেই গান-বাজনার বৈঠক বসিয়া গিয়াছিল। শ্রান্ত হইয়া বাইজী গান থামাইয়াছে, হঠাৎ গল্পের সেরা গল্প—ভূতের গল্প উঠিয়া পড়িল। নিমিষে যে যেখানে ছিল আগ্রহে বক্তাকে ঘেরিয়া ধরিল।

প্রথমটা আমি তাচ্ছিল্যভরেই শুনিতেছিলাম। কিন্তু শেষে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়া বসিলাম। বক্তা ছিলেন একজন গ্রামেরই হিন্দুস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক। গল্প কেমন করিয়া

বলিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বলিতেছিলেন, প্রেতযোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে—যেন আজিকার এই শনিবার অমাবস্যা তিথিতে, এই গ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যান। তিনি যে জাত, যেমন লোকই হন, এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রে মহাশ্মশানে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আজিকার ঘোর রাত্রে এই শ্মশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়; তাহার কণ্ঠস্বর শুনা যায় এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথাবার্তা পর্যন্ত বলা যায়। আমি ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি আমার কাছে আসুন। আমি নিকটে সরিয়া গেলাম। তিনি প্রশ্ন করিলেন, আপনি বিশ্বাস করেন না?

না।

কেন করেন না? না করার বিশেষ কোন হেতু আছে?

না।

তবে? এই গ্রামেই এমন দুই-একজন সিদ্ধ সাধক আছেন, যাঁরা চোখে দেখেছেন। তবুও যে আপনারা বিশ্বাস করেন না, মুখের উপর হাসেন, সে শুধু দু'পাতা ইংরিজি পড়ার ফল। বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা ত নাস্তিক—স্লেচ্ছ। কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িল। দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। বলিলাম, দেখুন এ সম্বন্ধে আমি তর্ক করতে চাইনে। আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আমি নাস্তিকই হই, স্লেচ্ছই হই, ভূত মানিনে। যাঁরা চোখে দেখেচেন বলেন—হয় তাঁরা ঠকেচেন, নাহয় তাঁরা মিথ্যাবাদী—এই আমার ধারণা।

ভদ্রলোক খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আপনি আজ রাত্রে শ্মশানে যেতে পারেন? আমি হাসিয়া বলিলাম, পারি। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক শ্মশানেই অনেক রাত্রে গেছি।

বৃদ্ধ চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, আপ্ সেখি মৎ করো বাবু। বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া, এই শ্মশানের মহা ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। এ শ্মশান যে যে-সে স্থান নয়, ইহা মহাশ্মশান, এখানে সহস্র নরমুণ্ড গণিয়া লইতে পারা যায়, এ শ্মশানে মহাভৈরবী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রত্যহ রাত্রে নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়া খেলিয়া নৃত্য করিয়া বিচরণ করেন, তাঁহাদের খল্‌খল্ হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিশ্বাসী ইংরাজ, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটেরও হৃদ্‌স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—এমনি সব লোমহর্ষণ কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে দিনের বেলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, পিয়ারী কোন একসময়ে কাছে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছে এবং কথাগুলো যেন সর্বাঙ্গ দিয়া গিলিতেছে।

এইরূপে এই মহাশ্মশানের ইতিহাস যখন শেষ হইল, তখন বক্তা গর্বভরে আমার প্রতি কটাক্ষ হানিয়া প্রশ্ন করিলেন, কেয়া বাবুসাহেব, আপ্ যায়েগা?

যায়েগা বৈকি!

যায়েগা! আচ্ছা, আপ্‌কা খুশি। প্রাণ যানেসে—

আমি হাসিয়া বলিলাম, না বাবুজী, না। প্রাণ গেলেও তোমাকে দোষ দেওয়া হবে না, তোমার ভয় নেই। কিন্তু অজানা জায়গায় আমি ত শুধু হাতে যাব না—বন্দুক নিয়ে যাব।

তখন আলোচনাটা একটু অতিমাত্রায় খর হইয়া উঠিল দেখিয়া আমি উঠিয়া গেলাম। আমি পাখি মারিতে পারি না কিন্তু বন্দুকের গুলিতে ভূত মারিতে পারি; বাঙ্গালীরা ইংরাজী পড়িয়া হিন্দুশাস্ত্র মানে না, তাহারা মুরগি খায়; তাহারা মুখে যত বড়াই করুক, কার্যকালে ভাগিয়া যায়; তাহাদিগকে তাড়া দিলেই তাহাদের দাঁতকপাটি লাগে, এই প্রকারের সমালোচনা চলিতে লাগিল। অর্থাৎ যে সকল সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের অবতারণা করিলে আমাদের রাজা-রাজড়াদের আনন্দোদয় হয় এবং তাহাদের মস্তিষ্ককে অতিক্রম করিয়া যায় না—অর্থাৎ তাঁহারাও দুকথা কহিতে পারেন, সেই সব কথাবার্তা।

ইহাদের দলে একটিমাত্র লোক ছিল, যে স্বীকার করিয়াছিল, সে শিকার করিতে জানে না; এবং কথাটাও সে সচরাচর একটু কম কহিত এবং মদও একটু কম করিয়া খাইত। তাহার নাম পুরুষোত্তম। সে সন্ধ্যার সময় আসিয়া আমাকে ধরিল—সঙ্গে যাইবে। কারণ

ইতিপূর্বে সেও কোনদিন ভূত দেখে নাই। অতএব আজ যদি এমন সুবিধা ঘটিয়াছে, তবে ত্যাগ করিবে না। বলিয়া খুব হাসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ভূত মান না?

একেবারে না।

কেন মান না?

মানি না, নেই ব'লে, এই বলিয়া সে প্রচলিত তর্ক তুলিয়া বারংবার অস্বীকার করিতে লাগিল। আমি কিন্তু অত সহজে সঙ্গে লইতে স্বীকার করিলাম না। কারণ বহুদিনের অভিজ্ঞতায় জানিয়াছিলাম, এ সকল যুক্তিতর্কের ব্যাপার নয়—সংস্কার। বুদ্ধি দিয়া যাহারা একেবারেই মানে না তাহারাও ভয়ের জায়গায় আসিয়া পড়িলে ভয়ে মূর্ছা যায়।

পুরুষোত্তম কিন্তু নাছোড়বান্দা। সে মালকোঁচা মারিয়া পাকা বাঁশের লাঠি ঘাড়ে ফেলিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আপনার ইচ্ছা হয় বন্দুক নিন, কিন্তু আমার হাতে লাঠি থাকতে ভূতই বল আর প্রেতই বল, কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেব না।

কিন্তু সময়ে লাঠি হাতে থাকবে ত?

ঠিক থাকবে বাবু, আপনি তখন দেখে নেবেন। এক ক্রোশ পথ—রাত্রি এগারোটার মধ্যেই রওনা হওয়া চাই।

দেখিলাম, তাহার আগ্রহটা যেন একটু অতিরিক্ত।

যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব আছে। আমি তাঁবুর বাহিরে পায়চারি করিয়া এই ব্যাপারটিই মনে মনে আন্দোলন করিয়া দেখিতেছিলাম—জিনিসটা সম্ভবতঃ কি হইতে পারে। এ সকল বিষয়ে আমি যে লোকের শিষ্য তাহাতে ভূতের ভয়টা আর ছিল না। ছেলে-বেলার কথা মনে পড়ে—সেই একটি রাত্রে যখন ইন্দ্র কহিয়াছিল, শ্রীকান্ত মনে মনে রাম নাম কর! ছেলেটি আমার পিছনে বসিয়া আছে—সেই দিনই শুধু ভয়ে চৈতন্য হারাইয়াছিলাম, আর না। সুতরাং সে ভয় ছিল না। কিন্তু আজিকার গল্পটা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এটাই বা কি? ইন্দ্র নিজে ভূত বিশ্বাস করিত। কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই। আমি নিজেও মনে মনে যত অবিশ্বাসই করি, স্থান এবং কাল-মাহাত্ম্যে গা ছমছম যে না করিত, তাহা নয়। সহসা সম্মুখের এই দুর্ভেদ্য অমাবস্যার অন্ধকারের পানে চাহিয়া আমার আর একটা অমা-রজনীর কথা মনে পড়িয়া গেল, সে দিনটাও এমনি শনিবারই ছিল।

বৎসর পাঁচ-ছয় পূর্বে আমাদের প্রতিবেশিনী হতভাগিনী নিরুদিদি বালবিধবা হইয়াও যখন সূতিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া ছয় মাস ভুগিয়া ভুগিয়া মরেন, তখন সেই মৃত্যুশয্যার পাশে আমি ছাড়া আর কেহ ছিল না। বাগানের মধ্যে একখানি মাটির ঘরে তিনি একাকিনী বাস করিতেন। সকলের সর্বপ্রকার রোগে, শোকে, সম্পদে, বিপদে এতবড় সেবাপরায়ণা, নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী রমণী পাড়ার মধ্যে আর কেহ ছিল না। কত মেয়েকে তিনি যে লেখাপড়া শিখাইয়া, সূচের কাজ শিখাইয়া, গৃহস্থালির সর্বপ্রকার দুরূহ কাজকর্ম শিখাইয়া দিয়া, মানুষ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। একান্ত স্নিগ্ধ শান্তস্বভাব এবং সুনির্মল চরিত্রের জন্য পাড়ার লোকও তাঁহাকে বড় কম ভালবাসিত না। কিন্তু সেই নিরুদিদির ত্রিশ বৎসর বয়সে হঠাৎ যখন পা-পিছলাইয়া গেল এবং ভগবান এই সুকঠিন ব্যাধির আঘাতে তাঁহার আজীবন উঁচু মাথাটি একেবারে মাটির সঙ্গে একাকার করিয়া দিলেন, তখন পাড়ার কোন লোকই দুর্ভাগিনীকে তুলিয়া ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল না। দোষস্পর্শলেশহীন নির্মল হিন্দুসমাজ হতভাগিনীর মুখের উপরেই তাহার সমস্ত দরজা-জানালা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। সুতরাং যে পাড়ার মধ্যে এমন একটি লোকও বোধ করি ছিল না, যে কোন-না-কোন প্রকারে নিরুদিদির সযত্ন সেবা উপভোগ করে নাই, সেই পাড়ারই একপ্রান্তে অন্তিম-শয্যা পাতিয়া এই দুর্ভাগিনী ঘৃণায় লজ্জায়, নিঃশব্দে নতমুখে একাকিনী দিনের পর দিন ধরিয়া এই সুদীর্ঘ ছয়মাস-কাল বিনা চিকিৎসায় তাহার পদস্খলনের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করিয়া শ্রাবণের এক গভীর রাত্রে ইহকাল ত্যাগ করিয়া যে-লোকে চলিয়া গেলেন তাহার অভ্রান্ত বিবরণ যে-কোনো স্মার্ত ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত।

আমার পিসিমা যে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তাহাকে সাহায্য করিতেন, এ কথা আমি এবং বাটীর বুড়ী ঝি ছাড়া আর জগতে কেহই জানে না। পিসিমা একদিন দুপুরবেলা আমাকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা শ্রীকান্ত, তোরা ত এমন অনেকেরই রোগে শোকে গিয়ে

দেখিস; এই ছুঁড়িটাকে এক-আধবার গিয়ে দেখিস না। সেই অবধি আমি মাঝে মাঝে গিয়া দেখিতাম এবং পিসিমার পয়সায় এটা-ওটা-সেটা কিনিয়া দিয়া আসিতাম। তাঁর শেষকালে একা আমিই কাছে ছিলাম। মরণকালে অমন পরিপূর্ণ বিকার এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান আমি আর দেখি নাই। বিশ্বাস না করিলেও যে ভয়ে গা ছম্‌ছম্‌ করে, আমি সেই কথাটাই বলিতেছি।

সেদিন শ্রাবণের অমাবস্যা। রাত্রি বারোটার পর ঝড় এবং জলের প্রকোপে পৃথিবী যেন উপড়াইয়া যাইবার উপক্রম করিল। সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ; আমি খাটের অদূরে বহু প্রাচীন অর্ধভগ্ন একটা ইজিচেয়ারে শুইয়া আছি। নিরুদিদি স্বাভাবিক মুক্ত-কণ্ঠে আমাকে কাছে ডাকিয়া হাত তুলিয়া আমার কানটা তাঁর মুখের কাছে আনিয়া, ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিলেন, শ্রীকান্ত, তুই বাড়ি যা।

সে কি নিরুদি, এই ঝড়-জলের মধ্যে?

তা হোক। প্রাণটা আগে। ভুল বকিতেছেন ভাবিয়া বলিলাম, আচ্ছা যাচ্ছি।—জলটা একটু থামুক। নিরুদিদি ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, না, না, শ্রীকান্ত, তুই যা। যা ভাই যা—আর এতটুকু দেরি করিস নে—তুই পালা। এইবার তাঁর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিতে আমার বুকের ভিতরটায় ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। বলিলাম, আমাকে যেতে বলছ কেন?

প্রত্যুত্তরে তিনি আমার হাতটা টানিয়া লইয়া রুদ্ধ জানালার প্রতি লক্ষ্য করিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, যাবিনি, তবে কি প্রাণটা দিবি? দেখ্‌চিস নে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে কালো কালো সেপাই এসেচে? তুই আছিস বলে ঐ জানালা দিয়ে আমাকে শাসাচ্চে?

তার পরে সেই যে শুরু করিলেন—ঐ খাটের তলায়! ওই মাথার শিয়রে! ওই মারতে আসচে! ওই নিলে! ওই ধরলে! এ চীৎকার শুধু থামিল শেষরাত্রে যখন প্রাণটাও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

ব্যাপারটা আজও আমার বুকের মধ্যে কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া আছে। সে রাত্রে ভয় পাইয়াছিলাম ত বটেই! বোধ করি বা যেন কিসব চেহারাও দেখিয়াছিলাম। এখন মনে করিয়া হাসি পায় সত্য; কিন্তু সেদিন অমাবস্যার ঘোর দুর্যোগ তুচ্ছ করিয়াও, বোধ করি বা ছুটিয়া পলাইতাম, যদি না এ কথা অসংশয়ে বিশ্বাস হইত—কপাট খুলিয়া বাহির হইলেই নিরু-দিদির কালো কালো সেপাই-সান্ত্রীর ভিড়ের মধ্যে গিয়া পড়িব। অথচ এসব কিছুই নাই, কিছুই ছিল না, তাহাও জানিতাম; মুমূর্ষু যে কেবলমাত্র নিদারুণ বিকারের ঘোরেই প্রলাপ বকিতেছিলেন, তাহাও বুঝিয়াছিলাম। অথচ—

বাবু?

চমকিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, রতন।

কি রে?

বাইজী একবার প্রণাম জানাচ্চেন।

যেমন বিস্মিত হইলাম, তেমনি বিরক্ত হইলাম। এতরাত্রে অকস্মাৎ আহ্বান করাটা শুধু যে অত্যন্ত অপমানকর স্পর্ধা বলিয়া মনে হইল, তাহা নয়; গত তিন-চারি দিনের উভয়-পক্ষের ব্যবহারগুলো স্মরণ করিয়াও এই প্রণাম পাঠানোটা যেন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বলিয়া ঠেকিল। কিন্তু ভৃত্যের সম্মুখে কোনরূপ উত্তেজনা পাছে প্রকাশ পায়, সেই আশঙ্কায় নিজেকে প্রাণপণে সংবরণ করিয়া কহিলাম, আজ আমার সময় নেই রতন, আমাকে বেরুতে হবে; কাল দেখা হবে।

রতন সুশিক্ষিত ভৃত্য; আদব-কায়দায় পাকা। সম্ভ্রমের সহিত মৃদুস্বরে কহিল, বড় দরকার বাবু, এখনি একবার পায়ের ধুলো দিতে হবে। নইলে বাইজীই আসবেন বললেন। —কি সর্বনাশ! এই তাঁবুতে এতরাত্রে, এত লোকের সুমুখে! বলিলাম, তুমি বুঝিয়ে বলগে রতন, আজ নয়, কাল সকালেই দেখা হবে। আজ আমি কোনমতেই যেতে পারব না।

রতন কহিল, তা হ'লে তিনিই আসবেন। আমি এই পাঁচ বছর দেখে আসচি বাবু, বাইজীর কোনদিন এতটুকু কথার কখনো নড়চড় হয় না। আপনি না গেলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।

এই অন্যায় অসঙ্গত জিদ দেখিয়া পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত জ্বলিয়া গেল।

বলিলাম, আচ্ছা দাঁড়াও, আমি আসচি। তাঁবুর ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম বারুণীর কৃপায় জাগ্রত আর কেহ নাই। পুরুষোত্তম গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চাকরদের তাঁবুতে দুই-চারি জন জাগিয়া আছে মাত্র। তাড়াতাড়ি বুট্‌টা পরিয়া লইয়া একটা কোট গায়ে দিয়া ফেলিলাম। রাইফেল ঠিক করাই ছিল, হাতে লইয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে বাইজীর তাঁবুতে গিয়া প্রবেশ করিলাম। পিয়ারী সুমুখেই দাঁড়াইয়া ছিল। আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, শ্মশানে-টশানে তোমার কোনমতেই যাওয়া হবে না—কোন মতেই না।

ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম—কেন?

কেন আবার কি? ভূত-প্রেত কি নেই যে, এই শনিবারের অমাবস্যায় তুমি যাবে শ্মশানে? প্রাণ নিয়ে কি তা হ'লে আর ফিরে আসতে হবে! বলিয়াই পিয়ারী অকস্মাৎ ঝরঝর্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বিহ্বলের মত নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কি করিব, কি জবাব দিব, ভাবিয়াই পাইলাম না। ভাবিয়া না পাওয়ার আর আশ্চর্য কি? যাহাকে চিনি না, জানি না সে যদি উৎকট হিতাকাঙ্ক্ষায় দুপুর রাত্রে ডাকাইয়া আনিয়া সমুখে দাঁড়াইয়া খামোকা কান্না জুড়িয়া দেয়—হতবুদ্ধি হয় না কে? আমার জবাব না পাইয়া পিয়ারী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, তুমি কি কোন দিন শান্ত সুবোধ হবে না? তেমনি একগুঁয়ে হয়ে চিরকালটা কাটাবে? কই, যাও দিকি কেমন করে যাবে, আমিও তা হ'লে সঙ্গে যাবো, বলিয়া সে শালখানা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইবার উপক্রম করিল।

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, বেশ, চল! আমার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া পিয়ারী বলিল, আহা! দেশ-বিদেশে তা হ'লে সুখ্যাতির আর সীমা-পরিসীমা থাকবে না! বাবু শিকারে এসে একটা বাইউলি সঙ্গে করে দুপুর রাত্রে ভূত দেখতে গিয়েছিলেন। বলি, বাড়িতে কি একেবারে আউট্‌ হয়ে গেছ নাকি? ঘেন্না-পিত্তি লজ্জা-সরম আর কিছু দেহতে নেই, বলিতে বলিতেই তাহার তীব্র কণ্ঠ ভিজিয়া যেন ভারি হইয়া উঠিল; কহিল, কখনো ত এমন ছিলে না। এত অধঃপথে তুমি যেতে পারো, কেউ ত কোন দিন ভাবেনি। তাহার শেষ কথাটায় অন্য কোন সময়ে আমার বিরক্তির হয়ত অবধি থাকিত না, কিন্তু এখন রাগ হইল না। মনে হইল পিয়ারীকে যেন চিনিয়াছি। কেন যে মনে হইল, তাহা পরে বলিতেছি। কহিলাম লোকের ভাবাভাবির দাম কত, সে নিজেও ত জান? তুমিই যে এত অধঃপথে যাবে, সেই বা ক'জন ভেবেছিল?

মুহূর্তের জন্য পিয়ারীর মুখের উপর শরতের মেঘলা জ্যোৎস্নার মত একটা সহজ হাসির আভা দেখা দিল। কিন্তু সে ঐ মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই সে ভীতস্বরে কহিল, আমার তুমি কি জানো? কে আমি, বল ত দেখি?

তুমি পিয়ারী।

সে ত সবাই জানে।

সবাই যা জানে না, তা আমি জানি—শুনলে কি তুমি খুশি হবে? হ'লে ত নিজেই তোমার পরিচয় দিতে। যখন দাওনি তখন আমার মুখ থেকেও কোন কথা পাবে না। এর মধ্যে ভেবে দেখো, আত্মপ্রকাশ করবে কি না। কিন্তু এখন আর সময় নেই—আমি চল্‌লুম।

পিয়ারী বিদ্যুদ্‌গতিতে পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যদি যেতে না দিই, জোর করে যেতে পার?

কিন্তু যেতেই বা দেবে না কেন?

পিয়ারী কহিল, দেবই বা কেন? সত্যিকারের ভূত কি নেই, যে তুমি যাবে বললেই যেতে দেব? মাইরি, আমি চেঁচিয়ে হাট বাধাব—তা বলে দিচ্চি, বলিয়াই আমার বন্দুকটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। আমি এক-পা পিছাইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ হইতেই আমার বিরক্তির পরিবর্তে হাসি পাইতেছিল। এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, সত্যিকারের ভূত আছে কি না জানি না, কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে জানি। তারা সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কয়, কাঁদে, পথ আগ্‌লায়—এমন অনেক কীর্তি করে, আবার দরকার হ'লে ঘাড় মট্‌কেও খায়। পিয়ারী মলিন হইয়া গেল; এবং ক্ষণকালের জন্য বোধ করি বা কথা খুঁজিয়াও পাইল না। তারপরে বলিল, আমাকে তা হ'লে তুমি চিনেচ বল! কিন্তু ওটা তোমার ভুল। তারা অনেক

কীর্তি করে সত্যি, কিন্তু ঘাড় মটকাবার জন্যেই পথ আগ্‌লায় না। তাদেরও আপনার-পর বোধ আছে। আমি পুনরায় সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম, এ ত তোমার নিজের কথা, কিন্তু তুমি কি ভূত?

পিয়ারী কহিল, ভূত বই কি! যারা মরে গিয়েও মরে না, তারাই ভূত; এই ত তোমার বলবার কথা। একটুখানি থামিয়া নিজেই পুনরায় কহিতে লাগিল, এক হিসাবে আমি যে মরেছি, তা সত্যি। কিন্তু সত্যি হোক মিথ্যে হোক—নিজের মরণ আমি নিজে রটাই নি। মামাকে দিয়ে মা রটিয়েছিলেন। শুনবে সব কথা? তাহার মরণের কথা শুনিয়া এতক্ষণে আমার সংশয় কাটিয়া গেল। ঠিক চিনিতে পারিলাম—এই সেই রাজলক্ষ্মী। অনেক দিন পূর্বে মায়ের সহিত সে তীর্থযাত্রা করিয়াছিল—আর ফিরে নাই। কাশীতে ওলাউঠা রোগে মরিয়াছে—এই কথা মা গ্রামে আসিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাকে কখনো যে আমি ইতিপূর্বে দেখিয়াছিলাম—এ কথা আমি মনে করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু তাহার একটা অভ্যাস আমি এখানে আসিয়া পর্যন্ত লক্ষ্য করিতেছিলাম। সে রাগিলেই দাঁত দিয়া অধর চাপিয়া ধরিতেছিল। কখন, কোথায়, কাহাকে যেন ঠিক এম্‌নি ধারা করিতে অনেকবার দেখিয়াছি বলিয়া কেবলি মনে হইতেছিল; কিন্তু কে সে, কোথায় দেখিয়াছি, কবে দেখিয়াছি কিছুতেই মনে পড়িতেছিল না। সেই রাজলক্ষ্মী এই হইয়াছে দেখিয়া, আমি ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেলাম। আমি যখন আমাদের গ্রামের মনসা পণ্ডিতের পাঠশালের সর্দার-পোড়ো, সেই সময়ে ইহার দুইপুরুষে কুলীন বাপ আর একটা বিবাহ করিয়া ইহার মাকে তাড়াইয়া দেয়। স্বামী-পরিত্যক্তা মা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী দুই মেয়ে লইয়া বাপের বাড়ি চলিয়া আসে। ইহার বয়স তখন আট-নয় বৎসর; সুরলক্ষ্মীর বারো-তেরো। ইহার রঙটা বরাবরই ফর্সা; কিন্তু ম্যালেরিয়া ও প্লীহায় পেটটা ধামার মত, হাত-পা কাঠির মত, মাথার চুলগুলো তামার শলার মত—কতগুলি তাহা গুণিয়া বলা যাইতে পারিত। আমার মারের ভয়ে এই মেয়েটা বঁইচির বনে ঢুকিয়া প্রত্যহ একছড়া পাকা বঁইচি ফলের মালা গাঁথিয়া আনিয়া আমাকে দিত। সেটা কোনদিন ছোট হইলেই পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া, ইহাকে প্রাণ ভরিয়া চপেটাঘাত করিতাম। মার খাইয়া এই মেয়েটা ঠোঁট কামড়াইয়া গোঁজ হইয়া বসিয়া থাকিত; কিন্তু কিছুতেই বলিত না—প্রত্যহ পাকা ফল সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কত কঠিন। তা সে যাই হোক, এতদিন জানিতাম, মারের ভয়েই সে এত ক্লেশ স্বীকার করিত; কিন্তু আজ যেন হঠাৎ একটুখানি সংশয় হইল। তা সে যাক। তার পরে ইহার বিবাহ। সেও এক চমৎকার ব্যাপার! ভাগ্নীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাৎ জানা গেল, বিরিঞ্চি দত্তের পাচকব্রাহ্মণ ভঙ্গ-কুলীনের সন্তান। এই কুলীন-সন্তানকে দত্তমশাই বাঁকুড়া হইতে বদলি হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিরিঞ্চি দত্তের দুয়ারে মামা ধন্না দিয়া পড়িলেন—ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত দত্তদের বামুনঠাকুর হাবা-গোবা ভালোমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সাংসারিক বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একান্নো টাকা পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, অত সস্তায় হবে না মশায়—বাজারে যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ-এক টাকায় একজোড়া ভাল রামছাগল পাওয়া যায় না—তা জামাই খুঁজচেন। একশ-একটি টাকা দিন—একবার এ-পিঁড়িতে ব'সে আর একবার ও-পিঁড়িতে ব'সে, দুটো ফুল ফেলে দিচ্চি। দুটি ভাগ্নীই একসঙ্গে পার হবে। আর একশখানি টাকা—দুটো ষাঁড় কেনার খরচাটাও দেবেন না? কথাটা অসঙ্গত নয় তথাপি অনেক কষা-মাজা ও সাধ্য-সাধনার পর সত্তর টাকায় রফা হইয়া একরাত্রে একসঙ্গে সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। দুইদিন পরে সত্তর টাকা নগদ লইয়া দু-পুরুষে কুলীন-জামাই বাঁকুড়া প্রস্থান করিলেন। আর কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। বছর-দেড়েক পরে প্লীহা-জ্বরে সুরলক্ষ্মী মরিল এবং আরও বছর-দেড়েক পরে এই রাজলক্ষ্মী কাশীতে মরিয়া শিবত্ব লাভ করিল। এই ত পিয়ারী বাইজীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

বাইজী কহিল, তুমি কি ভাবছ, বলব?

কি ভাবচি?

তুমি ভাবছ, আহা! ছেলেবেলায় একে কত কষ্টই দিয়েচি। কাঁটার বনে পাঠিয়ে রোজ-রোজ বঁইচি তুলিয়েচি, আর তার বদলে শুধু মারধর করেছি। মার খেয়ে চুপ ক'রে কেবল

কেঁদেচে, কিন্তু কখনো কিছু চায়নি। আজ যদি একটা কথা বলচে ত শুনিই না। নাহয় নাই গেলাম শ্মশানে। এই না?

আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

পিয়ারীও হাসিয়া কহিল, হবেই ত। ছেলেবেলায় একবার যাকে ভালবাসা যায়, তাকে কি কখনো ভোলা যায়? সে একটা অনুরোধ করলে কেউ কখনো কি পায়ে ঠেলে যেতে পারে? এমন নিষ্ঠুর সংসারে আর কে আছে! চল, একটু বসি গে, অনেক কথা আছে। রতন, বাবুর বুটটা খুলে দিয়ে যা রে। হাসচ যে?

হাসচি, কি ক'রে তোমরা মানুষ ভুলিয়ে বশ করো, তাই দেখে।

পিয়ারীও হাসিল; কহিল, তাই বৈ কি। পরকে কথায় ভুলিয়ে বশ করা যায়; কিন্তু জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত নিজেই যার বশ হয়ে আছি, তাকেও কি কথায় ভুলানো যায়? আচ্ছা, আজই নাহয় কথা কইচি; কিন্তু প্রত্যহ কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যখন বঁইচির মালা গেঁথে দিতুম, তখন কটা কথা কয়েছিলুম শুনি? সে কি তোমার মারের ভয়ে না কি? মনেও ক'রো না। সে মেয়ে রাজলক্ষ্মী নয়। কিন্তু ছিঃ! আমাকে তুমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে—দেখে চিনতেও পারোনি। বলিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িতেই তাহার দুই কানের হীরাগুলা পর্যন্ত দুলিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, তোমাকে মনেই বা কবে করেছিলুম যে, ভুলে যাবো না? বরং আজ চিনতে পেরেচি দেখে, নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। আচ্ছা, বারোটা বাজে—চললুম।

পিয়ারীর হাসিমুখ এক নিমেষেই একেবারে বিবর্ণ ম্লান হইয়া গেল। একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিল, আচ্ছা, ভূত-প্রেত না মানো, সাপ-খোপ, বাঘ-ভালুক, বুনো শুয়ার এগুলোকে ত বনে-জঙ্গলে অন্ধকার রাত্রে মানা চাই।

আমি বলিলাম, এগুলোকে আমি মেনে থাকি, এবং যথেষ্ট সতর্ক হয়েও চলি।

আমাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, তুমি যে-ধাতের মানুষ, তাতে তোমাকে যে আটকাতে পারব না সে ভয় আমার খুবই ছিল; তবু ভেবেছিলাম, কান্নাকাটি ক'রে হাতে-পায়ে ধরলে শেষ পর্যন্ত হয়ত নাও যেতে পারো। কিন্তু আমার কান্নাই সার হ'ল। আমি জবাব দিলাম না দেখিয়া পুনরায় কহিল, আচ্ছা যাও—পেছু ডেকে আর অমঙ্গল করব না। কিন্তু একটা-কিছু হ'লে, এই বিদেশ বিভূঁয়ে রাজ-রাজড়া বন্ধু-বান্ধব কোন কাজেই লাগবে না, তখন আমাকেই ভুগতে হবে। আমাকে চিনতে পারো না, আমার মুখের ওপর ব'লে তুমি পৌরুষী করে গেলে, কিন্তু আমার মেয়েমানুষের মন ত? বিপদের সময় আমি ত আর বল্‌তে পারব না—এ'কে চিনিনে; বলিয়া সে একটি দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। আমি যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিলাম। কেমন যেন একটা ক্লেশ বোধ হইল। বলিলাম, বেশ ত বাইজী, সেও ত আমার একটা মস্ত লাভ। আমার কেউ কোথাও নেই—তবু ত জানতে পারব, একজন আছে—যে আমাকে ফেলে যেতে পারবে না।

পিয়ারী কহিল, সে কি আর তুমি জানো না? একশবার 'বাইজী' ব'লে যত অপমানই কর না কেন, রাজলক্ষ্মী তোমাকে যে ফেলে যেতে পারবে না—এ কি আর তুমি মনে মনে বোঝো না? কিন্তু ফেলে যেতে পারলেই ভালো হ'তো। তোমাদের একটা শিক্ষা হ'তো। কিন্তু কি বিশ্রী এই মেয়েমানুষ জাতটা, একবার যদি ভালোবেসেচে, ত মরেচে।

আমি বলিলাম, পিয়ারী, ভালো সন্ন্যাসীতেও ভিক্ষা পায় না, কেন জানো?

পিয়ারী বলিল, জানি। কিন্তু তোমার এ খোঁচায় এত ধার নেই যে, আমাকে বেঁধো! এ আমার ঈশ্বরদত্ত ধন। যখন সংসারের ভাল-মন্দ জ্ঞান পর্যন্ত হয়নি, তখনকার; আজকের নয়।

আমি নরম হইয়া বলিলাম, বেশ কথা। আশা করি, আমার আজ একটা কিছু হবে। হ'লে তোমার ঈশ্বরদত্ত ধনের হাতে-হাতে একটা যাচাই হয়ে যাবে।

পিয়ারী কহিল, দুর্গা! দুর্গা! ছিঃ! এমন কথা ব'লো না। ভালোয়-ভালোয় ফিরে এসো—এ সত্যি আর যাচাই করে কাজ নেই। আমার কি সেই কপাল যে, নিজের হাতে নেড়ে-চেড়ে সেবা ক'রে, দুঃসময়ে তোমাকে সুস্থ, সবল করে তুলব! তা হ'লে ত জানতুম, এ জন্মের একটা কাজ করে নিলুম। বলিয়া সে যে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিল, তাহা হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোতেও টের পাইলাম।

আচ্ছা, ভগবান তোমার এ সাধ হয়ত একদিন পূর্ণ ক'রে দেবেন, বলিয়া আমি আর দেরি না করিয়া, তাঁবুর বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। তামাশা করিতে গিয়া যে মুখ দিয়া একটা প্রচণ্ড সত্য বাহির হইয়া গেল, সে কথা তখন আর কে ভাবিয়াছিল?

তাঁবুর ভিতর হইতে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠের দুর্গা! দুর্গা! নামের সকাতর ডাক কানে আসিয়া পৌঁছিল! আমি দ্রুতপদে শ্মশানের পথে প্রস্থান করিলাম।

সমস্ত মনটা পিয়ারীর কথাতেই আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কখন যে আমবাগানের দীর্ঘ, অন্ধকার পথ পার হইয়া গেলাম, কখন নদীর ধারের সরকারী বাঁধের উপর আসিয়া পড়িলাম, জানিতেই পারিলাম না। সমস্ত পথটা শুধু এই একটা কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি—এ কি বিরাট্ অচিন্তনীয় ব্যাপার এই নারীর মনটা। কবে যে এই পিলেরোগা মেয়েটা তাহার ধামার মত পেট এবং কাঠির মত হাত-পা লইয়া আমাকে প্রথম ভালবাসিয়াছিল, এবং বঁইচি ফলের মালা দিয়া তাহার দরিদ্র পূজা নীরবে সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল, আমি টেরও পাই নাই। যখন টের পাইলাম তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বিস্ময় সেজন্যও নয়। নভেল নাটকেও বাল্যপ্রণয়ের কথা অনেক পড়িয়াছি। কিন্তু এই বস্তুটি, যাহাকে সে তাহার ঈশ্বরদত্ত ধন বলিয়া সগর্বে প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইল না, তাহাকে সে এতদিন তাহার এই ঘৃণিত জীবনের শতকোটী মিথ্যা প্রণয়-অভিনয়ের মধ্যে কোন্‌খানে জীবিত রাখিয়াছিল? কোথা হইতে ইহাদের খাদ্য সংগ্রহ করিত? কোন্ পথে প্রবেশ করিয়া তাহাকে লালন-পালন করিত?

বাপ্!

চমকিয়া উঠিলাম। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, ধূসর বালুর বিস্তীর্ণ প্রান্তর এবং তাহাকেই বিদীর্ণ করিয়া শীর্ণ নদীর বক্ররেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া কোন সুদূরে অন্তর্হিত হইয়া গেছে। সমস্ত প্রান্তর ব্যাপিয়া এক-একটা কাশের ঝোপ। অন্ধকারে হঠাৎ মনে হইল, এগুলো যেন এক-একটা মানুষ—আজিকার এই ভয়ঙ্কর অমানিশায় প্রেতাত্মার নৃত্য দেখিতে আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, এবং বালুকার আস্তরণের উপর যে-যাহার আসন গ্রহণ করিয়া, নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছে! মাথার উপর নিবিড় কালো আকাশ, সংখ্যাতীত গ্রহতারকাও আগ্রহে চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে। হাওয়া নাই, শব্দ নাই, নিজের বুকের ভিতরটা ছাড়া, যতদূর চোখ যায়, কোথাও এতটুকু প্রাণের সাড়া পর্যন্ত অনুভব করিবার জো নাই। যে রাত্রিচর পাখিটা একবার 'বাপ্' বলিয়াই থামিয়াছিল, সেও আর কথা কহিল না। পশ্চিম-মুখে ধীরে ধীরে চলিলাম। এই দিকেই সেই মহাশ্মশান। একদিন শিকারে আসিয়া সেই যে শিমুলগাছগুলো দেখিয়া গিয়াছিলাম, কিছু দূরে আসিতেই তাহাদের কালো-কালো ডাল-পালা চোখে পড়িল। ইহারাই মহাশ্মশানের দ্বারপাল! ইহাদের অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। এইবার অতি অস্ফুট প্রাণের সাড়া পাইতে লাগিলাম; কিন্তু তাহা আহ্লাদ করিবার মত নয়। আরো একটু অগ্রসর হইতে, তাহা পরিস্ফুট হইল। এক-একটা মা 'কুম্ভকর্ণের ঘুম' ঘুমাইলে তাহার কচি ছেলেটা কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষকালে নির্জীব হইয়া যে প্রকারে রহিয়া রহিয়া কাঁদে, ঠিক তেমনি করিয়া শ্মশানের একান্ত হইতে কে যেন কাঁদিতে লাগিল। যে এ ক্রন্দনের ইতিহাস জানে না, এবং পূর্বে শুনে নাই—সে যে এই গভীর অমানিশায় একাকী সেদিকে আর এক-পা অগ্রসর হইতে চাহিবে না, তাহা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে যে মানব-শিশু নয়, শকুন-শিশু অন্ধকারে মাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতেছে—না জানিলে কাহারো সাধ্য নাই, এ কথা ঠাহর করিয়া বলে। আরো কাছে আসিতে দেখিলাম—ঠিক তাই বটে। কালো কালো ঝুড়ির মত শিমুলের ডালে ডালে অসংখ্য শকুন রাত্রিবাস করিতেছে; এবং তাহাদেরই কোন একটা দুষ্ট ছেলে অমন করিয়া আর্তকণ্ঠে কাঁদিতেছে।

গাছের উপরে সে কাঁদিতেই লাগিল; আমি নীচে দিয়া অগ্রসর হইয়া ঐ মহাশ্মশানের একপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সকালে তিনি যে বলিয়াছিলেন, লক্ষ নরমুণ্ড গণিয়া লওয়া যায়—দেখিলাম, কথাটা নিতান্ত অত্যুক্তি নয়। সমস্ত স্থানটাই প্রায় নরকঙ্কালে খচিত হইয়া আছে। গেণ্ডুয়া খেলিবার নরকপাল অসংখ্য পড়িয়া আছে; তবে খেলোয়াড়েরা তখনও আসিয়া জুটিতে পারে নাই। আমি ছাড়া আর কোন অশরীরী দর্শক তথায় উপস্থিত ছিলেন

কি না, এই দুটা নশ্বর চক্ষে আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। তখন ঘোর অমাবস্যা। সুতরাং খেলা শুরু হইবার আর বেশি দেরি নাই আশা করিয়া, একটা বালুর ঢিপির উপর চাপিয়া বসিলাম। বন্দুকটা খুলিয়া, টোটাটা আর একবার পরীক্ষা করিয়া, পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া, কোলের উপর রাখিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম। হায় রে টোটা! বিপদের সময় কিন্তু সে কোন সাহায্য করিল না।

পিয়ারীর কথাটা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল, যদি অকপটে বিশ্বাসই কর না, তবে কর্ম-ভোগ করিতে যাওয়া কেন? আর যদি বিশ্বাসের জোর না থাকে, তাহা হইলে ভূত-প্রেত থাক বা না থাক, তোমাকে কিছুতেই যাইতে দিব না। সত্যই ত! এ কি দেখিতে আসিয়াছি? মনের অগোচরে ত পাপ নাই। আমি কিছুই দেখিতে আসি নাই; শুধু দেখাইতে আসিয়াছি—আমার সাহস কত। সকালে যাহারা বলিয়াছিল, ভীরু বাঙ্গালী কার্যকালে ভাগিয়া যায়, তাহাদের কাছে শুধু এই কথাটা সপ্রমাণ করা যে, বাঙ্গালী বড় বীর।

আমার বহুদিনের দৃঢ়-বিশ্বাস, মানুষ মরিলে আর বাঁচে না; এবং যদি বা বাঁচে, যে-শ্মশানে তাহার পার্থিব দেহটাকে অশেষ প্রকারে নিপীড়িত করা হয়, সেইখানেই ফিরিয়া নিজের মাথাটায় লাথি মারিয়া মারিয়া গড়াইয়া বেড়াইবার ইচ্ছা হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিকও নয়, উচিতও নয়—অন্ততঃ আমার পক্ষে ত নয়। তবে কিনা, মানুষের রুচি ভিন্ন। যদিবা কাহারও হয়, তাহা হইলে এমন একটা চমৎকার রাত্রে রাত্রি-জাগিয়া আমার এতদূরে আসাটা নিষ্ফল হইবে না। অথচ এম্নি একটা গুরুতর আশাই আজিকার প্রবীণ ব্যক্তিটি দিয়াছিলেন।

হঠাৎ একটা দমকা বাতাস কতকগুলো ধুলা-বালি উড়াইয়া গায়ের উপর দিয়া বহিয়া গেল; এবং সেটা শেষ না হইতেই, আর একটা এবং আর একটা বহিয়া গেল। মনে হইল, এ আবার কি? এতক্ষণ ত বাতাসের লেশমাত্র ছিল না। যতই কেন না বুঝি এবং বুঝাই, মরণের পরেও যে কিছু-একটা অজানা গোছের থাকে—এ সংস্কার হাড়ে-মাসে জড়ানো। যতক্ষণ হাড়-মাস আছে ততক্ষণ সেও আছে—তাহাকে স্বীকার করি, আর না করি। সুতরাং এই দমকা বাতাসটা শুধু ধুলা-বালিই উড়াইল না, আমার মজ্জাগত সেই গোপন সংস্কারে গিয়াও ঘা দিল। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে বেশ একটু জোরে হাওয়া উঠিল। অনেকেই হয়ত জানে না যে মড়ার মাথার ভিতর দিয়া বাতাস বহিলে ঠিক দীর্ঘশ্বাস ফেলা গোছের শব্দ হয়। দেখিতে দেখিতে আশেপাশে, সুমুখে, পিছনে দীর্ঘশ্বাসের যেন ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। ঠিক মনে হইতে লাগিল, কত লোক যেন আমাকে ঘিরিয়া বসিয়া, অবিশ্রাম হা-হুতাশ করিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে; এবং ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'uncanny feeling' ঠিক সেই ধরনের একটা অস্বস্তি সমস্ত শরীরটাকে যেন গোটা-দুই ঝাঁকানি দিয়া গেল। সেই শকুনির বাচ্চাটা তখনও চুপ করে নাই, সে যেন পিছনে আরও বেশি করিয়া গোঙাইতে লাগিল। বুঝিলাম ভয় পাইয়াছি। বহু অভিজ্ঞতার ফলে বেশ জানিতাম, এ যে-স্থানে আসিয়াছি, এখানে এই বস্তুটাকে সময়ে চাপিতে না পারিলে মৃত্যু পর্যন্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়। বস্তুত এইরূপ ভয়ানক জায়গায় ইতিপূর্বে আমি কখনো একাকী আসি নাই। একাকী যে স্বচ্ছন্দে আসিতে পারিত, সে ইন্দ্র—আমি নয়। অনেকবার তাহার সঙ্গে অনেক ভয়ানক স্থানে গিয়া গিয়া আমারও একটা ধারণা জন্মিয়াছিল যে ইচ্ছা করিলে আমিও তাহার মত এইসব স্থানে একাকী আসিতে পারি। কিন্তু সেটা যে কত বড় ভ্রম এবং আমি যে শুধু ঝোঁকের উপরেই তাহাকে অনুসরণ করিতে গিয়াছিলাম, এক মুহূর্তেই আজ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সেই চওড়া বুক কই? আমার সে বিশ্বাস কোথায়? আমার সেই রাম নামের অভেদ্য কবচ কই? আমি ত ইন্দ্র নই যে, এই প্রেতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া, চোখ মেলিয়া, প্রেতাত্মার গেণ্ডুয়াখেলা দেখিব? মনে হইতে লাগিল, একটা জীবন্ত বাঘ-ভালুক দেখিতে পাইলেও বুঝি বাঁচিয়া যাই। হঠাৎ কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলিল। তাহা এমনি শীতল যে তুষারকণার মত সেইখানেই জমিয়া উঠিল। ঘাড় না তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, এ নিশ্বাস যে নাকের মস্ত ফুটাটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, এক্‌ফোটা রক্তের সংস্রব পর্যন্ত নাই—কেবল হাড় আর গহ্বর। সুমুখে, পিছনে, দক্ষিণে, বামে অন্ধকার। স্তব্ধ নিশীথ রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। আশেপাশে হা-হুতাশ ও দীর্ঘশ্বাস ক্রমাগতই যেন হাতের কাছে ঘেঁষিয়া আসিতে লাগিল। কানের উপর তেমনি

কন্‌কনে ঠাণ্ডা নিশ্বাসের বিরাম নাই। এইটাই সর্বাপেক্ষা আমাকে অবশ করিয়া আনিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেতলোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা দিয়াই বাহিয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে।

এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু এ কথাটা ভুলি নাই যে, কোনমতেই আমার চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। তাহা হইলে মরণ অনিবার্য। দেখি, ডান পা-টা ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। থামাইতে গেলাম, থামিল না। সে যেন আমার পা নয়।

ঠিক এম্‌নি সময়ে অনেক দূরে অনেকগুলা গলার সমবেত চীৎকার কানে পৌঁছিল—বাবুজী! বাবুসাব! সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। কাহারা ডাকে? আবার চীৎকার করিল—গুলি ছুঁড়বেন না যেন! শব্দ ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আসিতে লাগিল—গোটা-দুই ক্ষীণ আলোর রেখাও আড়চোখে চাহিতে চোখে পড়িল। একবার মনে হইল, চীৎকারের মধ্যে যেন রতনের গলার আভাস পাইলাম। খানিক পরেই টের পাইলাম, সেই বটে। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, সে একটা শিমুলের আড়ালে দাঁড়াইয়া, চেঁচাইয়া বলিল, বাবু, আপনি যেখানেই থাকুন, গুলি-টুলি ছুঁড়বেন না—আমরা রতন। রতন লোকটা যে সত্যিই নাপিত, তাহাতে আর ভুল নাই।

উল্লাসে চেঁচাইয়া সাড়া দিতে গেলাম, কিন্তু স্বর ফুটিল না। একটা প্রবাদ আছে, ভূত-প্রেত যাবার সময় কিছু একটা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। যে আমার পিছনে ছিল, সে আমার কণ্ঠস্বরটা ভাঙ্গিয়া দিয়াই বিদায় হইল।

রতন এবং আরও তিনজন লোক গোটা-দুই লণ্ঠন ও লাঠিসোঁটা হাতে করিয়া কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তিনজনের মধ্যে একজন ছট্টুলাল—সে তব্‌লা বাজায়; এবং আর একজন পিয়ারীর দরোয়ান। তৃতীয় ব্যক্তি গ্রামের চৌকিদার।

রতন কহিল, চলুন—তিনটে বাজে।

চল, বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম। পথে যাইতে যাইতে রতন বলিতে লাগিল, বাবু, ধন্য আপনার সাহস। আমরা চারজনে যে কত ভয়ে ভয়ে এসেচি, তা বলতে পারিনে।

এলি কেন?

রতন কহিল, টাকার লোভে। আমরা সবাই এক মাসের মাইনে নগদ পেয়ে গেছি। বলিয়া আমার পাশে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিতে লাগিল, বাবু, আপনি চলে এলে গিয়ে দেখি, মা বসে বসে কাঁদচেন। আমাকে বললেন, রতন, কি হবে বাবা; তোরা পিছনে যা। আমি এক-একমাসের মাইনে তোদের বকশিশ দিচ্ছি। আমি বললুম, ছট্টুলাল আর গণেশকে সঙ্গে নিয়ে আমি যেতে পারি মা; কিন্তু পথ চিনিনে। এমন সময় চৌকিদার হাঁক দিতেই মা বললেন, ওকে ডেকে আন রতন, ও নিশ্চয়ই পথ চেনে। বেরিয়ে গিয়ে ডেকে আনলুম। চৌকিদার ছ'টাকা হাতে পেয়ে, তবে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে। আচ্ছা বাবু, কচি ছেলের কান্না শুনতে পেয়েছেন? বলিয়া রতন শিহরিয়া উঠিয়া, আমার কোটের পিছনটা চাপিয়া ধরিল; কহিল, আমাদের গণেশ পাঁড়ে বামুন মানুষ, তাই আজ রক্ষে পাওয়া গেছে, নইলে—

আমি কথা কহিলাম না। প্রতিবাদ করিয়া কাহারো ভুল ভাঙ্গিবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আচ্ছন্ন, অভিভূতের মত নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

কিছুদূরে আসার পর রতন প্রশ্ন করিল, আজ কিছু দেখতে পেলেন, বাবু?

আমি বলিলাম, না।

আমার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে রতন ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, আমরা যাওয়ায় আপনি কি রাগ করেছেন, বাবু? মার কান্না দেখলে কিন্তু—

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলাম, না রতন, আমি একটুও রাগ করিনি।

তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া চৌকিদার তাহার কাজে চলিয়া গেল। গণেশ, ছট্টুলাল চাকরদের তাঁবুতে প্রস্থান করিল। রতন কহিল, মা বলেছিলেন যাবার সময় একটিবার দেখা দিয়ে যেতে।

থমকিয়া দাঁড়াইলাম। চোখের উপর যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, পিয়ারী দীপের সম্মুখে অধীর-আগ্রহে, সজলচক্ষে বসিয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছে, এবং আমার সমস্ত মনটা উন্মত্ত ঊর্ধ্বশ্বাসে তাহার পানে ছুটিয়া চলিয়াছে।

রতন সবিনয়ে ডাকিল, আসুন।

মুহূর্তকালের জন্য চোখ বুজিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়া দেখিলাম, সেখানে প্রকৃতিস্থ কেহ নাই! সবাই আকণ্ঠ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া উঠিয়াছে! ছি ছি! এই মাতালের দল লইয়া যাইব দেখা করিতে? সে আমি কিছুতেই পারি না।

বিলম্ব দেখিয়া রতন বিস্মিত হইয়া কহিল, ওখানে অন্ধকারে দাঁড়ালেন কেন বাবু—আসুন?

আমি তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম, না, রতন, এখন নয়—আমি চললুম।

রতন ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, মা কিন্তু পথ চেয়ে বসে আছেন—

পথ চেয়ে? তা হোক! তাঁকে আমার অসংখ্য নমস্কার দিয়ে বোলো, কাল যাবার আগে দেখা হবে—এখন নয়; আমার বড় ঘুম পেয়েছে রতন, আমি চললুম! বলিয়া বিস্মিত, ক্ষুব্ধ রতনকে জবাব দিবার সময়মাত্র না দিয়া দ্রুতপদে ওদিকের তাঁবুর দিকে চলিয়া গেলাম।

নয়

মানুষের অন্তর জিনিসটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া মানুষ যখন নিজেই গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে কাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না—আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না। আমার শুধু নিজের মনটাই নয়; পরের সম্বন্ধেও দেখি, তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলো পড়িয়া দেখ—হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহার কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়। জোর করিয়া বলে, এ চরিত্র কোন মতেই ওরূপ হইতে পারে না, সে চরিত্র কখনও সেরূপ করিতে পারে না—এমনি কত কথা। লোকে বাহবা দিয়া বলে, বাঃ রে, বাঃ! এই ত ক্রিটিসিজম্। একেই ত বলে চরিত্র-সমালোচনা! সত্যই ত! অমুক সমালোচক বর্তমান থাকিতে ছাই-পাঁশ যা-তা লিখলেই কি চলিবে? এই দেখ বই-খানার যত ভুল-ভ্রান্তি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া ধরিয়া দিয়াছে! তা দিক। ত্রুটি আর কিসে না থাকে! কিন্তু তবুও যে আমি নিজের জীবন আলোচনা করিয়া, এই সব পড়িয়া তাদের লজ্জায় আপনার মাথাটা তুলিতে পারি না। মনে মনে বলি, হা রে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিসটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা! দম্ভ-প্রকাশের বেলায় কি তাহার কানাকড়ির মূল্য নাই? তোমার কোটী-কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার যে এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে, এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু একমুহূর্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে, এ কথাটা কি একটি বারও মনে পড়ে না! এও কি মনে পড়ে না, এটা সীমাহীন আত্মার আসন!

এই ত আমি অন্নদাদিদিকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাঁহার অম্লান দিব্যমূর্তি ত এখনো ভুলিয়া যাই নাই! দিদি যখন চলিয়া গেলেন, তখন কত গভীর স্তব্ধ রাত্রে চোখের জলে বালিশ ভাসিয়া গিয়াছে; আর মনে মনে বলিয়াছি, দিদি, নিজের জন্য আর ভাবি না, তোমার পরশমানিকস্পর্শে আমার অন্তর-বাহিরের সব লোহা সোনা হইয়া গিয়াছে, কোথাকার কোন জল-হাওয়ার দৌরাত্ম্যেই আর মরিচা লাগিয়া ক্ষয় পাইবার ভয় নাই। কিন্তু কোথায় তুমি গেলে দিদি! দিদি, আর কাহাকেও এ-সৌভাগ্যের ভাগ দিতে পারিলাম না। আর কেহ তোমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে, যে যেখানে আছে, সবাই যে সচ্চরিত্র সাধু হইয়া যাইত, তাহাতে আমার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। কি উপায়ে ইহা সম্ভব হইতে পারিত, তখন এ লইয়া সারারাত্রি জাগিয়া ছেলেমানুষি কল্পনার বিরাম ছিল না। কখনো ভাবিতাম, দেবী-চৌধুরাণীর মত কোথাও যদি সাত ঘড়া মোহর পাই ত অন্নদাদিদিকে একটা মস্ত সিংহাসনে বসাই, বন কাটিয়া, জায়গা করিয়া, দেশের লোক ডাকিয়া তাঁর সিংহাসনের চতুর্দিকে জড় করি। কখনো ভাবিতাম, একটা প্রকাণ্ড বজরায় চাপাইয়া ব্যাণ্ড বাজাইয়া তাঁহাকে দেশ-বিদেশে লইয়া বেড়াই। এমনি কত কি যে উদ্ভট আকাশকুসুমের মালা গাঁথা—সে সব মনে করিলেও এখন হাসি পায়; চোখে জলও বড় কম পড়ে না।

তখন মনের মধ্যে এ বিশ্বাস হিমাচলের মত দৃঢ়ও ছিল, আমাকে ভুলাইতে পারে, এমন নারী ত ইহলোকে নাই-ই, পরলোকে আছে কি না, তাহাও যেন ভাবিতে পারিতাম না। মনে করিতাম, জীবনে যদি কখনো কাহারো মুখে এম্‌নি মৃদু কথা, ঠোঁটে এম্‌নি মধুর হাসি, ললাটে এম্‌নি অপরূপ আভা, চোখে এম্‌নি সজল করুণ চাহনি দেখি, তবে চাহিয়া দেখিব। যাহাকে মন দিব, সেও যেন এম্‌নি সতী, এম্‌নি সাধ্বী হয়। প্রতি পদক্ষেপে তাহারও যেন এম্‌নি অনির্বচনীয় মহিমা ফুটিয়া উঠে, এম্‌নি করিয়া সেও যেন সংসারের সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত ধর্মাধর্ম ত্যাগ করিয়াই গ্রহণ করিতে পারে।

সেই ত আমি! তবুও আজ সকালে ঘুম-ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই কাহার মুখের কথা, কাহার ঠোঁটের হাসি, কাহার চোখের জল মনে পড়িয়া বুকের একান্তে একটুখানি ব্যথা বাজিল? আমার সন্ন্যাসিনী দিদির সঙ্গে কোথাও কোন অংশে কি তাহার বিন্দু-পরিমাণও সাদৃশ্য ছিল? অথচ, এমনিই বটে! ছয়টা দিন আগে, আমার অন্তর্যামী আসিয়াও যদি এ কথা বলিয়া যাইতেন, আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিতাম, অন্তর্যামি! তোমার এই শুভকামনার জন্য তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ! কিন্তু তুমি তোমার কাজে যাও, আমার জন্য চিন্তা করিবার আবশ্যকতা নাই। আমার বুকের কষ্টিপাথরে পাকা সোনার কষ ধরানো আছে, সেখানে পিতলের দোকান খুলিলে খরিদ্দার জুটিবে না।

কিন্তু তবু ত খরিদ্দার জুটিল। আমার অন্তরের মধ্যে যেখানে অন্নদাদিদির আশীর্বাদে পাকা সোনার ছড়াছড়ি তার মধ্যেও যে এক দুর্ভাগা পিতলের লোভ সামলাইতে পারিল না, কিনিয়া বসিল—এ কি কম আশ্চর্যের কথা!

আমি বেশ বুঝিতেছি, যারা খুব কড়া সমঝদার তাঁরা আমার আত্মকথার এইখানে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিবেন, বাপু, এত ফেনিয়ে কি বলতে চাও তুমি? বেশ স্পষ্ট ক'রেই বল না, সেটা কি? আজ ঘুম ভাঙ্গিয়াই পিয়ারীর মুখ মনে করিয়া তোমার ব্যথা বাজিয়াছিল—এই ত? যাহাকে মনের দোরগোড়া হইতে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিতেছিলে, আজ তাহাকেই ডাকিয়া ঘরে বসাইতে চাহিতেছ—এই ত? তা বেশ! এ যদি সত্য হয়, তবে এর মধ্যে তোমার অন্নদা-দিদির নামটা আর তুলিয়ো না। কারণ তুমি যত কথা যেমন করিয়াই সাজাইয়া বল না কেন, আমরা মানবচরিত্র বুঝি। জোর করিয়া বলিতে পারি, সে সতী-সাধ্বীর আদর্শ তোমার মনের মধ্যে স্থায়ী হয় নাই, তাঁহাকে তোমার সমস্ত মন দিয়া কস্মিন্‌কালেও গ্রহণ করিতে পার নাই। পারিলে এই ঝুঁটোয় তোমাকে ভুলাইতে পারিত না।

তা বটে। তর্ক আর নয়। আমি টের পাইয়াছি মানুষ শেষ পর্যন্ত কিছুতেই নিজের সমস্ত পরিচয় পায় না। সে যা নয়, তাই বলিয়া নিজেকে জানিয়া রাখে এবং বাহিরে প্রচার করিয়া শুধু বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে; এবং যে দণ্ড ইহাতে দিতে হয়, তা নিতান্ত লঘুও নয়। কিন্তু থাক। আমি ত নিজে জানি, আমি কোন নারীর আদর্শে এতদিন কি কথা 'প্রচ' করিয়া বেড়াইয়াছি। সুতরাং আজ আমার এ দুর্গতির ইতিহাসে লোকে যখন বলিবে, শ্রীকান্তটা হম্‌বগ, হিপোক্রিট্‌, তখন আমাকে চুপ করিয়াই শুনিতে হইবে। অথচ হিপোক্রিট্‌ আমি ছিলাম না; হম্‌বগ করা আমার স্বভাব নয়। আমার অপরাধ শুধু এই যে, আমার মধ্যে যে দুর্বলতা আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহার সন্ধান রাখি নাই। আজ যখন সে সময় পাইয়া মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়া, তাহারই মত আর একটা দুর্বলতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া, একেবারে অন্দরের মধ্যে লইয়া বসাইয়া দিয়াছে, তখন অসহ্য বিস্ময়ে আমার চোখ দিয়া জল পড়িয়াছে; কিন্তু যাও বলিয়া তাহাকে বিদায় দিতে পারি নাই। ইহাও জানিয়াছি, আজ আমার লজ্জা রাখিবার ঠাঁই নাই; কিন্তু পুলক যে হৃদয়ের কানায় কানায় আজ ভরিয়া উঠিয়াছে! লোকসান যা হয় তা হোক, হৃদয় যে ইহাকে ত্যাগ করিতে চাহে না।

বাবুসাব! রাজভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। শয্যার উপর সোজা উঠিয়া বসিলাম। সে সসম্মানে নিবেদন করিল, কুমারসাহেব এবং বহুলোক আমার গতরাত্রির কাহিনী শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। প্রশ্ন করিলাম, তাঁরা জানিলেন কিরূপে? বেহারা কহিল, তাঁবুর দরোয়ান জানাইয়াছে যে, আমি রাত্রিশেষে ফিরিয়া আসিয়াছি।

হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া বড় তাঁবুতে প্রবেশ করিবামাত্রই সকলে হৈ হৈ করিয়া

চীৎকার করিয়া উঠিল। একসঙ্গে এক লক্ষ প্রশ্ন হইয়া গেল। দেখিলাম, কালকের সেই প্রবীণ ব্যক্তিটিও আছেন এবং একপাশে পিয়ারী তাহার দলবল লইয়া নীরবে বসিয়া আছে। প্রতিদিনের মত আজ আর তাহার সহিত চোখাচোখি হইল না। সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া বসিয়া ছিল।

উচ্ছ্বসিত প্রশ্নতরঙ্গ শান্ত হইয়া আসিলে জবাব দিতে শুরু করিলাম। কুমারজী কহিলেন, ধন্য সাহস তোমার শ্রীকান্ত! কত রাত্রে সেখানে পৌঁছুলে?

বারোটা থেকে একটার মধ্যে।

প্রবীণ ব্যক্তিটি কহিলেন, ঘোর অমাবস্যা। সাড়ে-এগারোটার পর অমাবস্যা পড়িয়াছিল।

চারিপাশ হইতেই বিস্ময়সূচক ধ্বনি উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ প্রশমিত হইলে কুমারজী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তারপর? কি দেখলে?

আমি বলিলাম, বিস্তর হাড়গোড় আর মড়ার মাথা।

কুমারজী বলিলেন, উঃ, কি ভয়ঙ্কর সাহস! শ্মশানের ভেতরে ঢুকলে, না বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে?

আমি বলিলাম, ভেতরে ঢুকে একটা বালির ঢিপিতে গিয়ে বসলুম।

তারপর, তারপর? বসে কি দেখলে?

ধু-ধু করছে বালির চর।

আর?

কসাড় ঝোপ, আর শিমুলগাছ।

আর?

নদীর জল।

কুমারজী অধীর হইয়া কহিলেন, এ সব ত জানি হে! বলি, সে সব কিছু—

আমি হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, আর গোটা-দুই বাদুড় মাথার উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখেছিলুম।

প্রবীণ ব্যক্তিটি তখন নিজে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আউর কুছ্ নেহি দেখা?

আমি কহিলাম, না। উত্তর শুনিয়া এক-তাঁবু লোক সকলেই যেন নিরাশ হইয়া পড়িল। প্রবীণ লোকটি তখন হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এ্যাসা কভি হো নহি সক্‌তা! আপ্ গয়া নহি। তাঁহার রাগ দেখিয়া আমি শুধু হাসিলাম। কারণ, রাগ হইবারই কথা, কুমারজী আমার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিলেন, তোমার দিব্যি শ্রীকান্ত, কি দেখলে সত্যি বল।

সত্যিই বলচি, কিছু দেখিনি।

কতক্ষণ ছিলে সেখানে?

ঘণ্টা-তিনেক।

আচ্ছা, না দেখেচ, কিছু শুনতেও কি পাওনি?

তা পেয়েছি।

এক মুহূর্তেই সকলের মুখ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কি শুনিয়াছি, শুনিবার জন্য তাহারা আরও একটু ঘেঁষিয়া আসিল। আমি তখন বলিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া পথের উপরেই একটা রাত্রিচর পাখি বাপ্ বলিয়া উড়িয়া গেল; কেমন করিয়া শিশুকণ্ঠে শকুনশিশু শিমুলগাছের উপর গোঙাইয়া-গোঙাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কেমন করিয়া হঠাৎ ঝড় উঠিল এবং মড়ার মাথাগুলো দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল এবং সকলের শেষে কে যেন আমার পিছনে দাঁড়াইয়া অবিশ্রাম তুষার শীতল নিশ্বাস আমার ডান কানের উপর ফেলিতে লাগিল। আমার বলা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারো মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না। সমস্ত তাঁবুটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। অবশেষে সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, বাবুজী, আপনি যথার্থ ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়াই কাল প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর কেহ হইলে পারিত না। কিন্তু আজ হইতে এই বুড়ার শপথ রহিল বাবুজী, আর কখনো এরূপ দুঃসাহস করিবেন না। আপনার পিতামাতার চরণে আমার কোটী-কোটী প্রণাম—এ শুধু

তাঁদেরই পুণ্যে আপনি বাঁচিয়াছেন। এই বলিয়া সে ঝোঁকের মাথায় খপ্ করিয়া আমার পায়েতেই হাত দিয়া ফেলিল।

আগে বলিয়াছি, এই লোকটি কথা কহিতে জানে। এইবার সে কথা শুরু করিল। চোখের তারা, ভুরু কখনো সংকুচিত, কখনো প্রসারিত, কখনো নির্বাপিত, কখনো প্রজ্বালিত করিয়া, সে শকুনির কান্না হইতে আরম্ভ করিয়া কানের উপর নিশ্বাস ফেলার এমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা জুড়িয়া দিল যে, দিনের বেলা এতগুলো লোকের মধ্যে বসিয়াও আমার পর্যন্ত মাথার চুল কাঁটা-দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। কাল সকালের মত আজও কখন যে পিয়ারী নিঃশব্দে ঘেঁষিয়া আসিয়া বসিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। হঠাৎ একটা নিশ্বাসের শব্দে ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, সে আমার ঠিক পিঠের কাছে বসিয়া নির্নিমেষ চোখে বক্তার মুখের পানে চাহিয়া আছে। এবং তাহার নিজের দুটি স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডের উপর ঝরা-অশ্রুর ধারা দুটি শুকাইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। কখন কি জন্য যে চোখের জল গড়াইয়াছিল, এ বোধ করি সে টের পায় নাই; পাইলে মুছিয়া ফেলিত। কিন্তু সেই অশ্রুকলুষিত তন্গত মুখখানি পলকের দৃষ্টিপাতেই আমার বুকের মধ্যে আগুনের রেখায় আঁকিয়া গেল। গল্প শেষ হইলে সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কুমারজীকে একটা সেলাম করিয়া, অনুমতি লইয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আজ সকালেই আমার বিদায় লইবার কথা ছিল কিন্তু শরীরটা ভাল ছিল না বলিয়া, কুমারজীর অনুরোধ স্বীকার করিয়া ও-বেলায় যাওয়াই স্থির করিয়া নিজেদের তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। এতদিনের মধ্যে আজ এই প্রথম পিয়ারীর আচরণে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম। এতদিন সে পরিহাস করিয়াছে, বিদ্রূপ করিয়াছে, কলহের আভাস পর্যন্ত তাহার দুই চোখের দৃষ্টিতে কতদিন ঘনাইয়া উঠিয়াছে, অনুভব করিয়াছি; কিন্তু এরূপ ঔদাসীন্য কখনও দেখি নাই, অথচ ব্যথার পরিবর্তে খুশিই হইলাম! কেন তাহা জানি! যদিচ যুবতী নারীর মনের গতিবিধি লইয়া মাথা-ঘামানো আমার পেশা নহে, ইতিপূর্বে এ কাজ কোনদিন করিও নাই, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বহু জনমনের যে অখণ্ড ধারাবাহিকতা লুকাইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার বহুদর্শনের অভিজ্ঞতায় রমণী-হৃদয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য ধরা পড়িয়া গেল। সে ইহাকে তাচ্ছিল্য মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইল না, বরং প্রণয়-অভিমান জানিয়া পুলকিত হইল। বোধ করি, ইহারই গোপন ইশারায় আমার শ্মশান-অভিযানের এতখানি ইতিহাসের মধ্যে শুধু এই কথাটার উল্লেখ পর্যন্ত করিলাম না যে, পিয়ারী কাল রাত্রে আমাকে ফিরাইয়া আনিতে শ্মশানে লোক পাঠাইয়াছিল; এবং সে নিজেও গল্প-শেষে তেমনি নীরবেই বাহির হইয়া গিয়াছিল। তাই অভিমান! কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া দেখা করিয়া বলি নাই, কি ঘটিয়াছিল। যে কথা সকলের আগে একলা বসিয়া তাহার শুনিবার অধিকার ছিল, তাহাই আজ সে সকলের পিছনে বসিয়া যেন দৈবাৎ শুনিতে পাইয়াছে। কিন্তু অভিমান যে এত মধুর, জীবনে এই স্বাদ আজ প্রথম উপলব্ধি করিয়া শিশুর মত তাহাকে নির্জনে বসিয়া অবিরাম রাখিয়া-চাখিয়া উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আজ দুপুরবেলাটা আমার ঘুমাইয়া পড়িবারই কথা; বিছানায় পড়িয়া মাঝে মাঝে তন্দ্রাও আসিতে লাগিল; কিন্তু রতনের আসার আশাটা ক্রমাগত নাড়া দিয়া-দিয়া তাহা ভাঙিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া বেলা গড়াইয়া গেল, কিন্তু রতন আসিল না। সে যে আসিবেই, এ বিশ্বাস আমার মনে এত দৃঢ় ছিল যে, বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া যখন দেখিলাম সূর্য অনেকখানি পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, তখন নিশ্চয় মনে হইল আমার কোন্ এক তন্দ্রার ফাঁকে রতন ঘরে ঢুকিয়া আমাকে নিদ্রিত মনে করিয়া ফিরিয়া গেছে। মূর্খ! একবার ডাকিতে কি হইয়াছিল! দ্বিপ্রহরের নির্জন অবসর নিরর্থক বহিয়া গেল মনে করিয়াও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম, কিন্তু সন্ধ্যার পরে সে যে আবার আসিবে—একটা কিছু অনুরোধ—না হয় একছত্র লেখা—যা হোক একটা, গোপনে হাতে দিয়া যাইবে, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু এই সময়টুকু কাটাই কি করিয়া? সুমুখে চাহিতেই খানিকটা দূরে অনেকখানি জল একসঙ্গে চোখের উপর ঝকঝক করিয়া উঠিল। সে কোন একটা বিস্মৃত জমিদারের মস্ত কীর্তি! দীঘিটা প্রায় আধ ক্রোশ দীর্ঘ। উত্তরদিকটা মজিয়া বুজিয়া গিয়াছে, এবং তাহা ঘন জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। গ্রামের বাহিরে বলিয়া গ্রামের মেয়েরা ইহার জল ব্যবহার করিতে পারিত না। কথায় কথায়

শুনিয়াছিলাম, এই দীঘিটি যে কতদিনের এবং কে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা কেহ জানে না। একটা পুরানো ভাঙ্গা ঘাট ছিল, তাহারই একান্তে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এক সময়ে ইহারই চতুর্দিক ঘিরিয়া বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; কবে নাকি ওলাউঠার মহামারীতে উজাড় হইয়া গিয়া বর্তমান স্থানে সরিয়া গিয়াছে। পরিত্যক্ত গৃহের বহু চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান অস্তগামী সূর্যের তির্যক্ রশ্মিছটা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দীঘির কালো জলে সোনা মাখাইয়া দিল, আমি চাহিয়া বসিয়া রহিলাম।

তারপরে ক্রমশঃ সূর্য ডুবিয়া দীঘির কালো জল আরো কালো হইয়া উঠিল, অদূরে বন হইতে বাহির হইয়া দুই-একটা পিপাসার্ত শৃগাল ভয়ে ভয়ে জলপান করিয়া সরিয়া গেল। আমার যে উঠিবার সময় হইয়াছে, যে সময়টুকু কাটাইতে আসিয়াছিলাম তাহা কাটিয়া গিয়াছে—সমস্ত অনুভব করিয়াও উঠিতে পারিলাম না—এই ভাঙ্গা ঘাট যেন আমাকে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিল।

মনে হইল, এই যেখানে পা রাখিয়া বসিয়াছি, সেইখানে পা দিয়া কত লোক কতবার আসিয়াছে, গিয়াছে। এই ঘাটেই তাহারা স্নান করিত, গা ধুইত, কাপড় কাচিত, জল তুলিত। এখন তাহারা কোথাকার কোন্ জলাশয়ে এই সমস্ত নিত্যকর্ম সমাধা করে? এই গ্রাম যখন জীবিত ছিল, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এমনি সময়ে এখানে আসিয়া বসিত; কত গান, কত গল্প করিয়া সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিত। তারপরে অকস্মাৎ একদিন যখন মহাকাল মহামারী-রূপে দেখা দিয়া সমস্ত গ্রাম ছিঁড়িয়া লইয়া গেলেন, তখন কত মুমূর্ষু হয়ত তৃষ্ণায় ছুটিয়া আসিয়া এই ঘাটের উপরেই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। হয়ত তাহাদের তৃষ্ণার্ত আত্মা আজিও এইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাহা চোখে দেখি না তাহাই যে নাই এমন কথাই বা কে জোর করিয়া বলিবে? আজ সকালেই সেই প্রবীণ ব্যক্তিটি বলিয়াছিলেন, বাবুজী, মৃত্যুর পরে যে কিছুই থাকে না, অসহায় প্রেতাত্মারা যে আমাদের মতই সুখ-দুঃখ ক্ষুধা-তৃষ্ণা লইয়া বিচরণ করে না, তাহা কদাচ মনে করিয়ো না। এই বলিয়া তিনি রাজা বিক্রমাদিত্যের গল্প, তাল-বেতাল সিদ্ধির গল্প, আর কত তান্ত্রিক সাধু-সন্ন্যাসীর কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। আরও বলিয়াছিলেন যে, সময় এবং সুযোগ হইলে তাহারা যে দেখা দিতে, কথা কহিতে পারে না বা করে না, তাহাও ভাবিয়ো না, তোমাকে আর কখনো সেস্থানে যাইতে বলি না, কিন্তু যাহারা এ কাজ পারে তাহাদের সমস্ত দুঃখ যে কোনদিন সার্থক হয় না, এ কথা স্বপ্নেও অবিশ্বাস করিয়ো না!

তখন সকালবেলার আলোর মধ্যে যে কথাগুলো শুধু নিরর্থক হাসির উপাদান আনিয়া দিয়াছিল, এখন সেই কথাগুলাই এই নির্জন গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আর একপ্রকার চেহারা লইয়া দেখা দিল। মনে হইতে লাগিল, জগতের প্রত্যক্ষ সত্য যদি কিছু থাকে, ত সে মরণ। এই জীবনব্যাপী ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখের অবস্থাগুলা যেন আতসবাজীর বিচিত্র সাজ-সরঞ্জামের মত শুধু একটা কোন্ বিশেষ দিনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই এত যত্নে এত কৌশলে গড়িয়া উঠিতেছে। তবে মৃত্যুর পরপারের ইতিহাসটা যদি কোন উপায়ে শুনিয়া লইতে পারা যায়, তবে তার চেয়ে লাভ আর আছে কি? তা সে যেই বলুক এবং যেমন করিয়াই বলুক না।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম শুধু অন্ধকার, কেহ কোথাও নাই। একটা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া নিজের মনে হাসিয়া বলিলাম, না, আর বসে থাকা নয়। কাল ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলে গেছে, আজ এসে যদি বাঁ কানের উপর শুরু করে দেয় ত সে বড় সোজা হবে না।

কতক্ষণ যে বসিয়া কাটাইয়াছি, এখন রাত্রি কত ঠিক ঠাহর করিতে পারিলাম না। বোধ হয় যেন দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। কিন্তু এ কি? চলিয়াছি ত চলিয়াছি—এই সঙ্কীর্ণ পায়ে-চলা পথ আর শেষ হয় না। এতগুলা তাঁবুর একটা আলোও যে চোখে পড়ে না! অনেকক্ষণ হইতেই সম্মুখে একটা বাঁশঝাড় দৃষ্টিরোধ করিয়া বিরাজ করিতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, কৈ এটা ত আসিবার সময় লক্ষ্য করি নাই। দিক্ ভুল করিয়া ত আর একদিকে চলি নাই? আরো খানিকটা অগ্রসর হইতেই টের পাইলাম। সেটা বাঁশঝাড় নয়, গোটা-কয়েক তেঁতুলগাছ জড়া-জড়ি করিয়া দিগন্ত আবৃত করিয়া অন্ধকার জমাট বাঁধাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই নীচে

দিয়া পথটা আঁকিয়া-বাঁকিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। জায়গাটা এমনি অন্ধকার যে নিজের হাতটা পর্যন্ত দেখা যায় না। বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুরুগুরু করিয়া উঠিল—এ যাইতেছি কোথায়? চোখ-কান বুজিয়া কোনমতে সেই তেঁতুলতলাটা পার হইয়া দেখি, সম্মুখে অনন্ত কালো আকাশ যতদূর দেখা যায়, ততদূর বিস্তৃত হইয়া আছে। কিন্তু সুমুখে ওই উঁচু জায়গাটা কি? নদীর ধারে সরকারী বাঁধ নয়ত? বাঁধই ত বটে! পা-দুটো যেন ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল; তবুও টানিয়া টানিয়া কোনমতে তাহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই! ঠিক নীচেই সেই মহাশ্মশান। আবার কাহার পদশব্দ সুমুখ দিয়াই নীচে শ্মশানে গিয়া মিলাইয়া গেল। এইবার টলিয়া টলিয়া সেই ধূলা-বালুর উপরেই মূর্ছিতের মত ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। আর আমার লেশমাত্র সংশয় রহিল না যে, কে আমাকে এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহাশ্মশানে পথ দেখাইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল। সেই যাহার পদশব্দ শুনিয়া ভাঙ্গা ঘাটের উপর গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার পদশব্দ এতক্ষণ পরে ওই সম্মুখে মিলাইল।

দশ

সমস্ত ঘটনারই হেতু দেখাইবার জিদটা মানুষের যে বয়সে থাকে, সে বয়স আমার পার হইয়া গেছে। সুতরাং কেমন করিয়াই যে এই সূচিভেদ্য অন্ধকার নিশীথে একাকী পথ চিনিয়া দীঘির ভাঙ্গাঘাট হইতে এই শ্মশানের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং কাহারই বা সেই পদধ্বনি সেখানে আহ্বান-ইঙ্গিত করিয়া এইমাত্র সুমুখে মিলাইয়া গেল, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিবার মত বুদ্ধি আমার নাই—পাঠকের কাছে আমার দৈন্য স্বীকার করিতে এখন আর আমি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছি না। এ রহস্য আজও আমার কাছে তেমনি আঁধারে আবৃত রহিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রেতযোনি স্বীকার করাও এ স্বীকারোক্তির প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য নয়। কারণ নিজের চোখেই ত দেখিয়াছি—আমাদের গ্রামেই একটা বৃদ্ধ পাগল ছিল; সে দিনের বেলা বাড়ি বাড়ি ভাত চাহিয়া খাইত, আর রাত্রিতে একটা ছোট মইয়ের উপর কোঁচার কাপড়টা তুলিয়া দিয়া, সেটা সুমুখে উঁচু করিয়া ধরিয়া পথের ধারের বাগানের মধ্যে গাছের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইত। সে চেহারা দেখিয়া অন্ধকারে কত লোকের যে দাঁতকপাটি লাগিয়াছে, তাহার অবধি নাই। কোন স্বার্থ নাই, অথচ এই ছিল তাহার অন্ধকার রাত্রির কাণ্ড। নিরর্থক মানুষকে ভয় দেখাইবার আরও কত প্রকারের অদ্ভুত ফন্দি যে তাহার ছিল, তাহার সীমা নাই। শুকনো কাঠের আঁটি গাছের ডালে বাঁধিয়া তাহাতে আগুন দিত; মুখে কালিঝুলি মাখিয়া বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে বহুক্লেশে খড়া বাহিয়া উঠিয়া বসিয়া থাকিত; গভীর রাত্রিতে ঘরের কানাচে বসিয়া খোনা গলায় চাষাদের নাম ধরিয়া ডাকিত। অথচ কেহ কোন দিন তাহাকে ধরিতে পারে নাই; এবং দিনের বেলায় তাহার চাল-চলন, স্বভাব চরিত্র দেখিয়া ঘুণাগ্রেও তাহাকে সংশয় করিবার কথা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। আর এ শুধু আমাদের গ্রামেই নয়—আট-দশখানা গ্রামের মধ্যেই সে এই কর্ম করিয়া বেড়াইত। মরিবার সময় নিজের বজ্জাতি সে নিজে স্বীকার করিয়া যায়; এবং ভূতের দৌরাত্ম্যও তখন হইতে শেষ হয়। এ ক্ষেত্রেও হয়ত তেমনি কিছু ছিল, হয়ত ছিল না। কিন্তু যাক গে!

বলিতেছিলাম যে সেই ধূলা-বালি-ভরা বাঁধের উপর যখন হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলাম, তখনই শুধু দুটি লঘু পদধ্বনি শ্মশানের অভ্যন্তরে গিয়া ধীরে ধীরে মিলাইল। মনে হইল, সে যেন স্পষ্ট করিয়া জানাইল—ছিঃ ছিঃ, ও তুই কি করিলি? তোকে এতটা পথ যে পথ দেখাইয়া আনিলাম, সে কি ওইখানে বসিয়া পড়িবার জন্য! আয় আয়! একেবারে আমাদের ভিতরে চলিয়া আয়! এমন অশুচি অস্পৃশ্যের মত প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে বসিস্‌ না—আমাদের সকলের মাঝখানে আসিয়া বোস্‌। কথাগুলো কানে শুনিয়াছিলাম, কিম্বা হৃদয় হইতে অনুভব করিয়াছিলাম—এ কথা আজ আর স্মরণ করিতে পারি না। কিন্তু তবুও যে চেতনা রহিল, তাহার কারণ—চৈতন্যকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে, সে এমনি একরকম করিয়া বজায় থাকে; একেবারে যায় না, এ আমি বেশ দেখিয়াছি। তাই দু-চোখ মেলিয়া

চাহিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু সে যেন এক তন্দ্রার চাহনি। সে ঘুমানও নয়, জাগাও নয়। তাহাতে নিদ্রিতের বিশ্রামও থাকে না, সজাগের উদ্যমও আসে না। ঐ এক রকম।

তথাপি এ কথাটা ভুলি নাই যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে, আমাকে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে; এবং সে জন্য একবার অন্ততঃ চেষ্টা করিতাম কিন্তু মনে হইল সব বৃথা। এখানে আমি ইচ্ছা করিয়া আসি নাই—আসিবার কল্পনাও করি নাই। সুতরাং যে আমাকে এই দুর্গম পথে পথ দেখাইয়া আনিয়াছে, তাহার বিশেষ কোন কাজ আছে। সে আমাকে শুধু শুধু ফিরিতে দিবে না। পূর্বে শুনিয়াছিলাম, নিজের ইচ্ছায় ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। যে পথে যেমন করিয়াই জোর করিয়া বাহির হও না কেন, সব পথই গোলকধাঁধার মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সাবেক জায়গায় আনিয়া হাজির করে।

সুতরাং চঞ্চল হইয়া ছটফট করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোনপ্রকার গতির চেষ্টামাত্র না করিয়া যখন স্থির হইয়া বসিলাম, তখন অকস্মাৎ যে জিনিসটি চোখে পড়িয়া গেল, তাহার কথা আমি কোনদিন বিস্মৃত হই নাই।

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি জাতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশ-তলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত-চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ-বাতাস স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন। তাই রাধার দু-চক্ষু ভরিয়া যে-রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম! কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান-প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এমনি অফুরন্ত, সুন্দর রূপে আমার দু-চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে, হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্বদুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জন মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি। সহসা মনে হইল, তাই ত! তাঁহার ওই নির্বাক আহ্বান উপেক্ষা করিয়া অত্যন্ত হীন অন্তেবাসীর মত এই বাহিরে বসিয়া আছি কি জন্য? একেবারে ভিতরে, মাঝখানে গিয়া বসি না কেন?

নামিয়া গিয়া ঠিক মধ্যস্থলে একেবারে চাপিয়া বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ যে এখানে এইভাবে স্থির হইয়া ছিলাম, তখন হুঁশ ছিল না। হুঁশ হইলে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে; এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিতেছে। একটা চাপা কথাবার্তার কোলাহল কানে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমুল গাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারা যেন চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহাদের দুই-চারিটা লণ্ঠনের আলোকও আশেপাশে ইতস্ততঃ দুলিতেছে। পুনর্বার বাঁধের

উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, দুইখানা গরুর গাড়ির অগ্রপশ্চাৎ জনকয়েক লোক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম কাহারা এই পথে স্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক। কারণ আগন্তুকের দল যত বুদ্ধিমান এবং সাহসীই হোক, হঠাৎ এই অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর-কিছু না করুক, একটা বিষম হৈ-হৈ রৈ-রৈ চীৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ফিরিয়া আসিয়া পূর্বস্থানে দাঁড়াইলাম, এবং অনতিকাল পরেই ছই-দেওয়া দুইখানি গো-শকট পাঁচ-ছয়জনের প্রহরায় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। একবার মনে হইল, ইহাদের অগ্রগামী লোক-দুটা আমার দিকে চাহিয়াই ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কি যেন বলাবলি করিয়াই পুনরায় অগ্রসর হইয়া গেল; এবং অনতিকাল মধ্যেই সমস্ত দলবল বাঁধের একটা ঝাঁকড়া গাছের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। রাত্রি আর বেশি বাকী নাই অনুভব করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে সু-উচ্চ কণ্ঠের ডাক কানে গেল, শ্রীকান্তবাবু—

সাড়া দিলাম, কে রে, রতন?

আজ্ঞে, হাঁ বাবু, আমি। একটু এগিয়ে আসুন।

দ্রুতপদে বাঁধের উপরে উঠিয়া ডাকিলাম, রতন, তোরা কি বাড়ি যাচ্ছিস্?

রতন উত্তর দিল, হাঁ বাবু, বাড়ি যাচ্ছি—মা গাড়িতে আছেন।

অদূরে উপস্থিত হইতেই, পিয়ারী পর্দার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এ যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি দরোয়ানের কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি। গাড়িতে উঠে এসো, কথা আছে।

আমি সন্নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কথা?

উঠে এসো বলচি!

না, তা পারব না, সময় নেই। ভোরের আগেই আমাকে তাঁবুতে পৌঁছুতে হবে। পিয়ারী হাত বাড়াইয়া খপ্ করিয়া আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া তীব্র জিদের স্বরে বলিল, চাকর-বাকরের সামনে আর টলাটলি কোরো না—তোমার পায়ে পড়ি একবার উঠে এসো—

তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কতকটা যেন হতবুদ্ধি হইয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম; পিয়ারী গাড়ি হাঁকাইতে আদেশ দিয়া কহিল, আজ আবার এখানে তুমি কেন এলে?

আমি সত্য কথাই বলিলাম। কহিলাম, জানি না।

পিয়ারী এখনও আমার হাত ছাড়ে নাই। বলিল, জান না? আচ্ছা বেশ। কিন্তু লুকিয়ে এসেছিলে কেন?

বলিলাম, এখানে আসার কথা কেউ জানে না বটে, কিন্তু লুকিয়ে আসিনি।

মিথ্যে কথা।

না।

তার মানে?

মানে যদি খুলে বলি, বিশ্বাস করবে? আমি লুকিয়েও আসিনি, আসবার ইচ্ছেও ছিল না।

পিয়ারী বিদ্রূপের স্বরে কহিল, তা হ'লে তাঁবু থেকে তোমাকে উড়িয়ে এনেচে—বোধ করি বলতে চাও?

না, তা বল্‌তে চাইনে। উড়িয়ে কেউ আনেনি; নিজের পায়ে হেঁটে এসেছি সত্যি। কিন্তু কেন এলুম, কখন এলুম, বলতে পারিনে।

পিয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, রাজলক্ষ্মী, তুমি বিশ্বাস করতে পারবে কি না জানিনে, কিন্তু বাস্তবিক ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য। বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করিলাম।

শুনিতে শুনিতে আমার হাত-ধরা তাহার হাতখানা বারংবার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না। পর্দা তোলা ছিল, পিছনে চাহিয়া দেখিলাম আকাশ ফর্সা হইয়া গেছে। বলিলাম, এইবার আমি যাই।

পিয়ারী স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, না।

না কি রকম? এমনভাবে চলে যাবার অর্থ কি হবে জান?

জানি—সব জানি। কিন্তু এরা ত তোমার অভিভাবক নয় যে, মানের দায়ে প্রাণ দিতে হবে? বলিয়াই সে আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া পা ধরিয়া ফেলিয়া রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, কান্তদা, কিন্তু সেখানে ফিরে গেলে আর তুমি বাঁচবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না, কিন্তু সেখানেও আর ফিরে যেতে দেব না। তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি, তুমি বাড়ি চলে যাও—কিংবা যেখানে খুশি যাও, কিন্তু ওখানে আর এক দণ্ডও না।

আমি বলিলাম, আমার কাপড়-চোপড় রয়েছে যে।

পিয়ারী কহিল, থাক পড়ে। তাদের ইচ্ছা হয় তোমাকে পাঠিয়ে দেবে, নাহয় থাক গে। তার দাম বেশি নয়।

আমি বলিলাম, তার দাম বেশি নয় সত্য; কিন্তু যে মিথ্যা কুৎসার রটনা হবে, তার দাম ত কম নয়!

পিয়ারী আমার পা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়ি এই সময় মোড় ফিরিতেই পিছনটা আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে হইল, সম্মুখের ওই পূর্ব-আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়াই যেন একটা বিরাট অগ্নিপিণ্ড অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে। কহিলাম, চুপ করে রইলে যে?

পিয়ারী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, কি জানো কান্তদা, যে কলম দিয়ে সারা-জীবন শুধু জালখত তৈরি করেচি, সেই কলমটা দিয়েই আজ আর দানপত্র লিখতে হাত সরুচে না। যাবে? আচ্ছা যাও! কিন্তু কথা দাও—আজ বেলা বারোটার আগেই বেরিয়ে পড়বে?

আচ্ছা।

কারো কোন অনুরোধেই আজ রাত্রি ওখানে কাটাবে না, বল?

না।

পিয়ারী হাতের আঙটি খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল; এবং পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া আঙটিটা আমার পকেটে ফেলিয়া দিল। বলিল, তবে যাও—বোধ করি ক্রোশ-দেড়েক পথ তোমাকে বেশি হাঁটতে হবে।

গো-যান হইতে অবতরণ করিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল। পিয়ারী অনুনয় করিয়া কহিল, আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখতে হবে। বাড়ি ফিরে গিয়ে একখানি চিঠি দেবে।

আমি স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলাম। একটিবারও পিছনে চাহিয়া দেখিলাম না, তখনও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে কিংবা অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু বহুদূর পর্যন্ত অনুভব করিতে পারিলাম, দুটি চক্ষের সজল-করুণ দৃষ্টি আমার পিঠের উপর বারংবার আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।

আড্ডায় পৌঁছাইতে প্রায় আটটা বাজিয়া গেল। পথের ধারে পিয়ারীর ভাঙ্গা-তাঁবুর বিক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত জিনিসগুলো চোখে পড়িবামাত্র একটি নিষ্ফল ক্ষোভ বুকের মধ্যে যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দ্রুতপদে তাঁবুর মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলাম।

পুরুষোত্তম জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বড় ভোরেই বেড়াতে বার হ'য়েছিলেন?

আমি হাঁ-না কোন কথাই না বলিয়া শয্যায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম।

এগার

পিয়ারীর কাছে যে সত্য করিয়াছিলাম, তাহা যে রক্ষাও করিয়াছিলাম, বাটী ফিরিয়া এই সংবাদ জানাইয়া তাহাকে চিঠি দিলাম। অবিলম্বে জবাব আসিল। আমি একটা বিষয় বারবার লক্ষ্য করিয়াছিলাম—কোন দিন পিয়ারী আমাকে তাহার পাটনার বাটীতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি ত করে নাই, সামান্য একটা মুখের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত জানায় নাই। এই পত্রের মধ্যেও তাহার লেশমাত্র ইঙ্গিত ছিল না। শুধু নীচের দিকে একটা 'নিবেদন' ছিল, যাহা

আমি আজও ভুলি নাই। সুখের দিনে না হোক, দুঃখের দিনে তাহাকে বিস্মৃত না হই—এই প্রার্থনা।

দিন কাটিতে লাগিল। পিয়ারীর স্মৃতি ঝাপসা হইয়া প্রায় বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার মাঝে মাঝে আমার চোখে পড়িতে লাগিল—এবার শিকার হইতে ফিরিয়া পর্যন্ত আমার মন যেন কেমন বিমনা হইয়া গেছে; কেমন যেন একটা অভাবের বেদনা চাপা সর্দির মত দেহের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেছে। বিছানায় শুইতে গেলেই তাহা খচখচ করিয়া বাজে।

এটা মনে পড়ে, সে দিনটা হোলির রাত্রি। মাথা হইতে তখনও আবিরের গুঁড়া সাবান দিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলা হয় নাই। ক্লান্ত বিবশ দেহে শয্যার উপর পড়িয়া ছিলাম। পাশের জানালাটা খোলা ছিল; তাই দিয়া সুমুখের অশ্বত্থ গাছের ফাঁক দিয়া আকাশ-ভরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া ছিলাম। এতটাই মনে পড়ে। কিন্তু কেন যে দোর খুলিয়া সোজা স্টেশনে চলিয়া গেলাম এবং পাটনার টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িয়া বসিলাম—তাহা মনে পড়ে না। রাত্রিটা গেল। কিন্তু দিনের বেলা যখন শুনিলাম সেটা 'বাড়' স্টেশন, এবং পাটনার আর দেরি নাই তখন হঠাৎ সেখানেই নামিয়া পড়িলাম। পকেটে হাত দিয়া দেখি উদ্বেগের কিছুমাত্র হেতু নাই, দু-আনি এবং পয়সাতে দশটা পয়সা তখনও আছে। খুশি হইয়া দোকানের সন্ধানে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া গেলাম। দোকান মিলিল। চুড়া, দহি এবং শর্করা সংযোগে অত্যুৎকৃষ্ট ভোজন সম্পন্ন করিতে অর্ধেক ব্যয় হইয়া গেল। তা যাক। জীবনে অমন কত যায়—সে জন্যে ক্ষুণ্ণ হওয়া কাপুরুষতা।

গ্রামে পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। ঘণ্টা-খানেক ঘুরিতে না ঘুরিতে টের পাইলাম জায়গাটার দধি ও চুড়া যে পরিমাণে উপাদেয়, পানীয় জলটা সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট। আমার অমন ভূরিভোজন এইটুকু সময়ের মধ্যে এমনি পরিপাক করিয়া নষ্ট করিয়া দিল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন দশ-বিশ দিন তণ্ডুল-কণাটিও মুখে যায় নাই। এরূপ কদর্য স্থানে বাস করা আর একদণ্ড উচিত নয় মনে করিয়া স্থান ত্যাগের কল্পনা করিতেছি, দেখি অদূরে একটা আমবাগানের ভিতর হইতে ধুম দেখা দিয়াছে।

আমার ন্যায়শাস্ত্র জানা ছিল। ধুম দেখিয়া অগ্নি নিশ্চয়ই অনুমান করিলাম; বরঞ্চ অগ্নিরও হেতু অনুমান করিতে আমার বিলম্ব হইল না। সুতরাং সোজা সেইদিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, জলটা এখানকার বড় বদ।

বাঃ—এই ত চাই! এ যে খাঁটি সন্ন্যাসীর আশ্রম। মস্ত ধুনির উপর লোটায় করিয়া চায়ের জল চড়িয়াছে। 'বাবা' অর্ধমুদ্রিত চক্ষে সম্মুখে বসিয়া আছেন; তাঁহার আশেপাশে গাঁজার উপকরণ। একজন বাচ্চা-সন্ন্যাসী একটা ছাগী দোহন করিতেছে—চা-সেবায় লাগিবে। গোটা-দুই উট, গোটা-দুই টাট্টু ঘোড়া এবং সবৎসা গাভী কাছাকাছি গাছের ডালে বাঁধা রহিয়াছে। পাশেই একটা ছোট তাঁবু। উঁকি মারিয়া দেখি, ভিতরে আমার বয়সী এক চেলা দুই পায়ে পাথরের বাটি ধরিয়া মস্ত একটা নিমদণ্ড দিয়া ভাঙ তৈয়ারি করিতেছে। দেখিয়া আমি ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম; এবং চক্ষের পলকে সাধু বাবাজীর পদতলে একেবারে লুটাইয়া পড়িলাম। পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া করজোড়ে মনে মনে বলিলাম, ভগবান, তোমার কি অসীম করুণা! কি স্থানেই আমাকে আনিয়া দিলে! চুলোয় যাক গে পিয়ারী,—এই মুক্তি-মার্গের সিংহদ্বার ছাড়িয়া তিলার্ধ যদি অন্যত্র যাই, আমার যেন অনন্ত নরকেও আর স্থান না হয়!

সাধুজী বলিলেন, কেঁও বেটা?

আমি সবিনয়ে নিবেদন করিলাম, আমি গৃহত্যাগী, মুক্তি-পথান্বেষী হতভাগ্য শিশু; আমাকে দয়া করিয়া তোমার চরণ-সেবার অধিকার দাও।

সাধুজী মৃদু হাস্য করিয়া বার-দুই মাথা নাড়িয়া হিন্দী করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, বেটা ঘরে ফিরিয়া যাও—এ পথ অতি দুর্গম।

আমি করুণ-কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলাম, বাবা, মহাভারতে লেখা আছে, মহাপাপিষ্ঠ জগাই-মাধাই বশিষ্ঠ মুনির পা ধরিয়া স্বর্গে গিয়াছিলেন; আর আপনার পা ধরিয়া আমি কি মুক্তিও পাইব না? নিশ্চয়ই পাইব।

সাধুজী খুশি হইয়া বলিলেন, বাত তেরা সাচ্চা হ্যায়। আচ্ছা বেটা রামজীকা খুশি। যিনি দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া চা তৈরি করিয়া 'বাবা'কে দিলেন। তাঁহার সেবা হইয়া গেলে আমরা প্রসাদ পাইলাম।

ভাঙ তৈয়ারি হইতেছিল সন্ধ্যার জন্যে। তখনও বেলা ছিল, সুতরাং অন্য প্রকার আনন্দের উদ্যোগ করিতে 'বাবা' তাঁর দ্বিতীয় চেলাকে গঞ্জিকার কলিকাটা ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন; এবং প্রস্তুত হইতে বিলম্ব না হয় সে বিষয়ে বিশেষ করিয়া উপদেশ দিলেন।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সর্বদর্শী 'বাবা' আমার প্রতি পরম তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হাঁ বেটা, তোমার অনেক গুণ। তুমি আমার চেলা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

আমি পরমানন্দে আর একবার বাবার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলাম। দেখিলাম, গুরুজীর আশীর্বাদে অভাব কিছুরই নাই। প্রধান চেলা যিনি, তিনি টাট্‌কা একসুট গেরুয়া বস্ত্র, জোড়া-দশেক ছোটবড় রুদ্রাক্ষ-মালা এবং এক-জোড়া পিতলের তাগা বাহির করিয়া দিলেন। যেখানে যেটি মানায়—সাজগোজ করিয়া, খানিকটা ধুনির ছাই মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিলাম। চোখ টিপিয়া কহিলাম, বাবাজী, আয়না-টায়না হ্যায়? মুখখানা যে ভারি একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্চে! দেখিলাম, তাঁহারও রস-বোধ আছে; তথাপি একটুখানি গম্ভীর হইয়া তাচ্ছিল্যভরেই বলিলেন, হ্যায় একঠো।

তবে লুকিয়ে আনো না একবার!

মিনিট-দুই পরে আয়না লইয়া একটা গাছের আড়ালে গেলাম। পশ্চিমী নাপিতরা যেরূপ একখানি আয়না হাতে ধরাইয়া দিয়া ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করে, সেইরূপ ছোট একটুখানি টিন-মোড়া আরশি। তা হোক, একটুখানি দেখিলাম, যত্নে এবং সদা ব্যবহারে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চেহারা দেখিয়া আর হাসিয়া বাঁচি না। কে বলিবে আমি সেই শ্রীকান্ত, যিনি কিছুকাল পূর্বেই রাজা-রাজড়ার মজলিসে বসিয়া বাইজীর গান শুনিতেছিলেন! তা যাক।

ঘণ্টাখানেক পরে গুরুমহারাজের সমীপে দীক্ষার জন্য নীত হইলাম। মহারাজ চেহারা দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, বেটা, মহিনা এক-অধ ঠহ্‌রো।

মনে মনে বহুত আচ্ছা বলিয়া তাঁর পদধূলি গ্রহণ করিয়া যুক্তকরে, ভক্তিভরে একপাশে বসিলাম।

আজ কথায় কথায় তিনি আধ্যাত্মিকতার অনেক উপদেশ দিলেন। ইহার দুরূহতার বিষয়, ইহার গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার বিষয়, আজকাল ভণ্ড পাষণ্ডেরা কি প্রকারে ইহা কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার বিশেষ বিবরণ, এবং ভগবৎপাদপদ্মে মতি স্থির করিতে হইলেই বা কি-কি আবশ্যক, এতৎপক্ষে বৃক্ষজাতীয় শুষ্ক বস্তুবিশেষের ধূম ঘন-ঘন মুখ-বিবর দ্বারা শোষণ করত নাসারন্ধ্রপথে শনৈঃ শনৈঃ বিনির্গত করায় কিরূপ আশ্চর্য উপকার, তাহা বুঝাইয়া দিলেন, এবং এ বিষয়ে আমার নিজের অবস্থা যে অত্যন্ত আশাপ্রদ সেই ইঙ্গিত করিয়াও আমার উৎসাহবর্ধন করিলেন। এইরূপে সে দিন মোক্ষপথের অনেক নিগূঢ় তাৎপর্য অবগত হইয়া গুরুমহারাজের তৃতীয় চেলাগিরিতে বহাল হইয়া গেলাম।

গভীর বিরাগ এবং কঠোর সাধনার জন্য মহারাজের আদেশে আমাদের সেবার ব্যবস্থাটা অমনি একটু কঠোর রকমের ছিল। তাহার পরিমাণও যেমনি, রসনাতেও তাহা তেমনি। চা, রুটি, ঘৃত, দধিদুগ্ধ, চুড়া, শর্করা ইত্যাদি কঠোর সাত্ত্বিক ভোজন এবং তাহা জীর্ণ করিবার অনুপান। আবার ভগবৎপদারবিন্দ হইতেও চিত্ত বিক্ষিপ্ত না হয়, সেদিকেও আমাদের লেশমাত্র অবহেলা ছিল না। ফলে আমার শুক্‌নো কাঠে ফুল ধরিয়া গেল,—একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণও দেখা দিল।

একটা কাজ ছিল—ভিক্ষায় বাহির হওয়া। সন্ন্যাসীর পক্ষে ইহা সর্বপ্রধান কাজ না হইলেও, একটা প্রধান কাজ বটে। কারণ সাত্ত্বিক ভোজনের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু মহারাজ নিজে ইহা করিতেন না, আমরা তাঁহার সেবকেরা পালা করিয়া করিতাম। সন্ন্যাসীর অপরাপর কর্তব্যে আমি তাঁহার অন্য দুই চেলাকে অতি সত্বর ডিঙ্গাইয়া গেলাম; শুধু এইটাতেই বরাবর খোঁড়াইতে লাগিলাম; এটা কোনদিনই নিজের কাছে সহজ এবং রুচিকর করিয়া তুলিতে পারিলাম না। তবে এই একটা সুবিধা ছিল—সেটা হিন্দুস্থানীদের

দেশ। আমি ভাল-মন্দর কথা বলিতেছি না, আমি বলিতেছি, বাঙ্গলা দেশের মত সেখানকার মেয়েরা 'হাতজোড়া—আর একবাড়ি এগিয়ে দেখ' বলিয়া উপদেশ দিত না, এবং পুরুষেরাও চাকরি না করিয়া ভিক্ষা করি কেন, তাহার কৈফিয়ত তলব করিত না। ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে প্রতি গৃহস্থই সেখানে ভিক্ষা দিত—কেহই বিমুখ করিত না। এম্‌নি দিন যায়। দিন-পনর ত সেই আম-বাগানের মধ্যেই কাটিয়া গেল। দিনের বেলা কোন বালাই নাই, শুধু রাত্রে মশার কামড়ের জ্বালায় মনে হইত—থাক্ মোক্ষসাধন। গায়ের চামড়া আর একটু মোটা করিতে না পারিলে ত আর বাঁচি না! অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালী যত সেরাই হোক, এ বিষয়ে বাঙ্গালীর চেয়ে হিন্দুস্থানী-চামড়া যে সন্ন্যাসের পক্ষে ঢের বেশি অনুকূল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেদিন প্রাতঃস্নান করিয়া সাত্ত্বিকভোজনের চেষ্টায় বহির্গত হইতেছি, গুরুমহারাজ ডাকিয়া বলিলেন—

"ভরদ্বাজ মুনি বসহিঁ প্রয়াগা
যিনহি রামপদ অতি অনুরাগা—"

অর্থাৎ স্ট্রাইক্ দি টেন্ট—প্রয়াগ যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু কাজ ত সহজ নয়! সন্ন্যাসীর যাত্রা কিনা! পা-বাঁধা টাট্টু খুঁজিয়া আনিয়া বোঝাই দিতে, উটের উপরে মহারাজের জিন কষিয়া দিতে, গরু-ছাগল সঙ্গে লইতে, পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিতে গুছাইতে একবেলা গেল। তার পরে রওনা হইয়া ক্রোশ-দুই দূরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে বিঠৌরা গ্রামপ্রান্তে এক বিরাট বটমূলে আস্তানা ফেলা হইল। জায়গাটি মনোরম, গুরুমহারাজের দিব্য পছন্দ হইল। তা ত হইল, কিন্তু সেই ভরদ্বাজ মুনির আস্তানায় পেঁছিতে যে কয় মাস লাগিবে, সে ত অনুমান করিতেই পারিলাম না।

এই বিঠৌরা গ্রামের নামটা কেন আমার মনে আছে, তাহা এইখানে বলিব। সে দিনটা পূর্ণিমা তিথি। অতএব গুরু-আদেশে আমরা তিন জনেই তিন দিকে ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। একা হইলে উদরপূর্তির জন্য চেষ্টাচরিত্র মন্দ করিতাম না। কিন্তু আজ আমার সে চাড় ছিল না বলিয়া অনেকটা নিরর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। একটা বাড়ির খোলা দরজার ভিতর দিয়া হঠাৎ একটা বাঙ্গালী মেয়ের চেহারা চোখে পড়িয়া গেল। তার কাপড়খানা যদিচ দেশী তাঁতে-বোনা গুণচটের মতই ছিল, কিন্তু পরিবার বিশেষ ভঙ্গিটাই আমার কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছিল। ভাবিলাম, পাঁচ-ছয়দিন এই গ্রামে আছি, প্রায় সব ঘরেই গিয়াছি, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে ত দূরের কথা—একটা পুরুষের চেহারাও ত চোখে পড়ে নাই। সাধু-সন্ন্যাসীর অবারিত দ্বার। ভিতরে প্রবেশ করিতেই, মেয়েটি আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখখানি আমি আজও মনে করিতে পারি! তাহার কারণ এই যে, দশ-এগার বছরের মেয়ের চোখে এমন করুণ, এমন মলিন উদাস চাহনি, আমি আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাহার মুখে, তাহার ঠোঁটে, তাহার চোখে, তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া দুঃখ এবং হতাশা যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। আমি একেবারেই বাঙ্গলা করিয়া বলিলাম, চাট্টি ভিক্ষে আনো দেখি মা। প্রথমটা সে কিছুই বলিল না। তার পরে তার ঠোঁটদুটি বার-দুই কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিল; তার পরে সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি মনে মনে একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। কারণ সম্মুখে কেহ না থাকিলেও, পাশের ঘর হইতে বেহারী মেয়েদের কথাবার্তা শুনা যাইতেছিল। তাহাদের কেহ হঠাৎ বাহির হইয়া এ অবস্থায় উভয়কে দেখিয়া কি ভাবিবে, কি বলিবে, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া—দাঁড়াইব, কি প্রস্থান করিব, স্থির করিবার পূর্বেই মেয়েটি কাঁদিতে কাঁদিতে এক নিশ্বাসে সহস্র প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তুমি কোথা থেকে আসচ? তুমি কোথায় থাক? তোমার বাড়ি কি বর্ধমান জেলায়?' কবে সেখানে যাবে? তুমি রাজপুর জানো? সেখানকার গৌরী তেওয়ারীকে চেন?

আমি কহিলাম, তোমার বাড়ি কি বর্ধমানের রাজপুরে?

মেয়েটি হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া বলিল, হাঁ। আমার বাবার নাম গৌরী তেওয়ারী, আমার দাদার নাম রামলাল তেওয়ারী। তাঁদের তুমি চেনো? আমি তিনমাস শ্বশুরবাড়ি এসেছি—একখানি চিঠিও পাইনে। বাবা, দাদা, মা, গিরিবালা, খোকা কেমন আছে কিছু জানিনে। ঐ যে অশ্বত্থ গাছ—ওর তলায় আমার দিদির শ্বশুরবাড়ি। ও-সোমবারে দিদি

গলায় দাঁড় দিয়ে মরেছে—এরা বলে, না—সে কলেরায় মরেছে।

আমি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। ব্যাপার কি? এরা ত দেখ্‌ছি পুরা হিন্দুস্থানী, অথচ মেয়েটি একেবারে খাঁটি বাঙ্গালীর মেয়ে। এতদূরে এ-বাড়িতে এদের শ্বশুরবাড়িটিই বা কি করিয়া হইল, আর ইহাদের স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ীই বা এখানে কি করিতে আসিল?

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার দিদি গলায় দাঁড় দিল কেন?

সে কহিল, দিদি রাজপুরে যাবার জন্য দিনরাত কাঁদত, খেত না, শুত না। তাই তার চুল আড়ায় বেঁধে তাকে সারা দিনরাত দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তাই দিদি গলায় দাঁড় দিয়ে মরেচে।

প্রশ্ন করিলাম, তোমারও শ্বশুর-শাশুড়ী কি হিন্দুস্থানী?

মেয়েটি আর একবার কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, হাঁ। আমি তাদের কথা কিছু বুঝতে পারিনে, তাদের রান্না মুখে দিতে পারিনে—আমি ত দিনরাত কাঁদি; কিন্তু বাবা আমাকে চিঠিও লেখে না, নিয়েও যায় না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, তোমার বাবা এতদূরে তোমার বিয়ে দিলেন কেন?

মেয়েটি কহিল, আমরা যে তেওয়ারী। আমাদের ঘর ও-দেশে ত পাওয়া যায় না।

তোমাকে কি এরা মারধোর করে?

করে না? এই দেখ না, বলিয়া মেয়েটি বাহুতে, পিঠের উপর, গালের উপর দাগ দেখাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, আমিও দিদির মত গলায় দাঁড় দিয়ে মরব।

তাহার কান্না দেখিয়া আমার নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল। আর প্রশ্নোত্তর বা ভিক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। মেয়েটি কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিতে লাগিল, আমার বাবাকে গিয়ে তুমি বল্‌বে ত আমাকে একবার নিয়ে যেতে? নইলে আমি— বলিতে আমি কোনমতে একটা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলাম। মেয়েটির বুকচেরা আবেদন আমার দুই কানের মধ্যে বাজিতেই লাগিল।

রাস্তার মোড়ের উপরেই একটা মুদির দোকান। প্রবেশ করিতেই দোকানদার সসম্মানে অভ্যর্থনা করিল। খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা না করিয়া যখন একখানা চিঠির কাগজ ও কালি-কলম চাহিয়া বসিলাম, তখন সে কিছু আশ্চর্য হইল বটে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিল না। সেইখানে বসিয়া গৌরী তেওয়ারীর নামে একখানা পত্র লিখিয়া ফেলিলাম। সমস্ত বিবরণ বিবৃত করিয়া পরিশেষে এ কথাও লিখিতে ছাড়িলাম না যে, মেয়েটির দিদি সম্প্রতি গলায় দাঁড় দিয়া মরিয়াছে, এবং সেও মারধোর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে। তিনি নিজে আসিয়া ইহার বিহিত না করিলে কি ঘটে বলা যায় না। খুব সম্ভব, তোমার চিঠিপত্র ইহারা মেয়েটিকে দেয় না। ঠিকানা দিলাম, বর্ধমান জেলার রাজপুর গ্রাম। জানি না, সে পত্র গৌরী তেওয়ারীর কাছে পৌঁছিয়াছিল কি না; এবং পৌঁছাইলেও সে কিছু করিয়াছিল কি না। কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনের মধ্যে এম্‌নি মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল যে, এতকাল পরেও সমস্ত স্মরণ রহিয়াছে, এবং এই আদর্শ হিন্দু-সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাতিভেদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের ভাব আজিও যায় নাই।

হইতে পারে, এই জাতিভেদ ব্যাপারটা খুব ভাল; এই উপায়েই সনাতন হিন্দুজাতিটা যখন আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তখন ইহার প্রচন্ড উপকারিতা সম্বন্ধে সংশয় করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই নাই। কে কোথায় দুটো হতভাগা মেয়ে দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দাঁড় দিয়া মরিবে বলিয়া ইহার কঠোর বন্ধন এক বিন্দু শিথিল করার কল্পনা করাও পাগ্‌লামি। কিন্তু মেয়েটার কান্না যে-লোক চোখে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার সাধ্য নাই, এ প্রশ্ন নিজের নিকট হইতে থামাইয়া রাখে যে—কোনমতে টিঁকিয়া থাকাই কি চরম সার্থকতা? এমন অনেক জাতিই ত টিঁকিয়া আছে। কুকিরা আছে, কোল-ভীল-সাঁওতালরা আছে, প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক ছোটখাটো দ্বীপের অনেক ছোটখাটো জাতিরা মানুষ সৃষ্টির শুরু হইতেই বাঁচিয়া আছে। আফ্রিকায় আছে, আমেরিকায় আছে, তাহাদেরও এমন সকল কড়া সামাজিক আইন-কানুন আছে, যে শুনিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়। বয়সের হিসাবে তাহারা য়ুরোপের অনেক জাতির অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের চেয়েও প্রাচীন, আমাদের চেয়েও পুরাতন কিন্তু তাই বলিয়াই যে, ইহারা আমাদের চেয়ে সামাজিক আচার-ব্যবহারে শ্রেষ্ঠ এমন অদ্ভুত সংশয় বোধ করি কাহারো মনে উঠে না। সামাজিক সমস্যা ঝাঁক বাঁধিয়া দেখা

দেয় না। এমনই এক-আধটা কচিৎ, আবির্ভূত হয়। নিজের বাঙ্গালী মেয়ে দুটির খোট্টার ঘরে বিবাহ দিবার সময় গৌরী তেওয়ারীর মনে বোধ করি এরূপ প্রশ্ন আসিয়াছিল। কিন্তু সে বেচারা এই দুরূহ প্রশ্নের কোন পথ খুঁজিয়া না পাইয়াই, শেষে সামাজিক যূপকাষ্ঠে কন্যা-দুটিকে বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিল। যে-সমাজ এই দুইটি নিরুপায় ক্ষুদ্র বালিকার জন্যও স্থান করিয়া দিতে পারে নাই, যে-সমাজ আপনাকে এতটুকু প্রসারিত করিবার শক্তি রাখে না, সে পঙ্গু আড়ষ্ট সমাজের জন্য মনের মধ্যে কিছুমাত্র গৌরব অনুভব করিতে পারিলাম না। কোথায় একজন মস্ত বড়লোকের লেখায় পড়িয়াছিলাম, আমাদের সমাজ 'জাতিভেদ' বলিয়া যে একটা বড় রকম সামাজিক প্রশ্নের উত্তর জগতের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছিল, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজিও হয় নাই, এই রকম একটা কথা; কিন্তু এই সমস্ত যুক্তি-হীন উচ্ছ্বাসের উত্তর দিতেও যেমন প্রবৃত্তি হয় না—'হয় নাই', 'হইবে না', বলিয়া নিজের প্রশ্নের নিজেরই উত্তর প্রবল কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দিয়া যাহারা চাপিয়া বসিয়া যায়, তাহাদের জবাব দেওয়াও তেমনি কঠিন। যাক্ গে।

দোকান হইতে উঠিলাম। সন্ধান করিয়া বেয়ারিং পত্রটা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া যখন আস্তানায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তখনও আমার অন্যান্য সহযোগীরা আটা, চাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে নাই।

দেখিলাম, সাধুবাবা আজ যেন বিরক্ত। হেতুটা তিনি নিজেই ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, এ গ্রামটা সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি তেমন অনুরক্ত নয়; সেবাদির ব্যবস্থা তেমন সন্তোষজনক করে না; সুতরাং কালই এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। যে আজ্ঞা, বলিয়া আমি তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলাম। পাটনাটা দেখিবার জন্য মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রবল কৌতূহল ছিল, নিজের কাছে আর তাহা ঢাকিয়া রাখিতে পারিলাম না।

তা ছাড়া এই সকল বেহারী পল্লীগুলিতে কোন রকম আকর্ষণই খুঁজিয়া পাই না। ইতিপূর্বে বাঙ্গলার অনেক গ্রামেই ত বিচরণ করিয়া ফিরিয়াছি, কিন্তু তাহাদের সহিত ইহাদের কোন তুলনাই হয় না। নরনারী, গাছপালা, জলবায়ু—কোনটাই আপনার বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত মনটা সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত শুধু কেবল পালাই-পালাই করিতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলায় পাড়ায় পাড়ায় তেমন করিয়া খোল-করতালের সঙ্গে কীর্তনের সুর কানে আসে না। দেব-মন্দিরে আরতির কাঁসর-ঘণ্টাগুলাও সেরূপ গম্ভীর মধুর শব্দ করে না। এ দেশের মেয়েরা শাঁখগুলাও কি ছাই তেমন মিষ্ট করিয়া বাজাইতে জানে না! এখানে মানুষ কি সুখেই থাকে! আর মনে হইতে লাগিল, এই সব পাড়াগাঁয়ের মধ্যে না আসিয়া পড়িলে ত নিজেদের পাড়াগাঁয়ের মূল্য কোন দিনই এমন করিয়া চোখে পড়িত না। আমাদের জলে পানা, হাওয়ায় ম্যালেরিয়া, মানুষের পেটে-পেটে পিলে, ঘরে-ঘরে মামলা, পাড়ায়-পাড়ায় দলাদলি—তা হোক, তবু তারই মধ্যে যে কত রস, কত তৃপ্তি ছিল, এখন যেন তাহার কিছুই না বুঝিয়াও সমস্ত বুঝিতে লাগিলাম।

পরদিন তাঁবু ভাঙ্গিয়া যাত্রা করা হইল, এবং সাধুবাবা যথাশক্তি ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমের দিকে সদলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু পথটা সোজা হইবে বলিয়াই হোক, কিংবা মুনি আমার মন বুঝিয়াই হোক পাটনার দশ ক্রোশের মধ্যে আর তাঁবু গাড়িলেন না। মনে একটা বাসনা ছিল। তা সে এখন থাক, পাপতাপ অনেক করিয়াছি, সাধুসঙ্গে দিন-কতক পবিত্র হইয়া আসি গে। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে জায়গায় আমাদের আড্ডা পড়িল, তাহার নাম ছোট বাঘিয়া। আরা স্টেশন হইতে ক্রোশ-আষ্টেক দূরে। এই গ্রামে একটি মহাপ্রাণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার সদাশয়তার এইখানে একটু বিবরণ দিব। তাঁহার পৈতৃক নামটা গোপন করিয়া রামবাবু বলাই ভাল। কারণ এখনও তিনি জীবিত আছেন, এবং পরে অন্যত্র যদিচ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎলাভ ঘটিয়াছিল, তিনি আমাকে চিনিতে পারেন নাই। না-পারা আশ্চর্য নয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাব জানি—গোপনে তিনি যে-সকল সৎকার্য করিয়াছেন, তাহার প্রকাশ্যে উল্লেখ করিলে তিনি বিনয়ে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবেন, তাহা নিশ্চিত বুঝিতেছি। অতএব তাঁর নাম রামবাবু। কি সূত্রে যে রামবাবু এই গ্রামে আসিয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া যে জমিজমা সংগ্রহ করিয়া চাষ-আবাদ করিতেছিলেন,

অত কথা জানি না। এইমাত্র জানি, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ এবং গুটি তিন-চার পুত্র-কন্যা লইয়া তখন সুখে বাস করিতেছিলেন।

সকালবেলা শোনা গেল, এই ছোটা-বড়া বাঘিয়া ত বটেই, আরও পাঁচ-সাতখানি গ্রামের মধ্যে তখন বসন্ত মহামারীরূপে দেখা দিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, গ্রামের এই সকল দুঃসময়ের মধ্যেই সাধু-সন্ন্যাসীর সেবা বেশ সন্তোষজনক হয়। সুতরাং সাধুবাবা অবিচলিতচিত্তে তথায় অবস্থান করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ভাল কথা। সন্ন্যাসী-জীবটার সম্বন্ধে এইখানে আমি একটা কথা বলিতে চাই। জীবনে ইহাদের অনেকগুলিকেই দেখিয়াছি। বার-চারেক এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবেও মিশিয়াছি। দোষ যাহা আছে, সে ত আছেই। আমি গুণের কথাই বলিব। নিছক 'পেটের দায়ে সাধুজী' আপনারা ত আমাকেই জানেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যেও এই দুটো দোষ আমার চোখে পড়ে নাই। আর চোখের দৃষ্টিটাও যে আমার খুব মোটা তাও নয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইহাদের সংযমই বলুন, আর উৎসাহের স্বল্পতাই বলুন—খুব বেশি; এবং প্রাণের ভয়টা ইহাদের নিতান্তই কম, 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ' ত আছেই; কি করিলে অনেকদিন জীবেৎ, এ খেয়াল নাই। আমাদের সাধুবাবারও এ ক্ষেত্রে তাহাই হইল। প্রথমটার জন্য দ্বিতীয়টা তিনি তুচ্ছ করিয়া দিলেন।

একটুখানি ধুনির ছাই এবং দু ফোঁটা কমণ্ডলুর জলের পরিবর্তে যে-সকল বস্তু হু-হু করিয়া ঘরে আসিতে লাগিল, তাহা সন্ন্যাসী, গৃহী—কাহারও বিরক্তিকর হইতে পারে না।

রামবাবু সস্ত্রীক কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন। চারদিন জ্বরের পর আজ সকালে বড়-ছেলের বসন্ত দেখা দিয়াছে, এবং ছোট ছেলেটি কাল রাত্রি হইতেই জ্বরে অচৈতন্য। বাঙ্গালী দেখিয়া আমি উপযাচক হইয়া রামবাবুর সহিত পরিচয় করিলাম।

ইহার পরে গল্পের মধ্যে মাসখানেকের বিচ্ছেদ দিতে চাই। কারণ কেমন করিয়া এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইল, কেমন করিয়া ছেলে দুটি ভাল হইল—সে অনেক কথা। বলিতে আমার নিজেরই ধৈর্য থাকিবে না, তা পাঠকের ত ঢের-দূরের কথা। তবে মাঝের একটা কথা বলিয়া রাখি। দিন-পনর পরে রোগের যখন বড় বাড়াবাড়ি, তখন সাধুজী তাঁহার আস্তানা গুটাইবার প্রস্তাব করিলেন। রামবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীদাদা তুমি ত সত্যিই সন্ন্যাসী নও—তোমার শরীরে দয়া-মায়া আছে। আমার নবীন, জীবনকে তুমি ফেলে চ'লে গেলে, তারা কখ্‌খনো বাঁচবে না। কই, যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে? বলিয়া তিনি আমার পা ধরিয়া ফেলিলেন। আমার চোখেও জল আসিল। রামবাবুও স্ত্রীর প্রার্থনায় যোগ দিয়া কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন। সুতরাং আমি যাইতে পারিলাম না। সাধুবাবাকে বলিলাম, প্রভু, তোমরা অগ্রসর হও; আমি পথের মধ্যে না পারি, প্রয়াগে গিয়া যে তোমার পদধূলি মাথায় লইতে পারিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রভু ক্ষুন্ন হইলেন। শেষে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া নিরর্থক কোথাও বিলম্ব না করি, সে বিষয়ে বারংবার সতর্ক করিয়া দিয়া সদলবলে যাত্রা করিলেন। আমি রামবাবুর বাটীতেই রহিয়া গেলাম। এই অল্পদিনের মধ্যেই আমি যে প্রভুর সর্বাপেক্ষা স্নেহের পাত্র হইয়াছিলাম, এবং টিকিয়া থাকিলে তাঁহার সন্ন্যাসী-লীলার অবসানে উত্তরাধিকার-সূত্রে টাট্টু এবং উট দুটা যে দখল করিতে পারিতাম, তাহাতে কোন সংশয় নাই। যাক, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া, গত কথা লইয়া পরিতাপ করিয়া লাভ নাই।

ছেলে দুটি সারিয়া উঠিল। মারী এইবার প্রকৃতই মহামারীরূপে দেখা দিলেন। এ যে কি ব্যাপার, তাহা যে না চোখে দেখিয়াছে, তাহার দ্বারা লেখা পড়িয়া, গল্প শুনিয়া বা কল্পনা করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। অতএব এই অসম্ভবকে সম্ভব করিবার প্রয়াস আমি করিব না। লোক পালাইতে আরম্ভ করিল—ইহার আর কোন বাচবিচার রহিল না। যে বাড়িতে মানুষের চিহ্ন দেখা গেল, সেখানে উঁকি মারিয়া দেখিলেই চোখে পড়িতে পারিত—শুধু মা তার পীড়িত সন্তানকে আগলাইয়া বসিয়া আছেন।

রামবাবুও তাঁহার ঘরের গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বোঝাই দিলেন। অনেকদিন আগেই দিতেন, শুধু বাধ্য হইয়াই পারেন নাই। দিন পাঁচ-ছয় হইতেই আমার সমস্ত দেহটা এমনি একটা বিশ্রী আলস্যে ভরিয়া উঠিতেছিল যে, কিছুই ভাল লাগিত না। ভাবিতাম রাতজাগা এবং পরিশ্রমের জন্যই এরূপ বোধ হইত। সেদিন সকাল হইতেই মাথা টিপ্‌টিপ্‌ করিতে

লাগিল। নিতান্ত অরুচির উপর দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইলাম, অপরাহ্ণবেলায় বমি হইয়া গেল। রাত্রি নটা-দশটার সময় টের পাইলাম জ্বর হইয়াছে। সেদিন সারারাত্রি ধরিয়াই তাঁহাদের উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছিল, সবাই জাগিয়া ছিলেন। অনেক রাত্রে রামবাবুর স্ত্রী বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, সন্ন্যাসীদাদা, তুমি কেন আমাদের সঙ্গেই আরা পর্যন্ত চল না?

আমি বলিলাম, তাই যাব। কিন্তু তোমাদের গাড়িতে আমাকে একটু জায়গা দিতে হবে।

ভগিনী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কেন সন্ন্যাসীদাদা? গাড়ি ত দুটোর বেশী পাওয়া গেল না—আমাদের নিজেদেরই যে জায়গা হচ্ছে না।

আমি কহিলাম, আমার হাঁটিবার যে ক্ষমতা নেই দিদি! সকাল থেকেই বেশ জ্বর এসেচে।

জ্বর? বল কি গো? বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমার নূতন ভগিনী মুখ কালি করিয়া প্রস্থান করিলেন।

কতক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিতে পারি না। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলাম, বেলা হইয়াছে, বাড়ির ভিতর ঘরে-ঘরে তালা বন্ধ—জনপ্রাণী নাই।

বাহিরের যে ঘরটায় আমি থাকিতাম তাহার সুমুখ দিয়াই এই গ্রামের কাঁচা রাস্তাটা আরা স্টেশন পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর দিয়া প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ-ছয়খানা গরুর গাড়ি মৃত্যুভীত নরনারী বোঝাই লইয়া স্টেশনে যাইত। সারাদিন অনেক চেষ্টার পরে ইহারই একখানিতে সন্ধ্যার সময় স্থান করিয়া লইয়া উঠিয়া বসিলাম। যে প্রাচীন বেহারী ভদ্রলোকটি দয়া করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়াছিলেন, তিনি অতি প্রত্যুষেই স্টেশনের কাছে একটা গাছ-তলায় আমাকে নামাইয়া দিলেন। তখন আর আমার বসিবার সামর্থ্য ছিল না, সেইখানেই শুইয়া পড়িলাম। অদূরে একটা পরিত্যক্ত টিনের শেড ছিল। পূর্বে এটি মোসাফিরখানার কাজে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু বর্তমান সময়ে বৃষ্টি-বাদলার দিনে গরু-বাছুরের ব্যবহার ছাড়া আর কোন কাজে লাগিত না। ভদ্রলোক স্টেশন হইতে একজন বাঙ্গালী যুবককে ডাকিয়া আনিলেন। আমি তাঁহারই দয়ায়, জন-কয়েক কুলীর সাহায্যেই এই শেডখানির মধ্যে নীত হইলাম।

আমার বড় দুর্ভাগ্য, আমি যুবকটির কোন পরিচয় দিতে পারিলাম না; কারণ কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। মাস পাঁচ-ছয় পরে জিজ্ঞাসা করিবার যখন সুযোগ এবং শক্তি হইল, তখন সংবাদ লইয়া জানিলাম, বসন্ত রোগে ইতিমধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার কথা শুনিয়া এইমাত্র জানিয়াছিলাম, তিনি পূর্ববঙ্গের লোক এবং পনর টাকা বেতনে স্টেশনে চাকরি করেন। খানিক পরে তিনি তাঁহার নিজের শতজীর্ণ বিছানাটি আনিয়া হাজির করিলেন, এবং বার বার বলিতে লাগিলেন, তিনি স্বহস্তে রাঁধিয়া খান এবং পরের ঘরে থাকেন; দুপুরবেলা একবাটি গরম দুধ আনিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইয়া বলিলেন, ভয় নাই, ভাল হইয়া যাইবেন; কিন্তু আত্মীয়বন্ধুবান্ধব কাহাকেও যদি সংবাদ দিবার থাকে ত ঠিকানা দিলে তিনি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে পারেন।

তখনও আমার বেশ জ্ঞান ছিল। সুতরাং ইহাও বেশ বুঝিতেছিলাম আর বেশিক্ষণ নয়। এমনি জ্বর যদি আর পাঁচ-ছয় ঘণ্টাও স্থায়ী হয় ত চৈতন্য হারাইতে হইবে। অতএব যাহা কিছু করিবার, ইতিমধ্যে না করিলে আর করাই হইবে না।

তা বটে, কিন্তু সংবাদ দিবার প্রস্তাবে ভাবনায় পড়িলাম। কেন তাহা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ভাবিলাম গরীবের টেলিগ্রাফের পয়সাটা অপব্যয় করাইয়া আর লাভ কি!

সন্ধ্যার পর ভদ্রলোক তাঁর ডিউটির ফাঁকে এক ভাঁড় জল ও একটা কেরোসিনের ডিবা লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন জ্বরের যন্ত্রণায় মাথা ক্রমশঃ বেঠিক হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম, যতক্ষণ আমার হুঁশ আছে, ততক্ষণ মাঝে মাঝে দেখবেন; তার পরে যা হয় তা হোক, আপনি আর কষ্ট করবেন না।

ভদ্রলোক অত্যন্ত মুখচোরা প্রকৃতির লোক। কথা সাজাইয়া বলিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। প্রত্যুত্তরে তিনি 'না না' বলিয়াই চুপ করিলেন।

বলিলাম, আপনি সংবাদ দিতে চেয়েছিলেন। আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার যথার্থ আপনার জন কেউ নাই। তবে পাটনার পিয়ারী বাইজীর ঠিকানায় যদি একখানা পোস্টকার্ড

লিখে দেন, যে শ্রীকান্ত আরা স্টেশনের বাইরে একটা টিনশেডের মধ্যে মরণাপন্ন হ'য়ে পড়ে আছে, তা হ'লে—

ভদ্রলোক শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমি এখনি দিচ্ছি, চিঠি এবং টেলিগ্রাফ দুই-ই পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আমি মনে মনে বলিলাম, ভগবান, সংবাদটা যেন সে পায়।

জ্ঞান হইয়া প্রথমটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মাথায় হাত দিয়া ঠাহর করিয়া টের পাইলাম, সেটা আইস্ ব্যাগ! চোখ মেলিয়া দেখিলাম ঘরের মধ্যে একটা খাটের উপরে শুইয়া আছি। সুমুখের টুলের উপর একটা আলোর কাছে গোটা দুই-তিন ঔষধের শিশি; এবং তাহারই পাশে একটা দড়ির খাটিয়ার উপর কে একজন লাল-চেক র‍্যাপার গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছুই স্মরণ করিতে পারিলাম না। তার পরে একটু একটু করিয়া মনে হইতে লাগিল, ঘুমের ঘোরে কত-কি যেন স্বপ্ন দেখিয়াছি। অনেক লোকের আসা-যাওয়া, ধরাধরি করিয়া আমাকে ডুলিতে তোলা, মাথা ন্যাড়া করিয়া ওষুধ খাওয়ানো—এমনি কত কি ব্যাপার।

খানিক পরে লোকটি যখন উঠিয়া বসিল, দেখিলাম, ইনি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক, বয়স আঠারো-উনিশের বেশি নয়। তখন আমার শিয়রের নিকট হইতে মৃদুস্বরে যে তাহাকে সম্বোধন করিল, তাহার গলা চিনিতে পারিলাম।

পিয়ারী অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, বঙ্কু, বরফটা একবার কেন বদ্‌লে দিলিনে বাবা!

ছেলেটি বলিল, দিচ্ছি, তুমি একটুখানি শোও না মা। ডাক্তারবাবু যখন ব'লে গেলেন বসন্ত নয়, তখন ত আর কোন ভয় নেই মা।

পিয়ারী কহিল, ওরে বাবা, ডাক্তারে ভয় নেই বললেই কি মেয়েমানুষের ভয় যায়? তোকে সে ভাবনা করতে হবে না বঙ্কু, তুই শুধু বরফটা বদলে দিয়ে শুয়ে পড়,—আর রাত জাগিস্ নে।

বঙ্কু আসিয়া বরফ বদলাইয়া দিল এবং ফিরিয়া গিয়া সেই খাটিয়ার উপর শুইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে তাহার যখন নাক ডাকিতে লাগিল, আমি আস্তে আস্তে ডাকিলাম, পিয়ারী!

পিয়ারী মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কপালের জলবিন্দুগুলো আঁচলে মুছাইয়া লইয়া বলিল, আমাকে কি চিন্‌তে পার্‌চ? এখন কেমন আছ? কা—

ভাল আছি। কখন এলে? এ কি আরা?

হাঁ, আরা। কাল আমরা বাড়ি যাব।

কোথায়?

পাটনায়। আমার বাড়ি ছাড়া আর কি কোথাও এখন তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি?

এই ছেলেটি কে রাজলক্ষ্মী?

আমার সতীন-পো। কিন্তু বঙ্কু আমার পেটের ছেলেই। আমার কাছে থেকেই ও পাটনা কলেজে পড়ে। আজ আর কথা কয়ো না, ঘুমোও—কাল সব কথা বলব। বলিয়া সে আমার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

আমি হাত বাড়াইয়া রাজলক্ষ্মীর ডান হাতখানি মুঠোর মধ্যে লইয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

বার

যাহাতে অচৈতন্য শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বসন্ত নয়, অন্য জ্বর। ডাক্তারি-শাস্ত্রে নিশ্চয়ই তাহার একটা-কিছু গালভরা শক্ত নাম ছিল, কিন্তু আমি তাহা অবগত নই। খবর পাইয়া পিয়ারী তাহার ছেলেকে লইয়া জন-দুই ভৃত্য এবং দাসী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই দিনই একটা বাসা ভাড়া করিয়া আমাকে স্থানান্তরিত করে এবং শহরের ভালমন্দ নানাবিধ চিকিৎসক জড় করিয়া ফেলে। ভালই করিয়াছিল। না হইলে অন্য ক্ষতি না হোক, 'ভারতবর্ষে'র পাঠক-পাঠিকার ধৈর্যের মহিমাটা সংসারে অবিদিত থাকিয়া যাইত।

ভোরবেলা পিয়ারী কহিল, বঙ্কু আর দেরি করিস নে বাবা, এই বেলা একখানা সেকেন্ড ক্লাস গাড়ি রিজার্ভ ক'রে আয়। আমি একদণ্ডও এখানে রাখতে সাহস করিনে।

বঙ্কুর অতৃপ্ত নিদ্রা তখনও দু চক্ষু জড়াইয়া ছিল; সে মুদ্রিত-নেত্রে অব্যক্ত-স্বরে জবাব দিল, তুমি খেপেচ মা, এ অবস্থায় কি নাড়ানাড়ি করা যায়?

পিয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আগে তুই উঠে চোখে মুখে জল দে দেখি; তার পরে নাড়ানাড়ির কথা বোঝা যাবে। লক্ষ্মী বাপ আমার, ওঠ্।

বঙ্কু অগত্যা শয্যা ত্যাগ করিয়া, মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া স্টেশনে চলিয়া গেল। তখন সবেমাত্র সকাল হইতেছিল—ঘরে আর কেহ ছিল না। ধীরে ডাকিলাম, পিয়ারী! আমার শিয়রের দিকে আর একখানা খাটিয়া জোড়া দেওয়া ছিল। তাহারই উপর ক্লান্তিবশতঃ বোধ করি সে ইতিমধ্যে একটুখানি চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙ্গল?

আমি ত জেগেই আছি। পিয়ারী উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত আমার মাথায় কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল, জ্বর এখন খুব কম। একটুখানি চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা কর না কেন?

তা ত বরাবরই করচি পিয়ারী! আজ জ্বর আমার ক'দিন হ'ল?

তেরো দিন, বলিয়া সে কতই যেন একটা বর্ষীয়সী প্রবীণার মত গম্ভীরভাবে কহিল, দেখ, ছেলেপিলেদের সামনে আর আমাকে ও ব'লে ডেকো না। চিরকাল লক্ষ্মী ব'লে ডেকেচো, তাই কেন বল না?

দিন-দুই হইতেই পূর্ণ সচেতন ছিলাম, আমার সমস্ত কথাই স্মরণ হইয়াছিল। বলিলাম, আচ্ছা। তারপরে যাহা বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম, মনে মনে সেই কথাগুলি একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচ, কিন্তু তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দিতে চাইনে।

তবে কি করতে চাও?

আমি ভাবছি এখন যেমন আছি, তাতে তিন-চারদিনেই বোধ হয় একরকম সেরে যাবো। তোমরা বরঞ্চ এই কটা দিন অপেক্ষা ক'রে বাড়ি যাও।

তখন তুমি কি করবে শুনি?

সে যা হয় একটা হবে।

তা হবে, বলিয়া পিয়ারী একটুখানি হাসিল। তার পর সুমুখে উঠিয়া আসিয়া খাটের একটা বাজুর উপর বসিয়া, আমার মুখের দিকে ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া, আবার একটু হাসিয়া কহিল, তিন-চার দিনে না হোক দশ-বারো দিনে এ রোগ সারবে তা জানি, কিন্তু আসল রোগটা কতদিনে সারবে, আমাকে বলতে পারো?

আসল রোগ আবার কি?

পিয়ারী কহিল, ভাববে একরকম, বলবে একরকম, করবে আর-একরকম—চিরকাল ঐ এক রোগ। তুমি জানো যে একমাসের আগে তোমাকে চোখের আড়াল করতে পারব না—তবু বলবে—তোমাকে কষ্ট দিলুম, তুমি যাও। ওগো দয়াময়! আমার উপর যদি তোমার এতই দরদ তবে যাই হোক্ গে—সন্ন্যাসী নও, সন্ন্যাসী সেজে কি হাঙ্গামাই বাধালে! এসে দেখি, মাটির ওপর ছেঁড়া কাঁথায় প'ড়ে অঘোর অচৈতন্য! মাথাটা ধুলো-কাদায় জট পাকিয়েছে; সর্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষি বাঁধা; হাতে দুগাছা পেতলের বালা। মা গো মা! দেখে কেঁদে বাঁচিনে! বলিতে বলিতেই উদ্বেল অশ্রুজল তাহার দুই চোখ ভরিয়া টলটল করিয়া উঠিল। হাত দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, বঙ্কু বলে, ইনি কে মা? মনে মনে বললুম, তুই ছেলে, তোর কাছে সে কথা আর কি বলব বাবা! উঃ, কি বিপদের দিনই সে দিনটা গেছে। মাইরি, কি শুভক্ষণেই পাঠশালে দুজনের চার-চক্ষুর দেখা হয়েছিল! যে দুঃখটা তুমি আমাকে দিলে, এত দুঃখ ভূ-ভারতে কেউ কখনো কাউকে দেয় নি—দেবে না! শহরের মধ্যে বসন্ত দেখা দিয়েছে—সবাইকে নিয়ে ভালোয় ভালোয় পালাতে পারলে যে বাঁচি! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল।

মুখে আসিল জিজ্ঞাসা করি, মায়ের উপর এত ভক্তি আসিল কিরূপে? কিন্তু চাপিয়া গেলাম।

বঙ্কু কহিতে লাগিল, আচ্ছা আপনিই বলুন, গান-বাজনা করাতে কি কোন দোষ আছে? আমার মা ত শুধু তাই করেন। পরনিন্দে পরচর্চা ত করেন না?, বরঞ্চ গ্রামে আমাদের যারা পরম শত্রু, তাদেরই আট-দশজন ছেলের পড়ার খরচ দেন; শীতকালে কত লোককে কাপড় দেন, কম্বল দেন। এ কি মন্দ কাজ করেন?

আমি বলিলাম, না; এ ত খুব ভাল কাজ।

বঙ্কু উৎসাহিত হইয়া কহিল, তবে বলুন ত। আমাদের গাঁয়ের মত পাজী গাঁ কি কোথাও আছে? এই দেখুন না, সে বছর ইঁট পুড়িয়ে আমাদের কোঠা-বাড়ি তৈরি হ'ল। গ্রামে ভয়ানক জলকষ্ট দেখে মা আমার মাকে বললেন, দিদি, আরও কিছু টাকা খরচ করে ইঁটখোলাটাকেই একটা পুকুর কাটিয়ে দিই। তিন-চার হাজার টাকা খরচ ক'রে তাই ক'রে দিলেন, ঘাট বাঁধিয়ে দিলেন। কিন্তু গাঁয়ের লোক সে পুকুর মাকে প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না। অমন জল—কিন্তু কেউ খাবে না, ছোঁবে না, এমনি বজ্জাত লোক। কেবল এই হিংসায় সবাই মরে যায় যে আমাদের কোঠাবাড়ি তৈরি হ'ল! বুঝলেন না?

আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, বল কি হে! এই দারুণ জলকষ্ট ভোগ করবে, তবু অমন জল ব্যবহার করবে না?

বঙ্কু একটু হাসিয়া কহিল, তাই ত। কিন্তু সে কি বেশি দিন চলে? প্রথম বছর ভয়ে কেউ সে জল ছুঁলে না, কিন্তু এখন ছোটলোকেরা সবাই নিচ্ছে, খাচ্ছে—বামুন-কায়েতরাও চৈত্র-বৈশাখ মাসে লুকিয়ে জল নিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু তবু, পুকুর প্রতিষ্ঠা করতে দিলে না—এ কি মায়ের কম কষ্ট?

আমি কহিলাম, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙ্গবার যে একটা কথা আছে, এ যে দেখি তাই।

বঙ্কু জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, ঠিক তাই! এমন গাঁয়ে আলাদা, একঘরে হয়ে থাকাই শাপে বর। আপনি কি বলেন? প্রত্যুত্তরে আমি শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলাম। হাঁ-না স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিলাম না। কিন্তু সেজন্য বঙ্কুর উদ্দীপনা বাধা পাইল না। দেখিলাম, ছেলেটি তাহার বিমাতাকে সত্যিই ভালবাসে। অনুকূল শ্রোতা পাইয়া শক্তির আবেগে সে দেখিতে দেখিতে মাতিয়া উঠিল এবং তাহার অজস্র স্তুতিবাদে আমাকে প্রায় ব্যাকুল করিয়া তুলিল।

হঠাৎ একসময়ে তাহার হুঁশ হইল যে, এতক্ষণের মধ্যে আমি একটি কথাতেও কথা যোগ করি নাই। তখন সে অপ্রতিভ হইয়া কোনমতে প্রসঙ্গটা চাপা দিবার জন্য প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কিছুদিন এখানে আছেন ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না, কাল সকালেই আমি যাচ্চি।

কাল?

হাঁ, কালই।

কিন্তু আপনার দেহ ত এখনো সবল হয়নি। অসুখটা একেবারে সেরেচে বলে কি আপনার মনে হচ্চে?

বলিলাম, সকাল পর্যন্ত সেরেচে বলেই মনে হয়েছিল বটে; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, না। আজ দুপুরে থেকেই আবার মাথাটা ধরেছে।

তবে কেন এত শীঘ্র যাবেন? এখানে ত আপনার কোন কষ্ট নেই, বলিয়া ছেলেটি চিন্তিতমুখে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আমিও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া তাহার মুখের উপর ভিতরের যথার্থ কথাটা পড়িতে চেষ্টা করিলাম, যতটা পড়িলাম, তাহাতে সত্য গোপনের কোন প্রয়াস অনুভব করিলাম না। তবে, ছেলেটি লজ্জা পাইল বটে; এবং সেই লজ্জাটা ঢাকিয়া ফেলিবারও চেষ্টা করিল; কহিল, আপনি এখন যাবেন না।

কেন বল দেখি?

আপনি থাকলে মা বড় আনন্দে থাকেন। বলিয়া ফেলিয়াই মুখ রাঙা করিয়া চট্ করিয়া উঠিয়া গেল। দেখিলাম, ছেলেটি খুবই সরল বটে, কিন্তু নির্বোধ নয়। পিয়ারী কেন যে

বলিয়াছিল, আর বেশি দিন থাকলে আমার ছেলে কি ভাববে। কথাটার সহিত ছেলেটির ব্যবহার আলোচনা করিয়া অর্থটা যেন বুঝিতে পারিলাম বলিয়া বোধ হইল; মাতৃত্বের এই একটা ছবি আজ চোখে পড়ায় যেন একটা নূতন জ্ঞান লাভ করিলাম। পিয়ারীর হৃদয়ের একাগ্র বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়; এবং সে যে সংসারে সব দিক্‌ দিয়া সর্বপ্রকারেই স্বাধীন, তাহাও কল্পনা করা বোধ করি পাপ নয়। তবুও সে, যে মুহূর্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুটি পায়ে শত পাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাই হোক, কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে ত এখন দিতেই হইবে! তাহার অসংযত কামনা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহাকে ঠেলিতে চাউক, কিন্তু এ কথাও সে ভুলিতে পারে না—সে একজনের মা! এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোনমতেই অপমানিত করিতে পারে না! তাহার বিহ্বল-যৌবনের লালসামত্ত বসন্ত-দিনে কে যে ভালবাসিয়া তাহার পিয়ারী নাম দিয়াছিল, আমি জানি না; কিন্তু এই নামটা পর্যন্ত সে তাহার ছেলের কাছে গোপন করিতে চায়, এই কথাটা আমার স্মরণ হইয়া গেল।

চোখের উপর সূর্য অস্ত গেল। সেই দিকে চাহিয়া আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন গলিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, রাজলক্ষ্মীকে আর ত আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারি না। আমাদের বাহ্য ব্যবহার যত বড় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াই এত দিন চলুক না, স্নেহ যতই মাধুর্য ঢালিয়া দিক না, উভয়ের কামনা যে একত্র সম্মিলিত হইবার জন্য অনুক্ষণ দুর্নিবারবেগে ধাবিত হইতেছিল, তাহাতে ত সংশয় নাই। কিন্তু আজ দেখিলাম, অসম্ভব। হঠাৎ বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে মনে বলিলাম, কাল সকালেই ত আমি এখান হইতে যাইতেছি, কিন্তু তখন যেন মনের মধ্যে লাভালাভের হিসাব করিতে গিয়া হাতের পাঁচ রাখিবার চেষ্টা না করি। আমার এই যাওয়াটা, যেন যাওয়াই হয়। দেখিতে পাই নাই—ছল করিয়া, একখানি অতিসূক্ষ্ম বাসনার বাঁধন রাখিয়া না যাই, যাহার সূত্র ধরিয়া আবার একদিন আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়।

অন্যমনস্ক হইয়া সেইখানেই বসিয়া ছিলাম। সন্ধ্যার সময় ধুনুচিতে ধূপধুনা দিয়া সেটা হাতে করিয়া রাজলক্ষ্মী এই বারান্দা দিয়াই আর একটা ঘরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মাথা ধরেচে, হিমে বসে কেন, ঘরে যাও।

হাসি পাইল। বলিলাম, অবাক করলে লক্ষ্মী! হিম এখানে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হিম না থাক্‌, ঠাণ্ডা বাতাস ত বইচে। সেইটাই কোন্‌ ভাল?

না, সেও তোমার ভুল। ঠাণ্ডা গরম কোন বাতাসই বইচে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার সমস্তই ভুল। কিন্তু মাথাধরাটা ত আর আমার ভুল নয়—সেটা ত সত্যি? ঘরে গিয়ে একটু শুয়েই পড় না! রতন কি করচে? সে কি একটু ওডিকোলন মাথায় দিতে পারে না? এ বাড়ির চাকরগুলোর মত 'বাবু'-চাকর আর পৃথিবীতে নেই। বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের কাজে চলিয়া গেল।

রতন যখন ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া ওডিকোলন, জল প্রভৃতি আনিয়া হাজির করিল, এবং তাহার ভুলের জন্য বারংবার অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

রতন সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে কহিল, এতে আমার যে দোষ নেই, সে কি আমি জানিনে বাবু? কিন্তু মাকে ত বলবার জো নেই যে, তুমি রেগে থাকলে মিছিমিছি বাড়িশুদ্ধ লোকের দোষ দেখতে পাও।

কৌতূহলী হইয়াই প্রশ্ন করিলাম, রাগ কেন?

রতন কহিল, সে কি কারো জানবার জো আছে? বড়লোকের রাগ বাবু শুধু শুধু হয় আবার শুধু শুধু যায়। তখন গা-ঢাকা দিয়ে না থাকতে পারলেই চাকর-বাকরদের প্রাণ গেল! দ্বারের নিকট হইতে হঠাৎ প্রশ্ন আসিল, তখন তোদের কি আমি মাথা কেটে নিই রে রতন? আর বড়লোকের বাড়িতে যদি এত জ্বালা ত আর কোথাও যাস্‌নে কেন?

মনিবের প্রশ্নে রতন কুণ্ঠিত অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। রাজলক্ষ্মী কহিল,

তোর কাজটা কি? ওঁর মাথা ধরেছে—বঙ্কুর মুখে শুনে আমি তোকে জানালুম। তাই এখন আট্‌টা রাত্তিরে এসে আমার সুখ্যাতি গাইচিস্‌। কাল থেকে আর কোথাও কাজের চেষ্টা করিস্‌—এখানে হবে না। বুঝলি?

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে, রতন ওডিকোলন জল দিয়া আমার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাল সকালেই নাকি বাড়ি যাবে? আমার যাবার সংকল্প ছিল বটে, কিন্তু বাড়ি ফিরিবার সংকল্প ছিল না। তাই প্রশ্নটার আর-একরকম করিয়া জবাব দিলাম, হাঁ, কাল সকালেই যাব।

সকাল কটার গাড়িতে যাবে?

সকালেই বেরিয়ে পড়ব—তাতে যে গাড়ি জোটে।

আচ্ছা। একখানা টাইম-টেবলের জন্য কাউকে নাহয় স্টেশনে পাঠিয়ে দিই গে। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তারপরে যথাসময়ে রতন কাজ সারিয়া প্রস্থান করিল। নীচে ভৃত্যদের শব্দসাড়া নীরব হইল; বুঝিলাম, সকলেই এবার নিদ্রার জন্য শয্যাশ্রয় করিয়াছে।

আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া একটা কথা কেবলই মনে হইতে লাগিল, পিয়ারী বিরক্ত হইল কেন? এমন কি করিয়াছি যাহাতে সে আমার যাওয়ার জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে? রতন বলিয়াছিল, বড়লোকের ক্রোধ শুধু-শুধু হয়। কথাটা আর কোন বড়লোকের সম্বন্ধে খাটে কি না জানি না, কিন্তু পিয়ারীর সম্বন্ধে কিছুতেই খাটে না। সে যে অত্যন্ত সংযমী এবং বুদ্ধিমতী, সে পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি; এবং আমার নিজেরও বুদ্ধি নাই থাক, প্রবৃত্তি-সম্পর্কে সংযম তার চেয়ে কম নয়—বোধ করি কারও চেয়ে কম নয়। বুকের মধ্যে যাই হোক্‌, মুখ দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনা আমার অতি বড় বিকারের ঘোরেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না। ব্যবহারেও কোন দিন কিছু ব্যক্ত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাহার নিজের কার্যের দ্বারা লজ্জার হেতু কিছু ঘটিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা; কিন্তু আমার উপর রাগ করিবার তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই। সুতরাং বিদায়ের সময় তাহার এই ঔদাসীন্য আমাকে যে বেদনা দিতে লাগিল, তাহা অকিঞ্চিৎকর নয়।

অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, টেবিলের উপর হইতে আলোটা সরাইয়া, ও-দিকে দরজার কোণে সম্পূর্ণ আড়াল করিয়া রাখিয়া দিল। সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল—তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমার শয্যার কাছে আসিয়া এক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। তারপরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উত্তাপ অনুভব করিল, পরে জামার বোতাম খুলিয়া বুকের উত্তাপ বারংবার অনুভব করিতে লাগিল। নিভৃতচারিণীর এই গোপন করস্পর্শে প্রথমটা কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া উঠিলাম; কিন্তু তখনই মনে হইল, সংজ্ঞাহীন রোগে সেবা করিয়া যে চৈতন্য ফিরাইয়া আনিয়াছে, তাহার কাছে আমার লজ্জা পাইবার আছে কি! তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্যন্ত টানিয়া দিল; শেষে মশারির ধারগুলো ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি সমস্তই দেখিলাম, সমস্ত বুঝিলাম। যে গোপনেই আসিয়াছিল, তাহাকে গোপনেই যাইতে দিলাম। কিন্তু এই নির্জন নিশীথে সে যে তাহার কতখানি আমার কাছে ফেলিয়া রাখিয়া গেল, তাহা কিছুই জানিতে পারিল না। সকালে প্রস্ফুট জ্বর লইয়াই ঘুম ভাঙিল। চোখ-মুখ জ্বালা করিতেছে, মাথা এত ভারি যে, শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তবু যাইতেই হইবে। এ বাটীতে নিজেকে আর এক দণ্ডও বিশ্বাস নাই, সে যে-কোন মুহূর্তেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। নিজের জন্যও তত নয়। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর জনাই [illegible] ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র দ্বিধা করা চলিবে না।

মনে মনে ভাবিয়া দেখিলাম, সে তাহার বিগত জীবনের কালি অনেকখানিই ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ তাহার চারিপাশে ছেলে-মেয়েরা মা বলিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রীতি ও ভক্তির আনন্দধাম হইতে তাহাকে অসম্মানিত করিয়া, ছিনাইয়া

বাহির করিয়া আনিব—এত বড় প্রেমের এই সার্থকতা কি অবশেষে আমার জীবন অধ্যায়েই চিরদিনের জন্য লিপিবন্ধ হইয়া থাকিবে?

পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, এখন দেহটা কেমন আছে?

বলিলাম, খুব মন্দ নয়! যেতে পারব।

আজ না গেলেই কি নয়?

হাঁ, আজ যাওয়া চাই।

তা হলে বাড়ি পেঁৗছেই একটা খবর দিয়ো। নইলে আমাদের বড় ভাবনা হবে।

তাহার অবিচলিত ধৈর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলাম, আচ্ছা, আমি বাড়িতেই যাব। আর গিয়েই তোমাকে খবর দেব।

পিয়ারী বলিল, দিয়ো। আমিও চিঠি লিখে তোমাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

বাহিরে পালকিতে যখন উঠিতে যাইতেছি, দেখি শিবতলের বারান্দায় পিয়ারী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বুকের ভিতরে যে কি করিতেছিল, তাহার মুখ দেখিয়া তাহা জানিতে পারিলাম না।

আমার অন্নদাদিদিকে মনে পড়িল। বহুকাল পূর্বের একটা শেষদিনে তিনিও যেন ঠিক এম্‌নি গম্ভীর, এম্‌নি স্তব্ধ হইয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার সেই দুটি করুণ চোখের দৃষ্টি আমি আজিও ভুলি নাই, কিন্তু সে চাহনিতে যে তখন কত বড় একটা আসন্ন-বিদায়ের ব্যথা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত পড়িতে পারি নাই। কি জানি, আজিও তেমনি ধারা একটা-কিছু ওই দুটি নিবিড় কালো চোখের মধ্যেও আছে কি না।

নিঃশ্বাস ফেলিয়া পালকিতে উঠিয়া বসিলাম, দেখিলাম, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে। ছোটখাটো প্রেমের সাধ্যও ছিল না—এই সুখৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্নেহ-স্বর্গ হইতে মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য আমাকে আজ একপদও নড়াইতে পারিত। বাহকেরা পালকি লইয়া স্টেশন-অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিলাম, লক্ষ্মী, দুঃখ করিয়ো না ভাই, এ ভালই হইল যে, আমি চলিলাম। তোমার ঋণ ইহজীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে জীবন তুমি দান করিলে, সে জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ সংকল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।

শ্রীকান্ত

দ্বিতীয় পর্ব

এক

এই ছন্নছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই, আবার তাহার ছিন্ন-সূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে। কিন্তু ডাক যখন সত্যই পড়িল, তখন বুঝিলাম, বিস্ময় এবং সংকোচ আমার যত বড়ই হোক, এ আহ্বান শিরোধার্য করিতে লেশমাত্র ইতস্ততঃ করা চলিবে না।

তাই, আজ আবার এই ভ্রষ্ট জীবনের বিশৃংখল ঘটনার শতছিন্ন গ্রন্থিগুলো আর একবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

আজ মনে পড়ে, বাড়ি ফিরিয়া আসার পরে আমার এই সুখে-দুঃখে-মেশানো জীবন-টাকে কে যেন হঠাৎ কাটিয়া দুই ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। তখন মনে হইয়াছিল, আমার এ জীবনের দুঃখের বোঝা আর আমার নিজের নয়। এ বোঝা বহিয়া বেড়াক সে, যাহার নিতান্ত গরজ। অর্থাৎ আমি যে দয়া করিয়া বাঁচিয়া থাকিব, এই ত রাজলক্ষ্মীর ভাগ্য। চোখে আকাশের রঙ বদলাইয়া গেল, বাতাসের স্পর্শ আর-একরকম করিয়া গায়ে লাগিতে লাগিল, —কোথাও যেন আর ঘর-বার, আপনার-পর রহিল না। এমনি একপ্রকার অনির্বচনীয় উল্লাসে অন্তর-বাহির একাকার হইয়া উঠিল যে, রোগকে রোগ বলিয়া, বিপদকে বিপদ বলিয়া, অভাবকে অভাব বলিয়া আর মনেই হইল না। সংসারের কোথাও যাইতে, কোনও কিছু করিতে দ্বিধা-বাধার যেন আর লেশমাত্র সংস্রব রহিল না।

এসব অনেক দিনের কথা। সে আনন্দ আর আমার নাই; কিন্তু সেদিনের এই একান্ত বিশ্বাসের নিশ্চিন্ত নির্ভরতার স্বাদ একটা দিনের জন্যও যে জীবনে উপভোগ করিতে পাইয়াছি, ইহাই আমার পরম লাভ। অথচ হারাইয়াছি বলিয়াও কোন দিন ক্ষোভ করি না। শুধু এই কথাটাই মাঝে মাঝে মনে হয়, যে-শক্তি সেদিন এই হৃদয়টার ভিতর হইতেই জাগ্রত হইয়া, এত সত্বর সংসারের সমস্ত নিরানন্দকে হরণ করিয়া লইয়াছিল, সে কি বিরাট শক্তি! আর মনে হয়, সেদিন আমারই মত আর দুটি অক্ষম, দুর্বল হাতের উপর এতবড় গুরু-ভারটা চাপাইয়া না দিয়া, যদি সমস্ত জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের ভারবাহী সেই দুটি হাতের উপরেই আমার সেদিনের সেই অখণ্ড বিশ্বাসের সমস্ত বোঝা সঁপিয়া দিতে শিখিতাম, তবে আজ আর আমার ভাবনা কি ছিল? কিন্তু যাক সে-কথা।

রাজলক্ষ্মীকে পৌঁছান সংবাদ দিয়া চিঠি লিখিয়াছিলাম। সে চিঠির জবাব আসিল অনেকদিন পরে। আমার অসুস্থ দেহের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া, অতঃপর সংসারী হইবার জন্য সে আমাকে কয়েকটা মোটা রকমের উপদেশ দিয়াছে, এবং সংক্ষিপ্ত পত্র শেষ করিয়াছে এই বলিয়া যে, সে কাজের ঝঞ্ঝাটে সময়মত পত্রাদি লিখিতে না পারিলেও আমি যেন মাঝে মাঝে নিজের সংবাদ দিই, এবং তাহাকে আপনার লোক মনে করি।

তথাস্তু! এতদিন পরে সেই রাজলক্ষ্মীর এই চিঠি!

আকাশকুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল, এবং যে দুই-একটা শুকনা পাপড়ি বাতাসে ঝরিয়া পড়িল, তাহাদের কুড়াইয়া ঘরে তুলিবার জন্যও মাটি হাতড়াইয়া ফিরিলাম না। চোখ দিয়া যদিবা দু-এক ফোঁটা জল পড়িয়া থাকে ত, হয়ত পড়িয়াছে, কিন্তু সে কথা আমার মনে নাই। তবে এ কথা মনে আছে যে, দিনগুলো আর স্বপ্ন দিয়া কাটিতে চাহিল না। তবুও এমনিভাবে আরও পাঁচ-ছয় মাস কাটিয়া গেল।

একদিন সকালে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছি, হঠাৎ একখানা অদ্ভুত পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরে মেয়েলী কাঁচা অক্ষরে আমার নাম ও ঠিকানা। খুলিতেই পত্রের ভিতর হইতে একখানি ছোট পত্র ঠক্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তুলিয়া লইয়া তাহার

অক্ষর এবং নাম-সইর পানে চাহিয়া সহসা নিজের চোখ দুটাকেই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমার যে মা দশ বৎসর পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহারই শ্রীহস্তের লেখা। নাম-সই তাঁরই। পড়িয়া দেখিলাম, মা তাঁর 'গঙ্গাজল'কে যেমন করিয়া অভয় দিতে হয়, তা দিয়াছেন। ব্যাপারটা সম্ভবতঃ এই যে. বছর বারো-তেরো পূর্বে এই 'গঙ্গাজলে'র যখন অনেক বয়সে একটি কন্যারত্ন জন্মগ্রহণ করে, তখন তিনি দুঃখ দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা জানাইয়া মাকে বোধ করি পত্র লিখিয়াছিলেন; এবং তাহারই প্রত্যুত্তরে আমার স্বর্গবাসিনী জননী এ গঙ্গাজল-দুহিতার বিবাহের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, এখানি সেই মূল্যবান দলিল। সাময়িক করুণায় বিগলিত হইয়া মা উপসংহারে লিখিয়াছেন, সুপাত্র আর কোথাও না জোটে, তাঁর নিজের ছেলে ত আছে! তা বটে! সংসারে সুপাত্রের যদিবা একান্ত অভাব হয়, তখন আমি ত আছি! সমস্ত লেখাটা আগাগোড়া বার-দুই পড়িয়া দেখিলাম, মুন্সিয়ানা আছে বটে। মার উকিল হওয়া উচিত ছিল। কারণ,'যত প্রকারে কল্পনা করা যাইতে পারে, তিনি নিজেকে, মায় তাঁর বংশধরটিকেও দায়িত্বে বাঁধিয়া গিয়াছেন। দলিলের কোথাও এতটুকু ত্রুটি রাখিয়া যান যাই।

সে যাই হোক. গঙ্গাজল যে এই সুদীর্ঘ তেরো বৎসর কাল এই পাকা দলিলটির উপর বরাত দিয়াই নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নীরবে বসিয়া ছিলেন, তাহা মনে হইল না! বরঞ্চ মনে হইল, বহু চেষ্টা করিয়াও অর্থ ও লোকাভাবে সুপাত্র যখন তাঁহার পক্ষে একেবারেই অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, এবং অনূঢ়া কন্যার শারীরিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পুলকে বুকের রক্ত মগজে চড়িবার উপক্রম করিয়াছে, তখনই এই হতভাগ্য সুপাত্রের উপর তাঁহার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন।

মাতা বাঁচিয়া থাকিলে এই চিঠির জন্য আজ তাঁর মাথা খাইয়া ফেলিতাম। কিন্তু এখন যে উঁচুতে বসিয়া তিনি হাসিতেছেন, সেখানে লাফ দিয়াও যে তাঁর পায়ের তলায় সজোরে একটা ঢুঁ মারিয়া গায়ের জ্বালা মিটাইব, সে-পথও আমার বন্ধ হইয়া গেছে।

সুতরাং মায়ের কিছু না করিতে পারিয়া, তাঁর গঙ্গাজলের কি করিতে পারি না পারি, পরখ করিবার জন্য একদিন রাত্রে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সারারাত্রি ট্রেনে কাটাইয়া পরদিন তাঁহার পল্লীভবনে আসিয়া যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা অপরাহ্ণ। গঙ্গাজল-মা প্রথমে আমাকে চিনিতে পারিলেন না। শেষে পরিচয় পাইয়া এই তেরো বৎসব পরে এমন কান্নাই কাঁদিলেন যে, মায়ের মৃত্যুকালে তাঁর কোন আপনার লোক চোখের উপর তাঁকে মরিতে দেখিয়াও এমন করিয়া কাঁদিতে পারে নাই।

বলিলেন. লোকতঃ ধর্মতঃ তিনিই এখন আমার মাতৃস্থানীয়া এবং দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম সোপান-স্বরূপ আমার সাংসারিক অবস্থা পুঙখানুপুঙখরূপে পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বাবা কত রাখিয়া গিয়াছেন. মায়ের কি কি গহনা আছে. এবং তাহা কাহার কাছে আছে, আমি চাকরি করি না কেন, এবং করিলে কত টাকা আন্দাজ মাহিনা পাইতে পারি. ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল. এই আলোচনার ফল তাঁহার কাছে তেমন সন্তোষজনক হইল না। বলিলেন. তাঁর কোন-এক আত্মীয় বর্মামুল্লুকে চাকরি করিয়া 'লাল' হইয়া গিয়াছে. অর্থাৎ অতিশয় ধনবান হইয়াছে। সেখানকার পথে-ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে —শুধু কুড়াইয়া লইবার অপেক্ষামাত্র। সেখানে জাহাজ হইতে নামিতে না নামিতে বাঙ্গালীদের সাহেবেরা কাঁধে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়া চাকরি দেয়—এইরূপ অনেক কাহিনী। পরে দেখিয়াছিলাম, এই ভ্রান্ত বিশ্বাস শুধু তাঁহার একার নহে. এমন অনেক লোকই এই মায়া-মরীচিকায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সেখানে ছুটিয়া গিয়াছে এবং মোহ-ভঙ্গের পর তাহাদিগকে ফিরিয়া পাঠাইতে আমাদের কম ক্লেশ সহিতে হয় নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। গঙ্গাজল-মায়ের বর্মামুল্লুকের বিবরণ আমাকে তীরের মত বিঁধিল। 'লাল' হইবার আশায় নহে—আমার মধ্যে যে 'ভবঘুরে'টা কিছুদিন হইতে ঝিমাইতেছিল. সে তাহার শ্রান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া এক মুহূর্তেই খাড়া হইয়া উঠিল। যে সমুদ্রকে ইতি-পূর্বে শুধু দূর হইতে দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, সেই অনন্ত অশ্রান্ত জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে পাইব, এই চিন্তাই আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কোন মতে একবার ছাড়া পাইলে হয়।

মানুষকে মানুষ যতপ্রকারে জেরা করিতে পারে, তাহার কোনটাই গঙ্গাজল-মা আমাকে বাদ দেন নাই। সুতরাং নিজের মেয়ের পাত্র হিসাবে আমাকে যে তিনি মুক্তি দিয়াছেন, এ বিষয়ে আমি একপ্রকার নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু রাত্রে খাবার সময় তাঁহার ভূমিকার ধরন দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, আমাকে একেবারে হাতছাড়া করা তাঁহার অভিপ্রায় নয়। তিনি এই বলিয়া শুরু করিলেন যে, মেয়ের বরাতে সুখ না থাকিলে, যেমন কেন না টাকাকড়ি, ঘরবাড়ি, বিদ্যা-সাধ্য দেখিয়া দাও, সমস্তই নিষ্ফল; এবং এ সম্বন্ধে নামধাম, বিবরণাদি সহযোগে অনেকগুলি বিশ্বাসযোগ্য নজির তুলিয়াও বিফলতার প্রমাণ দেখাইয়া দিলেন। শুধু তাই নয়। অন্য পক্ষে এমন কতকগুলি লোকের নাম উল্লেখ করিলেন, যাহারা আকাট-মূর্খ হইয়াও, সুদ্ধমাত্র স্ত্রীর আয়-পয়ের জোরেই সম্প্রতি টাকার উপরে দিবারাত্রি উপবেশন করিয়া আছে।

আমি তাঁহাকে সবিনয়ে জানাইলাম যে, টাকা জিনিসটার প্রতি আমার আসক্তি থাকিলেও চব্বিশ ঘণ্টা তাহার উপরেই উপবেশন করিয়া থাকাটা আমি প্রীতিকর বিবেচনা করি না; এবং এজন্য স্ত্রীর আয়-পয় যাচাই করিয়া দেখিবার কৌতূহলও আমার নাই। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। তাঁহাকে নিরস্ত করা গেল না। কারণ যিনি সুদীর্ঘ তেরো বৎসর পরেও এমন একটা পত্রকে দলিলরূপে দাখিল করিতে পারেন, তাঁহাকে এত সহজে ভুলানো যায় না। তিনি বার বার বলিতে লাগিলেন, ইহাকে মায়ের ঋণ বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত 'এবং যে সন্তান সমর্থ হইয়াও মাতৃঋণ পরিশোধ করে না—সে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যখন নিরতিশয় শঙ্কিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছি, তখন কথায় কথায় অবগত হইলাম, নিকটবর্তী গ্রামে একটি সুপাত্র আছে বটে, কিন্তু পাঁচ শত টাকার কম তাহাকে আয়ত্ত করা অসম্ভব।

একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি চোখে পড়িল। মাসখানেক পরে যা হোক একটা উপায় করিব—কথা দিয়া, পরদিন সকালেই প্রস্থান করিলাম। কিন্তু উপায় কি করিয়া করিব—কোন দিকে চাহিয়া তাহার কোন কিনারা দেখিতে পাইলাম না।

আমার উপরে আরোপিত এই বাঁধনটা যে আমার পক্ষে সত্যকার বস্তু হইতেই পারে না, তাহা অনেক করিয়া নিজেকে বুঝাইতে লাগিলাম; কিন্তু তথাপি মাকে তাঁহার এই প্রতি-শ্রুতির ফাঁস হইতে অব্যাহতি না দিয়া, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার কথাও কোনমতে ভাবিতে পারিলাম না।

বোধ করি, এক উপায় ছিল, পিয়ারীকে বলা; কিন্তু কিছুদিন পর্যন্ত এ সম্বন্ধেও মনস্থির করিতে পারিলাম না। অনেকদিন হইল, তাহার সংবাদও জানিতাম না। সেই পৌঁছান খবর ছাড়া আমিও আর চিঠি লিখি নাই, সেও তাহার জবাব দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পত্র লেখে নাই। বোধ করি, চিঠিপত্রের ভিতর দিয়াও উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে, এ তার অভিপ্রায় ছিল না। অন্ততঃ তাহার সেই একটা চিঠি হইতে আমি এইরূপই বুঝিয়াছিলাম। তবুও আশ্চর্য এই যে, পরের মেয়ের জন্য ভিক্ষার ছলে একদিন যথার্থই পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বাটীতে প্রবেশ করিয়া নীচের বসিবার ঘরের বারান্দায় দেখিলাম, দুজন উর্দিপরা দরোয়ান বসিয়া আছে। তাহারা হঠাৎ একটা শ্রীহীন অপরিচিত আগন্তুক দেখিয়া এমন করিয়া চাহিয়া রহিল যে, আমার সোজা উপরে উঠিয়া যাইতে সঙ্কোচ বোধ হইল। ইহাদের পূর্বে দেখি নাই। পিয়ারীর সাবেক বুড়া দরওয়ানজীর পরিবর্তে কেন যে তাহার এমন দুজন বাহারে দরওয়ানের আবশ্যক হইয়া উঠিল, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। যাই হোক, ইহাদের অগ্রাহ্য করিয়া উপরে উঠিয়া যাইব কিংবা সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিব, স্থির করিতে না করিতে দেখি, রতন ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিতেছে। অকস্মাৎ আমাকে দেখিয়া সে প্রথমে অবাক হইয়া গেল। পরে পায়ের কাছে ঢিপ্‌ করিয়া একটা প্রণাম করিয়া বলিল, কখন এলেন? এখানে দাঁড়িয়ে যে?

এইমাত্র আসচি রতন। খবর সব ভাল?

রতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সব ভাল বাবু! ওপরে যান—আমি বরফ কিনে নিয়ে এখনি আসচি, বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

তোমার মনিব ঠাকরুন ওপরেই আছেন?

আছেন, বলিয়া সে দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

উপরে উঠিয়া ঠিক পাশের ঘরটাই বসিবার ঘর। ভিতর হইতে একটা উচ্চ হাসির শব্দ এবং অনেকগুলি লোকের গলা কানে গেল। একটু বিস্মিত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া অবাক হইয়া গেলাম। আগের বারে এ ঘরটার ব্যবহার হইতে দেখি নাই। নানাপ্রকার আসবাবপত্র, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি অনেক জিনিস একটা কোণে গাদা করিয়া রাখা থাকিত, বড় কেহ এ ঘরে আসিত না। আজ দেখি, সমস্ত ঘরটা জুড়িয়া বিছানা। আগাগোড়া কার্পেট পাতা, তাহার উপর শুভ্র জাজিম ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে। তাকিয়াগুলোয় অড় পরানো হইয়াছে, এবং তাহারই কয়েকটা আশ্রয় করিয়া জনকয়েক ভদ্রলোক আশ্চর্য হইয়া আমার পানে চাহিয়া আছেন। তাঁহাদের পরনে বাঙ্গালীর মত ধুতি-পিরান থাকিলেও, মাথার উপর কাজ-করা মসলিনের টুপিতে বেহারী বলিয়াই মনে হইল। এক জোড়া বাঁয়া-তবলার কাছে একজন হিন্দুস্থানী তবলচি এবং তাহারই অদূরে বসিয়া পিয়ারী বাইজী নিজে। একপাশে একটা ছোট হারমোনিয়াম। পিয়ারীর গায়ে মুজ্‌রার পোশাক ছিল না বটে, কিন্তু সাজসজ্জারও অভাব ছিল না। বুঝিলাম, এটা সঙ্গীতের বৈঠক—ক্ষণকাল বিশ্রাম চলিতেছে মাত্র।

আমাকে দেখিয়া পিয়ারীর মুখের সমস্ত রক্ত কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল! তার পরে জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, এ কি! শ্রীকান্তবাবু যে! কবে এলেন?

আজই।

আজই? কখন? কোথা উঠলেন?

ক্ষণকালের জন্য হয়ত বা একটু হতবুদ্ধি হইয়া গিয়া থাকিব, না হইলে জবাব দিতে বিলম্ব হইত না। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইতেও বিলম্ব হইল না। বলিলাম, এখানকার সমস্ত লোককেই ত তুমি চেন না, নাম শুনলে চিনতে পারবে না।

যে ভদ্রলোকটি সবচেয়ে জমকাইয়া বসিয়াছিলেন, বোধ করি এ যজ্ঞের যজমান তিনিই। বলিলেন, আইয়ে বাবুজী, বৈঠিয়ে; বলিয়া মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। ভাবে বুঝাইলেন যে, আমাদের উভয়ের সম্বন্ধটা তিনি ঠিক আঁচ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে একটা সসম্মান অভিবাদন করিয়া জুতার ফিতা খুলিবার ছলে মুখ নীচু করিয়া অবস্থাটা ভাবিয়া লইতে চাহিলাম। বিচারের সময় বেশি ছিল না বটে, কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এটা স্থির করিয়া ফেলিলাম যে, ভিতরে আমার যাই থাক, বাহিরের ব্যবহারে তাহা কোনমতেই প্রকাশ পাইলে চলিবে না। আমার মুখের কথায়, আমার চোখের চাহনিতে, আমার সমস্ত আচরণের কোন ফাঁক দিয়া যেন অন্তরের ক্ষোভ বা অভিমানের একটি বিন্দুও বাহিরে আসিয়া না পড়িতে পারে। ক্ষণকাল পরে ভিতরে সকলের মধ্যে আসিয়া যখন উপবেশন করিলাম, তখন নিজের মুখের চেহারাটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু অন্তরে অনুভব করিলাম যে, তাহাতে অপ্রসন্নতার চিহ্ন লেশমাত্রও আর নাই। রাজলক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিলাম, বাইজীবিবি, আজ শুকদেব ঠাকুরের ঠিকানা পেলে তাঁকে তোমার সামনে বসিয়ে একবার মনের জোরটা তাঁর যাচাই করে নিতুম। বলি, করেচ কি? এ যে রূপের সমুদ্র বইয়ে দিয়েচ!

প্রশংসা শুনিয়া কর্মকর্তা বাবুটি আহ্লাদে গলিয়া বারংবার মাথা নাড়িতে লাগিলেন। তিনি পূর্ণিয়া জেলার লোক, দেখিলাম, তিনি বাঙ্গলা বলিতে না পারিলেও বেশ বুঝেন। কিন্তু পিয়ারীর কান পর্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু সেটা যে লজ্জায় নয়—রাগে, তাহাও বুঝিতে আমার বাকী রহিল না। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিলাম না, বাবুটিকে উদ্দেশ করিয়া তেমনি হাসিমুখে বাঙ্গলা করিয়া কহিলাম, আমার আসার জন্যে আপনাদের আমোদ-আহ্লাদের যদি এতটুকু বিঘ্ন হয় ত অত্যন্ত দুঃখিত হব। গান-বাজনা চলুক।

বাবুটি এত খুশি হয়ে উঠিলেন যে আবেগে আমার পিঠের উপর একটা চাপড় মারিয়া বলিলেন, বহুৎ আচ্ছা বাবু!—পিয়ারীবিবি, একঠো ভালা সঙ্গীত হোক।

সন্ধ্যার পরে হবে—আর এখন নয়, বলিয়া পিয়ারী হারমোনিয়ামটা দূরে ঠেলিয়া দিয়া সহসা উঠিয়া গেল।

এইবার বাবুটি আমার পরিচয় গ্রহণের উপলক্ষে নিজের পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাঁর নাম রামচন্দ্র সিংহ। তিনি পূর্ণিয়া জেলার একজন জমিদার, দ্বারভাঙ্গার মহারাজ তাঁর কুটুম্ব, পিয়ারীবিবিকে তিনি সাত-আট বৎসর হইতে জানেন। সে তাঁর পূর্ণিয়ার বাড়িতে তিন-চারবার মুজরা করিয়া আসিয়াছে। তিনি নিজেও অনেকবার এখানে গান শুনিতে আসেন; কখনও কখনও দশ-বারো দিন পর্যন্ত থাকেন—মাস তিনেক পূর্বেও একবার আসিয়া এক সপ্তাহ বাস করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কেন আসিয়াছি—এইবার তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উত্তর দিবার পূর্বেই পিয়ারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম, বাইজীকেই জিজ্ঞেস করুন না, কেন এসেচি।

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি একটা তীব্র কটাক্ষ করিল, কিন্তু জবাব দিল সহজ শান্ত স্বরে; কহিল, উনি আমার দেশের লোক।

আমি হাসিয়া কহিলাম, বাবুজী, মধু থাকলেই মৌমাছি এসে জোটে—তারা দেশ-বিদেশের বিচার করে না। কিন্তু বলিয়াই দেখিলাম, রহস্যটা গ্রহণ করিতে না পারিয়া পূর্ণিয়া জেলার জমিদার মুখখানা গম্ভীর করিলেন, এবং তাঁর চাকর আসিয়া যেই জানাইল, সন্ধ্যা-আহ্নিকের জায়গা করা হইয়াছে, তিনি তখনই প্রস্থান করিলেন। তবল্‌চী এবং আর দুইজন ভদ্রলোকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। তাঁর মনের ভাবটা অকস্মাৎ কেন এমন বিকল হইয়া গেল তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিলাম না।

রতন আসিয়া কহিল, মা, বাবুর বিছানা করি কোথায়?

পিয়ারী বিরক্ত হইয়া বলিল, আর কি ঘর নেই রতন? আমাকে জিজ্ঞেস না করে কি এতটুকু বুদ্ধি খাটাতে পারিস নে? যা এখান থেকে, বলিয়া রতনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বাহির হইয়া গেল। বেশ দেখিতে পাইলাম, আমার আকস্মিক শুভাগমনে এ বাড়ির ভার-কেন্দ্রটা সাংঘাতিক রকম বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ারী কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এখন হঠাৎ আসা হ'ল যে?

বলিলাম, দেশের লোক, অনেকদিন না দেখে বড় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলুম বাইজী!

পিয়ারীর মুখ আরও ভারী হইয়া উঠিল। আমার পরিহাসে সে কিছুমাত্র যোগ না দিয়া বলিল, আজ রাত্রে এখানেই থাকবে ত?

থাকতে বল, থাকব।

আমার আর বলাবলি কি! তবে তোমার হয়ত অসুবিধে হবে। যে ঘরটায় তুমি শুতে, সেটাতে—

বাবু শুচ্ছেন? বেশ! আমি নীচে শোবো, তোমার নীচের ঘরগুলোও ত চমৎকার।

নীচে শোবে? বল কি! মনের মধ্যে এতটুকু বিকার নেই—দু-দিনেই এতবড় পরমহংস হয়ে উঠলে কি করে?

মনে মনে বলিলাম, পিয়ারী, আমাকে তুমি এখনও চেনোনি। মুখে বলিলাম, আমার তাতে মান অভিমান একবিন্দু নেই। আর কষ্টের কথা যদি মনে কর ত সেটা একেবারে নিরর্থক। আমি বাড়ি থেকে বেরোবার সময় খাবার-শোবার ভাবনাগুলোও ফেলে রেখে আসি। সে ত তুমি নিজেও জানো। বেশী বিছানা থাকে ত একটা পেতে দিতে বলো, না থাকে দরকার নেই—আমার কম্বল সম্বল আছে।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা আছে জানি। কিন্তু এতে তোমার মনে কোনরকম দুঃখ হবে না ত?

আমি হাসিয়া বলিলাম, না। কারণ স্টেশনে পড়ে থাকার চেয়ে এটা ঢের ভাল।

পিয়ারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি হলে বরঞ্চ গাছতলায় প'ড়ে থাকতুম, এত অপমান সহ্য করতুম না।

তাহার উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া আমি না হাসিয়া পারিলাম না। সে যে কি কথা আমার মুখ হইতে শুনিতে চায়, তাহা আমি অনেকক্ষণ টের পাইয়াছিলাম। কিন্তু শান্ত, স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দিলাম, আমি এত নির্বোধ নই যে, মনে করব তুমি ইচ্ছে ক'রে আমাকে নীচে শুতে ব'লে অপমান করচ। তোমার সাধ্য থাকলে তুমি সেবারের মতই আমার শোবার ব্যবস্থা করতে। সে যাক্, এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি করবার দরকার নেই—তুমি রতনকে

পাঠিয়ে দাও গে, আমাকে নীচের ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসুক, আমি কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

পিয়ারী কহিল, তুমি জ্ঞানী লোক, তুমি আমার ঠিক অবস্থা বুঝবে না ত বুঝবে কে? যাক, বাঁচলুম! বলিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ আসার সত্যি কারণটা শুনতে পাইনে কি?

বলিলাম, প্রথম কারণটা শুনতে পাবে না, কিন্তু দ্বিতীয়টা পাবে।

প্রথমটা পাব না কেন?

অনাবশ্যক ব'লে।

আচ্ছা, দ্বিতীয়টা শুনি।

আমি বর্মায় যাচ্ছি। হয়ত আর কখনো দেখা হবে না। অন্ততঃ অনেক দিন যে দেখা হবে না, সে নিশ্চয়। যাবার আগে একবার দেখতে এলুম।

রতন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, আপনার বিছানা তৈরি হয়েছে, আসুন!

খুশি হইয়া কহিলাম, চল। পিয়ারীকে বলিলাম, আমার ভারী ঘুম পাচ্চে। ঘণ্টাখানেক পরে যদি সময় পাও ত একবার নীচে এসো—আমার আরও কথা আছে, বলিয়া রতনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলাম।

পিয়ারীর নিজের শোবার ঘরে আনিয়া রতন যখন আমাকে শয্যা দেখাইয়া দিল, তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। বলিলাম, আমার বিছানা নীচের ঘরে না ক'রে এ ঘরে করা হ'ল কেন?

রতন আশ্চর্য হইয়া কহিল, নীচের ঘরে?

আমি বলিলাম, সেই রকমই ত কথা ছিল!

সে অবাক হইয়া ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনার বিছানা হবে নীচের ঘরে? আপনি কি যে তামাশা করেন বাবু! বলিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল – আমি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মনিব শোবেন কোথায়?

রতন কহিল, বঙ্কুবাবুর ঘরে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়েছি। কাছে আসিয়া দেখিলাম, এ সেই রাজলক্ষ্মীর দেড়-হাত চওড়া তক্তাপোশের উপর বিছানা পাতা হয় নাই। একটা মস্ত খাটের উপর মস্ত পুরু গদি পাতিয়া রাজশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। শিয়রের কাছে একটা ছোট টেবিলের উপর সেজের মধ্যে বাতি জ্বলিতেছে। একধারে কয়েকখানি বাঙ্গলা বই, অন্যধারে একটা বাটির মধ্যে কতকগুলি বেলফুল। চোখ চাহিবামাত্র টের পাইলাম, এর কোনটাই ভৃত্যের হাতে তৈরি হয় নাই—যে বড় ভালবাসে, এসব তাহারই স্বহস্ত-প্রস্তুত। উপরের চাদরখানি পর্যন্ত যে রাজলক্ষ্মী নিজের হাতে পাতিয়া রাখিয়া গেছে, এ যেন নিজের অন্তরের ভিতর হইতে অনুভব করিলাম।

আজ ওই লোকটার সম্মুখে আমার অচিন্ত্যপূর্ব অভ্যাগমে রাজলক্ষ্মী হতবুদ্ধি হইয়া প্রথমে যে ব্যবহারই করুক, আমার নির্বিকার ঔদাসীন্যে মনে মনে সে যে কতখানি শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা আমার অগোচর ছিল না, এবং কেন যে আমার মধ্যে একটা ঈর্ষার প্রকাশ দেখিবার জন্য সে এতক্ষণ ধরিয়া এত প্রকারে আমাকে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল তাহাও আমি বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু সমস্ত জানিয়াও যে নিজের নিষ্ঠুর রূঢ়তাকেই পৌরুষ জ্ঞান করিয়া তাহার অভিমানের কোন মান্য রাখি নাই, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র আঘাতটিকেই শতগুণ করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছি, এই অন্যায় আমার মনের মধ্যে এখন ছুঁচের মত বিঁধিতে লাগিল। বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, কিন্তু ঘুমাইতে পারিলাম না। নিশ্চয় জানিতাম, একবার সে আসিবেই। এখন সেই সময়টুকুর জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

শ্রান্তিবশতঃ হয়ত একটুখানি ঘুমাইয়াও পড়িয়াছিলাম। সহসা চোখ মেলিয়া দেখিলাম, পিয়ারী আমার গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া বসিয়াছে। উঠিয়া বসিতেই সে কহিল, বর্মায় গেলে মানুষ আর ফেরে না—সে খবর জানো?

না, তা জানিনে।

তবে?

ফিরতেই হবে, এমন ত কারো মাথার দিব্যি নেই।

নেই? তুমি কি পৃথিবীর সকলের মনের কথাই জানো নাকি?

কথাটা অতি সামান্য। কিন্তু সংসারের এই একটা ভারী আশ্চর্য যে মানুষের দুর্বলতা কখন কোন্ ফাঁক দিয়া যে আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে, তাহা কিছুতেই অনুমান করা যায় না। ইতিপূর্বে কত অসংখ্য গুরুতর কারণ ঘটিয়া গিয়াছে, আমি কোনদিন আপনাকে ধরা দিই নাই; কিন্তু আজ তাহার মুখের এই অত্যন্ত সোজা কথাটা সহ্য করিতে পারিলাম না। মুখ দিয়া সহসা বাহির হইয়া গেল—সকলের মনের কথা ত জানিনে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু একজনের জানি। যদি কোনদিন ফিরে আসি ত শুধুই তোমার জন্যই আসব। তোমার মাথার দিব্যি আমি অবহেলা করব না।

পিয়ারী আমার পায়ের উপর একেবারে ভাঙিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়াই পা টানিয়া লইলাম না। কিন্তু মিনিট-দশেক কাটিয়া গেলেও যখন সে মুখ তুলিল না, তখন তাহার মাথার উপর আমার ডান হাতখানা রাখিতেই, সে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তেমনি পড়িয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না। বলিলাম, উঠে ব'স, এ অবস্থায় কেউ দেখলে সে ভারী আশ্চর্য হয়ে যাবে।

কিন্তু পিয়ারী একটা জবাব পর্যন্ত যখন দিল না, তখন জোর করিয়া তুলিতে গিয়া দেখিলাম, তাহার নীরব অশ্রুতে সেখানকার সমস্ত চাদরটা একেবারে ভিজিয়া গেছে। টানাটানি করিতে, সে রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, আগে আমার দু-তিনটে কথার জবাব দাও, তবে আমি উঠব!

কি কথা বল?

আগে বল, ও লোকটা এখানে থাকাতে তুমি আমাকে কোন মন্দ মনে করনি?

না।

পিয়ারী আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু আমি যে ভাল নই, সে ত তুমি জানো! তবে কেন সন্দেহ হয় না?

প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন। সে যে ভাল নয়, তাও জানি; সে যে মন্দ এও ভাবিতে পারি না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

হঠাৎ সে চোখ মুছিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞেস করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক, ভাল হ'তে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন? অজ্ঞানে, অভাবে প'ড়ে একদিন যা করেচি, চিরকাল আমাকে তাই করতে হবে কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হতে দেবে না?

আমি বলিলাম, আমরা কোনদিন মানা করিনে। আর করলেও সংসারে ভাল হবার পথ কেউ কারো আটকে রাখতে পারে না।

পিয়ারী অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, বেশ। তা হ'লে তুমিও আটকাতে পারবে না।

আমি জবাব দিবার পূর্বেই রতনের কাসির শব্দ দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল।

পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কি রে রতন?

রতন মুখ বাড়াইয়া বলিল, মা, রাত্রি ত অনেক হ'ল—বাবুর খাবার নিয়ে আসবে না? বামুনঠাকুর ঢুলে ঢুলে রান্নাঘরেই ঘুমিয়ে পড়েচে।

তাইত, তোদের কারুর যে এখনো খাওয়া হয়নি, বলিয়া পিয়ারী ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমার খাবারটা সে বরাবর নিজের হাতেই লইয়া আসিত; আজও আনিবার জন্য দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

আহার শেষ করিয়া যখন বিছানায় শুইয়া পড়িলাম, তখন রাত্রি একটা বাজিয়া গেছে। পিয়ারী আসিয়া আবার আমার পায়ের কাছে বসিল। বলিল, তোমার জন্যে অনেক রাত্রি একলা জেগে কাটিয়েচি—আজ তোমাকেও জাগিয়ে রাখব। বলিয়া সম্মতির জন্যে অপেক্ষামাত্র না করিয়া আমার পায়ের বালিশটা টানিয়া লইয়া বাঁ হাতটা মাথায় দিয়া আড় হইয়া পড়িয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখলুম, তোমার অত দূরদেশে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'তে পারে তা হ'লে? এমনি ক'রে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো?

পিয়ারী তাহার জবাব না দিয়া বলিল, তা ছাড়া কিসের জন্যে বর্মায় যেতে চাচ্চ শুনি?

চাকরি করতে, ঘুরে বেড়াতে নয়।

আমার কথা শুনিয়া পিয়ারী উত্তেজনায় সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, দেখ, অপরকে যা বল, তা বল; কিন্তু আমাকে ঠকিও না। আমাকে ঠকালে তোমার ইহকালও নেই, পরকালও নেই—তা জানো?

সেটা বিলক্ষণ জানি; এবং কি করতে বল তুমি?

আমার স্বীকারোক্তিতে পিয়ারী খুশি হইল; হাসিমুখে বলিল, মেয়েমানুষে চিরকাল যা ব'লে থাকে, আমিও তাই বলি। একটা বিয়ে ক'রে সংসারী হও—সংসারধর্ম প্রতি-পালন কর।

প্রশ্ন করলাম, সত্যি খুশি হবে তাতে?

সে মাথা নাড়িয়া, কানের দুলে দুলাইয়া সোৎসাহে কহিল, নিশ্চয়! একশ' বার। এতে আমি সুখী হব না ত সংসারে কে হবে শুনি?

বলিলাম, তা জানিনে, কিন্তু এ আমার একটা দুর্ভাবনা গেল! বাস্তবিক এই সংবাদ দেবার জন্যেই আমি এসেছিলাম যে বিয়ে না ক'রে আমার আর উপায় নেই।

পিয়ারী আর একবার তাহার কানের স্বর্ণাভরণ দুলাইয়া মহা আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমি ত তা হ'লে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসব। কিন্তু মেয়ে আমি দেখে পছন্দ করব, তা বলে দিচ্চি।

আমি বলিলাম, তার আর সময় নেই—পাত্রী স্থির হয়ে গেছে।

আমার গম্ভীর কণ্ঠস্বর বোধ করি পিয়ারী লক্ষ্য করিল। সহসা তাহার হাসিমুখে একটা ম্লান ছায়া পড়িল, কহিল, বেশ ত, ভালই ত! স্থির হয়ে গেলে ত পরম সুখের কথা।

বলিলাম, সুখ-দুঃখ জানিনে রাজলক্ষ্মী; যা স্থির হয়ে গেছে, তাই তোমাকে জানাচ্চি।

পিয়ারী হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, যাও—চালাকি করতে হবে না—সব মিছে কথা।

একটা কথাও মিথ্যে নয়, চিঠি দেখলেই বুঝতে পারবে। বলিয়া জামার পকেট হইতে দুখানা পত্রই বাহির করিলাম।

কৈ দেখি চিঠি, বলিয়া হাত বাড়াইয়া পিয়ারী চিঠি দুখানা হাতে লইতেই, তাহার সমস্ত মুখখানা যেন অন্ধকার হইয়া গেল। হাতের মধ্যে পত্র দুখানা ধরিয়া রাখিয়াই বলিল, পরের চিঠি পড়বার আমার দরকারই বা কি! তা কোথায় স্থির হল?

পড়ে দেখ।

আমি পরের চিঠি পড়িনে।

তা হ'লে পরের খবর তোমার জেনেও কাজ নেই।

আমি জানতেও চাইনে, বলিয়া সে ঝুপ করিয়া আবার শুইয়া পড়িল। চিঠি দুটা কিন্তু তাহার মুঠার মধ্যেই রহিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত সে কোন কথা কহিল না। তারপরে ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া দীপের সম্মুখে, মেজের উপর সেই দুইখানা পত্র লইয়া সে স্থির হইয়া বসিল। লেখাগুলো বোধ করি সে দুই-তিনবার করিয়া পাঠ করিল। তারপরে উঠিয়া আসিয়া আবার তেমনি করিয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ঘুমুলে?

না।

এখানে আমি কিছুতেই বিয়ে দেব না। সে মেয়ে ভাল নয়, তাকে আমি ছেলেবেলা দেখেচি।

যার চিঠি পড়লে?

হাঁ, কিন্তু খুড়ীমার চিঠিতে এমন-কিছু লেখা নেই যে তোমাকে তাকে ঘাড়ে করতে হবে। আর থাক ভাল, না থাক ভাল, এ মেয়ে আমি কোনমতেই ঘরে আনব না।

কিরকম মেয়ে ঘরে আনতে চাও, শুনতে পাই কি?

সে আমি এখনি কি ক'রে বলব! বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে ত!

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া বলিলাম, তোমার পছন্দ আর বিবেচনার ওপর নির্ভর করে থাকতে হ'লে আমাকে আইবুড়ো নাম খণ্ডাতে আর একজন্ম এগিয়ে যেতে হবে—এতে কুলোবে না। থাক, যথাসময়ে তাই নাহয় যাবো, আমার তাড়াতাড়ি নেই। কিন্তু

এই মেয়েটিকে তুমি উম্থার ক'রে দিয়ো। শ' পাঁচেক টাকা হ'লেই তা হবে, আমি তাঁর মুখেই শুনে এসেছিলুম।

পিয়ারী উৎসাহে আর একবার উঠিয়া বসিয়া বলিল, কালই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব, খুড়ীমার কথা মিথ্যে হ'তে দেব না; একটুখানি থামিয়া কহিল, সত্যি বলচি তোমাকে, এ মেয়ে ভাল নয় বলেই আমার আপত্তি, নইলে—

নইলে কি?

নইলে আবার কি! তোমার উপযুক্ত মেয়ে আমি খুঁজে বার ক'রে তবে কথার উত্তর দেব—এখন নয়।

মাথা নাড়িয়া বলিলাম, তুমি মিথ্যে চেষ্টা ক'রো না রাজলক্ষ্মী, আমার উপযুক্ত মেয়ে তুমি কোনদিন খুঁজে বার করতে পারবে না।

সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, সে নাহয় নাই পারব; কিন্তু তুমি বর্মায় যাবে, আমাকে সঙ্গে নেবে?

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া হাসিলাম, কহিলাম, আমার সঙ্গে যেতে তোমার সাহস হবে?

পিয়ারী আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, সাহস! এ কি একটা শক্ত কথা ব'লে তুমি মনে কর?

আমি যাই করি, কিন্তু তোমার এই সমস্ত বাড়িঘর, জিনিসপত্র, বিষয়-আশয়—তার কি হবে?

পিয়ারী কহিল, যা ইচ্ছে তা হোক। তোমাকে চাকরি করবার জন্যে যখন এত দূরে যেতে হ'ল, এত থাকতেও কোন কাজেই কিছু এল না, তখন বঙ্কুকে দিয়ে যাবো।

এ কথার জবাব দিতে পারিলাম না। খোলা জানালার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

সে পুনরায় কহিল, অতদূরে না গেলেই কি নয়? এসব তোমার কি কোনদিন কোন কাজেই লাগতে পারে না?

বলিলাম, না, কোনদিন নয়।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু নেবে আমাকে সঙ্গে? বলিয়া আমার পায়ের উপর ধীরে ধীরে আবার তাহার হাতখানা রাখিল। একদিন এই পিয়ারীই আমাকে যখন তাহার বাড়ি হইতে একরকম জোর করিয়াই বিদায় করিয়াছিল, সেদিন তাহার অসাধারণ ধৈর্য ও মনের জোর দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। আজ তাহারই আবার এতবড় দুর্বলতা, এই করুণ কণ্ঠের সকাতর মিনতি, সমস্ত একসঙ্গে মনে করিয়া আমার বুক ফাটিতে লাগিল; কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারিনে বটে, কিন্তু যখনি ডাকবে, তখনি ফিরে আসব! যেখানেই থাকি, চিরদিন আমি তোমারই থাকব রাজলক্ষ্মী।

এই পাপিষ্ঠার হয়ে তুমি চিরদিন থাকবে?

হাঁ, চিরদিন থাকব।

তা হ'লে ত তোমার কোনদিন বিয়েও হবে না বল?

না। তার কারণ, তোমার অমতে, তোমাকে দুঃখ দিয়ে এ কাজে আমার কোনদিন প্রবৃত্তি হবে না।

পিয়ারী অপলকচক্ষে কিছুক্ষণ আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তার পরে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া, বড় বড় ফোঁটা গাল বাহিয়া টপটপ করিয়া পড়িতে লাগিল। চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, এই হতভাগিনীর জন্যে তুমি সমস্ত জীবন সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে?

বলিলাম, তা আমি থাকব। তোমার কাছে যে জিনিস আমি পেয়েছি, তার বদলে সন্ন্যাসী হয়ে থাকাটা আমার লোকসান নয়; যেখানেই থাকি না কেন, আমার এই কথাটা তুমি কোনদিন অবিশ্বাস ক'রো না।

পলকের জন্য দুইজনের চোখাচোখি হইল, এবং পরক্ষণেই সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। সমস্ত বাড়িটা গভীর সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন—কোথাও কেহ জাগিয়া নাই। একবার শুধু মনে হইল, জানালার বাহিরে অন্ধকার রাত্রি তাহার কত উৎসবের প্রিয় সহচরী পিয়ারী বাইজীর বুকফাটা অভিনয় আজ যেন নিঃশব্দে চোখ মেলিয়া অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত দেখিতেছে।

দুই

এক-একটা কথা দেখিয়াছি, সারাজীবনে ভুলিতে পারা যায় না। যখনই মনে পড়ে—তাহার শব্দগুলো পর্যন্ত যেন কানের মধ্যে বাজিয়া উঠে। পিয়ারীর শেষ কথাগুলোও তেমনি। আজও আমি তাহার রেশ শুনিতে পাই। সে যে স্বভাবতঃই কত বড় সংযমী, সে পরিচয় ছেলেবেলাতেই সে বহুবার দিয়াছে। তাহার উপর এতদিনের এই এত বড় সাংসারিক শিক্ষা! গতবারে বিদায়ের ক্ষণটিতে কোনমতে পলাইয়া সে আত্মরক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু এবার কিছুতেই আর আপনাকে সামলাইতে পারিল না, চাকর-বাকরদের সামনেই কাঁদিয়া ফেলিল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, দেখ, আমি অবোধ নয়, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগতে হবে জানি; কিন্তু তবু বলচি আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দয়! একেও এর শাস্তি একদিন পেতে হবে! ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন!

সমাজের উপর কেন যে সে এত বড় অভিশাপ দিল, তাহা সেই জানে, আর তাহার অন্তর্যামী জানেন। আমিও যে না জানি, তা নয়, কিন্তু নির্বাক হইয়া রহিলাম। বুড়া দরোয়ান গাড়ির কপাট খুলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। পা বাড়াইবার উদ্যোগ করিতেছি, পিয়ারী চোখের জলের ভিতর দিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিল; কহিল, কোথায় যাচ্ছ—আর হয়ত দেখা হবে না—একটা ভিক্ষা দেবে?

বলিলাম, দেব।

পিয়ারী কহিল, ভগবান না করুন, কিন্তু তোমার জীবনযাত্রার যে ধরন, তাতে—আচ্ছা যেখানেই থাকো, সে সময়ে একটা খবর দেবে? লজ্জা করবে না?

না, লজ্জা করব না—খবর দেব, বলিয়া ধীরে ধীরে গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। পিয়ারী পিছনে পিছনে আসিয়া আজ তাহার অঞ্চলপ্রান্তে আমার পায়ের ধুলা লইল।

ওগো, শুনচ? মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সে তাহার ওষ্ঠাধরের কাঁপুনিটা প্রাণপণে দমন করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি এক হইবামাত্রই তাহার চোখের জল আবার ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল; অস্ফুট অবরুদ্ধ স্বরে চুপিচুপি বলিল, নাই গেলে অত দূরে? থাক গে, যেও না!

নিঃশব্দে চোখ ফিরাইয়া লইলাম। গাড়োয়ান গাড়ি ছাড়িয়া দিল। চাবুক ও চারখানা চাকার সম্মিলিত সপাসপ ও খড়খড় শব্দে অপরাহ্নবেলা মুখরিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সমস্ত চাপা দিয়া একটা ধরা-গলার চাপা কান্নাই শুধু আমার কানে বাজিতে লাগিল।

তিন

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন ভোরবেলায় একটা লোহার তোরঙ্গ এবং একটা পাতলা বিছানামাত্র অবলম্বন করিয়া কলিকাতার কয়লাঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়ি হইতে নামিতে না নামিতে, এক খাঁকি-কুর্তি-পরা কুলি আসিয়া এই দুটাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া কোথায় যে চক্ষের পলকে অন্তর্ধান হইয়া গেল, খুঁজিতে খুঁজিতে দুশ্চিন্তায় চোখ ফাটিয়া জল না আসা পর্যন্ত, আর তাহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। গাড়িতে আসিতে আসিতেই দেখিয়াছিলাম, জেটি ও বড় রাস্তার অন্তর্বর্তী সমস্ত ভূখণ্ডটাই নানা রঙের পদার্থে বোঝাই হইয়া আছে। লাল, কালো, পাঁশুটে, গেরুয়া—একটু কুয়াসা করিয়াও ছিল—মনে হইল একপাল বাছুর বোধ হয় বাঁধা আছে, চালান যাইবে। কাছে আসিয়া ঠাহর করিয়া দেখি, চালান যাইবে বটে কিন্তু বাছুর নয়—মানুষ। মোট-ঘাট লইয়া স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া সারা-রাত্রি অমনি করিয়া হিমে পড়িয়া আছে—প্রত্যূষে সর্বাগ্রে জাহাজের একটু ভালো স্থান

অধিকার করিয়া লইবে বলিয়া। অতএব কাহার সাধ্য পরে আসিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া জেটির দোরগোড়ায় যায়! অনতিকাল পরে এই দল যখন সজাগ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দেখিলাম, কাবুলের উত্তর হইতে কুমারিকার শেষ পর্যন্ত এই করলাঘাটে প্রতিনিধি পাঠাইতে কাহারও ভুল হয় নাই।

সব আছে। কালো কালো গেঞ্জি গায়ে একদল চীনাও বাদ যায় নাই। আমিও নাকি ডেকের যাত্রী (অর্থাৎ যার নীচে আর নাই), সুতরাং ইহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আমারও একটুখানি বসিবার জায়গা করিয়া লইবার কথা। কিন্তু কথাটা মনে করিতেই আমার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। অথচ যখন যাইতেই হইবে, এবং জাহাজ ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানও জানা নাই, তখন যেমন করিয়া হোক, ইহাদের দৃষ্টান্তই অবলম্বন করা কর্তব্য বলিয়া যতই নিজের মনকে সাহস দিতে লাগিলাম, ততই সে যেন হাল ছাড়িয়া দিতে লাগিল। জাহাজ যে কখন আসিয়া ঘাটে ভিড়িবে, সে জাহাজই জানে; সহসা চাহিয়া দেখি, এই চোদ্দ-পনর শ' লোক ইতিমধ্যে কখন ভেড়ার পালের মত সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেছে। একজন হিন্দুস্থানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বাপু, বেশ ত সকলে বসেছিলে—হঠাৎ এমন কাতার দিয়ে দাঁড়ালে কেন?

সে কহিল, ডগ্‌দরি হোগা।

ডগ্‌দরি পদার্থটি কি বাপু?

লোকটা পিছনের একটা ঠেলা সামলাইয়া বিরক্তমুখে কহিল, আরে, পিলেগ্‌কা ডগ্‌দরি।

জিনিসটা আরও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িল। কিন্তু বুঝি-না-বুঝি, এতগুলো লোকের যাহা আবশ্যক, আমারও ত তাহা চাই। কিন্তু কি কৌশলে যে নিজেকে ওই পালের মধ্যে গুঁজিয়া দিব, সে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কোথাও একটু ফাঁক আছে কি না খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি, অনেক দূরে কয়েকটি খিদিরপুরের মুসলমান সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এটা আমি স্বদেশে-বিদেশে সর্বত্র দেখিয়াছি—যাহা লজ্জাকর ব্যাপার, বাঙ্গালী সেখানে লজ্জিত হইয়াই থাকে। ভারতের অপরাপর জাতির মত অসঙ্কোচে ঠেলাঠেলি মারামারি করিতে পারে না। এমন করিয়া দাঁড়ানোটাই যে একটা হীনতা, এই লজ্জাতেই যেন সকলের অগোচরে মাথা হেঁট করিয়া থাকে। ইহারা রেঙ্গুনে দর্জির কাজ করে, অনেকবার যাতায়াত করিয়াছে। প্রশ্ন করিলে বুঝাইয়া দিল যে, বর্মায় এখনো প্লেগ যায় নাই, তাই এই সতর্কতা। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া পাশ করিলে তবেই সে জাহাজে উঠিতে পাইবে। অর্থাৎ রেঙ্গুন যাইবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছে, তাহারা প্লেগের রোগী কি না, তাহা প্রথমে যাচাই হওয়া দরকার। ইংরাজ রাজত্বে ডাক্তারের প্রবল প্রতাপ। শুনিয়াছি কসাইখানার যাত্রীদের পর্যন্ত জবাই হওয়ার অধিকারটুকুর জন্য এদের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু অবস্থা হিসাবে রেঙ্গুনের সহিত তাহাদের যে এতবড় মিল ছিল, এ কথা তখন কে ভাবিয়াছিল? ক্রমশঃ 'পিলেগ্‌কা ডগ্‌দরি' আসন্ন হইয়া উঠিল,—সাহেব ডাক্তার স-পেয়াদা দেখা দিলেন। সেই লাইনবর্তী অবস্থায় বেশি ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিবার সুযোগ ছিল না, তথাপি পুরোবর্তী সঙ্গীদের প্রতি পরীক্ষা-পদ্ধতির যতটুকু প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হইল, তাহাতে ভাবনার সীমা-পরিসীমা রহিল না। দেহের উপরার্ধ অনাবৃত করায় ভীত হইবে, অবশ্য বাঙ্গালী ছাড়া এরূপ কাপুরুষ সেখানে কেহ ছিল না; কিন্তু সম্মুখবর্তী সেই সাহসী বীর পুরুষগণকেও পরীক্ষায় চমকাইয়া চমকাইয়া উঠিতে দেখিয়া শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলাম। সকলেই অবগত আছেন, প্লেগ রোগে দেহের স্থান বিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে। ডাক্তারসাহেব যেরূপ অবলীলাক্রমে ও নির্বিকার চিত্তে সেই সকল সন্দেহমূলক স্থানে হস্ত প্রবেশ করাইয়া স্ফীতি অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাতে কাঠের পুতুলেরও আপত্তি হইবার কথা। কিন্তু ভারতবাসীর সনাতন সভ্যতা আছে বলিয়াই তবু যা হোক একবার চমকাইয়া স্থির হইতে পারিতেছিল; আর কোন জাত হইলে ডাক্তারের হাতটা সেদিন মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া না দিয়া আর নিরস্ত হইতে পারিত না। সে যাই হোক, পাশ করা যখন অবশ্য কর্তব্য, তখন আর উপায় কি? যথাসময়ে চোখ বুজিয়া সর্বাঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া একপ্রকার মরিয়া হইয়াই ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম, এবং পাশ হইয়াও গেলাম। অতঃপর জাহাজে উঠিবার পালা। কিন্তু ডেক প্যাসেঞ্জারের এই অধিরোহণ-ক্রিয়া যে কিভাবে নিষ্পন্ন হয়, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে ধারণা করা অসাধ্য। তবে কল-কারখানায় দাঁতওয়ালা চাকার ক্রিয়া দেখা থাকিলে বুঝা কতকটা সম্ভব হইবে। সে যেমন

সম্মুখের টানে ও পিছনের ঠেলায় অগ্রসর হইয়া চলে, আমাদেরও এই কাবুলী, পাঞ্জাবী, মারোয়াড়ী, মাদ্রাজী, মারহাট্টী, বাঙ্গালী, চীনা, খোট্টা, উড়িয়া গঠিত সুবিপুল বাহিনী সুশৃঙ্খলায় পরস্পরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বেগে ডাঙ্গা হইতে জাহাজের ডেকে প্রায় অজ্ঞাতসারে উঠিয়া আসিল; এবং সেই গতি সেইখানেই প্রতিরুদ্ধ হইল না। সম্মুখেই দেখিলাম, একটা গর্তের মুখে সিঁড়ি লাগানো আছে। জাহাজের খোলে নামিবার এই পথ। আবদ্ধ নালার মুখ খুলিয়া দিলে বৃষ্টির সঞ্চিত জল যেমন খরবেগে নীচে পড়ে, ঠিক তেমনি করিয়া এই দল স্থান অধিকার করিতে মরি-বাঁচি জ্ঞানশূন্য হইয়া অবরোহণ করিতে লাগিল; আমার যতদূর মনে পড়ে, আমার নীচে যাইবার ইচ্ছাও ছিল না, পা দিয়া হাঁটিয়াও নামি নাই। ক্ষণকালের জন্য সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম, কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিলেও বোধ করি, শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না। তবে সচেতন হইয়া দেখিলাম, খোলের মধ্যে অনেক দূরে এককোণে একাকী দাঁড়াইয়া আছি। পায়ের নীচে চাহিয়া দেখি, ইতিমধ্যে ভোজবাজীর মত চক্ষের পলকে যে যাহার কম্বল বিছাইয়া বাক্স পেটরার বেড়া দিয়া নিরাপদে বসিয়া প্রতিবেশীর পরিচয় গ্রহণ করিতেছে। এতক্ষণে আমার সেই নম্বর-আঁটা কুলি আসিয়া দেখা দিল; কহিল, তোরঙ্গ ও বিছানা উপরে রেখেচি; যদি বলেন, নীচে আনি।

বলিলাম, না; বরঞ্চ আমাকেও কোন মতে উদ্ধার ক'রে উপরে নিয়ে চল।

কারণ, পরের বিছানা না মাড়াইয়া, তাহার সহিত হাতাহাতির সম্ভাবনা না ঘটাইয়া পা ফেলিতে পারি, এমন একটুখানি স্থানও চোখে পড়িল না। বর্ষার দিনে উপরে জলে ভিজি, সেও ভালো, কিন্তু এখানে আর একদণ্ডও না। কুলিটা অধিক পয়সার লোভে, অনেক চেষ্টায়, অনেক তর্কাতর্কি করিয়া কম্বল ও সতরঞ্চির এক-আধটু ধার মুড়িয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া উপরে আনিল এবং আমার জিনিসপত্র দেখাইয়া দিয়া বকশিশ লইয়া প্রস্থান করিল। এখানেও সেই ব্যাপার—বিছানা পাতিবার জায়গা নাই। কাজেই নিরুপায় হইয়া নিজের তোরঙ্গটার উপরেই নিজের বসিবার উপায় করিয়া লইয়া নিবিষ্ট চিত্তে মা ভাগীরথীর উভয় কূলের মহিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। স্টীমার তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বহুক্ষণ হইতেই পিপাসা পাইয়াছিল। এই দুই-ঘণ্টা কাল যে কাণ্ড মাথার উপর দিয়া বহিয়া গেল, তাহাতে বুক শুকাইয়া উঠে না—এমন কঠিন বুক সংসারে অল্পই আছে! কিন্তু বিপদ এই হইয়াছিল যে, সঙ্গে না ছিল একটা গ্লাস, না ছিল একটা ঘটি। সহযাত্রীদের মধ্যে যদি কোথাও কোন বাঙ্গালী থাকে ত একটা উপায় হইতে পারিবে মনে করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। নীচে নামিবার সেই গর্তটার কাছাকাছি হইবামাত্র একপ্রকার তুমুল শব্দ কানে পৌঁছিল—যাহার সহিত তুলনা করি, এরূপ অভিজ্ঞতা আমার নাই। গোয়ালে আগুন ধরিয়া গেলে একপ্রকার আওয়াজ উঠিবার কথা বটে, কিন্তু ইহার অনুরূপ আওয়াজের জন্য যত বড় গোশালার আবশ্যক, তত বড় গোশালা মহাভারতের যুগে বিরাট রাজার যদি থাকিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা, কিন্তু এই কলিকালে কাহারও যে থাকিতে পারে তাহা কল্পনা করাও কঠিন। সভয় চিত্তে সিঁড়ির দুই-এক ধাপ নামিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, যাত্রীরা যে যাহার national সঙ্গীত শুরু করিয়া দিয়াছে। কাবুল হইতে ব্রহ্মপুত্র ও কুমারিকা হইতে চীনের সীমানা পর্যন্ত যত প্রকারের সুর-ব্রহ্ম আছেন, জাহাজের এই আবদ্ধ খোলের মধ্যে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাহারই সমবেত অনুশীলন চলিতেছে! এ মহাসঙ্গীত শুনিবার ভাগ্য কদাচিৎ ঘটে; এবং সঙ্গীতই যে সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, তাহা সেইখানেই দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময় এই যে এতগুলা সঙ্গীত-বিশারদ একসঙ্গে জুটিল কিরূপে?

নীচে নামা উচিত হইবে কি না, সহসা স্থির করিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, ইংরাজের মহাকবি সেক্সপীয়র নাকি বলিয়াছিলেন, সঙ্গীতে যে মুগ্ধ না হয়, সে খুন করিতে পারে, না, এমনি কি-একটা কথা। কিন্তু মিনিটখানেক শুনিলেই যে মানুষের খুন চাপিয়া যায়, এমন সঙ্গীতের খবর বোধ করি, তাঁহার জানা ছিল না। জাহাজের খোল বীণাপাণির পীঠস্থান কি না, জানি না; না হইলে, কাবুলিয়ালা গান গায়, এ কথা কে ভাবিতে পারে! একপ্রান্তে এই অদ্ভুত কাণ্ড চলিতেছিল! হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি; হঠাৎ দেখি একব্যক্তি তাহারই অদূরে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে হাত নাড়িয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতেছে। অনেক কষ্টে অনেক

লোকের চোখরাঙানি মাথায় করিয়া এই লোকটির কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ব্রাহ্মণ শুনিয়া সে হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিল, এবং নিজেকে রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিল। পাশে একটি বিগত-যৌবনা স্থূলাঙ্গী বসিয়া একদৃষ্টে আমাকে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। মানুষের এত বড় দুটো ভাঁটার মত চোখ ও এত মোটা জোড়াভুরু আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। নন্দ মিস্ত্রী তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, বাবুমশায়, ইটি আমার পরি—

কথাটা শেষ না হতেই স্ত্রীলোকটি ফোঁস করিয়া গর্জাইয়া উঠিল—পরিবার! আদ্দার সাত পাকের সোয়ামী বলচেন, পরিবার! খবরদার বলচি মিস্তিরী, যার-তার কাছে মিছে কথা ব'লে আমার বদনাম করো না ব'লে দিচ্চি।

আমি ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

নন্দ মিস্ত্রী অপ্রতিভ হইয়া বলিতে লাগিল, আহা! রাগ করিস কেন টগর? পরিবার বলে আর কাকে? বিশ বচ্ছর—

টগর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল, হলোই বা বিশ বচ্ছর! পোড়া কপাল! জাত-বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবত্তের পরিবার! কেন, কিসের দুঃখে? বিশ বচ্ছর ঘর করচি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁসেলে ঢুকতে দিয়েচি? সে কথা কারও বলবার জো নেই! টগর বোষ্টমী ম'রে যাবে, তবু জাতজন্ম খোয়াবে না—তা জানো? বলিয়া এই জাত-বোষ্টমের মেয়ে জাতের গর্বে আমার মুখের পানে চাহিয়া তাহার ভাঁটার মত চোখ-দুটো ঘূর্ণিত করিতে লাগিল।

নন্দ মিস্ত্রী লজ্জিত হইয়া বারংবার বলিতে লাগিল, দেখলেন মশায়, দেখলেন? এখনো এদের জাতের দেমাক! দেখলেন! আমি তাই সহ্য করি, আর কেউ হ'লে—কথাটা সে তাহার বিশ বচ্ছরের পরিবারের চোখের পানে চাহিয়া আর সম্পূর্ণ করিতে পারিল না।

আমি কোন কথা না কহিয়া একটা গেলাস চাহিয়া লইয়া প্রস্থান করিলাম। উপরে আসিয়া এই জাত-বোষ্টমীর কথাগুলো মনে করিয়া হাসি চাপিতে পারিলাম না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়িল, এ ত একটা সামান্য অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এবং শহরে কি এমন অনেক শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত পুরুষমানুষ নাই, যাহাদের দ্বারা অনুরূপ হাস্যকর ব্যাপার আজও প্রত্যহ অনুষ্ঠিত না হইতেছে! এবং পাপের সমস্ত অন্যায় হইতে যাহারা সুদ্ধমাত্র খাওয়া-ছোঁওয়া বাঁচাইয়াই পরিত্রাণ পাইতেছে! তবে এমন হইতে পারে বটে, এদেশে পুরুষের বেলা হাসি আসে না, আসে শুধু স্ত্রীলোকের বেলাতেই।

আজ সন্ধ্যা হইতেই আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমা হইতেছিল। রাত্রি একটার পরে সামান্য জল ও হাওয়া হওয়ায় কিছুক্ষণের জন্য জাহাজ বেশ একটুখানি দুলিয়া লইয়া পরদিন সকালবেলা হইতেই শিষ্টশান্ত হইয়া চলিতে লাগিল। যাহাকে সমুদ্রপীড়া বলে, সে উপসর্গটা আমার বোধ করি ছেলেবেলায় নৌকার উপরেই কাটিয়া গিয়াছিল; সুতরাং বমি করার দায়টা আমি একেবারেই এড়াইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু সপরিবার নন্দ মিস্ত্রীর কি দশা হইল, কি করিয়া রাত্রি কাটিল, জানিবার জন্য সকালেই নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কল্যকার গায়কবৃন্দের অধিকাংশই তখনও উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। বুঝিলাম, রাত্রির ধকল কাটাইয়া ইহারা এখনও মহাসঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই। নন্দ মিস্ত্রী ও তাহার বিশ বছরের পরিবার গম্ভীরভাবে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া প্রণাম করিল। তাহাদের মুখের ভাবে মনে হইল, ইতিপূর্বে একটা কলহের মত হইয়া গেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, রাত্রে কেমন ছিলে মিস্ত্রীমশাই?

নন্দ কহিল, বেশ।

তাহার পরিবারটি তর্জন করিয়া উঠিল, বেশ, না ছাই! মা গো মা, কি কাণ্ডই হয়ে গেল!

একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি কাণ্ড?

নন্দ মিস্ত্রী আমার মুখের পানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, গোটা-দুই তুড়ি দিয়া, অবশেষে কহিল, কাণ্ড এমন-কিছুই নয় মশাই। বলি, কলকাতার গলির মোড়ে সাড়েবত্রিশ-ভাজা বিক্রী করা দেখেছেন? দেখে থাকলে আমাদের অবস্থাটি ঠিক বুঝে নিতে পারবেন। সে যেমন ঠোঙার নীচে গুটি দুই-তিন টোকা মেরে ভাজা চাল-ডাল-মটর-কড়াই-ছোলা-বরবটি-মুসুরি-খেঁসারি

সব একাকার করে দেয়, দেবতার কৃপায় আমরা সবাই ঠিক তেমনি মিশিয়ে গিয়েছিলুম—এই খানিকক্ষণ হ'ল যে যার কোট চিনে ফিরে এসে বসেচি। তাহার পর টগরের পানে চাহিয়া কহিল, মশাই, ভাগ্যে আসল বোষ্টমের জাত যায় না, নইলে টগর আমার—

টগর ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত গর্জিয়া উঠিল—আবার! ফের!

না, তবে থাক, বলিয়া নন্দ উদাসীনের মত আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিল। মূর্তিমান নোংরা একজোড়া কাবুলিয়ালা আপাদমস্তক সমস্ত পৃথিবীর অপরিচ্ছন্নতা লইয়া অত্যন্ত তৃপ্তির সহিত রুটি ভক্ষণ করিতেছিল। ক্রুদ্ধ টগর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে সেই হতভাগ্যদিগের প্রতি তাহার অত বড় দুই চক্ষুর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। নন্দ তাহার পরিবারের উদ্দেশে প্রশ্ন করিল, আজ তা হলে খাওয়া-দাওয়া হবে না বল?

পরিবার কহিল, মরণ আর কি! হবে কি ক'রে শুনি!

ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া আমি কহিলাম, এই ত মোটে সকাল, একটু বেলা হ'লে—

নন্দ আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কলকাতা থেকে দিব্যি একহাঁড়ি রসগোল্লা আনা হয়েছিল মশায়, জাহাজে উঠে পর্যন্ত বলচি, আয় টগর কিছু খাই, আত্মাকে কষ্ট দিস্ নে—নাঃ রেঙ্গুনে নিয়ে যাবো। (টগরের প্রতি) যা না এইবার তোর রেঙ্গুনে নিয়ে!

টগর এই ক্রুদ্ধ অভিযোগের স্পষ্ট প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুব্ধ অভিমানে একটিবার মাত্র আমার পানে চাহিয়াই, পুনরায় সেই হতভাগ্য কাবুলীকে চোখের দৃষ্টিতে দগ্ধ করিতে লাগিল।

আমি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল রসগোল্লা?

নন্দ টগরের উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া বলিল, সেগুলোর কি হ'ল বলতে পারি নে। ওই দেখুন ভাঙ্গা হাঁড়ি, আর ওই দেখুন বিছানাময় তার রস; এর বেশি যদি কিছু জানতে চান ত ওই দুই হারামজাদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বলিয়া সে টগরের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কটমট করিয়া চাহিয়া রহিল।

আমি অনেক কষ্টে হাসি চাপিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিলাম, তা থাক, সঙ্গে চিঁড়ে আছে ত!

নন্দ কহিল, সেদিকেও সুবিধে হয়েছে। বাবুকে একবার দেখা ত টগর!

টগর একটা ছোট পুঁটলি পা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, দেখাও গে তুমি—

নন্দ কহিল, যাই বলুন বাবু, কাবুলী জাতটাকে নেমকহারাম বলা যায় না। ওরা রসগোল্লাও যেমন খায়, ওর কাবুল দেশের মোটা রুটিও অমনি বেঁধে দেয়! ফেলিস নে টগর, তুলে রাখ, তোর মালসা-ভোগে লেগে যেতে পারে।

নন্দর এই পরিহাসে আমি ত হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই টগরের মুখের পানে চাহিয়া ভয় পাইয়া গেলাম। ক্রোধে সমস্ত মুখ কালো করিয়া, মোটা গলায় বজ্র-কর্কশ-শব্দে জাহাজের সমস্ত লোককে সচকিত করিয়া, টগর চীৎকার করিয়া উঠিল—জাত তুলে কথা ক'য়ো না বলচি মিস্তিরী—ভাল হবে না, তা বলচি—

চীৎকার শব্দে যাহারা মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহাদের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নন্দ এতটুকু হইয়া গেল। টগরকে সে ভালোমতোই চিনিত, একটা বেফাঁস ঠাট্টার জন্য ক্রোধটা তাহার সে শান্ত করিতে পারিলেই বাঁচে। লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিল, মাথা খাস্ টগর, রাগ করিস্ নে—আমি তামাশা করেচি বৈ ত নয়।

টগর সে কথা কানেও তুলিল না। চোখের তারা, ভুরু একবার বামে ও একবার দক্ষিণে ঘুরাইয়া লইয়া, গলার সুর আরও এক পর্দা চড়াইয়া দিয়া বলিল, কিসের তামাশা! জাত তুলে আবার তামাশা কি! মোচলমানের রুটি দিয়ে মালসা-ভোগ হবে? তোর কৈবর্ত্তর মুখে আগুন—দরকার থাকে, তুই তুলে রাখ্ গে—বাপের পিণ্ডি দিস্।

জ্যা-মুক্ত ধনুর মত নন্দ খাড়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াই টগরের কেশাকর্ষণ করিয়া ধরিল—হারামজাদি, তুই বাপ তুলিস্!

টগর কোমরে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, হারামজাদা, তুই জাত তুলিস্! বলিয়াই আকর্ণ মুখব্যাদান করিয়া নন্দর বাহুর একাংশ দংশন করিয়া ধরিল, এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যেই নন্দ মিস্ত্রী ও টগর বোষ্টমীর মল্লযুদ্ধ তুমুল হইয়া উঠিল। দেখিতে

দেখিতে সমস্ত লোক ভিড় করিয়া ঘেরিয়া ধরিল। হিন্দুস্থানীরা সমুদ্রপীড়া ভুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বাহবা দিতে লাগিল। পাঞ্জাবীরা ছি-ছি করিতে লাগিল, উৎকলবাসীরা চেঁচামেচি করিতে লাগিল—সবসুদ্ধ একটা কাণ্ড বাধিয়া গেল। আমি স্তম্ভিত বিবর্ণমুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত সামান্য কারণে এত বড় অনাবৃত নির্লজ্জতা যে সংসারে ঘটিতে পারে, ইহা ত আমি কল্পনা করিতেও পারিতাম না। তাহাই আবার বাঙ্গালী নরনারীর দ্বারা এক-জাহাজ লোকের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিলাম। কাছেই একজন জৌনপুরী দরওয়ান অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত তামাশা দেখিতেছিল; আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাবুজী, বাঙ্গালীন্ তো বহুত আচ্ছি লড়নেওয়ালী হ্যায়! হট্‌তি নাহি!

আমি তাহার পানে চাহিতেও পারিলাম না। নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিয়া কোন মতে ভিড় ঠেলিয়া উপরে পলাইয়া গেলাম।

চার

সেদিন এমন প্রবৃত্তি হইল না যে নীচে যাই। সুতরাং নন্দ-টগরের যুদ্ধের অবসান কি ভাবে হইল, সন্ধিপত্রে কোন্ কোন্ শর্তাদি নির্দিষ্ট হইল, কিছুই জানি না। তবে, পরে দেখিয়াছি, শর্ত যাই হোক, বিপদের দিনে সেই স্ক্র্যাপ-অফ-পেপারটা কোন কাজেই লাগে না। যাহার যখন আবশ্যক হয়, অবলীলাক্রমে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অপরের ব্যূহ ভেদ করে। বিশ বৎসর ধরিয়া তাহারা এই কাজ করিয়াছে; এবং আরও বিশ বৎসর যে করিবে না, এমন শপথ বোধ করি স্বয়ং বিধাতাপুরুষও করিতে পারেন না।

সারাদিন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনার বিরাম ছিল না; এখন অপরাহ্নের কাছাকাছি একটা গাঢ় কালো মেঘ দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইল, সমস্ত খালাসীদের মুখে-চোখেই কেমন যেন একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িয়াছে। তাহাদের চলাফেরার মধ্যেও একপ্রকার ব্যস্ততার লক্ষণ—যাহা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করি নাই।

একজন বৃদ্ধ-গোছের খালাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, চৌধুরীর পো, আজ রাত্রেও কি কালকের মত ঝড় হবে মনে হয়?

বিনয়ে চৌধুরীর পুত্র বশ হইল। দাঁড়াইয়া কহিল, কোর্তা, নীচে যাও; কাপ্তান কইচে ছাইক্লোন হোতি পারে।

মিনিট পনের পরেই দেখিলাম কথাটা অমূলক নয়। উপরের যত যাত্রী ছিল, সকলকে একরকম জোর করিয়া খালাসীরা হোল্‌ডের মধ্যে নামাইয়া দিতে লাগিল। দু-চারিজন আপত্তি করায়, সেকেণ্ড অফিসার নিজে আসিয়া ধাক্কা মারিয়া তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া বিছানাপত্র পা দিয়া গুটাইয়া দিতে লাগিল। আমার তোরঙ্গ, বিছানা খালাসীরা ধরাধরি করিয়া নীচে লইয়া গেল; কিন্তু আমি নিজে আর একদিকে সরিয়া পড়িলাম। শুনিলাম, সকলকে—অর্থাৎ যে হতভাগ্যেরা দশ টাকার বেশি ভাড়া দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে জাহাজের খোলের মধ্যে পুরিয়া গর্তের মুখ আঁটিয়া বন্ধ করা হইবে। তাহাদের মঙ্গলের জন্যও বটে, জাহাজের মঙ্গলের জন্যও বটে, এইরূপই বিধি। আমার কিন্তু নিজের জন্য এই কল্যাণের ব্যবস্থা কিছুতেই মনঃপূত হইল না। ইতিপূর্বে সাইক্লোন বস্তুটি সমুদ্রে কেন ডাঙ্গাতেও দেখি নাই। কি ইহার কাজ, কেমন ইহার রূপ, অমঙ্গল ঘটাইবার কতখানি ইহার শক্তি—কিছুই জানি না। মনে মনে ভাবিলাম, ভাগ্যবলে যদি এমন জিনিসেরই আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে, তবে না দেখিয়া ইহাকে ছাড়িব না—তা অদৃষ্টে যা ঘটে তা ঘটুক। আর ঝড়ে জাহাজ যদি মারাই যায়, ত অমন প্লেগের ইঁদুরের মত পিঁজরায় আবদ্ধ হইয়া, মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল খাইয়া মরিতে যাই কেন? যতক্ষণ পারি, হাত-পা নাড়িয়া, ঢেউয়ের উপরে নাগরদোলা চাপিয়া, ভাসিয়া গিয়া, এক সময়ে টুপ করিয়া ডুব দিয়া পাতালের রাজবাড়িতে অতিথি হইলেই চলিবে। কিন্তু রাজার জাহাজ যে আগে-পিছে লক্ষকোটি হাঙ্গর-অনুচর ছাড়া কালাপানিতে এক পা চলেন না, এবং জলযোগ করিয়া ফেলিতেও যে তাহাদের মুহূর্ত বিলম্ব হয় না—এ সকল তথ্য তখনও আমার জানা ছিল না।

অনেকক্ষণ হইতে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার কাছাকাছি বাতাস এবং বৃষ্টির

বেগ উত্তরই বাড়িয়া উঠিল; এমন হইয়া উঠিল যে পালাইয়া বেড়াইবার আর জো রহিল না, যেখানে হোক, সুবিধামত একটু আশ্রয় না লইলেই নয়। সন্ধ্যার আঁধারে যখন স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলাম, তখন উপরের ডেক জনশূন্য। মাস্তুলের পাশ দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঠিক সম্মুখেই বুড়ো কাপ্তেন দূরবীন হাতে ব্রিজের উপর ছুটাছুটি করিতেছেন। হঠাৎ তাঁর সুনজরে পড়িয়া গিয়া পাছে এত কষ্টের পরেও আবার সেই গর্তে গিয়া ঢুকিতে হয়, এই ভয়ে একটা সুবিধা-গোছের জায়গা অন্বেষণ করিতে করিতে একেবারে অচিন্তনীয় আশ্রয় মিলিয়া গেল। একধারে অনেকগুলো ভেড়া, মুরগি ও হাঁসের খাঁচা উপরি-উপরি রাখা ছিল, তাহারই উপরে উঠিয়া বসিলাম। মনে হইল, এমন নিরাপদ জায়গা বুঝি সমস্ত জাহাজের মধ্যে আর কোথাও নাই। কিন্তু তখনও অনেক কথাই জানিতে বাকী ছিল।

বৃষ্টি, বাতাস, অন্ধকার এবং জাহাজের দোলন সব কটিই ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমুদ্রতরঙ্গের আকৃতি দেখিয়া মনে হইল, এই বুঝি সেই ছাইক্লোন; কিন্তু সে যে সাগরের কাছে গোষ্পদমাত্র, তাহা অস্থিমজ্জায় হৃদয়ঙ্গম করিতে আর একটু অপেক্ষা করিতে হইল।

হঠাৎ বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে, পরক্ষণের একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানি না।

ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতরে ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র একডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ' রাক্ষসী মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি-একটা বিপ্লব বাধিয়াছে; তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়, শতকোটি; উন্মত্ত কোলাহলে এদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে। আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভাল ছিল।

এই দুর্জয় বায়ুর শক্তি বর্ণনা করা ত ঢের দূরের কথা, সমগ্র চেতনা দিয়া অনুভব করাও যেন মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে। জ্ঞান-বুদ্ধি সমস্ত অভিভূত করিয়া সুধমাত্র এমনি একটা অস্পষ্ট অথচ নিঃসন্দেহ ধারণা মনের মধ্যে জাগিয়া রহিল যে, দুনিয়ার মিয়াদ একেবারে নিঃশেষ হইতে আর বিলম্ব কত! পাশেই যে লোহার খুঁটি ছিল, গলার চাদর দিয়া নিজেকে তাহার সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলিয়া ছিলাম, অনুক্ষণ মনে হইতে লাগিল, এইবার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে সাগরের মাঝখানে উড়াইয়া লইয়া ফেলিবে।

হঠাৎ মনে হইল, জাহাজের গায়ে কালো জল যেন ভিতরের ধাক্কায় বজ্‌বজ্‌ করিয়া ক্রমাগত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। দূরে চোখ পড়িয়া গেল—দৃষ্টি আর ফিরাইতে পারিলাম না। একবার মনে হইল এ বুঝি পাহাড়, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভ্রম যখন ভাঙ্গিল তখন হাত জোড় করিয়া বলিলাম, ভগবান! এই চোখ দুটি যেমন তুমিই দিয়াছিলে, আজ তুমিই তাহাদের সার্থক করিলে। এতদিন ধরিয়া ত সংসারে সর্বত্র চোখ মেলিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু তোমার এই সৃষ্টির তুলনা ত কখনও দেখিতে পাই নাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, এই যে অচিন্তনীয় বিরাটকায় মহাতরঙ্গ মাথায় রজতশুভ্র কিরীট পরিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, এত বড় বিস্ময় জগতে আর আছে কি!

সমুদ্রে ত কত লোকই যায় আসে; আমি নিজেও ত আরও কতবার এই পথে যাতায়াত করিয়াছি; কিন্তু এমনটি ত আর কখনও দেখিতে পাইলাম না। তা ছাড়া চোখে না দেখিলে, জলের ঢেউ যে কোন গতিকেই এত বড় হইয়া উঠিতে পারে, এ কথা কল্পনার বাপের সাধ্যও নাই কাহাকেও জানায়।

মনে মনে বলিলাম, হে ঢেউ-সম্রাট্! তোমার সংঘর্ষে আমাদের যাহা হইবে সে ত আমি জানিই; কিন্তু এখনও ত তোমার আসিয়া পৌঁছিতে অন্ততঃ আধ-মিনিট কাল বিলম্ব আছে, সেই সময়টুকু বেশ করিয়া তোমার [illegible] যেন দেখিয়া লইতে পারি।

একটা জিনিসের সুবিপুল উচ্চতা ও ততোধিক বিস্তৃতি দেখিয়াই কিছু এ ভাব মনে আসে না; কারণ তা হইলে হিমালয়ের যে-কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ত যথেষ্ট। কিন্তু এই যে বিরাট ব্যাপার জীবন্তের মত ছুটিয়া আসিতেছে সেই অপরিমেয় গতিশক্তির অনুভূতিই আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রজলে ধাক্কা দিলে যাহা জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে, সেই জ্বলা নানা প্রকারের বিচিত্র রেখায় ইহার মাথার উপর খেলা করিতে না থাকিলে, এই গভীরকৃষ্ণ জলরাশির বিপুলত্ব এই অন্ধকারে হয়ত তেমন করিয়া দেখিতেই পাইতাম না। এখন যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূরেই এই আলোকমালা, যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদীপ জ্বালিয়া এই ভয়ঙ্কর সুন্দরের মুখ আমার চক্ষের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দিল।

জাহাজের বাঁশী অসীম বায়ুবেগে থরথর করিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিতেই লাগিল; এবং ভয়ার্ত খালাসীর দল আল্লার কর্ণে তাহাদের আকুল আবেদন পৌঁছিয়া দিতে গলা ফাটাইয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

যাঁহার শুভাগমনের জন্য এত ভয়, এত ডাক-হাঁক, এত উদ্যোগ-আয়োজন—সেই মহাতরঙ্গ আসিয়া পড়িলেন। একটা প্রকাণ্ড-গোছের ওলট-পালটের মধ্যে হরবল্লভের মত আমারও প্রথমটা মনে হইল, নিশ্চয়ই আমরা ডুবিয়া গেছি, সুতরাং দুর্গানাম করিয়া আর কি হইবে! আশেপাশে, উপরে-নীচে চারিদিকেই কালো জল। জাহাজ-সুদ্ধ সবাই যে পাতালের রাজবাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইতে চলিয়াছি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন ভাবনা শুধু এই যে, খাওয়া-দাওয়াটা তথায় কি জানি কিরূপ হইবে। কিন্তু মিনিটখানেক পরে দেখা গেল, না—ডুবি নাই, জাহাজ-সুদ্ধ আবার জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছি। অতঃপর তরঙ্গের পর তরঙ্গেরও আর শেষ হয় না, আমাদের নাগরদোলা-চাপারও আর সমাপ্তি হয় না। এতক্ষণে টের পাইলাম, কেন কাপ্তেনসাহেব মানুষগুলোকে জানোয়ারের মত গর্তে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়াছেন। ডেকের উপর দিয়া মাঝে মাঝে যেন জলের স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। আমার নীচে হাঁস-মুরগিগুলা বার কতক ঝট্‌পট্‌ করিয়া এবং ভেড়াগুলা কয়েকবার ম্যা ম্যা করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল। আমি শুধু তাহাদের উপরতলা আশ্রয় করিয়া লোহার খুঁটি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া ভবলীলা বজায় করিয়া চলিলাম। কিন্তু এখন আর-একপ্রকারের বিপদ জুটিল। শুধু যে জলের ছাট ছুঁচের মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল, তাই নয়, সমস্ত জামাকাপড় ভিজিয়া প্রচণ্ড বাতাসে এমনি শীত করিতে লাগিল যে, দাঁতে-দাঁতে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে হইল জলে ডোবার হাত হইতে যদিবা সম্প্রতি নিস্তার পাই, নিমোনিয়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইব কিরূপে? এইভাবে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিলে যে পরিত্রাণ পাওয়া সত্যই অসম্ভব হইয়া পড়িবে, তাহা নিঃসংশয়ে অনুভব করিলাম। সুতরাং যেমন করিয়া হোক্, এ-স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন-কোথাও আশ্রয় লইতে হইবে, যেখানে জলের ছাট বল্লমের ফলার মত গায়ে বেঁধে না। একবার ভাবিলাম, ভেড়ার খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলে কিরূপ হয়? কিন্তু তাইবা কতটুকু নিরাপদ? তার মধ্যে যদি সেইরূপ লোনা জলের স্রোত ঢুকিয়া পড়ে ত নিতান্তই যদি-না ম্যা-ম্যা করি, মা-মা করিয়াও অন্ততঃ ইহলীলা সমাপ্ত করিতে হইবে।

শুধু এক উপায় আছে। জাহাজের পার্শ্ব-পরিবর্তনের মধ্যে ছুট দিবার একটু অবকাশ পাওয়া যায়; অতএব এই সময়টুকুর মধ্যে আর কোথাও গিয়া যদি ঢুকিয়া পড়িতে পারি, হয়ত বাঁচিতেও পারি। যে কথা, সেই কাজ। কিন্তু খাঁচা হইতে অবতরণ করিয়া তিনবার ছুটিয়া ও তিনবার বসিয়া যদিবা সেকেণ্ড ক্লাস কেবিনের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম, দ্বার বন্ধ। লোহার কপাট হাজার ঠেলাঠেলিতেও পথ দিল না। সুতরাং আবার সেই পথ তেমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া ফার্স্ট ক্লাসের দোরগোড়ায় আসিয়া হাজির হইলাম। এবার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইয়া একটা নিরালা ঘরের মধ্যে আশ্রয় দিলেন। লেশমাত্র দ্বিধা না করিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া খাটের উপর ঝুপ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

রাত্রি বারোটার মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু পরদিন ভোরবেলা পর্যন্ত সমুদ্রের রাগ পড়িল না।

আমার জিনিসপত্রের এবং সহযাত্রীদের অবস্থা কি হইল, বিশেষ করিয়া মিস্ত্রীমশায়

সস্ত্রীক কি করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, জানিবার জন্য সকালবেলা নীচে নামিয়া গেলাম। কাল নন্দ মিস্ত্রী একটু রসিকতা করিয়াই বলিয়াছিল, মশায়, সাড়েবত্রিশভাজার মত আমরা মিশিয়ে গিয়েছিলুম; এইমাত্র যে-যার কোটে ফিরে এসেচি। আজিকার মিশামিশি সাড়েবত্রিশভাজায় চলে কিনা, জানি না; কিন্তু এখন পর্যন্ত কেহই যে কাহারও নিজের কোটে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম।

তাহাদের অবস্থা দেখিলে সত্যই কান্না পায়। এই তিন-চারশ' যাত্রীর মধ্যে সমর্থ থাকা ত অনেক দূরের কথা, বোধ করি, অক্ষত কেহই ছিল না।

মেয়েরা শিলের উপর নোড়া দিয়া যেমন করিয়া বাটনা বাটে, কল্যকার সাইক্লোন এই তিন-চারশ' লোক দিয়া ঠিক তেমনি করিয়া সারারাত্রি বাটনা বাটিয়াছে। সমস্ত জিনিসপত্র, বাক্স-পেঁটরা লইয়া এই লোকগুলি সমস্ত রাত্রি জাহাজের এধার হইতে ওধার গড়াইয়া বেড়াইয়াছে। বমি এবং অনুরূপ আর দুটা প্রক্রিয়া এত করিয়াছে যে, দুর্গন্ধে দাঁড়ানো ভার। এখন ডাক্তারবাবু জাহাজের মেথর ও খালাসীদের লইয়া ইহাদের পঙ্কোদ্ধার করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

ডাক্তারবাবু আমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া বোধ করি আমাকে সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী ঠিক করিয়াছিলেন। তথাপি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, মশাইকে ত খুব তাজা দেখাচ্ছে; বোধ করি একটা হ্যামক পেয়েছিলেন, না?

হ্যামক কোথায় পাব মশাই, পেয়েছিলাম একটা ভ্যাড়ার খাঁচা। তাই তাজা দেখাচ্চে।

ডাক্তারবাবু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বলিলাম, ডাক্তারবাবু, অধমও এই নরক-কুণ্ডেরই যাত্রী। কিন্তু দুর্বল বলিয়া এখানে ঢুকিতে পারি নাই। শুরু হইতে ডেকের উপরেই ছিলাম। কাল সাইক্লোনের খবর পাইয়া খানিকটা সময় ভ্যাড়ার খাঁচার উপরে বসিয়া, আর বাকী রাত্রিটা ফার্স্ট ক্লাসের একটা ঘরের মধ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছি। কি বলেন, অন্যায় করিয়াছি কি?

সমস্ত ইতিহাস শুনিয়া ডাক্তারবাবু এমনি খুশি হইয়া গেলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁর নিজের ঘরের মধ্যে বাকী দুটো দিন কাটাইবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। অবশ্য সে নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করিতে পারি নাই, শুধু ডেকচেয়ারটা তাঁহার লইয়াছিলাম।

দুপুরবেলা, ক্ষুধার তাড়নে নির্জীবের মত এই কেদারাটার উপরে পড়িয়া ব্রহ্মাণ্ডের খাদ্যবস্তুর চিন্তা করিতেছি—কোথায় গিয়া কি ফন্দি করিলে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য মিলিবে, সেই দুর্ভাবনায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময়ে খিদিরপুরের সেই মুসলমান দর্জিদের একজন আসিয়া কহিল, বাবুমশায়, একটি বাঙ্গালী মেয়েলোক আপনাকে ডাক্‌তেচে।

মেয়েলোক? বুঝিলাম ইনি টগর। কেন যে ডাকিতেছেন, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। নিশ্চয়ই মিস্ত্রীর সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর স্বত্ব-সাব্যস্ত ব্যাপারে আবার মতভেদ ঘটিয়াছে! কিন্তু আমাকে কেন? Trial by ordeal ছাড়া বাহিরের লোক আসিয়া কোনদিন যে ইহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে, তাহা মনে করাও ত শক্ত।

বলিলাম, ঘণ্টাখানেক পরে যাবো, বল গে।

লোকটি কুণ্ঠিতভাবে কহিল, না বাবুমশায়, বড় কাতর হয়ে ডাক্‌তেচে—

কাতর? কিন্তু টগর ত আমার কাতর হবার মানুষ নয়! জিজ্ঞাসা করিলাম, পুরুষ-মানুষটি কি করচে?

লোকটি কহিল, তেনার বেমারির জন্যেই ত ডাক্‌তেচে।

বেমারি হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়—কাজেই উঠিলাম। লোকটি সঙ্গে করিয়া আমাকে নীচে লইয়া গেল। অনেক দূরে এক কোণে কতকগুলা কাছি বিঁড়ার মত করিয়া রাখা ছিল: তাহারই আড়ালে একটি বাইশ-তেইশ বছরের বাঙ্গালী মেয়ে যে বসিয়াছিল, তাহা একদিনও আমার চোখে পড়ে নাই। কাছেই একখানি ময়লা সতরঞ্চির উপরে এই বয়সেরই একটি অত্যন্ত ক্ষীণকায় যুবক মড়ার মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে—অসুখ ইহারই।

আমি নিকটে আসিতে মেয়েটি আস্তে আস্তে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল, কিন্তু আমি ইহার মুখ দেখিতে পাইলাম।

সে খুব সুন্দর বলিলে তর্ক উঠিবে, কিন্তু তাহা অবহেলা করিবার জিনিস নয়। কারণ,

বড় কপাল স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যের তালিকার মধ্যে স্থান পায় না জানি; কিন্তু এই তরুণীর প্রশস্ত ললাটের উপর এমন একটু বুদ্ধি ও বিচারের ক্ষমতা ছাপমারা দেখিতে পাইলাম যাহা কদাচিৎ দেখিয়াছি। আমার অন্নদাদিদির কপালও বড় ছিল—অনেকটা যেন তাঁর মতই। সিঁথায় সিন্দুর ডগ্‌ডগ্‌ করিতেছে, হাতে নোয়া ও শাঁখা—আর কোন অলঙ্কার নাই, পরনে একখানি নিতান্ত সাদাসিধা রাঙ্গাপেড়ে শাড়ি।

পরিচয় নাই, অথচ এমন সহজভাবে কথা কহিলেন যে, বিস্মিত হইয়া গেলাম। কহিলেন, আপনার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর ত আলাপ আছে, একবার ডেকে আনতে পারেন?

বলিলাম, আলাপ আজই হয়েচে। তবে মনে হয় ডাক্তারবাবু লোক ভাল—কিন্তু, কি প্রয়োজন?

তিনি বলিলেন, ডাকলে যদি ভিজিট দিতে হয়, ত কাজ নেই, ইনি নাহয় কষ্ট করে উপরেই যাবেন। বলিয়া সেই রুগ্ন লোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম, জাহাজের ডাক্তারকে ডাকলে বোধ করি কিছু দিতে হয় না। কিন্তু সে যাই হোক, এ'র হয়েচে কি?

আমি মনে করিয়াছিলাম, লোকটি এ'র স্বামী। কিন্তু স্ত্রীলোকটির কথায় যেন সন্দেহ হইল। লোকটির মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ি থেকেই তোমার একটু পেটের অসুখ ছিল, না?

লোকটি মাথা নাড়িলে তিনি মুখ তুলিয়া কহিলেন, হাঁ, এর পেটের অসুখ দেশেতেই হয়েছিল, কাল থেকে জ্বর হয়েচে। এখন দেখচি জ্বর খুব বেশি, একটা কিছু ওষুধ না দিলেই নয়।

আমি নিজেও হাত দিয়া লোকটির গায়ের উত্তাপ অনুভব করিয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই খুব জ্বর। ডাক্তার ডাকিতে উপরে চলিয়া গেলাম।

ডাক্তারবাবু নীচে আসিয়া রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধপত্র দিয়া কহিলেন, চলুন শ্রীকান্ত-বাবু, ঘরে গিয়ে দুটো গল্পগাছা করা যাক।

ডাক্তারবাবু লোকটি চমৎকার। তাঁহার ঘরে লইয়া গিয়া কহিলেন, চা খান ত?

বলিলাম, হাঁ।

বিস্কুট?

তাও খাই।

আচ্ছা।

খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হইবার পর দুজনে মুখোমুখি দুখানা চেয়ারে বসিলে, ডাক্তারবাবু কহিলেন, আপনি জুটলেন কি ক'রে?

বলিলাম, স্ত্রীলোকটি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

ডাক্তারবাবু বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, পাঠাবারই কথা। বিয়ে-টিয়ে করেচেন?

বলিলাম, না।

ডাক্তারবাবু কহিলেন, তা হলে জুটে পড়ুন, নেহাৎ মন্দ হবে না। লোকটার ঐ ত চেহারা; তাতে টাইফয়েডের লক্ষণ বলেই মনে হচ্চে। যা হোক্‌, বেশি দিন টিকবে না, তা ঠিক। ইতিমধ্যে একটু নজর রাখবেন, আর কোন ব্যাটা না ভিড়ে যায়।

অবাক হইয়া বলিলাম, আপনি এ সব কি বলচেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, আচ্ছা, ছোঁড়াটা বার ক'রে আনচে, না ওকেই বার করে এনেচে, কি মনে হয় বলুন ত শ্রীকান্তবাবু? খুব forward, না? দিব্যি কথাবার্তা কয়।

বলিলাম, এ রকম ধারণা আপনার মনে কি করে এল?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, প্রতি ট্রিপেই দেখি কিনা, একটা-না-একটা আছেই! গতবারেই ত বেলঘোরের একজোড়া ছিল। একবার বর্মায় গিয়ে পা দিন, তখন দেখবেন, আমার কথাটা ঠিক কি না।

বর্মার কথাটা যে তাঁর অনেকটাই সত্য, তাহা পরে দেখিয়াছিলাম বটে; কিন্তু আপাততঃ সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় যেন তিক্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তারবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একবার নন্দ মিস্ত্রীর খবর লইতে নীচে গেলাম। 'সপরিবার' মিস্ত্রীমশাই তখন ফলাহারের আয়োজন করিতেছিল; একটা নমস্কার করিয়া প্রথমেই প্রশ্ন করিল, ঐ মেয়েমানুষটি কে মশাই?

টগর শিরঃপীড়া বাবদে মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধিতেছিল—ফোঁস করিয়া গর্জাইয়া উঠিল, তোমার সে খবরে কাজ কি শুনি?

মিস্ত্রী আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া কহিল, দেখলেন মশাই, মাগীর ছোট মন? কে বাঙ্গালী মেয়েটা রেঙ্গুনে যাচ্ছে—খবরটা নিতেও দোষ?

টগর শিরঃপীড়া ভুলিয়া, পাগড়িটা ফেলিয়া দিয়া আমার মুখপানে চাহিল। সেই দুটি গো-চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, মশাই, টগর বোষ্টমীর হাত দিয়ে ওর মত কত গণ্ডা মিস্তিরি মানুষ হয়ে গেল—এখন ও আমার চোখে ধুলো দেবে? আরে, তুই ডাক্তার, না বদ্যি যে, যেই একটু জল আনতে গেছি, অমনি ছুটে দেখতে গেছিস? কেন, কে ও? ভাল হবে না বলে দিচ্ছি মিস্তিরি! আর যদি ওদিকে যেতে দেখি ত, তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন!

নন্দ মিস্ত্রীও গরম হইয়া কহিল, তোর কি আমি পোষা বাঁদর যে, যে-দিকে শেকল ধরে নিয়ে যাবি সেই দিকে যাবো? আমার ইচ্ছে হলে আবার গিয়ে বেচারাকে দেখে আসব—তুই যা পারিস, তা করিস। বলিয়া ফলারে মন দিল।

টগরও শুধু একটা 'আচ্ছা' বলিয়া তাহার পাগড়ি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও প্রস্থান করিলাম। ভাবিতে ভাবিতে গেলাম, এমনি করিয়া ইহারা বিশ বৎসর কাটাইয়াছে। অনেক পোড় খাইয়া টগর এটা বুঝিয়াছে যে, যেখানে সত্যকার বন্ধন নাই. সেখানে এতটুকু রাশ শিথিল করিলে চলিবে না, ঠকিতেই হইবে; হয়, অহর্নিশি সতর্ক হইয়া জোর করিয়া দখল বজায় রাখিতে হইবে, নাহয়, যৌবনের মত নন্দ মিস্ত্রীও একদিন অজ্ঞাতসারে খসিয়া পড়িবে। কিন্তু যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া টগরের এই বিদ্বেষ, ডাক্তারবাবুর এমন কুৎসিত তীব্র কটাক্ষ—সে কে, এবং কি? টগর কহিয়াছিল, এই কাজ করিয়া সে নিজে চুল পাকাইয়াছে—তাহার চক্ষে ধূলি দিবে, এমন মেয়েমানুষ আছে কোথায়?

ডাক্তারবাবু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই কাণ্ড নিত্য দেখিয়া তাঁর চোখে দিব্যদৃষ্টি আসিয়াছে; আজ ভুল করিলে এমন চোখ তিনি উপড়াইয়া ফেলিতে রাজী আছেন।

এমনিই বটে। অপরকে বিচার করিতে বসিয়া কোন মানুষকেই কখনো বলিতে শুনি নাই. সে অন্তর্যামী নয়, কিংবা তাহার ভ্রম-প্রমাদ কখনো হয়। সবাই কহে. মানুষ চিনিতে তাহার জোড়া নাই, এবং এ বিষয়ে সে একটি পাকা জহুরী। অথচ সংসারে কে কবে যে নিজের মনটাকেই চিনিতে পারিয়াছে, তাহাই ত জানি না। তবে আমার মত যে কেহ কখনও কঠিন ঘা খাইয়াছে, তাহাকে সাবধান হইতেই হয়। সংসারে অন্নদাদিদিও যখন থাকে, তখন বুদ্ধির অহঙ্কারে পরকে মন্দ ভাবিয়া বুদ্ধিমান হওয়ার চেয়ে. ভালো ভাবিয়া নির্বোধ হওয়াতেই যে মোটের উপর বুদ্ধির দামটা বেশিই পাওয়া যায়. সে কথা তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতেই হয়। তাই এই দুটি পরম বিজ্ঞ নরনারীর উপদেশ অভ্রান্ত. বলিয়া অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কিন্তু ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, অত্যন্ত forward, তা বটে। এই কথাটাই শুধু আমাকে থাকিয়া থাকিয়া খোঁচা দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে আবার ডাক পড়িল। এইবার এই স্ত্রীলোকটির পরিচয় পাইলাম। নাম শুনিলাম, অভয়া। উত্তররাঢ়ী কায়স্থ, বাড়ি বাদুচরের কাছে। যে ব্যক্তি পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, সে গ্রাম-সম্পর্কে ভাই হয়। নাম রোহিণী সিংহ।

ঔষধে রোহিণীবাবুর যথেষ্ট উপকার হইয়াছে. এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া অভয়া অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে আত্মীয় করিয়া লইল। অথচ স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমার মনের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কঠোর সমালোচনার ভাবই বরাবর জাগ্রত ছিল। তথাপি এই স্ত্রীলোকটির সমস্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যে কোথাও একটা অসঙ্গতি বা অশোভন প্রগল্‌ভতা ধরিতে পারিলাম না।

অভয়ার মানুষ বশ করিবার আশ্চর্য শক্তি! ইহারই মধ্যে শুধু যে সে আমার নাম-ধাম জানিয়া লইল, তাহা নয়, তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে যেমন করিয়া পারি খুঁজিয়া দিব,

তাহাও আমার মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইল। তাহার স্বামী আট বৎসর পূর্বে বর্মায় চাকরি করিতে আসিয়াছিল। বছর-দুই তাহার চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু এই ছয় বৎসর আর কোন উদ্দেশ নাই। দেশে আত্মীয়স্বজন আর কেহ নাই। মা ছিলেন, তিনিও মাসখানেক পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করায় অভিভাবকহীন হইয়া বাপের বাড়িতে থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ায়, রোহিণীদাদাকে রাজী করিয়া বর্মায় চলিয়াছে। একটুখানি চুপ করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এতটুকু চেষ্টা না করে কোনমতে দেশের বাড়িতে পড়ে থাকলেই কি আমার ভাল কাজ হ'ত? তা ছাড়া এ বয়সে দুর্নাম কিনতেই বা কতক্ষণ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন তিনি এতকাল আপনার কোন খোঁজ নেন না, কিছু জানেন?

না, কিছু জানিনে।

তার পূর্বে কোথায় ছিলেন, তা জানেন?

জানি। রেঙ্গুনেই ছিলেন, বর্মা রেলওয়েতে কাজ করতেন; কিন্তু কত চিঠি দিয়েচি, কখনো জবাব পাইনি। অথচ একটা চিঠিও কোনদিন আমার ফিরে আসেনি।

প্রতি পত্রই যে অভয়ার স্বামী পাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়। কিন্তু কেন যে জবাব দেয় নাই, তাহার সম্ভবতঃ হেতু এইমাত্র ডাক্তারবাবুর কাছেই শুনিয়াছিলাম। অনেক বাঙ্গালীই সেখানে গিয়া, কোন সুন্দরী ব্রহ্মরমণী লইয়া আবার নূতন করিয়া ঘর-সংসার পাতে। এমনও অনেকে আছে, যাহারা সারাজীবন আর কখনো দেশে ফিরিয়াও যায় না। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অভয়া প্রশ্ন করিল, তিনি বেঁচে নেই, তাই কি আপনার মনে হয়?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, বরং ঠিক তার উল্টো। তিনি যে বেঁচে আছেন এ কথা আমি শপথ করে বলতে পারি।

খপ্ করিয়া অভয়া আমার পায়ে হাত দিয়া হাতটা মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, আপনার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক শ্রীকান্তবাবু, আমি আর কিছুই চাইনে। তিনি বেঁচে থাকলেই হ'ল।

আমি পুনরায় মৌন হইয়া রহিলাম। অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি কি ভাবচেন, আমি জানি।

জানেন?

জানিনে? আপনি পুরুষমানুষ হয়ে ভাবতে পারলেন, আর আমার মেয়েমানুষের মনে সে ভয় হয়নি? তা হোক, আমি ভয় করিনে—আমি সতীন নিয়ে খুব ঘর করতে পারব।

তথাপি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু আমার মনের কথা অনুমান করিতে এই বুদ্ধিমতী নারীর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। কহিল, আপনি ভাবছেন, আমি ঘর করতে রাজী হ'লেই ত হ'ল না; আমার সতীন রাজী হবে কি না, এই ত?

বাস্তবিক, আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বলিলাম, বেশ তাই যদি হয় ত কি করবেন?

এইবার অভয়ার চোখ দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। আমার মুখের প্রতি সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, সে বিপদে আপনি একটু আমাকে সাহায্য করবেন শ্রীকান্তবাবু! আমার রোহিণীদাদা বড্ড সাদাসিধে ভাল মানুষ, তাঁর দ্বারা তখন ত কোন উপকারই হবে না।

সম্মত হইয়া বলিলাম, সাধ্য থাকলে নিশ্চয়ই করব; কিন্তু এ-সব বিষয়ে বাইরের লোক দিয়ে কাজ ত প্রায় হয়ই না, বরং অকাজই বেড়ে যায়।

সে-কথা সত্যি, বলিয়া অভয়া চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

পরদিন বেলা এগার-বারটার মধ্যে জাহাজ রেঙ্গুনে পৌঁছিবে; কিন্তু ভোর না হইতেই সমস্ত লোকের মুখেচোখে একটা ভয় ও চাঞ্চল্যের চিহ্ন দেখা দিল। চারিদিক হইতে একটা অস্ফুট শব্দ কানে আসিতে লাগিল, কেরেন্টিন্—কেরেন্টিন্। খবর লইয়া জানিলাম, কথাটা Quarantine. তখন প্লেগের ভয়ে বর্মা গভর্নমেন্ট অত্যন্ত সাবধান। শহর হইতে আট-দশ মাইল দূরে একটা চড়ায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়া খানিকটা স্থান ঘিরিয়া লইয়া অনেকগুলি কুঁড়ে ঘর তৈয়ারি করা হইয়াছে; ইহারই মধ্যে সমস্ত ডেকের যাত্রীদের নির্বিচারে নামাইয়া দেওয়া হয়। দশদিন বাস করার পর, তবে ইহারা শহরে প্রবেশ করিতে পায়। তবে যদি কাহারও কোন আত্মীয় শহরে থাকে, এবং সে Port Health Officer-এর নিকট হইতে কোন কৌশলে ছাড়পত্র যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য আলাদা কথা।

ডাক্তারবাবু আমাকে তাঁহার ঘরের মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, শ্রীকান্তবাবু, একখানা চিঠি যোগাড় না ক'রে আপনার আসা উচিত ছিল না; Quarantine-এ নিয়ে যেতে এরা মানুষকে এত কষ্ট দেয় যে কসাইখানার গরু-ছাগল-ভেড়াকেও এত কষ্ট সইতে হয় না। তবে ছোটলোকেরা কোন রকমে সইতে পারে, শুধু ভদ্রলোকদেরই মর্মান্তিক ব্যাপার। একে ত মুটে নেই, নিজের সমস্ত জিনিস নিজে কাঁধে করে একটা সরু সিঁড়ি দিয়ে নামাতে ওঠাতে হয়—ততদূরে বয়ে নিয়ে যেতে হয়; তার পরে সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে খুলে ছড়িয়ে স্টিমে ফুটিয়ে লণ্ডভণ্ড করে ফেলে—মশাই, এই রোদের মধ্যে কষ্টের আর অবধি থাকে না।

অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিলাম, এর কি কোন প্রতিকার নেই, ডাক্তারবাবু?

তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। তবে ডাক্তারসাহেব জাহাজে উঠলে একবার আপনার জন্য ব'লে দেখব, তাঁর কেরানীবাবুটি যদি আপনার ভার নিতে রাজী— কিন্তু কথাটা তাঁর ভাল করিয়া শেষ না হইতেই বাহিরে এমন একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহা স্মরণ হইলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাই। একটা গোলমাল শুনিয়া দুইজনেই ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখি, জাহাজের সেকেণ্ড অফিসার ৬-৭ জন খালাসীকে এলোপাতাড়ি লাথি মারিতেছে; এবং বুটের চোটে যে যেখানে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে। এই ইংরাজ যুবকটি অত্যন্ত উদ্ধত বলিয়া বোধ করি ডাক্তারবাবুর সহিত ইতিপূর্বে কোনদিন বচসা হইয়া থাকিবে, আজও কলহ হইয়া গেল। ডাক্তারবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তোমার এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত গর্হিত— একদিন তোমাকে এ জন্য দুঃখ পাইতে হইবে, তাহা বলিয়া দিতেছি।

লোকটা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কেন?

ডাক্তারবাবু বলিলেন, এভাবে লাথি মারা ভারি অন্যায়।

লোকটা জবাব দিল, মার ছাড়া ক্যাটল্ সিধা হয়?

ডাক্তারবাবু একটু স্বদেশী। তাই উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, এরা জানোয়ার নয়, গরীব মানুষ। আমাদের দেশী লোকেরা নম্র এবং শান্ত বলিয়াই কাপ্তেনসাহেবের কাছে তোমার নামে অভিযোগ করে না, এবং তুমিও অত্যাচার করিতে সাহস কর।

হঠাৎ সাহেবের মুখ অকৃত্রিম হাসিতে ভরিয়া গেল। ডাক্তারের হাতটা টানিয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, Look, Doctor, they are your countrymen; you ought to be proud of them!

চাহিয়া দেখি, কয়েকটা উঁচু পিপার আড়ালে দাঁড়াইয়া এই লোকগুলো দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে এবং গায়ের ধুলা ঝাড়িতেছে। সাহেব একগাল হাসিয়া, ডাক্তারবাবুর মুখের উপর দু'হাতের বুড়া আঙ্গুল দুটা নাড়িয়া দিয়া, আঁকিয়া-বাঁকিয়া শিস দিতে দিতে প্রস্থান করিল। জয়ের গর্ব তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর মুখখানা লজ্জায়, ক্ষোভে, অপমানে কালো হইয়া গেল। দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, বেহায়া ব্যাটারা, দাঁত বার ক'রে হাসচিস যে!

এইবার এতক্ষণে দেশী লোকের আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়া আসিল। সবাই একযোগে হাসি বন্ধ করিয়া চড়া কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি ডাক্তারবাবু, ব্যাটা বলবার কে? কারো কর্জ ক'রে খায়ে হাসতেচি মোরা?

আমি জোর করিয়া টানিয়া ডাক্তারবাবুকে তাঁর-ঘরে ফিরাইয়া আনিলাম। তিনি চৌকির উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া শুধু বলিলেন, উঃ—!

আর দ্বিতীয় কথা তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল না। হওয়াও অসম্ভব ছিল।

বেলা এগারটার সময় Quarantine-এর কাছাকাছি একটা ছোট স্টীমার আসিয়া জাহাজের গায়ে ভিড়িল। এইখানি করিয়াই নাকি সমস্ত ডেকের যাত্রীদের সেই ভয়ানক স্থানে লইয়া যাইবে। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদার ধুমধাম পড়িয়া গিয়াছে। আমার তাড়া ছিল না, কারণ ডাক্তারবাবুর লোক এইমাত্র জানাইয়া গেছে যে, আমাকে আর সেখানে যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্ত হইয়া যাত্রী ও খালাসীদের চেঁচামেচি দৌড়ঝাঁপ কতকটা অন্যমনস্কের মত নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, হঠাৎ পিছনে একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, অভয়া দাঁড়াইয়া। আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, আপনি এখানে যে?

অভয়া কহিল, কৈ, আপনি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন না?

বলিলাম, না—আমার এখনো একটু দেরি আছে। আমাকে ওখানে যেতে হবে না, একেবারে শহরে গিয়েই নামব।

অভয়া কহিল, না—না, শিগ্‌গির গুছিয়ে নিন।

বলিলাম, আমার এখনও ঢের সময় আছে।

অভয়া প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, সে হবে না। আমাকে ছেড়ে আপনি কিছুতে যেতে পারবেন না।

অবাক হইয়া বলিলাম, সে কি কথা! আমার ত ওখানে যাওয়া হতে পারে না।

অভয়া বলিল, তা হলে আমারও না। আমি বরং জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, তবু কিছুতেই এমন নিরাশ্রয় হয়ে ও-জায়গায় যাব না। ওখানকার সব কথা শুনেছি। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ-দুটি জলে টলটল করিয়া উঠিল। আমি হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলাম। এ কে যে এমন জোর করিয়া তাহার জীবনের সঙ্গে আমাকে ধীরে ধীরে জড়াইয়া তুলিতেছে!

সে আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিল, আমাকে একলা ফেলে চলে যাবেন—এত নিষ্ঠুর আপনি হতে পারেন, আমি ভাবতেও পারিনে। উঠুন, নীচে চলুন। আপনি না থাকলে ওই রোগা মানুষটিকে নিয়ে আমি একলা মেয়েমানুষ কি করব বলুন ত?

নিজের জিনিসপত্র লইয়া যখন ছোট স্টীমারে উঠিলাম, তখন ডাক্তারবাবু উপরের ডেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন। হঠাৎ আমাকে এ অবস্থায় দেখিয়া তিনি চীৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, না, না, আপনাকে যেতে হবে না। ফিরুন, ফিরুন—আপনার হুকুম হয়েচে—আপনি—

আমিও হাত নাড়িয়া চেঁচাইয়া কহিলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ, কিন্তু আর একটা হুকুমে আমাকে যেতেই হচ্চে।

সহসা বোধ করি তাঁহার দৃষ্টি অভয়া ও রোহিণীর উপর পড়িল। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, তবে মিছে কেন আমাকে কষ্ট দিলেন?

তার জন্যে ক্ষমা চাইচি।

না না, তার দরকার নেই, আমি জানতাম। Good bye, চললুম! বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিমুখে সরিয়া গেলেন।

পাঁচ

কেরেন্টিন্ কারাবাসের আইন কুলিদের জন্য—ভদ্রলোকের জন্য নয়; এবং যে-কেহ জাহাজের ভাড়া দশ টাকার বেশি দেয় নাই, সেই কুলি। চা বাগানের আইনে কি বলে জানি না, তবে জাহাজী আইন এই বটে এবং কর্তৃপক্ষরাও প্রত্যক্ষ জ্ঞানে কি জানেন, তা তাঁরাই জানেন, কিন্তু অফিসিয়েলি তাঁহাদের ইহার অধিক জানার রীতি নাই। অতএব সে-যাত্রায় আমরা সকলেই কুলি ছিলাম। সাহেবরা ইহাও জানেন যে, কুলির জীবনযাত্রার সাজসরঞ্জাম এমন-কিছু হইতে পারে না, অন্ততঃ হওয়া উচিত নয়, যাহা সে নিজে একস্থান হইতে স্থানান্তরে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে পারে না। সুতরাং ঘাট হইতে কেরেন্টিন্ যাত্রীদের জিনিসপত্র বহন করাইবার যে কোন ব্যবস্থাই নাই, ও..ত ক্ষুব্ধ হইবারও কিছু নাই! এ সকলই সত্য, তথাপি আমরা তিনটি প্রাণী যে মাথার উপর প্রচণ্ড সূর্য এবং পদতলে ততোধিক উগ্র উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে এক অপরিচিত নদীকূলে, এক রাশ মোটঘাট সুমুখে লইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে পরস্পরে মুখোমুখি চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, সে শুধু আমাদের দুরদৃষ্ট। সহযাত্রীদের পরিচয় ইতিপূর্বেই দিয়াছি। তাঁহারা যে-যাহার লোটা-কম্বল পিঠে ফেলিয়া, এবং অপেক্ষাকৃত ভারী বোঝাগুলি তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মীদের মাথার উপরে তুলিয়া দিয়া, স্বচ্ছন্দে গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রোহিণীদাদা একটা বিছানার পুঁটুলিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন। জ্বর, পেটের অসুখ এবং চরম শ্রান্তি—এইগুলি এক করিয়া তাঁহার অবস্থা এরূপ যে, চলা ত ঢের দূরের কথা, বসাও অসম্ভব—শুইয়া পড়িতে পারিলেই তিনি বাঁচেন! অভয়া স্ত্রীলোক। রহিলাম শুধু আমি

এবং নিজের ও পরের নানা আকারের ছোট-বড় বোঁচকা-বুঁচকিগুলি! অবস্থাটা আমার একবার ভাবিয়া দেখিবার মত বটে! অকারণে চলিয়াছি ত এক অজ্ঞাত অপ্রীতিকর স্থানে; এক স্কন্ধে ভর করিয়াছেন এক নিঃসম্পর্কীয়া নিরুপায় নারী, অপর স্কন্ধে ঝুলিতেছেন তেমনি অপরিচিত এক ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ। মোটঘাটগুলো ত সব ফাউ। এই সকলের মধ্যে ভীষণ রৌদ্রে আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া এক অজানা জায়গায় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছি। চিত্রটি কল্পনা করিয়া, পাঠক হিসাবে লোকের প্রচুর আমোদ বোধ হইতে পারে; হয়ত কোন সহৃদয় পাঠক এই নিঃস্বার্থ পরোপকার-বৃত্তির প্রশংসা করিতেও পারেন; কিন্তু বলিতে লজ্জা নাই, এই হতভাগ্যের তৎকালে সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া মন বলিতেছিল, এতবড় গাধা ত্রিসংসারে কি আর কেউ আছে! কিন্তু পরমাশ্চর্য এই যে, এ পরিচয় ত আমার গায়ে লেখা ছিল না; তবে এক-জাহাজ লোকের মধ্যে ভার বহিবার জন্য একদণ্ডেই অভয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল কি করিয়া? কিন্তু আমার চমক ভাঙ্গিল তাহার হাসিতে। সে মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিল। এই হাসির চেহারা দেখিয়া শুধু আমার চমক নয়, তাহার ভয়ানক কষ্টটাও এইবার চোখে পড়িয়া গেল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হইয়া গেলাম—এই পল্লীবাসিনী মেয়েটির কথায়। কোথায় লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় মাটির সহিত মিশিয়া গিয়া করুণা ভিক্ষা চাহিবে, না, হাসিয়া কহিল, খুব ঠকেচেন—মনে করবেন না যেন। অনায়াসে যেতে পেরেও যে যান নি, তার নাম দান। এতবড় দান করবার সুযোগ জীবনে হয়ত খুব কমই পাবেন, তা ব'লে রাখচি। কিন্তু সে কথা থাক। জিনিস-পত্তর এইখানেই প'ড়ে থাক, চলুন, এ'কে যদি কোথাও ছায়ায় একটু শোয়াতে পারা যায়।

বোঁচকা-বুঁচকির মমতা আপাততঃ ত্যাগ করিয়াই আমি রোহিণীদাদাকে পিঠে করিয়া কেরেন্টিনের উদ্দেশে রওনা হইলাম। অভয়া ছোট একটি হাতবাক্স মাত্র হাতে লইয়া আমার অনুসরণ করিল, অন্যান্য জিনিসপত্র সেইখানেই পড়িয়া রহিল। অবশ্য সে-সকল আমাদের খোয়া যায় নাই, ঘণ্টা-দুই পরে তাহাদের আনাইয়া লইবার উপায় হইয়াছিল।

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সত্যকার বিপদ কাল্পনিক বিপদের চেয়ে ঢের সুসহ। প্রথম হইতেই ইহা স্মরণ থাকিলে অনেক দুশ্চিন্তার হাত এড়ানো যায়। সুতরাং কিছু কিছু ক্লেশ ও অসুবিধা যদিও নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, কেরেন্টিনের নির্দিষ্ট মিয়াদের দিনগুলি আমাদের একপ্রকার ভালই কাটিল। তা ছাড়া পয়সা খরচ করিতে পারিলে যমের বাটীতেও যখন বড়কুটুম্বের আদর পাওয়া যায়, তখন এ ত মোটে কেরেন্টিন। জাহাজের ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকটি বেশ forward; কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই স্ত্রীলোকটি যে কিরূপ বেশ forward হইতে পারে তাহা বোধ করি, তিনি কল্পনাও করেন নাই। রোহিণীবাবুকে যখন পিঠ হইতে নামাইয়া দিলাম, তখন অভয়া কহিল, হয়েচে, আর আপনাকে কিছু করতে হবে না শ্রীকান্তবাবু, এবার আপনি বিশ্রাম করুন, যা করবার আমি করচি।

বিশ্রামের আমার যথার্থই আবশ্যক হইয়াছিল—পা-দুটি শ্রান্তিতে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তথাপি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, আপনি কি করবেন?

অভয়া জবাব দিল, কাজ কি কম রয়েচে? জিনিসগুলি আনতে হবে, একটা ভাল ঘর যোগাড় করে আপনাদের দুজনের বিছানা তৈরি করে দিতে হবে, রান্না করে যা হোক দুটো দুজনকে খাইয়ে দিয়ে তবে ত আমার ছুটি হবে, তবে ত একটু বসতে পাবো। না না, মাথা খান, উঠবেন না; আমি এক্ষুনি সমস্ত ঠিকঠাক করে দিচ্চি। একটু হাসিয়া কহিল, ভাবচেন, মেয়েমানুষ হয়ে একা এসব যোগাড় করব কি ক'রে, না? তা বৈ কি! আপনাদের যোগাড় করেছিল কে! সে আমি না আর কেউ?' বলিয়া সে ছোট বাক্সটি খুলিয়া গুটিকয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া কেরেন্টিনের অফিস-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সে পারুক আর না পারুক, আমি ত আপাততঃ বসিতে পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। আধঘণ্টার মধ্যেই একজন চাপরাসী আমাদের ডাকিতে আসিল। রোহিণীকে লইয়া তাহার সঙ্গে গিয়া দেখিলাম, ঘরটি ভালই বটে। মেমসাহেব-ডাক্তার নিজে দাঁড়াইয়া লোক দিয়া সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাইতেছেন, জিনিসপত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছে, দুখানি খাটিয়ার উপর

দুজনের বিছানা পর্যন্ত তৈরি হইয়া গিয়াছে। একধারে নূতন হাঁড়ি, চাল, ডাল, আলু, ঘি, ময়দা, কাঠ সমস্তই মজুত। মাদ্রাজী ডাক্তারের সঙ্গে অভয়া ভাঙ্গা হিন্দিতে কথাবার্তা চালাইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই কহিল, ততক্ষণ একটু শুয়ে পড়ুন গে, আমি মাথায় দু' ঘটি জল ঢেলে নিয়ে এবেলার মত চারটি চালে-ডালে খিচুড়ি রেঁধে নিই। ওবেলা তখন দেখা যাবে। বলিয়া গামছা এবং কাপড় লইয়া মেমসাহেবকে সেলাম করিয়া একজন খালাসীকে সঙ্গে করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। অতএব ইহারই অভিভাবকতায় এখানের দিনগুলি যে আমাদের ভালই কাটিয়াছিল, তাহা বলায় নিশ্চয় বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় নাই।

এই অভয়াতে আমি দুটো জিনিস শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এরূপ অবস্থায় নিঃসম্পর্কীয় নর-নারীর ঘনিষ্ঠতা স্বতঃই দ্রুত অগ্রসর হইয়া যায়; কিন্তু ইহা সে কোনদিন ঘটিবার সুযোগ দেয় নাই। ইহার ব্যবহারের মধ্যে কি যে একটা ছিল, তাহা প্রতিক্ষণেই স্মরণ করাইয়া দিত, আমরা এক-জায়গার যাত্রী মাত্র। কাহারও সহিত কাহারও সত্যকার সম্বন্ধ নাই—দুদিন পরে হয়ত সারা জীবনের মধ্যেও আর কখন কাহারও সহিত সাক্ষাৎ ঘটিবে না। আর এমন আনন্দের পরিশ্রমও কখনও দেখি নাই। সারাদিন আমাদের সেবার জন্যেই ব্যস্ত, সমস্ত কাজ নিজেই করিতে চায়। সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলেই হাসিয়া বলিত, এ ত সমস্তই আমার নিজের কাজ। নইলে রোহিণীদাদারই বা এ কষ্টের কি আবশ্যক ছিল, আপনারই বা কি মাথা-ব্যথা পড়েছিল এই জেলখানায় আসতে। আমার জন্যেই ত আপনাদের এত দুঃখ।

হয়ত খাওয়া-দাওয়ার পরে একটু গল্প হইতেছে, অফিসের ঘণ্টায় দুটো বাজিতেই একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই, আপনাদের চা তৈরি ক'রে আনি—দুটো বাজল।

মনে মনে বলিতাম, তোমার স্বামী যত পাপিষ্ঠই হোন, পুরুষমানুষ ত! যদি কখনো তাঁকে পাও, তোমার মূল্য তিনি বুঝবেনই।

তার পরে একদিন মিয়াদ ফুরাইল। দাদাও ভাল হইলেন, আমরাও সরকারি ছাড়পত্র পাইয়া আর একবার পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া রেঙ্গুন যাত্রা করিলাম। কথা ছিল, শহরে মোসাফিরখানায় দুই-একদিনের জন্য আশ্রয় লইয়া একটা বাসা তাঁহাদের ঠিক করিয়া দিয়া তবে আমি নিজের জায়গায় যাইব, এবং যেখানেই থাকি, তাঁহার স্বামীর ঠিকানা জানিয়া তাঁহাকে একটা সংবাদ পাঠাইবার প্রাণপণ চেষ্টা করিব।

শহরে যেদিন পদার্পণ করিলাম, সে দিনটি ব্রহ্মবাসীদের কি একটা পর্বদিন। আর পর্বও তাহাদের লাগিয়াই আছে। দলে দলে ব্রহ্ম নর-নারী রেশমের পোশাক পরিয়া তাহাদের মন্দিরে চলিয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশ, সুতরাং আনন্দ-উৎসবে তাহাদের সংখ্যাই অধিক। বৃদ্ধা, যুবতী, বালিকা—সকল বয়সের স্ত্রীলোকই অপূর্ব পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, হাসিয়া গল্প করিয়া, গান গাইয়া সমস্ত পথটা মুখরিত করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের রং অধিকাংশই খুব ফরসা; মেঘের মত চুলের বোঝা ত শতকরা নব্বুই জন রমণীর হাঁটুর নীচে পড়ে। খোপায় ফুল, কানে ফুল, গলায় ফুলের মালা—ঘোমটার বালাই নাই, পুরুষ দেখিয়া ছুটিয়া পলাইবার আগ্রহাতিশয্যে হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া পড়া নাই—দ্বিধা-সঙ্কোচলেশ-হীন—যেন ঝরনার মুক্ত প্রবাহের মতই স্বচ্ছন্দে, অবাধে বহিয়া চলিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। নিজেদের দেশের তুলনায় মনে মনে তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, এই ত চাই! এই নইলে আবার জীবন! তাহাদের সৌভাগ্যটা সহসা যেন ঈর্ষার মত বুকে বাজিল। কহিলাম, এই যে ইহারা চতুর্দিকে আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, সে কি অবহেলার জিনিস? রমণীদের এতখানি স্বাধীনতা দিয়া এ দেশের পুরুষেরা কি এমন ঠকিয়াছে, আর আমরাই বা তাহাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিয়া জীবনটা পঙ্গু করিয়া দিয়া কি এমন জিতিয়াছি! আমাদের মেয়েরাও যদি এমনি একদিন—হঠাৎ একটা গোলমাল শুনিয়া পিছনে ফিরিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আজও আমার তেমনি স্পষ্ট মনে আছে। বচসা বাধিয়াছে ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া লইয়া। গাড়োয়ান আমাদের হিন্দুস্থানী মুসলমান। সে কহিতেছে, চুক্তি হইয়াছিল আট আনা, আর তিনজন ভদ্রঘরের ব্রহ্মরমণী গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—না, পাঁচ আনা; মিনিট দুই-তিন তর্কা-

তার্কের পরেই, বলং বলং বাহুবলং। পথের ধারে একটা লোক মোটা মোটা ইক্ষুদণ্ড গাদি করিয়া বিক্রি করিতেছিল, অকস্মাৎ তিনজনেই ছুটিয়া গিয়া তিনগাছা হাতে তুলিয়া হতভাগা গাড়োয়ানকে একযোগে আক্রমণ করিলেন। সে কি এলোপাথাড়ি মার! বেচারা স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিতেও পারে না—শুধু আত্মরক্ষা করিতে একে আটকায় ত ওর বাড়ি মাথায় পড়ে, ওকে আটকায় ত তার বাড়ি মাথায় পড়ে। চারিদিকে লোক জমিয়া গেল—কিন্তু সে শুধু তামাশা দেখিতে। সে দুর্ভাগার কোথায় গেল টুপি-পাগড়ি, কোথায় গেল হাতের ছিপটি—আর সহ্য করিতে না পারিয়া সে রণে ভঙ্গ দিয়া পুলিশ! পুলিশ! পিয়াদা! পিয়াদা! চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল!

সবে বাঙ্গলা দেশ হইতে আসিতেছি, তাও আবার পাড়াগাঁ হইতে। কলিকাতায় স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে—কানে শুনিয়াছি, চোখে দেখি নাই। কিন্তু স্বাধীনতা পাইলে ভদ্রঘরের অবলারাও যে একটা জোয়ান-মদ্দ পুরুষমানুষকে প্রকাশ্য রাজপথের উপর আক্রমণ করিয়া লাঠি-পেটা করিতে পারে—ক্রমশঃ এতখানি সবলা হইয়া উঠার সম্ভাবনা আমার কল্পনার অতীত ছিল। অনেকক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া স্বকার্যে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে কহিতে লাগিলাম, স্ত্রী-স্বাধীনতা ভাল কিংবা মন্দ, সমাজে আনন্দের মাত্রা ইহাতে বাড়ে কিংবা কমে—এ বিচার আর একদিন করিব—কিন্তু আজ স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম, তাহাতে ত সমস্ত চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল।

ছয়

অভয়া ও রোহিণীদাদাকে তাহাদের নূতন বাসায় নূতন ঘরকন্নার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যেদিন সকালে নিজের জন্য আশ্রয় খুঁজিতে রেঙ্গুনের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম, সেদিন ওই দুটি লোকের সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে যে একেবারেই কোন গ্লানি স্পর্শ করে নাই, এমন কথা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু এই অপবিত্র চিন্তাটাকে বিদায় করিতেও আমার বেশি সময় লাগে নাই। কারণ কোন দুটি বিশেষ বয়সের নর-নারীকে কোন একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে দেখিতে পাওয়ামাত্রই একটা বিশেষ সম্বন্ধ কল্পনা করা যে কত বড় ভ্রান্তি—এ শিক্ষা আমার হইয়া গিয়াছিল; এবং ভবিষ্যতের জটিল সমস্যাও ভবিষ্যতের হাতে ছাড়িয়া দিতে আমার বাধে না। সুতরাং সুদ্ধমাত্র নিজের ভারটাই নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেদিন প্রভাতকালে তাহাদের নূতন বাসা হইতে বাহির হইয়াছিলাম। এখনকার মত তখনকার দিনে নূতন বাঙ্গালী বর্মা মুলুকে পদার্পণ করামাত্রই পুলিশের প্রকাশ্য এবং গুপ্ত কর্মচারীর দল তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বিদ্রূপ করিয়া লাঞ্ছিত করিয়া, বিনা অপরাধে থানায় টানিয়া লইয়া গিয়া ভয় দেখাইয়া যন্ত্রণার একশেষ করিত না। মনের মধ্যে পাপ না থাকিলে তখনকার দিনে পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেকেরই নির্ভয়ে বিচরণ করিবার অধিকার ছিল; এবং এখনকার মত নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করিবার নিরতিশয় অপমানকর গুরুভারও তখন নবাগত বঙ্গবাসীর ঘাড়ের উপর চাপানো হয় নাই। অতএব স্বচ্ছন্দচিত্তে কোন একটা আশ্রয়ের অনুসন্ধানে সমস্ত সকালটাই সেদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম, তাহা বেশ মনে পড়ে। একজন বাঙ্গালীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে মুটের মাথায় এক ঝাঁকা তরি-তরকারি চাপাইয়া ঘাম মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে চলিয়াছিল—জিজ্ঞাসা করিলাম, মশাই, নন্দ মিস্ত্রীর বাসাটা কোথায়, ব'লে দিতে পারেন?

লোকটা থামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কোন্ নন্দ? রিবিট ঘরের নন্দ পাগড়িকে খুঁজছেন?

বলিলাম, সে ত জানিনে মশাই—কোন্ ঘরের তিনি! শুধু পরিচয় দিয়েছিলেন, রেঙ্গুনের বিখ্যাত নন্দ মিস্ত্রী ব'লে।

লোকটা অসম্মানসূচক একপ্রকার মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, ওঃ—মিস্তিরী। অমন সবাই নিজেকে মিস্তিরী কবলায় মশায়! মিস্তিরী হওয়া সহজ নয়! মর্কট সাহেব যখন আমাকে বলেছিল, হরিপদ, তুমি ছাড়া মিস্তিরী হবার লোক ত দেখতে পাইনে! তখন বড়সাহেবের কাছে কত উড়ো চিঠি পড়েছিল জানেন? একশখানি। আরে, কাস্তের জোর থাকলে কি উড়ো চিঠির কর্ম্ম? কেটে যে জোড়া দিতে পারি। তবে কি জানেন মশাই—

দেখিলাম, অজ্ঞাতে লোকটার এমন জায়গায় আঘাত করিয়া ফেলিয়াছি যে, মীমাংসা হওয়া কঠিন। তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলাম, তা হলে নন্দ ব'লে কোন লোককে আপনি জানেন না।

শোন কথা! চল্লিশ বছর রেঙ্গুনে বাস, আমি জানিনে আবার কাকে? নন্দ কি একটা? তিনটে নন্দ আছে যে! নন্দ মিস্তিরী বললেন? আসচেন কোত্থেকে? বাংলা থেকে বুঝি? ওঃ—তাই বলুন—টগরের মানুষকে খুঁজচেন?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, হাঁ—হাঁ, তিনিই বটে!

লোকটা কহিল, তাই বলুন। পরিচয় না পেলে চিনব কি করে? আসুন আমার সঙ্গে! বরাতে করে খাচ্চে মশাই, নইলে নন্দ পাগড়ি নাকি আবার একটা মিস্তিরী। মশাই আপনারা?

ব্রাহ্মণ শুনিয়া লোকটা পথের উপরেই প্রণাম করিল; কহিল, সে দেবে আপনার চাকরি ক'রে? তা সাহেবকে ব'লে দিতেও পারে একটা যোগাড় ক'রে, কিন্তু দুটি মাসের মাইনে আগাম ঘুষ দিতে হবে। পারবেন? তা হলে আঠারো আনা পাঁচসিকে রোজ ধরতেও পারে। এর বেশি নয়!

জানাইলাম যে, আপাততঃ চাকরির উমেদারিতে যাইতেছি না, একটু আশ্রয় যোগাড় করিয়া দিবে, এই আশা আমাকে নন্দ মিস্ত্রী জাহাজের উপরেই দিয়াছিল।

শুনিয়া হরিপদ মিস্ত্রী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মশাই ভদ্রলোক, কেন ভদ্র-লোকদের মেসে যান না?

কহিলাম, মেস কোথায়, সে ত চিনি না!

সেও চিনে না—তাহা সেও স্বীকার করিল। কিন্তু ও বেলা সন্ধান করিয়া জানাইবে আশা দিয়া বলিল, কিন্তু এত বেলায় নন্দের সঙ্গে দেখা হবে না—সে কাজে গেছে—টগর খিল দিয়ে ঘুমুচ্চে! ডাকাডাকি করে তার ঘুম ভাঙ্গালে আর রক্ষে থাকবে না মশাই।

সেটা খুব জানি। সুতরাং পথের মধ্যে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া সে সাহস দিয়া কহিল, নাই গেলেন সেখানে! অমন তোফা দাঠাকুরের হোটেল রয়েচে—চান করে সেবা করে ঘুম দিয়ে বেলা পড়লে তখন দেখা যাবে। চলুন।

হরিপদর সহিত গল্প করিতে করিতে দাঠাকুরের হোটেলে আসিয়া যখন উপস্থিত হইলাম, তখন হোটেলের ডাইনিঙ রুমে জন-পনর লোক খাইতে বসিয়াছে।

ইংরাজীতে দুটা কথা আছে instinct এবং prejudice; কিন্তু আমাদের কাছে শুধু সংস্কার। একটা যে আর একটা নয়, তাহা বুঝা কঠিন নয়; কিন্তু আমাদের এই জাতিভেদ, খাওয়া-ছোঁওয়া বস্তুটা যে instinct হিসাবে সংস্কার নয়, তাহা দাঠাকুরের এই হোটেলের সংস্রবে আজ প্রথম টের পাইলাম; এবং সংস্কার হইলেও যে ইহা কত তুচ্ছ সংস্কার, ইহার বাঁধন হইতে মুক্ত হওয়া যে কত সহজ, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আমাদের দেশে এই যে অসংখ্য জাতিভেদের শৃঙ্খল—তাহা দু'পায়ে পরিয়া ঝমঝম করিয়া বিচরণ করার মধ্যে গৌরব এবং মঙ্গল কতখানি বিদ্যমান, সে আলোচনা এখন থাক; কিন্তু এ কথা আমি অসংশয়ে বলিতে পারি যে, যাঁহারা নিজেদের গ্রামটুকুর মধ্যে অত্যন্ত নিরাপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে পুরুষানুক্রমে-প্রাপ্ত সংস্কার বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এবং ইহার শাসন-পাশ ছিন্ন করার দুরূহতা সম্বন্ধে যাঁহাদের লেশমাত্র অবিশ্বাস নাই, তাঁহারা একটা ভুল জিনিস জানিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ যে-কোন দেশে খাওয়া-ছোঁয়ার বাছ-বিচার প্রচলিত নাই, তেমন দেশে পা দেওয়া মাত্রই বেশ দেখিতে পাওয়া যায় এই ছাপ্পান্ন পুরুষের খাওয়া-ছোঁয়ার শেকল কি করিয়া না জানি রাতারাতিই খসিয়া গেছে। বিলাত গেলে জাতি যায়; একটা মুখ্য কারণ, নিষিদ্ধ মাংস আহার করিতে হয়। যে নিজের দেশেও কোন কালে মাংস খায় না, তাহারও যায়। কারণ জাতি মারিবার মালিকেরা বলেন, সে ও একই কথা —না খেলেও, সে ওই খাওয়াই ধরে নিতে হবে। নেহাৎ মিথ্যা বলেন না। বর্মা ত তিন-চার দিনের পথ; অথচ দেখি, পনর আনা বাঙ্গালী ভদ্রলোকই—বোধ করি ব্রাহ্মণই বেশি হইবেন, কারণ এ যুগে তাঁহাদের লোভটাই সকলকে হার মানাইয়াছে—জাহাজের হোটেলে সস্তায় পেট ভরিয়া আহার করিয়া ডাঙ্গায় পদার্পণ করেন। সেখানে মুসলমান ও গোয়ানিজ পাচক ঠাকুরেরা কি রাঁধিয়া সার্ভ করিতেন, প্রশ্ন করা রূঢ় হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যে হবিষ্যান্ন

পাক করিয়া কলাপাতায় তাহাদিগকে পরিবেশন করে নাই, তাহা ভাটপাড়ার ভট্চার্যিদের পক্ষেও অনুমান করা বোধ করি কঠিন নয়। আমি ত সহযাত্রী! যাঁহারা নিতান্তই এই সকল খাইতে চাহেন না, তাঁহারা অন্ততঃ চা রুটি, ফলটা পাকড়টাও ছাড়েন না। অথচ সেই একদম নিষিদ্ধ মাংস হইতে বর্তমানে রম্ভা পর্যন্ত সমস্তই একত্রে গাদাগাদি করিয়া জাহাজের কোল্ড-রুমে রাখা হইয়া থাকে, এবং তাহা কাহারও অগোচর রাখার পদ্ধতিও জাহাজের নিয়ম-কানুনের মধ্যে দেখি নাই। তবে আরাম এইটুকু যে, বর্মা-প্রবাসীর জাতি যাইবার আইনটা বোধ করি কোন গতিকে শাস্ত্রকারের কোডিসিলটা এড়াইয়া গেছে। না হইলে হয়ত আবার একটা ছোটখাটো ব্রাহ্মণ-সভার আবশ্যক হইত। যাক, ভদ্রলোকের কথা আজ এই পর্যন্তই থাক। হোটেলে যাহারা সারি সারি পঙ্‌ক্তিভোজনে বসিয়া গেছে, তাহারা ভদ্রলোক নয়। অন্ততঃ আমরা বলি না। সকলেই কারিকর, ওয়ার্কশপে কাজ করে। সাড়ে-দশটায় ছুটিতে ভাত খাইতে আসিয়াছে। শহরের প্রান্তে মস্ত একটি মাঠের তিনদিকে নানা রকমের এবং নানা আকারের কারখানা, এবং একধারে এই পল্লীর মধ্যে দাঠাকুরের হোটেল। এ এক বিচিত্র পল্লী। লাইন করিয়া গায়ে গায়ে মিশাইয়া জীর্ণ কাঠের ছোট ছোট কুটীর। ইহাতে চীনা আছে, বর্মা আছে, মাদ্রাজী, উড়িয়া, তৈলঙ্গী আছে, চট্টগ্রামী মুসলমান ও হিন্দু আছে, আর আছে আমাদের স্বজাতি বাঙ্গালী। ইহাদেরই কাছে আমি প্রথম শিখিয়াছি যে, ছোটজাতি বলিয়া ঘৃণা করিয়া দূরে রাখার বদ্ অভ্যাসটা পরিত্যাগ করা মোটেই শক্ত কাজ নয়। যাহারা করে না, তাহারা যে পারে না বলিয়া করে না, তাহা নয়; যে জন্য করে না, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলে বিবাদ বাধিবে।

দাঠাকুর আসিয়া আমাকে সযত্নে গ্রহণ করিলেন, একটি ছোট ঘর দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, আপনি যতদিন ইচ্ছা এই ঘরে থেকে আমার কাছে আহার করুন, চাকরি-বাকরি হ'লে পরে দাম চুকিয়ে দেবেন।

কহিলাম, আমাকে ত তুমি চেন না, একমাস থেকে এবং খেয়ে দাম না দিয়েও ত চলে যেতে পারি?

দাঠাকুর নিজের কপালটা দেখাইয়া হাসিয়া কহিল, এটা ত সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না মশাই?

বলিলাম, না, ওতে আমার লোভ নেই।

দাঠাকুর মাথা নাড়িতে নাড়িতে এবার পরম গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন, তবেই দেখুন! বরাত মশাই, বরাত! এ ছাড়া আর পথ নেই, এই আমি সকলকে বলি।

বস্তুতঃ, এ শুধু তাঁর মুখের কথা নয়। এ সত্য তিনি যে নিজে কিরূপ অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহা হাতে-নাতে সপ্রমাণ করিবার জন্য মাস চার-পাঁচ পরে একদিন প্রাতঃকালে অনেকের গচ্ছিত টাকাকড়ি, আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শুধু তাহাদের নিরেট কপালগুলি শূন্য হোটেলের মেঝের উপর সজোরে ঠুকিবার জন্য বর্মায় ফেলিয়া রাখিয়া দেশে চলিয়া গেলেন। যাই হোক, দাঠাকুরের কথাটা শুনিতে মন্দ লাগিল না, এবং আমিও একজন তাঁর নূতন মক্কেল হইয়া একটা ভাঙ্গা ঘর দখল করিয়া বসিলাম। রাত্রে একজন কাঁচা বয়সের বাঙ্গালী ঝি আমার ঘরের মধ্যে আসন পাতিয়া আমার খাবার জায়গা করিয়া দিতে আসিল। অদূরে ডাইনিং রুমে বহু লোকের আহারের কলরব শুনা যাইতেছিল। প্রশ্ন করিলাম, আমাকেও সেখানে না দিয়ে এখানে দিচ্ছ কেন?

সে কহিল, তারা যে নোয়াকাটা, বাবু, তাদের সঙ্গে কি আপনাকে দিতে পারি?

অর্থাৎ তাহারা ওয়ার্কমেন, আমি ভদ্রলোক। হাসিয়া বলিলাম, আমাকেও যে কি কাটতে হবে, সে ত এখনও ঠিক হয়নি। যাই হোক, আজ দিচ্ছ দাও, কিন্তু কাল থেকে আমাকেও ঐ ঘরেই দিয়ো।

ঝি কহিল, আপনি বামুনমানুষ, আপনার সেখানে খেয়ে কাজ নেই।

কেন?

ঝি গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল, সবাই বাঙ্গালী বটে, কিন্তু একজন ডোম [illegible]।

ডোম! দেশে এই জাতিটা অস্পৃশ্য। ছুঁইয়া ফেলিলে স্নান করা compulsory কি [illegible],

জানি না; কিন্তু কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিতে হয়, তাহা জানি। অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আর সবাই?

ঝি কহিল, আর সবাই ভাল জাত; কায়েত আছে, কৈবর্ত আছে, সদ্‌গোপ আছে, গয়লা আছে, কামার—

এরা কেউ আপত্তি করে না?

ঝি আবার একটু হাসিয়া বলিল, এই বিদেশে সাতসমুদ্দুর-পারে এসে কি অত বামুনাই করা চলে বাবু? তারা বলে, দেশে ফিরে গঙ্গাস্নান ক'রে একটা অঙ্গ-প্রাচিত্তির করলেই হবে।

হয়ত হয়; কিন্তু আমি জানি, যে দুই-চারিজন মাঝে মাঝে দেশে আসে, তাহারা চলতি-মুখে কলিকাতার গঙ্গায় একবার গঙ্গাস্নানটা হয়ত করিয়া লয়, কিন্তু অঙ্গ-প্রাচিত্তির কোনকালেই করে না। বিদেশের আবহাওয়ার গুণে ইহা তাহারা বিশ্বাসই করে না।

দেখিলাম, হোটেলে মাত্র দুটি হুঁকা আছে; একটি ব্রাহ্মণের, অপরটি যাহারা ব্রাহ্মণ নয় তাহাদের। আহারাদির পর কৈবর্তের হাত হইতে ডোম এবং ডোমের হাত হইতে কর্মকার-মশাই স্বচ্ছন্দে হাত বাড়াইয়া হুঁকা লইয়া তামাক ইচ্ছা করিলেন। দ্বিধার লেশমাত্র নাই। দিন-দুই পরে এই কর্মকারটির সহিত আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, এতে তোমাদের জাত যায় না?

কর্মকার কহিল, যায় না আর মশাই, যায় বৈ কি।

তবে?

ও কি আর প্রথমে ডোম ব'লে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, বলেছিল, কৈবর্ত। তার পর সব জানাজানি হয়ে গেল।

তখন তোমরা কিছু বললে না?

কি আর বলব মশাই, কাজটা ত খুবই অন্যায় করেচে, সে বলতেই হবে। তবে লজ্জা পাবে, এই জন্য সবাই জেনেও চেপে গেল।

কিন্তু দেশে হ'লে কি হ'ত?

লোকটা যেন শিহরিয়া উঠিল। কহিল, তা হলে কি আর কারও রক্ষে ছিল? তারপর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিতে লাগিল, তবে কি জানেন বাবু, বামুনের কথা ধরিনে, তাঁরা হলেন বর্ণের গুরু, তাঁদের কথা আলাদা। নইলে আর সবাই সমান; নবশাখই বলুন আর হাড়ি-ডোমই বলুন কিছুই কারো গায়ে লেখা থাকে না; সবাই ভগবানের সৃষ্টি, সবাই এক, সবাই পেটের জ্বালায় বিদেশে এসে লোহা পিটচে। আর যদি ধরেন বাবু, হরি মোড়ল ডোম হলে কি হয়, মদ খায় না, গাঁজা খায় না—আচার-ব্যবহারে কার সাধ্যি বলে ও ভাল জাত নয়, ডোমের ছেলে; আর ঐ লক্ষ্মণ, ও ত ভাল কায়েতের ছেলে, ওর দেখুন দিকি একবার ব্যবহারটা? ব্যাটা দু-দুবার জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। আমরা সবাই না থাকলে এত দিন ওকে জেলে মেথরের ভাত খেতে হ'ত যে!

লক্ষ্মণের সম্বন্ধেও আমার কৌতূহল ছিল না, কিংবা হরি মোড়ল তাহার ডোমত্ব গোপন করিয়া কত বড় অন্যায় করিয়াছে, সে মীমাংসা করিবারও প্রবৃত্তি হইল না; আমি শুধু ভাবিতে লাগিলাম, যে-দেশে ভদ্রলোকেরা পর্যন্ত চর লাগাইয়া তাহাদের আজন্ম প্রতিবেশীর ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া, তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড করিয়া দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে, সেই দেশের অশিক্ষিত ছোটলোক হইয়াও ইহারা একজন অপরিচিত বাঙ্গালীর এতবড় মারাত্মক অপরাধও মাপ করিয়াছে; এবং শুদ্ধ তাই নয়, পাছে এই প্রবাসে তাহাকে লজ্জিত ও হীন হইয়া থাকিতে হয়, এই আশঙ্কায় সেকথা উত্থাপন পর্যন্ত করে নাই, এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব হইল! বিদেশী বুঝিবে না বটে, কিন্তু আমরা ত বুঝিতে পারি, হৃদয়ের কতখানি প্রশস্ততা, মনের কত বড় ঔদার্য ইহার জন্য আবশ্যক। এ যে শুধু তাহাদের দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আসার ফল তাহাতে আর সংশয়মাত্র নাই। মনে হইল, এই শিক্ষাই এখন আমাদের দেশের জন্য সকলের চেয়ে বেশি প্রয়োজন। ঐ যে নিজের পল্লীটুকুর মধ্যে সারাজীবন বসিয়া কাটানো, মানুষকে সর্ববিষয়ে ছোট করিয়া দিতে এত বড় শত্রু বোধ করি কোন একটা জাতির আর নাই। যাক্‌। বহুদিন পর্যন্ত আমি ইহাদের মধ্যে বাস করিয়াছি। কিন্তু আমার যে অক্ষর-পরিচয় আছে এ সংবাদ যতদিন না তাহারা জানিবার সুযোগ পাইয়াছে, শুধু ততদিনই আমি ইহাদের সহিত

ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাদের সকল সুখ-দুঃখের অংশ পাইয়াছি। কিন্তু যে মুহূর্তে জানিয়াছে, আমি ভদ্রলোক, আমি ইংরাজি জানি, সেই মুহূর্তেই তাহারা আমাকে পর করিয়া দিয়াছে। ইংরাজি-জানা শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে ইহারা আপদ-বিপদের দিনে আসেও বটে, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে, তাহাও সত্য; কিন্তু বিশ্বাসও করে না, আপনার লোক বলিয়াও ভাবে না। আমি যে তাহাদিগকে ছোট বলিয়া মনে মনে ঘৃণা করি না, আড়ালে উপহাস করি না, দেশের এই কুসংস্কারটা তাহারা আজও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। শুধু এইজন্যই আমার কত সংসঙ্কল্পই যে ইহাদের মধ্যে বিফল হইয়া গিয়াছে, বোধ করি, তাহার অবধি নাই। কিন্তু সে কথাও আজ থাক। দেখিলাম বাঙ্গালী মেয়েদের সংখ্যাও এ অঞ্চলে বড় কম নাই। তাহাদের কুলের পরিচয় প্রকাশ না করাই ভাল, কিন্তু আজ তাহারা আর একভাবে পরিবর্তিত হইয়া একেবারে খাঁটি গৃহস্থ-পরিবার হইয়া গেছে। পুরুষদের মনে মনে হয়ত আজও একটা সাবেক জাতের স্মৃতি বজায় আছে, কিন্তু মেয়েরা দেশেও আসে না, দেশের সহিত আর কোন সংস্রবও রাখে না। তাহাদের ছেলেমেয়েদের প্রশ্ন করিলে বলে, আমরা বাঙ্গালী, অর্থাৎ মুসলমান, খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী নই, বাঙ্গালী হিন্দু। আপোষের মধ্যে বিবাহাদি আদান-প্রদান স্বচ্ছন্দে চলে, শুধু বাঙ্গালী হলেই যথেষ্ট এবং চট্টগ্রামী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্ত্র পড়াইয়া দুই হাত এক করিয়া দিলেই ব্যস্। বিধবা হইলে বিধবা-বিবাহের রেওয়াজ নাই, বোধ করি, পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে রাজী হন না বলিয়াই; কিন্তু বৈধব্যও ইহারা ভালবাসে না; আবার একটা ঘর-সংসার পাতাইয়া লয়—আবার ছেলে-মেয়ে হয়; তাহারাও বলে, আমরা বাঙ্গালী। আবার তাহাদের বিবাহের সেই পুরোহিত আসিয়াই বৈদিক মন্ত্র পড়াইয়া বিবাহ দিয়া যান—এবার কিন্তু আর একতিল আপত্তি করেন না। স্বামী অত্যধিক দুঃখ-যন্ত্রণা দিলে ইহারা অন্য আশ্রয় গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত লজ্জার কথা বলিয়া দুঃখ-যন্ত্রণার পরিমাণটাও অত্যন্ত হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইহারা যথার্থ-ই হিন্দু এবং দুর্গা-পূজা হইতে শুরু করিয়া, ষষ্ঠী-মাকাল কোন পূজাই বাদ দেয় না।

সাত

পথে যাহাদের সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে করিতে এই বিদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, ঘটনাচক্রে তাহারা রহিয়া গেল শহরের এক প্রান্তে, আর আমার আশ্রয় মিলিল অন্য প্রান্তে। সুতরাং পনর-ষোল দিনের মধ্যে ওদিকে আর যাইতে পারি নাই। তাহা ছাড়া সারাদিন চাকরির উমেদারিতে ঘুরিতে ঘুরিতে এমনি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি যে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাসায় ফিরিয়া এ-শক্তি আর থাকে না যে, কোথাও বাহির হই। ক্রমশঃ যত দিন যাইতেছিল, আমারও ধারণা জন্মিতেছিল যে, এই সুদূর বিদেশে আসিয়াও চাকরি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে ঠিক দেশের মতই সুকঠিন।

অভয়ার কথা মনে পড়িল। যে লোকটির উপর নির্ভর করিয়া সে স্বামীর সন্ধানে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে—সন্ধান না মিলিলে, সে লোকটির অবস্থা কি হইবে! বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইবার পথ যথেষ্ট উন্মুক্ত থাকিলেও, ফিরিবার পথটি যে ঠিক তেমনি প্রশস্ত পড়িয়া থাকে, বাঙ্গলা দেশের আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া এত বড় আশার কথা কল্পনা করিবার সাহস আমার নাই। নিজেদের অধিক দিন প্রতিপালন করিবার মত অর্থবলও যে সংগ্রহ করিয়া তাহারা পা বাড়ায় নাই, তাহাও অনুমান করা কঠিন নয়। বাকী রহিল শুধু সেই রাস্তাটা, যাহা পনের আনা বাঙ্গালীর একমাত্র অবলম্বন; অর্থাৎ মাস-মাহিনায় পরের চাকরি করিয়া মরণ পর্যন্ত কোনমতে হাড়-মাংসগুলাকে একত্র রাখিয়া চলা। রোহিণীদাদারও যে সে-ছাড়া পথ নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই রেঙ্গুনের বাজারে কেবলমাত্র নিজের উদরটা চালাইয়া লইবার মত চাকরি যোগাড় করিতে আমারই যখন এই হাল, তখন একটি স্ত্রীলোককে কাঁধে করিয়া সেই হাবাগোবা-বেচারা-গোছের অভয়ার দাদাটির যে কি অবস্থা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার পর্যন্ত যেন ভয় করিয়া উঠিল। স্থির করিলাম, কাল যেমন করিয়াই হোক, একবার গিয়া, তাহাদের খবর লইয়া আসিব।

পরদিন অপরাহ্ণবেলায় প্রায় ক্রোশ-দুই পথ হাঁটিয়া তাহাদের বাসায় উপস্থিত হইয়া

দেখিলাম, বাহিরের বারান্দায় একটি ছোট মোড়ার উপর রোহিণীদাদা আসীন রহিয়াছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল নবজলধরমণ্ডিত আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের ন্যায় গুরুগম্ভীর; কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু যে! ভাল ত?

বলিলাম, আজ্ঞে হাঁ।

যান, ভিতরে গিয়ে বসুন।

সভয়ে প্রশ্ন করিলাম, আপনাদের খবর সব ভাল ত?

হুঁ—ভেতরে যান না। তিনি ঘরেই আছেন।

তা যাচ্ছি—আপনিও আসুন?

না—আমি এইখানেই একটু জিরুই। খেটে খেটে ত একরকম খুন হবার জো হয়েচে, দুদণ্ড পা ছড়িয়ে একটু বসি।

তিনি পরিশ্রমাধিক্যে যে মৃতকল্প হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা তাঁহার চেহারায় প্রকাশ না পাইলেও, মনে মনে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। রোহিণীদাদার মধ্যেও যে এতখানি গাম্ভীর্য এতদিন প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছিল, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে ত বিশ্বাস করাই দুরূহ। কিন্তু ব্যাপার কি? আমি নিজেও ত পথে পথে ঘুরিয়া আর পারি না। আমার এই দাদাটি কি—

কপাটের আড়াল হইতে অভয়া তাহার হাসিমুখখানি বাহির করিয়া নিঃশব্দ সঙ্কেতে আমাকে ভিতরে আহ্বান করিল। দ্বিধাগ্রস্তভাবে কহিলাম, চলুন না রোহিণীদা, ভিতরে গিয়ে দুটো গল্প করি গে।

রোহিণীদা জবাব দিলেন, গল্প! এখন মরণ হলেই বাঁচি, তা জানেন শ্রীকান্তবাবু?

জানিতাম না—তাহা স্বীকার করিতেই হইল। তিনি প্রত্যুত্তরে শুধু একটা প্রচণ্ড নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, দুদিন পরেই জানতে পারবেন।

অভয়ার পুনশ্চ নীরব আহবানে আর বাহিরে দাঁড়াইয়া কথা কাটাকাটি না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভিতরে রান্নাঘর ছাড়া শোবার ঘর দুটি। সুমুখের খানাই বড়, রোহিণীবাবু ইহাতে শয়ন করেন। একধারে দড়ির খাটের উপর তাঁহার শয্যা। প্রবেশ করিতেই চোখে পড়িল—মেঝের উপর আসন পাতা, একখানি রেকাবিতে লুচি ও তরকারি, একটু হালুয়া ও একগ্লাস জল। গণনায় নিরূপণ করিয়া এ আয়োজন যে পূর্বাহ্ণ হইতে আমার জন্য করিয়া রাখা হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহ। সুতরাং এক মুহূর্তেই বুঝিতে পারিলাম, একটা রাগারাগি চলিতেছিল। তাই রোহিণীদার মুখ মেঘাচ্ছন্ন—তাই তাঁহার মরণ হইলে তিনি বাঁচেন। নীরবে খাটের উপর গিয়া বসিলাম। অভয়া অনতিদূরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছেন? এতদিন পরে বুঝি গরীবদের মনে পড়ল?

খাবারের থালাটা দেখাইয়া কহিলাম, আমার কথা পরে হবে; কিন্তু এ কি?

অভয়া হাসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ও কিছু না; আপনি কেমন আছেন বলুন।

কেমন আছি সে ত নিজেই জানি না, পরকে বলিব কি করিয়া? একটু ভাবিয়া কহিলাম, একটা চাকরির যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। রোহিণীবাবু যে বলছিলেন—আমার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। রোহিণীদা তাঁহার ছেঁড়া চটিতে একটা অস্বাভাবিক শব্দ তুলিয়া পটপট শব্দে ঘরে ঢুকিয়া কাহারও প্রতি দৃকপাতমাত্র না করিয়া, জলের গেলাসটা তুলিয়া লইয়া এক নিশ্বাসে অর্ধেকটা এবং বাকিটুকু দুই-তিন চুমুকে জোর করিয়া গিলিয়া ফেলিয়া, শূন্য গেলাসটা কাঠের মেঝের উপর ঠকাস করিয়া রাখিয়া দিয়া বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেলেন—যাক, শুধু জল খেয়েই পেট ভরাই! আমার আপনার আর কে আছে এখানে যে, ক্ষিধে পেলে খেতে দেবে।

আমি অবাক হইয়া অভয়ার প্রতি চাহিয়া দেখিলাম, পলকের জন্য তাহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া সে সহাস্যে কহিল, ক্ষিধে পেলে কিন্তু জলের গেলাসের চেয়ে খাবারের থালাটাই মানুষের আগে চোখে পড়ে।

রোহিণী সে-কথা কানেও তুলিলেন না—বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু অর্ধমিনিট না যাইতেই ফিরিয়া আসিয়া কপাটের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

সারাদিন অফিসে খেটে খেটে ক্ষিধেয় গা-মাথা ঘুরছিল শ্রীকান্তবাবু—তাই তখন আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারিনি—কিছু মনে করবেন না।

আমি বলিলাম, না।

তিনি পুনরায় কহিলেন, আপনি যেখানে থাকেন, সেখানে আমার একটুকু বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন?

তাঁহার মুখের ভঙ্গিতে আমি হাসিয়া ফেলিলাম; কহিলাম, কিন্তু সেখানে লুচি-মোহনভোগ হয় না।

রোহিণী বলিলেন, দরকার কি! ক্ষুধার সময় একটু গুড় দিয়ে যদি কেউ জল দেয়, সেই যে অমৃত! এখানে তাই বা দেয় কে?

আমি জিজ্ঞাসু-মুখে অভয়ার মুখের প্রতি চাহিতেই সে ধীরে ধীরে বলিল, মাথা ধ'রে অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, তাই খাবার তৈরি করতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু।

আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, এই অপরাধ?

অভয়া তেমনি শান্তভাবে কহিল, এ কি তুচ্ছ অপরাধ শ্রীকান্তবাবু?

তুচ্ছ বৈ কি?

অভয়া কহিল, আপনার কাছে হতে পারে, কিন্তু যিনি গলগ্রহকে খেতে দেন, তিনি এই বা মাপ করবেন কেন? আমার মাথা ধরলে তাঁর কাজ চলে কি করে!

রোহিণী ফোঁস করিয়া গর্জিয়া উঠিয়া কহিলেন, তুমি গলগ্রহ—একথা আমি বলেচি?

অভয়া বলিল, বলবে কেন, হাজার রকমে দেখাচ্চো।

রোহিণী কহিলেন, দেখাচ্চি! ওঃ—তোমার মনে মনে জিলিপির প্যাঁচ! তোমার মাথা ধরেছিল—আমাকে বলেছিলে?

অভয়া কহিল, তোমাকে ব'লে লাভ কি? তুমি কি বিশ্বাস করতে?

রোহিণী আমার দিকে ফিরিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, কথাগুলো একবার শুনে রাখুন! ওঁর জন্যে আমি দেশত্যাগী হলুম—বাড়ি ফেরবার পথ বন্ধ—আর ওঁর মুখের কথা শুনুন। ওঃ—

অভয়াও এবার সক্রোধে উত্তর দিল, আমার যা হবার হবে—তুমি যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যাও। আমার জন্যে কেন তুমি এত কষ্ট সইবে? তোমার কে আমি? এত খোঁটা দেওয়ার চেয়ে—

তাহার কথা শেষ না হইতেই রোহিণী প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, শুনুন শ্রীকান্তবাবু, দুটো রেঁধে দেবার জন্যে—কথাগুলো আপনি শুনে রাখুন! আচ্ছা, আজ থেকে যদি তুমি আমার জন্যে রান্নাঘরে যাও ত তোমার অতি বড়—আমি বরঞ্চ হোটেলে—বলিতে বলিতেই তাঁহার কান্নায় কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল; তিনি কোঁচার খুঁটটা মুখে চাপা দিয়া দ্রুতবেগে বাড়ির বাহির হইয়া গেলেন। অভয়া বিবর্ণ মুখ হেঁট করিল—কি জানি চোখের জল গোপন করিতে কি না; কিন্তু আমি একেবারে কাঠ হইয়া গেলাম! কিছুদিন হইতে উভয়ের মধ্যে যে কলহ চলিতেছে, সে ত চোখেই দেখিলাম। কিন্তু ইহার নিগূঢ় হেতুটা দৃষ্টির একান্ত অন্তরালে থাকিলেও সে যে ক্ষুধা এবং খাবার তৈরির ত্রুটি হইতে বহু দূর দিয়া বহিতেছে, তাহা বুঝিতে লেশমাত্র বিলম্ব ঘটিল না। তবে কি স্বামী-অন্বেষণের গল্পটাও—

উঠিয়া দাঁড়াইলাম। এই নীরবতা ভঙ্গ করিতে নিজেরই কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিলাম, আমাকে অনেক দূর যেতে হবে—এখন তা হলে আসি।

অভয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। কহিল, আবার কবে আসবেন?

অনেক দূর—

তা হলে একটু দাঁড়ান, বলিয়া, অভয়া বাহির হইয়া গেল। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আসিয়া আমার হাতে একটুকরা কাগজ দিয়া বলিল, যে জন্যে আমার আসা, তা সমস্তই এতে সংক্ষেপে লিখে দিলুম। পড়ে দেখে যা ভাল বোধ হয় করবেন। আপনাকে এর বেশি আমি বলতে চাইনে। বলিয়া, আজ সে আমাকে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ঠিকানাটা কি?

প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমি সেই ছোট কাগজখানি মুঠার মধ্যে গোপন করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। বারান্দার সেই মোড়াটি এখন শূন্য—রোহিণীদাদাকে আশেপাশে কোথাও দেখিলাম না। বাসা পর্যন্ত কৌতূহল দমন করিতে পারিলাম না। অনতিদূরেই পথিপার্শ্বে একখানি ছোট চায়ের দোকান দেখিয়া ঢুকিয়া পড়িলাম, এবং একবাটি চা লইয়া ল্যাম্পের আলোকে সেই লেখাটুকু চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিলাম। পেন্সিলের লেখা কিন্তু ঠিক পুরুষমানুষের মত হস্তাক্ষর। প্রথমেই সে তাহার স্বামীর নাম এবং তাহার পূর্বেকার ঠিকানা দিয়া নীচে লিখিয়াছে—আজ যাহা মনে করিয়া গেলেন সে আমি জানি; এবং বিপদে আপনার উপর আমি যে কতখানি নির্ভর করিয়াছি, সেও আপনি জানেন। তাই আপনার ঠিকানা জানিয়া লইলাম।

অভয়ার লেখাটুকু বার বার পড়িলাম; কিন্তু ওই কয়টা কথা ছাড়া আর একটা কথাও বেশি আন্দাজ করিতে পারিলাম না। আজ তাহাদের পরস্পরের ব্যবহার চোখে দেখিয়া যে কোন একটা বাহিরের লোক যে কি মনে করিবে, তাহা অভয়ার মত বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে অনুমান করা একেবারেই কঠিন নয়। কিন্তু তথাপি সে সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে একবিন্দু ইঙ্গিত করিল না। তাহার স্বামীর নাম ও ঠিকানা ত পূর্বেই শুনিয়াছি; বিপদে আমার উপর নির্ভর করিতে ত তাহাকে বারংবার চোখেই দেখিয়াছি; কিন্তু তার পরে? এখন তাঁহার অনুসন্ধান করিতে সে চায় কি না, কিংবা আর কোন বিপদ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া সে আমার ঠিকানা জানিয়া লইল—কোনটার আভাস পর্যন্ত তাহার লেখার মধ্যে হাতড়াইয়া বাহির করিতে পারিলাম না। কথায়-বার্তায় অনুমান হয়, রোহিণী কোন একটা আফিসে চাকরি যোগাড় করিয়াছে। কি করিয়া করিল, জানি না—তবে খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তাটা আপাততঃ আমার মত তাহাদের নাই; লুচিও জোটে। তথাপি যে কি রকম বিপদের সম্ভাবনাটা আমাকে শুনাইয়া রাখিল, এবং শুনাইবার সার্থকতাই বা কি, তাহা অভয়াই জানে।

তথা হইতে বাহির হইয়া সমস্ত পথটা শুধু ইহাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিছুই স্থির হইল না; শুধু এইটা আজ নিজের মধ্যে স্থির হইয়া গেল যে, অভয়ার স্বামী লোকটি যেই হোক, এবং যেখানে যে ভাবেই থাকুক, স্ত্রীর বিশেষ অনুমতি ব্যতীত ইহাকে সন্ধান করিয়া বাহির করার কৌতূহল আমাকে সংবরণ করিতেই হইবে।

পরদিন হইতে পুনরায় নিজের চাকরির উমেদারিতে লাগিয়া গেলাম, কিন্তু সহস্র চিন্তার মধ্যেও অভয়ার চিন্তাকে মনের ভিতর হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিলাম না!

কিন্তু চিন্তা যাই করি না কেন, দিনের পর দিন সমভাবেই গড়াইয়া চলিতে লাগিল। এদিকে অদৃষ্টবাদী দাঠাকুরের প্রফুল্ল মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। ভাতের তরকারি প্রথমে পরিমাণে, এবং পরে সংখ্যায় বিরল হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু চাকরি আমার সম্বন্ধে লেশমাত্র মত পরিবর্তন করিলেন না; যে চক্ষে প্রথম দিনটিতে দেখিয়াছিলেন, মাসাধিককাল পরেও ঠিক সেই চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। কাহার 'পরে জানি না, কিন্তু ক্রমশঃ উৎকণ্ঠিত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু তখন ত জানিতাম না, চাকরি পাবার যথেষ্ট প্রয়োজন না হইলে আর ইনি দেখা দেন না। এই জ্ঞানটি লাভ করিলাম হঠাৎ একদিন রোহিণী-বাবুকে পথের মধ্যে দেখিয়া। তিনি বাজারে পথের ধারে তরিতরকারি কিনিতেছিলেন। আমি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে দেখিতে লাগিলাম—যদিচ তাঁহার গায়ের জামাকাপড় জুতা জীর্ণতার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে—তীক্ষ্ন রৌদ্রে মাথায় একটা ছাতি পর্যন্ত নাই, কিন্তু আহার্য দ্রব্যগুলি তিনি বড়লোকের মতই ক্রয় করিতেছেন; সেদিকে তাঁহার খোঁজাখুঁজি ও যাচাই-বাছাইয়ের অবধি নাই। হাঙ্গামা ও পরিশ্রম যতই হোক, ভাল জিনিসটি সংগ্রহ করিবার দিকে যেন তাঁহার প্রাণ পড়িয়া আছে। চক্ষের পলকে সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখে পড়িয়া গেল। এই সব কেনাকাটার ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যগ্র ব্যাকুল স্নেহ যে কোথায় গিয়া পৌঁছিতেছে, এ যেন আমি সূর্যের আলোর মত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। কেন যে এই সকল লইয়া তাঁহার বাড়ি পৌঁছান একান্তই চাই, কেন যে এই সকলের মূল্য দিবার জন্য চাকরি তাঁহাকে পাইতেই হইল, এ সমস্যার মীমাংসা করিতে আর লেশমাত্র বিলম্ব হইল না। আজ বুঝিলাম, কেন সে এই জনারণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে, এবং আমি পাই নাই।

ঐ যে শীর্ণ লোকটি রেঙ্গুনের রাজপথ দিয়া একরাশ মোট হাতে লইয়া, শতচ্ছিন্ন মলিন বাসে গৃহে চলিয়াছে—আড়ালে থাকিয়া আমি তাহার পরিতৃপ্ত মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। নিজের প্রতি দৃক্‌পাত করিবার তাহার যেন অবসরমাত্র নাই। হৃদয় তাহার যাহাতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে, তাহাতে তাহার কাছে জামাকাপড়ের দৈন্য যেন একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেছে। আর আমি? বস্ত্রের সামান্য মলিনতায় প্রতিপদেই যেন সংকোচে জড়সড় হইয়া উঠিতেছি; পথচারী একান্ত অপরিচিত লোকেরও দৃষ্টিপাতে লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছি!

রোহিণীদা চলিয়া গেলেন—আমি তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলাম না, এবং পরক্ষণেই লোকের মধ্যে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। কেন জানি না, এইবার অশ্রুজলে আমার দুচক্ষু ঝাপসা হইয়া গেল। চাদরের খুঁটে মুছিতে মুছিতে পথের একধার দিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম, এবং নিজের মনেই বার বার বলিতে লাগিলাম, এই ভালবাসাটার মত এত বড় শক্তি, এত বড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর নাই। ইহা পারে না এত বড় কাজও বুঝি কিছু নাই।

তথাপি বহু-বহু-যুগ-সঞ্চিত অন্ধ সংস্কার আমার কানে কানে ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, ভাল নয়, ইহা ভাল নয়! ইহা পবিত্র নয়—শেষ পর্যন্ত ইহার ফল ভাল হয় না!

বাসায় আসিয়া একখানি বড় লেফাফার পত্র পাইলাম। খুলিয়া দেখি, চাকরির দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে। সেগুন কাঠের প্রকাণ্ড ব্যবসায়ী—অনেক আবেদনের মধ্যে ইঁহারাই গরীবের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ভগবান তাঁহাদের মঙ্গল করুন।

চাকরি বস্তুটির সহিত সাবেক পরিচয় ছিল না; সুতরাং পাইলেও সন্দেহ রহিল, তাহা বজায় থাকিবে কি না। আমার যিনি 'সাহেব' হইলেন, তিনি খাঁটি সাহেব হইলেও দেখিলাম, বেশ বাঙ্গলা জানেন। কারণ কলিকাতার অফিস হইতে তিনি বদলি হইয়া বর্মায় গিয়াছিলেন।

দুই সপ্তাহ চাকরির পরে ডাকিয়া কহিলেন, শ্রীকান্তবাবু, তুমি ঐ টেবিলে আসিয়া কাজ কর—মাহিনাও প্রায় আড়াই গুণ বেশি পাইবে।

প্রকাশ্যে এবং মনে মনে সাহেবকে এক লক্ষ আশীর্বাদ করিয়া হাড়-বাহির-করা টেবিল ছাড়িয়া একেবারে সবুজ বনাত-মোড়া টেবিলের উপর চড়িয়া বসিলাম। মানুষের যখন হয়, তখন এমনি করিয়াই হয়! আমাদের হোটেলের দাঠাকুর নেহাত মিথ্যা বলেন না।

গাড়ি ভাড়া করিয়া অভয়াকে সুসংবাদ দিতে গেলাম। রোহিণীদা অফিস হইতে ফিরিয়া সেইমাত্র জলযোগে বসিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাঁহার নিছক জল দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রবৃত্তি কিছুমাত্র দেখিলাম না। বরঞ্চ যা দিয়া পূর্ণ করিতেছিলেন, তা দিয়া পূর্ণ করিতে সংসারে আর যাহারই আপত্তি থাক. আমার ত ছিল না। অতএব অভয়ার প্রস্তাবে যে অসম্মত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য। খাওয়া শেষ হইতেই রোহিণীদা জামা গায়ে দিতে লাগিলেন। অভয়া ক্ষুন্নকণ্ঠে কহিল, তোমাকে বরাবর বলচি রোহিণীদাদা, এই শরীরে তুমি এত পরিশ্রম ক'রো না, তুমি কি কিছুতেই শুনবে না? আচ্ছা, কি হবে আমাদের বেশি টাকায়? দিন ত বেশ চলে যাচ্চে।

রোহিণীদার দুচক্ষু দিয়া স্নেহ যেন ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তার পরে একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। একটা বামুন পর্যন্ত রাখতে পারচি নে, খেটে খেটে দুবেলা আগুন-তাতে তোমার দেহ যে শুকিয়ে গেল! বলিয়া পান মুখে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

অভয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, দেখুন ত শ্রীকান্তবাবু, এ'র অন্যায়! সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরে বাড়ি এসে কোথায় একটু জিরুবেন, তা নয়, আবার রাত্রি নটা পর্যন্ত ছেলে পড়াতে বেরিয়ে গেলেন। আমি অত বলি, কিছুতে শুনবেন না। এই দুটি লোকের রান্নায় আবার একটা রাঁধুনি রাখার কি দরকার বলুন ত? ওঁর সবই যেন বাড়াবাড়ি, না? বলিয়া সে আর একদিকে চোখ ফিরাইল।

আমি নিঃশব্দে শুধু একটু হাসিলাম। না, কি হাঁ, এ জবাব দিবার সাধ্য আমার ছিল না —আমার বিধাতাপুরুষেরও ছিল কি না সন্দেহ।

অভয়া উঠিয়া গিয়া একখানি পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল। কয়েক দিন হইল, বর্মা রেল কোম্পানির অফিস হইতে ইহা আসিয়াছে। বড়সাহেব দুঃখের সহিত জানাইয়াছেন যে,

অভয়ার স্বামী প্রায় দুই বৎসর পূর্বে কি একটা গুরুতর অপরাধে কোম্পানীর চাকরি হইতে অব্যাহতি পাইয়া কোথায় গিয়াছে—তাঁহারা অবগত নহেন।

উভয়েই বহুক্ষণ পর্যন্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে অভয়াই প্রথমে কথা কহিল; বলিল, এখন আপনি কি উপদেশ দেন?

আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, আমি কি উপদেশ দেব?

অভয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, সে হবে না। এ অবস্থায় আপনাকেই কর্তব্য স্থির ক'রে দিতে হবে। এ চিঠি পাওয়া পর্যন্ত আমি আপনার আশাতেই পথ চেয়ে আছি।

মনে মনে ভাবিলাম, এ বেশ কথা! আমার পরামর্শ লইয়া বাহির হইয়াছিলে কিনা, তাই আমার উপদেশের জন্য পথ চাহিয়া আছ!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বাড়ি ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি?

অভয়া কহিল, কিছুই না। বলেন, যেতে পারি, কিন্তু আমার ত সেখানে কেউ নেই।

রোহিণীবাবু কি বলেন?

তিনি বলেন, তিনি ফিরবেন না। অন্ততঃ দশ বছর ওমুখো হবেন না।

আবার বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলাম, তিনি কি বরাবর আপনার ভার নিতে পারবেন?

অভয়া বলিল, পরের মনের কথা কি ক'রে জানব বলুন? তা ছাড়া, তিনি নিজেই বা জানবেন কি ক'রে? বলিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আবার নিজেই কহিল, একটা কথা। আমার জন্যে তিনি একবিন্দু দায়ী ন'ন। দোষ বলুন, ভুল বলুন, সমস্তই একা আমার।

গাড়োয়ান বাহির হইতে চীৎকার করিল, বাবু, আর কত দেরি হবে?

আমি যেন বাঁচিয়া গেলাম। এই অবস্থা-সঙ্কটের ভিতর হইতে সহসা পরিত্রাণের কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। অভয়া যে যথার্থই অকূল-পাথারে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে, আমার মন তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছিল না সত্য, কিন্তু নারীর এতরকমের উল্টাপাল্টা ব্যবস্থা আমি দেখিয়াছি যে, বাহির হইতে এই দুটা চোখের দৃষ্টিকে প্রত্যয় করা কতবড় অন্যায়, তাহাও নিঃসংশয়ে বুঝিতেছিলাম।

গাড়োয়ানের পুনশ্চ আহ্বানে আর আমি মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, আমি শীঘ্রই আর একদিন আসব। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলাম। অভয়া কোন কথা কহিল না, নিশ্চল মূর্তির মত মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

গাড়িতে উঠিয়া বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল; কিন্তু দশহাত না যাইতেই মনে পড়িল ছড়িটা ভুলিয়া আসিয়াছি। তাড়াতাড়ি গাড়ি থামাইয়া ফিরিয়া বাড়ি ঢুকিতেই চোখে পড়িল —ঠিক দ্বারের সম্মুখেই অভয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া, শরবিদ্ধ পশুর মত অব্যক্ত যন্ত্রণায় আছাড় খাইয়া যেন প্রাণ বিসর্জন করিতেছে।

কি বলিয়া যে তাহাকে সান্ত্বনা দিব, আমার বুদ্ধির অতীত। শুধু বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার তেমনি নীরবে ফিরিয়া গেলাম। অভয়া যেমন কাঁদিতেছিল, তেমনি কাঁদিতেই লাগিল। একবার জানিতেও পারিল না—তাহার এই নিগূঢ় অপরিসীম বেদনার একজন নির্বাক সাক্ষী এ জগতে বিদ্যমান রহিল।

আট

রাজলক্ষ্মীর অনুরোধ আমি বিস্মৃত হই নাই। পাটনায় একখানা চিঠি পাঠাইবার কথা, আসিয়া পর্যন্তই আমার মনে ছিল, কিন্তু একে ত সংসারে যত শক্ত কাজ আছে, চিঠি লেখাকে আমি কারও চেয়ে কম মনে করি না। তার পরে, লিখিবই বা কি? আজ কিন্তু অভয়ার কান্না আমার বুকের মধ্যে এমনি ভারি হইয়া উঠিল যে, তার কতকটা বাহির করিয়া না দিলে যেন বাঁচি না, এমনি বোধ হইতে লাগিল। তাই বাসায় পৌঁছিয়াই কাগজ-কলম জোগাড় করিয়া বাইজীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেলাম। আর সে ছাড়া আমার দুঃখের অংশ লইবার লোক ছিলই বা কে! ঘণ্টা দুই-তিন পরে সাহিত্য-চর্চা সাঙ্গ করিয়া যখন কলম রাখিলাম, তখন রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে; কিন্তু পাছে সকালবেলায় দিনের আলোকে এ চিঠি পাঠাইতে

লজ্জা করে, তাই মেজাজ গরম থাকিতে থাকিতেই তাহা সেই রাত্রেই ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

একজন ভদ্র নারীর নিদারুণ বেদনার গোপন ইতিহাস আর একজন রমণীর কাছে প্রকাশ করা কর্তব্য কি না, এ সন্দেহ আমার ছিল, কিন্তু অভয়ার এই পরম এবং চরম সঙ্কটের কালে যে-রাজলক্ষ্মী একদিন পিয়ারী বাইজীরও মর্মান্তিক তৃষ্ণা দমন করিয়াছে, সে কি হিতোপদেশ দেয়, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে একবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, প্রশ্নটা উল্টাদিক দিয়া একবারও ভাবিলাম না। অভয়ার স্বামীর উদ্দেশ না পাওয়ার সমস্যাই বার বার মনে উঠিয়াছে। কিন্তু পাওয়ার মধ্যেও যে সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিতে পারে, এ চিন্তা একটিবারেও মনে উদয় হইল না। আর এ গোলযোগ আবিষ্কার করিবার ভারটা যে বিধাতাপুরুষ আমার উপরেই নির্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বা কে ভাবিয়াছিল! দিন চার-পাঁচ পরে আমার একজন বর্মা কেরানী টেবিলের উপর একটা ফাইল রাখিয়া গেল—উপরে নীল পেন্সিলে বড়সাহেবের মন্তব্য। তিনি কেসটা আমাকে নিজেই নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিয়াছেন। ব্যাপারটা আগাগোড়া পড়িয়া মিনিট কয়েক স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ঘটনাটি সংক্ষেপে এই—

আমাদের প্রোম অফিসের একজন কেরানীকে সেখানকার সাহেব ম্যানেজার কাঠ-চুরির অভিযোগে সস্‌পেণ্ড করিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন। কেরানীর নাম দেখিয়াই বুঝিলাম, ইনিই আমাদের অভয়ার স্বামী। ইহারও চার-পাঁচপাতা-জোড়া কৈফিয়ত ছিল। বর্মা রেলওয়ে হইতে যে কোন্ গুরুতর অপরাধে চাকরি গিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে অনুমান করিতে বিলম্ব হইল না। খানিক পরেই আমার সেই কেরানীটি আসিয়া জানাইল, এক ভদ্রলোক দেখা করিতে চাহে। ইহার জন্য আমি প্রস্তুত হইয়াই ছিলাম। নিশ্চয় জানিতাম, প্রোম হইতে তিনি কেসের তদ্বির করিতে স্বয়ং আসিবেন। সুতরাং কয়েক মিনিট পরেই ভদ্রলোক সশরীরে আসিয়া যখন দেখা দিলেন, তখন অনায়াসে চিনিলাম, ইনিই অভয়ার স্বামী। লোকটার প্রতি চাহিবামাত্রই সর্বাঙ্গ ঘৃণায় যেন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। পরনে হ্যাট-কোট—কিন্তু যেমন পুরনো, তেমনি নোংরা। সমস্ত কালো মুখখানা শক্ত গোঁফ-দাড়িতে সমাচ্ছন্ন। নীচেকার ঠোঁটটা বোধ করি দেড়-ইঞ্চি পুরু। তাহার উপর, এত পান খাইয়াছে যে, পানের রস দুই কসে যেন জমাট বাঁধিয়া আছে; কথা কহিলে ভয় করে, পাছে বা ছিটকাইয়া গায়ে পড়ে।

পতি নারীর দেবতা—তাহার ইহকাল-পরকাল; সবই জানি। কিন্তু, এই মূর্তিমান ইতরটার পাশে অভয়াকে কল্পনা করিতে আমার দেহ-মন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। অভয়া আর যাই হোক, সে সুশ্রী এবং সে মার্জিতরুচি ভদ্রমহিলা; কিন্তু এই মহিষটা যে বর্মার কোন্ গভীর জঙ্গল হইতে অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল, তাহা, যে-দেবতা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন।

তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার বিরুদ্ধে নালিশটা কি সত্য? প্রত্যুত্তরে লোকটা মিনিট-দশেক অনর্গল বকিয়া গেল। তাহার ভাবার্থ এই যে, সে একেবারে নির্দোষ; তবে সে থাকায় প্রোম অফিসের সাহেব দুই হাতে লুঠ করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহার আক্রোশ। কোন রকমে তাহাকে সরাইয়া একজন আপনার লোক ভর্তি করাই তাঁহার অভিসন্ধি। একবিন্দু বিশ্বাস করিলাম না। বলিলাম, এ চাকরি গেলেই বা আপনার বিশেষ কি ক্ষতি? আপনার মত কর্মদক্ষ লোকের বর্মা মুলুকে কাজের ভাবনা কি? রেলওয়ের চাকরি গেলে ক'দিনই বা আপনাকে ব'সে থাকতে হয়েছিল?

লোকটা প্রথমে থতমত খাইয়া পরে কহিল, যা বলচেন তা নেহাত মিথ্যে বলতে পারিনে। কিন্তু কি জানেন মশাই, ফ্যামিলি-ম্যান, অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা—

আপনি কি বর্মার মেয়ে বিয়ে করেচেন নাকি?

লোকটা হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া বলিল, সাহেব ব্যাটা রিপোর্টে লিখেচে বুঝি? এই থেকেই বুঝবেন শালার রাগ।—বলিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি নরম হইয়া কহিল, আপনি বিশ্বাস করেন?

আমি ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, তাতেই বা দোষ কি?

লোকটা উৎসাহিত হইয়া কহিল, যা বলেচেন মশাই। আমি ত তাই সবাইকে বলি, যা

করব, তা বোল্ডলি স্বীকার করব। আমার অমন ভেতরে এক, বাইরে আর নেই। আর পুরুষমানুষ—বুঝলেন না? যা বলব, তা স্পষ্ট বলব মশাই, আমার ঢাক্-ঢাক্ নেই। আর দেশেও ত কেউ কোথাও নেই—আর এখানেই যখন চিরকাল চাকরি ক'রে খেতে হবে—বুঝলেন না মশাই!

আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, সমস্ত বুঝিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার দেশে কি কেউ নেই?

লোকটা অম্লানমুখে কহিল, আজ্ঞে না, কেউ কোথাও নেই—কাকস্য পরিবেদনা—থাকলে কি এই সুয্যিমামার দেশে আসতে পারতাম? মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি একটা যে-সে ঘরের ছেলে নই, আমরাও একটা জমিদার। এখনো আমার দেশের বাড়িটার পানে চাইলে আপনার চোখ ঠিকরে যাবে। কিন্তু অল্প বয়সেই সবাই মরেহেজে গেল,—বললাম, দূর হোক গে; বিষয়-আশয় ঘরবাড়ি কার জন্যে? সমস্ত জ্ঞাত-গুষ্ঠিদের বিলিয়ে দিয়ে বর্মায় চলে এলাম।

একটুখানি স্থির থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনি অভয়াকে চেনেন?

লোকটা চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি তাকে জানলেন কি ক'রে?

বলিলাম, এমন ত হ'তে পারে, সে আপনার খোঁজ নিয়ে খাওয়া-পরার জন্যে এ-অফিসে দরখাস্ত করেচে। লোকটা অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লকণ্ঠে কহিল, ওঃ—তাই বলুন। তা স্বীকার করচি, এক-সময় সে আমার স্ত্রী ছিল বটে—

এখন?

কেউ নয়। তাকে ত্যাগ ক'রে এসেচি।

তার অপরাধ?

লোকটা বিমর্ষতার ভান করিয়া বলিল, কি জানেন, ফ্যামিলি-সিক্রেট বলা উচিত নয়। কিন্তু আপনি যখন আমার আত্মীয়ের সামিল, তখন বলতে লজ্জা নেই যে, সে একটা নষ্ট স্ত্রীলোক। তাই ত মনের ঘেন্নায় দেশত্যাগী হ'লাম। নইলে সাধ ক'রে কি কেউ কখনো এমন দেশ পা দিয়ে মাড়ায়! আপনিই বলুন না—এ কি সোজা মনের ঘেন্না!

জবাব দিব কি, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া গেল। গোড়া হইতেই এই ঘোর মিথ্যাবাদীটার একটা কথাও বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু এখন নিঃসংশয়ে বুঝিলাম, এ যেমন নীচ, তেমনি নিষ্ঠুর।

অভয়ার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু তবুও শপথ করিয়া বলিতে পারি—যে অপবাদ স্বামী হইয়া এই পাষণ্ড নিঃসঙ্কোচে দিল—পর হইয়াও আমি তাহা উচ্চারণ করিতে পারি না। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া বলিলাম, তার এই অপরাধের কথা আপনি আসবার সময় ত ব'লে আসেন নি! এখানে এসেও কিছুদিন যখন চিঠিপত্র এবং টাকাকড়ি পাঠিয়েছিলেন, তখনও ত লিখে জানান নি।

মহাপাপিষ্ঠ স্বচ্ছন্দে তাহার বিরাট স্থূলে ওষ্ঠাধর হাস্যে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, এই নিন কথা। জানেন ত মশাই, আমরা ভদ্রলোক, শুধু চুপিচুপি সহ্য করতেই পারি—ছোট-লোকের মত নিজের স্ত্রীর কলঙ্ক ত আর ঢাক পিটে প্রচার করতে পারিনে। থাকগে, সে-সব দুঃখের কথা ছেড়ে দিন মশাই—এ-সব মেয়েমানুষের নাম মুখে আনলেও পাপ হয়। তাহ'লে কেসটা ত আপনিই ডিস্পোজ করবেন? যাক, বাঁচা গেল, কিন্তু তাও ব'লে রাখচি, সাহেবব্যাটাকে অমনি অমনি ছাড়া হবে না। বেশ এমন একটু দিয়ে দিতে হবে, বাছাধন যাতে আর কখনো আমার পেছনে না লাগেন। আমারও মুরুব্বির জোর আছে, এটা যেন তিনি মনে বোঝেন। বুঝলেন না? আচ্ছা, আমি বলি, হারামজাদাকে হেড অফিসে টেনে আনা যায় না?

আমি বলিলাম, না।

লোকটা হাসির ছটায় ফাইলটা একটুখানি সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, নিন তামাশা রাখুন। বড়সাহেব একেবারে আপনার মুঠোর মধ্যে, সে খবর কি আমি না নিয়েই এসেচি ভাবেন? তা মরুক গে, আর একবার আমার সঙ্গে লেগে যেন তিনি দেখেন। আচ্ছা,

বড়সাহেবের অর্ডারটা আজই বার ক'রে আমার হাতে দিতে পারা যায় না? নটার গাড়িতেই চ'লে যেতুম, রাত্তিরটা কষ্ট পেতে হ'ত না; কি বলেন?

হঠাৎ জবাব দিতে পারিলাম না। কারণ খোশামোদ জিনিসটা এম্নি যে, সমস্ত দুরভিসন্ধি জানিয়া বুঝিয়াও—ক্ষুন্ন করিতে ক্লেশ বোধ হয়। উল্টা কথাটা মুখের উপর শুনাইয়া দিতে বাধ বাধ করিতে লাগিল; কিন্তু সে বাধা মানিলাম না। নিজেকে শক্ত করিয়াই বলিয়া ফেলিলাম, বড়সাহেবের হুকুম হাতে নিয়ে আপনার লাভ নেই। আপনি আর কোথাও চাকরির চেষ্টা দেখবেন।

এক মুহূর্তে লোকটা যেন কাঠ হইয়া গেল। খানিক পরে কহিল, তার মানে?

তার মানে, আপনাকে ডিস্‌মিস্‌ করবার নোটই আমি দেব। আমার দ্বারা আপনার কোন সুবিধা হবে না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িল। তাহার দুই চোখ ছলছল করিতে লাগিল—হাত জোড় করিয়া কহিল, বাঙ্গালী হ'য়ে বাঙ্গালীকে মারবেন না বাবু, ছেলেপুলে নিয়ে আমি মারা যাবো।

সে দেখবার ভার আমার ওপরে নেই। তা ছাড়া আপনাকে আমি জানিনে, আপনার সাহেবের বিরুদ্ধেও আমি যেতে পারব না।

লোকটা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বোধ করি বুঝিল, কথাগুলো পরিহাস নয়। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরেই অকস্মাৎ হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কেরানী, দরোয়ান, পিয়ন—যে যেখানে ছিল, এই অভাবনীয় ব্যাপারে অবাক হইয়া গেল। আমি নিজেও কেমন যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তাহাকে থামিতে বলিয়া কহিলাম, অভয়া আপনার জন্যেই বর্মায় এসেচে। দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে আমি অবশ্য নিতে বলিনে, কিন্তু আপনার সমস্ত কথা শুনেও যদি সে মাপ করে—তার কাছ থেকে চিঠি আনতে পারেন—আপনার চাকরি আমি বজায় রাখবার চেষ্টা দেখব। না হ'লে আর আমার সঙ্গে দেখা ক'রে লজ্জা দেবেন না—আমি মিছে কথা বলিনে।

এই নীচপ্রকৃতির লোকগুলা যে অত্যন্ত ভীরু হয় তাহা জানিতাম। সে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কোথায় আছে?

কাল এম্নি সময়ে আসবেন, তার ঠিকানা বলে দেব।

লোকটা আর কোন কথা না কহিয়া দীর্ঘ সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যাবেলায় আমার মুখ হইতে অভয়া নিঃশব্দে নতমুখে সমস্ত কথা শুনিয়া আঁচল দিয়া শুধু চোখ মুছিল, কিছুই বলিল না। আমার ক্রোধেরও সে কোন জবাব দিল না। অনেকক্ষণ পরে আবার আমিই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি তাঁকে মাপ করতে পারবে?

অভয়া শুধু ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

তোমাকে নিয়ে যেতে চাইলে যাবে?

সে তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল।

বর্মা-মেয়েদের স্বভাব যে কি, সে ত তুমি প্রথম দিনেই টের পেয়েচ; তবু সেখানে যাবার সাহস হবে?

এবার অভয়া মুখ তুলিতে দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুর ধারা বহিতেছে। সে কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। তার পরে বার বার আঁচলে চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, না গেলে আর আমার উপায় কি বলুন?

কথাটা শুনিয়া খুশি হইব, কি চোখের জল ফেলিব, ভাবিয়া পাইলাম না; কিন্তু উত্তর দিতে পারিলাম না।

সেদিন আর কোন কথা হইল না। বাসায় ফিরিবার সমস্ত পথটা এই একই কথাই পুনঃপুনঃ আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনদিকে চাহিয়া কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলাম না। শুধু বুকের ভিতরটা—তা সে কাহার উপর জানি না—একদিকে যেমন নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনই এক নিরাশ্রয় রমণীর ততোধিক নিরুপায় প্রশ্নে ব্যথিত, ভারাক্রান্ত হইয়া রহিল; পরদিন অভয়ার ঠিকানার জন্য যখন লোকটা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন ঘৃণায় তাহার প্রতি আমি চাহিতে পর্যন্ত

পারিলাম না। আমার মনের ভাব বুঝিয়া, আজ সে বেশি কথা না কহিয়া শুধু ঠিকানা লিখিয়া লইয়াই বিনীতভাবে প্রস্থান করিল। কিন্তু তাহার পরের দিন আবার যখন সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন তাহার চোখ-মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেছে। নমস্কার করিয়া অভয়ার একছত্র লেখা আমার টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়া বলিল, আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, তা মুখে ব'লে কি হবে—যতদিন বাঁচব, আপনার গোলাম হ'য়ে থাকব।

অভয়ার লেখাটার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলিলাম, আপনি কাজ করুন গে, বড়সাহেব এবার মাপ করেচেন।

সে হাসিমুখে কহিল, বড়সাহেবের ভাবনা আমি আর ভাবিনে, শুধু আপনি ক্ষমা করলেই আমি বর্তে যাই—আপনার শ্রীচরণে আমি বহু অপরাধ করেচি; এই বলিয়া আবার সে বলিতে শুরু করিয়া দিল—তেমনি নির্জলা মিথ্যা এবং চাটুবাক্য, এবং মাঝে মাঝে রুমাল দিয়া চোখ মুছিতেও লাগিল। অত কথা শুনিবার ধৈর্য কাহারও থাকে না—সে শাস্তি আপনাদের দিব না—আমি শুধু তাহার মোট বক্তব্যটা সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছি। তাহা এই যে, সে স্ত্রীর নামে যে অপবাদ দিয়াছিল, তাহা একেবারেই মিথ্যা। সে কেবল লজ্জার দায়েই দিয়াছিল; না হইলে অমন সতীলক্ষ্মী কি আর আছে! এবং মনে মনে অভয়াকে সে চিরকালই প্রাণের অধিক ভালবাসে। তবে এখানে এই যে আবার একটা উপসর্গ জুটিয়াছে, তাহাতে তাহার একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, শুধু বর্মাদের ভয়ে প্রাণ বাঁচাইবার জন্যই করিয়াছে (কিছু সত্য থাকিতেও পারে)। কিন্তু আজ রাত্রেই যখন সে তাহার ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে লইয়া যাইতেছে, তখন সে-বেটিকে দূর করিতে কতক্ষণ! আর ছেলেপুলে? আহা! বেটাদের যেমন শ্রী-ছাঁদ, তেমনি স্বভাব! তারা কি কাজে লাগবে? সময়ে দুটো খেতে পরতে দেবে, না মরলে এক গণ্ডূষ জলের প্রত্যাশা আছে! গিয়াই সমস্ত একসঙ্গে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবে, তবে তাহার নাম—ইত্যাদি ইত্যাদি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অভয়াকে কি আজ রাত্রেই নিয়ে যাবেন? সে বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিল, বিলক্ষণ! যতদিন চোখে দেখিনি, ততদিন কোনরকমে নাহয় ছিলাম; কিন্তু চোখে দেখে আর কি চোখের আড়াল করতে পারি? একলা এত দূরে এত কষ্ট সয়ে সে যে শুধু আমার জন্যেই এসেছে। একবার ভেবে দেখুন দেখি ব্যাপারটা!

জিজ্ঞাসা করিলাম, তাকে কি একসঙ্গে রাখবেন?

আজ্ঞে না, এখন প্রোমের পোস্টমাস্টার মশায়ের ওখানেই রাখব। তাঁর স্ত্রীর কাছে বেশ থাকবে। কিন্তু শুধু দুদিন—আর না। তার জন্যেই একটা বাসা ঠিক ক'রে ঘরের লক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে যাবো।

অভয়ার স্বামী প্রস্থান করিলে, আমিও আমার দিনের কাজে মন দিবার জন্য সুমুখের ফাইলটা টানিয়া লইলাম।

নীচেই অভয়ার লেখাটুকু পুনরায় চোখে পড়িল! তার পরে কতবার যে সেই দু-ছত্র পড়িয়াছি এবং আরো কতবার যে পড়িতাম, তাহা বলিতে পারি না। পিয়ন বলিতেছিল, বাবুজী, আপনার বাসায় কি আজ কাগজপত্র কিছু দিয়ে আসতে হবে? চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিলাম, কখন সুমুখের ঘড়িতে সাড়ে-চারিটা বাজিয়া গেছে এবং কেরানীর দল দিনের কর্ম সমাপন করিয়া যে যাহার বাড়ি প্রস্থান করিয়াছে।

নয়

আবার অভয়ার স্বামীর পত্র পাইলাম। পূর্ববৎ সমস্ত চিঠিময় কৃতজ্ঞতা ছড়াইয়া দিয়া, এবার সে যে কি সংকটে পড়িয়াছে, তাহাই সসম্ভ্রমে ও সবিস্তারে নিবেদন করিয়া আমার উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই যে, তাহার সাধ্যের অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও, সে একটা বড় বাড়ি ভাড়া লইয়াছে, এবং তাহার একদিকে তাহার বর্মী স্ত্রীপুত্রকে আনিয়া, অন্যদিকে অভয়াকে আনিবার জন্য প্রত্যহ সাধ্যসাধনা করিতেছে; কিন্তু কোন-মতেই তাহাকে সম্মত করিতে পারিতেছে না। সহধর্মিণীর এই প্রকার অবাধ্যতায় সে অতিশয় মর্মপীড়া অনুভব করিতেছে। ইহা যে শুধু কালিকালের ফল, এবং সত্যযুগে যে

এরূপ ঘটিত না—বড় বড় মুনি-ঋষিরা পর্যন্ত যে—দৃষ্টান্ত-সমেত তাহার পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়া সে লিখিয়াছে, হায়! সে আর্য-ললনা কৈ! সে সীতা-সাবিত্রী কোথায়! যে আর্যনারী স্বামীর পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া, হাসিতে হাসিতে চিতায় প্রাণ বিসর্জন করিয়া স্বামীসহ অক্ষয় স্বর্গলাভ করিতেন, তাঁরা কোথায়? যে হিন্দু-মহিলা হাস্যবদনে তাহার কুষ্ঠ-গলিত স্বামীদেবতাকে স্কন্ধে করিয়া বারাঙ্গনার গৃহে পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিল. কোথায় সেই পতিব্রতা রমণী? কোথায় সেই স্বামীভক্তি! হায় ভারতবর্ষ! তুমি কি একেবারেই অধঃপথে গিয়াছ। আর কি আমরা সে সকল চক্ষে দেখিব না? আর কি আমরা—ইত্যাদি ইত্যাদি প্রায় দুইপাতা-জোড়া বিলাপ। কিন্তু অভয়া পতিদেবতাকে এই পর্যন্ত মনোবেদনা দিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। আরও আছে। সে লিখিয়াছে, শুধু যে তাহার অর্ধাঙ্গিনী এখনও পরের বাটীতে বাস করিতেছে তাই নয়, সে আজ পরম বন্ধু পোস্টমাস্টারের কাছে জ্ঞাত হইয়াছে যে, কে-একটা রোহিণী তাহার স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছে এবং টাকা পাঠাইয়াছে। ইহাতে হতভাগ্যের কি পর্যন্ত যে ইজ্জৎ নষ্ট হইতেছে, তাহা লিখিয়া জানান অসাধ্য।

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে হাসি সামলাইতে না পারিলেও রোহিণীর ব্যবহারে রাগ কম হইল না। আবার তাহাকে চিঠি লেখাই বা কেন, টাকা পাঠানোই বা কেন? যে স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর করিতে এত দুঃখ স্বীকার করিয়াছে, বুঝিয়া হোক, না বুঝিয়া হোক আবার তাঁহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করার প্রয়োজন কি? আর অভয়াই বা এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে কিসের জন্য? সে কি চায় তাহার স্বামী যাহাকে স্ত্রীর মত গ্রহণ করিয়াছে, ছেলেমেয়ে হইয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করিয়া শুধু তাহাকে লইয়াই সংসার করে? কেন, বর্মাজর মেয়ে কি মেয়ে নয়? তার কি সুখ-দুঃখ মান-অপমান নাই? ন্যায়-অন্যায়ের আইন কি তাহার জন্য আলাদা করিয়া তৈরি করা হইয়াছে? আর তাই যদি, তবে সেখানে তাহার যাওয়াই বা কেন? সব ঝঞ্ঝাট এখান হইতে স্পষ্ট করিয়া চুকাইয়া দিলেই ত হইত।

সেই পর্যন্ত রোহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই নাই। সে যে অযথা ক্লেশ পাইতেছে, তাহা মনে মনে বুঝিয়াই, বোধ করি সেদিকে পা বাড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। আজ ছুটির পূর্বেই গাড়ি ডাকিতে পাঠাইয়া উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময়ে অভয়ার পত্র আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলাম, আগাগোড়া লেখা রোহিণীর কথাতেই ভরা। যেন সর্বদাই তাহার প্রতি নজর রাখি—সে যে কত দুঃখী, কত দুর্বল, কত অপটু, কত অসহায় এই একটা কথাই ছত্রে ছত্রে অক্ষরে অক্ষরে এমনি মর্মান্তিক ব্যথায় ফাটিয়া পড়িয়াছে যে, অতি বড় সরল-চিত্ত লোকও এই আবেদনের তাৎপর্য বুঝিতে ভুল করিবে মনে হইল না। নিজের সুখ-দুঃখের কথা প্রায় কিছুই নাই। তবে নানা কারণে এখনও সে যে সেইখানেই আছে, যেখানে আসিয়া প্রথমে উঠিয়াছিল, তাহা পত্রের শেষে জানাইয়াছে।

পতিই সতীর একমাত্র দেবতা কি না, এ-বিষয়ে আমার মতামত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমার নাই; তাহার আবশ্যকতাও দেখি না। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ সতীধর্মের একটা অপূর্বতা, দুঃসহ দুঃখ ও একান্ত অন্যায়ের মধ্যেও তাহার অভ্রভেদী বিরাট মহিমা—যাহা আমার অন্নদাদিদির স্মৃতির সঙ্গে চিরদিন মনের ভিতরে জড়াইয়া আছে, এবং চোখে না দেখিলে যাহার অসহ্য সৌন্দর্য ধারণা করাই যায় না—যাহা একই সঙ্গে নারীকে অতি ক্ষুদ্র এবং অতি বৃহৎ করিয়াছে—আমার সে যে অব্যক্ত উপলব্ধি—তাহাই আজ এই অভয়ার চিঠিতে আবার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

জানি সবাই অন্নদাদিদি নয়; সেই কল্পনাতীত নিষ্ঠুর ধৈর্য বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার মত অত বড় বুকও সকল নারীতে থাকে না; এবং যাহা নাই, তাহার জন্য অহরহ শোক প্রকাশ করা গ্রন্থকারমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য কি না, তাহাও ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখি নাই, কিন্তু তবুও সমস্ত চিত্ত বেদনায় ভরিয়া গেল। রাগ করিয়াই গাড়িতে গিয়া উঠিলাম; এবং সেই অপদার্থ, পরস্ত্রীতে আসক্ত রোহিণীটাকে বেশ করিয়া যে দুকথা শুনাইয়া আসিব, তাহাই মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে তাহার বাসার অভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ি হইতে নামিয়া, কপাট ঠেলিয়া যখন তাহার বাটীতে প্রবেশ করিলাম, তখন সন্ধ্যার দীপ জ্বালানো হইয়াছে, কি হয় নাই। অর্থাৎ দিনের আলো শেষ হইয়া রাত্রির আঁধার নামিয়া আসিতেছে মাত্র।

সেটা মাহ ভাদরও নয়, ভরা বাদরও নয়,—কিন্তু শূন্য মন্দিরের চেহারা যদি কিছু থাকে ত, সেই আলো-অন্ধকারের মাঝখানে সেদিন যাহা চোখে পড়িল, সে যে এছাড়া আর কি, সে ত আজও জানি না। সব কয়টা ঘরেরই দরজা হাঁ-হাঁ করিতেছে, শুধু রান্নাঘরের একটা জানালা দিয়া ধুঁয়া বাহির হইতেছে। ডান দিকে একটু আগাইয়া গিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, উনুনে জ্বলিয়া প্রায় নিবিয়া আসিয়াছে এবং অদূরে মেঝের উপর রোহিণী বঁটি পাতিয়া একটা বেগুন দুখানা করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। আমার পদশব্দ তাহার কানে যায় নাই; কারণ, কর্ণেন্দ্রিয়ের মালিক যিনি, তিনি তখন আর যেখানেই থাকুন, বেগুনের উপরে যে একাগ্র হইয়া ছিলেন না, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। আরও একটা কথা এমনি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। কিন্তু নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া একে একে সেই ঘর দুটার মধ্যে যখন দাঁড়াইলাম, তখন চোখের উপর স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, সমস্ত সমাজ, সমস্ত ধর্মাধর্ম, সমস্ত পাপ-পুণ্যের অতীত একটা উৎকট বেদনাবিদ্ধ রোদন সমস্ত ঘর ভরিয়া যেন দাঁতে দাঁত চাপিয়া স্থির হইয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া বারান্দার মোড়াটার উপর বসিয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে বোধ করি আলো জ্বালিবার জন্যই রোহিণী বাহির হইয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে ও?

সাড়া দিয়া বলিলাম, আমি শ্রীকান্ত।

শ্রীকান্তবাবু? ওঃ—বলিয়া সে দ্রুতপদে কাছে আসিল এবং ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিয়া আমাকে ভিতরে আনিয়া বসাইল। তাহার পরে কাহারো মুখে কথা নাই—দুজনেই চুপচাপ। আমি প্রথমে কথা কহিলাম। বলিলাম, রোহিণীদা, আর কেন এখানে! চলুন আমার সঙ্গে।

রোহিণী জিজ্ঞাসা করিল, কেন।

বলিলাম, এখানে আপনার কষ্ট হচ্চে, তাই।

রোহিণী কিছুক্ষণ পরে কহিল, কষ্ট আর কি!

তা বটে! কিন্তু এ সকল বিষয়ে ত আলোচনা করা যায় না। কতই-না তিরস্কার করিব, কতই-না সৎপরামর্শ দিব ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছিলাম, সব ভাসিয়া গেল। এত বড় ভালবাসাকে অপমান করিতে পারি—নীতিশাস্ত্রের পুঁথি আমি এত বেশি পড়ি নাই। কোথায় গেল আমার ক্রোধ, কোথায় গেল আমার বিদ্বেষ! সমস্ত সাধুসঙ্কল্প যে কোথায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল, তাহার উদ্দেশও পাইলাম না।

রোহিণী কহিল, সে প্রাইভেট টিউশানিটা ছাড়িয়া দিয়াছে; কারণ তাহাতে শরীর খারাপ করে। তাহার অফিসটাও ভাল নয়—বড় খাটুনি। না হইলে আর কষ্ট কি!

চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ এই রোহিণীর মুখেই কিছুদিন পূর্বে ঠিক উল্টা কথা শুনিয়াছিলাম। সে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, আর এই রাঁধা-বাড়া, অফিস থেকে ক্লান্ত হ'য়ে এসে ভারি বিরক্তিকর। কি বলেন শ্রীকান্তবাবু?

বলিব আর কি। আগুন নিবিয়া গেলে শুধু জলে যে ইঞ্জিন চলে না, এ ত জানা কথা।

তথাপি সে এই বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে রাজী হইল না। কল্পনার ত কেহ সীমানির্দেশ করিয়া দিতে পারে না, সুতরাং সে কথা ধরি না। কিন্তু অসম্ভব আশা যে কোনভাবেই তাহার মনের মধ্যে আশ্রয় পায় নাই, তাহা তাহার কয়টা কথা হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তবুও যে কেন সে এই দুঃখের আগার পরিত্যাগ করিতে চাহে না, তাহা আমি ভাবিয়া পাইলাম না বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না যে, যে হতভাগ্যের গৃহের পথ পর্যন্ত রুদ্ধ হইয়া গেছে, তাহাকে এই শূন্য ঘরের পুঞ্জীভূত বেদনা যদি খাড়া রাখিতে না পারে, ত ধূলিসাৎ হইতে নিবারণ করিবার সাধ্য সংসারে আর কাহারও নাই।

বাসায় পৌঁছিতে একটু রাত্রি হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখি, এক কোণে বিছানা পাতিয়া কে একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। ঝিকে জিজ্ঞাসা করায় কহিল ভদ্রলোক।

তাই আমার ঘরে!

আহারাদির পরে এই ভদ্রলোকটির সহিত আলাপ হইল। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম জেলায়। বছর-চারেক পরে নিরুদ্দিষ্ট ছোট ভাইয়ের সন্ধান মিলিয়াছে। তাহাকেই ঘরে ফিরাইবার জন্য

নিজে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, মশাই, গল্পে শুনি, আগে কামরূপের মেয়েরা বিদেশী পুরুষদের ভেড়া ক'রে ধরে রাখত। কি জানি, সেকালে তারা কি করত; কিন্তু একালে বর্মামেয়েদের ক্ষমতা যে তার চেয়ে একতিল কম নয়, সে আমি হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছি।

আরও অনেক কথা কহিয়া, তিনি ছোট ভাইকে উদ্ধার করিতে আমার সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার এই সাধু উদ্দেশ্য সফল করিতে আমি কোমর বাঁধিয়া লাগিব, কথা দিলাম। কেন, তাহা বলাই বাহুল্য। পরদিন সকালে সন্ধান করিয়া ছোট ভাইয়ের বর্মা-শ্বশুরবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলাম, বড় ভাই আড়ালে রাস্তার উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন।

ছোট ভাই উপস্থিত ছিলেন না, সাইকেল করিয়া প্রাতঃভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়ী নাই, শুধু স্ত্রী তাহার একটি ছোট বোন লইয়া এবং জন-দুই দাসী লইয়া বাস করে। ইহাদের জীবিকা বর্মা-চুরুট তৈরি করা। তখন সকালে সবাই এই কাজেই ব্যাপৃত ছিল। আমাকে বাঙ্গালী দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ তাহার স্বামীর বন্ধু ভাবিয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ করিল। ব্রহ্ম-রমণীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী; কিন্তু পুরুষেরা তেমনি অলস; ঘরের কাজকর্ম্ম হইতে শুরু করিয়া বাহিরের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় সমস্তই মেয়েদের হাতে। তাই লেখাপড়া তাহাদের না শিখিলেই নয়। কিন্তু পুরুষদের আলাদা কথা। শিখিলে ভাল, না শিখিলেও লজ্জায় সারা হইতে হয় না। নিষ্কর্মা পুরুষ স্ত্রীর উপার্জ্জনের অন্ন বাড়িতে ধ্বংস করিয়া বাহিরে তাহারই পয়সায় বাবুয়ানা করিয়া বেড়াইলে, লোকে আশ্চর্য হয় না। স্ত্রীরাও ছি-ছি করিয়া, ঘ্যানঘ্যান, প্যানপ্যান করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলা আবশ্যক মনে করে না। বরঞ্চ ইহাই কতকটা যেন তাহাদের সমাজে স্বাভাবিক আচার বলিয়া স্থির হইয়া গেছে।

মিনিট-দশেকের মধ্যে 'বাবুসাহেব' দ্বিচক্রযানে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গে ইংরাজি পোশাক, হাতে দু-তিনটা আঙটি, ঘড়ি-চেন—কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে হয় না—অথচ অবস্থাও দেখিলাম বেশ স্বচ্ছল। তাঁহার বর্মা-গৃহিণী হাতের কাজ রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুপি এবং ছড়িটা হাত হইতে লইয়া রাখিয়া দিল। ছোট বোন চুরুট, দেশলাই প্রভৃতি আনিয়া দিল, দাসী চায়ের সরঞ্জাম এবং অপরে পানের বাটা আগাইয়া দিল। বাঃ—লোকটাকে যে সবাই মিলিয়া একেবারে রাজার হালে রাখিয়াছে! লোকটার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি। বোধ হয় চারু-টারু এমনি কি-একটা যেন হইবে। যাক্ গে, আমরা নাহয় তাঁকে শুধু বাবু বলিয়াই ডাকিব।

বাবু প্রশ্ন করিলেন, আমি কে?

বলিলাম, আমি তাঁর দাদার বন্ধু।

তিনি বিশ্বাস করিলেন না। বলিলেন, আপনি ত কলকেতিয়া, কিন্তু আমার দাদা ত কখনো সেখানে যাননি। বন্ধুত্ব হ'ল ক্যামনে?

কেমন করিয়া বন্ধুত্ব হইল, কোথায় হইল, কোথায় আছেন ইত্যাদি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্যটাও জানাইলাম এবং তিনি যে ভ্রাতৃরত্নের দর্শনাভিলাষে উদ্গ্রীব হইয়া আছেন, তাহাও নিবেদন করিলাম।

পরদিন সকালেই আমাদের হোটেলে বাবুটির পদধূলি পড়িল, এবং উভয় ভ্রাতায় বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পরে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই হইতেই দুই ভাইয়ের কি যে মিল হইয়া গেল—সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, বাবুটি দাদা বলিয়া ডাক দিয়া যখন তখন আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন এবং ফিসফিস মন্ত্রণা, আলাপ-আপ্যায়ন, খাওয়া-দাওয়ার আর অবধি রহিল না। একদিন অপরাহ্নে দাদাকে ও আমাকে চা-বিস্কুট ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করিয়া গেলেন।

সেই দিন তাঁহার বর্মা-স্ত্রীর সহিত আমার ভাল করিয়া আলাপ হইল। মেয়েটি অতিশয় সরল, বিনয়ী, এবং ভদ্র। ভালবাসিয়া স্বেচ্ছায় ইহাকে বিবাহ করিয়াছে এবং সেই অবধি বোধ করি একদিনের জন্যেও তাহাকে দুঃখ দেয় নাই। দিন-চারেক পরে দাদাটি আমাকে একগাল হাসিয়া কানে কানে জানাইলেন যে, পরশু সকালের জাহাজে তাঁহারা বাড়ি যাইতেছেন। শুনিয়াই কেমন একটা ভয় হইল; জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাই আবার ফিরে আসবেন ত?

দাদা বলিলেন, আবার! রাম রাম ব'লে একবার জাহাজে চড়তে পারলে হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটিকে জানিয়েছেন?

দাদা কহিলেন, বাপরে! তা হ'লে আর রক্ষা থাকবে! বেটির যে যেখানে আছে, রক্তবীজের মত এসে ছেঁকে ধরবে। বলিয়া চোখ দুটো মিটমিট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, ফ্রেণ্ড লিভ মশাই, ফ্রেণ্ড লিভ—এ আর বুঝলেন না?

অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইল; কহিলাম, মেয়েটি ত তা হলে ভারি কষ্ট পাবে?

আমার কথা শুনিয়া দাদা ত একেবারে হাসিয়াই আকুল। কোনমতে হাসি থামিলে, বলিতে লাগিলেন, শোন কথা একবার। বর্মা-বেটিদের আবার কষ্ট! এ শালার জেতের লোক খেয়ে আঁচায় না—না আছে এঁটোকাঁটার বিচার, না আছে একটা জাতজন্ম। বেটিরা সব নেপ্পী (এক প্রকার পচা মাছ যাহাকে 'ঙাপি' বলে) খায়, মশাই নেপ্পী খায়! গন্ধের চোটে ভূত-পেত্নী পালায়। এ ব্যাটা-বেটীদের আবার কষ্ট! একটা যাবে, আর একটা পাকড়াবে—ছোটজাত ব্যাটারা—

থামুন মশাই, থামুন, আপনার ভাইটিকে যে এই চার বছর ধ'রে রাজার হালে খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, আর কিছু না হোক, তারও ত একটা কৃতজ্ঞতা আছে!

দাদার মুখ গম্ভীর হইল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আপনি যে অবাক করলেন মশাই! পুরুষবাচ্চা বিদেশ-বিভুঁয়ে এসে বয়সের দোষে নাহয় একটা শখ ক'রেই ফেলেচে। কোন্ মানুষটাই বা না করে বলুন? আমার ত আর জানতে বাকী নেই, এর না-হয় একটু জানাজানি হ'য়েই পড়েচে—তাই ব'লে বুঝি চিরকালটা এমনি ক'রেই বেড়াতে হবে। ভাল হ'য়ে সংসার-ধর্ম ক'রে পাঁচজনের একজন হ'তে হবে না? মশাই, এ বা কি! কাঁচা বয়সে কত লোক হোটেলে ঢুকে যে মুরগি পর্যন্ত খেয়ে আসে। কিন্তু বয়স পাকলে কি আর তাই করে, না, করলে চলে? আপনিই বিচার করুন না, কথাটা সত্যি বলচি, না মিথ্যে বলচি!

বস্তুতঃই এ বিচার করিবার মত বুদ্ধি আমাকে ভগবান দেন নাই, সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম। অফিসের বেলা হইতেছিল, স্নানাহার করিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

কিন্তু অফিস হইতে ফিরিলে তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, ভেবে দেখলাম, আপনার পরামর্শই ভাল মশাই। এ জাতকে বিশ্বাস নেই, কি জানি, শেষে একটা ফ্যাসাদ বাধাবে না কি,—ব'লে যাওয়াই ভালো। এ বেটীরা আর পারে না কি! না আছে লজ্জাসরম, না আছে একটা ধর্মজ্ঞান! জানোয়ার বললেই ত চলে!

বলিলাম, হ্যাঁ, সেই ভাল।

কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কেমন যেন মনে হইতে লাগিল, ভিতরে কি একটা ষড়যন্ত্র আছে। ষড়যন্ত্র সত্যই ছিল। কিন্তু সে যে এত নীচ, এত নিষ্ঠুর, তাহা চোখে না দেখিলে কেহ কল্পনা করিতে পারে বলিয়াও ভাবিতে পারি না।

চট্টগ্রামের জাহাজ রবিবারে ছাড়ে। অফিস বন্ধ, সকালবেলাটায় করিই বা কি, তাই তাঁকে see off করিতে জাহাজঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলাম। জাহাজ তখন জেটিতে ভিড়িয়াছে, যাহারা যাইবে এবং যাহারা যাইবে না—এই দুই শ্রেণীর লোকেরই ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকিতে কে বা কাহার কথা শুনে—এমনি ব্যাপার। এদিকে ওদিকে চাহিতেই সেই বর্মা-মেয়েটির দিকে চোখ পড়িল। একধারে সে ছোট বোনটির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সারা রাত্রির কান্নায় তাহার চোখ দুটি ঠিক জবাফুলের মত রাঙ্গা। ছোটবাবু মহা ব্যস্ত। তাঁহার দুচাকার গাড়ি লইয়া, তোরঙ্গ বিছানা লইয়া, আরও কত কি যে লট-বহর লইয়া কুলিদের সহিত দৌড়-ধাপ করিয়া ফিরিতেছেন—তাঁহার মুহূর্ত অবসর নাই।

ক্রমে সমস্ত জিনিসপত্র জাহাজে উঠিল, যাত্রীরা সব ঠেলাঠেলি করিয়া গিয়া উপরে উঠিল, অ-যাত্রীরা নামিয়া আসিল, সুমুখের দিকে নোঙ্গর-তোলা চলিতে লাগিল—এইবার ছোটবাবু তাঁহার দ্রব্য-সম্ভারের হেফাজত করিয়া, জায়গা ঠিক করিয়া তাঁহার বর্মা-স্ত্রীর কাছে বিদায়ের ছলে সংসারের নিষ্ঠুরতম এক অঙ্কের অভিনয় করিতে জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী—সে অধিকার তাঁহার ছিল।

আমি অনেক সময় ভাবি, ইহার কি প্রয়োজন ছিল? কেন মানুষ গায়ে পড়িয়া আপনার মানব-আত্মাকে এমন করিয়া অপমানিত করে। সে মন্ত্র-পড়া স্ত্রী নাই বা হইল, কিন্তু সে ত নারী! সে ত কন্যা-ভগিনী-জননীর জাতি। তাহারই আশ্রয়ে সে ত এই সুদীর্ঘ কাল স্বামীর

সমস্ত অধিকার লইয়া বাস করিয়াছে। তাহারই বিশ্বস্ত হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য, সমস্ত অমৃত সে ত সমস্ত কায়মনে তাহাকেই নিবেদন করিয়া দিয়াছিল! তবে কিসের লোভে সে এই অগণিত লোকের চক্ষে তাহাকেই এত বড় নির্দয় বিদ্রূপ ও হাসির পাত্রী করিয়া ফেলিয়া গেল। লোকটা এক হাতে রুমাল দিয়া নিজের দুচক্ষু আবৃত করিয়া এবং অপর হাতে তাহার বর্মা-স্ত্রীর গলা ধরিয়া কান্নার সুরে কি-সব বলিতেছে; এবং মেয়েটি আঁচলে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে।

আশেপাশে অনেকগুলি বাঙ্গালী ছিল। তাহারা কেহ মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছে; কেহবা মুখে কাপড় গুঁজিয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি একটু দূরে ছিলাম বলিয়া প্রথমটা কথাগুলো বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু কাছে আসিতেই সকল কথা স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। লোকটা রোদনের কণ্ঠে বর্মা-ভাষায় এবং বাঙ্গলা ইতর ভাষায় মিশাইয়া বিলাপ করিতেছে। বাঙ্গলাটা কথঞ্চিত মার্জিত করিয়া লিখিলে এইরূপ শুনায়,—একমাস পরে রংপুর হইতে তামাক কিনিয়া যা আসিব, তা আমিই জানি। ওরে আমার রতনমণি! তোকে কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম রে, কদলী প্রদর্শন করিয়া চলিলাম।

এগুলি শুধু আমাদের মত কয়েকজন অপরিচিত বাঙ্গালী দর্শকদের আমোদ দিবার জন্যই; কিন্তু মেয়েটি ত বাঙ্গলা বুঝে না, শুধু কান্নার সুরেই তাহার যেন বুক ফাটিয়া যাইতেছে, এবং কোনমতে সে হাত তুলিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

লোকটা টানিয়া টানিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া বলিতে লাগিল, মোটে পাঁচশ' টাকা তামাক কিনতে দিলি—আর যে তোর কিছু নেই—পেট ভরল না—অমনি তোর বাড়িটাও বিক্রি করিয়ে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যেতে পারতাম, তবে ত বুঝতাম একটা দাঁও মারা গেল। এ যে কিছুই হ'ল না রে! কিছুই হ'ল না!

আশেপাশে লোকগুলা অবরুদ্ধ হাস্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু যাহাকে লইয়া, এত আমোদ, তাহার চক্ষু-কর্ণ তখন দুঃখের বাষ্পে একেবারে সমাচ্ছন্ন! মনে হইতে লাগিল, বুঝি বেদনার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়ে বা।

খালাসীরা উপর হইতে ডাকিয়া কহিল, বাবু, সিঁড়ি তোলা হচ্ছে।

লোকটা গলা ছাড়িয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিল। মেয়েটির হাতে সাবেক-কালের একটি ভাল চুনির আংটি ছিল, সেইটির উপর হাত রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ওরে, দে রে, আংটিটাও বাগিয়ে নিয়ে যাই। যেমন ক'রে হোক দুশ-আড়াইশ' টাকা দাম হবে—এটাই বা ছাড়ি কেন!

মেয়েটি তাড়াতাড়ি সেটি খুলিয়া প্রিয়তমের আঙ্গুলে পরাইয়া দিল। যথা লাভ! বলিয়া লোকটা কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া উপরে গিয়া উঠিল। জাহাজ জেটি ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, এবং মেয়েটি মুখে আঁচল চাপা দিয়া হাঁটু গাড়িয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। অনেকেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। কেহ বা কহিল, আচ্ছা ছেলে! কেহ বা বলিল, বাহাদুর ছোকরা! অনেকেই বলিতে বলিতে গেল, কি মজাটাই করলে! হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধ'রে গেল। এম্‌নি কত কি মন্তব্য। শুধু আমি কেবল সেই সকলের হাসি-তামাশার পাত্রী বোকা মেয়েটার অপরিসীম দুঃখের নিঃশব্দ সাক্ষীর মত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ছোট বোনটি চোখ মুছিতে মুছিতে পাশে দাঁড়াইয়া দিদির হাত ধরিয়া টানিতেছিল। আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই, সে আস্তে আস্তে কহিল, বাবুজী এসেছেন, দিদি, ওঠো!

মুখ তুলিয়া সে আমার প্রতি চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কান্না তাহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আমার সান্ত্বনা দিবার কি-ই বা ছিল! তবুও সেদিন তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারিলাম না। তাহারই পিছনে পিছনে তাহারই গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। সমস্ত পথটা সে কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু এই কথাই বলিতে লাগিল, বাবুজী, বাড়ি আমার আজ খালি হইয়া গেছে। কি করিয়া আমি সেখানে গিয়া ঢুকিব। একমাসের জন্য তামাক কিনিতে গেছেন—এই একটা মাস আমি কি করিয়া কাটাইব। বিদেশে না জানি কত কষ্টই হবে, কেন আমি যাইতে দিলাম। রেঙ্গুনের বাজারে তামাক কিনিয়া ত এতদিন আমাদের চলিতেছিল;

—কেন তবে বেশি লাভের আশায় এতদূরে তাঁকে পাঠাইলাম। দুঃখে আমার বুক ফাটিতেছে বাবুজী, আমি পরের মেলেই তাঁর কাছে চলিয়া যাইব। এমনি কত কি!

আমি একটা কথারও জবাব দিতে পারিলাম না, শুধু মুখ ফিরাইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চোখের জল গোপন করিতে লাগিলাম।

মেয়েটি কহিতে লাগিল, বাবুজী, তোমাদের জাতের লোক যত ভালবাসিতে পারে, এমন আমাদের জাতের লোক নয়। তোমাদের মত দয়া-মায়া আর কোন দেশের লোকের নাই।

একটু থামিয়া আবার বার দুই-তিন চোখ মুছিয়া কহিতে লাগিল, বাবুজীকে ভালবাসিয়া যখন দুজনে একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলাম, কত লোক আমাকে ভয় দেখাইয়া নিষেধ করিয়াছিল; কিন্তু আমি কারও কথা শুনি নাই। এখন কত মেয়ে আমাকে হিংসা করে।

চৌমাথার কাছে আসিয়া আমি বাসায় যাইতে চাহিলে, সে ব্যাকুল হইয়া দুই হাত দিয়া গাড়ির দরজা আটকাইয়া বলিল, না বাবুজী, তা হবে না। তুমি আমার সঙ্গে গিয়া এক পিয়ালা চা খাইয়া আসিবে চল।

আপত্তি করিতে পারিলাম না। গাড়ি চলিতে লাগিল। সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবুজী, রংপুর কত দূরে? তুমি কখনো গিয়াছ? সে কেমন জায়গা? অসুখ করিলে ডাক্তার মিলে ত?

বাহিরের দিকে চাহিয়া জবাব দিলাম, হাঁ, মিলে বৈ কি।

সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ফয়া ভাল রাখুন। তাঁর দাদাও সঙ্গে আছেন, তিনি খুব ভাল লোক, ছোট ভাইকে প্রাণ দিয়া দেখিবেন। তোমাদের যে মায়ার শরীর! আমার কোন ভাবনা নাই, না বাবুজী?

চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া শুধু ভাবিতে লাগিলাম, এ মহাপাতকের কতখানি অংশ আমার নিজের? আলস্যবশতঃই হোক বা চক্ষুলজ্জাতেই হোক, বা হতবুদ্ধি হইয়াই হোক, এই যে মুখ বুজিয়া এতবড় অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে দেখিলাম, কথাটি কহিলাম না, ইহার অপরাধ হইতে কি আমি অব্যাহতি পাইব? আর তাই যদি হইবে, ত মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারি না কেন? তাহার চোখের প্রতি চাহিতে সাহস হয় না কিসের জন্য?

চা-বিস্কুট খাইয়া, তাহাদের বিবাহিত জীবনের লক্ষ কোটি তুচ্ছ ঘটনার বিস্তৃত ইতিহাস শুনিয়া যখন বাটীর বাহির হইলাম, তখন বেলা আর বেশি নাই। ঘরে ফিরিতে প্রবৃত্তি হইল না। দিনের শেষে কর্ম-অন্তে সবাই বাসায় ফিরিয়াছে—দাঠাকুরের হোটেল তখন নানাবিধ কলহাস্যে মুখরিত। এই সমস্ত গোলমাল যেন বিষের মত মনে হইতে লাগিল।

একাকী পথে পথে ঘুরিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, এ সমস্যার মীমাংসা হইত কি করিয়া? বর্মাদের মধ্যে বিবাহের বিশেষ কিছু একটা বাঁধাধরা নিয়ম নাই। বিবাহের ভদ্র অনুষ্ঠানও আছে, আবার স্বামী-স্ত্রীর মত যে কোন নর-নারী তিন দিন একত্রে বাস করিয়া তিন দিন এক পাত্র হইতে ভোজন করিলেও সে বিবাহ। সমাজ তাহাদের অস্বীকার করে না। সে হিসাবে মেয়েটিকে কোন মতেই ছোট করিয়া দেখা যায় না। আবার বাবুটির দিক দিয়া হিন্দু-আইন-কানুনে এটা কিছুই নয়। এই স্ত্রী লইয়া সে দেশে গিয়া বাস করিতে পারে না। হিন্দুসমাজ তাহাদের গ্রহণ নাহয় নাই করিল, কিন্তু আপামরসাধারণ যে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে, সেও সারা জীবন সহ্য করা কঠিন। হয় চিরকাল প্রবাসে নির্বাসিতের ন্যায় বাস করা, নাহয়, এই দাদাটি ছোট ভাইয়ের যে ব্যবস্থা করিল, তাহাই ঠিক। অথচ ধর্ম কথাটার যদি কোন অর্থ থাকে ত—সে হিন্দুরই হোক, বা আর কোন জাতিরই হোক—এত বড় একটা নৃশংস ব্যাপার যে কি করিয়া ঠিক হইতে পারে সে ত আমার বুদ্ধির অতীত। এই সকল কথা নাহয় সময়মত চিন্তা করিয়া দেখিব; কিন্তু এই যে কাপুরুষটা আজ বিনাদোষে এই অনন্যনির্ভর নারীর পরম স্নেহের উপর বেদনার বোঝা চাপাইয়া, তাহাকে মুখ ভ্যাঙচাইয়া পলায়ন করিল, এই আক্রোশটাই আমাকে যেন দগ্ধ করিতে লাগিল।

পথের একধার দিয়া চলিয়াছি ত চলিয়াছি। বহুদিন পূর্বে একদিন অভয়ার পত্র পড়িবার জন্য যে চায়ের দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই দোকানদারটি বোধ করি, আমাকে চিনিতে পারিয়া ডাক দিয়া কহিল, বাবুসাব, আইয়ে।

হঠাৎ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিলাম, এ সেই দোকান এবং ওই রোহিণীর বাসা। বিনা বাক্যে তাহার আহ্বানের মর্যাদা রাখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া এক পেয়ালা চা পান করিয়া বাহির হইলাম। রোহিণীর দরজায় ঘা দিয়া দেখিলাম ভিতর হইতে বন্ধ। কড়া ধরিয়া বার-দুই নাড়া দিতেই কবাট খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখি, সম্মুখে অভয়া।

তুমি যে?

অভয়ার চোখ-মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল; এবং কোন জবাব না দিয়াই সে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া গিয়া তাহার ঘরে ঢুকিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু লজ্জার যে মূর্তি সন্ধ্যার সেই অস্পষ্ট আলোকেও তাহার মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম, তাহাতে জিজ্ঞাসা করিবার, প্রশ্ন করিবার আর কিছুই রহিল না। অভিভূতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরবে ফিরিয়া যাইতেছিলাম—অকস্মাৎ আমার দুই কানের মধ্যে যেন দুরকম কান্নার সুর একই সঙ্গে বাজিয়া উঠিল। একটা সেই পাপিষ্ঠের, অপরটা সেই বর্মা মেয়েটির। চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়াইলাম। মনে মনে বলিলাম, না, এমন করিয়া অপমান করিয়া আর আমার যাওয়া হইবে না। নাই, নাই—এমন বলিতে নাই, এমন করিতে নাই—এ উচিত নয়, এ ভাল নয়—এসব অভ্যাস মত অনেক শুনিয়াছি, অনেক শুনাইয়াছি, কিন্তু আর না। কি ভাল, কি মন্দ, কেন ভাল, কোথায় কাহার কিসে মন্দ—এ সকল প্রশ্ন পারি যদি তাহার নিজের মুখে শুনিয়া তাহারই মুখের পানে চাহিয়া বিচার করিব; না পারি ত শুধু পুঁথির লেখা অক্ষরের প্রতি চোখ পাতিয়া মীমাংসা করিবার অধিকার আমার নাই, তোমার নাই, বোধ করি বা বিধাতারও নাই।

দশ

হঠাৎ অভয়া দ্বার খুলিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল,, কহিল, জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধ-সংস্কারের ধাক্কাটা প্রথমে সামলাতে পারিনি বলেই পালিয়েছিলুম শ্রীকান্তবাবু, নইলে ওটা আমার সত্যিকারের লজ্জা বলে ভাববেন না যেন।

তাহার সাহস দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। অভয়া কহিল, আপনার বাসায় ফিরে যেতে আজ একটু দেরি হবে। রোহিণীবাবু এলেন ব'লে। আজ দুজনেই আমরা আপনার আসামী। বিচারে অপরাধ সাব্যস্ত হয়, আমরা তার দণ্ড নেব।

রোহিণীকে 'বাবু' বলিতে এই প্রথম শুনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি ফিরে এলেন কবে?

অভয়া কহিল, পরশু। কি হয়েছিল, জানতে নিশ্চয় আপনার কৌতূহল হচ্ছে। বলিয়া সে নিজের দক্ষিণ বাহু অনাবৃত করিয়া দেখাইল, বেতের দাগ চামড়ার উপর কাটিয়া কাটিয়া বসিয়াছে। বলিল, এমন আরও অনেক আছে, যা আপনাকে দেখাতে পারলুম না।

যে-সকল দৃশ্যে মানুষের পৌরুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে ইহা তাহারই একটা। অভয়া আমার স্তব্ধকঠিন মুখের প্রতি চাহিয়া চক্ষের নিমেষে সমস্ত বুঝিয়া ফেলিল, এবং এইবার একটুখানি হাসিয়া কহিল, কিন্তু ফিরে আসার এই আমার একমাত্র কারণ নয় শ্রীকান্তবাবু, আমার সতীধর্মের এ সামান্য একটু পুরস্কার। তিনি যে স্বামী আর আমি যে তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী, এ তারই একটু চিহ্ন।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে পুনরায় কহিতে লাগিল, আমি যে স্ত্রী হ'য়েও স্বামীর বিনা অনুমতিতে এত দূরে এসে তাঁর শান্তি ভঙ্গ করেচি,—মেয়েমানুষের এত বড় স্পর্ধা পুরুষমানুষে সইতে পারে না। এ সেই শাস্তি। তিনি অনেক রকমে ভুলিয়ে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন, কেন রোহিণীর সঙ্গে এসেচি। বললুম, স্বামীর ভিটে যে কি, সে আমি আজও জানিনে। আমার বাপ নেই, মা মারা গেছেন—দেশে খেতে-পরতে দেয় এমন কেউ নেই; তোমাকে বার বার চিঠি লিখে জবাব পাইনে।

তিনি একগাছা বেত তুলে নিয়ে বললেন, আজ তার জবাব দিচ্চি। এই বলিয়া অভয়া তাহার প্রহৃত দক্ষিণ বাহুটা আর একবার স্পর্শ করিল।

সেই নিরতিশয় হীন অমানুষ বর্বরতার বিরুদ্ধে আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা পুনরায়

আলোড়িত হইয়া উঠিল; কিন্তু যে অন্ধ-সংস্কারের ফল বলিয়া অভয়া আমাকে দেখিবামাত্রই ছুটিয়া লুকাইয়াছিল, সে সংস্কার ত আমারও ছিল! আমিও ত তাহার অতীত নই! সুতরাং, বেশ করিয়াছ, একথাও বলিতে পারিলাম না, অপরাধ করিয়াছ, এমন কথাও মুখ দিয়া বাহির হইতে চাহিল না। অপরের একান্ত সঙ্কটের কালে যখন নিজের বিবেক ও সংস্কারে, স্বাধীন চিন্তায় ও পরাধীন জ্ঞানে সংঘর্ষ বাধে, তখন উপদেশ দিতে যাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলাম, চ'লে আসাটা যে অন্যায় এ-কথা আমি বলতে পারিনে, কিন্তু—

অভয়া কহিল, এই কিন্তুটার বিচারই ত আপনার কাছে চাইচি শ্রীকান্তবাবু। তিনি তাঁর বর্মা-স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্ছিনে, কিন্তু স্বামী যখন সুধুমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তার পরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই ত আপনার কাছে জানতে চাইচি।

আমি কিন্তু চুপ করিয়া রহিলাম। সে আমার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া পুনরায় কহিল, অধিকার ছাড়া ত কর্তব্য থাকে না শ্রীকান্তবাবু, এটা ত খুব মোটা কথা। তিনিও ত আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে, তাঁর ইচ্ছাকে ত এতটুকু বাধা দিতে পারলে না! অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল,—কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়েমানুষ ব'লে আমারি উপরে? শ্রীকান্তবাবু, আপনি একটা কিন্তু পর্যন্ত ব'লেই থেমে গেলেন। অর্থাৎ সেখান থেকে চ'লে আসাটা আমার অন্যায় হয়নি, কিন্তু,—এই কিন্তুটার অর্থ কি এই যে, যার স্বামী এত বড় অপরাধ করেচে তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন জীবন্মৃত হ'য়ে থাকাই তার নারী-জন্মের চরম সার্থকতা? একদিন আমাকে দিয়ে বিয়ের মন্ত্র বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল—সেই বলিয়ে নেওয়াটাই কি আমার জীবনে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই একেবারে মিথ্যা? এত বড় অন্যায়, এত বড় নিষ্ঠুর অত্যাচার কিছুই আমার পক্ষে একেবারে কিছু না? আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই—সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনা দোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই? এই জন্যেই কি ভগবান মেয়েমানুষ গড়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? সব জাত, সব ধর্মেই এ অবিচারের প্রতিকার আছে—আমি হিন্দুর ঘরে জন্মেচি বলেই কি আমার সকল দিক বন্ধ হ'য়ে গেছে শ্রীকান্তবাবু?

আমাকে মৌন দেখিয়া অভয়া বলিল, জবাব দিন না শ্রীকান্তবাবু?

বলিলাম, আমার জবাবে কি যায় আসে? আমার মতামতের জন্য ত আপনি অপেক্ষা করেন নি?

অভয়া কহিল, কিন্তু তার ত সময় ছিল না।

কহিলাম, তা হবে। কিন্তু আপনি যখন আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন, তখন আমিও চ'লে যাচ্ছিলুম। কিন্তু আবার ফিরে এলুম কেন জানেন?

না।

ফিরে আসবার কারণ, আজ আমার ভারি মন খারাপ হ'য়ে আছে। আপনাদের চেয়ে ঢের বেশি নিষ্ঠুর আচরণ একটি মেয়ের উপর হ'তে আজই সকালে দেখেচি। এই বলিয়া জাহাজ-ঘাটের সেই বর্মা-মেয়েটির সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই মেয়েটির কি উপায় হবে, আপনি ব'লে দিতে পারেন?

অভয়া শিহরিয়া উঠিল। তার পরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি বলতে পারিনে।

কহিলাম, আপনাকে আরও দুটি মেয়ের ইতিহাস আজ শোনাব। একটি আমার অন্নদা-দিদি, অপরটির নাম পিয়ারী বাইজী। দুঃখের ইতিহাসে এঁদের কারুর স্থানই আপনার নীচে নয়।

অভয়া চুপ করিয়া রহিল। আমি অন্নদাদিদির সমস্ত কথা আগাগোড়া বলিয়া চাহিয়া

দেখিলাম, অভয়া কাঠের মূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে, তাহার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া সে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া উঠিয়া বসিল। আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, তার পরে?

বলিলাম, তার পরে আর জানিনে। এইবার পিয়ারী বাইজীর কথা শুনুন। তার নাম যখন রাজলক্ষ্মী ছিল, তখন থেকে একজনকে সে ভালবাসত। কি রকম ভালবাসা জানেন? রোহিণীবাবু আপনাকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি। এ আমি স্বচক্ষে দেখে গেছি ব'লেই তুলনা দিতে পারলুম। তার পরে বহুকাল পরে হঠাৎ একদিন দুজনের দেখা হয়। তখন সে আর রাজলক্ষ্মী নয়, পিয়ারী বাইজী। কিন্তু রাজলক্ষ্মী যে মরেনি, পিয়ারীর মধ্যে চির-দিনের জন্যে অমর হ'য়ে ছিল, সেইদিন তার প্রমাণ হ'য়ে যায়।

অভয়া উৎসুক হইয়া বলিল, তার পরে?

পরের ঘটনা একটি একটি করিয়া সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলাম, তার পরে এমন একদিন এসে পড়ল, যেদিন পিয়ারী তার প্রাণাধিক প্রিয়তমকে নিঃশব্দে দূরে সরিয়ে দিলে।

অভয়া জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে কি হ'ল জানেন?

জানি। তার পরে আর নেই।

অভয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনি কি এই বলতে চান যে, আমি একা নই—এমনি দুর্ভাগ্য মেয়েমানুষের অদৃষ্টে চিরদিন ঘটে আসচে, এবং সে দুঃখ সহ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব?

আমি কহিলাম, আমি কিছুই বলতে চাইনে। শুধু এইটুকু আপনাকে জানাতে চাই, মেয়েমানুষ পুরুষমানুষ নয়। তাদের আচার-ব্যবহার এক তুলাদণ্ডে ওজন করাও যায় না, গেলেও তাতে সুবিধা হয় না।

কেন হয় না, বলতে পারেন?

না, তাও পারিনে। তা ছাড়া আজ আমার মন এমনি উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে আছে যে, এই সব জটিল সমস্যার মীমাংসা করবার সাধ্যই নেই। আপনার প্রশ্ন আমি আর একদিন ভেবে দেখব। তবে আজ শুধু আপনাকে এই কথাটি বলে যেতে পারি যে, আমার জীবনে আমি যে-ক'টি বড় নারী-চরিত্র দেখতে পেয়েচি, সবাই তারা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হ'য়ে আছেন। আমার অন্নদাদিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই করতে পারতেন না, এ আমি শপথ করেই বলতে পারি। সে ভার অসহ্য হ'লেও যে তিনি কখনো আপনার পথে পা দিতে পারেন, এ কথা ভাবলেও হয়ত দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে!

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, আর সেই রাজলক্ষ্মী! তার ত্যাগের দুঃখ যে কত বড়, সে ত আমি চোখে দেখেই এসেচি। এই দুঃখের জোরেই আজ সে আমার সমস্ত বুক জুড়ে আছে।

অভয়া চমকিয়া কহিল, তবে আপনিই কি তাঁর—

বলিলাম, তা না হ'লে সে এত স্বচ্ছন্দে আমাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না, হারাবার ভয়ে প্রাণপণে কাছে টেনে রাখতেই চাইত।

অভয়া বলিল, তার মানে রাজলক্ষ্মী জানে আপনাকে তার হারাবার ভয় নেই।

আমি বলিলাম, শুধু ভয় নয়—রাজলক্ষ্মী জানে আমাকে তার হারাবার জো নেই। পাওয়া এবং হারানোর বাহিরে একটা সম্বন্ধ আছে; আমার বিশ্বাস সে তাই পেয়েচে ব'লে আমাকেও এখন তার দরকার নেই! দেখুন, আমি নিজেও বড় এ জীবনে কম দুঃখ পাইনি। তার থেকে এই বুঝেচি. দুঃখ জিনিসটা অভাব নয়, শূন্যও নয়। ভয় ছাড়া যে দুঃখ, তাকে সুখের মতই উপভোগ করা যায়।

অভয়া অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আমি আপনার কথা বুঝেচি শ্রীকান্তবাবু! অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী এঁরা দুঃখটাকেই জীবনে সম্বল পেয়েছেন! কিন্তু আমার তাও হাতে নেই। স্বামীর কাছে পেয়েচি আমি অপমান—শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেচি। এই মূলধন নিয়েই কি আমাকে বেঁচে থাকতে আপনি বলেন?

অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া অভয়া পুনরায় বলিল, এঁদের সঙ্গে

আমার জীবনের কোথাও মিল নেই শ্রীকান্তবাবু। সংসারে সব নর-নারীই এক ছাঁচে তৈরি নয়, তাদের সার্থক হবার পথও জীবনে শুধু একটা নয়। তাদের শিক্ষা, তাদের প্রবৃত্তি, তাদের মনের গতি কেবল একটা দিক দিয়েই চালিয়ে তাদের সফল করা যায় না। তাই সমাজে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। আমার জীবনটাই একবার ভাল ক'রে আগাগোড়া ভেবে দেখুন দেখি। আমাকে যিনি বিয়ে করেছিলেন, তাঁর কাছে না এসেও আমার উপায় ছিল না, আর এসেও উপায় হ'ল না। এখন তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেপুলে, তাঁর ভালবাসা কিছুই আমার নিজের নয়। তবুও তাঁরই কাছে তাঁর একটা গণিকার মত পড়ে থাকাতেই কি আমার জীবন ফুলে-ফলে ভরে উঠে সার্থক হ'তো শ্রীকান্তবাবু? আর সেই নিষ্ফলতার দুঃখটাই সারা জীবন ব'য়ে বেড়ানোই কি আমার নারী-জন্মের সবচেয়ে বড় সাধনা? রোহিণীবাবুকে ত আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা ত আপনার অগোচর নেই; এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু ক'রে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে শ্রীকান্তবাবু।

হাত তুলিয়া অভয়া চোখের কোণদুটো মুছিয়া ফেলিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর ক'রে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ ক'রে দেব? যে বিধাতা ভালবাসা দিয়েচেন, তিনি কি তাতেই খুশি হবেন? আমাকে আপনি যা ইচ্ছা হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুশি বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় ব'লে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। তা হ'লে তারা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যাবে।

অভয়া চুপ করিল, কিন্তু সমস্ত আকাশটা যেন আমার চোখের সম্মুখে কাঁপিতে লাগিল। মুহূর্তকালের জন্য মনে হইল, এই মেয়েটির মুখের কথাগুলি যেন রূপ ধরিয়া বাহিরে আসিয়া আমাদের উভয়কে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এম্‌নিই বটে! সত্য যখন সত্যই মানুষের হৃদয় হইতে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন মনে হয় যেন ইহারা সজীব; যেন ইহাদের রক্তমাংস আছে; যেন তার ভিতরে প্রাণ আছে—নাই বলিয়া অস্বীকার করিলে যেন ইহারা আঘাত করিয়া বলিবে, চুপ কর; মিথ্যা তর্ক করিয়া অন্যায়ের সৃষ্টি করিয়ো না।

অভয়া সহসা একটা সোজা প্রশ্ন করিয়া বসিল; কহিল, আপনি নিজে কি আমাদের অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখবেন শ্রীকান্তবাবু? আর আমাদের বাড়িতে আসবেন না?

উত্তর দিতে আমাকে কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিতে হইল। তার পরে বলিলাম, অন্তর্যামীর কাছে আপনারা হয়ত নিষ্পাপ—তিনি আপনাদের কল্যাণ করবেন। কিন্তু মানুষ ত মানুষের অন্তর দেখতে পায় না—তাদের ত প্রত্যেকের হৃদয় অনুভব ক'রে বিচার করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকের জন্য আলাদা নিয়ম গড়তে গেলে ত তাদের সমাজের কাজকর্ম শৃঙ্খলা সমস্তই ভেঙ্গে যায়।

অভয়া কাতর হইয়া কহিল, যে ধর্মে, যে সমাজের মধ্যে আমাদের তুলে নেবার মত উদারতা আছে, স্থান আছে, আপনি কি তবে সেই সমাজেই আমাকে আশ্রয় নিতে বলেন?

ইহার কি জবাব, ভাবিয়া পাইলাম না।

অভয়া কহিল, আপনার লোক হয়ে আপনার জনকে আপনারা সঙ্কটের কালে আশ্রয় দিতে পারবেন না, সে আশ্রয় আমাদের ভিক্ষে নিতে হবে পরের কাছে? তাতে কি গৌরব বাড়ে শ্রীকান্তবাবু?

প্রত্যুত্তরে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস্ ছাড়া আর কিছুই মুখ দিয়া বাহির হইল না।

অভয়া নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকার পরে কহিল, যাক, আপনারা জায়গা নাই দিন, আমার সান্ত্বনা এই যে, জগতে আজও একটা বড় জাত আছে, যারা প্রকাশ্যে এবং স্বচ্ছন্দে স্থান দিতে পারে।

তাহার কথাটায় একটু আহত হইয়া কহিলাম, সকল ক্ষেত্রে আশ্রয় দেওয়াই কি ভাল কাজ ব'লে মেনে নিতে হবে?

অভয়া বলিল, তার প্রমাণ ত হাতে হাতে রয়েছে শ্রীকান্তবাবু। পৃথিবীতে কোন অন্যায়ই বেশি দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে না। এই যদি সত্যি হয়, তাহলে কি তারা অন্যায়-টাকেই প্রশ্রয় দিয়ে দিন দিন বড় হয়ে উঠছে, আর আপনারা ন্যায়-ধর্ম আশ্রয় করেই প্রতিদিন ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছেন বলতে হবে? আমরা ত এখানে অল্প দিন এসেচি, কিন্তু এর মধ্যেই আমি দেখেচি, মুসলমানেতে এ দেশটা ছেয়ে যাচ্চে! শুনেচি এমন গ্রাম নাকি নেই, যেখানে একঘর মুসলমানও বাস করেনি, যেখানে একটা মসজিদও তৈরি হয়নি। আমরা হয়ত চোখে দেখে যেতে পাব না, কিন্তু এমন দিন শীঘ্র আসবে যেদিন আমাদের দেশের মত এই বর্মা দেশটাও একটা মুসলমান-প্রধান স্থান হয়ে উঠবে। আজ সকালেই জাহাজঘাটে যে অন্যায় দেখে আপনার মন খারাপ হয়ে আছে, আপনিই বলুন ত, কোন মুসলমান বড় ভাইয়েরই কি ধর্ম এবং সমাজের ভয়ে এই ষড়যন্ত্র, এই হীনতার আশ্রয় নিয়ে এমন একটা আনন্দের সংসার ছারখার ক'রে দিয়ে পালাবার প্রয়োজন হ'তো? বরঞ্চ সে সবাইকে দলে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ ক'রে অগ্রজের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতো। কোন্‌টাতে সত্যকার ধর্ম বজায় থাকতো শ্রীকান্তবাবু?

গভীর শ্রদ্ধাভরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, আপনি ত পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আপনি এত কথা জানলেন কি করে? আমার ত মনে হয় না, এত বড় প্রশস্ত হৃদয় আমাদের পুরুষ-মানুষের মধ্যেও বেশি আছে। আপনি যার মা হবেন, তাকে দুর্ভাগা ব'লে ভাবতে ত অন্ততঃ আমি কোন মতেই পারবো না।

অভয়া ম্লানমুখে একটুখানি হাসির আভাস ফুটাইয়া বলিল, তা হলে শ্রীকান্তবাবু, আমাকে সমাজ থেকে বার করে দিলেই কি হিন্দুসমাজ বেশি পবিত্র হয়ে উঠবে? তাতে কি কোন দিক দিয়েই সমাজে ক্ষতি পৌঁছুবে না?

একটু স্থির থাকিয়া পুনরায় একটু হাসিয়া কহিল, আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাব না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়ে আমি চিরদিন আপনাদের হয়েই থাকব। আমার একটি সন্তানকেও যদি কোন দিন মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি, সেদিন আমার সকল দুঃখ সার্থক হবে, এই আশা নিয়ে আমি বেঁচে থাকব। সত্যিকার মানুষই মানুষের মধ্যে বড়, না তার জন্মের হিসাবটাই জগতের বড়, এ আমাকে যাচাই ক'রে দেখতে হবে।

এগার

মনোহর চক্রবর্তী বলিয়া একটি প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। দাঠাকুরের হোটেলে একটা হরি-সংকীর্তনের দল ছিল; তিনি পুণ্যসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে মাঝে মাঝে তথায় আসিতেন! কিন্তু কোথায় থাকিতেন, কি করিতেন, জানিতাম না। এই মাত্র শুনিয়াছিলাম—তাঁর নাকি অনেক টাকা, এবং সকল দিক দিয়াই অত্যন্ত হিসাবী। কেন জানি না, আমার প্রতি তিনি নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়া একদিন নিভৃতে কহিলেন, দেখুন শ্রীকান্তবাবু, আপনার বয়স অল্প,—জীবনে যদি উন্নতি লাভ করতে চান ত আপনাকে এমন গুটি-কয়েক সৎপরামর্শ দিতে পারি, যার মূল্য লক্ষ টাকা। আমি নিজে যাঁর কাছে এই উপদেশ পেয়েছিলাম, তিনি সংসারে কিরূপ উন্নতি লাভ করেছিলেন শুনলে হয়ত অবাক হয়ে যাবেন; কিন্তু সত্য। পঞ্চাশটি টাকা মাত্র ত মাহিনা পেতেন; কিন্তু মরবার সময় বাড়িঘর, পুকুর-বাগান, জমি-জিরাত ছাড়া প্রায় দুটি হাজার টাকা নগদ রেখে গিয়েছিলেন। বলুন ত, একি সোজা কথা! আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে আমি নিজেও ত—

কিন্তু নিজের কথাটা এইখানেই চাপিয়া দিয়া বলিলেন, আপনি মাহিনাপত্র ত মোটাই পান শুনি; কপাল আপনার খুব ভাল—বর্মায় এসেই ত এমন কারও হয় না; কিন্তু অপব্যয়টা কিরূপ করচেন বলুন দেখি! ভিতরে ভিতরে সন্ধান নিয়ে দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়। দেখতেই ত পান আমি কোন লোকের কথায় থাকি না; কিন্তু আমার কথা, মত,

বেশি নয়, দুটো বৎসর চলুন দেখি; আমি বলচি আপনাকে, দেশে ফিরে গিয়ে চাই কি বিবাহ পর্যন্ত করতে পারবেন।

এই সৌভাগ্যের জন্য অন্তরে আমি এরূপ লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি—এ তথ্য তিনি কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন, জানি না; তবে কিনা, তিনি ভিতরে ভিতরে সন্ধান লওয়া ব্যতীত কাহারও কোন কথায় থাকেন না—তাহা নিজেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যাই হোক, তাঁহার উন্নতির বীজ-মন্ত্রস্বরূপ সৎপরামর্শের জন্য লুব্ধ হইয়া উঠিলাম। তিনি কহিলেন, দেখুন, দান-টান করার কথা ছেড়ে দিন—মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হয়—এক কোমর মাটি খুঁড়লেও একটা পয়সা মেলে না। সে কথা বলি না—নিজের মুখে-রক্তউঠা কড়ি—আজকালকার দুনিয়ায় এমন পাগল আর কেই বা আছে! নিজের ছেলেপুলে, পরিবারের জন্য রেখেথুয়ে তবে ত?—সে কথা ছেড়েই দিন, তা নয়; কিন্তু দেখুন,—যার সংসারে দেখবেন টানাটানি, কদাচ তেমন লোককে আমল দেবেন না। বেশি নয়, দু-চার দিন আসা-যাওয়া ক'রেই নিজে হতেই নিজের সংসারের কষ্টের কথা তুলে দুটাকা চেয়ে বসবে। দিলে ত গেলই, তা ছাড়া বাইরের ঝগড়া ঘরে টেনে আনা। দু-দুটাকার মায়া কিছু আর সত্যই কেউ ছাড়তে পারে না—তাগাদা করতেই হয়। তখন হাঁটাহাঁটি ঝগড়াঝাঁটি—কেন, আমার তাতে আবশ্যক কি, বলুন দেখি?

আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সত্যই ত!

তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, আপনি ভদ্রসন্তান, তাই কথাটা চট্ ক'রে বুঝলেন; কিন্তু এই ছোটলোক লোহা-কাটা ব্যাটাদের বুঝাও দেখি! হারামজাদা ব্যাটারা সাতজন্মেও বুঝবে না। ব্যাটাদের নিজের এক পয়সা নাই, তবু পরের কাছে কর্জ ক'রে আর একজনকে টাকা এনে দেবে—এই ছোটলোক ব্যাটারা এমনি আহাম্মুক!

একটু চুপ করিয়া কহিলেন, তবেই দেখুন, কদাচ কাকেও টাকা ধার দিতে নাই। বলে, বড় কষ্ট! কষ্ট তা আমার কি বাপু! আর যদি সত্যই কষ্ট ত দু ভরি সোনা এনে রেখে যাও না, দিচ্ছি দশ টাকা ধার! কি বলেন?

বলিলাম, ঠিক ত!

তিনি বলিলেন, ঠিক নয় আবার! একশ বার ঠিক! আর দেখুন ঝগড়া-বিবাদের স্থানে কখনো যাবেন না। একজন খুন হয়ে গেলেও না। প্রয়োজন কি আমার? ছাড়াতে গেলেও হয়ত দু-এক ঘা নিজের গায়েই লাগবে; তা ছাড়া একপক্ষ সাক্ষী মেনে বসবে। তখন কর ছুটোছুটি আদালতে। বরঞ্চ থেমে গেলে ইচ্ছা হয় একবার ঘুরে এসে দুটো ভালমন্দ পরামর্শ দাও, পাঁচজনের কাছে নাম হবে। কি বলেন?

একটু চুপ করিয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর এই লোকের ব্যামো-স্যামোয়—আমি ত মশাই, পাড়া মাড়াই না; তখ্খনি ব'লে বসবে, দাদা মরি—এ বিপদে দুটাকা দিয়ে সাহায্য কর। মশাই, মানুষের মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না—তাকে টাকা দেওয়া আর জলে ফেলে দেওয়া এক—বরঞ্চ জলে দেওয়াও ভাল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে না। নাহয় ত বলবে, এসো রাত্রি জাগতে। আচ্ছা মশাই, আমি যাবো তার অসুখে রাত্রি জাগতে, কিন্তু এই বিদেশ-বিভুঁয়ে আমার কিছু-একটা—মা-শীতলা না করুন, এই নাক-কান মলচি মা! বলিয়া জিভ কাটিয়া তিনি নাকে একবার হাত ঠেকাইয়া নিজের হাতে নিজের দুই কান মলিয়া একটা নমস্কার করিয়া বলিলেন, আমরা সবাই তাঁর চরণেই ত পড়ে আছি—কিন্তু বলুন দেখি, সে বিপদে আমায় দেখে কে?

এবার আমি আর সায় দিতেও পারিলাম না। আমাকে মৌন দেখিয়া তিনি মনে মনে বোধ করি একটু দ্বিধায় পড়িয়া বলিলেন, দেখুন দেখি সাহেবদের! তারা কখ্খনো ওরূপ স্থানে যায় কি? কখ্খনো না। নিজের একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে ব্যস্! হয়ে গেল। তাই তাদের উন্নতিটা একবার চেয়ে দেখুন দেখি। তার পরে ভাল হলে আবার যেমন মেলা-মেশা, সব তেমনি। মশাই, কারুর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কখনো যেতে নাই।

অফিসের বেলা হইয়াছে বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। এই প্রাজ্ঞের সাধু-পরামর্শের বলে এতটা বয়সে যে খুব বেশি মানসিক উন্নতি হওয়া আমার সম্ভবপর, তাহা নহে। এমন কি মনের মধ্যে খুব বেশি আন্দোলনও উঠিল না। কারণ, এরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তির একান্ত অভাব

পল্লীগ্রামেও অনুভব করি নাই; এবং অপরাপর দুর্নাম তাঁহাদের যতই থাকুক, পরামর্শ দিতে কার্পণ্য করেন, এ অপবাদও শুনি নাই; এবং এ পরামর্শ যে সুপরামর্শ তা সামাজিক জীবনে তত না হোক, পারিবারিক জীবনে, জীবন-যাত্রার কার্যে যে অবিসংবাদী সাধু উপায়, তাহা দেশের লোক মানিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালী গৃহস্থ-ঘরের কোন ছেলে যদি অক্ষরে অক্ষরে ইহা প্রতিপালন করিয়া চলে তাহাতে বাপ-মা অসন্তুষ্ট হন—বাঙ্গালী পিতামাতার বিরুদ্ধে এত বড় মিথ্যা বদনাম রটনা করিতে পুলিশের সি. আই. ডি.র লোকেরও বোধ করি বিবেকে বাধে। সে যাই হোক, কিন্তু এই প্রাজ্ঞতার ভিতরে যে কত বড় অপরাধ ছিল, সপ্তাহ-দুই গত না হইতেই, ভগবান ইঁহারই সাহায্যে আমার কাছে প্রমাণ করিয়া দিলেন!

সেই অবধি অভয়ার বাড়ির দিকে আর যাই নাই। তাহার সমস্ত অবস্থার সহিত তাহার কথাগুলি মিলাইয়া লইয়া আগাগোড়া জিনিসটা জ্ঞানের দ্বারা একরকম করিয়া দেখিতে পারিতাম—সে কথা সত্য। তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নির্ভীক সততা, তাহাদের পরস্পরের অপরূপ ও অসাধারণ স্নেহ আমার বুদ্ধিকে সেইদিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, ইহাও ঠিক; কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সেদিকে পা বাড়াইতে চাহিত না। কেবলই মনে হইত, আমার অন্নদাদিদি এ কাজ করিতেন না। কোথাও দাসীবৃত্তি করিয়া লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখের ভিতর দিয়াও বরঞ্চ তাঁর বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতেন; কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের পরিবর্তেও—যাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হয় নাই—তাঁহার সহিত ঘর করিতে রাজী হইতেন না! আমি জানিতাম, তিনি ভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্তব্যের যে জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন,—সে কি অভয়ার সুতীক্ষ্ন বুদ্ধির মীমাংসার কাছে একেবারে ছেলেখেলা?

অভয়ার একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িল। তখন ভাল করিয়া সেটা তলাইয়া বুঝিবার অবকাশ পাই নাই। সেদিন সে কহিয়াছিল, শ্রীকান্তবাবু, দুঃখ-ভোগ করার মধ্যে একটা মারাত্মক মোহ আছে। মানুষ বহুযুগের জীবনযাত্রায় এটা দেখিয়াছে যে, কোন বড় ফলই বড় রকম দুঃখ-ভোগ ছাড়া পাওয়া যায় না। তার জন্মজন্মান্তরের অভিজ্ঞতা আজ এই ভ্রমটাকে একেবারে সত্য বলিয়া জানিয়াছে যে, জীবনের মানদণ্ডে একদিকে যত বেশি দুঃখের ভার চাপানো যায়, আর-একদিকে তত বড় সুখের বোঝা গাদা হইয়া উঠিতে থাকে। তাই ত মানুষ যখন সংসারে সহজ এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটুকু স্বেচ্ছায় বর্জন করিয়া, তপস্যা করিতেছে, মনে করিয়া নিরাহারে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন যে তাহার জন্য কোথাও না কোথাও চতুর্গুণ আহার্য সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—এ বিষয়ে না তাহার নিজের, না আর কাহারও মনে তিলার্ধ সংশয় উত্থিত হয়। এই জন্যই সন্ন্যাসী যখন নিদারুণ শীতে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া, এবং ভীষণ গ্রীষ্মের দিনে রৌদ্রের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড করিয়া মাটিতে মাথা এবং আকাশে পা করিয়া বসিয়া থাকে, তখন তাহার দুঃখ-ভোগের কঠোরতা দেখিয়া দর্শকের দল শুধু যে দুঃখই ভোগ করে না, তাহা নয়, একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহার ভবিষ্যৎ আরামের অসম্ভব বৃহৎ হিসাব খতাইয়া প্রলুব্ধ চিত্ত তাহাদের ঈর্ষাকুল হইয়া উঠে; এবং ওই পা-উঁচু ব্যক্তিটাই যে সংসারে ধন্য, এবং নরদেহ ধারণ করিয়া সেই যে সত্যকার কাজ করিতেছে, এবং তাহারা কিছুই করিতেছে না, বৃথায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে,—এই বলিয়া নিজেদের সহস্র ধিক্কার দিতে দিতে মন খারাপ করিয়া বাড়ি যায়। শ্রীকান্তবাবু, সুখের জন্য দুঃখ স্বীকার করিতে হয়, এ কথা সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে উল্টাইয়া লইয়া যেমন করিয়া হোক কতকগুলো দুঃখ-ভোগ করিয়া গেলেই যে সুখ আসিয়া স্কন্ধে ভর করে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ নয়। ইহকালেও সত্য নয়, পরকালেও সত্য নয়।

আমি বলিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু বিধবার ব্রহ্মচর্য—

অভয়া আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিয়াছিল, বিধবার আচরণ বলুন,—তার সঙ্গে ব্রহ্মের বিন্দুবিসর্গ সম্বন্ধ নাই। বিধবার চালচলনটাই যে ব্রহ্মলাভের উপায়, তাহা আমি মানি না। বস্তুতঃ ওটা ত কিছুই নয়। কুমারী-সধবা-বিধবা—যে-কেহ তাহার নিজের নিজের পথে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। বিধবার চালচলনটাই সেজন্য একচেটে করিয়া রাখা হয় নাই।

আমি হাসিয়া বলিয়াছিলাম, বেশ, না হয় ত নাই। তাদের আচরণটাকে ব্রহ্মচর্য না হয় নাই বলিলেন। নামে কি আসে যায়?

অভয়া রাগ করিয়া বলিয়াছিল, নামই ত সব শ্রীকান্তবাবু। কথা ছাড়া আর দুনিয়ায় আছে কি? ভুল নামের ভিতর দিয়া মানুষের বুদ্ধির, চিন্তার, জ্ঞানের ধারা যে কত বড় ভুলের মধ্যে চালনা করা যায়, সে কি আপনি জানেন না? ওই নামের ভুলেই ত সকল দেশে সকল যুগে বিধবার চালচলনটাকেই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব'লে ভেবে এসেছে। ইহাই নিরর্থক ত্যাগের নিষ্ফল মহিমা শ্রীকান্তবাবু—একেবারে ব্যর্থ, একেবারে ভুল। মানুষকে ইহ-পরকালে পণ্ড ক'রে দেবার এত বড় ছায়াবাজি আর নাই।

তখন আর তর্ক না করিয়া চুপ করিয়া গিয়াছিলাম। বস্তুত, তর্ক করিয়া পরাস্ত করা তাহাকে একপ্রকার অসম্ভব ছিল। প্রথম যখন জাহাজে পরিচয় হয়, তখন ডাক্তারবাবু শুধু তাহার বাহিরটাই দেখিয়া তামাশা করিয়া বলিয়াছিলেন, মেয়েটি ভারি forward; কিন্তু, তখন দুজনের কেহই ভাবি নাই—এই forward কথাটার অর্থ কোথায় গিয়া দাঁড়াইতে পারে! এই মেয়েটি যে তাহার সমস্ত অন্তরটাকে পর্যন্ত কিরূপ অকুণ্ঠিত তেজে বাহিরে টানিয়া আনিয়া সমস্ত পৃথিবীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিতে পারে, লোকের মতামত গ্রাহ্যও করে না—তখন তাহার ধারণাও আমাদের ছিল না। অভয়া ত শুধু তাহার মতটাকে মাত্র ভাল প্রমাণ করিবার জন্যই কথা-কাটাকাটি করিত না—সে তাহার নিজের কাজটাকে সবলে জয়ী করিবার জন্যই যেন যুদ্ধ করিত। তাহার মত একরকম—কাজ আর-একরকম ছিল না। বলিয়াই বোধ করি অনেক সময়ে তাহার মুখের উপর জবাব খুঁজিয়া পাইতাম না—কেমন একরকম থতমত খাইয়া যাইতাম; অথচ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া মনে হইত, এই ত বেশ উত্তর ছিল! যাই হোক, তাহার সম্বন্ধে আজও যে আমার মনের দ্বিধা ঘুচে নাই, একথা ঠিক। যতই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতাম—এ ছাড়া অভয়ার আর কি গতি ছিল,—ততই মন যেন তাহারই বিরুদ্ধে বাঁকিয়া দাঁড়াইত। যতই নিজেকে বলিতাম, তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবার লেশমাত্র অধিকার আমার নাই,—ততই যেন অব্যক্ত বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরিয়া উঠিত। আমার মনে পড়ে, এমনি একটা কুণ্ঠিত অপ্রসন্ন মন লইয়াই আমার দিন কাটিতে-ছিল বলিয়া, না পারিতাম তাহার কাছে যাইতে, না পারিতাম তাহাকে একেবারে দূরে ফেলিয়া দিতে।

এমনি সময় হঠাৎ একদিন শহরের মাঝখানে প্লেগ আসিয়া তাহার ঘোমটা খুলিয়া কালো মুখখানি বাহির করিয়া দেখা দিল! হায় রে! তাহাকে সমুদ্রপারে ঠেকাইয়া রাখিবার লক্ষ-কোটি যন্ত্র-তন্ত্র, কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতম সতর্কতা—সমস্তই একমুহূর্তে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মানুষের আতঙ্কের আর সীমা-পরিসীমা রহিল না। অথচ শহরের চৌদ্দ আনা লোকই হয় চাকুরিজীবী, নাহয় বাণিজ্যজীবী। একেবারে দূরে পলাইবারও জো নাই—এ যেন রুদ্ধ ঘরের মাঝখানে অকস্মাৎ কে ছুঁচোবাজি ছুঁড়িয়া দিল। ভয়ে এ-পাড়ার মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরিয়া পোঁটলা-পুঁটলি ঘাড়ে করিয়া ও-পাড়ায় ছুটিয়া পালায়, আর ও-পাড়ার মানুষগুলো ঠিক সেই সব লইয়া এ-পাড়ায় ছুটিয়া আসে। 'ইঁদুর' বলিলে আর রক্ষা নাই। সেটা মরিয়াছে কি মরে নাই, তাহা শুনিবার পূর্বেই লোকে ছুটিতে শুরু করিয়া দেয়। মানুষের প্রাণগুলা যেন সব গাছের ফলের মত প্লেগের আবহাওয়ায় এক রাত্রেই পাকিয়া উঠিয়া বোঁটায় ঝুলিতেছে,—কাহার যে কখন টুপ করিয়া খসিয়া নীচে পড়িবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই।

সে দিনটা ছিল শনিবার। কি-একটা সামান্য কাজের জন্য সকালে বাহির হইয়াছি। শহরের মধ্যে একটা গলির ভিতর দিয়া বড় রাস্তায় পড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছি, দেখি অত্যন্ত জীর্ণ পুরাতন একটা বাটীর দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছেন প্রাজ্ঞ মনোহর চক্রবর্তী।

হাত নাড়িয়া বলিলাম, সময় নাই।

তিনি একান্ত অনুনয়ের সহিত কহিলেন, দু-মিনিটের জন্য একবার উপরে আসুন শ্রীকান্তবাবু, আমার বড় বিপদ।

কাজেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপরে উঠিতে হইল। আমি তাই ত মাঝে মাঝে ভাবি,

মানুষের প্রত্যেক চলাফেরাটি পর্যন্ত কি একেবারে ঠিক করা! নইলে, আমার কাজও গুরুতর ছিল না, এ গলিটার মধ্যেও আর কখনো প্রবেশ করি নাই। আজ সকালেই বা এখানে আসিয়া হাজির হইলাম কেন?

কাছে গিয়া বলিলাম, অনেক দিন ত আমাদের ও-দিকে যাননি—আপনি কি এই বাড়িতে থাকেন?

তিনি বলিলেন, না মশাই, আমি দিন বারো-তেরো এসেচি। একে ত মাসখানেক থেকে ডিসেন্টিতে ভুগচি, তার ওপর আমাদের পাড়ায় হ'ল প্লেগ। কি করি মশাই, উঠতে পারিনে, তবু তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

বলিলাম, বেশ করেচেন!

তিনি বলিলেন, বেশ করলে কি হবে মশাই—আমার combined hand ব্যাটা ভয়ানক বজ্জাত। বলে কি না, চলে যাবো। দিন দেখি ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে ধমকে।

একটু আশ্চর্য হইলাম। কিন্তু তাহার পূর্বে এই combined hand বস্তুটার একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। কারণ যাঁহাদের জানা নাই যে, পয়সার জন্য হিন্দুস্থানী জাতটা পারে না এমন কাজই সংসারে নাই, তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই ইংরাজি কথাটার মানে হইতেছে দুবে, চৌবে, তেওয়ারী প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের দল। এখানে যাহারা চৌকার ধারে গেলেও লাফাইয়া উঠে, তাহারাই সেখানে রসুই করে, উচ্ছিষ্ট বাসন মাজে, তামাক সাজে এবং বাবুদের অফিসে যাইবার সময় জুতা ঝাড়িয়া দেয়, তা বাবুরা যে জাতই হোক। অবশ্য দুটাকা বেশি মাহিনা দিয়া তবেই ত্রিবেদী-চতুর্বেদী প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তিকে চাকর ও বামুনের function একত্রে combined করিতে হয়। মূর্খ উড়িয়া বা বাঙ্গালী বামুনদের আজিও একাজে রাজী করা যায় নাই, গিয়াছে শুধু ওই উঁহাদেরই। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, পয়সা পাইলে কুসংস্কার বর্জন করিতে হিন্দুস্থানীর এক-মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। (মুরগি রাঁধাইতে আরও চার আনা, আট আনা মাসে অতিরিক্ত দিতে হয়। কারণ, মূল্যের দ্বারাই সমস্ত পরিশুদ্ধ হয়, শাস্ত্রের এই বচনার্থের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং এই শাস্ত্রবাক্যে অবিচলিত আস্থা রাখিতে আজ পর্যন্ত যদি কেহ পারিয়া থাকে, ত এই হিন্দুস্থানীরা—এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে।)

কিন্তু মনোহরবাবুর combined hand -কে আমি কেন ধমক দিতে যাইব, আর সেই বা কি জন্য আমার ধমক শুনিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। এই হ্যাণ্ডটি মনোহরবাবুর নূতন। এতকাল তিনি নিজের combined hand নিজেই ছিলেন—শুধু ডিসেন্টির খাতিরে অল্পদিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মনোহরবাবু বলিতে লাগিলেন, মশাই, আপনি কি সহজ লোক! শহরসুদ্ধ লোক আপনার কথায় মরে বাঁচে, তা কি আর জানিনে ভাবচেন! বেশি নয়, একটি ছত্র যদি লাটসাহেবকে লিখে দেন ত ওর চৌদ্দ বচ্ছর জেল হয়ে যাবে, সে কি আমি শুনিনি? দিন ত ব্যাটাকে বেশ করে শাসিত করে।

কথা শুনিয়া আমি যেন দিশেহারা হইয়া গেলাম। যে লাটসাহেবের নামটা পর্যন্ত শুনি নাই—তাঁহাকে, বেশি নয়, মাত্র একটা ছত্র চিঠি লিখিলেই, একটা লোকের চৌদ্দ বৎসর কারাবাসের সম্ভাবনা,—আমার এত বড় অদ্ভুত শক্তির কথা এত বড় বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়া কি যে বলিব, আর কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। তথাপি তাঁহার বারংবার অনুযোগ ও পীড়াপীড়িতে অগত্যা সেই হতভাগ্য combined hand-কে শাসন করিতে রান্নাঘরে ঢুকিয়া দেখি, সে একটা অন্ধকূপের ন্যায় অন্ধকার।

সে আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রভুর মুখে আমার ক্ষমতার বহর শুনিয়া এখন কাঁদ-কাঁদ হইয়া হাতজোড় করিয়া জানাইল যে, এ বাড়িতে 'দেও' আছে, এখানে সে কোনমতেই থাকিতে পারিবে না। কহিল, নানা প্রকারের 'ছায়া' রাত্রিদিন ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাবু যদি আর কোন বাড়িতে যান, ত সে অনায়াসে চাকরি করিতে পারে, কিন্তু এ বাড়িতে—

যে অন্ধকার ঘর তা 'ছায়া'র আর অপরাধ কি! কিন্তু ছায়ার জন্য নয়, একটা বিশ্রী পচা গন্ধ ঢুকিয়া পর্যন্তই আমার নাকে লাগিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দুর্গন্ধ কিসের রে?

Combined hand কহিল কোই চুহা-উহা সড়া হোগা।

চমকাইয়া উঠিলাম। চুহা কি রে? এ ঘরে মরে নাকি?

সে হাতটা উল্টাইয়া তাচ্ছিল্যভরে জানাইল যে, প্রত্যহ সকালে অন্ততঃ পাঁচ-ছয়টা করিয়া মরা ইঁদুর সে বাহিরের গলিতে ফেলিয়া দেয়।

কেরোসিনের ডিপ্পা জ্বালাইয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু পচা ইঁদুরের সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তবুও আমার গা-টা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। এবং কিছুতেই মন খুলিয়া লোকটাকে সদুপদেশ দিতে পারিলাম না যে, পীড়িত বাবুকে একা ফেলিয়া পালান তাহার উচিত নয়।

শোবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, মনোহরবাবু খাটের উপর বসিয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। আমাকে পাশে বসাইয়া তিনি এ-বাড়ির গুণের কথা বলিতে লাগিলেন—এমন অল্প ভাড়ায় শহরের মধ্যে এত ভাল বাড়ি আর নাই; এমন ভদ্র বাড়িওয়ালাও আর নাই, এবং এরূপ প্রতিবেশীও সহজে মিলে না। পাশের ঘরে যে চার-পাঁচজন মাদ্রাজী খ্রীশ্চান মেস করিয়া বাস করে, তাহারা যেমন শিষ্ট-শান্ত তেমনি অমায়িক। একটু ভাল হইলেই এই বামুন-ব্যাটাকে তাড়াইয়া দিবেন, তাহাও জানাইলেন। হঠাৎ বলিলেন, আচ্ছা মশাই, আপনি স্বপ্ন বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, না।

তিনি বলিলেন, আমিও না; কিন্তু কি আশ্চর্য মশাই, কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম, আমি সিঁড়ি থেকে পড়ে গেছি। আর জেগে উঠেই দেখি ডান পায়ের কুঁচকি ফুলে উঠেচে। সাঁত্য-মিথ্যে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখুন না মশাই, তাড়সে জ্বর পর্যন্ত হয়েছে।

শুনিয়াই আমার মুখ কালি হইয়া গেল। তার পরে কুঁচকিও দেখিলাম, গায়ে হাত দিয়া জ্বরও দেখিলাম।

মিনিটখানেক আচ্ছন্নের মত বসিয়া থাকিয়া, শেষে বলিলাম, ডাক্তার ডাকতে পাঠান নি কেন, শীঘ্র পাঠান।

তিনি কহিলেন, মশাই, যে দেশ—এখানে ডাক্তারের ফি ত কম নয়। আনলেই ত চার-পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেল। তা ছাড়া আবার ওষুধ! সেও ধরুন প্রায় দু টাকার ধাক্কা।

বলিলাম, তা হোক, ডাকতে পাঠান।

কে যাবে মশাই? তেওয়ারী বেটা ত চেনেই না। তা ছাড়া ও গেলে রাঁধবেই বা কে?

আচ্ছা আমিই যাচ্ছি, বলিয়া ডাক্তার ডাকিতে নিজেই বাহির হইয়া গেলাম।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া আমাকে আড়ালে ডাকিয়া কহিলেন, ইনি আপনার কে?

বলিলাম, কেউ না। এবং কি করিয়া আজ সকালে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহাও খুলিয়া বলিলাম।

ডাক্তার প্রশ্ন করিলেন, এঁর কোন আত্মীয় এখানে আছে?

বলিলাম, জানি না। বোধ হয় কেউ নেই।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমি একটা ওষুধ লিখে দিয়ে যাচ্ছি। মাথায় বরফ দেওয়াও দরকার; কিন্তু সবচেয়ে দরকার এঁকে প্লেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া। আপনি থাকবেন না এ ঘরে—আর দেখুন, আমাকে ফিস্‌ দেবার দরকার নেই।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, আমি বহু সঙ্কোচের পর হাসপাতালের প্রস্তাব করিতেই মনোহর কাঁদিতে লাগিলেন। সেখানে বিষ দিয়া মারিয়া ফেলে, সেখানে গেলে কেউ কখনো ফিরে না—এমনি কত কি!

ঔষধ আনিতে পাঠাইবার জন্য তেওয়ারীর সন্ধান করিয়া দেখি, combined hand তাহার লোটা-কম্বল লইয়া ইতিমধ্যে অলক্ষ্যে প্রস্থান করিয়াছে। সে বোধ করি, ডাক্তারের সহিত আমার আলোচনা দ্বারের অন্তরাল হইতে শুনিতেছিল। হিন্দুস্থানী আর কিছু না বুঝুক, 'পিলেগ' কথাটা ভারি বুঝে।

তখন আমাকে যাইতে হইল ঔষধ আনিতে। বরফ, আইস-ব্যাগ প্রভৃতি যাহা কিছু প্রয়োজন, সমস্তই কিনিয়া আনিয়া হাজির করিলাম। তাহার পরে রহিলাম, আমি আর তিনি—তিনি আর আমি। একবার আমি দিই তাহার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া—একবার সে দেয় আমার মাথায় আইস-ব্যাগ তুলিয়া। এইভাবে ধস্তাধস্তি করিয়া বেলা দুটো বাজিয়া গেলে, তবে সে নিস্তেজ হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। মাঝে মাঝে তাহার চৈতন্য আচ্ছন্ন হইতো

যায়, আবার মাঝে মাঝে সে বেশ জ্ঞানের কথাও বলে। অপরাহ্নের কাছাকাছি সে ক্ষণেকের জন্য সচেতনভাবে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, শ্রীকান্তবাবু, আমি আর বাঁচব না।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন সে বহু চেষ্টায় কোমর হইতে চাবি লইয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, আমার তোরঙ্গের মধ্যে তিন শ গিনি আছে—স্ত্রীকে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা আমার বাক্স খুঁজলেই পাবেন।

আমার একটা সাহস ছিল, পাশের 'মেস'টা। তাদের সাড়া-শব্দ, চাপা কণ্ঠস্বর প্রায়ই শুনিতে পাইতেছিলাম। সন্ধ্যার পর একবার তাহাদের একটু বেশি রকম নড়াচড়ার গোলমাল আমার কানে আসিয়া পৌঁছিল; কিছুক্ষণ পরেই যেন মনে হইল, তাহারা দরজার তালা বন্ধ করিয়া কোথায় যাইতেছে। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, তাই বটে—সত্যই দ্বারে তালা ঝুলিতেছে। বুঝিলাম, তাহারা বাহিরে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তবুও কেমন মনটা আরও খাবাপ হইয়া গেল।

এদিকে আমার ঘরের লোকটি উত্তরোত্তর যে-সকল কাণ্ড করিতে লাগিলেন, সে সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি, তাহা রাত্রে একাকী বসিয়া উপভোগ করিবার মত বস্তু নয়। ওদিকে রাত্রি বারটা বাজিতে চলিল, কিন্তু পাশের ঘর খোলার সাড়াও পাই না, শব্দও পাই না। মাঝে মাঝে বাহিরে আসিয়া দেখি, তালা তেমনি ঝুলিতেছে। হঠাৎ চোখে পড়িয়া গেল যে, কাঠের দেয়ালের একটা ফুটা দিয়া ও-ঘরের তীব্র আলো এ-ঘরে আসিতেছে; কৌতূহল-বশে সেই ছিদ্রপথে চোখ দিয়া তীব্র আলোকের যে হেতুটা দেখিলাম, তাহাতে সর্বাঙ্গের রক্ত হিম হইয়া গেল! সুমুখের খাটের উপর দুইজন যুবা পাশাপাশি বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রা দিতেছে, আর শিয়রে খাটের বাজুর উপর একসার মোমবাতি জ্বলিয়া জ্বলিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমি পূর্বেই জানিতাম, রোমান ক্যাথোলিকরা মৃতের শিয়রে আলো জ্বালিয়া দেয়। সুতরাং এ দুজনের ঘুম যে হাজার ডাকাডাকিতেও আর ভাঙ্গিবে না, এবং এমন হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় লোক দুটির এত অসময়ে ঘুমাইয়া পড়িবার হেতুটা যে কি, সমস্তই একমুহূর্তে বুঝিতে পারিলাম।

এ-ঘরেও আমাদের মনোহরবাবু প্রায় আরও ঘণ্টা-দুই ছটফট করিয়া তবে ঘুমাইলেন। যাক, বাঁচা গেল!

কিন্তু তামাশাটা এই যে, যিনি জানাশুনা লোকের পীড়ার সংবাদে পাড়া মাড়াইতে নাই বলিয়া আমাকে সেদিন বহু উপদেশ দিয়াছিলেন তাহারই মৃতদেহটা এবং গিনিপোরা বাক্সটা পাহারা দিবার জন্য ভগবান আমাকেই নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

তা যেন দিলেন, কিন্তু বাকি রাত্রিটুকু আমার যেভাবে কাটিল, তাহা লিখিয়া জানাইবার সাধ্যও নাই, প্রবৃত্তিও হয় না। তবে মোটের উপর যে ভাল কাটে নাই, একথা বোধ করি, কোন পাঠকই অবিশ্বাস করিবেন না।

পরদিন death certificate লইতে, পুলিশ ডাকিতে, টেলিগ্রাফ করিতে, গিনির সুব্যবস্থা করিতে এবং মড়া বিদায় করিতে বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। যাক, মনোহর ত ঠেলাগাড়ি চড়িয়া বোধ করি বা স্বর্গেই রওনা হইয়া পড়িলেন,—আমিও বাসায় ফিরিলাম। আগের দিন একাদশী করিয়াছি—আজও অপরাহ্ন। বাসায় ফিরিয়া মনে হইল, আমার ডান কানের গোড়াটা যেন ফুলিয়াছে, এবং ব্যথা করিতেছে। কি জানি, সমস্ত রাত্রি নিজেই টিপিয়া টিপিয়া বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিলাম, কিংবা সত্যসত্যই গিনির হিসাব দিতে স্বর্গে যাইতে হইবে—হঠাৎ বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কিন্তু এটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পরে যাই হোক, সম্প্রতি জ্ঞান থাকিতে থাকিতে নিজের বিলিব্যবস্থাটা নিজেই করিয়া ফেলিতে হইবে। যেহেতু মনোহরের ন্যায় আইস-ব্যাগ লইয়া টানাটানি করাটা সঙ্গত নয়, শোভনও নয়। স্থির করিতে দেরি হইল না। কারণ, চক্ষের পলকে দেখিতে পাইলাম, এতবড় বিশ্রী ব্যামোর ভার কোন পুণ্যাত্মা সাধুলোকের উপর নিক্ষেপ করিতে গেলে নিশ্চয়ই আমার গুরুতর পাপ হইবে। ভাল লোককে বিব্রত করা কর্তব্য নহে,—অশাস্ত্রীয়। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই। বরঞ্চ সেই যে রেঙ্গুনের আর এক প্রান্তে অভয়া বলিয়া একটা মহা পাপিষ্ঠা পতিতা নারী আছে,—এতদিন যাহাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছি,—তাহারই কাঁধের উপর এই মারাত্মক পীড়ার বিশ্রী বোঝাটা অনায়াসে নামাইয়া দিয়া আসি গে, মরিতে হয় সে মরুক।

হয়ত তাহাতে কিছু পুণ্যসঞ্চয়ও হইয়া যাইতে পারে। এই বলিয়া চাকরকে গাড়ি আনিতে হুকুম করিয়া দিলাম।

বার

সেদিন যখন মৃত্যুর পরওয়ানা হাতে লইয়া অভয়ার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম, তখন মরণের চেয়ে মরার লজ্জাই আমাকে বেশি ভয় দেখাইয়াছিল।

অভয়ার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল; কিন্তু সেই পাংশু ওষ্ঠাধর ফুটিয়া শুধু এই কটি কথা বাহির হইল—তোমার দায়িত্ব আমি নেব না ত কে নেবে? এখানে আমার চেয়ে কার গরজ বেশি? দুই চক্ষু আমার জলে ভাসিয়া গেল; তবুও বলিলাম, আমি ত চললুম। পথের কষ্ট আমাকে নিতেই হবে, সে নিবারণ করবার সাধ্য কারও নেই। কিন্তু যাবার মুখে তোমাদের এই নূতন ঘর-সংসারের মধ্যে এতবড় একটা বিপদ ঢেলে দিয়ে যেতে আর আমার কিছুতেই মন সরচে না অভয়া। এখনও গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েচে, এখনও জ্ঞান আছে—এখনও ভদ্রভাবে প্লেগ হাসপাতালে গিয়ে উঠতে পারি। তুমি শুধু একটি মুহূর্তের জন্য মনটা শক্ত করে বল, আচ্ছা যাও।

অভয়া কোন উত্তর না দিয়া, আমাকে হাত ধরিয়া আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া এইবার নিজের চোখ মুছিল। আমার উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া কহিল, তোমাকে যাও বলতে যদি পারতুম তা হলে নূতন ক'রে ঘর-সংসার পাততে যেতুম না। আজ থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকারের সংসার হ'ল।

কিন্তু খুব সম্ভব, সে আমার প্লেগ নয়। তাই মরণ আমাকে শুধু একটু ব্যঙ্গ করিয়াই চলিয়া গেল। দিন-দশেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম; কিন্তু অভয়া আমাকে আর হোটেলে ফিরিতে দিল না।

অফিসে যাইব, কি আরও কিছুদিনের ছুটি লইয়া বিশ্রাম করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে একদিন অফিসের পিয়ন আসিয়া চিঠি দিয়া গেল। খুলিয়া দেখিলাম, পিয়ারীর চিঠি। বর্মায় আসার পরে এই তাহার পত্র; আমাকে জবাব না দিলেও, আমি কখনো কখনো তাহাকে চিঠি লিখিতাম। আসিবার সময় এই শর্তই সে আমাকে স্বীকার করাইয়া লইয়াছিল। পত্রের প্রথমে সে ইহারই উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছে, আমি মরিলে তুমি খবর পাইবে। বাঁচিয়া থাকার মধ্যে আমার এমন সংবাদই থাকিতে পারে না, যাহা তোমার না জানিলেই নয়, কিন্তু আমার ত তা নয়! আমার সমস্ত প্রাণটা যে ঐ বিদেশেই সারাদিন পড়িয়া থাকে, সে কথা এত বড় সত্য যে, তুমিও বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পার নাই। তাই জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে চিঠি দিয়া তোমাকে বলিতে হয়, যে, তুমি ভাল আছো।

আমি এই মাসের মধ্যেই বঙ্কুর বিবাহ দিতে চাই। তুমি মত দাও। পরিবার প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না জন্মিলে যে বিবাহ হওয়া উচিত নয়, তোমার এ কথা আমি অস্বীকার করি না। বঙ্কুর সে ক্ষমতা হয় নাই, তথাপি কেন যে তোমার সম্মতি চাহিতেছি, সে আমাকে আর একবার চোখে না দেখিলে তুমি বুঝিবে না। যেমন করিয়া পারো এসো, আমার মাথার দিব্যি রহিল।

পত্রের শেষের দিকে অভয়ার কথা ছিল। অভয়া যখন ফিরিয়া আসিয়া কহিয়াছিল, সে যাহাকে ভালবাসে, তাহারই ঘর করিতে একটা পশুকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে এবং এই লইয়াই সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধে স্পর্ধার সহিত তর্ক করিয়াছিল, সেদিন আমি এমনই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, পিয়ারীকে অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। আজ তাহারই প্রত্যুত্তরে সে লিখিয়াছে, তোমার মুখে যদি তিনি আমার নাম শুনিয়া থাকেন ত, আমার অনুরোধে একবার দেখা করিয়া বলিও যে, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সহস্র কোটী নমস্কার জানাইয়াছে। তিনি বয়সে আমার ছোট কি বড় জানি না, জানার আবশ্যকও নাই; তিনি শুধুমাত্র তাঁর তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্য রমণীর প্রণম্য। আজ আমার গুরুদেবের শ্রীমুখের কথাগুলি বার বার মনে পড়িতেছে। আমার কাশীর বাড়িতে দীক্ষার সমস্ত আয়োজন হইয়া গেছে, গুরুদেব আসন গ্রহণ করিয়া [illegible]

আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রসন্ন মুখের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ ভয়ে আমার বুকের ভিতরে তোলপাড় করিয়া উঠিল। তাঁর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া বলিলাম, বাবা, আমি মন্তর নেব না। তিনি বিস্মিত হইয়া আমার মাথার উপর তাঁর ডান হাতটি রাখিয়া বলিলেন, কেন মা নেবে না? বলিলাম, আমি মহা-পাপিষ্ঠা। তিনি বাধা দিয়া কহিলেন, তা হলে ত আরও বেশি দরকার মা।

কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, আমি লজ্জায় আমার সত্যি পরিচয় দিইনি, দিলে এ-বাড়ির যে চৌকাঠও আপনি মাড়াতে চাইতেন না। গুরুদেব স্মিতমুখে বলিলেন, তবুও মাড়াতুম, তবুও দীক্ষা দিতুম। পিয়ারীর বাড়ি না হয় নাই মাড়ালুম; কিন্তু আমার রাজলক্ষ্মী মায়ের বাড়িতে কেন আসবো না মা?

আমি চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলাম, কিন্তু আমার মায়ের গুরু যে বলেছিলেন, আমাকে দীক্ষা দিলে পতিত হতে হবে! সেকথা কি সত্য নয়? গুরুদেব হাসিলেন। বলিলেন, সত্য বলেই ত তিনি দিতে পারেন নি মা। কিন্তু সে ভয় যার নাই, সে কেন দেবে না? বলিলাম, ভয় নেই কেন?

তিনি পুনরায় হাসিয়া কহিলেন, একবাড়ির মধ্যে যে রোগের বীজ একজনকে মেরে ফেলে, আর-একজনকে তা স্পর্শ করে না—কেন বলতে পারো? কহিলাম, স্পর্শ হয়ত করে, কিন্তু যে সবল সে কাটিয়ে উঠে, যে দুর্বল সেই মারা যায়।

গুরুদেব আমার মাথার উপর আবার তাঁর হাতটা রাখিয়া বলিলেন, এই কথাটি কোন দিন ভুলো না মা। যে অপরাধ একজনকে ভূমিসাৎ করে দেয়, সেই অপরাধই আর-একজন হয়ত স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হয়ে চলে যায়। তাই সমস্ত বিধিনিষেধই সকলকে এক দড়িতে বাঁধতে পারে না। সঙ্কোচের সহিত আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম, যা অন্যায়, যা অধর্ম, তা কি সবল-দুর্বল উভয়ের কাছেই সমান অন্যায় অধর্ম নয়? না হলে সে কি অবিচার নয়?

গুরুদেব বলিলেন, না মা, বাইরে থেকে যেমনই দেখাক, তাদের ফল সমান নয়। তা হলে সংসারে সবলে-দুর্বলে কোন প্রভেদ থাকত না। যে বিষ পাঁচ বছরের শিশুর পক্ষে মারাত্মক, সেই বিষ যদি একজন ত্রিশ বছরের লোককে মারতে না পারে, ত কাকে দোষ দেবে মা? কিন্তু আজই যদি আমার কথা বুঝতে না পারো ত অন্ততঃ এটি স্মরণ রেখো যে, যাদের ভিতরে আগুন জ্বলছে, আর যাদের শুধু ছাই জমা হয়ে আছে—তাদের কর্মের ওজন এক তুলাদণ্ডে করা যায় না। গেলেও তা ভুল হয়।

শ্রীকান্তদা, তোমার চিঠি পড়িয়া আজ আমার গুরুদেবের সেই অন্তরের আগুনের কথাই মনে পড়িতেছে। অভয়াকে চক্ষে দেখি নাই, তবুও মনে হইতেছে—তাঁর ভিতরে যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যেও যেন দেখিতে পাইতেছি। তাঁর কর্মের বিচার একটু সাবধানে করিও। আমাদের মত সাধারণ স্ত্রীলোকের বাটখারা লইয়া তাঁর পাপ-পুণ্যের ওজন তাড়াতাড়ি সারিয়া দিয়া বসিয়ো না।

চিঠিখানা অভয়ার হাতে দিয়া বলিলাম, রাজলক্ষ্মী তোমাকে শত-সহস্র নমস্কার জানাইয়াছে—এই নাও।

অভয়া দুই-তিনবার করিয়া লেখাটুকু পড়িয়া কোনমতে তাহা আমার বিছানার উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। সংসারের চক্ষে তাহার যে নারীত্ব আজি লাঞ্ছিত, অপমানিত, তাহারই উপরে শতযোজন দূর হইতে যে অপরিচিতা নারী আজি অযাচিত সম্মানের পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছে, তাহারই অপরিসীম আনন্দ-বেদনাকে সে পুরুষের দৃষ্টি হইতে তাড়াতাড়ি আড়াল করিয়া লইয়া গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে অভয়া বেশ করিয়া চোখমুখ ধুইয়া ফিরিয়া আসিয়াই কহিল, শ্রীকান্তদাদা—

বাধা দিয়া বলিলাম, ও আবার কি! দাদা হলুম কবে?

আজ থেকে।

না, না, দাদা নয়—দাদা নয়। সবাই মিলে সব দিক থেকে আমার রাস্তা বন্ধ ক'রো না। অভয়া হাসিয়া কহিল, মনে মনে বুঝি এই সব মতলব আঁটা হচ্ছে?

কেন, আমি কি মানুষ নই?

অভয়া কহিল, বিষম মানুষ দেখি যে! রোহিণীবাবু বেচারা অসুখের সময় আশ্রয় দিলেন, এখন ভাল হ'য়ে বুঝি তার এই পুরস্কার ঠিক করেচ? কিন্তু আমার ভারি ভুল হয়ে গেছে। সে সময়ে যদি অসুখ ব'লে একটা টেলিগ্রাম করে দিতুম, আজ তা হলে তাঁকে দেখতে পেতুম।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, আশ্চর্য নয় বটে।

অভয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, তুমি মাসখানেকের ছুটি নিয়ে একবার যাও শ্রীকান্তদাদা। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে তাঁর বড় দরকার পড়েছে। কেমন করিয়া যেন নিজেও এ কথা বুঝিতেছিলাম, আমাকে আজ তাহার বড় প্রয়োজন। পরদিনই আফিসে চিঠি লিখিয়া আরও একমাসের ছুটি লইলাম এবং আগামী মেলেই যাত্রা করিবার জন্য টিকিট কিনিতে পাঠাইয়া দিলাম।

যাবার সময় অভয়া নমস্কার করিয়া কহিল, শ্রীকান্তদাদা, একটা কথা দাও।

কি কথা দিদি?

সংসারে সকল সমস্যাই পুরুষমানুষে মীমাংসা করে দিতে পারে না। যদি কোথাও ঠেকে, চিঠি লিখে আমার মত নেবে বল?

স্বীকার করিয়া জাহাজ-ঘাটের উদ্দেশে গাড়িতে গিয়া বসিলাম। অভয়া গাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আর একবার নমস্কার করিল; বলিল, রোহিণীবাবুকে দিয়ে আমি কালই সেখানে টেলিগ্রাম করে দিয়েচি। কিন্তু জাহাজের ওপরে কটা দিন শরীরের দিকে একটু নজর রেখো, শ্রীকান্তদাদা, আর তোমার কাছে আমি কিছু চাইনে।

আচ্ছা বলিয়া মুখ তুলিয়াই দেখিলাম, অভয়ার দুটি চক্ষু জলে ভাসিতেছে।

তের

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ ভিড়িল। দেখিলাম, জেটির উপর বঙ্কু দাঁড়াইয়া আছে। সে সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, মা রাস্তার উপর গাড়িতে অপেক্ষা করচেন। আপনি নেবে যান, আমি জিনিসপত্র নিয়ে পরে যাচ্চি। বাহিরে আসিতেই আর একটা লোক গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, রতন যে! ভাল ত?

রতন একগাল হাসিয়া কহিল, আপনার আশীর্বাদে। আসুন। বলিয়া পথ দেখাইয়া গাড়ির কাছে আনিয়া দরজা খুলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কহিল, এসো। রতন, তোরা বাবা আর একটা গাড়ি করে পিছনে আসিস—দুটো বাজে, এখনও ওঁর নাওয়া-খাওয়া হয়নি, আমরা বাসায় চললুম। গাড়োয়ানকে যেতে বলে দে।

আমি উঠিয়া বসিলাম। রতন যে-আজ্ঞে বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গাড়োয়ানকে হাঁকিতে ইঙ্গিত করিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী হেঁট হইয়া পদধূলি লইয়া কহিল, জাহাজে কষ্ট হয়নি ত?

না।

বড্ড অসুখ করেছিল নাকি?

অসুখ করেছিল বটে, বড্ড নয়। কিন্তু তোমাকে ত ভাল দেখাচ্চে না! বাড়ি থেকে কবে এলে?

পরশু; অভয়ার কাছে আসবার খবর পেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি। সেই আসতেই ত হ'তো—দুদিন আগেই এলুম। এখানে তোমার কত কাজ আছে জানো?

কহিলাম, কাজের কথা পরে শুনবো। কিন্তু তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছিল?

রাজলক্ষ্মী হাসিল, এই হাসি যে কতদিন দেখি নাই, তাহা এই হাসিটি দেখিয়াই শুধু আজ মনে পড়িল। এবং সঙ্গে সঙ্গে কতবড় যে একটা অদম্য স্পৃহা নিঃশব্দে দমন করিয়া ফেলিলাম, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ জানিল না। কিন্তু দীর্ঘশ্বাসটা তাহাকে

লুকোইতে পারিলাম না। সে বিস্মিতের মত ক্ষণকাল আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া পুনরায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দেখাচ্চে আমাকে, রোগা?

সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলাম না। রোগা? হাঁ রোগা একটু বটে, কিন্তু সে কিছুই নয়। মনে হইল সে যেন কত দেশ-দেশান্তর পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ-পর্যটন করিয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিল—এমনি ক্লান্ত, এমনি পরিশ্রান্ত! নিজের ভার নিজে বহিবার তাহার আর শক্তিও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। এখন কেবল নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার একটু জায়গা অন্বেষণ করিতেছে। আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া কহিল, কৈ বললে না যে?

কহিলাম, নাই শুনলে।

রাজলক্ষ্মী ছেলেমানুষের মত মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, না বল। লোকে যে বলে আমি একেবারে বিশ্রী দেখতে হয়ে গেছি। সত্যি?

আমি গম্ভীর হইয়া কহিলাম, সত্যি। রাজলক্ষ্মী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি মানুষকে এমনি অপ্রতিভ করে দাও যে—আচ্ছা, বেশ ত! ভালই ত! শ্রী নিয়ে আমার কি-ই বা হবে! তোমার সঙ্গে আমার সুশ্রী-বিশ্রী দেখাদেখি ত সম্পর্ক নয় যে সেজন্যে আমাকে ভেবে মরতে হবে!

আমি বলিলাম, সে ঠিক, ভেবে মরবার কিছুমাত্র হেতু নেই। কারণ, একে ত লোকে ও কথা বলে না, তা ছাড়া বললেও তুমি বিশ্বাস কর না। মনে মনে জানো যে—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি অন্তর্যামী কিনা, তাই সকলের মনের কথা জেনে নিয়েচো! আমি কখ্‌খনো ও কথা ভাবিনে। তুমি নিজেই সত্যি করে বল ত, সেই শিকার করতে গিয়ে আমাকে যেমন দেখেছিলে, তেমনি কি এখনো দেখতে আছি না কি? তার চেয়ে কত কুচ্ছিত হয়ে গেছি।

আমি কহিলাম, না, বরঞ্চ তার চেয়ে ভাল দেখতে হয়েচ।

রাজলক্ষ্মী চক্ষের নিমিষে জানালার বাহিরে মুখ ফিরাইয়া বোধ করি তাহার হাসি মুখখানি আমার মুগ্ধদৃষ্টি হইতে সরাইয়া লইল, এবং কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন মুখের উপর হইতে অপসৃত করিয়া ফিরিয়া চাহিল। জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি জ্বর হয়েছিল? ও দেশের আবহাওয়া কি সহ্য হচ্চে না?

কহিলাম, না হলে ত উপায় নেই। যেমন করে হোক সহ্য করিয়ে নিতেই হবে।

আমি মনে মনে নিশ্চয় জানিতাম, রাজলক্ষ্মী এ কথার কি জবাব দিবে। কারণ, যে দেশের জল-বাতাস আজও আপনার হইয়া উঠে নাই, কোন সুদূর ভবিষ্যতে তাহাকে আত্মীয় করিয়া লইবার আশায় নির্ভর করিয়া সে যে কিছুতেই আমার প্রত্যাবর্তনে সম্মত হইবে না, বরঞ্চ ঘোর আপত্তি তুলিয়া বাধা দিবে, ইহাই আমার মনে ছিল। কিন্তু সেরূপ হইল না। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, সে সত্যি। তা ছাড়া সেখানে আরো ত কত বাঙ্গালী রয়েছেন। তাঁদের যখন সইচে, তখন তোমারই বা সইবে না কেন? কি বল?

আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাহার এই প্রকার উদ্বেগহীনতা আমাকে আঘাত করিল। তাই শুধু একটা ইঙ্গিতে সায় দিয়াই নীরব হইয়া রহিলাম। একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবিতাম, আমার প্লেগের কাহিনীটা কিভাবে রাজলক্ষ্মীর শ্রুতিগোচর করিব। সুদূর প্রবাসে আমার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে যখন দিন কাটিতেছিল, তখনকার সহস্রপ্রকার দুঃখের বিবরণ শুনিতে শুনিতে তাহার বুকের ভিতর কি ঝড় উঠিবে, দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া কিরূপ অশ্রুধারা ছুটিবে, তাহা কত রসে, কত রঙে ভরিয়া যে, দিনের পর দিন কল্পনায় দেখিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এখন সেইটাই আমাকে সবচেয়ে লজ্জায় বিঁধিল। মনে হইল, ছি ছি—ভাগ্যে কেহ কাহারো মনের খবর পায় না। নইলে—কিন্তু থাক গে সে কথা। মনে মনে বলিলাম, আর যাহাই করি সেই মরণ-বাঁচনের গল্প আর তাহার কাছে করিতে যাইব না।

বৌবাজারের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মী হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সিঁড়ি—তোমার ঘর তেতলায়। একটু শুয়ে পড় গে। আমি যাচ্চি। বলিয়া সে নিজে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

ঘরে ঢুকিতে দেখিলাম, এ ঘর আমার জন্যই বটে। পাটনার বাড়ি হইতে আমার বইগুলি, আমার গুড়গুড়িটি পর্যন্ত আনিতে পিয়ারী বিস্মৃত হয় নাই; একখানি দামী সূর্যাস্তের ছবি আমার বড় ভাল লাগিত। সেখানি সে নিজের ঘর হইতে খুলিয়া আমার শোবার ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। সেই ছবিটি পর্যন্ত সে কলিকাতায় সঙ্গে আনিয়াছে এবং ঠিক তেমনি করিয়া দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিয়াছে। আমার লিখিবার সাজসরঞ্জাম, আমার কাপড়, আমার সেই লাল মখমলের চটিজুতাটি পর্যন্ত ঠিক তেমনি সযত্নে সাজানো রহিয়াছে। একখানি আরামচৌকি আমি সর্বদা সেখানে ব্যবহার করিতাম। সেটি বোধ করি আনা সম্ভব হয় নাই, তাই নূতন একখানি সেইভাবে জানালার ধারে পাতা রহিয়াছে। ধীরে ধীরে তাহারি উপরে গিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলাম। মনে হইল যেন ভাটার নদীতে আবার জোয়ারের জলোচ্ছ্বাসের শব্দ মোহনার কাছে শুনা যাইতেছে।

স্নানাহার সারিয়া ক্লান্তিবশতঃ দুপুরবেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিতে দেখিলাম, পশ্চিমের জানালা দিয়া অপরাহ্ণ-রৌদ্র আমার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে এবং পিয়ারী একহাতে ভর দিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া আমার কপালের, কাঁধের এবং বুকের ঘাম মুছিয়া লইতেছে। কহিল, ঘামে বালিশ-বিছানা ভিজে গেছে। পশ্চিম খোলা—এ ঘরটা ভারি গরম। কাল দোতলায় আমার পাশের ঘরে তোমার বিছানা করে দেব। বলিয়া আমার বুকের একান্ত সন্নিকটে বসিয়া পাখাটা তুলিয়া লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। রতন ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, বাবুর চা নিয়ে আসব?

হাঁ, নিয়ে আয়। আর বঙ্কু বাড়ি থাকে ত একবার পাঠিয়ে দিস।

আমি আবার চোখ বুজিলাম। খানিক পরেই বাহিরে চটিজুতার আওয়াজ পাওয়া গেল। পিয়ারী ডাকিয়া কহিল, কে বঙ্কু? একবার এদিকে আয় দিকি।

তাহার পায়ের শব্দে বুঝিলাম, সে অতিশয় সঙ্কুচিতভাবে ঘরে প্রবেশ করিল। পিয়ারী তেমনি বাতাস করিতে করিতে বলিল, ওই কাগজ-পেন্সিল নিয়ে একটু ব'স। কি-কি জানতে হবে, একটা ফর্দ করে দরোয়ান সঙ্গে করে একবার বাজারে যা বাবা। কিছুই নেই।

দেখিলাম এ একটা মস্ত নূতন ব্যাপার। অসুখের কথা আলাদা, কিন্তু সে ছাড়া, সে ইতিপূর্বে কোনদিন আমার বিছানার এত কাছে বসিয়া আমাকে বাতাস পর্যন্ত করে নাই; কিন্তু তা নাহয় একদিন সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারি, কিন্তু এই যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, চাকর-বাকর, এমন কি বঙ্কুর সম্মুখে অবধি দর্পভরে আপনাকে প্রকাশ করিয়া দিল, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। আমার সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন এই বঙ্কুই পাছে কিছু মনে করে বলিয়া পাটনার বাটী হইতে আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। তাহার সহিত আজিকার আচরণের কতই না প্রভেদ।

জিনিসপত্রের ফর্দ করিয়া বঙ্কু প্রস্থান করিল। রতনও চা ও তামাক দিয়া নীচে চলিয়া গেল। পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে—আচ্ছা, রোহিণীবাবু আর অভয়ার মধ্যে কে বেশি ভালবাসে বলতে পারো?

হাসিয়া বলিলাম, যে তোমাকে পেয়ে বসেছে—সেই অভয়াই নিশ্চয় বেশি ভালবাসে।

রাজলক্ষ্মীও হাসিল। কহিল, সে আমাকে পেয়ে বসেছে, তুমি কি করে জানলে?

বলিলাম, যেমন করেই জানি, সত্যি কি না বল ত?

রাজলক্ষ্মী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তা সে যাই হোক, বেশি ভালবাসেন কিন্তু রোহিণীবাবু। বাস্তবিক এত ভালবেসেছিলেন ব'লেই সংসারে এতবড় দুঃখ তিনি মাথা পেতে নিলেন। নইলে এ ত তাঁর অবশ্য কর্তব্য ছিল না। অথচ সে তুলনায় কতটুকু স্বার্থ-ত্যাগ অভয়াকে করতে হয়েচে বল দেখি?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, বরঞ্চ আমি ত দেখি ঠিক বিপরীত। এবং সে হিসাবে যা-কিছুই ইহার কঠিন দুঃখ, যা-কিছু ত্যাগ, সে অভয়াকে করতে হয়েছে। রোহিণীবাবু যাই কেন করুন না, সমাজের চক্ষে তিনি পুরুষমানুষ—এ অভ্রান্ত সত্যটা ভুলে যাচ্ছো কেন?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কিছুই ভুলিনি। পুরুষমানুষ বলতে তুমি যে সুযোগ এবং সুবিধের ইঙ্গিত করচ, সে ক্ষুদ্র এবং ইতর পুরুষের জন্যে, রোহিণীবাবুর মত মানুষের জন্যে নয়। শখ ফুরালে, কিংবা হালে পানি না পেলে ফেলে পালাতে পারে, আবার ঘরে ফিরে মান্যগণ্য ভদ্র জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে—এই ত বলচ? পারে বটে, কিন্তু সবাই পারে? তুমি পারো? যে পারে না, তার ভারের ওজনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। তার নিন্দিত জীবন ঘরের কোণে নিরালায় কাটাবার জো নেই, তাকে সংসারের মাঝখানে স্বচ্ছন্দে নেমে আসতে হবে, অবিচার ও অপযশের বোঝা একাকী নিঃশব্দে বইতে হবে, তার একান্ত স্নেহের পাত্রী, তার ভাবী সন্তানের জননীকে বিরুদ্ধ সমাজের সমস্ত অমর্যাদা ও অকল্যাণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—সে কি সোজা দুঃখ তুমি মনে কর? আবার সকলের চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, সে যে অনায়াসে এই দুঃখের বোঝা নামিয়ে দিয়ে সরে যেতে পারে, তার এই সর্বনেশে বিকট প্রলোভন থেকে অহোরাত্র আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে চলার গুরুভারও তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। দুঃখের মানদণ্ডে এই আত্মোৎসর্গের সঙ্গে ওজন সমান রাখতে যে প্রেমের দরকার, পুরুষমানুষে আপনার ভিতর থেকে যদি বার করতে না পারে, ত কোন মেয়েমানুষেরই সাধ্য নয় তা পূর্ণ করে দেয়।

কথাটা এদিক হইতে কোনদিন এমন করিয়া ভাবি নাই। রোহিণীর সেই সাদাসিধা চুপচাপ ভাব, তার পরে অভয়া যখন তাহার স্বামীর ঘরে চলিয়া গেল, তখন তাহার সেই শান্ত মুখের উপর অপরিসীম বেদনা নিঃশব্দে বহন করিবার যে ছবি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম, তাহাই চক্ষের পলকে রেখায় রেখায় আমার মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু মুখে বলিলাম, চিঠিতে কিন্তু একা অভয়ার উদ্দেশেই পুষ্পাঞ্জলি পাঠিয়েছিলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তাঁর প্রাপ্য আজও তাঁকে দিই। কেননা আমার বিশ্বাস, যা-কিছু পাপ, যা-কিছু অপরাধ সে তাঁর অন্তরের তেজে দগ্ধ হয়ে তাঁকে শুদ্ধ নির্মল করে দিয়েচে। তা নইলে ত আজ তিনি নিতান্ত সাধারণ স্ত্রীলোকের মতই তুচ্ছ, হীন হয়ে যেতেন।

হীন কেন?

রাজলক্ষ্মী বলিল, বেশ! স্বামী-পরিত্যাগের পাপের কি সীমা আছে নাকি? সে পাপ ধ্বংস করবার মত আগুন তাঁর মধ্যে না থাকলে ত আজ তিনি—

কহিলাম, আগুনের কথা থাক। কিন্তু তাঁর স্বামীটি যে কি পদার্থ, সে একবার ভেবে দেখ।

রাজলক্ষ্মী বলিল, পুরুষমানুষ চিরকালই উচ্ছৃঙ্খল, চিরকালই কিছু কিছু অত্যাচারী; কিন্তু তাই বলে ত স্ত্রীর স্বপক্ষে পালিয়ে যাবার যুক্তি খাটতে পারে না। মেয়েমানুষকে সহ্য করতেই হয়। নইলে ত সংসার চলতে পারে না।

কথা শুনিয়া আমার সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল। মনে মনে কহিলাম, মেয়েমানুষের এ সেই সনাতন দাসত্বের সংস্কার! একটু অসহিষ্ণু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এতক্ষণ তা হলে তুমি আগুন আগুন কি বক্‌ছিলে?

রাজলক্ষ্মী সহাস্য মুখে কহিল, কি বক্‌ছিলুম শুনবে? আজই ঘণ্টা-দুই পূর্বে পাটনার ঠিকানায় লেখা অভয়ার চিঠি পেয়েচি। আগুনটা কি জান? সেদিন প্লেগ ব'লে যখন তাঁর সবে-পাতা সুখের ঘরকন্নার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলে, তখন যে বস্তুটি নির্ভয়ে নির্বিচারে তোমাকে ভিতরে ডেকে নিয়েছিল, আমি তাকেই বলচি তাঁর আগুন। তখন সুখের খেয়াল আর তাতে ছিল না। কর্তব্য ব'লে বুঝলে যে তেজ মানুষকে সুমুখের দিকেই ঠেলে, দ্বিধায় পিছুতে দেয় না, আমি তাকেই এতক্ষণ আগুন আগুন ব'লে বকে মরছিলুম। আগুনের এক নাম সর্বভুক জানো না? সে সুখ-দুঃখ দুই-ই টেনে নেয়—তার বাচবিচার নেই। তিনি আর একটা কথা কি লিখেচেন জানো? তিনি রোহিণীবাবুকে সার্থক করে তুলতে চান। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, নিজের জীবনের সার্থকতার ভিতর দিয়াই শুধু সংসারের অপরের জীবনের সার্থকতা পৌঁছাতে পারে। আর ব্যর্থ হতে শুধু একটা জীবন একাকীই ব্যর্থ হয় না, সে আরও অনেকগুলো জীবনকে নানা দিক দিয়ে নিষ্ফল করে দিয়ে তবে যায়। খুব সত্যি না? বলিয়া সে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। তার পরে দুজনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত মৌন হইয়া রহিলাম। বোধ করি, সে কথার অভাবেই এখন আমার

মাথার মধ্যে আঙ্গুলে দিয়া রুক্ষ চুলগুলো নিরর্থক চিরিয়া চিরিয়া বিপর্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহার এ আচরণও একেবারে নূতন। সহসা কহিল, তিনি খুব শিক্ষিতা, না? নইলে এত তেজ হয় না।

বলিলাম, হ্যাঁ, যথার্থ-ই তিনি শিক্ষিতা রমণী।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু একটা কথা তিনি আমাকে লুকিয়েচেন। তাঁর মা হবার লোভটা কিন্তু চিঠির মধ্যে বরাবর চাপা দিতে গেছেন।

বলিলাম. এ লোভ তাঁর আছে নাকি? কৈ আমি ত শুনিনি?

রাজলক্ষ্মী বলিয়া উঠিল, বাঃ, এ লোভ আবার কোন্ মেয়েমানুষের নেই! কিন্তু তাই বলে বুঝি পুরুষমানুষের কাছে বলে বেড়াতে হবে! তুমি ত বেশ!

কহিলাম, তা হলে তোমারও আছে নাকি?

যাও—বলিয়া সে অকস্মাৎ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই সেই আরক্ত মুখ লুকাইবার জন্য শয্যার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন অস্তোন্মুখ সূর্যরশ্মি পশ্চিমের খোলা-জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই আরক্ত আভা তাহার মেঘের মত কালো চুলের উপর অপরূপ শোভায় ছড়াইয়া পড়িল, এবং কানের হীরার দুল দুটিতে নানাবর্ণের দ্যুতি ঝিক্‌মিক্ করিয়া খেলা করিয়া ফিরিতে লাগিল। ক্ষণেক পরেই সে আত্মসংবরণ করিয়া সোজা হইয়া বসিয়া কহিল. কেন. আমার কি ছেলে-মেয়ে নেই যে লোভ হবে? মেয়েদের বিয়ে দিয়েচি, ছেলের বিয়ে দিতে এসেচি—একটি দুটি নাতি-নাতনী হবে, তাদের নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকব—আমার অভাব কি বল ত?

চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথা লইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

রাত্রে রাজলক্ষ্মী কহিল, বঙ্কুর বিয়ে ত এখনো দশ-বারদিন দেরি আছে; চল কাশীতে তোমাকে আমার গুরুদেবকে দেখিয়ে নিয়ে আসি।

হাসিয়া বলিলাম, আমি কি একটা দেখবার জিনিস?

রাজলক্ষ্মী কহিল. সে বিচারের ভার যারা দেখে তাদের, তোমার নয়।

কহিলাম, তাও যদি হয়, কিন্তু এতে আমারই বা লাভ কি, তোমার গুরুদেবেরই বা লাভ কি? রাজলক্ষ্মী গম্ভীর হইয়া বলিল. লাভ তোমাদের নয়, লাভ আমার। না হয় শুধু আমার জন্যেই চল।

সুতরাং সম্মত হইলাম। সম্মুখে একটা দীর্ঘকালব্যাপী অকাল থাকায় এই সময়টায় চারিদিকে যেন বিবাহের বন্যা নামিয়াছিল। যখন-তখন ব্যান্ডের কর্নেট এবং ব্যাগপাইপের বাঁশি বিবিধ প্রকারের বাদ্যভাণ্ড-সহযোগে মানুষকে পাগল করিয়া তুলিবার যোগাড় করিয়া-ছিল। আমাদের স্টেশন-যাত্রার পথেও এমনি কয়েকটা উন্মত্ত শব্দের ঝড় প্রচণ্ড বেগে বহিয়া গেল। তেজটা একটু কমিয়া আসিলে রাজলক্ষ্মী সহসা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, তোমার মতেই যদি সবাই চলে. তাহলে ত গরীবদের আর বিয়ে করাও হয় না, ঘর-সংসার করাও চলে না; তাহলে সৃষ্টি থাকে কি করে?

তাহার অসামান্য গাম্ভীর্য দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, সৃষ্টিরক্ষার জন্যে তোমার কিছুমাত্র দুশ্চিন্তার আবশ্যক নেই। কারণ, আমার মতে চলবার লোক পৃথিবীতে বেশি নেই। অন্ততঃ আমাদের এ দেশে ত নেই বললেই চলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, না থাকাই ত ভাল। বড়লোকেরাই শুধু মানুষ, আর গরীব বলে কি তারা সংসারে ভেসে এসেছে? তাদের ছেলেপুলে নিয়ে ঘরকন্নার সাধ-আহ্লাদ নেই?

কহিলাম, সাধ-আহ্লাদ থাকলেই যে তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে. তার কি কোন অর্থ আছে?

রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, কেন নাই আমাকে বুঝিয়ে দাও।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, দরিদ্র নির্বিশেষেই আমার এ মত নয়, আমার মত শুধু দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থদের সম্বন্ধেই. তার কারণও তুমি জানো ব'লেই আমার বিশ্বাস।

রাজলক্ষ্মী জিদের স্বরে কহিল, তোমার ও মত ভুল।

আমারও কেমন জিদ চাপিয়া গেল। বলিয়া ফেলিলাম, হাজার ভুল হলেও তোমার মুখে সে কথা শোভা পায় না। বঙ্কুর বাপ যখন তোমাদের দু'বোনকেই একসঙ্গে মাত্র বাহাত্তরটি টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, সেদিন এখনো এত পুরানো হয়নি যে তোমার মনে নেই।

তবে নাকি সে লোকটার নেহাৎ পেশা বলেই রক্ষে; নইলে ধর, যদি সে তোমাকে তার ঘরে নিয়ে যেত, তোমার দুটি-একটি ছেলেপুলে হতো—একবার ভেবে দেখ দেখি অবস্থাটা?

রাজলক্ষ্মীর চোখের দৃষ্টিতে কলহ ঘনাইয়া উঠিল, কহিল, ভগবান যাদের পাঠাতেন তাদের তিনিই দেখতেন। তুমি নাস্তিক বলেই কেবল বিশ্বাস কর না।

আমিও জবাব দিলাম, আমি নাস্তিক হই, যা হই, আস্তিকের ভগবানের দরকার কি শুধু এই জন্য?—এই সব ছেলে মানুষ করতে?

রাজলক্ষ্মী রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, না হয় তিনি নাই দেখতেন। কিন্তু তোমার মত আমি অত ভীতু নই। আমি দোর দোর ভিক্ষে করেও তাদের মানুষ করতুম। আর যাই হোক, বাইউলী হওয়ার চেয়ে সে আমার ঢের ভাল হ'তো।

আমি আর তর্ক করিলাম না। আলোচনাটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং অপ্রিয় ধারায় নামিয়া আসিয়াছিল বলিয়া জানালার বাহিরে রাস্তার দিকে চাহিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিলাম।

আমাদের গাড়ি ক্রমশঃ সরকারী এবং বেসরকারী অফিস কোয়ার্টার ছাড়াইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িল। সে দিনটা ছিল শনিবার। বেলা দুটার পর অধিকাংশ অফিসে কেরানী ছুটি পাইয়া আড়াইটার ট্রেন ধরিতে দ্রুতবেগে চলিয়া আসিতেছিল। প্রায় সকলের হাতেই কিছু-না-কিছু খাদ্যসামগ্রী। কাহারও হাতে দুইটা বড় চিংড়ী, কাহারও রুমালে বাঁধা একটু পাঁঠার মাংস, কাহারও হাতে পাড়াগাঁয়ের দুষ্প্রাপ্য কিছু কিছু তরিতরকারি এবং ফলমূল। সাতদিনের পরে গৃহে পৌঁছিয়া উৎসুক ছেলেমেয়ের মুখে একটু আনন্দের হাসি দেখিতে প্রায় সকলেই সামর্থ্যমত অল্প-স্বল্প মিষ্টান্ন কিনিয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া ছুটিতেছে। প্রত্যেকেরই মুখের উপর আনন্দ ও ট্রেন ধরিবার উৎকণ্ঠা একসঙ্গে এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজলক্ষ্মী আমার হাতটা টানিয়া অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, কেন এ'রা সব এমনভাবে ইস্টিশনের দিকে ছুটচেন? আজ কি?

আমি ফিরিয়া চাহিয়া কহিলাম, আজ শনিবার। এ'রা সব অফিসের কেরানী, রবিবারের ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছেন।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ তাই বটে। আর দেখ, সবাই একটা-না-একটা কিছু খাবার জিনিস নিয়ে যাচ্ছেন। পাড়াগাঁয়ে ত এসব পাওয়া যায় না, তাই বোধ হয় ছেলে-মেয়েদের হাতে দেবার জন্য কিনে নিয়ে যাচ্ছেন, না?

আমি কহিলাম, হাঁ।

তাহার কল্পনা দ্রুতবেগে চলিয়াছিল, তাই তৎক্ষণাৎ কহিল, আঃ—ছেলেমেয়েগুলোর আজ কি স্ফূর্তি—কেউ চেঁচামেচি করবে, কেউ গলা জড়িয়ে বাপের কোলে উঠতে চাইবে, কেউ মাকে খবর দিতে রান্নাঘরে দৌড়বে—বাড়িতে বাড়িতে আজ যেন একটা কাণ্ড বেধে যাবে, না? বলিতে বলিতেই তাহার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আমি সায় দিয়া বলিলাম, খুব সম্ভব বটে।

রাজলক্ষ্মী গাড়ির জানালা দিয়া আবার কিছুক্ষণ তাহাদের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, হাঁ গা, এ'দের মাইনে কত?

বলিলাম, কেরানীর মাইনে আর কত হয়, পঁচিশ-ত্রিশ-কুড়ি—এমনি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু বাড়িতে ত এ'দের মা আছেন, ভাই-বোন আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে—

আমি যোগ করিয়া দিলাম, দুই-একটি বিধবা বোন আছে, কাজকর্ম, লোক-লৌকিকতা, ভদ্রতা আছে, কলিকাতার বাসাখরচ আছে, অবিচ্ছিন্ন রোগের খরচ—বাঙ্গালী কেরানী-জীবনের সমস্তই নির্ভর করে এই ত্রিশটি টাকার উপর।

রাজলক্ষ্মীর যেন দম আটকাইয়া আসিতেছিল। সে এমনি ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, তুমি জান না। এ'দের বাড়িতে সব বিষয়-আশয় আছে। নিশ্চয় আছে।

তাহার মুখ দেখিয়া তাহাকে নিরাশ করিতে আমার বেদনা বোধ হইল, তথাপি বলিলাম, এ'দের ঘরকন্নার ইতিহাস আমি ঘনিষ্ঠভাবেই জানি। আমি নিঃসংশয়ে জানি এ'দের চোদ্দ-আনা লোকের কিছু নেই। চাকরি গেলে হয় ভিক্ষা, নাহয় সমস্ত পরিবারের সঙ্গে উপোস করতে হয়। এ'দের ছেলেমেয়েদের কথা শুনবে?

রাজলক্ষ্মী অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, না-না, শুনব না, শুনব না— আমি চাইনে শুনতে।

সে যে প্রাণপণে অশ্রু সংবরণ করিয়া আছে, সে তাহার চোখের প্রতি চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, তাই আর কিছু না বলিয়া পুনরায় পথের দিকে মুখ ফিরাইলাম। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আর তাহার সাড়াশব্দ পাইলাম না। এতক্ষণ অবধি বোধ করি সে নিজের সঙ্গে ওকালতি করিয়া শেষে নিজের কৌতূহলের কাছে পরাজয় মানিয়া, আমার জামার খুঁট ধরিয়া টানিল। ফিরিয়া চাহিতেই সে করুণকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা, বল ওঁদের ছেলেপুলের কথা। কিন্তু তোমার দুটি পায়ে পড়ি, মিছিমিছি বাড়িয়ে ব'লো না। দোহাই তোমার!

তাহার মিনতি করার ভঙ্গি দেখিয়া আমার হাসি পাইল, কিন্তু হাসিলাম না; বরঞ্চ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত গাম্ভীর্যের সহিত বলিলাম, বাড়িয়ে বলা ত দূরের কথা, তুমি জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তোমাকে শোনাতাম না, যদি না তুমি একটু আগে নিজের সম্বন্ধে ভিক্ষা ক'রে ছেলে মানুষ করার কথা বলতে। ভগবান যাদের পাঠান, তিনিই তাদের সুব্যবস্থার ভার নেন, এ একটা কথা বটে। অস্বীকার করলে নাস্তিক ব'লে হয়ত আবার আমাকে গালমন্দ করবে, কিন্তু সন্তানের দায়িত্ব বাপ-মায়ের উপর কতটা, আর ভগবানের উপর কতটা, এ দুই সমস্যার মীমাংসা তুমি নিজেই ক'রো—আমি যা জানি তাই শুধু বলব। কেমন?

সে নীরবে আমার দিকে জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিলাম, ছেলে জন্মালে তাকে কিছুদিন বুকের দুধ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তার মায়ের উপরেই থাকে ব'লে আমার মনে হয়। ভগবানের উপর আমার অচলা ভক্তি, তাঁর দয়ার প্রতিও আমার অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু তবুও মায়ের বদলে তাঁর নিজের এই ভারটা নেবার উপায় আছে কি না—

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দেখ চালাকি ক'রো না—সে আমি জানি।

জানো? যাক, তা হলে একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা হ'ল। কিন্তু ত্রিশ-টাকা-ঘরের জননীর দুধের উৎস শুকিয়ে আসতে কেন যে বিলম্ব হয় না, সে জানতে হলে কোন ত্রিশ-টাকা-ঘরের প্রসূতির আহারের সময় উপস্থিত থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে যখন পারবে না, তখন এ ক্ষেত্রে আমার কথাটা নাহয় মেনেই নাও!

রাজলক্ষ্মী ম্লানমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

আমি বলিলাম, পাড়াগাঁয়ে যে গো-দুগ্ধের একান্ত অভাব, এ কথাটাও তোমাকে মেনে নিতে হবে।

রাজলক্ষ্মী তাড়াতাড়ি কহিল, এ আমি নিজেও জানি। ঘরে গরু থাকে ত ভাল, নইলে আজকাল মাথা খুঁড়ে মলেও কোন পল্লীগ্রামে একফোঁটা দুধ পাবার জো নেই। গরুই নেই, তার আবার দুধ! বলিলাম, যাক, আরও একটা সমস্যার সমাধান হ'ল। তখন ছেলেটার ভাগ্যে রইল স্বদেশী খাঁটি পানাপুকুরের জল, আর বিদেশী কৌটাভরা খাঁটি বার্লির গুঁড়ো। কিন্তু তখনও দুর্ভাগাটার অদৃষ্টে হয়ত এক-আধ ফোঁটা তার স্বাভাবিক খাদ্যও জোটে, কিন্তু, সে সৌভাগ্য এ-সব ঘরে বেশিদিন থাকার আইন নেই। মাস-চারেকের মধ্যেই আর একটি নূতন আগন্তুক তার আবির্ভাবের নোটিশ দিয়ে দাদার মাতৃদুগ্ধের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ করে দেয়। এ বোধ করি তুমি—

রাজলক্ষ্মী লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, হাঁ, হাঁ, জানি। এ আর আমাকে ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে না! তুমি তারপরে বল।

কহিলাম, তারপর ছোঁড়াটাকে ধরে পেটের রোগে এবং স্বদেশী ম্যালেরিয়া জ্বরে। তখন বাপের দায়িত্ব হচ্ছে বিদেশী কুইনিন ও বার্লির গুঁড়ো যোগানো, এবং মায়ের ঘাড়ে পড়ে—ঐ যে বললুম, আঁতুড়ে গিয়ে পুনরায় ভর্তি হবার মুলতুবির ফুরসতে—ঐগুলো খাঁটি দেশী জলে গুলে তাকে গেলানো। তারপরে যথাসময়ে সূতিকাগৃহের হাঙ্গামা মিটিয়ে নবকুমার কোলে করে বেরিয়ে এসে প্রথমটার জন্যে দিন-কতক চ্যাঁচানো।

রাজলক্ষ্মী নীলবর্ণ হইয়া কহিল, চ্যাঁচানো কেন?

বলিলাম, ওটা মায়ের স্বভাব বোলে। এমন কি কেরানীর ঘরেও তার অন্যথা দেখা যায় না, যখন ভগবান তাঁর দায়িত্ব শোধ করতে ছেলেটাকে শ্রীচরণে টেনে নেন!

বাছা রে!

এতক্ষণ বাহিরের দিকে চাহিয়াই কথা কহিতেছিলাম, অকস্মাৎ দৃষ্টি ফিরাইতে দেখিলাম, তাহার বড় বড় দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতেছে। অতিশয় ক্লেশ বোধ করিলাম। মনে হইল, এ বেচারাকে নিরর্থক দুঃখ দিয়া আমার লাভ কি? অধিকাংশ ধনীর মত ইহারও না হয় জগতের এই বিরাট দুঃখের দিকটা অগোচরেই থাকিত। বাঙ্গলার ক্ষুদ্র চাকুরিজীবী প্রকাণ্ড দরিদ্র গৃহস্থ পরিবার যে শুধু খাদ্যাভাবেই ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা প্রভৃতি উপলক্ষ করিয়া প্রতিদিন শূন্য হইয়া যাইতেছে, অন্যান্য বড়লোকের মত এও না হয় এ কথাটা নাই জানিত। কি এমন তাহাতে বেশি ক্ষতি হইত! ঠিক এমনি সময় রাজলক্ষ্মী চোখ মুছিতে মুছিতে অবরুদ্ধ স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, হোক কেরানী, তবু তারা তোমার চেয়ে ঢের ভাল। তুমি ত পাষাণ। তোমার নিজের কোন দুঃখ নেই বলে এঁদের দুঃখকষ্ট এমন আহ্লাদ করে কাঁদা করচ। আমার কিন্তু বুক ফেটে যাচ্ছে। বলিয়া সে অঞ্চলে ঘন ঘন চোখ মুছিতে লাগিল। ইহার প্রতিবাদ করিলাম না। কারণ তাহাতে লাভ হইত না। বরঞ্চ সবিনয়ে কহিলাম, এঁদের সুখের ভাগটাও ত আমার কপালে জোটে না। বাড়ি পৌঁছতে এঁদের আগ্রহটাও ভেবে দেখবার বিষয়।

রাজলক্ষ্মীর মুখ হাসি ও কান্নায় মুহূর্তেই দীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমিও ত তাই বলচি! আজ বাবা আসচে বলে ছেলেপুলেরা সব পথ চেয়ে আছে। কিসের কষ্ট? ওঁদের মাইনে হয়ত কম, তেমনি বাবুয়ানিও নেই। কিন্তু, তাই বলে কি পঁচিশ-ত্রিশ টাকা, এত কম? কখ্‌খনো নয়। অন্ততঃ—এক শ দেড় শ টাকা, আমি নিশ্চয় বলচি।

বলিলাম, হতেও পারে। আমি হয়ত ঠিক জানিনে।

উৎসাহ পাইয়া রাজলক্ষ্মীর লোভ বাড়িয়া গেল। অতিশয় ক্ষুদ্র কেরানীর জন্যও মাসে দেড় শ টাকা মাহিনা তাহার মনঃপূত হইল না। কহিল, শুধু কি ওই মাইনেটিই ওঁদের ভরসা তুমি মনে কর? সবাই উপরিও কত পান?

কহিলাম, উপরিটা কি? প্যালা?

আর সে কথা কহিল না, মুখ ভার করিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। খানিক পরে বাহিরের দিকেই চোখ রাখিয়া বলিল, তোমাকে যতই দেখচি, ততই তোমার ওপর থেকে আমার মন চলে যাচ্চে। তুমি ছাড়া আর আমার গতি নেই জানো ব'লেই আমাকে তুমি এমন ক'রে বেঁধো।

এতদিনের পরে আজ বোধ করি এই প্রথম তাহার হাতদুটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। তাহার মুখের পানে চাহিয়া কি যেন একটা বলিতেও চাহিলাম, কিন্তু গাড়ি আসিয়া স্টেশনের ধারে দাঁড়াইল। একটা স্বতন্ত্র গাড়ি রিজার্ভ থাকা সত্ত্বেও বঙ্কু কিছু কিছু জিনিসপত্র লইয়া পূর্বাহ্নেই আসিয়াছিল। সে রতনকে কোচবাক্সে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। হাত ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলাম; যে কথাটা মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল, আবার তাহা নীরবে অন্তরের ভিতরে গিয়া লুকাইল।

আড়াইটার লোকাল ছাড়ে-ছাড়ে। আমাদের ট্রেন পরে। এমন সময়ে একটি প্রৌঢ়-গোছের দরিদ্র ভদ্রলোক একহাতে নানাজাতীয় তরিতরকারির পুঁটুলি এবং অন্য হাতে দাঁড়শুদ্ধ একটি মাটির পাখি লইয়া শুধু প্লাটফরমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য ভাবে ছুটিতে গিয়া রাজলক্ষ্মীর গায়ে আসিয়া পড়িল। মাটির পুতুল মাটিতে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া গেল। লোকটা হায় হায় করিয়া বোধ করি কুড়াইতে যাইতেছিল, পাঁড়েজী হুঙ্কার ছাড়িয়া একলম্ফে তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিল এবং বঙ্কু ছড়ি তুলিয়া বুড়ো কানা ইত্যাদি বলিয়া মারে আর কি! আমি একটু দূরে অন্যমনস্ক ছিলাম, শশব্যস্তে রণস্থলে আসিয়া পড়িলাম। লোকটি ভয়ে এবং লজ্জায় বার বার বলিতে লাগিল, দেখতে পাইনি। মা, আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—

আমি তাড়াতাড়ি ছাড়াইয়া দিয়া বলিলাম, যা হবার হয়েচে, আপনি শীঘ্র যান, আপনার ট্রেন ছেড়ে দিল বলে।

লোকটি তবুও তাহার পুতুলের টুকরা কয়টা কুড়াইবার জন্য বারকয়েক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে দৌড় দিল, কিন্তু অধিক দূর ছুটিতে হইল না, গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তখন ফিরিয়া

আসিয়া সে আর একদফা ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সেই ভাঙ্গা অংশগুলো সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া, আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, ওতে আর কি হবে?

লোকটি কহিল, কিছুই না মশাই। মেয়েটার অসুখ—গেল সোমবারে বাড়ি থেকে আসবার সময় বলে দিলে, আমার জন্যে একটি পাখি-পুতুল কিনে এনো না! কিনতে গেলুম, ব্যাটা গরজ বুঝে দর হাঁকলে কিনা—দু আনা—তার একটি পয়সা কম নয়। তাই সই। মরি-বাঁচি করে আট-আটটা পয়সা ফেলে দিয়ে নিলুম, কিন্তু এমনি অদেষ্ট দেখুন না যে, দোড়গোড়ায় এনে ভেঙ্গে গেল! রোগা মেয়েটার হাতে দিতে পারলুম না। বেটি কেঁদে বলবে, বাবা আনলে না। যা হোক টুকরোগুলো নিয়ে যাই, দেখিয়ে বলব, মা, এ মাসের মাইনেটা পেলে আগে তোর পুতুল কিনে তবে আমার অন্য কাজ। বলিয়া সমস্তগুলি কুড়াইয়া সযত্নে চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া কহিল, আপনার স্ত্রীর বোধ হয় বড্ড লেগেচে—আমি দেখতে পাইনি। লোকসানকে লোকসানও হ'লো, গাড়িটাও পেলুম না—পেলে তবুও রোগা মেয়েটাকে আধঘণ্টা আগে গিয়ে দেখতে পেতুম। বলিতে বলিতে ভদ্রলোকটি পুনরায় প্লাট-ফরমের দিকে প্রস্থান করিল। বঙ্কু পাঁড়েজীকে লইয়া কি-একটা প্রয়োজনে অন্যত্র চলিয়া গেল; আমি হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, শ্রাবণের ধারার মত রাজলক্ষ্মীর দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। ব্যস্ত হইয়া কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, খুব লেগেচে না কি? কোথায় লাগল?

রাজলক্ষ্মী আঁচলে চোখ মুছিয়া চুপিচুপি কহিল, হ্যাঁ, খুবই লেগেচে—কিন্তু সে এমন জায়গায় যে, তোমার মত পাষাণের দেখবারও জো নেই, বোঝবারও জো নেই।

চৌদ্দ

শ্রীমান বঙ্কুকে কেন যে বাধ্য হইয়া আমাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র গাড়ি রিজার্ভ করিতে হইয়াছিল, এই খবরটা যখন তাহার কাছে আমি লইতেছিলাম, তখন রাজলক্ষ্মী কান পাতিয়া শুনিতেছিল। এখন সে একটু অন্যত্র যাইতে রাজলক্ষ্মী নিতান্ত গায়ে পড়িয়াই আমাকে শুনাইয়া দিল যে, নিজের জন্য বাজে খরচ করিতে সে যত নারাজ, ততই তাহার ভাগ্যে এই সকল বিড়ম্বনা ঘটে। সে কহিল, সেকেন্ড ক্লাশ ফার্স্ট ক্লাশে গেলেই যদি ওদের তৃপ্তি হয়, বেশ ত, তাও ত আমাদের জন্যে মেয়েদের গাড়ি ছিল? কেন রেল কোম্পানীকে মিছে এতগুলো টাকা বেশি দেওয়া।

বঙ্কুর কৈফিয়তের সঙ্গে তাহার মায়ের এই মিতব্যয়-নিষ্ঠায় বিশেষ কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু সে কথা মেয়েদের বলিতে গেলে কলহ বাধে। অতএব চুপ করিয়া শুনিয়া গেলাম; কিছুই বলিলাম না।

প্লাটফরমে একখানি বেঞ্চের উপর বসিয়া সেই ভদ্রলোকটি ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সুমুখ দিয়া যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাবেন?

লোকটি কহিলেন, বর্ধমান।

একটু অগ্রসর হইতেই রাজলক্ষ্মী আমাকে চুপিচুপি বলিল, তা হলে ত উনি অনায়াসে আমাদের গাড়িতে যেতে পারেন? ভাড়াও লাগবে না—তাই কেন ওঁকে বল না?

বলিলাম, টিকিট নিশ্চয়ই কেনা হয়ে গেছে—ভাড়ার টাকা ওঁর বাঁচবে না।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তা হোক না কেন, ভিড়ের কষ্টটা ত বাঁচবে।

কহিলাম, ওঁদের অভ্যাস আছে, ভিড়ের কষ্ট গ্রাহ্য করেন না।

রাজলক্ষ্মী তখন জিদ করিয়া বলিল, না না, তুমি ওঁকে বল। আমরা তিনজনে কথা-বার্তায় এতটা পথ বেশ যেতে পারব।

বুঝিলাম, এক্ষণে সে নিজের ভুলটা টের পাইয়াছে। বঙ্কু এবং নিজের চাকরবাকরদের চোখের উপর আমার সঙ্গে একাকী একটা আলাদা গাড়িতে উঠার দৃষ্টিকটুত্বতা এখন সে কোনমতে একটুখানি ফিকা করিয়া লইতে চায়। তথাপি ইহাকেই আরও একটু চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার জন্য তাচ্ছিল্যের ভাবে কহিলাম, কাজ কি একটা বাজে লোককে গাড়িতে ঢুকিয়ে। তুমি যত পার আমার সঙ্গে কথা ক'য়ো—বেশ সময় কেটে যাবে।

রাজলক্ষ্মী আমার প্রতি একটা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, সে আমি জানি। আমাকে জব্দ করবার এতবড় সুযোগ হাতে পেয়ে কি তুমি ছাড়তে পারো! এই বলিয়া সে চুপ করিল।

কিন্তু ট্রেন স্টেশনে লাগিতেই আমি তাঁহাকে গিয়া কহিলাম, আপনি কেন আমাদের গাড়িতেই আসুন না। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই, ভিড়ের দুঃখটা আপনার বাঁচবে।

বলা বাহুল্য তাঁহাকে রাজী করাইতে ক্লেশ পাইতে হইল না, অনুরোধমাত্রই তিনি তাঁহার পুঁটুলি লইয়া আমাদের গাড়িতে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

ট্রেন গোটা-দুই স্টেশন পার না হইতেই রাজলক্ষ্মী তাঁহার সহিত চমৎকার কথাবার্তা জুড়িয়া দিল, এবং আরও কয়েকটা স্টেশন উত্তীর্ণ হইবার মধ্যেই তাঁহার ঘরের খবর, পাড়ার খবর, এমন কি, আশপাশের গ্রামগুলার খবর পর্যন্ত সে খুঁটিয়া জানিয়া লইল।

রাজলক্ষ্মীর গুরুদেব কাশীতে দৌহিত্র-দৌহিত্রী লইয়া বাস করেন, তাঁহাদের জন্য সে কলিকাতা হইতে অনেক জিনিসপত্র লইয়া যাইতেছিল। বর্ধমানের কাছাকাছি আসিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া সে তাহারই মধ্যে হইতে বাছিয়া একখানি সবুজ রঙের রেশমের শাড়ি বাহির করিয়া বলিল, সরলাকে তার পুতুলের বদলে এই কাপড়খানি দেবেন।

ভদ্রলোক প্রথমে অবাক হইলেন। পরে সলজ্জভাবে তাড়াতাড়ি কহিলেন, না, না, মা, সরলাকে আমি আসচে বারে পুতুল কিনে দেব, আপনি কাপড় রেখে দিন। তা ছাড়া এ যে বড্ড দামী কাপড় মা!

রাজলক্ষ্মী বস্ত্রখানি তাহার পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, বেশি দাম নয়। আর দাম যাই হোক, এখানি তার হাতে দিয়ে বলবেন, তার মাসি তাকে ভাল হ'য়ে পরতে দিয়েচে।

ভদ্রলোকের চোখ ছলছল করিয়া আসিল। আধঘণ্টার আলাপে একজন অপরিচিত লোকের পীড়িত কন্যাকে এমন একখানি মূল্যবান বস্ত্র উপহার দেওয়া জীবনে বোধ করি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। কহিলেন, আশীর্বাদ করুন, সে ভাল হ'য়ে উঠুক; কিন্তু গরীবের ঘরে এত দামী কাপড় নিয়ে সে কি করবে মা? আপনি তুলে রেখে দিন। বলিয়া তিনি আমার প্রতিও একবার চাহিলেন। আমি কহিলাম, তার মাসি যখন তাকে পরতে দিচ্ছে, তখন নিয়ে গিয়ে আপনার দেওয়াই উচিত। বলিয়া হাসিয়া কহিলাম, সরলার ভাগ্য ভাল। আমাদের এমন একটা মাসি-পিসি থাকলে বেঁচে যেতুম মশাই। এইবার কিন্তু আপনার মেয়েটি চটপট সেরে উঠবে দেখবেন।

ভদ্রলোকের সমস্ত মুখে কৃতজ্ঞতা তখন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আর আপত্তি না করিয়া কাপড়খানি গ্রহণ করিলেন। আবার দুজনের কথাবার্তা চলিতে লাগিল। সংসারের কথা, সমাজের কথা, সুখদুঃখের কথা—কত কি। আমি শুধু জানালার বাহিরে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। এবং যে প্রশ্ন নিজেকে নিজে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র ঘটনার সূত্র ধরিয়া আবার সেই প্রশ্ন মনে উঠিল, এ যাত্রার সমাপ্তি কোথায়?

একখানা দশ-বারো টাকা মূল্যের বস্ত্র দান করা রাজলক্ষ্মীর পক্ষে কঠিনও নয়, নূতনও নয়। তাহার দাসী-চাকরেরা হয়ত এ কথা লইয়া একবার চিন্তা পর্যন্তও করিত না। কিন্তু আমার চিন্তা আলাদা। এই দেওয়া জিনিসটা যে দান করার হিসাবে তাহার কাছে কিছুই নয়—সে আমিও জানি, এবং কাহারও চেয়ে কম জানি না; কিন্তু আমি ভাবিতেছিলাম, তাহার হৃদয়ের ধারাটা যেদিক লক্ষ্য করিয়া আপনাকে নিঃশেষ করিতে উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার অবসান হইবে কোথায় এবং কি করিয়া!

সমস্ত রমণীর অন্তরেই নারী বাস করে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে, এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়।

রাজলক্ষ্মীকে আমি চিনিয়াছিলাম। তাহার পিয়ারী বাইজী যে তাহার অপরিণত যৌবনের সমস্ত দুর্দাম আক্ষেপ লইয়া প্রতি মুহূর্তেই মরিতেছিল, সে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম। আজ সে নামটা উচ্চারণ করিলেও সে যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে থাকে। আমার সমস্যাও হইয়াছিল ইহাই।

সর্বস্ব দিয়া সংসার উপভোগ করিবার সেই উত্তপ্ত আবেগ আর রাজলক্ষ্মীর মধ্যে

নাই; আজ সে শান্ত, স্থির। তাহার কামনা-বাসনা আজ তাহারই মধ্যে এমন ডুব মারিয়াছে যে, বাহির হইতে হঠাৎ সন্দেহ হয় তাহারা আছে, কি নাই। তাহাই এই সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া আমাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিল, আজ এই তাহার পরিণত যৌবনের সুগভীর তলদেশ হইতে যে মাতৃত্ব সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, সদ্যনিদ্রোত্থিত কুম্ভকর্ণের মত তাহার বিরাট ক্ষুধার আহার মিলিবে কোথায়? তাহার নিজের সন্তান থাকিলে যাহা সহজ এবং স্বাভাবিক হইয়া উঠিতে পারিত, তাহারই অভাবে সমস্যা এমন একান্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সেদিন পাটনায় তাহার মধ্যে যে মাতৃরূপ দেখিয়া মুগ্ধ অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম, আজ তাহার সেই মূর্তি স্মরণ করিয়া আমার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলি মনে হইতে লাগিল, তত বড় আগুনকে ফুঁ দিয়া নিভানো যায় না বলিয়াই আজ পরের ছেলেকে ছেলে কল্পনা করার ছেলেখেলা দিয়া রাজলক্ষ্মীর বুকের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটিতেছে না। তাই আজ একমাত্র বংকুই তাহার কাছে পর্যাপ্ত নয়, আজ দুনিয়ার যেখানে যত ছেলে আছে, সকলের সুখ-দুঃখই তাহার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে।

বর্ধমানে ভদ্রলোক নামিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল। আমি জানালা হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এই কান্নাটা কার কল্যাণে হ'লো? সরলা, না তার মায়ের?

রাজলক্ষ্মী মুখ তুলিয়া কহিল, তুমি বুঝি এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলে?

বলিলাম, কাজে কাজেই। মানুষ নিজে কথা না কইলেই পরের কথা তার কানে এসে ঢোকে। সংসারে কম কথার লোকের জন্যে ভগবান এই শাস্তির সৃষ্টি করে রেখেছেন। ফাঁকি দেবার জো নেই। সে যাক, কিন্তু চোখের জল কার জন্যে ঝরছিল শুনতে পাইনে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমার চোখের জল কার জন্যে ঝরে, সে শুনে তোমার লাভ নেই।

কহিলাম, লাভের আশা করিনে—শুধু লোকসান বাঁচিয়ে চলতে পারলেই বাঁচি। সরলা কিংবা তাহার মায়ের জন্যে যত ইচ্ছে চোখের জল ঝরুক, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার বাপের জন্য ঝরাটা আমি পছন্দ করিনে।

রাজলক্ষ্মী শুধু একটা 'হুঁ' বলিয়াই জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মনে করিয়াছিলাম, এমন একটা রসিকতা নিষ্ফল হইবে না, ইহা অনেক নিরুদ্ধ উৎসের বাধা মুক্ত করিয়া দিবে। কিন্তু সে ত হইলই না, বরঞ্চ যদি বা সে এতক্ষণ এইদিকেই চাহিয়াছিল, রসিকতা শুনিয়া আর-এক দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিল।

কিন্তু বহুক্ষণ মৌন ছিলাম, কথা কহিবার জন্যে ভিতরে ভিতরে একটা আবেগ উপস্থিত হইয়াছিল; তাই বেশিক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার কথা কহিলাম। বলিলাম, বর্ধমান থেকে কিছু খাবার কিনে নিলে হ'তো।

রাজলক্ষ্মী কোন উত্তরই দিল না, তেমনি চুপ করিয়া রহিল।

বলিলাম, পরের শোকে এতক্ষণ কেঁদে ভাসিয়ে দিলে, আর ঘরের লোকের দুঃখে যে কানই দাও না। এ বিলেত-ফেরতের বিদ্যা শিখলে কোথায়?

রাজলক্ষ্মী এবার ধীরে ধীরে কহিল, বিলেত-ফেরতের উপর যে তোমার ভারি ভক্তি দেখি!

বলিলাম, হাঁ, তাঁরা ভক্তির পাত্র যে!

কেন, তারা তোমাদের করলে কি?

এখনো কিছু করেনি, কিন্তু পাছে কিছু করে এই ভয়েই আগে থেকে ভক্তি করি।

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এ তোমাদের অন্যায়। তোমরা তাদের দল থেকে, জাত থেকে, সমাজ থেকে—সব দিক থেকেই বার করে দিয়েচ। তবু যদি তারা তোমাদের জন্য এতটুকুও করে, তাতেই তোমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

কহিলাম, আমরা ঢের বেশি কৃতজ্ঞ হতুম যদি তারা সেই রাগে পুরোপুরি মুসলমান কিংবা খ্রীষ্টান হয়ে যেত। ওদের মধ্যে যারা নিজেদের ব্রাহ্ম বলে, তারা ব্রাহ্ম সমাজকে নষ্ট করছে, যারা হিন্দু বলে মনে করে, তারা হিন্দু সমাজকে ত্যক্ত করে মারছে। ওরা নিজেরা

কি, যদি তাই আগে ঠিক করে নিয়ে পরের জন্যে কাঁদতে বসতো, তাতে হয়ত ওদের নিজেদেরও মঙ্গল হ'তো, যাদের জন্য কাঁদে তাদেরও হয়ত একটু উপকার হ'তো।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু আমার ত তা মনে হয় না!

বলিলাম, না হলেও তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু যে জন্যে সম্প্রতি আটকাচ্ছে, সে অন্য কথা। কই—তার ত কোন জবাব দাও না!

এবার রাজলক্ষ্মী হাসিয়া কহিল, ওগো, সে জন্যে আটকাবে না। আগে তোমার ক্ষিদে পাক, তারপর চিন্তা করে দেখা যাবে।

বলিলাম, তখন চিন্তা করে যে-কোনও স্টেশন থেকে যা মেলে খাবার কিনে গিলতে দেবে—এই ত? কিন্তু সে হবে না, তা বলে রাখচি।

জবাব শুনিয়া সে আমার মুখের প্রতি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া আবার একটু হাসিয়া বলিল, এ আমি পারি, তোমার বিশ্বাস হয়?

বলিলাম, বেশ, এতটুকু বিশ্বাসও তোমার উপর থাকবে না?

তা বটে! বলিয়া সে পুনরায় তাহার জানালার বাহিরে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

পরের স্টেশনে রাজলক্ষ্মী রতনকে ডাকিয়া খাবারের জায়গাটা চাহিয়া লইল এবং তাহাকে তামাক দিতে হুকুম করিয়া, থালায় করিয়া সমস্ত খাদ্যসামগ্রী সাজাইয়া সম্মুখে ধরিয়া দিল! দেখিলাম, এ-বিষয়ে একবিন্দু ভুলচুক কোথাও নাই; আমি যাহা কিছু ভালবাসি সমস্ত খুঁটাইয়া সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

বেঞ্চের উপর রতন বিছানা পাতিয়া দিল। পরিপাটি ভোজন সমাধা করিয়া গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া আরামে চোখ বুজিবার উপক্রম করিতেছি, রাজলক্ষ্মী কহিল, খাবারগুলো সরিয়ে নিয়ে যা রতন। যা পারিস খেগে যা—আর তোদের গাড়িতে অন্য কেউ যদি খায় দিস।

কিন্তু রতনের অত্যন্ত লজ্জা ও সংকোচ লক্ষ্য করিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কই, তুমি খেলে না?

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, আমার ক্ষিদে নেই, যা না রতন, দাঁড়িয়ে রইলি কেন, গাড়ি ছেড়ে দেবে যে।

রতন লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। কহিল আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবু, মোচলমান কুলিতে খাবারটা ছুঁয়ে ফেলেচে। কত বলচি, মা ইস্টিশান থেকে কিছু কিনে এনে দিই, কিন্তু কিছুতেই না। বলিয়া সে আমার মুখের প্রতি সকাতর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঠিক যেন আমারই অনুমতি ভিক্ষা করিল।

কিন্তু আমার কথা কহিবার পূর্বেই রাজলক্ষ্মী তাহাকে একটা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, তুই যাবি, না দাঁড়িয়ে তর্ক করবি?

রতন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া খাবারের পাত্রটা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গেল। ট্রেন ছাড়িলে রাজলক্ষ্মী আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। মাথার চুলের মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কহিল, আচ্ছা দেখ—

বাধা দিয়া কহিলাম, পরে দেখব অখন। কিন্তু—

সেও আমাকে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া দিয়া বলিল, তোমার 'কিন্তু' গেয়ে লেকচার দিতে হবে না, আমি বুঝেচি। আমি মুসলমানকে ঘৃণাও করিনে, সে ছুঁলে খাবার নষ্ট হয়ে যায়, তাও মনে করিনে। করলে নিজের হাতে তোমাকে খেতে দিতুম না।

কিন্তু নিজে খেলে না কেন?

মেয়েমানুষের খেতে নেই।

কেন?

কেন আবার কি? মেয়েমানুষের খাওয়া নিষেধ।

কিন্তু পুরুষমানুষের নিষেধ নেই?

রাজলক্ষ্মী আমার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া বলিল, না। পুরুষমানুষের জন্যে আবার অত বাঁধাবাঁধি আইন-কানুন কিসের জন্যে? তারা যা ইচ্ছে খাক, যা ইচ্ছে পরুক, যেমন করে হোক সুখে থাক আমরা আচার পালন ক'রে গেলেই হ'লো। আমরা শত কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু তোমরা পার কি! এই যে সন্ধ্যা হতে-না-হতেই ক্ষিদেয় অন্ধকার দেখছিলে?

বলিলাম, তা হতে পারে, কিন্তু কষ্ট সইতে না পারাটা আমাদেরও গৌরবের কথা নয়।

রাজলক্ষ্মী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, এতে তোমাদের এতটুকু অগৌরব নেই। তোমরা ত আমাদের মত দাসীর জাত নয় যে, কষ্ট সহ্য করতে যাবে। লজ্জার কথা আমাদেরই যদি না পারি।

কহিলাম, এ ন্যায়শাস্ত্র তোমাকে শেখালে কে? কাশীর গুরুদেব?

রাজলক্ষ্মী আমার মুখের অত্যন্ত সন্নিকটে ঝুঁকিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া রহিল, পরে মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার যা-কিছু শিক্ষা সে তোমারই কাছে। তোমার চেয়ে বড় গুরু আর আমার নেই।

বলিলাম, তাহলে গুরুর কাছে ঠিক উল্টোটাই শিখে রেখেচ। আমি কোনদিন বলিনে যে, তোমরা দাসীর জাত। বরঞ্চ এই কথাই চিরদিন মনে করি যে, তোমরা তা নও। তোমরা কোন দিক থেকে আমাদের চেয়ে এক তিল ছোট নও।

রাজলক্ষ্মীর চোখ দুটি সহসা ছলছল্ করিয়া উঠিল। বলিল, সে আমি জানি। আর জানি বলেই ত এ কথা তোমার কাছে শিখতে পেরেচি। তোমার মত সবাই যদি এমনি করে ভাবতে পারতো, তাহলে পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত মেয়ের মুখেই এ কথা শুনতে পেতে। কে বড় কে ছোট, এ সমস্যাই কখনো উঠত না।

অর্থাৎ এ সত্য নির্বিচারে সবাই মেনে নিত?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হ্যাঁ।

আমি তখন হাসিয়া কহিলাম, ভাগ্যে পৃথিবীসুদ্ধ মেয়েরা তোমার সঙ্গে একমত নয়, তাই রক্ষা। কিন্তু আপনাদের এত হীন মনে করতে তোমার লজ্জা করে না?

আমার উপহাস রাজলক্ষ্মী লক্ষ্য করিল কি না সন্দেহ। অত্যন্ত সহজভাবে কহিল, কিন্তু এর মধ্যে ত কোন হীনতা নেই।

আমি কহিলাম, তা বটে। আমরা প্রভু, তোমরা দাসী, এই সংস্কারটাই এ দেশের মেয়েদের মনে এমনি বদ্ধমূল যে, এর হীনতাটাও আর তোমাদের চোখে পড়ে না। বোধ করি এই পাপেই পৃথিবীর সকল দেশের মেয়ের চেয়ে তোমরাই আজ সত্যিসত্যি ছোট হয়ে গেছ।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ শক্ত হইয়া বসিয়া, দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়। তোমাদের দেশের মেয়েরা নিজেদের ছোট মনে ক'রে ছোট হয়ে যায়নি, তোমরাই তাদের ছোট মনে ক'রে ছোট করে দিয়েচ, নিজেরাও ছোট হয়ে গেছ। এই সত্যি কথা।

কথাটা অকস্মাৎ যেন নূতন করিয়া বাজিল। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি যেটুকু ছিল, তাহা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া মনে হইতে লাগিল, বাস্তবিকই অনেকখানি সত্য ইহাতে লুকাইয়া আছে, যাহা আজ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

রাজলক্ষ্মী কহিল, তুমি সেই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে তামাশা করেছিলে। কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার কতখানি চোখ খুলে গেছে, সে ত জানো না?

জানি না, তাহা স্বীকার করিতেই সে কহিতে লাগিল, জানো না তার কারণ আছে। কোন জিনিস জানবার জন্যে যতক্ষণ না মানুষের বুকের ভেতর থেকে একটা ব্যাকুলতা ওঠে, ততক্ষণ সবই তার চোখে ঝাপসা হয়ে থাকে। এতদিন তোমার মুখে শুনে ভাবতুম, সত্যিই যদি আমাদের দেশের লোকের দুঃখ এত বেশি, সত্যিই যদি আমাদের সমাজ এমন ভয়ানক অন্ধ, তবে তার মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকেই বা কি করে, তাকে মেনে চলেই বা কি করে।

আমি চুপ করিয়া শুনিতেছি দেখিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, আর তুমিই বা এত বুঝবে কি করে? কখনো এদের মধ্যে থাকোনি, কখনো এদের সুখ-দুঃখ ভোগ করোনি; তাই বাইরে থেকে বাইরের সমাজের সঙ্গে তুলনা ক'রে ভাবতে, এদের বুঝি কষ্টের আর অবধি নেই। যে বড়লোক জমিদার পোলাও খেয়ে থাকে, সে তার কোন দরিদ্র প্রজাকে পান্তা ভাত খেতে দেখে যদি ভাবে, এর দুঃখের আর সীমা নেই—তার যেমন ভুল হয়, তোমারও তেমনি ভুল হয়েচে।

বলিলাম, তোমার তর্কটা যদিচ ন্যায়শাস্ত্রের আইনে হচ্চে না, তবুও জিজ্ঞাসা করি কি করে জানলে দেশের সম্বন্ধে আমার এর চেয়ে বেশি জ্ঞান নেই?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কি করে থাকবে? তোমার মত স্বার্থপর লোক আর সংসারে আছে নাকি? যে কেবল নিজের আরামের জন্যে পালিয়ে বেড়ায়, সে ঘরের খবর জানবে কোথা থেকে! তোমাদের মত লোকই সমাজের বেশি নিন্দে করে বেড়ায় যারা সমাজের কোন ধারই ধারে না। তোমরা না জানো ভাল ক'রে পরের সমাজ, না জানো ভালো ক'রে নিজেদের সমাজ।

বলিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, তার পরে এই যেমন বাইরে থেকে বাইরের সামাজিক ব্যবস্থা দেখে তোমরা ভেবে মরে যাও, আমাদের মেয়েরা বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ থেকে দিনরাত কাজ করে ব'লে তাদের মত দুঃখী, তাদের মত পীড়িত, তাদের মত হীন আর বুঝি কোন দেশের মেয়ে নেই। কিন্তু দিনকতক আমাদের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে নিজেদের চিন্তা কর দেখি! নিজেদের একটু উঁচু করবার চেষ্টা করো—যদি কোথাও কিছু সত্যিকার গলদ থাকে, সে শুধু তখনই চোখে পড়বে—কিন্তু তার আগে নয়।

কহিলাম, তার পরে?

রাজলক্ষ্মী রাগ করিয়া বলিল, তুমি আমাকে তামাশা করচ, তা জানি। কিন্তু তামাশা করবার কথা আমি বলিনি। বাড়ির গিন্নী সকলের চেয়ে কম, সকলের চেয়ে খারাপ খায়! অনেক সময়ে চাকরের চেয়েও। অনেক সময়ে চাকরদের চেয়েও বেশি খাটতে হয়। কিন্তু তার দুঃখে আকুল হয়ে কেঁদে না বেড়িয়ে আমাদের বরঞ্চ অমনি দাসীর মতই থাকতে দাও, কিন্তু অন্য দেশের রানী ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রো না, আমি এই কথাটাই তোমাকে বলচি।

বলিলাম, তর্কশাস্ত্রের মাথায় পা দিয়ে ডোবাবার জো করে তুলেচ বটে, কিন্তু আমিও যে শাস্ত্রমতে তর্ক করবার ঠিক বাগ পাচ্চিনে, তা মানচি।

সে কহিল, তর্ক করবার কিছু নেই।

বলিলাম, থাকলেও সে শক্তি নেই, ভয়ানক ঘুম পাচ্চে। কিন্তু তোমার কথাটা একরকম বুঝতে পেরেচি।

রাজলক্ষ্মী একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমাদের দেশে যে জন্যেই হোক ছোট-বড় উঁচু-নীচু সকলের মধ্যেই টাকার লোভটা ভয়ানক বেড়ে গেছে। কেউ আর অল্পে সন্তুষ্ট হতে জানে না—চায়ও না। এতে যে কত অনিষ্ট হয়েচে, সে আমিই টের পেয়েচি।

কহিলাম, কথাটা সত্যি, কিন্তু তুমি টের পেলে কেমন করে!

রাজলক্ষ্মী কহিল, টাকার লোভেই ত আমার এই দশা। কিন্তু আগেকার কালে বোধ হয় এত লোভ ছিল না।

বলিলাম, এ ইতিহাসটা ঠিক জানিনে।

সে কহিতে লাগিল, কখ্খনো ছিল না। সেখানে কখ্খনো মায়ে টাকার লোভে মেয়েকে এ পথে পাঠাতো না। তখন ধর্মভয় ছিল। আজ ত আমার টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কি কেউ আছে? পথের ভিক্ষুক যে, সেও বোধ হয় আজ আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুখী।

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, তোমার কি সত্যিই এত কষ্ট?

রাজলক্ষ্মী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আঁচল দিয়া চোখদুটি একবার মুছিয়া লইয়া বলিল, আমার কথা আমার অন্তর্যামীই জানেন।

অতঃপর উভয়েই স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। গাড়ির গতি মন্দীভূত হইয়া ক্রমশঃ একটা ছোট স্টেশনে আসিয়া থামিল। খানিক পরে আবার চলিতে শুরু করিলে বলিলাম, কি করলে তোমার বাকী জীবনটা সুখে কাটে, আমাকে বলতে পারো?

রাজলক্ষ্মী কহিল, সে আমি ভেবে দেখেচি। আমার সমস্ত টাকাকড়ি যদি কোন রকমে চলে যায়, কিছু না থাকে—একেবারে নিরাশ্রয়, তা হলেই—

আবার দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। তাহার কথাটা এতই স্পষ্ট যে, সবাই বুঝিতে পারে, আমারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কথা তোমার কবে থেকে মনে হয়েচে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বোঙ্কদ অভয়ার কথা শুনেচি, সেই দিন থেকে।

বলিলাম, কিন্তু তাদের জীবনযাত্রা ত এর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতে তারা যে কত দুঃখ পেতে পারে, এ ত তুমি জানো না।

সে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, জানিনে সত্যি; কিন্তু যত দুঃখই তারা পাক, আমার মত দুঃখ যে তারা কোন দিন পাবে না, এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার জন্যে আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি ক'রে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কি তোমাকে তাই বলচি? আর সম্ভ্রমই ত মানুষের আসল জিনিস। সেই যদি ত্যাগ করতে পারো না, তবে ত্যাগের কথা মুখে আনচো কেন? তোমাকে ত আমি কিছুই ত্যাগ করতে বলিনি!

বলিলাম, বলনি বটে, কিন্তু পারি। সম্ভ্রম যাওয়ার পরে পুরুষমানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শুধু সেই সম্ভ্রম ছাড়া তোমার জন্যে আর সমস্তই আমি বিসর্জন দিতে পারি।

রাজলক্ষ্মী সহসা হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, আমার জন্যে তোমাকে কিছুই বিসর্জন দিতে হবে না। কিন্তু, তুমি কি মনে কর শুধু তোমাদেরই সম্ভ্রম আছে, আমাদের নেই? আমাদের পক্ষে সেটা ত্যাগ করা এতই সহজ? তবু তোমাদের জন্যেই কত শত-সহস্র মেয়েমানুষ যে এটাকে ধুলোর মত ফেলে দিয়েচে, সে কথা তুমি জানো না বটে, কিন্তু আমি জানি।

আমি কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্, আর কথায় কাজ নেই। তোমাকে আমি এতদিন যা ভেবেছিলুম তা ভুল। তুমি ঘুমোও—এ সম্বন্ধে আর আমিও কোনদিন কথা কইব না, তুমিও কয়ো না। বলিয়া সে উঠিয়া তাহার নিজের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।

পরদিন যথাসময়ে কাশী আসিয়া পৌঁছিলাম এবং পিয়ারীর বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। উপরের দুইখানি ঘর ভিন্ন প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের বিধবা স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ।

পিয়ারী কহিল, এরা সব আমার ভাড়াটে।—বলিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল।

বলিলাম, হাসলে যে? ভাড়া আদায় হয় না বুঝি?

পিয়ারী কহিল, না। বরঞ্চ কিছু কিছু দিতে হয়।

তার মানে?

পিয়ারী এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তার মানে ভবিষ্যতের আশায় আমাকেই খাওয়া-পরা দিয়ে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হয়; বেঁচে থাকলে তবে ত পরে দেবে। এটা আর বুঝতে পারো না?

আমিও হাসিয়া বলিলাম, পারি বই কি। এমনিধারা ভবিষ্যতের আশায় কত লোককেই যে তোমাকে নিঃশব্দে অন্ন-বস্ত্র যোগাতে হয়, আমি তাই শুধু ভাবি।

তা ছাড়া দু-একজন আমার কুটুম্বও আছেন।

তাই নাকি? কিন্তু জানলে কি ক'রে?

পিয়ারী একটুখানি শুষ্ক হাসি হাসিয়া কহিল, মায়ের সঙ্গে এসে এই কাশীতেই যে আমার মরণ হয়েছিল, সে বুঝি তোমার মনে নেই? তখন অসময়ে যাঁরা আমার সদ্গতি করেছিলেন, তাঁদের সে উপকার ত প্রাণ থাকতে ভোলা যায় না কিনা!

চুপ করিয়া রহিলাম। পিয়ারী বলিতে লাগিল, বড় দয়ার শরীর এঁদের। তাই কাছে এনে একটু কড়া নজরে রেখেচি, যাতে লোকের আর বেশি উপকার করবার সুযোগ না পান।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তোমার বুকের ভেতরটায় কি আছে আমার মাঝে মাঝে চিরে দেখতে ইচ্ছা করে রাজলক্ষ্মী!

মলে দেখো! আচ্ছা, ঘরে গিয়ে একটুখানি শোও গে যাও। আমার খাবার তৈরি হলে তোমাকে তুলব অখন। বলিয়া সে হাত দিয়া ঘরটা দেখাইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

আমি অনেকক্ষণ সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাহার হৃদয়ের আজ যে

বিশেষ কোন নূতন পরিচয় পাইলাম তাহা নহে, কিন্তু আমার নিজের হৃদয়ে এই সামান্য কাহিনীটা একটা নূতন আবর্তের সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল।

রাত্রে পিয়ারী কহিল, তোমাকে বৃথা কষ্ট দিয়ে এতদূর নিয়ে এলুম। গুরুদেব তীর্থ-ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন, তাঁকে তোমাকে দেখাতে পারলুম না।

বলিলাম, সে জন্যে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত নই। আবার কলকাতায় ফিরে যাবে ত?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

কহিলাম, আমার সঙ্গে যাবার কি কোন আবশ্যক আছে? না থাকে ত আমি আর একটু পশ্চিম থেকে ঘুরে আসতে চাই।

পিয়ারী বলিল, বঙ্কুর বিয়ের ত এখনো কিছু দেরী আছে, চল না, আমিও প্রয়াগে একবার স্নান করে আসি।

একটু মুস্কিলে পড়িলাম! আমার জ্ঞাতি-সম্পর্কের এক খুড়ো সেখানে কর্মোপলক্ষে বাস করিতেন, মনে করিয়াছিলাম, তাঁর বাসায় গিয়াই উঠিব। তা ছাড়া আরও কয়েকটি পরিচিত আত্মীয়-বন্ধুও সেইখানেই থাকিতেন।

পিয়ারী চক্ষের নিমেষে আমার মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিল, আমি সঙ্গে থাকলে হয়ত কেউ দেখে ফেলতেও পারে, না?

অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, বাস্তবিক দুর্নাম জিনিসটা এমনি যে, লোকে মিথ্যে দুর্নামের ভয় না ক'রে পারে না।

পিয়ারী জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তা বটে। আর বছর আরাতে ত তোমাকে একরকম কোলে নিয়েই আমার দিন-রাত কাটল। ভাগ্যি সে অবস্থাটা কেউ দেখে ফেলেনি। সেখানে বুঝি তোমার কেউ চেনাশুনা বন্ধু-টন্ধু ছিল না।

অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, আমাকে খোঁটা দেওয়া বৃথা, মানুষ হিসাবে তোমার চেয়ে যে আমি অনেক ছোট, সে কথা ত অস্বীকার করিনে।

পিয়ারী তীক্ষ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, খোঁটা! তোমাকে খোঁটা দিতে পারবো বলেই বুঝি তখন গিয়েছিলুম? দ্যাখো, মানুষকে ব্যথা দেবার একটা সীমা আছে—সেটা ডিঙিয়ে যেও না।

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় বলিল, কলঙ্কই বটে! কিন্তু আমি হ'লে এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে লোককে বরঞ্চ ডেকে দেখাতুম, কিন্তু এমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারতুম না।

বলিলাম, তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ—কিন্তু আমি যে অত্যন্ত ছোটমানুষ রাজলক্ষ্মী তোমার সঙ্গে যে আমার তুলনাই হয় না।

রাজলক্ষ্মী দৃপ্তস্বরে কহিল, প্রাণ যদি দিয়ে থাকি ত সে নিজের গরজে দিয়েচি, তোমার গরজে দিইনি। সেজন্য তোমাকে একবিন্দু কৃতজ্ঞ হতে হবে না। কিন্তু ছোটমানুষ ব'লে যে তোমাকে ভাবতে পারিনি। তা হলে ত বাঁচতুম, গলায় দড়ি দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে পারতুম। বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালে রাজলক্ষ্মী চা দিয়া নীরবে চলিয়া যাইতেছিল, ডাকিয়া বলিলাম, কথাবার্তা বন্ধ নাকি?

সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, কিছু বলবে?

বলিলাম, চল প্রয়াগ থেকে একবার ঘুরে আসি গে।

বেশ ত, যাও না।

তুমিও চল।

অনুগ্রহ নাকি?

চাও না?

না। যদি সময় হয় চেয়ে নেব, এখন না।—বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আমার মুখ দিয়া শুধু একটা মস্ত নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কিন্তু কথা বাহির হইল না।

দুপুরবেলা খাবার সময় হাসিয়া কহিলাম, আচ্ছা লক্ষ্মী, আমার সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে কি তুমি থাকতে পারো যে, এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা করচ।

রাজলক্ষ্মী শান্ত-গম্ভীর মুখে বলিল, সামনে থাকলে কেউ পারে না, আমিও পারব না। তা ছাড়া, সে আমার ইচ্ছেও নয়।

তবে ইচ্ছেটা কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কাল থেকেই ভাবচি, এই টানা-হেঁচড়া আর না থামালেই নয়। তুমিও একরকম স্পষ্টই জানিয়েচ, আমিও একরকম করে তা বুঝেচি। ভুল আমারই হয়েচে, সে নিজের কাছেও আমি স্বীকার করচি। কিন্তু -

তাহাকে সহসা থামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু কিছুই না। কি যে নির্লজ্জ বাচালের মত যেচে যেচে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরে মরচি—, বলিয়া সে হঠাৎ মুখখানা যেন ঘৃণায় কুণ্ঠিত করিয়া কহিল, ছেলেই বা কি ভাবচে, চাকরবাকরেরাই বা কি মনে করচে! ছিঃ ছিঃ, এ যেন একটা হাসির ব্যাপার করে তুলেচি।

একটুখানি থামিয়া বলিল, বুড়ো বয়সে এসব কি আমায় সাজে! তুমি এলাহাবাদে যেতে চাইছিলে, তাই যাও। তবে পারো যদি, বর্মা যাবার আগে একবার দেখা ক'রে যেয়ো। বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্ষুধারও অন্তর্ধান হইল। তাহার মুখ দেখিয়া আজ আমার প্রথম জ্ঞান হইল, এসব মান-অভিমানের ব্যাপার নয়। সে সত্যসত্যই কি একটা ভাবিয়া স্থির করিয়াছে।

বিকালবেলায় আজ হিন্দুস্থানী দাসী জলখাবার প্রভৃতি লইয়া আসিলে একটু আশ্চর্য হইয়াই পিয়ারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। এবং প্রত্যুত্তরে অধিকতর বিস্মিত হইয়া অবগত হইলাম, পিয়ারী বাড়ি নাই, সাজসজ্জা করিয়া, জুড়িগাড়ি চড়িয়া কোথায় গিয়াছে। জুড়ি-গাড়িই বা কোথা হইতে আসিল, বেশভূষা করিয়াই বা তাহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন হইল, কিছুই বুঝিলাম না—তবে তাহার নিজের মুখের কথাটাই মনে পড়িল বটে যে, সে এই কাশীতেই একদিন মরিয়াছিল।

কিছুই বুঝিলাম না সত্য, তবুও সমস্ত মনটাই যেন এই সংবাদে বিস্বাদ হইয়া গেল।

সন্ধ্যা হইল, ঘরে আলো জ্বলিল, রাজলক্ষ্মী ফিরিল না।

চাদর কাঁধে ফেলিয়া একটু বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে ঘুরিয়া কত কি দেখিয়া শুনিয়া রাত্রি দশটার পর বাড়ি আসিয়া শুনিলাম, পিয়ারী তখনও ফিরে নাই। ব্যাপার কি? কেমন যেন একটা ভয় করিতে লাগিল। রতনকে ডাকিয়া সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জন দিয়া এ সম্বন্ধে তত্ত্ব লইব কি না ভাবিতেছি, একটা ভারি জুড়ির শব্দে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি প্রকাণ্ড ফিটন আমাদের বাড়ির সম্মুখেই থামিয়াছে।

পিয়ারী নামিয়া আসিল। জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার সর্বাঙ্গের জড়োয়া অলঙ্কার ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিল। যে দুইজন ভদ্রলোক গাড়িতে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা মৃদুকণ্ঠে বোধ করি পিয়ারীকে সম্ভাষণ করিয়া থাকিবেন—শুনিতে পাইলাম না। তাঁহারা বাঙ্গালী কি বিহারী তাহাও চিনিতে পারিলাম না—চাবুক খাইয়া জুড়ি ঘোড়া চক্ষের পলকে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

পনর

রাজলক্ষ্মী আমার তত্ত্ব লইতে সেই সাজেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া থিয়েটারী গলায় কহিলাম, ওরে পাষণ্ড রোহিণি! তুই গোবিন্দলালকে চিনিস না? আহা! আজ যদি আমার একটা পিস্তল থাকিত! কিংবা একখানা তলোয়ার!

রাজলক্ষ্মী শুষ্ককণ্ঠে কহিল, তা হলে কি করতে?—খুন?

হাসিয়া বলিলাম, না ভাই পিয়ারী, আমার অত বড় নবাবী শখ নেই। তা ছাড়া এই

বিংশ-শতাব্দীতে এমন নিষ্ঠুর নরাধম কে আছে যে, সংসারের এই এত বড় একটা আনন্দের খনি পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেবে? বরঞ্চ আশীর্বাদ করি, হে বাইজীকুলরাণি! তুমি দীর্ঘজীবিনী হও, তোমার রূপ ত্রিলোকজয়ী হোক, তোমার কণ্ঠ বীণানিন্দিত এবং ঐ দুটি চরণকমলের নৃত্য উর্বশী তিলোত্তমার গর্ব খর্ব করুক—আমি দূর হইতে তোমার জয়গান করিয়া ধন্য হই!

পিয়ারী কহিল, এ সকল কথার অর্থ?

বলিলাম, অর্থমনর্থম্। সে যাক আমি এই একটার ট্রেনে বিদায় হলুম। সম্প্রতি প্রয়াগ, পরে বাঙ্গালীর পরম তীর্থ চাকরিস্থান—অর্থাৎ বর্মা। যদি সময় এবং সুযোগ হয়, দেখা ক'রে যাবো।

আমি কোথায় গিয়েছিলুম, তাও শোনা তুমি আবশ্যক মনে কর না?

কিছু না, কিছু না।

এই ছুতো পেয়ে কি তুমি একেবারে চলে যাচ্ছো?

বলিলাম, পাপ-মুখে এখনও বলতে পারিনে। এ গোলকধাঁধা যদি পার হতে পারি তবেই।

পিয়ারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমার ওপর যা ইচ্ছে তাই অত্যাচার করতে পারো?

কহিলাম, যা ইচ্ছে? একেবারেই না। বরঞ্চ জ্ঞানে-অজ্ঞানে অত্যাচার যদি বিন্দুমাত্রও কখনো করে থাকি, তার জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি।

তার মানে আজ রাত্রেই তুমি চলে যাবে।

হাঁ।

আমাকে বিনা অপরাধে শাস্তি দেবার তোমার অধিকার আছে?

না, তিলমাত্র নেই। আমার যাওয়াকেই যদি শাস্তি দেওয়া মনে কর, তা হলে অধিকার নিশ্চয়ই আছে।

পিয়ারী হঠাৎ জবাব দিল না। আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আমি কোথায় গিয়েছিলুম, শুনবে না?

না। আমার মত নিয়ে যাওনি যে, ফিরে এসে তার কাহিনী শোনাবে। তা ছাড়া আমার সে সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

পিয়ারী আহত ফণিনীর ন্যায় সহসা গর্জিয়া উঠিয়া বলিল, আমারও শোনাবার প্রবৃত্তি নেই। আমি কারও কেনা বাঁদী নই যে, কোথায় যাবো, না যাবো, তারও অনুমতি নিতে হবে! যাবে যাও—বলিয়া রূপ ও অলঙ্কারের একটা তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল। ঘণ্টাখানেক পরে সদর-দরজায় একখানা গাড়ি থামিবার আওয়াজ পাইয়া ব্যাগটা হাতে লইতে যাইতেছি, পিয়ারী আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।

কহিল, এ কি তুমি ছেলেখেলা মনে কর? আমাকে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে চাকর-বাকরেরাই বা কি ভাববে? তুমি কি এদের কাছেও আমার মুখ রাখবে না?

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, তোমার চাকরদের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া ক'রো—আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই।

তা নাহয় হ'লো, কিন্তু ফিরে বঙ্কুকেই বা আমি কি জবাব দেব?

এই জবাব দেবে যে তিনি পশ্চিমে বেড়াতে গেছেন।

এ কি কখনো বিশ্বাস করে?

যাতে বিশ্বাস করে সেই রকম কিছু একটা বানিয়ে ব'লো।

পিয়ারী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, যদি অন্যায়ই একটা করে থাকি তার কি মাপ নেই? তুমি ক্ষমা না করলে আমাকে আর কে করবে?

বলিলাম, পিয়ারী এগুলো যে দাসীবাঁদীদের মত কথা হচ্ছে। তোমার মুখে ত মানাচ্ছে না!

এই বিদ্রূপের কোন উত্তর পিয়ারী সহসা দিতে পারিল না, আরক্তমুখে চুপ করিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। সে যে প্রাণপণে আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। বাহির হইতে গাড়োয়ান উচ্চৈস্বরে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আমি নিঃশব্দে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই এবার পিয়ারী ধপ্ করিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি যে সত্যিকার অপরাধ কখনো করতেই পারিনে, তা জেনেও যদি শাস্তি দিতে চাও, নিজ হাতে দাও, কিন্তু এই একবাড়ি লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট করে দিও না। আজ এমন করে তুমি চলে গেলে আমি কারও কাছে আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবো না।

হাতের ব্যাগটা রাখিয়া দিয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া কহিলাম, আচ্ছা আজ তোমার-আমার একটা শেষ বোঝাপড়া হয়ে যাক। তোমার আজকের আচরণ আমি মাপ করলুম। কিন্তু আমি অনেক ভেবে দেখেচি, দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া আর চলবে না।

পিয়ারী তাহার একান্ত উৎকণ্ঠিত মুখ আমার মুখের প্রতি তুলিয়া সভয়ে প্রশ্ন করিল, কেন?

কহিলাম, অপ্রিয় সত্য সহ্য করতে পারবে?

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া অস্ফুটে বলিল, পারবো।

কিন্তু ব্যথা একজন সহিতে স্বীকার করিলেই কিছু ব্যথা দেওয়ার কাজটা সহজ হইয়া উঠে না। আমাকে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে হইল। কিন্তু আজ যে কোনমতেই আমি সংকল্প ত্যাগ করিব না, তাহা স্থির করিয়াছিলাম। তাই অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার আজকের ব্যবহার ক্ষমা করা যত কঠিনই হোক, আমি করলুম। কিন্তু নিজে তুমি এ লোভ কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ-গুণ। অনেকের ওপর তোমার অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিস আর নেই। তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো, শ্রদ্ধা করতে পারো, আমার জন্যে অনেক দুঃখ সইতেও পারো, কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে কহিল, অর্থাৎ এরকম কাজ আমি মাঝে মাঝে করবই?

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু মৌন হইয়া রহিলাম। সে নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, তার পরে?

কহিলাম, তার পরে একদিন খেলাঘরের মত সমস্ত ভেঙ্গে পড়বে। সে দিনের সেই হীনতা থেকে আজ তুমি আমাকে চিরদিনের মত রেহাই দাও—তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

পিয়ারী বহুক্ষণ নতমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। তার পরে যখন মুখ তুলিল, দেখিলাম, তাহার দু'চোখ বহিয়া জল পড়িতেছে। আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাকে কি কখনো কোন ছোট কাজে আমি প্রবৃত্তি দিয়েছি?

এই বিগলিত অশ্রুধারা আমার সংযমের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিল, কিন্তু বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ পাইতে দিলাম না। শান্ত ও দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, না, কোন দিন নয়। তুমি নিজে ছোট নও, ছোট কাজ তুমি নিজেও কখনো করতে পারো না, অপরকেও করতে দিতে পারো না।

একটু থামিয়া কহিলাম, কিন্তু লোকে ত মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সেই রাজলক্ষ্মীটিকে চিনবে না, তারা চিনবে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ পিয়ারী বাইজীকে। তখন সংসারের চোখে যে কত ছোট হ'য়ে যাবো, সে কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না? সে তুমি কেমন করে বাধা দেবে বল ত?

রাজলক্ষ্মী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কিন্তু তাকে ত সত্যিকারের ছোট হওয়া বলে না!

বলিলাম, ভগবানের চক্ষে না হতে পারে, কিন্তু সংসারের চক্ষুও ত উপেক্ষা করবার বস্তু নয় লক্ষ্মী!

রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু তাঁর চক্ষুকেই ত সকলের আগে মানা উচিত।

কহিলাম, এক হিসাবে সে কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর চক্ষু ত সর্বদা দেখা যায় না! যে দৃষ্টি সংসারের দশজনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায় সেও ত তাঁরই চক্ষের দৃষ্টি রাজলক্ষ্মী! তাকেও ত অস্বীকার করা অন্যায়।

সেই ভয়ে আমাকে তুমি জন্মের মত ত্যাগ করে চলে যাবে?

কহিলাম, আবার দেখা হবে। তুমি যেখানেই থাকো না কেন, বর্মা যাবার পূর্বে আমি আর একবার দেখা করে যাবো।

রাজলক্ষ্মী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া অশ্রু-বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যাবে যাও। কিন্তু তুমি আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার চেয়ে আপনার লোক তোমার আর নেই। সেই আমাকেই ত্যাগ করে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম, একথা আমি কখনো মানবো না। বলিয়া দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম, এখনো সময় আছে, এখনো হয়ত একটার ট্রেন ধরিতে পারি। নিঃশব্দে ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গিয়া গাড়িতে গিয়া বসিলাম।

বকশিশের লোভে গাড়ি প্রাণপণে ছুটিয়া স্টেশনে পৌঁছাইয়া দিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেই পশ্চিমের ট্রেন প্লাটফরম ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। খবর লইয়া জানিলাম আধঘণ্টা পরেই একটা ট্রেন কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইবে। ভাবিলাম, সেই ভাল, গ্রামের মুখ বহুদিন দেখি নাই—সেই জঙ্গলের মধ্যে গিয়াই বাকী দিন কয়টা কাটাইয়া দিব।

সুতরাং পশ্চিমের পরিবর্তে পূবের টিকিট কিনিয়াই আধঘণ্টা পরে এক বিপরীতগামী বাষ্পীয় শকটে উঠিয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া গেলাম।

বহুকাল পরে আবার একদিন অপরাহ্ণবেলায় গ্রামে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। আমার বাড়িটা তখন আমাদের আত্মীয়-আত্মীয়া ও তাঁহাদের আত্মীয়-আত্মীয়ায় পরিপূর্ণ। সমস্ত ঘরদুয়ার জুড়িয়া তাঁহারা আরামে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন, ছুঁচটি রাখিবার স্থান নাই।

আমার আকস্মিক আগমনে ও বাস করিবার সংকল্প শুনিয়া তাঁহারা আনন্দে মুখ কালি করিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! এ ত সুখের কথা, আহ্লাদের কথা! এইবার একটি বিয়ে-থা করে সংসারী হ শ্রীকান্ত! আমরা দেখে চক্ষু জুড়োই।

বলিলাম, সেই জন্যেই ত এসেচি। এখন আপাততঃ আমার মায়ের ঘরটা ছেড়ে দাও, আমি হাত-পা ছড়িয়ে একটু শুই।

আমার বাবার এক মাতুল-কন্যা তথায় স্বামী-পুত্র লইয়া কিছুদিন হইতে বাস করিতেছিলেন, তিনি আসিয়া বলিলেন, তাই ত!

বলিলাম, আচ্ছা আচ্ছা, আমি বাহিরের ঘরেই নাহয় থাকব—ঘরে ঢুকিয়া দেখি এক-কোণে চুন এবং এককোণে সুরকি গাদা করা আছে। তাহারও মালিক বলিলেন, তাই ত। এগুলো দেখেশুনে কোথাও এখন সরাতে হবে দেখচি। এ ঘরটা ত ছোট নয়—ততক্ষণ না হয় এই ধারে একটা তক্তাপোশ পেতে—কি বলিস্ শ্রীকান্ত।

বলিলাম, আচ্ছা, রাত্রির মত নাহয় তাই হোক।

বস্তুতঃ এমনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, যেখানে হোক একটু শুইতে পাইলেই যেন বাঁচি, এমনি মনে হইতেছিল। বর্মায় সেই অসুখ হইতে শরীর আমার কোন দিনই সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতে পারে নাই, ভিতরে ভিতরে একটা গ্লানি প্রায়ই অনুভব করিতাম। তাই সন্ধ্যার পর হইতে মাথাটা টিপটিপ করিতে লাগিল, তখন বিশেষ আশ্চর্য হইলাম না।

রাঙাদিদি আসিয়া বলিলেন, ওটা গরম। ভাত খেয়ে ঘুমোলেই সেরে যাবে।

তথাস্তু। তাই হইল। গুরুজনের আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া গরম কাটাইতে অন্ন আহার করিয়া শয্যাগ্রহণ করিলাম। সকালে ঘুম ভাঙ্গিল—বেশ একটু জ্বর লইয়া।

রাঙাদিদি আসিয়া গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, কিছুই না, ওটা ম্যালোয়ারী। ওতে ভাত খাওয়া চলে।

কিন্তু আজ আর সায় দিতে পারিলাম না। বলিলাম, না, রাঙাদি, আমি এখনো তোমাদের ম্যালোয়ারী রাজার প্রজা নই। তাঁর দোহাই পেড়ে অত্যাচার হয়ত আমার সইবে না। আজ আমার একাদশী।

সমস্ত দিন-রাত্রি গেল, পরদিন গেল, তাহার পরের দিনও কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বর

ছাড়িল না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে দেখিয়া মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। গোবিন্দডাক্তার এ-বেলা ও-বেলা আসিতে লাগিলেন, নাড়ি টিপিয়া, জিব দেখিয়া, পেট ঠুকিয়া ভাল ভাল মুখরোচক সুস্বাদু ঔষধ যোগাইয়া মাত্র 'কেনা দাম'টুকু গ্রহণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু দিনের পর দিন করিয়া সপ্তাহ গড়াইয়া গেল। বাবার মাতুল—আমার ঠাকুরদাদা আসিয়া বলিলেন, তাই ত ভায়া, আমি বলি কি, সেখানে খবর দেওয়া যাক—তোমার পিসিমা আসুক। জ্বরটা কেমন যেন।

কথাটা সম্পূর্ণ না করিলেও বুঝিলাম, ঠাকুরদাদা একটু মুস্কিলে পড়িয়াছেন। এমনি-ভাবে আরও চার-পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্বরের কিছুই হইল না। সেদিন সকালে গোবিন্দডাক্তার আসিয়া যথারীতি ঔষধ দিয়া তিন দিনের বাকী কেনা দামটুকু প্রার্থনা করিলেন। শয্যা হইতে কোনমতে হাত বাড়াইয়া ব্যাগ খুলিলাম—মনিব্যাগ নাই। শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ব্যাগ উপুড় করিয়া ফেলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু যাহা নাই, তাহা পাওয়া গেল না।

গোবিন্দডাক্তার ব্যাপারটা অনুমান করিয়া ব্যস্ত হইয়া বার বার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিছু গিয়াছে কি না।

বলিলাম, আজ্ঞে না, যায়নি কিছুই।

কিন্তু তাঁহার ঔষধের মূল্য যখন দিতে পারিলাম না, তখন তিনি সমস্তই বুঝিয়া লইলেন। স্তম্ভিতের ন্যায় কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ছিল কত?

যৎসামান্য।

চাবিটা একটু সাবধানে রাখতে হয় বাবাজী। যাক, তুমি আমার পর নও, দামের জন্যে ভেবো না, ভাল হও, তার পরে যখন সুবিধে হবে পাঠিয়ে দিয়ো, চিকিৎসায় ত্রুটি হবে না। এই বলিয়া ডাক্তারবাবু পর হইয়াও পরমাত্মীয়ের অধিক সান্ত্বনা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

বলিলাম, একথা কেউ যেন না শোনে।

ডাক্তারবাবু বলিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা, সে বোঝা যাবে।

পাড়াগাঁয়ে বিশ্বাসের উপর টাকা ধার দেওয়া প্রথা নাই। টাকা কেন, শুধু হাতে একটা সিকি ধার চাহিলেও সবাই বুঝিবে, লোকটা নিছক তামাশা করিতেছে। কারণ, সংসারে এমন নির্বোধও কেহ আছে, শুধু হাতে ধার চায়, একথা পাড়াগাঁয়ের লোক ভাবিতেই পারে না; সুতরাং আমি সে চেষ্টাও করিলাম না। প্রথম হইতেই স্থির করিয়াছিলাম এ কথা রাজলক্ষ্মীকে জানাইব না। একটু সুস্থ হইলেই যাহা হয় করিব—সম্ভবতঃ অভয়াকে লিখিয়া টাকা আনাইব, মনের মধ্যে এই সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু সে সময় মিলিল না। সহসা যন্ত্রের সুর তারা হইতে উদারায় নামিয়া পড়িতেই বুঝিলাম, যেমন করিয়াই হোক, আমার বিপদটা বাটীর ভিতরে আর অবিদিত নাই।

অবস্থাটা সংক্ষেপে জানাইয়া রাজলক্ষ্মীকে একখানা চিঠি লিখিলাম বটে, কিন্তু নিজেকে এত হীন, এত অপমানিত মনে হইতে লাগিল যে, কোনমতেই পাঠাইতে পারিলাম না, ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম। পরদিন এমনি কাটিল। কিন্তু তাহার পরে আর কিছুতেই কাটিতে চাহিল না। সেদিন কোনদিকে চাহিয়া আর কোন পথ দেখিতে না পাইয়া অবশেষে একপ্রকার মরিয়া হইয়াই কিছু টাকার জন্য রাজলক্ষ্মীকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া খান-দুই পত্র লিখিয়া পাটনা ও কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিলাম।

সে যে টাকা পাঠাইবেই তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না, তথাপি সেদিন সকাল হইতেই কেমন যেন উৎকণ্ঠিত সংশয়ে ডাক-পিয়নের অপেক্ষায় সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া পথের উপর দৃষ্টি পাতিয়া উন্মুখ হইয়া রহিলাম।

সময় বহিয়া গেল। আজ আর তাহার আশা নাই, মনে করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে দূরে একখানা গাড়ির শব্দে চকিত হইয়া বালিশে ভর দিয়া উঠিয়া বসিলাম। গাড়ি আসিয়া ঠিক সুমুখেই থামিল! দেখি, কোচমানের পাশে বসিয়া রতন। সে নীচে নামিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিতেই যাহা চোখে পড়িল, তাহা সত্য বলিয়া প্রত্যয় করা কঠিন।

প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই গ্রামের পথের উপর রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তার অতীত।

রতন কহিল, ঐ যে বাবু!

রাজলক্ষ্মী শুধু একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল মাত্র। গাড়োয়ান কহিল, মা, দেরি হবে ত? ঘোড়া খুলে দিই?

একটু দাঁড়াও, বলিয়া সে অবিচলিত ধীর পদক্ষেপেই আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া হাত দিয়া আমার কপালের, বুকের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, এখন আর জবর নাই। ও-বেলায় সাতটার গাড়িতে যাওয়া চলবে কি? ঘোড়া খুলে দিতে বলব?

আমি অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের পানে চাহিয়াই ছিলাম। কহিলাম, এই দুদিন জবরটা বন্ধ হয়েচে। কিন্তু আমাকে কি আজই নিয়ে যেতে চাও?

রাজলক্ষ্মী বলিল, নাহয় আজ থাক। রাত্তিরে আর গিয়ে কাজ নেই; হিম লাগতে পারে, কাল সকালেই যাবে।

এতক্ষণে যেন আমার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। বলিলাম, এ গ্রামে, এ পাড়ার মধ্যে তুমি ঢুকলে কোন সাহসে? তুমি কি মনে কর তোমাকে কেউ চিনতে পারবে না?

রাজলক্ষ্মী সহজেই কহিল, বেশ যা হোক। এইখানেই মানুষ হলাম, আর এখানে আমাকে চিনতে পারবে না? যে দেখবে সেই ত চিনবে।

তবে?

কি করব বল? আমার কপাল, নইলে তুমি এসে এখানে অসুখে পড়বে কেন?

এলে কেন? টাকা চেয়েছিলাম, টাকা পাঠিয়ে দিলেই ত হ'তো।

তা কি কখনও হয়? এত অসুখ শুনে কি শুধু টাকা পাঠিয়েই স্থির থাকতে পারি?

বলিলাম, তুমি নাহয় স্থির হলে, কিন্তু আমাকে যে ভয়ানক অস্থির করে তুললে। এখনি সবাই এসে পড়বে, তখন তুমিই বা মুখ দেখাবে কি করে, আর আমিই বা জবাব দেব কি!

রাজলক্ষ্মী প্রত্যুত্তরে শুধু আর-একবার ললাট স্পর্শ করিয়া কহিল, জবাব আর কি দেবে—আমার অদৃষ্ট!

তাহার উপেক্ষা এবং ঔদাসীন্যে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিলাম, অদৃষ্টই বটে! কিন্তু লজ্জা-সরমের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছো? এখানে মুখ দেখাতেও তোমার বাধলো না?

রাজলক্ষ্মী তেমনি উদাসকণ্ঠে উত্তর দিল, লজ্জা-সরম আমার যা কিছু, এখন সব তুমি।

ইহার পরে আবার বলিবই বা কি! শুনিবই বা কি! চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম:

খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, বঙ্কুর বিয়ে নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, হাঁ।

এখন কোথা থেকে আসচো? কলকাতা থেকে?

না, পাটনা থেকে। সেইখানেই তোমার চিঠি পেয়েচি।

আমাকে নিয়ে যাবে কোথায়?—পাটনায়?

রাজলক্ষ্মী একটু ভাবিয়া কহিল, একবার সেখানে ত তোমাকে যেতেই হবে। আগে কলকাতায় যাই চল, সেখানে দেখিয়ে শুনিয়ে ভাল হলে—তারপরে—

প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু তার পরেই বা আমাকে পাটনায় যেতে হবে কেন শুনি!

রাজলক্ষ্মী কহিল, দানপত্র ত সেখানেই রেজেস্ট্রী করতে হবে। লেখাপড়া সব একরকম ক'রে রেখেই এসেচি বটে, কিন্তু তোমার হুকুম ছাড়া ত হতে পারবে না।

অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়াও জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের দানপত্র? কাকে কি দিলে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, বাড়ি দুটো ত বঙ্কুকেই দিয়েচি। শুধু কাশীর বাড়িটা গুরুদেবকে

দেব ভেবেচি। আর কোম্পানীর কাগজ, গয়না-টয়নাগুলো ত আমার বুদ্ধি-বিবেচনামত একরকম ভাগ করে এসেচি, এখন শুধু তুমি বললেই—

বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। কহিলাম, তা হলে তোমার নিজের রইল কি? বঙ্কু যদি তোমার ভার না নেয়? এখন তার নিজের সংসার হ'লো, যদি সে শেষে তোমাকেই খেতে না দেয়?

আমি কি তাই চাইচি নাকি? নিজের সমস্ত দান ক'বে কি অবশেষে তারই হাত-তোলা খেয়ে থাকবো? তুমি ত বেশ!

অধৈর্য আর সংবরণ করিতে না পারিয়া উঠিয়া বসিয়া রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলাম, হরিশচন্দ্রের মত এ দুর্বুদ্ধি তোমাকে দিলে কে? খাবে কি? বুড়ো বয়সে কার গলগ্রহ হতে যাবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, তোমাকে রাগ করতে হবে না, তুমি শোও। আমাকে এ বুদ্ধি যে দিয়েচে, সেই আমাকে খেতে দেবে। আমি হাজার বুড়ো হলেও সে কখনও আমাকে গলগ্রহ ভাববে না। তুমি মিথ্যে মাথা গরম ক'রো না—স্থির হয়ে শোও।

স্থির হইয়াই শুইয়া পড়িলাম। সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া অস্তোন্মুখ সূর্যকর-রঞ্জিত বিচিত্র আকাশ চোখে পড়িল। স্বপ্নাবিষ্টের মত নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল—এমনি অপরূপ শোভার সৌন্দর্যে যেন বিশ্বভুবন ভাসিয়া যাইতেছে। ত্রিসংসারের মধ্যে রোগ-শোক, অভাব-অভিযোগ, হিংসা-দ্বেষ কোথাও যেন আর কিছু নেই।

এই নির্বাক নিস্তব্ধতায় মগ্ন হইয়া যে উভয়ের কতক্ষণ কাটিয়াছিল বোধ করি কেহই হিসাব করি নাই, সহসা দ্বারের বাহিরে মানুষের গলা শুনিয়া দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম। এবং রাজলক্ষ্মী শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার পূর্বেই ডাক্তারবাবু প্রসন্ন ঠাকুরদাকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু সহসা তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরদা যখন দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, তখন খবরটা তাঁহার কানে গিয়াছিল বটে, কে একজন বন্ধু কলিকাতা হইতে গাড়ি করিয়া আমার কাছে আসিয়াছে, কিন্তু সে যে স্ত্রীলোক হইতে পারে, তাহা বোধ করি কাহারও কল্পনায়ও আসে নাই। সেই জন্যই বোধ হয় এখন পর্যন্ত বাড়ির মেয়েরা কেহ বাহিরে আসে নাই।

ঠাকুরদা অত্যন্ত বিচক্ষণ লোক। তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রাজলক্ষ্মীর আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মেয়েটি কে শ্রীকান্ত? যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, ছোটখুড়ো, আমারও যেন মনে হচ্চে এঁকে কোথায় দেখেচি।

আমি আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত মুখ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। সেই নিমেষেই কে যেন আমার বুকের মধ্যে বলিয়া উঠিল, শ্রীকান্ত, এই সর্বত্যাগী মেয়েটি শুধু তোমার জন্যেই এই দুঃখ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।

একবার আমার সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম, আমার সত্যে কাজ নাই, আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব। এবং পরক্ষণেই তাহার হাতের উপর একটি চাপ দিয়া কহিলাম, তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি রাজলক্ষ্মী! ঠাকুরদা, ডাক্তারবাবু এঁদের প্রণাম কর।

পলকের জন্য দুজনের চোখাচোখি হইল, তাহার পরে সে উঠিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

চরিত্রহীন

এক

পশ্চিমের একটা বড় শহরে এই সময়টায় শীত পড়ি-পড়ি করিতেছিল। পরমহংস রামকৃষ্ণের এক চেলা কি-একটা সৎকর্মের সাহায্যকল্পে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে এই শহরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারই বক্তৃতা-সভায় উপেন্দ্রকে সভাপতি হইতে হইবে এবং তৎপদ-মর্যাদানুসারে যাহা কর্তব্য তাহারও অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই প্রস্তাব লইয়া একদিন সকালবেলায় কলেজের ছাত্রের দল উপেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সৎকর্মটা কি শুনি?

তাহারা কহিল, সেটা এখনো ঠিক জানা নাই। স্বামীজী বলিয়াছেন, ইহাই তিনি আহূত সভায় বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিবেন এবং সভার আয়োজন ও প্রয়োজন অনেকটা এইজন্যই।

উপেন্দ্র আর কোন প্রশ্ন না করিয়াই রাজী হইলেন। এটা তাঁহার অভ্যাস। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি এতই ভাল করিয়া পাশ করিয়াছিলেন যে, ছাত্রমহলে তাঁহার শ্রদ্ধা ও সম্মানের অবধি ছিল না। ইহা তিনি জানিতেন। তাই, কাজে-কর্মে, আপদে-বিপদে তাহারা যখনই আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের আবেদন ও উপরোধকে মমতায় কোনদিন উপেক্ষা করিয়া ফিরাইতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীকে ডিঙ্গাইয়া আদালতের লক্ষ্মীর সেবায় নিযুক্ত হইবার পরও ছেলেদের জিমন্যাস্টিকের আখড়া হইতে ফুটবল, ক্রিকেট ও ডিবেটিং ক্লাবের সেই উঁচু স্থানটিতে গিয়া পূর্বের মত তাঁহাকে বসিতে হইত।

কিন্তু এই জায়গাটিতে শুধু চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায় না—কিছু বলা আবশ্যক। একজনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিছু বলা চাই ত হে! সভাপতি সেজে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ থাকা ত আমার কাছে ভাল ঠেকে না—কি বল তোমরা?

এ ত ঠিক কথা। কিন্তু তাহাদের কাহারো কিছুই জানা ছিল না। বাহিরের প্রাঙ্গণের একধারে একটা প্রাচীন পুষ্পিত জবা বৃক্ষের তলায় এই ছেলের দলটি যখন উপেন্দ্রকে মাঝখানে লইয়া সংসারের যাবতীয় সম্ভব-অসম্ভব সৎকর্মাবলীর তালিকা করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন দিবাকরের ঘর হইতে একজন নিঃশব্দে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। উপেন্দ্র দিবাকরের মামাতো ভাই। শিশু অবস্থায় দিবাকর মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া মামার বাড়িতে মানুষ হইতেছিল। বাহিরের একটি ছোট ঘরে দিনের বেলায় তাহার লেখাপড়া এবং রাত্রে শয়ন চলিত। বয়স প্রায় উনিশ;-এফ. এ. পাস করিয়া বি. এ. পড়িতেছিল।

উপেন্দ্রর দৃষ্টি এই পলাতকের উপর পড়িবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিলেন, সতীশ, চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিস যে! এদিকে আয়—এদিকে আয়!

ধরা পড়িয়া সতীশ অপ্রতিভভাবে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন দেখিনি যে?

অপ্রতিভ ভাবটা সারিয়া লইয়া সতীশ হাসিমুখে বলিল, এতদিন এখানে ছিলাম না উপীনদা, এলাহাবাদে কাকার কাছে গিয়েছিলাম।

কথাটা ভাল করিয়া শেষ না হইতেই একজন ছাটা-দাড়ি টেরি-চশমাধারী যুবক চোখ টিপিয়া দাঁত বাহির করিয়া বলিয়া বসিল, মনের দুঃখে নাকি সতীশ?

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এবারেও তাহাকে পাঠান হয় নাই এ সংবাদ সকলেই জানিত, তাই কথাটা এমন বেয়াড়া বিশ্রী শুনাইল যে, উপস্থিত সকলেই লজ্জায় মুখ নত করিয়া মনে মনে ছি ছি করিতে লাগিল। যুবকটির পরিহাস ও দাঁতের হাসি কোথাও আশ্রয় না পাইয়া তখনি মিলাইয়া গেল বটে, কিন্তু সতীশ তাহার হাসিমুখ লইয়া বলিল, ভূপতিবাবু, মন

থাকলেই মনে দুঃখ হয়। পাস করার আশাই বলুন আর ইচ্ছেই বলুন, আমার ভাল করে জ্ঞান হবার পর থেকেই ছেড়েছি! শুধু বাবা ছাড়তে পারেন নি। তাই, মনের দুঃখে কাউকে দেশান্তরী হতে হলে তাঁর হওয়াই উচিত ছিল; অথচ তিনি দিব্যি অটল হয়ে তাঁর ওকালতি করে গেলেন। কিন্তু যা বল উপীনদা, এবারে তাঁরও চোখ ফুটেছে।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। হাসির কথা ইহাতে ছিল না, কিন্তু এই ভূপতিবাবুর অভদ্র পরিহাস যে সতীশকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, ইহাতেই সকলে অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল।

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিল, এবারে তা হলে তুই ছেড়ে দিলি?

সতীশ বলিল, আমি কি কোনদিন ধরেছিলাম যে আজ ছেড়ে দেব? আমি কোনদিন ধরিনি উপীনদা, লেখাপড়া আমাকে ধরেছিল। এবারে আমি আত্মরক্ষা করব। এমন দেশে গিয়ে বাস করব যেখানে পাঠশালাটি পর্যন্ত নেই।

উপেন্দ্র বলিলেন, কিন্তু কিছু করা ত দরকার। মানুষে একেবারে চুপ করে থাকতেও পারে না, পারা উচিতও নয়।

সতীশ বলিল, না, চুপ করে থাকব না। এলাহাবাদ থেকে একটা নূতন মতলব পেয়ে এসেছি। একবার ভাল করে চেষ্টা করে দেখব সেটার কি করতে পারি।

বিস্তারিত বিবরণের আশায় সকলে তাহার মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে সলজ্জ হাস্যে বলিল, আমাদের গাঁয়ে যেমন ম্যালেরিয়া, তেমনি ওলাউঠা। পাঁচ-সাতটা গ্রামের মধ্যে সময়ে হয়ত একজনও ডাক্তার পাওয়া যায় না। আমি সেইখানে গিয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করে দেব। আমার মা তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমাকে হাজার-কয়েক টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। সে টাকা আমার কাছেই আছে। ঐ দিয়ে আমাদের দেশের বাড়ির বৈঠকখানা-ঘরে ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে দেব। তুমি হেসো না উপীনদা, তুমি নিশ্চয় দেখো, এ আমি করব। বাবাকেও সম্মত করেছি। তাঁকে বলেছি, মাস-খানেক পরেই কলকাতা গিয়ে হোমিও-প্যাথি স্কুলে ভর্তি হয়ে যাব।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মাস-খানেক পরে কেন?

সতীশ বলিল, একটু কাজ আছে। দক্ষিণপাড়া নবনাট্যসমাজ ভেঙ্গে একটা ফ্যাকড়া বার হয়ে গেছে, আমাদের বিপিনবাবু হয়েছেন ওই দলের কর্তা। টেলিগ্রাফের উপর টেলিগ্রাফ করে তিনিই আমাকে এনেছেন আমি কথা দিয়েছি তাঁদের কনসার্ট পার্টি ঠিক করে দিয়ে তবে অন্য কাজে হাত দেব।

শুনিয়া সকলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সতীশও হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণে উচ্চহাসি মৃদু হইয়া আসিলে সতীশ বলিল, একটা বাঁশীর অভাব হচ্ছে, সেইজন্যেই আজ দিবাকরের কাছে এসেছিলাম। যদি থিয়েটারের রাতটায় আমাকে উদ্ধার করে দেয়·ত আর বেশী ছুটোছুটি করে বেড়াতে হয় না।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলে ও?

সতীশ বলিল, আর কি বলবে—পরীক্ষা সন্নিকট। এটা আমার মাথাতে ঢোকে না উপীনদা, দুই বৎসরের পড়াশুনার পরীক্ষা কেমন করে লোকের একটা রাতের অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। আমি বলি, যাদের সত্যিই যায় তাদের যাওয়াই উচিত। এমন পাস করার মর্যাদা যাদের কাছে থাকে থাক আমার কাছে ত নেই। তুমি রাগ করতে পারবে না উপীনদা, আমি তোমাকে যত জানি এঁরা তার সিকিও জানেন না। জিমন্যাস্টিকের আখড়া থেকে ফুটবল ক্রিকেটে চিরদিন তোমার সাক্‌রেদি করে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, অনেকদিন অনেক রকমেই তোমার সময় নষ্ট হতে দেখেছি, অনেকগুলো পরীক্ষা দিতেও দেখলাম, সেগুলো রীতিমত স্কলারশিপ নিয়ে পাস করতেও দেখলাম, কিন্তু কোনদিন তোমাকে ত একজামিনের দোহাই পাড়তে শুনলাম না।

উপেন্দ্র কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, আমি যে বাঁশী বাজাতে জানিনে সতীশ।

সতীশ বলিল, আমিও অনেক সময়ে ওই কথাই ভাবি। সংসারের এই জিনিসটা কেন যে তুমি জানলে না, আমার ভারী আশ্চর্য বোধ হয়। কিন্তু সে কথা যাক—তোমাদের দুপুর রোদের এ কমিটিটি কিসের?

শীতের রৌদ্র পিঠে করিয়া মাথায় র‍্যাপার জড়াইয়া ইহাদের এই বৈঠকটি দিব্য জমিয়া

উঠিয়াছিল। বেলা যে এত বাড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কেহই নজর করে নাই। সতীশের কথায় বেলার দিকে চাহিয়া সকলেই এককালে চিন্তিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সভাভঙ্গের মুখে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, উপেন্দ্রবাবু তা হলে?

উপেন্দ্র বলিলেন, আমি ত বলেছি, আমার আপত্তি নেই। তবে তোমাদের স্বামীজীর উদ্দেশ্যটা যদি পূর্বাহ্ণে একটু জানা যেতো ত ভারী স্বস্তি পেতাম। নিতান্ত বোকার মত কোথাও যেতে বাধবাধ ঠেকে।

ভূপতি কহিল, কিন্তু কোন কথাই তিনি বলেন না। বরং এমনও বলেন, যাহা জটিল ও দুর্বোধ্য, তাহা বিশদভাবে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া বলিবার সময় ও সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত একেবারে না বলাই ভাল। ইহাতে অধিকাংশ সময়ে সুফলের পরিবর্তে কুফলই ফলে।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। এতক্ষণে সকলেই বাহির হইয়া রাস্তার একধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ ধরিয়া বসিল, ব্যাপারটা কি উপীনদা?

উপেন্দ্রকে বাধা দিয়া ভূপতি কহিল, সতীশবাবু, আপনাকেও চাঁদার খাতায় সই করতে হবে। কেন, এখন আমরা ঠিক করে বলতে পারব না। পরশু অপরাহ্ণে কলেজের হলে স্বামীজী নিজেই বুঝিয়ে বলবেন।

সতীশ বলিল, তা হলে আমার বোঝা হলো না ভূপতিবাবু। পরশু আমাদের পুরো রিয়ার্সেল—আমি অনুপস্থিত থাকলে চলবে না।

ভূপতি আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি সতীশবাবু! থিয়েটারের সামান্য ক্ষতির ভয়ে এরূপ মহৎ কাজে যোগ দেবেন না? লোকে শুনলে বলবে কি?

সতীশ কহিল, লোকে না শুনেও অনেক কথা বলে—সে কথা নয়। কথা আপনাদের নিয়ে। কিছু না জেনেও এই অনুষ্ঠানটিকে আপনারা যতটা মহৎ বলে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পেরেছেন, আমি যদি ততটা না পারি ত আমাকে দোষ দেবেন না। বরং যা জানি, যার ভালমন্দ কিসে হয় না হয় বুঝি, সেটা উপেক্ষা করে, তার ক্ষতি করে একটা অনিশ্চিত মহত্ত্বের পিছনে ছুটে বেড়ানো আমার কাছে ভাল ঠেকে না।

উপস্থিত ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে বয়সে এবং লেখাপড়ায় ভূপতিই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া তিনি কথা বলিতেছিলেন। সতীশের কথায় হাসিয়া বলিলেন, সতীশবাবু, স্বামীজীর মত মহৎ ব্যক্তি যে ভাল কথাই বলবেন, তাঁর উদ্দেশ্য যে ভালই হবে, এ বিশ্বাস করা ত শক্ত নয়।

সতীশ বলিল, ব্যক্তিবিশেষের কাছে শক্ত নয় মানি। এই দেখুন না, এন্ট্রান্স পাস করাও শক্ত কাজ নয়, অথচ, পাস করা দূরে থাক, তিন-চার বৎসরের মধ্যে আমি তার কাছে ঘেঁষতে পারলাম না। আচ্ছা, এই স্বামীজী লোকটিকে পূর্বে কখনও দেখেছেন কিংবা এঁর সম্বন্ধে কোনদিন কিছু শুনেছেন?

কেহই কিছু জানে না, তাহা সকলেই স্বীকার করিল।

সতীশ বলিল, এই দেখুন, এক গেরুয়া বসন ছাড়া আর তাঁর কোন সার্টিফিকেট নেই। অথচ আপনারা মেতে উঠেছেন এবং আমি নিজে কাজ ক্ষতি করে তাঁর বক্তৃতা শুনতে পারিনে বলে সবাই রাগ করছেন।

ভূপতি বলিল, মেতে উঠি কি সাধে সতীশবাবু! এই গেরুয়া কাপড়-পরা লোকগুলি সংসারকে যে অনেক জিনিসই দিয়ে গেছেন। সে যাই হোক, আমি রাগ করিনি, দুঃখ করছি। জগতের সমস্ত বস্তুই সাফাই সাক্ষীর হাত ধরে হাজির হতে পারে না বলে মিথ্যা বলে ত্যাগ করতে হলে অনেক ভালো জিনিস হতেই আমাদের বঞ্চিত হয়ে থাকতে হয়। আপনিই বলুন দেখি, যখন সঙ্গীতের সা-রে-গা-মা সাধতেন, তখন কতটুকু রসের আস্বাদ পেয়েছিলেন? কতটুকু ভালমন্দ তার বুঝেছিলেন?

সতীশ কহিল, আমিও ঠিক সেই কথাই বলছি। সঙ্গীতের একটা আদর্শ যদি আমার সুমুখে না থাকত, মিষ্ট রসাস্বাদের আশা যদি না করতাম, তা হলে এত কষ্ট করে সা-রে-গা-মা সাধতাম না। ওকালতির মধ্যে টাকার গন্ধ আপনি যদি অত করে না পেতেন, তা হলে

একবার ফেল করেই ক্ষান্ত দিতেন, বারংবার এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করে আইনের বইগুলো মুখস্থ করতেন না। উপীনদাও হয়ত একটা ইস্কুল-মাস্টারি নিয়ে এতদিন সন্তুষ্ট হয়ে থাকতেন।

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ভূপতির মুখ লাল হইয়া উঠিল। একগুণ খোঁচা যে দশগুণ করিয়া সতীশ ফিরাইয়া দিয়াছে, তাহা উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিল।

রোষ চাপিয়া রাখিয়া ভূপতি কহিলেন, আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। একটা জিনিসের ভালমন্দ যে কত রকমে প্রমাণ হতে পারে, তাই হয়ত আপনি জানেন না।

কথায় কথায় সকলেই ক্রমশঃ রাস্তার একধারে উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিল। সতীশ দাঁড়াইয়া উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল, মাপ করুন ভূপতিবাবু! ছয় রকম 'প্রমাণ' ও ছত্রিশ রকম 'প্রত্যক্ষে'র আলোচনা এত রোদে সহ্য হবে না। তার চেয়ে বরং সন্ধ্যার পর বাবার বৈঠকখানায় যাবেন, যেখানে দুপুর-রাত্রি পর্যন্ত কালোয়াতি তর্ক হতে পারবে। প্রফেসার নবীনবাবু, সদর-আলা গোবিন্দবাবু, যায় এ-বাড়ির ভট্‌চায্যিমশায় পর্যন্ত এই নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত চুলোচুলি করতে থাকেন। পাশের ঘরেই আমার আড্ডা। হেরফের-গুলো বেশ কায়দা করে এখনও পেকে উঠেনি বটে, কিন্তু গায়ে আমার রং ধরেচে। অসময়ে পেকে গাছতলায় পড়ে শিয়াল-কুকুরের পেটে যেতে চাইনে। তাই, এটা বাদ দিয়ে আর কিছু যদি বলবার থাকে ত বলুন, না হয় অনুমতি করুন, বিদায় হই।

যুক্তহস্ত সতীশের কথার ভঙ্গীতে সকলেই হাসিয়া উঠিল। রুষ্ট ভূপতি দ্বিগুণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। রাগের মাথায় তর্কের সূত্র হারাইয়া গেল, এবং এমন অবস্থায় যাহা প্রথমেই মুখে আসে তাহাই তর্জন করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—আপনি তা হলে দেখছি ঈশ্বরও মানেন না।

কথাটা যে নিতান্তই অসংলগ্ন ও ছেলেমানুষের মত হইল, তাহা ভূপতির নিজের কানেও ঠেকিল।

সতীশ ভূপতির আরক্ত মুখের 'পরে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া উপেন্দ্রের মুখ-পানে চাহিয়া হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, ও উপীনদা, ভূপতিবাবু এবারে কোণ নিয়েচেন। আমার মত দশ-বারোটা কুকুরেও এবারে আর ঘেঁষতে পারবে না। ভূপতির প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক করেছেন ভূপতিবাবু, 'চোর-চোর' খেলায় ছুটতে না পারলে বুড়ি ছুঁয়ে ফেলাই ভাল।

এই অপবাদের আঘাতে আগুন হইয়া ভূপতি উঠিয়া দাঁড়াইতেই উপেন্দ্র হাত ধরিয়া বলিলেন, তুমি চুপ কর ভূপতি, আমি এই লোকটিকে জব্দ কচ্ছি। বুড়ি ছোঁয়া, কোণ নেওয়া, এ-সব কি কথা রে সতীশ? বাস্তবিক তোর যেরূপ সন্দিগ্ধ প্রকৃতি, তাতে সন্দেহ হতেই পারে, তুই ঈশ্বর পর্যন্ত মানিস নে।

সতীশ গভীর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট! ঈশ্বর মানিনে? ভয়ঙ্কর মানি। থিয়েটারের আড্ডা ভাঙ্গবার পরে দুপুর-রাত্রে গোরস্থানের পাশ দিয়ে একলা ফিরবার পথে যখন বিশ্বাসের জোরে বুকের রক্ত বরফ হয়ে যায়, তোমরা ভালমানুষের দল তার কি খবর রাখ? হাসছ কি উপীনদা, ভূত-প্রেত মানি, আর ঈশ্বর মানিনে?

তাহার কথায় ক্রুদ্ধ ভূপতি পর্যন্ত হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, সতীশবাবু, ভূতের ভয় করলেই ঈশ্বর স্বীকার করা হয়—এ দুটি কি তবে আপনার কাছে এক?

সতীশ বলিল, একেবারে এক। পাশাপাশি রাখলে চেনবার জো নেই। শুধু আমার কাছেই নয়, আপনার কাছেও বটে, উপীনদার কাছেও বটে, এবং যাঁরা শাস্ত্র লেখেন তাঁদের কাছেও বটে। ও এক কথাই। না মানেন ত বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু মানলে আর রক্ষা নেই। দায়ে-ঘায়ে, আপদে-বিপদে, অনেক তরফ দিয়ে অনেক রকম করে ভেবে দেখেছি, বাগ্‌-বিতণ্ডাও বিস্তর শুনেছি, কিন্তু যে অন্ধকার সেই অন্ধকার। ছোট একটুখানি নিরাকার ব্রহ্মই মানো, আর হাত-পা-ওয়ালা তেত্রিশ কোটি দেবতাই স্বীকার কর, কোন ফন্দিই খাটে না। সমস্ত এক শিকলে বাঁধা। একটিকে টান দিলেই সব এসে হাজির হবে। ওই স্বর্গ-নরক আসবে, ইহকাল-পরকাল আসবে, অমর আত্মা এসে পড়বে, তখন কবরস্থানের [illegible] ঠেকাবে কি দিয়ে? কালীঘাটের কাঙালীর মত? সাধ্য কি তোমার একজনকে

চুপি চুপি কিছু দিয়ে পরিত্রাণ পাও! নিমেষের মধ্যে যে যেখানে আছেন এসে ঘিরে ধরবেন। ঈশ্বর মানি, আর ভূতের ভয় করিনে—সে হবার জো নেই ভূপতিবাবু!

যেরূপ ভঙ্গী করিয়া সে কথার উপসংহার করিল তাহাতে সকলেই উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল। অপেক্ষাকৃত লঘুবয়স্ক দুইজন বালকের হাস্য-কোলাহলে রবিবারের অলস মধ্যাহ্ন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্রর স্ত্রী সুরবালার প্রেরিত যে চাকরটা দূরে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ বিড়বিড় করিতেছিল, সে পর্যন্ত মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কলহের যে মেঘখানা ইতিপূর্বে আকার ধারণ করিতেছিল, এই সমস্ত হাসির ঝড়ে তাহা কোথায় উড়িয়া গেল তাহার উদ্দেশ রহিল না।

কেহই হুঁশ করিল না, দ্বিপ্রহর বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এতক্ষণে বাড়ির ভিতরে ক্ষুৎপিপাসাতুর ঝি-র দল উঠানে দাঁড়াইয়া চেঁচামেচি করিতেছে ও রান্নাঘরে বামুন-ঠাকুরেরা কর্মত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া দিতেছে।

দুই

মাস-তিনেক পরে কলিকাতার একটা বাসায় একদিন সকালবেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া সতীশ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে হঠাৎ স্থির করিয়া বসিল, আজ সে স্কুলে যাইবে না। সে হোমিওপ্যাথি স্কুলে পড়িতেছিল। এই কামাই করিবার সঙ্কল্পটা তাহার মনের মধ্যে সুধা বর্ষণ করিল এবং মুহূর্তের মধ্যে বিকল দেহটাকে সবল করিয়া তুলিল। সে প্রফুল্ল-মুখে উঠিয়া বসিয়া তামাকের জন্য হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল।

ঘরে ঢুকিল সাবিত্রী। সে অনতিদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, ঘুম ভাঙলো বাবু?

সাবিত্রী বাসার ঝি এবং গৃহিণী। চুরি করিত না বলিয়া খরচের টাকাকড়ি সমস্তই তাহার হাতে। একহারা অতি সুশ্রী গঠন। বয়স বোধ করি একুশ-বাইশের কাছাকাছি, কিন্তু মুখ দেখিয়া যেন আরও কম বলিয়া মনে হয়। সাবিত্রী ফরসা কাপড় পরিত এবং ঠোঁট-দুটি পান ও দোক্তার রসে দিবারাত্রি রাঙ্গা করিয়া রাখিত। সে হাসিয়া কথা কহিতে যেমন জানিত, সে হাসির দামটিও ঠিক তেমনি বুঝিত। গৃহসুখ-বঞ্চিত বাসার সকলের উপরই তাহার একটা আন্তরিক স্নেহ-মমতা ছিল। অথচ, কেহ সুখ্যাতি করিলে বলিত, যত্ন না করলে আপনারা রাখবেন কেন বাবু! তা ছাড়া, বাড়ি গিয়ে গিন্নীদের কাছে নিন্দে করে বলবেন, বাসার এমন ঝি যে, পেট ভরে দুবেলা খেতেও দেয় না—ও অপযশের চেয়ে একটু খাটা ভালো, বলিয়া হাসিমুখে কাজে চলিয়া যাইত। বাসার মধ্যে শুধু সতীশই তাহার নাম ধরিয়া ডাকিত। যা-তা পরিহাস করিত এবং যখন-তখন বকশিশ দিত। সতীশের উপর তাহার স্নেহটা কিছু অতিরিক্ত ছিল। সারা দিন সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে বোধ করি এইজন্যই সে তাহার একটি চোখ এবং একটি কান এই উন্নত বলিষ্ঠ চারুদর্শন যুবকটির উদ্দেশে নিযুক্ত রাখিত। বাসার সকলেই ইহা জানিত, এবং কেহ কেহ সকৌতুক ইঙ্গিত করিতেও ছাড়িত না। সাবিত্রী জবাব দিত না, মুখ টিপিয়া হাসিয়া কাজে চলিয়া যাইত।

সতীশ কহিল, হাঁ, ঘুম ভাঙলো। বলিয়াই বালিশের তলা হইতে একটা টাকা ঠং করিয়া ফেলিয়া দিল।

সাবিত্রী টাকাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, সকালবেলায় আবার কি আনতে হবে?

সতীশ বলিল, সন্দেশ! কিন্তু আমার জন্যে নয়। এখন রেখে দাও, রাত্রে তোমার বাবুর জন্যে কিনে নিয়ে যেও।

সাবিত্রী রাগ করিয়া টাকাটা বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, রেখে দিন আপনার টাকা। আমার বাবু সন্দেশ খেতে ভালবাসে না।

সতীশ টাকাটা পুনরায় ফেলিয়া অনুনয়ের স্বরে কহিল, আমার মাথা খাও সাবিত্রী, এ টাকা আমাকে কিছুতেই ফিরুতে পারবে না, আমি সত্যিই তোমার বাবুকে সন্দেশ খেতে দিয়েছি।

সাবিত্রী মুখ ভার করিয়া বলিল, যখন-তখন আপনি মেয়েমানুষের মত মাথার দিব্যি দেন, এ ভারী অন্যায়। বাবু-টাবু আমার নেই। বাবু আমার আপনি—আপনারা।

সতীশ হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, দাও টাকা। কিন্তু বলো, আমরা ছাড়া যদি আর কোন বাবু থাকে ত তার মাথা খাই।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আমার বাবু কি আপনার সতীন যে, মাথা খাচ্ছেন?

সতীশ কহিল, আমি তাঁর মাথা খাচ্ছি, না তিনি আমার খাচ্ছেন? আমি ত বরং তাঁকে সন্দেশ খাওয়াচ্ছি!

সাবিত্রী মুখ ফিরাইয়া হাসি দমন করিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, চাকর-দাসীর সঙ্গে এ-রকম করে কথা কইলে ছোটলোক প্রশ্রয় পেয়ে যায়, আর মানে না, একটু বুঝে সমঝে কথা কইতে হয় বাবু, নইলে লোকেও নিন্দা করে। বলিয়া টাকাটা তুলিয়া লইয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিন্তু অনতিকাল পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আজ এ বেলা কি রান্না হবে?

রন্ধনশালা সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যাপারে সতীশ যে একজন গুণী লোক সে পরিচয় সাবিত্রী পূর্বেই পাইয়াছিল। সেইজন্য প্রত্যহ সকালবেলা একবার করিয়া আসিয়া সতীশের হুকুম লইয়া যাইত, এবং নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বামুনঠাকুরের দ্বারা সমস্তটুকু নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করাইয়া লইত। ইতিমধ্যে চাকর তামাক দিয়া গিয়াছিল, সতীশ আর একবার কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, যা খুশি।

সাবিত্রী বলিল, আবার রাগও আছে যে!

সতীশ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া তামাক টানিতে টানিতে বলিল, পুরুষমানুষ, রাগ থাকবে না? আজ আমি খাবও না।

সাবিত্রী বলিল, আর কোথাও জুটেছে বোধ হয়? কিন্তু সে যাই হোক সতীশবাবু, ইস্কুলে আপনাকে যেতেই হবে তা বলে রাখছি।

এই অল্পকালের মধ্যেই নিয়মিত স্কুলে যাওয়া ব্যাপারটা পুনরায় সতীশকে বোঝার মত চাপিয়া ধরিতেছিল, এবং নানা ছলে নানা উপলক্ষে সে যে কামাই করিতে শুরু করিয়াছিল, সাবিত্রী তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। আজ সেই ছলনার পুনরাবৃত্তির সূত্রপাতেই সে টের পাইল।

সতীশ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে বলিল, শুভকর্মের গোড়াতেই টুকো না বলচি।

সাবিত্রী কহিল, তা ত বললেন। কিন্তু এন্ট্রান্স পাস করতে চব্বিশ বছর কেটে গেল, এই ডাক্তারি পাস করতে চৌষট্টি বছর কেটে যাবে যে!

সতীশ রাগতভাবে বলিল, মিথ্যা কথা বলো না সাবিত্রী। আমি এন্ট্রান্স পাস করিনি।

সাবিত্রী হাসিয়া উঠিল। বলিল, এটাও করেন নি?

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। হিংসুটে মাস্টারগুলো আমাকে পাস করতে যেতেই দেয়নি।

সাবিত্রী এবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। তারপরে বলিল, তবে এটা হবে কি?

কোন্‌টা?

এই ডাক্তারিটা?

সতীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা সাবিত্রী, গাধার মত লোকগুলো একজামিন-পাস করে কি ক'রে বলতে পার?

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, গাধার মতন, কিন্তু গাধা নয়। যারা ঠিক গাধা, তারা পারে না।

সতীশ ব্যস্তভাবে দরজার বাহিরে গলা বাড়াইয়া একবার দেখিয়া লইল, পরক্ষণেই স্থির হইয়া বসিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, কেউ যদি শোনে ত সত্যিই নিন্দে করবে। আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে গাধা বলছ, এর কোন কৈফিয়তই দেওয়া চলবে না।

হায় রে! কর্মদোষে আজ সাবিত্রী বাসার দাসী! তাই সে এই আঘাতটুকু সহ্য করিয়া লইয়া বলিল, তা বটে! বলিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ আর একবার অলসের মত বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার মনের মধ্যে কর্মহীন সারা দিনের যে ছবিটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, সাবিত্রীর কথার ঘায়ে তাহার অনেকটাই মলিন হইয়া গেল এবং যে ব্যথাটুকু বহন করিয়া সাবিত্রী নিজে চলিয়া গেল, তাহাও তাহার ছুটির আনন্দকে বাড়াইয়া দিয়া গেল না, এবং যদিচ সে মনে মনে বুঝিল আজ আর কামাই করিয়া লাভ হইবে না, তথাচ কিছুই না করিবার লোভও সে ত্যাগ করিতে না পারিয়া অলস বিরক্ত মুখে বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। কিন্তু যথাসময়ে স্নানের জন্য তাগিদ পড়িল। সতীশ উঠিল না; বলিল, তাড়াতাড়ি কি? আমি আজ ত বার হবো না।

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সে হবে না। আপনাকে ইস্কুলে যেতেই হবে—যান, আপনি স্নান করে খেয়ে নিন।

সতীশ বলিল, তোমাকে কি আমার অছি বহাল করা হয়েছে যে, এমন করে পীড়াপীড়ি লাগিয়েছ? আজ আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি।

সাবিত্রী একটুখানি হাসিল; বলিল, না যান ত স্নান করে খেয়ে নিন। আপনার কুড়েমিতে দাসী-চাকরে কষ্ট পায় সেটা দেখতে পান না?

সতীশ বলিল, এ কি রকম দাসী-চাকর যে নটা বাজতে না বাজতে কষ্ট পায়! নাঃ—এ বাসা আমাকে বদলাতেই হবে, না হলে শরীর টিকবে না দেখচি।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল; বলিল, তা হলে আমাকেও বদলাতে হবে। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়া সে তাড়াতাড়ি নিজের কথাটা চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, ততক্ষণ কিন্তু আপনাকে এই বাসার নিয়মই মেনে চলতে হবে—ইস্কুলেও যেতে হবে। নিন, উঠুন, বেলা হয়ে যাচ্ছে। বলিয়াই সতীশের ধুতি ও গামছা স্নানের ঘরে রাখিয়া আসিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ প্রত্যহ নিয়মিত সন্ধ্যাহ্নিক করিত। আজ সে স্নান করিয়া আসিয়া পূজার আসনে বসিয়া দেরি করিতে লাগিল। সাবিত্রী দুই-তিনবার আসিয়া দেখিয়া গিয়া দরজার বাহির হইতে ডাকিয়া বলিল, আর কেন, বাড়া ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে! ইস্কুলে যেতে হবে না আপনাকে, দয়া করে দুটি খেয়ে নিয়ে আমাদের মাথা কিনুন।

সতীশ আরও মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, পূজো-আহ্নিকের সময় গোলমাল করলে কি হয় জানো?

সাবিত্রী বলিল, কোশাকুশি সামনে নিয়ে ছল করলে কি হয় জানেন?

সতীশ চোখ কপালে তুলিল, ছল করছিলাম! কখ্খন না।

সাবিত্রী কি একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। তারপরে বলিল, তা আপনিই জানেন। কিন্তু আপনারও ত অন্যদিন এত দেরি হয় না—যান, ভাত দেওয়া হয়েছে; বলিয়া চলিয়া গেল।

আজ শীতের মধুর মধ্যাহ্নে বাসা নির্জন ও নিস্তব্ধ। এ বাসার সকলেই কেরানী। তাঁহারা অফিসে গিয়াছেন। বামুনঠাকুর বেড়াইতে গিয়াছে, বেহারী বাজার করিতে গিয়াছে, সাবিত্রীরও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না। সতীশ নিজের ঘরে প্রথমে দিবানিদ্রার মিথ্যা চেষ্টা করিয়া এইমাত্র উঠিয়া বসিয়া যা-তা ভাবিতেছিল। তাহার শিয়রের দিকের জানালাটা বন্ধ ছিল। সেটা খুলিয়া দিয়া সম্মুখের খোলা ছাদের দিকে চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া ফেলিল। ছাদের একপ্রান্তে বসিয়া সাবিত্রী চুল শুকাইতেছিল এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একটা বই দেখিতেছিল। জানালা খোলা-দেওয়ার শব্দে সে চকিত হইয়া মাথার উপরে আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল জানালা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনতিকাল পরেই সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, ডাকছিলেন আমাকে?

সতীশ বলিল, না, ডাকিনি ত।

আপনার পান, জল আনব?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, আনো।

সাবিত্রী পান, জল আনিয়া বিছানার কাছে রাখিয়া দিয়া, ঘরের সমস্ত দরজা জানালা একে একে বেশ করিয়া খুলিয়া দিয়া মেঝের উপর বসিয়াই বলিল, যাই, আপনার তামাক সেজে আনি।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, বেহারী কোথায়?

বাজারে গেছে, বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরে তামাক সাজিয়া আনিয়া হাজির করিয়া খোলা দরজার সুমুখে বসিয়া পড়িয়া হাসিমুখে বলিল, আজ মিথ্যে কামাই করলেন।

সতীশ কহিল, এইটেই সত্যি! আমার ধাতটা কিছু স্বতন্ত্র, তাই মাঝে মাঝে এ-রকম না করলে অসুখ হয়ে পড়ে। তা ছাড়া আমি রীতিমত ডাক্তার হতেও চাইনে। অল্প-স্বল্প কিছু কিছু শিখে নিয়ে আমাদের দেশের বাড়িতে ফিরে গিয়ে একটা বিনি-পয়সার ডাক্তার-খানা খুলে দেব। চিকিৎসার অভাবে দেশের গরীব-দুঃখীরা ওলাউঠায় উজাড় হয়ে যায়, তাদের চিকিৎসা করাই আমার উদ্দেশ্য।

সাবিত্রী বলিল, বিনি-পয়সার চিকিৎসায় বুঝি ভাল শেখার দরকার নেই? ভাল ডাক্তার কেবল বড়লোকের জন্যে, আর গরীবের বেলাই হাতুড়ে। কিন্তু তাই-বা হবে কি করে? আপনি চলে গেলে বিপিনবাবুর ভারী মুশকিল হবে যে!

বিপিনবাবুর উল্লেখে সতীশ লজ্জিত হইয়া বলিল, মুশকিল আবার কি, আমার মত বন্ধু তাঁর ঢের জুটে যাবে। তা ছাড়া, ওখানে আমি আর যাইনে!

সাবিত্রী আশ্চর্য হইয়া বলিল, যান না? তা হলে আর ওঁকে গান-বাজনা শেখায় কে?

সতীশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, গান-বাজনা বুঝি আমি শেখাই?

সাবিত্রী বলিল, কি জানি বাবু, লোক ত বলে।

কেউ বলে না—এ তোমার বানানো কথা।

আপনাকে বিপিনবাবুর মোসাহেব বলে, এও বুঝি আমার বানানো কথা।

কথা শুনিয়া সতীশ আগুন হইয়া উঠিল। তাহার কারণ ছিল। বিপিনের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ বাহিরের লোকের সমালোচনার বিষয় হইলে সেই সমালোচনার ফল সাধারণতঃ কি দাঁড়ায়, ইহা সে বিদিত ছিল। কলিকাতাবাসী বিপিনের সাংসারিক অবস্থা ও তাহার আমোদ-প্রমোদের অপর্যাপ্ত সাজ-সরঞ্জামের মাঝখানে প্রবাসী সতীশের স্থানটা লোকের চোখে যে নীচে নামিয়াই পড়িবে, সতীশের অন্তরস্থ এই উৎকণ্ঠিত সংশয় সাবিত্রীর তীক্ষ্ণ ঘায়ে একেবারে উগ্রমূর্তি ধরিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। সে দুই চোখ দীপ্ত করিয়া গর্জিয়া উঠিল, কি, আমি মোসাহেব—কে বলে শুনি?

সাবিত্রী মনে মনে হাসিয়া বলিল, কার নাম করব বাবু? যাই, রাখালবাবুর বিছানাটা রোদে দিয়ে আসি।

বিছানা থাক—নাম বল।

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, কুমুদিনী।

সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল, তাকে তুমি জানলে কি করে?

সাবিত্রী বলিল, তিনি আমাকে কাজ করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

তোমাকে? সাহস ত কম নয়! তুমি কি বললে?

এখনো বলিনি—ভাবচি। বেশী মাইনে, কম কাজ, তাই লোভ হচ্চে।

সতীশের চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সে বলিল, এ বিপিনের মতলব। তোমার নাম সে প্রায়ই করে বটে।

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, করেন? তা হলে বোধ করি আমাকে মনে ধরেছে!

সতীশ সাবিত্রীর মুখের প্রতি ক্রুর দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল, ধরাচ্চি; এক শ' টাকা ফাইন দিয়ে অবধি লোকজনকে আর চাবকাই নি—আবার দেখচি কিছু দিতে হলো! আচ্ছা, তুমি যাও।

সাবিত্রী চলিয়া গেল। রাখালের বিছানাগুলি রৌদ্রে দিয়া তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, সতীশ জামা গায়ে দিয়াছে, এবং বাক্স খুলিয়া একতাড়া নোট লুকাইয়া পকেটের মধ্যে লইতেছে। সাবিত্রী দুই চৌকাঠে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কোথায় যাওয়া হবে?

কাজ আছে—পথ ছাড়ো।

কি কাজ শুনি?

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, সরো।

সাবিত্রী সরিল না। হাসিয়া বলিল, ভগবান আপনাকে কোন গুণ থেকে বঞ্চিত করেন নি দেখচি। ইতিপূর্বে জরিমানা দেওয়াও হয়ে গেছে!

সতীশ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, কথা কহিল না।

সাবিত্রী কহিল, এ ত আপনার ভারী অন্যায়! কোথায় কাজ করি, না-করি আমার ইচ্ছে —আপনি কেন বিবাদ করতে চান?

সতীশ বলিল, বিবাদ করি না-করি আমার ইচ্ছে, তুমি কেন পথ আটকাও?

সাবিত্রী হাতজোড় করিয়া বলিল, আচ্ছা, একটু সবুর করুন, আমি এলে যাবেন।

সতীশ ফিরিয়া গিয়া খাটের উপর বসিতেই সাবিত্রী বাহিরে আসিয়া খট্ করিয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া জানালা দিয়া আস্তে আস্তে বলিয়া গেল, শান্ত না হলে দোর খুলব না—নীচে চললুম। বলিয়া সে সত্যই নীচে নামিয়া গেল। বাহিরে যাইতে না পারিয়া সতীশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া গায়ের জামাটা মাটিতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িল।

বিপিনের সহিত তাহার আলাপ এলাহাবাদে। কলিকাতায় আসিয়া ইহা যথেষ্ট ঘনীভূত হইলেও এই বাসার মধ্যে তাহার যখন-তখন আসা-যাওয়াটা যে বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইতেছিল, ইহা সে নিজেও লক্ষ্য করিতেছিল। আজ সাবিত্রীর কথায় সেই হেতুটা একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সতীশের বন্ধু বলিয়া এবং বড়লোক বলিয়া এ বাসায় তাহার যথেষ্ট সম্ভ্রম ছিল। সতীশের অনুপস্থিতিতেও তাহার আদর-যত্নের ত্রুটি না হয়, এ ভার সতীশ নিজেই সাবিত্রীর উপরে দিয়াছিল। এই খাতির-যত্ন বিপিনবাবু যে পুরা মাত্রায় আদায় করিয়া লইতেছিলেন এ সংবাদ বাসায় ফিরিয়া আসিয়া সতীশ যখন-তখন পাইতেছিল। নিজের মনের এই সরল উদারতার তুলনায় বিপিনের এই কদাকার লুব্ধতা গভীর কৃতঘ্নতার মত আজ তাহাকে বিঁধিল এবং সমস্ত নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, সৌহার্দ্য, ঘনিষ্ঠতা একমুহূর্তেই তাহার কাছে বিষ হইয়া গেল। বাহ্যতঃ সে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল বটে, কিন্তু মর্মান্তিক আক্রোশ পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র পশুর মত ক্রমাগত তাহার অন্তরের মধ্যে এ-কোণ ও-কোণ করিতে লাগিল।

ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী জানালার বাহির হইতে আস্তে আস্তে বলিল, রাগ পড়ল বাবু?

সতীশ জবাব দিল না।

দোর খুলিয়া সাবিত্রী ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আচ্ছা এ কি অত্যাচার বলুন ত?

সতীশ কোনদিকে না চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের অত্যাচার?

সাবিত্রী বলিল, সকলেই নিজের ভাল খোঁজে। আমিও কোথাও যদি একটু ভাল কাজ পাই, আপনি তাতে বাদ সাধেন কেন?

সতীশ উদাসভাবে বলিল, বাদ সাধব কেন? তোমার ইচ্ছে হলে যাবে বৈ কি!

সাবিত্রী কহিল, অথচ আমার নূতন মনিবটিকে মারধর করবার আয়োজন কচ্চেন।

সতীশ উঠিয়া বসিয়া বলিল, তুমি কি করতে সাবিত্রী? তোমার জিনিসটি যদি কেউ ভুলিয়ে নিয়ে যায়—

কিন্তু আমি কি আপনার জিনিস? বলিয়াই সাবিত্রী ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

সতীশ লজ্জিত হইয়া বলিল, দূর্—তা—নয়—কিন্তু—

সাবিত্রী বলিল, কিন্তুতে আর কাজ নেই—আমি যাব না। সতীশের পিরানটা মাটিতে লুটাইতেছিল, সাবিত্রী তুলিয়া লইয়া পকেট হইতে নোটগুলি বাহির করিয়া ফেলিল। বাক্সে চাবি লাগানই ছিল, নোটগুলি ভিতরে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া চাবি নিজের রিঙে পরাইতে পরাইতে বলিল, আমার কাছে রইল। টকার আবশ্যক হলে চেয়ে নেবেন।

সতীশ বলিল, যদি চুরি কর?

সাবিত্রী সে কথায় হাসিয়া আঁচল-বাঁধা চাবির গোছা ঝনাৎ করিয়া পিঠের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, আমি চুরি করলে আপনার গায়ে লাগবে না।

সতীশ সাবিত্রীর মুখের পানে ক্ষণকাল স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই ক্ষণিকের

দৃষ্টিতে সে কি দেখিতে পাইল সে-ই জানে, চমকিয়া বলিয়া উঠিল, সাবিত্রী, তোমাদের বাড়ি কোন্ দেশে?

বাঙলা দেশে।

তার বেশী আর বলবে না?

না।

বাড়ি কোথায় না বল, কি জাত বল?

সাবিত্রী একটুখানি হাসিয়া বলিল, তাই বা জেনে কি হবে? হাতে ভাত খাবেন না ত!

সতীশ ক্ষণকাল ভাবিয়া কহিল, সম্ভব নয়। কিন্তু জোর করে একেবারে না বলতেও পারিনে।

সাবিত্রী তাহার দুই আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু সতীশের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া মুহূর্ত-কাল পরেই হাসিয়া উঠিল। ছেলেমানুষের মত মাথা নাড়িয়া কণ্ঠস্বরে অনির্বচনীয় সোহাগ ঢালিয়া দিয়া বলিল, না বলতে পারেন না—কেন বলুন ত?

অকস্মাৎ সতীশের মাথায় যেন ভূত চাপিয়া গেল। তাহার বুকের রক্ত তোলপাড় করিয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ গাঢ়-স্বরে বলিয়া ফেলিল, কেন জানিনে সাবিত্রী, কিন্তু তুমি রেঁধে দিলে খাব না বলা আমার পক্ষে শক্ত।

শক্ত? আচ্ছা, সে একদিন দেখা যাবে। ঐ যাঃ—রাখালবাবুর পাশ-বালিশটা রোদে দিতে ভুলেছি, বলিয়াই চক্ষের নিমিষে সে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

একটা কথা শুনে যাও সাবিত্রী, বলিয়াই সহসা সতীশ সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া তাহার অঞ্চলের ক্ষুদ্র একপ্রান্ত ধরিয়া ফেলিল। সাবিত্রী দুই চক্ষে বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া 'ছি! আসচি।' বলিয়া এক টান মারিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হঠাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তাহার এই অকস্মাৎ সত্রাস পলায়ন, এই চাপা-গলায় 'আসচি', এই চোখের বিদ্যুৎ—বজ্রাগ্নির মত সতীশের সমস্ত দুর্বুদ্ধিকে এক নিমিষে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া ফেলিল। কুৎসিত লজ্জার ধিক্কারে তাহার সমস্ত শরীর শূলবিদ্ধ সর্পের মত গুটাইয়া গুটাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, ইহজন্মে সে আর সাবিত্রীকে মুখ দেখাইতে পারিবে না এবং পাছে কোনো প্রয়োজনে সে আবার আসিয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় সে তৎক্ষণাৎ একখানা র‍্যাপার টানিয়া লইয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া পড়িল। তিন-চারিটা সিঁড়ি বাকী থাকিতে সতীশ উপর হইতে সাবিত্রীর গলা আবার শুনিতে পাইল। সে রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিয়া বলিতেছিল, একেবারে খাবার খেয়ে বেড়াতে যান বাবু, নইলে ফিরে আসতে দেরি হলে সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু যেন শুনিতেই পাইল না, এইভাবে সতীশ ঊর্ধ্বশ্বাসে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা সাবিত্রী যখন রান্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিল, সতীশ আস্তে আস্তে বলিল, কিছু মনে করো না সাবিত্রী।

সাবিত্রী বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করিল, কি মনে করব না?

সতীশ ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া বলিল, বেশ যা হোক! আমার সময় নেই—কি রান্না হবে বলুন।

আমি জানিনে—তোমার যা ইচ্ছে।

আচ্ছা, বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া গেল, দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না।

ঘণ্টা-দুই পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কি কাণ্ড বলুন ত! আজো পাদমেকং ন গচ্ছামি নাকি?

সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী বলিল, নটা বেজে গেছে যে!

সময় উত্তীর্ণ হইবার সংবাদে সতীশ লেশমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া বলিল, বাজুক গে—আমার আর ভাল লাগছে না।

এই সকল অন্যায় আলস্য, বৃথা সময় নষ্ট, সাবিত্রী একেবারে দেখিতে পারিত না। তাই সে কিছুদিন হইতেই ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ এবং অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। একটু রুক্ষস্বরেই প্রশ্ন করিল, বলি, কি ভাল লাগচে না? পড়তে যাওয়া?

সতীশ নিজেও মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল—জবাব দিল না। তাহার মুখের পানে চাহিয়া সাবিত্রী ইহা বুঝিল এবং ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া বলিল, লেখাপড়া ভাল লাগছে না! এখন ভাল লাগছে বুঝি মেয়েমানুষের আঁচল ধরে টানাটানি করা? যান আপনি ইস্কুলে। অনর্থক বাসায় বসে থেকে উপদ্রব করবেন না।

তাহার তিরস্কারের মধ্যে যদিচ আন্তরিক স্নেহ ও একান্ত মঙ্গলেচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, কিন্তু কথার ভঙ্গীটা সতীশের সর্বাঙ্গে যেন বিছুটি মাখাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে চোখ-মুখ তাহার ক্রোধে রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বলিল, যা মুখে আসে তাই যে বল দেখছি? প্রশ্রয় পেলে শুধু কুকুরই মাথায় ওঠে না, মানুষকেও মনে করে দিতে হয়।

এ যে গালি-গালাজ! সাবিত্রী মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কণ্ঠস্বর আরো নত করিয়া বলিল, হয় বৈ কি সতীশবাবু! না হলে আপনাকেই বা মনে করে দিতে হবে কেন এটা ভদ্রলোকের বাসা, বৃন্দাবন নয়। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

দুঃসহ বিস্ময়ে সতীশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সাবিত্রী যে তাহাকে এমন করিয়া বিঁধিতে পারে, এ কথা সে ত মনে স্থান দিতেও পারিত না। কতক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোনমতে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া লইয়া পড়িবার ছলে বাহির হইয়া গেল।

সেদিন সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার অপমানাহত ক্ষুব্ধ চিত্ত তাহার প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে লাগিল এবং যতই সে নিজের এই অভাবনীয় অদ্ভুত ব্যবহারের কোন তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইল না, ততই তাহার মনের মধ্যে একটা কথাই বারংবার আনাগোনা করিয়া দাগ কাটিতে লাগিল। কেন যে সে আঁচল ধরিয়াছিল, কি কথা তাহার বলিবার ছিল, এবং সাবিত্রী অমন করিয়া পলাইয়া না গেলে সে কি বলিত, কি করিত, তাহার অপদস্থ ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ নিরন্তর এই সমস্ত তিক্ত প্রশ্নে সাবিত্রীর অপেক্ষাও তাহাকে অধিকতর নিষ্ঠুর-ভাবে অবিশ্রাম বিঁধিতে লাগিল। এমনি করিয়া সারা দিন সে নিজের অস্ত্রে নিজে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া দিন-শেষে গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং কোনমতে খেয়ার মাঝিদের বিনীত আক্রমণ এড়াইয়া নির্জীবের মত একখণ্ড পাথরের উপর গিয়া বসিয়া পড়িল।

কাল যখন সাবিত্রীর কাছে মনের দুর্বলতা হঠাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ায় লজ্জায় বাসা হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়াছিল, তখন সে লজ্জার মধ্যে কেমন করিয়া যেন একটু মাধুর্য মিশিয়াছিল। কে যেন আড়ালে থাকিয়া অংশ লইয়াছিল। কিন্তু আজ সাবিত্রীর বিদ্রূপের বহ্নিতে সেই রসের লেশটুকু পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়া নিঃসঙ্গ লজ্জা একেবারে শুষ্ক কঠিন হইয়া তাহার বুকের মধ্যে আড় হইয়া বাধিল। সেদিন তাহার আত্মসম্ভ্রম শুধু মাথা হেঁট করিয়াছিল, আজ তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আবার সবচেয়ে বাজিতে লাগিল এই দুঃখটা যে, এই স্ত্রীলোকটিকে সে যতদিন যত পরিহাস করিয়াছে, তাহার সমস্তরই আজ একটা কদর্থ করা হইবে। কাল সকালবেলা পর্যন্ত সত্যই যে তাহার পরিহাসের মধ্যে রহস্য ভিন্ন দ্বিতীয় অর্থ ছিল না, নির্জন মধ্যাহ্নের ওইটুকু অসংযমের পরে সে কথা ত মুখে আনিবারও আর পথ রহিল না। আসক্তি যে বহুদিন হইতে লুকাইয়া অপেক্ষা করিয়া ছিল না, এ কথা ত সাবিত্রী কোন মতেই বিশ্বাস করিবে না। সে বলিবে, এঁর মনে এই ছিল! কিন্তু তাহার মনে ত কিছুই ছিল না। এই সত্যটা বুঝাইয়া বলিবার সময়-সুযোগ তাহার কবে মিলিবে? সে সৎ ছেলে নয়, সে লজ্জাও তাহার খুব বেশী ছিল না, কিন্তু ভণ্ডামির অপবাদ সহ্য করিবে সে কি করিয়া? সে মনে মনে বলিল, যদি চোর, তবে চোরের মত সিঁদকাঠি-হাতেই ধরা পড়িল না কেন? সাবিত্রী যেন মনে মনে হাসিয়া বলিবে, এই সাধু জটা-কমণ্ডলু পিঠে বাঁধিয়া ত্রিশূলে দিয়া সিঁদ খুঁড়িতেছিল—ধরা পড়িয়াছে। এই অপবাদের কল্পনা তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। এমনিভাবে বসিয়া কখন যে রাত্রি বাড়িয়া উঠিল, সে জানিতে পারিল

না। কখন ভাঁটা শেষ হইয়া জোয়ারের জল পায়ের কাছে উঠিয়াছে, কখন কলিকাতার অপ্পরপপ্ত গ্যাসের আলোর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, কখন মাথার উপরে আকাশ কালো হইয়া নক্ষত্র ফুটিয়াছে, কিছুই সে টের পায় নাই। শীতের জোলো হাওয়ায় তাহার শীত করিতে লাগিল এবং ওপারের চটকলের ঘড়িতে বারটা বাজিয়া গেল। তখন সতীশ উঠিয়া পড়িয়া বাসার অভিমুখে চলিল। এই সময়টায় কিছুক্ষণের জন্য বোধ করি, সে তাহার কাল্পনিক আশঙ্কাটা ভুলিয়াছিল; কিন্তু চলিতে চলিতে বাসার দূরত্ব যতই হ্রাস পাইতে লাগিল, মন তাহার পুনর্বার সেই অনুপাতেই ছোট হইয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে গলির মোড়ের কাছে আসিয়া পা আর উঠে না, এমনি হইল। ধীরে ধীরে কোনমতে সে বাসার দরজার সম্মুখে আসিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাসা নিস্তব্ধ! কোথাও কেহ যে জাগিয়া আছে এমন মনে হইল না এবং যদিচ সে জানিত, এত রাত্রে সাবিত্রী নিশ্চয়ই ঘরে ফিরিয়া গেছে, তথাপি দ্বারে ঘা দিতে, শব্দ করিতে সাহস হইল না। ভয় করিতে লাগিল, পাছে সে-ই আসিয়া দোর খুলিয়া দেয়। ঠিক এমনি সময়ে কবাট আপনি খুলিয়া গেল। এক-মুহূর্ত সতীশ কথা কহিতে পারিল না, তাহার পরে বলিল, কে, বেহারী?

হাঁ বাবু।

সকলের খাওয়া হয়ে গেছে?

হয়েছে।

ঝি চলে গেছে?

আজ্ঞা হাঁ, আমাকে বসে থাকতে বলে এইমাত্র গেল।

শুনিয়া সতীশ বাঁচিয়া গেল। খুশী হইয়া তাকে দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া, প্রফুল্লমুখে উপরে উঠিয়া গেল।

বেহারী আসিয়া বলিল, বাবু, আপনার খাবার—

খাবার থাক বেহারী—আমি খেয়ে এসেছি।

বেহারী বলিল, আপনার পান, জল ওই টেবিলের উপর আছে।

আচ্ছা, তুই শুগে যা।

বেহারী চলিয়া গেলে সতীশ বিছানায় শুইয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

কলহ করিয়া অবধি সাবিত্রীর মন ভাল ছিল না। সতীশ তাহাকে কটূক্তি করিলেও ফিরাইয়া বলা যে তাহার উচিত হয় নাই, এই অনুতাপ তাহাকে সমস্ত দুপুরবেলাটা ক্লেশ দিয়াছিল। তাই সন্ধ্যার পরে কোন একসময়ে নিভৃতে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইবার আশায় অপেক্ষা করিতে করিতে যখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন তাহার আশা আশঙ্কায় পরিণত হইতে লাগিল। সে জানিত এ কলিকাতায় বিপিন ভিন্ন সতীশের যাইবার স্থান নাই। তাই সর্বাগ্রেই ভয় হইল পাছে সে সেই দলেই মিশিয়া থাকে। ক্রমশঃ রাত্রি বাড়িতে লাগিল, সতীশ আসিল না। আর কোথাও যাইবার কথা মনে করিতে না পারিয়া সংশয় যখন বিশ্বাসে দৃঢ় হইয়া উঠিল, তখন প্রতীক্ষা করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ তাহার ঘৃণাবোধ হইতে লাগিল যে, ক্ষমা চাহিবার জন্য সে এমন লোকেরও পথ চাহিয়া আছে। তাই বেহারীকে বসিতে বলিয়া সাবিত্রী অনেক রাত্রে ঘরে ফিরিয়া গেল। ঘরে গিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিল, চোখে ঘুম আসিল না। সমস্ত দেহটা কি এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে প্রভাতের জন্য ছটফট করিতে লাগিল। ঘরের ছোট টাইমপিস্‌টিতে সব ক'টা বাজিয়া গেল, সে জাগিয়া থাকিয়া শুনিল এবং প্রভাতের জন্য আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া ঘোর থাকিতেই উঠিয়া পড়িয়া কাপড় ছাড়িয়া চোখে মুখে জল দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পথ দিয়া তখন মারোয়াড়ী রমণীরা দল বাঁধিয়া গান গাহিয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়াছিল, সেইদিকে মুখ করিয়া সাবিত্রী যেই বলিল, মা গঙ্গা, গিয়ে যেন সব ভাল দেখি, তাহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিয়া তপ্ত অশ্রুতে দুই চোখ ভরিয়া উঠিল এবং এই কম্পিত আশঙ্কায় সমস্ত মন পরিপূর্ণ করিয়া সে পথ দিয়া দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে সহস্রবার মনে মনে উচ্চারণ করিতে লাগিল, ভাল থাক। যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু ভাল থাক। বাসায়

পৌঁছিয়া ডাকাডাকির পরে বেহারী দরজা খুলিয়া দিয়াই সংবাদ দিল—সতীশবাবু অনেক রাত্রে আসিয়াছিলেন এবং কোথা হইতে খাইয়া আসিয়াছিলেন। এ সংবাদ যে প্রথমেই দেওয়া প্রয়োজন এই বৃদ্ধের তাহা অজ্ঞাত ছিল না। সাবিত্রী উপরে উঠিতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ললাট কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, খাননি বুঝি?

না, তাঁর খাবার ত ঢাকা পড়ে রয়েছে।

সাবিত্রী শুধু একটা হুঁ বলিয়া উপরে চলিয়া গেল। তাহার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন নির্ভর হইবামাত্রই আবার ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল।

পরদিন বেলা হইলে সতীশের ঘুম ভাঙ্গিল এবং ঘুম ভাঙ্গিয়াই মনে হইল সাবিত্রী! ঠিক সেই মুহূর্তেই সমস্ত মুখ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া সাবিত্রী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের পানে একবারমাত্র চাহিয়াই সতীশ মাথা হেঁট করিল। খানিক পরে সাবিত্রী বলিল, কি রান্না হবে জানতে এলুম।

সতীশ কোনদিকে না চাহিয়া বলিল, রোজ যা হয় তাই হোক।

'আচ্ছা', বলিয়া সাবিত্রী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই আবার দাঁড়াইল, কহিল, লেখা-পড়ার মত বাবুর কি খাওয়া-দাওয়াও আর ভাল লাগছে না।

সতীশ আস্তে আস্তে বলিল, আমি খেয়ে এসেছিলাম।

সে ভয়ে মিথ্যা বলিয়া ফেলিল। কিন্তু কোথায়, এ কথাও সাবিত্রী ঘৃণায় জিজ্ঞাসা করিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আজ দু দিন ধরে আপনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কিসের ভয়ে শুনি? অসুবিধা হলে আমাকে ত জবাব দিতেই পারেন।

সতীশ মুখ তুলিয়া বলিল, তোমার অপরাধ? তা ছাড়া আমি ত জবাব দেবার কর্তা নই, বাসা আমার একলার নয়।

সাবিত্রী বলিল, একলার হলে জবাব দিতেন বোধ হয়। আচ্ছা, আমি না হয় নিজেই যাচ্ছি।

সতীশ উত্তর দিল না, মৌন হইয়া রহিল দেখিয়া সাবিত্রী মনে মনে অধিকতর জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, আমি গেলে আপনি খুশী হন? আপনার পায়ে পড়ি সতীশবাবু, হাঁ না একটা জবাব দিন।

তবু সতীশ নিরুত্তর হইয়া রহিল। কারণ, সাবিত্রী যে এ বাসার কতখানি, তাহা সে জানিত এবং এমন করিয়া সে হঠাৎ চলিয়া গেলে কিছুই চাপা থাকিবে না, তখন সমস্ত কথাটা মুখে মুখে ঘাঁটাঘাঁটি হইতে হইতে কিরূপ জঘন্য আকার ধারণ করিবে, তাহাই নিশ্চয় অনুমান করিয়া সে ভয় পাইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমাকে মাপ কর সাবিত্রী! যে ক'টা দিন আমি আছি, সে ক'টা দিন অন্ততঃ তুমি কোথাও যেও না।

অন্য কোনো সময় হইলে সে তখনি ক্ষমা করিত, কিন্তু ইহার সম্বন্ধে সে নাকি একটা অমূলক সন্দেহ মনে মনে পোষণ করিতেছিল, তাই এই মৃদু কণ্ঠস্বরকে ছলনা কল্পনা করিয়া নির্দয় হইয়া উঠিল এবং তাহারি গলার অনুকরণ করিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, আপনি এত আড়ম্বর করে মাপ চেয়ে সাধু হতে চাচ্ছেন কিসের জন্যে? আমার মত নীচ স্ত্রীলোকের আঁচল ধরে এই কি নূতন টেনেছেন যে, লজ্জায় একেবারে মরে যাচ্ছেন? তার চেয়ে বাড়ি চলে যান, কলকাতায় থেকে মিথ্যে নষ্ট হবেন না। লেখাপড়া আপনার কাজ নয়।

যে সতীশ উগ্র-প্রকৃতিতে কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না, কথা সহ্য করা যাহার কোনদিন স্বভাব নয়, সে এখন এতবড় অপমানের কথাতেও নির্বাক হইয়া রহিল। অপরাধী মন তাহার অসহ্য গুরুভারগ্রস্ত ভারবাহী জীবের মত এমনি নিরুপায়ভাবে পথের উপরে দুমড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, সাবিত্রীর এই পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠুর আঘাতেও সে কিছুতেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। সাবিত্রীর কিন্তু চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার স্পর্ধা যে ক্রোধকেও ডিঙ্গাইয়া গেল, ইহা তাহার নিজের কানেও বাজিল। সে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

তিন

আজও সাবিত্রী সমস্ত কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সারা দিন উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। সতীশ যদি কালকের মত আজও রাগ করিত কিংবা একটা কথারও উত্তর করিত ত ভাল হইত। কিন্তু সে কিছুই করিল না। গম্ভীর বিষন্ন মুখে যথানিয়মে আহারাদি শেষ করিয়া পড়িতে চলিয়া গেল এবং ঠিক সময়ে ফিরিয়া আসিয়া নিস্তব্ধ হইয়া ঘরে বসিয়া রহিল। আড়ালে থাকিয়া সাবিত্রী সমস্তই লক্ষ্য করিতে লাগিল; কিন্তু কোনরকম ছুতা করিয়াও আজ তাহার ঘরে ঢুকিতে সাহস করিল না। প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্বে সে নিজে গিয়া তাহার ঘর ঝাঁট দিয়া আসিত, আজ বেহারীকে পাঠাইয়া দিল এবং সন্ধ্যার সময় সে-ই গিয়া আলো জ্বালিয়া দিয়া আসিল।

রোজ এই সময়টায় রাখালবাবুর ঘরে পাশার আড্ডা বসিত, আজও বসিল এবং ঘোর কলরব থাকিয়া থাকিয়া উত্থিত হইতে লাগিল। সামনের খোলা ছাদে কেহই ছিল না। সাবিত্রী এদিকে ওদিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত সঙ্কোচ জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে সতীশের ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। সতীশ বিছানায় চিত হইয়া পড়িয়া বোধ করি কড়িকাঠ গুণিতেছিল, উঠিয়া বসিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আপনার আহ্নিকের জায়গা করে দেব?

সতীশ বলিল, দাও।

পুনর্বার সাবিত্রীকে নির্বাক্ হইতে হইল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, লোকে কি বলবে বলুন ত?

সতীশ কোন উত্তর করিল না।

সাবিত্রী বলিল, আপনি আমাকে থাকতে বললেন, কিন্তু নিজে কি রকম কাণ্ডটি করছেন বলুন দেখি?

সতীশ গম্ভীরভাবে বলিল, আমি কোন কাণ্ডই করিনি, চুপ করে আছি মাত্র।

সাবিত্রী বলিল, এই চুপ করে থাকাটাই যে সবচেয়ে বিশ্রী। সবাই যখন চুপ করে নেই, আপনি তখন চুপ করে থাকলেই ত কথা উঠবে—ওটা কি সাধ? মুহূর্তকাল স্থির থাকিয়া বলিল, ঐ যে খুঁচিয়ে ঘা করার একটা কথা আছে আপনি ঠিক তাই করছেন। দোষ নেই, অথচ দোষী সেজে বসে আছেন। এই নিয়ে পাঁচজনে কানাকানি করবে, হাসি-কৌতুক করবে, এ যদি বা আপনার বরদাস্ত হয়, আমার ত হবে না—আমাকে দেখছি তা হলে নিতান্তই যেতে হবে।

সতীশ মনে মনে অস্থির হইয়া বলিল, দোষ কি কিছুই করিনি?

সাবিত্রী বলিল, না। একটু তলিয়ে ভেবে দেখুন দেখি, মনটা আপনিই পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমার সম্বন্ধে আপনার মত দোষ—সাবিত্রী আর বলিতে পারিল না। ধাবমান অশ্ব অকস্মাৎ গভীর খাদের মুখে আসিয়া তাহার দুই পা অগ্রসৃত করিয়া যেভাবে প্রাণপণে রুখিয়া দাঁড়ায় সাবিত্রীর চলন্ত জিহ্বা ঠিক সেইভাবে থামিল। তাহার এই আকস্মিক নিস্তব্ধতায় বিস্মিত সতীশ মুখ তুলিতেই চোখাচোখি হইল—নিজের লজ্জায় সাবিত্রী নিজেই মরিয়া গেল। সে যে এই কথাটাই বলিতে গিয়াছিল যে, তাহার মত নারীর সম্বন্ধে ওরূপ অপরাধে লজ্জার হেতু নাই, এই লজ্জাতেই তাহার চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল।

সতীশও কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাবিত্রী থামাইয়া দিয়া বলিল, চুপ করুন। আপনিও বুঝুন। মিথ্যে তিলকে তাল করে কষ্ট পাবেন না। ও বেহারী, বাবুর আহ্নিকের জায়গাটা একটু শিগগির করে ধুয়ে দাও, আমি অনেকক্ষণ আসন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচি।

বেহারী কি-একটা কাজে এদিকে আসিতেছিল, তৎক্ষণাৎ জল আনিতে ফিরিয়া গেলে সাবিত্রী লাঞ্ছিত অভিমানের সুরে কহিল, আপনার ব্যবহারে আজ দুদিন যে আমি উত্তরোত্তর কি রকম অতিষ্ঠ হয়ে উঠছি, এ কি চোখ চেয়ে একবার দেখতেও পাচ্ছেন না? আশ্চর্য!

তাহার এত দ্রুত এত কথা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার অবকাশ সতীশের ঘটিল না,

তবুও তাহার ভিতরকার প্লানিটা যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিল এবং পরক্ষণেই ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধীর ন্যায় অনুতপ্ত-কণ্ঠে বলিল, কিন্তু তোমাকে কি অপমান করিনি?

সাবিত্রী অধীর হইয়া বলিল, না বুঝলে আপনাকে আমি বোঝাব কি করে? একশ'বার হাজারবার বলচি, ওতে আমার মত মেয়েমানুষের কোন অপমান হয়নি। আপনি দয়া করে সুস্থ হোন—এইটুকু শুধু আপনার পায়ে আমি মিনতি জানাচ্ছি।

প্রত্যুত্তরে সতীশ কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সাবিত্রী তাহার দুই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, এই যে বেহারী!

বেহারী ঘটিতে জল আনিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সাবিত্রী তাহার হাত হইতে ঘটি লইয়া ঘরের একটা কোণ বেশ করিয়া ধুইয়া ফেলিয়া আঁচল দিয়া মুছিয়া সতীশকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, যান, হাত-পা ধুয়ে এসে কাপড় ছেড়ে সন্ধ্যে করতে বসুন। কোশাকুশি ওই কুলুঙ্গিতে আছে, বলিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিয়া সতীশের দুর্বিষহ হৃদয়-ভারটা নিঃশেষে তুলিয়া লইয়া বেহারীকে সঙ্গে করিয়া ধীরপদে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ মন দিয়া সান্ধ্যকৃত্য সমাপন করিয়া উঠিয়াই দেখিল ইতিমধ্যে কে নিঃশব্দে আসিয়া আসন পাতিয়া তাহার খাবার রাখিয়া গিয়াছে। যদিও ঘরে আর কেহ ছিল না, তথাপি সে নিশ্চয়ই বুঝিল সে একা নহে। আসনে বসিয়া সে আস্তে আস্তে বলিল, এখন এত বেশী খেলে আর ত খেতে পারব না।

বাহির হইতে জবাব আসিল, খেতেও হবে না, বিপিনবাবুর ওখান থেকে নিমন্ত্রণ করে গেছে।

সতীশ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, যাও—জ্বালাতন করো না, আমি কোথাও যেতে পারব না।

সাবিত্রী আড়াল হইতে বলিল, সে কি হয়! বলে গেছেন কোথায় যেতে হবে আপনি জানেন এবং না গেলে তাঁদের সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। গান-বাজনা—

হয় হোক, বলিয়া সতীশ এ প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দিয়া নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল এবং শেষ হইয়া গেলে বিছানার শিয়রে আলো তুলিয়া আনিয়া ভালছেলের মত একখানা ডাক্তারি বই খুলিয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু সেদিকে কোনমতেই মন দিতে পারিল না। তাহার দুশ্চিন্তামুক্ত মন বন্ধন-মুক্ত ঘোড়ার মতই বিনা প্রয়োজনে সর্বত্র ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রান্নাঘরে তখন রান্না চাপাইয়া দিয়া বামুনঠাকুর বেহারীকে দিয়া গাঁজা জ্বালাইতেছিল এবং রাখালবাবুর ঘরে পাশার কোলাহল উত্তরোত্তর দুরন্ত হইয়া উঠিতেছিল।

সতীশ ডাকিল, সাবিত্রী!

সাবিত্রী তখনও চৌকাঠের বাহিরে বসিয়া ছিল, বলিল, আজ্ঞে।

সতীশ কহিল, বিপিনবাবুর নিমন্ত্রণে যাওয়া মহাপাপ। পাপ না বুঝে করেছি বটে, কিন্তু বুঝে করব না।

সাবিত্রী বাহির হইতে প্রশ্ন করিল, পাপ কেন?

সতীশ কহিল, আমি জানি কোন্ জায়গায় তাঁর গান-বাজনার আয়োজন চলছে। শুধু সেই স্থানটায় যাওয়াই একটা পাপের কাজ।

বেশ ত, তেমন স্থানে নাই গেলেন।

সতীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, নিশ্চয়ই যাব না। কিন্তু তারা যে সহজে আমাকে নিষ্কৃতি দেবে এমন মনে হয় না। তাই তোমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি—যদি কেউ আসে—ফিরিয়ে দিয়ো। বলো, আমি বাড়ি নেই—রাত্রে আসব না, বুঝেছ?

সাবিত্রী বলিল, বুঝেছি।

সতীশ একটা কর্তব্য পালন করিয়া সুস্থভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, কোথা দিয়ে জোলো হাওয়া আসছে সাবিত্রী—জানালাগুলো বন্ধ করে দাও।

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া জানালা বন্ধ করিতে লাগিল। সতীশ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া অকস্মাৎ কৃতজ্ঞতায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল; স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আচ্ছা সাবিত্রী, তুমি নিজে নীচ স্ত্রীলোক বল কেন?

সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সত্যি কথা বলব না?

সতীশ বলিল, এ কথা কিছুতেই সত্য নয়। তুমি একগলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও আমি বিশ্বাস করব না।

সাবিত্রী মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন করবেন না?

তা জানিনে। বোধ হয়, সত্যি নয় বলেই। নীচের মত তোমার ব্যবহার নয়, কথাবার্তা নয়, আকৃতি নয়—এত লেখাপড়াই বা তুমি শিখলে কোথায়?

সাবিত্রী অদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া আবার হাসিয়া বলিল, এত—কত শুনি?

সতীশ তাহাই ব্যাখ্যা করিতে খোলা বই একপাশে রাখিয়া হঠাৎ হাঁ করিয়াই থামিয়া গেল। অদূরে বাহিরে অতি দ্রুত জুতার শব্দ শোনা গেল, এবং মুহূর্ত পরেই তাহার ঘরের অতি সন্নিকটে মত্তকণ্ঠে গম্ভীর ডাক আসিল, সতীশবাবু।

সতীশ বুঝিল, এ বিপিনের দল, তাহাকেই ধরিতে আসিয়াছে। আর কোন কথা ভাবিল না—বিবর্ণমুখে ফস করিয়া ফুঁ দিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল।

অদূরে মেঝের উপর বসিয়া সাবিত্রী ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি করলেন?

পর মুহূর্তেই অন্ধকার কবাটের সম্মুখে দুই মূর্তি আসিয়া খাড়া হইল। একজন কহিল, এই ত সতীশবাবুর ঘর।

আর একজন কহিল, বেহারাটা যে বললে বাবু ঘরেই আছেন।

প্রথম ব্যক্তি রাগ করিয়া কহিল, ঘর ত অন্ধকার। ভদ্রলোকে কি কখন সন্ধ্যার সময় বাসায় থাকে? তোমার যত—

দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহার উত্তরে অস্ফুটে কি একটা বলিয়া পকেট হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া অনিশ্চিত কম্পিত-হস্তে আলো জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিছানার মধ্যে সতীশের দেহের রক্ত জল হইয়া গেল। সে বিলাতী কম্বলটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া ঘামিতে লাগিল, এবং অন্ধকার মেঝের উপর সাবিত্রী লজ্জায় ঘৃণায় কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

দীপ-শলাকা জ্বলিয়া উঠিল। এই যে এখানে বসে কে হে! প্রথম ব্যক্তি ঘরে ঢুকিয়া সন্ধান করিয়া আলো জ্বালিতেই সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, সতীশবাবু কোথায়?

সাবিত্রী নিঃশব্দে বিছানা দেখাইয়া বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া যাইতেই মাতাল দুইজন অট্টহাসি জুড়িয়া দিল। সে হাসির শব্দ ও অর্থ সাবিত্রীর কানে গিয়া পৌঁছিল এবং কম্বলের মধ্যে সতীশ বারংবার নিজের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।

তাহারা সতীশকে টানিয়া তুলিল এবং জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল; এবং যতক্ষণ না তাহাদের বিকট হাস্যধ্বনি বাটীর বাহিরে সম্পূর্ণ মিলাইয়া গেল ততক্ষণ পর্যন্ত সাবিত্রী একটা অন্ধকার কোণে দেওয়ালে মাথা রাখিয়া বজ্রাহতের মত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু বাসার কেহ কিছুই জানিতে পারিল না। রান্নাঘরে বামুনঠাকুর এইমাত্র গাঁজার কলিকাটি নিঃশেষ করিয়া ইহার মোক্ষ দান করিবার আশ্চর্য ক্ষমতা বেদে কিরূপ লেখা আছে তাহাই ভক্ত বেহারীকে বুঝাইয়া বলিতেছিল, এবং ও-ঘরে রাখালবাবুর দল হাড়ের পাশা মানুষের চীৎকার শুনিতে পায় কি না তাহাই যাচাই করিতে লাগিল।

রাস্তায় আসিয়া তিনজনেই একখানা গাড়িতে চড়িয়া বসিল, ইহাদের উন্মত্ত হাসি আর সহ্য করিতে না পারিয়া সতীশ তীক্ষ্ণভাবে বলিল, হয় আপনারা থামুন, না হয় মাপ করুন, আমি নেমে যাই।

প্রথম ব্যক্তি 'আচ্ছা' বলিয়াই ভয়ংকর রবে হাসিয়া উঠিল, এবং তাহার সঙ্গী তাহাকে ধমক দিয়া থামিতে বলিয়া তাহার অপেক্ষাও জোরে হাসিয়া উঠিল। এই মাতাল দুটোর সহিত বাক্যব্যয় বিফল বুঝিয়া সতীশ নিষ্ফল ক্রোধে জানালার বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

রাত্রে, অন্ধকার বারান্দায় সাবিত্রী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বোধ করি, সন্ধ্যার

লজ্জাকর ঘটনাই মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। এমন সময় বেহারী আসিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মা, সকলের খাওয়া হয়ে গেছে, ঠাকুরমশায় তোমাকে জল খেতে ডাকছেন।

সাবিত্রী মুখ তুলিয়া অবসন্নভাবে কহিল, আজ আমি খাব না বেহারী।

বেহারী সাবিত্রীকে স্নেহ করিত, মান্য করিত। চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, খাবে না কেন মা, অসুখ করেনি ত?

না, অসুখ করেনি, কিন্তু খাবার ইচ্ছে নেই। তোমরা খাও গে যাও বেহারী।

বেহারী বলিল, তবে চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

সাবিত্রী বলিল, আচ্ছা চল। কিন্তু একটা কথা আছে বেহারী, সতীশবাবু এখনো ফেরেন নি, তুমি জেগে থাকতে পারবে ত?

বেহারী উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, আমি! কিন্তু আমার সেই কোমরের বাতটা—

তবে কি হবে বেহারী—

বেহারী একটুখানি ভাবিয়া বলিল, আজ যদি তুমি ঠাকুরমশাইকে হুকুম দিয়ে—

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি বলিল, সে হবে না বেহারী। বামুন মানুষকে আমি শীতে কষ্ট দিতে পারব না।

অনিচ্ছুক বেহারী ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই না হয় থাকব। তবে চল, তোমাকে রেখে আসি।

সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই-এক পা অগ্রসর হইয়া থামিয়া বলিল, কাজ নেই বেহারী, তুমি খেয়ে নাও গে—তার পরেই যাব।

বেহারী চলিয়া গেলে সাবিত্রী সেইখানেই ফিরিয়া আসিয়া বসিল, এবং অন্ধকার আকাশের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। আজ সতীশের সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। সে মাতালের হাতে পড়িয়াছে, ইহা চোখে দেখিয়া তাহার কোনমতেই ঘরে ফিরিতে মন সরিতেছিল না। যদিচ, ইতিপূর্বে ইহারই নির্বুদ্ধিতায় নিদারুণ লাঞ্ছিত হইয়া জ্বালায় ছটফট করিয়া সে প্রত্যুষেই কর্মত্যাগের সংকল্প স্থির-নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু আজ রাত্রের মত এই লোকটিকে মনে মনে ক্ষমা না করিয়া, তাহার অবশ্যম্ভাবী দুর্গতির কোন একটা উপায় না করিয়া সে কোনমতেই ঘরে ফিরিতে পারিল না। বেহারী খাইয়া আসিলে বলিল, তুমি শুতে যাও বেহারী, আমিই আছি।

বেহারী আশ্চর্য হইয়া বলিল, ঘরে যাবে না?

বাবু ফিরে আসুন। তার পরে আমাকে রেখে আসতে পারবে না?

কেন পারব না মা? নিশ্চয় পারব।

তবে সেই ভাল। আমি আছি, তুমি শোও গে।

বেহারী খুশী হইয়া চলিয়া গেলে সাবিত্রী সেইখানেই একটা র‍্যাপার গায়ে দিয়া বসিয়া রহিল। এই মাতাল দুটো যাহা চোখে দেখিয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিবেই ইহাতেও তাহার যেমন লেশমাত্র সংশয় ছিল না, এ ঘটনার দ্বিতীয় অর্থও যে কেহ গ্রহণ করিবে না, ইহাতেও তাহার তেমনি সন্দেহ রহিল না। বিপিনবাবু লোকটিকে সাবিত্রী জানিত। সে এ কথা নিশ্চয় শুনিবে এবং এ বাসায় যখন তাহার গতিবিধি আছে তখন কেহই বঞ্চিত থাকিবে না। তাহার পরেও আর কোন্ মুখে সতীশ এখানে একদণ্ডও থাকিবে! এই অভিশপ্তির লজ্জা সে কি করিয়া সহ্য করিবে? দৈবাৎ যাহা ঘটিয়া গেল, তাহা ত গেলই; নিজের সম্বন্ধে সে এইখানে থামিল বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়াও সতীশের সম্বন্ধে কোন বুদ্ধিই খুঁজিয়া পাইল না।

ক্রমশঃ রাত্রি বাড়িতে লাগিল, অথচ সতীশের দেখা নাই। নিকটে কোন প্রতিবেশীর ঘরের ঘড়িতে টং-টং করিয়া দুটা বাজিয়া গেল—নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে তাহা স্পষ্ট শোনা গেল। এলোমেলো শীতল বায়ু খোলা ছাদের উপর দিয়া বহিয়া আসিয়া তাহার দুটি চক্ষুকে ঘুমে চাপিয়া ধরিতে লাগিল, তথাপি সে জাগিয়া থাকিয়া বাহির-দরজায় কান পাতিয়া রাখিল। এমনি করিয়া শুইয়া বসিয়া রাত যখন আর বড় বাকী নাই, এমন সময়ে একখানা গাড়ির শব্দে চকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়াই বুঝিল গাড়ি তাহাদেরই বাসার সম্মুখে

দাঁড়াইয়াছে। সাবিত্রী নিঃশব্দে নামিয়া গিয়া দরজার পার্শ্বে আসিয়া সতর্ক হইয়া দাঁড়াইল। পাছে আর কেহ থাকে এই ভয়ে সহসা খুলিতে সাহস করিল না। বিলম্ব হইতে লাগিল, কেহ দরজায় ঘা দিল না। যে গাড়িখানা আসিয়াছিল তাহাও ফিরিয়া গেল। অকস্মাৎ সাবিত্রী আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে অর্গল মুক্ত করিয়া ফেলিল। সতীশ বাহিরের চৌকাঠে হেলান দিয়া পাংশুমুখে চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। তাহার কাপড়ে চাদরে কাদা, মাথা এবং কপালের একধারে রক্তের রেখা অদূরবর্তী গ্যাসের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া সাবিত্রী কাঁদিয়া ফেলিল। চক্ষের নিমেষে তাহার সম্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দুই হাতে সতীশের মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, বাবু, ওপরে চলুন।

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বেশ আছি।

সাবিত্রী চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথাও লেগেছে?

না, লাগেনি, বেশ আছি।

এ যে রাস্তা, ঘরে চলুন।

সতীশ পুনর্বার মাথা নাড়িয়া বলিল, না, যাব না, বেশ আছি।

সাবিত্রী ধমক দিয়া বলিল, উঠুন বলছি।

ধমক খাইয়া সতীশ রক্তবর্ণ বিহ্বল-চক্ষে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তাহার দিকে দুই হাত বাড়াইয়া বলিল, চল।

তখন তাহারি কাঁধে ভর দিয়া সতীশ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকেই আশ্রয় করিয়া বহু ক্লেশে বহু বিলম্বে টলিতে টলিতে অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। জড়িত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, সাবিত্রী, তোমার ঋণ আমি কোন জন্মে শুধতে পারব না।

সাবিত্রী বলিল, আচ্ছা, আপনি ঘুমোন।

সতীশ চোখের নিমেষে উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি ঘুমোব? কখখন না।

পুনর্বার সাবিত্রী ধমক দিয়া উঠিল, আবার!

সতীশ শুইয়া পড়িল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু তোমার ধার—

সাবিত্রী 'আচ্ছা' বলিয়া উঠিয়া গেল এবং আলো কাছে আনিয়া ক্ষত পরীক্ষা করিয়া ধুইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় পড়ে গেলেন?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, না, পড়িনি।

সাবিত্রী সজল-কণ্ঠে বলিল, আর যদি কোনদিন মদ খান আপনার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

সতীশ তৎক্ষণাৎ বলিল, কোনদিন খাব না।

আমাকে ছুঁয়ে দিব্যি করুন, বলিয়া সাবিত্রী তাহার দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিল।

সতীশ নিজের দুই হাতের মধ্যে তাহার জলসিক্ত শীতল হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিল, দিব্যি কচ্ছি।

সাবিত্রী হাত টানিয়া লইয়া বলিল, মনে থাকবে?

না থাকলে তুমি মনে ক'রে দিয়ো।

আচ্ছা, আমি আসচি আপনি ঘুমোন, বলিয়া সাবিত্রী নিঃশব্দে সাবধানে কবাট বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঠিক সুমুখেই শুকতারা দপদপ করিয়া জ্বলিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া সাবিত্রী দুই হাত জোড় করিয়া কাঁদিয়া বলিল, ঠাকুর! তুমি সাক্ষী থেকো।

রাত্রের অন্ধকার তখন স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল এবং তাহাই ভেদ করিয়া পথে গরুর গাড়ির শব্দ এবং ও-পাড়ার ময়দার কলের বাঁশী শোনা যাইতে লাগিল। সাবিত্রী দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গিয়া রান্নাঘরের একটা কোণে র‍্যাপার মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল এবং পরক্ষণেই নিদ্রা-কাতর দুই চক্ষু তাহার ঘুমে মুদ্রিত হইয়া গেল।

চার

বেলা দশটার পর কোনমতে স্নানাহ্নিক সারিয়া লইয়া দিবাকর রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া খাতির করিয়া ডাক দিল, ঠাকুরমশাই গো! তাড়াতাড়ি ভাত বাড়ো, বড় বেলা হয়ে গেছে।

পাশেই ভাঁড়ার। তাহার গলার শব্দে মামাতো বড়বোন মহেশ্বরী বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ও দিবু, তোর জন্যেই অপেক্ষা কচ্ছি দাদা! একবার ওপরে গিয়ে ঠাকুরপুজোটি সেরে এস। সমস্ত যোগাড় ঠিক আছে, লক্ষ্মী ভাইটি আমার যাও।

মহেশ্বরী এ-বাড়ির বড়মেয়ে এবং গৃহিণী। বছর-চারেক পূর্বে বিধবা হইয়া বাপের বাড়ি আসিয়াছেন।

দিবাকর স্তম্ভিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি পারব না দিদি। আমার কলেজের প্রথম ঘণ্টা আজো তা হলে নষ্ট হয়ে যাবে।

মহেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, তোর প্রথম ঘণ্টা নষ্ট হবে বলে ঠাকুরপুজো হবে না রে!

দিবাকর প্রশ্ন করিল, ভট্‌চায্যিমশাই কোথা? তাঁর হলো কি?

মহেশ্বরী কহিলেন, তিনি বাবার সঙ্গে পাশায় বসেচেন। এখন কত বেলায় যে উঠবেন তার ঠিকানা কি?

দিবাকর কহিল, মেজদাকে বল দিদি; আজ তাঁর কাছারি বন্ধ আছে।

মহেশ্বরী বলিলেন, ধীরেনের কাল থেকে শরীর ভাল নেই। সে স্নান করবে না—পুজো করবে কি করে?

তবে ছোটদাকে বল। তিনি সেই বারোটার পরে আদালতে বার হন, এখনো তার ঢের দেরি আছে।

মহেশ্বরী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, কি যে তর্ক করিস দিবা, তার কোন ঠিকানা নেই। কাল রাত্তিরে উপীন থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল, এখন পর্যন্ত ঘুম থেকে ওঠেনি। এতটা বেলা হলো মুখ ধুলে না, চা খেলে না। রাত জেগে তার দেহটাই কি ভাল আছে? তা ছাড়া সে কি কোনদিন পুজো করে যে আজ যাবে পুজো করতে?

এদিকে বামুনঠাকুর ভাত দিয়া ডাকাডাকি করিতেছে। দিবাকর কহিল, কোন-না-কোন কাজে একটা-না-একটা বিঘ্ন এসে প্রায় রোজ আমার প্রথম ঘণ্টা নষ্ট হয়ে যায়—আমি পরীক্ষা দেব কেমন করে?

মহেশ্বরী রাগিয়া উঠিতেছিলেন, বলিলেন, পরীক্ষা না দিলেও বরং-বা চলে, ঠাকুর-পুজো না হলে চলতে পারে না। দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় আমার নেই—আরো কাজ আছে।

বামুনঠাকুর হাঁক দিয়া কহিল, দিবাবাবু, ভাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি যে—আসুন না শিগ্‌গির।

মহেশ্বরী তাহাকে তর্জন করিয়া উঠিলেন, তোমার কোন আক্কেল নেই ঠাকুর! আমি ওকে পুজো করতে পাঠাচ্ছি—তুমি কচ্চ ডাকাডাকি। ভাত তুলে নিয়ে যাও—পুজো করে এলে দিয়ো, বলিয়াই ভাঁড়ার-ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

দিবাকর কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে উপরে চলিয়া গেল। সেখানে পুজোর সাজ প্রস্তুত ছিল। গৃহে নারায়ণ-শিলা প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার নিত্যপুজার নিমিত্ত একজন পুরোহিত নিযুক্ত আছেন। তিনি বাড়িতেই থাকেন। কর্তা শিবপ্রসাদের ন্যায় তাঁহারও পাশাখেলার ঝোঁক খুব বেশী। শিবপ্রসাদ কিছুদিন হইল সরকারী চাকরিতে পেনশন লইয়া তাঁহার পশ্চিমের বাটীতে আসিয়া বসিয়াছেন। সকালে চা-পানের পরে পুরোহিত-মশায়কে ডাক পাড়েন। 'ভুতো, ভট্‌চায্যিমশায়কে একবার ডাক। একদান রঙে বসা যাক।' পরে একদান দুদান করিয়া বেলা বাড়িয়া উঠে—পুরোহিতের পুজো করিবার অবকাশ হয় না। ইতিপূর্বে পুজার জন্য তাগিদ দিয়া মহেশ্বরী চাকর পাঠাইতেন, কিন্তু উঠি উঠি করিয়াও আর উঠা হইত না—পুজার সময় বহুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া যাইত, কাহারো হুঁশ হইত না। ইদানীং পিতার শরীর ভাল নাই, অথচ খেলার ঝোঁকে থাকেন ভাল মনে

করিয়া মহেশ্বরী আর পুরোহিতকে ডাকেন না—একে-ওকে-তাকে দিয়া, অর্থাৎ দিবাকরকে দিয়া নিত্যপূজো সারিয়া লন।

সকালে চা খাইবার অভ্যাস এবং অবকাশ দিবাকরের ছিল না। প্রত্যহ প্রভাতেই তাহাকে চাকরের সঙ্গে বাজারে যাইতে হইত। আজ বাজার হইতে ফিরিয়া কোনমতে নিত্যকর্ম সারিয়া লইয়া সে ভাত খাইতে আসিয়াছিল।

দিবাকর পূজা করিতে গেল, কিন্তু আসনে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, পরের বাড়ি থাকার সুখ এই! যদিও সে তাহার ভাল করিয়া জ্ঞান হইবার পর হইতেই এই পরের বাড়িতে আছে এবং ইহার অনেক দুঃখ অভ্যাসও হইয়াছে, কিন্তু মানুষের যে জিনিসটি কোন দুঃখেই মরে না—সেই ভবিষ্যতের আশা—আঘাত খাইয়া তাহার বুকের ভিতর হইতে আজ ঘাড় বাঁকাইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। রাগে তাহার সর্বশরীর জ্বালা করিতেছিল, সে সিংহাসন হইতে ঠাকুর নামাইয়া ঠক্ করিয়া তাম্রকুণ্ডের উপর ফেলিল, এবং বিনা মন্ত্রে গায়ে জল ঢালিয়া দিয়া ভিজা ঠাকুর তুলিয়া রাখিল। তার ফুল দেওয়া, তুলসীপত্র সাজাইয়া দেওয়া, ঘণ্টা বাজান প্রভৃতি হাতের কাজগুলা অভ্যাসমত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু বিদ্বেষের জ্বালায় জিহ্বা তার একটি মন্ত্রও আবৃত্তি করিল না।

এমনি করিয়া পূজার তামাশা শেষ করিয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন মনে হইল বটে পূজা করা একেবারেই হয় নাই এবং ফিরিয়া বসিবে কি না সে দ্বিধাও একবার জাগিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গেই মনে পড়িল তাহার কলেজের প্রথম ঘণ্টা শেষ হইতেছে। আর সে কোনদিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। সোজা বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, মহেশ্বরী ভাঁড়ার হইতে দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, খেয়ে গেলিনে রে?

না—সময় নেই।

মহেশ্বরী বলিলেন, তবে কলেজ থেকে একটু সকাল করে ফিরে আসিস—ও বামুন-ঠাকুর, দিবাবাবুর জন্য যেন সমস্ত ঠিক থাকে।

দিবাকর উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। তাহার বাহিরের ছোট ঘরটিতে ফিরিয়া আসিয়া কাপড় পরিতে পরিতে চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সামনের বৈঠকখানা হইতে তখনও পাশাখেলার হুঙ্কার শোনা যাইতেছিল। হঠাৎ দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া দিবাকর পিছন ফিরিয়া দেখিল, ঝি দাঁড়াইয়া আছে। তাড়াতাড়ি জামার হাতায় চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি?

ঝি কহিল, ছোটবৌমা একবার ডাকচেন।

যাচ্ছি, তুমি যাও।

ঝি চলিয়া গেলে দিবাকর ছোটো টাইমপিসটির পানে চাহিয়া মুহূর্তকাল ইতস্ততঃ করিয়া বাঁ হাতের বইগুলা টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া জামার হাতায় আর একবার ভাল করিয়া চোখ মুছিয়া লইয়া ভিতরে ফিরিয়া গেল।

দিবাকরকে ডাকিতে পাঠাইয়া সুরবালা নিজের ঘরের সুমুখেই অপেক্ষা করিতেছিল। দিবাকর কাছে আসিয়া বলিল, কি?

সুরবালা প্রকাশ্যে কথা কহিত না, আড়ালে কহিত। মাথার কাপড়টা আরো একটু টানিয়া দিয়া বলিল, একবার ঘরে এস; বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া দেখাইয়া দিল—মেঝের উপর আসন পাতা, একবাটি দুধ এবং রেকাবিতে দুই-চারিটি সন্দেশ,—দেখাইয়া দিয়া বলিল, খেয়ে তবে ইস্কুলে যাও।

দিবাকর কোন কথা না বলিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

অদূরে শয্যার উপর তাহার ছোটদাদা উপেন্দ্রনাথ তখনও নিদ্রিতের মত পড়িয়া ছিলেন, দিবাকর খাইয়া চলিয়া যাইতেই মাথা তুলিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, এ আবার কি?

সুরবালা খাবার জায়গাটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতেছিল, চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি জেগে আছ নাকি?

ঘণ্টা-দুই। এগারোটা পর্যন্ত মানুষে ঘুমুতে পারে?

সুরবালা হাসিয়া কহিল, তুমি সব পার। নইলে মানুষে কি এগারোটা পর্যন্ত পড়ে থাকতে পারে?

উপেন্দ্র কহিলেন, সকলে পারে না, কিন্তু আমি পারি। তার কারণ, শুয়ে থাকার মত ভাল জিনিস সংসারে আমি দেখতে পাইনে। সে যাই হোক, দিবাকরের—

সুরবালা বলিল, ঠাকুরপো রাগ করে না খেয়ে কলেজে যাচ্ছিলেন, তাই ডেকে পাঠিয়েছিলুম!

হেতু?

সুরবালা বলিল, রাগ সত্যিই হয়। ও বেচারার সকালে পড়বার জো নেই—বাজারে যেতে হবে, ফিরে এসে ঠাকুরপুজো করতে হবে। কোনদিন এগারোটা-বারোটা বেজে যায়। বল দেখি, কখনই বা খায়, কখনই বা পড়তে যায়?

ঠিক বুঝলাম না। ভট্‌চায্যিমশায়ের জ্বর নাকি?

সুরবালা কহিল, জ্বর হবে কেন? বাবার সঙ্গে পাশায় বসেছেন। আর তাঁরই বা অপরাধ কি? বাবা ডেকে পাঠালে ত তিনি না বলতে পারেন না।

উপেন্দ্র কহিল, তা ত পারেন না, কিন্তু আগে তিনি চাকরের সঙ্গে সকালে বাজারে যেতেন না?

সুরবালা কহিল, দিন-কতক শখ করে গিয়েছিলেন মাত্র। না হলে ঠাকুরপোকেই বরাবর যেতে হয়।

হুঁ, বলিয়া উপেন্দ্র পাশ ফিরিবার উপক্রম করিতেই সুরবালা সভয়ে বলিয়া উঠিল, কর কি, আবার পাশ ফেরো যে!

উপেন্দ্র চুপ করিয়া আরো মিনিট-পাঁচেক পড়িয়া থাকিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং নিঃশব্দে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সেইদিন ঠাকুরপুজো হইল না, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে দিবাকর অপ্রসন্ন মুখে ধীরে ধীরে কলেজে চলিয়াছিল। বাড়িতে এইমাত্র যে-সব ব্যাপার ঘটিয়া গেল, সে আলোচনা ভিন্ন ভাবিতেছিল ঠাকুরের পুজা হইল না। অনেকদিনের অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও এ কাজটিকে সে অবহেলা করে নাই, করিবার কথাও কোনদিন মনে উদয় হয় নাই। বিশেষ করিয়া এই কারণেই সে আজিকার কথা স্মরণ করিয়া পীড়া অনুভব করিতে লাগিল। যদিও যুক্তিতর্ক দ্বারা বারংবার মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল যে, ভগবান একটিমাত্র স্থানেই আবদ্ধ নহেন, সুতরাং একস্থানে ভোগ না জুটিলেও অন্যত্র জুটিয়াছে; তবু সেই যে তাহাদের অভুক্ত গৃহদেবতাটি তাঁহার নিত্যপুজা ও ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া রুষ্টমুখে সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার প্রতিহিংসার আশঙ্কা তাহার মন হইতে কিছুতেই ঘুচিতে চাহিল না।

কলেজে গিয়া শুনিল, প্রফেসারের অসুখ হওয়ায় প্রথম ঘণ্টার ক্লাস বসে নাই—শুনিয়া দিবাকর প্রফুল্ল হইল। পরীক্ষা নিকট হইতেছে বলিয়া ছাত্রেরা হাজিরির হিসাবের নিমিত্ত কলেজের কেরানীকে ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আজ অন্যান্য ছাত্রেরা যখন ওই উদ্দেশ্যে অফিস-ঘরের দিকে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন দিবাকরও প্রস্তুত হইল। কিন্তু অফিসের সম্মুখে আসিয়া ঠাকুরপুজো না করিবার কথা স্মরণ হইবামাত্র সে থামিয়া দাঁড়াইল।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, দাঁড়ালে যে?

দিবাকর সংক্ষেপে উত্তর করিল, আজ থাক!

থাকবে কেন, এস না, আজই দেখে নিই।

না থাক, বলিয়া সে ফিরিয়া গেল। হাজিরি সম্বন্ধে মনে মনে তাহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, সেই সন্দেহের মীমাংসা করিবার সাহস আজিকার দিনে তাহার কোনমতেই হইল না।

খাইয়া না আসিলেও তাহার বাটী ফিরিবার তাড়া ছিল না। নানা কারণে আজ ক্ষুধা ছিল না। ছুটির পরে কলেজের ফটকের নিকটে আসিয়া দেখিল, তাহাদের বি. এ. ক্লাসের ছাত্রের দল দূরে দাঁড়াইয়া তর্ক-কোলাহল করিতেছে, দিবাকর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল এবং যে পথটা বরাবর গঙ্গায় গিয়া পড়িয়াছে, সেইদিকে চলিয়া গেল। ভাঙা

বাঁধানো-ঘাট মৃতের কঙ্কালের মত পড়িয়া আছে। একদিন যে ইহার দেহ ছিল, রূপ ছিল, প্রাণ ছিল, স্থানে স্থানে ইটের ভগ্নস্তূপ সেই কথাই বলে, আর কিছুই বলে না। কবে, কে বাঁধাইয়াছিল, কে আসিয়া বসিত, কাহারা স্নান করিত, কোথাও কোন সাক্ষ্য বিদ্যমান নাই। শীতের শীর্ণ গঙ্গা তাহারি এক প্রান্ত দিয়া অবিশ্রাম একটানা স্রোতে সমুদ্রে চলিয়াছে। তীরে পলির উপরে যবের শীষ মাথা তুলিয়া রৌদ্রের উত্তাপ ও গঙ্গার বায়ু গ্রহণ করিতেছে। তাহারি একধারে বালুময় সংকীর্ণ পথ দিয়া দিবাকর ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। একদিকে ছোট একখন্ড ইষ্টকস্তূপের উপর জুতা খুলিয়া রাখিল, পিরান খুলিয়া ভারী বাঁধান বইগুলা চাপা দিল। তাহার পরে জলে নামিয়া হাতমুখ ধুইয়া মাথায় গঙ্গাজলের ছিটা দিয়া অভুক্ত গৃহদেবতাকে স্মরণ করিল। আগাগোড়া সমস্ত মন্ত্র সাবধানে আবৃত্তি করিয়া গঙ্গায় জলগণ্ডূষ ভাসাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার হৃদয়ের ভার অনেক লঘু হইয়া গিয়াছে। জামা গায়ে দিয়া, জুতা পরিয়া, বই লইয়া যখন সে চলিয়া গেল তখনো একটু বেলা ছিল। 'তখনো হিন্দুস্থানী রমণীরা ঘাটের একান্তে বসিয়া মাথায় সাজিমাটি ঘষিতেছিল।

পাঁচ

সুরবালার পিতা ঠিকাদারি কাজে বিপুল সম্পত্তি উপার্জন করিয়া তাঁহার বক্সারের বাটীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার দুই মেয়ে। সুরবালা বড়, শচী ছোট। তাহার এখনো বিবাহ হয় নাই, সে বাপের বাড়ি বক্সারেই থাকে।

বাপের বাড়িতে সুরবালার ডাকনাম ছিল পশুরাজ। এইটি তাহার পিতামহের দেওয়া। পাড়ার কানা-খোঁড়া কুকুর-বিড়াল, বিলাতী ইঁদুর, পায়রা-পাখিতে প্রায় শতাধিক জীব তাহার আশ্রয়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার কোনটিকে কোন দিন সে মমতায় বিদায় করিতে পারে নাই, এখনো তাহারা শচীর কর্তৃত্বে অক্ষয় হইয়া আছে। সুরবালার নামের বিবরণ মহেশ্বরী জানিতেন, তাঁহার দ্বারাই নামটি এখানেও প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা বড়, তাঁহারা সংক্ষেপে পশু বলিয়া ডাকিতেন, চাকর-দাসীরাও কেহ বা পোশ-বৌঠাকরুন কেহ বা ছোট বৌঠাকরুন বলিয়া ডাকিত।

অনেক রাত্রে কাজকর্ম সারা হইলে সুরবালা ঘরে আসিলে উপেন্দ্র বলিলেন, পশু, তোমার বাবা শচীর পাত্র ঠিক করতে আমাকে তাগিদ দিয়ে চিঠি লিখেছেন। শচী তোমার চেয়ে কত ছোটো জানো?

সুরবালা বলিল, তা আর জানিনে! আমার কোলে একটি ভাই হয়ে আঁতুড়েই মারা যায়, তার পরে শচী। তা হলে আমার চেয়ে প্রায় ছ-সাত বছরের ছোটো।

এ হিসাবে তার বয়স বার-তের?

তা হবে বৈ কি! রোগা বলেই শুধু এতদিন পর্যন্ত রাখা গেছে। আমার মতন বাড়ন্ত গড়ন হলে ভারী বিপদ হতো।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, বিপদ আর কিসের? তোমার বাপের টাকার অভাব ত নেই, ও জিনিসটা থাকলে সব জিনিসই সুলভ হয়ে পড়ে। তোমার সময়ে আমি যে-রকম তাড়া করে গিয়ে পড়েছিলাম, সে-রকম তাড়া করে যাবার লোক সংসারে কম নেই।

সুরবালা বলিয়া উঠিল, তুমি কি বাবার টাকা দেখে গিয়েছিলে?

না বলতে পারলেই তোমার কাছে মান থাকে বটে, কিন্তু মিথ্যে কথাই বা বলি কেমন করে?

কিন্তু এইটেই যে মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা কেন?

মিথ্যে বলেই মিথ্যে কথা। তুমি যখন-তখন বল বটে, কিন্তু তুমি বাবার টাকা দেখে যাওনি। বাবার টাকা থাক না থাক, তোমাকে যেতেই হতো। আমি যেখানে, যে ঘরে জন্মাতুম, আমাকে আনবার জন্যে তোমাকে সেইখানেই যেতে হতো—বুঝতে পাচ্ছ?

উপেন্দ্র গাম্ভীর্যের ভান করিয়া বলিলেন, কতক পাচ্ছি। কিন্তু ধর, যদি তুমি কায়েতের ঘরে জন্মাতে?

সুরবালা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ যা হোক তুমি। বামুনের ঘরের মেয়ে কখন কায়েতের ঘরে জন্মায়? এই বুদ্ধি নিয়ে বুঝি ওকালতি কর?

উপেন্দ্র অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, তাও বটে। এইজন্যেই বোধ করি পসার হচ্ছে না।

সুরবালা নিজের কথায় ব্যথিত হইয়া সান্ত্বনার স্বরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কেন পসার হবে না, খুব পসার হবে। তবে, একটু দেরি হতে পারে, এই যা। কিন্তু তাও বলি, তোমার পসারের দরকারই বা কি? হাসিয়া বলিল, বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত আমার সামনে হাজির থাকলে আমি তোমাকে পাঁচ শ' টাকা করে দিতে পারি। বাবা আমাকে মাসে মাসে ত আড়াই শ' টাকা দেন, আরো আড়াই শ' টাকা না হয় চেয়ে নেব।

উপেন্দ্র বলিলেন, তা যেন নিলে; কিন্তু আমাকে করতে হবে কি? বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?

সুরবালা বলিল, হাঁ। আর নিতান্ত দাঁড়াতে না পারলে, না হয় বসো।

আর নিতান্ত বসতে না পারলে না হয় শোবো? কি বল?

সুরবালা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, না, শুতে পাবে না। বসতে না পারলে আবার দাঁড়াতে হবে। হাকিমের সামনে বেয়াদপি করলে তোমার ফাইন হবে।

ফাইন দিতে না পারলে?

আটক থাকতে হবে। চারটের পরেও বের হতে পাবে না—বুঝেছ?

উপেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিলেন, বুঝেছি—হাকিম কিছু কড়া—চাকরি বজায় রাখতে পারলে হয়।

সুরবালা তাহার দুটি কোমল বাহুদ্বারা স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল, হাকিম কড়া নয় গো, কড়া নয়। চাকরি তোমার বজায় থাকবে—একটি দিন শুধু পরীক্ষা করেই দেখ না। ক্ষণকাল পরে সুরবালা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, বাবার চিঠির জবাব দেবে?

উপেন্দ্র কহিল, খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন নেই, পাত্র আপনি হাজির হবে—এই জবাব দেব।

ছিঃ, ও কি কথা! তাঁর সঙ্গে কি তামাশা চলে?

এতক্ষণ তবে কি তুমি আমার সঙ্গে তামাশা কচ্ছিলে?

সুরবালা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, দেখ, তামাশা করিনি, কিন্তু বাবাকে এ কথা লেখবার দরকার নেই। সত্যিই আমি বিশ্বাস করি শচীর পাত্র ঠিক হয়েই আছে এবং সে ছাড়া তার অন্য পথও নেই, কিন্তু তোমার মুখে ও-কথা শুনলে বাবা রাগ করবেন।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, সত্যিই শচীর পাত্র ঠিক হয়ে আছে। তাকে আমিও জানি, তুমিও জানো।

সুরবালা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে বল না?

উপেন্দ্র বলিলেন, এখন না। সব ঠিক করে তবে তোমাকে জানাব।

সুরবালা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, আচ্ছা। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জানিয়ে রাখি—শচীর একটু দোষ আছে, সেই দোষটুকু গোপন করে পাত্র স্থির করা উচিত নয়। তাতে ফল ভাল হবে না।

উপেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন, দোষ আবার কি?

সুরবালা বলিল, বলছি। বাবার ইচ্ছে বোধ হয় ওইটুকু দোষ গোপন রাখা। না হলে তিনি নিজেই তোমাকে জানাতেন। শচী দেখতে-শুনতে লেখাপড়ায় ভালই, বাবার টাকাও আছে সত্যি, কিন্তু শচীকে কি তুমি ভাল করে দেখনি?

উপেন্দ্র বলিলেন, দেখেছি, কিন্তু ভাল করে দেখবার সাহস—

পায়ে পড়ি তোমার। আগে আমার কথা শোন, তারপর যা খুশি বলো। তুমি ত জানই, শচী ছেলেবেলা থেকে রোগা। দু-তিনবার ভারী ভারী ব্যামোতে মরতে মরতে

বেঁচেছে। তারি একবার ব্যারাম সেরে গেল, কিন্তু বাঁ পা আগাগোড়া ফুলে পেকে উঠল। ডাক্তার অস্ত্র করে তাকে বাঁচালেন বটে, কিন্তু পা আর সোজা হলো না। সেই অবধি একটু খুঁড়িয়ে চলে। ডাক্তার বলেছিলেন, বয়স হলে সেরে যেতেও পারে, কিন্তু এই আশ্বাসের উপর বিশ্বাস করে কে বিয়ে করতে সম্মত হবে? যে সত্যিই ভাল ছেলে, তার ভাল মেয়েও জুটবে—জেনেশুনে সে শচীর মত মেয়েকে বিয়ে করবে না। আর যে শুধুমাত্র টাকার লোভে রাজী হবে সে অসৎ পাত্র।

উপেন্দ্র স্থির হইয়া শুনিয়া বলিলেন, আমি ত শচীকে অনেকবারই দেখেছি, কিন্তু কোনদিন খুঁড়িয়ে চলতে ত দেখিনি।

সুরবালা মৃদু হাসিয়া কহিল, পুরুষেরা কোন্‌ জিনিসটা দেখতে পায়! কিন্তু মেয়েদের চোখকে ত ফাঁকি দেওয়া চলবে না—তারা চক্ষের নিমেষে দোষ ধরে ফেলবে।

উপেন্দ্র বলিলেন, কিন্তু তার ত মেয়েদের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে না যে, মেয়েদের চোখকে ভয় করতে হবে!

সে কি কথা! ঠকিয়ে বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকলে ত কানা মেয়েরও বিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু পরে?

উপেন্দ্র ভাবিতেছিলেন, কথা কহিলেন না।

সুরবালা পুনরায় বলিল, গত পুজোর সময় আমাদের বক্সারের বাড়িতে ঠিক এই রকম কথাই হয়েছিল। পিসীমা ও মা দুইজনেই বলেছিলেন যে, বিয়ের আগে এ-সব আলোচনার প্রয়োজন নেই। হয়ে গেলে জামাইকে বলে দিলেই হবে।

উপেন্দ্র বলিলেন, বেশ ত।

বেশ নয়, আমি এই কথাই বলি। আমি বলি যে, শাশুড়ী-ননদকে বাদ দিয়ে একলা জামাই নিয়ে চলে না। শচীর যে স্বামী হবে, সে ওকে ভালবাসবেই, কিন্তু তুচ্ছ একটা খুঁত নিয়ে প্রথমেই যদি ও তাদের বিদ্বেষের চোখে পড়ে যায় ত কোনদিন সুখে ঘরকন্না করতে পারবে না।

উপেন্দ্র বলিলেন, পারবে। কেননা, দিবাকর তোমার বোনকে অযত্ন করতে পারবে না, তুমি কিংবা দিদিও শচীকে গঞ্জনা দেবে না।

কথা শুনিয়া সুরবালা অবাক হইয়া গেল। অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, তবে কি ঠাকুরপোর সঙ্গে বিয়ে?

উপেন্দ্র বলিলেন, হাঁ।

কিন্তু বাবা ত রাজী হবেন না।

কেন?

ওর মা-বাপ নেই, বাড়ি-ঘর নেই—এক কথায় কিছুই নেই যে!

উপেন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, সব আছে, কেননা, আমি আছি।

সুরবালা কহিল, তবুও বাবা সম্মত হবেন না।

উপেন্দ্র কঠিন হইয়া বলিলেন, আর তুমিও হবে না এইটেই বোধ করি আসল কথা!

সুরবালা চুপ করিয়া রহিল।

উপেন্দ্রও ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ অপরদিকে পাশ ফিরিয়া অত্যন্ত নীরস-কণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা, রাত অনেক হলো—এখন ঘুমোও।

সে রাত্রে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সুরবালা জাগিয়া রহিল। হঠাৎ একসময়ে যখন তাহার নিশ্চয় বোধ হইল স্বামী নির্বিঘ্নে নিদ্রা যাইতেছেন, তখন দুই চক্ষে তপ্ত অশ্রু তাহার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। স্বামীর অসীম স্নেহে সে সন্দিহান নহে, কিন্তু কাঁদিতে কাঁদিতে এই কথাই ভাবিতে লাগিল যে, এ সাত-আট বৎসরের ঘনিষ্ঠ মিলনেও কেন সে এই লোকটির অন্ত পাইল না। প্রথম প্রথম অনেকবার সে মনে করিয়াছে যে, এই খামখেয়াল লোকটির মেজাজের কিছুই ঠিক নাই। কখন কি হেতু যে ইহার রাগ হইয়া পড়ে জানিবার বা বুঝিবার জো নাই, কিন্তু শেষে একসময়ে জিজ্ঞাসা করিয়া এটুকু সে বুঝিয়াছিল, ইঁহাকে সম্যক্‌ বুঝিবার ক্ষমতা তাহার কোনদিন হউক বা না হউক, ইঁহার কোন কাজ বা কথা অহেতুক বা অনিশ্চিত-প্রকৃতি লোকের মত নহে। বিশেষ করিয়া সেইজন্যই দুর্বোধ স্বামীটিকে

লইয়া তাহার ভয় ও ভাবনার অন্ত ছিল না। খোঁচা খাইয়া সে যখন-তখন এই দুঃখই করিত, ভগবান তাহার অদৃষ্ট যদি এমন ভালই করিলেন তবে সেই অদৃষ্টকে মানাইয়া চলিবার মত বুদ্ধি তাহাকে দিলেন না কেন? আজিও যতই সে মনে মনে এই কথার আলোচনা করিয়া ভিতরে ভিতরে কারণ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল, ততই সে নিজের কোন দোষ না পাইয়া হতাশ হইয়া পড়িতে লাগিল। ভগিনীর সম্বন্ধে ভগিনীর এই স্বাভাবিক আশংকা কি কারণে যে দোষাবহ এই কথা সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না।

বাহিরে শীতের সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং তাহারি পরিমাণ করিয়া দূরে সরকারী কাছারির ঘণ্টা একে একে বাজিয়া যাইতে লাগিল।

ছয়

পরদিন দ্বিপ্রহরের পরে মহেশ্বরী আহারে বসিলে উপেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া অদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। মহেশ্বরী চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, মেজবৌ, উপীনকে একটা আসন পেতে দাও।

উপেন্দ্র কহিল, আসন থাক দিদি। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

শুনিবার জন্য মহেশ্বরী তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

উপেন্দ্র বলিল, শ্বশুরমশাই শচীর পাত্র ঠিক করবার জন্যে পরশু একখানা জরুরী চিঠি লিখেছেন। তুমি ওদের সমস্ত কথা যত জানো তত আর কেউ জানে না। তাই জিজ্ঞাসা করছি, শচীর দেহে কি কোন দোষ আছে?

মহেশ্বরীর স্বামী ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া শেষদিকে প্রায় চার-পাঁচ বৎসর বক্সারে প্র্যাকটিস করিয়াছিলেন। সেখানে অবস্থিতিকালে সুরবালার পিতারই একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া কাছাকাছি ছিলেন বলিয়া উভয় পরিবারে অতিশয় ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। সুরবালার বিবাহের সম্বন্ধ মহেশ্বরীই স্থির করিয়াছিলেন। মহেশ্বরী ক্ষণকাল উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, পশু কি বলে?

সে বলে, শচী একটু খোঁড়া।

মহেশ্বরী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, খোঁড়া নয়; তার ছেলেবেলায় অসুখ হবার দরুন বাঁ পা'টা একটু টেনে চলত—তা এতদিনে বোধ করি সেরে গেছে।

আর দোষ নেই ত?

না।

শুনি ত শ্বশুরমশায়ের অগাধ সম্পত্তি—তোমার কি মনে হয় দিদি?

আমারও ত তাই মনে হয়।

উপেন্দ্র তখন আরও একটু কাছে সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, তবে তোমাকে একটা কথা বলি দিদি। শচীরা দুই বোনেই যখন ভবিষ্যতে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হবে তখন এত বিষয় বেহাত হতে দেওয়া ত সুবুদ্ধির কাজ নয়।

মহেশ্বরী হাসিমুখে বলিলেন, তা ত নয়; কিন্তু উপায়টা কি শুনি? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিলেন।

উপেন্দ্রও হাসিয়া বলিল, হাসি নয় দিদি। পশুকেও ক্ষ্যাপাবার জন্যে এ কথা বলিনি। আমি দিবার কথা মনে করেছি।

শুনিবামাত্রই মহেশ্বরীর মুখ কালি হইয়া গেল। তিনি দিবাকরকে দেখিতে পারিতেন না। তীক্ষ্ণদৃষ্টি উপেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইয়াও বলিল, কি বল দিদি?

মহেশ্বরী নতমুখে চিন্তার ভান করিয়া ভাত মাখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, বেশ ত।

উপেন্দ্র কহিল, শুধু বেশ হলে ত চলবে না দিদি, এ কাজ তোমারি। পশুর বিয়ে তুমিই দিয়েছিলে, এখন সে বলে, তার মত ভাগ্যবতী যেন সবাই হয়। আমার বিশ্বাস, তুমি যাতে হাত দেবে তাতেই সোনা ফলবে।

মহেশ্বরী চিন্তিত-মুখে কহিলেন, কিন্তু শচীর একটু খুঁত আছে যে!

উপেন্দ্র কহিল, আছে বলেই ত তোমাকে হাত দিতে বলছি। তোমার পুণ্যে সমস্ত নিখুঁত হয়ে যাবে।

উপেন্দ্রর কথায় মহেশ্বরীর চিত্ত ক্রমশঃ আর্দ্র হইয়া আসিতেছিল, বলিলেন, কিন্তু উপীন, দিবাকরের মেজাজ বুঝতে পারিনে। বাড়ির মধ্যে থেকেও সে যে বাড়ি-ছাড়া পর। সেইজন্যেই ভয় হয়, পাছে ওইটুকু খুঁত নিয়ে শেষে একটা মস্ত অ-সুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এক কথা—দিবাকর কি রাজী হবে?

কেন হবে না দিদি! এ সংসারে তার আপনার বলতে কিছুই নেই। সমস্তই যাকে নিজের হাতে না করলে মাথা গুঁজে দাঁড়াবার জায়গা হবে না, তার এ সুবিধে ত্যাগ করা শুধু বোকামি নয়—পাপ।

মহেশ্বরী হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, এ কি তোর ওকালতি ব্যবসা উপীন যে, শুধু মক্কেলের টাকার পরেই দুটি চোখ রেখে আর সমস্ত দিক থেকে দৃষ্টি তুলে নিতে হবে? পছন্দ-অপছন্দ বলে একটা কথা আছে ত।

উপেন্দ্র বলিল, থাকে থাক দিদি। যারা ওই নিয়ে তোলাপাড়া করতে চায় করুক, কিন্তু আমরা ও-দলে যেতে চাইনে। আর, শচীর মত মেয়েকে যার পছন্দ হয় না, তার ত বিয়ে করাই চলে না।

উপেন্দ্রর ব্যগ্রতায় মহেশ্বরী কৌতুক বোধ করিলেন। বলিলেন, সে বোধ হয় আজ কলেজে যায়নি; একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখ না, তার মতটা কি! বোধ করি সে তার ঘরেই আছে।

আছে? কে রে ওখানে, ভুতো? একবার দিবাবাবুকে ডেকে দে ত রে, বল, দিদি একবার ডাকচেন।

ক্ষণকাল পরে দিবাকর ঘরে ঢুকিতেই উপেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, তোর বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করলাম দিবা। পরীক্ষা-শেষেই দিন স্থির করা যাবে। দিদি, ভট্‌চায্যিমহাশয়কে পাঁজিটা দেখতে বলো, আর বাবাকে জিজ্ঞাসা করে তাঁর মতটাও একবার জেনে নিয়ো। শচীর সঙ্গে বিয়ে হবে শুনলে তিনি ভারী খুশী হবেন। তুই হাঁ করে চেয়ে রইলি যে! তোর ছোট-বৌঠাকরুনের ছোটবোন শচী—তাকে দেখেছিস না? দেখিস নি? তা শচীকে দেখবার প্রয়োজনও নেই। একটু পূর্বেই দিদিকে বলছিলাম, তার মত মেয়েকে যার পছন্দ হয় না, তার বিবাহ করা চলে না। ছেলেবেলায় বাঁ পায়ে অস্ত্র হওয়ায় এই পা'টা বুঝি একটু টেনে চলত। সে কথায় এইমাত্র আমি দিদিকে বলতে যাচ্ছিলাম যে, একটু খুঁত, একটু ত্রুটি, দিবাকর আত্মীয় হয়ে যদি মার্জনা করতে না পারে ত অপরে করবে কি করে? তা ছাড়া, ছোটখাটো খুঁটিনাটি নিয়ে হৈচৈ করা ত উচ্চশিক্ষার ফল নয়—সে নীচতা। নির্দোষ নিখুঁত এ জগতে পাওয়া যায় না, সে আশা করে বসে থাকা আর পাগলামি যে এক, দিবা তা বোঝে। আর তোমাকে বলতে কি দিদি, দিবাকরের সঙ্গে বিয়ে হবে শুনলে সুরবালার আনন্দের সীমা থাকবে না। ওঃ—তোর বুঝি সময় নষ্ট হচ্ছে? তবে এখন যা—আমিও শ্বশুরমশায়কে একটা চিঠি লিখে দি গে, বলিয়াই উপেন্দ্র উঠিয়া পড়িলেন এবং মহেশ্বরীকে কটাক্ষে ইঙ্গিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

মহেশ্বরী মুখ নীচু করিয়া ভাত নাড়িতে লাগিলেন এবং দিবাকর স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রবল ঝড় যেমন করিয়া খড়কুটা ধুলোবালি উড়াইয়া লইয়া যায়, উপেন্দ্র যে তেমনি করিয়া বাধা-বিঘ্ন ওজর-আপত্তি নিজের ইচ্ছামত উড়াইয়া লইয়া গেলেন, নিস্তব্ধ হইয়া দুইজনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণেও যখন কোনও কথাও উঠিল না, তখন দিবাকর ধীরে ধীরে বলিল, এ-সব কি দিদি?

মহেশ্বরী মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, সবই ত শুনলে!

দিবাকর প্রশ্ন করিল, এত তাড়া কিসের জন্যে?

মহেশ্বরী বলিলেন, শচীর বিয়ের বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং আগামী সমস্ত বছরই অকাল।

ইহার পরে আর কোনও কথা দিবাকরের মাথায় আসিল না, কিন্তু মনে পড়িল, উপেন্দ্র এতক্ষণ পত্র লিখিতেছেন এবং একটু পরেই জরুরী পত্র লইয়া চাকর ডাকঘরে ছুটিয়া

যাইবে। সে কোনও দিন বিবাহ করিবে না, এই তাহার জীবনের সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প এমন অকস্মাৎ একটানে ভাসিয়া যাইতেছে মনে হইবামাত্র সে অস্থির হইয়া উপেন্দ্রর ঘরের অভিমুখে চলিয়া গেল। ঘরে ঢুকিতেই সুরবালা তাহার অপ্রসন্ন মুখের পরে মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া আলমারির পাশে সরিয়া গেল। উপেন্দ্র টেবিলের কাছে কাগজ কলম লইয়া বসিয়াছিলেন, মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি?

দিবাকর যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা ঠিকমত ভাবিয়া দেখিবার সময়ও পায় নাই, এবং ওদিকে অঞ্চলের একপ্রান্ত আলমারির পাশে দেখা যাইতে লাগিল, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

উপেন্দ্র কহিলেন, কি রে?

দিবাকর কথা না কহিয়া আলমারির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

উপেন্দ্র সে ইঙ্গিত দেখিয়াও দেখিলেন না, বলিলেন, আমার সময় নেই দিবা—

দিবাকর কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, এত তাড়াতাড়ি কেন?

উপেন্দ্র বলিলেন, না, তাড়াতাড়ি ত নয়। এখনো যেমন করে হোক প্রায় মাস-দুই সময় আছে—তোর পরীক্ষা হয়ে গেলে—

তবে আজই চিঠি লেখার প্রয়োজন কি। কিছুদিন পরে লিখলেও ত হয়।

হতে পারে; কিন্তু কিছুদিন পরে লিখলে কি সুবিধে হবে শুনি?

দিবাকর আস্তে আস্তে বলিল, ভেবে দেখা উচিত।

উপেন্দ্র বলিলেন, উচিত বৈ কি! তুমি বিয়ের ভাবনা ভাবো, তোমার পরীক্ষার ভাবনা আমি ভাবি গে।

কিন্তু এরূপ দায়িত্ব-গ্রহণের পূর্বে—

বিজ্ঞের মত কিছু বলা আবশ্যক। আচ্ছা, ওই চেয়ারে বসো। ভেবে কি দেখতে চাও শুনি?

দিবাকর নিরুত্তর হইয়া রহিল।

উপেন্দ্র বলিলেন, দেখ দিবাকর, যে বস্তুরই হোক, শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখা মানুষের সাধ্য নয়। যিনি যতবড় বিচক্ষণ পণ্ডিতই হোন না কেন, শেষ ফলটুকু ভগবানের হাত থেকেই নিতে হয়। তবে আগে থেকে যেটুকু ভেবে দেখতে পারা যায় সেটুকুর জন্যে ত আধ-ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না, তুমি কিছুদিনের সময় চাও কেন?

দিবাকর মুখ তুলিয়া বলিল, সকলেই কি এত দ্রুত ভাবতে পারে?

পারে, কিন্তু এটা মনে রাখা চাই যে, এলোমেলো ভাবনার অন্তও নেই, আর মীমাংসাও হয় না। দু-চার দিন কেন, দু-চার বছরেও স্থির হয় না। তবে এ সম্বন্ধে মোটামুটি যেটুকু লোকে ভেবে দেখে, সেটুকু এই যে, প্রতিপালন করতে পারব কি না। কিন্তু শচীকে বিয়ে করলে সে চিন্তা ত তোমাকে কোনও দিনই করতে হবে না। দ্বিতীয় কথা, পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে। অবশ্য, সে মীমাংসা একজনের হয়ে অপরে করতে পারে না। তুই কি সেই কথাই ভাবছিস?

শচীর রূপের ইঙ্গিতে দিবাকরের অত্যন্ত লজ্জা করিয়া উঠিল; সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না, কখখন না।

তা হলে ত ভালই হলো। কেননা, এই কথাটা যতই অন্তঃসারশূন্য হোক না কেন, বাইরের আড়ম্বর আছেই। প্রথমেই ওই যে রূপের কথাটা এসে পড়ে, সেটা মানুষের অন্তরে বাইরে এমনি ভেলকি লাগিয়ে দেয় যে, ওরই ভালমন্দ অত্যন্ত সাবধানে নিরূপণ করাই মুখ্যবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ, ওটা ত কিছুই নয়। যে বস্তুটি না পেয়ে লোকে সারা-জীবন হায় হায় করে, সেটি আড়ালেই থেকে যায়। পছন্দ করবার যে সার সামগ্রী, সে জিনিসটি লাভ করতে না পারলে সংসার বিফল হয়ে দাঁড়ায়, সেটির উপরে ত জোর চলে না, তাই তাকে বিনা-পরীক্ষায় নির্বিচারে ভগবানের দোহাই দিয়ে লোকে গ্রহণ করে, আর যেটা কিছুই নয়, দু-চারদিনেই যা নষ্ট হতে পারে, চোখ চাইলেই যার দোষ-গুণ ধরা পড়ে, তার পরীক্ষার আর অন্ত থাকে না। দিবাকর, সাড়ে-পনেরো আনাই যদি চোখ বুজে নিতে পার ত বাকী দুটো পয়সার জন্যে গুরুজনের অবাধ্য হয়ে বিদ্রোহ করো না, বরং

আমি আশীর্বাদ করি, তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হোক, কোনদিন এ কথাটা ভুলো না যে. রূপই মানুষের সবটুকু নয়, কিংবা শুধুমাত্র সৌন্দর্যচর্চাই বিবাহের উদ্দেশ্য নয়।

দিবাকর মাথা নীচু করিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিল। উপেন্দ্রও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষকালে বলিলেন, এখন তবে তুই যা।

দিবাকর মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আমার রুচি নেই ছোড়দা, আমাকে মাপ কর। বিশেষ বড়লোকের মেয়ে।

অকস্মাৎ এরূপ উত্তর ক্ষণকালের নিমিত্ত উপেন্দ্রকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তিনি অল্পভাষী দিবাকরের কথার গুরুত্ব বুঝিতেন। কিন্তু কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়াও তাঁহার স্বভাব নয়। সুমুখের কাগজ কলম একপাশে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, রুচি নেই! তা না থাকতে পারে, কিন্তু বড়লোকের মেয়ের অপরাধটা কি শুনি?

দিবাকর কহিল, অপরাধ নয়, কিন্তু আমি দরিদ্র।

উপেন্দ্র বলিলেন, এর অর্থ এই যে, গরীবের ঘরের মেয়ে তোমাকে যেরূপ সম্মান বা শ্রদ্ধা-ভক্তি করবে, ধনীর মেয়ে সেরূপ করবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীর কাছে সম্মান বা ভক্তির কতটুকু ধারণা তোমার আছে? অবশ্য যদি গোঁ ধরে বসো যে. বিয়ে করবে না, সে আলাদা কথা, কিন্তু নিতান্ত অসঙ্গত অমূলক দোষের ভার আর একজনের কাঁধে তুলে দিয়ে নিজের দারিদ্র্যের জবাবদিহি করতে চেয়ো না। আমাদের পুরাণ ইতিহাস ত পড়েছ। তাতে সীতা, সাবিত্রী প্রভৃতি সাধ্বী স্ত্রীর যে উল্লেখ আছে, তাঁরা রাজা-রাজড়া ঘরের মেয়ে হয়েও কোন দরিদ্র ঘরের মেয়ের চেয়ে গুণে খাটো ছিলেন না। বড়লোকের ঘরের মেয়ের বিরুদ্ধে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে বলেই যে তা নির্বিচারে মেনে নিতে হবে এর কোন হেতু আমি দেখতে পাইনে।

দিবাকর ভিন্ন আরো একটি শ্রোতা অত্যন্ত মনোনিবেশ করিয়া আড়ালে থাকিয়া শুনিতেছিল, তাহার অঞ্চলপ্রান্তে চোখ পড়িবামাত্র উপেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, বড়লোকের ঘরের আর একটি মেয়ে এই বাড়িতেই আছে, এর অর্ধেক রূপ-গুণ নিয়েও যদি শচী আসে ত পৃথিবীর যে-কোন স্বামীই যেন তা ভাগ্য বলে জ্ঞান করে। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, রুচি নেই বলছিলে? ছেলেবেলায় পাঠশালে যেতেও ত তোমার রুচি দেখিনি। ধর্মকর্মেও কারো কারো রুচি থাকে না, জন্মভূমির উপরেও কারো বা অত্যন্ত অরুচি. কিন্তু তাই বলে কি এই-সব রুচির প্রশ্রয় দিতে হবে?

হঠাৎ এই সময়ে আলমারির পিছনে চুড়ির শব্দে চকিত হইয়া দিবাকর উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্তের মধ্যে কি যে স্থির করিল সেই জানে. সুরবালার নিকটে আসিয়া কহিল. বৌদি. তুমি যদি সুখী হও আমি ছোড়দাকে চিঠি লিখতে বলে দি।

সুরবালা তন্ময় হইয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল. একটা অনির্বচনীয় শান্তি ও তৃপ্তির তরঙ্গ তাহার সমস্ত ইচ্ছা সমস্ত কামনা ও সমস্ত স্বাতন্ত্র্যকে ভাসাইয়া আনিয়া স্বামীর ইচ্ছার পদতলে বারংবার আত্মসমর্পণ করিতেছিল। সে কিছুই স্থির করে নাই, কিন্তু অঞ্চলে চোখ মুছিয়া স্বামীকে উদ্দেশ করিয়া একান্তচিত্তে কহিল. উনি কোনদিন মিথ্যে বলেন না। আমি বলছি ঠাকুরপো, তোমাদের ভাল হবে এবং আমিও অত্যন্ত সুখী হব।

দিবাকর মুহূর্তমাত্র উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মুক্ত বাতায়ন দিয়া অপর্যাপ্ত আলোক তাঁহার মুখের 'পরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে মুখে উদ্বেগ নাই. দুশ্চিন্তার এতটুকু দাগ নাই—অত্যন্ত পবিত্র ও মঙ্গলময় বোধ হইল।

দিবাকর কহিল, তুমি যা ভাল বোঝ, কর। আমার সময় নষ্ট হচ্ছে আমি যাই—বলিয়াই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। সে চলিয়া গেলে সুমুখের কেদারায় আসিয়া সুরবালা বসিল। সজল চোখ দুটি স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া বলিল, তুমি আমাকেও মাপ কর। আমি ভুল বুঝেছিলুম; তুমি যা করতে চাইচো. তাতে শচীর ভালই হবে। এইবারটির মত তুমি আমাকে মাপ কর।

উপেন্দ্র চিঠিখানি শেষ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা।

সাত

তাহার পরক্ষণ হইতে দিবাকর কেবলই ভাবিতে লাগিল তাহার বিবাহের কথা। শচী কেমন, সে কি করে, কি ভাবে, কি পড়ে, তাহার সহিত বিবাহ হইলে কিরূপ ব্যবহার করিবে, এই-সব। রাত্রে পড়াশুনায় অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। আজ তাহার মন মাতাল হইয়া উঠিল। অথচ মাতাল যেমন তাহার কল্পনার আতিশয্যে স্পষ্ট করিয়া কিছুই ভাবিতে পারে না, তাহার মনও তেমনি সুস্পষ্ট কিছুই উপলব্ধি না করিতে পারিয়া আকাশ-কুসুম গাঁথিয়া ফিরিতে লাগিল, কিছুতেই কাজ করিল না।

পরীক্ষার ভয় চাবুকের মত যতবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া পাঠে নিযুক্ত করিল, ততবারই সে উধাও হইয়া গিয়া আর একদিকে স্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল। বহুক্ষণ অবধি এই বিদ্রোহী মনের পিছনে ছুটাছুটি করিয়া কিছুই না করিতে পারিয়া দিবাকর অনুতাপ করিতে লাগিল যে, তাহার সময় বৃথা নষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কি অভূতপূর্ব পরিবর্তন! কিসের নেশা যে তাহাকে অকস্মাৎ এমন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে, তাহার হেতু খুঁজিতে গিয়াই যে কথা মনে আসিল, অত্যন্ত লজ্জার সহিত দিবাকর তাহার প্রতিবাদ করিয়া দৃঢ়ভাবে এই কথা বলিল যে, ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা এবং একান্ত বিতৃষ্ণা। যদি পূজনীয় কাহারো মন এবং মান রক্ষা করিতেই হয় ত নিতান্ত উদাসীনের মতই করিবে। এই বলিয়া দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত উচ্চকণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু মনকে আজ সংযমে রাখা শক্ত। সে যে খেলার মাঝখান হইতে চলিয়া আসিতেছে, যে আকাশ কুসুমের অর্ধেক গাঁথা মালা ফেলিয়া রাখিয়া জবরদস্তি পড়া মুখস্থ করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ অনুক্ষণ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। তা ছাড়া এই যে কল্পনার বসন্ত বাতাস এইমাত্র তাহার দেহ স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, সে স্পর্শ কি মধুর! তাহার চতুর্দিকে যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি চলিতেছিল—সে কি সুন্দর! সূর্যের দিকে মুখ তুলিয়া চক্ষু বুজিলেও যেমন আলোকের সঞ্চার বিচিত্র বর্ণে অনুভূত হইতে থাকে, পড়া তৈরির একান্ত চেষ্টার মধ্য দিয়াও অস্পষ্ট মাধুর্যের সাড়া তেমনি করিয়া তাহার সমস্ত দেহে ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। কণ্ঠস্বর তাহার মন্দ হইতে মন্দতর, দৃষ্টি তাহার ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল এবং এই-সমস্ত ধরপাকড় বাদাবাদির মাঝখানে হঠাৎ এক সময়ে সে নিজেই এই নূতন খেলায় মাতিয়া গেল। তাহার চোখের সুমুখে অসংখ্য আলো, কানের কাছে অগণিত বাদ্য ও মনের মাঝখানে একটা বিবাহের বিরাট সমারোহ অবতীর্ণ হইয়া আসিল; এবং ইহারই কেন্দ্রস্থলে সে নিজেকে বরবেশে কল্পনা করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে এ পর্যন্ত যত-কিছু সে শুনিয়াছিল, যাহা-কিছু সে দেখিয়াছিল, ছায়াবাজির মত সমস্তই মনের মাঝখান দিয়া বিচিত্র বর্ণে অসম্ভব দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। কোথাও সে স্থির হইতে পারিল না, কিছুই ঠিকমত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, শুধু বিস্মিত পুলকে স্বপ্নাবিষ্টের মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

আট

বিপিনের নিমন্ত্রণ রাখিয়া আসার পরদিন আকণ্ঠ পিপাসা লইয়া সতীশচন্দ্র যখন ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল, তখন বেলা দশটা। তাহার ঘর তখনও বন্ধ। আজ সকাল হইতেই মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র অত্যন্ত প্রখর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই খর-উত্তাপে সমস্ত জানালা-দরজা তাতিয়া উঠিয়া এই রুদ্ধ ঘরের ভিতরটা যে কিরূপ অসহ হইয়াছিল, তাহা এতক্ষণ সে নিজে টের না পাইলেও তাহার সর্বশরীর ইহার জবাবদিহি করিতেছিল। সমস্ত বিছানা ঘামে ভাসিয়া গিয়াছে এবং সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় জলের অভাবে উন্মত্তের মত হাহাকার করিতেছে। এমনিধারা দেহ-মন লইয়া সতীশচন্দ্র ভগবানের নূতন দিনের মধ্যে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিল, এবং ব্যস্ত হইয়া শিয়রের জানালাটা খুলিয়া ফেলিতেই এক

ঝলক রৌদ্র তাহার মুখের উপর গায়ের উপর পড়িয়া যেন তাহাকে একমুহূর্তে দগ্ধ করিয়া দিয়া গেল।

সমস্ত রাত্রি মাতামাতি করিয়া বেলা দশটায় ঘুম ভাঙ্গার প্লানি মাতালেই জানে। এই প্লানি পরিপাক করিয়া সতীশ, বেহারী বেহারী. করিয়া ডাকিতে লাগিল। বেহারী ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

সতীশ বলিল, শিগগির এক গ্লাস জল আন ত রে!

বেহারী প্রশ্ন করিল, তামাক দিতে হবে না?

না, জল আন।

চান করবেন না?

এখন না, তুই জল আন।

বেহারী তথাপি গেল না, কহিল, আহ্নিকের—

আহ্নিকের ইঙ্গিতে সতীশ আগুন হইয়া ধমক দিয়া উঠিল, পাজী কোথাকার, তোর অত খোঁজ কেন? যা, জল আন গে!

ধমক খাইয়া বেহারী জল আনিতে নীচে নামিয়া গেল। রান্নাঘরের বারান্দায় বসিয়া সাবিত্রী সুপারি কুচাইতেছিল, স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, সতীশবাবু তামাক দিতে বললেন?

বেহারী মুখ ভার করিয়া কহিল, না, জল চাই।

স্নান করলেন না, আহ্নিক করলেন না—জল কি হবে?

বেহারী বিরক্ত হইয়া বলিল, আমি তার জানি কি! হুকুম হলো জল চাই, নিয়ে যাচ্চি।

সাবিত্রী জাঁতি রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই নিয়ে যাচ্ছি—তুমি খানিকটা বরফ কিনে আনো গে।

বেহারী পয়সা লইয়া বরফ কিনিতে গেল।

সাবিত্রী উপরে উঠিয়া গিয়া কহিল, যান, চান করে আসুন, আমি ততক্ষণ আহ্নিকের জায়গা করে রাখি।

সতীশ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, বেহারী কোথায়?

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, সে বরফ কিনতে গেছে। বাবু, দোষ করে শাস্তি নেওয়া ভাল—তাতে প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক না করে কোনও দিন কি জল খান যে, আজ জলের জন্যে হাঙ্গামা কচ্ছেন? যান, দেরি করবেন না।

সাবিত্রীর কাছে প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝিয়া সতীশ উঠিয়া পড়িল এবং তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে নামিয়া গেল।

আহারান্তে সতীশ আর একবার নিদ্রার আয়োজন করিতেই সাবিত্রী আসিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইল। তাহাকে যেন দেখিতেই পায় নাই এইভাবে সতীশ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িল।

সাবিত্রী মনে মনে হাসিয়া বলিল, রাত্রের কথাগুলো বাবুর মনে আছে কি না জানতে এলুম।

সতীশ জবাব দিল না।

সাবিত্রী কহিল, তবে ঘুম ভাঙ্গলে দয়া করে একবার ডেকে পাঠাবেন, সেগুলো একবার মনে করে দিয়ে যাবো। বলিয়া কবাট বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

বিগত রাত্রির সমস্ত ঘটনা সতীশের মনে থাকা সম্ভবও নয়, ছিলও না। বিপিনবাবুর মজলিস হইতে কখন কেমন করিয়া আসিয়াছিল, কাহার সহিত আসিয়াছিল, আসিয়া কি করিয়াছিল—এ-সমস্ত তাহার মনের মধ্যে এলোমেলো ও অস্পষ্ট হইয়াছিল। এই অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করিবার স্পৃহা যে তাহার একেবারেই ছিল না তাহা নহে, কিন্তু একটা অনির্দেশ্য লজ্জার আশঙ্কা তাহাকে যেন কোনমতেই পা বাড়াইতে দিতেছিল না। তাহার সান্ধ্য কীর্তিটাই মনে ছিল। এইটাই এতক্ষণে তাহার মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতির আকাশে শুকতারার মত জ্বলিতেছিল, কিন্তু অধিকতর জ্যোতিষ্মান্ দুষ্টগ্রহও যে ওই মেঘের আড়ালেই উদ্যত হইয়া আছে, সাবিত্রীর ইঙ্গিত সেইদিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিবামাত্রই তাহার চোখের ঘুম

মরুভূমির বাষ্পের মত উবিয়া গেল। গত সন্ধ্যায় হতবুদ্ধি হইয়া প্রদীপ নিবাইয়া ফেলার ফলটা যে শেষ পর্যন্ত কিরূপ দাঁড়াইবে, সে সম্বন্ধে তাহার মনে যথেষ্ট উৎকণ্ঠা ছিল; কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে সত্যকার দোষ কিছুই ছিল না বলিয়া তাহাকে দুর্ভাগ্য বলিয়া সে একরকম করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেছিল এবং দোষ না করার মধ্যে যে একটা সত্যকার জোর প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে সেই জোর তাহার অজ্ঞাতসারেও তাহাকে আশ্রয় দিতেছিল, কিন্তু সাবিত্রী এখন যাহা বলিয়া গেল, যে অন্ধকারের মধ্যে পথ নির্দেশ করিয়া গেল, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সাহস তাহার কোথায়? তাহার মাতাল হইবার অভিজ্ঞতা ছিল বটে, কিন্তু অচেতন হইয়া পড়িবার অভিজ্ঞতা সে কোথায় পাইবে? সে কেমন করিয়া আন্দাজ করিবে, সে কি করিয়াছিল না-করিয়াছিল! কত মাতালকে কত কাণ্ড করিতে সে ত নিজের চোখেই দেখিয়াছে। এখন নিজের বেলা কোন্ কাজটাকে সে কি সাহসে অসম্ভব বলিয়া দূরে সরাইয়া দিবে? তাই এই সম্ভব-অসম্ভবের সমস্যা তাহার যতই জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল, পীড়িত-চিত্ত তাহার ততই সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে রেখা টানিয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। পুনর্বার তাহার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল এবং আর একবার উঠিয়া বসিয়া জীবনে মদ স্পর্শ না করিবার প্রতিজ্ঞা আর একবার উচ্চারণ করিয়া সে প্রায়শ্চিত্ত করিল।

জানালা খুলিয়া দিয়া সতীশ ডাকিল, বেহারী।

বেহারী রাখালবাবুর বিছানা রোদে দিতেছিল, হাত মুছিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ বলিল, আচ্ছা, যা কচ্চিস কর, সাবিত্রীকে এক গেলাস জল আনতে বলে দে।

বেহারী বলিল, আমিই আনচি বাবু, তিনি এখন আহ্নিক করচে।

সতীশ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আহ্নিক করচে কি রে?

আজ্ঞে, তিনি ত রোজ করে। একাদশীর দিনে একফোঁটা জলও খায় না। আমরা কত বলি বাবু, কিন্তু তিনি মাছও খায় না, পাঁউরুটিও খায় না—তিনি ভদ্দরনোক কিনা তাই।

সতীশ অধিকতর আশ্চর্য হইয়া বলিল, ভদ্দরলোক কি রে—

হাঁ বাবু, ভদ্দরনোক। বলিয়া বেহারী জল আনিতে যাইতেছিল, সতীশ ডাকিয়া বলিল, সাবিত্রী রাত্রে যদি ভাত খায় না তবে কি খায়?

কি আর খাবে বাবু! থাকলে কোনদিন একটু [illegible] খায়, না থাকলে কিছুই খায় না।

বাসার আর কেউ জানে?

বেহারী বলিল, ঠাকুরমশায় জানে, আমি জানি, আর কেউ জানে না। তিনি বলতে মানা করে দেছে।

সতীশ বলিল, আচ্ছা, তুই জল আন।

বেহারী দুই-এক পা যাইতেই সতীশ পুনর্বার ডাকিল, আচ্ছা বেহারী—

আজ্ঞে?

ভদ্দরলোক তুই জানলি কেমন করে?

জানি বৈ কি বাবু! ভদ্দরনোকের মেয়ে শুধু অদেষ্টের ফেরে—

আচ্ছা আচ্ছা, তুই যা জল আন।

বেহারী চলিয়া গেলে সতীশ বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। সাবিত্রীকে সাধারণ দাসীর সহিত এক করিয়া দেখিতে কোথায় যে তাহার একটা ব্যথা বাজিত, কেন যে মন তাহার হীনতা ও গুপ্ত লাঞ্ছনার চাপে নিঃশব্দে মাথা হেঁট করিত, তাহা সে কিছুতে ধরিতে পারিতেছিল না। আজ বেহারীর মুখের এতটুকু পরিচয়েই শুধু আনন্দিত বিস্ময়ে নহে, তাহার সমস্ত মন যেন কোন অপরিচিতের ক্লেদাক্ত বাহুপাশ হইতে অকস্মাৎ মুক্তি পাইয়া পবিত্র হইয়া বাঁচিল। সে বেহারীর কথাটাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে একমুহূর্ত দ্বিধা করিল না।

জল আনিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। কোন কারণে দেরি হইতেছে মনে করিয়া সে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তবু বেহারীর দেখা নাই। পিপাসায় তাহার ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল সে আর একবার বেহারীকে ডাকিবে মনে করিয়া উঠিয়া বসিয়াই দেখিল জলের গ্লাস হাতে লইয়া সাবিত্রী আসিতেছে। এই আচারপরায়ণা হতভাগিনীকে আজ সে নূতন

চক্ষে দেখিল এবং সেই পলকের দৃষ্টিপাতেই তাহার হৃদয়ের অন্ধ্র-রন্ধ্র করুণায় ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যে কথা অন্য কোন সময়ে তাহার মুখে বাধিত, এখন বাধিল না। সে হাত হইতে জলের গ্লাস লইয়া সমস্তটুকু নিঃশেষে পান করিয়া খালি গ্লাস নীচে রাখিয়া দিয়া বলিল, অনেক কথা আছে।

সাবিত্রী মৌন-মুখে চাহিয়া রহিল।

সতীশ বলিল, প্রথম দফায় আমাকে মাপ করতে হবে।

সাবিত্রী শান্ত-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিতীয় দফায়?

সতীশ বলিল, কাল কখন কি করে এসেছিলাম বলতে হবে।

সাবিত্রী উত্তর দিল, শেষ রাত্রে গাড়ি করে।

তার পরে?

রাস্তার উপরেই শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

ভাল করিনি। তুলে আনলে কে?

আমি।

আর কে ছিল? এতবড় জড় পদার্থটাকে ওপরে তোলা হলো কি প্রকারে?

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, আপনার ভয় নেই—বাসায় কেউ কিছুই জানে না।

সতীশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, বাঁচলাম! কিন্তু তোমার সঙ্গে কোন রকমের দুর্ব্যবহার করিনি ত?

না।

সতীশ অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া বলিল, তবে কি কথা মনে করে দিতে চাচ্ছিলে?

আপনার শপথ। আপনি দিব্যি করেছেন আর কোন দিন মদ খাবেন না।

হঠাৎ দিব্যি করতে গেলাম কেন? এ-রকম দুর্বুদ্ধি ত আমার হবার কথা নয়।

বোধ করি আমার কথায় হয়েছিল।

সতীশ কণ্ঠস্বর নত করিয়া বলিল, আমার মনে পড়েছে সাবিত্রী। তোমাকে ছুঁয়ে শপথ করেছি, না?

সাবিত্রী নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

সতীশ বলিল, তাই হবে; কিন্তু, কাল সন্ধ্যার কথাটা তোমার মনে আছে ত?

এবার সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিল। ঘাড় নাড়িয়া সাবিত্রী বলিল, আছে।

লোকে শুনতে পাবে বোধ হয়; তার উপায় হবে কি?

সাবিত্রী সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, হবে আবার কি! অন্য কোন বাসায়, না হয় বাড়ি চলে যান।

তুমি?

সাবিত্রীর মুখে কোনরূপ উদ্বেগ প্রকাশ পাইল না। শান্ত সহজভাবে বলিল, আমি ভাবিনে। এ বাসার বাবুরা রাখেন, ভালোই; না রাখেন আর কোথাও কাজের চেষ্টা করে চলে যাব; যেখানে খাটবো, সেইখানেই দুটি খেতে পাব। আর কোন কথা আছে?

সতীশের সমস্ত মন যেন পর্বতের শিখর হইতে গড়াইয়া পাদমূলে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। তাহার এখানে থাকা না-থাকায় সাবিত্রীর কিছু আসে যায় না। এ সম্বন্ধে সে একেবারে উদাসীন! সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আর তাহার কোন কথা বলিবার নাই। কারণ, সাবিত্রীর এই নিঃশঙ্ক সংক্ষিপ্ত জবাবের পরে আর কোন প্রশ্নই তাহার মুখে আসিল না। অথচ, কত কথাই না তাহার বলিবার ছিল। সাবিত্রী খালি গ্লাসটা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল, সতীশ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

হায় রে মানুষের মন! এ যে কিসে ভাঙে, কিসে গড়ে, তাহার কোন তত্ত্বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই যে কতটুকু আঘাতে একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে, আবার কত প্রচণ্ড আঘাতও হাসিমুখে সহ্য করে তাহার কোন হিসাবই পাওয়া যায় না। অথচ, এই মন লইয়া মানুষের অহঙ্কারের অবধি নাই। যাহাকে আয়ত্ত করা যায় না, যাহাকে চিনিতে পর্যন্ত পারা যায় না, কেমন করিয়া 'আমার' বলিয়া তাহার মন যোগানো যায়! কেমন করিয়াই বা তাহাকে লইয়া নিরুদ্বেগে ঘর করা চলে!

সাবিত্রী অনেকক্ষণ চলিয়া গেলেও সতীশ তেমনিভাবে বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরটা ঠিক দুঃখে-কষ্টে নয়, কি একরকমের জ্বালায় যেন জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। "যাহাকে ভালবাসি, সে যদি ভাল না বাসে, এমন কি ঘৃণাও করে, তাও বোধ করি সহ্য হয়, কিন্তু যাহার ভালবাসা পাইয়াছি বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি, সেইখানে ভুল ভাঙ্গিয়া যাওয়াটাই সবচেয়ে নিদারুণ! পূর্বেরটা ব্যথাই দেয়, কিন্তু শেষেরটা ব্যথাও দেয়, অপমানও করে। আবার এ ব্যথার প্রতিকার নাই, এ অপমানের নালিশ নাই। যাহার ভালবাসিবার কথা নহে, সে ভালবাসে না—ইহাতে কাহারও কি বলিবার থাকে! তাই, এই না-থাকাটাতেই লাঞ্ছনা এত বেশী বাজে—বেদনার হেতু খুঁজিয়া মিলে না বলিয়াই ব্যথা এমন অসহ্য হইয়া পড়ে।

যাহা হউক, সাবিত্রীর এই নিশ্চিন্ত ও সরল কর্তব্য নির্ধারণ শুধু তাহার একলার হৃদয়ের মানচিত্রটাই উদ্ঘাটিত করিল না, তাহা সতীশের নিজের হৃদয়ের ছবিটাও বাহিরের আলোকে টানিয়া আনিয়া ফেলিল। এই দু'খানি মানচিত্রকে পাশাপাশি রাখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সে নিশ্চিত জানিয়াছিল, সাবিত্রী ভালবাসে, সে বাসে না। এখন দেখিল ঠিক বিপরীত, সেই বাসে, সাবিত্রী বাসে না। এই ঘৃণিত কথাটা স্বীকার করিতে শুধু লজ্জাতেই তাহার মাথা কাটা গেল না, নিজের মনের এই নীচ প্রবৃত্তিতে তাহার নিজের উপরে ঘৃণা জন্মিয়া গেল। তাহার গত রাত্রির কাজগুলা লজ্জাকর সন্দেহ নাই; তাহার জীবনে এমন অনেক রাত্রির অনেক লজ্জা জমা হইয়া আছে সত্য, কিন্তু এই ইতরতার তুলনায় সে-সমস্তই একেবারে অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল!

এ বাসায় ত আর একদিনও থাকা চলিবে না। এখানে থাকা না থাকা সম্বন্ধে সে যে সম্পূর্ণ উদাসীন নয়, এ কথা সে ত কোনও মতেই স্বীকার করিতে পারিবে না। সে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, বেদনার গুরুভারে মন যদি তাহার ভাঙ্গিয়া অণু-পরমাণু হইয়াও যায়, তথাপিও না। কোনমতেই এই নীচতাকেই প্রশ্রয় দিয়া সে একেবারে অধঃপথে যাইবে না।

বাহিরে যে বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, ঘরের মধ্যে সতীশের হুঁশ ছিল না। সহসা বাসায় প্রত্যাগত কেরানীদের শব্দ-সাড়ায় সে চকিত হইয়া জানালার বাহিরে উঁকি মারিয়াই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ একটা পিরান গায়ে দিয়া চাদর কাঁধে ফেলিয়া অলক্ষিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। এখনি হাত-মুখ ধুইবার প্রস্তাব লইয়া সাবিত্রী আসিয়া পড়িবে এবং খাবার জন্য জিদ করিতে থাকিবে। আজ তাহার কিছুমাত্র ক্ষুধা ছিল না; কিন্তু সাবিত্রী সে কথা কোনমতে বিশ্বাস করিবে না, অনুরোধ করিবে, পীড়াপীড়ি করিবে, হয়ত বা শেষে রাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। এই-সমস্ত মৌখিক স্নেহের বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে তাহার জীবনে আজ এই প্রথম সে নিজেকে অকৃত্রিম ঘৃণার সহিত দূরে সরাইয়া লইয়া গেল।

পথে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে দর্জিপাড়ার একটা গলির মোড়ে হঠাৎ পিছনে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইল—ছোটবাবু না?

সতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হ্যাঁ, মোক্ষদা নাকি?

মোক্ষদা বহুদিন পূর্বে তাহাদের পশ্চিমের বাড়িতে দাসীর কাজ করিত, ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিয়া আর ফিরিতে পারে নাই। বলিল, হাঁ বাবু, আমি। ছোটবাবু, আমার একখানা চিঠি পড়ে দেবেন?

সতীশ হাসিমুখে বলিল, এতবড় শহরে একখানি চিঠি পড়িয়ে নেবার আর কি লোক পেলে না ঝি? কৈ, চিঠি কোথায়?

ঝি বলিল, চিঠিখানি আমার ঘরে আছে বাবু। সাহস করে অচেনা লোককে দিয়ে পড়াতে পারিনি, পাছে আর কিছু বা থাকে। তবে আমাদের বাড়িতেই একটি মেয়ে আছে, সে লিখতে পড়তে জানে, কিন্তু তাকেও আজ দু'দিন ধরে পাচ্চিনে, এত রাত্তির করে বাড়ি ফেরে যে তখন আর সময় হয় না।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ি তোমার কত দূরে?

ঝি বলিল, এখান থেকে একটু দূর পড়ে বৈ কি! বড় রাস্তার ওধারে একটা গলির

মধ্যে। বাবু, যদি আপনার ঠিকানাটা বলে দেন, তা হলে কাউকে সংগে নিয়ে আমি না হয় কালই যাই, চিঠিটা পড়িয়ে আনি।

আচ্ছা, বলিয়া সতীশ তাহার শোভাবাজারের ঠিকানাটা বলিয়া দিল, এবং কোথা দিয়া কেমন করিয়া যাইতে হয়, বুঝাইয়া বলিতে বলিতে পথ চলিতে লাগিল। কতক্ষণ আসার পরে ঝি এক জায়গায় হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, বলতে সাহস পাইনে বাবু, যদি একবার পায়ের ধুলো দেন, ঘর আমার এখান থেকে আর বেশী দূরে নয়।

সতীশ ক্ষণকাল কি ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা চল।

তাহার আজ বাসায় ফিরিতে একেবারেই ইচ্ছা ছিল না। পথে পথে ঘুরিয়া রাত্রি অধিক হইলে, সাবিত্রী ঘরে চলিয়া গেলে বাসায় ফিরিবে, এই সংকল্প করিয়াই সে বাহির হইয়াছিল। তাই, সহজেই সম্মতি দিয়া গোটা-দুই গলি পার হইয়া তাহারা একটা মেটে দোতলা বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

'একটু দাঁড়ান', বলিয়া মোক্ষদা ভিতরে প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে একটা কেরোসিনের ডিবা হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া গেল। ওধারের কোণের ঘরে একটি ছোট টুলের উপর পিতলের পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই ঘরখানি দেখাইয়া দিয়া সবিনয়ে বলিল, একটু বসুন, আমি তামাক সেজে আনি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই ছোট ঘরটির পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া সতীশ আরাম বোধ করিল। একধারে একটা জলচৌকির উপর মাজাঘষা কতকগুলি পিতল-কাঁসার বাসন ঝক-ঝক করিতেছে এবং তাহারই পাশে একটি ছোট আলনার্তে কয়েকখানি কাপড় গোছান রহিয়াছে। দেওয়ালে ব্রাকেটের উপর একটি টাইমপিস ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল। সতীশ চৌকাঠের বাহিরে জুতা খুলিয়া রাখিয়া তক্তপোশে পাতা সাদা ধবধবে বিছানাটির উপর গিয়া বসিল এবং ঘরের অন্যান্য আসবাবগুলির মনে মনে পরীক্ষা লইতে লাগিল। প্রথমেই নজর পড়িয়া গেল একটি ছোট শেল্‌ফের উপরে। কতকগুলি বই সাজানো ছিল, সতীশ উঠিয়া গিয়া একখানা সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং প্রথম পাতা উলটাইতেই দেখিতে পাইল, ইংরাজি অক্ষরে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাম লেখা। সে বইখানি রাখিয়া দিয়া আরও তিন-চারিখানি বই খুলিয়া ওই একই নাম দেখিয়া বইগুলি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

মোক্ষদা বাঁধা হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিল।

সতীশ হুঁকা হাতে লইয়া বলিল, ঝিব ঘরটি চমৎকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উঠতে ইচ্ছে করে না।

মোক্ষদা একটুখানি হাসিয়া বলিল, উঠবেন কেন বাবু, বসুন। এ ঘরটি কিন্তু আমার নয়, আর একটি মেয়ের।

সতীশ প্রশ্ন করিল, তিনি কোথায়?

মোক্ষদা বলিল, সে এক বাবুদের বাসায় কাজ করে। আসতে প্রায়ই রাত হয়ে যায়, তাই ঘরের চাবি আমার কাছে থাকে। আমাকে মাসী বলে ডাকে।

সতীশ বলিল, তা ডাকুক, কিন্তু ভুবনবাবুটি আসবেন কখন?

ঝি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভুবনবাবু আবার কে?

ভুবনচন্দ্র মুখুয্যে—চেনো না?

অকস্মাৎ ঝি ভ্রূ প্রসারিত করিল -ও! আমাদের মুখুয্যেমশাই? না না, তাঁকে আর আসতে হবে না!

কেন, মারা গেছেন নাকি?

মোক্ষদা দুই চক্ষু দৃপ্ত করিয়া বলিল, না, মারা যাননি, কিন্তু গেলেই ছিল ভাল। তিনি বামুনমানুষ, বর্ণের গুরু, আমাদের মাথার মণি, নারায়ণতুল্য। তাঁকে অভক্তি করছি নে, তাঁর চরণের ধুলো নিচ্চি; কিন্তু কোনদিন দেখা পেলে তিনটি ঝ্যাটা মুখে গুনে মারব, তবে আমার নাম মোক্ষদা।

সতীশ হাসিয়া উঠিল। বলিল, রাগের মাথায় বামুনমানুষকে যেন অভক্তি করে মেরে বসো না! বেশ ভক্তি করে গুনে গুনে মেরো, তাতে পাপ হবে না। কিন্তু তিনি লোকটি কে?

মোক্ষদা উদ্ধতভাবে বলিয়া উঠিল, লোকটির পরিচয় আর কি দেব বাবু, তিনি মানুষ নয়, চামার। এই মেয়েটিকে যে পথে বসিয়ে গেলি বাপু, এই কি তোর আপনার লোকের কাজ হলো? ছি ছি, গলায় দেবার দাঁড় জুটল না!

সতীশ অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, কে তিনি? কি করেছেন তিনি?

হঠাৎ দ্বারের বাহির হইতে জবাব আসিল, লোকটিকে আপনি চেনেন না, কি হবে আপনার তাঁর কথা শুনে?

সতীশ চমকিয়া উঠিল।

মোক্ষদা মুখ ফিরাইয়া কহিল, সাবি নাকি। কখন এলি তুই?

সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এইমাত্র আসছি। বাবুটিকে কোথায় পেলে মাসী?

মোক্ষদা কহিল, ইনিই আমাদের ছোটবাবু, সাবিত্রী। আজ দুদিন হলো বৌমার কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছি, তা পড়াতে পাইনি, তাই বললুম বাবু যদি দয়া করে পায়ের ধুলো দেন।

সাবিত্রী বলিল, তবে পায়ের ধুলো তোমার ঘরে না দিয়ে আমার ঘরে কেন?

মোক্ষদা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, তা রাগ করিস কেন সাবি? আমার ঘরে ত ভদ্রলোককে বসানো যায় না, তাই তোর ঘরে বসিয়েছি। কত বড়দরের লোক এঁরা—কোথায় আহ্লাদ করবি, না রাগ করছিস?

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, রাগ করব কেন মাসী, রাগ নয়। কিন্তু অমনি অমনি পায়ের ধুলো নিলে যে পাপ হয়। কিছু জলযোগ করান উচিত—হাঁ বামুনঠাকুর, আপনার ক্ষিদে পেয়েছে কি?

সতীশ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়াছিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

সাবিত্রীর অভদ্র প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া মোক্ষদা বলিয়া উঠিল, এ তোর কি-রকম কথার ছিরি সাবিত্রী? ভদ্রলোকের সঙ্গে কি এইরকম করে কথা কইতে হয়?

সাবিত্রী জোর করিয়া হাসি চাপিয়া বলিল, এ আর মন্দ কথা কি মাসী? আচ্ছা, ওঁর ক্ষিদের কথা না হয় আর জিজ্ঞাসা করব না, তুমি কিন্তু দোকান থেকে কিছু খাবার কিনে আনো, আমি ততক্ষণ জায়গা করে রাখি।

মোক্ষদা অস্ফুটে বকিতে বকিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলে সাবিত্রী কহিল, কাল রাত থেকেই ত একরকম উপোস চলছে—বিকেলবেলা যে কেমন করে পালিয়ে এলেন তাও টের পেলুম না। এখন উঠুন, সন্ধ্যে-আহ্নিক করে কিছু খান। ওই আলনার ওপরে কাচা কাপড় আছে, পরে আমার সঙ্গে আসুন—না না, দেরি নয়, উঠুন।

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার ক্ষিদে নেই।

সাবিত্রী বলিল, না থাকলেও খেতে হবে। তার প্রথম কারণ, ক্ষিদে নেই এ কথা বিশ্বাস করলুম না, দ্বিতীয় কারণ—

সতীশ মুখের ভাব অত্যন্ত শক্ত করিয়া বলিল, দ্বিতীয় কারণটা মিছে কথা, ওই প্রথমই সব। সমস্ত বিষয়েই তোমার জিদ আর জবরদস্তি। এই জিদের সঙ্গে কারু পারবার জো নেই।

সাবিত্রী মুখ তুলিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, তবে মিথ্যে চেষ্টা করা কেন?

সতীশ আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, তা নয় সাবিত্রী! আজ আমার চেষ্টা কোনমতেই মিথ্যা হবে না। হয় তোমার দ্বিতীয় কারণ বলো, না হয় সত্যি বলছি তোমাকে, আমি কোনমতেই এখানে কিছু খাবো না।

সতীশের গোঁ দেখিয়া সাবিত্রী নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমি ভাবছি আজ আপনি এলেন কেন? আজ আমার জন্মদিন তাই, নিজে এসে যখন দাসীর ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, তখন শুধু শুধু আপনাকে ছেড়ে দিতে পারিনে। 'পারিনে' বলিয়াই সাবিত্রী হঠাৎ থামিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের গোপন ব্যথাটা তাহারই কণ্ঠস্বরের মুক্ত পথ ধরিয়া এমনি অকস্মাৎ সতীশের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল যে, কয়েক-মুহূর্তের জন্য সতীশের সমস্ত বোধশক্তি অসাড় হইয়া গেল। বুদ্ধিমতী সাবিত্রী ইহা চক্ষের নিমিষে অনুভব করিয়া তাহার সমস্ত কথাগুলাকে সহজ

পরিহাসে পরিণত করিয়া হাসিয়া বলিল, ভগবান আজ আপনাকে আমার অতিথি করে পাঠিয়েছেন, সুতরাং খেতেও হবে, দক্ষিণেও নিতে হবে,—আজ নিতান্তই জাতটা মারা গেল দেখচি।

এতক্ষণে সতীশের সহজ শক্তি ফিরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি আজ তোমার জন্মদিন?

সাবিত্রী বলিল, সত্যি।

সতীশ বলিল, তবে এমন দিনে যদি এসেই পড়েচি ত দোকানের কতকগুলো বাসী মেঠাই-মণ্ডা খেয়ে পেট ভরাব না। তা ছাড়া ও-সব ত আমি কোনদিনই খাইনে।

সাবিত্রীও তাহা জানিত। মনে মনে লজ্জিত হইয়া বলিল, কিন্তু আজ যে রাত হয়ে গেছে!

সতীশ বলিল, হলোই বা রাত। আজ বাসায় ফিরে গিয়ে ত বকুনি খেতে হবে না যে, রাতকে আজ ভয় করতে হবে। যাই বল তুমি, কোন মতেই আমি ও-সব খাব না।

তোমার সঙ্গে পারবার জো নেই, বলিয়া সাবিত্রী হাসিয়া উঠিয়া গেল।

সতীশ বসিয়া ছিল, শুইয়া পড়িল। এই ক্ষুদ্র কুটীর এবং এই নির্মল শুভ্র শয্যা ছাড়িয়া যাইতে কোনমতেই তাহার মন উঠিতেছিল না, অথচ, আত্মসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বসিয়া থাকিবারও কোনও সদুপায় ছিল না। এখন, এই খাবার তৈরির বিলম্বের সম্ভাবনা তাহাকে যেন একটা আসন্ন কর্তব্যের কঠিন দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া গেল। সে পাশ-বালিশটা জোর করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। চলিয়া যাইবার সময় সাবিত্রী বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল, ইহাও যেমন সে টের পাইয়াছিল, তাহার 'তুমি' সম্ভাষণও সে তেমনি লক্ষ্য করিয়াছিল। নির্জন ঘরের মধ্যে এই নবলব্ধ তথ্য দুটি, যাদুকর ও তাহার মায়াকাঠির মত তাহার মনের মধ্যে অপূর্ব ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়া চলিতে লাগিল। আজই দুপুরবেলা যে-সমস্ত ভালবাসার আবর্জনা তাহার মনের ভিতর হইতে ভাটার টানে বাহিরের দিকে ভাসিয়া গিয়াছিল, জোয়ারের উলটা স্রোতে আবার তাহারা একে একে ফিরিয়া আসিয়া দেখা দিতে লাগিল। আজই দুপুরবেলায় আত্মাভিমানের আঘাতের সুতীব্র জ্বালা নিজের মনের নীচ প্রবৃত্তির দিকে তাহার চোখ খুলিয়া দিয়াছিল, জ্বালার উপশমের সঙ্গে সঙ্গেই সে চক্ষু আপনি মুদ্রিত হইয়া গেল। এমনি করিয়া নিজেকে লইয়া খেলা করিতে করিতে একসময়ে বোধ করি সে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ দ্বার খোলার শব্দে জাগিয়া উঠিয়া পাশ ফিরিয়া দেখিল সাবিত্রী মোক্ষদাকে লইয়া ঘরে ঢুকিতেছে। মোক্ষদা চিঠিখানি সতীশের হাতে দিয়া বলিল, দেখুন ত বাবু, বৌমা কি লিখেচেন?

সতীশ সমস্তটা পড়িয়া লইয়া বলিল, তাঁদের ফিরতে এখনও মাস-দুই দেরি আছে।

মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করিল, আর কোন কথা নেই?

সতীশ চিঠিখানি ফিরাইয়া দিয়া বলিল, না, আর বিশেষ কিছু নেই।

আমার মাইনের কথাটা বাবু?

না, সে কথা নেই।

টাকার কথা নাই শুনিয়া মোক্ষদা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চিঠির জন্য হাত বাড়াইয়া বলিল, তা থাকবে কেন, থাকবে যত-সব বাজে কথা! দিন চিঠি। কাল সাবিত্রী আমাকে একখানা জবাব লিখে দিস ত। হাঁ লা, বাবুর খাবার দিবি কখন? রাত কি হয়নি?

সাবিত্রী বলিল, বামুনঠাকুর সন্ধ্যে-আহ্নিক করবে না, অমনি খাবে?

মোক্ষদা বিরক্ত হইয়াই ছিল, আরো বিরক্ত হইয়া বলিল, শোনো কথা একবার! এ কি তোর পুরুতঠাকুর, না ভট্‌চায্যিবামুন পেয়েচিস যে পুজো-আহ্নিক করতে যাবে?

সতীশ হাসিয়া বলিল, ও কি ঝি, সব ভুলে গেলে! আমি ত চিরকালই সন্ধ্যে-আহ্নিক করি।

মোক্ষদার বোধ করি হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ও মা, তাই ত! সাবিত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, দে মা, শিগ্‌গির বাবুর একটা জায়গা করে দে।

তোর ঘরে ত সমস্তই ঠিক আছে। দে মা, দে, আর দেরি করিস নে—বলিতে বলিতে মোক্ষদা স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে, সতীশের আহারের সময় ঘরে কেহ উপস্থিত নাই—অন্ধকার বারান্দা হইতে মোক্ষদা ইহা লক্ষ্য করিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল সাবিত্রী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রুষ্টস্বরে বলিল, এ তোর কি রকম আক্কেল সাবিত্রী! এ কি কাঙ্গালী-ভোজন হচ্চে যে, যা হোক দুটো ফেলে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছিস!

সাবিত্রী কি ভাবিতেছিল, চমকিয়া বলিল, দরকার হলে উনি চেয়ে নেবেন।

এমন বুদ্ধি না হলে আর দাসীবৃত্তি করতে যাস! কোথায় তুই নিজে দাসী-চাকর রাখবি, না—

সাবিত্রী হাসিয়া বলিল, নিজেই দাসী হয়ে আছি। তাতেই বা দোষ কি মাসী, খেটে খেতে লজ্জা নেই।

মোক্ষদা রাগিয়া বলিল, কে বললে নেই? আমার মত বয়সে না থাকতে পারে, কিন্তু তোর বয়সে আছে। তা থাক না থাক, বাবুকে যখন খেতে বসিয়েছিস, তখন বসে থেকে খাওয়াগে যা। মানুষের কপাল ফিরে যেতে বেশী দেরি লাগে না!

সাবিত্রী চলিতে উদ্যত হইয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি বকচো মাসী। উনি শুনতে পাবেন যে!

মোক্ষদা তৎক্ষণাৎ স্বর নত করিয়া বলিল, না না, শুনতে পাবেন কেন! আর একটা কথা তোকে বলে রাখি বাছা। ভগবান কপালের মাঝখানে যে দুটো চোখ দিয়েছেন সে দুটো একটু খুলে রাখিস। ঘড়ির চেন, হীরের আংটি না থাকলেই মানুষকে ছোটো মনে করিস নে।

আচ্ছা, বলিয়া সাবিত্রী হাসিয়া চলিয়া যাইতেছিল, মোক্ষদা আবার পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, শোন্ সাবিত্রী!

সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কি?

আয় দেখি একবার আমার ঘরে, একখানা ঢাকাই কাপড় বের করে দি, পরে যা।

সাবিত্রী হাসি চাপিয়া বলিল, তুমি পাব কর গে মাসী, আমি এখনি আসচি।

সতীশের খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, চোখ বুজে খাচ্চো নাকি?

সতীশ মুখ তুলিয়া বলিল, না।

কিন্তু, চোখ দুটি ত ঘুমে ঢুলে আসচে দেখচি।

বাস্তবিকই তাহার অত্যন্ত ঘুম পাইতেছিল। গত রাত্রির উচ্ছৃংখল অত্যাচার আজ অসময়েই তাহার চোখের পাতা দুটিকে ভারী করিয়া আনিতেছিল, সে সলজ্জ হাস্যে কবুল করিয়া বলিল, হাঁ, ভারী ঘুম পাচ্চে।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিল, আর কিছু চাই কি?

সতীশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিছু না, কিছু না; আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

বাহিরে পায়ের শব্দে সাবিত্রী টের পাইল, মোক্ষদা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; বলিল, বাবু, আমাকে একখানি ঢাকাই শাড়ি কিনে দিতে হবে।

সে কোনদিনই কিছু চাহে না, সুতরাং এ কথার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া সতীশ আশ্চর্য হইয়া গেল। সে মোক্ষদার আগমন টের পায় নাই। মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল, সত্যি চাই?

সত্যি বৈ কি!

পরবে কখন?

আজ পরবার সময় নেই বলে কোনও দিন সময় হবে না, এমন কি কথা আছে! তা ছাড়া আর একটি কথা; আমি খেটে খাই বলে মাসী দুঃখ করছিলেন, তাই মনে কচ্চি আর খেটে খাবো না—এখন থেকে বসে বসে খাবো।

সতীশ হাসিয়া বলিল, বেশ ত।

শুধু বেশ হলেই ত হবে না, ওই সঙ্গে একটি দাসী না হলেও আর মান থাকচে না—তাও আপনাকে রেখে দিতে হবে। আপনাকেই—কথাটা সে শেষ করিতে পারিল না, মুখে আঁচল গুঁজিয়া দিয়া উৎকট হাসির বেগ রোধ করিতে লাগিল।

মোক্ষদা কাঁচা লোক নহে। সে একমুহূর্তে সমস্তটা বুঝিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু বুঝি সাবিত্রীকে চেনেন?

সাবিত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, মাসীর সঙ্গে এতক্ষণ বুঝি তামাশা হচ্ছিল? তা এ ত ভালো কথা, আহ্লাদের কথা! আগে বললেই ত চুকে যেত! বলিয়া হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

আহারান্তে সতীশ আর একবার শয্যায় আসিয়া বসিল। সাবিত্রী ডিবা ভরিয়া পান আনিয়া দিল এবং বাঁধা হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া সতীশের হাতে দিয়া পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। সতীশের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতে লাগিল। সর্বদেহে কাঁটা দিয়া যেন শীত করিয়া উঠিল। ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহার হুঁকা টানিবার শক্তিটুকু পর্যন্ত রহিল না। মিনিট-দুই এইভাবে নীরবে কাটিবার পরে সাবিত্রী সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, রাত হলো, বাসায় যাবে না?

সতীশ শুষ্ক-গলায় বলিল, না গেলে থাকব কোথায়?

এইখানেই থাকবে। না যেতে পার ত কাজ নেই—মাসী এখনও জেগে আছে, আমি তার বিছানাতেই শুতে পারব—বলিয়া সাবিত্রী সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

একমুহূর্তের জন্য সতীশ নির্বাক হইয়া রহিল, কিন্তু পরক্ষণেই প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, নাঃ—চললাম।

আচ্ছা, আর একটু বোসো, বলিয়া সাবিত্রী উঠিয়া গিয়া সতীশের জুতাজোড়াটা বাহির হইতে তুলিয়া আনিল, এবং আঁচল দিয়া পা মুছাইয়া দিয়া জুতার ফিতা বাঁধিয়া দিতে দিতে আস্তে আস্তে কহিল, বাসার লোক যদি জানতে পারে?

কেমন করে জানবে?

আমিই যদি বলে দি!

কি বলবে তুমি—বলবার ত কিছু নেই।

সাবিত্রী আবার একটু হাসিয়া বলিল, কিছুই নেই? সত্যি বলচো?

সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী মৃদুকণ্ঠে কহিল, বলবার কথা না থাকলে কি জানি, আজ তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারতুম কি না। বলিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, তুমি বাসায় যাও। কিন্তু এই দুষ্টবুদ্ধি যদি না ছাড় ত একদিন সমস্ত প্রকাশ করে দেব তা বলে দিচ্চি।

এ কি রহস্য! ইহার ভিতরের কথাটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া সতীশ ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, বললেই বা। বাসার লোক ত আমার গারজেন নয়।

সাবিত্রী কহিল, নয় জানি। কিন্তু মাসী আমার সে ভারও অনায়াসে নিতে পারবে। তার জিভকে ঠেকিয়ে রাখবে কি দিয়ে?

মোক্ষদার ইঙ্গিতে সতীশ মনে মনে ভয় পাইলেও মুখে বলিল, টাকা দিয়ে।

সাবিত্রী বলিল, তাতে শুধু টাকার অপব্যয় হবে, কাজ হবে না। তা ছাড়া মাসীকেই না হয় টাকায় বশ করবে, কিন্তু আমাকে বশ করবে কি দিয়ে?

সতীশ ফস করিয়া বলিয়া ফেলিল, ভালবাসা দিয়ে।

সাবিত্রীর ওষ্ঠপ্রান্তে কঠিন চাপা-হাসির আভাস দেখা দিল, কহিল, এই নিয়ে চারবার হলো।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, ইতিপূর্বে আরও তিনজন এই জিনিসটিই দিতে চেয়েছিলেন।

তুমি নাওনি?

না। জঞ্জাল জড় করে রাখবার মত জায়গা নেই আমার।

সতীশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। সাবিত্রীর বিদ্রূপের হাসি এবং কণ্ঠস্বর কিছুই তাহার লক্ষ্য এড়ায় নাই, তাই তাহার দুপুরবেলার কথাগুলোও মনে পড়িয়া গেল, এবং

পড়ামাত্রই প্রেমের নদীতে জোয়ার শেষ হইয়া ভাটার টান ধরিল। সাবিত্রীর কথাগুলোকে সে তামাশা বলিয়া ভুল করিল না। হঠাৎ অত্যন্ত কঠিন হইয়া বলিয়া উঠিল, তারা নির্বোধ! তাদের এমন বস্তু দেওয়ার প্রস্তাব করা উচিত ছিল যা বাক্সে তুলে রাখতে কারো জঞ্জাল বলে মনে হয় না। আমিও নির্বোধ কম নই, কেননা, আমিও ভুলেছিলাম ও-বস্তুটা তোমাদের কত অবহেলার সামগ্রী! এতটা বয়সে এত বড় ভুল হওয়া আমার উচিত ছিল না। আচ্ছা, চললাম।

কথাটা সাবিত্রীকে শূলের মত বিঁধিল। 'তোমাদের' বলিয়া সতীশ যে তাহাকে কাহাদের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখিল, সাবিত্রীর তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। কিন্তু পরিহাস কলহে পরিণত হইয়া হাতাহাতির উপক্রম হইতেছে দেখিয়া সে চুপ করিয়া গেল। সতীশ কিন্তু থামিতে পারিল না, বলিল, শিকারী বঁড়শিতে মাছ গেঁথে খেলিয়ে যেমন করে আমোদ করে, এতদিন আমাকে দিয়ে বোধ করি তুমি সেই তামাশাই করছিলে,—না?

সাবিত্রী আর সহিতে পারিল না। তড়িৎবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বঁড়শিতে গেঁথে তোমাকে টেনেই তোলা যায়—খেলিয়ে তোলবার মত বড় মাছ তুমি নও।

সতীশ নির্মমভাবে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, নই আমি?

সাবিত্রী কহিল, না, নও তুমি। তাহার ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। সতীশের মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিল, অসচ্চরিত্র! আমার মত একটা স্ত্রীলোককে ভালবেসে ভালবাসার বড়াই করতে তোমার লজ্জা করে না? যাও তুমি—আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আমাকে মিথ্যে অপমান করো না।

এই অপমানে সতীশ আরও নির্দয় হইয়া উঠিল। এবার অমার্জনীয় কুৎসিত বিদ্রূপ করিয়া বলিল, আমি অসচ্চরিত্র! কিন্তু সে যাই হোক সাবিত্রী, তোমার নামটা কিন্তু তোমার বাপ-মা সার্থক দিয়েছিলেন।

সাবিত্রী সরিয়া গিয়া চৌকাঠ ধরিয়া ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুধু বলিল, যাও! তাহার মুখ ফ্যাকাশে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

সতীশ অপমান ও ক্রোধের অসহ্য জ্বালায় সেদিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া বলিল, কিন্তু যাবার আগে আর একবার আঁচল দিয়ে পা মুছিয়ে দেবে না? কিংবা আর কোনও খেলা—আর কিছু—

হঠাৎ দুজনের চোখাচোখি হইল। সাবিত্রী এক-পা কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, তুমি কসাইয়ের চেয়েও নিষ্ঠুর,—তুমি যাও! তুমি যাও! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও! না যাও ত মাথা খুঁড়ে মরব—তুমি যাও!

তাহার কণ্ঠস্বরের উত্তরোত্তর এবং অস্বাভাবিক তীব্রতায় অকস্মাৎ সতীশ ভীত হইয়া উঠিল এবং আর একটি কথাও না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। কিন্তু অন্ধকার বারান্দার শেষ পর্যন্ত আসিয়া তাহাকে থামিতে হইল। কোন দিকে সিঁড়ি, কোন দিকে পথ, অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, দেশলাই নাই। এই নিরুপায় অবস্থা-সংকটের মাঝখানে মিনিট-পাঁচেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার তাহাকে সাবিত্রীর ঘরের দিকে ফিরিয়া আসিতে হইল। বাহির হইতে দেখিল, সাবিত্রী মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। আস্তে আস্তে ডাকিল, সাবিত্রী! সাবিত্রী সাড়া দিল না। পুনর্বার ডাকিয়াও সাড়া না পাইয়া সতীশ ঘরের মধ্যে আসিয়া সাবিত্রীর মাথায় হাত দিল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিল, চক্ষু মুদ্রিত এবং মুখের মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া বুঝিল, সাবিত্রী মূর্ছিত হইয়া আছে। মুহূর্তের জন্য তাহার মনের মধ্যে একটা ভয় ও সঙ্কোচের উদয় হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সাবিত্রীর অচেতন দেহটা তুলিয়া লইয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল, এবং চাদরের এক অংশ কলসীর জলে ভিজাইয়া লইয়া মুখের উপর, চোখের উপর ছিটাইয়া দিয়া একখানা হাত-পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। মিনিট দুই-তিন পরেই সাবিত্রী চোখ মেলিয়া মাথার উপর কাপড় টানিয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিল, তুমি যাওনি?

সতীশ চুপ করিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

সাবিত্রী বিছানা হইতে উঠিয়া প্রদীপ হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চল, তোমাকে দোর খুলে দিয়ে আসি।

তার পরে নিঃশব্দে পথ দেখাইয়া নীচে নামিয়া আসিল এবং দ্বার খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মূর্ছিত সাবিত্রীকে শয্যায় শোয়াইতে সেই যে মুহূর্তের জন্য তাহার অচেতন দেহখানি তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে হইয়াছিল, সেই অবধি সতীশ কি রকম যেন অন্যমনস্ক হইয়াছিল; এখন দরজার বাহিরে আসিতেই তাহার চমক ভাঙিয়া গেল এবং কি একটা কথা বলিবার জন্য মুখ তুলিতেই সাবিত্রী বলিয়া উঠিল, না, আর একটি কথাও না, তোমার দেহটাকে ত তুমি পূর্বেই নষ্ট করেছ, কিন্তু সে না হয় একদিন পুড়েও ছাই হতে পারবে, কিন্তু একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গালে আর কালি মাখিয়ো না। হয় তুমি কালই ও-বাসা ছেড়ে চলে যাও, না হয়, আমি আর ওখানে যাবো না। বলিয়াই সাবিত্রী উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

নয়

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। কেন যে সাবিত্রী অবিশ্রাম আকর্ষণ করে, কেনই বা কাছে আসিলে এমন নিষ্ঠুর আঘাত করিয়া দূরে সরাইয়া দেয়, সেদিন সারা রাত্রি ধরিয়া ভাবিয়াও ইহার একটা অস্পষ্ট কারণও খুঁজিয়া পাইল না। গত রাত্রির এক একটা কথা এখন পর্যন্ত তাহার হাড়ের মধ্যে ঝনঝন করিয়া বাজিতেছিল। তাই সে প্রত্যূষেই বাহির হইয়া গেল এবং একটা বাসা ঠিক করিয়া আসিয়া মুটে ডাকিয়া জিনিসপত্র বোঝাই দিতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া বাসার সকলেই আশ্চর্য হইল। বেশী হইল বেহারী। সে কাছে আসিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু কি তবে বাড়ি যাচ্ছেন?

সতীশ তাহার হাতে গোটা-পাঁচেক টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, না বেহারী, বাড়ি নয় —স্কুলের কাছেই একটা বাসা পেয়েছি তাই যাচ্ছি।

বেহারী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলল, কিন্তু সে ত এখনো আসেনি বাবু।

সতীশ মুখ না তুলিয়াই কহিল, আসেনি? আচ্ছা, তুই বিছানাগুলো আমার বেঁধে দে, আমি ততক্ষণ রাখালবাবুর ঘর থেকে একবার আসি। বলিয়াই বাসার দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিতে রাখালবাবুর ঘরে চলিয়া গেল। সে ঘরে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন; বোধ করি এই আলোচনাই চলিতেছিল। কারণ, তাহাকে দেখিয়া সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রাখাল একটুখানি হাসির চেষ্টা করিয়া বলিলেন, সতীশবাবু এমন হঠাৎ যে!

সতীশ হাতের টাকাগুলো টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া বলিল, হঠাৎ একদিন এসেও ছিলাম, হঠাৎ একদিন চলেও যাচ্চি। এই টাকাগুলোতেই বোধ করি হবে, যদি না হয়, হিসাব হয়ে গেলে আমাকে জানাবেন, বাকি টাকা পাঠিয়ে দেব।

রাখাল বলিলেন, জানাব কোথায়?

আমার স্কুলের ঠিকানায় একখানা কার্ড লিখে ফেলে দেবেন, তা হলেই পাব, বলিয়া সতীশ আর কোনও সওয়াল-জবাবের অপেক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে একটা চাপা-হাসির শব্দ সতীশের কানে আসিয়া পৌঁছিল। বেহারী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরে ঢুকিয়া হাতের ছোট পুঁটলিটি কপাটের আড়ালে নামাইয়া রাখিয়া, রাখালকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বাবু, আমার সতের দিনের মাইনেটা হিসাব করে দিন, আমাকে এখুনি বাবুর সঙ্গে যেতে হবে।

রাখাল বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুই যাবি, এখানে কাজ করবে কে? যাব বললেই ত যাওয়া হয় না।

বেহারী কহিল, কেন হবে না বাবু। আমাকে যে যেতেই হবে!

রাখাল আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, হবে বললেই হবে! রীতিমত নোটিশ দেওয়া চাই, জানিস!

বেহারী কহিল, সে তখন একদিন সময়মত এসে দিয়ে যাব। এখন মাইনেটা দিন, আমাকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে।

রাখাল আর কোনও জবাব না দিয়া ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া সতীশের ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, সতীশবাবু, এইগুলো কি কাজ?

সতীশ বিছানা বাঁধিতেছিল, মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোনগুলো?

রাখাল উদ্ধতভাবে কহিল, ঝি আসেনি। সে ত আগেই গেছে দেখচি, আবার বেহারীকে নিতে চান কেন? দোষ করলেন আপনি শাস্তি ভোগ করবো কি আমরা?

সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল, আপনার কথা ত বুঝলাম না।

রাখাল গলার সুর চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, বুঝবেন কেন না বোঝাই যে সুবিধে। নিজে না গেলে আপনাকে ত বার করতেই হতো, কিন্তু সে যা হোক, একটা সহজ ভদ্রতার জ্ঞানও কি মানুষের থাকতে নেই?

সতীশের দুই চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, আপনি এ সমস্ত কি বলছেন?

ঈর্ষার বহ্নি রাখালকে দগ্ধ করিতেছিল, বলিলেন, বলছি ঠিক, আপনিও বুঝছেন ঠিক! সতীশবাবু, কোন কথাই আমাদের অজানা নেই। আচ্ছা যান আপনি—কি কাল-সাপকেই ঘরে আনা হয়েছিল, এমন বাসাটা লণ্ডভণ্ড করে দিলে।

সতীশ রাখালের একটা হাত চাপিয়া বলিল, কি বলছেন রাখালবাবু?

রাখাল জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া গর্জিয়া উঠিলেন, যান—যান, ন্যাকা সাজবেন না। যান আপনি, দূরে হোন।

বেহারী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, সতীশবাবু, যেতে দেন ওঁকে, কোথায় ওঁর দরদ, কোথায় ওঁর জ্বালা, সে একদিন আপনাকে আমি বলব। আমি সমস্ত জানি। আসুন, আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই।

রাখাল পদশব্দে বাড়ি কাঁপাইয়া বাহির হইয়া গেল, সতীশ চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, এ-সব কি বেহারী!

বেহারী বলিল, আমি আপনার সঙ্গে যাব বাবু, এখানে থাকতে পারব না।

সতীশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমার সঙ্গে? এখানে কাজ করবে কে?

বেহারী অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত বলিল, যার ইচ্ছে করুক, আমি সঙ্গে যাবই! একজন চাকর না থাকলে ত আপনার চলবে না বাবু!

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া সতীশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এ কথা আগে বললেই ত পারতিস বেহারী?

বেহারী জবাব দিল না। নিঃশব্দে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া মুটের মাথায় তুলিয়া দিতে লাগিল। সে যে যাইবেই, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

নূতন বাসায় আসিয়া সতীশ ভাবিতেছিল, সে এমন হইয়া গেল কিরূপে? যে-সে তাহাকে শুধু যে অপমান করিতেই সাহস করে, তাহাই নহে, অপমান করিয়া স্বচ্ছন্দে পরিত্রাণ পায় কেন? তাহার অসাধারণ দৈহিক শক্তি একতিলও কমে নাই, অথচ কেন সে মুখ তুলিয়া জোর করিয়া কথা কহিতে পারে না? কেন সে নতমুখে সমস্তই সহ্য করে? নিজের মনের এই শোচনীয় দুর্বলতা আজ তাহাকে অত্যন্ত বাজিল এবং তদপেক্ষা বাজিল এই দুঃখটা যে, প্রতিকার করিবার সাধ্যও যেন তাহার হাতছাড়া হইয়া গেছে। রাখালের রুক্ষ ভাষা যে, সে-রাত্রির ঘটনারই ইঙ্গিত করিয়াছে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইহাই মনে করিয়া সতীশ লজ্জায় মাটির সহিত মিশিয়া যাইতে লাগিল। বিপিনের লোক তাহাকে কেমন করিয়া কিভাবে ধরিয়াছিল, অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেমন করিয়া সে ভয়ে মড়ার মত পড়িয়াছিল, বুদ্ধিমান তাহারা কেমন করিয়া সমস্ত চালাকিটা বুঝিতে পারিয়া আচ্ছাদনের ভিতর হইতে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল ইত্যাদি চিত্তগ্রাহী দুর্লভ বিবরণ সত্যে-মিথ্যায়, অলঙ্কারে-আড়ম্বরে জড়াইয়া বর্ণিত হইবার সময়টায় উপস্থিত সকলে কিরূপ উৎকট আনন্দ, আগ্রহ ও উচ্চ-হাস্যের সহিত উপভোগ করিয়াছে, তাহার আগাগোড়া চেহারাটা কল্পনায় এতই মর্মান্তিক ও বীভৎস হইয়া দেখা দিল যে, একাকী ঘরের মধ্যেও সতীশের সমস্ত মুখ

বেদনায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল। আবার, ইহাদেরই সম্মুখে রাখাল তাহাকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়াছে, সে একটি কথাও বলিতে পারে নাই! এই কথা সাবিত্রী শুনিয়া কি মনে করিবে!

কিন্তু কোন কথাই সে বলিবে না। স্তব্ধ হইয়া সমস্ত লাঞ্ছনা সহ্য করিবে, একটা জবাবও দিবে না। তাহার আত্মসম্মানবোধ যে কত বৃহৎ, ইহাও যেমন সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, তাহার ব্যথিত মুখের চেহারাটাও সে কল্পনায় আজ সুস্পষ্ট দেখিতে লাগিল। সতীশ মনে মনে বলিল বটে, আমার নিজের নির্বুদ্ধিতায় যে অনাসৃষ্টি ঘটিয়াছে, অসহায়া সাবিত্রীকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া আসা উচিত হয় নাই, কিন্তু, উচিত যে কি হইতে পারিত তাহাও সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু সাবিত্রী কি নিজেই তাহাকে চলিয়া যাইতে বলে নাই! সে কি দর্প করিয়া বলে নাই, উহাতে সে কোন অপমানই বোধ করে না।

বেহারী আসিয়া বলিল, বাবু আপনার চান করবার সময় হয়েছে। তাহার কণ্ঠস্বরে আজ যেন একটু বিশেষ অর্থ ছিল।

সতীশ লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

হায় রে! মন যখন তাহার ছিঁড়িয়া পড়িতেছিল, তখনও নিয়মিত কোন কাজেই অবহেলা করিবার পথ ছিল না। সে স্কুলে গেল, কিন্তু ক্লাসে ঢুকিতে পারিল না। বাহিরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একসময়ে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই কিসের নৈরাশ্যে যেন সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই নূতন ঘরটিকে সাজাইয়া-গুছাইয়া লইতে বেহারী যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছে তাহা বুঝা গেল, কিন্তু অপটু হস্তের প্রথম চেষ্টা কোথাও চাপা পড়ে নাই, তাহাও তাহার তেমনি চোখে পড়িল। বেহারী সরবৎ তৈরি করিয়া আনিল, তামাক সাজিয়া দিল, এবং দোকান হইতে পানের দোনা কিনিয়া আনিয়া কাছে রাখিল। বৃদ্ধের অনভ্যস্ত এই-সব সেবার চেষ্টায় সতীশ মনে মনে হাসিতে গিয়া কাঁদিয়া চক্ষু মুছিল। রাত্রে বিছানায় শুইয়া সতীশ ভাবিতে লাগিল, যাহা হইবার হইয়াছে, এ-সব কথা সে আর মনেও আনিবে না, লেখাপড়ার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল, হয় ঐ লইয়াই থাকিবে, না হয়, বাড়ি ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু সেদিন ঐ যে মূর্ছিতা নারীর তপ্ত স্পর্শটুকু লইয়া সে বাসায় ফিরিয়াছিল, সে উত্তাপ তাহার সমস্ত সংযমের চেষ্টাকে গলাইয়া শেষ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেহারী মনে মনে সমস্তই বুঝিতেছিল, কিন্তু সান্ত্বনা দিবার সাহস তাহার ছিল না। তাই সে বিষণ্ণ-মুখে চুপ করিয়া দ্বারের বাহিরে বসিয়া রহিল। প্রায় দশটা বাজে, সে আস্তে আস্তে মুখ বাড়াইয়া বলিল, বাবু, আলোটা নিবিয়ে দেব কি?

সতীশ কহিল, দে, কিন্তু তুই শুবি কোথা বেহারী?

আমি এইখানেই আছি বাবু। আমার মাদুরটা দোর গোড়াতেই পেতেছি।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, এ-বাসায় কি চাকরদের শোবার ঘর নেই?

বেহারী বলিল, নীচে একটা খালি ঘর আছে, কিন্তু আপনার যদি কিছু দরকার হয়, তাই এখানেই থাকব।

সতীশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, সে কি রে, তুই শুতে যা। বুড়োমানুষ, হিমে থাকিস নি।

হিম কোথায় বাবু, বলিয়া সেইখানেই বেহারী গায়ের কাপড়টা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, রাত কত হলো রে?

বেশী হয়নি বাবু, বোধ করি দশটা বেজেছে।

সতীশ আবার মৌন হইয়া রহিল। কতক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তুই সাবিত্রীদের ঘর চিনিস না বেহারী?

বেহারী উঠিয়া বসিয়া বলিল, চিনি বৈ কি বাবু। কতদিন তাকে পৌঁছে দিয়েছি।

সতীশ আর কিছু বলিতে পারিল না। কিন্তু বেহারী বলিল, একবার গিয়ে দেখে আসব কি?

এবারে সতীশ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না, তুই যাবি কোথা? সে যে অনেক দূর!

বেহারী কহিল, দূর কিছুই নয় বাবু।

সতীশ ভাবিতে লাগিল, কথা কহিল না।

বেহারী আস্তে আস্তে বলিল, বাবু, যদি ঘণ্টা-খানেকের ছুটি দেন ত দেখে আসি। সকালবেলা আসেনি, বোধ হয় অসুখ-বিসুখ হয়ে থাকবে।

তথাপি সতীশ কথা কহিল না।

বেহারী মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিল। আজ সমস্ত দিন ধরিয়া সে অভ্যাসমত কথা বলিতে পায় নাই, উপরন্তু, বলিবার বিষয় ইতিমধ্যে এত বেশী সঞ্চয় হইয়া উঠিয়াছে, তাই আর একবার বলিল, নতুন জায়গায় ঘুম আসছে না বাবু, আর একবার অমাক সেজে দেব কি?

সতীশ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, সাড়া দিল না। তবুও বেহারী কিছুক্ষণ উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল, শেষে হতাশ হইয়া গায়ে কাপড়টা আর একবার টানিয়া সেইখানেই অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন ঠিক সময়ে সতীশ স্কুলে চলিয়া গেল। মধ্যাহ্নে বেহারী হাতের কাজকর্ম সারিয়া লইয়া সদ্য নিযুক্ত পাঁড়েঠাকুরের উপর বাসার খবরদারির ভার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, এবং সতের দিনের মাহিনা আদায়ের অছিলায় পুরাতন বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অথচ, তাহার এ ভয় ছিল, পাছে রাখালবাবু কোনগতিকে অফিসে না গিয়া থাকেন। তাই ঘরে ঢুকিয়াই নূতন ভৃত্যটার নিকটে সংবাদ জানিয়া লইয়া নির্ভয়ে রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া গলা বড় করিয়া ডাক দিল, ঠাকুরমশাই, প্রাতঃপ্রণাম হই।

ঠাকুরমশাই গাঁজা খাইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া ধ্যান করিতেছিলেন, চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, কল্যাণ হোক! তার পর মাথা সোজা করিয়া চোখ চাহিয়া বলিলেন, ও কে, বেহারী! আয় বোস।

বেহারী কাছে আসিয়া পদধূলি লইয়া বসিল। চক্রবর্তী গামছার খুঁট খুলিয়া খানিকটা গাঁজা বাহির করিয়া বেহারীর হাতে দিয়া বলিলেন, ও-বাসায় তা হলে রাঁধচে কে?

বেহারী উঠিয়া গিয়া হাতের তেলোয় ফোঁটা কয়েক জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, একটা খোট্টা বামুন। একেবারে জানোয়ার!

চক্রবর্তী খুশী হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ভগবান ওদের ল্যাজ দিতে ভুলেছেন তাই যা! তাহার পরে বাসার নূতন হিন্দুস্থানী চাকরটাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমাদের এখানে কালই এক ব্যাটা ভূতকে ধরে আনা হয়েছে, তা সে—বিদ্যে ওর—তার সাক্ষী দ্যাখ না বেহারী, আজ সকালে এক কলকে বার করে দিয়ে বললুম, কৈ তৈরি কর দেখি বাপু! মনে করলুম, বিদ্যেটা একবার দেখিই না! তা বললে বিশ্বাস করবি নে বেহারী, ব্যাটা জিনিসটাকেই মাটি করে ফেললে। তা তোদের ওখানে কষ্ট হবে না, সাবিত্রী আমার চালাক মেয়ে, দুদিনেই শিখিয়ে-পড়িয়ে তালিম করে নেবে।

তাঁহার নিজের পনের আনা বিদ্যাও যে ঐ গুরুর কাছেই শেখা, সে-কথাটা চাপিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, কিন্তু তাও বলি বেহারী, হাঁড়ি ধরলেই হয় না, বাবুভায়াদের খুশী করা, তাঁদের পাতে রান্না তুলে দেওয়া, বড় সামান্য বিদ্যে নয়—বামুনায়ের জোর চাই! ও খোট্টা-মোট্টার কর্মই নয়। কিন্তু আমার এখানে কাজ করা আর পোষাবে না, সে তোকে আগে থেকেই বলে রাখলুম। তুই বলিস দেখি আমার নাম করে সাবিত্রীকে। সে তখনি বলবে, যাও বেহারী, চক্রবর্তীকে ডেকে আনো, না হয় দু'টাকা মাইনে বেশী নেবে। সতীশ-বাবু কিন্তু কখখনো না বলবেন না। তাঁর মেজাজ জানি ত। বিশেষ ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণ গতিং। আমি দু'টাকা বেশী পেলে সে কিছু আর অপাত্রে পড়বে না, বলিয়া চক্রবর্তী নিজেই হাসিতে লাগিলেন।

বেহারী অবাক হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে বলিল, ঠাকুরমশাই, সাবিত্রী ত ওখানে নেই।

চক্রবর্তী অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা নেই নেই! তুই আমার নাম করে বলিস, তার পরে যা হয় আমি দেখে নেব।

বেহারী মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বাঁ হাতের পদার্থটা ডান হাতে লইয়া কহিল, ছুঁয়ে দিব্যি করে বলচি দেবতা, সে ওখানে যায়নি।

চক্রবর্তী এতবড় শপথের পরে আর সন্দেহ করিতে পারিলেন না; রীতিমত আশ্চর্য

হইয়া বলিলেন, তুই বলিস কি বেহারী! সে ত এখানেও আসেনি! তবে চব্বিশ ঘণ্টা রাখাল-বাবু সতীশবাবু বেচারাকে যে—আচ্ছা, তুই যা—একবার তাকে দেখে আর, তার পরে আমি আছি আর রাখালবাবু আছেন। আমাকে সে-বামুন পার্সনি বেহারী!

তাঁহার ব্রাহ্মণত্বে বেহারীর অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, সে কলিকাটি চক্রবর্তীর হাতে তুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা সতীশবাবুই বা গেলেন কেন? তিনি বলেন, ইস্কুল দূরে পড়ে—এটা কিন্তু কাজের কথাই নয়।

চক্রবর্তী সাবধানে আগুন তুলিতে তুলিতে বলিলেন, না, ভেতরে কথা আছে। অতঃপর দুজনে মিলিয়া কলিকাটি নিঃশেষ করিয়া বেহারী উঠিয়া পড়িল এবং উদ্বিগ্নমুখে সাবিত্রীর ঘরের অভিমুখে চলিয়া গেল। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইল সাবিত্রীর অসুখ হইয়াছে।

সাবিত্রীদের বাটীর সদর-দরজা খোলা ছিল, বেহারী নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। প্রায় সকল ঘরেরই কপাট বন্ধ, ভাড়াটেরা দিবানিদ্রা দিতেছে। বেহারী ধীরে ধীরে সাবিত্রীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। একটা কবাট বন্ধ ছিল। তাহার আড়ালে সাবিত্রী মাটির উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে, এবং অদূরে তক্তাপোশের উপর বিছানায় বিপিন মদ খাইয়া মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে। পদশব্দে চকিত হইয়া সাবিত্রী মুখ বাড়াইয়া অকস্মাৎ বেহারীকে দেখিয়া একমুহূর্তে যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, এস বেহারী, বসো। তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া দিল, এবং অত্যন্ত সমাদর করিয়া বসাইয়া নিজে অনতিদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, খবর সব ভাল বেহারী?

বেহারী মাথা নাড়িয়া জানাইল, ভাল। তার পর সাবিত্রীর মুখে আর কথা যোগাইল না। উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বেহারী হঠাৎ উঠিবার উপক্রম করিয়া বলিল, চললুম, আমার আবার অনেক কাজ।

সাবিত্রী শুষ্কমুখে জিজ্ঞাসা করিল, এখনি যাবে? একটু বসো না!

বেহারী উঠিয়া পড়িয়া বলিল. না, চললুম।

সাবিত্রী সঙ্গে সঙ্গে সদর-দরজা পর্যন্ত আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ বেহারী, বাবুরা খুব রাগ করেছেন?

বেহারী চলিতে চলিতে বলিল, আমি জানিনে ত; আমরা ওখানে আর নেই!

সাবিত্রী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিল, নেই? বাসা ভেঙ্গে গেছে নাকি?

বেহারী বলিল, না ভাঙ্গেনি। শুধু সতীশবাবু আর আমি চলে গেছি।

কেন তোমরা গেলে বেহারী?

সে অনেক কথা, বলিয়া পুনর্বার বেহারী চলিবার উদ্যোগ করিতেই সাবিত্রী দুই হাত দিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া অনুনয়ের স্বরে বলিল, আর একটিবার তোমাকে উঠে গিয়ে বসতে হবে বেহারী।

বেহারী অটলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আমার সময় নেই।

তবে কাল একটিবার আসবে, বলো?

বেহারী তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, না, আমার সময় হবে না।

পলকমাত্র সাবিত্রী তাহার মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া হাত ছাড়িয়া দিল। অভিমানে সমস্ত বক্ষ পূর্ণ করিয়া শান্তভাবে বলিল, আচ্ছা, তবে যাও। এই কথা তাকে বলো গিয়ে।

কথাটা বেহারীকে আঘাত করিল। সে মুখ তুলিয়া বলিল, তিনি ত তোমার কথা জানতে চাননি।

চাননি?

না।

সাবিত্রী স্থির হইয়া প্রতিঘাত সহ্য করিয়া লইয়া শুষ্কস্বরে বলিল, কোনদিন জানতে চাইলে বলবে বোধ হয়?

বেহারী বলিল, না। আমি মেয়েমানুষ নই—আমার শরীরে দয়ামায়া আছে—বলিয়াই আর কোন প্রশ্নের অপেক্ষামাত্র না করিয়া দ্রুতবেগে ক্ষুদ্র গলি পার হইয়া চলিয়া গেল।

সাবিত্রী সেইখানে চৌকাঠের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার অন্তরে-বাহিরে আর একবার আগুন ধরিয়া উঠিল।

আজ সকালে সে বাড়ি ছিল না। কালী-দর্শন করিতে কালীঘাটে গিয়াছিল। সেই অবকাশে কোথা হইতে বিপিন জন-দুই ইয়ার লইয়া মদ খাইয়া মাতাল হইয়া আসিয়াছে, এবং মোক্ষদার হাতে দু'খানা নোট দিয়া সাবিত্রীর ঘরের তালা খুলিয়া বিছানায় বসিয়াছে। আরো মদ আনাইয়া বাড়িসুদ্ধ সকলে মিলিয়া মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছে—এ সব কোনও কথা সাবিত্রী জানিত না। বেলা বারোটার সময় সে বাড়িতে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল, এই বাটীর ভাড়াটে, দুজন প্রবীণা মাতাল হইয়া বকাবকি করিতেছে, এবং তাহার মাসী মোক্ষদা সামনের বারান্দায় কাৎ হইয়া পড়িয়া ভাঙ্গা গলায় নিজের মনে বিদ্যাসুন্দরের গান আবৃত্তি করিতেছে। বাড়িময় মুড়ি, কড়াই-ভাজা, হাঁসের ডিমের খোলা, কাঁকড়া-চিবানো, চিংড়ি মাছের খোলা ছড়াছড়ি যাইতেছে- পা ফেলিবার স্থান নাই। মোক্ষদা সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়াই শিথিল-বস্ত্র কোমরে জড়াইতে জড়াইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে তাহার গলা জড়াইয়া কান্না জুড়িয়া দিল—মা, এমন সব বাবু যার, তার আবার কষ্ট, তার আবার চাকরি করা! আমি কিন্তু তোর গরীব মাসী সাবিত্রী—মুখে তাহার উগ্র মদের গন্ধ; গালে, কপালে, কাপড়ে, সর্বাঙ্গে হলুদের শুকনো দাগ, নিশ্বাসে কাঁচা পিঁয়াজের কুৎসিত তীব্র গন্ধ! অসহ্য ঘৃণায় সাবিত্রী তাকে সজোরে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, মাসী, তুমিও মদ খাও! তুমিও মাতাল?

ঠেলা খাইয়া মোক্ষদা কান্না বন্ধ করিয়া, চোখ রাঙ্গা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, মাতাল? আলবত্ মাতাল! পাড়ার লোককে জিজ্ঞাসা কর গে যা—তারা বলবে মোক্ষদা মাতাল। আমারো একদিন ছিল লো, আমারো একদিন ছিল। আমিও একদিন চব্বিশ ঘণ্টা মদে ডুবে থাকতুম! তুই তার জানবি কি—কালকের মেয়ে!

তাহার তর্জনে গর্জনে কুণ্ঠিত হইয়া সাবিত্রী শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, কিন্তু তুমি ত খাও না—আজ হঠাৎ খেতে গেলে কেন?

মোক্ষদা আরো রাগিয়া উঠিয়া বলিল, হঠাৎ আবার কি' আমরা হঠাৎ-খাইয়ে মেয়েমানুষ নই। জিজ্ঞাসা কর গে যা তোর বাবুকে, যে এক গেলাস খেয়ে উলটে পড়ে আছে, তাকে! ওরে, আমরা মরি, তবু মর্যাদা হারাইনে—আঁচলে দু'খানা নোট বেঁধে দিয়েচে, তবে গেলাস ধরেছি।—বলিয়া আঁচলটা সদর্পে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, বললেই ছুটে গিয়ে গিলব, সে মোক্ষদা আমি নই।

সাবিত্রী চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু এসেছেন নাকি?

মোক্ষদা কহিল, না হলে আর এত কাণ্ড করলে কে? কিন্তু তাও বলি, খাও বললেই খাব কেন? মান-ইজ্জত নেই কি?

ইতিপূর্বে বারান্দার ওধারে যাহারা আপোসে বচসা করিতেছিল, উচ্চ-কণ্ঠস্বরে কলহের আশ্বাস পাইয়া তাহারা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বিধু বলিল, ওগো, মান-ইজ্জত আমাদেরও আছে, ঠেস দেওয়া কথা আমরাও বুঝি। তবে নাকি সাবিত্রী মেয়ের মত, তার বাবু আমাদের হাতে ধরে সাধাসাধি করতে লাগল, তাই খাওয়া। না হলে—

তাহার কথা শেষ না হইতেই মোক্ষদা গর্জন করিয়া উঠিল, হলোই বা সাবিত্রীর বাবু! হলোই বা জামাই! কুড়ি টাকা আঁচলে বেঁধেছি তবে গেলাস ছুঁয়েছি!

কথা শুনিয়া সাবিত্রী লজ্জায় ঘৃণায় মরিয়া যাইতেছিল। বলিয়া উঠিল থামো মাসী, থামো! চুপ করো!

মোক্ষদা বলিল, চুপ করব কেন? যা বলব সামনেই বলব। তল্লাটের লোক জানে, স্পষ্ট বলিয়ে যদি কেউ থাকে ত সে মুকি!

এবার বিধুও গলা চড়াইয়া দিয়া বলিল, স্পষ্ট বলতে শুধু তুই জানিস, তা নয়। আমরাও জানি। জামায়ের কাছে দু'খানা নোট নিয়ে মদ খেয়েচিস, তিনখানা পেলে না জানি—

মোক্ষদা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, যত বড় মুখ নয়—আর বলিতে পাইল না। সাবিত্রী

হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল, এবং জোর করিয়া টানিয়া লইয়া তাহার ঘরের মধ্যে ফেলিয়া শিকল তুলিয়া দিল। তথা হইতে মোক্ষদা অকথ্য অশ্রাব্য ভাষা অবিশ্রাম বর্ষণ করিতে লাগিল।

ফিরিয়া আসিয়া সাবিত্রী বিধুর দুটো হাত ধরিয়া বলিল, মাসী, আমাকে মাপ কর। সমস্ত দোষ আমার।

তাহার নম্র-কথায় শান্ত হইয়া বিধু বলিল, তোর কি সাবি? মুকিকে চিরকাল জানি ঐ রকম। একটু খেলে আর রক্ষে নেই, পায়ে পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করবে। ঐ তার স্বভাব। যা, তুই নিজের ঘরে যা। বলিয়া বিধু সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া চলিয়া গেল।

সাবিত্রী কাঠের মত দাঁড়াইয়া রহিল। রোষে ও ক্ষোভে তাহার আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করিতেছিল। সতীশ যে এতবড় নির্লজ্জ হইতে পারে, প্রকাশ্যে দিনের বেলায় এমন উন্মত্ত আচরণ করিতে পারে, ইহা ত সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। তাই কাল্পনিক নহে, একটা সত্যকার ব্যথা তাহার বুকের মধ্যে বিরাট তরঙ্গের মত গড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যে তাহার প্রিয়তম অকস্মাৎ সে যেন তাহারি চোখের সুমুখে মরিয়া গেল, যাহাকে সে মাত্র দুইদিন পূর্বে কটুকথায় অপমান করিয়া বিদায় দিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে যখন এত সত্বর, এত সহজে, তাহার সমস্ত আত্মসম্ভ্রম বিসর্জন দিয়া এমন হীন, এমন কদাকার হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন ভরসা করিবার, বিশ্বাস করিবার, তাহার আর কিছুই রহিল না। তাহার দুই চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু একফোঁটা জল আসিল না। তাহার সর্বস্ব, তাহার দেবতা, কল্পনার স্বর্গ, তাহার ভ্রষ্টজীবনের ধ্রুবতারা, তাহার ইহকাল-পরকাল সমস্তই যেন একমুহূর্তে ঐ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টরাশির মাঝখানে লুটাইয়া পড়িল। সাবিত্রী স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ঘরের দিকে যাইতে কিছুতেই পা উঠিল না। তাহার মনে পড়িল, এই সেদিন রাত্রে তাহাকে স্পর্শ করিয়া সতীশ শপথ করিয়াছিল। আজ যখন সে এরই মধ্যে সব ভুলিয়া, মাতাল হইয়া তাহারি শয্যার উপর আসিয়া পড়িল, তখন তাহার মুখের দিকে সে চাহিয়া দেখিবে আর কি করিয়া?

এমন সময় নীচে বাড়িউলীর গলার শব্দ শোনা গেল। তিনিও আজ বাটী ছিলেন না। আসিয়াই একজনের নিকটে মোক্ষদা ও বিধুর বিবরণ, এবং সেই সঙ্গে আর যাহা কিছু সমস্তটুকু শুনিয়া ক্রোধভরে উপরে উঠিতেছিলেন, হঠাৎ সম্মুখেই রাশীকৃত এঁটোকাঁটা দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। সম্প্রতি প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়া আসিয়া তাঁহার বাচ-বিচারের অন্ত ছিল না। সাবিত্রীকে তদবস্থা দেখিয়া বলিলেন, সাবি, তোকে ত ভাল মেয়ে বলেই জানতুম—এ সমস্ত কি অনাছিষ্টি বল ত বাছা!

সাবিত্রী সংক্ষেপে কহিল, আমি বাড়ি ছিলুম না।

বাড়িউলী কহিলেন, এখন ত আছিস, এখন এগুলো মুক্ত করবে কে? আমি? না বাছা, আমার বাড়িতে এ-সব অনাচার চলবে না। যে যার ঘরে বসে যা ইচ্ছে করো, আমি বলতে যাব না, কিন্তু বাইরে বসে এ-সব কান্ড হবে না। আমি যে মাড়িয়ে যাব, ছোঁয়াছুঁয়ি করে জাতজন্ম খোয়াব, তা পাবব না। এই বলিয়া তিনি দেওয়াল ঘেঁষিয়া ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া, কোনও মতে তাঁহার ও-ধারের ঘরে চলিয়া গেলেন। সাবিত্রী আর দাঁড়াইয়া রহিল না। সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া, সমস্ত স্থানটা ধুইয়া-মুছিয়া পুনর্বার স্নান করিয়া আসিল এবং একখানা শুষ্ক বস্ত্রের জন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভিতরে গিয়া বিছানার দিকে চাহিয়াই সে ভয়ে, বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, মা গো? এ যে বিপিনবাবু!

মদ্যপ গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন,—জাগিল না। বাহিরের আর কেহ এ শব্দ শুনিতে পাইল না। সাবিত্রী দুই পা পিছাইয়া আসিল, তাহার সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করিতে লাগিল, এবং মাথার মধ্যে হঠাৎ মূর্ছার লক্ষণ অনুভব করিয়া দ্বারের আড়ালে কবাটে মাথা রাখিয়া নির্জীবের মত বসিয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে সে ভাব কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু তবুও সে মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারিল না। ইতিপূর্বে যে ক্ষোভে, যে দুঃখে তাহার অন্তরটাও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছিল, যাহার নির্লজ্জ আচরণের লজ্জায় তাহার মরিতে ইচ্ছা করিতেছিল, সে লজ্জা সত্য নহে, এ সতীশ নয়, আর একজন, তাহা চোখে দেখিয়াও তাহার সে ক্ষোভ, সে

দুঃখ যেন বিন্দুমাত্রও নড়িয়া বসিল না। বরং বুক যেন আরো ভারী, অন্তর যেন আরও অন্ধকার হইয়া উঠিল। শয্যার দিকে সে আর চাহিতেও পারিল না। এইবার তাহার দুই চোখ ভরিয়া বড় বড় অশ্রু ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

হায় রে রমণীর ভালবাসা! এত দুঃখে, ইহারই মধ্যে কখন যে সে গোপনে নিঃশব্দে সতীশের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে সেবা করিবার, সুস্থ করিবার পিপাসায় আর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং কখন যে তাহাকে দেখিবার, কথা কহিবার সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এ সংবাদ বোধ করি তাহার অন্তর্যামীও টের পান নাই। এখন, সেই দিককার সমস্ত আশা এই মুহূর্তে মিথ্যায় মিলাইয়া যাইবামাত্রই তাহার সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন এক দিগ্বিহীন শূন্যতার মাঝখানে ডুবিয়া গেল। ঠিক এই সময়টাতেই তাহার দ্বারের বাহিরে বেহারী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

[illegible]

সতীশের চিত্তের মাঝে একটা বহ্নির শিখা যে অহর্নিশ জ্বলিতেই লাগিল, এ কথা সে নিজের কাছে অস্বীকার করিতে পারিল না। সেই আগুনে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া তাহার অতবড় সবল দেহটাও যে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, ইহা সে স্পষ্ট অনুভব করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। বেহারীকে ডাকিয়া বলিল, জিনিসপত্র আর একবার বাঁধতে হবে রে, আজ সন্ধ্যার গাড়িতে বাড়ি যাব।

বেহারী প্রশ্ন করিল, দেশের বাড়িতে, না পশ্চিমের বাড়িতে বাবু?

পশ্চিমের বাড়িতে, বলিয়া সতীশ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিবার টাকা তাহার হাতে দিয়া স্কুলে চলিয়া গেল।

বেহারীর আনন্দ ধরে না। তার বাড়ি মেদিনীপুর জেলায়, পশ্চিমের মুখ সে আজও দেখে নাই। সেই পশ্চিমে আজ রওনা হইতে হইবে। সে তৎক্ষণাৎ সোরগোল করিয়া বাঁধা-ছাঁদা শুরু করিয়া দিল। পাঁড়ে আসিয়া আহারের আহ্বান করিল। বেহারী হাসিমুখে বলিল, ঠাকুরজী, তুমি খেয়ে নাও গে। আমার ভাত একধারে ঢাকা দিয়ে রেখো, যদি সময় পাই ত তখন দেখা যাবে,—এখন ত আমার মরবার ফুরসত নেই। পাঁড়েজী আগের কথাটা বুঝিয়াই চলিয়া গেল। শেষের কথাগুলো বুঝিতেও পারিল না, পারার প্রয়োজনও বোধ করিল না।

হাতের কাজ সম্পন্ন করিয়া বেহারী বাহিরে চলিয়া গেল। বাজারে যাইতে হইবে। তা ছাড়া ও-বাসার চক্রবর্তীকে এ সংবাদ দেওয়া চাই। সাবিত্রীর চিন্তাকে সে সেদিন ঘৃণার সহিত বর্জন করিয়াছিল, আজও মনে ঠাঁই দিল না।

আজ সকাল হইতেই সতীশের মাথা ধরিয়াছিল। বেলা বারোটার পরে সে রীতিমত জ্বর লইয়া বাসায় আসিল। বেহারী বাড়ি ছিল না। সে বেলা তিনটা আন্দাজ একরাশ জিনিস মাথায় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া একেবারে বসিয়া পড়িল। এই সময়টায় প্রায় চারিদিকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া সতীশ ভয় পাইল। পরদিন জ্বর ও যন্ত্রণা উভয়ই বৃদ্ধি পাইল। সন্ধ্যার পরে সতীশ চিন্তিতমুখে বেহারীকে বলিল, জ্বর যদি শীঘ্র না ছাড়ে, তুই একলা পারবি নে ত।

বেহারী ছলছল চোখে সাহস দিয়া বলিল, ভয় কি বাবু!

সতীশ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, একবার ওকে—তাই ভাবছি বেহারী, একবার সাবিত্রীকে খবর দিলে হয় না? বোধ করি, ডাক্তার ডাকতেও হবে।

কোন কারণেই সাবিত্রীকে আহ্বান করিতে বেহারীর লেশমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না, কিন্তু সে মনের ভাব দমন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, আচ্ছা, যাচ্ছি।

তখন হইতে সতীশ উন্মুখ হইয়া রহিল। তার জ্বরের যন্ত্রণা যেন আপনিই কমিয়া গেল। ঘণ্টা-দুই পরে বেহারী একা ফিরিয়া আসিলে সতীশ সভয়ে চাহিয়া রহিল।

বেহারী বলিল, সে বাড়ি নেই বাবু।

বাড়ি নেই! তবে ও-বাসায় একবার গেলি না কেন?

বেহারী বলিল, সে-বাসায় ও আর যায় না। তিন-চারদিন ঘরেও যায় না। কোথায় গেছে, কেউ জানে না।

তার মাসীও জানে না?

না, তাকেও বলে যায়নি।

সতীশ চুপ করিয়া রহিল। বেহারী চোখের জল কোনমতে নিবারণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রীর যে ইতিহাস সে তার মাসীর নিকটে শুনিয়া আসিয়াছিল, এবং যে কথা সে নিজে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিত, কোনও মতেই সে সংবাদ আজ এই রুগ্ন লোকটির সম্মুখে উচ্চারণ করিতে পারিল না।

পরদিন ডাক্তার আসিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন। সতীশ ঔষধের শিশি হাতে লইয়া জানালার বাহিরে নিক্ষেপ করিল। এই দেখিয়া বেহারী আর একবার অশ্রু নিরোধ করিয়া সাবিত্রীর সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। মোক্ষদা রাঁধিতেছিল, বেহারী জিজ্ঞাসা করিল, আজকেও আসেনি গা?

মোক্ষদা হাতের খুন্তিটা উদ্যত করিয়া চোখমুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, না বাছা, না। কতবার তোমাকে বলব, সে আর আসবে না। যখন অসময় ছিল, তখন ছিল মাসী। এখন যে তার সুসময়।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বেহারী মৃদুকণ্ঠে জানাইল, আজও সাবিত্রী ফিরিয়া আসে নাই।

দিন-দুই পরে ঔষধ না খাইয়াও সতীশের জ্বর ছাড়িয়া গেল। সে ভাত খাইয়া সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। বেহারীকে ডাকিয়া বলিল, আর নয়, আজই রওনা হওয়া চাই।

সেইদিনই সতীশ কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

এগার

উপেন্দ্র সতীশের শীর্ণ শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভায়ার কি এই ডাক্তারি শেখার নমুনা নাকি?

সতীশ হাসিয়া কহিল, হলো না উপীনদা।

উপেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হলো না কি রে?

সতীশ লজ্জিত হইয়া বলিল, ডাক্তারি আমার সহ্য হল না উপীনদা।

উপেন্দ্র স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল সতীশের উন্নত দেহটার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ভালই হয়েছে। পাড়াগাঁয়ে গিয়ে অনর্থক কতকগুলো জীবহত্যা করতিস, তার পাপ থেকে ভগবান তোকে রক্ষা করেছেন।

মাস-খানেক পরে আর একদিন উপেন্দ্র সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার সঙ্গে একবার কলকাতায় যেতে হবে সতীশ।

সতীশ হাতজোড় করিয়া বলিল, ঐ হুকুমটি করো না উপীনদা। কলকাতা বেশ শহর, চমৎকার দেশ, সব ভাল, কিন্তু আমাকে যেতে বলো না।

কথাটা সতীশ তামাশার ছলেই বলিতে গেল বটে, কিন্তু সে ছলনা তাহার চাপা ব্যথাটাকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। তাহার ছদ্মহাসি বেদনার বিকৃতিতে এমনই রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল যে, উপেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, সতীশ কি যেন সেখানে করিয়া আসিয়াছে, তাহা তাঁহার কাছে গোপন করিতেছে। ক্ষণেক পরে বলিলেন, তবে থাক সতীশ। তোর শরীরও ভাল নয়, আমি একাই যাই।

উপেন্দ্রর মনের ভাব অনুমান করিয়া সতীশ কুণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল, কবে যাবে উপীনদা?

আজ।

আজই? আচ্ছা চলো, আমিও যাই। বলিয়া হঠাৎ সম্মত হইয়া সতীশ ঘরে ফিরিয়া আসিল, এবং মুহূর্তকালের মধ্যেই কলিকাতার জন্যই অধীর হইয়া উঠিল। বেহারীকে বলিল, আর একবার তল্পী বেঁধে ফ্যাল বেহারী, কলকাতায় যেতে হবে।

বেহারী চিন্তিত-মুখে জিজ্ঞাসা করিল, কবে বাবু?

সতীশ সহাস্যে বলিল, কবে কি রে! আজই রাত্রের ট্রেনে।

আচ্ছা, বলিয়া বেহারী মুখ ভারী করিয়া চলিয়া গেল।

সতীশ তাহার অপ্রসন্ন মুখ লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল, বেহারীর এখানে ত কাজ-কর্ম নেই, তাই ওখানে খাটুনির ভয়ে যেতে চায় না। কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, সতীশ বৃদ্ধের মনের কথা একেবারেই বুঝে নাই।

ইতিপূর্বে একদিন সতীশ কথায় কথায় বেহারীকে বলিয়াছিল, আচ্ছা বেহারী, এতদিনে সাবিত্রী ত নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে, কিন্তু তখন কোথায় গিয়েছিল বলতে পারিস?

বেহারী সংক্ষেপে বলিয়াছিল, না বাবু! বলিলে ত সে অনেক কথাই বলিতে পারিত, কিন্তু একদিন সাবিত্রীর মুখের উপর সে নাকি তাহার পুরুষত্বের অহঙ্কার করিয়া আসিয়াছিল, কোন উপলক্ষেই সেইটুকু গর্বকে সে ক্ষুন্ন করিতে পারিল না।

যেদিন কলিকাতা হইতে বাটী ফিরিয়া আসিয়া সতীশ নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যুক্তকরে আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়াছিল, ভগবান, যা কর তুমি ভালর জন্যই কর! সেদিন সৃষ্টিকর্তার কোন্ বিশেষ কর্মটা স্মরণ করিয়া যে সে এতবড় ধন্যবাদ উচ্চারণ করিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলে বোধ করি সে বলিতে পারিত না। অথচ কতবড় সঙ্কটের মুখ হইতে সে যে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে, কতবড় দুশ্ছেদ্য জালের ফাঁস কত সহজে ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে পাইয়াছে ইহা সে নিশ্চিত জানিত, এবং এ সৌভাগ্যকে সে কৃতজ্ঞতার সহিতই গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু অন্তরশায়ী অবোধ মন তাহার সেদিকে দৃক্‌পাতমাত্র করে নাই, উপুড় হইয়া পড়িয়া নিশিদিন একভাবেই কাঁদিয়া কাটাইতেছিল। তবু চেষ্টা করিয়া সে পূর্বের মতই তাহার ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধব, থিয়েটার, গান-বাজনার আখড়া প্রভৃতিতে মিশিতেছিল, কিন্তু কোনক্রমেই পূর্বের মত আর মিলিতে পারে নাই। বরং যে লোক ঘরের গৃহিণীর সহিত কলহ করিয়া বাহিরের কর্তব্য সম্পন্ন করিতে আসে, তাহারই মত সে ছিদ্রান্বেষী ও অসহিষ্ণু হইয়া নির্বিচারে সমস্তই দংশন করিয়া ফিরিতেছিল। এমনি করিয়া দিনযাপনের মাঝখানে হঠাৎ আজ কলিকাতা যাইবার আহ্বান শুনিয়াই তাহার বিদ্রোহী গৃহলক্ষ্মী ধূলিশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, এবং ভবিষ্যৎ ভাল-মন্দর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাত্রা করিয়া পা বাড়াইয়া দাঁড়াইল।

সেই রাত্রেই কলিকাতার উদ্দেশে উপেন্দ্র ও সতীশ মেল-গাড়ির একখানা সেকেন্ড ক্লাস কামরায় চড়িয়া বসিলেন।

বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলে উপেন্দ্র জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইয়া বিছানায় কাত হইয়া শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু সতীশ জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

মেল-ট্রেন সব স্টেশনে থামে না। প্রান্তর, নদ-নদী, গ্রাম পথ অতিক্রম করিয়া হুহু শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং সেই দ্রুত ধাবনের পরিমাণ করিয়া কদাচিৎ নিঃসঙ্গ অদূরবর্তী বনস্পতি নিমেষে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। দিগন্তে বৃক্ষরাজি ও বাঁশঝাড় অন্ধকার করিয়া আছে এবং তাহারই নিম্নে নদীর বক্রাংশে শুভ্র জলরেখা জানালার নীল কাচের ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে। বাহিরে বৃক্ষ, গুল্ম, মাঠ লাইনের পাশে উলুবন ও শুষ্ক জল-খাদ সর্বত্র ম্লান জ্যোৎস্না বিকীর্ণ হইয়া আছে। সতীশের চোখে জল আসিয়া পড়িল। এই পথে কতবার সে আসিয়াছে, গিয়াছে, এই নিস্তব্ধ শান্ত প্রকৃতি কতবার সে এমনি ম্লান জ্যোৎস্নালোকে দেখিয়া গেছে, কিন্তু কোনদিন এমনভাবে তাহার চোখে ধরা দেয় নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল, সমস্তই বিচ্ছিন্ন, নির্লিপ্ত, মৃত। কেহই কাহারও জন্য ব্যাকুল নয়, কেহই কাহারও মুখ চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া নাই। সবাই স্থির, সবাই উদ্বেগশূন্য, সবাই আপনা-আপনি সম্পূর্ণ। এই নির্বিকার, উদাসীন ধরিত্রীর পানে চাহিয়া থাকিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল। সে চোখ মুছিয়া সরিয়া আসিয়া বেঞ্চের উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই উঠিয়া পড়িয়া, তোরঙ্গ খুলিয়া একটা সানাই বাহির করিয়া উপেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, গাড়ির শব্দে যদি তোমার ঘুমের ব্যাঘাত না হয় ত বাঁশীর শব্দেও হবে না। আমি ত ঘুমুতে পারিনে, বলিয়া সে আর একবার জানালার কাছে সরিয়া আসিয়া বসিল এবং বাহিরের দিকে চাহিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিল।

উপেন্দ্রর সাড়া পাওয়া গেল না। ভগবান সতীশকে গাহিবার গলা এবং বাজাইবার হাত দিয়াছিলেন। এদিকে তিনি কৃপণতা করেন নাই। শিশুকাল হইতে শুরু করিয়া এই বিদ্যাটাই সে শিক্ষা করিয়াছিল এবং শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায়, ঠিক তেমনি করিয়াই শিখিয়াছিল। সতীশ বাঁশী বাজাইতে লাগিল। সেই শুদ্ধসুন্দর অনির্বচনীয় সংগীত-সৃষ্টি বুঝিবার লোক কেহ ছিল না—শুধু বাহিরে আকাশের খণ্ড চন্দ্র তাহাকে অনুসরণ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, এবং মাটির উপর সুপ্ত জ্যোৎস্নার ঘুম ভাঙিয়া গেল। ক্রমে গাড়ির গতি যখন মন্দ হইয়া আসিল এবং বুঝা গেল, স্টেশন নিকটে আসিয়াছে, তখন সে বাঁশী নামাইয়া রাখিল।

উপেন্দ্র হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন, নাঃ, যদি শিখতে হয় ত সানাই বাজাতে শিখব। সেদিন তোর সেতার শুনে মিথ্যে একটা সেতার কিনে ফেললাম। টাকাগুলোই মাটি।

সতীশ হাসিয়া বলিল, রক্ষে কর উপীনদা, তাই বলে যেন সানাই কিনো না। ঘরে বসে ও যন্ত্রটা শেখবার চেষ্টা করলে আর পাড়ায় লোক টিকতে পারবে না।

উপেন্দ্র লেশমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া বলিলেন, না, শিখি ত তোরই ঘরে বসে শিখব! বলিতে দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন।

পরদিন অনেক বেলায় গাড়ি হাওড়ায় থামিলে উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কোথায় যাবি রে?

সতীশ আশ্চর্য হইয়া বলিল, ও আবার কি কথা? তোমার সঙ্গে।

তোর যাবার জায়গা নেই?

বেশ যা হোক তুমি!

এ সম্বন্ধে আর কোন কথাও হইল না।

স্টেশনে নামিতেই একজন বিলাতী পোশাক-পরা বাঙ্গালী সাহেব উপেন্দ্রর হাত ধরিলেন। ইনি উপেন্দ্রর বাল্যবন্ধু জ্যোতিষ রায়, ব্যারিস্টার। 'তার' পাইয়া লইতে আসিয়াছেন। বাহিরে তাঁহার গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল। অল্পস্বল্প জিনিসপত্র যাহা সঙ্গে ছিল, কুলি গাড়ির উপরে তুলিয়া দিলে তিনজনে ভিতরে উঠিয়া বসিলেন। বেহারী কোচ-বাক্সে চড়িয়া বসিল এবং কোচম্যান গাড়ি হাঁকাইয়া দিল। অনেক পরে, অনেক রাস্তা গলি পার হইয়া বড় বড় থাম দেওয়া প্রকাণ্ড একটা বাটীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ি থামিল। তিনজনে নামিয়া গেলেন।

বার

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। উপেন্দ্র ও সতীশ পাথুরেঘাটায় একটা অতি-সংকীর্ণ গলির মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

উপেন্দ্র কহিলেন, এই গলিটাই নিশ্চয় বোধ হচ্চে।

সতীশ সন্দেহ প্রকাশ করিল, এর ভেতরে থাকতে পারে না, এটা কখনও নয়।

ভাঙ্গা দেওয়ালের গায়ে টিন মারা আছে, খুব সম্ভব ইহাতে একদিন গলির নাম লেখা ছিল, এখন আর পড়া যায় না। সতীশ বলিল, ভাল করে না জেনে ঢোকা যায় না, এটা পাতাল-প্রবেশের সুড়ঙ্গও হতে পারে!

উপেন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, তুই তবে প্রহরী হয়ে থাক, আমি ভিতরে গিয়ে দেখে আসি।

সতীশ প্রথমে বাধা দিবার চেষ্টা করিল, পরে উপেন্দ্রর পশ্চাতে চলিতে চলিতে বলিল, উপীনদা, আমাদের মত বম্বেটে লোকেরাও এ-সব স্থানে সন্ধ্যের পরে আসতে সাহস করে না, তোমার খুব সাহস ত!

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, বোম্বেটের সাহস কি ভদ্রলোকের চেয়ে বেশী সতীশ? দুষ্কর্ম করতে পারাকেই সাহস বলে না।

সতীশ সে কথার প্রতিবাদ না করিয়া অত্যন্ত সাবধানে পথ দেখিয়া চলিতে লাগিল। পায়ের নীচেই দুর্গন্ধ-পঙ্কিল খোলা নর্দমা, ক্ষীণদৃষ্টি সতীশের তাহাতে পড়িয়া যাইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা ছিল। একস্থানে ক্ষুদ্র গলি অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং অন্ধকার গাঢ় হইয়া

আসিল। সতীশ পিছন হইতে উপেন্দ্রর জামার খুঁট টানিয়া ধরিল—উপীনদা, করচ কি, এই রাত্রে মারা পড়বে নাকি?

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, আমার এতক্ষণে ঠিক মনে পড়েচে। আর একটা বাড়ির পরেই তেরো নম্বরের বাড়ি। প্রায় বছর-আস্টেক আগে একদিন মাত্র এখানে এসেছিলাম, সেইজন্যেই প্রথমে চিনতে পারিনি। এখন চিনেছি, এই পথই বটে।

সতীশ বিশ্বাস করিল না। বলিল, পথ বটে, কিন্তু তোমার আমার জন্যে নয়। যাদের জন্যে বিশেষ করে এই পথের সৃষ্টি, তাদের কারো সঙ্গে গা ঠেকাঠেকি হয়ে গেলে, এ রাত্রে স্নান করে মরতে হবে, এইবেলা ফিরে যাই চল।

উপেন্দ্র জবাব না দিয়া সতীশের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন, এবং আরো একটু আগে আসিয়া একটা বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, তুই সিগারেট খাস, তোর পকেটে দেশলাই আছে; একবার জেবলে দেখ দেখি, এটা ক'নম্বরের বাড়ি।

সতীশ আলো জবালিয়া বেশ করিয়া বাড়ির নম্বর পরীক্ষা করিয়া বলিল, ভাল '.ড়া গেল না, কিন্তু চৌকাঠের গায়ে খড়ি দিয়ে ১৩ নম্বর লেখা আছে। বোধ হয় তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু এই কথা জিজ্ঞাসা করি আমি, বাড়ির নম্বর তেরই হোক আর তিপ্পান্নই হোক, এখানে তোমার প্রয়োজনটা কি হতে পারে?

উপেন্দ্র উত্তর না দিয়া ডাকিতে লাগিলেন, হারানদা! ও হারানদা!

উপরে, নীচে, কাছে, দূরে সর্বত্র অন্ধকার, শব্দমাত্রই নাই। সতীশ ভীত হইয়া উঠিল। উপেন্দ্র আবার ডাকিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণে উপরের জানালা ঈষৎ মুক্ত করিয়া স্ত্রীকণ্ঠে সাড়া আসিল, কে?

উপেন্দ্র বলিলেন, দরজা খুলে দিতে বলুন। হারানদা কোথায়?

যাচ্চি, একটু দাঁড়ান।

ক্ষণপরেই দরজা খোলার শব্দের সহিত ক্ষীণ আলোর রেখা পথের উপরে আসিয়া পড়িল। উপেন্দ্র দরজা ঠেলিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটি কেরোসিনের ডিবা হাতে করিয়া একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। মাথার উপরে অল্প একটুখানি আঁচলের ফাঁক দিয়া সযত্নরচিত কবরীর এক অংশ দেখা যাইতেছে। দেখা গেল, তাহার একটিমাত্র কেশও স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। নিখুঁত সুন্দর মুখের উপর হাতের আলোকসম্পাতে ভ্রূযুগের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কাঁচপোকার টিপ চিকচিক করিয়া উঠিল এবং ঈষৎ আনত চোখ দুটি দিয়া যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল, চতুর্দিকের নিবিড় অন্ধকারে তাহার অপূর্ব জ্যোতি ক্ষণকালের জন্য উভয়কেই বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিল। সতীশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা বাধা পাইয়া বারংবার ফিরিয়া যাইতেছে। সে উপেন্দ্রর গা ঠেলিয়া দিল। উপেন্দ্র সচকিত ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, হারানদা কোথায়?

স্ত্রীলোকটি বলিল, তিনি উপরে আছেন। উঠতে হাঁটতে পারেন না। মা-ও আজ সাত-আটদিন শয্যাগত, বাড়ির মধ্যে শুধু আমি ভাল আছি। আপনি উপেন্দ্রবাবু ত? আমরা আশা করেছিলুম আপনি কাল আসবেন, তাই প্রস্তুত ছিলাম না। রান্নাঘরে থাকলে এদিকের সাড়াশব্দ শোনা যায় না, অনেক ডাকাডাকি করতে হয়। ওপরে আসুন, এখানে বড় ঠাণ্ডা,—বলিয়াই পথ দেখাইয়া উপরে যাইবার সিঁড়িতে উঠিতে লাগিল। দুই-তিন ধাপ উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া হাতের আলোটা নীচু করিয়া বলিল, সাবধানে উঠবেন, সিঁড়ির ইঁট অনেকগুলো খসে গেছে।

ইহার আশঙ্কা যে অমূলক নহে, তাহা চাহিবামাত্রই উভয়ে টের পাইলেন এবং সতর্ক হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কোঠা-বাড়ি। পূর্বে উপরতলায় চার-পাঁচটি ঘর ছিল, তাহার গোটা-দুই একেবারে পড়িয়া গিয়াছে এবং একটা আগামী বর্ষায় পড়িবার জন্য ঠিক হইয়া আছে। বাকী তিনটার মধ্যে সুমুখের ঘরটায় তিনজনেই প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রই বোঝা গেল, অত্যন্ত অনধিকার-প্রবেশ হইয়াছে। মূষিকের দল তখন জীর্ণ ও পুরাতন অব্যবহার্য শয্যা ও উপাধান হইতে তূলা বাহির করিয়া ঘরময় ছড়াইয়া যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া ফিরিতেছিল, অসময়ে আলোক ও জনসমাগমে ছুটাছুটি চেঁচামেচি করিয়া উঠিল। সমস্ত ঘরময় ভাঙ্গা টেবিল-চেয়ার, ভাঙ্গা কাঠের তোরঙ্গ, ভাঙ্গা টিন, খালি শিশি-বোতল এবং আরও কত কি

প্রাচীন দিনের গৃহসজ্জার ভগ্নাংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তাহারি একধারে একটা তক্তপোশ পাতা। ছেঁড়া গদি, ছেঁড়া তোশক, ছেঁড়া বালিশ প্রভৃতি গাদা করিয়া জোর করিয়া একধারে ঠেলিয়া রাখিয়া তাহারই একাংশে একটা মাদুর পাতা রহিয়াছে। এটা অভ্যাগতদের জন্য:

স্ত্রীলোকটি মেঝের উপর কেরোসিনের ডিবাটা রাখিয়া দিয়া কহিল, একটু অপেক্ষা করুন, আমি সংবাদ দিই! বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইবামাত্রই সতীশ জুতাসুদ্ধ সেই অভ্যাগতের আসনটির উপর লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

উপেন্দ্র সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, ও কি ও?

সতীশ ফিসফিস করিয়া তর্জন করিয়া উঠিল, আগে প্রাণ রক্ষে হোক, তার পরে ভদ্রতা রক্ষে হবে; দেখচ না, পায়ের কাছে আলো দেখে ঘরের সমস্ত সাপ-খোপ ছুটে আসচে।

সতীশ যেমন করিয়া ভয় দেখাইল, তাহাতে বিচার-বিতর্কের আর অবসর রহিল না। উপেন্দ্রও লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

তক্তপোশের সেই সংকীর্ণ জায়গাটিতে স্থানাভাবে উভয়ে যখন ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকটি ফিরিয়া আসিয়া সেই সময়ে কবাটের সুমুখে দাঁড়াইয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইঁহারা যে ভয় পাইয়াছেন, তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল। বলিল, এটি আমার শ্বশুরের ভিটা, আপনারা অমর্যাদা করছেন!

উপেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন এবং সতীশের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বিড়বিড় করিতে লাগিলেন, এমনি ভয় দেখিয়ে দিলে,—এমনি করে উঠল—

সতীশ নামিল না। কিন্তু বিনয় করিয়া বলিল, ভয় কি সাধে দেখাই উপীনদা! আমার বিদ্যে চাণক্য শ্লোকের বেশী নয় জানি, কিন্তু এটুকু শিখেচি যে, আত্মরক্ষা অতি শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

স্ত্রীলোকটির পানে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা, আপনিই বলুন দেখি, আত্মরক্ষার্থে একটু নিরাপদ জায়গা বেছে নেওয়া কি অন্যায় কাজ হয়েছে? আপনার শ্বশুরের ভিটার অসম্মান করা আমাদের সাধ্য নয়, বরং যথেষ্ট সম্মাননার সঙ্গেই আপনার আশ্রিত প্রজাপুঞ্জের পথ ছেড়ে দিয়ে এইটুকু জায়গায় দুজনে দাঁড়িয়ে আছি।

তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন। ইহার পরিহাস যে এই দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীটিকে ব্যথিত করে নাই, বরং ইহার ভিতর যে সরলতা ও সমবেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল, এই তরুণী অতি সহজেই তাহা গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা হাস্যোজ্জ্বল মুখের 'পরে ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাইয়া উপেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত আরাম বোধ করিলেন। তাহার মুখপানে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, প্রজাপুঞ্জ আপনার সুমুখে কখনই ওর উপরে অত্যাচার করতে সাহস করবে না। এখন ওই লোকটি বোধ করি নেমে আসতে পারে।

নিশ্চয়, বলিয়া কেরোসিনের ডিবাটা হাতে তুলিয়া লইয়া বধূ সতীশের দিকে চাহিয়া ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া বলিল, এখন নির্ভয়ে রাজদর্শনে চলুন।

এইটুকু হাস্য-পরিহাসেই অপরিচিতের দূরত্বটা যেন একেবারেই কমিয়া গেল, এবং তিনজনেই প্রফুল্লমুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজ-দর্শনেচ্ছু উপেন্দ্র ও সতীশ হাসিমুখে আর একটি ঘরে ঢুকিয়াই শিহরিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ক্রুদ্ধ গুরুমশায়ের অতর্কিত চড় খাইয়া হাস্য-নিরত শিশু-ছাত্রের মুখের ভাবটা যেমন করিয়া বদলায়, এই দুজনের মুখের হাসি তেমনি করিয়া এক-নিমেষে কালি হইয়া গেল।

ক্ষণেক পরে লাঞ্ছিত ভাবটা কাটিয়া গেলে উপেন্দ্র অদূরবর্তী শয্যার নিকটে গিয়া ডাকিলেন,—হারানদা!

হারান নির্জীবের মত পড়িয়া ছিলেন, অস্ফুটে বলিলেন, এস ভাই, এস। আর উঠতে বসতে পারিনে, তোমাকেও ক্লেশ দিলুম। এইটুকু বলিয়াই তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন।

উপেন্দ্র ধপ করিয়া বিছানার একদিকে বসিয়া পড়িলেন। দুই চোখ তাঁহার জলে ভরিয়া গেল এবং সমস্ত বক্ষপঞ্জর দুলাইয়া দিয়া একটা অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস তাঁহার কণ্ঠের প্রান্তসীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কথা কহিতে সাহস করিলেন না—দাঁতের উপর

দাঁত চাপিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন। ওদিকে সতীশচন্দ্র মস্ত একটা কাঠের সিন্দুকের উপর শুষ্কমুখে বসিয়া রহিল।

মলিন ও শতচ্ছিন্ন শয্যার শিয়রে একটা মাটির প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, ঘরে অন্য আলো নাই, এইটুকু আলো রক্তশূন্য বিবর্ণ শীতল মুখের 'পরে লইয়া হারানের জীবন্ত মৃতদেহটা পড়িয়া আছে। সূর্যের উত্তাপ ও আকাশের বায়ু হইতে চিরদিন বিচ্ছিন্ন এই গৃহের অস্থিমজ্জায় যে জীর্ণতা ও অন্ধকার লালিত ও পুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, এই কনকনে শীতের রাত্রে অত্যল্প আলোকে, কুষ্ঠরোগের মত তাহা সমস্ত দেয়ালের গায়ে ফুটিয়া পড়িয়াছে। এই দিবানিশি অবরুদ্ধ গৃহের রুদ্ধ দুষ্ট বায়ু আত্মঘাতীর মুখোদ্গত বিষাক্ত ফেনের মত ফাঁপিয়া ফুলিয়া গৃহবাসীর কণ্ঠনালী যেন প্রতিমুহূর্তে রুদ্ধ করিয়া আনিতেছে। দ্বারে মৃত্যুদূতের প্রহরা পড়িয়াছে। সমস্ত দিকে চাহিয়া সতীশ বারংবার শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে চীৎকার করিয়া ছুটিয়া একেবারে রাস্তার উপর আসিয়া পড়িতে পাড়িলে বাঁচে, এখানে মানুষের জীবন থাকে কি করিয়া? অনতিদূরে বধূটি দাঁড়াইয়া ছিল, সেদিকে একবার চাহিয়াই সে আরো যেন ভয় পাইয়া গেল। কোথায় গেল ঐ অতুল রূপ! কোথায় গেল ঐ হাসি! তাহার দৃষ্টির সম্মুখে যেন কোন্ এক প্রেতলোকের পিশাচ উঠিয়া আসিল। সে ভাবিতে লাগিল, স্বামী যার এই, সে আবার হাসে, পরিহাসে যোগ দেয়, খোঁপা বাঁধে, টিপ পরে! একমুহূর্তের জন্য তাহার সমস্ত নারীজাতির উপরেই ঘৃণা জন্মিয়া গেল।

এমন সময়ে হারান ডাকিলেন কিরণ, উপীন এসেছে মা জানেন?

বধূ কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, মা ঘুমুচ্ছেন। ডাক্তার বলে গেছেন ঘুমুলে তাঁকে যেন জাগানো না হয়।

হারান মুখ বিকৃত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, চুলোয় যাক গে ডাক্তার, তুমি যাও, বলো গে তাঁকে।

উপেন্দ্র নিকটে বসিয়া সমস্তই শুনিতে পাইতেছিলেন, ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আজ রাত্রে জানিয়ে প্রয়োজন নেই হারানদা! কাল সকালে জানালেই হবে।

উপেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন, ক্রমাগত রোগে ভুগিয়া হারান অত্যন্ত খিটখিটে হইয়া গিয়াছে। তাই, এই নিরপরাধিনী সেবাপরায়ণা বধূটির অকারণ তিরস্কারে একটা ব্যথা অনুভব করিয়া একটুখানি সান্ত্বনার ইঙ্গিত করিতে একবার তাহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। কিছুই দেখা গেল না। কিরণময়ীর আনত মুখে দীপের আলোক পড়ে নাই।

মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই কৃষ্ণ বধূ দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উপেন্দ্র বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিলেন, এবং হারান পূর্বের মত হাঁপাইতে লাগিলেন। নিস্তব্ধ কক্ষ সতীশের কাছে আরও ভীষণ হইয়া উঠিল। অনতিকাল পরেই হারান হাত বাড়াইয়া উপেন্দ্রকে স্পর্শ করিয়া কাছে আসিতে ইশারা করিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, সাত-আট বছর পরে দেখা, এর মধ্যে একবারও কি তোমার এখানে আসা হয়নি?

ইহার মধ্যে অনেকবারই উপেন্দ্রকে এদিকে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে পারিলেন না। বলিলেন, অসুখটা কি হারানদা?

হারান কহিলেন, জ্বর, কাসি ইত্যাদি। এখন ও-প্রসঙ্গের আর প্রয়োজন নেই, সমস্তই শেষ হয়েছে।

ওধারে সিন্দুকের উপর উপবিষ্ট সতীশ মনে মনে মাথা নাড়িল।

হারান পুনশ্চ বলিলেন, আমারও তোমার কথা মনে পড়েনি, সময়ে মনে পড়লে হয়ত কাজ হতো।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া নিজেই বলিলেন, কাজ আর কি হতো, তা নয়, থাক গে ও-সব কথা, একটা কাজ করো ভাই, আমার হাজার-দুই টাকার লাইফ-ইন্সিওর আছে, আর আছে এই ভাংগা বাড়িটা, তুমি উকিল, একটা লেখাপড়া করে দাও, যেন সব জিনিসের উপর তোমারি পুরো হাত থাকে। তার পরে রইলে তুমি, আর আমার বুড়ো মা।

উপেন্দ্র বলিলেন, আর তোমার স্ত্রী?

আমার স্ত্রী কিরণ? হাঁ, ও ত আছেই। ওর বাপ-মা কেউ বেঁচে নেই, ওকেও দেখো।

উপেন্দ্র নির্নিমেষ-চোখে মুমূর্ষুর মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

সতীশ পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, উপীনদা, রাত্রি দশটা বেজে গেছে, ওখানে ওঁরা বোধ হয় ব্যস্ত হচ্ছেন।

হারান চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, এটি কে উপীন?

আমার বন্ধু, একসঙ্গেই কলকাতায় এসেছি। এখন তবে আসি হারানদা, কাল সকালেই আবার আসব।

না, কাল নয়, একেবারে কাগজ তৈরী করে পরশু এসো। যা-কিছু আমার আছে, আর যা-কিছু আমার বলবার আছে, সেইদিনেই বলে দেব, কোথায় আছ এখানে?

শহরের একধারে একজন বন্ধুর ওখানে উঠেছি।

যাইতে উদ্যত হইলে হারান ডাকিয়া বলিলেন, কিরণ?

উপেন্দ্র তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, থাক হারানদা! সতীশের পকেটে দেশলাই আছে, স্বচ্ছন্দে নেমে যেতে পারব। তিনি বোধ করি কাজে ব্যস্ত আছেন।

তদুত্তরে হারান কি যে বলিলেন, বোঝা গেল না।

সতীশ কবাট খুলিতেই বোধ হইল কে যেন দ্রুতপদে সরিয়া গেল। সে সভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি সতীশ?

কিছু না—তুমি এস, বলিয়া সে উপেন্দ্রর হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কি নিবিড় অন্ধকার! একে কৃষ্ণপক্ষের আকাশে মেঘ করিয়া আছে, তাহার উপরে চতুষ্পার্শ্বের উঁচু বাড়িগুলো সেই অন্ধকারকে যেন ঠেলিয়া আনিয়া নীচের অপ্রশস্ত উঠানটির উপরে, এই ভাঙ্গা খোলা বারান্দার ভিতরে একেবারে জমাট বাঁধাইয়া দিয়াছে। দুজনে আন্দাজ করিয়া সিঁড়ির নিকটে আসিতেই দেখিলেন, নীচে সেই কেরোসিনের ডিবাটা রাখিয়া কিরণময়ী স্থির হইয়া বসিয়া আছে। যাইতেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আলো দেখাচ্ছি, সাবধানে নেমে আসুন। আপনাদের জন্যই বসে আছি।

এই অন্ধকার শীতল রাত্রে, এই দুরন্ত হিমের মধ্যে স্যাঁতসেঁতে ভিজা মাটির উপর একাকিনী বধূকে তাঁহাদের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এবং তাহার আসন্ন বৈধব্যের কথা মুহূর্তে স্মরণ করিয়া উপেন্দ্রর চোখে জল আসিয়া পড়িল।

সদরের কবাট তখনও বন্ধ করা হয় নাই, নীচে নামিয়াই সতীশ একেবারে গলির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু উপেন্দ্র পিছন হইতে বাধা পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

কিরণময়ী তাহার সকরুণ তীব্র চক্ষু দুটি তাঁহার মুখের উপরে পাতিয়া একটা বিশেষ ভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ক্ষণকালের নিমিত্ত উপেন্দ্র হতবুদ্ধির মত নিশ্চল হইয়া রহিলেন।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল, উপেন্দ্রবাবু, আপনি আমাদের কে?

এই অদ্ভুত প্রশ্নের কি উত্তর উপেন্দ্র ভাবিয়া পাইলেন না। সে পুনরায় বুঝাইয়া বলিল, আপনি আমার স্বামীর কি কোন আত্মীয়? এতদিন এ বাড়িতে এসেছি, কিন্তু কোনদিন আপনার নাম ওঁর কাছেও শুনিনি, মার কাছেও শুনিনি। শুধু যেদিন আপনাকে চিঠি লেখা হয়, সেদিন শুনি—তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি।

বাহির হইতে সতীশ ডাকিল, উপীনদা, এস না!

উপেন্দ্র বলিলেন, না, আত্মীয় নয়—তবে বিশেষ বন্ধু। বাবা যখন নওয়াখালিতে ছিলেন, হারানদার পিতাও সরকারী স্কুলে মাস্টারি করতেন, আমাকেও বাড়িতে পড়াতেন। হারানদা আর আমি অনেকদিন একসঙ্গে পড়ি।

কিরণময়ী একটুখানি হাসিয়া বলিল, ওঃ এই! এর জন্যে লেখাপড়া করা! আচ্ছা উপীনবাবু, আপনি সমস্তই নিজের নামে লিখে নেবেন?

বিলম্ব দেখিয়া সতীশ মুখ বাড়াইয়াছিল, সে-ই চট করিয়া জবাব দিয়া ফেলিল, সেই রকম ত স্থির হয়েছে।

হারানের ঘর হইতে বাহির হইবার সময়ে কে যে দ্রুতপদে বাহিরে সরিয়া গিয়াছিল, তাহা সে পূর্বেই বুঝিয়াছিল।

যদু তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এই যে, আপনিও আছেন। বেশ কথা। ভাল কথা। এতদিন এত কষ্ট করেও যা করে হোক দু'সন্ধ্যা দু'মুঠো জুটেছিল—এখন পথে দাঁড়াতে হবে। তাই হোক, আপনারাই সমস্ত ভাগ করে নিন।

উপেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

সতীশ জবাব দিল, যার জিনিস সে যদি দিয়ে যায়, কারো কিছু বলবার নেই।

কিরণময়ীর দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, আমার আছে। মরণ-কালে মতিচ্ছন্ন হয়, আমার স্বামীর তাই হয়েছে। কিন্তু আপনারা লিখে নেবার কে?

সতীশ কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, তা জানিনে, কিন্তু হারানবাবুর আজো যে বুদ্ধি আছে, আমার অন্তর্যামী এ কথায় সায় দিচ্ছেন।

কিরণময়ী অত্যন্ত বিদ্রূপের স্বরে জবাব দিল, চমৎকার যুক্তি। লোকে কথায় বলে—বাক লোকের কথা। উপেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কিন্তু এই কথা জিজ্ঞাসা করি, আমি কি করে জানব, শেষকালে ইনি পথে বসাবেন না? কেমন করে বিশ্বাস করব, ইনি ফাঁকি দেবেন না?

এতবড় আঘাত হঠাৎ উপেন্দ্রর যেন অসহ্য বোধ হইল; কি একটা বলিতেও গেল, কিন্তু না বলিয়া চুপ করিয়া নিজেকে সামলাইতে লাগিল।

সতীশ মৃদুস্বরে বলিল, বৌঠাকরুন, জানবার আবশ্যক আপনার নেই।

কিরণময়ীও তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারিল না। এই বিদ্রূপাত্মক আত্মীয় সম্বোধনের স্পর্ধায় সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া শুধু কহিল, বৌঠাকরুন! আবশ্যক নেই!

সতীশ বলিল, না। আপনি নিজের অধিকার যদি নিজে নষ্ট না করতেন, হারানবাবুর এ সতর্কতার আবশ্যক ছিল না। অকস্মাৎ রাগারাগি করবেন না—একটু বুঝে দেখুন দেখি।

তীব্র কার্বলিকের গন্ধে সাপ যেমন করিয়া তাহার উদ্যত ফণা মুহূর্তে সংবরণ করিয়া আঘাতের পরিবর্তে আত্মরক্ষার পথ অন্বেষণ করে, এই নিরুপমা, এই লীলা-চঞ্চলময়ী তেজস্বিনী যুবতী চক্ষের পলকে তেমনি সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, আমার কথা উনি কি বলেচেন শুনি?

উপেন্দ্র আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই গর্বিতা নারীর নিষ্ঠুর তিরস্কার তাঁহাকে তপ্তশেলে বিঁধিতে থাকিলেও তাঁহার উচ্চশিক্ষিত ভদ্র-অন্তঃকরণ সতীশের এই গোয়েন্দাগিরির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। সে যে অন্যায় উত্তেজনার দ্বারা কি একটা গুপ্ত রহস্য টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। সতীশকে বাধা দিয়া কিরণময়ীকে বলিলেন, কেন আপনি সতীশের পাগলামিতে কান দিয়ে নিজেকে উত্যক্ত করচেন! স্বামীর বিষয় থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার কারো নেই—আপনি নিশ্চিন্ত হোন। তবে বোধ করি, আপনাদের বিশেষ সুবিধা হবে মনে করেই, হারানদা একটা লেখা-পড়ার কথা তুলেচেন। কিন্তু আপনার অমতে ত কোনমতেই হতে পারবে না। রাত্রি অনেক হয়েছে, কবাট বন্ধ করে দিন। চল্ সতীশ, আর দেরি করিস নে। সতীশকে ঠেলিয়া দিয়া গলির মধ্যে দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কাল-পরশু আবার দেখা হবে—নমস্কার।

তের

সেই জনশূন্য গলি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দুইজনে একটা ভাড়াটে-গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন এবং খোলা জানালার ভিতর দিয়া রাস্তার মন্দীভূত জনস্রোতের পানে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। কথা কহিবার মত মনের অবস্থা কাহারও ছিল না। উপেন্দ্র যাইতে-যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, কালই বাড়ি ফিরিয়া যাইব। ভাল হোক, মন্দ হোক, আমার হাত দিবার প্রয়োজন নাই। শুধু ফিরিবার পূর্বে এইটুকু দেখিয়া যাইব যে হারানদার চিকিৎসা হইতেছে—তার পরে? তার পরে আর কিছুই নয়—আট বৎসর যে লোক মনের বাহিরে পড়িয়াছিল,

সে বাহিরেই পড়িয়া থাকিবে। এই বলিয়া দেহ-লগ্ন কীট-পতঙ্গের ন্যায় এই বিরক্তিকর চিন্তাকে গা-ঝাড়া দিয়া সবেগে দূরে নিক্ষেপ করিয়া উপেন্দ্র গাড়ির মধ্যেই একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, সতীশ, একটা চুরুট দে ত রে, ভারী ঠাণ্ডা।

সতীশ পকেট হইতে চুরুট প্রভৃতি বাহির করিয়া হাতে দিয়া তেমনি বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না।

উপেন্দ্র চুরুট ধরাইয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ ধূমোদ্গার করিতে করিতে সতীশকে শুনাইয়া বলিলেন, ভিতরের অন্ধকার যেন এমনি করে ধুঁয়োর মত বার হয়ে যায়।

সতীশ সায় দিল না।

ঝড়্-ঝড়্ করিয়া ভাড়াটে-গাড়ি পরিচিত অপরিচিত রাস্তা-গলি ঘর-বাড়ি দোকান-বাজার পার হইয়া চলিতে লাগিল, চুরুট পুড়িয়া গেল, তাহার ধুঁয়া কোথায় আকাশে মিলাইয়া গেল, তথাপি দুইজনে রাস্তার দুইধারে তেমনি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন। উপেন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন, সতীশ নিশ্চয়ই এই সমস্ত আন্দোলন করিতেছে এবং যা হোক একটা কিছু স্থির করিতেছে, না হইলে সে এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার লোক নহে; এবং কি যে সম্ভবতঃ তাহার আলোচ্য বিষয় সেই অনুমান করিতে গিয়া উপেন্দ্রের আগাগোড়া সমস্তই স্মরণ হইয়া গেল। গোপনে শিহরিয়া উঠিয়া মনে মনে বলিলেন, কি কাণ্ডই ঘটিয়াছে! এবং যাহা ঘটিয়াছে, তাহা যতই শোচনীয় হউক না কেন, সমস্তরই একটা সঙ্গত হেতু তিনি ইতিমধ্যে নির্দেশ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু সতীশ যে কি দেখিয়া এই অসহায়া অপরিচিতার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেইটাই কোনমতে বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। বাড়ির বধূ যে নিজের উদ্যত বিপদের আশঙ্কা হইতে শুদ্ধমাত্র আত্মরক্ষার জন্যও দুটা রূঢ় কথা বলিতে পারে, এমন সোজা কথাটাও যে সতীশ বুঝিতে পারে নাই, এইটাই তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। সতীশ লেখাপড়া না করুক, নির্বোধ নহে। উপেন্দ্র ইহা জানিতেন বলিয়াই এত বেশী পীড়া অনুভব করিলেন। মুমূর্ষু হারানের উইলের প্রস্তাবে একটা বিশেষত্ব ছিল বলিয়াই উপেন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক কথা ভাবিয়াছিলেন। বাল্যসখার জীবন্মৃত দেহটার পাশে বসিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই অনাথা রমণী দুটির যাবজ্জীবন ভরণপোষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। একটা স্বাস্থ্যকর তীর্থে একটি ছোট রকমের বাড়ি কিনিয়া দিবেন। তাহা গাছপালা দিয়া, সৎ ও ভদ্র প্রতিবেশী দিয়া, শান্ত অথচ সুদৃঢ়ভাবে ঘেরা থাকিবে। গৃহপালিত গো-বৎসের সেবা করিয়া, অতিথি-ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া বার-ব্রত আচরণ করিয়া এই দুটি নারীর দিনগুলি যেমন করিয়া অতিবাহিত হইয়া যাইবে, ইহার খসড়া-চিত্রটাই কল্পনায় মধুর হইয়া উঠিয়াছিল। এই ছবিটির একধারে গাছপালার আড়ালে, সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পিছনে নিজের একটুখানি স্থান বোধ করি আপন অজ্ঞাতসারেই চিহ্নিত করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, এমনি সময়ে কিরণময়ীর কদর্য অভিযোগ, সংশয়ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ তপ্তশ্বাস ঘূর্ণা ঝড়ের মত সে ছবির চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত করিয়া দিল। উপেন্দ্র আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ডাকিয়া বলিলেন, সতীশ কি ভাবছিস রে!

সতীশ বাহির হইতে দৃষ্টি সরাইয়া লইয়া উপেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, ভাবচি কি জানো উপীনদা, ছেলেবেলায় একটা বাংলা নভেল পড়েছিলাম—সেই কথাই ভাবছি!

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিলেন, কি নভেল?

সতীশ বলিল, নাম মনে নেই। গ্রন্থকারের নামটাও ঠিক মনে পড়ে না—কিন্তু খুব বড়লোক। কিন্তু গল্পটা স্পষ্ট মনে আছে—এমনি সুন্দর।

উপেন্দ্র কৌতূহলী হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সতীশ অনুযোগের স্বরে বলিল, চিরকাল ইংরেজী পড়েই দিন কাটালে উপীনদা, কোনও দিন বাংলার দিকে চাইলে না। কিন্তু আমাদের দেশে এমন সব বই আছে যে, একবার পড়লে জ্ঞান জন্মে যায়। এই বলিয়া সে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

উপেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, আগে গল্পটা বল্ শুনি, তার পরে দেখা যাবে, কতটা জ্ঞান জন্মায়।

সতীশ হাসিল। রাগ করবে না বল?

না—তুই বল্।

সতীশ বলিল, অতি সুন্দর গল্প। বইতে লেখা আছে, একজন বড়লোক জমিদার নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ মেঘ করিয়া ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল। তিনি ত ভয়ে ডাঙায় উঠিয়া পড়িলেন। সুমুখের একটা মস্তবড় ভাঙ্গা-বাড়ি, বৃষ্টির ভয়ে তাহাতেই ঢুকিলেন, বাড়িটার ঘরে ঘরে অন্ধকার—জনমনুষ্য নাই। সমস্ত বাড়িময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষে উপরের একটা ঘরে দেখিলেন, মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং ছেঁড়া-বিছানায় একটা লোক মর-মর হইয়া পড়িয়া আছে এবং তাহার পদ্মপলাশাক্ষী রূপসী স্ত্রী লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতেছে। সে রাত্রে সে কি-একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছিল। আচ্ছা উপীনদা, তুমি স্বপ্ন বিশ্বাস করো?

উপেন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, না। তার পরে?

সতীশ বলিল, তার পরে সেই রাত্রেই লোকটা মারা গেল। জমিদারবাবু সেই পদ্ম-পলাশাক্ষী বিধবাকে ঘরে আনিয়া জোর করিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। চতুর্দিকে ছি ছি পড়িয়া গেল। আর সেই দুঃখে তাঁর প্রথম স্ত্রী বিষ খাইয়া আত্মঘাতী হইলেন।

পুনঃ পুনঃ পদ্মপলাশাক্ষীর উল্লেখে উপেন্দ্র বুঝিলেন, সতীশ বিষবৃক্ষের পঙ্কোদ্ধার করিতেছে এবং সতীশের এই অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির পরিচয়ে অন্য সময়ে বোধ করি খুব হাসিতেন, কিন্তু এখন হাসি আসিল না। এই এলোমেলো আখ্যানের ভিতর হইতে একটা কুৎসিত ইঙ্গিত তীরের মত আসিয়া তাঁহার বুকে বিঁধিল। এ ত সতীশের স্মৃতি নয়—এ তাহার আশঙ্কা। এই আশঙ্কা যে কি, এবং কাহাকে আশ্রয় করিয়া বিষবৃক্ষের ডাল-পালা ভাঙ্গিয়া নিজের ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই কথাটা মনে করিয়া উপেন্দ্র গভীর লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

সতীশ অন্ধকারে দেখিতে পাইল না যে, ক্ষণকালের নিমিত্ত উপেন্দ্রর মুখ পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে। সতীশ ব্যথার উপর ব্যথা দিয়া পুনরায় কহিল, খাল খুঁড়ে কুমীর এনো না উপীনদা।

উপেন্দ্র উত্তর দিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, বাংলা নভেলের কথা থাক। কিন্তু কি রকম উপদেশ দিতে চাও শুনি?

সতীশ হাসিয়া বলিল, এই দেখ উপীনদা, তুমি রাগ করেচ। তোমাকে উপদেশ আমি দিতে পারিনে—কিন্তু পা ধরে অনুরোধ করতে পারি, ওখানে তোমার গিয়ে কাজ নেই—ওঁরা ভাল লোক নন।

ওঁরা-টা কারা শুনি?

সতীশ বলিল, রাগ কোরো না উপীনদা, বহুবচনটা ভদ্রতা মাত্র। আমি হারানবাবুর কথা বলিনি—তিনি ভাল-মন্দের বাইরে গিয়েছেন। তাঁর মাকেও চোখে দেখিনি, আমি তৃতীয় ব্যক্তির উল্লেখ করেচি।

তৃতীয় ব্যক্তির অপরাধ? দেখ সতীশ, তোমার বাবা যদি আর একজনকে তাঁর সর্বস্ব লিখে দেবার সঙ্কল্প করেন, তুমি বোধ করি, খুব আনন্দ কর, না?

না; আশীর্বাদ করো উপীনদা, বাবার যেন সে দরকার না হয়। তিনি আমাকে তাঁর ভাল ছেলে বলে আহ্লাদ করেন না জানি, আমি তাঁর মন্দ ছেলে, কিন্তু এই মন্দ ছেলেটি তাঁর মৃত্যুর সময় সাজগোজ করে টিপ পরে ঘুরে বেড়াবে না। আজ আমার বাচালতা মাপ কর উপীনদা, কিন্তু, তোমার একটুখানি চোখ থাকলেও দেখতে পেতে, হারানবাবুর এ-রকম প্রস্তাব কেবল খেয়াল নয়, বরং অনেকদিনের অনেক চিন্তার ফল।

সতীশ পুনশ্চ বলিল, তুমি মনে কোরো না উপীনদা, হারানবাবু তোমাকে সমস্ত ভারার্পণ করবার সময়ে তাঁর স্ত্রীর কথাটাই ভুলে ছিলেন, কিংবা লজ্জায় বলতে পার-ছিলেন না। বরং আমার বিশ্বাস, তুমি যদি নিজে উল্লেখ না করতে, তিনি স্বেচ্ছায় কোন কথাই বলতেন না।

উপেন্দ্র মনে মনে বৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইতে থাকিলেও এতক্ষণ পর্যন্ত মৌন হইয়া শুনিতেছিলেন; কিন্তু পরস্ত্রী সম্বন্ধে এই সমস্ত সন্দিগ্ধ ইঙ্গিত তাঁহার অসহ্য হইয়া

উঠিল। কঠোরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, সতীশ, তুমি যে এত ইতর হয়ে গেছ, আমার ধারণা ছিল না; বোধ করি, তুমি আলাপ পরিচয়েরও নীচে গেছ।

সতীশ হাসিল। বলিল, ইতর কিসে? মন্দকে মন্দ বলচি, এইজন্যে?

ভাল হোক মন্দ হোক, তোমার অধিকার?

অধিকার আবার কি! ওটা ইংরাজী কথা, বাংলায় ওর মানে হয় না। আমাদের সমাজে অত সূক্ষ্ম বিচার চলে না। জেলখানার কয়েদীকে চোর বলতেও অনেকে আপত্তি করেন, কিন্তু সে কথা ত সাধারণ পাঁচজনে মেনে চলতে পারে না।

সেটা আলাদা কথা। চুরি প্রমাণ হবার পরে তাকে চোর বলে, চোর জেলে যায়, কিন্তু এ'র সম্বন্ধে কি প্রমাণ তুমি পেয়েছ?

প্রমাণ না হয়েও অনেকে জেলে যায়, সেটা জজসাহেবের হাতে। তোমরা যেটা বুঝতে পারিনে, তিনি সেটা বোঝেন। আবার তুমি-আমি যেটা জলের মত সোজা দেখি, অতবড় জজসাহেবের কাছে হয়ত সেটা পাহাড়-পর্বত! আজ তোমার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। মনে কোরো না ভুল বকচি উপীনদা। এতবড় দুনিয়াটা চোখের উপর রেখেও অনেকে ঈশ্বরের প্রমাণ খুঁজে পায় না। তুমি রাগ করবে জানি, কেননা চিরকালটা তুমি ভালর সঙ্গে মিশে, ভাল দেখে, ভাল হয়েই আছ, কিন্তু আমার মত ভাল-মন্দ দেখে যদি পাকা হতে, আমার এত কথা বলবার আবশ্যক হতো না, তোমার নিজের চোখেই অনেক জিনিস ধরা পড়ে যেত!

উপেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, সমস্ত জিনিস চোখে পড়বার প্রয়োজন আমার নেই, কিংবা পাকা হবার জন্যে তোর মত ইতর হতেও পারব না। তুই এ প্রসঙ্গ বন্ধ কর, গাড়ি ফটকের মধ্যে ঢুকছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিস সতীশ, কাঁচার দাম যে কি, সে কেবল তখন বুঝবি যখন আরও পাকা হবি।

পরদিন উঠিতে উপেন্দ্রর বেলা হইয়া গেল। বহুক্ষণ সূর্যোদয় হইয়াছে, তাহা জানালার ফাঁক দিয়া আলোর পানে চাহিয়াই বোঝা গেল। উপেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। ঘরে সতীশ ছিল না, সে কোথায় গিয়াছে। বাহিরে বেহারা দাঁড়াইয়া ছিল, আসিয়া সংবাদ দিল, সতীশবাবু সামনের বাগানে কুস্তি করিতেছেন এবং নীচে চা দেওয়া হইয়াছে, তথায় সাহেব প্রভৃতি অপেক্ষা করিয়া আছেন।

উপেন্দ্র অবিলম্বে প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিতেই জ্যোতিষ হাত ধরিয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত করিলেন। সেখানে তাঁহার ভগিনী সরোজিনী অপেক্ষা করিয়া ছিলেন। তিনি খবরের কাগজটা ফেলিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিলেন, কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত আমরা আপনাদের পথ চেয়ে বসেছিলুম। শেষে মেজদা বললেন, নিশ্চই কোন নির্দয় বন্ধু পথ হতে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছেন, এবং আপনারা হয়ত রাত্রে ফিরতেই পারবেন না। ফিরতে কাল কত রাত্রি হয়েছিল উপীনবাবু?

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, বারোটা। বিশেষ কাজে আবদ্ধ হয়ে গিয়ে সকলকে ক্লেশ দিয়েছি।

জ্যোতিষ বলিলেন, সেটুকু আমরা বুঝি। আমরা মনে করিনি, তোমরা মিছামিছি পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে। সতীশবাবু গেলেন কোথায়?

বেহারা হাজির হইয়া নিবেদন করিল, সতীশবাবু বাগানের ওদিকে কুস্তি করিতেছেন এবং তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

বেহারা চলিয়া গেলে, জ্যোতিষ উপেন্দ্রর দিকে চাহিয়া বলিলেন, কুস্তি কি হে! আরো কেউ আছেন নাকি?

উপেন্দ্র বলিলেন, আমি ত জানিনে। কুস্তি বোধ হয় নয়, ছেলেবেলা থেকে ওর ব্যায়াম করা অভ্যাস, তাই কোনও রকম কিছু করচে বোধ হয়।

সরোজিনী কাল দুপুরবেলা মিউজিয়ম দেখিতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পরে বাড়ি ফিরিয়া শুনিতে পান, উপেন্দ্রবাবু ও তাঁহার বন্ধু আসিয়াছেন। তখন কিন্তু ইঁহারা পাথুরেঘাটার উদ্দেশে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশবাবু কে উপীন-বাবু? আমি ত দেখিনি।

কাল যে সময়ে আমরা আসি, আপনি ছিলেন না। সতীশ আমার ছেলেবেলার বন্ধু, যদিও বয়সে অনেক ছোটো—ঐ যে—

সতীশ ঘরে প্রবেশ করিল। কি সুন্দর বলিষ্ঠ উন্নত দেহ! কপালে তখনও বিন্দু বিন্দু ঘাম রহিয়াছে, সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখে রক্তাভা পড়িয়া আরও সুন্দর দেখাইতেছে।

সরোজিনী মুহূর্তমাত্র চাহিয়াই চোখ নত করিলেন।

জ্যোতিষ বলিলেন, বেহারা বলছিল, আপনি কুস্তি করছিলেন। কিন্তু কুস্তিই করুন, আর যাই করুন, আপনার দেহের দিকে চাইলে হিংসে হয়, আমাদের মত চার-পাঁচজনেও বোধ করি আপনার কাছে ঘেঁষতে পারে না।

সতীশ একটুখানি হাসিয়া বলিল, বিনা-পরীক্ষায় অতবড় সার্টিফিকেট দেবেন না। তা ছাড়া শুধু গায়ের জোর নিয়েই বা কি হবে, আমার আর কোন জোরই নেই।

কথার শেষদিকটায় দুঃখের আভাস বাজিল। সরোজিনী চা ঢালিতে ঢালিতে মনে মনে আন্দাজ করিলেন, সতীশবাবুর সাংসারিক অবস্থা বোধ করি ভাল নয়। জ্যোতিষ পূর্বেই উপেন্দ্র নিকট সমস্ত শুনিয়াছিলেন, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে চায়ের বাটি-গুলি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সতীশ সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া দেয়ালে টাঙ্গানো একটা ছবির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

জ্যোতিষ বলিলেন, আসুন সতীশবাবু, সমস্তই প্রস্তুত।

সতীশ সরিয়া আসিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আপনারা শুরু করে দিন, আমি স্নান না করে কিছুই খাইনে।

বিলক্ষণ! আমি ত এ কথা জানিনে, তবে যান, আর দেরি করবেন না,—বেয়ারা—

না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। স্নান আমার যথাসময়েই হবে, তা ছাড়া সকালবেলা খাওয়া আমার অভ্যাস নেই। মধ্যাহ্নের ভোজনটা আমার সাধারণ পাঁচজনের চেয়ে কিছু বেশী—সেটা অসময়ে চা প্রভৃতি বাজে জিনিস খেয়ে নষ্ট করতে ভালবাসি নে। তার চেয়ে আমি ঐ হারমনিয়মটা খুলে দুটো ভজন করি, আপনাদের দু'কাজই চলুক।

গান গাইবার প্রস্তাবে সরোজিনী অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, সেই ভাল। কিন্তু পরক্ষণেই অপ্রতিভ হইয়া মুখ নত করিল। কথাটা তাহার নিজের কানেও কেমন কেমন শুনাইল। জ্যোতিষ হাসিয়া বলিলেন, বোনটি আমার গান পেলে আর কিছুই চায় না। না না সতীশবাবু, আপনি—

উপেন্দ্র এতক্ষণ চুপ করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেছিলেন, বলিয়া উঠিলেন, না না তবে কি? ও স্নান না করে খায় না, সকালবেলা খায় না। আমরা ওকে ক্রমাগত সাধ্য-সাধনা করতে থাকি, আর চা'র বাটি ঠাণ্ডা জল হয়ে যাক। নে সতীশ, তোর কি ভজন-টজন আছে সেরে নে, আমার আরও কাজ আছে। বলিয়া চা'র বাটি মুখে তুলিয়া দিলেন।

জ্যোতিষ মনে মনে অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

সতীশ দূরে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, ইহার পরে আর তাহার গান গাহিবার উৎসাহ রহিল না। সরোজিনী বিমর্ষ হইয়া নতমুখে চা নাড়িতে লাগিলেন।

উপেন্দ্র চা খাইতে খাইতে বলিলেন, কোথাও ওকে নিয়ে যদি স্বস্তি পাওয়া যায়! এমন ছিষ্টিছাড়া স্বভাব ওর, একটা-না-একটা কিছু বাধিয়ে দেবেই। ও যে সকালবেলা গান গাইবার বদলে সানাই বাজাবার প্রস্তাব করেনি, এই ভাগ্য।

কথাটার মধ্যে যে সত্যের আভাস বিন্দুমাত্রও ছিল, তাহা কেহই অনুমান করিতে না পারিয়া পরিহাসচ্ছলে সকলেই হাসিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চা-খাওয়া চলিতে লাগিল। ওদিকে সতীশ আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া ঘরের ছবিগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর এক সময়ে সরোজিনী আস্তে আস্তে উপেন্দ্রকে বলিলেন, সকালে আপনি গান শুনতে দেননি, আপনার ভারী অন্যায়।

উপেন্দ্র বলিলেন, আচ্ছা, এ বেলা তার প্রতিকার হতে পারবে, আসুক সতীশ।

জ্যোতিষ বলিলেন, বাস্তবিক উপেন, যে ঠাণ্ডা পড়েছে, কোথাও বার হতে ইচ্ছা হয় না, একটু গান-বাজনা হলে মন্দ হতো না। কিন্তু সতীশবাবু কৈ? ডাক্তারি করতে যাননি ত?

উপেন্দ্র বলিলেন, হতেও পারে। আলাপী বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেছে বোধ হয়।

সরোজিনী আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, সতীশবাবু ডাক্তার বুঝি?

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ।

জ্যোতিষ বলিলেন, না হে উপেন, শুধু স্কুলে পড়লে হবে না। কোন ভাল হোমিওপ্যাথের সঙ্গে যদি কিছুদিন ঘুরে বেড়াতে পারেন, তা হলেই কিছু শিখবেন। না হলে ঐ যে কথায় বলে, শতমারী সহস্রমারী—কেবল মেরে মেরেই বেড়াবেন! আমি একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে জুটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু কেমন বনিবনাও হয় বলা যায় না—তুমি যে-রকম সার্টিফিকেট দিচ্ছ—

উপেন্দ্র বলিলেন, লোক ভাল হলে নিশ্চয় বনবে, অন্যথায় রক্তারক্তি ঘটবে।

সরোজিনী বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন, জ্যোতিষ বলিলেন, আরও ভাল।

উপেন্দ্র বলিলেন, ভালই। ওকে চিনতে পেরে, ওর দোষগুণ সমস্ত বুঝে নিয়ে, যে ওর মন পাবে, সে বড় ভাল জিনিসটিই পাবে। কিন্তু পাওয়াই শক্ত। ও যে জটিল বা দুর্বোধ তা নয়, বরং খুব সোজা, খুব স্পষ্ট। আমার মনে হয়, এত স্পষ্ট বলেই মানুষে ওকে ভুল বোঝে। মতে অনৈক্য হলে আমরা যেখানে ভদ্রতার দোহাই পাড়ি এবং শিষ্টভাবে মতভেদ করে মন ভার করে চলে আসি, ও সেখানে হাতাহাতি করে মীমাংসা করেই আসে, মন ভার করে আসে না। ছেলেবেলা থেকে ওকে জানি, কখনও দেখিনি ওর মুখের কথা আর মনের কথা আলাদা হয়েছে। এত ভালবাসি এইজন্যেই।

জ্যোতিষ হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, এইজন্যেই সাধারণের মাঝে নিয়ে চলাফেরা শক্ত বলছিলে?

জ্যোতিষের দিকে তখন উপেন্দ্রর মন ছিল না। তাই তাঁহার কথাগুলো কানে গেলেও অন্তরে প্রবেশ করিল না। বাল্যবন্ধুর বিরুদ্ধে কাল রাত্রির ব্যবহার ও রূঢ় ভাষা তাঁহাকে ভিতরে ভিতরে ক্লেশ দিতেছিল, সেইজন্য কথায় কথায় মন তাঁহার গত দিনের অতি নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিশোর-দিনের ছোট-বড় কলহ-বিবাদে বিভিন্ন পাড়ার সম ও অসম-বয়সীদের সহিত হাতাহাতি, পেটাপেটি, বাদ-বিসংবাদ এবং আরও অনেক আপদ-বিপদে সর্বত্র সতীশ তাহার মস্ত দেহ ও মস্ত জোর লইয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই সমস্ত স্মৃত ও বিস্মৃত কাহিনীর মাঝখানে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিল এবং জ্যোতিষের কথায় উপেন্দ্র যখন বলিলেন, হ্যাঁ এই-জন্যই। ঠিক এইজন্যই চিরকাল ওকে এত ভালবাসি। জ্যোতিষ ও সরোজিনী উভয়েই বিস্মিতমুখে চাহিয়া রহিলেন। এই অসংবদ্ধ কথার কেহই অর্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নেরও সময় রহিল না। নিঃশব্দে পর্দা সরাইয়া সতীশ প্রবেশ করিল। তাহাকে প্রথমে দেখিতে পাইলেন সরোজিনী। তিনিই আনন্দকলরবে সংবর্ধনা করিয়া উঠিলেন—বেশ হয়েছে, সতীশবাবু এসে পড়েছেন।

সতীশ নীরবে সকলকে চাহিয়া দেখিয়া হাসিমুখে বলিল, আমার কথা হচ্ছিল বুঝি! উপীনদা আমাকে আর মুখ দেখাতে দেবে না, বলিয়া অনতিদূরে একটা কোচের উপর বসিতে গেলে, উপেন্দ্র হাত দিয়া হারমনিয়ম যন্ত্রটা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, একেবারে ঐখানে গিয়ে বসো, সরোজিনী এইমাত্র আমাকে দোষ দিচ্ছিলেন, শুধু আমার জন্যেই ও-বেলা গান হতে পারনি।

সতীশ নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া সকৌতুকে বলিল, এখন ত গান হতে পারবে না—এটা যে আমার সানাই বাজাবার সময় উপীনদা!

সে রাত্রে একটু অধিক রাত্রে সভা ভাঙ্গিবার পরে বিছানায় শুইয়া সরোজিনী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, উনি যদি আমাদের কোনো আত্মীয় হতেন ত ওঁর কাছেই শিখতুম। সঙ্গীত-শিক্ষার জন্য তাহার একজন হিন্দুস্থানী ওস্তাদ নিযুক্ত ছিল। ইহারই স্থানে সতীশকে কল্পনা করিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িল।

চোদ্দ

উপেন্দ্র ও সতীশ চলিয়া গেলে কবাট বন্ধ করিয়া সেইখানেই কিরণময়ী দাঁড়াইয়া রহিল। অন্ধকারে তাহার চোখ দুটো হিংস্র জন্তুর মতই জ্বলিতে লাগিল। তার মনে হইতে লাগিল, ছুটিয়া গিয়া কাহারো বক্ষঃস্থলে দংশন করিতে পারিলে সে বাঁচে। হাতের দীপটা উঁচু করিয়া ধরিয়া উন্মাদ ভঙ্গী করিয়া বলিল, আগুন ধরিয়ে দেবার উপায় থাকলে দিতুম। দিয়ে যেখানে হোক চলে যেতুম। ডাকাডাকি চেঁচাচেঁচি করে একটু একটু করে পুড়ে মরত, শত্রুতা করবার সময় পেত না। শীতের রাত্রেও তাহার কপালে মুখে ঘাম দিয়াছিল। সেগুলো হাত দিয়া মুছিতে মুছিতে সহসা নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, কেন সংবাদ দিতে দিলুম! কেন নিজের পায়ে কুড়ুল মারলুম! কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি, সমস্তই ওই হতভাগী বুড়ীর কাজ। ছেলের সঙ্গে মতলব করে ও-ই এমন ঘটিয়েছে।

সতীশের কথাগুলো বিছার কামড়ের মত রহিয়া রহিয়া জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। এই দুটি লোক যে কতক শুনিয়াছে, তাহাতে তাহার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কত এবং কি কি শুনিয়াছে, সেইটা নিশ্চয় বুঝিতে না পারিয়া সে আরও ছটফট করিতে লাগিল। তাহাকে স্বামী ও শাশুড়ী দুজনে মিলিয়া বুঝাইয়াছিল, উপীনের মত লোক নাই। সে আসিয়া পড়িলে আর কোনো দুঃখ থাকিবে না। কেন সে বিশ্বাস করিয়াছিল! কেন সে নিজের হাতে চিঠি লিখিয়া দিয়াছিল! অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে প্রাঙ্গণের একধারে দাঁড়াইয়া এই ক্রোধোন্মত্তা নারী ইহাদিগকে মিথ্যাবাদী, কুচক্রী, শয়তান, শয়তানী প্রভৃতি কত কি বলিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিল না! ক্রোধ ও হিংসা তাহার হৃদয়ে যে আক্ষেপ তুলিয়াছে তাহার কণামাত্র প্রকাশ করিবার ভাষাও তাহার মনে পড়িল না। তখন সে কায়মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন ওই অর্ধমৃত মানুষটির রাত্রি আর না পোহায়।

দিন-দুই পরে সকালে কিরণ রান্নাঘরে বসিয়া তরকারি কুটিতেছিল, ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, ডাক্তারবাবু এসেছেন।

কিরণ বঁটি হইতে মুখ না তুলিয়া বলিল, মা আজ ভাল আছেন। তাঁকে বল্ গে।

ঝি কিছু আশ্চর্য হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তিনি সেই ও-ঘরেই বসে আছেন।

তাহার কথার বিশেষ অর্থটার দিকে কিরণ লেশমাত্র মনোযোগ না দিয়া সহজভাবে কহিল, ওর ওষুধ কেউ ত খায় না, তবু কেন যে ও আসে জানিনে। তুই নিজের কাজে যা, ও আপনিই চলে যাবে।

এই ডাক্তারটির ঔষধ যে ব্যবহারে আসে না, ঝির নিকট ইহা নূতন সংবাদ নহে। সুতরাং উল্লেখের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু কেন যে সে আসে, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ নূতন। সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, কাল সন্ধ্যার সময় সে ঘরে গিয়াছে, ইহার মধ্যে হঠাৎ কি এমন ঘটিল যে ডাক্তারের এ বাটীতে আসা অনাবশ্যক হইয়া উঠিল! তথাপি সাহস করিয়া আর একবার বলিল, না হয় তরকারি আমি কুটে দিচ্চি, তুমি একবার যাও না।

কিরণময়ী সহসা অত্যন্ত রুক্ষভাবে বলিয়া উঠিল, তুই যা যা। নিজের কিছু কাজকর্ম থাকে ত কর গে।

এই আকস্মিক ও অত্যন্ত অনাবশ্যক উগ্রতায় ঝি এতটুকু হইয়া গেল। এ বাড়িতে সে খুব পুরাতন না হইলেও একেবারে নূতন নয়। ইতিপূর্বে এরূপ অকারণ তীব্রতার পরিচয় পাইয়াছে. কিন্তু ঠিক এমন ধারাটি সে স্মরণ করিতে পারিল না। আর কোন সময়ে সেও বোধ করি রাগ করিত, কিন্তু আজ করিল না, অতি-বিস্ময়ে সে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে ও-ঘরে দ্বারের কাছে আসিয়া ডাক্তারকে বলিল, তিনি কাজে ব্যস্ত আছেন, এখন আপনি যাও।

ডাক্তার পায়ের কাছে ব্যাগটা রাখিয়া সেই তক্তপোশটার উপরেই উদ্বিগ্ন-মুখে বসিয়াছিল. কহিল, ব্যস্ত আছে কি গো! কাজ আমারো ত আছে!

ঝি বলিল, তবে যাও না বাবু।

ডাক্তার অবাক হইয়া গেল; কহিল, একবার বল গে, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।

ঝি বলিল, আপনি বোঝ না কেন ডাক্তারবাবু! আমি খুব বলেছি—আর বলতে পারব না। ও-সব আমি কিছু জানিনে, আজ আপনি যাও, বলিয়া সে চলিয়া গেল।

এই অবহেলা ও লাঞ্ছনা প্রথমটা ডাক্তারকে গভীর আঘাত করিল, কিন্তু পরক্ষণেই একটা লজ্জাকর দুর্ঘটনার সম্ভাবনা তাহার মনে উদয় হইবামাত্রই সে ভিতরকার ব্যাপারটা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার অপেক্ষা করিয়া থাকিতে আপত্তি ছিল না এবং অপেক্ষা করিয়াই রহিল, কিন্তু কেহই ফিরিয়া আসিল না। তখন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কি ভাবিয়া চলিয়া যাইবে মনে করিয়া হাতব্যাগটা তুলিয়া লইয়া মুখ তুলিয়াই দেখিল, দ্বারের সম্মুখে কিরণময়ী। ডাক্তার উদ্যত অভিমান দমন করিয়া বলিল, একটু সরো, বড় দেরি হয়ে গেল, আরো অনেক রুগী পথ চেয়ে বসে আছে—মা ভাল আছেন আজ?

ভাল আছেন, বলিয়া কিরণময়ী পথ ছাড়িয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তারের কিন্তু পা উঠিল না। অথচ যাওয়ার প্রস্তাব নিজে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাও শক্ত হইয়া পড়িল।

কিরণময়ী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, যাও না।

ডাক্তার মুখ তুলিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; কহিল, তুমি কি মনে কর আমি যেতে জানিনে?

আমি কি পাগল যে মনে করব তুমি যেতে জান না? হ্যাঁ ডাক্তার, কতগুলি রুগী তোমার পথ চেয়ে আছে শুনি? বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল।

কুপিত ডাক্তারের প্রথমে ইচ্ছা করিল ঐ মুখ চড় মারিয়া বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু সেটা ত সম্ভব নহে, শুধু বলিল, যাও তুমি।

আমি যাব কোথায়? বাড়ি আমার, যেতে হলে তোমাকেই হয়।

আমি যাচ্ছি, বলিয়া সে গমনোদ্যত হইতেই কিরণময়ী দুই চৌকাটে হাত দিয়া পথরোধ করিয়া বলিল, যাচ্চো, কিন্তু জেনে যাও, এই যাওয়াই শেষ যাওয়া।

তাহার কণ্ঠস্বর ও মুখের বিস্ময়কর পরিবর্তনে ডাক্তার শঙ্কিত হইল। কিন্তু মুখে বলিল, বেশ তাই, এই শেষ যাওয়া।

কিরণময়ী বলিল, সত্যিই শেষ যাওয়া। যখন এসে পড়েছ তখন স্পষ্ট করেই সবটা জেনে যাও। আচ্ছা, ঐ ওখানে বসো, সমস্ত খুলে বলচি, বলিয়া ডাক্তারের হাতব্যাগটা লইয়া নিজে মেঝের উপর রাখিয়া দিল এবং হাত দিয়া চৌকি দেখাইয়া দিয়া বলিল, রাঁধতে হবে, বেশী সময় নেই, সংক্ষেপে বলচি—

এমন সময়ে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, দু'জন বাবু আসচে। সেই সঙ্গেই নীচে জুতার শব্দ শুনিয়া কিরণময়ী ব্যাধ-ভয়ে ভীতা হরিণীর ন্যায় ঝিকে সবেগে ঠেলিয়া দিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। ডাক্তার ও ঝি আশ্চর্য হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনতিকাল পরেই জুতার শব্দ দ্বারের কাছে আসিয়া থামিল। ডাক্তার দেখিল, দুটি অপরিচিত ভদ্রলোক। ভদ্রলোক দুটি দেখিলেন, ডাক্তার। তাঁহার কোটের পকেট হইতে বুক-পরীক্ষার চোঙটা গলা বাড়াইয়া পরিচয় জানাইয়া দিল। উপেন্দ্র সতীশ দেখিলেন ডাক্তারের মুখ অতিশয় শুষ্ক। দুর্ঘটনা আশঙ্কা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার নীরব। মুখ তাহার আরো কালি হইয়া গেল।

উপেন্দ্র অধিকতর শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এখন কি রকম দেখলেন?

তথাপি ডাক্তার কথা কহিল না, বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

ঝি কহিল, তুমি যাও না ডাক্তারবাবু, এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া ব্যাগটা তুলিয়া বলিল, আমি যাই, অনেক কাজ আছে আমার, বলিয়াই উপেন্দ্র সতীশের মাঝখান দিয়া দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। এবং এই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঝিটি যে কোথায় মিলাইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

সেই নিস্তব্ধ ভাঙ্গা বাড়ির ভাঙ্গা বারান্দার উপর বেলা ন'টার সময়ে উপেন্দ্র সতীশ নির্বাক-বিস্ময়ে উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সতীশ বলিল, উপীনদা, হারানবাবুর মা কি পাগল?

উপেন্দ্র বলিলেন, ও হারানদার মা নয়, আর কেউ—বোধ করি ঝি। কিন্তু আমি ভাবচি, ডাক্তার ও-রকম করে গেল কেন?

সতীশ বলিল, ঠিক চোরের মত যেন ধরা পড়বার ভয়ে পালিয়ে গেল।

উপেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, প্রায়। কাউকে ত দেখা যায় না, ঐ ঘর হারানদার না?

সতীশ বলিল, হাঁ, যাই চল।

কিন্তু হঠাৎ ঢুকতে সাহস হয় না। আমার ভয় হচ্চে হয়ত কিছু ঘটেছে।

সতীশ কহিল, সে হলে চীৎকার করবার লোক জুটত—তা নয়।

এমন সময় দেখিতে পাওয়া গেল, ও-ধারের বারান্দা ঘুরিয়া বধূ আসিতেছে। মনে হইল, যেন এইমাত্র সে কাঁদিতেছিল—চোখ মুছিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। কাল দীপের আলোকে যে মুখ সুন্দর দেখাইয়াছিল, আজ দিনের বেলা, সূর্যালোকে স্পষ্ট বোঝা গেল, এমন সৌন্দর্য আর কোনদিন চোখে পড়ে নাই। জীবিতও না, ছবিতেও না।

বধূ কহিল, আজ আমরা প্রস্তুত ছিলুম না। ভেবেছিলুম আসব বলে গেলেও হয়ত আসতে পারবেন না। সতীশের দিকে চাহিয়া সহসা মৃদু হাসিয়া কহিল, ঠাকুরপো যে!

আজ সতীশ মাথা হেঁট করিল।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হারানদা কেমন?

বধূ সংক্ষেপে উত্তর দিল, তেমনি। আসুন ও-ঘরে যাই।

হারানের ঘরে তাঁর জননী অঘোরময়ী শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা ছিলেন। উপেন্দ্র প্রণাম করিতেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

হারান শ্রান্তকণ্ঠে নিষেধ করিয়া বলিল, চুপ কর মা।

উপেন্দ্র লজ্জার দুঃখে এক ধারে বসিয়া পড়িলেন।

সতীশ এদিক ওদিক চাহিয়া মুখ যথাসাধ্য ভারী করিয়া সেই কাঠের সিন্দুকটির উপর গিয়া বসিল।

বধূ মুহূর্তমাত্র দাঁড়াইয়া সতীশের দিকে বিদ্যুদ্দাম কটাক্ষ করিয়া বাহির হইয়া গেল, যেন স্পষ্ট শাসাইয়া গেল, তোমরা কাজটা ভাল করিতেছ না।

পনর

সতীশ স্থির করিল, সে ডাক্তারী পড়া ছাড়িবে না। তাই পরদিন সন্ধ্যার সময় কাহাকেও কিছু না বলিয়া বেহারীকে সঙ্গে করিয়া তাহার সাবেক বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাড়িটা তখনও খালি পড়িয়া ছিল, বাড়িওয়ালাকে ধরিয়া ছয় মাসের বন্দোবস্ত করিল এবং নিকটবর্তী হিন্দু-আশ্রমে গিয়া সন্ধান করিয়া এক পাচক নিযুক্ত করিয়া খুশী হইয়া বাহির হইয়া পড়িল। বেহারীকে কহিল, আমরা কালই চলে আসব—কি বলিস বেহারী?

বেহারী সম্মতি জানাইল।

পথে চলিতে চলিতে সতীশ বলিল, কাজটা ভাল হয় না বেহারী। যাই হোক সে আমার ঢের করেছে; তা ছাড়া একরকম ধরতে গেলে আমার জন্যেই তার ও-বাসার কাজটা গেল, একবার খবর দেওয়া উচিত।

বেহারী বুঝিল, কাহার কথা হইতেছে—চুপ করিয়া রহিল।

সতীশ বলিতে লাগিল, যে কেউ হোক না কেন, পথের ভিখিরী হলেও দুঃখে পড়লে দেখা চাই—না হলে মানুষ-জন্মই বৃথা।

কিন্তু আমি তাদের বাড়িতে ঢুকব না—গলির মধ্যেও না—মোড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকব; তুই একটিবার গিয়ে জেনে আসবি, কষ্টে পড়েছে কিনা। কষ্টে ত নিশ্চয় পড়েছে—সে আমি বেশ দেখতে পাচ্চি, তাই কোন রকমে কিছু দিয়ে আসা। বেহারী নিঃশব্দে পিছনে চলিতে লাগিল। সতীশ বলিল, কিন্তু আমাকে সে সব কথা বলবে না, অথচ তোর কাছে কিছুই লুকোবে না—বুঝলি না বেহারী?

বেহারী তথাপি কথা কহিল না।

সাবিত্রীদের গলির মোড়ে আসিয়া সতীশ দাঁড়াইল। বলিল, বেশী দেরি করিস নে যেন!

কোথাও তাহাকে যেন শীঘ্র যাইতেই হইবে। তাহার প্রধান কারণ সে নিঃসংশয়ে অনুভব করিতেছিল, একমুহূর্তেই তাহার মুখের চেহারায় এমন একটা বিশ্রী পরিবর্তন ঘটিয়াছে যাহা লইয়া কাহারও সম্মুখে দাঁড়ানো চলে না।

ময়দানের একটা নিভৃত অংশে গাছতলায় বেঞ্চ পাতা ছিল। সতীশ তাহার উপরে গিয়া বসিল এবং নির্জন দেখিয়া স্বস্তি বোধ করিল। অন্ধকার বৃক্ষতলে বসিয়া প্রথমেই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, কি করা যায়! প্রশ্নটা কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহার দুই কানের মধ্যে অর্থহীন প্রলাপের মত ঘুরিতে লাগিল। শেষে উত্তর পাইল, কিছুই করা যায় না।

প্রশ্ন করিল, সাবিত্রী এমন কাজ করিল কেন?

উত্তর পাইল, এমন কিছুই করে নাই, যাহাতে নূতন করিয়া তাহাকে দোষ দেওয়া যায়।

প্রশ্ন করিল, এতবড় অবিশ্বাসের কাজ করিল কিজন্য?

উত্তর পাইল, কোন্ বিশ্বাস তোমাকে সে দিয়াছিল, তাই আগে বল?

সতীশ কিছুই বলিতে পারিল না। বস্তুতঃ সে ত কোন মিথ্যা আশাই দেয় নাই। একদিনের জন্যও ছলনা করে নাই। বরং, পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়াছে, শুভ কামনা করিয়াছে, ভগিনীর অধিক স্নেহ-যত্ন করিয়াছে। সেই রাত্রির কথা সে স্মরণ করিল। সেদিন নিষ্ঠুর হইয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া রক্ষা করিয়াছিল। কে এমন করিতে পারিত! কে নিজের বুকে শেল পাতিয়া লইয়া তাহাকে অক্ষত রাখিত? সতীশের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল, কিন্তু, এ সংশয় তাহার কিছুতেই ঘুচিতে চাহিল না, যে, এই প্রশ্নোত্তর-মালার কোথায় যেন একটা ভুল থাকিয়া যাইতেছে।

সে আবার প্রশ্ন করিল, কিন্তু, তাকে যে ভালবাসিয়াছি।

উত্তর পাইল, কেন বাসিলে? কেন জানিয়া বুঝিয়া পঙ্কের মধ্যে নামিলে?

প্রশ্ন করিল, তা জানিনে। পদ্ম তুলিতে গেলেও ত পাঁক লাগে।

উত্তর পাইল, ওটা পুরাতন উপমা—কাজে লাগে না। মানুষ ঘরে আসিবার সময় পাঁক ধুইয়া পদ্ম লইয়া আসে। তোমার পদ্মই বা কি, আর এ পাঁক কোথায় ধুইয়াই বা ঘরে আসিতে?

প্রশ্ন করিল, না হয়, নাই ঘরে আসিতাম।

উত্তর পাইল, ছিঃ! ও-কথা মুখেও আনিও না।

তাহার পরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে স্তব্ধ হইয়া নক্ষত্র-খচিত কালো আকাশের পানে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমি ত তার আশা ছাড়িয়াই ছিলাম। তাহাকে পাইতেও চাহি না, কিন্তু আমাকে সে এমন করিয়া অপমান করিল কেন? একবার জিজ্ঞাসা করিল না কেন? কি দুঃখে সে এ কাজ করিতে গেল? টাকার লোভে করিয়াছে, এ কথা যে কোনমতেই ভাবিতে পারি না? বিপিনের মত অনাচারী মদ্যপকে সে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল, এ কথা বিশ্বাস করিব কি করিয়া? তবে কেন?

গঙ্গার শীতল বাতাসে তাহার শীত করিতে লাগিল। সে র‍্যাপারটা আগাগোড়া মুড়িয়া দিয়া চোখ বুজিয়া বেঞ্চের উপর শুইয়া পড়িতেই সাবিত্রীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। পতিতার কোন কালিমাই ত সে মুখে নাই! গর্বে দীপ্ত, বুদ্ধিতে স্থির, স্নেহে স্নিগ্ধ, পরিণত যৌবনের ভারে গভীর অথচ রসে, লীলায় চঞ্চল—সেই মুখ, সেই হাসি, সেই দৃষ্টি, সেই সংযত পরিহাস, সর্বোপরি তাহার সেই অকৃত্রিম সেবা! এমন সে তাহার এতখানি বয়সে কোথায় কবে পাইয়াছিল! ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তাহার আবরণটা লইয়া খেলা করিতে গিয়া যে আগুন বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ইহার দাহ হইতে কেমন করিয়া কোন্ পথে পলাইয়া আজ সে নিষ্কৃতি লাভ করিবে! নিষ্কৃতি লাভ করিয়াই বা কি হইবে! তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এ অশ্রু সে দমন করিতে চাহিল না—এ অশ্রু সে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল না। অশ্রু যে এত মধুর, অশ্রুতে যে এত রস আছে, আজ সে তাহার পরম দুঃখের মধ্যে এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া সুখী হইল এবং যাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া এতবড় সুখের আস্বাদ সে জীবনে এই প্রথম গ্রহণ করিতে পাইল, তাহারি উদ্দেশে দুই হাত যুক্ত করিয়া নমস্কার করিল।

সতীশ আর যাই হোক,—ভগবান আছেন, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, ছোটবড় সকলেই

একদিন তাঁর কাছে জবাবদিহি করিতে হয়, এ কথাগুলো অসংশয়ে বিশ্বাস করিত। চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া মনে মনে বলিল, ভগবান! কার হাত দিয়ে তুমি কখন যে কাকে কি পাঠিয়ে দাও, কেউ বলতে পারে না। আজ তোমারি হুকুমে সাবিত্রী দাতা, আমি ভিক্ষুক। তাই সে ভাল হোক, মন্দ হোক, সে বিচার আর যে-ই করুক আমি যেন না করি। আমার বুক থেকে সব জ্বালা, সব বিদ্বেষ মুছে দাও—তার বিরুদ্ধে আমি যেন কৃতঘ্ন হয়ে না থাকি।

ওদিকে জ্যোতিষসাহেবের বাড়িতে সন্ধ্যার পরে, বসিবার ঘরে সরোজিনী, জ্যোতিষ, উপেন্দ্র এবং আরও একজন খর্বাকৃতি গোঁফ-দাড়ি-কামানো গুলিখোরের মত অল্প-বয়সী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। ইঁহার নাম শশাঙ্কমোহন। ইনিও বিলাত-প্রত্যাগত—সুতরাং সাহেব। অল্পদিনেই সরোজিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাহা প্রাণপণে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। সে প্রয়াস যে কতদূর সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সে শুধু বিধাতাপুরুষই জানিতেছিলেন। আজ সতীশের প্রসঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। উপেন্দ্র তাহার অসাধারণ গায়ের জোর এবং অদ্ভুত সাহসের ইতিহাস শেষ করিয়া, আশ্চর্য কণ্ঠস্বর ও তদপেক্ষা আশ্চর্য শিক্ষার কথা পাড়িয়াছিলেন। অদূরে সোফার উপর বসিয়া সরোজিনী দুই হাতের উপর চিবুক রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছিল। এমনি সময়ে বেহারী ভগ্নদূতের মত ঘরে ঢুকিয়া সতীশের ভবানীপুরে যাওয়ার সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিল।

উপেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তার কে আছে সেখানে?

বেহারী সংক্ষেপে 'জানি না' বলিয়াই চলিয়া গেল।

সতীশের জন্যই সকলে অপেক্ষা করিতেছিলেন, অতএব সকলেই নিরাশ হইলেন।

সরোজিনী সোজা হইয়া বসিয়া হঠাৎ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিল, তবে আর কি হবে!

জ্যোতিষ তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিয়া সস্নেহে একটুখানি হাসিলেন; কিন্তু, দমিলেন না শুধু শশাঙ্কমোহন। বরং খুশী হইয়া প্রস্তাব করিলেন, এখন সরোজিনীই কর্ণধার হউন। সঙ্গীত হইতে কতটা পরিমাণে আনন্দ আহরণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল তাহা তিনিই জানিতেন, কিন্তু সরোজিনী দৃঢ় আপত্তি প্রকাশ করিতেই বলিয়া বসিলেন, বরং আমি ত বলি, পুরুষের গান গাওয়াটাই ভুল। তার স্বভাবতঃ গলা মোটা এবং ভারী, সুতরাং শিক্ষা তার যতই হোক এবং যত ভাল করেই গাইবার চেষ্টা করুন না কেন, কোনমতেই শোনবার যোগ্য হতে পারে না।

এ কথার আর কেহ যদিও প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু সরোজিনী করিল। সে বলিল, আপনার কাছে নিশ্চয়ই যোগ্য নয়। হারমোনিয়ম পিয়ানোর গোড়ার মোটা ও ভারী পর্দাগুলো তৈরি করাও হয়ত ভুল, কিন্তু তবু সেগুলো তৈরীও হচ্চে, লোকেও কিনচে।

শশাঙ্কমোহনের তরফে এ কথার উত্তর ছিল না। তথাপি তিনি তাঁহার গৌরবর্ণ মুখ ঈষৎ রক্তাভ করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সরোজিনী হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, মাকে খবর দিয়ে আসি—তিনি আবার খাবার নিয়ে বসে থাকবেন।

উপেন্দ্র চকিত হইয়া বলিলেন, ওহো, তার খাওয়া-দাওয়া বুঝি ঐ-দিকেই হচ্চে—হমব্যাগ্!

উপেন্দ্রর বলার মধ্যে যে আন্তরিক স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না এবং সতীশ তাহার নিতান্ত স্নেহাস্পদ না হইলে তিনি এ ভাষা যে মুখে আনিতেও পারিতেন না ইহা সরোজিনী সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়া সহাস্যে কহিল, এ আপনার ভারী অন্যায়। তাঁর রুচি যদি আপনার কুরুচির সঙ্গে না মেলে ত দোষ আপনার—তাঁর নয়! আচ্ছা, মাকে বলেই আসচি। বলিয়া সরোজিনী দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া যাইতেই শশাঙ্কমোহন উপেন্দ্রর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আপনার বন্ধু বুঝি খুব গোঁড়া?

উপেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, কম নয়। পুজো-আহ্নিকও করে জানি।

সতীশ যে মাঝে মাঝে লুকাইয়া মদ খাইত, এ কথা তিনি জানিতেন না, বোধ করি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতেন না।

শশাঙ্কমোহন প্রশ্ন করিলেন, কি করেন তিনি?

উপেন্দ্র বলিলেন, কিছুই না; কোনদিন যে কিছু করবে এ ভরসাও কারো নেই।

এই সংবাদে শশাঙ্কমোহনের মনের উপর হইতে যেন একটা পাথর নামিয়া গেল। খুশী হইয়া বলিলেন, তাইতেই!

জ্যোতিষ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, উপেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কথাটি ঠিক হলো না, উপেন। শারীরিক উৎকর্ষটা কিছুই নয় নাকি? তা ছাড়া আমি ত তাঁর গানে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছি। যা কিছু তিনি করেছেন, আমাদের এদেশে সে সম্মান যদি তাঁর নাও মেলে, দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সে দোষ আমাদেরই—তাঁর নয়। মকদ্দমার নথি-পত্র না ঘেঁটে, এটর্নির সঙ্গে ধস্তাধস্তি না করে, হাকিমের তাড়া না খেয়েও যার ষোলআনা আদায় হয়েই আছে, সে যদি একটু এদিকে না তাকায় ত সংসারটা নিতান্ত মারোয়াড়ীর কাপড়ের দোকান হয়ে দাঁড়ায়। আমার ত তোমার বন্ধুটিকে দেখে সত্যিই হিংসা হয়। ভাল কথা, বন্ধুর আয় কত হে?

এই সময় সরোজিনী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া তাহার দাদার চৌকির পিঠের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কার দাদা?

জ্যোতিষ বলিলেন, [illegible] বাবার।

উপেন্দ্র বলিলেন, ঠিক জানি না, বোধ করি, প্রায় দু লাখ।

জ্যোতিষ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, রাজা নাকি হে!

উপেন্দ্র বলিলেন, না, রাজা নয়, তবে বরাবরই ওরা বড় জমিদার। তার ওপর বুদ্ধি বিশেষ করেই বুদ্ধি করেছেন।

জ্যোতিষ চৌকতে হেলান দিয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, একেবারে সৌভাগ্যের প্রিয়তম পুত্র! স্বাস্থ্য, শক্তি, রূপ, ঐশ্বর্য! মানুষ যা-কিছু কামনা করে, একাধারে সমস্তই।

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, একটা মারাত্মক দোষও আছে। পরের দায় যেচে ঘাড়ে নিয়ে অসময়ে অপঘাতে মারা না পড়ে ত তুমি যা বলচ সে-সবই ঠিক বটে।

জ্যোতিষ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, অপঘাতে মারা পড়বে কেন?

উপেন্দ্র বলিলেন, অসম্ভব নয়, এবং পূর্বে হয়েও গেছে। রাগ পদার্থটি ওর দেহে যেমন ভয়ানক বেশী, প্রাণের মায়াটাও ঠিক তেমনি পরিমাণে কম। এই কলিযুগে বাস করেও যাদের অন্যায় অত্যাচারের ধারণাটা সত্যযুগের মতই থাকে, এবং রেগে উঠলে যাদের হিতাহিত বোধ থাকে না, তাদের বেঁচে থাকা-না-থাকার উপর আমি ত বেশী আস্থা রাখিনে। সহ্য করতে পারাও যে একটা ক্ষমতা, অনাহূত সাহায্য করবার লোভ সংবরণ করতে পারাও যে অবস্থাবিশেষে প্রয়োজন, সেটা ও বোঝেই না। ও যেন সেই সেকালের ইউরোপের নাইট, একালে বাঙলাদেশে এসে জন্মেছে।

জ্যোতিষ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু যাই বল, শুনে শ্রদ্ধা হয়।

উপেন্দ্র বলিলেন, হয়ও না! সংসারে বাস করতে গেলে অনেক ছোটখাটো মন্দ জিনিসকে অগ্রাহ্য করতে হয়—এ শিক্ষা ওর আজো হয়নি। কোনদিন হবে কি না জানি না, কিন্তু যদি না হয়, শেষকালের ফলটা মধুর হবে না। ওরও না, ওর আত্মীয়-বন্ধুদেরও না।

জ্যোতিষ বলিলেন, কিন্তু তুমি ওর আত্মীয়-বন্ধু, তুমি কেন শেখাও না?

উপেন্দ্রর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, আমি ওর বন্ধু বটে, কিন্তু এ শিক্ষার ভার এ-রকম বন্ধুর উপরে নয়। যিনি সব বন্ধুর বড় বন্ধু হবেন, যিনি সমস্ত আত্মীয়ের উপর আত্মীয় হবেন, এ বিদ্যা হয় তিনি শেখাবেন, না হয় চিরদিন ওকে অশিক্ষিত হয়েই থাকতে হবে।

সরোজিনী এতক্ষণ নীরবে স্থির হইয়া শুনিতেছিল, এখন মুখ ফিরাইয়া বোধ করি একটুখানি হাসি গোপন করিল।

উপেন্দ্র বলিলেন, কিন্তু সতীশের কথা আজ এই পর্যন্ত। আমাকে উঠতে হবে, খান-দুই চিঠি লেখবার আছে।

জ্যোতিষেরও জরুরী কাগজপত্র দেখিবার ছিল, তাহারও বসিবার জো ছিল না, তাই তিনিও উঠি-উঠি করিতেছিলেন। কিন্তু সকলের পূর্বেই উঠিয়া পড়িল সরোজিনী। একবার মনে হইল সে উপেন্দ্রকে কি কথা যেন বলিতে চাহিল, কিন্তু শেষে কিছুই বলিল না, কাহাকেও একটি ক্ষুদ্র নমস্কার পর্যন্ত করিল না—অন্যমনস্কের মত ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। আজিকার সভা যেমন করিয়া জমিবার কথা ছিল, তেমন করিয়া জমিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ভাঙিল আরো বিশ্রী করিয়া।

উপেন্দ্র কিছুই জানিতেন না, তিনি কিছুই জানিলেন না।

ষোল

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী কিরণময়ী স্বামীর পীড়া উপলক্ষ্যে এই কয়টা দিন উপেন্দ্রকে ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পাইয়া তাহাকে চিনিল। ইহাতে শুধু যে তাহার স্বার্থহানির ব্যাকুল আশঙ্কাটাই তিরোহিত হইল তাহা নহে, এই অপরিচিতের উদ্দেশে একটা গভীর শ্রদ্ধার ভারে তাহার সমস্ত হৃদয় জলভারাক্রান্ত মেঘের মত বর্ষণোন্মুখ হইয়া উঠিল। এমন লোক সে কখন দেখে নাই। এমন লোকের সংসর্গে আসিতে পারার ভাগ্য কোন দিন সে কল্পনা করিতে পারে নাই। তাই এই অত্যল্পকালের পরিচয়েই সে তাহার ভবিষ্যতের সকল সুখ-দুঃখ ইহারই হাতে নিঃশঙ্কচিত্তে তুলিয়া দিল, এবং নির্ভয়ে নির্ভর করিতে পারা যে কি, তাহা এই প্রথম উপলব্ধি করিয়া তাহার চিরকারারুদ্ধ প্রাণ যেন মুক্ত পথের আলোক দেখিতে পাইল।

উপেন্দ্র প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত থাকিয়া মুমূর্ষু বন্ধুর সেবা করিয়াছিলেন। প্রয়োজন হিসাবে এ সেবার মূল্য ছিল না, কারণ হারানের জীবনের আশা আদৌ ছিল না —কিন্তু, এই সেবা, কিরণময়ীর চোখে তাহার স্বামীর শুষ্ক দেহটাকেও আজ মহামূল্য করিয়া দিল। এই অর্ধমৃত দেহটার লোভেই অকস্মাৎ সে ভয়ানক লুব্ধ হইয়া উঠিল। তাহার আচার-ব্যবহারের এই আকস্মিক অভাবনীয় পরিবর্তন মৃত্যুর উপকূলে দাঁড়াইয়া হারানও লক্ষ্য করিলেন। ছেলেবেলায় কিরণ আত্মীয়ের ঘরে মানুষ হইয়া ছেলেবেলাতেই ততোধিক অনাত্মীয় স্বামীভবনে আসিয়াছিল। শ্বশ্রূ অঘোরময়ী তাহাকে কোনদিন আদর-যত্ন করেন নাই; বরং যতদূর সম্ভব নির্যাতন করিয়া আসিয়াছেন। স্বামীও তাহাকে একদিনের জন্য ভালবাসেন নাই। তিনি দিনের বেলা স্কুলে শিক্ষা দিতেন, রাত্রে নিজে অধ্যয়ন করিতেন, বধূকে শিক্ষা দান করিতেন। বিদ্যার্জনের নেশা তাঁহাকে এমনি গ্রাস করিয়াছিল যে উভয়ের মধ্যে গুরু-শিষ্যের কঠোর সম্বন্ধ ভিন্ন স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্বন্ধের কিছুমাত্র অবকাশ ঘটে নাই। এমনি করিয়াই এই নিরুপমা প্রখর বুদ্ধিশালিনী রমণী শৈশব অতিক্রম করিয়া পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল,—এমনি করিয়াই সংসারের সৌন্দর্য মাধুর্য হইতে নির্বাসিতা, শুষ্ক কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল, এবং এমনি স্নেহপ্রেমে বঞ্চিত হইয়াই সে নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্মেও জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিল। অঘোরময়ী সমস্ত জানিতেন। তাঁহার রূপসী বধূ যে ইদানীং সতীধর্মেরও সম্পূর্ণ মর্যাদা বহন করিয়া চলে না, ইহাও তিনি বুঝিতেন। কিন্তু, পুত্র তাঁহার মৃতকল্প, দুঃসহ দুঃখের দিন সমাগতপ্রায়। এই মনে করিয়াই বোধ করি, বধূর বিসদৃশ আচার-ব্যবহারও উপেক্ষা করিয়া চলিতেন। যে ডাক্তার হারানের চিকিৎসা করিতেছিল, সে যে কি আশায় বিনা ব্যয়ে ঔষধপথ্য যোগাইতেছে, কেন সংসারের অর্ধেক ব্যয়ভারও বহন করিতেছে, ইহা তাঁহার অগোচর ছিল না। কিন্তু মৃতকল্প সন্তানের চিকিৎসার কাছে কোন অন্যায়কেই বড় করিয়া দেখিবার তাঁহার সাহস ছিল না, শিক্ষাও ছিল না। অধিকন্তু তিনি পুত্রবধূকে ভালবাসিতেন না। উপেন্দ্রও যে এই জালে ধীরে ধীরে আবদ্ধ হইতেছিল, তাহার অকাতর অর্থব্যয় এবং অক্লান্ত সেবার গোপন উদ্দেশ্য যে, আশৈশব বন্ধুত্বকে অতিক্রম করিয়া নিঃশব্দে আর একস্থানে মূলে

বিস্তার করিয়াছিল, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহও ছিল না, আপত্তিও ছিল না। কাল হইতে উপেন্দ্র আসে নাই। এই কথা অঘোরময়ী তাঁহার ঘরের চৌকাঠের বাহিরে একখানা জীর্ণ মলিন বালাপোশ গায়ে দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন।

শীতের সূর্য তখনও অস্ত যায় নাই, কিন্তু এ বাড়ির ভিতরটায় ইহারই মধ্যে অন্ধকারের ছায়া পড়িয়াছিল। সূর্যদেব কখন উদয় হন, কখন অস্ত যান, সুদিনেও সে সংবাদটা এ বাটীর কেহ রাখে নাই, এখন দুঃখের দিনে তাঁহার সহিত প্রায় সমস্ত সম্বন্ধই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল।

অঘোরময়ী ডাকিলেন, বৌমা, সন্ধ্যেটা জ্বেলে দিয়ে একবার বস ত মা, একটা কথা আছে।

কিরণময়ী তাঁহারই ঘরের মধ্যে কাজ করিতেছিল, বলিল, এখনো সন্ধ্যে হয়নি মা, তোমার বিছানাটা পেতে দিয়েই যাচ্চি।

অঘোরময়ী বলিলেন, আমার আবার বিছানা! শোবার সময় আমিই পেতে নেব। না না, তুমি যাও মা, প্রদীপগুলো জ্বেলে দিয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো। দিবারাত্রি খেটে খেটে দেহ তোমার আধখানি হয়ে গেল, সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখা যে দরকার মা। বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অনতিকাল পরে বধূ কাছে আসিয়া বসিতে গেলে, তিনি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আগে প্রদীপগুলো—

বধূ শ্রান্তভাবে বলিল, তুমি কেন ব্যস্ত হচ্চ মা, সন্ধ্যের এখনো ঢের দেরি আছে।

অঘোরময়ী বলিলেন, তা হোক—নীচে যে অন্ধকার, একটু বেলা থাকতেই সিঁড়ির আলোটা জ্বেলে দেওয়া ভাল। এখনি হয়ত উপীন এসে পড়বে, কাল থেকে সে আসেনি—কৈ বৌমা, এখনো তোমার ত গা-ধোয়া, চুল-বাঁধা হয়নি দেখচি—কি কচ্ছিলে গা এতক্ষণ?

শ্বশ্রূর কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ এই বিরক্তির আভাসে বিস্মিত বধূ ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি রোজ এমনি সময়ে গা ধুই, না কাপড় ছাড়ি মা? এখনো ত আমার রান্নাঘরেরই কাজ মেটে না! তার পরে—

শাশুড়ী বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, তার পরের কাজ তার পরে হবে বৌমা; এখন যা বলি শোন।

বধূ যাইতে উদ্যত হইয়া কহিল, যাই প্রদীপগুলো জ্বেলে দিয়ে তোমার কাছে এসেই বসি।

অঘোরময়ী রাগ করিয়া উঠিলেন—আমার কাছে এখন মিছিমিছি বসে থেকে কি হবে বাছা! কাজ আগে, না বসা আগে? দিন দিন তুমি কি-রকম যেন হয়ে যাচ্ছো বৌমা!

তাঁহার স্নেহের অনুযোগ হঠাৎ তিরস্কারের আকার ধরিতেই কথাগুলো অত্যন্ত শক্ত ও রূঢ় হইয়া কিরণময়ীর কানে গিয়া বিঁধিল। সেও রাগ করিয়া জবাব দিল, তোমরাই আমাকে কি-রকম করে তুলচ মা। সব সময়ে উলটো উলটো কথা বললে শোনা চুলোয় যাক, বুঝতেই ত পারা যায় না। কি বলতে চাও তুমি স্পষ্ট করেই বল না? বলিয়া উত্তরের জন্য মুহূর্তকাল অপেক্ষা না করিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। বধূর দ্রুতপদে চলিয়া যাওয়া যে কি, তাহা এ বাড়ির সকলেই বুঝিত, অঘোরময়ীও বুঝিলেন।

কিরণময়ী নীচে উপরে আলো জ্বালিয়া তাহার শাশুড়ীর ঘরে যখন প্রদীপ দিতে আসিল, তখন শাশুড়ী কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার কান্না যখন-তখন, যে-সে কারণেই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

কিরণময়ী থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তোমার হরিনামের মালাটা এনে দেব মা?

শাশুড়ী বালাপোশের কোণে চোখ মুছিয়া কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিলেন, দাও।

সে ঘরে গিয়া দেয়ালে টাঙ্গান মালার ঝুলিটা পাড়িয়া আনিয়া হাতে দিতে গেলে তিনি ঝুলিটা না লইয়া বধূর হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া একটুখানি বসো মা, বলিয়া টানাটানি করিয়া নিজের কাছে বসাইয়া তাহার মুখে কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন, চিবুক স্পর্শ করিয়া চুমো খাইলেন এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত কিছুই না বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিরণময়ী শক্ত হইয়া বসিয়া এই-সমস্ত স্নেহের আতিশয্য সহ্য করিতে লাগিল।

খানিক পরে অঘোরময়ী আর একবার বালাপোশের কোণে চোখের জল মুছিয়া

বলিলেন, শোকে-তাপে আমি পাগল হয়ে গেছি, আমার সামান্য একটা কথায় রাগ করলে কেন বল ত মা?

কিরণ অবিচলিতভাবে বলিল, শোক-তাপ তোমার ত একলার নয় মা। আমরাও মানুষ, সেটা ভুলে গিয়ে একটা কথা বলাই যে যথেষ্ট। না হলে হাজার কথাতেও রাগ হয় না।

অঘোরময়ী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, সে কথা কি জানি না মা, জানি। কিন্তু আমার একে একে সবাই গেল, এখন তুমিই আমার সব, তুমিই আমার ছেলেমেয়ে। হারানের শোকে যদি বুক বাঁধতে পারি, ত তোমার মুখ চেয়েই পারব। বলিয়া আর একবার বালা-পোশ চোখে দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু, এ ছলনায় কিরণ ভুলিল না। সে মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়াও শান্তভাবেই বলিল, তুমি কি করে বুক বাঁধবে, সেটা এখন থেকে ঠিক করে রেখেচ, কিন্তু আমি কি করে বুক বাঁধব, সেটা ত ভাবোনি মা! আবার তাও বলি—এ-সব কথা এখনি বা কেন? যখন সত্যই বুক বাঁধাবাঁধির দিন আসবে, তখন সময়ের টানাটানি হবে না; ও-সময় এত কম করে আসে না, মা, যে আগে থেকে ঠিক হয়ে না থাকলে সময়ে কুলোয় না।

বধূর কথাগুলি মধুর না শুনাইলেও ইহার ভিতরে যে কতখানি শ্লেষ ছিল, অঘোরময়ী ধরিতে পারিলেন না। বরঞ্চ বলিলেন, সময় আসা বৈ কি মা, উপীন সেদিন যে সাহেব ডাক্তারকে এনেছিলেন, তিনিও ত ভাল কথা কিছুই বলে গেলেন না। আমি তাই কেবলি ভাবছি বৌমা, উপীন যদি এ সময়ে না এসে পড়ত, তা হলে কি দুর্দশাই না আমাদের হতো।

বৌ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া তিনি একটু উৎসাহিত হইয়াই বলিতে লাগিলেন, ওকে ছেলেবেলা থেকেই জানি কিনা! ন'খালিতে ওরা দুটি ভায়ের মত আসত যেত—তখন হতেই আমাকে মাসী বলে ডাকত। যেমন বড়লোকের ছেলে, তেমনি নিজেও বড় হয়েছে। সেদিন আমাকে কাঁদতে দেখে বললে, মাসীমা, আমাকে হারানদার ছোট বলেই মনে করবেন, এর বেশী আমার আর কিছুই বলবার নেই। আমি বললুম, বাবা, আমাকে কোন একটি তীর্থস্থানে রেখে দিস। যে-ক'টি দিন বাঁচি, যেন গঙ্গাস্নান করতে করতে মা গঙ্গার কোলে আমার হারানের কাছে যেতে পারি।

আর তিনি বলিতে পারিলেন না, এইবার আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বৌ চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল। তিনি কিছুক্ষণ কাঁদিয়া বুকের ভার লঘু করিয়া পরিশেষে চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিলেন, থেকে থেকে এই কথাই মনে ওঠে, ও যদি না এসে পড়ত! নীচে কে ডাকলে না বৌমা?

বৌ কহিল, নীচে ঝি বাসন ধুচ্ছে, কেউ ডাকলেই খুলে দেবে।

শাশুড়ী অস্থির হইয়া বলিলেন, না না বৌমা, তুমিই যাও। ঝি কাজে ব্যস্ত থাকলে কিছুই শুনতে পায় না।

কিরণ কিছুমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমারও কাজ আছে মা, খাবার তৈরি—

অঘোরময়ী অকস্মাৎ আগুন হইয়া উঠিলেন—খাবার ত পালিয়ে যাচ্চে না বাছা! তুমি কিছুই বোঝ না কেন গা? যে না হলে—

কিরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার বুঝেও কাজ নেই। আমাদের আপনার লোক সবাই গেলেও যদি আমাদের দিন চলে ত উপীনবাবু না থাকলেও আটকাবে না।—বলিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অঘোরময়ী ক্রোধে কথা কহিতে পারিলেন না; এবং যতক্ষণ বধূকে দেখা গেল, ততক্ষণ তাঁহার জ্বলন্ত চোখ দুটো আগুন ছড়াইয়া তাহাকে যেন ঠেলিয়া বিদায় করিয়া দিয়া আসিল। তারপর তিনি অত্যন্ত ক্রোধের সহিত ঝিকে পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। সে শীতের ভয়ে সন্ধ্যার পূর্বেই খনখন ঝনঝন শব্দ করিয়া মাজা-ধোয়া সারিয়া লইতেছিল, তাঁহার ক্রুদ্ধ আহ্বান শুনিতে পাইল না। তখন ঘরের প্রদীপটা হাতে লইয়া বারান্দার ধারে আসিয়া চেঁচাইয়া বলিলেন, তুই কি কানের মাথা খেয়েচিস না? শুনতে পাসনে, উপীনবাবু একঘণ্টা বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি কচ্চেন!

এ চীৎকার ঝি শুনিতে পাইল এবং উপেন্দ্রর নাম শুনিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িয়া ছুটিয়া গিয়া কবাট খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু, কেহই নাই। বাহিরে গলা বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দেখা যায়, ভাল করিয়া দেখিয়াও কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কেউ নেই ত মা!

অঘোরময়ী প্রদীপ-হাতে উদ্বিগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, অবিশ্বাস করিয়া বলিলেন, নেই কি রে! আমি যে নিজের কানে তার ডাক শুনলুম। তুই গলির মধ্যে গিয়ে একবার দেখলি নে কেন?

ঝি বলিল, দেখেছি, কেউ নেই।

কথাটা বিশ্বাস করিবার মত নয়। উপীন কাল আসে নাই, আজও আসিবে না? তাই বিরক্ত হইয়াই বলিলেন, তুই আর একবার ভাল করে দেখ্ দেখি, কেউ আছে কিনা?

বাহিরে অন্ধকার গলির মধ্যে যাইতে ঝির আপত্তি ছিল। সেও বিরক্ত হইয়া জবাব দিল, তোমার এ কি কথা মা! তিনি কি লুকোচুরি খেলচেন যে, অন্ধকার গলির মধ্যে গিয়ে হাতড়ে দেখতে হবে!—বলিয়া সে নিজের কাজে মন দিল।

অঘোরময়ী ঘরে ফিরিয়া আসিয়া নির্জীবের মত বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। পীড়িত সন্তানের সংবাদ লইবার উৎসাহও তাঁহার রহিল না। তাঁহার ফিরিয়া ফিরিয়া কেবলি মনে হইতে লাগিল, সে কাল আসে নাই, আজিও আসিল না। সম্ভব অসম্ভব নানারূপ কারণ খুঁজিয়া ফিরিবার মধ্যে এ কথাটি তাঁহার কিন্তু একবারও মনে হইল না যে, সে কলিকাতা-বাসী নহে, অন্যত্র তাহার বাড়ি-ঘর আত্মীয়-স্বজন আছে—তথায় ফিরিয়া যাওয়াও সম্ভব। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, রাগ করে নাই ত? কথাটা আবৃত্তি করিতেই তাঁহার অন্তঃকরণ আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল; এবং বধূর ক্ষণপূর্বের আচরণের সহিত মনে মনে মিলাইয়া দেখিয়াই সন্দেহ সুদৃঢ় হইল,—তাই ত বটে! বৌ যদি এমন কিছু - তিনি আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না, উঠিয়া রান্নাঘরের দিকে গেলেন।

কিরণময়ী প্রজ্বলিত উনানের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। জ্বলন্ত ইন্ধনের উজ্জ্বল রক্তাভ আলোক প্রচুর পরিমাণে তাহার মুখের উপর পড়িয়াছে। মাথায় কাপড় ছিল না, আজ সে চুল বাঁধে নাই—এলোমেলো চুলের রাশি কোনমতে জড়াইয়া রাখিয়াছিল।

অঘোরময়ী দ্বারের সম্মুখে নির্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ যে বস্তুটি তাঁহার চোখে পড়িল, তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। যে স্তব্ধ মুখের উপরে উনানের রক্তাভ আলোক বিচিত্র তরঙ্গের মত খেলিয়া ফিরিতেছিল, সেই মুখ তাঁহার সমস্ত অভিজ্ঞতার বাহিরে। এ মুখে খুঁত আছে কিনা সে আলোচনা চলে না। নিখুঁত বলিয়াও ইহাকে প্রকাশ করা যায় না। ইহা আশ্চর্য! ইহাকে পূর্বে দেখেন নাই—ইহা অপূর্ব! নির্নিমেষ-চোখে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ দিয়া তাঁহার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সেই শব্দে বধূ চকিত হইয়া দেখিল শাশুড়ী দাঁড়াইয়া। স্খলিত আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া কহিল, তুমি এখানে কেন মা?

স্বর শুনিয়া তাঁহার আরও চমক লাগিয়া গেল; এমন শান্ত, এমন করুণ কণ্ঠস্বর তিনি আর কখনও শোনেন নাই। খপ্ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, তুমি একলাটি রান্না করচ মা, তাই একবার বসতে এলুম।

বধূ তাঁহার দিকে একটা পিঁড়ি ঠেলিয়া উনানের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে আবার বিরক্তি মাথা তুলিয়া উঠিল। গন্ধ যেমন বাতাস আশ্রয় করিয়া ফুলের বাহিরে আসে, অথচ ঝড়ে উড়িয়া যায়, কিরণময়ীর তৎকালীন মনের ভাবটা শ্বাশুড়ীর আকস্মিক আগমনে তেমনি মুহূর্তের মধ্যে বাহিরে আসিয়াই এই ছদ্ম-স্নেহের ঝড়ে উড়িয়া গেল। ইহা সত্য নহে—কদর্য প্রতারণা মাত্র; কিন্তু কথা কাটাকাটি করিতে তাহার আর ভাল লাগিতেছিল না, নিরন্তর ঝগড়া করিয়া সে সত্যই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অঘোরময়ী বলিলেন, ঝিকে একবার ডেকে দিয়ে যাব?

কিরণময়ী অন্তরস্থ সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া শান্তভাবে বলিল, কি দরকার মা?

আমি রোজই একলা রাঁধি—একলা থাকা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। বরং উনি ঘরে একলা আছেন—তাঁর কাছে গিয়ে কেউ বসলে ভাল হয়।

পীড়িত সন্তানের উল্লেখে জননী আঘাত পাইয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তাই যাই। তুমিও একটু শীঘ্র করে কাজ সেরে চলে এস মা।

ইতিমধ্যে উপেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছেন, সতীশও আর একটি দিন মাত্র উপেন্দ্রর সঙ্গে হারানকে দেখিতে আসিয়াছিল—আর আসে নাই। সে নিজের ব্যথা লইয়াই বিব্রত ছিল। উপেন্দ্র তাহার অন্যমনস্ক ভাব এবং এ বাটীতে আসিতে অনিচ্ছা জানিয়া তাহাকে আর আহ্বান করেন নাই, চিকিৎসা এবং অন্যান্য ব্যবস্থা একাকীই স্থির করিতেছিলেন। শুধু কলিকাতা ছাড়িয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবার দিন সতীশকে ডাকিয়া মধ্যে মধ্যে সংবাদ লইতে এবং তাঁহাকে চিঠি লিখিয়া জানাইতে অনুরোধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আজ সতীশ ইস্কুল হইতে ফিরিয়াই উপেন্দ্রর পত্র পাইল। তিনি লিখিয়াছেন,—ভরসা করি, তোমার লেখাপড়া ভালই হইতেছে। কয়দিন হারানদার সংবাদ না পাইয়া ভাবিত হইয়াছি। যদিও জানি, সংবাদ দিবার প্রয়োজন হয় নাই বলিয়াই দাও নাই, তথাপি তাঁহার চিকিৎসাটা কিরূপ হইতেছে, লিখিয়া জানাইবে।

সতীশের পিঠে চাবুক পড়িল। সে একদিনও যাইয়া সংবাদ লয় নাই। ইতিমধ্যে ও-বাটীতে কত কি ঘটিয়া থাকিতে পারে, অথচ, তাহারই উপরে নির্ভর করিয়া উপীনদা বাড়ি গিয়াছেন। সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। বেহারী জলখাবার আনিতেছিল, ধাক্কা খাইয়া তাহার থালা গেলাস ছড়াইয়া পড়িল—সতীশ ফিরিয়া দেখিল না। রাস্তায় আসিয়া একখানা খালি গাড়িতে চড়িয়া বসিল এবং দ্রুত হাঁকাইতে অনুরোধ করিয়া পথের দিকে সতর্ক হইয়া রহিল। তাহার ভয় ছিল পাছে চিনিতে না পারায় গলিটা পার হইয়া যায়। মিনিট-কুড়ি পরে, যখন গাড়ি ছাড়িয়া সে ক্ষুদ্র গলির মধ্যে প্রবেশ করিল, তখনও বেলা আছে। পায়ের নীচে খোলা নর্দমা ও চলিবার পথ, এবং মাথার উপরে আকাশ ও আলো তখনও অন্ধকারে একাকার হয় নাই। দ্রুতপদে হাঁটিয়া ১৩ নম্বর বাটীর সম্মুখে আসিতেই কবাট খুলিয়া গেল। কে যেন তাহারি জন্য অপেক্ষা করিয়া পথ চাহিয়া ছিল। সতীশের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, সহসা প্রবেশ করিতে পারিল না।

কবাটের পার্শ্বেই কিরণময়ী, সে তাহার হাসিমুখ একটুখানি বাহির করিয়া ভারী সমাদরের সহিত কহিল, এস ঠাকুরপো, দাঁড়িয়ে রইলে যে!

আবার সেই ঠাকুরপো! লজ্জায় সতীশের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু, তখনি সামলাইয়া লইয়া বিনীতভাবে কহিল, আপনি দেখচি আমাকে এখনো মাপ করেন নি।

কিরণময়ী কহিল, না, তুমি ত মাপ চাওনি। চাইবার আগেই গায়ে পড়ে দিলে, মানী লোকের অমর্যাদা করা হয়। অমর্যাদা করবার মত কম-দামী জিনিস ত তুমি নও ঠাকুরপো।

তাহার এই প্রসন্ন রহস্যালাপের মধ্যেও এমন একটা গভীর কারুণ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, সতীশ আনতমুখে মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার কোন দাম নেই বৌঠাকরুন! আমার কোন অমর্যাদা হবে না—আমাকে আপনি মাপ করুন।

কিরণময়ী একটুখানি হাসিয়া বলিল, এমন জিনিস অনেক আছে ঠাকুরপো, যাকে ক্ষমা করলেই তার শেষ হয়ে যায়। আজ তোমাকে ক্ষমা করতে গিয়ে যদি আবার সতীশবাবু বলে ডাকতে হয়, তা হলে বলে রাখচি ঠাকুরপো, সে ক্ষমা তুমি পাবে না। তোমাকে ধরে রাখবার ঐ একটুখানি শেকল তুমি নিজে আমার হাতে তুলে দিয়েচ, সেটি যে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ফিরিয়ে নেবে, তত নির্বোধ এই বৌঠাকরুনটি নয়। এই বলিয়া সে একটু বিশেষভাবে ঘাড় নাড়িল। কিন্তু সতীশ চমকাইয়া উঠিল। এই শিকল-বাঁধাবাঁধির উপমাটা তাহার ভাল লাগিল না, বরং হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহাকে অসাবধান পাইয়া এই মেয়েটি যেন সত্যই কিসের শক্ত শিকল তাহার পায়ে জড়াইয়া দিতেছে এবং মুহূর্তেই তাহার সমস্ত সহজ-বুদ্ধি আত্মরক্ষার্থে সাজিয়া দাঁড়াইল। বাটীতে প্রবেশ করিবার সময় তাহার চক্ষে যে দৃষ্টি

কর্তব্য-বুদ্ধিটির ধিক্কারে কুণ্ঠিত ও লজ্জায় বিনম্র দেখাইয়াছিল, ধাক্কা খাইয়া তাহা সন্দিগ্ধ ও তীব্র হইয়া উঠিল।

কিরণময়ী কহিল, তোমার মুখ কিন্তু শুকিয়ে গেছে ঠাকুরপো, হয়ত এখনো জল খাওয়াও হয়নি। এস, কিছু খাবে চল।

সতীশ কিছুই না বলিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইল এবং এই সমস্ত রহস্য-কৌতুকের কতটুকু শুধুই রহস্য এবং কতটুকু নয়, অত্যন্ত সংশয়ের সহিত ইহাই বিচার করিতে সে এই রহস্যময়ীর অনুসরণ করিয়া চলিল।

উপরে উঠিয়া বৌ ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, আজ ঝিকে নিয়ে মা কালীবাড়ি গেছেন। রান্নাঘরে বসে তুমি আমার লুচি বেলে দেবে, আমি ভেজে তুলব--পারবে ত? বলিয়াই হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তুমি যে পারবে, সে তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়—এস।

সতীশ অন্তরের স্পন্দন থামাইয়া রাখিয়া ভাল মানুষের মত প্রশ্ন করিল, লুচি বেলতে পারি সে কথা কি আমার গায়ে লেখা আছে বৌঠাকরুন?

কিরণময়ী বলিল, লেখা পড়তে জানা চাই ঠাকুরপো। সে রাত্রে আমার গায়েতেই কি কিছু লেখা ছিল—অথচ তুমি পড়েছিলে?

সতীশ আবার মুখ হেঁট করিল। রান্নাঘরে গিয়া প্রথমে এমনিধারা ঠোকাঠুকি এবং তার পরে দুজনে মিলিয়া খাবার তৈরির মধ্যে যখন এই সংঘর্ষের উত্তাপ অনেকটা শীতল হইয়া গেল, তখন কিরণময়ী জিজ্ঞাসা করিল, তোমার অনেক কথাই তোমার উপীনদার মুখে শুনেছি। আচ্ছা ঠাকুরপো, তিনি এখন এখানে নেই বুঝি? বাড়ি ফিরে গেছেন, না?

সতীশ, 'হাঁ' বলিলে, কিরণময়ী কহিল, আমি জানি, তিনি এখানে নেই, কিন্তু মা বিশ্বাস করতে চান না। মা বলেন, তাঁকে না জানিয়ে উপীনবাবু কখনই যাবেন না—তাঁকে বুঝি হঠাৎ যেতে হয়েছে?

সতীশ ইহা ঠিক জানিত না। বস্তুতঃ সে কিছুই জানিত না। ইতিমধ্যে ইহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া দুই বন্ধুতে যে-সকল অপ্রিয় কথা হইয়া গেছে, তাহাও বলা যায় না—সতীশ চুপ করিয়া রহিল। তাঁহার না বলিয়া চলিয়া যাইবার কারণ সে কিছুতেই অনুমান করিতে পারিল না। কিন্তু কিরণময়ী কথাটা চাপা পড়িতে দিল না, কহিল, কাজটা তোমার দাদার ভাল হয়নি ঠাকুরপো, জানিয়ে গেলে কেউ তাঁকে ধরে রাখত না, অথচ, মা এমন ভেবে সারা হতেন না। আমি কোন রকমেই তাঁকে বোঝাতে পারিনে যে, উপেনবাবু চিরকাল এ দেশেই থাকেন না; অন্যত্র তাঁর ঘর-বাড়ি আছে, কাজকর্ম আছে—এ-সমস্ত ছেড়ে কতদিন মানুষে পরের দুর্ভাগ্য নিয়ে আটকে থাকতে পারে? কিন্তু বুড়োমানুষের কাছে কোন যুক্তিই যুক্তি নয়—তাঁদের নিজের প্রয়োজনের বাড়া সংসারে আর কিছু তাঁরা দেখতেই পান না।

সতীশ সে কথার ঠিক জবাব না দিয়া বলিল, উপীনদা এতদিন বাইরে ছিলেন, এই ত আশ্চর্য! কোথাও বেশীদিন থাকা তাঁর স্বভাব নয়। বিশেষ, বিয়ের পর থেকে একটা রাতও কোথাও রাখতে হলে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়। আগে, সমস্ত বিষয়েই তিনি আমাদের কর্তা ছিলেন, এখন, একে একে সব ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণ নিয়েছেন—আদালতে নিতান্তই না গেলে নয়, তাই বোধ করি, একটিবার যান। এই একবার দেখুন না—

বৌ বাধা দিয়া বলিল, বসো ঠাকুরপো, তোমার খাবার জায়গা করে দিয়ে বসি। তুমি খেতে খেতে গল্প করবে, সেই বেশ হবে। বলিয়া আসন পাতিয়া থালের উপর পরিপাটি করিয়া আহার্য সাজাইয়া দিয়া কাছে বসিয়া একান্ত আগ্রহের সহিত বলিল, তার পরে?

সতীশ একখণ্ড লুচি মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল, সে একটা বিয়ে দিতে যাবার কথা, বৌঠাকরুন! উপীনদা একজন মস্ত ঘটক—কত লোকের যে বিয়ে দিয়েছেন ঠিক নেই। আমাদের দলের একটি ছেলের বিয়ে, উপীনদা ঘটকালি থেকে শুরু করে সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন নিজের হাতে করেন। অথচ, বিয়ের রাত্রে দাদাকে আর পাওয়া গেল না। ছোটবৌর শরীর ভাল নেই বলে কিছুতেই ঘর থেকে বার হলেন না। আমরা সমস্ত লোক মিলে ওঃ—সে কি অনুরোধ, বৌঠাকরুন! কিন্তু কিছুতেই না। পাথরের দেবতা হলে বর পাওয়া যেত,

কিন্তু উপীনদাকে রাজী করা গেল না। ভাল আছি বলে ছোটবৌ নিজে অনুরোধ করাতে বললেন, তোমার ভাল-মন্দ বিবেচনা করবার ভার আমার ওপরে, তোমার নিজের ওপরে নয়, তুমি চুপ করো।

কিরণময়ী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার সমস্ত বিগত জীবন, তাহারই হৃদয়ের অন্ধকার অন্তঃস্থলে নামিয়া আঁচড়াইয়া আঁচড়াইয়া কি যেন একটা রত্ন খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু সতীশ কিছুই বুঝিল না। কোন্ কাহিনী কোথায় কি করিয়া বাজে, সে তার কি সংবাদ রাখে! সে বলিয়া চলিল, এই অনুপস্থিতিতে কে কিরূপ নিন্দা করিয়াছিল, কে কি বলিয়া উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছিল, কত আনন্দ পণ্ড হইয়াছিল, এই-সব।

কিন্তু শ্রোতা কোথায়? এই তুচ্ছ কাহিনী হইতে কিরণময়ী তখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ একসময়ে সতীশ তাহার লুচি খাওয়া ও গল্প বলা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি শুনচেন না—কি ভাবচেন?

কিরণময়ী চকিত হইয়া হাসিয়া বলিল, শুনচি বৈ কি ঠাকুরপো! কিন্তু আমি বলি, অসুখ-বিসুখে যত্ন করাই ত ভাল।

সতীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, ভাল, কিন্তু বাড়াবাড়ি করা কি ভাল? এই সেবার ছোটবৌর পান-বসন্ত হয়েছিল, উপীনদা আট-দশদিন তাঁর শিয়র থেকে উঠলেন না। বাড়িতে এত লোক আছে, তাঁর নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল?

কিরণময়ী ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার উপীনদা কি ছোটবৌকে বড্ড ভালবাসেন?

সতীশ তৎক্ষণাৎ বলিল, ওঃ—ভয়ানক ভালবাসেন।

কিরণময়ী আবার কতক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল, ছোটবৌ দেখতে কেমন ঠাকুরপো? খুব সুন্দরী?

হাঁ, খুব সুন্দরী।

কিরণময়ী মৃদু হাসিয়া বলিল, আমার মতন?

সতীশ মুখ নীচু করিয়া রহিল; খানিক পরে কি ভাবিয়া লইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এ কথা সত্যিই জানতে চান?

সত্যি বৈ কি ঠাকুরপো।

সতীশ বলিল, দেখুন, আমার মতামতের বেশী দাম নেই। কিন্তু যদি থাকে, তা হলে এই বলি আমি, আপনার মত রূপ বোধ করি পৃথিবীতে আর নেই।

কিরণময়ী কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু ঠিক এই সময়ে নীচে ডাকাডাকির শব্দে সে উঠিয়া পড়িল। মা কালীবাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সতীশ তাহার জল-খাওয়া শেষ করিয়া বাহিরে আসিতেই অঘোরময়ীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। তিনি মুখপানে চাহিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উপীনের ভাই না বৌমা? সে কোথায়?

কিরণময়ী বলিল, তিনি বাড়ি ফিরে গেছেন।

অঘোরময়ী সংক্ষেপে 'ভাল' বলিয়া তাঁহার সিন্দুর ও চন্দনচর্চিত মুখখানি কালি করিয়া তাঁহার ছেলের ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন।

সতীশ কহিল, আমি তবে যাই বৌঠাকরুন।

কিরণময়ী অন্যমনস্কভাবে বলিল, এস।

সতীশ দুই-এক পা গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, উপীনদা চিঠি দিয়েছেন। জানতে চেয়েছেন, হারানদার চিকিৎসা কিরূপ হচ্ছে।

কিরণময়ী বলিল, চিকিৎসা বন্ধ আছে। যে ডাক্তার দেখছিল, তাঁকে দেখান অমত; অথচ, কি মত, তাও বলে যাননি।

সতীশ আশ্চর্য হইয়া বলিয়া উঠিল, সে কি কথা! চিকিৎসা একেবারে বন্ধ করে বসে আছেন—এ কি-রকম ব্যবস্থা?

ব্যবস্থা না করেই তিনি চলে গেছেন। আমার মনে হচ্চে, একবার যেন তিনি বলেছিলেন, সতীশ রইল, সে-ই ব্যবস্থা করবে—তুমি তো আসনি ঠাকুরপো।

সতীশ ক্ষণকাল অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, কাল সকালেই আসব. বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

সতীশ চলিয়া গেলে, কিরণময়ী স্বামীর ঘরের কবাট একটুখানি খুলিয়া দেখিয়া লইল. তিনি একটা মোটা তাকিয়া হেলান দিয়া মায়ের সহিত আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন। তাঁহার আজো সন্ধ্যায় জ্বর আসে নাই, এই খবরটুকু লইয়াই সে নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিল, এবং বাহিরের অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া অপূর্ব মমতার সহিত এইটুকুকে মনের মধ্যে লালন করিতে লাগিল। আজ সতীশের মুখে উপেন্দ্রর অধঃপতনের ইতিহাস তাহার সমস্ত বক্ষ মাধুর্যে ভরিয়া দিয়াছিল, আজ তাই যাহা কিছু এখানে আসিয়া পড়িল, তাহাই মধুর হইয়া কিরণময়ীকে অনির্বচনীয় রসে স্নিগ্ধ করিয়া দিতে লাগিল।

সতর

সে রাত্রে সতীশ চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত কিরণময়ী অন্ধকার বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অবশেষে উঠিয়া গিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল এবং রান্না চাপাইয়া দিয়া পুনর্বার স্তব্ধ হইয়া বসিল।

তাহার বুকের মাঝখানে আজ সতীশ নিজের অজ্ঞাতসারে আসর বাঁধিয়া সুরবালা প্রভৃতি অপরিচিত নর-নারীর দল আনিয়া এই যে এক অদ্ভুত নাটকের অস্পষ্ট অভিনয় শুরু করিয়া দিয়া সরিয়া গেল, নির্জন ঘরের মধ্যে একলাটি বসিয়া তাহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখিবার লোভ একদিকে কিরণময়ীর যেমন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল, অন্যদিকে কিসের অনির্দেশ্য শঙ্কায় তাহার হাত-পা চোখের দৃষ্টি তেমনি ভারী করিয়া দিতে লাগিল। এ যেন অন্ধকার রাত্রির ভয়ঙ্কর ভূতের গল্পের মত তাহাকে ক্রমাগত এক-হাতে টানিতে এবং আর-হাতে ঠেলিতে লাগিল। এমনি করিয়া বিচিত্র স্বপ্নজালের মধ্যে সে যখন নিরতিশয় অভিভূত. তেমনি সময়ে জুতার পদশব্দে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, দ্বারের বাহিরেই ডাক্তার অনঙ্গ-মোহন আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

কিরণময়ী মাথার কাপড় অনেকখানি টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ডাক্তার ইহা দেখিয়া ভ্রূকুটি করিলেন।

ইতিপূর্বে এই ডাক্তারটি ঠিক এই জায়গায় অনেকবার আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং পদ্ম-হস্তের রান্নার লোভে অতিথি হইবার আবেদন জানাইয়া পুনঃ পুনঃ রহস্য করিয়া গেছেন, সেই পুরাতন পরিহাসের পুনরাবৃত্তির কল্পনা করিয়াই কিরণময়ীর সমস্ত চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিল। সে কঠিন হইয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু ডাক্তার রহস্য করিলেন না, ক্রুদ্ধ গম্ভীর-মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন. দশ-বারো দিন বাইরে থাকতে হয়েছিল বলে হারানবাবুর জন্য বড় চিন্তিত হয়েছিলুম. কিন্তু এসে দেখচি উদ্বেগের কিছুমাত্র কারণ ছিল না।

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, উনি ভালই ছিলেন।

ভাল থাকলেই ভাল। আমাকে তাহলে আর আবশ্যক নেই, কি বল?

কিরণময়ী তাহার উত্তরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না—

ডাক্তার কহিলেন, তোমাদের আবশ্যক না থাকলেও আমার আবশ্যক এখনও শেষ হয়নি, এইটুকু বলবার জন্যই আমাকে এতদূর পর্যন্ত আসতে হলো।

কিরণময়ী মুখ না তুলিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, বেশ ত. মা এখনও জেগে আছেন. তাঁকে বলা দরকার—আমাকে বলা নিরর্থক।

ডাক্তার মুখখানা অতি ভীষণ করিয়া পুনর্বার কহিলেন, আমি তাঁর কাছ থেকেই আসচি। তিনিও বলেন, প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন যে শেষ হয়েচে, সে আমিও বুঝেচি. কিন্তু ডাক্তার-বিদায় বলে একটা কথা আছে, সেটা ভুলে গেলে ত চলে না।

কিরণময়ী চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার শ্লেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ পাঁচ-ছ মাস পরে এই ভারটা তুমিই নেবে, কিংবা তোমার শাশুড়ীই নেবেন, সে তোমাদের কথা, কিন্তু যাও বললেই ত ডাক্তার যায় না কিরণ।

ডাক্তারের মুখ দিয়া তাহার নিজের নাম আজ হঠাৎ যেন তীরের মত তাহাকে বিঁধিল। সে এমনি শিহরিয়া উঠিল যে, ওই ক্ষীণ আলোকেও ডাক্তার তাহা দেখিতে পাইল।

কিরণময়ী মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি চান আপনি, টাকা?

ডাক্তার হাসির ভান করিয়া বলিলেন, 'আপনি' কেন কিরণ? এখানে আর কেউ উপস্থিত নেই, 'তুমি' বললেও দোষ হবে না। কিন্তু এতদিন কি চেয়েছিলুম শুনি? সে কি টাকা?

পুনর্বার কিরণময়ীর সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল।

ডাক্তার বলিলেন, টাকা চাইনে এ কথা বলা শক্ত। এখন তোমার ও-অভাব যখন নেই, তখন টাকা দিয়েই বিদেয় কর। আমি—দু'দিকেই ঠকতে রাজী নই। কিন্তু, তুমি যে এত-দিনে আমার মনের কথাটা টের পেয়েছ, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিই। আজ আর বেশী বিরক্ত করব না, বলি, কাল একবার আসতে পারি?

এই লোকটি ভিতরে ভিতরে যে কিরূপ দগ্ধ হইতেছিল এবং এই-সমস্ত যে তাহারই উৎক্ষিপ্ত ভস্মাবশেষ, কিরণময়ী তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াও শান্ত-দৃঢ়স্বরে মুখ তুলিয়া কহিল, না। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি এখনি এনে দিচ্ছি, বলিয়াই পাশের দরজা খুলিয়া দ্রুত-পদে চলিয়া গেল।

এইবার ডাক্তার শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কিরণকে তিনি চিনিতেন। কোথায় কি যে আনিতে গেল, হঠাৎ এতরাত্রে কি একটা অসম্ভব কাণ্ড করিয়া কোথাকার হাঙ্গামা কোথায় টানিয়া আনিবে, এই দুর্ভাবনা তাঁহাকে তদ্দণ্ডেই চাপিয়া ধরিল। সে আঘাত খাইয়া চলিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া নির্দয় প্রতিঘাত করিবেই। সেই নিঃসন্দেহ প্রতিশোধের কঠোরতা কল্পনা করিয়া অনঙ্গমোহন আশঙ্কায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

ফিরিয়া আসিতে কিরণময়ীর বিলম্ব হইল না। সে নীরবে নতমুখে আঁচলে বাঁধা কতকগুলা অলঙ্কার ডাক্তারের পায়ের কাছে উজাড় করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে কহিল, এই নিন আপনি। আপনার দাবী যে কত, সে হিসাব এতদিন পরে করতে যাওয়া বৃথা। অত সময়ও আমার নেই, ধৈর্যও থাকবে না—যা-কিছু আমার ছিল, সমস্তই আপনাকে এনে দিয়েছি, এই নিয়ে আমাদের মুক্তি দিন,—আপনি যান।

অনঙ্গ পাংশুমুখে চুপ করিয়া রহিলেন; কিরণ কহিল, দেরি করচেন কিসের জন্য? বিশ্বাস করুন, আর আমার কিছুই নেই—যা ছিল সমস্তই এনে দিয়েচি—রাত হচ্চে, আপনি বিদেয়-হোন।

অনঙ্গ সভয়ে বলিলেন, আমি ত তোমার গায়ের গয়না চাইনি—টাকা চেয়েছিলুম মাত্র। তাও—

কিরণ অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল, গয়না যে টাকা, সে কথা বোঝবার বয়স আপনার হয়েচে। অনর্থক ছুতো করে কেন মিছে দেরি করচেন।

এবার অনঙ্গ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, না, আমি কিছুতেই এ-সব নিতে পারব না।

কিরণময়ী অদূরে বসিয়া পড়িয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—কেন পারবেন না? আপনি দয়া করচেন কাকে? আপনাকে যা দিলুম, কোনমতেই আর তা ফিরিয়ে নিতে পারব না, এ কথা নিশ্চয় বললুম। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, আপনি যদি নাও নেন, কাল সমস্তই গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেব, কিন্তু বাড়িতে রেখে কোনমতেই আমার স্বামীর অকল্যাণ করব না,—বলিয়া পা দিয়া সেগুলা ঈষৎ ঠেলিয়া দিয়া কহিল, নিন, তুলুন ও-সব! শেষ কথাগুলা এতই কঠিন শুনাইল যে, হতবুদ্ধি অনঙ্গমোহন হেঁট হইয়া সেগুলা কুড়াইতে লাগিল।

কিরণময়ী ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া উগ্রতা সংবরণ করিয়া নিরতিশয় ঘৃণাভরে

কহিল, নিয়ে যান। এ-সব চিহ্ন এ বাড়িতে থাকা পর্যন্ত আমার মুখে অন্নজল রুচবে না, চোখে ঘুম আসবে না।

ডাক্তার সবগুলি কুড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিরণময়ী অধীরভাবে কহিল, রাত অনেক হলো যে!

ডাক্তার কহিলেন, যাচ্ছি। কিন্তু তুমিও ভুল করলে। এ-সব আমি দিইনি, সমস্তই তোমার নিজের। তবুও কেন যে আমি না নিলে গরীব-দুঃখীকে বিলিয়ে দেবে, বুঝতে পারলুম না। আমাকে মাপ কর কিরণ।

কিরণময়ী ধমকাইয়া উঠিল—আবার নাম করে! হাঁ, ওগুলো আমার জিনিসই বটে, কিন্তু ঐ-গুলোর মায়াতেই আপনার সাহায্য নিয়েছিলুম।—রাত ঢের হলো যে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার নিজের নাম-ছাপানো একখণ্ড কার্ড বাহির করিয়া বলিলেন, আমার বাড়ির ঠিকানাটা—

দিন,—বলিয়া কিরণময়ী হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল এবং পিছাইয়া আসিয়া জ্বলন্ত উনানে উহা নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এর বেশি আমার আবশ্যক হবে না। আপনি এইমাত্র ক্ষমা চাইছিলেন না? আপনাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারব বলেই আপনার সমস্ত ঋণ, সমস্ত সম্বন্ধ, নিঃশেষ করে দিলুম। কোনদিন কোন কারণে যেন আপনাকে আমার মনে না পড়ে, যাবার সময় শুধু এই কথা বলে যান। আর কোনরূপ প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার রান্নার জায়গায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

বাহিরে ডাক্তারের পায়ের শব্দ যখন তাহার কানে দূরে চলিয়া গেল, তখন সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল, উনুন নিবিয়া গিয়াছে। ফুঁ দিয়া জ্বালিয়া দিয়া আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিল।

তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গেছে, তথাপি সে উঠিতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, বাহিরের অন্ধকারে তখনও কি-একটা আতঙ্ক যেন তাহারই জন্য হাত বাড়াইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। বুকের ভিতরটা এমনি অশান্ত হইয়া উঠিল যে, দুই বাহু দিয়া সজোরে চাপিয়া রাখিল। এই বিদায়ের পালাটা একদিন তাহাকে সমাপন করিতেই হইবে, ইহা সে নিশ্চয় জানিত, কারণ আগাছা তাহার সর্বদেহে মূল বিস্তার করিয়া তাহাকে নিরন্তর আচ্ছন্ন করিতেছে এ কথা সে যতই মনে করিয়াছে, ততই মন তাহার তিক্ত বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি এই বীভৎস বন্ধনপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবার মত জোর সে নিজের মধ্যে কিছুতেই খুঁজিয়া পায় নাই। এমনি করিয়া দিন বহিয়া গিয়াছে—অনুক্ষণ সহ্য করিয়াছে, কিন্তু কিছুই করিতে পারে নাই। সেই এতবড় শক্ত কাজটা যে এত সহজে হইয়া গেল, তাহাই কিরণময়ী চুপ করিয়া বসিয়া অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিল। প্রয়োজনের অনুরোধে যে পাপ নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বড় করিয়াছে, সে যে আজ 'যাও' বলিতেই গেল, এমন অসম্ভব কেমন করিয়া হইল! মান-ভিক্ষা, সাধাসাধি, কান্নাকাটি, মর্মস্পর্শী অনুনয়-বিনয়, এ কাজের অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারগুলা যাহার কল্পনা-মাত্র তাহাকে প্রতিদিন তপ্তশেলে বিঁধিয়া গেছে, সে-সমস্তই যে বাকী রহিল! সে কি আর একদিনের জন্য, না সত্যই সমস্ত নিঃশেষ হইল!

হঠাৎ দুয়ার খোলার শব্দে কিরণ চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, ঝি বলিতেছে, উনুন নিবে যে জল হয়ে গেছে বৌমা! রাতও ত কম হয়নি।

কিরণময়ী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া, কাছে সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার আছে, না গেছে রে?

সে ত প্রায় দু'ঘণ্টা হলো; হাতের প্রদীপটা উজ্জ্বল করিতে করিতে বলিল, কিন্তু তোমাকেও বলি বৌমা,—অকস্মাৎ জিহ্বা তাহার রুদ্ধ হইয়া গেল। প্রদীপটা উঁচু করিয়া ধরিয়া সম্পূর্ণ নিরাভরণা বধূর সর্বাঙ্গ বার বার নিরীক্ষণ করিয়া মেঝের উপর প্রদীপটা ধপ করিয়া রাখিয়া দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল,—এ-সব কি কাণ্ড বৌমা!

আঠার

দিবাকরের বড় দুঃখের রাত্রি প্রভাত হইল। কাল সকালে সে গোপনে বি. এ. ফেল হওয়ার সংবাদ পাইয়াছিল, এবং সন্ধ্যাবেলায় তাহারই বিবাহের কথাবার্তা তাহারই ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উপীনদাকে হৃষ্টচিত্তে, পরম উৎসাহে ভট্‌চাযি্য মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে শুনিয়া যথার্থই সে অকপটে নিজের মরণ-কামনা করিয়াছিল। সদ্য-পুত্রহারা জননী যেমন ব্যথায় ঘুমাইয়া পড়েন, ব্যথায় জাগিয়া উঠেন, সেই হতভাগিনীর মতই আজ সে ব্যথা লইয়া ঘুম ভাঙিয়া উঠিল। চোখ মেলিয়া দেখিল, ঘরের পূর্বদিকের সার্সীর গায়ে আলোর আভাস লাগিয়াছে। আজ, এই আলোকের সহিত সে নিজে লেশমাত্র সম্বন্ধ অনুভব করিল না। দিবসের এই প্রথম রশ্মিকণাটুকুকে যে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া অভিবাদন করিয়া লইতে হয়, এ কথা তাহার মনেও পড়িল না। পান্থশালার সম্পূর্ণ অপরিচিত অতিথির মুখের মত এই আলোক-কণাটুকুর পানে সে পরম ঔদাস্যভরে চাহিয়া বিছানাতেই পড়িয়া রহিল। স্বচ্ছ কাঁচের বাহিরে অসীম নীলাকাশ দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ মনে হইল, এই বিরাট সৃষ্টির কোথাও কোনও কোণে তাহার জন্য একটুকু স্থান আছে কিনা। তাহার পর যতদূর দেখা যায় তলাইয়া দেখিল, না কোথাও নাই। সৃষ্টিকর্তা এত সৃজন করিয়াছেন বটে, কিন্তু উপরে, নীচে, আশেপাশে, জলে-স্থলে সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থানও তাহার জন্য সৃষ্টি করিয়া রাখেন নাই। তাহার মা নাই, বাপ নাই, গৃহ নাই, বুঝি জন্মভূমিও নাই। না, যথার্থই আপনার বলিতে কোথাও কিছুই নাই। এই যে অতি ক্ষুদ্র কক্ষটুকু, শত-সহস্র বন্ধনে যাহার সহিত সে জড়িত, জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যাহা তাহাকে মাতৃস্নেহে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে, তাহাও তাহার নিজের নয়—এ তাহার মামার বাড়ি। এ আশ্রয় তাহার জননীর নহে—বিমাতার।

এইরূপে দুঃখের চিন্তা যখন ক্রমশঃ জটিল ও বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, অকস্মাৎ উপেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে তাহা একমুহূর্তে সোজা পথে ফিরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া জানালা খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, উপেন্দ্র ভৃত্যকে কি একটা আদেশ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তিনি ত কোনদিকে না চাহিয়াই সোজা চলিয়া গেলেন, কিন্তু, দিবাকর নিজের সেই দুই চোখে ব্যথা অনুভব করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার মনে হইল, ছোড়দার উন্নত দৃঢ় ললাটের উপর কতকটা সূর্যরশ্মি যেন ধাক্কা খাইয়া তাহার চোখের উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। সে আর একবার শয্যা আশ্রয় করিয়া নির্জীবের মত চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল এবং দুশ্চিন্তারাশি তদ্দণ্ডেই তাহাকে আবার চাপিয়া ধরিল।

আজিও অভ্যাসমত তাহার প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙিয়াছিল বটে, কিন্তু গত রাত্রিতে সে যে ঘুমাইতে পারে নাই, দুঃস্বপন-ভূতপ্রেতের দল সারারাত্রিই এই দেহটাকে লইয়া টানা-ছেঁড়া করিয়া এইমাত্র ফেলিয়া গেছে, তাহাদের পরিত্যক্ত নিশ্বাসের বাষ্প এখনও ঘরের কোণে জমা হইয়া আছে, ইহা সে চোখ বুজিয়াই অনুভব করিতে লাগিল। আবার মনে পড়িল, সে ফেল হইয়াছে,—তাহার অনেক দুঃখের লেখাপড়া ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আজ এ সংবাদ সবাই শুনিবে। তার পরে? তার পরে ধুঁয়া যেমন একটুখানি রন্ধ্রের সাহায্যে সমস্ত ঘর নিমিষে ব্যাপ্ত করিয়া ঘোলা করিয়া দেয়, তেমনি করিয়া একটিমাত্র নিষ্ফলতার ক্ষুদ্র দ্বার ধরিয়া নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে তাহার সমস্ত মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বেলা প্রায় আটটা। সে দুই-হাত মুঠা করিয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, না, কোন মতেই না। ছোড়দা রাগ করুন, কিংবা বৌদি দুঃখ করুন, এ আমি কিছুতেই পারব না। যিনি গৃহলক্ষ্মী হবেন, হয় তিনি আমার গৃহেই আসবেন, না হয় কোনদিনই আসবেন না। পারি, সসম্মানে প্রতিষ্ঠা করব, না পারি অন্ততঃ অসম্মানের মধ্যে টেনে আনব না। এ সঙ্কল্প হতে কেউ আমাকে বিচলিত করতে পারবে না।

দিবাকর ধীর-পদে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সুরবালার ঘরের সুমুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, বৌদি!

ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠের আহ্বান আসিল, ঘরে এস।

দিবাকর প্রবেশ করিয়া দেখিল, আলমারি উজাড় করিয়া সুরবালা নতমুখে বসিয়া তোরঙ্গ সাজাইতেছে; জিজ্ঞাসা করিল, ছোড়দা মফঃস্বলে যাবেন?

সুরবালা তেমনিভাবে কহিল, না, কলকাতায় যাবেন।

ইহার পরে আর দিবাকরের মুখে কথা যোগাইল না। নিজের নির্জন ঘরের মধ্যে যে শক্তি তাহাকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া এতদূরে আনিয়াছিল, প্রয়োজনের সময় সে শক্তি অন্তর্ধান করিল। সে মৌনমুখে ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া শুরু করা যায়।

এমন সময় বারান্দায় জুতার শব্দ শোনা গেল, এবং পরক্ষণেই উপেন্দ্র পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিলেন। দিবাকর অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া পলাইবার উপক্রম করিতেই উপেন্দ্র 'দাঁড়া' বলিয়া ধীরে-সুস্থে খাটের উপর বসিলেন এবং জামা খুলিতে খুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, ফেল হলি কি করে? রোজ রাত্রি একটা পর্যন্ত জেগে জেগে এতদিন তবে করেছিলি কি?

এ কথার আর জবাব কি? দিবাকর অধোবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

উপেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, এ বাড়িতে থেকে তোর কিছু হবে না দেখচি। যা, কলকাতায় গিয়ে পড়্ গে, তা হলে যদি মানুষ হতে পারিস।

তারপর একটু হাসিয়া বলিলেন, বৌদির কাছে কি দরবার করতে এসেছিলি? বিয়ে করবি নে, এই ত?

কথা শুনিয়া দিবাকর বাঁচিয়া গেল। তাহার সমস্ত দুঃখ যেন একেবারে ধুইয়া মুছিয়া গেল, সে সহসা হাসিয়া ফেলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

উপেন্দ্র হাসিলেন, যদিচ সে হাসির মর্ম কেহ বুঝিল না, তারপরে বলিলেন, আচ্ছা, এখন মন দিয়া পড়্ গে—আগামী অঘ্রান পর্যন্ত তোর ছুটি—তার এখনও অনেক বাকী। স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, সতীশ টেলিগ্রাফ করেছে, হারানদার অবস্থা ভারী খারাপ—আমি রাত্রির ট্রেন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না, এই এগারটার গাড়িতেই যাব, একবার থার্মোমিটারটা দাও ত দেখি, জ্বরটা বাড়ল কি না—ওকি, অত বড় তোরঙ্গ কি হবে? একটা ছোটখাটো দেখে দাও না।

সুরবালা কাপড় পাট করিয়া তোরঙ্গ বোঝাই করিতেছিল, কাজ করিতে করিতে মৃদুস্বরে কহিল, ছোট তোরঙ্গে দুজনার কাপড় আঁটিবে না,—আমিও সঙ্গে যাব।

উপেন্দ্র অবাক হইয়া কহিলেন, তুমি যাবে! ক্ষেপে গেলে নাকি?

সুরবালা মুখ না তুলিয়াই বলিল, না। পরে দিবাকরের উদ্দেশে কহিল, ঠাকুরপো, একটু শিগ্গির করে স্নান করে খেয়ে নাও, তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

দিবাকর সবিস্ময়ে উপেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতেই তিনি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তুইও কি পাগল হলি নাকি? হারানদার ভারী ব্যারাম, বোধ করি দিন শেষ হয়ে এসেছে, আমি যাচ্চি তাঁর সৎকার করতে, তোরা তার মাঝখানে যাবি কোথায়? যা, তুই নিজের কাজে যা।

সুরবালা এবার মুখ তুলিল। দিবাকরের দিকে চাহিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, আমি আদেশ করছি ঠাকুরপো, তুমি প্রস্তুত হও গে। তোমার ছোড়দা তিনদিন জ্বরে ভুগছেন, আজও জ্বর ছাড়েনি—তাই আমিও সঙ্গে যাব, তোমাকেও যেতে হবে। যাও, দেরি করো না।

উপেন্দ্র মনে মনে ভারী আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তিনি ইতিপূর্বে কোনদিন সুরবালার এরূপ কণ্ঠস্বর শোনেন নাই। সে যে স্বচ্ছন্দে একজন পুরুষমানুষকে এমন ছোট ছেলেটির মত হুকুম করিতে পারে, তাহা স্বকর্ণে না শুনিলে বোধ করি তিনি বিশ্বাস করিতেই পারিতেন না। তথাপি তিরস্কারের স্বরে কহিলেন, আমি যাচ্চি বিপদের মাঝখানে। তোমরা কেন সঙ্গে গিয়ে সেই বিপদ বাড়িয়ে তুলবে? তোমার যাওয়া হবে না। তাঁহার শেষ কথাটা কিছু কঠোর শুনাইল।

সুরবালা দাঁড়াইয়া উঠিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া পূর্ববৎ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, কেন তুমি সকলের সামনে সব কথায় আমাকে বকো? তুমি অসুখ নিয়ে বাইরে গেলে আমি সঙ্গে যাবোই। নটা বাজে, দাঁড়িয়ে থেকো না ঠাকুরপো, যাও।

দিবাকরের সুমুখে নিজের রূঢ়তায় উপেন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলেন, বকবো

কেন তোমাকে, বাকিনি। কিন্তু বাবা শুনলে কি মনে করবেন বল ত? যা দিবাকর, তুই খেয়ে নিগে।

সুরবালা কহিল, বাবা আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছেন।

এর মধ্যে তাঁর কাছেও গিয়েছিলে?

হাঁ, যাই তোমার দুধ নিয়ে আসি, বলিয়া সুরবালা ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। উপেন্দ্র গলার উড়ানিটা আলনা লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চিত হইয়া শুইয়া পড়িলেন। সুরবালা যে সঙ্গে যাইবেই, স্বামীর অসুস্থ দেহটা সে যে কিছুতেই চোখের আড় করিবে না, ইহাতে আর কাহারও সংশয় রহিল না। দিবাকর প্রস্তুত হইবার জন্য ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

উপেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, জিদ করিয়া সুরবালা এই যে এক নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিল, কলিকাতায় পৌঁছিয়া তাহার কি মীমাংসা করা যাইবে! কোথায় গিয়া উঠা যাইবে! হারানদাদার ওখানে অসম্ভব, কারণ, শুধু যে সেখানে স্থানাভাব, তাহা নহে, সেখানে কিরণময়ীর স্বামী মরিতেছে। তথাপি তাহারই চোখের উপর সুরবালা যে নিজের স্বামীর বিন্দু-পরিমাণ পীড়াটুকুও উপেক্ষা করিবে না, শোভন অশোভন কিছুই মানিবে না, স্বামীর স্বাস্থ্যটুকু অনুক্ষণ সতর্ক প্রহরা দিয়া ফিরিবে, ব্যাপারটা মনে করিয়াও তাঁহার লজ্জাবোধ হইল। বন্ধু জ্যোতিষের বাটীতে উপস্থিত হওয়াও প্রায় তদ্রূপ। সুরবালা বিষম হিন্দু; এই বয়সেই রীতিমত জপ-তপ আরম্ভ করিয়াছে,—সে বাটীতে এতটুকু অহিন্দু-আচার চোখে দেখিলে হয়ত জলগ্রহণ পর্যন্ত করিবে না। অতবড় বাটীর মধ্যে একমাত্র মায়ের আচার-বিচার বিশেষ কোন কাজেই লাগিবে না। তা ছাড়া, সেখানে সরোজিনী তাহার প্রায় সমবয়সী। তাহার বাড়িতে বসিয়া তাহাকেই ছুঁই ছুঁই করিয়া বাস করা সুখেরও নয়, উচিতও নয়। বাকী রহিল সতীশ। উপেন্দ্র শুনিয়াছিলেন, তাহার নূতন বাসায় সে একা থাকে। স্থানও যথেষ্ট। বিশেষতঃ সেও এই জপ-তপের দলভুক্ত। সতীশ ও দিবাকর—আচারনিষ্ঠ এই দুটি দেবর লইয়া সুরবালা ভালই থাকিবে।

উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সতীশকে তার করিয়া দিলেন, তিনি রওনা হইয়াছেন।

সংবাদ পাইয়া সতীশ স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা করিল।

ভগবান সতীশকে যথার্থ-ই দেহ-মনে বড় শক্ত করিয়া গড়িয়াছিলেন। তাই সেদিন হইতে মুমূর্ষু হারানের হতভাগ্য পরিবারের সমস্ত গুরুভার মাথায় লইয়া যেমন বহিতেছিল, সাবিত্রী বিপিনের ইতিহাসটাও সেদিন সে তেমনি সহ্য করিয়া লইয়াছিল।

এই ইতিহাস জানিত শুধু বেহারী এবং তাহার পরম পূজ্যপাদ চক্রবর্তীমশাই। বেহারী মনে করিত, সে সাবিত্রীকে অত্যন্ত ঘৃণা করে। তাই কাল দুপুরবেলাতেও সে চক্রবর্তীর প্রসাদ পাইয়া ক্ষুদ্র কলিকাটি উপুড় করিয়া দিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, ছি, ছি, দেবতা, মেয়েটা করলে কি! বাবুকে আমার সে চিনলে না, তাই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো বাঁধলে! শেষকালে কিনা বিপিনবাবুর সঙ্গে চলে গেল!

চক্রবর্তী হেলিয়া দুলিয়া জবাব দিলেন, বেহারী. নিমাই-সন্ন্যাসে লেখা আছে, 'মুনিনাঞ্চ মতভ্রম', না হলে সাবিত্রীর মত মেয়ে এতবড় আহাম্মুকি করে ফেলবে কেন! কিন্তু এই বলে রাখচি তোকে, পস্তাতে তাকে হবেই। মেয়েটা দেখতে শুনতেও মন্দ ছিল না, আমার সঙ্গে বসে দাঁড়িয়ে, শুনে শুনে, বাবু-ভায়াদের সঙ্গে দুটো কথাবার্তা কইতেও শিখেছিল, বুবোকাল, সতীশবাবুর নজরেও লেগে গিয়েছিল, টিঁকে থাকতে পারলে আখেরে ভাল হতো। কিন্তু আমার একটা মতলব পর্যন্ত ত নিলে না! ওরে বাপু, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেলে কি চলে? রাজ্যের লোক বিপদে পড়লেই যে ছুটে এসে এই চক্কোত্তিমশায়ের পা-দুটো ধরে, তা কেন? এই সেদিন সদির মা—

সদির মার ভাল-মন্দের জন্যে বেহারীর কৌতূহল ছিল না, সে কথার মাঝেই বলিয়া উঠিল. কিন্তু যাই বল দেবতা, বাবু বলতে হয় ত আমার মনিবকে। বড়লোক কলকাতা শহরে ঢের দেখলুম, কিন্তু এমন জোয়ান, এমন বুকের পাটা ত কারু দেখলুম না। যেন হাতীকে দাঁত, মরদ্‌কে বাত্‌! সেই যে সেদিন বলে দিলুম, বাবু, আর না, বাস্‌! যেমার

একটি দিন তার নাম পর্যন্ত মুখে আনলেন না, অথচ, কতখানিই না ভালবাসতেন—কি বলেন ঠাকুরমশাই?

চক্রবর্তী মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন, সেকথা ত শুরুতেই বলে দিয়েছি। এই থেকেই যত খুন-জখম, জেল, ফাঁসি—একবার চোখোচোখি হয়ে গেলে কি আর রক্ষে আছে বেহারী!

বেহারী শিহরিয়া উঠিল; পাংশু-মুখে সভয়ে বলিল, না না, ঠাকুরমশাই, বাবু আমার সে ধাতের লোক নয়। কিন্তু, কোন্ ঠিকানায় সে আছে জান কি? এর মধ্যে পথে-টথে কখন—

চক্রবর্তী অট্টহাসি হাসিয়া বলিলেন, মুখ্যু বলে আর কাকে! সে কি বিপিনবাবুর কাছে দাসীবৃত্তি করতে গেছে বেহারী, যে, পথে-ঘাটে দেখা হবে? সে নিজেই এখন কত গন্ডা দাসদাসী রেখেচে দেখ গে যা!

বেহারী নিরুদ্বিগ্ন হইল। স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, সে বটে। তাই ত মনে করলুম, যাই একবার ঠাকুরমশায়ের কাছে, দেখি তিনি কি বলেন! তাই বল দেবতা, আশীর্বাদ কর সে রাজরানী হোক, গাড়ি-পালকি চড়ে বেড়াক, দুজনের চোখোচোখি এ জন্মে আর যেন না হয়! এই বলিয়া সে মনের আনন্দে চক্রবর্তীর পদধূলি মাথায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িল।

এবার কলিকাতায় আসিয়া অবধি সতীশ বাসার বাহির হইলেই ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বেহারী এই ভয়ে ব্যাকুল হইয়া থাকিত, পাছে দৈবাৎ কোথাও দুজনের দেখা হইয়া যায়। সতীশ যে অত্যন্ত বদ্‌রাগী, এ সংবাদ সে বাটীর পুরাতন দাসদাসীর মুখে শুনিয়া আসিয়াছিল, এবং সাবিত্রী যত বড় গর্হিত কাজ করিয়াছে তাহাতে খুনোখুনি কাটাকাটি হয় ইহাও তাহার এতটা বয়সে অবিদিত ছিল না। শুধু সাবিত্রী যে কোনদিন দাসদাসী লইয়া যানবাহনে চলাফেরা করিতে পারে এই সম্ভাবনাটাই তাহার মাথায় ঢোকে নাই। আজ চক্রবর্তীর মুখের আশ্বাসবাক্যে সে নির্ভয় হইয়া বাঁচিল। সাবিত্রীর উপরে বিষম ক্রোধ তাহার পড়িয়া গেল, সে নিরুদ্বেগে পথ চলিতে চলিতে প্রতি মুহূর্তে আশা করিতে লাগিল, হয়ত মস্ত একটা জুড়ির উপর রাজরানী-বেশে এইবার সে সাবিত্রীকে দেখিতে পাইবে। সাবিত্রীকে বেহারী সত্যই ভালবাসিত। সে কি, কিংবা কোন্ পথে তাহার রানী হওয়া সম্ভব, এ-সকল অনাবশ্যক প্রশ্ন তাহার মনে ঠাঁই পাইত না। চিরদিনই সাবিত্রী তাহার পরম স্নেহের, পরম শ্রদ্ধার পাত্রী। সে দুঃখী, সে তাহাদের মত লোকের সঙ্গে এক আসনে দাঁড়াইয়া দাসীবৃত্তি করে মনে করিতেও তাহার লজ্জায় সঙ্কোচে মাথা হেঁট হইয়া যাইত। তথাপি সেইদিন হইতে অন্তরে বড় দুঃখ, বড় যাতনা পাইয়াই বেহারী তাহার উপর রুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আজ যেই শুনিল, সাবিত্রী তাহার মনিবের পথের কণ্টক, সুখের অন্তরায় নয়, সে সর্বান্তঃকরণে বারংবার আশীর্বাদ করিতে লাগিল, সাবিত্রী সুখী হোক, নির্বিঘ্ন হোক, রাজরাজেশ্বরী হোক।

উনিশ

হারানের জীবন-মরণের লড়াই ক্রমশঃ যেন একটা করুণ তামাশার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষুধার্ত সাপের মত মৃত্যু তাহাকে যতই অবিচ্ছিন্ন আকর্ষণে জঠরে টানিতেছিল, ব্যাঙের মত ততই সে দুই পায়ে তাহার চোয়াল আটকাইয়া ধরিয়া কোন এক অদ্ভুত কৌশলে দিনের পর দিন মৃত্যু এড়াইয়া যাইতেছিল। বস্তুতঃ, অশেষ দুঃখময় প্রাণটা তাহার যেন কোনমতেই শেষ হইবে না, এমনি মনে হইতেছিল।

এই বিপদে সতীশ আসিয়াছিল সাহায্য করিতে। কিন্তু কিরণময়ীর স্বামী-সেবা দেখিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে নিজেও অনেক দেখিয়াছে, স্ত্রীলোকের স্বামীর বড় কেহ নাই, তাহাও জানিত, কিন্তু যে কারণেই হোক, কোন মানুষ যে সমস্ত জানিয়া বুঝিয়া এতবড় পন্ডশ্রম এমন প্রাণ ঢালিয়া করিতে পারে, তাহা ত সে কল্পনা করিতেও পারিত না।

এ কি আশ্চর্য সেবা! প্রত্যহ সারারাত্রি একভাবে শয্যাপার্শ্বে জাগিয়া বসিয়া সমস্তদিন

এ কি অক্লান্ত পরিশ্রম! অথচ, মুখের উপর অবসাদ-বিষাদের দাগটুকু পর্যন্ত নাই। মুখ দেখিয়া বুঝিবার সাধ্য নাই কতবড় বিপদ তাহার মাথার উপর আসন্ন হইয়া রহিয়াছে!

সতীশ তাহার এই বৌঠানটিকে যথার্থই জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিয়াছিল। তাঁহার এই একান্ত উদ্বেগলেশহীন পতিসেবা দেখিয়া তাহার অত্যন্ত ব্যথার সহিত কেবলই মনে হইতেছিল, যে কারণেই হউক, বৌঠানের আশা হইয়াছে স্বামী বাঁচিবেন। অতএব, শেষ পর্যন্ত তাঁহার মনে যে কি বেদনাই বাজিবে ইহাই কল্পনা করিয়া সে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল, এবং কি উপায়ে এই অপ্রিয় সত্য গোচর করা যায়, ইহাই তাহার অনুক্ষণ চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল।

এমন একদিন ছিল, যখন নিজের সম্বন্ধে সতীশের ভারী বিশ্বাস ছিল, সে বুদ্ধিমান; লোকচরিত্র বুঝিতে বিশেষ অভিজ্ঞ। কিন্তু সাবিত্রীর কাছে ঘা খাইয়া অবধি এ দর্প তাহার ভাঙিয়া গিয়াছিল। সাবিত্রী তাহাকে ত্যাগ করিয়া বিপিনের কাছে চলিয়া গেল, সংসারে ইহাও যখন সম্ভব হইতে পারিল, তখনই সে টের পাইয়াছিল লোকচরিত্র সে কিছুই বুঝে না। মানুষের মনের ভিতর কি আছে, না আছে, তা লইয়া যার খুশি সে আলোচনা করিয়া বড়াই করুক, সে আর করিবে না। কথাটা স্মরণ করিলেও তাহার লজ্জা ও অনুশোচনার অন্ত থাকে না, যে, এই বুদ্ধির গর্বেই সে এই বৌঠানটির সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়াছিল এবং উপীনদাকে শিখাইতে গিয়াছিল।

আজ সকালে সতীশ ও-বাড়িতে উপস্থিত হইয়া দেখিল কিরণময়ী তেমনি প্রসন্ন শান্তোজ্জ্বল মুখে একা গৃহকর্ম করিতেছেন। দুই-তিনদিন শাশুড়ী আবার অসুখে পড়িয়াছেন। গত রাত্রে জ্বরটা কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় এখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই। কিরণময়ীর মুখ দেখিয়া কোন কথাই অনুমান করিবার জো ছিল না বলিয়া প্রত্যহ সতীশকে সব কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই জানিতে হইত। আজ প্রশ্ন করিতেই তিনি কাজ হইতে মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, আর দেরি করার আবশ্যক নেই, তোমার দাদাকে একবার আসতে লেখ।

সতীশ ভীত হইয়া প্রশ্ন করিল, কেন বৌঠান?

কিরণময়ীর মুখের উপর দিয়া শরতের একখণ্ড লঘু মেঘ ভাসিয়া গেল মাত্র। এ মুখের সহিত যাহার বিশেষ পরিচয় নাই, এ ছায়াটুকু তাহার নজরে পড়িবে না। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, এইবার বোধ করি যন্ত্রণার শেষ হয়ে এসেছে—তুমি একখানা টেলিগ্রাফ করে দাও।

সতীশ ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, এ আমি জানতুম বৌঠান। কিন্তু পাছে তুমি ভয় পাও, তাই বলতে সাহস করিনি।

কিরণময়ী সহজভাবে বলিলেন, ভয় পাবার কথা বৈ কি ঠাকুরপো, তাঁর শ্বাসের লক্ষণ পরশু টের পাই, কাল রাত্রে আরও একটু বেড়েচে। এ কমবে না, তাই একবার তাঁকে আসতে বলচি।

সতীশ এ খবর জানিত না, চমকিয়া বলিল, কৈ, সে ত আমি টের পাইনি। তুমিও বলনি।

কিরণময়ী কহিলেন, না। ও এত ধীরে ধীরে উঠেচে যে, পরের টের পাবার কথাও না। তবে আজ বিশেষ ভয় নেই। কিন্তু বিপদের ওপর বিপদ, দেখ ঠাকুরপো, কাল থেকে মায়ের অসুখটাও বাঁকা পথ ধরেচে। এইমাত্র দেখলুম বেশ জ্বর, মাঝে মাঝে ভুলও বকচেন, —বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন। কিন্তু, এ হাসি দেখিলে কান্না পায়।

সতীশের চোখে জল আসিল, সে সজল-কণ্ঠে আস্তে আস্তে কহিল, উপীনদা আসুন।

কিরণময়ী কহিলেন, আর একটা খবর শুনবে ঠাকুরপো?

সতীশ মৌনমুখে চাহিয়া রহিল, কিরণময়ী বলিলেন, পরশুদিন বিকালে একটা উকীলের চিঠি পাই, তাতে জানা গেল, বছর-দুই পূর্বে উনি এক বন্ধুর জামিন হয়ে হাজার-তিনেক টাকা কর্জ করেন। বন্ধু ব্যবসা ফেল করে সুদে-আসলে প্রায় হাজার-চারেক টাকা এঁর মাথায় তুলে দিয়ে বিষ খেয়ে মরেছেন। সে টাকা এই ভাঙ্গা বাড়ির ইঁট-কাঠ

বেচে শোধ হতে পারবে কিনা, উকীল সেই সংবাদটা অতি অবশ্য জানতে চেয়েছেন। বলিয়া তিনি আবার ঠিক তেমনি করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সতীশ মুখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। সে চোখ তুলিয়া দেখিতেও সাহস করিল না, প্রশ্নের জবাব দিতেও ভরসা করিল না।

সতীশ উপেন্দ্রকে টেলিগ্রাফ করিয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন বেলা দশটা। আস্তে আস্তে রান্নাঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। কিরণময়ী শাশুড়ীর জন্য সাগু তৈরি করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, বোসো ঠাকুরপো। তাঁহার গলাটা ঈষৎ ভারী। সতীশ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, চোখে অশ্রু নাই বটে, কিন্তু পাতা দুটি ভিজা। সে অদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। আজ কিরণময়ী আসন দিবার কথাও তুলিলেন না। সে কোথায় বসিল, কি করিল, বোধ করি তাহা দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার কোন সামান্য বিষয়েও কিছুমাত্র ত্রুটি এ পর্যন্ত সতীশ দেখে নাই। এতদিনের এত আসা-যাওয়া, এত মেশামেশির মধ্যে একটি দিনের তরেও সে বৌঠানের সহজ সরল ব্যবহারে সৌজন্যের এতটুকু অভাব, ঘনিষ্ঠতার বিন্দুপ্রমাণ অনাচার খুঁজিয়া পায় নাই, তাই আজ এইটুকুমাত্র অবহেলা যেন চোখে আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া দিল, কি গুরুভারে বৌঠানের সমস্ত মন আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

বহুক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ একসময় কিরণময়ী যেন আপনাকে আপনি তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বোধ হয় এতক্ষণ তিনি এই চিন্তাতেই মগ্ন ছিলেন, কহিলেন, আচ্ছা বল ত ঠাকুরপো, যমের সঙ্গে এই-সব দেনা-পাওনার ঝঞ্ঝাট মিটে যাবার পরে আমার চাকরি করা উচিত, না ভিক্ষে করা উচিত।

কথাটা সতীশ বুঝিতে পারিল। কহিল, উপীনদাকে জিজ্ঞেস কোরো, তিনি জবাব দেবেন।

কিরণময়ী কহিলেন, জিজ্ঞেসা না করেও বুঝতে পারচি, হয়ত দয়া করে তিনি আমাকে দুটো খেতে দেবেন, কিন্তু, এই পরের উপর নির্ভর করে থাকাই ত ভিক্ষে করা ঠাকুরপো!

সতীশ হঠাৎ বোধ করি প্রতিবাদ করিতে গেল, কিন্তু কথা খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল।

কিরণময়ী তাহার মনের ভাব বুঝিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, মুখ ফুটে বললেই রূঢ় হয় তা জানি ঠাকুরপো, কিন্তু কথাটা যে সত্যি! ক্ষণকাল থামিয়া কহিলেন, মনে কোরো না তোমার দাদাকে আমি চিনতে পারিনি। আমি তাঁকে চিনেচি! বুঝেচি, অনাথাকে দিতে তিনি জানেন, কিন্তু, শুধু দেওয়াই ত নয়, নেওয়াও ত আছে। দিয়ে কখনও দেখিনি ঠাকুরপো, কিন্তু, সারাজীবন পরের মন যুগিয়ে নিতে পারা যে কম কঠিন নয়, সে কথা যে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েচি।

তথাপি সতীশ উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু, কিরণময়ীর যেন ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছিল, প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করিলেন না, কহিলেন, এই পৃথিবীর সঙ্গে কারবার আমার বেশীদিনের নয়—দেনা-পাওনা চুকিয়ে নিতে এখনও ঢের বাকী। এই দীর্ঘ জীবনের হিসেব-নিকেশে দোষঘাট ভুলভ্রান্তি হতেও পারে। তখন, তিনিই বা কি বলে দেবেন, আর আমিই বা কোন্ মুখে হাত পাতব? তখন যে আবার গোড়া থেকে নিজের পথে নিজে চলতে হবে।

এতক্ষণ সতীশ শ্রদ্ধার সহিত, ব্যথার সহিত, তাহার ভাবী আশঙ্কার কথাগুলো শুনিতেছিল, কিন্তু শেষ কথাটায় যেন খোঁচা খাইয়া চমকিয়া উঠিল। কহিল, ও-কি কথা বৌঠান! দোষঘাট সকলেরই হয়, ভুলভ্রান্তি হবে কেন?

কিরণময়ী সতীশের উৎকণ্ঠিত বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া হাসিলেন। একমুহূর্তে নিজের ব্যগ্র উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর শান্ত কোমল করিয়া কহিলেন, কে জানে ঠাকুরপো, আমিও ত মানুষ।

হাসি দেখিয়া সতীশ নিজের ভ্রম বুঝিল। মুহূর্তের উত্তেজনায় তাহার মন যে কু-অর্থ গ্রহণ করিতে গিয়াছিল, সেই লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, আমাকে মাপ কোরো বৌঠান, আমি যেমন নির্বোধ, তেমনি অশুচি!

কিরণময়ী জবাব দিলেন না, আবার একটু হাসিলেন মাত্র।

অকস্মাৎ সতীশের অনুতপ্ত অপরাধী মন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, জোর দিয়া বলিয়া

উঠিল, কিন্তু, কেবল উপীনদার কথাই হবে কেন? তিনিই কি সব, আমি কেউ নয়? আমি তোমাকে তাঁর আশ্রয় নিতে দেব না।

কিরণময়ী হাসিমুখে কহিলেন, সে ত এক কথাই ঠাকুরপো। তুমি আর তোমার দাদা ত পর নয়। তোমার আশ্রয়ে তোমারও ত মন যুগিয়ে ভিক্ষে নিতে হবে।

সতীশ বলিল, না, হবে না, তার কারণ, আমি তোমার ছোট ভাই, কিন্তু উপীনদা তোমার স্বামীর বন্ধু। দরকার হয়, আমার বোনের ভার আমিই নিতে পারব।

কিন্তু যদি তোমার মন যুগিয়ে না চলতে পারি?

আমিও তোমার মন যুগিয়ে চলব না।

কিরণময়ী প্রশ্ন করিলেন, যদি দোষ অপরাধ করি?

সতীশ জবাব দিল, তা হলে ভাই-বোনে ঝগড়া হবে।

কিরণময়ী আবার প্রশ্ন করিলেন, জীবনে যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যায়, সে কি আমার এই ছোট ভাইটিই ক্ষমা করতে পারবে?

সতীশ মুখ তুলিয়া মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া সহসা অত্যন্ত ব্যথিতস্বরে কহিল, এ ভুল-ভ্রান্তির মানে আমি বুঝতে পারিনে বৌঠান। ছোট ভাইকে অর্থ বুঝিয়ে বলা আবশ্যক মনে কর, বল, আবশ্যক না মনে কর, ব'লো না। কিন্তু অর্থ তোমার যাই হোক, যে অপরাধ মনে আনাও যায় না, তাও যদি সম্ভব হয়, তবুও ভুলতে পারব না দিদি, আমি তোমার ছোট ভাই!

তাহার সাবিত্রীর কথা মনে পড়িল। কহিল, বৌদি, আজ তোমার এই ছোট ভাইটির অহঙ্কার মার্জনা কর—কিন্তু, যে অপরাধ এ জীবনে আমি ক্ষমা করতে পেরেচি, সে অপরাধ ক্ষমা করতে স্বয়ং ভগবানের বুকেও বাজত। বলিয়াই চাহিয়া দেখিল, কিরণময়ীর দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। সতীশ নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া পুনরায় গাঢ়স্বরে কহিল, আজ আমাকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ দিদি, যে-সতীশ নিজের দুর্বুদ্ধির স্পর্ধায় তোমাকে বৌঠান বলে ব্যঙ্গ করেছিল, সে তোমার এ-ভাইটি নয়। বলিতে বলিতে তাহার সমস্ত মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, সে আমি নই! সে কখনো তোমাদের চিনতে পারেনি, কখনো তোমাদের পুজো করতে শেখেনি, তাই জগন্নাথকে সে কাঠের পুতুল বলে উপহাস করেছিল। নিজের মহাপাতকের ভরা নিয়ে সে ডুবে গেছে বৌদি, সে আর নেই। বলিয়া সে ঘাড় হেঁট করিয়া নিজের অন্তরের ভিতর তলাইয়া দেখিতে লাগিল।

কিরণময়ী নির্নিমেষ চোখে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে অতি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কি করে আমাদের চিনলে ভাই?

সতীশ ঘাড় হেঁট করিয়াই বলিল, সে কথা গুরুজনের সুমুখে বলবার নয় বৌদি!

বলবার নয়? এ কি কথা! অকস্মাৎ সংশয়ে, ভয়ে কিরণময়ীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। ডাকিল, ঠাকুরপো?

কেন, বৌদি!

মুখ তোল দেখি?

সতীশ মুহূর্তকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া মুখ উঁচু করিল।

কিরণময়ী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, তুমি যে একটা বড় ব্যথা নিয়ে এস যাও, সে আমি অনেকদিন টের পেয়েচি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করবার অধিকার ছিল না বলেই জানতে চাইনি। কিন্তু আজ তুমি আমার ছোট ভাই—কি হয়েচে বল।

সতীশ মাথা হেঁট করিয়া বলিল, সে লজ্জার কথা বৌঠান।

কিরণময়ী কহিলেন, হোক লজ্জার। তবু তোমার এই বোনটিকে তার ভাগ দিতে হবে। ব্যথা তোমাকে আমি একা বয়ে বেড়াতে দেব না।

তার পরে একটু একটু করিয়া কিরণময়ী গোড়া হইতে এই দুঃখের অনেকখানি ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া লইয়া শেষে কহিলেন, কিন্তু, কেন এমন কাজ করলে?

সতীশ নির্বাক হইয়া রহিল।

কিরণময়ী প্রশ্ন করিলেন, কে সে?

সতীশ মুখ নীচু করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, হতভাগিনী—

কিন্তু কোথায় সে?

জানিনে।

খোঁজ করোনি?

সতীশ মৃদুস্বরে কহিল, না, তার আবশ্যক নেই। শুনেছি সে ভাল আছে।

কিরণময়ী ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ভাল আছে! ছি ছি, কেন এমন করে নিজেকে ঠকতে দিলে!

এবার সতীশ আর একবার মুখ উঁচু করিল। সুস্পষ্ট-কণ্ঠে জবাব দিল, আমি ঠকিনি বৌদি, কারণ আমি ভালবাসতে পেরেছিলাম। কিন্তু ঠকেছে সে,—সে ভালবাসতে পারেনি।

তার পরে?

সতীশ কহিল, প্রথমে সে নিজের মন বুঝতে পারেনি। কিন্তু যখন পারলে, তখনই সে চলে গেল।

না বলে লুকিয়ে গেল?

সতীশ মাথা নাড়িয়া কহিল, না, তাও নয়। যাবার আগে সাবধান করে গেল, একটা অস্পৃশ্য কুলটাকে ভালবেসে ভগবানের দেওয়া এই মনটার গায়ে যেন কালি না মাখাই।

কিরণময়ী গভীর বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, কি বলে গেল?

সতীশ পুনরায় তাহা কহিলে, কিরণময়ী কিছুক্ষণ ধরিয়া সেই কথাগুলো অস্ফুটে বারংবার আবৃত্তি করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু আবার যখন দেখা হবে ঠাকুরপো, তাকে একবার আমাকে দেখাবে?

সতীশ বিপিনের কথা স্মরণ করিয়া কহিল, কিন্তু আর ত দেখা হবে না বৌদি!

কিরণময়ীর ওষ্ঠাধরে ম্লান হাসি দেখা দিল। কহিলেন, আবার দেখা হবে।

কবে হবে? না হওয়াই ত মঙ্গল।

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কবে যে হবে তা জানিনে। কিন্তু যদি কখন দুঃখে পড়, বিপদে পড়, তখনই দেখা হবে—সে দেখায় মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না। ঠাকুরপো, সে যেখানেই থাক, তোমার নিজের চেয়েও সে তোমার অধিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, এ কথা যেন কোনদিন ভুলো না।

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে কিরণময়ী মুমূর্ষু স্বামীর উত্তপ্ত শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিয়া আসিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য বাহিরে দাঁড়াইলেন। দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়া সতীশ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, ক্লান্তিবশতঃ বোধ করি একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিরণময়ী বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন ঠাকুরপো এমন করে বসে? বাসায় যাওনি কেন?

সতীশ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না বৌঠান।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম—আজ আর বাসায় যাব না।

কিরণময়ী আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ছি ছি, সে কি কথা? খাওয়া হবে না, শোয়া হবে না—না না, লক্ষ্মী ভাইটি আমার, বাসায় যাও—আজ তোমার কোন ভয় নেই।

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ভয় থাক আর না থাক, আজ আমি তোমাকে একলা ফেলে যেতে পারব না। তা ছাড়া আমি দোকান থেকে খেয়ে এসেচি।

কিরণময়ী কহিলেন, সে হতে পারবে না। আমি জানি, তোমার দোকানের জলখাবারে পেট ভরে না। আমাকে তা হলে আবার রাঁধতে হয়, সে না হয় রাঁধলুম, কিন্তু এই ক'দিন ধরে তোমার সময়ে নাওয়া-খাওয়া হয়নি, কাল পরশু ভাল করে ঘুমোতে পাওনি, দেহের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার হয়ে গেছে ঠাকুরপো, আর না। আজ রাত্রে এখানে থাকলে অসুখ হয়ে পড়বে, সে আমি কিছুতেই হতে দেব না।

সতীশ রাগ করিয়া বলিল, আমার দিন-দুই আহার-নিদ্রা একটু কম হলেই অসুখ হবে, আর তুমি যে এই একমাস শোওনি? যা খেয়ে দিন-রাত কাটাচ্ছ, তা মানুষকে দেখতে দিচ্ছ না বটে, কিন্তু ভগবান ত দেখছেন। তারপর অবিশ্রান্ত এই খাটুনি,—এতেও তুমি দাঁড়িয়ে রয়েচ, আর এইটুকুতে আমি মরে যাব?

কিরণময়ী কহিলেন, তার মানে তুমিও কি একমাস না খেয়ে, না শুয়ে দাঁড়াতে পার?

সতীশ কহিল, সে কথা বলচি নে, কিন্তু—

কিরণময়ী হাসিয়া কহিলেন, এতে আবার কিন্তু আছে কোন্‌খানটায়? ঠাকুরপো, আমি যে মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষের কি কখনো অসুখ হয়, না মেয়েমানুষ মরে? কোথায় শুনেচ, অযত্নে অত্যাচারে মেয়েমানুষ মরে গেছে?

সতীশ কহিল, না শুনিনি। বরঞ্চ শুনেচি, মেয়েমানুষ অমর।

কিরণময়ী হাসিয়া কহিলেন, সত্যিই তাই। প্রাণ থাকলে তবে যায়, না থাকলে যায় না। ভগবান মেয়েমানুষের দেহে তা কি দিয়েছেন, যে যাবে? আমার ত মনে হয়, এ জাতকে গলায় দড়ি বেঁধে দশ-বিশ বছর টাঙিয়ে রেখে দিলেও মরে না।

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, তোমার এ-সব তামাশা আমি শুনতে চাইনে বৌঠান, শুনলেও পাপ হয়।

কিরণময়ী এবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন, আচ্ছা ঠাকুরপো, হঠাৎ মেয়েমানুষের এতবড় পক্ষপাতী হয়ে উঠেচ কেন বল ত?

সতীশ বলিল, বৌঠান, আমি বেশ বুঝতে পারি, যখন-তখন তুমি স্ত্রীলোকের নাম করে শুধু নিজের উপরেই কঠোর বিদ্রূপ কর। কেন কর জানিনে; কিন্তু তোমার সম্বন্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তোমার নিজের মুখ থেকেও আমি যেন সইতে পারি না। ওতে আমাকে ভারী আঘাত করে। আচ্ছা চললুম।

শোন ঠাকুরপো!

সতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কি?

সত্যি রাগ করলে নাকি?

রাগ হয় বৌঠান। সংসারে দু'টি লোককে আমি দেবতার মত ভক্তি করি—উপীনদাকে আর তোমাকে, একজনকে মনে করলেই আমি তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখি। এখানে নীচ ধরনের ঠাট্টা-তামাশা আমার সহ্য হয় না। চললুম, হয়ত খেয়ে আবার আসব,—বলিয়া সতীশ দুপদুপ করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

কিরণময়ী চোখ বুজিয়া চৌকাঠে মাথা রাখিয়া নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার দুই কানের মধ্যে কেবলি প্রতিধ্বনি ঘুরিতে লাগিল—আমি একজনকে ভাবলেই দুজনকে দেখি।

কুড়ি

ভাষায় হউক, ইঙ্গিতে হউক, কখন কাহারও কাছে সতীশ সাবিত্রীর উল্লেখ করে নাই। তাই যখন্ হইতে এ কথা কিরণময়ীর কাছে প্রকাশ পাইয়াছে, তখন হইতেই তাহার দেহ ভরিয়া অমৃত-স্রোত বহিয়াছে। কিরণময়ীকে সতীশ দেবী মনে করিত, তাঁহার সমস্ত কথাই একান্ত শ্রদ্ধায় বিশ্বাস করিত। তিনি বলিয়াছিলেন, দুঃখের দিনে আবার দেখা হইবে। সেই অবধি তাহার নিভৃত অন্তরবাসী শোকার্ত বিচ্ছেদ সেই পরম ঈপ্সিত দুঃখের দিনের আশায় উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ দুঃখ কিভাবে কতদিনে যে তাহাকে দেখা দিয়া দয়া করিবে, এই চিন্তা লইয়া সে ধীরে ধীরে পথ চলিতে চলিতে রাত্রি আটটার সময় বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া, যেদিকে যে বস্তুটির দিকে চাহিল, তাহাই আজ একটু বিশেষভাবে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জামাটা খুলিয়া আলনায় রাখিতে গিয়া দেখিল, কাপড়গুলি গোছানো—থাক-করা। হরিণের শিঙে টাঙানো আহ্নিক করিবার কাচা কাপড়খানি কোঁচানো। বসিতে গিয়া দেখিল, চেয়ারের উপরে রাখা ময়লা কাপড়ের রাশ আজ নাই। দু হপ্তা ধরিয়া রজক আসে না, সুতরাং ময়লা বস্ত্রের রাশি প্রত্যহ বসিবার চৌকিটার উপরেই ধীরে ধীরে উঁচু হইয়া উঠিতেছিল। বসিবার সময় সতীশ সেগুলি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বসিত, উঠিয়া গেলে বেহারী আবার যথাস্থানে তুলিয়া দিত। সাতদিন ধরিয়া প্রভু ও ভৃত্য এই কার্যই করিতেছিল, হঠাৎ আজ সেগুলি পুটুলি-বাঁধা হইয়া আলনার অন্তরালে সরিয়া গিয়াছে। বিছানার চাদর, বালিশের অড় অতিশয় মলিন

ছিল, আজ সাদা ধপধপ করিতেছে। মশারিটা চিরদিন অভদ্রের মত উটমুখো হইয়াই টাঙানো থাকিত, সেটাও আজ চারিকোণ সোজা করিয়া ভদ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আলোটার এক কোণে বরাবর কালি উঠিত, আজ সেটার কোন বালাই নাই—চমৎকার জ্বলিতেছে। সর্বদিকেই একটা শ্রীর লক্ষণ দেখিয়া সতীশ অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিল; কিন্তু বৃদ্ধ বেহারীর এই আকস্মিক রুচি-পরিবর্তনের কোন হেতু খুঁজিয়া পাইল না। ডাকিল, বেহারী?

বেহারী অন্তরালে দাঁড়াইয়া ছিল, সুমুখে আসিয়া কহিল, আজ্ঞে?

সতীশ বলিল, বেশ বেশ! যদি পারিস এ-সব, তবে কেন ঘরদোর এত নোংরা করে রাখিস? ভারী খুশী হলুম।

বেহারী সবিনয়ে মুখখানা ঈষৎ অবনত করিয়া বলিল, আজ্ঞে আপনার একখানা তারের চিঠি এসেছে।

কৈ রে? বলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেই টেবিলের উপর রক্ষিত হলদে খামখানা চোখে পড়িল। খুলিয়া দেখিল উপীনদার সংবাদ! তিনি সাড়ে-নয়টার ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছিবেন। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে-আটটা বাজিয়াছিল, ব্যস্ত হইয়া কহিল, শিগ্‌গির একখানা গাড়ি নিয়ে আয় বেহারী, উপীনদা আসচেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেহারী গাড়ি ডাকিয়া আনিয়া সংবাদ দিল এবং কবাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুকে নিয়ে বাসায় ফিরবেন ত?

সতীশ চিন্তা করিয়া কহিল, না, আজ রাতে আর ফিরব না।

উপীনদা যে সোজা হারানবাবুর ওখানেই উপস্থিত হইবেন, সতীশের তাহাতে সংশয়-মাত্র ছিল না। কারণ, তাঁহার সস্ত্রীক আসিবার খবর টেলিগ্রামে ছিল না।

সতীশ ইত্যবসরে খান-দুই লুচি গিলিয়া লইতেছিল, বেহারী আড়াল হইতে কহিল, বাবু, একটা নিবেদন আছে।

প্রার্থনা জানাইতে হইলে বেহারী পণ্ডিতী ভাষা প্রয়োগ করিত।

সতীশ মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি নিবেদন?

'আজ্ঞে', বলিয়া বেহারী চুপ করিল।

সতীশ প্রশ্ন করিল, কি আজ্ঞে শুনি?

বেহারী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আজ্ঞে, গোটা-তিরিশ টাকা হলে—

সতীশ বিস্মিত হইয়া কহিল, পরশুও ত তিরিশ টাকা নিলি; বাড়ি পাঠিয়েছিলি?

বেহারী মৃদুস্বরে কহিল, আজ্ঞে, অভিপ্রায়টা তাই ছিল বটে, কিন্তু চক্রবর্তীমশায়ের বাড়িতে—

চক্রবর্তীর নামে সতীশ জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, সে টাকা চক্রবর্তীকে দেওয়া হয়েচে—এ টাকাটা কাকে দান করা হবে শুনি?

আজ্ঞে, দান নয়, একজন বড় দুঃখে পড়ে—

কর্জ চাইচে?

আজ্ঞে, কর্জ আর তাকে কি দেব—

সতীশ অধীরভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, তোমার থাকে, তুমি দাও গে বেহারী, আমি এত বড়লোক নই যে, রোজ টাকা নষ্ট করতে পারি। আমি দিতে পারব না।

এবার বেহারী জিদ করিয়া বলিল, না দিলেই নয় বাবু। না হয় আমার মাইনে থেকে দিন।

মাহিনার নামে সতীশ চমকাইয়া উঠিল, মাইনের টাকা? এ পর্যন্ত কত টাকা নিয়েছিস বল ত বেহারী।

বেহারী বলিল, যেমন নিয়েচি, তেমনি ছেলেদের দেশে তিন বিঘে জমি, একজোড়া হেলে খরিদ করে দিয়েছি। তা ছাড়া একখানা নতুন ঘর তুলেও দিয়েছি—এ কি আমার মাইনের টাকা থেকে? আমার টাকা আপনার কাছেই জমা আছে—আজ তাই থেকে দিন।

সতীশ হাসিয়া ফেলিল, কহিল, ছেলেদের জন্যে কিনে দিয়ে আমার ভারী উপকার করেচ! যা, আমার টাকা নেই, বলিয়া উড়ুনিটা কাঁধে ফেলিয়া স্টেশনের উদ্দেশে বাহির হইয়া গেল।

বেহারী নিজের ঘরে আসিয়া কহিল, মা, আহ্নিক-টাহ্নিক করে এখন একটু জল খাও, কাল সকালে আমি যেমন করে পারি দেব।

সাবিত্রী ঘরের মেঝেতে আঁচল পাতিয়া শুইয়া ছিল, উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু দিলেন না?

বেহারী বলিল, জানো ত মা, পরের দুঃখের নাম করে যখন চেয়েচি তখন পাবই। আমার দাতাকর্ণ মনিব। এখন না দিয়ে ইস্টিশানে চলে গেলেন, কিন্তু কাল সকালে যখন ফিরে আসবেন, তখন, ডেকে দেবেন। তোমার কোন চিন্তা নেই মা, এখন উঠে একটু জল-টল খাও, সারাদিন শুকিয়ে আছো।

সাবিত্রীর কৃশ পাণ্ডুর মুখে একটুখানি হাসি ফুটিল। কহিল, ভালই হয়েচে, আজ রাত্রে আর ফিরবেন না। তা হলে কাল দুপুরবেলার গাড়িতেই কাশী চলে যেতে পারব, কি বল বেহারী?

বেহারী বলিল, নিশ্চয় মা! একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমার মনিবও মনিব, তোমার মনিবও মনিব। দেশে থেকে বুড়ী একখানা দুঃখ জানিয়ে পত্তর দিয়েছিল—বাবুকে পড়াতে গেলুম, পড়ে বললেন, বেহারী, তোর কি কিছু নেই নাকি রে? বললুম, গরীব-দুঃখীর আর কি থাকে বাবু? আর কথা কইলেন না। চারদিন পরে ছ'শ টাকা হাতে দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেন—জমি-জায়গা কিনলুম,—গরু-বাছুর করলুম,—ঘর-দুয়ার তুললুম—ছেলেদের হাতে দিয়ে একমাসের মধ্যে মনিবের পায়ের তলায় ফিরে এলুম। বুড়ী কেঁদে বললে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল, একবার দর্শন করে আসি। বললুম, না রে, আর ঋণ বাড়াস নে। তুই গেলেই দু-এক শ' তোর হাতে দিয়ে দেবেন। আর এই তোমার মনিব! অসুখে পড়ে পাঁচ-সাত টাকার ওষুধ খরচ হয়েছে বলে তোমাকে স্বচ্ছন্দে বললে, ধার শোধ করে তবে যাও! চাকরি করতে গিয়ে কত দুঃখ পেতেছিলে মা, আর আমরা কিছুই না জেনে বিপিনবাবুর নাম করে তোমার কত নিন্দেই না করেচি! মার্জনা কর মা, নইলে আমার জিভ খসে যাবে।

বিপিনের ইঙ্গিতে সাবিত্রী ঘৃণায় কণ্টকিত হইয়া অস্ফুটে ছি ছি করিয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ চাপিয়া গিয়া হাসিয়া কহিল, স্নান করব বেহারী, একখানা কাপড় দিতে পারবে?

কাপড়? বেহারী মলিন হইয়া কহিল, তোমার আশীর্বাদে একখানা কেন, পাঁচখানা দিতে পারি। কোন দুঃখই নেই মা, কিন্তু শূদ্দুরের পরা-কাপড় কেমন করে তোমাকে পরতে দেব মা? বরং চল, বাবুর একখানা ধোয়া কাপড় বার করে দিই গে।

বেহারী দেব-দ্বিজে অত্যন্ত ভক্তিমান। অতএব প্রতিবাদ নিষ্ফল বুঝিয়া সাবিত্রী সম্মত হইয়া তাহার অনুসরণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্নান করিয়া সাবিত্রী সতীশের ধোয়া দেশী বস্ত্র পরিয়া মনে মনে একটু হাসিল। তাহার ঘরে তাহারই কোশাকুশিতে আহ্নিক করিল এবং বেহারীর সযত্ন-আহরিত বিলাতী চিনিতে প্রস্তুত পরম পবিত্র কাঁচাগোল্লা সন্দেশ সমস্ত দিনের অনাহারের পর আহার করিয়া সুস্থ বোধ করিল।

তাহার পান ও দোক্তা খাওয়ার কু-অভ্যাস ছিল। অথচ দোকানের তৈরী পান খাইত না জানিয়া বেহারী ইতিমধ্যে কিছু পান সুপারি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। সেইগুলি একটা থালায় করিয়া হাজির করিতেই সাবিত্রী হাসিয়া কহিল, বেহারী, আমাকে একটুও ভোলনি দেখচি।

বেহারী জবাব দিল, তবু ত আমি মানুষ। তোমাকে একবার দেখলে পশুপক্ষীতেও ভুলতে পারে না যে মা! বলিয়া টেবিলের উপর হইতে আলো আনিয়া দোরগোড়ায় রাখিল, এবং থালাটা কাছে দিয়া পান সাজিতে বলিয়া দোক্তা-তামাকের সন্ধানে রান্নাঘরে হিন্দুস্থানী পাচকের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোক পুরোভাগে লইয়া মেঝের উপর সাবিত্রী পান সাজিতে বসিয়াছিল। মাথায় কাপড় নাই, আর্দ্র কেশভার সমস্ত পিঠ ব্যাপিয়া মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দু-একটা চূর্ণ-কুন্তল আঁচলের কালো পাড়ের সহিত মিশিয়া কাঁধ হইতে

কোলের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে। নারীর রোগ-ক্লিষ্ট শীর্ণ পাণ্ডুর মুখের যে নিজস্ব গোপন মাধুর্য আছে, তাহাই এই কৃশাঙ্গীর সদ্যস্নাত মুখের উপর বিরাজ করিতেছিল। সে কিছু অন্যমনস্ক, চিন্তামগ্ন। সহসা দূরবর্তী জুতার পদশব্দ সন্নিকটবর্তী হইয়া আসিল, তথাপি তাহার কানে গেল না। যখন গেল, তখন উপেন্দ্র সতীশ একেবারে দরজার উপরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ধ্যান ভাঙ্গিয়া মুখ তুলিয়া সাবিত্রী বিবর্ণ আত্মহারা হইয়া গেল, এবং সেই মুহূর্তের অসতর্ক অবসরে বঙ্গরমণীর জন্ম-জন্মার্জিত অন্ধ-সংস্কার তাহাকে অপরিসীম লজ্জায় একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল, এবং পরমুহূর্তেই সে দুই হাত বাড়াইয়া তাহার আরক্ত মুখের উপরে আবক্ষ দীর্ঘ ঘোমটা টানিয়া দিল।

সতীশ হতবুদ্ধির মত বলিয়া উঠিল, সাবিত্রী! তুমি!

সুরবালা এতক্ষণে আলোকের সাহায্যে বেহারী ও দিবাকরের সঙ্গে উপরে উঠিয়াছিল, উপেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, বাস্, আর এস না সুরবালা, ঐখানে দাঁড়াও।

সুরবালা আশ্চর্য হইয়া বলিল, কেন?

উপেন্দ্র সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া বলিলেন, দিবাকর, তোর বৌদিকে গাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যা। সতীশ, আমিও চললুম—বলিয়া ধীরপদে চলিয়া গেলেন।

একুশ

উপেন্দ্রর পদশব্দ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া সিঁড়িতে মিলাইয়া গেল। অবসন্ন, অভুক্ত, সস্ত্রীক—এই অন্ধকার রাত্রি—তত্রাচ, এতটুকু সংশয়, বিন্দুপ্রমাণ দ্বিধা তাঁহার মনে জাগিল না। সতীশের ঘরের মধ্যে বসিয়া যে তরুণী নিদারুণ লজ্জায়, ভয়ে, অমন করিয়া মুখ ঢাকিয়া ফেলিল, তাহার সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন পর্যন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন অনুভব করিলেন না। ঘৃণায় সেই যে বিমুখ হইলেন, আর মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন না।

কিন্তু, এ কি ঘটিয়া গেল! মুহূর্ত পরেই অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করিয়া সাবিত্রী শিহরিয়া উঠিল। সহস্র পুরুষের দৃষ্টির সম্মুখেও আর যে তাহার লজ্জা করিবার অধিকার ছিল না, মুহূর্তের ভুলে এ কথা ভুলিয়া আজ সে এ কি বিষম ভুল করিয়া বসিল! তাহার মনে হইতে লাগিল, এই তাহার শরমের ক্ষুদ্র মুখাবরণটুকু যেন নিমিষে দিগন্ত-বিস্তৃত হইয়া কুৎসিত লজ্জায় তাহার পদনখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া গেল। এতটুকু লজ্জা বাঁচাইতে গিয়া যে লজ্জার পাহাড় তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে, মুহূর্ত পূর্বে এ কথা কে ভাবিয়াছিল!

শ্বাসরোধের উপক্রমে মানুষ প্রাণপণে যেমন করিয়া মুখখানা বাহির করিবার চেষ্টা করে, সাবিত্রী ঠিক তেমনি করিয়া তাহার মুখের ঘোমটাটা মাথার উপরে সজোরে ঠেলিয়া দিয়া ঋজু হইয়া বসিল; প্রশ্ন করিল, উনি কে?

সতীশ আচ্ছন্নের মত দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, আচ্ছন্নের মতই উত্তর দিল—উপীনদা আর বৌঠান।

অ্যাঁ, ঐ উপীনদা? ঐ বৌঠাকরুন? ওঁরা! সাবিত্রী তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, তবে সর সর, ফিরিয়ে আনি। ছি ছি, আমি যে কেউ নই—বাসার সামান্য একটা দাসী মাত্র! সর—সর—

উপীন যে কে, সাবিত্রী তাহা বিলক্ষণ জানিত। সতীশের কথায়বার্তায় অনেকবার অনেক পরিচয় তাঁর পাইয়াছিল।

এতক্ষণে সতীশের যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এই চেঁচামেচি, এই মহা ত্রস্তব্যস্ত ভাব তাহার সমস্ত বিহ্বলতা মুহূর্তে ঘুচাইয়া দিয়া একেবারে সজাগ করিয়া দিল। এইবার সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত প্রসারিত করিয়া দ্বার রোধ করিয়া কহিল, না।

সাবিত্রী ব্যাকুল হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, না কি গো? সর্বনাশ কোরো না সতীশবাবু, পথ ছাড়ো। আমার সত্য পরিচয় তাঁদের জানতে দাও।

সতীশ পথ ছাড়িল না। পরন্তু, তাহার দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরে সর্প-জিহ্বার মত দ্বিধা-ভিন্ন বিষাক্ত হাসির অতিসূক্ষ্ম আভাস দেখা দিল কি? বোধ করি দেখা দিল। কহিল, ওঃ

—তোমার সর্বনাশ! না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু কি তোমার সত্য পরিচয় নিজে আগে শুনি?

সাবিত্রী সহসা জবাব দিতে পারিল না, শুধু চাহিয়া রহিল। এমনি নিরুত্তর চাহনি সতীশ পূর্বেও দেখিয়াছে। কিন্তু এ ত সে নয়! এ চাহনিতে এতবড় আঘাতেও আজ আগুন জ্বলিল কৈ? এ কি আশ্চর্য স্নিগ্ধ-করুণ চোখ দুটি! এ কি সেই সাবিত্রী?

ক্ষণেক পরে সে ধীরে ধীরে বলিল, আমার পরিচয়? ঐ ত বললুম—বাসার দাসী। সতীশবাবু দয়া করুন—আমি তাঁদের ফিরিয়ে নিয়ে আসি। এই অন্ধকার অজানা শহরে তাঁরা কি পথে পথে বেড়াবেন? সেই কি ভাল হবে?

সতীশ তিলার্ধ বিচলিত না হইয়া জবাব দিল—তাঁদের ভাল-মন্দ বোঝবার ভার তাঁদের ওপরেই থাক। কিন্তু পথে পথে বেড়ানোও ঢের ভাল—তবুও আমি কিছুতেই বৌঠানকে আর এ বাড়ি মাড়াতে দিতে পারব না।

কেন পারবে না? আমি এ-বাড়ি মাড়িয়েচি বলে? সতীশবাবু, মা বসুমতীও কি আমার স্পর্শে অশুচি হয়ে যান?

সতীশ মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি এ বাড়িতে ঢুকলে কেন?

সাবিত্রী মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। মাটির দিকে চাহিয়া অশ্রুজড়িত-স্বরে বলিল, আপনি আমার পুরোনো মনিব। তাই, অসময়ে কিছু ভিক্ষে চাইতে এসেছিলুম।

সতীশ বিদ্রূপ করিয়া হাসিল, কহিল, অসময়ে ভিক্ষা চাইতে? কিন্তু মনিব তোমার ত একটি নয় সাবিত্রী। এতদিন একে একে সব মনিবের বাড়িগুলোই ঘুরে এলে বোধ করি?

সতীশের নিষ্ঠুরতম আঘাত তাহার বুকের ভিতরটা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া দিতে লাগিল, কিন্তু আর সে মুখ তুলিল না—কথাটি কহিল না।

সতীশ পুনরায় কহিল, বিপিনবাবু তোমাকে তাড়ালেন কেন? তাঁর শখ মিটে গেল বোধ করি?

সাবিত্রী তেমনি নিরুত্তর।

হঠাৎ সতীশের বেহারীর প্রার্থনা মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল, কি ভিক্ষা চাও? ত্রিশটা টাকা, না?

সাবিত্রী হেঁট-মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না।

আচ্ছা—বলিয়া সতীশ দেরাজের কাছে গিয়া দাঁড়াইল, এবং চক্ষের পলকে ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার থামিল।

এই গৃহের যে নূতন পারিপাট্য কিছুক্ষণ পূর্বে তাহাকে এত আনন্দ দিয়াছিল, এখন তাহাই তাহাকে যেন মারিতে লাগিল। অদূরে ঐ যে শয্যা, ইহাও ঐ স্ত্রীলোকটার হস্ত-রচিত। স্টেশনে যাইবার পূর্বে ইহারই উপরে শুইয়া ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম করিয়া গিয়াছিল স্মরণ করিয়া তাহার সর্বাঙ্গ সংকুচিত হইল। চোখ ফিরাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলিয়া কয়েকখানা নোট টানিয়া বাহির করিয়া সাবিত্রীর পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, যাও যাও, নিয়ে বিদেয় হও—আর কখনো এসো না।

সাবিত্রী তিনখানি মাত্র নোট গনিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এই সময়টুকু সতীশ নীরবে চাহিয়াছিল। সাবিত্রী দাঁড়াইবামাত্র তাহাকে কি একটা বলিতে গিয়া অকস্মাৎ তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

হায় রে! এ সংবাদ সে ত রাখে নাই। শেষ-জ্যৈষ্ঠের খর-রৌদ্রের মত তাহার তপ্ত ক্রোধ যখন এই হতভাগিনীকে নিরুপায় নির্বাক ধরাতলের মত দগ্ধ করিতেছিল, তখনই অলক্ষ্য আকাশে তাহার বিন্দু বিন্দু বারি-সঞ্চয়ে গুরু মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। সে যে এমন অজ্ঞাতসারে এত শীঘ্র, এত নিঃশব্দ সঞ্চরণে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিতে পারে এ কথা ত সতীশ জানিত না। তাহার কণ্ঠ, তাহার মুখ, তাহার চক্ষু যেন কিসের অদৃশ্য আক্রমণে চাপিয়া আসিতে লাগিল,—সহসা সে প্রবল চেষ্টায় নিজেকে মুক্ত করিয়া ডাকিল, সাবিত্রী!

আজ্ঞে।

গল্পে শুনতুম, অমুক অমুককে ঘৃণা করে। আমার বিশ্বাস হতো না। ভাবতুম, ওটা শুধু রাগের কথা। কখনও ভেবে পাইনি, মানুষ কি করে মানুষকে ঘৃণা করতে পারে। আজ

দেখছি পারে—লোক লোককে ঘৃণা করতে পারে। সাবিত্রী, শপথ করে বলচি, আমি মরণ এড়াতেও আর তোমাকে স্পর্শ করতে পারিনে।

সাবিত্রী নির্বাক।

আচ্ছা সাবিত্রী, সংসারে টাকার বড় তোমাদের ত আর কিছু নেই,—নইলে ঐ তিনখানা নোট কিছুতেই হাত দিয়ে তুলতে পারতে না—আজ আমার কাছে যা আছে, তোমাকে সমস্ত দেব, একটা কথা আমাকে সত্যি বলে যাও।

জিজ্ঞাসা করুন।

করচি, বলিয়া সতীশ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, প্রশ্ন করতেও লজ্জা করে, তবু জানতে সাধ হয় সাবিত্রী, কখন কোনদিন কি কাউকে ভালবাস নি?

সাবিত্রী পলকমাত্র মৌন থাকিয়া মৃদু অথচ সুস্পষ্ট-কণ্ঠে কহিল, কি হবে আপনার আমার কথা জেনে?

সতীশ এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না।

সাবিত্রী দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, সংসারে অনেক কথাই ত আপনি জানেন না; তবু ত দিন কেটে যায়,—এ কথাটা না জানলেও আপনার ক্ষতি হবে না।

হয়ত হবে না, বলিয়া সতীশ দীর্ঘশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সাবিত্রীর কানে গেল। সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই তাহার রোগপাণ্ডুর কৃশ মুখখানির উপর সতীশের চোখ পড়িল। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার অসুখ নাকি সাবিত্রী?

সাবিত্রী চোখের পলকে মুখ নামাইয়া বলিল, না।

বড় রোগা দেখলুম যেন।

ও কিছু না, বলিয়া সাবিত্রী যাইবার জন্য পা বাড়াইল।

চললে?

সাবিত্রী নিরুত্তরে দ্বারের বাহিরে আসিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর হইতে একটা রুদ্ধ-কণ্ঠের ডাক আসিল, সাবিত্রী, সত্যিই কি একটা দিনের জন্যেও আমাকে ভালবাস নি?

সাবিত্রী চৌকাঠে ভর দিয়া দাঁড়াইল, আর মুখ ফিরাইল না।

ভিতরের সজলকণ্ঠ এবার কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল,—সাবিত্রী, একটিবার বলে যাও, আমি এতদিন কি শুধু ঘুমের ঘোরেই এই দুঃখের বোঝা বয়ে বেড়িয়েচি? আমার ভাগ্যে কি সবই ভুল, সবই মিথ্যে? এই অপরিসীম দুঃখটাও কি আমার অদৃষ্টে আগাগোড়া ফাঁকি?

সাবিত্রী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাবু, আমি নিতান্ত দায়ে ঠেকেই বেহারীর কাছে টাকা ধার করতে এসেছিলুম, কিন্তু সত্যি বলচি আপনাকে, এমন হাঙ্গামায় পড়ব জানলে আসতুম না।

সতীশ অবাক হইয়া রহিল। এ কণ্ঠস্বর শান্ত এবং মৃদু, কিন্তু কোমলতার লেশমাত্র নাই। ক্ষণকাল পূর্বে সে ত এ গলায় তাহার কাছে ভিক্ষা চাহে নাই।

সে পুনরায় কহিল, আপনি শপথ করে বললেন, আমাকে ঘৃণা করেন, আপনারা খুশী হলে ভালবাসতেও পারেন, রাগ হলে ঘৃণা করতেও পারেন—আপনারা করেও থাকেন তাই, কিন্তু আমাদের হাত-পা বাঁধা। এ-পথে যখন পা দিয়েছি, তখন সুপথ-কুপথ যাই হোক, এই ধরে না চললে ত উপায় নেই।

সতীশ নির্বাক স্তব্ধ। শুধু বিহ্বল-বিস্ফারিত চক্ষে তাহার দিকে অনিমিষে চাহিয়া রহিল।

সাবিত্রী এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিল না। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া একবার থামিল। তাহার নিজের কথা নিজের বুকেই মৃত্যুশেল হানিতেছে, তথাপি, মরণাহত সৈনিকের মত শেষবারের মত সতীশের লজ্জাকর প্রণয়ের উপরে খড়্গাঘাত করিল। কহিল, আপনি জিজ্ঞাসা করছিলেন, কোনদিন আপনাকে ভালবেসেছিলুম কিনা? না, বাসিনি। সে সমস্তই ছিল আমার ছলনা। কাকে ভালবাসি সে খবর ত পেয়েছেন!

শুনিয়া সতীশের হঠাৎ মনে হইল, তাহার গৃহ-প্রতিমাটিকে নদীর জলে বিসর্জন দিয়া দলিয়া পিষিয়া খড়ের পিণ্ড করিয়া কে যেন তাহারই চোখের উপরে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। সে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, যাও—যাও তুমি আমার সুমুখ থেকে।

সাবিত্রী চৌকাঠের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। সতীশ চাহিয়া দেখিল না, শুধু অতি মৃদু একটুখানি শেষ পদশব্দ শুনিতে পাইল।

নীচে বেহারীর ঘরে নিব-নিব হইয়া একটা আলো জ্বলিতেছিল, সেই ঘরে সাবিত্রী অর্ধ-মুদ্রিত চক্ষে টলিতে টলিতে প্রবেশ করিয়া দুই হাত বাড়াইয়া কিছু একটা যেন ধরিতে চাহিল, এবং পরক্ষণেই ভূমিতলে মুখ গুঁজিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

বেহারী উপেন্দ্র প্রভৃতিকে জ্যোতিষ সাহেবের বাড়ির দিকে খানিকটা পথ আগাইয়া দিয়া মিনিট-পাঁচেক পূর্বে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং অন্ধকারে লুকাইয়া সাবিত্রীর শেষ কথাগুলা শুনিতেছিল। আজ সারাদিন ধরিয়া সে তাহার সহিত কত গল্পই করিয়াছিল; নিষ্ঠুর গৃহস্থের ঘরে কাজ করিতে গিয়া যে দুঃখ-কষ্ট পাইয়াছিল, রোগে পড়িয়া যত যন্ত্রণা সহিয়াছিল, শুনিতে শুনিতে বেহারী কাঁদিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ এইমাত্র বাবুর সাক্ষাতে কেন যে সাবিত্রী আগাগোড়া মিথ্যা বলিয়া গেল, তাহার কোন তত্ত্বই বুড়া খুঁজিয়া পাইল না। সাবিত্রী নামিয়া গেলে সে-ও আঁধারের আশ্রয়ে বাবুর দৃষ্টি এড়াইয়া নীচে আসিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া রাস্তায় ছুটিয়া গেল। এদিকে ওদিকে কোথাও না পাইয়া আবার বাড়ি ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি সে নিজের ঘরটা খুঁজিতে আসিয়া একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তার পর সাবধানে সরিয়া আসিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া মুখের কাছে আসিয়া ডাকিল, এমন করে মাটিতে পড়ে কেন মা?

সাড়া না পাইয়া সস্নেহ-কণ্ঠে বলিল, রোগা দেহ, ঠাণ্ডায় অসুখ করবে যে মা! উঠে বোস, আমি একটা মাদুর পেতে দিই।

সাবিত্রী নির্বাক্, স্থির।

বেহারী বিস্মিত হইল। ভাল দেখা যাইতেছিল না, প্রদীপটা মুখের কাছে আনিয়া একটু ঝুঁকিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়াই বুড়া চীৎকার করিয়া উঠিল, মা গো, এ কি করলি মা!

সাবিত্রীর নয়ন মুদ্রিত, সমস্ত মুখ নীলবর্ণ। এতবড় চীৎকারেও সে সাড়া দিল না—তেমনি মৃতবৎ পড়িয়া রহিল।

উপরের ঘরে সতীশ তখনও একই ভাবে মূর্তির মত বসিয়া ছিল, বেহারীর কান্নার শব্দে চমকিয়া উঠিল। রান্না ফেলিয়া বামুনঠাকুর ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল।

সতীশ বেহারীর ঘরে ঢুকিয়া সাবিত্রীর মাথার কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিল, এবং আলো লইয়া মুখপানে চাহিয়াই বুঝিল সে মূর্ছিত হইয়াছে। কহিল চেঁচাস নে বেহারী, ওর মুখেচোখে জল দে—বামুনকে বল্, একটা পাখা নিয়ে বাতাস করুক।

সাহস পাইয়া বেহারী সজোরে জলের ছিটা দিতে লাগিল এবং হিন্দুস্থানী পাচক প্রাণপণে পাখা হাঁকিতে লাগিল।

খানিক পরে সাবিত্রী নিশ্বাস ফেলিল এবং পরক্ষণেই চোখ মেলিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

সতীশ কহিল, ঠাকুর বেশী করে খানিকটা গরম দুধ নিয়ে আসুক; আর ভিজে কাপড়টা শিগগির ছেড়ে ফেলতে বল বেহারী।

ঠাকুর দুধ আনিতে গেল, বেহারী মৃদুস্বরে বোধ করি তাহাই কহিল।

মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া সতীশ পুনরায় কহিল, সুস্থ বোধ করলে কোথায় ও যাবে, জিজ্ঞেসা করে একটা গাড়ি ডেকে দিস বেহারী—এর ওপর যেন হেঁটে না যায়।

সাবিত্রীর সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু ক্ষীণ আলোকে কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। সে প্রাণপণে আত্মসংবরণ করিয়া নিশ্চল হইয়া রহিল।

সতীশ আরও মিনিট-খানেক স্থির থাকিয়া বলিল, আর যদি সুস্থ বোধ না করে, না হয়, আমার ঘরেই শুতে বলিস, আমি আর কোথাও যাচ্ছি।

সাবিত্রী শিহরিয়া অনুভব করিল, বুঝি-বা সে কোনমতেই আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

সতীশ একটা ক্ষুদ্র চাবি বেহারীর কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, আর দ্যাখ, দেরাজের

চাবিটা তোর কাছেই রইল, যা টাকার দরকার হয়, যাবার সময় যেন নিয়ে যায়, রুগ্ন শরীরে যেন—

সতীশের কথাগুলো বিষ এবং অমৃতে মিশিয়া সাবিত্রীর কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল। সতীশ কহিল, আমি পাথুরেঘাটায় যাচ্চি বেহারী—কাল ফিরতে বোধ করি একটু বেলা হবে। এক-পা পিছাইয়া গিয়া কহিল, সাবিত্রী, কোন সঙ্কোচ কোরো না, যা আবশ্যক হয় নিয়ো—আমি চললুম।

সতীশ চলিয়া গেল।

সাবিত্রী আর একবার ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। বুকফাটা-কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল ওগো, কেন তুমি এই পাপিষ্ঠাকে এত ভালবেসেছিলে? এই যে শপথ করলে আমাকে ঘৃণা কর, এই কি ঘৃণা করা? তোমাকে এই দুঃখ দেওয়া, এত মিথ্যা বলা, সবই তোমার স্নেহের আগুনে পুড়ে কি ছাই হয়ে গেল? কে আমাকে বলে দেবে কি করলে আমি তোমার ঘৃণা পাব?

বেহারী এই কান্নার বিন্দুমাত্র অর্থও বুঝিতে পারিল না, একটুখানি কাছে সরিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, আচ্ছা, কেন মা, বাবুর কাছে এত মিথ্যে কথা বললে? যেখানে যাওনি, যে দোষ করনি, কি জন্যে সেই-সব নিজের ঘাড়ে নিয়ে এত অপরাধী হয়ে রইলে?

সাবিত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, ধর্ম জানেন বেহারী, আমার সমস্ত কথাই মিথ্যে। বলতে বুক ফেটে গেছে, তবুও বলতে হয়েছে। কিন্তু, কোন কাজেই ত এলো না বেহারী কোন কাজেই যে এলো না।

বেহারী মূঢ়ের মত মুখপানে চাহিয়া বলিল, মিথ্যে আবার কি কাজে আসে মা?

সাবিত্রী উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিল। তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, ঠিক জানো বেহারী, কোন কাজেই কি আসে না?

বেহারী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, তা আসে বৈ কি। আদালতে মিথ্যাতেই ত কাজ হয়—সেখানে মিথ্যা কথারই ত জয়-জয়কার।

সাবিত্রী জবাব দিল না। বহুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, কেন এত মিথ্যা বলে গেলুম, হয়ত একদিন বুঝতে পারবে। কিন্তু সে কথা যাক, বেহারী, আমার দুটি কথা রাখবে?

রাখব বৈ কি মা। কি কথা?

একটা কথা এই যে, আমি চলে গেলেও কোনদিন বাবুকে জানিয়ো না, আমি তাঁকে আগাগোড়া মিথ্যে বলে গিয়েছিলুম।

বেহারী মৌন হইয়া রহিল। সাবিত্রী কহিল, আর একটা কথা—আমার ঠিকানা তোমাকে লিখে জানাব। যদি কখনো বোঝো, আমার আসা দরকার, আমাকে জানিয়ো। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই বেহারী, আমি ছাড়া ওঁকে কেউ শাসন করতেও পারবে না, আমার চেয়ে বিপদের দিনে কেউ সেবা করতেও পারবে না।

বেহারী কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, সব জানি মা।

সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, তবে চললুম, ওঁকে তোমার হাতেই দিয়ে গেলুম—দেখো বেহারী, আমার দুটি কথা রেখো। ভগবান করুন, তোমরা সুখে থাকো—আমার এই পোড়ামুখ নিয়ে যেন আর তোমাদের সামনে আমাকে আসতে না হয়। বলিয়া সাবিত্রী চোখ মুছিয়া অগ্রসর হইল।

রাস্তায় আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিয়া সাবিত্রীকে তুলিয়া দিয়া বেহারী গড় হইয়া প্রণাম করিল। চোখ মুছিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, মা, আমারও একটি নিবেদন আছে। আজ যেমন ছেলে বলে মনে করেছিলে, দরকার হলে আবার স্মরণ করবে?

করব বৈ কি।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। বেহারী আর একবার পথের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বাসায় ফিরিয়া গেল।

বাইশ

পাথুরেঘাটায় চললুম,—বলিয়া সতীশ রাত্রি এগারোটার সময় বাসার বাহিরে আসিয়া খানিকটা পথ চলিয়াই বুঝিল ক্লান্তির সীমা নাই। পা অচল, সর্বাঙ্গ পাথরের মত ভারী। কত বড় গভীর অবসাদ তাহার দেহ-মনে আজ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

কিছুদিন পূর্বের এমনই আর একটা রাত্রির কথা স্মরণ হইল,—যেদিন বেহারী সাবিত্রীদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিল, সে নাই, বিপিনবাবুর কাছে চলিয়া গিয়াছে। সেদিন সংবাদটা শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য তাহাকে অবশ করিয়া ফেলিয়াছিল। পরক্ষণেই অভিমান ও অপমানের যে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বেল্লার নির্জন প্রান্তরে, স্তব্ধ আকাশের তলে চোখের জলে নিবিয়া না গেলে, যেখানে যতদিনে হউক, সাবিত্রীকে দগ্ধ না করিয়া শান্ত হইত না, তেমনি রাত্রি ত আজিও আসিয়াছিল, তবে তেমনি করিয়া আগুন জ্বলিল না কেন?

একখানা খালি গাড়ি যাইতেছিল, ডাকিয়া কহিল, পাথুরেঘাটায় যাবি রে?

গাড়োয়ান গাড়ি থামাইয়া রাস্তার আলোকে সতীশের প্রতি চাহিয়াই ভাবিল—মাতাল। বলিল, সে যে অনেকদূর! তিন টাকা কেরায়া লাগবে বাবু—টাকা আছে ত?

'আছে', বলিয়াই সতীশ চড়িয়া বসিল এবং গাড়ির একটা কোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিল। ক্লান্তি তাহাকে এমন করিয়াই ছাইয়া ফেলিয়াছিল যে, ইহার অধিক কথা কহিবার তাহার শক্তি ছিল না।

অনেক পরে অনেক পথ ঘুরিয়া গাড়োয়ান বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ ঠিকানায় যাবেন বাবু, ঠিক করে বলে দিন। মিছিমিছি ঘুরতে পারিনে। সতীশ নিজের বাসার ঠিকানা দিল। কিছু পরে গাড়ি আসিয়া তাহার দ্বারে পৌঁছিল। বহু ডাকাডাকির পরে বেহারী আসিয়া কবাট খুলিয়া দিলে সতীশ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, বেহারী, সাবিত্রী কি আমার ঘরে?

বেহারী বিহ্বলের মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল, না বাবু, সে ত নেই। তখুনি চলে গেছে।

গেছে?

হাঁ বাবু, সে নেই।

সতীশ নিশ্বাস ফেলিয়া বেহারীর শয্যার একাংশে বসিয়া পড়িল। এই না থাকাটা সুখের কিংবা দুঃখের, সতীশ ঠিক যেন উপলব্ধি করিতে পারিল না।

বেহারী খানিক পরে মৃদুস্বরে কহিল, আমি গাড়ি ঠিক করে দিয়েছিলুম। চলুন, আপনার ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে আসি।

না থাক, আমিই জ্বেলে নিতে পারব, বলিয়া সতীশ উঠিয়া গেল।

পরদিন সকালে যখন তাহার অতৃপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছিল।

অকস্মাৎ প্রচণ্ড ঝটিকার মত সমস্ত ওলট-পালট করিয়া দিয়া কত কাণ্ডই না এই একটা রাত্রির মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে! সেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত চিহ্নগুলার মাঝখানে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার মন অসাড় হইয়া রহিল। বেহারী আসিয়া তামাক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সতীশ ডাকিয়া কহিল, শোন বেহারী, কাল কখন সে এখানে এসেছিল রে?

সাবিত্রী চলিয়া যাওয়া অবধি তাহার সকল প্রকার দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া বেহারীর ব্যথিত মনটা ভিতরে ভিতরে ভারী কাঁদিতেছিল। সে অবনতমুখে মৃদুকণ্ঠে বলিল দুপুরবেলা।

কেমন ক'রে সে এ-বাড়ির সন্ধান পেলে?

সে ত জানিনে বাবু।

সতীশ তাহার মুখপানে কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, হাঁ রে বেহারী, তুই কি সত্যিই আমাকে এতবড় গরু পেয়েচিস যে, এটাও বুঝতে পারিনে? সত্যি কথা বল্।

বেহারী আশ্চর্য হইয়া তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রভুর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সতীশ কহিল, চেয়ে রইলি যে! তুই বিপিনের ওখানে যাসনে? সাবিত্রীর সঙ্গে তোর দেখাশুনো কথাবার্তা হয় না?

না বাবু, বলিয়া বেহারী বাহির হইবার উপক্রম করিতেই সতীশ অধিকতর রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, দাঁড়া, যাসনে। তুই তাকে এখানে আসতে শিখিয়ে দিসনি?

বেহারী নিঃশব্দে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

সতীশ ধমক দিয়া উঠিল—ফের না!

বেহারী অবনত-মস্তকে ছিল, চমকাইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। সতীশ বলিতে লাগিল, ফের না? তবে কেমন করে সেই শয়তানটা এ বাসার সন্ধান পেলে? যাও তুমি, তার কাছে গিয়েই থাক গে, আমার দরকার নেই। আমি ঘরের মধ্যে শত্রু পুষতে পারব না। আজই তুমি যাও—তোমাকে জবাব দিলুম।

বেহারী একটি কথাও কহিল না। শুধু তাহার বিস্ময়-প্রসারিত দুই চক্ষের প্রান্ত বাহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

এই অশ্রু সতীশ দেখিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, রাত্রে কোথায় গেল সে?

বেহারী চোখ মুছিয়া বলিল, জানিনে। চিঠি লিখে তার ঠিকানা জানাবে বলে গেছে।

সতীশ আবার ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া নরম হইয়া কহিল, ভারী রোগা দেখলুম, খুব ব্যারাম হয়েছিল বুঝি?

বেহারী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তাই বুঝি সেখানে আর জায়গা হল না।

বেহারী তেমনি মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

সতীশ আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু এবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্চি বেহারী, আমার বাসায় আর যেন সে না ঢোকে। কিংবা কোন রকম ছুতো করেও আমার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা না করে। আমার চাবি কৈ? যাবার সময় কত টাকা তাকে দিলি?

বেহারী চাবি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, টাকা দিইনি।

দিসনি? কেন দিলি নে? তোকে ত দিতে বলে গিয়েছিলুম।

সে নিতে চায়নি, বলিয়া বেহারী বাহির হইয়া গেল। সতীশ তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া ফিরাইল। সাবিত্রী উপস্থিত নাই, বেহারী তাহাকে ভালবাসে—সুতরাং, এই বেহারীকে আঘাত করিতে পারিলেও যেন কতকটা ক্ষোভ মিটে। সে সম্মুখে আসিতেই সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—তার পরে তোমাদের কি কি পরামর্শ হলো?

বেহারী আর নিজেকে চাপিয়া রাখিতে পারিল না। অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বাবু, সাবিত্রী কি পরামর্শ করবে আমার মত লোকের সঙ্গে? আপনার চরণে দোষ-ঘাট করে থাকি, মাথা পেতে দিচ্চি, যা ইচ্ছে হয় শাস্তি দিন, কিন্তু বুড়ো মানুষকে এমন করে পোড়াবেন না। বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সতীশের নিজের চোখের কোণও সহসা যেন আর্দ্র হইয়া উঠিল; আচ্ছা তুই যা,—বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়া আর একবার শুইয়া পড়িল এবং চোখ বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিল। বড় জ্বালায় জ্বলিয়া তাহার মুখ দিয়া যে ভাষাই সাবিত্রীর উদ্দেশে বাহির হউক না কেন, তাহার সেই রোগতপ্ত শীর্ণ মুখের স্মৃতি ভিতরে ভিতরে তাহাকে বড় কাঁদাইতেছিল। এখন বেহারীর কথায় পরিষ্কার যদিও কিছুই হইল না, কিন্তু ভাবে বোধ হইল সাবিত্রী যেন সত্যই আর কোথায় চলিয়া গেল। কোথায় গেল? বছর-দুই পূর্বে সতীশদের নবনাট্য-সমাজে বিল্বমঙ্গল প্লে হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ তাহার সেই কথাটা মনে পড়িল—'তবু কেন ভুলিতে না পারি তারে?' এ কি আশ্চর্য! যে সাবিত্রী দুষ্টগ্রহের মত তাহাকে শুধু অবিশ্রাম দুঃখ দিতেছে, যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও নিজের মুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছে, সে তাহার কেহ নয়—উভয়ের কোন বন্ধনই নাই—যাহার বিরুদ্ধে আজ তাহার ঘৃণার অন্ত নাই, তবুও তাহারই জন্য কেন সমস্ত মন জুড়িয়া হাহাকার উঠিতেছে! এ কি বিচিত্র ব্যাপার! এমন ভীষণ বিদ্বেষ এবং এতবড় আকর্ষণ একই সঙ্গে কি করিয়া তাহার বুকের ভিতরে স্থান পাইতেছে! হায় রে! এ যদি সে একটিবার দেখিতে পাইত,

তাহার নিভৃত অন্তরবাসী তাহার সমস্ত চক্ষু-কর্ণ দৃঢ়রুদ্ধ করিয়া এখনও এক বিশ্বাসে অটল হইয়া আছে—সে শুধু আমারই—আমার বড় আর তাহার কিছুই নাই—যাহাকে কোন প্রতিকূল সাক্ষ্য, এমন কি, সাবিত্রীর বিরুদ্ধে তাহার নিজের মুখের কথাও তিলার্ধ বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই—তাহা হইলে হয়ত সতীশ এই পরমাশ্চর্যের অর্থ বুঝিতে পারিত।

তেইশ

ঘণ্টা-দুই পরে সতীশ পাথুরিয়াঘাটার উদ্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মনে মনে কহিল, উঃ কি শয়তান! যাক, আমিও বাঁচিয়া গেলাম। আমার কাঁধের উপর হইতে ভূত নামিয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, কিন্তু উপীনদাকে আজ মুখ দেখাইব কেমন করিয়া? কারণ, আগুনে হাত দিলে কি হয়, ইহা যেমন সে নিশ্চিত জানিত, তাহার আবাল্য-সুহৃৎ উপীনদাকে সে ঠিক তেমনি চিনিত। তাঁহার কাছে এ-সকল অপরাধের ক্ষমা নাই, আজন্ম স্নেহের মূল্যেও বিন্দুপরিমাণ প্রশ্রয় কিনিবার ভরসা নাই, এ কথা তাহার চেয়ে বেশী আর কে বিদিত ছিল?

কিরণময়ীদের বাটীর সদর দরজা খোলা ছিল। সেইখানে আসিয়া সতীশ চুপ করিয়া দাঁড়াইল, এবং ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্বে সমস্ত কথা আর একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে লাগিল।

মনে হইল, শুধু কি উপীনদা তাহার পরম মিত্র, গুরু এবং আদর্শ? তাঁর চেয়ে যথার্থ আপনার কে আছে? সেই উপীনদার পাশে গিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার তাহার আর এতটুকু পথ নাই। সে কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, আজ দেখা হইবামাত্রই তাঁহার সেই অত্যন্ত কঠোর শুদ্ধ-চক্ষের জ্বলন্ত চাহনি তাহাদের আজন্ম বন্ধুত্ব, স্নেহ, প্রেম সমস্তই নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া দিবে—কিছুই ক্ষমা করিবে না।

আবার ইহাই কি সব? এ বাটীর কবাটও নিশ্চয়ই তাহার মুখের উপর আজ হইতে চিরদিনের মত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আর এখানে প্রবেশ করিবে সে কোন্ মুখ লইয়া?

কিন্তু, এত ক্ষতি, এত লাঞ্ছনা যাহার জন্য, এতবড় সর্বনাশ যে সাধিয়া গেল, সে তাহার কে ছিল? যে নিজে ধরা দেয় নাই, অথচ বাঁধিয়া গেল; দুঃখ ভোগ করে নাই, অথচ দুঃখের সাগরে ডুবাইয়া গেল। যাহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, অথচ মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া অসাধ্য! নিশ্বাস ফেলিয়া সতীশ মনে মনে কহিল, সাবিত্রী, দুঃখ দিয়াছ, সেজন্য আর দুঃখ নাই—কিন্তু সত্য-মিথ্যায় জড়াইয়া এ কি বিষম বিড়ম্বনায় আমাকে বাঁধিয়া রাখিয়া গেলে!

দাসী হঠাৎ মুখ বাড়াইয়া কহিল, বৌমা ডাকচেন আপনাকে।

সতীশ চমকিয়া চাহিল। প্রশ্ন করিল, উপেন্দ্রবাবু এসেছেন?

হাঁ, কাল অনেক রাত্তিরে।

তাঁর ছোটভাই? বৌঠাকরুন?

দাসী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, কৈ না। তিনি একলা এসেছেন। এসে পর্যন্ত আমাদের বাবুর কাছে বসে আছেন।

বাবু কেমন আছেন?

দাসী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর বাবু! শেষ হলেই হয়।

সতীশ মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, বৌঠান কোথায়?

তিনি এইমাত্র স্নান করে রান্নাঘরে গেলেন।

সতীশ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া পা টিপিয়া যথাসাধ্য পদশব্দ বাঁচাইয়া সোজা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। কিরণময়ী বোধ করি অপেক্ষা করিয়াই ছিল, সতীশ দ্বারের কাছে আসিতেই উৎসুকভাবে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে—ও কি ঠাকুরপো, চোখ-মুখ যে ভয়ানক বসে গেছে—রাত্রে ঘুমোও নি নাকি?

প্রশ্নটা সতীশের কানে প্রবেশ করিবামাত্রই তাহার মুখখানা ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইয়াই

তৎক্ষণাৎ নিবিয়া ছাই হইয়া গেল। কহিল, হাঁ, সারারাত্রি জেগে তাকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করেচি। শুনে সন্তুষ্ট হলে ত? আর এখানে যেন না ঢুকি, এই ত? কিন্তু সেই ছোটলোক উপীনবাবুকে বোলো, আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি সত্য কথাই বলতাম। সংসারে সে ছাড়া সত্যি কথা বলতে পারে, এমন লোক আরও আছে। তা ছাড়া সে আমার এমন কেউ নয় যে. ভয়ে মিথ্যে বলতে হতো। বোলো তাকে—বুঝলে বৌঠান! বলিয়াই সতীশ ফিরিয়া চলিল।

অকস্মাৎ সতীশের এই ভাব, এই অত্যুগ্র কণ্ঠস্বর—কিরণময়ী যেন দিশাহারা হইয়া গেল। সতীশ বড় ঘরের দরজা পার হইয়া যায় দেখিয়া কিরণময়ী ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল, যেয়ো না ঠাকুরপো, শোনো—

সতীশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া কহিল, কি হবে শুনে? সত্যি বলচি বৌঠান, সে যে এতবড় ছোটলোক, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। যেখানে সে থাকে, সেখানে আমি থাকিনে। আজ বুঝতে পারচি, হঠাৎ কেন সেদিন বাবা ও-রকম চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু বোলো সেই ইতরটাকে, আমি তাকে গ্রাহ্যও করিনে।

কিরণময়ী ব্যাকুল হইয়া কহিল, কাকে? কি বলচ ঠাকুরপো?

ঠিক বলচি বৌঠান, ঠিক বলচি। তাকে বললেই সে বুঝবে। কিন্তু তোমাকেও বলে যাই আজ—বিনা দোষে তোমার বাড়ির দরজা আমার মুখের ওপর বন্ধ করে দিলে বটে,—কিন্তু একদিন বুঝবে—সতীশ যত মন্দই হোক, তাকে বিশ্বাস করে কেউ কোনদিন ঠকেনি। আর একটা কথা তাকে বোলো, সে যত ইচ্ছে—প্রাণভরে আমার সর্বনাশের চেষ্টা করে যেন, কিন্তু আমিও তাকে আর মুখ দেখাব না, সেও যেন আমাকে—হঠাৎ সতীশ দরজার দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল, এবং পরক্ষণেই মুখ ফিরাইয়া ঝড়ের বেগে প্রস্থান করিল। তাহারই দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া কিরণময়ীরও দুই চক্ষু পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ উপেন্দ্রর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তিনি চেঁচামেচি শুনিয়া রোগীর শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আসিয়া ঘরের কবাট ঈষন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন।

কিরণময়ীর একবার মনে হইল, ব্যাপারটা কি, উপেন্দ্র তাহা জানিতে চাহিবেন। কিন্তু তিনি কোন কথাই বলিলেন না, নিঃশব্দে কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া ভিতরে সরিয়া গেলেন।

কিরণময়ীর বিস্ময়ের অবধি নাই। এ কি কাণ্ড! সতীশ তাহার উপীনদাকে এমন করিয়া তাহারি মুখের উপর অপমান করিয়া গেল কেমন করিয়া? কিসের জন্য? সে রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া হাতের কাজগুলো যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত করিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মনের মধ্যে একটা গভীর ক্ষুব্ধ বিস্ময় সহস্র রূপ ধরিয়া নিরন্তর চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাহার ঘরের মধ্যে যে এতবড় একটা বিপদ আসন্ন হইয়া রহিয়াছে, ক্ষণকালের জন্য সে তাহাও ভুলিল, শুধু ভাবিতে লাগিল, কাল সন্ধ্যার পর সতীশ বাসায় ফিরিয়া গেছে, তার পরে এই একটা রাত্রির মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটিতে পারে যাহাতে সে এমন উন্মত্ত আচরণ করিয়া চলিয়া গেল।

অথচ উপেন্দ্র একটা কথাও জানিতে চাহিলেন না। তাহার মনে হইল, ক্ষণকালের জন্য উপেন্দ্রর শুষ্ক কঠিন মুখের উপর যেন দুঃসহ বিস্ময় ফুটিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহা সত্য কিংবা শুধু তাহারই মনের কল্পনা, তাই বা কে জানে!

উপেন্দ্র ফিরিয়া গিয়া মুমূর্ষুর শয্যাপ্রান্তে তাঁহার পূর্ব স্থানটিতে বসিয়া রহিলেন। তিনি স্বভাবতঃই শান্ত-প্রকৃতির। সহসা কাহারো সপক্ষে বা বিপক্ষে মতামত গ্রহণ করিতেন না। কিন্তু সেই সহজ নির্মল বিচার-ক্ষমতা তাঁহার ছিল না, কাল রাত্রে যখন সুরবালা প্রভৃতিকে জ্যোতিষের বাটীতে পোঁছাইয়া দিয়া গভীর রাত্রে একাকী হারানের কক্ষে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন, হারানের শ্বাসকষ্ট তখন ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভিতরে সংজ্ঞা আছে কি না, তাহা অনুমান করা কঠিন। চারিদিকে চাহিয়া ব্যাপারটা তাঁহার কি ভীষণ ঠেকিয়াছিল! অথচ, কোথাও যেন এতটুকু ব্যাকুলতা নাই। ইতিপূর্বে তিনি যে দুই-একটা মৃত্যুশয্যা চোখে দেখিয়াছিলেন, ইহার সহিত তাহাদের কতবড় প্রভেদ। রোগীর শিয়রে তেমনি একটা তেলের প্রদীপ অত্যন্ত ম্লান হইয়া জ্বলিতেছে, মা ঘরের একটা কোণে মাদুর পাতিয়া নিদ্রিত—শুধু কিরণময়ী জাগিয়া বসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারও আচরণে উদ্বেগের কোন লক্ষণ খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল, সে যেন পরম

ঔদাস্যে স্বামীর মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। মায়েরও কেমন যেন নির্লিপ্ত ভাব,—নিজের রোগ ও রুগ্নদেহ লইয়াই অস্থির।

কাল রাত্রে উপেন্দ্র যেন অত্যন্ত সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, শুধু যে মৃত্যুর বিভীষিকাই এই দুটি রমণীর মধ্যে আর ছিল না তাহা নহে, পরন্তু ইহার বাঁচিয়া থাকাটাই যেন একটা বাঁধের মত হইয়া এই ক্ষুদ্র পরিবারটির সুখ-দুঃখের প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করিয়া, আবর্জনায় নিরতিশয় পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। যেমন করিয়াই হউক, এর অবরোধ হইতে মুক্তি পাইলেই ইহারা যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

উপেন্দ্র আজিও কিরণময়ীকে চিনিতে পারেন নাই—সে সুযোগই তাঁহার ঘটে নাই। কিন্তু সতীশ চিনিয়াছিল। তাই প্রথম যেদিন ইঁহারা হারানের আহ্বানে এ বাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন কিরণময়ীর সে রাত্রির আচরণ সতীশ ত ভুলিয়া ছিলই, অধিকন্তু নিজের রূঢ়তার সহস্র অপরাধ স্বীকার করিয়া, তাঁহার ক্ষমা লাভ করিয়া, ভাইয়ের স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু উপেন্দ্রর সে অবকাশ ঘটে নাই। তাই কাল রাত্রে ঘরে ঢুকিয়া এক মুহূর্তেই তাঁহার অপ্রসন্নচিত্ত মায়ের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা ও স্ত্রীর বিরুদ্ধে নিবিড় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই সকালে কিরণময়ী যখন চা দিয়া গেল তিনি স্পর্শও করিলেন না।

সকালে সতীশের আসা-যাওয়া অঘোরময়ী টের পান নাই। তখন তিনি নীচে নিজের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, এখন পা টিপিয়া ঘরে ঢুকিয়া ছেলের পানে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিল না, নিষেধও করিল না। হঠাৎ তাঁহার চায়ের বাটির প্রতি চোখ পড়ায় কান্নার সুরে প্রশ্ন করিলেন, কৈ বাবা, চা খেলে না যে?

উপেন্দ্র সংক্ষেপে কহিলেন, না—

অঘোরময়ী অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন,—না না, সে হবে না বাবা—সারা রাত্রি জেগে আছ,—এর উপর আবার তোমার অসুখ-বিসুখ হয়ে পড়লে আমি আর বাঁচব না উপীন।

উপেন্দ্র কথা কহিলেন না, শুধু কেবল অঘোরময়ীর মুখের পানে একটা তিক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর এক দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহার অর্থবোধ করা অঘোরময়ীর সাধ্য ছিল না। তিনি পুনঃ পুনঃ জিদ করিতেই লাগিলেন, কিন্তু সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিল কিরণময়ী। এই ঘরে এই মৃতকল্প সন্তানের পার্শ্বে বসিয়া পরের ছেলের জন্য জননীর এই উৎকট ব্যাকুলতা কত যে অসঙ্গত ও অশোভন দেখাইল, তাহা তাহার তীব্র বুদ্ধির অগোচর রহিল না। কিন্তু সে যাই হোক, উপেন্দ্রও কেন যে এই একটা তুচ্ছ অনুরোধের বিরুদ্ধে এইরূপ দৃঢ় পণ করিয়া শক্ত হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহারও কারণ কিরণময়ী অনুমান করিতে পারিল না। ইঁহার আচরণটাও তাহার চোখে কম অরুচিকর ঠেকিল না।

এই জেদাজেদি স্থগিত হইল ডাক্তারের আগমনে। সাহেব ডাক্তার মিনিট দুই-তিন পরীক্ষার পরে তাঁহার শেষ জবাব দিয়া গেলেন, এবং এই সঙ্গে ভরসাও দিয়া গেলেন যে, আগামী শেষ-রাত্রির এদিকে শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই।

বেলা তখন দশটা। কিরণময়ী একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিল, আপনার একবার সেখানে দেখা দিয়ে আসাও ত দরকার।

উপেন্দ্র কোন দিকে না চাহিয়া কহিল, তেমন দরকার নেই। তাঁরা সমস্ত জানেন।

কিরণময়ী কহিল, তবুও একবার যান। এখন ত কোন ভয় নেই—ততক্ষণ স্নান করে একটু বিশ্রাম করে ফিরে আসতে পারবেন।

উপেন্দ্র কথা কহিল না। কিরণময়ী মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, একটুখানি বুঝে দেখুন, স্নানাহার না করে উপোস করে এখন মুখোমুখি বসে থেকে কোন ফল নেই। গাড়িতে এসেচেন, কাল সমস্ত রাত্রি জেগে বসে আছেন, তার উপর আজ সারা দিনরাত্রি এমন করে বসে থাকলে অসুখ হয়ে পড়তে পারে। সতীশঠাকুরপোও নেই—এ সময় আপনি যদি—তা ছাড়া আপনাকে সত্যিই বড় ক্লান্ত দেখাচ্চে। আমি বসে আছি—ততক্ষণ আপনি একটুখানি ঘুরে আসুন। কথা শুনুন—উঠুন।

সহসা উপেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিয়াই দৃষ্টি অবনত করিয়া ফেলিল। এমন করিয়া এত

কথা কিরণময়ী আর কখনো তাঁহার সাক্ষাতে কহে নাই। এ কণ্ঠস্বরে শুভাকাঙ্ক্ষার আতিশয্য নাই, অথচ কি দৃঢ়! কি কোমল! উপেন্দ্রর কানের মধ্যে কিরণময়ীর এই প্রথম সস্নেহ অনুরোধ কি অপরূপ হইয়াই ঠেকিল! বহুদিন পূর্বে একদিন রাত্রে যে তীব্রকণ্ঠ, যে কঠিন ভাষা ইহারই কাছে সে শুনিয়া গিয়াছিল, তাহার সহিত ইহার কি আশ্চর্য প্রভেদ!

উপেন্দ্র কোনদিকে না চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আপনাদের আজ কিরকম হবে?

কিরণময়ী কহিল, সে কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন? আমাদের আজ যে দুঃখের দিন, তার ত কেউ ভাগ নিতে পারবে না। আপনি কিন্তু আর দেরি করবেন না, এইবেলা উঠে পড়ুন!

সত্য কথা বলিবার এ কি অদ্ভুত শান্ত-কঠিন ভঙ্গী! মুহূর্তের জন্য উপেন্দ্র সমস্ত ভুলিয়া তাহার বিস্ময়-বিস্ফারিত দুই চক্ষের পরিপূর্ণ দৃষ্টি কিরণময়ীর মুখের উপর নিবদ্ধ করিল। প্রথমেই চোখ পড়িল তাহার সিঁথার পুরোভাগে সিঁদুরের উজ্জ্বল রেখাটা—নারী-সৌভাগ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন—এ জীবনের পরম শ্রেয়ঃ এখনো নিশ্চিহ্ন হয় নাই—আয়তির সমস্ত গৌরব বহন করিয়া এখনও বিদ্যমান আছে। প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে উপেন্দ্রর সর্বশরীর একবার কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিল।

কিরণময়ী তাহা দেখিতে পাইল, কিন্তু তাহার আভাসমাত্রও তাহার মুখে প্রকাশ পাইল না। কহিল, আপনি উঠুন, আমি একটু দুধ খাইয়ে দিই।

উপেন্দ্র সরিয়া বসিয়া কহিল, ওষুধটা—

কিরণময়ী ব্যথিত স্বরে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না না, আর তাতে কাজ নেই। অনেক ওষুধই জোর করে খাইয়েচি, আর খাওয়াতে চাইনে।

উপেন্দ্র প্রতিবাদ করিল না। ঔষধের অনাবশ্যকতা সে নিজেও কম জানিত না। স্বামীকে দুধ পান করাইয়া সে পুনর্বার অনুরোধ করিতেই উপেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল এবং অতিশীঘ্র স্নানাহার করিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়া দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইতেই কিরণময়ী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আসবার সময় সতীশঠাকুরপোর বাসাটা হয়ে আসবেন কি?

উপেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কেন?

কিরণময়ী কহিল, আমার ত লোক নেই যে, তাঁর বাসায় একবার পাঠাব, সেই জন্যে বলছিলুম, আপনি যদি একবার—

উপেন্দ্রর সহসা মনে হইল, এই ডাকিতে পাঠাইবার প্রস্তাবের দ্বারা তাহাকেই যেন বিশেষভাবে একটু খোঁচা দেওয়া হইল। তাই তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তাকে কি আপনার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে?

এই কণ্ঠস্বর ও তাহার তাৎপর্য কিরণময়ীর অগোচরে রহিল না। কিন্তু, তাই বলিয়া নিজের কণ্ঠস্বরের দ্বারা আর তাহাকে সে বাড়াইয়া তুলিল না। শুধু বলিল, এ দুঃসময়ে ত আমার সকলকেই প্রয়োজন উপীনবাবু। তা ছাড়া, কেন যে হঠাৎ তিনি আপনার উপর অমন রাগ করে চলে গেলেন, তাও ত জানিনে। তাই ভাবচি, একবার তাঁকে ডেকে আনবার চেষ্টা করা কি ভাল নয়?

উপেন্দ্র মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল, আপনি সেজন্য উদ্বিগ্ন হবেন না। সে ত আমারই বন্ধু, আমাদের ভাল-মন্দ আমরাই স্থির করে নিতে পারব। তবে, আপনার যদি বিশেষ কাজ থাকে ত—তার কাছে লোক পাঠিয়ে দিতে পারি—আমার নিজের যাবার সময় হবে না।

কিরণময়ী মৃদুস্বরে কহিল, সেই ভাল। লোক পাঠিয়ে দেবেন। তার আসাই চাই। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর বোঝাপড়া যবে হয় হোক, কিন্তু আমি তার বোন। আমার এতবড় বিপদের দিনে আমাকে শাস্তি দিতে আপনাদের আমি দেব না।

না না, তার আবশ্যক কি, আমি খবর পাঠিয়ে দেব—বলিয়া উপেন্দ্র বাহির হইয়া গেল। অবশ্য, ভাই-বোনের নূতন সম্বন্ধ কোথায় কিভাবে গড়িয়া উঠিবে তাহা স্থির করিয়া দিবার ভার তাহার উপরে নাই, এ কথা সে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু তথাপি যে আত্মীয়তার ধারা একদিন শুধু তাহার মধ্য দিয়াই পথ পাইয়াছিল, সে যে আজ তাহাকেই অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, এ সংবাদ তাহাকে আঘাত না করিয়া পারিল

না। বন্ধুর প্রতি সে যা খুশি করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের এই ভাই-বোনের নিকটতম সম্বন্ধের মধ্যে কিরণময়ী কোন বন্ধুকেই যে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না, ইহা বুঝিবার পক্ষে সে অস্পষ্টতার লেশমাত্র স্থান রাখে নাই।

ক্ষুদ্র গলি দ্রুতপদে পার হইয়া আসিয়া উপেন্দ্র বড় রাস্তায় গাড়ি ভাড়া করিল। অন্ধকার-শীতল মৃত্যুপুরীর বাহিরে, শহরের এই প্রখর সূর্যালোকদীপ্ত, জীবন্ত, কর্ম-চঞ্চল রাজপথের উপরে দাঁড়াইয়াও কিন্তু সে আরাম বোধ করিল না। মনের ভিতরটায় কেমন যেন একরকম জ্বালা করিতেই লাগিল।

আবশ্যক হইলে কিরণময়ী যে কিরূপ উগ্রভাবে কঠিন হইয়া উঠিতে পারে, তাহা সে একদিন দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহার শান্ত বিরুদ্ধতাও যে তাহা অপেক্ষা অল্প কঠিন নয়, আজিকার এই গুটি-কয়েক কথাতেই সে স্পষ্ট অনুভব করিল। সতীশের সহিত তাহার যে একটা বিবাদ ঘটিয়াছে, কিরণময়ী তাহা টের পাইয়াছে বুঝা গেল। কিন্তু, কলহের কারণ যাহাই হোক, দোষ-গুণের বিচার সে নিজেই করিবে, আর কাহাকেও হাত দিতে দিবে না, এই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনের মধ্যে যাতায়াত করিতে লাগিল।

চব্বিশ

নারীর সম্বন্ধে উপেন্দ্রর মত পরিবর্তন করিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ তাহাকে মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের মধ্যে মস্ত ভুল ছিল। এমন নারীও আছে, যাহার সম্মুখে পুরুষের অভ্রভেদী শির আপনি ঝুঁকিয়া পড়ে। জোর খাটে না, মাথা অবনত করিতে হয়। এমনি নারী কিরণময়ী। সেই প্রথম পরিচয়ের রাত্রে ইহারই সম্বন্ধে উপেন্দ্র সতীশের কাছে, মুখে অন্যরূপ কহিলেও অন্তরে সকরুণ অবজ্ঞার সহিত ভাবিয়াছিল, ইহারা সেই-সব উগ্র-স্বভাবা রমণী—যাহারা অতি সামান্য কারণেই জ্ঞান হারাইয়া উন্মাদের মত বিষ খাইয়া, গলায় দড়ি দিয়া ভয়ংকর কাণ্ড করিয়া বসে। আজ দেখিতে পাইল, না, তাহা নয়। ইহারা একান্ত সংকটের মধ্যেও মাথা ঠিক রাখিতে জানে, এবং লেশমাত্র উগ্র না হইয়াও অবলীলাক্রমে আপন ইচ্ছা প্রয়োগ করিতে পারে। এ বাটীতে সতীশের আসা-যাওয়া উচিত-অনুচিত যাই হোক, কিরণময়ী ডাকিয়াছে, এ খবরটা সতীশকে দিতেই হইবে।

এই কথাটা পথে যাইতে যাইতে সে যতই আলোচনা করিতে লাগিল, ততই তাহার মন আক্ষেপে ভরিয়া উঠিল। কারণ, সতীশকে অত ভালবাসিত বলিয়াই তাহার উপর আজ উপেন্দ্রর বিতৃষ্ণার যেন অন্ত ছিল না। সে যে অপরাধ করিয়াছে, তাহার বিচার আর একদিন হইবে, কিন্তু আজ যে সতীশ প্রকাশ্যে, তাহারি মুখের উপর তাহার চিরদিনের অধিকৃত অগ্রজের সম্মানিত আসনটিকে সদর্পে মাড়াইয়া গেল, কোন সঙ্কোচ মানিল না, সকল দুঃখের চেয়ে এই দুঃখই উপেন্দ্রর মর্মে গিয়া বিঁধিয়াছিল।

কিছুদিন পূর্বে উপেন্দ্র বাড়িতে বসিয়াই একখানা অনামা পত্রে সতীশের কথা শুনিয়াছিল। সে পত্র, রাখালের লেখা। যখন দুজনের ভাব ছিল, তখন সতীশের নিজের মুখেই রাখাল তাহার এই পরম বন্ধুটির বহু অসাধারণ কাহিনী অবগত হইয়াছিল। উপেনদার অসামান্য বিদ্যা-বুদ্ধি এবং তাহার তুষার-শুভ্র অকলঙ্ক চরিত্রের খ্যাতি এবং সকল গর্বের বড় গর্ব ছিল তাহার সেই উপীনদার অপরিমেয় স্নেহ। সেইখানে ঘা দেওয়ার মত মারাত্মক আঘাত যে সতীশের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না, ধূর্ত রাখাল তাহা ঠিক বুঝিয়াছিল।

কিন্তু, সে পত্র তখন কোন কাজই করে নাই। উপেন্দ্র চিঠি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পত্র-প্রেরকের উদ্দেশে হাসিয়া বলিয়াছিল, তুমি যেই হও এবং সতীশের যত গোপনীয় কথাই জানিয়া থাকো, আমি তোমার চেয়েও তাহাকে বেশী জানি; এবং দিন-দুই পরে সতীশের পিতার প্রশ্নে সহাস্যে কহিয়াছিল, সতীশ ভালই আছে। তবে, বোধ করি, কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিয়া সাবেক বাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছে। সে লোকটা একখানা অনামা পত্রে তাহার সম্বন্ধে যা-তা লিখিয়া জানাইয়াছে।

বৃদ্ধ উদ্বিগ্নমুখে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিরকম যা-তা উপীন?

উপেন্দ্র জবাব দিয়াছিল, সে-সকল মিথ্যা গল্প শুনিয়া আপনার সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই। আমি ত সতীশকে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছি—আমি জানি, সে এমন কিছু করিবে না যাহাতে আত্মীয় কাহারও মাথা হেঁট হয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তাহার সেই বিশ্বাসের শিরে বজ্রপাত হইল সাবিত্রীকে স্বচক্ষে দেখিয়া। সতীশের নির্জন কক্ষের মধ্যে প্রসাধননিরতা একাকিনী রমণী! তাহার সে কি সুগভীর লজ্জা! এবং সমস্ত লজ্জা ছাপাইয়া সেই দুটি আয়ত চক্ষুর ব্যথিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে কি ত্রাসই না ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সে কি ভুল করিবার? এক মুহূর্তেই উপেন্দ্রর মনের মধ্যে রাখালের সেই বিস্মৃতপ্রায় চিঠিখানির আগাগোড়া একেবারে যেন আগুনের অক্ষরে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। প্রশ্ন করিবার, সংশয় করিবার আর কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না।

সে চিঠিখানিকে বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিতে রাখাল চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তাহাতে সাবিত্রীর নাম ত ছিলই, নানাবিধ বিবরণের মধ্যে তাহার ভ্রূর উপর একটি ছোট কাল আঁচিলের কথা উল্লেখ করিতেও সে ভুলে নাই। চিহ্নটি এতই সুস্পষ্ট যে, পলকের দৃষ্টিপাতেই তাহা উপেন্দ্রর লক্ষ্যগোচর হইয়াছিল।

সতীশকে ডাকিয়া দিবার অপ্রিয় কাজটা যাইবার পথেই শেষ করিয়া যাইবে কি না, স্থির করিতে করিতেই ভাড়াটে গাড়ি জ্যোতিষ-সাহেবের বাটীর সম্মুখীন হইল এবং ফটকে প্রবেশ করিতেই তাহার উৎসুক দৃষ্টি কিসে যেন বাড়ির দক্ষিণ দিকের দোতলা কক্ষের অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইল।

উপেন্দ্র মুখ বাড়াইয়া দেখিল, যাহা নিঃসংশয়ে প্রত্যাশা করিয়াছিল, ঠিক তাহাই। উন্মুক্ত সুদীর্ঘ বাতায়ন ধরিয়া একখানি স্তব্ধ প্রতিমা এই পথের পরেই যেন সমস্ত প্রাণ-মন পাতিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এতটা দূর হইতে ভাল করিয়া দেখা সম্ভব নহে, তবুও তাহার মনশ্চক্ষে ওই বাতায়নবর্তিনীর ওষ্ঠাধরের ঈষৎ কম্পনটুকু হইতে চক্ষুপল্লব-প্রান্তের জলের রেখাটি পর্যন্ত এড়াইল না। তাহার এতক্ষণকার চিন্তাজ্বালা, অভিমান ও অপমানের ঘাত-প্রতিঘাতের বেদনা মুছিয়া গিয়া শুধু কেবল এই একটা কথা মনে জাগিল, সুরবালার সারারাত্রি এবং এই-সমস্ত সকালটা না জানি কি করিয়াই কাটিয়াছে। যে সাধ্য থাকিলে হয়ত তাহাকে ঘরের বাহির হইতেই দেয় না, সে যে এই অপরিচিত শহরের মধ্যে গভীর রাত্রে তাহার অসুস্থ স্বামীকে একাকী বাড়ির বাহিরে যাইতে দিয়া এতটা বেলা পর্যন্ত কিরূপ করিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া একদিকে তাহার যেমন হাসি পাইল, অন্যদিকে তেমনি চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

সরোজিনী বোধ করি খবর পাইয়া সেইমাত্র ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিয়া বাহিরের বারান্দায় উপস্থিত হইয়াছিল, উপেন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাহার চোখ-মুখ হাসির ছটায় ভরিয়া গেল। গাড়ি হইতে নামিতে না নামিতেই বলিয়া উঠিল, বাইরে আর একদণ্ডও নয়, একেবারে উপরে চলুন।

উপেন্দ্র যথাসাধ্য গম্ভীর-মুখে হেতু জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নিজেও হাসিয়া ফেলিল। সরোজিনী তখন সহাস্যে কহিল, বেশ মানুষটিকে কাল রাত্রে আমার জিম্মা করে দিয়েছিলেন—না নিজে ঘুমিয়েছে, না আমাকে ঘুমুতে দিয়েছে। সারারাত্রি গাড়ির শব্দ শুনেচে, আর জানালা খুলে দেখেচে—ও কি, চিঠি লিখতে বসে গেলেন যে! না না, সে হবে না—একবার দেখা দিয়ে এসে তার পরে যা ইচ্ছে করুন—এখন নয়।

বাহিরের বারান্দায় একটা ছোট টেবিলের উপর লিখিবার সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত ছিল, উপেন্দ্র একখানা কাগজ টানিয়া লইয়া কহিল, বরং চিঠি লিখে তার পরে যা বলুন করতে পারি, কিন্তু তার পূর্বে নয়। পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবে না—ইচ্ছে হয় গিয়ে খবর দিতে পারেন।

সরোজিনী তেমনি হাসিমুখে বলিল, আমার খবর দেবার দরকার নেই—তিনিই আমাকে খবর দিতে বাইরে পাঠিয়েছেন। আচ্ছা, পাঁচ মিনিট আমি দাঁড়িয়ে রইলুম—আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে তবে যাব।

উপেন্দ্র আর জবাব না দিয়া চিঠি লিখিতে লাগিল। লিখিতে লিখিতে তাহার মুখের

উপর ব্যথা ও বিরক্তির সুস্পষ্ট চিহ্নগুলি যে অদূরে দাঁড়াইয়া সরোজিনী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

পত্র সমাপ্ত করিয়া তাহা খামে পুরিয়া ঠিকানা লিখিয়া উপেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিল। কোচম্যান আসিয়া সরোজিনীকে লক্ষ্য করিয়া জানাইল, গাড়ি প্রস্তুত হইয়াছে।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বেরুবেন নাকি?

সরোজিনী কহিল, হাঁ। আমার ছোট পিয়ানোটা মেরামত করতে দিয়েচে, সেইটে একবার দেখে আসব।

উপেন্দ্র খুশী হইয়া কহিল, ঠিকানা লেখা আছে, একটু কষ্ট স্বীকার করে এই চিঠিখানা সহিসকে দিয়ে বাড়ির মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন। বলিয়া উপেন্দ্র সরোজিনীর প্রসারিত হাতের উপর চিঠিখানি রাখিয়া দিল।

সরোজিনী কিছুক্ষণ ধরিয়া তাহার শিরোনামার প্রতি চাহিয়া রহিল। ঐ দুই ছত্র নাম ও ঠিকানা পড়িতে এতটা সময় লাগে না। তার পরে মুখ তুলিয়া কহিল, সতীশবাবু এবার আমাদের বাড়িতে উঠলেন না কেন?

সে ত আমাদের সঙ্গে আসেনি—সতীশ বরাবরই এখানে আছে।

সংবাদ শুনিয়া সরোজিনী চমকিয়া গেল। উপেন্দ্রর এ-সকল লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা ছিল না, থাকিলে সে আশ্চর্য হইত।

সরোজিনী নিজের লজ্জা চাপা দিতে সহজভাবে বলিবার চেষ্টা করিল, তিনি কখনো এদিকে মাড়ান না—অথচ এতদিন এত কাছে রয়েচেন।

উপেন্দ্র অন্যমনস্ক হইয়া আর একটা কিছু ভাবিতেছিল, কহিল, বোধ করি, আপনাদের কথা তার মনে নেই। কথাটা কত সহজ, কিন্তু কি কঠিন হইয়াই আর একজনের কানে বাজিল।

ভাল কথা, দিবাকর কৈ, তাকে দেখছিনে যে?

তিনি দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেড়াতে গেছেন। চলুন, আপনাকে সঙ্গে করে আগে ভিতরে দিয়ে আসি; বলিয়া সরোজিনী বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিল।

মিনিট-কুড়ি পরে ফিরিয়া আসিয়া সে যখন গাড়িতে উঠিয়া বসিল এবং আদেশমত গাড়ি সতীশের বাসার অভিমুখে রওনা হইল, তখন ভিতরে বসিয়া সরোজিনীর বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল এবং গাড়ি যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, হৃৎস্পন্দন ততই যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঠিক মনে হইতে লাগিল, সে এমনই কি একটা গুরুতর কাজের ভার লইয়া চলিয়াছে—যাহার সিদ্ধির উপর তাহার নিজেরই যেন সমস্ত ভবিষ্যতের ভাল-মন্দ নির্ভর করিয়া আছে।

অনতিকাল পরে গাড়ি সতীশের বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল এবং সহিস পত্রখানি হাতে করিয়া নামিয়া গেল। সরোজিনী গাড়ির একটা কোণ ঘেঁষিয়া আড়ষ্ট হইয়া কান পাতিয়া দরজার উপর সহিসের করাঘাত শুনিল। কিছুক্ষণ পরে দরজা খোলার শব্দ এবং তাহার ভিতরে যাওয়া অনুভব করিল এবং তাহার পর প্রতি-মুহূর্তে কাহার সুপরিচিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে আসিবার আশঙ্কায় ও আকাঙ্ক্ষায় স্তব্ধ কন্টকিত হইয়া বসিয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত, গাড়ি এবং গাড়ির ভিতরে যে বসিয়া আছে, সহিসের কাছে তাহার পরিচয় অবগত হইয়া সতীশ নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইবে। তাহার একবারও মনে হইল না, যে ব্যক্তি এতকাল এত কাছে বাস করিয়াও এমন করিয়া ভুলিয়া থাকিতে পারে, এ সংবাদ তাহাকে হয়ত অণুমাত্রও বিচলিত না করিতে পারে।

আবার সহিসের কণ্ঠস্বর দ্বারের কাছে শুনিতে পাওয়া গেল—সে দ্বার রুদ্ধও হইল এবং ক্ষণকাল পরেই সে চিঠি হাতে লইয়া একা ফিরিয়া আসিল। কহিল, বাবু বাড়ি নেই।

বাড়ি নেই? মুহূর্তকালের জন্য সরোজিনী সুস্থ হইয়া বাঁচিল। মুখ বাড়াইয়া কহিল, চিঠিটা ফিরিয়ে নিয়ে এলি কেন, রেখে আয়।

সহিস জানাইল, বাবু কলিকাতায় নাই, বেলা দশটার ট্রেনে বাড়ি চলিয়া গেছেন।

কথাটা শুনিয়া কেন যে তাহার এই বাসাটা একবার স্বচক্ষে দেখিয়া লইবার দুর্দমনীয়

স্পৃহা হইল, তাহার হেতু সে ঠিকমত নিজেও বুঝিতে পারিল না। কিন্তু, পরক্ষণেই নামিয়া আসিল এবং আর একবার কবাট খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। হিন্দুস্থানী পাচক জিনিস-পত্রের পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহার সাহায্যে সমস্ত ঘরগুলা ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া নীচে আসিবার পথে দড়ির আলনায় ঝুলোনো একটা অর্ধমলিন চওড়া পাড়ের শাড়ির প্রতি সরোজিনীর দৃষ্টি পড়িল। কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করায় ব্রাহ্মণ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করিল. এ বস্ত্রখানি মা-জীর।

সাবিত্রী অপরাহ্নবেলায় স্নান করিয়া তাহার পরিধেয় সিক্ত বস্ত্রখানি শুকাইতে দিয়াছিল, তাহা তখন পর্যন্ত তেমনিই টাঙ্গানো ছিল। সরোজিনী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা এই মাইজীর সম্বন্ধে যতটুকু অবগত হইল, তাহাতে আরও আশ্চর্য হইয়া গেল। যে-সকল ব্যাপার সচরাচর এবং সহজভাবে ঘটে না, এবং যাহার মধ্যে পাপ আছে, তাহা তলাইয়া বুঝিতে না পারিলেও সকলেই নিজের বুদ্ধি অনুসারে একরকম করিয়া বুঝিতে পারে। এই হিন্দুস্থানীটিও সস্ত্রীক উপেন্দ্রর আসা এবং অমন করিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাওয়া হইতে আজ সকালে মনিবের অকস্মাৎ প্রস্থানের মধ্যে মাইজীটির যে সংস্রব ছিল, তাহা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। বিশেষ করিয়া সতীশের উদ্‌ভ্রান্ত আচরণ কোন লোকেরই দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব ছিল না। তাই সে সাবিত্রীর অসুখ প্রভৃতি অনেক কথাই কহিল এবং তাহাকে দেখা-শুনা করিবার জন্যই যে তাহার মনিবকে এমন ব্যস্ত ও ব্যাকুল হইয়া অকস্মাৎ প্রস্থান করিতে হইয়াছে তাহাও সে একরকম করিয়া বুঝাইয়া দিল। সরোজিনী এই একটি নূতন তথ্য অবগত হইল যে, উপেন্দ্ররা সর্বপ্রথমে এই বাড়িতেই আসিয়াছিলেন, মোট-ঘাট নামানো পর্যন্ত হইয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সমস্ত তুলিয়া লইয়া সেই গাড়িতেই প্রস্থান করিয়াছিলেন। অথচ, তাঁহারা কেহই সতীশের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। তাহার পরে আজ এই পত্র,—স্পষ্ট বুঝা গেল, উপেন্দ্র তাহার বন্ধুর আকস্মিক প্রস্থানের কথাটা বিদিত নহেন। অধীর ঔৎসুক্যে সে ক্রমাগত এই রমণীটির সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া ইহার বয়স এবং সৌন্দর্যের যে তালিকা পাইল তাহা সত্যকে ডিঙ্গাইয়াও বহু ঊর্ধ্বে চলিয়া গেল। অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া সে যখন গাড়িতে উপবেশন করিল, তখন তাহার পিয়ানো সারানোর শখ চলিয়া গেছে এবং অজ্ঞাত গুরুভারে বুকের ভিতরটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এই রহস্যময়ী যে কে, এবং কি সূত্রে আসিয়াছিল তাহা জানা গেল না। কিন্তু একটা লুকোচুরির অস্তিত্ব তাহার মনের মধ্যে দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া রহিল।

সতীশ ও কিরণময়ীর উপর বিরক্তি ও অভিমান উপেন্দ্রের যত বড়ই হউক, তাহাকে প্রাধান্য দিয়া কর্তব্য অবহেলা করা তাহার স্বভাব নয়। তাই আহারাদির পর পাথুরেঘাটার বাড়িতে ফিরিয়া যাওয়াই তাহার ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু নিদারুণ শ্রান্তি আজ তাহাকে পরাস্ত করিল। অধিকন্তু সুরবালা এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল যে, তাহা অবহেলা করিয়া যাওয়াও অসাধ্য হইয়া পড়িল।

ঘণ্টা-কয়েক পরে তাহার উৎকণ্ঠিত নিদ্রা যখন ভাঙ্গিয়া গেল, তখন বেলা আর নাই। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই পাশের টিপয়ের উপর চিঠিখানার উপর চোখ পড়িল। তুলিয়া লইয়া দেখিল, পত্র তেমনি বন্ধ রহিয়াছে—যে কারণেই হউক, তাহা সতীশের হাতে পড়ে নাই। সাড়া পাইয়া সুরবালা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, সতীশ-ঠাকুরপো এখানে নেই, বেলা দশটার গাড়িতে বাড়িতে চলে গেছেন।

সংবাদ শুনিয়া উপেন্দ্রের মুখ কালি হইয়া গেল। প্রথমেই মনে হইল, এই অপরিচিত শহরের মধ্যে হারানের আসন্ন মৃত্যু-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্তব্য এখন একাকী তাহাকেই সম্পন্ন করিতে হইবে। উঃ, সে কত কাজ! এবং ভীষণ নিদারুণ! লোক ডাকা, জিনিসপত্র যোগাড় করা, সদ্যবিধবা ও জননীর কোলের ভিতর হইতে তাহার একমাত্র সন্তানের মৃতদেহ টানিয়া বহন করিয়া লইয়া যাওয়া! এই মর্মান্তিক শোকের দৃশ্য কল্পনা করিয়াই তাহার সর্বাঙ্গ পাথরের মত ভারী ও সমস্ত চিত্ত পাথুরেঘাটার প্রতিকূলে মুখ বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। নিজের অজ্ঞাতসারে সে যে ভিতরে ভিতরে সতীশের উপর

কতখানি নির্ভর করিয়া বসিয়াছিল, তাহা এইবার অভিমান ও অপমানের আবরণ ভেদ করিয়া দেখা দিল।

এই-সকল কার্য উপেন্দ্রর নিতান্তই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সাধ্যমত কোনদিন সে ইহার মধ্যে পড়িতে চাহিত না। কিন্তু সতীশের কাছে তাহা কতই না সহজ! দেশে এমন লোক মরে নাই, যেখানে সে তাহার কর্মপটু সুস্থ সবল দেহটি লইয়া সর্বাগ্রে উপস্থিত হয় নাই, এবং সমস্ত অপ্রিয় কার্য নিঃশব্দে বিনা-আড়ম্বরে সম্পন্ন করিয়া দেয় নাই। এ দুঃসময়ে সকলেই তাহাকে খুঁজিত, এবং তাহার আগমনে শোকার্ত ও বিপন্ন গৃহস্থ এই দুঃখের মাঝেও সান্ত্বনা এবং সাহস পাইত। সে যখন একেবারে কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন ক্ষণকালের জন্য উপেন্দ্র কোনদিকে চাহিয়া আর পথ দেখিতে পাইল না।

সুরবালা স্বামীর মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া হারানের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সতীশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল না। সরোজিনী ফিরিয়া আসিয়া কথা বাহির করিবার জন্যে গল্পচ্ছলে যাহা বিবৃত করিয়াছিল, তাহা হইতেই সে কাল রাত্রির ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল, সতীশ যে তাহার স্বামীর কত বড় বন্ধু, তাহা জানিত বলিয়াই এই ব্যথাটা এখন এড়াইয়া গেল।

সুরবালার সাংসারিক বুদ্ধির উপরে উপেন্দ্রর কিছুমাত্র আস্থা ছিল না বলিয়াই সে কোনদিন স্ত্রীর কাছে কোন সমস্যার উল্লেখ করিত না, কিন্তু এইমাত্র সে নিজেকে এতই বিপন্ন ভাবিতেছিল যে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া ব্যাকুল হইয়া কহিল, সে যে আমাকে এই বিপদের মাঝে ফেলে রেখে চলে যাবে সুরো, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। একা এই অজানা জায়গায় আমি কি উপায় করি! বলিয়া উপেন্দ্র যেন অসহায় শিশুর মত স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু আশ্চর্য, স্বামীর এতবড় বিপদের বার্তা পাইয়াও সুরবালার মুখে লেশমাত্র উদ্বেগ প্রকাশ পাইল না। সে কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া পুনরায় বিছানার উপর বসাইয়া দিয়া ধীরভাবে কহিল, তা অত ভাবচ কেন, এ কলকাতায় কারো জন্যেই কারো আটকায় না। তোমার চা তৈরি হয়েছে, হাতমুখ ধুয়ে তুমি চা খেয়ে নাও। ছোটঠাকুরপোকে সঙ্গে করে আমিও যাচ্চি চল।

উপেন্দ্র অবাক হইয়া কহিল, তুমি যাবে?

সুরবালা অবিচলিতভাবে কহিল, যাব বৈ কি! মেয়েমানুষের এ দুঃসময়ে কাছে থাকা মেয়েমানুষেরই কাজ—বলিয়া সে অনুমতির জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়া পাশের ঘর হইতে চা আনিয়া হাজির করিল এবং দিবাকরকে সংবাদ দিয়া নিজে প্রস্তুত হইবার জন্য শীঘ্র বাহির হইয়া গেল।

গৃহস্থের ঘরে ঘরে যখন সবেমাত্র সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ঠিক এমনি সময়ে তাহারা পাথুরেঘাটার বাড়িতে প্রবেশ করিল। সদর দরজা খোলা, কিন্তু নীচে কোথাও কেহ নাই। অন্ধকার ভাঙ্গা বাড়ি শ্মশানের মত স্তব্ধ। উভয়কে সাবধানে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া উপেন্দ্র নিঃশব্দে উপরে উঠিয়া হারানের রুদ্ধ কবাটের সম্মুখে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। ভিতর হইতে শুধু একটা মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস কানে আসিয়া বাজিল। কম্পিতহস্তে দ্বার ঠেলিয়া চাহিতেই আঁধার শয্যাতলে আপাদমস্তক বস্ত্রাচ্ছাদিত হারানের মৃতদেহ চোখে পড়িল। তাহার দুই পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সদ্য-বিধবা উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল—সে একবার মাথা উঁচু করিয়া দেখিল এবং পরক্ষণেই বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আর্তকণ্ঠে 'মা' বলিয়া চীৎকার করিয়াই উপেন্দ্রর পদতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল এবং সেই মুহূর্তেই চক্ষের নিমেষে সুরবালা উদ্‌ভ্রান্ত হত-বুদ্ধি স্বামীকে এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া কিরণময়ীর মুখখানি কোলের উপর তুলিয়া লইল।

পঁচিশ

অস্থি-মাংস-মেদ-মজ্জা-রক্তে গঠিত এই মানব-দেহে সমস্ত বস্তুরই একটা সীমা নির্দিষ্ট আছে। মাতৃস্নেহও অসীম নহে, তাহারও পরিমাণ আছে। গুরুভার অহর্নিশ অবিচ্ছেদে

টানিয়া ফিরিয়া রক্ত-চলাচল যখন বন্ধ হইয়া আসিতে থাকে, তখন সেই সীমারেখার একান্তে দাঁড়াইয়া জননীও আর সন্তানকে বহন করিয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। তাহা স্নেহের অভাবে কিংবা ক্ষমতার অভাবে সে মীমাংসার ভার অন্তর্যামীর হাতে, মায়ের হাতে নয়। তাই সেদিন যখন হারানের মৃতদেহ মাতৃ-অঙ্কচ্যুত হইয়া শ্মশানে চলিয়া গেল, তখন অঘোরময়ীর বক্ষ ভেদিয়া যে দীর্ঘশ্বাস সেই অসীমেরই পদপ্রান্তে এই মৃত্যুর বার্তা বহন করিয়া লইয়া গেল, তাহা আরও কিছু সঙ্গে লইয়া গেল কি না, সে অনুমান করিবার সাধ্য মানুষের নাই।

তাঁহার অত্যন্ত জ্বরের উপরেই হারানের মৃত্যু ঘটে। তারপর আট-দশ দিন যে কেমন করিয়া কোথা দিয়া গেছে, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই।

শ্রাদ্ধটা কোনমতে শেষ হইয়া গেলে তিনি উপেন্দ্রকে ধরিয়া পড়িলেন, বাবা, পাশের বাড়ির মল্লিকদের বড়বৌ কাশী বৃন্দাবন প্রয়াগ বেড়াতে যাবেন, আমার কি সেই সঙ্গে যাওয়া হতে পারে না?

কেন হতে পারবে না মাসী, স্বচ্ছন্দে হতে পারে। কিন্তু—, বলিয়া সে একবার কিরণময়ীর মুখের দিকে চাহিল।

কিরণময়ী বুঝিতে পারিয়া কহিল, আমার জন্যে চিন্তা নেই ঠাকুরপো, আমি ঝিকে নিয়ে বেশ থাকতে পারব।

উপেন্দ্র কিন্তু ইহাতে তৎক্ষণাৎ সায় দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল।

কিরণময়ী তাহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কিংবা এও ত স্বচ্ছন্দে হতে পারে। দিবাকর ঠাকুরপো ত কলকাতায় থেকেই বি. এ. পড়বেন স্থির হয়েছে, তাঁকে কেন আমার কাছেই রেখে দাও না? একটা অজানা বাসায় থাকার চেয়ে আমার চোখের উপর থাকা ত ঢের ভাল। যত্নও হবে, কলকাতায় একলা রাখার যে-সব ভয় আছে, সে ভয়ও থাকবে না। বলিয়া সে উপেন্দ্রর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করিল।

অঘোরময়ী একেবারে পূর্ণ সম্মতি দিয়া বলিয়া উঠিলেন, সে হলে ত আর কোন কথাই নেই উপীন—তাই কর বাবা, তাই কর। সে ছেলেটারও যত্ন হবে, এ হতভাগীও যা হোক একটু নাড়াচাড়া করে বাঁচবে। তিনি কোনগতিকে একটু বাহির হইয়া পড়িতে পারিলেই বাঁচেন। এতশীঘ্র এমন সোজা পথ আবিষ্কৃত হইতে দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্তভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু উপেন্দ্র কিরণময়ীর সাহস দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এমন একটা অভাবনীয় প্রস্তাব সে মুখ দিয়া বাহির করিল যে কি করিয়া, ইহাই ত সে প্রথমে ভাবিয়া পাইল না। দিবাকর যাই হউক, সে শিশু নহে,—সেও প্রাপ্ত-যৌবন পুরুষ। অথচ ঠিক যেন শিশুর মতই এই সর্বরূপ-যৌবনা রমণী একাকিনী এই নির্জন গৃহমধ্যে তাহাকে লালন-পালন ও মানুষ করিয়া দিবার সর্বপ্রকার দায়িত্ব অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে উদ্যত দেখিয়া উপেন্দ্রর মুখ দিয়া ভালমন্দ কোন কথাই বাহির হইল না। এই রমণী যে কিরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমতী তাহা জানিতে তাহার বাকী নাই। সে যে সঙ্গত-অসঙ্গত সাংসারিক ও সামাজিক বিধিব্যবস্থা সবিশেষ জানিয়া বুঝিয়াই এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছে তাহাতেও সংশয় নাই—তবে, এ কি কথা? কেমন করিয়া কহিল?

নিমেষের মধ্যে সে তাহার সংশয়োত্তেজিত সমস্ত পর্যবেক্ষণ-শক্তি জাগ্রত ও একত্র করিয়া এই অনন্ত সৌন্দর্যময়ীর অন্তরের মধ্যে প্রেরণ করিতে চাহিল, কিন্তু কোনখানে তাহারা প্রবেশের পথ পাইল না। বরঞ্চ কোথায় যেন সবেগে প্রতিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু, এই যে মুহূর্তকালের জন্য উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল, ইহাতে দুজনের মধ্যে যেন একটা নূতন পরিচয়ে চেনাশুনা হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এমন শুদ্ধ শান্ত ও একান্ত আত্মসমাহিত বৈরাগ্যের মূর্তি সে আর কখনও দেখে নাই। সেদিন রাত্রে ইহার বেশের পারিপাট্য দেখিয়া সদ্যসমাগত তাহার ও সতীশের দৃষ্টি ঝলসিয়া গিয়াছিল, মনে হইয়াছিল, ইহার তুলনা নাই—এমন করিয়া সাজিতে না পারিলে বুঝি কাহারও সাজাই হয় না, আজ আবার তাহারই এই রুক্ষ শিথিল অসংবদ্ধ কেশপাশ ও বিধবার সাজ দেখিয়া মনে হইল, এমন বুঝি আর কোন দিন ইহাকে দেখায় নাই। অত্যন্ত

অকস্মাৎ নবলব্ধ চেতনার মত এই একটি কথা তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া গেল যে, সৌন্দর্যের এই যে অপরিসীম সমাবেশ, ইহা ঠিক যেন অগ্নিশিখার মতই তরঙ্গিত হইয়া ঊর্ধ্বে উত্থিত হইতেছে—ইহাকে দুই চক্ষু ভরিয়া গ্রহণ করিতে হয়, স্পর্শ করিতে নাই—যে করে, সে মরে। এই তীব্র শিখারূপিণী বিধবা যে অসঙ্কোচে অকুতোভয়ে দিবাকরকে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে, সে ইহার সত্যকার অধিকারের গর্বেই করিয়াছে। দুঃসাহস বা স্পর্ধা প্রকাশ করে নাই।

উপেন্দ্র তখনও কথা কহিতে পারিল না বটে, কিন্তু তাহার মনশ্চক্ষের দৃষ্টিতে এই বিধবার কাছে দিবাকর একেবারে নিতান্ত ক্ষুদ্র শিশুর মতই অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল; এবং সেদিন কেন সতীশকে ছোট ভাইটির মত কাছে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিল, তাহাও আজ একেবারে সুস্পষ্ট হইয়া গেল। পরিতৃপ্ত মন তাহার নিঃশব্দ করযোড়ে এই মহামহিমময়ীর সম্মুখে নিজের অপরাধ বারংবার স্বীকার করিয়া মনে মনে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইল। তিন জনেই নির্বাক্; কিরণময়ী প্রথমে কথা কহিল। তাহার দুই চক্ষের করুণ দৃষ্টি তেমনিই উপেন্দ্রর মুখের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল, দিবাকরকে আমার কাছে কি রাখতে পারবে না ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের মত বলিয়া উঠিল, কেন পারব না বৌঠান! আপনি যদি তার ভার নেন, সে ত আমার পরম ভাগ্য। এতকাল পরে উপেন্দ্র আজ প্রথম তাহাকে আত্মীয়ার মত সম্বোধন করিল। কহিল, দিবাকর আমার সঙ্গেই ত এসেছিল, কখন একলা চলে গেছে বুঝি, নইলে এখনই তাকে ডেকে বলে দিতাম।

কথা শুনিয়া কিরণময়ী চকিত হইয়া উঠিল। এবার তাহারই মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। অকস্মাৎ আনন্দের বন্যায় তাহার দুই কূল যেন ভাসাইয়া দিবার আয়োজন করিয়া তুলিল। তাই সে ক্ষণকালের জন্য অন্যত্র মুখ ফিরাইয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া লইতে লাগিল। এইটুকু আত্মীয় সম্বোধন! তা কতটুকুই বা! কিন্তু ইহারই জন্য সে যেন কত যুগ হইতে তৃষ্ণার্ত হইয়া ছিল, তাহার এমনি মনে হইল। সতীশ এই বলিয়া ডাকিয়াছে, দিবাকর তাহাই বলিয়া ডাকে, কিন্তু তাহাতে ইহাতে কি অপরিমেয় ব্যবধান! এই আহ্বানটুকুর দ্বারা এত-দিন পরে উপেন্দ্র যে তাহাকে কাছে আকর্ষণ করিল, হঠাৎ তাহার আশঙ্কা হইল, ইহার প্রচণ্ড বেগ সে বুঝি-বা সহ্য করিতেই পারিবে না।

কিন্তু, ইহাদের এই আকস্মিক মৌনতায় অঘোরময়ী মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। একজন যদি-বা রাজী হইল, আর একজন মুখ ফিরাইয়া রহিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন, বাবা উপীন, তা হলে আমার যাবার ত কোন বিঘ্নই নেই? কিন্তু সে ত আর দেরি নেই, আমি কেন এখনি গিয়ে মল্লিকগিন্নীকে বলে আসিনে?

উপেন্দ্র কিরণময়ীর প্রতি আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আমি ত বলেছি মাসীমা, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। তোমার বৌমা সম্মত হলেই হলো। তাঁরও যখন মত আছে, তখন তোমার তীর্থযাত্রার কোন বাধাই ত আমি দেখিনে।

তবে যাই বাবা, আমি এখনি গিয়ে তাকে বলে আসি। জেনেও আসি, কবে তাঁদের যাওয়া হবে; বলিয়া অঘোরময়ী আর কালবিলম্ব না করিয়া ঝিকে ডাকিয়া লইয়া প্রফুল্ল-মুখে নীচে নামিয়া গেলেন।

তাঁহার এই ত্বরাটুকুতে উপেন্দ্র মনে মনে তৃপ্তি বোধ করিয়া কহিল, ভালই হলো। যেমন করে হোক, এখন দিন-কতক ওঁর বাইরে যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

কিরণময়ী কিছুই বলিল না। এই সময়টুকুর মধ্যে সে কেমন যেন একটু বিমনা হইয়া পড়িয়াছিল। জবাব না পাইয়া উপেন্দ্র পুনরায় কহিল, আপনার যথার্থ সম্মতি আছে ত বৌঠান?

উপেন্দ্রর কণ্ঠস্বরে সে ক্ষণকাল অবোধের মত তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া সহসা যেন সচেতন হইয়া উঠিল। কহিল, আছে বৈ কি ঠাকুরপো, নিশ্চয় আছে। এ যে কি অন্ধকূপ, সে শুধু আমরাই জানি। যান যান, দিন-কতক এই দুঃখের গণ্ডী থেকে অব্যাহতি পেয়ে বাঁচুন।

তাহার কথাগুলি এমন করিয়াই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল যে, উপেন্দ্র

ব্যথা অনুভব করিল। পীড়িত-চিত্তে কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এ দুঃখের গণ্ডী থেকে শুধু তাঁর নয় বৌঠান, আপনারও বার হওয়া উচিত।

কিরণময়ী কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, আমার আর কে আছে ঠাকুরপো, কার কাছে যাব?

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিল, আপনার বাপের বাড়িতে কি কেউ নেই?

কিরণময়ী হাসিল। কহিল, বাপের বাড়ি যে কোথায়, তাই ত জানিনে, মামার বাড়িতে মানুষ হয়েছিলাম, তাঁদের খবরও আট-দশ বছর জানিনে। দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে সেই যে এ-বাড়িতে ঢুকেছি, মরণ না হলে বোধ করি আর বার হতেই পারব না।

উপেন্দ্র অধিকতর ব্যথিত হইল। একটু চিন্তা করিয়া কহিল, তবে আপনিও কেন মাসীমার সঙ্গে পশ্চিমে যান না! বেড়ানোও হবে, তীর্থ করাও হবে, বলিয়া, সে কিরণময়ীর ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কারণ, এমন প্রস্তাবে সে কিছুমাত্র আনন্দ প্রকাশ করিল না। তেমনি নিরুৎসাহ-মুখে নীরবে চাহিয়া রহিল।

উপেন্দ্রর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল, সে বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না। কহিল, আপনি এই বাড়ির জন্যে ভাবচেন ত? কোন চিন্তা করবেন না। আমি দেখবার শোনবার বন্দোবস্ত করতে পারব। কোন জিনিস নষ্ট হবে না।

এইবার কিরণময়ী মুচকিয়া হাসিল। কহিল, তুমি আমার সেই প্রথম রাত্রির পাগলামি স্মরণ করে বুঝি এ কথা বললে ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি কহিল, না, না, তা নয়। কিন্তু তাও যদি হয়, তাকেই বা পাগলামি বলচেন কেন? ও-অবস্থায় ও-রকম সতর্ক হওয়া ত সকলেরই উচিত।

কিরণময়ী সহাস্যে কহিল, ঐ অতখানি সতর্ক হওয়া ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র কহিল, নয় কেন? নিজের ঘর-বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তির প্রতি মমতা কার নেই? ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা কার হয় না? না, না, অমন কথা আপনি বলবেন না। তাতে অসঙ্গতি বা অস্বাভাবিকতা কিছুমাত্র ছিল না।

না থাকলেই ভাল। কিন্তু আমি ত এখন সেটা নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারিনে; এবং হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, তোমাকেও সন্দেহ! ছি, ছি, কি কটুকথাই না বলেছিলুম! মনে হলে এখন নিজেই লজ্জায় মরে যাই। বলিতে বলিতেই তাহার স্বভাব-সুন্দর মুখখানি সকৃতজ্ঞ অনুতাপে যেন বিগলিত হইয়া গেল। উপেন্দ্র প্রতিবাদ করিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া সে পুনরায় কহিল, কিন্তু সে মমতা এখন কৈ ঠাকুরপো? একটিবারও ত মনে হয় না, এ বাড়ি-ঘর আমার থাকবে কি যাবে। থাকে থাক, না থাকে যাক! ভাবি, পথের গাছতলা ত কেউ ঘুচাতে পারবে না। আমার সেই ঢের হবে।

উপেন্দ্র ইহারও প্রত্যুত্তর করিল না। সদ্য-বিধবার বৈরাগ্যের এই ক'টি কথায় তাহার হৃদয় শ্রদ্ধায় করুণায় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিল।

কিরণময়ী কহিল, বাড়ির জন্যে নয় ঠাকুরপো, কিন্তু মায়ের সঙ্গে তীর্থে গিয়েই বা আমি কি শান্তি পাব? সে-সকল স্থান মাত্রেই ত বহু লোকের ভিড় শুনি।

উপেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তীর্থস্থানে লোকের ভিড় ত হয়ই বৌঠান, কিন্তু আপনার আর কিছু না হোক, তীর্থ করা ত হবে। সে-ও ত একটা কাজ।

আবার কিরণময়ী উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল, কিছু বলিল না। সে কেন যে হাসিল, তাহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া উপেন্দ্র কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ আশ্চর্য হইয়া দেখিল, পাশের ঘর হইতে দিবাকর বাহির হইল।

তুই কি এতক্ষণ ও-ঘরেই ছিলি না কি রে?

কিরণময়ী কহিল, দিবাকর ঠাকুরপো দয়া করে আমার বইগুলি গুছিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

দিবাকর কাছে আসিয়া বলিল, কত বই কি হয়েই আছে বৌদি! কিন্তু খুলে দেখলে জানা যায়, তিনি কি যত্ন করেই সমস্ত পড়েছিলেন।

কিরণময়ী সায় দিয়া কহিল, সত্যিই তাই। যাকে পড়া বলে, তিনি তেমনি করেই পড়তেন। তোমার হাতে ওখানা কি বই ঠাকুরপো?

দিবাকর সলজ্জভাবে কহিল, আমি সংস্কৃত জানিনে, তবু একবার পড়বার চেষ্টা করব। এখানি কঠোপনিষৎ।

কিরণময়ী কহিল, এত বই থাকতে পছন্দ হলো কঠোপনিষৎ?

দিবাকর প্রশ্নটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। মুখপানে চাহিয়া কহিল, কেন বৌদি, এর চেয়ে ভাল বই সংসারে আর কি আছে? তবে আমার পক্ষে হয়ত অনধিকারচর্চা। বুঝতে পারব না। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করা ত উচিত।

কিরণময়ী মৃদু হাসিয়া কহিল, যা মনে করেচ ঠাকুরপো, তা নয়। অমন করে চেষ্টা করবার কোন মূল্য এর নেই। তবে স্থানে স্থানে মন্দ লাগে না বটে। হাতে কাজকর্ম না থাকলে আত্মা-টাত্মার নানারূপ আজগুবি গল্প পড়লে সময়টা কেটে যায়, এই পর্যন্ত।

তামাশা শুনিয়া দিবাকরের মুখখানা একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। কহিল, বলেন কি বৌদি, শুনেছি উপনিষৎ যে বেদ! এর প্রতি-অক্ষর যে অভ্রান্ত সত্য!

তাহার বিস্ময়ের পরিমাণ দেখিয়া কিরণময়ী আবার হাসিল। কহিল, কোন ধর্মগ্রন্থই কখনও অভ্রান্ত সত্য হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং, এতেও মিথ্যার অভাব নেই।

দিবাকর দুই কানের মধ্যে আঙুল দিয়া সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, বেদ মিথ্যা! আর বলবেন না! বলবেন না! শুনলেও পাপ হয়—বেদ মিথ্যা! লোকে কথায় বলে বেদবাক্য। এ কি মানুষের তৈরি যে মিথ্যা হবে? এ যে বেদ!

তাহার কাণ্ড দেখিয়া কিরণময়ী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

দিবাকর কান হইতে আঙুল খুলিয়া লইয়া নিজের উত্তেজনায় লজ্জিত হইয়া কহিল, সত্যিই পাপ হয় বৌদি। বেদ কখনও মিথ্যা হয়? এ কি বাজে ধর্মগ্রন্থ যে, শিবের উক্তি বলে লোকে দুটো প্রক্ষিপ্ত রচা-শ্লোক, দশটা বানানো উপকথা ঢুকিয়ে দেবে? বেদ মানেই যে সাক্ষাৎ সত্য।

কিরণময়ী মুখের হাসি চাপিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, কি জানি ঠাকুরপো, ওঁর কাছে যা শুনেছিলুম তাই বললুম। কিন্তু তুমিও ত এইমাত্র স্বীকার করলে, ধর্মগ্রন্থ যার নাম, তাতেও শিবের উক্তি বলে মিথ্যা উক্তি ঢোকানো আছে।

দিবাকর মানিয়া লইল। কিছুদিন পূর্বেই পুরাণ সম্বন্ধে সে মাসিক পত্রিকার সমালোচনা পড়িয়াছিল; কহিল, অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু উপকথা, মিথ্যা শ্লোক যে আছে, এ কথা অস্বীকার করতে পারিনে। কিন্তু, সে ত বেশী দিন চলে না বৌদি। যা মিথ্যা, তা দুদিনেই ধরা পড়ে যায়।

কি করে ধরা পড়ে ঠাকুরপো?

দিবাকর কহিল, সে আমি ঠিক জানিনে বৌদি। কিন্তু, যা মিথ্যা, তার খুঁটিনাটি, আলোচনা করলেই পণ্ডিতেরা টের পান কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা, কোন্‌টা খাঁটি, কোন্‌টা প্রক্ষিপ্ত; কিন্তু তাই বলে আপনি বেদ সত্য বলে স্বীকার করতে চান না, এ অন্যায়, বড় অন্যায়!

উপেন্দ্র এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই। কিরণময়ীর এই সমস্ত উগ্র পরিহাসের তাৎপর্য যে কি তাহা ঠিক অনুমান করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিতেছিল। কিরণময়ী তাহার পানে একবার কটাক্ষে চাহিয়া বোধ করি একটু হাসি গোপন করিল। পরে গম্ভীর হইয়া দিবাকরকে কহিল, কি জানো ঠাকুরপো, আমি একবার একটা ধর্মশাস্ত্রে পড়েছিলুম যে, এক ব্রাহ্মণের ছেলে কোন কারণে যমের সঙ্গে দেখা করতে যায়। যম তখন বাড়ি ছিলেন না,—বোধ করি বা শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিলেন—তিন দিন পরে ফিরে এসে, বাড়ির লোকের কাছে শুনতে পেলেন, ব্রাহ্মণ-বালক উপোস করে আছে। কিচ্ছুটি খায়নি। একে ব্রাহ্মণ, তায় অতিথি! যম ত বড় দুঃখিত হয়ে পড়লেন। শেষে অনেক বিনয় করে বললেন, তুমি বাপু তিন দিনের উপোসের বদলে তিনটি বর নাও। আচ্ছা—

কথাটা শেষ করিবার পূর্বেই দিবাকর হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, এ কোন উপন্যাস শুরু করে দিলেন বৌদি?

কিরণময়ী নিরীহভাবে কহিল, কি করব ঠাকুরপো, যা পড়েছিলুম তাই বলচি। আচ্ছা এমন কাণ্ড হতে পারে বলে কি তোমার বিশ্বাস হয়?

দিবাকর জোর দিয়া কহিল, নিশ্চয় না। অসম্ভব।

কেন অসম্ভব? ধর্মশাস্ত্রেই ত আছে।

থাক ধর্মশাস্ত্রে। এ প্রক্ষিপ্ত—উপন্যাস!

উপন্যাস কি করে টের পেলে ঠাকুরপো?

বৌদি, সকলেরই একটু-আধটু বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে। আমি বেশী কিছু জানিনে বটে, কিন্তু এ যে মিথ্যা ঘটনা, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। এমন হতেই পারে না।

কিরণময়ী কহিল, ঠাকুরপো, এমনি করে সবাই নিজের বিদ্যে-বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দিয়েই সত্য-মিথ্যা ওজন করে। এ ছাড়া আর মানদণ্ড নেই। কিন্তু এ জিনিস সকলের এক নয়—তুমি যাকে সত্য বলে বুঝতে পার, আমি যদি না পারি ত আমাকে দোষ দেওয়া চলে না।

দিবাকর তৎক্ষণাৎ কহিল, নিশ্চয় না।

কিরণময়ী কহিল, তবেই দেখ ঠাকুরপো, এতেই যখন অমিল হলে দোষ দেওয়া যায় না, তখন, যে জিনিস বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা দুয়েরই বাইরে, তার সম্বন্ধে মতের কত অনৈক্য হওয়াই সম্ভব। কিন্তু, এ বিষয়ে আমাদের গরমিল নেই। আমরা দুজনেই মনে করি, এ ঘটনা, আমাদের বুদ্ধির বাইরে, তাই, এটা উপন্যাস, না ঠাকুরপো?

কিরণময়ী যে তাহাকে কোথায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া দিবাকর সংক্ষেপে কহিল, হ্যাঁ।

কিরণময়ী পুনর্বার হাসিয়া উঠিয়া বলিল, বেশ বেশ। কিন্তু, আমার এই উপন্যাসটির শেষ-ভাগটা তোমার হাতের ঐ বইখানিতেই পাবে।

দিবাকর চকিত হইয়া কহিল, এই উপনিষদে?

কিরণময়ী তেমনি কৌতুকভরে কহিল, হ্যাঁ, ওতেই পাবে, বেশী খোঁজাখুজি করতে হবে না। কিন্তু যদি পাও, তখন তোমার প্রতি-বর্ণটি অভ্রান্ত সত্য বলে মনে হবে না ত?

দিবাকর জবাব দিল না। হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল।

কিরণময়ী উপেন্দ্রর নির্বাক মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তোমার কি মত ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র শুধু একটুখানি হাসিল, কিছুই বলিল না।

দিবাকর নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, কিন্তু এটা রূপক হতেও পারে।

কিরণময়ী কহিল, তা পারে। কিন্তু রূপক ত সত্য ঘটনা নয়। ঐ বইখানি যে আগা-গোড়াই মিথ্যা, তা না হতে পারে। কিন্তু আগাগোড়া যে সত্য নয়, সে কথা বুদ্ধির তারতম্য হিসেবে বেছে নিতে হবে না? তাই তোমার বুদ্ধিতে যদি বার-আনা সত্য বলে ঠেকে, আমার বুদ্ধিতে হয়ত পনের-আনা মিথ্যে বলে মনে হতে পারে। তাতেও ত আমার অন্যায় হবে না ঠাকুরপো!

দিবাকর হাতের বইখানির প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিল। কিরণময়ীর কথাগুলা তাহার বুকে বেদনার মত বাজিতে লাগিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বৌদি, যাকে আপনি মিথ্যা ঘটনা বলচেন, তার হয়ত কোন গূঢ় অভিসন্ধি থাকতে পারে। তাই—

তাই মিথ্যার অবতারণা? তুমি যা আন্দাজ করছ তা হতে পারে, আমি মেনে নিচ্চি। তবুও সেটা আন্দাজ ছাড়া আর কিছু নয়; আর অভিসন্ধি যাই থাক, পথটা সাধু পথ নয়। এই কথাটা সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে, মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে সত্য প্রচার হয় না। সত্যকে সত্যের মত করেই বলতে হয়। তবেই মানুষ যে যার বুদ্ধির পরিমাণে বুঝতে পারে। আজ না পারে ত কাল পারে। সে না পারে ত আর একজন পারে। না-ও যদি পারে, তবুও তাকে মিথ্যার ভূমিকা দিয়ে মুখরোচক করার চেষ্টার মত অন্যায় আর নেই। ঠাকুরপো, মিথ্যা পাপ, কিন্তু মিথ্যায়-সত্যে জড়িয়ে বলার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে।

দিবাকর বিমর্ষ মলিন-মুখে চুপ করিয়া রহিল। কিরণময়ী তাহার মুখ দেখিয়া মনের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। কোমলস্বরে কহিল, এতে দুঃখিত হবার ত কিছু নেই ঠাকুরপো। যা সত্য, তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যা হোক, আর শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাক। সত্যের চেয়ে এরা বড় নয়, সত্যের তুলনায় এদের কোন মূল্য নেই। জিদের বশে হোক, মমতায় হোক, সুদীর্ঘ দিনের সংস্কারে হোক,

চোখ বুজে অসত্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করায় কিছুমাত্র পৌরুষ নেই। একটুখানি চুপ করিয়া কহিল, তাই বলে এমন কথাও মনে ভেবো না যে, আমি অসত্য বলে বুঝেছি বলেই তা অসত্য হয়ে গেছে। আমার মোট কথাটা এই যে, সত্য-মিথ্যা যাই হোক, তাকে বুদ্ধিপূর্বক গ্রহণ করা উচিত। চোখ বুজে মেনে নেওয়ার কোন সার্থকতা নেই। তাতে তারও গৌরব বাড়ে না, তোমারও না।

দিবাকর অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা বৌদি, যে বস্তু বুদ্ধির বাইরে, তার সম্বন্ধে সত্য-মিথ্যা বুদ্ধিপূর্বক কি করে স্থির করবেন?

কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিল, করব না ত। যা বুদ্ধির বাইরে, তাকে বুদ্ধির বাইরে বলেই ত্যাগ করব। মুখে বলব অব্যক্ত, অবোধ্য, অজ্ঞেয়, আর কাজে কথায় তাকেই ক্রমাগত বলবার চেষ্টা, জানবার চেষ্টা কিছুতেই করব না। যিনি করবেন, তাঁকেও কোনমতে সহ্য করব না। তুমি এই-সব বই পড়নি ঠাকুরপো, পড়লে দেখতে পাবে, সর্বত্র এই চেষ্টা, আর এই জিদ। কেবল গায়ের জোর আর গায়ের জোর। যে মুখে বলচেন জানা যায় না, সেই মুখেই আবার এত কথা বলচেন, যেন এইমাত্র সমস্ত স্বচক্ষে দেখে এলেন। যাকে কোনমতে উপলব্ধি করা যায় না, তাকেই উপলব্ধি করবার জন্যে পাতার পর পাতা, বইয়ের পর বই লিখে যাচ্ছেন। কেন? যে লোক জীবনে রাঙা রঙ দেখেনি, তাকে কি মুখের কথায় বোঝান যায় রাঙা কি? আর তাই না বুঝলে, না মানলে রাগারাগি, শাপ-সম্পাৎ আর ভয় দেখানোর সীমা-পরিসীমা থাকে না। কেবল বড় বড় কথার মারপ্যাঁচ। নির্গুণ, নিরাকার, নির্লিপ্ত, নির্বিকার এ-সব কেবল কথার কথা। এর কোন মানে নেই। যদি কিছু থাকে ত সে এই যে, যাঁরা এ-সকল কথা আবিষ্কার করেচেন, তাঁরাই প্রকারান্তরে বলচেন, এ-সম্বন্ধে কেউ চিন্তামাত্র করবে না—সব নিষ্ফল, সমস্ত পণ্ডশ্রম।

দিবাকর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পরে ধীরে ধীরে কহিল, বৌদি, আপনি আত্মা মানেন না?

না।

কেন?

মিথ্যে কথা বলে। তা ছাড়া এমন দম্ভ আমার মনে নেই যে, সমস্তই নাশ হবে, শুধু আমার এই মহামূল্য আমিটির কোনদিন ধ্বংস হবে না। এমন কামনাও করিনি যে, আমার মৃত্যুর পরেও আমার আমিটি বেঁচে থাকুক।

আচ্ছা ঈশ্বর? তাঁকেও কি আপনি স্বীকার করেন না?

কিরণময়ী হাসিয়া কহিল, অত ভয়ে ভয়ে বলচ কেন ঠাকুরপো? এতে ভয়ের কথা কিছু নেই; না, আমি অস্বীকারও করিনে।

দিবাকর প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে যেন একটু আলোর রেখা দেখিতে পাইল। জিজ্ঞাসা করিল, তাঁকে আপনি কি করে চিন্তা করেন?

কিরণময়ী কহিল, যে বস্তুকে অজ্ঞেয় বলে নিশ্চয় বুঝেচি, তাকে চিন্তা করাও যায় না, করিও নে। বস্তুতঃ, অচিন্তনীয়কে চিন্তা করব কি দিয়ে? তাই অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা কোনদিন আমার নেই। একটা জিনিসকে বাড়িয়ে বড় করা যায়, আরও বাড়ালে আরো বড় করা যায় তাও জানি, কিন্তু, তাকে টেনে টেনে অনন্ত করে তোলা যায়, এ ভুল আমার কখনো হয় না।

তবে কি তাঁকে ভাবাই যায় না?

যায় ঠাকুরপো, ছোট করে নিয়ে ভাবা যায়। মানুষের দোষ-গুণ জড়িয়ে দিয়ে ছোটখাট ঠাকুর-দেবতা করে নিয়ে, নিরক্ষর লোকে যেমন করে ভক্তি দিয়ে ভাবে, তেমনি করেই শুধু যায়। নইলে, জ্ঞানের অভিমানে ব্রহ্ম করে নিয়ে যারা ভাবতে চায়, তারা শুধু নিজেকে ঠকায়। কিন্তু, আজ আর না। এ-সব কথা আর একদিন হবে। উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়া হাসিমুখে কহিল, কিন্তু, তুমি ঠাকুরপো, ভারী সেয়ানা। আমরা যখন ঝোঁকের উপর তর্কাতর্কি করে নিজেদের ফাঁকা করে ফেললুম, তুমি তখন মুখ বুজে নিজেকে একেবারে গোপন করে রাখলে। আমি জানি, তুমি সমস্ত জানো, কিন্তু নিজের মনের একটি কথাও কাউকে জানাতে দিলে না।

উপেন্দ্র হাসিয়া ফেলিল। কহিল, না বৌঠান, আমি এ সম্বন্ধে একেবারে মহামূর্খ। আমি স্তম্ভিত হয়ে শুধু আপনার কথাই শুনছিলুম।

কিরণময়ীও হাসিয়া বলিল, বিদ্রূপ করচ বুঝি ঠাকুরপো!

না বৌঠান, সত্যি কথাই বলচি। কিন্তু ভাবচি, আপনার এইটুকু বয়সের মধ্যে এত পড়লেন বা কবে, এত ভাবলেন বা কবে?

প্রশংসা শুনিয়া কিরণময়ীর অন্তঃকরণ পুলকে, গর্বে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহা দমন করিয়া বিনয়ের সহিত কহিল, না না, ও-কথা বলো না ঠাকুরপো, আমিও মহা-মূর্খ। কিছুই জানিনে। তবে শুধু এইটুকু জেনেছি বটে যে, কিছুই জানবার জো নাই। তাই, এই-সমস্ত শাস্ত্রের জবরদস্তি আর দাম্ভিক উক্তি দেখলেই আমার গা-জ্বালা করে ওঠে—কিছুতেই যেন আর নিজেকে সামলে রাখতে পারি না। কেবলই মনে হয়, তুমিও জান না, আমিও জানিনে। তবে বাপু, তোমার এত গায়ের জোর, এত বিধি-নিষেধের ঘটা, এত মিথ্যে নিয়ে ভরতি করা কেন? সমস্ত কাজেই যে ভগবান তাঁদের মধ্যস্থ রেখে কাজ করেছেন, এমনি দাম্ভিক অনুশাসনের বহর? খেতে, শুতে, বসতে ভগবানের দোহাই, আর ধর্মের দাঁত-খিচুনি! কেন বাপু? কেন এমন করে হাঁচব, আর তেমন করে কাসব? অথচ, এত তেজ যে, কোথাও এতটুকু কারণ পর্যন্ত কেউ দেখাবার দরকার মনে করেন নি। শুধু জবর-দস্তি। তোমার গো-হত্যার ব্রহ্ম-হত্যার পাতক হবে, তুমি উচ্ছন্ন যাবে, তোমার চৌদ্দপুরুষ নরকে যাবে? কেন যাবে? কে তোমাকে বলেচে? শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ, সমস্তই এই গায়ের জোর আর চোখ-রাঙ্গানি। বাস্তবিক, এত অন্যায় জোর সহ্য হয় না ঠাকুরপো।

উপেন্দ্র কথা কহিল না। কিন্তু দিবাকর তাহার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, কিন্তু সে জোর হয়ত আমাদের মঙ্গলের জন্যই তাঁরা করেচেন।

কিরণময়ী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, অত ভালয় কাজ নেই ঠাকুরপো! যেন তাঁরাই শুধু মানুষ হয়ে দেশসুদ্ধ গরুর পাল লাঠির গুঁতো দিয়ে ভাল পথে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন। নিজের ভাল কে চায় না? বুঝিয়ে বললেই ত হয়, বাপু, এইজন্যে তোমার ভাল—তাই, এই-সব বিধি-নিষেধ তৈরি করে দিলুম। আমাকেও ত বুঝতে দেওয়া চাই কেন এই পথে আমার মঙ্গল। তাতে ত এত চোখ-রাঙ্গানি, এত মিথ্যে উপন্যাস রচনা করবার আবশ্যক হত না। বলিতে বলিতে তাহার ভিতরের ক্রোধটা অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্রর অকস্মাৎ সেই প্রথম রাত্রির কথা মনে পড়িয়া গেল। এ সেই মূর্তি! পিঞ্জরাবদ্ধ বন্যপশুর সেই মর্মান্তিক গর্জন। কিন্তু, কি চায় এ? কিসের বিরুদ্ধে ইহার এত আক্রোশ? শাস্ত্র এবং শাস্ত্রকারের কোন্ অনুশাসনের শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া এই বিধবা মুক্তি প্রার্থনা করে?

তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে উপেন্দ্র সবিনয় হাস্যের সহিত কহিল, আমরা দুজনে ত জবাব দিতে পারলাম না বৌঠান; কিন্তু একজন আছে—যার কাছে আপনাকেও তর্কে হেরে আসতে হবে, তা বলে দিচ্চি।

কিরণময়ী নিজের উত্তেজনা নিজেই উপলব্ধি করিয়া অবশেষে মনে মনে লজ্জা পাইয়া-ছিল। সেও হাসিয়া কহিল, এমন কে বল ত ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনি তামাশা মনে করবেন না। সত্যই বলচি, সেখানে তাকে জিতে আসা ভারী কঠিন। তার পড়াশুনা যে বেশী আছে তা নয়, কিন্তু তর্কের বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম। সেও এ-সমস্ত বিশ্বাস করে—তাকে নিরুত্তর করে দিয়ে আসতে পারেন, তবে ত বুঝি।

কিরণময়ী উৎসাহিত হইয়া কহিল, তা না পারি, অন্ততঃ কিছু শিখেও আসতে পারব ত? হাসিয়া কহিল, কে তিনি ঠাকুরপো? আমাদের ছোটবৌ নয় ত?

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিল। কহিল, সে-ই। বাস্তবিক বৌঠান, তার বিচার করবার শক্তি অদ্ভুত। তর্কের বুদ্ধি দেখে সময়ে সময়ে আমি যথার্থই মুগ্ধ হয়ে যাই। আমি কি জবাব দেব, কি প্রশ্ন করব, তা যেন খুঁজেই পাই না। হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকি।

উপেন্দ্রর মুখে সুরবালার এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় কিরণময়ীর মুখের দীপ্তি নিবিয়া

গেল। অথচ, ইহাতে যোগ দেয়, তাহাও ইচ্ছা করিল. কিন্তু ঈর্ষার বেদনা সর্বাঙ্গ বেড়িয়া যেন কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল। সহসা সে কথা কহিতেই পারিল না।

কিন্তু. উপেন্দ্র ইহা লক্ষ্য করিল না। জিজ্ঞাসা করিল, তার সঙ্গে আপনার বোধ করি এ প্রসঙ্গে আলোচনা কোনদিন হয়নি?

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। মোটে দুটি দিন ত সে এখানে এসেছিল। সেও আবার এমন সময় নয় যে কোন কথাবার্তা হয়। চল না ঠাকুরপো. আজ একবার তোমার তর্কবীরকে দেখে আসি।

উপেন্দ্র হাসিতে লাগিল। কহিল, না বৌঠান, সে তার্কিক একেবারেই নয়। বস্তুতঃ, এই বিষয়টা ছাড়া সে তর্কই করে না—যা বলবেন. তাই মেনে নেবে। দিন-তিনেক পরে সে বাড়ি ফিরে যাবে—অনুমতি করেন ত এইখানেই নিয়ে আসি।

কিরণময়ী ত্রস্ত হইয়া কহিল. না ঠাকুরপো, না, এখানে এনে তাকে কষ্ট দিতে চাইনে। যে দুটি দিন ক্লেশ স্বীকার করে এসেছিল. সেই আমার বহু ভাগ্য। আমাকে নিয়ে চল, আমি যাব। আচ্ছা. একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঠাকুরপো, এত বড় তার্কিক গুরু থাকতেও তোমরা দুটি ভাই আমার জবাব দিতে পারলে না কেন?

কথাগুলি কিরণময়ী সরল পরিহাসের আকারেই বলিতে চাহিল. কিন্তু তাহার বেদনার ভারে শেষ কথাগুলি ভারী হইয়া প্রকাশ পাইল।

দিবাকর চুপ করিয়া রহিল। উপেন্দ্র কহিল, না বৌঠান. সে-সব যুক্তি তার শেখা যায় না। কতবার ত শুনেচি, কোনমতেই আয়ত্ত করতে পারলাম না। যারা ভগবান মানে, তারা বলবে এ তাঁরই ডান হাতের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। সত্যি বলচি বৌঠান. আমার অনেকবার ঈর্ষা হয়েচে যে. এর সহস্র ভাগের এক ভাগও যদি আমি পেতাম. তা হলে ধন্য হয়ে যেতাম!

কিরণময়ী ঠিক বুঝিতে পারিল না, কি এ! তথাপি তাহার সমস্ত মুখ কালো হইয়া গেল; এবং ইহা নিজেই সে স্পষ্ট অনুভব করিয়া কোনমতে একটুকরা শুষ্ক হাসি দিয়া পুরোবর্তী এই দুই পুরুষের দৃষ্টিপথ হইতে নিজেকে আবৃত করিয়া ফেলিতে চাহিল। কিন্তু কিছুতেই তাহার মুখে হাসি ফুটিল না।

সহসা সে একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, চল ঠাকুরপো. আজই আমি তার সঙ্গে দেখা করে আসব। তোমারও যার জন্যে হিংসা হয়, এ দুর্লভ বস্তু কি, তা না দেখে আমি কোনমতেই স্বস্তি পাব না।

তাহার এই আগ্রহাতিশয্যে উপেন্দ্র কোনমতেই আর হাসি চাপিতে পারিল না। কিরণময়ী ঈর্ষায় এত আচ্ছন্ন না হইয়া পড়িলে তাহার এতক্ষণের ছদ্ম গাম্ভীর্য চক্ষের পলকে ধরিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু. সেদিকে তাহার দৃষ্টিই ছিল না। কহিল. না ঠাকুরপো. তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চল।

উপেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া দুই হাত মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, ছি. ছি, অমন কথা মুখে আনবেন না বৌঠান। আপনি বয়সে ছোট হলেও আমার পূজনীয়া। বেশ ত. মাসীমা ফিরে আসুন. চলুন আজই আপনাকে নিয়ে যাই।

ছাব্বিশ

প্রায় অপরাহ্নবেলায় কিরণময়ী জ্যোতিষবাবুদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। পরনে মোটা থানের কাপড়, গায়ে অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নাই, সুদীর্ঘ রুক্ষ কেশরাশি বিপর্যস্তভাবে মাথায় জড়ানো, দুই-একটা চূর্ণকুন্তল কপালে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; চোখে তাহার শ্রান্ত উদাস দৃষ্টি। যেন বৈধব্যের অলৌকিক ঐশ্বর্য তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া মূর্তিমতী হইয়াছে। সে মুখের পানে চাহিলেই চক্ষু আপনিই যেন তাহার পদপ্রান্তে নামিয়া আসে। সরোজিনী বাহিরের বারান্দায় একটা চৌকিতে বসিয়া বই পড়িতেছিল, চোখ তুলিয়া অকস্মাৎ এই আশ্চর্য রূপ দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া গেল। সে কিরণময়ীকে কখনো চোখে দেখে নাই. তাহার নাম এবং সৌন্দর্যের খ্যাতি সুরবালার মুখে শুনিয়াছিল মাত্র। কিন্তু. সে সৌন্দর্য যে এই প্রকার. তাহা কল্পনাও করে নাই।

উপেন্দ্র তাহার পরিচয় দিল, আমাদের বৌঠাকরুন—সরোজিনী!

সরোজিনী কাছে আসিয়া নমস্কার করিল।

কিরণময়ী তাহার হাত ধরিয়া সহাস্যে কহিল, তোমার নাম আমি সকলের কাছে শুনেছি ভাই, তাই আজ একবার চোখে দেখতে এলুম।

প্রত্যুত্তরে সরোজিনী কি বলিবে, তাহা তখনও খুঁজিয়া পাইল না। অপরিচিত নরনারীর সহিত মিশিতে, আলাপ করিতে সে শিশুকাল হইতেই শিক্ষিত এবং অভ্যস্ত, কিন্তু এই আশ্চর্য বিধবা নারীর সম্মুখে সে নির্বাক হইয়া রহিল।

উপেন্দ্রর দিকে একবার ফিরিয়া চাহিয়া কিরণময়ী কহিল, কিন্তু আজ ত আর বেলা নেই। বেশীক্ষণ থাকবার সময় হবে না—চল ঠাকুরপো, একেবারে ছোটবৌয়ের ঘরে গিয়ে বসি গে; বলিয়া সে সরোজিনীর করতলে একটু চাপ দিয়া ইঙ্গিত করিল।

কিন্তু, যে ঝোঁকের বশে কিরণময়ী আজ এই অসময়ে সুরবালার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, সেই উত্তেজনার হেতুটা আর তাহার অগোচর ছিল না। পথে আসিতে আসিতে তাহার অনেকবার মনে হইয়াছিল, তাহার সহিত মাত্র দুটি দিনের পরিচয়, সেই সুরবালার বিশ্বাস এবং বিদ্যাবুদ্ধি যাহাই হউক, অকারণে তাহার ঘর চড়িয়া আক্রমণ করিতে যাওয়ার মত অদ্ভুত হাস্যকর ব্যাপার আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং ফিরিয়া যাওয়াই কর্তব্য, ইহাতেও তাহার সন্দেহ ছিল না। অথচ কিছুতেই ফিরিতে পারে নাই। কিসে যেন তাহাকে ক্রমাগত টানিয়া আনিয়া হাজির করিয়া দিল। অন্যায়! অসঙ্গত! এ কথাও সে মনে মনে বার বার বলিল; কিন্তু, প্রেয়সী ভার্যার যে অমূল্য ঐশ্বর্যকে উপেন্দ্র ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই, সে যে কিছুই নয়, তাহাকে সে যে চক্ষের নিমিষে পরাস্ত খণ্ডবিখণ্ড করিয়া তাহারই চক্ষের উপর ধূলার মত উড়াইয়া দিতে পারে, ইহাই সপ্রমাণ করিবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের ভিতর প্রতিহিংসার মত গড়াইয়া বেড়াইতেছিল। কোনমতেই সে ইহাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। অথচ, গোড়া হইতেই তাহার এই খটকা বাজিয়াছিল যে, সতীশের কাছে উপেন্দ্রর যে পরিচয় সে পাইয়াছিল, তাহাতে তাহার মন বার বার বলিতেছিল, ইচ্ছা করিলে উপেন্দ্র জবাব দিতে পারিত। কিন্তু, কথাটি কহে নাই, শুধু মৃদু মৃদু হাসিয়াছে। কেন? কিসের জন্য? সে কি শুধু সুরবালার কাছে লইয়া গিয়া তাহাকে একেবারে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎ করিয়া দিবার জন্য? কিন্তু সুরবালা যদি কোন উত্তর না দেয়? স্বামীর মত অমনি মুখ টিপিয়া হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে? কি করিয়া সে তাহার বিজয়-পতাকা প্রতিষ্ঠিত করিবে?

এমনি ভাবিতে ভাবিতে যখন সে সরোজিনীর পিছনে পিছনে সুরবালার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন মেঝের উপর বসিয়া কাশীদাসী মহাভারত হইতে ভীষ্মের শরশয্যা পড়িয়া সুরবালা কাঁদিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অকস্মাৎ কিরণময়ীকে দেখিয়া শশব্যস্তে বই মুড়িয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল, এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া পরম সমাদরে কহিল, দিদি এস।

সেইখানে কার্পেটের উপর বসাইয়া বলিল, আমি কাল তোমার ওখানে যাব মনে করেছিলুম দিদি।

কিরণময়ী কহিল, আমিও তাই আজ এলুম ভাই।

উপেন্দ্র অদূরে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিয়াই কহিল, কান্না হচ্ছিল—ওটা মহাভারত বুঝি?

সুরবালা মহা লজ্জায় আঁচল দিয়া নিজের চোখ দুটি ক্রমাগত মুছিতে লাগিল।

উপেন্দ্র কহিল, কেন যে তুমি ঐ মিথ্যে রাবিশ বইখানা নিয়ে প্রায়ই সময় নষ্ট কর, আমি ত ভেবে পাইনে। তার উপর কান্নাকাটি, চোখের জলের—কথাটা শেষ হইল না। সুরবালা চোখ মোছা ভুলিয়া রাগিয়া উঠিয়া বলিল, এক শ'বার কি তুমি বল যে—

উপেন্দ্র কহিল, বলি যে ওর আগাগোড়া মিথ্যে। আর কিছু না।

এ-সকল বিষয়ে তাহাকে রাগাইতে বেশী বিলম্ব হইত না। সে তাহার রুষ্ট আরক্ত চোখ দুটি স্বামীর মুখের প্রতি স্থির করিয়া কহিল, মহাভারত মিথ্যে? অমন কথাটি তুমি কখনো মুখে এনো না। এ তামাশা নয়—এতে অপরাধ হয় তা জান?

উপেন্দ্র বলিল, জানি, কিছু হয় না। আচ্ছা, ওঁদের জিজ্ঞেস কর—ওঁরাও বিশ্বাস করেন না।

এবার সুরবালা কিরণময়ীর মুখের পানে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল, শোন কথা দিদি! তোমরা মহাভারত বিশ্বাস কর না। ওঁর ঐ রকম কথা। যা হোক একটা বলে দিলেই হলো।

কিরণময়ী চুপ করিয়া রহিল। স্বামী-স্ত্রীর এই অদ্ভুত বাক্‌বিতণ্ডার সে অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মনে হইল, ইহা একটা অভিনয় এবং তাহাকেই উপলক্ষ করিয়া ইহার অন্তরালে কি একটা রহস্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

উপেন্দ্র সরোজিনীকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আপনি মহাভারতের গল্পগুলো সত্য মনে করেন?

সরোজিনী সরলভাবে বলিল, কিছু সত্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আগাগোড়াই সত্য কেউ মনে করে না, আমিও করিনে।

সুরবালা প্রথমে অবাক হইল, তাহার পর তামাশা মনে করিয়া উড়াইয়া দিতে গেল, কিন্তু সরোজিনীর আরও দুই-চারিটা কথায় এবং উপেন্দ্রর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের খোঁচায় অধিকতর বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; এবং দেখিতে দেখিতে তিনজনের তর্ক উদ্দাম হইয়া উঠিল। কিন্তু, তখন পর্যন্ত কিরণময়ী একটি কথাও কহে নাই। কারণ, এই-সকল বাদানুবাদ পরিহাস ভিন্ন যে আর কিছু হইতে পারে তাহা মনে করিতেই পারিল না। যাহার সহিত সে দর্শন লইয়া তর্কযুদ্ধ করিতে আসিয়াছে, সে যখন সমস্ত মহাভারতটাই অখণ্ড সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে কোমর বাঁধিয়া বসিয়াছে—এমন অচিন্তনীয় ব্যাপার সত্য বলিয়া সে কেমন করিয়া মনের মধ্যে গ্রহণ করিবে! এদিকে তর্ক এবং কথা কাটাকাটি অবিরাম চলিতে লাগিল। কিন্তু কিরণময়ী শুধু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুরবালার পানে নীরবে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে তাহার সন্দেহের ঘোর বাষ্পের মত মিলাইয়া গেল। দেখিল সুরবালার কণ্ঠস্বর, চোখের চাহনি, সমস্ত মুখখানি, এমন কি সর্বাঙ্গ হইতে সংশয়-লেশহীন দৃঢ় প্রত্যয় যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। এই বিপুল বিরাট গ্রন্থখানি তাহার কাছে প্রত্যক্ষ-সত্য। এ ত কৌতুক নয়, এ যেন জীবন্ত বিশ্বাস! তাহার পর কিছুক্ষণের জন্য কে কি বলিতে লাগিল, সেদিকে তাহার চেতনা রহিল না। কেমন যেন আচ্ছন্নের মত এই সুরবালার মধ্যে একটা অপরিচিত ভাবের আকৃতি দেখিতে লাগিল। তাহা অদৃষ্টপূর্ব!

কিন্তু, এরূপ কতক্ষণ থাকিত বলা যায় না, সহসা সে উপেন্দ্র ও সরোজিনীর সমবেত উচ্চ হাসির শব্দে আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসিল। দেখিতে পাইল, হাসির ছটায় সুরবালা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে বেচারা একা। তাই, সে কিরণময়ীকে হঠাৎ মধ্যস্থ মানিয়া ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, আচ্ছা দিদি, এ কি মিথ্যে কখনও হতে পারে?

উপেন্দ্র কিরণময়ীর প্রতি চাহিয়া হাসি দমন করিয়া কহিল, বৌঠান, তর্কটা এই, সরোজিনী বলচেন, ভীষ্মের শরশয্যার সময় অর্জুন যে বাণ দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ করে গঙ্গা এনেছিলেন, সে মিথ্যা কথা। কখনো আনেন নি।

সুরবালা স্বামীর মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, যদি আনেন নি, তবে শোন বলি। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়ে জল খেতে চাইলেন। দুর্যোধন সুবর্ণ ভৃঙ্গারে জল আনলে, তিনি খেলেন না! এ ত আর মিথ্যে নয়। গঙ্গা যদি না এলেন, তবে তাঁর পিপাসা মিটল কিসে?

সরোজিনী অসহিষ্ণু হইয়া কহিল, কিসে! যদি বলি পিপাসা মিটল তাঁর সেই ভৃঙ্গারের জলে। তিনি দুর্যোধনের সেই ভৃঙ্গারের জলই খেয়েছিলেন।

এবার সুরবালা ভয়ানক উত্তেজিত ও রুষ্ট হইয়া কহিল, তবে লেখা আছে কেন খাননি? আর তাই যদি তিনি ভৃঙ্গারের জলই খাবেন, তা হলে অর্জুনের অত কষ্ট করে বাণ দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ করে গঙ্গা আনবার কি দরকার হয়েছিল! তা বল? দিদি, তুমিই বল, এ ত আর কিছুতেই মিথ্যে হতে পারে না? বলিয়া সে ক্রুদ্ধ অথচ করুণ দুই চক্ষুর দ্বারা কিরণময়ীকে আবেদন জানাইল। মুহূর্তমধ্যে উপেন্দ্রর উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া গেল। সরোজিনীও খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উপেন্দ্র কহিল, নিন বৌঠান, জবাব দিন। গঙ্গা যদি না এলেন, তবে পিপাসা মিটল কিসে? আর পিপাসা যখন মিটল, তখন গঙ্গা আসবেন না কেন? বলিয়া আর একবার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

কিন্তু আশ্চর্য! কিরণময়ী এই হাসিতে যোগ দিতে পারিল না। সে বিস্ময়স্তব্ধ-নেত্রে ক্ষণকাল সুরবালার মুখপানে চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল। তারপর অকস্মাৎ বিপুল আবেগে তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি কহিল, মিথ্যে নয় বোন, কোথাও এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই। গঙ্গা এসেছিলেন বৈ কি! তুমি যা বুঝেছ, যা পড়েচ, সব সত্যি। সত্যি ত সবাই চিনতে পারে না দিদি, তাই ঠাট্টা-তামাশা করে। বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল।

সরোজিনী এবং উপেন্দ্র উভয়েই বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না। তাহাকে তেমনি বুকে চাপিয়া রাখিয়া চোখ মুছিয়া ধীরে ধীরে কহিল, বোন, যারা অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়েছে, তারা জানে, আজ তুমি যেমন করে বিচার করে দিলে, এর চেয়ে বেশী বিচার কোন ধর্মগ্রন্থে, কোন পণ্ডিত কোনদিন করতে পারেন নি—তাঁদের সবাইকে এমনি করেই নিজেদের মনের কথা বলতে হয়েছে। এ কথা যে জানে, তার সাধ্য নেই আজ তোমার মুখের কথা কয়টি শুনে হাসে। বলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সরোজিনীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, তুমি বোধ করি, ভাই, আমার কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছ। হবারই কথা। বলিয়া একটুখানি হাসিল।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা অধিক হতবুদ্ধি হইয়াছিল উপেন্দ্র নিজে। বস্তুতঃ, কিরণময়ীর এই অদ্ভুত ভাব-পরিবর্তনের হেতু সে একেবারেই বুঝিতে পারে নাই। যে, মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছে, বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার তুলাদণ্ডই সে গ্রাহ্য করে না, এবং যে-বস্তু ইহার বাহিরে, তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইবারও কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করে না, সে সুরবালার এই একান্ত সরল ও ছেলেমানুষিতে বিচলিত হইল কি প্রকারে! তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া যে কথাগুলি এইমাত্র কহিল, সে ত মন-রাখা কথা নয়! তা ছাড়া সে নিশ্চয় জানিত, যাহা বলিয়াছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা সুরবালার সাধ্য নয়। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর তাহার আকস্মিক উদ্গত অশ্রু। সে আসিল কি প্রকারে! এতদ্ব্যতীত আর একটা কথা। উপেন্দ্র নিঃসংশয়ে জানিত, এই প্রকার তীক্ষ্ণবুদ্ধি নর-নারী আবেগ প্রকাশ করিতে কিছুতে চাহে না। কোনমতে প্রকাশ পাইলেও তাহাদের লজ্জার পরিসীমা থাকে না। কিন্তু, লেশমাত্র লজ্জাও সে যে নিজের ব্যবহারে অনুভব করিয়াছে, সে লক্ষণ ত সম্পূর্ণ অপরিচিতা সরোজিনীর কাছেও ধরা পড়িল না।

সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিরণময়ী সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে গাড়িতে আসিয়া উপবেশন করিল।

দিবাকর বাড়ি ছিল না; সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। সুতরাং ইতস্ততঃ করিয়াও উপেন্দ্রকে একাই ভিতরে গিয়া বসিতে হইল। কিন্তু কিরণময়ী আর তাহাকে যেন লক্ষ্যই করিল না। গাড়ির একটা কোণে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। অমন চুপচাপ বসিয়া থাকাও অপ্রীতিকর। তা ছাড়া উপেন্দ্র নিশ্চয় বুঝিতেছিল কিরণময়ী কিছু ভাবিতেছে। কিন্তু কি ভাবিতেছে, তাহাই যাচাই করিবার জন্য কহিল, দেখে এলেন ত! এই বুদ্ধিমতীটিকে নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়। কিন্তু, এমনিই ত তাঁকে আঁটবার জো নেই, তাতে আপনি আজ তামাশা করে যে সার্টি-ফিকেট দিয়ে এলেন, এবার আর তার নাগাল পাওয়াই যাবে না।

কিরণময়ী ইহার কোন উত্তর করিল না। একটুখানি অপেক্ষা করিয়া উপেন্দ্র হাসিয়া কহিল, কিন্তু এইখানেই এর শেষ নয় বৌঠান। ও এত বড় বোকা যে জন্মাবধি কখনো মিথ্যা কথা বলতে পারে না।

কিরণময়ী তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

উপেন্দ্র বলিল, কেন জানেন? একে ত তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা তাকে চতুর্দিকে ঘিরে

দিবা-রাত্রি পাহারা দিয়ে আছে,—তা ছাড়া, যা ঘটেনি, সেইটুকু সে নিজের বুদ্ধি খরচ করে বানিয়ে বলবে সে ক্ষমতাই ওর নেই।

কিরণময়ী রুদ্ধকণ্ঠে সংক্ষেপে কহিল, ভালই ত।

উপেন্দ্র কহিল, অতটাই যে ভাল, তা আমার মনে হয় না বৌঠান। সংসার করতে গেলে একটু-আধটু মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়। যাতে কারো কোন ক্ষতি নেই, অথচ একটা অশান্তি, একটা উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তাতে দোষ কি? আমি ত বলি বরং ভালই।

বেশ ত, শেখাতে পার না?

শিখবে কি করে বৌঠান? একটি অতি ছোট মিথ্যের জন্য যুধিষ্ঠিরের দুর্গতি হয়েছিল সে যে মহাভারতে লেখা আছে। দেব-দেবতারা যেরকম হাঁ করে তার পানে চেয়ে বসে আছে, তাতে জেনে-শুনে মিথ্যে কথা বললে আর কি তার রক্ষা আছে! তারা হিড়্হিড় করে টেনে ওকে নরকে ডুবিয়ে দেবে। একটু থামিয়া কহিল, বৌঠান, ঠাকুর-দেবতার চেহারা ও চোখ বুজে এমনি স্পষ্ট দেখতে পায় যে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। কেউ ঢাল খাঁড়া নিয়ে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম নিয়ে, কেউ বাঁশী হাতে করে এমনি প্রত্যক্ষ হয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ান যে, শুনে আমার গা পর্যন্ত শিউরে ওঠে। আর কারো মুখ থেকে ও-রকম শুনলে আমি মিথ্যা বানানো গল্প বলে হেসেই উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু ওর সম্বন্ধে এ অপবাদ ত মুখে আনবারই জো নেই। বলিয়া, শ্রদ্ধায় প্রেমে গর্বে বিগলিত-চিত্তে সস্নেহ কৌতুকের স্বরে কহিল, তাই দেখে-শুনে ওকে মানুষ না বলে একটি জানোয়ার বললেও চলে। বলিহারি তাঁর বুদ্ধি—যিনি ছেলেবেলায় ওর পশুরাজ নাম রেখেছিলেন—ও কি বৌঠান?

গাড়ি মোড় ফিরিতেই পথের উজ্জ্বল গ্যাসের আলোক সহসা কিরণময়ীর মুখের উপর আসিয়া পড়ায় উপেন্দ্র অত্যন্ত চমকিয়া দেখিল তাহার সমস্ত মুখখানি চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

উপেন্দ্র লজ্জায় স্তব্ধ অধোবদনে বসিয়া রহিল। না জানিয়া যেখানে সে আনন্দ মাধুর্যে মগ্ন হইয়া স্নেহে সম্ভ্রমে পরিহাসের পর পরিহাস করিয়া চলিতেছিল, আর একজন সেইখানে ঠিক তাহারই মুখের সম্মুখে বসিয়া কি জানি কিসের বেদনায় নিঃশব্দ রোদনে বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছিল।

পাথুরেঘাটার বাটীতে উভয়ে যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি একপ্রহর হইয়াছে। প্রায় সমস্ত পথটাই কিরণময়ী মৌন হইয়া ছিল, কিন্তু ভিতরে পা দিয়াই হঠাৎ অত্যন্ত অনুতপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আ, আমার পোড়া কপাল! কেবল ঘুরিয়ে নিয়েই ত বেড়াচ্চি। কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত একফোঁটা জলটুকু যে খেতে পেলে না ঠাকুরপো, তা আর এ হতভাগীর চোখে পড়ল না। হাত-মুখ ধোবে? তবে থাক গে। আমার সঙ্গে রান্নাঘরে এস, দুখানা লুচি ভেজে দিতে দশ মিনিটের বেশী লাগবে না। তুই কাঠের উনুনটা জেবলে দিয়ে তবে বাড়ি যাস্ ঝি! যা মা, চট করে যা। লক্ষ্মী মা আমার।

ঝি কবাট খুলিয়া দিতে আসিয়াছিল, এবং অমনি ঘরে যাইবে ভাবিয়াছিল। কিন্তু আদেশ পালন করিতে আবার তাহাকে উপরে যাইতে হইল। সদর দরজা বন্ধ করিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কিন্তু এই লুচি ভাজার প্রস্তাবে উপেন্দ্র একেবারে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কহিল, সে কিছুতেই হতে পারবে না। বৌঠান! আজ আপনি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আমি ফিরে গিয়েই খাব—আমার জন্যে কোনমতেই কষ্ট করতে পারবেন না।

পারব না কেন?

উপেন্দ্র কহিল, না না, সে কিছুতেই হবে না—কোনমতেই না।

কিরণময়ী মুচকিয়া হাসিল, হাসিমুখে বলিল, তুমি ঠাকুরপো বড্ড যশের কাঙাল। এত যশ নিয়ে রাখবে কোথায় বল ত?

সহসা এরূপ মন্তব্যের হেতু বুঝিতে না পারিয়া উপেন্দ্র কিছু বিস্মিত হইল।

কিরণময়ী কহিল, তা বৈ কি ঠাকুরপো! তোমার পরোপকারের যশ এমন নিঃস্বার্থ,

এমন নির্লিপ্ত হওয়া চাই, যেন স্বর্গে মর্ত্যে কোথাও তার জোড়া না থাকে। আমাদের জন্যে তুমি যা করেছ ঠাকুরপো, তাতে আমি বুক চিরে পা ধুইয়ে দিতে গেলেও ত তোমার আপত্তি করা সাজে না। আর এই দুটো খাবার তৈরি করে দেওয়ার কথাতেই ঘাড় নাড়চ? ছি, ছি, কি আমাদের তুমি ভাবো বল ত? মানুষ নই আমরা? না, মানুষের রক্ত আমাদের দেহে বয় না!

উপেন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, এ-সব কোন কথা ভেবেই আমি আপত্তি করতে যাইনি বৌঠান। আমি শুধু—

শুধু কি ঠাকুরপো? তবে বুঝি ঘরে ফেরবার তাড়ায় কি বলছি না বলছি হুঁশ ছিল না?

উপেন্দ্র বাঁচিয়া গেল। পরিহাস আবার সহজপথে ফিরিয়া আসায় সে খুশী হইয়া সহাস্যে কহিল, ও বদনামটা আমার আছে বটে বৌঠান, সে আমি অস্বীকার করতে পারিনে। কিন্তু এখন সেজন্য নয়। যথার্থই আমি ভেবেছিলুম, আজ আপনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।

ক্লান্ত হয়ে পড়েচি? হলুমই বা! বলিয়া কিরণময়ী পুনরায় একটু হাসিল। তার পরে সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, হায় রে! আজ যদি আমার সতীশ-ঠাকুরপো থাকতেন! তা হলে নিজের কথা আর নিজের মুখে বলতে হতো না। তিনি সহস্রবদন হয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিতেন। না ঠাকুরপো, আমার নিজের ত ও-সব শ্রান্তি-ক্লান্তির শখ করবার অবস্থাই নয়, তা ছাড়া, বাঙালীর ঘরের কোন মেয়ের পক্ষেই ও বদনামটা বোধ করি খাটে না। আত্মীয়ই হোক আর অনাত্মীয়ই হোক, পুরুষমানুষের খাওয়া হয়নি শুনলে বাঙালীর মেয়ে মরতে বসলেও একবার উঠে দাঁড়ায়। তা জানো?

উপেন্দ্র এবার হাসিয়া কহিল, জানি বৈ কি বৌঠান, বেশ জানি। স্বীকার করছি অপরাধ হয়েচে—আর না। ক্ষিদেও পেয়েছে, চলুন কি খেতে দেবেন।

এসো, বলিয়া কিরণময়ী পথ দেখাইয়া রান্নাঘরের অভিমুখে চলিল। শাশুড়ীর ঘরের সুমুখে আসিয়া দোর ঠেলিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, তিনি অকাতরে ঘুমাইতেছেন।

রান্নাঘরে আসিয়া সতীশকে যেমন পিঁড়ি পাতিয়া বসাইত, তেমনি করিয়া উপেন্দ্রকে বসাইল।

ঝি উনুন জ্বালিয়া দিয়া অন্যান্য আয়োজন করিতে বাহির হইয়া গেলে কিরণময়ী তাহার এই নূতন অতিথিটির প্রতি চাহিয়া কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, আমার কষ্ট হবে বলে না খেয়ে চলে যাবার এই যে প্রস্তাবটি করেছিলে, সেটি যদি আর কোথাও আর কারো সামনে করে বসতে, আজ তা হলে তোমাকে কি শাস্তি ভোগ করতে হতো জানো?

উপেন্দ্র বলিল, জানি। কিন্তু এখানে ত আর সে শাস্তিভোগের ভয় ছিল না বৌঠান!

ঝি ময়দার থালাটা রাখিয়া চলিয়া গেল। কিরণময়ী সুমুখে টানিয়া লইয়া নতমুখে মৃদুস্বরে কহিল, বলা যায় না ঠাকুরপো, কপালে শাস্তি লেখা থাকলে কিসে যে কি ঘটে, কোথায় এসে কোন ভোগ ভুগতে হয়, আগে থাকতে তার কোন হিসেবই পাওয়া যায় না। অদৃষ্টের লেখা কি এড়ান যায়? যায় না ঠাকুরপো, তারা আপনি এসে ঘাড়ে পড়ে।

উপেন্দ্র রহস্যটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। শুধু কহিল, তা বটে। কিরণময়ীও তখনিই আর কোন কথা কহিল না। একবার শুধু উপেন্দ্রর মুখপানে চাহিয়াই চোখ নত করিয়া ময়দা মাখিতে লাগিল। বোধ হইল, সে যেন চুপি চুপি হাসিতেছে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাজ করিতে করিতে হঠাৎ এক সময়ে চোখ না তুলিয়াই কহিল, আচ্ছা, আজ এত ঘটা করে বৌ দেখাতে নিয়ে যাবার অভিপ্রায়টা কি ছিল এখন বল দেখি?

উপেন্দ্র একটু আশ্চর্য হইয়া কহিল, ঘটা-পটা ত কিছুই করিনি বৌঠান।

কিরণময়ী বলিল, তবে বুঝি আমার বলতে ভুল হয়েচে। বলি, এত রকমের ছল-চাতুরী করে যাওয়া হলো কেন?

উপেন্দ্র কহিল, ছল-চাতুরীই বা কি করলুম?

কিরণময়ী কহিল, এই যেমন বোকা-টোকা নানারকম কথার বাঁধুনি করে। কিন্তু মিছে কতকগুলো কথা-কাটাকাটি করে আর কি হবে ঠাকুরপো? সে বৌটিকে বোকা বলেই

যদি জানতে পেরে থাক, এ বৌঠানটিরও ত কতক পরিচয় পেয়েচ? অত সহজে ভোলাতে পারবে বলেই কি মনে কর?

না, তা করি না।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া চাহিল। কারণ, যেমন লঘু করিয়া উপেন্দ্র জবাব দিতে চাহিয়াছিল, তেমনি করিয়া পারে নাই। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহার কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইয়াই বাহির হইয়াছিল, কিন্তু কিরণময়ী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল কি না, জানিতে দিল না। তেমনি সহজ পরিহাসের স্বরে কহিল, তবে?

উপেন্দ্র নিজের কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য অনুভব করিয়া মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল, এই অবকাশে সেও নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। হাসিয়া বলিল, বৌঠান, আপনাকে ফাঁকি দেওয়া কি সহজ কাজ? কিন্তু ছল-চাতুরী না করলে ত আপনি যেতেন না। আমি যে কতবড় নির্বোধকে নিয়ে ঘর করি সে ত দেখতে পেতেন না।

কিরণময়ী কহিল, সে দেখে আমার লাভ?

উপেন্দ্র বলিল, লাভ আপনার নয়, লাভ আমার। সবাই নিজের দুঃখ জানিয়ে দুঃখটা কম করে ফেলতে চায়। মানুষের স্বভাবই এই। তাই ছল-চাতুরী করে যদি কিছু ক্লেশ দিয়েই থাকি ত সে আপনার দয়া পাবার জন্যেই। আর কোন কারণে নয়।

কিরণময়ী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তার পরে কথা কহিল, কিন্তু মুখ তুলিয়া চাহিল না, কহিল, আর যে পারিনে ঠাকুরপো, এই ব্যাজস্তুতির পালাটা এইবার বন্ধ কর না। তোমার নির্বোধটিকে নির্বোধ বলে যদি কিছু কম ভালবাসতে, তা হলেও না হয় আর কিছুক্ষণ শোনা যেতে পারত। একটু দয়াও হয়ত পেতে। কিন্তু সতীশ-ঠাকুরপোর কাছে যে আমি সব শুনেচি। বেশ ত, ভাল না হয় তাকেই খুবই বাসো, কিন্তু তাই বলে কি এমন করে ঢাক পিটে বেড়াতে হয়? একটু বাধ-বাধও কি করে না?

কথা শুনিয়া উপেন্দ্র যে কি বলিবে, কি ভাবিবে, ঠাহর করিতেই পারিল না। এ কি বলিবার ভঙ্গী! এ কি কণ্ঠস্বর! পরিহাস ত ইহা কিছুতেই নয়, কিন্তু কি এ? বিদ্রূপ? ঈর্ষা? বিদ্বেষ? এ কিসের আভাস, এই বিধবা রমণী এই রাত্রে, এই নির্জন ঘরের মধ্যে আজ তাহার সাক্ষাতে ব্যক্ত করিবার প্রয়াস করিয়া বসিল!

আর কাহারও মুখে কথা নাই। কিছুক্ষণ পর্যন্ত উভয়েই নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

ঝি দরজার বাহির হইতে একবার কাসিল। তার পরে একটুখানি মুখ বাড়াইয়া কহিল, আর ত আমি থাকতে পারিনে বৌমা। সদরটা একটু বন্ধ না করে দিলেও ত যেতে পারচি নে।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া কহিল, যাবি? তবে একটুখানি বসো ঠাকুরপো, আমি সদরটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। বলিয়া সে চলিয়া যাইবামাত্রই এই ঘরের মধ্যে একাকী বসিয়া উপেন্দ্রর অন্তঃকরণ এমন এক অভাবনীয় বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল যাহা জীবনে কখনো সে অনুভব করে নাই। তাহার উন্মুক্ত চরিত্র চিরদিন স্ফটিকস্বচ্ছ প্রবাহের মত বহিয়া গিয়াছে। কোথাও কখনও বাধা পায় নাই। কোথাও কোনদিন বিন্দুমাত্র কলঙ্কের বাষ্প আসিয়াও তাহাতে ছায়া ফেলিয়া যায় নাই। কিন্তু আজ এই নির্জন কক্ষের মধ্যে সেই একান্ত নির্মলতা যেন মলিন হইয়া উঠিল।

সাতাশ

দাসীকে বিদায় দিয়া কিরণময়ী স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া যখন বসিল, উপেন্দ্র মাথা তুলিয়া একবার চাহিতে পর্যন্ত পারিল না। কিরণময়ীর তাহা দৃষ্টি এড়াইল না, কিন্তু, সেও কোন কথা না কহিয়া নীরবে কাজ করিয়া যাইতে লাগিল।

মিনিট-দশেক এইভাবে যখন গেল, তখন কিরণময়ী ধীরে ধীরে কহিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, আড়াল থেকে কেউ যদি আমাদের এই রকম চুপচাপ বসে থাকতে দেখে কি মনে করে বল দেখি? বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল।

এ হাসি উপেন্দ্র চোখে না দেখিলেও অন্তরে অনুভব করিল। কহিল, হয়ত ভাল মনে করে না।

তবে?

কি করব বৌঠান, কোন কথাই যেন খুঁজে পাচ্ছিনে।

কিরণময়ী সহাস্যে কহিল, পাচ্চ না? আচ্ছা, আমি খুঁজে বার করে দিচ্চি। কিন্তু মাঝখানে একটা খবর দিয়ে রাখি যে, আমার খাবার তৈরি থেকে তোমাকে খাইয়ে বিদায় করা পর্যন্ত আধ-ঘণ্টার বেশী লাগবে না। এই সময়টুকুর জন্যে তুমি একটুখানি প্রসন্ন-মুখে কথা কও, অমন মনভারী করে বসে থেকো না।

উপেন্দ্র জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, বেশ বলুন।

কিরণময়ী আবার মুখ টিপিয়া হাসিল। কহিল, তবু ভাল, বৌঠানের মান রেখে একটু হেসেচ। তোমাকে দেখে পর্যন্ত একটা কথা আমার প্রায় মনে হয় ঠাকুরপো। কিন্তু শুনে আবার উলটো বুঝে রাগ করে বসবে না ত?

না, রাগ কিসের?

কি জানো ঠাকুরপো, ভাল ভাল কাব্যে পড়া যায় ত, তা আমাদের দেশেরই বল, আর বিদেশেরই বল, প্রথম চোখের দেখাতেই একটা প্রগাঢ় ভালবাসা—আচ্ছা, এ কি সম্ভব বলে মনে কর?

উপেন্দ্রর মুখ চক্ষের পলকে লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কহিল, ভাল-মন্দ কোন কাব্য সম্বন্ধেই আমার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই বৌঠাকরুন, এ-সব আমি জানিনে।

কিরণময়ী বলিল, সে কি কথা ঠাকুরপো? এত লেখাপড়া শিখেচ, এতগুলো পাস করে কত টাকার জলপানি আদায় করেচ, আর কাব্য সম্বন্ধে কিছুই জান না? শকুন্তলা রোমিও-জুলিয়েট এ দুটোও কি তোমাকে পড়তে হয়নি?

উপেন্দ্র কহিল, কিন্তু পড়ে পাস করতে ত সম্ভব-অসম্ভব স্থির করতে হয়নি। বইয়ে যা লেখা আছে মুখস্থ করে লিখে দিয়ে এসেছিলুম। আপনার মত কোন পরীক্ষক কখনো প্রশ্ন করেন নি—তা হয় কি না। আমাকে মাপ করতে হবে বৌঠান, এ-সব আলোচনা আপনার সঙ্গে আমি করতে পারব না।

কিরণময়ী বিষণ্ণ হইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তাই জিজ্ঞাসা করেছিলুম, শুনে রাগ করবে না ত?

কিন্তু রাগ ত করিনি।

না করলেই ভাল, বলিয়া কিরণময়ী জ্বলন্ত উনানের উপর ঘিয়ের কড়া চাপাইয়া দিল।

খান তিন-চার লুচি নীরবে ভাজিয়া তুলিয়া কিরণময়ী সহসা বলিল, যে কথা আমি জানতে চেয়েছিলুম, সে আলোচনাই তুমি করতে চাইলে না। আমার কপাল! কিন্তু আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ঠাকুরপো, প্রণয়কে লোক অন্ধ বলে কেন?

উপেন্দ্র কহিল, বোধ করি চোখ থাকলে যে-পথে মানুষ যায় না—এতে তেমন পথেও তাকে নিয়ে যায়।

কিরণময়ী উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিল, যায় কি? কথাটা কি সত্যি, ভালবাসা অন্ধ?

সত্যি বৈ কি। অনেকের অনেক অভিজ্ঞতাই ত প্রবাদ-বচন।

কিরণময়ী কহিল, বেশ কথা। তা যদি হয়, কানা খানায় পড়লে লোকে ছুটে এসে তাকে তুলে দেয়। তার জন্যে দুঃখ করে, যার যেমন সাধ্য তার ভালর চেষ্টা করে, কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ হয়ে সে যখন গর্তে পড়ে, কেউ ত তুলে ধরতে ছুটে আসে না। বরং আরও তার হাত-পা ভেঙ্গে দিয়ে সেই গর্তেই মাটি চাপা দিতে চায়। যে-সত্য মানুষ নিজেই প্রচার করে, প্রয়োজনের সময় সে সত্যের কোন মর্যাদাই রাখে না! আমার কথাটা বুঝতে পারচো ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিল, পারচি বৈ কি!

কিরণময়ী কহিল, পারবে বলেই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করচি। কিন্তু তা হলেই দেখ, অপরের বেলায় অনেক জিনিস জেনেও জোর করে ভুলতে চায়। অন্ধকে চক্ষুষ্মানের শাস্তি দিয়ে আপনাকে বাহাদুর মনে করে। পরকে বিচার করবার সময় এ কথাটা তার

মনেও পড়ে না যে, চোখ হারালে তার নিজেরও খানায় পড়বার সম্ভাবনা ওই লোকটার চেয়ে একটুও কম থাকে না।

উপেন্দ্র একটুখানি অপ্রসন্ন বিস্ময়ের সহিত কহিল, তা না হতে পারে, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্চিনে বৌঠান, এ-সব আলোচনা কেন করচেন? সত্যি হোক, মিথ্যা হোক, আপনার জীবনের সঙ্গে এ মীমাংসার কোন সম্বন্ধ নেই।

কিরণময়ী উপেন্দ্রর অপ্রসন্নতা লক্ষ্য করিয়াও হাসিল, কহিল, অন্ধ আলোচনা করে খানায় পড়ে না ঠাকুরপো, পড়ে আলোচনা করে। আমি যে পড়িনি কিংবা পড়বার জন্যে সেদিকে এগিয়ে যাচ্চিনে, সেই বা কি করে জানলে?

উপেন্দ্র কহিল, কিন্তু আপনি ত অন্ধ নন। আমি যে আপনার বড় বড় দুটো চোখ দেখতে পেয়েছি বৌঠান।

কিরণময়ী বলিল, ঐখানেই ত মুশকিল ঠাকুরপো, দু'রকমের অন্ধ আছে কিনা! যারা চোখ বুজে চলে, তাদের সম্বন্ধে ত ভাবতে হয় না—তাদের চেনা যায়। কিন্তু, যারা দু'চোখ চেয়ে চলে, দেখতে পায় না, তাদের নিয়েই যত গোল। তারা নিজেরাও ঠকে, পরকেও ঠকাতে ছাড়ে না।

উপেন্দ্র কুণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার কাছে উত্তর না পাইয়া কিরণময়ী সহসা অত্যন্ত উৎসুক হইয়াই যেন প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, আমার যে বড় বড় দুটো চোখ দেখেছিলে বললে ঠাকুরপো, সে কবে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

উপেন্দ্র বলিল, সে আপনার স্বামীর মৃত্যুর পরেই। সেদিন আপনাকে যে দেখেচে তার কোনদিন আপনাকে ভুল হবে না। কেন যে আপনি নিজেকে অন্ধ বলে ভয় করচেন, সে আপনি জানেন, কিন্তু আমি জানি এ কথা সত্য নয়। সেদিন আপনার দুটি চোখে যে জ্যোতি আমি দেখতে পেয়েছিলাম, তাতে নিশ্চয় জানি যত অন্ধকারই আপনার চারিপাশে ঘনিয়ে আসুক, আপনাকে ভুলোতে পাববে না। আপনি ঠিক পথটি দেখে চিরজীবন চলে যেতে পারবেন।

কিরণময়ী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কথাটা এতক্ষণে বোধ হয় বুঝেছি ঠাকুরপো। সেদিন যেমন করে আমি চৈতন্য হারিয়ে তাঁর পায়ের তলায় পড়ে গিয়েছিলুম, তাই দেখে বোধ করি তোমার এ ধারণা জন্মেছে।

উপেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, হতেও পারে, কিন্তু সে দেখা কি ভুল করবার বৌঠান?

শুনিয়া কিরণময়ী একটুখানি হাসিল। তার পরে অসঙ্কোচে একান্ত সহজকণ্ঠে কহিল, ভুল বলেই ত মনে হয়। আমি ত আমার স্বামীকে ভালবাসতুম না।

উপেন্দ্র অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী বলিতে লাগিল, সত্যই তাঁকে কোনদিন ভালবাসি নি। আর শুধু আমিই নয়, তিনিও আমাকে বাসেন নি। তবে কি সে-দিনের সেটা আমার ছলনা? তাও নয় ঠাকুরপো, সেও সত্যি। সত্যিই, সেদিন জ্ঞান হারিয়েছিলুম,—বলিয়া উপেন্দ্রর স্তম্ভিত মুখ দেখিয়া সে একটুখানি থমকিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা জোর করিয়া কাটাইয়া বলিল, না, ভয় পেলে আমার চলবে না। তোমার কাছে আমার সব কথা আজ বলতেই হবে।

উপেন্দ্র কষ্টে মুখ তুলিয়া কহিল, চলবে না কেন? আমি শুনতে চাইনে, তবু আমাকে শুনতেই হবে কেন?

কিরণময়ী বলিল, তার কারণ তুমি আমার গুরু। তোমার কাছে সমস্ত স্বীকার না করে আমি কোনমতেই শান্তি পাব না।

উপেন্দ্র স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী দৃঢ় অথচ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল,—আমার মধ্যে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দেখেছিলে ঠাকুরপো, সে চোখের ভুল নয়, সত্যি; কিন্তু সে বড় ক্ষণিকের। স্বামীকে আমি কোনদিন ভালবাসি নি, কিন্তু কায়মনে ভালবাসতে চেষ্টা করতে শুরু করেছিলুম। কিন্তু, তিনি বাঁচলেন না, আমারও সে চেষ্টা স্থায়ী হলো না। বইয়ে এ-সব কথা পড়ে কখনো বা ভাবতুম মিছে কথা, কখনো বা ভাবতুম কবির কল্পনা, কখনো বা মনে করতুম, হয়ত আমার মধ্যে ভালবাসার শক্তি নেই বলেই এ-রকম মনে হয়। এ শক্তি আমার আছে কিনা আজও জানিনে ঠাকুরপো, কিন্তু ভালবাসার সাধ যে আমার

কত বেশী, সে কথা প্রথমে টের পাই তোমাকে দেখে। তাই তুমিই গুরু। একটুখানি থামিয়া কতকটা যেন আত্মগতভাবেই কহিল, দুদিন পরে তোমরা চলে যাবে। আবার যখন দেখা হবে, তখন নিজের কথা বলবার মত মনের অবস্থা হয়ত থাকবে না। হয়ত এই বলার জন্যে তখন লজ্জায় মরে যাব। না ঠাকুরপো, সে হবে না, আজই তোমাকে আমার সমস্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে তবে আমি নিরস্ত হব।

উপেন্দ্র কাতর হইয়া বলিল, বৌঠান, আজ নানা কারণে আপনার মন অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে আছে আমি দেখতে পাচ্ছি। এ অবস্থায় কি বলা উচিত, কি উচিত নয়, ভাবতে না পেরে—না না, বৌঠান, আমি অনুরোধ করচি, আর একদিন এসে আপনার সমস্ত কথা শুনে যাব, কিন্তু আজ নয়।

কিরণময়ী কহিল, ঠিক এই জন্যই ত আজই সমস্ত কথা শুনোতে চাই ঠাকুরপো। পাছে সেদিন লজ্জা এসে বাধা দেয়, সাংসারিক ভাল-মন্দর বিচার-বুদ্ধি মুখ চেপে ধরে। আজ আমার রেখে-ঢেকে, বুঝে-সমঝে, সাজিয়ে-বাঁচিয়ে বলবার সাধ্যও নেই, প্রবৃত্তিও নেই—আজই ত বলবার দিন। এর পরে হয়ত তুমি ইহজন্মে আর আমার মুখ দেখবে না,—তবু প্রার্থনা করি আরো কিছুক্ষণ এই দুর্বুদ্ধি, এই উন্মাদ মন আমার থাক ঠাকুরপো, আমি তোমার কাছে সমস্ত যেন খুলে বলতে পারি!

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া উপেন্দ্রর নির্মল শুদ্ধ সদন্তঃকরণ অজানা ভয়ে ত্রস্ত হইয়া উঠিল। শেষবারের মত বাধা দিয়া বলিল, বৌঠান, মানুষমাত্রেরই গোপনীয় কথা থাকে। সে ত কারো কাছে খুলে দেবার আবশ্যকতা নেই। বরঞ্চ প্রকাশ করাতেই বেশী অমঙ্গল। শুধু তোমার আমার নয়, আরো দশজনের।

কিরণময়ী কোন উত্তর করিল না। লুচিগুলি ভাজা শেষ হইয়াছিল, একটি থালায় পরিপাটী করিয়া সাজাইয়া উপেন্দ্রর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া কহিল, তুমি খাও, আমি বলাটা শেষ করে ফেলি।

নাই বললেন বৌঠান।

কিরণময়ী কহিল, আমি হাতজোড় করে মিনতি জানাচ্চি ঠাকুরপো, আর আমাকে বাধা দিয়ো না। সমস্ত শুনে তোমার ইচ্ছা হয় আমার শাশুড়ীর সঙ্গে আমারও ভার নিয়ো, না ইচ্ছে হয়, আমার নিজের পথ আমি নিজে খুঁজে নেব। আমি অনেককে ঠকিয়েছি ঠাকুরপো, কিন্তু তোমাকে ঠকাতে পারব না।

তবে বলুন, বলিয়া উপেন্দ্র একখণ্ড লুচি ছিঁড়িয়া মুখে পুরিয়া দিল।

কিরণময়ী কহিল, তোমাকে বলেছি ত ঠাকুরপো, স্বামীকে আমি ভালবাসি নি; ভালবাসা পাইনি। সেজন্যে আমাদের কোন খেদ ছিল না। বাড়ির মধ্যে স্বামী আর শাশুড়ী। একজন দার্শনিক,—তিনি আমাকে প্রাণপণে পড়িয়েই খুশী, আর একজন ঘোর স্বার্থপর—তিনি প্রাণপণে আমাকে খাটিয়ে নিয়েই খুশী ছিলেন। এমনি করেই দিন কেটেছিল, এবং কেটেও যেত বোধ করি, কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে সব উলটে-পালটে গেল। স্বামী অসুখে পড়লেন। তাঁর কাছে আমি বই পড়েছি অনেক। নাটক নভেলও কম পড়িনি, কিন্তু দুজনেই পড়ে পড়ে শুধু হাসতুম। ভালবাসার নামগন্ধও আমাদের বাড়িতে ছিল না, তাই এক-একজন লোক যেমন থাকে জন্ম-বধির, জন্মান্ধ, আমার স্বামীও ছিলেন তেমনি জন্ম-নীরস। কিন্তু, আমার মধ্যে যে কত রস ছিল তা তখনও জানতে পারিনি বটে, কিন্তু এটা একদিন হঠাৎ টের পেয়ে গেলুম যে, ভালবাসার এবং তা ফিরিয়ে পাবার তৃষ্ণাটা আমারও কোন মেয়ের চেয়েই কম,—না না, এর মধ্যেই ও-গুলো অমন করে ঠেলে রাখলে চলবে না—

উপেন্দ্র বিরসমুখে কহিল, কেমন যেন খেতে ভাল লাগচে না বৌঠান।

কিরণময়ী ক্ষণকাল মৌন হইয়া কি যেন চিন্তা করিয়া লইয়া কহিল, আমি জানি ঠাকুরপো, আর একটু পরেই লুচি-তরকারির স্বাদ তোমার জিভের উপর বিষিয়ে উঠবে, কিন্তু এখনো ত তার দেরি ছিল। আর একখানা খেতে পারতে।

উপেন্দ্র আরও মলিন হইয়া গেল।

কিরণময়ী তাহার প্রতি চাহিয়াই কহিতে লাগিল, যদি বলি, তোমার এই না-খাওয়ার দুঃখটা আমার নিজের ডান হাতটা নষ্ট হওয়ার চেয়েও আমার কাছে বেশী, সে ত তুমি

বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু, কর আর না কর, আমি ত জানি এ সত্যি। তবু থামবার জো নেই ঠাকুরপো—আমাকে বলতেই হবে।

বেশ বলুন।

বলি। আমার স্বামীর পীড়ায় শুধু আমার গহনাগুলা ছাড়া সঞ্চিত যা-কিছু ছিল যখন সব একে একে গেল, তখন এলেন একজন টাটকা পাস-করা ডাক্তার—আচ্ছা ঠাকুরপো, অনঙ্গ ডাক্তারকে তোমরা দেখেছিলে না?

উপেন্দ্র কহিল, হাঁ।

কিরণময়ী বিষের মত একটুখানি হাসিয়া কহিল, তিনিই! হায় রে পোড়া কপাল! এ-ঘরে স্বামী মর-মর, ও-ঘরে গেলুম তাঁকে নিয়ে ভালবাসার স্বাদ মিটোতে।

উপেন্দ্র ঘাড় হেঁট করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। কিরণময়ী কথা কহিতে গেল, কিন্তু কে যেন গলাটা তাহার চাপিয়া ধরিয়া কণ্ঠরোধ করিল। খানিকক্ষণ প্রবল চেষ্টার পরে শুষ্কস্বরে বলিয়া উঠিল, শুনেই তোমার ঘাড় হেঁট হয়ে গেল ঠাকুরপো, তবু ত সেই অনঙ্গ ডাক্তারকে তুমি চেন না। চিনলে বুঝতে পারতে, কত বৎসরের দুর্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালা আমার এই বুকের মাঝখানে জমাট বেঁধে ছিল বলেই এমন অসম্ভব সম্ভব হতে পেরেছিল। কি জানো ঠাকুরপো, যে তৃষ্ণায় মানুষ নর্দমার গাঢ় কালো জলও অঞ্জলি ভরে মুখে তুলে দেয়, আমারও ছিল সেই পিপাসা। কিন্তু সে খবর পেলুম সেই জল গলায় ঢেলে দিয়ে। তার পরে—উঃ, সে কি গা-বমি-বমির দিনগুলোই কেটেছে! বলিতে বলিতেই তাহার আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া উঠিল। একটা উৎকট দুর্গন্ধময় বিষাক্ত উদ্গার যেন তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কিরণময়ী পুনশ্চ কহিল, কিন্তু বমি করতেও পারলুম না ঠাকুরপো, শাশুড়ী আমার মুখ চেপে ধরলেন। অনঙ্গ তখন সংসারের অর্ধেক ভার নিয়েছিল।

উপেন্দ্র সেই একভাবে পাথরে-গড়া মূর্তির মত বসিয়া রহিল। তাহার নির্বাক নত মুখের দিকে একবার কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া কিরণময়ী বলিল, তার পরে আসক্তি-ঘৃণার, তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার অবিশ্রাম সংঘর্ষে যে গরল অহরহ উঠতে লাগল ঠাকুরপো, দেব-দানবের নিষ্ঠুর আকর্ষণে মন্দার-পীড়িত বাসুকিও বোধ করি ততখানি বিষ তার অতবড় মুখ দিয়ে ছড়াতে পারেনি! আমার মনে হয়, এ বাড়ির প্রত্যেক ইট-কাঠ, দরজা-জানালা, কড়ি-বরগা পর্যন্ত বিষে নীল হয়ে আছে।

একটুখানি থামিয়া কহিল, কতদিনে কেমন করে যে এর শেষ হতো, আমি জানিনে। কত ভেবেচি, কিন্তু কোনদিকে কোন কূলকিনারাই চোখে দেখিনি। কিন্তু কি অমৃত হাতে করেই তুমি উদয় হলে ঠাকুরপো, কোথায় বা গেল বিষের জ্বালা, আর কোথায় বা রইল বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণা। চোখের পলকে এ-সব এমনি তুচ্ছ হয়ে গেল যে, অনঙ্গকে বিদায় দিতে আমার একটা মিনিটও লাগল না। তুমিই যেন এসে আমার কানে কানে উপায় বলে দিয়ে গেলে! জানো ত ঠাকুরপো, মেয়েমানুষ গহনা কত ভালবাসে! আমার বড় দুঃখের গহনাগুলি ছিল যেন আমার বুকের পাঁজর। ওই যেখানে মাথা হেঁট করে তুমি এখন বসে আছ, ঠিক ঐখানেই সেই পাঁজরগুলো খসিয়ে তার পায়ে ঢেলে দিলুম। আমার প্রতি আসক্তি তার যত বড়ই হোক, এতগুলো গহনা হাতে পেলে সে যে আর কখনো মুখ দেখাবে না, জন্মের মত রেহাই দিয়ে সে যে চলে যাবে, এ মন্ত্রটা তুমিই যেন আমাকে শিখিয়ে দিলে। উঃ—কত ভয়, কত ভাবনাই ছিল আমার, পাছে এই দুর্দিনের চাপে একদিন সেই গয়নাগুলোই আমার নষ্ট হয়ে যায়। তাই ত গেল—কৈ ধরে রাখতে তাদের ত পারলুম না। কিন্তু, আঃ—সে কি তৃপ্তি, সে কি আশ্চর্য আনন্দ ঠাকুরপো? এমনি এক অন্ধকার সন্ধ্যায় যখন সেইগুলোর লোভে সে তার বীভৎস পুচ্ছপাশ আমার সর্বাঙ্গ থেকে খুলে নিয়ে চোরের মত নিঃশব্দে সরে গেল, মনে হল বাঁচলুম! আমি বাঁচলুম।

উপেন্দ্রর মনে পড়িল তাহার এবং সতীশের মাঝখান দিয়া একদিন সকালে চোরের মত অনঙ্গ ডাক্তার সরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন কথা না কহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিরণময়ী কহিতে লাগিল, তোমার মনে পড়ে কি ঠাকুরপো, আমার সে রাতের উগ্র-মূর্তি? সেদিন কত কাণ্ডই করেছিলুম। আড়ি পেতে তোমাদের কথাবার্তা শোনা, নীচে

গিয়ে তোমাদের চোখ রাঙিয়ে কত ভয় দেখান, তার পরে তোমরা চলে গেলে। নিজের বিষের সে কি জ্বালা! কিন্তু তার বদলে যে দুটি জিনিস পেলুম ঠাকুরপো, সে আমার স্বর্গ, সে আমার অমৃত। শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণ অহল্যা যেমন মানুষ অহল্যা হয়েছিলেন, আমিও যেন তেমনি বদলে গেলুম। অহল্যা মানুষ হয়ে কি পেয়েছিলেন জানিনে, কিন্তু আমি যা পেলুম, তার তুলনা নেই। আমার ভাই ছিল না, সতীশকে পেলুম আমার মায়ের পেটের ভাই, আর পেলুম তোমাকে—ছিঃ! অমন মলিন হয়ো না ঠাকুরপো, পুরুষমানুষের কি অত লজ্জা সাজে?

উপেন্দ্র জোর করিয়া মাথা সোজা করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, যা লজ্জার বস্তু, মেয়ে-পুরুষের উভয়েরই সমান বৌঠান। আমি এ-সব কথা শুনতে চাইনে—হয় আপনি চুপ করুন, না হয় আমি এই মুহূর্তেই উঠে যাব।

কিরণময়ী কহিল, জোর করে নাকি?

উপেন্দ্র কহিল, হাঁ।

কিরণময়ী কহিল, তা হলে আমিও জোর করে ধরে রাখবার চেষ্টা করব। কিন্তু বলে রাখচি ঠাকুরপো, এই জোরের পরীক্ষায় আমার লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

এই উত্তরের পর উপেন্দ্র ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। কিরণময়ী পুনরায় হাসিয়া কহিল,—ভয় নেই গো, ভয় নেই—তোমার অনিচ্ছায় গায়ে পড়ে তোমার গায়ে হাত দেব এত উন্মাদ এখনো হইনি। ইচ্ছা হয় উঠে যাও—আমি বাধা দেব না।

উপেন্দ্র অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। মেঘে ঢাকা চাঁদ চোখে দেখা না গেলেও চারিদিকে ঝাপসা জ্যোৎস্নার ইঙ্গিতে আসল বস্তুটা যেমন জানা যায়, এই দুটি নর-নারীর গোপন সম্বন্ধটাও এতক্ষণ পর্যন্ত ততটুকু মাত্রই আড়ালে ছিল। কিন্তু হাওয়া উঠিয়াছে, মেঘ দ্রুত সরিয়া যাইতেছে, অন্তরের মধ্যে উপেন্দ্র তাহা নিশ্চিত অনুভব করিয়াই এমন করিয়া পালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু সমস্ত বিফল হইয়া গেল। সহসা একটা দমকা বাতাসে সমস্ত আবরণ ছিঁড়িয়া দিয়া যতদূর দেখা যায়, সম্মুখের আকাশ অনাবৃত হইয়া উঠিল।

কিরণময়ী ধীরে ধীরে কহিল, যাক, তোমাকে যে ভালবাসি তা জানিয়ে দিয়ে আমি বাঁচলুম। এখন তোমার যা খুশি করো, আমার কিছুই বলবার নেই। কিন্তু মনে করো না ঠাকুরপো, আমি অন্ধ-আশায় ভুলে এ কথা জানালুম। আমি তোমাকে চিনি, আমি জানি এ নিষ্ফল! একেবারে নিষ্ফল! রক্ষক হয়ে এসে যে তুমি ভক্ষক হতে পারবে না, কোনমতেই না, এ আমি জানি।

এতক্ষণে উপেন্দ্র কথা কহিল, মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ শ্রদ্ধা যদি আমার 'পরে আছে, তবে জানালেন কেন?

কিরণময়ী কহিল, তার দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ, না জানালে আমি পাগল হয়ে যেতুম। দ্বিতীয় কারণ, তোমাকে সব কথা না বলে তোমার আশ্রয় নেওয়া আমার অসম্ভব। তা হলে আমার কেবল মনে হতো সুরবালাই আমাকে যেন খাওয়াচ্ছে পরাচ্ছে,—কিন্তু এখন যদি এর পরেও তুমি আমার ভার নাও—মনে হবে এ শুধু তোমারই খাচ্চি পরচি, আর কারো নয়। আচ্ছা, সুরবালাকে আমার কথা বলবে ত?

উপেন্দ্র কহিল, না।

কিরণময়ী প্রশ্ন করিল, না কেন? শুনলে সে কষ্ট পাবে?

উপেন্দ্র কহিল, না বৌঠান, কষ্ট সে পাবে না। সে ভারী বোকা। ভদ্রলোকের মেয়ে স্বামী ছাড়া আর কোন লোককে কোন অবস্থাতেই ভালবাসতে পারে, এ কথা হাজার বললেও তার মাথায় ঢুকবে না। কিন্তু অনুমতি করেন ত এখন উঠি।

কথাটা কিরণময়ীকে তীক্ষ্ণ আঘাত করিল, কিন্তু সে সহজকণ্ঠে কহিল, অনুমতি না করে ত উপায় নেই, করতেই হবে। কিন্তু আর একটু বসো। তোমাকে যে ভালবেসেছিলুম সেইটেই শুধু বলা হলো, কিন্তু ভুলতে যে চেয়েছিলুম, আজ, সে কথাটাও ত তোমার জানা চাই। কিন্তু তাতে কে আমার গুরু জান ঠাকুরপো? সেই যে নির্বোধের অগ্রগণ্য মেয়েটি ছোটবৌ হয়ে তোমাদের বাড়িতে ঢুকেচেন তিনিই।

উপেন্দ্রর মুখে বিস্ময়ের একটুখানি আভাস দেখিয়া কিরণময়ী কহিল, হাঁ তিনিই—তোমরা যাকে পশুরাজ বলে তামাশা কর, সেই সুরবালাই আমার গুরু। তুমি যা শেখালে, তিনি তাই ভুলিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি আমার নমস্য।

উপেন্দ্র মৌন হইয়া বসিয়া রহিল। কিরণময়ী কহিতে লাগিল, তোমাকে বার বার বলচি ঠাকুরপো, আজ যে তোমার পায়ে আমার লজ্জা-শরমের সমস্ত জঞ্জাল জলাঞ্জলি দিলুম, তার সমস্ত ফলাফল জেনেই। আমি জানি তোমার সুরবালা আছে। আর আছে তোমার নিষ্ঠুর কঠিন পবিত্রতা। সে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, বজ্রের মত শক্ত। তার গায়ে দাগ দিতে পারি, সে আমার সাধ্য নয়। কিন্তু জান ত ঠাকুরপো, মানুষের এমনি পোড়া স্বভাব, যা তার সাধ্যাতীত, তাতেই তার সবচেয়ে লোভ। ভগবানকে পাওয়া যায় না বলেই মানুষ এমন করে সব দিয়ে তাঁকে চায়। তাই আমার মনে হয়, তুমি আমার এতবড় অপ্রাপ্য বস্তু না হলে বোধ করি তোমাকে এত ভাল আমি বাসতুম না। কিন্তু যাক সে কথা।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কিরণময়ী কহিল, একলব্যের যেমন দ্রোণ গুরু, আমার গুরু তেমনি সুরবালা। কিন্তু কেমন করে হলো, সেই কথাটা জানিয়ে তোমাকে আজ ছুটি দেব। ঐ যেখানে তুমি খেতে বসেচ ঠাকুরপো, একদিন রাত্রে সতীশ-ঠাকুরপোও তেমনি খেতে বসেছিলেন। কিসে মনে নেই, হঠাৎ তোমাদের কথা উঠে পড়ল। জান ত, ভাইটি আমার তোমাদের কথায় একেবারে মেতে ওঠেন। তখন তাঁকে সামলানোই শক্ত। আমার নিজেরও তখন প্রায় সেই দশা। ভালবাসার মদ তখন সবেমাত্র পাত্র ভরে খেয়ে তোমার নেশায় তখন আমার হাত-পা অবশ, দুই চক্ষু ঢুলে ঢুলে আসছে, এমনি সময়ে সতীশ-ঠাকুরপো কত নজীর কত দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন, তুমি তোমার সুরবালাকে কত ভালবাসো। কবে তুমি তার পান-বসন্ত হলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছিলে, কবে সে তোমার একটুখানি মাথা-ধরা নিয়ে সারারাত্রি পাখা হাতে শিয়রে বসে কাটিয়েছিল—এমনি কত দিন-রাতের কত ছোটখাটো কাহিনী। তাঁর ত সে-সব শোনা-কথা। হয়ত বা কোনটা মিথ্যে, না হয় ত বাড়ানো, কিন্তু তাতে আমাদের দুজনের কারো কোন ক্ষতি হলো না। তোমাদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে প্রেমের গঙ্গা বয়ে যাচ্চে, আমরা দুটি ভাই-বোনে দেখতে দেখতে যেন তাতে ডুবে তলিয়ে গেলুম। তার পর অনেক রাত্রিতে সতীশ বাসায় চলে গেলেন, আমি কিন্তু এই রান্নাঘরে বসে রইলুম। কতক্ষণ জানিনে, বেরিয়ে দেখি সুমুখেই শুকতারা। আমার হঠাৎ মনে হলো সুরবালার মুখখানি যেন এমনি। এমনি মধুর, এমনি উজ্জ্বল। ঠিক এমনিধারাই বুঝি তার মুখ থেকে চোখ ফেরান যায় না। মনে মনে তাকে বললুম, তোমাকে ত দেখিনি তুমি কেমন, কিন্তু যেমনই হও, আজ থেকে তুমি হলে আমার গুরু। তোমার কাছ থেকেই আমি স্বামীপ্রেমের পাঠ নিলুম। ভালবাসার স্বাদ আমি পেয়েছি—এ আমি আর ছাড়তে পারব না। ভালবাসা আমার চাই-ই—ভাল আমাকে বাসতেই হবে। তবে, অন্যকে ভালবেসে কেন এ ব্যর্থ করি? আজও ত আমার স্বামী বেঁচে আছেন, এখনো ত বিধবা হইনি—তবে, কেন এ ভুল করি? তোমার মত আজ থেকে আমিও আমার স্বামীকেই ভালবাসব—আর কারুকে নয়। বলামাত্রই আমার মন যেন তার সমস্ত শক্তি এক করে সায় দিয়ে বললে, 'ভালবাসা ফিরে পাবার তোমার আশা নেই সত্যি, কিন্তু তবুও তোমাকে তাঁকেই ভালবাসতে হবে।' কিন্তু আমার এমনি পোড়া অদৃষ্ট ঠাকুরপো, তিনি বাঁচলেন না। আমার বড় সাধের সাধনা অংকুরেই শুকিয়ে গেল। তাই তাঁর মৃত্যুর দিনে আমার যে চেহারা তোমরা দেখতে পেয়েছিলে, তার মধ্যে একবিন্দু ছলনা ছিল না—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর যে করুণ এবং আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল, উপেন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু কথা কহিল না। কিরণময়ী নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, ঠাকুরপো, যারা মূর্খ, যারা গোঁড়া, তারা বুঝবে না বটে, কিন্তু তুমি ত জানো সংসারের সমস্ত জিনিসেরি প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। সে নিয়ম অগ্রাহ্য করে স্বামী-স্ত্রীর কেউ কখনো তাদের সেই চির-মধুর সম্বন্ধে পৌঁছুতে পারে না। বিয়ের মন্ত্র কর্তব্যবুদ্ধি দিতে পারে, ভক্তি দিতে পারে, সহমরণে প্রবৃত্তি দিতেও পারে, কিন্তু মাধুর্য দেওয়ার শক্তি ত তার নেই। সে শক্তি আছে শুধু ঐ প্রকৃতির হাতে। তাঁর দেওয়া নিয়ম-পালনের মধ্যে যখন সময় ছিল, সামর্থ্য ছিল, তখন দুজনেই দু পায়ে সে নিয়ম মাড়িয়ে গেছি, তার কোন সম্মানই রাখিনি, আজ অসময়ে

স্বামী যখন মৃতকল্প তখন প্রয়োজন বলে তাঁর কাছে যাব আমি কোন্ পথে? কিন্তু তবুও হাল ছেড়ে আমি দিইনি ঠাকুরপো। আশা ছিল একটা পথ বুঝি তখনও খোলা ছিল। সে তাঁর সেবা। ভেবেছিলুম আমরণ স্বামী-সেবা নিয়েই হয়ত বা একদিন তাঁকে পাবো, কিন্তু এমনি হতভাগিনী আমি—সেটুকু অবসরও আমার মিলল না, তিনি ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন।

উপেন্দ্র সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া দেখিল, কিরণময়ীর দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতেছে। কহিল, শুনেছি, আপনি যেমন তাঁর সেবা করেছেন তেমন মানুষে পারে না। সেদিকে স্ত্রীর কর্তব্যে আপনার লেশমাত্র ত্রুটি ঘটেনি।

কিরণময়ী বলিল, তা হয়ত ঘটেনি, কিন্তু মানুষে না পারলে আমিই বা কি করে পারলুম ঠাকুরপো? তা নয়,—তেমন সেবা স্ত্রীলোকমাত্রেই পারে। কিন্তু আমি ত কর্তব্য বলে কিছুই করিনি, আমার অন্য সমস্ত পথ বন্ধ ছিল বলে আমি চেয়েছিলুম আমার সেবার মধ্যে দিয়ে তাঁকে পেতে। তাই সেদিকে সাধ্যমত কখনো অবহেলা করিনি। ভেবেছিলুম, একবার যদি তাঁকে বুকের মধ্যে পাই, যতদিন বাঁচি, যেখানে যেভাবেই থাকি, ভদ্রভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারব। কিন্তু সমস্ত চেষ্টা আমার নিষ্ফল হয়ে গেল। তাঁকে পেতে শুরু করেছিলুম বটে কিন্তু পেলুম না। প্রথম থেকে সেই যে তুমি আমার বুক জুড়ে রইলে, কোনমতেই সেখান থেকে তোমাকে আর নড়াতে পারলুম না,—আমার স্বামীকেও আমার অন্তরের মধ্যে পেলুম না।

উপেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অনেক রাত্রি হয়েছে বৌঠান, আমি চললাম।

কিরণময়ীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল, চল তোমাকে দোর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে সদরটা বন্ধ করে আসি। কাল দেখা হবে?

না, কাল আমি বাড়ি যাবো।

আর কোনদিন দেখা হবে?

হওয়াই ত সম্ভব। নমস্কার বৌঠান!

নমস্কার ঠাকুরপো। দিবাকরকে এখানে পাঠাবে কি?

পাঠাব বৈ কি বৌঠান। তার বাপ-মা নেই, আমিই তাকে এতদিন দেখে এসেচি। আজ থেকে তাকে মানুষ করবার ভার আপনি যখন নিতে চেয়েছেন, সে ভার আপনার হাতেই সঁপে দিলুম।

কিরণময়ীর চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। কহিল, এত কথা শোনার পরও তুমি এতবড় বিশ্বাসের ভার আমার উপর কি করে দেবে ঠাকুরপো। তুমি যে দিবাকরকে কত ভালবাস সে ত আমি জানি।

উপেন্দ্র দরজার বাহিরে আসিয়া পড়িয়া কহিল, সেইজন্যেই ত দিলাম বৌঠান। আমি যাকে ভালবাসি তার অমঙ্গল আপনার দ্বারা কখনো হবে না এই ত আমার ভরসা—বলিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

কিরণময়ী অন্ধকার গলির মধ্যে মুখ বাড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, আর একটা কথা বলে যাও ঠাকুরপো, সতীশ কি কলকাতায় নেই?

উপেন্দ্র দূর হইতেই জবাব দিল, না।

কিরণময়ী পুনরায় প্রশ্ন করিল, সে যখন আমাকে না জানিয়ে চলে গেছে, তখন অনেক দুঃখেই গেছে ঠাকুরপো। তাকে কি তুমি এ বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছিলে?

উপেন্দ্র কহিল, দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দিইনি।

কিরণময়ী জিজ্ঞাসা করিল, যদি ইচ্ছাই ছিল দিলে না কেন?

উপেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

উত্তর না পাইয়া কিরণময়ী কহিল, এমন ইচ্ছে কেন হয়েছিল তাও কি জানতে পারিনে।

উপেন্দ্র কহিল, আমার ভুল হয়ে থাকতেও পারে। যাই হোক, কোথায় সে আছে খোঁজ করে আপনার কাছে আসতে তাকে চিঠি লিখে দেব। তাকেই জিজ্ঞাসা করবেন—বলিয়া উপেন্দ্র দ্বিতীয় প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে অন্ধকার গলি পার হইয়া গেল।

আটাশ

যে পাকা রাস্তাটা বরাবর সাঁওতাল পরগনার ভিতর দিয়া বৈদ্যনাথ হইতে দুমকায় গিয়াছে, তাহারই ধারে বাগানের মধ্যে বৈদ্যনাথ হইতে প্রায় ক্রোশ-দুই দূরে একটা বাঙলো ছিল। কলিকাতা হইতে চলিয়া আসিয়া সতীশ খোঁজ করিয়া এই বাড়িটা ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিল। নিজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইবার জন্যই সে এই নিরালায় অজ্ঞাতবাস করিতে আসিয়াছিল। সুতরাং যখন দেখিতে পাইল, ইহার আশেপাশে গ্রাম নাই, সম্মুখের রাস্তাটায় লোক-চলাচলও নিতান্ত বিরল, তখন খুশী হইয়াই বলিয়াছিল, 'এই আমার চাই। এমনি নির্জন নীরবতাই আমার প্রয়োজন।' কলিকাতা হইতে সে যে অপযশ ও দুঃখের বোঝা বহিয়া আনিয়াছিল, বিরলে বসিয়া একটা একটা করিয়া এইগুলারই হিসাব-নিকাশ করা তাহার মনোগত অভিপ্রায়। প্রথম দফায় সাবিত্রীকে তাহার যারপরনাই ঘৃণা করা প্রয়োজন, দ্বিতীয় দফায় পাথুরেঘাটার বৌঠাকরুনকে ভোলা চাই এবং তৃতীয় দফায় উপীনদার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেই হইবে। এই-সমস্ত কঠিন কাজ এই বনের মধ্যে বসিয়া শেষ করাই তাহার উদ্দেশ্য। সঙ্গে ছিল বেহারী এবং একজন এদেশী পাচক-ব্রাহ্মণ। বেহারীর কাজ ছিল বাবুর সেবা করিয়া অবশিষ্ট সময়টুকু পাচকের সহিত বাদানুবাদ করিয়া তাহাকে মূর্খ এবং আনাড়ী প্রতিপন্ন করা, আর অন্যের কাজ ছিল ভাত ডাল সিদ্ধ করিয়া বাকী সময়টুকু বেহারীর সহিত কলহ করিয়া সে যে বাজারের পয়সা দুই হাতে চুরি করিতেছে ইহাই সাব্যস্ত করা। অতএব এ-পক্ষের দিনগুলো ত এক রকম করিয়া কাটিতে লাগিল, কিন্তু প্রভু যিনি, তিনি অনুক্ষণ কেবল তত্ত্ব-চিন্তাতেই মগ্ন রহিলেন। সংসারে কামিনী-কাঞ্চনই যে সকল অনর্থের মূল, বৈরাগ্যই যে পরম বস্তু, পাখির ডাকই যে চরম সঙ্গীত, বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বতই যে সৌন্দর্যের নিখুঁত আদর্শ, এই সত্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করাই তাহার সম্প্রতি সাধনার বস্তু। সুতরাং, বারান্দার উপর একখানা ভাঙ্গা আরাম-কেদারায় সতীশ সারাদিন গাছের ডালে পাখির কিচিমিচি কান খাড়া করিয়া শুনিতে লাগিল, মহুয়া বৃক্ষে বাতাসের সোঁসোঁ শব্দ কোন্ রাগ-রাগিণীতে পূর্ণ, চিন্তা করিতে লাগিল, আকাশে যা-তা মেঘ দেখিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং দূরে পাহাড়ের গায়ে শুষ্ক বাঁশ-পাতায় আগুন ধরিলে সারারাত্রি জাগিয়া চাহিয়া রহিল।

এদিকে মাছ-মাংস ছাড়িয়া দিয়া সাত্ত্বিক আহার ধরিল এবং কোথা হইতে একটা সাদা পাথরনুড়ি কুড়াইয়া আনিয়া দিনের বেলা পূজা এবং রাত্রে আরতি করিতে শুরু করিয়া দিল।

অথচ, এই নব-প্রণালীর জীবনযাত্রার সহিত তাহার কোনকালেই পরিচয় ছিল না। ইতিপূর্বে চিরকাল তাহার কাছে পাখির শব্দের চেয়ে সেতারের শব্দই মিষ্ট লাগিয়াছে, বাতাসের মধ্যে রাগ-রাগিণীর অস্তিত্ব কখনো সে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই এবং আকাশের গায়ে মেঘোদয় কোনদিনই তাহাকে বিচলিত করে নাই। বস্তুতঃ প্রকৃতি-দেবীর এই-সকল শোভা-সম্পদ, তা সে যতই থাক, খবর লইবার ফুরসত সতীশের কোনকালে ছিল না। যেখানে গান-বাজনা, যেখানে থিয়েটার কনসার্ট, যেখানে ফুটবল ক্রিকেট, সেখানেই সতীশ দিন কাটাইয়াছে। কোথায় মারপিট করিতে হইবে, কোন্ আসরে স্টেজ বাঁধিতে হইবে, কার বাড়ির মড়া পোড়াইতে হইবে, কার দুঃসময়ে দশটা টাকা যোগাড় করিয়া দিতে হইবে, এই ছিল তাহার কাজ।

পাখির গানে মাধুর্য আছে কি না, কোকিল পঞ্চমে ডাকে কি ডাকে না, আকাশপটে কার তুলি রঙ ফলায়, নদীর জল কুলকুল শব্দে কোন্ বাণী ঘোষণা করে, কামিনী-কাঞ্চন সংসারে কতখানি অনর্থের মূল—এ-সব সূক্ষ্মতত্ত্ব কোনকালেই তাহার মাথায় প্রবেশ করে নাই এবং সেজন্য দুঃখ করিতে তাহাকে কেহ দেখে নাই। সে সোজা মানুষ, সংসারের কারবার সে সোজা করিয়াই করিতে পারে। যাহাকে ভালবাসে তাহাকে নির্বিচারেই ভালবাসে এবং তাহাতে ঘা পড়িলে কি করিবে ভাবিয়া পায় না। পৃথিবীতে দুটি লোককে সে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াছিল। একজন সাবিত্রী আর একজন তাহার উপীনদা।

সাবিত্রী তাহাকে ফাঁকি দিয়া কদাচারী বিশ্বাসঘাতক বিপিনকে সঙ্গে করিয়া কোথায় চলিয়া গেল, উপীনদা কোন প্রশ্ন না করিয়াই একটা অন্ধকার রাত্রে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। শুধু দাঁড়াইবার একটা জায়গা ছিল, সে কিরণময়ীর কাছে। কিন্তু সে দ্বারটাও রুদ্ধ দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার আর তাহার সাহস হইল না। তাই সে এই নির্জনে আসিয়া আকাশ-বাতাস গাছপালা পশুপক্ষীর সঙ্গে জোর করিয়া একটা নূতন সম্পর্ক পাতাইয়া লইয়া বৈরাগ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু চিরকাল যে লোক আমোদ-প্রমোদ বন্ধু-বান্ধব লইয়া হৈচৈ করিয়া কাটাইয়াছে, তাহার এই অভিনব চেষ্টায় বুড়া বেহারীর চোখে যখন-তখন জল আসিতে লাগিল।

সে হয়ত কোনদিন আসিয়া বলে, বাবু, দুজন ভদ্দর বাঙালী সুমুখের রাস্তা দিয়ে বোধ করি ক্রিকেট দেখতে যাচ্ছেন—

কথা শেষ না হইতেই সতীশ 'কৈ রে?' বলিয়া তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই 'যাক গে' বলিয়া বিমর্ষমুখে তাহার চেয়ারে বসিয়া পড়ে।

বেহারী বলে, ডেকে একবার আলাপ-টালাপ—

সতীশ কহে, কিসের জন্যে? তার পরে একটুখানি উচ্চ ধরনের শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলে, আমার আর ও-সব আলাপ-টালাপের দরকার নেই—ভালই লাগে না। জানিস বেহারী, বনের পাখিরা আজকাল আমাকে গান শোনায়, গাছপালা কথা কয়, বাতাস হুহু করে আমার কানে কত রাজ্যের গল্প বলে যায়, আমার কি আর বাজে লোকজনের সঙ্গে হাসি-তামাশায় সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হয় রে? আমার যথার্থ বন্ধু যদি বলতে হয় ত এরাই—বুঝলি নে বেহারী? বেহারী নিরুত্তর ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়।—কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত প্রভুর এই বেদনা-বিদ্ধ কণ্ঠস্বর তাহার কানের মধ্যে রি রি করিতে থাকে।

বেহারীর একটা স্বভাব ছিল, সে কথা দিয়া কথা ভাঙিতে পারে না। অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরা যে লোভ সামলাইতে পারে না, এই ছোটলোক বেহারীর সে শক্তি ছিল। সে মনে মনে একপ্রকার করিয়া বুঝিতে পারিত সাবিত্রী সে রাত্রে কি একটা জুয়াচুরি করিয়া গিয়াছিল। সে যে সতীশের অশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী এবং সতীশকে প্রাণাধিক ভালবাসিত, বেহারীর তাহাতে সংশয় ছিল না। কেন যে সে, যে দোষ করে নাই তাহাই স্বীকার করিয়া এবং যে-পাপ কোনদিন ছিল না তাহারই বোঝা স্বহস্তে নিজের মাথায় তুলিয়া তাহার প্রভুকে এত ব্যথা দিয়া গেল, এই কথাটা নিরন্তর চিন্তা করিয়াও সে মীমাংসা করিতে পারিত না। তবে কিনা সাবিত্রীর উপর বেহারীর অসীম ভক্তি ছিল। তাহাকে মা বলিত এবং শাপভ্রষ্টা দেবী মনে করিত। তাই নিজের বুদ্ধিতে কূল-কিনারা না পাইয়া এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিত যে, শেষকালে একটা কিছু ভালই হইবে; এবং এই ভালর আশাতেই সে ও-সম্বন্ধে একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছিল। প্রভুর মুখ দেখিয়া সাবিত্রীর আসল ব্যাপারটা প্রকাশ করিতে মাঝে মাঝে যখন তাহার ভারী একটা আবেগ উপস্থিত হইত, তখন এই বলিয়া সে আত্মসংবরণ করিত যে, আমার মা'র চেয়ে বাবুকে ত আর আমি বেশী ভালবাসি নে, তিনি নিজেই যখন এ দুঃখ দিয়ে গেলেন, তখন আমি কেন ব্যাঘাত ঘটাই? তিনি না বুঝে ত আমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ করে যাননি।

এমনি করিয়াই ইহাদের নির্জনবাসের দিনগুলা কাটিতেছিল। এবং বোধ করি আরও কিছুকাল কাটিতে পারিত, কিন্তু হঠাৎ একদিন বাধা পড়িল।

যাহাকে বলে কাল-বৈশাখী, সেদিন সময়টা ছিল তাই। সমস্ত দিনমানটায় যদিচ দুর্যোগের কোন লক্ষণ ছিল না, কিন্তু অপরাহ্নের কাছাকাছি মিনিট-কুড়ির মধ্যেই আকাশে প্রবল ঝড় উঠিল। ক্ষণকালেই সতীশ অশ্ব-পদশব্দে চকিত হইয়া গলা উঁচু করিয়া দেখিল একটা ভালো ঘোড়া পিঠের উপর সাজসজ্জা লইয়া ঝড়ের সঙ্গে উন্মত্ত বেগে ছুটিয়া যাইতেছে। সতীশ ডাকিয়া কহিল, বেহারী, ও কার ঘোড়া ছুটে পালাল জানিস রে?

বেহারী ঘরের মধ্যে বাতি পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল, কোন বাবু-টাবুর হবে বোধ হয়।

সতীশ প্রশ্ন করিল, এদিকে বাবু-টাবু আবার কে আছে রে?

বেহারী কহিল, এদিকে নাই থাকলো, দেওঘর থেকে প্রায়ই ত বাবু-ভায়ারা গাড়ি ক'রে ত্রিকূট দেখতে, তপোবন দেখতে আসে। তাদেরই কারো হবে। ঝড়ের ভয়ে ছুটে মেরেচে।

তা হলে ত তার ভারী মুশকিল, বলিয়া সতীশ পুনরায় তাহার আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িল। কিন্তু কথাটা সে মন হইতে তাড়াইতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেই হোন, সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকিলে বিপদ ত সোজা নয়। এ জায়গায় গাড়ি পাল্কি ত দূরের কথা, একটা লোকের সাহায্য পাওয়াও কঠিন। তা ছাড়া সন্ধ্যারও বিলম্ব নাই, সম্ভবতঃ বৃষ্টিও নামিবে। সতীশ থাকিতে পারিল না, লাঠিটা বারান্দার কোণ হইতে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় আসিয়া দেখিল, পাথরের কুচিগুলো ঝড়ের বেগে ছর্‌রার মত গায়ে বিঁধিতেছে এবং সমস্ত পথটা ধূলা-বালুতে অন্ধকার হইয়া গেছে। হঠাৎ সেই অন্ধকার হইতে ঝড়ের মুখে একটা হোহো চীৎকার ভাসিয়া আসিল। হোলির দিনের ছুটি পাইয়া হিন্দুস্থানী দরোয়ানের দল যে-ধরনের চীৎকার-শব্দে পথে বাহির হইয়া পড়ে—এ সেই। ব্যাপারটা কি, জানিবার জন্য সতীশ সেই ধূলার মধ্যে কতকটা পথ অগ্রসর হইতেই দেখিতে পাইল, পথের উপরে একটা টমটম; এবং সেটাকে বেষ্টন করিয়া আট-দশজন লোক আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে। কাহারও মাথায় টুপি, কাহারও মাথায় পাগড়ি—সকলেরই হিন্দুস্থানী পোশাক।

আনন্দটা কিসের জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে সতীশ আরও কয়েক পা আগাইয়া আসিতেই দেখিতে পাইল, টমটমের একটা হাতল ধরিয়া একটি স্ত্রীলোক মাথা গুঁজিয়া অত্যন্ত জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ইহাকেই উদ্দেশ করিয়া লোকগুলা যে ভাষা ব্যবহার করিতেছে, তাহা হিন্দুস্থানী জিহ্বা ছাড়া উচ্চারণ করিতে পারে এতবড় জিভ পৃথিবীর আর কোন জাতের নাই। সতীশের প্রথমে মনে হইল, ইহারা এই দিকে কোথাও এই স্ত্রীলোকটিকে লইয়া আমোদ করিতে আসিয়াছিল, এখন ঘোড়া পলাইয়া যাওয়ায় এ আর-এক প্রকারের আমোদ করিতেছে। একবার ভাবিল ফিরিয়া যায়, কিন্তু কি জানি কেন আজ সে কোনমতেই কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। ঠিক এমনি সময়ে তাহার সবিস্ময় দৃষ্টি পড়িল মেয়েটির পোশাকের উপর। সন্ধ্যা ও ধূলোবালির আঁধারেও মনে হইল, তাহার পরনের কাপড়খানা যেন বাঙালী-মেয়ের মত করিয়া পরা। পায়ে জুতা, কিন্তু সে জুতা লক্ষ্ণৌয়ের লপেটা নয়—ইংরাজ রমণীরা যাহা পায়ে দেয়, তাই।

অকস্মাৎ মেয়েটি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া কহিল, মশাই, আমাকে বাঁচান।

'বাঁচান'! একমুহূর্তে সতীশের বৈরাগ্যের নেশা ছুটিয়া গেল। কামিনী-কাঞ্চন যে একান্ত হেয় এ তত্ত্ব ভুলিয়া গেল—বাঘের মত লাফ দিয়া সে একেবারে মেয়েটির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কি হয়েছে?

মেয়েটি এতক্ষণ পর্যন্ত একাকী অনেক নির্যাতন সহ্য করিয়াছিল, এইবার মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সতীশ ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি? হয়েছে কি?

এরা আমাকে বড্ড অপমান করচে!

অপমান করচে! কে এরা?

জানিনে।

জান না? সতীশ একসঙ্গে একরাশ প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, তুমি কে? কোথা থেকে এখানে এলে? তোমার সঙ্গের লোক কৈ? গাড়ি কার?

মেয়েটি চোখ মুছিয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, আমার সহিস ঘোড়া ধরতে সঙ্গে সঙ্গে ছুটেছে—আর কেউ নেই। আমি ত্রিকূট দেখতে এসেছিলুম—প্রায় আসি—সেখান থেকে এরা আমাকে বিরক্ত করতে করতে আসচে।

সতীশ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, বেশ করেছে। আপনি কি মেমসাহেব যে টমটম হাঁকিয়ে এত দূরে এসেচেন! আপনি কি ইংরেজের মেয়ে যে, যেখানে ইচ্ছে একলা গেলেও কোন ভয় নেই? আমাদের দেশী লোক অসহায় দেশী মেয়ে পেলেই তাকে অপমান করবে—অত্যাচার করবে—এই এ দেশের নিয়ম, এ কি আপনার বাপ-মায়েরা জানেন না? বলিয়া

হিন্দুস্থানীদের যেটি সকলের বড় তাহার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, তুম-লোক খাড়া কাহে হ্যায়?

সে বলিল, হামারা খুশি!

তাহাদের চোখের পানে চাহিলেই বুঝা যায় তাহারা হয় ভাঙ, না হয় গাঁজা, না হয় দুই-ই সেবন করিয়াছে।

সতীশ হাত তুলিয়া সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিয়া সংক্ষেপে কহিল, যাও—

উত্তরে লোকটা মুখখানা অতি বিকৃত করিয়া কহিল, আরে, যাও রে—

প্রত্যুত্তরে সতীশ তাহার গালের উপর এমন একটা চড় কশাইয়া দিল যে, সে ঐ 'রে' শব্দটাই আর একটুখানি টানিবার অবসর পাইল মাত্র, তার পরে অজ্ঞান হইয়া পথের উপর ঘুরিয়া শুইয়া পড়িল; এবং সেই মুহূর্তেই তাহার পাশের নিরীহ গোছের রোগা ছোকরাটা বিনাদোষে সতীশের বাঁ হাতের চড় খাইয়া প্রথমে টমটমের সহিসের বসিবার জায়গায় এবং তাহার পরে চাকার তলায় চোখ বুজিয়া বসিয়া পড়িল। বাকী কয়েকজন কতক বা নেশার গুণে, কতক বা চড়ের কল্যাণে হতবুদ্ধির মত চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সতীশ সুমুখের লোকটাকে আহ্বান করিয়া বলিল, অব্ তুম আও—

প্রত্যুত্তরে সে বিদ্যুদ্বেগে সকলের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল।

সতীশ তখন মেয়েটিকে কহিল, উঠুন—

মেয়েটি নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল। সতীশ কহিল, জল এলো বলে—আসুন আমার সঙ্গে।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে কহিল, আমি কি টাউন পর্যন্ত হাঁটিতে পারব?

সতীশ বলিল, টাউনে নয়, আমার বাসায়। ঐ বাগানের মধ্যে। জল আসচে, আর দাঁড়িয়ে ভাবলে হবে না। না যান ত এখানেই দাঁড়িয়ে ভিজুন—আমি চললুম।

মেয়েটি কহিল, চলুন না। আপনার সঙ্গে যাব তার আর ভাবব কি?

ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে শুরু করিয়াছিল এবং ঝড়ের বেগ মন্দীভূত হইলেও থামে নাই। দুইজনে কিছুক্ষণ নীরবে আসিয়া বাগানের গেটের সম্মুখে সতীশ সহসা থামিয়া কহিল, আমার বাসায় কিন্তু স্ত্রীলোক নেই—আমি একা থাকি।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে আপনার রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজ করে কে? নিজে?

না, চাকর আছে। কিন্তু তারাও স্ত্রীলোক নয়।

নাই হলো, কিন্তু আপনি দাঁড়ালেন কেন? যেতে যেতে বলুন না।

সতীশ কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, তাই বলচি যে আমার ওখানে স্ত্রীলোক নেই। এই রাত্রে ভিতরে যাবার পূর্বে আপনাকে জানানো উচিত।

মেয়েটি কহিল, যদি উচিত, তবে ওখানেই জানালেন না কেন? আমি কিন্তু আর দাঁড়াতে পারচি নে—আমার হাত-পা কাঁপচে। তা ছাড়া আমার বড় তেষ্টাও পেয়েছে।

আসুন আসুন, বলিয়া সতীশ অপ্রতিভ হইয়া অন্ধকার বাগানের মধ্যে পথ দেখাইয়া অগ্রসর হইল। এই-সমস্ত বিশ্রী ঘটনার পরে মেয়েটি যে কিরূপ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া সতীশ লজ্জা পাইল। একটু পরেই সে ধীরে ধীরে কহিল, আপনার গলা যেন কোথায় শুনেচি মনে হয়।

মেয়েটি তাহার জবাব দিল না। কিন্তু বুঝিতে পারিল, সতীশ অন্ধকারে তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই। বারান্দায় উঠিয়া সে সতীশের ভাঙ্গা আরাম-চেয়ারের উপর গিয়া বসিয়াই কহিল, সঙ্গে বেহারী আছে ত? বলিয়াই উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, বেহারী, আমার জন্যে এক গেলাস জল আন ত?

বেহারী ওদিকের ঘরে ছিল। ডাক শুনিয়া জল লইয়া উপস্থিত হইল। বারান্দার দেওয়ালের গায়ে মিটমিট করিয়া একটা কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, সেই ক্ষীণ আলোকেও সে মেয়েটিকে দেখিবামাত্র চিনিয়া সবিস্ময়ে কহিল, দিদিমণি, আপনি যে?

সে অনেক কথা, বলিয়া মেয়েটি নিজে উঠিয়া বেহারীর হাত হইতে জলের গেলাস লইয়া সমস্তটা এক নিশ্বাসে পান করিয়া বেহারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া কহিল, দাদাকে

খবর দিতে হবে যে বেহারী। ঠিকানা বলে দিলে, এই রাত্তিরে তুমি বাড়ি খুঁজে বার করতে পারবে কি?

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না দিদিমণি, আমি ত শহরের কিছুই চিনিনে। তা ছাড়া, বুড়োমানুষ, এই জল-ঝড় অন্ধকারে পথ চলতে পারব না।

তা হলে কি হবে বেহারী? ঘোড়াটা যদি গিয়ে আস্তাবলে ঢুকে থাকে, দাদা ভেবে সারা হয়ে যাবেন। কোন উপায়ে তাঁকে জানাতেই হবে যে ভয় নেই, আমি নিরাপদে আছি।

বেহারী চিন্তা করিয়া কহিল, আমাদের বামুনঠাকুর এই দেশের লোক, পথঘাট সব চেনে। জ্যোতিষ-সাহেবের বাসা বলে দিলে নিশ্চয় যেতে পারবে। তাকে গিয়ে ডেকে আনি, বলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

সতীশ চিনিল মেয়েটি কে। কহিল, দাদাকে একখানা চিঠি লিখে দিন।

মেয়েটি কহিল, সে ত দিতেই হবে।

সতীশ বলিল, অমনি লিখে দেবেন, বোনকে মেমসাহেব করে তোলবার ফলটা আজ কি হয়েছিল, সাহেব-মানুষ শুনলে হয়ত খুশীই হবেন।

খোঁটা খাইয়া সরোজিনী ক্রুদ্ধ হইল। তাহার আজিকার আচরণ দৈব-বিড়ম্বনায় অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, এবং সেজন্য তাহার নিজেরও অনুশোচনা কম হয় নাই, কিন্তু, আর একজন তাই বলিয়া বারংবার মেমসাহেবের সহিত তুলনা করিয়া বিদ্রূপ করিলে সহ্য যায় না। সে তিক্তস্বরে জবাব দিল, দাদাকে আপনিই লিখে দিন, তাঁর বোনকে কি বিপদে আজ একাকী রক্ষা করেছেন।

তাঁহার বিরক্তির হেতুটা সতীশ বুঝিল। কিন্তু নিজে এই-সকল সাহেবিয়ানা সে একেবারে দেখিতে পারিত না। বলিল, লেখাই উচিত। তবু যদি আপনাদের সমাজের একটু চেতনা হয়।

সরোজিনী কহিল, আমাদের সমাজের প্রতি আপনার খুব ঘৃণা—না? ধারণা এই যে আমরা মানুষ নই?

সতীশ বলিল, আমার ধারণা যাই হোক, নিজেদের ধারণা আপনারা ছাড়া বাঙলাদেশে আর মানুষ নেই, এই না?

সরোজিনী কহিল, অন্ততঃ আমাদের মধ্যে এ ধারণা যাঁদের আছে, আমি তাঁদের দোষ দিইনে।

সতীশ বলিল, সে জানি। সেই জন্যেই আজ আপনার শাস্তি আরো ঢের বেশী হওয়া উচিত ছিল। ওখানে আপনাকে চিনতে পারলে আমি চুপ করে চলে আসতাম—কথাও কইতাম না।

সরোজিনী কহিল, শাস্তিটা কি শুনি? অপমান আর অত্যাচার—এই ত?

সতীশ কহিল, তাই।

সরোজিনী কহিল, তা হলে এতক্ষণে বুঝতে পেরেচি, কেন বলছিলেন অসহায় স্ত্রীলোকের অপমান করাটাই আপনাদের দেশী লোকের চরিত্র। আপনার উচিত ছিল আমার বাকী অপমানটা বাড়িতে এনে নিজেই করা। এখন চেনা লোক বলে বাধচে বলেই আপনার রাগ।

সরোজিনীর কথার ঝাঁজে সতীশ রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল। কহিল, ঠিক তাই। আপনাকে অপমান করতে না পেরেই আমার যত রাগ। আমাদের বাঙ্গালা ভাষায় কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে। আপনাদের সাহেব-মেমের অভিধানে সে কথাটাও হয়ত লেখা নেই।

সরোজিনীর ওষ্ঠাধরে একটা চাপা-হাসির ছটা মেঘাবৃত বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। তবুও সে ক্রোধের স্বরেই জবাব দিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর এত বেশী কৃত্রিম যে তাহা অতি বড়, অমনোযোগী শ্রোতার কানেও ঠেকে। সরোজিনী বলিল, না নেই। এই সাহেব-মেমগুলো যেমন অকৃতজ্ঞ, তেমনি পাষণ্ড। আপনি দলে না এলে তাদের পরিত্রাণের উপায় নেই। আসবেন তাদের দলে?

প্র[illegible]শও হাসি চাপিয়া কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, এমনি সময়ে বেহারী হনুমান পাঁড়েজীকে আনিয়া হাজির করিল। সরোজিনী হাতের ব্যাগটা খুলিয়া গোটা-

পাঁচেক টাকা বাহির করিয়া চেয়ারের হাতার উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, এই তোমার বকশিশ পাঁড়েজী, যদি এখনি শহরে গিয়ে একটা চিঠি দিয়ে আসতে পার,—বলিয়া সে নাম-ধাম যথাশক্তি নির্দেশ করিয়া দিল।

পাঁড়েজী তাহার এক মাসের আয়ের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া একমুহূর্তে রাজী হইয়া পত্রের জন্য হাত বাড়াইল। তাহার প্রসারিত করকমলে সরোজিনী টাকা কয়টি অর্পণ করিয়া চিঠি লিখিবার জন্য ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। লিখিবার টেবিল সম্মুখেই ছিল। অনতিকাল পরে সে পত্র আনিয়া পাঁড়েজীর হাতে দিল। পাঁড়েজী সাবধানে তাহা মেরজাইয়ের মধ্যে রক্ষা করিয়া বাম-হস্তে হারিকেন লণ্ঠন এবং ডান-হস্তে সুদীর্ঘ বংশ-যষ্টি গ্রহণ করিয়া বাহিরের মুষলধার-বারিপাতের মধ্যে চক্ষের পলকে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বেহারী কুণ্ঠিতভাবে কহিল, বাবু, ঠাকুর কখন যে ফিরবে তার ঠিক নেই—রান্নার কি হবে?

সতীশ সরোজিনীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া কথাটাকে চাপা দিবার জন্য তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, ওঃ—সে হবে তখন।

বেহারীর উদ্বেগ তাহাতে কিছুমাত্র কমিল না। বলিল, কি করে হবে, আমি ত ঠাউরে পাইনে বাবু।

সতীশ অপ্রসন্ন হইয়া কহিল, তোর ঠাওরাতে হবে না বেহারী, তুই যা না। সে-সব আমি ঠিক করে নেব। তাছাড়া, আজ আমার ক্ষিদেও নেই।

বেহারী এক পা-ও নড়িল না। কারণ কথাটা সে একেবারে বিশ্বাস করিল না। কারণ, একে ত সাধারণ পাঁচজনের অপেক্ষা মনিবের ক্ষুধার পরিমাণ বেশী, তা ছাড়া এতদিনের চাকরির মধ্যে সে তাঁহার এই বস্তুটার অভাব একটা দিনও লক্ষ্য করে নাই। সংক্ষেপে কহিল, সে কি হয় বাবু!

সতীশ তিরস্কার করিয়া বলিল, এই তোর দোষ বেহারী, তুই সব কথায় তর্ক করিস। বলছি সে-সব ঠিক করে নেব, তুই যা, তা নয়, মুখের ওপর দাঁড়িয়ে সমানে জবাব করচিস।

বেহারী ক্ষুব্ধচিত্তে চলিয়া যাইতেছিল, সরোজিনী ডাকিয়া ফিরাইয়া কহিল, আজ আমার জন্যেই তোমাদের যত বিপদ বেহারী। রান্নার যোগাড় কি কিছু হয়নি?

বেহারী কহিল, হবে না কেন দিদিমণি, কিন্তু রাঁধবে কে? ঠাকুরের ফিরে আসতে যে কত দেরি হবে তার ত ঠিকানা নেই। বলিয়া অপ্রসন্নমুখে চলিয়া গেল।

সরোজিনী কহিল, মেমসাহেব যা যাই হই, তবু আপনার সঙ্গে একই জাত ত। তার হাতে খেলে কি কারো জাত যাবে?

প্রশ্ন শুনিয়া সতীশ হাসিল। কহিল, জাত যাবে কিনা বলতে পারিনে, কিন্তু মেমসাহেবের হাতের রান্না গলা দিয়ে যাবে কি না সেইটেই আসল কথা।

ইস! তাই বৈ কি! মেমসাহেবের হাতের রান্না খেলে তিনি ভুলতে পারবেন না, বলিয়া সরোজিনী হাসি ও এসেন্সের গন্ধে সমস্ত স্থানটা যেন তরঙ্গিত করিয়া ত্বরিৎপদে উঠিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে যখন সে বাহির হইয়া আসিল, তখন তাহার পানে চাহিয়া সতীশ ক্ষণকালের জন্য মুগ্ধ হইয়া রহিল।

জুতা-মোজার পরিবর্তে পা-দুখানি খালি, রেশমের জামা-কাপড়ের বদলে শুধুমাত্র শেমিজের উপর সতীশের একখানি সাদাসিধে লালপেড়ে ধুতি পরা। দেখিয়া সতীশের দুচক্ষু জুড়াইয়া গেল। সে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া ফেলিল, কি চমৎকারই আপনাকে মানিয়েচে! যেন লক্ষ্মীঠাকরুনটি!

কথা শুনিয়া সরোজিনীর শিরার মধ্যে আনন্দের বান ডাকিয়া গেল। কিন্তু দারুণ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া কহিল, যান—ঠাট্টা করলে রাঁধব না বলে দিচ্ছি। তখন উপোস করতে হবে।

কিন্তু এই লজ্জার প্রকাশটাকে সে তৎক্ষণাৎ দমন করিয়া ফেলিল। কারণ সে জানিত, লজ্জাকে প্রশ্রয় দিলে তাহা উৎকট হইয়া উঠে। তাই মাথা তুলিয়া সহাস্যে কহিল, সুখ্যাতি পরে হবে। এখন রান্নাঘরটা কোন পাড়ায়, দেখিয়ে দিতে বলে দিন। বলিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া গেল।

ঊনত্রিশ

রাঁধা এবং খাওয়া শেষ হইয়া গেল, বারান্দায় দুখানা চেয়ারে দুজনে মুখোমুখি বসিয়া ছিল।

সরোজিনী কহিল, একটা কথা আমাদের কারো মনে হলো না যে, দাদার বাড়ির ঠিকানা ঠাকুর যদি না পায় ত নিজেই একটা গাড়ি ডেকে আনবে। কিন্তু, তা না হলে কি হবে সতীশবাবু?

সতীশ কহিল, কথাটা মনে হলেও বিশেষ কোন কাজ হতো না। এত রাত্রে, এত দূরে কোন গাড়িওয়ালাই বোধ করি আসতে চাইত না। হয় আপনাকে এইখানেই রাত্রিবাস করতে হবে, না হয় হাঁটতে হবে। এ-ছাড়া তৃতীয় উপায় নেই।

আমি হাঁটতে পারি, কিন্তু আপনি ছাড়া কারো সঙ্গে নয়।

তার মানে? আমার সঙ্গে গেলেই কি বিপদের সম্ভাবনা নেই?

নেই কেন, আছে। কিন্তু তার সব ভার আপনার উপরে। জবাবদিহি আপনাকেই করতে হবে, আমাকে নয়।

সতীশ কহিল, আমাকে জবাবদিহি করতে হবে কেন? আমার অপরাধ?

আর কারো কাছে না করুন, নিজের কাছে ত করতে হবে! বলিয়া হঠাৎ সরোজিনী স্তব্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

সতীশ আর তাহার প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করিল, দু'জনের ক্ষণিক নীরবতার মাঝখান দিয়া লজ্জার একটা দমক, বাতাস বহিয়া গেল।

কে আসছে না?—বলিয়া সরোজিনী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া অন্ধকার বাগানের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খানিক পরে সে যখন 'কেউ না', বলিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং কাপড়চোপড় আর একবার বেশ করিয়া সামলাইয়া লইয়া উপবেশন করিল, তখন সতীশ কোন কথাই কহিতে পারিল না।

অতঃপর উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তখন বাহিরে ঝড় থামিলেও বৃষ্টি থামে নাই। মাথার উপরে অন্ধকার আকাশ এবং চারিদিকে মহুয়ার বনের মধ্যে সে অন্ধকার দশগুণ গভীর হইয়াছিল। তাহারই একান্তে স্বল্পালোকিত বারান্দার উপর এই দুটি তরুণ-বয়স্ক নর-নারী মুখোমুখী বসিয়াও কথার অভাবে যখন নীরব হইয়া রহিল, তখন আর একটি অন্ধ দেবতা অলক্ষ্যে থাকিয়া নিশ্চয়ই মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং সেই চাপা হাসির দীপ্তি কালো মেঘের আড়ালে রহিয়া রহিয়া খেলা করিতে লাগিল।

বাহিরের প্রকৃতি তাহার আকাশ-বাতাস-আলো-অন্ধকারের লীলায় মানুষের মনোভাব ও হৃদয়বৃত্তিকে যে কেমন করিয়া টানিয়া লইতে পারে, সতীশ কিছুকাল পূর্বে একদিন রাত্রে তাহার পরিচয় পাইয়াছিল। সেদিন বেহারীর মুখে বিপিনের সহিত সাবিত্রীর গৃহ-ত্যাগের সংবাদ পাইয়া তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ দুঃখের সাগরে ডুবিয়া গেছে মনে করিয়া সে যখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া একাকী ছুটিয়া গিয়া কেল্লার জনহীন নীরব প্রান্তরের মধ্যে শুইয়া পড়িয়াছিল, তখন, এমনিই কালো আকাশ তাহার শীতল হাতখানি দিয়া সতীশের সমস্ত জ্বালা মুছিয়া দিয়া, সেই সাবিত্রীকেই ক্ষমা করিতে শিখাইয়া দিয়াছিল। আবার, আজিকার এই উদ্দাম-চঞ্চল বহিঃপ্রকৃতি তাহার সমস্ত সজীবতার স্পর্শ দিয়া, সতীশের নিরাশা-পীড়িত চিত্তকে আজ আবার আর এক পথে দুর্নিবার বেগে ঠেলিতে লাগিল।

সরোজিনী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আপনার এই বনবাসের অর্থটা কি?

সতীশ কহিল, অর্থ একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে।

তা ত আছে। কিন্তু, কাউকে না বলে পালিয়ে এলেন কেন?

কিন্তু পালিয়ে এসেচি এ খবর কে দিলে?

সরোজিনী একটুখানি হাসিয়া কহিল, এ খবর আমি নিজেই আবিষ্কার করেচি! আপনি যেদিন সকালে চলে এলেন, আমি নিজেই সেদিন আপনার বাসায় গিয়েছিলুম।

সতীশ বিস্মিত হইয়া বলিল, বুঝেছি। উপীনদা বোধ করি আমাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন, আর আপনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি যে যাবেন, সে আমি জানতাম, কিন্তু আমি নেই দেখে কি বললেন তিনি?

সরোজিনী কহিল, নিশ্চয় কিছু বলেছিলেন, কিন্তু আমি শুনিনি। কারণ, তিনি নিজে সেখানে যাননি, আমাকে দিয়ে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে?

সরোজিনী বলিল, আমি গিয়ে শুনলুম আপনি সকালের গাড়িতে চলে গেছেন। কি মনে হলো, বামুনঠাকুরকে বলে দরজা খুলিয়ে সমস্ত বাসাটা ঘুরে ঘুরে দেখলুম। বাইরের বারান্দায় একখানা শাড়ি শুকোচ্ছিল, জিজ্ঞাসা করে শুনলুম, এ কাপড় মাইজীর। তাঁর অসুখ, আপনি তাঁকে নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছেন। আচ্ছা, তিনি কে? কৈ, এ বাসায় ত তাঁকে দেখছি নে?

সতীশ পাংশু-মুখে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া কহিল, বামুনঠাকুর বললে, আমি তাঁকে নিয়ে পশ্চিমে গিয়েছি? রাস্কেল! মিথ্যাবাদী! উপীনদা তাই বিশ্বাস করলেন?

সতীশের মুখের চেহারা এবং কণ্ঠস্বর শুনিয়া সরোজিনী আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, উপীনবাবু ত ছিলেন না। আর বিশ্বাস করলেই বা দোষ কি? এ মাইজী আপনার কে সতীশবাবু?

সতীশ রুক্ষ হইয়া বলিল, আমার আবার কে? কেউ না, আমাদের সাবেক বাসার দাসী। শয়তান বদমাইস মেয়েমানুষ। বুড়ো-বয়সে ব্যারামে মরচে, তাই এসেছিল কিছু ভিক্ষে চাইতে। আমি তাকে নিয়ে পশ্চিমে চলে গেছি! হারামজাদা বেটা আমার মুখের সামনে এ কথা বললে তার—

সরোজিনীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, দাসী! কিন্তু, তাতে আপনি এত উত্তেজিত হচ্চেন কেন?

সতীশ কহিল, অন্যায় অপবাদ দিলে কে উত্তেজিত না হয় বলুন?

তিনি সে রাত্রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন?

সতীশ ঠিক তেমনি উত্তপ্ত-স্বরে কহিল, হাঁ পড়েছিল; কিন্তু তাতেই বা কি? তার অজ্ঞান হওয়াটা কি আমার অপরাধ? আর আপনিই বা তার সম্বন্ধে এত সসম্মানে কথা কইচেন কেন? বাড়ির দাসী-চাকরকে কি আপনারা 'আপনি' 'আজ্ঞা' করে কথা বলেন?

সরোজিনী ইহার উত্তর দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এতক্ষণ পর্যন্ত তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে আনন্দের চাঁদ উঠিয়াছিল, কোথা হইতে কালো মেঘ আসিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দিল। একবার তাহার মনের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগিল, কেন সে-রাত্রে উপেন্দ্র তাহার বাসায় সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গিয়াছিলেন,—কিন্তু প্রশ্ন করিল না। মনে মনে সে একপ্রকার বুঝিয়াছিল—ইহাতে এমন একটা কিছু আছে যাহা উপেন্দ্র নিজেও প্রকাশ করিতে পারে নাই এবং সতীশও পারিবে না।

কিন্তু এই ক্ষুব্ধ নীরবতা উভয়কেই যেন পীড়িত করিতে লাগিল। আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া সরোজিনী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করতে পারি?

সতীশ ঈষৎ অভিমানের সুরে কহিল, কি কথা?

আপনি এতদিন আমাদের এত কাছে থেকেও কখনো দেখা দেননি কেন?

সতীশের তরফে এ প্রশ্নের জবাব ছিল না। কহিল, নানা কারণে সময় পাইনি।

কারণটা কি? লেখাপড়া?

না, লেখাপড়া আমার নামমাত্র। তাতে আমাকে কোনদিন কোথাও যেতে বাধা দেয় না।

তবে?

সতীশ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, দেখুন, সত্যি কথাটা আপনাকে বলতে পারি। আপনাদের কথা কখনো যে আমার মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু কি জানেন, আমাদের যে-রকম সমাজ, যে-রকম তার শিক্ষা, তাতে আপনাদের মধ্যে যেতে কেমন একটা বাধ-বাধ ঠেকে। বোধ হয় এই জনাই যেতে পারিনি।

সরোজিনী কহিল, বোধ হয়! কিন্তু, কি-রকম আপনাদের সমাজের শিক্ষা একটু শুনতে পাই কি? উপীনবাবুদের সমাজের সঙ্গে বোধ করি তার বিশেষ কোন মিল নেই, কারণ, তাঁর মেলামেশা করতে বাধে না।

সতীশের বাসার সেই অজ্ঞাত স্ত্রীলোকটির প্রসঙ্গ উত্থিত হওয়া পর্যন্তই তাহার অন্তরে একটা জ্বালা ধরিয়াছিল। এই এলোমেলো কৈফিয়তে সেই ঈর্ষার দাহ আরও একমাত্রা বাড়িয়া গেল। সতীশকে সে লুকাইয়া না ভালবাসিলে ইহার সমস্ত লুকোচুরিটা হয়ত তাহার কাছে লুকানই থাকিত, কিন্তু প্রণয়ের অন্তর্দৃষ্টিকে অত সহজে প্রতারিত করা গেল না। ব্যাপারটা ঠিক না জানিয়াও তাহার হৃদয় কেমন করিয়া যেন আসল কথাটা বুঝিয়া লইল। সতীশ ব্যথিত বিস্ময়ের সহিত সরোজিনীর প্রতি চাহিল। তাহার কণ্ঠস্বরে কলহের চাপা সুরটা সতীশের কানের মধ্যে তীক্ষ্ণভাবে বাজিয়া সাবিত্রীকে স্মরণ করাইয়া দিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সরোজিনীও যে তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিতে পারে এমন সম্ভাবনা সতীশের মনে স্বপ্নেও উদয় হইল না। সুতরাং তাহার এই উত্তপ্ত প্রশ্নোত্তর-মালার যথার্থ হেতু সে সত্যকার আলোকে দেখিতে পাইল না। ইহাকে উচ্চশিক্ষিতা রমণীর নিছক স্পর্ধিত অভিমান কল্পনা করিয়া সে নিজেও মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল এবং জবাবও দিল তেমনি করিয়া। কহিল, উপীনদার সমাজ ও শিক্ষা যে কি, সে ত বেশ জানেন! কিন্তু, তবুও তিনি হয়ত আপনাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন, কিন্তু, আর কেউ না পারলে তাকে জবাবদিহি করতে হবে এর কোন মানে নেই। যাই হোক, আমাকে মাপ করবেন, এ-সব আলোচনার আমি কোন সার্থকতা দেখতে পাইনে।

সরোজিনী স্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং সতীশও নিঃশব্দে অধোমুখে চুপ করিয়া রহিল।

একটা গাড়ি আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং জ্যোতিষবাবু উচ্চকণ্ঠে সতীশের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে আলোক ও লোকজন সঙ্গে বাগানে প্রবেশ করিলেন।

অসংখ্য ধন্যবাদ, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ইত্যাদি যথারীতি সমাধা করিয়া জ্যোতিষ যখন ভগিনীকে লইয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন, তখন সতীশ সরোজিনীকে প্রশ্ন করিল, একটা খবর আপনাকে আমার জিজ্ঞাসা করা হয়নি। হারানবাবু বলে উপীনদার একজন বন্ধু ছিলেন, তাঁর কি হয়েছে বলতে পারেন?

জ্যোতিষ আশ্চর্য হইয়া তাহার জবাব দিলেন, বাঃ, আপনি শোনেন নি? তিনি ত মারা গেছেন।

সংবাদ শুনিয়া সতীশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, তাঁর মা, তাঁর স্ত্রী এঁরা কোথায় আছেন জানেন?

সরোজিনী ইহার উত্তর দিল। কহিল, তাঁরা বাড়িতেই আছেন। স্থির হয়েচে, দিবাকরবাবু তাঁদের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়বেন—তিনি তাঁদের ভার নেবেন।

জ্যোতিষ হঠাৎ ভগিনীকে প্রশ্ন করিলেন, হারানবাবুর স্ত্রী আমাদের বাড়িতে একদিন এসেছিলেন না?

সরোজিনী কহিল, হাঁ, অনেকক্ষণ ছিলেন, অনেক কথাবার্তা করেছিলেন।

তাহার নিজের কথা কি হইয়াছিল, স্বামীর শোক বৌঠান কিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন ইত্যাদি জানিবার জন্য সতীশ সরোজিনীর মুখের প্রতি একটা উৎসুক-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কারণ, তাহার নিজের সম্বন্ধে আলোচনা যে খরতর হইয়াছিল, তাহাতে তাহার সংশয় ছিল না। কিন্তু সেই অস্পষ্ট আলোকে হয় সরোজিনী তাহার মুখের ইঙ্গিত বুঝিল না, না হয় বুঝিয়াও সতীশের কৌতূহল নিবৃত্তি করার প্রয়োজন বোধ করিল না। সে দাদাকে অগ্রসর হইবার জন্য একটুখানি ঠেলা দিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর দেরি করো না দাদা, চল—

হাঁ বোন চল, বলিয়া সতীশকে নমস্কার করিয়া বলিলেন, আর একবার অসংখ্য ধন্যবাদ সতীশবাবু। কাল-পরশু একদিন যেন গরীবের ওখানে পদধূলি পড়ে।

সতীশ প্রতি-নমস্কার করিয়া অব্যক্ত-স্বরে যাহা কহিল, তাহা বুঝা গেল না। সরোজিনী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সতীশকে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

সেই সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া এইবার সতীশের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ঠিক

কেন যে পড়িতে লাগিল, তাহা সে নিঃসংশয়ে অবধারিত করিতে পারিল না, কিন্তু, কেমন যেন একটা অনির্দিষ্ট অনুভূতি তাহাকে বারংবার জানাইতে লাগিল, তাহার সাবিত্রী, তাহার বৌঠান, তাহার উপীনদা সকলেই একই কালে তাহাকে চিরদিনের তরে বিসর্জন দিয়াছে। এই নির্জন কুটীর ছাড়িয়া তাহার যাইবার স্থান আর নাই।

ত্রিশ

মাস-দুই পূর্বে হারানের মৃত্যুর সময় দিবাকর মাত্র দুই-চারি দিনের জন্য কলিকাতায় বাস করিয়াই ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এবার কিরণময়ীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কলিকাতার কলেজে বি. এ. পড়িবে স্থির হওয়ায় তাহার নূতন কেনা স্টিলের তোরঙ্গ ভরিয়া কেতাব-পত্র এবং কাপড়-চোপড় লইয়া দিবাকর হারানবাবুর পাথুরেঘাটার বাড়িতে একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কিরণময়ী তাহাকে অল্পবয়স্ক ছোটভাইটির মত সস্নেহে গ্রহণ করিল।

মাতুলাশ্রমে সুরবালা ভিন্ন দিবাকরকে যত্ন করিবার কেহ ছিল না। আবার সে যত্নের মধ্যেও মহেশ্বরীর খরদৃষ্টি, শনির দৃষ্টির মত অনেক রস অনেক সময়ে শুকাইয়া শুষ্ক করিয়া দিত। কিন্তু এখানে সে-সকল কোন উৎপাতই ছিল না।

অযত্ন-পালিত টবের গাছ দৈবাৎ ধরণীর ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া অপর্যাপ্ত রসের আস্বাদে তাহার বুভুক্ষু শীর্ণ শিকড়গুলা যেভাবে মাটির মধ্যে সহস্র বাহু বিস্তার করিতে থাকে, কিরণময়ীর আশ্রয়েও দিবাকরের ঠিক সেই মত হইল।

মহানগরীর বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া দেখিতে দেখিতে তাহার সংকুচিত আশা ও সঙ্কীর্ণতর ভবিষ্যৎ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। নিজেকে সে বড় করিয়া অনুভব করিল। বি. এ. ফেল করিয়া বিদ্যাভ্যাসের পুরাতন বন্ধন তাহার ছিন্ন হইয়াছে অথচ নূতন বন্ধনের এখনও বিলম্ব আছে, এই মধুর অবকাশ-কালটায় সে নিরন্তর সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্ঞান আহরণ করিতে লাগিল।

সে থিয়েটার দেখিয়া আসিয়া স্বপন দেখিল, জু দেখিয়া অবাক হইল, মিউজিয়ম দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, শিবপুরে সরকারী বাগান দেখিয়া প্রবন্ধ লিখিল, প্রাসাদতুল্য সৌধশ্রেণীর দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল; অবশেষে একদিন গাড়ি চাপা পড়িয়া পা মচকাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

আঘাত যৎসামান্য। কিরণময়ী তাড়াতাড়ি চুন-হলুদ গরম করিয়া আনিয়া প্রলেপ দিতে দিতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, কি চাপা পড়লে ছোট্‌ঠাকুরপো? ঘোড়ার গাড়ি, না গরুর গাড়ি?

দিবাকর মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, ঘোড়ার গাড়ি।

কিরণময়ী কহিল, তবু রক্ষা। নইলে এই খোঁড়া-পা নিয়ে আবার জরিমানা দিতে থানায় যেতে হতো।

দিবাকর লজ্জিত-মুখে বলিল, কিছুই লাগেনি, এ কাল সকালেই সেরে যাবে।

কিরণময়ী কহিল, তা যাবে। কিন্তু বেশী দূরে আর যেয়ো না। শুনচি নাকি একদল ছেলেধরা কলকাতায় এসেচে।

এমনি করিয়া দিন কাটিতেছিল; অঘোরময়ী নানা তীর্থে ঘুরিয়া একদিন বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। ইতিপূর্বে যে দু-একদিন তিনি দিবাকরকে দেখিয়াছিলেন তখন পুত্র-শোকে হৃদয়-মন এমনি মুহ্যমান ছিল যে, ইহার মুখখানা চোখেই পড়ে নাই। আজ এই শ্মশ্রুগুম্ফহীন নধরকান্তি চারুদর্শন ছেলেটির পানে চাহিবামাত্রই তাঁহার মায়ের প্রাণ স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল। বলিলেন, দিবু, আমি সম্পর্কে তোর মাসীমা হই, আমাকে মাসীমা বলে ডাকিস বাবা!

ইহারও মা-বাপ বাঁচিয়া নাই শুনিয়া তাহার দুচক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল এবং বড় বড় দু'ফোটা চোখের জল অঞ্চলপ্রান্তে মুছিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, ভগবান আমার

হারানকে কেড়ে নিয়েও যদি হতভাগিনীকে বাঁচিয়ে রাখলেন, তবে যে কটা দিন বাঁচি, তুই বাবা আমাকে ছেড়ে কোথাও যাসনে। বলিয়া হাত দিয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া নিজের অঙ্গুলি-প্রান্ত চুম্বন করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া এবং চোখের জল দেখিয়া দিবাকর নিজের চোখের জল লুকাইয়া সুমুখ হইতে সরিয়া গেল। ইহার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁহার দিবাকরের প্রতি অপত্যস্নেহ, যাদুকরের মায়াতরুর মত শাখায় পল্লবে বাড়িয়া উঠিল। আসল কথা এই যে, এই পুত্রহীনা জননী কিছুকাল প্রবাস-যাপনের পর বাটী ফিরিয়া পুত্রের অভাবটা সমস্ত হৃদয় দিয়া পূর্ণ করিয়া লইতে চাহিলেন। এই বাটীতেই মাস-কয়েক পূর্বে যখন তাঁহার নিজের ছেলে মরিয়াছিল, তখন সেই সর্বগ্রাসী নিষ্ঠুর শোকই তাঁহার মাতৃত্বের খোরাক যোগাইয়া কোনমতে তাঁহাকে খাড়া রাখিয়াছিল, এখন সেই শোক অপেক্ষাকৃত শান্ত হওয়ায় তাঁহার ক্ষুধাতুর মাতৃ-হৃদয় সন্তানের অভাবে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। সন্তান-পরিত্যক্ত সেই শূন্য সিংহাসনে দিবাকরকে তিনি অত্যন্ত সমারোহে অভিষিক্ত করিয়া লইলেন।

একদিকে তিনি এবং অপরদিকে কিরণময়ী—এই দুজনের মাঝখানে পড়িয়া এ বাটীতে দিবাকরের যত্ন-আদরের আর অবধি রহিল না।

ক্ষুধা না থাকিলে যে কৈফিয়ত দিতে হয়, সামান্য অসুখেও পুনঃ পুনঃ জবাবদিহি করিতে হয়, স্নেহের এই-সকল নিগূঢ় রহস্য তাহার এই বিংশবর্ষব্যাপী জীবনে আদৌ জানা ছিল না। জীবনের এই আকস্মিক পরিবর্তনের প্রথম কয়েকটা দিন তাহার বাধ-বাধ ঠেকিয়াছিল, চিরাভ্যস্ত অনধিকারের সঙ্কোচ একদমে কাটিতে চাহে নাই, তথাপি অল্প-দিনেই তাহার বিশীর্ণ মন এই দুটি নারীর অপরিমিত স্নেহে অপরিমিতরূপে প্রসারিত হইয়া গেল। অবশেষে কোন একদিন যে তাহার বহু ক্লেশার্জিত দুঃখসহ অভ্যাসগুলি শুষ্ক ত্বকের মত দেহ হইতে অজ্ঞাতসারে ঝরিয়া পড়িয়া গেল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

এদিকে ক্রমশঃ যাহা দেখিবার ছিল, দেখা হইয়া গেল। পুনর্বার গাড়ি-চাপা পড়ার আর যখন সম্ভাবনা রহিল না, তখন সে সভা-সমিতিতে যোগ দিতে শুরু করিয়া দিল এবং সামান্য দিনেই এক মাসিকপত্রের উৎসাহী এবং মান্য লেখক হইয়া উঠিল। ছেলেবেলা হইতে তাহার গান-বাজনা এবং সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। 'হায়', 'আছিল' প্রভৃতি দিয়া কবিতা মিলাইতে পারিত, এখন দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় নাম দিয়া গল্প লিখিতে লাগিল। কতকগুলি কলেজের ছেলেরা মিলিয়া 'চন্দ্রোদয়' নাম দিয়া এক মাসিকপত্র বাহির করিয়াছিল, ইহাতেই দিবাকর মাতিয়া উঠিল।

এখন সে আর যখন তখন বাড়ির বাহির হয় না, তার ঢের কাজ। ভাঙ্গা ছাদের এক নির্জন কোণে খাতা পেনসিল লইয়া গম্ভীর-মুখে বসিয়া থাকে—স্নানাহারের কথা মনে থাকে না—বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া নামাইয়া আনিতে হয়। তাহার মানস-রাজ্যের এই নূতন উৎপাতগুলি অঘোরময়ী সভয়ে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, এ বাড়িরই দোষ! হারান আমার লিখে-পড়ে প্রাণটা দিলে, একেও দেখচি সেই রোগেই ধরেচে—না বাপু পরের ছেলে—

কিরণময়ী সমস্তই লক্ষ্য করিতেছিল, হাসিয়া কহিল, সে ভাবনা করো না মা, উনি যে লেখাপড়ায় মন দিয়েচেন, তাতে পরমায়ু কমে না, বরং বাড়ে।

ইহার কিছুদিন পরেই উক্ত 'চন্দ্রোদয়ে' 'বিষের ছুরি' গল্প বাহির হইল। 'সূর্যোদয়' পত্রিকা তাহার সমালোচনা করিয়া বলিলেন, বাঙালীর গৌরব, সুপ্রসিদ্ধ নবীন লেখক শ্রীযুক্ত দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত একখানি প্রেমের নিখুঁত ছবি।

অতঃপর এই নিখুঁত ছবিখানিতে কি কি আছে এবং সমালোচক মহাশয় কেমন করিয়া পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই এবং এইরকম আর একখানি দেখিবার আশায় কিরূপ উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন, উপসংহারে সে আভাসও দিয়াছেন।

এই নির্লজ্জ চাটুতাকে নিরপেক্ষ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দিবাকর তিলার্ধ ইতস্ততঃ করিল না। তাহার কারণ এই যে, মানব-জীবনের যে সময়টায় আশা এবং আকাশকুসুম কল্পনার মাতৃক্রোড় ছাড়িয়া পৃথক হইয়া দাঁড়ায় নাই, এটা তাহার সেই অবস্থা—প্রথম

যৌবন। ইতিমধ্যেই সে দুই-চারিজন ভক্ত বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে সাহিত্যের জরির টুপি মাথায় পরিয়া বসিয়াছিল, 'সূর্যোদয়ে'র সম্পাদক তাহারই চারিপাশে একছড়া পুঁতির মালা জড়াইয়া দিলেন।

এই অপরূপ সাহিত্যের কিরীট মাথায় পরিয়া দিবাকর একদিন সকালে গর্বোজ্জ্বল মুখে রান্নাঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাতে তাহার সেই 'সূর্যোদয়' কাগজখানা।

কহিল, বৌদি, বড় ব্যস্ত নাকি?

কিরণময়ী রাঁধিতেছিল, বলিল, না, আর বড় ব্যস্ত নই ভাই—প্রায় শেষ হলো। তোমার হাতে ও কাগজখানা কি ছোট্‌ঠাকুরপো?

ওঃ, এখানা? এটা একটা মাসিকপত্র—'সূর্যোদয়'—নূতন বেরুচ্চে। কিন্তু যাই বল বৌদি, লিখচে বেশ।

কিরণময়ী 'সূর্যোদয়ে'র অস্তিত্বও অবগত ছিল না, আগ্রহ সহকারে বলিল, সত্যি? তা হলে একবার দেখবো।

এখনি দেখবে?

না এখন নয়—আমার বিছানায় রেখে দাও গে—দুপুরবেলা দেখব।

দুপুরবেলা কাজকর্ম খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে কিরণময়ী 'সূর্যোদয়' খুলিয়া বসিল। এদিকে-ওদিকে চাহিতে চাহিতে ঠিক জায়গাটাতেই চোখ পড়িয়া গেল। দিবাকর পাশের ঘরেই ছিল, উঠিয়া গিয়া তাহাকে কহিল, কৈ ঠাকুরপো, 'বিষের ছুরি' কৈ? সমালোচনা দেখালে, এবার আসল জিনিস বার করো।

দিবাকর সলজ্জ বিনয়ের সহিত কহিতে লাগিল, ওঃ, সেই গল্পটা তা—ও—সে—কিছুই নয় বৌদি—তাড়াতাড়ির লেখা—

কিরণময়ী হাসিয়া বলিল, তা হোক, দাও, বলিয়া নিজেই খুঁজিয়া পাতিয়া 'চন্দ্রোদয়' পত্রিকাখানি টানিয়া বাহির করিয়া সেইখানেই সেটা খুলিয়া একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। সে নিঃশব্দে পড়িতে লাগিল, কিন্তু দিবাকর আশা ও আকাঙ্ক্ষার তীব্র উত্তেজনা গোপন করিয়া মিছামিছি একখানা বইয়ের পাতা উলটাইতে লাগিল। তাহার 'বিষের ছুরি' গল্পের নায়িকা অসামান্যা সুন্দরী এবং ষোড়শী। ধনবান জমিদার-কন্যা হইয়াও দৈবচক্রে এক দরিদ্র রূপবান যুবককে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছেন। জমিদার ঘটনা অবগত হইয়া নায়ক বিজয়েন্দ্রকুমারকে দেশছাড়া করিয়াছে। কিন্তু, নগেন্দ্রনন্দিনী কিছুই জানে না—বসন্ত-সন্ধ্যায় মালতীকুঞ্জে বসিয়া আপন মনে মালা গাঁথিতেছে। ওদিকে রূপে মুগ্ধ পূর্ণচন্দ্র গাছের আড়ালে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে, কিন্তু আকাশে উঠিতে সাহস করিতেছে না। প্রভাত কল্পনা করিয়া মধ্যে মধ্যে কোকিল কুহুকুহু করিয়া উঠিতেছে, উপরে লুব্ধ ভ্রমর গুনগুন করিয়া নিদ্রালসা মালতীর ঘুম ভাঙ্গাইতেছে। এমন সময় ধীরে ধীরে কে আসে ওই? বিজয়েন্দ্র না? হাঁ, সেই বটে! কিন্তু এ কি বেশ? গেরুয়া বস্ত্র, কপালে বিভূতি, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষ যে! নগেন্দ্রনন্দিনীর হাত হইতে মালতীর মালা পড়িয়া গেল। বিজয়েন্দ্র নিকটে আসিয়া গদগদকণ্ঠে কহিল, বিদায়! চলিলাম!

নগেন্দ্রনন্দিনীর মস্তকে যেন সহসা বজ্রপাত হইল। বক্ষে লক্ষ লক্ষ বৃশ্চিক দংশন করিয়া উঠিল। মনে হইল, হৃৎপিণ্ড যেন শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। তাহার চোখে চাঁদের আলো মসীবর্ণ হইয়া গেল, কর্ণবিবরে কুহুধ্বনি পেচক-চীৎকারে পরিণত হইল। যুবতী আর দাঁড়াইতে পারিল না—ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

এ পর্যন্ত পড়িয়া কিরণময়ী সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, ছোট্‌ঠাকুরপো নিশ্চয়ই কাউকে ভালবাস? না?

দিবাকর আশ্চর্য হইয়া বলিল, আমি?

হাঁ গো তুমি; নিশ্চয়ই তুমি লুকিয়ে কাউকে ভালবাস।

এই আকস্মিক অপবাদের প্রবল লজ্জায় দিবাকর হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মুহূর্তকাল পরে কুণ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়া প্রতিবাদ করিয়া উঠিল, আমি? ছিঃ—রাম বল—কখ্‌খন না—কিছুতেই না—

না! ঠাকুরপোকে কোনদিন বৃশ্চিক দংশন করেনি?

না—কোনদিন না।

কিরণময়ী কহিল, আশ্চর্য! কাউকে কোনদিন দংশন করতেও দেখনি?

না, তাও দেখিনি।

কিরণময়ী অধিকতর আশ্চর্য হইয়া বলিল, হৃদয়ও যে তোমার কোনদিন শতধা বিদীর্ণ হয়েছে, তাও মনে হচ্চে না। কোনদিন ভালবাস নি, একটি ছোট্ট বৃশ্চিকও কখনও চোখে দেখনি, বজ্রাঘাতের ব্যথাও যে কেমন, তাও জান না, তবে বিরহ যে এমন ভয়ানক টের পেলে কি করে?

কিরণময়ী যে তাহাকে কোন্ দিকে ঠেলিতেছিল, দিবাকর ক্রমশঃ তাহা বুঝিতেছিল—মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিল, তা বুঝি জানা যায় না?

কিরণময়ী বলিল, কেমন করে যায় আমি ত জানিনে—কিন্তু শুনে কিংবা পরের বই থেকে চুরি করে লেখা যায়—সে কথা ঠিক।

দিবাকর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, আমি কি চুরি করেছি বলতে চাও?

কিরণময়ী সহাস্যে কহিল, তাই চাই। চুরি করেচ ত নিশ্চয়ই, তা ছাড়া চুরি যে করেচ, তাও টের পাওনি এমনি অন্ধ তুমি। রাগ করো না ঠাকুরপো, কিন্তু এক বৃশ্চিক আর বজ্রাঘাত ছাড়া হাতে তোমার আর কোন সম্বল নেই; এইটুকুমাত্র পুঁজি নিয়ে এই সমুদ্রে পাড়ি জমাবে? নভেল-লেখা এত ছোট জিনিস নয়। তবে যদি লাফ মেরে সমুদ্র ডিঙোতে চাও, তাতেও দেবতার আশীর্বাদ চাই—অমনি হয় না। বলিয়া হাসিতে লাগিল।

এই অপ্রত্যাশিত রূঢ়বাক্যে দিবাকর স্তম্ভিত হইয়া গেল। এতদিন পর্যন্ত যাহার কাছে শুধু ভাল কথা আর অম্ল-মধুর পরিহাস লাভ করিয়াই আসিয়াছে, তাহারই কাছে এই তাচ্ছিল্য ও শুষ্ক ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তরে সে যে কি উত্তর দিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে কহিল, তবে এত লোক যে লিখচে তাদের সবাই কি ভালবেসেছে, না বিচ্ছেদের জ্বালা সয়েচে? কবে জ্বালা সইতে পাব, সেই আশায় বসে থাকতে গেলে ত দেখচি সাহিত্য-চর্চাই ছেড়ে দিতে হয়।

তাহার উত্তাপ দেখিয়া কিরণময়ী হাসিমুখে কহিল, একে সাহিত্য-চর্চা বলে? একে বলে অনধিকার-চর্চা।—বলিতে বলিতেই তাহার মুখের হাসি অকস্মাৎ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল এবং তাহার নিজের কথাগুলাই যেন ডুব মারিয়া বুকের অন্তস্তল আলোড়িত করিয়া রক্তে ভিজিয়া ভারী এবং রাঙ্গা হইয়া উঠিয়া আসিল। মলিনমুখে কহিল, আমার কথা আজ তুমি বুঝবে না ঠাকুরপো, আর আশীর্বাদ করি, কোনদিন যেন বুঝতেও না হয়, কিন্তু আমি ত তোমার বয়সে বড়, এই কথাটা আমার শুনো ঠাকুরপো, যা নিজে বোঝ না, তা পরকে বোঝাবার মিথ্যা চেষ্টা করো না। যাকে চেন না, তার যা তা পরিচয় পরের কাছে দিও না।

দিবাকর কথা কহিল না। কিরণময়ী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ভারী গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, এ রাগ-অভিমানের কথা নয় ঠাকুরপো, এ দৈবের কথা, এ অতিবড় দুর্ভাগ্যের কথা। এ সংসারে যে দু-চারজন হতভাগ্যের এই নিগূঢ় রহস্যের পরিচয় দেবার সত্যকার অধিকার জন্মায়, এ গুরুভার তাদেরই হাতে ছেড়ে দিয়ে যদি অন্য কাজে মন দাও, তাতে কাজও হয়ত হয়, অকাজও কমে! অনর্থক ছাতের কোণে মুখ ভারী করে বসে কল্পনা করে লাভ হবে না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি। গিল্টি দিয়ে তোমার মত আনাড়ীকেই ভোলাতে পারবে, কিন্তু যে লোক পুড়ে পুড়ে সোনার রং চিনেছে, এ দুঃখের কারবারে যার ভরাডুবি হয়ে গেছে, তাকে ফাঁকি দেবে কি করে ছোট্‌ঠাকুরপো!

দিবাকর নরম হইয়া কহিল, তবে কল্পনা কি কিছুই নয়?

কিরণময়ী কহিল, কিছুই নয় এ কথা বলিনে, কিন্তু নিছক কল্পনা গড়তেও যদি বা পারে, প্রাণ দিতে পারে না; বইতে পারে, পথ দেখাতে পারে না। সেই পথ দেখবার আলোর সন্ধান তুমি যতদিন না পাচ্চ, ততদিন তোমার বৃশ্চিক শুধু তোমাকেই দংশন করবে, আর কারো গায়ে হুল ফোটাতে পারবে না।

তাহার শেষ কথাটায় দিবাকর মনে মনে জ্বলিয়া উঠিল, এবং মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া কিরণময়ী পুনরায় মৃদু হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমি ভাবচি ছোট্‌ঠাকুরপো,

তোমার এই 'সূর্যোদয়' মহাশয়ের অশ্রু সংবরণ না করতে পারার হেতুটা কি? নগেন্দ্রনন্দিনী শেষকালে বিষ খেয়ে মল না ত?

ক্রুদ্ধ দিবাকর জবাব দিল না।

কিরণময়ী গল্পের শেষ-দিকপানে ক্ষণকাল চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল, এই যে! বলিয়া উচ্চকণ্ঠে পড়িতে লাগিল, কিন্তু শ্মশানে ওই কাহার শব নীত হইতেছে? কিসের পশ্চাতে ওই অসংখ্য লোক বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে? কাহার শোকে নৃপতিতুল্য দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার উন্মত্তবৎ হইয়াছেন? অহো! এ কি করুণ হৃদয়-বিদারক দৃশ্য! বিজয়েন্দ্র ধীরে ধীরে সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিরণময়ী আর পড়িতে পারিল না। হাসিয়া বইখানা দিবাকরের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, বেলা গেল, যাই, তোমার খাবার তৈরি করি গে, বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

একত্রিশ

দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন দুপুরবেলায় দিবাকর কিরণময়ীর ঘরে ঢুকিয়া বিশেষ একটু আশ্চর্য হইয়া দেখিল, সে অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে মেঝেয় বসিয়া একখানা হাতের লেখা মূল সংস্কৃত রামায়ণ অধ্যয়ন করিতেছে। কিরণময়ী সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের চেয়ে যে বেশী লেখাপড়া করিয়াছে এবং বাংলা ইংরাজী দুই-ই একটু ভাল করিয়া জানে, দিবাকর তাহা জানিত। কিন্তু তাই বলিয়া সে ভাল যে হাতের লেখা পুঁথি পড়িবার মত এতটা ভাল, এমন কথা দিবাকর স্বপ্নেও মনে করে নাই। চক্ষের পলকে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া সে সেখানেই বসিয়া পড়িল।

কিরণময়ী হাতের পাতাটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, হঠাৎ এমন অসময়ে যে?

দিবাকর একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, তুমি পড়ছিলে তা মনে করিনি বৌদি। আমি বলি বুঝি—

ঘুমুচ্ছি। তাই নিরিবিলি ভেবে জাগাতে এসেচ?

দিবাকর লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া বলিল, যখন-তখন ওরকম ঠাট্টা করলে আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব, তা বলে দিচ্চি বৌদি।

'কিরণময়ী হাসিয়া কহিল, পালাব বললেই কি পালানো যায় ঠাকুরপো? গোলকধাঁধার পথ জানা চাই। আচ্ছা বসো বসো, রাগ করে আর উঠতে হবে না। আমি মনে করি ঠাকুরপো, দোর দিয়ে বসে বুঝি বিষের ছুরির পর খাঁড়া-টাঁড়া একটা কিছু বড় জিনিস তৈরি করচ। তাই আমিও ডাকিনি। নইলে আমারই কি দুপুরবেলায় রামায়ণ পড়া ভাল লাগে?

দিবাকর প্রশ্ন করিল, রামায়ণ তুমি বিশ্বাস কর?

কিরণময়ী কহিল, করি।

দিবাকর অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কিন্তু অনেকেই করে না। বাস্তবিক, এর মধ্যে এত মিথ্যা, এত অসম্ভব, এত প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার আছে যে, সে কথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

কিরণময়ী একটু হাসিয়া পুঁথিটা হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিল, এই ত মূল গ্রন্থ, কৈ, প্রক্ষিপ্ত ব্যাপারগুলো বার করে দাও দেখি?

দিবাকর অপ্রতিভ হইয়া বলিল, আমি কি করে বার করব বৌদি, আমি ত সংস্কৃত জানিনে।

কিরণময়ী কহিল, জান না বলেই অমন কথা চট করে তোমার মুখ দিয়ে বেরুলো। বিদ্যে না থাকলেই অবিদ্যে এসে জোটে। তার ফলেই মানুষ যা জানে না তাই অপরকে বেশী করে জানাতে চায়; যা বোঝে না তাই বেশী করে বোঝাতে চায়। এই বদ্ অভ্যাসটা ছাড় দেখি।

দিবাকর নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কথাটা বলিবার তাহার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। সে ভাবিয়াছিল, ধর্মগ্রন্থে অশ্রদ্ধা অবিশ্বাস দেখাইলে বৌদি খুশী হইবে।

কিরণময়ী একটু হাসিয়া কহিল, লেখা হচ্চে কেমন?
দিবাকর কহিল, আমি ত আর লিখিনে।
কিরণময়ী অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বলিল, লেখ না? বল কি ঠাকুরপো? কিন্তু যা লিখেছিলে, সে ত মন্দ হয়নি। কেন ছাড়লে বল দেখি?
দিবাকর বলিল, কেন লজ্জা দাও বৌদি, আমি তার পরে অনেক ভেবে দেখেচি, তোমার কথাই সত্যি। আমার সে লেখা পরের ঠিক চুরি না হোক, অনুকরণ বটে! যথার্থ-ই ত,—আমি ভালবাসার কি জানি যে অত কথা লিখতে গেলাম। তাই এখন আর আমি লিখিনে—শুধু ভাবি।
ভাবো? দিনরাত কি ভাবো বল ত? আমাকে নয় ত?
দিবাকর কথাটা কানে না তুলিয়া বলিল, অথচ, দেখচি নভেল লেখার ঝোঁকটাও আমি কাটাতে পারব না। আজ তাই এই মনে করে এলাম যে, তোমার কাছেই আমি শিখব।
কিরণময়ী বলিল, আমার কাছে আবার কি শিখবে ঠাকুরপো, ভালবাসা?
দিবাকর প্রবল লজ্জা কোনমতে দমন করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, সমস্তই শিখব। দরকার হয় তাও শিখব।
কিরণময়ীও মুখখানা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ করিয়া বলিল, কিন্তু তাতে একটা গোল আছে ঠাকুরপো। আমাকে ধরে ভালবাসা শিখতে গেলে লোকে বলবে কি?
দিবাকর তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাও, আমি চললুম, তোমার কেবলি ঠাট্টা।
কিরণময়ী খপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, তাই স্পষ্ট করে বল না ভাই, যে তুমি ঠাট্টা চাও না, সত্যি চাও।
দিবাকর হাতখানা প্রবলবেগে টানিয়া লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।
কিরণময়ী মনে মনে হাসিয়া তাহার পুঁথি বন্ধ করিল। তার পরে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া খানিক পরে দিবাকরের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।
দিবাকর মুখ ভারী করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, কিরণময়ী কহিল, রাগ করে পালিয়ে এলে কেন বল ত?
দিবাকর মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, ও-সব ঠাট্টা-তামাশা আমার ভাল লাগে না।
কিরণময়ী একটুখানি চুপ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, তুমি যে আমার দেওর হও ঠাকুরপো! তোমার সঙ্গে যে ঠাট্টা-তামাশারই সুবাদ। এ-সব না করে বাঁচি কি করে বল দেখি ভাই?
এই সস্নেহ কোমল স্বরে দিবাকরের রাগ পড়িয়া গেল। আজ তাহার সহসা প্রথম মনে হইল, সত্যিই ত! আমার লজ্জা পাবার ত কিছু নাই। আমাদের সম্পর্ক যে ঠাট্টা-তামাশারই সম্পর্ক।
তা কথাটা মিথ্যাও নয় যে, বাঙালী সমাজে দেবর-ভাজের মধ্যে একটি মধুর হাস্য-পরিহাসের সম্বন্ধই বিরাজিত রহিয়াছে; এবং কোথায় ঠিক কোন্‌খানে যে ইহার সীমারেখা তাহাও অনেকের চোখে পড়ে না, এবং পড়িবার প্রয়োজনও মনে করে না। কিন্তু এই নির্দোষ হাস্য-পরিহাসের আতিশয্যে কত সময়ে যে কত বিষের বীজ ঝরিয়া পড়ে এবং অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে উপ্ত হইয়া বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া এক সময়ে সমস্ত পারিবারিক বন্ধন কলুষিত করিয়া তোলে, সে হিসাব কয়জনে রাখে?
দিবাকর মুখ ফিরাইয়া অভিমানের সুরে বলিল, আমি গেলুম শিখতে, আর তুমি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে আমাকে তাড়িয়ে তবে ছাড়লে।
কিরণময়ী বিছানার একপাশে বসিয়া কহিল, কি শিখতে গিয়েছিলে?
দিবাকর বলিল, ঐ যে বললুম, গল্প লেখার ঝোঁক আমি কিছুতে কাটাতে পারব না। তাই মনে করেচি, তুমি শিখিয়ে দেবে, বলে দেবে, আমি লিখে যাব।
কিরণময়ী সহাস্যে কহিল, সে ত আমারই লেখা হবে ঠাকুরপো।
হয় হোক, কিন্তু আমার শেখা হবে। শুধু জানলে ত হয় না, ব্যক্ত করবার ক্ষমতা থাকাও ত চাই।
তা ত চাই; কিন্তু ব্যক্ত করবে কি শুনি?

সেই ত তুমি বলে দেবে বৌদি!

কিরণময়ী পুনরায় হাসিয়া বলিল, তবে অন্য লোক ধর গে ঠাকুরপো, এ কাজ আমার নয়। জলের মাছ যদি বুঝতে চায় মরুভূমিতে মানুষ কি করে তৃষ্ণায় মরে, তা হলে অন্য লোকের প্রয়োজন, আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে কুলোবে না।

দিবাকর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বৌদি, মরুভূমির তৃষ্ণা আমার জানা নেই সত্য, কিন্তু আমি জলচরও নই। তোমাদের মত ডাঙার উপরেই যখন আমারও বাস, তখন পিপাসার ধারণাটাও আছে। একবার বলেই দেখ না বুঝতে পারি কি না।

কিরণময়ী কথা কহিল না। শুধু হাসিমুখে চাহিয়া রহিল।

দিবাকরও মিনিট-খানেক স্থির থাকিয়া বলিল, এই যে এতক্ষণ রামায়ণ পড়ছিলে বৌদি, আমি তার কথাই বলি। সীতার যে রূপের আগুনে রাবণ সপরিবারে ধ্বংস হয়ে গেল, নারীর এই রূপ জিনিসটা কি? আর একা রাবণই নয়, এমন অনেক রাবণের ইতিহাসই ত আছে। কবিরা বলেন, রূপের পিপাসা। তুমিও সেইরকম উপমাই দিলে। তুমি মনে করো না বৌদি, আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করচি—আমি জানি, তোমার পায়ের কাছে বসে আমি অনেক কাল শিখতে পারি,—আমি শুধু জানতে চাই, একে পিপাসা বলা হয় কেন? জল দেখলেই কিছু মানুষের পিপাসা পেয়ে ওঠে না, তবে রূপ দেখলেই বা তার পিপাসা পাবে কেন?

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পায় নাকি ঠাকুরপো?

এই হাসি ও প্রশ্নের যথার্থ তাৎপর্য ধরিতে না পারিয়া দিবাকর মুহূর্তকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সামলাইয়া জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় পায়।

তাহার সংকুচিত ও কুণ্ঠিত সাহস অনুক্ষণ রহস্যালাপের ভিতর দিয়া ইতিমধ্যে যে কতখানি মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছিল তাহা সে নিজেও জানিত না। বলিল, না পেলে সংসারে বড় বড় কবিরা শকুন্তলাও লিখতেন না, রোমিও-জুলিয়েতও লিখতেন না। তাই ত জানতে চাই, বৌদি, নারীর এই রূপ জিনিসটা আসলে কি? আর ভালোবাসাই বা তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে কেন?

কিরণময়ী গম্ভীর হইয়া কহিল, নাঃ, তোমার অবস্থা তত খারাপ নয়।

দিবাকর দুঃখিত হইয়া বলিল, সব কথা যদি কেবল হেসেই উড়িয়ে দেবে বৌদি, তবে থাক। আমি আর কিছুই জিজ্ঞাসা করব না।

তাহার মুখ দেখিয়া কিরণময়ী বিষাদের ভান করিয়া বলিল, আমি মূর্খ মেয়েমানুষ ঠাকুরপো, এ-সব বড় বড় কথার কি জানি বল ত, যে রাগ করচ?

দিবাকর আর একদিনের কথা স্মরণ করিল। যেদিন বেদকেও তাচ্ছিল্যের সহিত উল্লেখ করিতে শুনিয়া সে কানে আঙুল দিয়াছিল। বলিল, আমি জানি বৌদি, তুমি ভয়ানক পণ্ডিত। তুমি ইচ্ছে করলে সব বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার।

কিরণময়ী বলিল, পারি? আচ্ছা, তবে যদি বলি রমণীর রূপ একটা ভ্রম মাত্র। আসলে এটা কিছুই নয়—মরীচিকার মত মিথ্যা। বিশ্বাস করবে?

দিবাকর কহিল, না। তার কারণ, মরীচিকাও মিথ্যা নয়—সে যা তাই। আয়নাতে মানুষের ছায়া পড়ে। সেটা ছায়া, মানুষ নয়, এ ত জানা কথা। ছায়াকে মানুষ বলে ধরতে গেলেই ভুল করা হয়। কিন্তু রূপ ত সেরকম কোন জিনিসের ছায়া নয়। সাপকে দড়ি বলে ধরতে যাওয়া ভুল, মরীচিকাকেও জল বলে ছুটে ধরতে যাওয়া ভুল, কিন্তু রূপের পিছনে মানুষ যে নিছক রূপের তৃষ্ণাতেই ছুটে যায় বৌদি।

কিরণময়ী বলিল, ঠাকুরপো, এইমাত্র আরসিতে ছায়া দেখার একটা উপমা দিয়েছিলে। যেদিন বুঝবে রূপটাও মানুষের ছায়া, মানুষ নয়—সেইদিনই শুধু ভালবাসার সন্ধান পাবে। কিন্তু সে যাক। জিজ্ঞেসা করি, রূপের পিছনেই বা মানুষ ছুটে যায় কেন?

তা জানিনে। ভ্রমরকে ছেড়েও গোবিন্দলাল রোহিণীর পিছনে ছুটে গিয়েছিল, এইটে আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকে।

কিন্তু তার ফল কি দাঁড়াল?

ফল যাই দাঁড়াক বৌদি, সে বিচারের ভার মানুষের হাতে নয়। রোহিণীর রূপ ছিল, গুণ ছিল না। কিন্তু রূপের সঙ্গে গুণ থাকলে গোবিন্দলালের কি হতো বলা যায় না।

কিরণময়ী চুপ করিয়া রহিল। এই বি. এ. ফেল করা ছেলেটির উপর মনে মনে তাহার শ্রদ্ধা ছিল না। শুধু ফেল করার জন্য নয়, পাস করিলেও সে মনে করিত, ইহারা শুধু পড়া মুখস্থ করিয়া পাস করিতেই পারে আর কিছু পারে না। কিন্তু প্রয়োজন হইলে ইহাদের শিক্ষিত মন যে তর্ক করিতেও সক্ষম, এ ধারণাই তাহার ছিল না। কহিল, রূপ যে ছায়া নয়, এ কথা অত নিঃসংশয়ে স্থির করে রেখো না। যাই হোক, জিজ্ঞেসা করি ঠাকুরপো, এ-সমস্ত কি তুমি নিজেই ভেবেচ, না কারো ভাবা কথা শুনে বলচ?

দিবাকর মৃদু হাসিয়া বলিল, না বৌদি, এ আমার নিজেরই কথা। ছেলেবেলা থেকে ভগবান আমাকে অনেক কথাই ভাববার সুবিধে দিয়েছিলেন।

কিরণময়ী মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, অথচ এত সুবিধাতেও রূপের তত্ত্ব খুঁজে পেলে না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সতীশ-ঠাকুরপোও একদিন আমাকে ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আরও একজন করেছিলেন, আর আজ তুমিও করচ। আমি ভাবচি, আমার রূপ দেখেই কি তোমাদের এই প্রশ্ন মনে আসে?

হঠাৎ দিবাকর চমকিয়া উঠিল। লজ্জায় তাহার মাথা কাটা যাইতে লাগিল, সে মুখ নীচু করিয়া বলিল, আমাকে মাপ কর বৌদি, আমি জানতাম না।

কিরণময়ী হাসিমুখে বলিল, এক-আধবার নয় ভাই, তোমাকে এক শ'বার মাপ করলুম: বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে যেন নিজের মনেরই একটা আগন্তুক দ্বিধাকে সবলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল; এবং অতুল সুন্দর গ্রীবা ঈষৎ উন্নত করিয়া কেমন যেন একটা মৃদু করুণ-সুরে বলিতে লাগিল, ঠাকুরপো, আজ যত কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেচ, তার সত্য উত্তর যদি দিতে যাই, কথাগুলো আমার দম্ভের মত শোনাবে। সেইটা তোমাকে ভুলতে হবে। নইলে নিজের ভুলে আমাকে ভুল বুঝে সমস্তই গোলমাল করে ফেলবে। আমার কথাটা বুঝতে পারচ ঠাকুরপো?

দিবাকর নীরবে ঘাড় নাড়িল।

কিরণময়ী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিতে লাগিল, আমার দেহের এই রূপটা শুধু তোমাদের পুরুষের চোখে নয়, আমার নিজের চোখেও একটা অদ্ভুত জিনিস। তাই এর কথা আমি অনেক ভেবেচি। যা ভেবেচি, হয়ত তাই ঠিক, হয়ত না, কিন্তু সে যাই হোক, আমার এ ভাবনা আর একটি দেওরকে বলতে যখন লজ্জা করিনি, তখন তোমাকে বলতেও পেছুব না। আমার নিজেকে দেখে কি মনে হয় জান? মনে হয় সন্তান-ধারণের জন্য যে-সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ। সমস্ত জগতের সাহিত্যে, কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপের বর্ণনা।

দিবাকর নিস্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী তাহার স্তব্ধ মুখের উপর নবীন যৌবনের একটা সদ্যজাগ্রত ক্ষুধার মূর্তি অকস্মাৎ অনুভব করিয়া সসঙ্কোচে থামিয়া গেল। কিন্তু মুহূর্তের জন্য, পরক্ষণেই তাহাকে স্পর্ধার সহিত অতিক্রম করিয়া বলিল, বাস্তবিক ঠাকুরপো, এইখানে রূপের যেন একটা কূল পাওয়া যায়। এই জন্যই নারীর বাল্যরূপ যদি বা মানুষকে আকৃষ্ট করে তাকে মাতাল করে না। আবার যেদিন সে সন্তান-ধারণের বয়স পার হয়ে যায়, তখনও ঠিক তাই। ভেবে দেখ ঠাকুরপো, শুধু নারী নয়, পুরুষেরও এই দশা। ততক্ষণই তার রূপ, যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার রূপ-যৌবন, এই সৃষ্টি করবার ইচ্ছাই তার প্রেম।

দিবাকর ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু—

কিরণময়ী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না, কিন্তুর জায়গা এর মধ্যে নেই। বিশ্ব চরাচরের যেদিকে খুশি চেয়ে দেখ, ওই এক কথা ঠাকুরপো, সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথা তোমাদের সৃষ্টি-কর্তার জন্যই থাক, কিন্তু এর কাজের দিকে একবার চেয়ে দেখ। দেখতে পাবে, এর প্রতি অণু-পরমাণু নিরন্তর আপনাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চায়। কেমন করে সে নিজেকে বিকাশ করবে, কোথায় গেলে, কার সঙ্গে মিশলে, কি করলে সে আরও সবল আরও উন্নত হবে, এই তার অক্লান্ত উদ্যম। দৃশ্যে-অদৃশ্যে, অন্তরে-বাহিরে প্রকৃতির তাই এই নিত্য

পরিবর্তন, এবং এই জন্যই নারীর মধ্যে পুরুষ যখন এমন কিছু দেখতে পায়—জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, যেখানে সে আপনাকে আরও সুন্দর আরও সার্থক করে তুলতে পারবে, সে লোভ সে কোনমতেই থামাতে পারে না।

দিবাকর আস্তে আস্তে কহিল, তা হলে ত চারিদিকেই মারামারি কাটাকাটি বেধে যেত!

কিরণময়ী কহিল, মাঝে মাঝে যায় বৈ কি। কিন্তু মানুষের লোভ দমন করবার শক্তি, স্বার্থত্যাগের শক্তি, সমাজের শাসন-শক্তি, এতগুলো বিরুদ্ধ-শক্তি আছে বলেই চতুর্দিকে একসঙ্গে আগুন ধরে যেতে পায় না। অথচ, এই সামাজিক মানুষেরই এমন একদিন ছিল যখন সে প্রবৃত্তি ছাড়া আর কারও শাসনই মানত না। রূপের আকর্ষণে তার সেই দুর্দান্ত প্রবৃত্তির তাড়নাই ছিল তার প্রেম,—অমন অবাক্ হয়ে যেয়ো না ঠাকুরপো, একেই শৌখিন কাপড়-চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে দাঁড় করালেই উপন্যাসের নিখুঁত ভালবাসা তৈরি হয়।

দিবাকর স্তম্ভিত হইয়া কহিল, কোথায় পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়না, আর কোথায় স্বর্গীয় প্রেমের আকর্ষণ! যে লোক পশুর প্রবৃত্তিতে পরিপূর্ণ, সে শুদ্ধ, নির্মল, পবিত্র প্রণয়ের কতটুকু মর্যাদা বোঝে? এ বস্তু সে পাবে কোথায়? তুমি কিসের সঙ্গে কার তুলনা দিচ্ছ বৌদি?

তুলনা দিইনি ভাই, দুটো যে একই জিনিস, তাই শুধু বলচি। ঠাকুরপো, ইঞ্জিনের যে জিনিসটা তাকে সুমুখে ঠেলে, সেই জিনিসটাই তাকে পিছনে ঠেলতে পারে, অপরে পারে না। যে ভালবাসতে পারে, সেই কেবল সুন্দর অসুন্দর সব ভালবাসাতেই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারে, অপরে পারে না। তুমি গোবিন্দলালের কথা বলছিলে, তার যে বস্তুটা ভ্রমরকে ভালবেসেছিল, ঠিক সেই বস্তুটাই তাকে রোহিণীর দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হরলাল তা পারেনি। সে সাংসারিক ভালমন্দ, কর্তব্য-অকর্তব্য, সুবিধে-অসুবিধে চিন্তা করে আত্মসংযম করেছিল, কিন্তু গোবিন্দলাল পারলে না। অথচ হরলাল লোকটা গোবিন্দ-লালের চেয়ে ভাল ছিল না—অনেক মন্দ ছিল। তবু সে যাকে ঘৃণায় ত্যাগ করে গেল, আর একজন তাকেই মাথায় তুলে নিলে।

নেওয়াটা নানা কারণে ব্যর্থ নিষ্ফল হতেও পারে, কিন্তু সমস্ত দুঃখ-গ্লানি-লজ্জার অতিরিক্ত একটা বৃহত্তর সার্থকতার ইঙ্গিত যে একজনকে আর একজনের কাছে টেনে নিয়ে যায়নি, এমন কথাও ত জোর করে কেউ বলতে পারে না ভাই!

দিবাকর ক্ষোভের সহিত বলিল, তোমার সমস্ত কথা যদিচ আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু পবিত্র প্রণয় যে স্বর্গীয় নয়, এমন অদ্ভুত কথা আমি কিছুতেই মানতে পারিনে, বৌদি!

কিরণময়ী কহিল, তোমার মানামানির ওপর ত কিছু নির্ভর করে না ঠাকুরপো! আমাদের এই দেহটিও ত নিতান্ত নশ্বর, একেবারে পার্থিব বস্তু, কিন্তু তাতে ত দুঃখের কারণ দেখিনে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে যতদিন না সে তার জড় দেহটার মধ্যে সৃষ্টি-শক্তি সঞ্চয় করে, ততদিন প্রেমের সিংহদ্বার তার সম্মুখে বন্ধই থাকে। সে সিংহদ্বার সে প্রবৃত্তির তাড়নাতেই ডিঙিয়ে যায়। তার পূর্বে সে তার বাপ-মাকে ভাই-বোনকে ভালবাসে, বন্ধু-বান্ধবকেও ভালবাসে, কিন্তু তার পঞ্চভূতের দেহটা বড় না হওয়া পর্যন্ত তোমার স্বর্গীয় প্রেমের কোন সংবাদ রাখবারই তার অধিকার জন্মায় না। ততদিন পর্যন্ত স্বর্গীয় আকর্ষণ তাকে একতিল নড়াতে পারে না। পৃথিবীর আকর্ষণ ত চিরদিনই আছে, কিন্তু সে আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করতে গাছের পাকা ফলটিই পারে, কাঁচায় পারে না। তার আঁশ, শাঁস পৃথিবীর রসেই পাকে, স্বর্গের রসে পাকে না। সুন্দর ফুল রূপ দিয়ে, গন্ধ দিয়ে, মধু দিয়ে মৌমাছি টেনে এনে ফলে পরিণত হয়, সেই ফল আবার ঠিক সময়ে মাটিতে পড়ে অঙ্কুরে পরিণত হয়—এই তার প্রকৃতি, এই তার প্রবৃত্তি, এই তার স্বর্গীয় প্রেম। বিশ্ব জুড়ে এই যে অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টির খেলা, রূপের খেলা চলেছে, স্বর্গীয় নয় বলে এতে দুঃখ করবার বা লজ্জা পাবার ত কিছুই দেখিনে।

একটুখানি থামিয়া কিরণময়ী বলিল, অবশ্য অন্ধকারে ভূতের ভয়ে যদি চোখ বুজেই

আরাম পাও, আমি চাইতে তোমাকে বলিনে, কিন্তু, প্রবৃত্তির তাড়না চাইনে, স্বর্গীয় প্রেম উপভোগ করব—প্রেমের ব্যবসা অত সোজা নয়।

দিবাকর প্রশ্ন করিল, পৃথিবীতে তবে পবিত্র প্রেম, ঘৃণিত প্রেম, এ দুটো আছে কেন?

কিরণময়ী হাসিয়া উঠিল। বলিল, তোমার তর্কটা ঠিক সতীশ-ঠাকুরপোর মত হলো। সংসারে ও-দুটো থাকবার কথা বলেই আছে। মানুষের প্রবৃত্তি জিনিসটা যুক্তি নয় বলেই আছে। যাকে ঘৃণিত বলচ, সেটা আসলে সুবুদ্ধির অভাব। অর্থাৎ যাকে ভালবাসা উচিত ছিল না, তাকেই ভালবাসা। অসাবধানে গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙ্গার অপরাধ মাধ্যাকর্ষণের উপর চাপান, আর প্রেমকে কুৎসিত ঘৃণিত বলা সমান কথা। ঠাকুরপো, এমনি করেই সংসারে একের অপরাধ অপরের মাথায় চেপে যায়, বলিয়া সহসা কিরণময়ী চুপ করিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে কি কথা যেন তলাইয়া দেখিয়া আসিল। পরক্ষণেই কহিল, তোমাকে পূর্বেই বলেচি, জীবের প্রতি অণু-পরমাণু, প্রতি রক্তকণা নিজের উৎকৃষ্টতর পরিণতির মধ্যে বিকাশ করবার লোভ কোনমতেই সংবরণ করিতে পারে না। যে দেহে তার জন্ম, সেই দেহের মধ্যে যখন তার পরিণতির নির্দিষ্ট সীমা শেষ হয়ে যায়, তখন সেই তার যৌবন। তখনই শুধু সে অন্য দেহ-সংযোগে অধিকতর সার্থক হবার জন্য শিরায়-উপশিরায় বিপ্লবের যে তাণ্ডব সৃষ্টি করে, তাকেই পণ্ডিতদের নীতিশাস্ত্রে পাশবিক বলে গ্লানি করা হয়। তাৎপর্য না বুঝতে পেরেই হতবুদ্ধি বিজ্ঞের দল একে ঘৃণিত বলে, বীভৎস বলে সান্ত্বনা লাভ করে। কিন্তু আজ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি ঠাকুরপো, এত বড় আকর্ষণ কোন মতেই অমন হেয়, অমন ছোট হতে পারে না। এ সত্য। সূর্যের আলোর মত সত্য! ব্রহ্মাণ্ডের আকর্ষণের মত সত্য! কোন প্রেমই কোনদিন ঘৃণার বস্তু হতে পারে না।

কথা শুনিয়া দিবাকর যথার্থই বিহ্বল হইয়া উঠিল। তাহার কেমন যেন বুকের ভিতর শিরশির করিতে লাগিল। এমন উত্তপ্ত তীব্র কণ্ঠস্বর ত সে কোনদিন শুনে নাই, চোখের এমন উত্তপ্ত উৎকট চাহনিও কখন লক্ষ্য করে নাই।

ভয়ে ভয়ে ডাকিল, বৌদি?

কেন ঠাকুরপো?

আমার মতো নির্বোধকে উপদেশ দিতে তোমার বোধ করি ধৈর্য থাকে না।

সে কি ঠাকুরপো, আমার ত বেশ ভালই লাগচে।

দিবাকর একটুখানি হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিল, ভাল লাগলে তোমার মুখ দিয়ে এ-সব উলটো-পালটা কথা বার হবে কেন? এইমাত্র তুমি নিজেই বললে, যাকে ভালবাসা উচিত ছিল না, তাকেই ভালবাসার নাম কুৎসিত প্রেম, আবার বলচ, এর তাৎপর্য বুঝতে না পেরেই বিজ্ঞের দল এর মন্দ আখ্যা দেয়,—তবে কোন্‌টা সত্য?

কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ বলিল, দুটোই সত্য।

বিধবা রোহিণীকে ভালবাসা কি গোবিন্দলালের মন্দ কাজ হয়নি?

ভালবাসা কি একটা কাজ যে তার ন্যায়-অন্যায় হবে? স্ত্রীকে ছেড়ে যাওয়াটাই তার মন্দ কাজ হয়েছিল।

দিবাকর আবার একবার উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বলিল, ছেড়ে চলে যাওয়া ত নিশ্চয়ই মন্দ কাজ। সহস্রবার মন্দ কাজ। কিন্তু স্ত্রীকে ছেড়ে আর একজনকে মনে মনে ভালবাসাও কি নিতান্ত অন্যায় নয়?

তাহার উত্তেজনায় কিরণময়ী হাসিল, কহিল, ঠাকুরপো, নিজেদের অমন শক্তিমান মনে করতে নেই, অহঙ্কারটা একটু কম থাকা ভাল। তুমি কি ভাবো, ইচ্ছা করলেই মানুষ যা খুশি তাই করতে পারে? গোবিন্দলাল ইচ্ছা করলেই রোহিণীকে ভালবাসতে পারত, আবার নাও পারত, এই কি তোমার ধারণা?

না, তা আমার ধারণা নয়। ইচ্ছার সঙ্গে চেষ্টা থাকা চাই।

কিরণময়ী কহিল, আবার তার সঙ্গে ক্ষমতা কিংবা অক্ষমতা থাকা চাই। শুধু চেষ্টা করলেই হয় না। ঐ ছাদের কোণে বসে যদি তোমার মাথায় গাছ গজিয়েও যায়, তবু তুমি কালিদাসের মত আর একটা 'মেঘদূত' লিখতে পারবে না। মেঘ দেখে তোমার ঝড়-জলের আশংকাই হবে। সর্দি লাগবার ভয়েই ব্যাকুল হয়ে উঠবে—বিরহীর দুঃখ ভাববার সময়

পারে না। হাজার চেষ্টা করলেও না। এই অক্ষমতা অস্থিমজ্জাগত—একে অতিক্রম করা যায় না। এই বলিয়া সে চুপ করিল।

দিবাকরও জবাব দিল না। মাথা হেঁট করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন শব্দ রহিল না। নিস্তব্ধ ঘরের কোণ হইতে শুধু একটা জীর্ণ প্রাচীন ধূলি-মলিন ঘড়ির টিক্‌টিক্‌ শব্দ আসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কিরণময়ী হঠাৎ বড় মিঠা-গলায় কথা কহিল। বলিল, তোমাকে আরও দু-একটা কথা বলতে চাই। সেদিন তোমার 'বিষের ছুরি' নিয়ে যাই কেন না বলে থাকি ঠাকুরপো, আমি এও দেখেছিলুম যে, তোমার মধ্যে একটা জিনিস আছে যা যথার্থই প্রেমিক, যথার্থই কবি। এই জিনিসটিকে যদি মেরে ফেলতে না চাও ত পরকে অপরাধী করার সুখ থেকে আপনাকে বঞ্চিত করতেই হবে। এ কথা কোনদিন ভুলো না যে, কবি বিচারক নয়। নীতিশাস্ত্রের মতের সঙ্গে যদি তোমার মত বর্ণে বর্ণে নাও মেলে, তাতে লজ্জা পেয়ো না। আমি জানি, মানুষ পরের অক্ষমতা আর অপরাধ এক তুলাদণ্ডেই ওজন করে শাস্তি দেয়, কিন্তু তাদের বাটখারা ধার করে এনে তোমার কাজ চলবে না। তুমি বারংবার গোবিন্দলালের উল্লেখ করেছিলে। সেই গোবিন্দলাল যে কত বড় শক্তির সম্মুখে পরাস্ত হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে গিয়েছিল, এ সংসারে যারা নিছক ভাল-মন্দ বিচারের ভার নিয়েচে, এ প্রশ্ন তাদের নয়, এ প্রশ্ন তোমার। খুনের অপরাধে জজসাহেব যখন হতভাগ্যের প্রাণদণ্ড করেন, তখন তিনি বিচারক, কিন্তু অপরাধীর অন্তরের দুর্বলতা অনুভব করে যখন তিনি দণ্ড লঘু করেন, তখন তিনি কবি। ঠাকুরপো, এমনি করেই সংসারের সামঞ্জস্য রক্ষা হয়, এমনি করেই সংসারের ভুল, ভ্রান্তি, অপরাধ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে না। কবি যে শুধু সৃষ্টি করে তা নয়, কবি সৃষ্টি রক্ষাও করে। যা স্বভাবতই সুন্দর, তাকে যেমন আরও সুন্দর করে প্রকাশ করা তার একটা কাজ, যা সুন্দর নয়, তাকেও অসুন্দরের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা তারই আর একটা কাজ।

দিবাকর একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তা হলে কি অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না?

কিরণময়ী কহিল, ঠিক জানিনে। হতেও পারে। শুনি, মন্দের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ঘৃণা জাগিয়ে দেওয়াও নাকি কবির কাজ। কিন্তু, ভালর উপর অত্যন্ত লোভ জাগিয়ে দেওয়া কি তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ নয়? তা ছাড়া পাপকে যতদিন না সংসার থেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া যাবে, যতদিন না মানুষের হৃদয় পাথরে রূপান্তরিত হবে, ততদিন এ পৃথিবীতে অন্যায় ভুল-ভ্রান্তি থেকেই যাবে, এবং তাকে ক্ষমা করে প্রশ্রয় দিতেও হবে। পাপ দূর করবার সাধ্যও নাই, সহ্য করবার ক্ষমতাও যাবে, তাতেই বা কি সুবিধা হবে ঠাকুরপো?

দিবাকর জবাব দিল, সুবিধেই ত সব নয়। অসুবিধের মধ্যেও ত ন্যায়ধর্ম পালন করা চাই। যা শুভ, যা নির্মল, যা সূর্যের আলোর মত, তাকেই ত সকলের উপর স্থান দেওয়া প্রয়োজন।

কিরণময়ী কহিল, না। পাপ যদি না মানুষের রক্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকত, তা হলে তোমার কথাই সত্য হতো। এক ন্যায় ছাড়া সংসারে আর কিছুই থাকতে পেত না। দয়া, মায়া, ক্ষমা প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তিগুলির নাম পর্যন্তও কারো জানা থাকত না। তুমি সূর্যের আলোর সাদা রঙের সঙ্গে ন্যায়ের তুলনা দিচ্ছিলে! কিন্তু, সাদা রঙ কি সবগুলো রঙের মিশ্রণে জন্মায় না? এই সাদা আলো যেমন বাঁকা কাঁচের মধ্যে দিয়ে রঙিন হয়ে ওঠে, ন্যায়ও তেমনি অন্যায়, অধর্ম, পাপ, তাপের বাঁকা পথ দিয়ে দয়া, মায়া, ক্ষমায় বিচিত্র হয়ে দেখা দেয়। অন্যায়কে ক্ষমা করলে অধর্মকে যে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তা মানি, কিন্তু অধর্মও যে তারই একটা রূপ নয়, এ কথাও ত স্বীকার না করে পারিনে। তর্ক করে হয়ত আমার কথা তোমাকে বোঝাতে পারব না ঠাকুরপো, কিন্তু যে ক্ষমা ভালবাসার মধ্যে জন্মলাভ করে, সেই ভালবাসার মর্ম যদি কখনো পাও, তখনই বুঝবে অন্যায়, অধর্ম, অক্ষমতাকে ক্ষমা করে প্রশ্রয় দেওয়া ধর্মেরই অনুশাসন। কিন্তু বেলা যে পড়ে গেছে ঠাকুরপো, আজ ক্ষিদে-তেষ্টা কি তোমার পায়নি?—বলিয়া ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর দিবাকর খাবার খাইতে বসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আজ সমস্ত দুপুরটা আমার বড় আনন্দে কেটেছে। কত নূতন কথাই যে শিখলাম, তা আর বলতে পারিনে!

কিরণময়ী হাসিমুখে কহিল, অনেক কথা শিখেচ? আমাকে তা হলে তোমার গুরু বলে মানা উচিত।

দিবাকর উদ্দীপ্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় নিশ্চয়। এক শ' বার তোমাকে গুরু বলে স্বীকার করছি। সত্যি বলচি বৌদি, এমনি যদি চিরকাল তোমার কাছে থাকতে পাই ত আর আমি কিছু চাইনে।

বল কি! এর মধ্যেই এত টান?

দিবাকরের চিত্ত আর একভাবে মগ্ন হইয়াছিল, সরল মনে কহিল, তোমাকে ছেড়ে আর একটা দিনও কোথাও থাকতে পারব না বৌদি।

কিরণময়ী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, চুপ চুপ, কেউ যদি শুনতে পায় ত অবাক হয়ে যাবে।

দিবাকর সচেতন হইয়া নিদারুণ লজ্জায় একেবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

বত্রিশ

শয্যা রচনা করিতে করিতে কিরণময়ী তাহারই একাংশে বসিয়া পড়িয়া ম্লান করুণ-স্বরে কহিল, একি তোমার চাকরি, না ব্যবসা ঠাকুরপো, যে মনিবের মর্জির উপর কিংবা দোকানের কেনা-বেচার ওপর সফলতা বিফলতা নির্ভর করবে? এ যে নিজের বুকের ধন। বাইরের লোকের সাধ্য কি ঠাকুরপো, একে বিফল করে! বলিয়া মুহূর্তকাল চোখ বুজিয়া রহিল।

দিবাকর ভক্তিনত-চিত্তে সেই সুন্দর তন্গত মুখখানির প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, আচ্ছা বৌদি, তুমি কি চোখ বুজলেই তোমার স্বামীর মুখ অন্তরে দেখতে পাও?

কিরণময়ী চোখ চাহিয়া একটুখানি যেন চকিত হইয়া বলিল, স্বামীর? হুঁ, দেখতে পাই বৈ কি ভাই। যিনি আমার যথার্থ স্বামী, তিনি নিশিদিনই আমার এইখানে আছেন, বলিয়া আঙুল দিয়া নিজের বক্ষঃস্থল নির্দেশ করিল।

দিবাকর কথাটাকে সরলভাবে গ্রহণ করিয়া বিনম্র-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু এ দেখে লাভ কি বৌদি? তুমি ঠাকুর-দেবতাও মান না, ইহকাল-পরকালও স্বীকার কর না, মরণের পরে কেমন করে তাঁর কাছে তুমি যাবে?

কিরণময়ী কহিল, মরণের পর আমি কারো কাছেই যেতে চাইনে ঠাকুরপো।

কোথাও কারুর কাছেই নয়? একেবারে একা থাকতে চাও? বলিয়া দিবাকর যেন হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল এবং তাহার প্রশ্ন শুনিয়া কিরণময়ীও ক্ষণকালের জন্য নির্বাক হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, কিন্তু যখন তখন আমার নিজের কথা এত শুনতে চাও কেন বল ত ঠাকুরপো?

কি জানি বৌদি, আমার ভারী শুনতে ইচ্ছা করে।

কিরণময়ী বিছানার চাদর পাতিবার ছলে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, আমি একজনের কাছে যেতে চাই, কিন্তু, সে মরণের ওপারে নয়—এপারেই।

দিবাকর কহিল, কিন্তু তিনি ত মরণের ওপারে চলে গেছেন। এপারে কেমন করে আর তাঁকে পাবে?

কিরণময়ী হাসিয়া কহিল, সে আমার এখনো এপারে আছেই। এতদিন চলেও যেতুম, শুধু—

শুধু কি বৌদি?

শুধু যদি একবার জানাতো আমাকে চায় কি না।

দিবাকর পুনরায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, কে এপারে আছে? কে জানাবে, সে তোমাকে চায় কি না? কি যে তুমি বল বৌদি!

কিরণময়ীর মুখের উপর পলকের জন্য একটা ম্লান ছায়া ভাসিয়া আসিল, কিন্তু ক্ষণকালেই তাহা অপসৃত হইয়া আবার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, এবং কৃত্রিম ক্রোধের সুরে কহিল, তুমি ত বড় দুষ্টু ঠাকুরপো! নিজে মুখ ফুটে কিছুই বলতে চাও না, কেমন

আমার মুখ থেকে এক শ'বার শুনতে চাও? যাও, তার খবর আমি তোমাকে দিতে পারব না। বলিয়া মুখটা একটুখানি আড়াল করিয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। দিবাকর এ হাসি দেখিতে পাইল এবং একটা অজ্ঞাত আবেগে তাহার হৃদস্পন্দন দ্রুততালে চলিতে লাগিল। একটুখানি সামলাইয়া কহিল, আমার আবার কি কথা আছে বৌদি যে মুখ ফুটে তোমাকে বলব?

কিরণময়ী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এত করে এতদিন যে শেখালুম, সবই কি ব্যর্থ হলো? একবার নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখ দিকি, একটা ভয়ানক কথা ওখানে তোলপাড় করে বেড়াচ্চে কি না? সত্যি বলো?

দিবাকর মন্ত্রমুগ্ধবৎ কহিল, কি কথা? কি শেখালে তুমি?

কিরণময়ী কহিল, অবাক করলে ঠাকুরপো! এই বয়সেই কি অভিনয় করতেই শিখেচ? কিন্তু তুমি মুখ ফুটে না বললে, আমিও বলছিনে, এতে আমারই বুক ফাটুক, আর তোমারই বুক ফেটে যাক! বলিয়াই হঠাৎ হেঁট হইয়া দিবাকরের দাড়িটা হাত দিয়া একবার নাড়িয়া দিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

দিবাকর স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। কিরণময়ী এ পর্যন্ত তাহাকে কতবার কত প্রকারে পরিহাস করিয়াছে, সহস্রবার সহস্র ছলে স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু, আজিকার এই পরিহাস, এ স্পর্শ তাহার কানের ভিতর দিয়া সর্বাঙ্গের স্নায়ু-শিরায় যেন প্রজ্বলিত তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া গেল। নিজের দেহের প্রত্যেক রক্তবিন্দুটির এতবড় আশ্চর্য দ্রুতবেগ সে কখনো অনুভব করে নাই।

তেত্রিশ

অনেকদিন পরে আজ আবার সকালবেলায় অঘোরময়ী পাড়ার কয়েকজন বর্ষীয়সী রমণীর সহিত কালীঘাটে কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কথা ছিল, মায়ের আরতি হইয়া গেলে, একটু রাত্রি করিয়া বাড়ি ফিরিবেন।

রাত্রি প্রায় আটটা। দিবাকর নিজের বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া ছিল। তাহার শিয়রে একটা মাটির প্রদীপ মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছিল। এই স্বল্প আলোকে যে-'দুর্গেশনন্দিনী' বইখানা সে ইতিপূর্বে পড়িতেছিল, সেখানা মুখের উপর চাপা দিয়া বোধ করি বা মনে মনে সে আয়েষার কথাই চিন্তা করিতেছিল, কিরণময়ী ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছোট্‌ঠাকুরপো, কি ঘুমোচ্চ নাকি?

দিবাকর মুখের উপর হইতে বইখানা না তুলিয়াই কহিল, না, ভারী মাথা ধরেচে।

কিরণময়ী হাসিয়া বলিল, তা হলে ত বেশ চিকিৎসা হচ্চে। মাথার ওপর আলো জ্বেলে রাখলে কি মাথা ছাড়ে নাকি ঠাকুরপো?

দিবাকর বলিল, বইটা কালই ফিরিয়ে দিতে হবে, তাই শেষ করে ফেলচি।

কিরণময়ী কহিল, চোখ বুজে আয়েষাকে ভাবলে বই শেষ হবে না ভাই, চোখ চেয়ে পড়তে হবে। তা না হয় খেয়েদেয়েই শেষ করো—এখন চল, খাবার জুড়িয়ে যাচ্চে।

দিবাকরের উঠিতে ইচ্ছা ছিল না ; সে শ্রান্ত অনুনয়ের সুরে কহিল, এখন থাক বৌদি। মাসীমা আসুন, তার পরে খাব।

কিরণময়ী কহিল, তাঁরা কতক্ষণে ফিরবেন তার ঠিক কি ঠাকুরপো? আজ আমার নিজের শরীরও ভাল নয়। মনে করছি, তাঁর ঘরে খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে একটু শোব। ওঠো, তোমাকে খাইয়ে দিই গে, বলিয়া সে কাছে আসিয়া বইখানা দিবাকরের মুখের উপর হইতে তুলিয়া লইল।

অদূরে দিবাকরের লোহার তোরঙ্গটা ছিল। কিরণময়ী ফিরিয়া আসিয়া তাহার উপর উপবেশন করিয়া পুনরায় তাড়া দিয়া কহিল, ওঠো না গো।

আমার উঠতে ইচ্ছে করে না বৌদি। তার চেয়ে বরং একটা গল্প কর আমি শুনি।

শুধু গল্প শুনে ত পেট ভরে না ঠাকুরপো, সময়ে খেতেও হয়। কি বল?

দিবাকর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা বৌদি, আমার নাওয়া-খাওয়া-শোয়া নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

কিরণময়ী হাসিমুখে কহিল, কেন জান না?

না বললে কেমন করে জানব?

এটি তোমার মিছে কথা ভাই। না বললেও জানা যায়, আর তুমিও ঠিক জান।

দিবাকরের মুখচোখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া সহসা কেমন যেন একটা উদাস করুণ-সুরে কথা কহিল। বলিল, আচ্ছা বৌদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

একটা কেন ভাই, এক শ'টা করো। কিন্তু, আগে খেয়েদেয়ে আমাকে ছুটি দাও—তার পরে না হয় সারারাত ধরে তোমার কথার জবাব দেব। কেমন রাজী? বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

দিবাকর এই পরিহাসের একটা পালটা জবাব দিবার প্রয়াস করিয়া কৃত্রিম সহানুভূতির স্বরে বলিল, বেশ ত বৌদি! তুমি বুঝি ঐ শক্ত বাক্সটার উপর সমস্ত রাত বসে আমার কথার জবাব দেবে?

কিরণময়ী মুচকিয়া হাসিল। কহিল, ঐটার ওপর বসলে যদি তোমার ব্যথা লাগে ঠাকুরপো, না হয় তোমার নরম বিছানার উপরেই উঠে বসব। কেমন? তা হলে ত আর ক্ষোভ থাকবে না।

আবার দিবাকরের কর্ণমূল পর্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। সে লজ্জায় পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিরণময়ী উঠিয়া আসিয়া বলিল, নাও ওঠো—আমাকে ছুটি দাও, আর পাশ ফিরে শুতে হবে না।

রান্নাঘর হইতে ঝির গলা শুনা গেল—আমি এখানে থেকে শুনতে পাচ্চি বৌমা, তুমি পাও না গা? মা যে নীচে ডাকাডাকি কচ্চেন।

কিরণময়ী ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই তোরঙ্গটার উপর বসিল। রাগ করিয়া বলিল, আস্পর্ধা ত কম নয় ঝি? আমি গিয়ে দোর খুলে দেব, তুই পারিস নে?

আমার হাত জোড়া, তাই বলা বৌমা! বলিয়া ঝি বকিতে বকিতে দুমদুম করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

দ্বার খুলিতেই অঘোরময়ী বকিয়া উঠিলেন, তোরা কি সব কানের মাতা খেয়েচিস ঝি? এ যে আধ-ঘণ্টা ধরে কড়া নাড়চি আমরা।

এবার ঝিও গর্জিয়া উঠিল, কানের মাতা চোখের মাতা না খেলে কি আর তোমার বাড়িতে কেউ চাকরি করতে আসে মা? এবার চোখকানবালা কাউকে রাখো গে মা, আমাকে জবাব দাও। রান্নাঘর থেকে আমি সদর-দরজার ডাক শুনতে পাব না!

অঘোরময়ী নরম হইয়া বলিলেন, বৌমা কোথায়?

ঝি অস্ফুট ঝঙ্কারে কহিল, দেওরকে নিয়ে সারাদিন সোহাগ হচ্চে—আর কি হবে! ঐ যে দোর খুলে দিতে বলেছিলুম বলে আমায় চোখ রাঙিয়ে আস্পর্ধা দেখিয়ে দিলে! ও মা! এ যে বড়বাবু! বলিয়া ঝি অপ্রতিভ হইয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

অঘোরময়ী মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, উপীন, আয় বাবা ওপরে আয়।

চল মাসীমা যাচ্ছি, বলিয়া উপেন্দ্র অঘোরময়ীর পিছনে পিছনে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। কিন্তু সমস্ত কথাই তাহার কানে গিয়াছিল।

উপরে আসিয়া অঘোরময়ী তীব্রকণ্ঠে ডাক দিলেন, কোথায় আছ একবার বার হও না বৌমা? উপীন এসেছে যে—

অন্ধকার ঘরের ভিতর বসিয়া কিরণময়ীর বুকের ভেতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল এবং বিছানার মধ্যে দিবাকরের সর্বাঙ্গ শিথিল হিম হইয়া গেল।

অঘোরময়ী পুনরায় ডাক দিলেন, গেলে কোথায়? একখানা মাদুর-টাদুর পেতে দাও না বৌমা—উপীন দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি গো?

কিরণময়ী বাহিরে আসিয়া বারান্দায় একখানা মাদুর পাতিয়া দিল। তাহার মুখ দিয়া সহসা কথা বাহির হইল না।

উপেন্দ্র কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, ভাল আছেন বৌঠান?

কিরণময়ী নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ। তুমি কেমন ঠাকুরপো? বৌ ভাল আছে? খবর না দিয়ে এমন হঠাৎ যে? কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া উপেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। গলার মধ্যে কোথাও যেন লেশমাত্র রস নাই, এমনি শুষ্ক, এমনি নীরস।

উপেন্দ্র কহিল, মক্কেলের পয়সায় আসা বৌঠান, আবার কাল বিকেলেই ফিরে যেতে হবে। কালীঘাটের দরকার সেরে বেরিয়েই দেখি মাসীমা। সেই পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছি। দিবাকরের খবর কি বলুন ত? সে না দেয় চিঠিপত্র, না দেয় একটা খবর। বেরিয়েছে বুঝি?

কিরণময়ী কহিল, মাথা ধরেছে বলে শুয়েচেন। কি জানি, বোধ করি ঘুমিয়ে পড়েচেন।

অঘোরময়ীর মেজাজ আজ ভাল ছিল না। একে ত বধূর দোষ দেখাইতে পারিলে সে সুযোগ তিনি কোনদিন ছাড়িতেন না, তাহাতে দিবাকরের প্রতিও তাঁহার চিত্ত প্রসন্ন ছিল না। সকালে তাহাকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের অছিলায় দিবাকর অস্বীকার করিয়াছিল। তীক্ষ্ণভাবে বলিলেন, এই ত তুমি তার ঘর থেকে বেরুলে বৌমা, সে ঘুমুচ্ছে কিনা তাও জানো না?

না, জানিনে, বলিয়া কিরণময়ী শাশুড়ীর প্রতি একটা বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

উপেন্দ্র উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, দিবাকর?

সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার ডাক দিলেন, দিবাকর ঘুমিয়েছিস?

সে জাগিয়াই ছিল, এ আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিল না। সাড়া দিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণাম করিয়া অব্যক্তস্বরে কহিল, কখন এলে ছোড়দা?

সকালে। তোর মাথা ধরেছে নাকি?

সামান্য।

অঘোরময়ী রাগ করিয়া বলিলেন, মাথা ধরবে না বাছা! প্রথম প্রথম তবু যা হোক একটু ঘুরে-ফিরে আসতে। এখন একেবারে বাড়ির বার হও না। সকালে বললুম, দিবু, আমার সঙ্গে একবার কালীবাড়ি চল ত বাছা। 'না মাসীমা, কাজ আছে'। তোমার কি কাজ ছিল বল ত বাপু?

দিবাকর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, চিঠিপত্র লেখাও বন্ধ করেচিস। কোন্ কলেজে ভর্তি হলি?

দিবাকর মৃদুস্বরে বলিল, কলেজ খুললেই ভর্তি হ'ব। এখনো হইনি।

খুললে ভর্তি হব! এখনো হইনি! অসহ্য ক্রোধে উপেন্দ্রর দুই চক্ষু আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল—ষোলো-সতর দিনের বেশী সমস্ত কলেজ খুলে গেছে—তুই তাও বুঝি জানিস নে?

দিবাকরের মুখখানা কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। সে কাঠের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

অঘোরময়ী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, কি করে খবর জানবে উপীন? দুজনের কি যে রাতদিন ফষ্টি-নষ্টি, হাসি-তামাশা, ফুস্-ফুস্ গল্প-গুজব হয় তা ওরাই জানে! আমি বার বার বলি বৌমা, ও পরের ছেলে, লেখাপড়া করতে এসেচে, ওর সঙ্গে অষ্টপ্রহর অত কেন? হলোই বা দেওর—বৌ-মানুষের সোমত্ত ছেলের কাছে একটু সরম-ভরম থাকবে না? তা কে কার কথা শোনে!

উপেন্দ্রর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তুই বসে আছিস উপীন,—তাই—নইলে এতক্ষণে এসে আমার চুলের মুঠি ধরত—ও আমার এমন লক্ষ্মী বৌ! আমি দিব্যি করে বলতে পারি উপীন, সমস্ত দোষ ঐ হতভাগীর।

কিরণময়ী নীরবে অদূরে দাঁড়াইয়াছিল—একটি কথারও জবাব দিল না। ধীরে ধীরে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

অঘোরময়ী তেমনি রুক্ষস্বরে কহিলেন, ওগো বড়মানুষের মেয়ে! বাছা আমার সারাদিন উপোসী—কিছু খাওয়া-দাওয়ার উযুগ কর গে? অমন করে চলে গেলে ত হবে না!

কিরণময়ী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে সহজ-সুরে কথা কহিল, তাই ত যাচ্ছি মা।

উপেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, পালিয়ো না যেন ঠাকুরপো। আমার খান-কতক লুচি ভেজে আনতে দশ মিনিটের বেশী লাগবে না।

স্তব্ধ, মূর্ছিতপ্রায় দিবাকরকে কহিল, ছোট্‌ঠাকুরপো, তোমাকে অমনি দিয়ে দিই গে—রান্নাঘরে এসো। মা, ঝিকে একবার দোকানে পাঠিয়ে দেব, ঠাকুরপোর জন্যে কিছু মিষ্টি কিনে আনবে?

অঘোরময়ী কিংবা উপেন্দ্র কেহই তাহার জবাব দিতে পারিল না। এই বধূটির অপরিমেয় সংযম এবং অসীম অহঙ্কার যেন একই কালে বুদ্ধির অতীত হইয়া ইহাদিগকে কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক বজ্রাহতপ্রায় করিয়া রাখিল।

প্রায় ঘণ্টা-খানেক কথাবার্তা কহিয়া অঘোরময়ী তাঁহার আহ্নিক এবং মালা-জপ সাঙ্গ করিতে উঠিয়া গেলেন। কিরণময়ী কাছে আসিয়া কহিল, আমার ঘরে তোমার খাবার দিয়েচি ঠাকুরপো, ওঠো।

উপেন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে, কিরণময়ী অদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, আজ এই দিয়েই যা হোক দুটো খাও ঠাকুরপো, বেশী কিছু করতে গেলেই অনর্থক রাত হয়ে পড়ত।

উপেন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিল। ক্ষীণ দীপালোকে তাহার মুখখানা পাথরের মত কঠিন দেখাইতেছিল। খাবারের থালাটা একপাশে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, বৌঠান, খাবার পক্ষে এই যথেষ্ট। কিন্তু আমি খেতে আসিনি—আপনার সঙ্গে নিভৃতে দুটো কথা কইতে এসেছি।

কিরণময়ী কহিল, আমার বহু ভাগ্য, কিন্তু খাবে না কেন?

উপেন্দ্র ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার কঠিন মুখ যেন কঠিনতর দেখাইতে লাগিল। কহিল, আপনার ছোঁয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্চে।

কিরণময়ী নিঃশব্দে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তা হলে খেয়ে কাজ নেই, বলিয়া আবার কিছুক্ষণ মাথা হেঁট করিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া একটু হাসিল। বলিল, ঘৃণা হবার কথাই বটে! কিন্তু তোমার মুখ থেকে এ কথা শুনব আমি কখনো ভাবিনি। সে শুধু একটি লোক ছিল যে ঘৃণায় থালাটা সরিয়ে দিতে পারত—সে সতীশ। তুমি নও ঠাকুরপো।

উপেন্দ্র ক্রোধে, ঘৃণায়, বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী তেমনি শান্ত কঠোরভাবে বলিতে লাগিল, তোমার রাগ বল, ঘৃণা বল ঠাকুরপো, সমস্ত দিবাকরকে নিয়ে ত? কিন্তু বিধবার কাছে সেও যা, তুমিও ত তাই। তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কতদূর গিয়ে দাঁড়িয়েচে, সেটা শুধু তোমাদের অনুমান মাত্র। কিন্তু সেদিন যখন নিজের মুখে তোমাকে ভালবাসা জানিয়েছিলুম, তখন ত আমার দেওয়া খাবারের থালাটা এমনি করে ঘৃণায় সরিয়ে রাখোনি! নিজের বেলা বুঝি কুলটার হাতের মিষ্টান্নে ভালবাসার মধু বেশী মিঠে লাগে ঠাকুরপো?

উপেন্দ্র ভিতরের দুর্নিবার ক্রোধ প্রাণপণে সংবরণ করিয়া কহিল, বৌঠান, স্মরণ করে দিচ্চি যে, আজও আমার সুরবালা বেঁচে আছে। সে বলে, আমাকে যে একবার ভালবেসেছে, তার সাধ্য নেই আর কাউকে ভালবাসে। আমি এই ভরসাতেই শুধু দিবাকে আপনার হাতে সঁপে দিয়েছিলুম! ভেবেছিলুম এ-সব বিষয়ে সুরবালার কখনো ভুল হয় না।

কথাটা শেষ না হইতেই কিরণময়ী অত্যন্ত অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া কহিল, থামো ঠাকুরপো। তার ভুল হয়েছে তোমার হয়নি, এ কথা এমন অসংশয়ে তুমি কি করে বিশ্বাস করলে?

উপেন্দ্র হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, রাত হয়ে যাচ্চে, আমার তর্ক করবার সময় নেই। আমি আপনাকে চিনি। কিন্তু এই কথাটা নিশ্চয় জেনে রাখবেন যে, ভাল আপনি কাউকে বাসতে পারবেন না—সে সাধ্যই নেই আপনার। শুধু সর্বনাশ করতেই পারবেন। ছি ছি—শেষকালে কিনা দিবাটাকে—

ঘৃণায় তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। কিন্তু সুমুখে চাহিয়া দেখিল, কিরণময়ীর সমস্ত মুখ এমনি বিবর্ণ হইয়া গেছে—ঠিক যেন কে তাহার বুকের মাঝখানে অকস্মাৎ গুলি করিয়াছে।

দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া অঘোরময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওয়া হলো বাবা উপীন?

না মাসীমা, আর খেলুম না—ভারী অসুখ করচে।

অসুখ করচে? সে কি রে? তা হলে আজ না হয় এইখানেই শো—আর যাসনে বাবা।

না মাসীমা, আমাকে যেতেই হবে, বলিয়া উপেন্দ্র বাহির হইয়া আসিল। দিবাকরের ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাক দিল, দিবা?

দিবাকর প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। তাহার অন্তরের কথা শুধু অন্তর্যামীই জানিতেছিলেন। অব্যক্ত-কণ্ঠে সাড়া দিয়া কম্পিতপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

উপেন্দ্র কহিলেন, তোর বাক্স-বিছানা বেঁধে নে—আমার সঙ্গে যাবি।

অঘোরময়ী বিস্মিত এবং ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, সে কি উপীন, রাত্তিরে ছেলেমানুষ কোথা যাবে?

আমার সঙ্গে যাবে, তার চিন্তা কি মাসীমা। নে রে, শিগগির ঠিক করে নে—আমি গাড়ি ডেকে আনি।

অঘোরময়ী উপেন্দ্রর হাত ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিলেন, না বাবা, আজ অমাবস্যার রাত্রে ওর কিছুতে যাওয়া হবে না। ছেলেমানুষ, একটা অন্যায় না হয় করে ফেলেচে,—এখানে না রাখিস কাল-পরশু যাবে, কিন্তু আজ রাত্রে কিছুতে আমি ওকে যেতে দিতে পারব না।

বাধা পাইয়া উপেন্দ্র হতাশ হইয়া কহিল, কিন্তু ওকে একটা রাত্রিও আমার এখানে রাখতে ইচ্ছে হয় না মাসীমা। আচ্ছা, আজ অমাবস্যার রাত্রিটা যাক, কিন্তু কাল সকালে আর বাধা দেবেন না—বেলা দশটার মধ্যেই যেন জ্যোতিষের বাড়ি গিয়ে পেঁছয়। বলিয়া অঘোরময়ীকে একটা নমস্কার করিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। সদর দরজার কাছে অন্ধকারে পিছন হইতে চাদরে টান পড়িল। মুখ ফিরাইতেই কিরণময়ী চক্ষের পলকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত দিয়া তাহার পা চাপিয়া ধরিল—আমার বুক ফেটে যাচ্চে ঠাকুরপো, সমস্ত মিথ্যে! সমস্ত মিথ্যে! ছি ছি, এত ছোট আমাকে তুমি পারলে ভাবতে!

চুপ করুন। অনেক অভিনয় করেছেন—আর না। বলিয়া উপেন্দ্র অসহ্য ঘৃণায় তাহার মাথাটা সজোরে ঠেলিয়া দিতেই সে পা ছাড়িয়া দিয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া গেল।

নাস্তিক! অপবিত্র, 'ভাইপার'! বলিয়া উপেন্দ্র দৃকপাতমাত্র না করিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

কিরণময়ী বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া বসিল। কি যেন তাহাকে চীৎকার করিয়া বলিতে গেল, কিন্তু গলা দিয়া স্বর ফুটিল না। শুধু উন্মুক্ত দরজার বাহিরে অন্ধকারে চাহিয়া রহিল এবং চোখ দিয়া যেন আগুন ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকদিন পূর্বে ঠিক এইখানে দাঁড়াইয়া তাহার দুই চোখে এমনি উন্মত্ত চাহনি, এমনি প্রজ্বলিত বহ্নিশিখা দেখা দিয়াছিল; যেদিন সতীশকে সঙ্গে করিয়া উপেন্দ্র প্রথম দেখা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। আবার আজ শেষ বিদায়ের দিনেও তাহার বিরুদ্ধে সেই দুটি চোখের মধ্যে তেমনি করিয়াই আগুন জ্বলিতে লাগিল।

ওমা, এ যে বৌমা! এখানে এমন করে বসে কেন মা?

তুই ঘরে যাচ্ছিস বুঝি ঝি? বলিয়া কিরণময়ী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, একবার আমার ঘরে আয় বাছা, তোকে দুটো কথা বলে নিই. বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে নিজের ঘরে টানিয়া আনিল, এবং প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বাক্স খুলিয়া একজোড়া রুপোর মোটা মল ঝির হাতে দিয়া কহিল, তোর মেয়েকে পরতে দিলুম ঝি—না না, আমার মাথা খাস, তোকে নিতেই হবে,—আর কখনো যদি দেখা না হয়; বলিতে বলিতেই সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

এ সব কি কাণ্ড বৌমা! বলিয়া ঝি বিহ্বল-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কিরণময়ী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, তুই ছাড়া আমার আপনার কেউ নেই ঝি! আমাকে বাঁচা—আমাকে এখান থেকে পরিত্রাণ কর। এখানে থাকলে আমার বুক ফেটে যাবে!

ঝি নিঃশব্দে কিরণময়ীর আপাদ-মস্তক বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, সমস্তই বুঝি বৌমা, আমিও ত মেয়েমানুষ! আমার মিনসে যেদিন পুকুরঘাটে কেঁদে বলেছিল, চললুম মুক্তো, আর হয়ত দেখা হবে না! তখন আমিও ত তার পায়ে পড়ে কেঁদে বলেছিলুম,

ওগো, আমায় সঙ্গে নাও! ফেলে রেখে গেলে আমার বুক ফেটে যাবে। তা কাল সকালেই বুঝি ছোটবাবু এখান থেকে চলে যাচ্ছে বৌমা?

কিরণময়ী বলিল, হুঁ। কিন্তু কলকাতায় আমাদের থাকা হবে না ঝি। কোথায় যাই বল দেখি?

ঝি লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কহিল, তবে আরাকানে যাও মা, মনের সুখে থাকবে। আমার ছোটবোনও সেখানে—আমার নাম করলে তোমাদের সে মাথায় করে রাখবে। আজ ত মঙ্গলবার—কাল ভোরেই জাহাজ ছাড়বে। যাবে মা সেখানে?

কিরণময়ী ঝির হাত ধরিয়া বলিল, যাব।

ঝি ভরসা দিয়া বলিল, তবে তোমরা ঠিক হয়ে থেকো, আমি ভোরবেলায় গাড়ি এনে তোমাদের নিয়ে যাব। কাক-পক্ষী জানতে পারবে না—তোমরা কোথায় গেলে। যাও মা, যাও, ছোটবাবুকে ছেড়ে তুমি বাঁচবে না, বলিয়া ঝি আঁচল তুলিয়া এবার নিজের চক্ষে দিল।

ঠাকুরপো?

রাত্রি বোধ করি তখন ভোর হইয়া গেছে, দিবাকর চমকিয়া উঠিয়া বসিল। ঠিক সম্মুখেই কিরণময়ী দাঁড়াইয়া।

দিবাকর চমকিয়া কহিল, একি, বৌদি যে!

হাঁ ঠাকুরপো, আমিই, বলিয়া কিরণময়ী বিহ্বল দিবাকরের বুকের উপর অকস্মাৎ উপুড় হইয়া পড়িল। কহিল, ঠাকুরপো, আমাকে ছেড়ে নাকি তুমি যাবে? কৈ যাও দেখি!

প্রত্যুত্তরে দিবাকর একটা কথাও কহিতে পারিল না—শুধু তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

কিরণময়ী উঠিয়া বসিয়া আঁচল দিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিয়া কহিল, ছিঃ! কান্না কেন ভাই!

বৌদি, আমি যে নিরুপায়! ছোড়দা যে আজ সকালেই আমাকে চলে যেতে বলেছেন!

উপেন্দ্রর নামমাত্রই কিরণময়ী ক্রোধে অন্ধ হইয়া কহিল, কে ছোড়দা! কে সে! সে কি আমার চেয়েও তোমার বেশী আপনার? তোমাকে না দেখতে পেলে কি তার বুক ফেটে যায়? না ঠাকুরপো, সংসারে কারু সাধ্য নেই আর আমাদের আলাদা করে রাখে। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে—চল আমরা যাই।

কোথায় বৌদি?

আমি যেখানে নিয়ে যাব সেইখানে ঠাকুরপো।

আচ্ছা চল, বলিয়া দিবাকর উঠিতে উদ্যত হইল। একবার তাহার মনে হইল, সে বুঝি জাগিয়া নাই, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু পরক্ষণেই কিরণময়ীর অনুসরণ করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

চৌত্রিশ

কাঁচপোকা যেমন করিয়া পতঙ্গকে টানিয়া আনে, তেমনি করিয়া দুর্নিবার যাদুমন্ত্রে কিরণময়ী অর্ধ-সচেতন বিমূঢ়-চিত্ত হতভাগ্য দিবাকরকে জাহাজ-ঘাটে টানিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল এবং টিকিট কিনিয়া আরাকান যাত্রী-জাহাজে চড়িয়া বসিল। এ জাহাজে ভিড় না থাকায়, জাহাজের কর্তৃপক্ষ স্বামী-স্ত্রী জানিয়া একটা কেবিনের মধ্যেই দিবাকর ও কিরণময়ীর স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। এইখানে কিরণময়ীকে বসাইয়া দিয়া দিবাকর ডেকের একটা নিভৃত অংশে রেলিঙ ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে ডেকের প্যাসেঞ্জারের ভিড় কমিয়া গেলে, কুলিদের গোলমাল থামিয়া আসিল। নোঙর তোলার কর্কশ শব্দে জাহাজের সম্মুখ দিকটার মত দিবাকরের বুকের ভিতরটাও কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণকালেই জাহাজ ভাগীরথীর মাঝামাঝি ভাসিয়া আসিল এবং অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিবার

উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে গতি সঞ্চয় করিতে লাগিল। যখন ঠিক বোঝা গেল জাহাজ চলিয়াছে, তখন দিবাকরের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল এবং সে তাহার দুই করতল মুখের উপরে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া কোনমতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রুদ্ধ করিয়া লজ্জা নিবারণ করিল। পূর্বদিকের আকাশটা তখন তরুণ সূর্যের আভায় রক্তাভ হইয়াছিল এবং তখনও তাহার নিঃসন্দিগ্ধ উপীনদাদা জ্যোতিষ-সাহেবের বাটীতে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠেন নাই। পলায়নোদ্দেশে বাটীর বাহির হওয়া পর্যন্ত যে ভীষণ অব্যক্ত গ্লানি দিবাকরের চিত্তের মাঝে জমা হইয়া উঠিতেছিল, ইহার শেষের দিকটা যে কত কুৎসিত এবং নিদারুণ, এইবার তাহার চক্ষের উপর সে দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। একজন ভদ্র-গৃহস্থবধূকে কুলের বাহিরে কোন এক অজানা দেশে সে নিজে লইয়া যাইতেছে, এমন অসম্ভব কাণ্ড তাহার অন্তরের মধ্যে এতক্ষণ কোথাও সত্যকার আশ্রয় পায় নাই। তাহার শিক্ষা, সংস্কার, চরিত্র, স্কুল, কলেজ, দেশ, বন্ধু-বান্ধব এবং সর্বোপরি তাহার পিতৃসম উপীনদাদা—এই সমস্ত হইতে সে যে কিরূপ নির্মম-ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, এখনই নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিল, যখন দেখিল জাহাজ সত্যই চলিতে শুরু করিয়াছে। তাহার উপীনদাদার কাছে আজিও সে বালক-মাত্র। সেই উপীনদাদার মনের ভাবটা এই সংবাদে কি হইয়া যাইবে, তাহা মনে করিতে গিয়াই তাহার বক্ষস্পন্দন থামিয়া যাইতে চাহিল। সেইখানে দুই জানুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল এবং এক নিমিষে তাহার অদম্য চক্ষের জল ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। এমন সময় কিরণময়ী তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মাথায় হাত রাখিয়া স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, ঠাকুরপো, একবারটি ঘরে এসো।

বহু চেষ্টায় ও বহুক্ষণে দিবাকর তাহার চক্ষের জল শুষ্ক করিয়া অধোমুখে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে কিরণময়ীর অনুসরণ করিয়া কেবিনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিরণময়ী দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া দিবাকরকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া তাহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, মুখপানে চাহিয়া অত্যন্ত করুণ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাঁদছিলে কেন ভাই?

প্রশ্ন শুনিয়া দিবাকরের চোখের জল আবার গড়াইয়া পড়িল।

কিরণময়ী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, সত্যি করে বল দেখি ঠাকুরপো, তুমি আমাকে ভালবাস কি না?

দিবাকর কিছুই বলিতে পারিল না। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

কিরণময়ী তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ নিজের বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিল এবং ধীরে ধীরে তাহার মাথার মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া নিঃশব্দে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

এমন বহুক্ষণ কাটিল ; বহুক্ষণে দিবাকরের অশ্রুর ধারা আপনিই নিঃশেষ হইয়া গেলে, সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল এবং কোন কথা না বলিয়া দরজা খুলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল। জাহাজ তখন নদীর তীর ঘেঁষিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মাটি বাঁচাইয়া, জল মাপিয়া মন্দগতিতে সমুদ্রের অভিমুখে চলিয়াছে এবং ছোটবড় জেলেডিঙি ও মালবোঝাই নৌকার ক্ষুদ্র যাত্রীরা মস্ত জাহাজের মস্ত মর্যাদা রক্ষা করিয়া তফাত দিয়া অতি সাবধানে বাহিয়া যাইতেছে।

দিবাকর রেলিংয়ের পার্শ্বে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া পুনরায় বসিয়া পড়িল এবং দূরে-অদূরে, জলে-স্থলে, যাহা-কিছু তাহার চোখে পড়িতে লাগিল, তাহারই কাছে মনে মনে অত্যন্ত বেদনার সহিত চিরবিদায় গ্রহণ করিতে করিতে অন্তরের অসহ্য দুঃখ অন্তর্যামীকে নিবেদন করিয়া দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণে আবার কেবিনের মধ্যে ডাক পড়িল।

কিরণময়ী বলিল, বেলা অনেক হলো, স্নান করে এস। আমি ততক্ষণ তোমার খাবার ঠিক করে রাখি।

সে নিজে এইমাত্র স্নান করিয়া লইয়াছিল। পিঠের উপর আর্দ্র চুলের রাশি ছড়াইয়া দিয়া কেবিনের মেঝেতে বসিয়া হাঁড়ির মুখ খুলিয়া কি কতকগুলো আহার্য-সামগ্রীর

জমা-খরচের হিসাব করিতেছিল। রাতের মধ্যে সে ঝিকে দিয়া এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল।

দিবাকর জবাব দিল, তুমি খাও, আমার কিছুমাত্র ক্ষিদে নেই বৌদি।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, সে হবে না। তুমি না খেলে আমারও খাওয়া হবে না। তুমিই এখন আমার সর্বস্ব—তোমাকে না খাইয়ে আমি কিছুতেই খেতে পারব না।

কথা শুনিয়া দিবাকর লজ্জায় মরিয়া গেল এবং কোনো কথা না বলিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই কিরণময়ী ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, এ যে সপ্তরথীর ব্যূহ ঠাকুরপো, পালাচ্চ কোথায়? প্রবেশের পথ আছে, কিন্তু বার হবার পথ কি সবাই জানে? যদি সে ইচ্ছেই ছিল, এ বিদ্যে তোমার উপীনদাদার কাছ থেকে শিখে নাওনি কেন?

একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল, তামাশা নয় ঠাকুরপো, আমার অবাধ্য হয়ো না—স্নান করে এসে কিছু খাও, তার পরে বাইরে রেলিঙ ধরে যত খুশি কেঁদো, আমি আপত্তি করব না। কিন্তু এও বলে রাখি ঠাকুরপো, চোখের জলের এর পরে বিস্তর প্রয়োজন হবে, অপ্রয়োজনে বাজে খরচ করে তখন যেন আপসোস করতে না হয়।

দিবাকর জবাব দিল না। আগন্তুক দিনের এই নিষ্ঠুরতম পরিণামের ইঙ্গিত নতশিরে বহন করিয়া স্নানের জন্য নীরবে বাহির হইয়া গেল। শূন্য কক্ষে কিরণময়ীও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বিদ্রূপের শূল শুধু দিবাকরকেই বিদ্ধ করিল না, তাহা সহস্রগুণিত হইয়া নিজের বক্ষের মাঝে ফিরিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়া দিবাকর ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে জাহাজের যে-অংশে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল সেইখানে নামিয়া গেল, এবং বিভিন্ন প্রদেশের নানা বর্ণের যাত্রীদের মধ্যে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবার পথ খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। এই ভারতবর্ষের মধ্যে কত বিভিন্ন জাতি, কত বিচিত্র পোশাক-পরিচ্ছদ, কত অজ্ঞাত ভাষা যে প্রচলিত রহিয়াছে, দিবাকর এই তাহা প্রথম দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। জাহাজের খোলের মধ্যেই সেই জনতা এবং নানাবিধ ভাষার সংমিশ্রণে যে অপরূপ শব্দরাশি উত্থিত হইতেছে তাহাই বা কি বিচিত্র! সে সিঁড়ি বাহিয়া তথায় নামিয়া গেল এবং নির্বাক-বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

অল্প একটুখানি স্থান দখল করিয়া লইতে যাত্রীদের মধ্যে ইতিপূর্বে যে প্রবল ঠেলাঠেলি রেষারেষি এবং তর্জন-গর্জন চলিয়াছিল, তখন তাহা থামিয়া আসিয়াছে। যাত্রীরা নিজেদের অধিকৃত স্থানটুকুর উপর শয্যা বিছাইয়া জিনিসপত্রের বেড়া দিয়া যথাসাধ্য নিরাপদ হইয়া এইবার প্রতিবেশীর প্রতি মনোযোগ দিবার সময় পাইয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের একটা সন্তোষজনক পরিচয় গ্রহণে উৎসুক।

এক অংশে দিবাকরের দৃষ্টি পড়িতেই একজন বাঙালী দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, বাবুমহাশয়, একবার এদিকে আসুন, এদিকে আসুন—

লোকটির পাশে একজন মজবুত গোছের স্ত্রীলোক বসিয়াছিল, সেও সোৎসুকনেত্রে সেই অনুরোধেরই সমর্থন করিল। দিবাকর বহু পরিশ্রমে বহু লোকের তিরস্কার ও চোখ-রাঙানি মাথায় করিয়া ভিড়ের মধ্যে সাবধানে পা ফেলিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতেই লোকটি নিকটস্থ তোরঙ্গের উপর স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, এটা আমার টিনের পেঁটি নয় মশাই, আসল লোহার,—আপনি স্বচ্ছন্দে বসুন। মশায়, আপনারা?

দিবাকর বলিল, ব্রাহ্মণ।

তৎক্ষণাৎ লোকটি দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দিবাকরের জুতার উপর হইতেই পদধূলি সংগ্রহ করিয়া লইয়া জিহ্বায়, কণ্ঠে ও মস্তকে স্থাপন করিয়া বলিল, ভাবছিলাম এ কটা দিন বুঝি বা বৃথায় যায়। মশায় আছেন কোথায়?

দিবাকর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উপরে দেখাইয়া দিলে, সে বলিল, কেবিনে আছেন? তা যেখানেই থাকুন দিনান্তে একটিবার পদধূলি থেকে বঞ্চিত করবেন না। যাবেন কোথায়, রেঙ্গুনে?

দিবাকর মাথা নাড়িয়া বলিল, না আরাকানে।

আরাকানে ত আমিও থাকি। আজ বিশ বৎসর ওখানে আছি, মহাশয়কে ত কখন দেখিনি।

এই প্রথম যাচ্ছেন? সেখানে কেউ আত্মীয় আছেন বুঝি? নেই? তা হোক—কিছু চিন্তা করবেন না। মশায়ের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে আমি ওখানকার একজন বাড়িওয়ালা, অনেকগুলো ঘর আমার খালি পড়ে আছে। তা যাবেন আপনি—আমার সঙ্গেই। পার্শ্বোপবিষ্টা স্ত্রীলোকটিকে দেখাইয়া বলিল, ইনি বাড়িউলী।

বাড়িউলী এতক্ষণ অনিমেষ-দৃষ্টিতে দিবাকরের পানে চাহিয়াছিল। অত্যন্ত ভারী ও মোটা গলায় জিজ্ঞাসা করিল, আপনার পরিবার সঙ্গে আছেন বুঝি?

দিবাকর মুখ রাঙ্গা করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কোনমতে জানাইয়া দিল, আছেন। স্ত্রীলোকটির কথা বাঁকা বাঁকা, কপালে উল্কি, সীমন্তে মস্ত চওড়া সিন্দুরের দাগ, নাকে নথ এবং দুই কানে বিশ-ত্রিশটা মাকড়ি। মাথায় যে একটুখানি আঁচল দেওয়া ছিল, উৎসাহের আবেগে তাহাও নামিয়া পড়িল। কহিল, ভালই হলো। আরাকান বড় মন্দ জায়গা মশায়,—মগের দেশ। কিন্তু আমার বাড়িতে কারো দাঁত ফোটাবার জো নেই—আমি তেমনি বাড়িউলী নই। কামিনীকে ভয় করে না এমন লোক ওদেশে নেই। থাকবেন আমার বাড়িতেই, কোন ভয় নেই। ভাড়া পাঁচ টাকা করে, তা দেবেন আপনি চার টাকা করেই,—হাঁ বাড়িআলা, তোমাদের বাংশালে একটা কাজ জুটবে না?

বাড়িআলা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, তা—তা জুটবে বৈ কি!

দিবাকর প্রশ্ন করিল, মশায়ের নাম—

হরিশ ভট্টাচায্যি! না, না, ও করবেন না—অপরাধ হবে। আমি ব্রাহ্মণ নই, কৈবর্ত। একটু শাস্তর-টাস্তর জানা আছে বলে লোকে আদর করে ভট্‌চায বলে ডাকে। ত্রিকণ্ঠি মালা ধারণ করেছি, মাছ-মাংস পরিত্যাগ করেছি,—আর কেন মশায়, ঢের ত করে দেখলুম; এখন প্রায় দু'হাজার আড়াই হাজার খরচ করে চার ধামে ঘুরে এলুম, বাড়িতেও বছর-চারেক থাকে আনলুম,—আর কেন! তাই বাড়িউলীকে মাঝে মাঝে বলি, বাড়িউলী আরাকানে যা-কিছু আছে বিক্রি সিক্রি করে কোথাও একটা তীর্থধামে গিয়ে থাকি চল। বলিয়া লোকটা উদাসমুখে উপরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। বাড়িউলীও তাহার স্বাভাবিক মোটা গলায় প্রত্যুত্তর করিল, আমিও তাই বলি। কাঁচা-বয়সে অদিষ্টের ফেরে যা করেছি, তা ত করেইছি—সে কিছু আর আমার গায়ে লেখা নেই—আমিও বলি, বাড়িআলা, আর নয়, এইবার যাই চল। বলিয়া সেও ঊর্ধনেত্রে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। দিবাকর পাকা লোক নয়, এই সমস্ত ইতিহাসের নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বাড়িউলী কথা কহিল। বলিল, হাঁ বাড়িআলা, এইবার তবে চিঁড়েগুলি ভিজিয়ে দিই?

বাড়িআলার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ধীরে ধীরে বলিল, দাও।

সংসার অনভিজ্ঞ দিবাকর এ ইঙ্গিতের তাৎপর্যটা এখন বুঝিতে পারিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি এখন যাই,—আবার আসব তখন।

হরিশের নিকট হইতে বিদায় লইয়া দিবাকর অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায় ডেকের একখানা আরাম-চৌকির উপরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কখন যে জাহাজ নদীর ঘোলা জল পার হইয়া গেল, কখন যে অগাধ কৃষ্ণবর্ণ লবণাম্বুরাশির মাঝখানে ভাসিয়া আসিল, তাহা জানিতেও পারিল না। অস্ফুট-কোলাহলে ঘুম ভাঙ্গিয়া সম্মুখে দেখিল রাঙ্গা-সূর্য অস্ত যাইতেছে। বহু লোক তর্ক-বিতর্ক করিতে করিতে তাহাই দেখিতেছে। যে সূর্যাস্তের বিবরণ সে ইতিপূর্বে ইংরাজী বাংলা অনেক পুস্তকে অনেকবার পড়িয়াছে, এই সেই সূর্যাস্ত! এই সেই সত্যকার সমুদ্র! চতুর্দিকে চাহিয়া একবার সে অনন্ত জলরাশি দেখিয়া লইল এবং পরক্ষণে অস্তগমনোন্মুখ সূর্যদেবকে নমস্কার করিতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সূর্য অস্ত গেল, সে চাহিয়া রহিল, আকাশ ম্লান হইয়া আসিল সে চাহিয়া রহিল, সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতে লাগিল সে চাহিয়া রহিল, ক্রমে আকাশ ও জল গাঢ় কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করিল, তবুও দিবাকর তেমনি করিয়াই চেয়ারে পড়িয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

নৈশ শীতল বায়ু হুহু করিয়া বহিয়া যাইতেছে, উপর ডেক প্রায় জনশূন্য, মাথার উপরে কৃষ্ণপক্ষের গভীর কালো আকাশ, নীচে সাগরের তেমনি গভীর কালো জল, তাহারি মাঝখানে দিবাকর নিজের অন্তরের সুগভীর কালিমাকে নিমজ্জিত করিয়া দিয়া কিছুক্ষণের

জন্য স্বস্তি বোধ করিতেছিল, এমনি সময়ে হঠাৎ কাহার কোমল হস্তস্পর্শে তাহার চমক ভাঙ্গিল। ফিরিয়া দেখিল, কিরণময়ী।

কিরণময়ী বলিল, কি হচ্চে ঠাকুরপো! তুমি কি মৃত্যু পণ করে অনশন-ব্রত নিয়েচ?

দিবাকর জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

কিরণময়ী ক্ষণকাল মাত্র উত্তরের অপেক্ষা করিয়া, ঘরে এস, বলিয়া জোর করিয়া তাহাকে কেবিনের মধ্যে টানিয়া আনিল এবং মেঝের উপরে পাতা শয্যার উপর বসাইয়া দিয়া কহিল, কিছুই যদি না বোঝ, এটা অন্ততঃ ত বুঝতে পারচ যে, শত কান্নাকাটিতেও জাহাজ তোমাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে না। না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না, সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেও না। আরাকানে তোমাকে যেতেই হবে। তবে কেন মিছে নিজে শুকিয়ে আমাকে শুকোচ্চ? যা দিই, যা পার খাও, তারপরে জাহাজ যখন আরাকানে পৌঁছবে, যেখানে খুশি নেবে যেয়ো, যখন খুশি ফিরে এসো—তোমার দিব্যি করে বলচি ঠাকুরপো, আমি বাধা দেব না। বলিতে বলিতেই কিরণময়ীর কণ্ঠস্বর উগ্র এবং ক্ষুৎপিপাসাতুর দুই চক্ষু আগুনের মত দীপ্ত হইয়া উঠিল। দিবাকর মুখ তুলিয়া মুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল। আজ এতদিন পরে তাহার মনে হইল, যবনিকার অন্তরালে সে যেন সত্য বস্তুটির অকস্মাৎ দেখা পাইয়া গেল। কিরণময়ীর সুন্দর দুই চক্ষের বাসনাদীপ্ত বুভুক্ষু দৃষ্টির মাঝে আর যাই কেন না থাক, তাহার জন্য সেখানে একবিন্দু ভালবাসা নাই। তথাপি সে কোন কথা কহিল না, নীরবে দৃষ্টি আনত করিয়া উচ্ছ্রিত দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পাথরের মত বসিয়া রহিল।

ক্ষণপরেই কিরণময়ী উঠিয়া গেল এবং একটা হাঁড়ির ভিতর হইতে কিছু মিষ্টি একখানি ছোট রেকাবিতে করিয়া আনিয়া দিবাকরের সম্মুখে আসিয়া জানু পাতিয়া উঁচু হইয়া বসিল এবং জোর করিয়া একহাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া একটির পর একটি করিয়া তাহার মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। এমনি করিয়া সবগুলি নিঃশেষ করিয়া কিরণময়ী মুহূর্তকাল কি ভাবিয়া লইল, পরক্ষণেই নত হইয়া দিবাকরের আর্দ্র ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই বিষাক্ত চুম্বন এবং এই নিষ্ঠুর হাসি, দিবাকর তাহার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া সহ্য করিল, কিন্তু রাত্রে যখন এক শয্যায় শয়ন করিবার আয়োজন চলিতে লাগিল, তখন সে আর কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, সে হবে না বৌদি, এ আমি কিছুতেই পারব না। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যেখানে হোক বাইরে এক জায়গায় পড়ে থাকি গে, কিন্তু তোমার এ হুকুম পালন করবার জন্যে কিছুতেই আমি এ-ঘরে রাত্রি কাটাতে পারব না—কিছুতেই না—কিছুতেই না।

কিরণময়ী তখন বিছানা পাতিতেছিল—ফিরিয়া চাহিল। দিবাকর আবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এ কোনমতেই হবে না।

কিরণময়ী প্রথমটা হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি আসিল না। কহিল, কি হবে না ঠাকুরপো, শোয়া?

দুই চক্ষু তাহার বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত জ্বলিয়া উঠিল। সে দাঁতের উপরে দাঁত চাপিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তুমি কি মনে কর, সমস্ত অপরাধ আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে, দিব্যি ভালমানুষটার মত দেশে ফিরে গিয়ে, তোমার উপীনদাদার পা ছুঁয়ে শপথ করে বলবে, তুমি সাধু! তোমার উপীনদাদা মাথা উঁচু করে চলবে? সে হবে না ঠাকুরপো! সব কথা আমার বুঝবে না, বোঝবার প্রয়োজনও নেই—তুমি সাধু হও, না হও, সেজন্যও ভাবি না; কিন্তু অপরাধের ভারে যখন আমার মাথা নুয়ে পড়বে, তখন তোমার উপীনদাদার ঘাড়েও উঁচু করে চলবার মত মাথা কিছুতেই রাখব না—এ তুমি নিশ্চয়ই জেনো। বলিয়াই আবার সে তাহার শয্যা-রচনায় প্রবৃত্ত হইল এবং অদূরে গদি-আঁটা বেঞ্চের উপর দিবাকর আড়ষ্ট হইয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

রাত্রে উভয়ে পাশাপাশি শয়ন করিল। অদৃষ্টের ফেরে সর্বস্ব দান করিয়া হরিশচন্দ্র যেমন করিয়া চণ্ডালের হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তেমনি ঘৃণায় দিবাকর কিরণময়ীর শয্যাপ্রান্তে আত্মসমর্পণ করিল। কিন্তু এ বিতৃষ্ণা কিরণময়ীর অগোচর রহিল না।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন দুই কানের মধ্যে কোথাকার অস্ফুট রোদন প্রবাহের

মত আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল এবং তাহারই মাঝে মাঝে কাহাদের রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস রহিয়া রহিয়া গর্জিয়া উঠিতে লাগিল। ভোরের দিকে একটা দোলা খাইয়া সে একেবারে সজাগ হইয়া উঠিয়াই বুঝিল, বাহিরে প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে এবং জাহাজ দুলিতে শুরু করিয়াছে। চোখ চাহিয়া দেখিল, তাহার বক্ষের উপর কিরণময়ীর কোমল বাম হস্ত নিদ্রিত কালসর্পের মত পড়িয়া আছে। পাছে সজাগ হইয়া উঠিয়াই দংশন করে, এই আশঙ্কায় সে যেন উঠিতে সাহস করিল না, আবার চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বাতাস এবং দোলনের বেগ ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল এবং কিরণময়ীর ঘুম ভাঙিয়া গেল। দিবাকরের বক্ষস্থিত শিথিল হস্ত ঈষৎ চাপিয়া ধরিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, বাহিরে ও কি—ঝড় নাকি?

দিবাকর বলিল, হাঁ।

তবে উপায়?

দিবাকর কথা কহিল না।

কিরণময়ী বলিল, জাহাজ যেন ডুবে যায়, এই প্রার্থনাই বোধ করি ভগবানের কাছে জানাচ্চ—না ঠাকুরপো?

দিবাকর বলিল, না।

ছোট্ট একটুখানি 'না'—তুমি মানুষ, না পাথরের, ঠাকুরপো? বলিয়াই সে সুদৃঢ় বলের সহিত দিবাকরকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, জাহাজ যদি ডোবে, আমরা যেন এমনি করেই মরি। তীরে ভেসে যাব, লোকে দেখবে, ছাপার কাগজে উঠবে, তোমার উপীনদাদা পড়বে—সে কেমন হবে ঠাকুরপো!

এই কাল্পনিক চিত্রের ঘৃণিত পরিকল্পনা দিবাকরকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল এবং কিরণময়ীর বন্ধন-পাশ হইতে নিজেকে সজোরে মুক্ত করিয়া টলিতে টলিতে সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পঁয়ত্রিশ

ডেকের উপর একখানা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। বুকের ভিতরটায় যে কি-রকম করিতে লাগিল, তাহাকে অস্পষ্টভাবে অনুভব করা ভিন্ন বুদ্ধিপূর্বক হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি তাহার ছিল না। জাহাজের গায়ে উদ্দাম তরঙ্গ উন্মাদের মত ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, আবার ছুটিয়া আসিয়া আবার মিলাইতেছে—এমনি করিয়া আঘাত-অভিঘাতের আশ্চর্য খেলা, দিবাকর আত্মবিস্মৃত হইয়া দেখিতে লাগিল। উপরে পূর্বদিকের আকাশে দিগন্ত হইতে ধূসর মেঘ পাহাড়ের মত জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল এবং তাহারি পশ্চাতে তরুণ সূর্য উঠিল কি না, রশ্মির একটি রেখাও সে সংবাদ নীচে বহন করিয়া আনিবার পথ পাইল না। পরক্ষণেই ডেকের উপরে খালাসীরা ব্যস্ত হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল এবং উপরে কাপ্তানের ঘন্টা মুহুর্মুহুঃ শব্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ঝড়ের বেগ যে উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়িবে, এ ইঙ্গিত আকাশের মেঘ এবং সিন্ধুর তরঙ্গ ব্রীজের কাপ্তান হইতে নীচের কামিনী বাড়িউলী পর্যন্ত সকলের কাছেই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া দিল। এমন সময় একজন খালাসী আসিয়া কহিল, বাবু, বৃষ্টি পড়তে আর দেরি নেই. ঝড়জলে বাইরে বসে কেন কষ্ট পাবেন, কেবিনে যান। দেখুন, সেখানে এতক্ষণ হয়ত বা কি হচ্চে!

দিবাকর উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে সেখানে?

খালাসী চট্টগ্রামবাসী মুসলমান। হাসিমুখে দুর্বোধ্য উচ্চারণে বলিল, কিছু হয়নি। কিন্তু জাহাজ ভারী দুলচে কিনা—তাই বলচি বাবু, গিয়ে দেখুন, মেয়েরা কি কচ্চেন। এত দুলানি সহ্য করা ভারী শক্ত। দিবাকর উঠিয়া দাঁড়াইয়াই বুঝিল, খালাসীর কথা অত্যন্ত সত্য। টলিয়া পড়িতেছিল, সে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, চলুন বাবু, আপনাকে দিয়ে

আসি। ইহার সাহায্যে কোনক্রমে দিবাকর কেবিনের দ্বার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল। দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখিল কিরণময়ী বিছানা ছাড়িয়া পাশের লোহার বেঞ্চের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহারই একপ্রান্ত জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আছে। দিবাকর শিয়রের কাছে গিয়া বসিল, বলিল, কষ্ট হচ্চে বৌদি?

কিরণময়ী কথা কহিল না, মাথা তুলিল না, শুধু নিঃশব্দে দিবাকরের কোলের উপর ডান হাতখানি রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। জাহাজ ওলট-পালট করিতে লাগিল. বাহিরে ক্রুদ্ধ পবন গোঁগোঁ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, এবং উত্তাল তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত জলকণা প্রবলতর বেগে ক্ষুদ্র জানালার মোটা কাঁচের উপর বারংবাব আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল।

তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল এবং বসিয়া থাকা অসম্ভব বুঝিয়া সে সংকীর্ণ বেঞ্চের উপরেই কিরণময়ীর মাথার কাছে মাথা রাখিয়া মূর্ছাগ্রস্তের ন্যায় শুইয়া পড়িল।

কিরণময়ী হাত বুলাইয়া তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, শুয়ে পড়লে, মাথা ঘুরচে বুঝি?

দিবাকর কহিল, হাঁ।

কিরণময়ী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ঠাকুরপো, ঝড় ত ক্রমেই বাড়চে, জাহাজ ডুববে বলে কি মনে হয়?

দিবাকর বলিল, না।

কিরণময়ী কহিল, হাঁ, নয় না,—তুমি কি আদালতে সাক্ষি দিচ্ছ ঠাকুরপো? বলিয়া সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলিল, ডুবলে ভাল হতো। যদি না-ই ডোবে, তা হলেই বা এমনি করে আমাদের ক'দিন চলবে?

দিবাকর উত্তর দিল না দেখিয়া কিরণময়ী দিবাকরের মাথাটা হাত দিয়া নাড়িয়া বলিল, শুনতে পাচ্চ কি?

পাচ্চি। যতদিন পারে চলুক।

তার পরে?

তার পরেও সমুদ্রে জল থাকবে, গলায় দেবার মত দড়িও জুটবে। যেটা হোক একটা বেছে নিলেই হবে।

এতক্ষণ পরে দিবাকরের মুখে একটা কঠিন কথা শুনিয়া কিরণময়ী অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার পরে সহজ-গলায় বলিল, না, তা করো না,—বাড়ি ফিরে যাও। তুমি পুরুষমানুষ, গিয়ে যা হোক একটা কিছু বললেই চুকে যাবে। খুব সম্ভব, সে প্রয়োজনও হবে না,—তোমার আপনার লোক কেউ এ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাইবে না।

দিবাকর চুপ করিয়া রহিল। এমন প্রস্তাবটি যত বড় লোভনীয় হোক, সে মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, আর তুমি?

কিরণময়ী পূর্বের মত সহজ শান্তস্বরে বলিল, আমি? যেখানে যাচ্ছি—আমাকে সেখানেই থেকে যেতে হবে।

দিবাকর কহিল, কি করে থেকে যাবে. কে আছে সেখানে?

কিরণময়ী কহিল, কেউ না।

তবে?

তবুও থেকে যেতে হবে।

দিবাকর উৎকণ্ঠায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, একটু স্পষ্ট করেই বল না বৌদি? বলচ কেউ নেই, অথচ থেকে যাবে কি করে, আমি ত ভেবে পাইনে। তুমি সেখানে একা থাকবে নাকি?

কিরণময়ী হাসিল। সে হাসি দিবাকর দেখিতে পাইল না, পাইলে বুঝিত। কিরণময়ী কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, না ঠাকুরপো, একা থাকতে পারব না,—আমার সে বয়স নয়। কিন্তু তোমার কাছে ও-সব আলোচনার প্রয়োজন নেই। বলিয়াই সে দিবাকরের ডান হাতটা মুখের উপর টানিয়া লইয়া ব্যথার সহিত বলিল, কিন্তু তোমাকে নিরর্থক কষ্ট দিলুম। সে জন্যে মাপ চাইচি ঠাকুরপো।

দিবাকর আবার অবসন্নের মত শুইয়া পড়িল। সব কথা সে নিঃসংশয়ে বুঝিল না, কিন্তু এটুকু বুঝিল যে, ঘরে ফিরিবার অন্ধকার পথে যে-আশার দীপ-শিখাটি মুহূর্ত পূর্বেই

সে মূঢ়ের মত জ্বালিয়া তুলিয়াছিল, আবার তাহা নিবাইয়া ফেলিবার সময় হইল।

প্রদীপ নিবিল বটে, কিন্তু তাহার দুর্গন্ধ বাষ্পে দিবাকরের বুকের ভিতরটা একেবারে বোঝাই হইয়া গেল। সে অবরুদ্ধ নিশ্বাসের গভীর বেদনায় খাড়া উঠিয়া বসিয়া তীব্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তুমি কি তামাশা করছিলে বৌদিদি এতক্ষণ?

মুখচোরা লজ্জা-নম্র দিবাকরের এই আকস্মিক উগ্রতায় কিরণময়ী চমকিত হইল। বলিল, কোন তামাশা ঠাকুরপো?

আমাদের বাড়ি ফিরে যাবার কথা! এ বিদ্রূপের কি কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল?

কিরণময়ী কহিল, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ত কিছুই করিনি।

তবে এ কি সত্যি?

সত্যি বৈ কি ভাই!

তুমি একা থেকে যাবে, এও তবে সত্যি!

এও সত্যি।

ওঃ—তাই বুঝি আরাকানে যাচ্ছ! কিন্তু কার কাছে কি ভাবে থাকবে শুনি?

প্রত্যুত্তরে কিরণময়ী শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল মাত্র। তাহাদের এই পালানোটা যে দিবাকরের পক্ষে কিরূপ ভয়াবহ, ইহার লজ্জা যে কিরূপ দুঃসহ, সে তাহার সমস্তই জানিত; এবং এই নিদারুণ অবস্থা-সংকটে পড়িয়া তাহার মনটা যে কতদূর বিকল হইয়া গেছে, কিছুই কিরণময়ীর অবিদিত ছিল না। দিবাকরকে সে ভালও বাসে নাই—বাসাও অসম্ভব। তথাপি, আশ্চর্য এই যে, ইহারই পরিপূর্ণ ঔদাসীন্যে কিরণময়ী মনে মনে এতক্ষণ ব্যথাই পাইতেছিল।

কিন্তু যে-মুহূর্তে দিবাকর তাহার রুক্ষস্বর ও তীব্রতর প্রশ্নে ভিতরের ঈর্ষার জ্বালাটা একেবারে অত্যন্ত সুগোচর করিয়া ফেলিল, সেই মুহূর্তেই কিরণময়ীর অন্তরের নিভৃত বেদনাটা হর্ষে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। এই পুলকের আরও একটা বড় কারণ ছিল। ইতিপূর্বে অপরিণত-বুদ্ধি এই তরুণ যুবকটি তাহার প্রথম যৌবনের সৌন্দর্য-তৃষ্ণায় এই আশ্চর্য নারীর অলৌকিক রূপের পানে যখন তিল-তিল করিয়া আকৃষ্ট হইতেছিল, কিরণময়ী তখন দেখিয়াও দেখে নাই, জানিয়াও ভ্রূক্ষেপ করে নাই। কেমন করিয়া সে মধুচক্র গড়িয়া উঠিতেছিল, কোথায় তাহার মধু সঞ্চিত হইতেছিল, নিরতিশয় অবহেলায় এদিকে সে দৃষ্টিপাত করে নাই। কিন্তু, আজ যখন খোঁচা খাইয়া অকস্মাৎ মধু ঝরিয়া পড়িল, তখন, এই নির্বাসনে যে-লোক তাহার একমাত্র অবলম্বন, তাহারই মধুচক্রের সযত্ন-সঞ্চিত প্রচ্ছন্ন মধু-ভাণ্ডারের প্রতি কিরণময়ী তাহার একান্ত সতর্ক দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়া রাখিল। হাসিয়া বলিল, কার কাছে কিভাবে থাকব, সে খবর শুনে তোমার লাভ কি ঠাকুরপো? যখন ফিরেই যাবে, তখন এ অনাবশ্যক কৌতূহলের কোন সার্থকতাই নেই।

দিবাকর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। পরে কহিল, ফিরে যাবই এ কথা ত আমি একবারো বলিনি। ওটা তোমারই মুখের কথা—আমার নয়।

কিরণময়ী বলিল, সে ঠিক। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে তোমার মনের কথাই বার হয়ে এসেছে,—বলিয়াই সে তীব্র প্রতিবাদ প্রত্যাশা করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। কিন্তু প্রতিবাদ আসিল না। কিরণময়ী তাহাকে ভাবিবার সময় দিয়া ধৈর্য ধরিয়া রহিল। বহুক্ষণ কাটিয়া গেল—বাহিরে ঝড়-জলের অশ্রান্ত আক্রমণে জাহাজের মেরুমজ্জা কাঁপিতে লাগিল, খালাসীদের অস্পষ্ট কোলাহল মাঝে মাঝে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, কিরণময়ীর ধৈর্যের বাঁধও ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, কিন্তু এ ক্ষুদ্র কাঠের ঘরটির নিস্তব্ধতা অক্ষুণ্ণ হইয়াই রহিল।

দিবাকর প্রতিবাদ করিবে না ইহাতে কিরণময়ীর যখন আর লেশমাত্র সংশয় রহিল না, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিল, তবে কি তোমার ফিরে যাওয়াই স্থির হলো?

দিবাকর বলিল, না।

কিরণময়ী আর কোন প্রশ্ন করিল না।

ছত্রিশ

সেই রাত্রেই ঝড়জল কমিয়া গেল। সারাদিন অবিশ্রাম মাতামাতি করিয়া মত্ত সিন্ধু ভোরের দিকে শান্ত হইয়া আসিল। কিন্তু উপরের আকাশ প্রসন্ন হইল না—মুখ ভারী করিয়া রহিল।

সকালে ক্ষণকালের জন্য সূর্যোদয় হইল বটে, কিন্তু সূর্যদেব এই জাহাজের ভয়ার্ত অর্ধমৃত যাত্রীদিগকে বাস্তবিক সান্ত্বনা দিয়া গেলেন, কিংবা চোখ রাঙ্গাইয়া অন্তর্ধান হইলেন, নিশ্চিত বুঝা গেল না।

এমনি সময়ে দিবাকর বাহিরে আসিয়া একটা ক্যাম্বিসের আরাম-চৌকির উপর কাত হইয়া শুইয়া পড়িল। কি জানি কেন, আত্মগ্লানির তুষানল আজ তাহাকে আর তেমন করিয়া দগ্ধও করিতেছিল না। লজ্জার বারিধিও আজ তত দুস্তর বোধ হইল না—কোথায় যেন নীল রঙের গাছপালায় ঘেরা একটা অস্পষ্ট কূল ঝাপসা হইয়া চোখে পড়িতে লাগিল। বুকের অসহ্য বোঝাটা এইভাবে যখন হালকা হইয়া আসিয়াছে, তখন স্থির হইয়া বসিয়া দিবাকর আর একবার কিরণময়ীর তর্কটার উপরে নিজের প্রবৃত্তির দাগা বুলাইয়া লইতে প্রবৃত্ত হইল। কাল রাত্রে কিরণময়ী এই বলিয়া তর্ক করিয়াছিল যে, আমরা যথার্থ অন্যায় তখনই করি, যখন কাহাকেও তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করি! সুতরাং, কোনো কাজে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ইহাই দেখা প্রয়োজন যে, কাহারো সত্যিকার অধিকারে হাত দিতেছি কি না। আবার এ অধিকার বাহিরের দিকে যেমন, ভিতরের দিকেও ঠিক তেমনি। নিজের উপরেও নিজের একটা সত্য অধিকার আছে। নিজের বলিয়া সে কাহারো চেয়ে তুচ্ছ নয়। সে অধিকারেও বাহিরের কাহারো হস্তক্ষেপ সহ্য করা নিজের উপরে অন্যায় করা। এই আমার কথা।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সে আরও বলিয়াছিল, আমরা চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি করিয়া যেমন পরের অধিকারে হাত দিয়া অন্যায় করি, মাতালকে পয়সা যোগাইয়াও ঠিক তাই করি। কেননা, সেখানে তাহার ভাল থাকিবার অধিকারে হাত দিই।

দিবাকর চুপ করিয়া শুনিতেছিল দেখিয়া কিরণময়ী পুনরায় কহিয়াছিল, যদিও সামাজিক লোকের এই অনধিকার অত্যন্ত ব্যাপক এবং কোথায় ইহার সীমারেখা, কোথায় পা দিলে অনধিকার প্রবেশ হবে না, এই নিয়ে সংসারে অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক মতভেদ, তবুও সীমা যে একটা আছেই সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এই সীমা অতিক্রম করবার ক্ষমতা কারও নেই, সমাজেরও না। সমাজ এই সীমা অতিক্রম করে শুধু যে পরকেই নষ্ট করে, তা নয়, নিজেকেও দুর্বল করে—ধ্বংস করে। তোমার এতটা মন ভারী করে থাকবার প্রয়োজন হতো না ঠাকুরপো, যদি একবার এই কথাটিই ভেবে দেখতে যে, আমাকে বাড়ির বাইরে এনে কারো সত্যিকার অধিকারে পা দিয়েছ কি না। আমি বিধবা, আমার উপরে কারো ন্যায়সঙ্গত দাবী নেই, তুমিও অবিবাহিত, তোমার হৃদয়ের উপরেও কারো অধিকার নেই। অতএব, আমাকে ভালবেসে তুমি অন্যায় কিছুই করনি, এ কথাটা বোঝা ত শক্ত নয়।

দিবাকর হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়াছিল, সে কি বৌদি, অবৈধ-প্রণয় যদি অন্যায় নয়, তবে সংসারে আর অন্যায় আছে কোথায়?

কিরণময়ী বলিয়াছিল, অবৈধ কোথায়? যাকে অবৈধ বলে মনে করচ, সে তোমার সংস্কার—যুক্তি নয়। ভাল, তোমার অবৈধ জিনিষটি কি শুনি?

দিবাকর উদ্দীপ্ত হইয়া জবাব দিয়াছিল, যাহা বিবাহের দ্বারা সুপবিত্র নয়—যাকে সমাজ স্বীকার করবে না—যাকে আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব ঘৃণার চক্ষে দেখবে, তাই অবৈধ। এ সোজা কথা।

কিরণময়ী হাসিয়া উত্তর করিয়াছিল, কৈ সোজা? একটু ভেবে দেখলে সোজা কথাও এমনি বাঁকা হয়ে দাঁড়ায় যে, দুনিয়ার অনেক বাঁকা জিনিসই হার মেনে যায়। তোমাকে ত অনেকবার বলেচি ঠাকুরপো, তোমার ঐ সুপবিত্র অপবিত্র জ্ঞানটা সংস্কার,—যুক্তি নয়। এই সংসারেই স্ত্রী-পুরুষের এমন অনেক মিলন হয়ে গেছে, যাকে কোনমতেই পবিত্র বলা

যায় না। আমি নজির তুলে আর কথা বাড়াতে চাইনে ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছে হয় ইতিহাস-পুরাণ পড়ে দেখো। অথচ, সে-সব মিলনকেও সমাজ স্বীকার করেছিলো এবং অবশেষে বিয়ের মন্ত্র দিয়েও সুপবিত্র করে নেওয়া হয়েছিল। ঠাকুরপো, আমাদের ঐ পাথুরেঘাটার বাড়ির পাশে যদি কন্বমুনির আশ্রম থাকত, তা হলে শকুন্তলা যে কাণ্ডটি ঘটিয়েছিলেন, তাতে শুধু মুনিঠাকুরের জাত-গুষ্টি নয়—সমস্ত পাথুরেঘাটার লোককে একঘরে হয়ে থাকতে হতো। কৈ, সে প্রণয়কাহিনী পড়তে ত কোন সতী-সাধ্বীরই চোখমুখ লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে ওঠে না!

না না, ব্যস্ত হয়ে উঠো না ঠাকুরপো, আমি সতী-সাধ্বীর ওপর কটাক্ষ করচি নে: কিংবা একালে সেকালে মিলিয়েও দিচ্চিনে। একাল একালই হয়ে থাক, এবং তাঁরা যে যেখানে আছেন, ভাল হয়েই থাকুন, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই, কিন্তু সেকালের শকুন্তলাকে কেন যে একালের কোন নর-নারীই অন্তরে অন্তরে মন্দ বলে ঘৃণা করতে পারে না এইটেই বিচিত্র।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিয়াছিল, ঘৃণা কেন যে করতে পারে না, জানো ঠাকুরপো, শুধু পারে না এইজন্যেই যে, মিলন তাঁর যেভাবেই হোক, মিলনের আদর্শকে তিনি খাঁটি রেখেছিলেন। যে বন্ধনে এক মুহূর্তেই নিজেকে চিরদিনের মত বেঁধে ফেলেছিলেন সে-বন্ধন পাকা নয় বলে মনের মধ্যে কোন সংশয়, কোন সংকোচ রাখেন নি। তা যদি রাখতেন, তা হলে কালিদাস যতবড় এবং যত মধুর করেই লিখুন না, কোন মানুষের হৃদয়ই এমনি করে টেনে নিতে পারতেন না। কোন্‌খানটায় আসল কথা, একটু ভাল করে ভেবে দেখ দেখি?

দিবাকরের একটা কথাও ভাল লাগে নাই। সে অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়াছিল, আদর্শ যেমনই হোক, আজকালকার সমাজ একে স্বীকার করবে না। আর, সমাজে যা স্বীকৃত হবে না, তা বৈধই হোক, অবৈধই হোক, তাতে সমাজকে আঘাত করাই হবে। সমাজে থেকে সমাজকে আঘাত করা, আর আত্মহত্যা করা ত সমান কথা।

কিরণময়ী জবাব দিয়াছিল, ঠাকুরপো, সমাজকে আঘাত করা এবং সমাজের অবিচারকে আঘাত করা এক জিনিস নয়! তোমাকে পূর্বেই ত বলেচি, সব জিনিসেরই একটা সত্যিকার অধিকার আছে। সমাজ উদ্ধত হয়ে যখন তার সত্যিকার সীমাটি লঙ্ঘন করে, তখন তাকে আঘাত করাই উচিত। এ আঘাতে সমাজ মরে না—তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়। লেখাপড়া শেখার জন্যেই হোক, দেশের জন্যেই হোক, বিলাত যাওয়াটাও সমাজ স্বীকার করেনি। এই নিয়ে একে বারংবার ঘা খেতে হয়েছে। তবু এমনি কঠিন পণ তার, আজও অহংকার ত্যাগ করতে পারেনি। এতে কি তুমি সমাজের সৎ-বিবেচনার প্রশংসা কর?

দিবাকর বলিয়াছিল, না করিনে। ভাল মনে করার হেতু নেই বলে।

কিরণময়ী কহিয়াছিল, ঠিক তাই। কিন্তু, এই নিঃসংশয়ে স্পষ্ট উত্তর কোথায় পাচ্চ? নিজের বুদ্ধি-বিচারের কাছে—সমাজের কাছে নয় ত?

দিবাকর উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিয়াছিল, কিন্তু সকলেই যদি সব কাজে নিজের বুদ্ধি-বিচার খাটাতে যায়, তা হলেও ত সমাজ টিঁকে না!

কিরণময়ী বলিয়াছিল, আমি ত তোমাকে এতক্ষণ এই কথাটাই বলবার চেষ্টা করচি। সব কাজে নিজের বুদ্ধি খাটাতে গেলেও যেমন সমাজ থাকে না, সমাজ যদি সব সময়ে এবং সব কাজে নিজের মতটাই চালাতে যায়, তাতেও মানুষ টিঁকে না। মানুষই ভুল করতে, অন্যায় করতে জানে, আর সমাজই জানে না ঠাকুরপো? উভয়েরই সীমা নির্দিষ্ট আছে—সে সীমা মূঢ়তায় হোক, প্রবৃত্তির ঝোঁকে হোক, অন্যায় জিদের বশে হোক—যেভাবেই হোক লঙ্ঘন করলেই অমঙ্গল। সে-অমঙ্গলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, এমন ক্ষমতা তোমাদের ভগবানেরও নেই!

দিবাকর ইহার উত্তরে কোন কথাই কহে নাই। কিরণময়ীও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল, অথচ, এই সীমা কোন সমাজেই চিরদিন একটিমাত্র স্থানেই আবদ্ধ থাকে না; প্রয়োজন মত সরে বেড়ায়।

দিবাকর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কে সরায়?

কিরণময়ী বলিয়াছিল, কেউ সরায় না। যে নিয়মে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সরে, সেই নিয়মে এও আপনি সরে। সরেছে কিনা তখন টের পাওয়া যায়, যখন কেউ একে আঘাত করে।

এতক্ষণ পর্যন্ত দিবাকর কিরণময়ীর যুক্তি-তর্কের সমস্তটাই এই পালানোর অনুকূলে মিলাইয়া লইতে গিয়া মনের মধ্যে বাধাই পাইতেছিল। একে ত এই কাজটাকে যৎপরোনাস্তি গর্হিত বলিয়া তাহার লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না, এবং সমস্ত অপরাধই সে সবিনয়ে গ্রহণ করিবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিল, যখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এই গর্বিতা নারী এতবড় অপরাধকেও অপরাধ বলিয়া গণ্য করিতে চাহে না, বরঞ্চ সমাজকেই দোষী করিতে চায়, তখন তাহার অসহ্য বোধ হইয়াছিল, অথচ শক্ত কথা বলাও তাহার পক্ষে অত্যন্ত শক্ত। তাই সে শুধু একটুখানি বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছিল, এই যেমন সমাজকে আমরা আঘাত করলুম! এখন দেখা যাক, কতখানি দর্প আর কতখানি মোহ সমাজের ছোটে' কি বল বৌদি?

কিরণময়ী দুই কনুয়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া দিবাকরের প্রতি চাহিয়া জবাব দিয়াছিল, আমরা আঘাত করলাম কৈ ঠাকুরপো? ভয়ে পালিয়ে যাওয়া, আর দাঁড়িয়ে ঘা দেওয়া কি এক জিনিস যে এতে সমাজের দর্প চূর্ণ হবে? এতে দর্প ত তার বেড়েই যাবে। কিন্তু তুমি বি. এ. পর্যন্ত পড়েচ, না? বলিয়া গায়ের চাদরটা মাথা পর্যন্ত টানিয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িয়াছিল।

বাহিরে মন্দীভূত ঝড়ের চাপাকান্না ভেদ করিয়া উপরে জাহাজের ঘণ্টায় বারটা বাজিয়া গেল। ডেকের একটা চেয়ারের উপর দীর্ঘশ্বাস বুকে করিয়া দিবাকর চুপ করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ ধরাগলায় ডাক আসিল, ঠাকুরপো!

দিবাকর চমকিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সাড়া দিল, কেন বৌদি?

কিরণময়ী কহিল, তুমি ফিরেই যাও।

দিবাকর জোর দিয়া বলিল, কিছুতেই না।

কিরণময়ী কহিল, না কেন? না বুঝে একটা অন্যায় করেছ। বুঝতে পেরেও তার প্রতিকার করবে না, পাপের বোঝা বয়ে বেড়াবে, আমি ত তার প্রয়োজন দেখিনে ঠাকুরপো।

দিবাকর কহিল, তুমি দেখ না, আমি দেখি। তা ছাড়া ফিরে গেলেই কি পাপের বোঝা নেমে যাবে বৌদি?

কিরণময়ী কহিল, আজই যে যাবে, এ কথা বলিনে। কিন্তু দু'দিন পরে যেতেও ত পারে।

দিবাকর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যাবো কোথায়?

কিরণময়ী কহিল, তোমাদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের কাছে। তোমার উপীনদার কাছে। সমস্তই ত তোমার আছে।

দিবাকর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যা কিছু আমার আছে বলচ—তা আমার নেই, এ কথা তুমি জান। আছে শুধু উপীনদা, কিন্তু তাঁকে কি তুমি চিনতে পারনি? তাঁর কাছেই আমাকে ফিরে যেতে বল বৌদি?

হাঁ, তাঁর কাছেই ফিরে যেতে বলি।

দিবাকর খানিক চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, ভেবেছিলাম তাঁকে তুমি চিনেছ। কিন্তু চেননি। আমিও যে চিনি তাও নয়। হয়ত ভাল করে তাঁকে চেনাই যায় না। কিন্তু শিশুকাল থেকে তাঁরই হাতে মানুষ হয়ে এটুকু বুঝতে পেরেচি যে, এর পর তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর চেয়ে আমার পক্ষে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ।

হঠাৎ কিরণময়ী- চকিত হইয়া উঠিল। দিবাকরের মুখের পানে চাহিয়া বলিল, কেন, তিনি কি এতই নিষ্ঠুর? যে-দোষ তোমার নয়, সে কথা বুঝিয়ে বললেও কি তোমাকে শাস্তি দেবেন? এ কখনই সম্ভব হতে পারে না ঠাকুরপো!

কিরণময়ীর আকস্মিক উৎসাহ দিবাকর লক্ষ্য করিল না। দেয়ালের গায়ে যে আলোটা জ্বলিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া অন্যমনস্কের মত আস্তে আস্তে বলিল, তাঁকে কোন কথা বুঝিয়ে বলতে হয় না। কেমন করে তিনি সমস্তই জানতে পারেন। অবশ্য, তোমার মত করে আমি ভাবতে পারিনে যে, আমার দোষ নেই, কিন্তু যদি তোমার কথাই ঠিক

হয়, যদি সত্যই আমি নির্দোষ হই, তা হলে যেদিন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াব, সেই দিনই তিনি জানতে পারবেন। কিন্তু দাঁড়াতে পারব না। তুমি শাস্তির কথা বলছিলে—কি করে জানব বৌদি, কি শাস্তি তিনি দেবেন! আজও কোনো দিন আমাকে তিনি শাস্তি দেননি।

আর সে বলিতে পারিল না। দুই করতল চোখের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া গেল।

কিরণময়ী কোন কথাই বলিল না—দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের বিপ্লব শুধু তাহার অন্তর্যামী জানিলেন।

ক্ষণকাল পরেই দিবাকর কথা কহিল। নিরতিশয় ব্যথিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, কাল তুমি বললে, উপীনদার মাথা হেঁট করে দেবে। সে-রাত্রে তোমাদের কি কথা যে হয়েছিল, কোন্ রাগে যে এ কথা বলেছিলে তা এখনো আমি ভেবে পাইনে। হেতু তোমার হয়ত কিছু আছেই, কিন্তু সে কারণ যাই হোক, ও-মাথা হেঁট করবার দুঃখ যে কত বড় তা যদি জানতে, অমন কথা মুখেও আনতে না। তা ছাড়া ও-সব মাথা যদি হেঁট হয়েই যায়, তবে কোনদিন নিজেদের মাথা তুলবো আমরা কোন্ দিকে চেয়ে? তুমি সে চেষ্টা করো না। যতক্ষণ না তিনি হেঁট হয়ে আমাদের পানে তাকান, ততক্ষণ তাঁর মাথা হেঁট করবার ক্ষমতা সংসারে কারও নেই বৌদি। এই কথাটা আমার সত্যি বলে বিশ্বাস ক'রো।

সেই গভীর রাত্রে এই দুটি বিপরীত প্রকৃতি, উপেন্দ্রর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার তটে আসিয়া সহসা একান্তভাবে সম্মিলিত হইল। যেখানে কোন বিরোধই ছিল না, যেখানে বলিবার অপেক্ষা শুনিবার, বুঝাইবার অপেক্ষা বুঝিবার আকাঙ্ক্ষাই নিরতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল।

প্রত্যূষে কখন যে দিবাকর শয্যা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, ঘুমন্ত কিরণ টের পায় নাই। তাই ঘুম ভাঙ্গিতেই সে দিবাকরের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কাল রাত্রে কথায় কথায় কিরণময়ী অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছিল। দিবাকর যে সত্যই কত নিঃসহায়, এবং তাহার উপীনদাদা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া যে তাহার পক্ষে কিরূপ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ইহা অত্যন্ত নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা অবধি কিরণময়ী তাহার নারী-হৃদয়ের নিভৃত অন্তস্তলে এতটুকু স্বস্তি পাইতেছিল না। এই সরল, বিনীত, সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র যুবকটিকে তাহার জীবনের প্রারম্ভেই অকারণে কক্ষভ্রষ্ট করিয়া দেওয়ার অপরাধ তাহার ঘুমের মধ্যেও তাহাকে বিঁধিয়াছিল। তাই সে ঘুম ভাঙ্গিতেই একটা অভিনব স্নেহের সহিত বেদনার সহিত এই নিরপরাধ হতভাগ্যের দিকে প্রথমেই মুখ ফিরাইয়া দেখিল, দিবাকর নাই। উঠিয়া বাহিরে সন্ধান করিয়া দেখিল, দেখা গেল না। তাহাদের 'বয়'কে ডাকিয়া অনুসন্ধান করিতে বলিল, সেও দেখা পাইল না।

সেই অবধি কিরণময়ী উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আজ এই উৎকণ্ঠার মধ্যেও বহুদূরাগত মৃদু সুগন্ধের মত একটি অস্পষ্ট আনন্দের আভাস উপলব্ধি করিয়া তাহার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল।

সেই অতি তুচ্ছ দিবাকর, যাহাকে সে কোনদিন ভালবাসে নাই, কোনদিন ভালবাসিতে পারে না, বুদ্ধির বিপাকে তাহারই ঘর করিতে হইবে, ভালবাসার অভিনয় করিতে হইবে, জাহাজে উঠিয়া পর্যন্ত এই ধিক্কার ভিতরে ভিতরে তাহাকে যেন পাগল করিয়া আনিতেছিল।

আবার এইখানেই শেষ নয়। এই দেখানো ভালবাসার টানাটানি একদিন ছিঁড়িবেই ছিঁড়িবে, এই ছদ্মলীলা একদিন যে কিছুতেই ভাল লাগিবে না, ডাক্তার অনঙ্গমোহন সে-শিক্ষা ভাল করিয়াই দিয়াছিল। সেই দুর্দিনেই যে প্রাণান্তকর ঘৃণায় ফাঁস কাটিয়া কাটিয়া তাহার গলায় বসিতে থাকিবে, সে দড়িটা যে সে কোন্ অস্ত্রে কাটিয়া ফেলিবে এ দুশ্চিন্তার সে কোথাও শেষ দেখিতে পায় নাই। কিন্তু, কাল গভীর রাত্রে উপেন্দ্রর

রাজসিংহাসন-তলে বসিয়া উভয়ের সন্ধিপত্র যখন স্বাক্ষরিত হইয়া গেল, তখন ঘুম ভাঙিয়া এই নিরীহ ছেলেটার জন্যই করুণায় ব্যথায় কিরণময়ী একদিকে যেমন পীড়িত হইয়া উঠিল, এই অবশ্যম্ভাবী ঘৃণার বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইয়া তেমনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

একলা ঘরের মধ্যে বসিয়া সে নিশ্বাস ফেলিয়া বারংবার এই কথাই বলিতে লাগিল, আর আমার ভয় নেই—আমার কোন ভয় নেই। যাকে ভালবাসতে পারব না, অন্ততঃ স্নেহ দিয়েও তার মনের কালি অনেকখানি মুছে দিতে পারব। তথাপি একটা ভয় তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল,—পাছে অগ্নির প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া একদিন দিবাকর পতঙ্গের মত পুড়িয়া মরিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠে। তাহার রূপের আকর্ষণের যে কি দুর্নিবার শক্তি, ইহা ত তাহার অবিদিত ছিল না।

মনে পড়িল তাহার মৃত স্বামীর কথা। সেই শুষ্ক কঠোর মূর্তিমান বিদ্যার অভিমান! বিজ্ঞানের শক্ত বেড়া দিয়া যিনি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দিবারাত্র নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতেন—সেই স্বামী। তাঁহার কাছে সে ত একদিনও যাইতে পারে নাই, তবু ত দিন কাটিয়াছিল। লিখিয়া পড়িয়া, ভাত রাঁধিয়া, শাশুড়ীর বকুনি খাইয়া, ঘরের কাজকর্ম করিয়া দিনের বেলা কাটিত; রাত্রে পরকালের বিরুদ্ধে আত্মার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া, নালিশ করিয়া, গ্লানি করিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া, ঘরের দেওয়ালগুলো পর্যন্ত দূষিত বিষাক্ত করিয়া দিয়া ক্লান্ত জর্জর হইয়া কোন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িত; আবার প্রভাত হইত, আবার রাত্রি আসিত, এমনি করিয়া মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর গড়াইয়া গিয়াছিল। বাড়িতে ভিক্ষা দাও মা, বলিয়া ভিখারী প্রবেশ করে নাই। কেমন আছ, বলিয়া প্রতিবেশী সংবাদ লয় নাই; একদিনের জন্য সূর্যের কিরণ আলো ফেলে নাই, এক মুহূর্তের জন্য আকাশের বায়ু পথ ভুলিয়া প্রবেশ করে নাই,—তবু দীর্ঘ দশ বৎসর গত হইয়াছিল। তাহার মা-বাপের কথা মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে বালিকা-বয়সে কালনার কাছে একটা ক্ষুদ্র গ্রামের কোন এক নিরানন্দ মাতুল-সংসার হইতে বাহির হইয়া একদিন বধূর সজ্জায় এই অন্ধকার বাড়িটাতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। স্বামী ছোট ছাত্রীটির মত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অবধি সেদিন পর্যন্ত গুরু-শিষ্যার কঠোর সম্বন্ধ আর ঘুচে নাই। স্বামী একদিনের জন্যও আদর করেন নাই, ভালবাসিতেন কি না, একদিনের জন্যও সে কথা বলিয়া যান নাই।

বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী পাঠ দিতেন, পাঠ গ্রহণ করিতেন। পাঠ মুখস্ত করিতে না পারিলে তিরস্কার করিতেন, প্রহারও না করিতেন নয়। রাগ-অভিমানের পরিবর্তে কোনদিন সাধেন নাই, কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলে কোনদিন ঘুম ভাঙাইয়া খাইতে বলেন নাই—এই ত তাহার বধূ-জীবনের ইতিহাস!

শাশুড়ীর পরীক্ষা ছিল আরও কঠোর। সেখানে অতি ক্ষুদ্র ভুলভ্রান্তিরও ক্ষমা ছিল না। অঘোরময়ী তাঁহার রান্নাঘরের হাতা-বেড়ি-খুন্তি হইতে পোড়া কাঠ পর্যন্ত সবগুলির চিহ্নই এই ছোট বধূটির দেহে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। একদিন কি একটা অপরাধের শাস্তিবিধান করিয়া তিনি বালিকার সমস্ত চুলগুলি কাটিয়া দিলেন। দুঃখে অভিমানে বধূ যখন রান্নাঘরের এক কোণে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন পিঠের উপরে জ্বলন্ত কাঠের খোঁচা দিয়া অঘোরময়ী চুপ করিতে আদেশ করিলেন। সেই দগ্ধ-ক্ষত আরোগ্য হইতে কিরণময়ীর এক মাস লাগিয়াছিল।

হঠাৎ যেন সেই ক্ষতটাই জ্বালা করিয়া উঠিল। কিরণময়ী মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হইয়া আবার স্থির হইয়া বসিল।

কবে যে সে কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনে পা দিয়াছিল, এ কথা সে মনে করিতে পারে না। সে কথা স্মরণ করাইবার কোন স্মৃতিই তাহার নাই। বোধ করি বা ঊষার মত নিঃশব্দেই সে প্রভাতের উজ্জ্বল আলোকে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

যৌবনে, অজ্ঞাতে, নিরহঙ্কারে দেহের কূল-উপকূল যখন সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, তখন সে স্বামীর সহিত সূক্ষ্ম বিচার লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিল। কেন যে তাহার দৈহিক নির্যাতন শেষ হইল, কেন যে সে গৃহিণী-কর্ত্রী হইয়া উঠিল, এ কথা

সে একবারো ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল না। স্বামী বলিতেন, সুখই জীবের একমাত্র লক্ষ্য এবং আর সমস্ত উপলক্ষ্য! দয়া, ধর্ম, পুণ্য, এ সমস্তই ওই উপলক্ষ্য। হয় ইহকালে, নয় পরকালে; হয় নিজের, না হয় পাঁচজনের; হয় স্বদেশের, না হয় বিদেশের—কি উপায়ে যে সুখের সমষ্টি বাড়াইয়া তুলিতে পারা যায়—ইহাই জীবের কর্ম, এবং জানিয়াই হউক, না জানিয়াই হউক, এই চেষ্টাতেই জীবের সমস্ত জীবন পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; এবং এইটিই একমাত্র তুলাদণ্ড, যাহাতে ফেলিয়া সমস্ত ভালমন্দই ওজন করিয়া দিতে পারা যায়। নিজের কি পরের সেদিকে চাহিয়ো না। কিরণ, তুমি কেবল এটি বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিবে, ইহাতে সুখের মাত্রা বাড়ে কি না।

কিরণ কহিত, ঠিক তাই; কিন্তু কি করিয়া জানিব, আমার কাজে সংসারে সুখের সমষ্টি বাড়িতেছে? সুখের চেহারা ত সকলের কাছে এক নয়।

হারান তাহার জ্যোতিহীন চোখের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য ঝুল-মাখানো অন্ধকার কড়ি-বরগার দিকে নিবদ্ধ করিয়া বলিত, খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিলে এক নয় বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে এক। তোমাকে তাহারি উপরে বিচার করিতে হইবে।

কিরণময়ীর কাছে সুখের কোন রূপই সুস্পষ্ট নয়, সে অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিত, 'খণ্ড খণ্ড করিয়া', 'সমগ্র করিয়া' ও-সব কথার কথা। নিজের কিসে সুখ হয়, এইটিই বড় জোর মানুষে বুঝতে পারে; তাও আবার সব সময়ে সব অবস্থায় ঠিকমত পারে না। যখন নিজের সম্বন্ধেই মানুষ নির্ভুল নয়, তখন সমস্ত জগতের দায় হাতে করতে যার সাহস হয় হোক, আমার হয় না। ওই, ওপারের জুটমিলের কাজীরা হয়ত মনে করে, যদি সম্ভব হয় কাশীর সমস্ত মন্দিরগুলো পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে পাটের কল তৈরি করতে পারলেই মানুষের সুখের মাত্রা বাড়বে, কিন্তু সবাই কি তাই মনে করবে! সুখ জিনিসটি যে কি, এ যতক্ষণ না তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারবে, ততক্ষণ আমি তোমার কোন কথাই শুনব না; বলিয়া কিরণময়ী যাইবার উপক্রম করিতেই হারান হাত ধরিয়া বলিতেন, একটু বসো। এত পড়াশুনার পরেও যদি তুমি এত অল্পেই রেগে ওঠ, তা হলে সমস্তই মিছে হয়ে যায়। দেখ কিরণ, আমি তোমাকে সত্যিই বলি,—সুখ জিনিসটি যে কি, আমি ঠিক জানিনে। কোন দেশে কেউ কখনও জেনেছিল কিনা তাও আমার জানা নেই—ওটা বোধ হয় জানাই যায় না। আমাদের দেশে বহু পূর্বেই তিন রকম দুঃখ-নিবৃত্তির চেষ্টা হয়ে গেছে—ওতিনটে বাদ দিয়ে যে জিনিসটি পাওয়া যায়, তাই যে সুখ—তাও বলা চলে না।

প্রত্যুত্তরে কিরণময়ী অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিত, কিছুই যখন বলা চলে না, তখন কারো সুখের কল্পনাকে পরিহাস করাও যেমন অসঙ্গত, সাধারণভাবে সংসারে সুখের পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার চেষ্টাও তেমনি ক্ষ্যাপামি। ভাল-মন্দ মেপে দেবার পূর্বেই তোমার তুলাদণ্ডটির দণ্ডটি নির্ভুল হওয়া চাই। সেইটি নির্ভুল করবে যে তুমি কোন্ আদর্শে, আমি তাই ত ভেবে পাইনে।

হারাণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া হতাশ হইয়া বলিতেন, কিরণ, জানি তোমার মনের গতি কোন দিকে ঝুঁকে আছে। কিন্তু যতদিন তুমি পরকালের কল্পনা, আত্মার কল্পনা, ঈশ্বরের কল্পনা, প্রভৃতি জঞ্জালগুলি মনের মধ্যে থেকে পরিষ্কার করে ঝেঁটিয়ে না ফেলতে পারবে, ততদিন সংশয় তোমার থেকেই যাবে। সুখই যে জীবনের শেষ উদ্দেশ্য এবং সুখী হওয়াই যে জীবনের চরম সার্থকতা, এ কথা বুঝেও বুঝবে না। কেবলই মনে হতে থাকবে, কে জানে, হয়ত বা আরো কিছু আছে। অথচ এই আরো-কিছুর সন্ধান কোনদিনই খুঁজে পাবে না। এ তোমাকে ব্যস্ত করে রাখবে, অথচ গতি দেবে না, আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলবে, কিন্তু পরিতৃপ্তি দেবে না। পথের গল্পই বলবে, কিন্তু কোনদিন পথ দেখিয়ে দিতে পারবে না।

এইভাবে, শিক্ষা ও সংস্কারের মাঝখানে কিরণময়ী মানুষ হইয়া উঠিয়াছে,—আজ তাহার একটি একটি করিয়া সে কথা মনে পড়িতে লাগিল।

এমনি করিয়া তাহার চিন্তার ধারা যখন বর্তমান দুঃখকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া অতীত দিনের অগাধ অতল দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খাইয়া মরিতেছিল, এমনি এক

সময়ে কোথা হইতে দিবাকর শুষ্ক ম্লানমুখে কেবিনের ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্রই কিরণময়ীর দুঃস্বপ্নের ঘোর এক নিমিষে কাটিয়া গেল; সে মুখখানি স্নেহ-হাস্যে উজ্জ্বল করিয়া তিরস্কারের স্বরে কহিল, ব্যাপার কি বল ত ঠাকুরপো? কি করে বেড়াচ্চো, খেতে-দেতে হবে না নাকি? আচ্ছা ছেলে বাপু!

তাহার কণ্ঠস্বরে দিবাকর এতদিনের পরে একেবারে চমকিয়া গেল। অকস্মাৎ মনে পড়িল যে, কত শত সহস্র বৎসর বহিয়া গিয়াছে, বৌদিদির এই কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পায় নাই। সে স্বরে বিদ্বেষ-বিদ্রূপের জ্বালা নাই, তাহা যথার্থই স্নেহের বেদনায় কোমল, মানুষের কান সেখানে ভুল করে না—কি করিয়া সে যেন চিনিতে পারে। দিবাকর অভিভূতের ন্যায় চুপ করিয়া রহিল।

কিরণময়ী পুনরায় মৃদু হাসিয়া কহিল, সকালবেলা থেকে এতক্ষণ ছিলে কোথা শুনি?

দিবাকর আস্তে আস্তে বলিল, নীচে।

নীচে! এতটা বেলা পর্যন্ত নীচে বসে কেন? একবার উপরে এসে কিছু মুখে দিয়ে যাবারও বুঝি ফুরসত পাওনি?

প্রত্যুত্তরে দিবাকর শুধু অপলক-চক্ষে চাহিয়াই রহিল—মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

কিরণময়ী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, কি করছিলে নীচে?

তাহার মুখের উপর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সেই নির্মল স্নেহ-হাস্য, কণ্ঠে ভালবাসার তেমনি অনুরাগ, যাহা কলিকাতায় প্রথম আসিয়া ইঁহারই কাছে লাভ করিয়া দিবাকর কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিল। আনন্দে তাহার চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল, সে কোনমতে তাহা নিবারণ করিয়া বলিয়া ফেলিল, বৌদি, নীচে একজন বাঙালী পরিবার নিয়ে আরাকনে যাচ্ছে,—তাঁদের সেখানে বাড়ি পর্যন্ত আছে—

কিরণময়ী উৎসুক হইয়া বলিল, বল কি ঠাকুরপো?

দিবাকর কহিল, সত্যি, বৌদি, বেশ লোক তাঁরা—

কিরণময়ী কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, তা হলে আমরা ত তাঁদের বাড়ি গিয়েই উঠতে পারি। তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমার ভাব করে দিতে পার না?

দিবাকর খুশী হইয়া বলিল, কেন পারব না? বাড়িউলীটি বলছিলেন, তোমার সঙ্গে একবার—

কিরণময়ী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িউলীটি আবার কে ঠাকুরপো?

দিবাকর কামিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া কহিল, হরিশবাবু ওই বলেই তাঁর স্ত্রীকে ডাকেন যে। একখানা বাড়ি আছে কিনা তাঁদের।

শুনিয়া কিরণময়ী মৌন হইয়া রহিল। কারণ, এই 'বাড়িউলী' শব্দটি সে ইতিপূর্বে কলিকাতার দাসীদের মুখে যে-সকল গৃহকর্ত্রীর উদ্দেশে ব্যবহৃত হইতে শুনিয়াছে, তাঁহারা কেহই ভদ্রগৃহিণী নহেন। তাই দিবাকর যখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া এখানে আনিবার জন্য উদ্যত হইল, তখন কিরণময়ী একটু হাসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, তিনি ভালো লোক ত ঠাকুরপো?

দিবাকর তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল, চমৎকার মানুষ তাঁরা বৌদি! একবার আলাপ হলে—

কিরণময়ী বলিল, না হয় আজ থাক ঠাকুরপো। আর একদিন—

দিবাকর মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না বৌদি, তোমার পায়ে পড়ি, তিনি এখুনি আসতে চাচ্চেন। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে যখন উঠতেই হবে, তখন,...যাবো বৌদি ডেকে আনতে? বলিয়া দিবাকর প্রায় অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার চোখ, মুখ কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়া ছোটভায়ের স্নেহের আবদার তাহার ভুলটাকে যেন তপ্ত শূলের মত করিয়া কিরণময়ীর হৃদয়ে বিঁধিল। অকস্মাৎ প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনাইয়া উঠিল এবং উদ্গত অশ্রু গোপন করিতে কিরণময়ী মুখ ফিরাইয়া কোনমতে বলিল, আচ্ছা, তবে যাও—

কথাটা সত্য যে, একটা অজানা-স্থানে যাইবার পথে বন্ধুলাভ কম ভাগ্য নয়। অবশেষে এই মনে করিয়াই বোধ করি সে দিবাকরের ব্যগ্র অনুরোধ স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু সে যখন সত্যই তাহাকে ডাকিয়া আনিতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, তখন নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া কিরণময়ী মনের মধ্যে ভারী একটা লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। যে আসিয়া উপস্থিত হইবে, সে বাঙালীর মেয়ে, তাহার বয়স হইয়াছে—কি জানি তাহার চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইবে কিনা! দিবাকরের সহিত তুলনায় তাহার নিজের বয়সটাই শুধু স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বাঙালীসমাজে এমনি দৃষ্টিকটু যে, কেবল এই কথাটা মনে করিয়াই কিরণময়ীর হৃদয় কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

অনতিকাল পরেই দিবাকরের পিছনে বাড়িউলী আসিয়া হাজির হইল। তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্রই কিরণময়ী টের পাইল এ ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক নহে। যাহারা কলিকাতায় দাসীবৃত্তি করিয়া বেড়ায়, তাহাদেরই একজন। তাহার বুকের উপর হইতে একটা বোঝা নামিয়া গেল, হাসিমুখে কহিল, এসো, বসো।

রূপ দেখিয়া বাড়িউলী ক্ষণকাল অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে গলায় আঁচল দিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া কহিল, বাবুর মুখে শুনে বাড়িআলা বললে, যা বাড়িউলী, বামুন-মাকে একটা নমস্কার করে আয়। তা মগের দেশে যাচ্চো বটে বৌমা, কিন্তু এই কামিনী বাড়িউলীর বাড়িতে টুঁ শব্দ করে যায় এমন ব্যাটা-বেটি কেউ নেই। খেংরে বিষ ঝেড়ে দেব না? বলিয়া খ্যাংরার অভাবে বাড়িউলী শুধু হাতটাই একবার উঁচু করিয়া নাড়িয়া দিল।

কিরণময়ী খুশী হইয়া বলিল, বাঁচলুম বাছা, নতুন জায়গায় যেতে কতই না ভয় হচ্ছিল, কতই না দুজনে ভাবছিলুম।

বাড়িউলী কহিল, ভয় কি মা? আমি আরাকানের একটা ডাকসাইটে বাড়িউলী। নাম করলে যমে পথ ছেড়ে দেয়। তা চল বাছা, আমার ওখানে কোন কষ্ট হবে না। ভাড়া পাঁচ টাকা করেই বাঁধা, তা তোমরা চার টাকা করেই দিয়ো; তার পরে বাবুর একটু কাজকর্ম হলে সে তখন বোঝা যাবে। আর সেজন্যে চিন্তা কর়ো না বৌমা, আমার বাড়িআলা গিয়ে যে সাহেবকে ধরবে, সে নাকি আবার না বলবে? তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে তেমন খাতির আমরা রাখিনে, বলিয়া কামিনী ওষ্ঠাধর প্রসারিত করিয়া ঘাড়টা বার-দুই দক্ষিণে ও বামে হেলাইয়া দিল।

কিরণময়ী একটা নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, ভগবান তোমাদের ভাল করবেন বাছা।

তাহার মুখেব প্রতি বাড়িউলী হঠাৎ একটা তীক্ষ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, এ কি কাণ্ড বৌমা! এমনি মাথা ঘষেচ যে একফোঁটা সিঁদুরের দাগ পর্যন্ত সিঁথিতে নেই! কৌটাটা একবার দাও, পরিয়ে দিয়ে যাই।

কিরণময়ী ইহার জন্য পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়াছিল। বাঁ হাতটা দেখাইয়া কহিল, না বাছা, মাথা ঘষার জন্যে নয়। নোয়া-সিঁদুর আমার এক বছর থেকে মা-কালীর পায়ে বাঁধা আছে। ও বছর বাবুর প্রাণের আশা আর ছিল না,—সিঁদুর নোয়া বাঁধা রেখেই ও-দুটো কোনমতে বজায় রাখতে পেরেছি মা, বলিয়া সে একটুখানি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া আড়চোখে দিবাকরের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখখানা লজ্জায় কুণ্ঠায় একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

তাই ত বলি মা! বলিয়া বাড়িউলীও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিল, তা আমাদের আরাকানেও কালীবাড়ী আছে। পোঁছেই একটা পুজো-আচ্চা যা হোক দিয়ে নোয়া-সিঁদুর ছাড়িয়ে নিয়ো বৌমা, নইলে পাঁচজনে পাঁচরকম ভাবতেও বা পারে। এমন হারামজাদা যায়গা আরাকানের মত আর ত্রিসংসারে আছে নাকি! শুধু আমাদের ভয়েই যা একটু শাসন আছে, নইলে—

কিরণময়ী সহাস্যে কহিল, সেই কথাই ত বাবুর সঙ্গে আজ দুদিন ধরে কেবলই হচ্ছে। কত সুখ্যাতিই যে উনি তোমাদের করছিলেন, সে আর তোমার মুখের সামনে কি বলব! জাহাজে উঠে পর্যন্তই দুজনে ভয়ে সারা হয়ে যাচ্চি, বাছা, কি হবে! তা ভগবান—

কথাটা শেষ হইতেও পাইল না,—ভয় কি মা! বলিয়া অভয় দিয়া বাড়িউলী আত্ম-শ্লাঘায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে উভয়ের ঘর-কন্না সুখ-দুঃখের গল্প এমনি জমিয়া উঠিল যে, কে বলিবে দশ মিনিট পূর্বে দুজনের লেশমাত্র পরিচয়ও ছিল না।

অদূরে চৌকিটার উপর দিবাকর সেই যে আসিয়াই বসিয়া পড়িয়াছিল, আর উঠে নাই। কিরণময়ী কত মিথ্যা যে কিরূপ অসঙ্কোচে ও অবলীলাক্রমে বলিয়া যাইতে পারে, শুনিতে শুনিতে সে যেন একপ্রকার হতচেতনের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, এতক্ষণের পর হঠাৎ সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া সে উঠিয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই কিরণময়ী বলিয়া উঠিল, সারাদিন খাওনি, আবার বাহিরে যাচ্ছ যে?

প্রত্যুত্তরে দিবাকর যাহা কহিল তাহা শোনা গেল না, কিন্তু বুঝা গেল। কিরণময়ী ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, তা হবে না। তুমি একবার বাইরে গেলে আর শিগগির আসবে না, আমি বেশ জানি। বাড়িউলীর মুখের পানে চাহিয়া হাসিমুখে কহিল, শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, বিয়ে হয়ে পর্যন্ত চিরকালটা এই আমার জ্বালা! খাওয়ার জন্যে যেন মারামারি করতে হয় বাছা। আবার একটুখানি হাসিয়া বলিল, আমি যাই, তাই জোর-জবরদস্তি করে খাওয়াতে পারি বাড়িউলী, আর কোন মেয়ে হলে তার শুধু চোখের জল আর উপোস সার হতো।

নিদারুণ লজ্জায় দিবাকরের মাথাটা একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িল।

বাড়িউলী হাসিয়া বলিল, হাঁ বাবু, এমন করে বুঝি দুটিতে বিদেশে গিয়ে ঘরকন্না করবে। কিন্তু আমার বাড়িতে সে হবে না বাবু, বৌমাকে জ্বালাতন করতে আমি কিছুতেই দেব না, তা বলে দিচ্ছি! কিরণময়ীর মুখের প্রতি চাহিয়াই হঠাৎ প্রশ্ন করিযা বলিল, হাঁ বৌমা, বাবু বুঝি তোমার চেয়ে বেশী বড় নয়, যেন সমবয়সী বলে মনে হয়,—না?

কিরণময়ী তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া হাসিয়া কহিল, কুলীনের ঘর বাছা; আমিই যে বড় হয়ে যাইনি, এই আমার ভাগ্যি! তা প্রায় সমবয়সী বৈ কি! ওঁর জন্ম বোশেখ মাসে, আমার জন্ম আষাঢ়ে—এই মোটে দুটি মাসের বড় বৈ ত নয়। অনেকে যে আমাকেই বয়সে বড় বলে ঠাওরায়! মা গো! কি লজ্জা! বলিয়া কিরণময়ী টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

বাড়িউলী এ হাসিতে যোগ দিল না। বরঞ্চ গম্ভীরমুখে কহিল, কুলীনের ঘরে আর লজ্জা কি মা। দশ বছরের বরের সঙ্গে পঞ্চাশ বছরের বুড়ীর বিয়েও যে হয়ে যায় শুনি। তা হোক মা, সে জন্যে নয়, তবে গিয়ে পুজোটা দিয়ে নোয়া-সিঁদুর পরো, নইলে এ'স্ত্রী মানুষকে যেন মানায় না। এখন তবে উঠি, তোমরা খাওয়া-দাওয়া কর, আবার না হয় সন্ধ্যের পরে আসব, বলিয়া বাড়িউলী কিরণময়ীর পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া গাত্রোত্থান করিল।

সাঁইত্রিশ

সতীশের অরণ্যবাসের ব্যবস্থাটা যদিচ আজও তেমনি আছে বটে, কিন্তু তাহার সেই বৈরাগ্যসাধনের ধারাটা ইতিমধ্যে যে কতখানি বিপথে সরিয়া গিয়াছে, তাহা যে-কেহ তাহাকে মাস-দুই পূর্বে দেখিয়াছে তাহারই চোখে পড়িবে।

যে লোক স্বেচ্ছায় নির্বাসন-দণ্ড গ্রহণ করিয়া এই নির্জন নির্বান্ধব পুরীতে একাকী বাস করিতে আসিয়াছে, তাহার এই আকস্মিক বেশভূষার প্রতি অনুরাগের হেতুটাই বা কি এবং কেনই বা পাখির গানের পরিবর্তে তাহার নিজের গানের খাতাটা আবার তোরঙ্গের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া পড়িল, বেহালা, সেতার, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্রগুলাই বা কেন তাহাদের অনাদৃত বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া সাবেক দিনের মত টেবিলের উপরে আসিয়া জুটিল, তাহার মুখচোখের সেই মলিন ছায়াটাই বা কি করিয়া

সহসা তিরোহিত হইয়া গেল—এ-সব ভাবিবার কথা বটে!

বস্তুতঃ, মাস দুই-তিন পূর্বের সতীশকে এখন হঠাৎ যেন চেনাই ভার!

কিন্তু এই এতবড় অদ্ভুত পরিবর্তনের আসল কারণটা হয়ত এখানে খুলিয়া না বলিলেও চলিত, কিন্তু পাছে সাঁওতাল-পরগনার অসাধারণ জলহাওয়ার গুণ মনে করিয়া কতকগুলো নির্বোধের দল ছুটিয়া আসিয়া পড়ে, এই শুধু ভয়!

সুতরাং এটুকু আভাসে বলা প্রয়োজন যে, কোন পক্ষ হইতেই যদিচ বিবাহের প্রস্তাবটাকে এখনও স্পষ্ট করিয়া উত্থাপিত করা হয় নাই, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের কাছে সতীশ-সরোজিনীর মনের কথাটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে বাকী ছিল না।

সরোজিনীর জননী জগৎতারিণীর আগ্রহটাই যে এ-বিষয়ে সবচেয়ে বেশী, তাহা বছর-খানেক পূর্বে কলিকাতাতেই জানা গিয়াছিল। কিন্তু আগ্রহ এবং ব্যাকুলতা সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়াই বোধ করি সমস্ত লোকের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁরই মনের মধ্যে একটা সংশয়ের ছায়া ছিল, কি জানি তাঁর শিক্ষিতাভিমানিনী কন্যা চিরদিনের সমাজ ও সংস্কার কাটাইয়া সতীশকে গ্রহণ করিতে রাজী হইবে কি না! সম্প্রতি তিনি বাপের বাড়ি শান্তিপুরে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়াই কথাটা তিনিই পাকা করিয়া লইবেন এমনই একটা ইঙ্গিত যাইবার সময় জগৎতারণী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সকালে সতীশ বেহালায় নূতন তার চড়াইতেছিল, বেহারীর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি জ্যোতিষবাবুর বাড়ির সরকার। জগৎতারিণীর সঙ্গে শান্তিপুরে গিয়াছিলেন, আবার তাঁর সঙ্গেই ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সরকার নমস্কার করিয়া জানাইল, মা আপনাকে আজ আহারের নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন।

খবর শুনিয়া সতীশের বুকের রক্ত চমক খাইয়া গেল, কহিল, তিনি কবে ফিরে এলেন?

সরকার কহিল, আজ তিনদিন হলো।

প্রায় ছয়-সাতদিন হইল সতীশ ওদিকে যায় নাই। তাহাদের সম্বন্ধটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইবার পর হইতে জ্যোতিষবাবুর বাড়িতে যখন-তখন বেড়াইতে যাইতে তাহার লজ্জা করিত। কহিল, আচ্ছা, মাকে জানাবেন আমি দশটা-এগারটার মধ্যেই গিয়ে হাজির হব।

যে আজ্ঞা, বলিয়া লোকটা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

সতীশকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াও জগৎতারিণী আহারের কোনরূপ উদ্যোগ না করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল, সতীশ সন্ধ্যার পূর্বে আসিবে না। এখন সরকারের মুখে খবর শুনিয়া তিনি ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

আজ ছিল একাদশী। তাঁহার নিজের জন্য কোনরূপ আয়োজনের আবশ্যক ছিল না, এবং যে বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার দ্বারা তাঁহার রাঁধাবাড়ার কাজ চলিত, তিনিও দিন-দুই হইতেই শান্তিপুরের কল্যাণে ম্যালেরিয়া জ্বরে শয্যাগত ছিলেন।

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সরকারকে কহিলেন, তুমি এবেলা খাবার কথা বলে আসতে গেলে কেন? তোমার কি কোন বুদ্ধিই নেই?

সরকার ভয়ে ভয়ে কহিল, আমি বলিনি, তিনি নিজেই এবেলার কথা বলেছিলেন।

জগৎতারিণী তখন রাগ করিয়া হুকুম করিলেন, তবে তুমিই যাও বাপু, ভাল মাছ-টাছ কোথায় পাওয়া যায়, শিগ্‌গির নিয়ে এসো।

আজ সকাল হইতেই যেজন্য তাঁহার মন বিগড়াইয়া গিয়াছিল, তাহার হেতু ছিল। সতীশকে নিমন্ত্রণ করিতে পাঠাইবার পরে তিনি খবর পাইয়াছেন কাল রাত্রে সহসা শশাঙ্কমোহন পুনরায় আসিয়া হাজির হইয়াছেন। এই লোকটাকে উৎকট সাহেবীয়ানার জন্য তিনি কোনদিন দেখিতে পারিতেন না, এবং বিশেষ করিয়া যখন হইতে শুনিয়াছিলেন সে সরোজিনীর পাণিপ্রার্থী, তখন হইতে লোকটি তাঁহার দু'চক্ষের বিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দিন-কুড়ি পূর্বে যখন সে কি উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া কলিকাতা হইতে এখানে আসিয়াছিল তখন জগৎতারিণী তাহাকে একপ্রকার স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কন্যার সহিত

বিবাহ অসম্ভব। তবুও বেহায়া লোকটা বলা নাই, কহা নাই, আবার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়াই তাঁহার চিত্ত সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তা ছাড়া, এ সংবাদ একটুখানি পূর্বাহ্ণে জানিতে পারিলে আজ সতীশকে হয়ত তিনি নিমন্ত্রণ করিতেই পাঠাইতেন না। কেন এ খবর যথাসময়ে তাঁহাকে জানান হয় নাই বলিয়া তিনি জ্যোতিষ হইতে বাড়ির বেহারাটা পর্যন্ত সকলের উপরেই চটিয়া গিয়াছিলেন। সরোজিনী বাহিরে বসিবার ঘর হইতে বাহির হইয়া কোনমতে মায়ের চোখ এড়াইয়া উপরে যাইতেছিল —শশাঙ্কমোহনের আগমন সেও জানিত না। কিন্তু জগৎতারিণী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার আপাদমস্তক ক্ষণকাল নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিয়া গূঢ় ক্রোধের স্বরে বলিলেন, বেড়ানো হলো ত? এখন জুতা-মোজাটা একদণ্ড ছাড় বাছা! সতীশ আজ এখানে খাবে, আমি নিজে না রাঁধলে ত তোমাদের এই খ্রীষ্টানের বাড়িতে সে জলস্পর্শ করবে না। যাও, ঘাগ্‌রা-টাগ্‌রা ছেড়ে আমার রান্নাঘরে এসো গে। বুড়ো মায়ের একটুখানি সাহায্য করলে তোমাদের যীশুখৃষ্ট রাগ করবেন না বাছা, যাও।

মা রাগিলে যে কিরূপ অগ্নিমূর্তি হইতেন এবং সত্য-মিথ্যা নির্বিচারে লঙ্ঘন করিয়া যা মুখে আসে বলিতেন, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। সরোজিনী কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, আমি এখুনি আসচি মা।

কিন্তু মায়ের রাগ তাহাতে কিছুমাত্র শান্ত হইল না; বলিলেন, এসেই বা আমার কি মাথা কিনবে মা? সতের-আঠার বছরের মেয়ে হলে, আজও এক মুঠা চাল সিদ্ধ করতে শিখলে না। আমরাও গরীবের ঘরের মেয়ে ছিলুম না মা, কিন্তু ও-বয়সে সংসার চালিয়ে এসেচি। বামুনমেয়ে আজ যদি চলে যায়, আমাকে তা হলে খাবার অভাবে শুকিয়ে মরতে হবে। যে ঘর-সংসারে ধর্ম-কর্ম নেই, সে ঘরে ছেলেমেয়ে পেটে ধরাই বৃথা! এই কঠোর মন্তব্য অত্যন্ত কঠিন করিয়া ব্যক্ত করিয়া জগৎতারিণী মুখ হাঁড়িপানা করিয়া নিজেই রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কেন যে তাঁহার নিজের ছেলে-মেয়ে এবং নিজের সংসারের আচার-ব্যবহারের উপর এই মর্মান্তিক আক্রোশ, তাহা তাঁহার পূর্ব-ইতিহাস হইতে অনেকটা বুঝা যাইবে।

জগৎতারিণীর পরলোকগত স্বামী পরেশনাথ ওকালতি করিয়া অগাধ অর্থ উপার্জন করিয়াও যখন অনেক বয়সে অধিকতর উপার্জনের আশায় ব্যারিস্টার হইতে কৃতসংকল্প হইলেন, তখন স্ত্রী কান্নাকাটি করিয়া, উপবাস করিয়া, মাথা খুঁড়িয়া অশেষ প্রকারে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। পরেশনাথ কোন কথা শুনিলেন না, জগৎতারিণীকে এবং বারো বৎসরের পুত্র জ্যোতিষ ও ছয় বৎসরের কন্যা সরোজিনীকে দেশের মাটিতে রাখিয়া বিলাত চলিয়া গেলেন। প্রথম কয়েকদিন জগৎতারিণী একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে বিষয়কর্ম দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু, স্বামীর উপর চিত্ত তাঁহার চিরদিনের মত ভাঙিয়া গেল। কিছুদিনের পর পরেশনাথ ব্যারিস্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়া আশাতিরিক্ত অর্থোপার্জন করিতে লাগিলেন, কলিকাতায় নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া নূতন ধরনে বাড়িঘর সাজাইতে শুরু করিলেন, বয়-বাবুর্চি নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু জগৎতারিণী নীরবে পৃথক হইয়া রহিলেন—স্বামীর গৃহকর্মে লেশমাত্র যোগদান করিলেন না। এমনি করিয়া দিন দিন স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ নিদারুণ হইয়া উঠিতে লাগিল। বাক্যালাপ ত বন্ধই ছিল, সংবাদ লওয়াও প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল।

একদিন জ্যোতিষ আসিয়া কহিল, মা, বাবা আমাকে বিলেতে পাঠাতে চাচ্চেন।

এ আশংকা জননীর ছিলই, তিনি অত্যন্ত কঠিন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কবে?

জ্যোতিষ কহিল, বোধ করি মাস-দুয়ের মধ্যেই।

আচ্ছা, বলিয়া মা মুখ অন্ধকার করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। বিলাত-যাত্রার দিন তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া রহিলেন, জ্যোতিষ রুদ্ধ-দ্বারের সম্মুখ হইতেই প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া গেল। পরেশনাথ সরোজিনীকে সঙ্গে করিয়া বোম্বাই পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিতে গেলেন, ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, জগৎতারিণী শান্তিপুরে পিত্রালয়ে চলিয়া গেছেন। কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলেন, ইতিমধ্যে তাঁহার খুড়শ্বশুর গোবিন্দ-

বাবু সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এ বাটীতে আহারাদি করেন নাই। সুতরাং স্ত্রীর গৃহত্যাগের কারণ বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

ফিরাইয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু জগৎতারিণী আসিলেন না। পরেশনাথ সরোজিনীকে বোর্ডিঙে ভরতি করিয়া দিলেন এবং প্র্যাক্‌টিস প্রায় ছাড়িয়া শূন্য বাটীতে অদ্ভুত কীর্তি আরম্ভ করিয়া দিলেন। জগৎতারিণী পিত্রালয়ে থাকিয়া স্বামীর অধঃপতনের সমস্ত বিবরণ শুনিতে পাইলেন, কিন্তু বাধা দিবার লেশমাত্র চেষ্টা করিলেন না। যে স্বামী তাঁহাকে আত্মীয়-সমাজের বাহিরে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া গেলেন, তাঁহার উপর জগৎতারিণীর অভিমানের অবধি রহিল না।

এমনি করিয়া দীর্ঘ পাঁচ বৎসর হইয়া গেল। জ্যোতিষ ফিরিয়া আসিয়া মাকে আনিতে গেল, কিন্তু মা অটল হইয়া রহিলেন, গৃহে ফিরিলেন না। কাঁদিয়া কহিলেন, সব ত শুনেচিস জ্যোতিষ, এখন যাতে তোরা সুখে থাকিস, তাই কর গে বাবা, কিন্তু আমাকে সে নরকের মাঝে আর টানিস নে—ও আমি সইতে পারব না।

জ্যোতিষ কহিল, আমরা আলাদা বাসা করে থাকব মা, তোমাকে সে বাড়ির ছায়াও মাড়াতে হবে না। আমি যা উপার্জন করব, তাতেই আমাদের কোনমতে দুঃখেকষ্টে চলে যাবে, তুমি এসো।

অনেক কষ্টে জগৎতারিণী সম্মত হইলেন এবং পুত্রকে কলিকাতায় আলাদা বাসা ঠিক করিতে বলিয়া দিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। জ্যোতিষ এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া লইয়া যাইবে বলিয়া মায়ের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু অত বিলম্বের আবশ্যক হইল না। পাঁচদিন পরেই সে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহার খালি পা, খালি গায়ে একখানা শাল জড়ানো দেখিয়াই জগৎতারিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। জ্যোতিষ যেদিন কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহার তৃতীয় রাত্রেই অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে পরেশনাথের মৃত্যু হইয়াছিল।

নিদারুণ অভিমানে একদিন জগৎতারিণী বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে আবার একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে সে বাড়িতেই ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে ইহলোকে আর দেখা হইল না।

মেয়েকে স্কুল ছাড়াইয়া বাড়ি আনিলেন এবং তাহার আগাগোড়া পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জ্যোতিষকে আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া কহিলেন, বোনের বিয়ে দিবি কবে বল্ দেখি?

জ্যোতিষ মায়ের মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া কহিল, ওর চেয়েও অনেক বড় বয়সের মেয়েদের বিয়ে হচ্চে মা, তুমি নির্ভাবনায় থাকো। জগৎতারিণী বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিলেন, নির্ভাবনায় থাকব কি রে! তোর বাপ যা করে গেছেন সে ত ফিরবে না জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে ত বামুনের মেয়েকে মোসলমান খৃষ্টানদের হাতে দিতে পারব না, তাতে মেয়ের বিয়ে হোক আর নাই হোক। তোর জন্যে ভাবিনে, একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই হতে পারবে—সে বিধান আমি কাকার কাছ থেকে জেনেই এসেচি, কিন্তু হাজার প্রায়শ্চিত্ত করেও ত মেয়ের বয়স কমাতে পারা যাবে না? তার উপায় হবে কি?

জ্যোতিষ কহিল, তোমাকে বয়স কমাতে হবে না মা, কিন্তু দু'দিন সবুর করতে হবে। আমি ভাল বামুনের ছেলে এনে দেব, তোমাকে মোসলমান খৃষ্টানের ঘরে খুঁজে বেড়াতে হবে না।

জগৎতারিণী রাগিয়া বলিলেন, তুই আরও সবুর করতে বলিস জ্যোতিষ?

জ্যোতিষ জবাব দিল, দোষ ত আমার নয় মা, যে সবুর করতে বলায় অপরাধ হবে। দোষ তোমার এবং বাবার। আমি ত ছিলুম বিদেশে।

এ কথা যে সত্য, তাহা জগৎতারিণী মনে মনে বুঝিলেন, কিন্তু সৎ-ব্রাহ্মণসন্তান কোথায় কেমন করিয়া জুটিবে তাহাও ভাবিয়া পাইলেন না। বলিলেন, যা ভাল বুঝিস কর বাছা, কিন্তু আমি কিছুর মধ্যেই নেই তা আগে থেকে বলে দিয়ে যাচ্চি, বলিয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাজে চলিয়া গেলেন।

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জ্যোতিষ পিতার শ্রাদ্ধ করিল।

ইহার অনতিকাল পরেই পাত্র জুটিল একজন বিলাত-ফেরত বাঙালী সাহেব। ব্যারিস্টারী পাস করিয়া তিনি বছর-দুই পূর্বে দেশে ফিরিয়াছিলেন।

শশাংকমোহনের রঙ্‌টা নেটিভ, মেজাজটা ব্রিটিশ—তিনি বাংলা বলিতেন অশুদ্ধ, ইংরাজী বলিতেন ভুল। অল্পদিনেই তাঁহার নিয়মিত আসা-যাওয়াটা অনিয়মিত এবং সরোজিনীর প্রতি মনের ভাবটা অস্পষ্ট হইতে সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিল।

জগৎতারিণী পর্দার আড়াল হইতে ভাবী জামাতাকে অবলোকন করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; এবং সেই আক্রোশ মিটাইলেন মেয়ের উপর। তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, তুই বেহায়ার মত যার-তার সামনে বার হস কেন বল ত?

সরোজিনী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রুদ্ধা জননী আর কিছু না বলিয়া দ্রুতপদে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। অতঃপর শশাংকমোহন অনেকবার আসিলেন গেলেন, কিন্তু যাহার জন্য যাতায়াত তাহার দেখা পাইলেন না। মায়ের অনুশাসন স্মরণ করিয়া সরোজিনী অত্যন্ত সতর্ক হইয়া অন্তরালে রহিল। জ্যোতিষ লক্ষ্য করিয়া একদিন ভগিনীকে কহিলেন, সরো, আজকাল তুই অমন পালিয়ে থাকিস কেন রে?

সরোজিনী মুখ নীচু করিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, মা— আর কিছুই বলিতে হইল না, জ্যোতিষ নীরবে চলিয়া গেলেন। এ বাড়িতে ঐ একটা অক্ষরই যথেষ্ট।

প্রায় মাস-দুই পরে একদিন সকালে সেই পাত্রটির তরফ হইতেই প্রস্তাব লইয়া জ্যোতিষ মায়ের কাছে উপস্থিত হইয়া রীতিমত বকুনি খাইল।

ছেলেকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মা কিঞ্চিৎ কোমল হইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোরাও ত বিলেতে ছিলি বাছা, কিন্তু ওই রকমটি হয়েছিস কি?

জ্যোতিষ ধীরে ধীরে বলিল, সবাই একই রকম হয় না মা, কেউ কেউ একটু আধটু বদলেও যায়। কিন্তু তাই বলে এমন ছেলে কি হাতছাড়া করা ভাল? শশাংক ব্যারিস্টার হয়ে এসেচে, এর মধ্যেই একটু পসারও করেচে, আমার ত মনে হয় না মা, বিয়ে হলে সরোজিনী মন্দ হাতে পড়বে। চাল-চলনে যা একটু তফাত ঘটেচে, সেটুকু যদি মাপ করে নিতে পার মা, ভবিষ্যতে বোধ করি ভালই হবে।

মা বলিলেন, আমি বলচি জ্যোতিষ, এ কোনদিন ভাল হবে না। তা ছাড়া বিদেশে গিয়েই যে বিদেশী হয়ে যায়, তাকে ত আমি কোনমতেই বিশ্বাস করতে পারব না। আর এই বা কেমন কথা যে, হিন্দুস্থানে গেলে হিন্দুস্থানী হব, কাবুলে গেলে কাবুলি হব, কটকে গিয়ে উড়ে হয়ে যাব—না না জ্যোতিষ, তুই ওকে বিদায় কর বাছা। ওটা মানুষ নয়—বাঁদর। বাঁদরের হাতে আমি মাথা খুঁড়ে মলেও মেয়ে দিতে পারব না।

কাহারও সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতেও যেমন জগৎতারিণীর বিলম্ব ঘটিত না, তাঁহার প্রকাশিত মতামতের মধ্যেও তেমনি সংশয়-দ্বিধার অবকাশ মাত্র থাকিত না। তা ছাড়া, যে অপরাধে তিনি স্বামী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, সে অপরাধ যে তিনি কোন প্রলোভনেই ক্ষমা করিবেন না, তাহা নিশ্চয় বুঝিয়া জ্যোতিষ নীরবে চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, একটা কথা কিন্তু ভেবে দেখবার আছে।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কথা?

জ্যোতিষ কহিল, সরোজিনীকে তোমরা যে শিক্ষা দিয়ে এসেছ, তাতে তার অমতেও কাজ করা চলবে না। সেটা সবচেয়ে মন্দ কাজ হবে। শিশুকাল থেকে ওর ভার তোমরা নিলে না, দিলে বিদেশী মেমদের ওপর। এখন বড় হয়ে ওর মনের টানটা যে কোন্ দিকে ঝুঁকে থাকবে সেটা বোঝা ত শক্ত নয় মা।

জগৎতারিণী চুপ করিয়া রহিলেন।

এই কথাটা তিনি মনে মনে অস্বীকার করিতেও পারিলেন না, অথচ, প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে পারাও অসম্ভব।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, বেশ ত জ্যোতিষ, তোমরা সবাই যদি সায়েব-মেম হতে চাও, হও, কিন্তু তার আগে আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও। আমি এতই যদি সহ্য করতে পেরে থাকি, এও সইতে পারব।

জ্যোতিষ তাড়াতাড়ি হেঁট হইয়া মায়ের পায়ের ধূলো মাথায় লইয়া হাসিয়া কহিল, তা হলে আমাকেও কাশীতে গিয়ে থাকতে হবে। মাকে ছেড়ে যে আমার কোথাও থাকা চলবে না, সে ত দেশে ফিরেই ঠিক হয়ে গেছে মা।

জগৎতারিণী মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার মনের সমস্ত আগুন একমুহূর্তেই নিবিয়া জল হইয়া গেল। ক্ষণকাল গভীর স্নেহে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, না বাছা, তুই আমাদের কাশীর বাড়িটা খালি করে দিতে চিঠি লিখে দে। আমি যে চিরকাল উপস্থিত থেকে নিজের মত নিয়ে তোদের বিব্রত করে রাখব, সেটা উচিতও নয়, দরকারও নয়।

জ্যোতিষ হাসিয়া বলিল, তাই ভাল মা, চল, সবাই গিয়ে কাশীতে থাকা যাক।

মাতা-পুত্রে উক্ত কথোপকথন কলিকাতার বাটীতে যেদিন হইয়াছিল, তাহার কিছুদিন পরেই উপেন্দ্র সতীশকে লইয়া জ্যোতিষের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার পরের ঘটনা পাঠকের অবিদিত নাই।

জগৎতারিণী সতীশকে দেখিলেন। তাহার গলায় মোটা পৈতা, সে সন্ধ্যা-আহ্নিক করে, সে মোসলমানের ছোঁয়া পাউরুটি বিস্কুট খায় না, সে শ্রীমান্, নিষ্ঠাবান্, তাহার পিতার অগাধ টাকা—জগৎতারিণী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাহার পরে ক্রমশঃ যখন আভাসে ইঙ্গিতে অনুভব করিলেন, সে বিলাতে গিয়া পাস না করিলেও, এমন কি এতগুলো কুসংস্কার থাকা সত্ত্বেও মেয়ের মনে অশ্রদ্ধার ভাব নাই, কি জানি, হয়ত বা সে মনে মনে—তখন হইতে জগৎতারিণীর চোখে সংশয়ের চেহারা আবার পরিবর্তিত এবং এতকালের পুঞ্জীভূত বেদনাও সহজ হইয়া উঠিবার পথ পাইল। সতীশের মুখের মাতৃসম্বোধনও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল।

কিন্তু, তার পরে বহুদিন পর্যন্ত সতীশের আর দেখা ছিল না। ইহার প্রত্যেক দিনটিই জগৎতারিণীকে বিঁধিয়া গিয়াছে, তথাপি নিজে, উদ্যোগী হইয়া এ সম্বন্ধে কোন উপায়ই খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রয়াস করেন নাই। তাঁহার বড় একটা ভয় ছিল, পাছে চেষ্টা করিতে গেলেই একটা অত্যন্ত মন্দ সংবাদ শুনিতে হয়।

তিনি মনে মনে জানিতেন, তাঁহার নিজের কন্যার মতামতের উপরেই শুধু বিবাহের সমস্ত ফলাফল নির্ভর করে না। কারণ সতীশের বৃদ্ধ পিতা এখনও জীবিত আছেন। কি জানি তিনি কি বলিবেন। তা ছাড়া সতীশ নিজেই যে বিলাতফেরতের বাড়িতে বিবাহ করিতে ভয় পাইয়া পিছাইয়া যাইবে না, তাহারও বিশেষ কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

এমনি করিয়া অনেকদিন অনেক দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় কাটাইয়া সেদিন হঠাৎ যখন বৈদ্যনাথে আসিয়া দেখিতে পাইলেন সতীশ বসিয়া গল্প করিতেছে, তখন আনন্দে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সতীশ কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

সে কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসিয়া অজ্ঞাতবাস করিতেছিল। সরোজিনীই তাহাকে আবিষ্কার করিয়াছে, ইহা জ্যোতিষ গল্প করিয়া মাকে শুনাইল। নিজের কন্যার দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়া তিনি সতীশের মাথায় হাত দিয়া তাহাকে অসংখ্য আশীর্বাদ করিলেন, এবং এই উপলক্ষে ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজের নকল করাকে অজস্র গালি পাড়িয়া বলিলেন, বাবা সতীশ, তুমি যে মেয়েটাকে রক্ষা করেছ এ কথা যেন ওরা কোনদিন না ভুলে যায়। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে একলা থাকার দরকার কি সতীশ? তুমি এ-বাড়ির ছেলে, যতদিন আমরা এখানে আছি, ততদিন এই বাড়িতেই এসে কেন থাক না?

সতীশ হাসিয়া বলিল, বেশ আছি মা। আমার সেখানে কোন কষ্ট নেই।

জগৎতারিণী কহিলেন, কষ্টের জন্য নয় বাবা, একা থাকার অনেক বিপদ। এ বাড়িতে অনেক ঘর খালি পড়ে আছে, তুমি চলে এস। জল-হাওয়া সেখানেও যা, এখানেও ত তাই।

সরোজিনী কহিল, তা হলে ওঁর জাত যাবে মা।

জগৎতারিণী তখনও ভিতরের কথা জানিতেন না, মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুই ত খুব মেয়ে সরি! কেন, আমরা কি, যে আমাদের এখানে, লোকের জাত যাবে? না বাবা সতীশ, তুমি ওর কথা বিশ্বেস করো না। আর তাই যদি হবে, উপীন বৌ নিয়ে আমাদের বাড়িতে অতদিন থেকে গেলেন কি করে? তাদের কৈ জাত

গেল না? তুই অমন মিছে করে ওকে ভয় দেখাস নে বলে দিচ্ছি।

সরোজিনী মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল; সতীশ কহিল, না মা, জাত যাবে কেন? আমি ত প্রায় প্রত্যহই আসি, রাত্রের খাওয়াটাও ত আমার এ বাড়িতেই হয়।

শুনিয়া জগৎতারিণী পুলকিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন, তাই এসো বাবা। অন্ততঃ আমি যে ক'দিন আছি, আমার কাছেই তোমাকে রোজ খেয়ে যেতে হবে। বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ খাবার ব্যবস্থা করিতে অন্যত্র চলিয়া গেলে সরোজিনী কহিল, আপনি যে আমাকে গান শেখাবেন বলেছিলেন?

সতীশ কহিল, আমি ত প্রায় রোজ আসি, শিখলেই ত পারেন।

সরোজিনী বলিল, আপনি এলেই ত সমস্ত ভদ্রলোক আপনার গান শুনতে আসেন—তার মধ্যেই বুঝি শেখা যায়?

সতীশ হাসিয়া কহিল, 'নো অ্যাডমিশন' বলে ফটকে দরোয়ান বসিয়ে দিন না কেন?

সরোজিনী বলিল, তার চেয়ে মা যা বললেন তাই করুন। সেই জঙ্গলের মধ্যে আর পড়ে থাকবেন না।

কিন্তু জঙ্গলে থাকার প্রয়োজন আর যাহাকেই বলা যাক, সরোজিনীর কাছে বলা চলে না। সতীশ চুপ করিয়া রহিল।

সরোজিনী পুনরায় কহিল, আচ্ছা, দাদা যে বললেন, পাঁচ-ছদিন পরে কলকাতায় যাবেন, তখন আমাদের দেখবে কে?

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, ক'দিনের জন্য যাবেন?

সরোজিনী কহিল, অন্ততঃ সাত-আটদিন তাঁকে সেখানে থাকতেই হবে।

সতীশ কহিল, তা হলে সে ব্যবস্থা তিনিই করে যাবেন। আর এত ভয়ই বা কি জন্যে? আপনারা ত আমাদের হিন্দুর ঘরের মত অসূর্যম্পশ্যা নন যে, বাড়িতে পুরুষ-মানুষ না থাকলেই মুশকিলে পড়ে যাবেন। আপনারাই বরঞ্চ কত পুরুষের—

সরোজিনীর মুখ পলকের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল, কি আমরা করি শুনি? পুরুষের কান কেটে নিই? না, হিন্দুর ঘরের মেয়ে নই আমরা?

সতীশ অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি কথাটা সারিয়া লইবার জন্য মুখ তুলিয়াই দেখিতে পাইল, সম্মুখে শশাঙ্কমোহন ব্যারিস্টারকে লইয়া জ্যোতিষ ঘরে ঢুকিতেছেন। অন্যদিনের মত আজও তিনি স্টেশনে বেড়াইতে গিয়া দেখেন ব্যারিস্টার সাহেব ফার্স্টক্লাস কামরা হইতে অবতরণ করিতেছেন।

ঘরে পা দিয়াই শশাঙ্কমোহন সরোজিনীর দিকে হাত বাড়াইয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া করমর্দন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং নিজের এইরূপ অকস্মাৎ আগমনের কৈফিয়তস্বরূপে কহিলেন, কেন যে সহসা কলিকাতা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল, কেন যে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া স্টেশনে আসিয়া দেওঘরের ফার্স্টক্লাস টিকিট কিনিয়া বসিলেন, তাহার হেতু নিজেই এখন পর্যন্ত জানেন না। অতঃপর নিকটে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া ব্যারিস্টার-সাহেব অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু সরোজিনীর পাংশু মুখ দিয়া দুই-একটা সাধারণ কথা ছাড়া কথাই বাহির হইল না।

মিনিট-দশেক পরে সতীশকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় ঘাড়টা একটু কাত করিয়া বিস্ময়ের কণ্ঠে সরোজিনীকে কহিলেন, এঁকে কোথায় দেখেচি বলে মনে হচ্চে না!

সরোজিনীর পাংশু মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সংক্ষেপে কহিল, বলতে পারি না কোথায় দেখেছেন।

অনতিকাল পরে জগৎতারিণী খাবার দিয়া সতীশকে যখন ডাকিতে পাঠাইলেন তখন দেখা গেল, সতীশ কাহাকেও কোন কথা না কহিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ইহার পরে তিন দিন পর্যন্ত সতীশের আর দেখা না পাইয়া জগৎতারিণী ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ছেলেকে নিভৃতে ডাকিয়া কড়া করিয়া প্রশ্ন করিলেন, লোকটি আর কতদিন এখানে থাকবে জ্যোতিষ? বরঞ্চ আমি বলচি, তোমরা ওঁকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও যে, তাঁর থাকবার আর কোন আবশ্যক নেই।

মাতৃ-আজ্ঞা জ্যোতিষ কিভাবে পালন করিয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু প্রস্থানের পূর্বে শশাঙ্কমোহন নিঃসংশয়ে শুনিয়া গেলেন যে, যে-জন্য তাঁহার আসা সে আশা লেশমাত্র নাই, এবং সতীশই যে সেই ভাগ্যবান পাত্র, তাহাও জানিতে তাঁহার অবশিষ্ট রহিল না।

সাহেবের মুখ কালো হইয়া উঠিল, কিন্তু আঘাতটা তিনি ভদ্রভাবেই গ্রহণ করিলেন। এমন কি, যাইবার সময় তিনি সরোজিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও চেষ্টা করিলেন না।

ট্রেনে উঠিয়া বসিয়া বিদায় লইবার ঠিক পূর্বক্ষণেই অত্যন্ত অকস্মাৎ জ্যোতিষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশবাবু কোথায় যে ডাক্তারি শেখবার চেষ্টা করছিলেন, তা হয়েচে?

জ্যোতিষ মাথা নাড়িয়া কহিল, বোধ হয় না। হোমিওপ্যাথি স্কুলে কিছুদিন পড়েছিলেন মাত্র।

ওঃ, হোমিওপ্যাথিক স্কুল! বলিয়া শশাঙ্ক অন্য কথা পাড়িলেন।

আটত্রিশ

সহসা ভ্রাতার অসুখের টেলিগ্রাম পাইয়া জগৎতারিণীকে তাড়াতাড়ি শান্তিপুরে যাইতে হইয়াছিল। সুতরাং সতীশের কাছে প্রস্তাবটা উত্থাপন করিবার তখন সুযোগ পান নাই। আজ তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া কথাটা পাড়িবেন, মনে মনে এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া সকালে উঠিয়াই সরকারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে এই অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। যাহার আগমন সবচেয়ে অপ্রীতিকর, অকস্মাৎ সেই শশাঙ্কমোহন সকালের ট্রেনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া জগৎতারিণীর বিরক্তির আর অবধি রহিল না। মানুষের অত্যন্ত কামনার বস্তু হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহার সন্দেহের আর হিসাব-নিকাশ থাকে না। সুতরাং ঠিক সেই সময়ে বাহির হইতে সরোজিনীকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে বিষের জ্বালা দিয়া মনে হইল, শশাঙ্কর এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের মধ্যে হয়ত বা এই হতভাগা মেয়েটারও কোন হাত আছে। তাঁহার ব্যারিস্টার ছেলেকে ত তিনি কোনদিনই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ, তাঁহাকে দোষ দেওয়াও যায় না। তাঁহার হিন্দু আচারভ্রষ্ট ছেলে-মেয়েরা যে সতীশের আচারপরায়ণতা প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে, এ কথা তিনি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

মেয়েকে কটূক্তি করিয়া তিনি রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ঝিকে রান্নার আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া স্নানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ঘণ্টা-খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কন্যার প্রতি চাহিয়া জননীর চক্ষু জুড়াইয়া গেল।

ইতিমধ্যে তাড়াতাড়ি সে স্নান সারিয়া লইয়া পট্টবস্ত্র পরিয়া মায়ের রান্নাঘরে ঢুকিয়া অপটুহস্তে বঁটিতে তরকারি কুটিতেছিল এবং ঝি অদূরে বসিয়া দেখাইয়া দিতেছিল।

জগৎতারিণী নীরবে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, হিঁদুর মেয়ের যে আর কোন পোশাকেই সাজে না, তোকে দেখে আজ তা টের পেলুম বাছা! তোর পানে চেয়ে এত আহ্লাদ আর আমার কোনদিন হয়নি।

সরোজিনী লজ্জায় মুখ নত করিয়া কাজ করিতে লাগিল; মা তাহাকেই খোঁচা দিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সব বুঝি মা সব বুঝি। তা সে যতই পাস করুক, বাঁদর ছাড়া তাকে আমি কিছুই বলিনে। আর যার ইশারা পেয়েই কেন না বেহায়াটা আবার ফিরে আসুক, আমি থাকতে তা হবে না, তা সত্যি করে বলে দিচ্চি বাছা!

একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, জ্যোতিষ বলে, ছেলেবেলায় যে যেমন শিক্ষা পেয়ে আসে, মনের টানটা তার সেইদিকেই যায়। কিন্তু তাই বা সত্যি হবে কেন? দিন-রাত হ্যাট-কোট পরে না থাকলে পছন্দ হবে না, এই বা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে মা?

আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া জগৎতারিণী রাঁধিতে বসিয়া একসময়ে কহিলেন, আমার মনের বাসনা ভগবান যদি পূর্ণ করেন, তুই দেখিস দিদি বাছা, তাতে তোর ভালই হবে।

সরোজিনী আনতমুখে মায়ের মনের বাসনাটা স্পষ্ট শুনিবার প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হইয়া রহিল, জগৎতারিণী আর তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন না, নিজের মনে রাঁধিতে লাগিলেন। তিনি নীরবে মনে মনে কি আলোচনা করিতে লাগিলেন সরোজিনী তাহা বুঝিল এবং হ্যাট-কোটধারী সম্বন্ধে যে লজ্জাকর অপবাদের ইঙ্গিতে তাহাকে পুনঃ বিদ্ধ করিলেন, তাহারও প্রতিবাদ করা কঠিন ছিল না, কিন্তু নিরতিশয় অসহিষ্ণু-প্রকৃতি জগৎতারিণীকে কোন কথাই শেষ পর্যন্ত শুনানো যায় না জানিয়াই সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

বেলা প্রায় দশটা বাজে এমন সময় একটা গোল বাধিল। সরকারমশাই কোথা হইতে খুঁজিয়া পাতিয়া একটা প্রকাণ্ড বড় রুইমাছ আনিয়া হাজির করিলেন। জগৎতারিণী রান্নাঘরের ভিতর হইতে উঁকি মারিয়া দেখিয়া খুশী হইয়া বলিলেন, বাঃ—বেশ মাছ কিন্তু—

সরোজিনী কহিল, সতীশবাবুর আসতে এখনও দেরি আছে মা, এখনও দশটা বাজেনি।

জগৎতারিণী বলিলেন, বাজা-বাজির কথা নয় মা, আজ আমার একাদশী, আমি ত মাছ ছোঁব না। ভাবচি, তোদের বামুনঠাকুর রাঁধতে পারবে কি? আচ্ছা দেখ ত এলোকেশী, ও-ঘরের রান্না কতদূর এগুলো?

ঝি বাহিরে যাইতেই সরোজিনী লজ্জিত-মুখে আস্তে আস্তে বলিল, তুমি দেখিয়ে দিলে আমি কি পারব না?

জগৎতারিণী বিস্মিত-মুখে বলিলেন, পারবি তুই?

পারব না? তুমি কেবল দেখিয়ে দাও।

ঝি থমকিয়া দাঁড়াইল। এমন চারু-দর্শন বৃহদায়তন রোহিত একটা আনাড়ীর হাতে পড়িয়া সম্পূর্ণ নষ্ট হইবার আশংকায় সে ভীত হইয়া উঠিল। কহিল, সে কি হতে পারে মা, বাইরের লোক খাবে যে।

জগৎতারিণী ক্ষণকাল কি ভাবিয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক, সতীশ আমার বাইরের লোক নয়, সে আমার ঘরের ছেলে। তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে এলোকেশী, ওধারের উনুনটা বেশ করে নিকিয়ে দিয়ে মাছ কুটে আন্। তুইও এক কাজ কর মা। গরদের কাপড় পরে ত সুবিধে হবে না—আচ্ছা তা হোক, না হয় আঁচলটা বেশ করে কোমরে জড়িয়ে নে। হাসিয়া বলিলেন, আজ আঁশ-হাতেই তোর হাতেখড়ি হয়ে যাক, সরি, আশীর্বাদ করি, চিরকাল আজকের দিনের মত যেন তোর আঁশ-হাতই হয়।

এই আশীর্বাদে সরোজিনী মুখখানি আরও একটু অবনত করিল। ঘণ্টা-খানেক পরে জ্যোতিষ মায়ের কাছে কি একটা কাজের জন্য রান্নাঘরের দরজার কাছে আসিয়া নিরতিশয় বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিল, ওখানে রাঁধে কে মা? সরো না কি?

মা একটু হাসিয়া বলিলেন, দেখ দেখি, চিনতে পারিস কি না!

চিনতে না পারারই কথা মা। কিন্তু ও কি সত্যই রাঁধচে, না তোমার ঢাক ঘাড়ে করে আছে?

মা একটা নিগূঢ় ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, রাঁধাবাড়ার কাজ কি হিন্দুর মেয়েকে শিখতে হয় রে, এ ত আমাদের জন্মকাল থেকেই শেখা হয়ে থাকে। কিন্তু—

কি মা?

ছেলেকে একটু আড়ালে লইয়া জগৎতারিণী বলিলেন, কিন্তু আমি এখন ভাবছি সতীশ শুনলে কি জানি ওর হাতে খাবে কি না!

জ্যোতিষ হাসিয়া উঠিতেই সরোজিনী মুখ তুলিয়া চাহিল। জ্যোতিষ কহিল, মা, তুমি সতীশকে মস্ত একটা মনু-পরাশর গোছের লোক ভাবো কেন বল দেখি?

মা বলিলেন, সে তোদের চেয়ে ত ভাল?

জ্যোতিষ কহিল, এমনই বা কি ভাল শুনি? ঐ সরো গিয়ে তাদের ভাত ডাল রেঁধে দিয়ে এসেছিল বলে সে রাত্রে খেতে পেয়েছিল, নইলে উপোস করে থাকতে হতো—সে জান?

মা পুলকিত বিস্ময়ে ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, কবে রে?

জ্যোতিষ সে রাত্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিলেন।

তিনি আনন্দে বিহ্বলপ্রায় হইয়া ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে মেয়েকে বলিলেন, ধন্যি মেয়ে মা তুই! আমি তখন থেকে ভেবে মরচি, আর তুই চুপ করে আছিস?

জ্যোতিষ হাসিয়া বলিল, ওই বা কি করে জানবে মা, তুমি নিজের মনে ভেবে সারা হচ্চ? কিন্তু সেদিন ত খেতে পাইনি, আজ খেয়ে দেখি পোড়ারমুখী পেট থেকে পড়েই কেমন রাঁধতে শিখেছে। বলিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

জগৎতারিণী মেয়ের লজ্জাবনত মুখখানির পানে চাহিয়া গভীর স্নেহে কহিলেন, লজ্জা কি মা? আপনার জনকে রেঁধে-বেড়ে খেতে দেবে এর চেয়ে সৌভাগ্য মেয়েমানুষের কি আর আছে! আমি আহ্নিকটা ততক্ষণ সেরে নি গে, বলিয়া কিছুক্ষণের জন্য বাহির হইয়া গেলেন।

তার পর সমস্ত দিন গেল, কিন্তু সতীশের দেখা নাই। না আসার কারণও কেহ জানাইয়া গেল না। সারাদিন ছটফট করিয়া জগৎতারিণী সন্ধ্যার পর জ্যোতিষকে ডাকিয়া বলিলেন, তার নিশ্চয় কিছু একটা হয়েচে, কাউকে খবর নিতে একবার পাঠিয়ে দিলিনে কেন?

জ্যোতিষ নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিল, কাকে ততদূর আবার পাঠাতে যাব মা!

জগৎতারিণী আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, কেন, দরোয়ান একবার যেতে পারত না?

দরকার কি মা?

তুই বলচিস কি জ্যোতিষ? তার অসুখ-বিসুখ হলো, না কি হলো, একবার খবর নেওয়াও আবশ্যক নয়?

কি আবশ্যক? সে আমাদের আত্মীয়ও নয়, বন্ধুও নয়, তার জন্যে ভেবে মরার আমি কোন প্রয়োজনই দেখিনে, বলিয়া জ্যোতিষ বাহিরে চলিয়া গেল।

সতীশের সম্বন্ধে ছেলের মুখে জবাব শুনিয়া জগৎতারিণী হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। মাত্র এই একটা বেলার মধ্যে সতীশ আর তাহাদের কেহ নয়? তাঁহার মুখের উপর ছেলের এই স্পর্ধিত উত্তর ক্ষণকালের জন্য তাঁহার কাছে দুঃস্বপ্নের মত ঠেকিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া কয়েক মুহূর্তেই কত কি যে তাঁর উপবাসক্ষীণ মাথার মধ্য দিয়া ছুটিয়া গেল, তাহা ভাল করিয়া ঠাহর করিতেও পারিলেন না।

ধীরে ধীরে উপরে গিয়া নিজের শয্যায় শুইয়া পড়িয়া সরোজিনীকে কাছে ডাকাইয়া আনিয়া জগৎতারিণী মেয়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আরও ভয় পাইয়া গেলেন। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, সরি, সতীশ এলো না কেন জানিস?

সরোজিনী বলিল, না।

কন্যার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে জগৎতারিণী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, না! যদি জানোই না, তবে লোক পাঠিয়ে জানতে কি হয়েছিল? এও কি আমাকে বলে দিতে হবে নাকি?

সরোজিনী মৃদুকণ্ঠে কহিল, দাদা বললেন লোক পাঠাবার দরকার নেই।

কেন নেই, সেইটাই জানতে চাই। যাও এখ্খুনি দরোয়ানকে পাঠিয়ে দাও, তার খবর নিয়ে আসুক।

সে ত নেই মা, দাদা তাকে উপীনবাবুকে টেলিগ্রাম করতে পাঠিয়েছেন!

উপীনবাবুকে! হঠাৎ তাকে টেলিগ্রাম করা কেন?

আমি সব কথা জানিনে মা, তুমি দাদাকে জিজ্ঞাসা কর, বলিয়া সরোজিনী মাকে এক প্রকার উপেক্ষা করিয়াই চলিয়া গেল।

এইবার জগৎতারিণীর অকস্মাৎ মনে হইল সতীশকে নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার হেতু যে কি, তাহা কেহই তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিতে চাহে না বটে, কিন্তু সে যে গুরুতর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; এবং এই ভীষণ অনিষ্টের মূলে যে ঐ শশাঙ্কমোহন এবং এই দুরভিসন্ধি লইয়াই সে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেও তাঁহার কোন সংশয় রহিল না। কিন্তু, কারণ যতবড় ভয়ানকই হোক, তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেও যে ছেলে-মেয়েরা তাঁহার অনুমতি না লইয়া সতীশকে মানা করিয়াছে, ইহা মনে করিতেই তাঁহার চিত্ত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৎক্ষণাৎ এলোকেশীকে দিয়া জ্যোতিষকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই সতীশকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করেছিস?

জ্যোতিষ আশ্চর্য হইয়া বলিল, না, এ তোমাকে কে বললে?

উপীনকে তুই সতীশের কথা নিয়ে টেলিগ্রাম করেচিস?

হ্যাঁ।

সতীশ কি করেচে?

জ্যোতিষ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, যা করেচে, সে যদি সত্যি হয়, তা হলে তার সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্বন্ধই নেই।

এ খবর তোকে কে দিলে, শশাঙ্কমোহন? দুষ্টু লোক, ওর কথা আমি একতিল বিশ্বেস করিনে।

জ্যোতিষ কহিল, আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয়, তা হলেও আমি বলচি মা, সতীশের ছায়া মাড়াতেও আমাদের ঘৃণা হওয়া উচিত।

ছেলের উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে জগৎতারিণী নরম হইয়া বলিলেন, বেশ ত, আমাকে খুলেই বল না বাছা কি হয়েচে। সতীশ কিছু চুরি-ডাকাতিও করেনি, খুন করেও পালিয়ে আসেনি যে, তার ছায়া মাড়াতেও তোমাদের ঘৃণা হবে। ছেলেমানুষ, মনের ভুলে যদি কিছু দোষ-ঘাট করেই থাকে—এমন কত লোকই ত করে—শুধরে নিতে কতক্ষণ?

জ্যোতিষ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না মা, সে সব অপরাধ মাপ করা যায় না। অন্ততঃ সরোজিনী পারবে না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

জগৎতারিণী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, অপরাধটা কি শুনি?

কাল শুনো মা। উপীনের চিঠি না পাওয়া পর্যন্ত এ আলোচনায় আর কাজ নেই, বলিয়া জ্যোতিষ দ্বিতীয় অনুরোধের পূর্বেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এতক্ষণ উত্তেজনার আবেগে জগৎতারিণী বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিলেন, ছেলে চলিয়া যাইতেই একেবারে নির্জীবের মত শয্যা গ্রহণ করিলেন. দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ভগবান! এ কলিকালে কি কাউকে বিশ্বাস করবার তুমি জো রাখোনি ঠাকুর।

আভাসে অনুমানে তিনি অনেক কথাই বুঝিলেন। তাই শুধু সতীশের জন্য নয়, স্বামীর কথা মনে পড়িয়াও তাঁহার দুচক্ষু বাহিয়া এখন হুহু করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

রাত্রে একবার মেয়েকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলেন. এলোকেশী সরোজিনীর সাড়া না পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল. দিদিমণি ঘুমিয়ে পড়েছে।

শুনিয়া তিনি কপালে করাঘাত করিলেন। যে মেয়ে এত দুঃসংবাদ শুনিয়াও ঘুমাইতে পারে, অর্থাৎ সে যে সতীশের চেয়ে মনে মনে ওই বাঁদরটার প্রতি বেশী অনুরাগী, এ কথা মনে করিয়া তাঁহার মেয়ের প্রতি ক্রোধ ও অশ্রদ্ধার অন্ত রহিল না।

পরদিন বেলা প্রায় তিনটা বাজে, গেটের থামে সাইকেল কাত করিয়া রাখিয়া সতীশ বাহিরের বসিবার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

তাহার শুষ্ক মুখ, এলোমেলো রুক্ষ চুল. উপস্থিত সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সরোজিনী মুখ তুলিয়া চাহিল. কিন্তু কথা কহিল না। জ্যোতিষ জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অসুখ করেচে নাকি সতীশবাবু?

সতীশ একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, না।

কেহই আর কোন কথা কহিল না দেখিয়া সতীশ মনে মনে বিস্মিত হইল। সে ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিল আজ উপস্থিত হওয়ামাত্র অভিযোগ অনুযোগের অন্ত থাকিবে না। তাই, সে তখন বাড়ির ভিতরের দিকে অগ্রসর হইবার উদ্যোগ করিয়া নিজেই কহিল, কালকের অপরাধের জন্যে আগে মায়ের কাছে মাপ চেয়ে আসি, তার পরে অন্য কাজ।

শশাঙ্ক এতক্ষণ তীব্রদৃষ্টিতে সতীশের পানে চাহিয়া ছিল, সে-ই কথা কহিল। বলিল, মা এখন ঘুমোচ্চেন, তাঁকে জাগিয়ে মাপ চাইবার এত তাড়া কি? একটু বসুন, আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করবার আছে।

তাহার কথার ধরনে সতীশ অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার সঙ্গে আলোচনা?

শশাঙ্ক কহিল, আজ্ঞে হাঁ, দুর্ভাগ্যক্রমে আছে বৈ কি।

জ্যোতিষকে দেখাইয়া কহিল, আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি ওঁর একজন পরম বন্ধু—না না, জ্যোতিষবাবু, আপনি উঠবেন না—ও কি, আপনারাই বা পালালে চলবে কেন? আমার যা নালিশ তা আপনাদের সামনেই করতে চাই। দুজনেই বসুন,—বলিয়া সরোজিনীর প্রতি একটা কটাক্ষ করিল। কিন্তু সরোজিনী এমনি ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল যে, সে ইহার কিছুই দেখিতে পাইল না।

শশাঙ্ক সুমুখের টেবিলের উপর একটা চড় মারিয়া বলিল, আমার ছেলেবেলা থেকেই এই স্বভাব যে, যাদের ভালবাসি, তাদের সম্বন্ধে কিছুতেই চোখ বুজে উদাসীন থাকতে পারিনে। তাই গতবারে শুনেই মনে মনে বললুম, এ ত ভাল কথা নয়। সতীশবাবুর এই নির্জন-বাসের একটা খবর নেওয়া উচিত। আপনি হয়ত রাগ করবেন সতীশবাবু, কিন্তু আমিও ত আমার নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে যেতে পারিনে। কি বলেন জ্যোতিষবাবু?

জ্যোতিষ নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া রহিল। সতীশও চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সমস্ত শ্রোতাদের সমবেত নীরবতার মাঝখানে শশাঙ্কর উত্তেজনার বেগ আপনিই ঢিলা হইয়া আসিল। সে অপেক্ষাকৃত সংযত-কণ্ঠে কহিল, জ্যোতিষ আমার পরম বন্ধু বলেই আপনাকে গুটিকয়েক প্রশ্ন করবার আমার অধিকার আছে। আপনি ত জানেন—

কথার মাঝখানেই সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি বন্ধুত্বের কথা কিছুই জানিনে, কিন্তু আপনার প্রশ্ন কি শুনি?

শশাঙ্ক একটা ঢোক গিলিয়া বলিল, আমি জানতে চাই আপনি এখানে এসে আছেন কেন?

সতীশ কহিল, আমার ইচ্ছে। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্ন?

শশাঙ্ক থতমত খাইয়া জ্যোতিষকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল, সতীশবাবুর কলকাতার বাসা খুঁজে বার করতে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হয়েচে। রাখালবাবুকে উনি চেনেন, তিনি বললেন—

সতীশের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, কহিল, চুলোয় যাক রাখালবাবু। আপনার নিজের কথা বলুন।

এবার জ্যোতিষ মুখ তুলিয়া বলিল, সতীশবাবু, শশাঙ্ক আমার অনুরোধেই আপনাকে জিজ্ঞেসা করচে। আপনি ইচ্ছা করলে জবাব না দিতেও পারেন, কিন্তু ওঁকে অপমান করবেন না। আমাদের সঙ্গে আপনি যে ব্যবহার করেচেন তাতে কোন প্রশ্ন না করাই উচিত ছিল, শুধু আমার মায়ের জন্যই আপনার নিজের মুখ থেকে একবার শোনার প্রয়োজন। বেশ, আমিই না হয় প্রশ্ন করচি, সাবিত্রী কে? এবং তার সঙ্গে আপনার সম্বন্ধই বা কি?

সতীশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল, পরে কহিল, সাবিত্রী কে তা আমি জানিনে জ্যোতিষবাবু। কিন্তু তার সঙ্গে আমার কি-সম্বন্ধ, সে উত্তর দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করিনে।

কেন?

কারণ, বললেও আপনারা বুঝতে পারবেন না।

কিন্তু যেমন করেই হোক, আমাদের বুঝা একান্ত আবশ্যক। ভাল, তাকে কোথায় এনে রেখেচেন, এ সংবাদ দিলে বোধ করি বুঝতে পারব।

সতীশ জ্যোতিষের মুখের উপর তাহার জ্বলন্ত চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, দেখুন জ্যোতিষবাবু, আমি কোনদিন গায়ে পড়ে আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করিনি, সুতরাং প্রশ্নোত্তরের ছলে কতকগুলো অপ্রিয় কথা-কাটাকাটির দরকার মনে করিনে। আমি বুঝতে পেরেচি, কি ঘটেচে। অতএব, আপনাদের যতটুকু জানা প্রয়োজন আমি নিজেই জানাচ্চি। সাবিত্রী কোথায় গেছে আমি জানিনে। কেন, কি বৃত্তান্ত, এ-সব সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। তবে এ কথা খুব সত্যি, সাবিত্রী যাই হোক,

যদি নিজের ইচ্ছেয় সে আমাকে ছেড়ে চলে না যেত, আমি যতদিন বাঁচতুম, তাকে মাথায় করে রাখতুম। এ কথা শুধু আপনাদের সাক্ষাতে নয়, সমস্ত পৃথিবীর সামনে স্বীকার করতেও আমি লজ্জা বোধ করিনে। আশা করি, এর পরে আপনাদের আর কোন জিজ্ঞাস্য নেই। থাকলেও আমি জবাব দিতে পারব না।

সতীশের এই সুস্পষ্ট এবং অতিশয় সংক্ষিপ্ত উত্তরে সকলেই যুগপৎ বিস্ফারিতচক্ষে চাহিয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিল। সরোজিনীর মুখের উপরেই তাহার এই অমানুষিক হৃদয়হীন স্পর্ধা তাহার অসীম নির্লজ্জতাকেও বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গেল। বহুক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসিয়া থাকিয়া জ্যোতিষ প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সচেতন করিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, আপনার কাছে আমাদের আর কিছুই জিজ্ঞাস্য নেই। যেটুকু ছিল, উপীনের জবাবে সেটুকু পূর্ণ হয়েচে। এই দেখুন, বলিয়া সে টেলিগ্রামের কাগজখানা সম্মুখে ছুঁড়িয়া দিল।

উপীনদার টেলিগ্রাম? কৈ দেখি, বলিয়া সতীশ ব্যগ্রহস্তে কাগজখানা তুলিয়া লইল। ভাঁজ খুলিয়া ধীরে ধীরে সমস্তটা পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া, ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল। তার পরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সমস্ত সত্য। আমার উপীনদা কখনও মিথ্যা বলেন না। যথার্থই আমি ভাল নই, যথার্থই আমার সঙ্গে কারও সংস্রব রাখা উচিত নয়। বোধ করি নিজেই এ কথা মনে মনে টের পেয়েছিলাম বলেই এই জঙ্গলের মধ্যে এমন করে একদিন পালিয়ে এসেছিলাম। বলিতে বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর যেন কোন মন্ত্রবলে জলভারাক্রান্তের ন্যায় গদগদ হইয়া আসিল। কিন্তু কেহই কোন কথা কহিল না এবং সতীশ নিজেও স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পরক্ষণেই একটা বুকচেরা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তাহার মনে হইল, একটা বড় জটিল সমস্যার আজ অত্যন্ত অদ্ভুত মীমাংসা হইয়া গেল। কাল সকালেও তাহার জগৎতারিণীর নিমন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে কত চিন্তাই না মনে উদয় হইয়াছিল! সরোজিনীর হৃদয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা হঠাৎ কবে যে তাহার অন্তরে প্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল, এইমাত্র এ কথা সে স্মরণ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু নিভৃত অন্তরের মধ্যে তাহার আকাঙ্ক্ষা ত ছিলই! না হইলে এমনটি ঘটিয়াছিল কি করিয়া? এ অমৃত সঞ্জাত হইয়াছিল কোন্ সিন্ধু মন্থন করিয়া? সাবিত্রীকে হারাইয়া পর্যন্ত এই সত্যটার সে সাক্ষাৎলাভ করিয়াছিল যে, যুবতী রমণীর মন পাওয়া এক, কিন্তু সে পাওয়া কাজে লাগানো সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। কারণ, পাওয়া যখন নর-নারীর নিভৃত হৃদয়ে গোপনে, নিঃশব্দে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে, বাহিরের সংসার তাহার সাড়া পায় না, কিন্তু যেদিন এই সংসারের সম্মতি না লইয়া আর এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় থাকে না, সেই দিনই দারুণ দুঃখের দিন। এ পাওয়া যে কত কঠিন, এ রত্ন যে কত দুর্লভ, বাহিরের সংসার সে বিচারের দিক দিয়া যায় না—সে কেবল তাহার শাস্ত্র লইয়া, সমাজ লইয়া, লোকাচার লইয়া বিরুদ্ধস্বরে কলরব করে, বাধা দেয়, নিষ্ফল করে—এই শুধু তাহার কাজ। সরোজিনীকে হয়ত সে ভালবাসে। সেদিকেও প্রতিদান যদি এমনি উন্মুখ হইয়াই উঠিয়া থাকে ত তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিবে সে কোন্‌খানে। উভয়ের সমাজ যে বিভিন্ন। কালও তাহার বৃদ্ধ পিতার চিন্তিত গম্ভীর মুখ বারংবার মনে পড়িয়াছে, উপীনদাদাদের বাড়ির শুষ্ক ভট্টাচার্যের শুষ্কতর তীব্রস্বর সহস্রবার তাহার কানে আসিয়া বিঁধিয়াছে, পাড়ার শত্রু-মিত্র সমস্ত লোকের তীব্র শিরশ্চালন তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর বহুবার ধাক্কা মারিয়া গিয়াছে, তবুও এই বিরুদ্ধ জগতের সমস্ত লোকের সম্মিলিত 'না' 'না' রবের মাঝখানে শুধু কেবল নিঃশব্দ সরোজিনীর লজ্জাবনত মুখখানিই তাহাকে সবল রাখিতে পারিয়াছিল।

কিন্তু আজ আর কোন ভয় নাই। একদিনে অচিন্তনীয় উপায়ে সমস্ত গ্রন্থি সমস্ত দুশ্চিন্তার শান্তি হইল। বাঁচা গেল!

কথাটা নিজের মনে বলিয়াই সে চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সবাই ঠিক তেমনি নীরবে অধোবদনে বসিয়া আছে। সরোজিনীর মুখের দিকে সে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, প্রায় কিছুই দেখা গেল না। তখন তাঁহাকেই সম্বোধন করিয়া কহিল, তুমি—আপনি আমার সাবেক বাসায় একদিন যাঁর কাপড় শুকোতে দেখে এসেছিলেন, তাঁর নাম সাবিত্রী।

আমি ভেবেছিলুম, একদিন নিজেই সমস্ত কথা আপনাকে জানাব, কিন্তু কোনদিন সে সুযোগ হলো না, সে সাহসও ছিল না। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, জ্যোতিষবাবু, দোষ আমার। এ আমি প্রতিদিনই টের পাচ্ছিলাম, তাই, মনে আমার সুখ ছিল না। বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, অথচ, আমি কোন বিষয়ে কাউকে ঠকাই নি, ও-সব আমি জানিও নে। তবু বলবারও আমার কিছু নেই।

জ্যোতিষ মুখ তুলিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না।

সতীশ নিজেও বোধ করি যেন একটা কঠিন বাষ্পোচ্ছ্বাস সংবরণ করিয়া ফেলিল। কহিল, আমি চললাম। আমার একটা অনুরোধ, আমার কথা আলোচনা করে আপনারা মন খারাপ করবেন না। আমি কখনো কোন ছলে আর আপনাদের সুমুখে আসব না—আমাকে আপনারা ভুলে যাবেন। বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

জ্যোতিষ পার্শ্বে চাহিয়া সভয়ে দেখিল, সরোজিনীর মাথাটা একেবারে তাহার জানুর কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে!—ওরে, ও সরো, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে না উঠিতে সরোজিনীর শিথিল মুষ্টি চেয়ারের হাতল হইতে স্খলিত হইয়া সে নীচে কার্পেটের উপর মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। অভিমান ও অপমানের ক্রোধে জ্যোতিষের বুদ্ধি এমনি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, সতীশের বিদায়-পালাটা সরোজিনীর সাক্ষাতে ঘটিলে যে আঘাতটা তাহার কি কঠিন হইয়া বাজিবে এ হিসাবই তাহার মনে ছিল না।

তাই, অনেক শুশ্রূষার পর সরোজিনীর চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে সে যখন কাঁপিতে কাঁপিতে টলিতে টলিতে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন জ্যোতিষের মাথায় একেবারে বাজ ভাঙিয়া পড়িল।

ভগিনীকে শুধু যে সে প্রাণাধিক ভালবাসিত তাই নয়, তাহার সর্বরূপলাবণ্যবতী শিক্ষিতা ভগিনীর দৃপ্ত আত্মমর্যাদাজ্ঞানের উপরেও তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে যে এত ভালও বাসিতে পারে যে, এ-সব কিছুই কোনো কাজে লাগিবে না, সমস্ত জানিয়াও সে একটা চরিত্রহীন লম্পটের পরম অন্যায়ের পদতলে সমস্ত বিসর্জন দিয়া চেতনা হারাইয়া শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত লুটাইয়া পড়িবে, এ আশংকা সে কল্পনাও করে নাই। তাহার মুখের উপর বেদনার যে ছবি ফুটিয়া উঠিতে সে এইমাত্র স্বচক্ষে দেখিল, সে যে কত বড়, তাহা নিরূপণ করিবার শক্তি এবং অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না, তথাপি সে বহুক্ষণ পর্যন্ত অসাড়ের মত বসিয়া থাকিয়া শশাংকমোহনের প্রতি চাহিয়া কহিল, আপনি বোধ হয় আজ রাত্রের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরবেন?

শশাংক বলিল, না, তেমন কিছু জরুরী কাজ নেই সেখানে।

জ্যোতিষ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া উঠিয়া ভিতরে চলিয়া গেল এবং নিজের ঘরে গিয়া দোর দিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে ডিনারটা শশাংকমোহনকে একাই সমাধা করিতে হইল, কারণ, জ্যোতিষের একেবারেই সাড়া পাওয়া গেল না।

জগৎতারিণী একটি একটি করিয়া ছেলের মুখে সমস্ত শুনিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপরে বলিলেন, এ-সব আমারই পোড়া কপালের ফল, জ্যোতিষ। পরলোকগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া কহিলেন, নিজে ত সারা-জীবন এই নিয়ে জ্বলে-পুড়ে মলুম, বাকীটুকু ছেলে-মেয়েদের জন্যেই যদি না জ্বলতে হবে ত ষোল-আনা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে! বেশ বাবা, তোমাদের যাকে পছন্দ হয় তার সঙ্গেই বোনের বিয়ে দাও গে, আমি আর কথাটি ক'ব না।

আর একটি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, মন অন্তর্যামী—তাই হঠাৎ ওর আসা শুনেই সেদিন বুক আমার দমে গিয়েছিল জ্যোতিষ।

কিন্তু জ্যোতিষ কোন কথা কহিল না। সে মনে মনে বুঝিতেছিল যে ব্যাপারটা অত সহজ নহে। সুতরাং যাহা হইয়া গেছে, তাহা হইয়া গেছে বলিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিলেই চলিবে না, হয়ত বা একদিন এই চরিত্রহীনটাকেই নিজে গিয়া সাধিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

কাল সারাদিনের মধ্যে সে সরোজিনীকে একবার ঘরের বাহিরে পর্যন্ত আসিতে দেখে নাই, কিন্তু আজ বিকালে চা খাইতে বাহিরের ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল সরোজিনী ইতিপূর্বেই

আসিয়াছে এবং শশাংকমোহনের সংগে আস্তে আস্তে গল্প করিতেছে।

জ্যোতিষ কাছে আসিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল। যদিচ ভগিনীর শ্রীহীন মলিন মুখের পানে চাহিয়া তাহার বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না, তবুও বুকের উপর হইতে একটা ভারী পাথর নামিয়া গেল।

খাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত অনেক কথাবার্তা হইল, কিন্তু সেদিনের কেহই কোন ইংগিত করিল না। সন্ধ্যার পরে অনেকটা স্বচ্ছন্দচিত্ত ভগিনীকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া জ্যোতিষ মনে মনে কহিল, দুর্ঘটনাকে সে যত বড় ভাবিয়াছিল, তত বড় নয়। হয়ত বা অনতিকাল মধ্যেই আবার সমস্ত ঠিকঠাক হইয়া যাইবে, তাহার এমন আশাও হইল।

সেইদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুই বন্ধুতে আলাপ-আলোচনা চলিল। এমন কি জ্যোতিষ তাহার আশার কথাটাও ইংগিতে ব্যক্ত করিল। বস্তুতঃ সরোজিনী যে তাহার প্রথম ঝঞ্ঝাট সামলাইয়া লইবার পরেও সতীশের এতবড় ঘৃণিত আচরণের সংগে মনে মনে শশাংক-মোহনের তুলনা করিয়া দেখিবে না, ইহা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই উভয়ের বোধ হইল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পরে সরোজিনী তাহার উপরের শোবার ঘরের খোলা জানলার সামনে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া পথের পানে চাহিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ মনে হইল খানিক দূরে একখানা বোঝাই-দেওয়া গরুর গাড়ির পিছনে পিছনে যে দুটি লোক ছাতা মাথায় ধীরে ধীরে চলিয়াছে, তাহার একজন বেহারী। সরোজিনী সতর্ক হইয়া গরাদে ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি ক্রমশঃ তাহার জানালার কাছে আসিতে একটা লোক মুখ তুলিয়া উপর পানে চাহিতেই স্পষ্ট দেখা গেল সে বেহারী। সরোজিনী হাত নাড়িয়া আহ্বান করিতেই বেহারী তাহার সংগীকে অগ্রসর হইতে বলিয়া ছাতি মুড়িয়া জানালার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সরোজিনী কহিল, বেহারী, ঢুকেই বাঁ-হাতি সিঁড়ি। ওপরে এসো।

তখন বাড়ির সকলেই দিবানিদ্রায় সুপ্ত, বেহারী অনতিবিলম্বে সিঁড়ি দিয়া সরোজিনীর উপরের ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা জিহ্বায়, কণ্ঠে ও মস্তকে ধারণ করিল।

সরোজিনী মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া কহিল, তোমাদের গাড়ি ত সেই রাত্রি এগারটার পরে—এখনো তার ঢের সময় আছে। ঠাকুর সংগে আছে, সে জিনিসপত্র মুটে দিয়ে নামিয়ে রাখতে পারবে, তুমি একটু বসো।

জিজ্ঞাসা না করিয়াই বুঝিয়াছিল সতীশ এখানকার বাসা উঠাইয়া অন্যত্র চলিয়াছে।

বেহারী তাহার উড়ুনীর অঞ্চলে কপালের ঘাম মুছিয়া মেঝের উপর উপবেশন করিল।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সরোজিনী এইপ্রকারে ভূমিকা করিল; কহিল, আচ্ছা বেহারী, তুমি ত কখনো বামুনের মেয়ের কাছে মিথ্যা কথা বলো না।

বেহারী জিভ কাটিয়া কহিল, বাপ্ রে! তা হলে কি রক্ষে আছে দিদিমণি! সাতজন্ম কাশীবাস করলেও যে এ পাপের মোচন হবে না।

সরোজিনী স্নিগ্ধদৃষ্টিতে এই পল্লীবাসী ধর্মভীরু বৃদ্ধের মুখের পানে চাহিয়া স্নেহহাস্যে কহিল, সে ত জানি বেহারী, তুমি কখনো মিছে বলো না, কিন্তু আমি যা জিজ্ঞাসা করব, সে তুমি কারো কাছে বলতে পাবে না—তোমার মনিবের কাছেও না।

বেহারী কহিল, আমার দরকার কি দিদিমণি, কারো কাছে বলবার!

সরোজিনী একটুখানি মৌন থাকিয়া আসল কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সাবিত্রী মেয়েটি কে বেহারী?

বেহারী সরোজিনীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমার সাবিত্রী মায়ের কথা জিজ্ঞেসা কচ্চ দিদিমণি? জানিনে দিদিমণি, মা-জননী আমার কার শাপে পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে এত দুঃখ পাচ্চেন! আহা, মা যেন লক্ষ্মীর প্রতিমে!

অনেকদিন হইয়া গেল বেহারী সাবিত্রীর নামটা পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করিবার সুযোগ পায় নাই। তাহার কণ্ঠস্বর গদগদ এবং চোখের দৃষ্টি অশ্রুজলে ঝাপসা হইয়া উঠিল।

সাবিত্রীর উল্লেখমাত্রই বুড়োর এতখানি ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সরোজিনী আশ্চর্য হইয়া গেল।

বেহারী হাত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, মা আমার যেদিন রাখালবাবুর মেসে দাসীবৃত্তি করতে এলেন, তখন মানুষগুলো সব দেখে অবাক হয়ে গেল। মুখে যেন হাসিটি লেগেই রয়েছে। রাখালবাবু ম্যানেজার, আর আমি ত চাকর, কিন্তু মায়ের কাছে সবাই সমান—সবাইকে সমান যত্ন। একাদশীর দিন কাঠফাটা উপোস করেও কখনও মায়ের মুখ বেজার দেখিনি দিদিমণি।

বৃদ্ধ যেন সমস্ত হৃদয় দিয়া কথা কহিতেছিল। তাই এই তাহার অকৃত্রিম ভক্তি-উচ্ছ্বাসে সরোজিনী মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাহার বিদ্বেষের জ্বালাও যেন গলিয়া অর্ধেক ঝরিয়া পড়িল। বেহারী কহিতে লাগিল, দিদিমণি, শাস্তরে লেখা আছে, মা-লক্ষ্মী একবার কি যেন একটা অপরাধ করে নারায়ণের হুকুমে দাসী-বৃত্তি করেছিলেন, আমার মাও যেন ঠিক তেমনি কোন দোষে চাকরি করতে এসে নানান দুঃখ পেয়ে শেষকালে চলে গেলেন। যেদিন চলে গেলেন, সেদিনটা আমার বুকের মাঝে আজও যেন গাঁথা হয়ে আছে দিদিমণি!

সরোজিনী আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিল, তিনি এখন কোথায় আছেন বেহারী?

বেহারী এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিল না, মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সরোজিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, জান না বেহারী?

বেহারী এবার ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ঠিক জানিনে বটে, কিন্তু তবুও জানি। কিন্তু সে কথা জানাতে যে মায়ের মানা আছে দিদিমণি, আমি ত বলতে পারব না।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, মানা কেন?

মানা যে কেন, তাহা বেহারী নিজেও ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না। তথাপি এই নিষেধ চিরদিন মান্য করিয়া চলা, সে কেমন আছে জানিতে না পাওয়া, তাহাকে এ জীবনে আর একবার চক্ষে দেখিতে না পাওয়া, এ-সকল যে বেহারীর পক্ষে কত দুরূহ, তাহা সে শুধু নিজেই জানিত। বিশেষ করিয়া যখনই কোন কথাবার্তায় তাহার মায়ের বিরুদ্ধে সতীশের তীব্র কুৎসিত ইঙ্গিত প্রকাশ পাইত, তখন সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া ফেলিতে তাহার মনের মধ্যে আবেগের ঝড় বহিয়া যাইত, কিন্তু তবুও বুড়া আজ পর্যন্ত তাহার শপথ ভঙ্গ করে নাই। যদি কোনদিন অসহ্য হইয়াছে, তখনই সে এই কথাই স্মরণ করিয়াছে যে, সাবিত্রী যখন নিজে এতবড় কলঙ্ক নীরবে বহন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই ভিতরে এমন কিছু একটা আছে, যাহা তাহার বুদ্ধির অগোচর। সাবিত্রীর প্রতি তাহার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না।

কিন্তু, এখন আর একজন যখন সে কথা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন সমস্ত ব্যাপারটা বলিয়া ফেলিতে তাহার প্রাণটাও আকুলি-বিকুলি করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বলতে পারি দিদিমণি, তুমি যদি আমার বাবুকে না বল।

সরোজিনী মনে মনে ভারী আশ্চর্য হইল। বেহারী জানে অথচ সতীশ জানে না এবং তাহাকেই জানাইতে বিশেষ করিয়া সাবিত্রীর নিষেধ—ইহার কি কারণ সে ভাবিয়া পাইল না। কহিল, না বেহারী, আমি কাউকে বলব না, তুমি বল।

বেহারী মিনিট-দুই সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বোধ করি চিন্তা করিয়া দেখিল, ইহাতে অসত্যের পাপ তাহাকে স্পর্শ করিবে কিনা, তাহার পরে ধীরে ধীরে সমস্ত ইতিহাস সে একটি একটি করিয়া বিবৃত করিয়া বলিল।

সাবিত্রী যে সতীশকে প্রাণাধিক ভালবাসিত এবং এইজন্যই যে রাখালবাবু গায়ের জ্বালায় ঝগড়া করিয়া বাবুকে বাসা হইতে বিদায় লইতে বাধ্য করিয়াছিল এবং সতীশবাবু মাঝে মাঝে মদও খাইতেন, ইত্যাদি কোন কথাই সে গোপন করিল না।

সমস্তক্ষণ সরোজিনী মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া শুনিল! বোধ করি এমন একাগ্রচিত্তে, এত মনোযোগ দিয়া আর কেহ কখনও কাহারও কথা শুনে নাই। যে রাখালবাবুর কাছে শশাঙ্কমোহন খবর সংগ্রহ করিয়াছিলেন, দৈবাৎ সে লোকটির ইতিহাসও আজ সরোজিনীর অপরিজ্ঞাত রহিল না।

সাবিত্রীর কোথায় বাড়ি, কিংবা তাহার পিতৃকুল বা শ্বশুরকুলের পরিচয় কি, সকল সন্ধান বেহারী না দিতে পারিলেও সে যে ব্রাহ্মণের মেয়ে, বিধবা, সুরূপা, লেখাপড়া জানে—শুধু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় দাসীবৃত্তি করিতে আসিয়াছিল, এ কথা সে বার বার করিয়া কহিয়া বলিল. এত ত ভালবাসতেন, কিন্তু তবুও বাবু মাকে যেন বাঘের মত ভয় করতেন দিদিমণি! মদ খেয়ে বাসায় ঢোকবার পর্যন্ত তাঁর সাহস ছিল না। বিপিনবাবু বলে বাবুর একজন বজ্জাত বন্ধু ছিল, তার সঙ্গে মিশে গান-বাজনা করতে বাবু একটা কুস্থানে যাতায়াত করতেন, মায়ের কানে যাওয়ামাত্রই সেখানে যাওয়া তাঁর একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। এমন ক্ষমতা হলো না যে, আমার সাবিত্রী মাকে তুচ্ছ করে আর সেখানে যান! বলিয়া বেহারী সগর্বে সরোজিনীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

সতীশের উপর আর একজন নারীর এতবড় অধিকারের সংবাদ সরোজিনীর বুকে শেলের মত বিঁধিল, তথাপি সে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বেহারী, তাঁকে এত ভয় করবার সতীশবাবুর দরকার কি ছিল?

বেহারী যেমন বুঝিয়াছিল তেমনি বলিল, আমার মা যে ভয়ানক রাশভারী লোক ছিলেন দিদিমণি! শুধু আমাদের বাবুই নয়, বাসাসুদ্ধ লোক তাকে মনে মনে ভয় করত যে। একটা দিনের কথা বলি। সেদিন অনেক রাত্তিরে বাবু কোথা থেকে মদ খেয়ে আর একটা মদের বোতল সঙ্গে নিয়ে বাসায় ফিরলেন। ভেবেছিলেন অত রাত্তিরে সাবিত্রী মা নিশ্চয়ই তার বাসায় চলে গেছে। আমি জেগে ছিলাম, দোর খুলে দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন, সাবিত্রী চলে গেছে না বেহারী? বললাম, না বাবু, আজ তিনি যাননি—এখানেই আছেন। যাই শোনা, অমনি মদের বোতল রাস্তায় ফেলে দিয়ে আস্তে আস্তে চোরের মত বাসায় ঢুকলেন। ভয়ে নেশাটেশা চোখের পলকে উবে গেল। বল ত দিদিমণি, তিনি ছাড়া বাবুকে কি আর কেউ কোনদিন শাসন করতে পারবে!

সরোজিনী নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কহিল, সতীশবাবু কি এখনো মদ খান বেহারী?

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না। কিন্তু আবার শুরু করতে কতক্ষণ দিদিমণি? তাইতে ত আজ দুদিন ধরে কেবলি ভাবচি এই দুঃসময়ে আমার সাবিত্রী মা যদি একবার আসতেন।

সরোজিনী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন বেহারী?

বেহারী কহিল, আমি বরাবর দেখি, বাবু মন খারাপ হলেই মদ খেতে আরম্ভ করেন। এক উপীনবাবুকে ভয় করেন, তা তাঁর সঙ্গেও কি জানি কি হয়ে গেছে। সে রাত্রিতে তিনি বাসায় উঠে হঠাৎ সাবিত্রী মাকে চোখে দেখতে পেয়েই সেই যে চলে গেলেন, তার পর থেকে কেউ আর কারও নাম করেন না। তবে বল দিকি দিদিমণি, মা ছাড়া বাবুকে আর কে সামলাতে পারে?

একটুখানি থামিয়া বলিতে লাগিল, অসুখের খবর পাওয়া পর্যন্ত এই পাঁচ-ছ'টা দিন বাবুর যে কি করে কেটেচে, সে তো আমি চোখের ওপরেই দেখলুম। পরশু ঘুম থেকে উঠে তারের খবর পেয়ে সেই যে মুখ থুবড়ে পড়লেন, সারাদিন আর উঠলেন না। তার পরে রাত্তিরের গাড়িতে বাড়ি চলে গেলেন। আমাক শুধু এই কথাটি বলে গেলেন, বেহারী, তোরা সব নিয়ে-থুয়ে বাড়ি চলে আয়।

সরোজিনী ব্যগ্র হইয়া কহিল, কার অসুখ বেহারী?

বেহারী আশ্চর্য হইয়া কহিল, যাবার পথে বাবু তোমাদের বলে যাননি দিদিমণি?

সরোজিনী মাথা-নাড়িয়া বলিল, না। কার অসুখ?

বেহারী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা হলে মনের ভুলে অমনি সোজা চলে গেছেন, এ বাড়িতে ঢোকেন নি। যেদিন সকালে এখানে নেমন্তন্ন খেতে আসবেন, সেইদিনই চিঠি এলো বুড়োবাবুর অসুখ। তাই আর খেতে আসতে পারলেন না। টেলিগ্রাফ করে নিজেই সারাদিন পোস্টাফিসে দাঁড়িয়ে কাটালেন। কিন্তু কোন খবর এলো না। তার পরে পরশু সকালে একেবারে শেষ খবর এলো। রাত্তিরের গাড়িতে বাবু বাড়ি চলে গেলেন।

সরোজিনী চমকিয়া উঠিল, সতীশবাবুর বাবা মারা গেলেন?

বেহারী বলিল, হাঁ দিদিমণি।

কি হয়েছিল?

অনেক বয়স হয়েছিল, শুধু একটা উপলক্ষ করে প্রাণটা বেরিয়ে গেল, বলিয়া বেহারী আর্দ্রচক্ষু মার্জনা করিয়া কহিল, অন্য কিছুর জন্যে দুঃখ করিনে, কিন্তু, এই বুড়োটা ছাড়া বাবুর আপনার বলতে আর কেউ রইল না। তাই এই দুটো দিন এই শুধু ভাবচি, এখন থেকে কি যে করতে থাকবেন, তা মা দুর্গাই জানেন। বলিয়া বৃদ্ধ চাদরের প্রান্তে তাহার সিক্ত চোখ দুটো একবার ভাল করিয়া মুছিয়া লইল।

সরোজিনীর নিজের চোখেও জল আসিয়া পড়িতে লাগিল। কহিল, এবার থেকে সতীশবাবু ভাল হয়েও যেতে পারেন। মন্দই যে হবেন, এ ভয় তোমার কেন হচ্চে বেহারী?

বেহারী অন্যমনস্কের মত বলিল, কি জানি! তার পরে মুখ তুলিয়া কহিল, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক দিদিমণি, বাবু ভালই হোন—আর যেন সেদিকে মতিগতি না হয়। কিন্তু যাবার সময় গাড়িতে উঠে নাকি বললেন, যাক, এক রকমে বাঁচা গেল বেহারী, সংসারে আর কারো জন্যে ভাবনা-চিন্তে করতে হবে না। তোমাকে সত্যি বলচি দিদিমণি, সেই থেকে যখনই মনে পড়চে তখনই বুকের ভিতর হুহু করে উঠচে। হাতে কত টাকাই ত এবার পড়বে—সঙ্গী-সাথীও বাবুর সব ভাল নয়—মন্দ পথে গেলে এখন কে ঠেকাবে? শুধু পারে আমার মা। বলিয়া বেহারী অজ্ঞাতসারে আর একবার তাহার শ্রোতার বক্ষে তপ্ত শেল হানিয়া হাত-দুটা জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

সরোজিনী আঘাত সহ্য করিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, বেশ ত বেহারী, তাঁকেই কেন আসতে চিঠি লিখে দাও না?

বেহারী বলিল, ঠিকানা ত জানিনে। নিজে যদি একবার কাশী যেতে পারতাম, যেমন করে হোক খুঁজে-পেতে ফিরিয়ে আনতে পারতাম, কিন্তু আমার ত সে জো নেই; বাবুকে একলা ফেলে রেখে যেতেও ত মন সরে না। তা ছাড়া, আমি ত কখনো কাশী যাইনি,—সে দেশ ত চিনিনে, বলিয়া সে নিরুপায়ের মত সরোজিনীর মুখের প্রতি চাহিল। স্পষ্ট বুঝা গেল সতীশের এই পরম হিতৈষী বৃদ্ধ ভৃত্য প্রভুর অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তাহার কাছে নীরবে আশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু সরোজিনী তাহাকে কোন ভরসাই দিল না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিল।

আজ তা হলে আসি দিদিমণি, বলিয়া বেহারী উঠিয়া আসিয়া পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল এবং পুনরায় পদধূলি গ্রহণ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই অকস্মাৎ ফিরিয়া আসিয়া হাতজোড় করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

কি বেহারী?

একটা কথা নিবেদন করব দিদিমণি?

সরোজিনী অনেক কষ্টে একটুখানি ম্লান হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, কি কথা?

বেহারী তেমনি যুক্তকরে করুণ-কণ্ঠে কহিল, আমি গোয়ালা চাষা, তাতে বুড়োমানুষ। কি বলতে যদি কি বলে ফেলি, অপরাধ নেবেন না?

সরোজিনীর চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িল। কিন্তু প্রাণপণে তাহা নিরোধ করিয়া ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

তাহার মুখের এই একটিমাত্র 'না' শব্দ শুনিয়াই বেহারীর যেন চমক ভাঙিয়া গেল। সে নিজেকে চাষা প্রভৃতি বলিয়া নিজের বুদ্ধিহীনতার সহস্র পরিচয় দিলেও সে আসলে নির্বোধ ছিল না। সুতরাং কেন যে সরোজিনী সাবিত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহাকে পথ হইতে ডাকিয়া আনিয়াছিল, কেন যে সে এমন গভীর মনোনিবেশপূর্বক তাহার কাহিনী শুনিতেছিল, সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে অকস্মাৎ সূর্যের আলোর মত নির্মল হইয়া উঠিল। এবং না জানিয়া সে যে তরুণীকে এতক্ষণ ধরিয়া বিঁধিয়া এত বেদনা দিয়াছে, সেজন্য তাহার মনস্তাপের অবধি রহিল না। তখন বেহারী নিরতিশয় করুণ-কণ্ঠে কহিল, আমি জানি তোমার কথা কখনো ঠেলতে পারবেন না—তুমিও ইচ্ছে করলে বাবুকে অসময়ে রক্ষে করতে পার। কিন্তু আমার মন বলে, তুমি যেন তাঁকে

ত্যাগ করেছ মা। বেহারী এই প্রথম সরোজিনীকে মাতৃ-সম্বোধন করিল। 'মা' বলিয়া কাজ আদায় করিবার ফন্দিটা বুড়া বেশ জানিত।

সরোজিনীর অশ্রু আর মানা মানিল না, দুই চক্ষু প্লাবিয়া বড় বড় ফোঁটা ঝরঝর করিয়া বুড়ার সাক্ষাতেই ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, না বেহারী, আমার দ্বারা কিছু হবে না—আমি আর তাঁর কোন কথায় নেই।

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মা বলে ডেকেচি, আমি তোমার ছেলের মত। দোষ-ঘাট তাঁর যাই হয়ে থাক, আমি ঘাট মানচি, বলিয়া বেহারী ঝুঁকিয়া পড়িয়া সরোজিনীর পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া বলিল, কিন্তু তুমি ত আমার বাবুকে চেনো? এই বিপদের দিনে অভিমান করে তাঁকে মেরে ফেলতে তোমাকে ত আমি কিছুতে দেব না মা!

সরোজিনীর নিদারুণ অভিমান গলিয়া গিয়া সতীশকে ক্ষমা করিবার জন্য একবার উন্মুখ হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুড়ার মুখের সাবিত্রীর সমস্ত প্রসঙ্গ মনে পড়িয়া তাহার বিগলিত চিত্ত চক্ষের পলকে পুনরায় শুকাইয়া কাঠ হইয়া উঠিল। সে ঘাড় নাড়িয়া শান্ত কঠোর-স্বরে কহিল, না বেহারী, তুমি ভয় করো না, সাবিত্রী এসে পড়লেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু, আমাকে দিয়ে তোমাদের কোন উপকার হবে না।

এই নিষ্ঠুর প্রত্যুত্তরের জন্য বেহারী একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাহার নিজের সর্বজয়ী ভালবাসার কাছে এই শুষ্ক কণ্ঠস্বর এমন কঠিন হইয়া বাজিল যে, সে কিছু-ক্ষণের জন্য বিহ্বলের মত শুধু চাহিয়া রহিল। তার পরে আর একটি কথাও না বলিয়া আর একবার প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

ঊনচাল্লিশ

যক্ষ্মারোগগ্রস্ত স্ত্রীকে লইয়া উপেন্দ্র মাস পাঁচ-ছয় নৈনিতালে বাস করিয়া মাত্র কয়েকদিন হইল বক্সারে ফিরিয়া আসিয়াছে। এটা সুরবালার শেষ ইচ্ছা। সেদিন, সন্ধ্যার পর স্নিগ্ধ দীপালোকের পানে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া এই পরলোকের যাত্রীটি ধীরে ধীরে স্বামীর হাতের উপর ডান হাতটি রাখিয়া বলিল, তোমার কথায় আর কখনো কোনদিন সন্দেহ হয় না। আজ আমাকে একটি কথা সত্যি করে বলবে? ভুলোবে না বল?

উপেন্দ্র মুমূর্ষু স্ত্রীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, কি কথা পশু?

সুরবালা মুহূর্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, তোমাকে আমি আবার পাব ত?

উপেন্দ্র স্ত্রীর কপালের উপর হইতে রুক্ষ চুলগুলি সরাইয়া দিয়া শান্ত দৃঢ়স্বরে কহিল, পাবে বৈ কি!

আচ্ছা, কতদিনে পাব? আমি ত শিগগিরই চললুম, কিন্তু ততদিন কোথায় তোমার জন্যে বসে থাকব?

স্বর্গে থাকবে। সেখানে থেকে আমাকে সর্বদাই দেখতে পাবে।

কিন্তু, একলাটি কেমন করে থাকব আমি? আচ্ছা, ডাক্তারে সবাই জবাব দিয়ে দিয়েছে? এমন কোন ওষুধ নেই যাতে আমি বাঁচি? আমি গেলে তোমার হয়ত কত কষ্টই হবে।

একফোঁটা চোখের জল উপেন্দ্র কোনমতেই সামলাইতে পারিল না—টপ করিয়া সুরবালার কপালের উপর ঝরিয়া পড়িল।

সমস্ত হৃদয়টা তাহার মথিত করিয়া নালিশ ধ্বনিয়া উঠিল, ভগবান! স্বামীর বুকে এতবড় ভালবাসাই শুধু দিলে, কিন্তু এতটুকু শক্তি দিলে না যে, স্নেহাস্পদটিকে সে একটা দিনও বেশি ধরিয়া রাখে।

সুরবালা শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া স্বামীর চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, তোমার কান্না আমি সইতে পারিনে,—আমার আর একটি কথা রাখবে?

উপেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, রাখব।

সুরবালা কহিল, তা হলে আমার ছোটবোন শচীর সঙ্গে ছোটঠাকুরপোর বিয়ে দিয়ো, আমি অনেকদিন তাঁকে দেখিনি, দু-চারদিনে পড়ার এমন কি ক্ষতি হবে,—একবার কলকাতা থেকে আসতে টেলিগ্রাফ করে দাও না।

উপেন্দ্রর বুকে আর একবার শেল বিঁধিল। দিবাকরকে সুরবালা যে কত ভালবাসিত তাহা সে জানিত। তথাপি তাহার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই। দিবাকরের চরম কীর্তি চিরদিনই সে পত্নীর কাছে গোপন রাখিয়াছিল, আজও তাহা প্রকাশ করিল না। টেলিগ্রাফ করিবার অনুরোধটা এড়াইয়া গিয়া কহিল, কিন্তু তার সঙ্গে শচীর বিয়ে দিতে প্রথমে ত তোমার মত ছিল না পশু! শুধু আমার মতেই শেষে মত দিয়েছিলে। এখন আমার নিজের মত বদলে গেছে, শচীর জন্যে ঢের ভাল সম্বন্ধ আমি ঠিক করে দেব, কিন্তু এ বিয়েতে কাজ নেই সুরো।

সুরবালা বলিল, না, সে হবে না। ছোটঠাকুরপোর সঙ্গেই শচীর বিয়ে দিয়ো।

উপেন্দ্র একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, কেন বল ত?

সুরবালা কহিল, তার মুখ দেখে তুমি কোনদিন আর আমাদের পর হতে পারবে না। তা ছাড়া, সে বাড়িতে থাকলে তোমাকেও দেখতে পারবে।

উপেন্দ্র অন্যমনস্কের মত কহিল, আচ্ছা, যদি অসম্ভব না হয় দেব।

ইহার তিনদিন পরে খবর পাইয়া উপেন্দ্রের নিষেধসত্ত্বেও মহেশ্বরী আসিয়া পড়িলেন। সুরবালা তাঁহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া কহিল, আমি গেলে ওঁর ওপরে একটু দৃষ্টি রেখো দিদি। আমি ত জানি, উনি আর কখনো বিয়ে করবেন না, কিন্তু ভারী কষ্ট হবে। তোমরা সবাই ওঁকে দেখো, তোমাদের কাছে এই আমার শেষ মিনতি, বলিয়া তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহেশ্বরী তাহার বুকের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া একটা কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

এমনি করিয়া আরও চার-পাঁচদিন কাটিল, তাহার পরে একদিন সকালে স্বামীর কোলের উপর মাথা রাখিয়া, সমস্ত পাড়াটা শোকের সাগরে মগ্ন করিয়া দিয়া সতীসাধ্বী স্বর্গে চলিয়া গেল।

উপেন্দ্র শান্ত-স্থিরভাবে পত্নীর শেষ কর্তব্য সমাপন করিয়া মহেশ্বরীকে লইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। উপেন্দ্রর পিতা শিবপ্রসাদবাবু পুত্রের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন ছেলের মুখ দেখিয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। মনে মনে বলিলেন, না, যতটা ভয় পেয়েছিলাম সে-রকম নয়। এমন কি, তিনি অচিরভবিষ্যতে আর একটি টুকটুকে বধূ ঘরে আনিবার আশাও হৃদয়ে স্থান দিলেন। কিন্তু অন্তর্যামী বোধ করি অলক্ষ্যে থাকিয়া বৃদ্ধের জন্য সেদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

দিন-কয়েক পরেই উপেন্দ্রকে শামলা মাথায় দিয়া কোর্টে বাহির হইতে দেখিয়া শিবপ্রসাদ অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করিলেন। এমন কি, পুলকের আতিশয্যে পুত্রকে কিছু-ক্ষণের জন্য কাছে ডাকিয়া সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে অনেক হিত-কথা কহিয়া অবশেষে বলিলেন, উপীন, তোমাকে আর বোঝাব কি বাবা, তুমি নিজেই সমস্ত জানো, সমস্তই বোঝো! এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নয়—আজ যা আছে, কাল তা নেই, কাল যা আছে, আজ তা নেই—কেউ কারো নয়—সব মিছে, সমস্তই মায়ার খেলা! এই কথাটি সর্বদা মনে রেখো বাবা, কখনো আখের নষ্ট করো না। প্রাণপণে উন্নতি করবার এই ত সময়। কে কার? শাস্ত্রে আছে, চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি! অর্থাৎ কিনা, মান বল, সম্ভ্রম বল, সমস্তই হচ্ছে টাকা। টাকা রোজগারের ওপরেই সমস্ত নির্ভর। দেখ না, সতীশের বাবা কিরকম টাকাটা রেখে গেলেন বল দেখি? বলিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন। উপেন্দ্র আনত-মুখে নিঃশব্দে সমস্ত শুনিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া কাছারি চলিয়া গেল।

আদালতে সতীশের দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, তিনি এই দুর্ঘটনার জন্য অত্যন্ত

দুঃখ প্রকাশ করিয়া অবশেষে সতীশের কথা পাড়িলেন। উপেন্দ্রর ধারণা ছিল যে, সতীশ পিতার মৃত্যু হইতে বাড়িতেই আছে, কিন্তু এখন শুনিতে পাইল যে, সে বাড়িতেই আছে বটে, কিন্তু এখানের নহে, দেশের। টুনুবাবু সতীশের বৈমাত্রেয় বড় ভাই। কোনদিন তাহাকে সুনজরে দেখেন নাই—এক বাড়িতে বাস করিয়াও কখনো তাহার একটা সংবাদ পর্যন্ত রাখার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ সতীশের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেও অন্যায় হয় না। পিতার মৃত্যুতে অর্ধেক শরিক হইয়া সে দাদার আরও বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছে। বলিলেন, এর মধ্যেই প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা খরচ করে মস্ত দুই ডিস্‌পেনসারী খুলেচে, এক শ' টাকা মাইনে দিয়ে এক ডাক্তার এনেচে, তা ছাড়া বাড়িটাকে পর্যন্ত হাসপাতাল করে তুলেচে।

উপেন্দ্র সহজভাবে বলিল, হাঁ, এ মতলব তার অনেকদিন থেকেই ছিল, শুধু টাকার অভাবেই এতদিন পারেনি বোধ করি।

টুনুবাবু শ্লেষ করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, সে তো আমিও বোধ করি হে উপীন। কিন্তু, শুধু ডিস্‌পেনসারি খোলার মতলবই ত তুমি জানতে, কিন্তু তার সাধন-ভজনের মতলবটা ত আর জানতে না ভায়া।

উপেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাধন-ভজন কি রকম?

টুনুবাবু বলিলেন, এই যেমন চক্র, কারণ, পঞ্চমকার ইত্যাদি। শুধু ফিলানথ্রপিস্ট নয় হে, 'সতীশস্বামী' এখন একজন উঁচুদরের সাধক। গেরুয়া বসন, বড় বড় চুল-দাড়ি, রুদ্রাক্ষ-মালা, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা—সদাই ঘূর্ণিত লোচন! তার একটা সই নেবার জন্যে রাসবিহারীকে পাঠিয়েছিলাম, সে ত ভয়ে দু'দিন কাছেই ঘেঁষতে পারেনি—আর এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, তার চাকর বেহারী আমাকে লিখে পাঠিয়েচে--জবাব দেওয়া এখনো হয়নি, তাই পকেটে পকেটেই ঘুরচে, বলিয়া তিনি একখানা হলদে রঙের ভাঁজকরা কাগজ বাহির করিয়া উপেন্দ্রর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন।

নিরুপায় বেহারী সতীশের অগ্রজের কাছে উপায় ভিক্ষা করিয়া এই পত্রখানি পাঠাইয়াছে। খুব সম্ভব, সে গ্রামের কোন অজ্ঞ বালককে ধরিয়া পত্রখানি লিখাইয়া লইয়াছে। আগাগোড়া চিঠিখানি পড়া গেল না বটে, কিন্তু যতটুকু গেল, ততটুকু উপেন্দ্রকে বহুক্ষণের নিমিত্ত স্তম্ভিত করিয়া রাখিল।

তাহার আবাল্যসুহৃদ, তাহার ডান হাত, তাহার ছোট ভাই—সেই সতীশ আজ অধঃপাতের এতই নিম্নস্তরে নামিয়া গিয়াছে যে, গ্রামের মধ্যে প্রকাশ্যে এই-সমস্ত বীভৎস কীর্তি করিয়া বেড়াইতে লজ্জাবোধ ত করেই না, বরঞ্চ ধর্মসাধন করিতেছে মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে। হয়ত সেই কুলটা দাসীটাও সঙ্গে যোগ দিয়াছে। তা ছাড়া, বেহারীর পত্রের ভাবে ইহাও বুঝা যায় যে, গ্রামের নিষ্কর্মা কয়েকজন লোকও তাহার সঙ্গী জুটিয়াছে।

অন্যমনস্ক হইয়া উপেন্দ্র চিঠিখানি পকেটে পুরিয়া আদালত হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল, টুনুবাবুকে ফিরাইয়া দিবার কথা তাহার মনে পড়িল না।

বেহারী পত্রখানি ডাকে ফেলিয়া দিয়া প্রথম কয়েকদিন স্বয়ং টুনুবাবুর প্রত্যাশা করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল, পরে একখানি উত্তরের জন্য অধীর হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল, কিন্তু দিনের পর দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, না আসিলেন বড়বাবু, না আসিল তাঁহার একখণ্ড জবাব।

বিশেষ করিয়া 'থাকোবাবা'র দৌরাত্ম্যেই বেহারী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী, সিদ্ধ-পুরুষ। সতীশের মন্ত্র-গুরু। অষ্টপ্রহর মদ ও গাঁজায় মেজাজ দুর্বাসা অপেক্ষাও তীক্ষ্ন। মুখ এত খারাপ যে, শুধু রাগের উপর নয়, তাঁহার বহাল-তবিয়তের আলাপেও কানে আঙুল দিতে হয়।

কিন্তু ইহাই নাকি তান্ত্রিক সিদ্ধ-সাধুর একটা লক্ষণ। তা ছাড়া সতীশের গুরু যে! বেহারীর নিজের তরফ হইতেও ইহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা অল্প ছিল না; কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সতীশের কোনরূপ অনিষ্টের গন্ধ পাইলেও বেহারী হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিত।

'গুরুবাবা'র শিক্ষকতায় সতীশ ও তাহার দলের নিশীথের নিভৃত চক্রসাধনা ও অতোধিক নিভৃত আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি এতদিন বেহারী কোনমতে সহিয়াছিল, কিন্তু যেদিন দিনের বেলা সতীশ মদ ও গাঁজা 'বাবা'র প্রসাদ পাইল, সে দৃশ্য এই ভৃত্য কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। সতীশের অবর্তমানে সে গুরুবাবার ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া জোড়হাতে ভক্তিভরে কহিল, বাবা, আপনি দিনের বেলায় আর বাবুকে গাঁজা মদ খাওয়াবেন না।

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। 'বাবা' একমুহূর্তেই সপ্তমে চড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তুই শালা মদ বলিস!

বেহারী বিনীত স্বরে কহিল, কি জানি, আমাদের দেশে ত ওরে মদই কয়।

'বাবা' বলিলেন, মদ! কিন্তু তোর শালার কি? তুই বলবার কে?

বেহারীও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, সেও দৃঢ়স্বরে বলিল, আমি বাবুর চাকর।

ওরে আমার চাকর! বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই 'বাবা' একটা অশ্রাব্য গালাগালি দিয়া দাঁত খিঁচাইয়া কহিয়া উঠিলেন, কিন্তু আমি তোর বাবুর বাবা, তা জানিস!

বেহারী বসিয়া ছিল, তড়াক করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া চেঁচাইয়া বলিল, খবরদার! আমার সামনে ও-সব তুমি বলো না, তা বলে দিচ্চি!

থাকোবাবার এমনিই ত দিবারাত্রির মধ্যে সহজ-চৈতন্য প্রায়ই থাকে না, বেহারীর তিরস্কারে একেবারে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। কি করবি রে শালা! বলিয়া সুমুখের খড়মটা তুলিয়া লইয়া বেহারীর মাথা লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিলেন।

নাক দিয়া বেহারীর ঝরঝর করিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িল, এবং একমুহূর্তেই তাহার হৃদয়ের কোন্ এক অজ্ঞাত স্থান হইতে চল্লিশ বৎসর পূর্বেকার গরম রক্ত একেবারে মগজে চড়িয়া গেল। সে ঘরের কোণ হইতে 'বাবা'র চারি হাত দীর্ঘ লোহার ত্রিশূল চক্ষের নিমেষে টানিয়া লইয়া 'বাবা'র মাথার উপর উদ্যত করিয়া ধরিল। ভয়ে দুই হাত সুমুখে তুলিয়া 'বাবা' কুকুরের মত চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং সেই অমানুষিক চীৎকারে বেহারীর নিজেরও চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে হাতের ত্রিশূলটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া নাকের রক্ত মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি?

বেহারী বলিল, হাঁ। কিন্তু, সে নিজের রক্তপাতের উল্লেখ করিল না।

সতীশ পলকমাত্র স্থির থাকিয়া বলিল, তোকে এ-বাড়িতে থাকতে দিতে আর পারব না। কিন্তু তোকে জবাবও দেব না। শ'-দুই টাকা নিয়ে তুই বাড়ি যা, তোর মাইনে আমি মাসে মাসে তোর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।

বেহারী নতমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, যে আজ্ঞে।

সে ক্ষোভ প্রকাশ করিল না, ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল না, দুই শত টাকা উত্তরীয়প্রান্তে বাঁধিয়া লইয়া প্রভুর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সন্ধ্যার পূর্বেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সতীশ উপরের বারান্দা হইতে যতক্ষণ দেখা গেল তাহার পানে চাহিয়া রহিল। ক্রমে বিধু পালের দোকানের আড়ালে তাহার দেহটা যখন অদৃশ্য হইল তখন শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক—এতদিনে বেহারীটাও গেল!

এবার আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই মহামায়ার পূজা। এখন তাহার দেরি ছিল, কিন্তু সতীশের বন্ধু-মহলে ইহারই মধ্যে আলোচনা উঠিয়াছে, এবার মায়ের কি কি করা চাই। মহাষ্টমীর জন্য এখন হইতেই যে প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু ভাদ্রের মাঝামাঝি ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল; এমন কি, দুই-চারিটি সান্নিপাতিক জ্বরের জন্যও ডাক্তারবাবুর হাঁটাহাঁটি আরম্ভ হইয়া গেল।

আজ কয়দিন হইতেই সতীশের দেহটা তেমন ভাল বোধ হইতেছিল না। বেহারী যেদিন চলিয়া গেল সে রাত্রে জ্বরের লক্ষণ স্পষ্ট অনুভব করিল। হয়ত একাদশীর জন্য

হইয়া থাকিবে বলিয়া সে পরদিন সকালে উড়াইয়া দিতে গেল, কিন্তু যাহা বাস্তব, যাহার ভার আছে, তাহাকে অত সহজে উড়ানো চলে না। সমস্তদিন ধরিয়া তাহাকে মানিতেই হইল যে, তাহার দেহ সুস্থ নয়।

তিনদিন পরে, পূর্বপ্রথামত আজিকার চতুর্দশী রাত্রিতেও ঘটা করিয়া পূজার আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু সতীশ স্বয়ং যোগ দিতে এবার অস্বীকার করিল। অপরাহ্ন-বেলায় গুরুবাবা আসিয়া সতীশের মাথায় শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়া কমণ্ডলু দেখাইয়া হাস্যপূর্বক কহিলেন, বাবা, এর ওপর ত যমের অধিকার নেই। তা ছাড়া, তুমি যে মূলাধার, তুমি না থাকলে যে সব পণ্ড।

গুরুজীর কথা সতীশ অগ্রাহ্য করিত না, তাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রাজী হইল। বস্তুতঃ, বেহারীকে বিদায় করার পর হইতে সমস্ত কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া এ-সব তাহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। যদিচ, কোনমতেই তাহার বিশ্বাস হয় না যে, বেহারী একেবারে চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না, তথাপি যত শীঘ্র হয় তাহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য প্রাণ তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তা ছাড়া, আরও একটা চিন্তা তাহাকে ভিতরে ভিতরে যাতনা দিতেছিল। কি জানি, বেহারী নিজের বাড়িতেই গেছে, কিংবা তাহাদের পশ্চিমের বাড়িতেই গেছে; গিয়া সমস্ত ব্যাপার প্রচার করিয়া কি একটা বিশ্রী কাণ্ড বাধাইবার চেষ্টায় আছে, কিংবা, আর কোন মতলব করিতেছে। যাই হোক, তাহাকে আবার চোখে না দেখা পর্যন্ত সতীশ কিছুতেই সুস্থির হইতে পারিতেছিল না।

সন্ধ্যার পূর্বেই দ্বিতলের ঘরটিতে সমবেত হইয়া দুই-এক পাত্র সেবন করার পরে সতীশের সেই নির্জীব ভাবটা কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, তবুও অন্তরে পীড়ার গ্লানি তাহাকে ভিতরে ভিতরে পীড়াই দিতেছিল। ঠিক এমনিই সময়ে পাশের ঘরে অকস্মাৎ বেহারীর গলা শুনিতে পাইয়া সতীশ পুলকিত-বিস্ময়ে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

হাঁক দিয়া ডাকিল, বেহারী নাকি রে?

বেহারী দ্বারের কাছে আসিয়া সসম্ভ্রমে সাড়া দিল, আজ্ঞে!

'গুরুবাবা'র মুখ কালি হইয়া গেল। কহিলেন, এ ব্যাটা আবার ফিরে এলো নাকি বাবা? শালা ও-ঘরে ঢুকেছে কেন!

এই ঘরেই তাঁদের নিশীথ-চক্রের আয়োজন চলিতেছিল।

সতীশ এ-সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বেহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই বাড়ি গিয়েছিলি নাকি রে?

বেহারী কহিল, আজ্ঞে না, আমি কাশী গিয়েছিলুম।

কাশী? কাশীতে কেন?

মাকে আনতে।

সতীশ চমকিয়া উঠিল। বেহারী কাহাকে যে 'মা' বলে সতীশ তাহা জানিত। কহিল, সে কাশীতে থাকে নাকি?

আজ্ঞে, হাঁ।

তুই তার ঠিকানা জানতিস?

বেহারী কহিল, না। কিন্তু, আমি জানতুম, মা যেখানেই থাকুন, বাবার মন্দিরে একদিন দেখা হবেই।

দেখা হয়েছিল?

আজ্ঞে হাঁ।

সতীশের বুকের ভিতরটায় তোলপাড় করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, কিন্তু আমাকে না জানিয়ে সেখানে যাওয়া তোর ভাল কাজ হয়নি। তাদের মান-সম্ভ্রম লজ্জা-শরমের জ্ঞান নেই,—তোকে আহাম্মক পেয়ে তোর সঙ্গে যদি চলেই আসত, আজ তা হলে তুই কি বিপদেই পড়তিস বল্ ত?

বেহারী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সতীশ তখন নিজেই আবার কহিতে লাগিল, বাড়ি ঢুকতে ত দিতাম না,—ফটকের

বাইরে থেকেই দরোয়ান দিয়ে দূর করে দিতাম। তাকে নিয়ে এই রাত্রে তুই কি মুশকিলে পড়ে যেতিস ভেবে দেখ্ দেখি? সাধে কি আর লোকে তোদের ভেমো-গয়লা বলে রে! আচ্ছা যা, খাওয়া-দাওয়া কর গে যা। কালীচরণ, বেশ একটু বড় করে একপাত্র দাও ত ভাই।

হুকুমমাত্র কালীচরণ একপাত্র 'কারণ' মূলে সাধকের হাতে তুলিয়া দিল।

বেহারী মৃদুকণ্ঠে কহিল, বাবু, মা একবার আপনাকে ডাকচেন!

সতীশ পাত্র মুখে তুলিতে যাইতেছিল, চমকিয়া কহিল, কে ডাকচেন বললি?

বেহারী বলিল, মা।

সতীশ হতবুদ্ধির মত হাতের পাত্রটা পিকদানিতে উপুড় করিয়া দিয়া কহিল, তোর সঙ্গে এসেচে? তা আগে বললি নে কেন?

বেহারী তাহার জবাব না দিয়া পুনরায় কহিল, তিনি এখুনি একবার ডাকচেন।

সতীশ গলা একটু খাটো করিয়া বলিল, তুই বল্ গে বেহারী, যে, বাবুর জ্বর হয়েচে, তাই বাইরের জন-কয়েক বন্ধু তাঁকে দেখতে এসেছেন। আধ-ঘণ্টা পরে যাচ্চি, বল্ গে যা।

বেহারী তাহার হাতের পাশের দরজাটা চোখের ইঙ্গিতে নির্দেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, মা এই যে দাঁড়িয়ে রয়েচেন, একবার বেরিয়ে আসুন।

সতীশ চকিত হইয়া নিঃশব্দে অঙ্গুলি-সংকেতে প্রশ্ন করিল, এই ঘরে?

বেহারী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, হাঁ, এই যে।

সতীশ চট করিয়া গোটা-দুই লবঙ্গ এলাচ মুখে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া দেখিল তাহার পাশের দরজার অন্তরালেই সাবিত্রীর অঞ্চল-প্রান্ত দেখা যাইতেছে! সে যে স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল বোকা বেহারীকে বেশ করিয়া দুই গালে চড়াইয়া দেয়।

সাবিত্রী উঁকি মারিয়া দেখিয়া চুপি চুপি কহিল, ঘরের ভিতরে এসো।

এই কণ্ঠস্বরের সুরে তাহার বুকের সমস্ত তারগুলো যেন বাঁধা ছিল,—সমস্ত এক সঙ্গে ঝমঝম করিয়া ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। সে ঘরে ঢুকিতেই সাবিত্রী কহিল, জ্বর হয়েচে বলছিলে যে?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, জ্বর হয়েচে ত।

কৈ দেখি? বলিয়া সতীশের কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া সতীশের কপালের উত্তাপ অনুভব করিয়া চমকিয়া বলিল, হাঁ—সত্যিই জ্বর যে! গা যেন পুড়ে যাচ্চে,—এসো, আমি বিছানা করে দিচ্চি, ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বে চল। বেহারী, বাবুর ঘরে একটা আলো জেলে দেবে এসো, বলিযা সাবিত্রী তেতালার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। সে বাড়ি ঢুকিয়াই বাবুর শোবার ঘরটা বেহারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিল।

পালঙ্কের উপর শয্যা প্রস্তুত করাই ছিল, শুধু আঁচল দিয়া একবার ঝাড়িয়া দিতেই সতীশ শান্ত বালকের মত চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। শিয়রে এবং পায়ের দিকের জানালা দুটা বন্ধ করিয়া দিয়া বেহারীকে জিজ্ঞাসা করিল, সাধুটি থাকেন কোন্ ঘরে?

বেহারী পাশের ঘরটা দেখাইয়া দিলে সাবিত্রী কহিল, তাঁর কি কি আছে ওখানে নীচে দিয়ে এসো বেহারী। বাইরের এক সার ঘর ত অমনি পড়ে আছে—তার কোন একটাতে বেশ থাকতে পারবেন তিনি। বেহারী চলিয়া যাইতেছিল, সাবিত্রী ডাকিয়া বলিয়া দিল, অমনি যাঁরা বাবুকে দেখতে এসেছিলেন, তাঁদেরও বাড়ি যেতে বলে দিয়ো। বলো, বাবুর জ্বর বেশী হয়েচে, আর নামতে পারবেন না।

সতীশ একটা কথাতেও কথা যোগ করিল না, মুখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

বেহারী বীর-দর্পভরে আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্থান করিতে সাবিত্রী বলিল, আর উঠো না যেন। আমি খাবার ব্যবস্থাটা ঠিক করে দিয়ে আসি। বলিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে চলিয়া গেল।

তাহার ভয় ছিল 'সাধুবাবা' বোধ হয় বিদ্রোহ করিবেন, তাই অলক্ষ্যে আসিয়া দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল।

পরক্ষণেই ওধারের দরজা দিয়া বেহারী প্রবেশ করিয়া জোর গলায় কহিল, মা বলে দিলেন, আপনারা বাড়ি যান। বাবুর জ্বর বেড়েচে, আজ আর তাঁর নামা চলবে না। 'খাকোবাবা'কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার জিনিসপত্তর ঠাকুর, নীচে নিবারণের ঘরের পাশের ঘরে রেখে দিতে মা হুকুম দিয়েচেন। তুমি সেইখানেই থাকবে।

'বাবা'র উগ্রতা প্রকাশ পাইল না। তিনি শান্তভাবে প্রশ্ন করিলেন, মা কে বেহারী?

বেহারী কটুকণ্ঠে জবাব দিল, সে খোঁজে তোমার দরকার কি ঠাকুর? যা বলচি তাই কর,—নীচে যাও। মনে মনে কহিল, কে তা টের পাবে। বিনি পয়সার মদ-গাঁজা খেয়ে খড়ম মারা তোমার কাল আমি বার করব।

সকলেই হতবুদ্ধির ন্যায় পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। কেহই বুঝিতে পারিল না বটে, কিন্তু আদেশ যখন সত্যকার আদেশরূপে অকুণ্ঠিত-স্বরে বাহির হইয়া আসে, তা সে যাহারই মুখ দিয়া আসুক, মানুষ কেমন করিয়া যেন নিশ্চয় অনুভব করিতে পারে ইহা অগ্রাহ্য করা চলিবে না।

বেহারী রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, সাবিত্রী বামুনঠাকুরকে দিয়া দুধ জ্বাল দিবার উদ্যোগ করিতেছিল। কহিল, রাত হয়ে গেল, তোমার ত এখনও পর্যন্ত স্নান-আহ্নিক হয়নি মা। সারাদিন গাড়িতে একফোঁটা জল পর্যন্ত খাওনি,—চল, আগে তোমাকে স্নানের জায়গা-টায়গাগুলো দেখিয়ে দিয়ে আসি, ততক্ষণে বাবুর দুধটুকু জ্বাল দেওয়া হয়ে যাবে এখন। বলিয়া সাবিত্রীকে একরকম জোর করিয়াই লইয়া গেল।

তাহাকে পাঠাইয়া দিয়া বেহারী বাবুর জন্য তামাক সাজিয়া গুড়গুড়িটি হাতে করিয়া নিঃশব্দে দ্বার ঠেলিয়া বাবুর ঘরে ঢুকিল। সতীশ চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, চোখ মেলিয়া কহিল, কে বেহারী?

হাঁ বাবু, তামাক সেজে এনেচি।

আয়। সে কোথায় রে?

বেহারী কহিল, এখন পর্যন্ত একফোঁটা জল মুখে যায়নি। তাই জোর করে চান করতে পাঠিয়ে দিয়ে তবে আসচি বাবু!

সতীশ কহিল, বেশ করেচিস। কিন্তু, তোকে আমি খুঁজছিলাম বেহারী।

বেহারী ব্যস্ত হইয়া উঠিল—কেন বাবু? দেহটা এখন কেমন আছেন?

সতীশ মাথা নাড়িয়া বলিল, ভাল নেই বেহারী। তোকে তাই আমি খুঁজছিলাম। দোরটায় খিল দিয়ে আমার কছে এসে একটু বস।

বেহারী দ্বার রুদ্ধ করিয়া শঙ্কিত-চিত্তে প্রভুর পায়ের কাছে আসিয়া মেঝের উপর উবু হইয়া বসিল।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বেহারী, তুই ফাঁড়া মানিস?

বেহারী সবিস্ময়ে কহিল, ফাঁড়া? ফাঁড়া মানিনে আবার? পাঁজিপুঁথির লেখা কখনো কি মিথ্যে হতে পারে বাবু?

সতীশ একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, এবার আমার একটা মস্ত ফাঁড়া আছে বেহারী!

বেহারী শিহরিয়া উঠিল; বলিল, না না, অমন কথা বলবেন না বাবু!

সতীশ নিজের মনে বার-দুই মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি টের পেয়েচি বেহারী, এই জ্বরই আমার শেষ জ্বর,—এবার আমি আর বাঁচব না।

চক্ষের পলকে বেহারী প্রভুর দুই পা চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, ও-কথা মুখে আনবেন না বাবু, আপনার সব আপদ-বালাই নিয়ে আমি যেন মরি, আমার পেরমাই নিয়ে আপনি বেঁচে থাকুন বাবু, আমরা সবাই তা হলে মরে যাব, একটি প্রাণীও বাঁচব না। বলিতে বলিতে বেহারী হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সতীশ গম্ভীর-মুখে বলিল, মরা-বাঁচার কথা ত বলা যায় না বেহারী, যদি না-ই বাঁচি, তোকে যা জিজ্ঞেসা করব, সত্যি কথা বলবি?

বেহারী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, এই আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করচি বাবু, একটি কথাও মিছে বলব না।

কিছুই লুকোবি নে বল্?

না বাবু, একটি কথাও গোপন করব না।

তখন সতীশ কহিল, আচ্ছা বস গে।

বেহারী চোখ মুছিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলে, সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, সাবিত্রীকে কোথায় পেলি বল্ দেখি?

ঐ যে বললুম কাশীতে।

সেখানে বিপিনবাবুর সঙ্গে তোর দেখা হলো?

বেহারী জিভ কাটিয়া ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, রাম! রাম! সে হারামজাদা আমাদের কে যে তার সঙ্গে দেখা হবে বাবু!

সতীশ কহিল, কিন্তু তুই যে নিজের চোখে তাকে ওর বিছানায়—

বেহারী দুই হাত তুলিয়া সতীশকে কথাটা শেষ করিতেও দিল না। সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া নিজের গালে মুখে ঠাস্-ঠাস্ করিয়া গোটাকতক সশব্দে চড় কশাইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, তার শাস্তি এই! এই! এই! তবু না জেনে বলেছিলুম বলেই এখনো পাঁচজনের কাছে মুখ বার করতে পারচি, না হলে এই জিভটা আমার এতদিন পচে খসে পড়ত।

সতীশ আশ্চর্য হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল, কি হলো রে তোর?

বেহারী লজ্জা পাইয়া তখন স্থির হইয়া বসিয়া একটি একটি করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল। এতটুকু বাড়াইল না, একবিন্দু গোপন করিল না। নিজে যাহা জানিত, মোক্ষদার কাছে, চক্রবর্তীর কাছে যাহা শুনিয়াছিল, সাবিত্রীর নিজের মুখ হইতে যাহা-কিছু জানিতে পারিয়াছিল, সমস্ত একে একে ব্যক্ত করিয়া কহিল।

সতীশ পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বেহারীর মুখেও আর কথা রহিল না।

বহুক্ষণ পরে সতীশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, এতদিন এ-সব কথা তবে বলিস নি কেন বেহারী?

বেহারী কহিল, কতদিন বলবার জন্যে আমার যেন বুক ফেটে যেত বাবু, কিন্তু কিছুতেই মুখ ফুটোতে পারতুম না।

কেন শুনি?

আমার সাবিত্রী-মায়ের মাথার দিব্যি দিয়ে নিষেধ ছিল বাবু।

সতীশ আবার একটুখানি মৌন থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, সে যেন হলো বেহারী, কিন্তু সেদিন রাত্রে সাবিত্রী নিজের মুখেই ত বলে গিয়েছিল সে বিপিন ছাড়া কাউকে চায় না,—তার সঙ্গেই সে চলে যাচ্চে। তার কি বল দেখি?

বেহারী বলিল, এই কথাটা আমি নিজেও বুঝতে পারিনে বাবু। তবু আমি নিশ্চয় জানি, এ মিথ্যে! মিথ্যে! একেবারে ঘোর মিথ্যে! এ যদি মিথ্যে না হয় ত আমার একটা ছেলেও যেন বাঁচে না বাবু। মায়ের যাবার সময় কেঁদে বললুম, কেন এ মিথ্যে কলঙ্কের ডালি নিজের মাথায় তুলে নিলে মা? তবু মা আমাকে প্রকাশ করবার হুকুম দিলেন না। আমায় নিজেও কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বেহারী, আমার মাথার দিব্যি রইল বাবা, বাবুকে এ-সব কথা তুমি বোলো না। তিনি আমাকে ঘেন্না করুন, আর কখনো মুখ না দেখুন, সেও আমার ঢের ভাল, তবু তাঁকে বলো না যে, আমি নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে চলে গেলুম। বলিয়া বেহারী সে-রাত্রের স্মৃতির বেদনায় ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু, প্রভুর চোখ দিয়াও যে হুহু করিয়া জল পড়িতেছিল, বৃদ্ধ ভৃত্য তাহা দেখিতেও পাইল না।

অনেকক্ষণ পরে সতীশ অলক্ষ্যে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তুই বুঝতে পারিস নি বেহারী, কিন্তু আমি বুঝেছি, কেন সে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছিল। কিন্তু মিথ্যের ত জয় হয় না বেহারী—

বাহির হইতে দ্বারে করাঘাত পড়িল—ও কি দোর বন্ধ করে ঘুমোলে নাকি গো? খিল খুলে দাও।

বেহারী প্রভুর মুখের পানে চাহিল, কিন্তু প্রভু নিরুত্তরে চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া পড়িলেন।

বাহির হইতে পুনরায় শব্দ আসিল—দোর খুলে দাও না, হাত পুড়ে গেল যে!

বেহারী উঠিয়া কবাট খুলিয়া নীরবে পাশ কাটাইয়া সরিয়া পড়িল।

চল্লিশ

এক বাটি গরম দুধ হাতে সাবিত্রী ঘরে ঢুকিয়া তাড়াতাড়ি সেটা পাশের টিপয়ের উপর নামাইয়া রাখিল। তাহার পরনে ধপধপে গরদের শাড়ি, সদ্যস্নাত সুদীর্ঘ সিক্ত কেশভার পিঠ ছাড়াইয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কয়েকটা চূর্ণকুন্তল মুখের উপর কপালের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সতীশ আড়চোখে চাহিয়া দেখিল। তাহার হঠাৎ মনে হইল, সাবিত্রীকে আজ যেন সে এই প্রথম দেখিল।

কিন্তু সে সতীশের আর্দ্র চক্ষু-পল্লব এই ক্ষীণ দীপালোকে দেখিতে পাইল না। একটুখানি সরিয়া কাছে আসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, দোর দিয়ে বসে প্রভু-ভৃত্যে কি পরামর্শ হচ্ছিল শুনি? বেহায়া আপদটাকে কি করে ফটকের বাইরে দূর করে দেওয়া যায়, এই না?

সতীশ সাড়া দিল না। পাছে কথা কহিলে কণ্ঠস্বরে ভিতরের দুর্বলতা ধরা পড়ে, এই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

সাবিত্রী বলিল, ছেলেবেলায় সেই বেড়ালের গলায় ঘণ্টা-বাঁধার গল্প পড়েচ ত? আমিও দেখতে চাই এ-ক্ষেত্রে ঘণ্টা বাঁধতে কে এগিয়ে আসে। তুমি নিজে, না তোমার ও সাধুজীটি!

তবুও সতীশ কথা বলিল না, যেমন চুপ করিয়া ছিল তেমনি রহিল।

একটা চৌকি টানিয়া লইয়া সাবিত্রী কাছে বসিল। কিন্তু এবার তাহার পরিহাস-তরল কণ্ঠস্বর গম্ভীর হইল। কহিল, তামাশা যাক, কাণ্ডটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার? উপীনদার সঙ্গে ঝগড়া করলে, শেষে কিনা সরোজিনীর সঙ্গে পর্যন্ত ঝগড়া করে চলে এলে! তা না হয় একদিন মিটে যাবে জানি, কিন্তু এ কি হচ্ছে? আমার গা-ছুঁয়ে দিব্যি করেছিলে মদ ছোঁবে না, তা মদ চুলোয় যাক, গাঁজা খেতে ধরেচ! তাও আবার সোজা করে নয়,—যত সমস্ত অভাগার দল জুটিয়ে, গেরুয়া কাপড় পরে যন্ত্র-মন্ত্রের ঢাক পিটে প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে খাওয়া চলেচে!

সাবিত্রীর মুখে সরোজিনীর উল্লেখে সতীশের গা জ্বলিয়া গেল। বেহারী যে কিছুই বলিতে বাকী রাখে নাই, তাহা সে বুঝিল। একবার তাহার ঠোঁটে আসিয়া পড়িল তোমার জন্যেই আমার সর্বনাশ—তুমিই আমার শনি! কিন্তু সে কথা চাপিয়া গিয়া শুধু ধীর-গম্ভীর গলায় সংক্ষেপে বলিল, বুক ফুলিয়ে মদ-গাঁজা খাওয়ার দোষ কি?

দোষ কি সে তুমি জানো না?

না।

আচ্ছা, তাও যদি না জানো, এটা ত জানো যে, আমার গা-ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলে খাবে না?

তুমি আমার কে যে, কবে জোর করে দিব্যি করিয়ে নিয়েচ বলে সে একটা মস্ত বাধা!

সাবিত্রী কোনমতে হাসি চাপিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, কেউ নয় আমি? একেবারেই কেউ নয়?

সতীশও ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তবে মদের গেলাস পিকদানিতে ঢেলে ফেলে এলাচ চিবোতে চিবোতে এসেছিলে কেন?

সে শুধু তুমি বকাবকি করবে এই ভয়ে।

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, তবু সাবিত্রী কেউ নয়। আচ্ছা, এখন একটু দুধ খেয়ে ঘুমোও। বলিয়া উঠিয়া গিয়া দুধের বাটিটা হাতে লইয়া সতীশের সুমুখে দাঁড়াইল। সতীশ আপত্তি করিল না, উঠিয়া বসিয়া সমস্ত দুধটুকু পান করিয়া শুইয়া পড়িল।

সাবিত্রী বাটিটা হাতে করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সতীশ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আহ্নিক সারা হয়েছে?

সাবিত্রী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, হাঁ।

কি খেলে?

এখনো খাইনি। এইবার গিয়ে যা হোক কিছু খাব।

শোবে কোথায়?

দেখি, ফটকের বাইরে কোথাও একটু জায়গা-টায়গা পাওয়া যায় কিনা! নইলে গাছতলায়। বলিয়া নিজেই একটু হাসিয়া কহিল, আচ্ছা, কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করতেও কি একটু কষ্ট হয় না? ধন্য তুমি! বলিয়া পরম স্নেহে সতীশের কপালের উপর হইতে চুলগুলি হাত দিয়া উপরে তুলিয়া দিতে গিয়া তাহার ললাটের উত্তাপ অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিল। বেহারী ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, মা, তোমার বিছানাটা—

সাবিত্রী পাশের ঘরটা হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই ঘরটাতেই আমার বিছানা হবে বেহারী, বাবুর জ্বরটা কিছু বেশী বোধ হচ্ছে—আমি এই পাশের ঘরেই শোবো। মাঝের দরজাটা খোলা থাকবে—তোমাকেও আজ এই ঘরের মেঝেতেই শুতে হবে। সতীশকে কহিল, আর রাত জেগো না, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর, বলিয়া ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

অল্পকাল পরে সামান্য কিছু আহার করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে পাশের ঘরেই একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল এবং ক্লান্ত চক্ষু-দুটি তাহার দেখিতে দেখিতে গভীর নিদ্রায় মুদ্রিত হইয়া গেল।

অতি প্রত্যুষেই ঘুম ভাঙ্গিতে সাবিত্রী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া এ ঘরে আসিয়া দেখিল, শয্যার উপর সতীশ যাতনায় ছটফট করিতেছে। কপালে হাত দিয়া দেখিল উত্তাপে পুড়িয়া যাইতেছে। তাহার শীতলস্পর্শে সতীশ চোখ মেলিল—দু'চক্ষু জবাফুলের মত রাঙ্গা।

জ্বরের অবস্থা দেখিয়া সাবিত্রী ভয়ে সেই শয্যার উপরেই ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করে তাহার এ ক্ষমতা রহিল না।

সতীশ তাহার হাতটা টানিয়া লইয়া নিজের তপ্ত ললাটের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমি কালকেই টের পেয়েছিলাম। কালই আমি বেহারীকে বলেছি—এই জ্বর আমার শেষ জ্বর—এবার আমি আর বাঁচব না।

জ্বরের তীব্র যাতনায় সে এমন করিয়া হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া এই কথাগুলি কহিল যে, সাবিত্রী তাহাকে সান্ত্বনা দিবে কি, অদম্য কান্নায় তাহার নিজেরই কণ্ঠরোধ হইয়া গেল; এবং সমস্ত রাত্রি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়াছে বলিয়া অনুশোচনায় তাহার নিজের মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

সতীশ কহিল, আমার একটা সাহস যে তুমি আমার কাছে আছ, বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

আজ সে-ই তাহার সকলের বড় অবলম্বন, কাল রাত্রে যাহাকে সে অভিমানের স্পর্ধায় বলিয়াছিল, তুমি আমার কে!

কিন্তু ক্ষণকালের জন্য সাবিত্রীর এ সাধ্যটুকুও রহিল না যে, বেহারীকে ডাকিয়া ডাক্তার আনিতে বলে। শুধু সতীশের একটা উচ্ছ্রিত বাহুর উপর হাত রাখিয়া পাথরের মূর্তির মত বসিয়া রহিল।

ক্ষণেক পরেই সতীশ আবার এ-পাশে ফিরিল। আবার সাবিত্রীর হাতটা টানিয়া লইয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমিও ত কিছু কিছু ডাক্তারি পড়েচি, আমি নিশ্চয় জানি আমার এ জ্ঞান হয়ত ও-বেলা পর্যন্ত থাকবে না, কিন্তু এখনো আমার বেশ হুঁশ আছে। কিন্তু সে জ্ঞান যদি আর আমার ফিরে না আসে ত উপীনদাকে বলো, ওই দেরাজের মধ্যে আমার উইল আছে। সে আমার মুখ দেখবে না জানি, কিন্তু এও জানি, আমার মরণের পরে আমার শেষ ইচ্ছার সে অপমান করবে না। সাবিত্রী, সংসারে এক তুমি ছাড়া আর কেউ বোধ হয় তার চেয়ে আমার বেশী আপনার নেই।

উইলের উল্লেখ সাবিত্রীকে আত্মহারা করিয়া দিল, এবং এতকালের সংযমের বাঁধ আজ তাহার একমুহূর্তের আবেশে ভাঙিয়া পড়িল। সতীশের বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সে একেবারে ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া উঠিল।

বেহারী প্রায় সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র থাকিয়া ভোরবেলাটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সে চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল।

তখন সতীশ দুই হাত দিয়া জোর করিয়া সাবিত্রীর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সেই নিমীলিত অশ্রু-উৎস নিজের অগ্ন্যুত্তপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠাধরের উপরে টানিয়া নিঃশব্দে স্থির হইয়া রহিল।

তাহার মুখ, তাহার চিবুক, তাহার গলা সাবিত্রীর দুই চক্ষুর অশ্রুপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, এবং সে প্রবাহ যে তাহার প্রাণাধিকের রোগোৎপন্ন প্রবল প্রদাহকেও কতখানি ভিজাইয়া শীতল করিল, তাহা অন্তর্যামীর অগোচর রহিল না বটে; কিন্তু সংসারে ওই বৃদ্ধ বেহারীর বিস্ময়মুগ্ধ বিহ্বল চক্ষু ছাড়া তাহার আর দ্বিতীয় সাক্ষী রহিল না।

বাহিরে শরতের স্নিগ্ধ প্রভাত তখন দিনের আলোকে ফুটিয়া উঠিতেছিল, সাবিত্রী আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া বসিল এবং আঁচলে নিজের চোখ মুছিয়া প্রিয়তমের মুখ হইতে সমস্ত অশ্রুচিহ্ন সযত্নে মুছিয়া লইল, উঠিয়া আসিয়া ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খুলিয়া দিতেই স্বর্ণাভ রৌদ্রকিরণে ঘর ভরিয়া গেল।

বেহারীর চোখ দিয়া তখন ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছিল, সাবিত্রী মুখের ভাবটা সামলাইয়া ফেলিয়া শান্ত সহজ-কণ্ঠে শুধু কহিল, ভয় কি বেহারী, আমি থাকতে ওঁর কোন ভয় নেই,—বাবু ভাল হয়ে যাবেন। আমি ততক্ষণ বাবুর কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে বিছানা বদলে দিই, তুমি গিয়ে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো গে, বলিয়া রোগশয্যায় পুনরায় ফিরিয়া গেল।

ডিস্পেন্সারির ডাক্তারবাবু আসিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সতীশকে পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, তাই ত! এ যে নিমোনিয়ার লক্ষণ দেখি। ভয় নেই, রোগ এখনও বাড়তে পারেনি।

ভরসা দিয়া, সান্ত্বনা দিয়া, ডাক্তারবাবু স্বহস্তে ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য নীচে চলিয়া গেলেন, সতীশ কষ্টে একটুখানি হাসিয়া সাবিত্রীর মুখের পানে চাহিয়া কহিল, ভয় আমি একতিল করিনে। বলিয়া বালিশের তলায় হাত দিয়া একটা চাবির গোছা বাহির করিয়া দেখাইয়া কহিল, এটা চিনতে পার সাবিত্রী? নিজে ইচ্ছে করে একদিন যাকে আঁচলে বেঁধেছিলে, আজ আমিই তাকে তোমার আঁচলে বেঁধে দিই, বলিয়া সাবিত্রীর অশ্রুসিক্ত আঁচলখানি টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার চাবির রিংটা বাঁধিয়া দিয়া, একটা শান্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

সাবিত্রীর প্রতি বেহারীর নির্ভরতার অন্ত ছিল না; তাহার কাছে সাহস পাইয়া সে প্রথমটা প্রফুল্ল হইল বটে, কিন্তু সে ত ছেলেমানুষ নহে, দিন-কয়েক পরে সে-ই সাবিত্রীর মুখের চেহারা দেখিয়া মনে মনে ভীত হইয়া উঠিল। সে লক্ষ্য করিয়া স্পষ্ট দেখিতেছিল, এই অসীম কর্মপটু সহিষ্ণু রমণীর শান্ত মুখের উপর একটা পাণ্ডুর ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে।

আট-দশদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় সে সাবিত্রীকে নিভৃতে পাইয়া সহজ-কণ্ঠে কহিল, মা, এই বুড়োকে ভুলিয়ে কি হবে? তোমার ওই কচি বুকে যা সহ্য হবে, এই এই বুড়ো হাড়ে কি সইবে না মা? তার চেয়ে আমাকে সব কথা খুলে বল, আমি দেখি যদি কিছু উপায় করতে পারি।

সাবিত্রী একটুখানি স্থির থাকিয়া বলিল, তোমাকে এখনো বলিনি বেহারী, কিন্তু তোমার নাম করে উপীনবাবুকে আজ সকালে আমি চিঠি লিখে দিয়েচি। দু'দিন অপেক্ষা করে দেখি, যদি তিনি না আসেন, তোমাকে নিজে একবার তাঁর কাছে যেতে হবে বেহারী।

বেহারী উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, আমাকে না বলে এ কাজ কেন করলে মা!

কেন বেহারী, তিনি কি আসবেন না?

বেহারী মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিল, তিনি আসতেও পারেন, কিন্তু আমাকে কেন একবার জানালে না মা?

কেন বেহারী?

বেহারী সঙ্কোচে চুপ করিয়া রহিল। কথাটা বলা দরকার। কিন্তু এই অত্যন্ত অপমানকর বাক্যটা তাহার মুখ দিয়া সহসা বাহির হইতে চাহিল না।

সাবিত্রী কহিল, এ-সময়ে তাঁর আসা যে নিতান্ত দরকার বেহারী?

বেহারী বহু কষ্টে সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিয়া উঠিল, সে ত জানি মা, কিন্তু তুমি কাছে না থাকলে পৃথিবীর সমস্ত লোক বাবুর বিছানা ঘিরে থাকলেও ত তাঁকে বাঁচাতে পারা যাবে না, সে-কথা কেন ভেবে দেখনি মা!

সাবিত্রী কহিল, ভেবেচি বেহারী। আমি বাড়ির যেখানে হোক লুকিয়ে থেকে আমার কাজ করতে পারব, কিন্তু উপীনবাবুর যে না এলেই নয়! তা ছাড়া আমি মেয়েমানুষ, এ বিপদের কতটুকু ভাল-মন্দই বা বুঝি! না বেহারী, তিনি আসুন।

বেহারী ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, উপীনবাবুর কথা জানিনে মা, কিন্তু বাবুর কথা জানি। নির্বোধ বটে, কিন্তু এই যাট বচ্ছর ধরে সংসারটা ত দেখচি? কটা পুরুষমানুষ তোমার চেয়ে ভাল-মন্দ বেশী বোঝে মা? তা সে যাই হোক, তুমি কাছ থেকে সরে গেলে এ-যাত্রা বাবুকে যে ফেরাতে পারব না, এ কথা আমি তোমার পা ছুঁয়ে পর্যন্ত দিব্যি করে বলতে পারি। এমন কাজ কোরো না মা, তুমি আমার বাবুকে ছেড়ে আর কোথাও পালিয়ে থেকো না।

এ কথা বেহারীর চেয়ে সাবিত্রী যে কম জানিত তাহা নহে, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে হাতের কাছে না পাইলে সতীশের ব্যাকুলতা যে কতখানি বাড়িবে, সে সতীশই জানে; কিন্তু এই নিদারুণ রোগশয্যায় সতীশকে চোখের আড়াল করিয়া সাবিত্রী আপনিই বা বাঁচিবে কি করিয়া? তাহাদের প্রতি উপেন্দ্রর ঘৃণা তাহার অবিদিত ছিল না। তিনি আসিলে তাহাকে আত্মগোপন করিতেই হইবে, তাহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই—সমস্তই সে মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু যাহার জন্য এতদিন এত দুঃখ সহিয়াছে, তাহার জন্য এ দুঃখও সহিবে; এই মনে করিয়াই সে উপেন্দ্রকে পীড়ার সমস্ত বিবরণ খুলিয়া লিখিয়া, আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল।

সাবিত্রী দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, না বেহারী, সে হতে দিতে পারব না। তিনি পরশুর মধ্যে না এসে পড়লে, তোমাকে নিজে গিয়ে তাঁকে আনতে হবে।

বেহারী ম্লানমুখেই কহিল, এ কথা কেন বলচ মা! আমি চাকর, আমাকে যা হুকুম করবে, তাই আমাকে করতে হবে। কিন্তু আমিও ত মানুষ? তোমার চোরের মত লুকিয়ে থাকা যদি কোনদিন সয়ে উঠতে না পারি মা, আমাকে গাল দিতে পারবে না, তা কিন্তু আগে থেকে বলে দিচ্চি, বলিয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে চলিয়া গেল।

কিন্তু, সাবিত্রীর সে চিঠি উপেন্দ্রর হাতে পড়িল না। পিতা ও মহেশ্বরীর পুনঃ পুনঃ অনুরোধে সে মাস-খানেক পূর্বে নিজের সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও জলহাওয়া বদলাইতে পুরী যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এখানে কাহারো সহিত পরিচয় ছিল না বলিয়া প্রথম রাত্রে তাহাকে একখানা ছোট-রকম হোটেলে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। ইচ্ছা ছিল পরদিন সকালে একটা ভাল জায়গা অনুসন্ধান করিয়া লইবে। স্বত্বাধিকারী ভুবন মুখুয্যে মহাশয় কিন্তু খাতির-যত্নের অবধি রাখিলেন না—আলাদা ঘরে বিছানা করিয়া দিলেন, এমন কি, যতদিন খুশি এখানে থাকিলেও যত্নের ত্রুটি হইবে না ভরসা দিলেন।

সকালে একজন প্রৌঢ়া-গোছের স্ত্রীলোক ঘর ঝাঁট দিতে আসিয়া উপেন্দ্রকে বার বার নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে ঝাঁটাটা ফেলিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, বাবুর কি কোন ব্যারাম হয়েছিল? বড্ড রোগা দেখচি যে! সে চেহারা নেই, সে বর্ণ নেই—

উপেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আমাকে চেন নাকি?

স্ত্রীলোকটি কহিল, আমি যে মোক্ষদা, বাবু, আপনাকে চিনিনে?

উপেন্দ্রর মনে পড়িল, এ সেই মোক্ষদা, যে বহুকাল পূর্বে সতীশের বাড়িতে চাকরি করিত। কহিল, তুমি এখানে চাকরি কর বুঝি?

মোক্ষদা সলজ্জভাবে কহিল, না—হাঁ—তা একরকম চাকরি করা বৈ কি! মুখুয্যেমশাই বললে, আর কলকাতায় পড়ে থাকা কেন, বরং চল কোন তীর্থস্থানে গিয়ে থাকি গে। যা হোক একটা হোটেল-টোটেল করে—

উপেন্দ্র বাধা দিয়া কহিলেন, তা হোটেল চলচে ভাল?

তাঁহার বিরক্তি মোক্ষদার দৃষ্টি এড়াইল না। কহিল, অমনি চলে যাচ্ছে। তা বাবু, এই বয়সে আমার চাকরি করতেই বা হবে কেন? আর মুখুয্যেরই বা ছায়া মাড়াতে হবে কেন? মেয়েটাকে ধরতে গেলে আমিই ত একরকম মানুষ করলুম। মাসী বলে ডাকত, সত্যিকারের মাসীর মতই তাকে বুকে করে রেখেছিলুম, এ না জানে কে? লাথি বললে, মাসী, এ-সব করব না, আমি চাকরি করে মাসী-বোনঝির পেট চালাব। তাই সই। বাবুদের মেসের বাসায় চাকরি করে দিলুম, বাবুরা ঝি বলে ভাবত না, বাড়ির গিন্নী বলে মানত। না যাবে সে, না আজ আমাকে এ-সব করতে হবে। কিন্তু যাই বল বাবু, আমি সত্য কথা বলব,—আমাদের ছোটবাবু হতেই ত আজ আমার এত দুঃখ।

উপেন্দ্র উৎসুক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, ছোটবাবু কে? আমাদের সতীশ?

মোক্ষদা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ। ছুঁড়ি কি চোখেই যে ছোটবাবুকে দেখলে, তার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করলে! আর তাই, ছোটবাবুকেই কি ধরা-ছোঁয়া দিলে? তাও দিলে না। বিপিনবাবু লক্ষপতি জমিদার। আমার বাসায় রাত নেই, দিন নেই, হাঁটাহাঁটি কাঁদাকাটি করে পায়ের তলা ক্ষইয়ে ফেললে। সোনা রূপা জড়োয়া গয়নায় দশ হাজার টাকা ধরে দিতে চাইলে, কিন্তু ছুঁড়ি ত তার মুখ পর্যন্ত দেখলে না! কি মেয়ের তেজ বাবা, দশ দশ হাজার টাকার মায়া যেন খোলামকুচির মত পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, নিজের ঘর-দুয়ার জিনিসপত্তর পর্যন্ত ফেলে রেখে এক কাপড়ে বেরিয়ে গিয়ে, চেতলার কোন্ এক বামুনের ঘরে ছ মাস চাকরি করে খেটে খেটে হাড়-পাঁজরা সার করে শেষে কোথায় যে চলে গেল, মা দুর্গাই জানেন, হতভাগী বেঁচে আছে না মরে গেছে! বলিয়া মোক্ষদা পূর্বস্মৃতির আবেগে আঁচল দিয়া চোখ মুছিল।

উপেন্দ্র চুপ করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

মোক্ষদা চোখ মুছিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ বাবু, ছোটবাবু এখন কোথায়? একবার দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করি, তাঁর খোঁজ-টোজ কিছু জানেন কি না!

উপেন্দ্র মৃদুস্বরে কহিলেন, সতীশ যে এখন ঠিক কোথায়, তা আমিও জানিনে। শুনেচি তাদের দেশের বাড়িতে আছে। আচ্ছা, এই সাবিত্রী মেয়েটি কে মোক্ষদা?

মোক্ষদা একমুহূর্তেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া বলিল, কে! কুলীন বামুনের মেয়ে বাবু, আসল কুলীনের মেয়ে! বাছা ন'বছর বয়সে বিধবা হয়ে ঘরেই থাকে, এই মুখপোড়া মিন্‌সে বিয়ে করব, রাজরানী করব বলে ভুলিয়ে বের করে নিয়ে এসে শেষে হাড়ির হাল করে ফেলে পালালো। আমি যাই, তাই মুখ দেখি,—নইলে বামুন নয়, ও চামার! চামারের হাতের জল খেতে আছে ত, ওর নেই।

উপেন্দ্র বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন, কার কথা বলচ মোক্ষদা?

মোক্ষদা উদ্ধতভাবে বলিল, এই মুখপোড়া ভুবন মুখুয্যে! নইলে এমন চামার ত্রিসংসারে আর কে আছে, তুই বড় ভগিনীপতি, তোর এই কাজ? অ্যাঁ!

উপেন্দ্র অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই হোটেল যাঁর? তিনি?

মোক্ষদা কহিল, হাঁ বাবু, হাঁ, এই লক্ষ্মীছাড়া হাভাতে মিনসে। অতঃপর অনুপস্থিত মুখুয্যেকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, কিন্তু কি করতে পারলি তার? অকূলে ভাসিয়ে দিলি, তা ছাড়া কোনদিন তার গা ছুঁতে পারলি কি? নিয়ে এসে, আজ নয় কাল করে মাস-খানেক কাটিয়ে যেদিন বললি বিয়ে হবে না, সেইদিনই মুখে লাথি মেরে দূর করে দিলে! ছেলেমানুষ অল্পবুদ্ধি মেয়ে, তবু কি আর কখনো তার ছায়া চৌকাঠ মাড়াতে পারলি! এ ত আর মুখ কি নয়, যে দুটো সোহাগের কথা বলে ভুলোবি? সে

সাবিত্রী! যে দশ হাজার টাকার জড়োয়া গয়নায় ন্যাথি মেরে চলে যায়—সে!

উপেন্দ্র অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, তোমার মুখুয্যেমশাইকে একবার ডাকতে পার, দুটো কথা জিজ্ঞাসা করব?

মোক্ষদা কহিল, মিন্‌সে বাজারে গেছে। একটুখানি থামিয়া পুনরায় বলিল, মাঝে একদিন রাস্তায় চক্কোবর্ত্তি-ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। ঠাকুর বলে আর কাঁদে—মাকে আমার সবাই ভালবাসত। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি দয়া-মায়া কিনা!

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, চক্রবর্তীঠাকুর কে?

মোক্ষদা বলিল, তিনি বাবুদের মেসের বাসায় রাঁধত কিনা, সব কথাই জানত। বেহারীর মুখে শুনে সমস্ত আমাকে বললেন। চেতলার বামুনবাড়ি থেকে ব্যারাম হয়ে মা আমার ছুটি চাইলে, তা—অচ্ছা বাবু, বামুন মাত্রেই কি এত নিষ্ঠুর! সে স্বচ্ছন্দে বললে, তোমার ওষুধের দেনা হয়েচে সাত টাকা। দিয়ে, তবে যাও। টাকা ক'টি শোধবার জন্যে সাবিত্রী সতীশবাবুর বাসায় সারা পথ হেঁটে আসে। তা ছোটবাবুর একদিকে মেজাজটা খুব উঁচু কিনা—টাকাকাড়ি চাইলে তা যতই হোক, কখনো না বলেন না ত! কিন্তু এমনি পোড়া অদেষ্ট যে, সেই রাতেই বাবুর কোন্ এক মুখপোড়া বন্ধু পরিবার নিয়ে এসে হাজির। সমস্তদিনের পর চানটি কোরে বাছা সেই ঘরে উঠেচে, অমনি তাঁরা এসে পড়লেন। বন্ধুমানুষ, এসোচিস, রাতটা থাক! তা নয়, রাগ করে পরিবারের হাত ধরে ফরফর করে বেরিয়ে গেলেন। ছোটবাবু ত অবাক। কিন্তু সাবি আমার বড় অভিমানী মেয়ে। তার কি এ অপমান সয়! জল-গ্রহণ না করে বাছা সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ত তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

উপেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই রাত্রের নিষ্ঠুর ইতিহাস চোখের উপর উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল; এবং বার বার মনে হইতে লাগিল, মোক্ষদার কাহিনী যদি অর্ধেকও সত্য হয়, তাহা হইলে যাহার নামটাকে পর্যন্ত সে ঘৃণা করিয়া আসিতেছে, সে কি আশ্চর্য নারী!

মোক্ষদা নিজের কাজে চলিয়া গেল, কিন্তু উপেন্দ্র সেইখানে নিস্পন্দের ন্যায় বসিয়া রহিল। ছয়মাস পূর্বেও সে এ-সকল কথা কানেও তুলিত না। যাহা অসৎ, যাহা মিথ্যা, যাহা লেশমাত্রও কলঙ্কের বাষ্পে কলুষিত, তাহা চিরদিনই তাঁহার কাছে বিষবৎ ত্যাজ্য। যে সতীশকে ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, আজ মোক্ষদার কথায় তাহারই চোখের পাতা ভারী এবং দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া আসিল। তাহার মর্মরের মত শুভ্র হৃদয় পাথরের মতই কঠিন ছিল, তবে কেন যে আজ অজ্ঞাত নারীর কলঙ্কিত প্রণয়-বেদনার কাহিনী সেই অকলঙ্ক শুভ্রতায় ছায়াপাত করিল, তাহা ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইত এ দুর্বলতা এতদিন সেই পাষাণ-তলেই চাপা ছিল,—শুধু সুরবালা যখন তাহার অর্ধেক শক্তি হরণ করিয়া চলিয়া গেল, তখন সুযোগ পাইয়া ইহাই প্রচণ্ড উৎসের মত তাহার পাষাণ-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। সুরবালা যে তাহাকে কতখানি শক্তিহীন করিয়া গিয়াছে, জানিতে পারিলে উপেন্দ্র আজ ভয় পাইত।

কিন্তু সেদিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু শূন্যদৃষ্টি লইয়া সুমুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, এবং কোন্ অজানা সাবিত্রীর ভালবাসার ইতিহাস তার সুরবালার শেষ-মুহূর্তের সেই অনির্বচনীয় করুণ চোখ-দুটির মত তাহার চোখের উপর চোখ পাতিয়া স্থির হইয়া রহিল।

তাহার চমক ভাঙিগল ভুবন মুখুয্যের কণ্ঠস্বরে। লোকটা সাড়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবু, আমাকে কি ডেকেছিলেন?

উপেন্দ্র কহিল, বসো। তুমি সাবিত্রীকে চেনো?

মুখুয্যে মাথা হেঁট করিয়া বলিল, আজ্ঞে চিনি।

তার সম্বন্ধে যা জানো আমাকে বলতে পারবে?

আজ্ঞে পারব, বলিয়া এই নির্লজ্জ লোকটা তাহার গভীর অপরাধের ইতিহাস একে একে ব্যক্ত করিয়া শেষে কহিল, আমিও ভদ্রলোকের ছেলে বাবু, কিন্তু আগে যদি তাকে চিনতে পারতাম, এ পথে পা দিয়ে আজ বিদেশে হোটেলের রাঁধুনি-বামুনের কাজ করে

দিন কাটাতে হতো না। শুধু আমার এই স্বস্তি যে, তার দেহে প্রাণ থাকতে কেউ তাকে নষ্ট করতে পারবে না।

উপেন্দ্র প্রশ্ন করিল, তাতে তোমার স্বস্তিটা কি?

মুখুয্যে কহিল, তবু পরকালে জবাব দিতে পারব সে নষ্ট হয়ে যায়নি।

তাহাকে বিদায় দিয়া উপেন্দ্র তেমনি অসাড়ের মতই বসিয়া রহিল, শুধু তাহার মন তাহাকে অবিশ্রাম এই বলিয়া বিঁধিতে লাগিল, ভাল কর নাই উপেন, ভাল কর নাই। যে নিরুপায় নারী এতবড় প্রলোভন অনায়াসে জয় করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, তাহাকে অপমান করার তোমার অধিকার ছিল না।

সেইদিন অপরাহ্নেই উপেন্দ্র ভুবন মুখুয্যের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

কিন্তু কিছুতেই সমুদ্রের জলবায়ু তাঁহাকে খাড়া করিতে পারিল না। বেলা যতই পড়িয়া আসিতে থাকে, চোখমুখ জ্বালা করিয়া জ্বর আসে এবং প্রতিদিনান্ত যে তাঁহাকে তিল তিল করিয়া তাঁহার পরলোকবাসিনী স্বামীহারা সুরবালার কাছেই অগ্রসর করিয়া দিতেছে, ইহাই যেন সে অন্তরের মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করিতে থাকে।

এইভাবে সমুদ্রতটের এই নির্জনবাসে ইহকালের মিয়াদ যখন প্রতিদিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, এমনি এক সকালের ডাকে বেহারীর পত্র বাটীর ঠিকানা হইতে পুনঃপ্রেরিত হইয়া উপেন্দ্রর হাতে আসিয়া পোঁছিল।

যাহাকে মনে পড়িলেই তাঁহার বুকে ছুঁচ ফুটিয়াছে, তাঁহার সেই চিরদিনের বন্ধুকে অপমান করিয়া ত্যাগ করার দুঃখ যে তাঁহার অন্তরে অহরহ কত বড় হইয়া উঠিতেছিল সে শুধু অন্তর্যামীই দেখিতেছিলেন, কিন্তু, আজ যখন তাহারই কঠিন পীড়ার সংবাদ বহন করিয়া বেহারীর পত্র চিকিৎসা ও শুশ্রূষার অভাব নিবেদন করিল, তখন অনেকদিনের পরে উপেন্দ্রের শুষ্ক ওষ্ঠাধরে হাসি দেখা দিল। সে বেচারা জানে না, যাহার দিনগুলো পর্যন্ত গণনায় আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহারই হাতে সে আর একজনের সেবার গুরুভার ন্যস্ত করিতে চাহিতেছে। তবুও উপেন্দ্র সেইদিনই তল্পি বাঁধিয়া পুরী ত্যাগ করিলেন।

একচল্লিশ

জ্যোতিষ হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া বাটীতে পা দিয়াই দেখিতে পাইল সম্মুখের বারান্দায় দুখানা আরাম-চৌকির উপর শশাঙ্ক ও সরোজিনী মুখোমুখি বসিয়া গল্প করিতেছে।

শশাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহাস্যে জবাবদিহি করিল, আজ কাজকর্ম একটু সকাল সকাল শেষ হয়ে গেল, ভাবলুম এইখান থেকেই চা খেয়ে একসঙ্গে ক্লাবে যাব।

বেশ, বেশ। বলিয়া জ্যোতিষ একটুখানি হাসি গোপন করিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

সরোজিনী দাদার সঙ্গে সঙ্গে আসিবার উপক্রম করিতেই জ্যোতিষ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম ভর্ৎসনার সুরে কহিল, অতিথিকে একলা ফেলে—এ তোর কি বুদ্ধি বল ত সরো?

সরোজিনী আরক্ত-মুখে পুনরায় চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। ভগিনীর এই লজ্জাটুকু জ্যোতিষের চোখে পড়িতে বাকী রহিল না।

জননীর আদেশে তাহাকে আদালত হইতে ফিরিয়া কাপড় ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া তবে জলযোগ করিতে হইত। মায়ের সহিত দেখা হইতেই কহিল, শশাঙ্ক এসেচেন, আজ খাবার বাইরে পাঠিয়ে দাও মা।

মা বলিলেন, আচ্ছা। বাইরে সরি আছে বুঝি?

জ্যোতিষ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আছে। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আচ্ছা মা, এমন মানুষ কোথায় আছে জানো, যার শরীরে দোষ নেই, শুধুই গুণ?

প্রশ্নটাকে জগৎতারিণী প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিলেন না, কহিলেন, কেন তোরা যখন-তখন আমাকে ও-কথা বলিস জ্যোতিষ? আমি ত অনেক বার বলেচি, আর আমার আপত্তি নেই। তোরা ভাল বুঝিস ওর হাতেই সরিকে দে না।

জ্যোতিষ কহিল, দোষ ছাড়া মানুষ নেই মা। কিন্তু আমি অনেকরকম করে ভেবে দেখেচি, সরোজিনী অসুখী হবে না। তা ছাড়া, ও বড় হয়েচে, ওর অমতেও কাজ করা যায় না। বলিয়াই দেখিতে পাইল, সরোজিনী আসিয়া ধীরে ধীরে দাদার পিঠ ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

মা ভাঁড়ার ঘরের দরজার ভিতর হইতে কথা কহিতেছেন, সুতরাং তিনি কন্যার আগমন টের পাইলেন না। জ্যোতিষের কথার উত্তরে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, এ কথা ত আমি কোনদিন বলিনে জ্যোতিষ, ঐ ধাড়ি-মেয়ের বিয়ে তার অমতেই দেওয়া হোক। আমার যা সাধ ছিল, সে যখন তোরা দু' ভাই-বোনে মিলে ঘুচিয়ে দিলি, তখনই কি মেয়ের মনের ভাব আমি বুঝিনি বাছা! আমি সব বুঝি, বুঝেই ত মুখ বুজে আছি। এখন আমাকে মিথ্যে খোঁটা দেওয়া জ্যোতিষ, বলিয়া তিনি জলখাবার সাজাইতে বসিলেন। সঙ্কোচে, লজ্জায় সরোজিনী মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। মা কিন্তু তাহার কিছুই জানিলেন না। জ্যোতিষ জবাব দিবার পূর্বেই তিনি নিজের কথার অনুবৃত্তিস্বরূপে পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—যাকে পেলে তোমার বোন খুশী হবেন, তাকেই দাও গে বাছা, আমার মত আর বার বার জানতে হবে না। আমার মত আছে, তোমাদের বলে দিলাম।

ভগিনীর নিরতিশয় সঙ্কোচে জ্যোতিষ নিজেও অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, তবুও জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, কিন্তু মতটা প্রসন্নমনে দেওয়া চাই মা!

জগত্তারিণী কহিলেন, প্রসন্নমনেই দিচ্চি বাছা, প্রসন্নমনেই দিচ্চি। আমাকে আর দিক্ করো না তোমরা।

জ্যোতিষ একটুখানি চুপ করিয়া ভাবিয়া দেখিল, ব্যাপারটা যদি এতটাই গড়াইল, তবে মায়ের বিরক্তি সত্ত্বেও আজই একটা মীমাংসা করিয়া লওয়া উচিত। কারণ, তাহাদের ক্লাবে, লাইব্রেরীতে এ কথাটা আজকাল প্রায়ই আলোচিত হইতেছে, অথচ, ঠিক কি হইবে তাহাও বুঝা যাইতেছে না। বাড়িতেও কথাটা প্রায়ই উঠে বটে, কিন্তু এমনি করিয়াই থামিয়া যায়—অগ্রসর হইতে পারে না। শশাঙ্ককেও এইরূপ অনিশ্চিতের মধ্যে দীর্ঘকাল ফেলিয়া রাখা যায় না। সুতরাং বর-কন্যার সুনিশ্চিত কামনার বিরুদ্ধে জননীর স্পষ্ট অনিচ্ছা জ্যোতিষ মাথায় পাতিয়া লইয়াই যা হোক একটা কিছু এখনি স্থির করিয়া ফেলিবার জন্য কহিল, তা হলে আমি মনে করচি মা, দু-চারজন বন্ধু-বান্ধবদের সামনে পরশু রবিবারেই কথাটা পাকা হয়ে যাক,—কি বল?

মা বলিলেন, ভালই ত।

সরোজিনী ধীরে ধীরে তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

রবিবারের সকালে জ্যোতিষের বসিবার ঘরটা বন্ধু-বান্ধবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। নব-দম্পতির বিবাহ সম্বন্ধে পাকা কথা হইবার পরে এইখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজেরও একটা আয়োজন করা হইয়াছিল। আজ শশাঙ্কর বেশভূষাতেই শুধু যে বিশেষ একটু পারিপাট্য লক্ষিত হইতেছিল তাহা নয়, তাহার মুখ-চোখেও আজ এমন একটু শ্রী ফুটিয়াছিল—যাহাতে তাহাকে সুন্দর দেখাইতেছিল। কয়েকটি মহিলাও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু উপস্থিত ছিল না শুধু সরোজিনী। বেহারাকে দিয়া ডাকাইবার পরে জ্যোতিষ নিজে গিয়া তাহার ঘরের দ্বারে করাঘাত করিয়া সত্বর হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া আসিয়াছিল। অন্য কোনদিন হইলে তাহার এই আচরণ অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারিত, কিন্তু আজ মার্জনা পাইবার অধিকার আছে জানিয়া সস্নেহ-কৌতুকে অতিথিরা জ্যোতিষকেই শুধু তাড়া দিয়াছিলেন মাত্র।

তার পরে অনেক ডাকাডাকিতে বেলা দশটার কাছাকাছি সরোজিনী যখন উপস্থিত হইল, তখন তাহার চেহারা দেখিয়া উপস্থিত সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাহার মুখ পাণ্ডুর, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে, যেন সারারাত্রি সে এতটুকু ঘুমায় নাই। জ্যোতিষ নির্বাক হইয়া শুধু ভগিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া বসিয়া রহিল,—আকৃতি দেখিয়া সে যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেল।

কিন্তু, ইহার অপেক্ষাও শতগুণ বড় বিস্ময় যে মুহূর্তকাল পরেই তাহার অদৃষ্টে ছিল তাহা সে জানিত না। সেই প্রচণ্ড বিস্ময় যেন উপেন্দ্রর অতীতের ছায়া লইয়া সম্মুখের

পর্দা সরাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। জ্যোতিষ চমকাইয়া উঠিল, বলিল, এ কি, উপীন নাকি!

সরোজিনী কহিল, উপীনবাবু!

বস্তুতঃ, দিনের বেলা না হইলে তাহাকে বোধ হয় ইহারা চিনিতেই পারিত না। সহসা নিজের চক্ষুকেই যেন অবিশ্বাস হয়—যেন ভাবা যায় না মানুষের দেহ এমন করিয়া পরিবর্তিত হইতে পারে! উপেন্দ্র একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, শরীরটা তেমন ভাল নেই,—পুরী থেকে আসচি। আজ ব্যাপার কী?

সরোজিনী উঠিয়া আসিয়া উপেন্দ্রর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া, মুখপানে চাহিয়া কহিল, কি অসুখ হয়েচে উপীনবাবু? বলিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্র তাহার বিবর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি টানিয়া কহিল, অসুখ ত একটা নয় বোন।

উপেন্দ্র আজ এই প্রথম সরোজিনীকে ভগিনী সম্বোধন করিল। সরোজিনী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, চলুন, ও ঘরে বসি গিয়ে, বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া এই জনাকীর্ণ কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই এ ঘরের সমস্ত আনন্দ-উৎসব একেবারে যেন নিবিয়া গেল। জ্যোতিষ আসিয়া যখন সরোজিনীকে কহিল, উপীন ততক্ষণ বিশ্রাম করুক, তুমি একবার ও ঘরে এস; সরোজিনী তখন ঘাড় নাড়িয়া শুধু সংক্ষেপে বলিল, আজ থাক দাদা।

জ্যোতিষ হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, থাকবে কি রকম?

সরোজিনী তেমনি মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আজ থাক।

জগৎতারিণী খবর পাইয়া ঘরে ঢুকিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, কেমন করে এত রোগা হলি বাবা! কিন্তু, আর কোথাও তোর থাকা হবে না উপীন, আমার কাছে থেকে ডাক্তার দেখাতে হবে। নইলে এ অসুখ সারবে না।

সরোজিনী জোর দিয়া বলিল, হাঁ উপীনদা, তোমাকে আমাদের কাছেই থাকতে হবে। সেও আজ এই প্রথম উপেন্দ্রকে দাদা বলিয়া ডাকিল। উপেন্দ্র যে চিকিৎসার জন্যই পুরী হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াই সবাই ধরিয়া লইয়াছিলেন।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিল, ফিরে এসে না হয় আপনাদের কাছেই থাকব, কিন্তু আজ আমাকে এক ঘণ্টার মধ্যেই ছেড়ে দিতে হবে।

জগৎতারিণী সবিস্ময়ে কহিলেন, আজই এখ্‌খনি? কেন উপীন?

উপেন্দ্র সতীশের কঠিন পীড়ার উল্লেখ করিয়া তাহার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতির সংবাদ যতদূর জানিত বিবৃত করিয়া পকেট হইতে বেহারীর পত্রখানি সরোজিনীর হাতে দিয়া কহিল, সাড়ে এগারোটার সময় ট্রেন আছে, যা হোক কিছু খেয়ে নিয়ে আমাকে তাতেই যেতে হবে। যদি ফিরে আসতে পারি, তখন আপনার আশ্রয়েই থাকব।

জগৎতারিণীর মাতৃহৃদয় আলোড়িত হইয়া আবার চোখে অশ্রু দেখা দিল। সতীশকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন,—সেই সতীশ আজ পীড়িত, কিন্তু উপেন্দ্র এই দেহ লইয়া তাহার সেবা করিতে চলিয়াছে শুনিয়া তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি চোখ মুছিতে মুছিতে উপেন্দ্রর খাবার ব্যবস্থা করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সরোজিনী চিঠিখানি আগাগোড়া দুইবার তিনবার পড়িয়া সেখানি ফিরাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পরে কহিল, তোমার সঙ্গে আমিও যাব উপীনদা!

উপেন্দ্র কহিল, এত বেলায় অনর্থক স্টেশনে গিয়ে কি হবে বোন?

সরোজিনী কহিল, স্টেশনে নয়, সতীশবাবুর বাড়িতে;—আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চল।

উপেন্দ্র অবাক হইয়া কহিল, পাগল হয়েচ? তুমি সেখানে যাবে কি করে?

তোমার সঙ্গে।

উপেন্দ্র কহিল ছিঃ, তা কি হয়? এরা তোমাকে যেতে দেবেন কেন, আর তুমিই বা সেখানে যাবে কেন?

সরোজিনী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া শুধু বলিল, না, আমি যাবই। বলিয়া উঠিয়া গেল।

অফিস-ঘরে একটা কোচের উপর বসিয়া জ্যোতিষ নিভৃতে শশাঙ্কর সহিত কথা কহিতেছেন, বোধ করি এই আলোচনাই হইতেছিল, সরোজিনী আস্তে আস্তে গিয়া দাদার

পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া তাঁহার কাঁধের উপর হাত রাখিতেই তিনি চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, কি রে সরো?

সরোজিনী দাদার কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, সতীশবাবুর ভারী অসুখ।

জ্যোতিষ ঘাড় নাড়িয়া দুঃখিত হইয়া কহিলেন, তাই ত শুনলুম। উপেন এই এগারোটার ট্রেনেই যাচ্ছে নাকি?

সরোজিনী কহিল, হ্যাঁ, আমিও তাঁর সঙ্গে যাব।

জ্যোতিষ চমকাইয়া কহিলেন, তুমি যাবে? কোথায় যাবে?

সরোজিনী কহিল, সেখানে।

জ্যোতিষ ফিরিয়া বসিয়া বলিলেন, সেখানে মানে? সতীশের বাড়িতে নাকি?

সরোজিনী কহিল, হাঁ।

শশাঙ্ক দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিল। জ্যোতিষ উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, তুই পাগল হলি নাকি? তার অসুখ ত তোর কি? তুই যাবি কেন?

সরোজিনী শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল আমি যাব না ত কে যাবে? না দাদা, তাঁর শক্ত অসুখ, আমাকে যেতেই—আর সে বলিতে পারিল না। কান্নায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া দাদার কাঁধের উপর মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

জ্যোতিষের চোখের উপর হইতে অনেক দিনের একটা কালো পর্দা যেন প্রচণ্ড ঘূর্ণা হাওয়ায় চক্ষের পলকে ছিঁড়িয়া উড়াইয়া লইয়া গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া পরে বোনের মাথায় হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, আচ্ছা যা। সঙ্গে ঝি আর দরোয়ানও যাক। কেমন থাকে গিয়েই টেলিগ্রাফ করিস—আমি কাল-পরশু তা হলে রমণী ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পড়বো। বলিয়া তাহাকে একটু সুমুখে টানিবার চেষ্টা করিতেই সরোজিনী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ঘর হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

শশাঙ্ক মূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া সেই প্রশ্নই করিল, সতীশবাবুর অসুখ, তাতে উনি কেন যাবেন, এ ত বুঝতে পারলুম না জ্যোতিষবাবু? এ-সব কি ব্যাপার বলুন ত?

জ্যোতিষের কানে এ প্রশ্ন পৌঁছিল কিনা বলা শক্ত। সে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল—তার জন্যে ও এত ব্যাকুল হবে এ ত স্বপ্নেও ভাবিনি! এরা বলে একরকম—করে অন্যরকম—এ-সব কি কাণ্ড হতে চলল!

স্টেশনে নামিয়া উপেন্দ্র যে ভদ্র যুবকটির কাছে সতীশের গ্রামের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাগ্যক্রমে সে ছোকরা তাহারই ডিসপেন্সারির কম্পাউণ্ডার, নিজের কি একটা কাজে স্টেশনে আসিয়াছিল। বাবুর বাড়িই গন্তব্য স্থান শুনিয়া সে বিস্তর ছুটাছুটি করিয়া একখানা মাত্র পাল্কি সরোজিনীর জন্য যোগাড় করিতে পারিল এবং উপেন্দ্রকে কহিল, ঐ ত মহেশপুর দেখা যাচ্ছে, চলুন না, কথা কইতে কইতে হেঁটে যাই,—যেতে আধ-ঘণ্টাও লাগবে না। নইলে, গোরুর গাড়িতে গেলে অনেক দেরি হবে।

হাঁটিবার অবস্থা উপেন্দ্রর নয়, কিন্তু গো-শকটের ভয়ে পদব্রজেই স্বীকার করিলেন।

সরোজিনীকে পাল্কিতে বসাইয়া দিয়া এবং দরোয়ান ও দাসীকে সঙ্গে দিয়া উপেন্দ্র ছেলেটির সঙ্গে রওনা হইয়া পড়িলেন। তাহার বয়স সতেরো-আঠারোর বেশী নয়,—খুব চালাক চটপটে, নাম এককড়ি। তাহার ভরসা আছে, আর বছর-খানেক কোনমতে তাঁহাদের পাস-করা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঘুরিতে পারিলে সেও আলাদা প্র্যাক্‌টিস করিতে পারিবে। তাহার মতে ডাক্তারিটা কিছুই নয়, ও কেবল একটু হাতযশ হওয়া চাই। নইলে যে বাঁচবার সে বাঁচে, যে মরবার সে কিছুতেই বাঁচে না।

উপেন্দ্রর তাহাকে কিছুমাত্র মতভেদ নাই জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের বাবু এখন কেমন আছেন?

এককড়ি কহিল, বাবু? আজ বাইশ দিন হলো, তিনি ত ভাল হয়ে গেছেন। মশায়, সমস্ত ওষুধ আমিই দিয়েচি। বলিয়া সে বার-করেক নিজের বুক নিজেই ঠুকিয়া দিল।

উপেন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, অসুখটা কি খুব বেশী হয়েছিল, এককড়িবাবু?

এককড়ি কহিল, বেশী? তিনি ত মরেই গেছলেন। গিন্নীমা না এসে পড়লে ত শিবের অসাধ্যি ছিল। হবে না মশাই? দিনরাত থাকোবাবুর সঙ্গে মদ আর মদ, গাঁজা আর গাঁজা। কি না কালীসিন্ধ হচ্চে। ছাই হচ্চে! ও-সব কি আমরা ডাক্তারেরা বিশ্বাস করি মশাই? আমরা সায়েন্টিফিক্ মেন। কিন্তু গিন্নীমা এসেই থাকোবাবার বাবাজি বের করে দিলেন—টান মেরে ত্রিশূল-ফ্রিশূল ফেলে দিয়ে দূর করে দিলেন। ব্যাটা দিন-কতক কি কম কান্ডই করলে! সেই যেন বাবু,—একে তেড়ে মারতে যায়, ওকে তেড়ে মারতে যায়,—একদিন সামান্য কথায় মশাই, আমাকে এমনি দাঁতঝাড়া দিয়ে উঠল! আমি নেহাত নাকি ভালমানুষ, কারো সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতে চাইনে, নইলে, আর কেউ হলে দিত ব্যাটার মাথাটা সেদিন ফাটিয়ে। বলিয়া এককড়ি হাতের ছাতাটা একবার শূন্যে আস্ফালন করিয়া লইল।

উপেন্দ্র একটু আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, গিন্নীমা কে?

এককড়ি কহিল, তা কি জানি মশাই। সবাই বলে গিন্নীমা, আমিও বলি গিন্নীমা।

উপেন্দ্র কহিলেন, তাঁকে তুমি দেখেচ?

এককড়ি কহিল, হাঁ সে এক-রকম দেখাই বৈ কি।

উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর বয়স কত বলতে পার?

এককড়ি একটু ভাবিয়া কহিল, তা চাল্লিশ-পঞ্চাশ হবে বোধ হয়। নইলে বাবুকে কি কেউ শাসন করতে পারে মশাই? ডাক্তারবাবু ত বলেন, তিনি না এলে ত হয়েই গেছল।

এককড়ির সঙ্গে উপেন্দ্র যখন সতীশের বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন বেলা ডোবে-ডোবে। সরোজিনী পূর্বেই পৌঁছিয়াছিল, তাহার পালকি ফটকের বাহিরে বটগাছ-তলায় নামাইয়া দরোয়ান অপেক্ষা করিতেছে। সুমুখেই দাতব্য-চিকিৎসালয়, সেখানে লোকজনের অসম্ভব জনতা।

এককড়ি সকলকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া নীচের বসিবার ঘরে বসাইয়া বেহারীকে ডাকিতে গেল, কিন্তু তাহার দেখা মিলিল না। ডাক্তারবাবুও বাহিরে রোগী দেখিতে গিয়াছিলেন, সমস্ত লোক ভিড় করিয়া তাঁহার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে।

উপেন্দ্রর এই গিন্নীমা সম্বন্ধে অত্যন্ত সংশয় ছিল, তাই সরোজিনীকে সেইখানেই অপেক্ষা করিতে বলিয়া সোজা সুমুখের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

সতীশ শয্যার উপর ঘুমাইতেছিল। তাহার শিয়রে বসিয়া সাবিত্রী জ্বরের কাগজখানা নিবিষ্ট-মনে পরীক্ষা করিতেছিল। ও-ধারের খোলা জানালা দিয়া সূর্যাস্ত-আভা মেঘের উপর রাঙ্গা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এমনি সময় দ্বারের ভারী পর্দা সরানোর শব্দে সাবিত্রী মুখ তুলিয়া দেখিল—একজন অপরিচিত ভদ্রলোক।

শশব্যস্তে মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেই আগন্তুক নিকটে আসিয়া কহিলেন, আপনি উঠবেন না—আমি উপেন। আপনি সাবিত্রী ত?

সাবিত্রী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। কিন্তু ভয়ে, লজ্জায়, সংকোচে একেবারে যেন মরিয়া গেল।

উপেন জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীশ ঘুমুচ্চে? এখন কেমন আছে?

সাবিত্রী পূর্বের মতই মাথা নাড়িয়া জানাইল, ভাল আছেন।

উপেন্দ্র তখন ধীরে ধীরে খাটের একাংশে আসিয়া বসিলেন। নিজের কর্তব্য তিনি পূর্বেই স্থির করিয়া লইয়াছিলেন, বলিলেন, আমাকে সে চিঠি যে আপনিই লিখেছিলেন তা এখন বুঝতে পারচি। আমাকে আসতে বলে নিজের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ যে আপনি কতখানি তুচ্ছ করেছিলেন, মনে করবেন না সে আমি বুঝিনি। এই ত চাই। এই ত নিজের পরিচয়!

সাবিত্রীর মনে হইল, সে বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছে। এ বুঝি আর কেহ, এ বুঝি সতীশের সে উপীনদা নয়।

উপেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, তোমার চেয়ে আমি বয়সে বড়।

তোমাকে আমি সাবিত্রী বলে ডাকব, তুমি আমাকে দাদা বলে ডেকো; আজ থেকে তুমি আমার ছোট বোন।

সাবিত্রী নীরবে উঠিয়া আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া উপেন্দ্রর পায়ের কাছে প্রণাম করিল এবং দুই হাত বাড়াইয়া উপেন্দ্রর জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে অধোমুখে প্রশ্ন করিল, আসতে এত দেরি হলো কেন? চিঠি কি সময়ে পাননি?

উপেন্দ্র সাবিত্রীর কাজে বাধা দিলেন না। সহজভাবে বলিলেন, না ভাই, পাইনি। আমি পরশু পুরীতে তোমার চিঠি পেয়ে আসচি। কিন্তু তোমার যে একটা ভারী শক্ত কাজ বাকী রয়েচে দিদি,—কথাটা এইখানে উপেন্দ্রর মুখে বাধিয়া গেল।

সাবিত্রী জুতাজোড়াটা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া মোজা খুলিতে খুলিতে বলিল, কি কাজ দাদা?

তথাপি উপেন্দ্রর মুখে একবার বাধিল। তার পর যেন জোর করিয়াই ভিতরের সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন, কিন্তু তুমি ছাড়া এ কাজ আর কারুর সাধ্য নয় বোন। আর একজন পারত, সে সুরবালা—

সাবিত্রী মৌনমুখে অপেক্ষা করিয়া আছে দেখিয়া উপেন্দ্র কহিলেন, সরোজিনীর নাম শুনেচ?

সাবিত্রী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, শুনেচি।

সমস্তই শুনেচ বোধ হয়?

সাবিত্রী তেমনিই মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে সমস্তই জানে।

তখন উপেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিলেন, সতীশের অসুখ শুনে তাকে কোনমতেই ধরে রাখা গেল না, আমার সঙ্গে সে এসেচে। নীচের ঘরে অপেক্ষা করে বসে আছে,—তার কোন উপায় কর দিদি।

সাবিত্রী ত্রস্তপদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তিনি এসেছেন! আমি এখুনি গিয়ে—কিন্তু আমি কি তাঁর কাছে যেতে পারি দাদা?

এ ইঙ্গিত উপেন্দ্র বুঝিলেন। দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, তুমি যেতে পারো না? আমার ছোটবোন সংসারে কি কোন মেয়ের চেয়ে ছোট সাবিত্রী, যে, কোথাও তার মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সঙ্কোচ হবে? আমার বোন, পৃথিবীতে সে কি সোজা পরিচয় দিদি!

সাবিত্রী আর সহিতে পারিল না, চক্ষের নিমিষে তাহার মাথাটা উপেন্দ্রর দুই পায়ের উপর একেবারে লুটাইয়া পড়িল। বার বার করিয়া সেই শীর্ণ পা-দুখানির ধুলো মাথায় তুলিয়া লইয়া সে যখন সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখে আবরণ নাই, দুই চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানির উপর নারী-চরিত্রের বৃহৎ মহিমা উপেন্দ্র নির্নিমেষ-চক্ষে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

চোখ মুছিয়া সাবিত্রী যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, উপেন্দ্র পিছন হইতে বলিলেন, যাও দিদি, যার বোন বলে তার কাছে নিজের পরিচয় দেবে, তাকে বোলো, আমরা দু'ভাই-বোন আজ পর্যন্ত কখনো সংসারে ছোট কাজ করিনি।

সাবিত্রী চলিয়া গেলে তিনি নিদ্রিত সতীশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ডাকলেন, সতে? ওরে সতীশ?

ঘুম ভাঙিয়া সতীশ ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া চাহিয়া রহিল।

তোর উপীনদা—আমায় চিনতে পারিস নে?

উপীনদা! সতীশ বিহ্বল-চক্ষে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

কি রে, এখনো চিনতে পারিস নি?

সতীশ ঠিক যেন ঘুমের ঘোরে কথা কহিল—যেন এখনো তাহার ঝোঁক কাটে নাই—এমনিভাবে কহিল, চিনতে পেরেচি। তুমি এসেচ উপীনদা?

হাঁ ভাই, এসেচি।

তবে পা-দুটি একবার তোল না উপীনদা, অনেকদিন তোমার পায়ের ধুলো মাথায় দিতে পাইনি।

উপেন্দ্র দুই হাত বাড়াইয়া তাহার চিরদিনের বন্ধুকে বুকে টানিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত অচেতন মূর্তির মত উভয়ে উভয়ের বক্ষ-সংলগ্ন থাকিবার পরে উপেন্দ্র আস্তে আস্তে বলিলেন, আর দেরি করিস নে সতীশ, একটু শিগগির সেরে ওঠ ভাই, আমার অনেক কাজ তোর জন্যে পড়ে রয়েচে।

কি কাজ উপীনদা? বলিয়া সতীশ পায়ের শব্দে পিছনে চাহিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। সাবিত্রীর হাত ধরিয়া সরোজিনী আসিতেছে!

সে একবার উপেন্দ্রর পানে চাহিয়া, আর একবার ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া এই দুটি রমণীর মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সে যে নিজের দৃষ্টিকে প্রত্যয় করিতে সাহস করিতেছে না তাহা উপেন্দ্র এবং সাবিত্রী উভয়েই বুঝিল।

সরোজিনী মুহূর্তকাল সতীশের কঙ্কালসার পাণ্ডুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহার পায়ের কাছে বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন দমন করিতে লাগিল। কেহই কথা কহিল না, কিন্তু এই কান্নার ভিতরে যে কত বড় বেদনা ও ক্ষমাভিক্ষা ছিল, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। সতীশ নির্বাক কাষ্ঠপুত্তলির মত বসিয়া রহিল, তাহার হৃদয়ের একপ্রান্ত অব্যক্ত আনন্দের উচ্ছ্বাসে যেমন তরঙ্গিত হইয়া উঠিতে লাগিল, অপর প্রান্ত তেমনি নিদারুণ সমস্যার অভিঘাতে ভীত, সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত কাহারও মুখে কথা নাই,—দিবাশেষের এই প্রায়ান্ধকার স্তব্ধ ঘরটার মধ্যে শুধু কেবল সরোজিনীর দুর্নিবার ক্রন্দনের বেগ তাহার প্রাণপণ শাসনের নীচে রহিয়া রহিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই নীরবতা ভঙ্গ হইল উপেন্দ্রর কণ্ঠস্বরে। তিনি সরোজিনীর মাথার উপর ধীরে ধীরে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া কহিলেন, অপরাধ যারই হয়ে থাক সতীশ, আমার এই বোনটিকে আজ তুই মাপ কর। ওর বুকের ভেতরের অনেক দিনের অনেক সঞ্চিত দুঃখ আজ তোকে সেবা করবার জন্যেই আমার সঙ্গে ওকে পাঠিয়ে দিয়েচে। কিন্তু সাবিত্রী, তুমি দিদি অমন মুখটি বিমর্ষ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ত হবে না! তোমার এই মরণোন্মুখ দাদাটির অনেক উৎপাত অনেক ভার আজ থেকে তোমাকে বইতে হবে বোন। এসো, আমার কাছে এসে বসো।

সাবিত্রীর নামে সরোজিনী লজ্জা, শরম, বেদনা সমস্ত ভুলিয়া মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে তাহাকে উপেন্দ্রর কোনরূপ আত্মীয়া বলিয়াই মনে করিয়াছিল।

সাবিত্রী নিঃশব্দে আসিয়া উপেন্দ্রর পায়ের কাছে মেঝের উপর বসিল। উপেন্দ্র তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া বলিলেন, তুমি মনে করো না দিদি, তোমার কাছে মাপ চেয়ে তোমার আমি অমর্যাদা করব। কিন্তু সতীশ, তুই আমাকে মাপ কর। তোর যত অপমান, যত অনিষ্ট আমি করেচি, সমস্ত আজ ভুলে যা ভাই।

সতীশ কথা কহিবে কি, সে অবাক হইয়া শুধু নিষ্পলক-চক্ষে চাহিয়া রহিল।

উপেন্দ্র একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, আমি বুঝেচি, সতীশ, তোরা কি ভাবচিস। ভাবচিস যে, সেই উপীনদা ছেলেমানুষের মত এত বকে কেন! কিন্তু তোরা জানিস নে ভাই, কতকাল তোদের উপীনদার এই মুখখানা একেবারে মূক হয়ে ছিল। তাই, যত কথা জমা হয়েছিল, সব আজ মাতালের মত বেরিয়ে আসচে, কাকে আটকে রাখি বল ত!

উপেন্দ্রর কথার ভঙ্গীতে সতীশের বুকের ভিতরটায় কি এক রকমের অজানা ভয়ে তোলপাড় করিতে লাগিল, কি একটা কথা সে জানিতেও চাহিল, কিন্তু, না পড়িল তাহার প্রশ্নটা মনে, না তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিল। সে যেমন চাহিয়া ছিল তেমনি চাহিয়া রহিল।

পরক্ষণেই উপেন্দ্র সরোজিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া সতীশকে বলিলেন, তুই ভাল হ', আশীর্বাদ করি তোরা সুখী হ'—আমি আমার এ বোনটিকে নিয়ে চলে যাব। বলিয়া উপেন্দ্র আস্তে আস্তে সাবিত্রীর মাথার উপর আঙুলের ঘা মারিয়া কহিলেন, তুমি ছাড়া আমার ভার নেবার আর কেউ নেই দিদি। আর যে অসুখ, তাতে আর কাউকে কাছে ডাকতে সাহসও হয় না, হওয়া উচিতও নয়। শুধু তোমার মত যার পরের জন্যই

কেবল বেঁচে থাকা, আমার সেই বোনটির ওপরেই নিজেকে সঁপে দিতে পারি। যাবে দিদি আমার সঙ্গে? সতীশকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে,—তা হলোই বা। এর চেয়ে কত বেশী দুঃখ-কষ্ট যে ভগবান মানুষকে সইতে দিয়ে মানুষ করে তোলেন ভাই!

সতীশের মনের মধ্যে এতক্ষণের সেই বিস্মৃত প্রশ্নটা যেন বিদ্যুতের রেখায় খেলিয়া গেল। সে সহসা বলিয়া উঠিল, উপীনদা, আমাদের পশু-বৌঠান কেমন আছেন? তাঁর যে অসুখ শুনে এসেছিলাম।

উপেন্দ্র একমুহূর্তের জন্য দাঁত দিয়া জোর করিয়া অধর চাপিয়া ধরিলেন, তার পরে অভ্যাসমত একবার উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, পশু নেই—মারা গেছে।

সরোজিনী চেঁচাইয়া উঠিল, সুরবালা-বৌদি নেই?

উপেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না।

সতীশ মোটা বালিশটায় হেলান দিয়া মূর্ছাহতের মত শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

সুরবালা নাই, সে মারা গেছে! এই বার্তা উপেন্দ্রর মুখ দিয়া অতি সহজেই বাহির হইয়া আসিল; কিন্তু এ 'নাই' যে কি না-থাকা, এ যাওয়া যে কি যাওয়া, সতীশের চেয়ে কে বেশী জানে! সরোজিনীর চেয়ে কে বেশী দেখিয়াছে! সাবিত্রীর চেয়ে কে বেশী শুনিয়াছে!

তথাপি সুরবালা নাই—সে মরিয়াছে। সতীশের মুখের প্রতি চাহিয়া উপেন্দ্র একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, ভগবান নিলেন, তার আর নালিশ কি! কিন্তু এ সময়ে দিবা-ছোঁড়াটা যদি কাছে থাকত! মা-বাপ নেই, ছেলেবেলা থেকে মানুষ করে এত বড় করলাম, সেও কোথায় গেল! কি জানি মরবার আগে একবার তাকে দেখতে পাব কি না।

সতীশ তেমনি মূর্ছাহতের মত থাকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, দিবার কি হলো উপীনদা?

উপেন্দ্র কহিলেন, কি জানি তার কি হলো! কলকাতায় হারানদার বাড়িতে থেকে পড়তে দিলাম—এ লজ্জার কথা কারুকে বলাও যায় না, বলতে ইচ্ছেও করে না—বাড়িতে আজও জানে, সে কলকতায় পড়চে, সুরো তাকে ভারী ভালবাসতো, সে বেচারা মরবার আগে দেখতে চেয়েছিল, কিন্তু এ সাধ তার পূর্ণ করতে পারলাম না। হারানবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে কোথায় যে চলে গেল তার উদ্দেশও নেই।

তিনজন শ্রোতাই একসঙ্গে অব্যক্ত-কণ্ঠে কি একটা চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথাই স্পষ্ট হইল না।

তার পরে সমস্ত নীরব। সমস্ত ঘরটা যেন একটা শূন্য শ্মশানের মত থমথম করিতে লাগিল।

কেহই উপেন্দ্রর মুখের পানে চাহিতেও পারিল না, কিন্তু প্রত্যেকেরই মনে হইতে লাগিল, তাহাদের এতদিনের দুঃখ-কষ্ট-মান-অভিমানগুলো যেন এই অভ্রভেদী বেদনার কাছে একেবারে তুচ্ছ হইয়া গেছে।

সাবিত্রী সতীশের কাছে সকল কথাই শুনিয়াছিল। সকল কথাই জানিত। সে ভাবিতে লাগিল, এই বিপুল শূন্যতা এই লোকটা কি দিয়া ভরিয়াছে! এ ব্যথা, সে কেমন করিয়া তাহার দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মধ্যে এত সহজে বহিয়া বেড়াইতেছে! বুকের ভিতরে যাহার এতবড় হাহাকার, বাহিরে তাহার এতটুকু আক্ষেপ নাই কেন? এ কি পাইয়াছে? কে ইহার সুখ-দুঃখ এমন সহজ সুসহ করিয়া দিয়াছে!

সে পায়ের উপর আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, দাদা, এ-সব ব্যারামে তোমার পক্ষে পাহাড়ের হাওয়া খুব ভাল, না?

উপেন্দ্র তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, হাঁ ভাই, তাই ত ডাক্তারেরা বলেন, কিন্তু ভগবান যাকে তলব করেন, তার কিছুই কাজে লাগে না।

সাবিত্রী বলিল, তা হোক দাদা, আমরা কিন্তু পাহাড়ে গিয়েই থাকব।

উপেন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তাই হবে।

মহামায়ার পূজা আসন্ন হইয়া আসিল এবং সতীশ সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বেই বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দোজ্জ্বল দিনগুলি সুখ-স্বপ্নের মত অতিবাহিত হইয়া গেল।

আরও কিছুদিন এখানে থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু উপেন্দ্রর দেহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সাবিত্রী ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করিবার জন্য দিন স্থির করিয়া ফেলিল। উপেন্দ্রর আপত্তির বিরুদ্ধে জিদ করিয়া বলিল, সে হবে না দাদা। সতীশবাবুর অসুখ আর নেই, কিন্তু, তাঁর শরীর সবল হবার জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে তোমাকে আর খুঁজে পাব না। পরশু আমাদের যেতেই হবে, তুমি অমত করো না দাদা।

উপেন্দ্র মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, সে দেখা যাবে। কিন্তু, তা হলেই কি আমাকে খুঁজে পাবে দিদি?

সাবিত্রী তর্ক না করিয়া কাজে চলিয়া গেল। উপেন্দ্রর দিনগুলো এখানে শান্তিতে কাটিতেছিল, তাই যাবার জন্য তাঁহার তাড়া ছিল না এবং যাত্রার দিন যে সত্যিই এত আসন্ন হইয়াছে তাহাও বোধ করি তিনি বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু সতীশের মুখ শুকাইল। কারণ, এই জিদের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইহা যে কোন বাধা মানে না এবং যে-কেহ ইহার সংস্রবে আছে, তাহাকেই যে শেষ পর্যন্ত নত হইতে হয়, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। সুতরাং ত্রয়োদশী যে কিছুতেই পার হইবে না, তাহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু, কোন কথা কহিল না। পরদিনও এ সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নির্বাক হইয়া রহিল। তাহার সাক্ষাতেই বেহারী সজলনয়নে সাবিত্রীকে যখন প্রশ্ন করিল, আবার কতদিনে দেখা দেবে মা, তখনও সতীশ মৌন হইয়া রহিল।

সাবিত্রী সতীশের মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, তোমার বাবুর যেদিন বিয়ে হবে বেহারী, তখন আবার দেখা হবে। অবিশ্যি তোমার বাবু যদি দয়া করে আনেন তবেই।

দিন-দশেক পূর্বে সরোজিনীকে লইয়া যাইবার জন্য জ্যোতিষ নিজে আসিলে উপেন্দ্রর মধ্যস্থতায় বিবাহের পাকা কথাবার্তাই হইয়া গিয়াছিল।

সতীশ কিছুমাত্র আপত্তি করে নাই, স্থির হইয়াছিল তাহার কালাশৌচ গত হইলেই বিবাহ হইবে। সাবিত্রী এখন সেই ইঙ্গিতই করিল এবং সতীশ চুপ করিয়াই শুনিল।

যাবার দিন সকালে উপেন্দ্র একটু চিন্তান্বিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, তোর শরীর কি তেমন সুস্থ বোধ হচ্চে না, সতীশ? কাল থেকে যেন তোকে ভারী শুকনো দেখাচ্চে।

সতীশ উদাস-কণ্ঠে কহিল, না, বেশ ভালই ত আছি।

উপেন্দ্র চলিয়া গেলে সাবিত্রী ঘরে ঢুকিল। তাহার দুচক্ষু রাঙ্গা, চোখের পল্লব ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা চাহিলেই চোখে পড়ে। মাথার দিব্যের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া বলিল, কথা রাখবে?

সতীশ বলিল, রাখব।

মদ গাঁজা হাত দিয়েও কখনো ছোঁবে না?

না।

আমাকে জিজ্ঞাসা না করে তন্ত্র-মন্ত্রের দিকেও যাবে না?

না।

যতদিন না শরীর একেবারে সারে দুদিন অন্তর চিঠি লিখবে?

লিখব।

তাতে কোন কথা লুকোবে না?

না।

তবে চললুম, বলিয়া সাবিত্রী তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সতীশ বিছানার উপর উপর বসিয়াছিল, শুইয়া পড়িল। বিদায় দিবার জন্য নীচে নামিবার চেষ্টাও করিল না।

বাহিরে দুখানা পাল্কি প্রস্তুত ছিল। কাছে দাঁড়াইয়া উপেন্দ্র ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আস্তে আস্তে আলাপ করিতেছিলেন, মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সাবিত্রী

ধীর-পদবিক্ষেপে আসিয়া অন্যটায় প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেই বেহারী ছুটিয়া আসিয়া চুপি চুপি কহিল, একবার ফিরে চল মা, বাবু কি একটা বিশেষ দরকারে ডাকচেন।

সাবিত্রী ফিরিয়া গেল, উপেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে তাহা লক্ষ্য করিলেন।

সাবিত্রী ঠিক এই ভয়ই করিতেছিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সতীশ ও-ধারে মুখ করিয়া শুইয়া আছে। বিছানার সন্নিকটে আসিয়া হাসির ভান করিয়া কহিল, ব্যাপার কি? আমাদের ট্রেন ফেল করে দেবে নাকি?

সতীশ মুখ ফিরিয়া একেবারেই হাত বাড়াইয়া সাবিত্রীর গায়ের চাদরটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বসো। আমি তোমাকে যেতে দেব না। এ আমার গ্রাম, আমার বাড়ি,—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারে এ সাধ্য দশটা উপীনদার নেই।

সাবিত্রী অবাক হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, সতীশের চোখে এমন একটা হিংস্র তীব্র দৃষ্টি, যাহাকে কোনমতেই স্বাভাবিক বলা চলে না।

সাবিত্রী বুঝিল জোর খাটিবে না। শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া স্নিগ্ধ ভর্ৎসনার কণ্ঠে কহিল, ছি, ও কি কথা! তিনি ত আমাকে জোর করে নিয়ে যাননি—তাঁর স্ত্রী নেই, ভাই নেই, তুমি নেই—এতবড় সাংঘাতিক অসুখে সেবা করিবার কেউ নেই। তাই ত তিনি আমাকে তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাচ্চেন। একে কি জোর করা বলে?

সতীশ প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, ও মিছে কথা—স্তোক দেওয়া। তিনি তাঁর বন্ধু জ্যোতিষবাবুর মুখ চেয়েই শুধু তোমাকে সরিয়ে নিতে চান। এই দু'দিন আমি দিবা-রাত্রি ভেবে দেখেছি, যে চুপ করে সহ্য করে, সবাই তার ওপর অত্যাচার করে। তা সে কারণ যার যাই থাক, আমি তোমাকে যেতে দেব না। যাক্, এ নিয়ে তর্কাতর্কি করে মাথা গরম করতে আমি চাইনে—বেহারীকে দিয়ে নীচে বলে পাঠাও তোমার যাওয়া হবে না। বেহা—

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? বেশ, তার না হয় ভাল মতলবই নেই, কিন্তু তুমিই বা আমাকে নিয়ে করবে কি শুনি?

সতীশ মুহূর্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, যদি বলি বিয়ে করব!

সাবিত্রী বলিল, আর আমি যদি বলি আমার তাতে মত নেই?

সতীশ কহিল, তোমার মতামতে কিছুই আসে যায় না।

সাবিত্রী সভয়ে হাসিয়া বলিল, তবে কি জোর করে বিয়ে করবে নাকি? বলিয়া মুখের হাসিকে গাম্ভীর্যে পরিণত করিয়া তাহার ললাট হইতে রুক্ষ চুলগুলি গভীর স্নেহে হাত দিয়া ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলিয়া দিতে দিতে কহিল, ছি, এমন কথা কখনো ভ্রমেও মনে কোরো না। আমি বিধবা, আমি কুলত্যাগিনী, আমি সমাজে লাঞ্ছিতা, আমাকে বিয়ে করার দুঃখ যে কত বড়, সে তুমি বোঝোনি বটে, কিন্তু যিনি আজন্ম শুদ্ধ, শোকের আগুন যাঁকে পুড়িয়ে হীরের মত নির্মল করেচে, তিনি বুঝেচেন বলেই এই হতভাগিনীকে আশ্রয় দিতে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন। তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা আজ তুমি ঝোঁকের উপর দেখতে পাবে না, কিন্তু তাই বলে তাঁকে মিথ্যা দোষারোপ করে অপরাধী হয়ে থেকো না। বলিতে বলিতেই তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

এই চোখের জল সতীশকে আজ শান্ত করিতে পারিল না, বরং সে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিল, সমস্ত মিথ্যে। তুমি এমনি করেই নিজেকে আমার কাছ থেকে ঠেকিয়ে রেখে আমার সর্বনাশ করেচ। উপীনদাই বলেছেন, তুমি সংসারে কারো চেয়ে ছোট নয়—এই সত্য কথা।

সাবিত্রী বলিল, না, তা নয়। দাদা এখন সমাজের অতীত, ইহলোকের অতীত, তাই তাঁর মুখে যা সত্য, অন্যের মুখে অন্যের প্রয়োজনে সে সত্য নয়। তুমি বলবে সত্য হোক মিথ্যা হোক আমি সমাজ চাইনে, তোমাকে চাই। কিন্তু আমি ত তা বলতে পারিনে। সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না জানি, কিন্তু আমি ত সমাজ চাই, আমি ত তাকে মানি। আমি ত জানি শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না। সমাজ যে

স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোন স্বামীরই ত সাধ্য নেই নিজের জোরে সেই আসনটি তার বজায় করে রাখেন! ওগো, এ অসাধ্যসাধনের চেষ্টা করো না!

সতীশ দুই হাত দিয়া সাবিত্রীর দুটো হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, সাবিত্রী, এ-সব কথা শোনবার আজ আমার ধৈর্য নেই, বোঝবার শক্তি নেই, আজ শুধু আমাকে ছুঁয়ে তুমি এই সত্য কথাটা সোজা করে বল, আমাকে তুমি ভালবাস কি না? বলিয়া সে যেন তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত শরীরটাকে পর্যন্ত উন্মুখ করিয়া সাবিত্রীর মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল।

এই একান্ত ব্যথিত ব্যগ্র চোখ-দুটির পানে চাহিয়া সাবিত্রীর আবার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কহিল, ভালবাসি কি না! নইলে কিসের জোরে তোমার ওপর আমার এত জোর? কিসের জন্য আমার এত সুখ, আমার এতবড় দুঃখ? ওগো, তাই ত তোমাকে এত দুঃখ দিলুম, কিন্তু কিছুতে আমার এই দেহটা দিতে পারলুম না! বলিয়া আঁচলে নিজের চোখ মুছিয়া কহিল, আজ আমি তোমার কাছে কোন কথা গোপন করব না। এই দেহটা আমার আজও নষ্ট হয়নি বটে, কিন্তু তোমার পায়ে দেবার যোগ্যতাও এর নেই। এই দেহ নিয়ে যে আমি ইচ্ছে করে অনেকের মন ভুলিয়েচি, এ ত আমি কোনমতেই ভুলতে পারব না! এ দিয়ে আর যারই সেবা চলুক, তোমার পুজো হবে না। আজ কি করে তোমাকে সে কথা বোঝাব! এত ভাল যদি না বাসতুম, হয়ত এমন করে তোমাকে আজ আমায় ছেড়ে যেতে হতো না। বলিয়া সাবিত্রী বারংবার চক্ষু মার্জনা করিল।

সতীশ স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তবে আর চাইনে। কিন্তু তোমার মন? এ দিয়ে ত তুমি কাউকে কখনও ভোলাতে যাওনি! এ ত আমার।

সাবিত্রী তৎক্ষণাৎ কহিল, না,.এ দিয়ে কোনদিন কাউকে ভোলাতে চাইনি—এ তোমারই। এখানে তুমিই চিরদিন প্রভু। বলিয়া সে বুকের উপর হাত রাখিয়া কহিল, অন্তর্যামী জানেন, যতদিন বাঁচব, যেখানে যেভাবেই থাকি, এ তোমার চিরদিন দাসীই থাকবে।

সতীশ খপ্ করিয়া তাহার হাতটা নিজের ডান হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, ভগবানের নাম নিয়ে আজ যে অঙ্গীকার করলে এই-ই আমার যথেষ্ট। আমি এর বেশী কিছু চাইনে।

তাহার কথার ভাবে সাবিত্রী মনে মনে আবার শঙ্কিত হইল।

এমনি সময়ে বেহারী দ্বারের বাহির হইতে ডাকিয়া কহিল, মা, বাবু বললেন আর ত সময় নেই।

চল যাচ্ছি, বলিয়া সাবিত্রী উঠিতে গেল, সতীশ জোর করিয়া ধরিয়া রাখিয়া বলিল, কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি—আজ যাবার সময় আমাকে একটা ভিক্ষে দিয়ে যাও।

আমার কি আছে যে তোমাকে দেব? কিন্তু কি চাই বল?

সতীশ কহিল, আমি এই ভিক্ষা চাই, কেউ কখনো যদি আমাদের সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা করে, আমার স্বামীত্ব স্বীকার করবে বল?

সাবিত্রী ঠিক এই আশঙ্কাই করিতেছিল, তথাপি এই অদ্ভুত অনুরোধে হাসিল। কহিল, কেন বল ত? সাক্ষীর জোরে শেষকালে জোর করে ঘরে পুরবে নাকি?

সতীশ কহিল, তোমার নিজের বুকের অন্তর্যামীই আমাদের সাক্ষী—অন্য সাক্ষীতে আমাদের দরকার নেই। আর, বাইরের সাক্ষীর জোরে শেষকালে ঘরে পুরব এই তোমার ভয়? কিন্তু, নিজের জোরে আজই যদি ঘরে পুরি ত কে ঠেকাবে বল ত?

সাবিত্রী দ্বিরুক্তি করিল না।

সতীশ কহিল, তোমার যেখানে-সেখানে যা খুশি ভাবে থাকা আমার পছন্দ নয়। সাবিত্রীর মুখ উত্তরোত্তর পাংশু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু এ অবস্থায় সতীশকে উত্তেজিত করিবার ভয়ে সে চুপ করিয়া রহিল। সতীশ বলিল, উপীনদা পাথরের দেবতা, নইলে রক্ত-মাংসের দেবতা হলেও আমি সঙ্গে পাঠাতাম না। আচ্ছা, আজ যাচ্চ যাও, কিন্তু বেশীদিন বোধ করি সেখানে রাখা আমার সুবিধে হয়ে উঠবে না।

তোমার ইচ্ছে, বলিয়া সাবিত্রী নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বিপ্রদাস

অপরাহ্ণ সাড়ে-পাঁচটায় কাঠের কারখানায় ছুটি হইলে দিবাকর আরাকানের একটা রাস্তা দিয়া চলিয়াছে। ধুলোয় ধুলোয়, করাতের গুঁড়ায় তাহার সর্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন। গলায় উত্তরীয় নাই, পিরানখানি জীর্ণ মলিন, নানাস্থানে সেলাই করা, পরিধেয় বস্ত্রও তদ্রূপযুক্ত, ডান পায়ের জুতাটার গোড়ালি ক্ষইয়া একপেশে হইয়া গেছে, বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগাটা জুতার সুমুখ দিয়া দেখা যাইতেছে—হঠাৎ দেখিলে যেন চেনাই যায় না,—সারাদিন পেটে অন্ন নাই—এ অবস্থায় সে ধুঁকিতে ধুঁকিতে কামিনী বাড়িউলীর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাসিক চার টাকা ভাড়ায় নীচের তলার একটি ঘরে তাদের বাসা। অপ্রশস্ত বারান্দাটির একধারে রান্না হয়, একধারে কাঠ ঘুঁটে জলের বালতি প্রভৃতি ঠেসাঠেসি করিয়া রাখা।

দিবাকরের পায়ের শব্দে পাশের একটা ঘর হইতে বাড়িউলী বাহির হইয়া ঝঙ্কার দিয়া কহিল, আসা হলো? তা বেশ, এ-সব কি বাপু তোমাদের! রান্না-বাড়া নেই, নাওয়া-খাওয়া নেই—কেবলি রাত-দিন ঝগড়া, কিচি-কিচি, দাঁতের বাদ্যি—এ যে আমাদের শুদ্ধ লক্ষ্মী ছাড়িয়ে দেবার জো করলে তোমরা।

দিবাকর ম্লান-মুখে মাথা হেঁট করিয়া রহিল। সে দুপুরবেলায় ভাত খাইতে আসিয়া কিরণময়ীর সহিত ঝগড়া করিয়া অস্নাত অভুক্ত অবস্থাতেই পুনরায় তাহার কাজে ফিরিয়া গিয়াছিল; এখন ছুটি হইবার পরে বাসায় আসিয়াছে। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া বাড়িউলীর রাগ পড়িল না, সে পুনরায় কহিল, ও তোমার বিয়ে করা পরিবার নয় বাপু, যে এত জোর-জুলুম নাগিয়েচ। বের করে যেমন এনেছিলে, সেও তেমনি ধর্ম রেখেচে। এখন তোমারও যা হোক একটা চাকরি-বাকরি হয়েচে—এইবার সরে যাও। আর কেন বাপু তাকে দুঃখ দেওয়া! অমন সোমত্ত মেয়েমানুষটা খাওয়া-পরা বিহনে একেবারে শুকনো কাঠ হয়ে গেল যে! একটুখানি চুপ করিয়া কহিল, নইলে ওর ভাবনা কি? মোড়ের মাথায় গোলদার মারাড়িবাবু আমাকে নিত্যি লোক পাঠাচ্চে। বলে, সোনায় সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবে। আর তোমারি বা মেয়েমানুষের ভাবনা কি বাপু? ভাত ছড়ালে নাকি কাকের অভাব! যাও, সরে যাও। আমার কথা শোন, ক'দিন থেকে বলচি, আর তোমাদের বনিবনাও হবে না।

দিবাকর তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, থাক থাক, আমার কথায় কাজ নেই। কিন্তু ওঁরও কি তাই মত নাকি? তুমিই তা হলে তাঁর মন্ত্রিমশাই কিনা!

ঠিক এই সময়ে কিরণময়ী তাহার ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল। অবস্থার পরিবর্তনে মানুষের দৈহিক, মানসিক, সর্বপ্রকার পরিবর্তন যে কত দ্রুত কিরূপ একান্ত হইয়া উঠিতে পারে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়।

আজ তাহার প্রতি চাহিয়া হঠাৎ কে বলিবে এ সেই সৌন্দর্যের প্রতিমা কিরণময়ী! ছয় মাস পূর্বে সেই যে একদিন সে সমাজকে ধর্মকে ব্যঙ্গ করিয়া মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া এক অবোধ অপরিণামদর্শী যুবককে রূপ ও ভালবাসার মোহে প্রতারিত করিয়া তাহার সর্বপ্রকার সার্থকতা হইতে বিচ্যুত করিয়া আনিয়াছিল, আজ সেই প্রতারণার ফাঁসিই কিরণময়ীর নিজের গলায় আঁটিয়া বসিয়াছে।

পাপের সহিত নিষ্ফল ক্রীড়া করিতে গিয়া সেই দিবাকরের বুকের ভিতর হইতেই আজ বাসনার যে রাক্ষস বাহির হইয়া আসিয়াছে, আত্মরক্ষা করিতে তাহারই সহিত অহর্নিশি লড়াই করিতে করিতে কিরণময়ী আজ ক্ষত-বিক্ষত।

তাহার মাথার চুলগুলা রুক্ষ, বিপর্যস্ত, বস্ত্র মলিন ও জীর্ণ, মুখের উপর কি এক-প্রকারের শুষ্ক ক্ষুধা যেন হতাশ্বাসের শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছে, দেহের সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া কদর্য শ্রীহীনতায় দৃষ্টি পীড়িত হয়—সেই মূর্তিমতী অলক্ষ্মীর মত সে ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দায় একটা খুঁটি ঠেস দিয়া উভয়ের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিবামাত্র ক্ষুধার্ত দিবাকর গর্জন করিয়া উঠিল।

নির্লজ্জতার অন্ত নাই। সেই মুখচোরা দিবাকর যে আজ একবাড়ি লোকের সামনে

এই ভাষা হাঁকিয়া উচ্চারণ করিতে পারে, তাহা প্রত্যয় করা সহজ নয়। কিন্তু বাস্তবিকই সে চীৎকার করিয়া কহিল, কি গো বৌঠান, তাই নাকি? এখন মারোয়াড়ী, মুসলমান, মগ, মাদ্রাজী—এদের দরকার নাকি? ওঃ—তাই দিনরাত ঝগড়া? তাই আমি হয়েছি দু'চক্ষের বিষ?

কিরণময়ী প্রথমটা যেন কিছু বুঝিতে পারিল না এমনিভাবে শুধু চাহিয়া রহিল। কিন্তু তাহার জবাব দিল বাড়িউলী। সে এক-পা আগাইয়া আসিয়া হাত নাড়িয়া চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিল, কেন চাইবে না শুনি? আমরাও আর গেরস্তর মাঠাকরুন নই গো, যে একজনকেই কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। আমরা হলুম সুখের পায়রা—বেবুশ্যে! যেখানে যার কাছে সুখ পাব, সোনা-দানা পাব, তার কাছেই যাব। এতে লজ্জাই বা কি, আর ঢাকাঢাকিই বা কিসের জন্য!

দিবাকর ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল, তুই থাম্ মাগী! যাকে জিজ্ঞাসা করচি সে বলুক।

এবার বাড়িউলীও বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল, মারমুখী হইয়া কহিল, কি! আমার বাড়িতে দাঁড়িয়ে আমাকে মাগী! বেরো বলচি আমার বাড়ি থেকে।

দিবাকরও রুখিয়া উঠিল। ছয় মাস পূর্বে তাহার অতি বড় দুঃস্বপ্নেও বোধ করি কল্পনা করা সম্ভবপর হইত না যে, সে একটা অন্ত্যজ গণিকার মুখে এতখানি অপমানের পরেও কোমর বাঁধিয়া তুই-তোকারি করিয়া বিবাদ করিতেছে! কিন্তু, সে ত আর উপেন্দ্র-সুরবালার স্নেহে, শাসনে, লালিত-পালিত সে দিবাকর নাই! তাই, সেও চোখ-মুখ রাঙ্গা করিয়া গর্জাইয়া উঠিল, কি! আমাকে বেরো? ভাড়া খাসনে তুই?

বাড়িয়ালী ঠিক তেমনি তর্জন করিয়া কহিল, ইস্! ভাড়া দেনেবালা! তোকে ছি! তোর গলায় দেবার দড়ি জোটে না রে! বেরো বলচি, নইলে ঝাঁটা মেরে দূর করব।

আচ্ছা, বের করাচ্চি! বলিয়া দিবাকর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া উন্মত্তপ্রায় দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিয়া নির্বাক্ কিরণময়ীকে সজোরে ধাক্কা মারিল। সমস্তদিন ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত, অবসন্ন কিরণময়ী সে ধাক্কা সামলাইতে পারিল না, প্রথমটা গিয়া সে একটা রঙের শূন্য বালতির উপর পড়িয়া তথা হইতে গড়াইয়া একটা ঘুঁটের ঝুড়ির উপরে মুখ গুঁজিয়া পড়িল।

উন্মত্ত দিবাকর বলিল, যাও বেরোও। কে তোমার মারোয়াড়ী আছে,—দূর হও। বলিয়া ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিল।

বাড়িউলি বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। কারখানা হইতে সদ্যপ্রত্যাগত পুরুষের দল যে-যাহার হাত-মুখের কালিঝুলি প্রক্ষালিত করিতেছিল, চীৎকারে চকিত হইয়া হাতের সাবান ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। বাড়িউলী সুউচ্চ নাকীসুরে নালিশ করিতে লাগিল—বৌটাকে মেরে ফেলেছে গো! হতভাগা ছোঁড়াটাকে তোমরা মারতে মারতে দূর করে দাও—আর না আমার বাড়ি ঢোকে।

বাড়িউলীর আদেশে তাহারা ভিড় করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেই কিরণময়ী মাথায় আঁচল তুলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, ঝগড়াঝাঁটি কার ঘরে না হয়? আমার গায়ে হাত দিয়েচে তা তোমাদের কি? তোমরা ঘরে যাও, বলিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িয়া নিজের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া খিল বন্ধ করিয়া দিল।

লোকগুলা বিক্রম-প্রকাশের সুযোগ হারাইয়া ক্ষুণ্নমনে ফিরিয়া গেল। বাড়িউলী বাহিরে দাঁড়াইয়া গালে হাত দিয়া শুধু বলিল, অবাক কাণ্ড!

দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিরণময়ী দেশলাই বাহির করিয়া আলো জ্বালিল। কাঠের ঘর অপ্রশস্ত হইলেও দীর্ঘ, একধারে দড়ির খাটের উপর দিবাকরের শয্যা, অপর প্রান্তের কাঠের মেঝের উপর কিরণময়ীর বিছানাটি গুটান রহিয়াছে। পায়ের দিকে কতকগুলি হাঁড়ি-কলসী উপরি উপরি সাজানো এবং সেই কোণেই কাঠের শিকায় রান্নার হাঁড়ি, কড়া, চাটু প্রভৃতি তোলা রহিয়াছে। ইহাই তাহাদের গৃহস্থালীর সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম।

আলো জ্বালিয়া কিরণময়ী দ্বারের কাছে মেঝের উপর স্থির হইয়া বসিল। কাহারও মুখে কথা নাই—খাটের উপর দিবাকর ঘাড় গুঁজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া,—এমনি বহুক্ষণ

পর্যন্ত উভয়েই নিঃশব্দে বসিয়া থাকার পরে কিরণময়ী ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া সহজভাবে কহিল, হাঁড়িতে ভাত রান্না আছে, বেড়ে দিই, খাও।

দিবাকর রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, না।

তাহার কণ্ঠস্বরে বোধ হইল, এতক্ষণ সে নীরবে কাঁদিতেছিল।

কিরণময়ী বলিল, না কেন? সারাদিন খাওনি, আজ না খেলেও কাল খেতে হবে। খাওয়া-পরার উপর রাগ করা কারও চলে না—হাত-মুখ ধুয়ে এসে যা পারো দুটি খাও—আমি ভাত বেড়ে দিচ্চি।

দিবাকর সাড়া দিতে পর্যন্ত পারিল না। লজ্জায় অনুশোচনায় সে পুড়িয়া যাইতেছিল। সে সত্যই কিরণময়ীকে ভালবাসিয়াছিল।

এখানে আসা অবধি অনেকদিন পর্যন্ত বাহিরের কেহ জানিতে না পারিলেও, ভিতরে অত্যন্ত সংগোপনে আসক্তি ও বিরক্তির যে নির্মম সংগ্রাম উভয়ের মধ্যে প্রত্যহ ঘটিতেছিল, তাহার সমস্ত অভিঘাতই দিবাকর নীরবে সহ্য করিয়াছিল।

কিছুদিন হইতে এই সমর প্রকাশ্য ও অত্যন্ত দুর্বার হইয়া উঠিবার মধ্যেও এমন উত্তেজনা বহুবার ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু, আজিকার পূর্বে কোনদিন সে এইরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়া এতবড় পাশব আচরণ করে নাই। বস্তুতঃ, কোন কারণে কোন অত্যাচারের ফলেই সে যে কিরণময়ীর গায়ে হাত তুলিতে পারে, এবং সত্য সত্যই এইমাত্র তুলিয়াছে, তাহা এখনও সে ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। তাই, ঘরে ঢুকিয়া সে স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহার বিছানায় আসিয়া বসিয়া ছিল। কিন্তু ক্ষণেক পরেই কিরণময়ী যখন নিজের সমস্ত লাঞ্ছনা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাড়ির লোকের আক্রমণ ও নির্যাতন হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া ঘরে ঢুকিয়া খিল দিল, তখনই শুধু তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। কিরণময়ীর অনুরোধ শেষ না হইতেই তরঙ্গ যেমন শৈলমূলে আছাড় খাইয়া পড়ে, তেমনি করিয়া সজোরে এই রমণীর পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। বলিল, আমি পশু, আমাকে মাপ কর বৌদি।

কিরণময়ী কিছুক্ষণ নির্বিকার স্তব্ধ থাকিয়া আগের মতই সহজ-কণ্ঠে কহিল, তোমার একার দোষ নয়, মানুষমাত্রকেই এ-সব কাজ পশু করে ফেলে। আমাকেও একতিল কম পশু করেনি ঠাকুরপো!

দিবাকর প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, না না, অন্য কারও কথায় আমার কাজ নেই, বৌদি, কিন্তু আমার আজকের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি করে? আমাকে বলে দাও,—আমি তাই প্রাণপণে করব।

কিরণময়ী কহিল, অপরাধ আবার কি? শোননি, এতে মানুষে মানুষকে খুন করে ফেলে? তুমি ত শুধু ঠেলে দিয়েছ,—অপরাধ আমি করিনি? সব কি কেবল তোমারই দোষ? কিন্তু, যাক গে এ-সব। সমস্ত অভিযোগ অনুযোগের আজ শেষ হয়ে গেছে—এতে তোমারও ভবিষ্যতে আর দরকার হবে না, আমারও না। এখন যাও, হাত-মুখ ধুয়ে এসে ভাত খেতে বসো। আমি যেন আর দাঁড়াতে পাচ্চিনে।

দিবাকর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। কিরণময়ীর কণ্ঠস্বরে সে বুঝিয়াছিল, আর কথাবার্তা কহিতেও সে ইচ্ছুক নয়।

সমস্তদিন উপবাসের পর দিবাকর খাওয়া শেষ করিয়া বাহিরে আঁচাইতে গেল। তাহার মনের গ্লানিটাও কমিয়া আসিয়াছিল। আঁচাইয়া হৃষ্টচিত্তে ঘরে ঢুকিয়া একটু আশ্চর্য হইয়াই দেখিল কিরণময়ী তাহার বিছানাটা গুটাইয়া খাট হইতে নীচে নামাইয়া রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, নামাচ্চ কেন?

কিরণময়ী অবিচলিত-স্বরে কহিল, আগে বললে হয়তো তোমার খাওয়া হতো না, তাই বলিনি। আজ থেকে আমাদের মধ্যে আর দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। রাত এখনো বেশী হয়নি, আজকের মত কালীবাড়িতে গিয়ে শোও গে, কাল সুবিধে মত একটা বাসা খুঁজে নিয়ো। আর যদি এ দেশে না থাকতে চাও, পরশু স্টীমার আছে, আমি টাকা দেব, দেশে ফিরে যেয়ো। মোট কথা, যা ইচ্ছে হয় করো, আমার সঙ্গে আর তোমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

দিবাকর হতজ্ঞানের মত কথাগুলা শুনিয়া যাইতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, কিরণময়ীর মমতা-লেশহীন এক-একটি শব্দ যেন কঠিন পাষাণখণ্ডের মত তাহাদের মাঝখানে চিরদিনের অভেদ্য প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিতেছে।

তাহার কথা শেষ হইলে, সে স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, আর তুমি?

কিরণময়ী কহিল, আমার কথা শুনে তোমার লাভ নেই, তবে এ দেশে যদি থাকো, কাল-পরশু শুনতেই পাবে।

দিবাকর কহিল, তা হলে বাড়িউলীর কথাই সত্যি—সেই খোট্টা মারোয়াড়ীটাই—

কিরণময়ী কঠিনস্বরে জবাব দিল, হতেও পারে। কিন্তু, আর যাই হোক, তোমার কাঁধে ভর দিয়ে অধঃপথে নেমেছিলুম বলেই যে তার শেষ ধাপটি পর্যন্ত তোমাকেই আশ্রয় করেই নামতে হবে, তার কোন মানে নেই। আমার শরীর ভাল নেই, এখুনি শুয়ে পড়ব—আর তুমি অনর্থক দেরি করো না, যাও! কাল সকালে তোমার জিনিসপত্র তোমাকে পাঠিয়ে দেব।

দিবাকর কহিল, এত তাড়া! আজ রাত্রের মতও আমাকে তুমি থাকতে দেবে না?

কিরণময়ী কহিল, না।

দিবাকর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, তা হলে আমার শুধু সর্বনাশ করবার জন্যই এই বিপদে টেনে এনেছিলে? কোনদিন ভালও বাসনি?

কিরণময়ী কহিল, না; কিন্তু তোমার নয়, আর একজনের সর্বনাশ করচি ভেবেই তোমার ক্ষতি করেচি। আর আমার? যাক আমার কথা। সমস্তই আগাগোড়া ভুল হয়ে গেছে। আর, এই ভুলের জন্যেই আজ তোমার পায়ে ধরে মাপ চাচ্চি ঠাকুরপো।

এই নির্বিকার পাষাণ-প্রতিমার মুখের প্রতি চাহিয়া দিবাকর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আমার সর্বনাশের ধারণা নেই তোমার, তাই তুমি এত সহজে মাপ চাইতে পারলে। কিন্তু, এই সর্বনাশের চেয়েও আজ আমার ভালবাসা অনেক বড়, তাই এখনো বেঁচে আছি, নইলে বুক ফেটে মরে যেতুম। কিন্তু একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে বলো। যার কাছে তুমি যাবে, তাকেও ত ভালবাস না, হয়ত চেনোও না, তবু আমাকে ছেড়ে সেখানে যেতে চাও কেন? আমি ত কোনদিন তোমার কোন অনিষ্ট করিনি! কিন্তু সত্যিই কি যাবে?

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সত্যিই যাব। তার পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত মাটির দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, না, আজ আর কিছুই গোপন করব না। আমি ভগবান মানিনে, আত্মা মানিনে, জন্মান্তর মানিনে, স্বর্গ নরক ও-সব কিছুই মানিনে—ও সমস্তই আমার কাছে ভুয়ো, একেবারে মিথ্যে। মানি শুধু ইহকাল, আর এই দেহটাকে। জীবনে কেবল একটা লোকের কাছে একদিন হার মেনেছিলুম—সে সুরবালা। কিন্তু সে কথা থাক। সত্যি বলচি ঠাকুরপো, আমি মানি শুধু ইহকাল, আর এই সুন্দর দেহটাকে। কিন্তু আমার এমনি পোড়াকপাল যে, এই দিয়ে অনঙ্গের মত পতঙ্গটাকেও একদিন মজাতে চেয়েছিলুম।—বলিয়া ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কিরণময়ী স্তব্ধ হইয়া রহিল।

মিনিট-দুই স্থির থাকিয়া সে সহসা যেন জাগিয়া উঠিয়া কহিল, তার পরে একদিন—যেদিন সত্যি সত্যিই ভালবাসলুম ঠাকুরপো, সেদিনই টের পেলুম, কেন আমার সমস্ত দেহটা এতদিন এমন করে এর জন্যে উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করেছিল!

দিবাকর ব্যগ্র হইয়া কহিল, কাকে ভালবাসলে বৌদি?

কিরণময়ী একটু হাসিয়া, যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল, ভেবেছিলুম, আমার এ ভালবাসার তুলনা বুঝি তোমাদের স্বর্গেও নেই। কিন্তু সে গর্ব টিকল না। সেদিন মহাভারতের গল্প নিয়ে সেই যে মেয়েটার কাছে হেরে এসেছিলুম, আবার তার কাছেই হার মানতে হলো—ভালবাসার দ্বন্দ্বেও মাথা হেঁট করে ফিরে এলুম। মোহের ঘোর কেটে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, তাকে রূপ দিয়ে ভোলাতে পারি এ সাধ্য আমার নেই।

দিবাকরের একবার মনে হইল তাহার নিবিড় অন্ধকার বুঝি স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে।

কিরণময়ী কহিতে লাগিল, সেই মেয়েটির কাছে একটা জিনিস শেখবার বড় লোভ

হয়েছিল—সে আমার আপন স্বামীকে ভালবাসা—হয়ত শিখতেও পারতুম, কিন্তু, এমনি পোড়া অদৃষ্ট, সে পথও দুদিনে বন্ধ হয়ে গেল। ভাল কথা, কি জিজ্ঞাসা করছিলে ঠাকুরপো, তোমাকে ভালবাসিনি কেন? কে বললে বাসিনি? বেসেছিলুম বৈ কি! কিন্তু বয়সে আমি বড়, তাই যেদিন তোমার উপীনদা আমার হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে যান, সেই দিন থেকে তোমাকে ছোটভাইটির মত ভালবেসেছিলুম। তাই ত এই ছটা মাস নিজের ছলনায় আমি ক্ষত-বিক্ষত। তোমার চোখের ক্ষুধায়, তোমার মুখের প্রেম-নিবেদনে আমার সমস্ত দেহ ঘৃণায় লজ্জায় কেমন করে শিউরে ওঠে, তা কি একটা দিনও বুঝতে পারনি ঠাকুরপো? যাও, এবার তুমি সরে যাও। আমার পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক না থাক, কিন্তু এই দেহটার ওপর তোমার লুব্ধদৃষ্টি আর আমি সইতে পারিনে। বলিয়া সে বিছানাটা তুলিয়া আনিয়া দিবাকরের সুমুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, আর তোমাকে আমার বিশ্বাস হয় না। আমার আরও একটি ছোটভাই আজও বেঁচে আছে। সেই সতীশের মুখ চেয়েও আমার চিরদিন তোমার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। তুমি যাও—

দিবাকর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বিছানাটা তুলিয়া লইয়া বাহিরের অন্ধকারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তেতাল্লিশ

সকাল বেলা কিরণময়ী শ্রান্ত অবসন্ন দেহে কাজ করিতেছিল, কামিনী বাড়িউলী আসিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইয়া একগাল হাসিয়া কহিল, গেছে ছোঁড়া? বালাই গেছে। কাল আমারে যেন মারমুখী! আরে, তোর কর্ম মেয়েমানুষ রাখা? ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো গেলে লোকে আর গোরু পুষত না।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কে বললে সে গেছে?

বাড়িউলী আসিয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, নাও আর ঢঙ করতে হবে না। কে বললে? আমি হলুম বাড়িউলী, আমাকে আবার বলবে কে গা? নিজে কান পেতে শুনেচি। নইলে কি এতকাল এ-বাড়ি রাখতে পারতুম, কোন্‌কালে পাঁচ-ভূতে খেয়ে ফেলত তা জানো?

কিরণময়ী নীরবে গৃহকর্ম করিতে লাগিল; জবাব না পাইয়া বাড়িউলী নিজেই বলিতে লাগিল, কতদিন থেকে বলচি বোমা, তাড়াও আপদটাকে। তা না, থাক কোথায় যাবে! আরে, কোথায় যাবে তার আমি জানি কি! অত ভাবতে গেলে ত চলে না। খাও, পরো, মাখো, সোনা-দানা গায়ে তোলো, সংগে সংগে পীরিতও কর। তা এ কোন্‌ দিশি ছিষ্টিছাড়া পীরিত করা বাছা!

কিরণময়ী একবারমাত্র মুখ তুলিয়াই আবার দৃষ্টি আনত করিল। বাড়িউলী বুঝিল, তাহার বহুদর্শিতার উপদেশাবলী কাজে লাগিতেছে। সতেজে কহিতে লাগিল, আর এই কি বাছা, তোমার পিরিত করবার সময়? সোমত্ত মেয়েমানুষ, এখন শুধু দু'হাতে লুটবে। তার পর দু'পয়সা হাতে করে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে ভারী বয়সে পীরিত করো না, কে তোমাকে মানা করচে! হাতে পয়সা থাকলে কি ছোঁড়ার অভাব? কত্তগন্ডা চাই? দু'পায়ে যে তখন জড়ো করে উঠতে পারবে না।

কিরণময়ী বিমনা হইয়াছিল,—কি জানি সব কথা তাহার কানে গেল কি না। কিন্তু সে কোন কথা কহিল না।

বাড়িউলীর নিজের ঘরের কাজ তখনও বাকী ছিল। তাই আর দেরি করিতে না পারিয়া দুপুরবেলায় পুনরায় আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া প্রস্থান করিল।

এ বাটীর সকলেই প্রায় কারখানায় চাকরি করে। সকালে কাজে যায়, দুপুরবেলা খাইবার ছুটি পাইয়া ঘরে আসে এবং স্নানাহার সারিয়া পুনরায় কাজে গিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেদিনের মত অবসর পায়।

আজও সকালে কাজে চলিয়া গেলে বেলা দুটো-আড়াইটার পর বাড়িউলী আসিয়া পুনরায় দরজার কাছে দাঁড়াইল। স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, খাওয়া হলো বোমা? কি রাঁধলে

কিরণময়ী আজ উনানে আগন্ন পর্যন্ত দেয় নাই, তথাপি বাড়িউলীর প্রশ্নে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ হয়েচে। এসো, বসো।

বাড়িউলী দরজার কাছে আসন গ্রহণ করিল। সে ঘরে ঢ্ৰকিয়াই ব্ৰঝিয়াছিল কিরণময়ীর মন ভাল নাই, তাই সহান্ৰভ্ৰতির স্বরে কহিল, তা হবে বৈ কি বাছা, দ্ৰ'দিন মনটা খারাপ হবে। একটা পশ্ৰ-পক্ষী প্ৰষলে মন কেমন করে, তা এ ত মান্ৰষ। যেমন করে হোক, ছ-সাতটা মাস ঘর-সংসারও ত করতে হয়েচে! তা ঐ দ্ৰটো দিন—তিন দিনের দিন আর কেউ নাম-গন্ধও করে না বৌমা, চোখের ওপর কত গণ্ডা দেখল্ৰম।

কিরণময়ী জোর করিয়া একট্ৰ হাসিয়া কহিল, সে ত সত্যিই।

বাড়িউলী চোখ-ম্ৰখ ঘ্ৰরাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিধ্বনি করিল, সত্যি নয়? তুমিই বল না বাছা, সত্যি নয় কি! আবার নতুন মান্ৰষ আস্ৰক, নতুন করে আমোদ-আহ্লাদ কর,—বাস্, সব শ্ৰধরে গেল! কি বল, এই নয়?

কিরণময়ী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল বটে, কিন্তু এই গায়ে-পড়া আলাপে ক্রমশঃ চিত্ত তাহার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল।

অকস্মাৎ বাড়িউলী চোখ-ম্ৰখ কুঞ্চিত ও গলা খাটো করিয়া কহিল, ভাল কথা মনে পড়েচে বৌমা, খোট্টা মিন্‌সেকে ত সকালেই খবর পাঠিয়েছিল্ৰম। ব্যাটার আর তর্ সয় না, বলে, লোকজন কাজে বেরিয়ে গেলে দ্ৰপ্ৰরবেলাতেই আসব। কি জানি, এখ্ৰনি এসে পড়বে নাকি—

কিরণময়ী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল—এখানে কেন?

বাড়িয়ালী কথাটাকে অত্যন্ত কৌতুকের মনে করিয়া কৃত্রিম ক্রোধের ছলে কহিল, আ মর্ ছ্ৰ্ঁড়ি, সে আসবে না ত কি তুই সেখানে যাবি নাকি? তোর কথা শ্ৰনলে যে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ী ছি'ড়ে যায়। বলিয়া শ্ৰষ্ক হাসির ছটায় ঢলিয়া একেবারে কিরণময়ীর গায়ের উপর গিয়া পড়িল।

কিরণময়ী কথা কহিল না, শ্ৰধ্ৰ একট্ৰখানি সরিয়া বসিল। বাড়িউলী আত্মীয়তার আবেশে আজ প্রথম তাহাকে 'তুই' সম্বোধন করিয়াছিল।

কিন্তু, সখিত্বের এই একান্ত মাখামাখি সম্ভাষণ এই ইতর স্ত্রীলোকটার ম্ৰখ হইতে কিরণময়ীর কানের ভিতর গিয়া একেবারে তীরের মত বি'ধিল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে আজিও যে মহিমা ম্ৰর্ছাহতের মত পড়িয়া ছিল, এই একটিমাত্র শব্দের কঠিন পদাঘাতে তাহার ঘ্ৰম ভাঙ্গিয়া গেল এবং ম্ৰহ্ৰর্তমধ্যেই ভদ্রনারীর ল্ৰপ্ত মর্যাদা তাহার মনের মধ্যে দ্ৰপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তব্ৰও সে আত্মসংবরণ করিয়া চ্ৰপ করিয়াই রহিল।

বাড়িউলী ইহার কিছ্ৰই লক্ষ্য করিল না, সে আপনার ঝোঁকেই বলিয়া যাইতে লাগিল, তুই দেখিস দিকিন বৌ, ছ'মাসের মধ্যে যদি না তোর বরাত ফিরিয়ে দিতে পারি ত, আমার কামিনী বাড়িউলী নাম নয়। তুই শ্ৰধ্ৰ আমার কথামত চলিস্—আর আমি কিছ্ৰই চাইনে।

কিরণময়ীর মনে হইল, ঐ স্ত্রীলোকটা তাহার কানের সমস্ত স্নায়্ৰশিরা যেন পোড়ানো সাঁড়াশি দিয়া ছি'ড়িয়া বাহির করিতেছে, কিন্তু নিষেধ করিবার কথা তাহার ম্ৰখে ফ্ৰটিল না। শ্ৰধ্ৰ চ্ৰপ করিয়া শ্ৰনিতেই লাগিল।

বাড়িউলী কহিল, খোট্টা মারোয়াড়ী; দ্ৰ'পয়সা আছে। ঝোঁকে পড়েচে, দ্ৰ'হাত দিয়ে দ্ৰয়ে নে; তার পর যাক না বেটা গোল্লায়,—আবার কত এসে জ্ৰটবে। এমন হয়ে আছিস তাই,—নইলে তোর র্ৰপটা কি সোজা র্ৰপ বৌ!

এমনি সময়ে বাহিরের বারান্দার প্রান্ত হইতে ভাঙ্গা-গলার ডাক আসিল, বাড়িউলী?

এই যে যাই, বলিয়া সাড়া দিয়া বাড়িউলী বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই কিরণময়ী দ্ৰই হাত বাড়াইয়া তাহার আঁচলটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, না না, এখানে কিছ্ৰতেই না—এ ঘরে কেউ যেন না ঢোকে।

বাড়িউলী হতব্ৰদ্ধি হইয়া কহিল, কেন? কে আছে এখানে?

কিরণময়ী দ্ৰঢ়কণ্ঠে কহিল, কেউ থাক, না থাক—এখানে না—কিছ্ৰতেই না—

আগন্তক লোকটার পদশব্দ ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

বাড়িউলী অবাক হইয়া কহিল, তুই ত আর কারো কুলের বৌ ন'স! মানুষ-জন তোর ঘরে আসবে, বসবে, তাতে ভয়টা কাকে শুনি? তুই হলি বেবুশ্যে।

কিরণময়ী চীৎকার করিয়া উঠিল, কি আমি? আমি বেশ্যা?

তাহার মনে হইল, বজ্রাগ্নি-রেখা তাহার পদতল হইতে উঠিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ করিয়া বুঝি বাহির হইয়া গেল।

তাহার আঁরক্ত চক্ষু ও তীব্র কণ্ঠস্বরে বাড়িউলী বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া কহিল, তা নয় ত কি বল্? ন্যাকামি দেখলে গা জ্বালা করে—এখন আমরাও যা, তুইও সেই পদার্থ। ভদ্দরনোক আসচে, নে ঘরে বসা।

এই 'ভদ্দরনোক'টির কাছে বাড়িউলী টাকা খাইয়াছিল এবং আরও কিছুর প্রত্যাশা রাখে। ভদ্রলোক দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, কেয়া বাড়িউলী, খবর সোব ভাল?

বাড়িউলী আঁচল টানিয়া লইয়া বিনয়-সহকারে কহিল, যেমন তোমাদের মেহেরবানি। যাও, ঘরে গিয়ে বসো গে—আমি পান সেজে আনি। একটু হাসিয়া বলিল, এখন এ ঘর-দোর সব তোমার বাবুজী; ভাল করে সাজিয়ে গুজিয়ে দিতে হবে তা কিন্তু বলে রাখচি।

আচ্ছা আচ্ছা, সে সোব হোবে, বলিয়া লোকটা বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া ঘরে ঢুকিয়া খাটের উপর বসিতে গেল।

কিরণময়ীর স্নায়ু-শিরার সহিষ্ণুতা ইস্পাতের অপেক্ষাও দৃঢ়, তাই এতক্ষণ পর্যন্ত বরদাস্ত করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আর পারিল না। তাহার রূপ-যৌবনের এই অপরিচিত হিন্দুস্থানী খরিদ্দারের গৃহ-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই সে চৈতন্য হারাইয়া বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

লোকটা চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিয়া এই আকস্মিক বিপৎপাতে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। বাড়িউলীর প্রবল চীৎকারে বাড়ির সমস্ত স্ত্রীলোক কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া মুহূর্তে ছুটিয়া আসিয়া পড়িল এবং কেহ জল, কেহ পাখা লইয়া হতভাগিনীর শুশ্রূষা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

আর বাড়িউলী দোরগোড়ায় বসিয়া তারস্বরে অবিশ্রাম ঘোষণা করিতে লাগিল, সে এই কাজে চুল পাকাইয়া ফেলিল বটে, কিন্তু, এখনও এত নষ্টামি, এত ঢঙ শিখিতে পারে নাই। আজও নাগর দেখিয়া দাঁত-কপাটি লাগাইবার কৌশল তাহার আয়ত্ত হয় নাই।

অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনার মধ্যে আবার এক নূতন গোলমাল শোনা গেল। সদর দরজায় কে একটা নূতন বাবু আসিয়া দিবাকর ও বৌঠানের নাম ধরিয়া মহা হাঙ্গামা বাধাইয়া দিয়াছে খবর আসিল। চাকরটার কাছে বাড়িউলী আগন্তুক বাবুর সবিশেষ পরিচয় গ্রহণ করিতে করিতেই এক দীর্ঘকায় পুরুষ প্রকাণ্ড একটা চামড়ার ব্যাগ বামহস্তে স্বচ্ছন্দে বহন করিয়া লইয়া সম্মুখে আসিয়া গম্ভীরকণ্ঠে ডাক দিল, বৌঠান!

তাহার ডান হাতের আঙুলে প্রকাণ্ড একটা হীরার আংটি রবিকরে ঝলমল করিয়া উঠিল, বাড়িউলী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া বলিল, কাকে খুঁজছেন?

দিবাকর থাকে এখানে?

বাড়িউলী বলিল, না।

আমার বৌঠান? কিরণময়ী বৌঠান? কোন্ ঘরে থাকেন?

বাড়িউলীর সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই-চারিজন কৌতূহলী স্ত্রীলোক গলা বাড়াইয়া দেখিতেছিল, কে একজন কহিল, সেই ত মূর্ছা হয়েছে গো।

মূর্ছা হয়েছে? কৈ দেখি, বলিয়া আগন্তুক ভদ্রলোক তিন লাফে ভিড় ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। অচেতন কিরণময়ী তখন মাটিতে পড়িয়া। সর্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে—চক্ষু মুদ্রিত, মুখ পাংশু, চুলের রাশি সিক্ত বিপর্যস্ত, অঙ্গের বসন স্রস্ত—

আগন্তুক সতীশ। তাহার চোখ পড়িল হিন্দুস্থানীটার উপর। এতক্ষণ সে কাছে সরিয়া আসিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে কিরণময়ীর প্রতি চাহিয়াছিল। সতীশ বিস্মিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন করিল, এই, তুম্ কোন্ হ্যায়?

তাহার হইয়া বাড়িউলী জবাব দিল, আহা উনি যে আমাদের মারোয়াড়ীবাবু গো। ঐ যে—

কিন্তু পরিচয় দেওয়া শেষ হইবার পূর্বেই সতীশ লোকটাকে দরজা নির্দেশ করিয়া কহিল, বাহার যাও—

মারোয়াড়ীর টাকা আছে, সে নবীন প্রেমিক, বিশেষতঃ এতগুলো স্ত্রীলোকের সামনে সে হীন হইতেও পারে না, সুতরাং সাহসে ভর করিয়া কহিল, কাহে?

অসহিষ্ণু সতীশ কাঠের মেঝের উপর সজোরে পা ঠুকিয়া ধমক দিল, বাহার যাও উল্লু!

সমস্ত লোকগুলোর সঙ্গে সমস্ত বাড়িটা পর্যন্ত চমকাইয়া উঠিল, এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া মারোয়াড়ী বাহির হইয়া গেল।

সতীশ কিরণময়ীর দেহের উপর তাহার স্খলিত বস্ত্র তুলিয়া দিয়া নিজেই একটা হাতপাখা লইয়া সবেগে বাতাস করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া সমবেত নারীমণ্ডলী বিচিত্র কলরব করিতে লাগিল। ইহাদের নানাবিধ আলোচনার মধ্য হইতে সতীশ অল্পকালের মধ্যে অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিয়া লইল। বাড়িউলী আক্ষেপ এবং অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বার বার বলিতে লাগিল, সে তাহার পিতাঠাকুরের বয়সেও এমন সৃষ্টিছাড়া মেয়েমানুষ দেখে নাই যে, বেবুশ্যেকে বেবুশ্যে বলিলে তাহার চোখ উলটাইয়া দাঁত-কপাটি লাগিয়া যায়।

মিনিট-কুড়ি পরে সংজ্ঞা পাইয়া কিরণময়ী মাথার বসন তুলিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। ক্ষণকাল একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, ঠাকুরপো?

সতীশ প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলো মাথায় তুলিয়া লইয়া কহিল, হাঁ বৌঠান, আমি। কিন্তু কি কাণ্ড বল ত। যেমন কাপড়-চোপড়, তেমনি ঘরদোর, তেমনি শ্রী,—কে বলবে যে ইনি সতীশের দিদি! যেন কোথাকার একটা অনাথা পাগলী! ছেলেমানুষী ত ঢের হলো, এখন কালকের জাহাজে বাড়ি চল। মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিল, আর দরকার নেই, তোমরা ঘরে যাও।

কিরণময়ী নিশ্চল পাষাণ-মূর্তির মত অধোমুখে চাহিয়া রহিল। তাহার অন্তরের কথা অন্তর্যামীই জানুন, কিন্তু বাহিরে লেশমাত্র ব্যক্ত হইল না।

মেয়েরা বাহির হইয়া গেলে সতীশ কহিল, সে শুয়োর কৈ বৌঠান?

কিরণময়ী মুখ না তুলিয়াই কহিল, এতদিন ত এইখানেই ছিল, কাল রাত্রে অন্যত্র গেছে।

কেন?

আমি চলে যেতে বলেছিলুম বলে।

কিন্তু ডাকলে কি একবার আসে না?

ডাকিয়ে দেখচি, বলিয়া কিরণময়ী বাহিরে গিয়া বাড়ির চাকরকে কালীবাড়ি পাঠাইয়া দিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বসিল। কহিল, তুমি আসবে এ আমার স্বপ্নের অতীত ঠাকুরপো।

সতীশ কহিল, আমার আসাটা কি আমার নিজেরই স্বপ্নের অতীত নয় বৌঠান?

তা বটে, বলিয়া কিরণময়ী আবার ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অনেক কথাই জানিবার আবশ্যক ছিল, সতীশ যে তাহাদের বাটীর মুক্ত দাসীর কাছে সন্ধান লইয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝা শক্ত নয়, কিন্তু অকস্মাৎ এতকাল পরে অনুসন্ধান করিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইতে এতদূরে আসার যথার্থ হেতু অনুমান করা সত্যই কঠিন।

কিন্তু আসিবার হেতু সতীশ নিজেই ক্রমশঃ ব্যক্ত করিল, কহিল, কাল জাহাজ আছে, তোমাদের নিতে এসেচি বৌঠান।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া কহিল, উপীনঠাকুরপো পাঠিয়েছেন ত? বেশ, দিবাকরকে নিয়ে যাও। প্রার্থনা করি সে যেন যেতে পারে।

সতীশ কহিল, শুধু পরের হুকুম তামিল করতেই এতদূরে আসিনি, আমার নিজের তরফ থেকেও বড় তাগিদ আছে। ভাবচ, তবে এতকাল পরে কেন? খবর পাইনি। তার পরে বাবা মারা গেলেন, নিজেও যেতে বসেছিলুম, হয়ত আর দেখাই হতো না।

কিরণময়ী মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া জগতের সমস্ত স্নেহ যেন সতীশের সর্বাঙ্গে বর্ষিত হইল। ক্ষণকাল পরে করুণ-কণ্ঠে কহিল, আমি কার কাছে যাব ঠাকুরপো, আমার কে আছে?

আমার কাছে যাবে বৌঠান, আমি আছি।

কিন্তু আমাকে আশ্রয় দেওয়া কি ভাল হবে?

সতীশ কহিল, তোমার কি মনে নেই বৌঠান, অনেকদিন আগে এই ভাল-মন্দ একদিন চিরকালের জন্য স্থির হয়ে গিয়েছিল, যেদিন ছোটভাই বলে আমাকে ডেকেছিলে? অন্যায় যদি কিছু করে থাকো, তার জবাব দেবে তুমি, কিন্তু আমার জবাবদিহি এই যে, আমি ছোটভাই,—তোমাকে বিচার করবার অধিকার আমার নেই।

কথা শুনিয়া কিরণময়ীর মনে হইতে লাগিল, কোথাও ছুটিয়া গিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া আসে, কিন্তু আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, কিন্তু ঠাকুরপো, সমাজ আছে ত?

সতীশ বাধা দিয়া বলিল, না. নেই। যার টাকা আছে, গায়ের জোর আছে, তার বিরুদ্ধে সমাজ নেই। ও দুটো জিনিসই আমার একটু বেশী রকম যোগাড় হয়ে গেছে বৌঠান।

তাহার কথা বলার ভঙ্গীতে কিরণময়ীর মুখে হাসি আসিল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ঠাকুরপো, টাকা আর গায়ের জোরে তুমি সমাজ না মানতে পার, কিন্তু নিজের অশ্রদ্ধার হাত থেকে এই পাপিষ্ঠাকে বাঁচাবে কি করে?

সতীশ অধীর হইয়া বলিয়া উঠিল, আমি লেখাপড়া শিখিনি, আমি গোঁয়ার মুখ্যু-মানুষ বৌঠান, অত তর্কের জবাব দিতেও আমি পারিনে, অত চুলচেরে লোকের ভাল-মন্দর হিসেব করতেও আমি জানিনে। আর, এ কি সত্য যুগ যে, পৃথিবীসুদ্ধ সবাই উপীনদার মত যুধিষ্ঠির হয়ে বসে থাকবে? এ হলো কলিকাল, অন্যায়-অকাজ ত লোকে করবেই! তার কে আবার জমাখরচ খতিয়ে বসে আছে? আমার উলটো বিচার, তা ভালই বল আর মন্দই বল বৌঠান, আমি দেখি কে কি কাজ করেচে! হারাণদার মৃত্যুকালে তোমার সেই স্বামিসেবা, সে ত আমিই চোখে দেখেচি। সেই তুমি হবে অসতী! এ আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করব না। তা সে যাই হোক, নিয়ে তোমাকে আমি যাবই। অসুখটায় একটু কাহিল আমাকে করেচে বটে, তা এ-পাড়ার লোকের সাধ্যি নেই যে, তোমাকে সাহায্য করে আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। কাল তোমাকে কাঁধে করে জাহাজের ওপর আমি তুলবেই, তা সে তুমি যত আপত্তিই কর না কেন?

কিরণময়ী হাসিয়া ফেলিল। অপরাধের সমস্ত কালিমা বিদূরিত হইয়া সরল স্নিগ্ধ হাস্যচ্ছটায় তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য তাহার মনে হইল, সে যেন কোন গর্হিত কর্মই করে নাই, শুধু রাগ করিয়া দুটো দিনের জন্য শ্বশুরবাড়ি হইতে বাপের বাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল, স্নেহময় দেবর ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য সাধাসাধি করিতে বসিয়াছে।

এমনি সময়ে কবাটের বাহির হইতে ডাক দিয়া দিবাকর প্রবেশ করিল। কহিল, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলে? বলিয়াই তাহার খাটের উপর দৃষ্টি পড়ায় যেন ভূত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বাহিরের আলোক হইতে ঘরের অন্ধকারে ঢুকিয়া প্রথমে সে সতীশকে দেখিতে পায় নাই। এখন চিনিতে পারিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

সতীশ হাসিয়া কহিল, আমি উপীনদা নই রে, সতীশদা—কুকাজের রাজা। আমাকে দেখে অমন শুকিয়ে কাঠ হবার দরকার নেই। নে বস্, বস্। উপীনদার পরোয়ানা নিয়ে এসেছি, কাল ভোর সাড়ে-ছটার আগেই জাহাজ ছাড়বে মনে থাকে যেন।

দিবাকর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া অনেকক্ষণ পরে কহিল, আমি যাব না সতীশদা।

সতীশ কহিল, তোর ঘাড় যাবে। উপীনদার হুকুম—জীবিত কি মৃত, বিদ্রোহী দিবাকরের মুণ্ড চাই-ই!

দিবাকর কহিল, তবে তার মরা মুণ্ডই নিয়ে যেয়ো সতীশদা। সে আমি কাল সকালে ছ'টার মধ্যে তোমাকে অনায়াসে দিতে পারব।

সতীশ মুখে একটা আওয়াজ করিয়া বলিল, আরে বাপ রে, ছেলের রাগ দেখ! কিন্তু যাবিনে কেন?

দিবাকর কহিল, তুমি কি পাগল হয়েছ সতীশদা? সংসারে কি কেউ আছে, এর পরে তাঁর কাছে গিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে?

সতীশ বলিল, বেশ ত, মাথা উঁচু করতে আপত্তি থাকে, নীচু করে গিয়েই দাঁড়াস্। কিন্তু যেতে তোকে হবেই। আরে, তুই আর এ কি এমন বেশী করেছিস যে লজ্জায় মরে যাচ্চিস? আমি যে-সব কান্ড এর মধ্যে করে বসে আছি, সে-সব গিয়ে শুনিস। মায় 'পঞ্চমকার' পর্যন্ত! ভূত-সিদ্ধি—বেতাল-সিদ্ধি—এ-সব নাম শুনেচিস কোন কালে? নে, চল্, উপীনদা আর সে উপীনদা নেই—আমরা পাঁচজনে তাকে একরকম ঠিক করেই এনেচি। বৌঠান, যা গুছিয়ে নেবার নাও, আমি টিকিট কিনতে চললুম।

তাহার শেষ কথাটা কিরণময়ীর কানে খট করিয়া বাজিল, জিজ্ঞাসা করিল, ঠিক করে আনা কি-রকম ঠাকুরপো?

সতীশ জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, গেলেই দেখতে পাবে বৌঠান।

তাহার শুষ্ক হাসি কিরণময়ী লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত তোমাকে বলেচি ঠাকুরপো, আমি যেতে পারবো না।

দিবাকরও দৃঢ়স্বরে কহিল, আমিও কিছুতে যাব না সতীশদা, তুমি মিথ্যে আমার জন্যে টাকা নষ্ট করো না।

সতীশ উঠিতে যাইতেছিল, হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। উপেন্দ্রর পীড়ার সংবাদ এখনও পর্যন্ত সে গোপন রাখিয়াছিল, কিন্তু আর রাখা চলিল না, কহিল, আমি অনেক গর্ব করে বলে এসেচি তাদের আনবই। আমার মুখ তোমরা না হয় নাই রাখবে, কিন্তু তিনি কি তোমাদের কাছে এমন কোন গুরুতর অপরাধ করেছেন যে, এই ব্যথা তাঁকে দিতে হবে? আমি শুধু-হাতে ফিরে গেলে তাঁর যে কত বাজবে, সে ত আমি চোখে দেখেই এসেচি। দিবাকর, এত অধর্ম করিস নে রে! তোকে দেখবার জন্যই তাঁর প্রাণটা এখনো আটকে রয়েছে, নইলে অনেক আগেই যেত।

উভয় শ্রোতাই একসঙ্গে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

সতীশ কহিতে লাগিল, এই মাঘের শেষে যক্ষ্মারোগে পোশ্-বৌঠান যখন স্বর্গে গেলেন, তখনই বোঝা গেল উপীনদাও চললেন। কিন্তু তার যাবার তাড়া যে এত ছিল সে কেউ আমরা টের পাইনি। চিরকালই কম কথা কন,—স্বর্গের রথ একেবারে দোরগোড়ায় এসে হাজির না হওয়া পর্যন্ত একটা খবরও দিলেন না যে, তাঁর সমস্তই প্রস্তুত। তোর ভয় নাই রে দিবাকর, নির্ভয়ে চল্। আমাদের সে উপীনদা আর নেই। এখন সহস্র অপরাধেও আর অপরাধ নেন না,—শুধু মুচকে মুচকে হাসেন,—ছি ছি, ঐ ধুলোবালির ওপর ওখানে অমন করে শুয়ো না বৌঠান। আচ্ছা, আমরা বাইরে যাচ্চি, তুমি একটু শোও—উঠো না যেন। —বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া সতীশ পায়ের উপর একটু ঠেলা দিয়াই বুঝিল, কিরণময়ী সংজ্ঞা হারাইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে—ইচ্ছা করিয়া ভূ-শয্যা গ্রহণ করে নাই।

সতীশ এবং দিবাকর উভয়েই পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্ত-কয়েক পরে সতীশ ধীরে ধীরে কহিল, ঠিক এই ভয়ই আমার ছিল দিবাকর। আমি জানতুম এ-খবর উনি সইতে পারবেন না।

দিবাকর চকিত হইয়া সতীশের মুখের প্রতি চাহিল, সতীশ বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, এতদিন এত কাছে থেকেও কি তুই এ কথা টের পাসনি দিবা? আবার ভয় হয়, বুঝি বা বৌঠানকে আমি মেরে ফেলতেই নিয়ে যাচ্চি। কিন্তু তবুও নিয়ে যেতেই হবে। এ জগতে দুটি লোক কিছুতেই সে শোক সইতে পারবে না, কিন্তু একটি ত স্বর্গে গেছেন, আর একটি—কিন্তু যা, জল নিয়ে আয় দিবাকর, আমি বাতাস করি—ও কি রে, কথা কস্নে কেন?

অকস্মাৎ দিবাকরের আপাদমস্তক বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সে অচেতন কিরণময়ীর দুই পদতলের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, আমি সমস্ত

বুঝেচি বৌদি, তুমি আমার পূজনীয়া গুরুজন, তবে, কেন এতকাল গোপন করে আমাকে নরকে ডোবালে। আমি এ মহাপাপ থেকে কি করে উদ্ধার পাবো বৌদি!

চুয়াল্লিশ

উপেন্দ্র বলিয়াছিলেন, সাবিত্রী, হাড়-ক'খানা আমার গঙ্গায় দিস দিদি—অনেক জ্বালায় জ্বলেচি, তবু একটু ঠান্ডা হব।

সাবিত্রীকে তিনি আজকাল কখনো 'তুমি' কখনো 'তুই' যা মুখে আসিত, তাই বলিয়াই ডাকিতেন। সাবিত্রী তাঁহার সেই শেষ ইচ্ছা এবং শেষ চিকিৎসার জন্য কিছুদিন হইল কলিকাতার জোড়াসাঁকোয় একটা বাড়ি ভাড়া লইয়া আসিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার পর এক পসলা ঝাড়াবৃষ্টি হইয়া গেলেও আকাশে মেঘ কাটে নাই। উপেন্দ্র অনেকক্ষণ পরে ক্লান্ত চোখ-দুটি মেলিয়া আস্তে আস্তে কহিলেন, সুমুখের জানালাটা একটু খুলে দে দিদি, সেই বড় নক্ষত্রটি একবার দেখি।

সাবিত্রী তাঁহার কপালের রুক্ষ চুলগুলি ধীরে ধীরে সরাইয়া দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, গায়ে জোলো-হাওয়া লাগবে যে দাদা!

লাগুক না বোন! আর আমার তাতে ভয় কি?

ভয় তাঁহার শুধু আজ কেন, যেদিন হইতে সুরবালা গিয়াছে সেদিন হইতেই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সাবিত্রীর ত ভয় ঘুচে নাই। তাহার বুঝি যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণই আশ; তাই মৃত্যু যখন শিয়রের পাশে তাহার সঙ্গে সমান আসন দখল করিয়া বসিয়া গেছে, তখনও সে তুচ্ছ জোলো-হাওয়াটাকে পর্যন্ত ঘরে ঢুকিতে দিতে সাহস পায় না। অনিচ্ছুক-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু নক্ষত্র ত দেখা যায় না দাদা, আকাশে যে মেঘ করে আছে।

উপেন্দ্র ম্লান চক্ষু-দুটি উৎসাহে বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, মেঘ? আহা, অসময়ে মেঘ দিদি, খুলে দে, খুলে দে—একবার দেখে নিই, আর ত দেখতে পাব না।

বাহিরে আর্দ্র বায়ু জোরে বহিতেছিল; সাবিত্রী কপালে বুকে হাত দিয়া দেখিল জ্বর বাড়িতেছে; মিনতি করিয়া বলিল, ভাল হও, মেঘ কত দেখবে দাদা,—বাইরে ঝড় বইচে, আজ আমি জানালা খুলতে পারব না।

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া উপেন্দ্র রাগ করিয়া বলিলেন, ভাল চাস তো খুলে দে সাবিত্রী, নইলে বর্ষার দিনে যখন মেঘ উঠবে, তখন কেঁদে কেঁদে মরবি তা বলে দিয়ে যাচ্চি। আমি আর দেখবার সময় প্যাব না।

সাবিত্রী আর প্রতিবাদ না করিয়া একফোঁটা চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া গিয়া জানালা খুলিয়া দিল।

সেই খোলা জানালার বাহিরে উপেন্দ্র নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। আকাশের কোন্ এক অদৃশ্য প্রান্ত হইতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছিল, তাহারি আলোকচ্ছটায় সম্মুখের গাঢ় মেঘ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, চাহিয়া চাহিয়া উপেন্দ্রর কিছুতেই যেন আর সাধ মিটে না এমনি মনে হইতে লাগিল।

সাবিত্রী নিজেও একটা গরাদে ধরিয়া সেইদিকে চাহিয়াই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, উপেন্দ্রর দৃষ্টি হঠাৎ তাহার উপরে পড়িতে মনে মনে একটু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা দে দে, জানালা বন্ধ করে দিয়ে কাছে এসে বস। কিন্তু এত মায়া ত ভাল নয় দিদি। একটুখানি গায়ে হাওয়া লাগতে দিতে চাও না, কিন্তু আমি চলে গেলে কি করবে বল ত!

সাবিত্রী জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া কাছে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তুমি ত আমাকে কাজ দিয়ে যাবে বলেছ। আমি তাই সারাজীবন ধরে করব। তুমি আমার চোখের ওপরেই দিনরাত থাকবে!

পারবে করতে?

সাবিত্রী আস্তে আস্তে বলিল, কেন পারব না দাদা? তোমার কথায় উনি ত কখনো না বলবেন না।

উপেন্দ্র হাসিমুখে কহিল, উনি [illegible] সতীশ ত?

সাবিত্রী ঘাড় হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

উপেন্দ্র তাহার সলজ্জ মৌন মুখের পানে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, সাবিত্রী, সতীশ যে আমার কি, সে পরের পক্ষে বোঝা শক্ত। বাইরে থেকে যেটা দেখা যায়, তাতে সে আমার সঙ্গী, আমার আজন্ম সুহৃৎ। কিন্তু যে সম্বন্ধটা দেখা যায় না, সেখানে সতীশ আমার ছোটভাই, আমার শিষ্য, আমার চিরদিনের অনুগত সেবক। সেই রাত্রে তুই যদি দিদি, আত্মপ্রকাশ করে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতিস, আমার শেষ-জীবনটা হয়ত এত দুঃখে কাটত না। দিবাকরও হয়ত আমাকে এত ব্যথা দেবার সুযোগ পেত না।

সাবিত্রী সজল-চক্ষে কহিল, আমি ফেরাতে তোমাদের চেয়েছিলুম দাদা, কিন্তু উনি কিছুতেই যেতে দিলেন না, দুই চৌকাঠে হাত দিয়ে আমার পথ আটকে রাখলেন। বললেন, আমি তোমাদের সামনে গেলে তোমাদের অপমান করা হবে।

তাঁরই ইচ্ছে, বলিয়া উপেন্দ্র উপর দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া নীরব হইলেন।

বাড়িতে উপেন্দ্রর পিতা শিবপ্রসাদ বাতে শয্যাগত, তাঁহাকে এবং সংসার ফেলিয়া মহেশ্বরী সঙ্গে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু মেজভাই অভিভাবক হইয়া কলিকাতার বাসায় ছিলেন, তাঁহার এবং আর একজনের পদশব্দ সিঁড়িতে শোনা গেল।

পরক্ষণেই তিনি কবিরাজ সঙ্গে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। কবিরাজ উপেন্দ্রর নাড়ী দেখিয়া জ্বর পরীক্ষা করিয়া ঔষধ পরিবর্তন করিবার প্রস্তাব করিতেই উপেন্দ্র হাতজোড় করিয়া কহিল, ঐটে আমাকে মাপ করতে হবে কবিরাজমশাই। আপনার অগোচর ত কিছু নেই—তবে, যাবার সময়ে আর কেন দুঃখ দেবেন।

প্রাচীন চিকিৎসকের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, আমরা চিকিৎসক, আমাদের শেষ-মুহূর্তটি পর্যন্ত যে নিরাশ হতে নেই বাবা। তা ছাড়া ভগবান সমস্ত আশা শেষ করে দিলেও ত যাতনা নিবারণ করবার জন্যে ঔষধ দেওয়া চাই।

উপেন্দ্র আর প্রতিবাদ না করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

তখন ঔষধ পরিবর্তন করিয়া, ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়া বিচক্ষণ চিকিৎসক প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভরসা ত বিন্দুমাত্রও ছিল না, অধিকন্তু আজ সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া গেলেন যে, রোগীর মৃত্যুক্ষণ অত্যন্ত দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

তিনদিন পরে সোমবারের সকালবেলা সাবিত্রী একখানি টেলিগ্রাফ হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, কাল সকালে তাঁরা জাহাজে উঠেছেন।

কারও নাম দেয়নি সতীশ? কৈ দেখি?

উপেন্দ্রর প্রসারিত হাতের উপর সাবিত্রী কাগজখানি তুলিয়া দিল।

কাগজখানি তিনি উলটিয়া-পালটিয়া নিরীক্ষণ করিয়া সাবিত্রীকে ফিরাইয়া দিয়া শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। এই নিশ্বাসটুকুর অর্থ সাবিত্রীর অগোচর রহিল না।

যাবার সময় সতীশ তাহাকে নিভৃতে বলিয়া গিয়াছিল, কিরণময়ীর দেখা পাইলে সে যেমন করিয়া হোক তাহাকে ফিরাইয়া আনিবেই। তাহাদের ভাই-বোন সম্বন্ধটাও সে উল্লেখ করিয়া যাইতে ত্রুটি করে নাই।

এই পরমাশ্চর্য রমণীকে একবার চোখে দেখিবার কৌতূহল সাবিত্রীর বহুদিন হইতে ছিল, কিন্তু, পাছে কাণ্ডজ্ঞানহীন সতীশ তাহাকে এই বাটীতেই আনিয়া হাজির করে, এ আশঙ্কাও তাহার যথেষ্ট ছিল। কহিল, তিনি সব দিক বিবেচনা করে কাজ করেন না; আমার ভয় হয় দাদা, পাছে কিরণবৌঠানকে তিনি এখানেই এনে তোলেন।

উপেন্দ্রর পাংশু ওষ্ঠাধরে বেদনার একটুখানি শুষ্ক হাসি দেখা দিল, কহিলেন, এ বাড়িতে সে আসবে কেন বোন? এদেশে যদি সে ফিরেও আসে, তার অন্য হেতু আছে। কিন্তু সে ত আর সাবিত্রী নয়, সে ত আর নির্বোধ নয়, তোর মত ইহকাল পরকাল এক করে বসে নেই, সে কেন সাধ করে এই ভয়ানক ব্যাধির গারদের মধ্যে ঢুকতে যাবে বল ত?—বলিতে বলিতেই সাবিত্রীর পানে চাহিয়া স্নেহে, শ্রদ্ধায়, করুণায়, বেদনায় তাঁহার গলা কাঁপিয়া গেল।

সাবিত্রী দৃষ্টি আনত করিয়া কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল। একটুখানি সামলাইয়া লইয়া উপেন্দ্র পুনরপি কহিলেন, অথচ আশ্চর্য দ্যাখ্ সাবিত্রী, একসময়ে সে নাকি সত্যি সত্যিই আমাকে ভালবেসেছিল।

শুনিয়া সাবিত্রী সত্যই আশ্চর্য হইল, কারণ এ কথাটা সে সতীশের কাছে শুনে নাই। কহিল, ওঁর কাছে শুনেছিলুম তাঁর স্বামিসেবার কাহিনী—এ কি তবে সত্যি নয় দাদা?

উপেন্দ্র বলিলেন, তাও সত্যি বোন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। তোকে আর সুরোকে না জানলে আমার মনে হত, এমন সেবাও বুঝি আর কোন মেয়েমানুষ পারে না, স্বামীকে এত ভালবাসাও বুঝি আর কারো সাধ্য নয়।

সাবিত্রী কহিল, কিন্তু, এ জিনিস কখনো ছলনা হতে পারে না দাদা।

উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিলেন, না, ছলনা ত নয়। সে ত কখনো কাউকে দেখাতে চায়নি, কখনো কারো কাছে প্রকাশও করেনি। তার পতিসেবার সাক্ষী শুধু ভগবানই ছিলেন, আর ছিলুম আমরা দু'জন—সতীশ আর আমি। পরক্ষণেই তাঁহার ডাক্তার অনঙ্গমোহনের কথা মনে পড়িল। একটু স্থির থাকিয়া বলিলেন, আজ ত আমার কারো উপর রাগ নেই, ঘৃণা নেই, বিতৃষ্ণা নেই—আজ আমার বড় ব্যথার সঙ্গে কি মনে হচ্ছে জানিস দিদি,—মনে হচ্চে সে সারা জীবন শুধু হাতড়েই বেড়িয়েচে, কিন্তু কোন দিন কিছু পায়নি। আমাকেও সে কখনো ভালোবাসে নি। এতটুকু ভালবাসলে কি কেউ এত ব্যথা দিতে পারে? দিবাকর যে আমাদের কি ছিল, সে ত সে জানত! তার হাতেই ত তাকে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম, আমার স্নেহের বস্তুকে সেও স্নেহের চক্ষে দেখবে। উঃ—কত বড় ভুলই হয়েছিল।

উপেন্দ্র কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন, তাই ভাবচি, সতীশ যদি না বুঝে সকলকে নিয়ে এখানেই এসে ওঠে!

সাবিত্রী মাথা নাড়িয়া কহিল, না, সে কিছুতেই হতে পারবে না দাদা, তাঁর বোনের থাকবার ব্যবস্থা তিনিই করুন, কিন্তু এখানে নয়।

উপেন্দ্র কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মুখের কথা মুখেই রহিল, অঘোরময়ী কেমন করিয়া পীড়ার সংবাদ পাইয়া উপেন্দ্রর গুণরাশির বিরাট তালিকা নাকী-সুরে মুখে মুখে রচনা করিতে করিতে কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ঢুকিলেন।

এ পীড়ার সাংঘাতিকতার স্পষ্ট ধারণা তাঁহার বিশেষ কিছু ছিল না, তথাপি এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, এ পোড়ামুখ লইয়া ভিক্ষা করার পথও যখন হতভাগীর জন্য হারাইয়াছে, এবং কিছু একটা ঘটিলে না খাইয়া শুকাইয়া মরাই যখন অনিবার্য, তখন উপীনের সমস্ত বালাই লইয়া তাঁহার মরণ হইতেছে না কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি।

উপেন্দ্র এত দুঃখেও হাসিয়া কহিলেন, খেতে পাবে না কেন মাসী? সাবিত্রীকে দেখাইয়া বলিলেন, আমি গেলেও আমার এই বোনটিকে রেখে গেলুম, তোমাদেব ও কষ্ট দেবে না।

অঘোরময়ী সাবিত্রীকে ইতিপূর্বে দেখেন নাই। সুতরাং কঠোর পরিশ্রমে ও নিরতিশয় মনঃকষ্টে শ্রীহীন এই সম্পূর্ণ অপরিচিত ভগিনীটির পানে চাহিয়া তাঁহার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। কিন্তু, কৌতূহল-নিবৃত্তির উদ্যোগ করিতেই সাবিত্রী কাজের ছুতা করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বৃহস্পতিবার দিন বেলা দশটা-এগারোটার সময় সতীশ জাহাজঘাটে নামিয়া গাড়ি ভাড়া করিতেছিল, দেখিল, বেহারী দাঁড়াইয়া আছে। প্রভুকে দেখিতে পাইয়া সে কাছে আসিয়া প্রণাম করিল। কিরণময়ী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, বেহারীর একবার সন্দেহ হইল হয়ত তিনিই! সে পূর্বে কখনো দেখে নাই, শুধু শুনিয়াছিল ইনি অসাধারণ রূপসী। অথচ রূপের বিশেষ কিছুই এই মলিন বস্ত্র-পরিহিতা সাধারণ রমণীটির মধ্যে খুঁজিয়া না পাইয়া সে এই স্ত্রীলোকটিকে অপর কেহ মনে করিয়া, আস্তে আস্তে বলিল, বাবু,

মা বলে দিলেন, সেই বৌটি যদি এসে থাকে, তাঁকে আর কোথাও রেখে আপনারা দু'জনে বাসায় আসবেন। সঙ্গে আনবেন না যেন।

সতীশ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় শ্রান্তিতে এমনিই বিরক্ত হইয়া ছিল, বেহারীর এই অপমানকর প্রস্তাবটা কিরণময়ীর মুখের উপরেই হইতে শুনিয়া আগুন হইয়া কহিল, কেন শুনি? তাঁকে গাছতলায় বসিয়ে রেখে আমরা বাসায় গিয়ে উঠব? যা বল গে, আমরা কেউ সেখানে যেতে চাইনে।

বেহারীর মুখ চুন হইয়া গেল। কিরণময়ী তখন সরিয়া আসিয়া একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, এ ত ঠিক কথা ঠাকুরপো। এতে রাগ করবার ত কিছু নেই। এখন বাবু কেমন আছেন বেহারী?

বেহারী জবাব দিবার পূর্বেই সতীশ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, কে তোকে বলতে পাঠিয়েছে,—সাবিত্রী? তার ভারী আস্পর্ধা হয়েচে দেখচি।

সাবিত্রীর প্রতি এই রূঢ় ভাষায় ব্যথিত হইয়া বেহারী কিরণময়ীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনি ঠিক বলচেন মা। বাবু না বুঝেই রাগ করচেন। এ-সব খারাপ ব্যারামে কেউ কি সেখানে যেতে চায়? উপীনবাবু কাল রাত্তিরে সাবিত্রী-মাকে ডেকে নিজেই বললেন, ভয় নেই, কিরণ বৌঠান আমার ব্যারামের নাম শুনলে এ বাসায় কেন, এ পাড়ায় ঢুকবেন না। সাবিত্রী-মার মত সকলের ত আর মরা-বাঁচার—

কিরণময়ীর ম্লান মুখখানি ব্যথায় একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। কহিল, এ কথা কি বাবু বলেছিলেন বেহারী?

বেহারী মাথা নাড়িয়া উৎসাহে কি একটা বলিবার উপক্রম করিতেই সতীশ ধমক দিয়া উঠিল, তুই থাম, হতভাগা গাধা।

ধমক খাইয়া বেহারী সংকুচিত হইয়া গেল, কিরণময়ী কহিল, ওর ওপর রাগ করলে কি হবে ঠাকুরপো? তারপরে বেহারীর প্রতি চাহিয়া কহিল, তোমার বাবুকে বলো ভয় নেই, তাঁর হুকুম না পেয়ে আমি সেখানে যাব না। সতীশকে কহিল, ঠাকুরপো, আজ আমাকে কোন হোটেলে রেখে,—একটা ছোট বাড়ি-টাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না?

সতীশ উত্তেজিতভাবে বলিল, কলকাতা শহরে বাড়ির ভাবনা বৌঠান, এক ঘণ্টার মধ্যে আমি সমস্ত ঠিক করে ফেলব। আয় রে দিবাকর, একটু পা চালিয়ে আয়, বলিয়া ডাক দিয়া সে কিরণময়ীকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া নিজে কোচবাক্সে উঠিয়া বসিল।

গাড়ি চলিয়া গেলে ক্ষুব্ধ লজ্জিত বেহারী বিষণ্ণ-মুখে ধীরে ধীরে বাসার দিকে প্রস্থান করিল।

সুবিধা পাইলেই সাবিত্রী সকালে তাড়াতাড়ি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়া যাইত। সতীশ ফিরিয়া আসিবার পরে এ-কয়দিন সে প্রায় নিত্যই গঙ্গাস্নান করিতে আসিত।

দিন-চারেক পরে, একদিন সকালে সে স্নানাহ্নিক করিয়া উঠিয়াই দেখিল, ঘাটের উপরে একটা গোলমাল বাধিয়াছে। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্নানান্তে নামাবলী-গায়ে মন্ত্র আবৃত্তি করিতে করিতে বাড়ি ফিরিতেছিলেন, কোথাকার একটা পাগলী আসিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়াছে। পাছে স্পর্শ করিয়া গঙ্গাস্নানের সমস্ত পুণ্যটা মাটি করিয়া দেয়, এই ভয়ে বৃদ্ধ বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন। পাগলী নির্বন্ধ-সহকারে অদ্ভুত প্রশ্ন করিতেছে, ঠাকুর, ভগবানকে আপনি বিশ্বাস করেন? তাঁকে ডাকলে তিনি আসেন? কি করে আপনারা তাঁকে ডাকেন? আমি পারিনে কেন? আমার বিশ্বাস হয় না কেন?

প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে সংকুচিত হইয়া কহিতেছেন, দেখবি মাগী, পাহারা-ওয়ালা ডাকবো? পথ ছাড়, বলছি।

দুই-চারিজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকও আশেপাশে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখিতেছিল, কে একজন কহিল, পাগল নয়, পাগল নয়, দেখচ না, ছুঁড়ি সারারাত মদ খেয়েছে।

শুনিতে পাইয়া পাগলী কাতর হইয়া কহিল, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে গো, আমি মদ খাইনে। ঐ ওখানে আমার বাসা—আমি শুধু তোমাদের হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করছি ভগবান কি সত্যি আছেন? তোমরা কি তাঁকে ভাবতে পার? ভক্তি করতে পার? আমি পারিনে কেন? আমি ত পরশু থেকে তাঁকে কত ডাকচি! বলিতে বলিতেই তাহার

দুই চোখ বহিয়া দরদর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সাবিত্রীরও তাহাকে পাগল বলিয়াই মনে হইল, কিন্তু তথাপি, এই অপরিচিতা উন্মাদিনীর অশ্রুজল-সিক্ত অদ্ভুত ব্যাকুল প্রার্থনা তাহার আপনার শত-দুঃখ-বেদনাপূর্ণ হৃদয়ের উপর যেন হাহাকার করিয়া পড়িল, এবং মুহূর্তেই তাহারও দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া গেল। পাগলীর দৃষ্টি হঠাৎ এদিকে পড়িতেই সে বৃদ্ধকে ছাড়িয়া সাবিত্রীর সম্মুখে আসিয়া কহিল, তুমিও ত পূজা-আহ্নিক কর, তুমি আমাকে বলে দিতে পার?

চারিদিকে ভিড় জমা হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সাবিত্রী খপ করিয়া তাহার হাত ধরিতেই সে চমকিয়া কহিল, আমাকে আপনি ছুঁলেন?

সাবিত্রী কহিল, তাতে কোন দোষ নেই। আপনি বাড়ি চলুন, পথে যেতে যেতে আপনার উত্তর দেব, বলিয়া হতভাগিনীর হাত ধরিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

দুই-একটা কথা কহিয়াই সাবিত্রী বুঝিল, স্ত্রীলোকটি উন্মাদ নয়, কিন্তু কোন দিকে মন দিবার মতও তাহার মনের অবস্থা নয়, কথার মাঝখানেই সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আমি ভগবানকে দিনরাত জানাচ্চি, তাঁর পায়ে ত আমি অনেক অপরাধ করেচি, তাই তাঁর ব্যামো আমাকে দিয়ে তাঁকে ভাল করে দাও। আচ্ছা ভাই, এ কি হতে পারে? উপোস করে দিনরাত ডাকলে কি সত্যি সত্যিই তাঁর দয়া হয়? তুমি জানো? বলিয়া সে তীব্র-দৃষ্টিতে সাবিত্রীর মুখের প্রতি চাহিল।

সাবিত্রী কি যে জবাব দিবে, তাহা ভাবিয়াই পাইল না। কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, পরক্ষণেই সে সাবিত্রীর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, যাই আমি গঙ্গাস্নান করে আসি। গঙ্গাস্নানে অনেক পাপ কেটে যায়—না? বলিয়া সে উত্তরের জন্য প্রতীক্ষামাত্র না করিয়াই যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে দ্রুতবেগে চলিয়া গেল।

পঁয়তাল্লিশ

সাবিত্রীর দুই চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারা নামিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আজ তাহারই ক্রোড়ের উপর উপেন্দ্র মৃত্যুশয্যা বিছাইয়াছে। শীর্ণশীতল পা-দুখানির উপর মুখ গুঁজিয়া দিবাকর নিঃশব্দ-রোদনে অন্তরের অসহ্য দুঃখ নিবেদন করিয়া দিতেছে। তাহার পরিতাপ, তাহার ব্যথা, অন্তর্যামী ভিন্ন আর কে জানিবে! ও-ঘরে মহেশ্বরী ভূমিশয্যায় পড়িয়া বিদীর্ণ-কণ্ঠে কাঁদিতেছেন। এই সর্বগ্রাসী শোকের মধ্যে শুধু সতীশই একা স্থির হইয়া পাশে বসিয়া আছে।

আজ সকাল হইতে উপেন্দ্রর মুখ দিয়া রহিয়া রহিয়া যে রক্তধারা পড়িতেছে, সহস্র চেষ্টাতেও তাহা রোধ করা গেল না। নিশ্বাস ক্রমশঃই ভারী এবং কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। তাহারই দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করিয়া উপেন্দ্র নিমীলিত-নেত্রে নিঃশব্দে পড়িয়া ছিলেন এবং চক্ষু মেলিয়া সাবিত্রীর মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুটে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত কত দিদি, এ কি ফুরোবে না?

সাবিত্রী আঁচল দিয়া তাহার ওষ্ঠপ্রান্তের রক্ত-রেখা মুছিয়া লইয়া হেঁট হইয়া কহিল, আর বেশী বাকী নেই দাদা! এখন কি বড্ড কষ্ট হচ্চে?

উপেন্দ্র বলিল, না দিদি, সকলের যা হয় তাই হচ্চে, বেশী হবে কেন?

একটু স্থির থাকিয়া তেমনিভাবে বলিলেন, সতীশ, বৌঠানকে কি খুঁজে পাওয়া গেল না?

আজ চার দিন হইতে কিরণময়ী সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। কলিকাতায় পৌঁছিবার দিনই সতীশ কাছাকাছি বাসা ভাড়া করিয়া, দাসী নিযুক্ত করিয়া, সমস্ত আবশ্যকীয় আয়োজন ঠিক করিয়া দিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু উপেন্দ্রর পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় সে দুই-তিন দিন নিজে যাইয়া খোঁজ লইতে পারে নাই। তিন দিন পরে গিয়া দেখিল কোন জিনিস সে স্পর্শ করে নাই। নূতন হাঁড়িটা কিনিয়া যেখানে রাখিয়া দিয়া আসিয়াছিল সেটা সেইখানে সেই অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। চুলার গায়ে একবিন্দু কালির দাগ পর্যন্ত নাই।

ঝি আসিয়া বলিল, কাজ কার করব বাবু? বৌমা সেই যে এসে জানলার গরাদে ধরে রাস্তার পানে চেয়ে বসল, আর উঠল না, চান করলে না, মুখে জল দিলে না—পাতা-বিছানা পড়ে রইল, উঠে এসে একবার শুলে না। তার পরে কাল সকাল থেকে ত আর দেখ্‌চি নে। জিনিসপত্তর কি করবে বাবু কর, আমি খালি ঘরে পাহারা দিয়ে থাকতে পারব না।

খবর শুনিয়া সতীশ মাথায় হাত দিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে ঝির হাতে আরও পাঁচটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল। সেই অবধি লোক দিয়া অনুসন্ধানের ত্রুটি করে নাই, কিন্তু ফল হয় নাই।

সমস্ত কথাই উপেন্দ্রর কানে গিয়াছিল।

সাবিত্রীর অত্যন্ত ব্যথার সহিত মাঝে মাঝে মনে হইত, সেদিন সকালে গঙ্গার ঘাটে যাহাকে দেখিয়াছিল, সে-ই কিরণময়ী নয় ত? কিন্তু কিরণময়ী যে অসামান্য সুন্দরী! সে পাগলীটার মধ্যে রূপ থাকিলেও তাহাকে সুন্দরী বলা ত যায় না!

কিন্তু সে কেন গেল, কোথায় গেল, কি জন্যে গেল?

উপেন্দ্রর প্রশ্নের উত্তরে সতীশ শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

আর তিনি কোন প্রশ্ন করিলেন না, এবং পরক্ষণেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। এইভাবে বাকী রাত্রিটুকুর অবসান হইল।

বেলা দশটার পর আবার একবার চোখ মেলিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া হঠাৎ যেন চিনিতে পারিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ও কে, সরোজিনী?

সরোজিনী মেজের উপর হাঁটু গাড়িয়া শয্যার উপর মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। উপেন্দ্র আস্তে আস্তে ডান হাতটি তুলিয়া তাহার মাথার উপর রাখিয়া বলিলেন, এসেচ দিদি? তোমাকেই আমি মনে মনে খুঁজছিলাম, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিলাম না—আজ না এলে হয়ত আর দেখাই হতো না, বলিয়া আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল, আজ আর সব কথা স্মরণ করিবার তাঁহার শক্তি নাই। হঠাৎ যেন মনে পড়ায় ডাকিলেন, সতীশ কৈ রে?

ও-ধারের জানালা ধরিয়া সতীশ বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই উপেন্দ্র বলিলেন, তোদের বিয়েটা আমার চোখে দেখে যাবার সময় হলো না সতীশ, কিন্তু এই লক্ষ্মী বোনটিকে আমার তুই কোনদিন দুঃখ দিসনে। তোর ডান হাতটা একবার দে ত রে, আয়, আমিই তোদের প্রথম পুরুতের কাজ করে যাই। বলিয়া নিজের কঙ্কালসার হাতখানি উপরের দিকে তুলিলেন। সাবিত্রীর আনত মুখের পানে চাহিয়া মুহূর্তের জন্য সতীশের বুকের ভিতরটায় ধক্‌ করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে হাত বাড়াইয়া উপেন্দ্রর কম্পিত হাতখানি নিজের বলিষ্ঠ দক্ষিণ হাতের মধ্যে ধরিয়া ফেলিল।

উপেন্দ্র মনে মনে জগৎতারিণীর কথা স্মরণ করিয়া বলিলেন, সতীশ, তুই সরোজিনীর মাকে ত জানিস। তাঁর কাছে আমি জোর করে কথা দিয়েছিলুম যে, আমার সতীশ ভাইটিকে তোমাকেই দেব। দেখিস রে, আমার মরণের পরে কেউ যেন না বলতে পারে আমার কথা তুই রাখিস নি।

সতীশ চোখের জল আর সামলাইতে পারিল না, কাঁদিয়া কহিলেন, না উপীনদা, এ কথা কেউ বলবে না তোমার কথা আমি অবজ্ঞা করেছি কিন্তু তবু ত গোপন করা চলে না—আমার সকল কথাই ত খুলে বলা দরকার। আমি ভাল নই, বহু দোষ, বহু-অপরাধে অপরাধী—তবু কেমন করে সরোজিনী আমাকে গ্রহণ করবেন। বরঞ্চ আমাকে তুমি এ অধিকার দিয়ে যাও যেন কারও ভয়ে, কোন লোভে, কোন দুর্বলতায় তাকে না অস্বীকার করি, যে আমাকে ভালবাসতে শিখিয়েছে: বলিয়া সে সাবিত্রীর মুখের প্রতি মুখ তুলিতেই দুজনের চারি চক্ষের দেখা হইয়া গেল। কিন্তু তখনই উভয়ে দৃষ্টি আনত করিল।

উপেন্দ্র হাসিলেন, বলিলেন, আজও কি সে কথা আমার জানতে বাকী আছে সতীশ? আমি সব জানি। সমস্ত জেনেই তোদের আমি এক করে দিয়ে গেলুম।

সতীশ বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমাকে নিয়ে কি সরোজিনী সুখী হতে পারবেন?

জবাব দিতে গিয়া উপেন্দ্র সাবিত্রীর মুখের পানে একবার চাহিবামাত্রই সাবিত্রী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, সে ভার আমি নিলুম দাদা,—তুমি নিশ্চিন্ত হও।

উপেন্দ্র কথা কহিলেন না, শুধু নির্নিমেষ-চক্ষে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, আসক্তির বন্ধন আর তোমার জন্যে নয়, সাবিত্রী। দুর্ভাগ্য যদি তোমাকে কুলের বাইরেই এনে ফেলেচে বোন, আর তার ভেতরে যেতে চেয়ো না। চিরদিন বাইরে থেকেই তাকে বুকে করে রেখো, এই আমার অনুরোধ।

শুনিয়া পাষাণ-মূর্তির মত সাবিত্রী নতনেত্রে বসিয়া রহিল। আজ সতীশ আর একজনের, তাহার উপর আর তাহার লেশমাত্র অধিকার রহিল না। তাহার ভাবনার, তাহার বাসনার, তাহার পরম সুখের, চরম দুঃখের, তাহার সুদুঃসহ বেদনার আজ তাহার চোখের উপরেই সমাধি হইল, কিন্তু ক্ষুদ্র একটা নিঃশ্বাস পর্যন্ত সে পড়িতে দিল না। ব্যথায় বুকের ভিতরটা মুচড়াইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু সর্বংসহা বসুমতী যেমন করিয়া তাঁহার অন্তরের দুর্জয় অগ্ন্যুৎপাত সহ্য করেন, ঠিক তেমনি করিয়া সাবিত্রী অবিচলিত মুখে সমস্ত সহ্য করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

উপেন্দ্র তাহার অবনত মুখের প্রতি পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আমি সমস্তই টের পাচ্ছি বোন, কিন্তু বইতে না পারলে কি এ ভার তোকে দিয়ে যেতাম রে?

প্রত্যুত্তরে সাবিত্রী শুধু তাঁহার কপালের চুলগুলি নাড়িয়া দিল।

অকস্মাৎ সতীশ চীৎকার করিয়া উঠিল, অ্যাঁ, এ যে বৌদি?

সাবিত্রী চমকিয়া মুখ তুলিয়া দেখিল, এ সেই গঙ্গার ঘাটের পাগলী। পা টিপিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে ঘরে ঢুকিতেছে। চক্ষের পলকে ঘরটা একেবারে চকিত হইয়া উঠিল।

কিরণময়ীর সুদীর্ঘ রুক্ষ চুলের রাশি মুখে, কপালে, পিঠের উপর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে; পরনের বস্ত্র ছিন্ন মলিন, চোখে শূন্য তীব্র চাহনি—এ যেন কোন উন্মাদ শোকমূর্তি ধরিয়া সহসা ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সতীশের পানে চাহিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, খুঁজে আর পাইনে ঠাকুরপো। কত লোককে জিজ্ঞাসা করি, কেউ কি ছাই বলে দিতে পারলে না বাড়িটা কোথায়। আজ কালীবাড়ি থেকে আসছিলুম, ভাগ্যে বেহারীর সঙ্গে পথে দেখা হলো—তাই তার পেছনে পেছনে আসতে পারলুম।

উপেন্দ্রের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কেমন আছ ঠাকুরপো? উপেন্দ্র হাত নাড়িয়া জানাইল—ভাল নয়।

কিরণময়ী অত্যন্ত বেদনার সহিত কহিল, মরে যাই! সুরবালা আর নেই শুনে আমি কেঁদে বাঁচিনে। সেই ত আমার গুরু! সেই ত আমাকে বলেছিল, ভগবান আছেন! তখন যদি তার কথাটা বিশ্বাস হতো! সহসা তাহার চক্ষু দিবাকরের পাণ্ডুর মুখের উপর পড়িতেই বলিয়া উঠিল, আহা! তুমি কেন অমন কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছ ঠাকুরপো, তোমাকে কি এরা লজ্জা দিচ্ছে? বলিয়াই উপেন্দ্রর প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, ওকে তোমরা দুঃখ দিয়ো না ঠাকুরপো, আমার হাতে যেমন ওকে সঁপে দিয়েছিলে, সে সত্য একদিনের জন্যে ভাঙ্গিনি—ওকে প্রাণপণে রক্ষে করে এসেচি। কিন্তু আর আমার সময় নেই—এবার ওকে তুমি ফিরিয়ে নাও।

হঠাৎ শান্ত হইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আমার আঁচলে মা কালীর প্রসাদ বাঁধা আছে ঠাকুরপো, একটু খাবে? হয়ত ভাল হয়ে যাবে। শুনেচি এমন কত লোকে ভাল হয়ে গেছে।

একদিন যে রমণীর রূপেরও সীমা ছিল না, বিদ্যা-বুদ্ধিরও অবধি ছিল না, এ সেই কিরণময়ী, আজ সে কি বলিতেছে, সে নিজেই জানে না।

সতীশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঃ—করিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল এবং এতদিনের পর উপেন্দ্রর চোখ দিয়া কিরণময়ীর জন্য জল গড়াইয়া পড়িল।

কিরণময়ী হেঁট হইয়া আঁচল দিয়া অশ্রু মুছাইয়া দিয়া কহিল, আহা কেঁদো না ঠাকুরপো, ভাল হয়ে যাবে।

এইবার সাবিত্রীর প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিল,

সেদিন তোমার সঙ্গেই গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়েছিল না গা? একটু সর না ভাই, তোমার মত আমিও একটু ঠাকুরপোকে কোলে নিয়ে বসি!

সরোজিনী তাহার হাত ধরিয়া কহিল, আমাকে চিনতে পার বৌদি?

কিরণময়ী অত্যন্ত সহজ গলায় বলিল, পারি বৈ কি। তুমি ত সরোজিনী।

সরোজিনী কহিল, চল বৌদি, আমরা ও-ঘরে গিয়ে একটু গল্প করি গে,—বলিয়া এক রকম জোর করিয়াই পাশের ঘরে টানিয়া লইয়া গেল।

তাহারা গৃহের বাহির হইতে না হতেই উপেন্দ্রর সংজ্ঞা লোপ হইল। বোধ করি পরিশ্রম ও উত্তেজনা তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল। সাবিত্রী তেমনি কোলে করিয়াই বসিয়া রহিল, আর সে জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিবার জন্য উঠিল না।

সমস্ত দুপুরবেলাটা অজ্ঞান অবস্থায় কাটিল, কিন্তু সন্ধ্যার পর জ্বর-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আবার তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল।

চোখ মেলিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল, সাবিত্রী। ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, বসে আছিস বোন? তোকে ছেড়ে যেতেই আমার চোখে জল আসে সাবিত্রী।

সাবিত্রী কাঁদিয়া কহিল, আমাকেও তুমি সঙ্গে নাও দাদা।

উপেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া সতীশকে বলিলেন, বৌঠান কোথায় রে?

সতীশ বলিল, নীচের ঘরে ঘুমুচ্চেন, তাঁকে আমি চোখে চোখেই রেখেছি।

চোখে চোখেই রাখিস ভাই, যতদিন না আবার প্রকৃতিস্থ হন। কিন্তু তোর ভয় নেই সতীশ, ওঁর অন্তরের আঘাত যে কত দুঃসহ, সে উপলব্ধি করার শক্তি নেই আমাদের, কিন্তু সে যত নিদারুণ হোক, অতবড় বুদ্ধিকে চিরদিন সে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারবে না।

সতীশ বলিল, সে আমি জানি উপীনদা! ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তোমার দিবাকরের ভারও আমি নিলাম যদি বিশ্বাস করে দিয়ে যাও।

প্রত্যুত্তরে উপেন্দ্র শুধু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। অনেক কথা, অনেক উত্তেজনা জীবন-দীপের শেষ তৈলকণাটুকু পর্যন্ত পুড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিল। অল্পক্ষণেই দেখা গেল মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে, নিঃশ্বাস আছে কিনা সন্দেহ।

ধরাধরি করিয়া সকলে নীচে নামাইয়া ফেলিল—উপেন্দ্রর নিষ্পাপ বিরহ-জর্জর প্রাণ তাঁহার সুরবালার উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

তখন সকলের বিদীর্ণ কণ্ঠের গগনভেদী ক্রন্দনে সমস্ত বাড়িটা কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু নীচের ঘরে কিরণময়ী নিরুদ্বেগে ঘুমাইতেই লাগিল।